সচিত্র মাসিক বসুমতী

১৭শ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৪৫ সাল—কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, [illegible] নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৭শ বর্ষ] ১৩৪৫ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

কবিতা ঃ—

উপন্যাস ঃ—

প্রাণি-জগৎ ঃ—

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র — পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিগণের চিত্র ঃ—

বিশিষ্টগণের চিত্র ঃ—

মঠ ও মন্দির চিত্র ঃ—

দেবদেবীর চিত্র ঃ—

ভারতীয় মহিলা চিত্র ঃ—

যুদ্ধ চিত্র

শক্তিসাধনার চিত্র ঃ—

ফিল্ম চিত্র

বৈজ্ঞানিক চিত্র

বিভিন্ন দেশের নর-নারীর চিত্র

শিল্প-চিত্র

কংগ্রেস চিত্র

চিত্র	পত্রাঙ্ক

দৃশ্যচিত্র

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক চিত্রসূচী

প্রতীক্ষা

শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৭শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩৪৫ [১ম সংখ্যা

গীতা-বিচার

৭

চতুর্থ প্রশ্নে যে 'ঘ' অনুপ্রশ্ন—চতুর্থ অনুপ্রশ্ন, এবারে তাহারই বিচার। শাস্ত্রে ও বেদে ভেদ আছে কি না? ইহাই (ঘ) অনুপ্রশ্ন। এই অনুপ্রশ্নের সহিত (খ) অনুপ্রশ্নের বিচারের সম্বন্ধ আছে, ঐ বিচারে ('বসুমতী' শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) 'শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য' এবং 'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।' এই দুইটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, 'কেবল বেদের প্রতি নহে, তৎকাল-প্রচলিত শাস্ত্রমাত্রের প্রতিই এই যে শ্রদ্ধা' ইত্যাদি। অতএব 'বেদও যে শাস্ত্রের অন্তর্গত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অভ্রান্ত কি না?' এই সংশয়ের নিরাকরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভগবান্ মনুর বচনানুসারে বুঝিতে হয় শাস্ত্র দ্বিবিধ—সৎ এবং অসৎ। মনুসংহিতা একাদশ অধ্যায়ে পাপ কার্য্যের শ্রেণী-বিভাগ, সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ এবং প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ আছে।

গোহত্যা প্রভৃতি কতিপয় পাপকার্য্য উপপাতকমধ্যে পরিগণিত। 'অসৎশাস্ত্রাভিগমন' তন্মধ্যে একটি।

গোবধোঽযাজ্যসংযাজ্য-পারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।

* * * *

অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া॥

ধান্যকুপ্যপশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।

স্ত্রীশূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্॥

৬০-৬৭।

গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, ইত্যাদি কতিপয় কার্য্যের পরে উল্লিখিত হইয়াছে, অসচ্ছাস্ত্রাভিগমন, যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদিতে অভিনয় প্রদর্শন দ্বারা অর্থার্জ্জন, ধান্য, তাম্র লৌহাদি দ্রব্য এবং পশুর অপহরণ, মদ্যপায়িনী স্ত্রীর সহবাস, স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, বৈশ্যহত্যা, ক্ষত্রিয়হত্যা এবং নাস্তিক্য—এই সমস্ত কার্য্য উপপাতক-মধ্যে গণ্য।

এই অসচ্ছাস্ত্রাভিগমন—অর্থাৎ অসৎশাস্ত্রাভিগমন কি?—ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে শব্দমধ্যস্থিত দুই পদের অর্থ স্থির করা আবশ্যক। মনুভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন,—

'অসচ্ছাস্ত্রাণি—চার্ব্বাকনির্গ্রন্থা যত্র ন প্রমাণং ন বেদ-কর্ম্ম ফলসম্বন্ধমাপদ্যতে।'

চার্ব্বাকদর্শন ও দিগম্বর (জৈন) শাস্ত্র প্রভৃতি (নির্গ্রন্থাঃ এই বহুবচন প্রয়োগ ও তাহার পরবর্ত্তী ব্যাখ্যা হইতেই অনুবাদে প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি) যাহাতে প্রমাণ নাই—শ্রুতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা যাহা সমর্থিত

নহে,—তাহাই অসচ্ছাস্ত্র, কিন্তু তাহার অভিগম কি, তাহার কোন ব্যাখ্যা বা প্রতিশব্দ মেধাতিথি-ভাষ্যে নাই। কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন, 'শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধশাস্ত্র-শিক্ষণম্' অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ শাস্ত্রই অসচ্ছাস্ত্র, আর অভিগম শব্দের অর্থ শিক্ষা। কুল্লূক ভট্ট-লিখিত শিক্ষা শব্দের অর্থ বর্ত্তমান সময়ে অনুভব করা কঠিন,—বস্তুতঃ শিক্ষা ও অভিগম একই, অসচ্ছাস্ত্রে আত্ম-সমর্পণই এই অভিগম—শিক্ষাও ঐরূপ।

এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ হইলেও তাহা শাস্ত্রমধ্যে গণ্য, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। শাস্ত্র হইলেও তাহা অসৎ—অশিক্ষণীয়, তাহার শিক্ষায় গোহত্যা, স্ত্রীহত্যার ন্যায় পাতক হইয়া থাকে।

মনু স্মৃতি ও দর্শন সম্বন্ধেও ঐরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন,

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ যাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥

১২ অঃ।

'বেদবাহ্যাঃ বেদবিরুদ্ধাঃ,' 'কুদৃষ্টয়ঃ অসত্তর্কদর্শনানি'।

(মেধাতিথি)

'যাঃ স্মৃতয়ো বেদমূলা ন ভবন্তি চৈত্যবন্দনাৎ স্বর্গো ভবতীত্যাদি বাক্যানি। যানি বাসত্তর্কমূলানি বেদ-বিরুদ্ধানি চার্ব্বাকাদিদর্শনানি। (কুল্লূক)

অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ বা অ-বেদমূলক যে স্মৃতি আর যে সকল অসৎ-তর্কমূলক দর্শন ইহলোকে তাহা নিষ্ফল, এবং পরলোকে নরকভোগ তাহার পরিণাম।

ধর্ম্মের প্রমাণরূপে যে স্মৃতি-মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, ইহা সে স্মৃতি নহে,—সে স্মৃতির পরিচয় 'ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।'

(২ অঃ)

সে স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, অতএব তাহা বেদবাহ্য নহে, কারণ, 'স্মৃতি-বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং শীলে চ তদ্বিদাম্' (মনু ২য়) বেদজ্ঞ-গণের স্মৃতি ও চরিত্র ধর্ম্মের প্রমাণ। 'বেদজ্ঞগণের' এই যে বেদের বিশেষভাবে উল্লেখ, তাহাই বেদমূলকত্বের নিদর্শন।

অতএব মনুবচনে যাহা বেদবাহ্য স্মৃতি এবং 'কুদৃষ্টি' শ্রৌত-স্মার্ত্তধর্ম্মবিরোধী অসৎতর্কমূলক দর্শন—তাহাই তাঁহারই বচনান্তরে 'অসচ্ছাস্ত্র'—অসৎ শাস্ত্র নামে নিন্দিত।

তাহার শাস্ত্রসংজ্ঞার হেতু—তদ্দারাও অনেকে শাসিত—অর্থাৎ উপদিষ্ট হয়। সে উপদেশ নিষ্ফলই হউক আর পরকালে নরকভোগের কারণই হউক, লোকে যখন তাহার শাসন মানে, তখন তাহাকে শাস্ত্র বলা অসঙ্গত নহে। ইহাই বোধ হয় মনুর অভিপ্রায়। এই শাব্দিক ব্যুৎপত্তি-মূলক অর্থ অনুসরণেই বেদবাহ্য স্মৃতির উল্লেখ করিতেও মনু কুণ্ঠিত হ'ন নাই। বেদার্থস্মরণমূলক সে স্মৃতি না হইলেও তাহাদিগের পরম্পরাপ্রাপ্ত আচারস্মরণমূলক, সেই জন্য 'স্মর্য্যতেঽনেন' এই ব্যুৎপত্তি আশ্রয়ে চৈত্যবন্দনাদি জৈন বাক্যও 'স্মৃতি' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু গীতামধ্যে শাস্ত্র বা স্মৃতিবিষয়ে এরূপ ভাবের অস্পষ্ট ইঙ্গিতও নাই। গীতামধ্যে বেদ, ত্রয়ী, ছন্দঃ, বেদান্ত এবং শাস্ত্র ইহারই স্পষ্ট উল্লেখ আছে; কিন্তু শাস্ত্র যে কি? তাহার নির্দ্দেশ নাই।

স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকায়—মতভেদ উপস্থিত,—(১) এক নবীন সম্প্রদায় বলেন, শাস্ত্র শব্দের অর্থ—এই শ্রীমদ্ ভগবদ্-গীতা, (২) অপর এক সম্প্রদায় বলেন, বেদব্যতিরিক্ত তৎকালপ্রচলিত দর্শনও ধর্ম্মশাস্ত্র। (৩) প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন, শাস্ত্রশব্দের অর্থ চতুর্দ্দশ বিদ্যা,

পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥

—যাজ্ঞবল্ক্য ১ম।

(১) প্রথম মতে যুক্তি এই যে, স্বয়ং ভগবান্ গীতার উপদেষ্টা, তিনি 'বেদান্তকৃৎ' বলিয়া যখন আত্মপরিচয় দিয়াছেন, 'বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্' (গীতার ১৫অঃ ১৫ শ্লোক) এবং অর্জ্জুন 'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং' বলিবার পর যে শাসন—অর্থাৎ উপদেশ—যাহার দ্বারা প্রচারিত তাহাই যে শাস্ত্র—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

(২) দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন,—গীতার প্রথমাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

—গীতা ১।৩৯-৪১।

ধর্ম্ম—কুলধর্ম্ম, অধর্ম্ম—স্ত্রীদোষ, বর্ণসঙ্কর, নরক, পিণ্ড-লোপ ও জললোপ—এ বিষয়ে যে অর্জ্জুনের শাস্ত্রমূলক আশঙ্কা, তাহার মূল গীতা নহে। কারণ, গীতা তখন উপদিষ্টই হয় নাই। যে উপদেশ দ্বারা অর্জ্জুন এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, তাহাকে শাস্ত্র না বলা কদাচ সঙ্গত নহে। কিন্তু সেই শাস্ত্র বর্ত্তমানে যে নামে পরিচিতই হউক—তাহা যে বেদ নহে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কারণ, আর্ষগ্রন্থেই দেখিতে পাই,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিমাশ্রয়ন্তে
ভগ্নাঃ কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি॥

—অত্রিসংহিতা ৩৭৫ শ্লোক।

অর্থাৎ বেদে বঞ্চিত হইয়া শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে জ্ঞান না হইলে পুরাণ পাঠ করে,—তাহাতে কিছু না হইলে, কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে, পরে ভগ্নাঃ কৃষের্ভাগবতা ভবন্তি।'

মৎস্যপুরাণে ৬৬ অধ্যায়ে আছে—

বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥

বেদ এবং শাস্ত্রসকলকে পৃথগ্ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, অতএব বেদ শাস্ত্রমধ্যে গণনীয় নহে।

(৩) শাস্ত্র এবং আগমঃ—পুংলিঙ্গ আগম শব্দ একার্থক, মেদিনী প্রভৃতি অভিধান তাহার প্রমাণ।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৬৮ অধ্যায়ে আছে, 'আগমো বেদবাদাশ্চ তর্কশাস্ত্রাণি চাগমঃ॥

ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ—

যদন্যদ্ বেদবাদেভ্যস্তদশাস্ত্রমিতি শ্রুতিঃ।

—ঐ অধ্যায় ৫৯।

বেদই প্রকৃত শাস্ত্র, তদনুগত স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রমধ্যে গণ্য। যাহা বেদবাদ হইতে ভিন্ন—তাহা অশাস্ত্র। যাহা মনু-বচনে অসচ্ছাস্ত্র (অসৎ-শাস্ত্র) মহাভারত-বচনে তাহাই 'অশাস্ত্র'। গীতায় এই অশাস্ত্র শব্দপ্রয়োগও আছে,—

'অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ'-

—গীঃ ১৭ অঃ ৫।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'ন শাস্ত্রবিহিতং' যাহা শাস্ত্রবিহিত নহে,—এ অর্থে এখানে 'অশাস্ত্র' শব্দের প্রয়োগ হয় না বটে, কিন্তু শাস্ত্র শব্দ যে বেদেরও বোধক, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। নতুবা স্বীকার করিতে হয়, বেদ-বিহিত তপস্যারও ভীষণ পরিণাম। এ কথা শঙ্করাচার্য্য গীতামুখে ভাষ্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন ইহা অতিবড় নাস্তিকেও বলিতে পারে না।

শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যায় 'অশাস্ত্র' শব্দ এস্থানে অসচ্ছাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত ইহা সমর্থিত হয়। যথা—"যে পুনরত্যন্তং মন্দ-ভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তঃ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভূতভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি।"

'পাষণ্ডসঙ্গেন তদাচারানুবর্ত্তিনঃ' এই অংশই অশাস্ত্র শব্দ যে অসচ্ছাস্ত্র (অসৎ শাস্ত্র) অর্থে প্রযুক্ত, তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে।

যাহা হউক—শাস্ত্র দ্বারা যে বেদকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না।

তবে যে অত্রিসংহিতা ও মৎস্যপুরাণে বেদ পৃথক্ উল্লিখিত, তাহার কারণ, বেদের প্রাধান্য। জনসভায় যিনি সভাপতি তিনি 'জন' হইলেও তাঁহার যেমন পৃথক্ নির্দ্দেশ সভাপতিরূপেই হইয়া থাকে,—সেইরূপ বেদ শাস্ত্রমধ্যে নিবিষ্ট হইলেও—'বেদ' এই প্রাধান্যসূচক আখ্যাতেই তাঁহার উল্লেখ হইয়াছে।

অতএব 'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে' ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত গীতাবচনে শাস্ত্র শব্দ বেদ ও তন্মূলক স্মৃতি দর্শনের বোধক, কেবল গীতার বোধক নহে ; বেদ ব্যতীত স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রেরও বোধক নহে।

এরূপ হইলেও শাস্ত্র ও বেদে ভেদ আছে, যাহা শাস্ত্র তাহাই বেদ নহে, বা যাহা বেদ তাহাই শাস্ত্র নহে। স্মৃতি-ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং সৎ দর্শনশাস্ত্র শাস্ত্র হইলেও বেদ নহে, এবং যাহা বেদ কেবল যে তাহাই শাস্ত্র—এরূপ নহে, বেদ ব্যতীত শাস্ত্রও আছে।

যাহা বলা হইয়াছে—তাহাতেই গীতার শাস্ত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্পষ্টই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, বেদ এবং তদনুগত স্মৃতি ও দর্শনই শাস্ত্র, গীতাও তাহার অন্তর্গত। যাহা বেদ-বিরুদ্ধ, তাহা অশাস্ত্র। কিন্তু শাস্ত্রশব্দ ব্যাপক অর্থে এবং বেদশব্দ ব্যাপ্য অর্থে প্রযুক্ত এইমাত্র ভেদ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্যামপুকুরে ও তাঁহার চিকিৎসা

কলিকাতায় ঠাকুরের থাকিবার জন্য রাম, সুরেন্দ্র প্রভৃতি শোভাবাজার রাজাদের ঘাটের পূর্ব্ব দিকে, বাগবাজার দুর্গাচরণ মুখুয্যের ষ্ট্রীটে, একখানি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিলেন। ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া সেই বাড়ী দেখিয়াই বলিলেন, "আমাকে কি তোমরা গঙ্গাযাত্রা করিয়াছ না কি ? এই বাড়ীতে আমি থাকিব না।" সে বাড়ী অপছন্দ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তিনি বলরাম বাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেইখানে ঠাকুর কয়েকদিন থাকিলেন—প্রতাপ মজুমদার চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু শরীর এখন এমন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দানাও সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। যাহা হউক, প্রায় এক পক্ষকাল বলরামের বাটীতে বাস করিবার পর—ঠাকুরের জন্য শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে শিব ভট্টাচার্য্যের বৈঠকখানা-বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল ও ঠাকুর সেইখানেই আসিয়া রহিলেন। কয়েকদিন পরে প্রতাপ ডাক্তার বলিলেন, পরামর্শের জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে আনিলে ভাল হয়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের কলিকাতা শাঁখারিটোলাতে বাড়ী। তিনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এম, ডি ডিগ্রী গ্রহণ করেন। এলোপ্যাথিক ডাক্তার হওয়ায় প্রথমে ইনি হোমিওপ্যাথির বিরোধী ছিলেন; কিন্তু পরে বহুবাজারের ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্তের প্রভাবে তিনি হোমিওপ্যাথিক-ভক্ত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বহুবাজার ষ্ট্রীটে Indian Association for the Cultivation of Science নামে প্রতিষ্ঠানটি আরম্ভ করিয়া তাহাতে নিজেই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্রলাল কলিকাতার শেরিফ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি C. I. E. উপাধি পান ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে D. L. উপাধি দান করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়।

ইতোমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুরকে একদিন মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ীতে দেখাইবার জন্য লইয়া
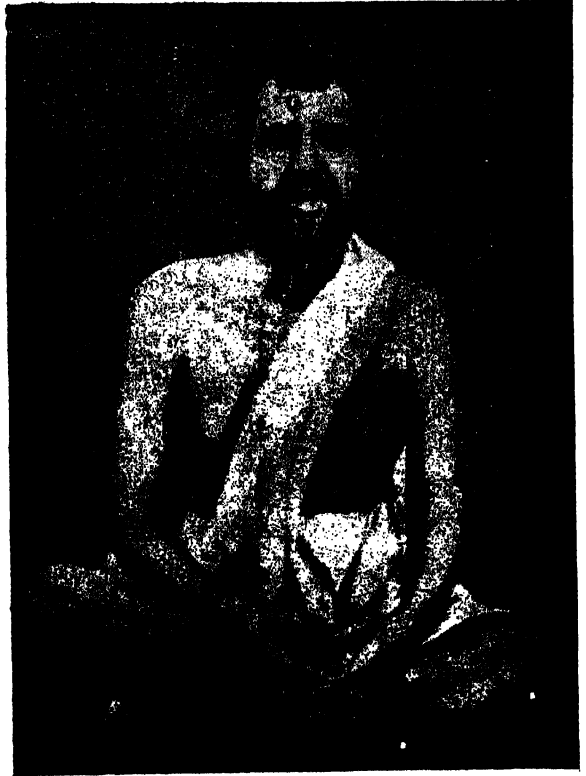
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

যাওয়া হইয়াছিল গলা দেখিবার সময় তিনি ঠাকুরের জিহ্বা এমন টিপিয়া ধরিয়াছিলেন যে, ঠাকুর—অন্য ডাক্তার দেখিতে আসিলেই সেই যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া বলিতেন, "জিহ্বা টিপেছিল যেমন গরুর জিহ্বা লোকে টিপে ধরে।" মহেন্দ্রলাল বড়ই গর্ব্বিত ও অপ্রিয়ভাষী ছিলেন,

কাহারও খাতির করিয়া কথা বলিতেন না। ডাক্তার সরকার যখন ইতঃপূর্ব্বে জানবাজারের মথুর বিশ্বাসের চিকিৎসা করিতেন, তখন সেইখানে পরমহংস দেবকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং মনে মনে ঠাকুরকে মথুরের সাধারণ পোষ্য-মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহাকে মথুরের পরমহংস বলিয়া তৎসম্বন্ধে এক হীন ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্যামপুকুরের বাড়ীখানি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উপর, দক্ষিণ খোলা। উপরে ৪খানি ঘর—দুইখানি বড়, দুইখানি ছোট। বড় একখানিতে ঠাকুরকে রাখা হইল—অন্য ঘরটিতে ভক্তরা বসিতেন। ছোট দুইখানির একখানিতে সেবক-

শ্যামপুকুরের বাড়ী

ভক্তরা রাত্রে থাকিতেন। অন্য ঘরটিতে শ্রীমা থাকিতেন। চিলের ঘর একটু ছোট ছিল, তাহাতে রান্না হইত এবং দিবা ভাগে শ্রীমা সেইখানে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। প্রথমে ভক্ত ব্রাহ্মণী গোলাপ আসিয়া রন্ধনাদি করিতে লাগিলেন। শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। অল্প কিছু দিন মধ্যে তাঁহাকে রাম বাবুরা হাতে পায় ধরিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য লইয়া আসিলেন। বাড়ী ভাড়া ও সেবার ব্যয় রাম, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, গিরিশ প্রভৃতি বহন করিতে লাগিলেন। কালীপদ ঘোষের বাড়ী অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুরের সেবার জন্য বিশেষ ভাবে যোগীন, লাটু, নিরঞ্জন, রাখাল, কালী, শশী ও বুড়ো গোপাল রহিয়া গেলেন। নরেন্দ্র ইঁহাদের নেতৃস্বরূপে প্রায় আসিতেন ও খোঁজ খপর করিতেন। নরেন্দ্র এখন বি,এ পাশ করিয়া বি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তাঁহার সংসারের অভাব তেমনই অপরিবর্ত্তিতই ছিল। কোথাও কোন কায-কর্ম্ম আর তিনি যোগাড় করিতে পারিলেন না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর থাকিতে থাকিতে একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরকে ধরিয়াছিলেন যে, তিনি যেন মা ভবতারিণীকে তাঁহার দুঃখের কথা জানান। ঠাকুর তাহাতে নরেন্দ্রকে স্বয়ং গিয়া মাকে মনের বাসনা নিবেদন করিতে বলেন। যে নরেন্দ্র পূর্ব্বে সাকার আদৌ মানিতেন না, দুঃখের ও কষ্টের চাপে ও তাপে তাঁহাকে সেই মত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ইহা তিনি এখন স্বীকার করিতেছিলেন। এই ঈশ্বরীয় রূপ-দর্শন যে মনের ভুল বা hallucination নহে, তাহাও কতকটা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিন তিন বার তিনি মন্দিরে ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াও প্রথম দুই বারে মাকে নিজের দুঃখ জানাইতে একবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। মা'র কাছে বিবেক, বৈরাগ্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর যখন তৃতীয় বার তাঁহাকে মা'র কাছে পাঠাইলেন, তখন প্রার্থিতব্য বিষয়ের কথা তাঁহার স্মরণ থাকিলেও মা'র কাছে ধন-দৌলত চাওয়া তিনি নিজে লজ্জার কথা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং মাকে এ বিষয়ে কিছুই না বলিয়া ঠাকুরকে আসিয়া সব নিবেদন করিলেন। এ সমস্তই ঠাকুরের খেলা, তিনি মাকে আগে হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "মা, নরেন্দ্রকে মায়া-পাশে বাঁধিয়া রাখো—দুঃখ-কষ্ট না থাকলে ও আমার মত উল্টে দিয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা ক'রে আর একটা কৃষ্ণ-বিষ্ণু হ'য়ে ব'সবে।" তাহা হইলেও লীলাময় ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের দুঃখ দেখিয়া নিজেও ব্যথা অনুভব করিতেন। শেষে তিনি নরেন্দ্রকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, পরিজন-বর্গের কোন রকমে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা মা করিবেন।

তাহার বেশী স্বচ্ছলতা আর হইবে না। আগে ঠাকুর 'নরেন্দ্র নরেন্দ্র' করিয়া পাগল হইয়াছিলেন, এখন সেই প্রেমের প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। নরেন্দ্র তখন ঠাকুরকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না, প্রত্যহ আসিয়া খোঁজ-খপর করেন ও সেবার বিষয় সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ভক্তরা কেহই এখনও গৃহত্যাগ করেন নাই, সকলেই বাড়ীতে আহার করিতে যান এবং বাড়ী হইতে যাতায়াত করেন। রাত্রে কেহ কেহ থাকেন।

যখন ডাক্তার সরকারকে আনাই স্থির হইল, তখন

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

মাষ্টার মহাশয়ের উপর ডাক্তার ডাকার ভার দেওয়া হইল। তিনি ডাক্তার সরকারের বাড়ীতে গিয়া প্রথম দিন তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন,—ডাক্তারের ফি ১৬৲, তাহা যোগাড় করিয়া রাখা হইল। প্রতাপ বাবুর consultation জন্যই প্রথমে তাঁহাকে ডাকা হইল। ডাক্তার সরকার আসিয়া ঠাকুরের বিছানাতেই বসিলেন ও পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার প্রতাপকে ঔষধ বলিয়া দিলেন। বাহিরে আসিলে ডাক্তারকে যখন মাষ্টার ফি দিতে গেলেন, তখন ডাক্তার ফি না লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ী কার?" মাষ্টার বলিলেন, "এটি ভাড়া বাড়ী, এঁর চিকিৎসার জন্য ভক্তরা লইয়াছেন।" ডাক্তার "ভক্তরা" শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ভক্ত, এঁর ভক্ত! কারা এঁর ভক্ত?" মাষ্টার কতকগুলি নাম করিলেন। কিন্তু যখন গিরিশের নাম করিলেন এবং বলিলেন যে, গিরিশ ইঁহার প্রেমে অতিশয় পরিবর্তিত হইয়াছেন, তখন ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"ফি আমি লইব না।" মাষ্টার যদিও বলিলেন যে, ঠাকুরের ভক্তরা ধনী না
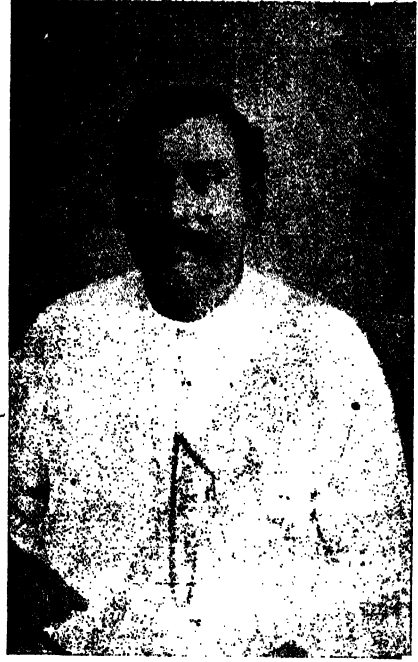
কালীপদ ঘোষ

হইলেও তাঁহার চিকিৎসার ও সেবার জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন ডাক্তার বলিলেন—"দেখুন, আমাকেও আপনাদের পাঁচ জনের মধ্যে এক জন গণনা করিবেন। আমি অতি যত্নে চিকিৎসা করিব, আসিব, দেখিব, ঔষধ দিব কিন্তু ফি লইব না। আমার অন্য স্বার্থ আছে। আমার কাছে কেবল এক জন করিয়া প্রত্যহ গিয়া রোগীর সংবাদ দিয়া আসিতে হইবে।" এই সংবাদ দিবার ভারও মাষ্টার গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বোপরি তত্ত্বাবধান করিতেন কালীপদ ঘোষ। নরেন্দ্র তাঁহাকে 'দানা' উপাধি দিয়াছিলেন

এবং ভক্তসাধারণে তাঁহাকে ম্যানেজার বলিতেন। তিনি ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী সেবাকার্য্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত ও অগ্রণী ছিলেন। কালীপদর নৈতিক চরিত্রও তখন খুব উন্নত হইয়াছিল। তিনি মদ্যাদি কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম রাত্রে নরেন্দ্র সেখানে থাকিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কালী, ছোট গোপাল প্রভৃতি রাত্রিতে থাকিতে লাগিলেন। শ্রীমা রান্না করিতেন ও অনেক রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে দোতলায় আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেন। বয়স্ক ভক্তরা সমস্ত ব্যয় যোগাইতেন এবং সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন। এইরূপ বন্দোবস্তে সেবা চলিতে লাগিল।

যে ডাক্তারগণ ঠাকুরকে ইতঃপূর্ব্বে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, এবং বলরাম বাবুর বাটীতে থাকা-কালীন গঙ্গাপ্রসাদাদি কবিরাজকে যাঁহারা ডাকাইয়া ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এখন একমত হইয়া বলিলেন যে, রোগ অতি কঠিন—Cancer বা অর্ব্বুদ রোগ। দুরারোগ্যই বটে। যদি দৈবক্রমে ঠাকুর আরোগ্য হন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ও সুচিকিৎসার ফলেই তাহা সম্ভব। এতদিন খরচ চালাইবার টাকা কে যোগাইবে, সে প্রশ্নও ভক্তগণের মনের মধ্যে যে উদিত হইত না তাহা নহে। তবে সকলেই ঠাকুরের উপর নির্ভর করিতেন ও তাঁহার ইচ্ছায় সব যোগাড় হইবে, এইরূপ বিশ্বাসও করিতেন। কোন কোন ভক্ত এরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, ঠাকুরের রোগ শুধু সর্ব্বসাধারণকে তাঁহার সেবার অধিকার দিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য। সুতরাং ব্যয়ের ভাবনা তাঁহাদের কি জন্য? এ ব্যয়ও যে তাঁহার কৃপারই রূপান্তর। যাহাই হউক, এই যে শ্যামপুকুরে সেবাকার্য্যের সূত্রপাত হইল, ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর একত্র সম্মিলন ও তাঁহাদের মধ্যে সহযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করিল। এই মিলন ও আত্মীয়তাবোধ পরে কাশীপুর বাগানে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই সব দেখিয়া অনেকেই ভাবিতে লাগিলেন যে, ঠাকুরের ব্যাধি বুঝি বা শুধু গৃহী ও ত্যাগী ভক্তগণকে একতাবন্ধনে বাঁধিবার উপায়ান্তর মাত্র।

ঠাকুরের রোগ সম্বন্ধে নানা মত, নানা দলের ভক্তরা পোষণ করিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু, রাম বাবু, দেবেন্দ্র ভূপতি প্রমুখ কতকগুলি ভক্ত ভাবিতেন যে, ঠাকুরের পীড়া তাঁহার নর-লীলারই এক অংশ—ভক্তদের সঙ্গে আর এক প্রকার খেলা। ইহা বিশেষ উদ্বেগের বিষয় না-ও হইতে পারে এবং তিনি ইচ্ছা করিলে নিজেকে আরোগ্য করিতে পারেন। মাষ্টারাদি অপর কেহ কেহ এরূপ ভাবিতেন যে, যিশুর ন্যায় ঠাকুর নিজের শরীর দিয়াও জগতের হিত করিতে পশ্চাৎপদ নন। জগতের পতিত ও পাপিগণের পাপতাপ গ্রহণ করিয়াই তাঁহার পীড়া এবং এখনও পাপ একা তিনি লইতেছেন ও শেষ পর্য্যন্ত এই ভারবহন স্বীকার করিতে মা তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল ঠাকুরের দেহের পতন; কিন্তু তাহাতে তিনি প্রস্তুত। ইচ্ছা করিলেই তিনি দেহ ছাড়িতে পারেন, কেবল ভক্তগণের মুখ চাহিয়া এই অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতেছেন। নরেন্দ্রাদি ছোকরা ভক্তরা ভাবিতেন, রোগভোগ শরীরের ধর্ম্ম—ভগবান্ হইলেও দেহ ধারণ করিলে মহামায়া তাঁহার কাছ হইতে পীড়ার পীড়ন বা ট্যাক্স আদায় করিয়া লইতে ছাড়েন না। ভক্তগণের কর্ত্তব্য—তাঁহার রোগমুক্তি ও যন্ত্রণা লাঘবের জন্য নিজ নিজ শক্তি, বুদ্ধি ও সামর্থ্য মত তাঁহার সেবা করা। তবে ঠাকুরকে কায়মনোবাক্যে সেবা করা যে এখন ভক্তগণের প্রধানতঃ কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে সকল ভক্তই একমত ছিলেন। ঠাকুর কিন্তু শ্রীমাকে নিভৃতে বলিয়াছিলেন যে, স্পর্শদোষই রোগের কারণ। পাপিগণের বিশেষ করিয়া গিরিশচন্দ্রের দুষ্কৃতির বোঝা গ্রহণ করায় শরীর যাইবে।

প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় সুরেন্দ্রের বাড়ী ঠাকুর যাইতেন। এ বৎসর আর যাইতে পারেন নাই। তাই—পূজার নবমীর দিন ঠাকুর ভাবে সুরেন্দ্রের দালানে পূজা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, ঠাকুর-প্রতিমা জ্যোতির্ম্ময়, সবই জ্যোতির্ম্ময়—এক জ্যোতিঃস্রোতঃ যেন শ্যামপুকুরের বাটী ও সুরেন্দ্রের সিমলার বাটীর মধ্যে বহিতেছে। সুরেন্দ্র সে কথা শুনিলেন। তিনি ঠিক সেই সময়ে দালানে বসিয়া মা! মা! বলিয়া কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি বিজয়া-দশমীর দিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে প্রাতেই শ্যামপুকুরে আসিয়াছিলেন। ঐদিন বৈকালে ডাক্তার সরকার আসিলেন। সঙ্গে তাঁহার ছেলে অমৃত। ঠাকুরের ছেলেটিকে খুব ভাল লাগিয়াছিল। ঠাকুর তাঁহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধ্যান তিনি কেমন করিতে পারেন।

ধ্যানের সময় মনটি হয়ে যাবে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন—তা' হ'লে ধ্যানে অন্য চিন্তা আর মনে আসিবে না,—এই সকল কথাও তাঁহাকে বলিলেন। তার পর ডাক্তারকে ঠাকুর বলিলেন—"তোমার ছেলেটি অবতার মানে না—তবুও—বেশ! তা হবে না? বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয়? এর ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস! মানুষ আর মানহুঁস্। যার নিশ্চিত জ্ঞান যে, ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য, সেই মানহুঁস্।" উত্তরে ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, ছেলেকে পেলে অনেকে বাপকে ভুলে যায় বটে।" অর্থাৎ অবতার অবতার করিয়া কোন কোন নরদেহধারীকে লইয়া মানুষ এমনই মাতিয়া যায় যে ঈশ্বরকে আর মনে থাকে না।

ডাক্তার সরকারও অবতার মানিতেন না। এক জন আর এক জনের চেয়ে বড়, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তাই বলিতেন, "অবতার আবার কি! যে মানুষ সাধারণ লোকের মত প্রস্রাব-বাহ্যে করে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বাধ্য, তার পদানত হব! হাঁ, তবে Reflection of God's light অর্থাৎ ভগবানের আলো বা মহিমা মানুষে প্রতিবিম্বিত হয় তা মানি।" ঠাকুর বলিতেন,—"বিচার শুধু কাঁচা দিয়ে ময়দা ছাড়ার কল্‌কলানি মাত্র। পূর্ণজ্ঞানী পুরুষ চুপ—তাহার বিচারবন্ধ হ'য়ে যায়।" ডাক্তার তাহাতে পাল্টা জবাব দিয়া বলিতেন, "এই পূর্ণজ্ঞান থাকে কই? বেশ, আপনি যদি পূর্ণজ্ঞানী, তবে চুপ ক'রে থাকেন না কেন? পরমহংসগিরি কর্চ্ছেন বা কেন আর এরা আপনার সেবা কর্চ্ছে কেন? আর আপনার 'আমি' যে নাই বলেন, তবে কেন বলেন, 'ওগো এটা সারিয়ে দাও?'" ঠাকুর উত্তরে বলিতেন, "এই আমি তিনি রেখে দিয়েছেন—তাঁর লীলা। তাঁর দর্শন হ'লে সব সংশয় যায়। বিচারপথে কিছুই টেঁকে না, শেষে দাঁড়ায় ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা! কিন্তু এই যে সংসার-ভ্রম—এ ভ্রম কিন্তু সহজে যায় না। চোর চুরি ক'রতে গিয়াছে ক্ষেতে—সেখানে খাড়া ক'রে রেখেছে একটা খড়ের মূর্ত্তি, তাই দেখেও ভয়—বুক দুর দুর ক'রছে।" শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, এ বেশ কথা।" ঠাকুর তখন রহস্য করিয়া বলিলেন, "একটা Thank you দাও।" "আপনি কি বুঝ্‌ছেন না মনের ভাব? আর কেনই বা এত কষ্ট ক'রে প্রত্যহ এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছি?" ডাক্তার এই উত্তর দিলেন। তার পর ডাক্তার ঔষধার্থ দু'টি globule দিলেন ও বিজয়ার মিষ্টমুখ করিলেন। মিষ্ট গ্রহণান্তে ডাক্তার বলিলেন, "এখন Thank you দিচ্ছি খাবার জন্য, উপদেশের জন্য নয়। সে Thank you মুখে ব'লবো কেন?"

ইহার কয়দিন পরে আবার ডাক্তার আসিলেন। ঠন্‌ঠনের ঈশান মুখোপাধ্যায়ও ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার সেই কথা উঠিল। ঠাকুর

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বলিলেন, তিনি সাকার আবার নিরাকার। এক সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করিয়া সন্দেহ করিলেন, জগন্নাথ সাকার না নিরাকার। পরখ করিবার জন্য নিজের দণ্ডটা ঠাকুরের রত্ন-বেদীর এধার থেকে ওধারে যখন ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন, প্রথমে তখন দণ্ড ঠিক চলে গেল, কিছুতে আটকাল না। দেখিলেন মূর্ত্তি সেখানে নাই। কিন্তু ফিরে আসবার সময় সেটি বাধলো। তখন সন্ন্যাসী বুঝলেন, ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুই-ই। ডাক্তার বলিলেন যে, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। ঠাকুর বলিলেন, "এ সব ঈশ্বরলাভ না ক'রে শুধু বুদ্ধি বা তর্ক দ্বারা ঠিক ঠিক বলা যায় না।"

এই সময়ে গিরিশচন্দ্র একদিন ডাক্তার সরকারকে নিমন্ত্রণ করিয়া "বুদ্ধদেব" অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। অভিনয় ডাক্তারের খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি গিরিশ বাবুকে বলিলেন—"তুমি বড় বদ্‌লোক! আমায় কি রোজ থিয়েটারে যেতে হবে?" ঠাকুর ঈশানকে অবতারবাদ সম্বন্ধে ডাক্তারের সহিত একটু বিচার করিতে বলিলেন। ঈশান প্রথমে বলিলেন, বিচার আর ভাল লাগে না। তার পর ডাক্তারকে বলিলেন, "আপনি অবতার মান্‌ছেন না কেন? এই ত আপনি বল্লেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। ঈশ্বরের কাণ্ড সবই সম্ভব!" ঠাকুর তখন হাসিতে হাসিতে ঈশানকে বলিলেন—"ঈশ্বর যে মানুষরূপে আসেন এ কথা ত' ওঁর সায়ান্সে নাই। তবে কেমন ক'রে বিশ্বাস হয়? গল্প আছে—একজন একদিন এসে বন্ধুকে বল্লে, ওহে, ও পাড়ার অমুকের বাড়ীটা হুড়মুড়্ ক'রে ভেঙ্গে পড়ল আমি দেখে এলাম। বন্ধু বল্লে, বটে, রোসো ত' দেখি খপরের কাগজখানা। খপরের কাগজে কিন্তু বাড়ীপড়ার কোন সংবাদই লেখে নি। তখন বন্ধু বল্লে—কই হে কাগজে ত কিছু নেই, তবে আমি তোমার কথা বিশ্বাস ক'রতে পারলুম না।"

ডাক্তার ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া ৩।৪ ঘণ্টা বসিয়া থাকেন আর কথা কহেন। তাহা দেখিয়া গিরিশ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এখানে এতক্ষণ রইলেন; কই অন্য সব রোগীকে চিকিৎসা করতে যাবেন কখন?" উত্তরে ডাক্তার বলিলেন, "আর ডাক্তারী, আর রোগী! যে পরমহংস হ'য়েছে, আমার বুঝি সব গেল।" ঠাকুর তাহা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখ গা, কর্ম্মনাশা বলে নদী আছে, তাতে ডুব দিলে ভারি বিপদ—কর্ম্মনাশ হ'য়ে যায়।" পরে ডাক্তার ঠাকুরকে বলিলেন—"যে অসুখ আপনার হ'য়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হ'বে না, কেন না, তাতে রোগ বাড়বার সম্ভাবনা। তবে আমি যখন আস্‌বো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবেন।" এই কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন।

কোজাগর পূর্ণিমার দিন। এ দিন বৈকালে ঠাকুর ডাক্তার সরকারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে অদ্ভুতভাবে ভাবিত হইলেন। মেয়ে মানুষের মত তিনি বুকে কাপড় দিয়াছেন, কোলে একটি বালিস, সেটি যেন ছেলে, তাহাকে বাৎসল্যভাবে যেন দুধ খাওয়াইতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ভাব ভঙ্গ হইলে একটু সুজির পায়স খাইলেন, তার পর মাষ্টারকে বলিলেন—"এতক্ষণ কি দেখ্‌ছিলাম জান? দেখ্‌ছিলাম, তিন চার ক্রোশব্যাপী সিওড়ে যাবার রাস্তায় মাঠ। সেই মাঠে আমি একাকী! সেই যে আগে ষোল বৎসরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আবার ঠিক সেইরূপ দেখলাম। চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোয়াসা! তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বৎসরের আর একটি ছেলে উঠল, মুখটি দেখা যাচ্ছে। দুই জনেই দিগম্বর। তার পর আনন্দে মাঠে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা। দৌড়াদৌড়ি ক'রে তার জলতৃষ্ণা পেলে। সে একটা পাত্র ক'রে জল খেলে। জল খেয়ে আমাকে দিতে আসে। আমি বল্লাম, 'ভাই, তোর এঁঠো খেতে পারবো না।' তখন সে হাস্‌তে হাস্‌তে গিয়ে গ্লাসটি ধুয়ে আর এক গ্লাস জল এনে দিলে।"

এই কথা বলিতে বলিতেই ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"আবার কি দেখ্‌ছিলাম জান? ঈশ্বরীয় রূপ! ভাগবতীমূর্ত্তি!—পেটের ভিতর ছেলে—তাকে বার ক'রে আবার গিলে ফেল্‌ছে! ভিতরে যতটা যাচ্ছে শূন্য হ'য়ে যাচ্ছে! আমায় দেখাচ্ছে যে সব শূন্য! যেন বল্‌ছে—লাগ্ ভেল্কি! লাগ্! লাগ্! লাগ্!" মায়াময়ীর সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস সবই মায়া, সেই দৃশ্য ঠাকুর দেখিতেছিলেন।

গিরিশের থিয়েটারের গায়ক রামতরণ সান্ন্যাল আসিয়াছেন। গান হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া ছোট নরেন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন—কাঠের মত বসিয়া আছেন। ঠাকুর ডাক্তারকে ছোট নরেনকে দেখাইয়া বলিলেন—"এ অতি শুদ্ধ! বিষয়-বুদ্ধির লেশ নাই।" ছোট নরেন্দ্র তখনও অবিবাহিত।

পরদিন নরেন্দ্রের গান হইল, ডাক্তার ও ভক্তেরা সব উপবিষ্ট আছেন। গান শুনিয়া ডাক্তার মুগ্ধপ্রায় হইয়াছেন; অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন যে, তিনি সেদিন যাইতেছেন, পরদিন আবার আসিবেন। ঠাকুর তাঁহাকে আর একটু বসিতে বলিলেন—গিরিশকে ডাকিতে লোক গিয়াছে। তার পর নরেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "এ কেমন?" ডাক্তার উত্তরে বলিলেন, খুব ভাল! তাহার

পর মাষ্টারকে দেখাইয়া বলিলেন—"আর 'ইনি?" ডাক্তার তাহাতে বলিলেন, "আহা, খুব!"

পরদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। বিজয়কৃষ্ণ পশ্চিমে অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সবে কলিকাতায় আসিয়াছেন। মহিম চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সব দেখলেন একটু বলুন।" উত্তরে বিজয় বলিলেন, "কি ব'লবো! দেখছি যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা। কোন কোন স্থানে এঁরই এক আনা কি দুই আনা, কোথাও চার আনা এই পর্য্যন্ত! এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখ্‌ছি!" তার পর বিজয় বলিলেন, "আপনার পীড়ার কথা শুনিয়া দেখতে এলাম। আবার ঢাকা থেকে—" ঠাকুর ঢাকার কথাটা কি জিজ্ঞাসা করিলে, বিজয় কোন উত্তর দিলেন না। তার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ধরা না দিলে ধরা শক্ত।" তার পর বিজয় হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি আপনি কে। আর বলতে হবে না।" তাহা শুনিয়া ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া বলিলেন, "যদি তা বুঝে থাক, তবে তাই।" বিজয়, 'বুঝেছি' এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে পতিত হইলেন ও নিজের বক্ষে তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। ঠাকুর তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। এই দৃশ্যে উপস্থিত ভক্তরা কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ বা স্তব করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ডাক্তার আসিলেন। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—'ডাক্তারী কর্ম্ম খুব উচ্চ কর্ম্ম বলে অনেকের ধারণা। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া ক'রে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ, কাযটিও মহৎ।' নরেন্দ্রের গতদিনের গান ডাক্তারের খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ গান হবে না?' গান হইল। নরেন্দ্র গান গাহিলেন—আমায় দে মা পাগল করে। গানের পর একটি অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্ট হইল। ডাক্তার দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমায় দে মা পাগল করে। বিজয় ভাবোন্মত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; ঠাকুরও রোগ ভুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রোগীরও হুঁস নাই—ডাক্তারেরও হুঁস নাই। ছোট নরেন, লাটু ও মণীন্দ্র গুপ্ত (খোকা) ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন। ভাব শান্ত হইলে কেহ হাসিতেছেন, কেহ কাঁদিতেছেন,—একদল মাতাল যেন মিলিত হইয়াছেন। ডাক্তার এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক্! সকলে আবার আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যা ভাব-টাব দেখলে, এসব বিষয়ে তোমার scienceএ কি বলে? তোমার কি এ সব ঢং বোধ হয়?" ডাক্তার বলিলেন—যখন এত লোকের হচ্ছে, তখন ঢং বোধ হয় না। তার পর নরেন্দ্রকে বল্লেন,

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

"তুমি যখন গাহিলে 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে,' তখন আর থাকিতে পারি নাই; তার পর কষ্টে চাপলুম এই ভেবে যে display করা হবে না।" ঠাকুর বলিলেন, "ও গো, তুমি যে অচল অটল, সুমেরুবৎ। শ্রীমতী সখীকে বল্লেন, 'সখি, তোরা ত কৃষ্ণবিরহে কত কাঁদছিস, কিন্তু দেখ, আমি কি কঠিন, আমার চোখে একবিন্দু জল নাই।' তখন বৃন্দা বল্লেন, সখি, তোর চোখে জল

নাই, তার অনেক মানে আছে। তোর হৃদয়ে বিরহ-অগ্নি সদা জ্বলছে,—চোখে জল উঠ্‌ছে আর সেই অগ্নির উত্তাপে শুকিয়ে যাচ্ছে!" ডাক্তার বলিলেন, "আপনার সঙ্গে ত কথায় পারবার যো নাই।" তখন বিজয় বলিলেন, "আমি ঢাকায় ওঁকে দেখেছি এবং গা ছুঁয়েছি!" তাহা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে আর কেউ হবে, আমি নই।" তাহা শুনিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, "এইরূপ অনেকবার আমিও দেখেছি। তাই আপনার কথা বিশ্বাস করি না, এমন কথা বলিতে পারি না।"

পরদিন ডাক্তার আসিলেন। পূর্ব্বদিন ঠাকুর ভাবে বিজয়ের বক্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই কথা ঠাকুর বলিতে লাগিলেন। বলিতেছিলেন যে, তিনি যন্ত্র, মা যন্ত্রী। তিনি যেমন করিয়া ঠাকুরকে চালাইতেছেন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঠাকুরকে তেমনই চলিতে হইতেছে। তাঁহার নিজের আমি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছা (free will) নাই। তাহা শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন যে, তিনি কেন সাবধান হন না। ঠাকুর তখন ডাক্তারকে বলিলেন—"তবে তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর তা হ'লে তোমার সায়েন্স মায়েন্স সব ছাই আর ভস্ম।" ডাক্তার বলিলেন, "মহাশয়! যদি ঢং মনে করি, তা হ'লে কি এত আসি? কত রোগীর বাড়ী যেতে পারি না, এখানে এসে ছয় সাত ঘণ্টা থাকি।" ঠাকুর উত্তর দিলেন দেখ, "সেজো (মথুর) বাবুকে বলেছিলুম তুমি মনে করো না যে, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মানছ বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম! মানুষ কি ক'রবে, তিনিই মানাবেন।" কথাগুলিতে ডাক্তার চটিলেন, এবং বলিলেন, "কেউ আপনাকে মানিয়েছে, সে জন্য আমি আপনাকে মানিব এমন ধাতু আমার নহে, মহাশয়! তবে আমি আপনাকে সম্মান করি বটে। আপনি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, মা'র হাতের যন্ত্র নিজেকে বলিতেছেন, অথচ চুপ ক'রেও থাকেন না, আমি আপনার এ অমিলের ভাব ত বুঝ্‌তে পারি না।' তাঁহার ঠিক ঠিক অবস্থা যে ডাক্তার সরকার তখনও বুঝিতে পারেন নাই, তাহা জানিয়া ঠাকুর তখন চুপ করিয়া গেলেন।

ঠাকুরের রোগ কিন্তু আরোগ্যের দিকে যাইতেছিল না। ২।৫ দিন তিনি ভাল থাকেন, আবার রোগ এমনই বাড়ে যে, ভক্তরা মাথায় হাত দিয়া বসেন। কি উপায়ে তাঁহাকে রোগের যন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ শান্তি দিতে পারা যাইবে, ভক্তগণ সেরূপ কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

নরেন্দ্রের সাংসারিক কষ্ট সমানই আছে। বিদ্যাসাগরের বৌবাজার স্কুলে কিছুদিন মাষ্টারি করা ছাড়া—কোন কাম-কর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিলেন না।—বি, এল পড়িতেছেন কিন্তু সর্ব্বদাই সংসারের ভাবনা, তাই একটু চাপা ভাবেই থাকেন। অথচ ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক আছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে শুনাইয়া একদিন বলিলেন, "দেখ, কেশব সেন ঈশ্বরচিন্তা ক'র্‌তো। তার সব অভাব অনাটন ভগবান্ ঘোচাতেন। বিজয়কৃষ্ণও বলেছিল, হাজার দশেক টাকা পেলে সংসারে গোছ গাছ ক'রে ঈশ্বরে মন ডুবিয়ে দেওয়া যায়। নরেন্দ্র সে রকম কোন কার্য্য পাচ্ছে না কেন!" তার পর নিজেই বলিছেন, "যার ঠিক বৈরাগ্য তীব্র, তার আর নিজের সংসারের খোঁজ খপর থাকে না।"

শিকদারপাড়ার চিত্রকর অন্নদা বাক্‌চী ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন—তিনি কয়েকখানি নিজের অঙ্কিত চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন,—ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি, অহল্যা পাষাণী ইত্যাদি। এই অন্নদা বাগচীই পরে ঠাকুরের বসা ছবির লিথো সর্ব্বপ্রথম ছাপিয়াছিলেন। এই ছবি তখন বাজারে অতিশয় চলিত

ছোট নরেন একদিন ঠাকুরকে তাড়িতের প্রকৃতি, উৎপত্তি প্রভৃতি দেখাইবার জন্য তাড়িত-উৎপাদক যন্ত্র আনিয়া ঠাকুরকে সমস্ত দেখাইলেন। ঠাকুরের তাহা দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। বড় নরেন্দ্রও তার পরে কিছু গান শুনাইলেন। বৈকালে ডাক্তার সরকার, ডাক্তার শ্যাম বসু, ডাক্তার দোকড়ি, গিরিশ প্রভৃতি সকলে আসিলেন। পীড়ার অবস্থা দেখা ও ঔষধ-পত্রাদি দিবার পর ডাক্তার যখন চলিয়া যাইবেন, তখন তাঁহাকে নরেন্দ্রের গান শুনিবার কথা বলাতে তিনি বসিলেন; কিন্তু ঠাকুরকে সাবধান করিয়া দিলেন, যেন গান শুনিয়া তাঁহার ভাব-টাব না হয়। ঠাকুর বলিলেন, "না না, ভাব হবে কেন?" অথচ ধ্রুপদ গান যেমন আরম্ভ হইল, অমনই তিনি গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন। গীতসমাপনান্তে ঠাকুরের বদন প্রেমোজ্জ্বল হইল,—কোথায় রোগ চলিয়া গিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই।—তিনি ডাক্তারকে বলিলেন, "লজ্জা ঘৃণা ভয় এই তিন ত্যাগ কর। জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাও।

অহঙ্কার ত্যাগ কর, তা না হ'লে জ্ঞান হয় না। দেখ টাকা, মান, লেক্‌চার এ সব ত অনেক ক'রলে, এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে।"

ডাক্তার গিরিশকে বলিলেন, "আর সব কর—But do not worship him as God (*ঈশ্বর বোধে এঁকে পূজা ক'রো না*)।" *গিরিশ তাহাতে বলিলেন, "কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসারসমুদ্র ও সন্দেহসাগর থেকে পার ক'রলেন,* তাঁকে আর কি ক'রবো বলুন। তাঁর বিষ্ঠা কি বিষ্ঠা বলে বোধ হয়?"

ডাক্তার চট্‌ করিয়া বলিলেন, "বিষ্ঠার জন্য হ'চ্ছে না। আমারও এ বিষয়ে ঘৃণা নাই। আর আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না? এই দেখ নিচ্ছি!" এই বলিয়া তিনি ঠাকুরের পদধূলি লইলেন। এবং শুধু ঠাকুরের নহে গিরিশাদি অনেকেরই পদধূলি লইলেন। ডাক্তারের প্রতিবাদের উত্তরে নরেন্দ্র বলিলেন—'এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। God বলছি না। God-like man বলছি। We offer to him worship bordering on Divine worship." নরেন্দ্র এখনও ঠাকুরকে ঠিক ঈশ্বরের অবতার না বলিলেও এতদিনে প্রায় সেই কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা এই কথাতেই প্রকাশ পাইল।

যাহা হউক, ডাক্তার সরকারের চিকিৎসায় ঠাকুরের বিশেষ কোন উপকারই হইল না। তাই ভক্তরা ভাবিতে লাগিলেন, অতঃপর তাঁহারা কি করিবেন? ডাক্তার সরকারের কাছে মাষ্টার প্রায় প্রত্যহই ঠাকুরের অসুখের সংবাদ লইয়া যান এবং ডাক্তারকে ডাকিয়া আনেন। একদিন তিনি কথা-প্রসঙ্গে মাষ্টারকে শুনাইয়া ঠাকুরকে 'an inspired idiot' বলিয়াছিলেন। সেই কথায় ব্যথা পাইয়া মাষ্টার আর খুব স্বেচ্ছায় সেখানে যাইতে চাহিতেছিলেন না। সেই কথা মাষ্টারের কাছে শুনিয়া পরে ঠাকুর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে ডাক্তার বলিয়াছিলেন—"হাঁ, আপনার অহঙ্কার আছে; লোককে পায়ের ধূলি দেন এর জন্য বলেছি। লোকে পায় হাত দিয়ে নমস্কার করে—তাতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি, এমন ভাল লোকটাকে মাথা খারাপ ক'রে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা ঐ রকম করেছিল।" কিছু পরে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ডাক্তারকে বলিলেন, "মহীন্দ্র বাবু, কি টাকা টাকা ক'রছো! মাগ, ছেলে! সংসার, সংসার এ সব ছেড়ে দিনকতক ঈশ্বরেতে মন দাও। ঐ আনন্দ উপভোগ কর! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? গীতা পড়লে কি হয়? দশবার গীতা বল্‌লে যা হয় অর্থাৎ ত্যাগী হয়ে যায়।" *ডাক্তার একথা ঠিক প্রণিধান করিলেন কি না, বলা যায় না; তবে জবাব দিলেন, "আমায় একজন রাধার মানে বলেছিল। রাধার মানে বল্‌লে ঐ কথাটা উল্টে নাও* অর্থাৎ ধারা ধারা। রাধাকৃষ্ণ নাম ক'রবে—নয়নে ধারা পড়া চাই।"

১৮৮৫, ৩১ অক্টোবর তারিখে বলরামের পিতৃব্যপুত্র কটকের বিখ্যাত সরকারী উকিল হরিবল্লভ বসু শ্রীঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। বলরাম বাবুর বাড়ীর মেয়েদের তিনি ঠাকুরের কাছে লইয়া যান বলিয়া ইনি প্রথমে বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাই বলরাম তাঁহাকে একবার ঠাকুরকে স্বয়ং দর্শন করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর হরিবল্লভকে ঠাকুর আবার আসিতে বলিয়া বিদায় দিলেন, হরিবল্লভ জোর করিয়া ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইলেন। তিনি চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন, "দেখ গো, ভিতরে আমার প্রতি ভক্তি আছে, তা না হ'লে জোর ক'রে পায়ের ধূলা নিলে কেন।"

এই দিন ঠাকুরের কাছে এক খৃষ্টান ভক্তের সমাগম হইয়াছিল—তাঁহার নাম P. D Misra (প্রভুদয়াল মিশ্র); ইনি ছিলেন প্রথমে কনোজ ব্রাহ্মণ, পরে Quaker সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান হন। মিশ্রের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যৌবনেই বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। একদিন তাঁহার একটি ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে আসর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়ায় সেই বর ভ্রাতাটি এবং আরও একটি ভ্রাতার মৃত্যু সমকালেই ঘটে, কেবল মিশ্র বাঁচিয়া যান। ইহাই তাঁহার বৈরাগ্যের কারণ। মিশ্র, পর্ব্বত গহ্বরে কিছুদিন নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তা করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ধ্যানে নদীতীরে এক সুরম্য উদ্যানে, সাধুবেশে, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মূর্ত্তি দেখিতে পান। সেই মূর্ত্তি যে যিশুর মূর্ত্তি এইটি তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা হয়। তাই ঐরূপ শরীরধারী যিশুর অনুসন্ধানে বাগান ও সাধু তিনি অনেক স্থানেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, কিন্তু কোথাও অভিলষিত মূর্ত্তির দর্শন পান

নাই। এই দিনে তিনি পরমহংসদেবের নাম শুনেন এবং ইনি গঙ্গার ধারে এক সুন্দর বাগানে ছিলেন এ কথাও শুনেন এবং সেই সন্ধানে দক্ষিণেশ্বর গিয়া সেইখান হইতে ঠাকুরের সন্ধান লইয়া শ্যামপুকুরে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মিশ্র আসিয়াই ঠাকুরকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাজন, সাক্ষাৎ দেহধারী যিশুখৃষ্ট। তাই মিশ্র আনন্দে ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা এঁকে চিন্‌তে পারছেন না। আমি আগেই এঁকে দেখেছি।" ঠাকুর মিশ্রকে জ্যোতিঃদর্শন হয় কি না জিজ্ঞাসা করাতে মিশ্র বলিলেন, "আজ্ঞে, যখন বাটীতে ছিলাম, তখন থেকে জ্যোতিঃদর্শন হ'ত। তার পর যিশুকে দর্শন করেছি। সে রূপ আর কি ব'লব! সে সৌন্দর্য্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য্য!" মিশ্রের পরণের ভিতর গেরুয়া আছে, পেণ্টুলুন খুলিয়া ভক্তদের তাহা দেখাইলেন। মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের যিশুর ভাব হইল। তিনি দাঁড়াইয়া ভাবাবস্থায় মিশ্রের সহিত shake hands করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "তুমি যা চাইছ তা হ'য়ে যাবে।"

ডাক্তার সরকার আবার আসিলেন। তখন ঠাকুর আস্তে আস্তে গাহিতেছিলেন, 'সুরা পান করি না আমি সুধা খাই জয় কালী বলে।' গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায়। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ ভাব উপশম হইলে বলিলেন, "তুমি খুব শুদ্ধ! তা না হ'লে পা রাখতে পারতাম না। সেদিন মা এঁকে দেখালেন। খুব জ্ঞান হবে কিন্তু শুষ্ক। কিন্তু আমি ব'লছি তুমি রোস্‌বে।"

১৮৮৫, ৬ই নবেম্বর শুক্রবার, অমাবস্যা কালীপূজার দিন;—ঠাকুর প্রায় বেলা ৯টার সময় সিদ্ধেশ্বরীর প্রসাদ ধারণ করিলেন, মাষ্টার আনিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথায় মাষ্টার আজ ঠনঠনের মা সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি সন্দেশ উপহারে পূজা দিয়া সেই প্রসাদ আনিয়াছিলেন। আর তিনি আনিয়াছিলেন রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গানের বই; ঠাকুর আনিতে বলিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার সরকারকে উহা উপহার দিবেন। মাষ্টারের সহিত সহাস্য বদনে পাইচারি করিতে করিতে ঠাকুর হঠাৎ চমৎকৃত হইলেন, অমনি চটি জুতা যাহা পায়ে ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন। সে দিনটি কালীপূজার দিন, অতএব কিছু পূজার আয়োজন করা ভাল, এই কথা ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন। মাষ্টার সে কথা ভক্তদিগকে জানাইলেন। তাহাতে কালীপদ প্রভৃতি পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বেলা দু'টার সময় ডাক্তার সরকার আসিলেন, সঙ্গে অধ্যাপক নীলমণি। ঠাকুর ডাক্তারকে দু'খানি গানের বই দেওয়াইলেন ও কতকগুলি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গান গাহিয়া ডাক্তারকে শুনানও হইল। তার পর গিরিশ ও কালীপদ বুদ্ধদেবের গান গাহিলেন, তার পর চৈতন্যলীলার গান। আগের দিন প্রতাপ মজুমদার ঠাকুরকে ঔষধ দিয়াছিলেন শুনিয়া ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি ত মরি নাই, আমি থাকিতে প্রতাপের ঔষধ দেওয়া কেন?' প্রতাপ মজুমদার ডাক্তার বিহারী ভাদুড়ীর জামাতা। বিহারী ভাদুড়ীও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। এ দিনও হরিবল্লভ আসিয়াছিলেন ও ঠাকুরকে তিনি বাতাস করিতেছিলেন। পরে ডাক্তারাদি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যা ৭টার সময় ঘরে বহু ভক্ত বসিয়াছিলেন। ঠাকুর ধুনা দিতে বলিলেন। ঘরের মধ্যেই পূজার উপকরণ—ডাব, ফুল-চন্দন, বেলপাতা, পায়স, সন্দেশাদি মিষ্টান্ন সমস্ত প্রস্তুত। তার পর সকলকে ঠাকুর ধ্যান করিতে বলিলেন। একটু ধ্যানের পর গিরিশ ঠাকুরের চরণে জয় কালী! জয় কালী! বলিতে বলিতে মালা দিলেন। মাষ্টার গন্ধপুষ্প দিলেন। আর রাম, কালীপদ প্রভৃতি সকলেই ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া ব্রহ্মময়ী! ব্রহ্মময়ী! বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। সকলের মুখে 'জয় মা!' 'জয় মা!' ধ্বনি। ইতি মধ্যে ঠাকুরের সমাধি ও অদ্ভুত রূপান্তর হইয়াছে; মুখমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে, দুই হস্তে বরাভয়,—উত্তরাস্যে বসিয়া। ভক্তরা স্তব করিতে লাগিলেন। শ্যামা-বিষয়ক অনেক গান গীত হইল। তার পর ঠাকুর একটু পায়স মুখে দিলেন এবং তৎপরে ভক্তগণ পরম উল্লাসে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

সেই রাত্রে সুরেন্দ্রের বাড়ীতে কালীপূজা। রাত্রি ৯টার সময় ঠাকুর ভক্তদিগকে বৈঠকখানায় বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তাঁহারা সকলে নিমন্ত্রণে যান। ভক্তরা সকলে সুরেন্দ্রের বাড়ী গিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন। গীত-বাদ্য নানা প্রকার আনন্দ হইতেছিল। আনন্দ করিয়া ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়া নিজ নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্যামপুকুরে যখন ঠাকুর ছিলেন, তখন ভক্তরা তাঁহাকে একদা জেদ করিয়া ধরেন যে, তিনি যেন মাকে বলেন, যাহাতে মা ঠাকুরকে অন্ততঃ কিছু খাইতে পারার মত আরোগ্য দান করেন। ঠাকুর নিজের জন্য মাকে কিছু বলিতে চাহিতেন না। শেষে ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে মাকে একথা বলিলেন; তাহাতে মা জবাব দিয়াছিলেন—"আমি লক্ষ মুখে খাই, একমুখে যদি না খাইতে পাই, তাহাতে ক্ষতি কি? এজন্য জেদ্ করা কেন?" উত্তর শুনিয়া লজ্জায় ঠাকুর এ-বিষয়ে মাকে আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

ডাক্তাররা কেবল ঠাকুরকে কথা কহিতে বারণ করিতেন—সুতরাং অচেনা লোক বিনা কারণে আসিয়া যাহাতে ঠাকুরকে কথা কহাইয়া বিরক্ত না করিতে পারে, সেইজন্য নিরঞ্জন সদর দরজার দ্বারিরূপে দ্বার রক্ষা করিতেন। বিনোদিনী নাম্নী যে অভিনেত্রী গিরিশ বাবুর থিয়েটারে চৈতন্যলীলা নাটকে চৈতন্য সাজিতেন এবং যাঁহাকে ঠাকুর থিয়েটারে দর্শন দিয়া "গুরু হরি হরি গুরু" স্মরণ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, ঠাকুরের অসুখ শুনিয়া তাঁহার ঠাকুরকে দেখিতে অতিশয় বাসনা জন্মিল। কিন্তু দ্বারদেশে প্রহরী—সহজে প্রবেশ অসম্ভব। এইজন্য—বিনোদিনী কালীপদ ঘোষের সাহায্যপ্রার্থিনী হন এবং তাঁহারই উপদেশে এক সাহেব যুবকের বেশ পরিধান করেন। কালীপদ ঘোষ তাঁহাকে দর্শনার্থী সাহেব বলিয়া অনায়াসে ভিতরে লইয়া আসেন। সেখানে ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া ছদ্মবেশিনী বিনোদিনী বলিয়া চিনিতে পারেন এবং তাঁহার অনুরাগ দর্শনে প্রীত হন।

এই শ্যামপুকুরে একদিন ঠাকুর দেখেন যে, তাঁহার সূক্ষ্ম-দেহ খোল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাঁহার গায়ে, পিঠে, গলায়, ঘা। যত পাপীর—পাপ লইয়া এই সব ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে। যা তা লোক তাঁহাকে স্পর্শ করে ও করিয়াছে এবং সেই সব লোকের পাপ ঠাকুরে আসিয়া সংক্রামিত হইয়াছে,—ঠাকুর ইহা ভাবদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন।

শ্যামপুকুরে এই ভাবে আড়াই মাস কাল প্রায় কাটিয়া গেল। ডাক্তার সরকার Cancer রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যেখানে যত পুস্তক সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ক্রয় করিতে অনেক অর্থ ব্যয় করিলেন ও তৎসমুদয় পাঠ করিলেন, যদি কোন নূতন প্রণালীর সন্ধান মিলে এই উদ্দেশ্যে। প্রতাপ মজুমদার, মহেন্দ্র সরকার, বিহারী ভাদুড়ী, শ্যাম বসু, দোকড়ী প্রভৃতি বহু ডাক্তার পর্য্যায়ক্রমে যথাকালে ঠাকুরকে দেখিলেন বটে, রোগের কোন বিশেষই হইল না। কেহই বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। ক্রমে স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল। অল্পবয়স্ক ভক্তগণ তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে লইয়া গিয়া রাখাই উচিত মনে করিতে লাগিলেন। ডাক্তার সরকারও সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সকল ভক্ত এই বিষয়ে একমত হওয়ায় কাশীপুর সদর রাস্তার উপর, বরাহনগর বাজারের দক্ষিণে, অনতিদূরে, সুবিখ্যাত লালাবাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাড়ীটি মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ায় প্রথমে তিন মাসের বন্দোবস্তে ভাড়া করা হইল। বাড়ীভাড়া সুরেন্দ্র দিতে স্বীকার করিলেন। সেবার খরচ অন্যান্য ভক্তরা দিবেন স্থির হইল। বাগানবাড়ীটি দু'তলা। উপরের বড় হলঘরখানি দক্ষিণে খোলা। বাগানে দুটি বাঁধা ঘাট, রাস্তা পাকা, চতুর্দ্দিকে বেশ স্থান আছে। এই বাগানে ১৮৮৫ খৃঃ ১১ই ডিসেম্বর শুক্রবার, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্লাপঞ্চমীর দিন ঠাকুর আগমন করিলেন। [ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

দর্পচূর্ণ

লঘু বায়ু ভরে নভে
উঠি' বহু দূর,
গরবেতে ফানুষের
মন ভরপুর।

ভিতরেতে কহে দীপ
"যাই যদি নিবে,
দর্প তবে হ'বে চূর—
মাটীতে পড়িবে।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বণিক।
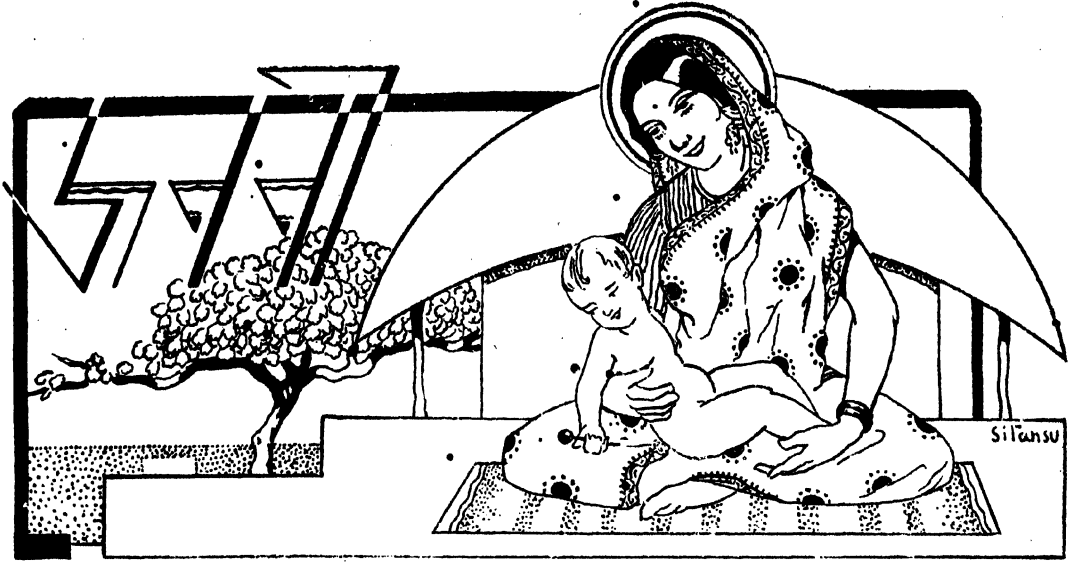
[উপন্যাস]

২৯

পরদিন প্রাতে মৃণালিনী যখন দেবদত্তকে লইয়া আপনার গৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন, তখন তিনি ভাবিলেন, রেণুকে রাখিয়া যাইবেন—না, সঙ্গে লইয়া যাইবেন, না—তাহাকে তাহার স্বামি-গৃহে দিয়া যাইবেন; কিন্তু তিনি যাহা জানিতেন, তাহাতে তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে যাবি না?"

রেণু দৃঢ়তা সহকারেই বলিল, "না।"

মৃণালিনী তাহার দিকে চাহিলেন। সে বলিল, "আমি এখানেই থাকি।"

"ভাল। আমি যত শীঘ্র পারি, আসব। তোর সব ব্যবস্থা—"

রেণু বলিল, "পুরুত ঠাকুর মশাই ত এখনই আসবেন। তিনি যেমন বলবেন, কুমুদা তেমনই ব্যবস্থা ক'রে দিবে। আপনি যেন না খেয়ে ছুটে আসবেন না।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তুই মুখে দু'টো না দিলে কি আমার খাবার রুচবে, মা?"

তিনি কুমুদাকে ডাকিয়া বলিলেন, সে যেন সব আয়োজন করিয়া রাখে—তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

তিনি যখন গাড়ীতে উঠিবেন, সেই সময় পূর্ণিমার গাড়ী গলিতে প্রবেশ করিল। তাহা দেখিয়া মৃণালিনী দ্বারেই দাঁড়াইলেন—তাঁহার গাড়ী অগ্রসর হইয়া পূর্ণিমার গাড়ীর জন্য স্থান করিয়া দিল।

নীরেন্দ্র, অশোক ও কণাকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণিমা অবতরণ করিলেন। মৃণালিনীর শিক্ষানুসারে দেবদত্ত পূর্ণিমাকে ও নীরেন্দ্রকে প্রণাম করিল। পূর্ণিমা তাহার মুখচুম্বন করিলেন। নীরেন্দ্রের মনে কেমন যেন বেদনার সঞ্চার হইল। দেবদত্ত—কণা ও অশোকেরই মত তাহার সন্তান! কিন্তু সে যেন তাহার উপর সব অধিকার হারাইয়াছে তাহাকে আপনার বলিবার অধিকারও তাহার নাই। সে তাহার কর্ম্মফল। কিন্তু ত্রুটি কি সংশোধিত হয় না? না যে বাণ এক বার নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যেমন আর ফিরান যায় না, তেমনই যে কথা একবার উচ্চারিত হয়, তাহাও আর ফিরান যায় না।

মৃণালিনী পূর্ণিমাকে বলিলেন, রেণু তাঁহাকে বলিয়াছে, সে এই গৃহেই থাকিবে। তিনি পূজার পরই ফিরিয়া আসিবেন—পূর্ণিমা কি ততক্ষণ থাকিবেন?

পূর্ণিমা বলিলেন, "হাঁ।"

তখন মৃণালিনী গমনোদ্যোগ করিলে কণা ও অশোক তাঁহাকে বলিল, "দিদিমা, দেবু আমাদের কাছে থাকুক না কেন।"

মৃণালিনী জানিতেন, তাহা রেণুর অভিপ্রেত নহে।

তিনি বলিলেন, "ওর সকালে মুখ ধোয়াও হয়নি ; এখন চলুক, না হয় আবার আসবে।"

গাড়ীতে বসিয়া তিনি ভাবিতে ভাবিতে যাইলেন—এখন অবস্থার না জানি কি পরিবর্ত্তন হইবে। এক জনের অভাবে মানুষের সংসারে ও জীবনে কত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা তিনি আপনার অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছেন—সুধীরের জীবনে ও সংসারেও দেখিয়াছেন। কিন্তু রেণুর সমস্যা সে সকল হইতেও স্বতন্ত্র। এই জটিল সমস্যার সমাধান কিরূপ হইবে, তাহা কে বলিবে? তিনি দেবতাকে উদ্দেশে বলিলেন,—মানুষ যাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না, তাহা ভাবিয়া কোন লাভ নাই—তুমি যাহা কল্যাণকর মনে করিবে, তাহাই করিও।

গৃহে আসিয়া মৃণালিনী দেবদত্তের সব ব্যবস্থা করিয়া স্নান করিতে গমন করিলেন—তাহার পর যথারীতি ঠাকুর ঘরে যাইয়া কায করিতে লাগিলেন।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় টেলিফোন আসিল—প্রকাশ বাবু সুধীরের গৃহে আসিয়াছেন—তিনি এখন চলিয়া যাইতেছেন, আদালত হইতে বেলা চারিটার সময় আসিবেন; তখন মৃণালিনী সুধীরের গৃহে আসিতে পারিবেন কি?

মৃণালিনী জানাইয়া দিলেন, তিনি যাইবেন।

তাহার অল্পক্ষণ পরেই তিনি তথায় গমন করিলেন, অনেক ভাবিয়া দেবদত্তকে না লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। পাছে রেণু বিরক্ত হয়।

তিনি যাইয়া দেখিলেন, পুরোহিত ঠাকুর তখনও অপেক্ষা করিতেছেন—কুমুদা তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সব দ্রব্য আনিয়াছে।

মৃণালিনী পূর্ণিমাকে বলিলেন, কণা ও অশোকের খাইতে বিলম্ব হইতেছে, তিনি তাহাদিগকে লইয়া গমন করুন।

কণা ও অশোক কিন্তু সহজে রেণুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল না; বলিল, তাহারা মা'র কাছে থাকিবে। শেষে পূর্ণিমা তাহাদিগকে লইয়া গমন করিলেন। মৃণালিনী নীরেন্দ্রকেও যাইতে বলিলেন।

তখন রেণু মৃণালিনীকে বলিল, "মাসীমা, দেখুন।" সে একখানা কাগজ তাঁহার হাতে দিল। তাহা সুধীরের লিখিত—এবং তাহারই জন্য উদ্দিষ্ট। তাহাতে সে লিখিয়াছে, অগ্রে তাহার মৃত্যু হইলে পিসীমা যদি সে সংবাদ জানিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে যেন তাহা জানান না হয়—প্রতি মাসে তাঁহাকে যে টাকা পাঠান হয়, তাহা নিয়মিত ভাবে পাঠান হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার টাকা ও তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সে টাকা—মিলাইয়া তাঁহার স্বামী সুরনাথের নামে সুরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি বাগান ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ মন্দির নির্ম্মাণের ও দেবসেবার সব ব্যবস্থা পিসীমা'র টাকা হইতে হইতে পারিবে। তাহার বিস্তৃত ব্যবস্থাও সে লিখিয়া রাখিয়াছিল।

মৃণালিনী যখন সেই কাগজে লিখিত নির্দ্দেশ পাঠ করিতেছিলেন, তখন ভৃত্য একখানি পত্র লইয়া আসিল—ডাক-পিয়ন তাহা দিয়া গিয়াছে। পত্র সুধীরের নামে। রেণু খাম খুলিল- খামের উপর যে হস্তাক্ষর তাহা তাহার পরিচিত—পিসীমা'র!

পিসীমা লিখিয়াছেন—তিনি বিশ্বনাথের চরণে নিত্য তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছেন। কয় দিন তাহার পত্র না পাইয়া তিনি চিন্তিত হইয়াছেন। সে যেন পত্র পাইয়াই তাঁহাকে তাহার কুশল-সংবাদ দেয়।

পত্র পাঠ করিয়া মৃণালিনী রেণুর দিকে ও রেণু তাহার মাসীমা'র দিকে চাহিল। রেণু বলিল, "মাসীমা, কি হ'বে?"

মৃণালিনী ভাবিতে লাগিলেন। এ সংবাদ কে তাঁহাকে দিবে? অথচ সংবাদ গোপন রাখাও কি সম্ভব হইবে?

রেণুকে আহার করাইয়া মৃণালিনীর গৃহে যাইতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর তিনি বেলা তিনটা বাজিলেই ফিরিয়া আসিলেন—এ বার দেবদত্তকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

তিনি কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

যতক্ষণ তিনি আইসেন নাই, ততক্ষণ রেণু তাহার পিতার বসিবার ঘরেই কাটাইয়াছে। সে তাঁহার উপর অভিমান করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্নেহ সে পরিমাণ করিতেও পারে নাই। আজ তাহার সে ত্রুটি সংশোধনের কোন উপায় আর নাই।

মৃণালিনী আসিলে সে তাঁহাকে সেই কথা বলিল। শুনিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "তোর যদি ক্রটি হয়ে থাকে, তবে সে তা কোন দিন ক্রটি ব'লে মনে করে নি। ছেলে-মেয়ের অত্যাচারও বাপমা'র কাছে মিষ্ট মনে হয়। সুধীর যে কখন তোর উপর বিরক্ত হয় নি, তা' ত তুই তা'র সব ব্যবস্থা দেখেই বুঝতে পারছিস।"

"তা' পারছি, মাসীমা! আর তা' পারছি ব'লেই আমার আর দুঃখ রাখবার স্থান নাই।"

তাহার পর বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতে প্রকাশ-চন্দ্র আসিয়া ডাকিলেন, "মা—রেণু?"

ডাকিয়া তিনি দ্বিতলে আসিলেন।

মৃণালিনী পার্শ্বের ঘরে চলিয়া যাইলেন; রেণুর নির্দ্দেশে তিনি সুধীরের বসিবার ঘরেই বসিলেন। রেণু তাঁহাকে পিসীমা'র সম্বন্ধে সুধীরের নির্দ্দেশ এবং পিসীমা'র পত্র দেখাইল। পাঠ করিয়া প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "আমরা বুঝ্‌তে পারি না, এমন অনেক ঘটনা ঘটে। এক জন ইংরেজ কবি লিখেছেন, যে ঘটনা ঘটিবে—পূর্ব্বেই তাহার ছায়া-পাত হয়। হয়ত পিসীমা'র মনে তেমনই এই ঘটনার ছায়াপাত হয়েছিল। তিনি সুধীরকে কত স্নেহ করতেন, তা' ত আমরা সকলেই জানি।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "মা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ত দু'দিন কেটে গেল। ছেলের চাইতেও মেয়ে বাপমা'কে বেশী ভালবাসে। তাই আমাদের নিয়ম—ছেলের আগে মেয়ে বাপমা'র উদ্দেশে জল দিবে। তোমাকে পরশু দিনই সুধীরের 'কায' করতে হ'বে।"

রেণু শুনিতে লাগিল।

রেণু বলিল, "জ্যাঠা মশায়, আমার যা' যা' কর্ত্তব্য তা' করবার ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিন। যেন কোন কাযে কোন ক্রটি না থাকে।"

প্রকাশচন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এ-ও আমাকে করতে হ'বে, মা?"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "এ বাড়ীতে কোন ব্যবস্থা আমি যে কবে করেছি, তা' যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ তোমার কথায় সব নূতন হয়ে উঠছে। লোককে খাওয়ান সুধীরের একটা ঝোঁকের মত ছিল। তোমার মা'রও সে ঝোঁক কম ছিল না—বিশেষ তিনি স্বামীর সত্তায় আপনার সত্তা এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্বামীর যা' ভাল লাগত, তিনি তাই ভালবাসতেন। তিনি কখন গৃহিণীর অধিকার নিতে পারেন নি—পিসীমা'র তাঁবেই থাকতেন, তবু সুধীরের কাছে এ বিষয়ে তাঁ'র উৎসাহের কথা আমরা জান্‌তে পারতাম।"

তিনি বলিলেন, "তোমার মাসীমা তা' জানেন।"

মৃণালিনী তাহা বিশেষ জানিতেন—কারণ, এই সব নিমন্ত্রণেই তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর আগমন না ঘটিলে সুধীর ও কাত্যায়নীর অনুযোগের সীমা থাকিত না।

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "তা'র পর তোমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুধীর যেন আপনার সব সখ বিসর্জ্জন করল—আদালতের কায, সে-ও যেন করতে হয় ব'লে করত—তা'র মন স্ত্রীর রোগ-শয্যায় থাকত। কোন সাধকও সে ভাবে সাধনা করতে পারে না—সে সেই ভাবে স্ত্রীর সেবা করত। আমি সে কথা যতই ভা'বি, ততই তা'র প্রতি ভক্তিতে আমার মন পূর্ণ হয়—ততই আপনাকে ভাগ্যবান্‌ ব'লে মনে করি—তা'র বন্ধু হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম।"

প্রকাশচন্দ্রের গলাটা ধরিয়া আসিল। মৃণালিনীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রেণু কাঁদিতেছিল।

প্রকাশচন্দ্র আপনাকে সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন, "মা, কায কোথায় করবে?"

রেণু দৃঢ়ভাবে বলিল, "বাবার এই বাড়ীতে।"

"সেই ভাল, মা। এ বাড়ী তা'র কাছে স্ত্রীর স্মৃতিমন্দির ছিল। তোমার শাশুড়ীকে সে কথা বলেছ?"

"তাঁ'র কোন আপত্তি হ'বে না। হ'বে কি, জ্যেঠামশাই?"

মৃণালিনী পার্শ্বের কক্ষের দ্বারের পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি বলিলেন, "না।"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "কায করবার লোকের ত বাহুল্য নাই—তুমি সংক্ষেপে সেরে নাও—দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ আর যা'দের না বললে নয়—তা'রা; পাড়ার যে ছেলেরা ঘাটে গিয়েছিল, তা'রা—"

বাধা দিয়া রেণু বলিল, "সে হ'বে না, জ্যাঠামশায়। বাবা লোককে আদর-যত্ন করতে কত ভালবাসতেন, তা'র পরিচয় পাইনি বটে, কিন্তু আজ আপনার কাছেই

তা শুনেছি। যেমন ভাবে কায করলে তাঁর মনের মত হ'ত—সেই ভাবে কায করতে হ'বে।"

"বেহানকে খুব পরিশ্রম করতে হ'বে। কায করবার লোক ত তিনি আর তোমার মাসীমা।"

"কেন জ্যেঠাইমা আসবেন না?"

"কেন আসবেন না, মা?"

"আমি কি গিয়ে তাঁকে ব'লে আসব?"

"তোমায় যেতে হ'বে না, মা। আমি ত তোমার ছেলে—আমিই তোমার হয়ে বলব। কলকাতায় জীবন কাটালাম বটে, কিন্তু কলকাতার হালের চা'ল কখন ভাল মনে করতে পারি না। বাড়ীর গৃহিণী নিমন্ত্রণ করতে না এলে বাড়ীর গৃহিণী যা'বেন না—এ সব একেলে চা'ল। সেকালে আমাদের সময় ছিল, বাড়ীর একটি ছেলে এসে মেয়ে-পুরুষ সব নিমন্ত্রণ করত, তা'তেই হ'ত।"

তিনি হাইকোর্টের এক জন বৃদ্ধ জজের গল্প বলিলেন। তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ হইয়া গেল—কুটুম্বরা পশ্চিমে থাকেন, কলিকাতার হাল আমলের প্রথা জানেন না; বাড়ীর বড় মেয়ে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণের দিন জজের পুত্রবধূ—কন্যার মাতা আসিয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, নতুন কুটুমবাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে কে যা'বে?" তীক্ষ্ণধী শ্বশুর ব্যাপারটা বুঝিলেন; তিনি বলিলেন, "দেখছি তুমি মহা সমস্যায় পড়েছ! তোমার বেহান যখন নিজে নিমন্ত্রণ করতে আসেন নি, তখন তুমি অবশ্যই যেতে পার না—তা'তে তোমার অপমান হ'বে। আমি বলি, তোমার শাশুড়ী ত একালের লোক ন'ন, তাঁর অপমান হ'বে না—তিনিই যা'ন।" পুত্রবধূর খুব শিক্ষা হইয়াছিল।

রেণু বলিল, "চলুন না, আমিই যাই।"

"না, মা—তোমাকে যেতে হ'বে না। আমি তাঁকে ঠিক সময় নিয়ে আসব। মেয়ের বাড়ীতে আসবেন—দুঃখের সময়; নিমন্ত্রণ কেন, মা?"

মৃণালিনী কয়দিন হইতেই একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছিলেন—রেণুর কোন কাযের মধ্যে তাহার স্বামীকে সে যেন স্থান দিতেছিল না—ইচ্ছা করিয়াই সে তাহা করিতেছিল, কি অন্য কারণে, তাহা তিনি বুঝিতে না পারিলেও ইহাতে তাঁহার মনে শঙ্কার উদ্ভব হইতেছিল। তিনি ভয় করিতেছিলেন—রেণুর জীবনে পাছে তাহার শ্বশুরালয়ের—বিশেষ স্বামীর প্রভাব আরও হ্রাস পায়। তাহা তিনি একান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি এই সুযোগে বলিলেন, "কেন, ওর মেয়ে নিমন্ত্রণ করতে যা'বে। ছেলে-মেয়ে একদিন মা'কে না পেয়ে একেবারে ম্লানমুখ হয়ে বেড়াচ্ছে।"

রেণু কোন কথা বলিল না—আপত্তিও করিল না। প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "তাই হ'বে। তবে রেণুর জ্যেঠাইমাকে নিমন্ত্রণ করতে যেতে হ'বে না। তিনি বাড়ীর সকলকে নিয়ে আসবেন—কায-কর্ম্ম করবেন। সে বিষয়ে কোন ভাবনা নেই।"

সেই ব্যবস্থাই হইল এবং প্রকাশচন্দ্র যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, তাঁহাদিগের এবং দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মাত্র একটি দিন—কাযেই আর বিলম্ব করা চলে না।

তিনি তাঁহার গৃহে গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে আনাইয়া লইলেন। তিনি আসিয়া মৃণালিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া সব আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ণিমা তাঁহাদিগের কার্য্যে যোগ দিলেন।

কণা ও অশোক আবার মা'র কাছে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কণাকে মৃণালিনী বলিলেন, "তুমি ত দিদি, এবার মস্ত বড় হ'য়ে গেলে; মা'র হয়ে তুমি নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছ।"

অশোক বলিল, "কেন, দিদি, আমি যা'ব না?"

মৃণালিনী বলিলেন, "মা যা'বেন না—তাই কণা তাঁ'র প্রতিনিধি হয়ে যা'বেন! তুমি এক কায কর—তুমি বাবার সঙ্গে যা'বে।"

অশোক বলিল, "আমি দিদির সঙ্গে যা'ব।"

"আচ্ছা তাই হ'বে।"

তাহাই হইল এবং উদ্যোগ-আয়োজন এমন ভাবে হইতে লাগিল যে, রেণুর মনে হইতে লাগিল, সে তাহার যতটুকু সাধ্য পিতার প্রীতিকর অনুষ্ঠান করিতেছে। তাহার মনের কথা কেহই জানিতে পারিলেন না। সে কেবলই ভাবিতেছিল—সে পিতার প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, তাহা তাহার অপরাধ—সে তাহা পাপ বলিয়া বিবেচনা করে; সে কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবে না? প্রকাশচন্দ্র

তাহাকে কথায় কথায় পিতার সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা শুনাইয়াছেন—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম—তাঁহার প্রীতিতে সর্ব্বদেবতার প্রীতি সম্পাদিত হয়। সেই পিতাকে সে ভুল বুঝিয়াছে; তাঁহার স্নেহের স্বরূপ সে বুঝিতে পারে নাই। তাহা বুঝিবার মত শক্তি তাহার ছিল না—অভিমান তাহাকে সেই স্নেহের সম্বন্ধে ভুল বুঝাইয়াছিল। তাহার ব্যবহারে তাহার পিতার মনে কত বেদনার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারিতেছে; কিন্তু—সেই বেদনাই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ হয় নাই ত? সে যত ভাবিতেছিল, ততই তাহার বক্ষ বেদনায় ও চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তাই পিতা লোককে আদর করিতে ভালবাসিতেন—এই কথা প্রকাশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াই সে সঙ্কল্প করিয়াছিল—সে "চতুর্থীতে" তাহাই করিবে। জলে মজ্জমান ব্যক্তি যেমন সম্মুখে তৃণখণ্ড দেখিলে তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, সে'ও তেমনই মনে করিতেছিল—পিতার সম্বন্ধে এখনও তাহার যাহা করণীয় আছে, সে সেই সকল এমন ভাবে সম্পন্ন করিবে যে, তাহাতে তাহার ভুলের ফল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

তাহার আগ্রহাতিশয় লক্ষ্য করিয়া মৃণালিনী যখন বলিলেন, সে অত্যন্ত ব্যাকুলতায় বিব্রত হইতেছে কেন—তখন সে যাহা বলিল, তাহাতে মৃণালিনী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার নিকট রেণুর মনের কথা আর গোপন থাকিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি কি সুধীরের কোন ব্যবহারে কোন দিন মনে করিতে পারিয়াছ, সে তোমাকে অপরাধী মনে করিয়াছে? স্নেহ নিম্নগামী। আমাদের দেশে চলিত কথা আছে—

'কুপুত্র যদিও হয়
কুমাতা কখন নয়'

—তুমি যেমন সুধীরের পুত্রেরও অধিক—সর্ব্বস্ব ছিলে, সে'ও তেমনই তোমার কেবল পিতাই ছিল না—একাধারে পিতা ও মাতা ছিল। দেবদত্তের জন্মকালে তুমি যখন জীবনের আর মরণের সন্ধিস্থলে—তখন কি কেহ সুধীরের অপেক্ষাও বেশী চিন্তিত হয়েছিল?"

সে সময় পিতার যে অবস্থা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহা রেণুর মনে পড়িল। সে আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "মাসীমা, বাবার ব্যবহারে—তাঁ'র স্নেহে কখন কোন ত্রুটি কেহ লক্ষ্য করতে পারে নি বটে, কিন্তু আমার ত্রুটি ত আমার কাছে - আমি গোপন করতে পারি না। আমি যত তা' মনে করছি, ততই আমার মনে হচ্ছে, আমি যে অপরাধ করেছি, তা'র হয় ত প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

মৃণালিনীরও মনে হইয়াছে- যদি রেণুর ভুলের জন্য সুধীর বেদনা না পাইত, তবে হয়ত দীপ এত শীঘ্র নির্ব্বাপিত হইত না, তথাপি তিনি সে কথা আজ মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টাই করিলেন। তিনি রেণুকে বলিলেন, "তুমি ভুল করছ, মা। তোমার শোক তোমার ত্রুটি তোমার কাছে অতিরঞ্জিত ক'রে অপরাধে পরিণত করেছে। গঙ্গার জল যেমন যাঁ'কে স্পর্শ করে, তা'কেই নির্দ্দোষ করে—তেমনই সুধীরের মত দেবচরিত্রের স্নেহ তোমার কোন ত্রুটি থাকলেও তা'কে স্পর্শ ক'রে নির্দ্দোষ করেছে; তা'র সব মলিনত্ব বিধৌত ক'রে দিয়েছে।"

তাহাতেও যেন রেণুর মনের ভার দূর হইল না লক্ষ্য করিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "তা'র মনে যদি সে ভাব থাকত, তবে কি সে তা'র স্নেহের একমাত্র অবলম্বন কন্যাকেই তা'র সর্ব্বস্ব দিয়ে, তা'র ইচ্ছামত সেই সর্ব্বস্বের ব্যবহার করতে নির্দ্দেশ দিয়ে যেত? তা'র সঙ্গে অর্থের সদ্ব্যবহার করা নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকবার অনেক আলোচনা হয়েছে। দেবদত্তকে তুমি আমার কোলে দিবার পূর্ব্বে সে তোমার মেস মহাশয়ের সম্পত্তির কি করা কর্ত্তব্য তা' নিয়ে অনেক ভেবেছে। সে বিদেশে কোন এক জন মনীষীর কথা বলত—ধনী হয়ে মরা কলঙ্কের কথা, যে ধন উপার্জ্জন করে, সে তা'র সদ্ব্যবহার করতে না জানলে—তা'র ধন গর্দ্দভের চিনির বস্তা বহিবার মতই হয়। সে নিজে তা'র বাপের আর মা'র নামে হাসপাতালে টাকা দিয়াছে—অনেক ছেলে তা'র সাহায্য পেয়ে লিখা-পড়া শিখে জীবনে সাফল্য লাভ করেছে; সে পিসীমা'র জন্য দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করবার নির্দ্দেশ দিয়ে গেছে। কিন্তু নিজের সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার তা'র মেয়েকেই দিয়ে গেছে। এতেও কি তুমি বুঝতে পারছ না—তুমি তা'র কি ছিলে—সে তোমাকে কত স্নেহ করত—তোমার উপর তা'র আস্থা কেমন ছিল?"

রেণু যেন অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল, হয়ত সে তাহার ত্রুটি সত্য সত্যই অতিরঞ্জিত করিতেছে। সে মনে একটু শান্তি পাইল।

তাহার পর "চতুর্থীর" উদ্যোগে ও আয়োজনে সে দুই দিন আর অধিক ভাবিবার সময় পাইল না।

একান্ত নিষ্ঠা সহকারে সে "চতুর্থীতে" কন্যার কর্ত্তব্য পালন করিল।

১০

"চতুর্থীর" কায শেষ হইল—তাহার পর-দিন মৃণালিনী লক্ষ্য করিলেন—রেণু যেন অন্য দিনের অপেক্ষাও বিষণ্ণ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর কি ভাল নাই?"

রেণু বলিল, "কিছু ত অসুখ মনে হচ্ছে না।"

"ক'দিনের পরিশ্রমেই তোমাকে এমন দেখাচ্ছে।"

রেণু আর কিছু বলিল না—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল—তাহার পর বলিল, "সব কায শেষ হ'ল!" সে যেন অন্য-মনস্কভাবেই এই কথা বলিল।

মৃণালিনী যেন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, এখনও রেণু তাহার পিতার চিন্তাতেই মগ্ন আছে এবং তাহাই তাহার ভাল লাগিতেছে। তিনি বলিলেন, "মা, কায ত এখনও শেষ হয় নি।"

"কেন?"

"শুনলে ত প্রকাশ বাবুর কথা—কন্যাই অধিক স্নেহের, তাই পিতামাতা প্রথমে তা'র শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন।"

"তা'র পর?"

"তা'র পর—কে কি করবেন, সে কথা প্রকাশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে হ'বে।"

প্রকাশচন্দ্র অন্য দিনেরই মত আদালত হইতে ফিরিবার পথে আসিলেন এবং বলিলেন, "আমি সে কথা ভেবে রেখেছি। সুধীরের এক জ্ঞাতি-পুত্র আমাদের আদালতেই উকীল—তা'কে ব'লে রেখেছি। সে সব সংবাদ দিলে অধিকারী স্থির ক'রে ব্যবস্থা করব।"

তিনি রেণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ইচ্ছা, সে কায এই বাড়ীতেই হ'বে।"

রেণু বলিল, "হ্যাঁ।"

সে যেন আরও কয় দিন এই বাড়ীতে থাকিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দিতা হইল।

তাহার পর সে প্রকাশচন্দ্রকে বলিল, "জ্যেঠামশায়, আজ ক'দিনই আমি 'পিসীমার' কথা ভাবছি। তাঁ'র সম্বন্ধে কি করা যা'বে?"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি ত দেখেছ, তিনি যদি জান্‌তে না পারেন, তবে তাঁ'কে সংবাদটা জানান না হয়—এই সুধীরের অভিপ্রেত ছিল। সে যে কা'র জন্য ভাবেনি—তাই আমি ভাবি। কিন্তু এ সংবাদ কি গোপন থাকবে? জান ত, মা, যাঁরা তীর্থবাস করতে যান, তাঁরাও অনেকে এক একটি সংবাদপত্র। আমার এক জ্যেঠাইমা পুরীতে বাস করতেন, তিনি প্রথম প্রথম প্রতিদিন তিনবার মন্দিরে যেতেন—শেষে কেবল সন্ধ্যারতি দেখতে যেতেন; মা মধ্যে মধ্যে তাঁ'র কাছে যেতেন—তিনি কেবল সন্ধ্যারতি দেখতে যাওয়া আরম্ভ করবার পর মা যে বার গেলেন, সে বার তা'র কারণ জিজ্ঞাসা করলে জ্যেঠাইমা বললেন, 'আর বলিস নে, ছোট বৌ, শুনেছিস ত—

'গয়ায় গেলাম ঘুচাতে পাপ—
সেখানে দেখি—সতীনের বাপ!'

এলাম দেবস্থানে—এখানেও দেখি যা'রা তীর্থবাসিনী হয়েছেন, তাঁ'রা মন্দিরে গিয়েও কেবল পরের কথার আলোচনা—কুৎসার আলোচনা করেন। তাই বিরক্ত হ'য়ে এই ব্যবস্থা করেছি—আর সময় বাড়ীতে ব'সে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করি।' সুধীরের সংবাদ ত অনেক সংবাদপত্রেই বেরিয়েছে—হয়ত কে কোন দিন ব'লে ফেলবেন—সহানুভূতি দেখাতে যা'বেন।"

রেণু বলিল, "তা' হ'লে কি করা যায়, জ্যেঠামশাই?"

"কি আর করবে বল।"

"কিন্তু দেখুন আজও তাঁ'র এক পত্র এসেছে—তিনি বাবার চিঠি না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। হয়ত তিনিই কাউকে সংবাদ নিতে বলবেন।"

"তা'হ'লে কি সংবাদ দেবে?"

পিসীমা'র প্রতি রেণুর কখনই বিশেষ আকর্ষণ ছিল না—বরং তাহার বিপরীত ভাবই ছিল বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাহার মহাশোক তাহাকে অন্যের শোকে সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়াছিল। তাই সে কয় দিনই পিসীমা'র কথা ভাবিয়াছে।

প্রকাশচন্দ্র ভাবিয়া বলিলেন, "যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁ'কে সংবাদ দিতে যেতে হয়। পত্রে সংবাদ দেওয়া ভাল হ'বে না।"

"আমি যা'ব?"

"যদি যেতে চাও—তবে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ ক'রেই যেতে হয়। কাশীতে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'রে যেতে হয়।"

"সে ব্যবস্থা কে করবে?"

"কেন, মা, তোমার অভাব কি? কাশীতে আমাদের ক'জন বন্ধুর বাড়ী আছে—যাঁকে বলব, তিনিই সানন্দে বাড়ী দেবেন। নীরেন্দ্র যা'বেন। তোমার মাসীমা যেতে পারবেন না—কিন্তু তোমার শাশুড়ী হয়ত যেতে পারবেন। তোমরা সবাই যেতে পার।"

"কিন্তু—জ্যেঠামশায়, 'পিসীমাকে' কি আমি সংবাদ দিতে পারব?'

"না"—বলিয়া প্রকাশচন্দ্র একটু চিন্তা করিলেন; তাহার পর সুধীরের মুহুরীকে ডাকিয়া পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন পঞ্জিকা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মঙ্গলবারে কায পড়বে। যদি বল—আমি শুক্রবারে তোমাদের নিয়ে যা'ব। যদি ব্যবস্থা করতে পারি বুধবার অবধি থেকে তোমাদের নিয়ে আসব—না হয়, রবিবারের মধ্যে সব ব্যবস্থা ক'রে তবে ফিরব।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমার জ্যেঠাইমা'রও কি একটা পূজা মানত করা আছে—ক'বার যাবেন যাবেনও করেছেন, দেখি যদি তিনি যেতে চান।"

তিনি উঠিয়া যাইয়া টেলিফোন ধরিলেন—বাড়ীতে ফোন করিলেন এবং তাহার পর আসিয়া বলিলেন, "কাশী যাত্রা—একবার শুনলে হয়! তোমার জ্যেঠাইমাও যা'বেন।"

তখন সেই আয়োজন হইতে লাগিল।

পূর্ণিমাও যাইবেন—কণা ও অশোকও যাইবে।

প্রকাশচন্দ্র সব ব্যবস্থা করিলেন। ভৃত্যদিগকে পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

প্রকাশচন্দ্রের ব্যবস্থায় কলিকাতায় সব আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করা হইল এবং সুধীরের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জ্ঞাতিকে সম্মত করাইয়া তাঁহাকেই লইয়া যাওয়া স্থির হইল।

মোগলসরাই ষ্টেশন হইতে দুইখানি বাসে সকলে কাশী যাত্রা করিলেন।

বাস অগ্রসর হইলে যখন কাশীর দৃশ্য সকলের নয়ন-সমক্ষে প্রকট হইল, তখন প্রকাশচন্দ্রের পত্নী উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া পূর্ণিমাকে ও রেণুকে বলিলেন—"কাশী দেখ।"

উভয়েই উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। কণা ও অশোক বিস্মিত ভাবে—যেন একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"কি চমৎকার!"

চমৎকারই বটে। নিম্নে উত্তরবাহিনী জাহ্নবী—তাহার কূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী—সোপানশ্রেণী নদীতে নামিয়া আসিয়াছে—সোপানে জনতা—তাহাদিগের বেশে বর্ণে কি বৈচিত্র্য!

যে বাসে মহিলারা ছিলেন, প্রকাশচন্দ্র তাহাতেই—সম্মুখে চালকের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। রেণু যখন তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—"জ্যেঠাইমা, ঐ যে চূড়া দেখা যাচ্ছে—ঐ কি বিশ্বনাথের মন্দির?"—তখন তিনি বলিলেন, "না, মা। পরধর্ম্মদ্বেষী বাদশাহ ঔরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির অপবিত্র ক'রে তা'র উপর যে মসজেদ প্রতিষ্ঠা ক'রে মনে করেছিলেন—বিরাট পুণ্য সঞ্চয় করলেন—ঐ সেই মসজেদের চূড়া; হিন্দুর বুকে বেদনা দিতে দণ্ডায়মান।"

রেণু যেন ব্যথিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ধর্ম্মের লোকের মনে অকারণে ব্যথা দিলে কি সত্যই পুণ্যসঞ্চয় হয়?"

"কখনই হয় না। যদি বল—তা'র ফলও ভাল হয় না, তবে তা'রই প্রমাণে বলা যায়—ঔরঙ্গজেব তাঁ'র দীর্ঘ রাজত্বের ও জীবনের অর্দ্ধাংশ যুদ্ধে, অশান্তিতে ছেলেমেয়েদের ভয়ে কাটিয়েছিলেন—তাঁ'র কাযের ফলেই মোগলরাজ্য শেষ হয়।"

অশোক ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিতেছিল—সে বলিল, "কেন, দাদা, তা'র পরেও ত মোগলরাজ্য ছিল।"

প্রকাশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "খুব ঠকিয়েছিস। ছিল বটে, কিন্তু না থাকবার মত—ঐ যে তোর বুড়ী দিদিকে দেখ্‌ছিস, ওঁরই মত—যা'বার পথে থাকা। তখন থেকে মোগলরাজ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল—শেষে যিনি একেবারে সব শেষ করলেন—"

অশোক বলিল, "বাহাদুর শা?"

"হাঁ। তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন—কিন্তু কাযে কিছুই না। তুই যেমন বড় হ'লে বৌদিদির কাছেই থাকবি—তিনি তেমনই তাঁ'র বেগমদের মহলেই থাকতেন।"

বাস গঙ্গার উপর সেতুতে উপস্থিত হইল।

যে বন্ধুর গৃহ লওয়া হইয়াছিল, তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে বাস চলিল—অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহদ্বারে উপনীত হইল।

তাহার পর গৃহে সকলকে রাখিয়া প্রকাশচন্দ্র পিসীমা'র গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

তিনি যখন সেই গৃহে উপনীত হইলেন, তখন পিসীমা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আইসেন নাই। তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

তিনি ফিরিয়া আসিলেই সংবাদ পাইলেন এক জন লোক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কে ?"

প্রকাশচন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "পিসীমা,—আমি প্রকাশ।"

পিসীমা ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, "প্রকাশ! তুমি কি কাশীতে এসেছ, বাবা ?"

"হাঁ।"

"তোমাকে ব'সে থাকতে হয়েছে। এই গঙ্গাস্নান ক'রে শিবের মাথায় জল দিয়ে সুধীরের, রেণুর, দেবুর মঙ্গল কামনা ক'রে ফিরি—একটু দেরী হয়। তা'রা সব ভাল আছে ত ?"

কথাটার সরল উত্তর না দিয়া প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "পিসীমা, রেণু কাশীতে এসেছে। তাই আপনাকে নিয়ে যেতে হ'বে।"

"রেণু এসেছে! কেন? কবে এল? একা এসেছে ?"

প্রকাশচন্দ্র শেষ প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন, "একা নহে, পিসীমা, জামাই এসেছেন, ছেলেমেয়ে এসেছে; বেহানও এসেছেন।"

"বেড়া'তে এসেছে বুঝি? তা' বেশ। দেবুকে আনে নি ?"

"না।"

"মাসী কি তা'কে আসতে দেবে!"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি পূজা সেরে নিয়ে যাব, তোমার ত দেরী হ'বে!"

"আমি ত বাড়ী চিনে গেলাম—আমিই বিকেলে এসে আপনাকে নিয়ে যা'ব। সেই ভাল হ'বে না কি, পিসীমা ?"

"তা'ই হ'বে। তবে, বাবা, যত শীঘ্র পার এস—পোড়া মন—মায়া কি কাটাতে পারা যায়? রেণু এসেছে—কতক্ষণে তা'কে দেখব, তা'ই কেবল মনে হচ্ছে। আহা, সুধীর যদি আসত—কত দিন তা'কে দেখি নি!"

"রেণু ত বলছে, আপনাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যা'বে।"

"না, বাবা, একথা আর যেন বলে না। সুধীর ত আর সংসারী হ'ল না—হ'লে আমার পায় আবার বেড়ী পড়ত। এখন যে ক'দিন থাকব, যেন বাবা বিশ্বনাথের চরণে থেকে মণিকর্ণিকায় পুড়তে পারি।"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, পিসীমা, আমি বিকেলেই আসব।"

"ক'দিন সুধীরের পত্র পাই নি—বোধ হয়, তোমরা আসবে বলেই আর পত্র দেয় নি। তুমি কি কোন কাযে এসেছ ?"

"না, পিসীমা, আমার স্ত্রীর পূজা দিবার ছিল—তিনি এলেন, আমিও এলাম।"

* * * * *

অপরাহ্নে প্রকাশচন্দ্র আসিয়া পিসীমা'কে লইয়া যাইলেন।

পিসীমা যাইয়া রেণুকে, নীরেন্দ্রকে, পূর্ণিমাকে ও ছেলে-মেয়েকে আদর করিলেন—প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রীকে বলিলেন, "বৌমা, তোমাকে কত দিন পরে দেখলাম! তাইত কথায় বলে, বেঁচে থাকলেই দেখা হয়।"

তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সুধীর কেমন আছে, রেণু ?"

রেণু এতক্ষণ স্থির ছিল—আর পারিল না! কাঁদিয়া ফেলিল।

পিসীমা চমকিয়া উঠিলেন—"রেণু, তবে কি সুধীর—"

তিনি অবশিষ্ট কথা বলিতে পারিলেন না।

প্রকাশচন্দ্রের পত্নী ও পূর্ণিমা আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন।

পিসীমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

বহুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া পিসীমা বলিলেন,—"তাই আমার মনে কত আশঙ্কা হচ্ছিল—কেন, তা'র পত্র পাচ্ছি না।"

তখন প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদিগের কাশীতে আসিবার কারণ জানাইলেন।

পিসীমা কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "আপনি সুধীরকে যেমন ভালবেসেছেন, সে-ও আপনাকে তেমনই ভক্তি করত। তা'র কাগজপত্রের মধ্যে দেখলাম, সে রেণুর জন্য লিখে গেছে—আপনাকে যেন সংবাদ জানান না হয়—আপনি মনে কত ব্যথা পা'বেন তা' সে বুঝতে পেরেই ঐ কথা লিখে গিয়েছিল।"

তাহার পর তাঁহার সম্বন্ধে সুধীর আর যে সব ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিল, প্রকাশচন্দ্র তাহাও বলিলেন। তিনি সেই সুযোগ লইয়া বলিলেন, সুধীর যে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জমি কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—তাহাতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, পিসীমাকে যাইয়া তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

পিসীমা কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বাবা, আমি আবার সেই বাড়ীতে যা'ব! একে একে সকলেই গেল—রইলাম কেবল আমি, আমার কপাল পোড়া তাই।"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "পিসীমা, আজ সে কথা আর বলব না। কিন্তু আপনাকে রেণু যেতে বলছে, আপনি কি তা'র কথা ফেল্‌তে পারবেন?"

তাহার পর শ্রাদ্ধ শেষ হইল।

তখন প্রকাশচন্দ্র আবার পিসীমাকে যাইবার কথা বলিলে, পিসীমা যখন বলিলেন, "বাবা, আমি কি আর যেতে পারি?"

প্রকাশচন্দ্র বলিলেন, "পিসীমা, সুধীর গেল—তা'ও যে সহ্য করতে হ'ল। এখন সব বিষয় আমাদের পরামর্শ ক'রে করতে হবে। এই দেখুন না বাড়ী। রেণুর ইচ্ছা নহে বাড়ী ভাড়া দেয়। কিন্তু কেউ না থাকলে কি বাড়ী থাক্‌বে? আপনি থাক্‌লে রেণুও মধ্যে মধ্যে আসবে—আমাকে বলেছে, আমি যেন যাই—আমার কাছে বাপের কথা শুনতে ভালবাসে। আর নীরেনের ছেলেমেয়ে তা'রাও ত আপনার পর নহে।"

প্রকাশচন্দ্র শেষে বলিলেন, "পিসীমা, আপনি কাশীতে বাস করবেন ব'লে তা'র কোন ব্যবস্থাতেই ত সুধীর কোন ক্রটি রেখে যায় নি। আপনার যখন ইচ্ছা কাশীতে আসবেন। এখন—রেণু বড় আঘাত পেয়েছে; আপনি আর ওর মাসীমা বাপের বাড়ীর বলতে ত এই দু'জন। আপনাদের কর্ত্তব্য—ওকে শোকে সান্ত্বনা দেওয়া।"

মাসীমা'র কথায় পিসীমা'র ভাবান্তর হইল! মাসীমাই রেণুকে সান্ত্বনা দিবেন—আর তিনি দূরেই থাকিবেন? তখন তিনি মনে মনে অনুকূল যুক্তির অবতারণা করিতে লাগিলেন। মাসীমা ত কলিকাতাতেই আছেন—তবুও রেণু কাশীতে আসিয়াছে এবং তাঁহাকে যাইতেই বলিতেছে। এ সময় না যাওয়া কি ভাল হইবে?

ইহার পর তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি প্রকাশচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

প্রকাশচন্দ্রের আর থাকিবার সুবিধা হইল না। তিনি বুধবারেই তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া যাইলেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বে নীরেন্দ্রকে ভার দিয়া যাইলেন—সে যেন তাহার মাতাকে ও রেণুকে কাশীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইয়া লইয়া যায়।

কাশীতে দ্রষ্টব্য স্থানের—মন্দিরের অন্ত নাই। কেহ কেহ বলেন, ছয় মাস দেখিলেও কাশীর সব মন্দির দেখা হয় না। কিন্তু শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। তাই নীরেন্দ্র প্রধান প্রধান মন্দিরাদি সকলকে দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হইল।

কাশীতে আসিয়া রেণু তাহার শোকতপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করিল। যে ইহকালের কার্য্যে আমরা এত ব্যস্ত থাকি, তাহা কিরূপ তুচ্ছ, তাহা কাশীতে আসিলেই বুঝিতে পারা যায়। যুগে যুগে—স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু ইহকাল তুচ্ছ করিয়া পরকালের জন্য সাধনা করিতে এই বারাণসীতে আসিয়াছে—তাঁহাদিগের সাধনার সিদ্ধিলাভ কি হয় নাই? ইহকাল ও পরকালের যে ব্যবধান, তাহা বুঝি এই মহাতীর্থে আসিলে দূর হইয়া যায়।

তাহার পর সকলে কলিকাতায় ফিরিলেন।

গৃহদ্বারে পিসীমা'র আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইলে গৃহমধ্যে কুমুদার ক্রন্দন তাহাতে যুক্ত হইল। পূর্ণিমার সঙ্গে রেণুই পিসীমা'কে নামাইয়া লইল। তাঁহাদিগের আসিবার সংবাদ পাইয়া মৃণালিনী আসিয়াছিলেন।

পিসীমা'র আগমনে রেণু আরও কয় দিন পিতৃগৃহে—তাহার গৃহে রহিয়া গেল।

তাহার পর প্রকাশচন্দ্রের ও মৃণালিনীর পরামর্শে সে আবার স্বামিগৃহে গেল। তবে সে মধ্যে মধ্যে পিসীমা'র কাছে আসিতে লাগিল।

ওদিকে প্রকাশচন্দ্র সুধীরের ত্যক্ত সম্পত্তিতে রেণুর অধিকার-প্রতিষ্ঠার যে সব ব্যবস্থা আইনে প্রয়োজন, সে সব করিলেন এবং রেণুর অভিপ্রায় অনুসারে পিসীমা'র জন্য কল্পিত মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্যেরও ব্যবস্থা করিলেন। সে কার্য্যে রেণু বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিল।

গঙ্গার কূলে সুধীরের ক্রীত বাগানে শিবমন্দির নির্ম্মিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তথায় একটি গৃহও নির্ম্মিত হইল।

পিসীমা'র শরীর কিন্তু ক্রমেই অপটু হইয়া আসিতে লাগিল এবং সেই জন্য তিনি কাশীতে যাইতে চাহিলে রেণু যেমন তাহাতে আপত্তি করিত, তেমনই যাহাতে শীঘ্র মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়, সে চেষ্টাও করিতে লাগিল। সে কার্য্যের ভার প্রকাশচন্দ্র বিশেষ বিবেচনা করিয়া নীরেন্দ্রকে দিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কেমাল আতাতুর্ক

তুরস্ক গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, নবীন তুরস্কের ভাগ্যবিধাতা কেমাল আতাতুর্ক গত ১০ই নভেম্বর প্রভাতে ৭টা ৫ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

কেমাল আতাতুর্ক গত অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সহসা রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সুচিকিৎসায় ও যথাযোগ্য সেবা-শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছিল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে গত ৮ই নভেম্বর তাঁহার রোগ সহসা প্রবল হওয়ায় তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করা হয়; অবশেষে ১০ই নভেম্বর প্রভাতে তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত তুরস্কের জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেণ্ট আবদুল হালিক্রেণ্ডা অস্থায়িভাবে তুরস্ক গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল ইস্‌মেট হনেউনু স্থায়িভাবে নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিবার পর রাজকার্য্যের সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি ত্রয়োদশবর্ষকাল রাজকার্য্যে কেমালের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনিও প্রাচীন হইয়াছেন; ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি এই গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে তুরস্ক চিরদিন রুগ্ন (Sick man) বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। কেমাল পাশা অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও শক্তিবলে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রভাব হইতে তাহার মুক্তিবিধান করিয়া তাহাকে নবজীবন দান করেন; তাঁহার চেষ্টায় তুরস্ক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। তিনিই তুরস্ক হইতে মুসলমান ধর্ম্মগুরু খলিফাকে বিতাড়িত করিয়া, তুরস্কে বহুবিধ সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি তুর্ক জাতির বহু শতাব্দীব্যাপী কুসংস্কার অপসারিত করিয়া তুরস্ককে বর্ত্তমান কালোচিত শিক্ষা-দীক্ষা দানে অভিনব ভাবে সংগঠিত করিয়াছিলেন বলিয়াই 'আতাতুর্ক' অর্থাৎ 'তুর্কজাতির পিতা' এই গৌরবপূর্ণ খেতাব গ্রহণ করেন। বিগত ষোড়শ বৎসর কাল ব্যাপিয়া তাঁহার জীবনের ইতিহাস তুরস্কের জাতীয় জীবনের ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গাজী মুস্তাফা কেমালের জননী সাধারণ গৃহস্থ মহিলা ছিলেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল না। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মাসিডোনিয়ায় কেমালের জন্ম হয়। কেমাল ভবিষ্যৎ জীবনে যে সকল অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ, তিনি বাল্যকাল হইতে জননীর নিকট সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দরিদ্রা জননী তাঁহার সুশিক্ষার জন্য অসাধারণ ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে কোন কোন দিন তাঁহাকে অনাহারে থাকিতে হইলেও তিনি পুত্রের শিক্ষাদানে কোন দিন অবহেলা করেন নাই। কেমাল যৌবন-কালে তুরস্কের রাজকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; ইহাই তুরস্কের সৌভাগ্যের সূচনা।

মুস্তাফা কেমালের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তুরস্কের সুলতান এবং মুসলমান ধর্ম্মজগতের গুরু ছিলেন। এই ব্যসনাসক্ত, অসংযতচরিত্র, ও দুর্নীতিপরায়ণ নরপতির রাজত্বকালে তুরস্ক অবনতির শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সিংহাসনারোহণের অল্পকাল পরে প্রথম রুসো-তুর্কি যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর তুরস্কের দুর্গতির সীমা ছিল না, তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিদারুণ অধঃপতন হইয়াছিল।

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় কেমাল পাশা সেনাপতিরূপে যে বীরত্ব প্রকাশ করেন, তাহাতেই তাঁহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও খ্যাতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল; অবশেষে লুসেনের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি তুরস্কের অনুকূলে সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গৌরব-জ্যোতিঃ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়াছিল। কেমাল তুরস্কের খলিফাকে বিতাড়িত করিয়া যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন, তুর্কজাতি কেমালকে সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। কেমাল নবীন তুরস্কে জাতীয়তাবাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তুরস্কে বিবিধ সংস্কারের এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া তুরস্কের রাজনীতি পাশ্চাত্য আদর্শে পরিচালিত করেন। বহুশতাব্দীব্যাপী যে সকল কুসংস্কার তুরস্কের জাতীয়-জীবন অভিশপ্ত করিয়াছিল, মুস্তাফা কেমাল তাহা পদাঘাতে অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার এই সকল কার্য্যে রক্ষণশীল মুসলমান ধর্ম্মজগৎ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইলে, সিংহ যেরূপ ফেরুপালের তর্জ্জন গর্জ্জন অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করে—তিনিও সেইভাবে তাহাদিগের সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছিলেন।

কেমাল আতাতুর্ক

গাজী মুস্তাফা কেমাল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তুর্ক গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; ১৯২৭, ১৯৩১ এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই দক্ষতাগুণে আজ তুরস্ক সভ্যজগতে গৌরবান্বিত এবং পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জ কর্ত্তৃক সম্মানিত শক্তিশালী রাজ্য। কেমাল কঠোরহস্তে রাজ্যশাসন করিলেও জনপ্রিয় দেশনায়ক বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মাণ স্থপতিগণের সাহায্যে এঙ্গোরার নিকট যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই প্রাসাদেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন; কিন্তু তিনি বৃথা আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশনায়কের সকল গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত না হইলেও তুরস্কের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার কর্ম্মজীবনের অবসান হইল। তাঁহার পরলোকগমনে আজ তুর্ক জাতি মর্ম্মাহত। তাঁহার মৃত্যুতে তুরস্কের যে ক্ষতি হইল, ভবিষ্যতে সেই ক্ষতিপূরণ হইবে কি না, তাহা মানববুদ্ধির অগোচর।

তাল-বেতালের কাণ্ড

[রূপকথা]

এক

বিক্রমাদিত্য তখন ভারতবর্ষের সম্রাট। দেশ-বিদেশে তাঁহার খুবই নাম-ডাক। বড় বড় রাজারাও তাঁহার ভয়ে তটস্থ। কথায় কথায় যাহারা রাজ্যের ভিতর বিপ্লব বাধায়, লুঠপাট করিয়া যে সব বদ লোক ঘূর্ণী বাতাসের মত সারা রাজ্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাও একেবারে থরহরিকম্প; কাহারো টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই,—এমনই রাজার প্রতাপ ও দাপট।

রাজার রাজধানী উজ্জয়িনী যেন দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী। ঘর-বাড়ী, মঠ-মন্দির, বাগান-বাগিচা, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট সবই যেন ছবির মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। আর, কি বাহার তাঁর রাজসভাটির! দেখিলে যেন চক্ষুর পলক আর পড়িতে চাহে না; মনে হয়, সত্যই কোথায় আসিলাম, এ সব কি দেখিতেছি!

রাজার বত্রিশ সিংহাসন—সে বুঝি পৃথিবীর এক আশ্চর্য্য বস্তু। আসনের ধাপে ধাপে মণিমুক্তাখচিত সারি সারি বত্রিশটি সোনার পুতুলের কি সুন্দর বাহার! কত রকমের কত কারুকার্য, কত সব দামী দামী হীরা মাণিক মরকতের ছড়াছড়ি সেই আশ্চর্য্য সিংহাসনে।

রাজাকে দেখিলেই মনে হয়, এই সিংহাসন তাঁরই যোগ্য বটে! রাজার রূপের আলোটি পড়িয়া সিংহাসনের শোভা ও সৌন্দর্যটুকু যেন আরো উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজার দিকে চাহিলে চোখ দুটি আর ফিরাইতে পারা যায় না; তাঁর চোখ-ঝলসানো রূপ চুম্বকের মত লোকের দৃষ্টিকে যেন ধরিয়া রাখিতে চায়। যেমন রূপে-গুণে অপূর্ব্ব রাজা, আর তাঁর রত্নময় অপূর্ব্ব সিংহাসন, নবরত্নের সমাবেশে তাঁহার সভাও তেমনই অপূর্ব্ব। রাজার মতই যে নয় জন পণ্ডিতের সে সময় দেশ-যোড়া নাম, এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায়,—তাঁহারা সবাই আসিয়া রাজসভার শোভা বাড়াইয়া দিয়াছেন; সেই নয়টি পণ্ডিত এখানে রাজার নবরত্ন। ইঁহারা ছাড়াও মাথাওয়ালা মন্ত্রী, বড় বড় যোদ্ধা, কত রকমের কত কর্ম্মচারী, কত সভাসদ, প্রত্যহই সভায় উপস্থিত থাকেন। সকলের সমাগমে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা যেন গম-গম করিতে থাকে।

রামের মত রাজা পাইয়া সবাই সুখী; কিন্তু রাজবাড়ীর সকলে রাজরাণীর অভাবে বড়ই দুঃখী। এ পর্য্যন্ত রাজা বিয়েই করেন নাই। কত রাজাই তো রাজকন্যা লইয়া সাধাসাধি করিয়াছেন, কিন্তু রাজা কিছুতেই সায় দেন নাই। আত্মীয়-স্বজন এ জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করিলে রাজা শুধু হাসিয়া বলিতেন—ওরা সব নামেই রাজকন্যা, রাণী হবার মত কেউই ওদের ভেতরে নেই!

রাজার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া যায়; তাহারা ভাবিয়া পায় না যে, কোন রাজকন্যাকেই চোখে না দেখিয়া রাজা এমন কথা কি করিয়া বলেন! শেষে তাহারা মনে মনে ইহাই ঠিক দিয়া রাখে,—আসলে রাজার বিয়ে করবার গা নেই, ও একটা ছুতো বই আর কি!

কিন্তু এ ভুল তাহাদের একদিন ভাঙ্গিয়া গেল।

দুই

সেদিন রাজসভায় কায আরম্ভ হইতেই এক দূত আসিয়া উপস্থিত, তাহার সঙ্গে এক অনুচর, সে কতকগুলি আশ্চর্য্য রকমের ফল ও অন্যান্য সামগ্রী বহন করিয়া আনিয়াছিল। রাজার সিংহাসনের সম্মুখে সেগুলি রাখা হইলে দূত রাজাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—রাজা ভোজ আমাকে মহারাজের সভায় পাঠিয়েছেন। এগুলি তাঁরই উপঢৌকন।

রাজা হাসিমুখে নিজেই দূতকে অভ্যর্থনা করিলেন। হাতখানি তুলিয়া সিংহাসনের কাছেই একখানা সুন্দর আসন দেখাইয়া বলিলেন,—বসুন।

দূত আসনে বসিবামাত্রই রাজার ইঙ্গিতে ফুলের মালা, চুয়া-চন্দন, রেশমী কাপড় ও চাদর, রত্নখচিত সোনার বলয় দিয়া দূতের সম্বর্দ্ধনা করা হইল।

সে সময় আমাদের দেশে এক রাজার সভায় আর এক রাজার দূত আসিলে, এমনি করিয়াই তাহাকে আদর-আপ্যায়ন করা হইত। দূতও খালি হাতে রাজসভায় আসিতেন না, কিছু না কিছু উপহার দ্রব্য লইয়া আসিতেন; রাজাও তাহার বদলে দূতকে এইভাবে পুরস্কৃত করিতেন।

দূতের সম্বর্দ্ধনা শেষ হইলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার রাজা ও তাঁর রাজ্যের সব কুশল তো?

যাঁহারা মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন, বিদ্বান্ লোকের সহিত ব্যবহার করিবার কৌশল অবগত, সমস্ত রাজ্য ও রাজনীতির বিষয় যাঁহারা রীতিমত জানেন এবং কথা বলিবার কায়দাও যাঁহাদের চমৎকার, তাঁহারাই রাজদূত হইতে পারিতেন। এখনকার দিনে যাত্রার দলে বা থিয়েটারে তোমরা দূতের চেহারা ও পোষাক দেখিয়া দূতকে চৌকীদার পাহারাওয়ালার সামীল করিয়া লইয়াছ, কিন্তু আসলে দূত অমন হেয় নয়। বড় হইয়া তোমরা বড় বড় বই পড়িয়া দূতের কথা ভাল করিয়া জানিতে পারিবে।

রাজার মুখে রাজা ও রাজ্যের কুশলের প্রশ্ন শুনিয়া ভোজরাজার

দূত সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন,—মহারাজের কুশলেই ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের কুশল।

দূতের বাক্‌পটুতায় প্রীত হইয়া রাজা এবার হাসিমুখে বলিলেন,—আমার ওপর আপনার রাজার কোনো আদেশ আছে?

দূত কহিলেন,—আদেশ দেবার অধিকার শুধুই মহারাজের আছে। আমার রাজা আমাকে দিয়ে শুধু নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তাই বহন ক'রে মহারাজের সভায় আমি এসেছি।

রাজা গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—বলুন।

দূত সবিনয়ে কহিলেন,—আমাদের রাজার এক অবিবাহিতা কন্যা আছেন, তাঁর নাম ভানুমতী।

রাজা কহিলেন,—তার পর?

দূত কহিলেন,—রাজকন্যা সকল বিদ্যায় বিদুষী, নানা গুণে গুণবতী, রূপেও তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরী।

রাজা কহিলেন,—তথাপি তিনি এখনো অবিবাহিতা কেন?

দূত কহিলেন,—তাঁর ঐ সব অতি গুণের জন্যই বিবাহে বাধা পড়েছে।

দূতের কথায় সভাশুদ্ধ সকলেই অবাক্! গুণের জন্য বিবাহে বিঘ্ন, এ আবার কি কথা!

রাজা দূতের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি রকম?

দূত কহিলেন,—রাজকন্যা পণ ক'রে বসে আছেন, তিনি যে বিদ্যায় বিশেষ পটু, তাতে যে তাঁকে হারাতে পারবে, তিনি তাঁকেই বিবাহ করবেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রার্থী এসেছিল?

দূত কহিলেন,—অনেক। রাজা, রাজপুত্র, পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠী, অনেক রকমের অনেকেই রাজকন্যার রূপ গুণ আর বিদ্যার খ্যাতি শুনে প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে বিদ্যার বিচার তো পরের কথা প্রার্থীরা এ পর্য্যন্ত কেউ তাঁর দেখাই পায় নি।

সভাস্থ সকলেই কৌতূহলের সহিত দূতের কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু এই কথাটা শুনিয়া সকলেই একেবারে থ! রাজকন্যার পাণি-প্রার্থী হইয়া তাহারা বিদ্যার বিচার করিতে আসিল, অথচ দেখা পাইল না—এ কি রকম কথা?

রাজা দূতের মুখের দিকে পুনরায় চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—দেখা না পাবার কারণ? তিনি কি দেখা দিতে অনিচ্ছুক?

দূত কহিলেন,—তিনি যখন বিচারে প্রস্তুত, তখন দেখা দিতে অনিচ্ছুক হবেন কেন? কিন্তু তাঁর বিদ্যার এমনই প্রভাব যে, কোনো প্রার্থীই ভোজরাজ্যে এ পর্য্যন্ত ঢুকতে পারেন নি, সীমান্ত থেকেই হার মেনে ফিরে গেছেন।

রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখনো প্রার্থীদের আনাগোনা চলেছে?

দূত উত্তর দিলেন,—না। প্রায় পাঁচশো প্রার্থীর দুর্গতির কথা শুনে কেউ রাজকন্যার প্রার্থী হয়ে ভোজরাজ্যের ত্রিসীমায়ও আর আসে না। কেন না, যাঁরা রাজকন্যার আশায় কোমর বেঁধে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই নানারকম নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরে গেছেন। এখন এটা আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল ও সেই সঙ্গে মৃদুস্বর বাহির হইল,—বটে!

দূত এবার দুই হাত যোড় করিয়া বিনয়ের সুরে কহিলেন,—এখন আমার রাজার এই অনুরোধ, মহারাজ তাঁর এই আশ্চর্য্য রকমের বিদুষী কন্যাটির পণভঙ্গ ক'রে তাঁর পাণিগ্রহণ করুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য গম্ভীর মুখখানি প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—আপনার রাজার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলুম।

তিন

আর কোনো রাজার প্রস্তাবেই রাজা বিক্রমাদিত্য এমন করিয়া সায় দেন নাই। অবশ্য, আর কোনো রাজাই এমন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিমন্ত্রণও করেন নাই। ভোজরাজ তো বলেন নাই—দয়া করিয়া আমার রূপবতী কন্যাটিকে গ্রহণ করুন, মহারাজ! তিনি বলিয়াছেন,—আমার মেয়ের যেমন রূপ আছে, গুণ আছে, তেমনই আছে একটা কঠিন পণ; সেই পণটি তাহার ভাঙ্গিয়া দিয়া—তাহাকে জয় করিয়া আপনার রাণী করুন। এমন করিয়া নিমন্ত্রণ করিলে বিক্রমাদিত্যের মত রাজা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তিনিও যে রূপকথার রাজাদেরই একজন—যাঁহারা দুর্গমপথের যাত্রী হইতেই ভালোবাসেন, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া শক্তি সাহস আর বুদ্ধির বলে রাজকন্যা লাভ করিতে চান!

রাজধানী ও রাজপুরীর সকলেই আহ্লাদে আটখানা, সকলেরই মুখে একই কথা—আর ভাবনা কি, আমাদের রাজার বিয়ের ফুল এতদিনে সত্যিই ফুটলো!

কিন্তু রাজার মনে যে একেবারেই ভাবনা উঠে নাই, একথা বলা চলে না। রাজকন্যার অদৃশ্য বিদ্যার প্রভাবটুকুর কথা ভাবিয়া রাজাকে রীতিমত বিচলিত হইতে হইয়াছিল বৈ কি! এ পর্য্যন্ত অনেক অসাধ্যই তো তিনি সাধন করিয়াছেন, কত বড় বড় দুর্দ্ধর্ষ রাজাকে যুদ্ধে হারাইয়া আয়ত্তে আনিয়াছেন, কত ভীষণ ভীষণ যুদ্ধে নামিয়া হেলায় জয়ের মালা গলায় পরিয়াছেন, কিন্তু এ রকম যুদ্ধের কথা তো এ পর্য্যন্ত কখনো শুনেন নাই! রাজার প্রাসাদের ভিতর রাজকন্যা বসিয়া রহিলেন, অথচ তাঁহার বিদ্যার এমনই প্রভাব যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই তাঁহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে পারিল না, নাস্তানাবুদ হইয়া পথ হইতেই ফিরিয়া গেল! রাজকন্যার এই বিদ্যাটি কি?

নবরত্ন লইয়া রাজা মন্ত্রণাগারে পরামর্শ সভা বসাইলেন। সকলেই একবাক্যে জানাইলেন, রাজকন্যার কোনো অলৌকিক শক্তি আছে, তাঁকে জয় করা কঠিন।

রাজা বরাহ পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—আপনি গণনা ক'রে বলুন, রাজকন্যার শক্তিটা কিসের?

বরাহ পণ্ডিত রাজার নবরত্নের এক রত্ন—মস্ত জ্যোতিষী। তিনি খড়ির দাগ কাটিয়া ও নানাবিধ অঙ্ক কসিয়া রাজাকে জানাইলেন,—রাজকন্যার শক্তিটা বিদ্যার।

রাজা একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—বিদ্যা কি অমন ক'রে অনর্থ ঘটাতে পারে?

বরাহ কহিলেন,—পারে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কোন্ বিদ্যা?

বরাহ কহিলেন,—গণনায় আমি শুধু বিদ্যাই পাচ্ছি। আর, সব শক্তির গোড়াতেই তো এই বিদ্যা; শস্ত্র এবং শাস্ত্রচর্চা দুটোর ধারা আলাদা হলেও ওরা তো বিদ্যা। মুনিঋষিদের তপস্যাও

বিদ্যা। দেহের শক্তি চালিয়ে শত্রুকে জয় করা যেমন বিদ্যা, মনের শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়াও তেমনি বিদ্যা। রাজকন্যা এই বিদ্যায় সিদ্ধা।

নবরত্ন পরামর্শ করিয়া বলিলেন, আর কিছু নয়, রাজকন্যার ঐ বিদ্যা হচ্ছে মায়া বিদ্যা; মহারাজ সাবধান!

রাজা বলিলেন,—আমার কিসের ভাবনা, যখন নবরত্ন আমার সহায়। মহাকবি কালিদাসের কবিতাই আমাকে—

রাজাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই মহাকবি কালিদাস তাড়াতাড়ি কহিলেন,—মহারাজ আমাকে ক্ষমা করবেন, কাব্যের বিচারে যে কোনো পণ্ডিতকে আমি হারাতে পারি; কিন্তু মায়া বিদ্যার আমি কিছুই জানি না।

রাজা বলিলেন,—আপনি না পারেন, ধন্বন্তরি আছেন। উনিই আমাকে—

ধন্বন্তরি অমনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—মহারাজ, যত বড় কঠিন রোগ হোক না কেন, আমি তার ওষুধের ব্যবস্থা দিতে পারি। কিন্তু ও বিদ্যায় আমার হাতে খড়িও হয় নি।

ধন্বন্তরির কথা শেষ হইতে না হইতে অমরসিংহ বলিলেন,—যে কোনো শক্ত কথার মানে আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, যা কেউ পারবে না—আমি তখুনি বলে দেব। কিন্তু আমার অভিধানে ও বিদ্যা নেই।

এমনি করিয়া রাজার সকল রত্নই পর পর জানাইয়া দিলেন যে, মায়া বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের কাহারও কোনো ধারণাই নাই।

রাজা তখন হতাশের মত ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—তা হ'লে তো আমি নিরুপায়! হঠাৎ নিমন্ত্রণটি গ্রহণ ক'রে কি অন্যায়ই করেছি!

এই সময় নবরত্নের চোখে চোখে কি যেন একটা পরামর্শ চকিতের ভিতরে হইয়া গেল! তার পরই এক জন হঠাৎ একটু হাসিয়া কহিলেন,—আপনার এত ভাবনাই বা কেন, মহারাজ! আপনার তাল-বেতাল কোথায় গেল? তাদের ডাকুন না কেন?

রাজা মনে মনে হাসিয়া কহিলেন,—অগত্যা, এ ভিন্ন আর উপায় কি! আপনারা যখন অক্ষম, তখন তাল-বেতালকেই ডাকতে হ'ল!

এই কথাটার গোড়ায় একটু রহস্য আছে। কালো কুচকুচে দুটি ছেলে রাজার এমনই ন্যাওটো হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া অনেকেই মনে মনে হিংসা করিত। ছেলে দুটির আকার বা আসা-যাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না। রাজা ছাড়া তাহারা কাহারো সহিত কথা কহে না, কেহ যাচিয়া কথা কহিলে বা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না; কাহাকেও তাহাদের গ্রাহ্য নাই। অথচ, রাজা ডাকিবামাত্রই তাহারা যেন হাওয়ার মত কোথা হইতে আসিয়া নিমেষের মধ্যে উপস্থিত হয়, কেহই তাহা ভাবিয়া পায় না। দুটি ছেলে যেন একটি বোঁটায় ফোটা এক যোড়া অপরাজিতা ফুল! দুটিতেই মাথায় মাথায় এক রকম, সমান বয়স, চেহারায় আশ্চর্য্য-রকম সাদৃশ্য, যেন এক মায়ের পেটের যমজ ভাই। দেখিলে মনে হয়, তাহারা এখনো বারো বছরের গণ্ডী পার হয় নাই, কিন্তু এই বয়সেই এমনই ইহাদের বুদ্ধি আর পাকা পাকা কথা যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সবাই বলে রাজার আস্কারা পাইয়া এই দুটি ছোকরা একবারে রাজার মাথার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

আর আস্কারা নয়ই বা কেন! রাজার নবরত্ন যখন অনেক মাথা ঘামাইয়াও কোনো জটিল বিষয়ের কোনো মীমাংসা করিতে পারেন না, রাজা তখনই ডাকিয়া বসেন এই দুই বাচ্চাকে। তাহারা অমনই ঝড়ের মত আসিয়া রাজার কাণে কাণে কি বলিয়া দেয়, তার পরেই রাজা যে যুক্তি দেন, তাহাই পাকা হইয়া যায়। সকলেই বলে, আসলে ওটা রাজারই কথা, ছেলে দুটাকে বাড়াইবার জন্যই রাজার ও একটা চাল। ছেলে দুটি নবরত্নেরও চক্ষুঃশূল! এ দিনও নবরত্ন যেই হাল ছাড়িয়া দিলেন, রাজা ডাকিলেন তাল-বেতালকে। অমনই যুগল শিশু নাচিতে নাচিতে একবারে রাজার মন্ত্রণাগারে উপস্থিত। দুই জনেরই খোলা গা, গলায় প্রবালের মালা, হাতে ও কোমরে কড়ির গোট-ছড়া, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, তাহাতে পালক আঁটা, পরণে ছোপানো কাপড়, মুখে নির্ম্মল হাসি, বড় বড় দুইটি চক্ষুর কি আশ্চর্য্যজনক দীপ্তি! আসিবামাত্র ইহাদের দৃষ্টিই যেন প্রশ্ন করিতেছিল,—কি হুকুম, মহারাজ?

রাজা কহিলেন, এসেছো? আমি যে ভারি ভাবনায় পড়েছি।

তাল-বেতাল সমস্বরে কহিল,—জানি, মহারাজ!

রাজা যেন আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—জানো তোমরা?

উভয়ে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল যে, তাহারা সবই সব জানে।

রাজা কহিলেন,—তা হ'লে এখন বল দেখি কি করা যায়? এগুব, না, পেছুব?

তাল কহিল,—এগুতেই হবে, কোনো দিন কি মহারাজ পেছিয়েছেন?

বেতাল কহিল,—জিত আপনারই হবে, রাজকন্যা হেরে গিয়ে আপনার গলাতেই মালা দেবে।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—বল কি?

কালিদাস বরাহের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—বরাহের গোঁ এবার উল্টে গেলো, অন্নও বুঝি বা ওঠে!

রাজা গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—বরাহ পণ্ডিত, আপনি ত আসল কথাটাই গণনা করেন নি, হার জিত কার, আর রাজকন্যার গতি?

রাজার প্রশ্নে বরাহ পণ্ডিতের গলাটি অমনি শুকাইয়া গিয়াছে; বার দুই কাসিয়া উত্তর দিলেন,—মহারাজ তো আমাকে শুধু রাজকন্যার বিদ্যার কথাই গণনা করতে বলেছিলেন।

রাজা গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—হুঁ!

তাল-বেতাল কহিল,—ও তো জানা কথা, ওতে গুণবার কি আছে?

তাল-বেতালের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া নয়টি রত্নই চটিয়া লাল! কিন্তু অবস্থাটি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহাদের ঝাল ঝাড়িবার আজ কোন উপায়ই নাই; ছেলেদুটি এক কথায় সবারই মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

বরাহ পণ্ডিত মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের মনেই কহিলেন,—কেলে বিচ্ছু!

রাজা কহিলেন,—রাজকন্যা যে মায়াবিদ্যায় পাকা!

তাল-বেতাল কহিল,—আপনিই বা কোন্ বিদ্যায় কাঁচা?

রাজা কহিলেন,—তবু ভয় হচ্ছে—যদি হারি?

তাল কহিল,—দেশ শুদ্ধ সবাই চাইছে রাণী আগে; আপনার কি হার হ'তে পারে?

বেতাল কহিল,—তাই তো! এত বড় আপনার নাম, অত বড় বত্রিশ সিংহাসন, তার ওপর এই নবরত্ন,—কিসের ভয়? আপনি সাজুন। আমরাও সাজিগে।

পরক্ষণেই দুটি ছেলে যেমন বায়ুর মত আসিয়াছিল, তেমনই চলিয়া গেল।

রাজা নবরত্নের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তা হ'লে যাওয়াই স্থির; আপনারাও তৈরী হন।

নবরত্নের মধ্যে দুই এক জন কহিলেন,—তাল বেতাল তো যাচ্ছে, আমাদেরও যাবার কি দরকার হবে?

রাজা কহিলেন,—বিলক্ষণ! ওরা ছেলে মানুষ; দুটো কথাই না হয় বলতে পারে, কিন্তু বিদ্যা ওদের কত দূর! শেষ রক্ষা আপনাদেরই করতে হবে; সবাই জানে আমার ভরসা নবরত্ন!

চার

নবরত্ন ও লোক-জন লইয়া রাজা বিক্রমাদিত্য যখন ভোজ-রাজ্যের সীমান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। নবরত্ন যুক্তি দিলেন,—এই স্থানেই শিবির ফেলা হউক; ভোর হইলেই আবার যাত্রা সুরু হইবে। রাজাও তাহাতে রাজী হইলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সফর; সঙ্গে হাজার হাজার লোক আসিয়াছে। সৈন্য সামন্ত; হাতী ঘোড়া উট; রথ, গাড়ী, পালকী, এবং ইহাদের খাবার যোগাইবার মত বিরাট ভাঁড়ার; জাঁক-জমক কিছুরই অভাব নাই। অথচ এমনই রাজার দপদপা যে, একচুল এদিক্ ওদিক্ বা কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র ভুলচুক হইবার যো নাই। যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়ার পাট সারা হইতেই সমস্ত শিবির যেন ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িল। কেবল প্রহরীর দল পালা করিয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা দিতে লাগিল।

তখনও ভোর হয় নাই, গাছে গাছে পাখীদের কাকলী উঠে নাই, এমন সময় ঘাঁটিগুলির প্রহরীরা ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—বন্যা-বন্যা! ওঠ, জাগ, তৈরী হও, বন্যার জল ছুটে আসছে।

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিবিরবাসী একসঙ্গেই জাগিয়া উঠিল, রাত্রিবাস ছাড়িবার অবসরও অনেকে পাইল না; সকলেই অবাক্ হইয়া দেখিল, দূরে নদীর ঢেউগুলি পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া শিবির লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে; কাছে যে সব পাহাড় ছিল, সেগুলিও যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের নাক মুখ দিয়া সহস্র ধারায় জলের ঢল বহিয়াছে। আর রক্ষা নাই!

রাজাও শিবির হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন, নবরত্নও —যিনি যে অবস্থায় জাগিয়াছেন, সেই ভাবেই রাজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সৈন্য-সেনানী লোক-জন সবাই তটস্থ, সকলেই চঞ্চল, রাজার মুখের কথা শুনিবার জন্য প্রত্যেকেই ব্যাকুল হইয়া চাহিয়া আছে।

রাজা নবরত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করা যায়?

প্রত্যেক রত্নই যুক্তি দিলেন,—পলায়ন ভিন্ন গতি নাই; আর বিলম্ব কিছুতেই উচিত নয়।

রাজা কহিলেন,—এখানে পলায়ন মানে পরাজয়। ভোজ-রাজ হাসবে।

নবরত্ন জানাইলেন,—জীবন আগে।

রাজা কহিলেন—জীবন পণ করেই কিন্তু রাজধানী থেকে যাত্রা করেছি।

নবরত্ন কহিলেন,—বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন নাকি? প্রকৃতি বিরূপ হ'লে নিরুপায়।

বরাহ কহিলেন,—আপনার তাল-বেতাল এ সময় কোথায়?

রাজা কহিলেন,—তাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম; আপনাকে ধন্যবাদ, স্মরণ করিয়ে দিলেন। ঐ তারা এসেছে।

সকলেই চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই সেই দুই অদ্ভুত শিশু যেন বাতাসে ভর দিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু আজ তাহাদের আর এক রকম বেশ; গায়ের গহনায় কড়ি বা পলার চিহ্নও আজ নাই, সেখানে উঠিয়াছে নানা বর্ণের নানা রকমের ফুল, মাথার চূড়ায় কৃষ্ণচূড়া, হাতে এক একটি বাঁশের বাঁশী।

রাজা তাহাদিগকে দেখিয়াই কহিলেন,—ব্যাপার দেখছ ত?

ছেলে দুইটির দুইখানি মুখই তখন বাঁশীর বুকে; চাপাকণ্ঠে কহিল,—হুঁ।

রাজা কহিলেন,—এরা সব বলছে পালাতে। তোমাদের কি মত?

তাল কহিল,—যদি এগুলো পানি না হয়ে প্রাণী হ'ত?

বেতাল পরক্ষণেই কহিল,—অর্থাৎ ওরা যদি ঘোড়ায় চড়ে সেপাই হয়ে অমনি ক'রে ছুটে আসতো, ভয়ে পালাতেন?

রাজা নবরত্নের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—শুনলেন তো এদের কথা, এখন কি বলতে চান?

নবরত্ন পরামর্শ করিয়া কহিলেন,—তা হ'লে ওদের কথাই শুনুন, এগিয়ে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করুন।

রাজা শুধু হাসিলেন।

তাল কহিল,—সেই ভালো, আমরা রাজাকে নিয়ে লড়াই দিতেই চললুম।

বেতাল কহিল,—আর আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে এই খবরটি সবাইকে শুনিয়ে দিন।

ইতিমধ্যে বন্যার জল আরও ফুলিয়া, আরও উচু হইয়া ভীষণ গর্জ্জনে চারিদিক্ কাঁপাইয়া আরও কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, যাহারা এতক্ষণ রাজার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার তাহারাও প্রাণভয়ে অধীর হইয়া উঠিল; সকলেই বুঝিল, আর একটু পরেই বন্যার প্লাবনে তাহারা তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে! আকুল কণ্ঠেই তাহারা রাজার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইল,—হুকুম দিন মহারাজ, পেছুই।

ঠিক ইহার পরেই তাল-বেতাল রাজার দিকে চাহিয়া কহিল,—আসুন মহারাজ, আমরা এগুই; কিসের ভয়!

সকলেই তখন সভয়ে দেখিল, কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে দুইটি নাচিতে নাচিতে বাঁশীর রন্ধ্রে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া হাত-ধরাধরি করিয়া ছুটিয়াছে বন্যার মুখে।

রাজা হাত তুলিয়া চঞ্চল জনতার উদ্দেশে কহিলেন,—খবরদার! পেছুলেই মৃত্যু, এগিয়ে চলো—যেমন ওরা চলেছে।

রাজা বিক্রমাদিত্যের হুকুম! মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও কেহ আর পিছাইবার নামটিও করিল না। রাজাও তখন বন্যার দিকে বেগে ছুটিয়াছেন, জয়ধ্বনি তুলিয়া সৈন্যদলও ছুটিল; ঘোড়া হাতী

গাড়ী রথ, সারি সারি শিবির, ঠাট-ঠমক এক নিমিষে সমস্তই যেন দূরের বন্যার মতই সচল হইয়া উঠিল।

নবরত্ন বুঝিলেন রাজা পাগল হইয়াছেন, ছেলে দুইটা তাঁহার মাথা খাইয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগকে রাজার পিছু পিছু ছুটিতে হইল।

আশ্চর্য্য কাণ্ড! কিছুদূর গিয়াই সকলে দেখিল, যে বন্যা পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, এখন হঠাৎ পিছাইয়া যাইতেছে। আর সেই দুইটি ছেলের বাঁশীর সুর যেন রণভেরীর মত উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে ডাকিতেছে—আগে চল, ওরে আগে চল! দেখিতে দেখিতে উষার আলোর সঙ্গে সঙ্গে বন্যার অত বড় বিভীষিকা যেন কুয়াশার মত দিগ্‌দিগন্তের কোলে মিশিয়া গেল!

অমনি হাজার কণ্ঠে আনন্দের ধ্বনি উঠিয়া বিশাল বনভূমি কাঁপাইয়া দিল। কোথা হইতে কি যে হইল, সৈন্যমহলে তাহা লইয়া নানারূপ আলোচনা চলিল। এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড কেহই আর কখনও দেখে নাই।

রাজা চাহিয়া দেখিলেন, নবরত্নের মুখগুলি তখনও বিষণ্ণ। মনে মনে হাসিয়া তিনি কহিলেন, কি বুঝলেন?

নবরত্ন একবাক্যেই জানাইলেন,—আমাদেরই ভ্রম হয়েছিল। এই—মায়া!

রাজা কহিলেন,—কিন্তু ছেলে দুটো সহজেই মায়া কাটাতে পেরেছিল।

নবরত্ন কহিলেন—ছেলেদের কথা আলাদা, ওরা সব তাতেই বাহোবা নিতে ছোটে। সাপের মুখে ছেলেরাই চুমো খায়।

তাল-বেতাল এই সময় রাজার পাশেই ছিল, নবরত্নের কথায় দুজনেই হাসিয়া উঠিল।

তাল কহিল,—ছেলে হলেও আমরা তুচ্ছ নই।

বেতাল কহিল,—আপনারাও একদিন আমাদের মতই ছেলে ছিলেন।

নবরত্ন চোখ পাকাইয়া এই ফাজিল ছেলে দুইটির দিকে চাহিলেন মাত্র, মুখে কিছু বলিলেন না। আর বলিবেনই বা কি!

এই সময় বনের ভিতর হইতে দুইটি কালো কুচকুচে পতঙ্গ ভন্‌ভন্ শব্দ করিয়া উড়িয়া আসিল এবং আর সকলকে ছাড়িয়া নবরত্নের মুখগুলির উপর ঘুরিতে লাগিল।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—আর আপনাদের নিস্তার নেই, ওরা রত্নের সন্ধান পেয়েছে।

কালিদাস কহিলেন,—ওরা বোকা, তাই অন্ধের মত নীরস রত্নের ওপর ঘুরে মরছে।

পতঙ্গ দুইটি বররুচিকে বড়ই বিরক্ত করিতেছিল, তিনি ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন,—এরা আমার হাতে মরবার জন্যই এসেছে। কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পতঙ্গ দুইটি মারিবার জন্য গায়ের চাদরখানি বাগাইয়া ধরিলেন।

তাল-বেতাল সমস্বরে বাধা দিয়া কহিল,—ওদের মারবেন না, ওরা রাজার প্রয়োজনেই এসেছে।

বররুচি তাল-বেতালের দিকে ভ্রুকুটী করিয়া চাহিলেন, তাহার পর ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন,—রাজার লোকের বড় অভাব, তাই বনের পতঙ্গ এসেছে তাঁর প্রয়োজনে কায করতে!

পতঙ্গ দুইটাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি চাদরের একটা ঝাপটা দিলেন। কিন্তু দেখা গেল, তাহারা বররুচি অপেক্ষাও সতর্ক; যেন তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিয়াই শরণ লইবার জন্য রাজার দিকে উড়িয়া গেল।

তাল বেতাল কহিল,—এরা তুচ্ছ হলেও, এদের দ্বারা রাজার যে কায হ'তে পারে, সেটা তুচ্ছ নয়, আর সে রকম কায করবার সাধ্য আপনাদের কারুরই নেই।

নবরত্ন উত্তেজিত হইয়া কহিলেন,—নীচের স্পর্দ্ধা!

রাজা কহিলেন,—বালক, ক্ষমা করুন।

ইতিমধ্যে তাল-বেতাল তাড়াতাড়ি পতঙ্গ দুইটিকে ধরিয়া একটি কৌটার ভিতর পুরিয়া ফেলিল।

রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হবে?

তাল-বেতাল কহিল,—কাছে রেখে দিন, রাজা, কাযে লাগবে।

রাজা কহিলেন,—বল কি?

তাহারা কহিল,—আমরা এখন যাচ্ছি, এর পর যদি দরকার পড়ে, আমাদের না ডাকলেও চলবে; আমাদের হয়ে কৌটোর এই পোকা দুটোই আপনার কায ক'রে দেবে।

তখন সেই পোকাভরা কৌটোটি রাজার হাতে দিয়া সেই অদ্ভুত ছেলে দুইটি হাত-ধরাধরি করিয়া বনের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বরাহ পণ্ডিত কহিলেন,—আমরা বলেছি কি না পোকা দুটো কোনো কাযের নয়, তাই ওদের দেখাতেই হবে যে, ওরা কাযের।

রাজা হাসিয়া কহিলেন, বেশ তো কাছেই থাক না, এর পর বোঝা যাবে, এদুটো সত্যি সত্যিই বাজে কিম্বা কাযের।

আর এক পণ্ডিত এই ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া কহিলেন,—মহারাজের কাছে আস্কারা পেয়ে ওরা সত্যিই ভারি বেড়ে উঠেছে, লঘু গুরু জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই!

রাজা মুচকি হাসিয়া কহিলেন,—ছেলেমানুষ, ওদের দোষ কি ধরতে আছে? তা ছাড়া, ওদের কাযে ভুল তো কখনো দেখিনে।

নবরত্ন ক্রুদ্ধ হইয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই সময় কাছেই একটা কোলাহল উঠায় তাহাতে বাধা পড়িল। ঠিক এই সময় এক জন লোক ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল,—ভোজরাজ নিজেই বিস্তর লোক-জন নিয়ে মহারাজের অভ্যর্থনা করতে আসছেন।

রাজা কহিলেন,—বটে! বন্যার পরেই রাজা!

একটু পরেই দেখা গেল, মন্ত্রী, সভাসদ, পাত্র-মিত্র ও রাজ্যের প্রধান প্রধান নাগরিকদের সহিত সত্যই রাজা ভোজ হাসিমুখে আসিতেছেন।

পাঁচ

ইহার পর ভোজরাজের বাড়ীতে রীতিমত রাজভোজের ঘটা চলিল। রাজা বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার দলের প্রত্যেক লোকটির কি আদর, কত আপ্যায়ন! রাজার নবরত্ন বরাবরই একটু বেশী রকমের ভোজনবিলাসী, ভোজপুরীতে তাঁহাদের খাই-দাইয়ের বহর দেখিয়া ভুঁড়ীওয়ালা ভোজপুরীদেরও তাক লাগিয়া গেল।

ভোজনের পর কোমল শয্যায় গড়াইতে গড়াইতে নবরত্ন ভাবিতেছিলেন, বিচার-পর্ব্বটাও যদি ভোজের এমনি সুখের হয়?

বরাহ কহিলেন,—সোয়াস্তি এইটুকু, ডেপো ছোঁড়া দুটো ভেগেছে।

কালিদাস কহিলেন,—কিন্তু কৌটো রেখে গেছে, তার ভেতরে আছে ওদেরই মত একটি যোড়া কেলে পোকা!

বররুচি কহিলেন,—যা বলেছো! পোকা দুটো ঠিক ঐ ছোঁড়া দুটোরই মত! আমাকে ভারি জ্বালাতন করেছিল! সেই জন্মই তো মারবার জন্মে হাত তুলেছিলুম।

আর এক রত্ন কহিলেন—কিন্তু মারতে পারলে কই! ছোঁড়া দুটো কেমন খপ ক'রে ধরে কৌটোর ভেতর পূরে ফেললে।

অপর এক রত্ন কহিলেন,—কৌটোটাও ওদের সঙ্গেই ছিল। এতেই মনে হয়, পোকা দুটো ওদের পোষা।

কালিদাস কহিলেন,—এর পর ঐ দুটো পোকাই না আমাদের বোকা বানিয়ে দেয়।

এই সময় রাজা ভোজ নবরত্নের কাছে আসিয়া হাত যোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনাদের কোনো কষ্ট কিম্বা কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত?

এক সঙ্গে নয়টি শিখা নাড়া দিয়া নবরত্ন জানাইলেন,—কিছু না, মহারাজ, কিছু না।

রাজা ভোজ কহিলেন,—সন্ধ্যার পরেই সময়টা ভালো, সেই সময়েই রাজকন্মার সঙ্গে রাজার দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনাই উচিত, কি বলেন?

বরাহ পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ গণনায় বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই বলিলেন,—ঠিক, ঐ সময়টিই চমৎকার।

* * * *

সন্ধ্যার পর রাজবাড়ীতে যেমন মধুর সুরে নহবত বাজিয়া উঠিল, অমনি রাজা ও নবরত্নের নিকট খবর আসিল, সময় হয়েছে; আপনারা আসুন।

নবরত্নের সহিত রাজা বিক্রমাদিত্য রাজকন্মার মন্দিরে চলিলেন। রাজকন্মার সহচরীরা ফুলের সাজে সাজিয়া ও হাতে এক একটি ফুলের মালা লইয়া রাজা ও নবরত্নের অভ্যর্থনায় আসিয়াছিল। তাহারাই পথ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল।

খানিকক্ষণ পরে ছবির মত একখানি সুন্দর ও সুদৃশ্য ঘরের সম্মুখে তাঁহারা সকলে আসিলে, রাজকন্মার প্রধানা সহচরী রাজাকে কহিল,—মহারাজ! এই ঘরে আছেন রাজকন্মা ভানুমতী; এইখানেই হবে বিদ্যার পরীক্ষা। কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা অঙ্গীকার করতে হবে।

রাজা কহিলেন,—বলো।

সহচরী জানাইল,—পরীক্ষায় রাজকন্মা যদি হারেন, আপনার গলায় মালা দিয়ে চিরজীবনের মত আপনার দাসী হবেন। কিন্তু আপনি যদি হারেন, তা হ'লে নবরত্নের সঙ্গে আপনাকে সারা জীবন ভোজরাজ্যে রাজকন্মার দাস হয়ে থাকতে হবে। যদি আপনি রাজী হন, তবেই পরীক্ষা হবে।

রাজা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নবরত্নের দিকে চাহিলেন; তাঁহারা একবাক্যে জানাইলেন,—মহারাজের যে মত, আমাদেরও তাই; মহারাজের সঙ্গেই আমাদের অদৃষ্ট বাঁধা।

বরাহ চাপা কণ্ঠে কহিলেন,—ছোঁড়া দুটো ভারি চালাক, সব জানতো, তাই পথ থেকেই কেমন ভেগে গেলো!

রাজা রাজকন্মার সহচরীকে কহিলেন,—বেশ, আমি স্বীকার করছি।

রাজার কথার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সুন্দর ঘরখানির দরজাগুলি এক সঙ্গে এক লহমায় খুলিয়া গেল! কিন্তু এ কি! সুসজ্জিত ঘরখানির ভিতর একই বয়সের একই আকারের একই প্রকার সাজসজ্জায় সজ্জিতা অসংখ্য রাজকন্মা পুতুলের মতই স্থির হইয়া বসিয়া আছেন!

সহচরী কহিল,—মহারাজ, আসুন! এদের ভেতর থেকে রাজকন্মা ভানুমতীর হাতখানি ধরুন আর তার হাতের মালাটি গলায় পরুন। আর যদি ভুল হয়, দাসত্বের জন্ম সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত থাকুন।

নবরত্নের সহিত অবাক্ হইয়া রাজা দেখিলেন, অত বড় প্রকাণ্ড ঘরখানির চারিদিকেই সারি সারি রাজকন্মা, তাহারা যে কত, তাহা গণিয়া ঠিক করা কঠিন! আবার এমনই আশ্চর্য্য, প্রত্যেক কন্মার চোখের ভ্রুকুটি হইতে পায়ের আঙ্গুলের নখটি পর্য্যন্ত সমান; মুখ, চোখ, হাত, কাপড়-চোপড়, গহনা—কোনো কিছুরই এতটুকু এদিক্-ওদিক্ নাই। ইহাদের ভিতর হইতে আসল রাজকন্মাটিকে কেমন করিয়া ধরা যাইতে পারে!

রাজা নবরত্নের দিকে চাহিয়া চাপাকণ্ঠে কহিলেন,—এখন উপায়? কি করা যায়?

নবরত্নই এক কথায় হতাশের নিশ্বাস ফেলিয়া জানাইলেন,—তাঁহারা নিরুপায়; এ বিদ্যা তাঁহারা এ পর্য্যন্ত পড়েন নাই।

বরাহ এই সময় টিপ্পনী কাটিলেন,—আপনার তাল-বেতাল থাকলে হয়তো উপায় কিছু ব'লে দিত!

রাজা যেন অকূলে কূল পাইলেন। মুখখানা প্রসন্ন করিয়া কহিলেন,—ভালো কথাই আপনারা মনে করিয়ে দিলেন।

তাল-বেতালের কথা মনে পড়িতেই তাদের দেওয়া সেই কৌটাটির কথা রাজার খপ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। জামার ভিতর হইতে কৌটাটি খুঁজিয়া বাহির করিলেন।

নবরত্ন ভাবিলেন,—রাজা কি পাগল হইলেন! ছোঁড়া দুটার কথাই তাঁর কাছে বেদবাক্য হইল না কি? পোকা দুটাকে লইয়া সত্যিই কি কাযে লাগাইতে চান,—ওরাই কি এ বিপদে উপায় করিবে?

রাজা কিন্তু কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কৌটাটি খুলিয়া পোকা দুইটা ছাড়িয়া দিলেন। এতক্ষণ কৌটার ভিতর বন্ধ থাকিয়া এভাবে সহসা ছাড়া পাইয়া তাহাদের কি আমোদ!

প্রথমেই দুই পাক উড়িয়া রাজার দুইখানি পায়ের উপর পোকা দুইটি বসিল। নবরত্ন হাসিয়া কহিলেন,—মজা দেখ, রাজার পায়ে ধরে তোষামোদ করবার ঘটা!

তাহার পরই আবার তাহারা উড়িল, নবরত্নকে বার দুই প্রদক্ষিণ করিয়াই ছুটিল কন্মাদের দিকে। নবরত্নদের সহিত রাজা নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে পোকা দুইটির কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। এক একটি মেয়ের মুখের উপর ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া মুখে চোখে ক্ষুদে ক্ষুদে পাখার ঝাপটা দিয়া ক্রমশঃই আগাইয়া চলিল। রাজার চক্ষু তখন খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু নবরত্ন তখনও কিছুই ঠাহর করিতে পারেন নাই। তাই, রাজাকে আস্তে আস্তে পোকা দুটির পিছু পিছু যাইতে দেখিয়া তাঁহারা তখনও ভাবিতেছিলেন—ব্যাপার কি! কিন্তু আর একটু পরেই তাঁহাদের চোখগুলিও খুলিয়া গেল।

পোকা দুটি ঐভাবে এক ধার হইতে এক একটি মেয়ের মুখের

উপর দিয়া অবাধেই উড়িয়া চলিল, দেখিতে দেখিতে দুইটি সারি পার হইয়া তৃতীয় সারিতে ঢুকিল। এই সারির গুটি সাতেক মেয়ের মুখে ঝাপটা দিয়া পরের মেয়েটির চোখের উপর উড়িতেই এই মেয়েটি হঠাৎ শিহরিয়া হাতখানি তুলিয়া পোকা দুটিকে বাধা দিল!

আর যায় কোথায়,—রাজাও তখন এই সারিটার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া সেই মেয়েটির তোলা হাতখানা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন,—ইনিই রাজকন্যা!

চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে আর সব কন্যাই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল; রহিলেন শুধু রাজকন্যা ভানুমতী, তাঁহার হাতে ফুলের মালা। তিনি তৎক্ষণাৎ মালাটি রাজার গলায় পরাইয়া দিয়া তাঁহার পায়ের তলায় মাথাটি নত করিয়া কহিলেন,—আজ হ'তে আমি আপনার দাসী।

রাজা দুই হাতে রাজকন্যাকে তুলিয়া আদর করিয়া কহিলেন,—তুমি উজ্জয়িনীর রাজমহিষী!

সহচরীরা সকলেই প্রস্তুত ছিল, অমনই চারিদিক্ দিয়া শাঁখ বাজিল, উলুধ্বনি উঠিল, রাজা রাণী সকলেই উল্লাসে ছুটিয়া আসিলেন।

*   *   *   *   *

নবরত্ন তখন অবাক্ হইয়া দেখিতেছিলেন, বাজে পোকা দুটি কান গুছাইয়া উড়িতে উড়িতে গবাক্ষ দিয়া বাগানে গিয়া নাচিতেছে। তাঁহাদের মনে হইল, কালো রঙ্গের দুইটি পোকা—ঠিক সেই দুইটি কালো কালো ছেলের মতই যেন হাত-ধরাধরি করিয়া রাজপুরীর বাগানে নাচিতেছে!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

—

জাহাজে পশুশালা

(জাহাজী রঙ্গ-চিত্র)

মিঃ ডি, ই, উইলিয়াম্‌স যে সময় কোন জাহাজে 'কোয়াটার-মাষ্টারে'র কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় কলিকাতায় আমেরিকার বোষ্টনের পশুশালার জন্য এক পাল জীব-জন্তু জাহাজে লওয়ায় তাঁহাদিগকে কি বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহার কৌতুকাবহ বিবরণ তিনি লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিকে প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ উইলিয়াম্‌সের প্রকাশিত বিবরণটি কেবল বয়স্ক পাঠকগণেরই নহে ছোটদেরও আমোদজনক হইবে, এই আশায় আমরা তাহা 'ছোটদের আসরে' হাজির করিতেছি।

মিঃ উইলিয়াম্‌স লিখিয়াছেন, "বাষ্পীয় জাহাজ 'এঞ্জ—'এ আমি 'কোয়াটার-মাষ্টারে'র পদে নিযুক্ত ছিলাম। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় আমাদের জাহাজ কলিকাতার খিদিরপুর-ডকে থাকিয়া আমেরিকান আট্‌লাণ্টিক বন্দরসমূহের জন্য নানা প্রকার মাল বোঝাই লইতেছিল। জাহাজের বোঝাই লওয়ার কায প্রায় শেষ হইয়াছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন সংবাদ পাইলাম, আমাদের জাহাজের ডেকে এক পাল বন্য-জন্তু চালান যাইবে। অতঃপর জাহাজের কাপ্তেন আমাকে বলিলেন, "সারেঙ্‌কে জানাও, আজ কি কাল জেটিতে এক 'রয়াল বেঙ্গল' বাঘের আমদানী হইবে; সে যেন তাহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকে। সেই বাঘের খাঁচার জন্য জাহাজের পশ্চাদ্ভাগের সম্মুখের অংশ খালি করিয়া রাখিতে হইবে।" আমার বাসের কামরা সেই অংশেই স্থাপিত ছিল; বাঙ্গালার 'রাজকীয় ব্যাঘ্র' আমার প্রতিবেশী হইবে শুনিয়া আমি যে বেশ হর্ষোৎফুল্ল হইলাম, ইহা স্বীকার করা কঠিন।

সেই রাত্রেই জাহাজে বৃহল্লাঙ্গুলের আবির্ভাব হইল। পরদিন জেটির দিকে চাহিয়া দেখি—সেখানে রীতিমত একটি পশুশালার পত্তন হইয়াছে, তাহা জাহাজে উত্তোলিত হইবে। বস্তুতঃ, তাহা একটি ছোটখাট 'চিড়িয়াখানা' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিভিন্ন খাঁচায় নানা বর্ণের কত রকম পাখীর আমদানী হইয়াছিল, তাহা গুণিয়া ঠিক করা কঠিন; তদ্ভিন্ন, আমাদের তথা-কথিত পূর্ব্বপুরুষগণকেও দেখিতে পাইলাম। পিঞ্জরে বসিয়া মানবের অবোধ্য ভাষায় তাঁহারা আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও সংখ্যা অন্যূন আট শত! এই আট শত কপির কটক ব্যতীত সেই স্থানে দুইটি 'গুল বাঘ' এবং হিমালয়প্রদেশের এক জোড়া ক্ষুদ্রকায় ভল্লুকও দেখিতে পাইলাম।

কিছু দূরে তারের জাল-বেষ্টিত তিনটি পিঞ্জর সংস্থাপিত ছিল। একটি পিঞ্জরের লেবেলে লেখা ছিল 'বোড়া সাপ' (Pythons.); অন্য দুইটি পিঞ্জরের লেবেল পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহাতে গোখ্‌রো সাপ (Cobra) সংরক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকার বোষ্টন নগরের পশুশালার জন্য এই সকল প্রাণী কলিকাতা হইতে আমাদের জাহাজে প্রেরিত হইতেছিল। শুনিলাম, এত অধিক সংখ্যক জন্তু-জানোয়ার আর কখন কোন জাহাজ-মারফৎ এক চালানে প্রেরিত হয় নাই।

আমাদের এই 'এঞ্জ—' মালবাহী জাহাজ। এই জাহাজে কাপ্তেন ব্যতীত তিন জন মেট, পাঁচ জন এঞ্জিনিয়ার, প্রধান ষ্টুয়ার্ড, বে-তার 'অপারেটার', চারি জন শিক্ষানবীশ, এবং তিন জন কোয়াটার-মাষ্টার ছিলেন। ইহারা সকলেই য়ুরোপীয়; এতদ্ভিন্ন নাবিক, খালাসীরা সকলেই ভারতবাসী। একটি 'রাজপুত্র' এবং দুই জন হিন্দু ঐ সকল জানোয়ারের ভার লইয়া আমাদের জাহাজের আরোহী হইয়াছিল। মালবাহী জাহাজ বলিয়া ইহাতে অন্য আরোহী ছিল না।

জীবিত মালগুলি জাহাজে উত্তোলিত হইলে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল, এবং ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই আড়কাটীকে বিদায় দান করিয়া আমরা পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইলাম। ব্যাঘ্র এবং বানরগুলি জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে সংরক্ষিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রাণীগুলি জাহাজের ডেকের পশ্চাতের অংশে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল; কেবল বোড়া সাপের খাঁচা 'গ্যালির' বাহিরে জাহাজের খোলের দ্বারে রক্ষিত হইয়াছিল।

বানরগুলা প্রতিদিন প্রভাতে ভীষণ কোলাহল করিয়া শান্তিভঙ্গ করিত। এক দিন রাত্রিশেষে আমি আমার কামরা হইতে বাহির হইয়া ব্রীজের উপর যাইতেছিলাম, সেই সময় অদূরে দুইটি আলোক দেখিতে পাইলাম। প্রথমে মনে হইল, উহা এক জোড়া ল্যাম্পের সবুজ আলোক; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম, তাহা ব্যাঘ্রের চক্ষু, অন্ধকারে ল্যাম্পের সবুজ আলোকের ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল! ইহা বুঝিতে পারিয়া আমার বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। উষালোকে পূর্ব্বাকাশ আলোকিত হইবার

আধঘণ্টা পূর্ব্বেই বাঘটা প্রত্যহ যথানিয়মে 'গাঁ-গাঁ' শব্দ করিত। পরে শুনিতে পাইলাম—ঐ সময়ে ঐ প্রকার শব্দ করাই উহাদের স্বভাব। যখন উহারা স্বাধীনভাবে অরণ্যে বিচরণ করে, সেই সময় রাত্রিশেষে আড্ডায় ফিরিতে ফিরিতে ঐ প্রকার গর্জ্জন করিতে থাকে; সেই শব্দ শুনিয়া অন্যান্য বন্য-জন্তু তাহাদের পথ ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করে।

যে পিঞ্জরে বৃহৎ ব্যাঘ্রটি আবদ্ধ ছিল, তাহা তেমন সুদৃঢ় বলিয়া আমাদের মনে হয় নাই। যদি সে কোন উপায়ে সেই পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় বিপজ্জনক হইতে পারে—এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে নানা প্রকার আলোচনা চলিত। আমাদের অর্থাৎ জাহাজের 'কোয়ার্টার-মাষ্টার'গণের বাসের কামরার অদূরেই তাহার পিঞ্জরটি সংস্থাপিত থাকায় আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল—সে কোন উপায়ে তাহার পিঞ্জর হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিলে সর্ব্ব-প্রথমে আমাদিগের দেহেই তাহার প্রচণ্ড 'থাবার' বল পরীক্ষার সুযোগ পাইবে, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকেই 'বিশেষ-রূপে আঘ্রাণ' করিবে। বিশেষতঃ, আমাদের কামরার দ্বার বন্ধ করিলে অসহ্য গরমে কামরায় বাস করা অসাধ্য হইত বলিয়া কামরার দ্বার খুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইতাম; সুতরাং বাঘটা তাহার পিঞ্জর হইতে কোনরূপে বাহির হইলে তাহার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পাতলা মশারি ভিন্ন অপর কোনও বাধা সেখানে ছিল না।

এই প্রসঙ্গে প্রধান এঞ্জিনিয়ার আমাদিগকে যে গল্প বলিলেন—তাহা শুনিয়া আমরা যে বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিলাম, এ কথা বলিতে পারি না। তিনি বলিলেন, যে সময় একখানি জার্ম্মাণ জাহাজ হইতে সেই জাহাজের দ্বিতীয় বাবুর্চ্চির দেহাবশেষ নামাইয়া লওয়া হয়, তখন তিনি হাম্বার্গে উপস্থিত ছিলেন। হেগেন্‌বেকের পশুশালার জন্য নানা প্রকার পশু সেই জাহাজে আনীত হইয়াছিল। যে কয়েকটি ব্যাঘ্র সেই জাহাজে পিঞ্জরাবদ্ধ ছিল, তাহাদের দলের একটি বাঘ কোন উপায়ে পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করে। জাহাজের বাবুর্চ্চি বাঘের খাঁচার অদূরে নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। এক দিন মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়; সে তৎক্ষণাৎ শয্যায় উঠিয়া-বসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল, একটা প্রকাণ্ড বাঘ তাহার শয্যার একপ্রান্তে সম্মুখের দুই পা তুলিয়া-দিয়া তাহাকে মুখে পুরিবার উদ্দেশ্যে মুখব্যাদান করিয়াছে! বাঘটা সম্ভবতঃ বাবুর্চ্চিকে মুখে তুলিয়া লইয়াই সেই স্থান ত্যাগ করিত, মতলবটা তাহার সেই রকমই ছিল বলিয়া বাবুর্চ্চির সন্দেহ হইয়াছিল।

বাবুর্চ্চি এই ভীষণ সঙ্কটে হতবুদ্ধি না হইয়া আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিল। তাহার বেহালা বাজাইবার অভ্যাস ছিল; সে শয্যায় বসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বেহালা বাজাইয়াছিল, তাহার পর নিদ্রাকর্ষণ হইলে বেহালাখানা শয্যার এক পাশে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গে সে বাঘটাকে আক্রমণোদ্যত দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য অগত্যা সেই বেহালাখানাই তুলিয়া লইল, এবং তদ্দ্বারা বাঘের মাথায় দমাদম্ প্রহার করিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ আঘাতে বেহালাখানি চূর্ণ হইল বটে, কিন্তু বাবুর্চ্চির প্রাণরক্ষা হইল। বাঘটা তাহাকে আক্রমণের চেষ্টায় বিরত হইয়া পলায়নের পূর্ব্বে নীচের 'বাঙ্কে' দৃষ্টিপাত করিয়া, দ্বিতীয় বাবুর্চ্চিকে সেখানে নিদ্রিত দেখিল। বাঘটা সেই অবস্থায় তাহাকে মুখে তুলিয়া লইয়া জাহাজের ডেকে উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে বসিয়া তাহার 'ডিনার' শেষ করিল। হতভাগ্য বাবুর্চ্চির মৃতদেহের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাই জাহাজ হইতে হামবার্গ নগরে নামাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

বাবুর্চ্চি বেহালা দিয়া বাঘটাকে দমাদম্ পিটিতেছে

আমাদের জাহাজ সমুদ্র-পথে চলিতে আরম্ভ করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি বানর কোন কৌশলে পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া জাহাজের প্রধান মাস্তলের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং জাহাজের চিমনি-নিঃসৃত ধূমরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তাহাদিগকে ধরিয়া পিঞ্জরে আবদ্ধ করা সহজ হয় নাই। তাহা-দিগকে ধরিবার জন্য কোন খালাসী মাস্তলে উঠিতে আরম্ভ করিলেই তাহারা মাস্তল ত্যাগ করিয়া পালের রজ্জুতে আশ্রয় গ্রহণ করিত; এবং তাহাদিগকে ধরিবার আশায় প্রধান খালাসী যতক্ষণ মাস্তল হইতে না নামিত, ততক্ষণ তাহারা পালের দড়ি ধরিয়া ঝুলিতে থাকিত। প্রধান এঞ্জিনিয়ার বানরগুলার এই রকম দুষ্টবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিলেন; খালাসীগুলাকে অকৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া তিনি উৎসাহভরে বলিতেন, 'কেমন জব্দ! বানরের সঙ্গে চালাকি?'—কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে মত-পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল; তিনি মুক্তকণ্ঠে যাহাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহারাই একদিন গোপনে তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার ব্যবহার্য্য অনেক জিনিস ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। এই ঘটনার পর তিনি বানরগুলার বুদ্ধি-প্রসঙ্গে উৎসাহসূচক কোন কথা বলিতেন না।

একদিন রাত্রি দুইটার সময় আমি আমার কামরার ভিতর পা বাড়াইতেই পদপ্রান্তে অস্ফুট 'গোঁ-গোঁ' শব্দ শুনিতে পাইলাম। শেষে কি বাঘের লেজে পা চাপাইলাম? আমি তৎক্ষণাৎ দরজার

নিকট লাফাইয়া পড়িলাম, তাহার পর উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন। বাঘটা খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে কি না দেখিবার জন্য দ্রুতবেগে তাহার খাঁচার নিকট উপস্থিত হইলাম; পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে দেখিলাম, ব্যাঘ্রবর খাঁচার ভিতর বিশ্রাম করিতেছেন। তখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। অতঃপর আমি 'গুলবাঘ' দুইটির খাঁচার নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকেও খাঁচায় আবদ্ধ দেখিলাম। তখন আমি কতকটা নিরুদ্বেগ চিত্তে আমার কামরায় ফিরিয়া 'সুইচ্' টিপিয়া আলো জ্বালিলাম; দেখিলাম, হিমালয় প্রদেশজাত ভল্লুক দ্বয়ের একটি আমার কামরায় খাদ্যসংগ্রহের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। 'জমান দুগ্ধের' প্রতি তাহাদের অনুরাগ অসাধারণ। ভালুকটা বোধ হয় সেই লোভেই আমার কামরায় প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু আমার কামরায় তাহার সেই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

অতঃপর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কাণ্ড ঘটিল, ভারতীয়'সারেঙের মতে তাহা 'বেজায় বগড়!' যে মোটা নলের সাহায্যে (hose) জল নিঃসারিত করিয়া জাহাজ ধৌত করা হয়, সেই নলের জোড়ের বিভিন্ন অংশের একটি অংশ গুলবাঘের খাঁচার পশ্চাদ্ভাগে সংরক্ষিত হইয়াছিল। জাহাজ ধুইবার জন্য সেই নলের বিভিন্ন অংশগুলি জুড়িয়া রাখিবে, জাহাজের লস্করগণের সেরূপ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাইত না। এক দিন সকালে এক জন লস্কর জাহাজের পাটাতন ধৌত করিবার জন্য সেই নলের নিকট উপস্থিত হইয়া বাঘের খাঁচার নিকট একটা 'ফ্লেমিঙ্গো' (সারস জাতীয় জলচর বিহঙ্গ) পাখীর মৃতদেহ দেখিতে পাইল। তাহার মস্তক ও কণ্ঠদেশ শোণিতাপ্লুত। সেই সময় একটা বাঘ তাহার খাঁচা হইতে বাহির হইয়া অন্য একটি পাখীর উপর লম্ফ প্রদানের চেষ্টা করিতেছিল।

বাঘ খাঁচা হইতে বাহির হইয়া পাখী শিকার করিতেছিল; তৎক্ষণাৎ জাহাজে সোরগোল আরম্ভ হইল। অনেকে ভাবিল, বাঘটা কি শেষে মানুষের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে? পশুগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত প্রহরিগণের দ্বিতীয় প্রহরী অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে জাতিতে হিন্দু, পরিধানে হাফ্‌প্যাণ্ট ও জুতা, মস্তকে ছৎরিদার প্রকাণ্ড 'টুপি'। দুইটি ডাক-নামে সে পরিচিত; একটি নাম 'কাপ্তেন বোষ্টক, দ্বিতীয় নাম 'কর্ণেল উম্‌ওয়েল।'

এই পশুরক্ষীর সাহসের পরিচয় পাইয়া সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাঘ খাঁচা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া 'কাপ্তেন বোষ্টক' সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পড়িল, এবং বাঘটাকে শিকার সন্ধানে ঘুরিতে দেখিয়া তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইল; সে বাঘটাকে ঘাড় ধরিয়া অসঙ্কোচে তাহার খাঁচার নিকট টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পর খাঁচার দরজা দিয়া তাহাকে খাঁচার ভিতর পুরিয়া খাঁচার দ্বার বন্ধ করিল!

আমাদের জাহাজ সৈয়দ বন্দরে উপস্থিত হইলে যে সময় আমরা জাহাজে কয়লা বোঝাই করি, সেই সময় একটা হীরামন পক্ষী খাঁচা হইতে পলায়ন করে। জাহাজের কাপ্তেন এই উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত রাজপুত্রটিকে দুই একটি কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ, রাজপুত্রটির উপর যে দায়িত্বভার অর্পিত হইয়াছিল, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার ঔদাসীন্যে একটি ভালুক মরিয়া গিয়াছিল, এবং দুইটি 'গুলবাঘ'ই পীড়িত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি রাজপুত্র, সে দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না।

আমাদের জাহাজ আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করিলে জাহাজ গ্রীষ্মমণ্ডল অতিক্রম করিয়াছে বুঝিয়া কাপ্তেন জানোয়ারগুলির বাসস্থানের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইবে কি না—চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন ছুতোরমিস্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া কাপ্তেনের সহিত জাহাজের ডেকে উপস্থিত হইলাম। এক জন শিক্ষানবীশও আমাদের সঙ্গে ছিল। 'গেলিস্কাই-লাইটের' চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় বোড়া সাপের একটা খোলস দেখিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম। সমুদ্রযাত্রা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কয়েকটি সাপ মরিয়া গিয়াছিল; ভারতীয় লস্করগণ মৃত সাপের সেই সকল খোলস শুকাইয়া রাখিয়াছিল, উহা তাহারা বিক্রয় করিত।

কাপ্তেন বোড়া সাপের সেই খোলসটি পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য ও গঠনবৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করিতেছিলেন; সেই সময় খোলসের মাথা হঠাৎ নড়িয়া উঠিল! তাহার পর

রক্ষী বাঘটার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে খাঁচায় পুরিতেছে

জীবিত বোড়া তাঁহার মুখের ছয় ইঞ্চি দূরে তাহার স্থূল দেহ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে লাগিল!

এই দৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রাজপুত্রটি তাঁহার কর্ত্তব্যে উদাসীন বলিয়া কাপ্তেন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেন। বোড়া সাপটার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া আমরা সাপের খাঁচাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু একটি খাঁচা খালি দেখিলাম। খাঁচার তারগুলি সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত ছিল, কেবল এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ফুকর দেখিতে পাওয়া গেল। সেই ফুকর দিয়া একটি ক্ষুদ্র ইন্দুরও বাহির হইতে পারে না; অথচ আঠার ফুট দীর্ঘ এবং সেই অনুপাতে স্থূল বোড়া সাপটা সেই ফুকর দিয়া কিরূপে বাহির হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। ইহা জটিল রহস্য বলিয়াই সকলের ধারণা হইল।

অতঃপর 'কর্ণেল উম্‌ওয়েল' পলাতক বোড়া সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার খাঁচায় পুরিবার ভার গ্রহণ করিল। সে সম্পূর্ণ

অবিচলিত চিত্তে সেই সাপটার নিকট উপস্থিত হইল, এবং দুই হাতে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ ও স্থূল সাপটিকে সে একাকী টানিয়া লইয়া যাইবে—তাহার সেরূপ শক্তি ছিল না। এজন্য জাহাজের সারেঙ ও দুই জন কোয়ার্টার-মাষ্টার তাহাকে সাহায্য করিতে আসিল। এতদ্ভিন্ন, আঠার জন লস্কর ও ফায়ারম্যান শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সাপটাকে দুই হাতে জাপ্টাইয়া ধরিল, এবং সেই ভাবেই তাহাকে বহন করিয়া তাহার খাঁচার নিকট উপস্থিত হইল। সেই স্থানে সাপটাকে নামাইয়া দেওয়া হইলে আমরা তাহার লেজের দিক্ হইতে রজ্জুর ন্যায় জড়াইতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাপটা কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, বা গা-ঝাড়া দিল না। সুতরাং তাহাকে তাহার খাঁচার মধ্যে স্থাপন করা কষ্টকর হইল না।

কিন্তু জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বানর-সংখ্যা হ্রাস হইল। একটি বানর-শিশু তাহার খাঁচার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়িলে, যে সকল বানর নীচের খাঁচায় ছিল, তাহারা তাহার লেজ হাতে পাওয়ায় সেই লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, এবং তাহাকে নামাইয়া লইল। তাহার মা উপরের খাঁচার ভিতর দাপা-দাপি ও লাফালাফি করিতে লাগিল। অতঃপর শাবকটিকে তাহার মাতার হস্তে অর্পণ করা হইলে বানরী তাহার রক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিল; সে কাহাকেও সেই খাঁচার নিকট যাইতে দেখিলে শাবকটিকে খাঁচার ঘেরের নিকট ঘেঁসিতে দিত না, শাবকটি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে তাহাকে চড়-চাপড় মারিয়া দূরে সরাইয়া দিত।

যে তিনটি বানর পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া জাহাজের মাস্তুলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া পুনরায় খাঁচায় পুরিবার ব্যবস্থা করা অসাধ্য হইল। তাহারা সেই মাস্তুলের উপর বসিয়া থাকিত; রাত্রিকালে মাস্তুল হইতে নামিয়া, বানরগুলার জন্য সঞ্চিত ফলমূল চুরি করিয়া ভোজন করিত। একটা বানর একদিন ধরা পড়িতে পড়িতে পলায়ন করিয়াছিল। সেদিন সে একটা খাঁচার অন্যান্য বানরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া খাঁচার পাশে বসিয়া ছিল। সেই সময় একজন লস্কর সেই স্থানে উপস্থিত হইলে সে পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু খাঁচার একটা বানর তাহার পা ধরিয়া তাহাকে আটক করিল। লস্কর তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেই বানরটা বহু চেষ্টায় তাহার আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দ্রুতবেগে মাস্তুলের গোড়ায় উপস্থিত হইল, এবং তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় উঠিয়া বসিল। লস্কর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না।

নিউব্রন্জ উইকের হালিফাক্স বন্দরে আমাদের জাহাজ ভিড়িলে, জাহাজে বহু পশু-পক্ষী আসিয়াছে শুনিয়া তাহাদিগকে দেখিতে নগরের বিস্তর লোক জাহাজে উঠিয়া আসিল। স্থানীয় সংবাদপত্র-সমূহের রিপোর্টারগণও নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে আসিল। তাহারা শুনিতে পাইল, একটা বানর একজন কোয়ার্টার-মাষ্টারের গালে দংশন করিয়াছে. ইহা ভিন্ন জাহাজে অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই; ইহা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইল, এবং বলাবলি করিতে লাগিল, বাঘে যদি জাহাজের একজন লোককেও আক্রমণ করিয়া খাইয়া ফেলিত, তাহা হইলে প্রকাশযোগ্য একটা সংবাদ মিলিত! —এই সকল লোকের হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম!

আমাদের জাহাজ বোষ্টন বন্দরে উপস্থিত হইবামাত্র বোষ্টন নগরের বহু সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জাহাজে প্রবেশ করিল। ফটোগ্রাফারগণও দলে দলে আসিয়া জুটিল। একজন ফটোগ্রাফার একটা বৃহৎ বানরের খাঁচার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বানরটা খাঁচার তারের ফাঁক দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার প্যাণ্টের পশ্চাদ্ভাগ চাপিয়া ধরিল! ফটোগ্রাফার প্রাণভয়ে পলায়নের চেষ্টা করিল। তাহার মুখভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, বাঘটাই তাহাকে ধরিয়া চর্ব্বণ আরম্ভ করিয়াছে। যাহা

বানর ফটোগ্রাফারের 'প্যাণ্ট' ধরিয়া টানাটানি করিতেছে

হউক, টানাটানিতে অবশেষে তাহার প্যাণ্টের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া গেল।

জানোয়ারগুলিকে জাহাজ হইতে নাবাইবার সময় দুইটি বোড়া সাপের একটির সন্ধান মিলিল না। জাহাজের সকল অংশে সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না; অগত্যা অনুমান হইল, সাপটা কোন উপায়ে খাঁচা হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জাহাজের কিনারা হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

টকি-কার্টুন

তুলি দিয়া কাগজের উপর কার্টুন-ছবি তৈয়ার করা খুব বড় কথা হয়তো নয়; কিন্তু হাতে-আঁকা সেই সব ছবির মানুষ-জন যদি জীবন্ত প্রাণীর মতো কাজ-কর্ম্ম বা নড়া-চড়া করে কিম্বা গান গায়, তাহা হইলে সে ব্যাপারে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আজ বায়োস্কোপের পর্দ্দায় যখন দেখি, মিকি মাউস বা ডোনাল্ড ডাক বা বেটী বুপ্

মানুষের মতো সকল কাজে পটুতা প্রকাশ করিতেছে, তখন সত্যই তাজ্জব লাগে!

হাতে আঁকা এই সব সাদাসিধা ছবি কোথা হইতে এতখানি প্রাণ পায়, এবং কে সেই প্রতিভাধর স্রষ্টা—হাতে-আঁকা জীব-জগৎকে যিনি এমন আশ্চর্য্য কৌশলে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন—জানিতে কাহার না বাসনা হয়!

এই মিকি মাউসের স্রষ্টা ওয়াল্ট ডিস্নি। তিনি নিজে বলেন, তাঁর রচনা-প্রণালীতে এতটুকু জটিলতা নাই। ঐ যে তুলিতে

বেগে পরিচালিত করা হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিব, হাতের গতি বিরামবিহীন অভিন্ন এবং অবিচ্ছিন্ন—continuous motion অব্যাহত দেখিতে এতটুকু অসুবিধা থাকে না।

এই অবিচ্ছিন্নতার কারণ, একখানি ছবি চোখের সামনে হইতে সরিবামাত্র পরের ছবিখানি চকিতে তৎনই চোখের সামনে আসিয়া উদয় হয় এবং এমনিভাবে পর-পর আঁকা ছবিগুলি চোখের সামনে দ্রুত প্রতিফলিত হওয়ার ফলে ছবিগুলির বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা চেতনা থাকে না। সেই জন্যই পর-পর আঁকা ছবিগুলি—

শব্দ-সংযোজনা-পর্ব্ব

ওয়াল্ট ডিস্নী

ঐ যায়, যায়, যায়
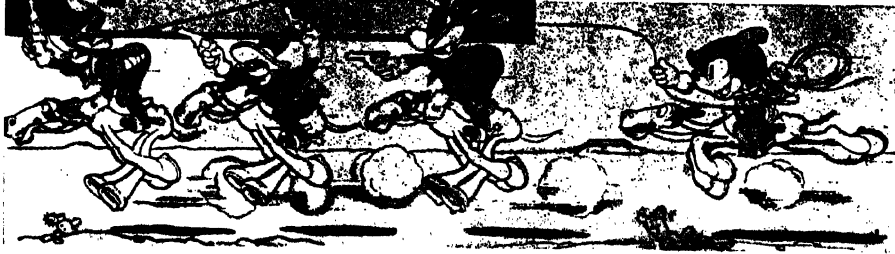
আঁকা মানুষ হাত তুলিয়া সেলাম করিতেছে বা বন্দুক ছুড়িতেছে,—ও ছবিতে প্রথমে তিনি আঁকেন ছবির মানুষ হাত ঝুলাইয়া আছে; তার পরের ছবিতে আঁকেন, সে হাত একটু উঠিয়াছে; তার পরের ছবিতে হাত আর-একটু ওঠে; এবং এইরূপে পর পর ছবি আঁকিয়া তাহাতে ঐ ছবির মানুষের হাত মাথায় ছোঁয়ানো পর্য্যন্ত দেখানো হয়। শুধু এই সেলামটুকু জীবন্তভাবে দেখাইবার জন্য দেড়শো-দুশো ছবি আঁকিবার প্রয়োজন। এই সব ছবি পর্য্যায়ক্রমে পর-পর জুড়িয়া চোখের সামনে দিয়া যদি প্রচণ্ড

একই ছবির অবিচ্ছিন্ন পর্য্যায় হিসাবে আমরা সমগ্রভাবে উপলব্ধি করি। ছবির গতিবেগের জন্যই সত্যকার সজীব প্রাণীর ছবির মতোই এই কার্টুন ছবির প্রাণীগুলি সজীবভাবে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়। (movie cartoons are like any other motion picture, in respect to this illusion of motion) সত্যকার জীব-জগতের সিনেমা-ছবি অসংখ্য নিশ্চল (still) ছবির জোড়াতালি ভিন্ন যেমন আর কিছুই নয় তেমনি হাতে আঁকা অসংখ্য

নিশ্চল ছবি জুড়িয়াই এই মিকি মাউস জাতীয় ছবিগুলির সৃষ্টি।

এই কার্টুন-ছবিতে আজ শব্দ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়াই তার সজীবতা আমাদিগকে এতখানি অভিভূত করিয়াছে। এই কার্টুনের প্রত্যেকখানি ছবি "stop-action" ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয়। এ ক্যামেরায় এককালে একখানি মাত্র exposure গৃহীত হয় এবং পর পর ছবিগুলি তোলা হইলে, মাপিয়া জুপিয়া যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে তেমনি শব্দ বা সুর সংযোজিত করা হয়।

কার্টুনের জন্য সুর রচনা

ছবির প্রতি-নব্বই ফুট ফিল্মে, শব্দ ও সুর সংযোজিত করিতে হয় ঠিক এক মিনিট ধরিয়া। অর্থাৎ কার্টুনের নব্বই ফুট ফিল্ম দেখিতে এক মিনিটমাত্র সময় লাগে। কাজেই এই নব্বই ফুটের সঙ্গে যে শব্দ বা সুর জুড়িতে হইবে, তাহার সময় ঠিক এক মিনিট নির্দ্দিষ্ট থাকে।

সত্যকার জীবন্তপ্রাণী লইয়া সবাক্ ছবি তুলিতে যেমন ছবি তোলা ও শব্দসংযোজনার কাজ এক সঙ্গেই চলে, কার্টুন ছবিতে তাহা করিবার উপায় নাই। কার্টুনের শব্দ ও সুর চিত্র-নাট্য দেখিয়া আগে তোলা হয়। তার পর কার্টুন-ফিল্মের ছবি সেই শব্দ ও সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া তুলিতে হয়।

ছবির জন্য অনুরূপ ভাবাভিনয়

কার্টুন ছবিতে music, সংলাপ এবং শব্দ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন লোকের দ্বারা তোলানো হয়, এবং ছবি তোলা, শব্দ ও সুর সংযোজনা প্রভৃতির কাজ চুকিলে সুদক্ষ শিল্পী সেগুলিকে সুসমঞ্জস ভাবে জুড়িয়া নিখুঁত ভাবে তাহাকে দর্শন-যোগ্য করিয়া তোলেন।

শব্দ ও সুরসংযোজনার সময়—কাজিয়ের দল প্রত্যেকে Earphone ভূষায় সজ্জিত থাকেন এবং ইলেকট্রিক মেট্রোনোম

ভাবভঙ্গী দেখিয়া ছবি আঁকা

সুর ও শব্দ-যোজনা

…গুড়ুম্
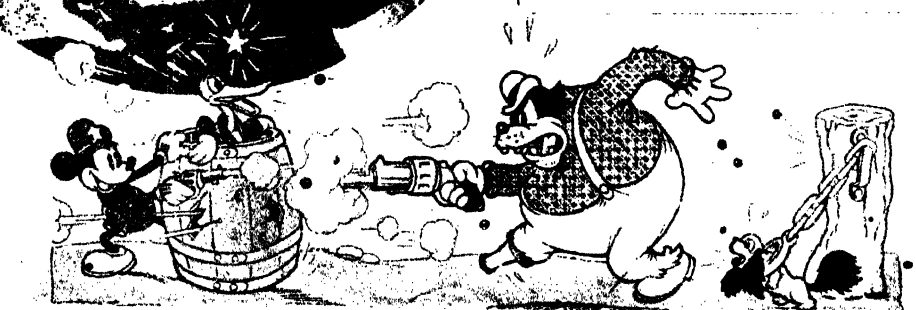
যন্ত্র (metron me) সাহায্যে সুরে ও সঙ্গীতে সমতা (rhythm) রক্ষা করেন। যাঁরা এই সব কার্টুন-লোকের জীব-জন্তুর মুখে সংলাপ জুড়িয়া দেন, তাঁহাদিগকেও উক্ত সজ্জাভূষণে ভূষিত থাকিতে হয়। এই মিউজিক (music), কথা এবং শব্দ ঘড়ি ধরিয়া এমন সূক্ষ্ম মাপে আগে হইতে নির্দ্ধারিত থাকে যে, ছবির গতি ও শব্দের সাযুরূপ সংযোগ সম্বন্ধে কোথাও এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না।

কার্টুন-ফিল্ম তুলিবার সময় প্রতি ফুটে ষোলখানি ফ্রেম (Frame) ব্যবহার করা হয়; এবং ক্যামেরায় প্রতি সেকেণ্ডে চব্বিশখানি ফ্রেম চলে; কাজেই কার্টুন-ছবি তুলিতে হইলে গণিত-শাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হয়। কার্টুন ছবির জন্য যে চিত্র নাট্য (Scenario) রচনা করা হয়, তার প্রত্যেকটি দৃশ্য ক'ফুট করিয়া হইবে, আগে-ভাগে তাহা সুনির্দ্দিষ্ট থাকে; অর্থাৎ

কোন্ দৃশ্য তুলিতে কত ফুট ফিল্ম লাগিবে, তাহার হিসাব চিত্র-নাট্যে লেখা থাকে এবং সে হিসাবে এতটুকু গরমিল ঘটিবার উপায় নাই। ঘটিলে ছবি তালগোল পাকাইয়া যাইবে।

ধরো, কোনো দৃশ্য চব্বিশফুট তোলা হইবে—তাহাতে ফিল্মস্পেশে (Film space) তিনশো চুরাশিখানি ফ্রেম লাগিবে; কাজেই এই দৃশ্যের জন্য যে ছবি আঁকা হইবে, তাহা এমন কৌশলে আঁকা চাই—যেন ঐ চব্বিশ ফুটের মধ্যেই উক্ত দৃশ্যের সমস্ত কাজ বা এ্যাকশন (action) সম্পূর্ণ হয় এবং এই দৃশ্যটির সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া সুর-শিল্পীকে সুর-সংযোজনা করিতে হইবে। চারিদিক্ দিয়া এমনি সূক্ষ্ম হিসাব করা থাকে বলিয়াই সুদক্ষ শিল্পীর হাতে ছবি তোলায় কোন গলদ ঘটে না।

বাঁয়ে—একই ছবির পর-পর দৃশ্য

ডাহিনে—দু'খানি একই ছবির অংশ

তার পর দৃশ্যের কথা বলি। প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে পিছনকার দৃশ্য (background) স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্নভাবে আঁকা থাকে না। এই ব্যাক-গ্রাউণ্ডের দৃশ্য বেশ ভারী স্বচ্ছ কাগজে সুদীর্ঘভাবে আঁকা হয়। ছবি তুলিবার সময় একদল লোক ছবিগুলিকে ক্যামেরার সামনে ধরিয়া টানিতে থাকে, এবং এক দল লোক ছবির পিছনে এই আঁকা দৃশ্যপটখানিকে হিসাব-মাফিক টানে। তাহার ফলে বিভিন্ন দৃশ্যাংশের সহিত ছবির বিভিন্ন এ্যাকশন নিখুঁত ভাবে মিলাইয়া তোলা হয়।
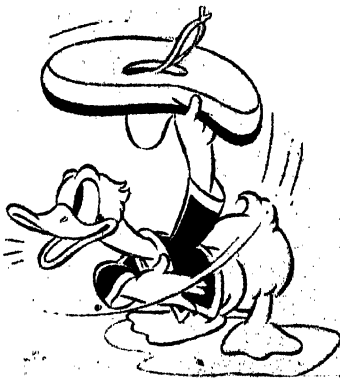
ডোনাল্ড ডাক্

ওয়াল্ট ডিস্নি এই কার্টুন-চিত্র-নাট্য রচনা করিয়া প্রতি দৃশ্যের কপি প্রত্যেক শিল্পীর হাতে বুঝাইয়া দেন এবং সেই কপি দেখিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্য সম্পাদন করেন। ছ'সাতশ ফুট সচল সবাক্ কার্টুন ছবি তুলিতে পনেরো হাজারখানি বিভিন্ন ছবি আঁকিতে হয়। প্রথমে কাগজে এই ছবি আঁকিয়া সেলুলয়েড-শিটে (celluloid sheet) ট্রেস (trace) করা হয়। এই শীটগুলি সাত ইঞ্চি বা ন ইঞ্চি লম্বা হয়। ট্রেস-করা শীটগুলি যায় ফটোগ্রাফারের হাতে। প্রতিদিন যদি পঞ্চাশ ফুট ফিল্ম তোলা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কাজ ভালো হইয়াছে। প্রতি মিনিটে একশো ফুট ফিল্মে শব্দ সংযোজিত হয়। দশ হাজার ফ্রেমে ছ'সাতশো ফুট যে কার্টুন ছবি তোলা হয়, পর্দ্দার গায়ে সে ছবি মাত্র সাত মিনিটের জন্য আমাদের প্রচুর আনন্দ দেয়!

ছবিতে আঁকা মানুষ বা জন্তুজানোয়ারের অভিনয়-ভঙ্গী ছবি আঁকিবার সময় সম্প্রদায়ের নিপুণ অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়া প্রয়োজনানুরূপ ভাবে অভিনয় করানো হয় এবং চিত্রশিল্পীরা সেই ভঙ্গী দেখিয়া ছবির জীবজন্তুর ভাবভঙ্গী অঙ্কিত করেন।
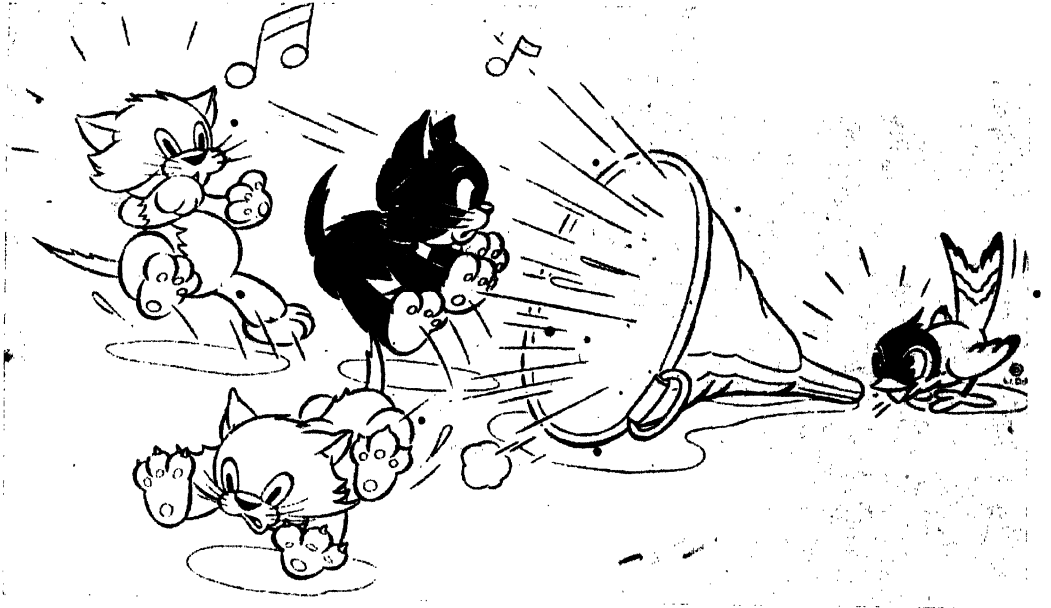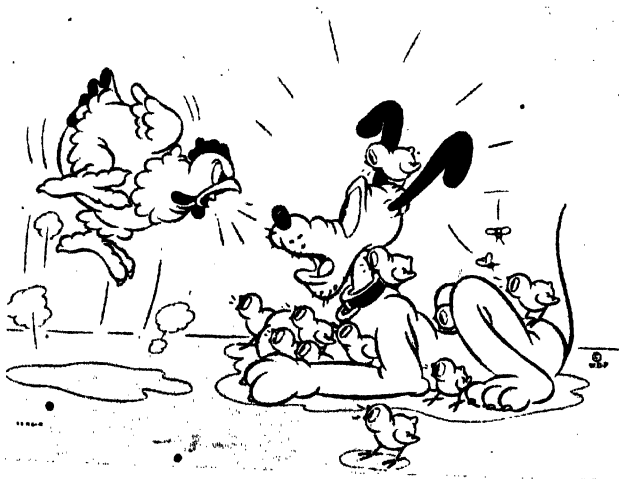
সিলি সিম্ফনির দুষ্ট বিড়ালেরা

মাদার প্লুটোর একটি দৃশ্য

জন্য কত লোক, কতখানি সময় ধরিয়া, কত রকমের পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নুইয়া পড়ে। এত বেশী খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছবি তুলিতে হয় বলিয়া কার্টুন-ফিল্ম তুলিতে সাধারণ বড় ফিল্ম তোলার চেয়েও বেশী সময় লাগে, এবং অনেক সময় খরচও হয় বেশী।

কার্টুন ছবির চরম উন্নতি সম্প্রতি দেখা গিয়াছে ডিস্নির "স্নো হোয়াইট এ্যাণ্ড দি সেভেন ডোয়ার্ফ্স্" কার্টুনখানিতে! এখানি রঙীন কার্টুন এবং একখানি প্রমাণ-বহরের ফিল্ম। আনন্দ-পরিবেষণের ডিগ্রী মাপিতে গেলে বলিব, এখানি বোধ হয় সাধারণ যে-কোন ফিল্মকে হার মানাইয়াছে। এই ছবিখানি তুলিতে কি পরিমাণ সময় লাগিয়াছে, কত লোককে কত বিচিত্র রকমের পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হইবে। যত দিন যাইতেছে, কার্টুন-ছবি ততই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, তাই কার্টুন-শিল্পীরা তাঁহাদের এ পরিশ্রম সার্থক মনে করেন।

এই কার্য্যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সীমা নাই। সাত আট মিনিট ছবি দেখিয়া আমরা যে আনন্দ পাই, সেটুকু আনন্দের

অন্তরের আহ্বান

সুরেশ আই, এ, পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে ফল জানিবার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল—

তাহার বাবা মোক্তারী করিতেন। অতি অকস্মাৎ ছয় দিনের জ্বরভোগের পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না, কাজেই এই পরিবারের গুরু দায়িত্ব অনভিজ্ঞ সুরেশেরই অতি দুর্ব্বল স্কন্ধে আসিয়া চাপিল। জীবনে বড় হইবার, সুখী হইবার, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া সে অবনত মস্তকে সে দায়িত্বকে গ্রহণ করিল।

গ্রামের পাশেই একটি মাইনর স্কুল ছিল, তিরিশ টাকায় সে তাহার হেডমাষ্টারী পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সে ভাবিয়াছিল—পড়িয়া বড় হইবে; এম, এ, পাশ করিয়া কোন কলেজে অধ্যাপনা করিবে; সাহিত্য, কলা বিষয়ে গবেষণা করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইবে। যে দিন এ আশাকে—কত বৎসরের স্নেহসিক্ত এই জীবন-স্বপ্নকে বিসর্জ্জন দিয়া, ছিন্ন ছাতা বগলে ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া সে মাষ্টারী আরম্ভ করিল, সে দিনের সেই ব্যর্থতার ম্লানিমাময় মুখ আজিও প্রতিবেশীর স্পষ্ট মনে পড়ে! সেই দিন হইতে সুরেশ কখনও হাসে নাই।

দুঃখে দারিদ্র্যে, অনটনে, অভাবে, তাহার পর সুদীর্ঘ পনরটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ নিত্য কার্য্যের ফাঁকে সে আকাঙ্ক্ষার কথা তাহার একবার মনেও পড়ে না। তাহার ছোট ভাইকে সে মানুষ করিয়াছে। এই বৎসর সে এম, এ, এবং ল পাশ করিয়াছে। সারা জীবনের মধ্যে সুরেশ এক সঙ্গে দু'খানির বেশী কাপড় কিনিতে পারে নাই। তিরিশ টাকা মাহিনার ২৫৲ টাকাই সে রমেশকে পাঠাইয়া বাকী পাঁচ টাকা ও জমিজমার সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত গৃহস্থালী না-চলার মতই চালাইয়াছে। সুরেশ যাহাকে সুখী করিবে, ভরণ-পোষণ করিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহে আনিয়াছিল, সে-ও সুরেশের সঙ্গে এই দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছে। স্বামীর এই দারিদ্র্যকে সে নির্ব্বিচারে আপনার করিয়া লইয়াছে।

সুরেশ সে দিন স্কুল হইতে আসিয়া ব্যস্ততার সঙ্গে ডাকিল, —মা, মা গো,—শীগ্‌গির এসো—শীগ্‌গির—

মা বাহিরে আসিলেন। সুরেশ আজ পনর বৎসর পরে হাসিয়া বলিল,—মা, রমেশ হাকিম হ'য়েছে। তার চিঠি পেলাম—শোনো—

শ্রীচরণেষু,

দাদা, তোমার পত্র পাইয়াছি। কাল জানিতে পারিলাম, মুন্সেফী পাইয়াছি। সেপ্টেম্বর হইতে যোগদান করিতে হইবে। সম্ভবতঃ রংপুরের কোন মহকুমায় প্রথম যাইতে হইবে—আমার শরীর ভাল—ইত্যাদি—

পত্র পড়িতে পড়িতে সুরেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সহসা সে চুপ করিয়া গেল। সুরেশের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাহার স্ত্রী শুনিতেছিল, তাহার উদ্দেশ্যে বলিল,—বড় বৌ, শুনেছ—

সুরেশের আর্দ্র আঁখি হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া চিবুকে আসিয়া থামিল। সুদীর্ঘ পনর বৎসরের এই সাধনা আজ তাহার দ্বারে পুরস্কার আনিয়াছে,—আনন্দে, হর্ষে, বার বার তাহাকে যেন স্বপ্নেরই মত অলীক বলিয়া মনে হয়! আনন্দই অমন হৃৎস্পন্দনকে এমনই করিয়া দ্রুততর করিয়া দেয়!

সুরেশ আর একখানি পত্র বাহির করিয়া পড়িল—রমেশের এক বন্ধুর লেখা—

আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই, তবে আমি আপনার ভাই রমেশের বন্ধু। সেই পরিচয়কেই যথেষ্ট মনে করিয়া আমি আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস

পাইয়াছি। রমেশের সঙ্গে আমার পরিচয় আজ ছয় বৎসর।

আমার এক ভগিনী এইবার থার্ড ইয়ারে পড়িতেছে। তাহাকে যদি আপনি আপনার ভ্রাতৃবধূরূপে গ্রহণ করেন, তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। আপনি শীঘ্র এখানে আসিয়া মেয়ে দেখিয়া গেলে বাধিত হইব। ...

পুঃ—রমেশের এ বিবাহে কোন আপত্তি নাই, আপনি যদি পছন্দ করেন, তবে শুভকার্য্য শ্রাবণের মধ্যেই সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করি।

পরদিন সকালে সুরেশ বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল—

তাহার পুত্র বাদল মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, কনিষ্ঠটির বয়স তিন বৎসর, এখনও পাঠাভ্যাস আরম্ভ করে নাই। বাদল একখানা কাটারী লইয়া উঠানের এক কোণে নিবিষ্ট মনে আসসেওড়ার ডাল দিয়া ডাণ্ডা-গুলি তৈয়ারী করিতেছে। দিগম্বর ভোলা নারিকেলের মালায় জল এবং কাদা গুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া মাঝে মাঝে তাহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে—

বড়-বৌ আসিয়া বলিল,—কি গো, ইস্কুলে যাবে না?

সুরেশ একটু একটু হাসিতেছিল, সে বলিল,—আজ আর যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ক'রছে না। ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন, আজ ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত ভার তোমার মাথায় তুলে দিয়ে আমি—

—তুমি কি ক'রবে শুনি—

সুরেশ খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল,—তাই ত ভাবছি।

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল—চান ক'রতে ক'রতে ভাবলেও ত পার—

বড়-বৌ তেলের বাটি সম্মুখে রাখিয়া গেল। সুরেশ তাহার আনন্দের ভার যেন একা রহিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে বাদলকে বলিল,—বাদলা, তোর কাকা তোর কাকীমাকে আনবে, তা জানিস্—

বাদল কাটারী হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাগর চোখে চাহিয়া বলিল,—কবে?

—এই দুই এক মাসের মধ্যেই। তোর কাকীমা বি, এ, পড়ে, তার কাছে পড়বি, কেমন?

বাদলের পৌরুষ যেন অনেকটা আহত হইল বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীলোকের নিকটে পড়িবার মত দৈন্যকে স্বীকার করিতে হইবে ভাবিয়া সে প্রতিবাদ করিল,—আমাকে পড়াতে পারবে?

—তোকে ত ভাল, আমাকেও পারবে।

বাদল নিবিষ্ট মনে ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিল,—তবে ও কাকীমার দরকার নেই—

সুরেশ হাসিয়া বলিল,—কেন রে, পাড়ার সেরা বৌ আসবে—

বাদল ব্যথিত স্বরে বলিল,—যদি কাণ মলে দেয়।

বাদলের এই গুরুতর আশঙ্কার কথায় সুরেশ হো হো করিয়া হাসিয়া গামছা কাঁধে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কয়েকদিন পরে—

সুরেশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া বারান্দায় জীর্ণ ছাতাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ডাকিল, মা, বড়-বৌ, শোনো, ভগবান্ যখন দেন তখন এমনি ক'রেই দেন।

সমবেত মা, স্ত্রী প্রভৃতির নিকট সুরেশ বলিল, সে মেয়ে যেমন শিক্ষিতা, তেমনই সুন্দরী; জগদ্ধাত্রীর মত রূপ যেন ফেটে পড়ছে। শ্রাবণের ২০শেই দিনস্থির ক'রে এলাম।

মা ব্যস্তভাবে বলিলেন,—এ কটা দিনের মধ্যে কেমন ক'রে হবে—

—খুব হবে, এখনও আঠার দিন আছে, ভাবনা কি? দেনা-পাওনা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিনি, যা তাদের ইচ্ছে, তাই দেবেন। এই মেয়ে যে আমাদের ঘরে আনবো সেই আমাদের যৌতুক।

সুরেশ কিরূপে সেলুনে চুল ছাঁটিয়া রমেশের কাচানো সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া, ট্যাক্সিতে চড়িয়া ক'নে দেখিতে গেল, কিরূপে অতি নম্র অথচ স্বাধীন পদক্ষেপে ক'নে ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে নমস্কার জানাইল, কি প্রশ্ন করিবে ভাবিয়া সে আকুল হইয়া পড়িল প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনার একটি সুদীর্ঘ তালিকা মায়ের কাছে দাখিল করিয়া আনমনে সে হাসিতে লাগিল।

দুই তিন বার এই কাহিনীই অতি ক্ষুদ্র ঘটনাসহ বর্ণনা করিতে যেন সুরেশের ক্লান্তি নাই। বাদল একটি বৃহদাকার কোলাব্যাংএর ঠ্যাংএ সূতা বাঁধিয়া টানিতে টানিতে উঠানে আনিয়া, বড় বড় চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া অনাগতা জগদ্ধাত্রীরূপিণী কাকীমার আগমন-সম্ভাবনার কথা শুনিতেছিল। সে প্রশ্ন করিল, বাবা, কাকীমাকে ইস্কুলের সরস্বতী ঠাকুরের মত দেখ্‌তে, এ্যাঁ?

—হ্যাঁ, অবিকল ওই রকম।

—কবে আস্‌বে?

—এই বাইশে তারিখে, হ্যাঁ রে বাদলা, তোর কাকীমাকে কি দিবি বল ত?

বাদল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহার কোন্ প্রিয়বস্তু উপহার দিবে, ঠিক পাইল না। ব্যাংটাকে দুই তিন বার উঠানে পাক দিয়া সহসা চীৎকার করিয়া বলিল,—হাঁ বাবা, একটা শালিকের ছা দেব, নন্দদের পাখীর মত পড়বে—

সুরেশ হাসিয়া বলিল,—তুই একটা গাধা, শালিক নিয়ে বৌমা কি ক'রবে?

আরও কয়েক দিন চলিয়া গিয়াছে—

পৈতৃক দালানের একটি জীর্ণ কুটুরীকে সংস্কার করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া নূতন করা হইয়াছে। টেবল, চেয়ার, ছবি দিয়া তাহাকে আধুনিক প্রণালীতে সাজানোও হইয়াছে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যাহা কিছু অর্থ ছিল, সমস্ত দিয়া বিবাহের আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে—

পাড়ার কলেজ-ছাত্র বা শিক্ষিত কলিকাতা-প্রবাসী যুবকদের দেখাইয়া গৃহখানি বি, এ, পড়া বৌএর থাকিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া সুরেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বিবাহের আয়োজন সুসম্পন্ন—

সেদিন রাত্রে সুরেশ গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে কত কি ভাবিয়া যাইতেছিল। রঙীন নেশায় তাহার দৃষ্টি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বড়-বৌ ঘরে আসিয়া বসিতেই সুরেশ বলিল,—বৌমা এলে তুমি কেমন ক'রে আলাপ ক'রবে বল তো—

—যেমন ক'রে আলাপ করি, তেমন ক'রেই ক'রবো। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে, ঠাকুরপোর চা তৈরী ক'রে দেবে, বিকেলে বিছানা ক'রবে, রান্নার সময়ে এটা ওটা এগিয়ে দেবে—

সুরেশ বিজ্ঞের মত খানিক হাসিয়া লইয়া বলিল,—ওই সব মেয়ে কি হাঁড়ি ঠেল্‌তে পার্‌বে। সে জমাখরচ লিখবে, বাদলকে পড়াবে, আর ধর, জামাটা কাপড়টা সেলাই ক'রবে—

বড়-বৌ বলিল,—সে হবে না। কিছু করুক আর না-ই করুক, সে আমার সঙ্গেই থাকবে—

দুই জনে তুমুল তর্ক বাধিয়া গেল। সুরেশ পরিশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিল,—বেশ, বেশ, বৌমা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাংবোটের মত থাক্‌বে, না ত কি ভাসুরের সঙ্গে দাবা খেলবে?

মা সুরেশকে বলিলেন,—সুরেশ, মুখ দেখবার গয়নাখানা একটু ভাল দেখে আনিস্, আগে থেকে দেখে নিস্ কোন্ গহনাটা আজকাল চলে—

সুরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, ও সব আমি জানি। ব্রেসলেট, আর্মলেট, ব্রূচ আরও কত কি—

আজ সুদীর্ঘ পনর বৎসরের সাধনা মূর্ত্ত হইয়া, তাহার সমস্ত পুরস্কার সহ তাহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—সমস্ত সংসার কেমন করিয়া সেই পুরস্কারকে বরণ করিয়া লইবে, তাহা ভাবিয়াই আকুল হইয়া পড়িয়াছে। এই অতি দীর্ঘ অবন্ধ্য দৈন্যের মাঝে যে বাসনা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা যে এমন করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত অতি অকস্মাৎ তাহাদিগকে আনন্দে বিহ্বল করিয়া দিবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল!

শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়াছে—

রমেশ নব-পরিণীতা পত্নী রেবাকে লইয়া পাঁচদিন সুরেশের সাজানো গৃহে বাস করিয়া গিয়াছে। বৌ-ভাত হইবার পরে রমেশ স্ত্রীকে কলিকাতায় রাখিয়া সেখান হইতেই কর্ম্মস্থানে গিয়াছে। কথা আছে, পূজার সময় রমেশ নববধূ সহ বাড়ীতে পৌঁছিবে।

চারিপাশে পূজার আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। রমেশ পত্র দিয়াছে, চতুর্থীতে সস্ত্রীক বাড়ীতে পৌঁছিবে। আজ চতুর্থী, রমেশের বাড়ী পৌঁছিবার দিন।

সুরেশ বড়-বৌকে বলিল,—বাদলা কোথায়?

—কি জানি সকালে উঠে এক কোঁচড় মুড়ি নিয়ে যে বেরিয়েছে, এখনো ত দেখা নেই—

—ভোলা কোথায় ?

—একটু দেখো না, কোথাও জলে-টলে পড়লো না ত ?

৭টায় ট্রেণ, উজান নৌকা দশটার পূর্ব্বে কোন মতেই ঘাটে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না, তবুও সুরেশ একবার নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা দেখিয়া মনে হয়, আটটা হইয়াছে।

বাদল নদীর পাড়ে একটি অনতি-উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে দূরে নদীর বাঁকে একখানা লাল পালতোলা নৌকার দিকে চাহিয়া বলিল,—ভোলা, ওই লাল পালের নৌকায় কাকা আস্‌ছে জানিস্—আমার জন্যে জামা আন্‌বে, বই আন্‌বে—

দিগম্বর ভোলা কচুবনরূপ ছাত্রমণ্ডলীকে হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিতেছিল, হঠাৎ লাল পালটির দিকে চাহিয়া বলিল,—কাক্‌কী—কাক্‌কী আত্‌বে—

কাকীমার আগমন-প্রতীক্ষারত দুইটি বালকের উদ্দেশ্যে সুরেশ বলিল,—বাদলা, এখনও দেরী আছে, চল্ বাড়ী চল্—

বাদলা বৃক্ষশাখা দোলাইতে দোলাইতে বলিল,—যাও, আমি খবর দেব—

সুরেশ রাগ করিল না, হাসিয়া ভোলাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ বাদে বাদল আসিয়া জানাইল, কাকা, কাকীমা আসিয়াছে। সুরেশ ত্বরিতপদে ঘাটে উপস্থিত হইল। বাদল লাল পালের নৌকাটা দেখাইয়া বলিল,—ওই নৌকো—

সুরেশ অধীর আগ্রহে দেখিল, নৌকাখানি ধীরে ধীরে তাহাদের ঘাট অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, সুরেশের ঘাটে ভিড়িল না।

কিছুক্ষণ বাদে বাদল আসিয়া পুনরায় সংবাদ দিল, কাকা কাকীমা, এসেছে—

সুরেশ বলিল, যাঃ, নৌকো দেখ্‌ছে আর দৌড়ে আস্‌ছে,—

বাদল প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—সত্যি, বাবা, কাকীমা সাদা উঁচুগোড়ালী জুতা পায় দিচ্ছে, চামড়ার বাক্স এসেছে, কাকা ফুটো ফুটো গেঞ্জি গায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

সুরেশ, বড়-বৌ সকলে ঘাটে উপস্থিত হইল। বড়-বৌ অভ্যর্থনা করিয়া রেবাকে লইয়া গেলেন। রমেশ প্রণাম করিল, সুরেশ বলিল,—যা, তুই যা, আমি জিনিসপত্র তোলার ব্যবস্থা করছি। রাত্রিজাগরণ হয়েছে—

এই কয়টি অতি দীন বুভুক্ষু অন্তর এতদিন ধরিয়া যাহার পাশে কপোতের মত নাচিয়া ফিরিয়াছে, সে আজ আসিয়াছে। সকলেই তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া নিজের অন্তরের তৃপ্তি চায়। যে যাহা পায়, তাহাই আনিয়া রেবাকে দিয়া, দেওয়ার আনন্দ উপভোগ করিতে চায়।

ভোলা সারা বৈকালটি লাঠি ঘাড়ে করিয়া এদিক্ ওদিক্ ফিরিতেছে। যে বিড়ালের ছানাটিকে কখনও কাণ ধরিয়া কখনও লেজ ধরিয়া সে টানিয়া লইয়া বেড়ায়, কাকীমাকে দিবার জন্যে সে বিড়ালছানা উপস্থিত করিল। বাদল তাহার ডাণ্ডাগুলির কস্‌রতের কথা আসিয়া জানাইল। পাড়ার বৌ মেয়ে সকলে নববধূ দেখিয়া গেল। কলিকাতায় পোনা-মাছই বিশেষ চল, অতএব সুরেশ পোনামাছের উদ্দেশ্যে হাটে ছুটিল। বড়-বৌ কখন চা খাওয়া অভ্যাস, কখন স্নান করা অভ্যাস, সব জানিয়া লইল এই স্নেহের কোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া রমেশ গর্ব্বে হর্ষে প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিল; কিন্তু রেবা তাহার সংস্কৃতি শিক্ষা লইয়া যেন কেমন হাঁপাইয়া উঠিল।

দিন দশেক পরে—

স্নানের ঘাটে চাটুয্যে-গৃহিণী বড়-বৌকে ডাকিয়া বলিলেন,—বড়-বৌ, তোমার দেওর জা'র কেমন মিল-মিশ হ'ল, সে কিছু জান্‌লে ?

বড়-বৌ জানিত, চাটুয্যে-গৃহিণীর আড়ি পাতিয়া দাম্পত্য-জীবন উপভোগ করার বাতিকটা একটু বেশী। সে বলিল,—না, দিদি, তুমি না এলে একা আমি ও সব পারি না।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আজ একটু আস্‌বো, বি, এ, পড়া বৌ অন্ততঃ কেমন ক'রে বরের সঙ্গে কথা বলে, সেটাও ত জানা দরকার। আজ কাল কেমন হ'য়েছে—

রাত্রি ১০টায় রান্না খাওয়া শেষ করিয়া চাটুয্যে-গৃহিণী আসিলেন, দুই জনে দালানের দুইটি জানালার ছিদ্রকে অবলম্বন করিয়া নিরুদ্ধনিশ্বাসে দাঁড়াইলেন।

রেবা কি একখানা বই পড়িতেছিল, রমেশ চেয়ারে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল। রেবা বলিল,—চিঠি লেখা হ'ল ?

—হ্যাঁ, কেন ? তোমার দাদার কাছে চিঠি দেবে না কি ?

—না, যদি কিছু মনে না কর, তবে একটা কথা বলি,—

—কি বল না, অত ভূমিকা কেন ?

—বলছিলুম, বন্ধের পরে তুমি আমাকে এখানে রেখে যাবে ?

—হ্যাঁ।

—এ জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না মোটেই। লোক-গুলো কেমন অসভ্য, মানে uncultered, rugged মত। এ সংসর্গে আমি থাকতে পারবো না। এদের আদর-যত্নও যেন আমার কাছে বিশ্রী বলে মনে হয়।

রমেশ ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার কাছে ত তেমন মনে হয় না।

—না, আমাকে হয় ক'লকাতায় রেখে যাও, না হয় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল, এখানে আমি থাক্‌তে পারবো না। এই বিশ্রী অসভ্য atmosphereএ মানুষ বাস করতে পারে ?

—তা কখনই হয় না, তুমি জানো, দাদা তাঁর জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন। তিনি যখন বলেছেন, বড়দিন পর্য্যন্ত তোমাকে এখানে থাক্‌তে, তখন সে তোমাকে থাকতেই হবে—

রেবা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, রমেশ কিসের একটা শব্দ পাইয়া জানালার নিকট উঠিয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে দুইটি ছায়ামূর্ত্তি জানালা হইতে সরিয়া দূরের অন্ধকারে মিশিয়া গেল। রমেশ সবই বুঝিল, কিছুই না বলিয়া সে চুপ করিয়া পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিল।

বড়-বৌ নিজের ঘরে আসিয়াই শয্যাগ্রহণ করিল দেখিয়া সুরেশ বলিল,—কি, শরীর খারাপ না কি ? এসেই যে শুয়ে পড়লে !

বড়-বৌ কথা বলিল না। সুরেশ পুনরায় প্রশ্ন করিলে সংক্ষেপে জানাইল, না।

—তবে কি হ'ল ?

বড়-বৌ উঠিয়া বসিলে সুরেশ দেখিল, তাহার চোখের কোণ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার শুষ্ক রেখা তখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ! সুরেশ বলিল,—কি হ'য়েছে আমার কাছে বল—

—সে কথা তোমার না জানাই ভাল !

কিন্তু যাহা না জানাই ভাল, তাহা জানিবার জন্য মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। বড়-বৌ যে কথা স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছিল, দুই ফোঁটা অশ্রুসহ তাহা স্বামীকে জানাইল। জীবনের সুখস্বপ্ন, সারা জীবনের সুকঠোর দারিদ্র্যের সাধনা, এক নিমেষে একটি মাত্র কথায় একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। এই দুঃখের সান্ত্বনা নাই, সুরেশ ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া থাকিয়া বলিল,—দুঃখের কিছু নাই, বড়-বৌ। আমাদের জীবন ত শেষ ক'রে এনেছি। ওরা সুখী হোক, বড় হোক, এই কামনা করেই না আমরা এ দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করেছিলাম, ওরা সুখী হয়েছে, সেই যথেষ্ট।

এ সান্ত্বনা-বাক্যে বড়-বৌ কোনই সান্ত্বনা পাইল না, স্বামীর শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ, উদাস নিষ্প্রভ চোখদুটির দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত অশ্রু উৎসারিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সুরেশ এক মনে গুড়গুড়ি টানিয়া ঘরখানাকে ধূমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

রমেশ কাল বাড়ী হইতে কর্ম্মস্থানে যাইবে—

সুরেশ তাহাকে ডাকিয়া লইয়া বলিল,—রমেশ, এখন ত গ্রামে খুবই ম্যালেরিয়া হবে, তা ছাড়া এ গ্রামে থাক্‌তে বৌমার নানা অসুবিধা হওয়াই স্বাভাবিক, তুমি তাঁকে নিয়ে যাও। যদি সেখানে কোন অসুবিধে হয়, না হয় ক'লকাতায়ই রেখে যাও—

রমেশ অবনত মস্তকে মাটীর দিকে চাহিয়া ভাবিল, সেই অশুভ মুহূর্ত্তের কথাটা হয় ত দাদার কাণেও উঠিয়াছে। একদিন যাহাকে আনিবার জন্য ইঁহারা এত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, আজ তাহাকেই বিদায় করিয়া দিবেন কেন ? দাদার সম্মুখে লজ্জায়, কুণ্ঠায়, রমেশের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

তাহার দাদার সারা জীবনের এই স্বপ্নকে আজ সে এক নিমেষেই সাহারার শূন্যতায় ভরিয়া দিল!

সুরেশ বলিল,—বিদেশে তোমাকেও ত সম্মান বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে? আচ্ছা এখন থাক্, বৌমাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আমাকে জানিও—

রমেশ অতি মৃদু পাদক্ষেপে নিজের ঘরে আসিয়া ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। রেবা বলিল,—কি হয়েছে, অমন ক'রে রইলে যে!

রমেশ রেবার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—তুমি আমাকে সকলের চোখে কত ছোট করে দিয়েছ, তা যদি জান্‌তে! যাই হোক, বড়দিন পর্য্যন্ত তোমাকে এখানেই থাক্‌তে হবে!

রেবা সবই জানিত; ভাসুরের কানে এ কথা উঠিবে। শঙ্কায় সে মনে মনে লজ্জিতও হইয়াছিল; কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। রেবা প্রতিবাদ করিল না বটে, কিন্তু দুইটি মাস এখানে বাস করিতে হইবে ভাবিয়া সে একটু অস্বস্তি অনুভব করিল।

অগ্রহায়ণের সকাল। পূব আকাশে কিছু আগে সূর্য্য উঠিয়াছে, উষ্ণ রৌদ্রে সমস্ত উঠানের শিশির শুকাইয়া গিয়াছে। রেবা একখানা বই খুলিয়া বসিয়া উঠানের পানেই চাহিয়াছিল—

চা, স্নানের গরম জল, পড়িবার নভেল, কিছুরই অভাব নাই। নিয়মিত সময়ে সকলই আসে, কিন্তু সে বিরক্ত হইবে বলিয়া ভোলা, বাদল কেহই আসে না। সুরেশের হুকুম, বৌমার যেন কোন অসুবিধা না হয়। জীবন একান্তই নিঃসঙ্গ, তাহার উপভোগ্য কিছু নাই—একটা কিছুকে অবলম্বন করিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

দিগম্বর ভোলা তাহার বিড়ালের ছানার কাণ ধরিয়া লেজ ধরিয়া, পাঁচ সাতবার সমস্ত উঠান চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে তাহাকে ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে শোয়াইয়া দিল। কিন্তু শিশু বিড়ালটির ঘুমাইবার আগ্রহ আদৌ নাই, সে বার বার উঠিয়া যাইতে লাগিল। ভোলা তাহার ঘাড় ধরিয়া একখানা 'দাথি' সন্ধান করিয়া বাহির করিতেই সে নিরীহ জানোয়ারটি আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া প্রস্থান করিল।

রেবা চাহিয়া চাহিয়া আনমনে হাসিতেছিল, শিশুর এই সরলতার মধ্যে উপভোগ্য বস্তু যেন কি পাইয়াছে!

বাদলা চুপি চুপি ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, কাকীমা, রস খাবে, খেজুর রস, এই নাও—

গ্লাসটি টেবলে রাখিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে বলিল,—চট্ ক'রে নাও—

রেবা বলিল—ও আমার ভাল লাগে না। ও আমি খাই না,—

—মিষ্টি গুড়, খুব সুন্দর রস, ওই পুকুর পাড়ের বাঁকা গাছটার—

রেবা বাদলের আগ্রহে হাসিয়া ফেলিল। বাদল আবার পিছনে চাহিয়া বলিল,—ক'লকাতায় রস পাওয়া যায়, এঁ্যা কাকীমা?

—যায়, খুব মিষ্টি রস—

অকস্মাৎ সুরেশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাদল ভোজবাজীর মত অন্তর্হিত হইয়া গেল। রেবা মনে মনে দুঃখিত হইল। বাদল বা ভোলা তাহার নিকট আসিলে সে'ত সত্যই বিরক্ত হয় না। বরং বাদলের এই শত দুষ্টামির মধ্যে আনন্দই পাইয়াছে। কিন্তু সে কেমন করিয়া আজ তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইবে?

বাদলের প্রস্থানের কিছু পরেই উদ্যত যষ্টি স্কন্ধে ভোলা তাহার 'বেলি'র সন্ধানে গৃহে প্রবেশ করিল। খাটের নীচে, বাক্সের তলা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সে নিঃশব্দে কাকীমার নিকটে আসিয়া বলিল,—কাক্‌কী, বেলি?

রেবা বলিল,—বেলি? কই, নেই ত,—

ভোলা রেবার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল,—তুমি কাক্‌কী?

—হ্যাঁ, কাক্‌কী।

ভোলা তাহার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রেবার মুখখানা আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া উদ্যত যষ্টি দেখাইয়া বলিল,—'দাতি'—

বড়বৌ ডাকিলেন,—ভোলা, ভোলা—

ভোলা ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল।

ভোলা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার বিস্ফারিত চোখের সেই কৌতূহলী চাহনি রেবার অন্তরকে আহত করিয়া গেল।

এই ক্ষুদ্র শিশু! এও যেন আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না!

সন্ধ্যার রক্তিম আলোয় বসিয়া রেবা দূরের শুভ্রমেঘশ্রেণীর পানে চাহিয়াছিল। পিঠে একটি মৃদু স্পর্শ পাইয়া ফিরিয়া দেখে, বাদল বগলে কতকগুলি মটরশুটির গাছ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাদল বলিল, কাকীমা, মটরশুটি খাবে? মাঘীমটর খুব মিষ্টি,—

রেবা বলিল,—বস এখানে, কোথায় পেলে?

বাদল বীরগর্ব্বে বলিল,—ওই খালের ওপারে, এমন লুকিয়ে আনলুম।

বাদলের এই স্নেহের দানকে রেবা আজ উপেক্ষা করিতে পারিল না। রেবা একটা শুটি ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল,—তুমি পরীক্ষার পড়া পড়ছো না?

—হুঁ, খুব মুখস্থ। আচ্ছা, কাকীমা, কলকাতায় কইমাছ পাওয়া যায়?

—যায়, তবে ভাল না।

—চক্কোত্তিদের পুকুরের কই মাছ, এই এত বড় এক একটা। বাদল তাহার হাতের সাহায্যে কই মাছের দৈর্ঘ্য একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই দেখাইয়া দিল।

—যাও, অত বড় কই মাছ হয়?

—হয়, তুমি জানো না, আচ্ছা দাঁড়াও, বোলতার বাসা ভেঙ্গে, তার টোপ্ দিয়ে ধ'রে দেখাবো, হ'লদে টুকটুকে কই—তুমি কই মাছ খাও?

—হুঁ, কই মাছ আবার না খায় কে?

- মা বঁড়শীর মাছ খায় না!

অকস্মাৎ বড়বৌকে দেখিয়া সমস্ত মটরশুটি বগলে করিয়া বাদল দ্রুত চলিয়া গেল। পরীক্ষার পড়া তাহার কাছে আসিয়া পড়িতে বলিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু বাদলের কইমাছের গল্পের ভিতর সে প্রশ্ন সে করিয়া উঠিতে পারে নাই। বাদল যে এত অকস্মাৎ চলিয়া যাইবে, তাহা কে ভাবিয়াছে?

সন্ধ্যার পর বারান্দায় একটা আলোয়ান গায়ে দিয়া বাদল তারস্বরে পরীক্ষার পড়া পড়িতেছিল,—অ-কারের পর অ কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়—

বাদল অকস্মাৎ চুপ করিল। পর মুহূর্ত্তেই সে রেবার নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিল,—ট্রামগাড়ী কেমন? তুমি চড়েছ—

—হ্যাঁ,—

—বিদ্যুতে চলে, না? বিদ্যুৎ কেমন দেখেছ?

—বিদ্যুৎ কি দেখা যায়?

—কেন? আচ্ছা, হাওড়ার পুল দেখেছ—

বড়বৌ রান্নাঘর হইতে বলিলেন,—বাদলা, ঘুমুলি বুঝি?

বাদল এক ছুটে বারান্দায় যাইয়া তারস্বরে আরম্ভ করিল,—যে দুই বৃহৎ ভূখণ্ডকে এক সংকীর্ণ—

—কোথায় গিয়েছিলে?

—বই আনলুম ঘর থেকে।

বড়বৌ চুপ করিলেন।

রেবা ভাবিয়া পাইল না, বাদল এমন করিয়া মিথ্যা কথা বলিল কেন? তাহার কাছে আসাটাকে এই শিশু অপরাধ বলিয়া মনে করিল কি করিয়া। ইহার পশ্চাতে যাহারই শিক্ষা থাকুক, সে শিক্ষা যে অহেতুক, তাহা তাহারা বুঝিল না কেন?

পরদিন দুপুরের পরে উঠানের ধারে ধারে ছায়া পড়িয়া আসিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া রেবা হিসাব করিতেছিল, বড় দিনের আর কত বাকী আছে। হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাদল উঠানের ধূলার মধ্যে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। যন্ত্রণায় সে কাটা কবুতরের মত ছট্ ফট্ করিতেছে। এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাতের মুঠির মধ্যে সে বোলতার বাসাটিকে যত্নে ধরিয়া আছে।

সুরেশ, বড়বৌ সকলে ছুটিয়া আসিলেন। বাদলের সমস্ত শরীর বোলতার দংশনে ফুলিয়া উঠিয়াছে। বড়বৌ ক্রোধে দুঃখে বলিয়া উঠিলেন, লক্ষীছাড়া ছেলে, বোলতার বাসা তোকে কে ভাঙতে বলেছে, ফেলে দে ফেলে দে, এখনো কত বোলতা রয়েছে—

সুরেশ বোলতার বাসা ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিল। বাদল সজোরে সেটাকে ধরিয়া বলিল,—তোমার পায়ে পড়ি, বাবা, বাসাখানা নিও না!

—তোর ভয় নেই, ফেলবো না আমি, রেখে দিচ্ছি।

বাদল বাসা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—ফেলো না, বাবা, ওর জন্যে আমি কুড়িটা কামড় খেয়েছি।

রেবা রুদ্ধ নিশ্বাসে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সবই দেখিতেছিল। কি কুক্ষণে বাদলের সঙ্গে সে কই মাছের আলোচনা করিয়াছিল! তাহাকে সুখী করিবে বলিয়া, তাহাকে আনন্দ দিবে বলিয়া ওই শিশু আজ অতি সঙ্গোপনে বোলতার বাসা ভাঙ্গিতে গিয়াছে! রেবার চোখ দুইটি ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পরে বাদলের বেশ জ্বর লইল।

সুরেশ কিছু কুইনাইন দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেও সানাইল না। বাদলকে কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পরে বাদল ঘুমাইয়াছে মনে করিয়া বড়-বৌ রান্না ঘরে গেলেন। কক্ষান্তরে রেবা বার বার নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। কেমন করিয়া সে আজ এই অপরাধের কথা স্বীকার করিবে! যদি সে তখন বারণ করিত, তবে হয় ত এই দুর্ঘটনাটা হইতে পারিত না।

রেবা সহসা চাহিয়া দেখিল—নিঃশব্দে বাদলা তাহার অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেবা বলিল,—বাদল, তুমি—

বাদল রেবার মুখ চাপিয়া ধরিল। বাদলের হাত অত্যন্ত উষ্ণ, রেবা হাত ধরিয়া বলিল,—উঃ, তোমার এত জ্বর হ'য়েছে, তুমি উঠে এসেছ!

—আঃ, আস্তে কথা বল না, মা শুন্‌লে ব'কবে।

রেবা মৃদু কণ্ঠে বলিল,—কেন?

বাদল গর্ব্বের সঙ্গে বলিল, কাল দেখো এত বড় কই মাছ ধ'রে আনবো—

থাক্, তোমাকে আর কই মাছ ধরতে হবে না।

বাদল ম্লান হাসিয়া বলিল,—বোলতায় কামড়েছে, ও রকম কত কামড়ায়। ওই রতন বেটা তুক তাক ক'রেছে, নইলে কখনই কামড়াতো না। ও কিছু না, সব কাল সেরে যাবে—

—না লক্ষীটি, তুমি শোবে চল, সেখানে আমি সব শুন্‌বো। কলকাতার গল্প বলবো চল, এত জ্বর নিয়ে কি ঘুরে বেড়ায়—

বাদল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—তুমি যাবে?

বাদলের এই বিস্মিত চাহনি যেন শত কষাঘাতের লাঞ্ছনা লইয়া তাহার অন্তরকে আঘাত করিল। এই শিশু, যে তাহার জন্য নির্ব্বিবাদে এত বড় দুঃখ সহ্য করিয়াছে, সে তাহার স্নেহে, সেবায় বিশ্বাস করে না, এত বড় তিরস্কার সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে!

বাদলকে তাহার বিছানায় শোয়াইয়া রেবা শিয়রের পাখাখানা হাতে তুলিয়া লইল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাদল জিজ্ঞাসা করিল,—মা বক্‌বে না?

—না, তুমি ঘুমাও।

বড়-বৌ লণ্ঠন লইয়া পুত্রকে আর একবার দেখিতে আসিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—রেবা, তুমি? অন্ধকারে বসে—

রেবা লজ্জানত মাথা না তুলিয়াই বলিল,—হ্যাঁ, আমি।

বড়-বৌ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

বড়দিনের বন্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে—

রমেশ সস্ত্রীক কর্ম্মস্থলে যাইবে। নদীতীরে নৌকা বাঁধা রহিয়াছে,—

বাদল, ভোলা, বড় বৌ, সুরেশ সকলেই তাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিতে ঘাটে আসিয়াছে। জিনিষ-পত্র সব পূর্ব্বেই গোছাইয়া তোলা হইয়াছে। সুরেশ রমেশের উদ্দেশ্যে বলিল,—রমেশ, বিদেশে হিসেব ক'রে চ'লো। আমার জন্যে ভেবো না, তোমাদের যেন কষ্ট হয় না। একটু বাজে খরচও সম্মানের জন্যে দরকার হয়, তাতে ত্রুটি ক'রো আমাকে টাকা পাঠিও না। বৌমার ঘাড়ে সব বোঝা দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না, একটা বিশ্বাসী ঝি রেখে দিও—

রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—আচ্ছা—

—হ্যাঁ, আর চাকর-টাকর যা রাখো, একটু ভালো দেখে রেখো, টাকা-পয়সা সাবধানে রাখবে। আজকাল চাকরগুলো ত ফাঁক পেলেই চুরি ক'রে পালায়—

রমেশ প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিতে যাইতেছিল, সহসা সুরেশ বলিল,—বৌমা, তোমাকে একটি কথা আমার বলবার আছে। তুমি হয় ত জানো না, এ জীবনে কত কষ্টে রমেশকে আমি মানুষ করেছি। তোমরা সুখী হও, সেই আমি কেবল কামনা করছি।

সুরেশের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে কথা সমাপ্ত করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া গেল। ক্ষণেক পরে

গলাটাকে সংযত এবং পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল,—তোমরা সুখে আছ জান্‌লেই আমি সুখী। তবে এবার কত কষ্ট পেয়ে গেলে, আর একটিবার এখানে এসো, আর একবার তোমাকে একটু—

সুরেশ পুনরায় বাক্য হারাইয়া চুপ করিল। উচ্ছ্বসিত ব্যর্থতার ক্রন্দন তাহার কণ্ঠের অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে যেন চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সে বাধা-বন্ধন ঠেলিয়া ফেলিয়া সুরেশ বলিল, রমেশ, আর একবার বৌমাকে আনিস্—

রেবা বড়-বৌকে প্রণাম করিয়া সুরেশের পায়ের অদূরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশ বলিল, থাক্ থাক্ বৌমা, তুমি চির আয়ুষ্মতী হও—

রেবা সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কবে আমাকে আন্‌বেন?

সুরেশের অশ্রুপূর্ণ চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু নামিয়া আসিল, শত চেষ্টা করিয়াও সে কহিতে পারিল না যে, সে অবশ্যই তাহাকে আনিবে।

নৌকা ধীরে ধীরে চলিয়াছে—

তীরে দাঁড়াইয়া বাদল কোঁচার খুঁটে ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে। সুরেশ ঝাপসা দৃষ্টির ভিতর দিয়াও স্পষ্ট দেখিল, পান্‌সী-নৌকার জানালার ফাঁকে, সলজ্জ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে, দুইটি সজল আঁখি তীরে রোরুদ্যমান বাদলের পানে চাহিয়া আছে—

রেবা তীরের উদ্দেশ্যে মনে মনে নমস্কার জানাইয়া ভাবিল,—যে অন্তরকে সে অজ্ঞাতে অপমান করিয়াছে, সেই অন্তরকে যেন সে দ্বিগুণ সম্মানে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারে।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম, এ)।

আঁখি ও প্রাণ

প্রাণেতে প্রেমের রূপ, নয়নে আকাশ,
দুই রূপে বিশ্বমাঝে হয়েছি প্রকাশ।
ধরাতলে প্রাণ চায় দিয়ে আলিঙ্গন
সবারে-বাসিতে ভাল করিয়া আপন।

নয়ন চাহিছে সদা আকাশের আলো,
চন্দ্র সূর্য্য তার যেন লাগিয়াছে ভালো।
ছিন্ন যার বুকখানি বিরহ-ব্যথায়,
প্রেমিক পরাণ তারে সোহাগ জানায়।

নভতারা লাগি কাঁদে নয়নের মণি,
ধ্বনি সে যে খোঁজে নিত্য তারি প্রতিধ্বনি।
নিদারুণ বেদনার তপ্ত অশ্রুজল—
তাহাই মুছায়ে প্রাণ হয় সমুজ্জ্বল।

আঁখি চায় নীলাম্বরে বাঁধিবারে বাসা,
ধরণীতে খোঁজে প্রাণ পীড়িতের ভাষা,
পরাণে জন্মিয়া প্রেম, ঐশ্বর্য্য নয়নে,
আমি যে গো আছি বাঁধা আকাশে ভুবনে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম, এ)

প্রাচীন যুগের ভোজনবিলাস

শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার অপরূপ রসময় জাতীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য বাঙ্গালীকে হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই চরিত্রের হেতুর অনুসন্ধান করিতে গেলে বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালীর খাদ্যব্যবস্থার ইতিহাস ও প্রকৃতিকেও অবহেলা করা চলে না। বাঙ্গালাদেশে খাদ্যের যে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে, এমন কি, জগতের অন্যান্য দেশেও বিরল। ভারতবর্ষের বহু স্থানেই দেখা যায় যে, সে স্থানের অধিকাংশ হয় নিরামিষাশী আর না হয় অধিকাংশ আমিষাশী, কিন্তু একমাত্র বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ আমিষ ও নিরামিষ - এই মিশ্র আহারের পক্ষপাতী। শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৎস্যভোজন ভারতের অন্যান্য দেশে নিষিদ্ধ হইলেও নদীমাতৃক বঙ্গদেশে তাহা নিষিদ্ধ নহে। বাঙ্গালীর আহার নিরামিষপ্রধান হইলেও বাঙ্গালী আমিষ—বিশেষতঃ মৎস্যভোজনে পরাঙ্মুখ নহে। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাবে বাঙ্গালীকে মৎস্যভোজনে বিরত করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালায় বিবিধ উৎকৃষ্ট শাকসব্জী জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য দেশে শাক বলিতে নিরামিষ তরকারী মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু বাঙ্গলাদেশের 'শাকই' বিশুদ্ধ শাক নামের উপযুক্ত। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালাদেশে গৃহিনীরা এবং চিকিৎসকগণ নানাপ্রকার শাকভোজনের ব্যবস্থা দান করিয়া গিয়াছেন। লাউশাক, কুমড়াশাক, পুঁইশাক, বাস্তুকশাক, কলমীশাক, শুসুনীশাক, লালশাক, পালঙশাক, ছোলাশাক, কলাইশাক, মেথিশাক, মোচা এই সকল সুস্বাদু শাক ব্যতীত থুলকুড়ি (মণ্ডুকপর্ণী), ব্রাহ্মী, পলতা, সরিষা, পাটশাক (নালুতে), ধনেশাক, হিঞ্চেশাক, কচুশাক, ওলশাক, ডাঁটাশাক, নটেশাক, শ্বেতপুনর্নবা (শেফুনে) শাক, সজনেশাক, গিমেশাক, আমরুলশাক, মুলাশাক প্রমুখ নানাবিধ শাক অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালীর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদমতে এই সকল শাকের গুণাবলী বর্ণনা করিতে গেলে তাহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালীর খাদ্যব্যবস্থার একটি ইতিহাস সংগ্রহ করিবার চেষ্টা মাত্র করিব।

শাক ব্যতীত তরকারীপর্য্যায়ে বাঙ্গালাদেশে বিলাতী আলু, পটোল, শাঁক্ আলু, মেটে আলু, ঝিঙে, ডুমুর, ওল, পেঁপে, কচু, কচুরমুখী, মানকচু, সীম, বেগুন, কাঁচাকলা, উচ্ছে, কাঁকরোল, কাঁকুড়, কুমড়া, মিঠাকুমড়া, ঢ্যাড়শ, মূলা, বিলাতী লাউ, কাঁঠাল, শশা, ক্ষীরাই, চিচিঙ্গে প্রমুখ নানাবিধ তরকারী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই শাক ও তরকারীর সাহায্যেই প্রধানতঃ বাঙ্গালীর ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, বাঙ্গালার গৃহে নানাবিধ ডালেরও নিয়মিত ভাবে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ডালের মধ্যে মুদ্গ বা মুগের ডাল অতি প্রাচীনকাল হইতেই অতি প্রিয় খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বকালে মুগ বলিতে বাঙ্গালায় সোণামুগই বুঝাইত। এখন বাঙ্গালায় সোণামুগ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি সোণামুগ ডালবর্গের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এখন মুগের ডালের মধ্যে কৃষ্ণমুগ, রক্তমুগ, বিড়িমুগ, ঘোড়ামুগ—ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। উপকারিতায় ও উপাদেয়তায় ইহার কোনটিই সোণামুগের সমান নহে।

পশ্চিমবঙ্গে মুগের পরই কলাইয়ের ডাল—এই কলাইয়ের ডাল দেশভেদে ঠিকরি, বিড়ি ও অন্যান্য নাম ধারণ করিয়াছে। মাষকলাইও বাঙ্গালাদেশে বিশেষরূপে সমাদৃত।

সাধারণ ডাল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বড় মটরের ডাল প্রচলিত। পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের কোন কোনও স্থলে ছোট মটরের ডালের খুব প্রচলন দেখা যায়। এই সকল ডালের পর মসুরের ডাল—তন্মধ্যে বরিশালের ও বীরভূমের মসুর বিশেষরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বীরভূমের 'ভাণ্ডীরবন' নামক স্থানে মসুরের ডালের দ্বারা শ্রীশ্রীগোপালের ভোগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যতি ব্রহ্মচারী সাধু সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ও বিধবাগণ মসুর ডাল আহার করেন না। এই সকল ডাল ভিন্ন—ছোলা, অড়হর,

কুলত্থ, খেসারি প্রভৃতি ডালও বাঙ্গালায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

মাখন, ঘৃত, দধি, ঘোল, দুগ্ধ, ক্ষীর, রাবড়ী, ছানা—এই সকল দুগ্ধজ খাদ্য ও শর্করা সহযোগে বাঙ্গালাদেশে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধুনা ময়দা আটা সুজি প্রভৃতির সহযোগেও নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতেছে।

সংক্ষেপে ইহাই নিরামিষ খাদ্যের উপকরণ। আমরা ষোড়শ শতাব্দীর সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নানাবিধ নিরামিষ খাদ্যের বিবরণ দেখিতে পাই। যথা—

মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিগে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ।
বাস্তুক-শাক-পাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ী মানকচু আর॥
চই-মরিচ, সুক্তা দিয়া সব ফলমূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেলশস্য ছানা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥
* * * *
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥
সঘৃত পায়স নব-মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
* * * *
দুগ্ধ চিড়া কলা আর দুগ্ধ লকলকি। ইত্যাদি—
—মধ্য। ৩য় পরিচ্ছেদ

ইহা শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের গৃহের খাদ্য-তালিকা। পরম প্রিয়তম শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনে আচার্য্য তাঁহাকে অতি সমাদরে এই সকল খাদ্যে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। ইহার মধ্যে মুদ্গসূপ—আমাদের সুপরিচিত সোণা মুগের ডাল। বাস্তুকশাক বা বেথো শাকের নানাপ্রকার ব্যঞ্জনও পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত। কুষ্মাণ্ডবড়ী, ও মানকচু রাঢ়দেশে ও পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র সমাদরের বস্তু হইলেও চই আজকাল খুলনা ও যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রমুখ স্থানে যেরূপ সুপরিচিত, পশ্চিমবঙ্গে ও রাঢ়দেশে তাদৃশ পরিচিত নহে। পশ্চিমবঙ্গের কবিরাজ মহাশয়রা 'চন্দ্রামৃতরস' প্রস্তুত করিবার জন্য বাজার হইতে চব্য নামে একরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। রন্ধনে যে 'চই' বা 'চব্য' ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর। সুক্ত এখনও বাঙ্গালীর গৃহে সমাদৃত, গৃহলক্ষ্মীরা কুমড়ার, ডুমুরের, পেপের ও বেগুনের সহিত নানাপ্রকার তিক্ত দ্রব্য মিশাইয়া এখনও পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে নানারূপ সুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তিক্ত-ঝাল যে 'অমৃতনিন্দক' হইতে পারে, তাহা বোধ হয় অন্নপূর্ণার কৃপায় বাঙ্গালীর ঘরের অনেক বৃদ্ধা গৃহলক্ষ্মী এখনও ভুলিতে পারেন নাই; তবে যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আর ২৫ বৎসর পরে উহা গবেষণার বিষয়ে পরিণত হইবে। "কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী" কচি নিমপাতা দিয়া নিম্‌বেগুন। পটোল ভাজা ত' সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ফুলবড়ী ভাজা, কুষ্মাণ্ড ভাজা ও মানচাকী (মানকচুর ক্ষুদ্র চক্রবৎ খণ্ড) এখনও বহু স্থানে চলিয়া থাকে। নারিকেলশস্যও ছানার সহিত শর্করা যোগে নানাবিধ সুখাদ্য ও পিষ্টক এখনও বাঙ্গালার গৃহিণীগণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মোচা-ঘণ্ট অনেকে চিনিলেও দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড এখন অনেকে চিনিতে পারিবেন না। ইহা মিষ্টান্ন নহে; দুগ্ধ সহযোগে কচি কুষ্মাণ্ডের ঘণ্টই দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গ্রন্থকার মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীরও গ্রন্থ লিখিবার কাল ১৪৯০ শক বা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী। উহাতে মহাদেব জগন্মাতা গৌরীকে রন্ধন করিবার যে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহাতেও ঐ কালের নিরামিষ ব্যঞ্জনের একটি তালিকা পাওয়া যায়; যথা—

আজি গৌরি! রাঁন্ধিয়া দিবেক মনোমত।
নিম শিম বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুষ্মাণ্ড বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
ঘৃতে ভাজি শফ্রাতে ফেলহ ফুলবড়ি।
চোয়া চোয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি॥
রান্ধিবে ছোলার ডাল তাতে দিবে খণ্ড।
আলস্য ত্যজিয়া জ্বাল দিবে দুই দণ্ড॥
রান্ধিবে মসুর সূপ দিয়া লঘু জ্বাল।
সাম্ভালিয়া দিবে তথি মরিচের ঝাল॥
নটিয়া কাঁঠাল-বীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃত সম্ভরিয়া দিবে জামিরের রস॥
কড়ই করিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া করহ দড়পাক॥
রান্ধিবে মুগের সূপ দিয়া ডাবজল।
খণ্ডে মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জের ফল॥
আমড়া সংযোগে গৌরি! রান্ধহ পালঙ্ক।

বাঙ্গালাদেশে সুক্তা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভাব-প্রকাশে ও অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গদেশেই তাহা অবিকৃতভাবে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এক একটি তরকারী বা শাক দিয়া এক একটি ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে সমজাতীয় তরকারীর মিশ্রণে যে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা এক দিকে যেমন রসনার তৃপ্তিকর, অন্য দিকে তেমনই স্বাস্থ্যকর। বাঙ্গালা দেশে ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃতসিক্ত অন্নের ব্যবহার ও সুক্তা ব্যবহারের প্রথা সর্ব্বাংশে স্বাস্থ্যকর ও রুচিকর। কুষ্মাণ্ড ও বেগুনের সহিত নিম, পলতা, উচ্ছে বা নালিতা মিশাইয়া যে সুক্ত পাচিত হয়, তাহাতে শিমও মিশ্রিত হইয়া থাকে। ইহাতে শিমের যে সকল দোষ আছে, তাহা অপগত হয়। ডুমুর, মূলা, বেতের কচি অগ্রভাগও সুক্তাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল সিদ্ধ করিয়া মৃদু জ্বালে পাচিত ডাল সহজপাচ্য, সুস্বাদ ও পুষ্টিকর হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গ্রন্থকার ডাল রান্ধিবার নিয়মের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"আলস্য ত্যজিয়া জ্বাল দিবে দুই দণ্ড" "রান্ধিবে মসুর সূপ দিয়া লঘু জ্বাল" এই কথায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে। কটুতৈলে বা সরিষার তৈলে বথুয়া বা বাস্তূক শাক রন্ধন—বঙ্গদেশের রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিতে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিরামিষ রন্ধনের একটি সুবিস্তৃত তালিকা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধার করিতেছি। উহাতে গৌড় দেশের ও উৎকলের যে সকল রন্ধন তাৎকালিক বাঙ্গালা মাত্রেরই প্রিয় ছিল, তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার খ্যাতনামা বাসুদেব সার্ব্বভৌম উৎকলের স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজসভার প্রধান পণ্ডিতরূপে বৃত হইয়া তখন পুরীধামে বাস করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তিনি যখন অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তখন তিনি পুরীতে স্বগৃহে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে যে উপাদেয় খাদ্য তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তাহাই উদ্ধার করিতেছি।

পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিগে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল॥

*   *   *

দশ প্রকার শাক, নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া বড়ী ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট, মোচভাজা, বিবিধ শাকরা॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ার ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥
নবনিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী, পটোলভাজা, কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভৃষ্টমাষ, মুদ্গসূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি, অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া, কলা বড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী, নারিকেল পুলী আর যত পিষ্ট॥
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য। ১৫

এই ভক্ষ্যতালিকায় আমরা দেখিতে পাই :—

১। বিশুদ্ধ গব্যঘৃতসিক্ত উৎকৃষ্ট আতপ চাউলের অন্ন।

২। দশ প্রকার শাক—ইহার মধ্যে বাস্তূক ও হিঞ্চে বর্ত্তমান।

৩। নিম্বপত্রসহ পাচিত সুকুতা।

৪। মরিচের ঝাল—সম্ভবতঃ ইহা মুগডালের বড়া ও পটোলাদি তরকারী সহযোগে পাচিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবরা বর্ত্তমানে উহাকে "রসা" আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন।

৫। ছানার বড়া করিয়া তৎসঙ্গে মুগের বা মাষকলাইয়ের বড়ী দিয়া ঘোল সহযোগে পাচিত। বর্ত্তমানে ছানার কালিয়া ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

৬। দুগ্ধতুম্বী—কচি লাউ খুব কুচাইয়া তাহাকে দুগ্ধ-সহকারে ও মরিচের ঝাল সহকারে পাচিত ব্যঞ্জন। বর্ত্তমানে দধি ও সরিষা সংযোগে কচি লাউয়ের ল্যাওতা ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

৭। দুগ্ধকুষ্মাণ্ড—ইহার কথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে।

৮। বেসার, লাফরা—এই দুইটি উৎকলের ব্যঞ্জন। লাফরা এখনও শ্রীজগন্নাথদেবের একটি মিশ্র তরকারীর ব্যঞ্জনরূপে পরিচিত।

৯। মোচাঘণ্ট—কচি মোচা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে নারিকেল, দুগ্ধ ও ছোলা ভিজা দিয়া এই তরকারিটি পাচিত হইয়া থাকে।

১০। মোচা ভাজা—মোচা সিদ্ধ করিয়া বেশমের সহিত তাহা ভাজিয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

১১। বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন—কুমড়াবড়ী বা কুষ্মাণ্ড বড়ী বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব। ইহা সাচী কুমড়া কুচাইয়া তাহার সারভাগের সহিত ডাল বাটিয়া, হিঙ্গ, কর্পূর, দারুচিনি, এলাইচ ইত্যাদি নানাবিধ মসলা সহযোগে খুব বড় বড় করিয়া প্রস্তুত হয়। সাধারণ বড়ী ও ফুলবড়ী অপেক্ষা আকারে বড় হয় বলিয়া ইহাকে "বৃদ্ধ" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। জিরামরিচাদি সহযোগে ইহার যে ঝোল প্রস্তুত হয়, তাহা একদিকে যেমন পিত্তশ্লেষ্মাপ্রশমক—অপর দিকে তেমনই রুচিকর।

১২। নবনিম্বপত্র সহ ভৃষ্ট বার্ত্তাকী—কচি নিমপাতার সহিত ছোট ছোট করিয়া বেগুন ভাজা। বর্ত্তমানে ইহা "নিমবেগুন" নামে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তবে এই সকল তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য ব্যঞ্জন খাইবার পূর্ব্বেই খাওয়া হইয়া থাকে।

১৩। ফুলবড়ী, পটোল ভাজা, কুষ্মাণ্ড, মানচাকী—এই চারিটি দ্রব্য ভাজা-পর্য্যায়ভুক্ত। কচি কুষ্মাণ্ড ভাজা এখনও বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মানকচু জিরার মত ছোট ছোট করিয়া ভাজা অতি উপাদেয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে তাহা প্রচলিত। খুব পাতলা করিয়া মানকচু ছোট ছোট চক্রাকারে পরিণত করিয়া ঈষৎ মিষ্ট দিয়া বেশমে ভাজিলে তাহাও অতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

ভৃষ্ট মাষ, মুদ্গাসূপ—ভাজা মাষ-কলাইয়ের ডাল ও ভাজা সোণামুগের ডাল।

১৫। মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি—করমচার ফল, চালিতা, আমড়া, কচি আম, টক্‌পালং, আমরুল শাক, তেঁতুল এই সকল বঙ্গদেশের নিজস্ব অম্বলের উপকরণ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও "খণ্ডে মিশাইয়া রান্ধে করঞ্জার ফল।" করঞ্জার সহিত খণ্ড বা গুড় দিলে তাহা মধুরাম্লেই পরিণত হইয়া থাকে। মুগের ডাল বা কলাইয়ের ডালের বড়া প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা মিষ্টসংযোগে যে অম্ল প্রস্তুত হয়, তাহাই "বড়াম্ল"নামে অভিহিত।

১৬। মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া—মুগের ডাল বাটিয়া তাহাতে পাকা কলা মিশাইয়া তৈলে বা ঘৃতে ভাজিয়া মুদ্গবড়া, মাষডালের সহিত মাষবড়া, এবং চাউলের গুঁড়া বা আটার সহযোগে পাকা কলা দিয়া কলাবড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে, পরে এইগুলি চিনির রসে ফেলিতে হয়।

১৭। ক্ষীরপুলী, নারিকেলপুলী—আটা বা চাউলের গুঁড়া দিয়া পুলী প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে ক্ষীরের পূর দিলে তাহাকে ক্ষীরপুলী, এবং গুড় বা চিনির সহিত নারিকেল সাঁতলাইয়া পূর দিলে তাহাকে নারিকেলপুলী কহিয়া থাকে।

১৮। কাঞ্জিবড়া—ডাল দিয়া বা মিষ্ট সহযোগে চাউলের গুঁড়া বা আটা দিয়া বড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা কাঞ্জিতে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহাকে কাঞ্জিবড়া নাম দেওয়া হইত।

১৯। দুগ্ধচিড়া—সরুচিড়া ঘৃতে সাঁতলাইয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পায়স।

২০। দুগ্ধলকলকী—কচিলাউ খুব সরু ও পাতলা করিয়া ঘৃতে সাঁতলাইয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পায়স।

২১। রসালা—দধি, চিনি ও মসলা সহযোগে সুস্নিগ্ধ সরবৎ। বিশেষ প্রকার "ভৈষজ্য রত্নাবলীতে" দ্রষ্টব্য।

২২। "সন্দেশ অপার"—অতি প্রাচীন কাল হইতে ছানার ব্যবহার বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাঙ্গালীই কিছুদিন পূর্ব্বে ছানা সহযোগে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পূর্ব্বে রসগোল্লা ছিল না, তাহার অভাব ছানা-বড়ার দ্বারা পূর্ণ হইত, কিন্তু নানা জাতীয় সন্দেশ প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল।

বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকার পিষ্টকের বহুবিধ বিচিত্র প্রথা ছিল। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের "পাটিসাফ্‌টা" ইত্যাদি পিষ্টক সর্ব্বজনবিদিত। রুটি বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। মিষ্টান্নের মধ্যে 'জিলিপির' পরিচয় ভাবপ্রকাশে পাওয়া যায়। 'সেবিকা' বা সেউয়ের কথাও ভাবপ্রকাশে আছে। রাধাবল্লভী ও লুচি সে কালে পিষ্টকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ঘৃত ও নানাবিধ মসলাযোগে অন্ন প্রস্তুতের বিধান প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রচলিত

ছিল, কিন্তু মাংস ও মৎস্য সহযোগে পোলাও মুসলমান আমলেই প্রচলিত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে আমিষ খাদ্যের বিবরণও কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাওয়া যায়। খুল্লনার রন্ধনের বিবরণে দেখা যায়—নিরামিষ খাদ্যের প্রকার অধিক থাকিলেও তাহাতে মৎস্য ও মাংসের কয়েকটি রন্ধন আছে। যথা—

"বার্ত্তাকু কুষ্মড়া কচা   তাতে দিয়া কলা মোচা
বেসার পিঠালি ঘন কাটি।
ঘৃতে সম্ভোলন তথি   হিঙ্গ জীরা দিয়া মেথি
সুক্তার রন্ধন পরিপাটী॥
ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি   নটে শাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ী কাঁটাল-বীচি দিয়া।
নালিতার শাক   তৈলেতে বেথুয়া পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া॥
দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড   জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সাঁতলিল মউরির বাসে।
মুগসূপে ইক্ষুরস   কই ভাজে গণ্ডাদশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদারসে॥
মসুরি-মিশ্রিত মাষ   সূপ রান্ধে রসবাস
হিঙ্গ জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিতলের কোল   রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান-কচু মরিচ-ভূষিত॥
বোদালি হিলঞ্চা শাক   কাটিয়া করিল পাক
ঘন বেসার সম্ভোলিয়া তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খাড়া   চিঙ্গড়ীর ভোলে বড়া,
খরসুলা ভাজি কিছু তোলে॥
করিয়া কণ্টকহীন   আম্রযোগে শোল মীন
খর লোণ ঘন দিয়া কাটি।
রান্ধিল পাকাল ঝষ   দিয়া তেতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল দিয়া ভাটি॥
কলাবড়া মুগসাউলি   ক্ষীর মোননা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে সব শেষে   শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশে॥

ইহাতে বার্ত্তাকু (বেগুন), ও কচি কুমড়া ও কলার মোচা দিয়া সুক্তা রান্ধিবার কথা দেখা যাইতেছে। কাঁটালের বীচি দিয়া চিংড়ী মাছ, ঘৃতে নটে-শাকও ভাজিয়া তাহাতে ফুলবড়ি দেওয়া হইয়াছে। আমিষের মধ্যে চিংড়ী মাছ ব্যতীত কইমাছ, চিতল মাছের পেটি ভাজা, রোহিত মৎস্যের ঝোল, চিঙ্গড়ীর বড়া, খরসুলা ভাজা, কাঁচা আম্র সহযোগে শোল মাছের অম্বল, "পাকাল ঝষ" বা পাকাল মাছে তেঁতুল দিয়া অম্বল পাচিত হইয়াছে। ইহার পর পিষ্টকের কথা। ঐ সময়ে খাইবার প্রথা বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খাইবার সমস্ত অন্নগুলিকে প্রথমে ঘৃতসিক্ত করিয়া লওয়া হইত; তৎপরে সুক্তা, মরিচের ঝোল, শাক ও ঘণ্ট খাওয়া হইত। ইহার পর ডাল ও আমিষ নিরামিষ ভাজা, পরে মাছের ঝোল ও মাংসের ব্যঞ্জন, তৎপরে অম্বল ও পরে মিষ্টান্ন পিষ্টক পায়স। ইহার সঙ্গে আম কাঁটাল ইত্যাদি মিষ্ট ফলও চলিত। সর্ব্বশেষে দধি ও মিষ্ট খাইয়া আহার শেষ করা হইত। ভোজনের এই প্রথা এখনও সমাজে চলিতেছে। তবে ইদানীং সহরের সম্ভ্রান্ত সমাজে অন্নের পরিবর্ত্তে নিরামিষ বা আমিষ পোলাও এবং লুচির ব্যবস্থা হইয়াছে। নিরামিষ ঘিভাত—কোথাও ঘৃত, পেস্তা, বাদাম কিশ্‌মিস্ ইত্যাদির সহযোগে, কোথাও ঘৃত ও ছানা সহযোগে, এবং কোথাও বা সুপক্ক আনারস প্রভৃতি ফল সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোগল বাদশাহ আকবরের রন্ধনশালার জর্দ্দ বিরিঞ্জ এইরূপ নিরামিষ পোলাও—তবে তাহাতে প্রচুর পরিমাণে মিছরি দেওয়া হইত।

খিচুড়ীর বা খেচরান্নের সংস্কৃত নাম "কৃশরা"। ভাবপ্রকাশে আমরা খিচুড়ীর সাক্ষাৎ পাই। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে খিচুড়ীর উপাদান—অর্দ্ধেক চাউল, অর্দ্ধেক ডাল এবং তদর্দ্ধ ঘৃত ও লবণাদি মসলা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে বিভিন্ন প্রকারের ডাল মিশাইয়া "পহেৎ" নামক এক প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে প্রত্যেক ডালই স্বতন্ত্রভাবে পাচিত হইয়া থাকে।

রুটী বা রোটিকা ঘৃত সহযোগেই প্রস্তুত হইত। আইন-ই-আকবরীর বর্ণনায়—ময়দা দিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ সহকারে রুটি প্রস্তুতের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রেও সমসাময়িক আমিষ ও নিরামিষ রন্ধনের যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে পিষ্টকের মধ্যেই লুচি দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর এখন বঙ্গদেশে যেরূপ আটা, ময়দা, সুজি—ইত্যাদি গমজাত খাদ্যের প্রচলন দেখা যায়, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ গমকে ক্ষারপর্য্যায়ভুক্ত করায় উহা বিশুদ্ধ হবিষ্যান্নরূপে গণ্য হইত না। সেকালের পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে আটা ময়দা দুষ্প্রাপ্য ছিল, ঐ সকল দ্রব্যের

পরিবর্ত্তে চাউলের গুঁড়া ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাতে নিরামিষ ও আমিষ খাদ্যের কিরূপ প্রচলন ছিল, কবিবর ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল হইতে তাহার একটি বর্ণনা প্রদান করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"ভোগের রন্ধন ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেল মনে মহাসুখী॥
স্নান করি করে রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিল অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিল পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অড়হরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুল মটরে॥
বড়াবড়ী কলামূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা সুক্তানি ঘণ্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে বুড়া।
তিল পিঠালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিল অনায়াসে।
আরম্ভিল বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাংসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা ঝোল।
শিক পোড়া ঝুরা কাঁটালের বীজ ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোণা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙড়ীর ঝাল বাঘা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা বাল্কি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিক্ত দিয়া পচা মাছ রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শোল মাছ ঝোল চড়চড়ী।
আর রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রায় ভাজা।
অমৃত অধিক বোলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ মাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈল কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচিছাগ মৃগমাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা॥
অন্নমাংস শিকভাজা কাবাব পুরিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া॥
মৎস্য-মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড় বড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মান্দার॥
অম্বল রান্ধিলা রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।
চুষিরুটি রামরোট মুগের সামুলি॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড়ভাজা পুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভূয়া রাজবর চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী সার॥"

সে কালের রান্ধুনীরা রন্ধনের পূর্ব্বে মনে মনে রন্ধনের দেবী অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইতেন। পদ্মমুখীর রন্ধনে "দুধথোড়" ও "ডালনা" এই নূতন দুইটি নাম পাওয়া গেল। কচি থোড়ের সহিত দুগ্ধ, গুড় ও মরিচের ঝাল ও হরিদ্রাদি মশলা দিয়া দুধথোড় প্রস্তুত হইত। ঘণ্ট ও ঝোলের মধ্যবর্ত্তী ব্যঞ্জনই ডালনা। অল্প গামাখা ঝোল রাখিয়া নানাবিধ তরকারি মিশাইয়া (যেমন আলুপটোল) ডালনা রান্ধা বোধ হয়, এই সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে। 'তিল' বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবাসীর ভোজনের দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়াছে—ইহা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ও স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়। এখনও জন্মদিনে 'ষট্‌তিলী' হইবার বিধান দেখা যায়। ইহাতে ছয় প্রকারে তিল ব্যবহার করিতে হয়; তিলদান করিতে হয়, তিলমিশ্রিত জলে স্নান করিতে হয়, তিল বপন করিতে হয়, তিল বাটিয়া গায় মাখিতে হয়, তিল ভোজন করিতে হয় ও তিলের দ্বারা তর্পণ করিতে হয়। খোসা ছাড়ান কৃষ্ণতিলের পায়স ও নাড়ু বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিল ও চাউলের গুঁড়া বাটিয়া তাহার দ্বারা 'লাউ, বেগুন ও কুমড়া' রান্ধিবার কথা এখানে পাওয়া যাইতেছে। ভারতচন্দ্রে—কই, মাগুর, রুই, কাতলা, ভেটকী, চিতল, ফলই, চিংড়ী, শোল, মায়া, খড়কো, খয়রা, সুমাছ এই কয়টি মাছের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় তখনও ইলিশের আদর বাড়ে নাই। আর একটি ব্যাপার—মশলা দিয়া মুড়া রান্ধিবার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—কিন্তু ডালের সহিত মুড়িঘণ্টের কোনও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

মাংসপর্য্যায়ে কালকেতুর ভোজনে নকুলমাংস ও সজারু-মাংসের কথা থাকিলেও বোধ হয় তাহা ভদ্রসমাজে প্রচলিত

ছিল না। মুকুন্দরাম রন্ধনের মধ্যে ছাগমাংস ও খাসীর পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র মৃগমাংস, ছাগমাংস ও কাছিমের (কচ্ছপের) ডিম ভক্ষ্যপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। মেষমাংস বা পক্ষিমাংসের কথা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। মুকুন্দরাম ব্যাধের গৃহে নিদয়ার সাধভক্ষণে "হংসডিমের বড়া" আমদানী করিয়াছেন—কিন্তু ঐ সময়ে ভদ্রগৃহে ঐ বস্তু প্রচলিত ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে না।

শিক্ ভাজা ও শিক্ পোড়ার কথা মুকুন্দরামেও পাওয়া যায়, কিন্তু "কাবাব" "কালিয়া" "সেক্‌চী সমসা"—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, মুসলমান শাসন সময়ে ঐগুলি হিন্দুরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। মাছের বা মাংসের পোলাও ভারতচন্দ্রেও পাওয়া যায় না। বোধ হয়, আরও পরবর্ত্তী কালে উহার প্রচলন হইয়াছে। অম্লবর্গে—আম, চালিতা, তেঁতুল, কুল, আমড়া—এই কয়টির পরিচয় ভারতচন্দ্রে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণচণ্ডীর এই বর্ণনায়—

> "আমড়া নেয়াড়ি পাকা চালিতা।
> আমসী কাসন্দি কুল করঙ্গা॥"

নেয়াড়ি ও করঙ্গাও পাওয়া যাইতেছে। জামীরের রসের কথাও মুকুন্দরাম একাধিক স্থলে বলিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের পিষ্টকের তালিকায়—১। বড়া, ২। এলো, ৩। আসিকা, ৪। পীযুষী, ৫। পুরী, ৬। পুলী, ৭। চুষি, ৮। রুটি, ৯। রামরোট, ১০। মুগের সামুলী, ১১। কলাবড়া, ১২। ঘিয়ড়, ১৩। পাপড় ও ১৪ লুচি—পাওয়া যায়। বড়া ও পুলীর প্রকারভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিতামৃতকার অন্ত্যলীলার দশমে ধনিয়া-মহুরী ও তণ্ডুলচূর্ণ দিয়া নাড়ু বান্ধিয়া তাহা চিনিতে পাক করিবার সংবাদ দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত নারিকেলখণ্ডনাড়ু, নাড়ু, গঙ্গাজল, অমৃতকর্পূর, চিপিটকের নাড়ু, খৈচুর, কুটকলাইয়ের চূর্ণ দিয়া চিনির রসে পাচিত নাড়ু, সরপূরী, অমৃতগোটিকা মণ্ডা, কর্পূরকূপী, পদ্মচিনি—প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্নের উল্লেখও চরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রকাশে কুণ্ডলী (জিলেপী), ফেনিকা (খাজা), দুগ্ধকুপিকা ইত্যাদি পিষ্টকেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের রন্ধনপ্রথা ও ভোজ্যতালিকার ইতিহাস আলোচনা করিলে বাঙ্গালী জাতি যে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার 'রাজবল্লভ' প্রমুখ রন্ধনগ্রন্থে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রন্ধন সম্বন্ধে কি প্রকার তথ্য পাওয়া যায়, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

পাওয়া

জীবনের সার্থকতা খুঁজি
হারায়েছি মোর যত পুঁজি-
হৃদয়ের প্রতি কক্ষ হায়
শূন্য প্রাণে ধূলায় লুটায়।

ফোটে ফুল কাঁদে মোর আঁখি
হ'ল শেষ রয়ে গেল বাকি,
মধু মাসে দখিণা মলয়
নিরাশার বাণী মোরে কয়।

আসে ঐ মরণের সাথী
নব দেহে নব প্রেমে মাতি—
চাহে মোরে করিতে সার্থক
তাই হোক,—তবে তাই হোক!

এসেছে বসন্ত মোর দ্বারে
নিতে মোরে জীবনের পারে,
এত স্নেহে, অনুরাগ-ভরে'
হেথা কেহ ডাকে নাই মোরে।

কত আশে আকুল পরাণ
কাটায়েছি উর্দ্ধে পাতি কাণ
মরণের স্বামী আজ দ্বারে—
তারি পায়ে সঁপি আপনারে।

শ্রীমতী নিভা দেবী

ত্রয়ী

মায়া দত্ত, অলকা সেন, ইরা রায়, তিন জনেই আই, এ ক্লাসের ছাত্রী। বন্ধুত্ব নিবিড় কিন্তু প্রকৃতি একেবারে বিভিন্ন উপাদানে গড়া। তবে সেটা অবস্থার বৈষম্য হইতে উদ্ভব কি না, তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

অলকা পিতৃহীনা। বিধবা জননী তাহার ভায়েদের পরিবারভুক্ত। অলকার শিক্ষার গুরু-ব্যয়ভারটা মাতুলগণই স্কন্ধদেশে বহন করিয়া থাকেন। নিজের ওজন বুঝিয়া পা ফেলিতে অলকা অভ্যস্ত।

ইরা রায় বনেদী জমিদার-দুহিতা। বিমাতার সহিত সদ্ভাব ছিল। পিতৃস্নেহে ক্ষুণ্ণতাও নাই। আত্ম-পর অনেককেই লইয়া তাহাদের বৃহৎ সংসার। হিসাববুদ্ধিতে সে বিশেষ পারদর্শিনী।

মায়া দত্ত বিলাতপ্রত্যাগত যশস্বী ডাক্তারের একমাত্র নন্দিনী। মাতুলগোষ্ঠীর অপুত্রকতা হেতু অর্থের দিক্ দিয়া তাহাকে একটা বিশেষ সৌভাগ্য দান করিয়াছিল। চিকিৎসক জনকের স্নেহচ্ছায়ায় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগের মাত্রাটা বিচার করিয়া গ্রহণ করিত। অন্তর সর্ব্বদা শঙ্কা-শূন্য।

মায়া নিজের মোটারে কলেজে যাতায়াত করিত। অলকাকে সে সাধিত, "চল্ না, অলি, এক রাস্তা তো, তোকে নামিয়ে দিয়ে যাব—তবু খানিকটা লজিকের ডিস্কাসান্ হবে। আচ্ছা, না হয় গল্প।"

অলকা হাসিয়া মাথা নাড়িত, কহিত, "না ভাই, লজিকের ডিস্কাসানে যত সুবিধা হোক্, বাজে গল্পে যত লোভই থাক, তবু মোটার থেকে নাম্‌তে আমি পারব না। মামারা চেয়ে দেখবে, মামীরা হাসবেন।"

মায়া রাগিয়া উঠিত, কুপিত কণ্ঠে কহিত, "তোর ন্যাকামি! অত ভীতু কেন বল্‌তো, কিছু কি কুকায করছিস্ যে এত সঙ্কোচ?"

মায়ার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া অলকা কৌতুক অনুভব করিত, নিরীহ কণ্ঠে কহিত, "আমায় মেরে ফেল্লেও ও অসম্ভব কায আমি পারব না। আর ওই যে আমাদের ঝি এসেছে!"

রহস্যকণ্ঠে ইরা কহিত, "ইস্, অলির গভর্নের্স্ এসেছে! ওকে ছাড়া অলি চলে না এক পা।"

সহজ সুরে অলকা কহিত, "না তো কি। ওকে আমরা 'নেত্য-মা' বলে ডাকি! মাকে ও জন্মাতে দেখেছে"—বলিয়া খাতা বইগুলা বগলে চাপিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইত।

ইরা কহিত,—"থাকি বসে! বাস্ তো সেকেণ্ড ট্রিপ, ততক্ষণ নভেলখানা শেষ হবে।"

অলকার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে রুষ্টনেত্রে একবার চাহিয়া মুখ ঘুরাইয়া মায়া উত্তর দিত, "অলির চেলাগিরি না ক'রে আমার মোটারে তো আস্‌তে পারিস্!"

ইরা তাহার তপ্তস্বরে হাসিয়া ফেলিত, উত্তর করিত, "আপত্তি ছিল না, কিন্তু মহাজনের পন্থা অনুসরণ কত্তে হচ্ছে। শ্যামবাজার আর বালিগঞ্জ, পেট্রলটা—তা' হোক না কেন পরের।"

মায়ার ক্রোধের মাত্রাটা বাড়িয়া উঠিত, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিত,—"কেন, পেট্রল কি হিসাব ক'রে দেওয়া হয়েছে, এই কটা মাইল বই গাড়ীকে রান্ করাব না?"

"তা জানি। তবুও জিনিষটার যখন দাম আছে, তখন সেটা বুঝে ব্যয় করাই উচিত।"

—"তবে তুই থাক বসে, আমি চললুম," বলিয়া মায়া দুম দুম করিয়া গাড়ীতে উঠিত।

"গুড্ বাই" বলিয়া ইরা নভেলখানা খুলিত। এমন কাণ্ড তাহাদের প্রায়ই ঘটিত।

*　　　*　　　*　　　*

আই, এ, টেষ্ট্ পরীক্ষা বসিল। একটা উদ্বিগ্নতা অল্প-বিস্তর সকল ছাত্রীর মুখে-চোখে দেদীপ্যমান। 'সিটে' বসিয়া সকলেই নিজ নিজ প্রশ্নপত্রে মনঃসংযোগী। গার্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রশ্নের কঠিনতা লইয়া কেহ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ, কেহ চিন্তিত, কেহ বা প্রফুল্লতার সহিত খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। পাশের মানুষের কথা ভাবিবার কাহারও অবকাশ নাই।

'ফার্ষ্ট' পেপার শেষ হইল। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে পরীক্ষার্থিনীর দল হলের বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল।

মায়া ইরার কাছে ছুটিয়া আসিবামাত্র ইরা কহিল,—"কেমন লিখলি?"

—"ভালই"—বলিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মায়া কহিল, "অলিকে দেখছি না কেন—?"

বিস্মিতমুখে ইরা কহিল,—"তাই তো, অলি নেই?"

"সে আসেনি; কিন্তু তৈরী যে তার সব চেয়ে বেশী।"

ললিতা প্রশ্নপত্র হাতে লইয়া উপস্থিত হইল,—"দেখ ভাই মায়া,—লজিকটার—"

মায়া ঝাঁঝিয়া কহিল,—"তোর লজিক থামা, অলকা কেন একজামিন দিলে না,—জানিস্ কিছু—"

ললিতা অবাক্ হইয়া কহিল,—"তাই তো, অলকা আসে নি,—আমি তখন তাকে দেখতে পেলুম না,—" কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মায়া সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—"আসবার সময় দেখলুম, ওদের বাড়ীর দোরে অনেক 'হোগলা' এসেছে। গরুর গাড়ী হ'তে নামাচ্ছে।"

অবিশ্বাসভরা কণ্ঠে ইরা কহিল,—"না! না! সে কিছু হতে পারে না! অসুখ-বিসুখ—আচ্ছা মিস্ গুপ্ত তো গার্ড দিচ্ছিলেন,—ওঁকেই জিজ্ঞাসা কচ্ছি,—দেখি কিছু বলতে পারেন যদি।"

মিস্ গুপ্ত সেই দিকেই আসিতেছিলেন। মায়া ও ইরা গিয়া কহিল,—"হিরণ্দি, অলকা,—"

মিস্ গুপ্তার মুখ ভার হইয়া উঠিল। কহিলেন,—"তার কথা আর বলো না! মামারা তাকে বিয়ে দিয়ে চতুর্ভুজ করবেন। আজ পাকা-দেখা না গায়ে-হলুদ শুনলুম।"

এক নিমেষে যেন শরতের আকাশের এক ঝলক সোনালী আলোক তরুণীদের বিস্মিত আননের উপর ছড়াইয়া পড়িল! উল্লসিত মুখে, কৌতুককণ্ঠে সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল,—"অলকার বিয়ে?"

মিস্ গুপ্তা ভারিক্কি মেজাজের লোক ছিলেন। বয়স অনেক দিন চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের কথায় উল্লাসবোধটা তিনি সহিতে পারিতেন না! একটা ধমক দিয়া কহিলেন,—"আনন্দে সব উথলে উঠল! বিয়ে হবে তো ধিঙ্গি হবে,—আশে-পাশে আঁচলের তলায় ছেলেমেয়ে কিল্‌কিল্ করবে! অলকার কথাটা একবার ভাব তো!"

মিস গুপ্তার ধমকানিতে তরুণীদলের উৎসাহে একটা ভাটা পড়িয়া গেল। অপর্ণা কহিল,—"ইস, তাই তো,—অলি যে রকম খাটছিল!"

সমর্থন করিয়া মিস্ গুপ্তা কহিলেন,—"নিশ্চয়! অলকার অদৃষ্ট! আমরা আশা করেছিলুম,—ও এবার ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হবে, এমন মেয়ে! সেই কথাই প্রিন্সিপালের সঙ্গে আমার হচ্ছিল।"

মায়া কহিল,—"মিসেস্ বোস্ কি বললেন?"

উৎসুক নেত্রে মেয়েরা মিস্ গুপ্তার দিকে চাহিল।

ক্ষুব্ধস্বরে মিস্ গুপ্তা কহিলেন,—"বলবেন আর কি,—আমায় একবার বোঝাবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বললুম ওর মামাদের,—ভাগ্নীকে না হয় আর কটা মাস পরেই গিন্নী করবেন, আমাদের কলেজে,"— মিস্ গুপ্তা থামিলেন।

মেয়েদের কৌতুক বাড়িয়া চলিল! ইরা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—"মামারা কি বলে অলির?"

তাচ্ছিল্যভরে ওষ্ঠ বাঁকাইয়া মিস্ গুপ্তা উত্তর দিলেন, "তারা বল্লে, সত্যিকারের তো আর মাষ্টারনিগিরি ওকে করাব না। তবে যে কটা দিন বিয়ে না হয়, বসে না থেকে ব্যাগার-খাটার মত পড়াচ্ছিলুম। তারা মস্ত বড় লোক,—এখন ওর ভবিষ্যৎটাই তো দেখতে হবে। প্রিন্সিপাল তাই আক্ষেপ কচ্ছিলেন,—আমাদের ভাল ভাল মেয়েগুলো এমনি করেই মাটী হয়ে যায়।"

তরুণীর দল সকলেই কথাটা সায় দিয়া একবাক্যে অনুমোদন জানাইল। কিন্তু মিস্ গুপ্তা অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গেই

লাবণ্য চারি পাশে চাহিয়া কহিয়া উঠিল,—"হিরণ-দি ও-যা বলুন, আমি বলি বেশ করেছে,—একটা ভাবনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেলে। বাবা, পড়ে পড়ে আমার ব্যাজার ধরে গেল!"

মায়া কহিল,—"কি যে বলিস্ তোরা। অলির মামা-গুলো একেবারে 'ইডিয়ট্'-মার্কা। হ্যাঁ, আমি যদি হতুম, সাফ জবাব দিতুম,—পাত্র যদি অরক্ষণীয়, অন্যত্র চেষ্টা করুক; আমার এখন সুবিধা হবে না।"

ইরা অবাক্ হইয়া কহিল,—"তুই গুরু লোকের মুখের উপর—"

"হ্যাঁ। তোর মত ভক্তির ভণ্ডামি আমার নেই! আড়ালে অবিচার বলব,—আর সামনে এসে মাথা নোয়াব?"

কেতকী কহিল,—"সে তোরা যাই খুসী বলিস, ভাই, আজ যদি গায়ে-হলুদ হয়, অলকা তা হলে কত হীরে, মুক্ত পরে রাণী সেজে বসেছে!"

অত্যন্ত মনোরম দৃশ্য নিমেষে যেন সকলের নয়ন-পথে ভাসিয়া উঠিল। জ্যৈষ্ঠের খর-তপ্ত বাতাসের বুকে আচম্কা একখানি সজল মেঘের স্নিগ্ধ ছায়া পলকে সমস্ত উত্তাপকে শীতল করিয়া জুড়াইয়া দিল।

"সেকেণ্ড" পেপারটার পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে বাড়ী ফিরিবার মুখে ইরা ও মায়া একটি গোপন পরামর্শ আঁটিল। অলকার উপর কঠোর প্রতিশোধস্বরূপ বিনা নিমন্ত্রণে অনাহূতেরই মত একেবারে তাহার বাসর-ঘরে হানা দিতে হইবে! এতখানি বন্ধুত্বের ভিতর সে কেন তাহার অভিসন্ধি এমন করিয়া গোপন করিয়াছিল। স্পষ্ট না হউক, আভাস ইঙ্গিত তো দিতে পারিত!

* * * *

গোধূলী লগ্নে বিবাহ! সম্প্রদান চলিতেছে। সকলেই মহা ব্যস্ত। দুয়ারে সানাই,—উঠানে কন্‌সার্ট ও অন্দরে শাঁখ যেন পাল্লা দিয়া বাজিতেছে। এই সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে মানুষের কণ্ঠস্বর,—'পাণ, পাণ! আসুন! আসুন!

ঠিক্ সেই সময়ে বিবাহবাড়ীর দ্বারদেশে একখানি বহু-মূল্যবান্ মোটার আসিয়া থামিল। দুইটি তরুণী রূপের দীপ্তি ছড়াইয়া, বেশভূষার চমক দিয়া হাসিতে হাসিতে দুই হাত ভরিয়া গোলাপের সাজি, তোড়া, হার লইয়া অবতীর্ণ হইল। তাহাদের নামিবার ভঙ্গিমায় সকলের দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময় দেখা দিলেও অপরিচিতা আগন্তুক তরুণী-দ্বয়ের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হইল না। রাধিকা বাবু, অলকার জ্যেষ্ঠ মাতুল। তিনি সকলকে অভ্যর্থনা করিতে-ছিলেন। ব্যস্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—"আসুন! আসুন! এই কানাই, ভেতর থেকে নেত্য-ঝিকে ডেকে দে,—ছোট বৌমাকে বল, মেয়েদের নিয়ে যেতে।"

বরযাত্রীদের ভীড় এক পাশ করিয়া কানাই মহিলাদের লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে ইরা কহিল,—"বিয়ে কি হয়ে গেছে?"

—"আজ্ঞে না! সম্প্রদান হচ্ছে"—

নেত্য দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল,—"ও কানাই দাদা—এঁরা যে অলি-মাসীর কলেজের মেয়ে গো! এস! এস! দিদিমণিরা।"

কানাই উত্তর করিল,—"সে আমিও আন্দাজ করেছি"—

কানাই 'আজ্ঞা' বলিয়া কথা বলিয়াছিল,—মায়ার তাহাতে হাসি পাইয়াছিল। তাই ফস্ করিয়া সে কহিয়া ফেলিল,—"আজ্ঞে, আপনার অনুমানটা তো বেশ নির্ভুল হয়!"

ইরা মায়ার গায়ে একটা চিমটি কাটিল।

কানাই তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ইরা কহিল,—"আমরা খুব সময়ে তবে এসেছি! বিয়েটা দেখতে পাব।"

কানাই পুনর্ব্বার কহিল,—"আজ্ঞে, তা পাবেন।"

আবার দুই বন্ধুতে চোখো-চোখী হইয়া দৃষ্টি-বিনিময় হইল। কিন্তু কোন কথা উঠিবার পূর্ব্বেই সদর অন্দরের সন্ধিস্থানে যে বধূ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, উভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইল।

কানাই কহিল, "কাকীমা, অলির বন্ধুরা এসেছেন। বসাও এঁদের"—

কাকীমা অগ্রসর হইয়া সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—"এস মা! আজ কত আনন্দের দিন—আসবে বই কি, তোমরা না হ'লে কি মানায়!"

হাসিয়া মায়া কহিল,—"তবু আমরা নেমন্তন্ন পাইনি!"

কাকীমা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—"কি করব, মা,—অলিকে ঢের বল্লুম—ঠাকুরঝি অবধি বল্লেন। তবুও মেয়ে রাজি হোল না।"

ইরা কথাটার মোড় ঘুরাইয়া দিয়া কহিল,—"আপনি অলকার তো ছোট মামীমা?—"

—"হ্যাঁ! মা, আমিই ছোট মামী!"

"বেশ, তা হ'লে আমাদেরও ছোট মামীমা! মামীমা, আমাদের বিয়ে দেখাতে চলুন।"

পুলকিত কণ্ঠে উমাশশী কহিলেন, "বেশ, তাই চল, মা! এসে একেবারে বাসরে বসবে! ওই পাশের ঘরেই সম্প্রদান হচ্ছে, তা ওদিক্‌টার দোরে বড্ড পুরুষের ভীড়। তোমরা এই দোরটা দিয়ে ঢুকবে এস।"

উমাশশীর নির্দ্দিষ্ট দরজাটা দিয়া ইরা ও মায়া সম্প্রদান-কক্ষে প্রবেশ করিল। অনেকেই উপস্থিত, সকলেই একবার বিস্মিত চোখে উভয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল।

বরের হাতখানির উপর তখন কনের হাতখানি স্থাপিত হইয়া পুষ্পমাল্যে বন্ধনী পড়িয়াছে। সম্মুখেই নারায়ণ শিলা সিংহাসনে সাক্ষিরূপে অধিষ্ঠান! পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, আচম্বিতে মায়ার মনে হইল, এই যে দেব দ্বিজ-অগ্নি সাক্ষী করিয়া ঐ মানুষটা অলকার ইহ-পর সকল কালের ভার গ্রহণ করিতেছে, সে কি যথার্থই তাহা লইবার উপযুক্ত? অথচ আজ উহার উপর সমর্পিত হইতেছে অলকার সমস্ত জীবনের সুখ, দুঃখ, ভালমন্দের ভার। যে গৃহ, যে জননী এই আঠার বৎসর ধরিয়া তাহাকে মানুষ করিল, তাহাদের সমস্ত দাবী নিঃশেষে শেষ করিয়া যাহার হাতে অলকা আপনাকে দান করিতেছে, ইতিপূর্ব্বে সে হয়ত সম্মুখে উপবিষ্ট এই ব্যক্তিটিকে কখন চোখে অবধি দেখে নাই। বোধ করি, তাহার অস্তিত্ব অবধি জানিত না। তথাপি এই উদ্বাহক্রিয়ার সুকঠোর নির্দ্দেশ মৃত্যু অবধি টানিয়া চলিতে হইবে। ইহ-পর কোন লোকেই মুক্তি মিলিবে না। কেবল একটা মানুষের প্রতি নিশ্বাস, প্রতি পদক্ষেপের সহিত যে ভাগ্যটা বিজড়িত হইল, তাহা সুসহ, দুঃসহ যাহাই হউক, নির্ব্বিচারে বহন করিয়া উহারই অনুগমন করিতে হইবে। হাসিমুখে অথবা অশ্রুসজল চোখে,—যেমন করিয়া পারে এই স্বামি-দেবতাটিকে অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

মায়া নিষ্পলকনেত্রে দেখিতেছিল,—অলকার স্বামীর আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে। শ্যামবর্ণ, দেহে যৌবন-সন্ধ্যার ছায়াপাত। বয়সটা মায়া মনে মনে আন্দাজ করিল,—চল্লিশে উপনীত হইয়াছে, অতিক্রম করে নাই। দাড়ি-গোঁফ্ কামান, সৌম্য মুখমণ্ডল। হৃষ্টপুষ্ট চেহারার উপর ভদ্র-শ্রী জড়িত আছে। মাথায় পাতলা চুল ও বয়সের টাক দেখা দিয়াছে। মায়া ভাবিতেছিল,—মানুষটার কোথাও কোন কর্কশ, শ্রীহীনতা না থাকিলেও কদাচ ইহাকে অলকার স্বামী বলিয়া অন্তর তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে না। কেবলই মনে প্রশ্ন জাগিল,—লোকটার ধৃষ্টতা অদ্ভুত! তা না হইলে এই অষ্টাদশী সুন্দরী তরুণীকে প্রৌঢ়ত্বের ছায়ায় পদার্পণ করিয়া বিবাহ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না! আর অলকার এই মাতুলগোষ্ঠী,—ইহাদের স্বার্থপরতা, অর্থ-স্পৃহা মায়ার সমস্ত অন্তঃকরণকে নিপীড়িত করিতে লাগিল।

মায়ার ভিতর ক্রোধের ঢেউ বহিয়া গেল। ক্ষোভে, সহানুভূতিতে সহপাঠিনীর উপর তাহার মমতা-সিন্ধু নিমেষে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নিঃসংশয়ে সে অনুমান করিয়া লইল, আহা, এই জন্যই অলকা তাহার বিবাহের কথা ঘৃণাক্ষরেও বন্ধুদের জানাইতে পারে নাই। নিজের ভাগ্য-বিড়ম্বনার দুঃসংবাদ কি সহজে মুখ দিয়া বাহির করা যায়!

ইরা নিরীক্ষণ করিতেছিল, অলকার গায়ের হীরা, মুক্তা-ওলা গহনাগুলা সেকেলে হইলেও পাথরগুলা যে দামী, তাহা সে চিনিয়াছিল। মুক্তাগুলি স্থূল লালিমাযুক্ত। হ্যাঁ! প্রত্যেকটাই বসোরাই মুক্তা। হীরাগুলাও কমলহীরা বটে, দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। এমনই করিয়া ইরা সমুদয় বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া তাহার ভাল-মন্দটা মনে মনে যাচাই করিতেছিল। বরের পুষ্ট আঙ্গুলের কয়টি আংটির মূল্য অবধি নিঃশব্দে সে হিসাব করিতেছিল। নীলাখানা খুব বড়,—বার রতির কম নয়,—রক্তমুখী আছে। আর ঐ হীরের আংটিটা—উহাও হাজার দুইএর নীচে নয়। ঠিক বাবার আংটিটার মত। অলকার বেনারসীটা বড্ড মোট্টা, তবে ঢালা জংলার কায, এমনই করিয়া খুটি-নাটি সে বিচার বিশ্লেষণ করিতেছিল। জানিতেও পারিল না, তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মায়া ভিতরে ভিতরে ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিতেছে—কত অসম্ভব কল্পনার বিদ্যুৎপ্রবাহ তাহার মাথায় চলিতেছে!

ইরা একবার কানাইএর দিকে চাহিল। ওই 'আজ্ঞে' বলা মানুষটা না: যে যদি আজ বরের আসনে বসিত, মানাইত বেশ।

চিন্তাটা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পাইল না। বাধাপ্রাপ্ত হইল। মায়া একটা টান দিয়া কহিল,—"এখানে আর কি হবে, বাইরে চ'ল্।"

আশ্চর্য্য হইয়া ইরা কহিল,—"বিয়ে যে এখনও শেষ হয় নি।"

তাচ্ছিল্যভাবে মায়া কহিল,—"না হোক্—কি বিয়ে যে দেখব,—বাইরে চল্।"

অপ্রতিভ হইয়া ইরা কহিল,—"চুপ কর! ওরা শুন্‌তে পাবে।"

মায়ার কণ্ঠস্বরে অবজ্ঞাটা সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল,—কহিল, "পেলেই বা শুনতে, বয়ে গেল।" বলিয়া ইরাকে টানিয়া সে কক্ষের বাহিরে আসিল। আসিবার সময় ইরা দেখিতে পাইল,—অলকা একবার চোখ তুলিয়া তাহাদের পানে চাহিয়াই মুখ অবনত করিল।

* * * *

মেয়েদের বসিবার ঘরটায় ঢালা কার্পেট পাতা ছিল। ইরা ও মায়া আসিয়া তাহাতে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। নিকট দিয়া উমাশশী যাইতেছিলেন। কক্ষে ঢুকিয়া কহিলেন,—"বাসরে তোমাদের গান গাইতে হবে, মা। আহা, আর একটু আগে এলে ছাঁদ্‌নাতলাটা দেখতে পেতে, শুভদৃষ্টিটা।"

ইরা কহিল,—"আমরা বুঝতে পারিনি, মামীমা। বাসরে গান গাইব বলেই তো এলুম।"

মায়া দেওয়ালের গায়ে একখানা ছবির দিকে চাহিয়াছিল। তেমনি ভাবেই সে কহিল, "সকাল সকাল আমায় ফিরতে হবে বাপু।" তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তিটা অপ্রকাশ রহিল না।

উমাশশী ও ইরা সবিস্ময়ে তাহার পানে এক সঙ্গে চাহিয়া দেখিল।

উমাশশী কহিলেন, "তা বেশী রাত হবে না, ন'টার মধ্যেই বাসর বসবে। এই তো আটটার মধ্যে বিয়ে শেষ হয়ে গেল, গোধূলী লগ্ন কি না।"

ইরা কহিল, "তা হলেই হোল, মামীমা, আমরা যুগলকে অভিনন্দিত করে দুটো গান গেয়ে দশটার মধ্যেই ফিরতে পারব। কি বলিস, মায়া?"

মায়া কোন উত্তর দিল না, কেবল ভেলভেটের মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া দেওয়ালের পানে যেমন চাহিয়াছিল, তেমনই রহিল।

কানাই কক্ষে ঢুকিয়া কহিল, "ছোট কাকীমা, সেজ কাকীমা বল্লেন, মেয়েদের পাতে বসাতে! পাত হয়েছে। এর পর আবার বরযাত্রীর ভীড় আসবে।"

উমাশশী কহিলেন, "ওঠ, মা, তবে।"

নিস্পৃহ কণ্ঠে মায়া কহিল, "আমি তো খাব না, খেয়ে এসেছি।"

ইরা অবাক্ হইয়া মায়ার বীতরাগ-মাখা মুখখানার দিকে তাকাইল, যদি সেইখানে দৃষ্টিপাত করিয়া, এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বীতস্পৃহার অর্থটা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সবটাই যেন অন্ধকার বোধ হইল। তাহার চমকিত চিত্ত কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইল না, দু'দণ্ড পূর্ব্বে যে সব চেয়ে আগ্রহব্যাকুল হইয়া অলির সহিত একত্রে ভোজন করিবার কল্পনাটা তাহার সমীপে একাধিক বার বলিয়াছে, সারা পথটা যে উল্লাসে, উৎসাহে ভরপুর হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল,—তাহাকেও টানিয়া আনিল, অকস্মাৎ কোথায় কিসের বাধা তাহার আনন্দ-প্রস্রবণের গতিটাকে মুহূর্ত্তে রুদ্ধ করিয়া দিল!

উমাশশী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, জিদের সুরে কহিলেন,—"সে কি, তোমরা অলকার বন্ধু, আজকে তোমরাই অমনি ফিরবে—সে কি হয়, মা!"

অসঙ্কোচে মায়া কহিল,—"ক্ষমা করবেন, মামীমা। বন্ধু বলেই আমরা কিছু খেতে পারব না, তার জন্য যথার্থই মন আজ পীড়িত হয়।"

ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য হইয়া উমাশশী উচ্চারণ করিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া মায়া সোজা কানাইএর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আচ্ছা, আপনি তো এক জন ইয়ংম্যান, এ বিয়েতে কি আপনি এতটুকু অপোজ্ কত্তে পাল্লেন নি! ছি! ছি!"

উমাশশী হতবুদ্ধির মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়াছিলেন, এমনই অনাসৃষ্টি কথা-বার্ত্তা ইতিপূর্ব্বে কখন তিনি শুনেন নাই। তথাপি মনে করিলেন, এই সুশিক্ষিতা তরুণীর বিরাগের হেতুটা বুঝি এতক্ষণে তিনি ধরিতে পারিয়াছিলেন! ঈষৎ হাসিয়া ব্যাপারটাকে হাল্কা করিবার

দেবদাসী

[শিল্পী—শ্রীসুতি…

বাসনায় স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন.—"ও! অলির একজ্যামিনের জন্য-তুমি দুঃখ করছ, মা? তা বাছা, সব সময়ে তো সব সুযোগ আসে না—এমন ঘর, এমন বর, পয়সা কত, শুধু অলকার ভাগ্যেই পাওয়াটা—"

উমাশশীর পরিচয়ের ইতিহাস অকস্মাৎ তীব্র প্রতিবাদের স্বরে মায়া থামাইয়া দিয়া কহিল,—"দোহাই আপনার! এখন চুপ করুন। এমন ভাগ্য যেন কোন দিন কোন মেয়েরই না হয়।"

নিমেষে উমাশশীর মুখ, পিছনে অন্ধকার-ঘেরা সন্ধ্যার আরক্ত আকাশের মত রক্তিম হইয়া উঠিল। দ্বিরুক্তি তিনি করিলেন না। উচ্চবাচ্য না করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

মায়ার অদ্ভুত আচরণ, অপ্রত্যাশিত শ্লেষপূর্ণ ক্রোধ যে কিসের জন্য, তাহার কিছুই ইরা ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। অনুশোচনার সহিত কেবল মনে মনে জাগিতেছিল—এমন জানিলে কখনই সে এই দুর্বিনীতা সহপাঠিনীর সে সঙ্গিনী হইত না। সত্য হইলেও মানুষের মুখের উপর কতকগুলা স্পষ্ট কথা কহিয়া দেওয়াটা, কিছু বাহাদুরী নহে। সামঞ্জস্যের ভিতর সমস্তটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লওয়াই রীতি।

ইরা নিজের মনের দুর্নিবার ক্রোধ, বিরক্তিগুলা চাপিয়া কহিল,—"পাগলামী ছাড়! গুরুজন ডেকে গেলেন।"

মায়া কহিল,—"গুরুজনে ভক্তি তোর অচলা থাক, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক, একটা কথা ছাড়া আমি উঠতে পারি না।" বলিয়া কানাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আপনি তো অলকার কানাই দাদা।"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

মায়ার গায়ে কে যেন আগুনের মালসা ঢালিয়া দিল, এমনই সে জ্বলিয়া উঠিল। তিক্ত কণ্ঠে কহিল,—"আপনি অমন সব কথাতে 'আজ্ঞে' আমাদের বলবেন না, অতটা বিনয় আমরা ভালবাসি না।"

প্রত্যুত্তরে কানাই কেবল হাসিল।

মায়া কহিল,—"শুনেছি আপনি এক জন ডবল এম, এ!"

তেমনই মৃদু হাসিতে কানাই কহিল,—"ভুল শুনেছেন বলে মনে হয় না।"

উৎসাহিত কণ্ঠে ইরা কহিল,—"আপনি এই অক্টোবরেই বিলেত যাচ্ছেন?"

কানাই কহিল,—"ইচ্ছা আছে।"

মায়া খপ্ করিয়া কহিল, "ইচ্ছা কি রকম, 'পাসপোর্ট' অবধি নেওয়া হয়েছে শুনেছি।"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ"—

ইরা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "মায়াকে আজ্ঞে বলে আর ক্ষেপাবেন না! ওর মাথায় খুন চাপে।"

ছাদ হইতে উমাশশী চেঁচাইয়া কহিলেন, "কানাই, কে কে খাবে, এইবার নিয়ে আয়, বাবা! বড়ঠাকুর বকছেন।"

কানাই কহিল, "আপনারা উঠুন।"

ইরা মায়ার দিকে চাহিয়া কহিল, "উঠে চল,—"

গম্ভীরমুখে মায়া কহিল, "আমি অচলায়তন।"

অনুযোগভরা কণ্ঠে কানাই কহিল, "সে কি হয়,—সবাই আমরা তা হ'লে ভারি দুঃখিত হব।"

মায়া কানাইয়ের মুখের দিকে স্থির চোখে চাহিল, কহিল, "আমি খাব, আপনি যদি একটা কায করেন,—"

—"বেশ তো! কি বলুন,—

—"আমি একখানা চিঠি অলকাকে দেব। সময় মত আপনি সেখানা অলকার হাতে দেবেন।"

হাসিয়া কানাই কহিল, "এ আর কি শক্ত কায! কই চিঠি?"

—"একটা কাগজ কলম—"

—ওঃ! আপনি লিখে আনেন নি! কিন্তু এখানে তো ও সব কিছু নেই! আচ্ছা, চলুন আমার ঘরে।"

* * * * *

বাসি-বিবাহ! বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত। বর-বধূর যাত্রার শুভলগ্ন যেন না উত্তীর্ণ হয়। অলকার চুলবাঁধা শেষ হইলে, গা ধুইবার আদেশ পাইয়া সে একবার নিজের পড়িবার ঘরখানাতে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই পড়িল কানাই। অলিকে দেখিয়া সে কহিল, "এই যে অলি, তুই এসেছিস,—তোর বন্ধু কাল একখানা চিঠি তোর নামে আমার কাছে জমা রেখে গেছে, এই নে।"

বিস্মিতমুখে অলকা কহিল, "কে বন্ধু, কানাইদা?"

—"নাম তো ঠিক জানি না, ভাই! এই যে কাল একখানা মস্ত মোটারে ক'রে ফুল নিয়ে যারা এসেছিলেন।"

—"ওঃ! বুঝেছি, মায়া আর ইরা। কানাইদা, কাল ইরার গান শুনেছ? কেমন লাগল?"

—"ভারি ভাল লাগল! বেশ মিষ্টি গলাও; কিন্তু মায়া কেন একটা গাইলে না রে?"

অলকা একটুখানি হাসিল। কহিল, "ওর স্বভাবই ওই! একটুতেই বড্ড চটে যায়।"

—"তা হোক্—তবু,—" কানাই কথাটা অনুচ্চারিত রাখিয়াই থামিল।

পরিহাস কণ্ঠে অলকা কহিল, "দেখতে বেশ সুন্দর, নয়? কিন্তু ওকে পাওয়া একেবারে দুরাশা। আচ্ছা, কই চিঠিখানা দাও দেখি।"

কানাই 'ড্রয়ার' খুলিয়া খামে আঁটা পত্রখানা অলকার হাতে দিল।

ঈষৎ হাস্যসহকারে অলকা কহিল, "ইস্, একেবারে এঁটে-সেঁটে দিয়েছে দেখছি—কাল আমার কাণে কাণে বল্লে বটে, বক্তব্য রেখে গেলুম তোর কানাইদার কাছে—"

—"আচ্ছা অলি, তোর ঐ বন্ধুটি একটু ভাবপ্রবণ বুঝি?"

—"একটু? ওমা, এই জেনেছ? ভয়ানক যাকে বলে। ও যাকে ভালবাসে, বন্ধুত্ব করে, নিজের সঙ্গে তাকে ভিন্ন দেখে না। কাল কি ক'রে ছুটে এল, আমার হাতটা যখন চেপে ধরলে বাসর-ঘরে, তখন ওর দু'চোখ জলে ভরে এসেছে। এমনি অনাসৃষ্টি মেজাজ! তার উপর বড় মানুষের মেয়ে, স্বাধীনতা পায় অনেকখানি।"

হাসিয়া কানাই কহিল, "কাল তার ব্যবহারে আমি টের পেয়েছি খুব সুস্পষ্ট।"

অলকা কৌতুকদৃষ্টিতে কানাইএর দিকে চাহিল। রহস্যভরা কণ্ঠে সে কহিল, "তোমার এই প্রশংসার উচ্ছ্বাসটা 'লাভ-এ্যাট-ফার্ষ্ট সাইট' কি বল?—সাবধান, তা হলেই মুস্কিল হবে," বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে হাতের খামখানা ছিঁড়িয়া পত্রখানা বাহির করিল,—

কানাই কহিল,—"কাল তোকে একপাশে টেনে নিয়ে চুপি চুপি কি বলছিল, রে?"

অলকা ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, উত্তর দিল,—"সে পাগলামী,"—বলিয়া পত্রখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

মায়া লিখিয়াছে,—

অলি, আমার অলি! আজ তোর দিকে চেয়ে, বুকের ভিতর আমার ফেটে যাচ্ছে। দ্বিধা করিস্‌নি,—সঙ্কোচ রাখিস্ নি,—শুধু ভাবিস, পরে তোকে হত্যা করলে—বলি দিলে,—তাদের প্রতি মমতা দেখাসনি, পাপ। দেবতা দুর্ব্বলতা সহ্য করেন না। দুর্ব্বলতাই হ'ল পাপ। সকল অপরাধে মানুষকেই সে লিপ্ত করে। তুই ছিঁড়ে ফেলে দে এ বন্ধন—এ ত তোর উদ্‌বন্ধন! কেন তুই স্বেচ্ছায় তা গলায় পরবি? মরতেই যদি হয়, যুদ্ধ করে মরা ভাল। মরতে গিয়ে, মরা ভাল নয়।

তোর পাশে ওই লোকটা? অবশ্য ওকে আমি মন্দ বলছি না। আমি বলছি, তোর যোগ্য ও কিছুতেই নয়! কক্ষন নয়। তোর অধিকারী হতে যাওয়া ওর পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা।

অলকা, আমি জানি, মানুষের সাহসসঞ্চয়ের বনেদ্ হচ্ছে অর্থ। সে অর্থ আমার আছে, আমার মানে তোরও। আজ হতে আমরা অভিন্ন। ভগবানের নামে শপথ করে এ উক্তি কচ্ছি। তুই জানিস্, মামার বাড়ী হতে যে মাসহারাটা পাই, ব্যাঙ্কে সেটা জমে মোটা আকার হয়েছে। তোর সন্দেহ থাকে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সেটা সবই আমি তোর নামে করে দেব। একত্রে আমরা এখন হতে থাকব। লেখা-পড়া শিখব। এতদিন যে উঁচু 'আইডিয়াটাকে' মনের মধ্যে পোষণ করে এসেছি, বাস্তবে তাকে রূপ দেব। আমাদের 'আইডিয়াকে' আমরা কিছুতেই খর্ব্ব হতে দেব না। আমাদের স্বজন সমাজ, কারুর ভয়েই নয়। আমার বিলেত যাবার সঙ্কল্প তুই জানিস্। একসঙ্গে উভয়ে যাব। এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রইল। তোর কানাইদার হাতে চিঠিখানা দিলুম। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার চিঠিতে তুই সম্মত হবি।

হ্যাঁ! তবু এক ছত্র লিখে দিস,—লিখিস,—'শুধু সম্মত।' তার পরের ব্যবস্থা আমার হাতে। আমার বাবা তোর আত্মীয় স্বজনের এত বড় অন্যায় কদাচ সমর্থন করবেন না! তাঁর স্নেহ-বুকেই আমাদের দু'টি বোনের স্থান এখন হতে হবে। তাঁরই ভালবাসা আমরা ভাগ করে নেব। তোর মা, মামাদের ভয়ে, সমাজের ভয়ে এখন হয়ত কুপিত হতে পারেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, দু'দিন পরেই তিনি তোকে ভালবাসবেন, সব ক্রোধ শেষে নিভে যাবে তাঁর। আমি আশা-পথ চেয়ে রইলুম। ইতি

অভিন্নহৃদয় বন্ধু,
মায়া,—

সুদীর্ঘ পত্রখানা সমাপ্ত হইবার সঙ্গে অলকার চিন্তা করিবার আর অবকাশ রহিল না। মা কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাড়া দিয়া কহিলেন,—"অনাসৃষ্টি, এখনও তোর হ'ল না? সময় উত্তীর্ণ করবি না কি,—আবার বারবেলা, কালবেলা রয়েছে না?"

কানাই আসিয়া কহিল,—"অলি, তোর বন্ধুর বাড়ীর দরোয়ান এসেছে। মিসিবাবা না কি চিঠির জবাব চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

—"দিচ্ছি"—বলিয়া অলকা ত্বরিত হস্তে কলমটা তুলিয়া এক টুকরা কাগজে লিখিল,—"অসম্ভব! সবটাই অচল,—অলি!"

কানাই কহিল,—"খাম দেব"—

—"না, এমনি এইটা দাওগে।"

—"কি লিখেছিস্?"

—"পড়ে দেখ,—"

কানাই শব্দ কয়টা পড়িয়া চোখ তুলিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—"অর্থ?"

ঈষৎ হাসিয়া অলকা কহিল,—"আছে কিছু।"

* * * *

অনেকগুলা বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বাল্য-কৈশোরের সেই তিনটি অভিন্নহৃদয়া বন্ধু আজ যৌবন-মধ্যাহ্নে কেহই কাহারও খবর বিশেষ কিছু জানে না। অনন্ত প্রবহমান বিশ্বের গতিচ্ছন্দে নিত্য ভাঙ্গা-গড়ার মাঝে,—সকলেরই জীবনধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া নিজ অদৃষ্ট অনুযায়ী পথে ধাবিত হইয়াছে। ছাত্রী-জীবনের মধুর পরিকল্পনা সূর্য্যকিরণে শিশিরবিন্দুর মতই আয়ুহীন—স্বপ্নরাজ্যে বসতি করিতে গিয়াছে।

ইরা এখন অধ্যাপক-গৃহিণী! অনেকগুলি সন্তানের জননী। স্বাস্থ্য তাহার ভগ্ন! সেই লুপ্ত স্বাস্থ্যের অন্বেষণে দেশ-বিদেশে পর্য্যটনটা স্বামীর ব্যাঙ্কের খাতাখানাতে এক মোটা অঙ্ক কদাচিৎও বসিতে দেয় না।

কানাই আপশোষ করিয়া বলে, "বিলেত হ'তে পাশ ক'রে এলুম,—কত কল্পনাই ছিল, মাইনেও পাচ্ছি তো সাত-শো টাকা করে; কিন্তু আজ যদি চোখ বুজি, থাকবে তোমার সম্বল এই লাইফ্ ইন্সিয়রের টাকাটা। বাস্।—"

শান্ত মুখে ইরা জবাব করে, "তার আগেই আমি চোখ বুজব।"

ব্যস্ত হইয়া কানাই পত্নীর কপালে হাত দিত, "কেন, জ্বরটা আজ আবার এল নাকি?"

মায়া ব্যারিষ্টার-পত্নী! কিন্তু 'বারে' আর সে সুদিন নাই,—মানুষগুলার মাথায় বজ্জাতি বুদ্ধি ঢুকিয়াছে। মকদ্দমা করিতে কিছুতেই সম্মত হয় না। বলে "রাঘব বোয়ালের পেট ভরান।" সুতরাং সিতাংশু তাহার প্রচণ্ড প্রতিভাকে খবরের কাগজ মারফত বিকাশ করিতে সচেষ্ট। সভা সমিতির আকর্ষণ তাহার বিশেষ আছে।

মায়া বিরক্ত হইলে সিতাংশু কহিত,—"তোমার ভয় কি? মামার বাড়ীর টাকাটা পেয়েছ; বাবার বিষয় রয়েছে।"

বিরক্ত স্বরে মায়া কহিত,—"সেই দিকে চেয়ে তুমি বুঝি আর কিছু কত্তে পাচ্ছ না।"

"বাঃ! পাচ্ছি না! কি রকম তোমার অপবাদের কথা। এই যে ঘুরি, একি অমনি,—এত মিটিংএ লেকচার দিচ্ছি,—কাগজে নাম বার হচ্ছে, ছবি ছাপা হচ্ছে,—আচ্ছা মায়া, একটা কায কল্লে কিন্তু খুব ভাল হয়! আর সেটা কত্তে পাল্লে দু'দিনেই দেশের মাথা হব। দেখে নিও"—

—মায়া স্বামীর মুখ-চোখের উৎসাহ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিত,—কহিত,—"কি—?"

—"বেশী নয়,—লাখ্ তিনেক টাকা, বুঝেছ কি না একটা 'নিউস্ পেপার' বার কত্তে গেলে, এডিটার আমি নিজেই হব,—জন কতক সাব্ এডিটার—আমি তোমায় হিসেব খতিয়ে দেব, লোক্সান এতে একটা কাণা-কড়িও নেই।"

মায়া এতক্ষণ চুপ করিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল,—কিন্তু বেশীক্ষণ সে নীরব থাকিতে পারিল না,—মাঝখানে অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিয়া ফেলিল,—"হ্যাঁ, রেসের শনিবারগুলার একটা হিসাব অমনি ক'রে ফেল।"

সিতাংশু থতমত খাইয়া গেল,—বুঝিল, পত্নীর এতক্ষণের নীরবতা মৌন সম্মতিলক্ষণের পরিচয় নহে,—তীব্র তাচ্ছিল্যের প্রকাশ! মুখখানা তাহার কাল হইয়া উঠিল।

এক'দন সিতাংশু আসিয়া পুলকত কণ্ঠে কহিল,—"যাক্, মিত্তিরদের ষ্টেটের ম্যানেজারীটা পাওয়া গেল। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কথা এড়ায় কি ক'রে বল? তোমার সুপারিসের জোর আছে—আর দেখ, টাকাওলা মানুষই টাকাওলা মানুষের কথা রাখে। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট যদি তোমার বাবার না বন্ধু—"

মায়া বাধা দিয়া কহিল,—"থাক্,—ও সব কথা। তুমি সার্ভিসে জয়েন কচ্ছ কবে?"

"এই সপ্তাহেই গো! আর দু'টা দিন আমায় সহ্য কর।"

একটা উদ্গত নিঃশ্বাস দমন করিয়া সহজ মুখে মায়া কহিল,—"আমি কি তাই বলছি,—তোমায়। নিজের জন্যই

বলছি—! দেখ সঙ্গপ্রভাব বড় ভয়ানক,—তুমিই ভাব না, বিলেতে কি তুমি এমনি ছিলে?"

সিতাংশু চুপ করিয়া রহিল। পাণ্ডুর ম্লান মুখ, নিদ্রা স্বপ্ন অনেকক্ষণ পরে মনের মূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল। মাতাল যেমন নেশা ছুটিয়া যাইবার পর সহজ অবস্থাতে নিজের কৃত কর্ম্মগুলার পানে চাহিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, কেবল ক্ষণেকের জন্য,—তেমনই ক্ষণেকের তরে সিতাংশুর মুখেও একটা সরমের ছায়াপাত হইল। আস্তে আস্তে সে কহিল,—"এই তো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাব,—মায়া। আবার আগেকার মানুষ হয়েই আসতে চেষ্টা করব।"

নিমেষে মায়ার দুই চোখের কোণ চক্ চক্ করিয়া উঠিল। বাতায়নের বাহিরের দৃশ্যটা দেখিতে সে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া পড়িল। কিন্তু বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাহার সমস্তই যেন কুয়াসাভরা বোধ হইল।

*   *   *   *

কয়মাস হইল, সিতাংশু তাহার চাকরীতে চলিয়া গিয়াছে। মায়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। উঃ! যথার্থই স্বামী লইয়া তাহাকে দিনের পর দিন যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হইয়াছিল। অনুক্ষণ বুকের মাঝটা তাহার সশঙ্ক হইয়া থাকিত। কোথায়, কি বিপত্তি সিতাংশু বাধাইয়া বসিয়াছে। ভদ্রঘরে জন্মিয়া, উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও কোন দুষ্কর্ম্মেই যেন ইহার ঘৃণা নাই। মায়ার এমনই ভয়ানক মনে হইত, সিতাংশুর দুর্ব্বার অর্থের লিপ্সা তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে নিঃশেষে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। সেই মানুষকে নিকট হইতে সরাইয়া কিছু দিনের জন্য মায়া যেন সুস্থ হইতে চাহিল।

থাকিয়া থাকিয়া মায়ার মনে পড়ে, তরুণ যৌবনে সিতাংশু যখন প্রথম নেত্রপথে আসিয়াছিল, সে দিন কত না তাহার ভাল লাগিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, বরমাল্য শুধু এই মানুষটার কণ্ঠে অর্পণ করিলে জীবনটা সার্থক হইয়া উঠিবে। মায়া ভাবিত, সে কি সিতাংশুর মনোরম মূর্ত্তিখানার জন্য কেবল—না তাহা ছাড়া আরও কিছু ছিল, নিশ্চয় ছিল। তাহার ইউনিভার্সিটির রেকর্ড, অমায়িক ব্যবহার—ইহার কি কোন মূল্য নাই? তথাপি পরম আশ্চর্য্যের মত মায়া একটা বস্তু উপলব্ধি করিয়াছে, সিতাংশুর সৌখ্য যতই প্রীতিময় হউক, এই জাতির লোকদের দাম্পত্যজীবন কখন মধুর হইয়া উঠিতে পারে না। প্রচণ্ড স্বার্থপরতা কেবল গূঢ় অভিসন্ধি সাধন নিমিত্ত নিজের বিদ্যাবুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, সবগুলাই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া ইহারা অনন্ত সংগোপনে সতত শিকার অন্বেষণে ফিরিয়া থাকে।

তথাপি মায়া আশা করে, কর্ম্মের প্রচণ্ডতা অনেক সময় মানুষের সত্যকারের প্রকৃতিটাকে চাপা দিয়া তাহাকে তো নূতন করিয়া তুলে। সেই নিত্য অভ্যাস এক সময়ে ভিতরে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। তেমনই সিতাংশুর ওই ম্যানেজারিটা হয় তো এক সময়ে তাহার নীচাশয় প্রবৃত্তিটার রূপান্তর করিতে পারে। কে জানে?

স্বদেশী এক্জিবিসন! মায়া সেখানকার এক জন মস্ত পাণ্ডা। তাহার নিঃসঙ্গ দিনগুলা একটা এমনিতর হুজুগ লইয়া কাটাইতে ভালবাসিত। সেদিন সাক্ষাৎ ঘটিল ইরার সঙ্গে। আনন্দে মায়ার চোখ-মুখ ঝল্মল্ করিয়া উঠিল। হাসিয়া ইরাকে কহিল,—"সঙ্গে কে এসেছে?"

ফিক্ করিয়া ইরা হাসিয়া উত্তর দিল,—"সপুত্র গোলাম-টি, ওই যে! ডাকছি—তুই এলি কার সঙ্গে?"

"আমি? আমি রোজই আসি,—আজ এক জন বন্ধু আছে। কই, ইরা, তোর গোলামটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দে ভাই—আমি তো তাকে জানি না।"

"জানবি কি করে, তখন তো তুই বিলেতে, ওই যে, এদিকেই আসছে।" স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া ইরা কহিল, "ওগো, শুনছ—"

পুত্রের হাত ধরিয়া কানাই আসিয়া উপস্থিত হইল। "কিগো, অমন হঠাৎ ঘোড়ার মত ছুটে এলে কেন?"

"বাঃ! চেনা মুখ দেখতে পেলুম, একে চিনতে পার?"

কানাই মায়ার মুখের দিকে চাহিল; একটু পরে হাত তুলিয়া একটা নমস্কার দিয়া কহিল,—"আপনার চিঠি আমি অলকাকে দিয়েছিলুম।"

বিহ্বলের মত মায়া চাহিয়াছিল। এতক্ষণে স্বর ফুটিল, কহিল,—"ইরাকে আপনি পেলেন কি ক'রে?"

কানাই ঈষৎ হাসিল! কহিল,—"আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন।" বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি গিয়া পতিত হইল, মায়ার নিকটবর্ত্তী মানুষটির উপর। নিমেষে

মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল স্বরে কহিল, "মিসেস্ নাগ, এ আমার—"

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পাইল না। মাঝখানে পত্নীর প্রচণ্ড বকুনীতে কানাই একেবারে লজ্জায় সঙ্কোচে যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

ইরা কহিল,—"কাকে কি বল,—উনি মিষ্টার নাগ, মায়ার বন্ধু।"

সিন্দূরের মত আরক্ত মুখে কানাই নিজের বেয়াকুবীটা সামলাইতে কহিল, "না, না, দেবেন কি না " কিন্তু পূর্ব্বের মত কথাটা শেষ হইবার সুবিধা পাইল না।

ঈষৎ হাস্যসহকারে মায়া কহিল, "মিঃ বোস্ একটা বড় ষ্টেটের ম্যানেজারি পেয়েছেন। মাইনেটাও মোটা। সেইখানেই কটা মাস রয়েছেন। আর, আজকাল 'বারের' অবস্থা বুঝেছেন তো।"

মাথা নাড়িয়া কানাই সজোরে কহিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

মিঃ নাগ এতক্ষণে কহিল, "মিসেস্ বোস্, আপনাকে আপনার এই বন্ধুটির পরিচয় সবিশেষ দিই। ইনি একজন মস্ত 'সুইমার'। মিঃ ঘোষের এইটা সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ—হাত, পা বেঁধে জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসে থাকা।"

হাসিয়া দীপ্তমুখে কানাই কহিল, "সেই পুরস্কারস্বরূপ আপনার বন্ধুকে আমি পেয়েছি, মিসেস্ বোস্!"

কৌতুকচোখে মায়া কহিল, "কি রকম?"

ইরা কহিল, "ওই বেঞ্চিখানাতে বসে সে রোমান্স শুনবি," বলিয়া নিকটের লোহার বেঞ্চখানাতে সে বসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উপবেশন করিল।

ইরা স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "মা'র সঙ্গে গিছলুম গঙ্গাস্নান করতে। ভাদ্র মাসের গঙ্গা। একটা ইষ্টিমারের ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে টপ ক'রে পাতাল দেখতে গেলুম। মা ভয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, ঘাটশুদ্ধ লোকের চীৎকার—'ডুবে গেল, ডুবে গেল'। কেউ বুঝলে না, নাগকন্যাদের বাড়ী যাবার জন্য জলের ভিতর 'হাকুর-পাকুর' কচ্ছি। প্রভু এসেছিলেন স্নানে, বোধ হয় বিলেতের পাপ ধৌত কর্ত্তে,—নারীকণ্ঠের আকুল ক্রন্দন, সবাই চেঁচাচ্ছে—'জোয়ার জোয়ার'; কিন্তু মহাবীর করুণা পরবশ হয়ে দিলেন সে অগাধসলিলে ঝম্পদান।"

হাসিয়া কানাই কহিল, "দেখছেন মিসেস্ বোস্, প্রাণদাতাকে মহাবীর বলে অভিহিত কচ্ছেন।"

ইরা হাসিয়া কহিল, "বাঃ! মহাবীরই তো একদিন একলম্ফে সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন, আর একদিন গঙ্গাগর্ভে ঝম্পদানে আমার পাতালযাত্রার পথ রোধ করেন।"

মায়ার চোখ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিল, "দস্তুরমত এ্যাড্‌ভেঞ্চার, 'মুক্তা ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে যতনে ধীবর'।"

কানাই মাথা নাড়িয়া হাসিয়া কহিল, "না, তা নয়। ডুবুরী ভাল ছিল। মিলনান্ত আখ্যায়িকা—মিসেস বোস,

অগাধ সলিল হতে বক্ষে ধরি লক্ষ্মী তুলি,
নারায়ণ হই তার পাশে লভি স্থান,—
সানন্দে করিল মোরে বরমাল্য দান।"

মায়া হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। পুলকিত কণ্ঠে কহিল, "ব্রাভো!"

* * * *

সারাটা রাত মায়ার চোখে নিদ্রার বাষ্প অবধি রহিল না। বিনিদ্র নেত্রসম্মুখে কেবল ভাসিতে লাগিল,—ইরা আর কানাই। অন্তর যেন বার বার বলিতে লাগিল,—দাম্পত্যজীবন ওদের সার্থক। ইরা অনেকগুলি সন্তানের মা, স্বাস্থ্যভঙ্গ। তথাপি যেন বোধ হয়, ওর প্রতিটি নিঃশ্বাসে গভীর তৃপ্তি ঝরিয়া পড়িতেছে। পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা ওর ভারী হইয়া নাই।

মায়া পাশ ফিরিল। নিজের বিবাহিত জীবন অনিচ্ছাতেও কেমন মানসদৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল। অক্সফোর্ডে পড়িবার কালে সিতাংশুর সহিত পরিচয়, সৌহার্দ্দ্য। প্রতি-ক্ষণে মনে হইত,—সিতাংশুকে না পাইলে জীবনটা সার্থক হইয়া উঠা অসম্ভব। মা বলিয়াছিলেন,—আমরা বাহিরে যাই হই, তবু তো করণ কারণে কখন—তর্কের সম্মুখে মায়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল। পিতার সম্মতি পাইতে এতটুকু বেগ পাইতে হয় নাই। সিতাংশুর পিতা প্রতিবাদ-স্বরূপ পুত্রকে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিলেন। সেদিন মায়ার মনে হইয়াছিল, সিতাংশু কত বড় ত্যাগ মায়ার জন্য স্বীকার করিল। এখন প্রতিটি পলে অনুভব করে, স্বামীর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল,—শ্বশুরের ঐশ্বর্য্যের দিকে। তাই আপনার পিতার সামান্য জমি,—ভাগের বাড়ী, বা ব্যাঙ্কের

কয়েক হাজার টাকার লোভ সে অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। সে মায়ার জন্য নহে।

মায়ার উপাধান সিক্ত হইয়া আসিল। মনে হইল, বিড়ম্বিত বিবাহজীবন,—বোঝার মতই তাহাকে বহিয়া ফিরিতে হইবে। তথাপি আজও তাহার সম্ভ্রমটুকু বন্ধু-সমাজে টিঁকিয়া আছে, কিন্তু ভয় তাহার সেইখানে। সিতাংশু পরস্বহরণে তীক্ষ্ণবুদ্ধি,—অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার প্রচণ্ড প্রলোভন,— সংক্রামক ব্যাধির মত,—তাহার সমস্ত চিন্তার ধারাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আপনার পত্নীর স্বাক্ষর অবধি জাল করিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেদিনের সে বিভ্রাট বহু আয়াসে মায়া নিষ্পত্তিতে আনিলেও স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা তাহার অন্তরে যেন দাগ টানিয়া গিয়াছিল।

ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস জননীর স্নেহ-হস্তের মত মায়ার ললাটে স্পর্শ দিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইল। চোখ মেলিয়া যখন চাহিল,—সার্সিগাত্রের রৌদ্র কক্ষটাকে ভাসাইয়া দিয়াছে। দিনের আগন্তুককে সাদর সম্ভাষণ না দিয়া,—"ইস্, এতটা বেলা" বলিয়া কক্ষ ছাড়িয়া সে বাথরুমে প্রবেশ করিল।

বাথ্‌রুম হইতে আসিতেই, আয়া জানাইল নাগ সাহেব।

"চা দাওগে", বলিয়া মায়া কাপড় বদল করিতে চলিয়া গেল।

খানিকটা পরে সে যখন আসিয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল, মিঃ নাগকে সুপ্রভাত জানাইল, তখন প্রতি-উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া মিঃ নাগ প্রশ্ন করিল, "আপনার চোখ মুখ অসুস্থতার মত অত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?"

তাচ্ছিল্যের স্বরে মায়া কহিল,—"ও কিছু না।"

মিঃ নাগ কহিলেন,—"আজ আমাদের মোটারে যে লম্বা ট্রিপ্ দেবার কথা ছিল-"—

"ওঃ! আমি একেবারে বিস্মরণ হয়েছিলুম! আচ্ছা, অন্য একটা দিন,—আপনি মাপ করবেন, সত্যিই শরীরটা আমার"—

হাসিয়া প্রচ্ছন্ন খোঁচায় বিদ্ধ করিবার অভিলাষে মিঃ নাগ কহিলেন,—"শরীর,—না মন?"

অন্যমনস্কের মত মায়া উত্তর করিল,—"উভয়ই! হ্যাঁ, আমায় খানকতক চিঠি এক্ষুণি লিখতে হবে।"

মিঃ নাগের মুখ গম্ভীর হইল! নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন,—"আজ তা হ'লে আমি আসি?"

"আসুন, নমস্কার।"

কিছুক্ষণ পরে মিঃ নাগের মোটারের শব্দে মায়া বুঝিল, তিনি চলিয়া গেলেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আসিয়া প্রবেশ করিল, নিজের পড়িবার ঘরটিতে। ভারাক্রান্ত মন সে আজ কিসের অন্বেষণে হতাশ হইয়া ভিতরে ভিতরে কাঁদিতেছিল। কি যে তাহার প্রার্থনা, তাহাও যেমন মায়ার অজ্ঞাত, তেমনই তাহার এই চাঞ্চল্য যেন অপ্রত্যাশিত। বিমনার মত সে পুস্তকপরিপূর্ণ আলমারীগুলার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তাহার জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইতে ইহারা তাহার নিঃসঙ্গ চিত্তের সঙ্গী হইত! অবসরে চিত্ত-বিনোদন করিতে, এমন কি, বাস্তবের সমস্ত সুখ-দুঃখের আলোড়ন হইতে ছিনাইয়া তাহাকে কল্পনার কল্পলোকে নিমগ্ন করিতে, এই প্রশস্ত কক্ষপরিপূর্ণ পুস্তকরাশির বিশেষ একটা অধিকার ছিল। গৃহস্বামিনীর এই একান্ত প্রিয় সহচররা আজ অদৃশ্য অঙ্গুলির আহ্বানে তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না! অভ্যাসমত এই কক্ষে সে প্রবেশ করিয়াছিল। নিরুৎসুকের ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। আচম্বিতে কেমন মনে হইল, যদি একটা সন্তান থাকিত। চমকিয়া মায়া এই সর্ব্বনাশা চিন্তার মুখরোধ করিল। তড়িৎ-প্রবাহের মত সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া এই কথাটা জাগিয়া উঠিল, পুত্র, যদি পিতৃগুণের অধিকারী হইত, তবে? উঃ! ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন!

একখানা বই খুলিয়া বসিবার সঙ্গে দরজার ভারী পর্দ্দাটা তুলিল, বেহারা আসিয়া মায়ার হাতে 'তার' দিল, একটা সই দিয়া 'টেলিগ্রাম'খানা মায়া দেখিল, জরুরী। আকস্মিক ভয় হইল, স্বামীর কোন অসুখ-বিসুখ করে নাই তো? যাহার কথা মনে হইলে অন্তর কুঞ্চিত হইত, অকস্মাৎ তাহার পীড়ার কথাটা মনে হইতেই সারা চিত্ত ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া মায়া সুদীর্ঘ 'তার'টা পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার দুই চোখের দৃষ্টি যেন দীপ্ত হইয়া ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। সমস্ত মুখখানা দেখিতে দেখিতে কঠিন হইয়া উঠিল। আততায়ীর মত সেই লেখাগুলা যেন উপর্য্যুপরি তাহাকে আঘাতে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে, মায়ার এমনই মনে

হইল। বুকের মাঝে কেবল জাগিল, যদি এই 'টেলিগ্রাম'-খানা হাতে আসিবার পূর্ব্বে দুনিয়া হইতে সে চিরবিদায় লইতে পারিত!

সিতাংশু 'তারে' জানাইয়াছে,—

'মায়া, আমায় বাঁচাও। চিটিং কেস! আইন জানি,—সব পথই রুদ্ধ! কেবল তোমার করুণা। এরা লাখ টাকার ক্যাশ তছরুপের দাবী দিয়েছে। ইচ্ছা ছিল—একটা নিউস পেপার বার করব। ভবিষ্যতে তাহারই লাভ হতে শুধে দেব। কিন্তু টাকা—থাক, সে তুমি বুঝবে না! আমি তোমার জন্য মা, বাপ, সম্পত্তি সব ছেড়ে ছিলুম! সেদিন সে আবেগ, আজ তাই ছিল,—আমার প্রতিভাকে ফোটাবার উদ্দেশ্য! হ্যাঁ, একটা খবর পেয়েছি,—যিনি আমার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছেন,—তিনিই ওই বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষ! তরুণী ভার্য্যার আধিপত্য অসাধারণ। তারই ক্রোধে ব্যাপারটা পুলিসের কর্ণগোচর হয়েছে। বাড়ীতে পুলিস হানা দিয়েছে,—একমাত্র তুমি তাকে শান্ত করতে পার,—কারণ, আমি শুনেছি সে তোমার কলেজের বিশেষ বন্ধু ছিল,—নাম তার 'অলকা'! মায়া, আজ আত্মাভিমানের দিকে চেয়ে আমায় না বাঁচাতে চাইলেও স্বামী তোমার জেলে গেলে মুখ তোমার উজ্জ্বল হবে না। ইতি—

তোমার স্বামী
সিতাংশু।'

মায়ার চোখের সম্মুখে আলোক-উজ্জ্বল সকালটা যেন ম্লান কালিমাখা বোধ হইল,—কেবল সে ডাকিয়া বলিল,—"রামচরণ, মোটার বাবুকে গাড়ী বার কত্তে বল।"

* * * *

নলডাঙ্গার জমিদারবাড়ীতে দুর্গোৎসবটা মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিকট-দূর পাঁচখানা গ্রামের লোক,—ওই মহোৎসবটির জন্য উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। নাচ, তামাসা, যাত্রা, থিয়েটার—পূজার কটা দিন যেন আনন্দময়ীর আগমনকে সার্থক করিয়া তুলে। মুক্তহস্তে প্রসাদবিতরণে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়।

মহা অষ্টমীর পূজা চলিতেছে। লোকজনের ব্যস্ততার সীমা নাই। পাইক, লস্কর ছুটিতেছে, দাঁড়াইতেছে,—কাযে ফরমাসে। নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর এতটুকু কোথাও নাই। আনন্দ-উৎসাহের চিহ্ন সকলেরই মুখে দেদীপ্যমান।

জমিদার বাবু স্বয়ং ক্ষৌমবাসে ক্ষৌম উত্তরীয়ে আবৃত হইয়া স-পারিষদ দেবীর দালানে উপবিষ্ট। সন্ধি-পূজার আর বিশেষ বিলম্ব নাই। সকলের মুখে চোখে উৎসাহ-উদ্দীপনা সুপরিস্ফুট! সকলেই ঘন ঘন ঘড়িগুলার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। পাঁজি খুলিয়া তিন চারিজন বসিয়া আছেন। কর্ত্তা স্বয়ং একখানা পাঁজি খুলিয়া 'রিষ্ট ওয়াচের' দিকে কেবলই দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—পুরোহিতের দল,—বিশুদ্ধ দেবভাষাতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিতেছেন, চণ্ডীপাঠ চলিতেছে। নহবৎখানা হইতে সানাইয়ের মিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছে! ঢাকীর দল ঢাকের গায়ে পালক গুঁজিয়া সারি বাঁধিয়া অপেক্ষা করিতেছে। যেন রণোৎসাহী সৈনিক দল—সেনাপতির যুদ্ধ-ইঙ্গিতদানের পানে অধীর প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে। একটি ঘণ্টার শব্দেই মুহূর্ত্তে তুমুল বাদ্যরব ব্যোমপথে নভোমণ্ডলকে স্পর্শ করিতে ছুটিবে।

অন্তঃপুরে গৃহিণী তেমনই ব্যস্ত। এত বড় উৎসবের তিনিই কর্ত্রী।

রমেন আসিয়া ডাকিয়া কহিল,—"নতুন মা, আমার কলেজের প্রফেসার সস্ত্রীক আসবেন। তুমি রঘুয়াকে বলে দাও গাড়ী যেন ঠিক সময়ে ষ্টেসনে যায়।"

ভাঁড়ার ঘর হইতে অলকা কহিল,—"বলেছি, বাবা! গাড়ী তোমার ঠিক সময়ে যাবে।"

রেবা আসিয়া কহিল,—"নতুন মা, এই লিলির হার নাও! স্যাকরা এখন দিয়ে গেল! বাবা দিলেন,—"

"কই দেখি" বলিয়া অলকা ভাঁড়ারঘরের সম্মুখের দালানে আসিয়া দাঁড়াইল।

উৎসুক চোখে রমেন কহিল,—"এতগুলো গিনি তুমি রেবার ছেলেকে দিচ্ছ, নতুন মা? এই তো তাতে অত গয়না দিলে।"

হাসিয়া অলকা কহিল,—"দেব না! ও শালা যে আমার নাতি রে?"

রেবা কহিল,—"পুজো বলে নাতিরই সব হচ্ছে, নতুন মা, আমাদের—"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অলকা কহিল,—"কেন বাছা, তোমাদেরও তো যা যা দেবার দিয়েছি।" ছেলের দিকে চাহিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, রমু, তোমাদের প্রফেসরের নাম কি?"

"কানাইলাল ঘোষ, পি, এইচ, ডি। মহা পণ্ডিত, সে তুমি চিনবে না, নতুন মা।"

অলকা একটু হাসিল। কহিল,—"তা' হবে, বাবা! তবে বাড়ী তো ওই পটলডাঙ্গাতে?"

রেবা কহিল,—"তুমি জান না কি ?"

রমেন কহিল,—"রোস, রোস ! একদিন ঘোষ সাহেব আমাদের দেশটার নাম শুনে বল্লেন, তোমার মা, সম্পর্কে আমার বোন হন।"

অলকা কহিল,—"ভুল বলেনি, কানাইদা আমার বড় মামার ছেলে। বিলেত গিছল ; তারপর যখন বিয়ে কল্লে, আমার যাওয়া হয়ে উঠেনি।"

উৎসাহে রমেন লাফাইয়া উঠিল, "এ্যাঁ ! বল কি, তোমার আপন জন, কই বলনি তো, নতুন মা ! উনি খুব ভাল স্কুইমার ! ওঁর বউ আই, এ, পাশ !"

"জানি, তার নাম ইরা।"

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে রেবা কহিল,—"তোমার এত সব আপনার জন আছে, তুমি কখন কোথাও যেতে চাও না। কি মানুষ বাপু !"

অল্প একটুখানি হাসিয়া অলকা উত্তর দিল, "তোদের ফেলে যে যেতে পারি নি, বাছা।"

সরকার মশাই আসিয়া কহিল,—"কর্ত্তাবাবু ডাকছেন, নতুন মা। 'সন্ধ্যে' পূজার আর বিলম্ব নেই বল্লেন,—"

"যাও, আমি যাচ্ছি—কাপড়খানা বদলে আসি।"

একখানি নূতন আল্‌তা রঙ্গের বেনারসী পরিয়া অনাবৃত গাত্রে অলকা যখন উপর হইতে নামিয়া আসিল, তখন গঙ্গাজলে ধোয়ায় শ্রদ্ধাপ্লুত দৃষ্টিতে ভ্রাতা-ভগিনী তাহার পানে চাহিয়া রহিল। একটু হাসিয়া রমেন কহিল, "নতুন মা, তুমিই যেন মা দুর্গা !"

ঠিক সেই সময়ে জমিদারবাড়ীর গেটের মধ্যে একখানি সুবৃহৎ 'মোটার কার' আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার ভিতর হইতে যে মহিলাটি 'শ্লিপার' পায়ে দিয়া অবতীর্ণ হইলেন, মূল্যবান্ সিল্কের গাত্রবাসে তিনি নিজের সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া আচ্ছাদন করিয়া লইলেন।

* * *

প্রচণ্ড বিস্ময়ে শিবকালী কহিলেন,—"কি বলছ তুমি, নতুন-বৌ ? লাখটাকা আমি খোয়াব ! কেস্ তুলে নেব ? তোমার মাথা খারাপ হ'ল না কি ?"

দৃঢ়কণ্ঠে অলকা কহিল, "মাথা খারাপ আমার একটুও হয় নি। এ কায তোমায় কর্ত্তেই হবে। বলেছি তো সিতাংশু বাবু আমার কে ? মায়ার স্বামীকে কিছুতেই জেলে আমি দিতে পারব না।"

গম্ভীর মুখে শিবকালী কহিলেন, "কিন্তু পাপের প্রশ্রয় ! তুমিই না বলতে কর্ত্তব্যের সম্মুখে উপরোধ, অনুরোধ চলে না।"

"হ্যাঁ, তা তো আজও অস্বীকার কচ্ছি না ! কিন্তু অন্যায়ের জন্যই তো মার্জ্জনার সৃষ্টি ! মানুষকে—"

বাধা দিয়া শিবকালী কহিলেন, "তুমি ভুলেও মনে ক'র না, নতুন-বৌ, ও মানুষ কক্ষণ ভাল হবে। ও আলাদা জাত। শাস্তি পাওয়াই ওদের দরকার।"

অলকা কহিল,—"না, ও ভাল হবে, এমন আশা আমি করি না ! তোমার কথাই সত্য মানি ; কিন্তু বলেছি তো ও মায়ার স্বামী। আর মায়া আমার বন্ধু—"

শিবকালী মাথায় হাত বুলাইলেন,—"তাই তো, নতুন বৌ, একটা জালিয়াৎকে এমন ক'রে খালাস দিলে, এরা সব বুঝছ না—"

অধীর কণ্ঠে অলকা কহিল,—"বুঝি আমি সব। কিন্তু এ বিচার-বিতর্ক নয়। শুধু আমার দিকে চেয়ে এ ক্ষতি সহ্য কর্ত্তে হবে।"

শিবকালী কেশবিরল মস্তকে ঘন ঘন হাত বুলাইতে লাগিলেন, কহিলেন,—"তাই তো ! মুস্কিল ! সমস্যা বটে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে অলকা কহিল,—"না ! না ! সমস্যা নয় ! মুস্কিলও নেই। আমি তো কোন কিছু চাই নি কোন দিন ! আজ বলছি, এই লাখ টাকাটা আমায় দাও। এই বিজয়াদশমীর দিনে,—তুমি কি দেবে না ?" অলকার দৃষ্টি উজ্জ্বল—মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল।

শিবকালী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—"সে কি, নতুন-বৌ ! এত বিষয়-বৈভব সবই তোমার ! আমি রাজা হ'লে তুমিই তো তার রাণী ! তুচ্ছ এ'লাখ টাকা, আজ এত বড় দিনে। না ! না ! তুমি অমন ক'রে অভিমান কর না, আমার লক্ষ্মী যে তুমিই ! লাখ টাকা ? নিষ্কৃতি দিতে যা কিছু প্রয়োজন সবই করবো ! কথার নড়-চড় নেই।"

অলকার মুখের মেঘখানা নিমিষে সরিয়া গেলে চাঁদের আলোর বন্যা তাহাতে ছড়াইয়া পড়িল। পুলকিত হইয়া সে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিতে, শিবকালী কহিলেন,—"আঃ !

নতুন-বৌ, তুমি এসব আবার কি কচ্ছ? হ্যাঁ অলকা, তোমার বন্ধুটিকে তো দেখলুম না,—"

হাসিয়া অলকা কহিল,—"দেখাব। এই যাচ্ছি তাকে ধরে আনতে—"

*　*　*　*　*

মায়া স্তব্ধ হইয়া সোফার উপর বসিয়াছিল, অতীতের কত কথা মনের গায়ে একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। জমিদারবাড়ী বিজয়া-দশমীর বিসর্জ্জনের বাজনার উন্মাদনার মাঝেও যেন একটা সকরুণ বিদায়ের বেদনাকে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করিতেছিল।

অলকা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। ডাকিল, "মায়া, ওকি! আজকের দিনে অমন ক'রে শুয়ে—"

"কি করব,—উল্লাসের তো কিছু আমার নেই!"

"ছিঃ! মায়া, ও কি কথা? সিতাংশু কোথা?"

তাচ্ছিল্যের সুরে মায়া কহিল,—"কি জানি, বোধ হয় নিজের ঘরে। আবার কিছু বুদ্ধির উদ্ভাবন কচ্ছেন,—"

অলকা কহিল, "স্বামীর উপর অমন ক'রে বিতৃষ্ণ হসনি! আমরা তো মকর্দ্দমা করব না! টাকার দাবীও নেই! আমাদের দিক্ থেকে কোন কিছু আশঙ্কা তোদের নেই!"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মায়া কহিল, "টাকাটা আমি দেব শিবকালী বাবুকে, তিনি,—"

অলকা মায়ার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, "খবরদার! অমন কথা মুখে আনবি নি। কেন,—আমরা কি এমনই নীচ—সিতাংশু বাবু যদি টাকা নষ্ট ক'রে থাকেন, তার খেসারৎ? তুই কি আমার কেউ নস্? আমায় কি ভালবাসিস্ না? মায়া, সেই চিঠিখানা তোর মনে আছে?"

সবিস্ময়ে মায়া কহিল, "কোন্‌খানা?

"সেই আমাকে তুই লিখেছিলি, সে দিন আমার জন্য তুই কত পাগল হয়েছিলি, ভাব দিকি।"

হাত জোড় করিয়া মায়া কহিল,—"আমার ভুল।"

"হোক ভুল, তবু তোর সে দিনের ভালবাসা আমি বিস্মরণ হয়নি। কিন্তু ভুল যখন বুঝেছিস্, তখন বিধান কর্ত্তে হবে—সিতাংশুকে নিয়ে আমাদের বাড়ী চল্—আমার কর্ত্তার কাছে।"

মায়ার মুখমণ্ডল কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল, "একা পারব, কিন্তু ওকে পাশে নিয়ে অসম্ভব। অলি, আমায় ও অনুরোধ করিস্‌নি। তার চেয়ে যদি জেলে যায়,—সে সহ্য হবে।"

অলকা ক্রোধের স্বরে কহিল,—"ফের ওই কথা,—অমন কথা মুখ দিয়ে বার কত্তে আছে?—এত যদি সহ্য কত্তে পারিস্,—তবে অষ্টমীর দিনে অমন ক'রে পাগলের মত আমার হাত চেপে ধরেছিলি কেন?"

ম্লান হাসিতে মায়া কহিল,—"কেন ধরেছিলুম, এ চাকরী আমিই যোগাড় ক'রে দিয়েছিলুম। ভাবতুম যদি পাঁচ রকম কায-কর্ম্মে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়—মতিগতি বদলায়! কিন্তু সব আমার শেষ হয়ে গেছে। আজই ওকে বলেছি—তিন লাখ টাকা আমি দেব—তুমি যা একদিন চেয়েছিলে; তার পর যা আমার সামান্য থাক্‌বে, তাই নিয়ে আমি আলাদা থাক্‌ব।"

বিস্ফারিত চোখে অলকা কহিল, "একা!"

*　*　*

বিজয়া-দশমীর সাদর-সম্ভাষণ, কোলাকুলি, প্রণাম, আলিঙ্গন ঘরে ঘরে চলিতেছিল।

শিবকালী ফরাসের বিছানায় বসিয়া তাকিয়া হেলাম দিয়া মাঝে মাঝে দুর্গা দুর্গা করিতেছিলেন।

অলকা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, হাসিয়া কহিল, "আমার বন্ধু।"

শিবকালী ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, "কই, কই তোমার বীণাপাণি, কমলারা, নতুন-বৌ—"

ইরা ও মায়া কক্ষে প্রবেশ করিল। ইরা হাসিয়া কহিল, "মিত্তির মশাই, এই যে আজ লক্ষ্মী-সরস্বতী হাজির, দেবাদিদেব, শুধু একটু পদধূলি দিন।"

উভয়ে শিবকালীকে প্রণাম করিল।

শিবকালীর প্রসন্ন মুখ আনন্দের দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল! কহিলেন, "এ্যাঁ! তুমি তো আমার বড়-কুটুম্বের অর্দ্ধভাগিনী, আর ইনিই বুঝি দেবী বীণাপাণি?"

মায়ার গম্ভীর মুখেও ঈষৎ হাসি দেখা দিল।

শিবকালী তাহা দেখিলেন, কহিলেন,—"তোমরা আমার কাছে বোস। বয়েসে অনেক ছোট বলে, 'দণ্ড ন' বলতে পারব না।"

মায়া হাসিয়া কহিল,—"আমাদের আপত্তি নেই, মিত্তির মশাই! আমরা আপনার দু'পাশেই বসছি!"

অলকা হাসিয়া কহিল,—"সেই মানাবে ভাল। "দরজার দিকে চাহিয়া কহিল,—"এই যে কানাই-দা সিতাংশুকে নিয়ে আসছেন এদিকে—"

"হ্যাঁ, তাঁকে আমি আনতে পাঠিয়েছিলুম।"—বলিয়া শিবকালী তাকিয়ার তলা হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন,—"সরস্বতী, এই নাও, বন্ধুকে লেখা তোমার সেই পত্রখানা; ও আমার জিম্মাতে রেখেছিল। সখীকে জিজ্ঞেস কর; জীবনটা ওর সত্যিই ব্যর্থ হয়েছে কি না।" বলিয়া থামিয়া তিনি কহিলেন,—"আমি বলি, অযোগ্যকে ভালবাসলেই বা দোষ কি? আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে ভালবাসতে পারলে, হয়ত সেটা সার্থক হয়ে উঠে। অন্ততঃ সে চেষ্টা করাও তো উচিত। মন্দ বলে ত্যাগ করলেই কি তৃপ্তি পাওয়া যায়?"

এই সময়ে কানাই সিতাংশুকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সাদর-সম্ভাষণে শিবকালী কহিলেন,—"আসুন, সিতাংশু বাবু, আপনাকে আনতে আমার বড়-কুটুমকে পাঠিয়েছিলুম। আজকের দিনে কোলা-কুলিটা হয়ে যাক, গিন্নীটিকে আপনার আমি আগেই বশ ক'রে নিয়েছি।"

স্তম্ভিত সিতাংশু মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেল। দেখিল, অনেক দিনের মেঘাচ্ছন্ন মুখখানার উপর আজ যেন একটা প্রসন্নতার দীপ্তি আসিয়া পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ নেত্রে সে সিতাংশুর পানেই চাহিয়াছিল।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ত্যাগ ও সুখ

নিজের লাগিয়া ধরারে যেদিন
নিকটে টানি,
সেদিন আমার সহজ জীবন
বিফল মানি।

সেদিন প্রভাতে রবিকর আসি
ঢালে না বিমল আলো,
সেদিন উজল প্রভাতী গগন
নয়নে লাগে না ভালো।

সেদিন আমার আকুল পরাণ
রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া ওঠে,
সেদিন সকল সুখের ধারায়
কি জানি কিসের বেদনা ছোটে।

সেদিন আমার সকল সাধনা
বিফল মানি,
নিজের লাগিয়া ধরারে যেদিন
নিকটে টানি।

তোমারই লাগিয়া ধরারে যেদিন
রাখি হে দূরে,
সেদিন আমার সফল জীবন,
সহজ সুরে।

সেদিন ধরার সব হাসি, গান
যেন হে তোমারি লাগি
নবীন সুখের পরশ দোলায়
পরাণে বেড়ায় জাগি।

সেদিন তোমার পূজার লাগিয়া
যা কিছু আনি হে চরণ-তলে,
নিমেষে তাহার সব মাধুরিমা
শত-শিখা মেলি পরাণে জ্বলে।

সেদিন ধরায় সুখের প্রকাশ
সহজ-সুরে,
তোমারই লাগিয়া ধরারে যেদিন
রাখি হে দূরে।

শ্রীনন্দীপ্রসাদ রায়।

"বৃহৎ-বঙ্গ"

(সমালোচনা)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "বৃহৎ-বঙ্গ" নামক পুস্তকের লেখক ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম অধ্যায় সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া আর্য্য-ধর্ম্মের যে পুনরুত্থান হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক পূজা পাইল এবং ব্রাহ্মণের নূতন সংজ্ঞা হইল। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ জন্ম দ্বারা নির্ণয় হইতেন না, "প্রধানতঃ বৃত্তিই জাতিনির্দ্দেশক ছিল। যে কোন জাতির লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।" দীনেশ বাবু অন্ততঃ দুই চারিটি প্রমাণ দিলে ভাল করিতেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি জাতির উৎপত্তির কথা ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে (১০।৯০।১২) এবং যজুর্ব্বেদে (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১) দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় স্থলেরই অর্থ একরূপ, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। জন্মগত জাতির সহিত এই প্রকার উৎপত্তির সামঞ্জস্য হয়, বৃত্তিগত জাতির সহিত সামঞ্জস্য হয় না। জাতি বৃত্তিগত হইলে এক ব্যক্তি এক্ষণে যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে, কিছু দিন পরে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয় হইতে পারে। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে পুরুষসূক্ত অনুসারে ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন বলা যাইবে, না বাহু হইতে উৎপন্ন বলা যাইবে? বস্তুতঃ ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদের পূর্ব্বোক্ত অংশদ্বয় "বৃত্তি অনুসারে জাতি হইবে" এই মতের বিরোধী। সুতরাং দীনেশ বাবু যে মনে করিতেছেন, বৈদিক যুগে বৃত্তি অনুসারে জাতিনির্দ্দেশ হইত, ইহা তাঁহার কল্পনা মাত্র।

কঠ উপনিষদে দেখা যায় যম, নচিকেতাকে ব্রাহ্মণ এবং নমস্য বলিয়াছেন। তখন নচিকেতা বালক মাত্র। তাহার কি বৃত্তি ছিল, এ কথা উঠিতে পারে না। সুতরাং উপনিষদেও জন্ম অনুসারে জাতিনির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৃত্তি অনুসারে নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৭এর অনুবাদ এইরূপ :—

যাহারা উত্তম কর্ম্ম করে, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; যাহারা কুৎসিত কর্ম্ম করে, তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

সুতরাং এখানেও দেখা যায় যে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারে জন্ম এবং জন্ম অনুসারে জাতি।

শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে "নব আর্য্যধর্ম্ম" উত্থিত হইল, বেদব্যাস তাহার প্রধান প্রচারক এবং গীতা তাহার একটি প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদব্যাস—যিনি সমগ্র বেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তিনি অবশ্য বেদের মর্ম্ম অবগত ছিলেন। দীনেশ বাবু যে মনে করিয়াছেন, এই নব ধর্ম্ম প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধী, ইহা তাঁহার ভ্রম। গীতা-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, গীতায় সমগ্র বেদের সারভাগ সঙ্কলন করা হইয়াছে। গীতায় যখন সমগ্র বেদের সারভাগ সঙ্কলন হইয়াছে, তখন গীতা-প্রতিপাদিত "নব আর্য্যধর্ম্ম" বেদবিরোধী হইতে পারে না।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—

"কোনও কোনও মহর্ষি গণিকাজাত ছিলেন। সত্যকাম ও নারদের মাতার স্থান এই পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

সত্যকাম সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে, সত্যকামের পিতার গোত্র সত্যকামের মাতা জানিতেন না, যৌবনে তিনি বহু পরিচর্য্যায় ব্যস্ত ছিলেন। ইহা হইতে বলা যায় না যে, তিনি গণিকা ছিলেন।

শঙ্কর এ ভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। নারদের মাতা চাতুর্ম্মাস্তকারী সাধুদের দাসী ছিলেন। তিনি যে গণিকা ছিলেন, ইহা উক্ত হয় নাই। অধিকন্তু সত্যকামের গল্প হইতে ইহাই বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে, ইহাই নিয়ম ছিল। নচেৎ আচার্য্য সত্যকামকে তাহার বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন কেন?

ব্রাহ্মণজাতীয় ঋষি-মুনির ঔরসে নীচজাতীয় স্ত্রীলোক, পশু এবং কুম্ভ হইতেও সাধুপুরুষের জন্ম হইয়াছে, এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পুরাণে আছে। ঋষি-মুনিদের তপস্যার প্রভাবে ইহা সম্ভব হইত। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা ভুল যে, সাধারণ ভাবে সমাজে যে কোনও জাতির স্ত্রী এবং যে কোনও জাতির পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম হইত।

দীনেশ বাবু তাঁহার গ্রন্থে বহু স্থলে উচ্ছ্বসিত ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের নামেই উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দীনেশ বাবু নব্য আর্য্যধর্ম্মের সমর্থক বলিয়া কটাক্ষপাত করিয়াছেন। প্রধানতঃ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই দুইখানি গ্রন্থের প্রতি বিশেষ সমাদর ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। মহাভারতে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণ-ভক্তির উল্লেখ যে সকল স্থলে আছে, দীনেশ বাবু সেই সকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছেন (১ অধ্যায় ৭ পরিচ্ছেদ)। তিনি ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নৈষ্ঠিক হিন্দু রন্ধনশালায় সতর্ক পাহারা দেওয়াই পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া থাকেন। মহাভারতকার বলিয়াছেন, শূদ্রান্ন, শিল্পী ও নিন্দিত ব্যক্তির অন্ন শোণিত সদৃশ।"

শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার পথে যে গ্রামে ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, সেখানে ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করিতেন, যে গ্রামে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেখানে তাঁহার সঙ্গী ভট্টাচার্য্য রন্ধন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং দীনেশ বাবু যে সকল নৈষ্ঠিক হিন্দুকে ঠাট্টা করিয়াছেন, দীনেশ বাবুর অশেষ ভক্তিভাজন শ্রীচৈতন্যদেবকে তাহাদের দলভুক্ত দেখা যায়।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে,—

"খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাজকুল কনোজ হইতে 'নব ব্রাহ্মণ্যদীক্ষিত সাগ্নিক যজ্ঞানুষ্ঠানে পারগ ব্রাহ্মণদিগকে' আনিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মগুরু ও সমাজগুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'তাঁহাদের অধিকারে যুগে যুগে অনেক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। এই বিদ্রোহীদলের সর্ব্বজনস্বীকৃত অধিনায়ক ছিলেন সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব।'"—(৫২ পৃঃ)

দীনেশ বাবুর এই উক্তি যথার্থ নহে। কনোজ হইতে নব্য ব্রাহ্মণ্যদীক্ষিত যে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানে পারগ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম অবশ্য বেদ ও পুরাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মও বেদ ও পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবকে কনোজ হইতে আগত ব্রাহ্মণ-প্রচারিত আদর্শের বিদ্রোহী কিছুতেই বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম যে বেদ ও পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

"জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ"
—মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ

দীনেশ বাবু কল্পনা করিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যদেব বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাহার মূল পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মে।"—(৫২ পৃঃ)

আমরা পূর্ব্বে দেখাইলাম যে, শ্রীচৈতন্য বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে সমর্থন করেন নাই, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত চৈতন্যদেবের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক"
—মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেব যে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ দীনেশ বাবু বলিয়াছেন যে,—

"তন্ত্ররত্নাকরে লিখিত আছে যে, ত্রিপুরাসুর শ্রীচৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"—(৫২ পৃঃ)

শ্রীচৈতন্যদেব তান্ত্রিক ধর্ম্মের কতকগুলি অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন, বিশেষতঃ মদ্য মাংস প্রভৃতির দ্বারা কতকগুলি তান্ত্রিক যে প্রকারে পূজা করিতেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহার বিশেষরূপে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এজন্য তন্ত্ররত্নাকরে শ্রীচৈতন্যদেবকে ত্রিপুরাসুরের অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু এই তান্ত্রিকধর্ম্ম কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এ দেশে আনেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম মিশাইয়া এই তান্ত্রিকধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহা বাঙ্গালা দেশেই

উৎপন্ন। অতএব তন্ত্ররত্নাকরে চৈতন্যদেবের নিন্দা আছে বলিয়া দীনেশ বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কনোজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "নব্য হিন্দুধর্ম্মের" বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, দীনেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। বস্তুতঃ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ-প্রচারিত হিন্দু ধর্ম্মের একটি শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছেন শ্রীচৈতন্য। কারণ, চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে,—

"মহাভারতে জীবে দয়া যথেষ্ট ভাবে প্রচার করিয়াও যজ্ঞে নিহত পশুমাংস ভোজনের ব্যবস্থা দিয়া 'মাংসাশীদের জন্য রক্ষা কবচের কল্পনা করিয়াছেন।'—(৫৩ পৃঃ) 'সেই রন্ধ্রে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দেবস্থানগুলিকে পশুরক্তে রঞ্জিত করিয়া তুলিল'।"

বৈদিক ধর্ম্মের পশুবধকে নিন্দা করিয়া দীনেশ বাবু বৌদ্ধধর্ম্মের যজ্ঞবিরোধিতার প্রশংসা করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই যে, বৌদ্ধধর্ম্মে এরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই যে, বৃথা মাংস ভোজন পাপ। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মে পশুবধেরই নিন্দা আছে, কিন্তু অন্য ব্যক্তি পশু বধ করিলে সেই পশুর মাংস ভোজনকে নিন্দা করা হয় নাই। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশ, তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে মাংস ভোজনের জন্য যত প্রাণিহত্যা হয়, তাহার তুলনায় ভারতবর্ষে মাংস ভোজনের জন্য অনেক কম হত্যা হয়; দীনেশ বাবু বোধ হয় তাহা চিন্তা করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে বৃথা মাংস ভোজন করা পাপ, এই বিশ্বাস হেতু ভারতবর্ষে প্রাণি-বধ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কারণ, যজ্ঞ বা পূজা করিয়া পশুবধ করা প্রত্যহ হইয়া উঠে না; কিন্তু কসাইয়ের মাংস রোজই পাওয়া যায়। যাহাদের মাংসভোজনের প্রবৃত্তি প্রবল, বৃথা মাংস ভোজনের নিন্দা তাহাদের প্রবৃত্তি সংযত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে এরূপ সংযমের ব্যবস্থা নাই। এজন্য কেবল বৌদ্ধ গৃহস্থ নহে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণও অবাধে মাংস ভোজন করিয়া থাকে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে,—

"যজ্ঞে পশুবলির সহিত নরবলিপ্রথার সংযোগ আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, জরাসন্ধ নরবলি দিবেন বলিয়া পরাজিত রাজাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মণিপুরে দেবমন্দিরে ইংরাজকে বলি দেওয়া হইয়াছিল।"—(৫৩ ৫৪ পৃঃ)

কিন্তু মহাভারতে জরাসন্ধের অভীষ্ট নরবলির যথেষ্ট নিন্দা আছে এবং জরাসন্ধকে অসুরপর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে। দীনেশ বাবুই জরাসন্ধের ব্রতপালন, ধর্ম্মযুদ্ধ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তাহাকে "বৃহৎ-বঙ্গের" একজন মহাপুরুষ বলিয়া খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের নিন্দা করিয়াছেন (২৬-২৮ পৃঃ)। দীনেশ বাবু লক্ষ্য করিলেন না যে, যে ব্যক্তি প্রায় শত সংখ্যক পরাজিত রাজাকে দেবমন্দিরে বলি দিতে উদ্যত, তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কয়েকটি ব্রত ও আচার পালন কিছুমাত্র প্রশংসার বিষয় নহে। এবং এই প্রকার দৈত্যকে বধ করিবার জন্য ছদ্মবেশ গ্রহণ করা পাণ্ডবদের পক্ষে দূষণীয় হয় নাই। নরহত্যাকারী ব্যক্তি ধর্ম্মের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না, ইহাই জরাসন্ধ-কাহিনীর প্রতিপাদ্য শিক্ষা। মণিপুরে রাজনৈতিক যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনায় যে নরবলি হইয়াছিল, তাহার জন্য যজ্ঞে পশুবধের ব্যবস্থাকে দায়ী করাও দীনেশ বাবুর ভুল হইয়াছে। মণিপুরে নরবলি যে বৈদিক বা পৌরাণিক ধর্ম্ম অনুসারে করা হইয়াছিল, দীনেশ বাবু তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা কোনও তান্ত্রিক মত অনুসারে করা হইয়াছিল। তান্ত্রিকধর্ম্মের কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান বেদ ও পুরাণপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের বিরোধী।

বিলাতী পণ্ডিতগণ সন্ন্যাসপ্রথার নিন্দা করেন। এজন্য দীনেশ বাবু রামায়ণের মূলনীতি প্রতিপাদন উপলক্ষে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন (৩য় অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ)। রামায়ণ না কি সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরোধী। রামায়ণের নায়ক অবশ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, রামায়ণের মতে সন্ন্যাস গ্রহণ করা অন্যায়। রামায়ণে এ কথা কোথাও বলা হয় নাই। রামায়ণে বলা হইয়াছে যে, রামায়ণ "বেদৈশ্চ সম্মিতং" অর্থাৎ রামায়ণ বেদানুযায়ী গ্রন্থ। অতএব বেদে যে ব্যবস্থা আছে, রামায়ণে তাহার নিন্দা থাকিতে পারে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কথা আছে। অন্য উপনিষদেও আছে। বালিবধ উপলক্ষে শ্রীরামচন্দ্র মনুর নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মনুতে সন্ন্যাসের ব্যবস্থা আছে। এজন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, সন্ন্যাসের নিন্দা করা রামায়ণের উদ্দেশ্য। আর এক কথা—শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু শ্রীচৈতন্যকে আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি কিরূপে সন্ন্যাসের নিন্দা করিতে পারেন?

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—

"গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ নবাগত কনোজিয়া ব্রাহ্মণদের প্রবর্ত্তিত। অবশ্য ব্রাহ্মণেরা অনায়াসে শ্লোক রচনা করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন ও করিতেন, সুতরাং মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণকে তাঁহাদের মতের সমর্থকরূপে দাঁড় করাইতে বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হইত না।"—(৪৭২ পৃঃ)

দীনেশ বাবুর যুক্তি অতিশয় অদ্ভুত! মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের নবাগত কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ যদি ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহসমর্থক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার বাহিরে এই সকল গ্রন্থের যে সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বাল্যবিবাহসমর্থক শ্লোকগুলি নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত না। কিন্তু এরূপ একটি পাণ্ডুলিপিও কি দীনেশ বাবু দেখিয়াছেন? তিনি যদি এইরূপ দুই চারিটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু সকল পাণ্ডুলিপিতেই যখন এই শ্লোকগুলি পাওয়া যাইতেছে, তখন সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, দীনেশ বাবুর প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের কল্পনা ভ্রান্ত। বাস্তবিক বাল্যবিবাহ কেবল বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত নহে। যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই সকল প্রদেশেই প্রচলিত। সুতরাং ইহা বাঙ্গালার কনোজিয়াগণের কীর্ত্তি হইতে পারে না। বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায় যে, রামচন্দ্রের বিবাহের সময় রামচন্দ্রের বয়স ছিল তের এবং সীতার বয়স ছিল সাত। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০ মণ্ডল সূক্তে বৃহস্পতিকন্যা রোমলা ও তাঁহার স্বামী ভাবযব্যের কথোপকথন আছে। রোমলা মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন, ভাবযব্য তাঁহাকে অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া পরিহাস করিতেছেন, রোমলা উত্তর করিতেছেন যে, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক। যদি বাল্যবিবাহই প্রচলিত প্রথা না হইত, তাহা হইলে ভাবযব্যের উক্তি অসঙ্গত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে চাক্রয়ণ ঋষির পত্নীকে আটিকী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আটিকী শব্দের অর্থ—যে স্ত্রী ঋতুমতী হন নাই। সুতরাং বাল্যবিবাহ বেদ উপনিষদের সময়ও দেখা যায়, ইহা কনোজিয়া ব্রাহ্মণদের নূতন ফন্দী নহে। দীনেশ বাবু স্বয়ম্বরপ্রথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু স্বয়ম্বরপ্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ। কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই পিতার কর্ত্তব্য কন্যার বিবাহ দেওয়া; ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে যদি পিতা সে কর্ত্তব্য পালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে কন্যা স্বজাতীয় কোনও ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবেন, ইহাই স্বয়ম্বরপ্রথার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য মনু স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বয়ম্বর বিবাহ অপেক্ষা ব্রাহ্মবিবাহ শ্রেষ্ঠ—তাহাও বলা হইয়াছে। যৌবনে কামের তাড়নায় যুবক-যুবতী যে পরিণয়ে আবদ্ধ হইবে, তাহা অপেক্ষা সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতামাতা ধীর, স্থির ভাবে যে সম্বন্ধ করিবেন, তাহা যে অধিকতর কল্যাণজনক হইবে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। এবং পিতামাতার হাতে বর-নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহই সঙ্গত হয়, নচেৎ কন্যা বড় হইলে তাহার একটা স্বতন্ত্র অভিমত হয় এবং তাহা পিতার মতের অনুরূপ না হইতেও পারে। কন্যা রূপকে প্রাধান্য দিবে, পিতা গুণকে প্রাধান্য দিবে, ইহাই স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর কল্পনা একান্ত অযৌক্তিক।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষে কোনও সময় গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ বৈদিক আচার ও যাগযজ্ঞ চালাইয়াছেন, কখনও বা বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রভাবে অহিংসামূলক জনমত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে।"—(১২৩ পৃঃ)

দীনেশ বাবু বৈষ্ণবধর্ম্মকে যজ্ঞবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের কোঠায় ফেলিয়া ভুল করিয়াছেন। রামানুজ আচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন প্রধান আচার্য্য। "অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ ন শব্দাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৫) এই সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞে পশুবধে কোনও দোষ নাই, ইহা উত্তম কর্ম্ম। মধ্বাচার্য্য আর এক জন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য। তাঁহারও ঐ মত। তিনি ঐ সূত্রের ভাষ্যে বরাহপুরাণ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"হিংসা ত্ববৈদিকী যাতু তয়ানর্থক্যো ধ্রুবং ভবেং।
বেদোক্তয়া হিংসয়া তু নৈবানর্থঃ কথঞ্চন॥"

বস্তুতঃ সকল বৈষ্ণব আচার্য্যেরই এই মত। কারণ, সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন, যজ্ঞে পশুবধ বেদের ব্যবস্থা, তাঁহারা কেহ বেদের ব্যবস্থাকে

মন্দ বলিতে পারেন না। রামানুজ বলিয়াছেন যে, চিকিৎসক রোগীর অঙ্গচ্ছেদ করিলেও রোগীর হিতকারী, সেইরূপ ঋত্বিক্ পশুবধ করিলেও পশুর হিতকারী। কারণ, বেদ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। অবশ্য দীনেশ বাবু এই কথা অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব-আচার্য্যই ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বেদবিহিত পশুবধের নিন্দা করিয়াছেন, * ইহা পরস্পরবিরোধী হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্ম বেদবিরোধী ; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। সুতরাং বৌদ্ধ ও জৈনমতের সহিত বৈষ্ণবমতের মূলগত প্রভেদ আছে। দীনেশ বাবু এই তিন মতকে এক কোঠায় ফেলিয়া ভুল করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> "প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
> শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই ত প্রমাণ॥"
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ পরিচ্ছেদ

শঙ্করাচার্য্যের জীবনী গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধগণের সহিত বিচারে কিরূপে তাঁহার শাণিত যুক্তির সাহায্যে বৌদ্ধমত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহা রূপকচ্ছলে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধদের শির কুঠার দ্বারা কর্ত্তন করিয়া, তাহা উদূখলে চূর্ণ করিয়া দিলেন। বৌদ্ধমতের শ্রেষ্ঠ যুক্তিগুলিকে শির বলা হইয়াছে, শঙ্করের যুক্তিগুলিকে কুঠার বলা হইয়াছে, 'বৌদ্ধযুক্তি' খণ্ডন করিয়া শঙ্কর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাই বলা হইয়াছে যে, শির কাটিয়া উদূখলে চূর্ণ করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু এই রূপক বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, শঙ্করাচার্য্য সত্যসত্যই এই ভাবে বৌদ্ধদিগকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন (৯ পৃঃ)। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অমানুষিক কার্য্য করিতে পারেন, ইহা দীনেশ বাবু যে বিশ্বাস করিতে পারেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের প্রতি এইরূপ অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে, ইহাও বড় দুঃখের বিষয়।

দীনেশ বাবুর গ্রন্থে অনেক মূল্যবান্ তথ্য আছে। কিন্তু তিনি যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলে গুরুতররূপে ভ্রান্ত এবং পরস্পরবিরোধী। এই প্রবন্ধে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)।

* দীনেশ বাবু ১২২ পৃষ্ঠায় "আর্য্যগণের যজ্ঞের বীভৎসতা"র নিন্দা করিয়াছেন।

পরিত্রাণ

আর কি কখনো হবে দেখা ?—
দস্যুর হাতে লুণ্ঠিত হয়ে মরুমাঝে এলে একা-একা!
ছিল নাকো সেথা ছায়া তরু, জল-লেশহীন ধূ ধূ মরু
ভেবেছিলে ভীতা কপোতী গো! হায়,ভালে কিবা আছে লেখা!

নীড়-ছাড়া পাখী উড়ে ঝড়ে—
তাতার দস্যু তস্কর-হাতে আকাশ হইতে এসে পড়ে!
সে সুখে সোনার খাঁচা কেনে, নব-অঙ্কুর রাখে এনে,
তুমি নীড়-হারা পাখীটি গো! মন প'ড়ে রয় নিজ ঘরে!

তোমার শুখায় ভয়ে প্রাণ—
শীষ দিয়ে দিয়ে সে যবে তোমায় শিখাইতে চাহে কোনো গান,
তুমি ইতি-উতি চাহ আর ভগবানে স্মর অনিবার—
দস্যুর মন ভিজে যায়, দয়া করে তোমা ভগবান্!

তোমায় অভয় দেয় সে যে—
সমবেদনার করুণতা তার হৃদয়ের কোণে ওঠে বেজে।
বলে "ভীরু পাখী নাহি ভয়, হউক পূরবে রবি উদয়
ছেড়ে দিব আমি নিজ হাতে, চিরতরে যেয়ো মোরে ত্যেজে।"

প্রভাতে তপন রাঙা রাগে—
পূর্ব্ব-গগন উজলিয়া ওঠে, দস্যু তখনো নিশা জাগে!
ধীরে সযতনে কাছে এসে, খাঁচার দুয়ায় খোলে হেসে,
পাখী উড়ে যায়,—আঁখিজলে, তখন আঁখির বাঁধ ভাঙ্গে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

এমার্সন ও বেদান্ত

মার্কিণ দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমার্সনের জীবনচরিত-লেখক মিঃ ভান ব্রুকস্ (১) বলেন, "গির্জ্জার গোঁড়ামিতে বিরক্ত হইয়া এমার্সন প্রাচ্যের দিকে, বিশেষতঃ ভারতের দিকে লক্ষ্যপাত করেন এবং গীতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থের আধ্যাত্মিক আলোকে জীবন-প্রদীপ

এমার্সন

মোক্ষমূলার

প্রজ্বালিত করেন। তাঁহার মতবাদগুলির অধিকাংশ অনুপ্রেরণা তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতেই পাইয়াছিলেন।" ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম নেতা রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এমার্সনের সাধনার স্থল (বোষ্টন সহরের নিকটবর্ত্তী) কংকর্ডে গমন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানোপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "তিনি (এমার্সন) এত হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন যে, মার্কিণ দেশে তাঁহার আবির্ভাব ভুগোলের একটা ভুল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার ভারতে জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল। কারণ, তাঁহার স্বজাতি মার্কিণগণ অপেক্ষা হিন্দুগণই বোধ হয় তাঁহার অধিকতর আত্মীয় ছিল।"

ডাঃ আর্থার ক্রাইষ্টি (২) বলেন, এমার্সনের বেদান্ত-সাহিত্যের প্রতিই আন্তরিক প্রীতি ছিল এবং বেদান্ত গ্রন্থই তিনি সমধিক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি যে বৌদ্ধশাস্ত্র আদৌ পাঠ করেন নাই, এমন নহে—তবে তৎপঠিত বৌদ্ধ-গ্রন্থের সংখ্যা অত্যল্প; কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের নৈরাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিত না। তিনি মোক্ষ-মূলার অনূদিত (ইংরেজিতে) 'ধম্মপদ' ও টি, রোজারস্

(1) The life of Emersan by Mr. Van Wyck Brooks.

(2) "Emersan's Oriental Reading" নামক প্রবন্ধ in Aryan Path. Sept. 1933

সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত বুদ্ধঘোষের পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই কয়েকখানি বৌদ্ধগ্রন্থ তখন কংকর্ডে প্রচলিত ছিল। ডাঃ আর্থার ক্রাইষ্টি এমার্সন, থোরো, হুইটিয়ার, ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান প্রভৃতি আমেরিকার মনীষিগণের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব আলোচনা করিয়া এক গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ (৩) লিখিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

এমার্সনের কংকর্ডস্থ স্বীয় গ্রন্থাগারে এবং হার্ভার্ড কলেজ লাইব্রেরী ও বোষ্টন এথেনিউয়াম হইতে তিনি যে সকল বেদান্ত গ্রন্থ আনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা ডাঃ ক্রাইষ্টি সংগ্রহ করিয়াছেন। হোরেশ হেম্যান উইলসন অনূদিত 'ঋগ্বেদ' এবং জন ষ্টিভেনশন্ অনূদিত 'সামবেদ' (সংহিতা অংশ) তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। তবে খুব সম্ভবতঃ 'ব্রাহ্মণাদি' তিনি অধ্যয়ন করেন নাই। উপনিষদ্‌গুলি তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল এবং রাজা রামমোহন রায় অনূদিত 'ঈশোপনিষদ্' ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি সযত্নে অধ্যয়ন করেন। এমার্সনের (aunt) খুড়ীমা, মেরি মুডি এমার্সন তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। রামমোহন যখন কংকর্ডে গিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তখন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মেরি মুডি পত্র লিখিয়া যুবক এমার্সনকে রামমোহনের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে উৎসাহিত করেন। এ ঙ্কো য়ে টি ল্ ডুপারনের উপনিষদে (Anquetil Duperon's Oupnekhat) বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি অনূদিত আছে। উহা পাঠ করিয়া জার্ম্মাণ দার্শনিক সোপেন হাওয়ারের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এমার্সন উহা সাগ্রহে বারংবার পাঠ করেন। Bibliotheca Indicaতে ই, রোয়ার সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত ঈশ, কেন, কঠ, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রধান অংশগুলি প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ এই গ্রন্থ ছিল এমার্সনের পাঠ্য এবং এইগুলি অধ্যয়ন করিয়া তিনি 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মার অমরত্ব' প্রভৃতি কবিতা লেখেন। মহাভারত ও রামায়ণের কিয়দংশ তাঁহার অধীত ছিল, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পুস্তক ছিল—গীতা। চার্লস উইলকিন্সের অনূদিত ভগবৎগীতাখানি তাঁহার নিত্যসঙ্গী

(3) The Orient in Amrican Tarnscendentalism By Dr. Arther Christy, Ph. D.
—(Columbia University Press)

ছিল এবং কক্‌বার্ণ টমসনের গীতাও তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। কোন বন্ধুকে এমার্সন গীতা সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন —"প্রিয় বন্ধু, গীতা পাঠ করিয়া অদ্ভুত আনন্দ ও প্রশান্তি পাইয়াছি। উহা আমার জীবনের প্রথম ও শেষ পুস্তক। উহা পাঠে অন্য জগতের সংবাদ পাইয়াছি—উহাতে ক্ষুদ্র অনাবশ্যক কিছুই নাই, উহার ভাব বিরাট, গভীর ও যৌক্তিক। আমাদের সমস্যাগুলিই অন্য যুগ ও অন্য দেশের জ্ঞানিগণ উহাতে আমাদের জন্য চিরতরে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।"

সার উইলিয়ম জোন্সের অনূদিত 'মনুসংহিতা' এমার্সনের লাইব্রেরীতে ছিল এবং গীতার পরে এই পুস্তকখানি আমেরিকার আধ্যাত্মিক চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উইলসনের 'বিষ্ণুপুরাণ' পাঠান্তে 'মায়া' 'হেমাত্রেয়' প্রভৃতি কবিতা তিনি রচনা করেন। ফরাসী-প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ ইউজেন বার্ণফের 'ভাগবত-পুরাণ' পাঠান্তে এমার্সন বলিয়াছিলেন, "আহা, নতজানু হইয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত।" হেন্‌রী হার্ট মিলম্যানের 'নল-দময়ন্তী' সম্বন্ধে তিনি সুন্দর মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; "বোষ্টন নগরীর সংবাদপত্রসমূহের তাজা খবর অপেক্ষা এই বইখানি আমার অধিক অন্তরের বস্তু। ইহাতে আমি সতর্কতা ও সান্ত্বনা উভয়ই পাইতেছি। বইটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক।" উইলসনের 'মেঘদূত' চার্লস, উইলকিন্স অনূদিত বিষ্ণুশর্ম্মার 'হিতোপদেশ,' জৈমিনির 'মীমাংসাদর্শন', ভট্টের 'ভাষাপরিচ্ছেদ', মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ ও সার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ কর্ত্তৃক দুই প্রকারে অনূদিত 'শকুন্তলা' তিনি পাঠ করিয়াছিলেন।

ইংরেজি অনুবাদ ব্যতীত ইউকেন বার্ণফের ও গার্শিন টেসি প্রভৃতির ভারতীয় গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিয়াও তিনি বেদান্ত-জ্ঞান-পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। অনুবাদ-গ্রন্থ ছাড়া ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে লিখিত পুস্তকও তিনি যথেষ্ট পাঠ করিয়াছিলেন; যথা:—উইলসনের 'Theatre of Hindus,' থমাস্‌ আরস্কিন পেরী সাহেবের "Oriental life," কোলব্রুকের "Hindu Law" এবং উইলিয়াম জোন্সের গ্রন্থাবলী তাঁহার অধীত ছিল। ইংরেজীতে লিখিত জর্জ্জ স্মলের 'সংস্কৃত-সাহিত্য', উইলিয়াম ওয়ার্ডের 'হিন্দুসাহিত্য', বেলান্টাইনের 'বেদান্ত', উইলিয়াম ব্রকী সাহেবের 'ভারতীয় দর্শন' এবং ডেভিড আর্কুহার্টের 'শ্রাদ্ধ' এবং এতদ্ব্যতীত জেম্‌স মিল, জন মার্শম্যান প্রভৃতি লিখিত ভারতের ইতিহাসও যত্নসহকারে পাঠ করিতেন। এত ভারতীয় সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বেদান্তের সহিত তাঁহার চিন্তারাশির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। এমার্সন ছিলেন আজন্ম ভারত-প্রেমিক এবং হিন্দুদর্শন বা বেদান্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও মজ্জাগত ছিল।

সক্রেটিসের ন্যায় এমার্সন উদারমতাবলম্বী ও এক জন

রাজা রামমোহন রায়

বিশ্বনাগরিক ছিলেন। 'আপনি কোন্‌ দেশবাসী?' এই প্রশ্ন সক্রেটিসকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার জন্মস্থান কোরিন্থ বা কর্ম্মক্ষেত্র এথেন্স নগরবাসী এ কথা বলিতেন না। তিনি নিজেকে বিশ্বনাগরিক (citizen of the world) বলিতেন। রোমান দার্শনিক এপিকেটেটাস্‌ বলিতেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যখন এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ (kinship) বর্ত্তমান, জীবত্বের বীজ (seeds of being) যখন ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, তখন ঈশ্বরজ্ঞ মহাপুরুষকে ঈশ্বর-তনয় (son of God) বলা উচিত এবং এইরূপ ব্যক্তিকে

কোন বিশেষ দেশবাসী না বলিয়া জগদ্বাসী বলাই কর্ত্তব্য। এমার্সন বলিতেন যে, 'মহাপুরুষগণ ও তাঁহাদের অনুভূত আধ্যাত্মিক জ্ঞান কোন ব্যক্তি বা দেশের সম্পত্তি নহে, তাঁহারা ও তাঁহাদের সিদ্ধি-সম্পদ্ সর্ব্বদেশের সকল সাধকের ধন। প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব আধ্যাত্মিকতার উপর আরোপ করা যায় না।' কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী ভদ্রলোক এমার্সনকে একবার বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্ম ও দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, খ্রীষ্টানধর্ম্মই একমাত্র সত্য। প্রত্যুত্তরে এমার্সন বলিলেন, ইহাতেই প্রমাণিত হয়—আপনি কি সঙ্কীর্ণ মনে এই সকল পাঠ করিয়াছেন।

ডাক্তার উইলসন

সার উইলিয়াম জোন্স

বেদান্তের ভাবে এমার্সন এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলিতে তিনি বেদান্তের মূলতত্ত্বগুলি প্রচার করিতেন। উহাতে খ্রীষ্টান-সমাজ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয় এবং সেই জন্য তাঁহাকে গির্জ্জার পাদ্রীপদ ত্যাগ করিতে হয়। সমাজের ভয়ে তিনি তাঁহার দৃঢ় ধারণা বর্জ্জন করিলেন না, এমনই সত্যনিষ্ঠ তিনি ছিলেন। রাশিয়ার ঋষি টলষ্টয়ও উদার মতের জন্য গোঁড়া পাদ্রীগণ কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হন। এমার্সন তাই এক স্থানে বলিতেছেন, "জনসাধারণের ভাবে চলিলে সমাজে বাস করা সহজ, আর নির্জ্জনে থাকিলে নিজের ভাবে থাকা সম্ভব; কিন্তু যিনি সমাজের মধ্যে থাকিয়াও শান্ত ও সুমিষ্ট ভাবে নির্জ্জনের এবং স্বীয় মতের স্বাধীনতা রক্ষা করেন, তিনিই মহাপুরুষ।" এমার্সন নিজ জীবনে এইরূপ আদর্শ পালন করিয়া হিন্দুর ন্যায় কর্ম্মজীবনে বেদান্ত সাধন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির মধ্যে নানা স্থানে বেদান্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া বেদান্তের প্রতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। "Quotations and Originality" নামক প্রবন্ধে এমার্সন লিখিতেছেন, "খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ যাহা নিজ ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রচার করিতেন, জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ তুলনামূলক অধ্যয়ন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত। ভারতীয় শাস্ত্র অনূদিত ও পাশ্চাত্যে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীদের গোঁড়ামী মনীষিগণ বুঝিয়াছেন। নৈতিক জ্ঞান বা নীতিতত্ত্ব খ্রীষ্টানধর্ম্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের প্রচলিত আখ্যায়িকাগুলি প্রাচীন ভারত হইতে আনীত।" এমার্সন তাঁহার "Persian Poetry"তে লিখিয়াছেন, "এশিয়ার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের হিন্দুগণই অধিকতম প্রাচ্যভাবাপন্ন (oriental)। নীতি-দর্শন উদ্ভাবনায় ও আলোচনায় আর কোন জাতি তাহাদের সমকক্ষ নহে।"

উপনিষদাদি বেদান্ত গ্রন্থে যাহাকে পরমাত্মা বলা হয় এমার্সন তাহাকে 'over-soul' বলিতেন। তিনি তাঁহার 'Over-soul' নামক প্রবন্ধে মানবাত্মার যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বেদান্তানুযায়ী। 'Worship' নামক প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "সত্তা (Law)র প্রকৃত সংজ্ঞার জন্য আমরা হিন্দুশাস্ত্রের নিকট ঋণী। কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থে এই ভাবের তুলনা নাই। যাহা নামহীন, বর্ণহীন, যাহার হস্তপদ নাই, যিনি অণু হইতেও অণু ও মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি কর্ণ ব্যতীত শ্রবণ করেন, চক্ষু ব্যতীত দর্শন করেন, পদ ব্যতীত গমন করেন এবং হস্ত ব্যতীত ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত সত্তা বা আত্মা।" উহার মূল ইংরেজি অংশ পাঠ করিলে মনে হয়, উহা উপনিষদের কোনও শ্লোকের অনুবাদ। এমার্সনের "Brahma" নামক একটি কবিতা আছে, পাঠকের অবগতির জন্য তাহার একটি অংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"If the red slayer thinks he slayes,
or if the slain thinks he is slain;
They know not well the subtle ways,
I keep, and pass, and turn again."

উহার অনুবাদ অনাবশ্যক। ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকের অনুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। "Immortality" নামক প্রবন্ধে এমার্সন কঠোপনিষদ্ হইতে নচিকেতার সমগ্র উপাখ্যানটি বর্ণনা করিয়া আত্মার অমরত্ব বিবৃত করিয়াছেন। বোষ্টন বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দজী (৪) বলেন যে, এমার্সনের গ্রন্থাবলীকে বেদান্তের পাশ্চাত্য ভাষ্য বলা উচিত।

এমার্সন তাঁহার "Progress of Culture" নামক প্রবন্ধে প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পদ্ তুলনা করিয়া বলিতেছেন, "প্রাচীন গ্রীস ও রোম, তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইউরোপের অর্জ্জিত জ্ঞানভাণ্ডার দর্শনে আমরা চমৎকৃত হই এবং তাহার জ্ঞানলাভ করিয়া গৌরবান্বিত মনে করি। তখন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা ও বেদ প্রভৃতি অধিকতর প্রাচীন ও উন্নত ভারতীয় শাস্ত্রের কথা আর কি বলিব? এই সকল জ্ঞান-গ্রন্থের সমতুল্য পুস্তক জগতে আর নাই। তাঁহাদের গ্রন্থকারগণের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ অনায়াসেই প্রতিপন্ন হয়।"

বেদান্তের হিরণ্যগর্ভ বা বিশ্বমনের ধারণা এমার্সন গ্রহণ করিয়া লিখিতেছেন,—"একটি সমষ্টি-মন বিদ্যমান, উহা প্রত্যেক ব্যষ্টি-মনের অন্তর। প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্বমনের এক একটি মুখ মাত্র। যিনি একবার এই রাজ্যে প্রবেশ করেন, তিনি চির-স্বাধীন হন এবং এই সমগ্র মনোরাজ্যের অধীশ্বর হন। এই প্রদেশে প্রবেশের সৌভাগ্য যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি প্লেটোর মত চিন্তা করিতে পারেন, ঋষির মত অনুভব করিতে পারেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান্ হন। প্রত্যেক মানুষ যেন এই বিশ্বমনের এক একটি বিগ্রহ এবং ব্যষ্টি-মনে সমষ্টি-মনের সমস্ত গুণ ও শক্তি সদা নিহিত থাকে। মুসা ও মনু জরাথুষ্ট্র ও সক্রেটিশ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সাম্রাজ্যে চির-নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন।" সাধনার দ্বারা ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতির পথে মানুষ যখন ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার উপাধি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশেষে বিশ্বমনের চির-স্তরে যুক্ত ও একীভূত হয়, তখন বিশ্বমন তাহার শরীর-মন অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে এবং মানুষ স্বীয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হয়। বেদান্তের এই ভাবটি এমার্সন তাঁহার "Immortality" নামক প্রবন্ধের নিম্ন-উদ্ধৃতাংশে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ;—"যে ব্যক্তি সামান্য একটি গৃহের বা স্বীয় জীবনে শৃঙ্খলা আনিতে পারে না—তাহাকে রাজ্য-পরিচালনার ভার

টলষ্টয়

(4) See "Emersan and Vedant," By Swami Paramananda, Boston.

দেওয়া বিপজ্জনক। এমন লোক অনেক আছে—যাহাদের কাছে এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করা শক্ত, একটি দিন যাহাদের নিকট কাটে না, তাহাদিগকে অনন্ত যুগ দিলে কি হইবে? আত্মার অমরত্ব বা কালের অসীমতা তাহারা ধারণা করিবে কিরূপে? কিন্তু পরমাত্মার পূর্ণতার অধিকারী হইতে হইলে ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ধীরে ধীরে উচ্চ চিন্তা করিতে করিতে মানুষ ক্রমবিকাশের পথে আত্মার অজত্ব, অজরত্ব ও অমরত্বে বিশ্বাসী হয়। মনের প্রত্যেক চিন্তার মধ্যে একটি সূক্ষ্মতর চিন্তা লুক্কায়িত, প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে একটি গভীরতর চরিত্র নিহিত, উহা প্রথমে ধারণা করিতে হয়। যুবক শিশুসুলভ সারল্য ও ও চাঞ্চল্য অনায়াসে ত্যাগ করে, মানুষ যৌবনের কল্পনা ও কুশলতা বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করে না, সর্ব্বশেষে বিশ্বমনের সহিত সংযুক্ত হইলে মানুষ অবলীলাক্রমে মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিয়া দেবত্বের অধিকারী হয়। এই অবস্থায়ই মানুষ ঈশ্বরের নর-নারায়ণের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।"

এমার্সনের মতে বেদান্তের সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন সত্যসমূহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গ্রন্থে সমান ভাবে বিদ্যমান। তবে সামাজিক সংস্কার ও অজ্ঞ ধারণার বশীভূত হইয়াই আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তিনি বলেন, "স্বর্গের ভাষা দেবদূতগণের এত প্রিয় যে, উহা ব্যতীত মানুষের ভাষায় তাঁহারা কথা বলিতে চান না। লোকে বুঝুক আর নাই বুঝুক, জ্ঞানী দেবভাষায় তাঁহার বাণী প্রচার করিবেন।" সত্যান্বেষণ যদি আন্তরিক হয়, তাহা হইলে সত্য কালে প্রকাশিত হইবে। সত্য লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডী অতিক্রম করা আবশ্যক। মানুষ যতই ব্যক্তিগত ধারণার অধীন হন, ততই তিনি দৈবী সম্পদ হইতে দূরে চলিয়া যান। এমার্সন বলেন,—"Every personal consideration we allow costs us heavenly stato." এমার্সন বেদান্তের কর্ম্মবাদ বা জন্মান্তরবাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইহাকে Law of Compensation বলিতেন। তিনি তাঁহার Compensation নামক সারগর্ভ প্রবন্ধে কর্ম্মবাদের একটি সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উপরি-উক্ত প্রবন্ধে বলিতেছেন,—"বাল্যকাল হইতেই এই কর্ম্মবাদ বিষয়ে কিছু লিখিবার খুব আগ্রহ ছিল। যৌবনে দেখিলাম যে, পাদ্রীগণ গির্জ্জার বেদী হইতে যাহা প্রচার করেন, তাহা অপেক্ষা আমি ও অন্যান্য শ্রোতা অধিক জানেন। কর্ম্মবাদ উত্তমরূপে অবগত হইলে উহা জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল দুর্গমপথে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় সহায়ক হইবে। ইহার সারমর্ম্ম এই যে, মানবতার মধ্যে দেবত্বের রশ্মিকণা আচ্ছাদিত আছে। বাইবেলে কথিত Last Judgment-এর গূঢ়রহস্য এই কর্ম্মবাদের আলোকে বুঝিলে উহার প্রকৃত দার্শনিক ভিত্তি জানা যাইবে।" এমার্সনের মতে কর্ম্ম দুই প্রকারে ফল প্রসব করে: প্রথমতঃ আত্মাতে, দ্বিতীয়তঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে। অবস্থার অলঙ্ঘ্যনীয় পরিবর্ত্তনকে আমরা কর্ম্মফল বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও প্রধানভাবে কর্ম্মফল আত্মার উপর গভীর মসীরেখা পাত করে। অপরাধ ও তাহার ফল এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটি কুসুম। অপরাধজাত আনন্দ-কুসুমের মধ্যেই শাস্তি-কীট লুক্কায়িত থাকে। কর্ম্মফল ভাল হউক, মন্দ হউক, মানুষ এড়াইতে পারে না।" এমার্সনের ভাষায়:—"Curses always recoil on the head of him who imprecates them. If you put a chain around the neck of slave, the other end fastens itself around your own. Love for Love; Blood for blood." তিনি বলেন;—"একটি ছুরিকা ধার দেওয়া হইতে নগর-নির্ম্মাণ বা কাব্য-প্রণয়ন পর্য্যন্ত মানুষের পরিশ্রম সর্ব্ব আকারে কর্ম্মরহস্যই উদ্ঘাটন করিতেছে।" আবার তিনিই বলিতেছেন, কর্ম্মই জীবনরহস্যের সবখানি নহে। আত্মা কর্ম্ম নহে, কর্ম্ম আত্মার অস্থায়ী অবস্থামাত্র। আত্মার অস্তিত্বে ও আনন্দস্বরূপে বিশ্বাসী হইলে কর্ম্মের কুহেলিকা অপসৃত হয়। অবস্থার বৈচিত্র্য ভেদ করিয়া আত্মবিশ্বাসী, প্রেমের দ্বারা সব বস্তু ও ব্যক্তিকে নিজের বিভিন্ন মূর্ত্তি মনে করিয়া চির-শান্তির অধিকারী হয়। এমার্সন বলেন, "Love reduces mountainous inequalities, as the sun melts the ice-berg in the sea. The heart and soul of all men being one, this bitterness of His and Mine ceases. His is mine. I am my brother and my brother is me." আত্মার সর্ব্বভূতে অনুভূতি হইলে যে দেবদুর্লভ অবস্থা লাভ হয়—এইরূপ বর্ণনা উপনিষদ্ ও গীতার অনেক শ্লোকে আছে।

এমার্স ন বলেন, "we are idolaters of the old." অর্থাৎ আমরা অতীতের প্রাণপূজারী। আত্মার স্বর্গীয় সম্পদে বিশ্বাস হারাইয়াছি বলিয়াই আমরা দুঃখ-দৈন্যে এত অভিভূত হই। আত্মা মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদিগকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিতে পারে, ও নবীন সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে পারে। আত্মানন্দের একটি তরঙ্গ জীবনের দুঃখসমুদ্র শুকাইয়া দিতে পারে।" "পাশ্চাত্যদর্শন সহস্র সহস্র বৎসর আত্মার সন্ধান না পাইয়া অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়াছে। মানুষের মধ্যেই বিরাট আত্মা, অনন্ত আত্মা রহিয়াছে।"

'কেন উপনিষদে' আত্মার বর্ণনাক্রমে বলা হইয়াছে যে, আত্মা চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য এবং প্রাণের প্রাণ। এমার্স ন আত্মার সংজ্ঞা এইরূপ দিয়াছেন, "The soul in man is not an organ, but animates and exercises all the organs; is not a function or faculty like memory but a light; is not the intellect or the will, but the master of the intellect and will; is the back ground of our being." এমার্স ন আরও বলেন যে, "মানুষ একটি জীবন্ত মন্দির; এই মন্দিরের গভীরতম প্রদেশে অসীম জ্ঞান ও অনন্ত কল্যাণ নিহিত। মানুষের বাহ্য অংশ (apparent) হচ্ছে মানুষ কর্ত্তা, ভোক্তা, পাতা ইত্যাদি। আত্মাই প্রকৃত মানুষ—এই প্রকৃত মানুষ (the real man) কর্ম্মের পর্দ্দার পশ্চাতে অবস্থিত।" একটি প্রবাদ আছে যে, 'God often comes to us without bell.' মানুষের নিকট ঈশ্বর কখন কি ভাবে উপস্থিত হন, তাহা জানা যায় না। তাঁহার আগমনের কোন বিশেষ পূর্ব্বচিহ্নও সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। এমার্স ন বলেন, "ঈশ্বরই মানুষরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। মানুষকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করিলেই তাহা ঈশ্বরকে করা হয়। এমার্স ন জনৈক বৈদান্তিকের ন্যায় বলেন যে, দেশ-কালের পরিচ্ছদে আত্মা আবৃত। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্রভাব মনের উপর এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে, দেশ কালের প্রাচীরকে অভেদ্য ও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশ ও কাল আত্মার অস্থায়ী আবরণ মাত্র। আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-কালের দূরত্ব অন্তর্হিত হয়। শত শতাব্দী ও সহস্র মাইলের দূরত্ব ক্ষণমাত্রে অতিক্রম করিয়া আত্মদর্শন উপস্থিত হয়।" এমার্স ন বলেন, "we are wiser than our soul." অর্থাৎ অন্তর্নিহিত জ্ঞানের সংবাদ আমরা রাখি না বলিয়াই আমরা নিজেকে এত অজ্ঞ মনে করি।

এমার্স ন স্বীকার করেন, আত্মদ্রষ্টা মানব সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অন্য ভাবে বিচরণ করেন বলিয়া সমাজ তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। Blasted with excess of light' এই ভাষায় তিনি আত্মানুভূতি ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বেদান্তের আলোকে মহাপুরুষগণের অনুভূতিসমূহের দার্শনিক বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সক্রেটিশ, প্লটিনাশ, পরফাইরি, পল, প্লেটো, বেহেমান, জর্জ্জফক্স, শোয়েডেনবুর্গ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণের অনুভূতি (tranco) প্রভৃতিকে তিনি আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি বিভূতিকে তিনি আত্মজ্ঞানের পরিমাপক বলিয়া মনে করেন না। তিনি পণ্ডিত মনীষী ও আত্মজ্ঞ মুনির সুন্দর প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া বলেন, 'কবি ও দার্শনিকগণ বাহ্য অভিজ্ঞতা (from without) বা বুদ্ধির ভূমি হইতে কথা বলেন, আর সক্রেটিশ ও যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি মুনিগণ আত্মভূমি হইতে (from within) কথা বলেন। তাই মুনিগণের বাক্য এত হৃদয়স্পর্শ করে এবং শত শত বৎসর অতীত হইলেও শক্তিহীন হয় না। এমার্স ন বলেন যে, ভক্ত ও ভগবানের মিলন হইলে 'The simplest person becomes God.' আত্মজ্ঞ পুরুষের সম্বন্ধে উপনিষদে আছে, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।' আত্মজ্ঞ মানুষের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা অসাধারণ। এইরূপ ব্যক্তি অজ্ঞ বা উন্মত্তের মত থাকিলেও তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে ও কার্য্যে ভাগবতভাব বিকশিত হয়। তুলা যেমন অগ্নিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, মেঘ যেমন সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না, অজ্ঞান তেমন জ্ঞান আচ্ছাদিত করিতে পারে না। *

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

* সার উইলিয়ম জোন্সের ও ডাক্তার উইলসনের চিত্র বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত মর্ম্মরমূর্ত্তি হইতে গৃহীত।

২৫শ লহর

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের গোয়েন্দাগিরি

আর্দ্দালী প্রস্থান করিলে ব্যাঙ্কার হর্ণিব্রো থর্স বিকে বলিল, "বেন্থামের এখানে কি প্রয়োজন? কি উদ্দেশ্যে সে ইয়র্ক সায়ার হইতে এত দূরে আসিয়াছে?"

থর্সবি বলিল, "তাহা জানিবার জন্য আমারও আগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু সে জন্য তোমার উৎকণ্ঠার কোন কারণ নাই, কোন রকম গণ্ডগোল হইয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না; তবে—এখন তোমার একটু আড়ালে যাওয়াই ভাল।"

অল্পকাল পরে বেন্থাম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টেবলের পাশে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া থর্সবি সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "তুমি কি উদ্দেশ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, বেন্থাম! আমার ধারণা ছিল, গতকল্য অপরাহ্নে আমরা সন্তোষজনক ভাবেই সকল সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলাম। তবে আর এখানে হঠাৎ তোমার আগমনের কি প্রয়োজন হইল? তোমার মুখ বিবর্ণ, শুষ্ক; তুমি কি অসুস্থ হইয়াছ? অসুস্থ দেহে এত দূরে কেন আসিলে?"

সুইনফোর্ডের মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের খাতাঞ্জীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থর্সবির মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার মনে হইল, বেন্থাম অসুস্থ বা কোন কারণে আতঙ্কাভিভূত হইয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর দেহের ন্যায় থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। উৎসব উপলক্ষে সেই কক্ষে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিল; সেই সকল অতিথির সম্মুখে বেন্থাম কোন্ অপ্রীতিকর এবং আপত্তিজনক প্রসঙ্গের আলোচনা করিবে তাহা বুঝিতে না পারায় থর্সবি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে উত্তেজিত হইল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে দুই হাতে বেন্থামের ঘাড় মোচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিবে; কিন্তু তাহাকে সেই ইচ্ছা দমন করিতে হইল।

থর্সবির ভাবভঙ্গী দেখিয়া বেন্থাম অধিকতর ভীত হইল; সে স্খলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমাকে বাধ্য হইয়া এত দূরে আসিতে হইয়াছে। প্রয়োজন না থাকিলে কি আমি এই অসুবিধা সহ্য করিতাম? আমার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, অপরিহার্য্য।"

এই কথা শুনিয়া থর্সবি তাহার হাত ধরিয়া পাশের একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিল; তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক, অপরিহার্য্য? কিরূপ প্রয়োজন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি মন স্থির করিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল।"

অতঃপর সে বেন্থামের মুখের দিকে চাহিয়া, মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে তুমি গলাটা ভিজাইয়া সরস কর। মনে হইতেছে—তোমার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে, এবং তুমি পরিশ্রান্ত। ইহা পানে তোমার উপকার হইবে।"

থর্সবি টেবল হইতে ব্র্যাণ্ডির গ্লাস লইয়া তাহা বেন্থামের সম্মুখে প্রসারিত করিল, এবং তাহা পান করিবার জন্য তাহাকে ইঙ্গিত করিল।

মদ্যে সিলাস বেন্থামের অরুচি ছিল না; কিন্তু সে কৃপণ, মদ্য ক্রয় করিয়া পান করা ব্যয়সাধ্য, এজন্য অর্থব্যয় করিয়া মদ্যপানে সে অভ্যস্ত ছিল না; কিন্তু কেহ তাহাকে মদ্য উপহার দান করিলে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিত না। সে থর্সবিপ্রদত্ত মদ্য এক নিশ্বাসে নিঃশেষিত করিল।

ব্র্যাণ্ডি পানে তাহার অবসাদ দূর হইল। সে গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর থর্সবিকে আগ্রহভরে বলিল, "গতকল্য

রাত্রিকালে একটা অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, এই জন্যই আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে হইল।"

থর্সবি স্তব্ধভাবে বেন্থামের কথাগুলি শুনিতে লাগিল। সে তাহাকে কোন প্রশ্ন করিল না, বা তাহার কথায় বাধা দান করিল না। পূর্ব্বরাত্রে যে ব্যক্তি বেন্থামের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া যে সকল কথা বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়াছিল, বেন্থাম থর্সবিকে আনুপূর্ব্বিক সেই সকল কথাই বলিল।

বেন্থাম প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই তাহার বক্তব্য সকল কথা বলিয়া শেষ করিল। সে উপসংহারে বলিল, "এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আপনার নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, পত্রযোগে আপনাকে ঐ সকল কথা জানাইব; কিন্তু এ সকল জরুরি ও গোপনীয় কথা পত্রে প্রকাশ করা সঙ্গত নহে মনে করিয়া স্বয়ং আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। বিশেষতঃ এই নক্সাখানি—"

বেন্থাম একখণ্ড কাগজ পকেট হইতে বাহির করিয়া থর্সবির সম্মুখে রাখিয়াছিল। বেন্থামের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই থর্সবি সেই কাগজখানি লইয়া আগ্রহভরে তাহা খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। সেই কাগজে একখানি নক্সা অঙ্কিত ছিল। নক্সাখানিতে চিত্রশিল্প-দক্ষতার পরিচয় ছিল। তাহা একটি বৃহৎ বাজের চিত্র। পূর্ব্বগগনে চন্দ্রোদয় হইতেছিল, পূর্ণচন্দ্রের সুধাধবল কৌমুদী-সম্পাতে নৈশ প্রকৃতি সমুদ্ভাসিত; সেই আলোকে একটি সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গ-শিখরে সেই বাজ উপবিষ্ট; তাহার ঈষৎ উদ্ঘাটিত পক্ষের আন্দোলন-ভঙ্গী দেখিয়া প্রতীতি হইতেছিল, বাজটি নৈশাকাশে উড়িবার জন্য প্রস্তুত!

থর্সবি চিত্রখানি দুই তিন মিনিট কাল অপ্রসন্ন নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া তাচ্ছিল্য সহকারে বলিল, "অর্থহীন ছেলেমানুষী খেয়াল! গীতিনাট্যসুলভ 'রাবিস্' ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।"—সঙ্গে সঙ্গে সে অবজ্ঞাভরে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল।

বেন্থাম থর্সবির বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কিন্তু মহাশয়—"

বেন্থাম যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া থর্সবি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিন্তু মহাশয়, বলিয়া তুমি কি বলিতে চাও? আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, তোমার মত প্রবীণ ও বুদ্ধিমান্ লোক ঐ প্রকার বাজে লোকের অসংলগ্ন কথায় বিচলিত হইবে। আমার ধারণা, সেই লোকটা পাগল।"

সিলাস বেন্থাম মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। সে আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহাতে আমি পাগলামীর কোন লক্ষণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই; তবে লোকটা কে, তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছি। আমার কিরূপ অনুমান, তাহা আপনি জানেন, মিঃ থর্সবি?"

থর্সবি বলিল, "না, কে সে?"—সে তাচ্ছিল্যভরে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে তাহার আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা গোপন করিতে পারিল না।

বেন্থাম অস্ফুট স্বরে বলিল, "সে দস্যুসর্দ্দার নিশাচর বাজ। আমি লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি, সে কোন অপরাধজনক কার্য করিবার জন্য যেখানে যায়, সেই স্থানে ঐ প্রকার নক্সা ফেলিয়া আসে; উহাই না কি তাহার আবির্ভাবের নিদর্শন।"

থর্সবি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ননসেন্স! এই প্রকার প্রলাপ বাক্য উদ্গিরণ করিবার জন্য তুমি লণ্ডনে আসিয়াছ? এখন দেখিতেছি, তুমিও বদ্ধ পাগল!"

বেন্থাম থর্সবির কথা শুনিয়া সক্রোধে চেয়ারে ঠেস দিয়া সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর বিচলিত স্বরে বলিল, "আমার কথাগুলি যে অর্থহীন প্রলাপ—এরূপ আমি মনে করিতে পারিতেছি না। আমার ধারণা, নিশাচর বাজ আমাকে সতর্ক করিবার জন্য ঐরূপ একটা হুমকি দিয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি স্বয়ং নিশাচর বাজ হউক বা অন্য কেহ হউক, আমার ধারণা, সে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিল, তাহার সমস্তই তাহার সুবিদিত; এইজন্য আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, আপনার পরিচালিত বিভিন্ন কোম্পানীতে আমার যে সকল অংশ আছে, তাহা আমি অবিলম্বে বিক্রয় করিব, মিঃ থর্সবি! আপনি স্মরণ রাখিবেন, আমার এই সঙ্কল্প অবিচলিত এবং অপরিবর্ত্তনীয়।"

বেন্থামের এই প্রস্তাবে থর্সবির মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু সে যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংবরণ করিল, এবং যষ্টিপ্রহারে সিলাস বেন্থামকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে

বিতাড়িত না করিয়া সহাস্যে বলিল, "খুব ভাল কথা, মিঃ বেন্থাম ! যদি তুমি তাহা বিক্রয় কর, তাহা হইলে সেগুলি স্থানান্তরে বিক্রয়ের প্রয়োজন কি ? তাহাতে তোমার সময় নষ্ট হইবে – তাহার উপর তোমাকে হয়রান হইতে হইবে। আমিই বরং সেগুলি কিনিয়া লইয়া তোমাকে চেক দিব।"

দশ মিনিট পরে বেন্থাম থর্সবির মোটর-কারে সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া লেমারডেল ষ্টেশন-অভিমুখে ধাবিত হইল

* * *

সিলাস বেন্থাম থর্সবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার পূর্ব্বে হর্ণিব্লো অন্য কক্ষে প্রস্থান করিয়াছিল ; বেন্থাম থর্সবির সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলে সে থর্সবির নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হতভাগাটা কি বলিতেছিল ?"

থর্সবি বলিল, "আমার কোম্পানীগুলিতে তাহার যে সকল 'সেয়ার' আছে, তাহা বিক্রয়ের জন্য নির্ব্বোধটা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। অদ্যকার বাজার-দরে আমি তাহাকে একখান চেক দিয়াছি।"

হর্ণিব্লো বলিল, "কিন্তু সে কি কোন কথা বলিয়াছে ? অর্থাৎ আমাদের"—

থর্সবি সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু না ; ও বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।"

হর্ণিব্লোর বোধ হয় আরও কোন কথা বলিবার ছিল, কিন্তু সে নীরব রহিল ; থর্সবির কথায় সে নির্ভর করিতে পারিল কি না সন্দেহ।

* * *

সেই সময় ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তাঁহার টুপি তুলিয়া-লইয়া পুলিশ-কমিশনারকে বলিলেন, "আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু আশা করিতেছি, আজ রাত্রেই তাহাকে ধরিতে পারিব।"

পুলিস-কমিশনার লর্ড ব্রাডনি যে মেহগ্নি ডেস্কের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ডেস্কে তাঁহার অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে যে ভাবে তুমি কায চালাইতেছ— সেই ভাবেই কায চলুক ; আপাততঃ আমি কোন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিব না।"

পুলিস-কমিশনারের এই মন্তব্য শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট আর কোন অভিমত প্রকাশ করা শিষ্টাচার-সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারিবর্গ বলাবলি করিতেছিল যে, মাথার ঘায়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের যে অবস্থা হয়, বুড়া কর্ত্তার অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে অসুস্থ মনে করিতেছিল।

ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট অতঃপর বিচলিতচিত্তে তাঁহার কায করিতে চলিলেন। একখানি দ্রুতগামী পুলিস কারে এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সরে জিলার কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইলেন। তিনি যখন হীথল্যাণ্ডস্ লজের দেউড়িতে প্রবেশোদ্যত হইলেন, সেই সময় তাঁহাকে বাধা পাইতে হইল। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে তাঁহার নাম ও পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড বাহির করিয়া দেখাইলেন ; তাহা দেখিয়া দেউড়ির প্রহরী তাঁহার গমনে বাধা দান করিতে সাহস করিল না। ৩০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট বেগবান্ পুলিস-কার দেউড়ির অভ্যন্তরবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইয়া প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত এডমণ্ড থর্সবির পল্লী-নিকেতনের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপ্‌লটন ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। সে পুলিশ-কারের এঞ্জিন থামাইয়া ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি উহা শুনিতে পাইয়াছেন, মহাশয় ?"

ইন্‌স্পেক্টরের মন তখন নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত ছিল, বিশেষতঃ সেই দিন রাত্রিকালে এডমণ্ড থর্সবির সেই বিশাল পল্লীভবনে কি কাণ্ড সংঘটিত হইবে, এই চিন্তায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; এজন্য কোনও দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শুনিতে পাইবার কথা বলিতেছ ?"

ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপ্‌লটন তাঁহার এই প্রশ্ন শুনিয়া কোন কথা বলিল না। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে পথে লাফাইয়া পড়িল, এবং সুপ্রশস্ত ময়দানের দিকে যে অনুচ্চ তারের বেড়া ছিল, সেই বেড়া পার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ময়দানের ভিতর দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিলে মনে হইত, সে হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল !

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ায়, বিশেষতঃ তাহাকে উন্মত্তের ন্যায় ঐ ভাবে দৌড়াইতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং সে

কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছিল, তাহা বুঝিতে না পারায় তিনিও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং গাড়ী সেই স্থানেই ফেলিয়া-রাখিয়া দ্রুতবেগে ষ্টেপ্‌লটনের অনুসরণ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের বয়স সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপ্‌লটনের বয়সের তুলনায় অনেক অধিক হইয়াছিল, এবং তাঁহার দেহও ভারী হইয়াছিল; সুতরাং তিনি ষ্টেপ্‌লটনের সহিত সমান বেগে দৌড়াইতে পারিবেন—তাহার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপ্‌লটনকে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার পদপ্রান্তে নিপতিত একটি মনুষ্য-দেহ পরীক্ষা করিতে দেখিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপ্‌লটনকে তদবস্থায় দেখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে, সার্জ্জেণ্ট!"

ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপ্‌লটন মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আপনি ত ইহাকে চেনেন; এই ব্যক্তি গণৎকার ক্রিজিনো-ভস্কির প্রবঞ্চনাপূর্ণ ব্যবসায়ের অংশীদার নিউটন স্মিথ। ক্রিজিনোভস্কি কিছু দিন পূর্ব্বে এ দেশ ত্যাগ করিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বলিলেন, "ও কথা আমার স্মরণ আছে—এ লোকটার কি হইয়াছে?"

ষ্টেপল্‌টন বলিল, "নিউটন স্মিথ নিহত হইয়াছে। ঐ দেখুন, আততায়ীর ছোরা এখনও ইহার গলায় বিঁধিয়া আছে। ছোরার আঘাতে কণ্ঠনালী বিদীর্ণ হওয়ায় ইহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।"

নিউটন স্মিথ যে সকলের অজ্ঞাতসারে গোপনে থর্সবির পল্লী-ভবনে উপস্থিত হইয়া নৈশ ভোজসভায় যোগদান করিয়াছিল, এ সংবাদ ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের অগোচর ছিল। ক্রিজিনোভস্কি বুঝিতে পারিয়াছিল, সে যদি থর্সবির নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধব ও অতিথিগণের সম্মুখে নিউটন স্মিথকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে থর্সবি আতঙ্কাভিভূত হইবে, এবং তাহারও চেষ্টা বিফল হইতে পারে। ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট এ কথাও জানিতেন না যে, নিউটন স্মিথ যে সময় তাহার বাসা হইতে বাহির হইয়াছিল, ক্রিজি-নোভস্কি সেই সময় তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময় তাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় হয় নাই, তথাপি সে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া থর্সবির পল্লীভবন হীথ-ল্যাণ্ডস্ পর্য্যন্ত নিউটন স্মিথের অনুসরণ করিয়াছিল, এবং তাহাকে উৎসব-ভবনে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া, হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ছুরিকাঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়াছিল।

* * *

লর্ড ব্র্যাড্‌নি তাঁহার আফিসের টেবলস্থিত টেলিফোনের ঝন্‌-ঝন্ শব্দ শুনিয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন, এবং সাড়া দিয়া বলিলেন, "হাল্লো!"

উত্তর হইল, "আমি ফরেষ্ট, সার! আমি হীথল্যাণ্ডস্ হইতে আপনাকে কথা বলিতেছি। ইহা থর্সবির পল্লী-ভবন। একটা ভীষণ দুঃসংবাদ আছে; একটা হত্যা-কাণ্ডের—"

পুলিস-কমিশনার ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হত্যাকাণ্ড?"

যদি কোনও ব্যক্তি সেই সময় পুলিস-কমিশনারের আফিস-কক্ষে উপস্থিত থাকিতেন, এবং তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে তিনি লর্ড ব্র্যাডনির মুখ-ভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, এবং চক্ষুতে উৎকণ্ঠার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

পুলিস-কমিশনারের প্রশ্নের উত্তরে ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বলিলেন, "হ্যাঁ মহাশয়, প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে আমি সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপল্‌টনকে সঙ্গে লইয়া আমাদের পুলিস-কারে থর্সবির এই পল্লীভবনের নিকট উপস্থিত হইতেই একজন লোককে থর্সবির অট্টালিকা-সংলগ্ন ময়দানের ভিতর দিয়া দৌড়াইতে দেখি। লোকটিকে ঐ সময় ঐ ভাবে দৌড়াইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; এবং ইহার কারণ বুঝিতে না পারায় আমাদের মোটর-কার সেই স্থানে ফেলিয়া-রাখিয়া আমরা উভয়েই দ্রুতবেগে সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিলাম। অবশেষে ময়দানের ভিতর একটি মৃতদেহ পড়িয়া-থাকিতে দেখিয়া মৃতদেহটি পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, উহা আমাদের পরিচিত নিউটন স্মিথের দেহ; একখানি ছোরা তখনও তাহার কণ্ঠে আমূল প্রোথিত ছিল, এবং সেই ছোরার আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। অতি ভীষণ হত্যাকাণ্ড!"

পুলিস-কমিশনার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "নিহত ব্যক্তির কি নাম বলিলে ? নিউটন স্মিথ ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বলিলেন, "হ্যাঁ, নিউটন স্মিথ। আপনি ত তাহাকে চিনিতেন ; সে সম্ভ্রান্ত নর-নারীর গুপ্ত কথা নানা কৌশলে সংগ্রহ করিত, তাহাদের অনুষ্ঠিত অপকার্য্যের অকাট্য প্রমাণ পর্য্যন্ত তাহার হস্তগত হইত, তাহার পর সেই সকল গুপ্তকথা প্রচার করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎকোচ আদায় করিত। তাহার এই ব্যবসায়ে গণৎকার ক্রিক্তিনোভস্কি তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং তাহার এই ব্যবসায়ের অংশীদার ছিল।"

পুলিস-কমিশনার ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন। কয়েক মিনিট চিন্তার পর তিনি ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে বলিলেন, "কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের কারণ কি ? এ কার্য্য কে করিল, কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনাকে এখন নির্দ্ধারিতরূপে কোন কথা বলিতে পারিতেছি না, মহাশয় ! কারণ, এখনও আমি এই হত্যাকাণ্ডের যথাযোগ্য তদন্ত করিবার সুযোগ এবং অবসর পাই নাই। কিন্তু আমার অনুমান, আমাদের বন্ধু নিশাচর বাজকেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিতে পারিব।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের এই মন্তব্য শুনিয়া পুলিস-কমিশনার অস্ফুট স্বরে কয়েকটি কথা বলিলেন। ফরেষ্ট টেলিফোনের 'রিসিভারে' কর্ণ সংযোগ করিয়া কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একটি কথাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

ফরেষ্ট বলিলেন, "আপনি যে কথাগুলি বলিলেন, আর একবার সেগুলি দয়া করিয়া বলিবেন কি ? ও সকল কথা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।"

পুলিস-কমিশনার কিন্তু সেই সকল কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন না। তিনি ঈষৎ হাসিলেন, ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট সেই হাসি শুনিতে পাইলেন। পুলিস-কমিশনার হাসিয়া বলিলেন, "ও কিছু নয় ফরেষ্ট, আমি তেমন কোন কাযের কথা বলি নাই ; কিন্তু আর একটা কথা। নিশাচর বাজই যে নিউটন স্মিথকে হত্যা করিয়াছে, তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি ? তাহার বিরুদ্ধে এরূপ কি প্রমাণ পাইয়াছ যে, সেই প্রমাণ-বলে তাহাকেই নিউটন স্মিথের হত্যাকারী বলিয়া তোমার ধারণা হইয়াছে ? কয়েক মিনিট পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ—এখন পর্য্যন্ত তুমি এই হত্যাকাণ্ডের যথাযোগ্য তদন্ত করিবার সুযোগ ও অবসর পাও নাই ; অথচ তোমার ধারণা, নিশাচর বাজই নিউটন স্মিথকে হত্যা করিয়াছে। আমি তোমার এই উভয় উক্তির সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছি না!"

পুলিস-কমিশনারের এই মন্তব্য শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "না মহাশয়, নিশাচর বাজের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, এ কথা সত্য ; কিন্তু আমার যেরূপ ধারণা, তাহাই আপনাকে বলিয়াছি। আমার এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নিশাচর বাজ যে উদ্দেশ্যে নিউটন স্মিথকে হত্যা করিতে পারে, তাহার সেই উদ্দেশ্য অতি পরিস্কার বলিয়াই আমার মনে হয়। নিউটন স্মিথ জানিতে পারিয়াছিল, সেই দস্যুচূড়ামণি আজ রাত্রিকালে হীথল্যাণ্ডসএ গমন করিয়াছিল, সে তাহার গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার নিকট উৎকোচের দাবী করিয়াছিল ! নিশাচর বাজ তাহার সেই দাবী পূর্ণ করে নাই ; কিন্তু তাহার মুখ বন্ধ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। সে তাহার মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আমার এই ধারণা অসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কোন কারণ আছে কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের মন্তব্য শুনিয়া পুলিস-কমিশনার মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার উহা ভুল ধারণা, ফরেষ্ট ! হাঁ, নিউটন স্মিথের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করিয়া তুমি অত্যন্ত ভুল করিয়াছ। আমি দৃঢ়তার সহিত তোমার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিতেছি। যে ব্যক্তিকে নিশাচর বাজ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে, সে অপরাধী হইতে পারে ; হাঁ, তাহার অপরাধ সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু সে ইংরেজ, ভদ্র ইংরেজ, এ কথাও আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ; এবং যাহারা গুণ্ডার ন্যায় ছোরা-ছুরি ব্যবহার করে, সে সেই শ্রেণীর লোক নহে। ঐ প্রকার ইতর গুণ্ডা-সমাজের বহু উর্দ্ধে তাহার স্থান। তুমি শীঘ্রই এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আরম্ভ

করিবে—এরূপ আভাস পাইয়াছি। যত শীঘ্র পার তোমার তদন্তের ফল আমার গোচর করিবে, তাহা শুনিবার জন্য আমি প্রতীক্ষা করিব। আমার কথা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বলিলেন, "হাঁ মহাশয়।"

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট হীথল্যাণ্ডস্‌এর অধিবাসী থর্সবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তিনি অন্যান্য কথার পর থর্সবিকে বলিলেন, "আমরা প্রথমে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, সেই ব্যবস্থানুসারেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। এ সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?"

এডমণ্ড থর্সবি বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে, ইন্‌স্পেক্টর।"

ইন্‌স্পেক্টার ফরেষ্ট কি ভাবে তদন্ত আরম্ভ করিলেন, পাঠকগণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাহার বিবরণ জানিতে পারিবেন। [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

উৎসব কোথা আজি

আগমনী-গীতি ঢাকা গেছে আজি বিষাদের সুরে সুরে
চাপা কণ্ঠের হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে ওই দূরে;
আদুরী দুলালী ছোট মেয়ে তরে
জননীর আঁখি হোথা ওই ঝরে
কালো দীঘিজলে ছোয়াবীথিতলে উচ্চ যে মেরুচূড়ে
পতীহীনাদের মরমের ব্যথা ফোটে ধীরে নভ জুড়ে।

মাতৃহীনের বক্ষবিদারী ক্রন্দন-ঝঙ্কার
তারস্বরে হায় উঠিছে নিয়ত আগমনী-গানে মা'র;
শত কাঁদুনীর উঠিতেছে রব
কোথায় হরষ কোথায় উৎসব
অন্নহীনেরা কাঁদিছে ক্ষুধায় ঝরে ওই আঁখিধার
ডাকে যে পীড়িত ওষুধ অভাবে মরণেরে বারে বার।

দুঃখী শীর্ণ মূক অসহায় পথে ভাসে আঁখিনীরে
ক্ষীণ কণ্ঠের সকরুণ ডাকে চাহে না যে কেহ ফিরে;
দেবীর দেউলে চলিয়াছে আজি
সাগয়ে উহারা উপচার রাজি
দীনের মাঝারে জননী বিরাজে ভুলে গেছে তাহা কি রে!
জননী আসেনি—মাটীর প্রতিমা রয় শুধু বেদী ঘিরে।

কলহ বিবাদ ভাইয়ে ভাইয়ে পল্লীর ছায়াতলে
অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা অবলীলাভরে চলে;
ঈর্ষাদ্বেষের বিষভরা নদী
শতেক ছন্দে বহে নিরবধি
দলাদলিময় তৈলের দীপ নিশিদিন শুধু জ্বলে
উৎসব কোথা জননী আসেনি পল্লীর বেদীতলে।

শ্রীসত্যনারায়ণ দাস (বি, এ)।

সাহারা-বক্ষে
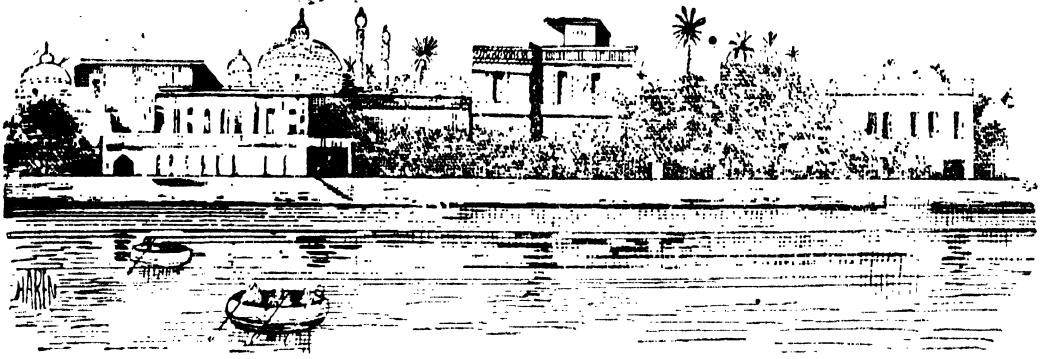
মার্কিণের থ-দম্পতি (মিঃ লরেন্স কোপ্‌লে থ ও তদীয় পত্নী মার্গারেট থ) ভূমধ্যসাগরের তটভূমি হইতে মোটরযোগে সাহারার মরুভূমি পার হইয়া আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তট-প্রান্ত এবং আফ্রিকার মধ্য দিয়া প্রায় ভারত-মহাসমুদ্রের তট-প্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ৬ মাস ধরিয়া সদলবলে মোটরযোগে তাঁহারা ১১ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করেন।

৬ মাস পর্য্যটনের জন্য তাঁহাদিগকে ১৩ মাস ধরিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইয়াছিল। দলে ৪ জন শ্বেতাঙ্গ ও একাদশ জন দেশীয় পরিচারক ছিল। একখানি লঘুভার মোটর ও দুইখানি ট্রাক্ এই অভিযানের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ওজন প্রায় ১ শত ৯৩ মণ হইবে। অভিযানকারীরা আলজিয়ার্স হইতে যাত্রা করেন।

আলজিয়ার্স হইতে প্রথম ২ শত মাইল পথ তাঁহারা স্বচ্ছন্দেই গমন করিয়াছিলেন। কারণ, লাঘোয়াট পর্য্যন্ত পথের অবস্থা খুব ভালই ছিল। তাহার পরই পথের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। আরও ১ শত মাইল গমনের পর পথের চিহ্ন ধরিয়াই তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। আরও এক-শত মাইল অতিবাহন করিবার পর তাঁহারা ভগবান্ ও দিগ্দর্শন-যন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকেন। সভ্যতার কোন নিদর্শনই আর তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই।

এল্ গলিয়া মরু-উদ্যানস্থিত দুর্গ

তিন রাত্রির পর তাঁহাদিগের একখানি ভারবোঝাই ট্রাক্ খানার মধ্যে পড়িয়া যায়। সেই ট্রাকে যে ৪ জন পরিচারক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ৩ জন লম্ফ দিয়া জীবন

রক্ষা করে। কিন্তু পাচক সাইদি ট্রাক্ চাপা পড়ে। দুইদিন পরে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

এই দুর্ঘটনার পর অভিযানকারীরা ভারাক্রান্ত চিত্তে মরুভূমির বুকের উপর দিয়া গাড়ী চালাইতে থাকেন। চারিদিকেই সীমাহীন বালুকা-বিস্তার। মাঝে মাঝে এক একটি পাহাড়।

সন্ধ্যার পরই তাঁহারা যাত্রা বন্ধ রাখিয়া বালুকারাশির উপর শিবির সন্নিবেশ করিতেন। নক্ষত্রখচিত আকাশ-তলে টেবল পাতিয়া লণ্ঠনের আলোকে তাঁহারা টিনভরা আহার্য্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। শ্রান্ত দেহে ৯টার পর নিদ্রাগত হইয়া তাঁহারা দিবালোক প্রকাশের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন। মরুবক্ষে উষার আলোক উজ্জ্বল হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রারম্ভ হইত।

ঘার্ডাইয়া নামক স্থান অতিক্রম করিবার পর তাঁহারা মরুভূমির মধ্যে আবর্ত্তনশীল বালিয়াড়ির মধ্যে পড়িয়াছিলেন। এই স্থান মোটর বা ট্রাক্‌যোগে অতিক্রম করা সহজসাধ্য নহে। এল্ গলিয়া নামক মরু-উদ্যানে তাঁহারা কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই স্থানটি পরম রমণীয়। তথা হইতে তাঁহারা ইনসালা নামক মরুভূমিস্থিত দুর্গাভিমুখে যাত্রা করেন।

এই ইন্‌সালা দুর্গ যেখানে অবস্থিত, তাহার চারিদিকে শত শত মাইলব্যাপী চলমান বালিয়াড়ি অবস্থিত। দুর্গ-প্রাচীরের অনেক অংশ চলমান বালুকারাশি গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। এই দুর্গটি ফরাসীদিগের। তথায় ৪ জন বৈদেশিক সামরিক কর্ম্মচারী বাস করেন। দুর্গের নিয়ন্ত্রণ-ভার তাঁহাদিগের উপরেই অর্পিত।

ইন্‌সালা হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ দিকে বালুকারাশির এমন অবস্থা যে, জোরে গাড়ী চালান তাঁহারা কষ্টকর মনে করিয়াছিলেন। গাড়ীর চাকা বালুকার মধ্যে বসিয়া যাইতেছিল। বালুকারাশি চাকার উপর হইতে সরাইয়া তবে তাঁহারা পথ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমে তাঁহারা আহাগার বা হোগার পর্ব্বতমালার কাছে উপনীত হন। সাহারার বক্ষোদেশে এই পাহাড়, ৯ হাজার ফুট উচ্চ। দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী পথে তাঁহারা যে সময় অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন সহসা বারিপাত আরম্ভ হইল। এ সকল অঞ্চলে দুই তিন বৎসর অন্তর একবার মাত্র বারিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু একবার বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সামান্য বর্ষণে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে না। যে শুষ্ক পথে তাঁহারা চলিতেছিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যে তথায় জলের স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিয়া চলিল।

টুয়ারেগ রাজা আমেনোকাল মিসেস্ থ'র সহিত আলাপ করিতেছেন

শেষে এমন অবস্থা হইল যে, লঘুভার মোটর গাড়ী বুঝি জলের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টায় গাড়ীখানিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে টানিয়া তোলা হইল।

বৃষ্টি যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তেমনই অতর্কিত ভাবে থামিয়া গেল। আর কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইলে, আরোহীরা

হয়ত পাহাড়ের উপর আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু ট্রাক্ ও গাড়ী ভাসিয়া যাইত।

তথা হইতে তাঁহারা টসানরাসেট বা ফোর্ট ল্যাপেরিনএ গিয়া পৌঁছিলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়াছে। আহাগার পর্ব্বতমালার ঠিক মাঝখানে উহা অবস্থিত। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় এক মাইল হইবে। বিরাট শৃঙ্গগুলি তুষারাচ্ছন্ন। তখন গগনপথে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিয়া উঠিয়াছিল।

এই অঞ্চলে টুয়ারেগগণ বাস করিয়া থাকে। টুয়ারেগ সম্প্রদায় মরু-সন্তান। ইহারা যাযাবর জাতি। একাদশ শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় যখন আরব-অভিযান হয়, সেই সময় ইহারা বিতাড়িত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা বার্ব্বার-বংশসম্ভূত। সাহারা মরুভূমির প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ-মাইল স্থান ইহারা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। টুয়ারেগ-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ফরাসীদিগের অধীনে কার্য্য করিলেও, অধিকাংশই বিদেশীয়দিগের প্রতি ঘোর বিদ্বিষ্ট।

জিণ্ডার সুলতানের প্রেরিত উপঢৌকন

অভিযানকারীরা সৌভাগ্যক্রমে টুয়ারেগগণের রাজা বা 'আমেনোকাল'এর খুব কাছেই আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ফোর্ট ল্যাপেরিন হইতে তাঁহার আবাসস্থান ১ শত মাইলের অধিক হইবে না। এই সম্প্রদায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ-কল্পে কয়েকদিন এই অঞ্চলে বসবাসের প্রয়োজন হইবে মনে করিয়া তাঁহারা দ্রুতগামী উষ্ট্রপৃষ্ঠে একজন দূত প্রেরণ করিলেন। রাজাকে উপঢৌকন প্রদানের জন্য চা ও চিনি গুছাইয়া লইলেন। উক্ত দুর্গের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকজন সৈনিক ও দুই জন ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রদান করিলেন।

সাত ঘণ্টাব্যাপী গাড়ী চালাইবার পর অতিকষ্টে তাঁহারা রাজার শিবিরে উপনীত হইলেন। রাজার শিবির উষ্ট্রচর্ম্মে নির্ম্মিত। একটি প্রকাণ্ড বালিয়াড়ির পার্শ্বে সংস্থাপিত চলমান শিবিরেই টুয়ারেগ-রাজা বাস করিয়া থাকেন। উঁহার সান্নিধ্যে তাঁহারা উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহারা ঢাকের বাদ্য শুনিতে পাইলেন।

অভিযানকারীরা আসিবামাত্র, রাজাকে মাঝখানে রাখিয়া ২০ জন সর্দ্দার তাঁহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সকলেরই অঙ্গে গাঢ় রক্তবর্ণ আঙ্গরাখা, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ পাগড়ী, মুখমণ্ডল কাল অবগুণ্ঠনে আবৃত। শুধু তাঁহাদিগের গাঢ় কৃষ্ণতারকালাঞ্ছিত নয়নযুগল ছাড়া মুখমণ্ডলের আর কোনও অংশ দৃষ্টিগোচর হইল না। সেই কৃষ্ণতার নয়নের দৃষ্টি যেন অতি ভীষণ। মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

পুরুষদিগের মুখেই এইরূপ অবগুণ্ঠন থাকে। নারীরা অবগুণ্ঠনাবৃতা নহে। পুরুষদিগের হাতে তীক্ষ্মমুখ বল্লম, কটিদেশে ক্ষুরধার ছোরা এবং তরবারি। ঢালগুলি উষ্ট্র-চর্ম্মে নির্ম্মিত।

প্রাথমিক সম্বর্দ্ধনায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতীত হইল। নিয়ম এই যে, প্রথমে করকম্পনের চিহ্নস্বরূপ রাজার করপল্লবে কর স্থাপন করিতে হয়। তাড়াতাড়ি সে কার্য্য সম্পন্ন করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হইবে, "লাবেসং ?"

উষ্ট্র-পৃষ্ঠে সার্থবাহদল

অর্থাৎ "কুশল ত ?" উত্তরে অনুরূপ প্রশ্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যাশা করিবার নাই।

অভিযানকারীরা রাজার শিবিরে আহূত হইলেন। শিবির-কক্ষ পঞ্চাশ বর্গফুট বিস্তৃত, কিন্তু উচ্চতায় ৪ ফুটের অধিক নহে। সবই মরুচারী হরিণচর্ম্ম-নির্ম্মিত। আগন্তুকগণ তথায় জুতা খুলিয়া কম্বলাবৃত ভূমির উপর উপবেশন করিলেন।

আহার্য্য আসিল। ভেড়ার দগ্ধ মাংস, মোটা আটার রুটী, উষ্ট্রদুগ্ধ এবং কড়া চা। উহাতে মিষ্ট অধিক পরিমাণে মিশ্রিত। দুই ঘণ্টা পরে "কুশল ত" প্রশ্ন অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া আবৃত্তির পর তাঁহারা তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট শিবিরে গমন করিলেন।

আমেনোকালের কাছে তাঁহারা তিন দিন যাপন করিলেন। আলোকচিত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গৃহীত হইল। তাঁহারা তথায় উষ্ট্রনৃত্য উপভোগ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের ও বাদ্যের তালে-তালে উষ্ট্র-নৃত্য সম্পন্ন হইয়াছিল। নারীরাই সঙ্গত করিয়াছিলেন। দেশীয় বহুবিধ অভিনব নৃত্যও তাঁহারা দর্শন করিয়াছিলেন।

আমেনোকাল বা টুয়ারেগ রাজা আগন্তুকদিগের শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে যাহা কিছু তাঁহার
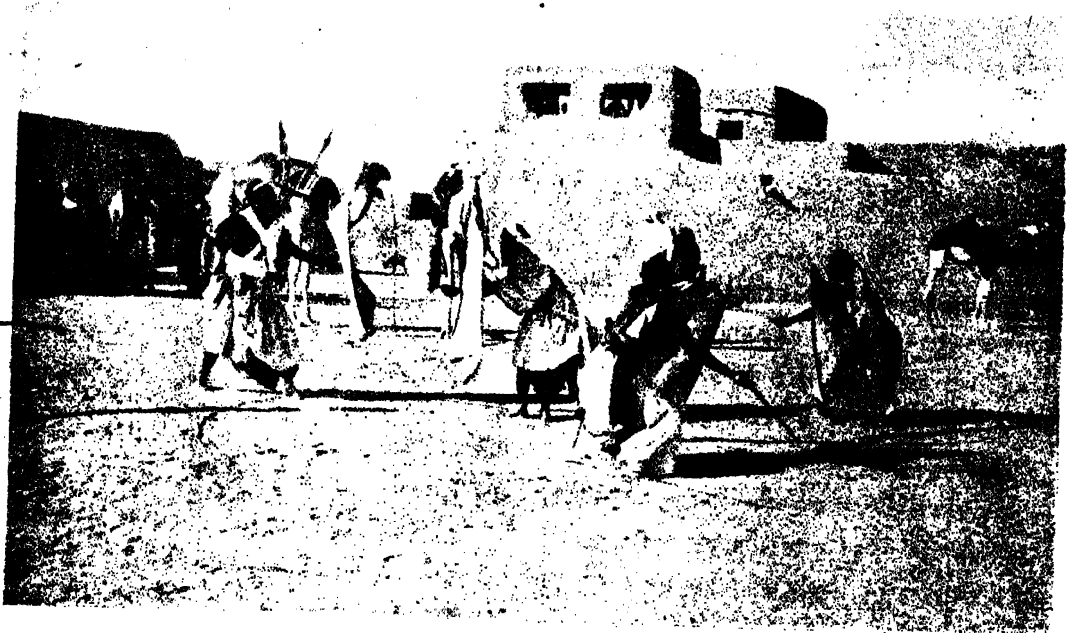
টুয়ারেগ যোদ্ধগণ কৃত্রিম লড়াই করিতেছে

মরুসমুদ্রবক্ষে মোটর গাড়ী

দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, তাহাতেই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। রেডিও যন্ত্রের ব্যাপারে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। রেফ্রি-জি-রেটার ও তন্মধ্যস্থ বরফের পাত্রগুলি দেখিয়া তিনি তথা হইতে নড়িতেই চাহিতেছিলেন না।

রাজাকে বক্তৃতা করিতে বলিয়া শব্দযন্ত্র সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতা তুলিয়া যখন তাঁহাকে তাঁহারই বক্তৃতা শুনাইয়া দেওয়া হইল, তখন রাজার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

টুয়ারেগরা স্নান করে না। জলের অভাব বলিয়াই স্নানের ব্যবস্থা নাই। রাজা ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে কখনও স্নান করেন নাই। সুতরাং তাঁহার কাছে অগ্রসর হওয়াও সুবিধাজনক নহে। শরীরে দুর্গন্ধের অভাব নাই।

তুষার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া টুয়ারেগগণ কি করিয়া মরুভূমির ভীষণ উত্তাপ, শৈত্য সহ্য করে, তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার। অপরাহ্নকালে বাহিরের উত্তাপ সময় সময় ১৬০ ডিগ্রি (ফারনাইট) পর্য্যন্ত উঠে রাত্রিকালে ০ ডিগ্রির বহু নিম্নে নামিয়া যায়।

মিসেস্ থ একদিন সূর্য্যের উত্তাপে একটি ডিম ভাঙ্গিয়া একটি পাথরের উপর রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ডিমটি একটু পরে ভাজা অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

রিয়াই বৌবার রাজা মনুষ্যবাহিত হইয়া চলিয়াছেন

একদিন সেই পাহাড়ের উপর এক পাত্র জল রাখিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উহা জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছিল।

অভিযানকারীরা তাঁহাদিগের গাড়ীতে এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহাতে কোন জিনিষই বরফে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

ল্যাপেরিন্ দুর্গের এক শত মাইল দক্ষিণে আসিয়া তাঁহারা আহাগার পর্ব্বতমালার সীমা অতিক্রম করিলেন। পাহাড় ও বালিয়াড়ির মাঝে মাঝে গাছপালার দেখা মিলিল। অবশ্য তাহাও রৌদ্রদগ্ধ। কিন্তু ছোট ছোট হরিণ প্রভৃতি শিকার তাহাতে দুর্ল্লভ নহে। বন্দুকের গুলীতে মৃগ শিকার করিয়া তাঁহারা তাজা মাংস পাইলেন। গুয়েজাকেও একটি ছোট কেল্লা আছে। উহা আলজিরিয়া ও ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত।

মরুভূমি পার হইয়া মিসেস্ থ স্নান করিতেছেন

আগাডস্ নামক স্থানটি একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। সার্থবাহগণ এইখানে পণ্যদ্রব্য সহ মিলিত হইয়া থাকে। এই সহরে ৩ হাজার কুটীর আছে। একটি স্তম্ভ-বিশিষ্ট মসজেদও তথায় বিদ্যমান। অভিযানকারীরা যখন সেখানে

নাইজিরিয়ার বাজারে বৃটিশ পণ্য

দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশী গারোয়ার বালিকাদিগের নৃত্য

উৎসব উপলক্ষে কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় এখানে হইয়া থাকে। ৮টি করিয়া শ্বেত উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া উভয় দিক্ হইতে যোদ্ধগণ সমবেত হয়। তার পর ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের অভিমুখে বল্লম নিক্ষেপ করে। অবশেষে ঢাল ও তরবারী লইয়া পরস্পরকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই সময় যোদ্ধারা এমন ভীষণ চীৎকার ও লম্ফ-ঝম্ফ দিতে থাকে যে, তাহাতে দর্শকগণের চিত্ত শঙ্কিত হইয়া উঠে। যতক্ষণ দিবার আলোক থাকে, ততক্ষণ এই ভাবের আক্রমণ চলিতে থাকে। যুদ্ধাভিনয় শেষ হইলে দেখা যাইবে, কাহারও অঙ্গে একটি আঁচড়ও লাগে নাই।

টুয়ারেগ সম্প্রদায়ের অধিকার-সীমার দক্ষিণ প্রান্তে আগাডেন। আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া অভিযানকারীরা হাউসাস্ সম্প্রদায়ের রাজ্যসীমায় প্রবেশ করিলেন। এই সম্প্রদায় নিগ্রো-জাতি হইতে উদ্ভূত।

কানোর বন্দীরা চলিয়াছে

সাহারা-মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে জিণ্ডার অবস্থিত। ফরাসী পশ্চিম-আফ্রিকার উহা প্রসিদ্ধ সহর। এখানে পৌঁছিবার পর সুলতানের দূত অভিযানকারীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়।

পৌঁছিলেন, তখন মুসলমানদিগের রামাদান পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

সুলতানের প্রাসাদে তাঁহার শরীররক্ষীরা থ-দম্পতিকে অভিনন্দিত করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। রৌপ্যদণ্ড হস্তে এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া চলিল। এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণের ধারে সুলতান সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুলতানের সম্মুখে সৈনিক ও ওমরাহগণ ভূমি চুম্বন করিয়া অভিবাদন করিল। সুলতান সংক্ষেপে

উটপাখীর পালক-রচিত স্যাণ্ডালপরিহিত কানোর সুলতান

তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপক বক্তৃতা করিলেন। ক্রীতদাসগণ বিবিধ উপঢৌকন সহ সিংহাসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল।

সুলতানের প্রাসাদ মৃত্তিকানির্ম্মিত। তাঁহার প্রাসাদ-কক্ষে আগন্তুকগণ নীত হইলেন। একজন ফরাসী দ্বিভাষীর সাহায্যে আলাপ-আলোচনা চলিল।

আলোচনার ফলে তাঁহারা জানিতে পারিলেন, সুলতান ও তাঁহার প্রজাবর্গ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহার চারিজন আইনসঙ্গত পত্নী আছেন। এতদ্ব্যতীত ৪০টি উপপত্নীও তাঁহার আছে। তবে তাঁহার মত পদস্থ সুলতানের পক্ষে এই সংখ্যা সামান্য। তাঁহার সন্তানের সংখ্যা কতগুলি, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। সম্প্রতি তিনি উহা গণনা করেন নাই।

গারৌয়ার জল্লাদ

জিণ্ডার হইতে কানো যাইবার ১৮০ মাইল পথ অত্যন্ত জঘন্য। নাইজিরিয়ার উপর দিয়া এই পথ প্রস্তুত। অভিযানকারীরা কানো সহরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে ৮০ হাজার হাউসাস্ সম্প্রদায়ের বাস। ৩ শত শ্বেতকায় এখানে বৃটিশ-জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহারা ক্রিকেট, পোলো, টেনিস্ খেলেন। তাঁহাদিগের একটি

ক্লাবও আছে। এখানকার দেশীয়দিগকে আমীর শাসন করিয়া থাকেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া একই ভাবে ইহাদের জীবনযাত্রা চলিতেছে। শ্বেতকায় প্রভুদিগের সহিত আমীর ও দেশীয়দিগের বেশ সদ্ভাব আছে।

আমীর ও তাঁহার পরিজনবর্গের আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য অভিযানকারীরা রেসিডেন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন। রেসিডেন্ট বলিলেন যে, আমীর গ্রেটবৃটেনের নিকট হইতে বহু অর্থ পাইয়া থাকেন। তাহা ছাড়া তাঁহার রাজকীয় আয়ও ৫ লক্ষাধিক ডলার। সুতরাং সাধারণ সর্দ্দারের ন্যায় তিনি নহেন। তাঁহার প্রজার সংখ্যা ২০ লক্ষ। আফ্রিকার রাজাদিগের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং ধনী।

আমীরের কাছে আলোকচিত্র গ্রহণের প্রস্তাব পাঠান হইল। প্রায় ২ শত অশ্বারোহী রাজকীয় রক্ষী তাঁহাদিগকে প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য আমীর প্রেরণ করিলেন।

অতি বিচিত্রদর্শন মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাসাদে তাঁহারা নীত হইলেন। আমীরের দরবার-কক্ষ ২৫ ফুট উচ্চ—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। কিন্তু বিচিত্র বর্ণসম্ভারে সুচিত্রিত।

আমীর তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনাকল্পে উঠিয়া আসিলেন। তাঁহার অঙ্গে রক্তবর্ণের মনোরম পরিচ্ছদ, চরণে উটপাখীর পালক-নির্ম্মিত স্যাণ্ডাল। দ্বিভাষী—তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহার আলোকচিত্র গৃহীত হইবে। তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। সর্ব্ব প্রথম তাঁহার আলোকচিত্র গৃহীত হইল। ইহার পূর্ব্বে কেহ কখনও তাঁহার ফটোগ্রাফ লয় নাই।

কানো হইতে তাঁহারা উত্তর নাইজিরিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর কামেরুনস্-এর দিকে চলিলেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অত্যন্ত প্রাচীন যুগের। নর-নারী প্রায় নগ্নাবস্থায় থাকে। মুসলমান ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পৌত্তলিকতার প্রভাবই ইহাদিগের মধ্যে প্রবল। আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিদিগের অধিকাংশই পৌত্তলিক।

কানোর প্রাসাদের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীর ও গৃহ

গারোয়ার সুলতান প্রথম আইয়াটাউ যেমন দীর্ঘাকার, তেমনই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে রাজার গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। তিনি কিছু কিছু ফরাসী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। এখানেও আলোকচিত্র গ্রহণে তিনি সাহায্য করিলেন।

সুলতান অভিযানকারীদিগের প্রীত্যর্থ নৃত্যসভার আয়োজন করিলেন। দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া প্রায় ২০ জন কিশোরী এই নৃত্যে যোগ দিল। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে

সাহারার টুয়ারেগ দুর্গ

দেশীয় পরিচ্ছদে ফরাসী অস্ত্রধারী টুয়ারেগ সেনাদল

তাহারা নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন করিল।

গারোয়ায় আসিয়া তাঁহারা নদীপার হইলেন। এতদিন তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে কোন নদী পড়ে নাই। এই নদীর নাম বেনুই ৫।৬ খানি চওড়া ডিঙ্গা একত্র বাঁধিয়া তাহার উপর কাঠের পাটাতনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার উপর ট্রাক ও মোটর রাখিয়া তবে তাঁহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কামেরুনদের মধ্য দিয়া ধীর গতিতে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। এখন হইতে প্রায়ই পথে নদী পড়িতে লাগিল। আটলান্টিক সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অরণ্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। ইয়াউণ্ডি সহরে তাঁহারা কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। এই সহরে ৩০

অশ্বারোহী জিণ্ডার সুলতান

টুয়ারেগ-পত্নী

হইলে ২ শত মাইল-ব্যাপী অরণ্য পার হইতে হয়। নারিকেল ও তাল কুঞ্জবেষ্টিত ক্রিবি সহরে পৌঁছিয়া তাঁহারা কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা একটি গরিলা-শিশু ও একটি সিম্পাঞ্জি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ক্রিবিতে অবস্থান-কালে তাঁহারা ক্ষুদ্রাকার হস্তী শিকার করিয়াছিলেন। পূর্ণ-বয়স্ক আফ্রিকার হস্তী দশ হইতে ১১ ফুট উচ্চ হইয়া থাকে। বামনাকার হস্তী এই অঞ্চলে বিদ্যমান। তাহারা ৬ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না। অভিযানকারীরা একটি ৬ ফুট উচ্চ হস্তিনী শিকার করিয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহারা রিয়াই বৌবা অঞ্চল অভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সে স্থানের অধিপতির নাম লামিডো বৌবা জামাহা। আফ্রিকার বহু রাজা প্রজাবৃন্দের উপর সার্ব্বভৌম

হাজার দেশীয় এবং ৩ শতাধিক শ্বেতকায় বসবাস করিতেছেন। ইয়াউণ্ডি হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ক্রিবি সহরে যাইতে

কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিয়া থাকেন। প্রজাপক্ষ হইতে কোনও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তাঁহাদিগের দরবারে স্থান পায়

না। সুতরাং রাজাদিগের ইচ্ছাই আইন। কিন্তু এই সকল রাজ্যে আমীর ওমরাহ এবং সাম্প্রদায়িক সর্দ্দারসমূহও আছে। প্রত্যেক গ্রামে মোড়লও দেখা যাইবে। ঐন্দ্রজালিক ডাক্তাররাই ধর্ম্ম-গুরু বলিয়া কথিত। কিন্তু রিয়াই বৌবাতে এ সব বালাই নাই।

এখানে ৫০ হাজার ক্রীতদাস আছে। তাহা-দিগের মাত্র এক-জন মালিক। তিনিই লামিডো। তাহাদিগের গৃহ, পশু, জমি শস্য সব বিষয়েরই তিনি মালিক। কোনও প্রজাকে কেহ কিছু বকশিস দিলে, সে তাহা লামিডোর কাছে লইয়া যাইবে। এজন্য যদি এক শত মাইলও পদব্রজে যাইতে হয়, তাহাও স্বীকার।

লামিডোর ১২

রিয়াই বৌবার ধানুকী

রিয়াই বৌবার পদাতিক সেনার পরিচ্ছদ

রিয়াই বৌবার অশ্বারোহী যোদ্ধপুরুষ

গারৌয়ার সুলতান ও পত্নীবৃন্দ

হইতে ১৫ হাজার সুশিক্ষিত সৈনিক আছে। পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনাদল প্রচুর শক্তিসম্পন্ন। বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়, লামিডোর রাজত্ব জার্ম্মাণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, তিনি ফরাসী ও বৃটিশ সেনাদলের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। পশ্চিম তটভূমিতে জার্ম্মাণ পক্ষ যে সহজে পরাজিত হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ লামিডোর শক্তিশালী সেনাবল মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া। বৃটিশ ও ফরাসী সেনাপতিরা এজন্য লামিডোকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার সহায়তার পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজার সাদর আহ্বানে অভিযানকারীরা তাঁহার মৃত্তিকা নির্ম্মিত

প্রাসাদে উপনীত হইলেন। প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণে দুই হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদিগের অঙ্গে মধ্যযুগের বীর পুরুষদিগের ন্যায় বর্ম্ম। সকলেরই কটিদেশে সেই যুগের তরবারী, শিরে শিরস্ত্রাণ। ধানুকীদিগের হস্তে ধনুক, পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণ। সৈনিক এবং অশ্বসমূহের দেহে বিবিধ বর্ণ-চিত্রিত পরিচ্ছদ। এই সকল বর্ম্ম স্থানীয় নহে, নিশ্চয় কোন না কোন উপায়ে এখানে সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। আফ্রিকার শিল্পীরা শৃঙ্খল-রচিত বর্ম্ম তৈয়ার করিতে জানে না। সম্ভবতঃ মরুভূমির পথে বহু প্রাচীন যুগে এই সকল অস্ত্র ও বর্ম্ম আমদানী হইয়া থাকিবে।

লামিডোর অশ্বারোহী সৈনিক

লাগোন নদের তীরবর্ত্তী গ্রাম্য কুটীর

বিবিধ উপঢৌকন লামিডোকে ভেট দিয়া অভিযানকারীরা তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজার প্রধান মন্ত্রী জানাইয়া দিলেন যে, প্রাসাদের ক্রীতদাসগণ নগ্ন দেহে ঐ সকল উপহার রাজার নিকট লইয়া যাইবে। অপর কাহারও উহা লইয়া যাইবার প্রথা নাই। প্রধান মন্ত্রী প্রাসাদের ক্রীতদাসগণকে লইয়া দ্রব্যসম্ভারসহ নগ্নবেশে রাজসন্নিধানে গমন করিলেন। তাহার পর প্রাসাদের একটা প্রকাণ্ড কুটীরমধ্যে অভিযানকারীরা আহূত
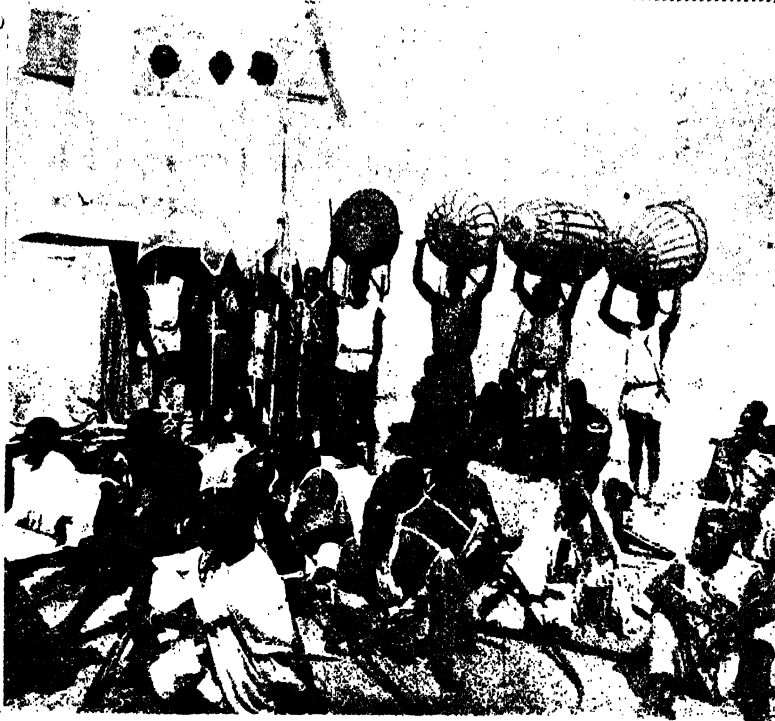
রিয়াই বৌবার সেনাদল

লামিডো বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে তুরী ভেরী ঢক্কার ধ্বনি

তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। তাঁহার শরীরের ওজন প্রায় সাড়ে তিন মণ হইবে।

প্রধান মন্ত্রী উপুড় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া লামিডোকে দীর্ঘ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। আগন্তুকগণ উহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। লামিডো কয়েকটি কথা বলিলেন। দ্বিভাষী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, রাজা তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আগন্তুকগণ প্রস্তাব করিলেন যে, বহুদূর হইতে লামিডোর যশের কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনলাভের জন্য তাঁহারা সমাগত। রাজার এবং তাঁহার পারিষদবর্গের আলোকচিত্র তাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহেন। মিঃ থ'র প্রস্তাবে লামিডো সম্মত হইলেন। কিন্তু মিঃ থ মাত্র একজন নারী লইয়া এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা অতি বিস্ময়কর। মিঃ থ বাক্‌কৌশলে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার হারেমের অন্য নারীদিগকে সঙ্গে আনেন নাই। কারণ, পথের কষ্ট অতি ভয়ানক।

হইলেন। দ্বারসন্নিধানে দেশীয়গণ ভূমির উপর হামা দিয়া পতিত অবস্থায় প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঘরের প্রায়ান্ধকারের মধ্যে এক বিপুলদেহ ব্যক্তি উপবিষ্ট। সম্ভবতঃ

রাজার জন্য উপহৃত বহু দ্রব্যের মধ্যে তাঁহার ৪ শত পত্নীর জন্য উলওয়ার্থ অলঙ্কার, সস্তা বিজলী মশাল, চুরুট

ধরাইবার আলোক এবং ছোট একটি কামান। লামিডো তাঁহাদিগের সম্মানার্থ প্রাসাদরক্ষকদিগের কুচকাওয়াজ দেখাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অন্ধকার কক্ষ হইতে সূর্য্যালোকে বাহির হইয়া রাজা একটি সুসজ্জিত বৃহৎ আসনে উপবেশন করিলেন। তোরণ-পার্শ্বে আগন্তুকদিগের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্রীতদাসরা রাজাসহ সেই বিরাট আসন মাথায় তুলিয়া লইল। রাজা বৎসরে মাত্র একবার কি দুইবার প্রজাসাধারণের সম্মুখে বাহির হইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু জনসমাগম হইল।

ঢাকের বাদ্য আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পিত্তলের তুরী ও বাঁশীও ছিল। বাদ্য বাজিতে লাগিল বটে, কিন্তু সুরতালের সামঞ্জস্য ছিল না। দশ মিনিট ধরিয়া বাদ্যধ্বনির পর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের নানা স্থানে নৃত্যারম্ভ হইল। তাহার পর কুচকাওয়াজ আরম্ভ হইল। রাজার আসনের সম্মুখ দিয়া দলে দলে অশ্বারোহী সেনারা ছুটিয়া যাইবার সময় বল্লম-নিক্ষেপ-কৌশল দেখাইয়া গেল। তাহার পর অসংখ্য পদাতিক সৈনিক সমর-কৌশল দেখাইল। চিতাবাঘের বেশপরিহিত ধানুকীরা এবং ঢাল-বল্লমধারীরা তাহাদিগের কৌশলও প্রদর্শন করিল।

কুচকাওয়াজ শেষ হইলে, লামিডো প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। কয়েক শত অশ্বারোহী সৈনিক অভিযানকারী-দিগকে তাঁহাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আবাসে লইয়া গেল। ৫০ জন বিচিত্রদর্শন নারী তাঁহাদিগের জন্য কাষ্ঠ ও জল লইয়া আসিল। আর দ্বাদশজন নারী মিঃ থ'র হারেমের নারীর অভাব পূর্ণ করিবার জন্য রহিয়া গেল। মিঃ থ ও তাঁহার পত্নী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। যাহা হউক, তাহাদিগকে নানাপ্রকার উপহার দিয়া বিদায় করা হইল। অবশ্য ইহাতে তাহারা বিষম রহস্য অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু বিবিধ অলঙ্কার উপহার পাইয়া তাহারা খুসী হইয়াছিল।

পর দিবস অভিযানকারীরা রাজার নিকট বিবিধ দ্রব্য উপঢৌকনস্বরূপ পাইলেন। ক্রীতদাসগণ ভারে ভারে দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতে লাগিল। বহু আধারপূর্ণ পক্ব আহার্য্য অর্থাৎ মাংস ও মধু, চাউল, মটর, আলু, মাদুর, বল্লম, ধনুক, তীর এবং চিতাবাঘের চর্ম্ম।

রিয়াই বৌবার রাজদর্শনপ্রার্থী ক্রীতদাস

লামিডোকে ম্যাজিক দেখাইয়া মুগ্ধ করিবার কল্পনায় থ দম্পতি ক্ষুদ্র রেফরিজেরেটর ও শব্দগ্রহণ যন্ত্র লইয়া প্রাসাদে গমন করিলেন।

লামিডো পূর্ব্বে কখনও বরফ দেখেন নাই। জল জমিয়

শব্দ হয়, ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু শব্দ-গ্রহণ যন্ত্রের কাছে কথা কহিবার পর যখন সেই রেকর্ড হইতে তিনি নিজের কণ্ঠস্বরের পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। একখানা রেকর্ড উপহার পাইয়া তিনি উহা নিজের গলদেশে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

৪ দিন ধরিয়া বিবিধ আলোক-চিত্র গ্রহণের পর তাঁহারা লামিডোর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। নদীর তীর পর্য্যন্ত রাজা একদল সেনা সহ তাঁহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলেন।

ধৃত হস্তী

গরোয়ার উত্তরে তাঁহারা কয়েক দিবস যাপন করিলেন। দুর্গের একজন সামরিক কর্ম্মচারী অসভ্য পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন। একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহারা চারিখানি মাত্র তৃণকুটীর দেখিতে পাইলেন। তথায় একজন মাত্র বৃদ্ধ ছিল। সামরিক কর্ম্মচারী তাহাকে বলিলেন, সে যেন তাহার সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া দেখায়। বৃদ্ধ তখন ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। পাহাড়ে পাহাড়ে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিল। উত্তরে অনুরূপ চীৎকারধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একদল কৃষ্ণকায় ব্যক্তি পাহাড় বাহিয়া বানর-কটকের ন্যায় ছুটিয়া আসিল।

কুটীরের সম্মুখে কৃষ্ণকায় নর-নারীরা সমবেত হইল। বৃদ্ধের নির্দ্দেশে তাহারা ঢাকের তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিল। দলের একধারে পুরুষ অপর ধারে নারীরা মুখোমুখী হইয়া নাচিতে লাগিল।

বনগর নামক স্থানের নিকট তাঁহারা লোগোন নদ পার হইলেন। পর্ব্বত-সমাকুল কামেরুন্‌স্‌ অপেক্ষা ফরাসী-অধিকৃত এই স্থানটি তাঁহাদিগের নিকট অধিক সমতল বলিয়া অনুমিত হইল। শিকারের পশুপক্ষী এখানে প্রচুর।

নদী পার হইবার পর দ্বিতীয় দিবসে তাঁহারা প্রচুর ধূম দেখিতে পাইলেন। বাতাসের ফলে অগ্নি অতি দ্রুত বিস্তৃতি-লাভ করিতেছিল। মানুষ দৌড়াইয়া এই আগুনের বেড়াজাল উত্তীর্ণ হইতে পারে না। দেশীয়দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এক মাইল পার হইতে না হইতেই তাঁহারা দেখিলেন যে, সেদিকেও আগুন জ্বলিতেছে। শুষ্ক তৃণ-গুল্ম যেন বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রত্যেক ট্রাকএ ১২৫ গ্যালন করিয়া গ্যাসোলিন ছিল। নিষ্ক্রিয়ভাবে অবরুদ্ধ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। মিঃ থ প্রত্যেক গাড়ীর বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সকলকে ভিজা কাপড়ে মুখ আবৃত করিতে আদেশ দিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া দ্রুততর গতিতে গাড়ী চালাইলেন। প্রায় ১ শত গজ

পর্য্যন্ত তাঁহারা জ্বালাময়ী, লেলিহান অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন। ধূম্রের প্রতাপে নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। তাঁহারা প্রাণপণ বেগে গাড়ী চালাইয়া কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অগ্নি-কুণ্ড পার হইয়া আসিলেন। বিপদের ভীষণ আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তাঁহারা নিরাপদে মুক্ত বায়ুতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুইদিন পরে তাঁহারা আর্চ্চাম্ বল্ট দুর্গে আসিলেন। বাড়িতে বাড়িতে উহারা থালার ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। ইহারা এই ওষ্ঠশোভার ভারে ভাল করিয়া পান-আহার করিতে পারে না। কথা বলিতেও পারে না।

বহু শতাব্দী ধরিয়া এই প্রথা এখানে চলিয়া আসিতেছে। অনেক কাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও তাহা-দিগকে এই প্রথা বিসর্জ্জন দিতে প্রলুব্ধ করা যায় নাই ফরাসীরা এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। দেশীয়

দীর্ঘশিরা মাংবেট্টু নারী

মাংবেট্ট নারীর দল
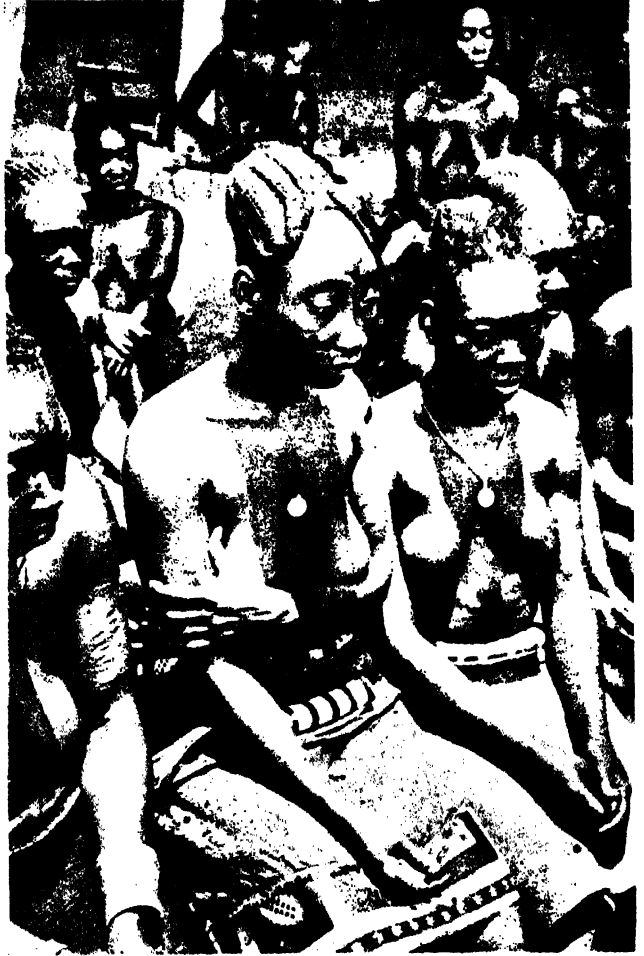
উবাঙ্গি দেশীয়দিগের রাজ্য এইখান হইতে আরম্ভ। এই দেশ দীর্ঘ ওষ্ঠাধরসমন্বিতা নারীর দেশ। এই দেশে বালিকা অবস্থায় ওষ্ঠ ও অধরে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ছোট ছোট কাঠের ছিপি আঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঠের ছিপির আকারও বাড়িতে থাকে। যুবকগণও কেন যে এই কুৎসিত অলঙ্কারপ্রথা বর্জ্জন করে না, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই।

বেলজিয়ান কঙ্গো অঞ্চলে আসিয়া অভিযানকারীরা প্রতিদিন ১ শত হইতে দেড় শত মাইলের বেশী অগ্রসর হইতে পারিলেন না। বেলজীয় সরকার এখানে এক

হস্তিশিকার

জঙ্গলের নদী উত্তীর্ণ হইবার ভেলা

কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় আফ্রিকার হস্তিযূথ ধরিয়া, পোষ মানাইয়া তাহাদিগের দ্বারা অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন। ইহার পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, আফ্রিকার হস্তী কখনও পোষ মানে না। কঙ্গোরার কৃষিক্ষেত্রে ৬০টির অধিক পোষা হাতী অভিযানকারীরা দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রতি বৎসরে ১২ হইতে ১৫টি হাতী স্থানীয় সরকার ধরিয়া আনেন।

উবাঙ্গী নারীকে জলপান করান হইতেছে

খালি হাতে শুধু রজ্জুর সাহায্যে আফ্রিকার হাতী ধরা হয়। ব্যাপারটি সহজ নহে। অভিযানকারীরা স্থানীয় সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত এই হাতী শিকার দেখিতে গিয়াছিলেন। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক অর্দ্ধপূর্ণ হাতীই শিকারের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। কারণ, তাহাদিগকে পোষ মানাইয়া লইতে সুবিধা হয়।

৩০ জন সহকর্ম্মীকে লইয়া সামরিক কর্ম্মচারী হস্তিযূথের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা শিকারীদিগের আগমন-সংবাদ তখন অনুভব করে নাই। হস্তিযূথের নিকট হইতে ৭০ গজ দূরে শিকারীরা থামিল। সুদীর্ঘ তৃণের অন্তরালে সকলেই আত্মগোপন করিয়া রহিল। নির্দ্দিষ্ট হাতীটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিকারীরা কাপ্তেনের নির্দ্দেশে শ্রেণীবদ্ধভাবে সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া ভীষণ চীৎকার ও শূন্যে বন্দুকের গুলী ছুড়িতে লাগিল।

হাতীর দল তখন পলায়নপর হইল। কিন্তু প্রথম শিকারীটি নির্ব্বাচিত হস্তীর এক চরণে কৌশলে দড়ির ফাঁস লাগাইয়া দিল। তখন প্রায় সকল শিকারীই সেই দড়ি

উবাঙ্গী নারীর ওষ্ঠ-ভূষণ

ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহার পরই টানাটানি খেলা। বার জন শিকারীকে পতঙ্গের মত টানিয়া লইয়া হস্তী ছুটিতে লাগিল—মাঝে মাঝে তাড়া করিতে লাগিল। কিন্তু শিকারীরা সুকৌশলে তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া অপর চরণে আর একটি দড়ির ফাঁস লাগাইয়া দিল। এইরূপে চারিটি চরণে দড়ির ফাঁস লাগাইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে হাতীটিকে বাঁধিয়া ফেলিল—শিকার তখন করতলগত।

উচ্চ বৃক্ষ হইতে মধু সংগ্রহ

নিয়ানগারায় ফিরিবার পর অভিযানকারীরা দক্ষিণাভিমুখে মাংচেটু অঞ্চলে চলিলেন। এখানকার নারীদিগের সকলেরই মস্তক দীর্ঘ। শিশু-কন্যার মাথা শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লম্বা করা হইয়া থাকে। এখানে আসিয়া এক ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহারা মিলিত হইলেন। মিশনের ধর্ম্মপ্রচারক ফাদার বন্‌হোফ্ তাঁহাদিগকে লইয়া বিশ মাইল দূরবর্ত্তী দীর্ঘশির নারীর দেশে চলিলেন।

ধর্ম্মপ্রচারক এই অঞ্চলের বহু-বিবাহপ্রথা বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। বহু-বিবাহের কুফল এ অঞ্চলে তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। ধনী পুরুষের অন্তঃপুরে বহু নারী থাকে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কোন কোন যুবকের সহিত পলায়ন করিয়া থাকে। কোন পলায়িতা নারী মিশনে আসিলে তাঁহারা তাহাকে ক্রয় করিয়া রাখেন। পরে কোন মনোনীত পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া দেন।

সেই পল্লীতে পঁহুছিবার পর স্থানীয় নর-নারীরা তাঁহাদিগের আনন্দবিধানের জন্য নৃত্যকৌশল দেখাইল। নারীরা সকলেই নগ্না। শুধু সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে সামান্য আবরণ মাত্র। তাহাদিগের অঙ্গে নানা আকারের ও বর্ণের উল্কী। অনেকের পৃষ্ঠদেশে নিদ্রিত শিশু বাঁধা।

এই অঞ্চলের রাজা নিয়াপু। একদা তিনি বৃক্ষতলে বিচার করিবার জন্য রাজসভা বসাইলেন। চুরীর মোকদ্দমা। নারীচুরী করিয়াছে। বিচারে বুদ্ধির ক্ষমতা প্রকাশ পাইল না। কিন্তু প্রতিবাদের উপায় নাই। যে প্রতিবাদ করিবে, তাহার শাস্তি ভীষণ—কল্পনাতীত। বিচারে সরকারি যে জরিমানা হইল, তখনই তাহা আদায় হইল।

এখান হইতে তাঁহারা নাইরোবী যাত্রা করিলেন। যে অঞ্চলে তাঁহারা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তথায় কদাচিৎ কোন শ্বেতাঙ্গের পদার্পণ ঘটিয়াছিল। সফর সারিয়া দীর্ঘ ৬ মাস পরে তাঁহারা আবার সভ্যসমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় জীবন

প্রথম প্রস্তাব

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬ই জুলাই স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই এসোসিয়েসনের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে যাইয়া তিনি ভারতব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই এসোসিয়েসনের প্রতিনিধিস্বরূপই লালমোহন ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়া, ভারতবাসীর অভিযোগ শুনাইয়া জন ব্রাইট লর্ড হার্টিংটন প্রভৃতি লিবারেল দলের নায়কগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এবং লর্ড রিপণের উদার বিধিবিধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্যতালিকার আলোচনা করিতে গিয়া স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্ম-জীবনীতে (A Nation in the Making) লিখিয়াছেন—
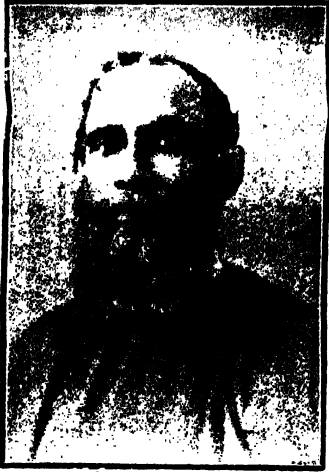
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

I worked for these ideals; others had worked for them too, for they were in the air, and the possession and property of every thoughtful and patriotic Indian.

"এই আদর্শ বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছিল," For they were in the air। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের, রাষ্ট্রীয় উন্নতির আদর্শ তখন বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছিল কেমন করিয়া? ইহার প্রধান কারণ অবশ্যই পাশ্চাত্য-প্রভাব। রাজা রামমোহন রায়ের আমল হইতে বাঙ্গালায় সেই প্রভাবকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল বাঙ্গালা-সাহিত্য। কবি ঈশ্বর গুপ্তও এদিকে উদাসীন ছিলেন না। কবি রঙ্গলাল "স্বাধীনতা-হীনতা"র জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু নীলকরগণের অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের শিঙ্গা বাঙ্গালীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্রের "ভারতবিলাপ" এবং "ভারতসঙ্গীত" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের (১২৭৯ সনের) বৈশাখ মাস হইতে, কবিজনোচিত রীতিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় চিন্তা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে" অমূল্য প্রবন্ধমালা

প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রবন্ধ "বঙ্গদর্শনে"র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতকলঙ্ক"। এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের অর্থাৎ হিন্দুদিগের রণনৈপুণ্যের অভাব বিষয়ক কলঙ্কের অপসারণ। ঐতিহাসিক প্রমাণের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, প্রাচীন হিন্দুগণ রণনিপুণ ছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে, "হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারক" এই কলঙ্ক রটিল কি

দীনবন্ধু মিত্র

প্রকারে? বঙ্কিমচন্দ্র ইহার তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

প্রথম কারণ—হিন্দু-ইতিবৃত্ত নাই—আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়?

দ্বিতীয় কারণ—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হয়। হিন্দুরা কখনও ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়যাত্রা করেন নাই।

তৃতীয় কারণ—হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল হইতে পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীর-গৌরব কি?

তার পরে বঙ্কিমচন্দ্র এই তৃতীয় কারণের কারণ, হিন্দু-পরাধীনতার কারণ আলোচনা করিয়াছেন। "ভারত-কলঙ্ক" প্রবন্ধের এই অংশ অত্যন্ত মূল্যবান্। ইহাতে হিন্দু-চরিত্রের চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। সুতরাং এই অংশের সারাংশ বিস্তৃত ভাবে প্রদান করিব। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুদিগের পরাধীনতার দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—

"প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-রহিত। স্বদেশীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না।...পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল, এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধমাত্র—সে আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে।...প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়-দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং অন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদের বিবেচনা যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয়ই সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান।"

অনেক সময় হিন্দুদিগকে পরজাতির সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায়। "কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই! হিন্দু রাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, পুনঃ পুনঃ ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখনও কোন জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না, সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।"

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণও বঙ্কিমচন্দ্র অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা এবং বায়ুর তাপ অত্যধিক। অল্লায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, অবকাশ অধিক। সুতরাং সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য এবং চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার ফলে কাব্যের এবং দর্শনশাস্ত্রের অতিমাত্রায় অনুশীলন। মনের আভ্যন্তরিক

গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্য সুখে অনাস্থা। বাহ্য সুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে হিন্দুর দীর্ঘকাল পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ—"সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতিহিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন।" সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করা। এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দ্ধাংশ মাত্র। আবার হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। অহিন্দুর মঙ্গলমাত্রেই হিন্দুর মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। যেখানে ভিন্নজাতির মঙ্গলে হিন্দুর অমঙ্গল হয়, সেখানে পরজাতির মঙ্গলের বাধা দেওয়াই হিন্দুর কর্ত্তব্য; যদি পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধন করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ। হিন্দুদিগের মধ্যে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা বা হিন্দু-জাতীয়তা কখনও ছিল না। দুইবার মাত্র ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদিগের মধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল, এবং রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখদিগের মধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদিগের মধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল কি না বলা যায় না; কিন্তু গুরুগোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখদিগের মধ্যে কতকটা ধর্ম্মগত জাতিপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। প্রকৃত রাষ্ট্রগত জাতিপ্রতিষ্ঠা বা nationalismএর অভ্যুদয় ঘটিয়াছে ব্রিটিশ-ভারতে। "ভারতকলঙ্ক" প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"ইংরাজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরাজের ধার ভারতবর্ষ কখনও শোধিতে পারিবে না।...ইংরাজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে; যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে; শুনাইতেছে; বুঝাইতেছে; যে পথ কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।"

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে (১২৮০ সনে) দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গদর্শনের জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্য" নামক প্রস্তাবের প্রথম দুই পরিচ্ছেদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তার পর আরও তিনটি পরিচ্ছেদ সহ "সাম্য" পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল।

কয়েক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পরিবর্ত্তন ঘটাতে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিনি "সাম্যে"র প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন, "সাম্যটা সব ভুল; খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপব না।" বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজের অন্তর্গত "বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী"তে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্য" প্রস্তাবে প্রকাশিত মত পরে পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও, লিখিবার সময় সাম্যবাদে তাঁহার জলন্ত বিশ্বাস ছিল, এবং লেখায় এই বিশ্বাস উথলিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য "সাম্য" রচিত হইয়াছিল, তাহা সার্থক

হইয়াছিল। "সাম্য" বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবের মুখবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহু কালান্তর, তিন দেশে তিন জন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম 'মনুষ্য সকলেই সমান।' এই স্বর্গীয় মহাপবিত্র বাক্য ভূমণ্ডলে প্রচার করিয়া, তাঁহারা জগতে সভ্যতা এবং উন্নতির বীজ বপন করিয়াছিলেন। যখনই মনুষ্য জাতি দুর্দ্দশাপন্ন, অবনতির পথারূঢ় হইয়াছে, তখনই এক মহাত্মা মহাশব্দে কহিয়াছেন, 'তোমরা সকলেই সমান—পরস্পর সমান ব্যবহার কর!' তখনই দুর্দ্দশা ঘুচিয়া সুদশা হইয়াছে, অবনতি ঘুচিয়া উন্নতি হইয়াছে।"

সাম্যবাদের মহিমা এমন করিয়া বাঙ্গালায় আর কেহ কীর্ত্তন করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত এই তিন জন মহাশুদ্ধাত্মার মধ্যে প্রথম শাক্য সিংহ বুদ্ধদেব, দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট, এবং তৃতীয় সাম্যাবতার রুসো (Jean Jacgnes Rousseau)। রুসোর শিষ্যরা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, এই রাষ্ট্রবিপ্লবে ফরাসীদেশে পুরাতন যাহা কিছু ছিল "অনন্ত প্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল—মনুষ্য জাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল। রুসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইল। কেন না, সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক—সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত।" এখানে দেখা যাইবে, বঙ্কিমচন্দ্র রুসোর মতের দোষের ভাগ সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। সাম্যবাদ প্রচারের এক ফল, ফরাসীবিপ্লবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আর এক ফল, কম্যুনিজম্‌এর পরিচয় দিয়াছেন। কম্যুনিজমের প্রধান প্রচারক কার্ল মার্কস তখন লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন, এবং তাঁহার প্রধান গ্রন্থ Das Kapitalএর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। খুব সম্ভব সেই মহা গ্রন্থের মর্ম্ম বঙ্কিমচন্দ্র তখনও জানিতে পারেন নাই। জানিলে হয় ত তিনি কার্ল মার্কসকে চতুর্থ সাম্যাবতার বলিয়া অভিনন্দিত করিতেন। কার্ল মার্কসের পূর্ব্ববর্ত্তী কম্যুনিষ্টগণের মত, ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত (অর্থাৎ সম্পত্তি অর্জ্জনকারী জীবনান্তে সেই সম্পত্তি অন্যকে দান করিয়া না গেলে সেই ত্যক্ত সম্পত্তি একক ভোগ করিবার কাহারও অধিকার নাই) বঙ্কিমচন্দ্র সরল ভাষায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে। অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা।"

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য মনীষিগণের প্রচারিত, পাশ্চাত্য জগতে বিপ্লব উৎপাদক সাম্য, সৌভ্রাত্র এবং স্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় হাজার-করা ৯৯৯ জন, এবং যাহাদিগকে লইয়া বঙ্গদেশ, সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষকদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা প্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রবল লেখনী পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কৃষকগণ ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন, প্রজাপার্টি হইয়াছে, কিষাণ সভা হইয়াছে, পাশ্চাত্য সাম্যবাদের—সোসিলিজ্‌ম এবং কম্যুনিজ্‌ম্‌এর হাওয়া ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসকে অনেকটা অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে, য়ুরোপেই যখন কম্যুনিজ্‌ম্ সূতিকাগৃহে, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষক সম্বন্ধে "বঙ্গদর্শনে" যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, এগুলি যেন এখনকার কোনও বামপন্থী কংগ্রেসের সদস্যের লেখা। এই প্রবন্ধ কয়েকটির নাম ও প্রকাশের তারিখ নিম্নে দেওয়া গেল।

বঙ্গদেশের কৃষক, প্রথম পরিচ্ছেদ।—দেশের শ্রীবৃদ্ধি বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৭৯ (আগষ্ট, ১৮৭২)।

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—জমীদার। বঙ্গ-দর্শন, কার্ত্তিক, ১২৭৯ (অক্টোবর, ১৮৭২)।

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—আইন।

বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯ (ডিসেম্বর, ১৮৭২)।

—চতুর্থপরিচ্ছেদ।—প্রাকৃতিক নিয়ম।

বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৭৯ (ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভে বলিয়াছেন, আজিকালি বড় গোল শুনা যায়, দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে। তার'পর প্রশ্ন করিয়াছেন—

"দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে?

"হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।

"তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?

"যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন, ইংরেজের আমলে কৃষিজাত ধনের বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা কৃষকের ঘরে যায় না, রাজা, ভূস্বামী, বণিক্ এবং মহাজনের ঘরে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জমীদারের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র পরাণ মণ্ডল নামক একজন কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া জমীদারের বৎসরব্যাপী প্রজাপীড়নের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তার পর জমীদারদিগের পক্ষে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন। অনেক অত্যাচার জমীদারের অজ্ঞাতসারে বা অনভিমতে নায়েব-গোমস্তা কর্ত্তৃক সাধিত হয়। অনেক প্রজাও ভাল নয়; পীড়ন না করিলে খাজানা দেয় না। জমীদারদিগের দ্বারা চিকিৎসালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তার পর লিখিয়াছেন—

"আমাদিগের দেশের লোকের জন্য যে ভিন্ন জাতীয় রাজপুরুষদিগের সমক্ষে দুটো কথা বলে, সে কেবল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—জমীদারদের সমাজ। তদ্দ্বারা দেশে যে মঙ্গল সিদ্ধ হইতেছে, তাহা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে হইতেছে না, বা হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব জমীদারদিগকে কেবল নিন্দা করা, অতি অন্যায়পরতা। এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন লোকের দ্বারা যে প্রজা-পীড়ন হয়, ইহাই তাঁহাদের লজ্জাজনক কলঙ্ক। এই কলঙ্ক অপনীত করা জমীদারদিগেরই হাত।"

"বঙ্গদেশের কৃষক" প্রস্তাবের "আইন" নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র জমীদারী স্বত্বের এবং প্রজাস্বত্বের ইতিহাস এবং এই সম্বন্ধে বিভিন্ন আইন-কানুন, বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অস্থায়ী করিবার কথা উঠিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। আমরা যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার অভিমত উল্লেখ করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, প্রাচীন হিন্দু রাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজারা বরাবর রাজাকে উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজস্ব দিত।* মুসলমানদিগের সময়ে প্রথম জমীদারের সৃষ্টি। তাঁহারা রাজস্ব আদায়ে পটু ছিলেন না। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পরগণায় করসংগ্রাহক নিযুক্ত করিতেন। ইহারা করসংগ্রহের কন্‌ট্রাক্ট লইত। এই কন্‌ট্রাক্টারেরাই জমীদার। ইহারা মুসলমান রাজাকে প্রত্যেক পরগণার জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিত। ইহার উপর প্রজার নিকট হইতে যত আদায় করিতে পারিত, ততই তাহাদের লাভ হইত। সুতরাং প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তাঁহারা খাজানা আদায় করিতেন।

তার পর ইংরেজেরা রাজা হইলেন। ইংরেজদিগের প্রজার দুরবস্থা মোচন করিবার ইচ্ছার অভাব ছিল না। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস মহা ভ্রমে পতিত হইলেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি করিলেন। রাজস্বের কন্‌ট্রাক্‌-টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের

* হিন্দু রাজ্যে রাজা ছিলেন দুই প্রকার—এক রাজাধিরাজ, আর এক রাজাধিরাজের অধীনে অনেক সামন্ত রাজা। সামন্ত রাজারা প্রকৃত ভূস্বামী ছিলেন। বাঙ্গালার বার ভৌমিক এই সামন্ত রাজা শ্রেণীর ভূস্বামী ছিলেন। মোগল বাদশাহগণ বার ভৌমিককে ধ্বংস করেন এবং বর্ত্তমান শ্রেণীর জমীদার সৃষ্টি করেন।

চিরকালের স্বত্ব লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন্‌কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্‌কালে ফিরিবে না। ইংরাজদিগের এই কলঙ্ক চিরস্থায়ী, কেন না, এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।"

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি সংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আইনে জমীদারের পীড়নের প্রতীকারের যে ব্যবস্থা আছে, আদালতের আশ্রয়ে তাহার ফল ভোগ করা প্রজার অসাধ্য। কেন না, মোকদ্দমা ব্যয়-সাধ্য। আদালত দুরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে অনেক বিলম্ব হয়। তার উপর আবার এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ইংরেজ হাকিমদিগের নিকট আপিল আছে। "সমাজদর্পণ" নামক একখানি সংবাদপত্রে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, "বঙ্গ-দর্শনে" "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রস্তাব লেখক দশশালা (চিরস্থায়ী) বন্দোবস্ত ধ্বংস করিতে চাহেন। ইহার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসের পক্ষপাতী নহেন। কারণ, তাহার ফলে বঙ্গসমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, এবং ইংরাজও প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হইবেন। তিনি আরও বলেন, "ইংরাজেরা যে ভূমিতে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে তাহাতে স্বত্ববান করিয়াছেন, এবং করবৃদ্ধির অধিকার ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দুষ্য বিবেচনা করি না। তাহা ভালই করিয়াছেন। এবং ইহা সুবিবেচনার কায, ন্যায়সঙ্গত, এবং সমাজের মঙ্গলজনক। আমরা বলি যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমীদারের সহিত না হইয়া প্রজার সঙ্গে হওয়াই উচিত ছিল। তাহা হইলেই নির্দ্দোষ হইত। তাহা না হওয়াতেই ভ্রমাত্মক, অন্যায় এবং অনিষ্টজনক হইয়াছে।" চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, অন্য সুনিয়ম করিয়া তাহার যতদূর প্রতীকার হইতে পারে, তাহা করা হউক, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য।

"বঙ্গদেশের কৃষক" প্রস্তাবের প্রথম তিন পরিচ্ছেদে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে—কৃষকগণের দারিদ্র্য, জমীদারের অত্যাচার, রাজকীয় বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি—বর্ত্তমান কালের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারিগণ এবং প্রজার দরদীগণ এই সকল বিষয়ের প্রতীকারের চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন; কিন্তু জমীদারের অত্যাচার এবং রাজবিধির ত্রুটি ভিন্ন প্রজার দারিদ্র্যের আরও যে কারণ থাকিতে পারে, সে দিকে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ভোটভিখারী পেশাদার প্রজাহিতকারী ছিলেন না। বঙ্গদেশের কৃষকগণের দারিদ্র্যের সকল কারণ নিরূপণ, এবং সেই সকল কারণেরই প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তজ্জন্য তিনি বর্ত্তমানে প্রজার অবস্থা, জমীদারের আচরণ, এবং রাজবিধানের বিচার করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই, অতীতের ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক নিয়মও আলোচনা করিয়াছেন। "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রস্তাবের চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম "প্রাকৃতিক নিয়ম"। এই পরিচ্ছেদের আরম্ভে তিনি বলিয়াছেন, এদেশের কৃষকদিগের দুর্দ্দশা দুই এক শত বৎসরে ঘটে নাই। স্বাধীন হিন্দু রাজাদিগের আমলেও ইহাদিগের অবস্থা এইরূপই ছিল। এখন প্রজাপীড়ন করে জমীদারগণ। তখন অন্য এক শ্রেণীর লোক সেই কুকর্ম্ম সম্পাদন করিত। ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন। এই উন্নতিহীনতার মূল কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম। সভ্যতার ইতিহাস-লেখক বাক্‌লের অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় সভ্যতার আদৌ দ্রুত উন্নতির, এবং পরে উন্নতিহীনতার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'প্রথম কারণ, ভূমির উর্ব্বরতা। ভূমির উর্ব্বরতার ফলে ভারতবর্ষে অতি শীঘ্র ধনসঞ্চয় সম্ভব হইয়াছিল, এবং ধনাধিক্য হেতু একটি সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রম হইতে অবসর লইয়া জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অর্জ্জিত প্রচারিত জ্ঞানের কারণেই ভারতবর্ষের সভ্যতা। কিন্তু যে দেশে মাটী আঁচড়াইলেই শস্য জন্মে, এবং তাহার যৎকিঞ্চিৎ খাইলেই ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং জীবন ধারণ হয়, সে দেশের লোক বিশেষ শ্রমশীল হয় না। দ্বিতীয় কারণ, উষ্ণ হাওয়া শরীরের শৈথিল্যজনক, এবং পরিশ্রমের অপ্রবৃত্তিদায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই দুইটি প্রাকৃতিক কারণে অতি পূর্ব্বকালেই ভারতবর্ষে

সভ্যতার উদয় হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দুর্দ্দশাও উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ফলে সার্ব্বজনীন অবনতি ঘটিয়াছিল। উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা ভাল আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমীদার প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি অনুর্ব্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এরূপ নিত্য যে, যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিরুদ্ধ না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি কারণান্তরে প্রতিবিদ্ধ হইতে পারে। সে সকল কারণ রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরে ইতালীতে গ্রীক সাহিত্যাদির আবিষ্কার না হইত, তবে এক্ষণকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্ব্বরতা বা অন্য বাহ্য প্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্ত্তন হইত না

এই উপসংহার ভাগের শেষ কয় পংক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র অতি অল্পাক্ষরে য়ুরোপীয় ইতিহাসের অনেক কথা সূচিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রস্তাবে সে সকল কথা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিবার স্থান নাই। তবে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, দরিদ্র প্রজার যাঁহারা প্রকৃত হিতকারী, তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জমীদারের অত্যাচার এবং রাজকীয় বিধি প্রজার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ নহে; প্রাকৃতিক নিয়মাধীন প্রজার নিজের দোষ—আলস্য, অনুৎসাহ প্রভৃতিও তাহার দুর্দ্দশার প্রবল কারণ। এই সকল নিয়ম অদৃষ্ট নহে, দৃষ্ট। আধুনিক য়ুরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চেষ্টা করিলে এই সকল নিয়মের নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ড "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত, এবং পূর্ব্বে আলোচিত, "সাম্য" নামক প্রবন্ধ দুইটির সহিত তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদরূপে "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রস্তাবের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ এবং স্ত্রী-পুরুষের সাম্য বিষয়ক একটি নূতন (পঞ্চম) পরিচ্ছেদ যোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্য" নামক পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কিছুকাল পরে সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিলে তিনি এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড "বিবিধ প্রবন্ধে" "বঙ্গদেশের কৃষক" অবিকল (তৃতীয় ও চতুর্থ-পরিচ্ছেদের সংখ্যা পরিবর্ত্তিত করিয়া) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রস্তাবের গোড়ায় পুনর্মুদ্রণের একটি দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে। এই কৈফয়তের কতকটা অংশ উদ্ধৃত করিব—

"এক্ষণে যে আমি ইহা (বঙ্গদেশের কৃষক) পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে।...(২) ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রথম সূত্রপাত, সুতরাং পুনর্মুদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবিদাওয়া রাখে।...(৪) এ প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন কিছু যশোলাভ করিয়াছিল।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র (আগষ্ট) মাসের "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রস্তাবের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের প্রণীত লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরগণের শাসনাধীনে বঙ্গদেশের ইতিহাস পুস্তকেও লিখিত হইয়াছে, তার পর হইতেই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের সংশোধন বিষয়ের আন্দোলন এবং আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। যথা—

When Sir R. Thompson became Lieutenant-Governor in April 1882, the question of the amendment of the rent law in the Lower provinces, which had for nearly 10 years been the subject of agitation and discussion, had reached a stage at which it was certain that some legislative measure would be introduced, though the nature of that measure had not yet been finally determined. The necessity for legislation had, indeed, been apparent ever since the occurrence, in 1873, of the serious agricultural disturbances in Pabna. *

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্যার রিভার্স টম্প্‌সন সাহেব বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol, II, P, 807.

বিসর্জ্জন
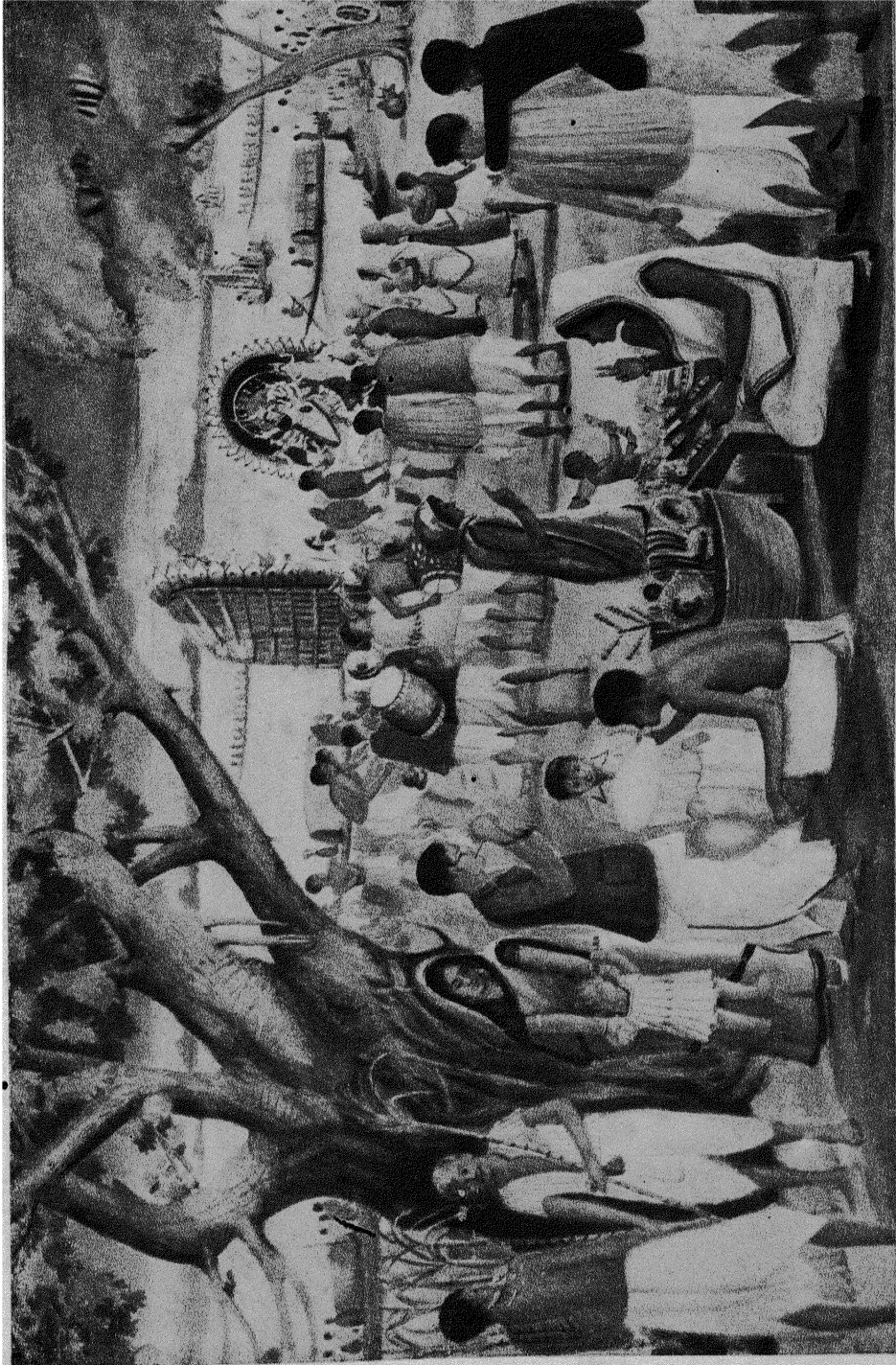
[শিল্পী—শ্রীভূদেব বিশ্বাস

তাহার ১০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই ফলে বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের আট আইন পাশ হইয়াছিল। বাঙ্গালার কৃষকদিগের ইতিহাসে দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদেশের কৃষক" যুগান্তরের সহায়তা করিয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যখন স্থির করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে আন্দোলন করিবার জন্য লালমোহন ঘোষকে সেখানে পাঠাইবেন, তখন তাঁহার ইংলণ্ডে যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে মোটা রকমের দান পাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরে গিয়াছিলেন, এবং তৎকালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বহরমপুর-বাসী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট হইতে সুপারিশ চিঠি লইয়া মহারাণীর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

"I fortified myself with a letter from Babu Bankim Chandra Chatterjee, the great Bengalee novelist, who evinced the utmost sympathy with the whole movement."

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

প্রশ্ন

আচ্ছা প্রিয়ে! রাগ করো না, ভাবছি বসে বসে
কাব্য যারা লিখে গেছে মুগ্ধ হয়ে রসে,
মিথ্যে দিয়ে কেন তারা মন ভরাল খালি!
তাদের নেহাৎ পোড়াকপাল পায়নি গালাগালি—
চিনির পানা নিত্য দিবা রুচবে কেন মুখে;
অম্ল-কটু কষায় ঝালে থাকছি কিবা সুখে।

তোমার মতন নারীরত্ন পায়নি কভু কেহ,
ধন্য আমি সুভাষিণি! ধন্য আমার গেহ,
তোমার কণ্ঠে গালি-গালাজ সুধার মতন মিষ্ট
শোনেনি যে তাহার সখি, নেহাৎ দগ্ধাদৃষ্ট।
তোমার হাতের লঙ্কাবাটা—নলেন গুড়ের চেয়ে
তোমার মুখের স্পষ্ট কথা মজেই আছি খেয়ে।'

নায়িকারা পরীর মতন আসমানে যায় উড়ে
তোমার মতন শ্লিষ্ট কথায় দৈন্য কি তারা তুড়ে—
চাঁদের আলো ফুলের মালা, অভিনয়েই সাজে,
অন্নপূর্ণা চাই যে সখি, প্রতিদিনের কাজে,—
মূর্চ্ছা যাওয়া রূপের পরী—তাদের সাথে আড়ি,
রুদ্র-মধুর তুমি থাক উজল করি বাড়ী।

শ্রীমতিলাল দাশ।

বিচিত্র রণ-বিমান

ইংলণ্ডে নানাপ্রকার রণ-বিমান নির্ম্মিত হইতেছে। তন্মধ্যে এক প্রকার রণবিমানের পশ্চাদ্ভাগে আবর্ত্তনশীল গম্বুজের মধ্যে কামান রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই গম্বুজের মধ্যে গোলন্দাজ অবস্থান
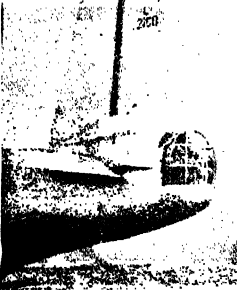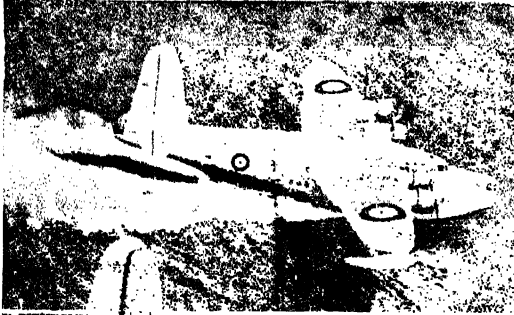
রণবিমানের উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, উহা ব্যোম-পথে ধাবিত হইতেছে; নিম্নের চিত্রে পশ্চাৎ ভাগের আবর্ত্তনশীল গম্বুজের সমগ্র দৃশ্য প্রদর্শিত হইল

করে। সে তথা হইতে চারিদিক লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায়। যখন যে ভাবে ইচ্ছা শত্রুপক্ষের উপর এইখান হইতে সে কামানের গোলা নিক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং সহসা কোন শত্রু এই রণ-বিমানকে আক্রমণ করিবে, সে সম্ভাবনা নাই। এই রণবিমান একাদিক্রমে ৩ হাজার মাইল উড়িয়া যাইতে পারিবে, এমন ব্যবস্থা হইয়াছে। কামান, গোলা ও বোমা প্রচুর পরিমাণে লইয়া একাদিক্রমে দ্রুতবেগে ৩ হাজার মাইল উড়িয়া যাওয়া সাধারণ ব্যাপার নহে।

বিনা মোটরে উড্ডীয়মান সাইকেল

মনুষ্যচালিত 'গিরো সাইকেল' সোজাভাবে উপরে উঠিতে পারে। এই যন্ত্র স্বাধীনভাবে এখনও উড়িতে পারে না। আপাততঃ একটি স্থায়ী তিনটি পায়াবিশিষ্ট স্থানে সাইকেলকে রাখিয়া উহার দ্বারাই তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। পরিচালক, চাকার উপরিস্থিত আসনে উপবেশন করিয়া প্রপেলারকে আবর্ত্তিত করিতে থাকে। মানুষের শক্তিতে যতদূর কুলায় ততবেগে উহা আবর্ত্তিত হইয়া গতিবেগ উৎপাদন করে। যখন সর্ব্বোচ্চ বেগ উৎপাদিত হয়, তখন পরিচালক হাতল টানিয়া ধরে। অমনই যন্ত্রটি আরোহীকে

বিনা মোটরে উড্ডীয়মান সাইকেল

লইয়া শূন্যে উত্থিত হয়। অবশ্য ভূমি হইতে শূন্যে উত্থান এখন এক বা দুই ইঞ্চির অধিক হয় নাই। পরিণামে উহা ১২ ফুট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে।

পুলিসের অঙ্গে মধ্যযুগের বর্ম্ম ও হস্তে ঢাল

প্যারিসের পুলিস মধ্যযুগের বীরদিগের ন্যায় বক্ষোদেশে বর্ম্ম ও হস্তে ঢাল ধারণ করিতেছে। বেপরোয়া দস্যু তস্কর অথবা অন্য প্রকার অপরাধীর সহিত পুলিসের বন্দুক বা পিস্তল-যুদ্ধ হইয়া থাকে। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পুলিস এই প্রকার বর্ম্ম ধারণ

করিয়া থাকে। গলদেশ হইতে এই বর্ম্ম বিলম্বিত থাকে। পুলিসের বাম হস্তে চতুষ্কোণ ধাতব ঢাল। মুখমণ্ডলের ঊর্দ্ধাংশ ও মস্তক আবৃত করিয়া আর একটি ঢাল বিরাজিত। এই ভাবে সুসজ্জিত

ঢাল হস্তে প্যারিসের বর্ম্মাবৃত পুলিস

হইয়া ইদানীং প্যারিসের পুলিস অপরাধীদিগের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

বিচিত্র যাত্রিবাহী বিমান

আমেরিকার বিমান বিভাগ এক দ্রুতগামী যাত্রি-বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বিমান ২০ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া এক-শত-যাত্রী ও ১৬ জন নাবিকসহ ঘণ্টায় ২ শত ৭৬ মাইল বেগে গমন করিবে। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে সাড়ে ৪ মাইল
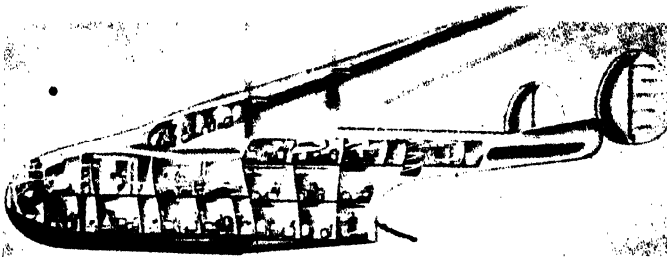
বিচিত্র যাত্রিবাহী বিমান

গতিবেগ। বিমানের ডানায় ৩৬ জন আরোহীর জন্য স্থান হইয়াছে। বাকি যাত্রীরা বিমানের প্রধান অংশে থাকিবে। প্রত্যেক কেবিন এমনভাবে নির্ম্মিত যে, এঞ্জিনের শব্দ ভিতরে প্রবেশ করিবে না। বাতাস ও আলোকচলাচলের সুবন্দোবস্ত আছে। ডানার বিস্তার ১ শত ৯৬ ফুট। বিমানখানিতে ৪টি এঞ্জিন আছে। ২ হাজার ১ শত ৫০ অশ্বশক্তিতে ঐ বিমান পরিচালিত হয়। উহার প্রভাবে ৩০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে। একাদিক্রমে এই বিমান ৫ হাজার মাইল ঘুরিয়া আসিতে পারে।

অভিনব বাদ্যযন্ত্র

ওকল্যাণ্ডের ওকলাহোমা সহরের পল ডবলু টমাস্ নামক

সপ্তস্বরা অভিনব বীণা

এক ব্যক্তি এক অভিনব বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রে ৩ শত স্বতন্ত্র সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করা সম্ভবপর। এই বাদ্য-যন্ত্রটি সপ্তস্বরা। অর্থাৎ ইহাতে ৭টি তার আছে। বাদক এই যন্ত্র হইতে ৩ শত বিভিন্ন সুর তুলিয়া থাকেন।

বিচিত্র ভাসমান সমুদ্র-পোত

বর্ত্তমান সমুদ্র-পোতের জন্য রবারনির্ম্মিত জুতার প্রচলন হইয়াছে। পূর্ব্বে কাঠের বা অন্যবিধ ধাতুনির্ম্মিত লঘুভার ভেলা এই সকল পোতে ব্যবহৃত হইত। কোন ভূতপূর্ব্ব সামরিক কর্ম্মচারী ইদানীং তৎপরিবর্ত্তে রবারের ভেলা ব্যবহার করিয়াছেন। এই রবার-নির্ম্মিত বেলুনগুলির সাহায্যে পোত অতি সহজে আকাশপথে উত্থিত হয় এবং জলের উপর নামিবার সময় কোন প্রকার স্পন্দনবেগ অনুভূত হয় না। পূর্ব্বে কিন্তু ইহা সম্ভবপর ছিল না। এই রবারনির্ম্মিত ভেলাগুলি এমন ভাবে আবদ্ধ

হজম করিয়া থাকে যে, তাহা অনুভবগম্যই হয় না। প্রত্যেক ভেলা ৫ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া ভাল্‌ব বা ছিপি আছে। প্রত্যেক ভেলার পার্শ্ব-দেশে রবারের ফাঁপা নল আছে। সেগুলি বায়ু-পূর্ণ থাকে। ইহার ফলে জল হইতে পোত যখন উত্থিত হয়, তখন সহজে সে কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।
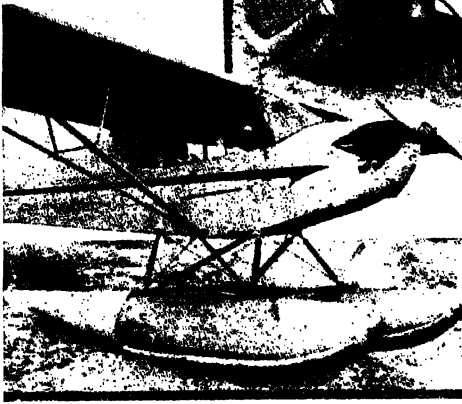
উপরের চিত্রে রবার ভেলা পাম্প বা বায়ুপূর্ণ-করা হইতেছে। নিম্নস্থ বাম দিকের চিত্রে পোত আকাশে উঠিবার পূর্ব্বে কি অবস্থা হয় তাহা দেখা যাইতেছে

বায়ু-তাড়িত বন্দুকের সাহায্যে সমুদ্রে মৎস্য-শিকার

বায়ু-চালিত বন্দুকে সমুদ্রে শিকার

ছিপ, জাল প্রভৃতির দ্বারা মৎস্য শিকার অতি পুরাতন ব্যবস্থা। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন অভিনব উপায়ে সমুদ্রের সুগভীর সলিল-মধ্যস্থিত মৎস্যাদি প্রাণি-শিকারের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্রে যাঁহারা শিকার করেন, তাঁহারা বায়ু-চালিত বন্দুকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। পুয়ারটো রিকান্‌এ একদল শিকারী এই বন্দুক লইয়া শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই বন্দুকের এমন শক্তি যে, সমুদ্রগর্ভস্থ ৫০ ফুট নিম্নে অবস্থিত মৎস্য শিকার করা সহজসাধ্য। বন্দুকের বায়ুকোষ যখন চাপিয়া ধরা হয়, তখন ২ হাজার পাউণ্ড ওজনের চাপ পিত্তল-শলাকার উপরে পড়ে। তখন শলাকা তীরবেগে মৎস্যদেহে বিদ্ধ হয়। বন্দুকের আকৃতি কি প্রকার, তাহা প্রদত্ত চিত্র হইতেই বুঝা যাইবে।

রাত্রিকালে সূর্য্যালোকবৎ বিদ্যুতালোকে বলক্রীড়া

ক্লেভল্যাণ্ডের ব্রুকসাইড ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে রাত্রি-কালে বেস্‌বল ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল।
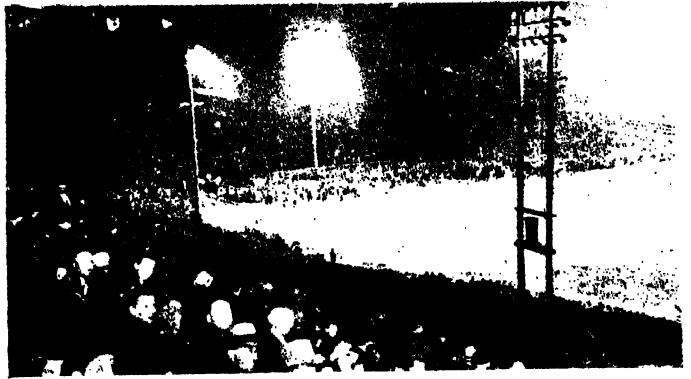
সূর্য্যালোকবৎ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে নৈশ বলক্রীড়া

সুবিস্তৃত, বৃহৎ ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে এমনভাবে বিদ্যুতালোকের ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, রাত্রিকালে সূর্য্যালোকবৎ সমস্ত প্রাঙ্গণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 'ওয়েষ্টিং হাউস ইলেক্‌ট্রিক ও ম্যানুফ্যাক্‌চারিং” কোম্পানী এই আলোক সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে ৮০ হাজার দর্শক ক্রীড়াক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। বল যখন অত্যন্ত উচ্চে উত্থিত হইতেছিল, তখনও সকলে তাহা দেখিতে পাইয়াছিল।

শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবী

(গল্প)

দুখানা উপন্যাস ছাপিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে লেখিকা শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবীর নাম দিকে দিকে রটিয়া গেছে। কাগজে কাগজে সুদীর্ঘ সুখ্যাতি—কাজেই বই দু'খানি হুড়-হুড় করিয়া বিক্রয় হইতেছে।

শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবীর বিবাহ হইয়াছে। স্বামী শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মার্চ্চেণ্ট অফিসে কেরাণীগিরি করেন। তিনি থাকেন শ্যামপুকুরে।

পূজার পূর্ব্বে প্রকাশকের কেয়ারে ঠিকানা কাটিয়া শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবীর নামে এক চিঠি আসিয়া হাজির। চিঠির সঙ্গে ছাপানো একতাড়া ফর্ম্ম। চিঠি আসিয়াছে কমলভোজী পরিষৎ হইতে। চিঠিতে লেখা—

৭ নং প্রিমরোজ ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ

মাননীয়াসু

আপনি বাঙলা দেশের একজন স্বনামধন্যা লেখিকা। এ যুগের কলা-রসিকদের মিলন-সৌকর্য্যার্থে কমলভোজী পরিষদের সৃষ্টি। এ পরিষৎ আপনাকে সদস্যা-তালিকাভুক্ত করিবার সুযোগ পাইলে গৌরব বোধ করিবে। আশা করি, আপনার সহযোগিতা-লাভে পরিষৎ বঞ্চিত হইবে না।

পরিষদের প্রবেশিকা-ফী দশ টাকা এবং মাসিক চাঁদা দু'টাকা। পত্রসহ ছাপানো ফর্ম্ম পাঠানো হইল। স্বাক্ষর করিয়া প্রবেশিকা-ফী এবং এক মাসের চাঁদা—মোট বারো টাকা পাঠাইলে আপনাকে আমরা সদস্য পদে বরণ করিয়া ধন্য হইব। যদি আদেশ করেন, আমাদের পিয়ন গিয়া নির্দ্ধারিত তারিখে প্রবেশিকা-ফী ও চাঁদা আনিতে পারে।

আশা করি, আপনার আনুকূল্য ও সহযোগিতা-লাভে বঞ্চিত হইব না। ইতি

ভবদীয়
শ্রীত্রিনয়নী সিংহ
শ্রীকুসুমকুমার পাঁজা
যুগল-সম্পাদক

স্বামী শ্যামাচরণ গিলেট-ক্ষুর লইয়া বারান্দায় বসিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিতেছিলেন, শ্রদ্ধা দেবী আসিয়া বলিলেন—আমার নামে কি চিঠি এসেছে, দ্যাখো।

শ্যামাচরণ ক্ষুর রাখিয়া চিঠি পড়িলেন। আনন্দে-গর্ব্বে দুই চোখ প্রদীপ্ত হইল। তিনি বলিলেন, কমল-ভোজী পরিষৎ!…ও, Lotus-Eeaters' Club…

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—নব-যুগের সাহিত্য সভা। কি করবো?

শ্যামাচরণ বলিলেন—এখনি জবাব লিখে দাও…হ্যাঁ, লিখে দাও, সভ্য হবো।

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—কিন্তু এদের সভায় মাঝে মাঝে তাহলে যেতে হবে, মশাই!

শ্যামাচরণ কহিলেন—যাবে। মেলামেশা করা চাই বৈ কি! Social gathering…এ সবগুলো না করলে পাব্লিসিটি হবে কেন? লিখে যখন নাম করেছো, তখন সব দিক্ দিয়ে সে নামকে সার্থক করা চাই। একালে মেয়েদেরই এদিকে খাতির বেশী। যত সভা-সমিতি বলো, ceromony বলো, লোকে মেয়েদের নিয়ে যায় প্রিসাইড (Preside) করতে, মায় লিটারারি কনফারেন্স পর্য্যন্ত। তোমারো এক দিন সে গৌরব কেন না হবে?

শ্রদ্ধা দেবীর মানস-নয়নের সামনে কনফারেন্সের তাঁবুর ছবি জাগিল! মস্ত তাঁবু—তাঁবুর মাথায় পতাকা উড়িতেছে! তিনি কহিলেন—এ সব সভা-সমিতি পোষায় যারা বড়লোক, তাদের। আমরা গরীব গেরস্ত-মানুষ…

স্বামী শ্যামাচরণ বলিলেন,—না, না, না…যে-কাজের যা দস্তর। যখন উপন্যাস ছেপে পাব্লিকের সামনে দাঁড়িয়েছ, এবং পাব্লিক যখন তোমাকে চায়, তখন তুমি ঘরের কোণে

হেঁশেল নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না!···লিখে দাও জবাব···এখনি। শুভস্য শীঘ্রং।

শ্রদ্ধা দেবীর কপোল লজ্জারক্তিম হইল। তিনি বলিলেন,—তুমি তাহলে দাড়ি কামিয়ে একটা জবাব লিখে দাও—আমি সেটা দেখে কপি করে চিঠি পাঠাবো।···কিন্তু বারো টাকা খরচ, মশাই···মনে রেখো। এ বারো টাকায় দু'মণ চাল আসে।

শ্যামাচরণ কহিলেন—যখন বড় হতে চলেছ, তখন নজর বড় করতে হবে। এ বারো টাকা পরে দশগুণে একশো কুড়ি টাকা হয়ে ফিরে আসবে! বুঝলে···লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা থাকা দরকার—তাতে পরস্পরের পাব্লিসিটির অনেক সুবিধা হয়।

শ্রদ্ধা দেবী হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু আমার ভারী লজ্জা করবে। লোকের ভিড়ে কি ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াবো? তোমার সঙ্গে যে ক'রে সিনেমা দেখতে যাই—গা ছমছম্ করে! তবু ট্রামে-বাসে এখনো চড়তে পারি না।

শ্যামাচরণ কহিলেন—এ ছমছমানি দু'দিনেই কেটে যাবে। সাঁতার শেখে মানুষ জলে নেমে হাত-পা ছুড়ে—ডাঙায় বসে কেউ সাঁতার শেখে না।···

স্বামীর এই উৎসাহের জন্য শ্রদ্ধা দেবী স্বামীর পায়ে মাথা বিকাইয়া দিয়াছেন!

সাত দিন পরের কথা। বেলা দুটায় শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবীর নামে আবার একখানি ছাপানো চিঠি আসিল। কমল-ভোজী পরিষদের শনি-বাসরীয় সান্ধ্য-মিলনে নিমন্ত্রণ। মিলনের স্থান—মুন-লাইট হোটেল, পাঁচ-তলার ফ্ল্যাট, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা। চিঠির এক জায়গায় লাল কালিতে হাতের হরফে লেখা—

নূতন সদস্য-সদস্যার অভিষেক:

১। শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবী
২। শ্রীযুত সখিবিলাস চক্রবর্ত্তী
৩। শ্রীমতী মরুমায়া সেন

স্বামী শ্যামাচরণ তখন অফিসে। চিঠি পাইয়া শ্রদ্ধা দেবীর মন আকুল অধীর হইয়া উঠিল। শনিবার আসিতে এখনো দু'দিন বাকী! আজ বুধবার। এ দু'দিন মনের চাঞ্চল্য চাপিয়া কি করিয়া থাকিবেন!

বৈকালে স্বামী আসিলে শ্রদ্ধা দেবী চিঠি দেখাইলেন। শ্যামাচরণের মন ছিল তপ্ত—অফিসের হিসাবে মারাত্মক ক'টা ভুল ধরা পড়িয়াছে বলিয়া সাহেবের কাছে বেশ খানিকটা তাড়া খাইয়াছেন। চিঠির অমৃত-স্পর্শে মনের সে দাহ নিমেষে জুড়াইয়া গেল। তিনি বলিলেন—কোন্ শাড়ী পরে যাচ্ছ তাহলে?

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—এ রকম ভদ্র সভ্য জায়গায় যাবার মতো শাড়ী আমার কৈ?···ভালো শাড়ীর মধ্যে একখানা ঐ বেনারসী, আর দুখানি মাত্র সেই শিল্কের···পরে' পরে' সে-শাড়ীর চেহারা যা হয়েছে!

শ্যামাচরণ কহিলেন—সে শাড়ী নয়—বড্ড gaudy হবে। কাল বরং চলো ঐ 'লক্ষ্মী-সদনে'—ভদ্র-গোছ একখানা শাড়ী···স্থতির শাড়ী···কিম্বা···

বাধা দিয়া শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—আমি বলি, থাক্‌গে, যায় না। যেতে হলে পনেরো-ষোল টাকা খরচ হবে। শাড়ী চাই, তার সঙ্গে ম্যাচ করে' ব্লাউশ, তবে ভালো এক জোড়া নাগ্‌রা···

শ্যামাচরণ কহিলেন—নাগরা নিতে হবে বার্ট্রাম ষ্ট্রীট থেকে···সেখানকার নাগরা যেমন aristocratic, এমন আর কোথাও নয়।

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—তার উপরে ট্যাক্সি-ভাড়া লাগবে।

শ্যামাচরণ কহিলেন—তা তো লাগবেই। ও বিষয়ে কৃপণতা চলে না। আমি প্রেইভেট-ট্যাক্সির ব্যবস্থা করবো'খন।

শ্রদ্ধা দেবী হাসিলেন, কহিলেন—একলা কি ক'রে যাবো? কখনো তো তেমন স্বাধীনতা দাও নি···

শ্যামচরণ কহিলেন,—ভয় কি! আমি সঙ্গে যাবো'খন তোমার chaperon হয়ে···

কথাটা বলিয়া শ্যামাচরণ হাসিলেন এবং যে-স্ত্রী সংসারে আজ এতখানি গৌরব বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁর সে গৌরবের তারিফ করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে···

স্বামীর বাহু-বন্ধ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—কি যে করো! ছাড়ো···ছেলে-মেয়েরা এসে পড়বে···কি ভাববে'?

—ভাববে, বাবামশায় মাতৃদেবীকে আদর করছেন!

—যাও···

শনিবার বেলা সাড়ে ন'টায় একখানি পোষ্টকার্ড আসিয়া হাজির শ্যামাচরণের নামে। চিঠি আসিয়াছে কমলভোজী পরিষৎ হইতে। হাতে লেখা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে—

মহাশয়

আপনি আমাদের নূতন সদস্যা শ্রীযুক্তা শ্রদ্ধা দেবীর স্বামী। অদ্য তারিখে শ্রীযুক্তা শ্রদ্ধা দেবীর অভিষেক-উৎসবে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। স্থান মুনলাইট হোটেল, পাঁচতলার ফ্ল্যাট, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা। সময় রাত্রি আট ঘটিকা। ইতি

শ্রীত্রিনয়নী সিংহ
শ্রীকুসুমকুমার পাঞ্জা
যুগল-সম্পাদক

শ্যামাচরণ হাঁকিলেন,—ওগো…

ওগো তখন রন্ধনশালায়, সেখান হইতে তিনি কহিলেন, —কেন ?

—একবার এসো, এসো…

—যাবার জো নেই। ঝোল সাঁৎলাচ্ছি। কি হয়েছে, বলো না…

—তোমার ভৃত্যের নিমন্ত্রণ-পত্র এসে গেছে। কমল-ভোজীদের চিঠি…

—সত্যি ?

—হ্যাঁ।

পর্ব্বত মহম্মদের কাছে যাইতে পারে নাই বলিয়া মহম্মদকে পর্ব্বতের কাছে আসিতে হইয়াছিল, এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কাজেই ঐতিহাসিক নজীর মানিয়া শ্যামাচরণ আসিলেন রন্ধনশালায়।

চিঠি পড়িয়া শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—তা হলে এক কাজ করো…আপিস থেকে ফেরবার সময় এক-জোড়া জুতো নিজের জন্যে কিনে এনো…পাঞ্জাবি ঘরে আছে…সিল্কের পাঞ্জাবি। ভাগ্যে কাচিয়ে রেখেছি। ভালো কথা, একখানা ধুতি কিনে এনো। ফরাসডাঙ্গা-শান্তিপুর বলছি না… অনর্থক বাজে-খরচ করবার লোক তুমি নও…মিলের মিহি ধুতি আজ-কাল অনেক পাওয়া যায়…বুঝলে…

শ্যামাচরণ কহিলেন—কি দরকার! আমি তো সদস্য নই—আমার অভিষেকও হবে না।…যা আছে…

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—না, না…যা-তা বেশে গেলে আমি তোমার সঙ্গে যাবো না…সত্যি।

—তোমার ইজ্জৎ যাবে! বটে;…অল্ রাইট!

শনিবার অফিস হইতে ফিরিয়া শ্যামাচরণ গিয়া ছেলে-মেয়েদের রাখিয়া আসিলেন শ্বশুরালয়ে বিধবা শাশুড়ীর কাছে, বলিলেন,—আমরা যাচ্ছি কমল-ভোজী সভায় নিমন্ত্রণে। ছেলেমেয়েরা একলা থাক্‌বে ? তাই।…ফেরবার সময় এখান হয়ে ফিরবো। তখন ওদের নিয়ে যাবো।

তার পর কমল-ভোজীদের সহিত মিলনের আয়োজন। সজ্জাভূষণে শ্রদ্ধা দেবীর সময় লাগিল দু'ঘণ্টা। শ্যামাচরণ তাঁর পানে চাহিয়া রহিলেন বিমুগ্ধ নেত্রে।

সজ্জা-শেষে শ্রদ্ধা দেবী বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে ভালো করিয়া দেখিলেন; তার পর শ্যামাচরণের পানে ফিরিয়া কহিলেন—কেমন হলো, বলো তো? চলন-সই গোছ ?

মোহাবেশে শ্যামাচরণের চোখের দৃষ্টি অবিচল। নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাচরণ কহিলেন—তোমার পাশে আমাকে এক-দম মানাবে না! কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি তোমার স্বামী!

শ্রদ্ধা দেবীর অধরে গর্ব্বের হাসি উথলিয়া উঠিল; একটু লজ্জার আভাসও সেই সঙ্গে। শ্রদ্ধা দেবী বলিলেন—থামো! চালাকি করতে হবে না!

তার পর তিনি স্বামীর বেশভূষার পানে লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন—পাঞ্জাবিটা এর মধ্যে করেচো কি! যেন কলসীর মধ্যে পোরা ছিল! ছি!…

শ্যামাচরণ বলিলেন—জামা পরি। কিন্তু পরে কি করে' তাকে ফিট্ রাখতে হয়, কখনো সে কৌশল শিখতে পারলুম না!

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—আটটা বাজে। আর দেরী নয়। এসো…

দুজনে নামিয়া আসিয়া প্রাইভেট ট্যাক্সিতে উঠিলেন। শ্যামাচরণ কহিলেন—পার্ক সার্কাস।

গাড়ী চলিল।

মস্ত ফ্ল্যাট—পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানা। সে ফ্ল্যাটের কোন্ দ্বার-পথে গেলে মুন-লাইট হোটেল মিলিবে, সমস্যা!

ফ্ল্যাটের এক-তলার এক বাসিন্দাকে প্রশ্ন করা হইল, —মুনলাইট হোটেল কোথায় ?

লোকটার মুখে যে ভাব ফুটিল, দেখিয়া মনে হইল, সে ভাবিয়াছে, জিওগ্রাফিতে তার কতখানি জ্ঞান, তাহারি পরীক্ষার জন্য বুঝি এ প্রশ্ন! ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া সে কহিল—নাম কখনো শুনিনি মশায়···মুন-লাইট হোটেল? না, জানি না। কোন্ রাস্তায় বলে দেছে?

শ্যামাচরণ কহিলেন—পার্ক সার্কাস···পাঁচতলা ফ্ল্যাট।

লোকটি কহিল—দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করুন।

জিজ্ঞাসা করিতে সাত-আট মিনিট সময় লাগিল। হদিশ মিলিল এবং সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দুজনে তখনি পাঁচতলায় উঠিলেন, নিশ্বাস তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে!

কাচের কেশে লাল হরফে লেখা—

Moonlight Hotel.

আঃ! দুজনে আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। মহা-প্রস্থানের পূর্ব্বে যাত্রাশেষে স্বর্গের দ্বারে পৌঁছিয়া যুধিষ্ঠির বোধ হয় এমনি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ছিলেন! সামনে ছিল একজন ছোকরা-ভলান্টিয়ার—বুকে জামার উপর ন্যাকড়ায়-রচা লালপদ্ম আঁটা। সে প্রশ্ন করিল,—নাম?'

শ্যামাচরণ কহিলেন—আপনাদের নতুন মেম্বার—ঔপন্যাসিক শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবী···

—ও···আসুন···অভিষেক আরম্ভ হয়ে গেছে! আটটা বেজে বারো মিনিট।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা প্রায় শ্রদ্ধা দেবীর হাত ধরিয়া সবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—শ্যামাচরণের পানে সে ফিরিয়া চাহিল না!

শ্যামাচরণ হতভম্ব! বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন···নিস্পন্দ, অচেতন···যেন ঠুঁটো! যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একটি কুকুর গিয়া দাঁড়াইয়াছিল স্বর্গের দ্বারে, তার কথা তাঁর মনে জাগিতেছিল! কুকুরটিকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল? না, সে ছিল বাহিরে···?

মহাভারত পড়িয়াছেন কবে সেই ছেলেবেলায়···কাজেই সে-কথা মনে পড়িল না।

ওদিকে ঘরের মধ্যে প্রবল করতালি-নাদ···সঙ্গে সঙ্গে কোরাশে চীৎকার—হিপ হিপ হুরে! হিপ হিপ হুরে! আনন্দ! আনন্দ! শ্রীমতী মরুমায়া সেনের জয়!

মরিয়া হইয়া বুক ঠুকিয়া শ্যামাচরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভোজের প্রকাণ্ড টেবিল। সেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া বহু নর-নারী—তাদের বেশে-ভূষায়-বয়সে রকমারি বৈচিত্র্য! সব ক'খানি চেয়ারই ভরতি। দশ-বারো জন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁদের ভাগ্যে চেয়ার জোটে নাই। শ্যামাচরণ ভাবিলেন, এঁরা হয়তো তাঁরই মতো বিদুষী লেখিকা স্ত্রীগণের chaperons!

কিন্তু শ্রদ্ধা দেবী? শ্রদ্ধা কোথায় গেল?

সারি-সারি মুখের উপর দিয়া দৃষ্টি বুলাইতে দেখেন, ঐ যে···ঐ···

টাক-ওয়ালা বয়স্ক এক মোটা ভদ্রলোকের পাশের চেয়ারে লজ্জায় এতটুকু হইয়া শ্রদ্ধা দেবী বসিয়া আছেন! মোটা ভদ্রলোকটির অধরে হাস্য। তিনি কি বলিতেছেন···সে কথা শুনিতে শুনিতে শ্রদ্ধা দেবী ক্রমে আরো আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছেন···শ্রদ্ধা দেবীর সে আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া শ্যামাচরণ যেন কাঠ!

শ্রদ্ধা দেবী যে-টেবিলের সামনে বসিয়াছেন, সে টেবিলে যেন ফুলের বাগান! মত্ত যত সদস্য মধুকরের গুঞ্জন চলিয়াছে সেই টেবিল ঘিরিয়া।

পাশাপাশি ছোট ছোট টীপয়। টীপয় ঘিরিয়া চারখানা করিয়া চেয়ার। টীপয়ের উপরে চা ও কেক, ডালমুট, ঝুরি-ভাজা, শিঙাড়া প্রভৃতি সাজানো। কমলভোজীর দল গুঞ্জন-রবের সহিত সে সব পেয়ালা-প্লেটের সদ্ব্যবহার করিতেছে।

শ্যামাচরণের ভাগ্যে না মিলিল আদর, না অভ্যর্থনা! যে-দলটির সহিত তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দলে সকলের এই এক দশা! খাবার কাড়িয়া বা চাহিয়া খাইবে, লেখিকাদের এ-সব আত্মীয়-বন্ধুর স্বভাব সে ধাতের নয়, কাজেই অদৃষ্টে কর্ম্মভোগ যা লেখা ছিল···

সে কর্ম্মভোগ চুকিল রাত্রি দশটায়।

অর্থাৎ দশটায় সভাভঙ্গ হইল। শ্রদ্ধা দেবীর সঙ্গে দু'চারিজন ভদ্রলোক শ্রদ্ধা দেবীকে বিদায়-বন্দনা করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন।

ঘরের দ্বারে শ্যামাচরণ। শ্যামাচরণের অবিচল দৃষ্টি শ্রদ্ধা দেবীর উপরে নিবদ্ধ। শ্রদ্ধা দেবী কাছে আসিলে শ্যামাচরণ কহিলেন—এসো···

শ্রদ্ধা দেবী বাঁচিলেন। এতক্ষণ তাঁর যেন চেতনা ছি

না। শ্যামাচরণকে দেখিয়া দল ছাড়িয়া তিনি স্বামীর কাছে আসিলেন।

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—আমার স্বামী…

তাঁরা বলিলেন,—ও! আপনিই! আচ্ছা, বেশ, বেশ! আলাপ হবে একদিন। (তার পর শ্রদ্ধা দেবীর পানে চাহিয়া) তা হলে সভাকে মনে রাখবেন। আপনার কাছে এ সভা অনেক-কিছু আশা রাখে!

তার পর গৃহে প্রত্যাগমন।

গাড়ীতে শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—তোমার কথায় এখানে এসে অন্যায় করেছি।

—কেন?

—লজ্জায় ভয়ে মুখে কথা ফোটে না। কখনো-তো কারো সঙ্গে মিশতে শেখাও নি! সকলে কি ভাবলো!

শ্যামাচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—ভাবলো, এক লক্ষ্মীছাড়া কেরাণীর হাতে পড়ে এত বড় genius অনাদরে-অবহেলায় মাটী হয়ে যাচ্ছে…

—যাও!…ও কি অসভ্য কথা!…হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার সঙ্গে কারো আলাপ হলো?

শ্যামাচরণ কহিলেন—কে করবে আলাপ! আমি তো বই লিখতে পারি না—লিখিও না…

—না, না, ঠাট্টা নয়…বলো না…

শ্যামাচরণ কহিলেন—ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলুম…দরোয়ানের মতো। কেউ ডেকে এক পেয়ালা চা পর্য্যন্ত খেতে বলে নি!

—সত্যি?

—মিথ্যা কথা বলে লাভ! শুধু আমি একা নই—একা হলে চলে আসতুম। আমার মতো এমন হতভাগা আরো ক'জন ছিল। তারা বোধ হয় আমারি মতো লেখিকা স্ত্রীদের অপদার্থ স্বামী! সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে-ছিলুম—নিরুপায় হয়ে…

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—সত্যি-কিছু খাওনি?

—না-গো, না…

শিহরিয়া শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—উপায়? বাড়ীতে তো আমি রাত্রে খাবারের ব্যবস্থা করিনি।…তা বেশ, মা'র ওখানে খাবে'খন। গাড়ী থেকে নেমে আমি ক'খানা গরম লুচি ভেজে দেবো।

গৃহে ফেরা হইল রাত্রি বারোটার পর। ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েদের বকিয়া টানিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া শ্রদ্ধা দেবী বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। শোয়াইয়া পৃথিবীর পানে চাহিবার অবসর পাইলেন।

চাহিবা মাত্র দেখিলেন, শ্যামাচরণ খোলা খড়খড়ির সামনে একটা তাকিয়ায় মাথা দিয়া মেঝেয় শুইয়া আছেন। শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—এখানে গড়াগড়ি দিচ্ছ কেন? উঠে বিছানায় শোও…

শ্যামাচরণ কহিলেন—শোবো'খন। আগে শুনি, সভায় কি হলো! তুমি যে রকম আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলে মাথা নীচু করে', সেই ফুলশয্যার রাত্রের কথা আমার মনে পড়ছিল…

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—কি অসভ্যর মত যে কথা কও!

শ্যামাচরণ কহিলেন,—অসভ্য কথা নয়। আমার মনে হচ্ছিল…মানে, ঠিক সেই রকম সলজ্জ, পুলক-কম্পিত ভাব…যাক্‌গে, তা ওরা কি বললে? ও লোকটি কে? মোটা…বেশ বয়স হয়েছে?…ঐ ভদ্রলোকটিরই যা বয়স বেশী দেখলুম…

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—ও ভদ্রলোকের নাম হারাধন দত্ত। মস্ত কবি।…ওঁর কবিতার বই আছে, বললেন। আমি পড়িনি। বললেন, ওঁর এক-শেট বই আমাকে পাঠিয়ে দেবেন…পড়ে ওঁকে বলতে হবে, আমার কেমন লাগে।

শ্যামাচরণ কহিল—তোমার বই দু'খানারও এক কপি করে' ওঁকে দিয়ো—উপহার। বুঝলে! এ সব শিষ্টাচার মানতে হবে বৈ কি…পরস্পরে এমনি আদান-প্রদান।

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—বললেন, শুধু বই ছাপানো নয়…দু'একখানা ভালো মাসিকে উপন্যাস-গল্প ছাপানো দরকার। নাম হবে, পয়সা হবে…

শ্যামাচরণ কহিলেন,—ঠিক কথা বলেছেন। আমি ও-পথের পথিক না হলেও ও-পথের খপর তো দু'চারটে রাখি!

পরের দিন বেলা পাঁচটা।

শ্রদ্ধা দেবী দোতলার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছেন, বিগত-রজনীর স্মৃতি মনের উপর নানা-

ছবির দোলন তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ঐ লোকটির নাম মুকুল গুপ্ত ··বটে! এ যুগে নাকি উঁহার মতো উপন্যাস কেহ লিখিতে পারে না! একখানা উপন্যাস শ্রদ্ধা দেবী পড়িয়াছেন—সে উপন্যাসের নাম "ঘরকে কৈনু বাহির"। মন একেবারে পাতায় পাতায় চাপিয়া বসে·· বাঙালী পুরুষ-রমণী লইয়া লেখা গল্প! তাদের কথা-বার্ত্তা কাজ-কর্ম্ম সব যেম কেমনতরো! পড়িতে পড়িতে মন উদাস হইয়া ওঠে। বই শেষ করিয়া শ্রদ্ধা দেবীর মনে হইয়াছিল, এত সব অজানা কথা জানার মতো করিয়া মানুষ লেখে কি করিয়া! হয়তো ইনি অনেক বই পড়িয়াছেন, বয়স হইয়াছে—জীবনের অভিজ্ঞতা··· খুব জ্ঞানী পণ্ডিত লোক···কিন্তু কাল রাত্রে দেখিলাম, বয়স খুব অল্প! ইহাকেই বলে যাদু-শিল্পী! তারপর ঐ হরেন্দ্র চাটুয্যে···লেখা পড়িয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। শ্রদ্ধা দেবী ভাবিতেন, লোকটা হয়তো দারুণ যণ্ডা পালোয়ান! হয়তো ইতর সমাজে বড় বেশী মিশিয়া বেড়ায়! কাল রাত্রে হরেন্দ্র চাটুয্যেকে দেখিয়া ভুল ভাঙ্গিয়া গেল! বেশ সুপুরুষ, তরুণ··· কথায় যেন মধু ক্ষরিতেছে···চমৎকার বিনয়ী এবং সদালাপী···

শ্রদ্ধা দেবীর মনে হইতেছিল, এক মস্ত অজানা জগতের সঙ্গে কাল পরিচয় হইয়া গিয়াছে।

আগে ভাবিতেন, ও-জগতে যারা বাস করে···অর্থাৎ যাঁরা রাশি রাশি বই লেখেন, না জানি তাঁরা কেমন! লিখিতে বসিয়া শ্রদ্ধা দেবীর নিজেকে এত ছোট মনে হইত, পদে পদে সঙ্কোচ-ভয়ে দ্বিধায়-সংশয়ে হাতের কলম থামিয়া পড়িত···

কাল রাত্রের পরিচয়ে সে দ্বিধা-সংশয় কাটিয়াছে ·· ও-সব লোক···এমনি সাধারণ ভাবেই কথা ক'ন্ · সাধারণ লোকের মতোই···!

চিন্তায় বাধা পড়িল। আট বছরের ছেলে বিনু আসিয়া বলিল,—একটি ভদ্দরলোক এসেছেন···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—বলোগে, উনি এখনো আপিস থেকে ফেরেন নি। যদি বসতে চান, বাইরের ঘরে বসাও···

বিনু বলিল—বলেছি বাবা বাড়ী নেই···তাতে বললেন, তোমার মা'র নাম বুঝি শ্রদ্ধা দেবী? আমি বললুম, হ্যাঁ ·· তাতে বললেন, আমি এসেছি তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে···বাবার কাছে আসিনি···

শ্রদ্ধা দেবীর সারা দেহ বহিয়া একটা কাঁপনের ঢেউ· শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—কে বাবু? কি নাম?

বিনু বলিল—বললেন, তোমার মাকে বলো গে, মহেন্দ্র বাবু···ছবি আঁকেন ··

ও! কাল রাত্রে আলাপ হইয়াছিল · দু'একটি কথা! ·· মহেন্দ্রবাবুর মূর্ত্তি মনে জাগিল! মাথায় দীর্ঘ ঘন কেশ···শুষ্ক রুক্ষ···যেন পাঁচ-সাত বৎসর ভদ্রলোক তেল মাখিয়া স্নান করেন নাই··ডাগর দুটি চোখ কোটরে ঢুকিয়া আছে ··

শ্রদ্ধা দেবী বিপদে পড়িলেন। স্বামী গৃহে নাই···অজানা পুরুষ··কি করিয়া তাঁর সঙ্গে বসিয়া কথা কহিবেন! কি কথা কহিবেন? ভয়ে-ভাবনায় তাঁর গা কাঁপিল।···

বিনু বলিল,—কি বলবো?

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—বসাও···বলো গে, মা ব্যস্ত আছেন···দেরী হবে।

বিনু চলিয়া গেল। শ্রদ্ধা দেবীর পা অবশ···

বিনু ফিরিল তখনি, ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ভদ্রলোক বাহিরের ঘরে বসিয়াছেন; বলিলেন—এক পেয়ালা চা ··

ভদ্রলোক তাহা হইলে নড়িবেন না!···

শ্রদ্ধা দেবী বলিলেন—ভিখুকে বলো, এক পেয়ালা চা তৈরী ক'রে দেবে ··আমি গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে গিয়ে দেখা করবো'খন···

গা ধুইয়া শ্রদ্ধা দেবী বেশে একটু পারিপাট্য-সাধন করিয়া লইলেন···তার পর কম্পিত চরণে আসিলেন বাহিরের ঘরে ···আসিবার পূর্ব্বে ভিখু ভৃত্যকে বলিয়া দিলেন,—সদরে থাকিস···বাইরের কোনো লোক যেন হুট ক'রে বাইরের ঘরে এসে না ঢোকে···বুঝলি

জড়োসড়ো মূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা দেবী বাহিরের ঘরে আসিলেন ···সিগারেটের গন্ধে ঘর ভরিয়া আছে। সিগারেটের গন্ধ শ্রদ্ধা দেবী সহ্য করিতে পারেন না। শ্যামাচরণ এককালে সিগারেট সেবা করিতেন···সিগারেটের গন্ধ শ্রদ্ধা দেবীর বিশ্রী লাগিত···শ্রদ্ধা দেবীর কথায় শ্যামাচরণ সিগারেট ছাড়িয়া দিয়াছেন···

আর্টিষ্ট মহেন্দ্র রায় কহিল,—আসুন···নমস্কার···

ঘরে দু'খানি মাত্র চেয়ার···এক ধারে বড় তক্তাপোষ

···মহেন্দ্র বসিয়াছিল চেয়ারে···শ্রদ্ধা দেবী বসিলেন তক্তাপোষে।

মহেন্দ্র বাবু নির্নিমেষ নয়নে শ্রদ্ধা দেবীর পানে চাহিয়া রহিল···শ্রদ্ধা দেবী চোখ তুলিয়া কথা কহিতে গিয়া সে-দৃষ্টির আঘাতে লজ্জা পাইয়া চোখ নামাইলেন।

মহেন্দ্র বলিল—মানে, কোনো কাজ ছিল না···সত্ত ছবি আঁকা শেষ করেছি। নতুন ছবি আঁকবার কল্পনা করছিলুম ···হঠাৎ মনে পড়লো আপনার কথা···তা কোনো অসুবিধা করিনি তো আপনার?

সলজ্জভাবে শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন —না···

মহেন্দ্র কহিল—সামনের বড়দিনে একটা আর্ট-এক্‌জিবিশন হচ্ছে···তাতে দু'চারখানা ছবি দেবো···তারি জন্য প্রাণপাত-সাধনা চলেছে।···

মহেন্দ্র আপন-মনে অনর্গল বকিয়া চলিল···আর্টে মডার্ণ রেনেশাঁ···কিউবিক আর্ট···প্রাচ্য চিত্রকলা··· রেমব্রাণ্ট, র‍্যাফেল, মিকেল এঞ্জেলো ··

শ্রদ্ধা দেবীর বুকের মধ্যে যেন প্রলয়ের রোল জাগিয়াছে!

সহসা সে রোল থামিল···শ্রদ্ধা দেবী শুনিলেন, মহেন্দ্র বলিতেছে—কাল রাতে অত লোকজনের মধ্যে আপনি সলজ্জভাবে বসেছিলেন—মুখে আনন্দ আর সঙ্কোচের লাইট-এ্যাণ্ড-শেডের লীলা তা ছবিতে আঁকবার মতো!··· আচ্ছা, আমার পানে একবার চেয়ে দেখুন তো···লজ্জা নয়··· আর্টে এমন একটা আমি সৃষ্টি করবো···একবারটি চান··· বেশ, আমার দিকে না পারেন, ঐ জানলার পানে···হ্যাঁ, হ্যাঁ···আপনার এই এক্সপ্রেশনটুকু চমৎকার···আপনি হয়তো নিজে জানেন না···চেয়ে থাকুন···চমৎকার প্রোফাইল্‌!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহেন্দ্র উঠিল···উঠিয়া অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধা দেবীর কাছে আসিল, কহিল,—মাথার উপর ডান দিকে শাড়ীখানা আর-একটু সরিয়ে দিন···লজ্জা কিসের?··· তাহলে মাপ করুন···আমি দেবো সরিয়ে···

শ্রদ্ধা দেবী সলজ্জ কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় সরাইলেন। মহেন্দ্র কহিল—আপনার ছবি আঁকা ভাগ্যের কথা ;·· এইভাবে একটু দাঁড়ান দয়া করে'···আমি দু'মিনিটে একটা স্কেচ করে নি···হলো না···না, মাপ করুন, আমি সরিয়ে নিচ্ছি···

শ্রদ্ধা দেবীর বুকের উপর দিয়া যেন লরি চলিতেছিল···

মহেন্দ্র তাঁর মাথার কাপড় একটু সরাইয়া বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া বলিল,—এই রকম···হ্যাঁ···

মহেন্দ্র কাগজ বাহির করিয়া শ্রদ্ধা দেবীর পানে চাহিয়া কাগজে রেখা টানিল···

শ্রদ্ধা দেবীর মনে হইতেছিল, মাথা ঘুরিয়া এখনি তিনি পড়িয়া যাইবেন···

হয়তো পড়িয়া যাইতেন! পড়া হইল না শ্যামাচরণ আসিলেন বলিয়া।

শ্যামাচরণ আসিলেন, কহিলেন—ব্যাপার কি!

শ্রদ্ধা দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন···মহেন্দ্র বিরক্তভাবে চাহিল শ্যামাচরণের পানে।

শ্যামাচরণ নির্ব্বাক্‌! শ্রদ্ধা দেবী মহেন্দ্রের চোখে সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিলেন···কোনোমতে কহিলেন,—আমার স্বামী···

—ও···মহেন্দ্র হাসিল। হাসিয়া কহিল—একটা ছবি আঁকতে চাই···একজিবিশনের জন্য···তাই···মানে, তা হবে'খন। আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হলো···

আলাপ হইল···শ্যামাচরণের সঙ্গে আর্টিষ্ট মহেন্দ্রর। শ্রদ্ধা দেবী পলাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে শ্যামাচরণ আসিলেন অন্দরে··· ডাকিলেন,—ওগো···

শ্রদ্ধা দেবী ছিলেন রান্নাঘরে···বাহিরে আসিয়া কহিলেন, —কেন?

শ্যামাচরণ কহিলেন—একদিন খুব বড় আর্টিষ্ট হবেন এই ভদ্রলোক—দেখে নিয়ো···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—এই কথা?

তিনি ফিরিলেন। শ্যামাচরণ কহিলেন—উনি একদিন আসবেন ছবির আদ্রা তৈরী হলে···একটা পোজ···ক্ষতি কি?

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—কি যে তুমি বলো! আমি পারবো না···আমি মডেল নই···

সাত-আট দিন পরের কথা।

বেলা দশটা বাজে। শ্যামাচরণ সত্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে উঠিয়াছেন, আজ অফিসে যাইবেন না; বাহিরের ঘরে

বসিয়া খপরের কাগজ পড়িতেছিলেন। শ্রদ্ধা দেবী বিনুর ভাত বাড়িতেছেন ; বিনু স্কুলে যাইবে।

শ্যামাচরণ অন্দরে আসিলেন, কহিলেন—কে তোমাদের কবি হারাধন দত্ত আছেন···এসেছেন···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—তা আমি কি করবো ?

শ্যামাচরণ কহিলেন,—বাঃ, তিনি এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—দেখা করবার মতো সময় এখন আমার নেই। ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে হবে।

শ্যামাচরণ কহিলেন,—ওদের ভাত বেড়ে দাও···ওরা নিজেরা বসে খাবে'খন···তোমাকে পাহারা-মোতায়েন থাকতে হবে, তার কি মানে আছে ?

শ্রদ্ধা দেবী স্বামীর পানে চাহিয়া রহিলেন···কি বলিবেন, কথা খুঁজিয়া পাইলেন না !

শ্যামাচরণ বলিলেন—ওদের ভাতের থালা ধরে দিয়ে তুমি একটু সাফসোফ্ হয়ে একখানা ফরসা শাড়ী পরে গিয়ে দেখা করো।

শ্রদ্ধা দেবীর দু'চোখে যেন অগ্নিশিখা···

সে-শিখা তখনি নিবিয়া গেল।

শ্যামাচরণ কহিলেন—লিখচো যখন, তখন এ সামাজিকতাটুকু রক্ষা ক'রে চলো গো···এতে আমার মনেও কি গর্ব্ব-গৌরব হয় না ? ভদ্রলোক আমার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করছিলেন,—আমার স্ত্রী-ভাগ্যের কত প্রশংসা করলেন ! বললেন, গেল-মাসে তোমার যে-গল্পটা "আলোকশিখা" কাগজে ছাপা হয়েছে, তেমন গল্প বাঙ্‌লায় বিশ বছরের মধ্যে বেরোয় নি।···এসো, এসো···ভদ্রলোককে আমি বলেছি, তুমি আসবে। এখন তুমি না এলে আমার মান থাকবে না···বুঝলে···

কাজেই শ্রদ্ধা দেবীকে আসিতে হইল···

হারাধন দত্ত অনেক কথা বলিল। বলিল, সে বাঙলা গল্প-উপন্যাস পড়া ছাড়িয়া দিয়াছে আজ বিশ বৎসর। কারণ, পড়িবার মতো গল্প-উপন্যাস বাঙলায় কেহ লিখিতে পারে না। সে কবিতা লেখে—কিন্তু লিখিয়াই খালাশ ! পড়িবার মধ্যে পড়ে শুধু কণ্টিনেণ্টাল গল্প-উপন্যাস-নাটক আর সমালোচনা। আরো বলিল, সুখ্যাতি শুনিয়া শ্রদ্ধা দেবীর লেখা উপন্যাস দু'খানি কিনিয়া পড়িয়াছে—চমৎকার বই ! এমন উপন্যাস বাঙলায় আর নাই। তবে একটু খুঁত আছে···অর্থাৎ লাইফ তেমন নাই ! লাইফ মানে, সারা পৃথিবীতে জীবনের যে রকমারি স্পন্দন বহিতেছে, সেই লাইফ ! শ্রদ্ধা দেবীর ষ্টাইলের সঙ্গে যদি এই লাইফ মেশে, তাহা হইলে তাঁর উপন্যাস একদিন নোবেল-প্রাইজ পাইবে, হারাধন দত্ত অকুতোভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে ! এই লাইফ···অর্থাৎ সংসারের অন্ধকূপে বসিয়া থাকিলে এ-লাইফের সঙ্গে পরিচয় হইবে না ! সে পরিচয়ের জন্য চাই···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—কিন্তু সংসারে আমার কর্ত্তব্য আছে তো। ঘর ছেড়ে পথে-ঘাটে কোথায় ঘুরতে যাবো লাইফের সন্ধানে ?

হারাধন কহিল—যাঁরা জিনিয়াস, এ ত্যাগ-স্বীকার তাঁদের করতেই হবে। মানে, ঘরের খানিকটা ছেঁটে বাইরে বেরুতে হবে···

সলজ্জভাবে শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—সে আমি পারবো না···

হারাধন কহিল,—একটা কাজ করুন···আপনি ধরুন একখানা নতুন উপন্যাস। যেদিন যেমন লিখে যাবেন, আমি এসে পরের দিন শুনবো···তার পর তা নিয়ে দুজ'নে আলোচনা করবো···লাইফের সঙ্গে কোথায় কতটা মিললো, কোথায় মিললো না, কি হ'লে মেলে···আলোচনায় তার হদিশ পাবেন'খন। সেইভাবে যদি লেখেন, তাহলে সে লেখা যা হবে···জানেন তো, আমার সমালোচনার উপর বাঙলা দেশের প্রচণ্ড আস্থা···এই সেদিন···ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবং তাহাই ঘটিল। শ্যামাচরণও এ-প্রস্তাবে ভীষণ উৎসাহ দিলেন।

শ্রদ্ধা দেবী উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন···হারাধন দত্ত সে-লেখা পড়িয়া-শুনিয়া কথার জাল বুনিতে সুরু করিল এবং কথায়-কথায় সে উপন্যাস নূতন রূপ ধরিয়া নূতন নূতন পথে বহু লোকের ভিড় রচিয়া তুলিয়া যে কাণ্ড করিল ··

একদিন শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—কি মাথামুণ্ডু লিখছি, নিজেই বুঝচি না···

শ্যামাচরণ কহিলেন—কিন্তু ভারী চমৎকার লাগছে··· কেবলি মনে হচ্ছে, বাঃ, এ তো ভারী অদ্ভুত ব্যাপার !

তাছাড়া এটা বোঝো তো, লেখকের চেয়ে সমালোচক অনেক বড়। লেখকের লেখা থেকে বড় বড় যা-কিছু তত্ত্ব, তা ঐ সমালোচকরাই তো খুঁজে-পেতে বার করে···

শ্রদ্ধা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন।

বাড়ীতে আসর জমিল। হারাধনের সঙ্গে আরো দু'চারিজন কমলভোজী মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হন। এখানে-সেখানে পার্টি···সাহিত্য লইয়া, সাইকলজি লইয়া, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা চলে—এবং সে-আলোচনার তরঙ্গে-তরঙ্গে শ্রদ্ধা দেবীর লেখা কি ভাবে কোন্ দিকে যে বহিয়া চলে···

হারাধন বলে—চমৎকার!

কমলভোজীরা বলে,—এমন লেখা বাঙলায় কেউ লেখেনি!

শ্যামাচরণ বলে,—সত্যি···অদ্ভুত!

ছেলেমেয়েরা এখন সন্ধ্যার পর মাকে বড় একটা কাছে পায় না···রান্না-বান্নায় সময় নষ্ট হয় বলিয়া শ্যামাচরণ একটা বামুন রাখিয়াছেন!

একটা ছুটীর দিনে ছেলে বিনু এবং মেয়ে টুনু ধরিল, সার্কাস দেখিতে যাইব। শ্রদ্ধা দেবী বলিলেন, বেশ।

সার্কাসে মা যাইবে সঙ্গে—ছেলেমেয়ে মহা-খুশী!

সাজসজ্জা করিয়া সকলে তৈরী···হারাধন আসিয়া হাজির।

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—উনি এখন এলেন, তাই তো···

বিনু-টুনু বলিল—তা হোক গে···তুমি সার্কাসে চলো।

মা বলিলেন—কিন্তু ভদ্রলোক এলেন···

বিনু বলিল—ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবা কথা বলবে'খন···

টুনু বলিল—ভদ্রলোককে আজ যেতে বলে দাও···

শ্যামাচরণ আসিয়া কহিলেন—তোমার এ-উপন্যাসের ভারী সুখ্যাতি করলেন। বললেন, উনি একেবারে আকুল হয়ে থাকেন···পরের পরিচ্ছেদে কি তুমি লিখবে, ভেবে রাত্রে ওঁর ঘুম হয় না!

শ্রদ্ধা দেবীর মন গর্ব্বে দুলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আমার আর সার্কাসে যাওয়া হলো না, দেখছি। উপন্যাস-খানা জমে এসেছে···কাল রাত্রে যে দু' পরিচ্ছেদ লিখেছি, শুনে উনি কি বলেন···অথচ না শুনে পরের ঘটনাগুলোর কথা ভাবতে পারছি না···কি উনি বলেন! ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি বরং সার্কাসে যাও। সার্কাস-যাওয়া বন্ধ হ'লে বড় কষ্ট পাবে ··

শ্যামাচরণ কহিলেন—বেশ···

বিনু-টুনুর হাত ধরিয়া শ্রদ্ধা দেবী বলিলেন—তোমরা তাহলে ওঁর সঙ্গে গিয়ে সার্কাস দেখে এসো···আমি আর একদিন যাবো তোমাদের নিয়ে সিনেমায়···কেমন?

বিনু মুখ ফিরাইল। টুনুর দু'চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া আসিল। তারা কোনো জবাব দিল না।

যে-মন একমাত্র ঘরকে আশ্রয় করিয়া পরম শান্তি উপভোগ করিতেছিল, সে-মন এখন ঘরের মধ্যে আপনাকে আর কুলাইতে পারে না! ঘর বড় ছোট···মনের গণ্ডী দিকে-দিকে এখন প্রসার চায়।···আগে নিজে একান্তে বসিয়া লিখিতেন, যেটুকু জগৎ জানা, তাহারি নানা কথা, নানা চিন্তা নব নব কল্পনার বর্ণে আঁকিতেন···এখন অজানা-জগতের অজানা-কথার দিকে মন ছুটিয়া চলে উতল আবেগে। লিখিতে বসিয়া নিজের মনের খুশীর পানে লক্ষ্য থাকে না—লক্ষ্য এখন, এ-লেখায় অপরকে কতখানি খুশী করা যাইবে···

তার উপর দিকে দিকে আহ্বান জাগিয়াছে। গার্ল-স্কুলের প্রাইজ বিতরণ,—স্পোর্টসের অধিনায়কত্ব,—সাহিত্য-সভার অধিবেশন—এ-সবে না গেলে নয়! পাঁচজনের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিলে তারাই বা মানিবে কেন?

বাণীপাড়ার সাহিত্য-সভায় নেত্রীত্ব করিয়া দু'দিন পরে শ্রদ্ধা দেবী গৃহে ফিরিলেন রাত্রি আটটায়। ফিরিয়া দেখেন, জরের ঘোরে বিনু অচেতন! কাল রাত্রি হইতে প্রবল জর··· শ্যামাচরণ অফিস-কামাই করিয়া বিনুর মাথার শিয়রে বসিয়া আছেন—বিনুর মাথায় আইস্‌ব্যাগ চাপিয়া···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—কি হয়েছে?

শ্যামাচরণ কহিলেন—ভয় নেই···ঠাণ্ডা লাগিয়েছিল··· ইনফ্লুয়েঞ্জা···

—তুমি সরো দিকিনি···দেখি।

শ্রদ্ধা দেবীর দু'চোখ কপালে উঠিল! তিনি ছেলের মাথার শিয়রে বসিলেন, গায়ে-মাথায় হাত বুলাইলেন, বলিলেন—ডাক্তার এসেছিল?

শ্যামাচরণ কহিলেন—হ্যাঁ, ওষুধ দিয়ে গেছেন। বললেন, তিন দিনের ভোগ···তার আগে কমবে না!

—হুঁ···

শ্রদ্ধা দেবী কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শ্যামাচরণ কহিলেন—মিটিং কেমন হলো?

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—ভালো।···টুনু কোথায়?

শ্যামাচরণ কহিলেন—ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে।

—এখনি ঘুমিয়েছে?

—একলাটি বসে থাকতে পারলো না···বললে, বাবা, ঘুম পাচ্ছে···আমি বললুম, ঘুমোও···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—আমি ট্রেণের কাপড় ছেড়ে এখনি আসছি।···জানি, আমাকে সংসারের বাইরে ঠেলে দিয়েছো—সংসার দেখা কি তোমার কাজ?···

তিন দিন পরে বিনুর জ্বর ছাড়িল। বিনু বলিল,—এ ক'দিন তুমি কোথাও যাও নি?

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—না···

টুনু বলিল—দেখেচো দাদা, বাণীপাড়ায় মাকে তারা কেমন মানপত্র দেছে···তা ছাড়া একখানা গরদের শাড়ী··· আর একটা রিষ্ট-ওয়াচ···

পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিনু বলিল—চাই না আমি দেখতে। তুই দেখ্‌গে যা···

শ্রদ্ধা দেবী কোনো কথা বলিলেন না···একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

লক্ষ্মীপুরের গার্ল স্কুলে প্রাইজ বিতরণ শেষ করিয়া হারাধনের মোটরে চড়িয়া শ্রদ্ধা দেবী বাড়ী ফিরিতেছিলেন··· রাত্রি প্রায় আটটা···ভয়ঙ্কর মাথা ধরিয়াছে···

কলিকাতায় রেস-কোর্শের কাছে গাড়ী আসিলে হারাধন কহিল—এখনো মাথা তেমনি ধরে আছে?

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—হ্যাঁ।

—মাঠে একটু নামবেন?

—না। বাড়ী গিয়ে চান করবো, ভাবছি। তা হলেই মাথা ছাড়বে'খন···

হারাধন কহিল—পাগল হয়েছেন! আমি বলি, খোলা মাঠে একটু বসে যান···ঐ ছোট হল···অত ভিড়···মাথা ধরবে না? আমারো মাথা খশে যাচ্ছে!

গাড়ী থামিল · নামিতে হইল।

সবুজ ঘাসের উপর দিয়া চলিতে চলিতে হারাধন বলিল, —আপনার এ উপন্যাসের খুব নাম বেরিয়েছে। পাব্লিসাররা বলছিল, ভয়ানক বিক্রী···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—আপনার জন্য। আপনি কম কষ্ট করেছেন···

হারাধন কহিল,—তার মানে, যেখানে কষ্ট করলে লাভ হবে, সেখানে কষ্ট করতে কোনোদিনই আমার ঔদাস্য নেই। জিনিয়াস্ হীরের মতো···তাকে কেটে-ছেঁটে মেজে-ঘষে নিতে হয়। আমি সেই cutter···তবে এর পরে যা লিখবেন, নিজে লিখুন···মানে, আপনার লেখায় যদি লাইফ দিতে পারেন···অর্থাৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভরা রক্ত-মাংসের তৈরী এই জীবন্ত মানুষ—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশা, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ·· এই সব নিয়েই তো মানুষ···দয়া-দাক্ষিণ্য আর ত্যাগ নিয়ে পুরাণ লেখা চলে, গল্প উপন্যাস লেখা হয় না। অর্থাৎ···

শ্রদ্ধা দেবী একাগ্র মনোযোগে শুনিতে লাগিলেন···

হারাধন অনেক কথা বলিতে লাগিল—মানুষের মন, এ বড় সহজ ব্যাপার নয়! এ-মনে সারা পৃথিবী ঠাঁই পায়। যারা এ-মনকে প্রসারিত করিতে পারে—জলস্থল-মরুদ্ব্যোম বহিয়া, দ্বিধা-ভয় ত্যাগ করিয়া···অর্থাৎ জড়-পুতুলের মতো গৃহকোণটিকে আশ্রয় না করিয়া, দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া অর্থাৎ গিরি-বন-সাগরের বাধা ঠেলিয়া,···শুধু অমৃত নয়, হলাহল পান করিয়া,···তাহা হইতে যে সাহিত্য রচনা করিবে, সে সাহিত্যের বিনাশ ঘটিবে না কোনো কালে···মানুষের জীবন গৃহকোণে নয়···সে জীবন বহিয়া চলিয়াছে আপন-পরের সম্পর্ক তুচ্ছ করিয়া··· লাইফ্···এই লাইফ্···

উচ্ছ্বসিত আবেগে হারাধন লাইফের পরিচয় দিতেছিল ···এবং সেই উচ্ছ্বাসের ঘোরে এক সময়ে ডাকিয়া উঠিল,— শ্রদ্ধা দেবী···

সে-স্বরে শ্রদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন···

হারাধন বলিল,—পাশে-পাশে এই যে লোকটি রয়েছে, কি দারুণ পিপাসা বুকে নিয়ে চাতকের মতো সে হা-হা ক'রে

বেড়াচ্ছে, তার কোনো পরিচয় জানবার সাধ হয় নি···? কোনোদিন নয়? তার পিপাসা চিরদিন অতৃপ্ত থাকবে?···

শ্রদ্ধা দেবীর দেহে-মনে বিদ্যুতের শিখা চমক দিয়া, ঝলক দিয়া বহিয়া গেল!

হারাধন বলিল,—বেশী নয়···শুধু গণ্ডীর মায়া বিসর্জ্জন দিন···

কথার সঙ্গে হারাধনের হাত শ্রদ্ধা দেবীর বাহুমূল চাপিয়া ধরিল···

শ্রদ্ধা দেবীর সারা দেহে রোমাঞ্চ—সবেগে ঝাঁকানি দিয়া হাত ছাড়াইয়া শ্রদ্ধা দেবী হাঁকিলেন—হারাধন বাবু···

হারাধন কহিল,—And this is life···ছেলেমেয়ে আছে, স্বামী আছে, সংসার আছে, মানি···তাদের উপর কর্ত্তব্য আছে, জানি।···কিন্তু তারাই সর্ব্বস্ব নয়। তারা ছাড়া পৃথিবীতে অনেক-কিছু আছে···নিজের উপরেও কর্ত্তব্য আছে···আমি দেখেছি এবারকারের আর্ট এগ্‌জিবিশনে মহেন্দ্রর আঁকা "যৌবনশ্রী" ছবি···সে আপনার ছবি···বুকে কোনো আবরণ নেই···মাথার ডান দিক বয়ে খশে পড়েছে শিথিল আঁচল···সে-মুখ আপনার···যৌবনের জীবন্ত ছবি··· উল্লাসে-মোহে সে-ছবি মানুষকে মাতাল ক'রে তোলে! অথচ মহেন্দ্র আপনার কি করেছে যে সে আপনাকে সব-গোপনতা ভেঙ্গে এমন ক'রে পেলো? আর আমি···? আপনার উপন্যাস লেখায় নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছি যে···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—চুপ···চুপ···চুপ!···পথে লোক চলছে···আপনার সাহস হচ্ছে এ কথা বলতে? এই সব পথের লোককে ডেকে আপনার পরিচয় দেওয়া শক্ত হবে না··

শ্রদ্ধা দেবীর চোখের সামনে যেন শূন্য মরুভূমি···সহসা সে মরুভূমির বুকে একখানা খালি ট্যাক্সি! শ্রদ্ধা দেবী হাঁকিলেন—ট্যাক্সি···

ট্যাক্সি থামিল। শ্রদ্ধা দেবী ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিলেন; স্তম্ভিত হারাধনের পানে চাহিয়া কহিলেন—নমস্কার হারাধন বাবু···

বাড়ীতে আসিয়া একেবারে কলতলায়। হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া দোতলার ঘরে আসিয়া শ্রদ্ধা দেবী দেখেন, শ্যামাচরণ বিছানায় শুইয়া একখানা মাসিক-পত্র পড়িতেছেন···

আসিয়া কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া স্বামীকে জড়াইয়া একেবারে তাঁর পাশে শুইয়া পড়িলেন···

শ্যামাচরণ কহিলেন,—ব্যাপার কি? ক্লান্ত?··· তা হলেও কাগজখানার উপর হিংসা কেন? তোমার নতুন উপন্যাসের সমালোচনা পড়ছিলুম···হারাধন বাবু সমালোচনা লিখেছেন। পড়ে সত্যি গর্ব্ব হচ্ছে···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—বটে! আমাকে পাশে পেয়ে গর্ব্ব হয় না···গর্ব্ব হয় আমার লেখার সমালোচনা কোন্ হতভাগা লিখেচে, তার লেখা সেই সমালোচনা পড়ে!··· ছেলেমেয়েরা কোথায়?

শ্যামাচরণ কহিলেন,—ঠাকুরের কাছে রান্নাঘরে বসে গল্প শুনছে···এ-ঠাকুরটি বেশ ভালো।

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—আমাকে একটু আদর করো··· আদর করো, বলছি···

শ্যামাচরণ কহিলেন,—হঠাৎ···?

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—হ্যাঁ, হঠাৎ···আমার ইচ্ছা হয়েছে···

শ্যামাচরণ কহিলেন,—বুঝেছি, মিটিং সাকসেশ্‌ফুল! আজ তুমি দিগ্বিজয় ক'রে এসেছো!

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন,—তাই। আমি আজ বিজয়িনী!

পাঁচ মিনিট পরে শ্রদ্ধা দেবী ডাকিলেন—বিনু-টুনু···

—মা···

ছেলেমেয়ে কাছে আসিল। মা বলিলেন,—মাকে আদর করো···চুমু দাও···দিয়ে ঠাকুরকে বলে এসো···এই ঘরে তোমাদের খাবার দিয়ে যাবে···

বিনু-টুনু চলিয়া গেল। শ্রদ্ধা দেবী মাসিক পত্রখানা লইয়া সমালোচনা-ছাপা পাতা ক'খানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। শ্যামাচরণ কহিলেন—আহাহা, করো কি! অমন সমালোচনা ছিঁড়ে ফেললে! আপিসের তারানাথ বাবুর বই ওখানা। সকলে আমায় আজ মাথায় তুলে নেচেছে···বলে, বৌদির এমন খ্যাতি, দাদা···এতে আমাদের সকলের গৌরব কত! বলছিল, বৌদি এবার কি বই লিখচেন?

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—বলো, বৌদি আর বই লিখবে না···

—তার মানে ?

—না। এ-লেখার কোনো দাম নেই। আগে লিখতুম, সংসারের সব কর্ত্তব্য সেরে···নিজের খুশীর জন্য।···এখন সংসারের কর্ত্তব্য গেছে চুলোয়—লিখছি শুধু পরের খুশীর জন্য!

শ্যামাচরণ কি বলিতে যাইতেছিলেন···শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন, —তুমি স্বামী, তোমার কথা আমি চিরদিন শিরোধার্য্য ক'রে চলেছি···এ-সব লেখা আমাকে তুমি আর লিখতে বলো না··· যে-লেখায় নিজের মন অখুশী থাকে, পরে খুশী হয়···আমি সে-লেখা লিখবো না···লিখবো না···লিখবো না। তুমি যদি আমায় মেরে ফ্যালো, তবু না···

বলিতে বলিতে উচ্ছ্বাসভরে শ্রদ্ধা দেবী বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন একেবারে শ্যামাচরণের গা গেঁষিয়া···

লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে দু'চোখে বান ডাকিল···শ্রদ্ধা দেবী বালিশে মুখ চাপিলেন।

শ্যামাচরণের বিস্ময়ের সীমা নাই। বলিলেন,—কি হয়েছে ?

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—আমাকে শুধু সংসারে রাখো···বাইরে থেকে আমাকে টেনে নাও তোমার সংসারে··ঠিক আগে যেমন ছিলুম গো, তেমনি থাকবো। বাইরে আমার ভালো লাগে না···

শ্যামাচরণের দু'চোখে বিস্ময়ের রাশি···

শ্রদ্ধা দেবী কহিলেন—বলবো···তোমাকে সব কথাই বলবো···আগে আমাকে একটু সামলাতে দাও ··তোমাকে না বলবার মতো কোনো কাজ কোনোদিন আমি করিনি ···এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখো!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বাসী

দেব-দেউলের সম্মুখে আর
মোটেই ছিল না ঠাঁই,
ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ বসিল
পিছনেতে গিয়া তাই।

উচ্চ কণ্ঠে ভক্তি-ব্যাকুল
গাহিতে লাগিল গান,
সুধার প্লাবন বহিতে লাগিল
মুগ্ধ সবার প্রাণ।

সঙ্গীত শেষে দেখেন পূজারী
ঢুকিয়া দেবীর ঘরে,
মুখ ফিরাইয়া শুনিছেন গীত
দেবী আগ্রহভরে।

পাষাণ-প্রতিমা ঘাড় ফিরাইয়া
শুনিছেন গীত হায়—
বলো দেখি বাপু এ কথা কি কভু
বিশ্বাস করা যায় ?

ভক্ত বলেন সম্মুখে বসি
আমি যবে গান গাহি
দেবী তা শোনেন আমার গানেও
বিরক্তি তাঁর নাহি।

সুমুখ হইতে ক্ষণেকের তরে
ফিরান না তাঁর মুখ
অপার স্নেহ ও ধৈর্য্য হেরিয়া
উল্লাসে ভরে বুক।

রামপ্রসাদের অপূর্ব্ব গীত
কত তার মধুরতা—
সে গান শুনিতে ফিরিবেন দেবী
সেটা কি অধিক কথা ?

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

চেক জাতিকে বলিদানের কারণ

নিউইয়র্কের প্রধান সংবাদপত্র 'নিউইয়র্ক টাইমস্' লিখিয়াছেন, "হিটলার য়ুরোপীয় সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া সেই চেষ্টা নিবারণের জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন, এ কথা সত্য হইলে—জার্ম্মাণীর বিমান-বাহিনী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রান্ত বলিয়াই যে এইরূপ করা হইয়াছে—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জার্ম্মাণ ফৌজকে ফরাসীর সাধারণ সৈন্যদলের ভয় করিবার কোন কারণ নাই ; বৃটিশ নৌ-বাহিনী যে যথেষ্ট শক্তি সম্পন্ন—এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু লণ্ডন ও প্যারিস উভয়েই জানিত, নাজীদের বিমান-বাহিনী বৃটিশ এবং ফরাসী এই উভয় জাতির সম্মিলিত বিমানবাহিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অধিকতর পরাক্রান্ত।

এ কথার অর্থ এই যে, গোয়েরিংএর অনুচরবর্গ সহস্র সহস্র নারী ও শিশু হত্যা করিয়া য়ুরোপের দুইটি বৃহৎ গণতন্ত্রাবলম্বী রাজ্যের রাজধানীর বিপুল ক্ষতি করিতে পারে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ; তাহার ফলে সম্মুখযুদ্ধেও বৃটিশ ও ফরাসী সৈনিক-বৃন্দের পঙ্গু হইবার সম্ভাবনা প্রবল।

গোয়েরিং পরিচালিত বিমান-বাহিনীর সংখ্যা সম্বন্ধে নানাপ্রকার 'রিপোর্ট' শুনিতে পাওয়া যায়। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার প্রকাশ করেন, তাঁহাদের ধারণা—জার্ম্মাণীর ৯ হাজার ৭ শত এরোপ্লেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে ; কিন্তু অনেকের বিশ্বাস, জার্ম্মাণী ১০ হাজার এরোপ্লেন সমর-ক্ষেত্রে আমদানী করিতে পারে। প্যারিসে জনসাধারণের ধারণা, জার্ম্মাণীর বিমান-বাহিনীতে ৫ হাজার এরোপ্লেন আছে। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীতে এরোপ্লেনের সংখ্যা যাহাই হউক, তাহা বৃটিশ ও ফরাসী এই উভয় দেশের সম্মিলিত এরোপ্লেনসমূহ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক, এবং যুদ্ধ উপলক্ষে তাহা পরিচালিত হইতে পারে।

জার্ম্মাণীর ১০ হাজার শিক্ষিত 'পাইলট' আছে, ইহা কেহ বিশ্বাস করে না; কিন্তু আকাশ-যুদ্ধে একের পরিবর্ত্তে অন্যের আমদানী একটি জটিল সমস্যা, এবং এই সমস্যার সমাধানে জার্ম্মাণীর কোন অসুবিধা নাই।

জার্ম্মাণী প্রতি মাসে চারি শত এরোপ্লেন প্রস্তুত করিতেছে ; এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু বৃটেন প্রতিমাসে ইহার এক-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যক এরোপ্লেন প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না; ফরাসী সরকার প্রতি মাসে যে পরিমাণ এরোপ্লেন প্রস্তুত করিতেছে, তাহার সংখ্যা আরও অল্প।

জার্ম্মাণীর এরোপ্লেনগুলি সকলই প্রথম শ্রেণীর নহে ; কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জার্ম্মাণী যে পর্য্যন্ত আকাশ-যুদ্ধে শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমানগুলিই ব্যবহার করিবে, তাহা হইলেও তাহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমানগুলিও কার্য্যোপযোগী হইবে।

এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, যদি হিটলার যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তাহা হইলে বৃটিশ ও ফরাসীর সম্মিলিত শক্তি দ্বারা জার্ম্মাণী পরাজিত হইবে ; কিন্তু লণ্ডন ও প্যারিসের ভয়, এই যুদ্ধে নাজীদের বোমাবর্ষী এরোপ্লেনগুলি প্রথমেই যে হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিবে, তাহা বর্ত্তমান সভ্যজগতের কল্পনাতীত। এই সকল কারণেই বৃটেন ও ফ্রান্স মান বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে বিরত হইয়াছে।

হিটলার আর কি চাহেন ?

অনেকের ধারণা, হিটলার অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রায় অর্দ্ধদেহ গ্রাস করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তিনি অন্য কোন দিকে লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না। হস্তচ্যুত আফ্রিকার উপনিবেশগুলির দাবীও সম্ভবতঃ ত্যাগ করিবেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ক্ষুধামান্দ্যের কি কোনও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ?

এডল্‌ফ হিটলারের রচিত 'Mein Kampt' (আমার জীবন-সংগ্রাম) নাজীদিগের বাইবেল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক জার্ম্মাণের ইহা অবশ্যপাঠ্য। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ২য় উইলহেলমের রাজত্বকালে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অবস্থা যেরূপ উন্নত ছিল, এডল্‌ফ হিটলার জার্ম্মাণীকে তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও শক্তিশালী করিবেন এরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার রচিত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অর্থাৎ য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে কাইজার-শাসিত জার্ম্মাণীর পরিমাণ ফল ছিল ২ লক্ষ ৮ হাজার ৮ শত ৩০ বর্গ মাইল, এবং জনসংখ্যা ছিল—৬ কোটি ৭৮ লক্ষ। সেই সময় জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে বৃটেনে উৎপাদিত লৌহের দ্বিগুণ লৌহ উৎপন্ন হইত। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যে সকল লৌহ-খনি ছিল, জার্ম্মাণীর লৌহখনি তাহাদের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। এতদ্ভিন্ন, গ্রেটবৃটেন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য সকল দেশ অপেক্ষা জার্ম্মাণীতে অধিক কয়লা উৎপন্ন হইত।

অতঃপর য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানে ভার্সেলে সন্ধি স্থাপিত হইল। জার্ম্মাণীর পরিমাণ-ফল হ্রাস হইয়া ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত ২৭ বর্গ-মাইলে পরিণত হইল, এবং জনসংখ্যাও হ্রাস হইয়া ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ হইল। এতদ্ভিন্ন, জার্ম্মাণীর লৌহখনি শতকরা ৪৫ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শিল্পজগতে তাহার যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল।

বর্ত্তমানকালে এডল্‌ফ হিটলার জার্ম্মাণ-সীমা বৰ্দ্ধিত করিয়া তাহার পরিমাণ-ফল ২ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গ-মাইলেরও অধিক করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর যে আকার ছিল, এখন ইহার আকার তাহা অপেক্ষা প্রায় সাত

হাজার বর্গ-মাইলেরও অধিক হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে জার্ম্মাণীর জনসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় ৮ কোটি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহু শিল্পপ্রধান অঞ্চল হিটলারের হস্তগত হইয়াছে।

হিটলারের বিরচিত 'Mein Kampt' নামক গ্রন্থে জার্ম্মাণীর যে সকল উন্নতির আভাস দেওয়া হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে জার্ম্মাণীর অন্য যে সকল পরিবর্ত্তন ও উন্নতির কথা লিখিত আছে, বিনা রক্তপাতে সুডেটেনল্যাণ্ড অধিকৃত হওয়ায়, এবং হার হিটলার বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনকে য প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, অর্থাৎ য়ুরোপে নবরাজ্য অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়াছে বলিয়া নিস্পৃহতা প্রকাশ করিয়াছেন, অতঃপর কি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির অসারতা প্রতিপন্ন করিবেন ?

তাঁহার গ্রন্থে জার্ম্মাণীর অধিকতর উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ভবিষ্যৎ উন্নতির যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, হিটলার কার্য্যতঃ যদি সেই তালিকার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ত্তমান প্রতিশ্রুতি পালনের সম্ভাবনা নাই।

মার্কিণ-সভ্যতার নিদর্শন

মার্কিণ যুক্তসাম্রাজ্যে যদি কোন নিগ্রো কোন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করে, অথবা কোন শ্বেতাঙ্গিনীর সম্ভ্রম নষ্ট করে, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ শ্বেতাঙ্গরা দলবদ্ধ হইয়া সেই হতভাগ্য নিগ্রোকে বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া গুলীবর্ষণে বধ করে। প্রতিশোধের এই পাশবিক প্রথাকে 'লিঞ্চ' করা বলে। এই প্রকার নিষ্ঠুর প্রথা বহু দিন হইতেই প্রচলিত আছে; দেশের আইন এই প্রকার বর্ব্বর আচরণের প্রতিবিধানে অসমর্থ। সে দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

টমি উইলিয়াম্‌স্ উনিশ বৎসর বয়স্ক নিগ্রো যুবক। অল্পদিন পূর্ব্বে সে রবার্ট ব্রেয়ার নামক একটি শ্বেতাঙ্গ যুবককে হত্যা করিয়া তাহার প্রণয়িনীর সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছিল।

এই অপকর্ম্ম করিয়া উইলিয়াম্‌স্ ফেরার হইলে সেরিফ একদল সৈন্য লইয়া তাহার সন্ধানে দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন; ঐ সকল সৈন্য ব্যতীত তাঁহাকে একদল 'ব্লড-হাউণ্ডে'রও সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল কুকুর তীব্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে ফেরারী আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে।

সেরিফ যখন এই ভাবে অপরাধীর সন্ধানে ঘুরিতেছিলেন, সেই সময় একদল শ্বেতাঙ্গ তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি তাহাকে ধরিয়া কয়েদ করিতে পারিবেন না। সে আমাদের শিকার, আমরা তাহাকে চাই।"

ব্লড-হাউণ্ডগুলি আসামীর দেহের গন্ধের অনুসরণ করিয়া সৈন্য-দল সহ একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকালয়ের নিকট উপস্থিত হইল। সকলেই বুঝিতে পারিল, আসামী সেই অট্টালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

সেই অট্টালিকার দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল; কিন্তু তাহার দেওয়ালে একটি ফাটল ছিল। সেই ফাটলে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া এক জোড়া আতঙ্কবিস্ফারিত চক্ষু আসামীর অনুসরণকারীদের দৃষ্টি-গোচর হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল—উহা নিগ্রো উইলিয়াম্‌সের চক্ষু।

সেরিফ ও তাঁহার ফৌজ সেই অট্টালিকার দ্বার ভাঙ্গিয়া উইলিয়াম্‌সকে টানিয়া বাহিরে আনিবার পূর্ব্বেই ক্রোধোন্মত্ত শ্বেতাঙ্গের দল সৈন্যগণকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া উইলিয়াম্‌সকে গেপ্তার করিল, এবং বেত্রাঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতে করিতে কিছু দূরে একটা গলির ভিতর লইয়া চলিল। সেরিফ ও তাঁহার সৈন্যদল উইলিয়াম্‌সকে সেই ক্ষিপ্তপ্রায় জনতার কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিল না; ব্যর্থমনোরথ হইয়া তাহাদিগকে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

পূর্ব্বোক্ত গলির নাম 'লভার্স লেন'; উইলিয়ম্‌স সেই গলির ভিতর একটা শাখাপত্রবহুল বৃক্ষমূলে রবার্ট ব্রেয়ারকে হত্যা করিয়া, তাহার প্রণয়িনীর সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছিল।

উন্মত্ত জনতা উইলিয়াম্‌সকে সেই বৃক্ষে তুলিয়া রজ্জু দ্বারা বৃক্ষ-শাখার সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পূর্ব্বেই সে প্রহারে মৃতবৎ হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে সেরিফ সদলে সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া উইলিয়াম্‌সের প্রাণহীন দেহ বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ দেখিলেন; বন্দুকের অসংখ্য গুলীতে তাহার সর্ব্বশরীর ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছিল। ক্রুদ্ধ জনতার অধিকাংশ লোকের হাতেই এক একটি বন্দুক ছিল, এবং সকলেই তাহার দেহ লক্ষ্য করিয়া গুলীবর্ষণ করিয়াছিল। একটি গুলীতেই তাহার মৃত্যু হইলেও তাহার মৃত্যুর পরও মৃতদেহ অসংখ্য গুলী দ্বারা বিদ্ধ করা হইয়াছিল।

আদালতের বিচারে এই অপরাধে নিগ্রোর প্রাণদণ্ড সুসভ্য ও খৃষ্টান মার্কিণ জাতির অনুমোদন-যোগ্য নহে। আমাদের দেশের হরিজনরা ঐরূপ অপকর্ম্ম করিলে তাহাদের প্রতি এই প্রকার দণ্ডের কথা কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন? অথচ আমাদের দেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা হরিজনদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, এই অভি-যোগে সংস্কারকগণ নিত্য তাঁহাদিগকে গালি দিয়া বিপুল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং মনে করেন, বর্ণহিন্দুরা হরিজনদের সহিত এক সানকীতে আহার না করিলে ভারতোদ্ধারের আশা নাই!

শিশুবার্গের চালবাজি

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হইয়াছিল, সেই সময় সিনর মুসোলিনী ইটালীকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ দান করিতে সাহসী না হইলেও ইটালীর রাজা ভিক্টর এমানুয়েল ইটালীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ দান করিয়াছিলেন; তদনুসারে দশ লক্ষাধিক ইটালীয় সৈন্য সশস্ত্র সজ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু এই আয়োজনের সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল, এবং জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে ইটালীর সমর বিভাগে রণসজ্জা চলিতেছিল। ইটালীর রাজা ভিক্টরের আদেশেই এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইটালীয় সৈন্যগণের সমর-সজ্জার সংবাদ গোপন রাখিবার কারণ এই যে, বারুদের স্তূপে অগ্নি-সংযোগের জন্য ইটালীই দায়ী বলিয়া কেহ তাহার উপর দোষারোপ করিতে না পারে।

কিন্তু এক ব্যক্তির চেষ্টার ফলে যুদ্ধের সকল আয়োজন পণ্ড হইয়াছিল। এই ব্যক্তি বিমান-পরিচালনবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষ

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধিবাসী বিজ্ঞানবিৎ কর্ণেল চার্লস্ অগষ্টস্ লিণ্ডবার্গ।

দস্যুরা কর্ণেল লিণ্ডবার্গের প্রথমজাত শিশুপুত্রকে অপহরণ করিয়া হত্যা করিলে লিণ্ডবার্গ সকলের অজ্ঞাতসারে গোপনে স্ত্রী-পুত্রসহ স্বদেশত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এ সংবাদ সকলেরই সুবিদিত; কিন্তু কি কারণে তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নিবিড় রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। এ কাল পর্য্যন্ত সেই রহস্য ভেদ হয় নাই।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গ ইংলণ্ডে আসিয়া বৃটানীর উত্তর উপকূলের অদূরস্থিত সেণ্ট গিলডাস নামক ক্ষুদ্র নিভৃত দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংগোপনে যে পরীক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ কেহই জানিতে পারে নাই; প্রকাশ—তিনি মনুষ্যদেহের বিভিন্ন অংশ দেহান্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া সেই দেহের উৎকর্ষসাধনের গবেষণায় রত আছেন। তাঁহার পরীক্ষা সফল হইলে চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

কিন্তু জনরবে প্রকাশ, কর্ণেল লিণ্ডবার্গ আন্তর্জ্জাতিক ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা করিতেছেন, তাহাই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বৃটিশ সরকারের একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন 'প্যান-আমেরিকান এয়ার ওয়েজ' এবং যুনাইটেড ষ্টেটস্ সরকারের সহযোগিতায় আটল্যাণ্টিক মহাসাগর পারাপারের জন্য একটি উড়ো-পথের সৃষ্টি করেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে কর্ণেল লিণ্ডবার্গ অন্য একটি কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। যখন তিনি আকাশপথে য়ুরোপে ভ্রমণ আরম্ভ করেন, সেই সময় য়ুরোপের রাজনৈতিক গগনে যুদ্ধের মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। এই সময় গগন-বিহার উপলক্ষে তিনি বার্লিনে গমন করিলে সেখানে মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে হার হিটলারের সহিত তাঁহার কি গুপ্ত পরামর্শ হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হয় নাই; তবে তিনি বিনা উদ্দেশ্যে বার্লিনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, অতঃপর তিনি রুশিয়ায় গমন করেন, এবং সোভিয়েট সরকার মহা সমাদরে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। রুশিয়া হইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মার্কিণ সরকারের জন্য একটি বিস্ময়াবহ রিপোর্ট রচনা করেন। সেই রিপোর্টের একপ্রস্থ নকল ফরাসী সরকারের সমর বিভাগে প্রেরিত হইয়াছিল। বৃটিশ সরকার পরে সেই রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন।

এই রিপোর্টের স্থূল মর্ম্ম এই যে, সোভিয়েট সরকার বলেন, তাঁহাদের উড়ো-বহর য়ুরোপের সকল রাজ্যের উড়ো-বহর অপেক্ষা প্রবল শক্তিসম্পন্ন, এবং সকলের পক্ষেই বিভীষিকাজনক, তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, সোভিয়েট সরকারের উড়োবহর প্রকৃতপক্ষে অকর্ম্মণ্য, (inefficient); অথচ জার্ম্মাণীর বিমান বহর যেরূপ প্রবল শক্তিসম্পন্ন, সেইরূপ সুপরিচালিত (strong and well-organised.)

কর্ণেল লিণ্ডবার্গের এই রিপোর্ট পাঠের পর বৃটিশ ও ফরাসী সমর-বিভাগের নেতৃবর্গ জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার বিমান-বাহিনীর দোষ-গুণের তুলনা করিয়া কে শ্রেষ্ঠ, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই তর্ক-বিতর্কের ফলে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব জর্জ্জেস্ বনেট নাজীদলের বিমান-বহরের শ্রেষ্ঠতার পরিচয়ে অত্যন্ত ভীত হইলেন। এদিকে নেভিল চেম্বারলেনের কতিপয় উপদেষ্টা তাঁহাকে এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, "লিণ্ডি" (লিণ্ডবার্গ) জার্ম্মাণ ও রুশিয়ান এরোপ্লেন বহরের শক্তির তুলনা করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে মূল্যেই হউক (wh.t ever the cost) হিটলারের সহিত শান্তি স্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিলেন যে, ফরাসীর বিমান-বাহিনীও আশানুরূপ শক্তিসম্পন্ন নহে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তাঁহার উপদেষ্টৃগণের এই সকল উপদেশে কর্ণপাত করিয়াছিলেন কি না, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই; তবে এ কথা সত্য যে, তিনি লিণ্ডবার্গের রচিত রিপোর্ট বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে যুদ্ধের অনুকূলে যে সকল আয়োজন চলিতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে রহিত হইল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গ জার্ম্মাণ ও রুশিয়ান বিমান-বাহিনীর আপেক্ষিক শক্তির তুলনা করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীর গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাহা সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহারা হার হিটলারের নিকট এ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করে, তাহার মর্ম্ম এই যে, এরোপ্লেন-পরিচালন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি (কর্ণেল লিণ্ডবার্গ) সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিমান-বাহিনী স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাদের বিমান-বাহিনীর অবস্থা উৎকৃষ্ট, এবং সোভিয়েট এরোপ্লেন-সমূহের 'মেসিন'ও উত্তম, কিন্তু তাহার পরিচালকবর্গের অবস্থা শোচনীয় এবং অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। এই প্রসঙ্গে রুসীয় বিমান-বাহিনীর পরিচালকবর্গের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটিরও আলোচনা হইয়াছিল। এই সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না।

এই সকল বিবরণ অবগত হইয়া এডলফ হিটলার কতদূর অগ্রসর হইতে পারেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্থির করিলেন, যদি বৃটেন, ফ্রান্স, রুশিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া—এই শক্তি-চতুষ্টয়ের বিমান-বাহিনী একযোগে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়—তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহা হইলে তিনি তাহা-দিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ স্ব-স্ব পরাক্রমে নির্ভর করিতে অসমর্থ। এ অবস্থায় যদি তিনি চেকোশ্লোভাকিয়াকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সঙ্কল্প-সিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

তিনি যাহা ধারণা করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা সফল হইয়াছিল, এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন উপযাচক হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায়, কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে তাঁহার যে কিছু সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহ অপসারিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার দাবী সহজেই পূর্ণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ, কর্ণেল লিণ্ডবার্গই তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। লিণ্ডবার্গ তাঁহার অনুকূলে রিপোর্ট প্রকাশ না করিলে য়ুরোপের রাজনৈতিক অবস্থা সম্ভবতঃ অন্য প্রকার হইত। বৃটেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না থাকায় তিনি অবাধে কার্য্যসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হিটলার সকাশে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন

অনাহূতভাবে মোড়লী—

বৃটিশ রাজনীতিকগণের মধ্যে কেহ কেহ—যথা ডেভিড লয়েড জর্জ্জ, র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড—এরূপ উচ্চাভিলাষী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান্ ছিলেন যে, তাঁহারা মনে করিতেন, যদি তাঁহারা পেশাদারী কূটনীতিতে একটু ঘুরো চাল্ খাটাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই চালে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী আর্থার নেভিল চেম্বারলেনও আত্মশক্তিতে এইরূপ বিশ্বাসবান্, এবং গত সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে তিনি সেই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্থূলকায় ষ্ট্যান্‌লি বল্‌ডুইন যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সে সময় এই সকল ব্যাপারে কোন দিন তাঁহাকে গায়ে-পড়িয়া 'দূতিয়ালি' করিতে দেখা যায় নাই; তিনি লণ্ডনে বসিয়াই এন্থনি ইডেনকে য়ুরোপীয় কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার বালকসুলভ হাস্য প্রসারিত করিতে দিতেন। কিন্তু নেভিল চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াই বেনিটো মুসোলিনীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "আমার ইচ্ছা আমি (রোমে) আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি লণ্ডন ত্যাগ করিতে পারিব না—"

অতঃপর চিঠি-পত্রে এবং টেলিফোনে কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল; প্রধান মন্ত্রী এংগ্লো-ইটালিয়ান চুক্তির জন্য আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি 'টনি' ইডেনকে উপেক্ষা করিয়া সেই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত করাইলে 'টনি' ইডেন বিরক্তিভরে পররাষ্ট্র আফিসের চাকরী ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সন্ধির সর্ত্তানুসারে এখনও কায আরম্ভ হইল না।

লয়েড জর্জ্জ

এন্থনি ইডেন

ষ্ট্যান্‌লি বল্‌ডুইন

র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড

এংগ্লো-ইটালিয়ান চুক্তি এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়কের সহিত নূতন করিয়া প্রেমাভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকবার হিট্‌লারকে সংবাদ পাঠাইলেও, জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়কের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ মিলে নাই। অবশেষে যখন লণ্ডনের অধিকাংশ অধিবাসী ভাবিতে লাগিল আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে কি? সেই সময় ডাউনিং ষ্ট্রীট হইতে যে সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হইল, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া জনসাধারণের মন আশায় ও উৎকণ্ঠায় আন্দোলিত হইতেছিল। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়ককে তার করিয়া জানাইয়াছিলেন,—
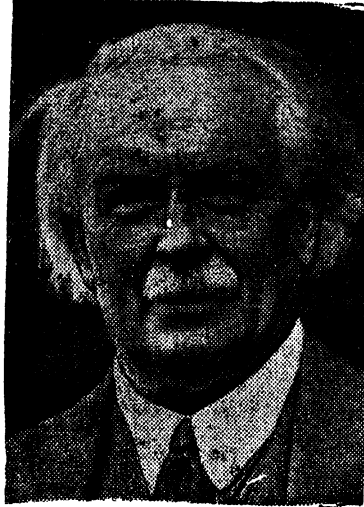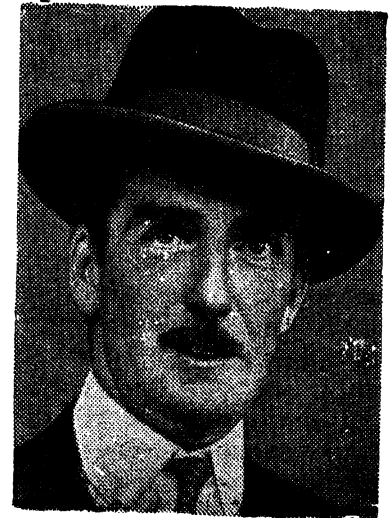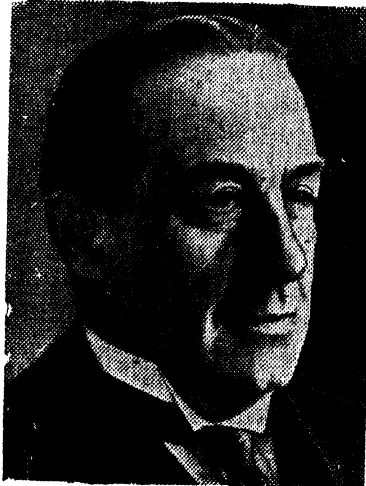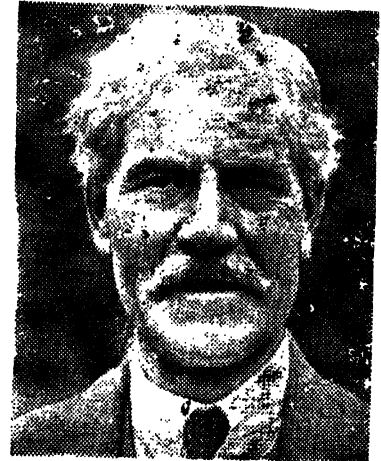
"সঙ্কটজনক অবস্থার গুরুত্ব-হেতু সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে উপনীত হইবার চেষ্টায় আমি অবিলম্বে আপনার নিকট হাজির হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব (প্রার্থনা?) করিতেছি। আমার প্রস্তাব এই যে, আমি আকাশ-পথে উড়িয়া যাইব; এবং আগামী কল্যই আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত। অতএব কোন্ সময় অতি শীঘ্র

আমাকে দেখা দিতে পারিবেন, সেই সময়টি, এবং কোথায় আপনি আমাকে দেখা দিবেন—সেই স্থানটি দয়া করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবেন। শীঘ্র উত্তর পাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

—নেভিল চেম্বারলেন।"

যাঁহার সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্তমিত হয় না, সেই অর্দ্ধ-পৃথিবীর সম্রাটের যিনি প্রধান মন্ত্রী, তিনি জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়কের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইয়া এই ভাবে তাঁহার দ্বারস্থ হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি ত উড়িবেন, সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ 'প্রেষ্টিজ'কে কোথায় উড়াইয়া দিবেন, এ কথা কি একবারও তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল? কিন্তু এই প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্বাপর যে প্রণালীতে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই প্রণালীর সহিত তাঁহার এই কার্য্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। ইহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা যাইতেছে। ৪০ বৎসর বয়সে যখন তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই—তিনি তখন বার্ম্মিংহামের একটি জাহাজী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন। সেই সময় উক্ত প্রতিষ্ঠানের জাহাজসমূহে আরোহিগণের শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট 'বক্স'সমূহে স্প্রীংএর গদীর প্রয়োজন হওয়ায়, উহার ঠিকা লইবার জন্য ঠিকাদারগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। বেলফাষ্ট নগরে এই চুক্তি লইয়া যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা 'টেণ্ডার' দিয়াছিল, তাহাদের টেণ্ডারে যে পার্থক্য ছিল তাহার পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য, কয়েক পাউণ্ডের অধিক নহে; বিশেষতঃ, ব্যাপারটি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ নহে যে, সে জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে বিশেষ ব্যাকুল বা উৎকণ্ঠিত হইতে হইত। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পরিচালক চেম্বারলেন উক্ত কোম্পানীর পরিচালক-সমিতির সহিত পরামর্শ বা তাঁহাদের মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বেলফাষ্টে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, "আমাদের প্রতিনিধি আগামী কল্য প্রভাতে বেলফাষ্টে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করিবেন ইহাই তাঁহার প্রস্তাব।"

অতঃপর নেভিল চেম্বারলেন তাঁহার ছাতাটা মুড়িয়া লইয়া সেই রাত্রিতেই বেলফাষ্টে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং চুক্তিনামা শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। যিনি তুচ্ছ বিষয় লইয়া এইভাবে গলদঘর্ম্ম হইয়া থাকেন, তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াও ত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রভাতে যখন অধিকাংশ ইংরেজ প্রাতর্ভোজনে রত ছিল, সেই সময় প্রধান মন্ত্রী কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ধূসর ওভারকোট ও ধূসর টুপি এবং একটি ছত্র গ্রহণ করিয়া হেষ্টন এয়ারোড্রোমে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সেখানে তিনি 'বৃটিশ এয়ার ওয়েজের' একখানি জোড়া ইঞ্জিনবিশিষ্ট এরোপ্লেনে প্রবেশ করেন।

যাঁহারা গগনপথে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, খ-পোত-ভ্রমণে ছত্র গ্রহণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জেদী লোক এডলফ্ হিটলারের সহিত চুক্তি করিয়া তিনি ছাতা দিয়া জগতের শান্তি রক্ষা করিবেন, সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই তিনি এরোপ্লেনে ছত্র গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন।

এক সময় যিনি কোম্পানীর ডাইরেক্টর ছিলেন, ৭০ বৎসর বয়সে এরোপ্লেনযোগে তাঁহার আকাশভ্রমণ যে ভয়ঙ্কর একটা 'এড্‌ভেঞ্চার', ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তাঁহাকে উড়িতে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, তিনি নাজী সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিবেন, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বৃটেন জেকোশ্লোভাকিয়ার অনুকূলে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত, এবং জেক সাধারণতন্ত্রের সুডেটেন জার্ম্মাণ অধিবাসিগণের মুক্তির জন্য যে সকল সর্ত্ত করা হইয়াছিল, সেই সকল সর্ত্তের পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি এডলফ হিটলারকে দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করিবেন। কিন্তু নিউ ইয়র্কের একখানি সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধের নাম ছিল,—

"পুনর্ব্বার হিটলারের জয়লাভের সূচনা।"

হেষ্টনে বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীর জন্য স্যাণ্ডউইচ, হুইস্কি, আপেলের তাড়ি, বীয়ার, সেরী এবং চা প্রভৃতি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য প্যাকবন্দী করিয়া এরোপ্লেনে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। বুড়ার দেহ ও মনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্য মতলবই কত প্রকার! একজন অনুচর বৃদ্ধের শ্রবণযুগলকে এরোপ্লেনের এঞ্জিনের রুদ্র গর্জ্জন হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কাণে পরিবার জন্য কয়েক তাল তুলা প্রদান করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে পথের বিবরণ জানাইবার জন্য একখানি মানচিত্রও প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহাকে বিদায় দানের জন্য তাঁহার যে সকল বন্ধু জাহাজঘাটায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে লর্ড ব্রোকেট, লর্ড লণ্ডনডেরি, লর্ড হ্যালিফাক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, এতদ্ভিন্ন সেই দলে লণ্ডনস্থ জার্ম্মাণ দূতাবাসের দুই জন জার্ম্মাণ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম থিও কর্ড, এবং প্রধান সেক্রেটারী ব্যারণ ভন সেলজান। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার সঙ্গে যে দুই জন ইংরেজ সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের এক জন সার হোরাস জন উইলসন, তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর, তিনি মন্ত্রণা সভার চীফ্ ইন্‌ডষ্ট্রীয়াল এড্‌ভাইসার, দ্বিতীয় ব্যক্তির বয়স ৪৫ বৎসর, তাঁহার নাম উইলিয়ম ষ্ট্রাং, তিনি বৃটিশ পররাষ্ট্র অফিসের সেণ্ট্রাল য়ুরোপীয় বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী।

মুসোলিনী

এরোপ্লেনখানি ইংলিশ উপসাগর অভিমুখে ধাবিত হইলে, প্রধান মন্ত্রী একবার তাঁহার হস্তস্থিত মানচিত্রের দিকে, এবং একবার নিম্নস্থিত মেঘের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

মিউনিকের মধ্যপথে আসিয়া প্রধান মন্ত্রী শূকরমাংসের স্যাণ্ড-উইচ ভক্ষণ করিয়া এক গ্লাস হুইস্কি পানে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিন ঘণ্টা পরে উড়োবন্দরে তিনি দেখেন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য 'কালোকুর্ত্তা'ধারী এক দল রক্ষী তাড়াতাড়ি তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকেও জার্ম্মাণীতে প্রবেশের জন্য 'পাসপোর্ট' রাখিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নাজী পররাষ্ট্র-সচিব জোয়াকিম ভন রিবেনট্রপ ১৪খানি মোটর-কার সহ প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন; এই সকল মোটর-কারে 'স্বস্তিক'-লাঞ্ছিত পতাকা উড়িয়া হিটলারের গৌরব ঘোষণা করিতেছিল। জার্ম্মাণ পররাষ্ট্রসচিব ভন রিবেনট্রপ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন; কারণ, তিনি হিটলারকে পূর্ব্বাপর এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন যে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ফ্রান্স ও বৃটেন জেকোশ্লোভাকিয়ার স্বার্থরক্ষার জন্য কখন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে না।" তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এইবার সফল হইবার উপক্রম দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

ভন রিবেনট্রপ

ভন রিবেনট্রপ মিঃ চেম্বারলেনকে মোটর-কারে তুলিয়া লইয়া ব্যাভেরিয়ার পল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলে, ব্যাভেরিয়ার পল্লীবাসীরা শুনিয়াছিল, বৃটিশ মহামন্ত্রী তাহাদের মোড়ল হার হিটলারের নিকট দরবার করিতে আসিয়াছেন; এ জন্য তাহারা সমবেত কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "স্বাগত চেম্বারলেন!" চেম্বারলেন তাহাদের পুনঃ পুনঃ অভিবাদনের ঘটা দেখিয়া মুখে হাসির লহর তুলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়াছিলেন।

হিটলারের অতিথিসৎকার—

চেম্বারলেন মিউনিকের উড়োবন্দর হইতে রেল-ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন, প্ল্যাটফর্ম্মে হিটলারের স্পেশাল ট্রেণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই ট্রেণের সহিত হিটলারের নিজের যে কামরাগুলি সংলগ্ন ছিল, তাহাতে অতিথির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের বিপুল আয়োজন লক্ষিত হইয়াছিল। সেলুনে একটি আরামপ্রদ শয়ন-কক্ষ এবং একটি স্নানাগার ছিল। তাহার আসবাবপত্রগুলি সুদৃশ্য ও মূল্যবান্; তাহা যে কোন সম্রাটের ব্যবহারযোগ্য। বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ শয়ন-কক্ষটি দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী প্রফুল্ল চিত্তে বলিয়াছিলেন, "ওঃ, লঞ্চের পর এখানে শয়ন করিয়া আমাকে কিছুকাল ঘুমাইতেই হইবে।"

মহানন্দে তিনি 'লঞ্চ' সমাধা করিয়াছিলেন, লঞ্চের আয়োজন প্রচুর; কচ্ছপের সুরুয়া, রোষ্টকরা গো-মাংস, ইয়র্কসায়ার পুডিং, পণীর, নানা প্রকার বিস্কুট ও ফল। খাদ্যের পর পানের ঘটা! তিনি প্রথমে শ্বেতবর্ণ রাইনমদ্য পান করেন, অতঃপর এক গ্লাস লোহিত সুরা, অনন্তর পোর্ট ও কফি পানের পর তিনি চুরুটধূমপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় যাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের সহিত তিনি স্ফুর্ত্তির সহিত গল্প করিতেছিলেন; গল্প ইংরেজী ভাষায় চলিতেছিল, কারণ, তিনি জার্ম্মাণ ভাষা বলিতে পারেন না, তবে কিছু কিছু বুঝিতে পারেন। রাজনীতি ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই তাঁহার গল্প চলিতেছিল। গল্পে তিনি মধ্যে মধ্যে রসিকতা প্রকাশেরও চেষ্টা করিতেছিলেন। কথায় কথায় তিনি ভন রিবেনট্রপকে বলেন, "যখন আমরা লণ্ডন ত্যাগ করি, সে সময় আকাশের অবস্থা কি চমৎকার! কিন্তু আমরা 'কন্টিনেন্টে' আসিতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, ইহার কারণ কি?"—হয়ত তাঁহার জার্ম্মাণীতে আগমনের সহিত য়ুরোপের রাজনৈতিক আকাশে আসন্ন ঘনঘটার সম্বন্ধ সূচিত হইতেছিল; ইহা সত্য কি না কে বলিবে? যাহা হউক গল্প করিবার উৎসাহে তিনি ঘুমাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী বার্চেস্‌গাডেনে পৌছিবার পূর্ব্বে শেষ ষ্টেশনে আর এক ডজন মোটর-কার দেখিতে পাইয়াছিলেন, এই সকল কার তাঁহাদের জন্য সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছিল। চেম্বারলেন সেই সকল কারের সাহায্যে সদলে গিরিপার্শ্বস্থ গ্র্যাণ্ড হোটেলে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়া কালোকুর্ত্তাধারী নাজী রক্ষী দল উচ্চৈঃস্বরে সকলকে সতর্ক হইতে আদেশ করিলে সেই শব্দতরঙ্গ বিভিন্ন গিরিকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

প্রধান মন্ত্রী গ্র্যাণ্ড হোটেলে পদার্পণ করিবামাত্র হোটেলশীর্ষে ইংরেজের জাতীয় পতাকা 'য়ুনিয়ন জ্যাক' উড্ডীন হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের ব্যক্তিগত রক্ষী দল হোটেলের প্রবেশদ্বারে পাহারায় নিযুক্ত হইল। এই সকল রক্ষীর শিরস্ত্রাণ কৃষ্ণবর্ণ।

চেম্বারলেনের বাসকক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে জোয়াকিম ভন রিবেনট্রপের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাঁহার দলস্থ লোকগুলি হোটেলের অবশিষ্ট কক্ষগুলি অধিকার করেন। তাঁহারা সংখ্যায় ৪০ জন; ইহারা সকলেই বার্লিনস্থ নাজী পররাষ্ট্র-সচিবের দলের লোক। হোটেলে যে সকল সাধারণ ভদ্রলোক বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা সাময়িক ভাবে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী যখন হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, এবং অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছিল। প্রধান মন্ত্রী হোটেলে ৪৫ মিনিট বিশ্রামের পর জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়কের গিরিপ্রান্তবর্ত্তী সুরম্য বাসভবন 'ডার বারঘফে' যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার মোটর-কার অল্পক্ষণ পরে সাধাসিধা রকমের একটি দেউড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল।

চেম্বারলেনকে মোটর-কার হইতে অবতরণ করিয়া ২০টি পাষাণ-সোপান অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। সেই সোপানশ্রেণীর ঊর্দ্ধে এডল্‌ফ হিটলার তাঁহার অতিথির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হিটলারের মনের ভাব তখন যেরূপই হউক, বৃটেনের সেকেলে ফ্যাসানের

প্রধান মন্ত্রীকে পদব্রজে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি মধুর হাস্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি সুখসাগরে সন্তরণ করিতেছিলেন। প্রকৃত মনোভাব গোপন করিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ। জোয়াকিম ভন রিবেন-ট্রপ সেই সময় মুখের যে ভঙ্গী করিয়াছিলেন, তাহা অতি অদ্ভুত! তিনি পূর্ব্বে বহুবার হতাশ হইয়া মর্ম্মপীড়া সহ্য করিয়াছিলেন, এতদিন পরে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় সেই আনন্দ গোপন করা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছিল।

জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব ভন রিবেনট্রপকে বহুবার অপদস্থ হইতে হইয়াছিল। এডল্‌ফ হিট্‌লার তাঁহার প্রিয় সহচর ভন রিবেনট্রপকে বৃটেনের বন্ধুত্বলাভের আশায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দূতরূপে লণ্ডনে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু রিবেনট্রপের সকল চেষ্টা বিফল হওয়ায় নাজীদলে তাঁহাকে অত্যন্ত অপদস্থ হইতে হইয়াছিল। রিবেনট্রপ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া হার হিটলারকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বৃটেন বা ফ্রান্স জেকোশ্লোভাকিয়ার অনুকূলে জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু হিটলার তাঁহার এ কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, বৃটেনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল একদল জার্ম্মাণ হিটলারকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—বৃটেনে তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হইতেছিল; এ অবস্থায় জার্ম্মাণী বৃটেনের সহানুভূতি লাভ করিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? হার হিটলার এ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এবং রিবেনট্রপ তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন; এই জন্যই ভন রিবেনট্রপকে মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছিল। এতদিন পরে বৃটিশ মহামন্ত্রী চেম্বারলেন স্বয়ং উপযাচক হইয়া এডল্‌ফ হিটলারের সহিত সাক্ষাতের আশায় তাঁহার বাসভবনে প্রবেশ করায় রিবেনট্রপের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মনের আনন্দ গোপন করিতে পারেন নাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনার জন্য হিটলারের বাসভবন কতকগুলি 'ইজি চেয়ার', ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবল, এবং জার্ম্মাণ তৈল-চিত্রসমূহে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। একটি সুবিস্তীর্ণ কক্ষের এক প্রান্তের দেওয়ালে একটি সুবৃহৎ বাতায়ন ছিল। সেই বাতায়ন হইতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলে তুষারমুকুটিত ব্যাভেরিয়ান আল্পস্ গিরিমালা, এবং বহুদূরবর্ত্তী অষ্ট্রীয় সীমাস্থিত সালবর্গ নয়ন-পথে নিপতিত হইয়া থাকে।

চা-পান ও আলাপ—

হিটলার ও চেম্বারলেন প্রথমে প্রায় ৪০ মিনিট ধরিয়া কর্ম্মচারিগণের সহিত নানাপ্রকার গল্প করিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা চা-পানে রত ছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের গল্পে রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা হয় নাই। ৪০ মিনিট পরে হার হিটলার চেম্বারলেনকে সঙ্গে লইয়া দোতলায় তাঁহার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করেন।

তাঁহারা যখন হিটলারের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তাঁহারা উভয়ে মুখোমুখী হইয়া উপবেশন করেন। সেই সময় সেই কক্ষে যে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার স্মিট্। ডাক্তার স্মিট্ দীর্ঘদেহ প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁহার মাথাভরা টাক। পেশায় তিনি সুদক্ষ দ্বিভাষী, কিন্তু 'বলরুমে' উৎসাহশীল নর্ত্তক বলিয়া তাঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল।

চেম্বারলেন-হিটলার সম্মিলন

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিবসঙ্ঘে ডাক্তার স্মিট ষ্ট্রেস্‌ম্যানের নিকট সর্ব্বপ্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। জার্ম্মাণী যখন জাতিসঙ্ঘে প্রবেশ করে, সেই সময় ষ্ট্রেসম্যান ডাক্তার স্মিটকে জেনিভা নগরে লইয়া গিয়াছিলেন। জেনিভা নগরে সকল সরকারী কার্য্য ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডাক্তার স্মিট য়ুরোপের সাতটি বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত। ষ্ট্রেসম্যান লীগে যে সকল মন্তব্য জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, ডাক্তার স্মিট দোভাষীরূপে তাহা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। অতঃপর নাজীদল জার্ম্মাণীতে প্রভুত্ব লাভ করিলে হার হিটলার ডাক্তার স্মিটকে তাঁহার আফিসে সরকারী দ্বিভাষীর পদে নিযুক্ত করেন। বেনিটো মুসোলিনী যে সময় বার্লিনে গমন করেন, ডাক্তার স্মিট সেই সময় তাঁহার দ্বিভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

তাহার পর হার হিটলার রোমে গমন করিলে মুসোলিনীই ডাক্তার স্মিটকে তাঁহার দ্বিভাষীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন।

এডল্‌ফ হিটলার যে জার্ম্মাণ ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন, তাহা ভাষান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তিনি বক্তৃতা করিবার সময় এরূপ আবেগভরে এবং অস্পষ্টভাবে কথা বলিয়া থাকেন যে, তাহা বুঝিয়া উঠা অপরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু ডাক্তার স্মিটের তাহার এক বর্ণও বুঝিতে কষ্ট হয় না।

নাজী-দলপতি (হার হিটলার) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে কি কথা বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয় কি ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ডাক্তার স্মিট ভিন্ন অন্য কাহারও জানিবার উপায় ছিল না, এবং অন্য কেহ কোনদিন তাহা জানিতে পারিবে না। ডাক্তার স্মিট তাহা জানিলেও কেহ যে কোন কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে সে সকল কথা বাহির করিয়া লইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ডাক্তার স্মিট এ বিষয়ে অসাধারণ সতর্ক, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের অতীত। কিন্তু বার্চেস গাডেনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত হার হিটলারের যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহার আভাস পাইয়া ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এডুয়ার্ড ডালাডিয়ার এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "হার হিটলার বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রস্তাব নহে, তাহা চরম দাবী।" (ultimatum,)

নেভিল চেম্বারলেন দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট হার হিটলারের নিকট একাকী ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার হোটেলে প্রত্যাগমন করেন। হার হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় তাঁহার মুখে যে হাসি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তিনি যখন ফিরিয়াছিলেন তখনও তাঁহার মুখে সেই হাসি লক্ষিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, যে উদ্দেশ্যে তিনি হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, হিটলারের সহিত আলাপে তিনি পরিতৃপ্ত!

প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলের সোপানশ্রেণীর ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া, হাস্যচ্ছটায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন, "আলাপ যতদূর বন্ধুত্বপূর্ণ হইতে পারে, তাহার চূড়ান্ত হইয়াছে।" অতঃপর তিনি জানাইয়াছিলেন, হিটলারের সহিত পুনর্ব্বার তাঁহার কথা হইবে, কিন্তু সে জন্য তিনি আর সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিবেন না, পরদিন প্রভাতেই তাঁহাকে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিতে হইবে; সেখানে তিনি সহমন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পরে জানিতে পারা গিয়াছিল, এডলফ হিটলার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনাকে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে, এ জন্য আমি দুঃখিত। আপনার ন্যায় বৃদ্ধের পক্ষে ইহা দুস্তর পথ। আমারই ইচ্ছা হইয়াছিল, আমি লণ্ডনে যাই; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছিলাম, কোন রাজ্যের প্রধান ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য্য বিজ্ঞোচিত নহে।"

হার হিটলারের এই উক্তির অন্তরালে যে বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা বৃটিশসাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর মর্ম্মভেদ করিয়া তাঁহার মনে অনুশোচনার সঞ্চার করিয়াছিল কি না কে বলিবে? কিন্তু হার হিটলারের এই ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

সাংবাদিকবর্গ-সমাগম—

অতঃপর প্রধান মন্ত্রী হেষ্টনে এরোপ্লেন হইতে অবতরণ করেন; তখনও তাঁহার মুখে সেই হাসিই লাগিয়াছিল, কিন্তু সেই 'দেঁতোর হাসির' অন্তরালে নিদারুণ অন্তর্ব্বেদনা ও আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ কি প্রচ্ছন্ন ছিল না? তিনি জেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটেন জার্ম্মাণ সমস্যার সমাধান করিয়া য়ুরোপে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে লণ্ডন হইতে ৬ শত মাইল উড়িয়া ব্যাভেরিয়ায় গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা কি ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল? তিনি হার হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিতীয় মুচনীগের ন্যায় অঙ্গীকারের পরিবর্ত্তে কেবল কতকগুলি দাবীর কথা শুনিয়াই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন নাই কি?

হেষ্টনের উড়োবন্দরে সংবাদপত্রের যে সকল প্রতিনিধি তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে মধুর হাস্যে অভিনন্দিত করিয়া একটি মাইক্রোফোনের সাহায্যে বলিয়াছিলেন, "আমি যে সময় প্রত্যাগমনের আশা করিয়াছিলাম—তাহার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়াছি। যদি আমার মন নানা চিন্তায় পূর্ণ না থাকিত, তাহা হইলে আমার এই ভ্রমণ যথেষ্ট আনন্দদায়ক হইত। গতকল্য অপরাহ্নে দীর্ঘকাল ধরিয়া হার হিটলারের সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। খোলাখুলি ভাবেই আমাদের আলাপ হইয়াছিল, সেই আলাপ বন্ধুত্বপূর্ণ। আমরা পরস্পরের মনের ভাব সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেই আলাপের পরিণাম কি, সে সম্বন্ধে আমি এখন আপনাদের সহিত আলোচনা করিব, ইহা আপনারা অবশ্যই প্রত্যাশা করিবেন না।

"আমাকে এখন এ সম্বন্ধে আমার সহযোগিবর্গের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার কোন অননুমোদিত বিবরণ যদি আপনাদের হস্তগত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ করা আপনাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। আজ রাত্রিকালে আমার সহযোগিবর্গের সহিত, বিশেষতঃ লর্ড রন্সিম্যানের সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব। কয়েকদিন পরে হার হিটলারের সহিত পুনর্ব্বার আলাপ করিবার ইচ্ছা আছে। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, এবার মধ্যপথে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আমার ন্যায় বৃদ্ধকে পুনর্ব্বার এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে না হয়, এইরূপ ইচ্ছাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।"

যাহা হউক, প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি শুনিয়া বৃটেনের জনসাধারণ জানিতে পারে নাই যে, হিটলার খোলাখুলি ভাবে তাঁহার উপর দাবী চালাইয়াছিলেন, সুডেটেন ভূমি জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি নিরতিশয় জীদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, যদি তাঁহার এই দাবী পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে তিনি জার্ম্মাণ-সৈন্যগণকে পরিচালিত করিবার আদেশ প্রদান করিবেন। হার হিটলার এ-কথাও বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি সেই সপ্তাহের বুধবারের মধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট হইতে অনুকূল উত্তর না পান, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, এজন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিবেন না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী হার হিটলারের এই দম্ভপূর্ণ বাণী শ্রবণে বিচলিত না হইলেও ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এডুয়ার্ড ডালাডিয়ার মন্ত্রণাসভায় উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে

উৎক্ষিপ্ত করিয়া এই প্রকার হীনতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে চেম্বারলেনেরই মতানুবর্ত্তী হইতে হইয়াছিল, তাহার ফলে জেকোস্লোভাকিয়া দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও বিদ্রোহী দল

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন-সন্ধির অবসানে বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি সেই সন্ধিপত্র পকেটে পুরিয়া সগর্ব্বে ইংলণ্ডে ফিরিলে তিনি কুইন ভিক্টোরিয়ার উল্লাসপূর্ণ ধন্যবাদ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের মন্ত্রণা-সভায় তাঁহাকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাহার কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে যে নির্ব্বাচন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার পরাজয় ঘটে, এবং তিনি হতমান হইয়া অবসরগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ দিক হইতে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ, রাণী, প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার পত্নী

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়কের স্বাক্ষরিত বন্ধুত্বের ঘোষণা-পত্র লইয়া মিউনিক হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, তিনিও সস্ত্রীক রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের সমর্থন ও প্রীতিসম্ভাষণ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সাধারণ নির্ব্বাচন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহাকে পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ঘর সামলাইতে গিয়া বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণের তীব্র মন্তব্য শুনিতে হইয়াছিল। মিঃ চেম্বারলেন পরম সহিষ্ণুচিত্তে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী টোরিদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই 'গ্রুপে' ২০।৩০ জন সদস্য ছিলেন; এণ্টনি ইডেন, উইনষ্টন চার্চ্চিল, ভূতপূর্ব্ব প্রধান নৌ-সচিব (ex-first Lord of Admiralty) আলফ্রেড ডফ্‌ কুপার, লর্ড ক্র্যান্‌বোর্ণ, এবং সার সিড্‌নি হারবার্ট তাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী ছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী সরকারী সম্মুখস্থ বেঞ্চ অধিকার করিয়া চারিদিন যাবৎ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; কিন্তু তৃতীয় দিবস বক্তৃতাকালে তাঁহার ক্লান্তি লক্ষিত হইয়াছিল। বক্তৃতা করিতে করিতে ক্লান্তিবশতঃ তিনি কয়েক মিনিটের জন্য নিদ্রামগ্ন হইলে চীফ্ হুইপ্ ক্যাপ্তেন ডেভিড মার্গেসন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে প্রধান বিদ্রোহিগণ তাঁহাদের বৃহৎ তোপগুলি সর্ব্বশেষে ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। খঞ্জ (one legged) সার সিড্‌নি হারবার্ট সর্ব্বপ্রথমে প্রধান মন্ত্রীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই আক্রমণের বেগ অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়াছিল।

তাঁহার আক্রমণের মর্ম্ম এই যে, "প্রচুর অপমানের বিনিময়ে আমরা সাময়িক শান্তি অর্জ্জন করিয়াছি। এখন শিষ্টাচারের অনুরোধে এই শান্তিটুকু আমরা সমরোপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যয় করিব।"

সার সিড্‌নির এই উক্তির পর লর্ড ক্র্যান্‌বোর্ণ উত্তেজিত স্বরে বলিয়াছিলেন, "প্রধান মন্ত্রী নিশ্চিতই শান্তি লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সম্মান তিনি কোথায় রাখিয়া আসিলেন?"

সর্ব্বশেষে আক্রমণ করেন, উইনষ্টন চার্চ্চিল; কিন্তু তিনি উভয় প্রধান মন্ত্রী বলড়ুইন এবং চেম্বারলেন কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

বাগ্মী চার্চ্চিল অবশেষে আর্ল বলড়-উইনকে তীব্রভাবে খোঁচা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পূর্ব্বদিন তিনি লর্ড সভায় প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতায় ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী (আর্ল বলড়ুইন) ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে শিল্পদ্রব্যাদি যুদ্ধে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।

এই কথা শুনিয়া চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন, "লর্ড বলড়ুইন যদি আড়াই বৎসর পূর্ব্বে, যখন দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি 'সপ্লাই মিনিষ্ট্রী'র (a Ministry of Supply) দাবী করিয়াছিল, সেই সময় এ কথা বলিতেন, তাহা হইলে ইহা অধিকতর শোভন হইত।"

অতঃপর চার্চ্চিল মিউনিক চুক্তির অতি কঠোর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্ব এবং মধ্য-য়ুরোপের অন্তর্গত সকল দেশ এখন বিজয়ী এডল্‌ফ্ হিট্‌লারের সহিত শান্তির অনুকূলে সন্ধি করিবে। ফ্রান্স যে সন্ধিবন্ধনে নির্ভর করিয়াছিল, তাহা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! তুরস্কের সীমান্ত পর্য্যন্ত দানিউব-তীরস্থ সকল দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বার্লিনের ইঙ্গিতই কার্য্যকর হইবে।"

মিঃ চার্চ্চিল নেভিল চেম্বারলেনের তিন চারি গজ মাত্র দূরে দাঁড়াইয়া তীব্র স্বরে বলিয়াছিলেন, "প্রধান মন্ত্রী এই সকল দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন বলিয়া আমার মনে হয় না।"

লেডি এষ্টর মিঃ চার্চ্চিলের দুই সারি আসনের পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন; তিনি মিঃ চার্চ্চিলের মন্তব্য শুনিয়া সকোপে

বলিয়াছিলেন, "প্রধান মন্ত্রীর প্রতি অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করিবেন না।"

লেডি এষ্টরের এই মন্তব্য শুনিয়া 'উইনি' (উইনষ্টন চার্চ্চিল) ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া অচঞ্চল স্বরে বলিয়াছিলেন, "লেডি এষ্টর অতি অল্প দিন পূর্ব্বে (লেডি এষ্টরের কোন কোন উক্তিতে কিছু দিন পূর্ব্বে শিষ্টাচারের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই চার্চ্চিলের এই বিদ্রূপোক্তি) শিষ্টাচার শিক্ষা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

রাজনীতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদিগণের সকল দল সরকারের পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা এই ভাবে শেষ করিয়া নীরব হইলে নেভিল চেম্বারলেনের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন-সংক্রান্ত ভোট (Vote of Confidence) গৃহীত হইয়াছিল। প্রথমতঃ 'সোসালিষ্ট' নেতা ক্লেমেণ্ট এট্লী, ডেপুটী লীডার আর্থার গ্রীণউড, ডেভিড্ গ্রীণ্ফেল, নোয়েল বেকার, এবং সার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্সএর সংশোধন-প্রস্তাব বাতিল হইয়াছিল। অবশেষে ৩ শত ৬৬ ভোটে সরকারী নীতি সমর্থিত হয় ; বিরুদ্ধবাদীরা ১ শত ৪৪ ভোট প্রাপ্ত হওয়ায় পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রধান মন্ত্রী স্বদেশ ও স্বজাতির সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া এডল্ফ হিটলারের বন্ধুত্ব ক্রয় করায় ইংলণ্ডের জনসাধারণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলেও বৃটিশ পার্লামেণ্টে তৎ-কর্ত্তৃক শান্তি-ক্রয়ের নীতি এই ভাবে সমর্থিত হইয়াছিল ; সুতরাং তাঁহার মুখ-রক্ষা হইয়াছিল। ভোটে তিনি পরাজিত হইলে বৃটিশ রাজনীতির অবস্থান্তর ঘটিত।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ডিস্রেলির সময় ইংরেজ জাতির যে 'প্রেষ্টিজ' ছিল, তাহার ৬০ বৎসর পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সেই 'প্রেষ্টিজ'-রক্ষায় ইংরেজ জাতির অণুমাত্র আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল কি ? মনুষ্যজীবনের ন্যায় জাতীয়-জীবনেও যৌবনের পর জরা ও বার্দ্ধক্যের সমাগম অপরিহার্য্য; এই জন্য বৃটিশ জাতি জাতীয়-সম্মানের বিনিময়ে শান্তিক্রয়ের পক্ষপাতী।

বিশ্ব-হাহাকার

রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে,
শান্তি আজিকে নাহিক কোথাও তৃপ্তি কাহারো মর্ম্মে !
বিষায়িত বায়ু চারিদিকে ছুটে ফিরে শুধু হাহা করে,
গোপন হিংসা আছে অন্তর ভরে !

আমি দেখিয়াছি আজো দরিদ্র ভাসিছে নয়নজলে,—
ধনীর চরণতলে !
আমি দেখিয়াছি কৃষক খাটিছে রক্ত করিয়া জল,
মহাজন তার লুটিছে শ্রমের ফল !
আমি দেখিয়াছি শ্রমিকের দল প্রতীকার পেতে চায়,
ফিরিছে নিঃসহায় !
মানুষের কাছে মানুষ হ'বার চাহিতেছে অধিকার,
ভিক্ষা হ'য়েছে সার !
শিক্ষা-দীক্ষা যাহাদের নাই ছুটেছে লক্ষ্যহারা,
অন্ধকারেতে গড়েছে নিজের কারা !

চলেছে নালিশ বিচারের তরে বিশ্বের দরবারে—
ফিরে আসে দীন ব্যর্থ অশ্রুভারে !
আমি দেখিয়াছি রাষ্ট্রসঙ্ঘে উদাস কর্ম্মধারা,
বুদ্ধি-বিবেকহারা !
আমি দেখিয়াছি দাপিয়া বেড়ায় শক্তিমানের দল—
ফেলে দুর্ব্বল ব্যর্থ চোখের জল !
প্রতিকার আজ কা'রো কোথা নাই ধর্ম্ম হ'য়েছে ম্লান,
জাতিপ্রেম শুধু গাহিছে জাতির স্বার্থরক্ষা-গান !
মহামানবতা লুণ্ঠিত হ'য়ে বেড়াইছে ফাঁকে ফাঁকে—
সভ্যজগৎ ডুবিছে গভীর পাঁকে !

এসেছে গিয়েছে যুগে যুগে কত যুগ-দূত-অবতার,
দূরিতে অন্ধকার !—
নিভায়ে দিয়াছে সত্যের আলো বিদ্বেষ-বিষরাশি,
মানব-মনের গোপন হিংসা রয়েছে বিশ্বগ্রাসী !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

সূচী-শিল্পের ভূমিকা

বাঙ্গালার সভা-সমিতিতে বক্তার মুখের ভাষায় এবং মাসিকে সাপ্তাহিকে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে কলরব ছুটিয়াছে,—বাঙ্গালার কুটীর-শিল্প নষ্ট হইতে বসিয়াছে! জাগো বাঙালী, জাগো,—ভাই কৃষক, তোমার ঐ-লাঙ্গল-ধরা পরুষ হাতে ছুঁচ-সুতা ধরিয়া বাঙ্গালার লুপ্ত সূচী-শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন করো! কিন্তু বাঙ্গালার বহু অন্তঃপুরে পুরলক্ষ্মীরা এখনো কমল-কোমল হাতে ছুঁচ-সুতা লইয়া গৃহ-শিল্পকে রুচি কারুর দিক্ দিয়া সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, কোনো-না-কোনো রূপে প্রতি গৃহেই যে গৃহ-শিল্পের সাধনা চলিয়াছে, নিত্য ইহা চোখে দেখিয়াও আমরা তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি না বা এ-কাযে পুর-লক্ষ্মীদের উৎসাহ দিই না!

আমরা চাই, নিয়মিত বাঙ্গালার পুর-লক্ষ্মীদের কাছে সূচী-শিল্প সম্বন্ধে নব নব তথ্য জোগাইব, তাহার ফলে শিল্প-সাধনায় তাঁহারা প্রচুর সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন! সূচী-শিল্প-সাধনায় শুধু চিত্ত-বিনোদন হয় না; সংসারের বহু অপচয় নিবারিত হয়; বহু সঙ্কট নিরাকৃত হয়।

তাই 'মাসিক-বসুমতীতে' সূচী-শিল্প সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা ছাপা হইবে। কেহ হয়তো বলিবেন, বাজারে যখন রকমারি জামা-কাপড়, ব্লাউশ, পর্দ্দা, টেবল-ক্লথ প্রভৃতি দরকারী-অদরকারী সকল বস্তু পয়সা দিয়া কিনিতে পাওয়া যায়, তখন সূচী-শিল্প লইয়া মেয়েদের মাথা ঘামাইবার কি-বা প্রয়োজন!

এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, প্রয়োজন আছে। প্রথমত ললিত-কলা-বিভাগে সূচী-শিল্পের স্থান যে কাব্য-উপন্যাস ও চিত্র-শিল্পের নীচে নয়, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মেয়েরা সূচী-শিল্পে চিরদিন অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছেন।

বেশে-ভূষায় আজ আমরা পাশ্চাত্য বহু আদর্শ গ্রহণ করিতেছি। বেশে-ভূষায় শালীনতা রক্ষা এবং সৌন্দর্য্য বিধান করিয়া যদি সে আদর্শ আমাদের পুর-লক্ষ্মীরা গ্রহণ করেন, তবে তাহাতে অমর্য্যাদা বা অগৌরব নাই এবং দেশ তাহাতে রসাতলে যাইবে না! এজন্য আধুনিক শোভন রীতি-সমূহের সহিত পরিচয় এবং সে রীতির ব্লাউশ প্রভৃতির রচনা-প্রণালী আমরা নারী-মন্দিরে নিয়মিত ভাবে সংগ্রহ করিব। ধনীর গৃহে দর্জ্জীর বিল বাড়িলে কোনো ক্ষতি নাই,—তবু বিচিত্র এবং নিত্য-নব ফ্যাশনের জন্য দর্জ্জীর উপর নির্ভর করায় বিনোদ বেশে যে পূর্ণ তৃপ্তি, তাহা পাওয়া যায় না। দর্জ্জীরা যে-ফ্যাশন জোগাইবে, দায়ে পড়িয়া তাহা

ব্লাউশের ছাঁট

অঙ্গ-ধার্য্য করা ছাড়া উপায় থাকে না! কাযেই সূচী-শিল্পের সাধনা করিলে পছন্দমত নব নব রীতির ব্লাউশ ফ্রক রুমাল ওয়াড়, টেবল-ক্লথ প্রভৃতির রচনায় মনে আনন্দ ও গৃহের শোভা হইবে চতুর্গুণ! তাছাড়া গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা যদি সূচী-শিল্পে অনুরাগিণী হন, তাহা হইলে সামান্য অর্থ এবং পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বেশ ভূষার সখ অনায়াসে মিটাইতে পারিবেন। পুরলক্ষ্মীদের বেশ ভূষা প্রিয়জনের মনোরঞ্জনের জন্য; সুতরাং সূচী শিল্প-সাধনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে তাঁহারা নিজেরা প্রচুর তৃপ্তি

উলের ব্লাউশ

পাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনরাও আরাম-তৃপ্তি উপভোগ করিবেন।

সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে তখনি তাহা ফেলিয়া দিয়া নূতন জামা-কাপড় কিনিয়া আনিয়া ব্যবহার—এমন আর্থিক অবস্থা সকলের না থাকিতে পারে! এরূপ ক্ষেত্রে জামা-কাপড়ের সে জীর্ণতা যদি সূক্ষ্ম সেলাইয়ে জুড়িয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ভদ্র সমাজে সে জামা-কাপড় ব্যবহার করিয়া আরো কিছুকাল ইজ্জৎ বাঁচানো অনায়াসে চলে। পুরুষদের সার্টের ডবল-কাফের অগ্রভাগ অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়, অথচ সার্টের অপরাংশ অটুট থাকে, এ অবস্থায় ছেঁড়া কাফ্-সমেত সে সার্ট গায়ে দিয়া আপিস-আদালতে বা সমাজে বাহির হওয়া যায় না; কিন্তু সূচী-বিদ্যার কারিগরিতে যদি মেয়েরা সে কাফের ছেঁড়া বেমালুম ঢাকিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সে সার্ট গায়ে দিয়া মান-সম্ভ্রম বাঁচাইয়া আরো এক বৎসর কাল আমরা ভদ্র-সমাজে বিচরণ করিতে পারি।

মশারি, বালিশের ওয়াড়, লেপের ওয়াড়—এগুলা এখন বহু পরিবার বাজার হইতে কিনিয়া সংগ্রহ করেন। তাহাতে দাম পড়ে অনেক; অথচ মনের মত জিনিষ মেলে না! সদুপদেশ বা অর্ডার দিলেও বাজারের ফাঁকি ভেজাল আমরা বন্ধ করিতে পারিব না! সূচী-শিল্পে মেয়েদের অনভিজ্ঞতা এবং ঔদাস্য-বশতঃ মশারি, ওয়াড় প্রভৃতি বাজার হইতে কিনিয়া আমরা নানাদিক্ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হই। গৃহে গৃহে সূচী-শিল্পের সাধনা বাড়িলে এ অপব্যয় সহজেই নিবারিত হইবে।

বেশভূষায় সখ বা রুচি কোনো কালেই নিন্দার বিষয় নয়। বেশ-ভূষার প্রয়োজন আবরু-রক্ষা এবং সৌন্দর্য্য-সাধনের জন্য। যে বেশ-ভূষায় সম্ভ্রম-হানির আশঙ্কা নাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য! এ-যুগের মেয়েরা যদি আমাদের দিদিমা-ঠাকুমার আমোলের মামুলি ছাঁটের জ্যাকেট জামা পরিতে না চান, তবে তাহাতে নিন্দা নাই! পুরুষদের সাজ-পোষাকে যদি নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন চলিতে পারে, তাহা হইলে মেয়েদের বেলাতেই বা কেন না চলিবে? কোন্ বাঙ্গালী বাবু আজ গায়ে উড়ানি মাত্র জড়াইয়া এবং পায়ে চটি আঁটিয়া ভদ্র-সমাজে বাহির হন? পিরানও কেহ গায়ে দেন না! সাদা সুতি-কাপড়ের চোগা-চাপকানের উপর দড়ির মত পাকানো উড়ানি ছিল অফিসার-বাবুর বিনোদ বেশ—সে বেশ আজ কোথাও দেখিতে পাই না!

দেখিতে পাই না বলিয়া হা-হুতাশও করি না। কারণ, কালভেদে বেশে-ভূষায় মানুষের রুচিভেদ ঘটে। এ বিধি অলঙ্ঘ্য এবং অপরিহার্য্য। কাযেই আমাদের অন্তঃপুরকে যদি আজ আধুনিক রীতির শোভন বেশে সাজাইয়া তুলি তাহা হইলে কোনো ক্রমেই তাহা অনুচিত হইতে পারে না।

দশ-আনা বারো-আনা গজের রকমারি ভালো কাপড় এখন বাজারে অনেক পাওয়া যায় ফ্রক ও ব্লাউশের জন্য

মেয়েদের প্রমাণ-ব্লাউশে এক গজ বা সওয়া গজ কাপড় লাগে। এই কাপড় কিনিয়া যদি দর্জ্জীকে দিয়া আধুনিক রুচিসম্মত শোভন সুন্দর ফ্রক ব্লাউশ তৈয়ার করাই, তাহা হইলে দর্জ্জীর মজুরী পড়িবে দু'টাকা, আড়াই টাকা। কম-দামী কাপড়ের ব্লাউশের জন্য দর্জ্জীকে এত টাকা মজুরী দিতে গায়ে লাগে! সূচী-শিল্প জানা থাকিলে কাপড় কিনিয়া ঘরে বসিয়া রকমারি প্যাটার্ণ দেখিয়া যদি ব্লাউশ-ফ্রক তৈয়ার করি, তাহা হইলে ব্লাউশ-ফ্রক পছন্দ-মত হয়, অথচ অপব্যয় ঘটে না।

বিলাসিতা এবং সুরুচি—দুটা এক বস্তু নয়। বড়লোকের পক্ষে বিলাসিতা সাজে। কারণ, বড়লোকের পয়সার জোর আছে; সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বিলাসিতা করিতে গেলে টাকায় টান পড়ে। তাই গৃহস্থের পক্ষে বিলাসিতা সাংঘাতিক। দোকান হইতে অনেক টাকা দাম দিয়া রকমারি পোষাক কেনা চলে—কিন্তু সে পোষাকের গর্ব্ব যা-কিছু, তা তার চড়া দামে! সুরুচি ও শোভনতার দিক্ দিয়া হয়তো অনেক সময় সে পোষাক নিরেস হয়। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এত টাকা খরচ করিয়া ও-পোষাক সংগ্রহ করা কঠিন—হয়তো অসম্ভব! কিন্তু এ অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে যদি ঘরে বসিয়া সূচী-শিল্প-বিদ্যার জোরে সে-পোষাক মেয়েরা নিজের হাতে তৈয়ার করেন! এ সব বিচিত্র রীতির পোষাক তৈয়ার করিতে দর্জ্জীর মজুরি অনেক সময় কাপড়ের দামের চেয়ে বেশী হয়—এই জন্যই সজ্জা-বিলাস সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সহজ নয়। সূচী-বিদ্যা শিখিলে সজ্জা-বিলাসের আশা গৃহস্থের পক্ষে দুরাশার বস্তু হইবে না। অল্প খরচে যদি শোভন বেশ-ভূষার ব্যবস্থা করিতে পারি, সে ব্যবস্থা কেন না করিব?
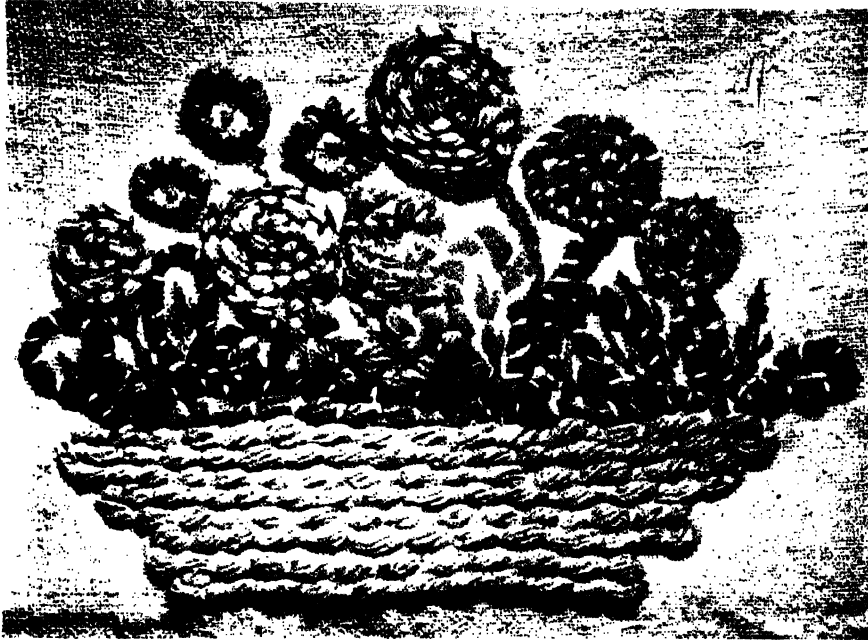
মোটা পশমে বোনা ফুলের সাজি

পরিচ্ছন্ন পরিপাটী করিয়া ঘর-দ্বার সাজাইয়া রাখায় লক্ষ্মীশ্রীর পরিচয় পাই। জানালায় শোভন পর্দ্দা ঝুলিতেছে, টেবিলের উপর সূতায় তোলা ফোটা ফুলের বাহার-করা আবরণ, বালিশের ওয়াড়গুলি ঝালরের দোলায় হাতের রচা রকমারি নক্সায় নয়নমনোহর, লেপের ওয়াড়ে বুটিদার কায—এ সবে গৃহ-বাস সুখশান্তিময় হয়। মানুষ সৌন্দর্য্য ভালোবাসে। ঘরে-দ্বারে যাহারা সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা শুধু দুর্ভাগা নয়, লক্ষ্মীছাড়া! এ সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইলে পরিশ্রম স্বীকার করা চাই। আলস্যে গা ঢালিয়া বসিয়া থাকিলে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রক্ষা করা যায় না—না দেহে, না বেশে-ভূষায়, না মনে।

অনেকে বলিবেন, সামান্য আয়! তাহাতে কুলায় না, কি করিয়া ঘরে-দ্বারে বেশে-ভূষায় সৌন্দর্য্য রক্ষা করিব? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যসাধনে

অর্থের তত প্রয়োজন নাই, যত প্রয়োজন সুরুচির এবং অনলসতার!

ছোট-খাট দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের কথা সকলে বুঝিবেন। দশ-বিশ বৎসর পূর্ব্বে ধনি-গৃহস্থ-দরিদ্র সকল ঘরেই দেখিয়াছি, শিশুর আগমন-সম্ভাবনা আসন্ন হইবা মাত্র বাড়ীর মেয়েরা অবসর-কালে বসিয়া ছেঁড়া কাপড় জড় করিয়া শিশুর ব্যবহারের জন্য কাঁথা-কানি রচনা করিতেন। সে সব কাঁথা-কানিতে তাঁহারা কত বিচিত্র রকমের নক্সা তুলিতেন! কাঁথার গায়ে সে-সব নক্সা মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিবার মত সামগ্রী ছিল। এ সব নক্সার কাজ করিতে তাঁহারা রেশম পশম বা ডি-এম-সির সুতা কিনিতেন না, ছেঁড়া কাপড়ের নানা রঙের পাড় ছিঁড়িয়া সেই পাড় হইতে বিচিত্র বর্ণের সুতা টানিয়া বাহির করিতেন; করিয়া সেই সুতায় রকমারি ফল-ফুল, লতা-পাতা, পাখী এবং বহু বিচিত্র চিত্র গড়িয়া তুলিতেন। সে নক্সায় প্রাণের অজস্র স্নেহ-প্রীতি যেমন উৎসারিত থাকিত, তেমনি তাঁদের সুকুমার রুচিজ্ঞানের পরিচয় জ্বলজ্বল্ করিত! আজ আমরা বাজারে ছুটি ছেলেমেয়েদের কাঁথা-কানি কিনিতে— সে কাঁথা-কানিতে না আছে কোনো বাহার, না কোনো বৈচিত্র্য!

গান-বাজনায় মেয়েরা আজ রেডিওর আসর মাতাইয়া তুলিতেছেন—সুরের রণাঙ্গনে সুরের লড়াই জিতিয়া মেডেল পাইতেছেন; তবু এই কাঁথা-কানি কেনার লজ্জা সে মেডেলে বা রেডিওর কলরবে ঢাকা পড়িবে না!

নিত্য দিনের ব্যবহারের মশারি—বিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ধনী ও গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা বাড়ীতে বসিয়া মাপ-মাফিক মশারি তৈয়ার করিয়াছেন। সে মশারির ঝালরে তাঁদের হাতে-বোনা লেশের যেমন রকমারি বাহার ফুটিত, সে মশারি তেমনি মজবুত হইত! সে মশারিতে খাট-পালঙের শোভা বাড়িত। বাজারে-কেনা মশারি সে মশারির পাশে ট্যানা বলিয়া মনে হয়! বিছানার চাদরে মুড়ি সেলাই দিয়া তাহাকে শোভন ও মজবুত করা—দু'তিন খানি মোটা কাপড় সেলাইয়ে জুড়িয়া প্রয়োজনানুরূপ দীর্ঘ চাদর করিয়া লওয়া—এ সব ছিল তাঁদের নিত্য দিনের কাজ! সূচী-শিল্পে তাঁদের ছিল যেমন নিষ্ঠা, তেমনি অনুরাগ। একালের অন্তঃপুরে সুর-সরস্বতীর আদর বাড়িয়াছে। খাইবার-পরিবার সংস্থান সম্বন্ধে যে গৃহে দুশ্চিন্তা সারা ক্ষণ প্রবল হইয়া আছে, সে গৃহেও দেখি মেয়েরা সিনেমা-গানের সাধনা করিতেছেন! করুন, ক্ষতি নাই। কিন্তু সে জন্য সূচী শিল্প-কলা-লক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করিবেন কেন? সুর-সরস্বতীর আসনের পাশে সূচী-শিল্প-কলা-লক্ষ্মীকে যদি আসন দেন, তাহা হইলে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপায় সংসার রমণীয় হইবে।
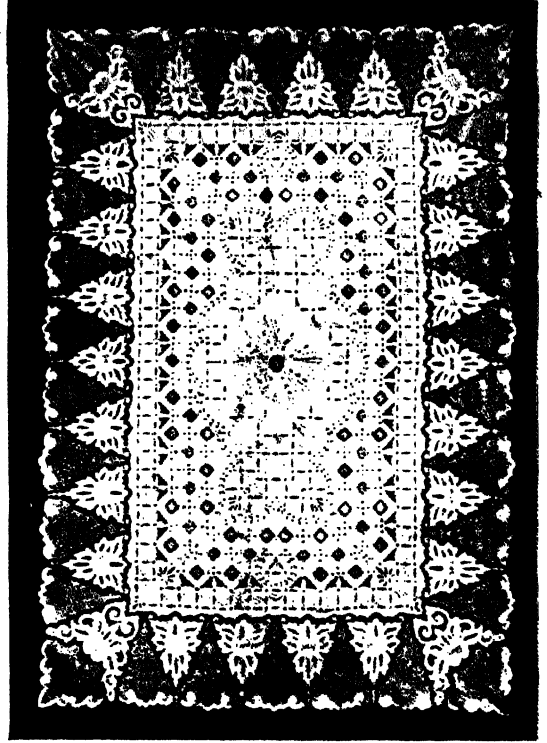
টেব্‌ল্ ক্লথ

শীতের দিনে ধনীর ঘরে পশমের জাম্পার, কার্ডিগান জ্যাকেট. মাফলার, স্কার্ফ প্রভৃতি দেখিয়া সাধারণ গৃহস্থের নিশ্বাস ফেলিবার কারণ নাই। বাজারে যে জাম্পার পনেরো-ষোল টাকায় বিকায়, পশম কিনিয়া আনিয়া বাড়ীর মেয়েরা যদি সে জাম্পার ঘরে বসিয়া তৈয়ার করেন, তাহা হইলে ব্যয় পড়িবে পাঁচ ছয় টাকা। শুধু ঐ পশমের দাম—প্যাটার্ণ দেখিয়া তাঁরা এমন

জাম্পার রচিতে পারিবেন, যাহার তুলনা বাজারে মিলিবে না।

আমরা চাই, বাঙ্গালার অন্তঃপুরে সূচীশিল্পের সমাদর হউক সকল দিকে। সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য ব্লাউশ ফ্রক সেমিজ পেটিকোট; সার্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া; মায় নরম কলার, রুমাল, ওয়াড়, টেবল-ক্লথ, পর্দ্দা প্রভৃতির কাযে মেয়েদের পটুতা সহজ এবং অনায়াস হউক—তাহাতে অন্তঃপুরের শোভা-সমৃদ্ধি বাড়িবে।

লেশের পর্দ্দা

শুধু তাহাই নহে—বাঙ্গালায় এমন বহু দুঃস্থ পরিবার আছেন, সংসারার্ণবে জীবন-তরীকে যাঁহারা সামাল দিতে পারেন না। সেই সব পরিবারের মেয়েরা ঘরে বসিয়া বিচিত্র সূচী-কায করিয়া হাতের তৈয়ারী রকমারি ছাঁদের ব্লাউশ সেমিজ ফ্রক ও জানলার পর্দ্দা প্রভৃতি যদি বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠান, তবে সে অর্থে সংসার সুশৃঙ্খল এবং মন নিরুদ্বেগ হইবে! বাজারের তৈয়ারী জিনিষের চেয়ে মেয়েদের ঘরে-তৈয়ারী জিনিষ অনেক বেশী আদর পাইবে—সন্দেহ নাই। কারণ, বাজারের জিনিষে ফাঁকি আছে; ভেজাল আছে। তা'ছাড়া তাহার ছাঁদে শ্রী বা কলা-কুশলতা কিম্বা বৈচিত্র্য থাকে না।

কার্পেটের উপর পশম দিয়া নানা রকমের চিত্র-রচনা—পশু-পক্ষী, নিসর্গ-দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া দেব-দেবীর চিত্র পর্য্যন্ত—এ কাযে বাঙ্গালার মেয়েদের আগ্রহ ও অনুরাগ চিরদিন প্রবল। সেকালে-একালে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে এই, একালের মেয়েদের মধ্যে অনেকে ড্রয়িং শিখিতেছেন; ড্রয়িং শেখার ফলে কার্পেটের ঘর গণিয়া পশম বুনিতে হয় না। ঘর গণিয়া কার্পেট বোনায় একটা মস্ত অসুবিধা ছিল এই যে, ছবির পশু-পক্ষীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ট্যারচা হইত, আঁকাবাঁকা হইত! এখন শুধু কার্পেট কেন—ভেলভেটে ছবির রেখা দাগিয়া চটের উপর বা মোটা সুতির কাপড়ের উপর পেন্সিল দিয়া ছবি আঁকিয়া তাহার উপর কাপড়ের সুতায় বা অন্য সুতায় মেয়েরা ছবি বুনিতেছেন। সেগুলা সত্যকার ছবি হইতেছে। চটের উপর সুতায়-তোলা ছবি দেখিয়া মনে হয়, অয়েলপেণ্টিং চিত্র! এ কারু-চিত্র দেখিয়া নয়ন মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

ভেলভেটের উপর জরির কায তোলা, বরের শয্যা-রচনা, ভেলভেটের ব্লাউশ-জ্যাকেটের উপরে জরির রকমারি নক্সা রচনা—এ-কাযেও বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের কৃতিত্ব অসাধারণ।

আমাদের ইচ্ছা আছে, সর্ব্ব রকমের সূচী-শিল্প সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে আলোচনা করিব। তাহাতে শুধু শিল্পসাধনা হইবে এমন নয়; অর্থ-সঙ্কটে হয়তো কিছু সমাধান মিলিবে।

আলোচনার মুখপাতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা আজ বলিয়া রাখি। সূচী-শিল্প কায করিবার সময় যেমন-তেমন ভাবে বসিলে চলিবে না; সেলাই করিবার জন্য বসিবার বিশিষ্ট ভঙ্গী মানিয়া চলিতে হইবে। তাহার পর যে সূচ-সুতা ব্যবহার করিবেন, সেগুলা যেন ভালো হয়। মরীচা-ধরা সূচ লইয়া কদাচ সেলাই করিবেন না। শস্তার তিন অবস্থা—এ কথা মনে রাখিয়া ভালো সূচ সংগ্রহ করিতে

হইবে। যেমন কায, সেই কাযের অনুরূপ স্চের আকার-প্রকার বাছিতে হইবে। আর একটা কথা মনে রাখিবেন,—সকল রকম সূচীকাযে লক্ষ্য রাখিবেন, সুতার চেয়ে স্চ যেন একটু মোটা (thicker) হয়! তাহা হইলে স্চের ছিদ্রপথে সুতা পরানোয় কষ্ট হইবে না। ছোট স্চে মোটা সুতা পরানো যদি বা সম্ভব হয়, সরু স্চে মোটা সুতা পরাইলে ঘর্ষণ লাগিয়া সুতা কম-মজবুত হইয়া পড়ে, সুতায় ফাঁশ পড়ে, আঁশ ওঠে; আরো বিবিধ উপসর্গ ঘটে। স্চের প্যাকেটে একসঙ্গে নানা আকারের স্চ থাকে। সোনামুখী স্চ সকলের সেরা।
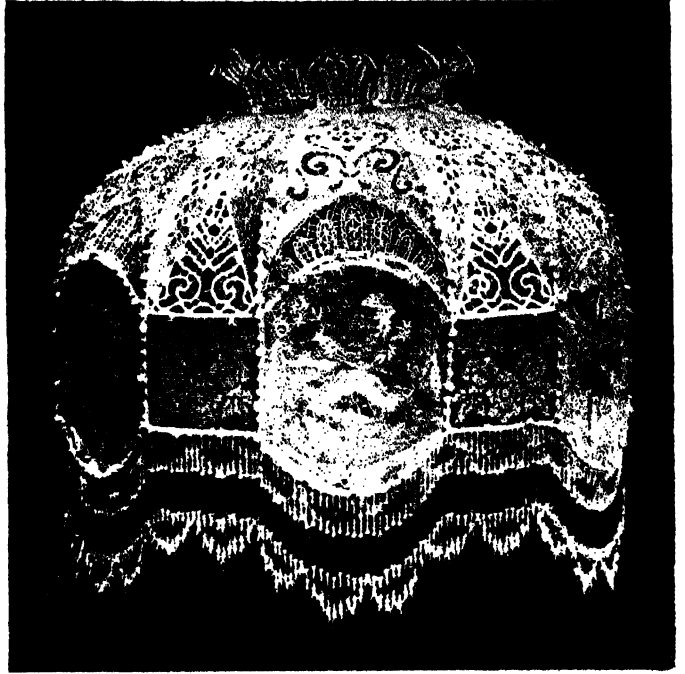
সেলাইয়ের পর স্চ রাখিয়া দবিার সময় স্চের প্যাকেটে পাউডার বা খড়ির গুঁড়া ছড়াইয়া দিবেন। ঘর্ম্মসিক্ত হাতে স্চ ধরিবেন না; ঘাম লাগিলে স্চ খারাপ হইয়া যায়। সেলাই করিতে বসিলে যদি হাত ঘামে, তাহা হইলে কাছে পাউডার বা খড়ির গুঁড়া রাখিবেন,—মাঝে মাঝে সে পাউডার আঙ্গুলে ঘষিয়া আঙ্গুলের ঘাম শুকাইয়া লইবেন। স্চে মরীচা ধরিলে গোল আলুতে সে স্চ বার কয়েক বিঁধিয়া লইলে-আলুর রস লাগিয়া সে মরীচা উঠিয়া যায়। মরীচা-ধরা স্চে সেলাই করিলে কাপড়ে দাগ ধরিবে এবং দাগ-ধরা সে-অংশ ছিঁড়িয়া যাইবে।

সেলাই করিবার সময়ে কাঁচি রাখা চাই দু'খানি। একখানি বড় ও মোটা; অপরখানি ছোট ও সরু। আঙ্গুলে আঙ্‌ট্রা আঁটিতে পারিলে ভালো হয়। নহিলে স্চের ফোঁড় দিতে দিতে আঙ্গুলে আঘাত লাগিবে, আঙ্গুলে ব্যথা হইবে।

শস্তা বাজে সুতা কদাচ ব্যবহার করিবেন না। এ বিষয়ে কার্পণ্য করিলে পরে অনুতাপ করিবেন।

আর একটি কথা—সেলাইয়ের কাপড় কদাচ টানিয়া ছিঁড়িবেন না; কাঁচি দিয়া প্রয়োজনমত কাটিয়া লইবেন। টানিয়া ছিঁড়িলে ধার বেমানান হইবে, বাঁকিয়া যাইতে পারে। এবং সব চেয়ে বড় কথা, কাপড়ের জোর কমিয়া বে-মজবুত্ হইবে। Cotton or cloth or silk should be cut rather than broken, as breaking would always weaken cotton or cloth or silk—বিশেষজ্ঞরা এ উপদেশটি সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিতে বলিয়াছেন।

ল্যাম্পের লেশ্-দার্ শেড্

পদ-লালিত্য

আমাদের দেশে মেয়েদের মুখ চিরদিন থাকিত ঘোমটায় ঢাকা; বধূ-নির্ব্বাচনের সময়ে লোকে মেয়ের মুখ ও রূপশ্রীর যেমন বিচার করিত, মেয়ের পায়ের গড়ন ভালো কি না অর্থাৎ পদলালিত্য কেমন, তাহাও বিশেষ মনোযোগে পরখ করিয়া লইত। তাহার কারণ, ঘরের বৌ চলিবে-ফিরিবে, ঘোমটার আড়ালে মুখখানি কেমন, বাহিরের লোকে তো তাহা দেখিবে না—তাহারা দেখিবে পা! পায়ের শোভার অর্থ যদি এদেশের লোক না বুঝিত, তাহা হইলে চরণ-কমলের উপমা কোনো কালে কোনো কবি কাব্যে লিখিতেন না!

রমণীর রূপ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবিরা রমণীর মুখকে বলিয়াছেন মুখপদ্ম, এবং চরণকে বলিয়াছেন চরণ-পদ্ম! অর্থাৎ পদ্মের মাধুরী যেমন নয়ন-মনের তৃপ্তিকর, নারীর সুন্দর মুখ এবং সুছাঁদে গঠিত চরণ দেখিয়া পুরুষ সমান তৃপ্তি পায়।

পূর্ব্বে আমরা চরণ-পদ্মের মনোরম বিকাশ-পদ্ধতির কথা বলিয়াছি, আজ আর একটি নূতন পদ্ধতির কথা বলিতেছি। তাহার কারণ, বিশেষজ্ঞরা বলেন, Legs really have personality. They give either a good or bad impression to the observer. পায়ের গঠন দেখিয়া ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। পা দেখিলে আমাদের মনে প্রীতি বা বিরাগের সঞ্চার হয়! বেঁটে খাটো বা মোটা পা দেখিলে যেমন চোখ করকর করে, তেমনি কটু লাগে পাঁকাঠির মত লিক্‌লিকে বেছাঁদের সরু পা! তাহার উপর পা দু'খানিকে সারা দেহের ভার বহিতে হয়; পা যদি ভালো না হয়, দেহের ছাঁদও সেই সঙ্গে বিগড়াইবে। এ যুগের ফিল্ম-ডাইরেক্টরের দল ছবির জন্য নায়িকা বাছিতে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে দেখেন নায়িকার পায়ের গড়ন এবং তার চোখ দুটি কেমন—An actress's legs and eyes are her most important assets.

অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত আমাদের পায়ের গঠনে পরিবর্ত্তন ঘটে। পায়ের ব্যায়াম বন্ধ রাখিলে পায়ের পেশী দুর্ব্বল হয়, রুগ্ন হয়; একটু পরিশ্রমে পা ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পায়ের পানে নজর রাখিয়া যদি পায়ের পরিচর্য্যা করি, তাহা হইলে প্রৌঢ়ত্বকে দীর্ঘকাল ফাঁকি দিয়া অঙ্গে অঙ্গে স্বাস্থ্য এবং যৌবনশ্রী বাঁধিয়া রাখিতে পারিব!

যে-সব মেয়ে নৃত্যলীলা করেন, তাঁহাদের পায়ের গঠন সুশ্রী থাকে। এদেশে গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা নাচিয়া পায়ের স্বাস্থ্য এবং শ্রী ভালো রাখিবেন, এ কথা বলা চলে না। সাঁতার কাটাও সহজ ব্যাপার নয়! কাযেই সিঁড়ি ভাঙ্গা এবং ছাদে বা মাঠে হাওয়া খাইতে যাওয়া ভিন্ন একালে মেয়েদের পায়ের পরিচর্য্যার পক্ষে অন্য কি উপায়ই বা আছে!

শুধু মেয়েদের পা বলিয়া নয়, পুরুষের মধ্যেও ক'জনের পায়ের গড়ন সুছাঁদের? কিন্তু পুরুষ মানুষের কথা ছাড়িয়া দিই। ব্যায়াম করিবার পক্ষে তাঁহাদের লক্ষ উপায় আছে—মেয়েদের সে উপায় নাই। তাহার কারণ, লজ্জাই আমাদের নারীর ভূষণ এবং দেশের কোন-কোন গৃহে প্রগতির বাতাস বহিলেও শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালীর মেয়ে প্রগতির মোহে ভুলিয়া পায়ের শ্রীসাধনার উদ্দেশ্যে ষ্টেজে চড়িয়া নাচিতে কিম্বা কষ্টুম আঁটিয়া গোলদীঘিতে সাঁতার কাটিতে পারিবেন না! তাই তাঁহাদের পদ লালিত্য-সাধনের সহজ উপায়—ব্যায়ামের যে নেপথ্য-সাধনা সম্ভব, তাহারি কথা বলিয়া এদিকে তাঁহাদিগকে সচেতন করিতেছি।

একটা কথা মেয়েরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন,—ওঠা-বসা এবং চলা-ফেরার ভঙ্গীর উপরে পায়ের শ্রী-ছাঁদ অনেকখানি নির্ভর করে। উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে পায়ের শ্রী কোথায় ভালো থাকে, কোথায় থাকে না, সে বিষয়ে নির্বিকার থাকিলে চলিবে না। A correct walking stride will make the legs graceful. সিধাভাবে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতে হইবে—পায়ের ও জঘনের গতি বা স্পন্দন যেন এক-তালে বাঁধা থাকে। গজেন্দ্রগামিনী বলিয়া একটা কথা নারী-সমাজে গৌরবের সহিত উল্লিখিত হয়। গজেন্দ্র-গতির অর্থ হাতীর মত থপ্‌থপে চলন নয়। তার অর্থ, হাতী যেমন দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে, তেমনি ভাবে চলা। হুঁশিয়ার ভাবে চলিলে ফিরিলে শুধু পা নয়, সারা দেহ সুছাঁদে গড়িয়া উঠিবে—এ সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় নাই। Good posture and trim legs go hand in hand.

চেয়ারে, পালঙ্কে বা তক্তাপোষে বসিবার সময় এক পা মুড়িয়া অন্য পা ঝুলাইয়া বসা কদাচ উচিত নয়। বসিবার সময় পায়ে যদি ঝিঞ্জিনি ধরিবার জো হয়, তাহা হইলে বুঝিবেন, বসায় দোষ হইয়াছে। কোনো দিকে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না হয়, এমন ভাবে বসিবেন। একভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতে যদি ক্লান্তি বোধ করেন, তাহা হইলে উঠিয়া দাঁড়ান—হাত পা ছড়াইয়া সে ক্লান্তি মোচন করুন। কুঁকড়ি-শুঁকড়ি ভাবে বা দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কিম্বা উবু হইয়া বসিবেন না। তাহাতে পায়ের হাড় সরু হয়, হাঁটুতে ঝিঁক ওঠে। আসন-পিঁড়ি হইয়া বসা সব-চেয়ে ভালো।

পায়ের গড়ন ভালো কি মন্দ, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে ঠিক-মাপের খুব মিহি রেশমী মোজা পায়ে দিন; পায়ে যদি মোজার কোন অংশ কুঁচকাইয়া না থাকে তবে বুঝিবেন, পায়ের গঠনে দোষ নাই—আর যদি মোজায়

মাঝে মাঝে কোঁচ পড়ে দেখেন, তাহা হইলে জানিবেন, পায়ের গড়ন ঠিক নয়!

বিলাতের মত আমাদের দেশে আজ দেখি, মেয়েরা প্রসাধন-কালে শুধু মুখশ্রী-বিকাশের জন্যই প্রাণপাত পরিশ্রম করেন; পায়ের দিকে এতটুকু দৃষ্টি নাই! তার ফলে এ যুগের যে-সব মেয়েকে পথে-ঘাটে দেখিতে পাই, তাঁহাদের পায়ের পানে চাহিলে লজ্জা হয়! অথচ পায়ের পরিচর্য্যায় ক্রীমক্রীম-পাউডারের কোনো প্রয়োজন নাই! প্রয়োজন শুধু একটু সহজ ব্যায়াম-লীলার। বাঙ্গালীর মেয়ের পায়ের শোভা-মাধুরীর বিকাশ চিরদিন ছিল অলক্ত-রাগে—তখন পায়ের পরিচর্য্যা চলিত। এখন চলে না। তাছাড়া এখন পায়ে জুতা আঁটিতে হয় নানা কারণে। সেই ব্যায়াম-লীলার কথা বলিতেছি।

১। উরু ও হাঁটুর সৌষ্ঠব-সাধনের জন্য,—১ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে দু'পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া সামনের দিকে হাঁটু ঝুঁকাইয়া উঁচু হইয়া বসিতে হইবে। দু'হাত দু' পায়ের হাঁটুর পাশ ছুঁইয়া মেঝেয় চেটো পাতিয়া রাখিতে হইবে। দু' হাত থাকিবে সামনা-সামনি—দু' হাতের মধ্যে ফাঁক থাকা চাই। (১নং ছবিতে বসিবার ভঙ্গী দেখুন)। এই ভাবে বসিয়া হাত একেবারে না তুলিয়া, না নাড়িয়া হাঁটু হইতে দেহের উপর-অংশ সামনে-পিছনে ধীরে ধীরে দুলান। দশ-বারো বার দুলাইতে হইবে।

১নং চিত্র—দু'পায়ের আঙ্গুলে ভর

২। পায়ের পেশী সবল করিবার জন্য—কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনে হেলাইয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান। দু'পায়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে। দাঁড়াইয়া দু'হাত সিধা বিলম্বিত করিয়া দু'পায়ের গোছ ধরিবেন। (২নং ছবি দেখুন)। এবার দু' হাত দিয়া পায়ের গোছ হইতে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ঘষিবেন; তৈল মর্দ্দন বা মালিশ করিবার ভঙ্গীতে ঘষিতে হইবে। দশবার হাঁটুর উপর হইতে গোছ পর্য্যন্ত এবং গোছ হইতে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিতে হইবে।

২নং চিত্র দু'পায়ের গোছ

তার পর ৩ এবং ৪নং ব্যায়াম-লীলার কথা বলি।

এ দুটি ব্যায়ামে উরু, হাঁটু এবং পায়ের চেটোর সর্ব্বরকম অস্বাস্থ্য ও বিকৃতি ঘুচিবে

৩। বাঁ-কাতে বাঁ হাতে দেহের ভর রাখিয়া হেলিয়া আধশোয়া ভাবে থাকুন। এবার ডান হাতে ডান পায়ের চেটো চাপিয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলুন—তুলিয়া ডান পা ঊর্দ্ধে

৩নং চিত্র—বাঁ-কাতে

৪নং চিত্র—ডান পা সিধা
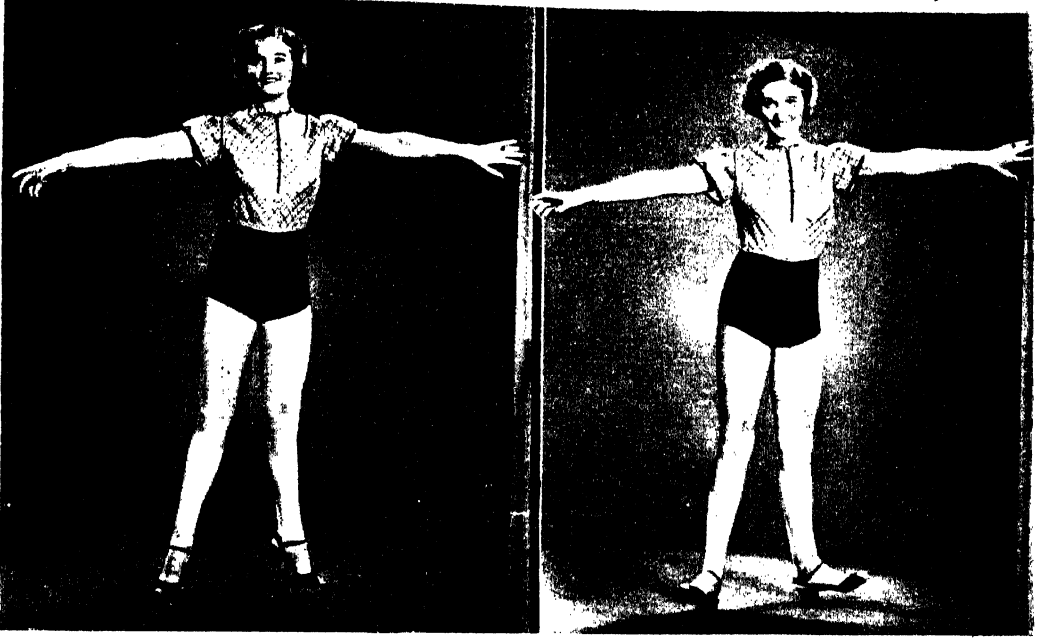
৫নং চিত্র—পায়ের আঙ্গুলে ভর

৬নং চিত্র—গোড়ালিতে ভর

রাখিয়া সামনে-পিছনে চক্রাকারে জোরে জোরে দুলান। এ সময়ে বাঁ পা থাকিবে সিধা শক্ত। (৩ নং ছবি দেখুন) আট দশবার ঘুরাইবার পর ডান কাতে ডান হাতের উপর দেহের ভর রাখিয়া বাঁ হাতে বাঁ পায়ের চেটো ধরিবেন। এ ব্যায়াম করিবেন দশবার।

৪। পূর্ব্বোক্তভাবে ৩ নম্বর ব্যায়াম শেষ করিয়া ডান পা সিধা খাড়াভাবে উর্দ্ধে তুলুন। তুলিয়া ডান হাতে ডান পায়ের চেটো ধরিয়া দশবার দুপাশে নাড়ুন। এ সময় ডান এবং বাঁ হাটু উভয়ই কঠিন ভাবে রাখা চাই (৪ নং ছবি দেখুন)। পরে ডান পা নামাইয়া বাঁ পা লইয়া উক্ত ব্যায়ামের পুনরাবৃত্তি করা চাই।

৭নং চিত্র—চেয়ারে বসিয়া

৫ ও ৬। পায়ের ডিম ও সমগ্র পায়ের স্বাস্থ্য ও গঠন-কল্পে সিধা খাড়াভাবে দাঁড়ান। দু'পায়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিবে অন্ততঃ ষোল ইঞ্চি। এবার দু'পায়ের আঙ্গুলগুলির উপর মাত্র ভর রাখিয়া দেহকে উর্দ্ধে তুলুন। এইভাবে পাঁচ ছ সেকেণ্ড খাড়া দাঁড়াইয়া থাকুন; তার পর পায়ের আঙ্গুল ভূমে ঠেকাইয়া সারা দেহের ভার গোড়ালির উপর রাখিয়া দাঁড়ান। এভাবে পাঁচ সেকেণ্ড দাঁড়াইতে হইবে। পায়ের আঙ্গুলের উপর এবং গোড়ালির উপর যখন দাঁড়াইবেন, তখন দু'হাত কাঁধের সঙ্গে সমরেখায় রাখিয়া যথাসাধ্য দুই দিকে

৮নং চিত্র—ডান পায়ের হাঁটু মুড়িয়া

প্রসারিত করিবেন। (৫ ও ৬ নং ছবি দেখুন)। এই ছুটি ব্যায়াম পর্য্যায়ক্রমে আট-দশবার করিতে হইবে।

৭। এবার একখানি চেয়ার আনিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া, সামনে আর একখানি চেয়ার আনিয়া দ্বিতীয় চেয়ারের উপর দু'পা প্রসারিত রাখুন। এবং কঠিন ভাবে বসিয়া থাকিয়া শুধু দু পায়ের তলদেশ দুলাইয়া ঘুরাইয়া দু'পায়ের আঙ্গুলে-আঙ্গুলে ঠেকান্। দু'পায়ের আঙ্গুলে আঙ্গুলে ঠেকাইয়া পরক্ষণে দু'পায়ের আঙ্গুল দু'দিকে আলাদা ভাবে বাঁকান্ (৭ নং ছবির ভঙ্গীতে)। এ ব্যায়াম করিবেন দশ-বারো বার।

৮। আবার উঠিয়া দাঁড়ান দু'পায়ের মধ্যে ঠেকাঠেকি হয় না—ব্যবধান থাকিবে। ডান পায়ের হাঁটু মুড়িয়া পায়ের চেটো তুলিয়া ডান হাতে ধরুন ; ধরিয়া ডান পায়ের আঙ্গুল-গুলি ধরিয়া তলদেশ স্পর্শ করুন। স্পর্শান্তে ধীরে ধীরে ডান পা ছাড়িয়া দিবেন। পরের বারে বাঁ পায়ের চেটো অনুরূপ ভঙ্গীতে তুলিয়া বাঁ হাতে ধরিয়া বাঁ দিক্‌কার জঘনদেশ স্পর্শ করুন। পর পর এ ব্যায়াম করিবেন দশবার। ব্যায়ামের সময় যে হাত মুক্ত থাকিবে, সে হাত ৮ নম্বর ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত রাখিতে হইবে।

এই কয়টি প্রণালীতে ব্যায়াম করিলে পদ-লালিত্য মনোরম হইবে, সারা দেহের গঠন সুঠাম হইবে।

ভগবান

জানি আমি জানি ঠিক আমাদের ভগবান্ নেই !
তবু ভুলে ডেকে ফেলি হারালেই জীবনের খেই।
ভাবি মনে ভগবান্
গাহিব না তব গান।
শুধু তুমি দিতে জানো নির্ম্মম আঘাত, দিতে জানো ব্যথা ;
যা ক'র তা বোঝ নাকো নিজে, তাই তুমি 'ধ্বংসের দেবতা !'

অতীতে যে ছিল জুড়ে, আপনার প্রতি কাষ দিয়ে।
কোন্ প্রয়োজন তব হ'ল সারা তারে কেড়ে নিয়ে ?
মুখর যাহার গানে,
আজ তুমি তার স্থানে,
কে আছে সে যোগ্যতম বসাইয়া দেবে তারে মান ?
কাল পুনঃ তারে নিয়ে, হে পাষাণ, অন্যে তুমি করে যাবে দান !

তোমার দয়ার দান চাহি নাকো চাহি নাকো তব কেড়ে নেওয়া,
তোমার শক্তিতে মম নাহিকো সংশয়, যা কিছু সকলি তব দেওয়া।
সকলি দেওয়ার পরে,
শুধু ধ্বংসের তরে
তোমারে থাকিতে নাহি হবে ভগবান্, জীবনে আমার ;
সৃজনের প্রয়োজন ছিলো নাকো কিছু, যদি তুমি করিবে সংহার !

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
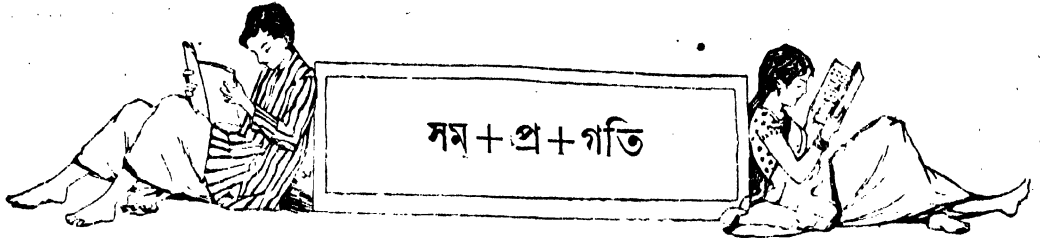
১

বালিগঞ্জ লেক্ রোডের ধারে একখানি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা। ফটকের মধ্যে দুই ধারে ফুল-বাগান, মাঝে সান-বাঁধান পথ, পথটি একটি গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অট্টালিকার নিম্ন-তলে এক সুবৃহৎ কক্ষে, নানা বয়সের আট-দশটি ভদ্রমহিলা বহু মূল্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, কেহ চেয়ারে, কেহ কৌচে বসিয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময় আর একটি প্রৌঢ়া মহিলা সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামিনীকে বলিলেন, "নমস্কার, মিসেস্ সরকার! তাঁরা এখনও আসেন নি? আমি মনে করেছিলাম, তাঁরা হয়তো এতক্ষণে এসে পড়েছেন! আমার আসতে একটু লেট্ হয়েছে।"

গৃহস্বামিনী মিসেস সরকার প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"তাঁরা ঠিক সন্ধ্যার সময় আসবেন বলেছেন। আজ কোর্টে মিসেস্ তরফদারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বল্লেন, তাঁরা সাড়ে পাঁচটার পূর্ব্বে আসতে পারবেন না, সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে আসবেন, বলেছেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বীয় রিষ্টওয়াচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পাঁচটা বাইশ মিনিট। শীতকালের বেলা, সাড়ে পাঁচটাতেই সন্ধ্যা।"

অভ্যাগতা মিসেস্ বিজলীহাসিনী মুখার্জ্জী রুমালে মুখ মুছিয়া পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং সিগারেটের ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। মিসেস্ অশোকা মজুমদার মিসেস্ মুখার্জ্জীকে বলিলেন, "ভাল কথা, আজ সেই abduction caseটার রায় দেবার কথা ছিল না?"

মিসেস্ মুখার্জ্জী বলিলেন, "হাঁ, আজ রায় দিয়েছি। প্রধান আসামী বেহুলা বাগ্দিনীর তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। আর দুজন আসামী রেবতী দুলেনী আর মনসা মণ্ডল খালাস পেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ ছিল না। জুরিরাও এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন। আমার ইচ্ছা ছিল, রেবতী দুলেনীকেও অন্ততঃ বছর খানেক ঠেলে দি, কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রমাণের জোর ছিল না।" এই বলিয়া গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।
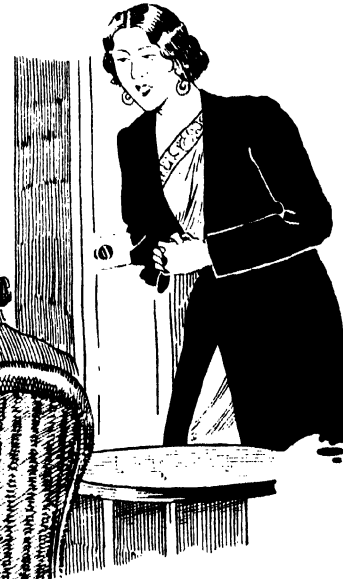
"নমস্কার, মিসেস্ সরকার! তাঁরা এখনও আসেন নি?"

অধ্যাপক রমা মজুমদার বলিলেন, "কেসটা কি? আমি কাগজে পড়েছি বলে ত মনে হচ্ছে না।"

মিসেস্ মুখার্জ্জী বলিলেন, "অর্ডিনারি সেসন্স কেস। মজিলপুরের হরিনাথ বোসের বাইশ বছরের ছেলে

রামনাথকে আসামীরা ষড়যন্ত্র করে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে তার শ্লীলতাহানি করে। বেহুলা বাগ্দিনী বোসেদের বাড়ীতে চাকরি করতো, সে তার ছোট ভায়ের অসুখ করেছে ব'লে রামনাথকে নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে রেবতী আর মনসা এসে তার সঙ্গে যোগ দেয়। ছেলেটা নিতান্ত ভালো মানুষ, তাই সে বেহুলার কথায় বিশ্বাস ক'রে তার বাড়ীতে যায়। বেহুলা রামনাথকে ভাঙ্গড়ে নিয়ে গিয়ে একটা পোড়ো বাড়ীতে প্রায় এক সপ্তাহ লুকিয়ে রাখে। পুলিস সেখান থেকে রামনাথকে উদ্ধার করে আর বেহুলাকে গ্রেপ্তার করে। রামনাথ রেবতী আর মনসার নাম করেছিল ব'লে তাদেরও আসামী করা হয়। কিন্তু এক রামনাথের কথা ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি। ঐ রেবতী বেটী দাগী আসামী, বছর কতক আগে এই রকম একটা মামলায় আঠার মাস জেল খাটে। তবে এ কেসটায় তাকে জড়াবার মত বিশেষ প্রমাণ না থাকাতে তাকে ছেড়ে দিতে হলো। বেটী ভারী ধড়িবাজ।"

মিসেস্ শঙ্করী চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "পূর্ব্বে এই সকল যুবক-হরণের কথা কালে-ভদ্রে শোনা যেত, কিন্তু আজকাল এ পাপটা বড়ই বেড়েছে ব'লে মনে হয়! যে কোন খবরের কাগজ খুললেই যুবক-হরণের দুটো পাঁচটা খবর পাওয়া যাবেই—এর প্রতিকার কি?"

মিস্ মহিষমর্দ্দিনী গুপ্তা বলিলেন, "বাঙ্গলায় পুরুষরা ব্যায়াম-চর্চ্চা ক'রে যত দিন পর্য্যন্ত এই সব নারী-পশুর আক্রমণ থেকে আত্মসম্ভ্রম-রক্ষায় সামর্থ্য লাভ না করবে, ততদিন এ পাপের প্রতিকার অসম্ভব। প্রত্যেক গ্রামে যুবক-রক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা ক'রে যুবক আর বালকদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে হবে। হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। যুবকরা আত্মরক্ষা করবার উদাহরণ দিতে আরম্ভ ক'রেছে। সে দিন কোন্ কাগজে দেখলেম, ফরিদপুরে বুঝি, এক ভদ্রলোকের ছেলে সন্ধ্যার পর গ্রামান্তর থেকে নিজগ্রামে আসছিল, এমন সময় পথে তিনচার জন মেয়েমানুষ হঠাৎ তাকে ঘিরে ফেলে। যুবকটি তাতে ভয় না পেয়ে, মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই চারটে মেয়ে-মানুষের নাকে এমন চারটে ঘুসি বসিয়ে দিলে যে, দুজন সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল, বাকি দু'জন রক্তমাখা ভাঙ্গা-নাকে হাত চাপা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "Bravo! এই ত চাই। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যখন এই রকম বীর যুবকের আবির্ভাব হবে, তখনই এ পাপের প্রতিকার হবে।"

এমন সময় বাহিরে মোটর গাড়ীর হর্ণের শব্দ শুনিয়া মিসেস্ সরকার তাড়াতাড়ি উঠিলেন, বলিলেন, "আপনারা আমাকে একটু ক্ষমা কর্ব্বেন—বোধ হয় ওঁরা এলেন। আমি রিসিভ ক'রে আনিগে" এই কথা বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মুহূর্ত্ত-কাল পরে তিনটি ভদ্র মহিলাকে সঙ্গে লইয়া কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

মিসেস্ সরকার

অভ্যাগতা দিগকে দেখিয়া সমাগতা মহিলা-মণ্ডলী দণ্ডায়-মান হইয়া নমস্কার করিলেন। অভ্যাগতারাও প্রতিনমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মিসেস্ সরকার তাঁহাদের কাছে সিগারেট-কেসটা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, "আসুন, আপনাদের পরস্পরের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিই। মিসেস্ মুখার্জ্জি, ইনি আমার পুত্রের ভাবী জীবনসঙ্গিনী মিস্ আইভি দত্ত। মিস্ দত্ত, ইনি মিস্ মুখার্জ্জি আই-সি এস, আলিপুরের সেসন্স জজ। ইনি অধ্যাপক রমা মজুমদার, প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাথিমেটিক্সএর প্রোফেসর, ইনি মিস্ মহিষমর্দ্দিনী গুপ্তা Director of Physical Culture. ইনি মিসেস্ গুপ্তা ব্যারিষ্টার, ইনি মিসেস্

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি এম, ডি, মেডিকেল কলেজের এনাটমির প্রফেসর।" এইরূপে সমাগতা ও অভ্যাগতাদের পরস্পরের সহিত আলাপ করাইয়া দিয়া মিসেস্ সরকার বলিলেন, "আপনারা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করুন, আমি এক মিনিট পরে আসছি।" বলিয়া তিনি কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

২

মিসেস্ সরকার প্রস্থান করিলে মিসেস্ মুখার্জ্জি আইভিকে বলিলেন, "মিস্ দত্ত, আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুস পরিচয়

"মিস্ দত্ত, এই আমার ছেলে নলিনী।"

না থাকলেও বিলাতে অনেকের কাছে আমি আপনার অনেক গল্প শুনেছি। গতপূর্ব্ব বৎসর আমি ছ'মাসের ফার্লো নিয়ে আমার জীবন-সঙ্গীকে সঙ্গে ক'রে যখন ইউরোপে বেড়াতে যাই, তখন বোধ হয় একখানা জার্ম্মেণ কাগজে দেখেছিলেম যে, আপনি একা একটা এরোপ্লেন নিয়ে টোকিও থেকে সাইবিরিয়ার উপর দিয়ে মস্কো পর্য্যন্ত উড়ে দ্রুতগতিতে রেকর্ড ব্রেক করেছিলেন। আপনি আর একবার ভিয়েনা থেকে বেরিয়ে আকাশপথে আল্‌স্ পার হয়ে মরোক্কোতে গিয়েছিলেন না?"

মিস্ দত্ত সিগারেটটা দাঁতে চাপিয়া বলিলেন, "আল্পস্ পর্ব্বতের উপর দিয়ে আমি তিনবার একলা উড়ে গেছি। একবার ভিয়েনা থেকে মরোক্কো যাবার সময়, দ্বিতীয় বার ভিনিস থেকে মাড্রিড যাবার সময়, আর একবার পারিস থেকে মস্কো যাবার সময়। ইউরোপ আর আফ্রিকার অধিকাংশ দেশেই আকাশে উড়ে বেড়িয়েছি।"

মিস্ মহিষমর্দ্দিনী গুপ্তা বলিলেন, "মিস্ দত্ত, আপনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন?"

মিস্ দত্ত বলিলেন, "আমেরিকাতে তিন বৎসর কাটিয়েছি। তবে দক্ষিণ-আমেরিকার সব দেশে এখনও যাওয়া হয় নি। ইচ্ছে আছে, এইবার একবার দক্ষিণ-আমেরিকাটা ঘুরে আসব। মিষ্টার সরকারের যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে দক্ষিণ-আমেরিকাতেই হনিমুনটা কাটিয়ে আসব।"

এই সময় মিসেস্ সরকার একটি সুশ্রী যুবকের হাত ধরিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মিস্ দত্তকে বলিলেন, "মিস্ দত্ত, এটি আমার ছেলে নলিনী। নলিনী, ইনিই মিস্ দত্ত।"

জননীর কথা শুনিয়া নলিনী হাসিমুখে মিস্ দত্তর দিকে অগ্রসর হইলে মিস্ দত্ত সহাস্থে গাত্রোত্থান করিয়া নলিনীমোহনের সহিত সেকহ্যাণ্ড করিলেন ও তাহার হাত ধরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "মিষ্টার সরকার, আপনার

সঙ্গে আমার পূর্ব্বে আলাপ-পরিচয় ছিল না। আপনার মায়ের ইচ্ছা যে, আপনাকে আমার জীবন-সঙ্গী করি। আমি কোর্টশিপের পক্ষপাতী নই। ঠেকে শিখেছি। তাই আমি স্থির করেছি যে, কোর্টশিপ না ক'রে যদি কেউ আমার চিরসাথী হ'তে প্রস্তুত থাকেন, তা হলেই আমি তাঁকে বিবাহ করব। আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত আছেন ?"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "ওর আবার সম্মতি-অসম্মতি কি? ও কি বোঝে? আমরা ওর গার্জ্জেন, আমরা যা ব্যবস্থা ক'রব, ও কি তাতে আপত্তি করতে পারে?"

নলিনী বলিলেন, "কিন্তু পরে যদি আমাদের বনিবনা না হয়?"

মিস্ দত্ত বলিলেন, "এই বিশাল পৃথিবীতে কি তা'হলে দুজন মানুষের পৃথক্ ভাবে বাস করবার স্থান হবে না? যদি আমাদের বনিবনা নাই হয়, তা'হলে আপনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে অনায়াসে অন্য কোন শিক্ষিতা মহিলার জীবন সঙ্গী হ'তে পারবেন, তাতে আমার আপত্তি হবে না।"

অধ্যাপক রমা মজুমদার বলিলেন, "মিস্ দত্ত, আপনি যে বল্লেন, আপনি কোর্টশিপের পক্ষপাতী নন্, ঠেকে শিখেছেন, তার মানে কি?"

"মানে কিছুই নয়। প্রকৃত ঘটনা। আমি তিনবার তিনটি যুবকের সঙ্গে কোর্টশিপ করেছিলেম। প্রথমে কোর্টশিপ হয় ইটালীর এক কাউণ্টের ছেলের সঙ্গে। ছোকরা মন্দ ছিল না, তার সঙ্গে প্রায় ছমাস কোর্টশিপের পর বুঝতে পারলেম যে, সে আমাকে ভালবাসায় বাঁধতে চায়। তার ইচ্ছা যে, আমি তার স্ত্রী হয়ে বারোমাস তাকে নিয়ে ইটালীতেই বাস করি। সে আমাকে ভাল বাসুক, তাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু বাঁধা ধরার মধ্যে থাকতে আমি রাজি নই। দ্বিতীয় বার কোর্টশিপ হয় জার্ম্মাণীর এক মার্চ্চেণ্টের সঙ্গে, তার অগাধ বিষয়, কিন্তু লোকটা ভারী গোঁয়ার-গোবিন্দ; সে চায়, তার সব কথাতেই আমি সায় দিয়ে যাব। তাই মাস তিনেক তার সঙ্গে কোর্টশিপ ক'রে তাকে ছেড়ে দিলেম। তার পর গত বৎসর, মিশরে এক পাশার সঙ্গে কোর্টশিপ করি। সে ছিল মিশরের বিমান-বাহিনীর একজন সেনাপতি। আমিও উড়ে বেড়াই, সেও উড়ে বেড়ায়, বেশ ভাব হয়েছিল, কিন্তু প্রায় চার মাস একসঙ্গে বাস করবার পর দেখলেম, লোকটার ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেজায় গোঁড়ামি। বল্লে, আমি মুসলমান না হ'লে আমাকে বিবাহ করবে না। আমি তাই সে কোর্টশিপও ভেঙ্গে দিলেম। আমি দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখলেম, আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে যেরূপ নারী-প্রগতি হয়েছে, অন্য কোন দেশে সেরূপ হয় নি। সব দেশেই দেখেছি, পুরুষদের এখনও কোন না কোন বিষয়ে গোঁড়ামি আছে। তাই স্থির করেছি, যদি একান্তই বিবাহ করি, তা'হলে বাঙ্গালীর ছেলেকেই বিবাহ করব, আর কোর্টশিপ করব না। এসেন্স দিয়ে, পোষাক দিয়ে, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিয়ে কোন যুবকের মন ভোলাবার পাত্রী আমি নই। ইউরোপের আর আমেরিকার অনেক দেশে এখনও সেই সেকালের প্রথা মত বিবাহের পর স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর উপাধি-গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। আমি ত ভেবে স্থির করতে পারি না যে, মিস্ এডিথ হ্যামিণ্টনের সঙ্গে মিষ্টার টমাস রবার্টসনের বিবাহ হ'লে টমাস মিঃ হ্যামিণ্টন না হয়ে এডিথ মিসেস রবার্টসন হয় কেন? শুনেছি সেকালে না কি এই বঙ্গদেশেও ঐরূপ প্রথা ছিল। সেনের কন্যা মজুমদারের ছেলেকে বিবাহ করলে মিসেস্ মজুমদার হয়ে যেত। কি লুডিক্রাস বলুন দেখি! সেই পুরাতন প্রথা আজও যদি প্রচলিত থাকত, তা হ'লে মিসেস্ সরকার, আজ আপনার নাম হ'ত মিসেস বোস, কেন না, শুনেছি আপনার বিবাহের পূর্ব্বে আপনার জীবনসঙ্গীর নাম ছিল মিষ্টার আর, এন, বোস। কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন দেখি?"

মিসেস সরকার বলিলেন, "আর আপনার নাম আজ মিস্ আই ভি দত্ত না হয়ে মিস আইভি তরফদার হ'ত। কেন না, আপনার পিতার নাম ছিল মিষ্টার বি, এম, তরফদার—অবশ্য তাঁর বিবাহের পূর্ব্বে। আবার তাঁর পিতার, অর্থাৎ আপনার পিতামহর আইবুড় বেলায় নাম ছিল টি, এস, চক্রবর্ত্তী। সে হিসেবে হয়ত মিস্ আইভি চক্রবর্ত্তী হয়ে থাকতেন।"

এমন সময় একটি আঠার-উনিশ বৎসরের মেয়ে আসিয়া মিসেস্ সরকারকে মৃদুস্বরে বলিল, "মা ওঁদের ডাইনিং রুমে নিয়ে এস।"

কন্যার কথা শুনিয়া মিসেস্ সরকার দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "কাইণ্ডলি সকলে একবার আমার সঙ্গে ও-ঘরে আসুন।"

৩

ভোজন-কক্ষের দ্বারে মিষ্টার সরকার দণ্ডায়মান ছিলেন। মিসেস্ সরকারের সঙ্গে আগন্তুকগণকে সমাগত দেখিয়া তিনি হাসিমুখে প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং সকলের শেষে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মানিতা প্রধান অতিথি মিস্ আইভির বাঁ দিকে আসন গ্রহণ করিলেন। টেবলের উপর নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং চায়ের সরঞ্জাম সুসজ্জিত ছিল।

লাঞ্চে বসিয়া সকলের হাসি-গল্প চলিতে লাগিল। মিস্ দত্তের সহিত সমাগতা বান্ধবীদ্বয়ের মধ্যে বৈদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে মিসেস্ তরফদার তাঁহার সঙ্গিনীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "মিস্ ভট্টাচার্য্য, তুমি মিষ্টার নলিনীর প্রতি অত ঘন ঘন দৃষ্টি দিচ্ছ কেন বল ত? তোমার মতলবটা ভাল বোধ হচ্ছে না। আমি তোমাকে ব্রাজিল আর তিব্বতের মধ্যে রাজনীতিক সম্বন্ধটা বোঝাবার চেষ্টা কচ্ছি, আর তুমি কেবলই অন্যমনস্ক হচ্ছ।"

সপ্রতিভ ভাবে মিস্ ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "তোমার ঐ বৈদেশিক রাজনীতি অপেক্ষা মিষ্টার নলিনী সরকারের মধুর হাস্যটা অধিক লোভনীয় নয় কি? মিষ্টার নলিনী সরকারকে যিনি জীবন-সঙ্গিরূপে লাভ করবেন, আমি তাঁর সৌভাগ্যের কথা ভাবছি।"

মিসেস্ তরফদার বলিলেন, "সে ভাগ্যবান্ও তোমার সুমুখে বসে রয়েছেন। আইভির সঙ্গে নলিনীর বিবাহের কথা ত একরূপ স্থির হয়েই ছিল। বাকী ছিল—পাত্র দেখা, তাও আজ হয়ে গেল। এখন বিবাহের দিন স্থির হলেই হয়।"

আইভি বলিলেন, "মিসেস্ সরকার যদি সম্মতি দেন, তা'হলে আগামী বড়দিনের সময় বিবাহটা হলেই ভাল হয়। কারণ, বড়দিনের সময় আমাদের দেশে শীত হলেও সাউথ আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গ্রীষ্মকাল মধুর। গ্রীষ্মকালে খুব হাই অল্টিচুড দিয়ে উড়ে বেড়াতে খুব আরাম।"

নলিনীমোহন বলিলেন, "আমি মাত্র একবার এরোপ্লেনে চ'ড়েছি, আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দমদম থেকে বোম্বাই গিয়েছিলেম। তিনি বোম্বাই থেকে সাউথ আফ্রিকায় গেলেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার সাহস হ'ল না; আমি ট্রেণে বোম্বাই থেকে ফিরে এলেম।"

নলিনীমোহনের কথা শুনিয়া আইভি বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "সাহস হ'ল না? তার মানে আপনার ভয় হয়েছিল? এরোপ্লেনে আবার ভয় কি? স্থলপথে কলিশনের ভয় আছে, অসীম অনন্ত আকাশে কলিশনের ভয় নেই। তার পর এঞ্জিন খারাপ হবার ভয়? আজকাল সমস্ত এরোপ্লেনেই এমন সুন্দর প্যারাসুটের ব্যবস্থা হয়েছে যে, দশ পনের হাজার ফুট উপরে এঞ্জিন খারাপ হ'লে কিম্বা পাখা ভেঙ্গে গেলে, সেই প্যারাসুট ধরে খুব ধীরে ধীরে, দু এক জন মানুষ নয়, আস্ত এরোপ্লেনটাই নীচে নেমে আসে। পড়ে গিয়ে মাথা বা হাত-পা ভাঙ্গবার কোন ভয় নেই। শুনেছি, সেকালে যখন প্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কার হয়, তখন প্রথম চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর মাঝে মাঝে এরোপ্লেনে দুর্ঘটনা ঘটত। কিন্তু সে অতীত যুগের কথা। আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, আমি সঙ্গে থাকব। পৃথিবীর বক্ষে থাকা অপেক্ষা আকাশে থাকা আমি অধিক নিরাপদ মনে করি। যে কোন মুহূর্ত্তে ভূমিকম্প হয়ে এই বাড়ী

নলিনীমোহন

আমাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে, কিন্তু আকাশে, অন্ততঃ ভূমিকম্পের ভয় নেই !"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "নলিন ভয়ানক নার্ভাস্। ছোটবেলায় ওকে কি কম কষ্টে বাইসিক্‌ল চড়া শিখিয়েছিলেম ! বলে, 'সাইকিলে চাপলে আমার মাথা ধরে, ও-সব মেয়েছেলের পক্ষেই ভাল।' এইবার মিস্ দত্তর হাতে পড়ে যদি ওর নার্ভাস্‌নেস্‌টা কাটে। হাঁ, বিবাহের দিনের কথা বলছিলেন ? তা' বড়দিনের সময় বিবাহ দিতে আমার আর আপত্তি কি ? তুমি কি বল ?" এই বলিয়া তিনি জীবনসঙ্গী মিষ্টার সরকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মিঃ সরকার বলিলেন, "আমার আর মতামত কি ? মিস্ দত্ত যখন বলছেন, তখন তাই হবে।"

ভোজন শেষ হইলে মিস্ দত্ত ও তাঁহার বান্ধবীদ্বয়ের অনুরোধে নলিনীমোহন পিয়ানো বাজাইয়া দুই একটা গান গাহিলেন। মিস্ দত্ত ও তাঁহার বান্ধবীরা বিশেষতঃ মিস্ ভট্টাচার্য্য উচ্চকণ্ঠে গায়কের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইলে মিসেস্ তরফদার নলিনীকে বলিলেন, "আপনি নাচতে পারেন ?"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "পারে এক রকম, তবে খুব ভাল নয়।"

মিসেস্ মুখার্জ্জী বলিলেন, "এক রকম কেন ? ভাল রকমই পারেন। আমার বড় মেয়ে ত বলে 'নলিনী দাদা চমৎকার নাচেন। বিশেষতঃ ঋক্ষ-নৃত্য, প্লবঙ্গম নৃত্যে নলিনী দাদা মাষ্টার'।"

মিস্ ভট্টাচার্য্য নলিনীমোহনকে বলিলেন, "আশা করি, আপনি আমাদের সে আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত করবেন না।"

মিষ্টার সরকারের ইঙ্গিতে নলিনীমোহন বেশ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলে সকলে উঠিয়া নিজ নিজ আসন সরাইয়া লইয়া জাঁকিয়া বসিলেন। মিস দত্ত পিয়ানো বাজাইবার জন্য উঠিয়া গিয়া পিয়ানোর কাছে উপবেশন করিলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে নলিনীমোহন বেশ-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নর্ত্তকের বেশে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে মিসেস্ মুখার্জ্জী বলিলেন, "বাবা নলিন, তুমি সেই ঋক্ষ-নৃত্যটা একবার দেখিয়ে দাও, আমারও সেটা দেখতে খুব ভাল লাগে।"

পিয়ানোর তালে তালে নলিনীমোহন ঋক্ষ-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সকলে মুগ্ধনেত্রে সেই থমকি থমকি—চমকি নাচ দেখিতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট নৃত্যের পর নলিনী সহসা একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলে সকলে

নলিনীমোহনের থমকি থমকি—চমকি ঋক্ষ-নৃত্য

করতালিতে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিলেন। তাহার পর সর্প-নৃত্য, প্লবঙ্গম-নৃত্য, কুম্ভীর-নৃত্য ও মকরী-নৃত্য দেখাইয়া অজস্র করতালি-ধ্বনির মধ্যে নলিনী আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষণকাল পরে মিস্ দত্ত বলিলেন, "মন্দ নয়, তবে একটু আধটু যা ত্রুটি আছে, তা আমি শুধরে নেবো। আপনারা বোধ হয় কাগজে দেখে থাকবেন, গত বৎসর

আফগানিস্থানে, কান্দাহারে যে নিখিল পৃথিবী নৃত্যসম্মেলন হয়েছিল, তাতে আমি মিস্ ডাটাটাস্কি ছদ্মনামে শুশুক-নৃত্য, বায়স-নৃত্য এবং কেঙ্গেরু-নৃত্য দেখিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস সার্টিফিকেট পেয়েছিলেম।"

মিস্ মহিষমর্দ্দিনী গুপ্তা বলিলেন, "আপনিই মিস্ ডাটাটাস্কি না কি? সে সময় ত খবরের কাগজে আপনার প্রশংসা প্রত্যহই পড়েছি।"

আরও প্রায় দশ পনের মিনিট বিভিন্ন দেশের নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনার পর মিসেস্ সরকার বলিলেন, "তা'হলে, মিস্ দত্ত, আগামী বড়দিনেই স্থির রইল। আমরা এই এক মাসের মধ্যে উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকি।"

মিস্ দত্ত বলিলেন, "নিশ্চয়। আমাকেও রেডি হ'তে হবে। তা' এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মিষ্টার সরকার বলিলেন, "তা'হলে নলিনকে আপনার পছন্দ হয়েছে ত?"

"অপছন্দের ত কোন কারণ নেই। একটু নার্ভাসনেস আছে, তা ভাল হয়ে যাবে। গুডনাইট।" বলিয়া মিস্ দত্ত গাত্রোত্থান করিলে সকলে পরস্পরের সহিত করমর্দ্দন করিলেন এবং কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৪

বড়দিনের আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে। মিসেস্ সরকারের বাড়ীতে পূর্ণোদ্যমে উদ্যোগ চলিতেছে। রাজ-মিস্ত্রি লাগাইয়া অট্টালিকার ভিতরে ও বাহিরে চুণকাম করা হইয়াছে, জানালা-দরজায় নূতন রং দেওয়া হইয়াছে। লনে দরবারী তাঁবু খাটান হইতেছে। দিকে দিকে মাইক বসাইয়া সুরলহরী প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। মিসেস্ সরকার হাইকোর্টের নামজাদা ব্যারিষ্টার। তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ, সুতরাং সকল দিক্ দিয়া সমারোহের ব্যবস্থা তাঁহার পদমর্য্যাদার অনুরূপ করিতে হইবে।

আলিপুরের সেশন্‌স্ জজ মিসেস্ মুখার্জ্জী মিসেস্ সরকারের সহপাঠিনী, উভয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একই ষ্টীমারে বিলাত গিয়াছিলেন; সেখানে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি সিভিলিয়ান হইয়া ভারতে ফিরিলেন এবং কয়েক বৎসর শাসন-বিভাগে কার্য্য করিয়া শেষে বিচার-বিভাগে আসিয়া জেলা ও দায়রা জজ হইলেন। মিসেস্ সরকার (তখন মিস্ সরকার) ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া হাইকোর্টে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। মিসেস্ মুখার্জ্জি বাঙ্গালার নানা জেলার জল খাইয়া প্রায় এক বৎসর হইল চব্বিশ পরগণায় বদলি হইয়া আসিয়াছেন। মিসেস্ সরকার পুত্রের বিবাহ-সংক্রান্ত সকল কার্য্যেই মিসেস্ মুখার্জ্জির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

মিস্ আইভি দত্তের বান্ধবী মিস্ ভট্টাচার্য্যের সহিতও মিসেস্ সরকারের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। মিস্ ভট্টাচার্য্য এই কয়দিনের মধ্যে চার-পাঁচ দিন আসিয়া মিসেস্ সরকারের সহিত এমন আত্মীয়তা করিয়া লইয়াছেন যে, সরকার-দম্পতি তাঁহাকে পুত্রের ভাবী জীবন-সঙ্গিনীর বান্ধবীর পরিবর্ত্তে "ঘরের মেয়ে" বলিয়াই মনে করেন। মিস্ ভট্টাচার্য্য আমেরিকার বোষ্টন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় জেশপ কোম্পানীর কারখানায় সহকারী ম্যানেজার হইয়াছেন।

বড়দিনের পাঁচ দিন পূর্ব্বে মিসেস্ সরকারের বাড়ীতে মিসেস্ সরকার ও মিসেস্ মুখার্জ্জি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিলেন, এমন সময় আর্দ্দালি একখানা কার্ড আনিয়া মিসেস্ সরকারের হাতে দিয়া বলিল, "পুলিসকা বড় মেমসাহেব মুলাকাৎ মাংতা।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "কে?"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "মিসেস্ হালদার পুলিস কমিশনার। সকাল বেলা পুলিস কমিশনার কি মনে করে?" আর্দ্দালিকে বলিলেন, "মেম সাবকো সেলাম দেও।"

মুহূর্ত্তকাল পরে কলিকাতার পুলিস কমিশনার মিসেস্ হালদার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মিসেস্ সরকারকে অভিবাদন করিলেন এবং মিসেস্ মুখার্জ্জিকে দেখিতে পাইয়া

পুলিস-কায়দায় অভিবাদন করিলে মিসেস্ মুখার্জ্জি প্রত্যভিবাদন করিয়া সহাস্থে বলিলেন, "বসুন। সকাল বেলায় কি মনে ক'রে?"

মিসেস্ হালদার আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "পুলিসের রাত-দিন, সকাল-বিকাল নেই। তবে এখন আমি পুলিসের কাযে আসিনি। একটা খবর শুনে, সেটা সত্য কি না, মিসেস্ সরকারের কাছে, বন্ধু-হিসাবে জানতে এসেছি। আশা করি, এই অনধিকারচর্চ্চার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "কি জান্‌তে চান বলুন, গোপনীয় না হ'লে এইখানেই বলতে পারেন।"

"আজ সকালে শুনলেম, আপনার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে মিস্ আইভি দত্তের বিবাহের আয়োজন হচ্ছে, কথাটা কি সত্য?"

"সত্য। কথা পাকা হয়ে আছে, আগামী খৃষ্টমাস-ডেতে বিবাহ হবে। নিমন্ত্রণপত্র ছাপাতে দিয়েছি। আপনার কাছেও পত্র যাবে। আশা করি, বিবাহ-সভাতে আপনার শুভাগমন অসম্ভব হবে না।"

মিসেস্ হালদার এ কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন, "মিস্ দত্তর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়? কোথায় আলাপ হয়েছিল?"

"আজ দু'ই বৎসর পূর্ব্বে বোম্বায়ে মিস্ দত্তর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কথায় কথায় জানতে পারলেম, ওঁর এক মাসী আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিলেন। তার পর আরও দু'-চারবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কেন বলুন দেখি?"

এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া বলিল, "মিস্ ভট্টাচার্য্য।"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "আইভির বান্ধবী। সেলাম দেও।"

মিস্ ভট্টাচার্য্য প্রবেশ করিলে মিসেস্-সরকার বলিলেন "মিসেস্ হালদার পুলিস কমিশনার, মিস্ ভট্টাচার্য্য আইভির বান্ধবী এবং জেসপ কোম্পানীর কারখানার ম্যানেজার।"

মিস্ ভট্টাচার্য্য মিসেস্ হালদারের সহিত শেক-হ্যাণ্ড করিয়া আসন গ্রহণ করিলে মিসেস্ হালদার মিসেস্ সরকারের
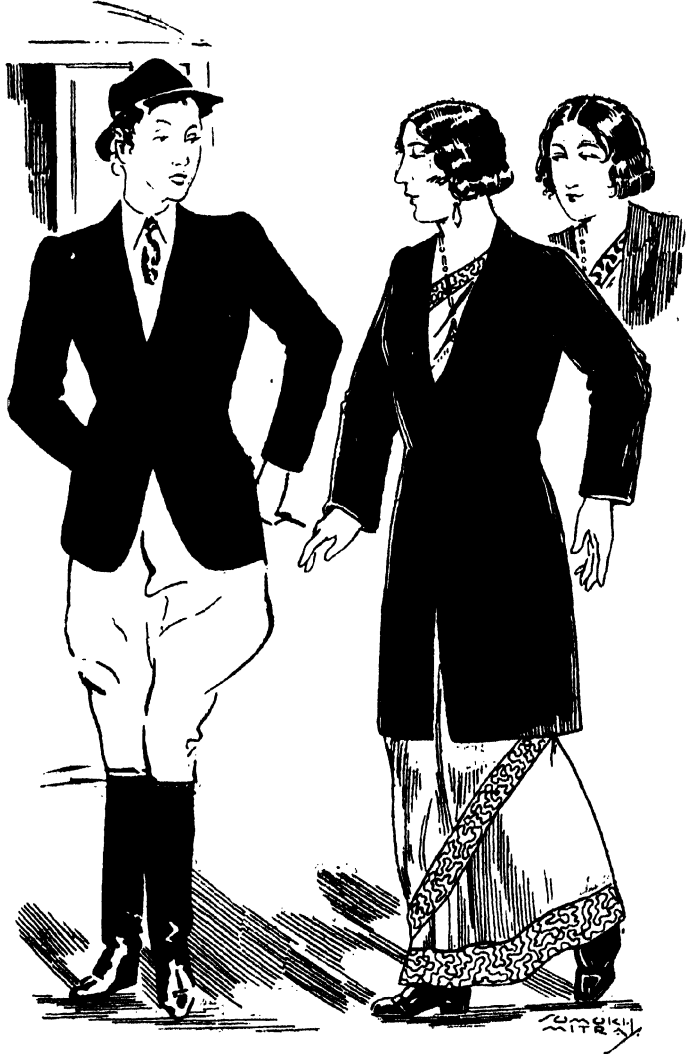
মিসেস্ মুখার্জ্জি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, "বসুন, সকাল বেলাই কি মনে করে?"

মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। মিসেস সরকার বলিলেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, মিস্ ভট্টাচার্য্য আমার ঘরের মেয়ে।"

মিসেস্ হালদার বলিলেন, "আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে বলি। এই আইভি দত্ত 'মিস' নন্, 'মিসেস্'। তাও

বার নয়, তিন বার। তার মধ্যে ওর দু'জন স্বামী এখনও জীবিত। ও প্রথম বিবাহ করে এক ইটালীয়ানকে। বিবাহের দু' চারি মাস পরেই সে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে ওকে ত্যাগ করে। আইভি ইটালী থেকে ফ্রান্সে গিয়ে সেখানে এক বুড়ো ইহুদীকে বিবাহ করে। তার অনেক টাকাকড়ি ছিল। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই সে বুড়া মারা গেল। ফরাসী-পুলিস সন্দেহ করে যে, তার মৃত্যু-রহস্যে আইভি জড়িত ছিল, কিন্তু প্রমাণ না পাওয়াতে আইভিকে ছেড়ে দেয়। সেই ইহুদীর প্রায় তিন লক্ষ টাকা ছিল, আইভি সেই টাকা হাত ক'রে দেশে ফিরে আসে। আজ প্রায় তিন বৎসর হ'ল, সে অমৃতসরে এক পাঞ্জাবী যুবককে বিবাহ করে। সেই বিয়ের ফলে একটি ছেলেও হয়েছে। তার বয়স এখন দেড় বৎসর। আইভি সেই পাঞ্জাবীকে প্রায়ই মারধর করত। রাত্রে ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে বেড়াত। পাঞ্জাবী বেচারী অনেক সহ্য ক'রে অবশেষে আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সে তার নিজের এবং পুত্রের জন্য ভরণপোষণের দাবীতে নালিশ করাতে আদালত থেকে মাসিক দেড়শ' টাকা ভরণপোষণের জন্য দেবার আদেশ হয়। মাস তিনেক টাকা দিয়ে আইভি পঞ্জাব থেকে সরে পড়ে। আইভি সরে পড়বার পর প্রকাশ পায় যে, এক-খানা চেক জাল ক'রে পঞ্জাব ব্যাঙ্ক থেকে একত্রিশ হাজার টাকা বা'র ক'রে নিয়েছে। ওর নামে গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। আমরা আজ চার দিন হ'ল সে ওয়ারেন্ট পেয়েছি, কিন্তু সে গা-ঢাকা দিয়েছে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, মিসেস্ সর-কার, আপনার বিষয়-সম্পত্তির লোভেই সে আপনার একমাত্র পুত্রকে বিবাহ করতে এসেছে।"

মিস্ ভট্টাচার্য্যকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমায় বাঁচালে।"

মিসেস্ সরকার টেবল চাপড়াইয়া বলিলেন, "বাই গড্! এখন উপায়? এদিকে যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এখন এ দায় থেকে উদ্ধার পাই কিরূপে?"

মিসেস্ সরকার কথাগুলি একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলাতে কথাগুলি তাঁহার জীবনসঙ্গী মিষ্টার সরকার এবং নলিনীরও কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুলিস দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাপার কি?"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "ব্যাপার আমার মাথা আর

মুগ্ধ। আইভি একটা দস্যি মেয়ে—জালিয়াৎ, মাতাল। সে আরো তিনবার বিয়ে করেছিল, তার মধ্যে দু'জন এখনও বেঁচে আছে।"

মিঃ সরকার বলিলেন, "কার কাছে শুনলে?"

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "স্বয়ং পুলিস কমিশনার মিসেস্ হালদার বল্‌লেন। উনি না বল্লে কি সর্ব্বনাশই হ'ত! নলিনীকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হ'ত। উনি আজ যে উপকার করেছেন—"

মিসেস্ সরকার বলিলেন, "তা' আর বল্‌তে? উনি আমাকে চিরকালের জন্য কিনে রাখলেন! আমি কথায় আর কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব?"

মিসেস্ হালদার বলিলেন, "এতে কৃতজ্ঞতার কথা উঠতেই পারে না। আমি পুলিসের কর্ত্তব্য করেছি মাত্র।"

মিষ্টার সরকার বলিলেন, "এখন উপায়? মাঝে আর চারটা দিন। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, মায় নিমন্ত্রণের কার্ডও ছাপতে গিয়েছে।"

নলিনী বলিলেন, "আমিও আমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণের কার্ড ছাপতে দিয়েছি।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "নলিনী, ছাপাখানায় ফোন ক'রে কার্ড ছাপাতে বারণ ক'রে দাও।"

মিস্ ভট্টাচার্য্য এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন, ছাপাখানায় ফোন করিবার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমার প্রস্তাব যদি গ্রহণীয় ব'লে মনে করেন, তা হ'লে আমি বলি কি, কার্ড ছাপা বন্ধ রাখতে হবে না—একটু বদল কল্লেই চলবে।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "কি বদল?"

"যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তা হ'লে মিস্ আইভি দত্তর পরিবর্ত্তে মিস্ রেবা ভট্টাচার্য্যের নাম দিয়ে কার্ড ছাপাতে পারেন।"

এ কথায় সকলে করুণ নয়নে নলিনীর পানে চাহিলেন।

নলিনী বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আমাকে যে এরোপ্লেনে চ'ড়ে আকাশময় ঘুরে বেড়াতে হবে না, এইটে আমার পরম লাভ।"

মিসেস্ সরকার তাড়াতাড়ি উঠিয়া মিস্ ভট্টাচার্য্যকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আমায় বাঁচালে! আমার মাথা থেকে মস্ত বড় একটা লজ্জার বোঝা সরিয়ে দিয়েছ।"

মিস্ ভট্টাচার্য্য নলিনীকে আবেগভরে চুম্বন করিলেন

মিস্ ভট্টাচার্য্য উল্লাসভরে নলিনীমোহনের করমর্দ্দন করিয়া আবেগভরে চুম্বন করিয়া ফেলিলেন। মিসেস্ মুখার্জ্জি এবং মিসেস্ হালদার সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দুটি হৃদয়ের ভাব-ভরা নদী একত্র মিলে আনন্দের অকূল সাগরে বিলীন হোক!"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[উপন্যাস]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অসির আশ্রম

মনের অসহ্য আবেগে দীপক আসিয়া টিকিট কিনিয়া ট্রেণের কামরায় চড়িয়া বসিল। মাথার মধ্যে প্রচণ্ড কলরব চলিয়াছে। সুধা…সুধা…

সুধা এমন নিরাশ্রয়, এমন দুর্ভাগিনী নয় যে আর্ত্ত-অভাগাদের সেবা করিয়া জীবন কাটাইয়া দিবে! কেন সে তাহা করিবে? আর কেহ তাহাকে না দেখুক—দীপক এখানো বাঁচিয়া আছে—দীপক দেখিবে সুধাকে! কাশীতে পৌছিয়া এ-কথা সে গার্গী দেবীর মুখের উপরে স্পষ্টভাষায় বলিয়া বুঝাইয়া দিবে, দীপক বাঁচিয়া থাকিতে সুধার স্থান এখানে নয়—এখানে হইতে পারে না! বলিয়া সুধাকে সে কলিকাতায় আনিবে।

তার পর…?

তার পরের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই! যেদিন নিঃসহায় অনাথা সুধাকে লইয়া রাত্রে মোটর হাঁকাইয়া মথুয়া ছাড়িয়া দীপক এলাহাবাদের পথে পাড়ি দিয়াছিল, সেদিন পরে কি হইবে, সে কথা ভাবে নাই…

কিন্তু ভাবে নাই বলিয়াই হয়তো সুধা আজ ওখানে গিয়া পড়িয়াছে! দীপক আর সুধার মধ্যে তাই আজ এমন সাগরের ব্যবধান! যেন দুজনে পর…নিঃসম্পর্ক!… যেন গার্গী দেবীই সুধার একমাত্র আপন-জন…দীপক কেহ নয়! দীপকের সারা মন বিদ্রূপের অট্টহাস্তে ফাটিয়া পড়িবার মতো হইল…

এমনি কলরব-কোলাহল মাথায় বহিয়া দীপক আসিয়া নামিল বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে। মন এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে তখন একটু সুস্থ হইয়াছে। দীপক ভাবিল, স্নান নাই, আহার নাই, এমন রুক্ষ বেশে ঘুরিয়া বেড়াইলে লোকে পাগল বলিবে! তাছাড়া যা-তা বকাবকি করিতে সে আসে নাই তো!

পথে ট্যাক্সি লইয়া ট্যাক্সি-ওয়ালার সাহায্যে একটা ভদ্র হোটেলে উঠিয়া দীপক বিছানা এবং কাপড়ের লগেজ রাখিল; পরে স্নানাহার সারিয়া ধুতি পরিয়া অসিঘাটে চলিল গার্গী দেবীর ক্যাম্পের সন্ধানে। হোটেলেই ক্যাম্পের সন্ধান মিলিয়াছিল। অসির ওদিকে হনুমানজীর মন্দির—তাহারি কাছে খোলা জায়গায় ক্যাম্প। সে ক্যাম্পে থাকিবার জায়গাও আছে।

ক্যাম্পে পৌছিয়া দীপক শুনিল, দু'ক্রোশ দূরে কোন্ দেহাতে সুধা গিয়াছে কাল গার্গী দেবীর সঙ্গে বিশেষ কাজে। আজ ফিরিবার কথা।

বেলা তখন তিনটা। রাগে দীপকের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিল। সুধাকে কি গার্গী দেবী কেনা বাঁদী পাইয়াছেন যে, তার জীবনটাকে লইয়া এভাবে ছিনিমিনি-খেলিয়া বেড়াইতেছেন? কিন্তু নিষ্ফল রাগ! রাগ করিয়া লাভ নাই!…

আশ্রমের এক তরুণ সেবক আসিয়া বলিল—চা খাবেন?

দীপক কহিল,—না।…

সেবক কহিল—সুধা দেবী মায়ের মতো রোগীদের সেবা করছেন! এমন যত্ন…এত মমতা…

দীপকের বুকের মধ্যটা যেন গলিয়া গেল! সেবায় যত্ন…মমতা…সে-পরিচয় দীপককে শুনিতে হইবে পরের কাছে! হায়রে, দীপক এ সেবা-যত্ন, এ মমতার পরিচয় যে নিজে পাইয়াছে…কিন্তু পরের জন্য নিজেকে এভাবে ঢালিয়া দিয়া তার পরিবর্ত্তে সুধা নিজে কি পাইয়াছে?…

সেবক প্রশ্ন করিল—আপনি সুধা দেবীর কে হন?

দীপকের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।··· কেন? দীপক কহিল—তার আপনার লোক।

সেবক কহিল,—কিন্তু শুনেছি, এক মামা ছাড়া তাঁর আর কোনো আপন-জন নেই।

এ কথার জবাব দিবার ইচ্ছা দীপকের ছিল না। তবু সুধাকে এরা আপন-জন ভাবিয়া গর্ব্বে সারা হইতেছে, পাছে ইহাদের কাছে ছোট হইতে হয়, এই জন্য জবাব দিতে হইল। দীপক কহিল—হয়তো আমার কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করেনি। তার কারণ, সুধা দারুণ অভিমান-বশে আমাদের ছেড়ে চলে এসেছিল!

সেবকের দু'চোখে বিস্ময়ের রাশি! দীপক তাহা লক্ষ্য করিল···

দ্বিধা-জড়িত স্বরে সেবক কহিল—সুধা দেবী আশ্রমে এসেছেন অনেক দিন···

দীপক কহিলেন—হাঁ···আমরা সন্ধান পাইনি, তার পর ঘটনাবশে আমাকে বিলেত যেতে হয়েছিল···বিলেত থেকে ফেরবার পর সুধাই আমাকে খপর দিয়েছিল···কলকাতায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল···অনেকবার। তার পর সেখান থেকে হঠাৎ চলে এলো···আমার সঙ্গে তাই দেখা হয়নি···কিন্তু এ-সব কথা যাক, সুধা আজ ফিরবে তো নিশ্চয়?

সেবক কহিল, হ্যাঁ। সন্ধ্যার আগেই ওঁরা ফিরবেন। যে-চাকর সঙ্গে গিয়েছিল, সে তাঁদের লগেজপত্র নিয়ে ফিরে এসেছে। সেখানে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে রোগে ভুগছিলেন নিঃসহায়, নিঃসম্বল। তা তিনি মারা গেছেন ভোরে। তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এঁরা ফিরবেন, বলে পাঠিয়েছেন।

—ও···তাহলে আমি একটু বসি···

সেবক কহিল,—চুপচাপ বসে থাকবেন! তাহলে বরং আমাদের পাঠাগারে এসে বসুন। খপরের কাগজ আছে, বই আছে, পড়তে পারবেন।

তাহাই হইল। দীপককে আনিয়া ক্যাম্পের ছোট লাইব্রেরী-কামরায় সেবক বসাইল। ছ্যাঁচা বাঁশের টেবিল, চেয়ার। টেবিলে কাগজপত্র রহিয়াছে, ক'খানা বই রহিয়াছে।

দীপক কহিল,—আপনাদের সব ব্যবস্থাই আছে, দেখছি।

মৃদু হাসিয়া সেবক কহিল,—মায়ের সব দিকে বিলক্ষণ নজর। রোগীদের জন্য এ-সব রাখতে হয়···

দীপক কহিল,—আপনারা পড়েন না?

সেবক কহিল,—পড়ি বৈ কি। তবে আমাদের কখন কোথায় ছুটতে হয়···

দীপক কহিল,—এখানে আপনারা ক'জন আছেন?

—রোগী আছে পনেরো জন···তাঁদের আত্মীয় বন্ধু আছেন কতক, আর আমরা আছি প্রায় বারো জন।

—পুরুষ? না, মেয়ে?

—সেবকদের মধ্যে আমরা পাঁচ জন আছি পুরুষ। সাত জন মেয়ে-ছেলে—মাকে আর সুধা দেবীকে নিয়ে।

দীপক কহিল,—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

—বলুন···

দীপক কহিল,—এই যে আর পাঁচ জন মেয়ে-ছেলে আছেন, এঁরা সুধার বয়সী?

—এক জন সুধা দেবীর বয়সী। বাকীদের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ বছর।

—এঁদেরও কি সুধার মতো পথে কুড়িয়ে পেয়েছেন?

সেবক কহিল,—ভগবান্ এনে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে এক-জনের অবস্থা ভালো। বিধবা হবার পর সংসারে বড় অত্যাচার সইছিলেন···শেষে আমাদের আশ্রমে আসেন ব্রত নিয়ে। বাকী যে ক'জন মেয়েছেলে এখানে আছেন, তাঁরা নিরাশ্রয় অবস্থায় এখানে এসে আশ্রয় নেছেন।

দীপক কহিল,—আপনারা যে ক'জন পুরুষ-সেবক আছেন···

সেবক কহিল,—জীবনে একটা-না-একটা চোট খেয়েই এ-পথে এসেছি, তা বলতে হবে! আমি একদিন বিপ্লব-পন্থী হয়েছিলুম···পলিটিক্যাল ব্যাপারে একবার জেল খেটেছি। জেলে বসে বসে ভাবতুম, এ হিংসা-বিষে জগতের কোনো মঙ্গল হবে না···হতে পারে না! জেল থেকে বেরিয়ে তাই সেবার কাজ নিয়েছি।

দীপক কহিল,—কিন্তু লোকের সেবা কি শুধু তার রোগেই প্রয়োজন? যাতে রোগ না হয়, যাতে লোকের দেহ-মন

সুস্থ থাকে,—মনের সত্য সত্য বিকাশ-সাধন হয়,···শিক্ষা, মনের ক্ষুদ্রতা-নাশ—এগুলোর ব্যবস্থা করা বুঝি আপনাদের প্রোগ্রামে নেই ?

সেবক হাসিল। হাসিয়া বলিল,—নেই, এ কথা বলি কি করে! সে চেষ্টা হচ্ছে। তবে তাতে অনেক টাকার দরকার। তাই আমরা শুধু রোগীর সেবার ভার নিয়েছি ·· তা ছাড়া ভুল-পথে গিয়ে যারা অস্বস্তি-অশান্তি কিনছে, কিম্বা প্রবলের নির্য্যাতনে পিষ্ট হচ্ছে, যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করা —এদিকেও অল্প-স্বল্প চেষ্টা চলেছে বৈ কি। দু'চারটে ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে মা গিয়ে প্রবল-দুর্ব্বল দু'দলকে বুঝিয়ে পরস্পরের মধ্যে মিল করিয়ে দেছেন। আমাদের সেবকের সংখ্যা এখন শ'খানেক! নানা জায়গায় তাঁরা নানা কাজ করছেন···সব কাজের মূলে মার প্রেরণা।

দীপক কহিল—মা মানে গার্গী দেবী ?

সেবক কহিল—হ্যাঁ···

দীপক কহিল—আপনারা কেউ বিবাহ করেন নি ?

সেবক কহিল—দু'জন বিবাহ করেছিলেন। স্ত্রী নেই, মারা গেছেন।

দীপক কহিল—আপনি বিবাহ করেছিলেন ?

—না।

দীপক কহিল—আপনাদের আশ্রমে মেয়ে-পুরুষ এখন কত আছেন ?

সেবক কহিল—মেয়ে প্রায় বত্রিশ জন···বাকী পুরুষ। পুরুষের সংখ্যা বেশী।

—মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গেই বাস করেন তো ?

সেবক কহিল মেয়েদের থাকবার জায়গা আলাদা। তবে মিলে-মিশে সকলকে এক সঙ্গে কাজ করতে হয়! ··

দীপক চুপ করিয়া রহিল।

মনের মধ্যে আজন্মের সংস্কার রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, মানুষের মন···কখন্ সে বিষের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, কে জানে!···অনাত্মীয় তরুণ-তরুণী···.

সেবক কহিল—আপনি বসুন···আমি একবার আসি ·· দু'একজন রোগীকে দেখবার সময় হয়েছে ··

দীপক কহিল—আসুন···

সেবক চলিয়া গেল। দীপক একখানা খপরের কাগজ টানিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিল।

কাগজে মন বসিল না। বিশ-পঁচিশটা হাউই বাঁধিয়া তাহাতে একসঙ্গে অগ্নি-সংযোগ করিলে ক্ষিপ্রতেজে তীব্রবেগে সেগুলা যেমন অযুত অগ্নিরেখা রচিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়, তেমনি ভাবে চিন্তা শত-সহস্র মুখে মনের মধ্যে অগ্নিতেজে জ্বলিয়া চীৎকার তুলিল,—সুধা···সুধা ··সুধা ··

অজানা-অচেনা পাঁচ রকম লোকের সংসর্গে সুধা থাকিবে না! তার থাকা চলিবে না—চলিতে পারে না! ভালো কথায় বুঝাইয়া না পারে, রাগ করিয়া, বিদ্রোহ তুলিয়া সুধাকে এখান হইতে সে লইয়া যাইবে!

তার পর ?

এরা হয়তো পাঁচ-কথা বলিবে! সে-বলা দীপক সহিতে পারিলেও সুধা কেন সহিবে ? সুধাকে সহিতে হইবে না! এলাহাবাদে মায়ের কাছে সুধাকে রাখিয়া আসিবে! মায়ের কাছে সুধা নিরাপদ থাকিবে, সুখে থাকিবে!

তার পর ?

তার পরের কথা ভাবিবার সময় এখনো আসে নাই। যখন সে-সময় আসিবে, তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুধার সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করিবে, যে-ব্যবস্থায় সুধার কোনো দিকে কোনো অসুবিধা হইবে না···

নানা চিন্তায় মনের অস্থিরতা বাড়িয়া এমন হইয়া উঠিল যে আর ধৈর্য্য সহে না! কোথায় গিয়াছে সুধা···জানিয়া সেই পথে অগ্রসর হইবে ভাবিয়া দীপক উঠিয়া দাঁড়াইল···

এবং ঠিক সেই সময়ে শুনিল বাহিরে গার্গী দেবীর স্বর —কে-বাবু এসেছেন সুধার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ?

স্বর শুনিয়া দীপক বাহিরে আসিল···আসিবামাত্র দেখা হইল গার্গী দেবীর সঙ্গে।

গার্গী দেবী বলিলেন—তুমি এসেছো! আমারো তাই মনে হচ্ছিল।···এসে রণদার মুখে শুনলুম, কে একটি ভদ্র-লোক এসেছেন সুধার কাছে···তখনি মনে হলো, তুমি! তবু কেমন সন্দেহ হচ্ছিল···হঠাৎ তুমি কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে এখানে আসবে কেন ?···তা ভালো আছো, বাবা ?

দীপক কহিল—আছি।

মনের অত দাহ নিমেষে নিবিয়া গেল।

গার্গী দেবী কহিলেন,—ক'টি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আসতে হলো···একটি একেবারে কোলের—ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের ব্যবস্থা করে রেখে সুধা এখনি আসবে। তুমি বসো

বাবা···আমি কাপড়খানা ছেড়ে আসি। পথের কাপড়··· বসতে অসুবিধা হবে না তো? আমার দেরী হবে না।

দীপক কহিল—আমার কোনো অসুবিধা হবে না আমি বসছি।

— —

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অসহায় নারী

সন্ধ্যার পর। ঘরে আলো জলিতেছে। দীপক চুপ করিয়া বসিয়া আছে···সুধা আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—কি ভাগ্যি···আপনার শুভাগমন হয়েছে!

দীপক চাহিল সুধার পানে,—তাকে আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিল। করিয়া কহিল,—চেহারাখানি চমৎকার হয়েছে ·· মহাপ্রস্থানের পথের পথিকের মতো!

মৃদু হাস্যে সুধা কহিল—কাল সারা রাত জাগতে হয়েছিল —তার পর আজ পথের ধকল···

দীপক কহিল—তোমার নামটি বদলে ফ্যালো···

সুধা কহিল—তার মানে?

দীপক কহিল—মানে, সুধা নাম কেটে নাম নাও যোগিনী দেবী।

সুধা এ-কথার কোনো জবাব দিল না, চুপ করিয়া দীপকের পানে চাহিয়া রহিল।

দীপক কহিল—কি দেখচো?

সুধা কহিল—আপনাকেও তো খুব সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না।

দীপক কহিল—আমারো কাল রাত কেটেছে জেগে···

—তার মানে?

দীপক কহিল—ট্রেণে সারা রাত চোখের পাতা বুজিনি···

মনের কোন্ কোণ হইতে ছোট একটা নিশ্বাস ফুটিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। সে-নিশ্বাস সবলে রোধ করিয়া সুধা কহিল—কাশীতে কোথায় এসেছেন?

দীপক কহিল—এইখানে···

বিস্ময়ে সুধার চোখ দুটি বুঝি খশিয়া পড়িবে! এমনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সুধা কহিল—সত্যি?

দীপক কহিল—সত্যি।

সুধা কহিল—হঠাৎ এখানে?

দীপক কহিল—যদি বলি, তোমাদের আশ্রমের কাজে যোগ দেবো বলে এসেছি,···তাহলে সে-কথা বিশ্বাস করবে?

সুধা কহিল—না।

সুধার স্বর গম্ভীর।

দীপক কহিল—কেন বিশ্বাস করবে না?

সুধা কহিল—আপনি কি-দুঃখে আশ্রমের কাজে যোগ দেবেন?

এ-কথায় দীপকের মনের কোথায় যেন আলোর একটু চমক ফুটিল। দীপক কহিল,—দুঃখ না পেলে বুঝি আশ্রমের কাজে কেউ যোগ দেয় না?

সুধা নিশ্বাস চাপিতে পারিল না··সনিশ্বাসে বলিল,—তা নয়। তবে আপনার পক্ষে সব ছেড়ে আশ্রমে আসা— এ-কথা কাকেও বিশ্বাস করতে বলেন, সত্যি?

দীপক কহিল—তোমার কিছু নেই বলেই তুমি আশ্রমে পড়ে আছো?

সুধা কহিল—আপনার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে পারবো না আমি। আমার কথা আলাদা···ভুল করে কোথায় চলেছিলুম···করবার কিছু ছিল না! হঠাৎ এঁরা এনে একটা কাজ হাতে দিলেন···তাই।···কিন্তু এ নিয়ে তর্ক কেন, বলুন? সত্যি, আপনি কাশীতে এসেছেন কেন? একা এসেছেন? না, এলাহাবাদের পথে কোনো কাজে···

সুধার মুখে যেন প্রশ্নের বান বহিয়া ছিল···এবং সে-বানের মুখে বাধা রচিয়া দীপক কহিল—একটি মাত্র কাজে এখানে এসেছি, সুধা। সে কাজ, তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো একবার বোঝাপড়া করবো বলে'···

—আমার সঙ্গে বোঝাপড়া?

—তাই!···এখানে তোমার থাকা হবে না···আমি থাকতে দেবো না···তোমাকে আমি আজ নিয়ে যেতে এসেছি···বুঝলে?

এ কথায় সুধা চমকিয়া উঠিল···তার চেতনা যেন বিলুপ্তপ্রায়···

দীপক কহিল—আমার কথায় আজ কোনো দ্বিধা নেই ···মনেও কোনো দ্বিধা নেই।···একদিন আমিই তোমাকে নিরাশ্রয় করেছি···আজ সে দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে···

সুধার বুকের মধ্যটা নিশ্বাসের বাঁপে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল···সে বাষ্প-ভারে বুক যেন ফাটিয়া যাইবে···

কোনোমতে সুধা কহিল—কিন্তু আমি নিরাশ্রয় নই।···তাছাড়া আমাকে আপনি কোনোদিনই নিরাশ্রয় করেন নি···আমি নিজেই আপনার-দেওয়া নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে এসেছি···

বলিতে বলিতে সুধার স্বর বাষ্প-ভারে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

দীপক কহিল—ও-সব পুরোনো কথা তুমি ভুলে যাও সুধা···যা হয়ে গেছে, তার কথা মনে এনো না!···শুধু এইটুকু বলো যে, আজ যদি তোমার হাত ধরে আমি বলি, ফিরে চলো সুধা···এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না—তাহলে আমার সে-কথা তুমি রাখতে পারবে কি, না?

সুধা মুখ নামাইল···চোখের কোণে জমাট বাষ্পরাশি এ-কথায় ফাটিয়া গলিয়া পড়িতেছিল···তার মুখে কথা ফুটিল না।

দীপক কহিল—বলো সুধা···বলো···আমার জোর নেই ···মিনতি করছি। ক'দিন ধরে গ্লানির ভারে মন আমার ভরে রয়েছে···তিলজলায় গিয়েছিলুম তোমার খপর নিতে ···তোমার সঙ্গে দেখা করতে। নবকুমারের মুখে শুনলুম, তুমি এখানে এসেছো তোমার মার সঙ্গে···কি মনে হলো··· এ খপর শুনেই আমি এখানে চলে এসেছি···মনে শুধু জেগেছে একটি কথা···তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে··· তা ছাড়া আর কোনো কথা মনে জাগেনি···বলো সুধা, বলো···তুমি যাবে ফিরে আমার সঙ্গে?···

আবেগের উচ্ছ্বাসে স্থান-কাল ভুলিয়া দীপক সুধার হাত ধরিল।

সুধার সারা দেহে বিদ্যুৎ-শিখা বহিয়া গেল। সুধা চাহিল দীপকের পানে···হাত ছাড়াইয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—মা আসছেন···

গার্গী দেবী আসিলেন, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—সুধাকে কেমন দেখছো?

দীপক কহিল,—ভালোই।

গার্গী দেবী কহিলেন,—একটা জিনিষ আমি বহুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি, কাজে-কর্ম্মে ডুবে থাকলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। মনে খুব বেশী আঘাত পেয়ে যে-কটি মেয়ে আমাদের এখানে এসেছে—দেখেছি, এখানকার এই সামান্য কাজে-কর্ম্মে তাদের মনের ব্যথা সেরে গেছে···তারা ভালো আছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, এ কাজ ভালো লাগছে? জবাবে বলেছে, হ্যাঁ।··· তা এখানে তুমি কোথায় এসে উঠেছো, বাবা?

দীপক কহিল,—একটা হোটেলে। সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে।

দীপকের মনে চমক লাগিতেছিল। এই মহিলাটির চারিদিকে কি যেন নিবিড় রহস্য···এ মহিলাটির কাছ হইতে দূরে থাকিবার সময় মন তাঁর বিরুদ্ধে ঝাঁজিয়া বার-বার নানা প্রশ্ন তোলে, কিন্তু কাছে আসিলে কোথায় উবিয়া যায় সে ঝাঁজ—স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরিয়া মন যেন এ মহিলাটির সঙ্গ আর ত্যাগ করিতে চায় না! কথাবার্ত্তায় যেমন মাধুর্য্য, সান্নিধ্যে তেমনি তৃপ্তির বাতাস বহিয়া মনকে সুশীতল করিয়া দেয়!

গার্গী দেবী বলিলেন,—ক'দিন এখানে থাকা হবে?

এ প্রশ্নের পরে আর দ্বিধা করা চলে না। মিথ্যা ছল করিতে মনে বিরাগ জাগে।

দীপক কহিল,—আপনার কাছেই এসেছি···সুধার সম্বন্ধে পরামর্শ করে যথাবিহিত ব্যবস্থার জন্য।

গার্গী দেবী বলিলেন,—সুধার ব্যবস্থা!

তাঁর স্বরে বিস্ময়!

দীপক একবার সুধার পানে চাহিল, সুধা মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে···

দীপক কহিল,—হ্যাঁ। মানে, সুধার উপর আমার কর্ত্তব্য আছে···এবং সে বড় সামান্য কর্ত্তব্য নয়। আপনি সুধার কথা সবই জানেন। সুধা তার জীবনকে এ ভাবে বিকিয়ে বাস করবে···এ চিন্তা ক'মাস ধরে আমার মনে কাঁটার মতো ফুটে আছে। তার এ নিরাশ্রয়তার জন্য আমি দায়ী। তার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য বহুকাল আগেই পালন করা উচিত ছিল। নানা কারণে ক্রটি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ, আমাদের পঙ্গু মন ঔদাস্য আর আলস্য-ভরে চুপ করে থাকে। ভাবি, কর্ত্তব্য সারবার অনেক সময় আছে। কিন্তু সে সময় যে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে না, সে জ্ঞান হয় বহু বিলম্বে। সুধার সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য-পালনে ঠিক সেই ক্রটি হয়ে গেছে!

কিন্তু এ ত্রুটি সেরে নেবার জন্য আমি আর একদিনও অপেক্ষা করতে চাই না···

এক-নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়া দীপক থামিল···কি বলিয়াছে, যেন তার অর্থ বুঝিবার উদ্দেশ্যে···

গার্গী দেবী প্রশান্ত স্বরেই বলিলেন,—সুধার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবে, স্থির করেছো ?

দীপক কহিল,—ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবো···মানে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে···

গার্গী দেবী সুধার পানে চাহিলেন। চকিত-দৃষ্টি···তারপর দীপকের পানে চাহিয়া বলিলেন,—তার পর ?

এ প্রশ্নে দীপক যেন চমকিয়া উঠিল ! তার পর···কি ? সে সম্বন্ধে এখনো সে কিছু স্থির করিতে পারে নাই !

বলিল,—আমার মা সুধাকে পাবার জন্য আকুল অধীর। মার কাছে সুধাকে নিয়ে যাবো। তার পর সুধার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি সুব্যবস্থা করবেন।

গার্গী দেবী কহিলেন,—সুধার বিয়ে দেবেন মা ?

দীপক কহিল,—ঘর-সংসার মেয়েদের সবচেয়ে বড় কর্ম্মক্ষেত্র আর কামনার বস্তু···নয় কি ?

উদ্গত নিশ্বাস ফেলিয়া গার্গী দেবী বলিলেন,—তাতে সন্দেহ নেই···কিন্তু সে-সৌভাগ্য থেকে যারা বঞ্চিত···

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দীপক বলিল—সুধা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে, এ কথা আপনি মনে করেন ?

গার্গী দেবী হাসিলেন, কহিলেন,—ছেলেমানুষ তুমি, বাবা—সংসারে মানুষ কি মন নিয়ে বাস করছে···সে মনের কোথায় কি আছে, তার খপর জানো না !

দারুণ বিস্ময়ে দীপক কহিল—তার মানে ?

গার্গী দেবী কহিলেন—তার মানে বলতে হলে সুধার সামনে বলবো না···দু'দিন তুমি কাশীতে থেকে যেতে পারবে ? তাহলে কাল এ সম্বন্ধে তোমাকে আমার কথা বলতে পারি। সুধা যদি তোমার সঙ্গে যায়, তাতে আমার আপত্তি থাকতে পারে না। যদি ঘর-সংসার পেয়ে সুখী হয়, আমি তাতে সুখী বৈ অসুখী হবো না !···তা কাল একবার আসতে পারবে ?···এখানে থাকতে বলতুম। কিন্তু তোমার তাতে কষ্ট হতে পারে।

দীপক কহিল—আমি কাল আসবো···আপনি বলচেন···আপনার কথা নিশ্চয় আমি শুনবো। সুধাকে আপনি মরণের কূল থেকে তুলে আশ্রয় দেছেন···নিরাপদ আশ্রয়। আপনার অনুমতি না পেলে সুধাকে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না !···তাই হবে···কাল আমি আসবো··· কখন, বলুন ?

গার্গী দেবী কহিলেন—সকালে···যদি আপত্তি না থাকে, এইখানে এসে চা খেয়ো···

দীপক কহিল চা খেয়েই আমি আসবো'খন···

এবং পরের দিন সকালে দীপক আবার আসিল।

গার্গী দেবী বলিলেন,—বসো।···যে কথা বলছিলুম, সে কথা বুঝতে হলে তোমায় একটি গল্প বলবো। তোমাদের উপন্যাসের রচা গল্প নয়···সত্যিকারের মানুষের সত্যি গল্প··· অর্থাৎ জীবনে যা ঘটেছিল !···একটি ডাগর মেয়ের কথা। মেয়েটির বয়স তখন সতেরো বৎসর—পশ্চিমে থাকতো বাপের কাছে। মা মারা গিয়েছিলেন, মেয়েটির বয়স তখন সাত বৎসর। বাপ সামান্য চাকরি করতেন। সতেরো বৎসর বয়সে বাপ মারা গেলেন। মেয়েটি নিরাশ্রয় হলো। বাপ যে-অফিসে কাজ করতেন, সেই অফিসের এক ভদ্রলোক—বয়স তাঁর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর—নিরাশ্রয় মেয়েটিকে তিনি দিলেন আশ্রয় তাঁর বাড়ীতে। এ ছেলেটি বিয়ে-থা করেনি···বাড়ীতে থাকতো সে আর তার বুড়ো মা। তাদের আশ্রয়ে মেয়েটির প্রায় দেড় বৎসর কাটলো। বুড়ো মা বললেন, বামুনের মেয়ে ডাগর হয়েছে রে ! শুধু তাকে অন্ন-বস্ত্র দিলে তো চলবে না বাবা, তার বিয়ে দিতে হবে ; তবেই ওর রক্ষার উপায় হবে ! ছেলেটি কায়স্থ কিন্তু বড় ভালো। ছেলেটি বললে, এখানে সুপাত্র কোথায় পাবো মা ? মা বললেন, ছুটী নাও ; নিয়ে কলকাতায় গিয়ে পাত্র ঠিক করো। ছেলেটি তাই করবে স্থির করলো। পশ্চিমে প্রথমেই দু'চারজনের কাছে পাত্রের সন্ধান করতে লাগলো। একজন ব্রাহ্মণ রাজী হলো, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে দায়-মুক্ত করবে—কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্রী অখ্যাতি ছিল। কাজেই তার হাতে কন্যাদান সম্ভব হলো না। মেয়েটি দেখতে—সকলে বলতো, সুশ্রী···লেখা-পড়াও জানতো। আশ্রয়দাতার সংসারে তার জন্য দুশ্চিন্তা জেগেছে দেখে সে একদিন বললে, বিয়ে সে করবে না··· কোনো মেয়ে-স্কুলে চাকরী করে কোনোমতে দিন কাটাতে

পারবে। বুড়ো মা বললেন, আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না, বাছা। ছেলেটির ভালো চাকরী—স্বভাব-চরিত্র ভালো—সেজন্য তার হাতে কন্যাদান করবে বলে' ক'জন ভদ্রলোক মহাব্যস্ত ছিলেন। ছেলেটি বললে, মেয়েটির সুব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সে নিজের সম্বন্ধে কোনো কিছু করবে না। শেষে ছুটী নিয়ে বুড়ো মা আর মেয়েটিকে সঙ্গে করে ছেলেটি এলো কলকাতায়। সন্ধানে পাত্র মিললো গেরস্থ-ঘরে। পাত্রের প্রথম স্ত্রী গত হয়েছিল···মেয়েটিকে রূপসী দেখে তার খুব পছন্দ হলো এবং বিয়ে হয়ে গেল···বিয়ের পর ছ'মাস মেয়েটির সুখে কাটলো···অর্থাৎ কোনো দিকে কোনো বিরোধ জাগেনি। তারপর কেমন মানুষের মন! পশ্চিমের সেই দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোক কি কারণে খুঁজে-পেতে ঠিকানা জেনে সে এলো কলকাতায় মেয়েটির স্বামীর কাছে। এসে নানা মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে গেল···বললে, অত-বড় মেয়ে যাদের ঘরে ছিল, তারা রাখতে পারলো না, তার কারণ, মেয়েটিকে গছিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না বলে'···এ-সব কুৎসা শুনে তার সত্য-মিথ্যার কোনো সন্ধান না নিয়েই স্বামী গর্জ্জন তুললো। বললে—কুলটা স্ত্রী···ভ্রূণহত্যা করে' তার ঘরে এসে আশ্রয় নেছে।

মেয়েটির মনে ছিল তেজ···এ-অপমানের উত্তরে সে শুধু বললে—মিথ্যা কথা! যাঁকে কেন্দ্র করে এ মিথ্যা কুৎসার সৃষ্টি, তাঁর পায়ের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা নেই স্বামীর···এই কথা বলে' মেয়েটি তার নিজের হাতে-গড়া ছোট সংসার ত্যাগ করে পথে চলে এলো···পথে পথে ঘুরে বেড়ালো···আশ্রয় মিললো বেলুড়ে। সন্ধান পেয়ে স্বামী পরে এসে ক্ষমা চাইলো,···বললে,—ফিরে এসো···

মেয়েটি গেল না। বললে, যে-মনে একবার সন্দেহ-বিষ ঢুকেছে, সে-মনের বিষ সারবার নয়! বিশ্বাসের উপরে ভর করে' চলেছে সমস্ত জগৎ। সে-বিশ্বাস একবার ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগে না···

মেয়েটি সেবার কাজে নিজেকে দিল সঁপে···

কাহিনী বলিয়া গার্গী দেবী মৃদু হাস্য করিলেন, পরে বলিলেন,—সুধার সম্বন্ধে আমার মনে ঐ ভয়ই জেগে আছে সারাক্ষণ। আমি বিশ্বাস করি, সে রাত্রে সুধাকে নিয়ে মোটরে বেড়াতে যাওয়া···তার মধ্যে কোনো দোষ নেই···নিছক স্নেহের ব্যাপার। কিন্তু যারা সুধাকে জানে না, তোমাকে জানে না, তারা সেই নির্দ্দোষ বেড়ানোটুকুর আড়ালে মনে-মনে কত কি গড়ে ইতর সন্দেহে তোমাদের দুজনকে বিদ্ধ করবে, এই কথা ভেবে আমার ভয়ের সীমা নেই! মানুষের মন বড় জটিল··তার কোথায় বিষ আছে···কেউ জানে না···সে বিষ কিসে মনকে ছেয়ে বসবে, তার ঠিক ঠিকানা নেই! তাই ভয় হয়···যে সরল বিশ্বাসের উপর স্বামি-স্ত্রীর ভালোবাসা আর সংসার গড়ে ওঠে, সে বিশ্বাসের গোড়া আলগা হলে স্বামি-স্ত্রী, সংসার···সব মিথ্যা হয়।

দীপক শুনিল···কিন্তু সুধার সম্বন্ধে মনের আবেগ এত গভীর যে সে-কথা মনে থিতাইতে পারিল না···

দীপক কহিল—আপনি যা বললেন, ও আপনার কল্পনা মাত্র!

গার্গী দেবী বলিলেন—যদি বলি, ঐ মেয়েটিই আমি···?

দীপক চমকিয়া উঠিল। তার মুখের উপর কে যেন সবলে কশাঘাত করিল। [ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নোবেল প্রাইজ

সাহিত্যে এ বৎসরের নোবেল্ পুরস্কার "দী গুড্ আর্থ" প্রভৃতির যশস্বিনী লেখিকা শ্রীমতী পার্ল এস বাক্‌কে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট-ভার্জ্জিনিয়ার হিল্‌স্‌বরো-সহরে শ্রীমতী পার্লের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন চীনে ইয়াংশি নদীতীরে চুকিয়াং-প্রদেশে পাদরী। এইখানেই শ্রীমতী পার্ল' চীনাভাষা শিক্ষা করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-অধ্যাপক শ্রীযুত জে লসিং বাকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। চীনাদের সরল জীবনের নানাকথা লইয়া তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আরও তিনজন লেখিকা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন—সেলমা লেজারলফ; গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা; সিগরিড আণ্ডশেট।

ভারতীয় সামন্ত রাজ্যে জাতীয় আন্দোলন

এদেশের কোন কোন অঞ্চলে সামন্ত নরপতিগণের সনদ বাতিল করিবার জন্য দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কটকের কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্য শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতব যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, উড়িষ্যার প্রায় সকল সামন্ত রাজ্য হইতেই নানাপ্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি অভিযোগ অত্যন্ত গুরু, এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—যথা, অর্থদণ্ড, শারীরিক দণ্ড এবং কখন কখন সশস্ত্র পুলিসের সাহায্যে বেগার খাটাইতে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাওয়া; রাজকীয় উৎসবাদি উপলক্ষে বলপ্রয়োগে মাগন বা যৌতুক আদায় করা; লবণ, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে অবশ্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন, সুব্যবস্থিত আইনের অভাব এবং প্রজাবর্গকে না জানাইয়া স্বেচ্ছাচারপূর্ণ আইন ও আদেশ-প্রবর্ত্তন; দীর্ঘকালব্যাপী যে কুশাসনে প্রজাবর্গের জীবন, সম্পদ্ এবং নারীজাতির সম্মান পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে, সেইপ্রকার আইন বা আদেশ প্রচার; রাজ্যের ন্যায্য আয় অপেক্ষা ক্রমশঃ অধিকতর অর্থ রাজকোষভুক্ত করিবার কুব্যবস্থা; রাজ্যের শাসন বিভাগের সাহায্যে সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। বস্তুতঃ, ঐ সকল ব্যবস্থায় কেহ শান্তভাবে বাস্তুভূমিতে বাস করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

উড়িষ্যার কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে সংপ্রতি যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সেই সকল ঘটনা দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঐ সকল রাজ্যের অধিবাসিবর্গের জীবনধারণ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ আশা করা গিয়াছিল যে, শীঘ্রই ঐ সকল অনাচার নিবারিত হইবে, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ঐ প্রকার অনাচার অনুষ্ঠিত না হয়, এ বিষয়ে রাজ্যের শাসক সম্প্রদায় জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ঐ সকল অনাচার নিরাকরণের দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না; এবং কোন না কোন অজুহাতে প্রজাসাধারণের এই সকল আন্দোলন দমন করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ সকল সামন্তরাজের সনদ বাতিল করিবার প্রশ্ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার উপায় লক্ষিত হইতেছে না। উড়িষ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যসমূহের অধিবাসিবর্গের জীবন, সম্পত্তি ও অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতিলাভের সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় উড়িষ্যার কংগ্রেস-সরকার কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া যদি এই সকল রাজ্যের উৎপীড়িত অসহায় প্রজাপুঞ্জের দুর্গতি নিবারণের চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের একটি গুরুকর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিবে, এবং ঐ সকল সামন্তরাজ্যের প্রজাপুঞ্জ কংগ্রেসের শক্তিতে নির্ভর করিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা কংগ্রেসের শুভাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইলে প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালাইতে সাহস করিবে। এই প্রকার সংগ্রামের ফলে ভারত সরকারও তাহাদের অভিযোগের প্রতিকারে যত্নশীল হইবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

বর্দ্ধমানে বিসর্জ্জন-সঙ্কট

বিগত কালী-পূজার পর কি কারণে এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে কালী-প্রতিমার বিসর্জ্জন হয় নাই, এবং বর্দ্ধমানের হিন্দু সমাজ হিন্দুর চিরাচরিত পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠক সমাজের অজ্ঞাত নহে। বর্দ্ধমানের যে পথে এত দিন হিন্দুর শোভাযাত্রা বাদ্যসহ প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছে, সেই পথে কালী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের বাদ্যসহ শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকারের মুসলমান স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীনের ইঙ্গিতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমান নাগরিকবর্গের অনুকূলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কি না, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; তবে বর্দ্ধমানের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ব্ব-মত পরিবর্ত্তনের কারণ রহস্যপূর্ণ বটে! বর্দ্ধমানের হিন্দুরা স্থির করিয়াছেন—তাঁহাদিগের সঙ্গত দাবী গ্রাহ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা কালী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য পথে বাহির করিবেন না। তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান সরকার ঘোষণা করুন, তাঁহাদের আমলে হিন্দুর

ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের চিরাচরিত নিয়ম রহিত করা হইল। কিন্তু সরকার যে কারণেই হউক, সেরূপ ঘোষণা না করিয়া এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "যদি কেবল বর্ত্তমান বৎসরের জন্য হিন্দুরা কালীপূজার শোভাযাত্রা অন্য পথে লইয়া যান, অথবা (নামাজের সময় না হইলেও) ভেড়ীখানা ও বড়বাজার মসজেদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করেন, তবে ভবিষ্যতে সব শোভাযাত্রা বাদ্যসহ নামাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইতে পারিবে। অন্য যে পথে শোভাযাত্রা যাইবে, সে পথে যদি মসজেদ থাকে, তবে নামাজের সময় না হইলে তাহার সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ শোভাযাত্রায় মুসলমানরা আপত্তি করিবেন না। এই ব্যবস্থা মুসলমানরা এক বৎসরের জন্য চাহিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন—ইহা নজীর বলিয়া বিবেচিত হইবে না।"

বস্তুতঃ ইহা স্থানীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানগণের অসঙ্গত আবদার ভিন্ন আর কি মনে করা যাইতে পারে? বলা বাহুল্য, বর্দ্ধমানের হিন্দু সমাজ এই আবদারে কর্ণপাত করেন নাই; সুতরাং এই সমস্যার মীমাংসার কোন সম্ভাবনা লক্ষিত হইল না, উভয় পক্ষে নানা প্রকার আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানগণের সঙ্কল্প অটুট রহিল; হিন্দুরাও তাঁহাদের সঙ্গত দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না।

অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্কটজনক, সেই সময় বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিব স্বয়ং বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছায় কি পরিমাণে আন্তরিকতা ছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক, প্রধান সচিব মিঃ এ, কে, ফজলুল হক গত ৩০এ অক্টোবর বর্দ্ধমানে গমন করিয়া প্রথমে বর্দ্ধমানের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলোতে, এবং পরে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের প্রাসাদে নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান নেতার সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বর্দ্ধমানে গমন করায় স্থানীয় হিন্দুগণের মনে বোধ হয় এই দুরাশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তিনি মধ্যস্থতা করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন, এবং কালী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের বাধা অপসারিত হইবে; অতঃপর স্থানীয় হিন্দুগণের অনুযোগের কোন কারণ থাকিবে না। তাঁহাদের এই প্রকার ধারণা যে অসঙ্গত, এরূপ মনে করিবার কারণ ছিল না; যেহেতু, মিঃ হক লীগপন্থী মুসলমান বলিয়া আপনাকে জাহির করিলেও হিন্দু-মুসলমানের দেশে তিনি সরকারের প্রধান সচিব; তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মানুরাগ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে না, এবং তাঁহার পদের দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হইবেন না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলোতে যে কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত হইয়াছিলেন, প্রধান সচিব তাঁহাদিগকে বিরোধ আপোষে মিটাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন, সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন; কিন্তু তাঁহার এই মন্তব্যের উত্তরে তাঁহাকে বলা হয়—চির দিন যে সকল রাস্তা দিয়া কালী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা গমন করে, সেই সকল পথে শোভাযাত্রার লাইসেন্স মঞ্জুর না করিয়া সরকার পূর্ব্বেই এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই সুস্পষ্ট অভিযোগের প্রতিবাদে প্রধান সচিবের কোন কথা বলিবার ছিল না। তিনি স্বয়ং বিরোধ নিষ্পত্তি না করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্থানীয় মুসলমান নেতৃবর্গের অসঙ্গত দাবী ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ বা আদেশ করিতে তাঁহার সাহস হইলে সম্ভবতঃ একটা মীমাংসা হইতে পারিত; কিন্তু প্রধান সচিব সে সাহস প্রকাশ করেন নাই। হিন্দুরা সাধারণের রাস্তাসমূহের উপর দিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য তাঁহাদিগের চিরকালের অধিকার লাভের এবং কোন শোভাযাত্রায় যাহাতে কোন গোলযোগ বা উপদ্রব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতির যে দাবী করেন, মুসলমান-নেতৃবর্গ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সম্মিলনে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। প্রধান সচিব স্থানীয় মুসলমানগণকে তাঁহাদিগের অসঙ্গত দাবী ত্যাগের জন্য অনুরোধ করিতে সাহসী না হওয়ায় তাঁহাকে মীমাংসায় অকৃতকার্য্য হইয়া বর্দ্ধমান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। হিন্দুরা তাঁহাদের সঙ্গত দাবী ত্যাগ করিবেন—ইহাই কি তিনি আশা করিয়াছিলেন? যাহা হউক, কালী-প্রতিমা বিসর্জ্জনের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় হিন্দুরা জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিসর্জ্জনও বন্ধ রাখিয়াছেন। অতঃপর এই বিসর্জ্জন-সমস্যার কিরূপে মীমাংসা হয়, তাহা দেখিবার জন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে

প্রতীক্ষা করিতেছেন। বর্দ্ধমানের হিন্দু-নেতৃবর্গ বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার পরিচালকবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও মীমাংসার কোন পন্থা লক্ষিত হইতেছে না। মুসলমান-প্রধান সচিবসঙ্ঘ হিন্দুদিগের ধর্ম্মাচরণের পথ মুক্ত করিবার কোন ব্যবস্থা করিবেন, তাহার সুদূর-সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিচারে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্কট এরূপ জটিল হইত না বলিয়াই সাধারণের ধারণা। যাহারা পক্ষভুক্ত, তাঁহাদের ইঙ্গিতে কর্ত্তৃপক্ষ প্রভাবিত হইলে নিরপেক্ষ বিচারের সম্ভাবনা থাকে কি?

বর্দ্ধমানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর হিন্দুর পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। গত ২১শে কার্ত্তিক বাঙ্গালার প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খোলা চিঠির জবাবে যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতে মিঃ ফজলুল হক লিখিয়াছেন,—"আমি কি কখনও মুসলমানের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য হিন্দুর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছি?" এ সম্বন্ধে তিনি প্রমাণ দিবার জন্য বিজয় বাবুকে অনুরোধ করিয়াছেন। বিজয় বাবু কি উত্তর দিবেন তাহা পরের কথা। কিন্তু বর্দ্ধমানের হিন্দুগণ এবং হিন্দু জনসাধারণ তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তাঁহার প্রধান সচিবত্বে বর্দ্ধমানের রাজপথ হিন্দুর প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য রুদ্ধ করিয়া তিনি কাহার স্বার্থ রক্ষা করিয়াছেন? ইহা কি হিন্দুর ধর্ম্ম ও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ নহে?

আম্বেদকরের মুখের মত জবাব

ডাক্তার আম্বেদকর সকল ব্যাপারেই হরিজনগণের মোড়লী করিয়া থাকেন। মহাত্মা গান্ধীও তফশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের এই স্বয়ংসিদ্ধ মোড়লের মোড়লী মানিয়া লওয়ায় ডাক্তার আম্বেদকর যখন-তখন হরিজনদের পক্ষাবলম্বন করিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সংপ্রতি তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে গুরু অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহার অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, বোম্বাই সরকার হরিজনদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহারা হরিজনদের জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার এই অভিযোগের উত্তরে বোম্বাই সরকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই; সম্ভবতঃ এই প্রকার অমূলক অভিযোগের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান না করিয়া 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বোম্বাই-সরকার ডাক্তার আম্বেদকরের অভিযোগের প্রতিবাদ না করিলেও হরিজনসেবক সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ এ, ভি, ঠক্কর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ ঠক্কর বলিয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ মন্ত্রী পরলোকগত র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হরিজনগণের জন্য ৭১টি আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর অনশনব্রত নিবন্ধন হরিজনরা প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে ১৪৮টি আসন লাভ করিয়াছিল; বিহার প্রদেশ হইতে উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহারা মোট ১৫১টি আসনের অধিকারী হইয়াছে, এবং বোম্বাই সিন্ধু-প্রদেশ পৃথক্ হওয়ায় বোম্বাই প্রদেশের হরিজনগণ ১০টির পরিবর্ত্তে ১৫টি আসন প্রাপ্ত হইয়াছে হরিজনদিগের ভিতর হইতে মাদ্রাজে ১ জন, বিহারে ১ জন, আসামে ২ জন, এবং যুক্তপ্রদেশে, বিহার ও মাদ্রাজে যথাক্রমে ২ জন ও এক একজন হিসাবে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু বোম্বাই পরিষদে ডাক্তার আম্বেদকর অনুচরবর্গ সহ বিপক্ষ দলে যোগদান করায় উক্ত প্রদেশে কোন হরিজন মন্ত্রিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং আম্বেদকরের অভিযোগ যুক্তিসহ নহে।

বোম্বাই সরকার হরিজনদের জন্য কিছুই করেন নাই—এই উক্তি ডাক্তার আম্বেদকরের অকৃতজ্ঞতারই নিদর্শন। হরিজন ও আদিম অধিবাসিগণের জন্য ছাত্রাবাস নির্ম্মাণে বোম্বাই সরকার কেবল যে উৎসাহ দান করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এরূপ নহে; তাঁহারা কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হরিজন ছাত্রবর্গকে বেতন প্রদান হইতে মুক্তি দিয়াছেন; অনুন্নত (তফশীলভুক্ত) শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন; হরিজনদিগের অনুকূলে মন্দির প্রবেশ আইন পাশ করা হইয়াছে; এবং তাহাদিগকে সাধারণ কূপ ব্যবহারের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বর্জ্জন-নীতি শ্রেণীহিসাবে হরিজনদিগের প্রভূত উপকারসাধনে সমর্থ হইয়াছে। বস্তুতঃ, বোম্বাই সরকার অল্পকালের মধ্যে তফশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের যে সকল উপকার করিয়াছেন, ডাক্তার আম্বেদকর একদেশদর্শী এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকাতাবাদী না হইলে বোম্বাই সরকারের উদারতা ও হরিজনগণের কল্যাণসাধনের জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও

যত্নের কথা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। ডাক্তার আম্বেদকর উচ্চশিক্ষিত ও বহুদর্শী হইলেও সঙ্কীর্ণতা ও চিত্তের ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই; ইহার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নহে। আকর হইতে যে দোষের উদ্ভব, শিক্ষা-প্রভাবে তাহা পরিমার্জ্জিত হইতে পারে কি?

—

ভূমি-রাজস্বের তদন্ত কমিশন

সমগ্র বঙ্গদেশের ভূমি-রাজস্ব প্রথার তদন্তের জন্য বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক একটি কমিটী সংগঠিত হইয়াছে। এই তদন্ত-কমিশনের উপর যে সকল কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(১) বাঙ্গালার বর্ত্তমান ভূমি-রাজস্ব-পদ্ধতির নানা বিষয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিক্ হইতে পরীক্ষা। (২) বাঙ্গালার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার উপর উক্ত পদ্ধতির ফল নির্দ্ধারণ। (৩) বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থার উপর প্রভাব নির্দ্ধারণ। (৪) বর্ত্তমান পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা নির্ণয়, এবং পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে, কিরূপ পরিবর্ত্তন কি ভাবে ও কোন্ অবস্থায় সাধন করা কর্ত্তব্য, পরামর্শ দ্বারা তাহা স্থির করা।

এই কমিটীর সদস্যগণের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে বিস্ময় বোধ করিবেন। এই সকল সদস্যের গবেষণার ফল কিরূপ হইবে - তাহাও অনুমান করা কঠিন। কারণ, এদেশে বহু অর্থব্যয়ে যে সকল কমিশন সংগঠিত হয়, তাহাদের কার্য্যারম্ভ কালের আড়ম্বর দেখিয়া রামধনুর বিচিত্র বর্ণরাগের ন্যায় নয়ন-মন মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাদের অস্তিত্বের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এদেশে অনেকগুলি কমিশন পূর্ব্বে আড়ম্বরসহকারেই আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের শেষ ফল দেশবাসীর অজ্ঞাত ছিল। ভূমি-রাজস্বের তদন্ত কমিশনের শেষ ফল সেইরূপ লঘু ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত না হইলেই অর্থব্যয় সফল হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই কমিশনের হিন্দু-সদস্যগণের নামের তালিকায় যেমন কোর্টের ওয়ার্ড বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সার বিজয়চাঁদ মহাতাপের নাম আছে, সেইরূপ সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নামও দেখিতে পাওয়া গেল; কিন্তু ভূমি-রাজস্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালার যে সকল অধিবাসীর হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের কাহারও নাম এই তালিকায় দেখিতে পাওয়া গেল না। তালিকায় যে সকল মুসলমান সদস্যের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ সংখ্যায় তাহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় আরও দুইজন মুসলমান সদস্যের এবং তফশীলভুক্ত জাতির একজন সদস্যের নাম পরে প্রকাশিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; তাঁহাদের নাম এখনও কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন; কিন্তু ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য থাক না থাক, সম্প্রদায়গত সংখ্যার অনুপাতে মাথা গণিয়া এই তদন্ত কমিশনের সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে; সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের আদর্শই এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কিন্তু প্রকৃত তথ্য নিরূপণের পক্ষে এই প্রকার মাথাগণতি ব্যবস্থার উপযোগিতা স্বীকার করিবার উপায় নাই।

ইহার উপর আরও একটি কথা আছে। এই তদন্ত কমিশনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশে, এমন কি, নিখিল ভারতে একজনও যোগ্য লোক মিলিল না, অনেক চিন্তার পর ইংলণ্ড হইতে ইহার সভাপতি আমদানী করিতে হইল! বাঙ্গালার পক্ষে আমরা ইহা লজ্জার বিষয় বলিয়াই মনে করি। কিন্তু এজন্য বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিবই দায়ী নহেন কি? এই সচিব-সঙ্ঘ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিয়াও চাকরী বজায় রাখিবার জন্য সকল বিষয়েই সর্ব্বতোভাবে শ্বেতাঙ্গ সমাজের কৃপা-প্রার্থী; তাঁহাদিগের অনুগ্রহে নির্ভর করা ভিন্ন এই সকল সচিবের গত্যন্তর নাই, এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই এই কমিশনের সভাপতি নির্ব্বাচনের উপযুক্ত লোক এদেশে সংগ্রহ না করিয়া বহু অর্থব্যয়ে লণ্ডন হইতে সার ফ্রান্সেস্ ফ্লাউড্‌কে আনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তিনি এই স্বদেশীয় নৈবেদ্যের শিরোভাগে কেকের ন্যায় বিরাজ করিয়া বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘের স্বাবলম্বন ও যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিবেন। এদেশের অনেকের ধারণা, যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন-ভার শ্বেতাঙ্গের হস্তে ন্যস্ত হয়, সেই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য যে ভাবেই পরিচালিত হউক, তাহার ইজ্জৎ বাড়িয়া থাকে। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশের জন-সাধারণের এই প্রকার গোরাপ্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন, "ওদের বাড়ীর পূজায় এবার

বড় ধুম, গোরায় লুচি ভাজবে!"—এতকাল পরেও কি এই দাস মনোবৃত্তির কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিয়া নিত্য যাঁহারা নানাভাবে তাহার অপপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা কত কালে মেরুদণ্ডে নির্ভর করিতে পারিবেন, তাহা অনুমান করা অসাধ্য।

পাটকল অর্ডিনান্স

বাঙ্গালা সরকারের পাটকল অর্ডিনান্স সমগ্র দেশের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে। গত ২৯শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু উক্ত অর্ডিনান্সের প্রতিবাদ করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ৩১শে অক্টোবর কলিকাতার মনুমেণ্টের পাদদেশে যে শ্রমিক-সভা হয়, তাহাতে প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিক সমবেত হইয়া তীব্রভাবে পাটকল অর্ডিনান্সের প্রতিবাদ করিয়াছে। এই পাট-অর্ডিনান্স তুলিয়া লইবার জন্য দৃঢ়ভাবে শ্রমিকদল দাবী জানাইয়াছে।

এই অর্ডিনান্স জারি হইবার পূর্ব্বে পাটের মূল্যবৃদ্ধির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু উহা জারি হইবার পর মূল্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। চটকল সমিতির হিসাবে দেখা যায়, ১৪ হাজার ২ শত ৫৮ জন শ্রমিক বেকার হইয়াছে। ভবিষ্যতে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না এমন নহে। বাঙ্গালার পক্ষে ইহা ভীষণ শোচনীয় অবস্থা।

পাটকল অর্ডিনান্স জারি করিবার সময় বাঙ্গালার অর্থ-সচিব বলিয়াছিলেন, পাটচাষীর মঙ্গলের জন্যই এই অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছে। তাঁহার যুক্তি, অনিয়ন্ত্রিত পাট উৎপাদনে পাট হইতে উৎপন্ন পদার্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং শেষ পর্য্যন্ত পাটের মূল্যও কমিয়া যায়। কিন্তু ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বাঙ্গালা সরকারের কাছে ভারত সরকার এ বিষয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ত্তমান অর্থ-সচিবের এই যুক্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়াছিলেন। ভারত সরকার বলিয়াছিলেন, পাটের মূল্য জগতের চাহিদার উপর নির্ভর করে।

পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া পণ্য-সম্পদ্। পাটের দাম ইদানীং এত হ্রাস পাইয়াছে যে, পাট উৎপন্ন করিয়া কৃষকদের লাভ ত দূরের কথা, লোকসানই হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কিসে পাটের দাম বৃদ্ধি পায়, সে দিকে চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালার সরকার পাট চাষ কমাইবার চেষ্টা করিলেন। পাট চাষ হ্রাস করিয়া অবশিষ্ট জমিতে সরকার ইক্ষু ও চীনা-বাদাম ফসলের চাষের প্রচার করিয়াছিলেন।

দেখা যাইতেছে, এই অর্ডিনান্সের ফলে পাটের মূল্য সামান্য পরিমাণেও বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহাতে কৃষকের দুর্দ্দশা বাড়িতে পারে, কমিবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে কৃষকদিগের প্রতিবাদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এই অর্ডিনান্সের ফলে বহু শ্রমিক বেকার হইল এবং যাহারা কর্ম্মচ্যুত হইবে না, তাহাদিগের পারিশ্রমিক হ্রাস হইল।

অবশ্য শ্রমিকদিগের কাযের সময় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাটকলের মালিকরা পারিশ্রমিক হ্রাস করিলেন।

কয় বৎসর ধরিয়া পাটকল সমিতি এই অর্ডিনান্সের মত একটা ব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এতকাল তাঁহাদিগের সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। বর্ত্তমান সচিব-সঙ্ঘ যখন অস্তিত্বরক্ষাকল্পে য়ুরোপীয়গণের শরণাপন্ন হইলেন, তাহার পরই এই অর্ডিনান্সের উদ্ভব।

কৃষক ও শ্রমিকের ক্ষতির বিনিময়ে কলের মালিকদিগের উপার্জ্জন বর্দ্ধিত হইলে, তাহা কি কেহ সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারে? পাটের মূল্য বৃদ্ধি না হইলে দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ কোটি কোটি কৃষকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইবে —তাহারা চরম দুঃখে নিপীড়িত হইতে থাকিবে। যাঁহারা প্রজার "ডাল-ভাতের" ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহারা অনশনক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত প্রজার দিকে চাহিলেন না। ভোটের জোরে যে য়ুরোপীয় দল সচিবসঙ্ঘকে হঠাইয়া দিলেন, তাঁহাদিগেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হইল।

এই অর্ডিনান্সের তীব্র প্রতিবাদ চলিয়াছে। বাঙ্গালার কৃষক ও শ্রমিকদিগের রক্ষাকল্পে এই সর্ব্বনাশকর অর্ডিনান্স তুলিয়া দেওয়া আশু কর্ত্তব্য।

দেশীয় রাজ্যে অনাচার

কিছুদিন হইতে দেশীয় সামন্ত-রাজ্যগুলিতে কঠোর হস্তে দমন-নীতি পরিচালিত হইতেছে—বেপরোয়া গুলীও চলিয়াছে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রচণ্ড দমননীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

দেখাদেখি কয়েকটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যেও স্বৈর শাসনের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ঢেনকানল, তালচের, আখগড় প্রভৃতি উড়িষ্যার অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্যে যেরূপ অনাচারের পরিচয় প্রকট, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। বিশেষতঃ ঢেনকানল রাজ্য সকলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই সকল রাজ্যের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। প্রজার নিকট হইতেই নানা প্রকারে টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার ফলে ঢেনকানলের প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। দরবারের আদেশে প্রজাকে বিনামূল্যে খাদ্য যোগাইতে হয়। বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রাজাকে রাজস্বের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হয়।

সামন্ত রাজ্যগুলিতে প্রজার অধিকারের দাবী এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমিত করিবার চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। অথচ এই অধিকারলাভের চেষ্টা প্রজাসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। বৃটিশ-ভারতের জনসাধারণ যে অধিকার সম্ভোগ করিবার অধিকারী, সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রজারা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

সামন্ত রাজ্যগুলির শাসকগণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সহিত সুপরিচিত থাকিলে রাজনীতিক ও নাগরিক অধিকারের দাবী মিটাইবার ব্যবস্থা করিতেন। তাহা না হইলে এই সকল অসুবিধা হইতে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

হায়দ্রাবাদ মুসলমান-রাজ্য। সেখানকার হিন্দু প্রজাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তাহাদিগকে নানা প্রকার অধিকারে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। সেখানে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮০, সে ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তাহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই। প্রজাদিগের প্রধান অভিযোগ, তাহারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারে বঞ্চিত, এজন্য সেখানে সত্যাগ্রহ চলিয়াছে। অনেক ব্যক্তি ধৃত অবস্থায় কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে।

এরূপ ব্যবস্থা কখনই কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে না। ভারত সরকার রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। এই প্রকার স্বৈরশাসন-দোষযুক্ত সামন্ত রাজ্যগুলিকে তাঁহারা যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘে গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে ভারতের অবশিষ্ট অংশের অধিবাসীরা কখনই তাহা সমীচীন মনে করিবে না। সামন্ত রাজ্যগুলির শাসকগণ স্বৈর-শাসনপদ্ধতি বর্জ্জন না করিলে, কেহই এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে করিতে পারিবে না। ইংরেজ-শাসকগণ স্বৈরশাসন-বিলাসী সামন্ত নরপতিদিগকে এই অবাঞ্ছনীয় পদ্ধতি ত্যাগ করাইতে পারিবেন কি? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে অসন্তোষ দিন দিন পুঞ্জীভূত হইতেই থাকিবে।

——

রাজনীতিক বন্দীদিগের মুক্তি

এখনও কয়েক শত রাজনীতিক বন্দী কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দুঃখপূর্ণ শোচনীয় জীবন-যাপন করিতেছে। তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদানের কোন ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সরকার এ বিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন। যে সকল বন্দী ইতোমধ্যে মুক্তি পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে। মুক্তিলাভের পর বাঙ্গালায় তাহারা কোন প্রকার বিভীষিকা বা আতঙ্ক সৃষ্টি করে নাই। তাহারা বিপ্লববাদের পথ ত্যাগ করিয়াছে। যে সকল বন্দী এখনও মুক্তিলাভ করে নাই, তাহারা এখন আর বিপ্লববাদের সমর্থক নহে। সে পথ যে ভ্রান্ত তাহা তাহারা স্বীকার করিয়াছে। তথাপি তাহাদিগের মুক্তিদানের ব্যবস্থা এখনও হইল না। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল প্রতীচ্যদেশে যাইবার পূর্ব্বে প্রকাশ্য ঘোষণায় বলিয়াছিলেন, যত দিন এক জন রাজনীতিক বন্দীও কারাগারে থাকিবে, ততদিন আন্দোলন বন্ধ হইবে না।

কিন্তু এখনও কয়েক শত পুরুষ ও নারী রাজনীতিক বন্দী মুক্তিলাভে বঞ্চিত। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘ তাহাদিগকে মুক্তি প্রদানের জন্য সচেষ্ট নহেন। অথচ দেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য—এই সকল বন্দীকে মুক্তিদান করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন করা। এখন সেই আন্দোলন অবিশ্রান্তভাবে যাহাতে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ অবহিত হউন। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নূতন উদ্যমে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা করুন। দেশবাসী প্রত্যেক রাজনীতিক বন্দীর মুক্তি চাহে।

বাঙ্গালায় ব্যয়সঙ্কোচ-নীতি

বাঙ্গালা সরকারের সচিবসঙ্ঘ তাঁহাদিগের প্রকাশিত প্রচার-পত্রে 'বঙ্গীয় সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ-নীতি'র যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির' কথা সকলেরই মনে পড়িবে। বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর অধিবাসী কিছু দিন হইতে অর্থ-সঙ্কটের শেষ সোপানে উপনীত হওয়ায় তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই; এ অবস্থায় বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘ সরকারের আয়বৃদ্ধির যে সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার শেষ ফল কি, দেশের লোক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই সচিবসঙ্ঘের বোধ হয় ধারণা, তাঁহারা কাগজে-কলমে যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য সেই পন্থায় পরিচালিত হইবে; সে জন্য জনসাধারণের অর্থসঙ্কটের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের বুদ্ধির ভাণ্ডে বিচার ও বিবেচনাশক্তি কি পরিমাণে সঞ্চিত আছে, তাঁহাদিগের গবেষণার গভীরতা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না কি? তাঁহারা দেশের লোককে ভরসা দিয়াছেন, "এই সকল ব্যাপারের আলোচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।"

প্রথমে বলা হইয়াছে, ব্যয়সঙ্কোচ ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত বাঙ্গালা সরকারের বিশেষ কর্ম্মচারী চল্লিশটিরও অধিক বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন; এই গবেষণার ফলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, যে সকল বিষয়ে ব্যয়সঙ্কোচ করা যাইতে পারে, ভূতপূর্ব্ব সরকার (সাদা আমলাতন্ত্র?) তাহাদের কোনটিই বাদ রাখেন নাই।

কথাটা খাঁটি সত্য, তাঁহারা যখন তামাকের গুলে ট্যাক্সের তুষানল প্রজ্বালিত করিতে, এবং দিয়াশলাইএর কাঠী গণিয়া তাহার উপর ট্যাক্সের হার বাঁধিয়া দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই, এবং কিছু দিন পূর্ব্বে যে অহিফেনের ভরি দশ বারো আনায় মিলিত, ট্যাক্সের প্রভাবে তাহার মূল্য এক টাকা চৌদ্দ আনায় উঠিল, তখন ট্যাক্স বসাইবার কোন্ সুযোগ তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা দেশবাসিগণের অগোচর নহে কি? এই সকল আয়বৃদ্ধি কি ব্যয়হ্রাসের দ্যোতক?

কিন্তু বর্ত্তমান সচিব-সঙ্ঘের আমলে কিঞ্চিৎ বাহাদুরী দেখাইতে না পারিলে কি করিয়া তাঁহাদের ইজ্জৎ বজায় থাকিবে? এই জন্য বিশেষ বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, বিভাগীয় কমিশনার এবং পুলিসের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেলগুলির সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে; কিন্তু ইহা সপরিষদ ভারত-সচিবের অনুমোদনসাপেক্ষ।

বাঙ্গালা সরকার এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে বৎসরে ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হ্রাস হইত; কিন্তু বাঙ্গালা সরকার এ জন্য ভারত-সচিবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না, দেশের লোক তাহা জানিতে পারে নাই।

অতঃপর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গঠিত অন্য এক কমিটীতে স্থির হয়—বাঙ্গালায় যে ৫ জন বিভাগীয় কমিশনার আছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ৩টি পদ বাহাল রাখা হউক। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় হ্রাস হইতে পারিত।

আসামে যে দুইজন বিভাগীয় কমিশনার আছেন, ভারত-সচিব তাঁহাদিগের একজনের পদবিলোপের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন; সুতরাং বাঙ্গালা সরকারের অধীন উক্ত ৫টি পদের কোন কোনটি রহিত করিবার জন্য ভারত-সচিব নির্দ্দেশ দান করিতেও পারেন; কিন্তু বাঙ্গালা সরকার একাল পর্য্যন্ত তাঁহার অভিমত জানিবার চেষ্টা করেন নাই, এবং বর্ত্তমান সচিব-সঙ্ঘের পতনের পূর্ব্বে সে চেষ্টা হইবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

প্রকাশ, প্রথম কমিটীর সিভিলিয়ান সেক্রেটারী সিভিল সার্ব্বিসের ৫টি পদ লোপের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালার গভর্ণর কর্ত্তৃক সচিবসঙ্ঘের হস্তে সরকারের অধিকাংশ কার্য্যভার অর্পিত হইলে তাঁহাদের মেহেরবাণীতে একটি অতিরিক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পদে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ আর কতকগুলি সেক্রেটারী ও স্পেশাল অফিসারও নিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং ৫ জন সিভিলিয়ানের চাকরীর অভাব হইবে না।

যে সচিবসঙ্ঘ দেশের লোকের প্রতিনিধি নহেন, যাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রিগণের বেতনের পাঁচ ছয় গুণ অধিক বেতন লইয়া চাকরী করিতেছেন, এবং যাঁহারা পকেটে হাত পড়িবার ভয়ে কাতর—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে, যাঁহারা চাকরী বজায় রাখিবার জন্য সরকারী বে-সরকারী ইংরেজগণের মনস্তুষ্টিসাধনে সদা তৎপর, এবং

ইংরেজ সিভিলিয়ানগণের জন্য নূতন নূতন পদসৃষ্টির পক্ষপাতী, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহারা ব্যয়সঙ্কোচের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিক্ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কি কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে? তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগের কোন্ নিদর্শন এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে?

ব্যয়সঙ্কোচের জন্য নাকি আরও ৬টি বিষয় বিবেচনাধীন আছে এবং তাহার উপর 'প্রভৃতিরও' উল্লেখ আছে; সচিবসঙ্ঘের মন্তব্যে প্রকাশ, বেতনের ব্যাপার ছাড়া অন্য কয়েক দফা অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহারা তিল কুড়াইয়া তাল করিবেন বলিয়া আশা করেন। সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারিগণের বেতনে তাঁহাদের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই, তাঁহাদের নিজেদের বেতন হ্রাসেরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রস্তাবগুলির উপসংহারে বোল্‌তার হুলের মত হুল বাহির হইয়াছে, বাঙ্গালা সরকার আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য কতিপয় পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন, তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত পন্থায় এই প্রদেশের রাজস্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিই সম্ভবপর হইবে।

বস্তুতঃ সচিবসঙ্ঘের কথায় দেশের লোকের আতঙ্ক বৃদ্ধি ভিন্ন আশ্বস্ত হইবার কোন কারণ লক্ষিত হইতেছে না।

স্বামী শুদ্ধানন্দ

গত ৬ই কার্ত্তিক রবিবার বেলুড় মঠের পঞ্চম মঠাধীশ বেদান্তশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ সুধীর মহারাজ ৬৬ বৎসর বয়সে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মুক্ত-আত্মা সন্ন্যাসীর দেহাবসানে শোক করিতে নাই, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনজন মঠাধীশ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন, ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। স্বামী অখণ্ডানন্দের পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মঠাধীশের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ-রক্ষার পর স্বামী শুদ্ধানন্দ অসুস্থ দেহেও সেই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহুদিন হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ ডায়েবেটীশে ও রক্তের চাপবৃদ্ধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া রোগে তিনি নশ্বর দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে ভক্তসম্প্রদায় একজন আদর্শ সাধু-দর্শনে—তাঁহার প্রত্যক্ষ কৃপাজ্ঞানলাভে চিরবঞ্চিত হইল।

স্বামী শুদ্ধানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম সুধীরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তিনি আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র। তিনি প্রতিভাবান্ ছাত্র;—প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। পাঠ্য জীবনেই তিনি দুইবার গৃহত্যাগ করেন। কলেজে বি, এ অধ্যয়ন-কালে ধর্ম্মসাধনায় শ্রীভগবানের কৃপালাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাবসানের পর স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি যে সকল নবীন সন্ন্যাসী গৃহত্যাগ করিয়া বরাহনগরে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্ম-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তাঁহাদের আদর্শ জীবন ও স্নেহ-প্রীতি-মাধুর্য্যে তিনি আকৃষ্ট হন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রতীচ্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। গুরুর সহিত পশ্চিম-ভারত পরিভ্রমণের পর শুদ্ধানন্দ স্বামী মানস-সরোবর দর্শনে গমন করেন। এই সময় সাধনা-কালে তিনি অদ্ভুত অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন—কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কেহ যে সাধনার উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহ তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দ

স্বামী শুদ্ধানন্দের অনুবাদ-শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। বেদান্ত, দর্শন, উপনিষদরাজি অধ্যয়নে তিনি প্রভূত জ্ঞান

অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা সাবলীল ও সতেজ। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তি-যোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি গ্রন্থরাজি, বক্তৃতা, পত্রাবলীর জ্ঞান প্রতিভা-জ্যোতিঃ তাঁহার অনন্যসাধারণ অনুবাদ-নৈপুণ্যে বাঙ্গালা ভাষায় সম্প্রসারিত হইয়া সাহিত্যকে প্রভাম্বিত, বাঙ্গালী জাতিকে উপকৃত করিয়াছে। ত্যাগী সন্ন্যাসি-সম্ভব ঔদাসীন্যে তিনি অনুবাদকরূপে নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া যশোলাভে বিরত ছিলেন।

স্বামীজীর দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার-নিপুণ ইংরেজী গ্রন্থের সরল অনুবাদ-প্রণয়নে স্বামীজীর সাহিত্য ও তাঁহার মতবাদ বাঙ্গালাদেশে সুপ্রচারের উপায়-বিধান ব্যতীত স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর "সন্ন্যাসীর গীতি" কবিতার—মূলানুগত অনুবাদেও অনুপম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শিবাবতার শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি ধর্ম্মাচার্য্যগণ বেদান্ত-দর্শনের বিভিন্ন ভাষ্যপ্রণয়নে অদ্বৈত, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ শেষ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের উপযোগী বেদান্ত-দর্শনের একখানি ভাষ্যপ্রণয়নে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ মিশন প্রচারিত 'উদ্বোধন' মাসিকপত্রের তিনি সহকারী সম্পাদক, পরে পাঁচ বৎসর কাল উহার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী শুদ্ধানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের ন্যাস-রক্ষকপদে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় কলিকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটী ও ঢাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দজীর পর মঠের ও মিশনের সম্পাদকপদে বৃত হইয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সহকারী সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মঠাধীশের পদ অলঙ্কৃত করেন। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য-হিসাবে তিনি স্বামীজীর সম্বন্ধে যত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। মঠ ও মিশন সম্বন্ধেও তাঁহার সংবাদ-সংগ্রহ অপূর্ব্ব বলিয়া প্রকাশ।

স্বামী শুদ্ধানন্দের পবিত্র কর্ম্মধারা, তাঁহার ত্যাগপূত আদর্শ জীবন অনুসরণ করিয়া তাঁহার দেশবাসী ধন্য হউক এই কামনায় আজ অন্তর পূর্ণ। আমরা তাঁহারই অনূদিত সন্ন্যাসীর গীতিসূচনা কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মুক্তির জয়যাত্রা অভিনন্দিত করিতেছি—

"উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রি-শিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্ব্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি প্রশান্তলহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা যশঃ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসী, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও, গাও সেই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

দেবেন্দ্রনাথ বসু

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণপদে আত্মনিবেদিত-প্রাণ পরিহাস-রঙ্গ-সুরসিক প্রতিভাবান্ সাহিত্য-সাধক দেবেন্দ্রনাথ বসু গত ২৩শে কার্ত্তিক অপরাহ্ণ সাড়ে ৪টায় ৮০ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রীতিমধুর হৃদয়ের স্নেহ-ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার বিয়োগে স্বজনবিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছি। যাঁহাদের সাধনায় বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য উন্নত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ব্যাঙ্‌ বাবু নামে সমধিক প্রসিদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ নাট্যকবি গিরিশচন্দ্রের আত্মীয়—সুযোগ্য সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। নাটক প্রহসন রচনায় গিরিশচন্দ্র তাঁহার পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিতেন। গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের অসমাপ্ত নাটক 'গৃহলক্ষ্মী'—দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করেন। পরবর্ত্তী যুগে অপরেশচন্দ্রের নাট্য-সাধনাও তাঁহারই সহায়তায় জয়যুক্ত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত 'বেজায় আওয়াজ', মহাকবি সেক্সপিয়রের 'ওথেলো,' 'এণ্টনী ক্লিওপেট্রা' নাটকের অনুবাদ, 'সীমন্তিনী', 'কুহকী', 'বাসিফুল', 'বরমাল্য' এবং তাঁহার সম্পাদিত 'গোপালের মা' সাহিত্যানুরাগী সমাজের সমাদর লাভ

করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের আত্মসংগোপন রচনা ও সম্পাদনা-নৈপুণ্যে কয়েকজন সাহিত্যিক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। সাধ্বী পত্নী, উপযুক্ত পুত্র কন্যাবিয়োগের শোকে বিহ্বল না হইয়া জরাজীর্ণ দেহে প্রীতি-প্রফুল্ল মনে দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য সাধনাই জীবনসম্বল করিয়াছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সম্পদ্লাভের পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথের নিকট সহায়তা লাভের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেই বৃত্তি যৎসামান্য নির্দ্ধারিত হইলেও দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য-সেবায় বিচলিত হন নাই।

'মাসিক বসুমতী'র সহিত তাঁহার স্মৃতি বিশেষভাবে

দেবেন্দ্রনাথ বসু

বিজড়িত। তিনি ইহা প্রচারের অন্যতম উৎসাহদাতা। তাঁহার প্রতিভার দানে—বহু প্রবন্ধে—হাসির গল্পে 'মাসিক বসুমতী' সমৃদ্ধ হইয়াছে—সুধীজনবৃন্দের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে 'জন্মভূমি', 'উপাসনা', 'সাহিত্য', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকপত্রেও তাঁহার বহু গল্প-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বিচিত্রিত তাঁহার প্রণীত 'চঞ্চরিকা' বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের উৎস উন্মুক্ত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিভা আলোচনার প্রবন্ধ প্রণয়নে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ সাহায্যও উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দের তিনি মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচনার সময়ে সাহচর্য্য করিতেন। 'শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে ও 'মাসিক বসুমতীর' প্রবন্ধে এবং তাঁহার লীলাসহচর স্বামী সারদানন্দের জীবনীপ্রণয়নে তিনি গুরুপদে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনের একনিষ্ঠ ধ্যানে, পুরাণের অমৃত বৈষ্ণব-পদাবলীর পরিমলে সুরভিত করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যসমাবেশে যে মোহন মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার অবদানে বঙ্গ-সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে—তাঁহার জীবনসাধনা সার্থক হইয়াছে। জগতের শোক দৈন্য নৈরাশ্যের বিনিময়ে দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্যে হাস্যরস—ভক্তিতরঙ্গের অজস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া বাঙ্গালীর মরু-হৃদয় সুশীতল করিয়া গিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু

গত ২৪শে আশ্বিন বঙ্গসাহিত্য-গৌরব বিরাট অভিধান "বিশ্বকোষ" "বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। একমাত্র পুত্রবিয়োগের শেলাঘাত সহ্য করিয়াও তিনি কর্ম্মে বিরত ছিলেন না। "বিশ্বকোষের" মত বিরাট অভিধান সম্পাদনায় তিনি যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দুর্লভ। ১৯ বৎসর ধরিয়া প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া তিনি উহা সমাপ্ত করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও প্রতিভা বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

'বসুমতীর' প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথের সহিত নগেন্দ্র বাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, উভয়েই একই সময়ে—একইরূপ নিঃসম্বল অবস্থায়—সততা ও আত্মবিশ্বাসের মূলধন লইয়া সাহিত্যপ্রচারব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উভয়ের সাধনার প্রভাবেই দেশবাসী উপকৃত ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে—বিশ্বকোষের বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশের পর তিনি হিন্দী সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। "বিশ্বকোষ" ২৫ খণ্ডে বিভক্ত। নগেন্দ্র বাবুর রচিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"ও ২৩ খণ্ডে বিভক্ত। এই দুই গ্রন্থে তাঁহার অনন্যসাধারণ শ্রম-শক্তির প্রকাশ বিদ্যমান।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই নগেন্দ্রনাথ উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" পত্রিকার সম্পাদকের আসনও বহুদিন তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। "কায়স্থ পত্রিকাও" তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত।

প্রথম যৌবনে তিনি "তপস্বিনী" ও "ভারত" নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা কার্য্য করিতেন। পরে সে কাগজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অনেকগুলি নাটকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। "রসমঞ্জরী" "চৈতন্যমঙ্গল" "কাশী-পরিক্রমা" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের সম্পাদনা কার্য্যেও

নগেন্দ্রনাথ বসু

তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব" উপাধি তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী "হিন্দী বিশ্বকোষের" জন্য নগেন্দ্র বাবুর অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ ৭২ বৎসর বয়সে কর্ম্মশ্রান্ত দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মত সাহিত্য-সাধকের গৌরবময় অবদানে—বঙ্গ সাহিত্য চিরদিন সমৃদ্ধ থাকিবে।

লেডী গোবিন্দমোহিনী সিংহ

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের সহধর্ম্মিণী লেডী গোবিন্দমোহিনী সিংহ গত ২৮শে আশ্বিন শনিবার ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১১ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বর্দ্ধমান জেলার মাহাটা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকুমার মিত্রের তিনি একমাত্র কন্যা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চারি পুত্র এবং তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

লর্ড সিংহ যখন বিহারের গভর্ণর ছিলেন, গোবিন্দমোহিনী তখনও হিন্দুমহিলার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

প্রগতিশীলা তরুণীদিগের ব্যবহারের প্রতিবাদকল্পে একবার তিনি কোন পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। নামের মোহে মত্ত হইয়া জননীর কর্ত্তব্য যে সকল নারী

লেডী গোবিন্দমোহিনী সিংহ

বিস্মৃত হন, প্রবন্ধে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ নিন্দা করিয়াছিলেন।

তিনি যে আদর্শের অনুরাগিণী ছিলেন, তাঁহার সন্তানগণের কেহ কেহ সে আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই, এজন্য তিনি সম্ভবতঃ হৃদয়ে বেদনা বোধ করিয়া থাকিবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি হিন্দু-বিধবার ন্যায় জীবন-যাপন করিতেন: তাঁহার স্বাস্থ্য ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল: তাঁহার আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হউক।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পুরাতন চিঠি

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
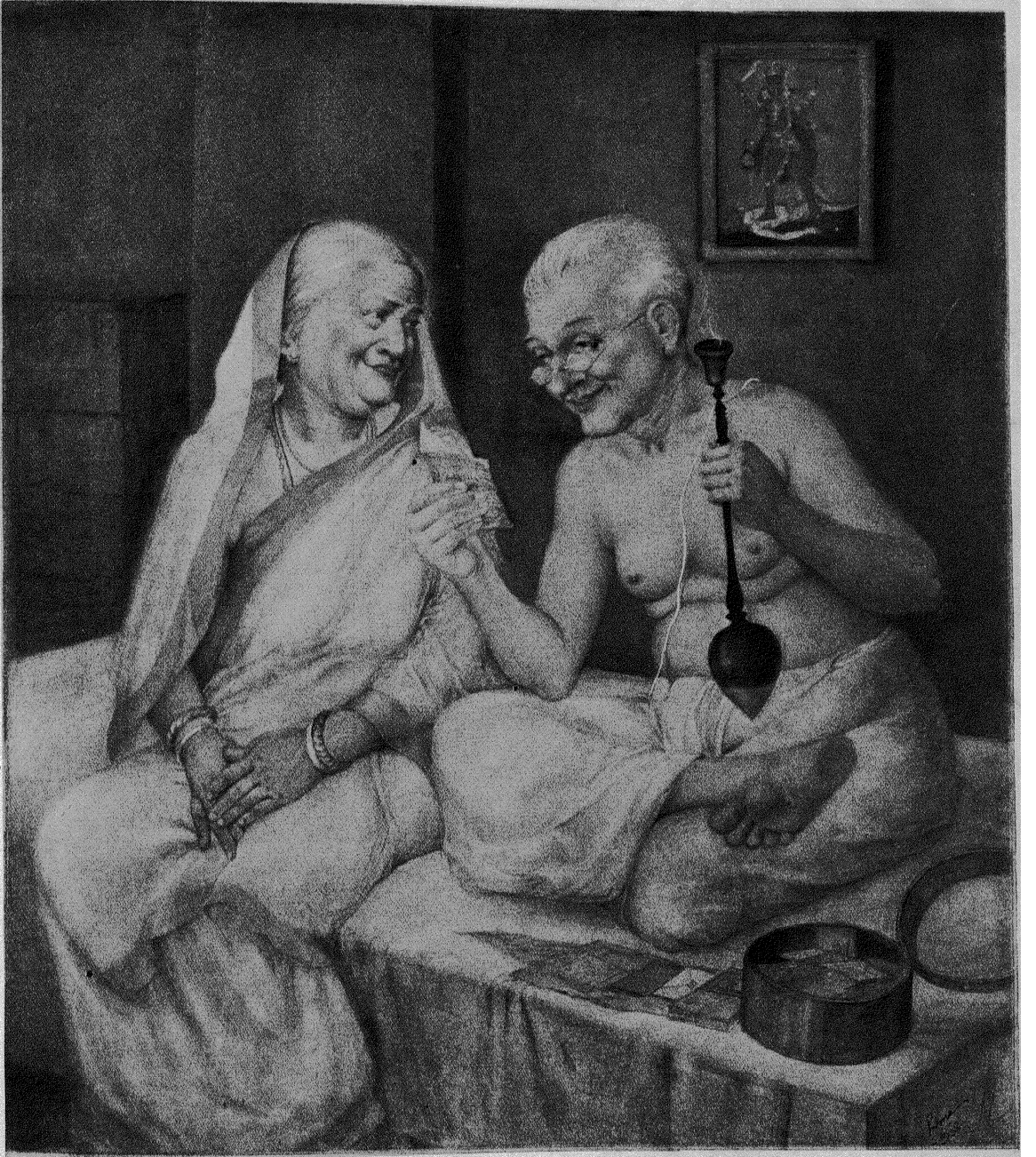
১৭শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ [২য় সংখ্যা

গীতাবিচার

৮

বিশিষ্টা চিৎ, চিদ্বা চিদচিদুভয়ং তদিতরৎ,
কিমপ্যেকং তদ্বৈত্যবিরতি-বিবাদৈঃ শ্রুতিবিদাম্।
অনির্দ্দেশ্যং তত্ত্বং প্রসভহৃতচিত্তং তনুভৃতাং,
মহামায়া-সংজ্ঞং ভুবনভয়ভঙ্গং বিজয়তে॥

এ বারে—'ব্রহ্মতত্ত্ব কি ?'—এই পঞ্চম অনুপ্রশ্নের বিচার,—কিন্তু কি ধৃষ্টতা, কি মোহ আমার, ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিব আমি! স্থূলদেহের উপর অহং-বোধ অনাদিকাল হইতে যাহার চলিয়া আসিতেছে, কতবার 'পাকা ঘুঁটি' হইতে হইতে 'কাঁচিয়া' গিয়াছি, সেই আমি কলিযুগের ভয়াবহ আবর্ত্তে পতিত হইয়া মজ্জনোন্মজ্জনে ব্যাকুল আমি আজ ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, এ কি কম ধৃষ্টতা!

অদ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে এই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, অথচ সেই সকল সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী, আজ আমি সেই শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত-বিচারে ব্রহ্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে কেমন করিয়া যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম,—তাহা আজ কার্য্য-ক্ষেত্রে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

বুঝিতেছি ধৃষ্টতা, বুঝিতেছি পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন-প্রয়াস—তথাপি ইহা আমার অপরিহার্য্য।

যত আত্মাভিমানের অর্থাৎ দেহাত্মাভিমানের ভার চাপিয়া পড়ুক না, অনাদি কালের বৈরী সেই মোহ, মনের তরঙ্গ তুলিয়া যত সঙ্কল্প-বিকল্প, যত আশা-নৈরাশ্য, যত বিভীষিকা-আশ্বাস প্রদান করুক না কেন, সেই দারুণ বৈরী স্বয়ং বিপদ্ ঘটাইয়া পরক্ষণেই অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে তাহার শান্তি-পরামর্শ প্রদানে উপস্থিত হউক না কেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না,—ধৃষ্টতা হউক, মোহ হউক—তাহা হয় বাহিরের, না হয় অপরিহার্য্য, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই বিচার করিব। আমার অবলম্বন ভগবদ্বাক্য—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এব হি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥

(গীতা ৭ম অঃ ১২)

যত কিছু সত্ত্ব-গুণ-সম্ভূত ভাব আছে, যথা জ্ঞান সুখ ইত্যাদি;—যত কিছু রাজস ভাব আছে, যথা দুঃখ কাম

ক্রোধ ইত্যাদি ;—যত কিছু তামস ভাব আছে,—অজ্ঞান আলস্য প্রমাদ ইত্যাদি ;—সে সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন ; ইহা যে ভগবানের শ্রীমুখারবিন্দ-নিঃসৃত বাণী-মকরন্দ।

ইহাই আমার আশ্রয়। এস ধৃষ্টতা, এস মোহ, তোমরাও যে আমার ন্যায় তাঁহারই এক জন—তবে তোমরা তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র, কারণ, তিনি বলিয়াছেন,—'ন ত্বহং তেষু' সেই গুলোর ভিতরে আমি নাই,—তথাপি (ইহা তিনি বলিলেও) পরক্ষণেই বলিয়াছেন,—'তে ময়ি'—আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিলেও তাহারা আমাকে ছাড়ে না—আমাকে আশ্রয় করিয়াই আছে। তাই—আমার অনাদি-কালের বৈরী তোমরা, তথাপি 'শত্রোরপি গুণা বাচ্যাঃ' তোমাদের গুণ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমা হইতে তোমরা শত গুণে শ্রেষ্ঠ,—তোমরা তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র হইলেও তাঁহাকে ছাড় না, আর আমি তাঁহার 'আদরে গোপাল পুত্র' হইয়াও তাঁহাকে ছাড়িয়া বসিয়া আছি। তাই তোমাদের তাড়নাই বল, আর সোহাগই বল, যাহা কিছু পাইয়াছি, তাই বলিয়া—'তে ময়ি'র সামিল হইতে ছুটিয়াছি। সেই মাতা—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাকে আদর করিতেছেন, ক্রোড়ে করিয়া আছেন—অন্নপান প্রদান করিতেছেন, অথচ আমি যাঁহার সন্ধান রাখি না—তাঁহার সন্ধান আজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মহাপুরুষ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে বিরোধ আছে, থাক বিরোধ—আমরণ তাঁহারা তোমার সন্ধান লইয়াছেন, সন্ধান পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, আর চাই কি? এক রকমে তাঁহারা তোমাকে দেখেন নাই, নাই বা দেখিলেন, এক বড় অভিনেতার পুত্রগণ পিতৃসন্দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিল,—সন্ধান পাইল, অমুক রঙ্গমঞ্চে পিতা অভিনয় করেন,—পুত্রগণ সেই রঙ্গালয়ে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন ভূমিকায় পিতাকে দেখিতে পাইয়া প্রত্যেকেই চিনিতে পারিল, প্রত্যেকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ, রঙ্গালয়ে ভ্রাতৃগণের পরস্পর সাক্ষাৎকার হয় নাই, বাড়ীতে আসিলে পরস্পরের দেখা হইল—তখন একজন বলিল,—বাবার কেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, কিরূপ সোণার মুকুট,—আর একজন বলিল, না ভাই, তোমার ভুল হইয়াছে—তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, গায়ে ভস্মমাখা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, প্রথম পুত্র পিতাকে রাজার ভূমিকায় দেখিয়াছিল, দ্বিতীয় দেখিয়াছিল সন্ন্যাসীর ভূমিকায়। তাই তাহাদের মতভেদ। ঐরূপ অপর পুত্র তাহাকে সাহেবের ভূমিকায় দেখে। তাহার সহিতও অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের মতভেদ। ঐরূপ মতভেদের প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই। সেই পুত্রত্রয় পিতার দর্শন যে পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য্যগণের মতভেদও ঐরূপ। আমি অতটা আশা করি না—তবে যেটুকু সন্ধান পাইয়াছি, তাহা আশ্রয় করিয়াই এই বিচার করিতেছি—আমাদিগের পরম পূজ্যপাদ ভক্তশিরোমণি আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন,—

ন্যায়চর্চ্চেয়মীশস্য মননব্যপদেশভাক্।
উপাসনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানন্তরাগতা॥

পরমেশ্বর-প্রসঙ্গে এই যে বিচার—ইহার নামান্তর মনন,—সেই মনন একরূপ উপাসনা, শ্রুতি হইতে তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বিচার করিতে হয়, তাহাই মনন, মননের প্রকৃত রূপ অনুমান। আমার সেই যে মনে মনে বিচার, তাহার বাহিরের রূপ বর্ণময়।

ব্রহ্মতত্ত্ব কি?—এই অনুপ্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য গীতার কতিপয় স্থান হইতে প্রথমতঃ ব্রহ্ম শব্দ উদ্ধৃত করিতেছি, তৃতীয়াধ্যায়ে 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি' (১৫)। (এতৎ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, ৮ সংখ্যার সম্বন্ধও আছে। একারণে সংখ্যা দ্বারা এই শ্লোক চিহ্নিত করি নাই)। ইহার প্রসঙ্গ পরে উত্থাপন করিব।

চতুর্থ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে,—

১। যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্—
২। 'বিততা ব্রহ্মণো মুখে' ৪।৩২।
৩। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ৫।৬।
৪। নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম ৫।১৯।
৫। ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতঃ ৫।২৪।
৬। শব্দ ব্রহ্ম ৬।৪৪।
৭। জরা-মরণ-মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ৭।২৯।
৮। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম ৮।৩।
৯। অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র ৮।৪

(এই শ্লোকে ব্রহ্ম-শব্দ না থাকিলেও এই শ্লোকের ব্রহ্ম-বিচারে প্রয়োজন আছে বলিয়া উদ্ধৃত হইল।)

১০। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ৮।১৩

১১। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ১০।১২।

১২। মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম ১৪।৩।

১৩। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিঃ ১৪।৪।

১৪। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্ ১৪।২৭।

১৫। ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ১৩।৩০। ইত্যাদি।

এতন্মধ্যে (২) সংখ্যায় 'ব্রহ্মণঃ' এই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ বেদ, (৬) সংখ্যার শব্দ-ব্রহ্ম বেদই বটে, তবে এই স্থলে বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান-ফল বলিয়া আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা আছে। (১২) (১৩) সংখ্যায় ব্রহ্ম-শব্দের একটি বিশেষণ আছে, তাহা 'মহৎ'। এই মহৎ ব্রহ্ম বহু ব্যাখ্যাতৃগণের মতে মহদ্‌ব্রহ্ম —ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি বা মায়া।

অবশিষ্ট স্থলে যে সকল ব্রহ্ম-শব্দ আছে, তাহা একই অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু তাঁহার সংক্ষিপ্ত লক্ষণ (৪) (৮) এবং (১১) সংখ্যায় লিখিত ব্রহ্ম-শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই, এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণের ভিতর দিয়া আমাদিগকে বিস্তারের পথ প্রকাশ করিতে হইবে। (৪) 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম' আছে—এই সমকে আর একস্থানে দেখিয়াছি 'সমোহহং সর্ব্বভূতেষু' (৯।২৯)—এই 'অহং' আর 'ব্রহ্ম' যে এক, তাহার এই একটু সূক্ষ্মপথ পাওয়া গেল; কিন্তু 'অহং' কে? তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। (৮) সংখ্যায় দেখিতেছি—অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম—পরমব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে ভেদ আছে কি না তাহার বিচার পরে করিব; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য 'অক্ষরম্' তিনি 'অক্ষর'—এই অক্ষরের সন্ধান পাইয়াছি সর্ব্বোপরি উল্লিখিত তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে, শ্লোকের একটি চরণ মাত্র তথায় নিদর্শনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। সেই শ্লোকটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, (১৪।১৫) দু'টি শ্লোকের আলোচনা করিতে হয়, তাহাই করিতেছি—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

অন্ন হইতে প্রাণীদিগের উদ্ভব, অন্নের উৎপত্তি বৃষ্টি হইতে, বৃষ্টির উদ্ভব যজ্ঞ হইতে, যজ্ঞের উৎপত্তি কর্ম্ম হইতে হইয়া থাকে—কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদের উদ্ভব অক্ষর হইতে,—অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপী হইলেও যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ইহা আক্ষরিক অনুবাদ। এই অনুবাদে শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীশ্রীধরস্বামী উভয়ের মত রক্ষিত হইলেও ব্যাখ্যায় উভয়ের মতে পার্থক্য অনুভূত হইবে।

প্রথম শ্লোকটির অনুরূপ শ্লোক মনুসংহিতায় আছে,—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

মনু—৩।৭৬।

অগ্নিতে যে সমীচীনভাবে আহুতি প্রদান করা হয়,—তাহা সূর্য্যে উপস্থিত হয়, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বর্ষণ ফলেই শস্য-সমৃদ্ধি—অন্ন-প্রাপ্তি হয়, সেই অন্ন হইতে প্রজাসমূহের—প্রাণীদিগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যজ্ঞ হইতে কিরূপে বৃষ্টি হয়, তাহা সংক্ষেপ-কথনের জন্য গীতাতে নাই, মনুতে আছে, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয় না, কিন্তু যজ্ঞীয় আহুতি সূর্য্যে উপস্থিত হইলে সূর্য্যই বৃষ্টিপাত করেন,—কিরূপে সেই আহুতি সূর্য্যে উপস্থিত হয়, মনুভাষ্যকার মেধাতিথি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—

"অগ্নৌ যজমানেন প্রাস্তা ক্ষিপ্তা আহুতির্হূয়মানং চরু-পুরোডাশাদ্যুচ্যতে, আদিত্যমদৃশ্যেন রূপেণ প্রাপ্নোতি, সর্ব্বরসানামাহর্ত্তাদিত্যঃ, অতঃ আহুতিরসানামাদিত্যপ্রাপ্তি-রুচ্যতে, অতঃ স রসঃ আদিত্য-রশ্মিষু কালেন পরিপক্কো বৃষ্টিরূপেণ জায়তে।"

অর্থাৎ আহুতি শব্দের অর্থ চরু, পুরোডাশ (পিষ্টক-বিশেষ) প্রভৃতি, অদৃশ্য সূক্ষ্ম রসরূপে সূর্য্যে উপস্থিত হয়, কারণ, পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ রসের শোষণ সূর্য্যই করিয়া থাকেন। এই হেতু বশতঃ আহুতি-রসের সূর্য্যে উপস্থিতি বলা হয়। সেই রস সূর্য্যের রশ্মিতে পক্ব হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়।

এইরূপ ভাব অভ্যন্তরে রাখিয়া যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি বলা হইয়াছে, যজ্ঞে ধর্ম্ম উপলক্ষেই তো আহুতি দ্রব্য অগ্নিতে প্রদান করা হয়। বৃষ্টি হইলে পৃথিবী শস্য-শ্যামল রূপ ধারণ করেন, সেই শস্যে সর্ব্বপ্রাণীরই অন্ন হয়, কাহারও পক্কান্ন, কাহারও আমান্ন, কাহারও বা গলিতান্নভোজনে শুক্রশোণিত হইয়া থাকে, বা গলিত বিশীর্ণ সেই শস্যাদি হইতে স্বেদজ প্রাণী হয়—শস্যাদি স্বয়ং উদ্ভিজ্জ, তাহার বীজ

হইতেও উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়। এইরূপে সর্ব্ববিধ প্রাণীরই অন্ন হইতে জন্ম। এই মনু-বচন ও গীতার তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকের তিন পাদের একই তাৎপর্য্য। তৎপরে তদীয় চতুর্থ পাদ ও পরবর্ত্তী (১৫) শ্লোকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। প্রথম কথা, যজ্ঞধর্ম্ম—যজ্ঞজনিত শুভাদৃষ্ট, সেই অদৃষ্ট সঞ্চয়ের জন্য আহুতি প্রদান করা হয় বটে, কিন্তু সেই যজ্ঞধর্ম্ম উৎপন্ন হয় কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর ১৫ শ্লোকের চতুর্থ চরণে আছে—'যজ্ঞঃ কর্ম্ম-সমুদ্ভবঃ' সেই যে যজ্ঞধর্ম্ম, পুরোহিত ও যজমানের ক্রিয়া কলাপ হইতেই তাহার উৎপত্তি। সেই ক্রিয়া-কলাপই যজ্ঞধর্ম্মের হেতু এবং যজ্ঞনামেই খ্যাত। সেই ক্রিয়া-কলাপ বেদ হইতে উৎপন্ন, বেদের অনুশাসন অনুসারেই তো সেই ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহিত হয়। ইহাই 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং' ইহার অর্থ, এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ বেদ। এখন প্রশ্ন আসিতেছে—বেদ কোথা হইতে উদ্ভূত,—উত্তর, 'ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্' ব্রহ্ম বেদ, অক্ষর হইতে উদ্ভূত, উদ্ভূতশব্দের অর্থ বেদ-নিত্যত্ববাদীদিগের মতে নিশ্বাসবৎ অনায়াসে নিঃসৃত। বলিয়াছি—এই অক্ষর শব্দের অর্থ পরমব্রহ্ম। ইনি বেদ-ব্রহ্ম নহেন, পরমব্রহ্ম। শ্লোক-শেষার্দ্ধের শঙ্করসম্মত ব্যাখ্যা—'অতএব ব্রহ্ম—বেদ, সর্ব্ববিষয়ের প্রকাশক বলিয়া—বেদ হইতেই সর্ব্ববিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে বলিয়া—তিনি সর্ব্বগত হইলেও যজ্ঞে তিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার প্রতিষ্ঠা যজ্ঞে—কারণ, যজ্ঞবিধিই বেদে প্রধান।' ইহা শ্রীধরস্বামি-সম্মত ব্যাখ্যা। 'অতএব পরমব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও যজ্ঞে তিনি প্রতিষ্ঠিত, যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়',—প্রতিষ্ঠিত শব্দের এইরূপ ভাব বুঝাইবার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—'উদ্যমস্থা লক্ষ্মীরিতিবৎ' যদ্দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে তাহার স্থান বলিবার প্রথা আছে, যেমন 'উদ্যমস্থা লক্ষ্মীঃ', উদ্যম দ্বারা লক্ষ্মী (ধন-সম্পত্তি) লাভ করা যায় বলিয়াই ঐরূপ কথা প্রচলিত। শ্রীধরের ব্যাখ্যায় এই শ্লোকেই 'অক্ষর' শব্দের অর্থও প্রাপ্ত হওয়া গেল।

(১) সংখ্যায় পাইয়াছি ব্রহ্ম সনাতনম্—ব্রহ্ম নিত্য, (১১) সংখ্যায় পাইয়াছি অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম—অতএব সনাতনের সঙ্গে মিলিয়া গেল।

তৃতীয় বারের (১৪।১৫) বিচারে যে অক্ষর ব্রহ্মকে পাইয়াছি—তিনি সর্ব্বপ্রাণি-সৃষ্টির মূল—ইহা পাইয়াছি।

'অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি' এই (১৪) শ্লোক হইতে শঙ্কর-মতে ১৫ শ্লোকের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত ও শ্রীধর-মতে সম্পূর্ণ শ্লোকটি মিলাইলেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন উপনিষদ্ কি বলিতেছেন, তাহা একবার এস্থলে আলোচ্য—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—(তৈ,) তদ্ ব্রহ্ম।'

প্রাণি-সৃষ্টি যাহা হইতে হয়, আর প্রাণি-সৃষ্টির মূল যিনি—এক ভাবেরই দু'টি কথা।

কাযেই সেই উপনিষদের ব্রহ্ম আর গীতার অক্ষর ব্রহ্ম একই বস্তু বলা যাইতে পারে।

আরও একটি বাক্যে ব্রহ্মের লক্ষণ এই ১৫ শ্লোকে মিলিয়াছে, 'ব্রহ্মাক্ষর-সমুদ্ভবম্' চতুর্থ চরণে। 'এতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতং যদৃগ্বেদঃ' ইত্যাদি, এই যে মহান্—এই যে ভূত—সত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম তাঁহা হইতেই বেদসমূহ নিশ্বাসবৎ নিঃসৃত।' শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (১।১।৩) সূত্রে ইহা বিচারিত। কিন্তু এখনও অনেক বলিতে হইবে,—ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ উপনিষদেও আছে,—

'এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণু'··· ইত্যাদি বৃহদারণ্যক উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রে 'অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ (১।৩।১০) ইত্যাদি সূত্রাশ্রিত অক্ষরাধিকরণ শারীরক ভাষ্যে মীমাংসিত। এই অক্ষরটি ব্রহ্ম। গীতাতেও সে অক্ষরশব্দেই ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ ঐ সব স্থানে হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দের যেরূপ নানা অর্থে ব্যবহার গীতাতে আছে, অক্ষর শব্দের অন্য অর্থেও আছে, কিন্তু ব্রহ্মের যে লক্ষণ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, তাহা সেই সব অক্ষরে নাই। বেদপ্রকাশকত্বরূপ যে অপর লক্ষণ, তাহাও সে অক্ষরে নাই। সে অক্ষরের পরিচয় নিম্নলিখিত শ্লোকে আছে, 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।' ক্ষর এবং অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ, 'ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।' (১৫।১৬)। পঞ্চভূত প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থসমূহ 'ক্ষর' নামে অভিহিত এবং কূটস্থ রাশিবৎ অবস্থিত, অথবা মায়াবঞ্চনাদিস্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরীয় রূপ মায়াশক্তি অক্ষর—ইহা শঙ্করাচার্য্য-ব্যাখ্যার আংশিক অনুবাদ। এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ, প্রথম ক্ষর দ্বিতীয়

অক্ষর, সকল প্রাণীরই দেহস্বরূপ পুরুষ 'ক্ষর' নামে এবং কূটস্থ পর্ব্বতের ন্যায় যিনি অবস্থিত, সেই জীবাত্মাই 'অক্ষর' নামে প্রসিদ্ধ।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৪।১৭।

এই দুই পুরুষ ব্যতীত এক উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা নামে কথিত হইয়া থাকেন, ইনি ত্রিভুবনে স্বশক্তি-বশে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহা ধারণ করিয়া আছেন। শঙ্কর-মতের এই অনুবাদে শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা-সম্মত অনুবাদের আংশিক ভেদ আছে, তাঁহার মতে বিভর্ত্তির অর্থ 'পালয়তি'—নির্ব্বিকারভাবে আবিষ্ট থাকিয়া ত্রিভুবন পালন করিতেছেন। তাহার পরবর্ত্তী শ্লোক বাদে 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ॥ অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।' (১৫।১৮) যেহেতু 'ক্ষর'কে আমি অতিক্রম করিয়া আছি এবং 'অক্ষর' হইতেও উত্তম অতএব আমি লোকমুখে ও বেদবাদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ।

পুরুষোত্তম নারায়ণের নাম—দেড়সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে কালিদাস বলিয়াছেন, 'হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ।' যেমন একমাত্র হরি—নারায়ণই যেমন পুরুষোত্তম। ইনিই পূর্ব্বশ্লোকে পরমাত্মা নামে কথিত। যিনি পরমাত্মা তিনি ব্রহ্ম, তিনি ঈশ্বর। তিনটিই পর্য্যায় শব্দ। এখানে 'অক্ষর' হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করা হইলেও এ স্থানের উল্লিখিত এবং সে স্থানের উল্লিখিত অক্ষরে বাস্তবিক ভেদ না থাকায় তৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(৪) সংখ্যায় শ্লোকের বিচারে যে (৯।২৯) শ্লোকস্থ 'সমোঽহং' এই অহং কে? ইহারও মীমাংসা হইয়া গেল, যিনি পুরুষোত্তমনামে 'অহং'এর পরিচয় দিয়াছেন, তিনিই প্রথমোক্ত অক্ষর, অতএব তিনি ব্রহ্ম এবং তিনিই পরমাত্মা।

কিন্তু (৯) সংখ্যায় কথিত 'অধিযজ্ঞোঽহমেব'—এ স্থানের 'অহং'কে অক্ষর হইতে পৃথক্ ভাবে ধরা হইয়াছে। অতএব এস্থানেও কথা ফুরাইল না। শ্রীকৃষ্ণ এই অহংকে নানাভাবে ব্যবহার করিয়াছেন—'গীতার উপদেষ্টা কে?' এই বিচারে (৩) প্রবন্ধে (১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ বসুমতীতে) অনেকটাই আছে, যাহা অবশিষ্ট তাহা এই প্রবন্ধেই বলিতে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রহ্মভাব তাহা আশ্রয় করিয়াই এ সব স্থলে 'অহং', অস্মৎ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত প্রবন্ধেই বলিয়াছি। (৯) সংখ্যায় 'অহং' ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি পরমাত্মা তিনিই যে ক্ষেত্রজ্ঞ, অথচ তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে উত্তম ইহাও দেখিতে পাই,—তাহার সমাধান সেখানে অনেকটা আছে। যাহা মোটেই নাই তাহা এই—যে ব্রহ্ম-ভাব আশ্রয়ে 'অহং' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা—অদ্বৈত ব্রহ্ম অথবা বৈষ্ণব বেদান্ত-দর্শন যোগ-দর্শন ও ন্যায়াদি-দর্শন সম্মত পৃথক্ ব্রহ্ম, যিনি পরমেশ্বর, ঈশ্বর ইত্যাদি নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, আর গীতা-মধ্যে মায়া, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দে যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন—এ বিষয়ে গীতার সিদ্ধান্ত স্থির করা একান্ত আবশ্যক; তাহা না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব কি? তাহা বুঝিতেই পারা যায় না, প্রথমতঃ তাহাই বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অদ্বৈত ব্রহ্মই গীতোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব। ভগবান্ রামানুজাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নিখিল কল্যাণ-কারণ সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন পরমেশ্বর নারায়ণ ব্রহ্ম এবং স্বল্প জ্ঞানাদি-সম্পন্ন জীবগণ তাঁহার অধীন,—প্রভুভৃত্যে যেমন অভিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপই জীবের সহিত পরমেশ্বরের অভেদ হইতে পারে না।

এ সকল আচার্য্যগণের মতবাদ সুপ্রচারিত, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইহাই গীতা-সিদ্ধান্ত কি না, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথম দেখিতে হইবে—

গীতায় গণিত পদার্থ এবং আচার্য্যগণ-ব্যাখ্যাত ব্রহ্মসূত্রের পদার্থে ঐক্য আছে কি না? তাহাতে বুঝা যাইবে, গীতা কোন দর্শনের অনুসরণ করিয়াছেন, কি, তাঁহারই পৃথক্ দার্শনিক মত?

গীতায় একস্থানে দেখিতে পাই—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৪-৫।

ভগবান্ বলিতেছেন—আমার অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই প্রকৃতি—অপরা ও পরা, অপরা প্রকৃতি আটটি, যথা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। পরা প্রকৃতি জীব, শঙ্করাচার্য্য ইহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন

আর এক স্থানে আছে—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ।১৩।৫ ৬।

মহাভূত সকল—অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, অব্যক্ত, একাদশ ইন্দ্রিয়—(পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাগ্‌যন্ত্র, কর, চরণ, মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়; এবং এতদুভয়প্রবর্ত্তক মন) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রাহ্য—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও গন্ধ। (ইহা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব—একথা আচার্য্য শঙ্কর ও স্বামী শ্রীধর উভয়েই বলিয়াছেন)।

এতদ্ভিন্ন ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ, সঙ্ঘাত—(স্থূলশরীর) চেতনা এবং ধৃতি—ধৃতি শব্দের অর্থ ধৈর্য্য বা সন্তোষও হইতে পারে—শঙ্কর বলেন, অবসাদগ্রস্ত ইন্দ্রিয় যদ্দ্বারা প্রকৃতিস্থ হয়—সেই শক্তিই এস্থলে ধৃতি। এই সমস্তই ক্ষেত্র, সংক্ষেপে বিকার সহ ইহা উদাহৃত হইল।

আর এক স্থানে আছে—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।৪।৬।

অতএব অপরা ও পরা প্রকৃতি মধ্যে যে নয়টির উল্লেখ আছে 'ক্ষেত্র' নামে কথিত একত্রিংশৎ পদার্থের মধ্যে তাহার ৮টির উল্লেখ দেখিতে পাই। 'ক্ষেত্র' নির্দ্দেশের পূর্ব্বেই আছে—

'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ।১৩।২।

সকল 'ক্ষেত্রে'ই আমি ক্ষেত্রজ্ঞ,—ইনিই জীবাত্মা, ইহাকেই পূর্ব্বে পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। এখন 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' বলিলে ঐ দ্বিবিধ প্রকৃতি যদি ধরা যায়, তাহা হইলে অর্থ হয়—পঞ্চভূতময় দেহ ও মন-বুদ্ধি অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া আমি জীবরূপে আবির্ভূত হই, কিন্তু তাহা আমার মায়া—নিজ শক্তি দ্বারাই ঘটে—আবার জীবের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মফলে আমার জন্ম নহে, এইরূপ ঐ শ্লোকের অর্থ হইলে—প্রকৃতি কি, ইহার জন্য ভাবিতে হয় না, মায়াই তাঁহার ঐ শক্তি, এইটুকুই মাত্র এখানে অধিক থাকিল—কিন্তু 'ক্ষেত্র'স্বরূপনির্দ্দেশ স্থানে একটি অব্যক্ত শব্দ আছে—তাহার অর্থ কি?—যদি মায়াই অব্যক্ত হয়, তাহা হইলে যেমন একটা দিক্ কতকটা পরিষ্কৃত হয়, তেমনই তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞের বাহিরে দেখিতে হয়। শক্তি আর শক্তিমানকে যে পৃথক্ করা যায় না, এ সাধারণ জ্ঞান ত্যাগ করিতে হয়।

মনে কর, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে—তাহাকে অগ্নি হইতে পৃথক্ করিয়া ধরা যায় না, মায়া যদি ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরেরই শক্তি হ'ন, তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া ধরা হয় কিরূপে?

যদি ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন হইলেও বাস্তব পক্ষে একই আকাশ—যেমন বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও একই বস্তু, সেইরূপই তিনি এক ব্রহ্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ;—তাহা হইলেও সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপ যাঁহার সেই ব্রহ্মের শক্তি ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিল কিরূপে? তাহাকে তো ক্ষেত্রজ্ঞের সহিতই মিশ্রিত রাখা উচিত ছিল।

আচ্ছা, এখন এ তর্ক থাক্, পরে হইবে। কিন্তু বেদান্ত-সূত্রোক্ত পদার্থের সহিত ইহার সেরূপ মিল নাই, সাংখ্যের সহিত যতটা আছে। সাংখ্যে মায়াশক্তির কথা নাই বটে—কিন্তু অব্যক্তের কথা আছে, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতি। পূর্ব্বে যে অপরা ও পরা প্রকৃতির নির্দ্দেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, অব্যক্ত সেই প্রকৃতি নহে,—এই প্রকৃতির পরিচয়—ক্ষেত্রনির্দ্দেশের কয়েকটি শ্লোকের পরেই আছে—

'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।'

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি। পুরুষ কে, তাহার পরিচয় একটু পূর্ব্বে আছে—

'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।'

এ স্থানের 'পুরুষ' শঙ্করমতে সে দু'এর মধ্যে পড়েন না। 'প্রকৃতি' তন্মধ্যে এক অক্ষর পুরুষ মধ্যে পড়িলেও—দ্বিতীয় পুরুষ শব্দের অর্থ কি?—এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অতএব বলিতে হয়, প্রকৃতি এখানে 'পুরুষ' নহেন, প্রকৃতি পৃথক্, তিনি পূর্ব্বোক্ত 'ক্ষেত্রের' অন্তর্গত—অব্যক্ত, আর পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ। এই প্রকৃতি—অপরা প্রকৃতির প্রসূতি। কারণ, অনাদি প্রকৃতির পরিচয়ে ঐ শ্লোকেই বলা হইয়াছে 'বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।' বিকার এবং গুণ সমস্তই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং স্বয়ং অনাদি। তবেই বুঝা গেল, প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি, আর সমস্তই

প্রকৃতির বিকার। এই কথাই গীতার অন্যত্র বলা হইয়াছে—

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।'

প্রকৃতি সমস্ত জগতের প্রসবকর্ত্রী, আমি অধ্যক্ষ দ্রষ্টা। অতএব এই যে প্রকৃতি, ইনি পূর্ব্বোক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত নহেন।

অদ্বৈতবাদে ও বৈষ্ণবমতে যে বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাতে এই সমস্ত পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের স্বীকৃত যে পঞ্চপ্রাণ—প্রাণময় কোষ যদ্দ্বারা গঠিত—তন্মধ্যে প্রধান পঞ্চবৃত্তি প্রাণকে গীতার ক্ষেত্র-মধ্যেও গণিত করা হয় নাই। অথচ সাংখ্যসিদ্ধান্তের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও পুরুষ এই মত গীতার স্বীকৃত, এই কারণে শঙ্করাচার্য্যকেও 'ক্ষেত্র'-বিবরণ ভাষ্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব এ স্থলে কথিত। কেবল চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের পঞ্চতন্মাত্র স্থলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পাঁচটি গুণ গৃহীত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী ইহাকেই পঞ্চতন্মাত্রের নির্দ্দেশ বলিয়াছেন। শান্তিপর্ব্বের যে সাংখ্য-সম্মত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব আছে, তাহার সহিত গীতার চতু-র্ব্বিংশতিতত্ত্ব অভিন্ন; গীতার স্থলে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব নাম নাই, কিন্তু ১৩।৫ শ্লোকে ঐস্থলেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মিল থাকিলেও সাংখ্যমতে পুরুষ নানা, গীতাসিদ্ধান্তে ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র-ভেদ-প্রযুক্ত নানা হইলেও তিনি বাস্তব পক্ষে এক ব্রহ্ম। তিনি প্রকৃতি-সম্মিলিত, চিৎ—জ্ঞানস্বরূপ। এই জন্য সেই ব্রহ্মের নামও অব্যক্ত, 'অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত-স্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।' যে অক্ষরব্রহ্মের কথা বলিয়াছি, তিনি অব্যক্ত। ব্রহ্মের যাহা স্বরূপ তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি সত্য নিত্যসম্বন্ধ বলিয়াই তিনিও অব্যক্ত। এই যে উভয় সম্মেলন, তাহা কতিপয় স্থানে স্পষ্টভাবেই স্বীকৃত, তাহার একটি স্থান অন্য উদ্ধৃত করিতেছি—

'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন স;
তৎ নাসদুচ্যতে॥' ১৩।১২।

অনাদি দুইটি—(পূর্ব্বেই গীতার প্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে) প্রকৃতি ও পুরুষ—সেই দুই অনাদি যাঁহাতে বর্ত্তমান, তিনিই পরব্রহ্ম। এইজন্য তিনি সৎও নহেন অসৎও নহেন। প্রকৃতি পরিণামিনী বলিয়া সেই অংশে তিনি সৎ—অব্যয় নহেন। আর পুরুষাংশে তিনি অব্যয়, এই কারণে তাঁহাকে অসৎও বলা যায় না। অতএব গীতার দার্শনিক মত পৃথক্।

এই বিষয়ে অবশিষ্ট বিচার বারান্তরে করিব

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

তাহাতে মিশায়ে যাই

যুগ-জনমের সঞ্চিত সাধ প্রভু গো তোমারে পাই,
তব পদরেণু পরশিয়া যেন তাহাতে মিশায়ে যাই।
যে দিন প্রভাতী কনক-আলোকে নলিনী মেলিল আঁখি,
দিকে দিকে মধু-কল-ঝঙ্কারে গাহিয়া উঠিল পাখী

মুগ্ধ ধরারে পুলকিত করি বহেছিল সমীরণ—
তরুণ-অরুণ কিরণধারায় ভ'রেছিল মোর মন।
সেই দিন হ'তে জানিয়াছি প্রিয়! আমি যে তোমারে চাই
জীবনের পথে, মোর মনোরথে, পাই বা নাহিক পাই।
সুন্দর তুমি বিধাতা আমার! তোমার বিধান জানি—
মরণের পর পাইব তোমার রাতুল চরণখানি।

*　*　*　*

অঙ্গে আমার দিয়ো শিহরণ, কণ্ঠে প্রেমের গান,
নয়নে আমার সপ্তসিন্ধু উছলিয়া দিয়ো বান।
পরাণ-পরতে হৃদয়-শোণিতে অণু-পরমাণুমাঝে—
যোগি-বাঞ্ছিত চরণ দু'খানি যেন গো নিয়ত রাজে।
ভাল করে বিভু জানাইয়া দিয়ো আমি যে তোমারে চাই-
তব পদরেণু পরশিয়া যেন তাহাতে মিশায়ে যাই।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

[উপন্যাস]

পঞ্চত্রিংশ লহর

নিশাচর বাজের পুনরাবির্ভাব

থর্সবির পল্লীভবনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া নিশাচর বাজের সমাগম সম্ভাবনায় প্রতীক্ষা করিতে হইল, তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। দীর্ঘকাল পরে থর্সবির পাঠ-কক্ষের রুদ্ধ দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইলে ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত হইল। সেই হাসিতে তাঁহার মানসিক আনন্দ পরিব্যক্ত হইল। থর্সবি তাহার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে উপদেশ পাইয়াছিল, তদনুসারে তাহার সম্মুখস্থ টেবলে সংরক্ষিত দলিলপত্রাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। যদিও তাহার স্নায়ুগুলি আঘাতের পর আঘাতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য দিকে চলিবার সময় সে সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিল। সেই সময় সে ভূতের মত যে মূর্ত্তিটি অদূরে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয় নাই।

সেই লোকটিকে দেখিয়া তাহার চেহারা কিরূপ, থর্সবি তাহা বুঝিতে পারিল না; কারণ, তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ রেশমী মুখোসে আবৃত ছিল। এতদ্ভিন্ন, তাহার দেহের সকল অংশ একটি অদ্ভুতাকার দীর্ঘ পরিচ্ছদে পরিবেষ্টিত ছিল। সেই পরিচ্ছদটি ধর্ম্মযাজকগণের ব্যবহৃত আলখেল্লার অনুরূপ। তাহার উভয় করতল এবং অঙ্গুলিগুলি কৃষ্ণবর্ণ দস্তানা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। দস্তানামণ্ডিত দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিতে একটি রিভলবার আবদ্ধ ছিল।

যে পুরু পর্দ্দা দ্বারা বাতায়নের সম্মুখ ভাগ আবৃত ছিল, ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তাহার অন্তরালে অদৃশ্য থাকিলেও মুখোসধারী আগন্তুকের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন।

মুখোসধারী বলিতে লাগিল, "শোন থর্সবি, আমি সুইনফোর্ড মিউনিসিপ্যাল দলিল-পত্রের (stock) জাল সার্টিফিকেটগুলি লইতে আসিয়াছি। তোমাকে কষ্ট স্বীকার করিয়া সেগুলি আমার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। হ্যাঁ, এই কার্য্য করিতে আমি তোমাকে বাধ্য করিব।"

এ কথা শুনিয়া থর্সবি মুখ তুলিয়া চাহিল; মুহূর্ত্তমধ্যে দারুণ বিস্ময় তাহার চোখে-মুখে পরিস্ফুট হইল

থর্সবি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "আমার অনুমান, তুমিই দস্যুদলপতি প্রচ্ছন্ননামা 'নিশাচর বাজ'; কেমন, আমার এই অনুমান কি সত্য নহে?"

মুখোসধারী বলিল, "তোমার অনুমান—আমিই নিশাচর বাজ, তোমার এই অনুমান সত্য কি না, তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। হ্যাঁ, আমিই নিশাচর বাজ। আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার এই অনুমান সত্য। তুমি আমার চিঠি পাইয়াছিলে কি? হ্যাঁ, তোমার মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া আমার প্রতীতি হইল—তুমি আমার সেই চিঠি পাইয়াছ। উত্তম, তোমার লোহার সিন্দুক খোলা আছে, ইহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাতে আমার শ্রমের লাঘব হইবে। আমার কায তুমি অনেক দূর আগাইয়া রাখিয়াছ দেখিতেছি।"—মুখোসধারী থর্সবির পশ্চাদ্‌ভাগে যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। সে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া বলিল, "গোয়েন্দা-পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট আজ রাত্রিকালে তোমার এই বাড়ীর চারি দিকে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। সে অত্যন্ত চতুর বটে, কিন্তু আমার দৃষ্টি সে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমার অনুমান, সে এখন নিকটেই কোথাও শিকারের প্রতীক্ষায় লুকাইয়া আছে। বেশ থাকুক, আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু যদি সে আমার দিকে হাত বাড়ায়, কোন রকম চাল চালিতে আসে, তাহা হইলে আমার

হাতের এই হাতিয়ারটি দেখিতেছ ত? ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন করেন নাই।"—সে তাহার হাতের রিভলভারটি থর্স বির ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল।

মুখোসধারীর কথাগুলি কেবল যে ফরেষ্টই শুনিতে পাইলেন এরূপ নহে; উহা অন্য একজনেরও কর্ণগোচর হইল। সেই ব্যক্তি জীবন বিপন্ন করিয়াও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কোন প্রকার ত্যাগে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না।

অতঃপর মুখোসধারী নিশাচর বাজের সুদৃঢ় কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্বের আভাস পরিব্যক্ত হইল। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তাঁহার তাঁবেদারকে যে স্বরে আদেশ করেন, নিশাচর বাজ সেইরূপ প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে থর্স বিকে বলিল, "থর্স বি, আমার কথা তুমি অগ্রাহ্য করিও না; ইহা অনুরোধ বা আদেশ, যাহা ইচ্ছা তাহাই মনে করিতে পার, কিন্তু অবিলম্বে তোমার ঐ টেবিল ত্যাগ কর, শীঘ্র উঠিয়া যাও। আমার আর সময় নষ্ট করিবার উপায় নাই।"

নিশাচর বাজের এই আদেশে থর্স বি তাহার আসন হইতে উঠিয়া কম্পিত পদে বিপরীত দিকের দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইল। সেই সময় নিশাচর বাজ বামহস্তে তাহার ডেস্কের কাগজগুলি অনুসন্ধান করিয়া তাহার সিন্দুকের নিকট উপস্থিত হইল।

এই কার্য্যে নিশাচর বাজ মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইতেই ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তাহার পশ্চাতে আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "ওই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও, নিশাচর বাজ!"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট এই কথা বলিবামাত্র—যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইল, সেই ব্যক্তি তাঁহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তাহার মুখোসে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "না, তুমি গুলী করিও না। তাহার ফল অত্যন্ত মন্দ হইবে। আমি তোমাকে আজ ঠিক ধরিয়া ফেলিয়াছি। তোমাকে ধরিবার জন্য আমি কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা অনেকেরই সুবিদিত।"

কিন্তু এই ব্যাপারের পর ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। থর্স বি মুখোসধারী আগন্তুককে পিস্তল বাহির করিতে দেখিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। থর্স বি এই ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের শিক্ষা অনুসারে চলিয়াছিল; তাহাকে যে সকল কার্য্যের ভার প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা পালনে তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু এতক্ষণ পরে তাহার পদদ্বয় থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

এই মুখোসাবৃত এবং সুদীর্ঘ আলখেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত মূর্ত্তি চলিবার সময় দেহের বিভিন্ন প্রকার ভঙ্গী করিলেও তাহার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার সঙ্গীরা পুলিসের হাতে ধরা না পড়ে, তদ্বিষয়ে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাহার ডান হাতের রিভলভারটি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের চক্ষু তাঁহার সম্মুখস্থ মুখোসধারীর মুখের উপর হইতে মুহূর্ত্তের জন্য অপসারিত হইয়াছিল; কিন্তু সে জন্য পরমুহূর্ত্তে তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। থর্স বির আতঙ্কপূর্ণ আর্ত্তনাদে ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে নিশাচর বাজ তাহার পিস্তলটি সরাইয়া লইয়া, ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের মুখে এরূপ প্রচণ্ড বেগে এক ঘুষি মারিল যে, ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইলেন; কিন্তু নিশাচর বাজ এক লম্ফে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইতেই ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বিদ্যুদ্বেগে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তাহাকে সামলাইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। ফরেষ্ট ভাবিলেন, ষ্টেপলটন এবং অন্য তিন জনের কি হইল? তিনি তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই সময় তাহাদের সেই স্থানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল; কিন্তু তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে কোন কথা চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। কারণ, তখন তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টায় অত্যন্ত বিব্রত ছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তাঁহার আততায়ীর সহিত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন। তিনি তাহার অসতর্কতার সুযোগে তাহার মুখের উপর ঘুসি তুলিলেন; সেই ঘুসি তাঁহার আততায়ীর মুখে পড়িলে তাহার মুখ ভাঙ্গিয়া যাইত, এবং সেই আঘাতে তাহার চেতনাও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ইন্‌স্পেক্টরের পশ্চাৎ হইতে তাঁহার মস্তকে এরূপ প্রচণ্ড বেগে দণ্ডাঘাত হইল যে, সেই আঘাতে তাঁহার দেহ অসাড় হইয়া পড়িল, তাঁহার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইল।

নিশাচর বাজের দেহ হইতে তাঁহার ভুজবন্ধন খসিয়া পড়িল, তিনি সংজ্ঞাহীনভাবে মাটীতে পড়িয়া রহিলেন।

* * * * *

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট যখন চেতনা লাভ করিলেন, তখনও তিনি মস্তকে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার সহকারী ষ্টেপলটন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "নিশাচর বাজ পলায়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু সে এই বাড়ীর সীমা অতিক্রম করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, বহুসংখ্যক কনষ্টেবল এই বাড়ীর চারিদিকেই মোতায়েন আছে, তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করা তাহার অসাধ্য।"

অনন্তর ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট ষ্টেপলটন চর্ম্মাসনে নিপতিত একটি মূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "নিশাচর বাজ পলায়ন করিলেও আমরা ইহাকে হাতে পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস, এই ব্যক্তিই কিছুকাল পূর্ব্বে রিভলভারের কুঁদা দ্বারা আপনার মস্তকে আঘাত করায় আপনার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল।"—সে তাহার সহযোগীকে আদেশ করিল, "উইণ্টার, উহার মুখ হইতে মুখোসটা খুলিয়া লও।"

উইণ্টার তাহার এই আদেশ পালন করিলে অচেতন মুখোসধারীর মুখের দিকে চাহিয়া ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন! কারণ, মুখোস অপসারিত হইলে তিনি দেখিলেন, মুখোসধারী পুরুষ নহে, রমণী! ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট তাহার মুখ দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন—সে সিন্‌থিয়া হলগেট!

সিন্‌থিয়া হলগেট চেতনালাভ করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং তাহার কর্ণমূলের কেশরাশি সুবিন্যস্ত করিতে করিতে পুলিস-কর্ম্মচারিগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ, আমিই নিশাচর বাজ। তোমরা আমাকে এখান হইতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া চল। ইহাই তোমাদের কর্ত্তব্য নহে কি?"

কোন জটিল সমস্যার সমাধান করিবার প্রয়োজন হইলে ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার কি কর্ত্তব্য তাহা চিন্তা করিতেন; এ জন্য এই নূতন সমস্যায় তাঁহার ধূমপানের জন্য প্রবল আগ্রহ হইল, তিনি পকেট হইতে পাইপ এবং গুঁড়া তামাকের কৌটা বাহির করিলেন।

তিনি ধূমপানে মনঃস্থির করিয়া মিস্ হলগেটকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমরা তোমার নিকট আরও কোন কোন কথা শুনিতে চাই; কিন্তু আমি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছি, তুমি যাহা কিছু বলিবে, তাহা তোমার প্রতিকূলে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে, মিস্ হলগেট।"

মিস্ হলগেট বলিল, "আমাকে ও কথা বলিয়া সতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি, ইন্‌স্পেক্টর! আমি আজ রাত্রে এখানে আসিয়াছিলাম; কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলাম তাহাও আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আমার আপত্তি নাই। এডমণ্ড থর্সবি এই বাড়ীর মালিক; সে মিউনিসিপাল 'ষ্টকের' সার্টিফিকেট-গুলি জাল করিতেছিল, আমি তাহারই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিলাম। কিছু দিন হইতে সে ব্যাপক ভাবে জুয়াচুরির ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল না। আমার পিতা আমার ভরণ-পোষণের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, এই নরপশু কৌশলক্রমে আমার জীবনের সম্বল সেই টাকাগুলি চুরি করিয়া আমাকে পথে বসাইয়াছিল; এজন্য আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যেরূপে পারি এই অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান করিব। আমি প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিলাম। আমার এই স্বীকারোক্তি আপনি আপনার নোট-বহিতে লিখিয়া লউন, আপনি ইহা আমার বিরুদ্ধে অনায়াসে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন।"

মিস্ হলগেটের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টের কয়েক মিনিট নিবিষ্টচিত্তে পাইপ টানিলেন। আমাদের দেশে 'বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া' বলিয়া একটা কথা আছে; ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টও বোধ হয় তাহাই করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, "তুমি স্বীকার করিতেছ—তুমিই স্বয়ং নিশাচর বাজ? নিশাচর বাজ পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক? সংবাদটা অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব, এবং বিস্ময়জনকও বটে!"—তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাস ছিল।

মিস্ হলগেট পূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন? আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হইল না, ইন্‌স্পেক্টর! শুনিয়াছি, আপনি বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ, এই জন্যই বোধ হয় সত্য কথা মিথ্যা বলিয়া

আপনার ধারণা হয়, এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া রহস্য-ভেদের জন্য মরীচিকার অনুসরণ করেন! ডিটেক্‌টিভরা এইজন্যই খ্যাতিলাভ করেন। আপনিও সম্ভবতঃ এই উপায়ে বিখ্যাত হইয়াছেন, নতুবা নিশাচর বাজ পুরুষ নহে স্ত্রীলোক, এ কথা শুনিয়া আপনার দুই চক্ষু কপালে উঠিত কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর মিস্ হলগেটকে কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় সাধারণ পরিচ্ছদধারী তিন জন কন্‌ষ্টেবল বেসিল ফেটিসবারিকে ধরিয়া টানিতে টানিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বেসিল ফেটিসবারির তখন আলুথালু বেশ, তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত ও বিব্রত মনে হইল।

একজন পুলিস-কর্ম্মচারী উৎসাহভরে বলিল, "আমরা বহু চেষ্টায় ইহাকে পাকড়াইয়াছি, ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর এঙ্গস্ ফরেষ্ট সাধারণ পুলিস-কর্ম্মচারিগণের ন্যায় দাম্ভিক হইলে ফেটিসবারিকে সেই ভাবে সেখানে নীত হইতে দেখিয়া উৎফুল্ল চিত্তে দুই একটি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, এবং পুলিসের শক্তি কিরূপ অমোঘ, ফেটিসবারিকে তাহাও জানাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু ফেটিসবারিকে দেখিয়া তিনি বিন্দুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। তিনি নিস্তব্ধভাবে একবার মিস্ হলগেটের মুখের দিকে চাহিয়া পরমুহূর্ত্তেই ফেটিসবারির মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন; এইভাবে তিনি একাধিকবার উভয়ের মুখের উপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে দুশ্চিন্তার ছায়াপাত হইল, এবং মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক গম্ভীরভাব ধারণ করিল।

মিস্ হলগেট এবং বেসিল ফেটিসবারি পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাদের উভয়েরই চক্ষুতে কেবল বিস্ময় নহে, তাহারা যেন স্ব স্ব চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, এই ভাবও পরিব্যক্ত হইল।

অবশেষে ফেটিসবারি কিঞ্চিৎ অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এই মেয়েটি কে ? ওখানে কি করিতেছিল ?"

ফেটিসবারি ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের মুখের দিকে চাহিয়াই এই প্রশ্ন করিল।

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই যুবতী নিশাচর বাজ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছে!"

ইন্‌স্পেক্টরের কথা শুনিয়া ফেটিসবারি উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বাজে কথা! আমি জীবনে উহাকে দেখি নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "যদি আমি তোমার আসন অধিকার করিতাম, তাহা হইলে অন্য কেহ সেই আসনের দাবী করিলে আমি তাহাতে আপত্তি না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতাম না।"

ফেটিস্‌বারি বলিল, "ও কথা তুমি কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি ইন্‌স্পেক্টর! যদি তুমি তাড়াতাড়ি এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চাও, তাহা হইলে আমি তোমার আসামীর স্থান অধিকার করিতে আপত্তি করিব না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "অর্থাৎ তুমি স্বীকার করিতে চাও তুমিই নিশাচর বাজ ?"

ফেটিস্‌বারি বলিল, "নিশ্চয়ই; তুমি ত বহুদিন হইতে এই ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছ ? আমার এ কথা সত্য নহে ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট ফেটিস্‌বারির প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

ষট্‌ত্রিংশ লহর

"জাতীয় স্বার্থের অনুরোধে"

বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রীর খাস-কামরায় একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই খ্যাতনামা ব্যক্তি। সেই সভায় প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র-সচিব, পররাষ্ট্র-সচিব, সমর-সচিব, নৌ-সচিব এবং এটর্ণী-জেনারল প্রভৃতি সমবেত হইয়াছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট, শোন।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট সুদীর্ঘ টেবলের এক প্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রধান মন্ত্রীর আহ্বানে তিনি তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে, তাহা বলিতে পার।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বলিতে লাগিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, অপরাধী নিশাচর বাজ যে সকল কাগজপত্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা পাঠ করা আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ

বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় আমাকে তাহা পাঠ করিতে হইয়াছিল। এ দেশের সংবাদপত্রসমূহে নিশাচর বাজ "ভদ্রলোক তস্কর" নামে অভিহিত। তাহার প্রেরিত যে সকল কাগজপত্র আমাকে পাঠ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুই একখানি কাগজ সম্পূর্ণ সাদা, অর্থাৎ তাহাতে কিছুই লিখিত ছিল না। যে সময় আমি আমার রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলাম, সেই সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ, পুলিস-কমিশনার লর্ড ব্র্যাড্‌নি সেই সাদা কাগজ কয়খানি এক পাশে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই দিনই কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সেই কাগজগুলি সম্ভবতঃ অদৃশ্য কালীর সাহায্যে লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার এই অনুমান সত্য কি না, তাহা পরীক্ষা করা উচিত। তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সেই কাগজ হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট এই সকল কথা বলিয়া নীরব হইলে প্রধান মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই সাদা কাগজগুলি হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করিবার পর কি জানিতে পারা গিয়াছিল ?"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বলিলেন, "হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ সেই সাদা কাগজ পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এই 'ফাইলে' সংরক্ষিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই রিপোর্ট সমর-সচিবের কৌতূহলোদ্দীপক হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের মন্তব্য শুনিয়া সমর-সচিব সেই কাগজ দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় ইন্‌স্পেক্টর তাহা 'ফাইল' হইতে খুলিয়া লইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। সমর-সচিব ব্যগ্রভাবে তাহা পাঠ করিলেন। পাঠের পর তিনি তাঁহার সহযোগিবর্গের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই তাঁহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, এবং তাঁহারা তাহার মর্ম্ম জানিবার জন্য উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সমর-সচিব তাঁহার সহযোগিবর্গের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "প্রধান মন্ত্রী, ইহা অত্যন্ত সঙ্গীন ব্যাপার!"—অনন্তর তিনি একখানি কাগজ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এরোপ্লেন ধ্বংসকারী কামানগুলির মধ্যে যে কামান সর্ব্ব-শেষে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার নির্ম্মাণ-কৌশলের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার ধারণা ছিল, এই কামানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সকল কথা কেবল আমাদের দলের কয়েকজনের সুবিদিত ; বাহিরের কোন লোক এই গুপ্ত সংবাদ জানিতে পারিয়াছে, ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে—ইহা আমাদের কল্পনারও অগোচর ছিল !"

অতঃপর প্রধান মন্ত্রী ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, এই সকল কাগজপত্র তুমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ক্রিজিনোভস্কি নামক একটি লোকের সিন্দুক হইতে এই সকল কাগজ-পত্র পাওয়া গিয়াছে। এই লোকটি পেশাদার দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। সে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিত, এবং তাহাদিগের ভাগ্যফল বলিয়া দিত। ক্রিজিনোভস্কির সিন্দুক হইতে যে ব্যক্তি উহা আবিষ্কার করিয়াছিল, এ দেশের সংবাদপত্রসমূহে সেই অপরাধীটা নিশাচর বাজ নামে পরিচিত। আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছি।"

প্রধান মন্ত্রী এটর্ণী-জেনারলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ এটর্ণী-জেনারল, এ সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত ?"

বৃটিশ-রাজের এটর্ণী-জেনারল তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমার উপদেশ এই যে, যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে তাহার নাম এবং সে কি কার্য্য করিয়াছে, তাহার বিবরণ যাহাতে প্রকাশ না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। জাতীয় স্বার্থের অনুরোধেই তাহা গোপন করিতে হইবে।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত। ইন্‌স্পেক্টর, তুমি লর্ড ব্র্যাড্‌নিকে আমাদের অভিমত জানাইবে কি ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হ্যাঁ মহাশয়, আমি আপনার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিব।"

অতঃপর সেই সভায় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল, সেই সকল বিষয়ের সহিত ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের কোন সম্বন্ধ না থাকায় প্রধান মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে তিনি সভা ত্যাগ করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভারতীয় নাট্যের বেদমূলকতা

মানব-জীবনের সজীব অনুকরণই নাট্য। এ কারণে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারগণ দৃশ্যকাব্যের একটি সাধারণ নাম দিয়াছেন—"রূপক"। রূপক বলিতে সেই শ্রেণীর সাহিত্যকে বুঝায় যাহাতে একের (অর্থাৎ নট-নটীর) উপর অপরের (অর্থাৎ কবি-বর্ণিত চরিত্রের বা পাত্রের) রূপ (অর্থাৎ স্বরূপ) আরোপিত হইয়া থাকে। এ প্রকার রূপারোপ একমাত্র দৃশ্যকাব্য-সাহিত্যেই সম্ভব—শ্রব্যকাব্যে নহে। অতএব, দৃশ্যকাব্যই "রূপক" (drama) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (১)

রূপকের বিষয় রূপণ বা রূপারোপ বা জীবনের জীবন্ত অনুকরণ। কিন্তু যে মানব-জীবনের অনুকরণ রূপক সাহিত্যের ধর্ম্ম, সেই জীবনই যে একটা বিরাট বিচিত্র প্রহেলিকা। আর এই কারণেই অনুকরণাত্মক নাট্যসাহিত্যের স্বরূপও চির-কুহেলিকায় সমাবৃত। শুধু ভারত নহে, পৃথিবীর কোন দেশেই দৃশ্যকাব্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির কোনরূপ সঠিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির ইতিহাস সম্বন্ধে বহু বিশ্ববিশ্রুত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষী নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই— আর কোন দিন কেহ পারিবেন বলিয়া ভরসাও হয় না। কারণ, এ বিষয়টির মধ্যে এতই বৈচিত্র্য বর্ত্তমান যে, তাহার প্রত্যেকটি বিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সমগ্র স্থিতিকালের মধ্যেও সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে না। সৃষ্টির বৈচিত্র্য সমগ্র স্থিতিকাল-ব্যাপী আর এই বৈচিত্র্যেরই অনুকরণে নাট্যের উৎপত্তি ও প্রসার। জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া যেমন সকল দর্শন ও বিজ্ঞান মূক হইয়া গিয়াছে, জীবনের অনুকরণস্বরূপ রূপকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সকল গবেষণাই সেইরূপ ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতের বিচিত্র মতবাদসমূহ নিঃশেষে ও সবিস্তারে সঙ্কলন করিয়া প্রবন্ধটিকে অনর্থক ভারগ্রস্ত করিতে চাহি না।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্য যুগে এদেশে যত কিছু আলোচনা হইয়াছে, সে সকলেরই আদিমতম উৎস মহামুনি ভরতের রচিত "নাট্যশাস্ত্র"। বর্ত্তমানে ভরতনাট্যশাস্ত্রের যে সংস্করণটি পাওয়া যায়, তাহাই মহর্ষি কর্ত্তৃক রচিত মূল নাট্যশাস্ত্র কি না—সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিবুধমণ্ডলী অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলিয়াই অধুনা উপলভ্যমান নাট্যশাস্ত্রখানিকে নিতান্ত আধুনিক যুগের রচনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য গবেষক পণ্ডিতই উহাকে টানিয়া খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর নিম্নে নামাইয়া আনিতে পারেন নাই। বরং উহা যে বহু প্রাচীনতর যুগের রচনা—অন্ততঃ, গ্রন্থখানির মধ্যে নানা যুগের রচনার বিভিন্ন স্তর বর্ত্তমান ও এই সকল স্তরের মধ্যে কোন কোনটি যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের রচনা—তাহা বিশ্বাস করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে। এ জন্য ভরতের নাট্যশাস্ত্র ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কৌতূহলকর বিবরণ দিয়াছেন, তাহাকে কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলে না। আমরা সর্ব্বপ্রথমে সেই বিবরণটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, নাট্য-সাহিত্য অনাদি। কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়ে নাট্যসাহিত্য অভিব্যক্ত অবস্থায়ও থাকে না। যুগবিশেষে, দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা অনুসারে রূপক-সাহিত্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পের প্রথম মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগে (২)

(১) বাঙ্গালা ভাষায় "রূপক" অর্থে সাধারণতঃ বুঝায়—allegory; কিন্তু সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে drama-র পারিভাষিক সংজ্ঞাই "রূপক"। অবশ্য "রূপক" শব্দটির বহুবিধ অর্থ সংস্কৃত অভিধান-কোষে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে নাট্যশাস্ত্রে "রূপক" শব্দটি দৃশ্যকাব্যের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'রূপক' শব্দটি উক্ত দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) বর্ত্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহকল্প। উহা ব্রহ্মার এক দিনের (দিবা-ভাগের) সমপরিমাণ। ১ কল্প=ব্রহ্মার ১ দিন (দিবা অথবা রাত্রি)=১৪ মন্বন্তর=১০০০ দিব্যচতুর্যুগ=৪৩২

চতুষ্পাদ ধর্ম্মের সুপ্রকাশ হেতু নাট্যের কোন প্রয়োজন অনুভূত না হওয়ায় উহা তিরোভূত অবস্থায় ছিল। পরে ত্রেতাযুগে জগতে একপাদ অধর্ম্ম সঞ্চারিত হইল দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন—শূদ্রজাতিগণের পক্ষে বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই। অতএব তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি যেন কোন এক সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রের প্রার্থনা পরিপূরণে সম্মত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদের অঙ্গসম্ভূত এই পঞ্চম 'নাট্যবেদ' সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। আর তদবধি প্রতি কল্পের প্রতি মন্বন্তরের প্রতি ত্রেতাযুগে নূতন করিয়া নাট্যশাস্ত্রের অভিব্যক্তি হইয়া আসিতেছে। ইহার সৃষ্টিহেতু ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্যাংশ, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্ব্ববেদ হইতে রস সংগৃহীত হইয়াছিল।

দেবগণের প্রার্থনায় নাট্যবেদের আবির্ভাব ঘটিলেও দেবগণ ক্লেশসাধ্য নাট্যবেদ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। তখন এই নাট্যবেদ ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রথম শিক্ষা করিলেন মহর্ষি ভরত। পরে তাঁহার শত পুত্র তাঁহার নিকট হইতে নাট্যবেদ শিক্ষা করিয়া উহার প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করিলেন। শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, কোহল, দত্তিল প্রভৃতি এই শত ভরত পুত্রই হইলেন ভারতের আদি অভিনেতা। কিন্তু কেবল অভিনেতা দ্বারাই ত অভিনয় চলে না; বিশেষতঃ কৈশিকী-বৃত্তিমূলক কোমল ভাবের অভিনয়ে অভিনেত্রীর একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এ কারণ পিতামহকে মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরোগণের সৃষ্টি করিতে হইল। ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি এই অপ্সরোবৃন্দই হইলেন ভারতের আদি অভিনেত্রী। এইরূপে উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মেলনে মহামুনি ভরত কর্ত্তৃক 'ভারতীয় আদি নাট্য-সম্প্রদায়' গঠিত হইল। সশিষ্য মহর্ষি স্বাতি 'বাদ্যভাণ্ডে'র (ঢক্কাজাতীয় বাদ্যের) অধিকারে ও নারদাদি গন্ধর্ব্বগণ 'গানযোগে' (অর্থাৎ 'তত' বা বীণা প্রভৃতি তারের যন্ত্র, ও 'সুষির' বা বংশী প্রভৃতি হাওয়ার যন্ত্র বাজাইতে) নিযুক্ত হইলেন। পরে দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে 'তণ্ডু' (নন্দী) ভরতকে নিজ সম্প্রদায়ের উদ্ধত 'তাণ্ডব' নৃত্য ও স্বয়ং দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে সুকুমার 'লাস্য' নৃত্যের উপদেশ প্রদান করেন। অবশেষে পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে (ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত) নাট্যমাতৃকাস্বরূপিণী 'বৃত্তি'-চতুষ্টয়ের (৩) শিক্ষা দান করিলে নাট্যবিদ্যা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

দেবলোকে দেবভাষায় রচিত যে সকল দৃশ্যকাব্য এই স্মরণাতীত যুগে অভিনীত হইয়াছিল, নাট্যশাস্ত্রে তাহাদিগের নামও উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। তবে এই সকল দৃশ্যকাব্যের মধ্যে প্রথম যেখানির অভিনয়ের আয়োজন হয় ও যাহার অভিনয়ে দৈত্য, অসুর ও বিঘ্নগণ বাধা প্রদান করায় বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে রূপকখানির নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। (সম্ভবতঃ উহা 'অমৃতমন্থন সমবকার' হইলেও হইতে পারে)। উহা যে বহুযুগব্যাপী দেবাসুর-সংগ্রামের কোন একটি বিশিষ্ট ঘটনা অবলম্বনে রচিত—ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র যে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি দেবলোকে চির উজ্জ্বল রাখিবার উদ্দেশ্যে অমরবৃন্দ "শক্রধ্বজ-মহোৎসবে"র আয়োজন করেন ও তদুপলক্ষেই দেবলোকে প্রথম নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অবশ্য এই অভিনয় বিজিত দৈত্যজাতির অন্তরে যথেষ্ট বিক্ষোভ উৎপাদন করে ও প্রতিহিংসা গ্রহণের অভিলাষে তাঁহারা মায়াবলে নাট্যবিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেবরাজের নিকট তাঁহাদিগের মায়াপ্রয়োগ ধরা পড়িয়া যায় ও তাঁহার ধ্বজপ্রহারে মায়াবীদিগের শরীর জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। সেই সময় হইতে ইন্দ্রধ্বজ 'জর্জ্জর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ও ক্রমশঃ উহা নাট্যাভিনয়ের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল (৪)। ইহার পর দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা

কোটি মানুষ বৎসর। পর্য্যায়ক্রমে এক কল্পে সৃষ্টি ও তাহার পরবর্ত্তী কল্পে প্রলয় ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ অবশ্য সৃষ্টিকল্প। ১ মন্বন্তর=১ মনুর অধিকার কাল=৭১ (বা মতান্তরে কিঞ্চিদধিক ৭১) দিব্যচতুর্যুগ। চতুর্দ্দশ মনুর নাম যথাক্রমে—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি (বা উত্তমৌজাঃ বা উত্তম), তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য-(বা দৈব=)-সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমানে শ্বেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগ চলিতেছে। কল্পারম্ভ হইতে ১৯৭২৯৪৯০৩৯ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে

---

(৩) মাসিক বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪৪—'নাট্যমাতৃকা' প্রবন্ধ।

(৪) Growse ভারতে 'হোলি' উৎসব ও প্রাচীন ইংলণ্ডের 'May-day' উৎসবের তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু ৺ম-মঃ ডাঃ

শক্ররোধক এক অতি দুর্ভেদ্য নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ করিলে তথায় পিতামহ কর্ত্তৃক রচিত 'অমৃতমন্থন' নামক 'সমবকার' ভরতের নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। পরে হিমাচলে দেবাদিদেব মহাদেবের সম্মুখে অমৃতমন্থনের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ও তৎসহ পিতামহের রচিত আর একখানি রূপক 'ত্রিপুরদাহ ডিম' রঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছিল (৫)। ইহার কিছুদিন পরে দেবরাজ ইন্দ্রের সভাস্থলে মহর্ষি ভরত-রচিত "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকের অভিনয়ের আয়োজন। চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি পুরূরবাঃ এই অভিনয় দর্শনার্থ নরলোক হইতে দেবলোকে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নাটকখানতে অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন ও তাঁহার সখী অপ্সরঃপ্রধানা মেনকা বারুণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। পুরূরবার অপরূপ রূপে মুগ্ধা দেবী উর্ব্বশী অভিনয়কালে নিজ পাঠ্যাংশ বিস্মৃত হইয়া অনবধানতাবশে 'পুরুষোত্তম' বলিতে 'পুরূরবাঃ' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। এ কারণে তিনি দেবরাজ কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হ'ন ও বহুদিন মহারাজ পুরূরবার সঙ্গিনীরূপে নরলোকে অবস্থানপূর্ব্বক মর্ত্ত্যে নাট্যকলার প্রথম প্রচার করেন (৬)। কিন্তু তাঁহার শাপমুক্তির পরে নরলোকে নাট্যকলার বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল। ইহার বহুবর্ষ পরে পুরূরবার পৌত্র মহারাজ নহুষ শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে দেবলোকের অভিনেতৃবর্গ (মহর্ষি ভরতের শতপুত্র) ঋষিগণের চরিত্রের প্রতি অশ্লীল কটাক্ষপূর্ণ একখানি অতি হীন স্তরের দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ করায় ঋষিশাপে পাতিত্য (শূদ্রভাব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ নহুষের অনুরোধে মহর্ষি ভরত তাঁহার অভিশপ্ত পুত্রগণকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করেন। তথায় মানুষী অভিনেত্রীগণের সহিত মিশ্রণের ফলে যে সকল সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগের বংশজাত স্ত্রী-পুরুষগণ সকলেই পরবর্ত্তী যুগে নটনর্ত্তকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল (৭)। ইহারাই 'নট', 'শৈলূষ' বা 'কুশীলব' জাতি নামে বিখ্যাত হয়। ঋষিশাপে নটবংশধরগণ কেবল শূদ্রত্বই প্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু জায়াজীবত্ব নিবন্ধন অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ (কু-শীল-ব) হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, ইহাদিগের সেই জাতিগত কদাচার আজও পর্য্যন্ত নটসম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে নাই। আজিও জগতের সকল দেশেই নটবৃত্তিধারিগণ অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট অল্পাধিক অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া আছেন।

মহর্ষি ভরতের রচিত বলিয়া খ্যাত ও বর্ত্তমানে উপলভ্যমান "নাট্যশাস্ত্রে" দেবলোকে নাট্যের প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া মর্ত্ত্যে নাট্যের প্রথম প্রচার পর্য্যন্ত যে বিচিত্র উপাখ্যান কতক বিচ্ছিন্ন কতক বা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল। নাট্যশাস্ত্রের এই উপাখ্যানাংশটি বিশেষরূপ প্রণিধানযোগ্য নাট্যশাস্ত্র বলিতেছেন যে, বেদই ভারতীয় নাট্যের আদি, অকৃত্রিম ও প্রধান উপাদান। আমরাও দেখিতে পাই যে, ঋগ্বেদসংহিতা-মধ্যে এমন কতকগুলি 'সূক্ত' আছে, যাহাতে নাটকীয় কথোপকথনের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই সূক্তগুলির কোনরূপ বিনিয়োগ বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপে —(১) ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ (ঋঃ ১।১৬৫, ১৭০ ও ১৭১), (২) অগস্ত্য, তৎপত্নী লোপামুদ্রা ও তাঁহাদের পুত্র (ঋঃ ১।১৭৯), (৩) বিশ্বামিত্র ও নদীগণ (ঋঃ ৩।৩৩), (৪) ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেব (ঋঃ ৪।১৮), (৫) ইন্দ্র ও বরুণ (ঋঃ ৪।৪২), (৬) বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণ (ঋঃ ৭।৩৩), (৭) নেম ভার্গব ও ইন্দ্র (৮।১০০), (৮) যম ও যমী (ঋ ১০।১০), (৯) ইন্দ্র, বসুক্র ও তৎপত্নী (ঋঃ ১০।২৮), (১০) অগ্নি ও দেবগণ (ঋঃ ১০।৫১-৫৩), (১১) ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপি (ঋঃ ১০।৮৬), (১২) পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশী (ঋঃ ১০।৯৫), (১৩) সরমা ও পণিগণ (ঋঃ ১০।১০৮)—প্রভৃতি 'সংবাদসূক্তের' উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ ব্যতীত অথর্ব্ববেদেও এইরূপ একটি সংবাদ-সূক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদসংহিতায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে Maypole Dance ও জর্জ্জরোৎসব সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবে। Maypole Dance শীতান্তে ও জর্জ্জরোৎসব বর্ষান্তে সম্পাদিত হয়।

(৫) সমবকার—দেবাসুরযুদ্ধ অবলম্বনে রচিত, ত্র্যঙ্ক-পরিমিত, দ্বাদশনায়কযুক্ত দৃশ্যকাব্যবিশেষ। ডিম—দেবাসুরপিশাচযক্ষরাক্ষসনাগসঙ্কুল, চতুরঙ্ক, ষোড়শনায়কযুক্ত দৃশ্যকাব্যবিশেষ। বিশেষ বিবরণ নাট্যশাস্ত্রের ১—৪ অধ্যায়, ও ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। (কাশীসংস্করণ)।

(৬) মহাকবি কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক 'ত্রোটকে' এই ঘটনার উল্লেখ আছে। 'ত্রোটক' উপরূপকবিশেষ—সপ্ত, অষ্ট, নব বা পঞ্চ অঙ্ক পরিমিত; প্রতি অঙ্কে বিদূষকের উপস্থিতি প্রয়োজন।

(৭) নাট্যশাস্ত্র, বারাণসীসংস্করণ, ৩৬ অধ্যায়।

(৫ । ১১) পুরোহিত 'অথর্ব্বা' দেবতার সহিত গোলাভের আশায় কথোপকথন করিতেছেন—এরূপ উল্লেখ আছে। অবশ্য ঋগ্বেদের এই সকল সংবাদসূক্তের মধ্যে দুই একটির স্বরূপ লইয়া কিছু বিবাদও আছে। 'নিরুক্ত'কার যাস্ক বলেন—'পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশী' (ঋঃ ১০ । ৯৫) সূক্তটি সংবাদসূক্ত, কিন্তু 'বৃহদ্দেবতা'-কার শৌনকের মতে ইহা ইতিহাস বা আখ্যানমাত্র। যাহাই হউক, একমাত্র 'ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী-বৃষাকপি' (ঋঃ ১০ । ৮৬) ব্যতীত অন্য কোন সংবাদ-সূক্তে বিনিয়োগ সায়নাচার্য্যের ভাষ্যে দৃষ্ট হয় না। এই সকল সংবাদসূক্ত ব্যতীত আরও এমন কয়েকটি সূক্ত আছে, যাহাতে মাত্র 'একজনের উক্তি' (monologue) (যথা ঋঃ ৭।১০৩, ৯।১১২, ১০।৩৪, ১০।১০২, ১০।১১৯) নাটকীয়ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কথোপকথন ব্যতীত অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত সূক্তগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে—'সংবাদসূক্ত' (dialogue hymn) (৮)।

এই সকল সূক্তের আদি উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা বর্ত্তমানে জানিবার সুযোগ না থাকিলেও এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার সাহেবের মন্তব্য বিশেষভাবে আলোচনীয়। 'ইন্দ্র ও মরুদ্গণ' (ঋঃ ১।১৬৫) সূক্তটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আজ হইতে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে (খ্রীঃ ১৮৬৯) অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছিলেন—এই সূক্তটিই ভারতীয় নাট্যরচনার প্রাচীনতম আদর্শ। মরুদ্যজ্ঞে মরুদ্গণের স্তুতির উদ্দেশ্যে উহা পঠিত হইত। আর এই পাঠ-প্রক্রিয়ার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। বহু প্রাচীনযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋত্বিগ্গণ আবশ্যকমত দুই বা ততোধিক দলে বিভক্ত হইতেন। বর্ত্তমান সূক্তটির আবৃত্তি-কালে ঐরূপ দুই দলে বিভক্ত ঋত্বিগ্বৃন্দের একদল সমস্বরে ইন্দ্রের উক্তি উচ্চারণ করিতেন ও অপর দল কর্ত্তৃক মরুদ্গণের পাঠ্যাংশ উচ্চারিত হইত। অতএব, এই প্রকার বিভিন্নদলগত উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক আবৃত্তিকে নাট্যের প্রথম হেতু বা বীজ বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারের এই উক্তি নাট্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-বিরোধী নহে—পরন্তু পরিপোষক। ঋগ্বেদ হইতে নাট্যবেদের পাঠ্যাংশ গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া ভরত-নাট্যশাস্ত্রের যে বচন পাওয়া যাইতেছে, তাহাকে ত আর অপ্রমাণ বলা চলে না। একুশ বৎসর পরে (খ্রীঃ ১৮৯০) অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি বলিলেন যে, অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। বৈদিক সাহিত্যই যে ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তিস্থল, তাহার আরও একটি প্রমাণ এই যে, সামবেদে সঙ্গীতকলার বিশেষ পরিপুষ্টির আভাস পাওয়া যায়। লেভি সাহেবের এই উক্তিও নাট্যশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের ("সামভ্যো গীতমেব চ") অনুকূল। আর অধ্যাপক কীথ্ সাহেব ত স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের যুগে যজ্ঞস্থলে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নাটকীয় দৃশ্যাদির প্রয়োগ হইত, আর ঐ সকল প্রয়োগে ঋত্বিগ্গণ দেবতা ঋষি প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রবর্ণিত দেবলোকে সঙ্ঘটিত ঘটনাবলীর মর্ত্ত্যে অনুকরণাত্মক অভিনয় করিতেন। (৯)

পক্ষান্তরে অধ্যাপক শ্রেডার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সংবাদসূক্ত ও একোক্তিসূক্তগুলি বৈদিক যুগের ধর্ম্ম-রহস্য-মূলক আখ্যানের লুপ্তাবশিষ্ট রূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নৃবংশবিদ্যার (Ethnology) আলোচনা দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সকল গীত-বাদ্য-নৃত্য-নাট্য প্রয়োগের দুইটি দিক্ ছিল—একটি যাজ্ঞিক ও অপরটি লৌকিক। যে মহানটের লীলানাট্যে নিখিল বিশ্বের অভিব্যক্তি, যাজ্ঞিক নাট্য তাহারই প্রতীকরূপে পরিগৃহীত হইত। তবে ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, গ্রীস্-মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের ন্যায় এ দেশের নাট্যোৎপত্তির উপর লিঙ্গপূজার আনুষঙ্গিক নৃত্যাদির প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। অবশ্য কাল-ক্রমে এই যাজ্ঞিক নাট্যের ধারা ভারতভূমি হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু লৌকিক নাট্যের দিকটি ধারাবাহিক

(৮) অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, বেদাংশ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ (বেদান্ত)-মধ্যে যে সকল আখ্যান দৃষ্ট হয়, তাহাদের কতকগুলিকে 'পারিপ্লব',-প্রয়োগার্থক ও কতকগুলিকে সন্নিহিত-বিদ্যাস্তুতিপর বলিয়া বেদান্তদর্শনে (ব্রহ্মসূত্রে) ভগবান্ বাদরায়ণ উল্লেখ করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৩)। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথম দিনে "মনুর্বৈবস্বতো রাজা", দ্বিতীয় দিনে 'যমো বৈবস্বতো রাজা', তৃতীয় দিনে 'বরুণ আদিত্যঃ' ইত্যাদি আখ্যানের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এই সকল আখ্যানকে 'পারিপ্লবার্থক' বলা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত 'যাজ্ঞবল্ক্য' মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী '(বৃহদারণ্যক উপ ৪।৫।১) 'প্রতর্দ্দন দৈবোদাসি' (কৌষীতকি ৩।১), 'জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ' (ছান্দোগ্য ৪।১।১)—প্রভৃতি উপনিষদুক্ত আখ্যান বিদ্যাপ্রতিপাদক।

(৯) A.B.Keith—The Sanskrit Drama, P, 16.

ভাবে প্রসার লাভ করিতে করিতে অবশেষে বাঙ্গালাদেশের 'যাত্রা'র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

ডক্টর হার্টেলও প্রকারান্তরে এই মতের সমর্থন করিয়া বলেন যে, বৈদিক সূক্তগুলি প্রায়ই গীত হইত (১০)। কিন্তু একই গায়কের কণ্ঠে গীত হইলে সংবাদসূক্ত-মধ্যগত বিভিন্ন চরিত্রে উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কারণ, সংবাদসূক্তগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় বিভিন্ন গায়ক বা পাঠক অবতীর্ণ হইতেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই তিনি সমীচীন বোধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীন বৈদিক সংবাদসূক্তগুলি ভারতীয় নাট্যের বীজস্বরূপ ("Mystery Plays Italics")। আর এই হিসাবে তিনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' সহিত বৈদিক সংবাদসূক্তের এক অতি অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদিক 'সুপর্ণাধ্যায়' একখানি পুরাদস্তুর সুবিস্তৃত দৃশ্যকাব্য।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋত্বিগ্‌গণ সংবাদসূক্তান্তর্গত বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ-পূর্ব্বক আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় বা নৃত্য-গীতাদি করিতেন—ইহার সম্ভাবনা মাত্র স্বীকার করিলেও এইরূপ ধর্ম্ম-রহস্যমূলক অভিনয়ই (mystery play বা miracle play) যে সংবাদসূক্তগুলির একমাত্র যাজ্ঞিক বিনিয়োগ ছিল, অথবা এই সকল সংবাদসূক্ত বা একোক্তিসূক্তের কোন কোনটি যে নবশস্যেষ্টি ও উর্ব্বরতা অনুষ্ঠানের রূপক মাত্র (১১), ইহা স্বীকার করা দুঃসাধ্য।

আবার অধ্যাপক উইণ্ডিশ্, ওল্ডেনবার্গ, পিশেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংবাদসূক্ত সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করিতেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহাদের মতে এই সূক্তগুলির রচনাশৈলী অতি প্রাচীন—একেবারে খাঁটি ইণ্ডো-ইউরোপীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সূক্তগুলি শ্রব্যকাব্যের শ্রেণীভুক্ত। তবে সাধারণ সূক্ত হইতে এগুলির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সংবাদসূক্তগুলির অন্তর্গত ঋক্‌সমূহ পূর্ব্বে নাটকীয় গদ্যাংশ (চূর্ণক) দ্বারা পরস্পর গ্রথিত ছিল। এক্ষণে কালক্রমে সেই সকল গদ্য সংযোজকাংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল অসংবদ্ধ পদ্যাংশ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল গদ্য চূর্ণকাংশের বিশেষ কোনরূপ কাব্যসৌন্দর্য্য ছিল না। পক্ষান্তরে ঋক্‌সমূহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কাব্যরস নিহিত রহিয়াছে। অতএব নীরস অংশের বিলোপ হইলেও সরস অংশের কোনই হানি ঘটে নাই। এ উক্তির মূলেও যুক্তি কতটুকু আছে, তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। বিশেষ করিয়া বৈদিক সংবাদসূক্তের প্রাচীনতা যতই হউক না কেন, তাহাতে ইণ্ডো-ইউরোপীয় গন্ধ মিলিল কিরূপে, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন! মোটের উপর এ সকল পণ্ডিত বলিতে চাহেন যে, লৌকিক যুগের গদ্য ও পদ্য—এই উভয়বিধ শ্রব্যকাব্য, ও গদ্য-পদ্যমিশ্রিত সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য—এই সকল শ্রেণীর কাব্যই বৈদিক সংবাদসূক্ত হইতে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে।

গেল্ড্‌নার প্রমুখ কতিপয় প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ বহুলাংশে এই মতের অনুগামী হইলেও নিজেদের বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সংবাদসূক্তগুলি চারণকণ্ঠোচ্চারিত গীতবিশেষ (ballad) মাত্র।

আর ষ্টেন কোনো, কীথ্, উইণ্টারনিজ প্রমুখ গবেষকবৃন্দ এগুলিকে নির্ব্বাক্ আঙ্গিক অভিনয় মাত্রের (pantomime) উপজীব্য কাহিনী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বৈদিক-যজ্ঞানুষ্ঠানে নাট্যের বীজ যে খুঁজিলে একেবারেই মিলে না—এমন নহে। তবে কেবল সংবাদসূক্ত কয়টি

(১০) হার্টেল সাহেব এই স্থলে একটি বড় ভুল করিয়াছেন—ঋগ্বেদের সূক্তগুলি 'শংসিত' (অর্থাৎ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরসংযোগে উচ্চারিত) হইত, কেবল সামগুলিই গীত হইত। অতএব, বেদমন্ত্র মাত্রেই গীত হইত, এরূপ অপ্রামাণিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তস্থাপনে অগ্রসর হওয়ায় তাঁহার মতে বহু দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(১১) উর্ব্বরতা বা শস্যোৎপত্তির রূপক বলিয়া যে সকল সূক্ত গৃহীত হইয়াছে—'মণ্ডূকসূক্ত' (ঋঃ ৭।১০৩) তাহাদিগের অন্যতম। মণ্ডূক বা ভেকের মুখোস পরিয়া ঋত্বিগ্‌গণ এই সূক্ত পাঠ করিতেন, তাহাতে বৃষ্টি নামিত—ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়। অতএব এ সূক্তটি বৃষ্টি নামাইবার মন্ত্র। পক্ষান্তরে 'ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ' (ঋঃ ১।১৬৫।১৭০।১৭১) সূক্তগুলির দ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক বৃত্রবিজয় দৃশ্যের অভিনয় হইত। মরুদ্‌গণের ভূমিকাধারী অস্ত্রগ্রাহী যুবকগণ ঐ অভিনয়ে নৃত্য করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই অস্ত্রনৃত্য 'শস্যেষ্টির' রূপক। পুরাতন বর্ষ বা শীত কালকে দূর করিয়া দেওয়ার অর্থ মৃত্যু জয়। Greek Kouretes, Phrygi.n Korybantes ও জার্ম্মাণ তরবারি-নৃত্যের সহিত মরুদ্‌বেশী যুবক-ঋত্বিগ্‌গণের অস্ত্রনৃত্যের সাদৃশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

হইতে সর্ব্বাঙ্গ-পরিপুষ্ট নাট্যকলার সূত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করাও গবেষণার প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। একটি মাত্র স্তর নামিয়া আসিলেই আমরা এই কথার সত্যাসত্য উপলব্ধি করিতে পারি। প্রথমেই ধরা যাউক, সামবেদের কথা। অবশ্য ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেও জন-মনোহারিণী নৃত্য-গীতকুশলা নারীর (নৃতূ—ঋ ১।৯২।৪) বিবরণ দৃষ্ট হইলেও উহাকে নৃত্যকলা বা সঙ্গীতকলার প্রাচীনতা-প্রতিপাদক পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বলিয়া অনেকে স্বীকার না করিতেও পারেন। কিন্তু সামবেদের যুগে গীতচর্চ্চা যে বহু বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকিতে পারে না। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও উহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে এই অভিনয়ের প্রাধান্য অল্প আয়াসেই অনুভব করা যায়। নাট্যশাস্ত্রও এই কথাই বলিয়াছেন—"যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্"। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা চলে যে, 'সোমযাগে' এই অভিনয়ের আভাস বেশ স্পষ্ট। সোম-বিক্রেতাকে মূল্য ত দেওয়াই হইত না, অধিকন্তু সে বেচারীকে মাটীর ঢেলা ও ইটপাটকেলের প্রহারে জর্জ্জরিত করা হইত। এই ঘটনায় সোমবিক্রয়ের নিন্দার কোন আভাস পাওয়া যায় না। পরন্তু ইহা সোমরক্ষক গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে সোম-হরণ পর্ব্বের অনুকরণাত্মক বাগঙ্গাভিনয় মাত্র। এইরূপ 'মহাব্রতে'র অনুষ্ঠানেও অভিনয়ের যথেষ্ট মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। শ্বেতবর্ণ গোলাকৃতি চর্ম্মখণ্ড লইয়া গৌরবর্ণ বৈশ্যের সহিত কৃষ্ণকায় শূদ্রের বিবাদ ও পরিণামে বৈশ্যের জয়—ইহাই মহাব্রতের নাটকীয় ঘটনা। শ্বেতবর্ণ চর্ম্মখণ্ড সূর্য্যের, আর গৌরাঙ্গ বৈশ্য আর্য্যজাতির (তথা আলোকের) ও কৃষ্ণাঙ্গ শূদ্র অনার্য্যজাতির (তথা অন্ধকারের) প্রতীক-স্থানীয় হইলেও এ ব্যাপারটি নিছক রূপক (allegory) বা ধর্ম্মরহস্যাভিনয় (mystery play) নহে। পুরাদস্তর অভিনয়ের যথেষ্ট উপাদান ইহাতে বিদ্যমান। এ জন্য ইহাকে অতি প্রাচীন যুগের যাজ্ঞিক অভিনয় বলাই সঙ্গত। ইহার আনুষঙ্গিকরূপে এক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী ও এক গণিকার পরস্পর গালিদানের বর্ণনাও পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ইহার মধ্যে যৌনমিলনের আভাস পাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, এ ঘটনাটিও উর্ব্বরতা অনুষ্ঠানের (fertility ritual) রূপক (allegory) মাত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের (যখন নাট্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণানুযায়ী নাটকাদি দৃশ্যকাব্য লৌকিক কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত হইত) বিদূষক ও মুখরা চেটীর কলহের সহিত এই ঘটনার সারূপ্য লক্ষ্য করিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, এই ব্যাপারটি কেবল রূপক নহে—ইহার মধ্যে লৌকিক অভিনয়েরও একটা দিক্ ছিল। অবশ্য "অশ্বমেধ" যজ্ঞানুষ্ঠানে পুত্রলাভের আশায় ছিন্নশীর্ষ যজ্ঞাশ্বের সহিত প্রধানা রাজমহিষীর যৌনমিলনের আভাস পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ উর্ব্বরতা অনুষ্ঠানের রূপক (allegory) বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যেও নাটকীয় উপাদান যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা অস্বীকার করা দুঃসাহসের কার্য্য।

কেবল তাহাই নহে, যজুর্ব্বেদে (বাজসনেয়-সংহিতা ৩০।৬, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩.৪.২) 'নট' শব্দের পর্য্যায় 'শৈলূষ' শব্দটিও দৃষ্টিগোচর হয়। অধ্যাপক কীথ্ বিনা যুক্তিতে শৈলূষ শব্দের অর্থ করিতে চাহিয়াছেন গায়ক অথবা নর্ত্তক—নট নহে। পক্ষান্তরে অধ্যাপক হিল্লেব্রাণ্ড সাহেব এই সকল অনু-করণাত্মক যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ যাজ্ঞিক দৃশ্যকাব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর অধ্যাপক কোনো বলেন যে, উক্ত ব্যাপারগুলি লৌকিক মূকাভিনয় হইতে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে আহৃত হইয়াছিল।

যাজ্ঞিক নাট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বেদের ব্রাহ্মণাংশে বহু আখ্যানমধ্যে দৃশ্যকাব্যের পর্য্যাপ্ত উপাদান সুস্পষ্ট দৃষ্টি-গোচর হয়। আর সে দৃষ্টিতে দেখিলে ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত-গুলির কয়েকটিকেও পরবর্ত্তী যুগের কোন কোন বিখ্যাত সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বীজ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়। সংবাদসূক্তের কোন কোনটি আবার ব্রাহ্মণভাগের আখ্যানে গদ্যাকারে (হয়ত বা পরিবর্ত্তিত ভাবে) বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপোপাখ্যান বা শতপথব্রাহ্মণের পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশীর উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। এই উর্ব্বশী ও পুরূরবার কাহিনীই পরবর্ত্তী যুগে মহাকবি কালিদাসের অমৃত-নিষ্যন্দিনী লেখনীমুখে 'বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকে' রূপান্তরিত হইয়াছিল। এইরূপ শতপথ ব্রাহ্মণের অপ্সরাঃ শকুন্তলা ও দুঃষন্ত আখ্যান ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দৌষ্‌ষন্তি ভরতের উপাখ্যানই সম্ভবতঃ কালিদাসের 'অভি-জ্ঞানশকুন্তল' নাটকের আদিম উপজীব্য। অতএব, এ

সকল সুপ্রাচীন আখ্যানের আনুষঙ্গিক বাগঙ্গাভিনয়াত্মক অনুষ্ঠানকে মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ধর্ম্মরহস্য-রূপকের সমপর্য্যায়-ভুক্ত বা নিছক মূকাভিনয়ের স্থানীয় বলিয়া কল্পনা করা সঙ্গত হইবে কি ?

'পারস্করগৃহ্যসূত্রে' বলা হইয়াছে যে, নৃত্যগীতবাদ্যাদি কলাবিদ্যার অনুশীলন ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে নিন্দনীয় (পাঃ গৃঃ ২।৭।৩)। এই 'কলা' শব্দটি 'কৌষীতকি' ব্রাহ্মণেও (২৯।৫) দৃষ্ট হয়। নাট্যকলা না হউক, অন্ততঃ নৃত্যকলা যে বহু যজ্ঞানুষ্ঠানের বা গৃহ্যকর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃষ্টি নামাইবার জন্য মহাব্রতে অগ্নির চতুর্দ্দিকে কুমারীনৃত্য, বিবাহোৎসবে বরবধূর সৌভাগ্যকামনায় সধবা গৃহিণীগণের প্রমোদ-নৃত্য, মৃত্যুর পরে প্রেতের অন্তিম স্মৃতি-চিহ্ন (ভস্ম)-রক্ষার আধারের চতুষ্পার্শ্বে শোকনৃত্য প্রভৃতি নানারূপ আনুষ্ঠানিক নৃত্যবিধির উল্লেখদর্শনে ওল্‌ডেনবার্গ-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ধর্ম্মনৃত্যকেই নাট্যের আদি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক কীথ্ প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত কোনরূপ বৈদিক অনুষ্ঠানেই কেবল মূকাভিনয় ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ নাট্যের বীজ যে নিহিত থাকিতে পারে—ইহা স্বীকার করিতে চাহেন নাই।

ভারতীয় নাট্যের বেদমূলকতা সম্বন্ধে এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য পাশ্চাত্য মতের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া ভারতীয় কোন কোন গবেষক (অধ্যাপক বেলভালকর প্রভৃতি) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সংবাদসূক্তাদির কোনটি চারণের গীত, কোনটি বা প্রাচীনতর আখ্যানের ত্রুটিত অংশ, আবার কোনটি হয় ত যাজ্ঞিক রূপকের (drama) অন্তর্ভূত কথোপকথনের অংশমাত্র। কিন্তু এরূপ চতুরতার সহিত গোঁজামিল দিয়া ও সকলের মনরক্ষা করিয়া কার্য্যোদ্ধারের পক্ষপাতী আমরা নহি ডক্টর হার্টেলের ন্যায় আমরা অবশ্য সুপর্ণাধ্যায়কে পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যকাব্য বলিবার প্রয়াসী নহি; কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলি যে শুধুই অলীক কাহিনীমাত্র (myth) নহে, তাহাই আমরা প্রতিপাদিত করিতে চাহি। আর পাশ্চাত্য সুধীবর্গের মতবাদ বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রমাণও দিয়াছি যে, ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি-বীজ চতুর্ব্বেদমধ্যেই সুগুপ্ত ছিল।

"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্ব্বণাদপি ॥"

(নাট্যশাস্ত্র ১।১৭)

ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের বেদমূলকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। অধিকন্তু মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে প্রাচীন যুগে যেরূপ ধর্ম্মাঙ্গ রূপকাভিনয়ের প্রচলন ছিল, আমাদের ভারতবর্ষেও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তদনুরূপ বাগঙ্গাভি-নয়াত্মক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত—ইহা অনুমান করিবার বিরুদ্ধে বলবৎ প্রমাণ কিছু নাই। তবে পার্থক্য এই যে, দেশান্তরে আনুষ্ঠানিক রূপকাভিনয় শুধু দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি হেতু বলিয়া গণ্য হয় (১২), আর ভারতের বৈদিক সংবাদ-সূক্ত, ব্রাহ্মণবর্ণিত আখ্যানাবলী বা যাজ্ঞিক বাগঙ্গাভিনয়—লৌকিক দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়বিধ কাব্যেরই উৎসরূপে পরি-গণিত হইয়া থাকে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

(১২) দেশান্তরের এই সকল আনুষ্ঠানিক অভিনয়ে কেবল মূক অনুকরণ (pantomime) প্রদর্শিত হইত, অথবা তাহার সহিত বাচিকাভিনয়েরও সংযোগ থাকিত, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ নিশ্চয় নাই; কিন্তু প্রাচীন ভারতের যাজ্ঞিক নাট্যে বাচিক ও আঙ্গিক উভয়বিধ অভিনয়ই যে প্রদর্শিত হইত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

চন্দ্র-সূর্য্যে

কহিলেন শশধর হাসি' দীপ্ত তপনে—
"তৃপ্ত আজি সর্ব্ব লোক মম স্নিগ্ধ কিরণে।"
প্রভাকর উত্তরিল—"আত্মহারা হ'য়ো না,
পরান্নভোজীর গর্ব্ব—এ যে ভাই সাজে না।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বণিক্
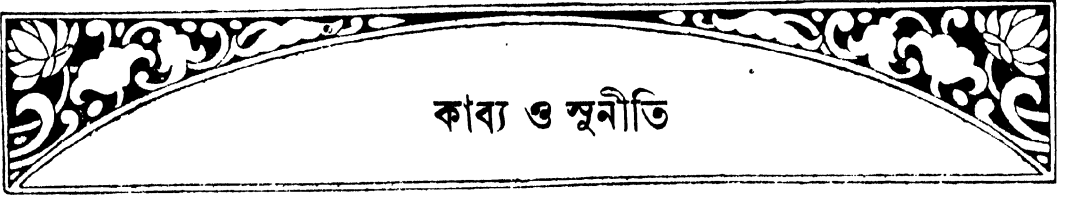
কাব্য ও সুনীতি

কাব্য যে চিত্তাকর্ষক হওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কোনও রচনা যদি চিত্তাকর্ষক না হয়, তাহা হইলে তাহাতে যতই কেন মহামূল্য উপদেশ থাকুক, তাহাকে কাব্য বলা যায় না। 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।' কাব্যে রস থাকা চাই। যাহা চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাই "রস"।

কিন্তু কোনও কাব্য চিত্তাকর্ষক হইলেই যে তাহা প্রশংসার্হ, এ কথা বলা যায় না, মানব-চিত্তকে সৎ-প্রসঙ্গের দ্বারাও আকর্ষণ করা যায়, অসৎ-প্রসঙ্গের দ্বারাও আকর্ষণ করা যায়। যে কাব্যে সৎ-প্রসঙ্গের দ্বারা চিত্ত আকর্ষণ করা যায়, তাহা সৎ-কাব্য। যে কাব্যে অসৎ-প্রসঙ্গের দ্বারা চিত্ত আকর্ষণ করা যায়, তাহা অসৎ-কাব্য। সৎকাব্য প্রশংসার্হ। অসৎ-কাব্য প্রশংসার্হ নহে।

কিন্তু এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, কাব্যের সহিত সুনীতি-দুর্নীতির কোন সম্বন্ধ নাই। কাব্য কেবল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবে। যাহা সুন্দর, তাহা সকল দেশের সকল সময়ের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু সুনীতি-দুর্নীতির কোনও সার্ব্বজনীন লক্ষণ নাই। যাহা একজন সুনীতি বলে, তাহা আর একজন দুর্নীতি বলে। যাহা এক কালে সুনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা আর এক কালে দুর্নীতি বলিয়া উপেক্ষিত হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, কাব্যে যদি সুনীতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্যসৃষ্টি—তাহারও অন্তরায় হয়।

কিন্তু এ সকল আপত্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণে যথেষ্ট সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পুত্রের কর্ত্তব্য, ভ্রাতার কর্ত্তব্য, পত্নীর কর্ত্তব্য, ভৃত্যের কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য—এ সকলই রামায়ণে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ঘটনাগুলি এরূপ ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে যে, তাহা চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। রাজ্যাভিষেক অবহেলা করিয়া রাম পিতৃসত্য পালন করিতে প্রসন্নবদনে বনে যাইতেছেন, রাজা শোকে অচেতন, সমগ্র অযোধ্যাপুরী মুহ্যমান, এই সকল কাহিনী শুনিলে হৃদয় করুণরসে বিগলিত হয় এবং সেই বিগলিত-হৃদয়ে এই উপদেশ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায় যে, পিতার আদেশ পালন করা পুত্রের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কৈকেয়ী মনে করিতেছেন, তিনি কৌশলে রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভরতের জন্য রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছেন, ভরত ইহা শুনিয়া লজ্জায় ও ক্রোধে অধীর হইতেছেন, কবি অপরূপ কৌশলের সহিত দেখাইতেছেন—ভ্রাতৃভক্তি কি সুন্দর, সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ কি কুৎসিত। সৎশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কোনও অন্তরায় হয় নাই। এইখানেই কবিপ্রতিভার সার্থকতা। সৎশিক্ষা দেওয়া হইবে, অথচ সে জন্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কোনও ব্যাঘাত হইবে না, কাব্য যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক থাকিবে। যে সকল নীতি রামায়ণে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সে সকল নীতি কোনও বিশেষ দেশ বা কালের উপযোগী, তাহা বলা যায় না। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেই এই সকল নীতির সমাদর করিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্য সকল দেশেও সমাদৃত হইয়াছে। সুতরাং সকল দেশে ও সকল কালে আদৃত নীতি অবলম্বন করিয়া চিত্তাকর্ষক কাব্য রচনা করা অসম্ভব নহে।

অবশ্য এমন কতকগুলি নীতি আছে—যেগুলি এক দেশে আদৃত, অন্য দেশে আদৃত নহে, অথবা এক সময়ে আদৃত, কিন্তু অন্য সময়ে অনাদৃত। মানবের জ্ঞানের উন্নতি সকল দেশে ও সকল সময়ে সমান থাকে না। কোনও দেশে জ্ঞান সমধিক উন্নত, কোনও দেশে ততদূর নহে। কোনও সময়ে জ্ঞানের উন্নতি হয়, আবার কোনও সময়ে অবনতি হয়। এই সকল কারণে সকল উত্তম নীতি সকল দেশে সকল সময়ে আবিষ্কৃত হয় না, অথবা জ্ঞানিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইলেও বহুসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা আদৃত হয় না। কিন্তু এই ভাবে নীতির যেরূপ দেশ ও কালভেদে প্রভেদ হয়, সৌন্দর্য্য

সম্বন্ধেও সেইরূপ দেশ ও কালভেদে লোকের ধারণা ভিন্ন হইয়া থাকে। এক দেশে বা এক সময়ে যাহা সুন্দর বিবেচিত হয়, অন্য দেশে বা অন্য সময়ে তাহা সুন্দর বিবেচিত না হইতে পারে। চীনদেশে রমণীর ক্ষুদ্র পদ এক সময় সুন্দর বিবেচিত হইত, অন্য দেশে নহে; চীনদেশেও বোধ হয় এখন বিবেচিত হয় না। পূর্ব্বে দীর্ঘকেশ সৌন্দর্য্যের বিষয় ছিল, এক্ষণে bobbed hair সৌন্দর্য্যের বিষয় হইয়াছে। অতএব দেশ ও কালভেদে নীতির যেরূপ প্রভেদ দেখা যায়, সৌন্দর্য্যেরও সেইরূপ প্রভেদ দেখা যায়।

দেশ ও কালভেদে নীতির যে প্রভেদের কথা বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাইতে পারে। কোন্ নীতি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, কোন্ নীতি নহে, ইহা জ্ঞানের কথা। যাহার প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই এ বিষয়ে যথার্থভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই, তাঁহার এ বিষয়ে ভ্রম হইতে পারে;—তাঁহার দৃষ্টিতে উত্তম নীতি মন্দ বলিয়া মনে হইতে পারে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিতে যদি তমোগুণ প্রবল হয়, তাহা হইলে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বুদ্ধিকে নির্ম্মল করা প্রয়োজন, বুদ্ধি হইতে তমোগুণ দূর করা প্রয়োজন। কামনা বা বাসনাই বুদ্ধির মলিনতা। কামনা দূর করা অতিশয় দুরূহ। সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা ঋষিগণ চিত্ত হইতে কামনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল চিত্তে জগতে সর্ব্বপ্রথম বেদ উপনিষদ্ দর্শনরাজি প্রকাশিত হইয়াছিল। তপস্যার দ্বারা তাঁহারা বেদের প্রকৃত অর্থও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থে বেদের প্রকৃত অর্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যদি শাস্ত্রের নিয়ম এক্ষণে আমাদের নিকট মন্দ বলিয়া প্রতীত হয়, যদি মনে হয় যে, এই সকল নিয়ম ঘৃণা বা সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত এবং সমাজের অকল্যাণজনক, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল নহে বলিয়া এইরূপ মনে হইতেছে। এ কথা বলা যায় না যে, নিয়মগুলি প্রাচীন যুগের উপযোগী ছিল, এ যুগের উপযোগী নহে। যে নিয়ম ঘৃণা বা সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত, তাহা কোনও যুগের উপযোগী নহে,—প্রাচীন যুগেরও নহে, বর্ত্তমান যুগেরও নহে। বিভিন্ন যুগে মানবের শক্তির প্রভেদ হেতু শাস্ত্রে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনের কথা আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ নিয়ম (প্রায় সকল নিয়মকে) সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ, অতএব অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং যে সকল নীতির আমরা পরিবর্ত্তন সম্ভব বলিয়া মনে করি, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে নীতির পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় না। দেশ ও কালভেদে মানবের বুদ্ধির প্রভেদ হয়,—এজন্য প্রকৃত নীতি কোথাও আবিষ্কৃত হয়, কোথাও হয় না; আবার কখনও বা ঋষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত প্রকৃত নীতি মন্দ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস 'রঘুবংশে' বলিয়াছেন যে, মনু যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন, রঘুবংশের নৃপতিসকল যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সেই সকল নিয়ম অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন।

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাৎ আমনোর্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥"

—রঘুবংশ ১।১৭

কালিদাস এ বিষয়ে বাল্মীকির অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ, বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায় যে, বালীবধপ্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র মনুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "আমরা স্বাধীন নহি, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অধীন।" পুনশ্চ কালিদাস বলিয়াছেন:—

"শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ"—(রঘুবংশ)

অর্থাৎ স্মৃতি যেমন বেদের অর্থ অনুসরণ করে, সুদক্ষিণা সেইরূপ বশিষ্ঠের ধেনুর অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র যে সত্য-সনাতন নীতি প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা যে কেবল শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্য ও মহাপুরুষগণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা নহে, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমাদের প্রাচীন কাব্যসকল ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করেন নাই। ধর্ম্মশাসনের অধীন থাকিয়া গ্রন্থকারগণ কাব্য রচনা করিয়াছেন—সৌন্দর্য্যচর্চ্চা করিয়াছেন। অথবা ধর্ম্মের তত্ত্বসকল সরল ও হৃদয়গ্রাহীরূপে প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ লাভ করিয়াছিলেন। নিয়মের বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন

বলিয়া তাঁহাদের সাহিত্য কালজয়ী, তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সংস্কৃত-সাহিত্যে গ্রন্থসকলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—প্রভুসম্মিত, সুহৃদ্‌সম্মিত ও কান্তাসম্মিত। যে গ্রন্থ প্রভুর ন্যায় আদেশ করেন, যুক্তি দেন না, তাহা প্রভুসম্মিত; যথা—বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র। যে গ্রন্থ যুক্তির দ্বারা কল্যাণের পথ নির্ণয় করে, তাহা সুহৃদ্‌সম্মিত; যথা—দর্শনশাস্ত্র। যে গ্রন্থ কান্তার ন্যায় চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান করে, তাহা কান্তাসম্মিত। কাব্যগ্রন্থ কান্তাসম্মিত। সৎগ্রন্থসকলেরই উদ্দেশ্য—মানবকে কল্যাণের পথে প্রবর্তিত করা। উদ্দেশ্য এক হইলেও এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। শাস্ত্র কেবল আদেশ দিয়াছেন। যাঁহাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহারা সে আদেশ পালন করেন—যুক্তির অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু অনেকের সে বিশ্বাস নাই, তাঁহাদিগকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়—দর্শনগ্রন্থরাজি তাহাই করেন। আবার অনেকের এইরূপ স্বভাব যে, তাঁহারা সুযুক্তিতেও কর্ণপাত করেন না। কাব্য করুণ মধুর প্রীতি প্রভৃতি বিবিধ রসের অবতারণা করিয়া, চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করিবে। ইহাতেই কাব্যগ্রন্থের সার্থকতা।

মানবচিত্ত পরস্পর সম্বন্ধবিহীন বিভিন্ন কক্ষে (water-tight compartment) বিভক্ত করা যায় না। সৌন্দর্য্যচর্চ্চা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। সকল বিষয়েই দুইটি পথ আছে—একটি কল্যাণের পথ, একটি অকল্যাণের পথ; একটি ধর্ম্মের পথ, একটি অধর্ম্মের পথ। একমাত্র পরব্রহ্মই ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উচ্চে অবস্থিত।

"অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ
অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ
অন্যত্র ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ
যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ।"
—(কঠোপনিষৎ)

যাহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে ভিন্ন, ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন—তাহা আপনি জানেন, আমাকে তাহাই বলুন।

একমাত্র ব্রহ্মই এইরূপ বস্তু, আর কিছুই নহে। কাব্যগ্রন্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উচ্চে অবস্থিত নহে। তাহারা ধর্ম্মানুমোদিত, নয় ধর্ম্মবিরোধী।

কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, যাহারা শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে, তাহাদের কল্যাণ হয়; যাহারা প্রেয় গ্রহণ করে, তাহাদের কল্যাণ হয় না।

"শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তে অর্থাৎ চ উ প্রেয়ে বৃণীতে।"

যাহা চিত্তাকর্ষক তাহা প্রেয়। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহা শ্রেয়ঃ। যে কাব্যে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহাই সার্থক; যথা—রামায়ণ ও মহাভারত। যে কাব্যে প্রেয়ের অনুরোধে শ্রেয়কে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহা বর্জ্জনীয়।

কবি কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কাব্য রচনা করিবেন না,—এ কথা শ্রদ্ধেয় নহে। মানব বুদ্ধিমান্ জীব। মানব কোনও উদ্দেশ্য না লইয়া কোনও কার্য্য করে না। "প্রয়োজনং বিনা কার্য্যে মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে।" সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিয়া যশ বা আনন্দ লাভ করিব,—সকল লোকেরই এইরূপ উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। ইহা প্রেয়ের কথা। ইহার সহিত শ্রেয়ের সংযোগ থাকা প্রয়োজন। নচেৎ সে কাব্যে জগতের কল্যাণ হইবে না। অকল্যাণও হইতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবাসুর-যুদ্ধের কাহিনী আছে। দেবগণ কনিষ্ঠ, অসুরগণ জ্যেষ্ঠ। দেবগণ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির সাহায্যে উৎকর্ষলাভের চেষ্টা করেন। অসুরগণ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি পাপের দ্বারা সংসৃষ্ট করেন। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিকে দেবতা বলা হইয়াছে, ভোগের প্রবৃত্তিকে অসুর শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কাব্যের দ্বারা যদি সৎনীতি প্রচার করিবার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে কাব্য ভোগের উপকরণে পরিণত হইবে। কারণ, ভোগের প্রবৃত্তি বড় প্রবল।

Art for arts sake এই ধুয়া ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতে Artএর নামে কাম এবং ইন্দ্রিয়-তর্পণের আয়োজন চলিতেছে। টলষ্টয় তাঁহার প্রণীত 'What is Art' গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি রোমা রোঁলাও সেই কথা

বলিয়াছেন। তাঁহার এক জন চরিত্র বলিয়াছে—"You cover your national lewdness in the name of Art and Beauty". তোমরা শিল্প ও সৌন্দর্য্যের নামে তোমাদের কামুকতা আবৃত করিয়া রাখ মাত্র।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার হইবার পর হইতে অপর অনেক বিষয় আমরা যেরূপ পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়াছি, সেইরূপ সাহিত্যেও পাশ্চাত্যের অনুসরণ করিতেছি। Art for arts sakeএর বাণী আমাদের দেশেও সুপ্রচারিত হইয়াছে। Artএর উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, ধর্ম্মের সহিত নীতির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, এই মত প্রচারিত হইয়াছে। ফলে, মানবের স্বাভাবিক প্রবল ভোগবৃত্তি Artএর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। Artএর নামে অধর্ম্ম ও দুর্নীতি চিত্তাকর্ষক ভাবে অঙ্কিত হইতেছে। ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সকল আদর্শ উপলব্ধি করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত অঙ্কিত করিয়াছেন, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সকল চরিত্র চিত্রণ করিয়া নিজদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মানিয়াছিলেন, সে সকল চরিত্রে আধুনিক নবীন লেখকদিগের অনেকের রুচি নাই। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষি সমাজের কল্যাণজনক যে সকল নীতি প্রচার করিয়াছিলেন, একশ্রেণীর আধুনিক তরুণ সাহিত্যিক তাহাদিগকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে সরস্বতীর পুণ্য তপোবন ব্যভিচারে প্লাবিত হইতেছে। বহু তরুণ পাঠক-পাঠিকা এই সকল রচনাকে প্রশংসা করিতেছেন। লেখকগণ নিজদিগকে দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া মনে করিতেছেন। আধুনিক লাইব্রেরীগুলি এক একটি দুর্নীতিপ্রচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে।

যক্ষ্মারোগ মানবদেহের প্রতি যেরূপ অনিষ্টকর, দুর্নীতি সমাজ দেহের প্রতি সেইরূপ অনিষ্টকর। সাহিত্যে দুর্নীতি হইতে সহজেই সমাজে দুর্নীতি প্রচারিত হয়। যদি সৎসাহিত্যের পুণ্য অবদানে আমাদের জাতীয় জীবন গৌরবান্বিত করিবার বাসনা থাকে—যদি ব্যাস বাল্মীকির প্রচারিত আদর্শ সঞ্জীবিত রাখা প্রয়োজন হয়, যদি জগতের সভায় হিন্দুর জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে এই নীতিবিহীন সাহিত্যিক অভিযান হইতে আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষা করিতে হইবে যে লেখক ব্যভিচারকে চিত্তাকর্ষকরূপে অঙ্কিত করেন, তিনি যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, তাঁহার রচনা বর্জ্জন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি প্রবঞ্চক বা পরস্বাপহারক, তাহার প্রতিভা যেমন তাহাকে আরও ভীষণ করিয়া তুলে, সেইরূপ এই শ্রেণীর লেখকের প্রতিভা সমাজের পক্ষে ভয়াবহ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম, এ)।

দূরে ও নিকটে

কুমুদ কাতরে কহে, শশধরে ডাকি,
"দূরে কেন আছ বন্ধু, কাছে নাহি থাকি?"
চাঁদ কহে মৃদু হাসি, "হে পরাণ-প্রিয়া,
কাছে গেলে ভয়ে আঁখি থাকিতে মুদিয়া।

দূরে আছি তাই ভাল—আমি সুধাকর,
দেখিতে নিকটে মোর, কঠিন অন্তর।"
কমলিনী মাথা তুলি, কহে দিবাকরে,
"কেন দূরে? কাছে মোর এস দয়া করে।"

রবি কহে, "ভুল তুমি করিয়াছ হায়,
কাছে গেলে তাপে মোর হবে মৃতপ্রায়।"
কবি কহে, "দূরে প্রেম হয় গাঢ়তর,
কাছে গেলে ঠোকাঠুকি, বাদ নিরন্তর।"

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত।

নৃত্যানন্দ

ঝুমুর ঝুমুর অই তাথই তাথই থই
নন্দদুলাল কিবা নাচে,
ঝিনিক ঝিনিক ঝিনি ঝুণুরুণু কিঙ্কিণী,
করতালি নাচে পাছে পাছে।
আহা—নন্দগোপাল কিবা নাচে॥
নাচে কিবা দুলি দুলি
ডান হাতখানি তুলি
দধিমন্থন ভুলি
গোপীরা ঘনায়ে বসে কাছে
নন্দগোপাল কিবা নাচে।

ঝুমুর ঝুমুর ঝুম নূপুরে লেগেছে ধুম,
যশোদানন্দ কিবা নাচে।
চরণ-আঘাত পেয়ে মরা মাটী শিহরিয়ে
বহুদিন পরে পুন বাঁচে।
আহা—যশোদা-গোপাল কিবা নাচে॥
নাচে ধ্বনি কঙ্কণে,
নাচে ধেনু অঙ্গনে,
নাচে বেণু শ্রীআননে
খঞ্জন শিখী নাচে গাছে;
যশোদাদুলাল কিবা নাচে॥

ঝুমুর ঝুমুর ঝুম ভাঙায়ে মায়ার ঘুম
ব্রজগোপাল কিবা নাচে।
আহ্লাদে রসবতী বসুমতী যশোমতী
অবাক্ হইয়া চেয়ে আছে।
আহা—ভুবনানন্দ কিবা নাচে॥
দশ দিকে দিক্‌পাল
তালি দিয়ে দেয় তাল,
বুকে এঁকে মহাকাল
এ ছবি অমর করিয়াছে॥
ব্রজগোপাল কিবা নাচে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

বিরহ ও মিলন

[গল্প]

১

অমলা প্রায় এক বৎসর পরে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। তাই সবই নূতন লাগিতেছে, সমস্তই মধুর মনে হইতেছে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ, আকাশে শরতের নীলিমা। গাছে শিউলিফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, ঘাসে ঘাসে শিশিরের বিন্দু মাণিকের মত টল-টল করিতেছে। এই প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে মিল রাখিয়া বাড়ীতেও উৎসবের রাগিণীর আমেজ লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মেজ বৌদি মেজদার সঙ্গে সেই সুদূর দিল্লীতে থাকেন, মেজদা সেখানে চাকরী করেন। পূজার ছুটী পাইয়া তিনিও আসিয়াছেন। মেজ বৌদি সুন্দরী, বিদুষী এবং সুরসিকা। যখন তিনি আসেন, হাসি, গল্প, গানে বাড়ীটাকে একেবারে মাতাইয়া রাখেন। অমলার ছোট বোন কমলার এক নামজাদা জমিদার বাড়ীতে বিবাহ হইয়াছে। শ্বশুরবাড়ীর কড়া নিয়ম-কানুন অনুসারে সে বেচারা বড় একটা বাপের বাড়ী আসিতে পায় না। কিন্তু এবার পূজার আগে সে-ও আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা গানের আসর বসিয়াছে। অমলার মেজ-বৌদি এস্রাজে সুর দিয়া গাহিতেছিলেন,

> "আলো ঝল-মল, পূর্ণিমারি জোছনা রাতে
> সারা নিশি জাগি ছিনু ফুলবনে সে ছিল সাথে।
> নয়নে কে যেন বুলালো স্বপন-মায়ার তুলি,
> প্রথম প্রেমের মধুমঞ্জরী গো, উঠেছে দুলি।"

গায়িকার করুণ মধুর সুর সত্য-সত্যই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দিগন্তে যেন মায়াজাল রচনা করিতেছিল। তথায় যাঁহারা বসিয়াছিলেন প্রত্যেকেরই মনে স্মৃতিভারাক্রান্ত প্রেমবিবশ প্রথম প্রেমের দিনগুলি মনে পড়িয়া যাইতেছিল। মনের মধ্যে গানের তানের মত গুঞ্জরণ উঠিতেছিল, "প্রথম প্রেমের মধুমঞ্জরী গো, উঠিছে দুলি।"

অমলার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। যদিও সে আসিবার সময় একরকম জোর করিয়া ঝগড়া করিয়াই বাপের বাড়ী আসিয়াছে। আসিবার সময় স্বামী বেচারা একা থাকিবার নির্দ্দয়তা একটুখানি প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার আশায় যখন বলিয়াছিলেন, "তুমি তো বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকবে, আর আমি একা ব'সে কড়িকাঠ গুণবো। না, তাও যে ছাই আজ-কালকার বাড়ীগুলোতে কড়িকাঠ থাকে না, সমস্তই কংক্রীটের। যাক্, কড়িকাঠ নাই থাকুক, একা ব'সে মাঠের সামনের ঐ তালগাছগুলো গুণবো। তারপরে যখন গোণা শেষ হয়ে যাবে, তখন কি করবো ব'লে যাও।"—

তখন সে কাণের কর্ণভূষা এবং হাতের বাজু আন্দোলিত করিয়া বলিয়াছিল, "আহা মশাই, আর বাড়াতে হবে না। পুরুষ মানুষরা য' স্বার্থপর তা বোঝাই গেছে। প্রায় এক বছর হ'ল বাপের বাড়ী যাই নি, তবুও বলবে ঐ কথা। কিছু একটা ছুতো ক'রে যাওয়া বন্ধ করবার মতলব আর কি।" তথাপি আজিকার এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সন্ধ্যায় গানের সুরে সুরে তাহার হৃদয় বিমথিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র কি যেন এক করুণ রাগিণী সঞ্চারিত হইয়া ফিরিতেছে। ইহার পর হইতেই তাহার মনটা বিকল হইয়া গেল। তখন মেজ বৌদি পরিহাস করিতে আসিয়া তিক্তস্বর শুনিলেন এবং ছোট বোন কমলা উলের প্যাটার্ণ দেখাইতে আসিয়া তিরস্কৃত হইয়া ফিরিয়া গেল।

কয়েকদিনের মধ্যেই পূজা আসিল এবং কাটিয়া গেল। কিন্তু এতদিন ধরিয়া অমলা পিতৃগৃহে আসিবার, সকলের

সহিত মিলিয়া আনন্দ করিবার যত কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সে সমস্তই ছায়াছবির মত মিথ্যা হইয়া গেল। পুরাতন পৃথিবী ঠিক সেই আগেকার মত শরৎশ্রী-মণ্ডিত হইয়া চিরনূতন হইয়া উঠিল, দীঘির কালো জলে সূর্য্যের আলো পড়িয়া টলমল করিতে লাগিল, আঙ্গিনার শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভাঙ্গিয়া পড়িবার যোগাড়। কিন্তু প্রকৃতির এই সমারোহের মধ্যে গোপনে যে একটি অশ্রান্ত করুণ বীণা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, অমলাকে তাহা কেবলই ভিতরে ভিতরে বিকল করিয়া তুলিতে লাগিল। অবশেষে সে কাগজ কলম লইয়া স্বামীকে লিখিল—

"এখন তো তোমার ছুটী ফুরাইবার দেরী আছে, তুমি একবার এখানে এস। তোমাকে একান্ত মিনতি রহিল আমার, এ অনুরোধ উপেক্ষা করিও না। এখানে আমাদের বাড়ীর সামনে যে দীঘিটা আছে, তাহাতে পদ্ম ফুটিয়াছে, শিউলিফুলের যেন গালিচা পাতা হইয়া থাকে ভোরবেলাটায়। তোমার কথা তখন মনে পড়িয়া যায়। আর মেজবৌদিকে তুমি জান, তাঁহার হাতের চা এবং তাঁহার গলার গান দু'টোই পরম লোভনীয় বস্তু। তার উপর এখানকার বাজারে এমন চমৎকার ফুলকপি উঠিয়াছে যে, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। তোমাকে বাদ দিয়া এ সব উপভোগ করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আশা করি, অনুরোধ রাখিবে।"

চিঠিখানা লিখিয়া অমলা কয়েকবার উল্টাইয়া দেখিল, ঠিক মনোমত হয় নাই। মনের আবেগের শতাংশের একাংশও হয় তো ঠিক প্রকাশ পায় নাই। তবু বিবাহের সাত বৎসর পরে চিঠিতে রবি ঠাকুরের কবিতা উদ্ধৃত করিতে কেমন যেন লজ্জা করে। তার চেয়ে ঢের সহজেই কলমের আগায় ফুলকপির কথা আসিয়া পড়ে।

ঠিক মনোমত না হইলেও চিঠিখানা লিখিয়া সে যথা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল এবং সাধ্বসচিত্তে উত্তরের পরিবর্ত্তে একটি পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া রহিল। কারণ, সে ঠিক জানিত, তাহার এ মিনতি কখনও ব্যর্থ হইবে না। যে ভদ্রলোক পত্র পাইবেন, তিনি বারোটার ডাকে চিঠি পাইয়া সেই দিনই রাত্রির এক্সপ্রেস অবশ্যই ধরিবেন।

অথচ ব্যাপারটা ঘটিল অন্যরূপ। তিনি তো আসিলেন না, প্রায় পাঁচ ছ' দিন তাঁহার নিকট হইতে কোন উত্তরও আসিল না। এই ক'দিন অমলা যে কি দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটাইয়াছে, তাহা সে নিজেই স্মরণ করিতে পারে না। হাজার বার ইচ্ছা হইয়াছে, বাড়ীর সরকারকে দিয়া টেলিগ্রামের ফর্ম্ম আনাইয়া একটা তার করিয়া দেয়। কিন্তু যথাসাধ্য গোপনে করিলেও প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা যথেষ্ট এবং প্রকাশ হইয়া গেলে মেজ বৌদির কৌতুক শাণিত তীক্ষ্ণ হাসি এবং অজস্র বিদ্রূপবাণের বর্ষণ যে কেমন হইবে, কল্পনা করিয়াও ভয় হয়। এমনই দ্বিধান্দোলনের ভিতর চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। পাঁচ দিন পরে অমলার স্বামী প্রকাশের নিকট হইতে চিঠি আসিল যে, সে আসিবার জন্য খুবই উৎসুক, কিন্তু অফিসের যিনি বড়বাবু, তাঁহার একমাত্র পুত্রের সাংঘাতিক নিউমোনিয়া হইয়াছে। তাহাকেই দু'বেলা ডাক্তার ডাকা ঔষধ আনা, রাত্রি জাগা সমস্তই করিতে হয়। বড়বাবু একটু কৃপণস্বভাবের বলিয়া লোকজন বড় একটা রাখেন না। অফিসের অন্যান্য বাবুরাও পূজার ছুটীতে যে যাহার বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশের ঘাড়েই এখন সমস্ত ভারটা আসিয়া পড়িয়াছে। বলিতে কি, এই কয়েকদিন সে নাওয়া-খাওয়ার অবধি অবসর পায় নাই। অফিসের বড়বাবু, চাকরীর হর্ত্তা-কর্ত্তা। এই দারুণ বেকার-সমস্যার যুগে হঠাৎ তাঁহার অমতে কিছু করাও যায় না। পত্রের শেষে প্রকাশ আশ্বাস দিয়া লিখিয়াছে, অমলা যেন রাগ না করে। তথায় যাইবার জন্য সে নিজেও বড় ব্যাকুল। বড়বাবুর ছেলেটি একটু ভালো থাকিলেই সে রওয়ানা হইবে।

এই নিতান্ত সাধারণ চিঠিখানি অমলার কাছে একান্ত অসাধারণ বলিয়া প্রতিভাত হইল। সে দরজায় অর্গল রুদ্ধ করিয়া দশবার করিয়া চিঠিখানি পড়িল এবং তাহার পর সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিল। এই এক মাসের বিরহ এবং অদর্শনের ফলে তাহার মন যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। সে আপন মনে নিরালায় বসিয়া তাহার জীবনের অধ্যায়গুলি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহারা স্বামি-স্ত্রী দুই জনে যখন একত্র ছিল, তখন কত সময় অকারণে সে কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, কঠিন কথা বলিয়াছে, একে একে মনে পড়িতে লাগিল।

মনে হইতে লাগিল, এ কথাটা তখন অমন করিয়া না বলিলেই হইত, এ কাযটা তেমন ভাবে না করিয়া সে যেমন চাহিতেছিল, তেমন করিলেই চলিত। তাহাতে কি-ই বা এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত!

২

বাড়ীর ছেলেরা জল্পনা করিতে লাগিল, সবাই একত্র হইয়াছে, পূজার পর নূতন ধরণের আমোদ করিতে হইবে। সেদিন সকাল হইতেই বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল, ষ্টীমারে করিয়া বেড়াইতে যাওয়া হইবে।

শরতের শীর্ণস্রোতা শুভ্র স্বচ্ছ গঙ্গাবক্ষে ঈষৎ বায়ুভরে অমলার কেশপাশ উড়িতেছে। ও-পারের বালুকাবিস্তীর্ণ গঙ্গার চর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কাশের ফুলে অপরাহ্লের বাতাসে আন্দোলন জাগিয়াছে। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া অমলা শূন্যমনে পরপারের দিকে চাহিয়াছিল। দূরে গাছপালার ক্ষীণ সবুজ কিনারা চোখে পড়িতেছে, তাহারও পরে আকাশ দিগ্বলয়ে মিশিয়াছে। নীচের কেবিনে আমোদ-প্রমোদের আয়োজনের অভাব নাই। এক দল তাস খেলিতেছে, এক দল এস্রাজ ও বক্স-হার্ম্মোনিয়াম লইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেছে। তাহার ছোট বোন কমলা আসিয়া কোন একটা দলে তাহাকে টানিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল, "দিদি, চল না নীচে যাই। নীরেন দা, যা চমৎকার হাত পেয়েছিল, ছক্কার হাত ছিলো, তবু সে এমন আনাড়ি যে, নিছক অমন ভালো হাতটা মাটী ক'রে দিলে। রঙের খেলাটাও রাখতে পারলে না। মেজ বৌদি বলছিলো, নীরেন-দা'র বদলে তুমি যদি বসতে, তবে সে একবার দেখে নিত।"

"আচ্ছা, আমি একটু পরে যাচ্ছি। তুই ততক্ষণ যা। কখন ষ্টীমার ঘাটে লাগবে জানিস?"

কমলা জবাব দিল, "ছ'টার সময়। আর কতক্ষণই বা, চারটে তো দেখতে দেখতেই বেজে গেলো। আর বড় জোর ঘণ্টা দুই। আচ্ছা দিদি, চমৎকার লাগছে না ভাই আজকের দিনটা? আমার তো এত ভালো লাগছে যে, নামতে হবে কোন এক সময়ে, মনে হলেও কষ্ট হচ্ছে।"

আর একবার নীচে যাইবার আবেদন জানাইয়া কমলা চলিয়া গেল। যাই যাই করিয়া তবুও অমলা সেই শূন্য ডেকেই দাঁড়াইয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, কমলার সবই ভালো লাগিতেছে, এ আর বিচিত্র কি! ছোট ভগিনীপতি সুরেশ, সে তো আর তাহার স্বামীর মত অবিবেচক, কর্ম্ম-সর্ব্বস্ব লোক নয়। সে স্ত্রীকে পৌঁছাইয়া দিয়াই চলিয়া যায় নাই। এখনও আছে, ষ্টীমারে আসিয়াছে এবং আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইবে। কাযেই তাহার কথা আর কমলার কথায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। মনে মনে সে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল, কাল সকালেই স্বামীকে চিঠি লিখিবে, হয় তিনি আসুন, নয় তো আর একটা দিনও সে এখানে থাকিবে না। মনে মনে একটু রাগ করিয়াই পদচারণা করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, একটা শঙ্কা তাহার মনে জাগিতে লাগিল। আচ্ছা, এতক্ষণ তাহাদের সেই ছোট বাসাবাড়ীতে কি হইতেছে! যা অন্যমনস্ক লোকটি। একবার জ্বলন্ত সিগারেট মশারির ভিতরেই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যা অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়াছিলেন। অমলা কাছে ছিল বলিয়াই সে যাত্রা অল্পের উপর দিয়া যায়। তেমন ভাবের আর কোন বিভ্রাট ঘটাইয়া বসিয়া আছেন কি না, তাহারই বা ঠিক কি। আর যাহাই হউক, তিনি ভালো থাকিলে, নিরাপদে থাকিলেই যথেষ্ট। অমলা আর কিছু চায় না। কে জানে সেই উড়ে বামুন বেটা নূতন লোক, বাসি মসলা দিয়া তরকারি রাঁধিয়া দিতেছে কি না, আঢাকা দুধে মাছি পড়িতেছে হয় তো, তাহারই বা বিচিত্র কি!

অপরাহ্ন-সূর্য্যের স্তিমিত স্নিগ্ধ কিরণের নীচে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার সমস্ত শোভা অমলার কাছে একান্ত নিরর্থক এবং শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। কতক্ষণে দিনটা কাটিয়া যাইবে, এই অবস্থায় ছটফট করিয়া কোনক্রমে তাহার সময় কাটিল।

৩

পরের দিন সকালের ডাকেই সে চিঠি লিখিল। লিখিয়া ডাকে দিয়া তবে সে নিশ্চিন্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু আশ্চর্য্যও হইল। এই তো কিছুদিন আগে বাপের বাড়ী আসিবার জন্য সে কত ব্যস্ত হইয়াছিল! কত ভাবে জিদ করিয়া, তর্ক করিয়া এখানে আসিবার অনুমতি আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল। মানুষের মন জিনিবটাই কি

বিচিত্র! কখন তাহার কি হয় আগে হইতে হিসাবনিকাশ করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

চিঠির উত্তর আসিল। প্রকাশ লিখিয়াছে, তাহার যাওয়া অসম্ভব। বড়বাবুর ছেলেটির বাড়াবাড়ি চলিতেছে। কিন্তু নিজেরও তাহার আর একলা থাকিতে ভালো লাগিতেছে না। ছুটীও ফুরাইয়া আসিয়াছে। পরশু দিন ভালো আছে, অমলা যদি তাহার বড়দা বা মেজদাকে সঙ্গে লইয়া ঐ দিন রাত্রির ট্রেণে চলিয়া আসে, তাহা হইলে খুব ভালো হয়।

অমলা চিঠি পড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। মা আসিয়া অনুরোধ করিলেন, আর দিনকতক থাকিয়া গেলে হয় না। দূরের রাস্তা, সহজে আসা হয় না। এই তো সবে সেদিন আসিয়াছে, পূরাপুরি একটা মাসও এখন হয় নাই। ইহারই মধ্যেই যাইবার তাড়া কেন?

অমলা বাক্স গোছাইতে গোছাইতে বলিল, "না মা, আর থাকা হয় না। জান তো একা বাড়ী, আর তোমার জামাই যা অগোছালো, একটি কাযও আপন হাতে করা অভ্যাস নেই। এক গ্লাস জলও নিজে গড়িয়ে খেতে পারে না।"

তার পর মেজবৌদি অনুনয়-বিনয় পরিহাস-মিশ্রিত কোপ, অনেক কিছু করিয়াও তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ছ্যাকড়াগাড়ীর মাথায় বাক্স বিছানা সন্দেশের হাঁড়ি, ফুলকপির ঝুড়ি চাপাইয়া তাহার বড়দাদার সহিত অমলা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রির অন্ধকার চিরিয়া যতক্ষণ ট্রেণ ছুটিতেছিল, নৈশ শীতল বাতাস খোলা জানালা-পথে হু হু করিয়া ঢুকিতেছিল, ততক্ষণ অমলার মনে একটি সুমধুর ভাব আপন মায়া বিস্তার করিয়াছিল। এত-দিন পরে প্রথম যখন স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে, তখন কি কথা তাঁহাকে বলিবে, কেমন করিয়া প্রথম কথাবার্ত্তা সুরু হইবে! কর্ণধারহীন অগোছালো গৃহস্থালীর মাঝখানে বসিয়া সেই অগোছালো গৃহস্থটি না জানি এতক্ষণ কি করিতেছেন। সহসা তাঁহার মুখে কি বিস্ময় কি আনন্দের রেখাই না ফুটিয়া উঠিবে!

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। ট্রেণে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও অমলা এক মিনিটের জন্যও ঘুমায় নাই। উত্তেজনায়, মধুর কল্পনায়, মনের চাঞ্চল্যে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে নাই। সকালবেলা তাহাদের গন্তব্য ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ দাঁড়াইল। চারিদিকে গাড়ীঘোড়া, কুলী, গাড়োয়ান এবং ষ্টেশনের যাত্রীদের বিচিত্র কলরব। রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে যে মোহাবরণ লালিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া কত রাস্তা, অলি-গলি পার হইয়া অবশেষে সেই পরিচিত গৃহদরজায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। দুয়ারের কাছে হাতকাটা বেনিয়ান পরিয়া প্রকাশ দাঁড়াইয়া আছে। খিড়কির দুয়ারের কাছে চির-প্রচলিত ছাইয়ের গাদাটা ঠিক তেমনই অটল হইয়া দাঁড়াইয়া বিরাজ করিতেছে। গোয়ালের প্রাচীরের গায়ে ঘুঁটে দেওয়া হইয়াছে। কুয়ার পাশে একটা জায়গায় জল নিকাশ না হইয়া খানিকটা জল জমিয়া আছে। কয়লার উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়াছে, ধোঁয়ায় সমস্ত প্রাঙ্গণটা আচ্ছন্ন হইবার যো হইয়াছে। বিরক্তিতে অমলার সারা মন ভরিয়া উঠিল। এই তো সেই চিরদিনকার অভ্যস্ত কারাগার। এখানে তাড়াতাড়ি আসিয়া ভর্ত্তি হইবার জন্য এত কি মাথা-ব্যথা পড়িয়াছিল, অথচ সে কত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল আসিবার জন্য! মনে করিলে অবাক্ লাগে। তাহার বড়দাদার বাড়ী ফিরিবার তাড়া ছিল। তিনি অমলাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই পরের ট্রেণে ফিরিয়া গেলেন। তিনি এতক্ষণ ছিলেন এবং অমলার স্বামী প্রকাশও দু'টি ভাত মুখে দিয়া বড় বাবুর ছেলের জন্য ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল; এই সব কারণে স্বামীর সহিত একান্তে মুখোমুখি হইবার অবকাশ এখনও তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। এই এক মাস সে ছিল না বলিয়া চাকর-বাকর পুরা মাত্রায় ফাঁকি দিয়াছে। চারিদিকে অগোছালো বিশৃঙ্খলতা। ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া ঘর-দ্বার পরিষ্কার করাইতে, এবং জিনিষ-পত্র বিন্যস্ত করিতে তাহার সারাদিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল, তুলসীমঞ্চে দীপ দেখাইয়া প্রণাম করিয়া সে ঘরে গেল। সারাদিনের ঘোরাঘুরি খাটুনির পর, প্রকাশও তখন শয়ন-কক্ষের একটা চেয়ারের উপর চুপ করিয়া বসিয়া-ছিল। দুইজনে দু'জনের দিকে চাহিল! অমলা এই প্রথম দেখা হওয়ার ক্ষণটির কথা কত বার কত ভাবে কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কল্পনার সহিত আসলে কিছুই মিলিল না। সে নিজেই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "আচ্ছা,

তোমাকে কত বার বলেছি না যে, স্নানের ঘরে একটা দরজা বসিয়ে দিতে। শুধু অমনি একটু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বড় লজ্জা পেতে হয়। বড়দা এসেছিলেন, বাড়ী ঘর দোরের শ্রী দেখে কি যে মনে ক'রে গেলেন।"

প্রকাশ জবাব দিল, "সারাদিন খেটে-খুটে এসেছি, এখন ও-সব ভালো লাগে না। বড়লোক বাপ তোমার, সে বাপের বাড়ী থেকে এসে প্রথম প্রথম দিনকতক এখন এখানকার সবই খারাপ লাগবে। তার আর কি করা যায়।"

প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া অমলা কি একটা জবাব দিতে গিয়া সহসা থামিয়া গেল। তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া সেই ষ্টীমারে যাওয়া, সেই গঙ্গায় উভয়তীরের অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত-সৌন্দর্য্যের সহিত মিশাইয়া প্রবাসী হৃদয়ের ব্যাকুলতা, সেই পূর্ণিমা রাত্রির গানের সুরে বিদেশবাসী প্রিয়তমের সান্নিধ্য কামনা করিবার উচ্ছলতা, সে সমস্তই ছবির মত একের পর এক করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মনে হইল, বিরহে যাহা অত সুকোমল অত সুকুমার ছিল, মিলনে তাহাই কি এত রূঢ়, কর্কশরূপে দেখা দেয়? বিরহ এবং মিলনের রূপে কি এত তফাৎ! তাই বুঝি জগতের যত অমর কাব্যে বিরহেরই জয়গান! বিশেষ আর কিছু সে বলিতে পারিল না। শ্রান্তভাবে নিকটস্থ একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। মনটা একান্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিলেই বাপের বাড়ীতে থাকিতে পারিত, তখন নিজে হইতে চিঠি লিখিয়া জিদ করিয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া আসিতে গেল কেন? কি আছে এখানে!

শ্রীমতী আশালতা সিংহ।

পরিচয়

সে দিন রাত্রে চিনিতে পারি নি তোমারে রাণী,
অবহেলা ক'রে শুয়ে ছিনু তাই—কহি নি বাণী!
দিই নি দুয়ার বন্ধ করিয়া,
আমার বক্ষে রাখি নি ধরিয়া,
প্রেমের বাক্যে দুঃখ হরিয়া নিই নি মানি!
সে দিন রাত্রে চিনিতে পারি নি তোমারে রাণী!

ক্ষমা করো দোষ—আজিকে চিনেছি মূরতি তব,
দেখেছি শুদ্ধ তোমার ও তনু কি অভিনব!
দেখেছি তোমার হরিণ-নয়ন,
এলানো আঁচল, শিথিল শয়ন,
দেখেছি তোমার হরিতে এ মন,—আরো কি কব?
ক্ষমা করো দোষ—আজিকে চিনেছি মূরতি তব!

বুঝেছি যখন, আর তো দিব না তোমারে ছাড়ি,
মধুর তোমার ওই দু'টি পাণি লইব কাড়ি!
বুঝেছি চেনা যে শত জনমের,
তুমি যে আমার কত মরমের,
তোমারে বাঁচায়ে রাখিব, যেমন করিয়া পারি।
বুঝেছি যখন, আর তো দিব না তোমারে ছাড়ি!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

ওয়াজিরিস্থান-পরিচয়

জেকোশ্লোভাকিয়া, চীন-জাপান, স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ, প্যালেষ্টাইনের বিদ্রোহ প্রভৃতি অন্যান্য দেশের সংবাদ আমরা যথেষ্ট রাখি এবং ঐ সকল দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যের তালিকাভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তর্গত যুদ্ধাচ্ছন্ন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের অতি অল্প লোকই খবর রাখেন। অবশ্য সম্প্রতি "বান্নু" সহরে সীমান্ত উপজাতির হানা ও লুঠপাটের সংবাদে ওয়াজিরিস্থান আমাদের দৃষ্টি কিঞ্চিং আকর্ষণ করিয়াছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শাসন অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত, গভর্ণমেণ্ট-শাসিত জেলা সকল (British Govt. administered settoled districts) এবং উপজাতি-অধিকৃত স্থানসমূহ (Tribal territory)। উপজাতি-অধিকৃত স্থানগুলিকে 'No mans Land' বলা চলে। এই সব স্থানে এখনও কোনও নির্দ্দিষ্ট শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মালেকগণই নিজ নিজ গ্রামের শাসনকর্ত্তা, এবং শরীরের শক্তি ও রাইফেলের গুলীই ইহাদের আইন।

উপজাতি-অধিকৃত স্থানগুলিতে যে সব উপজাতির বাস, তাহাদের মধ্যে আফ্রিদি ও ওয়াজিরিই প্রধান। কোরাম নদীর উত্তরে পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানের কাছে যাহারা বাস করে, তাহারা আফ্রিদি এবং মোহমান্দ। এই নদীর দক্ষিণে প্রধানতঃ ওয়াজিরিদের বাস, সেই জন্য এই স্থান 'ওয়াজিরিস্থান' নামে পরিচিত।

বিলাতের পার্লামেণ্টে ওয়াজিরিস্থান সম্বন্ধে কয়েকবার প্রশ্ন উঠায় এই স্থানটি ভারতের বাহিরে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ওয়াজিরিস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শুনা যাইত না। পূর্ব্বে আফ্রিদিদের বিদ্রোহ ও তাহাদের সহিত যুদ্ধের সংবাদই শুনা যাইত। এখন অবশ্য আফ্রিদিরা বেশ শান্তভাবেই আছে।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ওয়াজিরিস্থানে ইপির ফকিরের নেতৃত্বে বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যায়, এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। উক্ত বৎসরের প্রারম্ভেই ভারত সরকার ওয়াজিরিস্থানের সৈন্যসংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হন, এবং জেনারেল সার জন কদেরিংকে এই বিরাট বাহিনী পরিচালনা করিতে পাঠান। সৈন্যবাহিনী ব্যতীত "টোচি স্কাউট", "সাউথ ওয়াজিরিস্থান স্কাউট", ফ্রাণ্টিয়ার কনষ্টাবিউলারি ফোর্স এবং "খাসাদার" প্রভৃতি এখানে শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা কার্য্যে সর্ব্বদাই মোতয়েন রহিয়াছে।

অবশ্য এখনও পর্য্যন্ত ওয়াজিরিস্থান সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারা যায় নাই, তাহা "বান্নু" প্রভৃতি স্থানে হানা, স্থানে স্থানে সরকারি সৈন্যদল আক্রমণ ও লুঠ-তরাজ হইতেই বুঝা যায়।

ওয়াজিরিরা যে যুদ্ধবিদ্যায় নাবালক নহে, তাহা গভর্ণমেণ্টের এই দুই বৎসরব্যাপী 'ইপির ফকির'কে ধরিবার ব্যর্থ প্রয়াসেই প্রমাণ পাওয়া যায়। "ইপির ফকির" ছাড়া "মুল্লা শের আলি," "দিন ফকির" প্রমুখ আরও কয়েকজন সমরনিপুণ নেতা ইহাদের মধ্যে আছে এবং তাহারা "ইপির ফকিরে'র সহিত একযোগে কায করিতেছে। ইহাদের লস্কর সাধারণতঃ আধুনিক ধরণের রাইফেলে সজ্জিত, এবং ইহাদের কাছে কামান আছে এ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কামানগুলি ইহারা উষ্ট্রপৃষ্ঠে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়।

ওয়াজিরিস্থানে ওয়াজিরি ব্যতীত আরও দুইটি জাতির বাস, তাহারা "মাসুদ" ও "ভিটানী" নামে পরিচিত। ইহারা সংখ্যায় ওয়াজিরি অপেক্ষা অল্প, তবে অন্য কোন বিষয়ে ইহারা হীন নহে। দুর্দ্ধর্ষতায়, নৃশংসতায়, যুদ্ধপ্রীতিতে ইহারা ওয়াজিরিদের সমতুল্য। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে "ইপির ফকিরে"র নেতৃত্বে যে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ চলিতেছে, তাহাতে মাসুদরা যোগ দেয় নাই,—অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উদিত হয়—এই উপজাতি সকল কেন এত যুদ্ধপ্রিয়, হিংস্রভাবাপন্ন, এবং কেন ইহারা ভারত সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেদের এবং সীমান্ত প্রদেশে শান্তিপ্রিয়

জনসাধারণের শান্তি নষ্ট করিতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর ইহাদের দেশটাকে প্রত্যক্ষ করিলেই পাওয়া যায়।

সলোমান পর্ব্বতরাজির মধ্যে অবস্থিত এই জমিগুলি নিতান্ত অনুর্ব্বর এবং দুই একটি জায়গা ছাড়া সমস্তই তৃণ-গুল্মহীন পাহাড়ে ভরা। 'Have gots' এবং 'Have not's'এর সমস্যায় বৃহত্তর পৃথিবীর স্থানে স্থানে যে অশান্তি বিদ্যমান, তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ও রূপান্তরিত সংস্করণ এখানে দেখা যায়। অন্নাভাব দূর করিবার জন্য কোন উপায় বাহির করিতে না পারায় সুদূর অতীতকাল হইতে লুঠতরাজের উপরই ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, এবং সেই জন্যই দস্যুসুলভ মনোভাব ইহাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে। সদ্‌গুণও ইহাদের মধ্যে ছিল, ইহারা আশ্রিতকে রক্ষা করিতে নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। প্রতিজ্ঞা পালন করা, সে যতই কঠিন হউক না কেন, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু বাহিরের আধুনিক সভ্যতার হাওয়া লাগিয়া সম্প্রতি ইহাদের এই সব অসভ্যোচিত গুণ নষ্ট হইবার পথে আসিয়াছে। ইহাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় লুঠপাট এবং গভর্ণমেণ্ট-অধিকৃত স্থান হইতে লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া মুক্তিপণ আদায় করা। ইহারা স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকা, ক্ষুদ্র শিশুকেও লইয়া যায়। সাধারণতঃ হিন্দুদেরই ইহারা লইয়া যায়। কারণ, হিন্দুরাই সমৃদ্ধিশালী, ও সেই জন্য উচ্চহারে মুক্তিপণ দিতে সমর্থ। অবশ্য মুসলমানরাও ইহাদের অত্যাচার হইতে সকল সময় মুক্তি পায় না। বন্দীদিগের সহিত ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। ইহাদের নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমি ইতিপূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে "ওয়াজিরি-কবলে দশদিন' নামক ঘটনায় দিয়াছি। ইহাদের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার বালাই বিশেষ ছিল না, তবে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে

এই অসভ্য দস্যুদিগের একটা মহৎ গুণ আছে, যাহা অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যে খুবই কম। ইহারা স্ত্রীলোকদের উপরে কখনও অত্যাচার করে না, বা তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করায় না। ইহারা যে স্ত্রীলোকদের ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা শুধু মুক্তিপণের জন্য।

নিজেদের অধিকৃত স্থানে ইহারা অল্প পরিমাণে আপেল, আনার, আখরোট, চিলগোজা প্রভৃতি ফল ও মেওয়া এবং চাটাইএর জন্য মাল উৎপন্ন করে এবং এই সকল দ্রব্য 'বান্নু,' 'মাঙ্গাই' 'ডেরা-ইসমাইল-খাঁ' প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিয়া সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহা ব্যতীত দুম্বার (ভেড়া) লোম ও ঘী বিক্রয় করিয়াও সামান্য অর্থ পায়। প্রাকৃতিক সম্পদে মামুদরা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। ইহাদের অধিকৃত স্থানে জ্বালানী কাঠের জঙ্গল আছে এবং ঐ কাঠ সংগ্রহ করিয়া ইহারা বিক্রয় করে।

গভর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধের সময়ে ইহারা অধিক লাভবান্ হয়। কারণ, রাস্তা প্রভৃতি তৈয়ার করিবার কণ্ট্রাক্ট স্থানীয় উপজাতিদের দেওয়া হয় এবং রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ ও সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিভাগের কর্ম্মচারীদের শরীররক্ষকরূপে ইহাদের অনেক লোককে নিযুক্ত করা হয়। এই রক্ষীদিগকে 'খাসাদার' বা 'বদরগ্গা' বলা হয়। এই রক্ষকরা কখনও কখনও ভক্ষকও হইয়া থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'খাসাদার' পোষ্ট হইতে সরকারী এরোপ্লেন লক্ষ্য করিয়া গুলীছোড়ার কথাও শোনা যায়। যুদ্ধের সময় সরকারী রসদ লুঠ করিবার সুযোগও প্রায়ই পাওয়া যায়। কাযে কাযেই ইহারা যে শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধই বেশী পছন্দ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভারত সরকার উপজাতিদের দমন করিবার জন্য যে Forward Policy অবলম্বন করিয়াছেন, সেই নীতি অনুসারে ওয়াজিরিস্থানের দুর্গম স্থানগুলিকে সুগম করিবার জন্য গত বৎসর হইতে রাস্তা প্রস্তুত করাইতেছেন। এই Forward Policy চালাইতে গত বৎসরে ওয়াজিরিস্থানে অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে, এবং এখনও প্রচুর ব্যয় হইতেছে, কিন্তু সুফল এখনও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনই যদি এই Policyর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। অন্ততঃ সাধারণ লোকরা ইহাই মনে করিবে। কারণ, ওয়াজিরিস্থানে সরকারের এই নীতি অবলম্বনের পর হইতেই উপজাতির দ্বারা লুঠপাঠ, খুন-জখম ও লোক ধরিয়া লইয়া যাওয়া বেশী হইয়াছে।

ওয়াজিরি, মামুদ ও ভিটানীরা জাতিতে মুসলমান। ইহাদের অধিকৃত স্থানে কয়েক ঘর হিন্দুরও বাস। এই সব হিন্দুর বেশভূষা দেখিয়া তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া

চিনিবার উপায় নাই। এই সব হিন্দু ব্যবসায় উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে নিরাপদে বাস করে। ইহাদের প্রিয় খাদ্য রুটী ও দুম্বার মাংস। তবে নিমন্ত্রণাদিতে চালের 'পোলাও' খাওয়া হয়, রুটী এবং মাংস রন্ধন করা একটু অদ্ভুত রকম। রুটীর জন্য আটা মাখিয়া তাহাতে কিছু লবণ মিশ্রিত করে এবং দুই হাতের সাহায্যে রুটী গড়িয়া আগুন জ্বালিয়া তাহাতে কতকগুলি পাথর ফেলিয়া দেয়, এই নুড়িগুলি খুব গরম হইলে সেইগুলি তুলিয়া গড়া রুটী দিয়া মুড়িয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, এইরূপে রুটীর এক পিঠ তপ্ত পাথরে ও অপর পিঠ কয়লাতে ভাজা হয়। মাংস প্রস্তুতও কতকটা এইরূপ। দুম্বার মাংস বড় বড় খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাতে লবণ মিশ্রিত করিয়া দুম্বার ছালে মুড়িয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, ঘণ্টাখানেক পরে তাহা বাহির করিয়া দগ্ধ ছাল ফেলিয়া দিয়া মাংসগুলি রুটীর সহিত ভক্ষণ করে। অবশ্য ইহাদের রন্ধনপাত্রও আছে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য ইহারা সর্ব্বদাই একস্থান হইতে অন্যস্থানে ছুটাছুটি করিতে বাধ্য হওয়ায় বিনা বাসনে রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

ওয়াজিরি প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে স্ত্রীলোক অত্যন্ত দুর্লভ, সেইজন্য পুরুষদের বিবাহ হওয়া বিশেষ কঠিন ব্যাপার। যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ (স্ত্রী ক্রয় করিবার জন্য) সংগ্রহ করিতে না পারিলে কাহারও বিবাহ হয় না। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে, অভিভাবক তাহাকে শাদা রংএর সালওয়ার পরাইয়া দেয়। সেই সালওয়ার দেখিলেই বিবাহার্থীরা কন্যার অভিভাবকের নিকট গমন করে, এবং যে বিবাহের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে পারে, তাহারই সহিত বিবাহ স্থির হয়। একটি স্ত্রী ক্রয় করিতে ন্যূনকল্পে তিন শত টাকা লাগে, কখনও কখনও মূল্য নিলামে দুই সহস্র পর্য্যন্তও উঠে। টাকার সংখ্যা স্থির হইলে পাত্রপক্ষ একদিন কয়েকটি দুম্বা উপহারস্বরূপ লইয়া কন্যার বাড়ীতে যায়, এবং সেইদিন বিবাহের দিন স্থির হয়। বিবাহের দিন বর ও বরযাত্রী কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়, এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কন্যার অভিভাবককে দেয়। অর্থপ্রাপ্তির পরে এক এক গ্লাস চা দিয়া বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা করা হয়। ইহার পরে বরপক্ষের উপহৃত দুম্বার মাংস, রুটী ও আধসের করিয়া ঘৃত দ্বারা বরযাত্রী ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের আহার করায়। আহারাদির পরে একটি খোলা জায়গায় নৃত্য আরম্ভ হয়। সকলে মিলিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিয়া নৃত্য করে এবং নৃত্যের তালে তালে ঢোল বাজান হয়। বৃত্তের মাঝখানে ঘুঁটে জ্বালাইয়া স্থানটি আলোকিত করা হয়। নিকটে স্ত্রীলোকরাও নৃত্য করে। স্ত্রীলোকদের নৃত্য পুরুষদের নৃত্যের ন্যায় নহে। পুরুষরা নিজেকে কেন্দ্র করিয়া বন্ বন্ করিয়া পাক খাইতে খাইতে বৃত্তাকারে ঘোরে। ইহাদের নৃত্য দেখিয়া Geographyতে পৃথিবীর Rotation & Revolutionএর কথা মনে পড়িয়া যায়। স্ত্রীলোকরাও বৃত্তাকারে ঘুরিয়া নৃত্য করে। তবে একজন আর একজনের হাত ধরিয়া নৃত্য করে। ইহারা নিজেদের নৃত্যের আলোক-চিত্র তুলিতে দেয় না। নৃত্যের সময়ে বাহিরের কোনও লোকের হাতে "ক্যামেরা" দেখিলে ইহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়।

ইহাদের নৃত্যরত ছবি আমার সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু উপরি-উক্ত কথা শুনিয়া আমি কখনও ছবি তুলিবার চেষ্টা করি নাই।

শ্রীমতী শান্তি লাহিড়ী।

বদ্ধ ও মুক্ত

উড়ে যাওয়া পাখীটিরে করি ডাকাডাকি
'কত সুখে আছি' বলে পিঞ্জরের পাখী।
মুক্ত পাখী বলে, 'সুখ মানি এই মনে—
ঘটেনিকো পরিচয় পিঞ্জরের সনে।'

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

[উপন্যাস]

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঘরের পথে

সুধা আসিয়া ডাকিল,—মা···

গার্গী দেবী চাহিলেন সুধার পানে।

সুধা বলিল,—কোদাইচৌকির সে-রোগী সেরেছে। কাল বাড়ী যাবে ঠিক করেছিল; যেতে পারেনি। আপনি বলেছিলেন, এখান থেকে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে···আপনি তাকে কি সব কথা বলে দেবেন···

গার্গী দেবী কহিলেন,—ও, হ্যাঁ···ওর পথ্যের সম্বন্ধে কতকগুলো কথা বলে দিতে হবে—ডাক্তার বলে গেছেন।

সুধা কহিল,—যাবার জন্য সে অস্থির হয়েছে।

গার্গী দেবী কহিলেন,—আমি আস্‌ছি।···তুমি এখানে এঁর সঙ্গে কথা কও, সুধা। তোমার জন্যই ইনি এসেছেন···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া গার্গী দেবী দীপকের পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন,—সুধার সঙ্গে কথা কও···

গার্গী দেবী চলিয়া গেলেন।

সুধা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···দীপকের মুখেও কথা নাই। সে চাহিয়া ছিল বাহিরের পানে···

দু'চার মিনিট এমনি স্তব্ধভাবে কাটিবার পর দীপক মুখ তুলিয়া সুধার পানে চাহিল, কহিল—বসো সুধা···

সলজ্জ স্মিত হাস্যে সুধা বসিল।

দীপক কহিল,—এঁর সঙ্গে ঐ কথাই হচ্ছিল··মানে, বললুম, তোমাকে আমি নিয়ে যাবার জন্য এসেছি এবং নিয়ে যাবো। কারণ, নিয়ে যাওয়া আমার কর্ত্তব্য···

একাগ্র দৃষ্টিতে দীপকের পানে চাহিয়া সুধা এ-কথা শুনিল; কোনো জবাব দিল না।

দীপক কহিল,—ওঁর তাতে খুব মত আছে, এমন মনে হলো না! অনেক তর্কের কথা তুল্‌লেন··

সুধা এবারো কোনো জবাব দিল না।

দীপক কহিল,—ওঁর মত না হবারই কথা। সাধ ক'রে কাজের লোককে কে হাত-ছাড়া করে?

এ-কথায় শিহরিয়া সুধা বলিল,—আর যা বলেন, বলুন, ও কথা বল্‌বেন না। আপনি মাকে চেনেন না, কিন্তু আমি চিনি। কারো ইচ্ছায় কখনো উনি কোনো দিন বাধা দেন নি···দেন না···নিজেকে শত অসুবিধা সইতে হলেও নয়···

দীপক হাসিল; হাসিয়া কহিল—তা হ'লে অপরাধ করেছি···কিন্তু সে কথা যাক! তোমার নিজের কি মত, বলো। আমার সঙ্গে যাচ্ছো তো?

অবিচল স্বরে সুধা কহিল,—যেতে হবেই?

দীপক কহিল,—হ্যাঁ।

সুধা কহিল,—কবে?

দীপক কহিল,—আজই প্রথম যে-ট্রেণে সুবিধা কর্‌তে পারবো···

সুধা নিশ্বাস চাপিল···

দীপক কহিল,—পার্‌বে না যেতে?

অভিমান, ক্ষোভ, নৈরাশ্য, বেদনা এবং বিদ্রূপ মিশিয়া দীপকের স্বরে রূঢ়তার আমেজ্ টানিয়া দিল।

সুধা কহিল,—কেন এ কষ্ট কর্‌বেন? আমার তো এখানে কোনো কষ্ট কোনো দুঃখ নেই!

কথাটা দীপকের বুকে বাজিল তীরের মতো···তীরের মতোই সে বেদনা বোধ করিল। দীপক একটা নিশ্বাস ফেলিল···বেশ বড় নিশ্বাস। কহিল,—আমি বুঝিনি, সুধা। আমার নিজের মনে কাঁটার বেদনা জেগে আছে!···কষ্ট

বোধ করি···তাই ভেবেছিলুম, হয়তো তোমারো এখানে কষ্ট হচ্ছে···এখান থেকে নিয়ে গেলে হয়তো তোমার সে-কষ্ট দূর হবে।

সুধা হাসিল। ম্লান হাসি! হাসিয়া সুধা কহিল,—কষ্ট আপনি কাকে বলেন?

দীপক চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। একরাশ কথা ঠেলাঠেলি-হুড়াহুড়ি করিয়া আসিয়া জোট্ পাকাইয়া তার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল।

সুধা কহিল—এই সব কাজ করি, তাই? আমার কিন্তু এতে কষ্ট হয় না···

দীপক এতক্ষণে গলা সাফ করিয়া লইয়াছে; কহিল—এ-কাজ দায়ে পড়ে তুমি করছো···দায়ে-পড়ে-করা অনেক কাজ মানুষের সয়ে যায়; এবং সয়ে গেলে তখন আর তাতে সে কষ্ট বোধ করে না।···তা নয়, সুধা·· এ-কাজ করাটাই মেয়ে-জীবনে চরম লক্ষ্য নয়···এ-কাজ যারা মাথায় ক'রে নেছে, দায়ে পড়েই তাদের তা করতে হয়েছে।···তোমার মা গার্গী দেবী এইমাত্র তাঁর নিজের যে-কাহিনী আমায় বললেন, সে কাহিনী তুমি নিশ্চয় শুনেছো!···উনিও প্রথম-জীবনে বিয়ে-থা ক'রে সংসার-ধর্ম্মে মন দিয়েছিলেন···সংসার ভেঙ্গে গেল দৈব-দুর্ব্বিপাকে···তাই বেঁচে থাকতে হবে বলে' অবলম্বনের জন্য উনি এ-কাজ হাতে নিয়েছেন।

সুধা মন দিয়া এ কথা শুনিল। দীপকের কথা শেষ হইলে সুধা বলিল—আমার যে এ-কাজ ছাড়া অন্য গতি নেই···

এ কথায় কি করুণ কাতরতা, দীপক মনে-মনে তাহা উপলব্ধি করিল এবং উপলব্ধিমাত্র মনের যে-জায়গায় ব্যথা, সে-জায়গাটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

দীপক কহিল—তর্ক করো না সুধা···তবে অভিমান-বশে তুমি এ-কথা বলতে পারো।···আমার অপরাধ হয়েছে, আমি স্বীকার করি। সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত যদি করতে চাই, করে' এ গ্লানি থেকে পরিত্রাণ কামনা করি, তোমার আপত্তি আছে?

সুধা কহিল,—অত-সব বড় বড় কথা আমি বুঝতে পারি না। তবে আমি এখানে ভালোই আছি,···আমার কষ্ট হচ্ছে কল্পনা ক'রে আপনি মিছে কষ্ট পাচ্ছেন! সত্যি, আপনি আমার জন্ত এ কষ্ট আর ভোগ করবেন না।

সুধা তবে তাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে? দীপক যেন কৃপা করিতে আসিয়াছে! রাগ হইল···নিজের উপর। এ দয়া-দাক্ষিণ্য-বৃত্তি দেখাইবার জন্য যেমন আসিয়াছে—তেমনি!···কিন্তু···

একটা আঘাত দিবার বাসনা দীপক রোধ করিতে পারিল না। সে বলিল—তুমি যদি ভালোই ছিলে, কেন তবে আমাকে তিলজলা থেকে চিঠি লিখে দেখা করতে বলেছিলে?···সে-চিঠি যদি না লিখতে···আমি কষ্ট ক'রে এখানে আজ আসতুম না···তোমার কথা ভেবে কষ্টও পেতুম না।

সুধা এ-কথায় মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। কেন চিঠি লিখিয়াছিল? দেখিতে বড় ইচ্ছা হইত, তাই···

কিন্তু শুধু সেই জন্যই?···তাই···তাই···

দীপক কহিল,—বলো···জবাব দাও···চুপ ক'রে রইলে কেন?

দীপকের স্বরে বিজয়ীর দৃপ্ত উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দু'চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি লইয়া সুধা কহিল,—একবার দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল···সকলের খপর নেবার ইচ্ছা হয়েছিল···অকৃতজ্ঞের মতো চলে এসেছিলুম, সে-অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবো, ভেবেছিলুম···

শুধু ক্ষমা!···আর কোনো কারণ ছিল না?

দীপকের মাথায় যেন আগুন জ্বলিল!···মনের কোণে কোথায় জমিয়া ছিল রাশীকৃত আবর্জ্জনা—আগুনের দীপ্তিতে সেগুলা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল!

এলা তাকে সচেতন করিয়া দেয়···দীপক ভাবিয়াছিল, সুধার মনে হয়তো দীপকের জন্য একখানি আসন পাতা আছে সে-আসনে দীপককে বসাইয়া সুধা নীরবে তার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দেয়···এ-কথা ভাবিয়া মনের মধ্যে তার অজ্ঞাতে যে আনন্দ, যে-গর্ব্ব গড়িয়া উঠিতেছিল···সুধার কথায় সে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে বসিয়াছে! বুকের শিরায়-শিরায় টান্ পড়িল।

দীপক কহিল—চুপ করো সুধা···বড়-বড় কথা বুঝতে পারো না অথচ বড় বড় কথা তোমার মুখে আটকায় না, দেখছি। কিন্তু না, আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না···তোমাকেই শুনতে হবে আমার কথা···

দীপকের স্বর মাত্রা ছাড়িয়া একটু উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে-স্বর শুনিয়া এবং দীপকের মূর্ত্তি দেখিয়া সুধা কুণ্ঠিত হইল। শান্ত স্বরে কহিল—কখন বল্‌লুম, আপনার কথা শুনবো না?

আঃ···দীপক আরাম বোধ করিল। কহিল—তা'হলে শুনবে···?

সুধা কহিল—বলুন, কি কথা শুনতে হবে···

দীপক কহিল—আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে··· আজই···

সুধা চুপ করিয়া রহিল···একাগ্র দৃষ্টি দীপকের মুখে··· সে-মুখে তখন নানা বর্ণের বিকাশ চলিয়াছে।

দীপক কহিল—যাবে?

সুধা হাসিল···আবার সেই মৃদু হাসি। হাসিয়া সুধা কহিল—যদি বলি,···না?

আবার সেই আগুনের জ্বালা! দীপক কহিল—যদি না যাও, তা'হলে আমি কি করবো, জানো?

সুধা কহিল—ধরে নিয়ে যাবেন?

—না।

—তবে?

দীপক কহিল—আমি আর ফিরবো না···

সুধা কহিল—এইখানে থাকবেন?

দীপক কহিল—তামাসা মনে করছো? তামাসা নয়, সুধা···আমি তা'হলে ফিরবো না,—যেদিকে দু'চোখ যায়, যাবো। হয়তো তোমারি দৃষ্টান্তে··· জলে ঝাঁপ দেবো। কাশীর গঙ্গায় অনেক জল··· জানো তো···? দেরী করবো না···হয়তো এখান থেকে বেরিয়েই···বলিতে বলিতে দীপক দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল···

সুধার ভয় হইল।···সুধা দীপকের হাত আবার ধরিল; কহিল—ঢের হয়েছে···অত বীরত্বে কাজ নেই। আমি যাবো আপনার সঙ্গে···

—যাবে?···দীপকের চোখে অধীর দৃষ্টি···

সুধা কহিল,—যাবো।···

—আঃ! দীপক কহিল,—সুধা তুমি লক্ষ্মী···দেখো, তোমার কোনো অযত্ন হবে না···এখানে ভালো আছো, বলছিলে—সেখানে যাতে তুমি আরো ভালো থাকো, সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকবে···

সেই দিনই কাশী ছাড়িয়া সুধাকে লইয়া দীপক ট্রেণে চড়িল। সেকেণ্ড ক্লাস কামরা। সুধা জানলায় মুখ রাখিয়া কাশীর পানে চাহিয়াছিল···ঐ গঙ্গা···অর্দ্ধচন্দ্রের মতো কাশীকে ঘিরিয়া বহিয়া চলিয়াছে! ঐ সব মন্দিরের চূড়া···

মন আর্ত্ত রবে বলিতে লাগিল, কাশী···কাশী···কাশী···

দীপক ডাকিল—সুধা···

সুধা মাথা তুলিয়া দীপকের পানে চাহিল।

দীপক কহিল—কাশীর জন্য মন কেমন করছে?

সুধা বলিল—বড্ড মাথা ধরেছে···

মাথা সত্যই ধরিয়াছিল···

দীপক কহিল—শুয়ে পড়ো এই সুজনিখানা গায়ে চাপা দিয়ে···

পুল পার হইয়া ট্রেণ তখন এপারের লাইন ধরিয়া চলিয়াছে।

সুজনিতে গা ঢাকিয়া সুধা বেঞ্চের উপর শুইয়া চোখ বুজিল।

* * * *

ট্রেণে কোনো কথাবার্ত্তা হইল না। সুধা মুড়ি দিয়া বেঞ্চে পড়িয়া রহিল। সামনের বার্থে দীপক বসিয়া রহিল চুপচাপ···তার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা মানবদেহ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যেমন মৃতদেহকে ছিঁড়িয়া কাটিয়া চিরিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখে, নিজের মনটাকে লইয়া দীপক তেমনি ছিঁড়িয়া কাটিয়া চিরিয়া বিশ্লেষণ করিতেছিল···

অতীতের সমস্ত কথা ভিড় করিয়া মনে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল···কারখানায় আঙুল কাটিয়া যেদিন ব্রজকিশোরের অন্দরের অর্গলিত কক্ষে আশ্রয় পায়···সুধা আসিয়া সেবার ভার গ্রহণ করিল···বন্দিনী বেচারী সুধা···

তার পর ছোটখাট কথায়-বার্ত্তায় দুজনে দুজনকে পাইল কাছাকাছি···এলাহাবাদের খপর জানিয়া দীপকের মা-বাপ-বোনদের সঙ্গে মনে-মনে সুধা কি আত্মীয়তা রচিয়া তুলিল··· যেন তারা কত আপন-জন···তারপর ব্রজকিশোরকে লুকাইয়া দুজনের সেই মোটরে চড়িয়া বিচরণ ··এ্যাক্‌সিডেণ্টের ফলে

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল এবং বিনামেঘে সেই কঠিন রুদ্র বজ্রপাত···

এলাহাবাদে সুধা ছিল নিশ্চিন্ত-নিরাপদ আশ্রয়ে···

কিন্তু শুধু গৃহাবরণটুকুর ব্যবস্থা করিয়া দিলেই সুধার বয়সের মেয়ের সব দায় ঘোচে না ··আশ্রয়ের চেয়ে বড় যে ব্যবস্থা, সুধার সম্বন্ধে তাহা করা উচিত ছিল! সেদিকে যে অবহেলা করিয়াছে, সে-অবহেলার অনুশোচনা এ জীবনে মুছিবার নয়···ঘুচিবার নয়!···

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা শুধরাইয়া লইবার উপায় নাই···

মনে দ্বিধা জাগিল—সত্যই উপায় নাই?···

সে উপায়ের অন্তরাল···

···এলা!

এ-কথা মনে হইবামাত্র দীপক চমকিয়া উঠিল। এলার নাম ইহার মধ্যে আসিয়া উদয় হয় কেন? তবে কি···

দীপক আজ সুধাকে চায়?···

কামরার আলো দীপকের চোখে নিমেষে কালো হইয়া গেল···

যদি সেই ইচ্ছাই ছিল, কোনোদিকে জট্ বাঁধিবার পূর্ব্বে কেন তবে তাহা করো নাই?···আজ এলার অবহেলায় তাকে শাস্তি দিতে সুধাকে প্রয়োজন?···সুধা যদি জানিতে পারে—তাকে এত বড় অপমান করিবার বাসনা মনে লইয়া দীপক কথায় ভুলাইয়া সুধাকে তার কাশীর আরাম-নীড় হইতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—তার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া? যেন এ কৃপা না পাইলে সুধার জীবন সার্থক হইবে না!

সুধা যদি ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে হয়তো এই চলন্ত ট্রেণ হইতে সে এখনি ঝাঁপ দিবে! সুধার কথায় বা আচারে-ব্যবহারে এমন লোভের আভাস দীপক কি কোনোদিন পাইয়াছে?···

সহসা সুধা উঠিয়া বসিল, কহিল—এখন কত রাত্তির?

দীপক নিশ্বাস ফেলিল। ফেলিয়া বলিল—রাত প্রায় দেড়টা।

—ঠায় বসে আছেন! ঘুমোবেন না?

দীপক কহিল—চোখে ঘুম নেই···

অবিচল দৃষ্টিতে সুধা কিছুক্ষণ দীপকের পানে চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল,—কিসের এত দুশ্চিন্তা, বলুন তো?

দীপক কহিল—দুশ্চিন্তা নয়···

সুধা কহিল—মানুষ এমনিতে কাঠ হয়ে বসে থাকে না এতখানি রাত্তির জেগে···আরো দুবার আমি দেখেছি, আপনি ঠিক এইভাবে চুপ ক'রে বসে আছেন। মাথা ধরেনি তো?

দীপক নিশ্বাস ফেলিল; কোনো জবাব দিল না।

সুধা কহিল—মাথা ধরে থাকে যদি তো বলুন, মাথা টিপে দি···ঘুম আসবে'খন···

মন সবলে বলিল, না, না, না···মনে যে-বাসনা কালি-মাথা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, সুধার হাতের সেবায় সে বাসনা হয়তো প্রশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠিবে···বাড়িয়া উঠিলে দীপক কি যে বলিয়া ফেলিবে···

দীপক কহিল—মাথা ধরেনি···

—তা'হলে শুয়ে পড়ুন···এখনি শুয়ে পড়ুন। না'হলে ভয়ঙ্কর অন্যায় হবে···আমি ভয়ানক রাগ করবো···সত্যি।

দীপক কহিল—না সুধা, তোমাকে রাগ করতে হবে না। আমি এখনি শুচ্ছি।

সুধা বলিল,—শুয়ে পড়ুন। দুটি মাত্র প্রাণী ট্রেণের কামরায়···একজন ঠায় যখের মতো জেগে আছে মনে হলে কোনো মানুষ স্বস্তিতে ঘুমোতে পারে না।···

চমৎকার! ভৎ'সনা এমন মিষ্ট লাগে!···দীপকের মনে যে-ঝড় বহিতেছিল, সে ঝড় এ-ভৎ'সনার আঘাতে থামিয়া পড়িল। দীপক বেঞ্চে পা ছড়াইয়া শয়ন করিল। সুধা খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল···আকাশে এক-টুকরা ফালি চাঁদ। তাহারি স্তিমিত আলোয় ওদিক্‌কার গাছপালা জলা-বিল মাঠ-বাট যেন স্বপ্নপুরীর মতো সরিয়া সরিয়া চলিয়াছে···ট্রেণের একঘেয়ে ঘর্ঘর শব্দ ও-মায়াপুরীর গায়ে দাগ দিতে পারিতেছে না···মায়াপুরীর গা ছুঁইয়া চলিয়াছে···যেন তুলির পরশ বুলাইয়া, বিচিত্র ছবি আঁকিয়া!

সুধার মনে হইল, দিনের আলো যদি না ফোটে··· জগতে যদি কোলাহল-কলরব আর না জাগে···না থামিয়া ট্রেণ যদি এমনি আলো-ছায়ার বুক বহিয়া শুধু চলিতে থাকে···এবং চলিতে চলিতে একেবারে সেই পৃথিবীর শেষ প্রান্তে···

বড় ভালো লাগিতেছিল···এঞ্জিনের মাথা ফুঁড়িয়া মাঝে

মাঝে আলোর তীব্র দীপ্তি ঝলসিয়া ওঠে···যেন মায়াপুরীর কোথায় কি আছে, দেখিবার জন্য···এবং দেখার মতো কিছু দেখিতে না পাইয়া সে-দীপ্তি আবার অন্ধকারে মিলাইয়া যায়! আলো-আঁধারে-ঘেরা অস্পষ্ট বাহিরের পানে চাহিয়া চাহিয়া সুধা ভুলিয়া গেল যে, সে ট্রেণে চড়িয়াছে এবং কলিকাতায় চলিয়াছে···

ঘটঘট্ দুম্‌দাম্ শব্দে চমক ভাঙ্গিল। ধড়মড়িয়া সুধা উঠিয়া বসিল···জানলায় মাথা রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, খেয়াল নাই···

চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে, ট্রেণ থামিয়াছে। একটা ষ্টেশন···নিদ্রা-জড়িত স্বরে কুলি হাঁকিতেছে,—বর্দ্ধমান···

দীপকের পানে চাহিল। দীপক জাগিয়া শুইয়া আছে···

সুধার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিলে দীপক কহিল—বর্দ্ধমান··· আর ক'ঘণ্টা পরেই হাওড়া।

সুধা নিশ্বাস ফেলিল···বর্দ্ধমান···হাওড়া···ক'ঘণ্টা পরে যাত্রা-পর্ব্বের শেষ!···

ক্ষোভে-দুঃখে মন হায়-হায় করিয়া উঠিল। কেন? কেন? কেন এ পথ এখনি ফুরাইয়া যাইবে? পথের শেষ কেন হয়?

রাত্রে এই জানলায় মাথা রাখিয়া মনে হইতেছিল··· চিরজীবনের মতো চলিয়াছি! এ চলার যেন বিরাম ঘটিবে না!

বাহিরে ব্যস্ত কণ্ঠের স্বর—এইটেতে উঠে পড়ুন···ঘণ্টা দিচ্ছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে ঘণ্টা পড়িল এবং কামরার দ্বার ঠেলিয়া এক বাঙালী ভদ্রলোক কামরায় প্রবেশ করিলেন।

ভদ্রলোকের মুখে আলো পড়িয়াছিল। দীপক চিনিল···

ধড়মড়িয়া উঠিয়া দীপক কহিল—আপনি···

—কে?—দীপক···

ভদ্রলোক স্তম্ভিত···

ট্রেণ তখন ছাড়িয়া দিয়াছে···

ভদ্রলোক চাহিলেন সুধার পানে···চিনিলেন। চিনিবা-মাত্র কাঠ হইয়া গেলেন।

দীপক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

ব্রজকিশোর বাবু!

সুধা মামাকে দেখিয়াছে···মামার মুখের ভাব দেখিয়া সে যেন মরিয়া গেল।

ব্রজকিশোর বাবু কহিলেন,—বেলা নটায় পৌঁছুতে হবে ডায়মণ্ড-হার্বার। টেলিগ্রাম পেলুম রাত্রে···প্রোফেশর ভন্ মুড্ এসেছেন বার্লিন থেকে। কাল ডায়মণ্ড হার্বার থেকে বেরিয়ে পড়বেন···তাই এ কষ্টভোগ···তা তোমরা দুজনে··· কোথা থেকে আসছো?

দীপক কহিল,—কাশী।

—ও···কাশীতে ছিলে···

দীপক কহিল—বসুন···

ব্রজকিশোর বলিলেন—বসছি বাপু···তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তোমরা এ-কামরায় আছো, জানতুম না··· এর পরে কোন্ ষ্টেশনে গাড়ী থামবে, বলতে পারো?

দীপক কহিল,—ব্যাণ্ডেল···

ব্রজকিশোর বাবু কোনো কথা বলিলেন না। হাতে ছিল মাঝারি সাইজের একটা স্যুটকেশ্। ওধারের বেঞ্চে স্যুটকেশ রাখিয়া তিনি বসিলেন, বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

দীপক কহিল,—এখনো রাত রয়েছে···যদি শুতে চান ···বালিশ দেবো?

প্রচণ্ড নিষেধ তুলিয়া ব্রজকিশোর বলিলেন,—না, না, না। পরের ষ্টেশনেই আমি নেমে গিয়ে অন্য কামরায় উঠবো'খন···ব্যস্ত হতে হবে না।

দীপকের মনে এ-আঘাত বড় ভীষণ বাজিল···এমন রূঢ় অপমান···

কেন?

দীপক কহিল,—আমরা এমন অস্পৃশ্য যে এ-কামরায় বসা আপনার অসহ্য লাগছে?

ব্রজকিশোর কহিলেন,—এ-সব কথা কেন তোলো বাপু! এগুলো আমরা সহ্য করতে শিখিনি···কুসংস্কার!···বিয়ে-থা করবে না···অথচ এক ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে এমনি হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়াবে ঘর-সংসার, কাজ-কর্ম্ম ফেলে···

দীপক সহ্য করিতে পারিল না, কহিল—আপনার মনের এ পরিচয় পেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে যদি ঘৃণা হয়, তা হলে সে আমার অপরাধ হবে না!

—ব্যস্, ব্যস্…চুপ করো বাপু…

দীপক কহিল,—চুপই করবো…শুয়ে পড়ো, সুধা। এঁরা গুরুজন হলেও এঁদের শ্রদ্ধা-সম্মান করতে নেই। করলে পাপ হয়।

সুধার দু'চোখে অশ্রুর ঝর্ণা বহিয়া চলিয়াছে—অজস্র ধারে! সে ঝর্ণা-ধারায় বিশ্ব-নিখিল যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইবে!

সুধা কোনো কথা বলিল না…জানলায় মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল। সমস্ত বিশ্ব-জগৎ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মণিমালিকা

দীপকের গৃহে আসিয়া এলাকে না দেখিয়া সুধার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, বলিল,—বৌঠাকরুণ…?

দীপক কহিল,—আগে জিরোও সুধা—ট্রেণে যে-শক্ পেয়েছি, তার আঘাত আগে সারুক, তারপর সব কথা তোমাকে বলবো…

দীপকের মুখে মলিন হাসি…

দেখিয়া সুধার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে কৌতূহলেরও সীমা ছিল না। যতদিন সুধা কলিকাতায় ছিল, দীপক তখন কোনো দিনই এমন করিয়া তাকে এখানে আনিবার জন্য আকুল হয় নাই। বৌঠাকরুণও একদিন গিয়া দেখা করিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে কি এমন ঘটিল যে, দীপকের মনে অপরাধের গ্লানি বাড়িয়া এমন অসহ্য হইয়াছে যে, সুধাকে টানিয়া হিঁচড়িয়া না আনিলে দীপক কি করিত, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই!

রহস্য!…

এখানে আসিয়া তার মনের ভার লঘু হইয়াছে, তা নয়। মন ভারী হইয়া আছে…হয়তো আরো অনেক দিন আগে এখানে আসিতে পারিলে মন এমন ভারী হইয়া থাকিত না! হয়তো আগে এ ভার মনে এত বাড়িত না…ট্রেণের কামরায় ব্রজকিশোরের সেই অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং যা-নয়-তাই কতকগুলা রূঢ় বিশ্রী কথা বলিয়া চকিতে তাঁর নামিয়া যাওয়া—সেই এক নিমেষে সুধার মনে তিনি যে-আঘাত দিয়া গেছেন, সে আঘাত প্রথম যে রাত্রে সে মধুয়া ছাড়িয়া আসে, সে-রাত্রের আঘাতের চেয়ে অনেক বেশী! তার মন যেন সেই অবধি পাথর হইয়া আছে!

দীপকের কথায় স্নানাহার করিতে হইল। তার পরে দীপক চলিয়া গেল তার কারখানার কাজে; সুধা উদাস মনে চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বৈকালের দিকে দীপক বাড়ী ফিরিল, ফিরিয়া সুধাকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া বাহির হইল—খোলা হাওয়ায় বেড়াইলে মনের ভার যদি লঘু হয়! সুধা গেল দীপকের সঙ্গে…যন্ত্র-চালিত পুতুলের মতো…

এবং পুতুলের মতো আরো দু'দিন দু'রাত্রি কাটিল… তার পর সুধার চেতনা হইল। সুধা বলিল—এখানে চুপ-চাপ আমাকে ফেলে রেখে আপনার কি লাভ হচ্ছে, বলতে পারেন?

এ-কথায় দীপক চমকিয়া উঠিল। তার মনে নানা চিন্তা নানা বেশে জ্বলিতেছিল, জ্বলিয়া নিবিতেছিল।…দীপক কহিল—কি তুমি করতে চাও সুধা, বলো…

সুধা বলিল—আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন…কেন?

দীপক কহিল—যদি বলি, দূরে পরের মতো তোমাকে রেখে আমার মন দারুণ অস্বস্তিতে ব্যথা পাচ্ছিল…?

সুধা বলিল—কিন্তু শুধু নিজের দিক্‌টাই আপনি এত বড় করে দেখচেন কেন, বলতে পারেন?

এ কথা সুধা বলিবে, দীপক ভাবে নাই! ক'দিন ধরিয়া মাতুল ব্রজকিশোরের সেই কটু মন্তব্য মনের মধ্যে ঘূর্ণীচক্র রচিয়া বড় বেশী কলরব তুলিতেছিল…ব্রজকিশোর না জানিয়া না বুঝিয়া দুম্ করিয়া অ-কথা কু-কথা বলিয়া বসিলেন …তার পর এ-বাড়ীর ভৃত্যেরা সুধার পানে কি-রকম কৌতূহলী দৃষ্টিতে চায়; সে দৃষ্টি সুধার গায়ে বিঁধিতেছিল… তাই একা-একা সুধার এখানে ভালো লাগিতেছে না! পৃথিবীর সঙ্গে তার যে-পরিচয় হইয়াছে, তাহাতে মনের কোণে সে সরল বিশ্বাস আর তার নাই!…সেবারে ঢাকায় সেবার কাজ করিতে গিয়া আশ্রমের সেবক বীরেশ্বর ইঙ্গিতে তাকে যে-কথা বলিয়াছিল, সে-কথায় তার মনে যেন প্রচণ্ড বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল…এবং সেদিন হইতে সেবার কাজে নিজেকে তরুণ সেবকদের দল হইতে নিজেকে সে বেশ খানিকটা বিচ্ছিন্ন গম্ভীর রাখিয়া চলিয়াছে।

সুধার কথায় দীপক কহিল,—তোমার সম্বন্ধে উদাসীন নই সুধা···সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে কতকগুলো বৈষয়িক ব্যাপার ঠিক ক'রে নিচ্ছি···

সুধা বলিল—না, আমি এ-রকম চুপচাপ পড়ে থাকতে পারবো না। দয়া ক'রে বলুন···আমার কি ব্যবস্থা করবার জন্য আপনি ব্যাকুল···?

দীপক কহিল—আর একটা দিন সবুর করো···তার পর তোমাকে নিয়ে এলাহাবাদে যাবো···সেখানে গিয়ে আমার মায়ের হাত থেকে তোমার ভবিষ্যতের সব ভার আমি গ্রহণ করবো···

এ-কথার অর্থ সুধা ঠিক বুঝিল না; তবে অস্পষ্ট আভাসে যে-অর্থ বুঝায়···সুধা শিহরিয়া উঠিল। সুধা কহিল, —তার মানে?

দীপক কহিল—সে মানে আমি নিজে এখনো ঠিক বুঝিনি···আর একটা দিন সবুর করতে পারবে না, সুধা?··· দয়া···দয়া···আমি ভিক্ষা চাইছি···

কথার শেষে দীপক দুই কর-পুট অঞ্জলিবদ্ধ করিল।

সুধা বলিল—বেশ···কিন্তু আজ আমার একটা কথা রাখবেন?

—বলো···

—একবার তিলজলায় যদি নিয়ে যান···নবকুমারদের বাড়ী···নবকুমারের মায়ের কাছে অপরাধী আছি···সে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবো।

—অপরাধ!

সুধা বলিল—হ্যাঁ। এবারে যখন কাশী যাই, তখন তাঁর অসুখ দেখে গিয়েছিলুম···একবার দেখা ক'রে খপর নেবো···কাশীতে গিয়ে পর্য্যন্ত একখানি চিঠি লিখে তাঁর খপর নিতে পারিনি!

দীপক কহিল—বেশ, আজ চারটের আগেই আমি ফিরবো···ফিরে তোমাকে নিয়ে তিলজলায় যাবো।···

তিলজলা হইতে ফিরিতে রাত্রি নটা বাজিয়া গেল। নবকুমারের মা ভালো আছেন। তিনি ছাড়িলেন না···সেখানে দুজনকে খাইতে হইল।

বাড়ী ফিরিয়া দীপক দেখে, একখানা খালি ট্যাক্সি ফটকের বাহির হইয়া গেল। দীপক চমকিয়া উঠিল···এলা আসিল না কি?

এলা নয়···মণিমালিকা আসিয়াছেন···একা।

দীপক কহিল—আপনি?

মণিমালিকা চাহিলেন সুধার পানে···কহিলেন,—এ সেই সুধা···না?

সুধা তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল—হ্যাঁ···

মণিমালিকার দু' চোখের দৃষ্টি স্থির-গম্ভীর···

দীপক কহিল—তুমি যাও সুধা···বলছিলে, মাথা ধরেছে ···ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ো গে···কাল আবার এলাহাবাদ যাওয়া আছে। অনেক গোছগাছ করতে হবে। তুমি যাও···

মণিমালিকার স্নেহহীন নীরস দৃষ্টির স্পর্শে সুধা কাঠ হইয়া গিয়াছিল···দীপকের কথায় এখান হইতে নড়িতে পারিয়া সে যেন বাঁচিল!

সুধা চলিয়া গেলে দীপক কহিল—রাত্রে আপনি এখানে থাকবেন তো?

মণিমালিকা কহিল,—না···আমি এসেছিলুম তোমার সঙ্গে দেখা করতে···

দীপক কহিল—একলা?

—না। আমার সঙ্গে বেয়ারা আছে। তাকে পাঠিয়েছি অন্য জায়গায়···আমি এসেছি প্রায় ছ'টায়। ট্যাক্সিকে বলে দিয়েছিলুম, নটার সময় আসতে···এসেছিলো। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হলো না···তাই ট্যাক্সি ফিরিয়ে দিতে হলো। তাকে বলেছি, আরো এক ঘণ্টা পরে আসবে···

দীপক শুনিল। শুনিয়া কহিল—কোনো কথা ছিল? এখন বলবেন?

—হ্যাঁ। তার কারণ, কাল আর সময় পাবো না···দু' চার জনের সঙ্গে দেখা সেরে কলকাতা থেকে বেরুতে হবে···

—ও···তা, বলুন···

মণিমালিকা কহিলেন—বসো···

দীপক বসিল। বসিয়া মনকে সতর্ক করিল, অশান্ত হোস্ নে···সাবধান!

মণিমালিকা কহিলেন—এলাকে যে এভাবে দার্জ্জিলিংয়ে থাকতে দেছ, এ কি ভালো করছো? পাঁচজনে নিন্দা করবে···

দীপক কহিল—পাঁচজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকলে মানুষের পক্ষে বাঁচা শক্ত হয়। ··

কথাটা মণিমালিকার বিশ্রী লাগিল। মণিমালিকা এলাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন 'দার্জ্জিলিংয়ে গিয়া বুঝাইয়াছিলেন—প্রমোদ এখানে আছে তার বৌ নিয়ে। তোমার তা বলে এখানে থাকা উচিত নয়। তখন সুধার কথা লইয়া এলা মায়ের কাছে আভাসে যে দু' চারিটা কথা ব'লিয়াছিল, মণিমালিকা সে-কথা শুনিয়া অবধি চিন্তিত হইয়া আছেন···

মণিমালিকা এলাকে বলিলেন,—তা' বলে নিজের ঘর-সংসার ছেড়ে এভাবে প্রমোদের কাছে পড়ে থাকবে··· নিজের মান-মর্য্যাদা খুইয়ে···

এ-কথার জবাবে এলা বলিয়াছিল,—সেই সুধা মেয়েটি ···অপমান সয়ে সেখানে থাকতে বলো?

মা আর কোনো কথা বলেন নাই!

মণিমালিকা দীপকের পানে চাহিয়া ব'লিলেন,—এখানে তোমায় দেখছি, তুমি আর সুধা—দুজনেই কমবয়সী—এভাবে এক বাড়ীতে থাকা কারো পক্ষে উচিত নয়···

দীপক জ্বলিয়া উঠিল। অনুচিত! অন্যায়···এই কথাটাই সে শুনিতেছে সকলের মুখে। কিসের অনুচিত? কেন অন্যায়? স্ত্রী-পুরুষে প্রীতির সম্পর্ক নাই? অনাবিল প্রীতি-স্নেহ থাকিতে পারে না? স্ত্রী-পুরুষে শুধু বুঝি খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক?

দীপক কহিল—ক্ষমা করবেন! এ-সব কথায় আমার আর সুধার—দুজনেরি আপনি অপমান করছেন! আমরা ইতর নই···আমাদের সম্পর্কে কোনো দোষ ঘটেনি কোনো দিন...

মণিমালিকা বলিলেন—পাঁচজনে কুসম্পর্ক কল্পনা করে ···বড় সাবধানে সে-অপবাদ বাঁচিয়ে সংসারে চলতে হয়···

দীপক কহিল—পাঁচজনকে আমি মানি না। আমি মা'নি আমার নিজের ভদ্রতাকে। মনে-জ্ঞানে যদি আমি ভদ্র হই, পরের মিথ্যা অপবাদ-কুৎসা আমি গ্রাহ্য করবো না···

মণিমালিকা বলিলেন—বুঝি না, বাবা···সকল কাজে আজো আমরা ঐ অপবাদকে ভয় করে তা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি। এই সমাজের শাসনেই সীতা দেবী···

দীপকের সহ্য হইল না। দীপক কহিল,—ক্ষমা করবেন। সীতা দেবীকে ভালো জেনেও রামচন্দ্র তাঁর পরীক্ষা চে··· যেদিন প্রজাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছিলেন, সেদি··· থেকে মেয়ে-জাতকে তিনি অত্যন্ত অসহায়, অত্যন্ত বেচারা ক'রে গেছেন। কিন্তু এ সব কথা আর নয়···সুধা ভালো··· খুব ভালো···তার সম্বন্ধে আমার কোনো নিকট-আত্মীয়ও যদি মনে সংশয় পোষণ করেন, তা হলে সে নিকট-আত্মীয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না!

দীপকের কথায় ঝাঁজ দেখিয়া মণিমালিকা আর কোনো কথা বলিলেন না।···

দশটায় মণিমালিকার ট্যাক্সি আসিল ··মণিমালিকা বিদায় লইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—কাল আমি দার্জ্জিলিং যাচ্ছি···

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তার পরে

পরের দিন সুধাকে লইয়া দীপক আসিল এলাহাবাদে মায়ের কাছে।

সুধাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আরতি একরাশ গালি দিল—দুষ্টু···দুষ্টু···দুষ্টু···তোমার মতো দুষ্টু মেয়ে ভূ-ভারতে নেই···

সাশ্রুনয়নে সুধা বলিল—আমায় ক্ষমা করো ভাই আরতিদি···

আরতি বলিল—ক্ষমা করবো যদি আর কখনো আমাদের ছেড়ে না যাও ··

সুধা বলিল—কি ক'রে তা হবে! তোমার তো বিয়ে হচ্ছে···তোমার সঙ্গে তোমার শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে উঠবো কি বলে!···

আরতি বলিল—তোমারো সে-ব্যবস্থা এবার হবে। দেখে নিয়ো···পায়ে শিকল পড়বে···শক্ত শিকল···

সুধা কোনো জবাব দিল না···ম্লান বাষ্পার্দ্র নয়নে আরতির পানে চাহিয়া রহিল।···

মায়ের কাছে দীপক বলিল—সুধার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-পালনের একটি মাত্র উপায় আছে···আমি সে উপায় করতে চাই···

মা চাহিলেন দীপকের পানে অধীর-কুতূহলী দৃষ্টি…

দীপক কহিল—আমি জানি, আমার ছেলেখেলার দোষে তোমাদের সমাজের বাঁধা ঘরে এমন আঘাত করেছি যে সমাজের মান রাখবার একটি মাত্র উপায় আছে…সে মান রক্ষা না করলে সুধাকে তোমাদের সমাজ 'আপনার' বলে স্বীকার করবে না…

তার পর কথা বাধিয়া গেল। কি করিয়া মনের আসল কথাটুকু প্রকাশ করা যায়…দীপক আজ বহু দিন ধরিয়া বহু চিন্তা করিয়াও তার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে নাই… সুধাকে সে নিজে বিবাহ করিয়া তার সকল অসহায়তা, নিরুপায়তা এবং দুর্ভাগ্য মোচন করিতে চায়…সুধার যে-গৌরব পাঁচজনের স্পর্দ্ধিত ইতর আঘাতে আজ লুণ্ঠিতপ্রায়, সে-গৌরবকে দীপক তার স্বাভাবিক তেজে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতে চায়…তাকে বিবাহ করিয়া, তার গৌরব স্বীকার করিয়া…

কিন্তু এ-কথা কে বুঝিবে? যদি সকলে ভাবে, তরুণীর যৌবনের লোভে দীপক নিজের হীন লালসাকে মহত্ত্বের আবরণে ভূষিত করিতে চায়?

মা বলিলেন—সে উপায় ছিল একদিন, বাবা…যদি সেদিন সুধার গলায় তোমার হাতের মালা পরিয়ে তাকে বরণ ক'রে বুকে নিতুম…

দীপক কহিল—তা যদি ভেবেছিলে, কেন তা করোনি, মা?…সে-ত্রুটির জন্য সুধার জীবন নষ্ট হবে?

মা বলিলেন—আমাদের ভুল হয়েছিল…

দীপক বলিল—কিন্তু এ মারাত্মক ভুল আজো মেনে চলবো?

মা নিশ্বাস ফেলিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আজ এ ভুল শুধরোতে গেলে অন্য লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে হয়…তা করলে অন্যায় আরো গুরুতর হবে…

দীপক কহিল—বুঝেছি…তুমি এলার কথা ভাবচো! কিন্তু সে কি কোনোদিন স্ত্রীর অধিকার নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে?…আমি তাকে স্ত্রী বলে কোনোদিন গ্রহণ করতে পারিনি…সে-ও কোনোদিন আমাকে স্বামী বলে স্বীকার করতে পারেনি…

মা হাসিলেন,—মলিন হাসি। মা বলিলেন—স্বামি-স্ত্রী বলে স্বীকার করা…ও-কথা আমাদের কথা নয়, বাবা… ও হলো সাহেব-মেমের কথা। আমরা জানি, বিয়ে হলে স্বামি-স্ত্রীর পরস্পরকে পরস্পরের মানা চাই-ই…না মেনে উপায় নেই।…তুমি বলছো, তোমাদের দুজনের মধ্যে মনের মিল হয়নি…কিন্তু বিরোধও তো জাগে নি…

দীপক বলিল,—সে যে আমাকে ছেড়ে, তার নিজের সংসার ছেড়ে কোথায় কে তার প্রমোদ দাদা আছে, তার পিছনে ঘুরে বেড়ায়…এতে তাকে ভালো বলে তোমার মনে হয়…সত্যি?

মা বলিলেন—চুপ করো…নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এমন কথা মনে আনতে নেই। এলাকে আমি জানি · বড় তেজী মেয়ে।…কোথায় তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটু ত্রুটি ঘটেছে…তা বলে তাকে মন্দ বলবে?…না দীপু…তুমি তো নিজে জানো, সুধা ডাগর মেয়ে…তোমার সঙ্গে তার কোনো রক্ত-সম্পর্ক নেই…তবু তোমাদের সম্পর্কে এতটুকু ময়লা নেই! আর এলা…?

দীপক কহিল—তাহলে সুধার সম্বন্ধে…?

মা বলিলেন—একটা কথা সত্যি বলবি?

দীপক কহিল—মিথ্যা কথা আমি কখনো বলিনি… তুমি তো জানো, মিথ্যায় আমার কত ঘৃণা…

মা বলিলেন—সুধাকে তুই চাস তোর পাশে—এর কারণ…এলার উপর রাগ? না, সুধার উপর অনুকম্পা? না…আর কোনো কারণ আছে?

দীপক কহিল—অত আমি ভেবে দেখিনি…তবে সুধা সে আশ্রমে থাকবে না…আর পাঁচ-জনের মতো সে সংসারের গৌরব ভোগ করবে…এই আমি চাই। বিনাদোষে কেন সে তার স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চিত থাকবে?…

মা বলিলেন—বুঝেচি বাবা…আমিও তাই চাই। যেদিন সুধাকে এনে আমার হাতে দেছ, সেদিন থেকেই আমার সেই লক্ষ্য…দুর্গ্রহের বশে অনর্থ ঘটলো, তাই।…তা ভেবো না। সুধার সম্বন্ধে আমি সেই ব্যবস্থাই করবো…এবং সে সুব্যবস্থা হবে। সুধা আর আরতি—আমার কাছে সমান…আমি মা, এ-কথা তোর কাছে এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি। তুই বিশ্বাস কর্…বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্…

কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। সে-মন এত দিন আরো পাঁচ কাজে নিজেকে নিমগ্ন রাখিত, সে-মন আজ

বাহিরের পাঁচটা আঘাতে একই লক্ষ্যে উন্মুখ, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! তার উপর সুধাকে যখনি পরের ঘরে গৃহলক্ষ্মীর আসনে কল্পনা করিয়াছে, তখনি গার্গী দেবীর করুণ কাহিনী মনে জাগিয়াছে···ট্রাজেডির সকল ব্যথায় আতুর-আর্ত্ত বেশে! অথচ সে নিজে···

যদি তা সম্ভব হইত?···

সম্ভব হইবে না শুধু এলার জন্য···

কিন্তু এলা তার কে যে তার জন্য সুধার ভবিষ্যৎ এমন অনিশ্চিত থাকিবে?···

আরো ক'দিন কাটিয়া গেল···তার পর দার্জ্জিলিংয়ের টেলিগ্রামে খপর আসিল, পাহাড়ে চড়িতে গিয়া পড়িয়া এলা পা ভাঙ্গিয়াছে। এমন ভাবে ভাঙ্গিয়াছে যে সে. পা-খানিকে রক্ষা করা হয়তো সম্ভব হইবে না!···তারা কলিকাতায় রওনা হইয়াছে···একেবারে হাসপাতালে।···

মা বলিলেন—তুমি এখনি যাও দীপু···আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো···বাড়ীর বৌ···লক্ষ্মী···

মায়ের আদেশ অমান্য করা গেল না।···

এলার পায়ের খানিকটা কাটিয়া বাদ দিতে হইল···জুতা-শুদ্ধ পায়ের উপর ভারী পাথর পড়িয়াছিল···পায়ের আঙুল-গুলা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে···

মা বলিলেন—এলাকে নিয়ে আমি এলাহাবাদে যাবো···এলা যাবে তো?

এলা বলিল,—যাবো···

কোথা দিয়া কি যে ঘটিয়া গেল···

মানুষের রচা কাল্পনিক গল্প-উপন্যাসে এমন ঘটে না!

আরতি ডাকিল,—দাদা···

দীপক গুম্ হইয়া বসিয়া ছিল···

আরতি কহিল—বৌদি তোমাকে কি বলতে চায়···এসো একবারটি···লক্ষ্মী ভাই···

দীপক আসিল।

এলা বলিল,—তোমার উপর আমি অভিমান করে-ছিলুম··নিজের মনে অহঙ্কার ছিল বড় বেশী···ভেবেছিলুম, আমাকে পেয়ে নিজেকে তুমি ধন্য মনে করবে···তাই তোমায় আঘাত দেবো বলে উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছি···সে আঘাত তোমাকে লাগেনি···আমি নিজেই সে-আঘাতের বেদনায় জর্জ্জরিত হয়েছি! এত অবহেলাতেও যখন আমার পানে ফিরে তুমি তাকালে না, তখন বুঝলুম···সুধা তোমার মন জুড়ে বসে আছে।···আমায় ক্ষমা করো···সুধাকে তুমি বিয়ে করো···খোঁড়া বৌ নিয়ে কেউ ঘর করে না···বিশেষ তোমার মত মানী লোক! আমার এ পরিচয়ে হয়তো সমাজে তোমার মাথা হেঁট হবে, লোকে হাসবে···সুধাকে তুমি বিয়ে করো। আমি অসুখী হবো না। সুধা বড় ভালো···আমাকে সে অগ্রাহ্য করবে না···

দীপক কোনো জবাব দিল না···নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এলা বলিল,—সত্যি কথা বলছি, প্রমোদদা আমার দাদা—আমি তার বোন···আমাকে অনেক বকেছে,···তোমার 'কাছে আসিনি বলে'। আমি তাকে বলেছিলুম, একবার যদি আমাকে ডাকে, তাহলে ফিরবো···না ডাকলে যেতে পারবো না। প্রমোদদা আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারে না তো! বিশ্বাস করো, যা বলছি···সব সত্যি। আমায় আর যা করো, যে শাস্তিই দাও, শুধু ভুল বুঝো না···

দীপক এবারও কোনো জবাব দিল না।

এলা বলিল—বিশ্বাস হলো না?

দীপক কহিল—মেয়ে-জাতকে আমি কোনোদিন অবিশ্বাস করি না, এলা···তোমাকেও আমি কোনোদিন এক-মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাস করিনি।···

এলা কহিল—এটুকু আমি জানতুম···তুমি অবিশ্বাস করো না। তা না জানলে আমি সেখানে থাকতে পারতুম না।

* * * *

ভালো সম্বন্ধ আসিয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার যতীশ রায়। মেম বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন।···সে-মেম ঘরে রহিল না। বাঙালীর সঙ্গে জীবন-যাপন···ধিক্! এই কথা বলিয়া আইনের দৌলতে বিবাহের বাঁধন কাটিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন। যতীশ রায়ের এত বেশী রাগ হইল যে মাথা কামাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া খাঁটী বাঙালী হইয়া গৃহস্থালী পাতিবার সঙ্কল্প করিলেন। উমাচরণ রায়কে

খুব ভক্তি করিতেন। তাঁর স্ত্রীকে দেখেন মায়ের মতো ·· তাই তাঁর দেওয়া কন্যা সুধা···তার সম্বন্ধে যতীশ রায়ের মনে এতটুকু দ্বিধা বা আপত্তি নাই! সংসারে এই মেয়েটি ঠিক খাপ্ খাইবে!

দীপক কহিল—তুমি সুখী হবে, সুধা···সত্যি···

সুধা কোনো কথা বলিল না···

গভীর রাত্রে সকলে ঘুমাইলে সুধা আসিয়া ডাকিল,—মা···

মা বলিলেন,—কে? সুধা···

—হ্যাঁ···

—কি মা?

—আমি বিয়ে করবো না। সংসারে আমার এতটুকু রুচি নেই··· দয়া ক'রে আমায় গার্গী দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিন। সে-কাজ আমার বড় ভালো লাগে···সে-কাজ ছাড়া সংসারে আর কোনো কাজে আমার মন লাগবে না, মা···

মা চমকিয়া উঠিলেন—কেন সুধা···?

—সে-কথা আমি আরতিদির কাছে বলেছি···তা নিয়ে আমায় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না···আমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন···

—কিন্তু দীপু এ-কথা শুনলে···

—তাঁকে এখন বলবেন না। আমি গার্গী দেবীর কাছে চলে গেলে তাঁকে বলবেন···

সুধাকে রাখা গেল না।···দীপক তখন কলিকাতায়··· সুধা সকলকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।···

তিলজলায় চিঠি লিখিয়া খপর জানিয়াছিল, গার্গী দেবী এখন গয়ায়। ··

সুধা বলিল—আমাকে ভুলে যাবেন না···যদি কখনো দেখবার বড্ড ইচ্ছা হয়, এসে দেখা ক'রে যাবো। আমাকে তখন আশ্রয় দিয়ো, বৌঠাকরুণ···

এলা কহিল—কাছে এসো, সুধা। চুপিচুপি বলি···

সুধা কাছে আসিল ··

এলা বলিল—যদি কোনোদিন খপর পাও, আমি মরে গেছি, তখন যেখানেই থাকো, এসে এঁর ভার নিয়ো। আমার আসনে বসতে আপত্তি করো না···ঘৃণা করো না··· যত দোষ আমার থাকুক, আমি বড় বোন্। বুঝলে···

সুধার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল···কর্ণমূলে যেন অগ্নির উত্তাপ···

সুধা চলিয়া গেল। মা ডাকিলেন,—আরতি···

আরতির দু'চোখে জল···

মা বলিলেন,—সুধা কেন রইল না রে?

আরতি বলিল—ও দাদাকে ভালোবাসে···যদি সম্ভব হতো, এই ঘরে দাদার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতো। বললে,—সে ভাগ্য যখন সুধা করেনি, তখন আমরা যেন তাকে ধরে না রাখি···ধরে রাখলে বড় ব্যথা সয়ে তাকে দিন কাটাতে হবে···

মা নিশ্বাস ফেলিলেন···নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার মনেও এ-কথা জেগেছে চিরদিন। আমাদের অন্যায় ···আমাদের অপরাধেই এ-বয়সে সুধা হলো সংসার-সুখ-হারা যোগিনী!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শেষ

প্রতিভূ

(তুলসীদাস হইতে)

সত্য বল, লেগে থাক,
ছাড় পরধনের আশ।
এতে যদি না পাও হরি,
জামিন রইল তুলসীদাস।

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীরাধা

শ্রীরাধার জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময়। বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে অনেকেই এ প্রসঙ্গ যথাসম্ভব এড়াইয়া গিয়াছেন। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীরাধিকার উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু কবি তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রদান করিতে ভুল করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম পাওয়া গেলেও একমাত্র 'ললিতমাধব'-রচয়িতা শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী ব্যতিরেকে অন্যান্য কবিগণ আমাদের 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ভাগবত ও ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তাদি পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীরাধা বৃষভানু ও কৃত্তিদার কন্যা। 'ললিতমাধব' নাটকে বর্ণিত আছে, শ্রীমতী রাধিকা বৃষভানু রাজার কন্যা। দেবী ভগবতী ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রসন্না হইয়া শ্রীমতী রাধিকা ও চন্দ্রভানু রাজার কন্যা চন্দ্রাবলীকে তাঁহাদের প্রথমা মাতার গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যরাজমহিষীর গর্ভে স্থাপনা করেন। কন্যা দুইটি ভূমিষ্ঠা হইলে পূতনা রাক্ষসী তাঁহাদের অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, বিন্ধ্য-রাজ-পুরোহিতের রাক্ষস-নাশক মন্ত্রে ভীতা হইয়া সন্ত্রস্ত-হৃদয়ে পলায়ন বশতঃ পূতনা-হস্ত হইতে চন্দ্রাবলী এক নদীগর্ভে পতিতা হন, অপরা শ্রীরাধিকাকে দেবী পৌর্ণমাসী রাক্ষসীক্রোড় হইতে লাভ করেন। দেবী পৌর্ণমাসী ললিতা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা, শ্যামলা নাম্না আরও পাঁচটি কন্যা লাভ করেন। অতঃপর শ্রীরাধা যশোদার ধাত্রী মুখরার হস্তে অর্পিতা হন, বিশাখাকে জটিলা যমুনাস্রোতঃ হইতে প্রাপ্ত হন এবং দেবী চন্দ্রাবলীকে প্রথমতঃ বিদর্ভরাজ ভীষ্মক এবং তৎপরে জাম্ববান্ লাভ করেন। "বৃন্দাবনলীলার গোপাঙ্গনাগণ ও দ্বারকাপুরীর রাজমহিষীগণ দেহতঃ ভিন্ন হইলেও তত্ত্বতঃ অভিন্ন।" শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্রা এই অষ্টসখী অষ্টমহাশক্তির অংশসম্ভূতা। মোটামুটি এইরূপ ভাবে শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী তাঁহার 'ললিতমাধব' গ্রন্থে শ্রীরাধার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। মতান্তরে শ্রীরাধিকার পদ্ম হইতে উৎপত্তি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে—দেবগণের অনুরোধে এবং শ্রীকৃষ্ণের রস-সম্ভোগকারণে অন্তরা লক্ষ্মী শ্রীরাধারূপে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সগর এবং মাতার নাম পদ্মা। দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মী স্বর্গলোক পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করেন এবং তথায় সমুদ্রপতির আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। পরে সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী উত্থিতা হন। এই কারণেই বোধ হয় কবি শ্রীরাধিকাকে সাগরের কন্যারূপে কল্পনা করিয়াছেন। লক্ষ্মী পদ্মালয়া বলিয়া বোধ হয় পদ্মার সৃষ্টি হইয়াছে। মতান্তরে শ্রীরাধিকা বিন্ধ্যমহিষীর কন্যা, বিদর্ভরাজ কর্তৃক পালিতা এবং বৃন্দাবনে বৃষভানুগৃহে প্রতিপালিতা। এই মতের নানারূপ বিরোধিতা থাকিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধা বৃষভানুদুহিতা বলিয়া পরিচিতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাকে মহাভাবের প্রতিমারূপে অঙ্কিতা করিয়াছেন।

"মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।"—উজ্জ্বলনীলমণি। তিনি মহাভাবস্বরূপা, গুণশালিনী এবং শ্রেষ্ঠা। প্রায় সকল বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীরাধাকে আমরা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী দেখিতে পাই। শ্রীরূপ গোস্বামী ও অপরাপর বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। রূপ-গোস্বামীর কড়চায় আছে :—

"রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।"

"শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রেমের বিলাসরূপা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী নাম্নী শক্তি; অতএব শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ ভিন্ন না হইলেও তাঁহারা যে অনাদিকাল হইতে নিজধামে ভিন্ন দেহে বিরাজ করিতেছেন, তাহা স্থির।" এখন 'হ্লাদিনী শক্তি' কথাটির অর্থ কি। ভগবান্‌কে আনন্দের স্বরূপরূপে কল্পনা করিতে গেলে, যে শক্তির ক্রিয়াগুণে স্বয়ং ভগবান্ আনন্দ আস্বাদন করেন এবং অপরকে সেই আনন্দরসের দ্বারা অনুষিক্ত করেন, সেই শক্তির নাম 'হ্লাদিনী শক্তি'। 'হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা

হ্লাদিনী।" হ্লাদকরূপী বা আনন্দরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত এবং ভক্তগণকে সুখী করিবার নিমিত্ত হ্লাদিনীর সৃষ্টি। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে ঃ—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥"

চৈ, চ,—আদি—৪র্থ পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে ঃ—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।"

এই হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে সর্ব্বভূতাত্মময় ও সর্ব্বানন্দরূপী শ্রীহরি স্বয়ং সুখ আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে সুখের আস্বাদ দান করিতেছেন ও তাঁহাদিগকে পালন করিতেছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমমাধুর্য্য অর্থাৎ ব্রজের নিগূঢ় রসবর্ণনাই বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই মাধুর্য্য-রস বৈষ্ণব-কবি ও ভক্তগণ ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দোদ্বেলচিত্তে আস্বাদন করেন।

চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীরাধাচরিত্র কি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমাদের বর্ণনার বিষয়ীভূত হইবে।

গীতগোবিন্দ—প্রথমতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কবিবর জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্য অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধাচরিত্র কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাক্।

কবিবর জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্বকে পরমতত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহার মতে শ্রীরাধিকা "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী এবং ভগবানের প্রেয়সীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।" শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাবিলাস ভগবানের স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণ মহারাস সম্পন্ন করিয়া শ্রীরাধা-অনুরাগ অপরা প্রেয়সীবর্গের অনুরাগের সহিত তুলনা করিবার নিমিত্ত অথবা শ্রীরাধানুরাগের উৎকর্ষতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অপরূপ লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্যে ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরা, দ্বারাবতী প্রভৃতি রাজ্যে গমন করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ অসুরাদিনিধন, রাজকন্যাদি বিবাহ-পর্ব্ব সমাধা করিয়া আগমন করতঃ যে লীলা-বিলাস তিনি ব্রজপুরীতে সম্পন্ন করেন, কবি তাহা নানা রঙে রঙীন করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে উভয়কে দর্শন না করিলে তাঁহাদের রূপের পরমোৎকর্ষতালাভ ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিলাসব্যসনে মত্ত, সেদিকে শ্রীরাধার ভ্রূক্ষেপ নাই। শুধু তাঁহার চিন্তা কবে প্রিয়তম আসিবে এবং কি ভাবে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। ঋতুরাজ বসন্ত তাঁহার সহচর সর্ব্ব-সন্তাপহারী সমীরণ, নবপুষ্প-পল্লবোদ্গত লতিকা, মধুর গুঞ্জনকারী মধুপ প্রভৃতি সহ আগমন করিয়া শ্রীরাধার বিরহজ্বালা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে। এতদিন পরে যদি বা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রীরাধাভিলাষ জন্মিল, কিন্তু ভাগ্য এমনি প্রতিকূল যে, এ সময়ে শ্রীরাধা অভিমানভরে প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এমতাবস্থায় ক্ষোভ, অনুতাপই সম্বল হইল। শ্রীরাধাবিরহে আকুল ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষণ্ণহৃদয়ে যমুনাতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমনই সময়ে শ্রীরাধার প্রিয়সখী আগমন করিয়া তাঁহার অবস্থা বর্ণনা করিলেন। শ্রীরাধার অনুরাগের পরিচয় পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রীরাধামিলনের অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিয়া কি উপায়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে শ্রীরাধার প্রিয়সখী সকাশে স্বাভিলাষ জ্ঞাপন করিলে প্রিয়সখী শ্রীরাধা সকাশে গমন করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের কামনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। প্রিয়তমের ঈদৃশী অবস্থা শ্রবণানন্তর শ্রীরাধার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। অনুরাগ প্রবল সত্ত্বেও প্রিয়মিলনে প্রতিকূলাচরণ করিল তাঁহার ক্ষীণ অক্ষম দেহযষ্টি। এ অবস্থায় শ্রীরাধা বাসকসজ্জিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সখীমুখে শ্রীরাধার ঈদৃশী অবস্থার কথা জ্ঞাত হইলেন, প্রিয়ের দেখা নাই।

"কিশলয় শেজ করি কেন জাগি রাতি।
মদন তুরুজন তবে সঙ্গে হইল ভাতি॥"

শ্রীরাধা এইরূপ উৎকণ্ঠিতার ন্যায় প্রিয়-অপেক্ষায় উপবিষ্টা রহিয়াছেন, নানারূপ অমঙ্গলচিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেছেন, তথাপি মাধবের দেখা নাই। শ্রীকৃষ্ণের এই-রূপ অবজ্ঞায় শ্রীরাধা-হৃদয়ে মরণের অভিলাষ জাগরিত হইতে লাগিল। শ্রীরাধার এরূপ অবস্থার নাম বিপ্রলব্ধা। প্রিয় সঙ্কেত করিয়াছেন আসিবেন, এখনও আসিতেছেন না বলিয়া চিত্ত ব্যথিত হইতেছে।

"প্রভাত হইল পিয়া না আইলা ভবনে।
ছেদে রে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে॥"

এইরূপে সারানিশি যাপন করিয়া প্রিয় প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা তখন খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরাধার তখন—

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ॥"

অথবা—

"ভাল হইল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥"

এইরূপ বলিবার মত অবস্থা। প্রিয় মৃদুভাবে ভর্ৎসিত হইলেন। প্রিয়ের শত অনুনয় সত্ত্বেও প্রিয়তমার হৃদয় হইতে কিছুতেই মান অপগত হইল না। শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া চলিয়া গেলেন। প্রিয়সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইবার জন্য শ্রীরাধাকে অনুযোগ দিলেন। এইরূপ মানের পালাতেই দিনমান গত হইল। প্রদোষে শ্রীরাধার ক্রুদ্ধভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আসিয়া নানাভাবে শ্রীরাধার মানভঙ্গের নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন :—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥

* * * *

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগম্॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥"

এতক্ষণে শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন। সন্ধ্যাগমে মিলিতা হইবেন, এইরূপ আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মিলনকুঞ্জে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে প্রকৃতিদেবী নীরবে সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। শ্রীরাধা অভি-সারিকার উপযোগী বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া কুঞ্জদ্বারে গমন করিলেন। নটবরশেখর দর্শনে তিনি লজ্জায় অপরাজিতার ন্যায় বিনম্রা হইয়া পড়িতেছেন এবং ভাবো-দ্বেলচিত্তে পুনঃ পুনঃ দর্শনে শ্রীরাধাহৃদয়ে স্বেদ, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চাদি নানারূপ ভাবের সৃষ্টি হইতেছে। সখীগণ অন্তরালবর্তিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন। নানাপ্রকার অনুনয়বিনয়াদির পরে শ্রীরাধা প্রীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন দান করিলেন।

এইরূপভাবে 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্য রচিত হইয়াছে। প্রথমেই শ্রীরাধা আমাদিগকে দর্শন দিলেন শ্রীকৃষ্ণবিরহে উৎকণ্ঠিতাবস্থায়। কবি রসশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমান্বয়ে শ্রীরাধার প্রোষিতভর্তৃকা, বাসকসজ্জিকা, কলহান্তরিতা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা ও অভিসারিকা অবস্থা বর্ণনা করিয়া দীর্ঘবিরহের পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইলেন। এই যে শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের বহুদিন প্রবাসের পরে মিলন, বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে ইহাকে সমৃদ্ধিমান ভোগ বলে।

চণ্ডিদাসের পদাবলী :—

মহাকবি চণ্ডীদাস খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষপাদে সম্ভবতঃ আবির্ভূত হন। তাঁহার রচিত পদাবলীর বিশেষত্ব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমবর্ণনা। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রথমে'ই শ্রীরাধিকা আমাদিগকে উন্মাদিনীবেশে দেখা দিলেন। ভীতা, চকিতা, সন্ত্রস্তা শ্রীরাধিকাকেই আমরা দেখিলাম। এই উন্মাদিনী চকিতাহরিণী শ্রীরাধাকে আমরা তার পরেই দেখিলাম—প্রেমবিহ্বলা মোহিনীমূর্ত্তিতে। এ প্রেমে চপলতা,

চাঞ্চল্য নাই—এ প্রেম ধীর, স্থির, শান্ত। মান-বিরহ, দুঃখ-দৈন্য, অবজ্ঞা-উপেক্ষার কষ্টিপাথরে এ প্রেমের গভীরতার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহা আজও তেমনই অটুট, তেমনই অচল, তেমনই অনড়। শত কষ্ট, শত বাধা বিপত্তি-উপেক্ষার সংঘাতের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার মত উপকরণ জোগাইয়াছে 'চাঁদমুখের মধুর হাসি'। প্রিয়ের প্রসঙ্গেই অশ্রুর বন্যা বহিয়া যায়। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে যথা তথা গমন করিতেও সাহস হয় না।

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
দাঁড়াই যদি সখিগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয় তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥"

প্রিয়কে নিকটে না পাইয়াও তাঁহার স্মরণেই এই যে সুখানুভব, ইহাও যদি স্থায়ী হইত, তাহা হইলে বোধ হয় এই সুখ অপূর্ব্ব হইয়া উঠিত না। দুঃখ আছে বলিয়া সুখের এত আদর। "Sorrows crown of Sorrows are remembering happier things"। এই সুখের বস্তু পরিপূর্ণ রূপে ভোগ না করিয়াই এ সুখে ভাঙ্গানি দিবার ভয়ে শ্রীরাধা আকুলা হইয়া পড়িতেছেন—

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥"

ইহার পরে প্রিয় যখন আসিলেন না, তখন অভিমান আসিয়া দেখা দেয়। কিন্তু যে মন-প্রাণ উজাড় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছে, যাহার ইন্দ্রিয়সকল নিজের মতানুবর্ত্তী নহে, সে মান করিয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে?

"যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে॥"

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সকলেই যেন একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। অবশেষে শ্রীরাধিকা হাল ছাড়িয়া দিলেন।

"ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অণুভব॥"

চণ্ডীদাস শ্রীরাধিকাকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করিয়াছেন। "নীলনিচোলপরিহিতা রাধিকা মূর্ত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুলভ", কিন্তু 'বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমতি যোগিনীপারা'—এই রক্তবর্ণ বসনপরিহিতা যোগিনীমূর্ত্তি বৈষ্ণব-সাহিত্যে একমাত্র চণ্ডীদাসই দেখাইলেন। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ-মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কুলশীল জাতি-মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন-পূজন॥
পিরীতি-রসেতে, ঢালি তনু-মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপপুণ্য মম, তোমার চরণখানি॥"

শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণচরণে লীন হইয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের এই অভিন্নতা আমাদিগকে সেই শ্রীরূপ গোস্বামীর "অস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।" কথাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীরাধার এই আত্মোৎসর্গ তাঁহাকে যেন সর্ব্বচিন্তা হইতে মুক্তি দিয়াছে। গীতায় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রবোধ দিয়া বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥"

এখানে শ্রীরাধিকাকেও কি সেইরূপ পাপপুণ্যের হাত হইতে অব্যাহতি দিবেন?

চণ্ডীদাসের রচনা সর্ব্বত্র সহজ, সরল ও অনবদ্য। বিদ্যাপতি ঈষদুদ্গতযৌবনা শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য পূর্ব্বরাগে বর্ণনা করিয়াছেন নানা বিচিত্র সাজ-সজ্জায়, কিন্তু চণ্ডীদাস পূর্ব্বরাগের পরে শ্রীরাধিকার যে মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য্য। এই জন্যই বোধ হয়, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিদ্যাপতির ন্যায় উপমাবহুল রচনা চণ্ডীদাসের নহে। চণ্ডীদাসের প্রেমগীতিতে

নায়িকা রাধিকা অপেক্ষা রাধাভাবেরই উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থে শ্রীরাধিকাকে প্রথমে কৃষ্ণপ্রেমে বীতশ্রদ্ধ পরে শ্যামবিরহে উন্মাদিনীরূপে আমাদের দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ প্রথমে শ্রীরাধিকাকে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের প্রস্তাব তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, পরে তিনি নায়কের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া কলহান্তরিতা অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। চণ্ডীদাস শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনের সহায়করূপে বড়াই'র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বড়াই'র সাহায্যে শ্রীরাধার উন্মাদনা প্রশমিত হয় এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হন। বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব ও অপরাপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা যেরূপ পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী, কুন্দলতা প্রভৃতির সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া বড়াই'র সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বড়াই চণ্ডীদাসের অভিনব সৃষ্টি। কংসাদি অসুরগণের নিপাতসাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছেন। এই বৃন্দাবনে অবস্থানকালীন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত যে লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণনীয় বিষয়।

রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্রীরাধার কপালে গোপবালাদের ন্যায় দধিদুগ্ধ বিক্রয়ের ব্যতিক্রম ঘটিল না। শ্রীরাধার তত্ত্বাবধায়িকা বড়াই'র মুখে শ্রীরাধার রূপবর্ণনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে শ্রীরাধাভিলাষ জন্মে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাপ্রাপ্তি নিমিত্ত বড়াই'কে দূতীরূপে তাম্বুলসহ শ্রীরাধিকা সকাশে প্রেরণ করেন। শ্রীরাধা তাম্বুলগ্রহণ দূরে থাক্ বড়াইকে লাঞ্ছিত করিয়া বিতাড়িত করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের প্রথম কয়েক খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের অভিব্যক্তির কোন নিদর্শনই আমরা পাই না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার ভাগিনেয়-মাতুলানী সম্পর্কই বোধ হয় এইরূপ প্রেমবিমুখতার কারণ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুযায়ী দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইবার কালে পথে দানলীলা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমে কবি ভার, যমুনা, নৌকা, বৃন্দাবন, কালীয়দমন, বাণ প্রভৃতি খণ্ড বর্ণনা করিয়া বংশী ও বিরহখণ্ডের অবতারণা করিয়া গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। বংশীখণ্ডে শ্রীরাধা সুপ্ত শ্রীকৃষ্ণের শিয়র হইতে বংশী হরণ করিয়া তাঁহাকে নাকাল করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশীর জন্য কাতর হইয়া সানুনয়ে শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

"আল হে রাধা।
বারেক রাখহ সমানে ল॥
* * *
মুণ তো আইহনের গোআলী।
আকুল না কর বনমালী॥
বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে।
হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে॥"

কিন্তু কাহার কথা কে শোনে? শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে আরও দশ কথা শুনাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন। বিরহখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, শ্রীরাধা বিরহ-ব্যাকুলিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আনয়নের নিমিত্ত বড়াইকে মথুরা-পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"নেহ আমুল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আনি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মোর প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে॥"

অবশেষে বড়াই শ্রীরাধার কাতর-প্রার্থনায় দুঃখিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিতে স্বীকৃতা হইলেন এবং নানারূপ বাধাবিপত্তি অবহেলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করতঃ শ্রীরাধার বিরহসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিলেন। শ্রীরাধিকা ক্লান্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। পরে শ্রীরাধিকার সুপ্তা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ অন্তর্হিত হইলেন। জাগরিতা হইয়া শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিলেন। কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া নিতান্ত বিমর্ষা হইয়া পড়িলেন। পুনঃ বড়াইকে শ্রীকৃষ্ণ-আনয়ন নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। এই অবস্থায় শ্রীরাধাকে মহাভাবের স্বরূপিণী বলিয়াই বোধ হয়। গ্রন্থখানি ইহার পরে খণ্ডিত। সুতরাং পরবর্ত্তী ঘটনা জ্ঞাত হইবার আর আমাদের কোন সুযোগই রহিল না।

অপরাপর বৈষ্ণবগ্রন্থের ন্যায় শ্রীরাধা এখানেও (গ্রন্থের

মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ) প্রেমোন্মাদিনীরূপে বর্ণিতা। গ্রন্থের প্রথম ভাগে শ্রীরাধাপ্রেমের কোন নিদর্শন না পাইলেও পরবর্ত্তী ভাগে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী ভাগের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়ই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ও মিলন। সুতরাং এই ভাগে যে প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যাইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? চণ্ডীদাসের রচনাচাতুর্য্য, বর্ণনা-মাধুর্য্য বাস্তবিকই সুন্দর। উদাহরণস্বরূপ শ্রীরাধিকার রূপ-বর্ণনার স্থল আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দুর।
প্রভাত সমএ যেন উয়ি গেল সুর॥
ললাটে তিলক যেন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা॥
নাসা তিলফুল তোর আতী অনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈষত কটাক্ষে মোহে মুণি মনে॥
বিম্বফল জিনী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিনিআঁ তোর দশন উজলা॥
কণ্ঠ কম্বু সম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা॥
কনক-চম্পক সম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা॥"

অন্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী বিভিন্না হইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তাঁহারা অভিন্না।

বিদ্যাপতির পদাবলী ঃ—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক পদকর্ত্তা। বিদ্যাপতি শ্রীরাধার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভাবে, ভাষায়, সৌন্দর্য্যে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের ন্যায় ভাবগম্ভীরতা তাঁহার সৃষ্টিতে নাই। চণ্ডীদাসের ন্যায় সহজ, সরল, অনাড়ম্বর তাঁহার ভাষা নহে, চণ্ডীদাসের ন্যায় সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত করিবার মত রচনাচাতুর্য্য তাঁহার নাই। তথাপি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা নিখুঁত এবং পরিষ্কার। চণ্ডীদাসের সহিত সমপর্য্যায়ে স্থান পাইবার মত উপযুক্ত না হইলেও তাহা অন্যান্য বিশিষ্ট কবিদিগের রচনা হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

বিদ্যাপতি-বর্ণিত শ্রীরাধিকা :—

"ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥"
"হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥"
"কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥"
"মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।
সখিরে পুছই কৈছে···বিহার॥"
"শুনিতে রসের কথা যাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥"

অপরস্থলে :—

"একলি আছিনু ঘরে হীন পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এদিকে ঝাপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
* * *
ধিক যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥"

বিরহের চিত্রাঙ্কণে বিদ্যাপতি যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বিরহ ও তদনন্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিগণের অগ্রগণ্য। এই বিরহাবস্থা বর্ণনে বিদ্যাপতি দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি অত্যধিক মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু যখন এ অনুরোধ উপরোধ পায়ে ঠেলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, তখন শ্রীরাধা বলিতেছেন :—

"হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥

কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝুপাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥"

সখীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিতেছেন, তখন বিরহ-কাতরা শ্রীরাধা বলিতেছেন:—

"হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে॥"
"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে॥"

বিরহের এই যে বর্ণনা, ইহা যদিও আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তবু এ বর্ণনা চির সরস, চির সৌন্দর্য্যময়। এই বিরহের পরিসমাপ্তি মিলনে। বিদ্যাপতি এ বিষয়ে অপরাপর বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহাই অনেকের অভিমত। যে চন্দ্রকিরণ অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল, যে কোকিলের স্বর এতক্ষণ শ্রীরাধা-কর্ণে বিষের সঞ্চার করিতেছিল, আজ প্রিয় আসিবেন বলিয়া আনন্দ-মুগ্ধা শ্রীরাধা বলিতেছেন:—

"সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥"

যখন প্রিয় আগত, তখন আনন্দোৎফুল্লা শ্রীরাধা বলিতেছেন:—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

শ্রীরাধা যেন আজ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দর্শন হইতে অতি সুন্দর দেখিতেছেন। শ্রীরাধার তৃষ্ণার্ত্ত নয়ন যেন জন্ম জন্ম এ রূপ দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতেছে না:—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তব হিয়া জুড়ন না গেলি॥"

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বি, এ)।

আত্ম-নিবেদন

দীপ লাগি পতঙ্গের যে মূক বাসনা
দিবার লাগিয়া যেই কামনা নিশার—
আলোকের স্বপ্নমূর্ত্তি করিয়া কল্পনা
যেই আত্ম-নিবেদন করে অন্ধকার,
সেই অর্ঘ্য দিয়ে আজি সাজায়েছি বেদী,
তুমি কি বসিবে তাহে অন্তরাল ভেদি?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

স্বস্তি

[গল্প]

১

পাহাড়ের গা হইতে অতি স্নিগ্ধ শীতল মিষ্ট জলের একটি ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে, নাম শিবঝরা। সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া মালবের একটি রাজপথ অনেক দূর হইতে আসিয়া আরও অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। অনেক পথিক এই পথে যাতায়াত করিত,—ঝরণার কল্লোল-আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই কাছে আসিয়া জলপানে তৃপ্ত হইত, বসিয়া শীকরকণাস্পৃষ্ট স্নিগ্ধ শীতল বায়ুর বীজনে শ্রান্তি দূর করিত। নিকটেই একটি কৃষক-পল্লী। কন্যা ও বধূরা যখন-তখন আসিয়া এই ঝরণার জল লইয়া যাইত

গ্রীষ্মকাল, বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে—প্রখর সূর্য্যকিরণে চারিদিকে যেন ধ্বক্ ধ্বক্ আগুন জ্বলিতেছে।

কুন্তলা জল লইতে আসিয়াছিল। ভরা কলসীটি কক্ষে তুলিয়া লইল; সহসা অতি তীব্র খট্ খট্ শব্দে চমকিয়া সে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল,—তীরবেগে একটি অশ্বারোহী ছুটিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিয়াই সে অশ্ববেগ সংযত করিল, নামিয়া ধীরে ধীরে ক্লান্তচরণে কন্যাটির কাছে আসিতেই কুন্তলাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

কুন্তলা কহিল, "কে তুমি? এই রোদে ছুটে এসেছ—বড় তেষ্টা পেয়েছে বুঝি? জল খাবে?"

"হাঁ, তোমার কলসী থেকে একটু জল দেবে?"

"এস, ব'স এই পাথরটার ওপরে।"

অশ্বারোহী বসিয়া হাত পাতিল, কুন্তলা কলসী হইতে জল ঢালিয়া তাহার হাতে দিতে লাগিল। ঢক্ ঢক্ করিয়া একটানে প্রায় আধ-কলসী জল অশ্বারোহী খাইয়া ফেলিল। খাইতে খাইতে এক একবার কুন্তলার মুখের দিকেও চাহিতেছিল—যেমন হাতের জল, তেমন মুখখানিও বোধ হয় বড় মিঠা লাগিতেছিল। কুন্তলার হাসি পাইল। কহিল, "জল খাচ্ছ খাও। চেয়ে চেয়ে আবার দেখ্‌ছ কি? বিষম খাবে যে!"

বলিতে বলিতে অশ্বারোহী সত্যই বিষম খাইল, খাইয়া বড় অস্থির হইয়া পড়িল। উষ্ণীষটি খুলিয়া ফেলিয়া চোখে মুখে কুন্তলা জল ছিটাইয়া দিল, আঁচলে বাতাস করিতে লাগিল। বিষম খাওয়া একটু কমিল বটে,—কিন্তু সহসা অশ্বারোহী বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল। প্রখর রৌদ্রে বহু দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে, দেহ যার-পর-নাই ক্লান্ত ও উত্তপ্ত। এরূপ অবস্থায় সহসা এতখানি শীতল জল পান করিয়াছে, পান করিতে করিতে আবার বিষম খাইয়াছে, ইহার ফলেই এই দৈহিক অবসাদ তাহার উপস্থিত হইল—প্রস্তরখণ্ড হইতে মূর্চ্ছাপন্ন রোগীর ন্যায় সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

কুন্তলা বড় ভয় পাইল। সে শুনিয়াছিল, এরূপ অবস্থায় রোগীর হঠাৎ মৃত্যুও হইতে পারে। দুইটি বিদেশী লোক তখন পথ দিয়া যাইতেছিল; কুন্তলা তাহাদের ডাকিল, তাহাদের সাহায্যে পথিককে কুটীরে লইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিল, ঘোড়াটি পথে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

কিছুক্ষণ সযত্ন শুশ্রূষার পর পথিকের চেতনা হইল, চক্ষু মেলিয়া এদিক্ ওদিক্ একটু চাহিল, তারপরে উঠিবার চেষ্টা করিল।

বাধা দিয়া কুন্তলা কহিল, "উঠো না, বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ,—উঠ্‌লেই আবার মূর্চ্ছা যাবে।"

কুন্তলার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পথিক কহিল, "আমি বুঝি—ঝরণার কাছে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছিলাম?"

"হাঁ।"

"তুমি এখানে আমাকে নিয়ে এসেছ? এ বুঝি তোমাদের ঘর?"

"হাঁ। কথা বলো না, একটু দুধ এনে দিই, খাও।"

কুন্তলা দুধ লইয়া আসিল, খাইয়া পথিক যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ঘোড়া?"

"ঘোড়া ম'রে গেছে।"

"ম'রে গেছে? একেবারে মরেই গেছে!"

"হাঁ, তাইত দেখে এলাম। এই রৌদে কতদূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছ—মরবে সে আর আশ্চর্য্য কি? আমি ওখানে না থাক্‌লে তুমিও বোধ হয় ম'রে যেতে। কি ক'রব? তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, ঘোড়ার দিকে চাইতেও পারিনি—"

"তোমার দোষ কি? আমিই বড় দুর্ভাগা।"

"তা ঘোড়া গেছে, আবার ঘোড়া কিন্‌বে। ঘোড়া কি কারও চিরকাল থাকে?"

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া পথিক কহিল, "কিছুই চিরকাল থাকে না। কিন্তু যা যায় তা আর কেউ পায় না। ঘোড়া আবার কিন্‌ব। কিন্তু অমন ঘোড়া আর পাব না।"

হাত দু'খানি তুলিয়া পথিক অশ্রু মার্জ্জনা করিল। কুন্তলা কহিল, "ঘোড়াটা যদি এতই প্রিয় ছিল, একটানে এত পথ তবে এই রোদে কেন এত জোরে ছুটিয়ে এনেছিলে? কোথাও একটু বিশ্রাম ক'রতে পারনি? ঘোড়া গেল, নিজেও ত প্রায় গিয়েছিলে।"

পথিক উত্তর করিল, "তুমি ছিলে তাই বেঁচেছি। নইলে আমিও ঐখানে মরতাম। আমি বাঁচলাম, কিন্তু আমার ঘোড়া ম'রে গেল!"

"তা তুমি ম'রে ঘোড়াটা বাঁচলে কি সুসার কিছু বেশী হ'ত?"

পথিক আর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল, "আমি ম'লে আমার ঘোড়া বাঁচত না। কিন্তু ঘোড়া ম'রেছে শুনে আমি এখনও বেঁচে আছি।"

একটু হাসিয়া কুন্তলা কহিল, "আছ সে ভালই হ'য়েছে। ঘোড়ার সঙ্গে সহমরণে গেলে কি এমন লাভ হ'ত?"

পথিক কহিল, "থাক্, ও সব ভেবে আর ফল কিছু নেই। তা—আর একটা ঘোড়া আমাকে যোগাড় ক'রে দিতে পার? আমি এখানে কাউকে চিনি না।"

"আমি কোথায় পাব? বাবা আসুন, তিনি যোগাড় ক'রে দেবেন।"

"তোমার বাবা—হাঁ, কোথায় আছেন তিনি?"

"ক্ষেতে।"

"ক্ষেতে!—ক্ষেত কদ্দূর?"

"দু'তিনখানা ক্ষেত আছে, এখন যে ক্ষেতে গেছেন, সেটা দূরে—নদীর ওপারে।"

পথিক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। মুখে বড় একটা উদ্বেগের ভাবও দেখা দিল।

কুন্তলা কহিল, "কি হ'য়েছে? অত ব্যস্ত কেন হ'চ্ছ? সন্ধ্যেবেলায় তিনি আস্‌বেন। কালই একটা ঘোড়া তোমাকে যোগাড় ক'রে দেবেন।"

পথিক ধীরে ধীরে কহিল, "ঘোড়া একটা যদি পেতাম, এখুনি চ'লে যেতাম।"

"এখুনি যেতে! বল কি! কি ক'রে যেতে? তুমি কি এখন ঘোড়ায় উঠ্‌তে পার, না ঘোড়া ছুটিয়ে কোথাও যেতে পার?"

পথিক কহিল, "যেতেই হবে। বড় প্রয়োজন আছে। নইলে রোদে এত পথ এম্‌নি ছুটে এসে অমন ঘোড়াটি মেরে ফেলি?"

"প্রয়োজন যাই থাক, যদি যাও, নিজেই ম'রবে! কার প্রয়োজনে যাচ্ছ? প্রভুর না নিজের?"

"নিজের।"

"পথে প'ড়ে ম'লে কোন্ প্রয়োজনটা নিজের সিদ্ধ হবে?"

"ম'রব না, গেলে ম'রব না,—থাকলেই—"

"থাক্‌লেই বা ম'রবে কিসে? আমরা কি দস্যু যে তোমাকে মেরে ফেলে তোমার পুঁজিপাতি সব কেড়ে নেব?"

"না, তোমরা দস্যু নও, মেরেও আমাকে ফেল্‌বে না। তবে—যাক্, আমি যাব, যেতেই আমাকে হবে। তুমি

"স্বপনে হেরেছি মূরতি তোমার
স্বপনে কি যাবে টুটিয়া ?"

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

বেশ চতুর মেয়ে, একটি ঘোড়া আমাকে এনে দিতে পার না ?"

কুন্তলা উত্তর করিল, "পারলেও দেব না। কারণ, তা দিলেই তোমাকে মেরে ফেলা হবে।"

পথিক কহিল, "এখানে আট্‌কে রাখলেই মেরে ফেল্‌বে। যেতে দিলে হয় ত বাঁচব।"

তীব্রদৃষ্টিতে পথিকের মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কুন্তলা কহিল, "হুঁ—বুঝেছি। তা পথে পড়ে কেন ম'র্‌বে, এইখেনেই থাক, ভয় নেই।"

পথিক কেমন যেন একটু শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া চাহিল।

একটু হাসিয়া কুন্তলা কহিল, "কেমন, ঠিক ধরেছি না ? তুমিই ত সেই রাজদ্রোহী দস্যু পুরন্দর ?"

পথিকের মুখেও তখন একটু হাসি ফুটিল; কহিল, "হাঁ, আমিই সেই রাজদ্রোহী দস্যু পুরন্দর। কিন্তু কি ক'রে বুঝলে ? ওহো—মূর্চ্ছার সময় প্রলাপে এমন কিছু বোধ হয় ব'লেছি—"

"না, মূর্চ্ছায় তোমার আলাপের অপলাপই হ'য়েছিল, প্রলাপ কিছু বলনি !"

"তবে ?"

কুন্তলা কহিল, "পুরন্দর ছাড়া কে এই রোদে আজ এমনি ক'রে ছুটে আস্‌তে পারে ? পুরন্দর ছাড়া এ অবস্থায় কে আজ এখুনি আবার ঘোড়ায় চ'ড়ে পালাতে চায় ? এতটুকু বুদ্ধি যার আছে, সেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, তুমিই পুরন্দর।"

পুরন্দর কহিল, "হাঁ, ঠিক ব'লেছ, পুরন্দরের নাম সবাই এই মালবে জানে। আজ যে পুরন্দর মালবের আশ্রয়চ্যুত, রাজদণ্ড যে নিয়ত তার পশ্চাতে ফির্‌ছে, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে বন হ'তে বনান্তরে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, একথাও সকলে জানে।"

কুন্তলা কহিল, "দু'দিন আগে রাজঘোষরা এসেও জানিয়ে গেছে, পুরন্দরকে জীবিত কি মৃত যে ধরে দিতে পারবে, দশ হাজার মুদ্রা সে পুরস্কার পাবে। আর তাকে যে আশ্রয় দেবে, তার ধন-প্রাণ রাজার দণ্ডাধীন হবে।"

"তবে কোন্ ভরসায় আবার আশ্রয় দিয়ে আমাকে রাখ্‌তে চাইছ ?"

কুন্তলা কহিল, "প্রাণ আমাদের নিতান্ত অসার, ধনও এমন কিছু নাই। ভয়ই বা পাব কেন ?"

পুরন্দর উত্তর করিল, "ধন তেমন কিছু না থাক, প্রাণ কারও কারও কাছে অসার নয়। যাই হ'ক্, আমার প্রাণের চাইতে তোমাদের প্রাণ অসার, আমি অন্ততঃ এটা মনে করি না। কেন তবে তার জন্য তোমাদের প্রাণ বিপন্ন ক'রব ? আমাকে বিদায় দাও, আমি যাই, নিজেই বরং একটা ঘোড়া দেখে নেব।"

"চুপ ! দূরে ঐ একটা গোলমাল কি শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় এক দল রাজসেনাই আস্‌ছে !"

"এখন উপায় !"

"ভয় নাই। ঘরের পাশে ঐ চালার নীচে একটা মাচার উপরে খড় আছে, তার ভিতর গিয়ে লুকোতে পারবে ?"

"কেন পারব না ! পারতেই যে হবে।"

দ্রুত উঠিয়া পুরন্দর নির্দ্দিষ্ট মাচার উপরে খড়ের ভিতরে গিয়া লুকাইল। কুন্তলা ক্ষিপ্রহস্তে স্থানচ্যুত খড়ের আঁটিগুলি আবার গুছাইয়া রাখিল। ছুটিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া শয্যা ও জলপাত্রাদি সব যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল। তার পর একটি চরকা লইয়া দরজার বাহিরে সূতা কাটিতে বসিল।

২

কিছুক্ষণ পরেই ছোট একদল রাজসেনা গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহাদের গ্রাম্যকুটীরে এতগুলি সৈনিক আসিয়া উপস্থিত, কুন্তলা যেন অতি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

"কে তুমি ভদ্রমুখী ? এ গৃহ কার ?"

সেনানায়ক এই প্রশ্ন করিল। কুন্তলা তখন হাতের চরকা রাখিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া নামিল। নায়ককে এবং অন্যান্য সৈনিকদিগকে সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "আসুন ! হঠাৎ আপনাদের দেখে আমি কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তা আসুন, আমার পিতা গৃহে নাই। ঐ গাছের ছায়ায় বসুন, বিশ্রাম করুন। ঠাণ্ডাজল এনে দিচ্ছি, মুখ হাত ধুয়ে তাই পান করুন। আহা, আপনারা বোধ হয় এই রোদে অনেক দূর থেকে আসছেন ?"

"তুমি কে ? বাড়ীতে আর কে আছে ?"

"আমি কুন্তলা, বাড়ীতে এখন কেউ আর নেই। আমার পিতা অনেক দূরে ক্ষেতে কায করতে গেছেন। সন্ধ্যেবেলায় ফিরবেন। তা আপনারা বসুন না? ঐ গাছ-তলায় ব'সে একটু বিশ্রাম করুন। আপনাদের ঘোড়া-গুলিও বড় হাঁপাচ্ছে। আহা, আজ এই দুপুরবেলায় একটি লোক এমন ঘোড়া ছুটিয়ে কোত্থেকে এল, ঐ শিবঝরার কাছে থেমে যেমন জল খেতে গেল, ঘোড়াটা অম্‌নি মাটীতে প'ড়ে মরে গেল!"

"বটে! তুমি সে লোকটিকে দেখেছ?"

"হাঁ,—আমি তখন শিবঝরায় জল আন্‌তে গিয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর রোদ—ঘোড়াটা বড় হয়রান হ'য়ে প'ড়েছিল, ছুটে আসছিল যেন ঝড়ের মত। যেমন থামিয়ে লোকটি নামল, অমনি ঘোড়াটা প'ড়ে গেল—"

"সেই লোকটি এখন কোথায় আছে?"

"চ'লে গেছে।"

"চ'লে গেছে! কি ক'রে গেল? ঘোড়া কোথায় পেল? তবে কি পায়ে হেঁটে গেছে?" বলিতে বলিতে নায়কের মুখখানি যেন আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পায়ে হাঁটিয়া কতদূর যাইবে? অবশ্যই ধরা পড়িবে।

কুন্তলা উত্তর করিল, "না, পায়ে হেঁটে যায়নি। তখনই আর কে একটি বিদেশী লোক ঘোড়ায় চ'ড়ে আস্‌ছিল, ঐ লোকটি তাকে নামিয়ে দিয়ে ঘোড়াটা কেড়ে নিল।"

"বটে! লোকটা কিছু ব'ল্লে না? ঘোড়া অম্‌নি ছেড়ে দিল!"

"কাড়াকাড়ি কতক্ষণ ক'রেছিল, কিন্তু রাখ্‌তে পারল না। গায়ের বলে আর তেজে—এ লোকটি তার কাছে কিছু নয়। বাবা! সে কি যোয়ান! এমন আর দুটি দেখি নি। তা ঘোড়াটা নিয়ে একটা থলে তার সাম্‌নে ফেলে দিল, দিয়ে বল্লে, এই নেও, এতেই তোমার ঘোড়ার দামের বেশী মুদ্রা আছে।"

"হুঁ! কোন্ দিকে লোকটা গেল বলতে পার?"

"হাঁ। দাঁড়িয়েই আমি দেখ্‌ছিলাম। সামনের দিকে সোজা কতদূর গিয়ে দক্ষিণে যে পথ মহারাষ্ট্রের দিকে গিয়েছে, সেই পথ ধ'রে চ'লে গেল।"

"হুঁ! দুষ্ট এই দুর্দ্ধর্ষ লোকটি কে জান?"

"না। কে? এদিকে কখনও আর দেখিনি ওকে।"

"এই লোকটিই রাজদ্রোহী দস্যু পুরন্দর।"

"ও মা, তাই না কি? কি সর্ব্বনাশ!"

নায়ক কহিল, "যদি ধরিয়ে দিতে পারতে, দশ হাজার মুদ্রা পুরস্কার পেতে। তোমার পিতাকে আর চাষ ক'রে খেতে হ'ত না। রাজঘোষরা এসে কি এদিকে এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা ক'রে যায় নি?"

"গিয়েছিল। এই ত দু'তিন দিন আগেই ক'রে গেল। তা এই লোকটিই যে সেই পুরন্দর—এটা অল্পবুদ্ধি মেয়ে আমি কি ক'রে বুঝব বলুন? মনেই কথাটা ওঠে নি। আর বুঝলেই বা কি? মস্ত একটা মল্লের মত লোক সে, আমি কি তাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারতাম?"

"তুমি একা পারতে না। তবে হাঁকডাক ক'রে লোক জোটাতে পারলে পারতে!"

"তা বটে—তা বটে! তাই ত—বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। আর এতক্ষণ সে অনেক দূর চ'লে গেছে, ঘোড়া ছুটে গেল ঝ'ড়ো হাওয়ার মত।"

"কতক্ষণ গেছে?"

পশ্চিম আকাশে সূর্য্যের দিকে একটু কাল চাহিয়া দেখিয়া কুন্তলা কহিল, "বেলা তখন দুপুর না হ'ক আড়াই পহরের কম বোধ হয় হবে না। এখন আর কত বেলা আছে? চার ছ' দণ্ডের বেশী বোধ হয় হবে না। আপনারা বুঝি তাকে ধরতে এসেছেন?

"হাঁ।"

নায়কের মুখে একটু উদ্বেগ—একটু বিরক্তির ভাবও প্রকাশ পাইল। একটু ভাবিয়া কহিল, "এই গ্রামে কোথাও সে লুকিয়ে রয়নি ত? ঠিক তাকে চ'লে যেতে দেখেছ?"

তেমনই সহজভাবে কুন্তলা উত্তর করিল, "হাঁ, চ'লে গেলই ত দেখ্‌লাম। ঐ কত দূর সাম্‌নে গিয়ে পথ যে দুই ভাগ হ'য়ে দু'দিকে গেছে, তার দক্ষিণের পথ ধ'রে চ'লে গেল। তবে যদি ফিরে এসে থাকে। তাই বা কেন আস্‌বে? তা আপনারা গ্রামটা ভাল ক'রে একবার ঘুরে দেখুন না?"

অধীরভাবে নায়ক উত্তর করিল, "না—না! তাতে আরও সময় নষ্ট হবে। যথেষ্ট সময় গেছে। যদি মালবের সীমান্ত ছেড়ে মহারাষ্ট্রে সে গিয়ে ঢুকতে পারে, বড় বিপদের

কথা হবে। আমাদেরই রাজদণ্ডের ভাগী হ'তে হবে। চল সবাই, আর বিলম্বে কাজ নাই। ভদ্রমুখী! তোমার কাছে যেটুকু সংবাদ পেলাম, তাই আমাদের অনেক কাযে লাগ্‌বে। অন্ততঃ পথের সন্ধান ত পাওয়া গেল। এই নেও, এই পুরস্কার তোমাকে দিচ্ছি।"

দুইটি রৌপ্যমুদ্রা নায়ক কুন্তলার সম্মুখে ধরিল। নতশিরে অভিবাদন করিয়া কত যেন কৃতকৃতার্থ হইয়া কুন্তলা দুটি হাত পাতিয়া মুদ্রা দুইটি গ্রহণ করিয়া শিরঃস্পর্শ করিয়া কহিল, "এখনই আপনারা যাবেন? একটু বিশ্রাম ক'রবেন না?"

"না, সে সময় আর নাই। তুমি সুখে থাক। এই পথে যদি ফিরি, তোমাদের এই গৃহে অতিথি হব।" বলিয়া নায়ক স্নিগ্ধদৃষ্টিতে কুন্তলার সুন্দর মুখখানির দিকে একবার চাহিল; তার পর দলবলে চলিয়া গেল। নায়ক ছিল বয়সে যুবা।

৩

সৈনিকদল চলিয়া গেল। কুন্তলা পথের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। কত দূর গিয়া তাহারা দক্ষিণের পথ ধরিয়াই চলিয়া গেল। কুন্তলা দাঁড়াইয়াই রহিল। দক্ষিণের আকাশে অশ্ব-চরণোত্থিত ধূলিপটল পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইল। তখন কুন্তলা একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে কুটীরে ফিরিল।

ডাকিল, "পুরন্দর! তৃণ-দুর্গের মহাবীর! বেরিয়ে এস! শত্রু দূর হ'য়েছে, নির্ভয়ে এখন বীরগৌরবে বের হও!"

হাসিতে হাসিতে পুরন্দর খড়ের গাদা ঠেলিয়া মাচা হইতে লাফ দিয়া পড়িল। হাসিয়া রঙ্গ-অভিবাদন করিয়া কহিল, "যে আজ্ঞা, মহারাণী! দাস একান্তই আপনার চরণাশ্রিত দাস। আদেশ পেলে এখনই ওই চরণতলে সে তার প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রে কৃতার্থ হবে।"

"প্রাণটা যদি পেয়েছ, দেহেই আপাততঃ যত্ন ক'রে ধ'রে রাখ। আর বিসর্জ্জন যদি দিতেই চাও, তারও ব্যবস্থা ক'রতে পারি। তোমারও সাধ মিট্‌বে, আমারও দশ হাজার মুদ্রা লাভ হবে। সত্যই তা হ'লে রাণী হ'তে পারি।"

পুরন্দর কহিল, "যদি রাজা হ'তাম, কুন্তলা, তোমাকেই আমার রাণী ক'রতাম। তোমার বুদ্ধিতে চাণক্যের মত শত্রুকেও পরাভূত ক'রে ভারতের চক্রবর্ত্তী হ'তে পারতাম।"

হাসিয়া কুন্তলা কহিল, "আপাততঃ এই কুটীরের ভেতর গিয়ে সেইখানেই ছোট একটি চক্রবর্ত্তী হ'য়ে গে ব'স। ও-সব কথা পরে ভেবো। বেলা প'ড়েছে, পথে এখন লোক বেরোচ্ছে। এদিকে এসে যদি কেউ দেখে, বিপদ হবে।"

পথের দিকে একটিবার চাহিয়া দেখিয়া পুরন্দর কহিল, "তোমার কুটীরই এখন আমার দুর্গ। এই দুর্গে যদি আজ রক্ষা পাই, রাজা একদিন হবই। শোন কুন্তলা, তোমার এই কুটীরেই আমার রাজপাট তখন বসাব, এইখানেই আমার রাজবাড়ী তুলব। তুমি রাণী হবে ত?"

"নেও, পাগলের মত আর যা-তা ব'কো না। যাও, ঘরে গিয়ে ঢোক। রাজা যদি কখনও হও, এই কুটীর তোমাকে ছেড়ে দেব, রাজপাট বসিও। প্রাণটা ত আগে রাখ—"

"আর তুমি? তুমি রাণী হবে ত?"

"নেও, আর ব'কো না। রাজাই আগে হও, তখন আমিও না হয় রাণী হব। না হই, ধ'রে নিয়ে রাণী ক'রো, রাজারা তাও করে। এখন ঘরে চল।"

পুরন্দর আর বাক্যব্যয় না করিয়া ঘরে গিয়া উঠিল। কুন্তলা কিছু আহার্য্য আনিয়া তাহাকে দিল। তারপর আবার দরজার কাছে চরকাটি লইয়া সূতা কাটিতে বসিল।

আহার করিতে করিতে পুরন্দর কহিল, "বাঃ! তুমি যে চরকা নিয়ে সূতো কাট্‌তে গিয়ে বসলে। রাণী হবে, রাণীরা কি চরকায় সূতো কাটে?"

কুন্তলা উত্তর করিল, "কবে রাণী হব, তার আশায় আজই চরকাটা ফেলে দেব? আর রাজা প্রাণে বাঁচ্‌বে, তবে ত রাণী হব? তার প্রাণটা রাখতে যে কিছু সরু সূতো এখনই কাটা দরকার।"

"কেন?"

"এত মোটা বুদ্ধি নিয়ে দস্যুতা কর কি ক'রে? রাজার মোটা বুদ্ধি হ'লেও চলে, দস্যুর চলে না। তাই ত ধরা প'ড়বার মত হ'য়েছিলে। কেউ যদি আসে, এই সূতো কেটেই তাকে ফেরাতে পারব। ঘরে দুয়োর দিয়ে তোমার সঙ্গে ব'সে ফিস্‌-ফাস ক'রলে কেউ ফিরবে না, দুয়োরে উঠে উঁকি দিয়ে দেখবে।"

"ঠিক—ঠিক ব'লেছ, কুন্তলা! তোমার বুদ্ধি দেখছি সরু সূতোর চাইতেও সরু।"

"আর তোমার বুদ্ধি মোটা দড়ীর চাইতেও মোটা! তাতে বনের হাতী ধ'রতে পারলে বাঁধা যায়, পোকা-মাকড় সুতোয় জড়িয়েই বাঁধতে হয়। বনের হাতী বনে থাকে, ঘরে পোকা-মাকড়ের উৎপাতই বেশী।"

কুন্তলার চরকা ঘর্-ঘর্ চলিতে লাগিল। পুরন্দর কিছুক্ষণ মুগ্ধ, বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিল। তারপর কি ভাবিতে ভাবিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিতা কখন আসবেন?"

"এই সন্ধ্যের পরেই। তাই ত আসেন।"

"তাঁর নাম কি?

"কিষণদাস।"

"তিনি এসে যদি আমাকে দেখেন—"

"কিচ্ছু ভয় নেই তোমার। আমি যা ক'রেছি, তাতে সন্তুষ্ট বই বিরক্ত তিনি হবেন না। কিন্তু তুমি এখন কি ক'রবে? একটা রাজা কিছু আর আজই হ'তে পারছ না। তার আগে প্রাণটা রাখবার উপায় দেখতে হবে। আজ তোমাকে সাম্‌লে রাখতে কোনও মতে পেরেছি, কাল হয় ত পারব না।"

"না, তা পারবে না। খড়ের গাদায় আমিই বা কয় দিন লুকিয়ে থাকতে পারব! মালবে আর তিষ্ঠুতে পারছি না, আমি মহারাষ্ট্রে যাচ্ছিলাম। ঘোড়াটা যদি হঠাৎ এভাবে ম'রে না যেত, আজ রাত্রির ভেতরেই মহারাষ্ট্রের সীমায় গিয়ে পৌঁছুতে পারতাম। সেখানে মালবরাজের দণ্ড আমায় স্পর্শ ক'রতে পারত না।"

কুন্তলা কহিল, "হুঁ, বড় ভুল ক'রেছি। তুমি মহারাষ্ট্রের দিকে যাবে তা জানতাম না। রাজার লোকগুলোকে মহারাষ্ট্রের পথ দেখিয়ে দিয়েছি। বলেছি, তুমি ঐ পথে গিয়েছ। এখন গেলে ত ধরা প'ড়বে।"

"আর কোনও পথ নাই?"

"আছে, কিন্তু সে বড় দুর্গম পথ। কাছেই নর্ম্মদা পার হ'লেই যে পাহাড়ী বন আছে, তার ভিতর দিয়ে শুনেছি মহারাষ্ট্রে যাওয়া যায়।"

"তাই তবে যাব।"

"একা কি পথ চিনে যেতে পারবে?"

"তা পারব না? দুর্গম বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়েই ত জীবনটা এতদিন কাটালাম।"

"তাই ব'লেই যে নূতন বনের পথ চিনতে পারবে, এমন কোনও কথা নেই। শোন, পিতা আসুন, তিনি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন। তিনি বুড়া, বুড়া সেজেই তাঁর সঙ্গে যাবে। দেখলেও কেউ সন্দেহ কিছু ক'রবে না। আজ রাত্রিতেই চ'লে যাও, কাল সন্ধ্যার মধ্যেই বোধ হয় মহারাষ্ট্রে পৌঁছুতে পারবে। মহারাষ্ট্র এখান থেকে খুব বেশী দূর ত নয়।"

"তোমার পিতা কি এত ক্লেশ ক'রে আমার সঙ্গে যাবেন?"

"তা যাবেন। কোনও ভাবনা নেই তোমার। তোমার নাম তিনি জানেন। তোমার কথা ব'লে অনেক দুঃখও ক'রে থাকেন। ভেবে দেখ, নিজে আজই যেতে পারবে কি না।"

"পারব, শরীর এখন বেশ সুস্থ সবল হ'য়েছে। আর যেতে আজই হবে। নইলে কাল হয় ত মোটে যাওয়াই হবে না।"

"ঠিক কথা! যদি পার, আজই যাও। ভাল কথা, তোমার লোকজন সব কোথায় গেল? তারা কি ধরা প'ড়েছে সবাই?"

"না—এক জনও নয়। ধরা কেউ প'ড়েনি, তবে রাজার সেনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কেউ কেউ ম'রেছে বটে!"

হাসিয়া কুন্তলা কহিল, "যুদ্ধ ক'রে ম'রেছে! দস্যুরা কি আবার যুদ্ধ করে? তারা ত গরীব নিরীহ লোকদের মেরে কেটে লুঠপাট ক'রে সব নিয়ে যায়। রাজার লোক ধ'রতে এলে পালায়। তখন—হাঁ, দু'চার জন তাদের অস্ত্রে-শস্ত্রে মরেও বটে। যুদ্ধ কি কেউ করে, না ক'রতে পারে?"

কিছু দৃপ্তদৃষ্টিতে চাহিয়া পুরন্দর উত্তর করিল, "আমরা অনেক ক'রেছি। তবে রাজার বল বড় বেশী, তাই হেরে এখন পালাচ্ছি। গ্রাম নগর অনেক লুঠ ক'রেছি, লণ্ডভণ্ড ক'রেছি। কিন্তু কেবল রাজাকে জব্দ ক'রবার জন্য, ভয় দেখিয়ে তাদের বশে রাখবার জন্য, অর্থের লোভে নয়।"

কুন্তলা কহিল, "রাজার প্রজা তারা, রাজা তাদের রক্ষা করেন, তোমার বশ কেন তারা হবে?"

"বশ হ'লে আমারই প্রজা তারা হ'তে পারে, আমিই রাজার মত তাদের রক্ষা ক'রতে পারি।"

"এ কেমন কথা? জোর ক'রে তাদের তোমার প্রজা ক'রবে?"

"রাজারা যখন অন্যের রাজ্য জয় করে, জোর ক'রে লোকদের সব নিজেদের প্রজা ক'রে নেয় না ?"

"তুমি ত রাজা নও, দস্যু। রাজারা বাইরে রাজ্য জয় করেন, দস্যুরা রাজ্যের মধ্যেই উৎপাত করে।"

গম্ভীরস্বরে পুরন্দর উত্তর করিল, "বাইরে হ'লেও মানুষের উপরে উৎপাত দিগ্বিজয়ী রাজারা অনেক বেশী করে। দিগ্বিজয়ী রাজারা বড় দস্যু, আমরা ছোট দস্যু, এর বেশী পার্থক্য কিছু নাই।"

কুন্তলা একটু হাসিয়া কহিল, "তা এই ছোট দস্যুই বা হ'লে কেন ? মালবের এক ভাগ ভেঙ্গে নিয়ে তার রাজা হবে ব'লে ? এ লোভই বা কেন ?"

গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া ধীরদৃষ্টিতে চাহিয়া পুরন্দর কহিল, "কুন্তলা! রাজা আমার দস্যু নাম প্রচার ক'রেছেন, আর রাজদ্রোহীও আমাকে ব'লে থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক আমি দস্যু নই। তবে রাজদ্রোহী নামটার ভাগী বোধ হয় হ'তে পারি।"

"রাজদ্রোহীই বা কেন হ'য়েছ ? প্রজার পক্ষে সেটাও ত দোষের কথা।"

পুরন্দর উত্তর করিল, "রাজা যদি বড় বেশী অত্যাচার করেন, ধনে-প্রাণে যদি প্রজার সর্ব্বনাশ ক'রতে চান, তবে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে রাজদ্রোহিতা ব্যতীত আর কি উপায় সেই প্রজার আছে, কুন্তলা ?—নিজের দেশে নিজের ন্যায্য অধিকারে যদি তাকে থাকতে হয়, তবে সফল রাজদ্রোহিতায় রাজ্যের কোনও অংশ স্বতন্ত্র শক্তিতেই অধিকার ক'রে তাকে থাকতে হবে।"

চমকিয়া কুন্তলা চাহিল, কহিল, "আহা, সত্যই এত বড় একটা অত্যাচার তোমার উপরে হয়েছিল, পুরন্দর ?"

"আমার উপরে ঠিক নয়, আমার পিতার উপরে হ'য়েছিল। বর্ত্তমান রাজা মিত্রদেবের পিতা ভীমদেব আমার পিতা চক্রধরের উপরে এই অত্যাচার করেন। মালবরাজের বড় একজন সামন্ত তিনি ছিলেন। রাজার কোনও প্রিয় অমাত্য আমার পিতার বড় একজন শত্রু ছিলেন। তাঁর পরামর্শে রাজা পিতার নিকটে অতি অন্যায় কতকগুলি দাবী করেন।—পিতা সেই দাবী পালন না করায় রাজদ্রোহী ব'লে ঘোষণা ক'রে, ভীমদেব বড় একদল সেনা তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। সর্ব্বস্ব হারিয়ে পিতা দুর্গম পর্ব্বতাঞ্চল আশ্রয় ক'রে আত্মরক্ষা ক'রতে থাকেন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই মধ্যে মধ্যে নেমে গ্রাম নগর লুঠ করতেন। রাজা তখন তাঁকে দস্যু ব'লেও ঘোষণা করলেন। পিতা এখন জীবিত নাই। তাঁর পুত্র আমিই এখন তাঁর সেই দস্যুতার উত্তরাধিকারী হয়েছি।—তাঁর পণ ছিল, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিয়ে তাঁর পৈতৃক অধিকার তিনি রাজার গ্রাস থেকে আবার কেড়ে নেবেন। তাঁর সেই পণও আমি উত্তরাধিকার করেছিলাম। কিন্তু রাখতে পারলাম না, তাই এখন মহারাষ্ট্রে যাচ্ছি।"

কুন্তলার নয়নে জল আসিল। দুই হাতে মুছিয়া কহিল, "আহা, বড়ই অত্যাচার তোমাদের উপরে তবে হ'য়েছে! কিন্তু বর্ত্তমান মালবরাজ মিত্রদেব ত অত্যাচারী নন।"

পুরন্দর কহিল, "সাধারণতঃ তিনি অত্যাচারী নন, বরং সুশাসকই বটেন। তবে আমার সম্বন্ধে তাঁর পিতার পন্থাই অনুসরণ করছেন। হয়ত সকল কথা তিনি জানেন না। হয়ত বা মনে করেন, রাজ্যের উৎপাতস্বরূপ দস্যু পুরন্দরকে উচ্ছেদ করাই তাঁর রাজধর্ম্ম।"

একটু কি ভাবিয়া কুন্তলা কহিল, "তা মহারাষ্ট্রে কেন যাচ্ছ ? নিরাপদ আশ্রয় পাবে ব'লে ?"

"তাও বটে। কিন্তু কেবল তাই নয়।—শুনেছি, মহারাষ্ট্রের রাজা মালব-আক্রমণের আয়োজন করছেন। এই যুদ্ধে আমি তাঁর সহায়তা ক'রব।"

"তার পর ?"

"আমার সহায়তায় যদি তিনি মালব জয় ক'রতে পারেন, মালব আমার হবে।"

কুন্তলা কহিল, "এ বড় দুরাশা, পুরন্দর। মালব যদি মহারাষ্ট্ররাজ জয় করতে পারেনও, তুমি এমন কি সহায়তা তাঁর করতে পারবে যে, তাতে ক'রে হাতে ধ'রে মালব অমনি তোমাকেই তিনি দিয়ে দেবেন ?"

পুরন্দর উত্তর করিল, "সহস্রাধিক বীর অনুচর আমার আছে। সবাই গিয়ে তারা মহারাষ্ট্রে আমার সঙ্গে মিলবে। আমার পিতার পূর্ব্বের প্রজারাও সব প্রস্তুত হ'য়ে আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হলেই বিদ্রোহী হ'য়ে তারা আমার সঙ্গে এসে দাঁড়াবে। মহারাষ্ট্ররাজ যদি মালব জয় ক'রতে পারেন, আমার সহায়তাতেই পারবেন।"

কুন্তলা কহিল, "বড় ভুল তুমি বুঝছ, পুরন্দর। তোমার

সহায়তায় মহারাষ্ট্ররাজ মালব জয় হয়ত করতে পারবেন, কিন্তু সেই সহায়তার পুরস্কার ব'লে জিত মালব তোমাকে কখনও দেবেন না।—কেন দেবেন? যুদ্ধে ত তাঁর সেনাও সব আসবে? লড়াইও তারা করবে, তার একটা পুরস্কার কেন তিনি চাইবেন না? সেইটেই বরং আগে চাইবেন। মালব একবার হাতে পেলে তখন তোমার খাতিরই বা কেন করবেন? মালব পেতে হ'লে তাঁর সঙ্গে তখন লড়াই ক'রে ফের জয় ক'রেই তোমাকে নিতে হবে। তা কি পারবে? পারতেই যদি, মহারাষ্ট্রের সঙ্গে গিয়ে জুটতে হ'ত না, নিজের বিদ্রোহের বলেই মালব জয় ক'রে নিতে পারতে। ফল কেবল এই হবে, স্বাধীন মালবকে মালবের সন্তান হ'য়ে মহারাষ্ট্রের অধীন ক'রে দেবে। মহারাষ্ট্রের দাপে নিজেও যে কোথায় ভেসে যাবে, স্থির কিছু নাই।"

পুরন্দর নীরব। কুন্তলার কথাগুলির সত্যতা সে বেশ অনুভব করিতেছিল,—উত্তর কিছু মুখে যোগাইল না। নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। দরিদ্র গ্রাম্য কৃষকের কন্যা কুন্তলা —এই সব বিষয়েও এত বুদ্ধির—এত জ্ঞানের অধিকারিণী কি করিয়া হইল, ইহা ভাবিয়াও বড় বিস্মিত সে হইতেছিল।

কুন্তলা আবার কহিল, "পুরন্দর, ক্রোধের কারণ তোমার যথেষ্ট আছে। প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। আবার নিজের মর্য্যাদা—নিজের পৈতৃক সম্পদ্ ফিরে পেতেও সবাই চায়। কিন্তু তাই ব'লে মালবের সর্ব্বনাশ করবে? মালবের রাজা যত অপরাধীই হউক, মালব ত তোমার কাছে কোনও অপরাধ করে নাই। ভাবছ মালব তুমি পাবে, মালবের সন্তান তুমি মালবের রাজা হবে। কিন্তু তা পারবে না, এটা নিশ্চয় জেনো। বিজয়ী মহারাষ্ট্রসেনা একবার এসে মালব যদি দখল ক'রে ফেলে, কি ক'রে তুমি ভাবছ তাদের তখন উৎখাত ক'রে মালব তোমার দখলে আবার আনবে? সাধ করেও মালব তোমার হাতে তারা ছেড়ে দেবে না। কেন দেবে? কে এমন দেয়? আর তুমি তখন তাদের কে? কায উদ্ধার একবার হ'লে সেই উদ্ধারের অস্ত্রের আদর কে করে? কোনও বিঘ্নের আশঙ্কা যদি দেখে, সেই অস্ত্রই বরং তখন ভেঙ্গে ফেলে।"

পুরন্দর কহিল, "যা বলছ, হাঁ, সব সত্য, কুন্তলা! কিন্তু আমি আজ নিরুপায়। মালবে আজ কোনও স্থান যে আমার নাই।"

"তোমার স্থান নাই, তাই ব'লে কি মালব ভ'রে পরের স্থান ক'রে দেবে? মালবে স্থান নাই, মহারাষ্ট্রে যাচ্ছ, বেশ, সেইখানেই তোমার স্থান ক'রে নাও না গিয়ে? তাকে টেনে এনে মালবের উপরে বসাতে চাইছ কেন?"

পুরন্দর কহিল, "মহারাষ্ট্রে যদি স্থান ক'রে নিতে হয়, মালবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ আমাকে করতেই হবে। কারণ, যুদ্ধ অনিবার্য্য, মহারাষ্ট্ররাজ মালব আক্রমণ করবেনই।"

একটু কি ভাবিয়া কুন্তলা তখন কহিল, "তা হ'লে এক কায ক'রবে, পুরন্দর? আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি, বল।"

"তুমি বীর, তোমার অনুচররাও বলছ, সবাই বীর। তারা গিয়েও নাকি মহারাষ্ট্রের সীমান্তে তোমার সঙ্গে মিলবে। অন্ততঃ বন্দোবস্ত তাই আছে। ভাল, তাদের নিয়ে সীমান্তের পর্ব্বত অঞ্চলে থেকে মহারাষ্ট্রসেনার গতিরোধ করবার চেষ্টা কর না? মালবরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা তাতে হবে। মালবরাজ যখন জানতে পারবেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তোমাকে ক্ষমা করবেন, তোমার হৃত অধিকারও সব ফিরিয়ে দেবেন।"

একটু থমকিয়া থাকিয়া পুরন্দর কহিল, "কিন্তু পিতার উপরে সেই অবিচারের—অন্যায় উৎপীড়নের প্রতিশোধ কিছু ত নেওয়া হবে না, কুন্তলা।"

কুন্তলা কহিল, "তোমার উৎপীড়িত সেই পিতা আর উৎপীড়ক সেই মালবরাজ ভীমদেব দু'জনেই এখন পরলোকে। সেখানে তাঁদের শত্রুতা হয় ত তাঁরা মিটিয়ে ফেলেছেন। শুনেছি, এই পৃথিবীর মত হিংসাদ্বেষ সেথায় নাই। তার পর, হাজার হ'ক্, তোমার পিতা মালবেরই সন্তান ছিলেন। হীন প্রতিহিংসার বশে মালবের সর্ব্বনাশ না ক'রে মালব রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধরেছ, স্বর্গলোক থেকে তাই দেখলে অনেক বেশী সুখী তিনি হবেন। অভিশাপ না ক'রে বরং আশীর্ব্বাদই তোমাকে করবেন।"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া পুরন্দর কহিল, "হাঁ। ঠিক ব'লেছ, কুন্তলা! তাতেই তাঁর আশীর্ব্বাদ পাব; মালবের শত্রুতা এমন সময়ে করলে বরং তাঁর অভিশাপেরই ভাগী হব। তুমি যা ব'ল্লে, হাঁ, তাই আমি ক'রব, কুন্তলা। মালবরাজ শেষে এই উপকার স্মরণ রাখুন কি না রাখুন—কোনও প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ না হ'য়ে মালব-সন্তানের আজ যা ধর্ম্ম,

তাই আমি পালন ক'রব, মালবরক্ষায় রাজার সহায়তা করব। ভাগ্যে শেষে যা থাকে হবে ; কিছু তা আজ ভাব্‌ব না। কুন্তলা, আজ প্রাণ রক্ষা ক'রে যে উপকার আমার করেছ, তার চাইতে অনেক বেশী উপকার আমার ক'রলে ধর্ম্মের দিকে মোহে অন্ধ আমার দৃষ্টিকে এমন উন্মুক্ত ক'রে। এ ঋণ কি কখনও শুধ্‌তে পারব, কুন্তলা?"

হাসিয়া কুন্তলা কহিল, "ঋণটা আগে কর, পাকা হ'ক, তখন শুধবার কথা ভেবো। আজই ও কথা কেন?"

পুরন্দর কহিল, "কুন্তলা, আমি বড় আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি। গ্রাম্য কৃষককন্যা, এত সুবুদ্ধি এত জ্ঞান কি ক'রে কোথায় তুমি পেলে?"

কুন্তলা উত্তর করিল, "'সু' কি 'কু' যাই হ'ক, বুদ্ধি কারও শিখ্‌তে হয় না, যার যেমন আপনিই হয়। তবে একেবারে জ্ঞানহীন আমি রইতে পারিনি। দরিদ্র কৃষক হ'লেও আমার পিতা বংশে ক্ষত্রিয়, জ্ঞানের আলোচনাও কিছু কিছু ক'রে থাকেন। তাঁর একমাত্র সন্তান আমি, আমাকেও যা তিনি জানেন, কিছু কিছু শিখিয়েছেন। আর জ্ঞান-গৌরবে ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশ এই মালব, মালবের একটি দীনকন্যার পক্ষে এটুকু জ্ঞানের অধিকার এমন বেশী কিছু নয়।"

এমন সময় কুন্তলার পিতা কিষণদাস গৃহে ফিরিলেন। সকল কথা শুনিয়া অতি স্নেহে পুরন্দরকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে তাহার সহায়তা করিতেও প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার আনন্দে ও সহায়তা করিবার আগ্রহে কেমন যেন অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। কুন্তলা ও পুরন্দর উভয়েই তাহাতে বড় বিস্মিত হইল। যাহা হউক, সেই রাত্রিতেই কিষণলাল পুরন্দরকে লইয়া দুর্গম সেই বনপথে মহারাষ্ট্রের দিকে যাত্রা করিলেন।

৪

অনুচরবর্গ প্রায় সকলেই সীমান্তের নির্দ্দিষ্ট কোনও স্থানে গিয়া পুরন্দরের সঙ্গে মিলিতে পারিয়াছিল।

পার্ব্বত্য অঞ্চলবাসী আরও অনেক লোক পুরন্দর সংগ্রহ করিয়া লইল। ইহাদের লইয়া প্রবল এমন এক বাধা সে সৃষ্টি করিল যে, তাহার সঙ্গে বৃথা সংগ্রামেই মহারাষ্ট্র-সেনা বহুদিন ব্যাপৃত রহিল, বেশ কিছু বলক্ষয়ও তাহার হইল। ইতিমধ্যে মালবরাজ মিত্রদেবও সসৈন্যে মহারাষ্ট্রের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই তিনি শুনিয়াছিলেন, সীমান্তের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অপরিচিত কোনও বীর সমগ্র মহারাষ্ট্র-সেনার অগ্রগতি রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বাধার বল যে কত বড়, কতদূর সফল হইয়াছে, এই সফলতা মহারাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষায় কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে, নিকটে আসিয়া স্পষ্টই সব তাহা তিনি উপলব্ধি করিলেন। অজ্ঞাত এই বীরের প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

শত্রু ঘরে আসিতে পারিবার আগেই শত্রুর ঘরে গিয়া হানা দেওয়া অতি কুশল ও সমীচীন রণনীতি বলিয়া বিবেচিত হয়। অবস্থা অনুকূল বুঝিয়া অবিলম্বে মিত্রদেব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মহারাষ্ট্র-সেনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক দিক্ হইতে তাঁহার এবং অন্য দিক্ হইতে পুরন্দরের প্রচণ্ড আক্রমণে মহারাষ্ট্র-সেনা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রপতি রাজ্যের কতক অংশ ছাড়িয়া দিয়া মালবরাজ্যের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

পরিচয় সব দিয়া পুরন্দর মিত্রদেবের নিকটে একটি অনুচরকে পাঠাইল। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া অতি আগ্রহে মিত্রদেব পুরন্দরকে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করিলেন। পুরন্দর আসিল, এবং অতি আদরে সম্বর্দ্ধিত হইল। জীবনের সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পুরন্দর কহিল, "মহারাজ! আমার রাজদ্রোহিতার ইতিহাস সবই আপনি অবগত হ'লেন। আপনার পিতা ও আমার পিতা কেহই আর জীবিত নাই, কার দোষে কি হ'য়েছিল, সে বিচার এখন নিষ্প্রয়োজন। আপনি রাজা, আমি প্রজা; আপনি প্রভু, আমি দাস। সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে দাসকে আপনার সেবায়—আপনার সেবাতেই মালবের সেবায়—গ্রহণ ক'রলে সে এখন চরিতার্থ হবে।"

বলিয়া পুরন্দর রাজার চরণতলে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি হইল। স্নেহে পুরন্দরকে হাত ধরিয়া তুলিয়া মিত্রদেব কহিলেন, "পুরন্দর! তোমার এই বিনয়, এই তিতিক্ষা, তোমারই মহৎ প্রাণের যোগ্য। আর লজ্জা আমাকে দিও না। বেশ বুঝতে পারছি, তোমার পিতার অপেক্ষা

অপরাধ আমার পিতারই অধিক হ'য়েছিল। উৎপীড়িত প্রজার নিকটে রাজাও অপরাধের ঋণে ঋণী। পিতার সেই ঋণ পুত্র আমাকেই পরিশোধ ক'রতে হবে। ক্ষমাপ্রার্থনা আজ ক'রছি, তোমার ক্ষমার সে ঋণ আজ শোধ হ'ক। তোমার পৈতৃক অধিকার সব ন্যায্য দাবীতেই তুমি ফিরে পেলে জানবে। বিপদে আমার রাজ্যরক্ষায় অযাচিত এই সহায়তা ক'রে দুষ্পরিশোধ্য নূতন ঋণে তুমি আজ আমাকে আবদ্ধ ক'রেছ।"

পুরন্দর উত্তর করিল, "মহারাজ! আমি প্রজার ধর্ম্ম পালন করেছি মাত্র। রাজার ঋণ, দেশের ঋণ, শোধ করেছি।"

মিত্রদেব কহিলেন, "পুরন্দর! প্রজার কোনও অধিকার, দেশেও কোন স্থান তোমার ছিল না। সুতরাং শুধবার মত ঋণ কিছুই তোমার থাক্‌তে পারে না।"

যুক্তকরে পুরন্দর কহিল, "দয়া ক'রে এখন মহারাজ যা বলেন!"

"দয়া ক'রে নয় পুরন্দর, দয়া পেয়ে কৃতজ্ঞতায় ব'ল্‌ছি, আমিই আজ ঋণী, আর এ ঋণ প্রায় অপরিশোধ্য। তবে একটি অমূল্য রত্ন তোমাকে আজ দেব, যাতে মনে হয়, এ ঋণও আমার শোধ হ'তে পারে।"

"রত্ন! কি সে রত্ন, মহারাজ!"

সহসা একটু চমকিয়া কেমন যেন একটা শঙ্কিত উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পুরন্দর চাহিল। রাজার মুখে মৃদু একটু চটুল হাসি তখন ফুটিয়াছিল। এই হাসিতে যে রহস্যের আভাস সে পাইল, তাহাতে তাহার উদ্বিগ্নতা বাড়িল বই কমিল না। রত্ন! কি সে রত্ন? রাজা কি সত্যই তবে রূপবতী কোনও রাজকুলকন্যাকে তাহার হস্তে দান করিতে চান?

"কি ভাবছ, পুরন্দর? যে রত্ন তোমাকে দিচ্ছি, গ্রহণ ক'রতে কোনও আপত্তি তোমার আছে?—কি আপত্তি?"

"আপত্তি—মহারাজ! আমি অতি হীন, রাজার কৃপায় ক্ষমাপ্রাপ্ত দাস মাত্র।"

"না, মালবের অতি সম্রান্ত একজন সামন্তপুত্র, দস্যুতা অবলম্বন ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলে মালবরাজেরই অবিচারে, অন্যায় পীড়নের ফলে। আজ আবার মালব রক্ষা ক'রে মালব-সামন্তের গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত হ'য়েছ, রাজাকেও মহা ঋণে ঋণী ক'রেছ। সেই ঋণের বিনিময়ে আমার ভগ্নীকে তোমার হস্তে দান ক'রতে চাই।"

"মহারাজ!"

"কি, এ দান গ্রহণ ক'রবে না, পুরন্দর?"

রাজার মুখে একটু ভ্রূকুটিও দেখা দিল।

কৃতাঞ্জলি হইয়া নতশিরে পুরন্দর কহিল, "মহারাজ! আমি অন্য এক কুমারীর প্রতি প্রণয়াসক্ত, বিবাহপণেও তার নিকটে বদ্ধ।"

"প্রণয়াসক্ত হ'য়েছিলে কি না জানি না, কিন্তু বিবাহপণে ত বদ্ধ হও নাই, পুরন্দর!"

অতি বিস্ময়ে চমকিয়া পুরন্দর চাহিল; দেখিল, পাশেই এক দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কুন্তলা!

"কুন্তলা? তুমি—তুমি এখানে—"

"হাঁ, এখানেই ত আছি। পিতা যুদ্ধে এসেছিলেন, সঙ্গে আমাকে নিয়ে এলেন, রাজ-শিবিরেই তাঁর সঙ্গে আছি। তা সবে সেই একটি দিন এক বেলার দেখা—দুটো চারটে কথা যা হয়,—তাতে—হয়ত আকৃষ্ট কিছু তখনকার মত হ'য়েছিলে। অনেকেই শুনেছি, অমন হ'য়ে থাকে। কিন্তু বিবাহের কোনও পণ ত কর নি! আর সে পণ কিছু হ'লে হবে পিতার সঙ্গে,—আমার সঙ্গে ত হ'তে পারে না।"

"কিন্তু মনে মনে আমি তখন—"

"ও! মনে মনে? তা মনে মনে যা'ই হ'য়ে থাক, নিজের মনে নিজের কাছেই হ'য়েছে। আর কারও কাছে বদ্ধ তাতে তুমি হ'তে পার না। সুতরাং রাজা আগ্রহে দিতে চাইছেন, তাঁর ভগ্নীকে অনায়াসে বিবাহ করতে পার।"

"না, তা পারি না, কুন্তলা, পারব না। তোমাকেই আমি চাই, মনের সত্য সংকল্পে তুমিই আমার স্ত্রী! মার্জ্জনা করুন, মহারাজ! আজ এ অবস্থায়, অন্যাসক্ত, মনের সত্য সঙ্কল্পে অন্য স্ত্রীর স্বামী আমাকে জেনে আপনার ভগ্নীকে আমার হাতে আপনিও দিতে পারেন কি?"

একটু হাসিয়া রাজা উত্তর করিলেন, "কিন্তু মনের সত্য-সংকল্পে তোমার হাতে তাকে দিয়েছি, পুরন্দর; ফিরিয়ে নিতে আর পারি না। ইচ্ছা হয় তাকে ত্যাগ ক'রে যাও, কিন্তু তোমার স্ত্রীই সে থাক্‌বে।"

পুরন্দর কহিল, "গ্রহীতার গ্রহণের ইচ্ছা. গ্রহণের অধিকার, আছে কি না, না জেনে দাতা কি কাউকে কিছু দিতে পারেন, মহারাজ?"

রাজা উত্তর করিলেন, "ব'লছ তুমি গ্রহীতা আমি দাতা, তা হ'লে ইচ্ছা কি অধিকার কিছু থাক্ কি না থাক্ স্বীকার করছ, দান আমি ক'রেছি, গ্রহণও তুমি ক'রেছ!"

হাসিয়া কুন্তলা কহিল, "তবে আর কি? স্বীকারই ক'রে ফেল্লে রাজার ভগ্নীকে তুমি গ্রহণ ক'রেছ! বাঁচা গেল, আমি তবে এখন বিদায় হই।"

ছুটিয়া গিয়া কুন্তলার হাত ধরিয়া টানিয়া পুরন্দর বলিয়া উঠিল, "না না, কুন্তলা! কথার ছলে রাজা ঠকাতে চান, কিন্তু আমি ঠকব না। গ্রহণ আমি কাউকে করিনি। তুমি —তুমিই আমার স্ত্রী, গ্রহণ তোমাকেই আমি ক'র্লাম।"

"কিন্তু দান কে ক'রল যে গ্রহণ ক'রছ?"

থতমত খাইয়া পুরন্দর এদিক্ ওদিক্ একবার চাহিল। মিত্রদেব তখন আসন হইতে উঠিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "ভাল, আমিই তবে দান ক'রছি। এই নাও পুরন্দর, মনে সংকল্প করেছি, এখন হাতে হাতেই আমার ভগ্নী মণিকুন্তলাকে দান ক'র্লাম তোমাকে। গ্রহণ কি ত্যাগ ক'র্বে, সে এখন তোমার ইচ্ছা।"

"মণিকুন্তলা!—এই কুন্তলা—আপনার ভগ্নী—"

অন্তরাল হইতে কিষণদাস তখন অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, "হাঁ পুরন্দর, কুন্তলা—মণিকুন্তলা—রাজা মিত্রদেবেরই ভগ্নী। তার পিতা আমি, মিত্রদেবের খুল্লতাত প্রশান্তদেব।"

"প্রশান্তদেব! আপনিই তবে প্রশান্তদেব—যাঁর কথা অনেক শুনেছি।"

"হাঁ, আমিই সেই প্রশান্তদেব, স্বর্গীয় মহারাজ ভীমদেবের ভ্রাতা। তোমার পিতা বাল্যাবধিই আমার বড় প্রীতিভাজন বন্ধু ছিলেন। ভীমদেব যখন তাঁর প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, প্রতিকারের চেষ্টা অনেক করি, ফলে বিষম একটা বিরোধ তাঁর সঙ্গে ঘটে; আমাকেও তিনি ত্যাগ করেন। রাজগৃহ, রাজকুলের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন ক'রে, দূরে এক গ্রামে গিয়ে সাধারণ একজন প্রজার ন্যায় কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করি। কুন্তলা তখন শিশু বালিকা; তার মাতাও কয়েক বৎসর পরে দেহ ত্যাগ ক'রে যান। তোমার কথা সব জান্তাম, কুটীরে তোমাকে দেখে, তোমার সংকল্পের কথা শুনে বড় আনন্দ হ'ল। সীমান্তে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েই কুন্তলাকে নিয়ে এখানে এসেছি, যুদ্ধে যথাশক্তি মিত্রদেবের সহায়তা ক'র্তে পেরেও কৃতার্থ হ'য়েছি। মিত্রদেবও সসম্মানে আমাকে গ্রহণ ক'রেছেন। বহু বৎসর পরে, আজ আবার আমি সেই মালবরাজ-পরিবারের প্রশান্তদেব। আর আমার স্নেহের পুত্তলী মণিকুন্তলা—"

"ক্ষত্রিয়কুলতিলক মহাবীর মালব-সামন্ত পুরন্দরের পত্নী। এস পুরন্দর, আমার বহুমানাস্পদ, অশেষ প্রীতি-ভাজন ভগ্নীপতি তুমি—আমার আলিঙ্গনে এসে বদ্ধ হও।"

কুণ্ডলা সরিয়া দাঁড়াইল। বাহুবিস্তার করিয়া মিত্রদেব বীর পুরন্দরকে নিজের বীরবক্ষের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। কুন্তলা অগ্রসর হইয়া প্রণতি করিল। হাত তুলিয়া উভয়ের শিরঃস্পর্শ করিয়া প্রশান্তদেব সাশ্রুনয়নে ধীর গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন—

"ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!"

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম, এ)।

দুঃখী

বাজিছে সানাই, উঠিছে হাস্য,
কল-কোলাহল জাগে;
বাজিছে বাদ্য, উঠে সঙ্গীত,
শত ধ্বনি কাণে লাগে।

এত হর্ষের মাঝারে আমি যে
বসিয়া অচঞ্চল
আপন বিষাদে আপনার দুখে
ভ'রে রাখি চিত-তল।

নয়ন আমার আকাশে উদাস,—
পতিহারা নারী সম
হৃদয় লুটায় বুকের মাঝারে
গভীর দুঃখে মম।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সার জন উড্রফ্ ও তান্ত্রিক সৃষ্টিরহস্য

এ দেশের আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে তন্ত্র সম্বন্ধে ভাল ধারণা নাই অথবা বিকৃত ধারণা আছে ইহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় উক্তি করা হয় না। অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ সকল অন্ধ গোঁড়ামী ও অসংযত আচার এবং প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ এইরূপ বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় একজন শাস্ত্র-বিচারনিপুণ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইংরেজ মনীষী তন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য রীতিমত সাধনা করিয়া গিয়াছেন জানিয়া তাঁহার সাধু প্রচেষ্টার ও সত্যানুসন্ধিৎসার জন্য শ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ হয়।

বিখ্যাত বিচারপতি সার জন উড্রফ্ বঙ্গদেশের প্রধান বিচারালয়ের গুরুদায়িত্বের অন্তরালেও তন্ত্রশাস্ত্র অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আর্থার এভেলন (Arthur Avalon) নামে বহু সাধনায় তিনি কয়েকখানি প্রামাণ্য তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত গ্রন্থের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে য়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র অনুশীলন সম্ভবপর হইয়াছিল। তন্ত্র-শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, সে জন্য তন্ত্রানুরক্ত হিন্দুগণই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

তন্ত্রমতে ব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল রহস্য তিনি যেরূপ ভাবে বিন্যাস করিয়াছেন, তাহা আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি। *

আমাদের পার্থিব বিষয়াভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ করিলে স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন এই উভয়মূলক অনুভূতির সম্বন্ধেই সাধারণতঃ একটা ধারণা জন্মে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বিশ্বজনীন সত্যের অনু-সন্ধান পাওয়া যায়। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোনও মতবাদের বিচার করিতে যাইয়াও আমাদের পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনীয়, এক এবং বহু, নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার মৌলিক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় উহাদিগকে কূটস্থ এবং ভাব অথবা ভাবনা বলে। প্রথমটি হইতেছেন পরমাত্মা বা পুরুষ বা ব্রহ্ম এবং ইহারই নাম সচ্চিদানন্দ।

ভারতীয় ধারণা অনুসারে পরমাত্মার বা পরম পুরুষের স্বরূপ নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। কেবল প্রকৃতিই পরিবর্তনশীল। প্রকৃতিকে আমরা দুইভাবে বুঝিতে পারি; প্রথমতঃ, বাহ্য জগতের মূল নিদান ও দ্বিতীয়তঃ, পরিদৃশ্যমান্ জগদ্রূপে। প্রথমোক্ত হইতেছে মূল-প্রকৃতি। মূল-প্রকৃতি সকল বস্তুর মূলাধার, ইহা পুরুষ বা চিৎশক্তির সহিত এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূল কারণ হইয়া বর্তমান। শারদা-তিলকের মতে এই মূল-প্রকৃতিই হইতেছে মূলীভূত অব্যক্ত এবং শাঙ্কর বেদান্তের মতে মায়া।

প্রকৃতি দ্বিতীয় অর্থে অর্থাৎ মূল-প্রকৃতিজাত পরিদৃশ্যমান্ জগদ্রূপে হইতেছে সাংখ্য ও তন্ত্রের বিকৃতির ও বেদান্তের অবিদ্যাসম্ভূত নামরূপের সমন্বয়। দ্রব্যসমূহের নিমিত্ত কারণরূপে মূল-প্রকৃতি হইতেছে বিশ্ব—যাহার অভিব্যক্তি সেই প্রাকৃতিক শক্তির আধার।

প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে সাংখ্য, বেদান্ত ও তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদের কতকগুলি মূলগত সাদৃশ্য আছে। পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা পুরুষ সচ্চিদানন্দ ও নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। তিনি অপরিবর্তনীয় এবং কর্তৃত্ববিহীন। তিনি স্বয়ং সমবায় বা নিমিত্ত-কারণ নহেন—যদিও তাঁহার উপস্থিতির জন্য প্রকৃতির কার্য্যের উপলব্ধি হয়, এবং এই সম্পর্কে তাঁহার কারণত্বও একেবারে অস্বীকার করা কঠিন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষকে পরিব্যক্ত করে এবং বেদান্তমতে ত্রিগুণের সম্পর্কিত অবিদ্যা চিদানন্দের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। অপরপক্ষে মূল প্রকৃতি বা মায়ার সারাংশ হইতেছে প্রকৃতির উপাদানের ত্রিগুণ বা তিনটি বিশেষত্ব, যদনুসারে ইহা চিৎশক্তিকে বিকাশ বা আচ্ছন্ন করিয়া থাকে।

মূল-প্রকৃতি নিত্য হইয়াও অচিৎ। চৈতন্যবিহীন হইলেও ইহা কর্তৃত্ব, গতি ও পরিবর্তনশীল। ইহাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ। মূল-প্রকৃতি হইতে সমস্ত বস্তু প্রসূত হইলেও এবং সাংখ্য তন্ত্রের মতে বিকৃতি ও তত্ত্বসমূহের জন্মদান করিলেও ইহার সারাংশ কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, যে গুণসমূহ

* Vide, "Creation as Explained in the Tantra" by T. G. Woodroffe.

ইহার উপাদান, তাহারা সকল সময়েই অপরিবর্ত্তিত থাকে। জাত পদার্থগুলির পুনঃপুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব হইলেও তাহাদের উৎপত্তির উৎস কখনই নিঃশেষ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

সাংখ্যমতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই সত্য ও পৃথক্‌ এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে স্ব-তন্ত্র। বেদান্ত কিন্তু দুইটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্‌ সত্যের অস্বীকার করেন। বেদান্তমতে একমাত্র সদ্‌বস্তু হইতেছেন নির্গুণ ব্রহ্ম। মূল-প্রকৃতি বা মায়া অবস্তু। অবিদ্যাও যেমন অবাস্তব, তাহার কারণ-স্বরূপ মায়াও তদ্রূপ।

সাংখ্য, বেদান্ত ও তন্ত্র তিন মতেই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির কারণ হইতেছে মূলপ্রকৃতি বা অচিৎ-এর সহিত চিৎ-শক্তির সমন্বয় বা সহযোগ। সাংখ্য ও তন্ত্র উভয় মতেই মূল-প্রকৃতিতে গুণগুলির সাম্যাবস্থা আছে। কিন্তু মূল-প্রকৃতির সারই হইতেছে গতি, সেই জন্য সাম্যাবস্থাতেও গুণগুলির পরিবর্ত্তন হইতেছে, যাহাকে বলে স্বরূপ-পরিণাম। গুণ-গুলির প্রকৃতিগত সূক্ষ্মগতির নিমিত্তও কোন ফল হয় না; কিন্তু অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল বশতঃ গুণগুলির সাম্যাবস্থার পরি-বর্ত্তন হইয়া গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টির সূচনা হয়। সৃষ্টির কারণ-স্বরূপ এই প্রথম গতি বা দোলনকে তন্ত্রশাস্ত্রে পরাশব্দ বলে। পুরুষ ও মূল-প্রকৃতির সমন্বয়ে যে স্পন্দন আরম্ভ হয়, তাহার ফলেই বিশ্ব সৃষ্ট হয়। এই আদিম গতি-তরঙ্গের বিভিন্ন ভাব হইতে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান ইথর-(ether) তরঙ্গের স্পন্দন স্বীকার করিতেছে। এই নূতন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের "স্পন্দন-বাদ" ভারতের সুপ্রাচীন যুগ হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। "হ্রীং হংসঃ", এই কথাটিতে "হংসঃ" কথাটির মূল ধাতু "হন্তি"র অর্থ গতি। ভাষ্যকার সায়ন বলেন, ইহার নাম আদিত্য; কারণ, ইহা সর্ব্বদাই গতিশীল।

কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা এই "স্পন্দনবাদ"-(doctrine of vibration)কে বৈজ্ঞানিক "ইথর" (ether) অপেক্ষা অনেক দূরে লইয়া গিয়াছে। কারণ, "ইথর" মহাভূত পদার্থের অতিরিক্ত নহে। পরাশব্দ সৃষ্টির সদৃশ-পরিণাম অনুসারে মূল-প্রকৃতির গুণসমূহের মধ্যে স্পন্দন বা গুণক্ষোভ চলিতে থাকে, সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ বা পাঞ্চভৌতিক দেহেও ঐ স্পন্দনের অভাব দৃষ্ট হয় না। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট শব্দকে মধ্যম ও বৈখরী বলে। সুপ্রাচীন প্রাচ্যজ্ঞানধারা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য স্বীকৃত না হইবার কারণ হইতেছে যে, সাধারণ প্রাচ্যদর্শনবিষয়ে অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের এতদ্দেশীয় অনু-সরণকারিগণ ভারতীয় ধারণাগুলিকে অনেকটা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, এই সকল ভারতীয় ধারণার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে; মানসিক রসায়ন হিসাবে ইহাদের মূল্য থাকিলেও ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য বা উপযোগিতা বিশেষ কিছুই নাই।

স্পন্দনশীল মূলপ্রকৃতি ও তাহার গুণগুলি একইরূপ থাকিলেও কোনও সময়ে তাহাদের একটির, কোনও সময়ে অপরটির প্রাধান্যের নিমিত্ত বিবিধ বিকৃতি ও তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এই বিকৃতি ও তত্ত্ব হইতে আবার মন ও জড় জাগতিক বিভিন্ন বস্তু সৃষ্ট হয়।

সৃষ্টি আরম্ভ হয় কেন, ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে শেষ-মীমাংসা করা যায় না। কারণ, যদি তাহা যাইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিশ্বনিয়ামক কার্য্য-কারণের নিয়মের মধ্যে পড়িতেন; কিন্তু সকল বিষয়ের আদি কারণরূপে তিনি নিজে ঐ নিয়মের বহির্ভূত। এই জন্য সহজে ইহাকে জগজ্জননীর লীলা বলা হইয়াছে (It is the play of the Mother)।

অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের সহিত তন্ত্র অদৃষ্ট-সৃষ্টি বা জীবের কর্ম্মফলের নিবন্ধনই সৃষ্টির প্রেরণা হয় ইহা স্বীকার করে। কিন্তু কর্ম্ম ত নিত্যকালের, সুতরাং তাহারই ব্যাখ্যার প্রয়ো-জন। কর্ম্ম সংস্কার-জন্য এবং সংস্কার কর্ম্ম-জন্য। এই মতবাদ অনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় অবিরত অনন্তকাল ধরিয়া জগন্মাতার লীলা বা বিশ্বের জীবন্মৃত্যুর তালে-তালে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। এই নিমিত্ত তাঁহার (জগন্মাতার) সম্বন্ধে 'ললিত-সহস্রনাম' গ্রন্থে একটি সুন্দর কথা বলা হইয়াছে যে, তাঁহার আঁখির পলকে শত সহস্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে। কর্ম্ম যতক্ষণ থাকিতেছে, বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যও ততক্ষণ থাকিতেছে। এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে, কর্ম্ম সংস্কার-জন্য এবং সংস্কার কর্ম্ম-জন্য।

ব্রহ্মের যখনই অভিপ্রায় হইল, "এক আমি বহু হইব," তখনই তন্ত্রের মতে সদৃশ-পরিণাম আরম্ভ হইল, অর্থাৎ মহাবিন্দুর আবির্ভাব হইল। তন্ত্রে এই ব্যাপারটিকে

কামকলা বলা হইয়াছে। এই কামকলা হইতেছে সকল মন্ত্রের মূল-স্বরূপ। যদিও কর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, কিন্তু অগণিত কর্ম্মের মধ্যে সকল সময়েই কিছু অপরিণত ও কিছু পরিণত থাকিয়া যায়। পরিণত কর্ম্ম ফল-ভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি হয়। অপরিণত কর্ম্মের নিমিত্ত সৃষ্টির প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত পরিণত কর্ম্মভোগের পরই এক একবার প্রলয় হয়। অতঃপর বিশ্ব পুনরায় মায়ায় আচ্ছন্ন হয় এবং যে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট কর্ম্ম না পরিণত হইয়া উঠে, সে পর্য্যন্ত থাকে। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় প্রলয়কালে কর্ম্মও ব্রহ্মে বিলীন হয় এবং শক্তিশালী বীজের ন্যায় অবস্থান করে, সুপক্ক বীজ হইতে শস্যাঙ্কুরের ন্যায় পরিণত কর্ম্ম হইতে পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভ হয়।

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির ইচ্ছা হওয়ার পর সৃষ্টি হইতে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের মনের গঠন এইরূপ যে, সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের পরিকল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়। নিছক দার্শনিকভাবে বিচার করিতে গেলে সকল পদার্থেরই যুগপৎ সৃষ্টি হয়, এইরূপ কল্পনা করিতে হয় এবং ঐ সকল পদার্থের সত্তাও মাত্র মায়িক সত্তা। কিন্তু জীবের দিক্ হইতে বিবেচনা করিতে গেলে মূলীভূত অব্যক্ত বিন্দুরূপ (শারদাতিলকের মতে মূল-প্রকৃতি) হইতে তত্ত্ব, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মহাভূত পর্য্যন্ত একটা বাস্তব পরিণাম স্বীকার করিতে হয়।

সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে 'বিশ্বসার তন্ত্র' বলেন যে, পৃথিবী হইতে ওষধি উৎপন্ন হয়, ওষধি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে রেতস্ বা বীজ সমুৎপন্ন হয়। বীজ হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভাবে প্রাণিগণ সৃষ্ট হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কর্ম্মের বিপরিণাম বশতঃ বিশ্ব-সৃষ্টি। নিষ্কলা শিব সকলায় পরিণত হয়। শক্তির প্রকাশ হয় এবং ঈশ্বরের কারণশরীর সদৃশ-পরিণাম বশতঃ সাত প্রকার কারণে পরিণত হয়, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে শক্তির সাতটি অবস্থাস্বরূপ। পরাবিন্দু বা শক্তির তদানীন্তন অবস্থা হইতেছে প্রকাশমান শব্দ ও অর্থের কারণ-শরীর। কারণ-শরীরে ইচ্ছা, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই ত্রি-শক্তিরূপে বিশিষ্ট-বিপরিণাম হইবার পর প্রকাশমান জগৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থ-রূপে প্রতিভাত হয়।

ন্যায় বৈশেষিক যৌগিক সৃষ্টি স্বীকার করেন; সাংখ্য ও পাতঞ্জল যৌগিক ও পরিণাম সৃষ্টি স্বীকার করেন; বেদান্ত যৌগিক ও পরিণাম সৃষ্টি এবং বিবর্ত্তবাদ মানেন। সকলের মতেই সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা আসে অদৃষ্ট হইতে। তন্ত্র উল্লিখিত সকল মতের উপর অধিকন্তু একটি অদৃষ্ট সৃষ্টি স্বীকার করেন। এই হিসাবে তন্ত্র-মত সকল দর্শনের সমন্বয় বা সারস্বরূপ (কারণ, পরাবিন্দুর আবির্ভাব পর্য্যন্ত তন্ত্র অদৃষ্ট-সৃষ্টি স্বীকার করে। তান্ত্রিক অদ্বৈতবাদের তিনটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে,—যথা, মূল প্রকৃতির বাস্তবতা, সদৃশ পরিণাম, ইহা এক প্রকার বিবর্ত্ত, এবং লয়। এই ক্রমোন্নতি শব্দার্থের প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে)।

শ্রীদেবদেব ভট্টাচার্য্য, (এম-এ, কাব্যতীর্থ)।

ভিক্ষা

জগতের মাঝে সকলের ছোট ক্ষুদ্র প্রাণীটি আমি,
বিশ্বের মাঝে সকলের বড় তুমিই জগত-স্বামী।
তোমার চরণে জীবনে মরণে ভিক্ষা আমার প্রভু,
জগতের মাঝে অতি ছোট আমি ভুলে নাহি যাই কভু।

বিশ্বের মাঝে যতবার তুমি পাঠাবে আমারে স্বামী,
তোমার আদেশ পালন করিতে যেন নাহি ভুলি আমি।
মিনতি আমার আছে বলিবার কহি' তা চরণ ধরে,
মহৎ করিও হৃদয় আমার, ক্ষুদ্র করিও মোরে!

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীঠাকুর—কাশীপুরে

কাশীপুরের বাগানে আসিয়া স্থানপরিবর্ত্তনের গুণে অথবা ডাক্তার সরকারের ঔষধের গুণে—যে কারণেই হউক, ঠাকুরের শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। শরীরে কিঞ্চিৎ বলও আসিয়াছিল। তিনি উপর-তলা হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাগানে সামান্য সামান্য বেড়াইতেও

লক্ষ্মীমণি দেবী

সমর্থ হইলেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী সেবার্থ বাগানে আসিয়াছেন, সঙ্গে ব্রাহ্মণীভক্ত গোলাপও আছেন। পরে লক্ষ্মীমণি আসিয়াও মিলিলেন।

লক্ষ্মীমণি ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের কন্যা। ইনি বালবিধবা। ইঁহার বৈধব্য সম্বন্ধে ঠাকুর যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থানে বলা উচিত মনে করি। লক্ষ্মীর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেলে, যে দিন পাকা দেখা হইল, সে দিন হৃদয় মুখোপাধ্যায় আনন্দ সহকারে সেই শুভ সংবাদ ঠাকুরকে আসিয়া জানাইলেন। ঠাকুর তখন কতকটা ভাবস্থ ছিলেন। তিনি হৃদয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীর বিবাহ? বিবাহ দিলে ত' সুফল হ'বে না—লক্ষ্মী যে বিধবা হ'বে।" এই দিনে ঠাকুরের এই দারুণ কথা শুনিয়া হৃদয় ঠাকুরের মুখে হাত চাপিয়া বলিলেন, "মামা, তুমি কি কঠোর কথা বল্লে? আজ এই শুভদিনে এই কি তোমার আশীর্ব্বাদ!" এতক্ষণে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তিনি হৃদয়কে বলিলেন, "হৃদু, আমি কি বলিয়াছি বল্ ত। আমি কি কোন অমঙ্গলসূচক বাক্য বলিয়াছি?" তখন হৃদয় তাঁহাকে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনাইলেন। শুনিয়া ঠাকুর দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "হৃদু, জানি না, মা কেন আমার মুখ দিয়া এমন কথা কহিলেন—কিন্তু কথা যখন বাহির হইয়াছে, তখন তাহা আর মিথ্যা হইবে না।" বলা বাহুল্য, সে সত্যবাক্য হাতে হাতে ফলিয়া গেল এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মীমণি বৈধব্য প্রাপ্ত হইলেন। ঠাকুর লক্ষ্মীকে দেবী-অংশ—শীতলামাতার অবতার বলিতেন।

অপরাপর তরুণ ভক্তরাও সেবার্থ কাশীপুরে আসিলেন। তাঁহারা নীচের ঘরে থাকিতেন, বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তে কয়েকটি একতলা কামরা ছিল, সেইখানে সেবক-ভক্তরা বসিতেন। গৃহস্থ ভক্তরা প্রত্যহই আসিতেন, সংবাদাদি লইতেন এবং কেহ মধ্যে মধ্যে রাত্রেও থাকিতেন।

২৭শে ডিসেম্বর ঠাকুর ভাবাবস্থায় বুড়ো গোপাল ও কালীপদ ঘোষকে কৃপা করিলেন। ঠাকুরের রোগ হইয়াছে লোক বাছিবার জন্য, কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ উহা নির্দ্দিষ্ট হইবার জন্য, মাষ্টার এই কথা বলাতে, ঠাকুর বলিলেন, "তাই বটে। নিরঞ্জন বাড়ী গিয়েছিল; এখন কিন্তু আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ তা বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন, মশাই,'

জিজ্ঞাসা করে ও আবার সংসারে ফিরে যায়, তারাই বহিরঙ্গ। অবতার যখন আসেন, তখন ভক্তরাও সঙ্গে আসে,—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, আবার রসদ্দার।"

১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬ ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন। এদিন ঠাকুর একটু ভাল বোধ করিলেন। বেলা ৩টার সময় বাগান ভক্তগণে পরিপূর্ণ হইল, ছুটীর দিন, সকলেই প্রায় উপস্থিত আছেন। ঠাকুর উপর হইতে বাগানে নামিলেন। পরনে লালপাড় ধুতি, গায়ে সবুজ রংয়ের জামা, বনাতের কাণ-ঢাকা টুপী মাথায়, পায়ে মোজা ও বার্ণিশ করা চটি, মুখ জ্যোতির্ম্ময় ও লাবণ্যপূর্ণ। ভক্তরা কেহ কেহ গাছতলায়, কেহ বা এদিকে ওদিকে ছিলেন; তাঁহারা সকলে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর যখন নামিতেছিলেন, তখন এই কথা বলিতেছিলেন যে, রাম, গিরিশ প্রভৃতি তাঁহাকে অবতার বলে কেন। তারপর বাগানে গিরিশকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাকে অবতার বলিয়া প্রচার কর কেন?" উত্তরে গিরিশ ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া করজোড়ে উর্দ্ধমুখে বলিলেন, "প্রভু, ব্যাস, বাল্মীকি যাঁর অন্ত পান নাই, এবং যাঁর অবতারত্বের মহিমার বিপুল বর্ণনা করিয়াও নিজ নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়েছেন—সেখানে আমি কোন্ ছার যে, অবতার—আপনার মহিমা ভাষায় বর্ণনা করিব।" কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ভাবপূর্ণ হইয়া বলিলেন, "আর বেশী তোমাদের কি আশীর্ব্বাদ ক'রব, তোমাদের সবারই চৈতন্য হউক—তোমাদের সকলেরই মনে আনন্দ জাগিয়া থাকুক।" ইহা শুনিয়া ভক্তরা আনন্দে মাতিয়া ঠাকুরকে স্পর্শ করিয়া একে একে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং তিনি আশীর্ব্বাদ সহকারে প্রত্যেকের বুকে হাত স্পর্শ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে অনেকেরই আশ্চর্য্যদর্শন হইতে লাগিল;—কেহ বা ভাবে হাসিতে, কেহ বা কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ হঠাৎ ধ্যানমগ্ন হইয়া গেলেন। বাগানে তখন যে যেখানে আছে, গিরিশচন্দ্র তাহাদের ডাকিয়া আনিয়া আজি এই বাঞ্ছাকল্পতরুর কাছে মানবজীবনের সার্থকতা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। হরমোহনকে ঠাকুর বলিলেন, "তোমার আজ থাক।" হাজরা তখন ছিলেন না, কিছু পরে আসিলে নরেন্দ্র তাঁহাকে কৃপা করিতে ঠাকুরকে বলিলে, ঠাকুর বলিলেন যে, ওর এর পরে হ'বে। রামলাল, অক্ষয়, বৈকুণ্ঠ, নবগোপাল, অতুল, কিশোরী ইত্যাদি অনেককেই এই দিন কৃপাময় ঠাকুর চৈতন্য দান করিয়া তাহাদের নরজন্ম সার্থক করিয়া দিলেন!

এইরূপ কৃপা ও চৈতন্যদান করিবার পর ঠাকুর উপরে আসিলেন ও শয্যায় শয়ন করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার বিষম গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। রামলালকে গঙ্গাজল দিয়া গা ধোয়াইয়া ও মুছাইয়া দিতে শ্রীঠাকুর আজ্ঞা করিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "দেখছি, শালারা পাপ কিছু করতে বাকি রাখে নাই, তাই আমার এই জ্বালা!" ঠাকুরের অসুখ যে এইরূপে সর্ব্বজীবের পাপ-তাপের বোঝা-গ্রহণের ফল—ইহা তাঁহারই অন্য একটি ইঙ্গিত। তিনি শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন—তাই সকলের পাপ লইয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ ও পাপশূন্য করিয়া নিজের জীবন অকালে বিসর্জ্জন দিতেছেন!

১লা জানুয়ারী, যাঁহারা শ্রীঠাকুরের কৃপা পাইতে বাকি ছিলেন, তিনি প্রায় তাঁহাদের সকলকেই ক্রমশঃ কৃপা করিয়াছেন, কেবল নরেন্দ্রকে কিছুই করেন নাই। তাই তিনি দুই দিন পরে ঠাকুরকে বলিলেন, "সব্বাইএর হ'লো দেখলাম, আমায় কিছু দিন। সব্বাইয়ের হোলো আমার হবে না?" ঠাকুর বলিলেন, "তুই বাড়ীর একটা ঠিক ক'রে আয় না, সব হ'বে। তুই কি চাস্?" নরেন্দ্র বলিলেন, "আমার ইচ্ছা মুনি-ঋষিদের মত ৩।৪ দিন অমনি সমাধিস্থ হ'য়ে থাক্‌বো। কখনো একবার খেতে উঠবো!" ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "তুই ত' বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার চেয়ে উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত গান করিস, 'যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়!' সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন এইটিই খুব উচ্চ অবস্থা।"

নরেন্দ্র মধ্যে বাড়ীতে গিয়া পড়াশুনার দিকে মন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন (তিনি তখন Law পড়িতেছিলেন); কিন্তু তাহা আর পারিলেন না। পড়াতে বিষম আতঙ্ক হইল। বুকের ভিতর কোন এক অজ্ঞাত বেদনা আসিয়া উদয় হইল—প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় একদিন তিনি খুব উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। অতঃপর বাড়ী ত্যাগ করিয়া কাশীপুরের দিকে এক দৌড়ে দ্রুত আসিতে লাগিলেন। বাগবাজার খোড়ো-ঘাটার খড়ের গাদার কাছ দিয়া দৌড়াইতে পায়ে খড় জড়াইয়া গেল, জুতা পদ হইতে স্খলিত

হইয়া কোথায় পড়িয়া গেল, সে দিকে তাঁহার চেতনা রহিল না। নরেন্দ্র 'বিবেকচূড়ামণি' পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন যে, তিনটি জিনিষ মনুষ্যজন্মে বড়ই দুর্ল্লভ—মনুষ্যত্বং, মুমুক্ষুত্বং, মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। নরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জীবনে বহু বহু সৌভাগ্যফলে এই তিনটি বস্তুরই যোগাযোগ ঘটিয়াছে। তবে এ সমাবেশ কি বৃথা যাইবে! নরেন্দ্রের এই তীব্র বৈরাগ্য ঠাকুর লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি দুই একটি ছোক্‌রা ভক্তকে বলিতে লাগিলেন, "নরেন্দ্রের কি আশ্চর্য্য অবস্থা দেখেছ। এই

কাশীপুরের বাগান-বাড়ী

নরেন্দ্র আগে সাকার মান্‌তো না! অথচ এর প্রাণ এখন কিরূপ ব্যাকুল হ'য়েছে দেখ। ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আঁকু পাঁকু করলে জানবে যে, দর্শনের আর দেরী নেই। যেমন অরুণ উদয় হ'লে পূর্ব্বদিক্ লাল হ'লে বুঝা যায়—সূর্য্য উঠবে।" নরেন্দ্র কিছুদিন কাশীপুরে আসিয়া রহিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে তপস্যা করিতে যাইতে লাগিলেন। সঙ্গে থাকিত কখন বুড়ো গোপাল, কখন কালী, কখন তারক। মাষ্টার নরেন্দ্রকে একশত টাকা যোগাড় করিয়া দিলেন—তাহাতে নরেন্দ্র বাড়ীর তিন মাসের খোরাকের ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। ঠাকুর এইরূপ আজ্ঞাই নরেন্দ্রকে করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ছোট নরেনের ও আর কোন কোনও তরুণ ভক্তদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আসা-যাওয়া সেই জন্য কম পড়িতে লাগিল। ডাক্তার সরকার—যিনি এখনও দেখিতেছিলেন, তিনি ঠাকুরের আরোগ্যলাভের বিষয়ে এক রকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্তকে তখন দেখান আরম্ভ হইল। ইনিও হোমিওপ্যাথ। ক্রমশঃই রোগের বৃদ্ধি হইতেছে, গলার বাহিরের দিকে ক্ষত দেখা দিয়াছে। ঠাকুর কথা কহিতে অতিশয় কষ্ট বোধ করেন। আওয়াজ প্রায়ই নাই, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে রক্ত-পুঁযের অতিশয় স্রাব হইলে ঠাকুরকে নির্জ্জীব করিয়া দিত। ঠাকুরের দেহে আর কিছু নাই—জীর্ণশীর্ণ। আহার ভাতের মণ্ড বা সুজী, তাহাও অতি কষ্টে খান। কখনও কখনও বা মাংসের একটু ক্কাথ দেওয়া হয়, এই অল্প আহারে আর শরীর বুঝি থাকে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখনও ভক্তদের জন্য তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই। বাহিরে ক্ষতে লাগাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর বাগানের মুহুরী ভোলানাথ 'তেলপড়া' দিয়াছেন, তাহা লাগানও চলিতেছিল।

৭ই মার্চ্চ কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা হইয়া গেল। মাত্র পূজাটি হইল, উৎসব হইল যৎসামান্য। ভক্তগণ বিষাদসাগরে মগ্ন, শ্রীগুরুদেবের এমন কঠিন পীড়া! একদিন রাত্রিতে দ্বিপ্রহরে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিলেন—"তোমরা কাঁদবে ব'লে এত সহ্য করছি—সব্বাই যদি বল যে বড় কষ্ট, তবে দেহ যাক্—তা হ'লে দেহ যায়!" মাষ্টার

তাহা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এরই নাম কি crucifixion—ভক্তদের জন্য দেহবিসর্জ্জন? যিশুর কি এই অবস্থা হইয়াছিল? সেই রাত্রিতে অসুখ অতিশয় বাড়িয়া উঠিল—কলিকাতায় লোক পাঠান হইল। গিরিশ, উপেন্দ্র ডাক্তার ও নবগোপাল কবিরাজকে লইয়া আসিলেন। ঠাকুর একটু সুস্থ হইয়া গিরিশকে বলিলেন, "দেখ, অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি। তার মধ্যে এই রূপটিও দেখে'ছি।" ঠাকুরের রূপটিও ঈশ্বরীয় রূপ অর্থাৎ ঠাকুর ঈশ্বরের অবতার এই কথা পরম বিশ্বাসী ভক্ত গিরিশকে ইঙ্গিতে বলিলেন।

পরদিন প্রভাতে ভক্তরা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—গত রাত্রে বিষম অসুখ গিয়াছে। ঠাকুর নিজেই বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌ছি তিনিই সব হ'য়েছেন। মানুষ আর জীব যা দেখছি, যেন সব চামড়ার খোল—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত-পা নাড়ছেন। দেখ্‌ছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়কাঠ!" কিছুক্ষণ পরে রাখাল ও নরেনকে—ছোট ছেলেকে যেমন মুখে হাত বুলিয়ে আদর করা হয়, তেমনি ভাবে ঠাকুর আদর করিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "শরীরটা কিছুদিন থাক্‌তো তো আরও লোকের চৈতন্য হ'তো! তা রাখবে না। সরল মূর্খ দেখে পাছে লোক সব ধরে পড়ে! সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে ত' কলিতে ধ্যান জপ নাই।" রাখাল তখন বলিলেন, "আপনি বলুন, যাহাতে আপনার দেহ থাকে।" ঠাকুর বলিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।" নরেন্দ্র তাহাতে উত্তর করিলেন, "কিন্তু বুঝ্‌ছি যে, আপনার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এখন এক হয়ে গেছে।" ঠাকুর কিন্তু বলিলেন, "তা' আর ব'ল্লে কই হয়?—এখন দেখছি এক হ'য়ে গেছে। শ্রীমতী ননদিনীর ভয়ে কৃষ্ণকে ব'ললেন, তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো, তাই তিনি রইলেন। কিন্তু যখন আবার ব্যাকুল হ'য়ে কৃষ্ণকে বাহিরে দর্শন ক'রতে চাইলেন—এমনি ব্যাকুল যেন বেড়াল বুকের ভিতর আঁচড় পাঁচড় ক'রছে—তখন কিন্তু কৃষ্ণ আর বেরয় না!"

তারপর ঠাকুর নিজেই বলিতে লাগিলেন, "এর ভিতর দু'টি আছেন—একটি তিনি আর একটি ভক্ত হ'য়ে আছেন। ভক্তরই হাত ভেঙ্গে ছিল, তাঁরই অসুখ করেছে, বুঝেছ?" সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, "কাকেই বা ব'লবো, কেই বা বুঝবে! তিনি মানুষ হ'য়ে—অবতার হ'য়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তরা আবার তাঁর সঙ্গেই চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো; সকলে গান গাইলে; আবার হঠাৎ চ'লে গেল। এলো গেলো কেউ চিন্‌লে না। 'তাঁরে কেউ চিন্‌লি না রে; ও সে, দীন-হীন কাঙ্গালের বেশে, ফিরছে জীবের দ্বারে দ্বারে'।"

ঠাকুর ভক্তদের সস্নেহে দেখিতেছিলেন। প্রথমে নরেন্দ্রের দিকে আঙ্গুলের ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন, পরে মাষ্টারকে দেখাইলেন। রাখাল ইঙ্গিত বুঝিলেন, বলিলেন, "আপনি বুঝি বলছেন, নরেন্দ্রের বীরভাব আর এঁর সখীভাব।" ঠাকুর শুনিয়া হাসিলেন, তারপর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমার কি ভাব?" নরেন্দ্র বলিলেন, "আপনার বীরভাব, সখীভাব, সব ভাব।" এই কথায় ঠাকুর ভাবপূর্ণ হইয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছি, এর ভিতর থেকেই যা কিছু!" তার পর নরেন্দ্রকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝলি?" নরেন্দ্র বলিলেন, "যা কিছু অর্থাৎ যত কিছু সৃষ্ট পদার্থ সবই আপনার ভিতর থেকে (অর্থাৎ আপনিই সেই মহাকারণ ব্রহ্ম)।" উত্তর শুনিয়া ঠাকুর প্রীত হইয়া রাখালকে বলিলেন, "দেখেছিস্‌, নরেন্দ্র কেমন আমাকে বুঝছে!" তারপর নরেন্দ্র যখন ভাবপূর্ণ হইয়া গাহিলেন, 'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান!' তখন গান শুনিয়া ঠাকুর ও রাখাল প্রেমাশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন—ভক্তরা মুগ্ধ হইলেন। স্থানটিতে একটি বিষাদপূর্ণ প্রেম ও বিরহ-স্রোতঃ যেন বহিতে লাগিল।

নরেন্দ্রের বৈরাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুর বুঝিলেন যে, নরেন্দ্রের কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হইয়াছেন। এই সময় এক দিন বাগানের বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধি ঘটিল। কিঞ্চিৎ বাহ্য আসিলে তিনি কেবল নিজের মুখটি আছে দেখিতে লাগিলেন, দেহের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেন না। বুড়ো গোপাল যতই বলেন, "নরেন্দ্র, এই যে তোমার দেহ রয়েছে।" তিনি ততই বলেন, "কই আমার দেহ কই?" তখন ঠাকুরের কাছে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইল—তিনি বলিলেন, "সমাধির জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলে, এই তো আস্বাদন হইল। এখন কিন্তু তোমার সমাধির চাবি আমি বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার কার্য্য-শেষে আবার ঘর খুলিয়া যাইবে।"

ইহার কয়দিন পরে নরেন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া কালী ও তারককে সঙ্গে লইয়া গয়ায় গমন করিলেন। তাঁহারা বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধমূর্ত্তি দর্শন ও মূর্ত্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ঠাকুর কাঁদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ওরে, সে যে আমার মাথার মণি! সে ব্যাকুল হয়ে সর্ব্বত্যাগী হয়ে যা খুঁজছে তাই পাবে।" এই সময় ঠাকুর নরেন্দ্র সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র কলিযুগের খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞানী, নরেন্দ্রই বেদান্তের অধিকারী" এবং পরে একদিন কাশীপুর বাগানে তিনি ফিরিয়া আসিলে শ্রীঠাকুর নরেন্দ্রকে আদেশপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, "নরেন্দ্র লোক-শিক্ষা দিবে।"

১লা বৈশাখ ১২৯৩, প্রাতে মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ঝোল খাইতে কষ্ট হইতেছে, তাই তিনি মাষ্টারকে একটি সাদা পাথরের বাটি আনিতে বলিয়াছিলেন, তিনি নূতন বাজার হইতে বাটি ক্রয় করিয়া আনিলেন। এই দিন ঠাকুরের পায়ের মাপ লওয়া হইল। যে চটী জুতা আছে ছোট হইয়া কসা হইয়াছে, তাই ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত নূতন চটি * আনিয়া দিবেন। রাজেন্দ্র দত্তের সঙ্গে শ্রীনাথ ডাক্তার গীতা হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন।

আজ পাগলী ভক্ত আসিয়াছেন। এই পাগলীর সম্বন্ধে শুনা যায় যে, প্রথমে সে একজন ব্রাহ্মিকা ছিল, পরে তাহার চরিত্র নষ্ট হয় ও শেষে পাগল হইয়া যায়। শ্রীঠাকুর ১৮৮৫, ২৩শে মে তারিখে যখন রামচন্দ্র দত্তর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেই দিন পাগলিনী রামচন্দ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। পাগলী দেখিতে কুবেশা, কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু গলাটি ছিল অতিশয় মিষ্ট। সুরেন্দ্র পাগলিনীর পরিচয় করিয়া দিলে ঠাকুর তাহাকে শ্যামা-সঙ্গীত গাইতে আদেশ করিলেন। পাগলীর সুকণ্ঠে অনুরাগভরে গীত সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন—পাগলীও গান গাইতে গাইতে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই দর্শনের পর পাগলী ঠাকুরকে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিল বটে, কিন্তু ঠাকুরকে আর ভুলিতে পারিল না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইত। একদিন দর্শন করিতে করিতে হঠাৎ বেজায় কান্না আরম্ভ করিয়াছিল। ঠাকুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—"আমার মাথা-ব্যথা করিতেছে!" আর একদিন ঠাকুর আহার করিতেছেন, এমন সময় পাগলী দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর আহার করিতেছেন, ওদিকে পাগলী বলিল, "আপনি আমায় মনে ঠেলিলেন কেন?" ঠাকুর তাহার ভাব কি, জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিল, "আমার মধুর ভাব।" ঠাকুর তখন বলিলেন, "সে কি হয় রে! সব মেয়ে যে আমার মা হয়।" তাতে পাগলী বলে, "আমি তা জানি না!"

আজকাল ঠাকুরের বড়ই অসুস্থ দেহ, অথচ পাগলী ফাঁক পাইলেই হঠাৎ ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়ে। তাই নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তরা বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং এই কারণে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া পাগলীর উপরে যাইবার পথ এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাগলী কিন্তু বর্ষের প্রথম দিনে অসুস্থ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছে—এদিকে নিরঞ্জনও উপরে যাইতে দিবেন না। পাগলী মাটীতে পড়িয়া নিরঞ্জনের পা জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং কাতর অনুনয় করিতেছে একবার যাইতে দিতে। নিরঞ্জন ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুরের সেবক শশী তাহাকে আসিতে দিবেন না। তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন এবং কথা না শুনিলে মারিয়া তাড়াইবেন, এমন কথা বলিয়াছেন। তাহা শুনিয়া শ্রীঠাকুর মাষ্টারকে দিয়া শশীকে বলিলেন যে, তাহাকে মার-ধর কিছু যেন করা না হয়। 'সে শ্রীঠাকুরকে দর্শন করবে—চলে যাবে।' আহা! অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ভক্তবৎসল ভগবান্! তখন পাগলী সাহস পাইয়া উপরে যাইতে লাগিল—ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য। ঠাকুর আস্তে আস্তে বলিলেন—"নমস্কার ক'রে যেতে বল; আর কিছু ব'লে কায নাই।" ইতিমধ্যে পাগলী আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছে—ইচ্ছা একটু থাকে। প্রণামান্তে শশী পাগলীকে নামাইয়া লইয়া গেলেন।

১লা বৈশাখ নববর্ষ, তাই মেয়ে-ভক্তরাও আসিয়াছেন, তাঁহারা ঠাকুরকে ও শ্রীমাতা ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন। কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি

* এই চর্ম্মপাদুকা এখনও মঠে পূজিত হইতেছে।

ও আবীর দিলেন। ঠাকুর অল্পদিন পূর্ব্বে মাষ্টার ও কিশোরীর স্ত্রীকে কৃপা করিয়াছিলেন। কৃপা পাইয়া ইঁহাদের একজন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার এত দয়া!" তাঁহারাও দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বলরামের স্ত্রী আসিয়াছেন। বাগবাজারের ব্রাহ্মণীও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কথায় গান গাহিতে লাগিলেন,—"হরি, খেলবো আজ তোমার সনে।" বৈকালে সুরেন্দ্র আপিসের ফেরতা আসিয়াছেন ফল ও ফুল হাতে। তিনি ঠাকুরকে মালা দিলেন। রামও মালা আনিয়াছিলেন, তিনিও ঠাকুরকে মালা নিবেদন করিলেন। সুরেন্দ্র বলিলেন যে, তিনি আজ নববর্ষের দিনে কালীঘাটে গেলেন না। যিনি সাক্ষাৎ কালী, তাঁহাকেই দেখিতে আসিয়াছেন। কথাগুলি শুনিয়া ঠাকুর ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন।

তাহার পর তিন দিন গিয়াছে, ঠাকুর এদিন একটু ভাল আছেন। গিরিশ দর্শন করিতে আসিলেন ও ঠাকুর তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহাকে জলখাবার খাওয়াইতে, তামাক পাণ দিতে ঠাকুর লাটুকে আজ্ঞা করিলেন। মাষ্টার ঠাকুরকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন—পাখাখানি চন্দনকাঠের। এই পাখাখানি একজন ভক্ত আনিয়া দিয়াছেন। ঠাকুরকে মাষ্টার মালা আনিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন—ঠাকুর নিজে একে একে সে মালাগুলি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে দুই গাছা মালা মাষ্টারকে দিলেন। মাষ্টারের সাত আট বৎসরের একটি ছেলে মারা গিয়াছে, এই জন্য তাঁহার স্ত্রী শোকে পাগলের মত হইয়াছেন। মাষ্টারেরও শোক হইয়াছিল। লাটু সেই কথা ঠাকুরকে বলিলেন। শুনিয়া ঠাকুর চিন্তিত হইলেন। মাষ্টারও শোক পাইয়াছেন বুঝিয়া গিরিশ বলিলেন—"তার আর আশ্চর্য্য কি! অমন জ্ঞানী অর্জ্জুনও অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন।"

ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া গিরিশ জল খাইলেন। ঠাকুর তখন বালকের মত দিগম্বর। সেই অবস্থাতেই নিজ হাতে শয্যা হইতে অগ্রসর হইয়া ঘরের কোণে স্থিত কুঁজা হইতে গিরিশকে জল গড়াইয়া পান করিতে দিলেন। খাইতে খাইতে গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কোন্‌টা ঠিক, কষ্টে সংসার ছাড়া, না সংসারে থেকে তাঁকে ডাকা?" ঠাকুর মাষ্টারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"গীতায় তাই লিখেছে, আপনাকে অকর্ত্তা জেনে কর্ত্তার ন্যায় সংসার করা—এরই নাম অনাসক্ত সংসারী বা কর্ম্মযোগী। এরূপে সংসারে থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। যারা কষ্টে সংসার ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।" কথা কহিতে কহিতে গিরিশ অনেকগুলি কচুরি খাইয়া ফেলিয়াছেন—তাই ঠাকুর তাঁহাকে রাত্রে বাড়ীতে আর কিছু খাইতে নিষেধ করিলেন। বরাহনগরের ফাগুর কচুরি তখন বড়ই বিখ্যাত ছিল।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন তিনি প্রত্যহই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ধ্যান ও ঈশ্বরচিন্তা করিতে যান। সঙ্গে কালী, তারক বা অন্য অন্য কেহ থাকে। শশী বাপ, মা, বাড়ী, এমন কি পড়া-শুনাও ছাড়িয়া দিয়া ঠাকুরের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে লাগিলেন। শশী তখন বি, এ পড়িতেছিলেন। লাটুও সেবক, এমন কি তিনি ঠাকুরের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন। শ্রীমা, লক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি ঠাকুরের আহার পথ্য বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগী আছেন। ঠাকুর মাষ্টারের পরিবারের শোকের কথা শুনিয়াছেন, তাই মাষ্টারকে বলিয়াছেন, তাঁহাকে আনিয়া বাগানে শ্রীমা'র কাছে দুই দিন রাখিতে। কোলের ছেলেটি (প্রভাস)কে যেন আনে। মাষ্টার বলিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার স্ত্রীর ভক্তিভাব বাড়ে, তা হ'লে শোকটা শীঘ্র যেতে পারে। ঠাকুর উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তা হয় না, শোক ভক্তিকে ঠেলে দেয়। কৃষ্ণকিশোর অমন জ্ঞানী ও ভক্ত ছিল। তার ভবনাথের মত বয়স্ক দু'-দুটি ছেলে মারা গেল, দুটো-আড়াইটে পাশ। প্রথম প্রথম শোক সামলাতে পারলে না। উন্মত্তবৎ হয়েছিল তার অবস্থা। আমায় ভাগ্যিস্ ঈশ্বর দেন নি!" মাষ্টারের ভ্রাতা কিশোরী আসেন নাই, তাই ঠাকুর মাষ্টারের কাছে তাঁহার খোঁজ লইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের সংসারের কষ্ট ও সেই জন্য সেই দিকের চিন্তা একটু একটু আছেই। তিনি গয়াতে কোথায় একটি জমিদারীর ম্যানেজারী কার্য্য পাইবেন আশা করিতেছিলেন। বার বার আশা ভঙ্গ হইয়াছে, তাই নরেন্দ্র মাঝে মাঝে এখনও সন্দেহ করেন যে, যে ঈশ্বরকে লোকে কৃপাময় বলে, সেরূপ ঈশ্বর বুঝি নাই। ঠাকুর এক দিন নরেন্দ্রকে বলিলেন যে, তিনিই স্বয়ং ঈশ্বর, এ কথা কেহ কেহ বলে।

তাহাতে নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "হাজার লোকেও যদি ঈশ্বর বলে, তবু আমার যতক্ষণ সে কথা সত্য ব'লে না বিশ্বাস হবে, ততক্ষণ আমি তা মানবো না।" তিনি চান যে, ঈশ্বর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দেখা দিবেন এবং তিনি তাঁহাকে দেখিবেন, যেমন লোকে গাছ মানুষ এই সব বস্তু দেখে। এই সম্বন্ধে তাঁহার সহিত মাষ্টারের কথোপকথন হইয়াছিল। মাষ্টার নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, বিশ্বাস না থাকলে যদি সত্যই স্বয়ং ঈশ্বর আসিয়া এক দিন দেখা দেন এবং বলেন যে, তিনি ঈশ্বর, দেখা দিতে এসেছেন, তা হ'লে তাঁকে হয় ত জোচ্চোর ব'লে তাড়িয়ে দিতেই ইচ্ছা হবে। ঠাকুর যে ঈশ্বর দেখেছেন, সে মনের ভুল নয়—ঈশ্বরদর্শনের জন্য মনের একটি বিশেষ অবস্থা হওয়ার প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শনও হয় না বা হ'লে তা সত্য ব'লে মনে করা যায় না।

তখন বৈশাখ মাস বড় গরম হয় দিনের বেলা—তাই সুরেন্দ্র ঠাকুরের ঘরের সব জানালায়-দরজায় লাগাইবার জন্য খস্‌খসের পর্দ্দা আনিয়া দিয়াছিলেন। পর্দ্দাগুলি যথাস্থানে লাগান হইয়াছে। রাজেন্দ্র দত্ত তখনও চিকিৎসা করিতেছেন—তিনি ভক্ত মনোমোহন মিত্রের সম্পর্কে কাকা হন।

[ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

ব্যথার-বেদন

অবিচ্ছিন্ন বেদনার গান ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে অখিল সংসারে,
ক্ষণিকের যে আনন্দ আসে তারি মাঝে সুখ-স্বপ্ন জাগে অকারণ;
সে আনন্দে তুমি আর আমি অবিশ্রান্ত কল্পনায় করিয়া গাহন
রচিয়াছি আকাশকুসুম, জাগিয়াছে আশাবরী বীণার ঝঙ্কারে।
অশ্রুপ্লুত এ মর্ত্ত্যভুবনে ব্যর্থ হয়ে যায় সব চিত্ত-অভিলাষ,
নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে সন্ধ্যার কবরীচ্যুত আলোকের মত
খসে যায় আশার মঞ্জরী তোমার আমার প্রাণ করিয়া আহত,
বৃথা এই কল্পনা-বিভ্রম।

বুঝিয়াছি দিনে দিনে পূরিবে না আশ।
সাধ ছিল স্বর্গ রচিবারে ধরণীর ধূলি'পরে সন্তানক আনি'
যার পুষ্প-বীজের বলাকা একদিন পক্ষ মেলি' নিখিল বেদনা
আবরিবে অমৃতের গানে, ভূমানন্দে র'বে জীব, ভুলিবে যাতনা।
বিশ্বে র'বে চির চিদাকাশ, প্রভুর মন্দির আর চৈতন্যের বাণী।
কোথা সুখ, কোথা শান্তি বলো! ভ্রান্তি-বিলাসের পথে চলিয়াছি সবে,
রহস্যের পারাবারে জাগে কত প্রশ্ন: কত সাধ মিলায় নীরবে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

নাচ *

[বিদেশী গল্প]
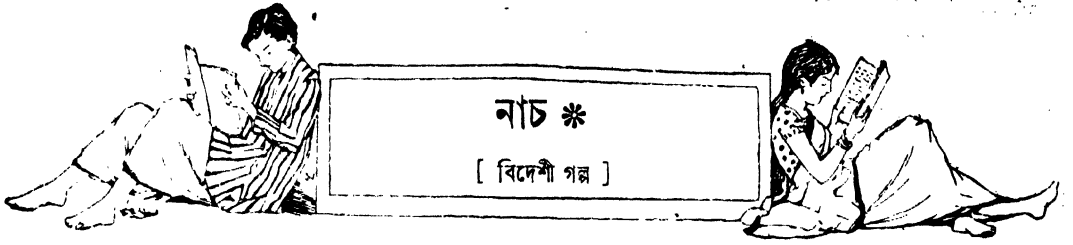
সাংহাইয়ে ফরাশীদের নাচ-ঘর। আলোয়-আলো-করা মস্ত হল্। এ হলের এক কোণে শ্রীমতী লিঙ বসিয়া আছেন। তাঁর পরণে রূপালি সাটিনের লম্বা কুর্ত্তা, হাত দুখানি কোলের উপর অলসভাবে বিন্যস্ত। শ্রীমতী লিঙের মূর্ত্তি স্থির গম্ভীর—সে মুর্ত্তিতে সম্ভ্রম এবং স্নিগ্ধ প্রশান্তি বিরাজ করিতেছে।

তিন ঘণ্টা তিনি বসিয়া আছেন—শান্ত, অবিচল। কেহ তাঁর সঙ্গে একটি কথা কহে নাই! কেহ তাঁর পানে একবার ফিরিয়া তাকায় নাই!

যদি তাকাইত, দেখিত, শ্রীমতী লিঙের চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। মেয়ে-পুরুষে মিলিয়া দূরে ঐ যে নানা ভঙ্গীতে নাচিতেছে···নানা জাতের, নানা বয়সের নর-নারী···তাদের ঐ নাচের গতি-লীলার সঙ্গে তাল রাখিয়া শ্রীমতী লিঙের চোখের দৃষ্টি চঞ্চল-ভঙ্গিমায় ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে।

সকলকে ছাড়িয়া শ্রীমতী লিঙের দৃষ্টি একজন বৃদ্ধকে শুধু অনুসরণ করিতেছে। বৃদ্ধটি দেখিতে বেঁটে মোটা। তার গায়ে নীল-রঙের রেশমী পোষাক। আর যে-সব পুরুষ এ আসরে নাচিতে নামিয়াছে, তারা বয়সে তরুণ। যে-সব মেয়ে নাচিতেছে, তারাও তরুণী। তরুণের এ আসরে বৃদ্ধ শুধু ঐ একজন! তবু তাকে লইয়া নাচিতে তরুণীদের কি উৎসাহ! রূপসী তরুণীরা বৃদ্ধকে বাহুর মালায় বাঁধিয়া নাচিতেছে হাসি-মুখে খুশী-মনে!

তিন ঘণ্টা ধরিয়া শ্রীমতী লিঙ দেখিতেছেন বৃদ্ধের নাচ। তাঁর মুখে-চোখে মৃদু হাসির রেখা। সে হাসি কখনো বেশ জলজল করে···কখনো মলিন হয়!

শ্রীমতী লিঙের কাছে তাঁর বান্ধবীরা আসিয়া গল্প করিত,—বুড়া লিঙ ঐ নাচের আসরে গিয়া যেভাবে নাচে, যেন সং! সকলে হাসে। বুড়ার পয়সার জোর আছে বলিয়া সকলে তাকে লইয়া নাচের আসরে যে রঙ্গ করে···

এ-কথায় শ্রীমতী লিঙ প্রথমে কাণ দেন নাই। স্বামী লিঙের বয়স হইয়াছে। এ বয়সে তাঁর এমন দুর্ম্মতি কেন হইবে?

কিন্তু নিত্য এ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রীমতী লিঙের মন একদিন ফুঁশিয়া উঠিল। ভাবিলেন, এ কি সত্য? স্বামীর নাম আছে, খ্যাতি আছে! বাড়ীতে ডাগর ছেলেমেয়ে! এ-বয়সে মানুষের এমন খেয়াল জাগিলে সে-খেয়াল মানুষ সবলে প্রাণপণে দমন করিয়া চলে, লোকে না হাসে,···লোকে না বলে, শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে আসিয়া মিশিয়াছে! স্বামীর সে-জ্ঞান সত্যই লোপ পাইয়াছে? মান-ইজ্জতের কথা তরুণীদের মেলায় এমন করিয়া ভুলিয়া গেছেন!

সন্ধ্যার পর স্বামী বাহিরে যান। বলেন, সারা দিন কাজ-কারবারে মুখ গুঁজিয়া থাকা—একদণ্ড নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই! শ্রীমতী লিঙ ভাবেন, সারাদিনের পরিশ্রম··· তার পর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করিয়া গল্প করিয়া মানুষ যদি একটু বিরাম-সুখ উপভোগ না করে, তাহা হইলে মনে মরীচা পড়িবে যে! শরীর বহিবে কেন? তাই তিনি এ ব্যাপারে কোনো দিন মাথা ঘামান নাই! সরল বিশ্বাস! স্বামীর সম্বন্ধে মনে নিমেষের জন্য সংশয় জাগে নাই!

কিন্তু প্রতিবেশিনীরা নিত্য আসিয়া এই এক কথাই বলে! বলে, বুড়া লিঙ নিত্য যায় নাচের আসরে। সেখানে রূপসী তরুণীরা রূপের পশরা ধরিয়া বেসাতি করে! বাহুতে বাহু বাঁধিয়া নব নব নৃত্যলীলা···তাদের চোখে বিলোল কটাক্ষ-দীপ্তি···সে কটাক্ষে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া ওঠে···পতঙ্গের মতো পুরুষ সে-অগ্নিশিখার জৌলুষে ভুলিয়া ভুলিয়া যায়! মান-সম্ভ্রম তো তুচ্ছ কথা!

আসরে আছে একালের নব-নব রঙ্গিণী—শ্বেতাঙ্গ রূপসী, চীনা রূপসী, জাপানী রূপসী···অর্থাৎ নানা জাতের তরুণী রূপসী···লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়া এরা যৌবন-উৎসবে পুরুষের মনকে পিষিয়া দেয়! এ সব রঙ্গিণীদের কুহক-মায়ায় কুল-লক্ষ্মীদের ঘর-সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়া

---

* সাহিত্যে এ-বৎসর নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীমতী পার্ল এস্ বাক্। তাঁহার লেখা "Dance" গল্পের মর্ম্মানুবাদ।

যায়। এদের প্রাণে দয়া নাই, মায়া নাই! দুনিয়ায় চিনিয়াছে শুধু বিলাস আর পয়সা···পয়সা আর বিলাস!

শ্রীমতী লিঙের কোনো অপরাধ নাই। স্বামী··· জীবনাধিক···স্বামী তাঁর সব! স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য— স্বামীর সংসার—তাহারি পরিচর্য্যায় জীবন সঁপিয়া দিনের পর দিন কাটাইতেছেন···সংসারের বাহিরে কি আছে, তার পানে চাহিবার কথা কোনো দিন তাঁর মনে জাগে নাই! বাহিরে নানা সুর বাজিয়াছে···সে সুরে অনেকের মন ভুলিয়াছে, শ্রীমতী লিঙের ভোলে নাই! সংসারে ছেলে-মেয়ে···স্বামী···তাঁদের লইয়া তাঁর মন ভরিয়া আছে। দুঃখ-শোক পাইয়াছেন। দুটি ছেলে তাঁর বুকের উপরে পড়িয়া প্রাণ দিয়াছে···কিন্তু আর তিনটি ছেলে মেয়ের মুখ চাহিয়া, স্বামীর মুখ চাহিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছেন। মনের মধ্যে হু-হু বেগে জ্বলিয়াছে শোকের আগুন···সে-আগুন বুকে চাপিয়া হাসি-মুখে সংসারের সেবা করিয়াছেন!

সে-জন্য দুঃখ নাই···ক্ষোভ নাই···অভিমান নাই!···

কিন্তু স্বামী? এ-বয়সে তাঁর এ কি মোহ! প্রথমে এ কথা বিশ্বাস হয় নাই। পাঁচজনের কথায় তিনি বলিতেন—আমার বিশ্বাস হয় না। উনি কোনো কথা কখনো চেপে রাখেন না। কারবারের ছোট কথাটি পর্য্যন্ত আমায় এসে বলেন। আর এ সম্বন্ধে একটি কথা আজ পর্য্যন্ত বলবেন না! আর কোনো কথা না বলুন—আসরের কথা ইঙ্গিতে-ইশারাতেও তো বলতে পারতেন! এত নতুন নতুন রঙ্গ দেখা···সে গল্প করবেন না, সে স্বভাবই ওঁর নয়! আমি তো ওঁকে জানি!

প্রতিবেশিনী উ বলিলেন—আমার ঐ নাতিটা···মানে, আমার মেজো ছেলের সেজো ছেলে···সেটা বয়ে গেছে না? তার জন্যে আমাদের জ্বালার অন্ত নেই! সেদিন সে গেছলো একটা রাশিয়ান নাচ-ঘরে। বললে,—বিশ্বাস করবে না ঠাকুমা, আমাদের বুড়ো লিঙ-সায়েবকে দেখি, একটা কম-বয়সী মেয়ের সঙ্গে নাচতে নেমেছেন! বলে, লিঙ-সায়েবকে দেখে সেখান থেকে সরে পালাবার পথ-সে খুঁজে পায় না!

শ্রীমতী লিঙ বলিলেন—কি-জাতের মেয়ে?

শ্রীমতী উ বলিলেন—সে কথা আমি আর জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না দিদি··কিন্তু জাতে কি এসে যায়! বয়স কম···বুড়ো মানুষ যদি কম-বয়সী মেয়ের পাল্লায় পড়ে, তাহলে সে-রোগ সর্ব্বনেশে হয়ে দাঁড়ায়, ভাই!

শ্রীমতী লী বলিলেন—দুদিন আগের কথা বলছি··· রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে—আমাদের পাড়ার ঐ শীন্ বুড়ো ··ভারী বাউণ্ডুলে—এসে আমাদের ডেকে তুললে', তুলে বললে,—আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলুম লী-সাহেব। উনি বললেন,—কি ব্যাপার? বুড়ো শীন্ বললে, জানো তো ভাই, আমরা বিশ্ববখা···আজ ও-পাড়ার রাশিয়ান নাচ-ঘরে গিয়ে ফূর্ত্তি করছি, দেখি, একটা ফরাসী ছুঁড়ির কোমর ধরে তাকে একেবারে জাপটে বুকে নিয়ে বুড়ো লিঙ-সায়েব তাথৈ তাথৈ নাচ নাচ্ছে! সকলে সে-নাচ দেখে হেসে খুন··· লিঙ সায়েবের সেদিকে হুঁশ নেই!···

শ্রীমতী লিঙের বুকে যেন কামানের গোলা পড়িতেছিল! এমন করিয়া লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়া স্বামী এ কি করিয়া বেড়াইতেছেন! এ কি সত্য? এমন দুর্ম্মতি তাঁর হইবে, এ যে শ্রীমতী লিঙ কল্পনা করিতে পারেন না!

সারা বুক বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তিনি কোনো কথা কহিলেন না·চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন··· চোখের সামনে দুনিয়ার আলো ঘোলাটে অস্পষ্ট হইয়া আসিল।

প্রতিবেশিনীর দল তাদের বিষকুম্ভ উজাড় করিয়া ব্রত-শেষে যে যার গৃহে চলিয়া গেল।···স্বামী লিঙ কারবার সারিয়া গৃহে ফিরিলেন। মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-ভূষা করিয়া বাহিরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে একটি কথা কহিলেন না! শ্রীমতী লিঙ বসিয়া শুধু নিশ্বাস ফেলিলেন ··

সংসার···কোনো মতে সংসারের কাজ সারিলেন। তার পর স্তব্ধ রাত্রি···আকাশে চাঁদ নাই···অন্ধকার জমাট হইয়া পৃথিবীর বুকে চাপিয়া বসিয়াছে! সে-অন্ধকারে নিজের মনের অন্ধকার মিশাইয়া শ্রীমতী লিঙ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রহরের পর প্রহর চলিয়াছে···খেয়াল নাই!···

স্বামী আসিলেন। শ্রীমতীর চেতনা ফিরিল। স্বামীর মুখে আনন্দের দীপ্তি···আরাম-তৃপ্তি মাখানো! শ্রীমতী লক্ষ্য করিলেন···এ তৃপ্তির অর্থ আজ বুঝিলেন, মন হা-হা করিয়া উঠিল।

স্বামী বলিলেন—ঘুমোওনি?

শ্রীমতী বলিলেন—ঘুম আসছে না···তাই একটু বাইরে ফাঁকায় এসে বসেছি।

স্বামী বলিলেন—আমার ভারী ঘুম পেয়েছে···

আর কোনো কথা নয়···স্বামী গেলেন ঘরে। শ্রীমতী তেমনি বসিয়া রহিলেন···তাঁর সব যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে···এত বড় পৃথিবীর কোথাও এমন আশ্রয় যেন নাই, যেখানে গিয়া দু'দণ্ড নিশ্বাস ফেলিবেন!

তার পরের দিনটাও কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল···

সন্ধ্যার পর স্বামীর বেশ-ভূষার পর্ব্ব!···মাথায় টাকের ধারে ধারে যে ক'গাছি চুল আছে, সেগুলিতে গন্ধতৈল ঢালিয়া চাপিয়া ব্রাশ করিলেন—গোঁফে আতর দিলেন···শ্রীমতী আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন।

স্বামী বলিলেন—আজ বড় রকমের খেলার আসর বসছে···ও-পাড়ায় ঐ মঙের বৈঠকখানায়···

শ্রীমতী লিঙ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—বিদেশী বন্ধু জুটেছে, শুনছি···তাদের ওখানে আমোদের ঘটা···আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? চলো না···রোজ চুপচাপ পড়ে থাকি। বড্ড আমার ইচ্ছা হচ্ছে···

স্বামী শিহরিয়া উঠিলেন! কহিলেন, সেখানে তুমি যাবে! না, না···তোমার সে ভালো লাগবে না···

শ্রীমতী বলিলেন—কেন লাগবে না? সেখানে আর কোনো মেয়েছেলে নেই? তাদের সঙ্গে বসে আমি গল্প করতুম···তোমরা খেলা করতে··

স্বামীর মুখ এ কথায় বিবর্ণ হইল। শ্রীমতী লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন,—ও, শুধু পুরুষের আসর বুঝি! তাহলে আমি কি করে যাই?···যাবো না। তুমি যাও···

স্বামী চাহিয়া রহিলেন স্ত্রীর পানে।

ম্লান মৃদু হাসিয়া শ্রীমতী বলিলেন—শুনেছিলুম, এই বিদেশী ইংরেজ-ফরাসী মেয়ে-পুরুষে একসঙ্গে খেলা করে, আমোদ-আহ্লাদ করে—তাই দেখতে যেতে চেয়েছিলুম···

স্বামীর মনে হইল···এতখানি ছলনা?···না—না··· তিনি বলিলেন—যাবে? বেশ, এসো··

স্বামি-স্ত্রী দু'জনে মোটরে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ী আসিয়া থামিল ফরাসী নাচ-ঘরের সামনে।

লিঙ বলিলেন—তুমি চুপচাপ বসে থেকো···কারো সঙ্গে মিশো না।

শ্রীমতী বলিলেন,—না···

নাচ-ঘর, না, রূপের হাট! তরুণীদের রূপে বেশে আলোর লহর বহিয়া চলিয়াছে—চল-চঞ্চল বিদ্যুৎ-বহ্নি! হাস্যে, ভাষ্যে, লাস্যে তরঙ্গ ছুটিয়াছে! যেন রূপের ঘূর্ণীচক্র! মেয়েদের গায়ে কোনো মতে একটু বসন লাগিয়া আছে··· দু'একটা পাতার আড়ালে ফুলের মাধুরী যেমন হিল্লোলিত হইয়া ওঠে, বিরল-বাসের ফাঁকে-ফাঁকে নারীর রূপে তেমনি মাধুরী হিল্লোল!

শ্রীমতী বসিলেন···এক কোণে। স্বামীকে বলিলেন— তুমি যাও···কোথায় তোমার বন্ধুরা···ওদের কাছে যাও।

স্বামী চলিয়া গেলেন··বলিয়া গেলেন,—একটু নাচ অভ্যাস কচ্ছি··নাচে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ব্যায়াম-চর্চ্চা। এ বয়সের পক্ষে উপকারী। বিলিতি ডাক্তাররা বলে, রোজ যদি নাচি, তাহলে দশ বৎসর পরমায়ু বেড়ে যাবে!···

শ্রীমতী কোনো কথা বলিলেন না···স্বামীর পানে চাহিয়া নিঃশব্দে এ-কথা শুনিলেন।

দু-পর্ব্ব নাচ শেষ করিয়া লিঙ আসিলেন স্ত্রীর কাছে··· বলিলেন—একা বসে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে না?

—না।

—কেমন দেখছো?

—ভালো। নাচটা তোমার পক্ষে উপকারী ব্যায়াম·· যাও, নাচো গে···

লিঙ গেলেন নাচিতে।

···তরুণীরা তাঁকে লুফিয়া লইল! লিঙের বাহুতে বাহু বাঁধিয়া তরুণী রূপসীদের পালা করিয়া নাচ···

লিঙের কিন্তু বিশ্রী ছাঁদ! অপরে নাচিতেছে···কেমন সুশ্রী পরিপাটী ছন্দ···

অথচ বুড়া লিঙের সঙ্গে নাচিতে রূপসীদের আগ্রহের সীমা নাই!···

শ্রীমতী লিঙ বসিয়া নাচ দেখিতে লাগিলেন···নিস্পন্দ··· নির্ব্বাক্···তিনি যেন পাথরে গড়া পুতুল···প্রাণ নাই, মন নাই···আছে শুধু চোখ-ভরা দৃষ্টি! সে দৃষ্টি অনিমেষে নিবদ্ধ ঐ বুড়া লিঙের উপর···

বুকের কোণে কোথায় ছিল অশ্রুর ঝর্ণা···রূপের

আলোয়, প্রমোদের এ রোশনি-তাপে সে ঝর্ণার বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া গেল! শ্রীমতীর দু'চোখ বহিয়া অশ্রু-ঝর্ণায় জল ঝরিতে লাগিল···অঝোর ধারে···

শ্রীমতী লিঙের জল-ভরা চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল ···প্রলয় বন্যা! সে বন্যার বেগে ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে তাঁহার মন, প্রাণ, সুখ, শান্তি, আরাম, সান্ত্বনা, গৃহ-সংসার, মান সম্ভ্রম, লজ্জা-সরম ··নারীর যাহা কিছু সম্বল··· সব···সব! ঐ সব রূপসী তরুণী ··উহাদের লজ্জা নাই, সরম নাই, প্রাণ নাই, মন নাই···বাদলা পোকার মত আসরের আলোয় এরা আসিয়া দেখা দেয়···তার পর আসরের আলো নিবিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলাইয়া যায়···

এ সব মেয়ের কথা শ্রীমতী লিঙ লোকের মুখে রচা কাহিনীর মত শুনিয়াছেন। এরা না কি একালের সাহসিকা নারী···পুরুষকে সবলে ধরিয়া এরা চায় তার প্রাণ মনের সর্ব্বময়ী অধীশ্বরী হইতে ··পুরুষকে চায় তার বিলাস-লীলায় দাস্য করিবে···তার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিবে ···পুরুষের সামনে পশরার মত নিজেদের দেহ ধরিয়া দিয়া পুরুষকে নিঃস্ব সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেয়! এরা রাক্ষসী··· মায়াময়ী অপ্সরী সাজিয়া অধর-সুধা আর কটাক্ষ দিয়া পুরুষের শোণিত পান করিয়া তাকে অস্থিসার করিয়া ছাড়িয়া দেয়···পুরুষ উহার পায়ে বলি দেয় তার ঘর সংসার, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা···তার মান-ইজ্জৎ···তার সর্ব্বস্ব!

অবিচল দৃষ্টিতে শ্রীমতী লিঙ দেখিতে লাগিলেন বুড়া স্বামীর পুতুল-নাচ! স্বামীর বুকে নিবিড়ভাবে সংলগ্ন এক কিশোরীর দেহ-লতা—যেন বিশাল বটকে আশ্রয় করিয়া ক্ষীণ লতা-বল্লরী নিমেষের আশ্রয় চাহিয়া ব্যাকুল! কিশোরীর বুকে লাল রঙের একটু সাটিন আঁটা—কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত নীল রঙের সাটিনের আবরণ···স্বামীর মুখে-চোখে আবেগের জ্বলন্ত শিখা···নিবিবার আগে দীপের মুখে শিখা যেমন তীব্র হয়, ও-শিখায় তেমনি তীব্রতা ···রূপ-সায়রে সব ভুলিয়া স্বামী মত্ত-মাতোয়ারা!

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্রীমতীর চেতনা ফিরিল··· পাশে দু'জন রূপসী আসিয়া বসিল। একজন বলিল—বুড়োকে নাচের নেশায় পেয়েছে! তিন পাকের পর ছাড়,— তবু ছাড়ে না···

দু' নম্বর রূপসী বলিল—কিন্তু পয়সা দেয় বেশ মোটা রকম···

এক নম্বর বলিল—পয়সার জন্যই তো ওকে সকলে চায়! নাচতে জানে না··যে-ভাবে জাপ্‌টে ধরে···প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে!···

সুরার পাত্র নিঃশেষ করিয়া দু' নম্বর রূপসী বলিল— পয়সা পেলে প্রাণের হাঁফ সারতে কতক্ষণ!···

শ্রীমতী লিঙের বুকে কে যেন ছুরির আঁচড় টানিয়া দিল! না, বসিয়া থাকা অসম্ভব! শ্রীমতী লিঙ উঠিয়া দাঁড়াইলেন ··

মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, এক-নম্বর রূপসী ধরিয়া ফেলিল। বলিল—বসুন···বসুন · না হলে বুড়ো মানুষ···পড়ে যাবেন!···আপনি এখানে কেন এসেছেন?

রূপসীরা তাঁকে ধরিয়া বসাইয়া দিল। দু' নম্বর রূপসী বলিল—অসুখ বোধ করছেন?···ক্লান্তি?···তা হলে ভালো ওষুধ আছে···বার্গাণ্ডি মদ···একটু খান। ব্যস···এখনি চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

দু'নম্বর রূপসী তার নিঃশেষিত পাত্রে সুরা ঢালিল, ঢালিয়া শ্রীমতীর সামনে ধরিয়া বলিল—এটুকু খেয়ে ফেলুন দিকিন্···

—না, না, না···আমার কিছু হয়নি···বসে বসে ঘুম পাচ্ছিল - তাই···কোনো-কিছু খেতে হবে না···

রূপসীদের স্পর্শে যেন আগুনের আঁচ···

শ্রীমতীর কথায় রূপসীদের বিস্ময়ের অন্ত নাই! তারা পরস্পরের পানে চাহিল। এক-নম্বর রূপসী বলিল—কিন্তু আপনি একা এখান থেকে যাবেন কি করে'?

শ্রীমতী বলিলেন,—আমি একা নই। আমার স্বামীর সঙ্গে এসেছি···ঐ আমার স্বামী···

রূপসীরা যেন মূর্চ্ছা যাইবে···এমনি ভাব! ঐ বুড়ো লিঙের স্ত্রী ইনি! বুড়ো তো আচ্ছা পাগল···এখানে আসিয়াছে স্ত্রীকে কোমরে বাঁধিয়া! আশ্চর্য্য!

দু'নম্বর রূপসী ছুটিয়া গিয়া বুড়া লিঙকে ধরিল···তাকে ঝাঁকানি দিয়া বলিল—তোমার স্ত্রীর ওদিকে অসুখ করেছে ···আর তুমি নাচে মত্ত!

মৌচাকে যেন খোঁচা পড়িল! চারিদিক্ হইতে নাচ ছাড়িয়া রূপসীরা আসিয়া বুড়া লিঙকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ছ'নম্বর রূপসী বলিল,—বুড়োর নতুন খেয়াল লো··· এখানে এসেছে, তা বৌকে সঙ্গে করে···দেখেছিস বুড়োর বৌকে? আহা, বেচারী···এখানকার বাতাসে মাথা ঘুরে গেছে···পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমরা ছিলুম পাশে!

সকলে হাসিয়া আকুল!

সে হাসির সমারোহের মধ্যে শ্রীমতী লিঙ ধীর-গম্ভীর মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলেন,—বাড়ী চলো। অনেক রাত হয়েছে···

বুড়া লিঙ বলিলেন—ক'টা বেজেছে?

রূপসীদের দলে মত্ত গুঞ্জন চলিল্। একজন বলিল—আমরা জানি সায়েব···এ তোমার বৌ। যাও, বাড়ী যাও। বৌয়ের কথা শোনো।···

আর একজন বলিল—এমন ঠাণ্ডা বৌ···তুমি এখানে আমাদের ধরে ঝুলতে থাকো···বাদুড়ের মত! বৌ নির্ব্বিকারে বসে দেখছিল···আমাদের জাতের মেয়ে হলে এইখানে তোমাকে ধরে আচ্ছা ক'রে পিটে দিতো···এ বয়সে তুমি এসেছো আমাদের ভালোবাসা দেখাতে···পেটমোটা বুড়োকে আমরা ভালোবাসি না···ভালোবাসি তার পয়সাকে···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তরুণী চাহিল শ্রীমতী লিঙের পানে, কহিল,—আপনাকে দেখে দুঃখ হচ্ছে! স্বামীকে এ বয়সে এমন করে ছেড়ে দেবেন না। এই বয়সেই পুরুষমানুষ বখে। বুদ্ধি কমে যায় কি না! আমরা যদি হেসে কথা কই, ভাবে, ভালোবেসে মশগুল হয়ে গেছি!···আপনার মলিন মুখ দেখে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে! পেটের দায়ে এ কাজ করি··· আমার মাকে দেখেছি তো! বাবার বদখেয়ালিতে এমনি নিরুপায় মলিন মুখে বসে থাকতো! আপনি নিয়ে যান আপনার স্বামীকে···এখানে আর আসতে দেবেন না···কাল ঐ মার্গারিৎকে উনি দেছেন একছড়া দামী নেকলেশ! সে আজ আর এ তল্লাটে আসে নি। উনি ভেবেছিলেন, মার্গারিৎ ওঁর প্রেমে বিভোর! হুঁঃ! বুড়ো মানুষ, বোঝেন না, সে বিভোর ছিল ওঁর টাকায়, ওঁর উপহারে···যান, আপনি ওঁকে নিয়ে যান···আমরা সাহায্য করবো···

গাড়ীতে দুজনে চুপ। নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর হাত নিজের হাতে তুলিয়া শ্রীমতী লিঙ বলিলেন—এ কোথায় তুমি কিসের লোভে আসো গো! এদের কথা তুমিই একদিন আমাকে বলেছো। বলেছো, এরা মানুষ নয়··· রাক্ষসী···

বুড়া লিঙ নির্ব্বাক্···শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।···

বাড়ী।

বুড়া লিঙ নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। শ্রীমতী লিঙ গিয়া ছেলে-মেয়েদের দেখিলেন···তারা ঘুমাইতেছে···

তিনি আবার বারান্দায় আসিলেন। বুড়া লিঙ উদাস-নয়নে বাহিরের পানে তাকাইয়া আছেন···

বহুক্ষণ কাটিল এমনি নিঃশব্দে··

তার পর হাসিয়া শ্রীমতী বলিলেন - একালের ও মেয়েদের দেখতে বেশ লাগে! বেশ জীবন্ত! আজ ওখানে গিয়ে ভারী ভালো লাগছিল···চমৎকার! সত্যি·

স্বামীর মুখে কোনো কথা নাই···

শ্রীমতী বলিলেন—নাচে ব্যায়াম হয় সত্যি···কিন্তু এ বয়সে অত পরিশ্রম···তোমার পায়ে ব্যথা হয়নি তো? বাড়ীতে সেই ডাক্তারী তেল আছে···এনে তোমার পায়ে আমি মালিশ করে দি। কিন্তু তা'ও বলি, তিনবারের বার যে-মেয়েটার সঙ্গে তুমি নাচছিলে, ও-মেয়েটা নাচের কিচ্ছু জানে না···তোমার সঙ্গে নাচতে গিয়ে কেবলি তাল কেটে ফেলছিল।··তোমাকে ও ধমকালো কেন, বলো তো? নিজের নাচের তো ঐ ছিরি! আমার তখন এমন রাগ হয়েছিল··· ভাগ্যে সে রাগ সামলে নিলুম, নাহলে ঐ ভিড়ে বোধ হয় গিয়ে তাকে এক চড় কষিয়ে দিতুম! তোমাকে দেয় ধমক! ···এত বড় ওর আস্পর্দ্ধা···

কথাটা বলিয়া শ্রীমতী চাহিয়া রহিলেন স্বামীর পানে উত্তরের প্রত্যাশায়···

কাশিয়া গলা সাফ করিয়া বুড়া লিঙ বলিলেন—হুঁ! নাচটা আমি আজ পর্য্যন্ত শিখতে পারলুম না···বুড়ো মানুষ···তাছাড়া আমি হলুম কাজের লোক।···ও বিদেশী নাচ শেখা···নাঃ, আমি আর ও আসরে যাবো না···

শ্রীমতী বলিলেন—শিখবে মনে করলে তুমি খুব শিখতে পারো···তবে কাজের মানুষ—কাজ-কাজ করে পাগল ···নাচতে গিয়েও যদি কারবারের কথা মনে জাগে, তাহলে নাচ শিখবে কি করে, বলো? নাচ শিখতে হলে নাচে মন

ঢেলে দিতে হয়।…নাচের সময় কাজের কথা মনে এনো না কাল থেকে…বুঝলে…

বুড়া লিও বলিলেন—কাল থেকে আর যাবো না। নাচ শিখে কি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করবো এ-বয়সে!…আমি আর ওদিকে যাবো না।

শ্রীমতী কোনো জবাব দিলেন না…চুপ করিয়া রহিলেন। মনের মধ্যে এতদিন ধরিয়া যে-ঝড় বহিতেছিল…সে ঝড় যেন ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতেছে…মনে প্রশান্তির আভাস…

সে প্রশান্তির মাঝখানে জাগিতেছিল সেই রূপসীর মুখ …তার কথা, আমার মাকে দেখেছি তো…বাবার বদ্‌খেয়ালির জ্বালায় নিরুপায় মলিন-মুখে মা বসে থাকতো…

ও-মেয়েটি চমৎকার! চমৎকার! একালের মেয়েরা সবাই ভালো…কেমন সব জীবন্ত…কেমন কথা কয়… কেমন হাসে! একালের মেয়েদের সব ভালো…ওরা চমৎকার…চমৎকার!…

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা।

মরণের পারে

জাগিছে প্রশ্ন হৃদয়ে আমার কেন আজি বারে-বারে—
'কি গুপ্ত চির-সুপ্ত রয়েছে মরণের পর-পারে?'
জীবনের পরে জীবন বহিছে নিভিয়া কি যায় থেমে?
কোথা হ'তে এলো মানব-জীবন কোথায় বা যায় নেমে?
ক্ষুদ্র একটি প্রবাহ উঠিল,
ধীরে ধীরে ধীরে নীলে সে মিশিল;
প্রশ্ন জাগিল হৃদয়ে আমার দেখিয়া তারে—
কি গুপ্ত চির-সুপ্ত রয়েছে মরণের পর-পারে?

কোথা হ'তে আমি এসেছি ভাসিয়া? কেমন ছিল সে দেশ?
আনন্দ সেথা বহে কিগো সদা? নাহি দুঃখের লেশ?
এ ধরায় আজ রয়েছি আঁকড়ি প্রাণের আকর্ষণে;
ছেড়ে যেতে হবে কেন এ পৃথিবী? মিশিব কাহার প্রাণে?
মিশিব আবার ওগো কার প্রাণে?
ছুটিব চকিতে ওগো কার পানে?
জীবনের শেষে উদ্‌ঘাটিবে কে আমার প্রশ্নটারে—
কি গুপ্ত চির-সুপ্ত রয়েছে মরণের পর-পারে?

অনন্তে আমি যাব কি মিশিয়া উর্জলি আকাশ বায়ু?
চিরদিন আমি র'বো কি বাঁচিয়া, হরিবে না কাল আয়ু?
আত্মা আমার ধূলায় মিশাবে? প্রাণ হবে মোর লয়?
না, না—বেঁচে র'বো বাতাসে ফুটিব। কিসের ভাবনা, ভয়?
নিয়ে যাবে মোরে মরণ আসিয়া,
চোখ মেলি তবু রহিব জাগিয়া;
স্মৃতির উপরে আঁকিয়া রাখিব দেখিব পরে—
কি গুপ্ত চির-সুপ্ত রয়েছে মরণের পর-পারে।

অনন্ত হ'তে গুপ্ত রয়েছে গুপ্ত কি চির রবে?
জীবনের শেষে রহস্য যত, আমি দেখাইব সবে।
ভয় নাই—আমি ভাঙ্গিব এ ছল, দেখাবো ভবিষ্যৎ;
মরণের ক্ষণে হবো না বিকল, রহিব গো জাগ্রৎ।
জীবনে-মরণে কেন ব্যবধান?
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া করিতে সমান—
চির-আকাঙ্ক্ষা বাসনা ইহাই—অভিলাষ জানিবারে—
কি গুপ্ত চির-সুপ্ত রয়েছে মরণের পর-পারে।

হে মরণ, চির-চতুরতা তব ভাঙ্গিতে বাসনা মোর!
অজ্ঞাত হ'য়ে কেন সদা রবে? নাশিব আঁধার ঘোর।
তব সনে মোর মিশে যাক্ প্রাণ; হৃদি-মন মিশে যাক্;
ওগো প্রিয় মোর, ভয় কিবা আর, বাধা যত পিছে থাক্।
সত্যই যদি তুমি মোর সখা,
নিশিদিন যেন নাহি দাও দেখা?
দেখাও না কেন? বুঝাও না কেন? জিজ্ঞাসি বারে-বারে—
কি গুপ্ত চির-সুপ্ত রয়েছে মরণের পর-পারে।

শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী

আফ্রিকার সাপুড়ে

[শিকার-কাহিনী]

আফ্রিকার ট্রান্সভালে ব্র্যাম্পি ডিকের বাড়ী। ব্র্যাম্পি বাল্যকাল হইতে সাপ পুষিতে ভালবাসে। তাহার একটি বাগান আছে; সেই বাগানে সে নানা জাতীয় সর্প প্রতিপালন করিতেছে। কোন বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে তাহার আলাপ আরম্ভ হইলে সে দুইচারি কথার পর সর্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, তাহার পর তাঁহাকে তাহার বাগানে লইয়া গিয়া তাহার সংগৃহীত সাপগুলি দেখাইয়া আনন্দ লাভ করে।

ভ্যান প্রেট্সেন নামক কোন য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত ব্র্যাম্পি ডিকের পরিচয় হইলে ব্র্যাম্পি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার সাপের বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। ভ্যান প্রেট্সেন কোন বিলাতী মাসিক-পত্রিকায় ব্র্যাম্পি ডিক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বালকেরা যেমন কুকুর-ছানা, গিনি-পিগ, খরগোস লইয়া খেলা করে, ব্র্যাম্পিও শৈশবকালে সেইরূপ সাপ লইয়া খেলা করিত; সাপগুলাকে নানা ভাবে আদর করিত। সাপগুলাকে সে কখন বিন্দুমাত্র ভয় করিত না। সকল রকম সাপ তাহার স্পর্শমাত্র তাহার বশীভূত হইত; এমন কি, অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত, ভীষণ বিষধর সর্পও তাহার স্পর্শে কেঁচোর মত নিরীহ হইয়া যাইত। ব্র্যাম্পি ডিক এখন জমি-জরীপের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। এই কার্য্যে তাহাকে নানা দুর্গম স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া তাহাকে নানা জাতীয় বন্য জীব-জন্তুর সংস্রবে আসিতে হয়। সে যখন পাহাড়-পর্ব্বতে ও অরণ্য-প্রান্তরে পরিভ্রমণ করে, সেই সময় সে অসংখ্য রকম সাপ ও অন্যান্য সরীসৃপ দেখিতে পায়; তাহাদিগকে দেখিবামাত্র ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া বাড়ী পাঠাইয়া থাকে। এই সকল সরীসৃপকে সে তাহার বাগানে আশ্রয় দান করিয়াছে।

"ব্র্যাম্পি যে সকল সর্পকে তাহার বাগানে পুষিতেছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য সে কোন অস্ত্র ব্যবহার করিত না, খালি হাতেই ধরিয়া ফেলিত; তবে যদি কোন দুর্দ্দান্ত ও তেজস্বী বিষধর সর্পকে ধরিতে হইত, তাহা হইলে সে একখানি ক্ষুদ্র যষ্টি ব্যবহার করিত, সেই যষ্টির অগ্রভাগ দু'ফাঁক করিয়া চেরা, অর্থাৎ তাহা সূক্ষ্মাগ্র সন্নার মত দুই অংশে বিভক্ত।

"ঐ সকল বিভিন্ন জাতীয় সাপগুলিকে সে যে বাগানে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছে, সেই বাগানের শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। সরীসৃপগুলিকে সর্ব্বদা সতর্কতা সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, এবং তাহারা যাহাতে আরামে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহারও সুব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। এতদ্ভিন্ন, তাহারা দীর্ঘকাল রৌদ্রে পড়িয়া না থাকিয়া কোন ছায়াচ্ছন্ন স্থানে আশ্রয় লাভ করিতে পারে, এজন্য ছায়াময় নিভৃত আবরণ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে; কারণ, সর্পাদি সরীসৃপ দীর্ঘকাল রৌদ্রে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইলে এবং ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহাদিগের মৃত্যু অনিবার্য্য। তাহাদের আহারের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবারও প্রয়োজন হয়। সাপ সর্ব্বদা ইন্দুর খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে না; কখন কখন তাহারা ভেক, পক্ষিশাবক প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। কোন কোন জাতীয় সর্প দীর্ঘকাল অনাহারে থাকে; কি কারণে তাহারা আহারে বিরত হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহারা উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ করে না। তাহারা শান্তভাবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। কোন কোন দুষ্প্রাপ্য জাতীয় উৎকৃষ্ট সর্পের এই প্রকার বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

"ব্র্যাম্পির বাগানে ছয় ফুট দীর্ঘ পীতবর্ণ একটি গোখ্রো সাপ ছিল। সেই সাপটির প্রকৃতি যেমন ভীষণ, সে সেইরূপ দুর্দ্দান্ত ছিল। ব্র্যাম্পি এই সাপটি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হওয়ায় আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিত, এবং ইহা তাহার গৌরবের বস্তু ছিল। কিন্তু এই সাপটা হঠাৎ অনশন-ব্রত আরম্ভ করিল। আমাদের দেশের জেল-খানার কয়েদীদের মত তাহার কোন অভিযোগ ছিল না; তথাপি সে কি কারণে প্রায়োপবেশন করিয়াছিল, ব্র্যাম্পি তাহা বুঝিতে পারিল না। ব্র্যাম্পি তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহার রুচিকর নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে মুখে তুলিল না। তাহাকে ভোজনবিমুখ দেখিয়া ব্র্যাম্পি জোর করিয়া তাহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কিছুদিন পরে সাপটা মরিয়া গেল।"

মিঃ ভ্যান প্রেট্সেন লিখিয়াছেন, "সেই সাপটি এই ভাবে প্রাণ-ত্যাগ করিবার কয়েক দিন পরে আমি ব্র্যাম্পির সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সে আমার নিকট এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিল যে, তাহার বাগানের গৌরবস্বরূপ সেই সাপটি প্রাণত্যাগ করায় তাহার সংগ্রহ কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। ছয় ফুট দীর্ঘ পীতবর্ণ গোখ্রো সাপ আর একটি সংগৃহীত না হইলে সেই অসম্পূর্ণতার ত্রুটি সংশোধিত হইবে না; কিন্তু ঐ প্রকার দুর্লভ সর্প সে পুনর্ব্বার কোথায় পাইবে?

"অতঃপর সে কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল, 'কিরূপে তাহা সংগৃহীত হইবে, তাহা আপনাকে বলিব। আপনি কাল সকালে আমার সঙ্গে চলুন। আমরা একটি নূতন পীত গোখ্রো ধরিয়া আনিব।'

"সাপ দেখিয়া আমি যে অত্যন্ত ভয় পাইতাম, এ কথা সত্য না হইলেও কোন কারণে আমাকে সাপের নিকট যাইতে হইলে, আমি যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিতাম, সাবধান হইতাম। যাহা হউক, সর্পের গর্তের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি সতর্ক থাকিব, এইরূপ স্থির করিয়া আমি ব্র্যাম্পির প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। ছয় ফুট দীর্ঘ পীত গোখ্রো যে কিরূপ ভীষণ বিষধর সর্প, তাহা আমার অজ্ঞাত ছিল না, ব্র্যাম্পি সেই প্রকার সর্প কোথায় সংগ্রহ করিবে এবং কিরূপে তাহা ধরিবে—তাহা দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল।

"এই জাতীয় গোখ্রো সাপ কিরূপ ভীষণ-প্রকৃতি, এবং ইহাদিগকে বশীভূত করা কিরূপ দুরূহ, তাহা আমরা সকলেই জানি। ইহারা ক্রুদ্ধ হইলে কি প্রকার ভীষণ ভাব ধারণ করে, ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তাহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ব্র্যাম্পির অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না; কিন্তু সে এই সাপ ধরিবার জন্য যথাযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হইয়া তাহার সেই মাথা-চেরা ক্ষুদ্র যষ্টি মাত্র সঙ্গে লইল; এতদ্ভিন্ন, সে একজোড়া পুরু দস্তানা এবং সাপটাকে বহনের জন্য একটি শক্তগর্ভ বস্তা লইয়া চলিল।

"আমরা এই দুর্লভ রত্নের সন্ধানে যাত্রা করিলে ব্র্যাম্পি চলিতে চলিতে বলিল, 'পীতবর্ণের এই গোখ্রোগুলা যেমন ভয়ঙ্কর, সেইরূপ বলবান্ প্রাণী; যদি কোন উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সাংঘাতিক ছোবল মারিবেই।'

"তাহার কথা শুনিয়া আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

"আমি প্রথমে একটি শুষ্ক নদীগর্ভে নামিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি নদীগর্ভে নামিলেও ব্র্যাম্পি নদীর তীরে তীরে চলিতেছিল। নদীতীরে যে সব গর্ত ছিল, দুই একটা গোখ্রো সেই গর্তগুলি কোনটির ভিতর হইতে বাহির হইয়া রোদ পোহাইতে থাকিলে হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে পড়িতে পারি—এই ভয়ে আমি নদীর ধারে ধারে না চলিয়া নদীগর্ভে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। তবে এ কথাও সত্য যে, এই জাতীয় সর্প অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; তাহাদিগকে যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে, বিশেষতঃ, পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এই জাতীয় সর্প বৎসরের কোন সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় না।

"ব্র্যাম্পি কথায় কথায় আমাকে বলিল, 'আমার দুঃখ এই যে, সাপটা যদি মরিলই, তবে মাস তিনেক আগে মরিল না কেন? ওটা তিন চার মাস পূর্ব্বে মরিলে ঐ জাতীয় আর একটা সাপ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে এরূপ কঠিন হইত না। এই সকল সাপ শীতকালে ঘুমাইয়া থাকে, প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সেই সময় তাহাদের গর্তের অদূরে অনুসন্ধান করিলে একটাকে ধরিতে পারিতাম।'

"আমি বলিলাম, 'শীতকালে উহারা কোথায় ঘুমাইয়া থাকে, তাহা তোমার জানা আছে কি?'

"ব্র্যাম্পি বলিল, 'তাহা আমার কিছু কিছু জানা আছে বৈ কি। তবে সেই সকল গর্তের নিকট গমন করিয়া অনেক খুঁড়া-খুঁড়ি করিতে হয়। বহুবার চেষ্টা বিফল হইলেও অবশেষে কৃতকার্য্য হওয়াই সম্ভব। এখন উহারা দেশের চারিদিকেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এখন তাহাদের অনুসরণ না করিলে একটার সন্ধান পাওয়া কঠিন।'

"আমি বলিলাম, 'যাহাকে দেখিলাম না, সে কোথায় আছে তাহাও জানি না, কিরূপে তাহার অনুসরণ করিব? ইহা কি সম্ভব?'

"ব্র্যাম্পি বলিল, 'তাহার চলিবার চিহ্ন দেখিয়া আমি তাহার অনুসরণ করিতে পারি। কাযটা অত্যন্ত সহজ। বালুকারাশির উপর তাহার দেহের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন্ জাতীয় সাপ সেই পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহা জানা চাই; ইহা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। আপনিও শীঘ্র তাহা শিখিতে পারিবেন। এই চিহ্নের বিশেষত্ব আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিব।"

"ব্র্যাম্পি আরও কি বলিতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ নীরব হইল। তাহার পর সে সেই স্থানের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিতে করিতে বলিল, 'আমি যে সাপের সন্ধানে বাহির হইয়াছি, মাটীতে তাহার গমনের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। এই চিহ্ন এরূপ টাট্কা যে, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, শিকারটা এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। কিন্তু ইহা গোখ্রো সাপের চিহ্ন হইলেও সাপটা পীত গোখ্রো নহে।'

"সে বালির উপর একটি চিহ্ন দেখাইয়া তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল।

"সেই চিহ্নের কোন বৈশিষ্ট্য আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু ব্র্যাম্পি আর কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই চিহ্নের অনুসরণ করিয়া কয়েক গজ দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

"সে পশ্চাতে চাহিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'এটা প্রকাণ্ড সাপ! চিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, অল্পকাল পূর্ব্বে আহার করায় উহার পেটটি ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই বালির উপর দাগ এইরূপ গভীর হইয়াছে। আমাদের সম্মুখে যে নিবিড় ঝোপটি দেখা যাইতেছে, উহারই অন্তরালে আমরা তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারিব।'

"কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ব্র্যাম্পির অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। আমরা যাহার চিহ্নের অনুসরণ করিতেছিলাম, তাহা একটি পাহাড়ে কচ্ছপ!

"ব্র্যাম্পি তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপদস্থ না হইয়া উৎসাহভরে বলিল, 'আমার ভুল হইয়াছে বটে; কিন্তু ভুল না হয় কার? সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমজদার ব্যক্তিরও ভুল হইয়া থাকে।'

"আমরা সেই শুষ্ক নদীগর্ভ দিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে তাহার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে ব-দ্বীপের ন্যায় একটি প্রশস্ত স্থান দেখিতে পাইলাম, তাহা বৃক্ষলতায় সমাচ্ছাদিত। সেই স্থান হইতে আমরা ডাইন দিকে ফিরিলাম এবং সম্মুখে একখানি পরিত্যক্ত কুটীর দেখিতে পাইলাম; তাহার প্রাচীরগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত, তাহাও বিধ্বস্তপ্রায়।

"ব্র্যাম্পি তাহার চতুর্দ্দিক্ লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'দুঃখের বিষয়, এখানে বালি নাই, আমাদিগকে কঠিন মাটীর উপর দিয়া চলিতে হইতেছে। মাটীতে যে সকল ঘাস জন্মিয়াছে, তাহার ভিতর সাপের গতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।'

"তাহার কথা শুনিয়া আমি কোন মতামত প্রকাশ করিলাম না। সে বাহাদুরী-প্রকাশের জন্য যে সকল কথা বলিয়া জাঁক করিতেছিল, তাহা নিতান্ত অসার বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা তাহাকে বলিয়া লাভ কি?

"আমরা সেই বিধ্বস্তপ্রায় কুটীরের জীর্ণ দেওয়ালগুলির ভিতর

প্রবেশ করিলাম। তাহা ঘাস, লতা পাতা ও গুল্মরাশিতে পরিপূর্ণ। ঘাসগুলি প্রায় চারি ফুট দীর্ঘ, এবং বিলক্ষণ সতেজ।

"আমি বলিলাম, 'কুটীরের ভিতর যখন আসিলাম, তখন একবার সন্ধান করিয়া দেখিতে দোষ কি?'

"কিন্তু ব্র্যাম্পি আমার প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'কোন প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানে পীত গোখ্‌রোকে বাস করিতে দেখা যায় না। উহারা খোলা জায়গায় বাস করিতে ভালবাসে। উহারা এরূপ স্থানে বাস করে, যে স্থানে হঠাৎ আক্রান্ত হইলে আততায়ীকে ছোবল মারিতে পারে, অথবা পলায়নের সুযোগের অভাব না হয়।

"যে স্থানে সেই কুটীরের দ্বার ছিল, দ্বারের অভাবে সেখানে ফুকর-মাত্র বর্ত্তমান ছিল। আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ফুকরের ভিতর মাথা বাড়াইয়া দিলাম। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেই প্রমাণ পাইলাম, ব্র্যাম্পি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহা ভ্রমাত্মক; কারণ, অদূরবর্ত্তী দেওয়ালের পাশেই এক প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ দেখিতে পাইলাম। উহা পীত গোখ্‌রো—যাহার সন্ধানে আমরা কষ্ট করিয়া এত দূর আসিয়াছিলাম।

পীতবর্ণ এক প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ

"আমাদের সাড়া পাইতেই গোখ্‌রো সক্রোধে দেহের উপর ভর দিয়া তাহার প্রসারিত ফণা মাটী হইতে কয়েক ফুট উর্দ্ধে উত্তোলন করিল। তাহার দেহের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, তাম্রবর্ণের একখানি যষ্টি মাটীর উপর কেহ খাড়া করিয়া রাখিয়াছে! সাপটা নির্নিমেষ স্বচ্ছ নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সুগোল চক্ষু হইতে ক্রোধ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যেন সে গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, আমরা কি উদ্দেশ্যে তাহার শান্তিভঙ্গ করিতে আসিয়াছি?

'ব্র্যাম্পি তাহার শক্তির পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে অনেক বাজে কথা বলিয়াছিল; তাহাতে তাহার অজ্ঞতা প্রকাশিত হইলেও একটি বিষয়ে তাহার ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম। তাহার অসামান্য সাহস দেখিয়া আমাকে বিস্মিত হইতে হইল। ব্র্যাম্পি সাপটাকে ফণা প্রসারিত করিয়া ঐ ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া দরজার সেই ফুকরের ভিতর দিয়া তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল; সে যে দস্তানা-জোড়াটা লইয়া আসিয়াছিল, তাহাও তাহার পরিয়া-লইবার অবসর হইল না।

"আমি তাহাকে উদ্যত-ফণা ক্রুদ্ধ বিষধরের সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সভয়ে বলিলাম, 'ঈশ্বরের দোহাই ব্র্যাম্পি, তুমি সতর্ক হও; দেখিতেছ না—সাপটা তোমাকে ছোবল মারিবার জন্য প্রস্তুত? ও তোমাকে চক্ষুর নিমেষে দংশন করিবে।'

এই কথা বলিয়াই আমি দুই খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর হাতে তুলিয়া লইলাম। সাপটাকে দেখিবামাত্র আমি তাহা কুটীরের সম্মুখ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। আরও কুড়ি-পঁচিশখানি পাথর আনিয়া সেখানে সঞ্চিত না করায় আমার মনে আক্ষেপ হইল।

"আমি ব্র্যাম্পিকে উচ্চৈঃস্বরে সতর্ক করায় ব্র্যাম্পি মুহূর্ত্তের জন্য মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া চাপা আওয়াজে বলিল, 'আহা, করেন কি? ওভাবে চীৎকার করিবেন না। উহাতে সাপটা ভয় পাইবে। আমার দিকে চাহিয়া সাপটা বুঝিতে পারিয়াছে—আমি উহার বিশ্বাসের পাত্র। উহাকে ধরা কত সহজ কায, আপনি নিস্তব্ধভাবে ঐখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহা দেখুন, মহাশয়!'

"ব্র্যাম্পির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই তাম্রবর্ণ যমদূতটা ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; তাহার সেই গর্জ্জনে আমার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ী পড়িতে লাগিল! তাহার সেই ফোঁস্ ফোঁসানি মৃত্যুর আহ্বান-ধ্বনি বলিয়াই আমার প্রতীতি হইল।

অতঃপর গোখ্‌রোটা তাহার লেজের ডগায় ভর দিয়া এভাবে

সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল যে, আমার মনে হইল ব্র্যাম্পির বাঁ গালে সে মুহূর্ত্তমধ্যে ছোবল মারিবে। সূর্য্যকিরণে তাহার সরল দীর্ঘ দেহের সেই আলোড়ন, নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘের কোলে বিদ্যুদ্বিকাশবং প্রতীয়মান হইল।

"এই দৃশ্য দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম, এবং ব্যাকুল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলাম, 'কি সর্ব্বনাশ! তোমাকে খাইয়া ফেলিল

ব্র্যাম্পি সাপের ফণার নীচে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল

যে?'—সঙ্গে সঙ্গে সাপটাকে লক্ষ্য করিয়া কম্পিতহস্তে আমার হস্তস্থিত প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সাপটা তদ্দ্বারা আহত হইল না; তাহা তাহার তিন ফুট দূরে পড়িল। যদি তাহা আর এক ইঞ্চ তফাতে পড়িত, তাহা হইলে তাহার আঘাতে ব্র্যাম্পির একখানা পা জখম হইত।

"কিন্তু সে দিকে ব্র্যাম্পির লক্ষ্য ছিল না, সাপটা তাহার বাঁ গালে ছোবল মারিবার পূর্ব্বেই ব্র্যাম্পি বিদ্যুদ্বেগে মুখ সরাইয়া লইয়া, সাপটার ফণার নীচে এরূপ প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিল যে, সেই আঘাতে সাপটা ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিয়া প্রায় পাঁচ গজ দূরে ধরাশায়ী হইল, এবং মাটীতে পড়িয়া আঘাত-বেদনায় লটর-পটর করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সবেগে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে দেখিলাম।

"সাপটা এই ভাবে আহত হইয়া ব্র্যাম্পির সহিত যুদ্ধের বাসনা ত্যাগ করিল। সে ফণা তুলিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতি অবলম্বন করিল। তাহাকে পলায়নোদ্যত দেখিয়া ব্র্যাম্পি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট লাফাইয়া পড়িয়া, বাজ যে ভাবে পলায়নপর ইঁদুরকে ছোঁ মারিয়া নখরবিদ্ধ করে, সেই ভাবে চক্ষুর নিমেষে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। ব্র্যাম্পির দুর্জ্জয় সাহসের পরিচয় পাইয়া আমার চক্ষু স্থির!

"ব্র্যাম্পি সাপটার গলা চাপিয়া-ধরিয়াই ব্যাকুল স্বরে আমাকে বলিল, 'উহার লেজটা চাপিয়া ধর। তুমি কি দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছ? আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না, শীঘ্র উহার লেজটা টানিয়া ধর; নতুবা এই মুহূর্ত্তেই উহার লেজ দিয়া আমার হাতখানা জড়াইয়া ধরিবে, এবং এরূপ জোরে চাপ দিবে যে, আমার হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে। উহার লেজের বাঁধন লোহার সাঁড়াশীর চাপের মত শক্ত!'

"আমি তৎক্ষণাৎ সাপটার লেজ দুই হাতে টানিয়া ধরিলাম। তাহার দেহের শক্তি কি ভীষণ! গোখ্‌রোটা অতঃপর তাহার লাঙ্গুলের সদ্ব্যবহার করিতে পারিল না। ব্র্যাম্পি তখন তাহার বাঁ-হাতের আঙ্গুল-গুলির সাহায্যে সাপটার মুখ টিপিয়া ধরিয়া তাহার মুখ ফাঁক করিল, এবং তাহার সুতীক্ষ্ণ শুভ্র দন্তশ্রেণী পরীক্ষা করিতে লাগিল।

"সে খুসী হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, 'কি চমৎকার নিখুঁত দাঁত! সাপটার বয়স অধিক হয় নাই, এখন উহার ভরা যৌবন। আমার যে সাপটা মরিয়া গিয়াছে, এটি তাহার তুলনায় সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। শুভক্ষণেই আজ হলদে গোখ্‌রোর সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম; আজ শুভ যাত্রা।'

"অতঃপর সে সাপটাকে তাহার কটি-দেশসংলগ্ন থলির ভিতর পুরিয়া ফেলিল। তাহার পর আমরা তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। পথে আসিতে আসিতে সে বলিল, 'আজ সকাল বেলাটা কি আরামেই কাটিল! এরূপ আনন্দ বহুদিন আমার ভাগ্যে জোটে নাই'।"

ছয় ফুট দীর্ঘ সাক্ষাৎ যম এই গোখ্‌রোটাকে ধরিতে পাওয়ায় সেই প্রভাতটি তাহার পক্ষে আরামদায়ক এবং আনন্দপ্রদ! যাহাদের জন্য এই সত্য ঘটনার বিবরণটি সঙ্কলন করিয়া 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা কি কোন দিন এই প্রকার আরামের প্রতি লোভ করিবেন?

আমাদের দেশে পীত গোখ্‌রো নাই বটে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ যে কেউটে আছে, তাহা এই জাতীয় সর্প অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ-প্রকৃতি ও প্রতিহিংসাপরায়ণ; তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে মানুষকে তাড়া করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চীলের চালাকী

[রূপকথা]

পণে হারিয়া ভোজরাজার কন্যা ভানুমতী রাজা বিক্রমাদিত্যের গলায় দিলেন মালা। এ মিলনে রাজপুরীর আর সকলেই খুসী, শুধু এক জনের মনে মোটেই সোয়াস্তি নাই,—সে হইতেছে রাজকন্যার প্রিয় সখী মঙ্গলা। বয়স যদিও তাহার রাজকন্যার মতই, কিন্তু চেহারাটি রূপের দিক্ দিয়া একেবারে ঠিক উল্টা। তাহার উপর ভগবান্ তাহাকে আর একটি সম্পদ্ দিয়াছিলেন, সেইটি লইয়া বেচারী আরও বিব্রত। তাহার পীঠটি জুড়িয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল একটা মস্ত কুঁজ। একে ত রূপের এই ছটা, তাহার উপর কুঁজের এই বাহার। কিন্তু তবুও মঙ্গলার দপ্‌দপার সীমা নাই। তাহার কারণ এই যে, মায়া বিদ্যাটা সেই-ই রাজকন্যাকে শিখাইয়াছিল। মায়া বিদ্যায় রাজাকে জিতিতে দেখিয়া তাহার কি কষ্ট! এই কষ্টটুকু দূর করিতে যে কাণ্ড সে বাধাইয়া বসিল, সেই গল্পই তোমাদিগকে আজ বলিতেছি।

বিয়ের পর দিন রাজবাড়ীর বাগানে রাজা বিক্রমাদিত্য পায়চারী করিতেছিলেন। সঙ্গে নবরত্ন। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক কথাবার্ত্তাই তাঁহাদের হইতেছিল।

কালিদাস কহিলেন,—বাগানখানি চমৎকার!

বররুচি কহিলেন,—আমাদের উজ্জয়িনীর বাগানেরই মতন, তবে ফুলের ভাগ এখানে যেন বেশী।

কালিদাস কহিলেন,—রাজকন্যার ফুলের ভারি সখ, শুনিছি, নিজের হাতেই এই ফুল-বাগানটি তৈরী করেছেন।

রাজা হাসিয়া কহিলেন, আপনি যে দেখ্‌ছি সব খবরই রাখেন, কবি?

কালিদাস কহিলেন,—কবিকে সব খবরই রাখতে হয়।

বিক্রমাদিত্য মুচকি হাসিয়া কহিলেন,—তাল-বেতালের খবর রাখেন?

হঠাৎ রাজার মুখে আবার তাল-বেতালের কথা শুনিয়া নবরত্নের নয়খানি মুখই একসঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গেল।

কিন্তু কালিদাস সে ভাবটুকু সামলাইয়া তখনই উত্তর দিলেন,—তারা ত বনের পথে পোকা দুটো কৌটোর ভেতরে ভরে আপনাকে দিয়েই পিট্‌টান দিলে; সেই থেকে কোনো খবরই তাদের নেই।

রাজা তেমনই হাসিয়া কহিলেন,—বিয়ের এত ঘটা হয়ে গেল, কত খাওয়া-দাওয়া আমোদ-উৎসব; কই তাদের ত কেউ ডাকলেন না?

বরাহ খপ করিয়া কহিলেন,—আমরা ডাকলে কি হবে বলুন, তারা যে শুধু আপনাকেই জানে, আপনি মনে মনে ডাকলেই এসে উপস্থিত হয়।

বররুচি কহিলেন,—আপনিও ত ওদের ডাকেন নি, আপনারই বরং উচিত ছিল ডাকা।

রাজা কহিলেন,—আমি তাদের ডাকিনি শুধু আপনাদের ভয়ে।

নয়টি রত্নই এক সঙ্গে চমকিয়া রাজার দিকে চাহিলেন, তাঁহাদের সেই চাহনীই যেন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—আমাদের ভয়ে?

রাজা কহিলেন,—পাছে তাদের দেখে আপনাদের আমোদ মাটী হয়, পাছে আপনারা মনে মনে লজ্জা পান, তাই তাদের ডাকিনি। ডাকাটা আপনাদেরই উচিত ছিল।

রাজার কথায় আটটি রত্নই মাথাগুলি হেঁট করিলেন, শুধু কালিদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন,—তাদের দেখে আমরা লজ্জা পাব কেন? ওরা কি আমাদের সমকক্ষ?

রাজা কহিলেন,—ছেলে মানুষ বলে ওদের কি এতটা উপেক্ষা করা ভাল? আমি বরাবরই দেখে আসছি, ওদের দেখলেই আপনারা চলে যান। ওদের সব কাযেই খুঁৎ ধরতে চান। আপনারা পোকা দুটোকে মারতে গেলে যেই ওরা বললে—ওদের মারবেন না, ওরা রাজার কাযেই এসেছে। আপনারা সে কথা শুনে ত হেসেই খুন। কিন্তু শেষ কালে সেই পোকা দুটোই কত বড় কায করলে বলুন ত?

কালিদাস কহিলেন,—ওটা হয়ে গেছে কাকতালের মত, এর জন্য বাহবা দেওয়াই ভুল।

রাজা কহিলেন,—কথাটা খুলেই বলুন।

কালিদাস কহিলেন,—একটা তাল পেকে পড়-পড় হয়েছিল, ঠিক সেই সময় একটা কাক উড়ে এসে যেমন তার ওপরে বসতে যাবে, অমনি তালটা পড়ে গেল। কাক ভাবলে, তার ভরেই তালটা খসে পড়লো, তাল বোলেছিল যে, তার পড়বার সময় হয়েছে তাই পড়ে গেলো। পোকা দুটোর কাযও কাকের মতই হয়েছিল।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—ভালো! এ নিয়ে আমি আর কথা কাটাকাটি করবো না; আপনাদের কথাটাই মেনে নিলুম। তা হ'লে এবার তাদের ডাকি?

বরাহ কহিলেন,—এখন ডেকে কি আর হবে? উৎসব ত হয়ে গেছে, ফিরে যাবার আয়োজন চলেছে, এখন আপনার তাল-বেতাল এসে কি দেখবে?

রাজা শুধু হাসিলেন।

কালিদাস কহিলেন,—বুঝতে পারছ না, কাকতালের কথা বলিছি না, মহারাজ নিজে কিছু বললেন না, তাদের দিয়েই এর উত্তর দেওয়াবেন।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—দেখছি, এখনো আপনাদের রাগ পড়েনি।

কালিদাস কহিলেন,—আমরা রাগ করিনি, আপনি তাদের ডাকুন।

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল, বাগানের লাল রঙ্গের কাঁকর দেওয়া পথটির একেবারে শেষ সীমানায় দৃষ্টি যেখানে হারাইয়া যায় সেখান হইতে জোনাকীর মত আলো ফুটাইয়া বাহির হইল দুটি ছেলে। আরো একটু অগ্রসর হইতেই চিনিতে পারা গেল, তাহারা আর কেহ নহে—তাল ও বেতাল। কিন্তু আজ তাহাদের সাজ-গোছের বাহার ভারি চমৎকার। হরিদ্রাবর্ণের রেশমী পোষাক ও সোনা-মুক্তার অলঙ্কার পরায় আজ তাহাদের রূপের বাহারও খুলিয়াছে। মাথায় পালকের টুপী, তাহাতে মণি-মুক্তার অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। নবরত্ন আড়নয়নে তাল-বেতালের রাজপুত্রদের মত সাজসজ্জা দেখিয়া আরও জ্বলিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এমন সাজপোষাক ইহারা পাইল কোথায়?

দুজনেই হাত তুলিয়া প্রথমে রাজাকে অভিবাদন করিল; তাহার পর নবরত্নকে হাত তুলিয়া প্রণাম জানাইয়া হাসিমুখে কহিল,—আবার এসেছি।

নবরত্ন কহিলেন,—বৃথাই এসেছ; বিয়ের উৎসব শেষ হয়ে গেছে, এখন চারদিকেই ঢু ঢু।

তাল হাসিমুখে উত্তর দিল,—আমরা উৎসবে বড় একটা আসি না।

বেতালও সঙ্গে সঙ্গে কহিল,—উৎসব শেষ হয়ে গেলেই আমরা দেখা দিই।

তাল-বেতালের কথাগুলি নবরত্নের ভালো লাগিল না। রাজা হাসিয়া কহিলেন,—আজ যে তোমাদের সাজ-গোজের ভারী বাহার দেখছি।

তাল হাসিয়া কহিল,—বাহার ত হবেই, আমরা যে বরযাত্রী।

কালিদাস কহিলেন,—বিয়ের পরেই ছাঁদনায় লাথি, বরযাত্রী তখন পর। এখন আর আদর পাবে না।

বেতাল কহিল,—বরযাত্রী হলেও, আমরা দুটিতে আবার নিত-বর, আমাদের আদর হবেই।

নবরত্ন কথাটায় মনে মনে বিরক্ত হইলেন। ছেলে-দুটোর স্পর্দ্ধা ত কম নয়, বলে কি না রাজার নিতবর তারা।

বরাহ পণ্ডিত চোখ দুইটি পাকাইয়া কহিলেন,—নিতবর যদি, বিয়ের সময় ছিলে কোথায়? পথ থেকেই ত সরে পড়েছিলে?

তাল হাসিয়া কহিল,—দেহ দুটো আমাদের সরে গিয়েছিল, কিন্তু মন দুটো বরাবর রাজার কাছেই ছিল।

বররুচি কহিলেন,—কি রকম?

বেতাল কহিল,—কৌটোটার কথা বুঝি ভুলে গেলেন?

বরাহ পণ্ডিত কহিলেন,—কৌটোয় ছিল ত দুটো পোকা?

মুখে দুষ্টামীর হাসিটুকু প্রকাশ করিয়া তাল কহিল,—পণ্ডিত হ'লে কি হয়, আপনারা ভারি বোকা!

বরাহ পণ্ডিতের মুখখানি পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠিল; তর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা; যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমরা বোকা?

তাল-বেতাল কিন্তু ভয় পাইল না, তাহাদের মুখের হাসিটুকুও মিলাইল না; কহিল,—হাতে পাজী মঙ্গলবার কেন? আপনি যখন জ্যোতিষ জানেন, গণলেই পারতেন।

রাজা কহিলেন,—তাল-বেতাল ঠিক কথাই বলছে, তখন আপনার গণনা করাই উচিত ছিল; তা হ'লে কৌটো খুলে আমাকে আর পোকা দুটো ছাড়তে হ'ত না।

তাল-বেতাল হাসিয়া কহিল,—যারা খুব বেশী ওস্তাদ, তাদের অমন ভুল হয়।

ধন্বন্তরি ধমক দিয়া কহিলেন,—ডেঁপোমী আর করতে হবে না, থাম্—

তাল তথাপি দমিল না, হাসিমুখে কহিল,—আমরা ছেলে মানুষ হলেও ঠিক কথাই বলি। ভুল-চুক সবারই হয়। আবার জগতের কিছুই বাজে নয়—সবই কাযের।

কালিদাস কহিলেন,—দুটো পোকা কাকতালের মত একটা ঘটনার উপলক্ষ হয়েছে বলে এদের দেমাক বেড়ে গেছে।

বেতাল মুরুব্বীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—পণ্ডিত যার সৃষ্টি, পোকাও তাঁর।

বেতালের এই কথা নবরত্নকে আবার রাগাইয়া দিল। ঠিক এই সময় একটা প্রকাণ্ড চীল উড়িয়া আসিয়া একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালটির উপর বসিল, সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝঙ্কার তুলিল,—টিঁয়্যা।

ধন্বন্তরি সভয়ে কহিলেন,—মহারাজ, একটা গোদা চীল, ওটাকে মারুন।

তাল মুখখানা ঘুরাইয়া কহিল,—মারবেন কেন? কি অপরাধ ও বেচারী করলে?

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—সে দিন পোকা দেখে বররুচি রেগেই খুন, মারবার জন্য কি প্রয়াস! আজ গাছের ডালে চীলটাকে দেখেই আপনার রক্তও নেচে উঠলো যে! ব্যাপার কি?

ধন্বন্তরি কহিলেন,—ব্যাপার আছে, সে একটা ছোট গল্প।

রাজা কহিলেন,—বলুন না শুনি।

ধন্বন্তরি আড়চোখে গাছের ডালের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চীলটা স্থির হইয়া বসিয়া আছে। গায়ের চাদরখানি নিজের টাকপড়া তেলা মাথাটির উপর চাপা দিয়া কহিলেন,—তখনও আমি মহারাজের সভায় আসি নি; স্বাধীন ভাবেই চিকিৎসা করি। একদিন ক'ল কি রোগী দেখে বাড়ী ফিরছি, সামনেই একটা মস্ত মাঠ, সেই মাঠটা পেরুলেই আমাদের গ্রামে পড়া যায়। তখনো স্নানাহার হয়নি, তৃষ্ণায় গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে, বেলাও তখন গড়িয়ে পড়েছে, অত বড় মাঠের ভেতর আমি একলাই চলেছি। হঠাৎ মাথার ওপর কিসের যেন একটা ছায়া পড়লো, চমকে উঠে চেয়ে দেখি—একটা গোদা চীল তার পায়ের নোখে কি একটা বিঁধে আমার দিকেই সোঁ সোঁ ক'রে নেমে আসছে। আমার মনে কেমন একটা ধোঁকা লাগলো; তাড়াতাড়ি অমনি গায়ের মোটা চাদরখানা মাথার ওপর চাপা দিয়ে তা'র ওপরে হাতখানা চেপে ধরলুম। যেই ধরা, তখনি চীলটা তার নোখে বেঁধা জিনিষটা নিয়ে তার ওপরে মারলে এক আছাড়! মাথাটা বাঁচলো, কিন্তু হাতের আঙ্গুলগুলো একবারে হেঁচে গেলো; আর সেই জিনিষটাও ছিটকে গিয়ে পড়লো তফাতে, চেয়ে দেখি—একটা কচ্ছপ!

সকলেই অবাক্ হইয়া ধন্বন্তরির এই গল্প শুনিতেছিলেন। রাজা মুখের হাসি চাপিয়া কহিলেন,—বুঝিছি, চীলটা তার ঐ শিকার নিয়ে ভারি মুস্কিলেই পড়েছিল; কচ্ছপের খোলাটা এমনি শক্ত যে, পাথরের মত কোনো শক্ত জায়গা না পেলে ত আর ভেঙ্গে তার শাঁসটুকু খাওয়া চলে না, কাযেই উঁচু থেকে আপনার নেড়া মাথাটির ওপরেই নজর তার পড়েছিল; ভেবেছিল—একটা তেলা পাথর, তাই মেরেছিল শিকার নিয়ে এক আছাড়! হাত দিয়ে ভাগ্যিস্ মাথাটা বাঁচিয়েছিলেন!

ধন্বন্তরি তাঁহার ডান হাতখানি দেখাইয়া কহিলেন,—দেখুন না, মাঝের তিনটে আঙ্গুলে এখনো দাগ রয়েছে, তিরিশ বছরেও তা মিলোয় নি। সেই থেকেই চীল দেখলেই আমার মাথায় যেন খুন চাপে।

বেতাল কহিল,—কিন্তু একটা চীলের দোষে চীল জাতটার ওপরে কি রাগ করা ঠিক?

ধন্বন্তরি কথাটা শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন এবং খরদৃষ্টিতে তাল-বেতালের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ—ঠিক, এইটিই উচিত এবং স্বাভাবিক।

তাল হাসিয়া কহিল,—এমন মানুষও ত আছে, এর চেয়েও বেশী দোষ করে; কিন্তু তাই ব'লে মানুষ দেখলেই কি চটে ওঠা উচিত?

বররুচি মুখখানি বাঁকাইয়া কহিলেন,—ছোটমুখে বড় কথা ভারি খারাপ শোনায়। মানুষের সঙ্গে চীলের তুলনা হয় না।

কালিদাস কহিলেন,—মশা, পোকা, পিপড়ে, চীল, ইঁদুর, বাঁদর আর বাদুড়, এরা শুধু ক্ষতিই করে; দেখলেই এদের মারা উচিত।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—কিন্তু পোকাটাকে বাদ দেওয়া উচিত কবি, যেহেতু ওরা আমাদের খুবই উপকার করেছে।

কালিদাস কহিলেন,—আগেই ত বলেছি মহারাজ, ওটা হয়েছে কাকতালীয়বং!

বেতাল কহিল,—চীলটাকেও আজ বাদ দেওয়া উচিত, মহারাজ। যেহেতু ও'হতেও উপকার সম্ভব।

কালিদাস জোর গলায় কহিলেন,—ঐ চীলটা যদি সত্যই কোনো বিশেষ উপকার আমাদের করতে পারে, তা হ'লে ওকে বাদ দিতে পারি, আর—তাল বেতালের কথার যে দাম আছে, এটাও মানতে প্রস্তুত আছি।

চীলটা এতক্ষণ জড়পদার্থের মতই গাছের ডালটির উপর চুপটি করিয়া বসিয়াছিল। এই সময় হঠাৎ ডানা দুইটি একবার মেলিয়া তীক্ষকণ্ঠে ডাকিল,—টিঁয়্যা—

ধন্বন্তরির কান দুটির ভিতর চীলের এই ঝঙ্কার যেন শূলের খোঁচা দিল। তিনি অমনই বিচলিত হইয়া হুঙ্কার তুলিলেন,—তবে রে বজ্জাত, এখনো বসে আছ! র'সো, আমার হাতেই তোমার আজ মৃত্যু।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কটমট করিয়া তিনি আশে পাশে ও তফাতে চাহিলেন; উদ্দেশ্য, যদি সুবিধামত কোন কিছু পান, তাহা ছুঁড়িয়া চীলটাকে মারিবেন। একটু দূরে ছিল একটা ঝোপ, কোন বাহারে গাছকে ঘিরিয়া কতকগুলি তৃণজাতীয় ফুলগাছ সেখানে খুব ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। ধন্বন্তরি দেখিলেন, গাছগুলির তলায় পাথরের নুড়ির মত কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। অমনি মনটি তাঁহার উৎসাহে নাচিয়া উঠিল, ঠিক হইয়াছে! ঐ নোড়াটা ছুঁড়িয়া চীলটার মাথাটি তিনি ভাঙ্গিয়া দিবেন।

এক রকম ছুটিয়া গিয়াই নোড়ার মত সেই বস্তুটি তিনি চাপিয়া ধরিলেন। কিন্তু যেমন ধরা, অমনি ফোঁস্ করিয়া সেটি তাঁহার হাতের মুঠাটি ছাড়াইয়া তুলিল এক প্রকাণ্ড চক্কর!

ধন্বন্তরি বুঝিলেন, নোড়া ভাবিয়া তিনি যাহা ধরিয়াছিলেন, আসলে তাহা নোড়া নহে, একটা সাপের মাথা। সকলেই আতঙ্কে চীৎকার তুলিল,—সাপ, সাপ! পালিয়ে আসুন।

কিন্তু ধন্বন্তরির তখন সসেমিরে অবস্থা; সাপটা উঁচু হইয়া তাঁহার মাথার উপর ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে. আর তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। সাপও তাঁহাকে ছোবল দিবার সুযোগটুকু খুঁজিতেছিল, কিন্তু ধন্বন্তরি ঠাকুরের বরাতে বোধ হয় সর্পাঘাত ছিল না, তাই সেই সঙ্কট সময়টিতে সেই গোদা চীলটা হঠাৎ গাছের ডাল হইতে তীরের বেগে উড়িয়া আসিয়া অতবড় সাপটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গিয়া বসিল একেবারে রাজবাড়ীর চীলের ছাদটির আলিসার উপরে।

সকলেই একবারে স্তব্ধ, কাহারও মুখে একটি কথাও নাই। কেবল তাল-বেতালের চোখ দিয়া কেমন একটা অদ্ভুত রকমের হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে হাসিটুকু ধন্বন্তরি ঠাকুরের চোখ দুটি বুঝি লজ্জায় বুজাইয়া দিল।

রাজা বোধ হয় ধন্বন্তরির দিকে চাহিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সহসা রাজবাড়ীর অন্দরের ভিতর হইতে একটা সোর-গোল উঠিল। তাহা শুনিয়া নবরত্নের সহিত রাজা পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব্যাপার?

কালিদাস কহিলেন,—কিছু ত বুঝতে পারছি না?

তাল কহিল,—গণকঠাকুর ত সঙ্গেই আছেন, গণে বলুন না!

বরাহ তাল-বেতালের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিলেন। ছেলে-দুটোর সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি!

কিন্তু রাজাও কথাটায় সায় দিয়া কহিলেন,—ভাল কথাই ত বলেছে, গণেই দেখুন না।

বরাহ অগত্যা গণিতে বসিলেন। বাগানটির ভিতর জায়গায় জায়গায় পাথরের তৈরী বসিবার আসন ও নানা রকম আধার ছিল। তাহারই একটাকে অবলম্বন করিয়া বরাহ পণ্ডিত খড়ির দাগ কাটিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি কহিলেন—অন্দরে গোল বেধেছে, মহারাজ!

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছে?

বরাহ বলিলেন,—ঐ যে গোলমাল হচ্ছে, ওর গোড়ায় হচ্ছে চুরি।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চুরি হয়েছে?

বরাহ কহিলেন,—কেন গোল হচ্ছে, সেই নিয়ে আমি গণনা করেছি। গণনায় দেখছি, মহারাণীর চন্দ্রহার চুরি গিয়েছে, চোরকে ধরবার জন্য রাণীর লোক মন্ত্রপড়া নল চালিয়েছে। সেই নল অন্দর তোলপাড় ক'রে এই বাগানে আসছে।

রাজা কহিলেন,—বল কি?

তাল-বেতাল কহিল,—মহারাজ, আমরা যাই, আমাদের আর রাজভোগ খেয়ে কায নেই।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেদুটি ছুটিল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কালিদাস কহিলেন,—ছেলে ত নয়, বিচ্ছু।

বররুচি কহিলেন,—চুরির কথা শুনেই মুখগুলো ওদের শুকিয়ে গেল দেখনি। এর ভেতর কথা আছে।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—আপনার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে ওদের ওপর!

বররুচি কথাটার আর উত্তর দিলেন না। রাজা তাঁহার দিকে আড়চোখে চাহিয়া কহিলেন,—কিন্তু বরযাত্রীদের ভেতর শুধু ওরাই দুটিতে অন্দরের ত্রিসীমাতেও যায় নি।

ধন্বন্তরি কহিলেন,—ওরা কি কোনো জায়গায় কাউকে জানিয়ে যায়, মহারাজ?

বাগানের যে দিকে অন্দরের দরজা, গোলমাল এবার সেদিকেই

শোনা গেল। সকলে চাহিয়া দেখিলেন, পীঠজোড়া কুঁজটি লইয়া নাচিতে নাচিতে রাজকন্যার প্রিয়সখী মঙ্গলা তাঁহাদের দিকেই আসিতেছে, দুই হাতে সে সাপটাইয়া ধরিয়াছে বাঁশের একটা নল। আর তাহার পিছনে রাজবাড়ীর এক পাল মেয়ে। তাহাদের ভিতরে রাজকন্যার সখী-সহচরী আছে, রাণীর দাসী-সেবিকা আছে, আরও আছে নানা বয়সের বালক-বালিকা ও আশ্রিতা পরিজনদের দল।

নল লইয়া মঙ্গলা শেষে রাজা ও তাঁহার নবরত্নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাই?

মঙ্গলা নির্ভয়ে উত্তর দিল,—চোর ধরতে চাই, মহারাজ!

রাজা কহিলেন,—চোর কোথায়?

মঙ্গলা কহিল,—চোর আপনার নবরত্নের ভেতরেই আছে।

মঙ্গলার কথা শুনিয়াই নবরত্ন চটিয়া একেবারে লাল। প্রত্যেকেই চোখ পাকাইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। বরাহ দুই চোখের ভ্রূ ফুলাইয়া কহিলেন,—স্পর্দ্ধা!

কালিদাস মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন,—কুজ্ঝটিকা মাসীর মাথায় ছিট আছে; পীঠটির মত মাথাটিও গোলমেলে।

মঙ্গলার মুখখানা রাগে কয়লার মত কালো হইয়া গেল; ঠোঁট-দুটি ফুলাইয়া কহিল,—যারা দোষী, তারাই দোষ ঢাকবার জন্যে সহজ মানুষকে পাগল বানাতে চায়।

রাজা তাড়াতাড়ি কহিলেন,—ব্যাপারখানা কি বল ত শুনি?

মঙ্গলা কহিল,—ব্যাপার ভারি গুরুতর! রাণীমা'র চন্দ্রহার চুরি গেছে। সে হারের আর জোড়া নেই, দামেরও ঠিক-ঠিকানা নেই। চোর ধরতে মন্ত্র প'ড়ে নল চালানো হয়েছে; নল সারা রাজবাড়ী ঘুরে এইখানে আমাকে টেনে এনেছে, আমার কি দোষ বলুন না? নল যখন আপনার নবরত্নের দিকে ঝুঁকেছে, এঁদের ভেতরেই হার-চোর নিশ্চয়ই আছে।

রাজা রাগিবার মত মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—আমার নবরত্নকে চোর বলা, আর শূলে বসা—সমান কথা তা জান?

মঙ্গলা কহিল,—কিন্তু আপনার নবরত্নের কোনো রত্ন সত্যই যদি রত্নহার চুরি করে আর তার কাছ থেকেই সেই হার বেরোয়?

রাজা কহিলেন,—তা হ'লে চোরের শাস্তি তিনি নিশ্চয়ই পাবেন।

মঙ্গলা কহিল,—আপনার নবরত্নের ভেতর থেকে হার-চোরকে বমাল শুদ্ধ যদি বার করতে না পারি, আমাকে না হয় শূলেই বসাবেন। কিন্তু চোরকে আমি পিঁজরের ভেতর পূরে রাজবাড়ীর দেউড়ীর সামনে বসিয়ে রাখবো—এ কথা আমি বলে রাখছি।

রাজা কহিলেন,—বেশ, তোমার নল চালাও।

বিড় বিড় করিয়া মঙ্গলা কি মন্ত্র পড়িল, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে লইয়া নল ছুটিল নবরত্নের দিকে। এমন বিপদে নব-রত্নকে বুঝি আর কখনও পড়িতে হয় নাই।

কালিদাস জোরে হাসিয়া কহিলেন,—কুজ্ঝটিকা মাসীর রাগটুকু আমার ওপরেই বেশী। নল শেষে আমাকেই না ধরে?

অবাক্ কাণ্ড! কালিদাসের মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতেই মঙ্গলার হাতের নল আর সকলকে ছাড়িয়া তাঁহারই কোমরটি জড়াইয়া ধরিল। নলটি এ পর্য্যন্ত একগাছি লাঠির মত সোজা হইয়াই ছিল, কিন্তু কালিদাসের গায়ে ঠেকিবামাত্র সাপের মত কোমরে একটা পাক দিয়া বসিল।

মঙ্গলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—চোর ধরেছি, মহারাজ! আপনার এই রত্নটিই চোর, এঁর কাছেই আছে রাণীর রত্নহার, অর্থাৎ চোরাই মাল।

কালিদাসের মুখে তখনও হাসি। কবি লোক কি না, ব্যাপারটি দেখিয়া মনে মনে বেশ একটু মজা অনুভব করিয়াই বিদ্রূপের সুরে কহিলেন,—কুজ্ঝটিকা মাসী গোড়া থেকেই আমার পেছনে লেগেছেন! আমি ত আগেই বলেছি, আমাকেই ধরবেন।

মঙ্গলা মুখখানা গম্ভীর করিয়াই কহিল,—আমার নল আসল চোরকেই ধরেছে, মহারাজ, এর বিচার করুন।

রাজাও গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু প্রমাণ? বামাল কই?

মঙ্গলা কালিদাসের কোমরের দিকে চাহিয়া দিব্য জোর গলায় কহিল,—আমার নল ত বামাল চেপেই বসেছে, মহারাজ! এই যে দেখুন না, হারটি ঢাকবার জন্যে কেমন কায়দা ক'রে চাদরখানি কোমরে জড়িয়েছে! কিন্তু নল ওখানে চেপে বসে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছে; কাপড় ফুঁড়ে হারের রত্নগুলোর জেল্লা ত চোখের ওপরেই ভাসছে।

নবরত্নের কয়েকজন উঁকি দিয়ে দেখিলেন, মঙ্গলার কথা হুবহু সত্য,—কালিদাসের কটিদেশে জড়ানো উত্তরীয় বস্ত্রের আবরণ ভেদ করিয়া বিভিন্ন রঙ্গের বড় বড় রত্নগুলির জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

রাজাও কবির কাছে আসিয়া দেখিলেন, মঙ্গলা সত্যই বলিয়াছে। তখন তিনি কালিদাসকে কহিলেন,—চাদরখানা আপনি খুলে ফেলুন ত।

কালিদাস কহিলেন,—কেমন ক'রে খুলি বলুন? কুজ্ঝটিকা মাসীর নলটি যে কোমরবন্ধের মত আমার চাদরখানাকে চেপে ধরেছে!

মঙ্গলা কহিল,—বেশ, নল আমি খুলে নিচ্ছি।

নলটি খুলিয়া লইলে, কালিদাস নিজেই যেমন তাঁহার কোমর হইতে চাদরখানি খুলিয়াছেন, অমনি তাহার ভিতর হইতে এক ছড়া অপূর্ব্ব রত্নহার বাহির হইয়া পড়িল।

মঙ্গলা হার ছড়াটি হাতে লইয়া রাজার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া কহিল,—দেখুন মহারাজ, আপনার কবিরত্নের কাণ্ড? এই হারছড়াটিই চুরি গিয়েছিল, আমরা খুঁজে খুঁজে নাকাল!

নবরত্নসহ রাজা বিক্রমাদিত্য একেবারে স্তব্ধ! সকলেরই দৃষ্টি হারটির দিকে। কি চমৎকার সেই হার! এক একটি রত্ন যেন দীপের শিখার মত জ্বলিতেছে। এমন আশ্চর্য্য হার বিক্রমাদিত্যও বোধ হয় এই প্রথম দেখিলেন।

কালিদাসও যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার দুই চক্ষু তখন কপালে উঠিয়াছে, মুখখানি যেন ছাইয়ের মত মলিন হইয়া গিয়াছে; যে মুখ দিয়া কথার খই ফুটিতে থাকে, তাহা একেবারে স্তব্ধ!

মঙ্গলা এবার হাসিয়া কহিল,—শূলে বসা আর আমার বরাতে হ'ল না, মহারাজ! তা হ'লে বলুন, পিঁজরে আনিয়ে আপনার নবরত্নের সেরা রত্নটিকে তার ভেতরে পুরে দেউড়ীতে বসাই?

রাজা কি বলিবেন, তিনি ত আগেই বলিয়াছেন, দোষী হইলে দণ্ড তিনি নিশ্চয়ই দিবেন। কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড! তাঁহার নবরত্ন হইল চোরের মত দাগী? মহাকবি কালিদাস চোর!

হঠাৎ একটা কবিতা শুনিয়া রাজার ভাবনাটা ভাঙ্গিয়া গেল। কালিদাস তখন সুর করিয়া এই শ্লোকটি বলিতেছিলেন,—

সভার শোভা নবরত্ন
আপদকালে তাল-বেতাল;
ঢেউ খেয়ে ভুল ভেঙ্গে গেছে
ছুটে এসে ধরো হাল।

শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে একটা ঝটাপট্ শব্দ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাগানে পড়িল কিসের ছায়া। সকলেই চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, দুইটি চীল আকাশপথে কি যেন লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।

এদিক্কার ব্যাপারে আগেকার চীলটার কথা রাজা ও নবরত্ন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। চীল দেখিয়া চীলের কথাটা আবার তাঁহাদের মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু এবার দেখা দিল একই রকমের দুইটা চীল। আর, সেই যে সাপটিকে আগেকার চীলটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই প্রকাণ্ড সাপটিকে লইয়াই এবার দুইটা চীল ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছে বুঝা গেল। দেখিতে দেখিতে সাপের টুক্রো টুক্রো অংশগুলো বৃষ্টির মত টুপটাপ করিয়া পড়িতে লাগিল শুধু নবরত্নের মাথায়। আবার এমনই আশ্চর্য্য কাণ্ড, সেই সব টুকরা নবরত্নের মাথায় পড়িবামাত্র এক এক ছড়া চন্দ্রহার হইয়া তাঁহাদের গলায় দিল বাহার। প্রত্যেক হারটির গড়ন ও মণিরত্নের কারিকুরি ঠিক একই রকমের। আরও আশ্চর্য্য এই যে, হারগুলি হুবহু আগেকার হার ছড়াটির মত,—মঙ্গলা যে হারটি মহাকবি কালিদাসের কোমর হইতে বাহির করিয়া অহঙ্কারে একেবারে যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল!

মঙ্গলা ও অন্দরের আর সকলে চোখগুলি কপালে তুলিয়া নবরত্নের পানে চাহিয়া তাহাদের গলার হারগুলি দেখিতেছিল। কি আশ্চর্য্য! সবই এক রকমের, কোনোটির কি এতটুকু এদিক্-ওদিক্ আছে? নবরত্নের গলার নয় ছড়া হার, আর মঙ্গলার হাতে-ধরা মহারাণীর রত্নহার—সবগুলিই সমান, যেন একবারে একই ছাঁচে গড়া! মঙ্গলাও এবার মনে মনে বুঝিল, তাহার চেয়েও কোনো বড় ওস্তাদের এই কারচুপি! ছি ছি, কি লজ্জা!

রাজা মঙ্গলার মনের অবস্থা বুঝিয়াই যেন হাসিয়া কহিলেন,—দেখলে ত নবরত্নের ক্ষমতা কত? কবিরত্ন কালিদাস একটা কবিতা আওড়াতেই ন'ছড়া রত্নহার এসে উপস্থিত। এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায়? এমন যে আমার রত্ন, তুমি কি না বলতে চাও—সে করেছে তোমার রাণীর রত্নহার চুরি? এখন ভালোয় ভালোয় কবির হার কবিকে ফিরিয়ে দাও, নইলে তোমাকেই পিঁজরেয় পুরে উজ্জয়িনীতে নিয়ে যেতে হবে।

মঙ্গলার মুখে আর কথা নাই। কি করিবে বেচারী? জিতিয়াও তাহাকে আশ্চর্য্য রকমেই হারিতে হইয়াছে। কাঁদ-কাঁদ হইয়াই হারছড়াটি সে কালিদাসের দিকে আগাইয়া ধরিল।

কালিদাস সেটি হাতে লইয়াই একগাল হাসিয়া কহিলেন,—নবরত্নের কাছে কেউ হারলেও নবরত্ন তাকে হার দিয়ে খুসী করে। আমিও খুসী মনে কুজ্ঝটিকা মাসীকে এটা দান করলুম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস হারটি পুনরায় মঙ্গলার হাতেই দিলেন। মঙ্গলা কটমট করিয়া একবার কালিদাসের দিকে চাহিয়াই পীঠের কুঁজটি দুলাইয়া অন্দরের পথে ছুটিল। ছেলে-মেয়েরাও তাহার পিছু লইল। নবরত্নের তখন হাসির কি ধুম!

এদিকে সেই দুইটি চীল উড়িতে উড়িতে নীচে একেবারে মাটীতে নামিয়া আসিল—বাগানের যে দিক্টায় রাজা ও নবরত্ন বসিয়াছিলেন।

রাজা ধন্বন্তরির দিকে চাহিয়া কহিলেন,—দেখছেন কি, আবার এসেছে। এবার কি ছুঁড়বেন?

ধন্বন্তরি কহিলেন,—ভুল আমার ভেঙ্গেছে, আমি এবার হারই স্বীকার করছি।

দুইটা চীলই একসঙ্গে ডানা মেলিয়া নাচিয়া উঠিল, অমনই কোথায় গেল উড়িয়া চক্ষের নিমেষে তাহাদের গায়ের খোলস,—সকলেই অবাক্ হইয়া দেখিলেন, চীলের বদলে তাঁহাদের চির-পরিচিত সেই দুইটি ছেলে—তাল ও বেতাল! কালো কালো দুইখানি মুখে হাসির কি মনমাতানো আলো!

কালিদাস কহিলেন,—তোমাদের সঙ্গে নবরত্নের আর ঝগড়া নেই, আমরা আজ তোমাদের চিনেছি।

রাজা হাসিয়া কহিলেন,—চেনা-শোনাটা আরো আগেই হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, তোমাদের মিলনে আমিও খুসী হয়েছি।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সফল

তোমার গীতি গাইবো যেদিন আমি,
সেদিন আমার সফল হবে গাওয়া,
চাইবো যেদিন তোমার পানে স্বামী,
সফল হবে সেদিন আমার চাওয়া!

তোমার নামে নয়ন দু'টি ভরি',—
অশ্রুরাশি পড়বে যবে ঝরি',
কালের স্রোতে জীর্ণ জীবন-তরী
সেদিন আমার সফল হ'বে বাওয়া!

এই যে বিপুল বিশ্বখানি জুড়ে—
মধুর সুরে আনন্দ-গান বাজে,
সে গানখানি গভীরতর হ'য়ে
বাজ্‌বে যে দিন ব্যাকুল হিয়া-মাঝে,—

মানস-পটে তোমার ছবি যবে,—
নয়নজলে মলিন নাহি হ'বে,—
উজল হ'য়ে জাগ্‌বে আঁখির আগে,
—সহজ হ'বে সেদিন তোমায় পাওয়া।

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী।

যুগ্মভেলায় জলক্রীড়া

গ্রীষ্মকালে আটলান্টিক সমুদ্র উপকূলে জলক্রীড়ার বাজি হইয়া থাকে। এক জোড়া করিয়া ভেলায় দুই জন করিয়া পুরুষ অথবা নারী ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এমন বহু যুগ্ম ভেলায় বহু ক্রীড়ার্থী-ক্রীড়ার্থিনী জলের উপর দৌড়-প্রতিযোগিতা করিয়া
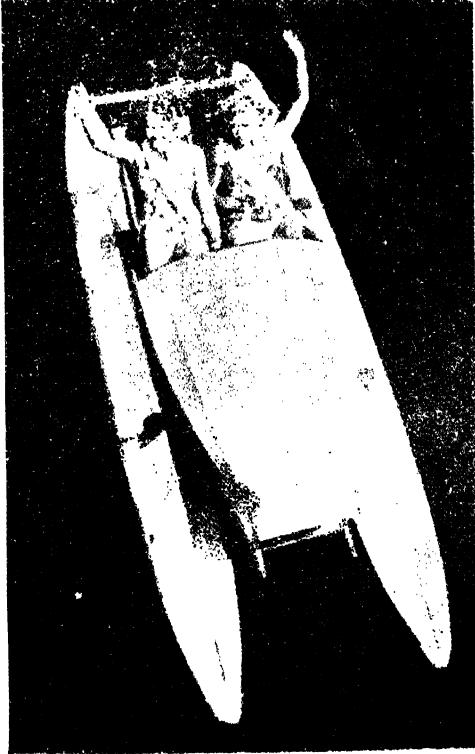
যুগ্ম ভেলায় জলক্রীড়া

থাকে। ভেলাতে যে চাকা থাকে, তাহা পদ দ্বারা চালিত করিতে হয়। যাহাদের পায়ের জোর খুব বেশী, তাহারাই এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া থাকে।

অগ্নিনির্ম্মাণকারীর পরিচ্ছদ

অগ্নিনির্ম্মাণকারী বিভাগের লোকজনকে অগ্নির উত্তাপ এবং বিষাক্ত বাষ্পের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার মুখোসযুক্ত বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পরিচ্ছদ ও মুখোসে সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত হয়। এই বস্ত্র বা পরিচ্ছদ রবার হইতে

অগ্নিনির্ম্মাণকারীর মুখোস ও পরিচ্ছদ

নির্ম্মিত। মুখোসের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। চক্ষু যাহাতে কুয়াশা প্রভৃতিতে দৃষ্টিশক্তিহীন না হইতে পারে, সে জন্য কুয়াশা নিবারণের ব্যবস্থা মুখোসের সম্মুখভাগে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই পরিচ্ছদ ধারণ করিলে দেহ ও দেহাভ্যন্তরের কোনও প্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে না।

সিন্ধুঘোটকাকৃতি যান

জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীতে এমন ভাবের মোটর-যানসমূহের সমাবেশ হইয়াছে যে, তাহারা জল-পথ ও স্থল-পথে সমানভাবে সৈনিকসহ

চলাফেরা করিতে পারে। সিন্ধুঘোটকের আকারবিশিষ্ট মোটর-চালিত যানে ৮ হইতে ১০ জন সৈনিক বসিতে পারে। সেতুপথে না গিয়া এই যানসমূহ সোজা পথ হইতে জলের উপর দিয়া সাঁতার

সিন্ধুঘোটকের আকারবিশিষ্ট স্বয়ংচালিত যান

কাটিয়া উত্তীর্ণ হয়। জলপথে ইহার গতি ঘণ্টায় ১২ মাইল, কিন্তু স্থলপথে ৭২ মাইল পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারে।

জীবনরক্ষক কোমরবন্ধ

এই কোমরবন্ধ এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, উহা হাত দিয়া পিষিবা মাত্র উহা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে বায়ুপূর্ণ হইয়া উঠিবে। কোন ব্যক্তি সমুদ্রে জলমগ্ন হইতেছে দেখিলে রক্ষাকারী এই কোমরবন্ধটি নিমজ্জিতপ্রায় ব্যক্তির বুকের উপর বাঁধিয়া দেয়। সেই সময় উহা চাপিয়া দিতে হয়। চাপিবার পরেই দেখা যায় যে, উহা বায়ুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

নিমজ্জিত ব্যক্তিকে তীরে আনয়ন করা হইতেছে

ইহার ফলে নিমজ্জিত ব্যক্তি জলের উপর ভাসিয়া থাকে। তখন রক্ষাকারী তাহাকে তীরের দিকে টানিয়া লইয়া আইসে।

পাঁচ ফুট উভচর যান

ক্যাপটেন্ হ্যাপ্ রসেল একজন বিমানবিদ্। তিনি ফোর্ট ওয়াশ ও লশএঞ্জেলেসের ব্যোম্‌পথে বিমান পরিচালনা করিয়া থাকেন। তিনি অবকাশ সময়ে একখানি ছোট বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বিমান ব্যোম্‌পথে দশ মিনিট পর্য্যটনের পর জলের উপর
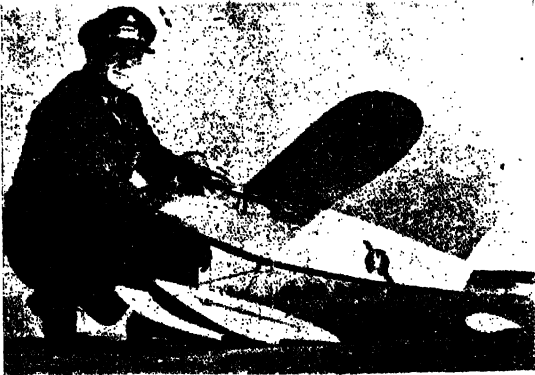
পাঁচ ফুট উভচর যান

নামিয়া আইসে। ইহার ডানার প্রসার ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। ইহাতে যে মোটর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা এক-অশ্বশক্তির পঞ্চমাংশ শক্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এক আউন্স গ্যাসোলিনে এই যান ৩০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত উড়িতে পারে।

নূতন ধরণের বাদ্যযন্ত্র

পূর্ব্বে দুই জনে চড়িবার দ্বিচক্রযান উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইদানীং দুই জনে এক সঙ্গে বাজাইবার বাদ্যযন্ত্রও উদ্ভাবিত হইল। এই বাদ্যযন্ত্রে যখন দুই জন সুর-ঝঙ্কার সৃষ্টি করে, তখন কোন প্রকার অসুবিধা বা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। এমন কি,
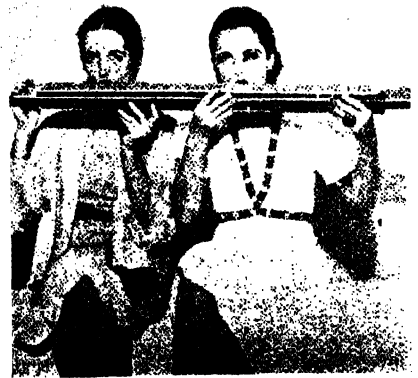
দুই জনে বাজাইবার মুখযন্ত্র

তিন জনের বাজাইবারও অবকাশ আছে। বাদ্যযন্ত্র-প্রদর্শনীতে সম্প্রতি এই অভিনব যন্ত্রের আমদানী হইয়াছিল। যন্ত্রটি ৪৯ ইঞ্চি দীর্ঘ।

তিন চাকার মোটর গাড়ী

ক্যালিফোর্ণিয়ার এক জন বৈজ্ঞানিক শিল্পী অবসরকালে একখানি তিন চাকার মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রায় ১৮ মাস পরিশ্রমের পর তিনি উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করেন। এই গাড়ীর ষ্টিয়ারীং চাকা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। পরীক্ষায় এই গাড়ী
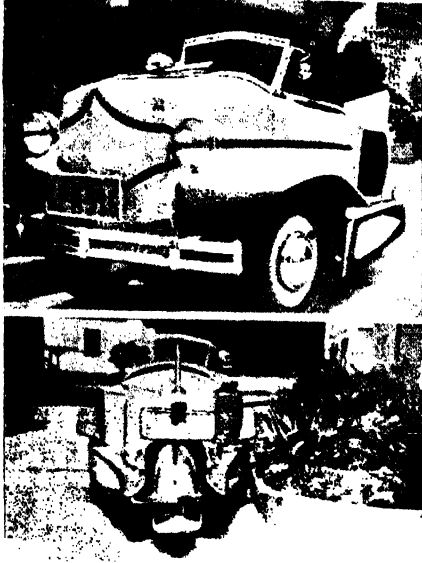
তিন চাকার মোটর গাড়ী, উপরের চিত্রে গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ এবং নীচের চিত্রে সম্মুখভাগ দেখা যাইতেছে

ঘণ্টায় ৬৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। এক গ্যালন তৈলে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করা যায়। এই তিন চাকার গাড়ী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

দ্বিচক্রযানে শিশুর আসন

সুইজারল্যাণ্ডে দ্বিচক্রযানে শিশুদিগের বায়ু-সেবনের জন্য বসিবার স্বতন্ত্র আসন আছে। যানের হাতলের কাছে এই আসন সংস্থাপিত হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য আসনের উপরে ছাউনি আছে। ইচ্ছামত উহা ভাঁজ করিয়া রাখাও চলে। এইখানে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাতে দেখা যাইবে, পিতা শিশু-পুত্রকে লইয়া দ্বিচক্রযানে বায়ু-সেবনে বাহির হইয়াছেন।

দ্বিচক্রযানে শিশুর আসন

পরিদর্শনকারী বিমান

সেনাদলে পরিদর্শনকারী বিমান ব্যবহৃত হইতেছে। এই বিমানের উপরিভাগ কাচ-নির্ম্মিত। কাচগুলি এমন স্বচ্ছ যে, ব্যোম-পথে উড়িবার সময় পরিদর্শনকারী সৈনিকগণ কাচ-কক্ষ হইতে

পরিদর্শনকারী বিমান

চতুর্দ্দিক্ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। শত্রু-সেনার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্যই এই বিমান সম্প্রতি আমেরিকায় নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পরিদর্শনকারী বিমানের এঞ্জিন ৮ শত ৫০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট।

আর কোথাও কি মানুষ আছে?

বিশ্ব অনন্ত। ইহার শেষ সীমা আছে কি না, মানুষ তাহা জানে না। তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। এ বিষয়ে মানুষ একেবারে শক্তিহীন। মানুষের দর্শনশক্তি এই ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতরা বলেন, সপ্ত সমুদ্রের সৈকতভূমিতে যত বালুকা আছে, তাহার তুলনায় একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণার লক্ষ ভাগের এক ভাগ যত ক্ষুদ্র, আমাদের এই ধরিত্রী সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তত ক্ষুদ্র বা তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আমাদের এই সৌরজগতের কেন্দ্রস্থিত সূর্য্যমণ্ডল এত বৃহৎ যে, তাহা আমাদের ধারণার মধ্যেই আসে না। আমরা আমাদের এই ধরিত্রীর বিশালত্ব ধারণা করিতেই পারি না। আর আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় বহু লক্ষ পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডলের গর্ভে লুকাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের এই সবিতৃদেব এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তারকা মাত্র। নিশাযোগে নভোমণ্ডলে যে সকল স্থিরদ্যুতি তারকা দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটা সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক। দিবাভাগেও আকাশ নক্ষত্রমালায় আচ্ছন্ন থাকে, তবে সূর্য্যকিরণের প্রাবল্য হেতু আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। এই তারকারাজি সংখ্যায় কত, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে, তখনকার দুরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে ছয় হাজার তারকা এই নভোমণ্ডলে দেখা গিয়াছিল। আজ তাহার পর ত্রিশ বৎসর কাল যাইতে না যাইতেই উন্নত দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, আকাশে ছত্রিশ হাজারেরও অনেক অধিক তারকা বিরাজিত। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা বলেন, নক্ষত্র-সংখ্যা ১৬০ কোটি, উহাদের সকলগুলির আকার সমান নহে। কতকগুলি আয়তনে আমাদের এই ধরণী অপেক্ষা বড় হইবে না; ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আর কতকগুলি এত বড় যে, আমাদের এই তপনদেবের ন্যায় কোটি কোটি গ্রহরাজ তাহার উদরে বিচরণ করিতে পারেন। অধিকাংশ তারকা এত দূরে অবস্থিত যে, তাহার আলোক ধরাতলে আসিয়া পৌঁছিতে কোটি কোটি বৎসর কাটিয়া যায়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল চলে, ইহাই আধুনিক মত। সম্প্রতি খুব শক্তিশালী দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আকাশের দক্ষিণ দিকে এক দল তারকা দেখা গিয়াছে। উহা হইতে ধরাতলে উহার আলোক আসিতে আড়াই লক্ষ আলোক-বৎসর অতিবাহিত হয়। এক আলোক-বৎসর কত জানেন? ৬ অঙ্কের পর বারটি শূন্য দিলে (৬,০০০,০০০,০০০,০০০) যত পার্থিব-বৎসর হয়, তত বৎসর। ঐরূপ আড়াই লক্ষ বৎসর। আমরা কথায় কথায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলি; কিন্তু উহা যে কিরূপ বিরাট, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য আমি এই কথাগুলি বলিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নভোমণ্ডলের স্থিরপ্রভ তারকাগুলি সূর্য্যের সমশ্রেণীয় জ্যোতিষ্ক। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-বিশারদগণ বলেন যে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি তারকাকে বেষ্টন করিয়া কয়েকটি গ্রহ ঘুরিতেছে জানিতে পারা গিয়াছে। অন্য অনেকগুলির কোন গ্রহই নাই বা ধরা পড়ে নাই। যাহাদের গ্রহ আছে, তাহাদের সেই গ্রহে মানুষের মত কোন জীব আছে কি না, তাহাকে লইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক আলোচনা এবং গবেষণা হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে সকলে একমত হইয়া কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, বৈজ্ঞানিক-সিদ্ধান্ত পর্য্যবেক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষার (experiment) উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কিন্তু এই ধরার অধিবাসীর পক্ষে ঐ সকল অতি দূরস্থ গ্রহের সন্নিহিত হইয়া কোন তথ্যেরই পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। অগত্যা আমাদের এই ধরার অভিজ্ঞতা লইয়া ঐ সকল স্থানের অবস্থা বিচার করিতে হয়। তাহাতে সম্ভাব্যতা মাত্র (possibility) মাত্র অনুমান করা যায়। আমাদের এই সৌরজগতের দূরস্থ গ্রহগুলির অস্তিত্ব মাত্র জানিতে কত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে? উরেনাস নেপচুন প্রভৃতি গ্রহ অধিক দিন ধরা পড়ে নাই। প্লুটো (Pluto) নামক গ্রহ ত সম্প্রতি

আবিষ্কৃত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কোটি কোটি যোজন দূরস্থ নক্ষত্রগুলির সঙ্গে কোন গ্রহ বা তাহাদের উপগ্রহ আছে কি না, তাহা নিশ্চিতভাবে স্থির করা কত কঠিন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিছু কাল পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক-জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা অণুবীক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করেন যে, আলগল (Algol) নামক একটি তারকার দ্যুতি মধ্যে মধ্যে ম্লান হইয়া যায়। পরে লক্ষ্য করিতে করিতে দেখা গেল যে, ঠিক নিয়মিতভাবে ঐ গ্রহের জ্যোতিঃ ম্লান ও উজ্জ্বল হয়। তাহার পর জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদগণ স্থির করেন যে, ঐ গ্রহের চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া একটি ম্লান-কিরণ জ্যোতিষ্ক ঘুরিতেছে। ঐ গ্রহটি আলগল তারকার একটি বৃহৎ গ্রহ কিম্বা সহযাত্রী কোন নির্ব্বাণদশাপ্রাপ্ত তারকা, তাহা বলা কঠিন। স্পাইকা (Spica) নামক আর একটি তারকার ঐরূপ জ্যোতিঃশূন্য একটি সঙ্গী আছে। উহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ধরা কঠিন। উহা কোন ম্লান-কিরণ বা মৃত তারকা কিম্বা স্পাইকার একটা গ্রহ, তাহা বুঝা কঠিন।

যাহা হউক, এই বিশ্বে অসংখ্য তারকা বিরাজ করিতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-জ্যোতির্ব্বিদ্‌ সার জেমস্‌ জিন্স বলিয়াছেন যে, আমাদের এই ধরিত্রী এই বিশ্বের তারকারাজির তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবীতে সপ্ত সাগরতীরে যত বালুকা-কণা আছে, তাহার তুলনায় একটি ক্ষুদ্র বালুকা-কণার দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ যত ক্ষুদ্র, তত ক্ষুদ্র। এখন এই ধরণীর বক্ষেই কেবলমাত্র সজীব সত্ত্ব বা প্রাণী আছে, আর কোথাও প্রাণী নাই—মানুষের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন, বিচারশক্তিসম্পন্ন এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞান-সম্পন্ন জীব আর এই বিশাল বিশ্বের কুত্রাপি নাই,—বিনা বিচারে এরূপ দম্ভপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। মানুষ ক্ষুদ্রবুদ্ধি হইলেও বিষয়টি বিচারসাপেক্ষ।

বৈজ্ঞানিকরা সকলেই এক বাক্যে বলেন যে, এই পৃথিবীতে কি প্রকারে জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানেন না। এ কথা সত্য যে, আমাদের এই পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী আছে, তাহাদের অস্তিত্ব উত্তাপের একটা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে থাকিতে পারে। সেই সঙ্কীর্ণ সীমার এ-দিকের বা ও-দিকের গণ্ডী অতিক্রান্ত হইলে আর জীব বাঁচে না। ধরার কোন জীবই সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, জীবরক্ষার জন্য কার্ব্বণ বা অঙ্গারজান, হাইড্রোজেন বা উদ্‌জান, অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্প প্রভৃতি থাকা চাই। ইহা ভিন্ন এই পৃথিবীর মত তথায় বাতাস, জল, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি থাকা একান্তই আবশ্যক। কারণ, এই পরিস্থিতির ভিতর দিয়া জীবের জীবন অভিব্যক্ত হইয়াছে। এতদিন বৈজ্ঞানিকরা বলিয়া আসিতেছিলেন যে, ঐরূপ পরিস্থিতি অন্য কোন গ্রহে আছে বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং অন্য কুত্রাপি জীব নাই, অন্ততঃ পৃথিবীর জীবের মত জীব নাই। তবে বৈজ্ঞানিকরা মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, মঙ্গলগ্রহে (Mars) মানুষের ন্যায় জীব আছে। ইহারা খাল কাটিয়াছে, অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছে এবং তথা হইতে দর্পণ (reflector) যোগে পৃথিবীতে আলোক পাঠাইয়া সঙ্কেত করিতেছে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক মহলে বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। এক জন মহিলা এই বিষয়টি পরীক্ষা করিবার জন্য অনেক টাকা দান করিয়া যান। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ইহার কোন শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই। যাহা হউক, দূরবীক্ষণ এবং আলোক-বিশ্লেষক যন্ত্রের (Spectarscope) সাহায্যে বৈজ্ঞানিক-জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা জানিতে পারিয়াছেন যে, মঙ্গল (Mars) বুধ (Urnus) এবং শুক্র (Mercury) গ্রহের পরিস্থিতির সহিত ধরার পরিস্থিতির অল্পাধিক মিল আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মিল নাই। মঙ্গলগ্রহ অনেকটা পৃথিবীরই মত। উহাতে পৃথিবীর মত জল, বাতাস প্রভৃতি বিদ্যমান। তথায় পৃথিবীর ন্যায় ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থাৎ এই গ্রহটি অনেকাংশে পৃথিবীরই অনুরূপ। সেই জন্য এক জন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, যদি পৃথিবীর কোন মানুষকে মঙ্গলগ্রহে নির্ব্বাসিত করা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যে পৃথিবী ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহা মনে করিতে পারে না। সে মনে করে যে, পৃথিবীর কোন স্থানেই আছে। হিন্দুরা মঙ্গলকে ধরাসুত বলিয়া থাকেন। এই গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের অধিক দূরবর্ত্তী। সুতরাং তথায় শীত কিছু অধিক হইবারই সম্ভাবনা। এই গ্রহটি পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র—প্রায় ইহার অর্দ্ধেক।

ইহা ভিন্ন বুধ গ্রহের সহিতও পৃথিবীর কতকটা মিল আছে। ইহা আকৃতিতে প্রায় পৃথিবীর সমান। ইহার দিবাভাগ ঠিক পৃথিবীরই দিবাভাগের মত। তবে ইহার বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদা মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, সেই জন্য ইহার

ভিতরকার অবস্থা ঠিক কিরূপ, তাহা এত দূর হইতে বুঝা যায় না। *এই গ্রহটি সূর্য্যের সন্নিহিত, সেই জন্য পৃথিবীর আলোক এবং উত্তাপ অপেক্ষা ইহার আলোক এবং উত্তাপ* অধিকতর প্রখর হইবেই। ইহাতে জীব থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। তবে যদি ঐ গ্রহে জীব থাকে, তাহা হইলে তাহারা যে পৃথিবীর জীবের মত জীব হইবেই, এমন কোন কথা নাই; তাহারা কতকটা স্বতন্ত্র ধরণের জীব হইতেও পারে।

মানুষের মধ্যে—বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বহু-কাল ধরিয়া একটা প্রশ্ন উদিত হইয়া আছে যে, আমাদের এই সৌরজগতের বাহিরে, অন্য কোন সৌরজগতে, এই ধরাবাসী মানুষের মত কোন জীব আছে কি না? এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারা এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, আমাদের এই সৌরজগতের মত পরিস্থিতিসম্পন্ন অন্য কোন সৌর-জগৎ এই বিশ্বে আছে। সম্প্রতি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতি সাধিত হওয়াতে অনেক নূতন নূতন তারকা ধরা পড়িতেছে। তাঁহারা এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় ঠিক সমান পরিস্থিতিযুক্ত অনেক সৌর-জগৎ এই বিশ্বে বিরাজ করিতেছে। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, সম্ভবতঃ অন্য সৌরজগতে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় জীব—এমন কি, মানুষ পর্য্যন্ত আছে। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিমানপথে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের সহিত সমান অগ্রসর। উহার প্রত্যেক সৌরজগতের গ্রহগুলি যখন আমাদের এই সৌর-জগতের গ্রহগুলির সমান বা প্রায় সমান, তখন উহাদের কাহারও কাহারও পরিস্থিতিও আমাদের এই ধরার মত সমান অগ্রসর হইতেই পারে। সুতরাং উহাতে ধরণী-বক্ষঃস্থিত জীব এবং জঙ্গলের ন্যায় জীব ও জঙ্গল থাকিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। একই কারণ একই প্রকারের ফল প্রসব করিবেই।

জড়বিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহার গণ্ডী কতকটা সঙ্কীর্ণ। যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভবে না, সে বিষয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান কোন কথাই বলিতে পারে না। এই বিজ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা তথ্য নির্ণয় করে এবং অবেক্ষিত তথ্যগুলিকে একটা সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। উহার নাম *সামান্যীকরণ (generalisation)। সেইজন্য পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি ভূত-বিজ্ঞানের অধিকার কতকটা* সঙ্কীর্ণ হইতে বাধ্য। এরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কেবলমাত্র সম্ভাব্যতা (possibility) বলিয়া দিয়াই খালাস। তাহার অধিক কিছু বলা তাহাদের অধিকার-বহির্ভূত। যদি সে বলে যে, অমুক তারকার অমুক গ্রহে জীব আছে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। যেমন পদার্থ-বিজ্ঞানবিশারদ যদি বলেন যে, দুই ভাগ হাইড্রোজেন বাষ্প আর এক ভাগ অক্সিজেন বাষ্প সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত করিলে উহা জলে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। তাঁহাকে তাহা হাতে-হাতিয়ারে দেখাইয়া দিতে হইবে।

তবে মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্থান সর্ব্বোচ্চ নহে। কারণ, মানুষের মানস ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি সমস্যা উদিত হয়, যাহার মীমাংসা বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান, করিতেই পারে না। সেইজন্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য এবং সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া দর্শনশাস্ত্র বিচার-পথে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া থাকে। এ স্থলে অবশ্য আমি অধ্যাত্ম দর্শনের কথা বলিতেছি না। ব্যবহারিক দর্শনের কথাই বলিতেছি। ব্যবহারিক দর্শন বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে বিচার পথে অগ্রসর হয়। কাযেই দর্শনশাস্ত্র বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে। যদি বৈজ্ঞানিকের তথ্য-সংগ্রহে বা সিদ্ধান্তে ভুল হয়, তাহা হইলে ব্যবহারিক দর্শনের ভুল হইবার সম্ভাবনা। এখন দেখা যাউক, দার্শনিকের দিক্ দিয়া এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়।

আমরা দেখিতে পাই যে, এই পৃথিবীর সকল স্থানই সচেতন জীবে পূর্ণ। সমুদ্রগর্ভে সলিলমধ্যে মানুষ বাঁচে না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যেও জীব আছে। তিমি, হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি বড় বড় জীব ত সলিলমধ্যে আছেই; তদ্ভিন্ন এক বিন্দু জলে লক্ষ লক্ষ জীব বিচরণ করে। উহাদের সকলগুলির আকৃতিও সমান নহে, প্রকৃতিও একরূপ নহে। তাহারা সকলেই আহার অন্বেষণ করিতেছে, বংশবৃদ্ধি করিতেছে, বিশ্রাম করিতেছে এবং মরিয়া যাইতেছে। বৃহত্তর প্রাণীদের ন্যায় উহাদের সকল চেষ্টাই আছে। উহারা আবার উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর জীবকে ধরিয়া খায়।

পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, তাহাও কোটি কোটি প্রাণীর অধিষ্ঠান-স্থান। ইহাতে যে কত জীবাণু এবং উদ্ভিজ্জাণু বিরাজ করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীর গিরিকন্দরে, গিরিশিখরে, মরুকান্তারে, মেরুপ্রান্তে সর্ব্বত্রই ত জীব বিরাজ করিতেছে। জীব ছাড়া স্থান কুত্রাপি নাই, ইহা বিজ্ঞানেরই সিদ্ধান্ত।

এখন জানিতে ইচ্ছা হয়, প্রকৃতি কি কেবলমাত্র এই বিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি গ্রহকে জীবের বাসভূমি বলিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন? ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতির কার্য্য খামখেয়ালি ভাবে চালিত হয় না, একটা বাঁধাধরা নিয়ম এবং পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞান বলিয়া কোন কিছুরই আবির্ভাব হইতে পারিত না। বিজ্ঞান প্রকৃতির সেই নিয়ম এবং পদ্ধতিগুলিই আবিষ্কার করিয়া তাহা গ্রথিত করিয়া রাখে। সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন, প্রকৃতির কার্য্যে একটা অভিসন্ধি বা মতলব আছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করিতেছেন।* যদি সে কথা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বতঃই এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে, প্রকৃতি এই পৃথিবীর ন্যায় বহু গ্রহ সৃষ্টি করিলেও কেবল এই ধরিত্রীকে জীবের আবাসভূমি করিয়া দিয়াছেন,—ইহা যেন অসম্ভব মনে হয়। প্রকৃতির সৃষ্টি-কার্য্যের মূলে একটা অভিপ্রায় ছিল এবং সেই অভিপ্রায় অনুসারেই মানুষ ধরণীতলে আবির্ভূত হইয়াছে। মানুষ যে আকস্মিক সৃষ্টি নহে, এ কথা আজ অতি বড় বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করিতেছেন। এই বিশ্ব অন্ধ বা জড়শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, কতকগুলি জড় অণুপরমাণুর নর্ত্তনে আচম্বিতে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহার ফলে ধরাতলে জীব দেখা দিয়াছে, তাঁহারা ভ্রান্ত, বর্ত্তমান যুগের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগের তাহাই মত। স্যর জেমস্ জিন্স বলিয়াছেন :—

"We discover that the universe shows evidence of a designing or controlling power that has something in common with our own individual minds—not so far as we have discovered, emotion morality or aesthetic appreciation, but the tendency to think in the way which for want of a better word, we describe as mathematical."

অর্থাৎ আমরা এখন এই কথাই বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে একটা অভিপ্রায়সাধক বা নিয়ন্ত্রণকারক মন রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সেই মনের সহিত আমাদের (মানুষের) ব্যক্তিগত মনের কতকটা একতা আছে। আমরা যতখানি বুঝিতেছি, তাহাতে সেই মনে (মানস শক্তি) মনের আবেগ, নীতিবিজ্ঞান অথবা সৌন্দর্য্য-সম্পর্কিত ধারণা আছে, তাহা না আবিষ্কৃত করিতে পারিলেও সেই মন যে গণিতের ন্যায় সূক্ষ্মবিচারী, অন্য শব্দের অভাবে আমরা এ কথা বলিতে পারি।

ধরাতলে মানুষের আবির্ভাব যদি একটা অচিন্ত্যনিমিত্তক বা আচম্বিত সংঘটিত ব্যাপার না হয়, অর্থাৎ উহা যদি উদ্দেশ্যহীন জড় অণুপরমাণুর সংঘাতে আচম্বিতে উৎপন্ন না হয়, যদি উহা একটা অজ্ঞাত মানস-শক্তির গূঢ় অভিপ্রায়প্রসূত ফল হয়, তাহা হইলে এই বিশাল বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র নগণ্য একটা গ্রহেই যে জীবের তথা মানবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা মনে করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই বিশ্বের অন্যত্রও নিশ্চিতই মানবের অথবা মানবের ন্যায় মানসীশক্তিসম্পন্ন কোন জীব আছে, তাঁহাদেরও মানুষের ন্যায় মনের আবেগ, নীতিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি প্রভৃতি আছে, ইহা মনে করা অন্যায় হইবে না। তাহাদের আকার আমাদের আকার হইতে অন্যরূপ হইতে পারে, তাহাদের মানসীশক্তি এবং প্রতিভা আমাদের এই ধরাবাসী মানুষের মানসীশক্তি অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইতে পারে। প্রকৃতি বৈচিত্র্যপ্রিয়া। তিনি একই গাছের দুইটি পাতাকে ঠিক সমান করেন না; একই জনক-জননীর দুই সন্তানকে আকারে এবং মানসশক্তিকে ঠিক হুবহু একরূপ করেন না; একই বৃক্ষের দুইটি ফল ঠিক একরূপ হয় না; সাম্যের মধ্যে বৈষম্য ঘটানই তাঁহার কায। আজ বৈজ্ঞানিক

* And in the world of living things we find that there is a principle at work which squares with what is basic in our moral code. *** But even judging by what has already been adduced, it would certainly appear that modern science tends to support the belief, not only that purpose, but *moral* purpose is at work in the cosmos in general in deciding the trend of organic evolution in particular.—Hugh P. Vowles in the Hurbert Journal.

জ্যোতির্ব্বেত্তারা উন্নততম যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়া বুঝিতেছেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের এই সৌরজগতের ন্যায় বা প্রায় সমান অনেক সৌরজগৎ রহিয়াছে। তাহা হইলে একই রূপ পরিস্থিতিতে একই রূপ ফল ফলিবে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা প্রকৃতির অভিপ্রায় ব্যর্থ হইবে। হইতে পারে, সমস্ত সমান শ্রেণীর গ্রহ বিকাশপথে ঠিক সমান স্থানে উপস্থিত হয় নাই, বিকাশ-ধারায় তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু অগ্রবর্ত্তী বা পশ্চাৎপদ হইতেই পারে। সেইজন্য মনে হয়, কোন পৃথিবীর ন্যায় অন্য সৌরমণ্ডলের গ্রহে ঋষিকণ্ঠসমীরিত বেদগান বা তাদৃশ পারমার্থিক কোন কোন সঙ্গীত তথাকার গগন-পবনকে বিধ্বনিত করিতেছে, কোথাও ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ভগবদ্গীতার ন্যায় অপূর্ব্ব উপদেশ দানে তথাকার বিশিষ্ট জীবমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিতেছেন, আবার কোথাও বা কুবুদ্ধির বশে তথাকার শ্রেষ্ঠতম জীব অতি ভীষণ মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত করিয়া তাহাদের সমাজের সযত্নপুষ্ট সভ্যতাকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্কল্পপ্রভাবে যখন একই ধরাবক্ষে একই সময়ে বিভিন্ন সভ্যতা বিরাজ করিতেছে, তখন বিভিন্ন বা উন্নততম জীবসমাজে যে বিভিন্ন পর্য্যায়ের সভ্যতা বিরাজ করিবে, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

যে সকল তারকা সর্ব্ববিষয়ে সবিতার অনুরূপ, তাহাদের কোন কোন গ্রহে পৃথিবীর প্রাণিগণের ন্যায় প্রাণী—এমন কি, আমাদের মত মানুষও থাকিতে পারে, এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবিরোধী হইবে না। প্রাকৃতিক নিয়মবশে একই পরিস্থিতি একই প্রকার ফল প্রদান করিবে। কিন্তু যে সকল সৌরমণ্ডল ভিন্নরূপ, যে সকল তারকা আমাদের সূর্য্যমণ্ডল হইতে বহুগুণে তেজস্কর, সেই সকল তারকায় যে সকল গ্রহ শীতল হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের উপরে কোন জীব আছে কি না,– যদি থাকে, তাহা হইলে তাহারা কিরূপ? বিজ্ঞান সে বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারে না—কোন সঙ্কেতও দিতে পারে না। কারণ, পার্থিব অভিজ্ঞতা হইতে তাহার অনুমান করা অসম্ভব। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যখন ভূমণ্ডলে জীবশূন্য কোন স্থান নাই, তখন তথায়ও জীব থাকিবার সম্ভাবনা। সে জীব কিরূপ, তাহা অনুমান করিতে যাওয়া মানুষের অধিকারবহির্ভূত। হয় ত তাহারা মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী! তবে ইহা সত্য, যখন বিশ্বে আমাদের সৌরমণ্ডলের মত আরও সৌরমণ্ডল আছে, তখন মানুষের ন্যায় জীব অন্যত্র আছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

টিকে থাকা

বহু তদ্বিরে কোনরূপে টিকে আছি
এড়াইয়া গ্রহ-ফাঁড়া টিক্‌টিকি হাঁচি।
আজ গণ-ভোট কালি অনাস্থা
আজ দুর্লভ কালিকে সস্তা
এত লেঠা সয়ে' কেমনেতে বল বাঁচি?

শত প্রশ্নের উত্তর দিই কত?
বাঙলার খাস্ মন্ত্রীদিগের মত।
এমন করিয়া জোগাইয়া মন
বৃথা জম্‌কালো বিফল জীবন,
না মরিতে যেন ধরিতেছে এসে মাছি।

কেবলি নকল কেবলি কৃত্রিমতা
জিলেপীর মত ঘোরালো পেঁচালো কথা
সত্য রাখে না কোন সংবাদ
সরল যা তাহা পড়িয়াছে বাদ
যেন চলিতেছে পাকা গুটীগুলি কাঁচি?

এতই হিড়িক এতই হুজুগ সয়ে'
গুণ টেনে শুধু তরণী এনেছি বয়ে'
সদা শঙ্কিত হারাই হারাই
এই আছে হায় এই যেন নাই
সাপ মনে হয় কণ্ঠের মালাগাছি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

বৃহত্তর ইটালী

বিগত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বেনিটো মুসোলিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ফ্যাসিষ্ট গ্র্যাণ্ড-কাউন্সিল হইতে এই মর্ম্মে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, লিবিয়াকে ইটালীর উপনিবেশের পর্য্যায়ে আর ফেলিয়া না রাখিয়া উহাকে ইটালী দেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইল।

ইটালীর ভাগ্যবিধাতা বেনিটো মুসোলিনীর এই কার্য্য 'খোদার উপর খোদকারী' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কারণ, কোথায় ইটালী, আর কোথায় লিবিয়া! 'ইটালিয়ান বুটের' প্রান্তভাগে সাগর-তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার কোলে যে শুষ্ক নীরস মরু রাজ্য অবস্থিত, এই আফ্রিকান ভূভাগের নাম লিবিয়া। মুসোলিনীর আদেশে ইহা ইটালীর অন্তর্ভুক্ত হইল। লিবিয়া দীর্ঘকাল তুরস্কের অধিকারভুক্ত ছিল; কিন্তু ইটালী ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইহা 'রুগ্ন' তুরস্কের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। কামাল পাশার বীর্য্যবহ্নি তখনও তুরস্ককে গৌরব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে নাই, এজন্য খলিফা-শাসিত দুর্ব্বল তুরস্ককে এই অপমান নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ইটালীর ফ্যাসিষ্টগণ আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ও পরিশ্রান্ত হইয়াও সাম্রাজ্য-সংগঠনের সঙ্কল্প ত্যাগ করে নাই; তাহারা লিবিয়াকে ইটালিয়ানগণের বাসোপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন করিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা লিবিয়ার মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে; কিন্তু লিবিয়া কেবল দুঃসহ উষ্ণ দেশ নহে, এই দেশে দক্ষিণ দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার উত্তাপ অসহ্য, এবং ইহার মৃত্তিকা বালুকাস্তরে আবৃত; তথাপি বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ইটালীয়ান এত কাল পরে এই দেশে স্থায়িভাবে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে!

কিন্তু লিবিয়া চিরদিনই অনুর্ব্বর মরুভূমি নহে। মহাকবি হোমর ইহাকে শস্যশ্যামল উর্ব্বর দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। রোমান অধিকার-কালে লিবিয়ার সাইরেনি নগরে তিন লক্ষ সমৃদ্ধ অধিবাসীর বাস ছিল। অবশেষে দিগ্বিজয়ী আরবগণ এই দেশ অধিকার করিয়া দেশের বৃক্ষগুলিকে নির্ম্মূল করায় ইহা বিশাল মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। ইটালীয়ানগণ আশা করিয়াছে—এই দেশ তাহারা পূর্ব্ববৎ উর্ব্বর করিয়া, ইটালীতে যাহারা স্থানাভাবে নিরাশ্রয়, তাহাদিগকে এখানে প্রেরণ করিবে। এই দেশের অধিবাসিগণকে ইটালী-বাসী বলিয়া গণ্য করা হইবে; অর্থাৎ ইহা ইটালীর একটি প্রদেশে পরিণত হইবে।

লিবিয়াকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া ক্রমশঃ বাসোপযোগী করা হইবে। প্রথমে বালুকাপূর্ণ সমুদ্রোপকূলের বালুকারাশিতে 'এস্পার্টো' নামক তৃণ রোপণ করা হইবে। এই কঠিনপ্রাণ তৃণ বালুকাস্তর হইতে রস-সঞ্চয় করিয়া জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়। এই তৃণ রোপণের পর ইউকালিপ্টস্ বৃক্ষ রোপিত হইবে। ইউকালিপ্টস্ বৃক্ষগুলি বৃহৎ হইলে ক্রমশঃ সেখানে সাইট্রস ও জলপাই বৃক্ষের আবাদ হইবে। এই ভাবে মরুভূমি দ্রাক্ষাকুঞ্জে পরিণত হইলে ইটালীয়ানদের আশা, অবশেষে সেখানে বিবিধ শস্যও উৎপাদিত হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই মরুভূমিতে দশ লক্ষাধিক বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা হইবে।

ইটালীয়ানগণ স্থানীয় শ্রমজীবিগণের সহযোগে মরুভূমির বালুকারাশি খনন করিয়া, এবং তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সমূহ তুলিয়া দূরে অপসারিত করিয়া গত বৎসর লিটোরেনিয়া নামক পথের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়াছে। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী এই পথটি টিউনিসিয়ান হইতে মিসর-সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণ এই পথের নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রচুর প্রশংসা করিলেও এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পথটি সমুদ্রের অদূরে নির্ম্মিত হওয়ায় ভবিষ্যতে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জাহাজ হইতে গোলা-বর্ষণে এই পথ সম্পূর্ণরূপ বিধ্বস্ত করা আদৌ কঠিন হইবে না।

লিবিয়াকে বাসোপযোগী করিবার জন্য ইটালীকে অগণ্য অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। যাযাবর আরব-আততায়ীগণের আক্রমণ হইতে ইহা সুরক্ষিত করিবার জন্যও প্রথমে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। স্থানীয় দুর্দ্দান্ত অধিবাসিগণ এই উপনিবেশ আক্রমণ করিয়া ইহার ক্ষতি করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে ইটালীয়ানগণ আরবগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কয়েক মাইল দীর্ঘ উন্মুক্ত শিবির সমূহে অবরুদ্ধ করিয়া, সেই সকল শিবির কাঁটা-তারের বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিল; এবং বেড়ার বাহিরে সশস্ত্র প্রহরী স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু এই রুদ্ধ স্থানে বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় বহুসংখ্যক যাযাবর আরব অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা সঙ্কীর্ণ স্থানে খর্ব্বকায় ও আহার্য্য দ্রব্যের অভাবে মৃতকল্প গৃহপালিত পশুগুলিকে চরাইয়া বেড়াইত।

লিবিয়াকে ইটালীর অন্তর্ভুক্ত করিবার কারণ এই যে, যে সকল ইটালীয়ান স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে বাস করিবে, তাহাদিগকে বুঝিতে দেওয়া হইবে যে, তাহারা স্বদেশেই বাস করিতেছে। গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে বেনিটো মুসোলিনী এক দলে যতগুলি ইটালীয়ানকে লিবিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, উপনিবেশের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। সেই দলে ১৫ হাজার ইটালীয়ান কৃষিজীবীকে লিবিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে; ইটালীতে তাহারা জমির অভাবে হাহাকার করিতেছিল। এই ১৫ হাজার কৃষক ১ হাজার ৯ শত পরিবারের সমষ্টি, এবং প্রত্যেক পরিবারের সন্তান-সংখ্যা গড়ে ৯টি। ২৬খানি জাহাজ পূর্ণ করিয়া ইহাদিগকে জেনোয়া হইতে লিবিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে যে ৫ লক্ষ ইটালীয়ান উত্তর-আফ্রিকায় বাস করিতে যাইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ইহারা সেই সকল ইটালীয়ানের প্রথম দল। বেনিটো মুসোলিনীর পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক ইটালীয়ান-পরিবারকে লিবিয়ায় স্থাপন করিতে ইটালীয়ান সরকারের গড়ে দুই হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইবে। প্রত্যেক পরিবারকে

ঘর-সংসার পাতিয়া সেখানে বাস করাইতে আমাদের দেশের টাকার হিসাবে অন্যূন ২৬৷২৭ হাজার টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইলেও মুসোলিনীর ধারণা, তাঁহার এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা ইটালীয়ান সরকারের অসাধ্য হইবে না।

লিবিয়ার উপকূলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া প্রত্যেক পরিবার এক একখানি মোটর-কারে লিবিয়ার অন্তর্দ্দেশে প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে প্রত্যেক পরিবারের জন্ম তাহাদের বাসগৃহ প্রস্তুত রাখা হইয়াছে; সেখানে নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রত্যেক দ্রব্য, এমন কি, আহারের জন্ম ময়দা-নির্ম্মিত পিষ্টক হইতে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটি পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, প্রত্যেক পরিবারকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রথম কয়েক বৎসর সরকার হইতে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। প্রত্যেক পরিবারের জনসংখ্যার উপর এই বৃত্তির পরিমাণ নির্ভর করিবে।

যে সকল জাহাজে এই সকল ইটালীয়ান জেনোয়া হইতে লিবিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল, লিবিয়ার গভর্ণর মার্সেল ইটালো বাল্বো তাঁহার "ভলকেনিয়া" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ঐ সকল জাহাজ পরিচালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবারই তাঁহার গভর্ণরীর খতম; কারণ লিবিয়া ইটালীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই দেশ স্বতন্ত্র গভর্ণরের শাসনাধীন রাখা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ, বেনিটো মুসোলিনী লিবিয়ার মরুভূমির যে পরিবর্ত্তন সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার; মানব-কল্পনার বিস্ময়াবহ পরিণতি!

ফরাসী-পুলিসের কীর্ত্তি

ফ্রান্সের মার্সেলে বন্দরে একটি স্ত্রীলোক এঞ্জেলো জিয়াকোমোজ নামক এক ব্যক্তির ১ শত ২৫ পাউণ্ড আত্মসাৎ করে; এঞ্জেলো মার্সেলে পুলিশের নিকট অভিযোগ করিলে তাহারা স্ত্রীলোকটিকে গ্রেপ্তার করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। অগত্যা এঞ্জেলো ক্রুদ্ধ চিত্তে প্যারিসের 'ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি'-পুলিশের নিকট পুনর্ব্বার অভিযোগ করেন।

'ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি পলিশ' স্ত্রীলোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিলে সে উত্তেজিত স্বরে বলে, "আমি পুলিশকে লুঠের এক-তৃতীয়াংশ বখরা প্রদান করিয়াছি, তথাপি তোমরা আমাকে কি কারণে গ্রেপ্তার করিলে?"

স্ত্রীলোকটির এই জবাব শুনিয়া 'সিকিউরিটি' পুলিশের কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইল, এবং কর্তৃপক্ষের নিকট টেলিফোনে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারের জরুরী তদন্তের আদেশ প্রদান করিলেন। তদন্তের ফলে 'মোরালস্ স্কোয়াডের' প্রধান কর্ম্মচারী এলবার্ট থেনজ্‌কে কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটির জন্ম সাময়িক ভাবে পদচ্যুত করা হইল।

অতঃপর অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায়, মার্সেলের পুলিশ দীর্ঘকাল হইতে এই ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। তাহাদিগের ব্যবস্থা এইরূপ ছিল যে, যে সকল স্ত্রীলোক কৌশল-ক্রমে কাহারও পকেট মারিত, তাহারা লুণ্ঠিত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ বখরা পাইত। যে হোটেলে এই কার্য্য হইত, সেই হোটেলের মালিক এক-তৃতীয়াংশ পাইত; অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ পুলিসের প্রাপ্য। পুলিশ সেই চোরকে রক্ষার ভার গ্রহণ করিত।

এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে প্যারিসের স্বরাষ্ট্র-সচিব জেনারেল ইন্স্পেক্টর ক্যাল্সকে যে পরোয়ানা প্রদান করিলেন, সেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লইয়া ইন্স্পেক্টর ক্যাল্স তৎক্ষণাৎ মার্সেলে বন্দরে উপস্থিত হইলেন, এবং স্থানীয় পুলিশের সকল কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করিলেন। ইন্সপেক্টর ক্যাল্সকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে আরও তিনজন পুলিশ-কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিল।

স্বরাষ্ট্র সচিবের অধীন ইন্স্পেক্টররা এই ব্যাপারে দেড়শত পুলিশ কর্ম্মচারীকে জেরা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

ইন্স্পেক্টর ক্যাল্স তদন্ত-শেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "চিকাগোর পুলিশ মার্সেলে পুলিশের নিকট দীর্ঘকাল শিক্ষা-লাভ করিতে পারে।"

উৎকোচ গ্রহণের কৌশল সম্বন্ধে চিকাগো পুলিশের খ্যাতি অসাধারণ।

য়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্য দেশ সমূহের পুলিশ যখন উৎকোচ গ্রহণে এইরূপ সুদক্ষ, তখন আমাদের দেশের পুলিশকর্ম্মচারীরা সকলেই নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র হইবে, কে ইহা আশা করিতে পারেন? এদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পুলিশকে অপাপবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে কি? নির্লোভ পুলিশ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিরল; অথচ তাহাদের হস্তে গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত আছে।

চীনের ক্যাণ্টনে বহ্ন্যুৎসব

২১এ অক্টোবরে দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টন, এবং ২৫এ অক্টোবর মধ্য-চীনের হ্যাঙ্কাউ— পাঁচ দিনের মধ্যে এই দুইটি নগর জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়া চীন-যুদ্ধের ইতিহাসে শোচনীয় দুর্ঘটনা। ক্যাণ্টনের ও হ্যাঙ্কাউএর পতনের পর মার্সাল চিয়াংকাই সেককে এবং তাঁহার সৈন্যগণকে পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিতে হইয়াছিল।

য়ুরোপের অভিজ্ঞ রাজনীতিকগণের ধারণা, জাপান কর্ত্তৃক ক্যাণ্টনবিজয় চীনের ৪২ কোটি ২৭ লক্ষ অধিবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার পূর্ব্বাভাস।

ক্যাণ্টনের পতনের ৯ দিন পরে বিজয়ী জাপানী সৈন্য ক্যাণ্টনে প্রবেশ করে; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই দশ লক্ষ অধিবাসিপূর্ণ, দক্ষিণ-চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর ক্যাণ্টনের প্রাদেশিক সরকার এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্থানীয় অধিবাসিগণকে এবং অল্পসংখ্যক সৈন্যদলকে এই সুন্দর নগর ধ্বংসের জন্য রাখিয়া ধীরে সুস্থে পলায়ন করেন। পার্ল নদীর যে সুদৃঢ় সেতু ৪ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারগণের সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার একটি 'স্প্যান' মহাশব্দে উড়াইয়া দিয়া, তাহারা যথাসম্ভব সত্বর ডিনামাইটের সাহায্যে ক্যাণ্টন নগরের বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান, সিমেণ্টের কারখানা, এবং সমর বিভাগের ব্যারাকসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া, নগরের কেন্দ্রস্থলে অগ্নিসংযোগ করায় নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

সেই দিন অপরাহ্ণে জাপানী ফৌজের ৬০ হাজার সৈন্য জাপান সম্রাট্ হিরোহিটোর ভ্রাতা প্রিন্স চিচিবু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ক্যাণ্টনের বিভিন্ন রাজপথে সদর্পে কুচ করিতে থাকে; কিন্তু চৈনিক সৈন্যগণ 'মুফ্‌তী'-সাহায্যে আত্মগোপন করিয়া শত শত নগরবাসীর সহযোগে তখনও নগরধ্বংসে রত ছিল।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে তাহারা ক্যাণ্টন নগরের চারিটি বিশিষ্ট স্থান পেট্রল দ্বারা প্লাবিত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করায় অগ্নিজিহ্বা ভীষণ বেগে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুসজ্জিত প্রাসাদ, অট্টালিকাশ্রেণী, বাজার, উপবন ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করে। সন্ধ্যার পর নগরের প্রধান প্রধান স্থান এক বিশাল অগ্নিসাগরের আকার ধারণ করে। পর দিন বেলা দশ ঘটিকার সময় নগরের সেই অগ্নিরাশি লোল জিহ্বা প্রসারিত করিয়া সামীন দ্বীপের অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী

প্রিন্স চিচিবু

ওয়্যংসা ষ্টেশন গ্রাস করে। এই স্থানে ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যদলের উপর বিপন্ন আশ্রিত ব্যক্তিগণের রক্ষার ভার অর্পিত ছিল।

ওয়্যংসা ষ্টেশনে রাশি রাশি সমরোপকরণ উত্তর দিকের যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে প্রেরণের জন্য বিভিন্ন ট্রেণের প্রতীক্ষায় স্তূপীকৃত ছিল। ষ্টেশনের অগ্নিরাশি সেই সকল বারুদের স্তূপ স্পর্শ করিবামাত্র তাহা জ্বলিয়া-উঠিয়া প্রচণ্ড বেগে বিস্ফুটিত হওয়ায়, প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ হয়, এবং তাহা বিক্ষিপ্ত হইবার সময় সেই স্থানে এক সহস্র গজ প্রশস্ত একটি গভীর গহ্বরের সৃষ্টি করে। এই বিস্ফোরণের ফলে ট্রেণের ইঞ্জিন, শত শত গাড়ী, এবং রেল পর্য্যন্ত উৎপাটিত ও শত শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সামীন দ্বীপের সন্নিহিত বৃটিশ দূতাবাস, একটি বৃটিশ গীর্জ্জা, এবং খালের উপর নির্ম্মিত একটি সেতু ভয়ঙ্কর জখম হইয়াছিল। বৃটিশ দূতাবাসের বৃহৎ অট্টালিকাগুলির প্রত্যেক বাতায়ন কম্পনবেগে চূর্ণ হইয়াছিল। ২৩শে অক্টোবর রবিবার সায়ংকালে বাঁধের সন্নিহিত স্থানের অগ্নিরাশি দক্ষিণ-পশ্চিমে আড়াই মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত হইয়াছিল। এই অগ্নিরাশিতে গগনস্পর্শী হোটেলগুলি, কাষ্টমস্-হাউস, হংকং ফেরির জেটিগুলি, এবং ডাকঘর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ক্যাণ্টনের সুপ্রসিদ্ধ সিল্ক ষ্ট্রীটের গুদামসমূহে লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের রেশম সঞ্চিত ছিল, অগ্নিকাণ্ডে তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

জাপানী সৈন্যগণ নানকিং নগর ধ্বংসের সময় নগরে যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল; তাহারা ক্যাণ্টন নগরে প্রবেশ করিয়া নগর লুণ্ঠন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে টোকিও হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও জাপ সৈন্যগণ নানকিংএ প্রবেশ করিয়া যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহার তুলনা নাই।

যে সকল জাপানী সৈন্য ক্যাণ্টন অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধে রত ছিল, ক্যাণ্টনের পতনের পর তাহাদের অধিকাংশ চীনের ক্যাণ্টনী সৈন্যগণের অনুসরণে প্রেরিত হওয়ায়, যে অল্পসংখ্যক জাপ সৈন্য ক্যাণ্টনে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ক্যাণ্টনের অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য অট্টালিকাগুলি ডিনামাইট দ্বারা চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যদিও ক্যাণ্টনবাসী সহস্র সহস্র অ-সামরিক চীনাম্যান প্রাণভয়ে ক্যাণ্টন হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তথাপি বহু সহস্র চীনাম্যানের বাসভবন অগ্নিরাশিতে ভস্মস্তূপে পরিণত হওয়ায় তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া লক্ষ্যহীন ভাবে নগরের পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। জাপানী সৈন্যরা বোমাবর্ষণে তাহাদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে।

সেই সকল ক্যাণ্টনবাসীর মধ্যে যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহারা ক্যাণ্টনের সেণ্ট্রাল হাসপাতালের সম্মুখে বিকলাঙ্গ দেহে নিপতিত ছিল। যে সময় হাসপাতালের চীনা কর্ম্মচারীরা হাসপাতাল ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করে, সেই সময় জাপানের বোমাবর্ষী এরোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণে আহত ও বিকলাঙ্গ শত শত চীনাম্যান হাসপাতাল হইতে বিতাড়িত হওয়ায়, হাসপাতালের বাহিরে পড়িয়া থাকিয়া এক বিন্দু পানীর জলের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছিল কিন্তু মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ নগরের জলের কল পূর্ব্বেই নষ্ট করায় অগ্নি-নির্ব্বাপিত করিবার জন্য জল পাওয়া ত দূরের কথা, ঐ সকল আহত তৃষাতুর চীনাম্যান একবিন্দু পানীর জল না পাওয়ায় শুষ্ককণ্ঠে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

পরদিন কাউয়ানটং প্রদেশের গভর্ণর-জেনারল উ-টিসেন যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, সেই ঘোষণার মর্ম্মানুসারে চীন দেশের সংবাদপত্রসমূহে এই মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হয় যে, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ক্যাণ্টনবাসীরা জাপ সৈন্যগণের ক্যাণ্টনে প্রবেশের পূর্ব্বেই নগর ত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু এই সংবাদ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা অভিজ্ঞগণের অজ্ঞাত নহে।

ক্যাণ্টনের পতনের অব্যবহিত পরেই মার্সাল চিয়াং-কাই সেকের

সৈন্যগণ পলায়ন করিলে, জাপানীরা হ্যাঙ্কাউ আক্রমণ করিতে ইয়াংসি নদীপথে ধাবিত হয়। চিয়াং-কাই সেক তখনও হ্যাঙ্কাউ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই; সুতরাং হ্যাঙ্কাউএর পতন অপরিহার্য্য হইয়াছিল। চিয়াং-কাই সেক তখন চীনের কেন্দ্রী সরকারের নূতন রাজধানী (হ্যাঙ্কাউ হইতে ৮ শত মাইল পশ্চিম-স্থিত) চুংকিং নগরে তাঁহার স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি প্রেরণ করিয়া, হ্যাঙ্কাউ নগরের আফিসে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই সময় জাপানের বোমাবর্ষী এরোপ্লেনসমূহ হ্যাঙ্কাউএর ঊর্দ্ধাকাশে উড়িয়া উড়িয়া যে সকল বোমা বর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে বহুসংখ্যক নগরবাসী নিহত হয়, এবং চিয়াং-কাই-সেকেরও জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। সেই সকল বোমার আঘাতে তিনি যে-কোন মুহূর্ত্তে নিহত হইতে পারিতেন। এই প্রকার বিপদের আশঙ্কায় চিয়াং-কাই সেক শেষ মুহূর্ত্তে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্তপ্রায় নগর শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার এরোপ্লেনের সাহায্যে আকাশ-পথে চীনের অভ্যন্তরস্থ কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করেন। জাপানী এরোপ্লেনসমূহ তাঁহার দ্রুতগামী বেগবান এরোপ্লেনের অনুসরণে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল।

অতঃপর চিয়াং কাই সেক জাপানী সৈন্যগণকে চীনের দুর্গম অন্তর্দ্দেশে প্রবেশের জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে চীনা সৈন্যগণ গরিলা যুদ্ধে তাহাদিগকে বিপন্ন করে; তাহাদের রসদ সরবরাহের উপায় রহিত হয়। জাপানী সৈন্যগণ বিভিন্ন দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া যাহাতে পীতসাগরে বিতাড়িত হয়, চিয়াং-কাই সেক তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এই যে, ক্যাণ্টনের পতনের পর চীনা সৈন্যগণের রসদ ও সমরোপকরণ সংগ্রহের জন্য দুইটি পথ ভিন্ন অন্য সকল পথ রুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু সেই দুইটি পথই সুদুর্গম। চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পথে রুসিয়া হইতে, এবং দক্ষিণ-স্থিত ইণ্ডো-চায়না হইতে এখন ঐ সকল সামগ্রী আমদানী করিবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান।

ক্যাণ্টন ও হ্যাঙ্কাউএর পতনের পর চীনদেশে বৃটিশের সম্মান রক্ষা করা দুরূহ হইয়াছে। হ্যাঙ্কাউএর দক্ষিণে দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী ইয়াংসি নদীর একটি শাখায় বৃটিশ সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার অপমানিত হইতে হইয়াছে। এই শাখা নদীতে 'স্যাণ্ড-পাইপার' নামক যে বৃটিশ রণতরী অবস্থিত ছিল, জাপানের বোমাবর্ষী ছয়খানি এরোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণের ফলে উক্ত 'স্যাণ্ড-পাইপার' চূর্ণ ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল (was punctured by splinters)। কিন্তু জাপানীরা কৈফিয়ং দিয়াছে—'স্যাণ্ড-পাইপার' জাহাজকে চীনা সৈন্যবাহী 'জঙ্ক' বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় ভ্রমক্রমে তাহা ঐভাবে নষ্ট করা হইয়াছিল।—জাপানীরা পুনঃ পুনঃ এই প্রকার ভ্রম করিতেছে, কিন্তু প্রত্যেক বার তাহাদের ভ্রমজনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করা হইতেছে! ইহা উদারতা, না কাপুরুষতা?

হিটলারের আতঙ্ক

এডলফ হিটলারের দেহরক্ষিগণের মধ্যে আধ ডজন ব্যাভেরীয় জোয়ান আছে। তাহাদের কেহই লম্বায় চারি হাতের কম নহে, অসুরের মত চেহারা; নাজী ব্ল্যাক-গার্ড সৈন্যদল হইতে ইহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া হিট্‌লারের দেহ-রক্ষায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই পদে নিযুক্ত হইবার সময় তাহারা এই মর্ম্মে শপথ করিয়াছিল যে, হার হিট্‌লারকে যদি কোন দিন আততায়ীর আক্রমণে নিহত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহারা আত্মহত্যা করিয়া অকর্ম্মণ্যতার প্রতিফল গ্রহণ করিবে। প্রত্যেক জার্ম্মাণই যে হিট্‌লারের অনুরক্ত, এ কথা সত্য নহে, কিন্তু তাঁহার জীবন অত্যন্ত মূল্যবান্, এবং তাঁহার মৃত্যুতে জার্ম্মাণ জাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার শত্রু-মিত্র কাহারও মতভেদ নাই।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হার হিটলার প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই আতঙ্কের কারণ বন্দুকের গুলী নহে, কর্কট (রোগ)।

বার্লিনের অধিবাসী কণ্ঠরোগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কার্ল ভন

কার্ল ভন ইকেন

ইকেন ফিলাডেলফিয়ার এক দল চিকিৎসকের নিকট হার হিটলার-সংক্রান্ত এই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

ডাক্তার ভন ইকেন চারি বৎসর পূর্ব্বে হার হিট্‌লারের কণ্ঠনালীতে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু কষ্টদায়ক স্ফোটক অপসারিত করিয়াছিলেন।

এই ঘটনাপ্রসঙ্গে ডাক্তার ভন ইকেন ফিলাডেলফিয়ার উক্ত চিকিৎসকবর্গকে বলিয়াছিলেন, "আমি হার হিট্‌লারকে বলিলাম, তাঁহার কণ্ঠনালীতে যে যন্ত্রণা হইতেছে, তাহার কারণ, সেখানে একটি ফোড়া হইয়াছে; তখন আমার কথা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কর্কট রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি কণ্ঠনালীতে ঐরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন।"

ডাক্তার ভন ইকেন বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতৃবর্গকে বলিতে লাগিলেন, "অতঃপর স্নায়ুর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বিচলিতচিত্ত, নিদ্রাহীনতা রোগগ্রস্ত হিটলারকে এক 'ডোজ' মরফাইন (অহিফেন-সার) প্রদান করা হইলে, ১৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে

পারেন নাই; এ জন্ত তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী সার্জ্জনগণের উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না।"

হিটলার কদাচিৎ পাঁচ ঘণ্টার অধিক নিদ্রিত থাকেন। রাত্রিকালে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শয়নের পরিচ্ছদে উঠিয়া-বসিয়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহ পাঠে রাত্রিযাপন করিতে ভালবাসেন।

অতঃপর ডাক্তার ভন ইকেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মরফাইন হিট্‌লারের দেহে কি কারণে একরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু ডাক্তার ইহার প্রকৃত কারণনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন যে, হিট্‌লার আদৌ ধূমপান করেন না, এবং কখন

হার হিটলার

কখন এক আধ গ্লাস পিল্‌সেনার বিয়ার ভিন্ন অন্ত প্রকার মদ্য পান করেন না। মাদকদ্রব্য সেবনে তাঁহার অভ্যাস না থাকায় তিনি সহজে মরফাইনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

হার হিট্‌লারের বয়স এখন ৪৯ বৎসর; তাঁহাকে যেরূপ কঠোর মানসিক শ্রম করিতে হয়, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তিনি সুস্থদেহেই বিস্তর ঝড়-তুফান সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি কণ্ঠনালীর রোগে ভুগিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বার্চটেস্‌গাডেনে দীর্ঘকাল হইতে বাস করায় পার্ব্বত্য বায়ুসেবনে তাঁহাকে কোন দিন এই পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় নাই। পার্ব্বত্য বায়ুপ্রভাবে তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ আছে। একবার তাঁহার পাকাশয়ে ক্ষত হওয়ায় তিনি এখন ষ্ট্রবেরি প্রভৃতি প্রিয় খাদ্যদ্রব্য আহার করেন না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার নাসারন্ধ্রে গ্যাস প্রবেশ করিয়াছিল; এ জন্ত এখনও সময়ে সময়ে তাঁহার পঞ্জরাস্থিতে বেদনা অনুভূত হয়।

কিন্তু প্রাণভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। তাঁহার এই আতঙ্ক যে অমূলক, একথা বলা যায় না; কারণ, তাঁহার আততায়ীরা কয়েকবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য।

তাঁহার মোটর-কারের একজন সফার ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ত যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহা অতীব কৌশলপূর্ণ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

এই সফার জানিত, হিট্‌লারের আদেশ ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথে তাঁহার মোটর-কার ঘণ্টায় অন্যূন ৬০ মাইল বেগে চালাইতে হইবে; কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল, গাড়ী ঐরূপ দ্রুতবেগে পরিচালিত হইলে আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। হিট্‌লারের সেই সফার তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ 'মার্সেডি' কারের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা কত ফুট তাহা জানিত, এবং নির্দ্দিষ্ট দিন তিনি কোন্ পথে তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিবেন, তাহাও সে জানিতে পারিয়াছিল। সেই দিন রাত্রিকালে হিট্‌লার কোন্ সময় তাঁহার গন্তব্যস্থানে পৌছিবেন, তাহাও জানিয়া লওয়া সেই সফারের পক্ষে কঠিন হয় নাই।

অতঃপর সফার ইস্পাত নির্ম্মিত এক খণ্ড ধারাল তার লইয়া হার হিট্‌লারের গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ছুইটি লেবু গাছে বাঁধিয়া পথ বন্ধ করিল। হিট্‌লারের মোটর-কারের 'বনেটে'র মাথা যতখানি উচ্চ, ঠিক ততখানি উর্দ্ধে সে তারটি বাঁধিয়া রাখিয়াছিল!

হার হিট্‌লার মোটরগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় সম্মুখের আসনে ড্রাইভারের ঠিক পার্শ্বেই সাধারণতঃ উপবেশন করেন। এই জন্য সফারের ধারণা হইয়াছিল, গাড়ী সবেগে চলিতে থাকিলে সেই তার হিট্‌লারের গলায় বাধিয়া যাইবে, এবং তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে।

কিন্তু হার হিট্‌লার সৌভাগ্যক্রমে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সফারের এবং তাহার দুই জন সহযোগীর অনুষ্ঠিত এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিতে পারেন। তাহাদের তিন জনই হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গেল। তাহাদের তিন জন সেই স্থানেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

অতঃপর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের এক দিন হিট্‌লার তাঁহার নিজস্ব এরোপ্লেনে পূর্ব্ব-এসিয়ার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিলেন। সেই সময় কোন অপরিচিত এরোপ্লেন কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অত্যন্ত দ্রুতবেগে 'মেসিন' চালাইয়া আততায়ীর বন্দুকের পাল্লার বাহিরে উড়িয়া যাওয়ায় তাহার নিক্ষিপ্ত গুলী তাঁহার এরোপ্লেন স্পর্শ করিতে পারে নাই। আততায়ী কয়েকটি গুলী বর্ষণ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় পোলিস্ সীমান্ত অভিমুখে পলায়ন করে।

তৃতীয় আক্রমণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ঘটনা। একদিন বার্লিনের অধিবাসীরা শুনিতে পাইল, হিটলারের প্রসিদ্ধ সফার জুলিয়াস্ শ্রেক্ হঠাৎ মারা পড়িয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর মহাসমারোহে সামরিক সম্মান-সহকারে তাহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। হার হিট্‌লার তাহার সমাধির পার্শ্বে বসিয়া-পড়িয়া, প্রিয় সফারের বিয়োগ-বেদনায় অধীর হইয়া শোকসন্তপ্তা বালিকার ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার বাসভবন বার্চটেস্‌গাডেনে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কয়েক দিন আর ঘরের

বাহিরে আসেন নাই। সেই কয়েক দিন তাঁহার যে সকল বক্তৃতা দানের কথা ছিল, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর রডলফ হেস তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সেই সকল বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন।

হার হিট্‌লারের প্রিয় সফারের আকস্মিক মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কেহই জানিতে পারে নাই; তাহা গোপন রাখা হইলেও পরে সরকারী দপ্তরখানা হইতে সেই গুপ্ত সংবাদ কোনও অজ্ঞাত উপায়ে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ,—

হিট্‌লার একদিন মোটরযোগে রুর জিলায় (Ruhr district) ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার গন্তব্যপথে এরূপ একটি ক্ষুদ্র নগর পড়ে—যে নগরটি কমুনিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীবর্গে পূর্ণ। হার হিট্‌লার এই নগরে প্রবেশের পূর্ব্বে তাঁহার মোটরের ড্রাইভারের সহিত উপবেশনের স্থান পরিবর্ত্তিত করিলেন। ড্রাইভার যে আসনে বসিয়া গাড়ী চালাইতেছিল, তিনি সেই আসনে বসিয়া ড্রাইভার জুলিয়াস্ শ্রেক্‌কে তাঁহার পাশে বসাইলেন। তাঁহার মুখাকৃতির সহিত জুলিয়াস্ শ্রেকের মুখাকৃতির এরূপ সাদৃশ্য ছিল যে, শ্রেক্‌কে কিছু দূর হইতে দেখিলে হিট্‌লার বলিয়াই ভ্রম হইত। শ্রেক্ হার হিট্‌লারের আসনে বসিলে, হিট্‌লার নিজের টুপি তাহার মাথায় আঁটিয়া দিলেন, এবং তাহার মাথার সম্মুখের চুলগুলি তাঁহার চুলের মত ভঙ্গীতে এক পাশে নামাইয়া দিলেন। হিট্‌লারের মাথার চুলের এই ভঙ্গীটি সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার বিভিন্ন ফটোতেও মস্তকের সম্মুখস্থ কেশগুচ্ছের এই বিশেষত্ব কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করে না। অতঃপর হিট্‌লার মাথার সম্মুখের চুলগুলি তাঁহার সফারের কেশের অনুকরণে উর্দ্ধে তুলিয়া মোটর চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

এই ভাবে গাড়ী চালাইয়া তিনি একটি 'রেলওয়ে-ক্রসিং'এ আসিয়া গাড়ীর গতিবেগ হ্রাস করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মোটরের উপর গুলী বর্ষিত হইল। সেই গুলীর আঘাতে শ্রেক্ নিহত হইল। আততায়ীর ধারণা হইয়াছিল, মোটর-চালকের পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিই হিট্‌লার!

শ্রেকের হত্যাকাণ্ডের পর হিট্‌লারের দেহরক্ষীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইয়াছে; তথাপি তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগের সন্ধানে বিরত হইয়াছে, এরূপ অনুমানের কারণ নাই।

বেনিটো মুসোলিনির ব্রিটিশ প্রেম

গত নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ক্যাথেরিনা ভ্যান্ আমেরিঞ্জেন নাম্নী অনাথা জার্ম্মান-ইহুদী রমণী বিষপানে আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছিল, "ইংলণ্ডকে আমি ভালবাসি।"

ইহুদী-বিদ্বেষী ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনি সংপ্রতি ফীল্ড-মার্শাল আর্ল অফ্ ক্যাভানকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডকে আমি ভালবাসি।"—তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রেমে গদ গদ!

আত্মঘাতিনী আমেরিঞ্জেনের মৃতদেহ যখন পরীক্ষিত হয়, সেই সময় তাহার স্বহস্ত-লিখিত ঐ কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল।—বৃটিশ পার্লামেণ্টের লর্ড-সভায় যখন এই প্রস্তাব ভোটে উঠিয়াছিল যে, "এংগ্লো-ইটালিয়ান চুক্তি কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে রাজার সরকারের ইচ্ছাকে এই সভা অভিনন্দিত করিতেছে"—তখন লর্ড-সভাকে এই প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট প্রদানের জন্য উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড ক্যাভান মুসোলিনির উক্ত বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্যাভান আরও বলেন, "ওয়ার গ্রেভস্ কমিশনের প্রতিনিধি দলের সহিত আমি সিনর মুসোলিনিকে দেখিতে যাই, এবং তিনি উপযুক্ত সময়ে মিউনিকে মধ্যস্থতা করায় আমি সৈনিকরূপে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি আমার উভয় হস্ত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ইংলণ্ডকে ভালবাসি, এবং আমাদিগের সম্বন্ধকে একটি অভিনব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই'।"

প্রস্তাবটির অনুকূলে ৫৫ ভোট ও প্রতিকূলে ৬ ভোট হওয়ায় তাহা গৃহীত হইয়াছিল। কমন্স সভায় প্রস্তাবটির অনুকূলে ৪৫৩ এবং প্রতিকূলে ১৩৮ ভোট হইয়াছিল; কিন্তু বিখ্যাত টোরি-বিরুদ্ধবাদিগণের দলে ছিলেন বিদ্রোহী উইনষ্টন চার্চ্চিল, এণ্টনী

মুসোলিনি

ইডেন, তাঁহার বন্ধু লর্ড ক্র্যানবোর্ণ, হ্যারল্ড নিকলসন, রোনাল্ড কার্টল্যাণ্ড, এবং ভাইভিয়ান আডামস্।

প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন এংগ্লো-ইটালিয়ান চুক্তির যুক্তির অনুকূলে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের সহিষ্ণুতা নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় রবার্ট এণ্টনী ইডেন বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন তাহার আভাস পাওয়া গেল।

ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র-সেক্রেটারীকে তাঁহার টাইপ-করা বক্তৃতা পাঠে উদ্যত দেখিয়া, তাঁহার দলস্থ সকল সদস্য তৎক্ষণাৎ সেখানে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তিনি সরকারকে এই কথা বলিয়া তিরস্কার করিলেন যে, তাঁহারা ইটালীর সহিত চুক্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যখন ইটালী একটি মিত্ররাজ্যে বে-সামরিক বিরোধে মধ্যস্থতা করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন,

তাহা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ইটালিয়ান এরোপ্লেনসমূহ বিভিন্ন নগরে বোমা বর্ষণ করিতেছিল, এবং যে সকল বৃটিশ জাহাজ বৈধ বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, বোমা মারিয়া সেগুলি ডুবাইয়া দিতেছিল। শীতকালে মাসের পর মাস ধরিয়া যখন সেনাপতি ফ্রাঙ্কো স্প্যানিস সরকারকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য অনাহারে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করিবেন, তখন তাঁহাকে ইটালিয়ান এরোপ্লেনসমূহেরই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে; অর্থাৎ যে ইটালী নানা ভাবে বৃটেনের অপমান ও শত্রুতা সাধন করিতেছে, তাহার এই প্রকার প্রতিকূল আচরণ উপেক্ষা করিয়া, এই চুক্তি দ্বারা তাহার আনুগত্য স্বীকার বৃটিশ জাতির পক্ষে ঘোর অপমানজনক, এবং আত্মসম্মানের হানিকর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

যে সময় কমন্স সভায় তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময় সোসিয়ালিষ্ট কর্ণেল যোসিয়া ওয়েজউড এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, সরকার দেশে গ্যাস-মুখোসের ছড়াছড়ি করিয়া দেশের লোককে নপুংসক করিয়া তুলিয়াছেন। এ কথা শুনিয়া চার্চ্চিল বিদ্রূপভরে বলিলেন, "নপুংসক নহে, বাষ্পময় বলুন।"

উইনষ্টন চার্চ্চিল

মিষ্টার চেম্বারলেন

এন্থনি ইডেন

সার জন এণ্ডারসন

অতঃপর নবনিযুক্ত সিভিলিয়ান 'ডিফেন্স'-সচিব সার জন এণ্ডারসন (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর) লাজুক শিশুর ন্যায় (like a shy little boy) নিঃশব্দে কমন্স সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি স্পীকারের চেয়ারের পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বার-পথে সভায় প্রবেশ করিয়া পর্দ্দা-সন্নিহিত আসনের পশ্চাতে ঘণ্টাখানেক দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবং প্রধান মন্ত্রীর অত্যুৎকৃষ্ট 'লইতে-হয়-লও অথবা-ছাড়িতে-হয় ছাড়' (take-it-or-leave-it) ধরণের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য মধ্যে মধ্যে কোণের চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন।

পর দিন তিনি তাঁহার অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়া সদস্যবর্গের সকলেরই সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ঢিমা এবং সুস্পষ্ট বক্তা বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিলেও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া কমন্স সভার শত শত সদস্য (hundreds of M. P.s) হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ মন্ত্রিসভার মন্ত্রিবর্গ যেরূপ বক্তৃতা দ্বারা কমন্সসভায় তাঁহাদিগের বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করেন, সার জন এণ্ডারসন বাঙ্গালার লাটগিরি ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া, প্রধানমন্ত্রীর কৃপায় মন্ত্রিমণ্ডলে প্রবেশ করিলেও অজ্ঞতাবশতঃ সেই প্রকার বক্তৃতা প্রদান করিতে পারেন নাই।

অথচ ইনি বাঙ্গালায় লাটগিরি করিবার সময় 'বাঘা-লাট' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন!—"এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে?"

আফ্রিকায় জার্ম্মাণীর লুব্ধ দৃষ্টি

দক্ষিণ-আফ্রিকার সরকারের রক্ষামন্ত্রী অস্ওয়াল্ড পিরো প্রকাণ্ড জোয়ান। তিনি জার্ম্মাণদিগের অপরিচিত নহেন; পূর্ব্বে তিনি জার্ম্মাণীতে গমন করিলে জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র সসম্মান অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধে অভিজ্ঞ, সন্তরণে সুদক্ষ, অশ্বারোহণে জকির ন্যায় সুনিপুণ, এরোপ্লেন পরিচালনে পারদর্শী, বিপুল দৈহিক বলের অধিকারী পিরোকে জার্ম্মাণীর নাজীরা সকল বিষয়ে তাহাদের আদর্শ বিবেচনায় তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল।

পিরো কোন জার্ম্মাণ-ধর্ম্মযাজকের পুত্র। পিরোর পিতা জার্ম্মাণী ত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় গমন করেন, এবং বুয়ার সাধারণ-তন্ত্রে কায়েমী ভাবে বাস করিতে থাকেন। পিরো জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ করিয়া একটি জার্ম্মাণ-যুবতীকে বিবাহ করেন। তিনি প্রুসিয়ান বলিয়া পরিচিত হইতে গৌরবানুভব করেন, এবং জার্ম্মাণীর গণনায়ক এডল্ফ হিটলারের আদর্শে জীবন পরিচালিত করিবার পক্ষপাতী। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি বার্চটেস্‌গাডেন তীর্থে পদার্পণ করিয়া তাঁহার গুরুদেবের পূজা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মাণীর প্রকাণ্ড গোঁড়া।

অস্ওয়াল্ড পিরো সংপ্রতি স্পেন ও পর্টুগালে পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছেন, এবং শীঘ্রই ব্রুসেল্‌স ও বার্লিন ভ্রমণে যাইবেন। তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য আর গোপন নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই রক্ষামন্ত্রী লণ্ডনের হাইড পার্ক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নবেম্বর মাসের প্রথমে লণ্ডনে এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন যে, তিনি আফ্রিকার কেপ টাউনে এক বিরাট 'নিখিল আফ্রিকা সভার' অধিবেশনের আয়োজন করিবেন; যে সকল যুরোপীয় জাতি আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের অধিকারী, তাঁহারা সকলেই এই সভায় নিমন্ত্রিত হইবেন। জার্ম্মাণীকে আফ্রিকার কোন্ অংশ উপনিবেশ স্বরূপ প্রদান করা যাইতে পারে—এই সভায় তাহা নির্দ্ধারিত হইবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকার পিরো এবং বৃটেনের ম্যাল্‌কম ম্যাক্‌ডোনাল্ড

এই সভায় আফ্রিকার অধিবাসিবর্গের এক প্রাণীকেও নিমন্ত্রণ করা হইবে না বটে, কিন্তু বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ম, পর্টুগাল, বিদ্রোহী স্পেন এবং জার্ম্মাণী হইতে প্রতিনিধিবর্গ আসিয়া যে বিষয়ের আলোচনা করিবেন—তাহার মর্ম্ম এই যে, জার্ম্মাণীকে তাহার উপনিবেশের ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য আফ্রিকার কোনও অংশ প্রদান করা হইবে কি না, এবং যদি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কাহার মাথায় 'কাঁটাল ভাঙ্গা' হইবে?

অস্ওয়াল্ড পিরো লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই বৃটিশ ঔপনিবেশিক-সচিব ম্যাল্‌কম ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জার্ম্মাণীর ঔপনিবেশিক সমস্যার আলোচনা করেন; কিন্তু ইহাতে খুসী হইতে না পারায় তিনি বৃটিশ মন্ত্রিসভার কয়েক জন মন্ত্রীর সহযোগে একটি ক্ষুদ্র বৈঠক বসাইয়া তাঁহাদের সহিত পরেও এই বিষয়ের আলোচনা করেন।

ডাক্তার ষ্টিফানস্ ফ্রাঙ্কোইস্ নাউডি জার্ট বার্লিনে নিযুক্ত আফ্রিকার য়ুনিয়ন-সরকারের দূত। গত নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাঁহাকে পিরোর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য লণ্ডনে আসিতে হইয়াছিল।

পিরো য়ুনিয়ন-সরকারের বার্লিনস্থ দূতের সহিত লণ্ডনে গোপন পরামর্শ করিয়া পরে ঘোষণা করেন—তিনি প্রথমে বেলজিয়ম-রাজধানীতে সরকারীভাবে দর্শন দান করিয়া, তাঁহার গুরু এডল্ফ হিটলারের সহিত পরামর্শ করিতে বার্লিনে যাইবেন।

এই সকল ইঙ্গিত হইতে লণ্ডনের কোন রাজনীতিক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদিও বৃটিশ-সরকার জার্ম্মাণীকে উপনিবেশের কোন অংশ প্রদান করিতে ক্রমাগত অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন, তথাপি জেদী পিরোর ফন্দি-ফিকিরের পরিচয় পাওয়ায় মনে হয়—আফ্রিকার যে সকল রাজ্য পর্টুগাল, বেলজিয়ম, এবং নামে-মাত্র জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অধিকারে আছে, তাহা হইতে বৃটেন জার্ম্মাণীকে আফ্রিকান সাম্রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিয়া জার্ম্মাণীর ঔপনিবেশিক সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন। হিটলার ইহা পাইলেই খুসী হইবেন, এবং জার্ম্মাণীর যে সকল উপনিবেশ বর্ত্তমানে বৃটিশের অধিকারে আছে, তাহার সকল দাবী ত্যাগ করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই বেলজিয়মের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। বেলজিয়মের প্রধান মন্ত্রী পল স্পাক বেলজিয়ান পার্লামেন্টে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, "বেলজিয়মের (আফ্রিকান উপনিবেশসমূহ হইতে হাত সরাইতে হইবে। প্যারিস, লণ্ডন,

বার্লিন হইতে আমাদের অধিকার সম্বন্ধে নূতন ঘোষণার (new declarations) জন্য ক্রমাগত তাগিদ আসায়, তাহা শুনিতে শুনিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই সকল রাজধানীতে আমি পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন 'নোট' পাঠাইতে অস্বীকার করিতেছি। আমাদের কঙ্গো উপনিবেশের সম্পূর্ণ অংশ নিজেদের জন্য রাখিব, এ বিষয়ে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প, এবং যদি আমাদের এই রাজ্য আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে আমরা তাহা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সকল সৈন্যবল সমবেত করিতে প্রস্তুত আছি।"

লণ্ডনের বিশেষজ্ঞগণ সন্ধান লইয়া ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, বৃটেন এবং জাতিসঙ্ঘ যদি জার্ম্মাণীকে তাহার পূর্ব্বের অধিকৃত উপনিবেশগুলি প্রত্যর্পণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের সে শক্তি নাই। আন্তর্জাতিক মিলন সভায় এই সকল উপনিবেশের স্বত্ব ও স্বামিত্বের বিষয় পাকাপাকি-রকম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি কোন রাজ্য তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন উপনিবেশের অধিকার ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই উপনিবেশ সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জেরই অধিকারভুক্ত হইবে; কারণ, জার্ম্মাণী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে তাহার উপনিবেশগুলি সম্মিলিত মিত্র-শক্তিসমূহের হস্তেই অর্পণ করিয়াছিল। এ কথার মর্ম্ম এই যে, বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, বেলজিয়ম, এবং মার্কিণ যুক্তসাম্রাজ্য কর্ত্তৃক সেই সকল উপনিবেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে।

এতদ্ভিন্ন, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে অন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মিলনীতে যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহাতে বৃটেনকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, সেই চুক্তির কোন সর্ত্ত মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সম্মতি ব্যতীত কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা চলিবে না।

অস্ওয়াল্ড পিরোর লণ্ডনে আগমনের পূর্ব্বে নাজী 'প্রোপাগাণ্ডা' বিভাগের মন্ত্রী গোয়েবেল্স হিট্‌লারের পরিকল্পিত উপনিবেশ-বিস্তৃতি সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোয়েবেলসের দলের মুখপত্র 'ডার এংগ্রিফ' প্রত্যহ ঘোষণা করিতেছিলেন, "উপনিবেশসমূহে জার্ম্মাণীর ন্যায্য অধিকার আছে।"

পিরো কয়েকবার সুস্পষ্ট ভাষায় জার্ম্মাণীর উপনিবেশগুলির পুনরধিকারের দাবী করিয়াছিলেন; কিন্তু আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী হার্টজগ প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এডল্‌ফ হিটলারকে বা অন্য কাহাকেও প্রদান করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। প্রধান মন্ত্রীর এই দৃঢ়তায় পিরো কিঞ্চিৎ নরম হইয়া আফ্রিকা পুনর্ব্বার যাহাতে বখরা করা হয়, এবং কাহারও ভাগ হইতে তাহার কিয়দংশ জার্ম্মাণীকে প্রদান করা হয়, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন তাঁহার শান্তিনীতির সমর্থনের উদ্দেশ্যে টাঙ্গানাইকা জার্ম্মাণীর হস্তে সমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় টাঙ্গানাইকার ঔপনিবেশিকগণ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন। তাঁহারা 'ডিফেন্স লীগ' সংগঠন করিয়া টাঙ্গানাইকার নানা স্থানে প্রতিবাদ সভার অধিবেশন করিতেছেন; এবং ঔপনিবেশিকগণ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের বাস-ভূমি অন্যের হস্তগত হইতে দিবেন না, এবং ঐ প্রকার চেষ্টা হইলে প্রাণপণে সেই চেষ্টায় বাধা দান করিবেন।

এই সকল ঔপনিবেশিক এই ব্যাপারে এতই উত্তেজিত হইয়াছেন যে, স্থানীয় নাজী নেতৃবর্গ তাঁহাদের অনুচরগণকে ঐ সকল সভায় গমন না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু কোন কোন নাজী রাত্রিকালে গোপনে পথে আসিয়া 'ডিফেন্স-লীগের' প্রচারপত্রগুলি গৃহপ্রাচীর হইতে খুলিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে।

এফ, এস্ জোয়েলসন 'ইষ্ট আফ্রিকা এণ্ড রোড্‌সিয়া' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক, পূর্ব্ব-আফ্রিকা সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। তিনি লণ্ডনে আফ্রিকানগণের এক সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যদি বৃটিশ সরকার টাঙ্গানাইকাকে জার্ম্মাণীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব-আফ্রিকার ঔপনিবেশিকগণ নিশ্চিতই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইবে।"

এই অবস্থায় হার হিটলার আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বৃটেনের সাহায্যে কোন উপনিবেশ সহজে গ্রাস করিতে পারিবেন, তাহার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

হারিয়ে গেছে কোন্ আঁধারে

কোথায় তুমি হারিয়ে গেছ কোন্ সাগরের পার
খুঁজি তোমায় নিখিল ভরি পাইনে আমি আর,
আঁধার রাতে একলা ঘরে
তোমার লাগি নয়ন ঝরে
তোমার তরে চাহিয়া আছি নিশীথ-বাতায়নে,
এসো আমার ধ্যানের ছবি নয়ন-ধারা সনে।

গ্রহ-তারায় খুঁজ্‌বো আমি খুঁজ্‌বো সুদূর নভে
তোমার চুলের বাস আসিছে কুসুম-সৌরভে।
সাগর পারের ভীরু চখা
পালিয়ে চলো পলাতকা
লুকিয়ে আছো কোন্ আঁধারে কোন্ সে অলকায়?
খুঁজবো তোমা প্রবাল-দ্বীপে মরীচি-মায়ায়।

নভ-পারের বলাকা যে তারে অকারণে
চেয়েছিলাম রাখ্‌তে ধরে নীরব গৃহকোণে;
পক্ষ মেলি মেঘলোকে সে
গান গাহিয়া চল্‌বে ভেসে
সোণার খাঁচায় কভু আজি মানাবে কি তায়!
নীড়-হারাণো মন যে তাহার করবে হায় হায়।

হারিয়ে গেছে কোন্ গহনে পাইনে আজি তারে
তাহার লাগি জাগ্‌ছে ব্যথা গোপন অন্ধকারে,
ভালো যারে বাসি গো হায়
আমারে সে এমনি কাঁদায়
অশ্রুতে মোর ভরে আছে তাহার মনের গান,
চখা-চখীর মাঝে আজি সাগর ব্যবধান।

বন্দে আলী মিয়া।

কৃষ্ণকলি

[গল্প]

১

"কৃষ্ণকলি তারেই আমি বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে,
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।"

কৃষ্ণকলির নীল অপরাজিতা ফুলের মত সুন্দর, কোমল মুখটি ধরিয়া মাধুরী গাহিল।

গ্রামের কৃষ্ণকলি বা কলি নাম্নী মেয়েটি এক ঝট্‌কায় মুখখানা সরাইয়া, সলজ্জস্মিত হাস্যে বলিয়া উঠিল, "মাগো, রঙ্গ দেখে বাঁচি না! আমি এলেম তোমার কাছে পড়া ক'রতে, তুমি ধরলে গান? এমন ক'রলে পড়াবে কখন, মাধুরীদি? দাদা ফেরার আগে আমাকে যে যেতে হ'বে, তা বুঝি মনে নেই?"

"মনে আবার নেই? খুব আছে। আমার কাছে এলে তোর দাদার এত আপত্তি কিসের বল দেখি? আমি বাঘ্-ভালুক নই, সাধারণ মেয়ে। আমার বাবা নেই, দাদা নেই, তাই ছোট ভাই-বোনের জন্যে মা'র জন্যে কায করতে হয়। কায করি ব'লে আমি কি এতই হীন, অমানুষ হয়েছি?" বলিয়া মাধুরী কলির বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

কলি শশব্যস্তে প্রতিবাদ করিল, "না মাধুরীদি, তুমি খুব ভাল, দেবতার মতন। আমি তোমাকে ভালবাসি, মা বাসেন। দাদার কথা ছেড়ে দাও, দাদা যেন কেমন; লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের পছন্দ করেন না। তুমি খদ্দর ছাড়া পরো না, এখনো বিয়ে করনি, তাই—"

মাধুরী হাসিয়া বলিল, "তাই আমার ভীষণ অপরাধ! দেশের জিনিস ব্যবহার করা, দেশের ওপর দরদ থাকা একবারেই মন্দ কায, কেমন? তা কি করবো বল, সে দোষে ত দোষী হ'য়েই রয়েছি। 'বিয়ে করিনি' সেটা আমার ইচ্ছাকৃত পাপ নয়। এখনো মনের মানুষ খুঁজে পাইনি। পেলেই এক মিনিট দেরী করবো না। আমার কথা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তুই যে আমার চেয়ে মোটে এক বছরের ছোট, তোর দাদা নামজাদা গোঁড়া, তবু বোনের বিয়ে দিতে পারছেন না কেন?"

কলি ম্লানমুখে, ছল ছল চোখে বলিল, "সেটা দাদার ক্রটি নয়, মাধুরীদি, আমাদের টাকা নেই, আমি কালো; আমায় কে নেবে?"

কলির বিমনা ভাবে মাধুরী ব্যথা পাইল। তাহার ক্ষত-স্থানে অসাবধানে আঘাত করিয়া মাধুরীর লজ্জার সীমা রহিল না। সস্নেহে কলিকে বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া অনুতপ্ত মাধুরী কহিল, "কে বলে আমাদের কৃষ্ণকলি কালো? ঘর-আলো-করা কৃষ্ণা, সময় হলেই অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ ক'রে নিয়ে যাবে।"

"তোমার ভুল, মাধুরীদি! এ কালের মেয়েদের জন্যে অর্জ্জুন আসে না, লক্ষ্যভেদ হয় না। সে-কালে হাটে দাসী বিক্রী হতো, এ-কালে পয়সা না দিলে দাসীও বিকায় না। যাদের আছে, তারা দেবে; যাদের নেই, তাদের কোন্ রাস্তা?"

"রাস্তা ঠিক আছে, কলি! অভিভাবকদের সাহস নেই। যেমন ক'রে দাসপ্রথার উচ্ছেদ হয়েছে, তেমনি ক'রেই দাসী-প্রথার উচ্ছেদ হবে। বর আসে না বলে তোর কি খুব দুঃখ হয়? তা ভয় নেই, সখি, 'রহু ধৈর্য্যম্'।"

কলির বাঁকা ঠোঁটে হাসির মাণিক ঝরিতে লাগিল। হরিণ-নয়নে কলহের আভাস ঘনাইয়া আসিল। মাধুরীর গায়ে একটা চিম্‌টি কাটিয়া কলি কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিল, "দেখ

মাধুরীদি, যা'তা বল্‌লে কিন্তু ভাল হবে না? তুমি তুল্‌লে বলেই না আমাকে জবাব দিতে হ'ল, নইলে আমার বয়ে গেছে বিয়ে করতে। বরে আমার দরকার নেই, দরকার হ'ল লেখাপড়ায়। তুমি নিজে বিদ্যার জাহাজ হয়ে আমাকে মূর্খ ক'রে রাখতে চাও? যখনি বই নিয়ে আসবো তখনি ফষ্টিনাষ্টি আরম্ভ করবে? শেখাতে যদি ইচ্ছা না থাকে, তা স্পষ্ট ক'রে বল্‌লেই পার? এত ছড়া-পাঁচালির দরকার কি?"

"দরকার না থাকলে কি বেণাবনে মুক্তো ছড়াই, সখি? আমি 'বিদ্যার জাহাজ' হইনি, তুমিও মূর্খ নও, গুরুমারা বিদ্যার ভয়েই না সাবধানে থাকি। আর রাগে কায নেই, নাও, বই খোল, এবার ঠিক পড়াতে পারবো, এই ত গম্ভীর হয়েছি।"

কলি চকিত দৃষ্টিতে পল্লীর ছায়াবন বঙ্কিম পথের দিকে চাহিয়া পাঠ্যপুস্তক খুলিল বটে, কিন্তু তাহার পাঠ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। বাঁশবনের মাথায় দিবাশেষের ঝিকিমিকি রৌদ্রটুকু ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার বনতলে নিবিড় হইতে লাগিল। ইহার পরে কলির এখানে থাকা শোভন নহে। তাহার দাদার ফিরিবার সময় হইয়াছে। যে অমৃতের আস্বাদে কলির চিত্ত ভরিয়া যায়, আঁধার অন্তর-গুহায় মণি-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সে জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া এখনই কলিকে যাইতে হইবে। কত কাব্য, কবিতা, ইতিহাস গোপন মনে জাগিয়া গোপনে ঘুমাইয়া পড়িবে। প্রকাশ্যে তাহার আলোচনা, অনুশীলন চলে না—ইহাই কলির সর্ব্বাপেক্ষা চরম দুঃখ।

দুঃখ হইলেও পড়ার মাঝখানে বই বন্ধ করিয়া কলিকে উঠিতে হইল। তাহার গোপন বিদ্যার চিহ্ন কয়েকটি অঞ্চলে ঢাকিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, "এখন চলি, মাধুরীদি। বেশী লোভ ভাল নয়। তুমি এ নোটের খাতাটা দেখে রেখো, যদি পারি দাদা শু'লে রাতে আসবো। না পারলে কাল ভোরে।"

মাধুরী বলিল, "ভোরের চেয়ে রাতের অভিসার মিষ্টি বেশী, তুই রাতেই আসিস। সে দিনের মত মাসীমা'র রান্না তরকারী আনিস, আমরা দু'জনা এবেলা এক সঙ্গে খাব। ভুলে যা'সনে যেন? আমি ভাত সাম্‌নে ক'রে তোর জন্যে বসে থাকবো।"

কলি নিরুত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইল।

মাধুরী তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া গুন্ গুন্ স্বরে গাহিতে লাগিল,—

"চাঁদ ওঠেছিল গগনে,
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কি জানি কি মধু-লগনে।"

* * * * *

কুমারী মাধুরী রায় বি, এ, এ গ্রামের মেয়ে নহে। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীরূপে বছর খানেক হইল আসিয়াছে। মাধুরীর বাসা কৃষ্ণকলিদের বাড়ীর গায়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই বাড়ীর মধ্যে খানিকটা পোড়ো জমির ব্যবধান। সারি সারি সীমানা ঘেঁসিয়া বাঁশের বেড়া, বেড়ার গায়ে ঝুম্‌কালতার আচ্ছাদন।

দুই বাড়ীর দুই তরুণীর মধ্যে স্নেহ অপরিসীম, প্রীতি অখণ্ড। শিক্ষা সংস্কারে উভয়ের ভিতরে পার্থক্য থাকিলেও, প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। মাতৃবিচ্ছেদকাতরা মাধুরীকে কৃষ্ণকলি সঙ্গ দিয়া মমতা দিয়া, এক অচ্ছেদ্য ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। মাধুরী দিতেছিল কলিকে জ্ঞানের দীপ্ত আলো। ক্ষেত্র উর্ব্বরা, অনুরাগ প্রবল থাকিলে শিক্ষার বিষয় মানুষ অনেক শিখিতে পারে। কলির যত্ন-চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল তাহার দাদা মোহিত।

মোহিতের প্রতি মা বীণাপাণি একেবারে বিমুখ। দেবীর অকরুণার আক্রোশে কাহারও বিদ্যাচর্চ্চা সে সহিতে পারিত না। কাঁচা বয়সে পাটের কুঠিতে চাকুরীতে ঢুকিয়া মোহিতের স্বভাব হইয়াছিল পাটের বস্তার মতই রসশূন্য। যে কাঁচা বাঁশের বাঁশরী বাজিলে স্বজনরা মুগ্ধ পুলকিত হইত, তাহাতে কালে প্রস্তুত হইয়াছিল শুষ্ক কঠিন বংশদণ্ড। সে দণ্ড বিধবা মা মুক্তকেশী ও অরক্ষণীয়া ভগিনী কৃষ্ণকলির শাসন-সংস্কারে সর্ব্বদাই উদ্যত হইয়া থাকিত। যেমন আয় সামান্য, তেমনই সংসারও ক্ষুদ্র; এখনও বধূর শুভাগমন হয় নাই। তিনটি প্রাণীর মোটা চালে দিন কাটে, কিন্তু মেয়ের বিবাহে নগদ দক্ষিণা দেওয়া চলে না। সেই জন্যই কৃষ্ণকলির বিবাহের ফুল ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতেছিল না।

২

কলি ভয়ে ভয়ে বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, তখনও মোহিত ফিরিয়া আসে নাই। সে আরামের নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ডাকিল, "মা!"

মুক্তকেশী রান্নাঘর হইতে সাড়া দিলেন, "কলি, এসেছিস? আমি এখানে, তুই ফিতে-চিরুণীটা একেবারে নিয়ে আমার কাছে আয়, আগে তোর চুলটা বেঁধে দেই, এক গাদা চুল না বেঁধে বেঁধে জট পাকিয়ে গেল।"

কলি পাণের সরঞ্জামগুলি বারান্দায় নামাইয়া উত্তর দিল, "থাক গে জট-পাকিয়ে, এখন আমার সময় নেই, মা। ঘর ঝাঁট, বিছানা পাতা, প্রদীপ সাজানো—স্বষ্টি পড়ে রয়েছে। দাদা আসবার আগে পাণগুলো সেঁজে তুলতে পারলে বাঁচি। শোন মা, আর একটা কথা, মাধুরীদি আজকে তোমার রান্না তরকারী খেতে চেয়েছে, আমাকেও তার সাথে খেতে বলেছে।"

মুক্তকেশী বাহিরে আসিয়া সখেদে কহিলেন, "আহা, বাছা, আমাদের কি ভালই বাসে; কি বা ঘাস-পাতা সেদ্ধ ক'রে দেই, তাতেই কত খুসী। তিন তিনটা পাশ করা মেয়ে যে এমন লক্ষ্মী হয়, তা জানতাম না। আমার পোড়া কপাল, তাই মোহিত মেয়েটার নাম পর্য্যন্ত শুনতে পারে না। তার ভয়ে কিছু করতে পারিনে, কাছে বসিয়ে দুটো খাওয়াতে পারি না। কেন যে—"

মা কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। প্রাঙ্গণে ছেলের জুতার শব্দ শুনিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া চায়ের জল চড়াইতে ছুটিলেন।

মা, বোনের বিভীষিকা স্বরূপ হইলেও মোহিতের বয়স পাঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়। যেমন গুরুগম্ভীর স্বভাব, তেমনই রুক্ষ মেজাজের জন্যই সকলে তাহাকে সমীহ করিয়া চলিত। আজ কিন্তু হাসিমুখেই সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

মোহিত জামা জুতা ছাড়িয়া বিছানায় বসিয়া হাঁকিল, "কলি, মাকে ব'লে দে মোহনভোগ করতে হবে না, শুধু চা খাব।"

কলি পাণের ডিবেটা টুলের উপর রাখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "খাবে না কেন, দাদা? মোহনভোগ না খাও, নারকেলের নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া দুটো নিয়ে আসি?"

"না, কিছু আনতে হবে না। আজ বড়বাবু যে মেঠাই মণ্ডা খাইয়েছেন তাই আগে হজম করি, তার পর খাবার কথা শুনবো। তুই মাকে পাঠিয়ে দিয়ে চা ক'রে আন।"

মাকে পাঠাইতে হইল না। মা নিজেই আসিয়া ছেলের সম্মুখে মেঝেয় বসিলেন।

মোহিত প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কেল্লা ফতে ক'রে এলাম, মা। এবার মেয়ের বিয়ের বরণডালা সাজাও গে। বঁড়শীতে চুনো-পুঁটী ধরি নি, মস্ত কাত্‌লা।"

পলকের মধ্যে মুক্তকেশীর মলিন বদনে আনন্দের আভা খেলিয়া গেল। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সাথে ঠিক ক'রে এলি, মোহিত? নয়নপুর থেকে সেদিন যারা দেখে গেল, তাদের ওখানে, না কলকাতার সেই পাশ-করা ছেলেটির সঙ্গে?"

"কলকাতার পাশকরা ছেলের বয়ে গেছে তোমার পেত্নী মেয়ে নিতে। ভারী ত পাশ করেছে, সেই অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়তে চায় না। আর সকল শেয়ালের যে রা, নয়নপুরদের তাই। তারা চায় টাকা, তোমার টাকাও নেই, মেয়ের রূপও নাই, কাযেই ওদের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি এদিকেই চেষ্টা করছিলাম, তা চেষ্টার অসাধ্য কায নেই। এবার যা পেয়েছি, দোরে বাঁধা হাতী, আকাশের চাঁদ হাতের মুঠায়। এর নাম বলে বরাত, জোর বরাত।"

মা'র বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল, ক্ষণোদিত রামধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল। ছেলের আনন্দের উপাদান মা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রশ্ন করিতেও তাঁহার সাহস হইতেছিল না, কি জানি কি শুনিতে কি শুনিবেন? মা ছেলের মুখের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় কলি চা লইয়া আসিল। মোহিতের হাতে চায়ের বাটি দিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বেলা কি রান্না হবে, মা? উনুনে দুধের কড়া বসিয়েছি।"

মুক্তকেশী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি যাচ্ছি, তুই গা ধুয়ে নি গে।"

কলি কিন্তু তখনই খিড়কীর পুকুরে যাইতে পারিল না। দাদার এ করতলগত সৌভাগ্যের বোঝা যে ব্যক্তি বহিয়া আনিয়াছে, সে অজানা অচেনা তরুণের চির-প্রিয়, চির-মধুর নামটি শুনিবার আশায় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। চৈত্রের উদাসী সন্ধ্যা, কলির নবীন হৃদয়ে নবভাবের রোমাঞ্চ

জাগাইল, যে অস্ফুট প্রেম এতদিন কুমারীর অজ্ঞাতসারে অন্তরে লুকাইয়া স্তব্ধ-মধ্যাহ্নে, গভীর নিশীথে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতম গুঞ্জন তুলিয়া স্বপনের ভিতর লীন হইয়া থাকিত, সহসা তাহার রুদ্ধদ্বার কোন্ অপরিচিতের আবির্ভাব-সম্ভাবনায় খুলিয়া গেল!

কলি দূরে যাইতে পারিল না, আড়ালে সরিয়া প্রদীপের সল্‌তে পাকাইতে লাগিল।

মোহিত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পুনশ্চ আরম্ভ করিল, "চৈত্রমাস হয়েই মুস্কিল হ'ল, নইলে তিন দিনেই দায় শেষ কর্‌তে পারতাম। পয়লা বৈশাখ বিয়ের দিন ছিল, সে দিন কাযে লাগ্‌বে না। বড়বাবুর জন্ম-বার। ঠিক হ'ল বৈশাখের দশ তারিখে। আমাদের কিছু ক'রবার নেই, সমস্ত খরচ তাঁর। আমার কায কেবল হাতের ওপর হাত তুলে দেওয়া। তিনি কথা দিয়েছেন, বিয়ের পরের দিন থেকে আমার দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবেন। খড়ের চাল ভেঙ্গে কোঠা দিয়ে দেবেন। এর নাম বলে বরাত, জোর বরাত।"

মুক্তকেশী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "তুই কি বলছিস, মোহিত? তোর বড়বাবুর জন্ম-বারের সঙ্গে কলির বিয়ের কি সম্বন্ধ? কার সাথে কলিকে হাত-পা বেঁধে ডুবিয়ে দিতে চাচ্ছিস?"

মোহিত মহাক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কার সাথে আবার? বড়বাবুই ত দয়া ক'রে আমার জাত, কুল, মান রক্ষা করতে রাজী হয়েছেন। মাসখানেক হ'ল গিন্নী মারা গেছেন, বড়বাবুর বয়েসও তেমন বেশী নয়, এই বাহান্ন। দিব্যি মজবুত আঁটো-সাঁটো চেহারা, যেমন টাকা, তেমনি প্রতিপত্তি। এমন বর পাওয়া ভাগ্যের কথা।"

মুক্তকেশী চোখে অঞ্চল চাপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "এমন ভাগ্য আমি চাই না। টাকাকড়িতে আমার দরকার নেই। পোষ্টাফিসে পাঁচশো টাকা আছে, জোত জমি, আমার গায়ের গহনা আছে, তাই দিয়ে তুই নয়নপুরের সম্বন্ধ ঠিক ক'রে আয়, বাবা। অমন ঘাটের মড়া বুড়োর হাতে আমি কলিকে দিতে পারবো না।"

"'দিতে পারবো না!' দেওয়া না দেওয়ার তুমি কে? জানো, আমি তোমার অভিভাবক, তোমার মেয়ের অভিভাবক; আমার ইচ্ছায় সব হ'বে। বড়বাবু হলেন ঘাটের মড়া, ওঁর মেয়ে হ'ল কচি খুকী। 'মেয়ে মানুষ কুড়িতে বুড়ি', কুড়ি পেরিয়ে যার একুশ যায়, সেই ত ঘাটের মড়া। বড় যে টাকা, জমি দেখাতে এসেছ, শুনি, সে সমস্ত কার? আমার জিনিষ আমি দেব না। আমার স্পষ্ট কথা জেনে রাখো। আজ আমি বিয়ে পাকা ক'রে এসেছি। পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হ'লেও আমার কথার নড়চড় হবে না, স্বর্গ থেকে দেবতা নেমে এলেও না।" বলিয়া মোহিত আপনার মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

৩

মাধুরী বেড়ার পাশে লণ্ঠনের 'নিশানা' রাখিয়া কলির আশা-পথপানে চাহিয়াছিল। তখনও রজনীর গভীরতা সুপ্তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করে নাই। প্রফুল্ল জ্যোৎস্নালেখা পল্লবিত কাননকুঞ্জে অপরূপ মায়াজাল রচনা করিতেছে।

মাধুরীর পিতার আমলের দারোয়ান রঘুনন্দন দোবে ভাতের হাঁড়ি সম্মুখে লইয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল। এখানে আসিয়া দিদিমণির দরোয়ানের পদ, রাঁধুনীর পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণের পদ এক সঙ্গে প্রাপ্ত হইয়া দোবের মেজাজ নিরন্তর গরম হইয়াই থাকিত। সে গরম মেজাজ বেশীক্ষণ গরম রহিল না, কলির আগমনে হঠাৎ নরম হইয়া গেল। বৃদ্ধ কলিকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

কলি লইয়া আসিয়াছিল একখানা থালার উপরে কলা-পাতায় ঢাকা কয়েকটা বাটি। মুক্তকেশী মাধুরীর নিমিত্ত কয়েক রকম তরকারী রান্না করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

বিলম্বে আসিবার জন্য সামান্য অনুযোগ অভিযোগের পালা শেষ হইলে, দুই সখী পাশাপাশি খাইতে বসিল। এমন খাওয়া তাহারা অনেক দিন খাইয়াছে। এক বিছানায় শুইয়া, হাতে হাত জড়াইয়া গল্পে গল্পে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছে।

মাধুরী ভাত মাখিতে মাখিতে জিজ্ঞাসা করিল, "সন্ধ্যা-বেলা তোর দাদা অত চেঁচাচ্ছিলেন কেন রে, কলি? আমি এগিয়ে গিয়ে মাসীমা'র কান্নার শব্দও শুনেছিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। তোদের গাঁয়ে তোর দাদার মত আর ক'টা বীরপুরুষ আছে রে?"

কলি লজ্জায় নতমুখী হইয়া বলিল, "দাদার বড্ড রাগ, ওঁর কথায় কেউ কিছু বল্লেই রেগে আগুন হ'য়ে ওঠেন।

দাদা আজ আমার বিয়ে এক জায়গায় পাকা ক'রে এসেছেন। তা, মা'র পছন্দ হয়নি বলেই রাগারাগি।"

এমন নূতন খবরে মাধুরী উল্লাসের সহিত একসঙ্গে একরাশি প্রশ্ন করিয়া বসিল।

কলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল। মোহিতের মনোনীত পাত্রের বিশদ বিবরণ, মা'র আপত্তি, কোন কথাই গোপন করিল না। তাহাদের অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যে গোপনীয় কিছুই ছিল না। কিন্তু কলি লক্ষ্য করিতে পারিল না, তাহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে মাধুরীর আহারের স্পৃহা চলিয়া গিয়াছে, শান্ত নয়নে বিদ্যুৎ ঝলসিত হইতেছে, উত্তেজনায় সমস্ত মুখ আবিরের মত টক্‌টক্ করিতেছে।

হাত বাড়াইয়া জলের গেলাস লইবার সময় কলি মাধুরীর দিকে তাকাইয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "একি, মাধুরীদি, তুমি অমন ক'রে বসে রয়েছ কেন? খাচ্ছ না যে? রান্না কি ভাল হয় নি?"

মাধুরী তীব্রস্বরে বলিল, "রান্না ভাল-মন্দের এটা কি বিচারের সময়, কলি? আশ্চর্য্য তোকে, এত বড় ভয়ানক কাণ্ড জেনে শুনে তুই তরকারী বয়ে নিয়ে, খেতে এসেছিস্? যদি কোন উপায় না হয়, ওখানে বিয়ে হ'য়ে যায়? তার জন্যেও কি তোর ভাবনা হচ্ছে না?"

"এ সব তুচ্ছ ঘটনায় ভাবনা হবে, বড়লোকের মেয়েদের। যাদের টাকা আছে, রূপ-গুণ আছে, তারা বিয়ের বাজারে যাচাই ক'রে বেছে নেবে। গরীবের মেয়ের এ বিলাস চলে না, মাধুরীদি। যাকে কেউ চায় না, নেয় না, তাকে তবু যে একজন চাইছেন, নিচ্ছেন, এই আমাদের মহাভাগ্য। প্রথমে দাদার মুখে শুনে মা কেঁদে কেটে অমত করেছিলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেছি।"

"মস্ত কায করেছ, কলি। এমন না হ'লে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে? বায়ান্ন বছরে তোমার কেন যে আপত্তি নেই, তা আমি জানি। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। বড় বাবুর স্ত্রী হবার লোভে, টাকা-গয়নার লোভে তোমার এমন হীন প্রবৃত্তি হয়েছে।"

কলির আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু নিমেষের জন্য প্রদীপ্ত হইল। সুকোমল মুখের প্রত্যেক রেখা কঠিন হইয়া আসিল।

কলি সতেজে উত্তর দিল, "মাধুরীদি, গেঁয়োমেয়েরা তোমাদের মত স্বাধীন থাক্‌তে পারে না। নিজের সুখটাই সকলের কাছে সুখ না হ'তে পারে। সুখী হওয়ার চেয়ে, সুখী করা কি ছোট কায?"

মাধুরী নীরব। যাহাকে এইমাত্র তিরস্কার করিয়াছে, তাহার এতটুকু খোঁচায় চট করিয়া জবাব দিতে পারিল না।

মাধুরী জবাব দিতে না পারিলেও কলি নিঃশব্দে রহিল না। তাহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া তাড়না করিতে লাগিল, "ওকি মাধুরীদি, বোসে থাক্‌লে চলবে না। খেয়ে নাও। আমি এত কষ্ট ক'রে তরকারী নিয়ে এলাম। তোমাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বো না। খাবে না বল্লেই হ'ল? না খেলে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি করবো কিন্তু। ওমা, আড়িতেও ভয় নেই, না থাকুক, আমি আর বসে থাকতে পারছি না। বড্ড ঘুম পেয়েছে। আজ আমি তোমার কাছেই শোব, মাকে বলে এসেছি। মুখ ধুয়েই আমি শুয়ে পড়বো, ভোরে জাগিয়ে দিয়ো।"

সত্যই কৃষ্ণকলির ঘুম পাইয়াছিল। হাত-মুখ ধুইয়া মাধুরীর শুভ্র সুন্দর বিছানায় শয়ন করিবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল।

মাধুরীর শ্রান্তিহরা নিদ্রা, চিত্তের প্রসন্নতা ক্ষণকাল পূর্ব্বে কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল। সে বালিসে হেলিয়া তাহার পাশের ঘুমন্ত মেয়েটিকে নির্নিমেষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শিয়রের মুক্ত বাতায়নপথে এক ঝলক স্নিগ্ধ করুণ জ্যোৎস্না কলির মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। অবেণীবদ্ধ এলো খোঁপাটা ভাঙ্গিয়া বিছানায় লুটাইতেছে। পদ্মের পাঁপড়ির মত নিমীলিত চক্ষুপল্লবে, সুগঠিত অধরোষ্ঠে প্রশান্ত শান্তি বিরাজ করিতেছে।

মাধুরী ভাবিতে লাগিল, ন্যায়, অন্যায় ভবিষ্যৎ ভাবিবার পক্ষে এ মেয়ের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে। ইহাকে উচ্চ শিক্ষিতা না বলিলেও অশিক্ষিতা বলা যায় না। উহার হৃদয়ের উদারতার সহিত, সরলতার সহিত মাধুরীর নিত্য পরিচয় ঘটিয়াছে। তবু এ মেয়ে এত বড় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে জানে না কেন? যাহার আলোকিত হৃদয়াকাশে চির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, বাসনার পুষ্পদল অত্যাচারীর সদর্প পদক্ষেপে দলিত পেষিত হইতেছে, সে কি এমন নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারে? পল্লীবালার নারীশক্তি কি নিমিষের জন্যও জাগ্রত হয় না? ইহারা

ইরাণী

[শিল্পী—শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত

পুরুষকে নিমিত্তের ভাগী করিয়াছে মাত্র। নিজেদের দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা নিজেরাই। যাহারা অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত, কাল-তন্দ্রায় আচ্ছন্ন গৃহের অগ্নিদাহ হইতে তাহাদের একটিকেও কি মাধুরী বাঁচাইতে পারিবে না? যে মেয়েটা স্নেহ দিয়া মমতা দিয়া তাহার হৃদয়ের প্রান্তে স্থান করিয়া লইয়াছে, সেই স্বঘরের সমশ্রেণীর পিতৃহীন মেয়েটিকে সে যদি রক্ষা করিতে না পারিবে, তাহা হইলে তাহার শিক্ষার—স্বাধীনতার মূল্য কি?

৪

পরের দিন কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে স্কুলের ছুটী ছিল। দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ নিরালায় মাধুরী কলিদের গৃহে উপনীত হইয়া ডাকিল, "মাসীমা!"

মুক্তকেশী মেঝেয় মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, কলি মায়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল।

অপ্রত্যাশিতরূপে মাধুরীকে পাইয়া মুক্তকেশী পুলকিত হইলেন। তিনি এই মেয়েটিকে যেমন স্নেহ করিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন ততোধিক। কলির আসন্ন বিবাহসম্ভাবনায় তাঁহার মাতৃহৃদয় বেদনায় বিগলিত হইতেছিল। পুত্রের কঠোরস্বভাব মা'র অগোচর ছিল না। সে যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে, মায়ের আকুল অশ্রুধারায়, ব্যাকুল মিনতিতে তাহা ভাঙ্গিবার নহে। কাহারও কাছে ছেলের বিরুদ্ধে বলিতে যেমন তাঁহার বাজিতেছিল, আবার না বলিয়াও বুক ফাটিবার উপক্রম হইতেছিল। কলির প্রতি মাধুরীর প্রবল অনুরাগ তাঁহার জানা ছিল বলিয়াই মাধুরীকে নিকটে পাইয়া মুক্তকেশীর দুঃখের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল।

তিনি হাত ধরিয়া মাধুরীকে কোলের কাছে বসাইলেন। তাহার খোলা ভেজা চুল আঙ্গুলে চিরিয়া দিতে লাগিলেন।

সে স্নেহস্পর্শে মাধুরীর মনের উত্তাপ জ্বলিল বই নিবিল না। সে মুক্তকেশীর হাতের বাহিরে মাথা সরাইয়া লইয়া ঝাঁঝের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "পাটের কুঠির বড়বাবু না বুড়োবাবু, কোন্ বাবুর সাথে কলির বিয়ে নাকি পাকা হয়ে গেছে? মা হয়ে আপনি এমন কর্ম্ম করতে যাচ্ছেন, মাসীমা? ছেলের ওপর কথা বল্‌বার আপনার সাহস নেই? শক্তি নেই? কেবল জানেন আপনারা কোণে লুকিয়ে কাঁদতে? ছেলেকে ডেকে বলুন, ওখানে বিয়ে দেবেন না, দিতে পারবেন না। কলির বাবা নেই, আপনি আপনার ছেলে-মেয়ের অভিভাবক। আপনার অনিচ্ছায় কোন কায হ'তে পারে না।"

মুক্তকেশীর শুষ্ক কপোল বহিয়া অঝোরে অশ্রুধারা ঝরিতেছিল। তিনি ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "মোহিত বড় হবার পরে আমি ত কখনো তার মতের ওপর মত দিই নি, মা। সেকাল থেকে এ পর্য্যন্ত আমি তার কথাই শুনে আসছি। সে যে কত রাগী, কত জেদী, তা তুমি জান না। আজ সকালেও বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে এসেছি। মোহিত বলে, পাকা কথা মানে অর্দ্ধেক বিয়ে, পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হ'লেও আমি তা ভাঙ্গতে পারবো না। আমিও ভেবে দেখলাম, এর পরে কেউ যদি না নেয়, তা হ'লে মেয়ের কি গতি হবে? সাধ ক'রে কোন্ মা মেয়েকে ডুবিয়ে দিতে চায়, মাধুরী? হাজার হ'লেও মায়ের প্রাণ ত?"

"নিশ্চয় মায়ের প্রাণ, মাসীমা, তাতে সন্দেহ করছি না। 'গতির ভয়' চমৎকার উদাহরণ। বাঙ্গালার মেয়েদের সহিষ্ণুতা অক্ষয় হয়ে থাকুক। ত্যাগের গল্প দেশে দেশে রটে যাক্। কিন্তু একটা কথা, 'কেউ নেয় নি নেবে না,' বলতে পারবেন না। কাকে আপনারা নেবার সুযোগ দিয়েছিলেন? কাকেই বা খুঁজে এনেছিলেন? আপনার ছেলে, আর তাঁর বন্ধুরা সমস্ত পুরুষ জাতের প্রতিনিধি নয়। দানবের উল্টো পিঠের দেবতার সঙ্গে আপনাদের দেখা হয় নি! আচ্ছা, মাসীমা, আপনি কি মনে মনে ওই বুড়ো জামাইকেই চেয়েছিলেন? না তার বদলে আর কারুকে কল্পনা ক'রে রেখেছিলেন? নিশ্চয়ই জন্তু-জানোয়ার চান নি?"

"না মা, নিজের সন্তানের জন্যে কে মন্দ চায়? কলি ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়া বলে পাগল; আমি ভেবেছিলাম, তিন চারটা পাশ করা অল্প বয়সের একটি পাত্র। আমার পোড়াকপাল তাই এমনি হচ্ছে।"

মাধুরী কিয়ৎকাল চিন্তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার চাওয়ার মত বর এখন যদি পাওয়া যায়? তাকে কি আপনি নিতে পারবেন, মাসীমা? ছেলের বিরুদ্ধে এক দিনও কি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন?"

মুক্তকেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। যে আজ

তাঁহার সম্মুখে বিদ্রোহের মশাল তুলিয়া ধরিল, তিনি না পারিলেন তাহার দিকে চাহিতে, না পারিলেন তাহার কথার উত্তর দিতে।

বাল্য হইতে কৈশোর, যৌবন হইতে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাঁহার শাসনের আড়ালে কাটিয়া গিয়াছে, তিনি আর যা করুন, নিজের দাবী, অধিকার চাহিতে পারেন না। যে নদীতে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, তাহার প্রবাহের পথ কোথায়? যে পা অবশ—পঙ্গু, তাহার বিশ্বের দরবারে দাঁড়াইবার শক্তি নাই। আছে শুধু সুখ-দুঃখের অনুভূতি, হাসি-অশ্রুর মেঘ ও রৌদ্র।

মা'র প্রতি মাধুরীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কলিকে আঘাত করিল। যিনি নিরুপায় অসহায়া, তাঁহার প্রতি এত আক্রোশ কেন? মাধুরী কি জানে না, বাঁধিয়া মরিলে অনেক সহিতে হয়।

নিভৃতে কলি কহিল, "ছিঃ মাধুরীদি, তুমি মাকে অমন ক'রে বল্লে কেন? মা'র কি দোষ? আমিই ত আমার ইচ্ছা মাকে জানিয়েছি। মানুষের বয়েসের ভেতর কি আছে? হোলই বা বয়েস বেশী; থাকলেই বা ছেলে, মেয়ে, নাতী-নাত্নী—তাতে আমার দুঃখ কিসের? যিনি আমার কুমারী নাম খণ্ডিয়ে আশ্রয় দেবেন, দাদার সহায় হবেন, তাঁর ওপর আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো! যাতে আমার শান্তি ভিন্ন অশান্তির আশঙ্কা নেই, তাই নিয়ে তুমি পাগলের মত করছ কেন?"

"কেন যে করছি তা তুমি বুঝবে না, কলি? যারা সত্যিকারের পাথর হয়ে যায়, পা-ছুঁইয়ে তাদের মানুষ করা স্বয়ং রামচন্দ্রেরও অসাধ্য। তোমার দাদা যার নিন্দা-কুৎসা করেন, ঘেন্না করেন, বোনের সঙ্গে মিশতে দিতে ভয় পান, তার ক্ষমতা যে তোমার দাদার চেয়ে কত বেশী, সেটা আমি না জানিয়ে ছাড়বো না।"

বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে মাধুরী চলিয়া গেল।

* * * * *

সপ্তাহ মাত্র, সাতটি দিন যে এত ধীর-মন্থর, কলির তাহা ধারণা ছিল না। সেই যে সেদিন মাধুরী রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর আসে নাই। বেড়ার পাশে দাঁড়ায় নাই। কলিকে ডাকে নাই। দুঃখে অভিমানে কলিও যায় নাই। কিন্তু আর না গেলে দিন কাটে না। অভিমানের তেজঃ ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতেছে, বেড়ার অভ্যন্তরের দুর্নিবার আকর্ষণ সবেগে টানিতেছে। কলি কাহার উপর অভিমানে বিমুখ হইবে? যে তাহারই নিমিত্ত, তাহার সুখ-শান্তির নিমিত্ত আকুল-উন্মুখ, কলি তাহার নিকটে না গেলে বাঁচে কেমন করিয়া? মাধুরী কলির মাকে অপ্রিয় বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছে, দাদার উদ্দেশে ঝাল ঝাড়িয়াছে, সে সমুদয় কি কলির জন্য নহে?

সে দিন কালবৈশাখীর মেঘমেদুর অপরাহ্ণে দুরুদুরু কম্পিতবুকে, সঙ্কুচিত পায়ে কলি বাহির হইল।

বেড়ার কাছে কেহ অপেক্ষায় ছিল না। প্রাঙ্গণ জনশূন্য। মাধুরীর নির্জ্জন গৃহ হইতে মৃদু বাক্যালাপের ক্ষীণ রেশ, হাস্যের কলধ্বনি মেঘলা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

কলি আস্তে আস্তে দ্বারে উপনীত হইল, কিন্তু মাধুরীর নিকটে যাইতে পারিল না।

চৌকীর উপরে মাধুরী ও একটি তরুণবয়স্ক ছেলে বসিয়া কি জানি কিসের আলাপ-আলোচনা করিতেছে। তরুণের অধরে মৃদুমন্দ হাসি, মাধুরী হাসির উচ্ছ্বাসে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

কলি সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইল। অপরিচিত তখন বাহিরের দিকে চাহিতেই কলির সহিত একেবারে দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল।

মাধুরী চকিতে ছুটিয়া আসিয়া কলির হাত চাপিয়া ধরিল। একবার কলির দিকে, একবার তরুণের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আয় কলি, ঘরে আয়। ওকে লজ্জা কি রে? ও আমার অভয়দা, খুড়োতুত ভাই, আজ সকালে এসেছে। আমার চেয়ে মাত্তর দু'বছরের বড়। তুই আমাকে বিদ্যার জাহাজ বলিস, অভয়দা বিদ্যার সমুদ্র। আমার যা কিছু শেখা ওরি কাছে। অভয়দার অনেক গুণ, অনেক কায। কেবল একটা দোষ পাটের দাম জানে না। জানে না বলেই ভয়ের ভেতর অভয় আনে।"

মাধুরীর অভয়দা রঞ্জিতমুখী কলির পানে একটি স্নিগ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "ছিঃ মাধু, এখনো কি তোর ছেলেমি গেল না। বয়েস হ'ল, প্রধানা হলি, তবু স্বভাব বদ্লালো না? ওঁকে বসতে দে, আমি যাই, দোবেকে নিয়ে গাঁয়ের ভেতর একটু ঘুরে আসি।"

মাধুরী ভ্যাংচাইল, "আমি দোবেকে নিয়ে গাঁয়ের ভেতর

ঘুরে আসি'! অত ঘুরে বেড়াতে হবে না, মশায়। এক দিনেই এহেন অপূর্ব্ব গাঁ বন্যায় ডুবে যাবে না। ইনি আমার বন্ধু কৃষ্ণকলি, তুমি একে একটুখানি পড়াও না, অভয়দা? ও লেখাপড়া খুব ভালবাসে। কৃষ্ণকলি অতি সুবোধ বালিকা, যাহা পায় তাহা খায়। শ্রীমতী মাধুরী রায় বাদে, সে কদাচ কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করে না। পাঠে কদাচ তাহার অবহেলা নাই। পাটের বস্তার নীচে পিষিয়া মরিতেও সুশীলা কৃষ্ণকলি পশ্চাৎপদ নহে।"

অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে এত অত্যাচার কলি সহিতে পারিল না। তাহার কাজল-কালো আঁখিতটে অশ্রু টলটল করিতে লাগিল। কলি মুখ তুলিয়া শান্তস্বরে বলিল, "আমরা তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি, মাধুরীদি? আমরা ছোট, আমরা গরীব, তা জেনেও কি দয়া হয় না?"

কলির আর্দ্রসকরুণ কণ্ঠস্বরে বিশ্বের বিপুল ব্যথা যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কলিকে আঘাত করিবার উদ্দেশে মাধুরী রঙ্গ-পরিহাস করে নাই, করিয়াছিল নিজের স্বভাবের দোষে। স্বভাবের দোষ যে মাত্রার বাহিরে যাইতেছিল, মাধুরী তাহা টের পায় নাই। টের পাইল কলির চোখের জলে।

ইহার পরে অনুতপ্তা মাধুরী স্থির থাকিতে পারিল না। দুই হাত বাড়াইয়া কলিকে বুকে চাপিয়া বিনয় করিতে লাগিল, "কলি, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, তোর মাধুরীদিকে মাপ কর। আমি তোকে ঠাট্টা ক'রে বলেছি, দুঃখ দেব বলে বলিনি। জানিসই তো আমি একটা পাগল, ছাগল, গোরু, গাধা। আমার কথায় কেউ নাকি রাগ করে? তুই রাগ করিসনে, বরং অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আমার কাণদুটো আচ্ছা ক'রে ম'লে দে।"

মাধুরীর ভাবভঙ্গীতে কলির চোখের জল শুকাইতে না শুকাইতে চাপা হাসির আভায় বারিসিক্ত ফুলের মত সুমিষ্ট মুখখানি ঝলমল করিতে লাগিল।

"ফাজিল মেয়ে, তোর কাণ ম'লে দেওয়াই উচিত।" বলিয়া মাধুরীর অভয়দা হাসিতে হাসিতে বাহিরে গেলেন।

মাধুরী অভয়দাকে কীল দেখাইয়া গান ধরিল—

"হাম্‌সে অবলা, হৃদয় অখলা, ভাল মন্দ নাহি জানি,
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখালে আনি।"

৫

বৈশাখের প্রথম দিবস, নববর্ষের সূচনা।

প্রভাতে উঠিয়া মুক্তকেশী মেয়েকে বলিলেন, "আজ তোতে আমাতে সোমবার করবো কলি, দিনমানে খাওয়া নেই, সেই সন্ধ্যায় সোমেশ্বর শিবের পূজো ক'রে খাওয়া। তুই কি পারবি, মা?"

কলি কৌতুকের হাসি হাসিল—"মা, তোমার কি ভুলো মন, সব ভুলে যাও কেন? আমি যে আরো দুবার সোমবারের উপোস করেছিলাম তা মনে নেই? থাকতে আবার পারবো না, খুব পারবো, কাযকর্ম্মেই দিন কেটে যাবে। তার পরে পূজো হয়ে গেলেই খাওয়া। ভারী তো তোমার সোমবারের উপোস—এ আবার কে করতে না পারে?"

"পারলেই ভাল, কলি" বলিয়া মা চলিতে উদ্যত হইতেছিলেন, কলি পিছন হইতে ডাকিল, "মা, ঠাকুর মশায়কে খবর দিতে হবে না? পূজো করবার কথা আগে তাঁকে না ব'লে রাখলে তিনি বাড়ীতে থাকেন না। তুমি ব'লে এসো গে। আমি কাপড় কেচে আগে ফুল তুলে রাখি। রোদ উঠলে ফুল শুকিয়ে যাবে।"

মুক্তকেশী ফিরিয়া কহিলেন, "আমাদের পূজোর যোগাড় করতে হবে না, মা, মাধুরীও সোমবার করবে কি না, তার ওখানেই আমরা গিয়ে একত্রে পূজো করব। সেই সমস্ত ঠিক ক'রে রাখবে। রাতে মোহিতের হালখাতার নেমন্তন্ন আছে। ফিরতে দেরী হবে, আমরা বিকেলে চান ক'রে মাধুরীর বাড়ী যাব।"

কলি সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল, "মাধুরীদি সোমবার করবে? ওকে দেখে তো মনে হয়, পূজো-টুজো জানে না।"

"কেন জানবে না, কলি? মাধুরী কি হিন্দুর মেয়ে নয়? এমন দয়ামায়া কোথাও দেখিনি। ও আর জন্মে আমার মা ছিল। অনেক তপস্যায় আমার কাছে এসেছে, জন্ম-জন্মও আমার সাধ্য হবে না, ওর ঋণ শোধ করা।"

কলি নীরবে মাধুরীর কথাই ভাবিতে লাগিল। আজকাল এ বাড়ীতে মাধুরীর আসা-যাওয়া বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। মোহিতকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, মোহিতও এ দিকে উদাস, উন্মনা। তাহার ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্নে দিবানিশি বিভোর—তন্ময়।

মোহিতের কড়া শাসন শিথিল হইলেও কলি আর

মাধুরীর বাড়ী যায় না। মাধুরীর অভয়দাকে সে সম্পূর্ণ এড়াইয়া এই বাড়ীতেই মাধুরীর সহিত পাঠের আলোচনা করে, মাধুরীর দেশের গল্প শোনে, অভয়দার গল্প শোনে।

কলি যত গল্পই শুনুক না কেন, এখন মুক্তকেশীর সহিতই মাধুরীর আলাপ-আলোচনা চলে বেশী। এক হাস্যময়ী, কৌতুকময়ী তরুণীর স্পর্শে আসিয়া মুক্তকেশীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার সদা সঙ্কুচিত ভীত আননে অনির্ব্বচনীয়, অপরিমেয় পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়াছে।

দিনান্তের রাঙ্গা ছবি ধরণীর গায়ে মিলাইতে না মিলাইতে মুক্তকেশী কলিকে লইয়া বসিলেন। তাহার সদ্যঃস্নাত ললাটে এক ফোঁটা হরিদ্রা লেপিয়া নিজের পুরাতন গহনা কয়েকটি পরাইতে লাগিলেন।

কলি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আজ তোমার কি হ'ল?"

মা অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া জবাব দিলেন, "কখনো ত সাজিয়ে গুছিয়ে দেখিনি মা, কেবল দুঃখ দিয়েছি। সে দুঃখ আমারি বুকে লুকানো থাকুক কলি, তার এতটুকু আঁচ যেন তোর গায়ে না লাগে, এই আমার আশীর্ব্বাদ।" মা'র দুই চোখে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

মায়ের আক্ষেপের মর্ম্ম কলি ভাল বুঝিতে পারিল না। কি এক অজানা আবেগে তাহার হৃদয় পদ্মপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল।

সে কম্পন অসম্বরণীয় হইল মাধুরীর বাড়ী ঢুকিয়া।

প্রাঙ্গণে কিসের যেন আয়োজন হইয়াছে। বৃদ্ধ ঠাকুর মহাশয় ব্যস্ত হইয়া কত কি সংগ্রহ করিতেছেন। মাধুরী আনন্দে উদ্দাম হইয়া চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

কলি কোন ধারণা করিতে পারিল না। তাহার উপবাস-ক্লিষ্ট শরীর ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। বারান্দার খুঁটির গায়ে দেহভার রক্ষা করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

কিয়ৎকাল পরে মাধুরী আসিয়া কলিকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "এখানে এমন হয়ে বসে রইলি কেন, কলি? তোকে লুকিয়ে চুরিয়ে আর কি হবে? তোর বড়বাবুর হুকুম হ'য়েছে—জন্ম-বারেই বিয়ে ক'রবেন। ছেলেদের ভয়ে এখানে লুকিয়ে বিয়ে হবে। মোহিত বাবু বড়বাবুকে আন্‌তে গেছেন। লগ্নের দেরী নেই, আয় তোকে সাজিয়ে দেই।"

কলি কথা কহিল না, চোখ খুলিল না, পাষাণমূর্ত্তির মত তেমনই বসিয়া রহিল।

কোথা দিয়া কি যে হইল, কলি তাহা জানে না। শুভদৃষ্টির সময় মাধুরীর বারম্বার অনুরোধে চোখ মেলিয়া কলি মন্ত্রমুগ্ধার মত চাহিয়া রহিল। কৃষ্ণকলির সম্মুখে আর কেহ নহে;—মাধুরীর অভয়দা।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

ক্রন্দি উঠে তবু কোন্ ব্যথা

বধূর অধরপুটে লভিয়াছি মধুর আস্বাদ,
রূপের অনল সেচি কাটায়েছি কত না প্রহর;
পরম দুঃসহ প্রেম সহিয়াছি জন্ম-জন্মান্তর
নিঙাড়ি জীবন-সুধা মিটায়েছি যত তৃষা সাধ।
মৃন্ময় ধরার পাত্রে ভুঞ্জিয়াছি ইন্দ্রের প্রসাদ,
ধূলি হতে কুড়ায়েছি মুকুতা মাণিক থরে থর,
করিয়াছি পুণ্যধ্যান যেথা বহে আনন্দ-নির্ঝর
বাজায়ে স্বপন-তন্ত্রী গাহি গান; নাহি অবসাদ।

মোর গানে ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দি উঠে তবু কোন্ ব্যথা,
অকস্মাৎ তপ্ত শ্বাসে ম্লান হয় রূপের মন্দার,
পুষ্পাসবমাঝে জাগে বিন্দু হলাহল; ফাল্গুনের
পুষ্পিত বাসরতলে সাড়া পাই গোপন সর্পের
কল্পনার রম্য বনে পথ রোধে কুহেলী কুণ্ঠায়
ঘন আনন্দের মাঝে ভরা অশ্রু জাগায় ব্যর্থতা।

ফজলুস্ সালাম।
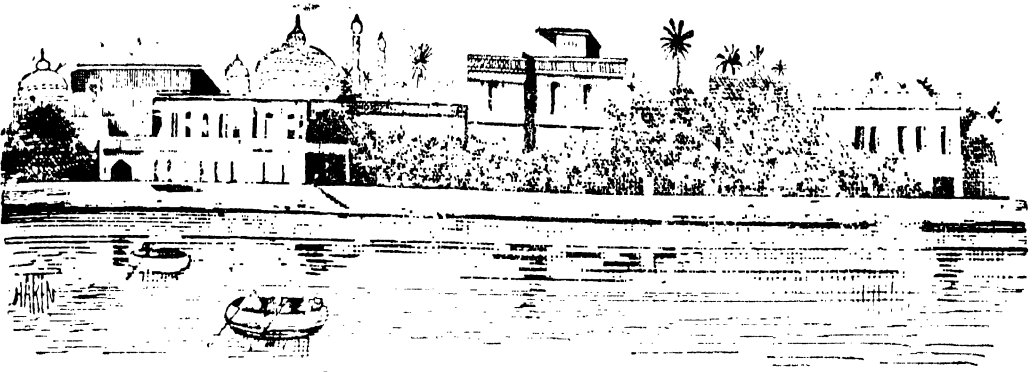
উত্তর-য়ুরোপের সাধারণতন্ত্র

য়ুরোপের সুদূর উত্তর-প্রান্তে সাধারণতন্ত্রশাসিত ফিন্ল্যাণ্ডের কথা পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হইবে। পশ্চিম য়ুরোপ ও জার-শাসিত রুশিয়ার মধ্যে ফিন্ল্যাণ্ড "বফার ষ্টেট" বা সংঘর্ষনিবারক রাজ্যের মত অবস্থিত ছিল।

ধাবমান ব্রোঞ্জমূর্ত্তি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ফিন্ল্যাণ্ড তাহার স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুগে পদার্পণ করিয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সুইডিস্ ও রুশীয় কোন প্রকার প্রভাবে প্রভাবিত না হইয়া ফিন্ল্যাণ্ড নিজের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর সে স্বাধীনতা লাভ করে।

ফিন্রা তাহাদিগের দেশকে "সুয়োমি" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কোনও বিদেশী আসিয়া যদি তাহাদিগের দেশসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহাতে ফিন্রা অধীর

ব্যায়ামরতা ফিন্ল্যাণ্ডের বালিকা, তরুণী

হইয়া উঠে না। কারণ, তাহারা জানে, ফিন্ল্যাণ্ড অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। তাহারা প্রায় নিজেদের দেশকে ক্ষুদ্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়া থাকে। ছোট হইলেও ফিন্ল্যাণ্ড আকারে প্রায় পোল্যাণ্ডের মত।

বর্ত্তমান যুগের বিমান এবং তুষারশিলাভঙ্গকারী জাহাজ-সত্ত্বেও তুষার-শিলামণ্ডিত বাল্‌টিক সমুদ্র শীতকালে যেন জীবনীশক্তিহীন অবস্থায় পরিণত থাকে। কাযেই ফিন্‌ল্যাণ্ড সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র অবস্থায় থাকিবে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায় ?

উত্তর আর্কটিক অঞ্চলের সুইডেন ও নরওয়ের অন্তর্ভুক্ত জনশূন্য স্থান ফিন্‌ল্যাণ্ডের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। সোভিয়েট অঞ্চলের জনশূন্য উপরের অংশ পূর্ব্বদিকে বিরাজিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তভাগে রেলপথ হেলসিংকি হইতে লেনিন-গ্রাড্ পর্য্যন্ত প্রস্তৃত। ইহাই ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রবেশ-তোরণ।

বিশ্বযুদ্ধের পরে ফিন্‌ল্যাণ্ড মেরুসমুদ্রের দিকে একটি পথ পাইয়াছে। রুশিয়া পেটসামো ডিষ্ট্রিক্ট ছাড়িয়া দেওয়ার ফলে এই ব্যবস্থা হয়।

গ্রীষ্মকালে উত্তর-অন্তরীপের চারিদিকে নানা প্রকার জলযানের ভিড় লাগিয়া যায়। সেই সময় পেটসামো ও তাহার সন্নিহিত স্থানগুলি বিভিন্ন দেশের জনসমাগমে উৎফুল্ল ও সজীব হইয়া উঠে। মেরুসমুদ্রতীর হইতে মোটর-পথ আছে। তাহার সাহায্যে সহর ও বড় বড় গ্রামে উপনীত হওয়া যায়।

উত্তর-মেরুর দিকে ইদানীং সোভিয়েটরা বিমান-যাত্রা করিতেছে। সেখানে তাহাদিগের একটি ষ্টেশন বিদ্যমান। তথায় আবহাওয়ার সংবাদ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

হেলসিংকি সহরেই ফিন্‌ল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই সহরে আমেরিকার দূত-বিভাগের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। হেলসিংকি নগরে সকল দেশের লোকই বিদ্যমান। সকল দেশের পতাকা এখানে উড্ডীন হইতে দেখা যাইবে। প্রত্যেক দেশের জাহাজ এখানকার বন্দরে স্ব স্ব জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া জলে ভাসিতেছে—দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সমুদ্র-তীরবর্ত্তী রাজপথের ধারে বাজার। তথায় বিভিন্ন-প্রকারের মৎস্য, ফল, ফুল স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মাথার উপর সামুদ্রিক গল্পক্ষীর উড্ডয়ন দর্শককে বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। দ্বিপ্রহরে বাজার-হাট জনশূন্য হইয়া পড়ে।

হেলসিংকি রেলষ্টেশনের সম্মুখভাগ

পরদিবস আবার পুষ্পবিক্রেত্রী, ফলওয়ালী, জেলে ও জেলেনীরা তাহাদিগের পশরা লইয়া বাজারে ভিড় জমাইয়া তুলিবে। দক্ষিণাঞ্চলের ন্যায় ফলগুলি তেমন রসাল না হইতে পারে, কিন্তু গোলাপ, প্যান্সি প্রভৃতি ফুলের বর্ণের বাহার চমকপ্রদ। টাটকা মাছগুলি দেখিলেই দর্শকের চিত্তে লোভ জন্মিবে।
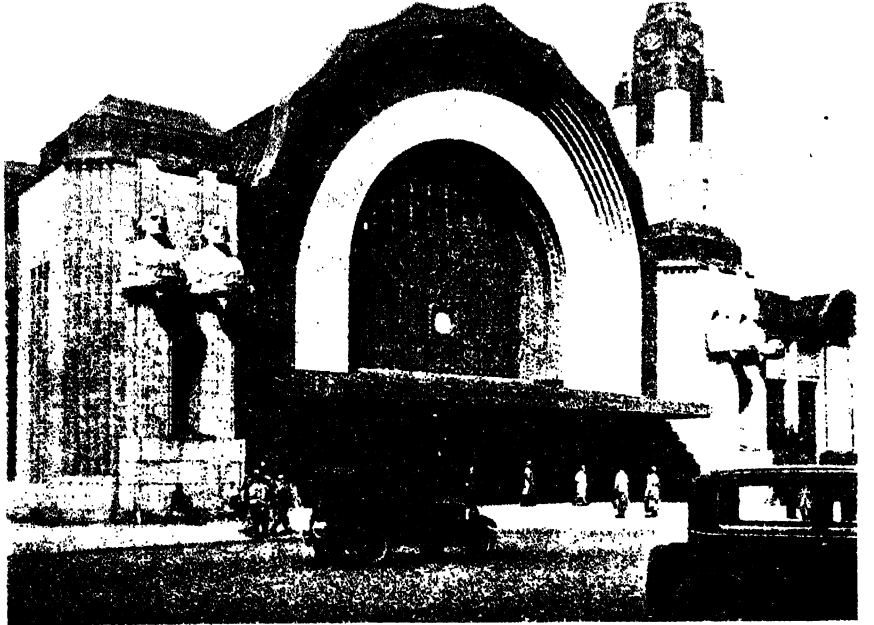
বাজারের পরই বৃক্ষবীথি—উহাই হেল্‌সিংকির প্রধান রাজপথ। এইখানে ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীর দেখা মিলে। ফিনিস্, সুইডিস্ সকলের মধ্যে রুশীয় রক্তের মিশ্রণ আছে। কিন্তু পার্থক্য নির্ণয় করা বড় কঠিন।

ফিনিশ-পরিবারের আচার-ব্যবহার সুইডেনের অনুরূপ আহারশেষে ছেলেমেয়েরা টেবল ত্যাগের সময় বলে

"খাবারের জন্য ধন্যবাদ"। সেই সঙ্গে তাহারা পিতামাতার করকম্পন করিয়া থাকে। অতিথিরাও গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রীর করকম্পন করিয়া অনুরূপ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া থাকে

ফিন্‌ল্যাণ্ড যখন সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন হইতেই সুইডেনের শিক্ষাপদ্ধতি ফিন্‌ল্যাণ্ডে শিকড় গাড়িয়াছিল। বহু শতাব্দীর এই শিক্ষাপদ্ধতি এখনও অব্যাহত আছে। কৈশোরকালে তরুণ-তরুণীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর

ফিনিসীয়গণ দৌড়-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ

শ্বেতবর্ণের ছাত্রটুপী ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে শিক্ষার নিদর্শন টুপীতে মুদ্রিত থাকে।

বিদ্যালয়ে ফিন্‌ভাষা, সুইডেনের ভাষা রুশীয় ভাষার সঙ্গে শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু ক্রমেই সুইডিশ ভাষার প্রভাব ফিনিসীয়গণ ত্যাগ করিতেছে। অনেক পরিবারে সুইডিশ নামের পরিবর্তে ফিনিশ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। পার্লামেণ্টে দুই ভাষাই চলে, তবে ভাষান্তরের প্রয়োজন হয় না।

ফিনিশ ভাষা বিদেশীর পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন। ফিনিশীয় ভাষার বানান এবং উচ্চারণ খুবই যুক্তিপূর্ণ। ফিন্‌ল্যাণ্ডে রেলপথের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফিনিশ সরকারের হাতেই রেলপথ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ভার অর্পিত।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে অরণ্যের বাহুল্য আছে। কিন্তু তথাপি কৃষি-জীবনের তুলনায় যন্ত্র-জীবনের প্রসার বাড়িয়াছে—অনেক লোকই নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনে মনোযোগী হইয়াছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের শতকরা ৭৫ ভাগ অরণ্য। এই অরণ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রচুর ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। কড়িকাঠ, কাগজের জন্য 'পাল্‌প্' প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

বহু-জাতীয় বৃক্ষ জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছে। দেবদারু, স্প্রুস প্রভৃতি বহু জাতীয় বৃক্ষের চাহিদা অন্যত্র আছে। ফিন্‌ল্যাণ্ডে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে "মিডসমার" উৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লাডোগা হ্রদের ধারে এই উৎসব সম্পাদিত হয়। অপরাহ্নকালে চারিদিকে আগুন জ্বলিতে থাকে। প্রদোষকালে উহার দৃশ্য অতি মনোরম। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। নাচ-গান সবই এই সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; সেই সময় প্রকৃতি যেন নূতন জীবন-স্পন্দনে নর-নারীকে উল্লসিত করিয়া তুলে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে অরণ্যজাত কাষ্ঠ হইতে প্রচুর অর্থাগম হয়, পূর্ব্বেই তাহা লিখিত হইয়াছে। তাহার পর জলের শক্তিজাত অর্থও অল্প নহে। এই দেশে অনূ্যন ৬৫ হাজার হ্রদ আছে। প্রত্যেক হ্রদে এত দ্বীপ আছে যে, হ্রদের অপেক্ষা তাহারা সংখ্যায় অধিক। দ্বীপের সংখ্যা লক্ষাধিক। সুতরাং ফিন্‌ল্যাণ্ডের সমগ্র দৃশ্যটি কল্পনায় দেখিলে তাহার মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য কতকটা অনুমান করা চলে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে যখন ভাল রাস্তা ছিল না, তখন জলপথেই সমস্ত কার্য্য চলিত। সমগ্র জলপথের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার ১ শত

আর্কটিক-তীরবর্ত্তী স্থানে ফিনিসীয়গণ

মাইল। ইহা ব্যতীত কৃত্রিম খাল, নদী ও হ্রদের মধ্য দিয়া খনন করা হইয়াছিল। ওয়ুলু নদীতে প্রপাত আছে। নদীর দক্ষিণে যে প্রপাত আছে, তাহার নাম ইমাট্রা প্রপাত। আধুনিক বিজ্ঞানের কৌশলে এই প্রপাতের অর্দ্ধেক শক্তি শ্বেত কয়লায় পরিণত হইয়াছে। ফিন্ল্যাণ্ডে কয়লা নাই। সে অভাব ইহার দ্বারা অনেকাংশে পূর্ণ করা হয়।

একস্থানে জলস্রোত ১ শত ৮৩ ফুট নিম্নে ভীষণ কল্লোল-সহকারে পতিত হইতেছে দেখা যাইবে। উহা হইতে ৭৫ হাজার অশ্বশক্তি উৎপাদিত হয়। এই প্রপাতসঙ্কুল নদীপথে আবহমান কাল হইতে ফিন্ল্যাণ্ডবাসীরা নৌকাযোগে নিরাপদে জলপথ অতিক্রম করিয়া থাকে।

ফিন্ল্যাণ্ড পূর্ব্বে কৃষিজাত-পণ্যপূর্ণ দেশ ছিল। কিন্তু বিশ বৎসরের মধ্যে উহা শ্রমশিল্পজাতপণ্য উৎপাদন করিয়া ধনার্জ্জন করিতেছে, সমবায় প্রথায় বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কের সংখ্যা সহস্রাধিক।
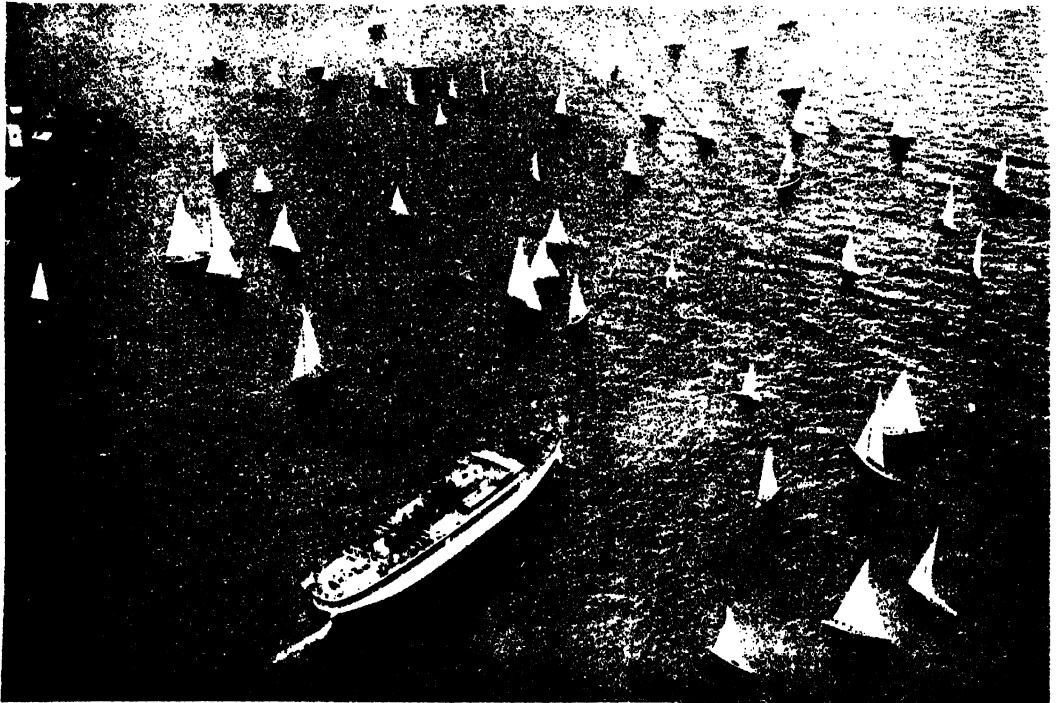
প্রদোষে সমুদ্রবক্ষে পালতোলা জলযান

পাইজানি হ্রদের বিচিত্র দৃশ্য

ফিন্‌ল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিবার পর, পুরুষ ও নারী সকলের পক্ষেই কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং নারী গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া, প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছিল। রাজপথে যে সকল গাড়ী যাত্রী বহন করিয়া থাকে, তাহাদিগের পরিচালন-কার্য্যে নারী কণ্ডাক্টর দেখিতে পাওয়া যাইবে। যে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতেছে, নারীর স্থান তাহাতে পুরোভাগে আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রাজনীতিক ব্যাপারে ফিন্‌ল্যাণ্ডে নারী অগ্রগামিনী। বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহারা ভোটদানের অধিকারিণী হইয়াছেন। কিন্তু পার্লামেণ্টে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে নারীরা সাম্প্রদায়িক এবং সমবায়-কার্য্যে অধিকতর সংখ্যায় যোগদান করিতেছেন।

নারীরা খাদ্য সমস্যা সমাধানকল্পে পুষ্টিকর খাদ্য, গৃহস্থালীর ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্যে সমধিক মনঃসংযোগ
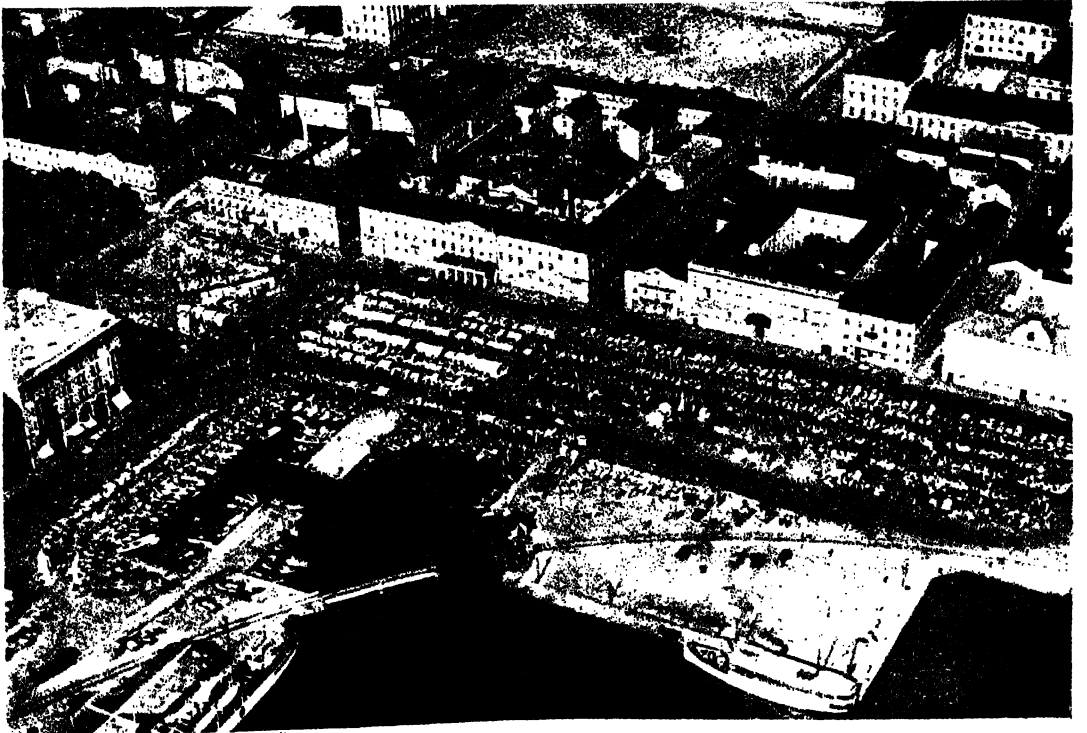
বন্দর-সম্মুখবর্ত্তী বাজারের দৃশ্য

করিতেছেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মার্থা-সঙ্ঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সদস্যা-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নারীদিগকে এই প্রতিষ্ঠানে উদ্যান রচনা এবং গৃহস্থালী কার্য্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। উত্তরমেরুর সন্নিহিত স্থান বলিয়া এই অঞ্চলে উদ্যান রচনায় বহু বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। বসন্তকাল বিলম্বিত সময়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং তুষারপাত বশতঃ বৃক্ষলতাদির অনিষ্ট ঘটে। কি উপায়ে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে নারীরা শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

কিছুকাল হইতে মার্থা-সঙ্ঘ কুটীরশিল্পের দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করিয়াছেন। গৃহে পুতুল ও অন্যান্য ক্রীড়নক কি ভাবে তৈয়ার করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে নারী-শিল্পীদিগকে শিক্ষাদান করা হইতেছে।

"লট্টা সাউ সোসাইটী" নামে ফিন্‌ল্যাণ্ডে আর একটি নারী-প্রতিষ্ঠান আছে। নগররক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণের সহযোগ আছে। নারীরা সাধারণ ধূসরবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া প্রথম সাহায্য-দানের যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইহারা কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রাখেন না। শুধু প্রাথমিক সাহায্য-দানের কার্য্যেই ব্রতী আছেন। নগররক্ষী স্বেচ্ছাসেবকরা সেনাদলের সহিত সংশ্লিষ্ট। ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুবকগণ অল্পকালের জন্য সেনাদলে যোগ দিয়া সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ফিন্‌ল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিবার পর হইতেই স্বেচ্ছাসেবকরূপে কায করিবার ব্যবস্থা যুবকদলের মধ্যে ক্রমাগত চলিয়াছে

১১৫৪ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের সেনাবাহিনী ফিন্‌ল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করিয়া থাকে। অউর

ফিন্‌ল্যাণ্ডের নূতন পার্লামেণ্ট-ভবন
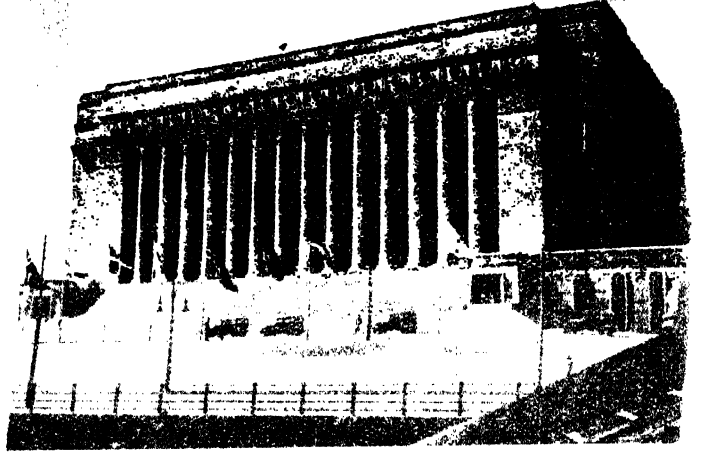
ল্যাপল্যাণ্ডের ডাকবাহী গাড়ী

নদীর জল উভয় পক্ষের রক্তপাতে লোহিতাভা ধারণ করিয়াছিল। সুইডিসরা পশ্চিমাংশের প্রতিবেশীদিগকে দীক্ষা দিয়াছিল। এই সময় ওয়েনামোনিনেন নামক এক জন সুরশিল্পী পাঁচটি তন্ত্রিবিশিষ্ট যন্ত্রে মধুরতর সুরসৃষ্টি

করিতেন। গানের জন্য তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি সকলকে এই কথাই বলিতেন যে, পৃথিবীকে শাসন করিবার জন্য বাহুবলের প্রয়োজন নাই। সঙ্গীতই মানুষকে বশীভূত করিয়া থাকে। তাঁহার সঙ্গীতের

টুর্কু ধর্ম্ম-মন্দির—ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রথম ধর্ম্ম-মন্দির

বিচিত্র শক্তি ছিল। ফিন্‌ল্যাণ্ডের জীবনধারাকে জানিতে হইলে এই ঘটনার বিষয় জানিয়া রাখা দরকার।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ফিন্‌ল্যাণ্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবাহধারা বহিয়া গিয়াছিল। টুর্কু বলিয়া যে নগর বর্ত্তমানে আছে, উহা ফিন্‌ল্যাণ্ডের তৃতীয় বৃহৎ নগর। এই-খানে অপ্‌শালার ইংরেজ বিশপ হেন্‌রী সুইডেনের সেনাবাহিনীর সহিত আগমন করিয়াছিলেন, বিশপ ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এইখানে সহিদ হয়েন। তাঁহার সমাধি দর্শন উপলক্ষে বহু যাত্রী এখানে সমবেত হইত। তদুপলক্ষে একটা মেলাও এখানে বসিত। টুর্কু ধর্ম্মমন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়।

ইতোমধ্যে পূর্ব্ব অঞ্চলে রুশিয়া হইতে গ্রীক্ ধর্ম্মমতের গোঁড়া প্রচারক-গণ আগমন করিতে থাকেন। লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ১১৬৪ খৃষ্টাব্দে লাডোগায় প্রথম রক্তপাত ঘটে। অর্থাৎ রুশিয়া ও সুইডেনের মধ্যে ইহাই প্রথম সংঘর্ষ। প্রাচ্য ধর্ম্মের সহিত প্রতীচ্য ধর্ম্মমতের ইহাই প্রথম যুদ্ধ। বর্ত্তমানে যাহাকে এষ্টোনিয়া সাধারণতন্ত্র বলা হয়, সেই অঞ্চল হইতে দলে দলে জলদস্যুগণ সুইডেনে প্রবেশ করিয়া সিনটুনা ধ্বংস করিয়া ফেলে। উহা সুইডেনের প্রথম যুগের রাজধানী ছিল। ফিন্‌ল্যাণ্ডেই বেশীর ভাগ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। দুই প্রবল প্রতিবেশীর মধ্যে ফিন্‌ল্যাণ্ড "বফার ষ্টেট" ছিল বলিয়াই এইখানে বহুবার সমরাভিনয় হইয়া গিয়াছে।

অধুনা ফিন্‌ল্যাণ্ডে ভ্যালামো এক বিচিত্র প্রতিষ্ঠান। ইহার ঐতিহ্য পূর্ণ-মাত্রায় রুশীয়। লাডোগা হ্রদের উত্তরাংশে দ্বীপপুঞ্জের উপর গ্রীক ক্যাথলিক ধর্ম্মের একটি মঠ আছে। এই মঠটি অতি পবিত্র স্মৃতিকথায় পূর্ণ। মঠের সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও কেশ কর্ত্তন করেন না। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাজি পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত অবস্থায় থাকে। সন্ন্যাসীরা সদানন্দ ও হাস্যপ্রফুল্ল হইলেও, তাঁহাদিগের আবেষ্টনে যেন একটা থম্‌থমে ভাব বিদ্যমান।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে কতিপয় গোঁড়া গ্রীক্ ধর্ম্মাবলম্বী থাকিলেও, নূতনের আমদানী এখানে নাই। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীরা নূতন

সন্ন্যাসী গ্রহণের ঘোর বিরোধী। সুতরাং ভ্যালামো প্রতিষ্ঠান ক্রমেই মরণোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

ভ্যালোমো দর্শনে জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এখানে আগমন করেন। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের এক প্রস্তর-মূর্ত্তি হেলসিংকির প্রামোদোদ্যানে স্থাপিত আছে। বর্ত্তমান যুগেও তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে জনসাধারণ পুষ্পমাল্য দ্বারা তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তিকে সুশোভিত করিয়া থাকে।

জোয়েনসু বাজারের দৃশ্য

নৃত্যের পূর্ব্বে—ফিন্‌ল্যাণ্ডের তরুণ-তরুণী

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় নিকোলাস যখন রুশিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন নব-নিযুক্ত গবর্ণর জেনারল নিকোলাজ আইভানোভিচ বোব্রিকফ সেনেটে ফিন্‌দিগকে রাজভক্ত থাকিবার জন্য এক বক্তৃতা করেন। সেইদিন ঝটিকার সূত্রপাত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ফিন্‌ল্যাণ্ডের দেশপরিচালন করিবার অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার এক ঘোষণালিপি ফিন্‌ল্যাণ্ডে আইসে। তখন সমগ্র ফিন্‌বাসী তাহার বিরুদ্ধে নিরস্ত্র প্রতিরোধ করিবার জন্য একতাবদ্ধ হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঘটনায় দেশবাসীর মন বিরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পথ প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের ষণ্ড

রেল-ষ্টেশনের ধারে ফিন্‌ল্যাণ্ডের খাদ্যবিক্রেত্রী
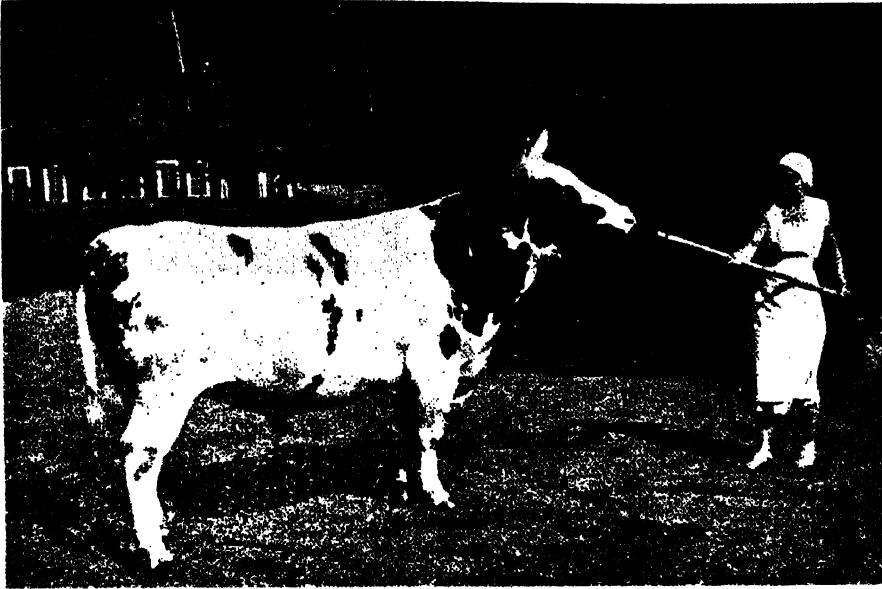
প্রতি পাদ্য বিষয় ছিল। তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতার প্রভাবে সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের বহু বীর জগতে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মন্ত্র ছিল—"ভার্টল্যাণ্ড" (আমাদের জন্মভূমি)। তাহাতে দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্টের উজ্জ্বল বর্ণনা সত্ত্বেও দেশ-প্রেমের বিচিত্র অভিব্যক্তি আছে।

ইলিয়াস্ লোন্‌রট কার্জ্জালার পূর্ব্বাঞ্চলে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া নানাবিধ রূপকথা, লোকসাহিত্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে জাতীঁয়তাদ্যোতক মহাকাব্য "কালেভালা" রচিত হয়।

যথাসময়ে আক্‌সেলি খ্যালেস্‌ক্যাল্‌লেনা এই মহাকাব্য হইতে উপাদান লইয়া চমৎকার চিত্রসমূহ অঙ্কিত করিয়াছিলেন। জিয়ান্ সাইবেলিয়স্ ২৬ বৎসর বয়সে উল্লিখিত উপকথা হইতে "কুলুলারভো" নামক নাট্যকাব্য রচনা করেন।

সুইডেন রুশিয়ার ব্যবহারের প্রতিরোধে অকৃতকার্য্য হওয়ার ফলে কবি জোহান লুডভিন্ রুন্‌বার্গ সুইডিশ ভাষায় তেজোদ্দীপ্ত কবিতা রচনা করেন। যুদ্ধই তাঁহার রচনার

তুষারশিলাভঙ্গকারী পোত চলিয়াছে

পাইজিস্ হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান ফিন্‌ল্যাণ্ডের তরুণী

হেলসিংকি সহরের দৃশ্য

ফিন্‌ল্যাণ্ডের কৃষকভবনে প্রদোষের দৃশ্য

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সেই নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয় দর্শনে দেশের লোক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ই তারিখে গভর্ণর জেনারেল বোব্রিকফ সেন্ট-পিটার্সবার্গ (বর্ত্তমান লেনিনগ্রাড) হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, ফিন্ল্যাণ্ডের নাটক, কাব্য, চিত্র প্রভৃতি যে ভাবে রচিত হইতেছে, তাহাতে ফিন্ল্যাণ্ড তাহার স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

এই সংবাদে দেশের মধ্যে শঙ্কা ও উদ্বেগের ভীষণ ছায়াপাত হয়। এক বৃহৎ জনসভায় রাজধানীর অধিবাসিগণ সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, জারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। বহু সহস্র লোক সেই আবেদনে স্বাক্ষর

আইসক্রিম বিক্রীত হইতেছে

সলিলবক্ষে ভাসমান ফুলের তরণী
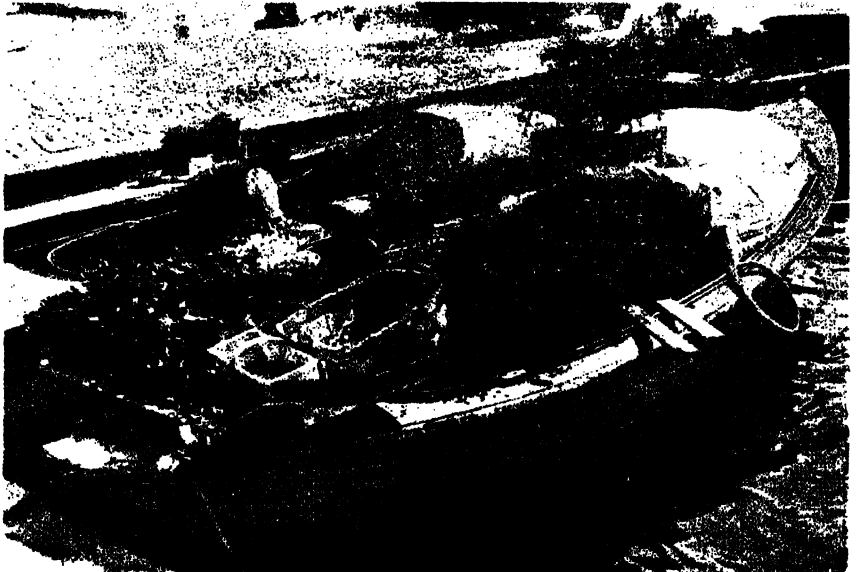
ফিন্‌ল্যাণ্ডের গৃহপালিত পশুর দল
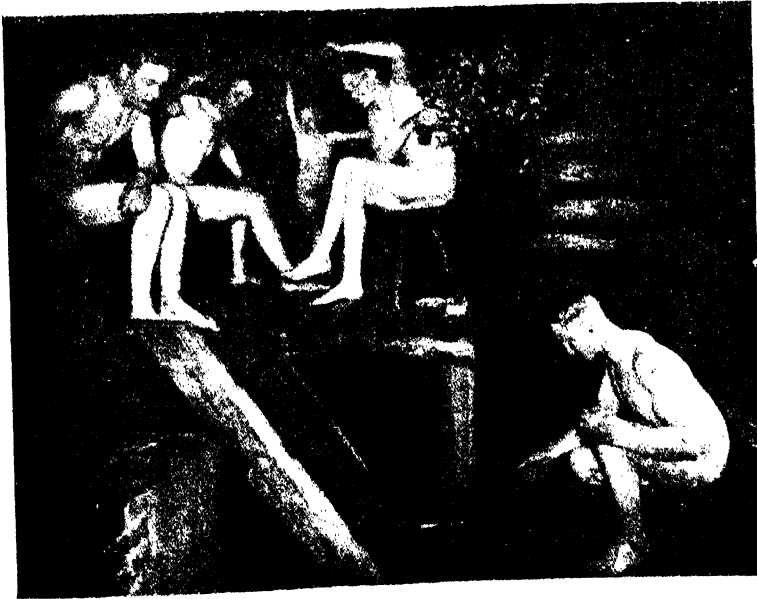
বাষ্পস্নানরত তরুণের দল

নহে। কারণ, গোয়েন্দারা তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারে। ছাপাখানার সাহায্যেও আবেদন ছাপিয়া লওয়া দুর্ঘট।

লোক পাঠাইয়া ফিন্‌ল্যাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ফিন্‌ল্যাণ্ডের এই গুরু প্রয়োজনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল। ফেব্রুয়ারী মাসে চারিদিক্ তুষারাচ্ছন্ন। স্কী যোগে সংবাদ-বাহক দ্রুতগতিতে দূরদূরান্তরে ধাবিত হইল। পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা সংবাদ পাইয়া আরও দূরবর্ত্তী গ্রামে সংবাদ পাঠাইতে লাগিল। প্রত্যেকেই একান্ত আগ্রহভরে সংবাদ প্রেরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। এইরূপে আর্কটিক অঞ্চলেও সকল সংবাদ প্রেরিত হইল।

হেলসিংকি দ্বীপপুঞ্জেই সহস্র যুবক ছাত্র—সকলেই স্কেটএ সুদক্ষ এবং ব্যায়ামবিদ্—কার্য্যভার গ্রহণ করিল। এক সপ্তাহের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী অরণ্য-সমাকুল স্থান ভেদ করিয়া, ২৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৫ লক্ষ ২৩ হাজার নর-নারী এই আন্দোলনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিল। এমন নিঃশব্দে

করিয়া ৫ শত প্রতিনিধি মারফৎ উহা রুশ-সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইবার প্রস্তাব হয়।

ব্যাপারটি সাধারণ নহে। আবেদন রচনা করিবার পর উহা লোক-মারফৎ স্বাক্ষর করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। তারযোগে বা ডাকঘরের মারফতে তাহা হইবার

এই কার্য্য সম্পাদিত হইল যে, শাসক বোব্রিকফ ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

এমন কি, ৫ শত জন সম্বলিত প্রতিনিধিদলকে সেণ্ট-পিটার্সবার্গে প্রেরণের কার্য্যসূচীও রূপ গ্রহণ করিল। রেলযোগে প্রতিনিধিদল ষ্টেশন ত্যাগ করিবার পর গভর্ণর

এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জারকে তার-যোগে সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

রুশসম্রাট প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলেন। অবশ্য রুশ-সম্রাটের সহিত সাক্ষাতে ব্যর্থকাম হইলেও এই প্রতিনিধিদল য়ুরোপের দ্বাদশটি দেশের কতিপয় শীর্ষ-স্থানীয় লোকের শুভেচ্ছা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

শৃঙ্গধারী হরিণবাহিত শকট

জুন মাসের মধ্যে এই সকল দেশের লোকের এক তালিকা প্রস্তুত হইল। ১ হাজার ৫০ জন নেতৃস্থানীয় লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি সর্ব্বজনপূজ্য প্রসিদ্ধ লোকও ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্য হইতে ৮ জন লোককে নির্ব্বাচিত করা হইল। তন্মধ্যে ৬ জন ফিন্‌ল্যাণ্ডের পক্ষে ওকালতী করিবার জন্য সেন্টপিটার্সবার্গে গমন করিলেন। জার তাঁহাদিগের সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এক ঐক্যতান-বাদ্যের আসরে জিয়ান্ সাইবেলিয়াসের একটা গান গীত হয়। উহাতে প্রচণ্ড উৎসাহের বন্যা বহিয়া যায়। অনেকেই সেই গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, দেশপ্রেমের অকৃত্রিম প্রবাহধারা সেই সঙ্গীতে অনুস্যূত আছে।

নারীরা কাঠের বোঝা নদীবক্ষে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে

এই সঙ্গীতের প্রভাব ক্রমশঃ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফিন্‌ল্যাণ্ড দণ্ডায়মান হইতে

দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ, এ সংবাদও আর গোপন রহিল না। ক্রমশঃ ঘটনার দ্রুত পরিণতি ঘটিতে লাগিল। একটি দল গঠিত হইল, তাহার নাম "অ্যাক্‌টিভিষ্ট পার্টি।" তাহারা রুশিয়ার বিপ্লবপন্থীদিগের সহিত একযোগে কায করিতে লাগিল। সহসা এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের এক সূর্য্যালোকিত দিনে ইউজেন স্কাউম্যান্ নামক এক যুবক হেলসিংকির সেনেট-গৃহের পথে গবর্ণর বোব্রিকফের দেখা পাইল। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গুলী করিয়া নিজেও গুলীর আঘাতে আত্মহত্যা করিল।

কফি-পানরত তরুণী ও সৈনিক পুরুষ

স্কাউম্যানের সমাধি এখন বর্গায় (পারভু) অবস্থিত। দেশের লোক তাহাকে দেশসেবকের সম্মান প্রদান করিয়া থাকে। রাজধানীর কাছেই এই সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জারকে দেশের লোক জানাইল যে, সমগ্র ফিন্‌ল্যাণ্ড ধর্ম্মঘট করিবে। সে ধর্ম্মঘট সপ্তাহব্যাপী হইবে। ঘটিলও তাহাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশবিদ্রোহে জার-সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হইয়া গেল। তারপর বিশ্বযুদ্ধের চিতাভস্ম হইতে স্বাধীন ফিন্‌ল্যাণ্ডের উদ্ভব হইল।

কিন্তু স্বাধীনতার সুফল ভোগ করিবার পূর্ব্বে শ্বেত ও রক্তদলের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া গেল। এক দলের জন্য জার্ম্মাণী হইতে সেনাবাহিনী আসিল। অন্য দলকে সাহায্য করিবার জন্য রুশিয়া সেনাদল প্রেরণ করিল। গৃহবিবাদ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। ক্রমে শ্বেতদল রক্তদলের উপর আধিপত্যবিস্তার করিল।

ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভাস্কর্য্য শিল্প জীবন্ত বলিয়া অনুভূত হইবে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের সাহিত্য বাস্তবপন্থী হইতে আদর্শপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে। আলেকসিস্ কিভির "সাত ভাই" গ্রন্থে যে বাস্তববাদ দেখিতে পাওয়া যায়, জারল্ হেমার বা এফ, ই,

হেলসিংকিং ট্রলির ভাড়া আদায়কারিণী নারী-কর্ম্মচারিণী

সিলান পার রচনায় তাহা নাই। এই সকল উপন্যাসে অধ্যাত্মবাদের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সিলান পা যে সকল ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহাতে জাতির মনোভাবের প্রচুর পরিচয় বিদ্যমান। জনসাধারণ তাঁহার রচনার অত্যন্ত অনুরাগী। সাহিত্যে নোবল পুরস্কারলাভের ভাবী উপাদান যেন তাঁহার সাহিত্যে বিদ্যমান। তাঁহার রচিত উপন্যাসের সৃষ্ট চরিত্রগুলি এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা মানুষের

মনকে প্রভাবিত করিয়া এক বিচিত্র রূপলোক প্রস্তুত করিয়া দেয়। ভাষায় তাহার অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ। তরুণী লেখিকা স্যালী সালমাইনেন্ তাঁহার রচিত "ক্যাট্রিনা" নামক একখানি উপন্যাসে আভেনান্মা (আলাণ্ড) দ্বীপকে আধুনিক সাহিত্যে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান প্রদান করিয়াছেন।

সঙ্গীতেও ফিন্ল্যাণ্ডের কবি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। কবি সিবেলিয়স্ রচিত সঙ্গীতগুলি সর্ব্বজন-প্রীতিপ্রদ। দিন দিন তাঁহার রচনার স্পষ্টতা লোক-সমাজকে আকৃষ্ট করিতেছে। তাঁহার রচনার মৌলিকতা

ফিন্ল্যাণ্ডের সুন্দরী কুমারী

ক্রমেই বাড়িতেছে। আমেরিকার গায়ক সমাজে তাঁহার সমাদর সর্ব্বাধিক।

স্থপতি-শিল্প ও চিত্র-শিল্পে প্রথমতঃ ফরাসী প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইদানীং তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অ্যালবার্ট এডেলফেল্ট স্বদেশের পল্লীচিত্রগুলিতে সাধারণ কৃষক-জীবনের দৃশ্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।

ফিন্ল্যাণ্ড ব্যায়াম ও দৌড়ে বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াছে। দৌড়-প্রতিযোগিতায় মানুষের গতিভঙ্গী কিরূপ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য ফিন্ল্যাণ্ডের ভাস্কর ব্রোঞ্জমূর্ত্তি গড়িয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ফিন্ল্যাণ্ড নানাবিধ ব্যায়ামে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। আগামী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ফিন্ল্যাণ্ডে ব্যায়াম প্রদর্শনী হইবে। তথায় পৃথিবীর ব্যায়াম-বীরগণ সমবেত হইবেন। প্রথমে জাপানে উহা হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু জাপানীরা ফিন্ল্যাণ্ডের উপর সে ভার অর্পণ করিয়া দায়িত্ব এড়াইয়াছে।

হেল্সিংকিতে যে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে

শূকরছানা বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনীত হইয়াছে

৫০ হাজার দর্শকের বসিবার স্থান আছে। ফিন্ল্যাণ্ডে দৌড়-প্রতিযোগিতায় নুর্মি, হানেস্ কোলেমেনেন, এল্বিন্ ষ্টেন্রুস্, ভিলে রিটোলা, ভলমারি ইসো হোলো এবং গনার হোকার্ট প্রভৃতি বড় বড় খেলোয়াড় যোগ দিবেন। ম্যাটি জারভিনেন্ বর্শা-নিক্ষেপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এতদ্ব্যতীত বহু ব্যায়ামবিদ্ ফিন্ল্যাণ্ডে বিদ্যমান।

ফিন্ল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ড। উহা ফিন্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত। তথায় ২ হাজার ল্যাপ আছে। ফিন্ল্যাণ্ডের ল্যাপরা যাযাবর নহে। তাহাদের সকলেই কাঠের গুহার

সুইডেনের আমলের দুর্গ

আধুনিক ফিন্‌ল্যাণ্ড পশ্চিমমুখী। উত্তরের পাঁচটি দেশ—ফিন্‌ল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং আইস্‌ল্যাণ্ড—সীমান্ত প্রদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং আচার-ব্যবহারের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আইন-কানুনের সংস্কার সাধন করিতেছে। আদর্শবাদ শিক্ষা দীক্ষারও পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তাহারা একীভূত হইতে চাহিতেছে। তবে জাতীয় পার্থক্য বিসর্জ্জন করিবার দিকে তাহাদিগের লোভ নাই।

মধ্যে বাস করে। তাহাদিগের সম্পদ্ বলিতে হরিণই সর্ব্বস্ব। কেহ কেহ পশু ও মৎস্য শিকার করিয়া জীবনধারণ করে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

নিঃশঙ্ক

ধীরে নামে অন্ধকার জীবনের যবনিকা পরে,
হলো বেলা অবসান। এইবার যেতে হবে ফিরে
অজানা রহস্যময় অন্ধকার পথরেখা ধরে
নাহি জানি কোন্ দেশে! সেথায় বুঝি রে

নাই সুশ্যামল ছায়া, সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি শুধু
মধ্যাহ্নের রৌদ্রকরে তপ্তদাহে জ্বলিতেছে ধূ ধূ
কঠিন সে পথখানি! শঙ্কাতুর তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়
পাবে না চলার পথে এতটুকু রসের সঞ্চয়।
কিম্বা আশা জাগে—
হয়তো সে পথশেষে মন মোর কুড়াইয়া পাবে
আজন্মের স্বপ্নখানি! আমার সে অসীম সুন্দর
কল্পনা অতীত যার সকরুণ প্রেমের নির্ঝর

দুর্দ্দিনের অন্ধকারে বেদনার কঠিন আঘাতে
পরশন রেখে যায়, চুপি চুপি নিদ্রাহীন রাতে
ভোরের প্রথম আলো, বসন্তের পুষ্পের সুবাস
নিভৃত হৃদয়পুরে রেখে যায় যাহার আভাস!
যাত্রা করো যাত্রা করো তবে—হোক্ মন নিঃশঙ্ক নির্ভয়
রাখিয়ো না কোন দ্বিধা আর, অন্ধকার হোক্ যদি হয়।
সঙ্গী কেহ নাহি রবে সাথে, তোর লাগি আসিবে না রথ
সগৌরবে পথের বেদনা মানি লয়ে ক'রে লও পথ।

ছিন্ন করো, ছিন্ন করো তবে, উৎসবের কুসুমমালিকা
যাত্রা করো অজানার লাগি, অকুণ্ঠিত! সর্ব্বহারা একা।

শ্রীনলিনী সেন।

শাস্ত্রচর্চ্চার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি

কলিকাতার সে কালের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্স যে দিন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, সেই দিনটি, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষার পক্ষে এই যুগের সর্ব্বাপেক্ষা শুভদিন ছিল। সার উইলিয়াম কালিদাসের শকুন্তলা নাটক পড়িয়া তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিলে, য়ুরোপের তদানীন্তন বিদ্বৎসমাজে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে য়ুরোপের বিদ্বৎসমাজ সংস্কৃত ভাষাকে পুরোহিত-গণের লোকবঞ্চনার যন্ত্রস্বরূপ কতকগুলি মন্ত্রতন্ত্রের সমষ্টি বলিয়া মনে করিতেন; সংস্কৃত ভাষার মধ্যে পড়িবার যোগ্য কোন বিষয় আছে, ইহা তাঁহাদের ধারণার মধ্যেই ছিল না। কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান নাটকের অনুবাদ (মূল নাটক নহে) পড়িয়া পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয়গণের অলৌকিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে, দিকে দিকে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি জানিবার জন্য উদ্যমের সাড়া পড়িয়া গেল। তখন জার্ম্মাণীতে, ফ্রান্সে, ব্রিটেনে সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ ও অধ্যয়নের জন্য বুদ্ধিমান্ বিদ্বন্মণ্ডলীর ঔৎসুক্যের সীমা রহিল না। এই ভাবে য়ুরোপে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রসার আরম্ভ হয়। আমরা অধ্যাপক গোল্ড্‌ষ্টুকারের সম্পাদিত এবং লণ্ডনের সংস্কৃত টেক্সট্ সোসাইটী কর্ত্তৃক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা হইতে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারি।

তাহার পরে, পাশ্চাত্ত্য দেশের সংস্কৃত চর্চ্চা বহুলভাবে বিস্তার লাভ করিয়া এখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের এই সংস্কৃত-চর্চ্চার মূল বাঙ্গালী। সার উইলিয়াম জোন্স্ বাঙ্গালাদেশের পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া,—শকুন্তলা পড়িয়া,—তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই অনুবাদকে উপলক্ষ করিয়াই য়ুরোপে সংস্কৃত-চর্চ্চার আরম্ভ হইয়াছিল।

যদিও য়ুরোপের সংস্কৃত-চর্চ্চার সূত্রপাত আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহায়তায় আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি পাশ্চাত্ত্যগণের সংস্কৃত-চর্চ্চার পদ্ধতি এবং আমাদের দেশের প্রাচীন পরম্পরাগত সংস্কৃত-চর্চ্চার পদ্ধতি একরূপ নয়। পাশ্চাত্ত্যরা প্রায়ই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়া থাকেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়ের প্রতি আত্যন্ত লক্ষ্য রাখিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান পূর্ব্বাপর বিরোধের সমাধান করিয়া সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সন্ধান করা,—এবং গ্রন্থের অন্তর্গত প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করা,—ইহাই আমাদের দেশের প্রাচীন অধ্যয়নপদ্ধতির স্বরূপ। য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে এইরূপ সামঞ্জস্য এবং এইরূপ সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের আদর নাই; আমাদের প্রাচীন পদ্ধতির এইটিই প্রাণ।

আজকাল আমাদের দেশের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি, পাশ্চাত্ত্যরীতিতে সংস্কৃতের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ইঁহারা পাশ্চাত্ত্যগণের পদ্ধতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং এ দেশীয় প্রাচীন তন্ত্রের পণ্ডিতরা সংস্কৃতচর্চ্চার পাশ্চাত্ত্যরীতিতে অনভিজ্ঞ বলিয়া ইঁহাদের মধ্যে অনেকে অনেক সময়ে পণ্ডিতগণের প্রতি উপহাসও করিয়া থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যরীতি ও দেশীয় প্রাচীন-রীতির গতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী,—এ কথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না।

যাঁহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শাস্ত্র-চর্চ্চা করেন, তাঁহারা সাধারণভাবে প্রত্যেক গ্রন্থের অধ্যয়নের সময়ে এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন যে, সেই গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপাদান কিছু আছে কি না। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য মূল বিষয় যদি দার্শনিক হয়, তাহা হইলেও ইঁহারা, ঐতিহাসিক বিষয় লইয়াই বেশীর ভাগ বিচার করিয়া থাকেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিতে যাইয়া, অনেক সময় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্য করা হয়। মূল বিষয়টি একটু মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারিলেই, ইঁহারা মনে করেন, সেই গ্রন্থের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে এক একখানি বৃহদাকার গ্রন্থের অধ্যয়ন, কয়েক ঘণ্টার বা কয়েক দিনের

মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয় এবং অধ্যয়নকারী সেই বিষয়ে বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ বা গ্রন্থ লিখিয়া সমগ্র জগতে যশস্বী হন।

প্রাচীন পণ্ডিতদের পঠন-পাঠন রীতিতে গ্রন্থের অন্তর্গত প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক পদ, এমন কি, প্রত্যেকটি চ, বা তু হি র অর্থ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিবার নিয়ম থাকায় প্রাচীন পদ্ধতির অনুযায়ী পণ্ডিতগণের এক একখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনেক সময় লাগিয়া যায়। পূর্ব্ব সময়ের পণ্ডিতগণের অনেকের সম্বন্ধে এমনও শোনা যায় যে, এক এক জন পণ্ডিত এক একখানি গ্রন্থ লইয়াই তপশ্চর্য্যার মত সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন পদ্ধতির পণ্ডিতের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অল্পসংখ্যক যাহারা অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারা অনেকেই পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞ হওয়ায় অনাদৃতভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন এবং নিজেদের লাঞ্ছনার কথা মনে করিয়া বংশধরগণকে অন্য পথে পরিচালিত করিতেছেন। ফলে শাস্ত্রচর্চ্চার প্রাচীন পদ্ধতি ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে।

এ সম্বন্ধে একটি ভাবিবার কথা আছে। আমাদের দেশের যে সকল আধুনিক সুধী পাশ্চাত্ত্য রীতিতে শাস্ত্র লইয়া গবেষণাত্মক কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের কৃতিত্ব এই বিষয়ে এখনও পাশ্চাত্ত্যগণের কৃতিত্বকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, এমন কি, অনেক বিষয়েই পাশ্চাত্ত্যগণের কৃতিত্ব হইতে এখনও অনেক দূরে আছে। এখনও আমাদের দেশের নব্যশিক্ষিতগণ পাশ্চাত্ত্যরীতির অনুযায়ী শাস্ত্রচর্চ্চার পদ্ধতি শিক্ষা করিতে বিদেশে যাইয়া থাকেন এবং বিদেশের প্রশংসাপত্র দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিয়া এখানকার সমাজে আদর লাভ করিতে হয়। এই ভারতভূমি সংস্কৃত-সরস্বতীর লীলানিকেতন হইলেও, আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্যদেশের কেহ এখানকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত-শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোনরূপ গবেষণাত্মক কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, এরূপ শোনা যায় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, আমরা গবেষণাত্মক কার্য্যে পাশ্চাত্ত্যপণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছি, ইহা আমরাও বিশ্বাস করি না অথবা পাশ্চাত্ত্যরাও এরূপ মনে করেন না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যগণ অপেক্ষা আমাদের অসম্পূর্ণতা আছে, ইহাতে কোন বিবাদ নাই।

ধরিতে গেলে, পৃথিবীতে আমাদের মত কাঙ্গাল কোন জাতিই নয়। আমাদের রাজ্য বহু শতাব্দী হইতে পরের পদানত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত বিপুল ধনরাশি বিদেশী বণিক্‌রা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। যে সকল প্রাসাদ, বহু ধন ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে পূর্ব্বপুরুষরা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বিজেতা জাতির পদাঘাতে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপে আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের সমস্ত বাহ্যসম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহাদের ভাব-সম্পত্তিরও বহু অংশ কালের আঘাতে এবং বিদেশীর আক্রমণে* বিলুপ্ত হইয়াছে; এমন অনেক গ্রন্থের নাম আছে, কিন্তু সে গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। পূর্ব্বপুরুষের ভাব-সম্পত্তির স্বল্প অংশ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও নাশের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

আজ-কাল এ দেশে ও বিদেশে অনেক প্রাচীন দুর্লভ সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। অপ্রাপ্য গ্রন্থের প্রাপ্তির ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইতেছি বটে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের প্রাচীন পদ্ধতির অধ্যাপনার যোগ্যতা যে সকল পণ্ডিতের ছিল, সেই সকল পণ্ডিত ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের স্থানে আর নূতন লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এ দেশের প্রাচীন সংস্কৃত-চর্চ্চার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে আধুনিক কালের লোকের ধারণা লুপ্ত হইতেছে। এই অবস্থায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বহু কষ্টে অর্জ্জিত ও রক্ষিত এই ভাব-সম্পদের শেষ দশা কি হইবে, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবের শেষ নিদর্শন পুস্তকেই পর্য্যবসিত হইবে অথবা তাহার যথাযথ উপদেষ্টা কেহ থাকিবে, এ কথা এখন নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নাই।

সংস্কৃত-বিদ্যার এই ভাবী বিপত্তির কথা আমাদের বাঙ্গালা দেশের এক জন মনস্বী বহুপূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; ইনি আর কেহ নহেন,—স্বনামখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাই ইনি জীবনের সন্ধ্যার সময় নিজের উপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব সংস্কৃত বিদ্যার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। আর এক জন লোকের দৃষ্টি এই বিষয়ে পড়িয়াছিল; তিনি বিধর্ম্মী

এবং বিদেশীর সন্তান হইলেও, এই ভারতভূমিতেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন—ইহার নাম ডাক্তার আর্থার ভেনিস্, ইনিও মনে-প্রাণে সংস্কৃত বিদ্যার বিপত্তির কথা বুঝিয়াছিলেন। এই ডাক্তার ভেনিস্ দীর্ঘকাল কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাচীন সংস্কৃত-পণ্ডিতগণের সাহচর্য্যে সংস্কৃত বিদ্যার মহত্ব ও প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতগণের শাস্ত্রচর্চ্চার গভীরতা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, এই মহিমময়ী সংস্কৃতবিদ্যাকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহার একনিষ্ঠ সেবক প্রাচীন পদ্ধতির পণ্ডিতগণের রক্ষা করিতে হইবে। এই পণ্ডিতগণের রক্ষা ছাড়া ইহার রক্ষার দ্বিতীয় উপায় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক সংস্কৃত পণ্ডিত (scholar) গণের দ্বারা এই প্রাচীন বিদ্যার মর্য্যাদা রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার ভেনিসের এই অভিমত, আমরা তাঁহার প্রিয় ছাত্র এবং কাশী সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ এম্, এ মহাশয়ের নিকট জানিতে পারি।

পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে আমরা অনেক পাইয়াছি। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মহার্ঘ-রত্ন পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা আমাদের দিয়াছে। আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নিকট হইতে এই সকল অমূল্য উপহার পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। আমরা এ কথা ভুলিয়া গিয়াছি যে, এগুলি আমাদের হইলেও এগুলি পাশ্চাত্ত্যের দান,—আমরা বিদেশী শাসনের ফলে ইহাদের পাইয়াছি। এ কথা আমাদের স্মরণের বহির্ভূত হইয়াছে যে, পূর্ব্বপুরুষদের প্রদত্ত আমাদের নিজস্ব সম্পত্তিও কিছু আছে; আমরা কেবল সেই সম্পত্তিটুকুই আমাদের প্রাচীন গৌরবের একমাত্র নিদর্শনরূপে এই পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি। আমরা নিগ্রো ও কাফ্রি হইতে অধিক আদর পাইবার যোগ্য, তাহার নিদর্শন এই কয়খানি শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সহস্র সহস্র বৎসরের প্রাচীন হিন্দু জাতির জাতীয় জীবনের এবং সমাজতন্ত্রের মূল সঞ্জীবনীমন্ত্র যে শাস্ত্রের মধ্যে বিন্যস্ত আছে, যে শাস্ত্র বহু সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবধারাকে বহন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত আজ পর্য্যন্ত আমাদের যোগাযোগ ঠিক রাখিয়াছে, যাহার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীতে চিরপরাধীন আমরা আজও সভ্য জাতিরূপে পরিগণিত হইতেছি, দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে সেই শাস্ত্রের প্রতি আমাদের উদাসীনতা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বহুকালের পরাধীন জাতির আত্মগৌরবের প্রতি অনাস্থা স্বাভাবিক হইলেও, ইহা হইতে আমাদের অকল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইতেছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা শাস্ত্রচর্চ্চার পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারি নাই, অথচ আমাদের নিজস্ব পুরাতন পদ্ধতিকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। যদি আমরা আমাদের প্রাচীন পদ্ধতিকে রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিকে আয়ত্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেটি আমাদের কল্যাণপ্রদ হইত; কিন্তু আমরা নূতন তেমন কিছু আহরণ করিতে পারি নাই এবং পুরাতন নিজস্ব বস্তুটিকে হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের এই ভুলের শেষ কোথায়?

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

সুর

প্রতিদিন একি শুনি সুর
সুমধুর;
সুদূরের দিক্-সীমা হ'তে
নিবিড় গোপন মৌন পথে
আসে ছুটে ছুটে।
সেই সুরে ফুল ফুটে,
ফল ধরে,
পাতা ঝরে,
পাখী গায়, রবি অস্ত যায়;
আঁধার ঘনায়।

জগৎপ্রবাহমাঝে,
রহে না যে
সেই সুর নীরব নিস্তব্ধ কোনদিন;
সদা তার গতিখানি আছে বাধাহীন।
অবিরল ছুটে তার ধারা,
ধরণীর কোলাহলে সে যে কভু নহে তাল-হারা।
কুসুম-কোমল স্পর্শে উঠি ভাসি ভাসি,
তৃণ-পত্র-লতা-গুল্মে বাজাইয়া যায় সে যে বাঁশী;
জাগায় সে প্রাণের স্পন্দন
কেটে যায় জড়তা-বন্ধন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল (এম, এ)।

উলের হাই-নেক্ ব্লাউশ

শীতের দিনে উলের ব্লাউশ, পুল-ওভার, জাম্পার প্রভৃতির কথা দিয়ে সূচী-শিল্পের আলোচনা সুরু করি।

ছবির আদর্শে এ ব্লাউশটি তৈরী করবার জন্য চাই— সাত আউন্স নিটিং (Knitting) উল ; ইচ্ছামতো যে-কোনো রঙের উল নিতে পারেন।—একজোড়া ১০ নম্বরের বোনার কাঁটা এবং একজোড়া ১৩ নম্বরের কাঁটা চাই ; আর চাই বারোটি আধলা-সাইজের সেলুলয়েডের বোতাম।

যে-প্যাটার্ণ দেওয়া হলো, উপরে-লেখা কাঁটার সাহায্যে তৈরী করলে সে ব্লাউশ হবে কাঁধ থেকে কোমর অবধি অর্থাৎ ঝুল সাড়ে আঠারো ইঞ্চি ; ছাতি ৩৬ ইঞ্চি ; পুট-হাতা ৬ ইঞ্চি। এই মাপ-অনুযায়ী ব্লাউশটিকে ইচ্ছামতো ছোট বা বড় করতে পারেন।

সঙ্কেতোক্তি

সংক্ষেপোক্তি :—সোঃ=সোজা। উঃ=উল্টো। সাঃ উঃ= সামনে উল দিয়ে ঘর তোলা (অর্থাৎ এক ঘরের জায়গায় দু' ঘর তোলা। এটি তুলতে হলে একটি সোজা ঘর তোলবার সময় যেমন উল দেন, সামনে তেমনি উল দেবেন, কিন্তু আসল ঘর তোলবার সময় কাঁটার মুখ বেঁকিয়ে উল্টো ঘর তুলবেন ; তাহলেই একটা ঘর ফেললে দুটো ঘর উঠবে)। এঃ=একসঙ্গে (অর্থাৎ দুটো ঘর একসঙ্গে নিয়ে এক-ঘর তোলা ; এই উপায়েই ঘর কমানো যায়)। রিঃ=রিপিট (Repeat)। ঘঃ কঃ=ঘর কমানো। ঘঃ বাঃ=ঘর বাড়ানো।

এইবার আসল ব্লাউশের কাজ আরম্ভ। প্রথমে পিঠের দিক্ করতে হবে।

ব্লাউশের পিঠের দিক

১৩নং কাঁটায় ১৩০টা ঘর তুলুন। চার ইঞ্চি বুনে যান ১টা সোঃ, ১টা উঃ এই প্যাটার্ণে। কিন্তু চার ইঞ্চি বোনা হলে সব-শেষের লাইনের শেষে এক ঘর বাড়াবেন (কাঁটায় ১৩১ ঘর হলো)। এইবার ১০নং কাঁটায় নিম্নলিখিত প্যাটার্ণটি বুনুন।

১ম লাইন। ১টা সোঃ, * ১টা উঃ সাঃ, ২টো সোজা এঃ। এই প্যাটার্ণে পাঁচ বার বুনুন। তার পর ১০টা সোঃ। এইবার এই ৩০ ঘরে যে-প্যাটার্ণটি হলো, সেটি রিঃ করুন * থেকে গোড়ার ১টা সোঃ বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত ঘরগুলি নিয়ে।

২য় লাইন—শুধু উ। এখন এই ১ম ও ২য় লাইন নিয়ে যে প্যাটার্ণ হলো, এটি রিঃ করুন আরো দু'বার।

৭ম লাইন—সোঃ ১১ ঘর, * উঃ সাঃ, ২টো সোঃ এঃ। এই প্যাটার্ণ পাঁচ বার রিপিট করুন, তার পর সোঃ ১০ ঘর। এখন * থেকে এই প্যাটার্ণটি রিপিট করে যান লাইনের শেষ পর্য্যন্ত।

৮ম লাইন—উঃ। প্রথম দুই লাইনের মত এই ৭ম ও ৮ম লাইনও আরো দু'বার রিপিট করুন। অর্থাৎ আমাদের সবশুদ্ধ এখন ১২ লাইন বোনা হলো। চৌকো-চৌকো, জালি-জালি যে-ডিজাইন ব্লাউশে দেখা যাচ্ছে তার এক একটি চৌখুপী করতে এই ১২ লাইন লাগবে।

এর পর এই ১২ লাইনের প্যাটার্ণে পিঠের বাকীটুকু করতে হবে।

যখন দেখবেন সমস্ত বোনাটি লম্বায় ১২ ইঞ্চি হয়েছে, তখন আবার নিম্নলিখিত প্যাটার্ণে বুনুন—এর পরের চার লাইনে—প্রত্যেক লাইন আরম্ভ করবার আগে ১০টি ঘর

বন্ধ করবেন (ঘর ফেলবেন)। তার পর বাকী ঘরগুলো বুনে যান "১ম লাইন থেকে ১২শ লাইন"এর প্যাটার্ণে। ৫ম লাইন থেকে আর ঘর ফেলতে হবে না—কিন্তু একই নিয়মে প্যাটার্ণে বুনে যাবেন।

যখন দেখবেন বোনাটি সবশুদ্ধ ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়েছে, (আরম্ভ থেকে), তখন আবার নিম্নলিখিত নিয়মে বুনবেন—

প্রথম সাত লাইন বুনে যান যথানিয়মে ; তার পর প্রতি ৮ম লাইন আরম্ভ করবার মুখে ৭টি করে ঘর ফেলবেন। যখন ৩৫টি মাত্র ঘর থাকবে কাঁটায়, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলবেন।

* সমস্ত ব্লাউশটিই ঐ "১ম থেকে ১২শ লাইন" বুনে যে-প্যাটার্ণ হবে, সেই প্যাটার্ণে। করতে হবে। এবং রিঃ করবার সময় ১ম লাইনের *-র পর থেকে রিঃ করবেন।

সামনের ডান দিক্‌কার অর্দ্ধাংশ

১৩নং কাঁটায় ৭০টি ঘর তুলুন। ১৮ লাইন বুনুন—১টা সোঃ, ১টা উঃ—এই প্যাটার্ণে। ১৯শ লাইন—৩টে উঃ, ৪টে ঘঃ বঃ (ঘর ফেলা) বাকী ৬৩ ঘর উঃ। ২০শ লাইন —৬৩ ঘর উঃ, ৪টে ঘর তোলা, ৩টে উল্টো। আরো ১৮ লাইন করুন—শুধু উঃ। ১৯শ লাইন—পূর্ব্বোক্ত ১৯শ লাইনের মতো। ২০শ লাইন—পূর্ব্বোক্ত ২০শ লাইনের মতো। এই ভাবে প্রত্যেক ১৮ লাইন অন্তর ১৯শ এবং ২০শ লাইন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বুনে যান, যতক্ষণ না সমস্ত বোনাটা লম্বায় চার ইঞ্চি হয়। এটুকু শেষ হলে সব-শেষের লাইনের একেবারে শেষে ১টা ঘর তুলুন। (৭১ ঘর)।

এইবার ১০নং কাঁটা নিয়ে আগেকার সেই প্যাটার্ণে কাজ করুন (১ম লাইন থেকে ১২শ লাইন)। কিন্তু বোনা আরম্ভ করবার আগে ১০টা ঘর একটা সেফটী-পিনে বন্ধ করে রেখে দিন।

পিঠের দিকের মতো এ-বোনাটিও যখন "আরম্ভ" (beginning) থেকে ১২ ইঞ্চি হবে লম্বায়, তখন নিম্নলিখিত ভাবে বুনুন—

১ম লাইনের গোড়াতেই ১০টা ঘঃ বঃ করুন। ২য় লাইন বুনুন প্যাটার্ণ-অনুযায়ী। তার পর ৩য় লাইনের আরম্ভে আবার ১০টা ঘঃ বঃ করুন। ৪র্থ লাইন প্যাটার্ণ

পশমের হাই-নেক্ ব্লাউশ

অনুযায়ী। ৫ম লাইনের গোড়ায় আবার ১০টা ঘর বন্ধ করুন। এখন কাঁটায় রইলো ৪১টা ঘর। আরো সাড়ে চার ইঞ্চি বুনে যান—ঘর না কমিয়ে।

এইবার প্রত্যেক এক-লাইন-অন্তর ৭টি করে ঘর

কমাতে হবে। এই ভাবে কমাতে কমাতে যখন সমস্ত ঘর ফেলা হয়ে যাবে, তখন সেই যে ১০টি ঘর সেফটী-পিনে বন্ধ করা আছে, সেগুলি ১২নং কাঁটায় তুলে নেবেন ; তার পর উল্টো বুনে যাবেন আগাগোড়া। কিন্তু প্রতি ১৮ লাইন অন্তর অর্থাৎ প্রতি ১৯শ লাইন বুনবেন এই নিয়মে—৩টে উঃ, ৪টে ঘঃ কঃ (ঘঃ রঃ) ৩টে উঃ।

২০শ লাইন—৩টে উঃ, ৪টে ঘঃ তোলা, ৩টে উঃ। এইভাবে বুনে যান যতক্ষণ না এই নিয়মে এই ১০টি ঘরের বোতামের পটীটিতে ১১টি বোতাম-ঘর হয় এবং এটী পাশের বোনা অংশের সঙ্গে সমান লম্বা হয়। আপাততঃ এই ১০টি ঘর আবার সেফটীপিনে বন্ধ রেখে দিন।

সামনের বাঁদিক্‌কার অর্দ্ধাংশ

এটি বুনতে হবে "ডানদিকের অর্দ্ধাংশের" মতো। তবে আরম্ভগুলো উল্টো দিক্ থেকে করতে হবে। যেমন, যেখানে ১টা সোজায় আরম্ভ এবং ১০টা সোজায় শেষ, সেখানে ১০টা সোজায় আরম্ভ এবং ১টা সোজায় শেষ-বোনা বুনতে হবে। বোতামপটীটি অর্থাৎ সেফটীপিনে আঁটা ঐ ১০টি ঘর বোনবার সময় মনে রাখতে হবে, এবার আর বোতাম-ঘর করতে হবে না। অর্থাৎ সমস্ত লাইনগুলিই উঃ বুনে যেতে হবে। বোতাম-ঘরের জন্য ১৯শ এবং ২০শ লাইনের বিশেষ বোনাটি আর বুনতে হবে না।

গলার পটী (Band)

পিঠের দিক্‌কার অংশের কাঁধের সঙ্গে সামনের বাঁ ও ডানদিক্‌কার কাঁধ জুড়ে ফেলুন—কার্পেটের ছুঁচ ও উল দিয়ে, কিম্বা ক্রুশ দিয়ে। এইবার সেফটীপিনে আঁটা ১০টি ঘর ১৩নং কাঁটায় তুলে নিন এবং গলা থেকে গোল্-দিকে (roundly) ৮৬টি ঘর তুলে নিন। এই সঙ্গে বাঁ-দিক্‌কার বোতাম-পটী করবার পর যে ১০টি ঘর সেফটী-পিনে আঁটা ছিল, সে ১০টিও এই কাঁটায় তুলে নিন। তাহলেই সর্ব্বসমেত ১০ ঘর+৮৬ ঘর+১০ ঘর=১০৬টি ঘর হলো। এইবার বুনুন ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে। কিন্তু ১৮ লাইন বোনার পর ১৯শ লাইন বোনবার সময় ডানদিক্‌কার সামনের অংশের বোনা আরম্ভ করবেন—৩টি উঃ, ৪টি ঘঃ কঃ এবং বাকী সব উঃ—এই প্যাটার্ণে। ২০শ লাইন বুনবেন—৯৯টি উল্টো, ৪টি ঘঃ তোঃ এবং ৩টি উঃ। এর পর দেড় ইঞ্চি এই প্যাটার্ণে বুনুন। দেড় ইঞ্চি হয়ে গেলে ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

হাত

১০নং কাঁটায় ২৯টি ঘর তুলুন এবং "১ম লাইন—১২শ লাইনের" প্যাটার্ণে বুনে যান। কিন্তু ২য় লাইন আরম্ভ করবার আগে ২টি ঘর তুলে নিন। তার পর ৩য় লাইন থেকে প্রত্যেক লাইনের অর্থাৎ ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ইত্যাদি লাইনের গোড়ায় দুটি করে ঘর তুলে যান, যতক্ষণ না কাঁটায় ৯১টি ঘর হয়। আগেকার ১ম লাইন—১২শ লাইন প্যাটার্ণ-অনুযায়ী বুনে যান। একবার মেপে দেখুন গোড়ার লাইন থেকে ধরে ৪ ইঞ্চি লম্বা হয়েছে কি না। ৪ ইঞ্চি লম্বা হলে ১৩নং কাঁটায় ঘর তুলে নিন। এইবার ১টা সোঃ, ১টা উঃ এই প্যাটার্ণে বুনুন ; কিন্তু প্রতি-লাইনে প্রতি ২য় এবং ৩য় ঘর এঃ বুনুন। এই ভাবে ঘর কমাতে-কমাতে ২ ইঞ্চি বুনে যান। তার পর ১ লাইন উল্টো করে ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

এখন পুরো জামাটির উপর অল্প-ভিজে একখানা কাপড় চাপা দিয়ে গরম-ইস্ত্রী এনে ইস্ত্রী করে ফেলুন। হাত দুটি সেলাই করুন। বোতাম-পটী এবং বোতাম-ঘর জুড়ে ফেলুন। পাশগুলি জুড়ে নিন। এইবার বেশ ভালো করে আর একবার ইস্ত্রী করে ফেলুন ভিজে কাপড় উপরে রেখে, নাহলে উল পুড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। এইবার বোতাম-ঘর মেপে বাঁ-দিকের পটীতে বোতামগুলি বসিয়ে নিন।

এম্‌ব্রয়ডারি

এম্‌ব্রয়ডারি কথাটির ঠিক বাংলা অর্থ—সুতায়-তোলা রকমারি নক্সার কাজ। কিন্তু আজকাল 'এম্‌ব্রয়ডারি' কথাটির প্রচলন এত বেশী হয়েছে যে, এটি ইংরেজী কথা বলে আর মনে হয় না।

ছুঁচের কাজে কিম্বা এম্‌ব্রয়ডারি-শিল্পে সিদ্ধিলাভ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সূক্ষ্ম-শিল্প-বোধ বা রসবোধ অর্থাৎ fine artistic sense. এই সূক্ষ্ম-রসবোধ যাঁর সেই

তিনি যতই চেষ্টা করুন, এম্‌ব্রয়ডারিতে নাম করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে। উল প্রভৃতির কাজে এত মিহি-ভাব বা সূক্ষ্ম-রসবোধের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এম্‌ব্রয়ডারি-শিল্পের মূল-মন্ত্র হচ্ছে সূক্ষ্ম চারুতা অর্থাৎ fineness

তার পরে চাই অধ্যবসায় বা কর্ম্মতৎপরতা (deftness)।

যাঁদের এই সূক্ষ্ম-রসবোধ, অধ্যবসায় এবং তৎপরতা আছে, আর সেই সঙ্গে বর্ণ-সামঞ্জস্য-জ্ঞান আছে, তাঁরা এ কাজে সিদ্ধিলাভ করবেন নিশ্চয়। বর্ণ-সামঞ্জস্য-জ্ঞান অথবা বর্ণবোধ কথাটির অর্থ,—কোন্ রঙের পাশে কোন্ রঙ মানাবে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা—যেমন সাদার পাশে নীল রঙ মানায়, সবুজের পাশে হলদে কিম্বা লাল রঙ মানায়। যে কাপড়ের উপর সেলাইয়ের কাজ হবে তার রঙ যদি গাঢ় নীল হয়, তা হলে তার উপর সাদা সূতার এম্‌ব্রয়ডারিতে বাহার খোলে; হলদে জমির উপর গাঢ় হলদে বা চকোলেট; গাঢ় হলদে জমির উপর লাল বা সবুজ সূতার কাজে খুব বাহার খোলে—এই যে বোধ একেই বলে বর্ণবোধ। এবং এই বর্ণ-বোধ (colour-harmony) যাঁর আছে, এম্‌ব্রয়ডারি করবার সময় তাঁর কোনো কারণেই অসুবিধা ঘটবে না।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি অতি-সাধারণ নিয়ম আছে। যেমন, যে-ছুঁচে সেলাই করা হবে, সেটির মুখ যেন খুব সূক্ষ্ম বা সরু হয়; কিন্তু সূতা পরাবার যে-ছিদ্র, সেটি যেন খুব মিহি না হয়। ছুঁচের ছিদ্র সরু বা ছোট হলে সূতা পরাবার সময় সূতা ফেঁশে যাবে, সূতায় আঁশ উঠবে এবং আরো বহু উপসর্গ ঘটতে পারে! বাজারে Embroidery needles বলে একরকম ছুঁচ কিনতে পাওয়া যায়। এম্‌ব্রয়ডারির জন্য সেই ছুঁচ ব্যবহার করবেন।

এবারে সূতার কথা। সূতা সম্বন্ধে কোন-কিছু বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। নানা জনে নানা রকম সূতা ব্যবহার করেন। কেউ পাড়ের সূতায় এম্‌ব্রয়ডারি করেন—তবে এ উপায়টিতে যেমন অনেকখনি ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তেমনি পাড়ের রকমারি সূতা অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য হয়। তার পর আছে চিরকালের D. M. C. সূতা। এ ছাড়া আর্ট-সিল্কের সূতাও উপযোগী।

সেলাইয়ের সময় অনেকের হাত খুব ঘামে—তাঁরা মধ্যে মধ্যে হাতে পাউডার ঘষে নেবেন না হলে হাতের কাজ ভালো হবে না।

এই যে কথাগুলি লেখা হলো, এগুলি লেখবার হয়তো প্রয়োজন ছিল না, কেন না, এম্‌ব্রয়ডারি-শিল্পে আজ বাঙ্গালী মহিলারা দেশে-বিদেশে বিশেষ কীর্ত্তি-অর্জ্জন করছেন... এ সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ কোনো ধারণা নেই, তাঁদের জন্যই এ কথাটুকু বিশেষ করে লেখা হলো।

১। "টী-কোজি" (কেটলী-ঢাকা)

ছবির আদর্শে এই টী-কোজিটি তৈরী করতে হলে চাই ½ গজ বা ৬ গিরা কাপড়। কাপড় একটু
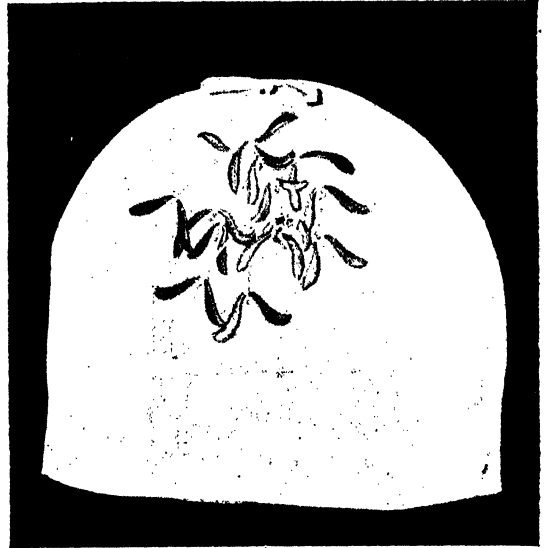
টী-কোজি

পুরু ধরণের হওয়া চাই—যেমন "ফ্লানেল", "পপলিন" কিম্বা "ব্লিচ লিনেন" (Bleach-linen)। খদ্দরও চলতে পারে। কাপড়ের রঙ যেন একটু হলদে ধরণের কিম্বা ফিকে সবুজ হয়। তারপর চাই দু'লচ্ছি ফিকে-সবুজ এবং সাদা সূতা (D M C. Special Standard Cotton) দু'লচ্ছি গাঢ়-সবুজ সূতো (D. M. C)। এ-ছাড়া সিকি-ইঞ্চি চওড়া এক গজ ফিতে চাই। ফিতের রঙ সেলাইয়ের কাপড়ের চাইতে সামান্য একটু গাঢ় হওয়া চাই। ফিতে সূতির কিম্বা সিল্কের হলে চলবে। তা ছাড়া মুক্তোর মত দুটি পুঁতি চাই।

সমস্ত কাপড়টুকু আড়া দিকে দু'ভাঁজ করে রেখে—ছবি দেখে এই ছবির চেহারা-মাফিক (shapeএ) কাপড় কেটে নিতে হবে। তার পর এই ছবি দেখে একখানি পুরু কাগজে ডিজাইনটি এঁকে নিতে হবে। ছবি অবশ্য আঁকতে হবে এর চারগুণ বড় সাইজে। তার পর কাটা কাপড়ের উপর একখানি কার্ব্বণ-পেপার রেখে তার উপরে আঁকা-ডিজাইনটি মেলে ধরুন। এটুকু লক্ষ্য রাখবেন, ট্রেস (trace) করবার সময় নক্সাটুকু যেন কাপড়ের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে—যেমন ছবিতে আছে। তার পর সরু-মুখ একটি পেন্সিল নিয়ে আঁকা দাগের উপর অল্প চাপ দিয়ে পেন্সিলের শীষ্ বুলিয়ে যান। ডিজাইনটি কাপড়ের উপর ঠিক ভাবে পড়ছে কি না, কাগজের কোণ একটু তুলে দেখে নেবেন।

এবার সেলাইয়ের পালা। কাঠের গোল-ফ্রেম আজকাল অনেকের ঘরেই মিলবে। যাঁদের ঘরে নেই, তাঁরা বাজারে এ-ফ্রেম অনায়াসে কিনতে পারবেন অল্প দামে। ফ্রেমে কাপড় আটকে সেলাই করতে হবে। সমস্ত সেলাইটুকু হবে সাটিন-ষ্টিচে (এর পরের সংখ্যায় ষ্টীচ সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণী দেওয়া হবে)। পাতাগুলি হবে গাঢ় সবুজ রঙের সুতায়; ডালগুলি ফিকে-সবুজ এবং ফলগুলি সাদা সুতায়।

সেলাই হয়ে যাবার পর—কাপড়টি মুখোমুখি করে নিয়ে ধার দিয়ে সেলাই করে যেতে হবে। এমনি সাধারণ ষ্টীচ দিয়ে ধার মুড়লেই চলবে—তবে সিকি-ইঞ্চি ছেড়ে দেবেন। সেলাই সোজা দিকেই হবে। এই সঙ্গে কাপড়টির ভিতর-দিকে ঠিক টী-কোজির মাপে একটি কাপড় কেটে টেঁকে নিতে হবে। তাহলে সোজা দিকে যখন ষ্টীচ পড়বে, তখন সেই সঙ্গে ভিতরের কাপড়টিও সেলাই হয়ে আটকে যাবে। সেলাইয়ের সময় নীচের দিক্‌টুকু বাদ দিয়ে সেলাই করবেন। এর পর কাপড়টির উপর গরম-ইস্ত্রী চালিয়ে নেবেন। তার পর টী-কোজির ভিতর-দিক্, যেটি একটি খোলের মত হয়ে আছে—তার মধ্যে তুলো পুরে দিতে হবে। ঠেশে তুলো পুরে দেবেন—যাতে হাত দিয়ে টিপলে বেশ শক্ত ঠেকে। তার পর ভিতরের লাইনিংএর কাপড়টি মুখোমুখি করে ষ্টিচ দিয়ে দেবেন—যেমন-করে ধার মুড়েছেন, সেই ভাবে।

এইবার ঐ রেশমী ফিতেটি-ছবির মতো "কোজি"র ধারে মুড়ে নিন। মাথার উপর একটি ফাঁশ বেঁধে মুক্তা ফলের মতো, পুঁতি দুটি ফিতের সঙ্গে সেলাই করে দিন। (ছবি দেখুন)।

২। ক্যালেণ্ডার

শস্তায় কাউকে উপহার দেবার পক্ষে এ জিনিষটি বেশ। অনেকের ঘরেই পুরানো ক্যালেণ্ডার আছে। ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলির দরকার নেই। শুধু কার্ডবোর্ডটাতে আমাদের প্রয়োজন। ক্যালেণ্ডারটি মেপে নিয়ে সেটা যতখানি লম্বা এবং যতখানি চওড়া, তার চাইতে তিন-ইঞ্চি বেশী (চওড়া দিকে এবং লম্বা দিকে) কাপড় কিনুন। কাপড় যেন বেশ

ক্যালেণ্ডার

মোটা হয় এবং তার রঙ যেন হয় বিস্কুটের মত হলদে। এই সঙ্গে চাই-সিকি ইঞ্চি চওড়া এবং তিন-ইঞ্চি লম্বা লাল ফিতে; ছোট একটি নতুন ক্যালেণ্ডার। আর নিন্ নীল রঙের, বেগুনি রঙের, পেটুনিয়া এবং জেড্ রঙের একলচ্ছি করে সুতা।

সমস্ত কাজটুকু ষ্টেম-ষ্টিচ্ (Stem stitch)-এ করা। পাখীর গা, লেজ এবং ডানা নীল সুতায় করা। গলার কাছে ও ডানার নক্সা পেটুনিয়া রঙের ও জেড রঙের

সুতায় করা ; চোখ ক্রীম এবং নীল রঙের সুতায়। পাখীর ঠোঁটের পোকা বেগুনি রঙে করা হয়েছে। ফুলগুলি পেটুনিয়া রঙে এবং পাতাগুলি জেড্ রঙে

লেখাগুলি তোলা হয়েছে ক্রীম রঙের সুতায়।

৩। পপিফুলের গুছি

কাপড়টি বিস্কুট রঙের ও পপলিন জাতীয়।

ফুলগুলির বাইরের সেলাই—গোলাপী সুতায় এবং ষ্টেম-ষ্টিচে। মাঝখানের রেণুগুলি ফিকে সবুজ রঙের সুতায় সাটিন-ষ্টিচ ও ফ্রেঞ্চ-নট করা হয়েছে। ফুলের বোঁটাগুলি—ফিকে সবুজ সুতায় ষ্টেম-ষ্টিচ করা হয়েছে। কুঁড়িগুলি ফিকে সবুজ রঙের সুতায় এবং পাতাগুলি গাঢ় সবুজ রঙের সুতায় ষ্টেম-ষ্টিচ করা হয়েছে। পাতার শিরগুলি ফিকে সবুজ।

পপিগুচ্ছ

৪। ডেজিফুলের কুশন্

কাপড়টি গাঢ় নীল এবং ফুলগুলি ধবধবে সাদা সুতা দিয়ে করা হয়েছে। তারপর সমস্তটা করা লেজি-ডেজি—(এ সম্বন্ধে পরে লেখা হবে) ষ্টিচ দিয়ে।

এর পরের বারে আমরা সব রকমের ষ্টিচ বোঝাবার জন্য একটি সচিত্র বিবরণী দেবো। কেন না, সব-রকমের সেলাই (stitch) জানলেও, অনেকে কোন্‌টির কি নাম জানেন না বলে সময়-সময় অসুবিধা ঘটে।
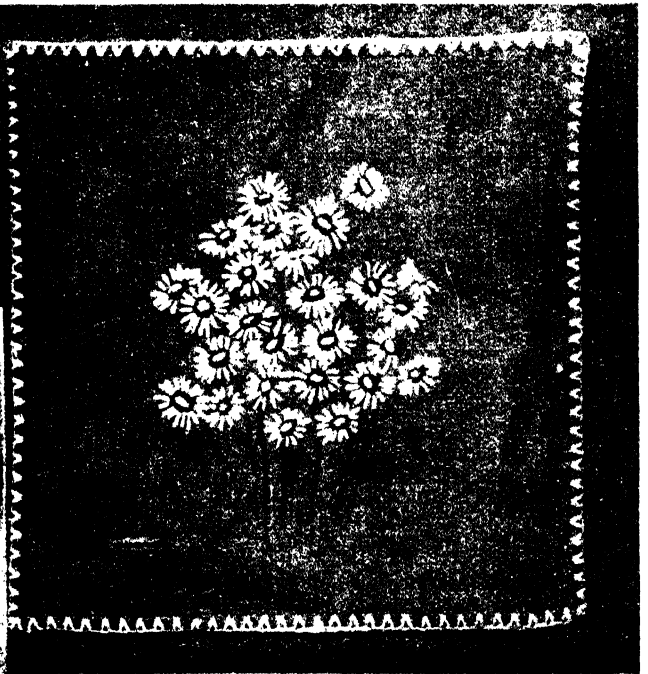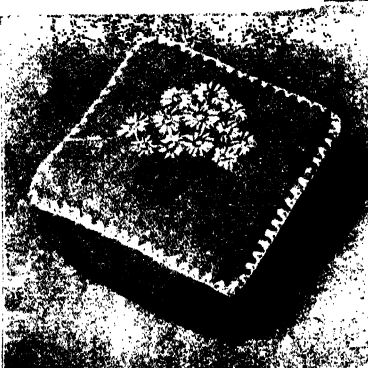
ডেজি কুশন্

তন্বী শ্যামা

স্থূলাঙ্গী রমণীর লজ্জা ও কষ্টের সত্যই সীমা নাই!

রূপসীর দেহ হইবে পল্লবের মতো! দেহ ভারী বা জঘনদেশ স্থূল-বর্ত্তুল হইলে রমণীর রূপ-যৌবনের কোনো মূল্য থাকে না। যাঁরা চেহারা ভালো রাখিতে চান, তাঁদের উচিত, দেহ যেন ভারী না হয়, সেদিকে নজর রাখা। দেহ ভারী হইলে দেহের কোনো শ্রী বা ছাঁদ থাকে না।

কোমর এবং জঘন—এ দুয়ের গড়নে সামঞ্জস্য থাকা চাই। দুয়ে মিশিয়া একাকার হইলে নারীকে কদর্য্য দেখায়!

এজন্য কোমর ও জঘনদেশের ব্যায়াম-পরিচর্য্যা প্রয়োজন। সে ব্যায়াম-পরিচর্য্যায় দেহের ছাঁদ ভালো; এবং ব্যায়ামের ফলে তলপেট এবং উদরদেশের পেশীগুলি সুনিয়ন্ত্রিত থাকে বলিয়া দেহ বেঢপ হইতে পারে না।

এ ব্যায়ামের গোড়ায় নজর রাখিতে হইবে—দাঁড়ানো, বসা এবং বেড়ানোর ভঙ্গীর দিকে। যেমন-তেমন ভাবে বসিলে, দাঁড়াইলে বা চলিলে-ফিরিলে দেহের গঠনে ছন্দ-তাল কাটিয়া দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়।

জঘন এবং উদরদেশ ও কোমরকে যদি সমঞ্জসভাবে গড়িতে চান, তাহা হইলে দুটি কথা মনে রাখিবেন।

১। নিয়মিত ধারায় ব্যায়াম করিতে হইবে।

২। উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে দেহের বিশিষ্ট ভঙ্গী সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে দেহ কখনো বিশ্রী বেঢপ হইবে না—চেহারা থাকিবে সুশ্রী-সুন্দর।

একটু বয়স হইলে মেয়েদের তলপেট মেদে ভরিয়া ভারী হয় এবং ঝুলিয়া পড়ে। জঘনদেশ মেদে স্ফীত ও কদর্য্য হইয়া ওঠে। হইবার কারণ, বসা-দাঁড়ানোয় বিধি মানিয়া না চলা। যেখানে খুশী থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম—গা হেলাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম,—চলিলাম নানা ভঙ্গীতে,—তার ফলে দেহ একভাবে বাড়িতে পায় না,—কোনোদিক্ সঙ্কুচিত হয়, কোনোদিক্ বা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঢোল হইয়া ওঠে! এবং এই অসামঞ্জস্য ঘটিবামাত্র অনাবশ্যক মেদ জমিয়া দেহকে ভারাক্রান্ত এবং অঙ্গ-মাধুরীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

কোনো চারা গাছকে যদি নিত্যদিন তার ডালপালা ধরিয়া নোয়াইতে থাকেন, তাহা হইলে সে-গাছ কখনো সরলভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; তার মূল কাণ্ড হেলিয়া থাকে, ডাল পালারও সেই দশা ঘটে। আমাদের দেহ চারা গাছের মতো। নোয়াইলে দুমড়াইলে তার স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গীতে চাড় পড়ে—স্বাভাবিক শ্রী হারাইয়া দেহ বিশ্রী বেছাঁদ হইয়া দাঁড়ায়। হেলিয়া দুলিয়া চলা এবং যেমন তেমন ভাবে বসা-দাঁড়ানোর কদভ্যাসে মেয়েদের জঘনদেশ মেদে ভরিয়া বিশাল ও বিশ্রী হয় এবং একবার ছাঁদ নষ্ট হইলে সে ত্রুটি-মোচন করিতে ইহ-জন্ম কাটিয়া যায়।

অর্থাৎ সরল স্বাভাবিক পথ ছাড়িয়া একবার বাঁকা পথে গেলে কোনো দিকে আর রক্ষা পাইবার উপায় থাকে না! এজন্য ছোটবেলা হইতেই এদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। জঘনদেশের ছাঁদের উপর মেয়েদের মনোহারিত্ব নির্ভর করে অনেকখানি।

অনেকের ধারণা, সন্তান-প্রসবের ফলে দেহ ভাঙ্গিয়া এ অনর্থের সৃষ্টি হয়! কিন্তু এ ধারণা ভুল। ফিল্ম-ষ্টার নর্ম্মা শীয়ারার সন্তানের জননী। তবু তাঁর দেহ দেখুন—সুশ্রী সুছাঁদে আজো কেমন নয়ন-বিমোহন! ইংরেজীতে যাকে figure বলে, সেই figure না থাকিলে রূপযৌবন থাকা সত্ত্বেও রমণীকে দুর্ভাগিনী বলিতে হইবে।

উদর ও জঘনদেশের গঠন যাহাতে সুকুমার থাকে, সে-জন্য বিশেষ ব্যায়ামের প্রয়োজন। সে ব্যায়ামে তলপেটের অস্থি ও পেশী সুস্থ থাকিবে; এবং উদর বা জঘনদেশ ফুলিয়া ফাঁপিয়া নারীর রূপশ্রীকে কদর্য্য করিয়া তুলিবে না।

আমাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গীর উপর জঘনদেশের গঠন প্রধানতঃ নির্ভর করে। যদি আমরা খুব বেশী ঝুঁকিয়া চলি, তাহা হইলে জঘনদেশের গঠনে বিকৃতি ঘটিবে। ঝুঁকিয়া চলাফেরার ফলে দেহ সামনের দিকে ঝোঁকে; তার ফলে জঘনদেশ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া বিশ্রী বেমানান দাঁড়ায়,—বুকের শোভা নষ্ট হয়; পাকস্থলী এবং অপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পিণ্ডবৎ কদর্য্য হইয়া পড়ে।

দাঁড়াইবার সময় তলপেটের অস্থি যেন তলপেটের খাঁজে খাঁজে আশ্রয় পায়—বুক যেন সরল সিধা সোজা থাকে; ঘাড় ও পা যেন সমরেখায় অবস্থান করে, দেখিবেন।

এক-পায়ে কদাচ দাঁড়াইবেন না। তাহাতে জঘন ও কাঁধের সমতা বা balance নষ্ট হয়। যখনি দাঁড়াইবেন, দু'পা এক করিয়া দাঁড়াইবেন ; দেহের কোনো অংশ যেন বাঁকিয়া বা ঝুঁকিয়া না থাকে, দেখিবেন।

এবার ব্যায়ামের কথা বলি।

১। জঘনদেশের উপর দুই হাত রাখুন—আঙুলগুলি বেশ ছড়ানোভাবে থাকিবে। তার পর পায়ের সামনের অংশের উপর মাত্র দেহের ভর রাখিয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান। ঘুরিবার সময় এক-পা তুলিয়া অপর-পা ভূমে রাখিবেন। যে-পা ভূমে রাখিবেন, সে-পায়ের সামনের দিক্ মাত্র ভূমি ছুঁইয়া থাকিবে ; গোড়ালি যেন ভূমিস্পর্শ না করে! যে-পা তুলিবেন, সে-পা তুলিতে হইবে পিছন-দিকে (১ নং ছবি) এবং সে সময় হাঁটু থাকিবে সিধা। এক-পায়ে যখন ভূমিস্পর্শ করিবেন, তখন সে-পায়ের উপর সারা দেহের ভর রাখিয়া দশ-বারো সেকণ্ড করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

১। জঘন দেশের উপর দুই হাত রাখুন

২। সামনে একখানি চেয়ার রাখিয়া ডান হাতে ধরুন। এবারে বাঁ পা তুলুন চেয়ারের দিকে ; হাঁটু মুড়িয়া জঘনদেশের সঙ্গে সমরেখায় রাখুন (২ নং ছবির বাঁ দিক্‌কার মূর্ত্তি দেখুন)। তার পর চেয়ার ছাড়িয়া এই ভাবে এক-পাক্ ঘুরুন। এবার বাঁ হাতে চেয়ার ধরিয়া বাঁ পা

২। সামনে চেয়ার রাখিয়া

তুলিয়া পূর্ব্বেকার মতো ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বিপরীত দিকে ঘুরুন। দ্রুতভাবে ঘোরা চাই। এ ব্যায়াম করা চাই দশ বারো বার।

৩। এবার মেঝেয় বসুন। দু'হাঁটু মুড়িয়া বসিতে হইবে। (৩ নং ছবির বাঁ দিক্‌কার মূর্ত্তি দেখুন)। দু'পা পরস্পরে ঠেকিয়া থাকিবে। দু'হাত থাকিবে সামনের দিকে

প্রসারিত। এবার দু'পা মাটী হইতে প্রায় দু'ফুট উর্দ্ধে তুলিয়া পিছন-দিকে হেলিয়া পড়ুন (৩ নং ছবি ডান-দিককার মূর্ত্তি)। দু'হাত আগেকার মতো সামনে প্রসারিত থাকিবে। এখন পিছনে জঘনদেশের হাড়ের উপরে থাকিবে আপনার সারা দেহের ভর। এমনি-ভাবে দু'চার সেকণ্ড থাকিয়া আবার পূর্ব্বেকার মতো বসুন। এ ব্যায়াম পর-পর করা চাই ষোল বার।

৩। মেঝেয় বসুন

৪। ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে এক পা মুড়িয়া সেই পায়ের উপর ও একখানি মাত্র হাতের উপর দেহের ভর রাখিয়া সোজা উঁচু হইয়া বসুন। যে-হাত মুক্ত আছে, সেই হাত দিয়া এবার সামনে যতদূর সম্ভব অপর-পা প্রসারিত করিয়া পায়ের পাতা চাপিয়া ধরুন। এমনি ভাবে দশ সেকণ্ডকাল থাকিবার পর অন্য হাত-পায়ে এ ব্যায়াম করুন। যদি হাত ছাড়িয়া শুধু এক-পায়ের উপর মাত্র দেহের ভর রাখিতে পারেন, আরো ভালো!

এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ-পক্ষে বিশবার।

৪। এক পা মুড়িয়া বসুন

ধান গাছ ও ধান

গাছে গাছে পাকা ধান, দুলিছে বাতাসে,
কৃষাণ কাটিতে তাহা, এসেছে হরষে।
ধান গাছ কহে ধানে, "ওরে কুসন্তান,
তোরে জন্ম দিয়ে মোর, যায় যে পরাণ।"

ধান কহে, "কেন খেদ কর অকারণ,
আমরাই হব গাছ, কে করে বারণ!
প্রাণশক্তি তব মোরা রাখিয়াছি ধরি,
মরণে কি ভয়—প্রাণ পুনঃ পাবে ফিরি।"

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

প্লাটিনমের ইতিহাস

প্লাটিনম্ আধুনিক ধাতু নহে, কিন্তু পেরুভিয়ান্‌রা ব্যতীত প্রাচীন যুগের অপর কেহ প্লাটিনম্ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিল না। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে নূতন গোলার্দ্ধে এই বিচিত্র ধাতু আবিষ্কৃত হয়। তখন ইহার গুণাবলী সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিত না। কলম্বিয়ায় প্লাটিনমের জন্মস্থান। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম্ উড্ এই নবাবিষ্কৃত ধাতুর কিয়দংশ ইংলণ্ডে লইয়া যান। ইহার অধিক কেহ জানিত না। এখনও পর্য্যন্ত বিবাহার্থী যুবক তাঁহার পত্নীর জন্য বিবাহের অঙ্গুরীয় ফরমাস দিবার জন্য রত্নবণিকের দোকানে গমন করিলেও, তিনি জানেন না যে, এই ধাতুর উপর জাতির ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। ধাতুতত্ত্ববিদ্ ব্যতীত কেহই এ সংবাদ রাখেন না যে, দাঁত বাঁধাইবার ব্যাপারে এই ধাতু খাদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ সংবাদ অনেকেরই জানা নাই যে, বিমান-নির্ম্মাণে প্লাটিনমের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী। টেলিফোন যন্ত্র, রেডিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্লাটিনম্ যে অবশ্য প্রয়োজনীয় ধাতু, তাহাও জনসাধারণের জ্ঞানের অগোচর।

বহু বৎসর ধরিয়া গবেষণার পর প্লাটিনমের উপযোগিতা প্রকাশ পাইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এই ধাতু আবিষ্কৃত হইবার পর, দীর্ঘকাল ধরিয়া য়ুরোপে প্রায় অপরিচিতই ছিল। ইহার প্রধান কারণ, স্পেন সরকার কলম্বিয়ার বাহিরে এই ধাতু রপ্তানী হইতে দিতেন না। প্রথমতঃ এই ধাতুকে "প্লাটিনা ডেল্ পিন্টো" বলিয়া অভিহিত করা হইত। স্পেন ভাষায় রৌপ্যের নাম প্লাটিনা। পিন্টো নামক নদীর বালুকাস্তরের নিম্ন হইতে উহা আবিষ্কৃত হওয়ায় "পিন্টো" নামকরণ করা হয়। ইদানীং প্লাটিনম্ অনেক স্থানেই পাওয়া যায়, কিন্তু নদীর তলদেশে অতি অল্পপরিমাণেই উহার প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই ধাতু অতি দুষ্প্রাপ্য—স্বর্ণের অপেক্ষাও শতগুণ দুষ্প্রাপ্য।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে সেফার পরীক্ষার দ্বারা অবগত হয়েন যে, একভাগ নাইট্রিক এসিড্ ও তিনভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশ্রিত দ্রাবকে প্লাটিনমকে দ্রবীভূত করা যায়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাগারফ্ আবিষ্কার করেন যে, এমনোনিয়ম্ ক্লোরাইড্‌যোগেও ইহাকে দ্রবীভূত করা যায়। এই উভয়বিধ উপায়ই বর্ত্তমানে চলিতেছে।
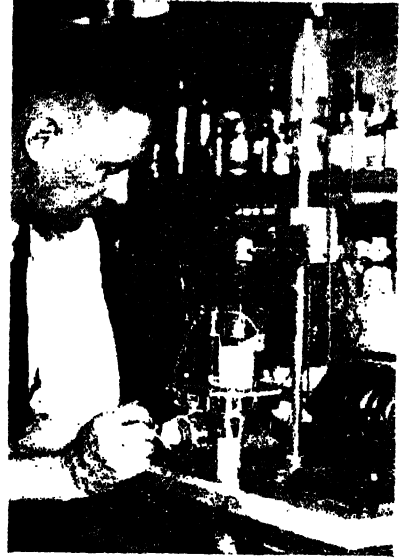
বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে প্লাটিনম্-খাদ পরীক্ষা করিতেছেন

ক্রমে ক্রমে ধাতুবিদ্যাবিশারদগণ বুঝিতে পারেন যে, এই ধাতুর অনেক গোষ্ঠী আছে। প্লাটিনম্ একা নহে, উহার আরও পাঁচটি জ্ঞাতি আছে। যথা—প্লাটিনম্,
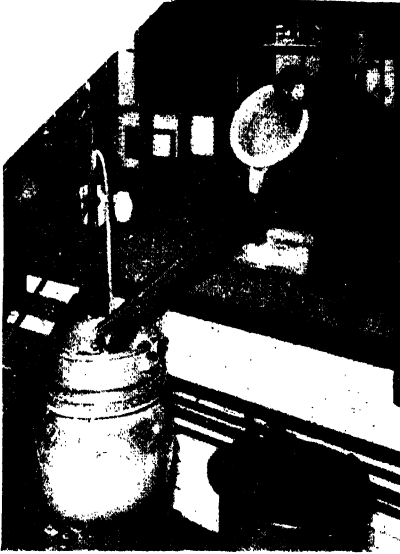
দ্রবীভূত প্লাটিনম্ ছাঁকিয়া লইবার প্রণালী

গবেষণাগারে প্লাটিনম্ দ্রবীভূত করিবার সময় মুখোস পরিধান করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষবাষ্পের প্রভাব দূর করিতেছেন

প্যালাডিয়ম্, ইরিডিয়ম্, রোডিয়ম্, অস্মিয়ম্ এবং রুথেনিয়ম্। এই সকল ধাতুতে মরিচা ধরে না এবং অত্যধিক উত্তাপেও গলিয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহিত অন্যান্য বিষয়ে পৃথক্। এই ছয়টি ধাতুরই বর্ণ শ্বেত, কোনটিতেই দাগ ধরে না। প্লাটিনম্ ৩ হাজার ২ শত ২৩ ডিগ্রি ফারেনহিট উত্তাপে গলিয়া যায়। তখন তাহা কার্য্যোপযোগী করিয়া লওয়া হয়। প্লাটিনম্ ও তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা বর্ত্তমান সভ্যতার বিবিধ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু।

বিদ্যুতালোক বা বিদ্যুৎশক্তি সভ্য মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু প্লাটিনমের সহায়তা ব্যতীত বর্ত্তমান সভ্যতার এই অতি প্রয়োজনীয় শক্তিকে মানুষ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইত না। বৈদ্যুতিক সংযোগ, বিদ্যুৎপ্রবাহরোধ প্রভৃতি ব্যাপার প্লাটিনমের সহায়তা ব্যতীত প্রসারলাভ করিতে পারিত না। কোন কোন ক্ষেত্রে প্লাটিনমের সগোত্র প্যালাডিয়ম ধাতুর সাহায্যে অনেক কার্য্য হইয়া থাকে।

প্লাটিনমের পাত তৈয়ার হইতেছে

শোধনাগারে প্যালাডিয়মের বাঁট পেটা হইতেছে

এডিসনের "কার্ব্বন ফিলামেণ্ট ল্যাম্পের" ব্যাপারে প্লাটিনমের প্রয়োজন হওয়ায় উহার চাহিদা অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছে। রঞ্জনরশ্মির নল, ইনকানডিসেণ্ট ল্যাম্প প্রভৃতির উদ্ভাবনে প্লাটিনম্ যে সহায়তা করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। প্লাটিনম্ না থাকিলে এত শীঘ্র উহাদের উদ্ভাবনা ঘটিতে পারিত না। রেডিও-যোগে দূরে বার্ত্তা প্রেরণও রোডিয়মের অভাবে বিলম্বিত হইত। এক কথায় বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রসার, প্লাটিনমের অভাবে এমন ব্যাপক হইতে পারিত না।

টেলিফোন্-যোগে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলার প্রয়োজন হইলে, প্লাটিনম্ ও প্যালাডিয়ম্ই ব্যবহৃত হইতেছে। চলচ্চিত্রেও এই জাতীয় প্রতিফলকের ব্যবহার চলিয়াছে।

যখন গ্যাস ও গ্যাসোলিন-চালিত এঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়, তখন প্লাটিনমের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরাশক্তি উৎপাদক যন্ত্রের ব্যয়হ্রাস করার ব্যাপারে প্লাটিনম্ কম উপযোগী নহে।

কাচ-শ্রমশিল্প বর্ত্তমান যুগে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাতে অনেক নূতন নূতন প্রণালীর প্রচলন হইতেছে। তাহাতে প্লাটিনমের প্রয়োজনীয়তা সমধিক হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণী কাচ-শ্রমশিল্প লইয়া অনেক পরিশ্রম করিতেছে; কিন্তু তাহাদের

গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক প্লাটিনম্‌কে ছাঁচে ফেলিবার পূর্ব্বে টর্চের সাহায্যে গলাইতেছেন

খাদ গলাইয়া তাপ-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে উত্তাপ নিরূপণ

টেলিফোন-লাইনের সংযোগরক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই দুই সহোদর না হইলে টেলিফোন বা রেডিও-যোগে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ আদান-প্রদান নির্ভুলভাবে সম্ভবপর হইত না।

প্লাটিনম্ ধাতুর আর একটি মহৎ গুণ এই যে, ইহার সাহায্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া উচ্চ স্তরের আলোক প্রতিফলনের কার্য্য অব্যাহত রাখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ তাহাদিগের সার্চ্চ-লাইটযন্ত্রে রোডিয়মের প্রলেপ দিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছে। সমুদ্রোপকূলভাগ রক্ষার জন্য এই জাতীয় সার্চ্চলাইটের বিশেষ প্রয়োজন। কাচের প্রতিফলকের পরিবর্ত্তে অধুনা এই ধাতু-নির্ম্মিত প্রতিফলক

উৎপাদিত কাচের দ্রব্যসমূহ তেমন মসৃণ হয় নাই। অনেক প্রকার দোষ-ত্রুটি তাহাতে আছে। কিন্তু নূতন প্রণালীতে প্লাটিনমের সাহায্যে সে সকল দোষ-ত্রুটি আর থাকিতেছে না। প্লাটিনমের সাহায্যে অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে জড়োয়া অলঙ্কার নির্ম্মাণে প্লাটিনমের প্রয়োজনীয়তা সুদূরব্যাপী হইয়াছিল। বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে অলঙ্কারপ্রস্তুতকারকগণ প্রচুর পরিমাণে প্লাটিনমের ক্রেতা ছিল। প্লাটিনমের উপর হীরক বসাইলে তাহার উজ্জ্বলতা বর্দ্ধিত হয় এবং দৃঢ়ভাবে প্লাটিনমের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে—খসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা অল্পই

হয়। প্লাটিনমের সহযোগে রত্নালঙ্কারসমূহ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত হইয়া লোকবিমোহন হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণে যে প্রকার কারুকার্য্য সম্ভবপর নহে, প্লাটিনমে তাহা সহজসাধ্য। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মহারাণী এলিজাবেথের মুকুট প্লাটিনমের উপর নির্ম্মিত।

দন্ত-চিকিৎসালয়ে প্লাটিনম্ ও প্যালাডিয়ম্ বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। এই দুই ধাতু দন্ত-চিকিৎসকের পক্ষে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। চিকিৎসা-বিভাগেও প্লাটিনম্ এবং প্লাটিনম্-ইরিডিয়ম্ ব্যবহৃত হইতেছে। সূচ এবং ক্যান্‌সার ক্ষতের চিকিৎসার জন্য নল প্রভৃতি প্লাটিনম্ হইতে নির্ম্মিত। এই বিভাগে আরও অনেক বিষয়ে প্লাটিনমের সার্থকতা আছে।

প্লাটিনম্ এবং প্লাটিনম্-পরিবারের অন্যান্য ধাতুর উপযোগিতা সম্বন্ধে সকল কথা বর্ণনা করা নিরর্থক। অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর পদকরচনায় প্লাটিনমের প্রয়োজন কত অধিক, তাহা বলা যায় না। সুন্দর পুস্তক ও অন্যান্য কারুশিল্পের জন্য প্যালাডিয়ম্ অত্যাবশ্যক। রৌপ্য-নির্ম্মিত দ্রব্যসমূহ যাহাতে কখনও কলঙ্কিত হইতে না পারে, এজন্য রেডিয়মের পালিশ প্রদত্ত হয়। প্লাটিনমের তার অতি সূক্ষ্মভাবে তৈয়ারী হয়। এক ইঞ্চির ৫ কোটিতম সূক্ষ্ম তার প্লাটিনম্ হইতে প্রস্তুত হইতে পারে।

এই বহুমূল্য ধাতুর উল্লিখিত গুণপণা সম্প্রতি কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণাগারে প্রযুক্ত হইয়াছিল। মানবের স্নায়বিক প্রসারণশক্তি-পরিমাপের জন্য প্লাটিনম্-ইরিডিয়ম্ সূক্ষ্মতম তারের প্রয়োজন হইয়াছিল।
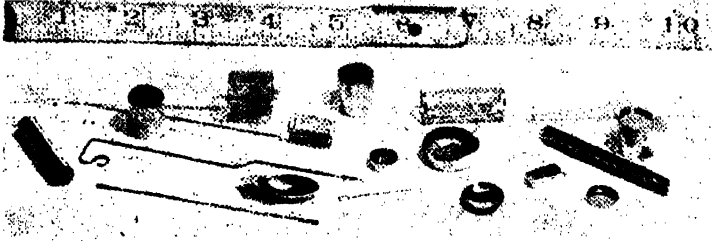
রসায়নাগারে বিভিন্ন আধার-সংরক্ষিত প্লাটিনমের সূক্ষ্মতম অংশ

কানাডার তাম্র ও নিকেল ধাতুস্তর হইতে প্লাটিনম্ অধিক পরিমাণে বিশ্বে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। তাম্র ও নিকেল যখন শোধনযন্ত্রে সংশোধিত হইতে থাকে, তখন তলদেশে এই মূল্যবান্ ধাতু এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য কাদামাটীর মধ্যে আনুষঙ্গিক উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। এই কাদামাটী ইংলণ্ডের শোধন কারখানায় জাহাজে করিয়া প্রেরিত হয়। তথায় বিবিধ প্রক্রিয়ার পর প্লাটিনম্, প্যালাডিয়ম্ ও স্বর্ণ পাওয়া যায়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও প্লাটিনম্ প্রস্তুত হইতেছে এবং আধুনিক শ্রমশিল্পে ইহা প্রযুক্ত হইয়া বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। প্লাটিনমের সাহায্যে বহুপ্রকার শ্রমশিল্প উৎপাদিত হইতেছে। এজন্য প্লাটিনমের চাহিদা অত্যধিক।

অভিযান

ভেবেছিনু বুঝি যেতে আজি একেলা তিমির রাতে
অন্তর্য্যামী ওগো প্রিয়তম তুমি সাথী হলে সাথে।
আমারে দিলে যে কত সান্ত্বনা
তা না হলে বুঝি মন মান্‌তো না
হে মোর দরদী, এলে নিয়ে যেতে হাতখানি ধরি হাতে
সুদূরের পথে সুন্দর সাথী তোমারে পেয়েছি সাথে॥

তিমির-রাত্রি দূরে গেল তাই উষসীর পানে চেয়ে
বিরাট বিশ্ব এসেছে আমার দৃষ্টির সীমা ছেয়ে,
অসীমের পথে দেখিয়াছি পথ
সাগরের ঢেউয়ে নাহিক বিপদ
পথের দুঃখ পুষ্পিত হলো ও পদ-পরশ পেয়ে
আসিয়াছ বলি শঙ্কাহরণ সান্ত্বনা-গীতি গেয়ে॥

কোন্ সাধনায় মিলিবে সিদ্ধি লভিবে মুক্তি গান?
লেখনী লিখিবে অমর ভাষ্য নিখিলে অটুট দান?
কে শিখাবে মোরে মহা প্রার্থনা
কে শিখাবে তার পূজা-বন্দনা
কোন্ প্রদীপের বরণ-আলোয় পাবে তার সন্ধান
ছন্দের রথে প্রকাশের পথে হবে তার অভিযান॥

শ্রীমতী শোভা দেবী।
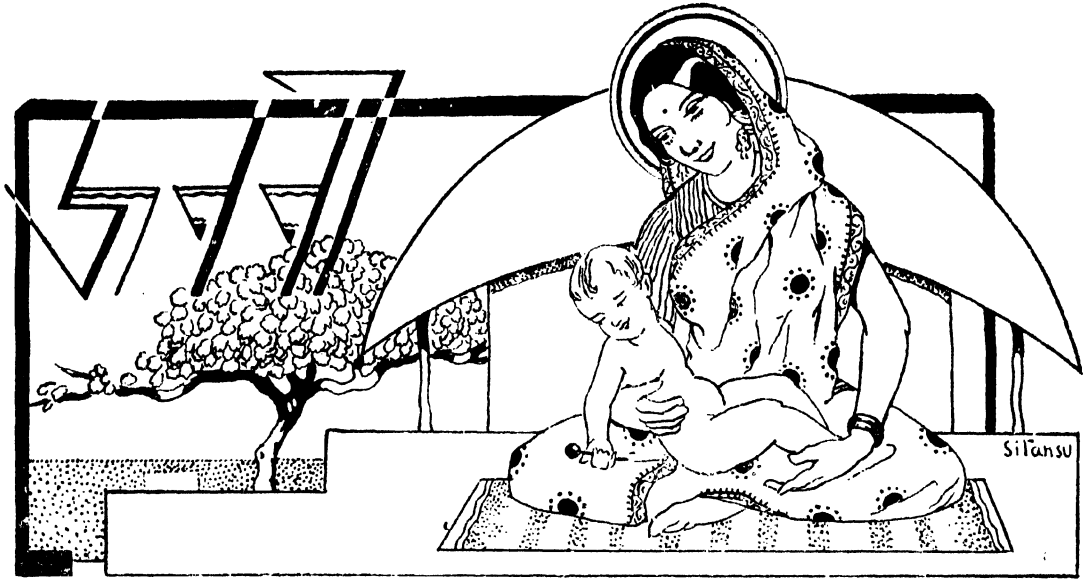
[উপন্যাস]

৩১

দশ বৎসর পরে। দশ বৎসর এক হিসাবে যেমন উপেক্ষণীয় —অন্য দিক্ হইতে দেখিতে তেমনই গুরুত্বপূর্ণ; জাতির বা দেশের ইতিহাসে যাহা সামান্য, ব্যক্তির বা পরিবারের পক্ষে তাহা তেমনই অসামান্য।

যাঁহাদিগকে লইয়া এই গল্প রচিত হইতেছে, তাঁহাদিগের পক্ষে এই দশ বৎসর সামান্য নহে।

এই দশ বৎসরের মধ্যে রেণু দুই জনকে হারাইয়াছে— আর এক জনকেও সে হারাইতে বসিয়াছে। যে পিতৃবন্ধু— প্রকাশচন্দ্র, সুধীরের মৃত্যুর পর, নানা বিষয়ে তাহার অবলম্বন ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। প্রকাশচন্দ্রের জীবনে ও চরিত্রে কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যৌবনে যে সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে হিন্দুসমাজের সকল আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া হয়ত সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি সে শ্রদ্ধা হারান নাই। প্রথমে তিনি পিতার নির্দ্দেশ বলিয়াই সে সকলের প্রতি শ্রদ্ধার অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং পরে—বিচার-বুদ্ধির উপর সেই শ্রদ্ধা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের যে উদারতা তাহার বৈশিষ্ট্য—তিনি তাহারই বিশেষ অনুশীলন করিয়াছিলেন।

সুধীরের মৃত্যুর পর হইতে তিনি লাভজনক ব্যবহারাজীবের ব্যবসার সঙ্কোচ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ট্রেণ ছাড়বার আগে দু'বার ঘণ্টা বাজে। প্রথম ঘণ্টা বাজা সুধীর জানিয়ে গেছে। যখন কেবল দ্বিতীয় ঘণ্টার অপেক্ষা, তখন মনে করা ভাল—জীবনে ওকালতী ছাড়া আরও কায আছে।" তিনি তাঁহার সম্পত্তির বিভাগেও কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রত্যেক পুত্রকে ও গৃহিণীকে সমান ভাবে সম্পত্তি দিয়া, কন্যাকে পুত্রের অর্দ্ধাংশ দিয়াছিলেন—গৃহিণীকে তাঁহার অংশ দিয়া—তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি জনহিতকর বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যয়ের জন্য তিনি নির্দ্দেশ দেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্যয়ের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। শরীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বুঝিতে পারিলেন, তখন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার পরামর্শ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"মনকে যে এখনও দৃঢ় করতে পারি নি! এখনও নাতি-নাতিনীরা কাঁদলে অস্থির হয়ে পড়ি—ওদের মধ্যেই শেষ শ্বাস ফেলব।" সকলকে লইয়া যাইবার কথা উঠিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "এত বড় স্বার্থপর হ'তে পারব না মেয়েদের সকলেরই সংসার আছে—তা'রা সংসারে তা'দের সব কর্ত্তব্য ছেড়ে—কবে আমি মরব তা'রই জন্য গিয়ে বসে থাক্‌বে! তা'র পর বুড়া বয়সে একটি মেয়ে বেড়েছে—সে ত যেতে পারবে না।" তিনি রেণুর কথাই বলিয়াছিলেন। শুনিয়া

রেণু যখন বলিয়াছিল, "কেন, জ্যেঠামশায়, আমিও যা'ব।"

তাহাতে প্রকাশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "না, মা, তুমি যেতে পার না। মানুষ যে যা'র কর্ম্মে বদ্ধ। তুমি যা'দের মা হয়ে নিজের ছেলেকেও বুকে রাখনি—নিজের মাতৃত্বকে যা'দের প্রতি কর্ত্তব্যের জন্যও দলিত ক'রে নারীত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছ, তা'দের ছেড়ে তুমি যেতে পার না। সে কর্ত্তব্য হ'তে তোমার ত ছুটী পাবার সময় হয় নি। তা'রা যদি তোমার সন্তান হ'ত, তা' হ'লে হয়ত তুমি তা'দের অন্যের কাছে রে'খে যেতে পারতে, মা। কিন্তু তা'রা তোমার নিজের সন্তান নয়—সন্তানের অধিক।"

শুনিয়া রেণু চমকাইয়া উঠিয়াছিল, "তবে কি আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে না?"

"নিশ্চয়ই হ'বে। কণার বিয়ে দিয়ে তা'কে যখন 'পরঘরী' ক'রে দেবে—তা'র নিজের সংসার নিয়ে সে ব্যস্ত হ'বে—অশোকেরও সংসার ক'রে দেবে—তখন তোমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে। তখন কর্ত্তব্য থাকবে কেবল স্বামীর সম্বন্ধে। তোমার জ্যেঠাইমা'র কর্ত্তব্য আমি গেলে শেষ হ'বে। তোমার শাশুড়ীর শরীর ভাল নাই; বিশেষ হৃদ্‌রোগ কখন কি হয়, বলা যায় না। আমি কোথাও যা'ব না—যে দিন ডাক আসবে, সে দিন তোমাদের মধ্যে থেকেই উত্তর দেব—'যাই।' যখন ছেলেমেয়েরা মুখে গঙ্গাজল দেবে, তখন তুমিও যেন তা' দিতে ভুল না।"

হইয়াছিলও তাহাই।

রেণুর মনে হইয়াছিল, পিতার মৃত্যুর শোক যেন সে নূতনভাবে পাইয়াছিল।

প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বেই পিসীমা জরাজীর্ণ ও শোকদুর্ব্বল দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্রের ও নীরেন্দ্রের চেষ্টায় তাঁহার দেবমন্দির তাঁহার জীবদ্দশাতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহার প্রতিষ্ঠাও হইয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন পিসীমা'র ভাব যে দেখিয়াছিল, সে-ই অশ্রু-বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি দেবমূর্ত্তির পদতলে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলেন—তিনি যেন আর সুধীরের নিকট হইতে দূরে না থাকেন—ঠাকুর তাঁহাকে সেই সৌভাগ্য দান করুন—তাঁহার আর কিছুই চাহিবার নাই। তদবধি তিনি অধিকাংশ সময় ঠাকুরবাড়ীতেই কাটাইতেন—দুই এক দিনের ব্যবধানে কলিকাতায় আসিয়া এক বার রেণুর গৃহে, এক বার মৃণালিনীর গৃহে যাইতেন।

তাহার পর তিনি আর দীর্ঘদিন জীবিত থাকেন নাই। নীরেন্দ্রই তাঁহার শেষ কায করিয়াছিল।

পূর্ণিমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন—যে কোন দিন রোগের আক্রমণে তিনি প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। শুনিয়া পূর্ণিমা বলিয়াছেন, "তা'র চেয়ে ভাগ্য আর কি হ'তে পারে? যদি নিজে না ভুগে আর কাউকে না ভুগিয়ে যেতে পারি, তবে সে ত পরম লাভ।" তিনি বলিয়াছেন, যদি তিনি রোগ ভোগ করেন, তবে যেন তাঁহাকে পিসীমা'র ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

রেণুর ইচ্ছা—পূর্ণিমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই স্বামীর কন্যার বিবাহ হয়। প্রকাশচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন—কণার সংসার হইলে তাহার একটি বন্ধন ছিন্ন হইবে। আর কণার জন্য পাত্র-নির্ব্বাচনের দায়িত্ব যদি পূর্ণিমা গ্রহণ করেন, তবেই ভাল হয়। নীরেন্দ্রের পরনির্ভরশীলতার বিষয় মনে করিয়া সে ভাবিত—সে হয়ত সে দায়িত্ব রেণুকেই দিবে। তাই সে প্রায়ই পূর্ণিমাকে কণার বিবাহ দিতে বলে। পূর্ণিমাও সে জন্য আবশ্যক উপদেশ দেন। কিন্তু ইচ্ছানুরূপ সম্বন্ধ সহজে পাওয়া যায় না। বিশেষ সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া পূর্ণিমার যেমন রেণুরও তেমনই মত ছিল—তাহার বিবাহ দূরে দেওয়া অভিপ্রেত হইবে না।

অশোক ও দেবদত্ত পড়িতেছে—কিন্তু দুই জনে দুই বিদ্যালয়ে; রেণুর অভিপ্রায়ানুসারেই তাহা হইয়াছে। উভয়েই মেধাবী এবং উভয়েই ভবিষ্যৎ উন্নতির লক্ষণ-বিকাশ করিতেছে।

কুমুদা কোথায় থাকিবে, তাহা মৃণালিনীর ও রেণুর বিবেচনার বিষয় হইয়াছিল। পিসীমা'র মৃত্যুর পর তাঁহারা তাহাকে সুধীরের শূন্য গৃহেই আনিয়াছেন। সে তথায় থাকিয়া প্রতিদিন এক বার রেণুর গৃহে, আর এক বার মৃণালিনীর গৃহে যায়—তাহার আহার মৃণালিনীর গৃহেই হয়।

এই দশ বৎসরে কাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই? কিন্তু রেণুর পরিবর্ত্তন যেমন তাহার বয়সের হিসাবে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে—মৃণালিনীর পরিবর্ত্তন তেমনই তাঁহার বয়স বিবেচনা করিলে অত্যন্ত অল্প হইয়াছে।

রেণুর পরিবর্ত্তন তাহার দেহে অকাল প্রৌঢ়ত্বের শেষ

সীমা আনিয়াছে। মানুষের দেহ তাহার মনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না। রেণু তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া পর্য্যন্ত তাহার মনের সহিত যে সংগ্রাম করিয়াছে, তাহার তীব্রতা সে ব্যতীত আর কেহই বুঝি সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। যদি কেহ তাহা অনুমান করিয়া থাকেন, তবে দুই জনের পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল—সুধীর আর মৃণালিনী। সুধীরের পক্ষে সেই অনুভূতি এতই বেদনাদায়ক হইয়াছিল যে, তাহাতেই যে তাহার অকালমৃত্যুর কারণ নিহিত ছিল, তাহা বলা যায়। তাহাকে যৌবনেই আপনাকে প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত করিতে হইয়াছিল। প্রথম সন্তান প্রসবের পরই তাহার পত্নী রুগ্না হইয়া পড়িলে সে যেরূপভাবে তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহা যে দেখিয়াছে, সে-ই প্রশংসা না করিয়া পারে নাই। সে যেন বাহিরের সব আকর্ষণ হইতে আপনাকে দূর রাখিয়াছিল—আনন্দ তাহার অজ্ঞাত ছিল। সে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা করিত—সে-ও, বোধ হয়, আপনাকে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য—সংযমের অনুশীলনে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য। সমগ্র অবসরকাল সে রোগীর কার্য্যে ব্যয় করিত। তাহাই যেন তাহার সাধনা ছিল। সেই সাধনায় সে কিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার পরিচিত সকলেই জানিতেন। যখন তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, বুঝি তাহার আর কোন বন্ধন নাই—জীবনে তাহার সব কায শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পর সে বুঝিয়াছিল—তাহার বন্ধন ছিল, সে বন্ধন তাহার স্ত্রীরই সৃষ্ট—তাহার একমাত্র সন্তান—কন্যা। সেই কন্যাই তাহার জীবনের আকর্ষণ ও স্নেহের কেন্দ্র হইয়াছিল। কন্যার বিবাহে যাহা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ে নিরাশার অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল - সে মনে করিয়াছিল, সুখ যাহার ভাগ্যে নাই, সে কি সুখের সন্ধান করিলে তাহা পাইতে পারে? সে কন্যার অভিমান আপনার অপরাধপ্রসূত বলিয়াই বিবেচনা করিত, আপনাকেই কন্যার ম্লান মুখের জন্য দায়ী বিবেচনা করিত। গৃহে যখন তাহার আর কোন আকর্ষণ ছিল না, তখন সে তাহার হৃদয়ের বেদনা ভুলিবার জন্যই—কেহ কেহ যেমন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তেমনই—ব্যবহারাজীবের কাযে অত্যন্ত অধিক মনোযোগদান করিয়াছিল। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল—তাহার অনিদ্রা-রোগ যত প্রবল হইতেছিল, সে ততই রাত্রিকালেও অধ্যয়ন করিত। অধ্যয়নফলে সে ব্যবহারশাস্ত্রে অনন্য-সাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহার সেই খ্যাতি যত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার ব্যবসার বিস্তারও তত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ব্যবসার বিস্তারলাভের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমও অধিক করিতে হইত। সেই গুরু শ্রমই তাহার অকালমৃত্যুর কারণ!

রেণুর বিবাহিত জীবন তাহার মনের সহিত সংগ্রামেই পূর্ণ ছিল। সে মনে করিয়াছিল—যে মাসীমা তাহাকে কন্যার অধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন আর যে পিতার সে-ই সর্ব্বস্ব—তাঁহারাও তাহার সম্বন্ধে ভুল করিলেন! তাঁহারাই যদি ভুল করিতে পারেন, তবে যে স্বামী ভুল করিবেন—তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? সে যখন প্রথম যৌবনে আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক ভালবাসার স্ফূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তখন তাহার অদৃষ্ট তাহার প্রতি বিমাতার মত ব্যবহার করিল। যে পিতার নিকট সে বহু বার শুনিয়াছে—স্ত্রীলোক বা পুরুষ কাহারও একাধিক বার বিবাহ ভালবাসার মর্য্যাদাহানিকর, সেই পিতাই তাহার বিপত্নীকের সহিত বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাহার হৃদয় অভিমানে পূর্ণ হইয়াছিল। বসন্ত যেমন প্রকৃতির সকল দিকে পরিবর্ত্তন প্রস্ফুরিত করে—শীতের স্পর্শে রিক্তপত্র তরুলতায় কুসুমসুষমা ফুটাইয়া তুলে, বিহগের কণ্ঠে সঙ্গীত ও তাহার দেহে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ফুটায়—তেমনই ভালবাসা নারীর হৃদয়ে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করে; বসন্তে যেমন চারিদিকে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়—যৌবনের ভালবাসায় তেমনই মানুষের কাছে চারি দিক্ সুন্দর হয়। সেই ভালবাসা যখন রেণুর হৃদয়ে বিকশিত হইতেছিল, সেই সময় স্বামীর এতটুকু অসাবধানতায়—একটি কথায়, তাহার পক্ষে জীবনে সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; অকালজলদোদয় যেমন বিকাশোন্মুখ পদ্মের উপর নবরবিকরপাত নিবারিত করে, তেমনই সেই কথা তাহার বিকাশোন্মুখ ভালবাসার বিকাশ রুদ্ধ করিয়াছিল। সে তাহার হৃদয়ের সহিত সংগ্রামজনিত বেদনায় ব্যথিত হইয়াছিল। সেই বেদনা লইয়াই তাহাকে ভাবী-জননীর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছে—সেই বেদনার

ভাগ্য-পরিচয় গোপন রাখিয়া সংসারের সব কায সম্পন্ন করিতে হইয়াছে ; যেন বুকে বৃশ্চিকের দংশন-যন্ত্রণা লইয়া স্বাভাবিক ভাবে কায করিতে হইয়াছে—স্বাভাবিকতার ছদ্মবেশে অস্বাভাবিক অবস্থা গোপন রাখিতে হইয়াছে। তাহাতে কেবল ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অনুশীলনই হইয়াছে— কিন্তু সবই দুঃখ। সেই দুঃখের মধ্যে দেবদত্ত প্রসূত হইল— তখন সে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। জীবনের সহিত মৃত্যুর সংগ্রামে জীবন যখন জয়ী হইল, তখন আবার নূতন চিন্তা তাহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল—সে কি করিবে? সেই সময় সে যাহা স্থির করিল, তাহাও যে তাহাকে পীড়িত করে নাই, তাহা নহে। সে তাহার পুত্রকে তাহার মাসীমা'কে দিয়া আসিল। তখনও তাহার মনে অভিমান প্রবলই ছিল। সে নারীজন্মে ধিক্কার দিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিল—সে তাহার নারীত্বের জন্য তাহার মাতৃত্ব বলি দিবে ; স্বামীর যে কন্যাপুত্রকে পালন করাই তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সে তাহাদিগকেই পালন করিবে। যে স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসার স্থানে সে অভিমানকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সেই স্বামীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ হইয়াছিল, তাহাও সহজে অনুমেয়। তাহার সবই যেন ছদ্মবেশ! এইরূপ অবস্থায় সে যদি একটিমাত্র আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া থাকে, তবে সে স্নেহের আকর্ষণ, সেই আকর্ষণ তাহাকে কণা ও অশোকের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম তাহার দেহে ও ব্যবহারে অসাধারণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে সে যখন পিতার ব্যবহারে আপনার ভুল কেবল উপলব্ধি করিতেছিল—আবার এক বার পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই সময় অদৃষ্ট তাহার হস্ত হইতে, অমৃতপূর্ণ পাত্র, তাহার ওষ্ঠাধর স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই, কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছে; পিতা অপ্রত্যাশিতভাবে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে রেণু তাহার প্রতি পিতার সীমাহীন স্নেহের যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতে পিতার প্রতি তাহার অভিমান মন হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে—সে মনে করিয়াছে, পিতার সম্বন্ধে সে বিষম ভুল করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে আর এক কারণে বিষম বেদনা অনুভূত হইতেছিল। সে ভুল বুঝিয়া সেই স্নেহশীল পিতার মনে কত বেদনাই দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছে, সে-ই কি সুধীরের অকালমৃত্যুর জন্য অন্ততঃ অংশতঃ দায়ী নহে? যদি তাহাই হয়? সে যেন কিছুতেই আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। সে তাহার জীবনের সব কথার আলোচনা করিত—আলোচনা করিত, আর বেদনানুভব করিত। সে জ্ঞানসঞ্চারাবধি মাতাকে রুগ্না দেখিয়াছে—তাহার পর মাতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগের পর তাহার বিবাহ—তাহার বিবাহিত জীবনে কেবলই মনের সহিত সংগ্রাম ; মা হইয়াও সে তাহার পুত্রকে পুত্ররূপে বক্ষে ধরিতে পারে নাই—ধরে নাই ; তাহার পর পিতৃবিয়োগ।

এই পিতৃবিয়োগ তাহাকে তাহার আপনার নিকট অপরাধী করিয়াছে। যদি তাহার মাসীমা ও তাহার পিতৃবন্ধু প্রকাশচন্দ্র তাহাকে তাহার সেই অপরাধ-বিশ্বাস-বেদনার অপনোদনে সাহায্য না করিতেন, তবে সেই বিশ্বাস-বেদনা যে সে সহ্য করিতে পারিত না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সংগ্রাম, এই ঘটনা-বিপর্য্যয়, এই বেদনা রেণুকে পিষ্ট করিয়াছে ও করিতেছে। সে পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে চিত্তের দৃঢ়তা লাভ করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে সব সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছে—সে বিষয়ে সে সুধীরের উপযুক্ত কন্যা।

কিন্তু মনের এই ভাব দেহেও তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনা-পরম্পরা যদি কাহাকেও পীড়িত করিতে না পারিয়া থাকে, তবে সে কেবল মৃণালিনীকে। তাহার কারণ—তিনি আপনাকে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই তিনি এই সংসারের সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য মনে করিয়া সংসারের কায কেবল কর্ত্তব্য বিশ্বাসে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। যখনই মন কোন কারণে চঞ্চল হইয়াছে, তখনই তিনি দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন—দেবতা কখন তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন নাই। দুঃখ আসিয়াছে—কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর আর যে সব দুঃখ আসিয়াছে, সে সব সেই বিরাট দুঃখের তুলনায় উপেক্ষণীয়—যেন সমুদ্রের তুলনায় সরোবর। সে সব দুঃখ তিনি তাঁহার পরীক্ষা বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। যিনি

সুখ ও দুঃখ অবিচলিতভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি যেমন প্রশংসার জন্য ব্যাকুল হন না, তেমনই নিন্দাও উপেক্ষা করেন। পূর্ণিমা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক সময় রেণুকে বলিয়াছেন—"বৌমা, তোমার মাসীমা'র কাছে গেলে অস্থির মন স্থির হয়—তিনি যেন পুণ্যতীর্থ।" তিনি যে দেবদত্তকে পুত্রের মত পালন করিয়াছেন, তাহাও কর্ত্তব্য-বোধে; যদি তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য না হইবে, তবে প্রসব-কালে রেণু তাঁহার নিকটে আসিয়া পীড়িতা হইয়া পড়িবে কেন—আর কেনই বা সে তাহার পুত্রকে তাঁহার অঙ্কে দিয়া যাইবে?

কিন্তু যে নৌকা বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করে, সে যেমন তরঙ্গে সামান্য চাঞ্চল্য ভোগ করিলেও কখন স্থানভ্রষ্ট হয় না, মৃণালিনী তেমনই অন্য সকল কাযের মধ্যে কখন আপনার স্থিরসঙ্কল্পভ্রষ্ট হয়েন নাই—দেবসেবায় কোন দিন কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হয়ত রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়াছে; হয়ত কোন কোন দিন দেবতার প্রসাদগ্রহণেরও অবসর হয় নাই; কিন্তু সকল অবস্থাতেই তাঁহার পূজার্চ্চনার নিয়ম তিনি কখন লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি তাঁহার জীবন দেবতার সেবা-কার্য্যেই উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন—এবং সেই কার্য্যেই তিনি অনাবিল শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতে পারি-তেন:—

ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই
বহু আর;
বহিয়াছি এ জীবন—আশার ও
নিরাশার;

লভিয়াছি শোকে শান্তি—লভিয়াছি
দুঃখে সুখ;—
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র,—প্রেমে
ভরিয়াছে বুক"

—আজ তিনি দেবতার শেষ আহ্বানের জন্য এই "জীবন-প্রভাসতীরে" ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন—

"সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু—ভাসে কৃষ্ণ-
পদতরি—
এই কূলে সন্ধ্যা—ঊষা অন্য কূলে
মুগ্ধকরী।"

তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ই দেবতার দান বলিয়া বিবেচনা করিতেন বলিয়াই যেমন কখন সুখে উল্লসিত হয়েন নাই, তেমনই দুঃখেও বিচলিত হয়েন নাই। শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্র যেমন নীলাচলের চরণে তাহার গর্জ্জনশব্দ স্তম্ভিত করে, তেমনই বুঝি কাল তাহার পরিবর্ত্তন মৃণালিনীর নিকটে আনিলে তাহা স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাই এই দশ বৎসরে তাঁহারই পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়াছে।

রেণু অনেক বার মনে করিয়াছে, সে তাহার সম্মুখে যে আদর্শ পাইয়াছে, সে কেন তাহারই অনুসরণ করে না? সে সে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে প্রভেদ অনিবার্য্য হয়, তাহা অতিক্রম করা যদি অসম্ভব না হয়, তবে তাহা যে শক্তিতে সম্ভব করা যায়, সে শক্তি সে সঞ্চয় করিতে পারে নাই। যে সাধনায় সে শক্তি সঞ্চয় করা যায়, হয়ত সে সেই সাধনা করিবার অবসর পায় নাই। সময় সময় সে মনে করিয়াছে, তাহার অভিমানই তাহার সেই সাধনার অন্তরায় হইয়াছে—কিন্তু সে কিছুই স্থির বুঝিতে পারে নাই। তবে সে বুঝিয়াছে, মাসীমা'র মত সাধনা যে করিতে পারে, সে-ই জীবনে প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারে—হয়ত তাহার সেই শান্তি জীবনের পরপারেও তাহাকে ত্যাগ করে না।

ঘটনাবহুল দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে—কালের রথ কখন নিশ্চল হয় না—কেহ তাহার চক্রতলে পড়িয়া পিষ্ট হয়, কেহ পার্শ্বে থাকে। যিনি সেই রথের সারথি—যিনি কালের রথচক্র পরিচালিত করেন, মাসীমা তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
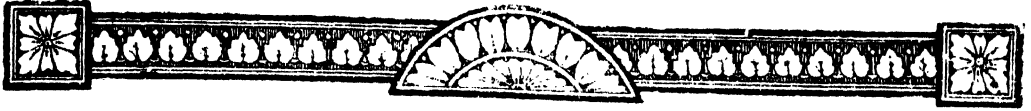
নূতন আয়কর-বিধান

তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ফলে ভারত সরকারের পক্ষে নূতন কর স্থাপনের দ্বারা আয়বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রাদেশিক সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি হওয়ায় প্রদেশবিশেষ হইতে যে বিশেষ বিশেষ করের অংশ ভারত সরকারকে দেওয়া হইত, তাহা যে ক্রমশঃ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, তাহাও প্রাদেশিক সরকারের ব্যবহার দেখিয়া ভারত সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে বঙ্গদেশের পাট-শুল্কের কথা ধরা যাইতে পারে। এই শুল্কের অধিকাংশই এক সময়ে ভারত সরকার গ্রহণ করিতেন, এখন বাঙ্গালায় অর্থাভাব নিবারণের জন্য ঐ শুল্কের অংশ বাঙ্গালা সরকারকে ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এখন পাটশুল্কের সমগ্র অংশই যাহাতে বাঙ্গালা সরকারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদত্ত হয়, তাহার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের ফলে ভারত সরকারের আয় হ্রাসের সম্ভাবনা বুঝিয়া ভারত সরকারের বর্ত্তমান অর্থসচিব সার জেম্‌স্ গ্রীগ তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারত সরকারের আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য আয়কর আইনের পরিবর্ত্তন করিয়া যাহাতে এই করের দ্বারা ভারত সরকারের আয় বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিছুদিন হইতে তাহার চেষ্টায় নিরত ছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রায় এক বৎসরের অধিককাল হইতে নূতন আয়কর সংশোধিত বিল রচনা করিয়া গত বৎসরের বাজেট আলোচনা শেষ হইবার পর গত ৪ঠা এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ঐ বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন।

গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যে আয়কর-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, এতাবৎকাল তদনুসারেই আয়কর আদায় হইয়া আসিতেছে। এই আইনের বিধানে অনেকের পক্ষে আয়করে অব্যাহতি লাভ করিবার সুযোগ ঘটিতেছে বলিয়া সরকার পক্ষ বলিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলেই এই নূতন বিলের উদ্ভব। এই বিল রচনা করিবার পূর্ব্বে আয়কর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়, ঐ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান বিল রচনা করা হইয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হইলে বর্ত্তমানে যে পরিমাণে আয়কর আদায় হইতেছে, তদপেক্ষা অন্ততঃ দুই কোটি টাকা হইতে ৫ কোটি টাকা অধিক আদায় হইতে পারিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়াছেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের আয়কর আইনে বিধান ছিল যে, ভারতের কোনও অধিবাসীর যে আয় তাহার হস্তগত হইবে, তাহারই উপর আয়কর দিতে হইবে; কিন্তু নূতন আইনে ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহার যে আয় বর্ত্তাইবে, তাহা তাঁহার হস্তগত হউক বা তাহা বিদেশের কোনও ব্যাঙ্কে বা অন্য যে কোথাও থাকুক, তাঁহাকে উহার উপর আয়কর দিতে হইবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির ব্রিটিশ ভারতের বহির্ভূত অন্য প্রকার আয় যদি ব্রিটিশ ভারতে আনয়ন করা হয়, তবেই তাহার উপর আয়কর দিতে হইবে; উহা ব্রিটিশ ভারতের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে উহার উপর আয়কর দিতে হইবে না। যাহারা মূলতঃ ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসী নহেন, কিন্তু কোনও কারণে ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীর অধিকার (domicile) অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ বিধান প্রযুক্ত হইবে না। যদিও এই বিল বিলাতের আয়করের অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছে, তথাপি এই স্থানে বিলাতী আইনের অনুকরণের সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই—বিলাতে এ বিষয়ে দেশের প্রকৃত অধিবাসীর (resident) মধ্যে ও যাহারা দেশে বসবাসের অধিকার (domicile) অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও রূপ ভেদ করা হয় না, কিন্তু ভারতের প্রস্তাবিত আয়কর আইনে তাহাই করা হইয়াছে। ইহার যে বিশেষ কারণ আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যবসায়ের দ্বারা বা চাকুরীর দ্বারা অর্থার্জ্জন করিবার জন্য অনেক য়ুরোপীয় ভারতের অধিবাসিত্ব (domicile) অর্জ্জন করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদিগের উপর ভারতের খাস্ অধিবাসীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐরূপ ভাবে আয়কর আদায় করা ভারত সরকার সমীচীন মনে করেন নাই। এইজন্যই এ দেশের খাস অধিবাসী ও প্রয়োজনে এ দেশে অধিবাসীর মধ্যে ভারত সরকার এই ভেদরেখা টানিয়াছেন।

আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রস্তাবিত আইনে, পূর্ব্বের আইন হইতে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান আইনের

ব্যবস্থায় ভারতের কোন অধিবাসী যদি তাঁহার মোট আয়ের ষষ্ঠাংশ জীবনবীমার প্রিমিয়াম দিবার জন্য ব্যয় করেন, তবে তাঁহার মোট করধার্য্যযোগ্য আয়ের ঐ ষষ্ঠাংশের উপর আয়কর স্থাপন করা হয় না। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে বীমাকারীর মোট আয়ের ঐ ষষ্ঠাংশ যদি ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত হয়, তবেই তাহার উপর আয়কর ধার্য্য করা যাইবে না, যদি মোট আয়ের ষষ্ঠাংশ ছয় হাজারের অধিক হয়, তবে ঐ ছয় হাজারের অধিক টাকা প্রিমিয়াম দিতে হয় এমন বীমা করিলে তাহার পর আয়কর ধার্য্য করা হইবে। প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য যে সিলেক্ট কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবারের বীমাকারীর বেলায় আয়ের ষষ্ঠাংশ বার হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইলেও তাহার উপর আয়কর ধার্য্য করা যাইতে পারিবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাহাতে কোনও কৌশলের দ্বারা কেহ আয়কর হইতে অব্যাহতি লাভের সুযোগ না পান, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার চেষ্টা হইয়াছে। সাধারণতঃ চাকুরীজীবিগণ ঋণ হিসাবে বা অগ্রিম বেতন হিসাবে কার্য্যস্থান হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পরে বেতনের টাকা হইতে মাসে মাসে ঐ টাকা কাটিয়া দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান আইনে উহার উপর আয়কর ধার্য্য করা যায় না, কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে কার্য্যস্থল হইতে ঐরূপ ঋণ বা অগ্রিম বেতন গ্রহণ করা বেতন লওয়ার তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং বেতনের উপর যে হারে আয়কর ধার্য্য হয়, উহার উপরও সেই ভাবে আয়কর ধার্য্য হইবে।

অন্যায় উপায়ে আয়কর বিভাগকে ফাঁকি দিলে এবার যে দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব-আইনে বিহিত দণ্ডের অপেক্ষা গুরুতর। প্রস্তাবিত আইনের ৩২ ধারায় এই দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা সময়ে ইন্‌কামট্যাক্সের রিটার্ণ দাখিল না করিলে এবং রিটার্ণের সমর্থক প্রমাণ উপস্থিত না করিলে যে পরিমাণ আয়কর ধার্য্য করা হইত, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ব্যবস্থা-পরিষদে আয়কর বিলের আলোচনায় দণ্ডের পরিমাণ আয়-কর ধার্য্য হইতে তাহার দেড়গুণ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আর যদি আয়কর ধার্য্য হইবার মত আয় না থাকে, তাহা হইলেও এই অপরাধে পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে হইবে।

আয়-করের বিপুল সেরেস্তা ও তাঁহাদের গোয়েন্দা-বাহিনীর অভাব না থাকা সত্ত্বেও, নোটিশ জারি না হইলেও আয়করের রিটার্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দাখিল না করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়!

বর্ত্তমানে যে আইন আছে, তাহাতে করধার্য্যের যোগ্য আয় যদি বৃটিশ ভারতের বহির্ভূত কোন কোম্পানীর নামে হস্তান্তর করা যায় এবং ঐ কোম্পানী হইতে পরে কোনও প্রকারে ঐ টাকা লওয়া হয়, তবে ঐ আয়ের উপর কর ধার্য্য হইতে পারে না। প্রস্তাবিত আইনে ঐরূপে হস্তান্তর করিলেও তাহা হস্তান্তরকারীর সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইয়া তাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইতে পারিবে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে যদি কাহারও আয়কর ধার্য্যের যোগ্য আয় থাকে, তবে যে ব্যক্তির আয় অল্প তাহার নামে যদি ঐ আয়ের অর্থ হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হয়, তবে ঐ হস্তান্তরিত আয় যাহাকে হস্তান্তর করা হইয়াছে—তাহার আয় করধার্য্যের যোগ্য না হইলে তাহার উপর কর ধার্য্য করা যায় না। প্রস্তাবিত আইনে এইরূপে হস্তান্তরিত আয়ও আয়করের আমলে আসিবে এবং তাহা হস্তান্তরকারীর আয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে যদি ফিরিয়া পাইবার কোনও উপায় না রাখিয়া স্থায়িভাবেই ঐরূপ হস্তান্তর করা হয়, তবে হস্তান্তরিত আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য হইতে পারিবে না।

আয়কর বিভাগ হইতে যাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইতে পারে—তাহার উপর নোটিশ জারি করিবার যে নিয়ম বর্ত্তমান আইনে ছিল, প্রস্তাবিত আইনে তাহা থাকিবে না। বিনা নোটিশেও আয়কর ধার্য্য হইবার যোগ্য আয় থাকিলে তাঁহাকে রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে। আয়কর ধার্য্য করিবার নোটিশ আয়কর বিভাগের কর্ম্মচারী ইচ্ছা হইলে জারি করিতে পারিবেন—প্রস্তাবিত আইন অনুসারে ঐরূপ নোটিশ জারি করিতে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন না।

সমস্ত আইন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে বলিয়া সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় ধারাগুলির মর্ম্মমাত্র আলোচিত হইল। এই বিল গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা হয়। পরে এই বিল সাধারণের অবগতির জন্য প্রচার না করিয়া একেবারে সিলেক্ট কমিটীতে দেওয়া হয়। গত ১১ই নবেম্বর

তারিখে সিলেক্ট কমিটীর সদস্যগণ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করেন।

সিলেক্ট কমিটী প্রস্তাবিত আইনের মূলনীতি সম্বন্ধে কোনও পরিবর্ত্তন না করিয়া কোনও কোনও বিষয়ে সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিলে স্বামীর ও স্ত্রীর পৃথক্ আয় থাকিলে উভয়ের আয় একত্র করিলে যে মোট আয় হয়, তাহার উপর আয়কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বামীর আয় যদি বার্ষিক ১৮০০৲ হয় এবং স্ত্রীর আয় যদি বার্ষিক ১২০০৲ হয়, তবে প্রস্তাবিত আইন অনুসারে উভয়ের আয় একত্র করিয়া মোট তিন হাজার টাকার উপর আয়কর ধার্য্য হইতে পারিত; কিন্তু সিলেক্ট কমিটী এই ব্যবস্থা রহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যেকের করধার্য্যযোগ্য স্বতন্ত্র আয় থাকিলে তাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইবে। কিন্তু কমিটী এ বিষয়ে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বামী যদি তাঁহার আয় হইতে একাংশ স্ত্রীকে দান করেন, তবে ঐ প্রদত্ত অংশকে স্বামীর আয় বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইতে পারিবে।

বীমাকারীর উপর আয়কর ধার্য্য করিবার সম্বন্ধে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিষয়ে সিলেক্ট কমিটী যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বীমা কোম্পানীর উপর আয়কর ধার্য্য করিবার নিয়মাবলী সম্বন্ধেও সিলেক্ট কমিটী কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এতদিন সেন্‌ট্রাল বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ের নিয়মানুসারেই বীমা কোম্পানীগুলির উপর আয়কর ধার্য্য করা হইত, প্রস্তাবিত আইনে বীমা কোম্পানীগুলির উপর আয়কর ধার্য্য করিবার নিয়মাবলী আয়কর আইনের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আয়করের রিটার্ণ দাখিল না করিলে প্রস্তাবিত আইনে যে দণ্ডের বিধান করা হইয়াছিল, সিলেক্ট কমিটী তাহারও কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। যাঁহাদের আয় সাড়ে তিন হাজার টাকার অধিক, তাঁহারা যদি রিটার্ণ দাখিল না করেন, তবে তাঁহারাই প্রস্তাবিত আইন অনুসারে দণ্ডিত হইবেন। ঐ দণ্ডের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মূল বিলে আয়কর-বিভাগের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় বৎসর কালের জন্য আয়কর ধার্য্য করিতে পারিবেন এইরূপ বিধান ছিল, কিন্তু সিলেক্ট কমিটী উহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ছয় বৎসরের স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী চারি বৎসর কালের জন্য আয়কর ধার্য্য করিবার বিধান দিয়াছেন—তবে যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া আয়কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের উপর পূর্ব্ববর্ত্তী ছয় বৎসর কালের জন্য আয়কর ধার্য্য করা যাইতে পারিবে।

প্রস্তাবিত বিলের বিধান অনুসারে আয়কর-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত কালের মধ্যে কোনও গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু সিলেক্ট কমিটী ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। আয়কর বিভাগের কর্ম্মচারিগণ আয়কর বিভাগের কমিশনারের লিখিত অনুমতি ভিন্ন কোনও গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন না। ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনায় এই ধারাটি রহিত করা হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটী "হিসাবরক্ষক"—শব্দে যাহাকে রেজিষ্টার্ড—"হিসাবরক্ষক" (Chartered Accountants) বুঝায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আয়কর-সম্পর্কিত মোকদ্দমায় 'রেজিষ্টার্ড' হিসাবরক্ষক ও উকীলগণ পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য্য করিতে পারিবেন। তবে ইঁহারা কোনও আইন-বিরোধী কার্য্য করিলে আয়করের কমিশনার উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত আইনে আয়কর সংক্রান্ত মোকর্দ্দমায় আপীলের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয়ের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু সিলেক্ট কমিটী ইহার জন্য বিচারালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আয়কর আদালতের (Tribunal) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যাইবে। এই আদালতের বিচারক-পদে একজন আইনসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ও একজন হিসাব-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি থাকিবেন। কিন্তু যাহাতে বর্ত্তমানে আরব্ধ কার্য্যপ্রণালীর বে-বন্দোবস্ত না হয়, সেইজন্য এই বিল আইনে পরিণত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে এই আদালত স্থাপিত হইবে না।

সিলেক্ট কমিটী হইতে সেন্‌ট্রাল বোর্ড অব্ রেভিনিউ-এর (Central Board of Revenue) উপর আয়কর বিভাগের কমিশনার নিয়োগের ভার প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই বোর্ডের উপরই আয়কর বিভাগের যাবতীয় কর্ম্মচারীর নিয়ন্ত্রণের ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

সিলেক্ট কমিটীতে আরও কতকগুলি ব্যাপারের পরিবর্ত্তন

সাধিত হইয়াছে। "লভ্যাংশ" (Divident) বিষয়ে যে সংজ্ঞা প্রস্তাবিত আইনে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনও কোম্পানী হইতে যে কোনও প্রকারে অংশীদারগণকে যে টাকা প্রদত্ত হইবে, তাহাই লভ্যাংশ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত আইনে যে সকল পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। অতঃপর পরিষদে প্রস্তাবিত আইনের আলোচনায় যে যে ব্যাপার উপস্থিত করা হইয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। প্রস্তাবিত আইনের চতুর্থ ধারায় প্রস্তাব হইয়াছিল যে, ভারতের যে কোনও অধিবাসীরই ভারতের বাহিরে যে কোনও প্রকার আয় বর্ত্তাইবে—সেই আয় ভারতে আনয়ন করা হউক বা না হউক, তাহার উপর আয়-কর ধার্য্য করা হইবে। ইহাতে ভারতের কোনও অধিবাসী অন্য যে কোনও দেশে কৃষিকার্য্যের দ্বারা বা ব্যবসায়ের দ্বারা যাহা কিছু আয় করুক না কেন, তাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইবে। ইহাতে যে সকল ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে জমিজমা খরিদ করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছেন, অথবা মালয়ে, ফিজিতে বা পূর্ব্ব-আফ্রিকায় কৃষিকার্য্য বা ব্যবসায়ের দ্বারা কিছু আয় করিতেছেন—তাঁহাদেরও সেই আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য হইবে। এই সকল স্থান হইতে অর্জ্জিত অর্থ তাঁহারা দেশে আনিতে পারুন বা না পারুন, তাঁহারা যে অর্থ আয় করিয়াছেন, তাহার উপর ভারতের আয়কর বিভাগ আয়-কর ধার্য্য করিবেন। এই ধারাটি যাহাতে আয়কর আইন হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য গত ২৯শে নভেম্বর তারিখে মিঃ বি, দাস ব্যবস্থা পরিষদে সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে, মুসলমান লীগের পক্ষ হইতে এবং স্বতন্ত্র দলের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের সমর্থন করা হয়। অবশেষে বে-সরকারী য়ুরোপীয় দলও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইহাতে এই ধারাটি উঠিয়া যাইবার মত হইলে তখন অর্থ-সচিব সার জেমস্ গ্রীগস্ বলেন, যদি এই ধারাটি পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে নূতন আয়কর আইন বিধিবদ্ধ করিয়া লাভ নাই। এই ব্যাপারে সমগ্র বিলটিই পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটায় এই ধারাটি সম্বন্ধে সর্ব্বদলের নেতারা যাহাতে একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন, তজ্জন্য পরিষদের অধিবেশন কয়েক ঘণ্টার জন্য মুলতুবী রাখিয়া প্রেসিডেণ্ট সর্ব্বদলের নেতাদিগকে এ বিষয়ে অর্থ-সচিবের সহিত আপোষ আলোচনা করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা হইবার পর, ব্যবস্থা পরিষদে আয়কর-বিলের অন্যান্য ধারা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু এই চতুর্থ ধারাটিই নূতন আয়কর আইনের সর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক ধারা। এই ধারাতেই ভারতের অধিবাসী (resident) ও যাঁহারা বসবাসের অধিবাসিত্ব (domicile) অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভেদ করা হইয়াছে। এই ভেদের ফলেই এদেশের ব্যবসায়ী য়ুরোপীয় কোম্পানী-গুলিকে ও য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগকে অনেক সুবিধা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের বেলায় ভারতের বহির্দ্দেশে মোট আয় বর্ত্তাইবার (accrual) পরিবর্ত্তে তাঁহাদের যে আয় ভারতে আনয়ন (remittance) করা হইবে, তাহারই উপর আয়কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু বে সরকারী য়ুরোপীয়গণের প্রতিনিধিও এই ধারায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাঁহারা এইরূপ পার্থক্যের দাবী করেন না। তথাপি এই ধারাটির বন্ধন হইতে ভারতের অধি-বাসিগণকে মুক্তিদান করিতে অর্থসচিব কিছুতে সম্মত হন নাই। তাঁহার মতে এই ধারাটি পরিত্যক্ত হইলেই প্রস্তাবিত আয়কর বিধানের দ্বারা যে অর্থাগমের আশা করা যাইতেছে, তাহা একেবারেই বিফল হইবে এবং তাহা হইলে নূতন আয়কর বিধানের কোনই প্রয়োজন থাকিবে না।

এই ধারাটি লইয়া প্রায় দুই সপ্তাহের অধিবেশনে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে অর্থ-সচিব নানারূপ যুক্তি দেখাইয়া বিলটি যাহাতে পরিত্যক্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। কংগ্রেসী দলের নেতাও মীমাংসার পক্ষ-পাতী ছিলেন, কিন্তু কি ভাবে যে মীমাংসা হইবে, তাহাই সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রস্তাবিত আয়কর আইনের চতুর্থ ধারাটি—ভারতবাসী কর্ত্তৃক ভারতের বাহিরে যে আয় বর্ত্তাইবে, তাহার উপর আয়কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টারও করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যগণ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এবার সেই পুরাতন প্রস্তাবটিকেই একটু ঘষিয়া মাজিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে পরিষদে এইরূপ প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারা যে কোন্

যুক্তিতে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তখন বরং ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল—এবার ব্রহ্মদেশ ভারতের বহির্ভূত হওয়ায় ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতবাসিগণকে নূতন বিল আইনে পরিণত হইলে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

প্রস্তাবিত আইনে ট্রাষ্ট বা দেবোত্তর সম্পত্তির উপর আয়কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ পাব্‌লিক্ ট্রাষ্ট বা সাধারণের উপকারার্থ স্থাপিত ট্রাষ্টের উপর আয়করের বিধান রহিত করিয়াছেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ব্যবস্থা-পরিষদে আয়কর বিলের চতুর্থ ও পঞ্চম ধারা সম্বন্ধে কংগ্রেসী ও লীগপন্থী সদস্যগণের সহিত অর্থ-সচিবের যে মীমাংসা হইয়াছিল, তাহা আইনে পরিণত করা হইয়াছে। চতুর্থ ধারায় মূলনীতি অব্যাহত রাখিয়া স্থির হইয়াছে যে, ব্রিটিশ ভারতের বহির্ভূত স্থানে করদাতার যে আয় বর্ত্তাইবে, তাহা যদি সাড়ে চারি হাজার টাকার অধিক না হয়, তবে তাহার উপর করধার্য্য করা হইবে না।

খাস্ অধিবাসী ও অধিবাসিত্ব অর্জ্জনকারীর মধ্যে যে প্রভেদ ছিল, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করা হইয়াছে। যে সকল বিদেশী কোম্পানী ব্রিটিশ ভারতের বহির্ভূত স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, আয়কর ধার্য্য করিবার ব্যাপারে তাঁহারাও ব্রিটিশ ভারতীয় কোম্পানী বলিয়া পরিগণিত হইবেন। যদি কোনও কোম্পানী বা ব্যক্তি যুগপৎ ব্রিটিশ ভারতে ও ব্রিটিশ ভারতের বহির্ভূত স্থানে আয় করেন, তবে কোনও বৎসরে তাঁহার আয়ের যে পরিমাণ অর্থ ব্রিটিশ ভারতে আনয়ন করা হইবে, তদপেক্ষা ব্রিটিশ ভারতের বহির্ভূত স্থানে যদি তাঁহার আয় অধিক পরিমাণে বর্ত্তায়, তবে সেই বহির্ভূত আয়ের পরিমাণ সাড়ে চারি হাজার টাকার যত টাকা অধিক হইবে, ঠিক তত টাকার উপর আয়কর ধার্য্য করা হইবে।

যদি কোনও ভারতের অধিবাসী করদাতার ভারতের বহির্ভূত স্থানে আয় বর্ত্তাইয়া থাকে, কিন্তু যে স্থানে ঐ আয় বর্ত্তাইয়াছে, সেই স্থানের আইন অনুসারে ঐ আয় তাঁহার পক্ষে ব্রিটিশ ভারতে আনয়ন করা সম্ভবপর না হয়, তবে যতদিন পর্য্যন্ত ঐ আয় ব্রিটিশ ভারতে আনয়ন সম্বন্ধে আইনের বাধা অপসৃত না হইবে, ততদিন তাঁহার নিকট কর আদায় করা যাইবে না।

করদাতার ভারতের বহির্ভূত স্থানে যদি কোনও আয়ের উপর সেই দেশের সরকার কোনও আয়কর আদায় করিয়া থাকেন, তবে ভারত সরকার ঐ আয়ের উপর অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত আয়কর ধার্য্য করিবেন না।

গত ১০ই ডিসেম্বর আয়কর আইন সম্বন্ধে অবশিষ্ট ১০টি ধারার আলোচনা শেষ হইয়াছে। অতঃপর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Council of State) বিলটি গৃহীত হইলে বড় লাটের সম্মতির পর এই বিধান আইনে পরিবর্ত্তিত হইবে। গত ১২ই ডিসেম্বর সংশোধিত বিলটি ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত হইয়াছে।

এই বিল গৃহীত হইবার প্রতিবাদ করিয়া সর্দ্দার সন্ত সিং যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, এতদিন যখন পুরাতন আইনেই কায চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে আর দুই বৎসরের মধ্যে এই নূতন আইনটি বিধিবদ্ধ না হইলে একবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত না। সম্ভবতঃ সর্দ্দার সন্ত সিং এই জীর্ণ ব্যবস্থা পরিষদের আর দুই বৎসর স্থায়ী আয়ুষ্কাল লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদের পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার পর—নূতন সংস্কৃত আইন অনুসারে ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইলেই এই বিল আইনে পরিণত করার চেষ্টা যে উচিত ছিল, এ সম্বন্ধে বোধ হয় সরকার পক্ষ ভিন্ন অন্য কাহারও মতভেদ হইবে না।

এই বিলটি আলোচনার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই সরকারের মন যোগাইবার জন্য যেরূপ আগ্রহের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, দেশবাসী বিশেষতঃ ব্যবসায়িগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সেরূপ আগ্রহ দেখান প্রয়োজন মনে করেন নাই। কংগ্রেস জাতীয় দলের শ্রীযুক্ত এনি ও শ্রীযুক্ত বাজোরিয়া ব্যবসায়িগণের স্বার্থরক্ষার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেও দলের ও উপদলের মহিমায় তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক হইতে পারে নাই। তথাপি বিলখানির কয়েকটি ধারা সংশোধনের জন্য তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছেন।

আয়কর বিলে করধার্য্য করিবার মূল নীতিতেও প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে রীতিতে আয় ও আয়কর ধার্য্য করা হইত, প্রস্তাবিত আইনে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া অধিক লাভবান অর্থশালী

ব্যক্তিদিগের উপর সমধিক পরিমাণে কর ধার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ক্রমবর্দ্ধমান আয়ের উপর যেরূপে আয়কর ধার্য্যের রীতি আছে, তাহা না করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কর ধার্য্যের রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই নূতন রীতির ইংরাজি নাম—Slab System এবং এই রীতি বৃটেনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান আইনে যেরূপ দুই হাজার টাকার উপর আয় হইলেই তাহার উপর আয়কর ধার্য্য হইয়া থাকে, প্রস্তাবিত আইনেও তাহাই থাকিবে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের পর মূল আইনের বিধানের পরিবর্ত্তন না হইলেও আয়করের হার বাড়িয়াছিল, সুপার-ট্যাক্স ও সার চার্জ্জ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং অস্থায়িভাবে ১০০০৲ টাকা আয়ের উপরও আয়কর স্থাপিত হইয়াছিল।

তবে বর্ত্তমানে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট আয় পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় নির্দ্দিষ্ট হারে কর আদায় হইত, তাহা হইবে না—এবং পৃথক্‌ভাবে যেমন Supertax আদায়ের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও থাকিবে না। আমরা প্রস্তাবিত আইনের আয়কর ধার্য্য করিবার হার নিম্নে প্রদান করিলাম :—

আয়	ধার্য্য কর	শতকরা হিসাবে আয়করের পরিমাণ
২,১৫০৲	৩০৲	১·৪
২৫০০৲	৪৭৲	১·৯
২৭০০৲	৫৬৲	২·০
৩০০০৲	৭০৲	২.৩
৩,২৫০৲	৮২৲	২·৫
৩৫০০৲	৯৪৲	২·৭
৩৭৫০৲	১০৬৲	২·৮
৪০০০৲	১১৮৲	৩·০
৪৫০০৲	১৪১৲	৩·১
৫০০০৲	১৬৪৲	৩·৩

অধিকতর আয়ের উপর কিভাবে কর বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছে, নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

বর্ত্তমানের হার

আয়	ধার্য্য কর	শতকরা হিসাবে আয়করের পরিমাণ
৪০০০০৲	৫৭০০৲	১৪·২
৪৫০০০৲	৭১০৯৲	১৫·৮
৫০০০০৲	৮০৬৯৲	১৬·১
৬০০০০৲	১০,৩২৫৲	১৭·২
৭০০০০৲	১২,৫৮২৲	১৮·০
৮০০০০৲	১৪,৮৪০৲	১৮·৬

(প্রস্তাবিত আইনের হার)

আয়	ধার্য্য কর	শতকরা হিসাবে আয়করের পরিমাণ
৪০০০০৲	৬৩৩৬৲	১৫·৮
৪৫০০০৲	৭,৭৪২৲	১৭·২
৫০০০০৲	৯,১৪৮৲	১৮৩
৬০০০০৲	১২,২৭৪৲	২০·৫
৭০০০০৲	১৫,৭১২৲	২২·৪
৮০০০০৲	১৯১৪৯৲	২৩·৯

এই তালিকা এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমরা আংশিক তালিকাই প্রকাশ করিলাম।

এই নূতন বিধানে কি পরিমাণ আয়ের উপর কি পরিমাণ কর ধার্য্য করা হইবে, তাহা কর ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে করদাতা নির্দ্দিষ্টভাবে জানিতে পারিবেন না; সুতরাং এই রীতি যে বিলক্ষণ জটিল, তাহা বলাই বাহুল্য। আয়ের আধিক্যের সঙ্গে করের হার কোনও কোনও স্থলে প্রায় অর্দ্ধেকের কাছেই পৌছিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। আরও রহস্যের বিষয় এই যে চতুর্থ ধারা ও অন্যান্য ধারায় বাঙ্গা-

উহা লইয়াই পরিষদে প্রায় দুই সপ্তাহ বাদবিতণ্ডা চলিয়াছে; কিন্তু করের হারের এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব সম্বন্ধে পরিষদে প্রতিবাদ হয় নাই। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র-সমূহেও এই অত্যধিক আয়করের হারের বিষয়ে কোনও আলোচনা সম্ভব হয় নাই। বরং পরিষদের কংগ্রেসী দলও এই উচ্চহারে করস্থাপনের সমর্থন করিলেন।

ভারতবর্ষে এখনও এইরূপ জটিল পদ্ধতিতে কর ধার্য্য করিবার সময় আসে নাই বলিয়া বহু ব্যবসায়ী মত-প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে যাঁহাদের আয় অধিক, তাঁহাদিগকে করের ভারও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বহন করিতে হইবে। আয়কর একেই তো সেকালের 'জিজিয়া' করের দাপটকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, ইহার উপর নূতন বিধির প্রভাব ঘটিলে এ বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা আরও দুর্ঘট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম্ এ, বি এল)।

বাঙ্গালার পুনর্গঠন

ভাঙ্গা বাঙ্গালা জোড়া লাগিবার পর, বঙ্গদেশের যে সকল অংশ অসঙ্গতরূপে আসাম এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া পাইবার দাবী বাঙ্গালার পক্ষ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে করা হইতেছে না। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আন্দোলন প্রবলভাবে চারিদিক্ হইতে করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিহার-সরকার বাঙ্গালাভাষী যে সকল জেলা অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া দিতে নারাজ। কারণ, বাঙ্গালাভাষী মানভূমে বহু খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। উহা বিহারের হাতছাড়া হইলে রাজস্ব হ্রাস পাইবে। সাঁওতাল পরগণার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে পাকুড়, জামতাড়া ও রাজমহল বাঙ্গালাভাষী। তাহা ছাড়া সাঁওতাল পরগণার অন্যান্য স্থানেও বাঙ্গালাভাষী লোকসংখ্যা অল্প নহে। বিহার সরকার এই স্বাস্থ্যকর অঞ্চলটি বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দিতে অসম্মত। পূর্ব্বের সরকারের সহিত বর্ত্তমান সরকার এ বিষয়ে একমত।

বিহার পাকাপাকিভাবে বাঙ্গালাভাষী অঞ্চলসমূহকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই কৌশল অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারীর হিসাবকালে দেখা গিয়াছিল যে, মানভূমের অধিবাসিসমূহের মধ্যে বাঙ্গালাভাষী লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ ছিল এবং ৩ লক্ষ ২৫ হাজার লোক হিন্দীভাষী। কিন্তু এই সওয়া তিন লক্ষ হিন্দীভাষীর মধ্যে খোট্টাই-ভাষাভাষী লোকও ধরা হইয়াছিল—খাঁটি হিন্দীভাষী সকলেই ছিল না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যে লোকগণনা হয়, তাহাতে বিহার সরকারের কৌশলময় চেষ্টার পরিচয় পরিব্যক্ত হয়।

লোকগণনার সময় হিন্দীভাষী লোকসংখ্যা অধিক পরিমাণে দেখাইবার উদ্দেশ্যে, বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালাভাষী অঞ্চলসমূহের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে যাহাতে বঙ্গভাষা শিক্ষার বাহনরূপে পরিগণিত হইতে না পারে, সেই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। আদালত হইতে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারের বিলোপসাধনেরও চেষ্টা হইয়াছিল: জমিদারী কাগজপত্রে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন রহিত করিবার প্রয়াস হয়। কিন্তু এত করিয়াও বিহার সরকার আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লোকগণনায় যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। মানভূম জেলায় ২৫ হাজার খোট্টাভাষী লোক ছিল। হিন্দী ভাষার সহিত খোট্টা ভাষার পার্থক্য স্বীকৃত হইলেও তাহাদিগকে হিন্দীর দলভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনায় পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বভাগে ৬ লক্ষ বাঙ্গালা ভাষাভাষী লোক আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনাকালে তাহাদিগকে বেমালুম হিন্দীভাষাভাষী বলিয়া গণনা করা হয়। অবশ্য লেখনীর মার-পেঁচে অনেক সত্য মিথ্যায় পরিণত হয়, বহু মিথ্যা সত্যের আকার ধারণ করে; কিন্তু পূর্ব্বতন বিহার সরকারের এ কৌশল তাহাও অতিক্রম করিয়াছিল। Linguistic Summery of India নামক গ্রন্থ মিঃ গ্রীয়ারসনের রচিত। তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত অঞ্চলের ভাষা বাঙ্গালা। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী ভাষাও বিহার সরকারের নির্দ্দেশমত হিন্দীর আদিম সংস্করণ নহে।

বিহার এখন কংগ্রেস-মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা শাসিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর প্রতি কংগ্রেসী সরকারও ন্যায়বিচার প্রদর্শনে কুণ্ঠিত। বাঙ্গালাভাষাভাষী অঞ্চলের উপর বাঙ্গালার ন্যায়সঙ্গত দাবী পূর্ণ করা বিহার সরকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ত্তব্যপালনে তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য প্রচুর। যেরূপ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আগামী ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনাতেও কৌশল অবলম্বিত হইবার আশঙ্কা প্রবল। এই আশঙ্কা যে প্রমাণশূন্য, তাহা বলা চলে না। কারণ, সাঁওতাল পরগণা শিক্ষা-কমিটী বিগত আগষ্ট মাসে ভোটাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গালাভাষাভাষী অঞ্চলসমূহেও প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হইবে হিন্দী—বাঙ্গালা নহে। মানভূমেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে।

বাঙ্গালাকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। বাঙ্গালীর এই সঙ্গত দাবীকে ব্যর্থ করিতে হইলে, বাঙ্গালাভাষাভাষী অঞ্চলসমূহে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা হইলে, ক্রমশঃ বাঙ্গালার সহিত সেই সকল অঞ্চলের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই অসঙ্গত ব্যবস্থার প্রতিবাদে সমগ্র বাঙ্গালীজাতির একতাবদ্ধ হওয়া অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন।

জওহরলালের প্রত্যাবর্ত্তন

পণ্ডিত জওহরলাল য়ুরোপ ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—আমরা জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যেখানে পৌঁছিয়াছি, সেই স্থান হইতে আমাদিগের গন্তব্য পথ বাছিয়া লইতে হইবে। আমরা গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করিব, না স্বৈর-শাসনের পথ বাছিয়া লইব।

কথাটা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কংগ্রেস গণতন্ত্রের নীতি ব্যক্ত করিতেছেন, তদনুসারে চলিতেছেন। এ দেশের ইতিহাস গণতন্ত্রকেই সমাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল গণতন্ত্রের ভক্ত। প্রতীচ্যদেশে নানাবিধ বক্তৃতায় তিনি গণতন্ত্রের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিশালী দেশ—যেখানে গণতন্ত্রের সমাদর সমধিক ছিল,—গণতন্ত্রের উপাসক ছিল, বর্ত্তমান সময়ে জেকো-শ্লোভাকিয়ার সর্ব্বনাশে, সেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গণতন্ত্রের সংহারে হিটলারের সহায়তা করিয়াছে। জার্ম্মাণী ও ইটালী স্পেনের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। আরও তিনি বুঝিয়াছেন যে, ফ্যাসিজমের প্রসার যে ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সেও নেভিল চেম্বারলেনের নীতি অনুসারে চলিয়া ফ্যাসিজমের—স্বৈর-শাসনের প্রতিবন্ধকতাচরণে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাইতেছে না। বরং ফ্যাসিজমের শক্তিবৃদ্ধিই ঘটিতেছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এখন ভীষণ সাম্রাজ্যবাদী হিটলারের বন্ধু।

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার বক্তৃতায় দেশের কল্যাণকল্পে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য সামরিক শক্তি, অর্থনীতিক ব্যাপারে স্বাধীনতা এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণক্ষমতালাভ ভারতবাসীর পক্ষে অপরিহার্য্য। দেশরক্ষা করিতে হইলে সেনাবল ও অস্ত্রের প্রয়োজন। বিগ্রহশীল শক্তিশালী দেশসমূহ অহিংসপন্থী নহে। কাযেই তাহাদিগের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে উপযুক্ত সেনাবল ও সামরিক সরঞ্জাম না রাখিলে কোন দেশই বাঁচিতে পারে না। ভারতে অর্থনীতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য শিল্প বাণিজ্যের অবাধ প্রসারের প্রয়োজন। অর্থনীতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ পরের অধীনতাপাশে আবদ্ধ বলিয়াই ভারতীয় শিল্পের দারুণ দুর্দ্দশা চলিয়াছে। দেশবাসীর অর্থনিয়ন্ত্রণে অধিকার লাভ করা আশু প্রয়োজন।

পররাষ্ট্রগত বিষয়ে ভারতবর্ষ যদি স্বাবলম্বী না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্রের কোন অর্থই হয় না। অন্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিবার অধিকার ভারতবাসীর করতলগত হওয়াই উচিত।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রতীচ্যদেশে অবস্থান করিয়া সকল বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। তাই কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসনলাভপ্রচেষ্টার মূলীভূত যে সকল দাবী আছে, তাহা তিনি সুস্পষ্ট দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষ জন্মগত অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র। উহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। তাই পণ্ডিতজীর নির্দ্দেশ—কংগ্রেসের পক্ষে বিবেচনা সহকারে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে।

বাঙ্গালায় নূতন মন্ত্রিনিয়োগ

বাঙ্গালা সরকারের সচিবসঙ্ঘে গভর্ণরের মনোনীত একাদশ সচিব বিভিন্ন বিভাগের ভার পাইয়াছিলেন; তাঁহারা বাঙ্গালার ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য হইলেও বাঙ্গালার জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে সচিবসঙ্ঘে প্রবেশ করেন নাই, গভর্ণরের অনুগ্রহেই তাঁহারা সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সরকারের নির্দ্দেশানুসারে চাকরী বজায় রাখিয়াছেন; কিন্তু কাঁধে মিল না হওয়ায় তাঁহাদের দলের একজন মুসলমান সচিব মিঃ নৌশের আলী চাকরীতে ইস্তফা দান করিতে বাধ্য হওয়ায় অবশিষ্ট দশ জনেই বাঙ্গালার শাসনকার্য্য

পরিচালিত করিতেছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন সচিবসঙ্ঘ সংগঠনের পূর্ব্বে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সাত জন সচিবেই সুসম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণের অর্থ যে ভাবে ইচ্ছা ব্যয় করা যাইতে পারে, সেজন্য কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দানের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং কার্য্যকালে সাত জনের স্থানে একাদশ সচিব নিয়োগেও কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই।

যে সময় দশ জন সচিব বাঙ্গালা শাসনের দায়িত্বভার বহন করিতেছিলেন, সেই সময় বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদের দুই জন মুসলমান-সদস্য নিখিল বঙ্গের কৃষক-প্রজার পক্ষ হইতে অভিযোগ প্রচার করেন যে, প্রধান সচিব মিঃ ফজলুল হক যাঁহাদের প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, এ অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে সচিবদলকে সমর্থন করিতে পারেন? সুতরাং সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা মিঃ হকের দল ত্যাগ করিলেন, অনেকের আশা হইল, তাঁহারা সম্ভবতঃ কংগ্রেসের দল পুষ্ট করিবেন। মিঃ ফজলুল হক প্রভৃতির মনোরঞ্জনে যাঁহাদের স্পৃহা নাই, সেই মিঃ সামসুদ্দীন ও তমিজুদ্দীন খাঁ অতঃপর কি ভাবে দেশোদ্ধার করিবেন, ইহা জানিবার জন্য অনেকে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে একদিন সকলে শুনিতে পাইল, মেহেরবান তমিজুদ্দীন ও সামসুদ্দীন মিঞা মেহেরবাণী করিয়া পুনর্ব্বার মিঃ ফজলুল হককে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইসলামকে আর তাঁহারা বিপন্ন করিবেন না; তবে এজন্য তাঁহাদিগকে সচিবসঙ্ঘে গ্রহণ করিতে হইবে। মোটা মাহিনার সচিবী চাকরীর বিনিময়ে দলত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দলে যোগদান করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে।

মিঃ ফজলুল হক অগত্যা তাঁহাদিগকে দলে রাখিবার জন্য এই কার্য্য করিলেন। যে বাঙ্গালায় একাদশ সচিবের স্থান হইয়াছিল, তাহার বিস্তার এবং সহ্য করিবার শক্তি এরূপ অল্প নহে যে, দ্বাদশ সচিবের স্থান হইবে না। সুতরাং তাঁহারা উভয়ে সচিবত্ব লাভ করিলেন, এবং বাঙ্গালায় দ্বাদশ সচিবের স্থান হইল। বাঙ্গালায় ৫ জন হিন্দু এবং ৭ জন মুসলমান-সচিব বিরাজিত হইলেন।

নিখিল-বঙ্গ-কৃষক-প্রজা-সমিতির সম্পাদক মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ উক্ত সমিতির সম্মতিক্রমে বা 'বিশ্বাস রক্ষা' করিয়া এই কার্য্য করিয়াছেন কি না, এ বিষয়ে মতভেদ আছে, এবং সম্ভবতঃ সম্পাদকের পদে তাঁহাকে ইস্তফাদানে বাধ্য করা হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধে বহুব্যক্তিস্বাক্ষরিত রিকুইজিসন প্রেরিত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, বাঙ্গালার অবস্থা কি শোচনীয়! যদি প্রধান সচিবের দলের আবার কোন ক্ষুদ্র দলপতি যূথ-ভ্রষ্ট হইয়া 'ইসলামকে বিপন্ন' করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পাঠশালার পড়ুয়ার মত সচিবের দল কি অধিকতর পরিপুষ্ট হইবে? বাঙ্গালার করদাতৃগণের অর্থের যোগ্যতর ব্যবহার অন্য কি প্রকারে হইতে পারে?

পাবনা জিলায় পুনর্ব্বার অনাচার

পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা সাম্প্রদায়িকতা-বাদের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের হিন্দু-অধিবাসিবর্গ সাধারণতঃ দরিদ্র, এবং তাহারা যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে অনাচারের বিরোধিতা করিবে, তাহাদিগের সেরূপ শক্তি নাই; তাহাদিগের নেতৃত্ব করিতে পারেন, এরূপ জন-নেতারও অভাব লক্ষিত হয়। এই সকল কারণে বিভিন্ন গ্রামে হিন্দুর দেবমন্দির কলুষিত, বা দেব-দেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করা হইলে, অথবা বেদী হইতে তাহা অপসারিত হইলে, তাহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে উল্লাপাড়া থানার এলাকায় এক জন মুসলমান প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে হিন্দুসন্তান; মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহার ধর্ম্মোন্মত্ততা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সে স্থানীয় মুসলমানগণকে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে নানা ভাবে উত্তেজিত করিতেছিল। ইহাতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিস তাহাকে উক্ত অঞ্চল হইতে অপসারিত করে; কিন্তু বিষবৃক্ষের ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। জমি পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল, এবং বিভিন্ন গ্রামে হিন্দু দেব-দেবী বিগ্রহের সম্বন্ধে নানা প্রকার অনাচার প্রশ্রয় লাভ করিতেছিল; কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া সুবিচার লাভ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ স্থলেই পুলিস চেষ্টা করিয়াও অপরাধিগণকে ধরিতে পারে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন আসামী ধরা পড়িয়া বিচারালয়ে প্রেরিত

হইলেও অপরাধের তুলনায় লঘু দণ্ড লাভ করিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যাহাদিগের দ্বারা অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তাহারা স্থানীয় অধিবাসী নহে। একবার দেখা যায়, দেব-প্রতিমা একটি বৃক্ষশাখায় ঝুলিতেছিল, এবং কয়েকটা মুসলমান রাখাল বালক 'এড়ো মারিয়া' তাহা চূর্ণ করিতেছিল। এই অনাচারের প্রতিবাদ করা হইলে কোন কোন প্রবীণ মুসলমান মোড়ল দাড়ি নাড়িয়া বিজ্ঞতা সহকারে মর্ম্মাহত হিন্দুগণকে হিতোপদেশদানচ্ছলে বলিয়াছিল, "আরে যাঁতি দাও, ও আবোর ছাওয়াল-পাওয়ালের চ্যাংড়ামি বৈ ত নয়।" হিন্দুর দেব-প্রতিমা গাছে টাঙ্গাইয়া লোষ্ট্রনিক্ষেপে চূর্ণ করা নির্দ্দোষ আমোদ বটে, কিন্তু ইহাই যে সকল মির্জ্জার নিকট ছেলেখেলার আদর্শ, তাহাদের দলের ধাড়ীরা নূতন নূতন অনাচার করিলে তাহার প্রতিকারের কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে, অপরাধিগণকে মৃদু র্ভৎসনা দ্বারা সতর্ক করিয়া কোন ফল না হওয়ায় এই শ্রেণীর অনাচার বন্ধ হয় নাই।

অল্প দিন পূর্ব্বে উল্লাপাড়া থানার অন্তর্গত সূতবেড়িয়া গ্রামের কালী-প্রতিমা অপবিত্র করিয়াই দুর্ব্বৃত্তেরা ক্ষান্ত হয় নাই, তাহা তাহারা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গ্রামের অধিবাসীরা গত ৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে কালীপূজা শেষ করিয়া দেবী-প্রতিমার বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহা পূজা-মণ্ডপে বেদীর উপর রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরদিন প্রভাতে দেখা যায়, প্রতিমার মস্তক চূর্ণ করা হইয়াছে! পুলিস অপরাধীর সন্ধান করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়—তাহারা ত দৈবজ্ঞ নহে, সুতরাং কাহারা কালী-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহারা কিরূপে আবিষ্কার করিবে? যদি পূর্ব্বে এই শ্রেণীর অপরাধে ধৃত অপরাধিগণকে যথাযোগ্য দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত, তাহা হইলে এই শ্রেণীর অনাচার রহিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মন্দিরের বা হিন্দু দেব দেবীর পবিত্রতা নষ্ট করা যে গুরু অপরাধ, এ ধারণা যত দিন কর্ত্তৃপক্ষের মনে বদ্ধমূল না হইবে, তত দিন এই শ্রেণীর অনাচারের প্রতিকারের আশা নাই। হিন্দু-মুসলমানের দেশে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখা যে শাসক সম্প্রদায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা যাঁহারা বুঝিতে না পারেন, অথবা বুঝিয়াও যথাযোগ্য ব্যবস্থা না করেন, তাঁহারা শাসন-ভার গ্রহণের সুযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। সমদর্শিতার অভাবেই শান্তিভঙ্গ হইয়া থাকে; তাহা কোন দেশের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ নহে।

দিল্লীর শিবমন্দিরে সত্যাগ্রহ

দিল্লীর শিবমন্দিরে হিন্দুর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্কল্পে যে সকল হিন্দু-স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ৭৪ জন দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনেকেই সম্ভ্রান্তবংশীয়, এবং শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। তাঁহারা যেরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আইন অনুসারে 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য হইলেও সেই অপরাধ দস্যু-তস্করগণের অপরাধের সমশ্রেণীর নহে, ইহা আইন অনুসারে 'অপরাধ' বলিয়া গণ্য হইলেও দণ্ডের আদর্শ ভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত, এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই।

১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আরও ৭ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং ৮ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; শ্রীযুত রামভরসীলালের স্ত্রী এই সকল মহিলার অন্যতম। শ্রীযুত রামভরসীলাল আগ্রার জিলা-হিন্দুসভার সম্পাদক, তিনি অনশনে মৃত্যুপণ করিয়া ১০ দিন দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু প্রকাশ, পুলিস তাঁহাকে আটক করিয়া রাত্রে কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করায় তাঁহার স্ত্রী অনশনে মৃত্যু বরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। রামভরসীলালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হরতাল করিবার জন্য স্থানীয় দোকানদারগণকে প্ররোচিত করিবার অভিযোগে পুলিস ৩ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, গত ১২ই ডিসেম্বর কয়েকজন হিন্দু মহিলা শিবমন্দিরে পূজা দিতে গমন করায় কয়েকটি মুসলমান মেয়ে-পুলিস তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার ও লাঞ্ছিতা করে। কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ভাই পরমানন্দের এই সম্পর্কে প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়াছে। মুসলমান নারী-পুলিস দ্বারা পূজার্থিনী হিন্দু মহিলাগণকে গ্রেপ্তার করাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। ভাই পরমানন্দ কেন্দ্রী পরিষদে বলিয়াছেন, ঐ স্থানে পূজার্চ্চনার অধিকারে কাহাকেও বঞ্চিত করা হয় নাই। বস্তুতঃ, এই ব্যাপার লইয়া দিল্লীর হিন্দু

সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, সত্যাগ্রহের 'অপরাধে' কারাদণ্ডে দণ্ডিত স্বেচ্ছাসেবকগণকে ইতর দস্যু-তস্করের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সেই ভাবে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

এই প্রকার ব্যবস্থায় উক্ত প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মনুষ্যত্বের পক্ষে অপমানজনক এবং মানবধর্ম্মেরও বিরোধী। ঐ সকল সত্যাগ্রহীর মধ্যে শ্রীযুত ধর্ম্মবীরকে দুর্দ্দান্ত দস্যু-তস্করের ন্যায় দাণ্ডাবেড়ি ধারণ করিতে হইয়াছে, এবং শ্রীযুত চুনিচাঁদকে নির্জ্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, যুক্তপ্রদেশের মহাবীর দলের স্বেচ্ছা-সেবক শ্যামসুন্দর বরষ্টাল জেলে দণ্ড ভোগ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, ধর্ম্মবীর ত্যাগী এবং চুনিচাঁদ বিল্লি জেলখানার ভিতর এই প্রকার কঠোর দণ্ডের প্রতিবাদকল্পে প্রায়োপবেশন করিয়াছেন। কিন্তু এই সংবাদ প্রচারিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন—কারাগারে কোন কয়েদী প্রায়োপবেশন করে নাই। কর্ত্তৃপক্ষের এই ঘোষণা সত্য হইলে তাহা কয়েদীগণের নিয়মানুবর্ত্তিতারই নিদর্শন। এই ব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষের কঠোরতা হ্রাসের বা মানবসুলভ মনোবৃত্তির কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে কি? অপরাধের শ্রেণী ও পরিমাণ অনুসারে কারাগারে দণ্ডদানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশের কারাগারে নানা প্রকার সংস্কারের প্রবর্ত্তন হইতেছে; কোন কোন প্রদেশের কারাগারে কঠোর দণ্ডের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার শিল্পকার্য্যে শিক্ষাদান করা হইতেছে; কয়েদীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং বহু স্থানে দণ্ডের কঠোরতা হ্রাস করিয়া সহানুভূতিসূচক অতি লঘু দণ্ড প্রদানের আদেশ হইয়াছে। কয়েদীগণের খাদ্য-দ্রব্যের অবস্থারও উন্নতি হইয়াছে; এ অবস্থায় কোন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সত্যাগ্রহের 'অপরাধে' ভীষণ ও যন্ত্রণাদায়ক দণ্ডের ব্যবস্থা করিলে, সেই কঠোর ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই প্রবৃত্তি কখন পরিহার করিবেন, দাসমনোভাবের এরূপ অভাব তাঁহাদের নিকট প্রত্যাশা করিতে পারা যায় কি?

সংবাদপত্র-দলন আইন

বাঙ্গালার গভর্ণর বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিব মিঃ ফজলুল হকের সংবাদপত্র-দলন আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থা-পরিষদে এবং ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এই আইনের উদ্দেশ্য এই ভাবে বিবৃত হইয়াছে,—

"সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় সরকারের অপ্রকাশিত দলিলের বিষয় প্রকাশে ক্রমবর্দ্ধমান চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। এই জন্য সরকারের অপ্রকাশিত কাগজ-পত্র প্রকাশে বাধা দান করা প্রয়োজন হইয়াছে। সরকারের অনুমোদন ব্যতীত এইরূপ কাগজ-পত্র প্রকাশ করা চলিবে না।"

আইনের এই নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য না হইলে, যদি ঐরূপ (সরকারী) কাগজ-পত্রে লিখিত বিষয় কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এই সকল ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ভাবে শাস্তি প্রদান করা হইবে, যথা (১) সংবাদপত্রের সম্পাদক, (২) প্রবন্ধের লেখক, (৩) প্রেসের 'কিপার' অর্থাৎ রক্ষক।

কেবল অপ্রকাশিত সরকারী নথি-প্রকাশই নহে, ঐ সম্বন্ধে আলোচনাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

বাঙ্গালা সরকার এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, প্রতিক্রিয়াশীল সরকার যতই চেষ্টা করুন, দেশের লোকের স্বার্থরক্ষার আগ্রহ নিষ্পেষিত করিতে পারিবেন না। দমন-নীতির প্রয়োগে সেই আগ্রহ প্রবলতর হইবে, এবং যে সকল ব্যবস্থা দেশবাসীর অধিকারবিরোধী, তাহা প্রবর্ত্তনের সঙ্কল্প গোপন রাখা অসম্ভব বলিয়াই সচিবসঙ্ঘের ধারণা হইবে, এরূপ অনুমানের কারণ আছে। পরোক্ষভাবে দেশের সংবাদপত্রগুলিকে 'অভিনন্দিত' করিবার আগ্রহেই যে এই আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন সংবাদ সরকারের হাতে আসিবার পূর্ব্বেই সংবাদপত্র সেই সংবাদ জানিতে পারেন, এবং তাহার ফলে জাতির স্বার্থ সুরক্ষিত হয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এস্থানে এ কথার উল্লেখ বাহুল্য নহে যে, আইনপ্রবর্ত্তক প্রধান সচিব যতই চেষ্টা করুন, যে সংবাদ প্রকাশ করা দেশের জনসাধারণের স্বার্থের

অনুকূল, তাহা গোপন রাখা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইবে না—ইহার একাধিক প্রমাণ যে তিনি অল্পদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ থাকিতে পারে। সরকারের যে কার্য্য জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া গোপনে সম্পাদিত হয়, তাহা ঠিক সময়ে প্রকাশ করা যাঁহারা কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিতে কদাচ কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে সরকারের কার্য্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা যতই নিরপেক্ষ হউক, আমলাতন্ত্র সেই সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া আইনের পর আইন প্রণয়নে এদেশে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের কর্ণমূলে নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার ঢক্কাধ্বনি হইলে কি বাঙ্গালা সরকার এই প্রকার আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করিতেন, না—তাঁহাদের নিজের ঢাক বাজাইবার জন্য প্রজার কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন অনুভূত হইত ?

সংবাদপত্র জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করাই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে। সংবাদপত্র দ্বারা জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ এবং অভিমত ব্যক্ত হয়। এজন্য যে সরকার আপনাকে গণমতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সরকার সংবাদপত্রকে সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাহাকে বিশ্বাস করেন, তাহার আদরও করেন, এবং তাহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার কণ্ঠরোধ করা অকর্ত্তব্য, ইহাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কিন্তু যে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম হয়, সেখানে (১) স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশকারী সংবাদপত্রের দলনের চেষ্টা হয়, (২) সংবাদপত্র সম্বন্ধে সরকারের নিরপেক্ষতা সন্দেহের অতীত হয় না, এবং (৩) কোন নিরপেক্ষ সংবাদপত্রে সরকারের নীতি বা কার্য্য সমর্থিত না হইলে সরকারকে তাঁহাদের নীতি ও কার্য্যের সমর্থনের জন্য প্রজার অর্থব্যয় করিয়া প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু যে সরকার সংবাদপত্রের সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না, এবং কঠোর সমালোচনার ভয়ে আইনের সাহায্যে তাহার কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেন, সেই সরকার কি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারেন ? যে সরকার লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বর্ত্তমান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকালে তাহা কত দিন স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে ? এ সকল বিষয় সরকারেরই বিবেচ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ 'প্রেস কনসলটেটিভ কমিটী'তে এদেশের সংবাদপত্র সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সংবাদপত্র শক্তিশালী সংবাদপত্র বিবিধ বিষয়ে যে মত অবলম্বন করে, গণতন্ত্র তাহারই উপর নির্ভর করে।...সরকার সংবাদপত্রের সহিত দুই প্রকার ব্যবহার করিতে পারেন—সহযোগ ও ভীতিপ্রদর্শন। যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডল সহযোগের পথই গ্রহণ করিয়াছেন।"

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে, কোন কোন প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার সংবাদপত্রের যে সকল কার্য্য আতিশয্যব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই সকল দমন করিবার জন্য নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, কোথাও কোথাও নূতন প্রকার আইনও বিধিবদ্ধ হইতেছে।

পণ্ডিতজী কোন্ প্রদেশের সংবাদপত্র দমনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতেই সুস্পষ্ট। বাঙ্গালা সরকার বহু অর্থব্যয়ে প্রচার-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াই নিরস্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এখন আরও দুইটি বিষয়ে আইন করিতে কৃতসঙ্কল্প। (১) সচিবগণকে কথায় বা চিত্রে আক্রমণ, (২) সরকারী সংবাদ বিনানুমোদনে প্রকাশ।

এ দেশে আমলাতন্ত্রের কল্যাণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক আইনের অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালা সরকার সেই সকল আইনেও পরিতৃপ্ত নহেন। তাঁহারা অধিকতর ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়া স্বাধীন মত প্রকাশের পথ বিঘ্নসঙ্কুল ও সমালোচনার পথ সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য আবার ব্যাকুল হইয়াছেন। বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘ স্বাধীন সংবাদপত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এই সচিব-সঙ্ঘের সংগঠনাবধি সংবাদপত্র-দলনের জন্য পুনঃ পুনঃ নব নব চেষ্টা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, যুক্তপ্রদেশের সরকারে ও বাঙ্গালা সরকারে সংবাদপত্রের প্রতি ব্যবহারে যে বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা আদৌ কঠিন নহে, এবং তাহার অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন

রেলওয়ে বোর্ড-সম্মিলন

ভারতীয় রেলপথ-সম্মিলনের বৈঠকে দিল্লীতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের এজেন্ট মিঃ হার্ডি যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, একাধিক কারণে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অভিভাষণে বিবৃত দুইটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচ্য। ১ম বিজ্ঞাপন, ২য় অশিষ্টতা ও অনাচার।

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বিজ্ঞাপন বিষয়ে রেলওয়ের যেরূপ মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, সেরূপ মনোযোগ প্রদান করা হয় না। রেলের আয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বিজ্ঞাপনে যে টাকা ব্যয় করা হয়, তাহা অতি অল্প। অথচ বিজ্ঞাপনের প্রচার-সাহায্যে মেলা প্রভৃতিতে অধিক যাত্রি-সমাগমে রেলের আয় বৃদ্ধি করা সহজসাধ্য।"

মিঃ হার্ডি বলিয়াছেন, "যাত্রীরা রেলের কর্ম্মচারিগণের নিকট যে শিষ্টাচার পাইবার আশা করে, অনেক স্থলে তাহা পায় না। আবার রেলে অনাচার অর্থাৎ উৎকোচ ব্যবহারও চলিয়া থাকে।"

মিঃ হার্ডি বলিয়াছেন বটে, জনসাধারণ এইরূপ অনাচারের দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়া রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, (১) লোক মনে করে, এইরূপে রেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রমাণসহ অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে (ক) প্রয়োজন কালে মাল পাঠাইবার জন্য গাড়ী পাইবে না অর্থাৎ ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা মালগাড়ী সরবরাহ করিবার পক্ষে নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সংঘটিত করিবে। (খ) তাহাদের মাল পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াই বিলম্ব করা হইবে, তাহাতে ক্ষতি অনিবার্য্য। (গ) রেলের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধায় ফেলিবে। (২) অনেকে এই কার্য্যে সময় ও উদ্যম ব্যয় করিতে অসম্মত।

মিঃ হার্ডি রোগ নির্ণয় করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি ব্যবসায়িগণের যে ত্রিবিধ আশঙ্কার কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারের জন্য কি কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল অনাচারের বিবরণ অবগত হইবার কোন উপায় কি তাঁহারা অবলম্বন করিতে পারেন না?

যদি ব্যবসায়ীদিগের বিশ্বাস হয় যে, অভিযোগের প্রতিকার হইবে এবং অভিযোগের কারণ দূর হইবে, তাহা হইলে লোকের অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে আগ্রহ হইবে, এবং সেজন্য তাহারা যত্নবান্ হইবে সন্দেহ নাই।

রেলের যাত্রিগণের প্রতি কিরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করা হয়, মিঃ হার্ডি চেষ্টা করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা প্রদান করেন, কিন্তু তাঁহারা রেল-কর্ম্মচারিগণের নিকট কিরূপ ব্যবহার পান, তাহাও মিঃ হার্ডি অল্প চেষ্টা করিলেই জানিতে পারিবেন। রেলের কর্ম্মচারীরা এই সকল যাত্রীকে মানুষ বলিয়া মনে করে না; যেন তাহারা তাহাদিগের ক্রীতদাস, এবং তাহারাই প্রভু! গালাগালিটা যেন তাহাদিগের অবশ্য প্রাপ্য। রেলে ফিরিঙ্গী পুরুষ ও নারীরা চাকরী করিতে আসায় তাহাদিগের ব্যবহার তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের অধিক আপত্তিজনক—দুঃসহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেল-ষ্টেশনে ব্যবস্থার দোষে চুরি বাটপাড়ি হইতে নারী-ধর্ষণ পর্য্যন্ত কোন অনাচারেরই অভাব হয় না। যদি কর্ত্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করেন, প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা হয়, ট্রেণে গাড়ীর অভাবে যাত্রিগণকে ছাগ-মেষের ন্যায় গাড়ীর ভিতর পুরিয়া চালান দেওয়ার ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে মোটর-গাড়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁহারা জয়লাভ করিতে পারিবেন, যাত্রিসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, এবং রেলের দুর্নামও ঘুচিবে। মিঃ হার্ডি সহানুভূতি-ভরে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করায় আমাদের আশা হইতেছে, হয় ত পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথে যাত্রী ও মহাজনগণের দীর্ঘকালের অভিযোগের প্রতিকার সম্ভব হইবে, এবং অচিরে এই রেলপথের সংস্কার সাধিত হইলে অন্যান্য রেলপথও তাহার অনুসরণ করিয়া জনসাধারণের অভাব নিরাকরণে সমর্থ হইবে।

আসামের সচিব-সঙ্কট

আসামে সাদুল্লা-সচিবসঙ্ঘের পতনে আসামের য়ুরোপীয়গণ কিরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার অধিবাসিগণের তাহা সুবিদিত; কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার য়ুরোপীয়

দলের সমর্থনে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘকে অনাস্থা প্রস্তাবের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া এই লাভজনক চাকরী বজায় রাখিতে হইয়াছিল ; আসাম ও বাঙ্গালার অবস্থা একরূপ হইলেও ফল ভিন্ন প্রকার হইয়াছিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় দলের যে গোপনীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে অভিযোগ করা হইয়াছিল—সাদুল্লা-সচিবসঙ্ঘের পতন হইলেও সেই সচিব-সঙ্ঘই সংখ্যাগরিষ্ঠ ; কেবল গৌহাটী-শিলং মোটর সার্ভিসের ঠিকাদারী-ব্যাপার উপলক্ষে সেই সচিব-সঙ্ঘের কতকগুলি লোক 'সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।'

এই শ্রেণীর লোকের সমর্থনে যে সচিব-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের প্রতি য়ুরোপীয় দলের সহানুভূতি লক্ষ্য করিবার বিষয় !

যাহা হউক, আসাম-প্রবাসী য়ুরোপীয়গণের সমর্থনেও যখন সাদুল্লা-সচিব-সঙ্ঘের 'হালে পানি পাইবার' সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের পরাজয় অপরিহার্য্য বুঝিতে পারিয়া 'খোস মেজাজে' না হউক 'বাহাল তবিয়তে' পদত্যাগ করিলেন। তখন আসামের গভর্ণর কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুত বরদলইকে মন্ত্রিমণ্ডল সংগঠনের জন্য আহ্বান করেন।

যাঁহারা গৌহাটী-শিলং মোটর সার্ভিসের ঠিকার ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া দলত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা, যে কারণেই হউক, পুনর্ব্বার সচিব-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তাঁহাদের দলপুষ্ট করায় য়ুরোপীয়দিগের মনে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হয় ; তাঁহারা তখন গভর্ণরকে বলেন, বরদলই মন্ত্রিমণ্ডল আর যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করিতেছেন না, তখন তাঁহাদিগকে বিদায় দান করিয়া পুনর্ব্বার সার সাদুল্লাকে ডাকিয়া সচিব-সঙ্ঘ সংগঠন করিতে বলা হউক ; কিন্তু য়ুরোপীয়দলের এই প্রার্থনানুসারে সাদুল্লা দলের 'কেঁচে গণ্ডুষ' করা সম্ভব হয় নাই ; কারণ, গভর্ণর য়ুরোপীয় দলের এই আবদার রক্ষা করেন নাই, এজন্য য়ুরোপীয় দলকে হতাশ হইতে হইল ; কিন্তু মগ্নোন্মুখ ব্যক্তি সম্মুখে ভাসমান তৃণখণ্ড দেখিয়া তাহার সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, য়ুরোপীয় দলও সেই ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন। বরদলই মন্ত্রিমণ্ডলের সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া, এবং এই কৌশলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া সাদুল্লা সচিবসঙ্ঘকে তাঁহাদিগের আসনে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য য়ুরোপীয় দল সচেষ্ট হইলেন।

সাদুল্লা সচিব-সঙ্ঘের প্রতি য়ুরোপীয় দলের অনুরাগ যে অকারণ, এ কথা বলা যায় না। সাদুল্লা-সচিব-সঙ্ঘ স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাঁহাদিগের আশঙ্কার অন্যতম কারণ এই যে, আসাম ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল যে, চা-বাগানে শ্রমিকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হউক। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের প্রভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে য়ুরোপীয় চা-করগণের স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল না—এরূপ অনুমানের কারণ নাই।

যাহা হউক, নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতে না হইতে সেই মন্ত্রিমণ্ডল সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব একটি দুইটি নহে, ৫০৬টি উপস্থাপিত করা হইল। গভর্ণরকেও অনুরোধ করা হইল, তিনি যেন এই মন্ত্রিমণ্ডলকে স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল বলিয়া স্বীকার না করেন ; কিন্তু গভর্ণর এই অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিলেন না ; তিনি বলিলেন, আইনানুসারে তিনি উহা করিতে পারেন না।

অতঃপর মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা চলিতে লাগিল। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলকে নানা বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইল। এক দিকে য়ুরোপীয় দল, অন্য দিকে মুসলমান-পরিচালিত কয়েকখানি সংবাদ-পত্র ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—এই মন্ত্রিমণ্ডল কোন কারণে স্থায়িত্ব লাভ করিবে না। এই সঙ্কটকালে কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু আসামে উপস্থিত হইয়া, কংগ্রেসী দলকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিলেন ; তাঁহারা তাঁহার উপদেশে পরিচালিত হইলেন। বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের অধিনায়ক আসামের মুসলমানগণকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া, তাঁহাদিগের মনে শক্তি-সঞ্চারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সতর্কতার বাণী অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইয়াছিল।

এই অবস্থায় সার মহম্মদ সাদুল্লাকে প্রধান সচিবের পদে স্থাপিত করিয়া সচিবসঙ্ঘ-সংগঠনের জন্য য়ুরোপীয় দল প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কোন কোন আসামবাসী হিন্দু য়ুরোপীয় দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলে

শত্রুতাসাধনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; এমন কি, এই চেষ্টা লজ্জাজনক অনাচারে পরিণত হইয়াছিল: লাঠি চলিয়াছিল, এবং কাহারও কাহারও মাথা ভাঙ্গিলে তাঁহাদিগকে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে সার মহম্মদ সাদুল্লা বলেন, মন্ত্রিমণ্ডলের সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে না, তাহা আইনসঙ্গত নহে: তাহাতে ৫ জন মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপন করা হইয়াছিল; কিন্তু মন্ত্রিসংখ্যা ৫ জন নহে ৮ জন।

কংগ্রেসী মন্ত্রীরা প্রত্যেকে ৫ শত টাকা বেতন এবং মাসিক ১ শত টাকা মোটর-ভাড়া গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা এইরূপ অল্প বেতন গ্রহণ করায় যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহা দেশের অভাবমোচনে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

যাহা হউক, সার মহম্মদ বলেন, পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই তাঁহারা মন্ত্রিগণের প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন।

অতঃপর গত ১৯এ অগ্রহায়ণ সোমবার অতর্কিত আক্রমণে কংগ্রেসী সরকারকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে সার সাদুল্লা ও তাঁহার দলের কেহ কেহ কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া ভোটযুদ্ধে অবতরণ করেন; তাহার ফলে দেখা যায়, তাঁহাদিগের অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব সচিবসঙ্ঘের পক্ষে ৪৬ ভোট, এবং সরকারের পক্ষে ৫২ ভোট হওয়ায়, অনাস্থাজ্ঞাপক অন্যান্য প্রস্তাব মুলতুবি রাখিয়া সার সাদুল্লার দলকে রণে ভঙ্গ দিতে হইয়াছে! বিরুদ্ধ দলের কেহ কেহ বলেন, পরাজয় ত কেবল ছয় ভোটে! কিন্তু এক ভোটে পরাজয়ও পরাজয়। বিরুদ্ধ দলের সকল আশার অবসান হইয়াছে, আর তাঁহারা কংগ্রেসী সরকারকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। জনরব—য়ুরোপীয় দলের নেতা না কি অতঃপর বামপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন, তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করিতেছেন। য়ুরোপীয় দলের সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। আসাম ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে! ভূতপূর্ব্ব সচিব রেভারেণ্ড জে, জে, এম নিকলস রায় নিমজ্জিত তরণীর মায়া ত্যাগ করিয়া গত ১৩ই ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি-পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া কংগ্রেসী দলে যোগদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সম্মিলিত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পর ভিন্ন দলভুক্ত আরও তিন জন সদস্য কংগ্রেসীদলে যোগদান করায় সংপ্রতি কংগ্রেসীদলের সমর্থকসংখ্যা ৫৯ জন। আসাম পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ১০৮ জন।

আসামের গভর্ণর সফর যাত্রার প্রাক্কালে গত ২৭শে অগ্রহায়ণ মন্ত্রিমণ্ডলের প্রস্তাবানুসারে রাজনীতিক কারণে বন্দী ৯ জনের সকলকেই মুক্তিদানে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছেন। সাদুল্লা-সচিবসঙ্ঘ দীর্ঘকালেও এই কার্য্য করিতে পারেন নাই, অথচ বরদলই মন্ত্রিমণ্ডল পদস্থ হইয়াই দেশের এই দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের স্বদেশানুরাগেরই উজ্জল দৃষ্টান্ত।

সামন্তরাজ্যে অশান্তি

ঢেনকানাল, রাজকোট প্রভৃতি বহু সামন্তরাজ্যে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ সামন্তরাজ্যের শাসক বর্ত্তমান যুগের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী নহেন।

সামন্তরাজ্যসমূহের অশান্তি দূরীভূত কল্পে ভারত সরকারের সেনাবল ও পুলিসের সাহায্য লইলেই কি হইবে? গণজাগরণকে অস্ত্রবলের দ্বারা দমন করিতে যাওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। মহীশূর-রাজের দাওয়ান স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের জন্য কমিটী গঠনে সম্মতি দিয়াছেন। প্রজার দাবীর বিষয় বিবেচনা করিয়া মতপ্রকাশের জন্যও কমিটী গঠিত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় প্রজাবর্গ শান্ত হইয়াছে। মহীশূরের এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য সামন্তরাজ্যের শাসকগণ গ্রহণ করিতে পারিলে এই সকল অশান্তির অবসান হইত।

সামন্তরাজ্যে নিরপেক্ষ কমিটী গঠিত না হওয়ায় স্বতঃই মনে হয় যে, শাসকগণ এই প্রকার তদন্ত করিতে দিতে সাহসী নহেন। হয়ত গলদ আছে বলিয়াই এইরূপ আশঙ্কা।

ঢেনকানালের ন্যায় রাজনন্দন গাঁও একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সে রাজ্যে সত্যাগ্রহ হইবার আশঙ্কা হওয়ায় ভারত সরকার সেনাবল প্রেরণ করিয়াছেন। প্রজারা কেন সত্যাগ্রহ করিতেছে, দোষ কোন্ পক্ষের, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাও কি ভারত সরকারের পক্ষে সঙ্গত ছিল না?

সামন্তরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন স্বৈরশাসন অব্যাহত থাকিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘগঠনে দেশবাসী সম্মতি দিতে পারে না।

নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র ও নিরবচ্ছিন্ন স্বৈরশাসনের মিলন অসম্ভব। সুতরাং সামন্তরাজ্যের শাসকগণ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া প্রজাবর্গের ন্যায়সঙ্গত দাবী পরিপূর্ণ করিতে উদ্যোগী না হইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে না।

রাজকোট সত্যাগ্রহে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের কন্যা শ্রীমতী মণিবেন পেটেল এবং আমেদাবাদের শেঠ অম্বালাল সারাভাইয়ের কন্যা মৃদুলা সারাভাই যোগদান করিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে প্রত্যেককে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। অনাদায়ে আরও ১ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ঢেনকানাল রাজ্যের প্রজাবর্গের উপর পুনঃ পুনঃ গুলীবর্ষণের পর মহাত্মাজী তাঁহার অভিমত "হরিজন" পত্রে লিখিয়াছেন, হরিপুরা কংগ্রেসে যে প্রস্তাবের পর প্রজারা বুঝিতেছে, তাহাদিগের চেষ্টার উপরেই তাহাদিগের মুক্তি নির্ভর করিতেছে। তাই বিভিন্ন সামন্তরাজ্যে প্রায় একই সময়ে জনজাগরণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সামন্তরাজের শাসকগণ যদি প্রজামণ্ডলীর সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই কল্যাণকর হইবে।

হয় সামন্তরাজ্যসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, নচেৎ শাসকগণকে তাঁহাদিগের কার্য্যের বিনিময়ে পারিশ্রমিকমাত্র গ্রহণ করিয়া প্রজাবর্গকে শাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে ন্যাসরক্ষকরূপে পরিণত করিতে হইবে।

মহাত্মাজীর এই নির্দ্ধারণ আদৌ অসঙ্গত নহে। সামন্ত রাজ্যের শাসকগণ প্রজাদিগকে তাহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদান করিলে ভারত সরকারের আপত্তির সঙ্গত কারণ নাই।

মহাত্মা গান্ধীর কথা অনুসারে মনে হয়, কংগ্রেস ও প্রাদেশিক উড়িষ্যা-সরকারের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত। উড়িষ্যার কংগ্রেস ঢেনকানাল সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গান্ধীজীও যথার্থ বলিয়াছেন, প্রাদেশিক সরকারেরও এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব আছে। প্রদেশের কল্যাণকল্পে উড়িষ্যা সরকার এবং উড়িষ্যার কংগ্রেস এই ব্যাপারের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ না করিয়া পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

হায়দ্রাবাদে সাম্প্রদায়িকতা ও সত্যাগ্রহ

হায়দ্রাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-ছাত্রগণকে "বন্দে মাতরম্" গান গাহিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। কারণস্বরূপ বলা হয় যে, বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত রাজনীতিক এবং বিতর্কমূলক। উহাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধসৃষ্টির আশঙ্কা আছে। নিজাম সরকার এই সম্পর্কে যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সুস্পষ্টভাবে ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে হিন্দুছাত্রগণ বহুকাল হইতে "বন্দে মাতরম্" গান করিয়া আসিতেছিল। এত দিন তাহাতে আপত্তি হয় নাই।

হিন্দুছাত্রগণ ঐ আদেশের প্রতিবাদ করিয়া ভাইস্ চ্যান্সেলারকে জানায় যে, "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত আদৌ রাজনীতিক বিতর্কমূলক বা সাম্প্রদায়িক বিরোধসৃষ্টিকর নহে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ যেন আদেশ প্রত্যাহার করেন। ছাত্রগণ নিষেধ আজ্ঞা সত্ত্বেও "বন্দে মাতরম্" গান গাহিয়া চলিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শতাধিক ছাত্রকে উক্ত অপরাধের জন্য ছাত্রাবাস ও কলেজ হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় হিন্দুছাত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। এই জন্য অন্যান্য বিদ্যায়তন হইতেও সহস্রাধিক ছাত্রের নাম কাটা গিয়াছে।

"বন্দে মাতরম্" ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে নানা অনুষ্ঠানে এই অমর সঙ্গীত গান করিয়া ধন্য হইয়া আসিতেছে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই গানে আপত্তি করেন নাই। সহসা ওস্‌মানিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ "বন্দে মাতরম্" গানে ত্রস্ত হইয়া স্বৈরাচার প্রকট করিলেন কেন?

সাম্প্রদায়িক ব্যাপার হায়দ্রাবাদ রাজ্যে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কলেজের হিন্দু ছাত্রগণের অভিযোগে ছাত্রদিগের উর্দ্দিতে মুসলমান-প্রভাবের পরিচয় প্রকট, উহা দূর করিতে হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

দিতে হইবে এবং মুসলমান-ছাত্রদিগকে যেমন ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে, হিন্দু ছাত্রগণকে তেমনই তাহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হইবে। ইহার প্রতিকার জন্য তাহারা ধর্ম্মঘট করিতেছে। তাহা ছাড়া হায়দ্রাবাদ দরবার অন্যান্য নানা ব্যাপারে যে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাহা পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

যে রাজ্যে শতকরা হিন্দুর সংখ্যা ৮৫ এবং মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১০ জন মাত্র, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদে মুসলমানের প্রভাব এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অশোভন নহে কি ?

হায়দ্রাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত রাজস্ব হইতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। শতকরা ৮৫ জন হিন্দুর প্রদত্ত রাজস্ব যে শতকরা ১০ জন মুসলমান-প্রজার প্রদত্ত রাজস্ব হইতে অনেক অধিক, তাহা হিসাব করিয়া দেখিবারও প্রয়োজন হয় না। এরূপ অবস্থায় হিন্দু ছাত্রগণের পরিচ্ছদে মুসলমান প্রভাব পরিস্ফুট করিবার যুক্তি থাকিতে পারে কি ?

রাজ্যের শাসক যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মমতে স্বাধীন ভাবে চলিবার অবকাশ প্রদানই সুশাসকের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পুনঃ পুনঃ নানাবিধ বিষয়ে হায়দ্রাবাদে হিন্দু জনসাধারণের সঙ্গত অধিকার ও দাবী লইয়া দরবারের সহিত হিন্দুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। ইহা কল্যাণকর নহে।

ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-ছাত্রের সংখ্যাই সমধিক। শুধু মুসলমান ছাত্রদিগের মনস্তুষ্টির জন্য যদি এ কার্য্য করা হইয়া থাকে, তবে তাহা অসঙ্গত, অশোভন এবং অনাচারদ্যোতক। হায়দ্রাবাদ সরকারের শিক্ষা-সচিব এবং ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার সার আকবর হায়দারী আপনাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। তিনি বহু বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ছাত্রগণকে তিনি অসাম্প্রদায়িক আদর্শের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াও থাকেন। ছাত্রগণ তাঁহার নিকট সুবিচার প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছে।

হায়দ্রাবাদের প্রজাবর্গ অধিকারলাভের জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছেন। জনরব, হায়দ্রাবাদ সরকার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নিজাম দরবারের সচিবসঙ্ঘে ৬ জন সদস্যের ৪ জন মুসলমান, ১ জন ইংরেজ বাদে এক জন মাত্র হিন্দু সদস্য রাজা শ্যামরাজ বাহাদুর দমননীতির প্রতিবাদে পদত্যাগপত্র প্রদান করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও পরিষদে হিন্দু সদস্য মাত্র ১ জন, দরবারের হিন্দু-কর্ম্মচারী মাত্র ১৭ জন, অথচ মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৭৩ জন।

এ কথা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণ, শিক্ষা ও কর্ম্মনিপুণতায় অযোগ্য। তথাপি এই বৈষম্য কেন? ইহাতে যদি হায়দ্রাবাদের হিন্দুর মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, তাহাতে অস্বাভাবিকত্ব কি থাকিতে পারে ?

হায়দ্রাবাদে ব্যক্তিস্বাধীনতা নানারূপে ক্ষুণ্ণ করা হয়, ইহা কবিকল্পনার কথা নহে। তথায় মসজেদের নিকট বাদ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ বিধিনিষেধ আছে। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে রাজনীতিক সভার অধিবেশন হইতে পারে না। ধর্ম্ম আলোচনার সভায়ও সন্দেহ করা হয় ও অনুমতি লইতে হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আত্মজীবনকাহিনীতে তাহার উল্লেখ আছে।

এইরূপ অবস্থায় হায়দ্রাবাদে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিলে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায় ?

হিন্দু-মহাসভার সভাপতি সাভারকর মহাশয় নিজাম রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবনার প্রসঙ্গকালে মুসলমান-শাসককে হিন্দুবিদ্বেষী বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের ব্যবহারে মোগল সাম্রাজ্যের পরিণামফলের কথাও স্মরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

বিহারে বাঙ্গালী-সমস্যা

বিহারের কংগ্রেস-নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী" বিহারে বাঙ্গালী-সমস্যা সমাধানের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার নির্দ্ধারণ বহু বিলম্বের পর কংগ্রেসের নিকট পেশ করিয়াছেন। ওয়ার্দ্ধার অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী সেই সমস্যার সমাধান করিবেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দ্ধারণের সংক্ষিপ্ত সার সংবাদ-পত্রে যতটুকু বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সমস্যাসমাধানকল্পে সুবিচার করিতে পারেন নাই বরং বিহার সরকারের নীতিরই সমর্থন করিয়াছেন।

তিনি ডমিসাইল সার্টিফিকেটপ্রথা বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ডমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণের প্রথা পরিত্যক্ত হইলেও বিহার সরকার সরকারী চাকরীতে বাঙ্গালীর প্রবেশ অসম্ভব করিতে পারেন।

বিহার প্রদেশে ব্যবসা করিবার পক্ষে কাহারও কোন বাধা থাকিবে না বলিয়া তিনি মতপ্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু যে সকল ব্যবসায়ী বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিহারী নিয়োগ করিয়া সরকারের অনুরোধ রক্ষা করিবেন, তাঁহারাই সরকারী সুবিধা পাইবেন।

এতদিন ধরিয়া ভারতবাসী আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন যে, এদেশে বিদেশীদিগের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে ভারতবাসীকে শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কোন প্রদেশ এমন কথা বলেন নাই যে, সেই প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানে সেই প্রদেশের লোককেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা প্রাদেশিকতার বিষ চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে।

বিহারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রসংখ্যা যখন সীমাবদ্ধ, তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য, বিহারবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের জন্যও ছাত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিতে অভিমত দিয়াছেন। তবে ভারতবাসীর সংখ্যা অনুসারে তাহা করিতে হইবে। যদি বিহারবাসীদিগের সুবিধার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অন্য প্রদেশের ছাত্রকে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত করা হইবে।

ইহাতেও প্রাদেশিকতার পূর্ণ বিকাশ প্রকট। স্থানাভাবের অজুহাতে কতকগুলি শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা জাতীয় একতা ও প্রসারের পরিপন্থী কি না, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার কর্ত্তব্যসম্পাদনে অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। কারণ, প্রথমতঃ তিনি নিজে বিহারী। দ্বিতীয়তঃ তিনি বিহারে কংগ্রেসের নেতা এবং বিহারের নিয়ামক। বিহারের কংগ্রেসী সরকার তাঁহার নিজের মতেরই অনুসরণ করিবেন। সুতরাং বিহারে বাঙ্গালী-সমস্যা সমাধানের ভার তাঁহার উপর প্রদান করায় তাঁহাকে নিজের মনোভাবের বিরুদ্ধেই রায় দিতে হয় নাই কি? এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট নিরপেক্ষ সুবিধার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। তিনি অতিমানব নহেন। কাজেই অনুসৃত সঙ্কীর্ণ নীতি তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দ্ধারণের পর ওয়ার্দ্ধা অধিবেশনেও সমাধান সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। বাঙ্গালী সম্বন্ধে তাঁহার মনে উদারতার অভাব আছে, ইহা অনেকেরই ধারণা। তাঁহার নির্দ্ধারণেও তাহাই প্রকাশ।

কংগ্রেস সমগ্র ভারতবাসীকে এক করিয়া অখণ্ড ভারত রচনার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেস-শাসিত বিহারে যদি জাতীয়তার বিঘ্নস্বরূপ প্রাদেশিকতার প্রভাব প্রবলই হয়, তাহা হইলে অখণ্ড ভারত রচনার চেষ্টা আকাশকুসুমেই পরিণত হইবে। প্রাদেশিকতার বিষবাষ্প ক্রমে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। বাঙ্গালীও এ দেশের বিহারীদিগের সম্বন্ধে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে না, কে বলিল? এইভাবে যদি সকল প্রদেশেই প্রাদেশিকতার প্রসার হয়, তখন তাহা সাম্প্রদায়িকতারই নামান্তর হইয়া উঠিবে না কি?

সময় থাকিতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁহার হিতকামী বন্ধুগণ বিহারে প্রাদেশিকতার স্থানে জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন। নচেৎ অখণ্ড ভারত রচনা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

মৌলানা সৌকত আলী

মৌলানা সৌকত আলী গত ২৭শে নবেম্বর ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অকস্মাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে মুসলমান সম্প্রদায় এক জন বিশিষ্ট জননায়ক ও জাতীয় সংগ্রামের সাহসী যোদ্ধা হারাইলেন।

রামপুর রাজ্যে তাঁহার জন্ম। আলীগড় কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সরকারী কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৭ বৎসর চাকরীর পর কার্য্যে ইস্তফা দিয়া তিনি সহোদর মৌলানা মহম্মদ আলীর প্রেরণাবশে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইসলামের গৌরব প্রতিষ্ঠায় উভয় ভ্রাতারই অত্যন্ত আগ্রহ ছিল।

জার্ম্মাণযুদ্ধের সময় উভয় ভ্রাতাকে বিনাবিচারে মধ্য

প্রদেশের চিণ্ডোয়ারায় বন্দী রাখা হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহারা দেশবাসীর প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে মুক্ত করিবার জন্য বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসও তাঁহাদিগের

মৌলানা সৌকত আলী

মুক্তির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের অবসানে তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

তাহার পর হইতেই আলী-ভ্রাতৃযুগল মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় জাতীয় আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করেন। যুদ্ধের পর যে শাসন-সংস্কার ভারতবর্ষকে প্রদত্ত হইল, জাতীয়তাবাদীরা তাহা গ্রহণে অসম্মত হইলেন। রাউলাট আইন প্রবর্ত্তনে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও পঞ্জাবের সামরিক আইনের অনাচারে দেশের হিন্দু-মুসলমান একযোগে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজ ও খিলাফৎ আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলে আলীভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মৌলানা সৌকত আলী সেই সময় খিলাফৎ কামটী সংগঠন করিয়া উহার প্রচারকার্য্যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। হিন্দু ও মুসলমানের সেই মিলিত আন্দোলনে ভারত সরকারকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল।

করাচী-সম্মেলনে সৈনিকগণকে পদত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধজ্ঞাপক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবে আলী-ভ্রাতৃযুগল এবং আরও ৬ জন সমর্থন করায় তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়া দুই বৎসর কারাদণ্ড বরণ করেন। মুক্তি-লাভের পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মৌলানা সৌকত আলী ও তাঁহার ভ্রাতা গান্ধিজীর সহিত কিছুদিন কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার পর কোহাটের ব্যাপারে গান্ধীজীর সহিত মৌলানা সৌকত আলীর বন্ধুত্ব বন্ধন ছিন্ন হয়। কোহাটের মুসলমানদিগের অত্যাচারে হিন্দুরা জর্জ্জরিত হইলে গান্ধীজী মৌলানা সৌকত আলীর সহিত কোহাট পরিদর্শনে গমন করেন। মহাত্মা গান্ধী সকল বিষয়ের সন্ধান লইয়া মুসলমানদিগকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেন। সৌকত আলী মুসলমানদিগের অপরাধ লঘু প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান।

তাহার পর হইতে নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মৌলানা সৌকত আলী কংগ্রেসের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। ক্রমে তাঁহার বৃটিশ-বিরোধিতার প্রবৃত্তিও হ্রাস পাইতে থাকে। ভারত সরকার তাঁহার বাজেয়াপ্ত পেন্সন পুনরায় দিবার ব্যবস্থা করেন।

শেষ জীবনে মৌলানা সৌকত আলী মুসলীম লীগে মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব স্বীকার করেন। ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের নূতন উদ্যমে যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, সেই মৌলানা সৌকত আলী তাহার ঘোর বিরোধিতায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তথাপি দেশের লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া পারে না। কারণ, এক দিন তিনি জাতীয় সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধার মত যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। তিনি সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইলেও, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী আপোষ ও সদ্ভাবস্থাপনের পক্ষপাতী

ছিলেন। আজ তাঁহার শেষ জীবনের সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিগত দিনের দেশসেবা ও স্বার্থত্যাগের কথাই স্মরণ করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়

লালগোলার মহারাজকুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ রায় গত ৯ই অগ্রহায়ণ পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি। লালগোলার দানবীর মহারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি দেশের—নানা জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র সুলেখক কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, তিন কন্যা ও পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

হেমেন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

গত শনিবার ১৭ই অগ্রহায়ণ বরেণ্য জ্ঞানবীর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে শুধু বাঙ্গালার নহে, সুসভ্য দেশসমূহের বিদ্বজ্জনসমাজের এক অত্যুচ্চ শৃঙ্গ খসিয়া পড়িল।

পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ব্রজেন্দ্রনাথ যে মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সুদুর্ল্লভ। বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অবাধ অধিকার ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসহকারে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ সিটি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য গ্রহণ করেন। এক বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর তিনি নাগপুর মরিশ কলেজে অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। বহরমপুর কলেজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হইয়া তিনি নাগপুর হইতে বহরমপুর আসিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন।

অতঃপর ব্রজেন্দ্রনাথ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি "সত্যের পরীক্ষা" শীর্ষক এক জ্ঞানগর্ভ পুস্তিকা রচনা করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্‌গণের এক আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁহার এই প্রসিদ্ধ পুস্তিকা পঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত "বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম", "আইনের আরম্ভ ও সমাজনীতির সংস্থাপক হিন্দু" নামক দুইটি সুচিন্তিত উপাদেয় প্রবন্ধও এই কংগ্রেসের ইতিহাস বিভাগে পঠিত হইয়াছিল। এই সকল রচনায় তিনি যে মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে পঞ্চম জর্জ্জ অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। মহীশূর রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির খসড়াও তাঁহার রচিত। তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ মহীশূর-দরবার এই গুরু দায়িত্বভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। মহীশূর-দরবারে তিনি শাসনপরিষদের আসনও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মহীশূর দরবারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সেই সময়ে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক বার য়ুরোপে গমন করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন আন্তর্জ্জাতিক সম্প্রদায়সমূহের কংগ্রেসে আলোচনা আরম্ভ করিবার গৌরবজনক আসন লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম রচনার জন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি কায করিয়াছিলেন।

রামমোহন-শতবার্ষিকী, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

শতবার্ষিকীতেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্ম-সম্মিলনের এক দিনের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

বিগত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসে তাঁহার ৭২ বৎসর বয়স উপলক্ষে এক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ অসাধারণ জ্ঞান ও মনীষার উপযুক্ত রচনাসম্ভারে বাঙ্গালা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি জ্ঞানপিপাসুকে অকাতরে তাঁহার সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার রচনাসম্ভার প্রচুর না হইলেও, যাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।

৭৬ বৎসর বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূর্ণ হইবে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। জ্ঞানের যে বিমলরশ্মি সম্প্রসারিত হইতেছিল, তাহা এতদিনে নির্ব্বাপিত হইল।

ওয়ার্দ্ধায় কার্য্যকরী সমিতি

গত ১১ই ডিসেম্বর হইতে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেসের কার্য্য-পরিচালক সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইলে সমিতির তিন জন সদস্য ব্যতীত অন্য সকলেই এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের পর যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমেই একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার য়ুরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ঢেনকানাল, হায়দ্রাবাদ, আজমীর, মাড়োয়ার প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সামন্তরাজ্যের কংগ্রেস-প্রতিনিধি সেই সকল রাজ্যের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তৃতীয় দিনের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী আলোচনায় যোগদান করিয়া বিভিন্ন সামন্তরাজ্যে প্রজা আন্দোলন সম্বন্ধে 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংস্কারব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্যস্থাপনের জন্য কি ভাবে নব উদ্যমে চেষ্টা করা যাইতে পারে, এই সম্মেলনে তাহারও আলোচনা হইয়াছিল। কংগ্রেসের গণসংযোগ-কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য মসলেম লীগ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কার্য্যপরিচালক সমিতিতে তাহারও আলোচনা হইয়াছিল।

১৩ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, পঞ্জাবে সার সিকন্দর হায়াৎ খাঁর সচিবসঙ্ঘের স্থায়িত্ব

সম্বন্ধে কেহ কেহ নিশ্চিন্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহার অবস্থা সেরূপ নিরাপদ নহে। ঠিক ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইলে সিন্ধুর মন্ত্রিসভার অবস্থা নিরাপদ হইবে। ব্যবস্থা পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের পতন অবশ্যম্ভাবী।

বাম্নুতে উপজাতির হানা সম্বন্ধে মিঃ আসফ আলি রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াও কোন সুমীমাংসা সম্ভব হয় নাই। অধিবেশনে হিসাবপত্র পরীক্ষার পর বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল ; কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারায় সদস্যগণ তাঁহার রিপোর্টের সমর্থন করিলেও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। যদি খণ্ড-ভারতের স্থানে মহাভারতের প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিকতার স্থানে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে।

সামন্ত রাজ্যগুলিতে প্রজা আন্দোলন সম্বন্ধে কমিটীতে আলোচনা হইয়াছিল। সামন্ত রাজ্যের সমস্যা ও প্রজা আন্দোলন সমাধানের খসড়া মহাত্মাজী রচনা করিবেন। মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ শরীফের পুনর্নিয়োগের প্রস্তাবও হইয়াছিল।

গত ১৪ই ডিসেম্বর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির আলোচনা হইয়াছে—

(১) দেশীয় রাজ্যসমস্যা, (২) মিঃ নরিম্যান ও মিঃ শরীফ সম্বন্ধীয় আবেদন, (৩) কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের তারিখ নির্ণয়, (৪) কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সংস্কার, (৫) সাম্প্রদায়িক সমস্যা, (৬) বাট্টার হার।

এই সকল বিষয়ের আলোচনাকালে মহাত্মা গান্ধী অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই দিনের অধিবেশনে স্থির হয় যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনা আরও এক দিন চলিবে এবং মহাত্মাজীর রচিত একটি প্রস্তাব পেশ হইবে। কংগ্রেসের ভুয়া সদস্য সম্পর্কে অভিযোগের তদন্তব্যবস্থা হইবে। সুতায় চাঁদা না দিলে এবং নিয়মিতভাবে খদ্দর ব্যবহার না করিলে কেহ কংগ্রেসের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না।

রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের সহিত বেরারের যে বিরোধ চলিতেছে—তাহার নিষ্পত্তির ভার সর্দ্দার পেটেলের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

বাট্টার হার সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীতে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেন্স বাঁধিয়া দেওয়ায় তাহা ভারতের অর্থনীতিক স্বার্থের প্রবল প্রতিকূল বলিয়া বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী মহল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার তাঁহাদের দাবীতে পুনঃ পুনঃ বাধাদান করিয়া আসিয়াছেন। ভারত সরকার ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন, আপাততঃ সরকার অর্থের বিনিময় মূল্যের কোন পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহেন। কমিটীর অভিমত এই যে, টাকা প্রতি ১ শিলিং ৬ পেন্স বিনিময় হার প্রচলিত থাকায় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে, এজন্য দেশের কৃষকগণকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অথচ এই ব্যবস্থায় আমদানী পণ্য অযথা সুবিধা ভোগ করিতেছে। এই বিনিময়ের হার অধিক দিন স্থায়ী হওয়া উচিত নহে। এই বিনিময় হার রক্ষা করিবার জন্য গত ৭ বৎসর এদেশ হইতে বহু স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে, ইহা এদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এ দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য কমিটী সপরিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করিয়াছেন, টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স ধার্য্য করিবার অনুকূলে তিনি অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন।

ওয়ার্দ্ধা বৈঠকে গৃহীত বাট্টার হার নির্দ্ধারণের প্রস্তাবটি নূতন নহে। বোম্বাইএর ব্যবসায়িগণ টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স স্থলে ১ শিলিং ৪ পেন্স নির্দ্ধারণের জন্য বহুদিন হইতে আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহারা ভারতজাত বিবিধ পণ্য রপ্তানী করেন। ইহাতে তাঁহাদের অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু ইহার সহিত কৃষকগণের লাভ-ক্ষতির কোন সম্পর্ক নাই। লৌহ, কাগজ ও বিবিধ শিল্পসম্ভার-আমদানীকারকগণ অসম্ভব উচ্চ হারে ডিউটী দিবার পর আর এক দফা টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাসের জন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। জাপানী সুলভ পণ্যের প্রতিযোগিতায় বিলাতী পণ্যের কাটতি আরও কমিয়া যাইবে। বোম্বাইএর ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারগণ রপ্তানী স্বর্ণের মূল্য পাউণ্ড হিসাবে পাইতেছেন ও পাইবেন ; কিন্তু স্বর্ণসংগ্রহের জন্য কোন গৃহস্থকে তাঁহারা পাউণ্ডে মূল্য দিতেছেন বা দিবেন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মানসী

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

১৭শ বর্ষ] পৌষ, ১৩৪৫ [৩য় সংখ্যা

গীতা-বিচার

৯

গীতায় ব্রহ্মতত্ত্ব কি এই পঞ্চম অনুপ্রশ্নের বিচার চলিয়াছে,—গীতার দর্শন ঠিক শাঙ্কর-দর্শন বা প্রচলিত ব্যাখ্যাতৃগণের অবলম্বিত দর্শন নহে—ঠিক সাংখ্যদর্শনও নহে, তাহার সূচনা অগ্রহায়ণ মাসের (৮) গীতা-বিচারে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই বিস্তৃত আলোচনা এবারে করিতেছি। প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে ব্রহ্মসূত্রসম্মত দার্শনিক পদার্থ—(১) ব্রহ্ম, (২) ব্রহ্মশক্তি মায়া, (৩) ঈশ্বর, (৪) অবিদ্যা—মায়ারই রূপান্তর—(৫) জীব, (৬) অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ বিষয়ে শাঙ্করভাষ্যের মত—উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনো বুদ্ধি-বিজ্ঞানং চিত্তমিতি চানেকধা তত্র তত্রাভিলপ্যতে, ক্বচিচ্চ বৃত্তি-বিভাগেন সংশয়াদি-বৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে, নিশ্চয়াদি-বৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি (শাঃ ভাঃ ২।৩।৩২ সূত্রস্থ) এই অন্তঃকরণের মধ্যে মন অন্যতর, আর একটির নাম বুদ্ধি, পূর্ব্ব প্রদর্শিত শাঙ্করভাষ্যে ইহা সুস্পষ্ট না হইলেও (২।৩।১৫) সূত্রভাষ্যে তাহা স্পষ্টীভূত, 'সেন্দ্রিয়স্য তু মনসো বুদ্ধেশ্চ সম্ভাবঃ প্রসিদ্ধঃ'; অতএব (৬) অন্তঃকরণস্থলে—(৬) বুদ্ধি (৭) মন, এইরূপ গণনাই সঙ্গত। দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চভূত—সূক্ষ্ম ও স্থূল—অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত। ব্রহ্ম ঈশ্বর ও জীব ভিন্নরূপে উল্লিখিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই ভেদ কল্পিত—মায়াকল্পিত ভেদ ঈশ্বরে, অবিদ্যাকল্পিত ভেদ জীবে। মায়া এবং অবিদ্যায় মূলতঃ ভেদ নাই—উভয়েই অনাদি অজ্ঞান। তথাপি ব্যবহারিক পদার্থরূপে উল্লিখিত (৩২) বত্রিশ পদার্থ মূলভাবে গ্রহণীয়। শব্দস্পর্শাদি গুণ এবং বিবিধ ক্রিয়া—উহাদিগেরই আশ্রিত। সূক্ষ্মভূত—অপঞ্চীকৃত, স্থূলভূত—পঞ্চীকৃত। যে সমস্ত ভূত আমরা দেখিতেছি বা স্পর্শ করিতেছি বা ব্যবহার ক্ষেত্রে কার্য্য দ্বারা যাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছি তাহাই পঞ্চীকৃত। এই যে ভূমণ্ডল আমাদিগের আশ্রয়—ধরিত্রী, ইহাও পঞ্চীকৃত। ইহাতে বিশুদ্ধ পার্থিবাংশ অর্দ্ধেক এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ—জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ পাদার্দ্ধ পরিমাণ সমান ভাগে মিলিত আছে। এস্থলে, বলা আবশ্যক, এই ভূমণ্ডল অর্থাৎ ধরিত্রীর মধ্যে জলভাগ গ্রহণ করা হয় নাই, তাহা পঞ্চীকৃত জলেরই অন্তর্গত। আমরা যে জল পান ও অবগাহন প্রভৃতিতে ব্যবহার করি, তাহার অর্দ্ধাংশ বিশুদ্ধ জল এবং অপর অর্দ্ধাংশ পৃথিবী, তেজ, বায়ু ও আকাশ দ্বারা সংগঠিত—এই ভাবে আমাদিগের

প্রত্যক্ষীভূত জলের উদ্ভব। অপর তিন ভূত—তেজ, বায়ু এবং আকাশের অবস্থাও ঐরূপ, ইহাকেই পঞ্চীকৃত ভূত বলা হইয়া থাকে। যাহা আমাদিগের ব্যবহারে আসিতে পারে না, তাহা সূক্ষ্ম ভূত—তাহার সঙ্গে অপর ভূতের মিলন নাই। সাংখ্যদর্শনে, পঞ্চীকরণের কোন কথা নাই, কিন্তু পঞ্চতন্মাত্র আছে - গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র এবং শব্দতন্মাত্র। গন্ধতন্মাত্র হইতে এই দৃশ্যমান পৃথিবীর উৎপত্তি, রসতন্মাত্র হইতে দৃশ্যমান জলের উৎপত্তি, রূপতন্মাত্র হইতে দৃশ্যমান তেজের উৎপত্তি, স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পৃশ্যমান বায়ুর উৎপত্তি এবং শব্দতন্মাত্র হইতে ব্যবহ্রিয়মাণ আকাশের উৎপত্তি। দৃশ্যমান, স্পৃশ্যমান ও ব্যবহ্রিয়মাণ কথা কয়টি স্থূল কথার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই দুই দর্শনের এ বিষয়ে আলোচনা করিলে মনে হয় বটে, যাহা সূক্ষ্মভূত তাহাই তন্মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ, সূক্ষ্ম ভূত ও স্থূল ভূতে গুণের সংখ্যা সমান, সূক্ষ্ম আকাশে সূক্ষ্ম শব্দ, সূক্ষ্ম বায়ুতে সূক্ষ্ম শব্দ, স্পর্শ, সূক্ষ্ম তেজে সূক্ষ্ম শব্দ, স্পর্শ রূপ, সূক্ষ্ম জলে সূক্ষ্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রস। সূক্ষ্ম পৃথিবীতে সূক্ষ্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। স্থূল পঞ্চভূতে ঐ সকল গুণই স্থূল হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশব্দের অর্থ সাধারণ জীবের অনুপভোগ্য,—দেবতা বা যোগিগণেরই উপভোগ্য। স্থূল শব্দের অর্থ সাধারণ জীবেরও উপভোগ্য। পঞ্চতন্মাত্রের গুণ এরূপ নহে—শব্দ তন্মাত্রের গুণ সূক্ষ্ম শব্দ, শব্দতন্মাত্র হইতে ব্যবহ্রিয়মাণ আকাশের উৎপত্তি, আকাশে স্থূল শব্দ, স্পর্শতন্মাত্রের গুণ কেবল সূক্ষ্ম স্পর্শ, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন স্পৃশ্যমান বায়ুতে শব্দ স্পর্শ দুই গুণ থাকে, রূপতন্মাত্রের গুণ কেবল সূক্ষ্ম রূপ, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন দৃশ্যমান তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিন গুণ থাকে, রসতন্মাত্রের গুণ কেবল সূক্ষ্ম রস, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন দৃশ্যমান জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস চার গুণ থাকে, গন্ধতন্মাত্রের গুণ কেবল সূক্ষ্ম গন্ধ, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন দৃশ্যমান পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণই থাকে। বেদান্তমতে, পঞ্চীকরণ দ্বারা পৃথিবীতে পাঁচটি গুণ হইয়া থাকে। অপঞ্চীকৃত পৃথিবীর—একই গুণ, গন্ধ। সুতরাং এস্থলে দোষ না হইলেও আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা খাটে না,—কারণ, প্রত্যেক স্থূলভূতই যখন পঞ্চীকৃত, তখন আকাশেও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচ গুণই সকলের অনুভবযোগ্য হইতে পারিত, এইরূপ বায়ু, তেজ ও জলেও পাঁচ গুণ অনুভবযোগ্য হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় না,—আকাশে গন্ধ, রস ও স্পর্শ নাই, ইহা সর্ব্বসম্মত। নীল আকাশ বলিয়া সাধারণের একটা ব্যবহার থাকিলেও ঐ নীলিমা যে আকাশের রূপ নহে—ইহাও সকল দর্শন ও বিজ্ঞানসম্মত। বায়ুতেও রূপ, রস নাই, তেজে রস নাই। কেন থাকে না—এই বিচারের স্থল—বর্ত্তমান প্রবন্ধ নহে। অতএব ইহা মানিতেই হয় যে, সূক্ষ্মভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এক নহে। ন্যায়াদি দর্শনে সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই প্রকার ভূত স্বীকৃত হইয়াছে, সূক্ষ্মভূত পরমাণু; তাহা পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চার ভূতেরই হয়। আকাশের পরমাণু হয় না।

সাংখ্যদর্শনের পঞ্চতন্মাত্রবাদের মূল ভিত্তি প্রশ্নোপনিষদ্; "পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ আপশ্চ আপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ।"

এই উপনিষদের বাণীকে ভিত্তি করিয়া সাংখ্যের তন্মাত্রবাদ; শাঙ্করদর্শনের পঞ্চীকরণবাদকে ঐ বাণীই স্পষ্ট করিয়াছে—পঞ্চীকরণের মূল ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎকরণ। ব্রহ্মসূত্রেও ত্রিবৃৎকরণ আছে। প্রশ্নোপনিষদ্ ও ছান্দোগ্য লইয়া পঞ্চীকরণবাদ আচার্য্য শঙ্করের সৃষ্ট।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকামাত্র। মূল গীতাদর্শনে এই দুই মতই গৃহীত হয় নাই। ব্যাখ্যাকারদিগের মত যাহাই হউক, সাংখ্যদর্শনে একাত্মবাদ নাই, একাত্মবাদ ব্রহ্মসূত্রে আছে, গীতা-দর্শনেও একাত্মবাদ।

সাংখ্যদর্শনের মূল উপনিষদ্—এরূপ দাবী সাংখ্যাচার্য্যরাও করিতে পারেন, বিশেষতঃ 'অহঙ্কার' নামক অন্তঃকরণ সম্পর্কে। 'ব্রহ্মসূত্রে' অহঙ্কারের কথা নাই, উপনিষদে আছে, সাংখ্যে আছে আর গীতায় আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে 'অহং নামাভবৎ'। প্রশ্নোপনিষদে আছে, 'অহঙ্কারশ্চাহং কর্ত্তব্যঞ্চ'। সাংখ্যদর্শনে আছে, 'প্রকৃতে র্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ'। ব্রহ্মসূত্রমতে এই অহঙ্কারকে বুদ্ধি বা মনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে হয়। উপনিষদের স্পষ্ট উক্তি হইতে তাহার গতি যে ভিন্ন প্রকার, ইহা অস্বীকারের উপায় প্রাচীন ব্যাখ্যানুসারে নাই। তবে, উপনিষদের বহু স্থানের বিচার ব্রহ্মসূত্রেই আছে, এই জন্য ব্রহ্মসূত্র ঔপনিষদদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। জৈমিনীয় দর্শনে কর্ম্মকাণ্ড, বেদার্থ-মীমাংসা

এবং বাদরায়ণ-দর্শনে জ্ঞানকাণ্ড—উপনিষদ্, বেদার্থমীমাংসা আছে—এই জন্য এই দর্শনের যথাক্রমে নাম পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। সাংখ্য উপনিষদের অর্থবিচার না করিলেও তাহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভাব সাংখ্যাচার্য্যগণের আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্ভুত প্রতিভা-বলে, উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকে একার্থেই সমানীত করিয়াছেন, সাংখ্যকে ব্রহ্মসূত্রের অস্ত্র দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। এতৎসত্ত্বেও বলিতেছি, গীতাদর্শন ঠিক সাংখ্যও নহে, প্রচলিত ব্যাখ্যাযুক্ত ব্রহ্মসূত্রে স্থাপিত ঔপনিষদ দর্শন নহে। কিন্তু তিনি স্বয়ং ঔপনিষদ দর্শন, তদনুগত ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসূত্রও তাঁহারই অনুগামী। পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসাকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া একই দর্শন রূপে গীতাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সাংখ্যের যে অংশ উপযোগী—তাহাও গ্রহণ করিয়া নূতন দর্শনের উপদেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন। ইহাকেই বৈদিকদর্শন—ব্রহ্মদর্শন—উপনিষদ্-দর্শন—যে কোন আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে।

গীতাদর্শন ও সপ্তশতী-দর্শন—একার্থ প্রতিপাদক। সপ্তশতীকে দর্শন বলাতে অনেকে হয় ত বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু উহাই গীতাদর্শনের অনুগত দর্শন, তাহা এই প্রবন্ধেই দেখাইব। শ্রীশ্রীচণ্ডীর সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ দেবীভাষ্যে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, অন্য পদার্থের বিশ্লেষণ সপ্তশতীতে তেমন ভাবে নাই বটে—ব্রহ্মতত্ত্ব-বিশ্লেষণ বিশেষভাবেই আছে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, গীতায় কোন্ পদার্থ স্বীকৃত, ক্ষেত্রমধ্যে যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আছে—তাহা শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীধর স্বামী উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব কি—তাহা বলিয়া তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিব—মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ-তন্মাত্র ও পঞ্চভূত এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অচেতন এবং ত্রিগুণাত্মক।

ক্ষেত্র-কথন-প্রসঙ্গে গীতায় যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের নির্দ্দেশ আছে, তাহা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত ইহা—প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ ধরিয়া লইয়া চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব যে গীতাসম্মত ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে তিনশত দশ অধ্যায়ে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) যাজ্ঞবল্ক্যপ্রদত্ত সাংখ্যোপদেশ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে 'শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ। শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্। বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ। এতে বিশেষা রাজেন্দ্র—।' এ স্থলে শব্দ-স্পর্শাদিকে বিশেষ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু শব্দতন্মাত্র প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্র অবিশেষ অর্থাৎ ইহারা 'বিশেষ' মধ্যে গণনীয় নহে ইহা সাংখ্য-কারিকায় স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে—

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ॥

অতএব গীতা-দর্শনের শব্দ-স্পর্শাদি যে লক্ষণা দ্বারা পঞ্চ-তন্মাত্রকে বুঝাইবে, এমনটি কল্পনা সঙ্গত নহে—গীতাদর্শনের মতই শান্তিপর্ব্বে স্পষ্টীকৃত। ইহাতে বুঝা যায়—সাংখ্যসম্মত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পঞ্চতন্মাত্র গীতাদর্শনে গৃহীত হয় নাই। তৎস্থলে শব্দাদি বিষয় পাঁচটি গৃহীত হইয়াছে। কঠোপনিষদেও আছে—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ' এই অর্থই শব্দাদি পঞ্চ বিষয়।

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ব্যতীত—নিত্য অপরিণামী বস্তু আছেন, তাঁহার নাম পুরুষ,—এই পুরুষের নামান্তর—আত্মা, ব্রহ্ম, চিৎ ইত্যাদি। সাংখ্য মতে পুরুষ অনন্ত,—অসংখ্য। যত দেহ তত পুরুষ তো বটেই, তদ্ভিন্ন অশরীরী মুক্তপুরুষও আছেন। শরীর দ্বিবিধ—দৃশ্য ও অদৃশ্য। অদৃশ্য শরীরে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ 'অশরীরী' এই সংজ্ঞার অধিকারী হইলেও—আমি যে অশরীরী পুরুষের কথা বলিয়াছি—সেই মুক্ত পুরুষের—কোনরূপ শরীরই নাই—না দৃশ্য না অদৃশ্য। এই সকল পুরুষ পৃথক্ না হইয়া এক হইলে জন্মমৃত্যু সুখ-দুঃখ ও বন্ধ-মুক্তির ব্যবস্থা থাকে না, এক আত্মার দেহ-সম্বন্ধ ও দেহ-বিয়োগ যুগপৎ হওয়াতে তাহার জন্ম বলা যাইবে? না—মৃত্যু বলা যাইবে? ইহা স্থির হয় না। আরও দেখ, রাম ও শ্যামের দেহে একই আত্মা,—অথচ রামের জন্ম ও মৃত্যু ঠিক এক সময় নহে—সুখ-দুঃখও একপ্রকার নহে—এক সময়েই উভয়ের ভোগ নহে,—বামদেব ও শুকদেবের আত্মা—মুক্ত হইলেও আমরা কেহই মুক্ত নহি, সংসারবন্ধনে বদ্ধ—অতএব পুরুষ, আত্মা এক নহে—ভিন্ন ভিন্ন,—ইহা সাংখ্যমত। এস্থানে একাত্মবাদীর আপত্তি এই যে, পুরুষ—আত্মা, বেদান্তের

ন্যায় সাংখ্যমতেও নির্গুণ, বুদ্ধির যে সুখদুঃখ তাহাই অবিবেক বশতঃই পুরুষ আপনাতে আরোপিত করে, তাহা হইলে পুরুষ বা আত্মার ন্যায় বুদ্ধিও জীব ভেদে ভিন্ন, ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে,—যদি বুদ্ধি ভিন্নই হইল, তখন নানা আত্মা মানার প্রয়োজন কি? বুদ্ধিযুক্ত স্থূল দেহের উৎপত্তিই জন্ম, আর বুদ্ধির সহিত স্থূল দেহের সম্বন্ধবিচ্ছেদই মৃত্যু, ইহা বলিলেই জন্ম-মৃত্যু ব্যবহারে বিশৃঙ্খলা নাই। সুখ-দুঃখও বুদ্ধিভেদেই ভিন্ন ভিন্ন, অতএব একের সুখে অন্যের সুখ, একের দুঃখে অন্যের দুঃখ বা ঐ ভাবের অনুরূপ আপত্তিও হইতে পারে না।

এই আপত্তির উত্তর,—সুখদুঃখ বুদ্ধির গুণ হইলেও একই আত্মা যখন সকল বুদ্ধির সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, তখন অবিবেকবশে সকল বুদ্ধির সুখদুঃখ একই পুরুষে আরোপিত হওয়াতে সুখী ও দুঃখী এই পৃথক্ ব্যবস্থা হইবার কারণ থাকে না। এইরূপ মুক্ত জীব এবং বদ্ধ জীবে ভেদ করাও যায় না। যে পুরুষ এক বুদ্ধির বিলয় বশতঃ মুক্ত, সেই পুরুষই অন্য বুদ্ধির সঙ্গে সুখদুঃখভোগী হওয়াতে তাহাকে মুক্ত বলা যাইবে?—বা বদ্ধ বলা যাইবে? ইহা নিশ্চয় হইবে কিরূপে? নানা আত্মা মানিলে এ দোষ নাই,—যে বুদ্ধির সঙ্গে যে পুরুষের সম্বন্ধ সেই বুদ্ধির লয় হইলে সেই পুরুষকে মুক্ত বলা যায়। তাহা না হইলেই তাহাকে বদ্ধ বলা হইয়া থাকে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন আত্মা মানিতে হয়। বেদান্ত-মতে যে একাত্মবাদের যুক্তি পৃথক্, তাহা গীতার মতের আলোচনা কালে বলিব।

এক্ষণে দেখা যা'ক্—গীতার মত কি? তাহাতে সাংখ্যের নানাত্মবাদ অথবা বেদান্তের একাত্মবাদ গৃহীত?

'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্।'

এই শ্লোক, এবং

'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ ধনঞ্জয়' ॥

এই সব শ্লোক দেখিলে গীতার মত নানাত্মবাদ, ইহা মনে হইতে পারে বটে,—কিন্তু

'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত'।

এই শ্লোকে একাত্মবাদের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'ইমে দেহাঃ' বলিলে,—প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান দেহসমূহ এইরূপ অর্থ বুঝায়। মানস নেত্রে দৃষ্টিগোচর হয়,—পার্থ-সারথি সেই যে পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ' মাথার উপরে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ঘুরাইয়া তাহাদিগের সকলকেই নির্দ্দেশ করিয়া এখন বলিতেছেন, "ইমে দেহাঃ' হে অর্জ্জুন! যাহা দেখিতেছ, এ সমস্তই দেহ,—ইহাদিগের নাশ আছে—নশ্বর যে ইহারা,—কিন্তু এই সকল দেহের অধিস্বামী এক জন, তিনি অবিনাশী। তাঁহার হনন নাই, অতএব যুদ্ধ কর!

ইহাতেও যদি সংশয় দূর না হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ সুস্পষ্ট একাত্মবাদের প্রমাণ আছে—

'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ'।

আমিই সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা। ইহা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের 'অহং' শব্দ স্বীয় ব্রহ্মভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত।

যদি এই একাত্মবাদই গীতাসম্মত হয়, তাহা হইলে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, (১) জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এবং মুক্ত, বদ্ধ ব্যবস্থা কেমন করিয়া সঙ্গত হয়—(২) 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গো-ঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।' ইত্যাদি শ্লোকে যে 'পুরুষ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কি সেই ব্রহ্ম অথবা জীব? যদি ব্রহ্ম হ'ন, তাহা হইলে—তাঁহার জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করিতে হয়, যদি জীব হ'ন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বা ভিন্ন? একটা কিছু বলিতেই হইবে। যদি অভিন্ন হ'ন, তাহা হইলে, ব্রহ্মেরই পুনর্জ্জন্মাদির আপত্তি, যদি ভিন্ন হ'ন, তাহা হইলে নানাত্মবাদ আসিয়া পড়ে।

এই দুই আপত্তির খণ্ডন :—

(১) পুরুষ শব্দের অর্থ চিৎ প্রতিবিম্ব,—যাহার বেদান্ত-সম্মত নাম চিদাভাস। প্রকৃতি, নদীর ন্যায়—তাহার বক্ষে শত শত লহরীমালা ছুটিতেছে, উপরে পূর্ণিমার চন্দ্র। নদীর প্রত্যেক লহরীতে সেই পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়া নাচিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে যেমন লহরীর অবস্থা—প্রতিবিম্বচন্দ্রেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিতেছে। পুরুষ—ব্রহ্ম, সেই পূর্ণচন্দ্র,—তাঁহার প্রতিবিম্ব প্রকৃতি-বক্ষে নিপতিত—ইহাই পুরুষের প্রকৃতি-স্থিতি। একটি লহরী বাঁকিয়া-চুরিয়া যাইলে তাহাতে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের রূপপরিবর্ত্তন

হইলেও—অপর লহরীস্থিত প্রতিবিম্বের যেমন কোন বৈলক্ষণ্য হয় না, তদ্রূপ এক পুরুষ-স্বরূপ চিদাভাসের প্রকৃতিবিকারজনিত যে ভাবান্তর, অর্থাৎ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি, তাহা অন্য চিদাভাসে উপস্থিত হয় না। যেমন চন্দ্রপ্রতিবিম্ব নানা, চন্দ্র এক, তেমনই পুরুষপ্রতিবিম্ব নানা, কিন্তু পুরুষ গীতোক্ত 'কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে' এই অক্ষর। প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণের অনেকেই এখানে 'কূটস্থ' শব্দের গীতামূলসম্মত অর্থ ত্যাগ করিয়াছেন,—অক্ষর শব্দের অর্থও অন্যরূপ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের সহিত ঐকমত্যযুক্ত গীতার নিজ সিদ্ধান্ত এখানে রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু অক্ষর ও কূটস্থ শব্দের অন্য অর্থে ব্যাখ্যা প্রাচীনরা করিয়াছেন, ইহাই আমি মনে করি। কেন মনে করি, তাহা বুঝাইবার জন্য গীতার মূল ও সেই উপনিষদ্ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে আছে—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখিয়া এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বব্যাপী অচল, নিত্য, সনাতন, অনির্দ্দেশ্য কূটস্থ, অব্যক্ত, অক্ষরকে উপাসনা করেন, সেই সর্ব্বভূত-হিতরত সাধকগণ আমাকেই (চিদচিদাত্মক পরব্রহ্মকেই) প্রাপ্ত হ'ন।

এখানে অক্ষর, অব্যক্ত, কূটস্থ শব্দের অর্থ চিন্মাত্র বা চিদচিদাত্মক ব্রহ্ম, ইহা বলিতেই হইবে। নতুবা অন্য কোন উপাসনা অর্থাৎ জড়ের উপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায় এবং প্রশ্ন ও উত্তরের সহিত জড়োপাসনার কোন সম্বন্ধ না থাকায় ঐ গীতাস্থিত কূটস্থ অক্ষর এবং অব্যক্ত যে জড় প্রকৃতি নহে, তাহা সুস্পষ্ট। অতএব এ স্থলে কূটস্থ শব্দের যে অর্থ—'কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে' এ স্থলে সেইরূপ অর্থ হইলেই গীতার মূলের অনুসরণ হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও দেখিতেছি—

'ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।'১।১০।

প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, 'ক্ষর' সংজ্ঞায় অভিহিত; হর অর্থাৎ পুরুষ—আত্মা, অমৃত 'অক্ষর', এই ক্ষর এবং অক্ষরের ঈশ্বর যিনি, তিনি এক অর্থাৎ ক্ষরাক্ষরে একীভূত, তাঁহার ধ্যান ও যোগ দ্বারা তদ্ভাবে ভাবিত হইলে 'বিশ্বমায়া' এই প্রপঞ্চকুহক নিবৃত্ত হয়। (এই অর্থ আচার্য্যাদিসম্মত না হইলেও শ্বেতাশ্বতরেরই মন্ত্রাশ্রয়ে এই অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে
সর্ব্বপাশৈঃ। ১৮।

সংযুক্ত যে ক্ষর ও অক্ষর, তিনিই ঈশ, ব্যক্তাব্যক্তাত্মক বিশ্বকে ধারণ ও পালন করেন, আত্মা অর্থাৎ অক্ষরাত্মক পুরুষ অনীশ—তিনি ভোক্তৃত্বাভিমানে বদ্ধ হন, এইরূপ দেবকে—জানিলে সর্ব্ব পাশ হইতে মুক্তিলাভ হয়। স্থূল অর্থ—পাশ শব্দের বন্ধন। এস্থলে 'সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ' থাকাতে ইহা বিশ্বের বিশেষণ হইতে পারে না—তাহাতে সংযুক্ত পদ নিরর্থক হয়, বিশেষতঃ 'ব্যক্তাব্যক্তং' থাকাতে সমস্ত বিশ্বই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে—'সংযুক্তমেতৎ ক্ষরম-ক্ষরঞ্চ' এই অংশই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব 'কেবল চিৎ' অক্ষর এবং কূটস্থ হইলেও—কোন কোন স্থলে ব্রহ্মনামে আখ্যাত হইলেও, ব্রহ্ম যে চিদচিদুভয়াত্মক, তাহা এতদ্ দ্বারা প্রমাণিত। অতএব 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতো লোকে চ বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' 'ক্ষরমতীতোঽহং' কেবল 'ক্ষর'কে আমি অতিক্রম করিয়াছি, আমার যে উভয়াংশ ক্ষর ও অক্ষর, তাহাকে আয়ত্ত করা ক্ষরের সাধ্য নহে, এ কারণে আমি ক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছি, এবং অক্ষর আত্মা হইতেও আমি উত্তম—কেবল চিৎ কর্তৃত্বাদিবিহীন, ঐশ্বর্য্যশূন্য, আর আমি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বকর্ত্তা,—অতএব অক্ষর হইতেও উত্তম,—এই কারণে আমি পুরুষোত্তম।

এই পুরুষোত্তমই সপ্তশতীর মহামায়া—

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।'

'অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা'। আবার 'চিতিরূপেণ'—'যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।'

তিনিই প্রকৃতি—প্রধান, আবার তিনিই পুরুষ আত্মা—চিৎ বা চিতি; জড় ও চেতন উভয়ের সংযুক্তাবস্থা। ভাবার্থ

এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষে একটি যে অখণ্ড সত্তা আছে, তাহাই মহাশক্তি, তিনিই পুরুষোত্তম। শব্দশাস্ত্রানুবর্ত্তী লিঙ্গবিচার করিয়া কেহ যেন ভুল না করেন, পুরুষোত্তম ও মহাশক্তি এক হইবেন কিরূপে? শব্দশাস্ত্রানুসারে, 'দার' 'কলত্র' 'কুটুম্বিনী' 'গৃহিণী' এই সকল শব্দ একার্থ-বাচক হইলেও দার শব্দ পুংলিঙ্গ, কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, কুটুম্বিনী প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া যাহাকে বলা হইয়াছে, তিনিই মহামায়া—লিঙ্গ ভেদে অর্থভেদ নাই। আর তিনিই যে মহাশক্তি—ইহা নির্ণয় করিবার পক্ষে প্রমাণ—

'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।'

এই উপনিষদ্-মন্ত্র। গীতারম্ভের পূর্ব্বেই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যে দুর্গাস্তোত্র পাঠে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই স্তোত্রার্থের সহিত গীতার্থের যে সম্বন্ধ আছে, গীতার ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সেই স্তোত্রার্থতত্ত্ব যে এক এবং এ সম্বন্ধে যে আপত্তি হইতে পারে, তাহা বারান্তরে দেখাইব।

[ক্রমশঃ

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সখী-সংবাদ

ইন্দিরা। সত্যি পূরবী, মিনুদের কথা, বলবো কত?
দু'বছর হ'ল এখনো বিয়ের ক'নের মত,
এখনো ওদের কত রাত কাটে, বিনিদ্রাতে,
সত্যি, এসব বাড়াবাড়ি না কি? সকল তাতে?
ছেলেপুলে হ'ল তবু যেন প্রেম বাড়ছে নিতি,
বরাবর থেকে জানি মিনতির অমনি রীতি।
ধরবে যাহা তা ছাড়বে না মোটে জীবনে আর,
এসব মেয়ের পাত্তা পাওয়া বড়ই ভার।

পূরবী। সত্যি না কি রে ইন্দিরা, যা' যা' বললি সবই,
হবে না তা কেন, জানিস না তুই? ওরা যে কবি—
কবিদের প্রাণে প্রেমের মাত্রা বেশীই জাগে,
ওরা ধরণীরে রাঙাইয়া তোলে প্রাণের রাগে!
তোদের মতন ইকনমিক্সে স'পে নি মন,
স্বামী-সংসার ঘর করুণাই শ্রেষ্ঠ ধন।
গণিত-শাস্ত্র ঘেঁটে কড়া পড়ে মোদের প্রাণে—
আজিও কোয়েলা গাহিছে মিনুর হৃদয়ে-মনে।

ইন্দিরা। তোর যে পূরবী বড়ই দুঃখ জাগছে, প্রাণে,
দেখো দিদিভাই, যেও না কো ভেসে প্রেমের টানে,
মোরা দুনিয়ার কত সংবাদ নিত্য পাই.
নূতন নূতন জ্ঞানালোক হেরি যেদিকে চাই
রুদ্ধ দুয়ারে নিশীথ রাত্রে প্রেমের বাণী
বলিস নে আর, শুনে শুনে তায় বিরাগ মানি।
আচ্ছা, পূরবী, বিয়ের আগে তো মোদেরই মত,।
বিয়ের উপর মিনতির ছিল বিরাগ কত!
তার পর বিয়ে হতে না হতেই ভিন্ন পথ,
অনায়াসে ছেড়ে দিল সে তাহার আগের মত।
শুনিস্ নে তার পাতিব্রত্যের বুকনী যত?
কভু হাসি পায়, কভু মন হয় বজ্রাহত!

পূরবী। বড় আনন্দে আছে ওরা তুই বুঝিস্ না রে,
বইয়ের কাঁটায় নিজেদের মোরা আছি যে ঘিরে,
স্বামী-সন্তান ঘর-সংসার সাধনার ধন,
সুগৃহিণী হবার তরে এ বিদ্যার্জ্জন,
মিনতি বুঝেছে নারী-জীবনের মর্ম্মকথা—
সংসার—স্বামী-সন্তান ল'য়ে সার্থকতা!

শ্রীমতী সুবাসিকা দেবী।

উপন্যাস]

৩২

কণার বিবাহ দিবার জন্য পূর্ণিমাও বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন; তাই সে বিষয়ে রেণুর আগ্রহ তাঁহার নিকট সমর্থন পাইল। স্বভাবতঃ পরনির্ভরশীল নীরেন্দ্র তাঁহাদিগের আগ্রহেই আগ্রহানুভব করিলেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যবস্থা সবই পূর্ণিমাকে ও রেণুকে করিতে হইল।

এক দিন বিবাহের একটি প্রস্তাবের আলোচনা-প্রসঙ্গে রেণু যখন বলিয়া ফেলিল, "মা, কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, ওর মা থাক্‌লে তিনি কি এ সম্বন্ধে সম্মতি দিতেন?"—তখন পূর্ণিমা, নীরেন্দ্র ও রেণু তিন জনই সেই কথায় চমকিয়া উঠিলেন। রেণু চমকিয়া উঠিল, যে ভাব সে এতদিন গোপন করিয়া আসিয়াছে এবং গোপন করিতেই আপনার মানসিক শক্তি প্রযুক্ত করিয়াছে, সেই ভাব আজ তাহার সকল সতর্কতা প্রহত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল! নীরেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, এ কি রেণু তাহারই এক দিনের একটি অসতর্ক উক্তির প্রতিশোধ লইল! যে দিন সে তাহার গৃহে আসিয়াছে, সেই দিন হইতে সে কণাকে ও অশোককে যেমন তাহাদিগের জননীর অভাব কখন অনুভব করিতে দেয় নাই, তেমনই আর কেহও কখন তাহাদিগের প্রতি তাহার ব্যবহার জননীর ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারে নাই—যে সব ঘটকী সম্বন্ধ লইয়া যাতায়াত করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই জানে না—সে কণার বিমাতা। আর পূর্ণিমা চমকিয়া উঠিলেন, যখন তিনি আশা করিতেছিলেন, রেণু তাহার অভিমান ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তখন তাঁহাকে বুঝিতে হইল—তাঁহার সে আশা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূর্ণিমাই সর্ব্বাগ্রে কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "কেন, তুমি কি কণার মা ছাড়া কিছু? যদি কোন সম্বন্ধে আমার আর নীরুর মত থাকে, আর তোমার মত না থাকে, তবে, তোমার অমতই প্রবল হ'বে—সে সম্বন্ধ গ্রহণ করা হ'বে না।"

রেণু এই কথায় লজ্জানুভব করিয়া নির্ব্বাক্ হইল না। সে বলিল, "আমি ওদের মা'র যা' কর্ত্তব্য তা' করব—এই ভেবেই আপনি আমাকে এনেছিলেন। যদি সে কায আমি আপনার মনোমত ভাবে সম্পন্ন করতে পেরে থাকি, তবে সে আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহের জন্য আপনি আমাকে যে অধিকার দিচ্ছেন, আমি যদি তা' আমার প্রাপ্য বলে গ্রহণ করি, তবে কি, সেটা প্রতারণা করাই হ'বে না? মা'র স্থান কেহ নিতে পারে না; আমার যে তা' বুঝ্‌বার বিশেষ অধিকার আছে, মা।"

পূর্ণিমা মাতৃহীনা রেণুর এই কথায় অনেক অর্থের আরোপ করিলেন এবং তাহা করিয়া ব্যথিতা হইলেন। রেণু কি তবে এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ মনে পোষণ করিয়াছে যে, যদি তাহার বিবাহকালে সে মাতৃহীনা না

হইত, তবে সে তাঁহার পুত্রবধূ হইত না? রেণু যে সত্য সত্যই কণার ও অশোকের মাতার স্থান গ্রহণ করিয়া কায করিয়াছে, সে কি কেবল তাহার ছদ্মবেশ? তবে কি তিনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা কেবল আকাশ-কুসুম?

তিনি বলিলেন, "মা, তুমি কণার ও অশোকের প্রতি যে ব্যবহার করেছ, তা' যা'রা দেখেছে, তা'রা তোমার কথায় সায় দিতে পারবে না।"

"মা, এটা আমার সম্বন্ধে আপনার স্নেহেরই ফল। কিন্তু তা'ই ব'লে আমি ত কখন আপনার ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারি না। যদি কোন পক্ষ মনে করে, যে মেয়ের মা নাই, তা'রা সে মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিবে না, তবে তা'দের সত্য কথা জানিয়ে দেওয়াই কি সঙ্গত নয়?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "তুমি কেন ও সব কথা মনে করছ? আর মা না হ'লেও যে মা'র অধিক হওয়া যায়, তা' তুমি যেমন দেখিয়েছ, তোমার মাসীমাও তেমনই দেখিয়েছেন।"

রেণু বুঝিল, এই বার তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল, "মা, মাসীমা'র সঙ্গে আমার তুলনা ক'রে আমাকে অপরাধী করবেন না। তিনি কেন যে মানুষ হ'য়ে জন্মেছেন, আমি তা'ই ভেবে পাই না।"

"কিন্তু মাসীমা তাঁ'র এই মেয়েকেই তাঁ'র গুণ দিয়েছেন"—বলিয়া পূর্ণিমা সস্নেহে বধূর পৃষ্ঠে করতল স্থাপিত করিলেন।

মাসীমা'র দেবদত্তের প্রতি ব্যবহারে আর তাহার সপত্নী-সন্তানদিগের প্রতি ব্যবহারে যে মূলগত পার্থক্য ছিল, তাহা রেণু আপনি বুঝিলেও তাহা কাহাকেও জানাইতে পারে না। তাহার ব্যবহার কর্ত্তব্যবোধে কৃত—আর অভিমানেই সেই কর্ত্তব্যবোধ দৃঢ় হইয়াছিল। কেবল নারীর স্বভাবসুলভ অপত্যস্নেহের আকর্ষণ বুঝি সে অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং যে মাতৃহীনরা তাহাকেই মা মনে করিয়াছে—মা'র শূন্য আসনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাদিগের ব্যবহার বুঝি সে আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রবল করিয়াছে। সে বহু বার যখন আপনার মনোভাবের ও ব্যবহারের বিশ্লেষণ করিয়াছে, তখন তাহার এই আক্ষেপ হইতে সে কখন অব্যাহতি লাভ করে নাই—যদি স্বামীর ব্যবহার তাহার এই স্নেহকে স্বাভাবিক নিয়মে পুষ্ট হইতে দিয়া—অভিমানের কৃত্রিমতায় পুষ্ট হইতে বাধ্য না করিত—তবে তাহা তাহার পক্ষে কত সুখের হইত! সে যখনই তাহা মনে করিয়াছে, তখনই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। আর তখনই তাহার মনে হইয়াছে—সে সপত্নীর সন্তানদিগের মা হইয়াছে, কিন্তু আপনার সন্তানকে পর করিয়া দিয়াছে। তখনই তাহার মাতৃত্ব তাহাকে পীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার দৌর্ব্বল্য প্রবল হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

দেবদত্তের প্রতি তাহার মাসীমা'র ব্যবহার কেবল অনাবিল স্নেহের উৎস হইতে উদ্গত—তাহাতে অভিমানের আবিলতা নাই, তাহার সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। সে যেন যমুনার ও সরস্বতীর স্রোতঃ তাহাতে মিলিত হইবার পূর্ব্বে জাহ্নবীর ধারা। সে স্বয়ংও সেই স্নেহে কখন বঞ্চিত হয় নাই।

রেণু সেই জন্য যখন তাহার শাশুড়ীকে বলিয়াছিল—তাহার মাসীমা'র সহিত তাহার তুলনা করিলে তাহাকে অপরাধী করা হইবে, তখন সে মনের কথাই বলিয়াছিল।

সে দিনের সেই সব কথার পর পূর্ণিমা, নীরেন্দ্র ও রেণু তিন জনেরই মনে নূতন চিন্তার ছায়াপাত হইল। পূর্ণিমাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদনানুভব করিলেন। সেই দিন তিনি সন্ধ্যার পর রেণুকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমি আজ তোমাকে একটি কথা বলব—একটি অনুরোধ করব; আমার এই কথাটি রেখ—এই অনুরোধটি রক্ষা করবে—বলব।"

রেণু যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

পূর্ণিমা তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন, "কি বল, মা?"

রেণু বলিল, "আপনার স্নেহের ঋণ আমি জন্মান্তরেও শোধ করতে পারব না। আপনার কথা, আমি আমার মার আদেশ মনে ক'রেই রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

পূর্ণিমা সস্নেহে বধূকে আপনার বুকের কাছে লইয়া বলিলেন, "তা' হ'লেই হ'ল। আমি, মা, তোমাকে বৃথা লক্ষ্য করি নি; তুমি যা' করবে বলবে,—তা' করবে।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি নীরুর, কণার আর অশোকের ভার তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। এ ভার কি বড়ই হ'বে?"

বলিয়াই যেন তাঁহার মনে হইল, যদি রেণু বলে, সে ভার দুর্ব্বহ ! তাই তাহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই তিনি বলিলেন, "আমার অনুরোধ—আমার প্রার্থনা—এ ভার তোমাকে নিতে হ'বে ; তুমি এ ভার এত দিন আমার সঙ্গে নিয়েছ এখন সব ভার তোমার।"

রেণু কি বলিবে ? একটু ভাবিয়া সে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আপনার আদেশ পালন করতে পারি "

সেই সময় কণাকে কক্ষদ্বারে দেখা গেল। কণা এখন বড় হইয়াছে। সে দেখে মা ও পূর্ণিমা প্রায়ই যে পরামর্শ করেন, তাহা তাহার বিবাহ সম্বন্ধে ; কাযেই সে সকল সময় তাঁহাদিগের পরামর্শ-স্থানে আইসে না।

তাহাকে দ্বারের কাছে দেখিয়া রেণু ডাকিল, "কি, কণা ? কি খুঁজছ।"

কণা হাসিতে হাসিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মা খুঁজছি।"

রেণু বলিল, "খুঁজলেই কি পাবে ?"

"এই ত পেয়েছি"—বলিয়া কণা রেণুকে জড়াইয়া ধরিল, আদর করিয়া ডাকিল—"মা গো ! মা !"

রেণুর বুকের মধ্যে কেমন চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে লাগিল।

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "আমরা কিন্তু যা' খুঁজছি, তা' পাচ্ছি না।"

"কি—বল না ?"

"তোমার মা'র জামাই।"

কথাটার অর্থবোধ করিয়াই কণা রেণুকে বলিল, "আচ্ছা, মা, তুমি আমাকে বিদায় করবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ?"

রেণু বলিল, "বিদায় কি, কণা ? বিয়ে হয়ে গেলেই কি মেয়েকে বিদায় করা হয় ?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "হয়ে যা'ক বিয়ে, তার পর আর মা'কে মনে থাকলে হয় ! আর এ বুড়ী মরবার সময় তোমাকে দেখ্‌তে পা'বে কি না, তা' কে বল্‌তে পারে ?"

শুনিয়া কণার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল—মা'কে মনে থাকিবে না, ঠাকুরমা'র মৃত্যুকালেও হয় ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না !—সে বলিল, "না, আমি বিয়ে করব না।"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "অত ভয় কেন, দিদি ? আমি যেমন আমার নাতি-নাতিনীদের পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, মা বুঝি তেমনই হ'বে না ?"

কেহ লক্ষ্য করেন নাই, এখন অশোক আসিয়া পশ্চাতের দিকে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "ঠিক, হ'বে দিদি, ঠিক হ'বে।"

রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'বে, অশোক ?"

"তুমি যেমন আমাদের জব্দ করেছ, দিদির ছেলে হ'লে আমরা তেমনই তোমাকে জব্দ করব।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'বে রে ?"

"মা'কে আমরা কত ক'রে বলেছি, 'দেবুকে নিয়ে এস' —মা আমাদের সব কথা শুনেন, ঐটি শুনেন নি ; দিদির কাছে তা'কে দিয়ে আমাদের জব্দ করেছেন। দিদির ছেলে হ'লেই দিদি তা'কে তেমনই মা'র কাছে দিয়ে চ'লে যা'বে।"

বলিয়া অশোক আপনি হাসিয়া উঠিল।

পূর্ণিমাও হাসিলেন।

কেবল কণা হাসিল না ; আর রেণুর মুখ যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল। এ সম্ভাবনা সে কখন মনে করে নাই। কিন্তু ইহাও হয়ত সম্ভব হইতে পারে। যদি তাহাই হয় ? সে যে কণার বিবাহ দিয়া তাহার পর অশোককে সংসারী করিয়া অব্যাহতিলাভের আশা করিতেছিল, সে আশা কি তবে পূর্ণ হইবার নহে ? প্রথমে পূর্ণিমার অনুরোধ—আদেশ ; তাহার পর কণার তাহাতেই তাহার মা'র অন্বেষণ ; আর তাহার পর অশোকের এই কথা। তাহার অদৃষ্ট কি তাহাকে জড়িত করিবার জন্য আবার কোন জাল বয়ন করিতেছে ? সে আতঙ্কিতা হইল।

অশোক বলিল, "মা, দিদির বিয়েতে লোক খাওয়াবে বলে কি আমাদের খাওয়া বন্ধ করবে ?"

রেণু উঠিল, বলিল,—"চল, খাবার দিব।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "মা'র সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে ; ঠাকুরকে খাবার দিতে বল।"

অশোক বলিল, "তোমাদের পরামর্শ ত আছেই—ও সব হ'বে না। আমি ঠাকুরের কাছে খা'ব না—মা, তুমি চল।"

"মা'কে বুঝি একটুও বিশ্রাম করতে দিতে নাই ?"

"না। যে দুষ্ট ছেলের মা হয়, তা'র কি বিশ্রামলাভ করা চলে ?"

রেণু উঠিয়া বলিল, "চল।"

অশোক তাহার কাছে নহিলে খাইতে চাহিত না।

খাবার দিয়া রেণু যখন কণাকে ডাকিতে আসিল, তখন সে দেখিল, পূর্ণিমা শয়ন করিয়া আছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! শরীর কি ভাল বোধ হচ্ছে না ?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "আরও কি ভাল বোধ হ'বে ?"

রেণু তাড়াতাড়ি যাইয়া ঔষধ আনিয়া দিল—বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া পূর্ণিমাকে ঔষধ সেবন করাইল। চিকিৎসকের নির্দ্দেশ ছিল—শরীর অসুস্থ বোধ করিলেই অবিলম্বে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে—হৃদ্‌রোগে কখন্ কি হয়, বলা যায় না।

রেণু নীরেন্দ্রকে সংবাদ দিতে ভৃত্যকে পাঠাইয়াছিল। নীরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বুকে কি যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে ?"

তখন পূর্ণিমার বুকের যন্ত্রণাটা কমিয়া আসিয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "একটু যে যন্ত্রণা ভোগ ক'রে মরব, বৌমা তা'ও করতে দেবেন না। যখন ডাক আসে, তখন্ কি আর রাখা চলে ?"

পূর্ণিমার যন্ত্রণার উপশম হইয়াছে শুনিয়া রেণু কণাকে লইয়া গেল। নীরেন্দ্র মাতার নিকটে বসিয়া রহিল।

সেই দিন একটি সম্বন্ধ আসিয়াছিল। সে সম্বন্ধে নীরেন্দ্র কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না, পূর্ণিমা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, নীরেন্দ্র বলিল, "তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, মা। আজ রাত্রিতেই বিয়ে হ'বে না। তুমি যদি অত ব্যস্ত হও ত আমি এখন কণার বিয়ে দেব না।"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "তুই বলিস, মেয়ের বিয়ে দিবি না—মেয়ে ভয় দেখায়, সে বিয়ে করবে না; তবে যত দায় বুঝি আমার আর বৌমার ?"

তাহার পর—সুস্থ হইয়া পূর্ণিমা বলিলেন, "আজ অশোক বৌমা'কে খুব ভয় দেখিয়েছে।"

তিনি অশোকের কথা পুত্রকে বলিলেন। কিন্তু তাহা শুনিয়া নীরেন্দ্র কি ভাবিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পুত্রকে যে রেণু তাহার মাসীমা'র নিকট দিয়া আসিয়াছে, তাহার মূলে যে তাহার একটি কথা ছিল, তাহা সে-ই জানিত। সেই বিষয় তাহার বক্ষে কণ্টকের মত বিদ্ধ হইয়াছিল—যখন তখন তাহা তাহাকে পীড়া দিত।

তাহার পর পূর্ণিমা উঠিয়া বসিলেন।

নীরেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময় বলিল,—"তুমি আজ আর বেশী নড়াচড়া করো না।"

সেই সময় রেণু কক্ষে প্রবেশ করিল। পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন,—"তোকে আর কিছু বলতে হ'বে না; যাঁকে ভয় করি, তিনি এসেছেন।"

রেণু বলিল, "কেন, মা, আমি কি পাহারাওয়ালা ?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিলেন, "ছেলেমেয়েরা যেমন মা'কে পাহারাওয়ালার মত ভয় করে, তেমনই বুড়া হ'লে মা-শাশুড়ীরাও মেয়ে-বৌকে ভয় করে।"

"কিন্তু, মা, আমি ত মনে করি—স্নেহের শাসনই বড় শাসন।"

"তা'তে কি আর সন্দেহ আছে ? তোমার সেই শাসনেই ত কণা আর অশোক তোমার অত অনুগত।"

"না, মা—ওদের শাসন করবার অধিকার আমার নাই; আছে স্নেহ করবার অধিকার

পূর্ণিমা কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "মা, ঐটুকু কি তুমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না ?"

"পারলে হয় ত আমিও শান্তি পেতাম।"—রেণুর স্বর কম্পিত। পূর্ণিমা বুঝিতে পারিলেন, রেণু ত তাহার হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিতেছে। কিন্তু সে কি কিছুতেই সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে না ?

সেই চিন্তা পূর্ণিমাকে বিশেষ চিন্তিত ও ব্যথিত করিল।

সে রাত্রিতে রেণুও ঘুমাইতে পারিল না।

আর নীরেন্দ্র ? সে কেবল দেখিতেছিল, তাহার অদৃষ্টাকাশ হইতে মেঘ দূর হইতেছে না।

[ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া

ফ্রাঙ্কো-ইটালীয় বিরোধ—

গত ৩০শে নভেম্বর তারিখে ইটালীর প্রতিনিধিসভায় কয়েক জন সদস্য অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠেন, "আমরা চাহি—টিউনিস্, কর্সিকা, নাইস্!" সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রোমস্থিত ফরাসী-প্রতিনিধি ইটালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউন্ট সিয়ানোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানান—ইটালীর এই দাবী এতদূর অস্বাভাবিক যে, এই বিষয়ে কোন আলোচনাই চলিতে পারে না। এদিকে ফরাসী-ছাত্রেরা প্যারীর রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি করে—"আমরা আমেরিকা চাহি, বিসুবিয়াস্ চাহি।" শুনা যায়, কাউন্ট সিয়ানো ফরাসী প্রতিনিধিকে জানাইয়াছিলেন যে, প্রতিনিধি-সভার ঐ ঘটনার সহিত ইটালীয় গভর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই। কাউন্ট সিয়ানো যাহাই বলুন না কেন, ইটালীর গভর্ণমেণ্টের গোপন ইঙ্গিতেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল—ইহা নিশ্চিত। এই জন্য কাউন্ট সিয়ানোর এই উক্তির পরও ইটালীতে আন্দোলন বন্ধ হয় নাই; ছাত্রগণ দলে দলে রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া "কর্সিকা, টিউনিস" ধ্বনি করিতে থাকে, টিউনিসেও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। সীনর গায়দা তাঁহার "জারন্যাল দ্য ইতালীয়" পত্রে ইটালীর "স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা" জ্ঞাপন করিতে থাকেন, সুয়েজ খালের পরিচালনা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আপত্তি জানান। এক পক্ষ কালের মধ্যে অবস্থা এইরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে যে, ফরাসী-গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পররাষ্ট্র-সচিব মঃ বনেট্ ঘোষণা করিতে বাধ্য হন যে, ফ্রান্স তাহার ইঞ্চি পরিমাণ ভূমি পরিত্যাগ করিবে না। ইহার পর, ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের লাভাল-মুসোলিনী চুক্তি বাতিল করেন। ইটালীর সংবাদপত্রগুলি টিউনিসের প্রবাসী ইটালীয়দিগের প্রতি "অন্যায় অত্যাচারের" অলীক কাহিনী প্রচার করিতে থাকে। ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে শোনা যায়, জিবুতি বন্দরের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে বহুসংখ্যক ইটালীয় সৈন্য অবস্থান করিতেছে; ঐ স্থানের সীমা অনির্দ্ধারিত। ইটালীর সৈন্য যে কোন মুহূর্ত্তে জিবুতি আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় ফরাসী-গভর্ণমেণ্ট বীরুট হইতে দুইখানি রণপোত এবং মার্সেলিস হইতে দুইটি সেনিগেনিস্ বাহিনী জিবুতিতে প্রেরণ করেন। ইহার পর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ দালাদিয়ার, নৌসচিব মঃ ক্যাম্পিঁচি এবং বিমানসচিব মঃ ভুলোমিঁ কর্সিকা, টিউনিস্ এবং য়্যালজেরিয়া পরিদর্শনে গমন করেন।

ইটালীর এই দাবী সম্পর্কে জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রগুলি তাহাকে সমর্থন করিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্রসচিব হার ভন রিবেনট্রপ, যখন ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্যারীতে আগমন করেন, তখন ইটালীর দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, ফ্রান্স ও ইটালীর এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া মীমাংসা করা উচিত।

ইটালীর বিরোধ সম্পর্কে যে সকল চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কাউন্ট সিয়ানো যাহাই বলুন না কেন, "টিউনিস-কর্সিকা" সংক্রান্ত আন্দোলনের পশ্চাতে ইটালীয় গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত আছে। ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট যে লাভাল-মুসোলিনী চুক্তি বাতিল করিয়াছেন, উহাতে প্রধানতঃ টিউনিসের ইটালীর অধিবাসীদিগের অধিকার সম্পর্কিত বিধান লিপিবদ্ধ ছিল। ইহা ব্যতীত, ঐ চুক্তিতে ফরাসী-গভর্ণমেণ্ট সাহারা অঞ্চলের তিবেস্তি, লোহিত সাগরের ডুমেয়িরা নামক একটি দ্বীপ এবং জিবুতি রেলপথের কতকগুলি অংশ ইটালীকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইটালীর এই দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে,—বহু অর্থ এবং লোকক্ষয় করিয়াও মুসোলিনীর সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা সফল হইতেছে না। পক্ষান্তরে, তাঁহার বন্ধু হিট্‌লার বিন্দুমাত্র ক্ষতি স্বীকার না করিয়া মাত্র ছয় মাসের মধ্যে মধ্য-য়ুরোপের একটি বিরাট অংশ জার্ম্মাণীর কুক্ষিগত করাইয়াছেন।

তাহার পর, স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব; আড়াই বৎসর কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পরও তাই গৃহযুদ্ধের অবসানের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জেনারল ফ্রাঙ্কো যদি যুযুধান শক্তির অধিকার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি স্পেনের উপকূলে অবরোধ ঘোষণা করিয়া খাদ্যাভাবে সরকার পক্ষকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। প্রধানতঃ ফ্রান্সের বিরোধিতার জন্যই জেনারল ফ্রাঙ্কো যুযুধান শক্তির অধিকার পাইতেছেন না; কারণ যুযুধান শক্তির অধিকারদানের পূর্ব্বে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষতা সমিতির বিধান অবহেলা করিতে দিতে ফ্রান্স প্রস্তুত নহে। মুসোলিনী আশা করিয়াছিলেন, গত ২০শে নবেম্বর তারিখে মিঃ চেম্বারলেন যখন ফ্রান্সে আসেন, তখন তিনি এই বিষয়ে দালাদিয়ার মন্ত্রিসভাকে সম্মত করাইবেন। মুসোলিনীর এই আশা ফলবতী হয় নাই—দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা স্পেন হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে ইহাদিগের পূর্ব্ব মনোভাব পরিবর্ত্তনে সম্মত হন নাই। এই দ্বিতীয় ব্যর্থতায় মুসোলিনী অধৈর্য্য হইয়াছেন, এবং "কর্সিকা-টিউনিস্"-সংক্রান্ত ধ্বনি উত্থাপন করিয়া স্পেন সম্পর্কে ফ্রান্সকে "চাপ" দিতেছেন।

ইটালীর দ্বিতীয় দাবী—সুয়েজ খালের পরিচালনা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। গত আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া সৈন্যপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইবার জন্য মুসোলিনীকে ২০ লক্ষ পাউণ্ড শুল্ক দিতে হইয়াছিল। আবিসিনিয়া-বিজয়ের পর প্রতি বৎসর ইটালী উচ্চহারে শুল্ক দিতেছে। এই জন্য সুয়েজ খালের পরিচালনার পরিবর্ত্তনসাধন ইটালীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে সীনর গায়দা "জারন্যাল দ্য ইটালীয়া" পত্রে লিখিয়াছেন,—"বিভিন্ন রাষ্ট্র যে পরিমাণ শুল্ক প্রদান করে, সুয়েজ খালের পরিচালনায় তাহাদিগের সেই পরিমাণ অংশ থাকা উচিত।" সুয়েজ খাল কোম্পানীর ২৮ জন

পরিচালকের মধ্যে ১৬ জন ফরাসী, ১০ জন বৃটিশ, ১ জন দীনেমার এবং ১জন মিশরীয়। সুতরাং সুয়েজ খালের পরিচালনা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য ইটালী ফ্রান্সকেই "চাপ" দিবে, ইহা সহজবোধ্য। "কর্সিকা টিউনিস্" আন্দোলনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—সুয়েজ খালসংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনসাধনে ফ্রান্সকে সম্মত করান। তাহার পর, জিবুতি বন্দর। এই বন্দরটি আফ্রিকার ইটালীয় সাম্রাজ্যের দ্বারস্বরূপ। সুতরাং ইটালী যে ইহা দাবী করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

প্রধানতঃ এই তিনটি দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে ইটালী এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিঃ চেম্বারলেন রোমে গমন করিবেন; সেই সময় তাঁহার মধ্যস্থতায় এই বিষয় মীমাংসা করাইবার জন্য ইটালী সচেষ্ট হইবে। ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলি বৃটেনের মধ্যস্থতায় আপত্তি জানাইয়াছে; মিঃ চেম্বারলেনও বলিয়াছেন যে, তিনি কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য রোমে যাইতেছেন না। কিন্তু কথা হইতেছে, ভূমধ্য সাগরের দ্বীপ কর্সিকা এবং ভূমধ্য উপকূলস্থ টিউনিস্ সম্পর্কে বৃটেনের ঔদাসীন্য কি কখনও সম্ভব? বেলিয়ারিক্ দ্বীপপুঞ্জেও বিমান সাবমেরিণের ঘাটী স্থাপন করিয়া ইটালী ইতঃপূর্ব্বেই ভূমধ্যসাগরকে বিপ্নসঙ্কুল করিয়া রাখিয়াছে। আজ যদি মাদাম ত্যাবুইর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইটালী কোন অছিলায় টিউনিস্ আক্রমণ করিয়া বসে, তাহা হইলে উহা বৃটেনের পক্ষে উৎকণ্ঠার বিষয়ই হইবে। তাহার পর, মিউনিকে বসিয়া মিঃ চেম্বারলেন ও মঃ দালাদিয়ার হিট্‌লারের সন্তুষ্টিবিধান করিয়াছেন—মুসোলিনীর জন্য তাহারা ত কিছুই করেন নাই। অথচ, যুরোপকে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাবমুক্ত করিয়া এবং উদ্ধত ডিক্টেটারদিগকে তুষ্ট করিয়া শান্তিপ্রতিষ্ঠার নবনীতি মিউনিকে অবলম্বিত হইয়াছে। এই নীতির সাফল্যের জন্য মিঃ চেম্বারলেনকে মুসোলিনীর সন্তুষ্টিবিধান করিতেই হইবে।

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ চুক্তি—

গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্যারী নগরে জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব হার ভন রিবেনট্রপ্ এবং ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ বনেট্ ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ যুদ্ধবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তিতে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী স্বীকার করিয়াছে যে, যুরোপে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদিগের মধ্যে স্থায়ী মিত্রতা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন; তাহাদিগের মধ্যে কোন ভূখণ্ডসংক্রান্ত মীমাংসার আর প্রয়োজন নাই—দুইটি দেশের সীমান্ত তাহার মানিয়া লইতেছে।

হার হিট্‌লার বহু দিন হইতে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট সামরিক চুক্তি ভঙ্গ করাইয়া ফ্রান্সকে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গত মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রীয়া গ্রাসের অব্যবহিত পরে তিনি মুসোলিনীর নিকট যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন,—ফ্রান্সের সহিত আমি জার্ম্মাণীর নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কন করিয়াছি। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে—অর্থাৎ মিউনিক বৈঠকের অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে—লণ্ডনের "ডেলী মেল্" পত্রের প্রতিনিধি মিঃ ওয়ার্ড প্রাইসের সহিত কথোপকথন কালে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান্ সীমান্তে রক্ষা-বূহ নির্ম্মাণ সম্পর্কে হিট্‌লার বলিয়াছিলেন, ইহা নিছক্ পাগ্‌লামী; কারণ, জার্ম্মাণীতে কেহই ফ্রান্সকে আক্রমণ করিবার স্বপ্ন দেখে না। ফ্রান্সের প্রতি আমাদিগের কোন বিদ্বেষ নাই।

মিউনিক বৈঠকে হার হিট্‌লারের সাধ পূর্ণ হইয়াছে। মিষ্টার চেম্বারলেনের প্ররোচনায় মঃ দালাদিয়ার জেকোশ্লোভেকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বস্তুতঃ ফ্রাঙ্কো সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়াছেন। মিউনিক্ বৈঠকের পর মঃ দালাদিয়ার মিঃ চেম্বারলেনের অনুকরণে স্বদেশবাসীকে যুদ্ধভীতি প্রদর্শন করিয়া বস্তুতঃ ডিক্টেটারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ জনসাধারণকে বুঝাইয়াছেন যে, যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিতে হইলে জার্ম্মাণী সম্পর্কে ফ্রান্সের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুসৃত নীতি সমর্থন করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সীমান্তসম্পর্কে ফ্রান্সকে আশ্বাসদানে হার হিট্‌লারের আর কি আপত্তি থাকিতে পারে?

জার্ম্মাণীর নূতন চক্রান্ত—

মেমেলের সাধারণ নির্ব্বাচনে স্থানীয় 'ডায়েটের' ২৯টি আসনের মধ্যে ২৬টি আসন জার্ম্মাণরা অধিকার করিয়াছে। মেমেলের জার্ম্মাণ দলের নেতা ডাঃ নিউম্যান্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা আর লিথুনিয়ার অধীনতা সহ্য করিবেন না; জানুয়ারী মাসেই জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন। বাল্‌টিক সাগরের উপকূলের এই বন্দরটি পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত ছিল। ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে মিত্রশক্তির নামে ফ্রান্স গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বন্দরের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে। এই বৎসর জানুয়ারী মাসে লিথুনিয়া এই বন্দরটি অধিকার করিয়া লয়। পরে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্যারী সন্ধিতে মেমেলের উপর লিথুনিয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়।

মেমেল বন্দরটি জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হওয়ায় পোলাণ্ডের বিশেষ অসুবিধা হইবে; কারণ, সে তখন মেমেলের অবাধ ব্যবহারে বঞ্চিত হইবে। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর সহিত পোলাণ্ডের মনোমালিন্য হইয়াছে। জেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে আপনার অভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী পোলাণ্ডকে হাতে রাখিয়াছিল। ঐ অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবার পর জার্ম্মাণী পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরির দাবীপূরণে সম্মত হয়ই নাই; অধিকন্তু ইউক্রেণ অঞ্চলকে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পরিণত করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া সে পোলাণ্ডকে দ্বিধা-বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই জন্য পোলাণ্ড এক্ষণে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে। সম্প্রতি পোলাণ্ডের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার এক বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছে; উহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপেক্ষা রাজনৈতিক গুরুত্বই অধিক।

জার্ম্মাণী কিছুকাল ধরিয়া পূর্ব্ব-যুরোপে বাণিজ্যবিস্তারের জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব-যুরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির উপর অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমে উহাদিগের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করাই জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণীর এই প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য রুমানিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে। রুমানিয়ার নাজী-আন্দোলন দমন করিবার জন্য রাজা ক্যারল যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় বৃটেনের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় রাজা ক্যারল সম্প্রতি লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। জার্ম্মাণী যে ইউক্রেণ আন্দোলনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছে, তাহাতে রুমানিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

কারণ, ঐ আন্দোলনের ফলে রুমানিয়ায়ও অশান্তির সৃষ্টি হইবে; লণ্ডন হইতে রুমানিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় রাজা ক্যারল হার হিট্‌লারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, অষ্ট্রীয়া গ্রাস করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হার হিট্‌লার তাঁহার বার্চেস্‌-গ্যাডেনের বাসভবনে ডাঃ স্সুনীগকে যেরূপভাবে অপমানিত করিয়াছিলেন, রাজা ক্যারলকেও নাকি তিনি সেইভাবে অপমানিত করিয়াছেন।

বহুদিন হইতেই রুসিয়ার ইউক্রেণ প্রদেশটির উপর জার্ম্মাণীর লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এই ইউক্রেণের গম উৎপাদনের উর্ব্বর জমিগুলিকে লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মাণী শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব-দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক্ষণে সে রুসিয়া, পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও রুথেনিয়ার মধ্যে বিস্তৃত ইউক্রেণ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। এই অভিসন্ধি জার্ম্মাণীর মনে ছিল বলিয়াই সে রুথেনিয়া সম্পর্কে পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরির দাবী দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। শুনা যাইতেছে, ডাঃ রোজেন্‌বার্গের নেতৃত্বে জার্ম্মাণীতে গুপ্ত 'ইউক্রেণিয়ান্‌ বুরো" গঠিত হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্রহীন ইউক্রেণিয়ান্‌দিগের নাম রেজেষ্টী করা হইতেছে। এই বুরো ইউক্রেণ অঞ্চলে "স্বাধীনতা আন্দোলন" পরিচালনা করিবে। প্রকাশ, জার্ম্মাণীতে এক্ষণে ৪০,০০০ ইউক্রেণিয়ান্‌কে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

জেকোশ্লোভেকিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা—

গত অক্টোবর মাসে ফ্রান্স ও বৃটেনের বিশ্বাসঘাতকতায় এই নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও লাঞ্ছিত হইয়া বিশ্বের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইয়াছে। ডাঃ ম্যাসারিক্‌ ও ডাঃ বেনেসের মাতৃভূমি আজ সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর পদাশ্রিত। জেকোশ্লোভেকিয়া এত দিন পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কারণে লাঞ্ছিতদিগকে আলিঙ্গনদানের জন্য দুই বাহু প্রসারিত রাখিয়াছিল; জার্ম্মাণীর সোস্যাল ডিমোক্রাট্‌, হিট্‌লারের বিরোধী নাজী ইহুদী, কম্যুনিষ্ট সকলেই এতদিন জেকোশ্লোভেকিয়ায় আশ্রয় পাইয়াছে। এই জেকোশ্লোভেকিয়ার নূতন গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি জার্ম্মাণ ইহুদী অধ্যাপকদিগকে পদচ্যুত করিয়াছেন; শ্লোভেকিয়ার প্রদেশিক ডায়েট্‌ অতি সত্বর ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। জেকোশ্লোভেকিয়ার কমুনিষ্টদলকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে; পক্ষান্তরে ন্যাশন্যাল্‌ সোস্যালিষ্ট দল (নাজী) ক্রমেই শক্তিশালী হইতেছে। বিশেষ করিয়া শ্লোভেকিয়া প্রদেশটি অত্যধিক নাজী-ভাবাপন্ন। সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ সিডর—ইনি জাতিতে শ্লোভ্যাক্‌—গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা করিয়াছেন, "ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে নাস্তিক রুসিয়া, কম্যুনিষ্ট স্পেন এবং ইহুদী-প্রভাবান্বিত জেনেভার সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল; সেই দিন এখন ফুরাইয়াছে। এখন আমরা ইহুদী-প্রভাবান্বিত বলশেভিজমের বিরোধী শক্তিগুলির সহিত বন্ধুত্ব করিব।" সম্প্রতি জেকোশ্লোভেকিয়ার ফেডারেল্‌ পার্লামেণ্ট দেশের অর্থনীতিক ও সামাজিক গঠনের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। জেকোশ্লোভেকিয়ার অস্ত্রের কারখানাগুলির উপর ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণীর প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। শুনা যাইতেছে, জেকোশ্লোভেকিয়ার একটি ব্যাঙ্ক স্কোডা কারখানার ফরাসী অংশগুলি ক্রয় করিয়াছে, ঐ অংশগুলি এক্ষণে ক্রাপ্‌সের নিকট বিক্রীত হইবে। কেহ কেহ বলেন, মিউনিক্‌ চুক্তি অনুসারে বৃটনের নিকট হইতে জেকোশ্লোভেকিয়া যে ৩ কোটি পাউণ্ড ঋণপ্রাপ্ত হইবে, উহা প্রকারান্তরে জার্ম্মাণীর অস্ত্র-সম্ভারবৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে।

স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব—

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের অবসানে স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের আঠার মাস পূর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে আরোগাণ রণক্ষেত্রে সরকার-পক্ষ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। গত এপ্রিল মাসে স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে অবস্থা ছিল, গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত সেই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বিদ্রোহিগণ ক্যাটালোনিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছে, এই আক্রমণের ফলাফল সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী সংবাদ আসিতেছে।

স্পেনে সরকারপক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের অধিকৃত অঞ্চলে খাদ্যাভাব তত অধিক নহে, তবে বস্ত্রাদির অভাব অনুভূত হইতেছে; কারণ, প্রধানতঃ ক্যাটালোনিয়া প্রদেশ হইতেই স্পেনের বস্ত্রাদি সরবরাহ হইত। জার্ম্মাণী ও ইটালীর কৃপায় বিদ্রোহীদিগের অস্ত্র-শস্ত্রের কোন অভাব নাই।

সম্প্রতি ইটালী যে "কর্সিকা-টিউনিস" আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, ইহার ফলাফলের উপর স্পেনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। নিরপেক্ষতা সমিতির বিধান অনুসারে স্পেন হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারিত না হইলে জেনারল ফ্রাঙ্কো যুযুধান শক্তির অধিকার লাভ করিতে পারেন না। আবার জেনারল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যে ৩০,০০০ ইটালীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা যদি অপসারিত হয়, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন—যুযুধান শক্তির অধিকার লাভ করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। এই জন্য, স্পেনে ইটালীয় সৈন্যের অবস্থিতি সত্ত্বেও জেনারল ফ্রাঙ্কোকে যুযুধান শক্তির অধিকার প্রদান করাইবার জন্য মুসোলিনী যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আজ যদি দালাদিয়ার গভর্ণমেণ্ট উপনিবেশ হস্তচ্যুত হইবার ভয়ে এবং ফ্রান্সের ধনিকদিগের প্ররোচনায় জেনারল ফ্রাঙ্কোকে যুযুধান শক্তির অধিকারদানে সম্মত হন, তাহা হইলে স্পেনের উপকূলভাগে অবরোধ ঘোষিত হইবে, এবং সরকারপক্ষ অবিলম্বে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। অবশ্য এই কার্য্যের দ্বারা ফ্রান্স তাহার নিজের সমাধিই রচনা করিবে। কারণ, স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে ফ্যাসিষ্ট শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইবে। দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা যদি ফ্রান্সের এই বিপদের কথা স্মরণ করিয়া স্পেনসম্পর্কে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সত্বর স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হইবে না; য়ুরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইবে।

সুদূর প্রাচীর যুদ্ধ—

গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে ক্যাণ্টন এবং হাঙ্কাওয়ের পতনের পর হইতে সুদূর প্রাচীর যুদ্ধের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। দক্ষিণ চীনে চীনা সৈন্যের প্রতি-আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, চীনারা ক্যাণ্টনের নিকটবর্ত্তী ওয়েচাও নামক স্থানটি পুনরধিকার করিয়াছে। ইয়াংসী নদীতে চীনা-বিমান হইতে

জাপানী-রণপোতের উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে। উত্তর-চীনে গরিলা-যোদ্ধৃগণ জাপানী-সৈন্যকে বিব্রত করিতেছে।

জাপান এক্ষণে উত্তর-চীনে এবং সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানে তাহার অধিকৃত অঞ্চলে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছে। বৈদেশিক শক্তিবর্গ এতদিন চীনে যে সকল অধিকার সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে, জাপানের প্রভাবাধীন অঞ্চলে সেই সকল অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য জাপান সচেষ্ট হইয়াছে। এই জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন্ রুষ্ট হইয়া জাপ-গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন্ চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে ঋণদান করিতেছে।

সুদূর প্রাচীর এই যুদ্ধ সত্বর অবসান হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জাপান এই যুদ্ধপরিচালনা লইয়া কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। এই বৎসর হইতে জাপানে জাতীয় সৈন্য-দল সংগঠন আইনের বিধানগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আইনের বিধান অনুসারে গভর্ণমেণ্ট শ্রমিকদিগের কার্য্যের সময় ও পারিশ্রমিকের হার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন; ভূমি, কারখানা, পণ্য প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে নিজের কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন। গত বৎসর এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাবে জাপ পার্লামেণ্টে দারুণ বিরোধিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। এক্ষণে জাপানের পার্লামেণ্টের বিভিন্ন দলগুলিকে একত্র করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সম্পর্কে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাপানের অর্থসচিব মিঃ ইকেদা ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বৎসর "চীনের ঘটনা" বাবদ ৫ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় হইবে; এই বৎসর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবে।

জাপান এক্ষণে বুঝিয়াছে যে, অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত সুদূর প্রাচীর যুদ্ধপরিচালনা করিতে হইবে। এই জন্য সে আপনার অধিকৃত অঞ্চলের সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। জাপানের এই কার্য্যের দ্বারা চীন দ্বিধাবিভক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই জন্য বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্ব হইতে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। বৃটেন ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া এবং ফ্রান্স ইন্দো-চীনের মধ্য দিয়া স্থলপথে চীনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতেছে। যে ফ্রান্স হাইনান্ দ্বীপ হস্তচ্যুত হইবার ভয়ে এতদিন ইন্দো-চীনের মধ্য দিয়া চীনে সমরোপকরণ প্রবেশে আপত্তি করিয়াছিল, সে আজ আর উহাতে আপত্তি করিতেছে না। বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আজ বুঝিয়াছে যে, জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে তাহাদিগের অবাধ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কাযেই তাহারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতেছে।

সম্প্রতি সোভিয়েট রুসিয়ার সহিত জাপানের মনোমালিন্য হইয়াছে। পূর্ব্ব-চীন-রেলপথ সম্পর্কে সোভিয়েট রুসিয়ার প্রাপ্য মাঞ্চুকো গভর্ণমেণ্ট নিয়মিতভাবে পরিশোধ করিতেছে না। এই কারণে সোভিয়েট রুসিয়া সাগালিয়ান্ দ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থানে মৎস্যশিকারের অধিকার হইতে জাপানকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই ব্যবস্থায় জাপান প্রতি বৎসর এক কোটি ইয়েন্ মূল্যের মৎস্য ধরিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সোভিয়েট রুসিয়ার সহিত মনোমালিন্যের ফলে জাপান উত্তর-চীন হইতে মাঞ্চুকোতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। এই মনোমালিন্যের ফলে সোভিয়েট রুসিয়ার পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কোন সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি জাপান চীনের সহিত সোভিয়েট রুসিয়ার সংযোগ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কান্সু ও শেন্সি প্রদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এই সময় সোভিয়েট রুসিয়া জাপানের সহিত এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়া তাহার ঐ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে। এই সুযোগে উত্তর-চীনের গরিলা যোদ্ধৃগণ অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে। সোভিয়েট রুসিয়া আমুর ও উসারী নদীর অপর পারে বসিয়া চীনের অবস্থা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে জাপ সৈন্যের আক্রমণের প্রাবল্য হ্রাস করিবার জন্য জাপানের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে।

সর্ব্ব আমেরিকা সম্মিলন—

গত ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত পেরু রাজ্যের রাজধানী লীমাতে সর্ব্ব-আমেরিকা সম্মিলনীর অষ্টম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনীতে গৃহীত একটি প্রস্তাবে ২১টি সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি আমেরিকা মহাদেশকে বৈদেশিক শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া উহার সংহতিরক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। আর্জ্জেণ্টাইন্ প্রতিনিধির বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবে কোন বৈদেশিক শক্তির নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

লীমার এই সম্মিলনীতে আলোচনার গতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, এখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। গত কিছুকাল ধরিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বৃটেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। অর্থনৈতিক প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকায় ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লীমা সম্মিলনীতে বৈদেশিক শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ কর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েক জন "দর্শক" সম্মিলনী আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সম্মিলনীতে "বৈদেশিক শক্তির প্রভাব" সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উল্লাস প্রকাশ করিলেও ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের মতে, তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে; কোন বৈদেশিক শক্তির নাম এই প্রস্তাবে করা হয় নাই। এই সম্মিলনীর অধিবেশনের সময়েই শুনা গিয়াছে, বৈদেশিক ব্যবসায়ী-দিগের নিকট হইতে মেক্সিকো গভর্ণমেণ্ট তৈল বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন, উহা তাঁহারা স্বল্প মূল্যে জার্ম্মাণীর নিকট বিক্রয় করিবেন স্থির করিয়াছেন। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর সহিত উরুগুয়ের বাণিজ্য-চুক্তির কথাও শ্রুত হইয়াছে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত।

পাশ্চাত্ত্য সোসিয়ালিজম্

ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব আছে। ইহাকেই আজকাল আমরা মানুষের ব্যক্তিত্ব বলি। ইংরেজী নাম ইণ্ডিভিডুয়ালিটী (individuality), এবং ইংরেজী এই কথাটা হইতেই 'ব্যক্তিত্ব' এই নামটা আমরা করিয়া লইয়াছি। আবার বহু ব্যক্তি যে নানারকম সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া, পরস্পরের উপরে নানারকমে নির্ভরশীল হইয়া এক এক দেশে বাস করে, এবং ইহাদের লইয়া সর্ব্বত্রই যে বহু মানবের এক একটা সমষ্টি-রূপ হয়, তাহাকে সাধারণতঃ আমরা সমাজ বলি। সুতরাং যেমন ব্যক্তির, তেমন সমাজেরও একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এইরূপ কোন না কোনও সমাজের অন্তর্ভুক্ত। যে নিয়মে সমাজ হইয়াছে,—যে নিয়মে চলিতেছে, তাহার অধীন হইয়া তাহাকে চলিতেই হইবে। নতুবা সেই সমাজের মধ্যে তাহার কোনও স্থান হইতে পারে না। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব একটা স্বার্থের বা মঙ্গলের দিক্ যেমন আছে, তেমন সমাজেরও নিজস্ব একটা স্বার্থের বা মঙ্গলের দিক্ আছে। সমাজের এই স্বার্থ ও মঙ্গলের অর্থ সমাজভুক্ত সকলেরই স্বার্থ ও মঙ্গল। এই স্বার্থ ও মঙ্গল কতক ব্যক্তিগত ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অথচ পরস্পরের অবিরোধে সকলের স্বার্থ ও মঙ্গলের একটা সমষ্টি, এবং কতক সমবেতভাবে সকলের সমান স্বার্থ ও মঙ্গল। এখন এই "সকল" কাহারা? কেবল বর্ত্তমানের জনগণ কি? না, তাহা হইতে পারে না। কেবল বর্ত্তমানের জনগণ লইয়াই এক একটা সমষ্টি বা সমাজের জীবন হয় না। সুদূর এক অতীত হইতে ইহার জীবনধারা চলিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানে চলিতেছে, ভবিষ্যতে বহুযুগ আরও চলিবে। সুতরাং এই সমষ্টি বা সমাজকে কেবল বর্ত্তমান বহু ব্যষ্টির সাময়িক একটা সমবায় বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। ইহার জীবনকে বুঝিতে হইলে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটা ধারাবাহিক সমগ্রতায় ইহাকে ধরিয়া লইতে হইবে। এই সমগ্রতার মূর্ত্তিই সমষ্টির মূর্ত্তি। সমগ্রতায় বিশিষ্ট একটা জীবনও ইহার আছে, যাহা কেবল এক একটি ব্যষ্টির জীবন হইতে নয়,—এক দেশের অধিবাসী একসমাজভুক্ত অগণ্য জনগণের পৃথক্ পৃথক্ জীবন হইতে; অথবা এই সব ব্যক্তিগত জীবনের কৃত্রিম একটা সমষ্টি যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইতেও পৃথক্ এক বস্তু—পরমাত্মায় জীবাত্মার ন্যায় যাহাতে বা যাহা হইতে এই সব ব্যষ্টি-জীবন অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহাতে আশ্রিত হইয়া আছে। সুদূর অতীত হইতে বহু ব্যষ্টির জীবন ব্যাপিয়া এই জীবন-ধারা বহিতেছে, ভবিষ্যতেও বহু পুরুষ-পরম্পরায় জীবন ব্যাপিয়া বহিবে। সমাজ যেন একটা বিশাল নদী-প্রবাহ, ব্যষ্টি তাহার বক্ষে উর্ম্মির পর উর্ম্মির ন্যায় উঠিতেছে, পড়িতেছে।

সুতরাং সামাজিক বা সমষ্টিগত এই যে দ্বিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা বলিলাম, কেবল বর্ত্তমান ব্যষ্টিবৃন্দের স্বার্থে ও মঙ্গলেই তাহার আরম্ভ বা পরিসমাপ্তি হয় না। এই স্বার্থ ও মঙ্গলের একটা ধারা অতীত হইতে বর্ত্তমানে আসিয়াছে, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে যাইবে। বর্ত্তমানের স্বার্থ ও মঙ্গল অতীতের কর্ম্মফলসাপেক্ষ, আবার বর্ত্তমানের কর্ম্মফলে ভবিষ্যতের স্বার্থ ও মঙ্গল নিয়ন্ত্রিত হইবে। আজ যে ব্যষ্টিমানব বা মানবসমূহ সমাজের অঙ্গে আশ্রিত হইয়া আছে, তাহাকে কেবল বর্ত্তমানে নিজের কথা ভাবিলেই চলিবে না। সমষ্টির এই জীবন প্রবাহের সঙ্গে অতীতের কর্ম্মফলভোগী হইয়া সে আসিয়াছে, ভবিষ্যৎ তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। বৃহৎ এই সমাজ-দেহের অঙ্গীভূতরূপে অতীতের সন্তান সে, ভবিষ্যতের জনক। সুতরাং সামাজিক বা সমষ্টিগত স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা যখন উঠিবে, তখন যেমন তাহার বর্ত্তমান এই জীবনের কথা, তেমন তাহার সকল স্বার্থ ও মঙ্গলের ধারাবাহিক সমগ্রতার এই যে গুরুত্ব, তাহার কথাও সর্ব্বদাই সকলকে মনে রাখিতে হইবে।

তার পর এই স্বার্থ ও মঙ্গলকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে, একটা নিয়মের শৃঙ্খলা আনিয়া সেই প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করিতে, সময়োপযোগী সংস্কারে তাহার উন্নতি-বিধান করিতে, সকল ব্যষ্টির উপরে সমষ্টিগত বা সামাজিক একটা প্রভুত্ব-শক্তির (social authority) স্থাপনা যে আবশ্যক, তাহারও নিজস্ব একটা স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্ আছে। যুগে যে প্রকৃতি ধরিয়া, যাহাদের নিয়ন্ত্রণে যে আকারেই যেখানে এই শক্তি গড়িয়া উঠুক কি স্থাপিত হউক, তাহার অস্তিত্ব রক্ষা এবং সময়োপযোগী

সংস্কারে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতার বৃদ্ধি—ইহাই শেষোক্ত এই স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা। পূর্ব্বে দ্বিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই দ্বিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের স্থাপনা ও রক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক প্রভুত্ব-শক্তির আর একটা স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্ যে আসিল, তাহা লইয়া সামাজিক বা সমষ্টিগত স্বার্থ ও মঙ্গল হইল ত্রিবিধ। এক এক জন ব্যক্তির পৃথক্ স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্ অপেক্ষা সামাজিক এই ত্রিবিধ স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্টা অনেক বড় এবং একের সঙ্গে অপরটির অতি ঘনিষ্ঠ একটা যোগও আছে। ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও নিজস্ব স্বার্থ ও মঙ্গলের দাবী সামাজিক এই স্বার্থ ও মঙ্গলের দাবীকে অতিক্রম করিয়া ত উঠিতেই পারে না, বরং ইহার অনুবর্ত্তী হইয়াই তাহাকে চলিতে হইবে।

কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বটাকেও একেবারে নিঃশেষে লোপ করিয়া ফেলিতে পারে না। সমাজপক্ষ এবং তাহার স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্টা অনেক বড় হইলেও, ব্যক্তিপক্ষ এবং তাহার স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্টাও একেবারে উপেক্ষার বস্তু নহে। মানুষমাত্রেই নিজস্ব স্বার্থ ও মঙ্গলসাধনে অথবা ব্যক্তিত্বের সিদ্ধিলাভে ব্যক্তিগত একটা স্বাধীনতার অধিকার চাহে; চাহিতেও পারে। কারণ, ব্যষ্টিরও ত একটা বিশিষ্ট স্বরূপ আছে এবং এই স্বরূপেই পরমাত্মায় সে জীবাত্মা। সুতরাং নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মহিমাও তাহার কম নহে। ব্যষ্টি যেমন সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত, সমষ্টির মধ্যে প্রসূত ও বর্দ্ধিত, তেমন আবার ব্যষ্টিকে লইয়া ব্যষ্টিকে জড়াইয়াই সমষ্টি। আবার সমষ্টির শক্তি, সমষ্টির মহিমা, সমষ্টির সুখ-সৌভাগ্য, ব্যষ্টির শক্তি, ব্যষ্টির মহিমা এবং ব্যষ্টির সুখ-সৌভাগ্যেরই সাপেক্ষ। বস্তুতঃ ব্যষ্টি-জীবন যেখানে দীনহীন, দুর্ব্বল ও নির্জীব, প্রতিভাবর্জ্জিত, ধর্ম্মে মূঢ়, কর্ম্মে নিরুদ্যম,—সমষ্টির উন্নত অবস্থার কোন অর্থই সেখানে হইতে পারে না।

এখন এই স্বাধীনতার অধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতটা ভোগ করিতে পারিলে ব্যক্তি তাহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আবার সমাজ-শক্তির পক্ষেই বা তাহার বিশিষ্ট সিদ্ধিলাভে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের এই অধিকারকে কতখানি সঙ্কুচিত করিয়া রাখা আবশ্যক হইতে পারে,—অল্প কথায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজ-শক্তির প্রভুত্ব—এই উভয় অধিকারের মধ্যে সীমা-রেখা কোথায় টানা যায়, উভয় অধিকারের মধ্যে কোথায় কি ভাবে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনা হয়, ইহা যে কঠিন ও জটিল একটা সমস্যা, একথা বলাই বাহুল্য। এমন কিছু একটা ধর্ম্ম বা নীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে সামাজিক মঙ্গলস্থাপনার অধীন থাকিয়াই মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনের চেষ্টা চলিবে, অথচ তাহার ব্যক্তিত্বের মহিমা-বিকাশ যতদূর হইতে পারে, তাহারও অবসর থাকিবে। এই অবস্থার আবশ্যকতা লক্ষ্য করিয়াই বিখ্যাত ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বেঞ্জামিন কিড্ (Benjamin Kidd) তাঁহার Social Evolution বা 'সামাজিক অভিব্যক্তি' নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"Other things being equal, the most vigorous social systems are those in which are combined the most effective subordination of the individual to the social organism with the highest development of his personality."

প্রাচীন যে সব সমাজ বিশিষ্ট এক একটা ধর্ম্মের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং তাহারই নীতিতে পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে, কোনও দিক্টাকেই অতি বড় না করিয়া সর্ব্বত্রই প্রায় সমাজস্থিতির সঙ্গে মিল রাখিয়া ব্যক্তিত্বের অধিকার কতটা চলিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য ধরিয়াই বিধিব্যবস্থা সব হইয়াছে। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না হউক, একেবারে ব্যর্থ কোথাও হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। এই দুই এর মধ্যে অতি প্রবল কোনও বিরোধজাত বিক্ষোভ বড় কোথাও দেখা যায় নাই। বিক্ষোভকর বিরোধ যাহা দেখা দিয়াছে, ধর্ম্মনীতিমূলক সমাজশক্তিরই নিজস্ব ক্ষেত্রে—বিভিন্ন মতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই ধর্ম্মনীতির সঙ্গে—ব্যক্তিত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় নহে।

বিশেষ একটা ব্যতিক্রম ইহার দেখা যায় ইউরোপে। ধর্ম্মনীতিই ইউরোপে 'চার্চ্চ' (the Church) বা ধর্ম্মসঙ্ঘ এই নামে দৃঢ়সঙ্ঘবদ্ধ একটি মণ্ডলীর আয়ত্ত হইয়া পড়ে। অভিজাতমণ্ডলীর কর্ত্তৃত্বাধীন ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রচক্রের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে মিলিত এই 'চার্চ্চ' বা ধর্ম্মসঙ্ঘ সেখানে সমাজ-শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। বড় কতকগুলি ত্রুটি ইহার মধ্যে দেখা দেয়। আপন প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে নানাদিকে

ইহা অতি সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে চাহে। যাজকমণ্ডলী ও অভিজাতমণ্ডলী—এই যে দুই সম্প্রদায়ের হাতে সমাজশক্তি গিয়া পড়ে, তাঁহাদের নানারকম অত্যাচারও জন-সাধারণের পক্ষে ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠে। ইহার ফলে বড় একটা বিদ্রোহ ফরাসী দেশে দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ প্রথমে দেশবাসীর মনোভূমিতে চরম এক ব্যক্তিত্ববাদে এবং তাহার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর লোকধ্বংসী ফরাসীবিপ্লবে আত্ম-প্রকাশ করে। এই বিপ্লবের পর ইউরোপের সামাজিক ক্ষেত্রে অতি দ্রুত এক ব্যক্তিত্ব-নীতির প্রতিষ্ঠা হয়।

এই নীতিবাদীরা বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন; অপর কোনও ব্যক্তি কি সম্প্রদায়, কোনও ধর্ম্ম কি শাস্ত্র, প্রতিষ্ঠিত কি পরম্পরাগত কোনও রাষ্ট্রপদ্ধতি কি ব্যবহার-পদ্ধতি, কাহারও বা কিছুরই কোনও প্রভুত্বের অধিকার তাহার উপরে নাই। জীবনের সকল কর্ম্মে নিজের বুদ্ধিই একমাত্র তাহার পথিপ্রদর্শক এবং সেই বুদ্ধির নির্দ্দেশে চলিতে সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে। প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই প্রত্যেকে সমান স্বাধীন, কেহ কোনও প্রকারে কাহারও অধীন নহে। তাই এই স্বাধীনতার অধিকারে মানুষে মানুষে একটা সাম্যের নীতিও আসিয়া পড়ে। প্রত্যেকে যেমন স্বাধীন, তেমন স্বাধীনতামূলক অধিকারে সমান। কিন্তু সকলেই যদি সমানভাবে যে যাহা ভাল বুঝে, যাহার যাহা ভাল লাগে, তাহাই করিতে পারে, তবে পরস্পরের অধিকারে একটা সংঘর্ষ সদাসর্ব্বদাই উপস্থিত হইবে। তাই শেষে ব্যক্তিগত অধিকারের নীতি এইরূপ একটা সূত্রে প্রকাশ করা হয়—Every man has the perfect liberty to act as he pleases so long as he does not interfere with the equal liberty of others—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই সর্ব্বদা তাহার নিজের ইচ্ছামত চলিবার অধিকার আছে, যতক্ষণ না সে অপর সকলের সেই সমান স্বাধীনতার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে।

কেহ কাহারও ন্যায্য অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে, তাহার জন্য সকলের উপরে একটা শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ইঁহারা বলেন, এই শাসন-শক্তি হইবে সকলের মতানুসারে গঠিত গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রপদ্ধতি এবং ইহার কর্ম্ম হইবে মাত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বাধীনতার অধিকারে সুস্থিত রাখা এবং একে অপরের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে, তাহা দেখা। ক্রমে ইহাও স্বীকৃত হয়, একে অপরের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিবে না, শাসন-শক্তির কেবল এইটুকু দেখিলেই চলে না। সকলের সমান স্বার্থমূলক আরও বহু ব্যাপার আছে—যেমন রাষ্ট্রীয় বা নাগরিক (political anl civic) সব প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, তাহাদের পরিচালনা, রাষ্ট্ররক্ষা ইত্যাদি। তাহারও যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা এই শক্তিকেই করিতে হইবে। ইহার প্রয়োজনে বহু বিধি-নিষেধের অধীন হইয়াও রাষ্ট্রের প্রজারূপে অথবা নগরের নাগরিকরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চলিতে হইবে। তবে এই শাসন-শক্তিকে সর্ব্বদা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতার উপরে অযথা কোনও অন্যায় বাধা আসিয়া না পড়ে। ব্যক্তিগত ভাবে কাহার ভাল-মন্দ কিসে হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজে তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। অপর কাহারও অথবা সেই সমাজের—অর্থাৎ সমান ও সমবেতভাবে অপর সকলের—কোন স্বার্থহানি যাহাতে না হয়, সমাজ-শক্তি এইটুকু মাত্র দেখিবে। জীবনের যে দিক্‌টায় বা ভাগটায় ব্যক্তির ভালমন্দের বিবেচনা প্রধান, তাহা ব্যক্তিরই স্বকীয় আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে। আর যে দিক্‌টায় বা ভাগটায় সমাজের ভালমন্দের বিবেচনা প্রধান, তাহা সমাজের বা সামাজিক এই শাসন-শক্তির হাতে থাকিবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার 'Liberty' নামক গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন—To individual shou'd belong tho part of life in which it is chiefly the individual that is interested and to society the part which chiefly interests society."

কিন্তু সমাজের ভালমন্দ বলিতে ঠিক কি বুঝায়? আর সেই ভালমন্দ এবং ব্যক্তির ভালমন্দ—এই উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় কোনও ব্যবধান আছে কি না। আর থাকিলে সেই সীমা-রেখা কোথায় টানা যায়? প্রশ্নগুলির উত্তর খুব সহজ নহে। ঘাঁটিলে অনেক জটিল সমস্যাই উপস্থিত হইবে। তবে ইঁহাদের কথা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, civic and political duties and responsibilities, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রজা ও নাগরিক ভাবে যে সব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব মানুষকে পালন করিতে হইবে, নহিলে রাষ্ট্র (State) কি নাগরিকসঙ্ঘ

(Civic Corporation) চলে না, সেই সকল বিষয়ে মানুষ সমাজ-শক্তিকে মানিয়া চলিবে, ব্যক্তিত্বকে যতটা প্রয়োজন তাহার বিধি-নিষেধের অধীন করিয়া রাখিবে। আর ইহার বাহিরে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে এমন যাহা কিছু—যেমন ব্যবসায়িক কাম-কর্ম্ম, অর্জ্জিত সম্পদের ভোগ, সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন এবং চরিত্রগত ব্যবহারাদি—এ সব বিষয়ে মানুষ সর্ব্বতোভাবে তাহার ব্যক্তিগত শক্তি, রুচি ও প্রবৃত্তির অনুসারে চলিবে। সমাজ-শক্তির কোনও কর্ত্তৃত্ব তাহার উপরে থাকিবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মানব-জীবন সম্বন্ধে এই নীতিই ইউরোপে সাধারণতঃ গৃহীত হয়। সমাজের অধিকার-ভূমিকে অতি সঙ্কুচিত করিয়া স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার-ভূমিকে অতি বড় ও প্রধান করিয়া ইহাতে লওয়া হইয়াছে, তাই নীতির নাম হইয়াছে, ব্যক্তিতন্ত্রনীতি বা ইণ্ডিভিডুয়ালিজম্। ইংরেজি কোনও প্রামাণিক অভিধানে (Oxford Dictionary of Current English) ইহার এইরূপ একটা সংজ্ঞাও পাওয়া যায়, যথা—Social theory favouring free action of individuals.

কিন্তু এই ব্যক্তিতন্ত্র-নীতি অনুসরণের ফল ইউরোপে কল্যাণকর হয় নাই। প্রথমেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার ক্রিয়া দেখা দেয়। ব্যক্তিগত অবাধ প্রতিযোগিতার প্রভাবে দেশের সব ব্যবসায়বাণিজ্য এবং ধন সম্পদ অল্প-সংখ্যক শক্তিমান্ লোকের হাতে গিয়া পড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিমান্ জনগণ যারপরনাই আর্থিক একটা দুর্গতির অবস্থায় আসিয়া নামিয়াছে। এই ধন-বৈষম্য দারুণ গ্লানিকর একটা সামাজিক বৈষম্যেরও সৃষ্টি করিয়াছে। গণতন্ত্র-মূলক শাসনের প্রসার এবং প্রজা সকলেরই সমান এক এক ভোটের অধিকার-প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় শক্তি অধিকাংশ দেশেই দেশের ধন-সম্পদের অধিকারী এবং সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ধনিক সম্প্রদায়ের হাতে গিয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহাদের স্বার্থেই পরিচালিত হইয়াছে। ইহা একরূপ অনিবার্য্য, এবং ভোটের অধিকার সত্ত্বেও দরিদ্র জনগণ তাহার প্রতিকার কিছু করিতে পারিতেছে না। মানবের সাম্য ও স্বাধীনতার নামে এই নীতি ঘোষিত হয়, অতি ক্লেশকর এক বৈষম্য এবং বহুলোকের পক্ষে অতি দুঃসহ ও দুরতিক্রম্য এক আর্থিক দাসত্বে ইহার ক্রিয়াফল পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে আবার এই ঊনবিংশ শতাব্দীরই শেষার্দ্ধে নূতন এক আন্দোলন ইউরোপে দেখা দিয়াছে, যাহা ব্যবসায়-বাণিজ্যে, ধনসম্পদের অধিকারে এবং আরও বহুবিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে একেবারে লোপ করিয়া সর্ব্বসাধারণের স্বার্থে সমাজ-শক্তির এমন প্রভুত্ব সেই সব ক্ষেত্রে স্থাপনা করিতে চায়, যাহাতে এই ধন-বৈষম্য ও সামাজিক-বৈষম্য দূর হইয়া সমান অবস্থায় সমান সুখে সকলে থাকিতে পারে; আর সকলের কল্যাণকর যত কিছু কর্ম্ম, পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির বা পরিবারের অধিকারে না থাকিয়া সকলের সমবেত অধিকারে আইসে। ব্যক্তিত্বের অধিকারকে অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত করিয়া সমাজ-শক্তির অধিকার-ভূমিকেই অতিবড় করা হইয়াছে, তাই এই অন্দোলনের যে মূলনীতি, তাহা সোসিয়ালিজম্ (Socialism) বা সমাজতন্ত্রনীতি নামে পরিচিত হইয়াছে।

এই 'সোসিয়ালিজম্' পাশ্চাত্য সমাজে ক্রিয়াশীল ব্যক্তি-তন্ত্র নীতির প্রতিক্রিয়া-মূলক বিপরীত এক নীতি। প্রামাণিক কোনও অভিধানে (Oxford Dictionary Current English) এইরূপ এক সংজ্ঞা ইহার পাওয়া যায়, যথা—Principle that individual freedom should be completely subordinated to the interests of the community with any deductions that may be correctly or incorrectly drawn from it.

অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে সামাজিক স্বার্থ ও মঙ্গলের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে, সোসিয়ালিজম্ বলিতে সাধারণভাবে এই নীতিকে এবং এই নীতির অনুসরণে উচিত কি অনুচিত সিদ্ধান্তে স্থিরীকৃত যে কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতিকে বুঝায়। এই সংজ্ঞার সঙ্গে এইরূপ একটা deduction বা সাধারণ নীতির অনুসরণে বিশিষ্ট একটা কর্ম্মপদ্ধতিরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, যথা—substitution of co-operative production for competitive production, national ownership of land and capital, state distribution of produce, free education and feeding of children and abolition of inheritance.

অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অধিকারে পরস্পরের প্রতিযোগিতায় ধনোৎপাদনের পরিবর্ত্তে সমবেতভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় ধনোৎপাদন, জমি ও মূলধনে সকলের সমান ও সমবেত স্বত্বাধিকার স্থাপনা, রাজসরকার হইতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধনবিভাগ, ব্যক্তিকে দায়িত্ব হইতে মুক্ত রাখিয়া সরকারী

ব্যবস্থায় শিশুপালন ও বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান এবং পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের লোপ।

সহজ কথায় এই সংজ্ঞার মর্ম্ম এই যে, ব্যক্তিগত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্বার্থ ও মঙ্গল অপেক্ষা মোট সমাজের বা একদেশবাসী সকলের স্বার্থ ও মঙ্গল অনেক বড় কথা। সুতরাং এই মঙ্গল যাহাতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। এখন কথা হইতেছে, কিসে অর্থাৎ কিরূপ নীতি-পদ্ধতি ধরিয়া চলিলে সমাজের বা সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত ও মঙ্গল সজ্ঘটিত হইবে। সকলে সর্ব্বত্র একমত এ বিষয়ে না হইতে পারেন,—আবার যেরূপ যুক্তি-সিদ্ধান্তে যে নীতি-পদ্ধতিই গৃহীত হউক, তাহা ভুল হইতেও পারে। তবে যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর বলিয়া যে পদ্ধতিই যখন যেখানে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হউক, ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষকে তাহার অধীন হইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের বা সর্ব্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল-স্থাপনার কামনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এই যে সঙ্কোচ, সোসিয়ালিজম্ বলিতে সাধারণতঃ ইহাই বুঝায়। এখন ইহার বিশিষ্ট নীতি পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, মানুষ সব সমান এবং সমান সুখের অধিকারী। ধনই এই পৃথিবীতে একমাত্র সুখের অবলম্বন এবং ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই সকলে সমান সুখে থাকিতে পারে। ধন বৈষম্যই বর্ত্তমান এই যুগে যত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছে। জমি, মূলধন ও ব্যবসায়বাণিজ্য সব ব্যক্তিগত অধিকারে এখন আছে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতায় ধনোৎপাদনাদির কাযকর্ম্ম সব চলিতেছে। ইহাই এই ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বৈষম্য দূর করিয়া ধনাধিকারে ও ধনভোগে সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই সব ক্ষেত্রে ও বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্ব লোপ করিয়া সবই সকলের সমান ও সমবেত অধিকারে আনিতে হইবে এবং প্রতিযোগিতা তুলিয়া দিয়া কাযকর্ম্ম সব সকলের সহযোগিতায় চালাইতে হইবে। সকলের সমান ও সমবেত শক্তির প্রতিভূ হইতেছে গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র। সুতরাং জমি, মূলধন ও ব্যবসায়বাণিজ্য সব এই রাষ্ট্রের অধিকারে আনিতে পারিলেই সকলের সমান ও সমবেত অধিকারে আসিল। সকলে তখন রাষ্ট্রশক্তির ধারক কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশে পরস্পরের সহযোগে সমবেতভাবে কায-কর্ম্ম করিবে। ধন-সম্পদ যাহা উৎপাদিত হয়, রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে থাকিবে এবং সেই ভাণ্ডার হইতে সকলকে তাহা এমন ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে যে, মোটামুটি সমান অবস্থায় সকলে থাকিতে পারে।

ধন-সম্পদের উৎপাদনে এবং ভোগে সকলের এই যে সমবেত অধিকার, এই নীতি সাধারণতঃ কমিউনিজম্ (Communism) নামে পরিচিত, বাঙ্গালায় যাহাকে আমরা সঙ্ঘতন্ত্র-নীতি বলিতে পারি, যদিও অনেকে ইহাকে 'সাম্যবাদ' বলেন। বিশিষ্ট একরূপ অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার সাম্য অবশ্য ইহার লক্ষ্য, তবে এই লক্ষ্য সাধন করিতে হইবে, এইরূপ একটা সমবায়ে ও সহযোগে। এই দিক্‌টাই প্রধানভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া ইংরেজী নাম হইয়াছে 'কমিউনিজম্', এবং এই নামের দ্যোতনা সঙ্ঘতন্ত্র-নীতি বা সঙ্ঘতন্ত্রতা কথাটায় যেরূপ পরিস্ফুট হয়, সাম্যবাদে সেরূপ হয় না। যাহা হউক, এইরূপ সঙ্ঘের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত অধিকারে ধনার্জ্জন ও ধনাধিকার যেমন চলে না, তেমনই আবার তাহা চলে না বলিয়া ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বে পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্যজীবনও চলে না। কারণ, ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বে পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্যজীবন ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বে অর্জ্জিত ও রক্ষিত পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তির ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বহু গৃহস্থ সমবেতভাবে বিশিষ্ট কোনও সম্পত্তি ভোগ করিলেও সাধারণ রীতি ইহা হইতে পারে না। সুতরাং ব্যবসায়বাণিজ্যাদি কর্ম্মে এবং ধন-সম্পদের অর্জ্জনে ও অধিকারে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্বের লোপের (abolition of the rights of private property) সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্য জীবনের লোপও কমিউনিষ্ট বা সঙ্ঘতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী পদ্ধতিতে অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায় এবং এই দুই-ই তাই কমিউনিষ্ট-নীতির অপরিহার্য্য দুইটি সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

গার্হস্থ্য-জীবনে সাধারণতঃ পিতার অর্জ্জিত ধনে এবং মাতার যত্নে গৃহে গৃহে পৃথক্‌ভাবে এক একটি দম্পতির সন্তান-সন্ততি সব লালিত-পালিত হয়। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও যে পরিবার যেরূপ পারে, সেইরূপই করে। কিন্তু গার্হস্থ্যজীবন না থাকিলে, ইহাদের লালন-পালন এবং শিক্ষাদানের ভারও সঙ্ঘকে গ্রহণ করিতে হইবে।

থিওডোর উল্‌সী নামে আমেরিকার বড় এক জন সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত তাঁহার 'Communism and Socialism

in their History and Theory' নামক গ্রন্থে কমিউনিজমের একটি যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে কমিউনিজম্ বলিতে জীবনের কিরূপ একটা অবস্থা বুঝায়, তাহা আমরা কতকটা স্পষ্টভাবেই ধরিতে পারিব।

"Communism in its ordinary signification is a system or form of life in which the right of private or family property is abolished by law, mutual consent or vow. To this community of goods may be added the disappearance of family life, and the subsitution for it of a mode of life in which, whether the family system is retained or not, the family is no longer the norm according to which the subdivisions of the community, if there are any, are regulated. But which the father's authority in the separate parts of the community is of little or no account, there are rulers of some sort, who must have considerable degree of power in order to prevent the system from falling to pieces."

অর্থাৎ, কমিউনিজম্ বলিতে সাধারণতঃ এইরূপ এক জীবনপদ্ধতি বুঝায়, যাহার মধ্যে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার কিছু থাকিবে না। আইনের বলে, সকলের সম্মতিতে অথবা কোনও শপথ গ্রহণে ইহা লোপ করিতে হইবে। এই ভাবে ধন-সম্পদে সকলের যে সমবেত অধিকার স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবনও উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে এমন এক জীবনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে, যাহার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ পরিবার কোথাও থাক্ কি না থাক্, পরিবারগত বৈশিষ্ট্য ধরিয়া কুলবংশ প্রভৃতি রূপ কোনও শ্রেণীবিভাগের রীতি সামাজিক জীবনে চলিবে না। সঙ্ঘের মধ্যে পিতার কর্তৃত্বরূপ কোনও কর্তৃত্ব-শক্তি চলিতে পারে না। তবে এমন কোনও শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা চাই, পরিবারের কর্ত্তার মতই যাহার কর্তৃত্ব সকলে মানিয়া চলিবে; যাহাতে সঙ্ঘের বন্ধন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে।

এইরূপ নিয়মে সঙ্ঘজীবনের প্রতিষ্ঠা ইউরোপে ও আমেরিকায় বিগত দুই শতাব্দীতে মধ্যে মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা সফল কোথাও হয় নাই।

ধনই এই পার্থিব-জীবনে সুখের একমাত্র অবলম্বন এবং সকলেই সমান ধনে সমান সুখের অধিকারী, এই কথা স্বীকার করিয়া লইলে, ইহাও আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ধনসাম্য স্থাপনাই সামাজিক মঙ্গলস্থাপনার শ্রেষ্ঠ পন্থা, আর কমিউনিষ্ট পদ্ধতিই এই ধনসাম্য স্থাপনার একমাত্র উপায়। কারণ, এক সময়ে দেশের সকল ধন সকলকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই ধনের উপরে প্রত্যেকেরই যদি পৃথক্ পৃথক্ স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকে, কেহ তাহা দুদিনেই নষ্ট করিয়া ফেলিবে, কেহ বা ফেলিয়া রাখিবে, কেহ বা পরিশ্রমে, ব্যবসায়বাণিজ্যাদি কর্ম্মে তাহা বৃদ্ধি করিবে। যতদিনেই হউক, আবার সেই ধনবৈষম্য দেখা দিবে। সুতরাং ধনসাম্য চাহিলে এই কমিউনিষ্ট পদ্ধতির উপরেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনকে তাহার অধীন করিয়া রাখিতেই হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত জার্ম্মাণ-মনীষী কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) এইরূপ যুক্তি অবলম্বনে কমিউনিষ্ট পদ্ধতিকেই সামাজিক মঙ্গলস্থাপনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তার পর সেই পদ্ধতি অনুসারে ধন-সম্পদে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্ব, ধনার্জ্জনে প্রতিযোগিতা, পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্যজীবন এবং তাহার পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থসংরক্ষণ ও স্বার্থোন্নতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত অধিকারমূলক যে-সব নীতি ও বিধি ধরিয়া বর্ত্তমান এই সমাজ-জীবন চলিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া সম্পূর্ণ কমিউনিষ্ট নীতিপদ্ধতি অবলম্বনে নূতন এক সমাজজীবনের পরিকল্পনা তিনি করেন। সকলের সমান ও সমবেত শক্তির প্রতিভূস্বরূপ ষ্টেট বা রাষ্ট্রই এই পদ্ধতি ধরিয়া নূতন এই সমাজ গড়িয়া লইবে, তাহার সব কর্ম্ম পরিচালনা করিবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে সকল মানুষকেই ইহার অধীন করিয়া রাখিবে।

বলা বাহুল্য, সামাজিক মঙ্গলস্থাপনার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্কোচরূপ যে সাধারণ নীতিকে সোসিয়ালিজম্ বলা হয়, ইহা তাহার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি। সোসিয়ালিজমের যে সংজ্ঞা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে. তাহাতেও ইহার সত্যতার প্রমাণ সকলে পাইবেন। মূল সংজ্ঞা হইতে যে deduction বা বিশিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা কার্ল মার্ক্স পরিকল্পিত এই

পদ্ধতিরই একটা বিবৃতি। এই পদ্ধতিকেই সোসিয়ালিজম্ এই নাম প্রথমে দেওয়া হয় এবং ইহারই সব কথা সোসিয়ালিজম্ বলিয়া প্রচার করা হয়। তাই সোসিয়ালিজম্ বলিতে সাধারণতঃ লোকে এই পদ্ধতিকেই বুঝে এবং সামাজিক মঙ্গলকামনায় সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা বলিতে এই পদ্ধতিরই প্রতিষ্ঠা মনে করে।

ধন-সম্পদে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত অধিকারের এবং পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবনের লোপ, এই দুইটি কমিউনিষ্ট নীতির প্রাথমিক ও প্রধান দুইটি সূত্র। কার্ল মার্ক্স ইহার সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করেন, ধর্ম্মের লোপ (abolition of religion)। কমিউনিষ্ট আদর্শে আর্থিক সাম্য-স্থাপনার সঙ্গে ধর্ম্মের যে কোনও অপরিহার্য্য বা স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহা নয়। এইরূপ সঙ্ঘস্থাপনা পূর্ব্বে যাঁহারা করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রেমমূলক সাম্যবাদই তাঁহাদিগকে প্রেরণা দিয়াছে এবং এই ধর্ম্মের ভিত্তিতেই এই সব সঙ্ঘ তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। তবে কার্ল মার্ক্স একান্ত ভাবে জড়বাদী ছিলেন। ধনসম্পদ-লভ্য পার্থিব সুখের উপরে অতিপার্থিব কোনও সত্তা বা তৎপ্রসূত কোনও সুখের অস্তিত্বকেই তিনি স্বীকার করিতেন না। মনে করিতেন, উচ্চতর সব ধনিকসম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনতায় দীন-দুঃখী জনগণ যে এখন পীড়িত হইতেছে, সেই অবস্থায় তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম ঐ সব সম্প্রদায়ের উদ্ভাবিত একটা কৌশল মাত্র। তাঁহার বিখ্যাত একটি উক্তিই এই আছে যে, ধর্ম্ম জনসাধারণের পক্ষে অহিফেনস্বরূপ (religion is opium for the people)। অহিফেনস্বরূপ এই ধর্ম্ম পরকালে স্বর্গসুখ ইত্যাদির মোহে ভুলাইয়া জনগণকে রাখিয়াছে। ইহলোকের দুঃখকে তাহারা তাই দুঃখ বলিয়াই মনে করে না, প্রতিকারেরও কোন চেষ্টা করে না। প্রতিকারের চেষ্টা আবার পাপ বলিয়াও ধর্ম্মাচার্য্যগণ উপদেশ দিয়া থাকেন।* এ-সম্বন্ধেও বিস্তৃত কোনও আলোচনার অবসর এ স্থলে নাই। এ-প্রসঙ্গে তাহা নিষ্প্রয়োজনও বটে। তার পর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এই সূত্রটি কার্ল মার্ক্সের সোসিয়ালিজমের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে; সাধারণভাবে কমিউনিষ্ট নীতির অঙ্গীয় নহে।

যাহা হউক, নূতন এই সূত্রটির যোগে কমিউনিষ্ট নীতির নূতন যে পরিণতি হয়, তাহারই স্থাপনায় সমাজের মঙ্গল হইবে এবং ব্যক্তিগত সব অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে ইহার অধীন করিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই কার্ল মার্ক্স-পরিকল্পিত পাশ্চাত্য সোসিয়ালিজমের মূল কথা। আর এই সোসিয়ালিজম্‌কে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে রাষ্ট্রশক্তির বলে। মার্ক্স বলেন, গণতান্ত্রিক শাসনে শ্রমিক জনগণের ভোটের সংখ্যা উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ত ধনিকদের ভোট অপেক্ষা অনেক বেশী। এই ভোটের বলে রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করিয়া সহজেই তাহারা এইরূপ কমিউনিষ্টপদ্ধতি এক এক দেশে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতেই সোসিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠা হইবে।

কার্ল মার্ক্সই কমিউনিষ্ট আদর্শে মানবের জীবনপদ্ধতির এইরূপ পরিকল্পনা করিয়া 'সোসিয়ালিজম্' এই নাম তাহাকে দেন। এই পদ্ধতিই তাই 'সোসিয়ালিজিম্' নামে পরিচিত হইয়া 'কমিউনিজমের' সঙ্গে একরূপ সমানার্থসূচক নাম হইয়া দাঁড়ায়। তবে এ কথাটা বোধ হয় পূর্ব্বের আলোচনার পর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে, সোসিয়ালিজম ও কমিউনিজম্ ঠিক এক কথা নহে। সোসিয়ালিজম্ মানব-সমাজের কল্যাণকর একটা সাধারণ নীতি এবং কমিউনিজম্ সেই নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিবার বিশিষ্ট একটা পদ্ধতি মাত্র। কমিউনিজম্ ব্যতীত অন্য উপায়েও এই কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তবে এই কমিউনিজম্ সোসিয়ালিজমের চরম একটা আদর্শ বটে, এবং সেই ভাবেই লোকসমাজে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপে সকলেই যে এই চরম আদর্শের পক্ষপাতী, এরূপ মনে করা ভুল। অনেক স্থলে কোথাও এই চরম আদর্শকে অনেকটা নরম করিয়া, কোথাও বা অনেকটা ভিন্ন রকম উপায়ে সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর এই চরম ব্যক্তিতন্ত্র-নীতিও ইহার ফলে বহু পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, চরম এই পদ্ধতিকে আমরা 'মার্ক্স-পন্থী সোসিয়ালিজম্' বা কমিউনিষ্ট সোসিয়ালিজম্ (সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র পদ্ধতি) এই নামে অভিহিত করিতে পারি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

* শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বলশেভিকগণের ধর্ম্মবিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদটিও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম-তত্ত্ব

বর্ণাশ্রম-তত্ত্বের সারমর্ম্মের সুনিপুণ সমাবেশ সুস্পষ্টভাবে কোথায় অভিব্যক্ত হইয়াছে, এ কথা যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার শেষ অধ্যায়ে। গীতায় বর্ণাশ্রম-তত্ত্বের সার সিদ্ধান্ত যেরূপ সুন্দর দার্শনিক বিবেক-প্রণালী অনুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ-পারিপাট্য দেখিলে পাঠকগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। সে বিবেক-প্রণালী আর কিছু নহে, ইংরেজিতে যাহাকে বলে process of Analysis। গীতায় প্রকাশ, জগতে এমন কেহ নাই, যিনি প্রকৃতি-জাত গুণ-ত্রয় হইতে মুক্ত। এই কথা বলিয়াই শ্রীভগবান্ বর্ণাশ্রম-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং গুণ-ত্রয়ের স্বরূপ এবং বর্ণাশ্রম-তত্ত্বের সহিত গুণত্রয়ের কি সম্বন্ধ, তাহাই—প্রথমে আলোচিত হইতেছে। অব্যক্ত প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপে প্রস্ফুরিত। সুতরাং এই ব্যক্ত জগতে এমন কোন পদার্থ নাই—যাহা এই গুণ-ত্রয় হইতে মুক্ত। সাংখ্য বলেন, "সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। "সাম্যাবস্থা" অর্থে সমবলবিশিষ্টত্ব বা স্বরূপমাত্রে অবস্থান। এই প্রকৃতিই ব্রহ্মের বা কারণের আত্মভূত শক্তি, আর শক্তির আত্মভূত যাবতীয় কার্য্য। প্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই গুণত্রয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন আকারে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং অব্যক্ত প্রকৃতিতেও গুণ-ত্রয়ের সংস্থান আছে, আবার ব্যক্ত প্রকৃতিতেও গুণ-ত্রয়ের সংস্থান বিদ্যমান। তবে প্রভেদ এই যে, অব্যক্ত প্রকৃতিতে উহাদের স্বরূপমাত্রে অবস্থান, আর ব্যক্ত প্রকৃতিতে বা সৃষ্টিতে উহাদের বিভিন্নরূপে অবস্থান। অতএব সৃষ্টি বা সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ত্রিগুণাত্মক। অব্যক্ত বা সম হইতে ব্যক্ত বা বিষম সৃষ্টি হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সম হইতে বিষম সৃষ্ট হয় নাই, কেন না, যে কার্য্য পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে ছিল, সেই কার্য্যের বর্ত্তমান অভিব্যক্তিফল তাহারই পরিবর্ত্তন ধারার বিকাশমাত্র, কেবল অজ্ঞানতা হেতুই বিষম বলিয়া বোধ হয়। তবে গুণত্রয় স্বরূপতঃ পরতন্ত্র, কাযেই স্বতন্ত্রের আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না। এই স্বতন্ত্রই ঈশ্বর, সুতরাং ঈশ্বরই উহাদিগের নিয়ামক। শ্রুতি বলেন, জগৎ ঈশ্বরের একাংশে স্থিত এবং মায়িক অর্থাৎ ইহাতেই প্রকৃতির অধিকার, আর অপর তিন অংশ প্রকৃতির অধিকারের অতীত। সুতরাং এই তিন অংশ নির্গুণ, আর এক অংশ মাত্র সগুণ। কিন্তু এই সগুণের সঙ্গে নির্গুণের কি সম্বন্ধ, তাহা বেদও বলিতে পারেন নাই। আমরা কোন্ ছার! ফল কথা, মায়ার কার্য্য যাহা কিছু, সবই ত্রিগুণাত্মক; কাযেই জাগতিক বস্তু যাহা কিছু, সবই ত্রিগুণাত্মক। অতঃপর শ্রীভগবান্ বর্ণাশ্রম-তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, যথা—

> ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
> কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ১৮।৪১

অর্থাৎ, হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের কর্ম্ম সকল স্বভাব-জাত গুণসকলের দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। ফলিতার্থ এই যে—ব্রাহ্মণাদির কর্ম্মসকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাগ করা আছে, আর এই বিভাগ গুণ-ত্রয় দ্বারা করা হইয়াছে। ফলতঃ সৃষ্টির প্রথম হইতেই গুণ-ত্রয়ের বিবিধ মিশ্রণে চারিপ্রকার বর্ণের জীব-প্রবাহ সৃষ্ট হইয়াছে, যথা—সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব মিশ্রিতরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান বৈশ্য, এবং রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান শূদ্র। উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেকটির নিজ নিজ পৃথক্ ক্রিয়াশক্তি আছে, কিন্তু তাহা মিশ্র অবস্থায় মিশ্রণ ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে চারি বর্ণের জীবপ্রবাহে চারি প্রকার কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং চারি বর্ণের প্রত্যেকটির স্বভাবজ কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, চারি বর্ণের কর্ম্ম স্বভাব-প্রভব গুণ দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত। স্বভাব-প্রভব অর্থে স্বভাবজাত। স্বভাব শব্দে [স্ব=আত্মা, ভাব=সামর্থ্যবিশেষ] ঈশ্বরের ব্যক্ত জগৎরূপ কার্য্য। এই কার্য্য অমূলক নহে, বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে উপনিষদ্ বলেন,—

(ছান্দোগ্য ৬।৮।৪) "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠা"। জীব জগৎ ছাড়া নহে, সুতরাং জীব স্বভাবও সন্মূলক, কদাপি অমূলক নহে। সেই মূলের নাম কর্ম্ম, আর সেই কৃত কর্ম্মের সঞ্চিত সংস্কারের ব্যক্ত অবস্থার নাম স্বভাব। বলা বাহুল্য, উক্ত সঞ্চিত সংস্কারের অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি। অতএব সকলেই নিজ নিজ স্বভাব অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। এই কথা শ্রীভগবান্‌ও এক স্থলে বলিয়াছেন, যথা—"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যা প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি" ইত্যাদি। ফল কথা, জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মসংস্কারের বর্ত্তমান ব্যক্ত অবস্থার নাম স্বভাব। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, জীবের যে জন্মান্তরীণ সঞ্চিত সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে স্বকার্য্যাভিমুখে অভিব্যক্ত হয়, তাহার নাম স্বভাব। এই স্বভাব স্বরূপতঃ আপেক্ষিক, যেহেতু কার্য্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ; আর সেই কারণই কর্ম্ম। জীবের জন্মান্তরীণ কৃত কর্ম্ম—যাহা সংস্কাররূপে তাহার সূক্ষ্মদেহে লীনভাবে থাকে, তাহাই বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হইয়া স্বভাব নামে আখ্যাত হইয়া থাকে, আর সেই স্বভাব অনুসারেই কার্য্যাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে। কারণ, সংস্কারের ব্যক্তাবস্থা বা স্বভাব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপে প্রস্ফুরিত হয়। জীবের কৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ ভাবী দেহ-বীজরূপ সংস্কার তাহার চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত থাকে। মৃত্যুকালে যে সংস্কার-সমষ্টি প্রবল ফলোন্মুখ হয়, সেই সমস্ত একভাবিক হইয়া ঈশ্বরাধীনে স্বকীয় বিপাক অনুসারে জাতি বা বর্ণাশ্রম উৎপন্ন করে। কাযেই জীবের চিত্ত-ক্ষেত্রে জাতিগত সংস্কার সংলগ্ন থাকে, যথাকালে উপাধি-তারতম্যে তাহার উদ্বোধ বা অনুদ্বোধ হইয়া থাকে। এইজন্য বিনা শিক্ষায় সংস্কারবশতঃ মানুষ নিজ জাতি অনুরূপ কর্ম্ম সহজে করিতে পারে। এক্ষণে বুঝা গেল যে, সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর সাধারণ কারণ, কিন্তু জীবগত কর্ম্মই তাহার অসাধারণ কারণ। অতএব জীবের কর্ম্মানুরোধেই ঈশ্বর চারি প্রকার বর্ণের জীব-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের অন্তরায় হয় না। পতঞ্জলিদেবও বলেন যে, মূল অর্থাৎ কর্ম্মাশয় থাকিলেই তাঁহার বিপাক বা ফলস্বরূপ জীবের জন্ম, জাতি ও ভোগ হইবেই হইবে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, গীতার মূল শ্লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ-ত্রয়কে এক সমাস-বদ্ধ করা হইয়াছে, কেন না, এই বর্ণ-ত্রয়ই দ্বিজত্ব হেতু বেদাধিকারসম্পন্ন-দ্বিজ অর্থে দ্বিজন্মা অর্থাৎ একটি পিতৃমাতৃজ জন্ম, অপরটি বেদ-বিহিত সংস্কার হেতু জন্ম। শূদ্রকে পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কেন না, শূদ্র বেদাধিকারবর্জ্জিত। এক্ষণে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে ঋগ্বেদ কি বলেন, তাহা দেখা যাউক। ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের সৃষ্টি প্রকরণে প্রকাশ, প্রকৃতি ব্রহ্মের একটি অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তি। এই প্রকৃতির যখন অব্যক্তভাব হয়, তখন মহাপ্রলয় হয় এবং ইহার পর যে সৃষ্টি, তাহাই আদি-সৃষ্টি। এইরূপ আদি-সৃষ্টি একবার মাত্র হইয়াছে। এই সৃষ্টির খণ্ড-প্রলয়ে যাবতীয় পদার্থের বীজ রহিয়া যায়, আর তাহাই ঈশ্বরের রেতঃস্বরূপ হওয়ায় ঈশ্বরের মনে সৃষ্টির ইচ্ছা হয়; সুতরাং তাহাই সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয়। এই কারণে সাংখ্য বলেন, সৃষ্টি আবির্ভাব মাত্র। বেদমন্ত্রে প্রকাশ, "ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ," অর্থাৎ যথাপূর্ব্ব বা পূর্ব্ববৎ বিধাতা একটির পর অপরটি সৃষ্টি করেন। কৢপ্ ধাতুর প্রয়োগে "অকল্পয়ং" শব্দ নিষ্পন্ন, সুতরাং জগৎ মায়াতে কল্পিত, সত্য নহে। যখন কারণ হইতে কার্য্য হইতে থাকে, তখনই সঙ্কল্পের উদয় হয়। এই সঙ্কল্প হইতেই জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সত্ত্ব-প্রধান "দেব," রজঃ-প্রধান মনুষ্য ও তমঃ-প্রধান তির্য্যক্, এই ত্রিবিধ জাতির সৃষ্টি হয়। দেব-জাতির অন্তর্ভূত কশ্যপ প্রভৃতি সাধ্যগণ অর্থাৎ সৃষ্টি-সাধনযোগ্য প্রজাপতিগণ এবং বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিগণ। প্রাকৃতিক নিয়মে যজ্ঞ না হইলে সৃষ্টি হয় না, কাযেই আদি-পুরুষ হইতে বিরাট-পুরুষ আবির্ভূত হন, আর তাঁহারই স্পন্দনে দেবগণ আবির্ভূত হন। এই দেবগণই সৃষ্টির জন্য মানস-যজ্ঞ করেন—ইহাই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ। এই দেবগণ মুক্ত পুরুষ, ইহারা ঈশ্বরের অনুকূল হইয়াই সৃষ্টির সঙ্কল্প করেন, কাযেই বিধাতার স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে। এই মুক্তপুরুষদিগের বৈশিষ্ট্য এই যে, জগৎ-স্রষ্টৃত্ব ছাড়া তাঁহাদিগের অন্যান্য শক্তি ঈশ্বর-তুল্য। তাঁহাদিগের শরীর মনোময়। কিন্তু মীমাংসক জৈমিনি বলেন যে, তাঁহারা কখনও মনোমাত্র শরীরী হন, আবার কখনও শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনই অবলম্বন করিয়া থাকেন। কথিত আছে, বেদমন্ত্রগুলি বিধাতারই ইচ্ছায় ঋষিগণের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়। এই ঋষিগণই মন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়া মানস-যজ্ঞে বিধাতাকে পরিতৃপ্ত করেন, তাই বিধাতাও নিজ মুখ হইতে

মন্ত্রগুলি প্রকাশ করেন, এইরূপে ঋষিরাও মন্ত্রগুলির উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই জন্য বেদের একটি নাম অনুশ্রব। ফল কথা, বেদ স্বরূপতঃ ব্রহ্মবাণী—অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন পুরুষরচিত নহে। আর একটা কথা—এই ঋষিগণের নাম প্রায়শঃ আধ্যাত্মিক, আর তাঁহারা স্বরূপতঃ আধ্যাত্মিক—প্রকৃত মনুষ্য নহেন, আর ইহা বেদেই প্রকাশ। উক্ত বিধাতার শরীর ত্রিধাতু-বিশিষ্ট, যথা—অগ্নি, বায়ু ও রবি। অগ্নি হইতে ঋক্ মন্ত্রের উদ্ভব, বায়ু হইতে যজুঃ মন্ত্র প্রকাশ এবং রবি হইতে সাম (মন্ত্রের বিকাশ)। বিধাতা বা বিরাট পুরুষ স্বরূপতঃ সমষ্টি-চৈতন্য মাত্র। দেবগণ ব্রাহ্মণকে এই বিরাট-পুরুষের মুখ বলিয়া কল্পনা করেন, তাই ব্রাহ্মণ মুখের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তাঁহারা ক্ষত্রিয়কে বিরাটের বাহুযুগল মনে করেন, তাই ক্ষত্রিয় বাহুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তাঁহারা বৈশ্যকে বিরাটের উরুযুগল মনে করেন, তাই বৈশ্য উরুযুগলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। অবশেষে তাঁহারা শূদ্রকে বিরাটের পাদযুগল মনে করেন, তাই শূদ্র পাদযুগলের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। স্বষ্টির নিয়ম এই যে, পূর্ণ হইতেই পূর্ণের উদ্ভব এবং পূর্ণতেই তাহার বিলয় হয়। যে যাহা হইতে হয়, সে তাহাতেই মিলিত হইয়া অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে অবস্থান করে। এইজন্য ব্রহ্মণ্যদেব ব্রাহ্মণের মুখের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হন। এইরূপে নৃদেব ক্ষত্রিয়ের বাহুযুগলের, অর্য্যদেব বৈশ্যের উরুযুগলের এবং দাসদেব শূদ্রের পাদযুগলের যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হন। দেবগণ স্বরূপতঃ সিদ্ধ-সঙ্কল্প, সুতরাং তাহাই হইল। এক্ষণে বুঝা গেল যে, ব্রাহ্মণাদি শব্দ ধর্ম্মপর অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বই ব্রহ্মণ্যদেব, ক্ষত্রিয়ত্বই নরদেব, বৈশ্যত্বই অর্য্যদেব, এবং শূদ্রত্বই দাসদেব। মনু-সংহিতাতে ব্রাহ্মণাদিকে বর্ণ বলা হইয়াছে—বর্ণ অর্থে [বর্ণনং বর্ণঃ] বর্ণন করা অর্থাৎ রং ফলানো। সহজ কথায়, দেবগণ মানসযোগে বিরাট-পুরুষরূপী চিত্র দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ বা রং ফলান। এইরূপে বিরাটের স্থূল শরীর চিত্রিত হইয়াছে। ফল কথা, কর্ম্ম-বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার অধিষ্ঠানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হয়। অতএব স্বষ্টির আদিতে সত্ত্বাদি গুণ-তারতম্যে যিনি যেরূপ বর্ণ হইবার উপযুক্ত, তিনি সেইরূপ বর্ণ হন। এই কারণে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থাপকরা ব্যবস্থা করেন যে, মূল পুরুষ যে বর্ণ, তাঁহার বংশীয়গণও সেই বর্ণ হইবে, আর সেই অবধি মূল বংশের সম্মান চলিয়া আসিতেছে। অতএব বেদ ও পুরাণরাজির মতে বর্ণধর্ম্মের সঙ্গেই বিধাতা মনুষ্য স্বষ্টি করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলির মহাভাষ্যে প্রকাশ, ব্রাহ্মণাদি শব্দগুলি কতিপয় গুণসমষ্টির বাচক; যথা,—ব্রাহ্মণের গুণ তপঃসাধন, বেদাধ্যয়ন পিতা ও মাতার ব্রহ্মকুলে জন্ম। এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইহাদিগের বেদ-বিহিত গুণ থাকিলে সেই গুণানুরূপ বর্ণতঃ প্রাপ্তি হয়। সার কথা এই যে জীব কর্ম্ম-বদ্ধ, কৃত কর্ম্মের ফল ভুগিবার জন্য ঈশ্বরেরই অনিবার্য্য বিধানে যথোচিত বর্ণে জন্মায় এবং সেই বর্ণানুরূপ মানসিক বৃত্তি পায় তাই শ্রীভগবানের শ্রীমুখে নিঃসৃত হইয়াছে, নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্ম্মে নিবৃত্তি-মার্গ অনুসরণ করা শ্রেয়ঃ।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য (জ্যোতিঃশাস্ত্রী)।

তরু ও তৃণ

তরু ডেকে কয়,—তৃণ,
তুমি কি চাহ না কভু নীচু থেকে উঠিতে
উপরেতে কোন দিনও?
তবে কেন তুমি শুধু নুয়ে নুয়ে থাক
গায়ে গায়ে শত শিশিরের কণা মাখ
চরণের চাপে চাপে
ধরণীর ধূলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে মৃদু—
ক্ষীণ তনু তব কাঁপে!

তৃণ বৃক্ষেরে বলে,—
ধরার ধূলিতে নম্র নতিটি মোর
লভেছি পুণ্যবলে
স্বর্ণ-রেণুতে গায়ে চন্দন মাখি
অশ্রু-কণায় অর্ঘ্য সাজায়ে রাখি
ধূপের সুরভি সম
দেবের দেউলে নমিয়া নীরবে লভি
উচ্চ আসন মম।

শ্রীশৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় (এম্, এ, বি, টি,)।
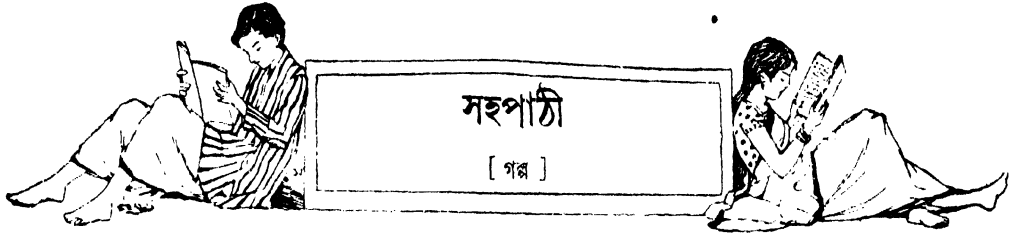
এক

স্কুলের ছুটীর পর ছেলেরা অনেকগুলি দলে বিভক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল।

স্কুলটির নাম দেশবন্ধু ইনষ্টিটিউসান। হুগলী জিলার রাধানগর নামে এক বিখ্যাত অঞ্চলে স্কুলটি অবস্থিত। জায়গাটি পল্লীগ্রামের সামিল হইলেও, বহু বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবে ও মিউনিসিপালিটীর বিধিব্যবস্থায় অনেকটা সহরের মতই হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তা-ঘাটগুলি সবই পাকা, নানাবিধ দোকান-পাটের বাহার, বাজার-হাটের ব্যবস্থাও কেতা-দুরস্ত; সন্ধ্যার পর রাস্তাগুলির ধারে একশো হাত অন্তর এক একটি কেরোসিনের আলো লণ্ঠনের ভিতর লম্বা খুঁটির মাথায় টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলে এবং গ্রাম্য-চৌকিদারের পরিবর্ত্তে পুলিশথানার উদ্দীপরা দুই জন পাহারাওয়ালা পালা করিয়া পাহারা দেয়।

এই অনুপাতে স্থানীয় উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুলটির অবস্থাও উন্নত এবং সহরের স্কুলগুলির আদর্শেই চালিত হইতেছে। পাকা বাড়ী, বড় হল, বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন শ্রেণী, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, খেলা শিখিবার ও খেলিবার কত সব ব্যবস্থা। আবার, এই সব সুযোগ সুবিধার সঙ্গে এমন শৃঙ্খলাও চালু হইয়াছে যে, পাণ হইতে বুঝি চূণটুকু খসিবারও যো নাই। মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখটির মধ্যে মাহিনা দাখিল না করিলেই দৈনিক এক আনা হিসাবে জরিমানা। আবার মাসটির ভিতরে জরিমানার সহিত মাহিনাটি মিটাইয়া না দিলে আরও মুস্কিল, রেজিষ্টারী খাতা হইতে বাকিদার ছেলেটির নাম কাটা যাইবে। অবশ্য হেডমাষ্টার সেই অবস্থাতেই তাহাকে ক্লাসে বসিয়া পড়া-শুনার অনুমতি দিলেও, ক্লাসের কোন পরীক্ষায় তাহার যোগ দিবার উপায় নাই। এমন ঘটনা কচিৎ ঘটিয়া থাকে, এবং ঘটনাচক্রে আজই ঘটিয়াছে। সেই সূত্রেই ছেলেদের জল্পনা ও কল্পনা।

দেশবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউসানের মোট ছাত্রসংখ্যা তিন শতের কম নয়। তৃতীয় শ্রেণীতেই বত্রিশ জন ছেলে পড়ে। তাহাদের মধ্যে একত্রিশ জনের নাম রেজেষ্টারী খাতায় আছে, এক জনের নাম কয় মাস ধরিয়া খাতায় উঠে নাই; সেই নামটিই আকবর আলি মোল্লার। খাতায় এখন যদিও তাহার নাম নাই, কিন্তু নূতন ক্লাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে তুলিবার সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রতি বৎসর যে নামগুলি ডাকিতেন, আকবরের নাম তাহাতে গোড়ার দিকেই বরাবর শুনা যাইত। সপ্তম শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রমোশনের দিন আকবরের নাম ছিল দশ জনের নীচে; কিন্তু বৎসরান্তে পঞ্চম শ্রেণীতে যে দিন উত্তীর্ণ ছেলেরা প্রমোশন পায়, সে দিন দেখা গিয়াছিল—আকবরের নাম স্থান পাইয়াছে পাঁচ জনের পরে। তৃতীয় শ্রেণীতে আরও দুই ধাপ আগাইয়া গিয়াছে অর্থাৎ এই শ্রেণীতে তিন জন ছাত্রের পরেই আকবরের নাম স্থান পাইয়াছে। ছেলেটির এমনই দুর্ভোগ যে, এতগুলি ছেলের মধ্যে তাহার নামটিই শুধু রেজেষ্টারী খাতায় নাই, অথচ প্রত্যহই সে ক্লাসে আসে, পড়া শুনা করে, ছুটীর পর বাড়ী যায়, মুখখানি তাহার সদা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ও ম্লান।

ক্লাস বসিতেই শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের নাম যখন ডাকিতে থাকেন, ছেলেরা ক্রমে ক্রমে 'প্রেজেণ্ট স্যার' বলিয়া হাসিমুখে সাড়া দেয়,—ক্লাসে 'প্রেজেণ্ট' থাকিয়াও আকবরের তাহাতে যোগ দিবার উপায় নাই; শুধু সে রুদ্ধ নিশ্বাসে সহপাঠীদের নামগুলি শুনিয়া যায়, বুকখানি তাহার দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে, বড় বড় দুইটি চোখের কোলে অশ্রু আসিয়া জমিতে থাকে, ছেলেটি যেন জোর করিয়াই তাহা চাপিয়া রাখে—বাহিরে আসিতে দেয় না

নামগুলি ডাকা হইয়া গেলে ক্লাসেরই কতকগুলি ছেলে চোখে ও মুখে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটাইয়া যেরূপ ভঙ্গীতে আকবরের দিকে চাহিতে থাকে, আকবর তাহার অর্থ স্পষ্টই বুঝিতে পারে। সহপাঠীদের এই বিদ্রূপের হাসি যেন কাঁটার মত তাহার গায়ে বিঁধিতে থাকে। আবার

কতকগুলি ছেলে যে, মুখগুলি তাহাদের ম্লান করিয়া ছল ছল চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া মনের নিবিড় বেদনা জানাইয়া দেয়, তাহাও বুঝিতে আকবরের বিলম্ব হয় না। ইহাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহপাঠী নির্ম্মল, পরিতোষ ও নবীনের কথাই তুলিবার মত। এই তিনটি ছেলের সহিত পরীক্ষায় ও পড়াশুনায় তাহার রীতিমত প্রতিযোগিতা চলে, অথচ ইহারাই আকবরের ব্যথায় অতিমাত্রায় ব্যথিত, তাহার এই দুর্ভাগের জন্য তাহাদের দুঃখের অন্ত নাই।

এই সমৃদ্ধ গ্রামখানির বাহিরে আরও দুই তিন খানি গ্রামের পরে প্রায় আড়াই ক্রোশ তফাতে আকবরদের গ্রাম। এই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া তাহাকে এই স্কুলে পড়িতে আসিতে হয়। আকবরদের অবস্থা বরাবর ভালই ছিল। তাহার বাবা ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে কাটা কাপড়ের কারবার করিতেন। নিজে দর্জ্জীর কাযে সুদক্ষ; কারবারে যাহা উপায় করিতেন, তাহাতে সেখানকার খরচ চালাইয়াও দেশে যাহা পাঠাইতেন, তাহাতে সংসার সচ্ছলভাবেই চলিয়া যাইত। কিন্তু প্রায় বৎসর ফিরিতে চলিল, তাঁহার কারবারের অবস্থা হঠাৎ মন্দ হইয়া পড়ে; আমদানীও কমিয়া যায়। ঠিক মত বাড়ীতে টাকা আসে না, কাযেই নানা বিষয়েই অভাব দেখা দিয়াছে। বরাবরই সে নিয়মিত সময়ে স্কুলের বেতন দিয়াছে, কিন্তু প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল, একটি মাসের বেতনও সে জমা দিতে পারে নাই। প্রথম মাসেই যখন তাহার নাম কাটা যায় এবং হেড-মাষ্টার তাহাকে ডাকিয়া সে জন্য কৈফিয়ৎ চাহেন, আকবর তখন ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে তাহাদের দুরবস্থার কথা জানাইয়াছিল; কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিয়াছিল, বাবা তিন মাস বর্ম্মা থেকে কিছুই পাঠান নি, স্যার। কি করে যে আমাদের দিন চলছে ভগবানই জানেন। বাবার কাছ থেকে টাকা এলেই আমি মাইনে চুকিয়ে দেব। যদি আমাকে ক্লাসে আসবার পারমিসন দেন, স্যার, তবেই আমার পড়া হয়; নইলে—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে চুপ করিয়াছিল, আর তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় নাই।

হেডমাষ্টার মহাশয় চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, ছেলেটির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, সুন্দর সুপুষ্ট মুখখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখের কথা তাহার অশ্রুর আবেগে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মুখখানি রীতিমত গম্ভীর করিয়াই হেড-মাষ্টার এই বাকিদার ছেলেটির বিচার করিতে বসিয়াছিলেন। কিন্তু ছেলেটির মর্ম্মবাণী বিচারকের মুখের গাম্ভীর্য্য কোথায় সরাইয়া দিয়াছিল, এক নিমিষে তাঁহার মনটিও বুঝি ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছিল; কাযেই ক্লাসে উপস্থিত থাকিবার বিশেষ অনুমতি তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতে আকবরকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই।

তাহার পর আরও কয় মাস কাটিয়াছে, কিন্তু অবস্থা তাহাদের ফিরে নাই, বরং আরও খারাপ হইয়াছে। সেই সময় বর্ম্মায় এক হাঙ্গামা বাধে। এক দল বর্ম্মী বিদ্রোহী হইয়া চারিদিকে লুট-তরাজ আরম্ভ করে। আকবরের বাবার দোকানেও ডাকাতি হইয়া যায়। বিদ্রোহীরা দোকানের মাল-পত্র লুট করে, দর্জ্জীখানার সিলায়ের কলগুলি ভাঙ্গিয়া বিগড়াইয়া দেয়, খাতা-পত্র ছিঁড়িয়া তছনছ করিয়া রাস্তার নর্দ্দমায় ছড়াইয়া ফেলে। আকবরের বাবা তাঁহার দোকানের লোকজনদের লইয়া প্রাণপণে ডাকাতদের বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মাত্র পাঁচ ছয় জন, ডাকাতদের দলে ছিল একশোর উপর গুণ্ডা। সকলেই শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া চোট খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে পুলিস ও সহরের লোকজন আসিয়া তাঁহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়।

হাসপাতালে প্রায় একটি মাস থাকিয়া আকবরের বাবা যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন তাঁহাকে একেবারে রিক্ত বলিলেই হয়। যথাসর্ব্বস্বই তাঁহার নষ্ট হইয়াছিল! কোনও রকমে রাহা-খরচের টাকাটি সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। এত বড় বিপদের কথা বাড়ীর কেহই জানিতে পারে নাই, তাঁহার মুখেই এই প্রথম সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল!

এ দিকে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার দিনও আজ ছুটীর পূর্ব্বে হেডমাষ্টার মহাশয় ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ক্লাসে আকবরকেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে—তিন দিনের ভিতরেই স্কুলের সমস্ত পাওনা পরিশোধ না করিলে সে পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

কথাটা থার্ড ক্লাসের ছেলেদের ভিতরেই চাপা থাকে নাই, স্কুলের সকল ছেলেই খবরটা শুনিয়াছিল। সকল ছেলের মুখেই আজ আকবরের কথা। পথে চলিতে চলিতে এই আলোচনাই তাহারা করিতেছিল, পিছনে ফিরিয়া এক একবার এই আলোচ্য ছেলেটিকেও তাহারা দেখিতেছিল।

আকবর বুঝি ইচ্ছা করিয়াই পিছাইয়া পড়িয়াছিল। ছেলেগুলিকে মুখখানি দেখাইতেও যেন তাহার লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু তাহার অতি অন্তরঙ্গ কয়জন সহপাঠী তাহাকে ফেলিয়া যায় নাই, তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। আকবরের মনের কষ্টটুকু ইহারা কয়জন যেন ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্যই তাহাকে ঘিরিয়া চলিয়াছিল। চারিটি রাস্তার সংযোগ স্থল—চৌমাথার কাছটিতে আসিয়াই তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল। এইস্থান হইতে মোড় ফিরিয়া আকবর তাহার গ্রামের রাস্তা ধরিবে।

নবীন কহিল,—তুই এক কায কর ভাই, কাল তোর বাবার কাছ থেকে একখানা চিঠি এনে হেডমাষ্টারকে দে, তা হলেই তোকে একজামীন দিতে দেবে।

পরিতোষ কথাটায় সায় দিয়া কহিল,—ঠিক বলেছে নবীন, তাই কর্, ভাই।

আকবর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্তাবটার প্রতিবাদ ক'রিল; কহিল,—না ভাই, তাতে কিছু হবে না; বাবা কি লিখবেন? কুড়ি টাকার কাছাকাছি ইস্কুলের দেনা, কুড়িটা পয়সাও বাবার কাছে নেই। জমি-জেরাৎ সব দেনায় বাঁধা পড়েছে, কারবার যখন গেছে, দেনা কি করে যে বাবা শুধবেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একজামীন আমার দেওয়া হবে না, ভাই! আর তিনটে দিন আসবো ইস্কুলে, দেখা-সাক্ষাৎ হবে, তার পরই, ভাই, খতম।

আকবরের কথাগুলি ছেলেদের বুকে বুঝি গুলীর মতই বিঁধিল। নির্ম্মল নামে সহপাঠীটি মনে মনে এতক্ষণ কি ভাবিতেছিল; সেইই ক্লাসের 'ফার্ষ্ট বয়,' অবস্থাও তাহার সব চেয়ে ভাল; তাহার বাবা নামজাদা উকীল, খুব পসার, অনেক টাকা উপায় করেন। নির্ম্মল এই সময় কহিল,—এক কায করলে হয় না, ভাই? আমাদের ক্লাসে ত বত্রিশ জন ছেলে, আকবরকে বাদ দিলেও একত্রিশ জন হয়। আমরা যদি চাঁদা করে এই টাকাটা তুলি?

কিন্তু ঠিক এই সময় আকবরের মুখের দিকে চাহিতেই কথাটা তাহার বন্ধ হইয়া গেল। আকবরের মুখখানা বুঝি কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই কালো হইয়া গিয়াছিল; নির্ম্মল বুঝিল, এ প্রস্তাব করিয়া সে ভালো করে নাই, ইহাতে আকবরকে ছোট করা হইয়াছে, তাহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত দেওয়া হইয়াছে,—সে তো এই ছেলেটির মনের গতি জানে? তখনই কথাটা চাপা দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি কহিল,—না ভাই, আকবর, আমার এ কথাটা তোলা ঠিক হয় নি, আমার ভুল হয়েছে।

আকবর কহিল,—ভাই নির্ম্মল, আমার বাবা অনেক পয়সা উপায় করেছেন, অনেক পয়সা অনেককে দিয়েছেনও; আজ আমরা কষ্টে পড়েছি বলে, পরের কাছে তিনিও শুধু শুধু হাত পাততে পারবেন না, আমিও পারব না। তা ছাড়া ভাই, বাবার যে শরীর এখন, আমি তাঁকে কিছু বলতে পারবো না। বুঝেছি ভাই, এবার একজামিন দেওয়া আমার অদৃষ্টে হল না।

নির্ম্মল আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—আর কি কোনো উপায় হতে পারে না, ভাই?

নবীন কহিল,—আচ্ছা, আমরা সবাই মিলে যদি হেড-মাষ্টারকে ধরি? হেডমাষ্টার যদি কথা না শোনেন, সেক্রেটারীকে ব'লি?

আকবর কহিল,—কিছুই হবে না, ভাই। সবাই দেখাবে আইন; গরীবের দুঃখ কেউ বুঝবে না। আমার জন্য তোমরা কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ, ভাই—

নির্ম্মল কহিল,—এ কষ্ট শুধু মুখের নয় ভাই, মনের সব্বাই সারা বছরটি ধরে এক সঙ্গে প'ড়ে এলুম, পড়াশুনায় এত ভালো হয়েও শুধু পয়সার জন্য তুমি ভাই পরীক্ষা দিতে পারবে না! এ কথা মনে হলেই আমার কান্না পায়, বুকখানা যেন দমে যায়—

আকবর কহিল,—সব বুঝছি, ভাই। তোমরা আমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসো, কিন্তু কি করবে, আমার নসীব। আজ ভাই আসি, তিনটে দিন আরো আছি; তার পর—

আর কোন কথা না বলিয়া আকবর তাহার সহপাঠীদের দিকে আর্ত্তদৃষ্টিতে চাহিল, পরক্ষণেই কোঁচার খুঁটটি তুলিয়া চোখ দু'টি মুছিতে মুছিতে গ্রামের পথটি ধরিল। যতক্ষণ আকবরকে দেখা যায়, এই তিনটি ছেলে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

দুই

মক্কেলদিগকে বিদায় দিয়া অনুকুল বাবু তাঁহার নথীপত্র গুছাইতেছিলেন, এবার ভিতরে যাইবেন; এমন সময় আস্তে আস্তে নির্ম্মল তাঁহার টেবলটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া অনুকুল বাবু চমকিত হইলেন। এ কি! এক রাত্রেই তাহার চেহারা যেন বদলাইয়া গিয়াছে, মুখখানি অত্যন্ত বিরস এবং ছাইয়ের মত বিবর্ণ! ত্রস্তভাবে তিনি কহিলেন,—কি হয়েছে রে? এ রকম চেহারা কেন?

কান্নার একটা আবেগ বুঝি নির্ম্মলের কণ্ঠ ঠেলিয়া উঠিতেছিল। সে যেন জোর করিয়াই তাহা রুখিয়া ব্যথাতুরের মতই কহিল,—কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি, বাবা!

বাবা বিচলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি, ঘুম হয় নি? কেন, কেন, কি হয়েছিল যে—

নির্ম্মল কহিল,—আমাদের ইস্কুলের একটি ছেলের কষ্ট দেখে মনে ভারী কষ্ট হচ্ছিল, তাই।

অনুকুল বাবু মনে মনে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—ও! ছেলের মনটি যে অতিশয় কোমল, পরের কষ্ট দেখিলেই তাহা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, ইহা তিনি জানিতেন এবং এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ছেলের উচিত অনুচিত অনেক আব্দারও সহ্য করিতে হইত। পাছে আজও ছেলের পক্ষ হইতে বিশেষ কোনো আব্দার উঠে, সেই জন্য তিনি সংক্ষেপেই প্রসঙ্গটা চাপা দিতে উদ্যত হইলেন।

ছেলে কিন্তু সহজে তাঁহাকে অব্যাহিত দিল না। বাবার সংক্ষিপ্ত কথাটার পরই সে সহসা কহিল,—আচ্ছা বাবা, ১লা জানুয়ারী ত আমার জন্ম দিন, আর আপনি তো আগে থাকতেই বলে রেখেছেন, এবার আমাকে ঐ দিন একটা বাইসিকেল কিনে দেবেন?

অনুকুল বাবু কহিলেন,—আমার সে কথা মনে আছে, আমি যা বলেছি, তা পাবে।

নির্ম্মল কহিল,—নতুন একটা বাইসিকেল যেমন তেমন হলেও তিরিশ টাকার কমে হবে না; আমি তা চাই না, বাবা। তার বদলে আমি এখন কুড়িটি টাকা নগদ চাই।

ছেলের এই কথায় অতিশয় বিস্মিত হইয়া অনুকুল বাবু কিছুক্ষণ তাহার নির্ভীক মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, সে মুখে লোভের কোনো ছায়া পড়ে নাই, বরং দৃঢ়তার একটা আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এ কথার মানে? কুড়িটি টাকা নগদ নিয়ে তুমি কি করবে?

নির্ম্মল তাহার মুখখানি উঁচু করিয়া উত্তর দিল,—একটি ভালো ছেলের লেখাপড়া শেখবার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাবা। আমি এই টাকা দিয়ে সেই পথটা খুলে দেব। বাইসিকল চড়ে নাই বা পথ চললুম, আমার যখন পা আছে!

ছেলের এই উত্তর অনুকুল বাবুকে অধিকতর বিস্মিত করিয়া দিল। তিনি দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া ছেলের মুখের দিকে পুনরায় চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের কথা বাহির হইবার আগেই নির্ম্মল কহিল,—কথাটা আমি খুলে বলছি, বাবা! আপনি সব শুনলে কখনই স্থির থাকতে পারবেন না, কেঁদে ফেলবেন।

বাবা কাঁদুন, আর নাই কাঁদুন, কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিল। অনুকুল বাবু অবাক! এমন কি কথা আছে, যাহার সঙ্গে চোখের জলের ঘনিষ্ঠতা এত নিবিড়, এমন মাখামাখি!

নির্ম্মল তখন তাহাদের সহপাঠী আকবর আলির কথা ও কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কেমন ভালো ছেলে, স্বভাবটি তাহার কেমন সুন্দর, কত ভাব তাহার সঙ্গে, কি বিপদ তাহাদের চলিয়াছে এবং তাহাতে তাহার শিক্ষার দ্বারে কত বড় বাধাই পড়িয়াছে; একটি একটি করিয়া সমস্ত কথাই সে তাহার পিতাকে শুনাইয়া দিল।

মনের ভাব মনেই চাপিয়া রাখিয়া অনুকুল বাবু কহিলেন,—এই টাকা যদি সত্যই তোমাকে দিই, কি করবে তুমি? একটা মিটিং করে সব ছেলেকে ডেকে তাদের সামনে আকবর আলির হাতে দেবে বোধ হয়?

কথাটা শুনিয়াই নির্ম্মলের চোখ দুটির উপর আকবরের মুখখানি ভাসিয়া উঠিল চাঁদার কথা তুলিলেই তাহার মুখখানিতে কি কালিমার সঞ্চারই না হইয়াছিল! নির্ম্মল কহিল, না বাবা, তা হ'লে আকবর সে টাকা ছোঁবে না; গরীব হলেও সে ভিখারী নয়। আপনি যদি সত্যই রাজী হন, বাবা, টাকা আমি হাতে করে নেব না, আপনি নিজেই এমন করে ইস্কুলে তার নামে জমা দেবেন, যেন কেউ দিয়েছে, ছেলেদের ভেতরে সেটা জানাজানি না হয়। সে এদিকে বড়ডো অভিমানী যে!

অনুকুল বাবু কহিলেন,—আমি আজই তোমাকে কথা কিছু দিতে পারছি না। তবে তুমি ছেলেটির নাম, তার

বাপের নাম, ঠিকানা, এগুলো সব লিখে ওবেলা আমাকে দিয়ো, আমি চেষ্টা করে দেখবো কি করতে পারি।

তিন

আজই শেষ দিন। আজও আকবর আলি স্কুলের পাওনা টাকাগুলি জোগাড় করিতে পারে নাই। আজই তাহার এই স্কুলে আসিবার ও ক্লাসের বেঞ্চিতে বসিবার শেষ তারিখ। ইহার পর পরীক্ষার পড়া তৈয়ারী করিবার জন্য স্কুল সাত দিন বন্ধ থাকিবে, তাহার পরই পরীক্ষা সুরু হইবে।

দুরু দুরু বক্ষে আকবর ক্লাসে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় রেজিষ্টারী বহিখানি হাতে করিয়া ক্লাসে ঢুকিলেন, ছেলেরা এক সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন করিল।

চেয়ারে বসিয়াই তিনি ছাত্রদের নাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

—নির্ম্মলচন্দ্র মুখার্জ্জী ?

—প্রেজেণ্ট স্যার।

—পরিতোষচন্দ্র সমদ্দার ?

—প্রেজেণ্ট স্যার।

—নবীনচন্দ্র দে ?

—প্রেজেণ্ট স্যার।

—আকবর আলি মোল্লা ?

এই নাম শিক্ষকের মুখে উঠিবামাত্রই ক্লাসের ভিতর একটা গুঞ্জন উঠিল। যাহার নাম, তাহার মুখখানা এক মুহূর্ত্তে যেন কালো হইয়া গেল! সে বুঝিল, স্যারের মস্ত ভুল হইয়াছে। মাসের আজ প্রথম দিন ; নূতন পাতায় ভুলিয়া তাহার নামটাও তোলা হইয়াছে।

শিক্ষক মহাশয় কণ্ঠে একটু বেশী জোর দিয়া আবার ডাকিলেন, আকবর আলি মোল্লা ?

কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধরাগলায় আকবর আলি মোল্লা উত্তর দিল,—প্রেজেণ্ট, স্যার!

কিন্তু তাহার পরই সে প্রতিবাদের সুরে কহিল, আপনার ভুল হয়েছে, স্যার আমার নাম যে কাটা—

স্যার কহিলেন,—না ; তোমার নাম উঠেছে। 'সীট ডাউন প্লীজ।"

আবার তিনি সুরু করিলেন,—পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী ? —ইত্যাদি।

নাম রেজিষ্টারী হইবার পরেই স্বয়ং হেডমাষ্টার ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ক্লাস-টিচারের সহিত ক্লাসের সকল ছাত্রই একযোগে দাঁড়াইয়া উঠিল।

হেডমাষ্টার মহাশয় গম্ভীরভাবে কহিলেন,—আকবর আলি মোল্লা,—স্কুল-কমিটী তোমার বাবার বিপদের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত। কমিটী তোমার পড়াশুনা ও স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করে সন্তুষ্ট হয়ে স্থির করেছেন যে, তোমার বাবার অবস্থা পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত বিনা বেতনেই তুমি বরাবর স্কুলে পড়বে, আর তোমার কাছে পাওনা পেছলি টাকার আদায়ও মুলতুবি থাকবে। তোমার বাবা যদি আবার উপায়ক্ষম হন, কিম্বা ভবিষ্যতে তুমি নিজে লেখাপড়া শিখে মানুষ যদি হতে পারো, কমিটীর বিশ্বাস, স্কুলের ঋণ তোমরা নিশ্চয়ই পরিশোধ করবে। তোমার বাবাকেও আলাদা চিঠিতে একথা জানানো হয়েছে।

ক্লাসের প্রায় সকল ছেলের মুখই তখন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে ; বিশেষতঃ পরিতোষ ও নবীন অতি উল্লাসে একটা চীৎকার তুলিয়াই বসিল। আর নির্ম্মল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু গণ্ডের উপর ঝরিতেছিল ; কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কি কেহ জানিতে পারিয়াছিল, দুস্থ সহপাঠীর এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের মূলে কে ?

দুই হাত যুক্ত করিয়া আকবর আলি সম্মানভাজন শিক্ষকদ্বয়কে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া তাহার সহপাঠীদিগের দিকে ফিরিল, তখনও তাহার দুইখানি হাত যুক্ত, দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত, মুখে একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি। সহপাঠীদের উদ্দেশে মাথাটি নত করিয়া সে তাহার স্থানটিতে বসিল।

চার

স্কুলের ঋণ পরিশোধ করিবার বা ক্লাসের মাহিনা দিবার মত অবস্থা আকবরের বাবার জীবনে পরবর্ত্তী দুইটি বৎসরের ভিতরেও আসিল না। অগত্যা আকবরের নামটি বরাবর বিনা বেতনে পড়ুয়া ছেলেদের তালিকাতেই রহিয়া গেল এবং এই অবস্থাতেই সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আকবরদের অবস্থা আশ্চর্য্য রকমেই বদলাইয়া গেল ; শুধু টাকার দিক্

দিয়া নহে - তাহার সহিত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার যোগাযোগ যথেষ্টই ছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় আকবর তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ত পাইলই, তাহা ছাড়া পাইল একটা সোনার মেডেল এবং পাঁচ শত টাকার একটা থলি। এই মেডেল ও টাকার থলি জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী ও বনেদী ভূস্বামী নবাব আসরফ আলি খাঁ বাহাদুরের প্রদত্ত। নবাব বাহাদুর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জিলার মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে মুসলমান-ছাত্র প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে, উক্ত স্বর্ণপদক ও টাকা তিনি তাহাকে খেলাত দিবেন। আকবরের সৌভাগ্যক্রমে সে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম দশ জন ছাত্রের মধ্যে মুসলমান-ছাত্র হিসাবে সে একাই স্থান পায় এবং তাহার এই সাফল্যই তাহাকে অবশেষে নবাব বাহাদুরের জামাতার মর্য্যাদার সহিত তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার সূচনা করিয়া দেয়।

বিবাহের পরেই নবাব বাহাদুর কলিকাতায় বাসার ব্যবস্থা করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে জামাতার পড়া-শুনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর দেশের স্কুল, স্কুলের সহপাঠী ও জন্মভূমির সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াই গেল। বিবাহের সময়েও সে তাহার সহপাঠীদিগকে স্মরণ করিবার অবসর পায় নাই বা বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার হাতে পুরস্কারের অতগুলি টাকা আসা সত্ত্বেও সে বছর দুই পূর্ব্বে তাহার সম্বন্ধে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের সেই বিশেষ নির্দ্দেশটুকুও স্মরণ রাখিতে পারে নাই।

আকবরের বাবা বরং সে সময় বলিয়াছিলেন,—আমি বলি কি, অতগুলো টাকা যখন মুফ্‌তো এলো, ও-থেকে অন্ততঃ গোটা পঁচিশ টাকা স্কুলে দিয়ে আয়।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আকবরের মাহিনার দেনা মাফ করিয়া ও তাহাকে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি দিয়া যে পত্র স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ এই নিরুপায় বৃদ্ধকে লিখিয়াছিলেন, ছেলে ভুলিলেও তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। পত্রের শেষে ভবিষ্যতের যে নির্দ্দেশটুকু ছিল, তাহাও দুস্থ পিতাকে বুঝি সর্ব্বদা সচেতন করিয়া রাখিত।

কিন্তু ছেলে তাহাতে মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিয়াছিল, —কি দরকার! কত ছেলেই ত ফ্রী পড়ে, তাতে কি হয়েছে! সে টাকা ত আর কেউ নিজের পকেট থেকে দেয় নি!

তখনও বৃদ্ধের চারিদিকে দেনা, বহু পাওনাদার। সংসারের অবস্থাও সচ্ছল নয় এবং নবাব বাহাদুরের বৈবাহিক হইবার সম্ভাবনাও তখন পর্য্যন্ত সূচিত হয় নাই। সুতরাং চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ও ছেলের মনোভাব বুঝিয়া তিনিও আর ইহার উপর কোনরূপ জোর দেন নাই। তাহার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহাদের অবস্থা যখন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, নবাব বাহাদুরের সুব্যবস্থায় এই পরিবারটি পল্লীর পর্ণকুটীর হইতে জিলার সদরে এক মনোরম অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন; অতীতের সকল স্মৃতিচিহ্নই তখন পিছনে পড়িয়া রহিল; দুর্দ্দিনে ছিল যাহারা পরম বন্ধু ও সহায়, পল্লীর যে উচ্চ বিদ্যালয়টির সদয় ব্যবস্থাতেই এই সুখী পরিবারটির সৌভাগ্যের ভিত্তি রচিত হয়, তাহারাও সেই সঙ্গে কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। আকবরের চিত্তমুকুরে তাহাদের কোন প্রতিবিম্ব কোন দিন পড়িয়াছিল, এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় নাই।

পাঁচ

ইহার পর সতেরোটি বৎসর অতীত হইয়াছে। সকল দিক্ দিয়া আরও কত পরিবর্ত্তনই আজ অতীতের প্রত্যক্ষদর্শীদিগকে বিস্ময়াভিভূত করিয়া দিয়াছে!

যে গ্রাম ও গ্রাম্য বিদ্যালয়টিকে উপলক্ষ করিয়া আমরা এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করি, দীর্ঘ সতেরো বৎসরে কালের কতরূপ প্রবাহই তাহাদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে!

যে অংশটি ছিল সমৃদ্ধ, অধিবাসীদের অবস্থা সচ্ছলতার পরিচয় দিত, বড় বড় অট্টালিকা গগন ভেদ করিয়া মাথা তুলিয়া এই অঞ্চলটির সৌভাগ্য ঘোষণা করিত, আজ যেন সে সকলই শ্রীভ্রষ্ট, কদর্য্য। রাস্তাগুলির সে পারিপাট্য নাই, অধিকাংশ বাড়ী পরিত্যক্ত, কোনটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দেওয়ালের ফাটল দিয়া বড় বড় আগাছা উঠিয়াছে, চারিদিকে বন-জঙ্গল জমিয়াছে, কৃতী অধিবাসীরা সহরবাসী, বাড়ীর পরিচর্য্যা করিতে কেহ নাই। যে সব বাড়ীতে এখনও মানুষ আছে, তাহারা কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া থাকে এই পর্য্যন্ত। উপার্জ্জন তাহাদের এত অল্প এবং পোষ্যের

সংখ্যা এত অধিক যে, দুই বেলা অন্নসংস্থানও তাহাতে হইয়া উঠে না, বাড়ী-ঘরের সংস্কার করিবার সাধ্য কোথায় ?

পূর্ব্বপরিচিত পুরাতন হাই স্কুলটির অবস্থাও পুরাতন গ্রাম্য সহরটির অধিবাসীদের মতই জরাজীর্ণ ও নিতান্ত শোচনীয়। ছাত্রসংখ্যা বিগত সতেরো বৎসরের ভিতর বিশেষ বাড়ে নাই, কিন্তু ব্যয়ের হার নানা সূত্রে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সতেরো বৎসর পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়টির কর্ত্তৃপক্ষদের যে কমিটী ছিল, তাহার অস্তিত্ব আজ নাই। তাহার পর কত কমিটীই পর পর গঠিত হইয়া কর্ত্তৃত্বের ভার লইয়াছে, কিন্তু এই শিক্ষায়তনটির উন্নতির কোন ব্যবস্থাই কোন কমিটী এ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। পুরাতন শিক্ষকদের মধ্যে অতীতের সাক্ষ্য দিতে আর কেহই নাই, শুধু আছেন এক মাত্র হেডপণ্ডিত বিধুভূষণ বিদ্যারত্ন মহাশয়।

গোড়া হইতেই এই স্কুলটির স্বতন্ত্র কেরাণী ছিল না; বোঝার উপর শাকের আটির মত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উপরেই কেরাণীর কাযটি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য ইহার বিনিময়ে তিনি বিদ্যালয়-সংলগ্ন বাস-বাড়ীটি বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

প্রায় সাতাশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বিদ্যালয়ে হেডপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন এবং এ পর্য্যন্ত একই ভাবে এই পদে বাহাল আছেন। শুধু ইহাই নহে, শিক্ষকদিগের প্রতিনিধি হিসাবে কমিটীর মধ্যেও ইনি স্থান পাইয়াছেন; এদিক্ দিয়াও ইনিই একাদিক্রমে দীর্ঘকাল কমিটীর স্থায়ী সদস্যের গর্ব্ব করিতে পারেন।

এই সতেরো বৎসরে আকবর আলির পরবর্ত্তী জীবনের গতিও বিস্ময়কর। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করে। নবাব বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে বারে প্রবেশ করিতে হয়। এখন আকবর আলি জেলার উকীল সরকার; কাউন্সিলের মেম্বার, তাহার প্রচুর আয়, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপরিমেয়। সম্প্রতি সরকার বাহাদুর খাঁ-বাহাদুর উপাধি দিয়া অনরেবল্ আকবর আলিকে সম্মানিত করিয়াছেন। জেলার সদরে রেলওয়ে ষ্টেশনের সান্নিধ্যেই উকীল সরকার খাঁ-বাহাদুর আকবর আলির প্রাসাদতুল্য বিশাল অট্টালিকা সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান স্কুল-কমিটীর বহু সাধ্য-সাধনার পর খাঁ-বাহাদুর আকবর আলি এবার স্কুলের প্রেসিডেণ্টের পদটি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে স্কুলের হিতৈষীমহলে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নামজাদা প্রেসিডেণ্টের সদয় দৃষ্টি যদি এই মুমূর্ষু স্কুলটির উপর পড়ে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং পুনরায় চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। তাঁহারা সাগ্রহেই সেই সদয় দৃষ্টি-বিন্দুটুকুর প্রতীক্ষায় উদগ্র হইয়া রহিলেন—কবে বর্ষণ হয়।

সপ্তাহখানেক পরেই নূতন প্রেসিডেণ্টের এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। লেফাফাখানি দেখিয়াই প্রেসিডেণ্টের প্রতি আস্থাশীল সদস্যদের মুখে হাসি আর ধরে না। কিন্তু খুলিয়া চিঠিখানা পড়িতেই তাঁহাদের মুখগুলি অন্ধকার হইয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট সেই পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

তাঁহার নির্দ্দেশ লইয়া কমিটীর প্রত্যেক মিটিং বসিবে। মিটিংএর 'অ্যাজেণ্ডা' তিনি দেখিয়া দিবেন। মিটিং হইয়া গেলে তাহার রিপোর্ট-বহি তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে। তাঁহার মঞ্জুরী ভিন্ন স্কুলের কোনও অদল-বদল হইবে না—কাহাকেও বাহাল-বরতরফও নয়।

চিঠি পড়িয়াই সকলের চক্ষুস্থির! প্রেসিডেণ্ট চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন বাড়ীতে, কালেভদ্রে কদাপি স্কুলে দেখা দিতে আসেন; কমিটীর ব্যবস্থার উপর কোন কথাই তিনি কহেন না, চোখ বুজাইয়া খাতায় সহি করিয়া দেন। বাহাল-বরতরফ ত কমিটীই বরাবর করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং প্রেসিডেণ্টের এরূপ নির্দ্দেশে চক্ষু ত কপালে উঠিবারই কথা! কিন্তু উপায় নাই, খাল কাটিয়া তাঁহারাই কুমীরকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, এখন তাহাকে ফিরাইবার সাধ্য কোথায় ?

আস্থাশীলের দল বলিলেন,—ও অমন লেখে, গোড়ায় একটু নেড়ে চেড়ে দেখবে, তার পরেই ঘুমোবে দেখো, টুঁ শব্দটিও আর করবে না।

ইহার কিছুদিন পরেই স্কুলের সেকেণ্ড-মাষ্টারের পদ খালি হইল। যিনি এই পদে কায করিতেছিলেন, বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটেরিয়েটে একটা বড় রকমের চাকরী পাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ

অভিজ্ঞ একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হইল এবং এ সম্বন্ধে কমিটীর মিটিং বসিবার পূর্ব্বেই হেডপণ্ডিত মহাশয় কমিটীর সভ্যগণকে জানাইলেন যে, এই গ্রামেই এক জন উপযুক্ত লোক আছেন, তিনি ম্যাথামেটিসে এম-এ, বি-এতেও অঙ্কে অনার্স নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে পাস করেন। তা ছাড়া এই স্কুল হইতেই তিনি ম্যাট্রিক দেন, সে হিসেবে এখানকার তিনি পুরাতন ছাত্র এবং এই পদে তাঁহারই দাবী অগ্রগণ্য। একখানা দরখাস্ত তিনি আগেই দিয়া রাখিয়াছেন—যদি কোনো পোষ্ট খালি হয় তাহার জন্য।

ইহা ব্যতীত ছেলেটির সম্বন্ধে অনেক ঘরোয়া কথা বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার অনুকূলে জোর সুপারিশই করিলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবটি কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের চিত্তস্পর্শ করিলেও তাঁহারা প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশটুকু তুলিয়া কহিলেন,—জানেন ত, বাহাল বরতরফের কর্ত্তা এখন তিনিই, এ ব্যাপারে কমিটীর কোনো জোর এখন নেই।

পণ্ডিত মহাশয় দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—কমিটীর জোর নেই, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারছি না। যেটা ঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত, তার দিকে ন্যায়নিষ্ঠমাত্রেরই মত দেওয়া উচিত। কমিটীর সব সদস্যই যদি একমত হন, প্রেসিডেন্টের আপত্তিতেও কিছু আসে যাবে না।

সদস্যগণ কহিলেন,—কিন্তু তিনি তাতে চটে যাবেন, আর আমাদের আসল উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হবে। এখন ও লোকটাকে চটানো মানেই, ইস্কুলটার দফা রফা হবার পথ পরিষ্কার করে দেওয়া। অনিষ্টের ক্ষমতা ওর যথেষ্ট আছে। আমরা তা চাই না। অন্ততঃ একটা বছর নির্ব্বিচারেই আমরা প্রেসিডেন্টের সমস্ত নির্দ্দেশই মাত্রায় মাত্রায় মেনে চলবো, এটা স্থির। হ্যাঁ, তবে এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে সুপারিশ করব—যাতে এই উপযুক্ত প্রার্থীটিকে এই ইস্কুলেরই এক্স-ষ্টুডেন্ট হিসেবেও তিনি বাহাল করবার মঞ্জুরী দেন। আর তিনিও ত এই ইস্কুলেরই এক জন এক্স-ষ্টুডেন্ট।

ছয়

প্রার্থীর আবেদন-পত্রের সহিত কলিকাতার কোন বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসাপত্রও ছিল। আবেদনে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, পারিবারিক ঘটনা-পরম্পরা তাঁহাকে স্বগ্রামে থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। ভবিষ্যতের সকল আকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভন ত্যাগ করিয়াই তিনি এই পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন এবং স্বগ্রামের এই প্রিয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সংস্রবেই তিনি তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক।

এই আবেদনপত্রের সহিত কমিটীর সকল সদস্য, সম্পাদক এবং হেডমাষ্টারের যথাবিহিত সুপারিশও ছিল—যাহাতে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকেই নিয়োগ করিবার মঞ্জুরী দেন।

যে লোক এই 'ডেসপ্যাচ' লইয়া প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে গিয়াছিল, যথাসময়ে সে তাঁহার উত্তর লইয়া ফিরিল। ছোট একখানি চিঠিতে গুটিকয়েক ছত্রে প্রেসিডেন্ট তাঁহার সংক্ষিপ্ত 'আদেশ' জানাইয়াছিলেন। ছোট হইলেও চিঠিখানার ঝাঁঝ ঠিক ধানিলঙ্কার মত, কোন অংশই অসার বা নিরর্থক নহে। চিঠিখানির মর্ম্ম এইরূপ—

স্কুলের চৌদ্দজন শিক্ষকের মধ্যে এক জন মৌলভি ভিন্ন আর সকলেই হিন্দু। দ্বিতীয় শিক্ষকের যে পদটি খালি হইয়াছে, তাহাতে এক জন উপযুক্ত মুসলমানকে নিয়োগ করা হইবে এবং সে ব্যবস্থা তিনিই করিবেন।

প্রেসিডেন্টের এই নির্দ্দেশ কমিটীর সদস্যদিগকে পুনরায় চমকিত করিয়া দিল মাত্র, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। বেত্রাহতের মতই তাঁহারা সমস্ত ক্রটি নিজেদের উপর লইয়া অনুশোচনার সুরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—কথাটা কিন্তু ঠিক, দোষ আমাদেরই।

শুধু পণ্ডিত মহাশয় প্রতিবাদ তুলিলেন,—দোষ আমাদের অদৃষ্টের, আর সেটা ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার দিক্ দিয়ে। আমার মনে হয় যখনই বুঝব যে, কাযে দোষ হয়েছে, তখনই উচিত—সে কায থেকে সরে যাওয়া।

প্রশ্ন হইল,—আপনি কি বলতে চান?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,— আমি বলতে চাই, এ পর্য্যন্ত কাযে আমাদের দোষ হয় নি, তবে অতঃপর যে হবে তারই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

—কি সূত্রে এ কথা বলছেন?

—পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সূত্রেই কথাটা বলতে হচ্ছে। এই স্কুলে এখন ছাত্রসংখ্যা মোট তিনশ তেইশ; তার মধ্যে মুসলমান-ছেলে আছে মোটে পনের জন। কোনো ক্লাসে তিনটি, কোনো ক্লাসে দুটি, আবার কোনো ক্লাসে একেবারেই

নেই। তথাপি তিশ টাকা মাইনে আর বাসা-খরচ অতিরিক্ত সাত টাকা দিয়ে বাইরের এক জন মৌলভিকে আনতে হয়েছে। এই স্কুলের মাষ্টারদের মাইনে অন্যান্য স্কুলের তুলনায় অনেক কম; তার কারণ এই যে, প্রায় সব মাষ্টারই এই অঞ্চলের; খাঁই এদের অল্প এবং স্কুলের ওপর একটা দরদ আছে। যতই দুর্দ্দশা এই গ্রামের হোক, এখনো এই একখানা গ্রাম থেকেই পঞ্চাশটি গ্রাজুয়েট জড় করা যায়, কিন্তু আশেপাশের দশখানা গ্রাম জড়িয়ে তাদের ভেতর থেকে অন্ততঃ তিন জন মুসলমান-গ্রাজুয়েট আপনারা যোগাড় করতে পারেন? তবুও বলবেন, ত্রুটি আমাদেরই?

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের এই উক্তি সদস্যদের অন্তর স্পর্শ করিলেও তাঁহারা প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশেই জোর দিয়া কহিলেন,—ন্যায় ও নিরপেক্ষতার দিক্ দিয়ে ভেবে দেখলে, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রেসিডেন্টের যুক্তিটাও অকাট্য।

সেবার সদস্যদের মন্তব্য শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিয়াছিলেন, এবার শুধু একটু হাসিলেন। কিন্তু সে হাসির অর্থ কমিটীর কোন সদস্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন কি?

তৃতীয় দিনে ইঁহারা সকলেই সবিস্ময়ে দৈনিক সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন—

অঙ্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এক জন গ্রাজুয়েট অথবা এম, এ, শিক্ষক আবশ্যক। আবেদনকারী অবশ্যই মুসলমান হইবেন। বেতন আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা; আহার ও বাসা আলাদা পাইবেন। সত্বর প্রেসিডেন্টের নিকট নিম্নঠিকানায় আবেদন করুন।

প্রেসিডেন্টের নামটির নীচে তাঁহারই বাড়ীর ঠিকানা দেখা গেল। আবার কমিটীর ঘরোয়া মিটিং বসিল। প্রেসিডেন্টের এই ডিক্টেটরী-তাণ্ডবের মধ্যেও তাঁহারা শৃঙ্খলা ও আন্তরিকতার প্রচুর আভাস পাইলেন; পূর্ব্বের বিস্ময় আর বিক্ষোভ তুলিবার অবসর পাইল না। যেহেতু, প্রেসিডেন্টের কর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রখরতা এতই তীব্র যে, গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া নিজেই খবরের কাগজে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দিয়াছেন? ইহাকেই বলে কাযের লোক, এমন না হইলে প্রেসিডেন্ট!

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এবারও একটা বিষয়ে প্রতিবাদ তুলিলেন,—পদটির মাইনে অবশ্য পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তার সঙ্গে আহার-বাসার কোন সম্বন্ধ নেই। প্রেসিডেন্ট যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাতে বোঝাচ্ছে, মাইনে পঞ্চাশ টাকার ওপর আহার ও বাসা তাঁকে ফ্রী দেওয়া হবে। তার মানে, আরো অন্ততঃ পনেরো টাকার ধাক্কা। সে টাকা কে দেবে?

উত্তরে সদস্যগণ কহিলেন,—যার লাঠি তার বোঝা। বুঝতে পারছেন না, প্রেসিডেন্ট নিজেই সে ভারটা নেবেন। আমাদের এ নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কি দরকার?

পণ্ডিত মহাশয় নীরবে শুধু হাসিলেন মাত্র।

ইহার সাত দিন পরে প্রেসিডেন্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র আসিল।—

অনেকগুলি আবেদন-পত্র আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই আমি ডাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আগামী ১লা নভেম্বর ছুটী আছে। ঐদিন বেলা দুই ঘটিকার সময় স্কুল-রুমে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করিবেন, যথাসময় আমিও উপস্থিত হইব।

পল্লীর কৃতবিদ্য দুঃস্থ প্রার্থীটির আশাভঙ্গে হয় ত কমিটীর কতিপয় সদস্যের অন্তরে বেদনার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু মহামান্য প্রেসিডেন্টের উপস্থিতির আনন্দে তাহা বুঝি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

সাত

অবশেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত পহেলা নভেম্বর দেখা দিল। এবার এই দিনে জগদ্ধাত্রী পূজা পড়ায় আফিস, আদালত, স্কুল প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ ছিল।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দুইটার সময় প্রেসিডেন্টের সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ মোটরখানি বিদ্যালয়ের হাতার সম্মুখে আসিয়া থামিল। ভক্তবৃন্দ প্রস্তুত ছিলেন; বিপুল শ্রদ্ধার সহিত এই সম্মানভাজন মানুষটিকে অভ্যর্থনা করিয়া সুসজ্জিত হলটির ভিতর লইয়া গেলেন।

সৌম্যমূর্ত্তি, দীর্ঘাকৃতি, দিব্য সুপুরুষ; মুখের দিকে কিন্তু চাহিলেই মনে হয় মানুষটি অতিশয় গম্ভীর ও দাম্ভিক, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু ঝিলিকও ফুটিয়া উঠে নাই। অথচ, তাঁহার আচরণে শিষ্টাচারের অভাব আছে, এমন কথা বলাও কঠিন। স্বল্পভাষী হইলেও প্রতি কথাটি তাঁহার মার্জ্জিত

ও দৃঢ় ওদিকে তাঁহার গাড়ীর সোফার ও সঙ্গের আর-দালীর পোষাক-পরিচ্ছদে প্রচুর পারিপাট্য থাকিলেও, তাঁহার সাজসজ্জা খুবই সাধারণ। সচরাচর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক যেরূপ কাপড়, জামা ও চাদর ব্যবহার করেন, তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, এমন কি, মাথাটি পর্য্যন্ত খালি, তাহাতে টুপি দেখা গেল না; মুখখানাও রীতিমত ক্ষৌরিত, গোঁফদাড়ির কোন চিহ্নই নাই।

স্কুলের কমিটীর সেক্রেটারী মুদ্রিত অভিনন্দনটি পাঠ করিলেন। অভিনন্দন-পত্রে বিশেষ করিয়া এইটুকু উল্লেখ ছিল যে, যাঁহাকে আজ তাঁহারা অভিনন্দিত করিতেছেন, যিনি আজ নানা সূত্রে বাঙ্গালা দেশের এক কৃতী সন্তান, এই জিলার অধিবাসীদের মুখ যিনি উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়া,—তিনি এই বিদ্যালয়েরই এক সুপ্রশংসিত ছাত্র এবং এই বিদ্যালয় হইতেই তিনি সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার অতিক্রম করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ছিলেন সে সময় তাঁহার সহপাঠী, এই অভ্যর্থনা সভায় যোগ দিবার সৌভাগ্য হইতে অদৃষ্ট তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ মৃত, কেহ বা জীবন্মৃত, অনেকে দেশান্তরিত। অতীতের সাক্ষিস্বরূপ এই বিদ্যামন্দিরটি আজ তাঁহাকেই পুনরায় অভিভাবক স্বরূপ পাইয়া ধন্য হইয়াছে—ইত্যাদি।

প্রেসিডেণ্ট গুটিকয়েক কথায় এই সুদীর্ঘ অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। তিনি যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং দীর্ঘকাল পরে পুনরায় ইহার সংস্পর্শে আসায় অতীতের অনেক কথাই যে তাঁহার মানসপটে ছবির মত ফুটিয়া উঠিতেছে—এ কথা তিনিও উল্লেখ করিলেন তাঁহার স্বল্প বক্তৃতায়।

অভ্যর্থনা সভার পর সুরু হইল কমিটীর সভা। আলোচ্য বিষয় উঠিতেই প্রেসিডেণ্ট একখানি আবেদনপত্র সেক্রেটারীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—এঁর কথাই আমি লিখেছিলুম, ঐ পোষ্টে ইনিই কায করবেন। আপ-নাদের আপত্তি আছে?

ইতিমধ্যেই আবেদনপত্রখানা সদস্যগণের হাতে হাতে ঘুরিয়া শেষ হেডমাষ্টারের হাতে গেল। তিনি কহিলেন,—ইনি দেখছি পাসকোর্শেই বি, এ পাস করেছেন, আর প্রাইভেটে এম, এ, পড়ছেন,—পাস এখনো করেন নি।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—হ্যাঁ। কিন্তু বি-এতে ওঁর কমবিনেসনে ম্যাথামেটিক্সও ছিল। আর, এম-এ-র জন্য ম্যাথামেটিক্স নিয়েই উনি প্রস্তুত হচ্ছেন। এই সব দেখেই আমি ওঁকে 'সিলেক্ট' করেছি।

হেডমাষ্টার কহিলেন,—কিন্তু ইনি যে ম্যাথামেটিক্সে এক্সপার্ট, ওঁর কথা ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে তা জানবার উপায় নেই। কোনো স্কুলে সেকেণ্ড-মাষ্টারের পোষ্টে কায করে-ছেন, এমন কোন সার্টিফিকেটও দেন নি।

হেডমাষ্টারের সহিত প্রেসিডেণ্ট পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়া-ছিলেন। হেডমাষ্টারের এই মন্তব্যের উত্তরে তিনি সহসা প্রশ্ন করিলেন,—আপনার কোয়ালিফিকেসন জানতে পারি?

হেডমাষ্টার উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই। ইংলিসে অনার্শ নিয়ে আমি বি-এ পাশ করি, এম-এ-তেও ঐ কোয়ালিফিকে-সন আমার।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—বেশ। এখন আপনিই বলুন ত, যদি প্রয়োজন পড়ে, ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেদের আপনি কি ম্যাথামেটিক্স পড়াতে পারেন না?

হেডমাষ্টার উত্তরে কহিলেন,—প্রয়োজনের কথা আলাদা। প্রয়োজন হলে শুধু ম্যাথামেটিক্স কেন, পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে ওঁর পিরিয়ডেও একদিন সংস্কৃত পড়িয়ে ক্লাসের 'ডিসিপ্লিনটা' হয় ত বজায় রাখতে পারি। কিন্তু যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যার জন্য সুরু থেকে তিনি সাধনা করেছেন, সে বিষয়ে শিক্ষা দেবার দাবী তাঁরই। কেউ যদি অঙ্কে অভিজ্ঞ একজন বহুদর্শী গ্রাজুয়েট চান, ডবল এম-এ হলেও, আমি নিশ্চয়ই সেখানে প্রার্থী হবার স্পর্দ্ধা করব না।

প্রেসিডেণ্টের মুখখানা এক নিমেষে কালো হইয়া গেল। এই সময় হেড-পণ্ডিত মহাশয় একখানা ভাঁজ করা কাগজ প্রেসিডেণ্টের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন,—আর এই দরখাস্তখানাও দেখুন, অঙ্কে অনার্শ নিয়ে ছেলেটি বি, এ, পাশ করেছে, এম, এতেও তাই; অঙ্ক নিয়েই ওর সাধনা। কলকেতার মিত্র ইনষ্টিটিউসনে সেকেণ্ড-মাষ্টারের পোষ্টে চাকরীও করেছে বছর-খানেক। তারও খুব ভালো সার্টিফিকেট এর আছে।

প্রেসিডেণ্ট কাগজখানার উপর তাঁহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি একবার বুলাইয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে ছুড়িয়া দিয়া অবজ্ঞার সুরে কহিলেন,—এ দরখাস্ত আমার দেখা আছে, কিন্তু এ নিয়ে ত কথা হচ্ছে না। আমাদের দরকার এখন —একজন মহামেডান টিচারে; আমার বিচার-বিবেচনায় আমি এই দরখাস্তই মঞ্জুর করেছি। আপনাদের আপত্তি থাকে, বাতিল করতে পারেন।

কমিটীর অধিকাংশ সদস্যই হেড-মাষ্টার ও হেডপণ্ডিতের ধৃষ্টতায় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন, এইবার তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। ব্যগ্রভাবে ও বিনীত কণ্ঠে তাঁহারা জানাইলেন,—প্রেসিডেণ্টের কথার উপর আমাদের কোন কথা নাই, ঐ দরখাস্তই আমরা মঞ্জুর করছি।

ইহার পরও পণ্ডিত মহাশয় নির্ব্বাচিত শিক্ষকটির আহার ও বাসার স্বতন্ত্র খরচ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়া প্রেসিডেণ্টকে বিব্রত করিলেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট দমিলেন না, গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—তার জন্য আটকাবে না, সে ব্যবস্থা আমিই করব।

অতঃপর প্রেসিডেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল ও তাঁহাকে জলযোগে আপ্যায়িত করিবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

জলযোগের পর প্রেসিডেণ্ট যখন উঠিবার উপক্রম করিতেছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় ঠিক সেই সময় তাঁহার কাছে গিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,—আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে, যদি দয়া করে—

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—নিশ্চয়ই শুনব

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—তা হ'লে লাইব্রেরীর ঘরটায় একবার যেতে হবে। ওখানে এখন কেউ নেই।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—চলুন।

আট

ছোট ঘর। মাঝে একখানা ছোট টেবল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকখানি চেয়ার; চারিদিকেই আলমারি, থাকগুলি পুস্তকে পূর্ণ।

একখানা চেয়ারে বসিয়াই প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—বলুন আপনার কথা।

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে প্রেসিডেণ্টের সৌম্যগম্ভীর মুখখানার দিকে চাহিয়া সহসা অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন,—এখন আমরা কমিটীর বাইরে, মনে করতে হবে —আরো বিশ বছর আমরা পেছিয়ে গেছি। সেই হিসেবে এখন তুমি অনরেবলও নও, খাঁ বাহাদুরও নও, কমিটীর প্রেসিডেণ্টও নও, এখন তুমি শুধু আকবর আলি মোল্লা— এই স্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র, আর আমি—এখনো কি আমাকে চিনতে পার নি?

প্রেসিডেণ্ট তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, —চিনতে পেরেছি, আপনি পণ্ডিত মশাই! কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি যুক্ত করিয়া ও ললাটে ঠেকাইয়া তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তাহার পর সবিনয়ে কহিলেন,— আপনি বসুন।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—বস, তুমি বস, আমি বসছি।

উভয়েই প্রায় মুখো-মুখী হইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। পণ্ডিত মহাশয়ই সেই নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিলেন। যে দরখাস্তখানি ইতিপূর্ব্বে তিনি সভায় প্রেসিডেণ্টের হাতে দিয়াছিলেন, সেইটিই এই রুদ্ধ কক্ষে প্রেসিডেণ্টের ঠিক মুখের সম্মুখে তুলিয়া কহিলেন,—এই দরখাস্তখানা পরিমল মুখোপাধ্যায়ের। তুমি একে জান?

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—আমি কি করে জানব? দরখাস্ত দেখে কি তার লেখককেও জানা সম্ভব?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—তুমি একে জানো, দেখেছ তবে হয় ত মনে নেই। আচ্ছা, নির্ম্মলকে তোমার মনে আছে?—তোমাদের ক্লাসে বরাবরই সে ছিল ফাষ্ট বয়,— নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়! মনে আছে?

নির্ম্মলের নামেই প্রেসিডেণ্টের মুখে বিস্ময়ানন্দের কতিপয় রেখা বুঝি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—খুব আছে। কিন্তু তার সম্বন্ধে কোন খবরই আর পাই না, সে'ও দেয় না।

—নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি কোন্ সময় থেকে মনে আছে?

—এক সঙ্গেই আমরা পরীক্ষা দিই তা বেশ মনে আছে। সেনেট হলেই আমাদের সীট পড়েছিল। নির্ম্মল সে সময় চোখের অসুখে খুব ভুগছিল, আমাকে রোজই বলত—মোটেই লিখতে পারিনি।

—পরীক্ষার পর আর বুঝি দেখা হয় নি ?

—না। পরীক্ষার পর আমি মামার বাড়ী যাই, ফল বেরোবার পরে ফিরি। আমরা সবাই জানতুম, নির্ম্মল ম্যাট্রিকে য়ুনিভার্সিটির রেকর্ড ভাঙ্গবে। কিন্তু যখন শুনলুম, সে টায়েটুয়ে কোনরকমে পাস করেছে, তখন আর লজ্জায় তার সঙ্গে দেখা করিনি। তার পরেই ঘটনাচক্রে আমাকেও দেশভুঁই ছাড়তে হয়।

—সে সমস্তই আমি শুনেছি। কিন্তু তার পর, নির্ম্মলদের অবস্থার কথা কি তুমি কিছুই শোননি ?

—না। কোন খবরই আমি আর পাই নি। কিন্তু আজ তার সম্বন্ধে সব খবর জানবার জন্য আমার ভারি আগ্রহ হচ্ছে।

—শোনবার ধৈর্য্য তোমার হবে ?

—নিশ্চয়ই হবে, আপনি বলুন।

এতক্ষণ পরে পণ্ডিত মহাশয়ের গলা যেন ধরিয়া আসিল, স্বরও গাঢ় হইয়া বাহির হইল,—পরীক্ষার আগে থাকতেই নির্ম্মলের চোখে 'গ্লুকোমা' হয়েছিল, যা কিছু সে লিখেছিল সবই আন্দাজে। তবুও সে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল এইটুকুই আশ্চর্য্য। তোমার যখন বিয়ের উৎসব খুব ঘটা করে চলছিল, এখানে তখন নির্ম্মলের চোখের চিকিৎসাও বিপুল ঘটা করেই হচ্ছিল। কিন্তু কোন ফল তাতে হল না, নির্ম্মল জন্মের মত অন্ধ হয়ে গেল।

যেন একটা তীরের তীক্ষ্ণ ফলা আচম্বিতে প্রেসিডেন্টের বুকে আসিয়া বিঁধিল। আর্ত্তস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন, —অন্ধ হয়ে গেল! কি বলছেন, পণ্ডিত মশাই, নির্ম্মল অন্ধ?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, —হাঁ, নির্ম্মল আজও অন্ধ; পৃথিবীর আলো আর তার চোখে পড়েনি। কিন্তু এইখানেই ওদের দুর্ভাগ্যের শেষ নয়। এই সময় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল হয়ে যায়, নির্ম্মলের বাবার সারা জীবনের সঞ্চয় ঐ ব্যাঙ্কে জমা ছিল, একদিনেই তিনি হলেন সর্ব্বহারা। সে টাল সামলাতে পারলেন না, কোর্ট থেকে ফিরেই হার্ট-ফেল করে মারা গেলেন।

প্রেসিডেন্ট অভিভূত হইয়া কহিলেন,—কি সর্ব্বনাশ! তার পর ?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—দরখাস্তের এই পরিমল হচ্ছে নির্ম্মলের ছোট ভাই। অন্ধ অবস্থায় নির্ম্মল তাকে জানালে, উচ্চশিক্ষা পাব—এই ছিল আমার জীবনের সাধ। তুমি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সে সাধ আমার পূর্ণ কর, ভাই! পরিমলও বললে, আমিও লেখাপড়া শিখবই, কিন্তু তুমিও লেখাপড়া ছাড়তে পারবে না, দাদা! অন্ধরাও আজকাল ত পড়াশুনা করছে। সেই থেকে দুই ভায়ের পড়ার সাধনা চলে। জমিজেরাত যা কিছু ছিল, পরিমলের পড়ার খরচে সমস্তই শেষ হয়ে যায়। এখন ওদের মত দুঃখী ও অসহায় এ তল্লাটে বুঝি কেউ নেই।

প্রেসিডেন্ট মুখখানা ম্লান করিয়া কহিলেন,—নির্ম্মলের কত আকাঙ্ক্ষাই ছিল, কত কথাই সে বলত তখন? উঃ, কি দুর্ভাগ্য!—কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস তাঁহার নাসিকার রন্ধ্র দিয়া সবেগে বাহির হইয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং পরক্ষণে সহসা নিজের মনকে দৃঢ় করিয়া কহিলেন,—অনুচিত হলেও আজ আমি একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না, হয় ত কথাটা তোমার পক্ষে অপ্রীতিকর হবে, কিন্তু সেটা কঠোর সত্য।

দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—সকল দিক্ দিয়ে এই যে তুমি আজ শ্রীবৃদ্ধির শিখরে উঠেছ, এর মূলে কিন্তু এই নির্ম্মল! সে ইতিহাস তুমি জান ?

পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথাগুলি প্রেসিডেন্টের বিষণ্ণ মুখখানার উপর হঠাৎ যেন আঘাতের মতই পড়িল, দেখিতে দেখিতে তাহা অপ্রসন্ন ও কঠিন হইয়া উঠিল। স্বরও একটু রুক্ষ করিয়া তিনি কহিলেন,—এইটুকুই জানি, পণ্ডিত মশাই, আমরা দুজনেই পরস্পরের প্রতি খুব সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলুম। একের দুঃখে অন্যের দরদের অন্ত ছিল না। আমার বেশ মনে আছে, মাইনে পড়ে যাওয়ায় আমার যখন নাম কেটে দেওয়া হয়, আমি একজামিন দিতে পারব না জেনে, নির্ম্মল ভেউ ভেউ করে কেঁদেই ফেলেছিল। সহপাঠীর এই দরদকে, এই সহানুভূতিকে আপনি যদি আমার উন্নতির ভিত্তি বলে ধরে নিতে চান, আমার তাতে আপত্তি নেই।

পণ্ডিত মহাশয় কণ্ঠের স্বরে এবার একটু জোর দিয়াই কহিলেন,—শুধু এইটুকুই নয়, এর চেয়েও অনেক বেশী কিছু আছে, আমি ভিন্ন যে বিষয়বস্তুটির সাক্ষী আর কেউ

নেই। সেই কথাটাই আমি তোমাকে আজ জানিয়ে দিতে চাই, আর এটা তোমার পক্ষে জানাও উচিত।

বিস্ময়ের সহিত প্রচ্ছন্ন-বিদ্রূপের সুরে প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—বলুন, পণ্ডিত মশাই বলুন, শুনতে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে একখানা অতি পুরাতন বাঁধানো খাতা ছিল। খাতাখানির নির্দ্দিষ্ট অংশটি খুলিয়া তিনি প্রেসিডেণ্টের সম্মুখে ধরিলেন।

প্রেসিডেণ্ট কহিলেন,—এ ত দেখছি স্কুল-কমিটীর মিটিংএর একটা রিপোর্ট।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—হ্যাঁ, বছর কুড়ি আগে এই ঘরেই ঐ মিটিংটা বসেছিল। সেদিন যাঁরা যাঁরা মিটিংএ উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাক্ষী দিতে আমি একাই এখনো বিদ্যমান আছি। ওর সঙ্গে যে চিঠিখানা পিন দিয়ে আঁটা আছে, আগে ওটা তোমাকে পড়তে হবে। চিঠিখানা লিখেছিল নির্ম্মলের বাবা, চিঠির ভেতরে ছিল দশ টাকার দুখানা নোট। ঐটে আসবার পরই মিটিং বসে। ক্লাসের রেজিষ্টারী খাতায় আবার তোমার নাম ওঠে, আর তোমার বাবার কাছে চিঠিও যায়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা বাইরের কেউ জানত না, যে জানে, সে কোন দিন বলে নি এবং বলবেও না। নিরুপায় হয়েই আমাকে এটা বলতে হচ্ছে, এ জন্য তুমি আমাকে তোমার শিক্ষক ভেবে মাপ ক'র।

এতক্ষণে প্রেসিডেণ্টের পড়াও শেষ হইয়াছিল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখের কঠিন ভাবটুকুও আশ্চর্য্য রকমেই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মানসপটে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল সেই দিনটির কথা।

কিছুক্ষণ প্রেসেডেণ্টের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় স্তব্ধ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুর দুই প্রান্তে বড় বড় মুক্তার মত দুইটি অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়াছে। বিগলিত কণ্ঠে অতঃপর তিনি কহিলেন,—নির্ম্মল তা হলে তাদের সেই বাড়ীতেই আছে?

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—আর কোথায় যাবে? মাথা রাখবার মত ঐ জায়গাটুকুই এখনো ওদের আছে।

হঠাৎ প্রেসিডেণ্ট টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পরিমলের দরখাস্তখানা তুলিয়া লইলেন। খাতাখানি দিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় সেখানি টেবলের উপরেই রাখিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মহাশয় প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রেসিডেণ্টের দিকে চাহিতেই তিনি সবেগে উঠিয়া হাত দুইখানি জোড় করিয়া অভিবাদনের ভঙ্গীতে কহিলেন,—আমি এখন উঠছি, পণ্ডিত মশাই, একটু কায আছে। আবার দেখা হবে।

কক্ষের বাহিরে কমিটীর সদস্যগণ তখনও সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন সকলেই লক্ষ্য করিলেন, প্রেসিডেণ্টের মুখখানি অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং তাহাতে উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধার দিক্ দিয়া প্রেসিডেণ্টের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তিনি সংক্ষিপ্ত গোটা-দুই কথায় এক সঙ্গে সকলকে বিদায়-অভিবাদন জানাইয়া এমন তৎপরতার সহিত মোটরে উঠিয়া বসিলেন যে, তাঁহাদের মনের কথা মনেই রহিয়া গেল।

নয়

গাড়ী স্কুলের সীমানা ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইতেই প্রেসিডেণ্ট সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—রোখো, রোখো।

গাড়ী থামিবামাত্রই তিনি নিজেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন।

তিনি সোফারকে কহিলেন,—আমি একটু হাঁটবো, গাড়ী নিয়ে তোমরা আস্তে আস্তে পেছনে এসো, কিম্বা এগিয়ে গিয়ে চৌরাস্তায় অপেক্ষা কর।

মনিবকে ফেলিয়া গাড়ী চালাইয়া যাইতে সোফার রাজী হইল না, গাড়ী লইয়া সে পিছু পিছুই চলিল।

কত পূর্ব্বের পরিচিত পথ, কত কাল পরে পুনরায় এই পথে তিনি চলিয়াছেন! কিন্তু পূর্ব্বের ও বর্ত্তমানের চলার মধ্যে কত পার্থক্যই রহিয়াছে!

রাস্তার ধারে ধারে বরাবর কত রকমের কত গাছ। কোনটা বট, কোনটি অশ্বত্থ, কোনটি বা পাকুড়। দারুণ গ্রীষ্মেও ইহারা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের এই সুদীর্ঘ রাস্তাটির উপর কত যত্নেই ছায়া ঢালিয়া দেয়। হেমন্তে শীতে আকাশের শিশির মাথা পাতিয়া লয়। এই সব গাছের তলায় বসিয়া কত কথাই তাঁহাদের সে সময় হইত!

জনবিরল পথটুকু অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃই তিনি

সহরের জনবহুল অংশে আসিয়া পড়িলেন। এ দিক্‌টায় পাশাপাশি দোকানপাট, ডাকঘর, গঞ্জ, বাজার। চলিতে চলিতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কোন্ দোকানটি হইতে নির্ম্মল প্রায় প্রত্যহই চীনাবাদাম ভাজা কিনিত, অতি অন্তরঙ্গ কয়টি ছেলে কি আনন্দেই সেগুলি ভাগাভাগি করিয়া খাইত!

আরও খানিকটা অগ্রসর হইতেই সেই সুপরিচিত চৌরাস্তাটির সংযোগস্থল সম্মুখেই দেখা গেল। সোজা রাস্তাটির দুই পাশ দিয়া দুইটি রাস্তা দুই দিকে গিয়াছে। একটি এই অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু অধিবাসীদের পল্লীর দিকে, অন্যটি কিছু দূর গিয়া গ্রামের পথে মিলিয়াছে।

সহসা ঝঁা করিয়া অতীতের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনটি বন্ধুর নিকট এই স্থানে দাঁড়াইয়াই না তিনি বলিয়াছিলেন—আর দুটি দিন দেখা হবে ভাই, তার পর আর ত আমার ইস্কুলে পড়া হবে না!

পায়ের তলা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাঁহার কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল, যেন অতীতের সেই দিনটিতে তিনি আবার পিছাইয়া গিয়াছেন! এই স্থানটি হইতে বিদায় লইবার সময় সহপাঠীদের অশ্রুময় চক্ষুগুলি তাঁহার চক্ষু দুটির উপর বুঝি আজও ভাসিতেছে! সারা পথ কি দুশ্চিন্তা লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, সারারাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কত কথাই ভাবিয়াছিলেন! কিন্তু তখন কি মনের কোণেও তাঁহার এ ভাবনা স্থান পাইয়াছিল যে, তাঁহারই অন্যতম সহপাঠীও তাঁহারই মত সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভাবিয়াছে, দুই চক্ষুর পাতায় নিদ্রার পদছায়া পড়ে নাই! প্রাতেই পিতার কাছে গিয়া নিজের স্বার্থ বলি দিয়া দুস্থ সহপাঠীর শিক্ষার পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাটা সরাইয়া দিতে আবেদন করিয়াছে, অথচ, এ কথা বাহিরের কাহাকেও জানিতে দেয় নাই, কেহ জানে নাই!—সেই মহাপ্রাণ মানুষটির কি চরম দুর্গতি আজ! আর—তাহারই স্নেহময় ভাইটি, ঐ অন্ধের যে একমাত্র অবলম্বন, সেই বিদ্যালয়ের খালি পদটির প্রার্থী। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও পদগৌরবের দাপটে ঐ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত জানিয়াও নিষ্ঠুরের মত তাহার প্রতি কি অবিচারই করিয়াছেন!

সহসা চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল আরদালীর কথায়। সভয় বিস্ময়ে সে পিছন হইতে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—গাড়ী এসেছে, হুজুর!

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—এইখানে থাকুক, আমি ঐ দিক্‌টায় একটু বেড়িয়ে আসি।

যে দিক্‌টায় বেড়াইবার জন্য তিনি মোড় ফিরিলেন, সেই পথেই নির্ম্মলদের বাড়ী। এই পল্লীর পথঘাট ও ঘরবাড়ী সবই তাঁহার পরিচিত।

দশ

সুবৃহৎ অট্টালিকাটির অধিকাংশই বেহাত হইয়া গিয়াছে। শুধু বাহিরের যে ঘরখানিতে বসিয়া নির্ম্মলের বাবা সকাল-সন্ধ্যায় মক্কেলদের সহিত আইনের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, সেই ঘরখানি এখনও ঠিক সেই ভাবেই বজায় আছে। তাহার সংলগ্ন কয়েকখানি ঘরে এই পরিবারটি কোনওরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকে।

নির্ম্মল বিবাহ করে নাই। পরিমলও বিবাহ করিতে প্রথমে চাহে নাই, কিন্তু দাদার একান্ত আগ্রহে তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। সংসারটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, পোষ্য অনেকগুলি। বিধবা মা আছেন, এখনও দুইটি ভগিনী অবিবাহিতা, এক ভগিনী বিবাহিতা হইয়াও স্বামীর সংসারে স্থান পায় নাই, এইখানেই আছে। ইহা ভিন্ন পরিমলেরও কয়েকটি পুত্র-কন্যা হইয়াছে। আয়ের মধ্যে সামান্য কিছু ধান-জমির উপস্বত্ব এবং ছেলে পড়াইয়া পরিমলের স্বল্প উপার্জ্জন। তথাপি ভাইদুইটির সৌভ্রাতৃত্ব শান্তিটুকু পরিপূর্ণ ভাবেই ধরিয়া রাখিয়াছে।

জটিল অঙ্কের একটা সমাধান লইয়া দুই ভ্রাতায় আলোচনা চলিতেছিল। একখানা আরাম-কেদারায় নির্ম্মল দেহটাকে এলাইয়া দিয়াছিল, পরিমল বসিয়াছিল তাহারই পাশে একখানা হাতলভাঙ্গা চেয়ারে। তাহার পাশেই ছিল একটা টেবল। অদূরে একখানা তক্তপোষ, তাহার উপর একখানা সতরঞ্চি পাতা, মাথার দিকে বিছানাটা গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। এই ঘরেই নির্ম্মল রাত্রিবাস করে এবং ইহাই তাহার শয্যা।

ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি যে বাহিরে দরজাটির পাশে দাঁড়াইয়া দুই ভ্রাতার অঙ্কের আলোচনা শুনিতেছিল, নির্ম্মলের ত তাহা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু পরিমলও

জানিতে পারে নাই। এখন কি, আগন্তুক পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেও পরিমলের হুঁস হয় নাই, দ্বারের দিকে পিছন করিয়া এমনই তন্ময় হইয়াই সে আলোচনায় যোগ দিয়েছিল।

কিন্তু নির্ম্মল বোধ হয় অন্যমনস্কই ছিলেন। সহসা সচকিতভাবে সোজা হইয়া বসিয়া একটু অস্বাভাবিক সুরেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—কে—কে এল?

পরিমলও তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই দেখিল—এক সৌম্যমূর্ত্তি অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরের ভিতর ঢুকিয়া অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাঁহার দাদার দিকে চাহিয়া আছেন।

তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারখানা ছাড়িয়া পরিমল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অভ্যাগতকে কহিল,—বসুন।

আগন্তুক আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—নির্ম্মল, আমি এসেছি তোমাকে দেখতে।

নির্ম্মলের বদ্ধচক্ষু কি তখন খুলিয়া গিয়াছিল, কিম্বা দৃষ্টিহীনের অনুভবশক্তি এমনই তীক্ষ্ণ হয়? উচ্ছ্বসিতস্বরে নির্ম্মল কহিলেন,—কে! আকবর? ঠিক ধরেছি, না ভুল করেছি, বল, বল?

আকবর আলি কহিলেন,—না, তুমি ঠিক ধরেছ। কিন্তু একি দেখছি, ভাই?

নির্ম্মল গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—আমার মনে হচ্ছে, ইস্কুল থেকে ফেরবার পথেই আমাদের যেন কথা হচ্ছে। তোমার গলার স্বর ঠিক আছে, একটুও বদলায় নি। মনে হচ্ছে, আমরা আবার পেছিয়ে গেছি।

আকবর আলি কহিলেন,—সারা পথটা এই কথা কতবারই যে ভেবেছি, কি বলব! কিন্তু তোমাকে দেখে আমার যে কথা বেরুচ্ছে না, নির্ম্মল!

নির্ম্মল কহিলেন,—মনে হচ্ছে তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ; পরিমল চেয়ার ছেড়ে দিলেও বসনি। ব'স ভাই, তুমি আসাতে কি আনন্দ যে পেয়েছি মুখে কি বলব?

পরিমলও পুনরায় অনুরোধ জানাইল,—বসুন আপনি, নতুবা দাদা ব্যথা পাবেন।

চেয়ারখানা টানিয়া নির্ম্মলের কেদারাখানার আরও কাছে লইয়া আকবর আলি তাহাতে বসিলেন। ক্ষণকাল কাহারও মুখে কথা নাই। সহসা আকবর আলি প্রশ্ন করিলেন,—আমি যে ইস্কুলের মিটিংএ আজ এসেছি, সে কথা শুনেছিলে?

নির্ম্মল উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ। ভেবেছিলুম, পরিমল যাবে; কিন্তু ও গেল না। তবে আজ সকাল থেকে মনটা যে কি রকম লুটপাট করছিল, সে কথা বলে বোঝাতে পারব না। এমন একটা ঘণ্টা যায় নি—তোমার কথা না ভেবেছি। আর - সারা ইস্কুল, খেলার মাঠ, ডোবা, পুকুর, বাগান, সেই চৌরাস্তা—মনটা বুঝি চষে ফেলেছে।

—খুব রাগ হচ্ছিল, নয়?

—এ অবস্থায় রাগ কি আসে, ভাই? তারও ত একটা বিবেচনা আছে।

—তবে বুঝি দুঃখ হচ্ছিল?

—বুঝতে পারো নি? আমি যে সুখ-দুঃখের বাইরে।

—তবে?

এবার উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে নির্ম্মল উত্তর দিলেন,—যে ইচ্ছা হয়েছিল ভাই, ইচ্ছাময় ঠিক তাই পূর্ণ করেছেন। তোর হাতখানা দে, আরো একটু কাছে এগিয়ে আয়—দেখি।

আস্তে আস্তে চেয়ারের ভাঙ্গা হাতলটির পাশ দিয়া নিজের হাতখানি নির্ম্মলের দুইটি ব্যগ্র হাতের মধ্যে সমর্পণ করিবামাত্রই, সজোরে একটা চাপ দিয়া উল্লাসের সুরে নির্ম্মল কহিলেন,—আঃ! মনে আছে আকবর, এমনি হাত-ধরাধরি করে পথ চলা, খেলা-ধূলা, কি আনন্দেই সে দিন কেটেছে! মনে পড়ছে?

একটা নিশ্বাস সজোরে ত্যাগ করিয়া আকবর আলি কহিলেন,—তুমি নামে নির্ম্মল, মনটিও তোমার নির্ম্মল, তাই সে সব মনে পড়তেই তুমি পাচ্ছ শুধু আনন্দ। কিন্তু তোমার স্পর্শে আজ আমার দুখানা হাত যে জ্বলে যাচ্ছে, নির্ম্মল! সত্যই জ্বলে যাচ্ছে।

—কেন ভাই, কেন? এ কথা বলছ কেন?

—কেন? এই হাত দিয়ে কত বড় অপকর্ম্ম করেছি, সে কথা শোন নি? জান না? যদি তার কৈফিয়ৎ চাইতে, যদি আমাকে তিরস্কার করতে, আসবামাত্রই গোটাকতক গালাগালও দিতে, তা হ'লে হয় ত কতকটা শান্তি আমি পেতুম।

আকবরের হাতখানি আরও জোরে চাপিয়া নির্ম্মল কহিলেন,—আঃ, কি বলছ, আকবর! এ সব কথা কেন? কত কাল পরে দুই সহপাঠীর দেখা, এখন এর ভেতরে

স্বার্থ-সুবিধে নিয়ে কোন কথা নেই, শুধু মনের কথা, প্রাণের কথা; আর সব ভুলে যাও।

গাঢ়স্বরে আকবর কহিলেন,—কিন্তু আমি মানুষ, ভুলতে পারি না: তুমি এত কাল যে-কথা লুকিয়ে রেখেছিলে, আজ প্রথম তা শুনিছি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে। শুধু শোনা নয়, তোমার বাবার চিঠিখানাও দেখেছি।

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে নির্ম্মল বলিলেন—কি বলছ, আকবর! ছি! আবার ঐ কথা! আমাকে শান্তি দেবে না?

আকবর আলি কহিলেন,—কিন্তু শান্তিটা ত শুধু তোমারই একচেটে নয়, ওর ওপর আমারও দাবী আছে। এত দিন অন্ধকারেই ছিলুম। এত বড় একটা রহস্যের তোষাখানা যে এখানে লুকানো আছে, তা জানতুম না। যদি এখনো আমাকে যথার্থই বন্ধু বলে মনে কর, নির্ম্মল, তা হ'লে পরিমলের ওপর যে অবিচার আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, এই তোমার বন্ধুর অনুরোধ।

স্নিগ্ধকণ্ঠে নির্ম্মল প্রশ্ন করিলেন,—কি করতে চাও?

আকবর আলি উত্তর দিলেন,—ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের যা কর্ত্তব্য, এর বেশী নয়। পরিমলের দরখাস্ত বাতিল করে যে ভুল আমি করেছিলুম, এইখানে বসেই আমি সেটা সংশোধন করতে চাই।

নির্ম্মল শান্ত কণ্ঠে কহিলেন,—কিন্তু এর জন্য আমার কোনো অনুরোধ নেই।

মৃদুস্বরে নির্ম্মলকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে আকবর আলি তাঁহার হাত দুইখানির ভিতর হইতে নিজের হাতখানি আস্তে আস্তে ছাড়াইয়া লইয়া পকেটে পুরিলেন।

পরিমলের দরখাস্তখানা পকেটের ভিতরেই ছিল। বুকের পকেট হইতে পার্কারের পেনটি খুলিয়া চড় চড় করিয়া তাহার উপরে কয়েক ছত্র লিখিয়া কহিলেন,—এখুনি আমাকে ইস্কুলে ফিরে যেতে হবে।

নির্ম্মল কহিলেন,—তা হবে না, যখন সহপাঠীর বাড়ীতে মনে করে এসেছ, মিষ্টিমুখ না করে যেতে পাবে না।

আকবর আলি কহিলেন,—মিষ্টিমুখ খুব চুটিয়েই করেছি ইস্কুলে, তাহলেও তোমার উপরোধে ঢেঁকি গিলতেও আমার আপত্তি নেই। হ্যাঁ, আর একটা কথা, আপাততঃ পরিমল ঐ পোষ্টেই কায করুক, কিন্তু ওর প্রতিভা পঁয়ষট্টি টাকায় বাঁধা থাকে সেটা আমার ইচ্ছা নয়।

পরিমল একটু বিস্ময়ের সুরেই কহিল,—ও পোষ্টের মাইনে কিন্তু পঞ্চাশ, পঁয়ষট্টি নয়।

আকবর আলি কহিলেন,—হ্যাঁ, কাগজে-কলমে পঞ্চাশ থাকলেও, ভাতা বলে আরো পনেরো টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। সেটা আলাদা দেওয়া হবে।

'কিন্তু' বলিয়া পরিমল প্রতিবাদের সুরে আরও কি বলিবার উপক্রম করিতেই আকবর আলি বাধা দিয়া কহিলেন,—আমি তোমার দাদার সহপাঠী, পরিমল, তোমারও দাদা। দাদার ওপর ছোট ভাইয়ের কথা কওয়া ঠিক নয়। নির্ম্মল, তুমি কি বল?

নির্ম্মল কহিলেন,—আমার সেই কথা, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না এবং তোমাদের কাউকেই এ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করিব না।

আকবর আলি কহিলেন,—ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি হবে, এমন কোন সরকারী পোষ্টে আমি পরিমলকে ঢোকাতে চাই, নির্ম্মল।

নির্ম্মলের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। মুখখানি তুলিয়া তিনি কহিলেন,—এমন অনেক সুযোগই পরিমলের অদৃষ্টে এসেছিল ভাই, কিন্তু ওর এই অন্ধ দাদাটির মুখ চেয়ে বাইরের সমস্ত প্রলোভনই ও ত্যাগ করেছে। এই গ্রাম আর বাড়ী ছেড়ে ও কোথাও যাবে না, আমার কাছ-থেকেও প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে—এ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ ওকে করতে পাব না।

আকবর আলি পরিমলের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, —সামান্য এই স্কুল-মাষ্টারী করেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেবে, পরিমল?

পরিমল একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—যে স্কুলের সংস্রবেই এত বড় সদ্ভাবটা আপনাদের ভেতর নিবিড় হয়ে উঠেছিল, সেই স্কুলের সংস্রবে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া কি অনুচিত, স্যার?

আকবর আলি প্রশংসার ভঙ্গীতে পরিমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কথাটা আমি প্রত্যাহার করছি, পরিমল। স্কুলটিকেই অবলম্বন করে দুই সহপাঠীর সদ্ভাবের এই স্মৃতিটুকু তুমিই জাগিয়ে রাখো।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের লীলাসংবরণ

গুডফ্রাইডের পূর্ব্বদিনে ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন, রাজেন্দ্র দত্তও আসিলেন। ঠাকুরের শরীর উত্তরোত্তর অতিশয় মন্দের দিকে যাইতেছে। ডাক্তার সরকার ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি বাগানে বড় খরচ হ'চ্ছে বলছেন? তা তারা ত সব প্রস্তুত। কিন্তু এখন দেখুন তা হ'লে কাঞ্চনও চাই! আবার কামিনীও চাই।" শ্রীমা বাগানে ঠাকুরের সেবা করিতেছেন, তাই ডাক্তার বলিতে-ছেন—কামিনীও চাই। ঠাকুর আস্তে আস্তে উত্তর করিলেন যে, "উভয়ই বড় জঞ্জাল।" তাহাতে ডাক্তার বলিলেন, "জঞ্জাল না থাকলে সবাই পরমহংস হ'ত।" ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, "স্ত্রীলোক নিয়ে মায়ার সংসার করলে মানুষ ঈশ্বর ভুলে যায়। কিন্তু তিনি জগতের মা—স্ত্রীলোক হয়ে আছেন, ওটি জানলে বিদ্যার সংসার হয়। তাতে অনিষ্ট হয় না, কিন্তু ঈশ্বর দর্শন না হ'লে ও অবস্থা হয় না।"

ভবনাথ বিবাহিত, কাযকর্ম্মের চেষ্টায় আছেন, তাই বেশী আসিতে পারেন না। তিনি আসিলে পর ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলেন, ভবনাথকে সাহস দিতে। এদিন হীরানন্দ নামক একজন সিন্ধুদেশবাসী ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। ইনি কলিকাতায় কেশব বাবুদের পরিবার-বর্গের সঙ্গে পঠদ্দশায় বাস করিয়াছিলেন এবং সেই সময় ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে দর্শন করিতেন। এতদিন তিনি দেশে ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গ্রাজুয়েট (বি, এ) হইয়া সিন্ধুদেশে গিয়া দুইখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হন—একখানি 'Sind Times' আর একখানি 'Sind Sudhar'। পরজীবনে হীরানন্দ সাধুর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন, ও অনেক লোককল্যাণকর প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তৎজন্য সিন্ধুদেশের লোকে এখনও তাঁহাকে সাধু হীরানন্দ বলেন। তিনি হায়দ্রাবাদে একটি স্কুল স্থাপন করিয়া বিদ্যার্থীদিগের বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছা, হীরানন্দের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা কিরূপ তাহা জানেন; তাই তিনি মাষ্টারকে হীরানন্দের সঙ্গে তাহার সম্মুখে আলাপ করিতে বলিলেন। মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন, সেজন্য নরেন্দ্রকে ডাকান হইল। তিনি আলাপ করিতে লাগিলেন। হীরানন্দ ঠাকুরের এই দারুণ ব্যাধি ও তজ্জন্য তাঁহার দেহের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, ভক্তের

সাধু হীরানন্দ

দুঃখ কেন হয়?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, "The scheme of the world is devilish! I could have created a better world! (জগতের কাণ্ড দেখে মনে হয় বুঝি ইহা সয়তানের সৃষ্টি। আমি অন্ততঃ এর চেয়ে ভাল সৃষ্টি করিতে পারিতাম।) হীরানন্দ বলিলেন, "দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোধ হয়?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, "I am giving no scheme of the Universe but my opinion of the present scheme. (জগতের সৃষ্টির নূতন মতলব সম্বন্ধে বলছি না, বর্ত্তমান সৃষ্টির

সম্বন্ধে আমার মত মাত্র প্রকাশ ক'রছি।) তবে সবই ঈশ্বর, এ বিশ্বাস হলে চুকে যায়।" হীরানন্দ তাহাতে জবাব করিলেন, "ও কথা বলা সোজা।" নরেন্দ্র তখন 'নির্ব্বাণ-ষটক' স্বর করিয়া আবৃত্তি করিলেন—"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তানি নাহং, ন কর্ণো ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্। ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্" ইত্যাদি। হীরানন্দ তাহা শুনিয়া বলিলেন, "এক কোণ থেকে ঘর দেখাও যা, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘর দেখাও তা। হে ঈশ্বর! আমি তোমার দাস—তাতেও ঈশ্বরানুভব হয় আর সেই আমি সোহহং—তাতেও ঈশ্বরানুভব হয়। একটি দ্বার দিয়ে ঘরে যাওয়া যায়, আর নানা দ্বার দিয়েও ঘরে যাওয়া যায়।" হীরানন্দ নরেন্দ্রকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্র আবার স্বর করিয়া 'কৌপীন-পঞ্চক' আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"বেদান্তবাক্যেষু সদা-রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ। অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" ইত্যাদি। তারপর ঠাকুরের আদেশে নরেন্দ্র গাহিলেন, "তুঝসে হামনে দিলকে লাগায়া, যো কুছ হ্যায় সব তুঁহি হ্যায়।" হীরানন্দ এই গান শুনিয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "দেখ্‌ছেন, সব তুঁহি হ্যায়। এখন তুঁহু তুঁহু। আমি নয়, তুমি।" নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "Give me one and I will give you million." ঠাকুর এই তেজস্বী বৈরাগ্যবান্ শক্তিধর নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া হীরানন্দকে বলিলেন, 'যেন খাপখোলা তলোয়ার নিয়ে বেড়াচ্ছে।" আর হীরানন্দকে দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিলেন—"কি শান্ত! রোজার কাছে জাত-সাপের মত ফণা ধরে চুপ ক'রে আছে!"

ঠাকুর অন্তর্মুখ। ঠাকুরের বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে। মহাবায়ু উপরে উঠিলে ঈশ্বরে অনুভূতি হয়। ঠাকুর তাই মাষ্টারকে বলিলেন—"বায়ু কখন্ উঠেছে জানি না। কি দেখছি জান—দেখছি—দেহটা যেন শাঁস-বীচি ফেলা কুমড়ো—ভিতর সর্ব্ব আসক্তিশূন্য, পরিষ্কার। অন্তরে বাহিরে দুইয়েই দেখছি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! এখন দেখছি একটা চামড়া-ঢাকা অখণ্ড। তারি অঙ্গের একপাশে গলার ঘা-টা পড়ে রয়েছে।" ঠাকুর সদানন্দ! কি আশ্চর্য্য, এত অসুখের কষ্টেও মাঝে মাঝে বলিতেন, "দেহ জানে আর রোগ জানে! মন তুমি আনন্দে থাক।"

পরদিন Good Friday। হীরানন্দ পূর্ব্বদিন হইতে রহিয়াছেন। পরদিনও বাগানে প্রসাদ পাইলেন। তিনি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছিলেন। ঠাকুর প্রায়ই দিগম্বর হইয়া থাকেন, হীরানন্দ তাই তাঁহার পরিধান জন্য তাঁহাদের দেশের ঢিলা পাজামা পাঠাইবেন বলিয়াছেন। হীরানন্দ বাগান ত্যাগ করিবেন, সেইজন্য ঠাকুর তাঁহাকে পরীক্ষার্থ বলিলেন, "নাই বা গেলে সে দেশে।" হীরানন্দ উত্তর দিলেন, "না গেলে হবে কেমন ক'রে? আর যে কেউ নেই সেখানে। চাকরি করি।" হীরানন্দ চলিয়া গেলেন। কলিকাতা হইতে হায়দ্রাবাদ রেলপথে প্রায় ১৬ শত মাইল। হীরানন্দের ঠাকুরের প্রতি এমনই আকর্ষণ যে, এই দূরদেশ হইতে তিনি অসুস্থ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন!

কেদার চাটুর্য্যে আসিয়াছিলেন। তিনি এতদিন ঢাকায় ছিলেন। ঠাকুরের অসুখ-সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছেন। নৃত্যগোপাল আসিয়া ঠাকুরের পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিলেন। সুরেন্দ্র বাগানের ভাড়া ও অন্যান্য খরচও দেন, সেইজন্য মাঝে মাঝে খরচপত্র সম্বন্ধে কিছু তর্ক-বিতর্ক করেন। এই জন্য ছোকরা ভক্তরা সুরেন্দ্রের কাছ হইতে যাহাতে টাকা না লইতে হয়, সেই জন্য বাহির হইতে টাকা তুলিবার চেষ্টায় গিয়াছিলেন শুনিয়া সুরেন্দ্রের মনে অভিমান হইয়াছে। তিনি ভক্তদের পশ্চাতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর কেদারকে তাই ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলেন, যেন তিনি একটু সুরেন্দ্রকে বুঝাইয়া বলেন যে, অন্য ভক্তরা ছেলেমানুষ, ভালমন্দ অত বুঝে না। ব্যাপারটি এইরূপ ঘটিয়াছিল—বাগানের খরচের হিসাব রাখিতেন বুড়ো গোপাল। গত মাসের হিসাবের ঠিকে ভুল ছিল, তাই খরচের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া গিয়াছিল। এ ন্য কালীপদ ঘোষ বুড়ো গোপালকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাহা লইয়া গৃহী ভক্তদের সঙ্গে ছোকরা ভক্তদের কথা-কাটাকাটি হইয়াছে। ঠাকুর কেদারকে তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

ঠাকুর কিন্তু যখনই এই বিবাদের কথা শুনিয়াছিলেন, তখনই নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, সম্ভব হইলে আর গৃহীদের টাকা যেন না লওয়া হয়। নরেন্দ্র তাঁহাকে যেখানে রাখিবেন ঠাকুর সেইখানেই যাইবেন,—তেমনই থাকিবেন, এ কথাও বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র

বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আপনাকে আমি মাথায় করিয়া রাখিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া খাওয়াইব।" ঠাকুর গিরিশের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আপনার সেবার জন্য ভিটে বেচিয়া আমি সব ব্যয় নির্ব্বাহ করিব।" অতঃপর আর সুরেন্দ্র, কালীপদ, রাম প্রভৃতির সাহায্য লওয়া হইবে না স্থির হইল এবং নিরঞ্জন আবার পাগড়ি বাঁধিয়া দারবান-বেশে ফটকে বসিলেন। উদ্দেশ্য—রাম,সুরেন্দ্র, কালীপদ প্রভৃতি গৃহীদের আর বাগানে ঢুকিতেই দেওয়া হইবে না। বাগানে প্রবেশ করিতে গিয়া অতুল ফিরিলেন, সুরেন্দ্র ফিরিলেন, রাম ফিরিলেন, আরও কেহ কেহ ফিরিলেন, এমনই তিন দিন চলিল। যাঁহারা দর্শন করিতে পাইতেছিলেন না, তাঁহারা বিষাদমগ্ন হইয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন—"প্রভু, আমাদের লঘু অপরাধে এ কি বাধা সৃষ্টি করলেন!" ভক্তদের কাতর ডাক শুনিয়া ঠাকুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শেষে রামকে ডাকিয়া ভক্তবৎসল ঠাকুর সব বুঝাইয়া মিটমাট করাইয়া দিলেন। কিন্তু এই যে সংসারী ও কুমার ভক্তগণের মধ্যে একটু বিবাদের মেঘ দেখা দিল, ইহা হইতে ভবিষ্যতে ত্যাগী ও সংসারী দুই শ্রেণীতে ভক্তগণ যে বিভক্ত হইবেন, তাহার এইখানেই সূচনা হইল। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। তিনিই ত্যাগী ও সংসারী দুই থাক আলাদা করিয়া দিলেন।

ঠাকুর যখন কাশীপুরে, তখন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নক্সা-লেখক অমৃতলাল বসু একদিন ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেদিন ঠাকুর কিছুই খাইতে পারেন নাই, তাই সমস্ত ভাত তরকারী ঢাকিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন। অমৃত বসু সঙ্গী লইয়া যখন পৌঁছিলেন তখন বেলা প্রায় ১টা। ঠাকুর যেন তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দর্শন ও প্রণামান্তে তাঁহাদিগের খাওয়া হয় নাই জানিয়া অতি যত্ন সহকারে নিজের প্রসাদী আহার্য্য তাঁহাদিগকে খাইতে দিলেন। অমৃত বসু বলিতেন, "জীবনে অমৃতের আস্বাদ সেই একদিনই পাইয়াছিলাম। এমন পরমান্ন আর জীবনে কখনও আস্বাদ করি নাই।"

দুর্গাচরণ নাগ এই সময়ও ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইতেন। একদিন ঠাকুরের আমলকী খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল সেই কথা তিনি কোন ভক্তকে বলিতেছিলেন। সে সময় বাজারে আমলকী পাওয়া যাইতেছিল না—অসময় বলিয়া। দুর্গাচরণ তাহা শুনিয়া দুই তিন ধরিয়া নানা বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে কতিপয় আমলকী ফল লইয়া ঠাকুরের নিকট হাজির করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে ঠাকুর তাঁহার ভালবাসা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্র যখন ছিলেন, তখন একদিন ঠাকুর তাঁহাতে শক্তি সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছিলেন। যে ঐশী শক্তির বলে ঠাকুর সরল ও শুদ্ধান্তঃকরণ অধিকারী পাইলে স্পর্শমাত্র তাহার ভিতর অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতা সঞ্চারিত করিতে পারিতেন, ইহা সেই জাতীয় শক্তি। ইহা
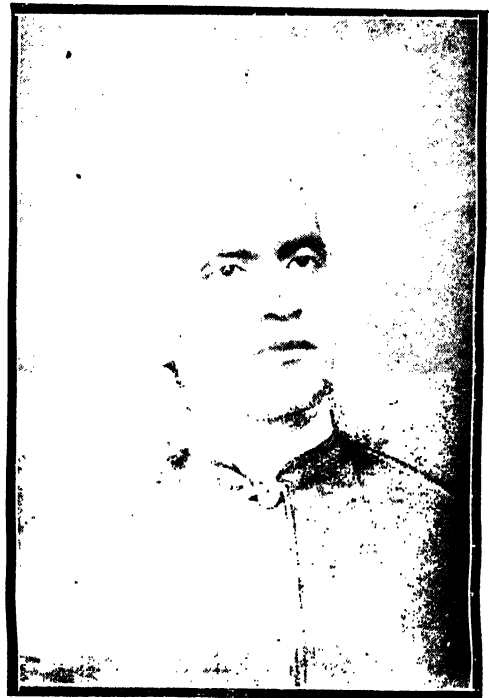
অমৃতলাল বসু

সিদ্ধাই নহে। সিদ্ধাইএ দেহ-বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় আর এই শক্তি হইলে বা থাকিলে অধিকারীর দেহ-বুদ্ধি কমিতে থাকে। উচ্চ অধিকারী জানিয়া নরেন্দ্রকেই তখন তিনি এই শক্তি পাইবার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই শক্তির কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইবে তাই তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে তৈয়ার করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিজে অষ্ট-সিদ্ধির অধিকারী হইলেও কোন সিদ্ধিরই ব্যবহার করেন

না, তাই নরেন্দ্রের ভিতর দিয়া তাহাদের কার্য্য করাইবেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, অষ্টসিদ্ধি থাকিলে কি ভগবান্ লাভ হয়? ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, 'হে অর্জ্জুন, যদি অষ্টসিদ্ধির একটিও সিদ্ধি তোমাতে থাকে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে পাইবে না।' তাহা শুনিয়া নরেন্দ্র বলেন, "মহাশয়, যাহাতে ভগবান্ লাভ হয় না, এমন কোন ঐশ্বর্য্যই আমার প্রয়োজন নাই। ঐরূপ ঐশ্বর্য্য আপনাতেই থাকুক।"

চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল হইতেছিল না দেখিয়া শ্রীমা তারকেশ্বরে হত্যা দিবার মানস করিলেন এবং সেখানে গিয়া হত্যা দিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় রাত্রে তাঁহার কর্ণে এক ভীষণ হাঁড়িকুড়ি ভাঙ্গা শব্দ প্রবেশ করাতে তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইল। সেই সময়ে তাঁহার মনে এই কথা উদয় হইল যে, পৃথিবীর সবই কালের অধীন, সবই ভঙ্গুর, সবই স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, তাহার স্থায়িত্বের বৃথা চেষ্টা করিয়া কি হইবে। ভগবানের যা ইচ্ছা আছে, তাহাই হউক। আর তিনি তারকেশ্বরে থাকিলেন না, চলিয়া আসিলেন। ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "যা হবে তা আমি আগে থেকেই জানতুম।"

বুড়ো গোপালের এই সময়ে ইচ্ছা হইল যে, তিনি কিছু সাধুসেবা করাইবেন ও তাহাদের প্রত্যেককে এক এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা ও এক একখানি গেরুয়া বস্ত্র দান করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা সহরে খুঁজিতে লাগিলেন কোথায় সাধু পাওয়া যায়। তাঁহার ভাব দেখিয়া ও শুনিয়া ঠাকুর কাহাকে কাহাকে বলিলেন, "এ কি হীনবুদ্ধি! নরেন্দ্রাদি এক একজন ভক্তকে খাওয়াইলে একশ' সাধুসেবার সমান ফল হয়—তা নয় তাদের ছেড়ে কোথায় অন্য সাধু খুঁজে বেড়াচ্ছে!" গোপাল তাহা শুনিয়া শেষে নরেন্দ্রাদি ঠাকুরের ভক্তগণকে সেবা করানই স্থির করিলেন এবং যে কাপড়-গুলি ছোপাইয়াছিলেন, তাহা ও মালাগুলি সমস্ত ঠাকুরের কাছে রাখিয়া দিলেন—ঠাকুরের যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে দিবেন। ঠাকুর মন বুঝিয়া সেইগুলি কুমার ভক্তগণের মধ্যে বণ্টন করাইলেন, কেবল একখানি কাপড় বাড়তি হইল। সেখানি পরদিন গিরিশ ঘোষকে দেওয়াইলেন। ঠাকুরের হস্ত হইতে যাঁহারা গেরুয়া পাইলেন, সেই সেই কুমার বৈরাগ্যবান ভক্তগণ পরে মনে করিতে লাগিলেন যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ঠাকুর তাঁহাদিগকে এইভাবেই ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং ফলে তাঁহাদের সকলেই উত্তর-কালে যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের শরীরের অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়—সমস্ত দিনে সামান্য দুগ্ধপানমাত্র করিয়া থাকিতে হইত। তাও এমন অবস্থা যে, এক পোয়া দুগ্ধ পান করিতে চেষ্টা করিলে এক ছটাক মাত্র খাইতে পারিতেন, বাকি সমস্ত ক্ষতের ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যাইত। রাজেন্দ্র দত্তর ঔষধে কিছুই হইল না। তখন বৃদ্ধ কবিরাজ নবগোপালকে দেখান হইতে লাগিল। তাহাতেও কিছু হইল না। শেষে মেডিকেল কলেজের তৎকালীন প্রধান ডাক্তার Coates (কোটস্)কে দেখান হইল। তিনি বলিলেন, রোগ চিকিৎসা-তীত অবস্থায় আসিয়াছে। আর কোন চেষ্টাতেই ফললাভ হইবে না। এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করিলেন এবং বুঝিলেন, তাঁহাদের অনাথ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

ঠাকুরের একদিন সাধ হইল যে, তিনি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। তাই ভক্তগণকে একদিন ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে বলিলেন। শুনিয়া নরেন্দ্রাদি খুব উৎসাহ বোধ করিলেন এবং প্রথমেই শ্রীমার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তিনি ষোল আনা দিলেন। তারপর বাহিরে ভিক্ষা করা হইতে লাগিল এবং ভিক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া যাহা কিছু চাউল, ফল, রূপার বা তামার মুদ্রাখণ্ডাদি প্রাপ্তি হইয়াছিল, সমস্ত আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখা হইল। ঠাকুর ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই তণ্ডুলের অন্ন রন্ধন করিয়া তাহা মণ্ড করিয়া দিলে তিনি কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন যে, এই শুদ্ধ অন্ন গ্রহণে তাঁহার প্রাণ শীতল হইয়াছে। এইরূপে ঠাকুর তাঁহার ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে ভিক্ষা করিতে শিখাইয়া গেলেন।

নরেন্দ্রের মন হইতে এখনও ঠাকুর সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়া যায় নাই। তিনি তখনও ঠিক করিতে পারিতেছেন না, ঠাকুর সাক্ষাৎ দেহধারী ভগবান্ না একজন সাধনসিদ্ধ পুরুষ। শীঘ্রই নরেন্দ্রের এই সন্দেহ ঠাকুর ঘুচাইয়া দিলেন। একদিন ঠাকুর রোগের অতিশয় বৃদ্ধিবশতঃ নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যায় শুইয়া আছেন, কথা কহিতে অতিশয় কষ্ট বোধ করিতেছেন। স্বর প্রায়ই নাই। নরেন্দ্র

ঠাকুরের ঘরে রহিয়াছেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ঠাকুর ত বলেন যে তিনি অন্তর্য্যামী। তাহাই যদি হয় তবে তিনি সেই সময়ে তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া লইয়া তাঁহার সন্দেহ অপনোদন করুন। কি আশ্চর্য্য! নরেন্দ্র যেমন এই কথা ভাবিলেন, অমনই শ্রীঠাকুর চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া নরেন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন, "যিনি জানকীবল্লভ রাম এবং যিনি অর্জ্জুনসখা কৃষ্ণ, তিনিই এইবার এই দেহে রামকৃষ্ণ হয়েছেন; এই কথা বেদান্তের দিক্ দিয়া বিচার করিও না।" এই কথা বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কৃপাময় গুরুদেবের এই ঘোষণা নরেন্দ্রের শেষ সন্দেহ ফুৎকারে উড়াইয়া দিল—তিনি গতসন্দেহ হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহার সম্মুখে রোগী ও পীড়িত হইয়া শ্রীভগবান্ই দেহের ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। জগতের তারণকার্য্যে বহুজনের পাপ নিজ শরীরে গ্রহণ করিয়া অন্যের পাপের শাস্তি নিজ দেহে ভোগ করিতেছেন—ইহারই নাম Vicarious atonement। এই কথাগুলি নরেন্দ্রের মনে এমন দাগ দিয়াছিল যে, শেষে তিনি নিজে এই কথাগুলি অবলম্বনে দুটি শ্লোক রচনা করিয়া লোকসমাজে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহা এই—

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষঃ রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

ঠাকুর এই সময় কিছুদিন শ্রীরামের সাধনা করিতে নরেন্দ্রনাথকে উপদেশ দেন। নরেন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি রামধ্যান করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহ শ্রীরামকীর্ত্তন করিতেন। একদিন বৈকালে তাঁহারা তুলসীদাসের বিখ্যাত গান গাহিতে লাগিলেন—'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই।' গান শুনিয়া প্রভু আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। অথচ মুখে মৌখিক বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখছো ওদের কাণ্ড, আমি এদিকে প্রাণে মরি, ওদিকে ওরা আনন্দে মাতোয়ারা।' তাহা শুনিয়া অতুল বলিলেন, 'তবে যাই, গান করিতে বারণ করিয়া আসি।' তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, 'না থাক, যতক্ষণ দুধ আছে, শালারা দুয়ে নিক; একসঙ্গে গান গাচ্ছে, এখন বারণ ক'রে রসভঙ্গ ক'রে কায নাই।' কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্র উপরে আসিলে ঠাকুর বলিলেন, "তোমরা গান গাচ্ছিলে কিন্তু ওর আরও দু লাইন আছে।" এই বলিয়া ছাড়া দুই লাইন বলিয়া দিলেন। এইরূপ রামাৎ সাধন করিতে করিতে একদিন নরেন্দ্রের হনুমানের ভাব উদয় হইল। হাতে লাঠি লইয়া সে লাঠি কাঁধে ফেলিয়া তিনি উচ্চশব্দে 'রাম' 'রাম' উচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের ঘরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—পাছে প্রভু রামকে কেহ হরণ করিয়া লইয়া যায়, তাই যেন প্রহরীর ন্যায় প্রভুর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পাহারার কার্য্য করিতেছেন—এই ভাব। ক্রমে নরেন্দ্রের ভাব আপনা-আপনি মন্দীভূত হইয়া শেষে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দেহ আর থাকে না, তাই ঠাকুর এইবার দেহরক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভক্তসঙ্গে লীলারসময়ের বাহ্য লীলা এইবার সাঙ্গ হইবার পালা—সে সময়ও অতি নিকটে আসিয়া পড়িল। লীলাসংবরণের ৭।৮ দিন পূর্ব্বে একদিন ঠাকুর যোগীনকে পাঁজী দেখিতে বলিলেন। তিনি শ্রাবণের শেষ কয় দিন পর পর পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ৩১শে শ্রাবণ ১২৯৩ পর্য্যন্ত বার, তিথি, নক্ষত্র—ঠাকুর সমস্ত শুনিলেন। ১লা ভাদ্র আরম্ভ করা মাত্র বলিলেন, "থাক্"। ইতিমধ্যে ঠাকুর এক দিন নরেন্দ্রাদি ভক্তদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা যদি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হও, তবে সন্ন্যাস ধর্ম্মের ফলে যার-তার খাইলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। আর সমস্ত ছোকরা ভক্তদের ভার আমি তোমার উপর দিয়া দিলাম।"

৩১ শ্রাবণ, ১২৯৩; ১৫ আগষ্ট, ১৮৮৬, রবিবার, শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন শ্রীঠাকুরের শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার শেষ দিন। প্রভাত হইতে প্রভুর নাড়ীর অবস্থা খারাপ হইয়াছিল। অতুলের খুব নাড়ীজ্ঞান ছিল, তিনি ভক্তদিগকে এই অশুভ সংবাদ জানাইলেন। ঠাকুরের শরীরে জ্বালা হইল—বোধ হইতে লাগিল, প্রত্যেক শিরার মধ্য দিয়া যেন কেহ গরম

জলের পিচকারী দিতেছে। খুব ক্ষুধা বোধ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "হাঁড়া হাঁড়ী ডাল-ভাত খাইতে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে।" সন্ধ্যায় নবীন পাল আসিলেন, তিনি আসিয়া নাড়ী পাইলেন না। সন্ধ্যার সময় নিশ্বাসে টান হইল—ঠাকুর নিজেই বলিলেন, "তাঁহার নাভিশ্বাস হইয়াছে।" সন্ধ্যার পর তাঁহাকে সুজী খাওয়াইতে চেষ্টা হইল; কিন্তু তিনি কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না—মুখ বাহিয়া সব নীচে পড়িয়া গেল। সামান্য কিছু ভিতরে গেল কি না গেল। মুখ ধোয়াইয়া দিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। পা সোজা করিবেন সে শক্তি নাই, শশী পা বালিশের

নরেন্দ্র তাঁহাকে শয়ন করিয়া একটু নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ণ ও সহজ স্বরে ঠাকুর তিন বার কালী নাম উচ্চারণ করিয়া আস্তে আস্তে শয্যায় শয়ন করিলেন। নরেন্দ্র পদসেবা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরকে সুস্থির দেখিয়া কিছু পরে নরেন্দ্র নীচে বিশ্রাম করিতে গেলেন। ইতিমধ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে প্রভুর শরীর কণ্টকিত হইল—দৃষ্টি নাসাগ্রে স্থাপিত—মুখে হাসি—এই ভাবে ঠাকুর রাত্রি ১টা ২ মিনিটের সময় মহাসমাধিস্থ হইলেন। ভারতের তথা সমস্ত জগতের আদর্শ মানব—উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব—পাপী-তাপীর ত্রাণকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মানব-শরীর

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি

উপর রাখিয়া দিলেন। অক্ষয় ও সান্ন্যাল পাখা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। সাধারণ সমাধির মত ইহা বোধ হইতেছিল না বুঝিয়া শশী কাঁদিতে লাগিলেন। অক্ষয় তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া গিরিশ ও রামকে সংবাদ দিলেন। প্রায় রাত্রি ১টার সময় ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল ও তিনি অতিশয় ক্ষুধা জানাইলেন। তাঁহাকে সুজী খাইতে দিলে তিনি সহজে খাইতে পারিলেন এবং এক পাত্রপূর্ণ সুজী খাইলেন। এমন সহজ ও অধিক আহার দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দ বোধ করিলেন এবং তখন

ত্যাগ করিয়া এইবার নিত্যধাম শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিলেন। আর সমাধিভঙ্গ হইল না। সকলে বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া রাত্রিযাপন করিলেন। ওদিকে এই মহাসমাধির রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর নিয়মিত লুচিভোগ বন্ধ হইয়া গেল—কোন বাধা ঘটিয়াছিল। এত বন্দোবস্ত ও লোকজন থাকা সত্ত্বেও এরূপ ঘটনা অতি অসাধারণ বলিতেই হইবে। সোমবার প্রভাতে এই মর্ম্মবিদারক মন্দ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত ও দর্শকে বাগান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বেলা ৮টার

সময় কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় আসিলেন। তিনি সমাধি-লক্ষণ বিশেষভাবে জানিতেন। তিনি আসিয়া পৃষ্ঠের শিরদাঁড়ায় গাওয়া ঘৃত মালিস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দেহে এখনও প্রাণ আছে। সেই জন্য বলিলেন, এখন দেহ ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের জন্য যেন লইয়া যাওয়া না হয়। বেলা ১টার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, বড় জোর আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গিয়াছে।

আর কি আশায় বসিয়া থাকা! সুন্দর খাটে বিছানা পাতিয়া ঠাকুরের দেহ চন্দনচর্চ্চিত করিয়া ও ফুলের মালায় সর্ব্বাঙ্গ সাজাইয়া, তাঁহাকে পীতাম্বর পরাইয়া বেলা অবসানে খাটের উপর নামাইয়া রাখা হইল। চারিদিকে ফুলের মালা ও তোড়া দিয়া খাট সাজান হইল। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। তাহার পর মহেন্দ্র সরকার ভক্তগণকে ঠাকুরের একখানি ফটো লইতে বলিয়া খরচ স্বরূপ দশ টাকা দিয়া ব্যবস্থা করিলেন—ফটো লওয়া হইল। বেলাশেষে পবিত্র দেহ পরামাণিক ঘাটে আনা হইল। রাস্তার দুপারে কাতারে কাতারে লোক সংবাদ শুনিয়া 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় অগ্নিকার্য্য আরম্ভ হয়। শ্মশানে ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল সময়োচিত গান গাহিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ও অগ্নিকার্য্যের স্থানটি বেড়ার বেষ্টনী দিয়া ঘিরিয়া এবং শ্রীঠাকুরের শেষাবশিষ্ট অস্থিগুলি শুদ্ধ করিয়া একটি তামার কলসে রক্ষা করিয়া, ভিতরে গঙ্গামাটী ভরিয়া কলসীর মুখে গঙ্গামাটী প্রলেপ দিয়া ভক্তগণ বিজয়ার দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনান্তে জলপূর্ণ মঙ্গলঘট আনয়ন করার মত সেই কলসী বহন করিয়া কাশীপুর বাগানে শূন্যহৃদয়ে ও উদাস প্রাণে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পদে কালভুজঙ্গ দংশন করিল। উপেন্দ্র সর্পাঘাতে বসিয়া পড়িলেন। এখন আর কি হইবে, দংষ্টস্থানের উপরে একটি তাগা বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং ক্ষতস্থানটিকে নিকটস্থ কামারশালা হইতে দগ্ধ লৌহের ছাঁকা দিয়া পোড়ান হইল। ক্ষতস্থানটি ৪।৫ মাস স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়া ছিল,—ইহার বেশী আর তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই।

ঠাকুরের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার পর লোকাচার মতে শ্রীমা অঙ্গের অলঙ্কার যখন খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, তখন যেমন বলয় খুলিতে যাইবেন, অমনি ঠাকুর সশরীরে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "আমি এই ত রহিয়াছি, এ ঘর হইতে ওঘরে গিয়াছি মাত্র। তুমি বিধবা-চিহ্ন ধারণ করিও না।" তদবধি শ্রীমা হাতে বলয় আমরণকাল ধারণ করিয়াছিলেন এবং সরু লালপাড় ধুতি বরাবর পরিধান করিতেন।

সাত দিন অস্থিকলস কাশীপুর উদ্যানে রাখা হইল। নিত্য সেবা ভোগ আরতি সবই বিধিমত হইতে লাগিল।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু অষ্টাহমধ্যে অস্থি সমাধিস্থ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান! কোথায় তাহা করা হয়? এই ভগবদস্থি-সমাধি ব্যাপার লইয়া গৃহী ও সন্ন্যাসীতে বাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ হইল। রাম প্রমুখ ভক্তরা অভিমত করিলেন যে, যেহেতু গঙ্গার ধারে কোন স্থান সংগ্রহ হইল না, তখন রামের কাঁকুড়গাছির বাগানেই ঠাকুরের দেহাবশেষ সমাহিত করা হউক। ঠাকুর একদিন ঐ বাগান দর্শন করিয়া এবং উহার মধ্যস্থ তুলসীকাননটি দেখিয়া সেইখানে দণ্ডবৎ হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, এই স্থানটি বেশ! রাম বলিলেন, সেইখানেই ঠাকুরের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করা হউক। তদ্ভিন্ন তিনি বাগানের যে পাকা ঘরখানি আছে তাহাও সন্ন্যাসিগণকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত এবং বাগানটি শ্রীগুরু-সেবায় উৎসর্গ করিতেও তিনি প্রস্তুত। তবে বাগানের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তিনি যে সব নিয়ম-কানুন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে

মানিতে হইবে। ছোকরা ভক্তরা তাহাতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "গঙ্গাতীরে আমাদিগকে জমী কিনিয়া সেইখানে ঠাকুরের দেহাবশেষ সমাধিস্থ করিয়া মঠ করিয়া দাও; আমরা তথায় থাকিব; কিন্তু আমরা সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা কাহারও বিশেষতঃ গৃহীদের আইন মানিব না।" রাম বলিলেন, "ভাই, আমার এত অর্থ-সামর্থ্য নাই, আমি এরূপ করিতে পারিব না।" এইরূপ বাদানুবাদে ৭ দিন অতিবাহিত হইল। ৮ম দিনে অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর দিনে ৮ই ভাদ্র ১২৯৩ সালে রামের বাগানেই কলসটি রাখা সর্ব্ববাদিসম্মত হইল। প্রাতঃকালে গাড়ী করিয়া কলসীটি লইয়া আসিলেন,—বাবুরাম, শশী ও উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রথমে কলসীটি পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া—রাম বাবুর বাড়ীতে যে ঘরে ঠাকুর বসিতেন, তথায় উহা রক্ষা করা হইল। তাহার পর নরেন্দ্র, রাখাল, সারদা, নিরঞ্জন, গিরিশ, হরিশ, অতুল, মনোমোহন, মহিম, বলরাম, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, অমৃত বসু প্রভৃতি ভক্তগণ নামসঙ্কীর্ত্তন সহকারে রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানেই ঠাকুরের দেহাবশেষের কলসীটি সমাহিত করিয়া আসিলেন। ঐ দিন হাঁড়ী হাঁড়ী ডালভাত ভোগ দিয়া এক মহোৎসব হইল। জন্মাষ্টমীতে এই স্মৃতি-মহোৎসব অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

প্রথম প্রথম সমাধিস্থলের উপর চালা করিয়া বর্ষাজল নিবারণ করা হইত। কিন্তু অস্থি সমাহিত করিবার কয়েক দিন পরে কুমার ভক্তগণ ঐ কলসটি আবার উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন এইরূপ কথা উঠে। অনেকেই এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র ইহাতে বাধা দেন। শেষে ঈশান মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। ঈশান বলিলেন যে, একবার সমাহিত দেহ বা দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করিবার মত গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য আর নাই। ৯ই আশ্বিন রামবাবুর বাড়ীতে এক সভা আহূত হয় এবং তাহাতে সর্ব্ববাদিসম্মত এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ঐ কলসটি আর কখনও স্থানান্তরিত করা হইবে না। তাহার পর উহার উপর একখানি একতলা (ঘর) মন্দির নির্ম্মিত হয়। এখন সেখানে এক উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বৎসরে কয়েকটি উৎসবও সেখানে যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন যে স্থানে অগ্নিসংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল, সেইখানে—কাশীপুর শ্মশানে এখন আর একটি সুন্দর স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেক বিদেশী ভক্ত ঠাকুরের লীলাভূমি দর্শন করিতে আসিয়া দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, কাঁকুড়গাছি প্রভৃতি স্থান দর্শনের সঙ্গে স্মৃতিমন্দিরটিও আজকাল দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

আশা

তুমি মোরে ডাক্ দেবে সেই আশা ধরে
এ জীবন-পথ বাহি; নিভৃত অন্তরে
জ্বলিছে আশার দীপ আমার বেদনা
জানি জানি এ জীবনে বিফল হবে না।

সে আশা রয়েছে বলে আমার ধরণী
নিত্য সুখ শোভাময়ী; সান্ত্বনার বাণী
তোমারি ইঙ্গিত সম অন্তরে আমার
দিনে দিনে পলে পলে কত বারম্বার

রেখে যায়, কাণে কাণে কে কহে আমারে,
"ওরে একা ভয় নাই, নেবে সে তোমারে।"
সে আনন্দে চলি পথ প্রতীক্ষা আমার
একদিন ধন্য হবে; চরণে তোমার

আপনারে সঁপে দেব সে আশায় প্রিয়—
জীবন সুন্দর মানি ব্যথা রমণীয়।

শ্রীনলিনী সেন।

বিনিময়

[উপন্যাস]

১

শ্বশুরের পয়সাতে অনেকেই যেমন বিলাত যায় কোন একটা কৃষ্ণ-বিষ্ণু বনিয়া আসিতে, শৈলও তেমনই গিয়াছিল! ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বা গল্প করিবার কিছুই ছিল না। তথাপি এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাটুকু যে জন্মলাভ করিল, তাহার কারণ, আই, সি, এস, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার পর ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার একটা বৎসর বাকী থাকিতে শৈলর আকস্মিক পত্নী-বিয়োগ ঘটিল।

দুঃস্বপ্নের মত এই নিষ্ঠুর সংবাদটা প্রচণ্ড সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া তাহার নিকট তারযোগে ছুটিয়া আসিল,—সুনীলা নাই।

শৈল বসিয়া পড়িল। আলোকিত কক্ষটা এক নিমেষে যেন তাহার চোখে অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ চিন্তা তাহাকে শোক করিবার বা মৃত্যুর জন্য অশ্রু ত্যাগ করিবার অবকাশ দিল না। শৈলর প্রথমেই মনে পড়িল, ল্যাণ্ড-লেডীর তাগিদের কথা! তাহার কাছে ল্যাণ্ড-লেডীর অনেকগুলি টাকা পাওনা। প্লাট্‌ফরমে গাড়ী থামিলে পথ খোলা পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ভীড় করিয়া সকলের আগে নিজেরা উঠিবার জন্য পরস্পরকে যেমন দলিয়া পিষিয়া ফেলিতে ইতস্ততঃ করে না, সেই ভাবে অসংখ্য চিন্তা মনের কোণ হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে তাহার মস্তিষ্ককে পিষ্ট—আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

প্রাতরাশ টেবলের উপর পড়িয়া রহিল। শৈল আস্তে আস্তে উঠিয়া কৌচের উপর শুইয়া পড়িল। স্বদেশে বা বিদেশে এমন কোন আত্মীয়-বান্ধব বা পরিচিত কাহাকেও শৈলর মনে পড়িল না, যাহার কাছে দেশে ফিরিয়া যাইবার শুধু পাথেয়টুকুর জন্য সে হাত পাতিতে পারে।

কূল নাই! কিনারা নাই! ক্ষিপ্তোন্মত্ত সমুদ্রের জলরাশির মত ভীতিসঞ্চারক দুর্ভাবনারাশি শুধু শৈলর চোখের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

শ্বশুর ব্রজমোহনের প্রকৃতির সহিত শৈল পরিচিত ছিল না। অষ্টমঙ্গলার পরের দিন সে ইংলণ্ডে চলিয়া আসিয়াছে। অন্তরে স্নেহের বাঁধন, ভালবাসার দাবী সেখানে জন্মিবার অবকাশ ঘটে নাই। আজ তাঁহার কন্যা জীবিত নাই! জামাতার প্রতি স্বার্থ শেষ হইয়া গিয়াছে। অকারণ কেনই বা তিনি পরের জন্য আর টাকা ব্যয় করিবেন? শৈল এইটাকেই নিশ্চিত করিয়া নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটগুলি তাহার ভালই ছিল। তাহারই জোরে স্বদেশে অনায়াসে সে কোন একটা কলেজের অধ্যাপক হইতে পারিত। কয়েক বৎসর ধরিয়া হাতে কিছু মোটা রকম জমাইয়া ইংলণ্ডে আইন অধ্যয়ন করিতে আসিলে, আজিকার মত এমন অসহায় বিপন্ন অবস্থা কি উদ্ভব হইতে পারিত?

শৈলর চোখে জল আসিল। এই বুদ্ধিকেই সে সম্বল করিয়া, কল্পনায় ভবিষ্যতের মর্ম্মর-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিল! সময় কাহারও মুখ চাহিয়া এক পল দাঁড়াইয়া থাকে না। শৈলর জন্যও রহিল না। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া মাসটা প্রায় কাটিয়া আসিল। ভারতের মেল আসিল, শৈল শ্বশুরের নিকট হইতে পত্র পাইল। ব্রজমোহন কন্যার জন্য কোন শোকপ্রকাশও করেন নাই। জামাতাকে কোন সান্ত্বনার বাণীও লেখেন নাই। শুধু লিখিয়াছেন, শৈল যে ভাবে টাকা পাইতেছিল, সেই ভাবেই টাকা পাইবে। সে যেন মন দিয়া অধ্যয়ন করে।

পত্রখানা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শৈলর মুখ দিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। প্রচণ্ড দুঃখে নহে। গভীর আরামে! দুর্ভাবনার গুরুভারটা কাঁধের উপর হইতে নামিয়া গেল বলিয়া। শ্বশুরের এই মহানুভবতা স্মরণ করিয়া ব্রজমোহনের চরণে পরম শ্রদ্ধায় তাহার সারা চিত্ত আছাড় খাইয়া পড়িল।

২

এক বৎসরের কিছু বেশী কাটিয়া গিয়াছে।

শৈল—মিঃ এস, এন, রায়, বার-এ্যাট-ল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ব্রজমোহন নিজে গিয়া হাওড়া ষ্টেশনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অনেকগুলি বৎসর পরে শ্বশুর-জামাতাতে সাক্ষাৎ হইল। ব্রজমোহন স্নেহ-সম্ভাষণ করিলেন! কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। শৈলর কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল।

শৈশবে শৈলর পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল! মামার বাড়ী মানুষ হইয়া পিতৃ-গৃহের সম্বন্ধটা তাহার নিকট অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বিবাহ হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার মা-ও স্বামি-শোকের হাত হইতে মুক্তি লইয়া স্বর্গে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাই মাতুলালয়ের বাঁধনটা শৈলর শিথিল। তথাপি মামাত' ভায়েরা নৈহাটী হইতে তাহাকে লইতে আসিয়াছিল। শৈলকে দেখিয়া তাহারা যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল।

ব্রজমোহন মোটরের দরজা খুলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বাবাজী কি আমার ওখানে নামবে?"

শৈলর বুকের মাঝটা ধক্ করিয়া উঠিল ছয় বৎসর আগেকার ছবিটা চকিতে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল! আই, সি, এস, পরীক্ষার নিমিত্ত যেদিন সে বোম্বে রওনা হইবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিল, তখন শ্বশুরবাড়ী হইতে শ্বশুরের গাড়ীতেই আসিয়াছিল। পাশে ছিলেন স্বয়ং শ্বশুর। আজিও তিনি সশরীরে আসিয়াছেন। তাঁহার গাড়ীও আসিয়াছে। কিন্তু সেদিনে, এদিনে ব্যবধান যেন সমুদ্রবিশেষ। আজ 'এস' বলিয়া জামাতাকে পাশে বসাইবার দাবী তাঁহার ফুরাইয়া গিয়াছে।

মামাত' ভায়েদের নমস্কার করিয়া শৈল কহিল, "হ্যাঁ, আমি আপনার ওখানে যাব মাকে প্রণাম কর্ত্তে।

ব্রজমোহনের মোটর তাহাকে বহন করিয়া সুবৃহৎ প্রাসাদের ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলর মনে পড়িল, তাহার বিদায়ের দিনে এই ফটকটি লতাপাতা-পুষ্পে সজ্জিত হইয়াছিল; আর সম্মুখের ওই গাড়ী-বারাণ্ডার উপর শ্বশুর-ভবনের আত্মীয়া মহিলার দল ভীড় করিয়া জড় হইয়াছিলেন। পাশের ঐ রেলিংটা ধরিয়া নীরবে বিষণ্ণ আননে দাঁড়াইয়াছিল সুনীলা। আট দিনের পরিচিত স্বামীকে বিদায় দিতে তাহার আয়ত নেত্র হইতে কি অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িয়াছিল? সে কথা শৈলর আজও যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল।

ব্রজমোহন জামাতাকে লইয়া আসিলেন, চাকরকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভেতরে খবর দে জামাইবাবু এসেছেন।" শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"এ বেলাটা এখানে তুমি খাওয়া-দাওয়া কর, শৈল!"

শৈল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

ভিতর হইতে চা আসিল। সুবৃহৎ রূপার রেকাবী ভরিয়া জলযোগের আহার্য্য আসিল। কিন্তু সব বহিয়া আনিল চাকর। শৈলর পাশের টেবলটার উপর সেগুলা রাখিতে বলিয়া ব্রজমোহন কহিলেন,—"নাও, বাবা! কিছু খেয়ে নিয়ে তার পর স্নান করতে যাবে।"

ভাঙ্গা জিনিষকে গোটা করিয়া সাজাইয়া রাখিবার দুঃখ অনেকখানি। শৈল প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সহজ অবস্থায় আনিবার প্রয়াস পাইতেছিল। কিন্তু ভিতরের আড়ষ্ট ভাবটা তাহার কিছুতেই কাটিতেছিল না। মনে ইচ্ছা জাগিতেছিল, এক ছুটে মামার বাড়ী গিয়া হাত-পা ছড়াইয়া দুটো গল্প করিয়া সে একটু স্ফূর্ত্তি করে। দীর্ঘকাল পরে জন্মভূমির কোলে ফিরিয়া আসিয়া পর-গৃহে প্রবাসীর মত থাকিতে অন্তর তাহার নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু উপায় নাই! দুঃখ তাহার যত প্রবলতম হউক না কেন, বর্ষার নদীর মত সে মুহুর্মুহু যত ফুলিয়া উঠুক না কেন, সংযমের কঠিন শৃঙ্খলে তাহাকে নিরুদ্ধ রাখিতে হইবে, শুধু শ্বশুর ব্রজমোহনের মুখপানে চাহিয়া। সন্তানহারা পিতৃবক্ষের সীমাহীন বেদনার কাছে তাহার ব্যথা যে খদ্যোতের মতই ক্ষীণ-দ্যুতি, ম্লান!

স্নান শেষে প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্বশুর-জামাতা আহারের নিমিত্ত অন্দরে আসিলেন।

মর্ম্মরমণ্ডিত সুবৃহৎ কক্ষে রূপার বাসনে পরিপাটী সাজান জামাতার উপযোগী বহু আহার্য্য থরে থরে শোভা পাইতেছিল। ব্যঞ্জনের সুগন্ধে কক্ষের বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছিল। শ্বশুর-জামাতার বসিবার জন্য হস্তরচিত দুই-খানি পশমের আসন পাশাপাশি পাতা এবং তাহারই সম্মুখে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী, বালক-বালিকা, অনেকগুলি বসিয়াছিল, —সূর্য্যের উপর পাতলা মেঘের আচ্ছাদনের মত, সকলের মুখেই একটা বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছিল; কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া চাহিলেই বুঝা যাইতেছিল, এই বিষণ্ণতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে, একটা দুর্নিবার কৌতূহল।

ব্রজমোহন জামাতার পানে চাহিয়া কহিলেন,—"শৈল, এঁদের তুমি ভাল চেন না, বাবা! ওঁরা তোমার খুড়-শ্বাশুড়ী, মামী-শ্বাশুড়ী, পিস্-শ্বাশুড়ী ওঁদের সব নমস্কার কর।"

শ্বশুরের নির্দ্দেশমত প্রণম্যগণের পায়ের ধূলা শৈল নত-মস্তকে গ্রহণ করিল! তাঁহারাও জনে জনে চোখ মুছিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া শৈলকে যথারীতি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রজমোহনের পানে চাহিয়া শৈল কহিল,—"মা?"

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! তিনি আছেন। এখন আর তাঁকে ডাকব না। যাবার সময়ে তাঁকে নমস্কার ক'রে যেও, বাবা! বেলা গেছে, এসো খেতে বসি।"

প্রবাসের পাঁচ কথা গল্প করিতে করিতে শ্বশুর-জামাতার আহার শেষ হইয়া গেল।

বসিবার ঘরে গুড়গুড়ির নলটা মুখে দিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "শৈল, কোথায় প্রাক্‌টিস্ ক'রবে? কিছু স্থির কল্লে?"

শৈল বলিল, "এখন ও বিষয়ে কোন চিন্তা করিনি! দাদারা কি বলেন শুনি?"

—"তা বটে! সবে তো আজ আস্‌ছ। তোমার মামাত' ভায়েদের সঙ্গে তোমার পরামর্শ করা উচিত। তবে আমি বলি,"—ব্রজমোহন থামিলেন।

শ্বশুর কি বলেন, তাহা জানিবার ইচ্ছায় শৈল ব্রজ-মোহনের মুখের পানে চাহিতেই তিনি কহিলেন, "পাটনা হাইকোর্টের মিষ্টার এস, মিত্তিরের সহিত আমার খুব আলাপ আছে। আমি তাঁকে ব'ললেই তিনি তোমায় জুনিয়ার করে নেবেন। তাঁর প্রসিদ্ধির কথা তুমি বোধ হয় শুনেছ। আর আমার পাটনার বাড়ীখানাও বেশ ভাল, সাজানও আছে।"

শৈল চুপ করিয়া রহিল। যাহার সহিত সমস্ত বন্ধন ভগবান বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন, সেই তাঁহারই কাছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সাহায্যের জন্য হাত পাতিবার ব্যথা, মেঘাবৃত চাঁদের মতই মনের আনন্দটাকে ম্লান করিয়া দেয়।

শৈলর আনত মুখে যে বিষাদের ছায়াটুকু পড়িয়াছিল, ব্রজমোহনের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির কাছে তাহা গোপন রহিল না। নিঃশব্দে জামাতার মুখের পানে চাহিয়া তিনি ধীরে ধীরে শৈলর মনের কথাটা কাড়িয়া লইলেন। কহিলেন, "আমি তোমায় কোন বিষয়ে জোর কচ্ছি না; তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, তাই কর্ত্তব্যবোধে সুবিধাটা শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি। মিঃ মিত্তিরের সাহায্য পেলে কর্ম্ম-জীবনের উন্নতিটা তোমার দ্রুতগতিতেই হবে।"

শৈল আস্তে আস্তে কহিল, "কিন্তু আমায় একটু ভাবতে হবে।"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়! খপ্ ক'রে কোন কায করা ঠিক নয়। ভাল, তোমার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে এইবার দেখা করতে চল।"

শৈল শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি কহিলেন, "তুমি কে গা, বাছা?"

শ্বশুরের পানে চকিতে চাহিয়া শৈল কহিল, "আমি শৈল।"

"শৈল? শৈল আবার কে? ল্যাবেণ্ডারের বড় ছেলে? সে এর মধ্যে এত বড় হ'লো কি ক'রে? তোমাতে আর সুনীলাতে এক-আঁতুড়ে তো জন্মালে।"

ব্রজমোহন কহিলেন, "আঃ, কাকে কি বলছ? শৈল! আমাদের জামাই শৈল! যে বিলেত গেছল।"

সবিস্ময়ে শৈল দেখিল, শ্বাশুড়ীর উদাস চোখে-মুখে এতক্ষণে একটা বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বাস্তবের কঠিন আঘাত স্বপ্নের ইন্দ্রজালকে ভাঙ্গিয়া দিল। ব্রজমোহন-গৃহিণী উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিলেন, "ও রে সুনীলা রে! ও রে সোনার প্রতিমা।"

শিবের জটায় যেন জাহ্নবীর ধারা এতদিন গুপ্ত ছিল। কন্যাহারার প্রচণ্ড শোকটা ব্রজমোহন এত দিন নিজের মাঝে চাপিয়া সহজভাবে চলাফেরা করিতেছিলেন! পত্নীর হাহাকারে সে আর আড়ালে রহিল না। ছিন্নসূতা মুক্তাদলের মত একরাশ জল তাঁহার দুই চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

শৈলকে লইয়া ব্রজমোহন বাহিরে আসিলেন। রুমালে চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"সে যাবার পর হ'তেই ওঁর—তোমার শ্বাশুড়ীর মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে, বাবা! মানুষ গুলিয়ে ফেলেন, কথা গুলিয়ে ফেলেন।"

৩

শৈলর মামার বাড়ীতে শৈলকে লইয়া যেন একটা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। আত্মপর পাঁচজনে মিলিয়া মুহূর্ত্তে তাহাকে ঘিরিয়া চক্রব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিলেন। চারিদিকের অজস্র প্রশ্নজালবর্ষণে শৈল একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

মুক্তি দিলেন শৈলর বড়মামার বড় ছেলে অর্থাৎ শৈলর বড়দা! সকলকে ধমকাইয়া তিনি কহিলেন,—"ওতো এখন আছে, পালাচ্ছে না! একে একে তোদের যত কথা আছে, জিজ্ঞেস করিস্! এখন ওকে জিরুতে দে। চল শৈল, ওপরে চল।"

ভায়েরা তাহাকে উপরে লইয়া গিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন,—"হ্যাঁরে! বোস মশায়ের কাছ হ'তে তুই টাকা চেয়েছিলি, না নিজেই তিনি দিতেন? আমাদের তো ভারি ভাবনা হ'য়েছিল।"

শৈল হাসিয়া কহিল,—"তা আমি জানতে পেরেছিলুম, যখন চিঠির উত্তর পেলুম না।"

বড়দা কহিলেন,—"কি উত্তর দেব বল? মনে বুঝলুম টাকা দেওয়া উচিত! বিদেশে বিভুঁয়ে! কিন্তু দিই কোথা থেকে? যা রোজগার করি, পেট চলে কোনমতে। তা বোস মশাইকে কি লিখ্‌লি?"

—"কিছু না। উনি নিজে হ'তেই লিখে পাঠালেন, কোন কিছু ভেব না; যেমন পাচ্ছিলে, তেমনি পাবে।"

ভায়েরা এক সঙ্গে মুখ ফাঁক করিয়া এ্যাঁ শব্দ করিয়া উঠিলেন! বড়দা কহিলেন,—"বলিস কি? কলজের জোর আছে বটে! আর নিজের চোখেই তো দেখে এলুম আজ তোকে যা যত্ন ক'রে নিয়ে গেলেন। আহা আজ বৌমা বেঁচে থাকলে তোর প্রাক্‌টিস্‌টার সুবিধে হ'তো। পাটনার মিত্তির সাহেব শুনেছি ওঁর বিশেষ বন্ধু।"

শৈল ধীরে ধীরে কহিল,—"উনি আমায় পাটনায় প্রাক্‌টিস্ করবার কথা ব'ল্‌ছিলেন।"

ভায়েরা লাফাইয়া উঠিলেন। "অতি উত্তম পরামর্শ। উনি যদি তোকে কারু জুনিয়ার ক'রে দেন।"

শৈল কহিল,—"বল্লেন ত, আমার বন্ধু মিত্তির আছে, তাকে ব'লে দেব। আমি কিন্তু কিছু কথা দিই নি।"

শৈলর মেজদা কহিলেন,—"তখনি তোমার রাজি হওয়া উচিত ছিল। শৈল! সুযোগটা জীবনে বার বার আসে না।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল কহিল,—"কিন্তু এতটা সাহায্য নেওয়া কি আমার পক্ষে ঠিক হবে? পাটনাতে উনি বাড়ীর অবধি ব্যবস্থা করেছেন।"

মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া সেজদা তৎক্ষণাৎ কহিলেন,—"ঠিক হবে, কেন না হবে শুনি? তিনি যখন মেয়ের বিয়ে দিলেন, তখনই তো ব'লেছিলেন,—'জামাই মানুষ করার ভার আমার'।"

বড়দা কহিলেন,—"মেয়ে থাকলে অবশ্য সে কথা চ'লত! আচ্ছা, শৈল, উনি ত নিজে এখানকার এটর্ণী, তবে তোমায় ঠেলছেন কেন পাটনাতে?"

মেজদা কহিলেন,—"সে কথা তিনি বুঝবেন; আমাদের ভাববার কিছু নেই। এখানকার বারের অবস্থা ত তিনি জানেন। নিশ্চয় বুঝেছেন পাটনাতেই শৈল সুবিধা করতে পারবে। আর অত বড় মিত্তির সাহেব র'য়েছেন। দাদা, তুমি মেয়ে থাকা-থাকির কথা কি বলছ? ওকি আর কারু মেয়ে বিয়ে ক'রেছে?" তার পর শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ্, শৈল, তুই এখন চট্ ক'রে বিয়ে করিস্ নি। নিজের সুবিধা গুছিয়ে তার পর।"

বড়দা কহিলেন,—"সে ত নিশ্চয় কথা! কিন্তু ও এখন অন্য বিয়ে না কল্লেও তাঁর মেয়ে ত নেই!"

সেজদা কহিলেন,—"নেই! সে তাঁর মন্দ কপাল! শৈল ত তাকে মারেনি? তার অদৃষ্টেই সে ম'রেছে!"

শৈল এতক্ষণ নীরবেই ভায়েদের বাদানুবাদ ও অযাচিত উপদেশগুলি শুনিতেছিল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্তর

তাহার উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা সেজদা! মন্দ কপালই যদি হয়, সেই মন্দটা তুমি আমার দিক্ থেকে ধরে নাও না! নেবার যেখানে সামান্য অধিকার নেই, সেখানে অনুক্ষণ হাত-পাতার কদর্য্যতা যে সব সুখ-শান্তি নষ্ট করে।"

শৈলর কথার ঝাঁঝে ও স্বরের তীক্ষ্ণতায় কক্ষটা যেন রি-রি করিয়া উঠিল। ভায়েরা থামিয়া গেলেন। সে নিজেও একপ্রকার অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। জোর করিয়া একটু হাসিয়া পূর্ব্ব আলোচনাটাকে টানিয়া আনিয়া শৈল কহিল,—"কিন্তু আমি আমার শ্বশুর মশাইকে বলে দিয়ে এসেছি যে দাদাদের পরামর্শ ছাড়া আমি চ'লতে পারি না। তিনিও ব'লেছেন, ভায়েদের সঙ্গে কথা কও।"

যে অপ্রসন্ন মেঘখানা কয়েক মুহূর্ত্ত কক্ষস্থিত প্রাণী কয়টির উত্তেজনা-দীপ্ত মুখগুলিকে অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শৈলর কথার সুবাতাসে নিমেষে তাহা অন্তর্হিত হইল—তাহার দাদাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বড়দা কহিলেন, "তিনি ঠিকই বলেছেন।"

সেজদা কহিলেন, "দেখ শৈল, তোমার ও কবিতার উচ্ছ্বাস রাখ। আমি চিরকালই জানি, তুই একজন মস্ত ভাবুক। কিন্তু এটা মনে রাখিস, খাঁটি সত্যি প্রয়োজন যতক্ষণ আছে, নেবার অধিকার ততক্ষণ আছে, লজ্জা অপ্রয়োজনে নিতে।"

বড়দা কহিলেন,—"কথাটা আমিও মানি, যখন তাঁর করবার শক্তি আছে, এবং তোমারও নেবার প্রয়োজন আছে, তখন নেওয়াই আমাদের সর্ব্ববাদিসম্মত মত।"

মেজদা সহসা প্রশ্ন করিলেন,—শৈল, তোর যে এক শালী ছিল?"

শৈল চমকিত হইল। দপ্ করিয়া মনে পড়িল, শ্বশুর তাহাকে অপরিচিত অনেকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেও নিজের আত্মজার নামটা অবধি তিনি ত কই একটিবারও উল্লেখ করেন নাই। ইহা যেন তাহাকে পরম বিস্ময়ে অভিভূত করিল। তবে মুখে তাহা প্রকাশ করিল না। চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, দাদারা উত্তরের অপেক্ষায় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

একটা ঢোক গিলিয়া শৈল কহিল,—"আছে ত কি?"

শৈলর নিরুত্তর আননের উপর মুহূর্ত্তের জন্য যে অন্যমনস্কতার ছায়াপাত হইয়াছিল, ভায়েদের দৃষ্টিতে তাহা গোপন না থাকিলেও অর্থটা তাঁহারা অন্য প্রকার করিলেন।

মেজদা কহিলেন,—"না, জিজ্ঞেস কচ্ছি, কত বড়টি সে হয়েছে, দেখতে-শুনতে কেমন? বোস মশায়ের ত ওই আর একটি মেয়ে—"

গম্ভীর মুখে শৈল উত্তর দিল,—"না, তাকে দেখিনি।"

বিস্মিত কণ্ঠে সেজদা কহিলেন,—"সে কি রে, সে যে তোর নিজের শালী!"

শৈল কোন কিছু একটা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সেই তীক্ষ্ণতর বিস্ময়টাকে বড়দা স্বচ্ছ করিয়া দিলেন। মাথা নাড়িয়া তিনি কহিলেন, "তা হোক্, উপেন, সে বোধ হয় বড় হয়েছে! বোস মশাই বোধ হয় পছন্দ করেন না, শৈলর সঙ্গে সে মেশামিশি করে। আর এটা স্বাভাবিক! হাজার হোক, আমাদের ত বৌমা এখন নেই।

ভায়েরা কথাটাকে অনুমোদন করিল। এত বড় একটা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরও শৈলর মুখ দিয়া কোন সাড়া বাহির হইল না! পূর্ব্বের মতই সে নীরব রহিল এবং তাহার মুখের উপর হইতে সে বিস্ময়ের ছায়াটা তিরোহিত হইলেও কথায়-বার্ত্তায় পূর্ব্বেকার উৎসাহ ফিরিয়া আসিল না।

রাত্রিতে আহারের স্থানে বৌদির দল শৈলকে ধরিয়া বসিল, "তোমার পাটনার বাড়ীতে আমরা বেড়াতে যাব, ঠাকুরপো!"

দুই চোখ কপালে তুলিয়া শৈল কহিল, "আমার বাড়ী!"

"না, তোমার বাড়ী নয় ত কি? তুমি যেখানেই বাস করবে, সেইটাই তোমার বাড়ী।"

"আমি যে সেখানে বাস করব, সেটা কি নিশ্চিত হয়ে গেছে?"

বৌদিদিরা কহিলেন, "নিশ্চিত স্থির হয় নি ত কি? তুমি বিলেতে থাকতে সুনীলা এখানে যে কবার এসেছিল, সেই কবারই সে গল্প করেছে! বাবা তার জন্যে পাটনায় বাড়ী কিনেছেন! তুমি এলে সেখানে থাকবে! আহা বেচারা কত সুখের কল্পনাই আঁকত।"

শৈল আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিশোরী-বুকের অপূর্ণ আশা লইয়া যাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া

যাইতে হইয়াছে, সেই স্বল্প-পরিচিত কিশোরী-বধূর মুখখানি চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

৪

বিবেক ন্যায়-ধর্ম্মের যত কথাই মনের মাঝে জড় করিয়া রাখুক, অভাবের প্রেরণা মানুষের ঘাড় ধরিয়া তাহাকে নির্দ্ধারিত কর্ম্মপথে পরিচালিত করে।

প্রায় দুই বৎসর হইল, শৈল পাটনায় আসিয়াছে। মিঃ এস্, এন, রায় সাহেব বা রয় নামে সে এখন সকলের নিকট পরিচিত। তাহাকে জুনিয়ার না দিলে মিত্র সাহেবের মত কর্ম্মব্যস্ত ব্যারিষ্টার কাহারও ব্রীফ লইয়া মামলা সুবিধামত পরিচালিত করিতে পারেন না, কাযেই শৈলর হাতে এখন অর্থের স্বচ্ছলতা ঘটিয়াছে। এবং বৌদিদির দল অনাহূতভাবে আসিয়া বার-দুই তাহার বাড়ীতে হানা দিয়া গিয়াছেন। দাদারাও শৈলর ব্যয়ে মাঝে মাঝে আসিয়া নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া শৈলর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। আসেন নাই শুধু শ্বশুর ব্রজমোহন। ভগ্ন-স্বাস্থ্যের উপযোগী জলবায়ু খুঁজিতে তিনি পশ্চিমের অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাটনার জলবায়ুর উপকারিতা জানা সত্ত্বেও সেখানে তিনি পদার্পণ করেন নাই। জামাতার সাদর-নিমন্ত্রণ তিনি নানা অজুহাতে এড়াইয়া যাইতেন।

সেদিন শ্বশুরের পত্রে শৈল জানিতে পারিল, তিনি সপরিবারে কাশীতে অবস্থান করিতেছেন এবং কিছুদিন তথায় থাকিবেন। উত্তরে শৈল নিজের কুশল দিয়া, অনেকখানি পীড়াপীড়ি করিয়া পত্রে অনুরোধ করিল, তিনি ফিরিবার মুখে একবার যেন পাটনা হইয়া যান। মনে মনে শৈল সঙ্কল্প করিল, শ্বশুর যদি এবারও তাহার কথা না রাখেন, তবে সে-ও এই পাটনার বাড়ীতে বাস করাকে ইতি করিয়া দিবে।

পত্র শেষ করিয়া শৈল যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন সম্মুখের সুবৃহৎ ঘড়িটার উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। ঘড়ির কাঁটা রাত্রি আটটা ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছে। শৈল চমকিয়া উঠিল! আজ মিত্র সাহেবের ভবনে তাহার যে আহারের নিমন্ত্রণ আছে! একদম এ কথাটা যে সে বিস্মৃত হইয়াছিল!

ত্রস্তে চেয়ার ছাড়িয়া হাতমুখ ধৌত করিয়া নিজেকে পরিচ্ছন্ন করিতে সে পাশের গোসলখানায় প্রবেশ করিল।

মিত্র সাহেবের কন্যার জন্মদিন উপলক্ষ করিয়া তাঁহার ভবনে ভোজের আয়োজন ঘটিয়াছিল। শৈলর স্মরণ হইল, উপহার একটা দেওয়া উচিত। কিন্তু দিবার মত নিজের কাছে কোন জিনিষই সে খুঁজিয়া পাইল না। রবিবার বিলাতী ফারমগুলি বন্ধ। কিছু যে একটা ত্বরিতে কিনিয়া আনিবে সে উপায় নাই। দেশীই বা কি দেওয়া যায়? শৈল ভাবিতে লাগিল। একটা বেনারসী! না, সে বড্ড জমকাল হইবে। খদ্দরের ঢাকাই সাড়ী বেশ হইবে। বৌদিদিরা তো পূজার সময়ে তাহাই পরিয়া আসিয়াছিলেন; এবং মানাইয়াছিল বেশ! শৈল নিজের ক্লার্ককে ডাকিয়া সাড়ীর ফরমাস করিল।

সে কহিল,—"আজ হরতাল, কিছু মিলবে না।"

শৈল বিব্রত হইয়া পড়িল। মনে মনে কহিল,—এমন দিনেও মানুষের জন্মদিন হয়? স্ত্রীলোককে উপহার দিবার মত কোন জিনিষই যে তাহার নারী-বর্জ্জিত গৃহস্থালীতে নাই! কি দিয়া আজিকার সম্ভ্রম সে রক্ষা করিবে? নিরুপায় মুখে শৈল চেয়ারখানার উপর বসিয়া পড়িল।

কিন্তু পরিত্রাণ নাই! কল্পনার চোখে সে সুলেখার প্রতীক্ষিত নেত্রদুইটি দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া যেন সুলেখার উৎসুকদৃষ্টিতে ধীরে ধীরে ছায়া ঘনাইয়া আসিল। আনন্দদীপ্ত মুখখানি যেন ম্লান হইয়া পড়িল।

শৈল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, সুবৃহৎ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধন আরম্ভ করিল। হঠাৎ খেয়াল চাপিল, খদ্দরের কাপড়-চাদরে আজ খাঁটি স্বদেশী সাজিয়া সুলেখার জন্মদিনে তাহার কল্যাণ কামনা সে করিবে। শৈলর বুকের মাঝটা কাঁপিয়া উঠিল। সুলেখার আজন্মের সংস্কার সংসর্গের প্রভাবের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার এই যে অকপট ইচ্ছা, ইহার মাঝে কি নিজের স্বার্থ জড়িত নাই? সুলেখাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চিন্তা যে অবসরমুহূর্ত্তে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করে, বাহিরে তাহা অপ্রকাশ থাকিলেও শৈল নিজের অন্তরের কাছে ত তাহা অস্বীকার করিতে পারে না!

কল্পনার দৃষ্টিতে মানুষ অনেক কিছু নিরীক্ষণ করে; কিন্তু সহসা তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিলে, বিস্ময়ের আর

সীমা থাকে না। অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির ত একটা আকর্ষণ আছে। শৈল নিজের কল্পনার তুলিতে অবসর মুহূর্ত্তে সুলেখার যে রূপটি মানসপটে ফুটাইয়া তুলিত, হঠাৎ যখন সেই অপরূপ মূর্ত্তিতে সুলেখা আসিয়া তাহাকে নত মাথায় প্রণাম করিল, তখন তাহার ললাটের চন্দন-চিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পরণের রক্ত বেণারসী, পায়ের আলতা সবগুলির পানেই শৈল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের সুগভীর আনন্দ দুই চোখের মুগ্ধদৃষ্টির মধ্য দিয়া যেন সুলেখার সারা অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

শৈলর সেই অপলক দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজের লজ্জা-রক্তিম মুখখানিকে ঘুরাইয়া লইয়া সে কহিল, "এত দেরী ক'রে আপনাকে আস্‌তে হয়? আমরা মনে কচ্ছিলুম, আপনি বুঝি আমাকে আর আশীর্ব্বাদ ক'রতে এলেন না।"

আশীর্ব্বাদ কথাটায় শৈলর চমক ভাঙ্গিল। উপহার-বিভ্রাট স্মরণ হইয়া হঠাৎ সে একটা কায করিয়া ফেলিল। নিজের মণিবন্ধ হইতে সুদৃশ্য সোনার হাতঘড়িটা খুলিয়া সুলেখার দিকে বাড়াইয়া দিল।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে সুলেখা কহিল,—"আপনার রিষ্টওয়াচ আমি কি ক'রব!"

হাসিয়া শৈল কহিল—"তোমার হাতে আজকের দিনে পরিয়ে দেব। কেমন, লেখা, নেবে তো?"

আরক্তমুখী সুলেখা নিজের বাম হাতখানি ধীরে ধীরে শৈলর দিকে বাড়াইয়া দিল! ঘড়ী পরিয়া আর এক দফা প্রণাম সারিয়া সে কহিল, "আপনি এখনো কিন্তু আপনার দেরী হওয়ার কৈফিয়ৎ আমায় দেন নি!"

সুলেখার আনন্দদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে শৈল কহিল,—"আচ্ছা দিচ্ছি শোন। সারা সন্ধ্যেটা ভেবেছি কি দেওয়া যায়! কিন্তু খুঁজে কিছু পাচ্ছিলুম না! সেই জিনিষটাই আমি খুঁজছিলুম, যে উপহারটা প্রত্যেক বছরের এই দিনটায় তোমার স্মৃতিতে জেগে উঠবে। কিন্তু—"

মিত্র সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলরব করিয়া কহিলেন, "দেখ, শৈল, এবার কি রকম ব্যবস্থা! লেখা প্রতিজ্ঞা ক'রেছে বিলিতীর গন্ধটুকুও সইবে না। তাই শুধু পোষাক পরিচ্ছদ নয়, বিলিতী খানা-দানার ব্যবস্থা অবধি বন্ধ ক'রেছে! কি যে কাণে ওর তুমি মন্তর দাও, তা তুমিই জান।"

সুলেখা কৃত্রিম অভিমানভরে কহিল,—"বাঃ উনি কেন মন্তর দেবেন! আমার নিজের যা করা কর্ত্তব্য, তাই করি।"

মিত্র সাহেব হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোর এ কর্ত্তব্য-জ্ঞান এলো কোথা হ'তে, পাগলী! তার গুরু ত শৈল। এখন আমার খালি ভয় হয়, কোন দিন না তুমি কোট ক'রে বস, বাবা তুমি প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়। এ সব তবু সইছে একরকম—"

শৈল হাসিয়া কহিল, "প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়া দরকার হ'লে—"

বাধা দিয়া মিত্র সাহেব কহিলেন, "ও সব পাগলামীর কথা তুলো না! ব্যাঙ্কে বেশী এখনও জমেনি, একটা মেয়ে, তবু খরচ আমি সামলে উঠতে পারি না। ছেলেটারও এখন বিলেত থেকে ফেরবার দেরী আছে। শেষে কি একটা—" থামিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা! ব্রজ পাটনায় আসছে না কি?"

শৈল চকিত হইয়া উঠিল। অন্তরের সমস্ত আগ্রহ উজাড় করিয়া সে যাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সেই পূজ্যতমের আগমন-সংবাদটা রবিকিরণস্পর্শে শুষ্কপ্রায় শিশির-বিন্দুর মত মনের আনন্দটাকে নিঃশেষে আয়ুহীন করিয়া দিল। অকস্মাৎ আলো নিবাইয়া দিলে কক্ষের চেহারাটা যেমন নিঃশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার পরিহাসদীপ্ত মুখের চেহারা ঠিক তেমনই মুহূর্ত্তে বদল হইয়া গেল। গম্ভীর কণ্ঠে সে কহিল,—"আমি ত কিছু জানি না।"

মিত্র সাহেব কহিলেন, "এইবার জান্‌বে। কাল কি, পরশুর মধ্যেই নিশ্চিত তোমার কাছে টেলিগ্রাম আস্‌বে। ব্রজ আমায় লিখেছে, শৈলর জেদ আমি এড়াতে পাচ্ছি না। শীগ্‌গীর যাব।"

৫

সে দিন মিত্র সাহেবের ভবন হইতে নিমন্ত্রণ সারিয়া আসিবার পর পুরাপুরী একটা সপ্তাহ কাটিয়া গেল। শৈল ব্রজমোহনের কাছ হইতে চিঠি বা টেলিগ্রাম কিছুই পাইল না। সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

ব্রজমোহনের আগমনের নামে শৈলর অন্তরের এই

অবস্থাটার জন্য সে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। এটা যে শুধু অনুচিত নহে,—ঘোর অন্যায়, তাহা সে বুঝিতে পারিল। তথাপি অবাধ্য মনটাকে সে কিছুতেই শাসনের শৃঙ্খল পরাইতে পারিল না। চিত্ত যে কেন সহসা ব্রজমোহনের সঙ্গগ্রহণে এতখানি বিমুখ, তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইলে, একটা অব্যক্ত বেদনা তাহাকে আঘাত করিবে, একটা ভয়ানক কুণ্ঠা, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের খোঁচার মত তাহাকে অনুক্ষণ বিদ্ধ করিবে, এমনই একটা বিচিত্র কল্পনা বুকের মাঝে অকারণ একটা ভয়কে ডাকিয়া আনিতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যায় শৈল আরাম-চেয়ারটার উপর শুইয়া ছিল। বর্ষার মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সোনালী আলো আসিয়া পড়ার মত একটা প্রসন্নতা তাহার সমস্ত অন্তরটাকে ভরিয়া তুলিয়াছিল। মৃদু বাতাসে কাঁপা শতদলের মত চিত্তটা তাহার পুলক-দোলায় দুলিতেছিল। সম্মুখের খোলা আকাশটার পানে চাহিয়া শৈল সুলেখার কথা ভাবিতেছিল! সুলেখার পিতার কাছে সে সুলেখার পাণি-প্রার্থনা জানাইয়াছে, মিত্র সাহেবও সানন্দে সম্মতি দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, বৈশাখের প্রথমেই বিবাহটা ঘটিবে। সম্মুখে ফাল্গুন মাস, কিন্তু এ মাসে বিবাহ শৈলর বিশেষ আপত্তি! কারণ, প্রথম বিবাহ তাহার ফাল্গুন মাসেই ঘটিয়াছিল!

সুলেখাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনটা তাহার কিরূপ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিবে, কল্পনার রঙ্গীন তুলিতে মানস-পটে সেই চিত্র আঁকিতে চিত্ত তাহার আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছিল!

কিড়িং কিড়িং করিয়া সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ-পিয়নের ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরে সজোরে আওয়াজ শোনা গেল,—"জরুরী তার"। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রূপালী ট্রেতে করিয়া নেপালী বয় একখানি লেফাপা আনিয়া শৈলর সম্মুখে ধরিল।

যন্ত্রচালিতের মত একটা সই দিয়া টেলিগ্রাফখানি খুলিয়া শৈল নিঃশব্দে লেখা কয়টার পানে চাহিয়া রহিল। লেখা ছিল,—

"আজ সন্ধ্যায় আমি একা রওনা হইলাম।

ব্রজমোহন।"

শৈলর মাথাটা ভারী হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। দেহটা ঘামে ভিজিয়া উঠিল! যাঁহার অর্থে ও যত্নে শৈল আজ দশ জনের এক জন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, যাঁহার কাছে নিজেকে সারা জীবন ঋণী জ্ঞান করিয়া অন্তর তাহার কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, এবং যে পূজ্যতম সুহৃদের নামে সমস্ত মন-প্রাণ তাহার গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে, সেই পরম উপকারক পিতৃপ্রতিম শৈলর একান্ত জেদের নিমন্ত্রণ এড়াইতে না পারিয়াই তাহার কাছে আসিতেছেন জানিয়াও এই জ্যোৎস্নাভরা ফাল্গুন-সন্ধ্যাটার মাঝে ক্ষণপূর্ব্বে সে নিজের অন্তরে অন্তরে যে আনন্দটুকু উপভোগ করিতেছিল, নিমেষে তাহা অন্তর্হিত হইয়া শীতের কুয়াসাভরা দিনটার মত সমস্ত চিত্ত একটা অস্বোয়াস্তিতে ভরিয়া উঠিল।

অর্দ্ধেকটা রাত অবধি সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম চিন্তার মধ্যে কাটাইয়া শেষের দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম যখন ভাঙ্গিল, চোখ মেলিয়া সে চাহিয়া দেখিল, ঘড়ির কাঁটায় আটটা।

শৈল ধড়-মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া মোটর-বাবুকে গাড়ী বাহির করিবার আদেশ দিল।

হাত মুখ ধোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ত্বরিত-হস্তে চা খাওয়া, কাপড় বদল করা—ছোটখাট কাযগুলা সম্পন্ন করিয়া শৈল বারাণ্ডায় পা দিতেই সম্মুখের বারাণ্ডায় সুলেখাকে দেখিতে পাইল। কপালে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার সারিয়া হাসিমুখে সুলেখা কহিল, "বাবা পাঠিয়ে দিলেন। জ্যাঠা-মণিকে আনতে আপনি যাবেন! আমাকেও আপনার সঙ্গে যেতে তিনি বলে দিলেন।"

পাংশুমুখে জড়িত-কণ্ঠে শৈল শুধু কহিল, "চলো।"

৬

জামাতার কাছে ব্রজমোহন যে কয়টা দিন কাটাইয়াছিলেন, তাহার মাঝে আদর, যত্ন, সম্মান এবং সেবার কোন ত্রুটিই তিনি দেখিতে পান নাই। বরঞ্চ সময়ে সময়ে, তাহার আতিশয্যে ব্রজমোহন বিব্রত হইয়া পড়িতেন। তথাপি যে প্রকাণ্ড আশা লইয়া তিনি পাটনায় আসিয়াছিলেন, মনের মাঝে যে কামনাটা সংগোপন রাখিয়া জামাতাকে তিনি পুত্র-স্নেহে পোষণ করিতেছিলেন, ব্রজমোহন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়া গেল।

জামাতাকে মুখ ফুটিয়া এ বিষয়ে অনুযোগ করিবারও তাঁহার কিছু ছিল না। তাঁহার অন্তরের একান্ত বাসনার অতি সামান্য ইঙ্গিত অবধি তিনি কোন দিন জামাতাকে দেন নাই। হায় রে অদৃষ্ট! এ ইঙ্গিত কি কেহ দিতে পারে? ব্রজমোহন শুধু প্রতীক্ষা করিতেছিলেন মৃত্যুর! সেই চরম আসন্নকালে শৈলর কাঁধে তিনি সকল দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্তে দুই চোখ চিরতরে মুদিত করিবেন

মানুষ যখন বিশেষ করিয়া কোন একটা কিছু প্রার্থনা করে, সেই কাম্যই তখন দূরে সরিয়া যায়। ব্রজমোহনের রক্তের চাপ বাড়িত, মাথা ঘুরিত,—ডাক্তার চিকিৎসা করিত, বায়ুপরিবর্ত্তন ঘটিত, কিন্তু মৃত্যু মঙ্গলময়রূপে দেখা দিত না।

শৈলর পাশে বন্ধু-কন্যা সুলেখাকে দেখিয়া ব্রজমোহনের বুকের মাঝে একটা সন্দেহের ছায়াপাত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া দাগ টানিয়া দিলেন,—মিত্র সাহেব নিজে। সহাস্যে তিনি ব্রজমোহনের গোচরীভূত করিলেন,—বৈশাখের প্রথমেই শৈল তাঁহার জামাতা হইবে। তাহাদের বিবাহিত জীবনটা যাহাতে শান্তিময় হয়, এ জন্য বন্ধু সমীপে আশীর্ব্বাদও প্রার্থনা করিলেন।

ব্রজমোহন কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নৈরাশ্যের গভীর পীড়ায় অন্তরটা অভিভূত হইয়া পড়িল এবং তাহারই চিহ্ন তাঁহার চোখে-মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ব্যারিষ্টার-সাহেব চকিত হইয়া কহিলেন, "ব্রজর কি অসুখ করেছে?"

প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসংযম করিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "শরীরটা ভাল যাচ্ছে না? রাত্রেও ভাল ঘুম হয়নি।"

ইহার পরদিন শৈলকে ডাকিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "আমি আজ ক'লকাতায় যাব।"

বিস্মিত চোখে শ্বশুরের মুখের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "এত শীগ্‌গীর? এখানকার সিজন্‌টা ত এখন বেশ ভাল।"

ব্রজমোহন ম্লান হাসিয়া কহিলেন, "না বাবা! আমার শরীরটা এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে সুট্ কচ্ছে না। আমায় যেতে হবে।"

নিজের শরীরের যে অসুস্থটাকে নির্ব্বিকারে ব্রজমোহন জল-বায়ুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন, শ্বশুরের একান্ত ক্লান্ত মুখ ও নিষ্প্রভ চোখের পানে চাহিয়া জামাতা সেইটাকে অসংশয়ে মানিয়া লইল। তাই থাকিবার অনুরোধ আর তাহার ওষ্ঠে আসিল না। শুধু দুঃখপ্রকাশ করিল!

৭

ব্রজমোহনের ধমনীতে রক্তের চাপ হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। চিকিৎসকরা ভয় পাইলেন! বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন! উত্তেজনাকর চিন্তারও নিষেধ হইল

ব্রজমোহনের পাংশু মুখের উপর একটা অতি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অনিলা পিতার কপালের উপর নিজের কোমল হাতখানি মৃদু বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "বাপি! তোমায় কি এখন ফলের রস দেব?"

"দিবি? তা দে, মা! অনু! তোমার মা কি কচ্ছেন?"

"ঠাকুর-ঘরে পূজো কচ্ছেন।"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "ও বেশ নিশ্চিন্তে আছে। আঃ! আমি যদি অমনি পারতুম, তা হলে এত যন্ত্রণা—"

বাধা দিয়া অনিলা কহিল, "বাপি, তুমি বড্ড ছট্‌ফট্ কচ্ছ! ডাক্তার ও-রকম করতে মানা করেছেন।"

. কন্যার হাতটা সাগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "তা জানি, মা! কিন্তু তারা ত আমার মনের জ্বালা জানে না।" ব্রজমোহন পাশ ফিরিয়া চোখ মুদিলেন; মুহূর্ত্তে চাহিয়া আবার কহিলেন, "উঃ! কি ভুলটাই করলুম! জীবনে প্রত্যেক পা ভুল করেই ফেলে এসেছি। আজ বাঁচ্‌তে চাইলেই বা বাঁচ্‌তে পাব কেন? আমি যে অনুক্ষণ মরণকে ডেকেছিলুম।"

অনিলা শিহরিয়া উঠিল। পিতার বুকজোড়া দুঃখটাকে সে মন-প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারিত। কিন্তু সেই মর্ম্মান্তিক দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছায় জনক যে অনুক্ষণ নিজের মৃত্যু-কামনা করিতেন, তাহার সংবাদ কেহ জানিত না। আঠার বছরের তরুণীর পক্ষে যে এরূপ সংবাদ জানাও কঠিন; কাণ ও বুদ্ধির মাঝে তখন যে একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার দাঁড়াইয়া থাকে যাহাকে ভেদ করা দুঃসাধ্য। তাই অতীব এই সত্যবাণীটা শুনিয়া তাহার পা হইতে মাথার চুল অবধি যেন বার-বার কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

পিতার চিন্তার ধারাটা অনিলার অগোচর ছিল না। সে চিন্তা যে দুঃসহ, তাহাও সে বুঝিত ; কিন্তু সে চিন্তার ধারা এমন চরমে উঠিয়াছে, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও অনিলার কল্পনায় আসিত না।

তাহারা দুইটি বোন একই সঙ্গে বসন্ত রোগে আক্রান্তা হইয়াছিল। দুরন্ত ব্যাধি তাহার দিদিকে মৃত্যুর রাজ্যে টানিয়া লইল এবং নিজের কিঞ্চিৎ ক্ষুধা উপশম করিয়া ভোজন-দক্ষিণা লইল—অনিলার দক্ষিণ নেত্র। সে নিষ্ঠুর যে একদিন আসিয়াছিল, এ কথা কোন দিন যাহাতে কেহ বিস্মৃত না হইতে পারে, তাহারই অমোঘ চিহ্ন সে আঁকিয়া রাখিয়াছিল অনিলার সারা দেহে।

একটিকে হারাইয়া এবং অপরটির রূপশ্রীহারা মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ব্রজমোহন-গৃহিণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মস্তিষ্ক দুর্ব্বল করিয়া বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিলেন এবং যে দয়াময় দেবতা তাঁহার সংসারের উপর এমন নির্ম্মম অমঙ্গল বর্ষণ করিলেন, তাঁহারই দয়া উদ্রেকের আরাধনায় ব্রজমোহন-গৃহিণী দিনের অধিকাংশ সময় ঠাকুর-ঘরে কাটাইয়া দিতেন। ভগ্নশ্রী সংসারটার পানে তিনি আর ফিরিয়া চাহিতেন না। লোকে বলিত, পূজোটা শেষে বাতিকে দাঁড়াইল।

ব্রজমোহন নিজে কোনদিন পূজা-জপ করিতেন না, তবে দেবতার অর্চ্চনায় পত্নীকে বাধাও দিতেন না। যদি শোকাহতা নারীর অনর্গল চোখের জলের পূজায় সেই নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত সত্য সনাতনের চিত্ত চঞ্চল হয়।

পাশ ফিরিয়া ব্রজমোহন ডাকিলেন, "অনি, মা!"

"—কি বাবা" বলিয়া অনিলা মুখ নত করিতেই তিনি কহিলেন, "শৈলকে তুই একখানা চিঠি লেখ মা, আমার মনের সব ইচ্ছা জানিয়ে!"

অনিলা চমকিয়া উঠিল। জনক যদি কহিতেন, অনি, তুই অমুককে খুন করিয়া আয়, মা ; তাহা হইলে বোধ করি সে এমন করিয়া ভয় পাইত না। পলকে তাহার মুখখানি ছাইয়ের মত সাদা হইয়া ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কন্যার শোণিতলেশহীন মুখের পানে—কম্পিত ওষ্ঠাধরের পানে চাহিয়া ব্রজমোহন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার ক্লান্ত চোখে-মুখে একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "বুঝতে পাচ্ছি, মা, এ কায তোর পক্ষে কতখানি কঠিন!"

ব্রজমোহন থামিলেন, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি নিজেও চেষ্টা ক'রেছিলুম তাকে এ কথা বলবার, কিন্তু প্রত্যেক বারই বেধে গেছে! মনে হ'য়েছে, তার চোখে আমি কশাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ব।"

অনিলা আস্তে আস্তে কহিল, "এত দুঃখ ভোগ ক'রবার দরকার কি, বাবা! বিয়ে কি প্রত্যেক মেয়েকেই ক'রতে হবে? যার রূপ আছে, সুবিধা আছে, সে করুক! কিন্তু যার তা নেই! এত দুঃখ করে তা' পাবার প্রয়োজন কি?"

বিদ্যুৎবিকাশ যেমন চকিতে, অন্ধকারে অদৃশ্য অনেক বস্তুকে এক নিমেষের জন্য টানিয়া বাহির করে, তেমনই অনিলার জীবনের একটা সঙ্কল্প মুহূর্ত্তের জন্য ব্রজমোহনের চোখে উদ্ভাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাঁহার সারা মুখ নিবিড় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে তিনি কহিলেন, "সারা জীবনটা ধ'রে তোর বিয়ে দেবার কথাটাই ভাবছি। না দেবার চিন্তাটা ত কোন দিন মনের মধ্যে উদয় হয় নি ; তাই যখন ভিতরে সামর্থ্য শেষ হ'য়ে যাচ্ছিল, তখন কোন কথা না ভেবে শৈলর বিলেতের খরচ মাসে মাসে চারশ' করে টাকা জুগিয়ে এসেছি, শুধু এই একটি লোভে! পাটনার বাড়ী তারই জন্যে কিনে রেখেছিলুম—ভবিষ্যতের উন্নতি তার ঐখান হ'তে হবে ব'লে। তা না হ'লে সুনীলা আমার অনেক দিন চলে গেছে! শৈলর পিছনে এত টাকা ঢেলেছিলুম শুধু এই একটি কামনায়! দেনা ক'রে তার মোটর কিনে দিয়েছি, বাড়ী সাজিয়ে দিয়েছি কৃতজ্ঞতার বোঝাটা ভারী ক'রে দেবার জন্যে। যে দিন উপকার চাইব, আমার উপকারের নাগপাশ সে দিন সে খুলতে পারবে না—সম্মতি দেবে।"

কন্যা-স্নেহে পিতা কেমন করিয়া পরের ছেলেকে আপন করিবার জন্য বাঁধনের উপর বাঁধন দিয়াছিলেন, তাহারই কাহিনী শুনিতে শুনিতে নিজের উপর অনিলার কেমন একটা উৎকট বিতৃষ্ণা জাগিতেছিল। ধীরকণ্ঠে সে কহিল, "বাবা, এমন ক'রে কোন কিছুই চাইতে নেই। এ অসম্ভব চিন্তা তুমি ত্যাগ কর।"

"কেন ছাড়ব, মা? আমি কি সাধ্যের অতিরিক্ত করি নি? অনিলা, তোমার চোখেও কি আমি স্বার্থপর হ'য়ে ফুটে উঠেছি?

কিন্তু ভেবে দেখ দিকি, এটর্ণীগিরিতে পসার অনেক দিন আমার ফুরিয়েছিল। বাইরের বড়মানুষী ঠাট বজায় রাখতে আমি দেনার পাকে কি ভয়ানক-ভাবে জড়িয়ে পড়লুম, তা ত তোমার অবিদিত নেই! সেই সময়ে ভদ্রাসন বাঁধা দিয়ে তোমাদের মাথা-গোঁজবার স্থান না রেখে আমি তার খরচ বহন ক'রেছি। কেন করেছি? শুধু ঐ একটি আশা মনে করেই ত?"

অনেক কথা এক সঙ্গে কহিয়া ব্রজমোহন হাঁপাইয়া পড়িলেন। কপালের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। অনিলা ব্যস্ত হইয়া ভৃত্যকে আইসব্যাগ ভরিয়া আনিতে বলিয়া অডিকলোনের পটীটা টেবলের উপর হইতে তুলিয়া লইল।

প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে রোগী যেমন বিকারের রক্ত-আঁখির শূন্যদৃষ্টি মেলিয়া একবার ঝাঁপাইয়া উঠে এবং পরমুহূর্ত্তে নির্জীব হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়ে, তেমনই করিয়া ব্রজমোহন তাঁহার রক্ত-আঁখি মেলিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। পর-মুহূর্ত্তে শয্যায় এলাইয়া পড়িলেন। পিতার রক্ত-নেত্রের পানে চাহিয়া অনিলা শিহরিয়া উঠিল! ভীত-কণ্ঠে কহিল, "আমি ডাক্তারকে ফোন্ কচ্ছি।"

"কেন আমার ত কোন অসুখ করেনি!" ম্লান দীপ্তিহীন অপরাহ্নের আলোর মত একটা ক্লান্ত হাসি ব্রজমোহনের ওষ্ঠ-প্রান্ত দিয়া গড়াইয়া পড়িল! "উঃ—অনিলা, বড্ড গরম!"

অনিলা ত্রস্তে উঠিয়া ফ্যানের রেগুলেটার পূর্ণ-বেগ করিয়া দিল। রক্তের চাপ এখন কতখানি, তাহা জানিবার জন্য সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

ভৃত্য আসিয়া বরফের থলিটা অনিলার হাতে দিল, অনিলা তাহাকে কহিল, "শীগ্গীর ডাক্তার সাহেবকে ফোন্ কর্ত্তে বল। আর অবনী বাবুকে ডেকে দাও।"

নিদারুণ ভয়ে অনিলার ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিতে-ছিল! প্রাণপণ চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করিয়া পিতার মাথায় আইসব্যাগটা চাপিয়া ধরিতেই তিনি হাত দিয়া অনিলার বাম হাতখানা টানিয়া লইলেন।

পিতার মুখের উপর মুখ নত করিয়া অনিলা কহিল,—"কি চাই, বাবা?"

মেয়ের বাম হাতখানা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ব্রজমোহন কহিলেন, "এইখানে হাত দে, দেখ্, শৈলকে আমি কত ভালবাসি, সে আমার ছেলে।"

ডান হাতে বরফের থলিটা জনকের মাথায় চাপিয়া ধরিয়া বাম হাতখানি সে পিতার বুকে বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সেবারতা কন্যার একান্ত ভীত পাংশু মুখের পানে ব্রজ-মোহন একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, কহিলেন, "অনিলা, তোমাদের কি দাদা আছে যে, তার হাতে তোমায় আমি দিয়ে যাব? তোমার মা পাগল, তাকেই বা আমি কার কাছে দিয়ে যাব! না, আমি যাব না! ডাক্তার—"

পরিচিত মোটরের হর্ণ রাস্তার দূরে শ্রুত হইল। অনিলা আশান্বিত হইয়া কহিল,—"এই যে তিনি এলেন ব'লে!"

ব্রজমোহনের ইতস্ততঃ দৃষ্টি একবার কক্ষের চারিপাশে ঘুরিয়া আসিল। তিনি কহিলেন, "নিজের জন্য অনিলা তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একবার কল্পনার চোখে আমার মত দেখ, তুমি চ'লে গেছ; আর সুনীলা—তোমার মতই অঙ্গহীন, কুৎসিত মূর্ত্তি নিয়ে বেঁচে আছে! তা হ'লে কি শৈল তাকে ত্যাগ ক'রত, না নিজের মন্দ অদৃষ্ট ব'লে বিনা দ্বিধায় তাকে গ্রহণ ক'রত?" ব্রজমোহন উত্তেজিত হইয়া সজোরে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন,—অনিলার হাত হইতে আইসের ব্যাগটা পড়িয়া গেল। ব্রজমোহনের ললাটের স্ফীত শিরাগুলা ভয়ানক—স্থূল হইয়া উঠিল। দেহের সমস্ত রক্ত যেন মগজের শিরা, উপশিরা ছিঁড়িয়া দিতে ঊর্দ্ধপথে ছুটিয়া সারা মুখখানিকে আরক্তিম করিয়া তুলিল।

"-বাবা কি কচ্ছ—" বলিয়া অনিলা পিতাকে ধরিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু ব্রজমোহনের সংজ্ঞাহারা দেহটা তাহার পূর্ব্বেই শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যু তাহার অশরীরী হাতে ব্রজমোহনের প্রশস্ত ললাটের উপর নিজের গাঢ় কালিমা ছিদ্রহীন করিয়া লেপিয়া দিতে লাগিল!

দুয়ারের বাহিরে জুতার আওয়াজ হইল। অবনী বাবু দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া ডাক্তার রায়কে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৮

ফাল্গুনের ঈষৎ-উষ্ণ বেলা-শেষে সদ্য-ফোটা ফুলের গন্ধভরা ঝিরঝিরে বাতাস, খোলা বারাণ্ডার উপর চেয়ারে উপবিষ্ট দুই জন তরুণ-তরুণীর চোখে-মুখে বুলাইয়া তাহাদের চিত্তে পুলকের শিহরণ দিতেছিল।

ব্যারিষ্টার শৈলেন্দ্রনাথ তাহার বাক্‌দত্তা পত্নী সুলেখার পানে চাহিয়া কহিল,—"লেখা, দেখ ত নেক্‌লেসের ডিজাইনটা তোমার পছন্দ হয় কি না? শাড়ীগুলো পছন্দ হ'য়েছে?" বলিয়া নীল মক্‌মলের কেস খুলিয়া একটা মূল্যবান্ নেক্‌লেস্ তাহার সম্মুখে ধরিল।

অলঙ্কারটার পানে চাহিয়া তরুণী সুলেখার দুই চোখে যেন প্রশংসা উপচাইয়া পড়িল। আনন্দিত কণ্ঠে সে কহিল,—"চমৎকার।"

হাসি হাসিমুখে সুলেখার মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দুষ্টামীভরা কণ্ঠে শৈল কহিল, "তোমার চেয়ে?"

"ইস্, তা বই কি? আমি কি—" সুলেখার কথাটা সমাপ্ত হইল না। টেলিগ্রাফ-পিওন হাঁকিল—"জরুরী তার!" আলোকিত নির্ম্মল আকাশের গায়ে চলন্ত মেঘের ছায়া-রচনার মত ব্যারিষ্টার সাহেবের মুখে অকস্মাৎ একটা উদ্বেগের ছায়াপাত হইল। সই দিয়া টেলিগ্রামখানি পড়িতেই হাতটা কাঁপিয়া উহা মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

শৈলর মুখের পানে চাহিয়া সুলেখা ভীত হইয়া কহিল, "দেখি" বলিয়া ভূমি হইতে কাগজখানি তুলিয়া লইয়া পড়িয়া গেল—"বাবা সংজ্ঞাহীন। আসন্ন অবস্থা। সত্বর আসুন।
অনিলা বোস।"

সুলেখা কহিল,—"নিজের শালী আছে না কি?"

অস্পষ্টকণ্ঠে শৈল কহিল, "শুনেছি। চোখে দেখিনি!"

সুলেখার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল,—"আশ্চর্য্য!"

কথাটা কিন্তু শৈলর কাণে গিয়াছে বোধ হইল না। সে সম্মুখের টেবলটার পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মানসদৃষ্টির সম্মুখে সে কাহাকে দেখিতেছিল? সৌম্য প্রশান্ত প্রৌঢ়ের আননে আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার চারিপার্শ্বে চিকিৎসক ও আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। অনুপস্থিত শুধু শৈল! পুত্রস্নেহে যে শ্বশুরের শোকতপ্ত বুকখানা জুড়িয়া আছে!

সুলেখা কহিল, "এখন কি তুমি যাবে সেখানে?"

সুলেখার কণ্ঠস্বরে শৈল যেন সম্বিৎ পাইল। চকিত হইয়া কহিল, "নিশ্চয়! তাঁর এ রকম অবস্থায় আমার পক্ষে না যাওয়া অসম্ভব, লেখা।" শৈলর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

মৃদুকণ্ঠে সুলেখা কহিল,—"আমিও তাই বলি! তা হ'লে সময় আর কোথা?"

ঘড়ির পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া শৈল কহিল, "আর আধ ঘণ্টা আছে। তার মধ্যে ট্রেণ ধ'রতে পারব, গোছাবার কিছু দরকার নেই। শুধু ব্যাগটা নিয়ে যাব। হ্যাঁ লেখা, এগুলো তাহ'লে তোমার কাছেই থাক। তোমার বাবার কাছে আর বিদায় নেবার সময় হবে না। তুমি আমার অবস্থাটা তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল, সুলেখা!"

সুলেখা কহিল, "বাবা যদি জান্‌তে চান তুমি কবে ফিরবে?"

"কবে যে ফিরব, কিছু ত ব'ল্‌তে পাচ্ছি না সু,—ঘটনাচক্র কোথা যে টান্‌ছে—"

সুলেখা শৈলর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "অর্থাৎ?"

সহজ কণ্ঠে শৈল কহিল, "এর মাঝে জটিলতা কিছু নেই। যদি তাঁর ভালমন্দ কিছু ঘটে!" শৈলর দুই চোখ অশ্রুতে চকচক্ করিয়া উঠিল, কহিল, "তাই বলছিলুম। তবে এটা নিশ্চিত, আমি ঠিক আমাদের বিয়ের সময়ের মধ্যে ফিরে আসব। ভগবান শুভ করেন ত কালই চ'লে আসতে পারি। তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি"—শৈল সুলেখার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একটু চাপ দিয়া কহিল,—"আমার বিপদ বুঝ্‌ছ!" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

শৈলর মোটর অনেকক্ষণ সুলেখার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তরুণীর ধ্যান-নেত্রের সম্মুখ হইতে তাহা যেন সরিয়া যায় নাই। কাণের কাছে তখনও যেন শৈলর কথাগুলা বাজিতেছিল। চাপরাশি দুইবার আসিয়া ফিরিয়া গেল। তথাপি সেই নেক্‌লেসের বাক্সটা হাতে লইয়া সুলেখা মূর্ত্তির মত বারাণ্ডার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের গায়ে পুঞ্জে-পুঞ্জে জড় হওয়া মেঘরাশি নিজেদের হাল্কা করিবার জন্য বৃষ্টি ছড়াইতে আরম্ভ করিল। তখন তাহারই স্পর্শে সুলেখার হুঁস হইল—শৈলর বাড়ীতে সে একাকী! শৈল অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে এবং আরও জানিতে পারিল যে, নিজের চোখের জলে তাহার বুকের বসনটা সিক্ত হইয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ধানের মঞ্জরী

[শিল্পী—শ্রীঅমলা ঘোষ

বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীরাধা

২

শ্রীকৃষ্ণবিজয় :—

খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদ করেন (১৪৭৩ খৃঃ)। এই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতারূপে পূজা করিয়া কৃতার্থা হইয়াছেন। কবি মালাধর বসু দানলীলা অধ্যায়ে শ্রীরাধাকে অপূর্ব্ব ভাব ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা করিয়া তুলিয়াছেন। ভক্ত ও ভগবানের এই সম্বন্ধ তুলিয়া দিয়া কবি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। কারণ, ভক্ত ও ভগবানের যে সম্পর্ক, সে সম্পর্কে নায়িকা (ভক্ত) নায়ককে (ভগবানকে) পূজা করিতে পারেন, কিন্তু বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন দিতে পারেন না। চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন—

"কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।"

ভাগবতের বিভিন্নতা তুলিয়া দিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমিক ও শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে প্রেমিকারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পারখণ্ডে যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নৌকাখানি ইতস্ততঃ আন্দোলন করিতেছেন, তখন গোপীগণ নির্ভয়ে পার হইবার আশায় শ্রীকৃষ্ণকে নানারূপ উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিতে চাহিলে 'শ্যাম সুনাগর নটবরশেখর' শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই লীলাবিলাস যাজ্ঞা করিলেন। "প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।" শ্রীরাধা এ স্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর করিলেন—

"কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।
নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই॥"

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র কবি ভক্ত ও ভগবানের ব্যবধান তুলিয়া দিয়া প্রেমকে চরম সার্থকতা প্রদান করিতে এবং মাধুর্য্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটক প্রণয়ন করেন। প্রথমে 'বিদগ্ধমাধব' এবং পাঁচ বৎসর পরে 'ললিতমাধব' রচিত হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনাই এই নাটকদ্বয়ের উদ্দেশ্য।

বিদগ্ধমাধব :—

'বিদগ্ধমাধবে' শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সহায়ক পৌর্ণমাসী, নান্দীমুখী, ললিতা ও বিশাখা, শ্রীরাধার লোকতঃ অভিমন্যুর সহিত বিবাহ হইলেও শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী। 'বিদগ্ধমাধবে'র প্রথম অঙ্কে আমরা শ্রীরাধাকে দেখি : তিনি বলিতেছেন :—

"নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীন-গৃহিণীগণ-গর্হনীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি।"

'কদম্বকাননের মধ্য হইতে কি এক শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল এবং আমি কুলীন-গৃহিণীগণের নিন্দনীয় দশা প্রাপ্তা হইলাম।'

দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীরাধা অসুস্থা। এ রোগের ঔষধ শ্রীকৃষ্ণদর্শন বলিয়া নান্দীমুখী নির্দ্ধারণ করিলেন। পৌর্ণমাসীর উপদেশানুযায়ী শ্রীরাধা একখানি লিপিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট লিখিলেন, ললিতা পত্রবাহিকারূপে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পত্রখানি প্রদানানন্তর তাঁহার গলার মালা লইয়া আসিলেন। সেই মালার গন্ধে শ্রীরাধার মূর্চ্ছা অপনোদন হইল। এই অঙ্কে কবি পূর্ব্বরাগের দশমী দশা পর্য্যন্ত প্রদর্শন করাইয়াছেন। এই অবস্থার ভাব বড় মধুর এবং করুণ। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মারোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং।
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥"

শ্রীরাধিকা সকাতরে সখীদিগকে অনুরোধ করিতেছেন, যাহাতে তাঁহারা যেন শ্রীরাধার দেহ মৃত্যুর পরে তমালবৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিয়া রাখেন। তাহা হইলেই তাঁহার দেহ চিরকাল অবিচলভাবে বৃন্দাবনেই বাস করিবে।

সম্পূর্ণ অঙ্কটির সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যেখানে যেখানে শ্রীরাধা-চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই সব স্থল বর্ণনা এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

তৃতীয় অঙ্কের নাম 'রাধাসঙ্গ'। এই অঙ্কের সমস্ত-অংশই নায়কের পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সুতরাং এ প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্যবিষয়বহির্ভূত। শেষাংশে বর্ণিত আছে—বিশাখাকে প্রিয়সকাশে প্রেরণ করিয়া শ্রীরাধিকার আর উৎকণ্ঠার সীমা নাই। নানারূপ চিন্তায় তাঁহার মন আন্দোলিত হইতেছে। তার পর ললিতা, বিশাখা সকলেই আসিল। রাতকাণা মুখরা (যশোদার ধাত্রী) আসিয়া ক্ষণকালের জন্য প্রিয়-মিলনে বাধা রচনা করিল। অবশেষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন সংঘটিত হইল।

চতুর্থ অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয় 'বেণুহরণ'। এখানে চন্দ্রাবলী ও শ্রীরাধার চরিত্রগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাবলী-প্রেম-লাভ সুলভ, কিন্তু শ্রীরাধা-প্রেম সহজলভ্য নহে। 'শ্রীরাধা প্রখরা, চন্দ্রাবলী মৃদু, শ্রীরাধা বামা, চন্দ্রাবলী দক্ষিণা, শ্রীরাধার মধু-স্নেহ আর চন্দ্রাবলীর ঘৃত-স্নেহ।'

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলী-কুঞ্জে গমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এদিকে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য তমোভিসারিকার উপযোগী বসন-ভূষণে দেহ আবৃত করিয়া ললিতা সহ ঘোরা যামিনীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া মৃদু-পাদ-বিক্ষেপে গমন করিতেছেন। এ অবস্থায় তিনি—

নিকট সঙ্কেত সময় আইল, শুনে রসময়ী মুরলী গাইল
ধরি ধনুঃশর মদন ধাইল, চলে নিধুবনে কামিনী।
পিক কলকলি সারিশুকধ্বনি, ফুটে বনফুল ভ্রমর গুণ্‌গুণী
তাহাতে মিলিত নূপুর রুণ্‌রুণী, শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী॥
বাছিয়া পরিলেক নীল অম্বর, মদন হেম গৃহে মেঘ ডমর,
পথিকজন ডর করিতে সম্বর, ঝাঁপিল তাহে তনু দামিনী॥
মদন সরসিজ গন্ধবৃত মন, মোহিত সহচরী ভ্রমর-শিশুগণ
তথি মলয়াচল গতি মন্দপবন, বাওল দ্রুত সখী যামিনী॥

তার পর ললিতার পরামর্শে কুঞ্জ সজ্জিত করিয়া বাসক-সজ্জিকার ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন। রাত্রি যায় যায়, তবু শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। শ্রীরাধিকা ক্রমে ক্রমে উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা অবস্থা প্রাপ্তা হইয়া ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, অভিমানের চিহ্ন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাইলেন। সারা কুঞ্জ যেন শ্রীরাধিকা-বিরহে কাতর হইয়াছে। এমনই সময়ে ললিতা ও বিশাখা সহ শ্রীরাধিকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণদর্শনে অভিমানবশতঃ শ্রীরাধিকা কঠোরতার আশ্রয় লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রীত্যর্থে নানাপ্রকার অনুনয়-বিনয়াদির পরে পুষ্প প্রদান করিবার কালে শ্রীরাধার নয়নযুগল-দর্শনে আত্মবিহ্বল হইয়া মুরলীটি পর্য্যন্ত দান করিয়া ফেলিলেন। শ্রীরাধিকার বিপ্রলব্ধা অবস্থার পরবর্ত্তী এই অবস্থার নাম খণ্ডিতা। মুখরা আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইবেন, কিন্তু বাঁশী খুঁজিয়া পান না। শ্রীরাধিকা প্রভৃতিকে চোর সাব্যস্ত করায় অনর্থক তিরস্কার লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেদিন বাঁশী না পাইয়া চলিয়া গেলেন।

এই বংশীহরণ ব্যাপারে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র কিঞ্চিৎ আভাস দৃষ্ট হয়। পার্থক্য এই—এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বংশীটি দান করিয়া ফেলিয়াছেন, আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের শিয়র হইতে বংশী অপহরণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বর্ণিত ব্যাপারে অন্য কিছু সাদৃশ্য না থাকিলেও উভয় গ্রন্থে যে শ্রীরাধিকা এই বংশীহরণের ফলভোগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা পাই।

পরবর্ত্তী অঙ্কে শ্রীরাধিকার অবস্থা কলহান্তরিতার ন্যায়। বৈষ্ণব-পদাবলীর মতে শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—

"আপন শিরোহা আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবরশেখর
কাহা সখি করল পয়ান॥"

শ্রীরাধা আজ বলিতেছেন :—

"কর্ণান্তে ন কৃতা প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো
মল্লীদামনিকামপথ্যবচসে সখ্যৈ রুষঃ কল্পিতাঃ।
ক্ষৌণীলগ্নশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ
স্বান্তং হন্ত মমাদ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহ্যতে॥"

হায়! কেন আমি প্রিয় প্রতি বিমুখ হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না। শ্রীরাধার কখনো শঙ্কা, কখনো উৎকণ্ঠা, কখনো বা ক্রোধ হইতেছে। হঠাৎ ললিতা আসিলেন। তৎপর নান্দীমুখী, পৌর্ণমাসী আসিলে শ্রীরাধা প্রিয়ের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশাখার পরামর্শে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বাতাসের দিকে মুখ করিয়া ধরিয়াছেন, বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বাঁশীর শব্দে জটিলা শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া আসিয়া শ্রীরাধা-হস্তে বাঁশী দেখিয়া কাড়িয়া লইলেন। বৃন্দাদেবীর চক্রান্তে বাঁশীটি বৃন্দাদেবীর হস্তে ফিরিয়া আসিল। অভিমন্যু আসিয়া শ্রীরাধাকে চণ্ডিকা পূজার উপকরণাদি সহ চৈত্যবৃক্ষতলে গমন করিতে নিদেশ দিলেন। ললিতা ও বিশাখা এই আদেশে বিশেষ দুঃখিতা হইলেন।

শ্রীরাধা-বিরহে কাতর শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনার নিমিত্ত এক অভিনব চাতুরীর সৃষ্টি করা হইল। শ্রীকৃষ্ণের নিকট যখন সারা জগৎ শ্রীরাধাময়—

"রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥"

তখন শ্রীরাধাবেশে সুবল এবং ললিতাবেশে বৃন্দাদেবী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদেবীর নিকট হইতে বংশী ফিরিয়া পাইলেন। এমনি সময়ে ক্রোধ-ভরে জটিলা আসিয়া উপস্থিত। শ্রীরাধিকাবেশী সুবলকে পৌর্ণমাসীর নিকটে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। তথায় প্রকৃত তথ্য বাহির হইয়া পড়িলে জটিলা লজ্জিতা হইয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন, প্রকৃত শ্রীরাধা ও ললিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। শ্রীরাধা প্রিয় সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মনে হইতেছে, এখন বিরহকাল। বিরহের ভাবনায় তিনি আকুলা হইয়া পড়িতেছেন। এই অবস্থার নাম প্রেমবৈচিত্র্য।

"নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেমবৈচিত্র্য॥"

সখীগণের সান্ত্বনায় শ্রীরাধা আশ্বস্তা হইলেন। জটিলা পুনর্ব্বার যষ্টির জন্য আসিয়া উপস্থিত। শ্রীরাধিকা ভয়ে ভাবনায় আকুলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু জটিলা শ্রীরাধাকে সুবল ও ললিতাকে বৃন্দা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ অঙ্কে 'শরদ্বিহার' বর্ণিত। সারা নিশি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়া নিশাবসানে শ্রীরাধা চলিয়া আসিবার কালে ভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। জটিলা পীতবস্ত্র শ্রীরাধা-অঙ্গে দর্শন করিয়া সন্দিহান হইয়াছেন। বিশাখা বুঝাইয়া দিলেন, পর্ব্বোপলক্ষে ব্রজরমণীগণ পরস্পর হরিদ্রাময় জল অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধার গাত্রবস্ত্র পীত হইয়াছে। জটিলা বিশ্বাস করিয়া বিশাখা-হস্তে শ্রীরাধার পবিত্রতা রক্ষার ভারার্পণ করিয়া প্রস্থান করিলে চন্দ্রাবলী-সখী পদ্মা আসিয়া ললিতার হস্তে শ্রীকৃষ্ণলিখিত একখানি লিপিকা অর্পণ করিলেন। ললিতা পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সূর্য্য-পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়নের ছলা করিয়া অঙ্কশেষে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাইলেন।

সপ্তম অঙ্কের নাম গৌরীতীর্থবিহার। শ্রাবণ-পূর্ণিমার নিশীথে এই বিহার সম্পন্ন হয়। অভিমন্যুর ইচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সপরিবারে মথুরায় চলিয়া যান। অভিমন্যুর যাহাতে মথুরায় যাওয়া না হয়, যাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন নির্ব্বিরোধে চলিতে পারে, সেই জন্য পৌর্ণমাসী দেবী অভিমন্যুকে কংস-অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত করেন। বৃন্দাদেবী এদিকে শ্রীকৃষ্ণকে নিকুঞ্জবিদ্যা-সাজে সজ্জিত করিয়া শ্রীরাধিকাকে তাঁহার উপাসনারতা করিলেন। নিকুঞ্জবিদ্যার নিকট শ্রীরাধা অভিমন্যুর মঙ্গলার্থে (কংস-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ যাহাতে পায়) উপাসনা করিতেছেন, সরলচিত্ত অভিমন্যু এই চাতুরীতে ভুলিয়া শ্রীরাধার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিদর্শনে মুগ্ধ হইলেন, জটিলা শ্রীরাধাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর মাতা-পুত্র প্রস্থান করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন হইল। নাটক-খানি যবনিকার শেষ রেখা টানিয়া দিল। পৌর্ণমাসী দেবী আনন্দোদ্বেলচিত্তে করুণাময় মাধবের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন।

"প্রথয়ন্ গুণবৃন্দমাধুরীমধিবৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরং।
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্যতু কেলিবিভ্রমম্॥"

ললিতমাধব :—

'ললিতমাধব' নাটকের প্রথম অঙ্ক 'সায়ং উৎসব' লইয়া রচিত। শ্রীকৃষ্ণবলরামাদি গোপবালকগণ ধেনু সহ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলী সাক্ষাৎ, যশোদা-রোহিণীর বাৎসল্য প্রেম প্রভৃতি বর্ণন করিয়া কবি শ্রীরাধাকে ললিতা সহ বকুলকাননে আনয়ন করতঃ দাঁড় করাইয়াছেন। শ্রীরাধা কুন্দলতা প্রমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করিয়াই এক অপূর্ব্ব ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন।—"নাম পরতাপে যার, ঐছন করল গো, অঙ্গের পরশে কি বা হয়।" শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা শ্রবণ করিয়াই শ্রীরাধার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইল। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন, শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। শ্রীরাধা তখন মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলা, তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। 'গৃহে গুরুজন ননদী দারুণ' তাঁহাদের আদেশ ও অধীনে তাঁহাকে বাস করিতে হয়। এই জন্য সুন্দরশ্রেষ্ঠকে নিবারণ করিতে কুন্দলতাকে বলিলেন। এমন সময়ে জটিলা আসিয়া তাঁহাদের নবজাত প্রেমের মধ্যে অলঙ্ঘ্য বাধা রচনা করিয়া দিয়া শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যর্থ-প্রেমিকের ন্যায় অগত্যা গৃহের দিকে ফিরিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয় শঙ্খচূড়বধ। মহারাজ কংস বৃন্দাবনের রমণীহরণের নিমিত্ত ইহাকে নিযুক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যোপাসনারতা শ্রীরাধিকার পূজকরূপে আগমন করিয়া বাহ্য পূজাবসানে কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন। মুখরা আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তরালে গমন করেন। এই সুযোগে শঙ্খচূড় রত্নসিংহাসনোপবিষ্টা শ্রীরাধাকে লইয়া পলায়ন করেন। গোপাঙ্গনাগণ "হা কৃষ্ণ! কোথায়! রক্ষা কর!" ইত্যাদি বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তচ্ছ্রবণে আগমন করিয়া শঙ্খচূড়কে বধ করেন। শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ বিপন্মুক্তা হইলেন। শঙ্খচূড়ের মস্তকের মণি শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে অর্পণ করেন, বলরাম মধুমঙ্গলের দ্বারা তাহা আবার শ্রীরাধাকরে অর্পণ করেন।

তৃতীয় অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয় 'উন্মত্ত রাধিকা'। অক্রূর আসিয়াছেন—কংস-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া যাইবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইবেন, এই ভাবনায় শ্রীরাধিকা ব্যাকুলা হইয়া পড়িয়াছেন। কখনও অক্রূরের প্রতি রাগতা হইতেছেন, কখনো মূর্চ্ছাভিভূতা হইয়া পড়িতেছেন, 'গৃহে গুরুজন, ননদী দারুণ' এ জ্ঞান আজ আর তাঁহার নাই। লোকলজ্জা, সমাজনিন্দা 'সকল'ই আজ প্রেমের নিকট তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। গুরুজনের সমক্ষেই আজ অপলক নেত্রে অশ্রুসজলদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বদনপঙ্কজ নিরীক্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও আজ ভাবাবেশে আকুল। অশ্রু তাঁহার গণ্ডে নিয়ত রেখাপাত করিয়া যাইতেছে। আবার আসিবেন, আবার মিলন হইবে, এই বলিয়া গোপীগণকে প্রবোধ দিতেছেন। প্রকৃতিসুন্দরীও যেন তাঁহাদের এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজবাসী সকলের নয়ন হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। ধীরা, স্থিরা, গম্ভীরা, শ্রীরাধা আজ চঞ্চলা, চপলা, উন্মত্তা। কখনও দৌড়াইতেছেন, কখনও বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন আবার কখনও প্রলাপ বকিতেছেন। শ্রীরাধা বলিতেছেন :—

> "ক নন্দকুলচন্দ্রমা ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
> ক মন্দ্র-মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
> ক রাসরসতাণ্ডবী ক নু সখি মম জীবরক্ষৌষধিঃ
> নিধির্মম সুহৃত্তম ক বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্॥"

বিশাখা শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিতেছেন। কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা' শুনিবে কে? শ্রীরাধার তখন উন্মত্তাবস্থা। শ্রীরাধা চক্রবাকী, বায়স, সারিকা, হরিণী প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ ধরণীতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন। ললিতাকে শ্রীরাধা জ্ঞান করিয়া এবং নিজেকে ললিতা কল্পনা করিয়া বলিতেছেন,—"সখি রাধে, শ্রীকৃষ্ণ কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন, তুমি অভিমান পরিত্যাগ কর।" আবার ললিতার চরণে ধরিয়া বলিতেছেন :—

> "মুকুন্দোঽয়ং কুন্দোজ্জ্বল-পরিসরং কুঞ্জময়তে
> লতালী চ স্মেরা-মধুপতিকৃতৈস্ত্বাং ত্বরয়তি।
> তদত্তিষ্ঠোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্নাং সহচরীং
> দুরাপস্তে মৌগ্ধ্যাদ্বিরমতি বরীয়ানবসরঃ॥"

"হে উন্মত্তে! পদলগ্না সহচরীকে ব্যথিতা করিও না, গাত্রোত্থান কর। মুগ্ধতায় প্রিয়মিলনের শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ অবসর ব্যর্থতায় ভরিয়া দিও না।"

তৎপর শ্রীরাধা ললিতা-বিশাখা সহ পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া শ্রীহরিবিরহে বৃন্দাবনের দুর্গতি অবলোকন করিয়া ব্যথিতা হইলেন। নন্দনন্দন যেন আসিতেছেন, গোবৎসরা যেন হাম্বা রবে ক্রন্দন করিতেছে, এইরূপ নানা চিন্তায় অস্থিরা হইয়া শ্রীরাধা যমুনাপুলিনে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সখীগণ চেতনাসম্পাদন করিলে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-হরণকারী দৈত্যঘটিত স্বপ্ন তাঁহাদের নিকট বিবৃত করিলেন। তৎপর দুঃস্বপ্নজনিত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যমুনাতে স্নান করিবার জন্য ললিতা-বিশাখা সহ অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ যেন নীলপদ্মবনে সন্তরণ করিতেছেন। এইরূপ মনে করিতে করিতে শ্রীরাধা ও বিশাখা সেই যে যমুনাজলে অবতরণ করিয়াছিলেন, আর উঠিলেন না। আকাশবাণী ললিতা, বৃন্দা, মুখরা প্রভৃতিকে জলে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করিলেন এবং আবার মিলন হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণও তদবস্থ। ভগবতী পৌর্ণমাসী ভরতমুনি দ্বারা 'শ্রীরাধার অভিসার' নামক নাটক রচিত করিয়া গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক তাহার অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী হইয়াও শ্রীরাধা-বেশধারী অভিনেত্রীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উদ্ধব তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। শ্রীরাধা (এদিকে) সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তথা হইতে আনীতা হইয়া ললিতা সহ অভিসারে গমন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিলেন। জটিলা পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আসিয়া মিলনের পথে অন্তরায় হইলেন। জটিলার তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে ললিতা এক কোটি গাভী-লাভের আশায় মাধবীমণ্ডলে সূর্য্যপূজার জন্য যাইতেছেন বলিয়া বুঝাইলেন। জটিলা সন্তুষ্টা হইয়া চলিয়া গেলেন। বৃন্দাদেবী ও কুন্দলতা কৌশলে জটিলাকে অপদস্থ করিয়া অভিমন্যুসাজে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া নিরাপদে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইলেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে 'চন্দ্রাবলী-লাভ' ও 'ললিতা-প্রাপ্তি' বর্ণিত। সুতরাং উক্ত প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনা-বহির্ভূত।

সপ্তম অঙ্কে 'নববৃন্দাবন-সঙ্গম' বর্ণিত। সূর্য্যদেবের অনুজ্ঞায় শ্রীরাধা দ্বারকাপুর আসিয়াছেন। সূর্য্যদেব নব-বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরাধা এখানে সম্পূর্ণা পরাধীনা এবং প্রিয় মথুরায় গমন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ধারণা, সুতরাং এমতাবস্থায় কি প্রকারে প্রিয়সঙ্গম হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। পরিচারিকা নববৃন্দা ও বকুলা কিছুতেই তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে পারিতেছেন না। নববৃন্দা-প্রমুখাৎ শ্রীরাধা যখন শুনিতে পাইলেন (যদিও একথা প্রকাশ করিতে নব-বৃন্দাকে নিষেধ করা হইয়াছিল এবং নববৃন্দা যখন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেন), ব্রজেন্দ্রনন্দনই দ্বারকাপতি, তখন তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টা হইলেন। তৎপর শ্রীরাধিকা সখীসহ নববৃন্দাবনকুঞ্জ পরিদর্শনে বহির্গতা হইয়া তথায় বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিলেন। পূজান্তে বিভিন্ন স্থল দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীরাধাবিরহে কাতর মাধব অধুনা দ্বারকাপতি, তৎপর কুঞ্জে আসিয়া স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি ও শ্রীরাধা-প্রদত্ত পুষ্পমাল্য সন্দর্শন করিয়া মধুমঙ্গলের দ্বারা স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি কুঞ্জান্তরে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে তথায় প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীরাধা আবার তথায় আসিলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নববৃন্দাবনে মিলন হইল। শ্রীরাধা মনে করিতেছেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতেছেন, ইনি শ্রীরাধার প্রতিমূর্ত্তি। উভয়ে বিশ্বকর্ম্মার ভাস্কর্য্যের প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীরাধা-অঙ্গস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ আকুল হইলেন, শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বকুলা মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধাকে স্থানান্তরিতা করিলেন। চন্দ্রাবলী আসিয়া ঈষৎ কোপ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টম অঙ্কে 'নববৃন্দাবন-বিহার' বর্ণিত। সত্যভামা বা শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভিক্ষা করিতেছেন। সত্যভামার নিকট ইহা স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। সত্যভামা দেবী বিশাখার জন্য শোক-প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ জটাবল্কলপরিহিতা তপস্যারতা বিশাখার কথা বলিলেন। শ্রীরাধা বিশাখাকে দর্শন করিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন যে, বিশাখার পিতা সূর্য্যদেব স্যমন্তকমণির বিচ্ছেদকালের মধ্যে

প্রিয়সখীর (শ্রীরাধিকা বা সত্যভামা) সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীরাধা এ উত্তরে সন্তুষ্টা হইলেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ নববৃন্দাবন-শোভা শ্রীরাধিকাসহ দর্শন করিতেছেন। নববৃন্দাবন-বিহারের এই আনন্দ শ্রীরাধা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

নবম অঙ্কে 'চিত্রদর্শন' বর্ণিত। চন্দ্রাবলীর নিকট হইতে ছলায় অনুমতি গ্রহণ করিয়া রুক্মিণীবল্লভ নববৃন্দাবনে শ্রীরাধা বা সত্যভামার সহিত মিলিত হইয়াছেন। বিশেষ কোন কারণে উভয়ে স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিয়া ইতস্ততঃ শ্রীরাধার অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময়ে সুকণ্ঠী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রপট দর্শনের নিমিত্ত পর্ব্বতগহ্বরে লইয়া গেলেন। শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল, নববৃন্দা চিত্রপট দর্শন করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে নন্দোৎসব, অসুরাদিবধ প্রভৃতি চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। রাসলীলার চিত্র প্রদর্শন দূরে থাক, রাস কথাটি শ্রবণ করিয়াই শ্রীরাধা অস্থিরা হইয়া পড়িলেন। তৎপর ক্রমে ক্রমে শঙ্খচূড়বধ, বৃষাসুরবধ প্রভৃতি চিত্র প্রদর্শিত হইবার পরে (চিত্রপটে) অক্রূর দেখা দিলেন। অক্রূরের নামেই শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন দ্বারা মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। তৎপর অন্যান্য চিত্রাদি প্রদর্শিত হইবার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রাবলী বা রুক্মিণী আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে নির্ভয়ে ক্রিয়া করিতে অনুমতি দিয়া সঙ্গিনীগণসহ প্রস্থান করিলেন।

দশম অঙ্কের নাম 'পূর্ণমনোরথ'। রুক্মিণী সকল তথ্য সম্যক্ অবগত হইয়া শ্রীরাধাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কোন উপায়েই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দর্শন পান না ; অবশেষে চতুরচূড়ামণি স্যমন্তকমণিসহ সত্রাজিৎ-রাজ-প্রেরিত দাসীর সাজে সজ্জিত হইয়া অন্তঃপুরে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইলেন। স্যমন্তকমণি দর্শনাশায় চন্দ্রাবলী তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ধরা পড়িয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া চন্দ্রাবলীকে কোন রকমে একটা উত্তর দিলেন। শ্রীরাধা ব্যথিতা হইলেন এবং কালিয়হ্রদে প্রাণ ত্যাগের সংকল্প করিলেন। এমন সময়ে ব্রজবাসী পিতা-মাতা, স্বজন-সুহৃদ সকলে আসিয়াছেন, এই সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীসহ তথায় গমন করেন এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। মুখরা প্রভৃতি চন্দ্রাবলীকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকা কালিয় হ্রদে দেহত্যাগে উদ্যতা, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তথায় গমন করতঃ শ্রীরাধিকার উদ্ধারসাধন করেন। ক্রমে প্রমাণিত হইল, শ্রীরাধিকাই সত্যভামা। অবশেষে ব্রজবাসী আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবাদি সমক্ষে সত্যভামার বিবাহ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল।

'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব' নাটকদ্বয়ের উদ্দেশ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমবিলাস নানা রঙে ও নানা ভাবে বর্ণনা করা। প্রথমতঃ একখানি গ্রন্থরূপে রচিত হইবার মত মালমসলা শ্রীরূপ গোস্বামী জোগাড় করেন। কিন্তু পুরীগমনকালে সত্যভামাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় দেবী সত্যভামা শ্রীরূপ গোস্বামীকে তাঁহার ঘটনাবলী ভিন্ন পুস্তকাকারে রচনা করিবার জন্য স্বপ্নে আদেশ দেন। মহাপ্রভুও বৃন্দাবনলীলা বা মাধুর্য্যলীলা ও মথুরালীলা বা ঐশ্বর্য্যলীলার বর্ণনা এক পুস্তকে স্থান পাইতে পারে না নির্দ্দেশ করিলে, শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীরাধালীলা ও দেবী সত্যভামালীলা বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কিন্তু মূলতঃ এক। 'বিদগ্ধমাধবে' শ্রীরাধালীলা এবং 'ললিতমাধবে' দেবী সত্যভামালীলা বর্ণিত হইয়াছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কাব্য-লেখা

কাঁটার মাঝে গোলাপ যেমন ফুটে,
দুঃখ সেঁচে সুখ লহি রে লুটে।
আমার এ যে কাব্য-লেখা, ভাই,
মরুর মাঝে জলের ফোঁটা পাই।

আক নিঙাড়ি' রসটি যেমন আসে,
ঝড়ের মাঝে দীপটি যেমন হাসে,
কাব্য আমার তেম্‌নি ভাতি দেয়,
শুক্‌না ডালে ছোট্ট ফুলের প্রায়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

ভুল

[গল্প]
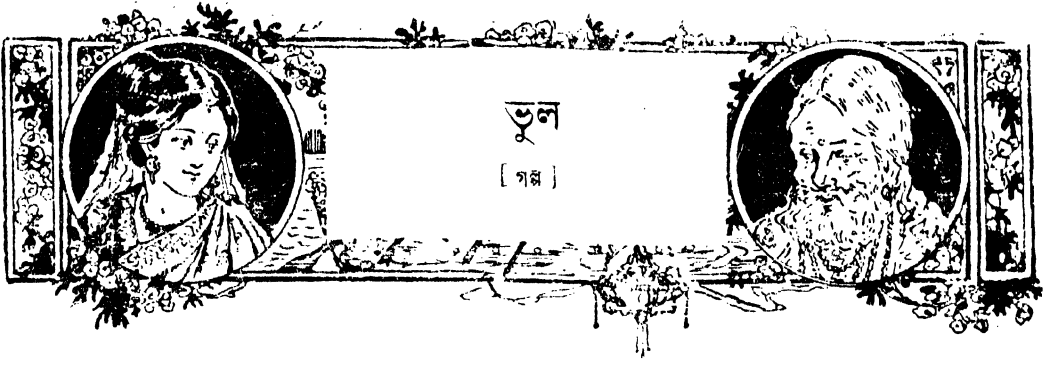
তপতী আর ভূপতির মধ্যে ছন্দজ মিল কিছু আছেই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহাদের চরিত্রের মিল। এই দুইটি নরনারী বিভিন্ন পরিবারে লালিত পালিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশ এবং পচিশের কাছাকাছি পৌঁছিয়া প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এক দিন মিলন-গ্রন্থি বাঁধিয়াছিল। অনেকে মনে করিতে পারেন, বিবাহের পর স্বামি-স্ত্রীতে মরজী-মাফিক কলম চালাইয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া নাম দুইটিকে ঐ ঢংএ দাঁড় করাইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, ইহা বিধাতার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে। কিন্তু ঘটনাটা একটু বিস্ময়কর এবং বৈচিত্র্যময়। তাহাই সংক্ষেপে বলিব।

সে-বারে ইষ্টারের ছুটিতে তপতী গিয়াছিল পুরী বেড়াইতে। এক দিন সমুদ্র-স্নান করিতে করিতে তপতী অকস্মাৎ উত্তাল-তরঙ্গের মধ্যে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া ফেলিতেছিল, সেই অকাল বিসর্জ্জনের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইল ভূপতি। সে তখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—কলেজ হইতে উহারাও প্রায় জন-দশেক এক্সকার্‌শনে বাহির হইয়া পুরীতে ক্যাম্প ফেলিয়াছিল। ওয়াদা পনের দিনের। ভূপতি এক দিন সকলের চক্ষু এড়াইয়া একাকী সমুদ্রের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল! হঠাৎ একটি ঝিয়ের উচ্চ চীৎকারে সচকিত হইয়া দেখিতে পাইল, ঢেউয়ের মধ্য হইতে একজোড়া ব্যাকুল বাহু ঊর্দ্ধে শূন্যে আশ্রয় খুঁজিতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া সেই তরঙ্গবিক্ষোভিত সমুদ্র মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিমজ্জমানা তপতীকে উদ্ধার করিয়াছিল ভূপতি। সহপাঠী সমভিব্যাহারে এক্সকার্‌শনে বহির্গত কলেজের ছেলের পক্ষে ইহার অপেক্ষা রোমাঞ্চকর এড্‌ভেঞ্চার আর কি হইতে পারে? অতঃপর পুরীর ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং পক্ষকালের অবশিষ্ট দিনগুলিই তপতী-ভূপতির বন্ধুত্বের দিক্ দিয়া যথেষ্ট, ইহা সহজেই অনুমেয়। বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক।

তপতীর মা কলিকাতায় ফিরিয়া ভূপতির সহিত তপতীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং অভিভাবক হিসাবে ভূপতির দূর-সম্পর্কের মামা অকিঞ্চন বাবু মেয়ে দেখিয়া খুসীর সঙ্গে সম্মতি জানাইলেন। কারণ, কোন দিক দিয়া বাধার বালাই ছিল না। তবে তপতী-ভূপতির মিলনের পথে একটা দমকা হাওয়া প্রতাপের পক্ষ হইতে খানিকটা জোরের সঙ্গে বহিয়া আসিয়া একটু আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু তাহা টিকিল না। তপতী জননীর ঐকান্তিক ইচ্ছার চাপে বেচারা প্রতাপের যত কিছু আলাপ একদিন প্রলাপে পরিণত হইয়াছিল এবং পরিশেষে সেই ভাগ্যবান পুরুষ একদিন বিলাপ করিয়া ফিরিয়াছিল। প্রতাপ ভাবিয়াছিল, তাহার আট বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দাবী ভূপতির আট দিনের দাবীর তুলনায় ঢের বড়। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি। তপতী প্রগতিশীলা, কাযেই তাহার 'জবানের' মধ্যেও একটা গতি আছে। প্রতাপকে সে কথা দিয়াছিল, কিন্তু কথার দাম কতটুকু? হৃদয়ের গোপন তন্ত্রী কোন্ পথে কাহার করস্পর্শে কবে ঝঙ্কৃত হইবে, তাহা নিজেই কি সে জানিত? যাহা হউক, প্রতাপের আখ্যায়িকা আর সুদীর্ঘ করিয়া লাভ নাই—যেহেতু, সে তপতীর সংস্রব হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। সহানুভূতির গোচায় আর তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া লাভই বা কি?

তপতী-ভূপতির দাম্পত্য-জীবন স্বামি-স্ত্রীর হিংসার বস্তু; যেন দুইটি নদী দুই বিভিন্ন দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া এক স্থানে আসিয়া পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া এক হইয়া মিলিয়াছে। প্রতিকূল বাত্যা-বিতাড়নে যত তরঙ্গই উঠুক, এই দুইটি নরনারীর জীবন-নদীর অন্তর-নীর একই সময়ে একই ভাবে আলোড়িত হয়। এমন মিলনের মধ্যেও একদিন ভুলের ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাই বলিতেছি।

'আষাঢ়স্য' প্রথম দিবস কি না ঠিক মনে নাই—তবে 'দিবস'টা আষাঢ়েই, তাহা মনে পড়ে। সমস্ত দিন ধরিয়া টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। অপরাহ্নের কাছাকাছি আসিয়া সমস্ত অকোশটা এমন ভয়াবহ রকমে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ধরিল যে, কাহারও ঘরের বাহির হইতে সাহস হইল না। আর ভূপতি? ভূপতি তো স্কুল-মাষ্টারী করিয়া বাড়ী ফিরিয়া কোনদিনই বড় একটা ঘরের বাহির হয় না। বন্ধুরা ডাকিতে আসিলে পর্য্যায়ক্রমে এক দিন মাথা ধরে এবং এক দিন ঘোরে, একদিন পেট কামড়ায়, একদিন দাঁতের গোড়া কন্‌কন্ করে ইত্যাদি আরও কত কি! কাযেই এই দুর্যোগ ভূপতির কাছে পরম সুযোগ। মাইকেলের কাব্য হইতে আরম্ভ করিয়া ইব্‌সেনের নাটক, মায় শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত ইহাদের সমালোচনা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া তলাইয়া গেল। মুষলধারে বারিপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রবল আঁধারে দিগন্ত সমাচ্ছন্ন। অকস্মাৎ ভূপতি বলিয়া উঠিল—"তপী! (তপতীকে আদর করিয়া এই নামেই সে ডাকিত) চেয়ে দেখ, অদূরে ঐ যে বনরেখা আকাশের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে, ঐ যে পুঞ্জীভূত মেঘের নীচে বনটাকে একটা অস্পষ্ট নীল পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে, ওর দিকে চেয়ে আজ আমার কি মনে হয় জান, প্রিয়? মনে হয়, ও যেন শিলংএর সেই জয়ান্তি পাহাড়ের এক প্রান্ত। ওরই শিখরদেশে দাঁড়িয়ে একদিন কবিগুরুর অমিতর অশ্রুধারা এমনি করে বন্যার বেগে 'বন্যা'রই জন্য প্রবাহিত হয়ে নেমে এসেছিল।"

তপতী মুখের একটা রুচিকর ভঙ্গিমা করিয়া বলিয়া উঠিল,—"এই বুঝি আবার কবিত্ব আরম্ভ হয়ে গেল! রক্ষে কর, আমি নিতান্ত অকবি। ও বর্ষার জলই বল আর বসন্তের হাওয়াই বল, কোনটাই আমার মধ্যে কবিত্বের বাষ্পটুকু খুঁজে পায় না। একেবারে নীরস তরুবর।"

ভূপতি বলিল,—"ওর দিকে চেয়ে আমার আর কি মনে হয় জান, তপী? সে-বারে শিলংএ বর্ষার দিনে এমনি করেই আমি 'হিলটপ' হোটেল থেকে জয়ান্তি পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকতাম। জয়ান্তির গা বেয়ে যখন জলের ধারা নেমে আসতো, তখন আমার লাবণ্যর কথা মনে হ'ত না, অমিতর কথা না, মনে পড়তো আমারই অন্তরের একান্তে যে শান্তি ছিল তারই কথা——" আর বলিতে পারিল না। যেন একখানা চলমান মোটর গাড়ী ধাক্কা খাইয়া আপনা হইতেই থামিয়া গেল। একটা তীব্র শিহরণ ভূপতির দেহটাকে একটা দোলা দিল। বাহির হইতেই তপতী তাহা টের পাইল। তপতী বলিল,—"তোমার অন্তরের শান্তি তাতে ব্যাহত হবার কোন কারণ তো এর মধ্যে দেখিনে।"

ভূপতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, নিজের হাব-ভাব এবং কথার স্বরে অপরকে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "আজকের কথা আলাদা। আজ আমার শান্তি-অশান্তির সকল প্রশ্নই তোমাকে নিয়ে। কিন্তু তবু যেন আজ আমি বাল্যের স্মৃতিটাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিনে। তার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সে আজ মৃত—"

আবার বাধা পাইল। কে যেন ভিতর হইতে গলা টিপিয়া তাহার স্বর বন্ধ করিল। তাহার থামিবার ভঙ্গীতে তপতী বিস্ময় অনুভব করিল। ভূপতি যেন জোর করিয়া স্বহস্তে তাহার মনের মধ্যে খানিকটা সন্দেহ পুরিয়া দিল। বিস্ময়সূচক সরু মেম-সাহেবী আওয়াজে তপতী বলিল, "তোমার কথার স্রোত এমন করে থেমে যাচ্ছে কেন? কি এমন ব্যাপার, যা আমাকেও গোপন করতে হয়? এমন তো তুমি—"

"না, ও কিছু না। তুমি দেখ, তপী! ঐ যে বাঁধনহারা বারিধারা, ও যেন কোন্ বিরহীর অন্তরনিহিত বেদনার বহিঃপ্রকাশ। পুঞ্জীভূত বেদনা যেন অশ্রু হয়ে ঝরছে!"

"তুমি বলছো কি? আজকের এই মিলনের মুহূর্ত্তে তোমার বিরহের স্মৃতি মনে জাগছে কেন? কি বলতে গিয়েও তুমি থমকে থেমে গেলে, প্রিয়? বলবে না?"

"নাঃ, ও কিছু না।"

তপতীর কথার স্বরে অনেকটা অভিমানের রেশ পাওয়া গেল। সে বলিল, "কিছু না বলে উড়িয়ে দিলে শুনবো কেন? সরল সত্যে অপরাধ নেই। আজও আমাদের মধ্যে এতখানি ব্যবধান রচনা করে রাখতে তোমার একটুও বাধে না? লজ্জা করে না?"

ইতিমধ্যে বারিবর্ষণ আরও প্রবলতর হইয়াছে। কোন্ ফাঁকে রাত্রি নামিয়াছে, সে দিকেও কাহারও লক্ষ্য ছিল না। অকস্মাৎ একটা প্রকাণ্ড বজ্রগর্জ্জনে তপতী-ভূপতি এক সঙ্গে

শিহরিয়া উঠিল। আতঙ্কের তীব্রতায় তপতী ভূপতিকে একেবারে আবেষ্টন করিয়া ধরিল। পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "না, চুপ করে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তোমার শিলংএর গল্পটা শেষ কর। আমি ভুল করেছিলাম, শান্তি মানে peace of mind নয়। শান্তি আমারই মত আর একটি দেহবিশিষ্টা জীব।"

ভূপতি বলিল, "তাতে বিস্মিত হবারই বা কি আছে? এ আমার বাল্যের একটা স্তিমিতপ্রায় স্মৃতি। ঐ আসমুদ্র-প্রসারী বর্ষণ স্রোতের সঙ্গে ভেসে এসে আমার মনের এক গোপন তারে সামান্য আঘাত করেছিল মাত্র। কিন্তু তাতে কি এসে যায়, তর্তী! আজ আর কোন পক্ষেরই কোন ক্ষতি নেই। সেই ভূপতি আর এই ভূপতির মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত তফাৎ। আর শান্তি? ভূপতির কথা ভাববার মত বাহুল্য সময় বোধ করি তার নেই। ভেবে অস্থির হচ্ছ শুধু তুমি।"

তপতী মৃদু হাসিয়া বলিল—"না। অতশত আমি ভাবিনি। আমি তোমার বাল্যের ঘটনা অর্থাৎ তোমার শান্তির কাহিনী শুনতে চেয়েছি মাত্র। তোমার ইচ্ছা না—"

ভূপতি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার শান্তি কি রকম?"

"না, না, তোমার শান্তি নয় শুধু শান্তি। তুমি ঘটনাটাই বল, আমার ধৈর্য্যের অভাব হচ্ছে।"

ভূপতি বিনা আড়ম্বরেই এবার আরম্ভ করিল, ব্যাপারটা শিলংএর নয় গয়ার। শান্তির বাড়ীর সকলে গয়ায় গিয়েছিলেন! আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। ঠিক এমনি এক বর্ষার দিনে শান্তি আর আমি গিয়েছি গয়ার প্রেতশিলা নামক পাহাড়ে বেড়াতে। দুজনেই পাহাড়টার ঠিক মাথায় উঠে বসে আছি। শান্তির সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়ে ছোট-খাটো একটা ঝগড়ার আকারে তার পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে। দুজনেরই মুখ ভার। কিন্তু তার চেয়েও ভারি হয়ে এল আকাশ। দেখতে দেখতে কাল মেঘে সমস্ত আকাশটা এমন করে ছেয়ে দিলে যে, মনে হ'ল, আজকেই পৃথিবীর শেষ দিন বুঝি ঘনিয়ে এসেছে। হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি এক ঝলক বিদ্যুত তীরের মত ছুটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জনে আকাশটা যেন চৌচির হয়ে ফেটে গেল। আর শান্তিও ঠিক এমনি করে তোমারি মত আমার দেহের মধ্যে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে। তার পর সেই পাহাড় থেকে দুজনেই দিলাম ছুট।—তাতেও এক বিপত্তি। শান্তি একটা অপল্কা ছোট শিলাখণ্ডে পা দিতেই পা হড়্‌কে পপাত ধরণীতলে। আমি অবিশ্যি অবিলম্বে তাকে ধরে তুললাম। কিন্তু সে বেচারা কান্নার বদলে খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলো। আবার দু'জনে দিলাম ছুট। পাহাড়ের ঠিক তলা পর্য্যন্ত নেমে আসতে না আসতেই বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। সে কি বর্ষণ! আকাশ থেকে কারা যেন জল ঢালছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘের আঁধারে আর সন্ধ্যার আঁধারে সব একাকার হয়ে মিশে গেল। শান্তি প্রবল জোরে আমাকে আকর্ষণ করে চল্‌তে লাগলো। এমনি অবস্থায় ফল্গুর পুল পার হয়ে নদীর ওপারে আমাদের বাসার কাছাকাছি এসে একটা হোঁচট্ খেয়ে আমিও ছিটকে পড়লাম। শান্তি আমাকে ধরে ছিল, কাযেই শান্তিও আমার উপর—"

"হোঃ হোঃ হোঃ" করিয়া তপতী উচ্চ চীৎকারে হাসিয়া উঠিল; "ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, যেমন শান্তির সময় তুমি হেসেছিলে? জান, ভগবান আছেন।"

"বা রে! আমি আবার হাস্‌লাম কখন? সে তো, শান্তি নিজেই হেসেছিল।"

তপতী বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তো। না, না, আমারই অন্যায়।"

ভূপতি বলিল, "উঠে কপালে হাত দিয়ে অনুভব করলাম, কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। একটা ইটের সঙ্গে কপালটা ঠুকে—

তপতী আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। সে ভূপতির কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "বল কি? তোমার কপাল কেটে গেল, আর শান্তিটা একবার 'আহা উহু' পর্য্যন্ত করলে না? ভারি নিষ্ঠুর তো? পাষণ্ড।"

"আঃ, শোনই না। শেষ পর্য্যন্ত শুনলে তো বুঝবে! হ্যাঁ, তার পর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল চেপে ধরে বাসায় ফিরলাম। বাসায় এসে দেখা গেল, রুমালখানা জব্‌জবে হয়ে ভিজে হাত বেয়ে রক্ত ঝরছে। রুমালখানা সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতস্থান হতে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। "শা—"

"না, না, তুমি থাম! আর আমি শুনতে পারবো না। শান্তিটা একেবারে পাষণ্ড। একেবারে—"

ভূপতিকে বাধা দিয়া তপতী চীৎকার করিল। আবার তপতীকে থামাইয়া ভূপতি আরম্ভ করিল, "নাঃ, তোমাকে বললামই তো শেষ পর্য্যন্ত শোন। আগেই মন্তব্য করা অন্যায়। সেই অবস্থা দেখে শান্তির একেবারে ফিট। ফিট যদি সারলো তো কান্না থামে না। আমি সুস্থ হব কি, তাকে নিয়েই সে এক মহামারী ব্যাপার—"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তপতী বলিল, "ঠিক হয়েছে। আমিও তো তাই বলি। শান্তিও তো মেয়েমানুষ, তোমার এতখানি কষ্ট সে অম্লান—"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে আমি পেরে উঠলাম না। আমি এবার থামলাম, তুমি বকে যাও। এতটুকু ধৈর্য্য ধরার ক্ষমতা যার নেই—"

"না, না, আছে। তুমি বল, বল। এবার আমি ঠিক মনোযোগ দেব।"

ভূপতি একটু রাগত ভাবে বলিল, "ছাই আছে। আচ্ছা শোন। তার পর খানিকটা বাদে আমার মাথাটা যখন ব্যাণ্ডেজ করা হয়ে গেছে, শান্তিরও কান্না থেমেছে, তখন শান্তি বললে, 'আমার ভারি লজ্জা করছে।' আমি একেবারে কেঁদে ফেললাম। আমি বললাম—"

"আহা-হা, শান্তি বেচারার মনটা ভারি নরম কি না তাই।" তপতী বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তুমি ভারি আশ্চর্য্যি লোক! এই শান্তির কথা তুমি আমাকে একদিনও বল নি। সে এখন কোথায়? আমি তার সঙ্গে সই পাতাব।"

ভূপতি অভিভূতের মত বলিয়া চলিল, "অনেক কাল শান্তির বিয়ে হয়ে গেছে। বাঙ্গালা দেশেরই কোন এক অখ্যাত সহরে তার বিয়ে হয়েছে শুনেছি। মাঝে মাঝে আজও তাকে আমার মনে পড়ে। শিলংএর কথা কেন বলছিলাম জান? তার পর আমি একবার গিয়েছিলাম শিলংএ। শান্তি আমার সঙ্গে যায় নি, কিন্তু তখনও শান্তির বিয়ে হয় নি। কিন্তু যখনই আমি পাহাড়ের দিকে চেয়ে বারিবর্ষণ দেখতাম, তখনই আমার শান্তির অশ্রুবর্ষণের কথাই মনে পড়তো। আজও আমার কি মনে হয়েছিল জান, প্রিয়? মনে হয়েছিল, ঐ বারিধারা বুঝি সেই বিরহিণী শান্তির বেদনার অশ্রুধারা সমস্ত বনানীর শিরোদেশ অভিষিক্ত করে নেমে আসছে।"

তপতী সহাস্যমুখে বলিল, "শান্তি ভাগ্যবতী। কিন্তু সে এখন কোথায়? তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল না কেন, বলতে পার?"

"সে কথা আর কেন, তপতী? সবই যখন বললাম, বলতে আমি পারি। তবে বিয়ে না হবার একমাত্র কারণ, আমি গরীব আর তারা বড়লোক। সেইবারই শিলং থেকে ফিরে এসে শুনলাম শান্তির বিয়ে হয়ে গেছে। শান্তির মা নিষ্প্রয়োজনেও ইনিয়ে বিনিয়ে খানিকটা কৈফিয়ৎ দিলেন। যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই—মেয়ের বিয়ের সুযোগ ছাড়তে নেই। সুযোগ এসে গিয়েছিল, ছেলেটি ভাল। শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। নগদ টাকাকড়ি কিছু আছে। বড্ড তেজী। চাকরী করতে ইচ্ছে নেই, তাই ব্যবসা বাণিজ্যে লেগেছে, ইত্যাদি। শান্তির পিসীমা না কি বলেছিলেন—ভূপতির সঙ্গেই শান্তির বিয়েটা—জবাবে শান্তির মা বলেছিলেন—রামো, খাবে কি? শুধু একটু লেখাপড়া শিখলেই হয় না। বাড়ীর টিউটারের সঙ্গে?—রামো!"

ভূপতি এইটুকু বলিয়াই তপতীর চোখের উপর দৃষ্টি পড়ায় দেখিল, সে যেন একটু বিহ্বল বোধ করিতেছে। তাহাকে ভুলাইবার জন্য খানিকটা স্মিতহাস্য করিয়া কহিল, "শান্তির মা মনে করলেন, আমি বুঝি—আচ্ছা, ততী! তোমার জীবনে এমন কোন ঘটনা নেই? তোমার বাল্যে?"

তপতী তৎক্ষণাৎ বলিল, "আছে বই কি? বাল্যে এমনতর একটু আধটু সবার জীবনেই ঘটে। তুমি যদি ধৈর্য্য ধরে শোন, আমি বলতে পারি। শুনবে তুমি? বল না, হ্যাঁ শুনবে? অত ধৈর্য্য কি তোমার আছে? বল শুনবে?"

বিস্ময়ের সঙ্গে ভূপতি বলিল, "কেন শুনবো না? তুমি বল, আমি শুনবো। আজ তো আর কোন কায নেই, তোমার বাল্যের কাহিনীই শুনি।"

তপতী বলিতে আরম্ভ করিল, "নীহারকে তুমি মনে করতে পার? সেই যে সিনেমায় একদিন দেখেছিলে গো, সেই নীহার সেন। তোমার মনে নেই, কি আশ্চর্য্য! যাকগে, তুমি শোন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা, তারা শোভাবাজারে না কোথায় থাকে বলেছিল না? তোমারই তো সামনে বললে? ···নং যদু ভট্টাচার্য্যের লেনে বাসা করেছে, আমার ঠিকই মনে আছে। তুমি একেবারে ভুলো। কিচ্ছু মনে থাকে না।"

ভূপতি বলিল, "দাঁড়াও, ভেবে দেখি।" এই বলিয়া আধ মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কৈ না, কিছুই মনে পড়ে না তো।"

তপতী বলিল, "একবার নীহারদের সঙ্গে আমি পশ্চিমে হাওয়া খেতে যাই। নীহারের মা, মাসী, বোন প্রভৃতি বহু লোক একসঙ্গে থাকতাম। দল বেঁধে বেরিয়েছি বেড়াতে। নীহার এবং আমি গল্প করতে করতে দলভ্রষ্ট হয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম, পাশের একটা বাগানে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পেয়ারা ঝুলছে। নীহারকে বললাম—পেয়ারা ছিঁড়তে হবে। অমনি দুজনে একমত। কিন্তু ছিঁড়তে গিয়ে দেখি নাগাল পাইনে। চট্ করে মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি গজালো। নীহারকে বললাম, আমি এই বেড়া ধরে দাঁড়াই, আর তুমি আমার কাঁধে পা দিয়ে ঐ বাবলা গাছটা ধরে দাঁড়িয়ে পেয়ারা ছিঁড়ে আন। নীহার অমনি রাজি। কিন্তু দুর্ভাগ্য! পেয়ারা ধরে টান দিতে না দিতেই মালী তেড়ে এল, গাল দিতে লাগ্‌ল।"

"গাল? কি বলে গাল দিলে?" ভূপতি প্রশ্ন করিল।

"না, এমন কিছুই নয়। সে বলেছিল, 'আপনারা কি পেয়ারা—, আর আপনারা কি পেয়ারা—' আমি তো মালীর কথা শেষ না হতেই দিলাম ছুট। নীহার দমাস্ করে মাটীতে পড়লো, সে শব্দ আমার কাণে এলো, কিন্তু পেছন ফিরে তাকানর অবসর ছিল না, এক দৌড়ে প্রায় রশি চারেক অতিক্রম করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মিনিট পাঁচেক পরে নীহারও একপ্রকার ছুটে এসে বল্‌লে—'নে, পেয়ারা খা'। এই বলে গোটা-দুই পেয়ারা-শুদ্ধ ডান হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিলে। পেয়ারা খাব কি! আমি একেবারে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। এতটুকু ক্ষোভ নেই। এই মাত্র যাকে আমি শত্রুর হাতে ফেলে পালিয়ে এলাম, সে অম্লান বদনে আমার সম্মুখে এসে আমাকে সম্বোধন করে বলছে—'নে, পেয়ারা খা'। খাবার প্রবৃত্তি আমার রইল না, শুধু বললাম—'মালী তোমাকে ছেড়ে দিলে?'

"সে তেমনি স্থিরভাবেই জবাব দিলে,—'ছেড়ে দেবে না তো কি? মালী নিজেই অপ্রস্তুত। সে শুধু প্রশ্ন করেছিল—'আপনারা কি পেয়ারা খাবেন?' সবটা না শুনেই তুমি লাগালে ছুট, আর আমি গেলুম পড়ে, পায়ের কড়ে আঙ্গুলটা ভাঙ্গলো'।"

ভূপতি বিস্ময়ের স্বরে বলিল,—"এ্যাঁ, বল কি? এমন সরল কি কোন মানুষ হয়?" বলিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের চেহারা বদলাইতে লাগিল।

তপতী বলিল, "কোন মানুষ হয় কি না তা জানিনে। তবে সে তাই। সে কথা যাক্। গল্পটা আগে শেষ করি। তার কড়ে আঙ্গুল বেয়ে তখনও রক্ত পড়ছিল। আমি তাড়াতাড়ি রুমালটা দিয়ে খুব কষে দিলাম তার পাটা বেঁধে। সে বললে, 'তপতী তুমি পেয়ারা না খেলে কিন্তু আমার পায়ের ব্যথা সারবে না, তা বলে দিচ্ছি।' তার পর—"

ভূপতি আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার হৃৎপিণ্ডের রক্ত অকস্মাৎ মগজে চড়িয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার প্রতি তপতীর যত কিছু ভালবাসা সবই ভণ্ডামী। এ শুধু তাহার পঙ্কিলতাকে ঢাকিবার একটা আচরণ মাত্র। আর গল্প শুনিতে তাহার প্রবৃত্তি রহিল না। একটা গাম্ভীর্য্যে তাহার দেহ এবং মন সহসা ভারি হইয়া উঠিল। সে বলিল—"তপতী! বৃষ্টি এইবার থেমেছে। আমার বিশেষ জরুরি কায নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি তবে উঠলাম।" এই বলিয়াই সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

আকস্মিক ভাবে রসভঙ্গ হওয়ায় তপতীর মনে সামান্য আঘাত লাগিল। ইহার মর্ম্ম সে কিছুই অনুধাবন করিতে পারিল না। সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেদিকে তপতীর খেয়ালই ছিল না। কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া সে নিজের কাযে চলিয়া গেল। কাশীপুর অঞ্চলে কতকটা পাড়াগাঁ ঘেঁসিয়া বাসা, কাযেই বৈদ্যুতিক আলো নাই। চাকর ৭ দিন ধরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। নিজের হাতেই সে হারিকেন ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভূপতি এদিকে শ্যামবাজার পৌঁছিয়া ···নং যদু ভট্টাচার্য্যের লেন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। যাহাকে প্রশ্ন করে সেই বলে—জানি না, মশাই। অবশেষে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করায় তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চোখ-দুটিকে ঢাকিয়া ফেলিয়া প্রায় আধ মিনিটকাল স্তব্ধ থাকিয়া

বলিলেন, "যদু ভট্টাচার্য্যের লেন তো মশাই কালীঘাটে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে, আপনি শ্যামবাজারে খুঁজছেন যে বড় ?"

"কালীঘাট ? ঠিক জানেন তো ?"

"আমি তো মশাই ঠিকই জানি, আপনার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না হয়, করবেন না ?" গলার স্বরে মনে হইল, বৃদ্ধ যেন একটু অপরাধ গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, অতটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের অবসর ভূপতির ছিল না। সে বলিল—"দেখুন, আমার বিশেষ প্রয়োজন, আমি সেখানে যাব, আপনি ঠিক জানেন তো ?"

"আমি ঠিকই জানি বলেই তো মনে করি। অবশ্য বিশ্বাস করা না করা আপনার হাতে।" ভূপতি বিশেষ লজ্জিত হইল। সে হাত জোড় করিয়া বলিল—"না মশাই, আপনি যান, আমি বিশ্বাস করেছি, তবে রাত হয়েছে কি না তাই—না, আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি যান।"

"রাত হয়েছে তো কি হয়েছে ? রাত হলে কি বুড়ো মানুষের কথা বিশ্বাস করতে নেই। ঐ তো বললাম, ইচ্ছা না হয়, বিশ্বাস করবেন না। বস্, মিটে গেল। তা আর অত কথা কেন ?"

বৃথা সময় নষ্ট করার সময় ভূপতির ছিল না। সে দৌড়াইয়া গিয়া কালীঘাটের বাস ধরিল। কালীঘাটে নামিয়া বহু খোঁজাখুঁজি করিয়াও সে যদু ভট্টাচার্য্যের লেন বাহির করিতে পারিল না। শেষে অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে অনেক লোককে বিরক্ত এবং উত্তেজিত করিয়া সে ··নং যদু ভট্টাচার্য্যের লেনের সন্ধান পাইল। অধিক রাত্রি হইয়াছে। সকলেই ঘুমাইয়াছে। ভূপতির সজোর কড়া-নাড়ায় অনেকেরই নিদ্রা ঘুচিল। একটি ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। বাড়ীটার গা ঘেঁসিয়া একটি গ্যাসের আলো সগর্ব্বে জ্বলিতেছিল। ভদ্রলোক সেই আলোকে চিনিতে পারিলেন আগন্তুক গুণ্ডা নয়, তাঁহারই মত আর এক জন ভদ্রলোক। তিনি ক্রোধ খানিকটা দমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি মশাই, এত রাত্রে দরজা গুতোচ্ছেন কেন ?"

ভূপতি একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিল, "এই বাড়ীতেই কি নীহার সেন থাকেন ?"

"হ্যাঁ থাকেন, কিন্তু কেন ?"

ভূপতি আরও খানিকটা ব্যস্তভাবে বলিল, "দেখুন, আমার স্ত্রী নীহার—"

"আপনার স্ত্রী নীহার !" বিস্ময়ে ভদ্রলোক একেবারে হাঁ করিয়া ফেলিলেন।

ভূপতি একটু কাতর ভাবে বলিল, "দেখুন, আপনি একটু ভাল করে শুনুন। আমার স্ত্রী···"

"আবার সেই কথা—আপনার স্ত্রী ! মশাই, আপনাকে আমি অনেক ক্ষমা করেছি। আর না। আপনি বাড়ী ভুল করেছেন আর কিঞ্চিৎ পানও করেছেন। কিন্তু আমারও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। তা বলে রাখছি।"

ভূপতি এবার বেশ একটু জোরেই জবাব দিল, কিন্তু গলার স্বর করুণ। সে বলিল, "মশাই, দয়া করে আমায় কথাটা শেষ করতে দিন। আমার স্ত্রী, নীহার সেনের বাড়ী—"

ভদ্রলোক এবার একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আপনার স্ত্রী নীহার সেনের বাড়ী এটা নয়, এটা আমার বাড়ী এবং আমারই স্ত্রী—"

সমগ্র গোলমালটাকে প্রতিহত করিয়া এবং উভয়কে স্তম্ভিত করিয়া এক যুবতী স্ত্রীলোক আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত পরেই সে ভূপতির দিকে ফিরিয়া কহিল,—"আপনি আসুন। আপনাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। আপনি আমার—"

ভদ্রলোক এবার একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, "কি ? আপনি আমার—?"

স্ত্রীলোকটি ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া কহিল, "কি পাগলামী আরম্ভ করেছ ? চিনতে পারছো না ? উনি আমার বন্ধু—।"

"কি ? তোমার বন্ধু ? এত রাত্রে তোমার বন্ধু—তাই বুঝি অত জোর ওঁর ?"

"আঃ, থাম। চিনতে পারছো না আমার বন্ধু তপতীর স্বামী ? সেই যে সিনেমায়—" আর বলিতে হইল না। শেষ সীমা পর্য্যন্ত জিভ কাটিয়া, "এ্যাঁ, বল কি ? কি সর্ব্বনাশ ! তপতীর স্বামী ? তুমি বলছো কি, নীহার ?" বলিয়া বারান্দার উত্তর ধারের ইজিচেয়ারটা টানিয়া আগাইয়া আনিলেন।

'নীহার' শব্দ উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপতি যেন ভূত দেখিল। এ্যাঁ, তবে কি নীহার স্ত্রীলোক ? তাহার

হৃৎপিণ্ড যেন সমস্ত দেহটাকে রক্ত সরবরাহ করিতে ভুলিয়া গেল। মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। সে নির্ব্বাক্। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া নীহারের স্বামী বলিলেন, "দেখুন, আমি একটা ভুল করে ফেলেছি, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি মাপ চাইছি। এত রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে—আমি ভুল—"

ভূপতি বলিল, "দেখুন, তার চেয়েও বড় ভুল আমি আগেই করে এসেছি। আমার স্ত্রীর মুখে 'নীহার' নাম শুনেই আমি ছুটে এসেছি। নীহার যে স্ত্রীলোক, সে ধারণাই আমার হয় নি। এর চেয়ে ভুল আর কি—"

নীহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "আজকালকের দিনে পুরুষ-বন্ধুর তো অভাব নেই। আশ্চর্য্যও নয়। কাযেই এ ভুল আপনার নয়, আমার বন্ধুর। বন্ধু 'নীহার' বলে শব্দটা ব্যবহার করেছে। কিন্তু স্ত্রী কি পুরুষ, তা ও বলেনি। তবে আপনিই বা এত মারমুখী হলেন কেন? যাক্, সে কথায় এখন আর লাভ নেই। ভুল আমারই। কারণ, ষ্টোভ জেলে চায়ের জল এখনও চড়াইনি, লুচিও খান্ কতক—আপনি আসুন।"

শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু।

মৃত্যু

সুন্দর তুমি, প্রশান্ত তুমি, তুমি মুনি মণিধর,
নগ্ন তাপস তুমি হে মরণ শাপরূপে তুমি বর।
যাতনে দহনে আপন-হারা,
অত্যাচারিত পারিত কি তারা,
লভিতে মুকতি আসিলে দৈন্য প্রসারিয়া তার কর—
তুহিন-পরশে তুমি না ঘুচালে সকল যাতনা-ভার?
তাই হে চির প্রশান্ত তুমি, নহ অশান্তিকর॥

সাঁঝের তিমির ঘনায় যখন সময়-সায়রনীরে,
জীর্ণ তরণী মোদের জীবন পারে না ফিরিতে পারে;
মৃত্যু! শিখাটি জালিয়া তখন,
দেখাও হে তুমি সে শুভ লগন,
সাদরে পরশি মোদের যখন লবে আপনার করে—
জীবনে যে সুখ পারি নি লভিতে পাইতে মরণ-পারে!
মরণে বাজিবে বিলাসের সুর মরম-বীণার তারে॥

হিয়াটি যখন শত পিয়াসী যৌবন নব রাগে,
ছয়টি দানব ঘুম হতে যবে সাড়া দিয়ে দিয়ে জাগে;
বিপ্লব আনি জাগাও হে তুমি,
ছয়টি দানব মাঝপথে থামি,
চাহে বিস্ময়ে আমি তোমা নমি নব নব অনুরাগে—
লাঞ্ছিত চির-পীড়িত মানব তব অনুরাগ মাগে!
প্রিয়তম বলি ডাকিতে তোমায় বাসনা তাদের জাগে।

প্রশান্তিময় চিরবসন্ত কোলেতে তোমার আঁকা,
বহ্নি-দীপ্ত ও নয়ন দুটি করাল স্নেহেতে মাখা;
ভবদ্বার হ'তে ফিরে চলে যায়,
দারিদ্র্য ত্যজি ব্যথিত হিয়ায়,
যাতনা-পীড়িত; তব আওতায় আশ্রয় লভে সখা,
তোমার আঁখির চাহনিতে জ্বলে মুক্তি-বহ্নিশিখা!
চিরকাল তোমা বলিব মরণ নিখিলের চিরসখা॥

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ নগরী—লে

নগাধিরাজ হিমালয়ের বক্ষে অবস্থিত কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে ৫,২১৪ ফুট উচ্চে বক্রগামিনী ঝেলামের বুকে নয় দিন গৃহতরীতে অবস্থান করিয়া স্বর্গ-শোভা উপভোগ করিলাম। আমাদের দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল প্রকারের লোকই আছেন। সহরের বাহিরে আমাদের প্রায় চল্লিশখানি গৃহতরীতে অবস্থিত নরনারীর কোলাহলে নদী-সৈকতভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা কয়েক জন উৎসাহী যুবক মিলিয়া কাশ্মীরের

লেখক

অন্যতম প্রদেশ লেডাকের রাজধানী লে নগরী পরিদর্শন করিতে মনস্থ করিলাম। কাশ্মীর চারি অংশে বিভক্ত। (১) শ্রীনগর (২) জম্মু (৩) লেডাক (৪) গিল্‌গিট্। সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে বৃটিশরাজ গিল্‌গিট্ নামক গিরিবত্মটি আপনাদের অধীনে গ্রহণ করিয়াছেন।

লেডাকের রাজধানী লে নগরী সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১১,৫০০ ফুট উচ্চ। সারা পৃথিবীর মধ্যে এত উচ্চে আর কোথাও লোকের বসতি নাই। কবির কাম্য-নিকেতন এই ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনের মোহে যেমন বহু যাত্রী এখানে আগমন করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই দুর্গম হিমালয়-শিখরে অবস্থিত উচ্চতম স্থানে মনুষ্য-বসতি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিল।

বৃদ্ধগণের বাধা-নিষেধ অবহেলা করিয়া আমরা কয়েক-জন যুবক দুর্গম পথের ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া

লেডাকের পথে

শ্রীনগর হইতে প্রায় ১৪৪ মাইল দূরে অবস্থিত লেডাক অভিমুখে অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে যে সমস্ত শীতবস্ত্র ছিল, তদ্ব্যতীত শ্রীনগর হইতে পট্টুর দীর্ঘ গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া লইলাম।

কাশ্মীরে শতকরা ৭৫ জন মুসলমান। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তর্গত, এই লেডাকবাসী সকলেই বৌদ্ধ। লেডাকে বহু বৌদ্ধগুম্ফা আছে। কাশ্মীর রাজ্যের অধীন হইলেও এ-স্থান লামার রাজত্ব।

যাত্রার পূর্ব্বে আমরা শ্রীনগরের লেডাকের বৃটিশ কমিশনারের নিকট আমাদের যাত্রার ছাড়পত্র গ্রহণ করিলাম। উহাতে আমাদের সহযাত্রিগণের নাম, কোথায় কয় দিন অবস্থান করিব, আমাদের গন্তব্য পথ প্রভৃতির বিবরণ দিতে হইল। গান্ধার বল হইতে টি্টি হাই রোড দিয়া সিন্ধু উপত্যকার মধ্য দিয়া আমাদের যাত্রা সুরু হইল। ক্ষুদ্র অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া আমরা চলিলাম। এই পার্ব্বত্যপথে ইহাই একমাত্র বাহন। মাল-বহনের জন্য কৃষ্ণকায় লোমবহুল

সিন্ধু নদের উপরিস্থিত সেতু

ইয়াক নামক একপ্রকার গো-জাতীয় পশু ব্যতীত অন্য কোন যান-বাহন এদেশে নাই।

শ্রীনগর হইতে সামান্য দূর অগ্রসর হইয়া আমরা ডা'ল হ্রদের তীরে পৌঁছিলাম। তার পর রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া, যথাসম্ভব দ্রুত অশ্ব-চালনা করিলাম। সুদৃশ্য দেবদারু বৃক্ষের শ্যামল বনানীর মধ্য দিয়া আমাদের গন্তব্য পথ। আমরা যতই যোজিলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বৃক্ষরাজি ততই অদৃশ্য হইতে লাগিল। সেই সুদূর পার্ব্বত্য-পথ হইতে সমগ্র কাশ্মীর-উপত্যকা আমাদের নয়নগোচর হইল। মনে হইতেছিল, আমাদের পশ্চাতে যেন একখানি সুদৃশ্য মায়াজাল বিস্তৃত হইতেছে। সুদূর-প্রসারী বক্রগামিনী ঝেলামের প্রবল জলধারা ভীম গর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে। বৃহৎ উপলখণ্ডসমূহে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নদীর গতিবেগ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। সংখ্যাতীত নির্ঝরিণীসমূহও এই উপত্যকাকে অভিষিক্ত করিয়া উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। আমাদের পশ্চাদ্ভাগে যেন একখানি মানচিত্র প্রসারিত। সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত বালুকারাশি এবং শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ নগ্নকায় পর্ব্বতশ্রেণী, দূরে উন্নত হিমানী-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতরাজি শোভা পাইতেছে। এই

স্রোতোধারা সিন্ধু নদে গিয়া পড়িতেছে

সমস্ত গিরিবর্ত্ম কখনও হিমশীতল, কখনও উষ্ণ। কখনও দেখিতে দেখিতে হিমশীতল বায়ুরাশি সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে। তাহারই মাঝে পড়িয়া যাত্রিগণের প্রাণ-বিয়োগ হইয়া থাকে।

সন্ধ্যাগমে আমরা কোন গ্রামে রাত্রিযাপন করিলাম। আমাদের দীর্ঘপথ কোথাও পর্ব্বতগাত্রে, কোথাও উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা প্রাচীন গ্রামের ভিতর দিয়া আমরা অশ্বারোহণে পথ অতিক্রম করিতেছি। গ্রামে দরিদ্রের কুটীরসমূহ প্রস্তর ও মৃত্তিকানির্ম্মিত।

ক্রমে আমরা পর্ব্বতবেষ্টিত এক শস্পাস্তীর্ণ উপত্যকায় লামা ইয়ারু নামক বৌদ্ধ-গুম্ফায় উপনীত হইলাম। মৃত লামাগণের স্মৃতিচিহ্নসমূহ পথের উভয় দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দির-দ্বারে এক বৃহৎ প্রার্থনা-চক্র। তাহার অভ্যন্তরে কয়েকটি স্বল্পালোকিত মন্দির। মন্দিরমধ্যে বৌদ্ধমূর্ত্তিসমূহ বিদ্যমান। কাগজে লিখিত প্রার্থনা গোল করিয়া মোড়া। বহু পবিত্র লেখমালা দেওয়াল-গাত্রে আলমারীতে স্তরে স্তরে সজ্জিত। বৌদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে দিবারাত্র ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। সুগন্ধি ধূনা ধূম বিকিরণ করিয়া শস্য-সম্ভার ও বনরাজি উৎপন্ন হয়। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম গালিচা-বিস্তৃত পুষ্পিত উদ্যানই কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য। কিন্তু দক্ষিণে সুদূর সমুদ্রতীর হইতে মেঘমালা কাশ্মীরের মধ্য-হিমালয় পর্ব্বতে বাধা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এখানে বৃষ্টির অভাব হয় না। মধ্য-এসিয়ার দেশসমূহ এই কারণেই মরুভূমিসদৃশ। লেডাক্ প্রভৃতি অঞ্চলে শীতঋতুতে তুষারপাতও অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই জন্য লেডাক্ বালুকাস্তীর্ণ বৃক্ষ-পত্রাদি-হীন মরুভূমি সদৃশ। এখানে বৃক্ষলতাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও একগাছি তৃণও দৃষ্ট হয় না। তুষারগলিত সামান্য
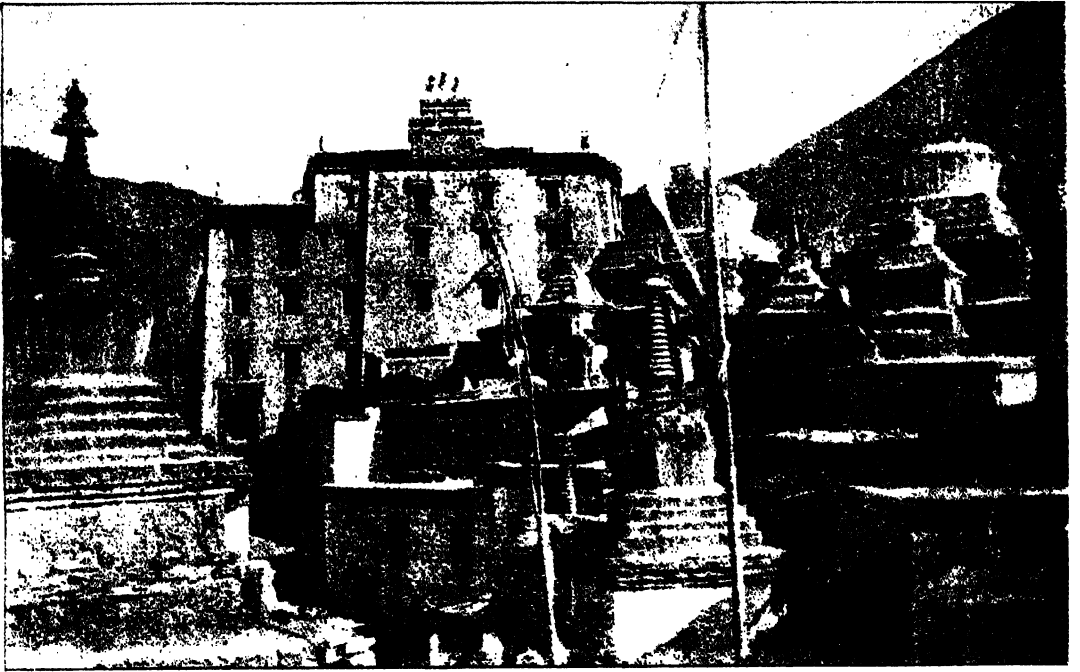
লামা ইয়ারু মঠ

স্থানটিকে সুরভিত করিয়া তুলিয়াছে। দেখিলাম, পূজারীগণ দেবতা-সমীপে নানাবিধ ফলমূলের অর্ঘ্য দান করিয়াছেন।

সিন্ধুনদ-তীরে স্পিটক নামক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া লামা ইয়ারু হইতে দুই দিন আমরা বালুকাময় এক মরুভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলাম। ইহার মধ্যে একগাছি শ্যামল তৃণও দৃষ্টিগোচর হইল না। এখানে একবিন্দুও পানীয় জল মিলে নাই। কাশ্মীরে বর্ষার বারিধারা নিয়মিত ভাবে পতিত হয়। তদ্ভিন্ন শীতঋতুতে তুষারপাতেও বারিরাশি অজস্র পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। তাহাতে কাশ্মীরে শ্যামল জলরাশি কৃত্রিম খালের সাহায্যে এই লেডাকে আনীত হয় নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। কোথাও কুয়াশার চিহ্ন দেখা যায় না। কোমল রৌদ্রে ধরণীবক্ষ প্লাবিত। প্রখর রৌদ্রে প্রস্তরখণ্ড উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ছায়াবহুল স্থানে জল জমিবার উপক্রম। একই দেশে এমন শীত ও গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব আর কোথাও দেখি নাই। নিজ দেহের রৌদ্রদগ্ধ অংশটি উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, অথচ শরীরের যে অংশে রৌদ্রের উত্তাপ লাগে না বরং ছায়ায় রাখা হইয়াছে, সেই অংশটি শীতে কম্পমান, এইরূপ অনুভূতিও দুর্ল্লভ নহে।

এখানে বায়ুতে আর্দ্রতা নাই। সেই জন্য বায়ু সহজেই শীতল অথবা উষ্ণ হইয়া উঠে। লেডাকের আবহাওয়া এমনই মনোরম যে, এখানে শরীর ক্লান্তি অনুভব করে না, শ্রমকাতর হয় না। "দেশের আবহাওয়াই জাতিকে শ্রমশীল অথবা শ্রম-বিমুখ করিয়া তোলে। এই কারণে শীত-প্রধান দেশের অধিবাসিগণ অকাতরে শ্রমস্বীকার করিতে পারে এবং গ্রীষ্মপ্রধান-দেশবাসী অল্প শ্রমেই কাতর হইয়া পড়ে।

শুষ্ক ও লঘু আবহাওয়ার অপর একটি গুণ এই যে, দূরের বস্তুকে নিকটে দেখায়। বায়ুস্তরের মধ্যে আর্দ্রতার অভাবে আমরা কোন বস্তুর দূরত্বের ধারণা করিতে পারি না। লেডাকে ৬০ মাইল দূরস্থিত পর্ব্বতমালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন বিশাল পর্ব্বতরাজি মাত্র ৪০ গজ দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখানকার বায়ুস্তরের আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, তাহা কোন দ্রব্যকে বৃহৎ দেখায়। দূরে পর্ব্বতোপরি মেঘকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখায়। এখানে আসিলে এইরূপ মিথ্যা ধারণা জন্মায়। সুতরাং এই স্বপ্নময় দেশ যেন মানব-কল্পনার অতীত।

ক্রমে আমরা সহরের প্রান্তদেশের মধ্য দিয়া লেডাকের রাজধানী ১১,৫০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত লে নগরের সুদৃশ্য বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে ঘর-বাড়ী দোকান-পশার। এখানকার গৃহের ছাদগুলি সমতল। এখানে নগর-মধ্যে ও বাজারে বহু তিব্বতবাসী নয়নগোচর হইল। তাহাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যময় পোষাক-পরিচ্ছদ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে বাজারের মাধুর্য্যও যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে হইল।

মেয়েদের কোন পর্দ্দা এখানে নাই। তাহাদের পরিচ্ছদ বিচিত্র। মস্তকের আবরণে নীল পাথর বসান। স্ত্রীলোকের স্বামীর অর্থের পরিমাণ অনুসারে তাহার মাথার আবরণ তত মূল্যবান। কাণে বৃহৎ মাকড়ি ঝুলিতেছে। রূপা কিম্বা পিতলের ব্রেসলেট এখানকার সাধারণ স্ত্রীলোকের অঙ্গে অলঙ্কারস্বরূপ দেখা যায়। এখানে স্ত্রীলোকরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। অর্থশালী স্ত্রীলোকগণ আপন স্বামী মনোনীত করিয়া থাকেন।

লে সহর ও রাজপ্রাসাদ

লেডাকবাসিগণের আকৃতি মঙ্গোলীয় ধরণের। গায়ের

রঙ্গ পীতবর্ণ। সেজন্য চীনদেশবাসীর সহিত তাহাদিগের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনী হইবার আশা অতি অল্প। ইয়াক্ ও গো-মেষ প্রভৃতির জন্য তৃণসংগ্রহ ব্যপদেশে অধিবাসীদিগকে বহু দূর গমন করিতে হয়। লেডাক-বাসিগণ ব্যবসায়ের জন্য দেশ-বিদেশে গমন করিয়া থাকে।

অত্যুচ্চ স্থানে দাঁড়াইলাম। দিবাবসানে সূর্য্যাস্তের বর্ণ-

লে নগরীর দৃশ্য

বৈচিত্র্যে মন মুগ্ধ হইয়া গেল। লেডাকের রাজা কাশ্মীর-রাজের অধীন। তিনি লে নগরীর সন্নিকটে ষ্টোক নামক স্থানে রাজপ্রাসাদে বাস করেন। এই ষ্টোক নগর হইতে যাহা আয় হইয়া থাকে, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন। তজ্জন্য তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল নহে। তিনি কখনও কাশ্মীর দর্শন করেন নাই শুনিলাম। তিনি বৎসরে একবার লে নগরে আগমন করিয়া থাকেন এবং পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদে বাস করেন। আমরা এক দিবস রাজপ্রাসাদে গমন করিয়াছিলাম। বহু সোপান এবং অপরিচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করিয়া তথায় উপনীত হইলাম। কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া আমরা এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। সেখানে লামাগণের নৃত্য হইয়া থাকে। এই রাজপ্রাসাদ প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য সুরক্ষিত,

লে নগরীর প্রধান পথ

এখান হইতে বহুদূরব্যাপী বালুকাস্তীর্ণ মরুভূমি এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ নয়নগোচর হইয়া থাকে।

সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখরে একটি গুম্ফা আছে। এখানে দুই জন লামা বাস করেন। গুম্ফার মধ্যে একটি বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি আছেন। মূর্ত্তিটি গুম্ফার মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। দেখিলাম, এখানে একটি চক্র আছে। সারি সারি বুদ্ধমূর্ত্তি

স্থাপিত। প্রত্যেক মূর্ত্তির সম্মুখে একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। এই প্রদীপসমূহ সমস্ত দিন ও রাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে থাকে, কখনও নির্ব্বাপিত হয় না।

লেডাকের অধিবাসীরা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন। জীবনে তাহারা কখনও স্নান করে না। গুম্ফা ব্যতীত আর কোথাও রাত্রিকালে আলোক প্রজ্বলিত হয় না। এখানে ঘর-দ্বার সবই কাষ্ঠনির্ম্মিত। যাহারা অতি দরিদ্র, তাহারাই মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গৃহে বাস করিয়া থাকে।

লামাগণ

গৃহে অতিথি আসিলে তাহারা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। তাহারা অতিথির সহিত বাক্যালাপ করে না, পাছে অতিথি অসন্তুষ্ট হইয়া অভিসম্পাত করে, এজন্য তাহারা অতিথির সহিত ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। আমাকে এক বৃদ্ধা একটি লৌহ-থালায় করিয়া কিঞ্চিৎ গোধূমচূর্ণ আনিয়া খাইতে দিল। মুখে বলিল, "ভুসা চাংলা" অর্থাৎ এই ছাতু খাও।

এখান হইতে নাঙ্গা পর্ব্বত ও কারাকোরাম পর্ব্বতের দৃশ্য অতি মনোরম। লেডাকই এখন ভারতবর্ষের একমাত্র বৌদ্ধপ্রধান দেশ। আমরা এই নগ্নকায় পর্ব্বতমধ্যস্থ নগরে লেডাকবাসিগণের বিচিত্র আচার-ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিন দিবস অবস্থানের পর আমরা এক অরুণোদয়ের পূর্ব্বে লে নগরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত সমুন্নত সহর শ্রীনগরে আসিয়া উপনীত হইলাম।

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন, বি, টি, বি, এল)।

ভোরের শিশির

গল্প

কপিলবস্তুর পাদমূলে ছোট একটি গ্রাম। তাহারই মাঝখানে ছোট একটি চতুষ্পাঠী তৈয়ার করিয়া আচার্য্য প্রভদেব যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই বসিয়াছিলেন। সাংসারিক নানা প্রতিকূল অবস্থায় এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এই সুকুমার বালকগুলিকে পরম স্নেহে কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, সারা জীবনব্যাপী অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর এখন এই শিশুদিগের সারল্যে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া দিনের শেষে কিছু পাথেয় সঞ্চয় করিবেন।

তিনি অবিবাহিত ছিলেন। জীবনের অর্দ্ধেক সময় পুঁথি পাঠ এবং অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিতেই গেল। তার পর তিনি যখন ভাবিলেন, এইবার পুঁথি হইতে বিশ্রাম লইবার সময়, তখন তাঁহার বিবাহের বয়স অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য ভাবিলেন, "ভালোই হ'লো। সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আমার আজন্মের ইচ্ছা কাব্যালোচনা করেই সময় অতিবাহিত করতে পারবো।" তখন হইতে তিনি তাঁহার গভীর জ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়া তাঁহার নিজের সমস্ত সত্তা বিলীন করিয়া পুঁথি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু বহুদিনের পরিশ্রমে তিনি যে পুঁথি লিখিয়াছিলেন, দেশের লোক তাহার সমাদর করিল না; আবার কেহ কেহ এমন মন্তব্যও করিল যে, উহা নিছক পাগলের প্রলাপ। মর্ম্মাহত হইয়া অভিমানী ব্রাহ্মণ সেদিন তাঁহার বহু পরিশ্রমলব্ধ পাণ্ডুলিপিগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

উক্ত ঘটনার এক বৎসর পরেই প্রৌঢ় প্রভদেব তাঁহার অনেক দিনের পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া সজল চোখে বিদেশ যাত্রা করিলেন। তার পর নানা তীর্থস্থানে ঘুরিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভের পর কপিলবস্তুতে আসিয়া তিনি চতুষ্পাঠী বাঁধিলেন। হৃদয়ের অপরিমিত স্নেহ দিয়া বালকগুলিকে কাছে ডাকিয়া তাহাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ব্যবস্থা তিনি নিজ হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি প্রাণে-মনে প্রকৃত শান্তি লাভ করিলেন। গভীর কৃতজ্ঞতায় আচার্য্য তাঁহার এক মাত্র ইষ্টা ও আরাধ্যা দেবী 'মরালবাহিনী'র চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিলেন, "মা, সংসারের বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে আজ এই শিশুগুলির কাছে শিশু হয়েই এসেছি। এবার কি—তবে যথার্থই শান্তি পাবো, মা?"

চতুষ্পাঠীর সমস্ত ছাত্রের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল সোমক। সোমকের উপর তাঁহার একটা অদ্ভুত রকমের স্নেহ ছিল। এই প্রিয় ছাত্রটিকে তিনি এক মুহূর্ত্তও চোখের আড়াল করিতে চাহিতেন না। সোমকও সমস্ত ছাত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ছিল। সে প্রভদেবকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তাহার একহারা ঈষৎ দীর্ঘ চেহারা। গায়ের রং শ্যামল, কমনীয় মুখটির উপর দৃঢ়তাব্যঞ্জক প্রতিভার ছায়া। সোমকের পৃথিবীতে আপনার বলিতে কেহ ছিল না বলিয়াই আচার্য্য তাহাকে এত ভালবাসিতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি ভাবিতেন, তাঁহার এই পক্ষপাতিত্বটুকু অন্য সব ছাত্র বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিয়া হয় ত মনে মনে তাহারা দুঃখ পাইতেছে। এ কথা কল্পনা করিয়াও তিনি মনে মনে গভীর লজ্জা অনুভব করিতেন। তিনি মনকে বুঝাইতে চাহিতেন, সমস্ত ছেলেই তাঁহার নিজের সন্তানের মত। কোন ছেলের উপরেই তাঁহার কমবেশী স্নেহ থাকিতে পারে না। তবুও সোমকের উপর তাঁহার এই বিশেষ পক্ষপাতিত্বটুকু মাঝে মাঝে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রকাশ হইয়া পড়িত।

প্রত্যেক দিন রাত্রিশেষে উঠিয়া তিনি চতুষ্পাঠীর

অনতিদূরে নদীতে স্নানান্তে দেবী 'মরালবাহিনীর' পূজা করিতেন। যেখানে তিনি পূজা করিতেন, সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তখনকার দৃশ্য এক অপূর্ব্ব। শুদ্ধ-শুচি তাপস ব্রহ্মচারী নব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিতেন। গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড দেহ ঘিরিয়া শুভ্র উত্তরীয়তে মনে হইত, তাঁহার পবিত্রতার শুভ্রতা যেন আরও বাড়িয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলিয়া তিনি দেবীর অর্চ্চনা করিতেন।

কিছুদিন পরের কথা। আচার্য্য সেদিন সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কেহই ছিল না। চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁহার পায়ে বেশ বড় রকমের একটা কাঁটা বিদ্ধ হইল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি কাঁটাটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। সমস্ত কাঁটাটা একেবারে পা'র ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছিল।

আস্তে আস্তে তিনি অতি কষ্টে ফিরিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই একটি ছোট গাছ তাঁহার চোখে পড়িল। সবুজ পাতায় গাছটি ভরা, তাহার আগা-গোড়া কাঁটায় পূর্ণ। এমন গাছ সাধারণতঃ দেখা যায় না। গাছটি দেখিয়া আচার্য্য উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। এই গাছের পাতার রস রগড়াইয়া দেহের ব্যথার স্থানে দিলে সে ব্যথাটা সাময়িক কম থাকে। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া গাছ হইতে একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া দুই হাতে রগড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ বহুদিনের বিস্মৃত একটি ঘটনার কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

অনেক দিনের কথা—যখন তিনি কিশোরবয়স্ক ছিলেন, তাঁহার সহিত আর একটি কিশোরের খুব প্রীতি ছিল। তাহার নাম ছিল চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীবই তাঁহাকে এই গাছটা দেখাইয়া ইহার গুণ বলিয়া দিয়াছিল। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর চিরঞ্জীবের সঙ্গে তাঁহার দেখা নাই। চিরঞ্জীবের কথা তাঁহার এত দিন মনেই ছিল না। আজ এই নাম-না-জানা গাছটি তাঁহার কিশোর বয়সের কথা -তাঁহার সোদরপ্রতিম বন্ধুর কথা মনে করাইয়া দিল। কি অপরিসীম প্রীতিই না ছিল উভয়ের মধ্যে

আচার্য্য তাঁহার ব্যথার কথা ভুলিয়া বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় অতীতে ফিরিয়া গেলেন। মনে পড়িল, চিরঞ্জীব যখন দেশ ছাড়িয়া 'বৈশাগী নগরে'—বিদ্যাশিক্ষার জন্য গেল, তখন রুদ্ধ অভিমানে তিনি ভাবিয়াছিলেন, চিরঞ্জীব তাঁহাকে ছাড়িয়া সত্যই যাইতে পারিল? তার পর বহুদিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, চিরঞ্জীবের কোন খবরই তিনি রাখেন না। তাহার অস্তিত্ব আচার্য্য একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজিকার এই সামান্য ঘটনায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল! চিরঞ্জীব জীবিত কি মৃত, তাহাও তিনি জানেন না। আশ্চর্য্য! এতদিন যাঁহার কথা তাঁহার মনেও পড়িত না, এই সামান্য ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গ পাইবার জন্য আচার্য্যের দেহ-মন উন্মুখ হইয়া উঠিল!

ভারাক্রান্ত মনে তিনি ধীরে ধীরে চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকদিন তিনি একটু গম্ভীর ভাবে রহিলেন। তাঁহার এই গাম্ভীর্য্য অন্য সব ছাত্র লক্ষ্য না করিলেও সোমকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সোমক বিস্মিত হইয়া ভাবিল, সদাপ্রফুল্ল গুরুদেবের এ কি ভাবান্তর!

তাঁহার বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে সোমক তাঁহাকে সাহস করিয়া কোন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। আচার্য্যের মনে বড় অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, চিরঞ্জীব তাঁহার পরম হিতৈষী বন্ধু। এতদিন তিনি তাঁহার খোঁজ করেন নাই বলিয়া তাঁহার অভিমানী বন্ধুও তাঁহার কোন খোঁজ খবর করেন নাই। আবার যদি ঘটনাক্রমে চিরঞ্জীবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়? কিশোর বয়সের প্রগাঢ়-বন্ধুত্ব প্রৌঢ় বয়সে আরও সুদৃঢ় হইবে না?- হারাণো অতীতের শত সহস্র মাধুর্য্য, কিশোর বয়সের চাপল্য, আবার নবীন ভাবে দেখা দিবে। আর কি তাঁহাদিগের উভয়ের দেখা হইতে পারে না? কিন্তু কোথায়, কোন্ দেশে আছে চিরঞ্জীব! তাহার সন্ধান কে বলিয়া দিবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আচার্য্য উঠিয়া পড়িলেন।

সে দিন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। এক জন বিদেশী, পরিশ্রান্ত, অভ্যাগত আচার্য্য প্রভদেবের চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। আচার্য্য অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইলেন। ছাত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "অতিথির যেন বিন্দুমাত্র কষ্ট না হয়।" অতিথির আহারের পর আচার্য্য তাঁহার সঙ্গে কথা

বলিতেছিলেন। অতিথির বয়স তাঁহার অপেক্ষা অনেক কম, তাই তিনি তাঁহাকে 'তুমি' সম্বোধন করিতেছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা থেকে আস্‌ছো?"

অতিথি উত্তর দিল, "আমি 'সুবর্চ্চল' হ'তে আস্‌ছি। পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হয়ে আপনার চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছি।"

"কপিলবস্তু থেকে সুবর্চ্চল কতদূর?"

"বেশী দূর নয়। দু'দিনের রাস্তামাত্র। তাও পথে অনেক বিশ্রামাগার পাওয়া যায়।"

"সুবর্চ্চল গ্রামটি কেমন?"

"নিজের জন্মভূমিকে আমি সর্ব্বদাই সুন্দর দেখি। এর দোষ যদিও কিছু থেকে থাকে, আমার চোখে সহসা পড়ে না।"

অতিথির নির্ভীক উত্তর শুনিয়া আচার্য্য সন্তুষ্ট হইলেন। হঠাৎ কি একটা কথা তাঁহার মনে পড়িতেই, সাগ্রহে তিনি অতিথির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি চিরঞ্জীব ভট্ট বলে কাউকে জানো?"

অতিথি এক মুহূর্ত্ত চিন্তার পর বলিল, "না, ও নামের কোন লোক আমাদের সুবর্চ্চল গ্রামে নেই; তবে লোক-মুখে শুনেছি, 'বৈশালী নগরে' এক জন মহাপণ্ডিত আছেন, তাঁর নাম চিরঞ্জীব উপাধ্যায়।"

আনন্দের আভায় আচার্য্যের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি বৈশালীর পণ্ডিত চিরঞ্জীব উপাধ্যায়ের কথাই বল্‌ছি। তিনি কি তোমার পরিচিত?"

অতিথি উত্তর দিল, "না, উনি আমার পরিচিত নন। তবে লোকের কাছে শুনি ওঁর নাম। বৈশালীতে ওঁর মত জ্ঞানী না কি আর কেউ নেই।"

প্রভদেব বলিলেন, "বাল্যে চিরঞ্জীব আমার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। আচ্ছা, কপিলবস্তু থেকে বৈশালী কতদূর হবে?"

"এখান থেকে দিন তিনেক লাগতে পারে যেতে"—অতিথি উত্তর দিল।

আচার্য্য ভাবিলেন, দেবী কি এতদিন পরে সদয় হয়ে এই অতিথিকে দূত করে পাঠিয়েছেন?

পরদিন প্রত্যুষে অতিথি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আচার্য্য আরও উন্মনা হইলেন। তিনি যদি বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তবে এই চতুষ্পাঠী এ কয়দিন চালাইবে কে? ইহারা সব বালক। এক সোমক আংশিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু হাজার হইলেও সে-ও বালক মাত্র। তাহার উপর এই দুরূহ কার্য্যের ভার দিয়া যাওয়া সমীচীন নহে।

গুরুদেবের এই উন্মনা ভাব লক্ষ্য করিয়া সোমক আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন বৈকালে তিনি যখন 'পিয়াল' গাছের নীচে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছিলেন, তখন আস্তে আস্তে সোমক তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আচার্য্য মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সোমককে দেখিয়া বলিলেন, "আমাকে কি কিছু বলতে চাও, সোমক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব।"

"বলো"। আচার্য্য বলিলেন।

তবুও সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নেই, তুমি সব কথা খুলে বলো।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সোমক বলিল, "আজ কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, আপনি যেন কোন চিন্তায় নিমগ্ন। সর্ব্বদাই আপনার কেমন একটা অস্বস্তি ভাব লক্ষ্য করছি। আপনাকে কি আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি, গুরুদেব?"

আচার্য্য হাসিলেন। স্নেহ-কোমল স্বরে সোমককে বলিলেন, "বোসো।"

আস্তে আস্তে সোমক তাঁহার কাছে বসিল।

আচার্য্য বলিলেন, "শোন! যখন তোমার মত এমনি কিশোর ছিলাম আমি, তখন আর এক জন কিশোরের সাথে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। এমন বন্ধুত্ব বোধ হয় সচরাচর দেখা যায় না। তার জন্য বোধ হয় আমি অনায়াসে প্রাণ দিতে পারতাম। যখন সে 'বৈশালী'তে চলে গেল বিদ্যাশিক্ষার জন্য, তখন আমি মনে বড় দুঃখ পেলাম। আমার এতখানি ভালবাসার মর্য্যাদা না রেখে সে আমাকে ফেলে চলে গেল। আমি হ'লে তো পারতাম্ না। যাওয়ার দিন সে আমার সাথে দেখা করতে এলে, প্রবল অভিমানে আমি লুকিয়ে রইলাম, দেখা করলাম না। তার পর সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর আমি তার

কোন সংবাদ জানি না। সোমক! আজ এত দিন পরে অদ্ভুত ভাবে আমি তার সন্ধান পেয়েছি। বৈশালী নগরে 'মহাপণ্ডিত' খ্যাতিলাভ করে সে সেখানেই বাস করছে।"

সোমক বলিল, "আপনি তাঁর সাথে দেখা করবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছেন, না গুরুদেব?"

আচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ সোমক। শৈশবের আপ্রাণ-সুহৃদ্‌কে বহুদিন পরে এই প্রৌঢ় বয়সে আবার নতুন করে পেতে ভারী ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু তা'তো কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।"

"কেন, গুরুদেব?"

আচার্য্য বলিলেন, "আমি ছাড়া এই চতুষ্পাঠীর প্রাত্যহিক কার্য্যাবলী আর কেউ সম্পাদন করতে পারবে না। তা' ছাড়া তোমাদের একা রেখে যাওয়া সমীচীন নয়। তোমরা বালক মাত্র। তোমাদের বালকসুলভ চপলতায় প্রতিবেশীদের অনেক অনিষ্ট হ'তে পারে। সুতরাং আমার যাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়।"

সোমক বলিল, "বৈশালীর রাস্তা আমার পরিচিত। আমি তো অনায়াসে তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে আস্‌তে পারি?"

আচার্য্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বলিলেন, "না বাবা, তুমি এখনো বালক আছ। তোমাকে আমি পাঠাতে পারিনে।"

হাসিয়া সোমক বলিল, "বিদেশে যাবার মত কি আমি এখনো যথেষ্ট বড় হইনি, গুরুদেব? আপনি আমাকে আর বাধা দেবেন না। আপনার অস্বস্তি দেখে আমি দ্বিগুণ অস্বস্তি ভোগ করছি। আপনি আমায় অনুমতি দিন, কাল প্রত্যুষেই আমি যাত্রা করি। আপনি আজ রাত্রেই ওঁর কাছে পত্র লিখে রাখুন।"

তবুও আচার্য্য বলিলেন, "আমি তোমাকে পাঠিয়ে কিছুতেই যে শান্তি পাবো না, সোমক!"

সোমক বলিল, "কোন ভয় নেই, গুরুদেব! বিপদ থেকে নিজকে রক্ষা করবার মত আমার যথেষ্ট শক্তি আছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার বন্ধুকে নিয়ে আমি ফিরে আসবো।"

তাহাকে বদ্ধপরিকর দেখিয়া আচার্য্য আর কিছু বলিলেন না। স্নেহবিগলিত নয়নে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দুই দিন পরের কথা। সোমক অনেক চেষ্টায় গুরুদেবের অনুমতি লইয়া বৈশালী যাত্রা করিয়াছে। এই প্রিয় ছাত্রটিকে চোখের অন্তরাল করিতে আচার্য্যের ভারী কষ্ট হইতেছিল।

সোমক তখনও পথ চলিতেছিল। কাল সন্ধ্যায় সে চিরঞ্জীবের সন্ধান পাইবে। বৈশালীর অনতিদূরে সে একটা অতিথিশালা পাইয়া সেখানে প্রবেশ করিল। সেখানে আর একটি বিদেশীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল। বিদেশী বৃদ্ধ। রাত্রে যখন তাহারা একই প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম করিতেছিল, তখন বৃদ্ধ সোমককে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি বৈশালীতে যাবে বলছিলে না?"

ঘাড় নাড়িয়া বিনীত ভাবে সোমক উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হুঁ"। বৃদ্ধের কুঞ্চিত মুখ আরও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি কি জন্য সেখানে যাচ্ছো? সেখানে কি তোমার আত্মীয় কেউ আছেন?"

সোমক উত্তর দিল, "আজ্ঞে না। সেখানে আমার গুরুদেবের সুহৃদ্ আচার্য্য চিরঞ্জীব উপাধ্যায় বাস করেন। আমি গুরুদেবের পত্রবাহক হ'য়ে তাঁরই কাছে যাচ্ছি।"

"বল কি?" বৃদ্ধ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সোমকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কপিলবস্তুতে ফিরে যাও। এক জন বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোককে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।"

সহসা বৃদ্ধের এ ভাবান্তর দেখিয়া সোমক বিস্মিত হইল। সে বলিল, "না, গুরুদেবের অনুমতি নিয়েই আমি যাত্রা করেছি। যেমন করেই হোক্—এ কায আমায় সুসম্পন্ন করতেই হবে।"

বৃদ্ধ আর কিছু না বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার শয্যায় শয়ন করিলেন। কি একটা কথা 'বলি বলি' করিয়াও বৃদ্ধের ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া থামিয়া গেল।

পর দিবস পথ চলিয়া সোমক 'বৈশালী'র কাছাকাছি

আসিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। আরও কিছুদূর হাঁটিয়া সে বৈশালীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু চিরঞ্জীবের বাড়ীর সন্ধান সে পাইল না। নতমুখে সে চিন্তা করিতে লাগিল, এখন সে কি করিবে? সন্ধ্যার পরেই আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড রূপালী চাঁদ ঝিলমিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমক তখনও পথে দাঁড়াইয়া। একটি পথিক সেই পথে যাইতেছিল। সোমক তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমি পরিশ্রান্ত বিদেশী, আচার্য্য চিরঞ্জীব উপাধ্যায়ের বাড়ীর সন্ধানটা আমায় অনুগ্রহ করে বলে দেবেন?"

পথিক যাইতে যাইতে বলিল, "এই বাঁ দিকের রাস্তা ধরে কিছুদূর গেলেই, অলক্ত নদীর ধারে চিরঞ্জীব উপাধ্যায়ের বাড়ী।"

সোমক আর কালবিলম্ব না করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। পথিকের নির্দ্দেশমত রাস্তা ধরিয়া যাইতেই সে চিরঞ্জীবের বাসস্থানের সন্ধান পাইল। ঐ তো অলক্ত নদীর তীরেই চিরঞ্জীবের ছোট মনোরঞ্জন কুটীরখানি! পথশ্রমে সোমক অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, সে কুটীরের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিল। প্রথম বার কোন সাড়া-শব্দ পাইল না। দ্বিতীয়বার আঘাত করিতেই সে দ্বার খোলার শব্দ পাইল। পরক্ষণেই সোমক যাঁহাকে দেখিতে পাইল, তিনি এক জন মহিলা।

মৃদু চাঁদের আলো তাঁহার মাথায় পড়িয়াছিল। সূক্ষ্ম সীঁথিতে সিঁদূরের রেখা জল জল করিতেছিল। এই মহিলাটি চিরঞ্জীবের পত্নী 'সুচরিতা দেবী।' তিনি সোমককে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি চাও?"

সোমক উত্তর দিল, "আমি কপিলবস্তু হ'তে এসেছি। আমার গুরুদেব আচার্য্য চিরঞ্জীবের সতীর্থ। তিনি আমার কাছে তাঁকে পত্র পাঠিয়েছেন।"

সুচরিতা দেবী বলিলেন, "কিন্তু আমার স্বামী তো এখন নিদ্রিত,—তা' ছাড়া কয়েক দিন থেকে তিনি অসুস্থ। এই অসুস্থ শরীরে তাঁকে জাগানো উচিত হ'বে না। তোমাকে পথশ্রমে অত্যন্ত অবসন্ন দেখ্‌ছি, তুমি ভিতরে এসে বিশ্রাম কর। কাল সকালে তাঁকে তোমার যা' বল্‌বার আছে, বলো।"

সুচরিতা দেবী সোমককে একটি ঘরে পরিচ্ছন্ন শয্যা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করো, আমি তোমার আহারের আয়োজন করি।"

প্রদীপের আলোকে সোমক এইবার তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। অসামান্য সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার দীপ্তিতে ভরা তাঁহার মুখটি।

সোমকের মনে সুচরিতা দেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জাগিল।

পরদিন প্রত্যূষে সোমকের ঘুম ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে 'অলক্ত' নদীতে গেল হাত-মুখ ধুইবার জন্য। সেখানে সে সুচরিতা দেবীকে দেখিতে পাইল। তিনি ঘড়া ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছেন। সোমককে দেখিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে তুমি উঠেছো। আমি তোমাকে ডাক্‌তে যাবো ভেবেছিলাম। আমার স্বামী উঠেছেন। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসো, তার পর তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবো।"

জল লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সোমক বিস্মিত হইয়া দেখিল, কাল রাত্রিতে সে যে মুখখানিতে অসামান্য সৌন্দর্য্যের দীপ্তি দেখিয়াছিল, আজ দিনের আলোয় দেখিল, সে মুখখানিতে কমনীয়তার সঙ্গে বিষাদ ও কারুণ্য ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। আয়ত চোখদুটিতে একটু ব্যথা লাগিলেই যেন বন্যার জলস্রোতের মত ছাপাইয়া পড়িবে। সে ভাবিল, এ সৌন্দর্য্য প্রখর দিবালোকে মানায় না। নিশীথ চন্দ্রালোকেই মানায় ভাল।

সুচরিতা দেবী কিন্তু তখনও চলিয়া যান নাই। কিছু দূরে দাঁড়াইয়া একাগ্র মনে সোমককে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সোমককে দেখিয়া হয় তো এই নিঃসন্তান নারীর মনে স্বাভাবিক সুপ্ত অপত্যস্নেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সোমক মাথা নীচু করিয়া মুখ ধুইতেছিল। তাহার শিশুর মত সরল মুখ, কচি হাতদুটির লীলায়িত ভঙ্গী ক্ষণে ক্ষণে সুচরিতা দেবীর মনে অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসের আভাস দিতেছিল। তাঁহারও ত এমনই একটি সন্তান থাকিতে পারিত!

অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ কি একটা কথা মনে হইতেই মুখখানি তাঁহার ম্লান হইয়া গেল। নূতন, কচি কিশলয়ের মত তাঁহার ঠোঁট দুটি থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া জলে ভরিয়া গেল। অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, "জীবনে তো আমায় অনেক দুঃখ দিলে, দেবতা! কোনদিন মুখ ফুটে সেজন্য তোমায় কোন অভিযোগ জানাই নি। আজ আমাকে শুধু এইটুকু দয়া করো,

দেবতা, যেন তাঁর প্রতি আবার আমায় বিশ্বাস হারাতে না হয়।"

সুচরিতা দেবী আত্মসংবরণ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন। জলপূর্ণ ঘড়াটা তিনি কক্ষান্তরে রাখিয়া সোমককে ডাকিয়া লইয়া চিরঞ্জীবের কক্ষে চলিলেন। চিরঞ্জীব তখন শয্যার উপর উপাধানে হেলান দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সুচরিতা দেবীর পায়ের শব্দ শুনিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে একটি অপরিচিত কিশোরকে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতেই সোমক আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আমি কপিলবস্তু হ'তে এসেছি। আমার গুরুদেব আচার্য্য প্রভদেব আপনার কাছে এই পত্র পাঠিয়েছেন। আমি তারই বাহক হয়ে আস্‌ছি।"

পত্রখানা বাহির করিয়া সে চিরঞ্জীবের হাতে দিল।

চিরঞ্জীবকে দেখিয়া সোমক ভারী নিরুৎসাহ হইয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল, চিরঞ্জীব হয় ত প্রভদেবের অনুরূপই হইবেন। কিন্তু এখন সে দেখিতে পাইল, তাহা মোটেই নহে। তাঁহার দেহ কঙ্কালসার। মানুষ অসুস্থ থাকিলে তাহার মুখের উপরে একটা ক্লান্ত ছায়া পড়ে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে চিরঞ্জীবের মুখের উপরে একটা কুটিলতার ছদ্ম আবরণ বিস্তৃত। ক্ষুদ্র চোখ দুটি দেখিলেই মনে হয়, অতি ক্রুদ্ধ স্বভাবের। গুরুদেবের পরম সুহৃদ্ যে এই ব্যক্তিটি, তাহা সোমকের মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না।

পত্র পড়া শেষ হইলে চিরঞ্জীব বলিলেন, "তোমারই নাম সোমক? তুমি প্রভদেবের শিষ্য?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সোমক বিনীত ভাবে উত্তর দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "প্রভদেব তার চতুষ্পাঠীতে যেতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু আমি তো এখন অসুস্থ। কিছু দিন পরে না হ'লে তো যাবার উপায় নেই।"

সোমক প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "তবে আমি আজকে একাই কপিলবস্তুতে ফিরে যাই। গুরুদেবকে গিয়ে জানাবো, আপনি সুস্থ হয়ে কিছু দিন পরে আসবেন।"

চিরঞ্জীব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি তো সবে মাত্র কালই এলে। আমার বাড়ীতে যখন অতিথি হয়ে এসেছ, তখন এত শীঘ্রই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। কিছু দিন থেকে, তার পর যেয়ো।"

সোমক ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "গুরুদেব আমায় বিলম্ব করতে নিষেধ করেছেন, আমার বিলম্ব দেখলে তিনি চিন্তিত হবেন।"

অধৈর্য্যকণ্ঠে চিরঞ্জীব বলিলেন, "তোমার গুরুদেব আমারই বাল্য-সুহৃদ্। আমার অনুরোধে তুমি এখানে কিছু-দিন আতিথ্য গ্রহণ করলে তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হবেন না বা তোমার পক্ষেও সেটা গুরুতর অন্যায় হবে না।"

লজ্জিত হইয়া সোমক চুপ করিল। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে চলিল। চিরঞ্জীব তাহার সুদৃঢ় অবয়ব আর নিটোল স্বাস্থ্যের দিকে ক্ষুধার্ত্ত চোখের দৃষ্টি ফেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। হিংস্র শ্বাপদের মত তাঁহার দুই চোখ্ জ্বলিতেছিল।

তিন চারি দিন পরের কথা। কাল প্রত্যূষে সোমক কপিলবস্তুতে যাত্রা করিবে। চিরঞ্জীব কিছু সুস্থ হইয়াছেন। তিনি আরও কয়েকদিন পরে যাইবেন।

সেদিন রাত্রে ঝড় উঠিল। 'কালবৈশাখী'র প্রচণ্ড ঝড়। কোন উন্মত্ত পশুর হুঙ্কারের মতই বার বার বজ্র-পড়ার শব্দ। আর সেই সঙ্গে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, যেন কোন সর্ব্বহারা অভিশপ্তের আর্ত্তনাদ! সুচরিতা দেবী রন্ধন করিতেছিলেন। এমন প্রবল ঝড় দেখিয়া তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে তিনি রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া চিরঞ্জীবের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চিরঞ্জীব তখন ঘরে ছিলেন না। সুচরিতা দেবী চিন্তিত হইলেন। এমন অসময়ে তো তিনি কখনো বাহির হন না। তাহা ছাড়া এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অসুস্থ শরীর লইয়া তিনি গেলেন কোথায়? কি একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁহার মন কাঁপিয়া উঠিল। অস্থির মনে তিনি সোমকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোমক শয্যায় শুইয়া আছে। সুচরিতা দেবী শয্যার কাছে আগাইয়া গেলেন। স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন, "সোমক?"

সোমক মুখ তুলিয়া চাহিল।

সুচরিতা দেবী আবার বলিলেন, "এমন অসময়ে শুয়ে যে? শরীর কি অসুস্থ বোধ করছো?"

সোমক বলিল "না দেবী, অসুস্থ নই। বসে বসে পুঁথি পড়ছিলাম, শরীরটা কেমন ক্লান্ত লাগলো, তাই একটু শুয়েছি।"

সে উঠিবার উপক্রম করিল। সুচরিতা দেবী বলিলেন, "না, না, তুমি উঠো না। আমি তাড়াতাড়ি তোমার আহার প্রস্তুত করিগে।"

নিশ্চিন্ত মনে তিনি রন্ধনশালায় চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টা দুয়েক পর সুচরিতা দেবী সোমকের আহারের আয়োজন করিয়া তাহাকে ডাকিতে আসিলেন।

সোমক তখন অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সুচরিতা দেবী ডাকিলেন, "সোমক?"

উত্তর পাইলেন না। আবার তাহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিলেন, "সোমক?"

এবার সোমক জড়িতস্বরে উত্তর দিল, "ঘুম, চোখে বড় ঘুম, কথা কইবার শক্তি নেই।"

আবার সে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

সুচরিতা দেবীর পা হইতে মাথা অবধি কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি—

তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। দ্রুতপদে চিরঞ্জীবের কক্ষের উদ্দেশে চলিলেন। কিন্তু তখনও চিরঞ্জীব ফেরেন নাই। ঘর শূন্য। দ্বার ধরিয়া সুচরিতা দেবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরক্ষণেই খোলা দ্বার দিয়া উন্মত্তের মত বাহির হইয়া গেলেন।

অলক্ত নদীর অল্প একটু দূরেই বহু প্রাচীন একটি মন্দির। তাহার চূড়াটা কবে যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরটা ফাটিয়া প্রায় চৌচির হইয়া গিয়াছে। আর সেই ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাটল দিয়া অসংখ্য 'পিপুল' গাছের চারার উদ্গম হইয়াছে। গাঢ় সবুজ রংয়ের শ্যাওলা পড়িয়া মন্দিরটা প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই মন্দিরের দ্বার আলগোছে রুদ্ধ করিয়া চিরঞ্জীব 'পদ্মাসনে' বসিয়া সেই মন্দিরস্থিত "বাণেশ্বর দেবের" উদ্দেশে অঞ্জলি দিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে তালপত্রে নির্ম্মিত রাশীকৃত পুস্তক। তাহারই কিছুদূরে একটা তাম্রকুণ্ডে হোমের নীলাভ অগ্নি অল্প অল্প জ্বলিতেছিল। চন্দন-কাঠের মৃদু সুবাসে মন্দির পরিপূর্ণ। সেই হোমাগ্নিতে তিনি যখন 'কমণ্ডলু' হইতে পূর্ণাহুতির জন্য বারি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, তখন সুচরিতা দেবী একেবারে তাঁহার পায়ের উপর পড়িলেন। চিরঞ্জীব চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত হইতে কমণ্ডলু পড়িতে পড়িতে তিনি সামলাইয়া লইলেন। ভ্রূকুটি করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি এখানে এমন অসময়ে কেন? যাও বাড়ী যাও।"

সুচরিতা দেবী ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "না, না, যাবো না আমি, আগে তুমি তোমার মন্ত্র ফিরিয়ে নাও।"

চিরঞ্জীব অত্যাশ্চর্য্য হইয়া প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি—এ কথা কি করে জান্‌লে?"

তেমনই ব্যাকুল স্বরে সুচরিতা দেবী বলিলেন, "আমি সব জানি। তোমার কোন কথাই তো আমার অজানা নয়। তুমি কত কষ্ট করে কতদিনের শ্রমের ফলে এ মন্ত্র আবিষ্কার করেছ, তা কি আমি জানি না? কত বার চেষ্টা করেছি, তোমাকে এ পাপ হ'তে উদ্ধার করতে, কিন্তু কিছুতেই তা পারিনি।"

"পাপ—?" চিরঞ্জীব গর্জ্জিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিলেন, "তুমি যখন জানো, তখন ভালোই হয়েছে। শোন, সুচরিতা! এই চিররুগ্ন দেহের বোঝা, অস্বাস্থ্যের বিষাদময় ভার আর আমি বয়ে বেড়াতে পারিনে। আজ সুদীর্ঘ দশ বছর পরে আমি অবিশ্রাম সাধনা আর কঠোর তপস্যার ফলে সাফল্য লাভ করেছি। এ অনাবিষ্কৃত মন্ত্র এতদিন গুপ্ত হয়েই ছিল, বহু আয়াসে বহু পরিশ্রমে এ মন্ত্র আমি আবিষ্কার করেছি। কি সে কঠোর পরিশ্রম তুমি তা' জানো না, সুচরিতা! শোন! তাই সোমকের সুদুর্লভ স্বাস্থ্য আমি আমার এই জরাজীর্ণ শরীরে প্রবেশ করিয়ে নিচ্ছি আমার অভিনব মন্ত্রের সাহায্যে।"

হাঁপাতে হাঁপাতে সুচরিতা দেবী প্রশ্ন করিলেন,—"আর সোমক? তার কি হবে?"

একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া চিরঞ্জীব উত্তর দিলেন, "তার দেহে আর তখন প্রাণ থাক্‌বে না—।"

"উঃ! সুচরিতা দেবী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "না—না, এমন পাপ করো না, তোমার আবাল্য সুহৃদের কাছে তুমি এত বড় বিশ্বাসঘাতক হয়ো না।"

চিরঞ্জীব বলিলেন, "নিজের জীবনের চেয়ে কি বন্ধু বেশী? আমার জীবনের মূল্য কি আমার আবাল্য সুহৃদ্ দিতে পারবে?"

সুচরিতা দেবী দৃঢ়বলে চিরঞ্জীবের দুই পা' জড়াইয়া

ধরিয়া বলিলেন, "ঐ সুকুমার নিষ্পাপ বালককে এত বড় শাস্তি দিয়ো না, সে তো তোমার কোন অন্যায় করেনি। তার চেয়ে আমায় বধ করো।"

"তুমি তোমার স্বামীর জীবন চাও না, সুচরিতা?"

"চাই, ওগো চাই! কিন্তু সে জীবন তো আমার স্বামীর হবে না। একটি নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ বালকের প্রাণ হবে। এ কথা আমার মনে অহর্নিশি জাগবে। আমি তো তোমাকে কোনদিন শ্রদ্ধা করতে পারবো না।"

চিরঞ্জীব প্রায় নির্ব্বাপিত হোমাগ্নির দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অধীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন,—"ছাড়ো, ছাড়ো, আমার সব শ্রম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" দৃঢ়বলে তিনি সুচরিতা দেবীর হাত হইতে পা' ছাড়াইয়া লইয়া হোমাগ্নিতে 'পূর্ণাহুতি' দিয়া দিলেন। সুচরিতা দেবী নিস্তেজ হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা তিনি ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া চিরঞ্জীবকে বলিলেন, "তোমার ঐ মন্ত্রের সাহায্যে আমাকেও বধ কর। বল করবে কি না? বলো?"

চিরঞ্জীব বলিলেন, "না"।

সুদৃঢ় কণ্ঠে সুচরিতা দেবী বলিলেন, "তা' যদি না করো, তবে তোমার সম্মুখে আমি আত্মহত্যা করব। আর তোমার ঐ পাপের সাক্ষী—" সুচরিতা দেবী আঙ্গুল দিয়া 'বাণেশ্বর দেবের' প্রস্তর মূর্ত্তি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "একে আমি এই মুহূর্ত্তে চূর্ণ করে ফেলবো।"

"কি?" চিরঞ্জীব গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার? বেশ তবে প্রস্তুত হও। ভালোই হলো, তোমার আয়ু আর সোমকের আয়ুর সাহচর্য্যে আমি আরও অনেক দিন সুস্থ শরীরে পৃথিবীতে থাকতে পারব।"

চিরঞ্জীব আর একবার হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মন্দিরের সম্মুখের 'ছত্রাক' গাছটা ঝড়ের দাপটে সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ হাসিয়া বিকটরবে বজ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কাল-বৈশাখীর ঝড় আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

আচার্য্য প্রভদেবের মন আজ বড় ভারাক্রান্ত। কাল রাত্রে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন।

'দেবী মরালবাহিনী' তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। কৃতার্থ হইয়া আচার্য্য বলিলেন,—"মা, এতদিন পরে সত্যই কি আমার উপর তুষ্টা হয়েছ?" দেবী বলিলেন, "প্রভদেব, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

আচার্য্য বলিলেন, "মা, আমায় অপরাধী করো না। তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।"

দেবী বলিলেন, "তোমার সোমককে আমি ভিক্ষা চাইছি। তাকে আমায় দাও।"

স্বপ্ন শেষ হইয়া গেল। সকালে উঠিয়া আচার্য্য মনে করিতেছিলেন, আজ তিনি সোমককে আনিবার জন্য বৈশালীতে যাত্রা করিবেন।

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

ভুলে যদি গিয়ে থাক

ভুলে যদি গিয়ে থাকো, ভুলেই যেয়ো,
এরে আর ফিরে পুনঃ না কভু চেয়ো!
যে তরণী বাহিতেছ,
যেই গান গাহিতেছ,—
সেই বহা ক'রো শেষ, সে গানই গেয়ো!
ভুলে যদি গিয়ে থাকো, ভুলেই যেয়ো।

মনে ক'রো ঘটেছে যা—স্বপন ও সে,
মিথ্যা সে কল্পনা,—নিয়তি দোষে!
হৃদয়ের স্মৃতি খানি
বুক চিরে নিয়ো টানি,
সব ব্যথা যেয়ো দলি—দারুণ রোষে!
মনে ক'রো ঘটেছে যা—স্বপন ও সে

এতে তব দোষ কিছু হবে না জেনো;
অভিশাপ বলে' তুমি আমারে মেনো।
আমি ও সকলি ভুলে,
নব নব আলো তুলে,
সেই মোর কাছে হবে সবার শ্রেয়!
ভুলে যদি গিয়ে থাকো, ভুলেই যেয়ো।

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের অনুসরণ

বাঙ্গালায় মাৎস্যন্যায়

বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। এই দেশের কোন ধারাবাহিক লিখিত বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি ইহার লিখিত কোন ইতিহাস থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলে তাহা হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে এই দেশের ইতিহাস পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দে ভূস্বামী চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী বংশের কুমার দেবী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি নিজের জমিদারীকে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। ইনিই বিখ্যাত গুপ্তবংশের আদি রাজা। ইনি ঠিক কোন্ সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই সত্য, কিন্তু ইহার সিংহাসন আরোহণের দিন হইতে গৌপ্তাব্দ গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার সিংহাসন আরোহণের কাল নির্ণয় করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার গৌড় এবং রাঢ় দেশ এই গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্তেরই অধিকারভুক্ত ছিল। গুপ্তবংশের রাজত্বকালে গৌড়ের এবং রাঢ়দেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্তরাজগণের গৌরব এবং প্রতাপ বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। গুপ্তরাজগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন, —(১) মালবের গুপ্তরাজগণ এবং (২) মগধের গুপ্তরাজগণ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অবসান কালে দ্বিতীয় জীবিত গুপ্তের মৃত্যুর পর এই গুপ্তরাজগণের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল। প্রদীপ নিবিয়া যাইবার পূর্ব্বে যেমন একবার জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ এই গুপ্তরাজবংশের শশাঙ্ক নামধেয় এক জন রাজা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার কথা আমি পরে বলিতেছি। গুপ্তরাজগণের তিরোভাবের সহিত বাঙ্গালা দেশে ঘোর মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। সেই অরাজকতার কথাই আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই সময়ে বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা চীন-পরিব্রাজক হুয়েনথ্ সাঙের লিখিত বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। তখন বাঙ্গালাদেশ অন্ততঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা (১) পৌণ্ড্রদেশ (উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গের কিয়দংশ), (২) কামরূপ (আসাম), (৩) সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), (৪) তাম্রলিপ্তি (দক্ষিণ-বঙ্গ) এবং (৫) কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিম বঙ্গ)। দক্ষিণ বঙ্গের কিয়দংশ সমতটের মধ্যে ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন কজঙ্গল নামে বাঙ্গালার একটা অংশ অভিহিত হইত। সে কথা পরে বলিব।

গুপ্ত-রাজগণের শেষ আমলেই তাঁহাদের বিস্তীর্ণ রাজ্য ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হইতে থাকে। উত্তরাপথে তখন কতকটা অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। গুজরাটে চালুক্যবংশীয় রাজগণ স্বাধীন হইয়া উঠেন। পুষ্পভূতি রাজগণ থানেশ্বরে এবং মৌখরীবংশীয় নৃপতিরা কান্যকুব্জে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঈশান বর্ম্মা নামক মৌখরীবংশীয় জনৈক নৃপতি সাগর-তীরবর্ত্তী বঙ্গবাসীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যশোধর্ম্ম দেব মধ্য ভারতে রাজপুতানায় এবং পঞ্চনদের কিয়দংশে স্বীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি মগধে এবং বঙ্গদেশেও স্বীয় অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের বিস্তার ছিল লৌহিত্য হইতে পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত। মালব দেশের গুপ্ত-রাজগণ যশোধর্ম্মদেবের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বকই আপনাদের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মগধের গুপ্তরাজগণ ঐ পন্থা ধরিয়াছিলেন। মৌখরী-রাজবংশের গ্রহবর্ম্মা যুদ্ধে দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত এবং নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক নামক জনৈক রাজা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়দেশে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার আমলের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে কোথাও কর্ণসুবর্ণের রাজা এবং কোথাও গৌড়েশ্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালায় ইহার অধিকার বিস্তীর্ণ ছিল। ইনি শৈব ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্ত রাজগণের ন্যায় বৈষ্ণব ছিলেন না। ইহার অন্য নাম ছিল নরেন্দ্র গুপ্ত। ইনি গুপ্তবংশীয়ই ছিলেন। ইনি বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমকে ছেদন করেন এবং তথাকার মন্দির হইতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সরাইয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছিলেন। শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন যে, থানেশ্বরের বৌদ্ধরাজার সহিত শশাঙ্কের শত্রুতা ছিল, সেই জন্য তাঁহার মনে আঘাত দিবার জন্য শশাঙ্ক ঐ কায করিয়াছিলেন, নতুবা তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি যদি সত্য সত্যই বৌদ্ধবিদ্বেষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজধানীতে এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে এত বৌদ্ধ-চৈত্য ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি থাকিত না।

প্রাচীন বাঙ্গালার মানচিত্র

যে সময়ে শশাঙ্ক বাঙ্গালা এবং বিহারে নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন, সে সময়ে বাঙ্গালায় ঠিক অরাজকতা উপস্থিত হয় নাই। শশাঙ্কের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে গোপচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্য, সমাচারচন্দ্র নামক তিন জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেক মুদ্রা এবং তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইঁহাদের রাজত্ব এবং অধিকার সম্বন্ধে অন্য কোন বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানা যায় নাই। ইঁহারা কতকটা শক্তিশালী নরপাল ছিলেন, সুতরাং ইঁহাদের আমলে গৌড়-বঙ্গে বিশেষ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের শাসনকালে বাঙ্গালায় প্রজাবর্গের অবস্থা ভালই ছিল। বাঙ্গালার উত্তর-পশ্চিম অংশ তখন কজঙ্গল নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান রাজমহলের দিক্‌টার নাম ছিল কজঙ্গল। তথায় খুব ভাল শস্য উৎপন্ন হইত। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সরল প্রকৃতির এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। উত্তর-বঙ্গ বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অঞ্চল সর্ব্ববিষয়েই সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই অঞ্চলে যেমন ভাল ভাল পল্লীগ্রাম ছিল, তেমনই বড় বড় নগরও ছিল এবং হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ বেশ সুখে শান্তিতে বাস করিত। কামরূপ, আসাম অঞ্চলের লোকদিগের ভাষা বাঙ্গালা দেশের ভাষা হইতে কতকটা পৃথক্ ছিল। ইহারা হিন্দু ছিল, বৌদ্ধ ছিল না। হুয়েনথ সাং বলিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের রাজা ভাস্কর বর্ম্মা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ বাণিজ্যপ্রধান ছিল। তথা হইতে অনেক মূল্যবান পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইত। এই অঞ্চলের লোক বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কৃষির অবস্থাও ভাল ছিল। এখানে নানারূপ ফল, ফুল ও শস্য

জন্মিত। সমুদ্রতটের সন্নিহিত অঞ্চলে বৌদ্ধ স্থবির, জৈন দিগম্বর ও নির্গ্রন্থ সম্প্রদায় এবং হিন্দুরা বাস করিত। শশাঙ্ক-শাসনের মূল কেন্দ্র কর্ণসুবর্ণে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকরাও শান্তিতে বাস করিত। এ দেশের লোক ধনাঢ্য, সচ্চরিত্র এবং বিদ্যোৎসাহী ছিল। শশাঙ্কের রাজধানীর পার্শ্বেই রক্তমৃত্তিকা (Lo-to-mo-te) বা রাঙ্গামাটীতে বৌদ্ধদিগের একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল। উহা অত্যন্ত বৃহৎ, বিখ্যাত, এবং বহু বৌদ্ধ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে শশাঙ্ক যে বৌদ্ধদিগের উপর উৎপীড়নকারী ছিলেন,—ইহা কোনমতেই বলা যায় না। শশাঙ্কের আমলে বাঙ্গালায় যে মাৎস্যন্যায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মনে হয় না।

কোন্ সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা বলা বড় কঠিন। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর শশাঙ্ক দেহরক্ষা করেন। তাহার পর তাঁহার সহোদর অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত মগধের রাজা হইয়াছিলেন। এই মাধবগুপ্তের আমলেই বাঙ্গালা দেশে মাৎস্যন্যায় উপস্থিত হয়। শশাঙ্ক-রাজত্বের শেষ আমলেই ইহার সূচনা দেখা দিয়াছিল। তাঁহাকে তাঁহার শেষ আমলে অনেক শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালেই তিব্বতের এক জন প্রবলপরাক্রান্ত রাজা (Srony betran Sgam po) বিহার এবং বাঙ্গালার কিয়দংশে অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। Sylvain Levy এবং ডক্টর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐ মত পোষণ করেন। কিন্তু কুত্রাপি তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তিব্বতাধিপ কোন্ কোন্ স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় নাই। তবে শশাঙ্ককে যে শেষ আমলে অনেক প্রবল শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, তাহার প্রচলিত মুদ্রাই তাহার সাক্ষ্য দেয়। তিনি অর্থাভাবে শেষকালে সুবর্ণ মুদ্রায় রজত মিশ্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পর মাধবগুপ্তের সময় বঙ্গদেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়। এই সময় নানাদিক্ দিয়া বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইতে থাকে। এই অরাজকতার সময়ের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়াই যায় না। কতকগুলি মুদ্রা এবং তাম্রলিপি অবলম্বন করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই সময়ের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই সকল তাম্রলিপি অধিকাংশই ভূমি প্রভৃতি দানের প্রশস্তি। উহাতে দানকর্ত্তার গুণের এবং শক্তির কথা অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণিত হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য উহা অবলম্বন করিয়া যে ইতিহাস রচিত হয়, তাহা সত্যের সহিত সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত থাকে না। সেজন্য ঐতিহাসিকদিগের পরস্পরের সহিত মতভেদও অধিক হইয়া থাকে। যাহা হউক, শশাঙ্কের রাজত্বকালের পর একদিক্ হইতে কামরূপের রাজা হর্ষদেব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়দেশ জয় করিয়াছিলেন। শৈলবংশজ দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পিতামহ পৌণ্ড্রাধিপকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের যশোবর্ম্মা সমুদ্রতটস্থ বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করিয়া বঙ্গাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার হস্তে পরাজিত এই বঙ্গাধিপটি কে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এ সময়ে বাঙ্গালায় কোন বড় রাজা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ কোন সামন্ত রাজা যশোবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা যখন গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন গৌড়দেশ এবং বঙ্গদেশ উভয়ই দুই জন স্বতন্ত্র রাজার শাসনাধীন ছিল। ইঁহারা উভয়েই যশোবর্ম্মার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা আবার কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক পরাজিত এবং রাজ্যচ্যুত হয়েন। বাঙ্গালার এবং মগধের সামন্তরাজগণও তখন পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতেন। তাহার ফলে এ দেশবাসীর শান্তি এবং শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়। প্রজাপুঞ্জ আর ধনপ্রাণ লইয়া নিশ্চিন্তভাবে বাস করিতে পারিতেছিল না। অগত্যা প্রজাবর্গ মিলিত হইয়া বপ্যটের পুত্র এবং দয়িত বিষ্ণুর পৌত্র গোপাল দেবকে বাঙ্গালা এবং বেহারের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

এই অরাজকতা কিরূপ ভীষণ হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের উপর তাহার প্রভাব বহুদিন ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই অরাজকতাজনিত অশান্তি ঠিক সাধারণ রাজায় রাজায় যুদ্ধের মত সামান্য হয় নাই। তখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে দেশের লোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিত না। রণক্ষেত্র

হইতে কয়েক মাইল দুরস্থ মাঠে কৃষকরা নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কৃষিকার্য্যে রত থাকিত। মনে করিত, যিনিই রাজা হইবেন, তাঁহাকেই তাহারা কর দিবে। স্থানীয় ভূস্বামীদিগের বিবাদ সম্বন্ধে এইরূপই হইত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমতটে খড়্গাবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। গৌড়ে এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অন্য রাজা ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর প্রাধান্য লাভের জন্য যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু প্রজার ক্ষতি বা অনিষ্ট করিতেন না। নিজ নিজ অধিকার-বিস্তারই ইঁহাদের যুদ্ধের কারণ ছিল। কিন্তু বিদেশী, বিধর্ম্মী এবং ভিন্ন ভাষা-ভাষী রাজা কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে প্রজার ক্ষতি ও শান্তিভঙ্গ হইত। কারণ, ঐ শ্রেণীর আক্রমণকারীরা প্রজার উপর কোন প্রকার দরদ দেখাইত না। কারণ, তাহারা জানিত, প্রজারা স্থানীয় রাজগণেরই পক্ষপাতী। সেই জন্য তাহারা বিভীষিকার দ্বারা রাজ্য শাসন করিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সময়ের কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই। মুদ্রা এবং তাম্রশাসন প্রভৃতি নিদর্শন দেখিয়া তাহা হইতে এখন অনুমান পূর্ব্বক ইতিহাস রচনা করা হইতেছে। ঐ প্রকার অনুমান দ্বারা ঠিক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাসের উদ্ধার করা সম্ভবে না। কিন্তু ইহার সহিত যদি পুরাবস্তু মিলিয়া যায়, তাহা হইলে এই তমসাচ্ছন্ন কালে আবার নূতন আলোকের সম্পাত হয়। এখন সেইরূপ কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখা আবশ্যক।

সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার রাজসাহীর পাহাড়পুরে, বগুড়ার মহাস্থান গড়ে, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটীতে খননকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। তাহাতে অনেক পুরাকীর্ত্তির এবং অপকীর্ত্তির নিদর্শন মিলিয়াছে। উহাতে গুপ্তবংশের পরে এবং পালবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গে যে ঘোর অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, তাহার নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। মিষ্টার কে, এন, দীক্ষিত এই অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। মহাস্থান গড়ে "বৈরাগীর ভিটা" এবং "গোবিন্দের ভিটা" নামক স্থান খনন করিতে করিতে গুপ্তবংশীয় এবং পাল-বংশীয় রাজগণের আমলের অনেক কীর্ত্তি দেখা দিয়াছে। এই স্থানটিতেই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর ছিল। ইহা রাজধানী বা রাজধানীতুল্য স্থান ছিল। দীক্ষিত মহাশয় বলিয়াছেন যে, এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী পাল-রাজগণের অনেক কীর্ত্তির অবশেষ বিদ্যমান। গুপ্ত-রাজগণের আমলের কতকগুলি মন্দিরাদিও আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি মন্দির, চৈত্য ও সৌধ যে চূর্ণবিচূর্ণ করা হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন দেদীপ্যমান। এই সময়ে দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার মাল-মশলা দিয়া একটি নর্দ্দামাও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মনে হয়, কোন বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক এই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে গোপাল দেবের পিতা বাপ্যট পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পরাক্রমী সামন্তরাজা বা রাজা ছিলেন। তিনি রণকুশল ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই গোপাল দেবের জন্মস্থান। গোপাল দেব কোন্ সময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ বিদ্যমান। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে গোপাল দেব ৭৩০ হইতে ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজা হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, গোপাল দেব খৃষ্টীয় ৭৮৫-৯০ অব্দের মধ্যে সিংহাসন লাভ করিয়া উহার অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু লামা তারানাথ বলিয়াছেন, গোপাল দেব ৪৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এরূপ অবস্থায় মোটামুটি মনে হয়, প্রথম গোপাল দেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনিই মাৎস্যন্যায়ের অবসান করিয়া গিয়াছিলেন, মনে করিলে অন্যায় হইবে না। তাহা না করিয়া গেলে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল দেব অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা হইতে পারিতেন না।

প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসরব্যাপী এই অরাজকতা বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতার ফলে এ দেশের অনেক ধনজন ক্ষয় হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অনেক বীর-বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছিল। অনেক ধনী সওদাগর এবং ব্যবসায়ীর ধন লুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ বাধা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও বড় বড় নগরে ঐ সকল বিধ্বস্ত মন্দির, চৈত্য, সঙ্ঘারাম প্রভৃতির ভগ্নস্তূপে ইহার গৌণ প্রমাণ বিদ্যমান। গোপাল দেবকেও এই অশান্তি দূর করিবার

জন্য অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল দেবও দিগ্বিজয় করিতে যাইয়া অনেক ধন-জন ক্ষয় করিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে তিনি বাঙ্গালা দেশে অরাজকতার দমন করিয়াছিলেন। ইঁহার পরই অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাঙ্গালীর সুখসমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিতে থাকে। ফলে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, বেহার এবং আসামের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার প্রভাব পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালার উপর কিরূপ হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

রাগের রেশ

কান্ত শান্ত হের নৈমিষারণ্য !
উঠে বেদ-গান, শব্দ নাহিক অন্য।
স্নিগ্ধ সমীর বহিতেছে হবিগন্ধী,
তপোবন-তরু রাজিছে নয়নানন্দি।
মগধের-রাজা কৌশিক ত্যজি রাজ্য
আশ্রমে আসি করিছেন সেবাকার্য্য।
মাটীর কর্ত্তা, মাটীর মানুষ অদ্য—
নাই অভিমান, চরিত্র অনবদ্য।
আদেশে যাঁহার চলিত বিরাট রাষ্ট্র
নীবার বহেন, কখনো কাটেন কাষ্ঠ।

এলো আশ্রমে সহসা অতিথি যুগ্ম,
মূর্ত্তি সৌম্য, মেজাজ অতীব রুক্ষ।
রাজা নিযুক্ত তাহাদের সেবাকর্ম্মে,
পরুষ বচনে ব্যথা পান বড় মর্ম্মে।
সাধ্য তাদের তর্জ্জনে কেবা তিষ্ঠে,
সজোরে আঘাত করিল রাজার পৃষ্ঠে।
রাজা ক'ন ধীরে কলসী ভরতে ভরতে
মগধে থাকিলে এটা পারিতে না করতে।
সব সংবাদ মিলিয়া বর্ণে বর্ণে—
পঁহুছিল আসি ক্রমে মহর্ষি-কর্ণে।

কিছুকাল পর, নৃপতি বলেন আর্য্য,
মন্ত্রদানের কবে দিন হবে ধার্য্য ?
হাসি মহর্ষি ক'ন আগে হও শুদ্ধ,
ক্রোধ মন্ত্রের পথ করে অবরুদ্ধ।
রাম ত লবে না যাতে আছে দান-গর্ব্ব—
রামের লাগিয়া ত্যাগ করা চাই সর্ব্ব।
রামের লাগিয়া সব ক্লেশ হয় সইতে
কারে বল্মীক, পাষাণ হয়েছে হইতে।
এখনো তোমার রসনায় রাজ-ছন্দ,
মুখে বেটা তোর আজও মগধের গন্ধ !

শুনি কৌশিক সম্ভ্রমে রয় স্তব্ধ
জীবনে তাহার আরব্ধ নব অব্দ।
ঘৃণা বা প্রহারে আর সে হয় না ক্ষুব্ধ
মগধের স্মৃতি একেবারে অবলুপ্ত।
শুধু আনন্দ, নাহিক দুঃখ শ্রান্তি
বক্ষে শান্তি, দেহেতে এসেছে কান্তি।
তন্ময় যবে সেবা-কাযে আছে মগ্ন,
গুরু ক'ন, এসো, এলো মন্ত্রের লগ্ন,
বিস্মিত রাজা অশ্রু ঝরিছে চক্ষে
গুহক জানে না, রঘুবীর এলো কক্ষে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সদাগরের তিন ছেলে

[রূপকথা]

এক সদাগর। তার তিন ছেলে। সদাগরের মস্ত কারবার। সদাগর নিজে কারবার দেখাশুনা করে; আর টাকার উপর টাকা জমায়।

তিন ছেলে ডাগর হলো। সদাগর তাদের ডেকে বললে—শোনো বাপু, এখন তোমরা ডাগর হয়েছো! ঘরে বসে আমার পয়সায় বাবুয়ানা করা চলবে না! সদাগরের ছেলে—সারা জীবন ব্যবসা করে খেতে হবে। তাই বলি, তিন জনে যাও বাড়ী ছেড়ে বিদেশে। গিয়ে কাজ কারবার শিখে এক বছর পরে আবার তিন জনে বাড়ী ফিরবে।

ছেলেদের হাসি-মুখ বিরস হলো। হবার কথা। খেয়ে-দেয়ে নেচে-গেয়ে বেড়ায়—কোনো কাজ-কর্ম্ম করতে হয় না—ফরমাশ করবা মাত্র দাসী-চাকর হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসে—এমন আরামের ঘর, আরামের বাস। সে আরাম ছেড়ে কোথায় অজানা বিদেশে যাবে? কি-বা কাজ শিখবে?

কিন্তু বাপকে তারা চেনে ভালো রকম। বাপের মেজাজ যখন নরম থাকে, তখন যা বলো, সহ্য করে; কিন্তু ও মেজাজ গরম হলে তার আঁচে সব ছারখার হয়!

শুভদিন দেখে তিন ভাই বাড়ী ছেড়ে পথে বেরুলো। গ্রামের শেষে তিন দিকে গেছে তিনটে সরু পথ। বড় ভাই আতাল বললে—আমি চলি উত্তর দিকে। দেখি, বরাতে কি ঘটে! এক বছর পরে ঠিক এই তেমাথায় ফিরে আসবো।

মেজো ভাই চাতাল বললে,—আমি যাই দক্ষিণে। এক বছর পরে এইখানে আবার দেখা হবে।

বাকী ছিল পূবদিক্‌কার পথ। ছোট ছেলে পাতাল বললে,—পূব দিকে হোক আমার গতি। কথা পাকা রইলো—এক বছর পরে এইখানে আবার একসঙ্গে সকলে এসে মিলবো।

তিন ভাই চলে তিন পথে।

আগে বড় ভাইয়ের কথা বলি।

সরু পথ ক্রমে বনে গিয়ে ঢুকেছে। অজগর বিজন বন! ঠেশাঠেশি-ঘেঁষাঘেষি গাছ-পালা। সে জঙ্গলে রৌদ্রের দেখা পাওয়া যায় না। আতাল চাইলো আকাশের দিকে—আকাশ দেখা যায় না। ভাবলে, সৃষ্টিছাড়া জঙ্গল—এ জঙ্গলে চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ—মাথার উপরে থাকবে একটু ফাঁকা আকাশ—তা তার কোনো চিহ্ন নেই!

উপায় কি? জঙ্গল ঠেলে কাঁটার আঁচড় সয়ে আতাল চলেছে বনের পথে, হঠাৎ হৈ-হৈ শব্দে গাছপালা থেকে ঝুপঝাপ শব্দে নামলো একদল ডাকাত—তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল! কি ষণ্ডা চেহারা…চোখেও সব মশাল জ্বলছে! তাদের দেখে আতালের বুক ধড়াশ্‌ করে' উঠলো।

ডাকাতরা বললে—কোথায় চলেছো, বন্ধু! ভালো চাও তো সঙ্গে পয়সা-কড়ি যা আছে, দাও—নাহলে একটি লাঠির ঘায়ে মাথা হবে দু'ফাঁক।

গায়ের জামা-চাদর খুলে আতাল বললে,—পয়সা-কড়ি কিছু নেই বাপু—নিঃসম্বল বেরিয়েছি কাজের সন্ধানে।

ডাকাতরা সন্ধান করলো। করে দেখলো, ছোকরার কথা সত্য। তার কাছে একটিও পয়সা নেই। বললে,—এমন নিঃসম্বল হয়ে পথে বেরিয়েছ, তার মানে?

আতাল বললে—রোজগার করবো।

কি করে' রোজগার করবে? কোথায় রোজগার করবে?

আতাল বললে—তা জানি না।

ডাকাতরা হেসে অস্থির। বললে—ভারী মজার ছোকরা তুমি! তা বেশ, আমাদের দলে থাকবে? আমাদের এ-বিদ্যা তোমাকে শেখাবো'খন। জানো তো, চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা…

আতাল বললে—যেচে এ-বিদ্যা শেখাতে চাইছো, কেন শিখবো না?

আতাল রইলো ডাকাতের দলে এবং এত চটপট এ-বিদ্যা শিখলো যে, ডাকাতরা খুশী হয়ে আতালকে করলো দলের সর্দ্দার।

আতাল চুরি-বিদ্যা ধরলো বটে, কিন্তু চুরির কাজে সে ধর্ম্ম মেনে চলে: অধর্ম্ম করে না। পরকে ঠকিয়ে যারা পরের ধনে ধনী, আতাল তাদের ঘরে চুরি করে। গতর খাটিয়ে যারা পয়সা রোজগার করে—খেটে সে পয়সায় পাহাড় জমিয়েছে বা মণি-জহরৎ কিনেছে, তাদের ঘরে কখনো চুরি করে না। দলের সকলে তার কথায় চুরিকাজে এই ধর্ম্ম মেনে চলে।

এবারে বলি মেজো ভাই চাতালের কথা। চাতাল চলেছে দক্ষিণ দিকে। এদিকেও সরু পথ এসে ঘন বনে মিশেছে। পাতায়-লতায় মাথার উপর যেন মোটা চাঁদোয়া খাটানো…

চলতে চলতে ঘণ্টাখানেক পরে চাতাল এসে পৌঁছুলো এক মস্ত পাহাড়ের নীচে। পাহাড়ের গুহায় ছিল একদল যক্ষ। চাতালকে দেখে হাউমাউ করে তারা এসে চাতালকে ঘিরে দাঁড়ালো। বললে,—আমাদের বড় ক্ষিদে…শীকার মেলে না। আজ তোমাকে খাবো।

চাতালের চক্ষু-স্থির! কিন্তু সাহস হারিয়ে চুপ করে থাকলে এ বিপদে নিস্তার নেই তো!

চাতাল বললে,—আমার দেহ কতটুকু বা! এ দেহে তোমাদের এত জনের ক্ষিদে মিটবে কেন?

যক্ষরা বললে—তা ছাড়া উপায় কি? যেটুকু তবু খেতে পাই!

চাতাল বললে—এমন দুর্দ্দশা তোমাদের কেন হলো?

যক্ষরা বললে—বনের পশুপক্ষী সব চালাক হয়েছে। আমরা তাদের ধরতে পারি না। আমাদের দেখলে তারা পালায়। কাজেই আমাদের চলেছে অনাহার!

চাতাল বললে—আচ্ছা, একটু সবুর করো। আমি তোমাদের পাখী মেরে খাওয়াবো, হরিণ মেরে খাওয়াবো। যত পাখী, যত হরিণ তোমরা চাও—আশ মিটিয়ে খেয়ো।

চাতালের কাছে ছিল তীর-ধনুক। ধনুকে তীর জুড়ে সে দিল টঙ্কার। তীরের ফলায় গাছের-ডালে-বসা পাখী পড়লো পায়ের কাছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী মলো চাতালের তীরে। চাতাল বললে,—নাও, কত পাখী খাবে, খাও।

যক্ষরা মহাখুশী। এমন খাওয়া তাদের ভাগ্যে প্রায় বারো বছর জোটেনি। তারা চাতালকে ছাড়বে না! বললে,—তোমাকে আমরা রাজা করবো। তুমি থাকো আমাদের দলে আমাদের রাজা হয়ে…

চাতাল ভাবলে, মন্দ কি! এক বছর এদের সঙ্গে কাটিয়ে দিই। তা না করে কোথায় অনিশ্চিতের সন্ধানে ছুটবো! এমন যাচা সর্দ্দারী…

চাতাল রইলো যক্ষদের দলে। তীর ছুড়ে নিত্য মারে গাছের পাখী, বনের হরিণ, জলের মাছ…খাওয়া-দাওয়ার অভাব রইলো না।

ওদিকে ছোট ভাই পাতাল চলেছে পূবদিকের পথে। মরু, জঙ্গল ফুঁড়ে এ-পথ এক নদীর বুকে এসে মিশেছে! নদীর তীরে এসে পাতাল দেখে, মস্ত একখানা নৌকো। নৌকোর উপর বসে আছে এক বুড়ী।

পাতাল ডাকলো—ও বুড়ী মা…

মা-ডাকে বুড়ীর মন গলে গেল। বুড়ী বললে—কি চাও, বাবা?

পাতাল বললে,—তোমার নৌকোয় তুলে আমাকে নদী পার করে দেবে?

বুড়ী বল্‌লে—ওপারে কোথায় যাবে?

পাতাল বললে—তা জানি না। তবে আমি বেরিয়েছি কাজের সন্ধানে…

বুড়ী বললে—বটে! তা, কোথাও তোমাকে যেতে হবে না, বাবা। ওপারে রাক্ষস-খোক্কশ থাকে। তোমার মতো চাঁদপানা ছেলেকে কোন্ প্রাণে ওপারে ছেড়ে দিয়ে আসবো, বলো? তার চেয়ে তুমি এই নৌকোয় থাকো। আমরা আছি দুজনে …বুড়ো আর বুড়ী। আমাদের ছেলে-পিলে নেই। ছেলের মতো যত্নে-আদরে তোমাকে রাখবো। আর কাজ শেখা? আমরা বুড়ো-বুড়ী জোড়াতালি দেওয়ার কাজ জানি। পৃথিবীতে যা কিছু ভাঙবে-ছিঁড়বে, সব বেমালুম জুড়ে দিতে পারি। সেই কাজ তোমাকে শেখাবো।

পাতাল খুশী মনে বললে—যদি সে-কাজ শেখাও, নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে এই নৌকোয় বাস করবো

আতাল রইলো বুড়ো-বুড়ীর কাছে নৌকোয় !

দিন যায়। মাস যায়। ক্রমে বছর গেল।

বছর-শেষে তিন ভাই ফিরলো সেই গ্রামের শেষে তেমাথা পথে। এক বছরে যা-যা ঘটেছে, তিন ভাইয়ে সে-কথা হলো।

তার পর তিন ভাই এলো বাড়ীতে।

সদাগর বাবা জিজ্ঞাসা করলো,—কে কি কাজ শিখলে, বলো।

বড় আতাল বললে,—আমি চুরি-কাজ শিখেছি।

মেজো আতাল বললে,—তীর-ধন্থকে আমি আজ ওস্তাদ।

ছোট আতাল বললে,—আমি শিখেছি জোড়া-তালির কাজ।

সদাগর বললে,—বেশ, কাল তোমাদের বিদ্যার পরীক্ষা নেবো।

পরের দিন সদাগরের বাড়ীতে মস্ত আসর। গ্রামশুদ্ধ সকলকে সদাগর নিমন্ত্রণ করেছে। সকলে এসেছে। তখন তিন ছেলেকে ডেকে সদাগর বললে,—ঐ যে দেখছো বাগানের শেষে মস্ত বট গাছ—ঐ গাছের মগডালে আছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসা। ব্যাঙ্গমী ডিম পেড়েছে। আতাল ও গাছ থেকে ব্যাঙ্গমীর ডিম চুরি করে আনো—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী না জানতে পাবে !

আতাল বললে,—বহুৎ আচ্ছা !

আতাল গাছে চড়লো নিঃশব্দে এবং পাতায় গা ঢেকে মগডালে উঠলো। তার পর এমন কৌশলে ডিম পেড়ে আনলো যে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী জানতেও পারলো না !

আতালের কৌশল দেখে সকলে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো।

সদাগর বললে,—এবার চাতালের পালা। আতাল ঐ ডিম ধরবে দু' আঙুলের টিপে—আর চাতাল তীর ছুড়ে ও ডিম ভেঙ্গে চুর করে দেবে।

তাই হলো। আতাল ডিম ধরলো দু'আঙুলে, চাতাল তার ধনুকে তীর জুড়ে তাগ করে সে তীর ছুড়লো—তীর লেগে ডিমটা খান্‌-খান্‌ হয়ে ভেঙ্গে চুর !

দেখে সকলে অবাক !

সদাগর ডাকলো,—পাতাল…

পাতাল বললে,—বাবা…

সদাগর বললে,—এবার জুড়ে ঐ ডিম যেমন ছিল, ঠিক তেমনি করে দাও। আমরা দেখি তোমার বিদ্যার কৌশল !

পাতাল তখনি ডিমটি এমন বেমালুম জুড়ে দিলে যে, দেখে কে বলবে, এ ডিম ভেঙ্গে চুর্‌ হয়েছিল !

সকলে বললে,—বাস্‌ রে, এ যে ভেল্‌কি !

সদাগর ডাকলো,—আতাল…

আতাল বললে,—বাবা…

সদাগর বললে,—এবার নিঃশব্দে ঐ ডিম ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসায় রেখে এসো।

বাপের কথায় আতাল ডিম রেখে এলো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসায়।

দিন যায়। তিন ছেলে বিদ্যা শিখে সে-বিদ্যার জোরে পয়সা-কড়ি উপার্জ্জন করছে। সকলে খুশী-মনে আছে।

একদিন রাজার প্রহরী এসে এত্তেলা দিল,—সদাগরকে মহারাজ স্মরণ করেছেন। সদাগরকে এখনি রাজ-বাড়ীতে যেতে হবে !

ঘোড়ায় চড়ে সদাগর ছুটলো রাজ-বাড়ীতে।

মলিন-মুখে রাজা সভায় বসে আছেন। সভাসদদের মুখে কথা নেই।

সদাগরকে দেখে রাজা নিশ্বাস ফেলে বললেন,—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, সদাগর।

সদাগর বললে,—কি সর্ব্বনাশ, মহারাজ ?

রাজা বললেন,—জানো তো আমার এক কন্যা…

সদাগর বললে,—রাজ্যে এ কথা কে না জানে, মহারাজ !

রাজা বললেন—সে-কন্যা ডাগর হয়েছে। তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছি…

সদাগর বললে—জানি মহারাজ…নিত্য ঘটকরা আনাগোনা করছে সেই জন্যে…

রাজা বললেন—পরশু বিকেলে আকাশ কালো-করা মেঘ দেখেছিলে ?

সদাগর বললে,—দেখেছি বৈ কি মহারাজ…বড্ড ভয় হয়েছিল—বুঝি, ভয়ঙ্কর বর্ষা নামবে…কাজ-কর্ম্মে লোকসান হবে।

রাজা বললেন—সে মেঘ নয়। হুমো পাখী ডানা মেলে চলে'ছিল আকাশের গা বয়ে। সেই হুমো পাখী আমার সর্ব্বনাশ করে গেছে।

বিস্ময়ে সদাগর হাঁ করে রইলো।

রাজা বললেন—রাজকন্যা সে সময় ছাদে দাঁড়িয়ে ভিজে চুল শুকোচ্ছিলেন। রাজকন্যাকে দেখে হুমোপাখী ঝুপ্ করে ছোঁ মেরে তাঁকে ডানায় তুলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। দুদিন আমার সেপাই-শান্ত্রীরা পৃথিবীময় রাজকন্যাকে খোঁজ করে বেড়িয়েছে। পয়সা যা খরচ করেছি, তার আর হিসেব নেই। তবু রাজকন্যার কোনো সন্ধান মেলেনি। শুনেছি, তোমার তিন ছেলে এক-বছর বিদেশে থেকে নানা বিদ্যা শিখে এসেছে। তারা যদি এ বিপদে আমায় বাঁচায়…

সদাগর বললে—একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ, তাদের আমি ডেকে পাঠাই।

ডাকবা মাত্র আতাল চাতাল-পাতাল তিন ভাই রাজ-বাড়ীতে এসে হাজির। তাদের বলা হলো রাজকন্যার কথা।

রাজা বললেন—রাজকন্যাকে তোমরা এনে দাও বাপু… না হলে আমি বাঁচবো না। অন্দরে মহারাণী অন্ন-জল ত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রাণ ধুক্-ধুক্ করছে।

রাজা কেঁদে ফেললেন।

তিন ভাই চুপি-চুপি তখন কি পরামর্শ করলো; তার পর তিন জনে বললে—রাজকন্যার উদ্ধার হলে কি পুরস্কার দেবেন, মহারাজ?

রাজা বললেন—তোষাখানায় একটি পয়সা নেই বাপু …দুদিন পৃথিবী ঘুরে কন্যার সন্ধান করাতে তোষাখানা খালি করে ফেলেছি। তবে হ্যাঁ, পুরস্কার না পেলে তোমরা এ-কাজে হাত দেবে কেন—সত্যি! তা বেশ, রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনো, পুরস্কার দেবো। মানে, রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবো…

কিন্তু রাজকন্যা তো একটি! এরা তিন ভাই—কি করে কি হবে?

রাজা বললেন—বুঝি, মস্ত সমস্যা! আচ্ছা, আগে তো রাজকন্যার উদ্ধার হোক। তার পর বিচার করবো'খন। আমি রাজা—চিরদিন সুবিচার করি বলে খ্যাতি আছে। অবিচার আমি করবো না, জেনো!…

তিন ভাই দুর্গা-নাম স্মরণ করে বার হলো রাজকন্যার উদ্ধার-সাধনে। তিন জনে প্রথমে এলো সেই নদীর তীরে—বুড়ো-বুড়ীর নৌকোয়।

পাতাল ডাকলো,—বুড়ী-মা…

বুড়ী বললে—এই যে বাবা পাতাল…এসেছো!

পাতাল বললে—বড় বিপদ, বুড়ী-মা। রাজার কন্যাকে হুমো পাখী ডানায় তুলে নিরুদ্দেশ।

বুড়ী বললে—ওঠো আমার নৌকোয়। ভয় কি; বাবা! নৌকোয় পাল তুলে দি। বুড়ো হুমোপাখীর বাসা জানে। দেড় মাসে তোমাদের তিন ভাইকে হুমোপাখীর বাসায় পৌঁছে দেবো'খন।

পাল তুলে নৌকো চললো তীরের বেগে। সাত নদী তেরো মহানদীর পারে মস্ত পাহাড়। বুড়ী বললে—ঐ পাহাড়ের গুহায় হুমোপাখীর বাস…

বুড়ো বললে—বেলা দুপুর পর্য্যন্ত হুমোপাখী ঘুমোয়; বিকেলে ওঠে। উঠে শীকার করে। সাবধান!

তখন বেলা প্রায় দশটা।

বুড়ো বললে—এ সময় হুমোপাখীর ঘুম গাঢ় থাকে। মস্ত সুযোগ।

আতাল চললো হুমোপাখীর গুহায়। এসে দেখে, মস্ত ডানা মেলে হুমোপাখী ঘুমোচ্ছে। তার মাথা রয়েছে রাজকন্যার কোলে। রাজকন্যা জেগে মলিন মুখে বসে আছেন। তাঁর দুচোখে জলের ধারা।

আতালের হাতের কশরৎ চমৎকার! নিঃশব্দে হুমোর পাশ থেকে রাজকন্যাকে চুরি করে কাঁধে তুলে চট করে' সে নৌকোয় চড়ে বসলো।

বুড়ো-বুড়ী উল্টো পাল তুলে নৌকো ছাড়লো।

ক'দিনের পর আর ক'ঘণ্টার পথ বাকী—হঠাৎ পিছনের আকাশ কালোয় কালো হয়ে গেল।

আতাল বললে—ভয়ঙ্কর মেঘ করেছে। এখনি ঝড় উঠবে…

বুড়ী বললে—ঝড় নয়। হুমোপাখী তাড়া করেছে।

বুড়ো বললে—উপায় ?

চাতাল বললে—ভয় নেই। আমার কাছে আছে তীর ধনুক !

ধনুকে তীর জুড়ে চাতাল নৌকোর ছইয়ের উপর দাঁড়ালো…হুমোপাখী ঐখানে…ঐ! এবার একেবারে মাথার উপরে! চাতাল তীর ছুড়লো…অব্যর্থ সন্ধান !… হুমোপাখী মরে হুড়মুড় করে পড়লো একেবারে নৌকোর উপর।

সে চাপে নৌকো ভেঙ্গে খান্‌খান্‌…

উপায় ?

পাতাল তখনি তালি দিয়ে নৌকো সারিয়ে দিল বেমালুম…

এবং নৌকো এসে বনের শেষে তীরে লাগলো।

রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তিন ভাই এলো রাজ-বাড়ীতে…

রাজ্যময় উৎসব পড়ে গেল।

সদাগর বললে,—এবার পুরস্কার দিন, মহারাজ…

রাজা বললেন,—পাত্র তিন জন, পাত্রী একটি মাত্র রাজকন্যা! বেশ, এদের মধ্যে রাজকন্যা যাকে পছন্দ করবে, তার সঙ্গে হবে রাজকন্যার বিবাহ।

রাজকন্যা বললেন,—বড় আতাল চুরি করে। চুরি কাজটা ভাল নয়—ওতে আমার বড় ঘৃণা। মেজো চাতালের কাজ তীর-ধনুক নিয়ে… জীব-হিংসা। জীবজন্তু মারা,—ও হলো কশাইয়ের কাজ। বড় নিষ্ঠুর। ও কাজের কথা মনে হলে আমি শিউরে উঠি! ছোট পাতাল জোড়া-তালির কাজ করে। ভাঙ্গাকে যে গড়তে পারে, সে মস্ত মানুষ! আমি ঐ ছোটর গলায় মালা দেবো।

তাই হলো।

তোমরা ভাবছো, আতাল-চাতালের মনে হিংসা হলো ? না। তারা খুশী-মনে রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করলো।

রাজা বললেন,—দুঃখ করো না তোমরা। তোমাদের দুজনের মধ্যে আতাল, তোমায় করবো এ রাজ্যের মন্ত্রী। আর চাতাল, তুমি হবে প্রধান সেনাপতি!

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ছায়ার মায়া

সিনেমার ছবিতে যখন দেখি, সাগরের বুকে জাহাজে আগুন লাগিয়াছে, বা জলের বুকে চোরা-পাহাড়ের ধাক্কায় জাহাজ ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া যাইতেছে—জাহাজের যাত্রীরা প্রাণের ভয়ে আকুল, তখন যেমন আমাদের আতঙ্ক-বিস্ময়ের সীমা থাকে না, তেমনি যখন আবার উত্তর-মেরুর তুষার-ভরা পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ীর দৃশ্য দেখি, তখন ভাবি, ঐ দুর্গম মেরু-প্রদেশে যে-সব মানুষ গিয়া ছবি তুলিয়াছে, সে ছবি তুলিতে না জানি কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে, কত লোকের প্রাণ গিয়াছে! সে সব ছবি দেখিলে রোমাঞ্চ হয়!

কিন্তু এ আতঙ্ক, এ বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই! হলিউডের যাদু-শিল্পীরা নানা কৌশলে এ-সব জাহাজ-ডুবি বা তুষার-ভরা মাঠ-ঘাটের দৃশ্য তোলার ব্যবস্থা ষ্টুডিয়োর মধ্যেই করেন এবং তাঁদের রচনা-কৌশলে আমরা এই সব বিচিত্র নব নব দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে সচকিত হই!

এই কুহক-সৃষ্টির ভিতরকার দু'চারিটা কথা আজ তোমাদের বলিব।

রাজা-রাণীর জীবনের কথা লইয়া সিনেমায় কত গল্পই না রচিত হইতেছে! শুধু এ যুগের রাজা-রাণীর গল্প নয়—হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসকে সিনেমা আজ সত্য জীবন্তরূপে পর্দ্দার গায়ে প্রতিফলিত করিয়া তুলিতেছে এবং সবচেয়ে প্রশংসার কথা এই যে, যে-সময়ের কাহিনী ছবিতে ফুটানো হয়, সেই সময়কার ঘর-বাড়ী, প্রাসাদ-মন্দির হুবহু আমরা দেখি ছবির পর্দ্দায়! ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরি কিম্বা ক্লিওপেট্রা ছবির কথা বলি। তোমাদের মধ্যে অনেকে নিশ্চয় এ ছবি দু'খানি দেখিয়াছ।

ক্লিওপেট্রা ছবিতে প্রাচীন রোম এবং প্রাচীন মিশরের প্রাসাদ বা উপবন শুধু দেখানো হয় নাই—মিশরের পিরামিড, ধু-ধু মরুভূমি, নীল নদ, রোমের পথ-ঘাট, প্রাসাদ—এ সবও দেখানো হইয়াছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এ-সব জায়গায় লইয়া গিয়া যদি ছবি তুলিতে হইত, তাহা হইলে কত লক্ষ টাকা যে শুধু ঐ কারণে ব্যয় হইত, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নাই! আসলে এ সব জায়গায় অভিনয়-দৃশ্যের ছবি রোমে বা মিশরে অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া গিয়া

তোলা হয় নাই ; অভিনয়ের ছবি তোলা হইয়াছে হলিউডের ষ্টুডিয়োতে।

ছবিতে সর্ব্বাগ্রে আবহাওয়া সৃষ্টি করা চাই। এ সব ছবি তুলিবার পূর্ব্বে ফটোগ্রাফারকে ক্যামেরাপত্র সমেত রোমে ও মিশরে পাঠানো হয়—তাঁরা রোমের পথ-ঘাট, মিশরের পিরামিড, নীল নদের তীরভূমি প্রভৃতির ফটো তুলিয়া হলিউডে ফেরেন ; তার পর অভিনয়-দৃশ্য তুলিবার সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেন ষ্টুডিয়োয়। মিশরে ও রোমে তোলা ফটোর পরিবর্দ্ধিত ছবি অভিনয়-কালে তাঁদের পিছনে খাটাইয়া সে দৃশ্যকে সমগ্র অভিনয়-ব্যাপারের সঙ্গে মিলাইয়া ছবি তোলা হয়। পিছনে রোম ও মিশরের সেই আসল প্রতিচ্ছবি এমন কৌশলে পরিচালিত করা হয় যে, জীবন্ত নর-নারীর অভিনয়ের সঙ্গে পিছনকার দৃশ্য মিশিয়া হুবহু এক হইয়া দর্শকের চোখে সত্য রূপে ফুটিয়া বিস্ময়-বিভ্রম সৃষ্টি করে।

ঐ সব সত্যকার মাঠ-বাটের ফটোর পরিবর্দ্ধিত প্রতিলিপি আয়নার সাহায্যে বেশ সুকৌশলে তোলা হয় ; দর্শকদের চোখে সে ফাঁকি ধরা পড়িবার কোনো আশঙ্কা থাকে না।

ধরো, কোনো সিনেমার ছবিতে তিব্বতের মঠ দেখানো হইবে, কোনো ছবিতে দেখানো হইবে আলজিয়ার্শের বাজার বা বোগদাদের প্রমোদ কানন, কিম্বা হাওয়াই দ্বীপের তালী-বন, অথবা হিমালয়ের প্রান্ত দেশ ; অর্থাৎ সিনেমা-নাটকে দেখাইতে হইবে, আলজিয়ার্শের বাজারে বাঁদী কেনা-বেচা চলিয়াছে ; তিব্বতের মঠে পরিব্রাজকের দল গিয়া আচার্য্যের সঙ্গে দেখা করিতেছে ; হাওয়াই দ্বীপের সমুদ্র-তীরে তালী-বনে জলমগ্ন জাহাজের যাত্রী কোনোমতে আশ্রয় পাইয়াছে—অভিনয়ের এ সব দৃশ্য তিব্বতে বা হাওয়াই দ্বীপে বা আলজিয়ার্শে নট নটীর দল লইয়া গিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই।

কি করিয়া এ সব দৃশ্য তোলা হয়, জানো ? অভিনয়-দৃশ্য তুলিবার পূর্ব্বে ফটোগ্রাফারকে ঐ সব জায়গায় পাঠানো হয় ; ফটোগ্রাফার ঐ সব জায়গায় গিয়া প্রয়োজনানুরূপ ব্যাক-গ্রাউণ্ডের ফটো তুলিয়া আনেন। অনেক সময় সিনেমা-কামেরায় প্যানোরামা-দৃশ্য তোলা হয়। সচল ছবি।

নকল পুল ও নকল ট্রেণ

তারপর অভিনয়-কালে অভিনেতারা ষ্টুডিয়োর শেটে বা মঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করেন এবং তাঁদের পিছনে আলজিরিয়ায় বা তিব্বতে তোলা ব্যাকগ্রাউণ্ডের সে
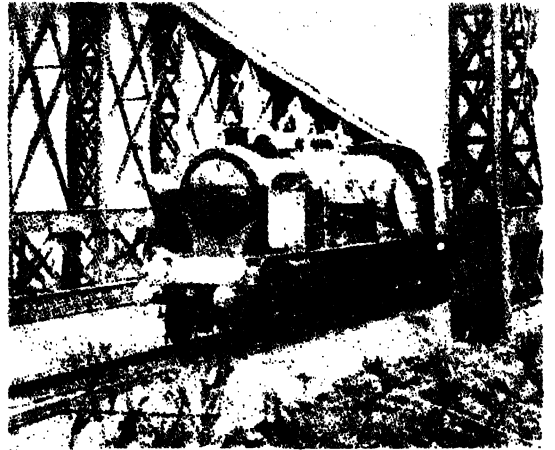
নকল ট্রেণের ছবি

ছবি বিপরীত দিকে টানিয়া লওয়া হয়। ছবিতে সে ব্যাক-গ্রাউণ্ড সোজাসুজি ভাবে উঠিয়া অভিনয়-ব্যাপারকে বাস্তব

জীবন্ত করিয়া তোলে। এ ভাবে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছবি তোলার নাম back-projection!

একখানি ছবি দেখিয়াছি Love and Let Live. এ ছবিতে একটি দৃশ্য দেখানো হইয়াছে টেমস্ নদীর বুক বহিয়া দু'খানি মোটর লঞ্চ চলিয়াছে পাশাপাশি—দুখানি লঞ্চের যাত্রীরা আলাপ-পরিচয় করিতেছেন। আলাপ-পরিচয়ের ফলে লঞ্চ চালাইতে দুজনেই অমনোযোগী হইলেন; অমনি সেই ফাঁকে লঞ্চ দুখানি সবেগে এক পুলের গায়ে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। কি করিয়া এ দৃশ্য তোলা হইল, ভাবিবার কথা! এ ভাবে জীবন বিপন্ন করিয়া ছবি তুলাইতে—আর যাহার সখ থাকে, থাকুক—মাহিনা লইয়া যে সব ভদ্র অভিনেতা-অভিনেত্রী ফিল্মে অভিনয় করেন, তাঁদের মনে এমন দুঃসাহস জাগিতে পারে না! এ দৃশ্য তোলার রহস্য বলিতেছি।

নকল সমুদ্রে ক্লিওপেট্রার নকল বজ্‌রা

কিঙ্-কঙ্

নকল লঞ্চ—পিছনে নদীর দৃশ্য

প্রথমে টেমসের বুকে মোটর-লঞ্চ চালাইয়া সেই লঞ্চে উঠিয়া বসিলেন ষ্টুডিয়োর ক্যামেরাম্যান। লঞ্চ চলিল। ক্যামেরাম্যান ফিল্ম-ক্যামেরায় সামনের ও দু'পাশের তীরভূমির ছবি তুলিয়া চলিলেন। দু'তীরে বাড়ী-ঘর-ঘাট, নৌকা-জাহাজ—সামনে নদীর বুকে ঢেউয়ের মালা, হুবহু এ সবের ছবি লইয়া তিনি ফিরিলেন ষ্টুডিয়োয়।

তারপর আসল মোটর-লঞ্চের আদর্শে নকল লঞ্চ তৈয়ার করা হইল। নকল লঞ্চ জলে নামিল না; রহিল ষ্টুডিয়োর হল-ঘরের মেঝেয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই নকল লঞ্চে চড়িয়া বসিলেন। তাঁদের কথাবার্ত্তা চলিল এবং শব্দযন্ত্র ও ক্যামেরার সাহায্যে সে কথাবার্ত্তার রেকর্ড ও ছবি যথারীতি তোলা হইল। এই কথা ও নকল লঞ্চে অভিনয়ের ছবি তুলিবার সময় পিছনের দেওয়ালে পূর্ব্বে ক্যামেরাম্যানের তোলা সেই নদীর দুই তীর ও সামনের ছবি বায়োস্কোপ-যন্ত্র-সাহায্যে সচলভাবে প্রতিফলিত হইল—এ ছবি তুলিবার

সময় একজন লোক নকল লঞ্চের সামনে বসিয়া লঞ্চকে কৌশলে নাড়া দিতে থাকে; তার ফলে ঢেউয়ে লঞ্চের দোলনটুকুর আভাস জাগে। এ দৃশ্য তোলার ছবিখানি দেখিলে রহস্যটুকু সব বুঝিতে পারিবে। ছবিতে দেখিবে, বড় জলাশয়ে নকল লঞ্চ—লঞ্চের পিছনে ক্যামেরাম্যানের আগে-তোলা নদী-তীরের সচল ফটো—লঞ্চের সামনে বসিয়া একজন লোক দড়ি টানিয়া লঞ্চকে দুলাইতেছে—লঞ্চের বাঁ দিকে ক্যামেরা এবং মাথার উপর শব্দ-গ্রহণের মাইক। লঞ্চে ধাক্কা লাগা? নদীর তীর ও সামনেকার ছবি তুলিয়া ক্যামেরাম্যান তাহা প্রিণ্ট করাইলেন; ধাক্কা লাগা দেখানো হয় ষ্টুডিয়োর ট্যাঙ্কে খেলাঘরের লঞ্চ চালাইয়া হাতে-গড়া পুলে ধাক্কা খাওয়াইয়া।

এই যে কিছুকাল পূর্ব্বে All Quiet on the Western Front ছবি দেখানো হইল, ভাবিয়ো না, এ ছবি তুলিতে ষ্টুডিয়ো-কর্ত্তৃপক্ষ হাজার-হাজার অভিনেতা অভিনেত্রী লইয়া ইপ্রেসে গিয়াছিলেন! গেলে খরচের অন্ত থাকিত না! এ ছবি তোলা হইয়াছিল বিচিত্র কৌশলে। ষ্টুডিয়োর অদূরে প্রশস্ত খোলা জায়গায় ট্রেঞ্চ খুঁড়িয়া, মাটী দলিয়া, দূরে ভাঙ্গা সেতুর কাঠামো রচিয়া ইপ্রেসের নকল যুদ্ধক্ষেত্র গড়িয়া সেইখানে অভিনেতাদের আনিয়া যুদ্ধ-দৃশ্য তোলা হইয়াছে। পাশের ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবে। দৃষ্টি-বিভ্রমের মহিমায় এ ফাঁকি ধরা যায় না। ছবি দেখিলে দৃশ্যরচনার কৌশল বুঝিতে পারিবে। ছবিতে দেখিবে, শুষ্ক নদীর বুকে ভাঙ্গা পুল—ট্রেঞ্চে সেনার বেশে অভিনেতার দল; ডান দিকে ক্যামেরা; পিছনে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করা হইয়াছে কতকগুলি রিফ্লেক্টর-সাহায্যে। সমুদ্র-জলে ডোবার দৃশ্য তুলিতে মানুষকে সমুদ্রে ডুবাইয়া ছবি তোলা হয় না; ষ্টুডিয়োর মধ্যে বড় চৌবাচ্চা গাঁথিয়া তার মধ্যে অভিনেতাকে নামানো হয়—বৈদ্যুতিক যন্ত্র-সাহায্যে জলে তুমুল তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়। এ ছবি তুলিতে চৌবাচ্চার একদিকে মঞ্চ খাড়া করিয়া সেই মঞ্চে যথানুরূপ বিজলী-বাতির ব্যবস্থা হয় এবং ক্যামেরাম্যান এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া এ দৃশ্যের ছবি তোলেন। 'পাশের ছবি দেখিলে এ ব্যাপার বুঝা যাইবে।

অনেক ছবিতে দেখা যায়, বিপদে পড়িয়া মানুষ চার-পাঁচ তলার ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িতেছে! এ ভাবে লাফ দিলে মানুষের বাঁচিবার কোনো আশা থাকে না। একখানি

ষ্টুডিয়োর মধ্যে ট্রেঞ্চ প্রভৃতি

ফিল্মে এমিল জেনিংসকে ষাট ফুট উঁচু-জায়গা হইতে লাফ দিতে হইয়াছিল। এ ছবি তুলিবার সময় ডামি বা ন্যাকড়ার পুতুল ফেলা হয়।

ষ্টুডিয়োর চৌবাচ্চায় ছবি তোলা

ট্রেণে করিয়া লোক চলিয়াছে—ট্রেণের কামরায় কত ঘটনার অভিনয় হইতেছে, কত কথাবার্ত্তা চলিয়াছে,—সত্যকার চলন্ত ট্রেণে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বসাইয়া এ সব দৃশ্য কোনোকালে তোলা হয় না। তোলা

সম্ভব হইতে পারে না। এ ছবি কি করিয়া তোলা হয়, বলি।

ট্রেণের কামরার নকলে অন্য-কামরা তৈয়ার করা হয়। এই নকল-কামরা থাকে ষ্টুডিয়োয়। এ কামরা নড়ে না। অথচ না নড়িলে jolting দেখানো অসম্ভব। নকল কামরায় বসিয়া ফিল্ম-নাট্যের পাত্র-পাত্রী কথাবার্ত্তা কন—অভিনয় করেন; ষ্টুডিয়োর ক্যামেরায় এবং শব্দযন্ত্রে তাঁদের সে অভিনয় ও কথাবার্ত্তায় সচল-সবাক ছবি ওঠে। কিন্তু তা যেন হইল, ট্রেণ চলার শব্দ—ট্রেণের ঐ হুইশল? এ সব শব্দ ঐ সঙ্গে না জুড়িলে, নকল ট্রেণকে আসল ট্রেণের মতো বাস্তব করা যায় কি করিয়া? ট্রেণ চলার ঐ শব্দ এবং হুইশল-রব তুলিবার জন্য ষ্টুডিয়োর শব্দযন্ত্রী রেলোয়ে-লাইনের নানা জায়গায় গিয়া তাঁর শব্দযন্ত্র ও সহকারীদের লইয়া ওৎ পাতিয়া থাকেন—চলন্ত ট্রেণের সকল রকমের শব্দ তাঁরা যন্ত্রে রেকর্ড করিয়া আনেন; এবং ষ্টুডিয়োয়-তোলা নকল ট্রেণের কথাবার্ত্তা ও অভিনয়ের সঙ্গে চলন্ত ট্রেণের সেই শব্দ ও হুইশলের ধ্বনি এক সঙ্গে জুড়িয়া ছবিকে জীবন্ত-সচল ট্রেণের মতো বাস্তব করিয়া তোলা হয়। ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়িবে, সে শব্দ; ষ্টেশন ছাড়িয়া ট্রেণ চলিল, সে শব্দ; মধ্যপথে ট্রেণ চলিয়াছে, সে চলার শব্দ—এমনি সর্ব্ববিধ শব্দ পূর্ব্বে হইতে রেকর্ড করা থাকে। অভিনয়ের সময় যখন যেমন শব্দ প্রয়োজন, ঠিক তদনুরূপ শব্দ ছবির শব্দের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হয়। কি করিয়া জোড়ার কাজ হয়—সে কথা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। এ কথার সঙ্গে আজ সে কথা বলা চলে না।

রেল-লাইনের ধারে ওৎ পাতা

ফিল্মের ল্যাম্প-পোষ্ট

যন্ত্রে ঘাম-লাগানো

মাকড়শার জাল তৈরী

সিনেমায় দেখি, লোকে বহু দীর্ঘ পথ ছুটিয়া আসিয়াছে—

তার ফলে সে হাঁপাইতেছে—ঘামে মুখ ও সারা দেহ ভিজিয়া একশা! ভাবিয়ো না, অভিনেতা-ভদ্রলোকটিকে সত্য সত্য দৌড়-ঝাঁপ করিয়া ঘামিতে হয়। তা নয়! এক রকম যন্ত্র আছে, সে যন্ত্র-সাহায্যে এক রকম আরক অভিনেতার মুখে মাথায় ও গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। তার ফলে দেখায়, অভিনেতা খুব ঘামিয়াছেন।

মাকড়শার জাল? পিচকিরির মধ্যে তরল রবার ভরিয়া বিজলী-পাখার সাহায্যে সেই তরল রবার ছিটাইয়া মাকড়শার জাল তৈয়ার করা হয়। সত্যকার মাকড়শার জাল আনিয়া ষ্টুডিয়োর সাজানো-ঘরে-জানালায় আঁটিয়া দিবে, এমন সাধ্য কাহারো নাই!

সিনেমায় ছবিতে যে ল্যাম্পপোষ্ট দেখি, তাহা সত্যকার ল্যাম্পপোষ্ট নয়; ষ্টুডিয়োর মিস্ত্রীরা পেপিয়ার-মেশ বা কাগজ দিয়া এ ল্যাম্পপোষ্ট তৈয়ার করে। তাহাতে ব্যয় হয় অল্প এবং যখন-খুশী ভাঙ্গা-গড়া চলে।

তুষার-বর্ষণের যন্ত্র

ফিল্মে ডিনারের ঘটা প্রায় হয়। সে ডিনারে নানা রকম সৌখীন ভোজ্য দেখি। এ-গুলা যদি সত্যকার ভোজ্য হইত, তাহা হইলে এ ভোজের খরচ দিতে অনেক কোম্পানিকে লাল-বাতি জ্বালিতে হইত! এ ভোজ্য নকল। নকল হইলেও অখাদ্য নয়। মাছ মাংস, কেক প্রভৃতির যে বিরাট সমারোহ দেখি, সে
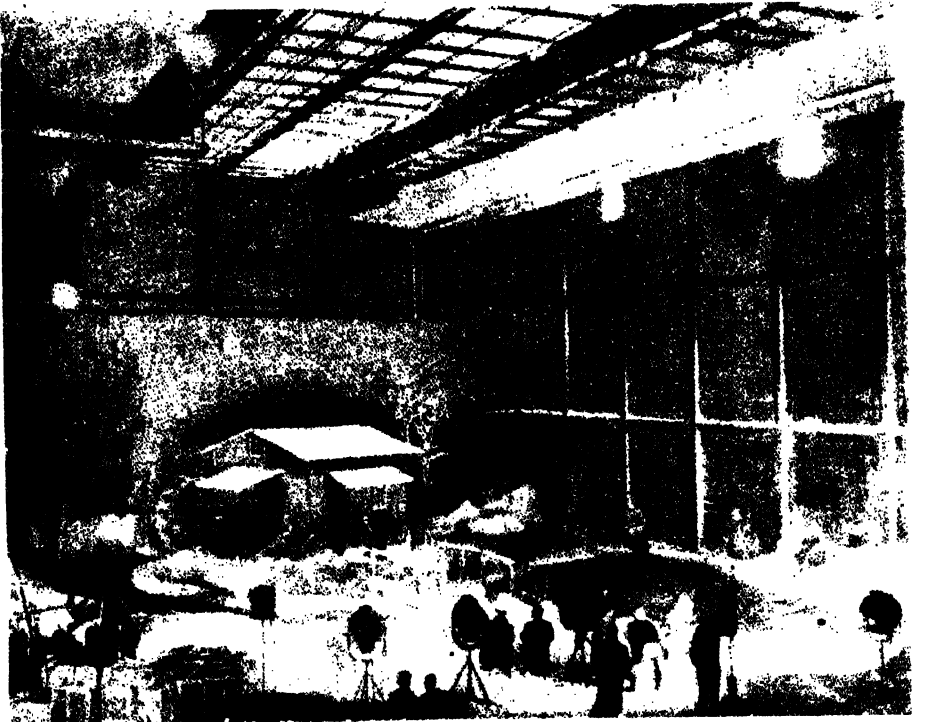
ষ্টুডিয়োর মধ্যে তুষার মেরুর দৃশ্য

সব মাছ-মাংস-কেক্ খুব পাৎলা ও হাল্কা প্যাটি দিয়া তৈরী করা হয়। কাজেই তাহা খাওয়া চলে এবং সে ভোজ্যের ব্যবস্থা করিতে খরচ পড়ে সামান্য।

প্রচণ্ড শীতে ঝড়ো বাতাসে নিবিড় তুষারপাত হইতেছে—পথ-ঘাট, ঘর-দ্বার তুষারে ভরিয়া গেল—সে তুষার-বর্ষণের মধ্যে নর-নারীরা মোটা গরম জামা-কাপড় মুড়িয়া পড়িয়া আছে—সিনেমা ছবিতে এ দৃশ্য নিত্য দেখিতে পাই। সে তুষারপাত দেখিবার সময় দর্শকের দেহ-মন যেন শীতে রী-রী করিয়া ওঠে! তোমরা ভাবো, আলাস্কা-ল্যাপলাণ্ডের সত্য তুষার-পাতের ছবি তোলা হইয়াছে? না! ও ছবি ষ্টুডিয়োয় তোলা। ঐ ঘর-বাড়ী, ঐ তুষার প্রদেশ, ঐ ঝড়ো বাতাস, ঐ তুষারপাত—এ সব ফরমাশ-মাফিক ষ্টুডিয়োয় তৈয়ার হইয়াছে। আগাগোড়া নকল!
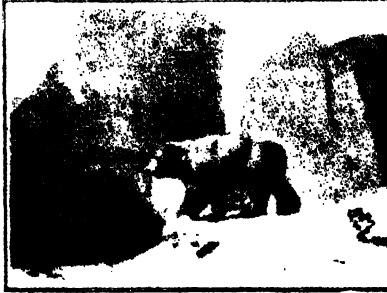
ষ্টুডিয়োর নকল গিরি-বনে নকল জন্তু-জানোয়ার

ঝড়ো বাতাসের সৃষ্টি হয় এরোপ্লেন-প্রোপেলার (বিমানপোতের পাখা) চালাইয়া। বাস্তবের ছাঁচে এ তুষার-পাতের জন্য বরফ-জমানো কল (ice-storage plant) পাওয়া যায়। সে-যন্ত্রের সহিত তুষার-বর্ষণযোগ্য নল বা হোজ্-পাইপ্ এবং বাতাস-বহানো পাখা লাগানো থাকে। এ যন্ত্র চালাইবামাত্র হোজ্-পাইপ ও বাতাস-বহা পাখা সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। যন্ত্রমধ্যে সামান্য বরফ ভরিয়া যন্ত্রটিকে চালাইয়া দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তুষার-বর্ষণের হোজ-পাইপ ধরিয়া শেটের যেখানে যেমন তুষার-বর্ষণ প্রয়োজন, এক জন লোক তাগ্ করিয়া সেই হোজ-পাইপের সাহায্যে তেমনি তুষার বর্ষণ করেন। একটা ঘর ১৪০ ফুট লম্বা, ১০০ ফুট চওড়া এবং ৪০ ফুট উঁচু এ ঘরটিকে ঐ যন্ত্র-সাহায্যে তুষারে ভরিয়া তুলিতে বরফ লাগে প্রায় সাড়ে বারো সের। যন্ত্রটি খুব ভারী নয়, আকারে ছোট—গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ বা টাইপ-রাইটারের মতো; কাজেই হাতে বহা চলে।

সিনেমার ছবিতে কনষ্টেবলের রুলের গুঁতায় চোর-বদমায়েসদের দুর্দ্দশা ঘটে খুব। এ সব রুল আসল রুল নয়; কাগজের তৈয়ারী। এ রুল এমন যে এ রুলের প্রহারে রুল ভাঙ্গে না, বাঁকে না; এ রুল যার পিঠে বা মাথায় পড়ে, তার পিঠে বা মাথায় সে এতটুকু বেদনা বোধ করে না!

যে-সব বন্য হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, বিষধর সাপ, কুমীর প্রভৃতি আমরা সিনেমায় দেখি, সেগুলা সব যদি জীবন্ত জন্তু-জানোয়ার বা সাপ-কুমীর হইত, তাহা হইলে ছবি তোলা কতখানি শক্ত হইত, ভাবিবার কথা! চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার কিম্বা বনের পশুপক্ষী ও জলাশয়ের জীবন্ত কুমীরের ছবি সাবধানে তুলিয়া লওয়া হয়। তার পর নকল জন্তু-জানোয়ার তৈয়ার করা হয়। ক্যামেরায় তোলা সত্যকার জীবন্ত জন্তু-জানোয়ারের ছবির সঙ্গে নকল-তৈয়ারী এই জন্তু-জানোয়ারের ছবি কৌশলে জুড়িয়া একসঙ্গে দেখানো হয়। ছবির গতি খুব দ্রুত; কাজেই আসল জন্তু-জানোয়ারের ছবির সঙ্গে নকল জন্তু-জানোয়ারের ছবি এত চট্ করিয়া চোখের সামনে দিয়া চলিয়া যায় যে সত্য-মিথ্যায় মিলিয়া দারুণ বিভ্রম ঘটে এবং নকলের ফাঁকি চোখে ধরা পড়ে না! *
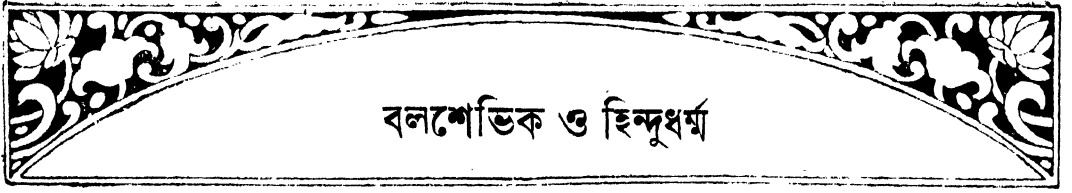
বলশেভিক ও হিন্দুধর্ম্ম

বলশেভিক-রুশিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছে। সে বলে, ধূর্ত্তগণ নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য ধর্ম্ম নামক বস্তু উদ্ভাবন করিয়াছে; সকল সমাজেই নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, এই সকল নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি পরলোকে পুরস্কার লাভ করিবার আশায় পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীদিগকে অর্থ দান করে; ধর্ম্মের প্রভাবেই দরিদ্র ব্যক্তিগণ অভাব ও দুঃখের মধ্যেও সন্তুষ্ট থাকে, নচেৎ তাহারা ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নিজ অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করিত, যেমন রুশিয়াতে হইয়াছে; ধর্ম্মের সাহায্যে ধনী ব্যক্তিগণ আরাম ও বিলাসের মধ্যে তাহাদের জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ উৎপাত করে না; এজন্য ধনিগণ ধর্ম্মের প্রতি সদয় এবং ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু বলশেভিকদের এই অভিযোগ যে মিথ্যা, তাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারকদের জীবনচরিত, নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে. ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্য, বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট ইঁহারা যে প্রবঞ্চনার সহায়তা করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না যে, তাঁহারা এরূপ একটা সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহাদিগকে পরম আনন্দ দান করিয়াছিল; অন্য মানবগণও এই আনন্দ আস্বাদন করিয়া নিজ জীবন ধন্য করুক, ইহাই তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ ছিল। বহুসংখ্যক ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য স্বেচ্ছাদারিদ্র্য, নির্য্যাতন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়াছেন। দুঃখের কষ্টিপাথরে ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে বহু বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাবাদী নহেন। ইহা সত্য যে, কোনও কোনও প্রবঞ্চক ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়াছেন; কিন্তু সকল উত্তম বস্তুর মন্দ অনুকরণ হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, উত্তম বস্তু নাই।

ধর্ম্ম প্রবঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত, বলশেভিকদের এই অভিযোগ যে মিথ্যা, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। কিন্তু বলশেভিকদের আর একটি যুক্তি আছে—তাহার উত্তর দেওয়া কিছু দুরূহ। তাহারা বলে, মন্দির বা গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যে উদ্যম এবং সময় ব্যয় হয়, সে উদ্যম এবং সময় দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য ব্যয় করা উচিত, অর্থাৎ মন্দির এবং গির্জ্জা নির্ম্মাণ না করিয়া হাসপাতাল এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। তাহারা বলে, যদি-ই বা ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, সে নিজে ইহলোকে বা পরলোকে উপকৃত হইতে পারে, কিন্তু নিজ উপকারের জন্য চেষ্টা করা স্বার্থপরতারই নামান্তর। অতএব ঈশ্বরকে আরাধনা না করিয়া, পরদুঃখ মোচনের চেষ্টাই কর্ত্তব্য। এজন্য বলশেভিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের রাজ্যে কোনও গির্জ্জা বা মন্দির থাকিবে না এবং জাতির সমগ্র উদ্যম আর্থিক উন্নতির জন্য নিযুক্ত হইবে। তাহারা বলে যে, আত্মসুখান্বেষণ অপেক্ষা পরোপকার চেষ্টা শ্রেষ্ঠ, ইহা যদি সকল জাতি সত্যসত্যই বিশ্বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রদর্শিত পথে সকল জাতির অগ্রসর হওয়া উচিত।

বলশেভিকদের এই যুক্তি যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে সত্যসত্যই পৃথিবী হইতে ধর্ম্মানুষ্ঠান উঠিয়া যাইবে। কারণ, তাহা হইলে যে কেবল মন্দির থাকিবে না তাহা নহে, গৃহে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান বা উপাসনা করাও স্বার্থপরতার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সময়টুকু ধ্যান বা উপাসনা করিবেন, সে সময়টুকু কোনও রোগীর সেবা করিবেন না কেন; অথবা দরিদ্রের জন্য অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন না কেন?

বলশেভিকদের এই যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, একটি মন্দির বা গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিলে অনেক ব্যক্তি সেখানে গিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে। এবং উপাসনা করিয়া সুখ এবং মানসিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। হাসপাতাল বা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে সাধারণের যতদূর উপকার করা যায়, মন্দির বা গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার করা যায়। কারণ, কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি করিলে তাহার যত উপকার করা হয়, অপর কোনও

উপায়ে ততদূর উপকার করা সম্ভব হয় না। ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি ইহাও বলিবেন যে, রোগী ও দুঃখীর জন্য প্রার্থনা করিয়া তাহার যতদূর কষ্ট লাঘব করা যায়, সেবা ও ঔষধের দ্বারা ততদূর করা যায় না।

কিন্তু এই সকল সাধারণ যুক্তির দ্বারা বলশেভিককে নিরস্ত করা দুরূহ। তাহারা বলিবে, ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক স্তব করিলে তিনি যতদূর প্রীত হইবেন, দুঃখীর দুঃখমোচনের চেষ্টায় তিনি অধিকতর প্রীত হইবেন,—যদি তিনি সত্য সত্যই দয়ালু হন। মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অনেক ব্যক্তিকে উপাসনা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু উপাসনা করিবার সুযোগ দেওয়া এবং স্বার্থপর হইবার সুযোগ দেওয়া, একই কথা। উপাসনা করা অপেক্ষা পরোপকার করা যখন শ্রেয়ঃ, তখন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করিবার সুযোগ দেওয়া অপেক্ষা, হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া সেবা করিবার সুযোগ দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

আমার মনে হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ হইতে বলশেভিকদের যুক্তির যেরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারা যায়, অপর কোনও ধর্ম্মের পক্ষ হইতে সেরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারা যায় না। এই উত্তর দিতে হইলে মানব কেন সুখ ও দুঃখ পায়, তাহা বিচার করা উচিত।

মানব পাপ করিলে দুঃখ পায়, পুণ্য করিলে সুখ পায়। হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন অপর ধর্ম্মে এই সত্য আংশিক ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মে বলা হইয়াছে যে, মানব ইহ জন্মে যে পাপ করে, তাহার ফলে ইহলোকে বা পরলোকে দুঃখ পাইবে; কিন্তু ইহা স্বীকৃত হয় নাই যে, ইহ জন্মে মানব যে সুখ বা দুঃখ পায়, সকলই তাহার ইহ জন্মে বা পূর্ব্বজন্মে কৃত পুণ্য বা পাপের ফল। ইহা না স্বীকার করিলে সত্যটির পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি হয় না, এবং ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর এবং খামখেয়ালী বলিতে হয়। হিন্দু ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের কর্ম্ম অনুসারে তাহাকে সুখ বা দুঃখ দেন। তিনি ন্যায়-পরায়ণ,—কর্ম্ম অনুসারেই ফল প্রদান করেন। তিনি দয়ালু—পাপীও যদি অনুতাপ করে এবং একান্ত ভাবে তাঁহার শরণ লয়, তাহা হইলে তাহাকে উদ্ধার করেন।

মানব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, তাই বলিয়া কি কাহারও দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত নহে? বলা বাহুল্য, হিন্দু ধর্ম্মের এরূপ অভিপ্রায় নহে। কাহারও দুঃখ দেখিলে সে দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু সে চেষ্টার উদ্দেশ্য হইবে, আত্মচিত্ত শুদ্ধি। আমার হৃদয়ে যে বিলাস-বাসনা আছে, পরের দুঃখে সহানুভূতি করিলে, পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিলে তাহা বিদূরিত হইবে, এজন্য সেরূপ চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু এরূপ চেষ্টা করিবার সময়ও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, ঈশ্বরই সকলকে নিজকর্ম্ম অনুসারে দুঃখ দিতেছেন, তিনি দুঃখ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছেন বলিয়া দুঃখ দিতেছেন; তিনি ইচ্ছা করিলে সকল জীবের দুঃখ দূর করিতে পারেন। পিতা অবাধ্য সন্তানকে দণ্ড দেন, কিন্তু কেহ যদি এরূপ সন্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হন। সেইরূপ ঈশ্বরও অবাধ্য সন্তানকে দণ্ড দেন কিন্তু কেহ যদি দণ্ডিতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। দুঃখীকে দয়া কর, ইহা তাঁহারই আদেশ, তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি বলিয়াই দুঃখীকে দয়া করা উচিত। কাহারও দুঃখ দূর করিতে পারিলে যেন চিত্তে এরূপ অহঙ্কার না হয় যে, আমি ইহার দুঃখ দূর করিলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া আমাদের অপরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। ঈশ্বর ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক কর্ম্ম করিবার সময় এই নিয়মগুলি মনে রাখিতে হইবে :—

(১) কর্ম্মে আসক্তি থাকিবে না।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।"

"অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে।"

(২) কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

"তোমার কর্ম্মেই অধিকার আছে। কর্ম্মফলে কদাপি অধিকার নাই।"

(৩) অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে,—"আমি কর্ম্ম করিতেছি" এ বোধ থাকিবে না।

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

যাঁহার মন অহঙ্কারে আবৃত হয়, তিনি মনে করেন, "আমিই কর্ত্তা।"

(৪) ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া কর্ম্ম করা উচিত।

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

"যে ব্যক্তি মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিয়া অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে, সেই উত্তম কর্ম্মী।"

(৫) ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা উচিত।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"

ঈশ্বর ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়।

এই সকল নিয়ম মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম চিত্ত শুদ্ধির কারণ হয়।

"যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।"

"যোগিগণ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।"

পরোপকাররূপ কর্ম্ম করিবার সময়ও এই নিয়মগুলি পালন করিয়া কর্ম্ম করা উচিত। এই নিয়মগুলি পালন না করিয়া পরোপকাররূপ কর্ম্ম করিলে, তাহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। বলশেভিক রুশিয়াতে তাহাই হইয়াছে। পরোপকার মানবজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। পরোপকাররূপ কর্ম্ম ঠিকমত করিলে এই উদ্দেশ্যের সহায়ক হইবে। ঠিক মত না করিলে অন্তরায় হইবে। পৃথিবীতে দুঃখের পরিমাণ খুব বেশী (তাহার কারণ পাপের পরিমাণ খুব বেশী)। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এই দুঃখের অল্প ভাগই দূর করিতে পারা যায়। দুঃখমোচনরূপ কর্ম্মফলে যদি আসক্তি থাকে, তাহা হইলে অশান্তি এবং নাস্তিকতা আসিবার সম্ভাবনা আছে। "আমরা চেষ্টা করিয়া পৃথিবীর এত বেশী দুঃখের অল্পপরিমাণই দূর করিতে পারি" এইরূপ ভাবিয়া পরোপকার হইতে বিরত হইয়া কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। পরদুঃখ মোচনের জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু এই চেষ্টার উদ্দেশ্য থাকিবে, আত্মশুদ্ধি।

কোনও ব্যক্তির দুঃখ দূর করিলেই সব সময় তাহার প্রকৃত উপকার করা হয় না। দুঃখ অনেক সময় হিতকারী বন্ধু। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া চিত্তের মলিনতা দূর হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নচেৎ পরমকারুণিক ভগবানের বিধানে দুঃখের সৃষ্টি হইত না। যাহারা সুখ এবং বিলাসে পালিত হয়, তাহারা অনেক সময় মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। পৃথিবীতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানব হইয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই অভাব ও দুঃখের মধ্যেই পালিত হইয়াছেন। এজন্যও পর-দুঃখ মোচন জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ, আমি কোনও ব্যক্তির দুঃখ মোচন করিয়া তাহার প্রকৃত উপকার করিতে পারিব কি না, কে বলিতে পারে? কিন্তু পরদুঃখ-মোচন জীবনের উদ্দেশ্য না হইলেও পরদুঃখমোচনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত, উপযুক্ত পাত্র নিরূপণ করিয়া দান করা উচিত। উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে, সে দানে অনিষ্ট হইবে না। অধিকন্তু যথাবিহিত দান করিলে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে। ঈশ্বরের আদেশ মনে করিয়া, অপর সকল আদেশ পালনের সহিত দান করাও উচিত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, পরোপকার-চেষ্টা এই উদ্দেশ্যলাভের সহায়ক উপায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য-লাভের পক্ষে পরোপকার চেষ্টা একমাত্র উপায় নহে,এমন কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ও নহে। শ্রেষ্ঠ উপায়, ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরারাধনা। মন্দির বা গির্জ্জায় ঈশ্বরকে আরাধনা করিবার সুবিধা হয়—সহজে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আসে। এজন্য পরোপকারের অজুহাতে মন্দির ও গির্জ্জা পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—আমি পরের দুঃখ দূর করিতেছি এরূপ অহঙ্কার থাকা পাপ, ঈশ্বরের নিকট কি কতকগুলি স্কুল ও হাসপাতাল চাইবি—না বলবি, হে ঈশ্বর, আমাকে দেখা দাও ;—যার বুদ্ধি নাই, সে কালীঘাটে গিয়া ভিখারীকে পয়সা দিবার সময় ভিখারীর ভিড়ে আটকাইয়া যায়, মাকে আর দর্শন করা হয় না।

বলশেভিকরুশিয়া পরোপকারের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছে। এজন্য রুশিয়াতে আমোদ-প্রমোদ থিয়েটার-বায়স্কোপ এ সকল নিষিদ্ধ হয় নাই। যদি রুশিয়াতে পরোপকারের অর্থ সাহায্যের উপলক্ষে এই সকল আমোদ প্রমোদের অজস্র ব্যয় নিবারিত হইত, তাহা হইলে ইহা বুঝা যাইত যে, তাহারা পরোপকারসাধনাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বাস্তবিক বলশেভিক রুশিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধর্ম্ম এই উদ্দেশ্যের প্রতিকূল বলিয়া তাহারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিয়াছে। এবং ধর্ম্মবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়সুখভোগের অনুসরণ করিয়া তাহারা নিষ্ঠুরতা দুর্নীতি এবং ব্যভিচারের পথেই অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (এম-এ)।
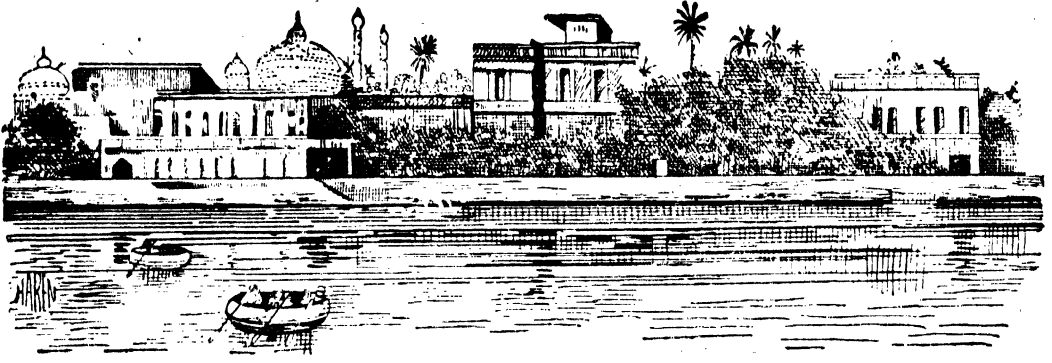
বাইবেলের দেশ

পূর্ব্বে একটা কথা প্রচলিত ছিল, "প্রাচ্যদেশ অপরিবর্ত্তনীয়," কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সে কথা বলা চলে না।

পূর্ব্বে মিশরে যে স্থানে ফারোয়া-রাজকন্যা মোজে-সের দেখা পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সেই স্থানেই হয় ত কায়রোর কোন চলচ্চিত্র কোম্পানী কোনও জনপ্রিয় আরব-অভিনেত্রীর ছবি দেখাইতেছে।

প্যালেষ্টাইনের অলিভ পাহাড়ের চারিদিকে হয় ত প্যালেষ্টাইনের যুবকরাই উইণ্ডমিলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া রেডিওযন্ত্র বসাইতেছে দেখা যাইবে।

বাগদাদে মার্কিণ এঞ্জিনীয়ার নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ কায করিতেছেন, এ দৃশ্য বিরল নহে। ইরাণের শা অধিবাসীদিগকে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণে বাধ্য করিতেছেন, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য।

প্রাচ্য এখন নানা বিষয়েই রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। বহু যাত্রী ইদানীং মোটর গাড়ীতে চড়িয়া মক্কাদর্শনে গমন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এক মিশরীয় কোম্পানী চলচ্চিত্রের ফিল্মে হজের দৃশ্যাবলী তুলিয়াছেন।

জাফা তোরণের সম্মুখে বৃটিশ-সৈনিকরা আরবদিগের গাত্রবস্ত্র সন্ধান করিয়া দেখিতেছে

পরিবর্ত্তন দেখা দিলেও হিব্রু, খৃষ্টান এবং মুসলমানগণ এখনও বাইবেল-দেশকে পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কারণ, বাইবেলের দেশ তিনটি ধর্ম্মের জন্মভূমি।

বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে তুর্ক সাধারণতন্ত্রের অভ্যুত্থান হয়। ইরাকের নূতন রাজ্য এবং সাউদী আরব দেশের উদ্ভব ঘটে। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের উপর বৈদেশিক অধিনায়কত্বের প্রভাব ও তৈল এই দুই ব্যাপারেই সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন এই
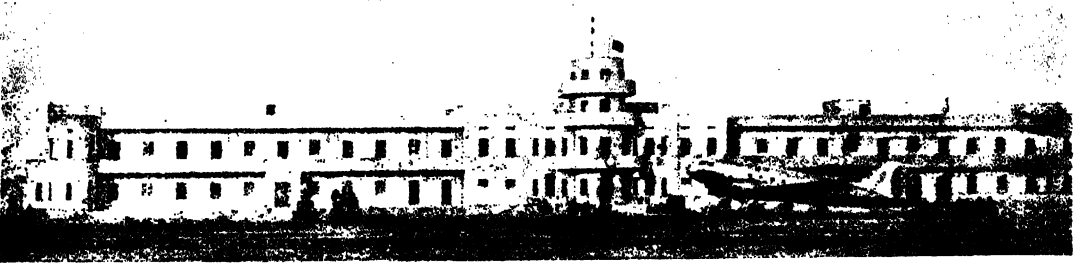
বসরার হোটেল—এইখানে বিমানবহর অবতীর্ণ হয়

সকল দেশে দেখা দিয়াছে। বাইবেল দেশের নূতন মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, বাবিলনের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। সেই স্থানে নেবুকাডনেজার তাঁহার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন বাবিলনের স্বর্গোদ্যান-সন্নিহিত স্থানে রেলপথ, খাল প্রভৃতি রচিত হইয়াছে।

রোমান্ ও ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের আগমনের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আসিরীয়, হিটাইটী এবং মিশরীয়গণ যে চলাপথে দেশ-পর্য্যটন করিত, তাহার সমান্তরালভাবে মোটর চলাচলের পথ নির্ম্মিত হইয়াছে।

নূতন রেলপথ কাস্পিয়ান সাগরের তীরভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া ইরাণের পার্ব্বত্য-পথের মধ্য দিয়া পারস্য উপসাগরে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

অধুনা অসংখ্য সামরিক ও বাণিজ্যসংক্রান্ত বিমানসমূহ ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়া গতায়াত করিয়া থাকে। মার্শেল এখন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পরিণত হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া অন্যান্য মিশরীয় সহরের ন্যায় অনেক দিন হইতে ফরাসী ও ইংরেজের প্রভাবাধীন রহিয়াছে। সুতরাং এই সহরের পরিবর্ত্তন তেমন অভাবনীয় নহে। কিন্তু বাগদাদ ও হাইফার পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর।

আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে আবুকীর। এই
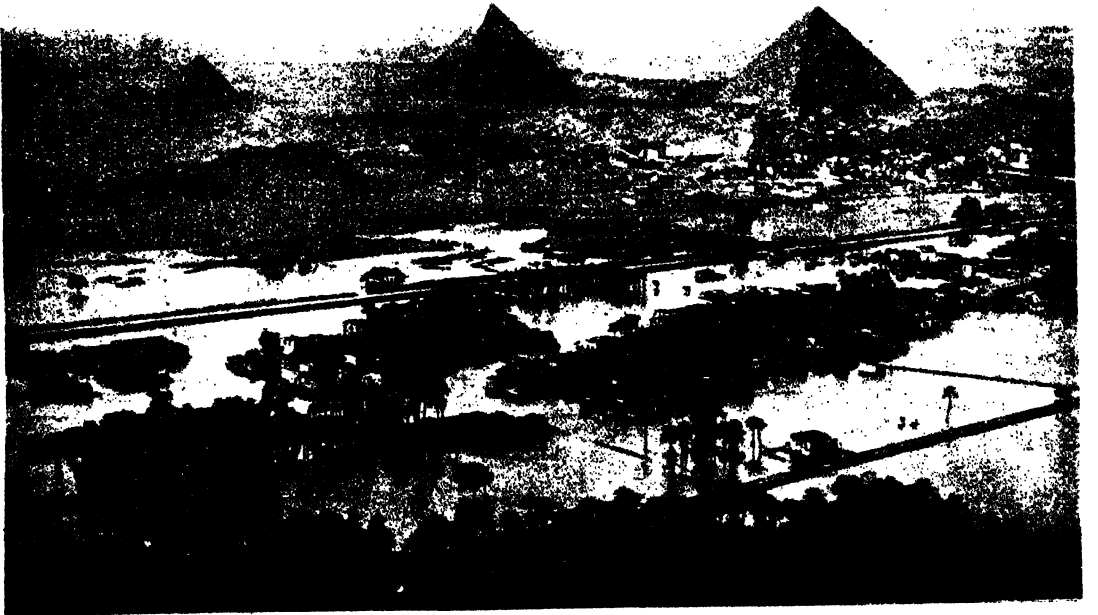
৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত গাজার পিরামিডসমূহ
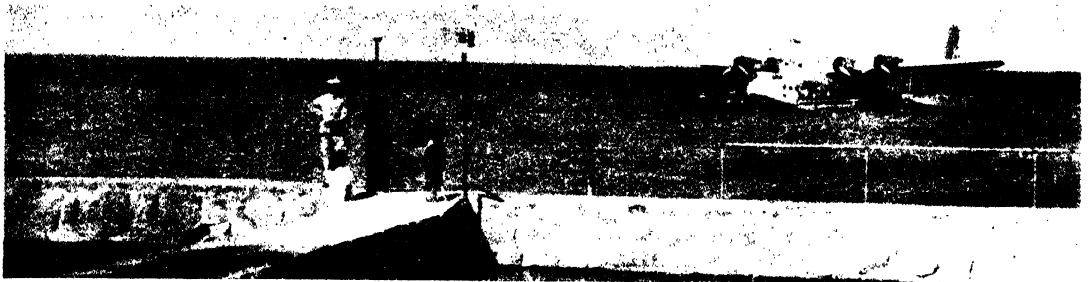
গ্যালিলির সমুদ্র—এইখানে খৃষ্ট হাঁটিয়া সমুদ্র পার হইয়াছিলেন

স্থানে এডমিরাল নেলসন ও নেপোলিয়নের সেনাদলের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। স্থানীয় যাদুঘরে বহু প্রাচীন বস্তু সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। আধুনিক আলেকজান্দ্রিয়া ইদানীং তুলা, শস্য, ব্যাঙ্ক এবং সামুদ্রিক ও বৈমানিক ব্যাপারে অনুক্ষণ বিব্রত।

প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার পুরাতন সংবাদ অনেকেই এখন অবগত নহে। এখানকার প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার যেখানে অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমান যুগের লোক তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। সে যুগের সপ্তমাশ্চর্য্য, ঐতিহাসিক কাঠের আলোর বাতিঘর কোথায় বিদ্যমান ছিল, তাহাও এ যুগের লোক অবগত নহে। কথিত আছে, এই বাতিঘর হইতে এমন আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইত যে, সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাতে প্রদীপ্ত হইয়া থাকিত। এই আলোকের এমনই শক্তি ছিল যে, শত্রুর জাহাজ তাহার উত্তাপে ভস্মীভূত হইয়া যাইত। বর্ত্তমান যুগের আলেকজান্দ্রীয় তুলার দালাল এ সকল বিষয় অবগত না হইলেও,

কায়রোর জামারিক সেতু
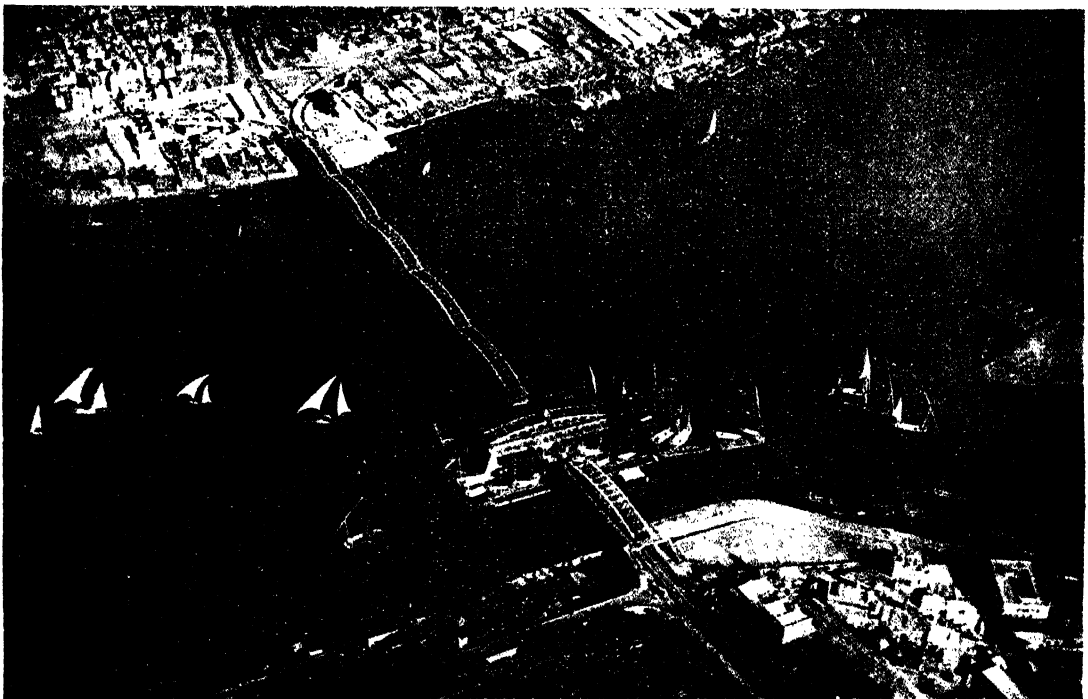
বেথেলহেম সহরের দৃশ্য
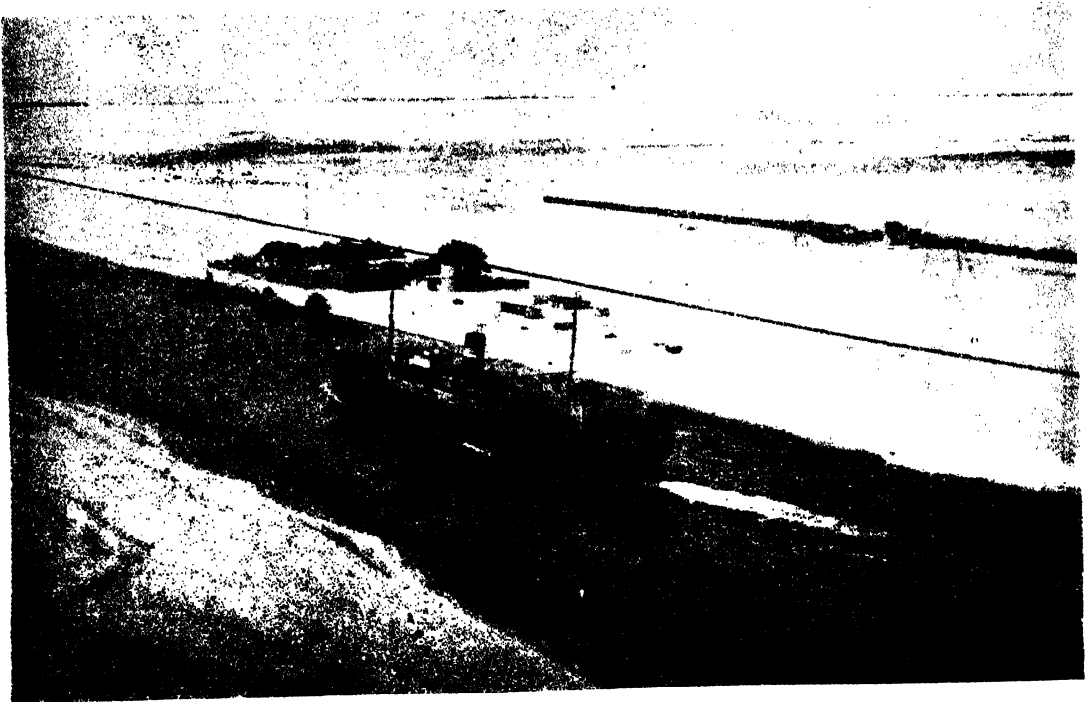
সুয়েজ খালের সঙ্কীর্ণপথে বৃটিশ-জাহাজ চলিয়াছে

টেল্‌-আভিব সহরের রাজপথের ধারে অত্যুচ্চ অট্টালিকাসমূহ
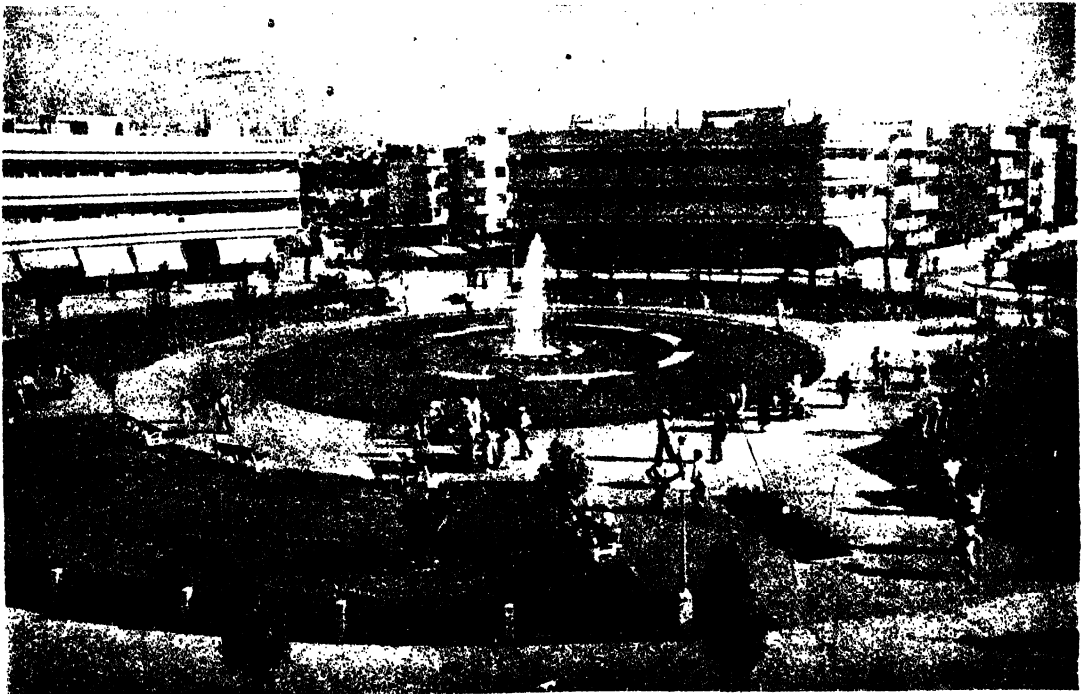
টেল্‌-আভিবের নবনির্ম্মিত সহর—এইখানে প্যালেষ্টাইনের প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় প্রভৃতি অবস্থিত

সুদূরবর্ত্তী টেক্সাসের তূলার দর অথবা তিন মিনিট পূর্ব্বে লিভারপুলে কি দরে তূলা বিক্রীত হইতেছে, তাহার সংবাদ দিতে পারিবে।

আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কায়রোতে বিমানযোগে গমন করিলে, দর্শকের নেত্রপথে নীলনদের এই বদ্বীপের সহর এবং কৃষকভবনসমূহ পতিত হইবে। আরও উর্দ্ধে যদি বিমান উত্থিত হয়, তাহা হইলে সাহারার বালুকা-ঝটিকা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে।

মসজেদে প্রবেশ করিবার জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্রনির্ম্মিত জুতা

কায়রোর সন্নিহিত নূতন হেলিওপলিস্ মিশরের বিমান-বন্দর। উহারই সন্নিকটে অন্‌ধ্বংসস্তূপ। এই স্থান বাইবেলের যুগের। জনশ্রুতি এই কথা বলে যে, পবিত্র দম্পতি হেরডের অত্যাচারভয়ে শিশু যীশুকে লইয়া সিনাইয়ের পথে পলায়ন করিয়া অনের চিরকুমারী বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়াছিলেন।

পবিত্র সহরের পার্শ্বে নূতন জেরুজালেম গড়িয়া উঠিয়াছে

হেলিওপলিস্‌এ কেপটাউন বা লণ্ডনের বিমান-আরোহীদিগকে নামাইয়া দেয়। এই বন্দর হইতে স্থানীয় মিশরীয় বিমানসমূহ, পোর্ট সৈয়দ, সাইপ্রস্, হাইফা এবং আরও দূরবর্ত্তী স্থানের যাত্রী বহন করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। এক্ষণে তথায় হোটেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন মিশরের উন্নতি এই হেলিওপলিস্ বন্দরের উন্নতিদৃষ্টে অনুমান করা চলে।

পূর্ব্ব-পশ্চিমভাগে কায়রো অবস্থিত। এই কায়রোতে অসংখ্য মসজেদ, প্রাসাদ, যাদুঘর এবং অন্ধকারময় বাজার প্রভৃতি বিদ্যমান। সহরের কিছু দূরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফিংকস্—উহার পদতলে বসিয়া কত লোক ছায়াচিত্র

আন্টিয়কের সন্নিকটে আলাউটা নারীদিগের উৎসব

পারা যায়। কোয়ান-টারা হইতে সুয়েজ খাল নৌকা যোগে পার হইলে রাত্রিকালে জেরুজালেমে পৌঁছান যায়। পূর্ব্বে পদব্রজে জেরুজালেমে যাইতে ৪০ বৎসর কাল লাগিত। ইসরেল-সন্তানগণ তাহাই করিত। এখন বিমান-যোগে এবং ট্রেণে চড়িয়া তথায় যাওয়া যায়। পথে কোন কষ্টই অনুভূত হয় না।

জাফা-পুলিশ রাজপথে আরবদিগের সহিত লড়াই করিতেছে

বাইবেলের দেশটা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এখান হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। গোসেন ভূমি—এইখানে রামেসেসের জন্য ইস্রেলাইটরা দাসত্ব করিয়াছিল। এই ভূমি নীলনদের নিম্নভাগে অবস্থিত। এইখানে মোজেস ফারোয়া নৃপতির স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভেক-মড়ক এইখানে সংঘটিত হয়। এই বন্ধনের দেশ হইতে মোজেস্ ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত জনগণকে পরিচালিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

এখন যেখানে বৈদ্যুতিক পাম্প জল উত্তোলন করিতেছে, সে যুগে তথায় ইস্রেলাইটরা রজ্জুসহযোগে জল উত্তোলন করিত। ফারোয়ার অশ্ববাহিত রথ যেখানে ঘর্ঘর রব তুলিয়া ধাবিত হইত, এখন তথায় মোটর গাড়ীর চক্রধ্বনি উত্থিত হইতেছে। যে সকল প্রাসাদ ইস্রেল্-সন্তান-গণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, অধুনা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধ্বংসস্তূপ হইতে তাহাদের উদ্ধারসাধন করিতেছেন।

বিমানযোগে মাঞ্জালা হ্রদের উপর দিয়া পোর্ট সৈয়দে লইয়া থাকে। আরবগণ পিরামিডে আরোহণ করিবার জন্য এক শিলিং মুদ্রা লইয়া ৭ মিনিটের মধ্যে পিরামিডশীর্ষে আরোহণ ও অবরোহণ করিতে পারে।

এখান হইতে মোটরযোগে পোর্ট সৈয়দে গমন করিতে

এখন পৌছান সহজ। এই সহরটি প্রায় জল দ্বারা বেষ্টিত। সমুদ্রতটভূমি হইতে ইহার উচ্চতা অধিক নহে। সৈয়দ বন্দরের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে টিমা সমতলভূমি। তাহার অদূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিনাই মালভূমি। এখন তাহা সম্পদশূন্য বলিলেই চলে। কিন্তু হিব্রু-সাহিত্য এবং "ওল্ড টেষ্টামেণ্টে" তাহার প্রসিদ্ধি বর্ণনাতীত।

সিনাই মিশরের অন্তর্ভুক্ত। গাজা প্যালেষ্টাইনের তটভূমিতে অবস্থিত। খাল হইতে গাজা পর্য্যন্ত রেলপথ বৃটিশের নির্ম্মিত। এই গাজারই কোন স্থানে ডেলিলা সাম্‌সনের চুল কাটিয়া লইয়াছিল। এইখানেই তিনি মন্দির চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আসিরীয় ও অষ্ট্রেলীয় সেনাবাহিনী প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া গাজার উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। এখন সেই গাজার কি দুর্দ্দশা! জেরুজালেমএ মার্কিণ-পণ্ডিত মিঃ জন, ডি, হুইটিং বাস করিয়া থাকেন। তিনি গাজায় অসংখ্য বটের পক্ষীকে আসিতে দেখিয়াছিলেন। আরবরা জাল পাতিয়া এই পাখী ধরিয়া থাকে। এক বার তাহারা দ্বিপ্রহরের মধ্যে ৬ হাজার বটের ধরিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে বাজারে চালান দিয়াছিল। জীবন্ত বটের ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে।

কিংবদন্তী অনুসারে গাজার পূর্ব্বভাগে রামাথ লেহী অবস্থিত ছিল। এইখানে সামসন ১ হাজার ফিলিষ্টাইনকে গর্দ্দভ-অস্থি দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন।

পশ্চিম-প্যালেষ্টাইন দেখিতে অনেকটা দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার মত বলিয়া অনেকে মতপ্রকাশ করিয়া থাকেন। বহু ক্রোশব্যাপী শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাকুঞ্জ বিরাজিত। মাঝে মাঝে সাদা প্রাচীরবেষ্টিত লাল রঙ্গের ছাদবিশিষ্ট ভবনসমূহ। টেল্-আভিব নামক প্যালেষ্টাইনের নূতন সহর ক্যালিফোর্ণিয়ার দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহুদীরা এই সহর সুন্দররূপে রচনা করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এইখানে তৃণগুল্মশূন্য বালিয়াড়িসমূহ বিরাজিত ছিল। এই সহরের বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা দেড় লক্ষ। অধিবাসীরা সকলেই ইহুদী। সহরের শাসন-সংরক্ষণ তাহারাই করিয়া থাকে। এখানকার অল্ডারম্যান, পুলিস, ডাকপিয়ন, বাসচালক, শিক্ষক, ইটের

আলাউয়িটা নারীদিগের নৃত্যপদ্ধতি

মিস্ত্রী—সবই ইহুদী। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সহর যেন ইন্দ্রজাল-বলে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে নৈশ-ক্লাবগৃহে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জনসমাগম হইয়া থাকে। সহরে সুদৃশ্য কাফিখানা, বড় বড় চলচ্চিত্রালয়, সুন্দর ঐক্যতানবাদকদল এবং চিত্রশিল্পপ্রদর্শনীসমূহ বিদ্যমান। প্রায় ৫০খানা দৈনিক ও সাময়িক পত্র এই সহর হইতে বাহির হইতেছে। বহু প্রকার কলকারখানা এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। গন্ধদ্রব্যের কারখানা হইতে কৃত্রিম-দন্তের কারখানা পর্য্যন্ত সবই সুখী। এই স্থান ইহুদীদিগের নিজস্ব সম্পদ। আপনাদের শিক্ষা-দীক্ষার অনুরূপ করিয়া তাহারা সহরটিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এখানে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে পারে।

টেল্-আভিব এবং জাভা হইতে মোটরযোগে প্রাচীন ধর্ম্ম-যোদ্ধাদিগের নির্ম্মিত জেরুজালেমে যাইবার পথে উপনীত হওয়া যায়। এই পথেই সিংহবিক্রম রিচার্ড অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই পথের ধারে প্রাচীন যুগের বহু স্মৃতি

প্রাচীন ব্যালবেকের সন্নিহিত প্রান্তরে মেষপাল চরিতেছে

এখানে আছে। ভেড়ার শিঙ্গা পর্য্যন্ত এখানে পাওয়া যায়। উহা হইতে তীব্র ধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে।

টেল্-আভিব সহরে বিদ্যালয়, ছাপাখানা, ধর্ম্মঘট এবং রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি দেখিলে ইহুদীর জাতীয় অভ্যুত্থানের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্রনীতিক্ দিক দিয়া জেরুজালেম হইতে প্যালেষ্টাইন পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু টেল্-আভিব ইহুদীদিগের সামাজিক ও বুদ্ধিনৈতিক কেন্দ্রস্থল।

এই সহরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। সহরের অধিবাসীরা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইদানীং এই পথে বৃটিশ-সৈনিকপূর্ণ সাঁজোয়া গাড়ীসমূহ যাতায়াত করিতেছে। ঝোপ-ঝাপের অন্তরাল হইতে মোটরযাত্রীদিগের উপর ইদানীং বন্দুকের গুলীও নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

সলোমনের মন্দির জেরুজালেমের যে স্থানে অবস্থিত ছিল, দর্শকগণ এখনও তাহা দেখিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন। যে পাহাড় হইতে হজরত মহম্মদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তাহাও জেরুজালেম্-এ অবস্থিত।

রাজা সলোমানের সময়ে নির্ম্মিত একটি কূপ আছে।
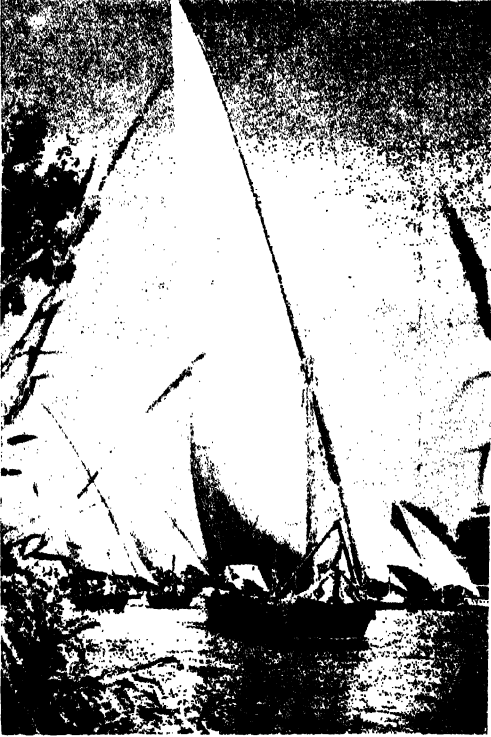
নীল-নদের বক্ষে পালতোলা নৌকাসমূহ

ইহুদী-বালিকারা ফুলের টব লইয়া চলিয়াছে

হাস্য-প্রফুল্ল ইহুদী-বালকের দল

টেল্‌-টামারএ নির্ব্বাসিত আসিরীয়

আরব তরকারী বিক্রেতা

আরব যোদ্ধা

জেরুজালেম—এই স্থানের পাহাড় হইতে মহম্মদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন

পুরোহিতের হস্তে মেষ শৃঙ্গ

শিশুসন্তানকে মাথায় রাখিয়া জননী চলিয়াছে

জর্দ্দান উপত্যকাভূমির নদীতে নৌকারোহী ইহুদী

বেদুইন শিবির ও মেষপাল

প্যালেষ্টাইনের আধুনিকা ইহুদী-তরুণী

জর্দ্দান উপত্যকাভূমি—পবিত্র নদীর স্রোত চলিয়াছে
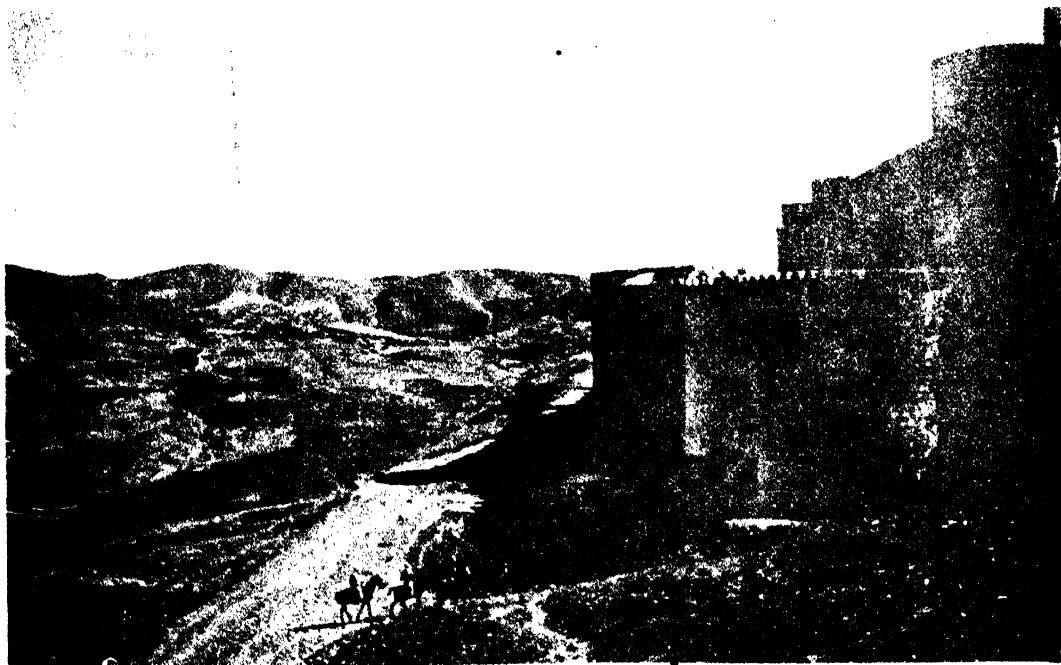
লাটাকিয়া পাহাড়ের উপরিস্থিত প্রাচীন যুগের দুর্গ

উহা হইতে আরবগণ জল উত্তোলন করিয়া থাকে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কয়েক জন মার্কিণ জেরুজালেম্ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে আরব বিভীষিকাবাদীরা প্যালেষ্টাইনের প্রাণস্পন্দনকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদিগের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বৃটিশ-সেনাদল, সাঁজোয়া গাড়ী এবং পুলিশ প্যালেষ্টাইনের সকল স্থান ছাইয়া ফেলিয়াছিল। হত্যাকারীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহারা আফ্রিকার সারমেয় দলকে নিযুক্ত করিয়াছিল। রাজপথে বাস চলাচলের সময় উহার বাতায়নগুলি তারের জাল দিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল। আরবরা পাথর ও বোমা ছুড়িয়া বাসের আরোহীদিগকে আহত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। জেরুজালেমের রাজপথে প্রত্যহই নরহত্যা ঘটিত। জুভাইয়া, হাইফা এবং টেল্ আভিবের পার্ব্বত্য-পথসমূহে প্রায়ই নরহত্যার সংবাদ পাওয়া যাইত। এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থাতেও গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ ছিল না। সহরের প্রাচীরের বহির্ভাগে নূতন জেরুজালেম্ দ্রুতগতিতে নির্ম্মিত হইতেছিল। ইহুদী ও আরবগণ চমৎকার এবং আরামপ্রদ গৃহনির্ম্মাণে যেন প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছিল। বহু নূতন দোকান, নূতন বাস্-চলাচলের পথ গড়িয়া উঠিতেছিল। এই নূতন জেরুজালেম্‌কে হিব্রু ও মুসলমান-জেরুজালেম্ বলা যাইতে পারে।

আরব-বংশীবাদক

আসিরীয় নারীদিগের বেশভূষা

ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টান, ইহুদী এবং মুসলমানগণ গত ৩ হাজার বৎসর ধরিয়া পবিত্র নগরে যাতায়াত করিতেছে। শান্ত

দামাস্কাসএর পল্লী নারীদিগের জলসংগ্রহের দৃশ্য

সিরিয়া দেশের গাড়ীর উপর মাল-পত্র ও আরোহীরা

গৃহে লইয়া গিয়া থাকে। দামাস্কাসের তোরণের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত একটি পর্ব্বতগুহায় যাইলেই তথায় একটি পাথরের খনি দৃষ্টিগোচর হইবে। জনশ্রুতি এই কথা বলে যে, রাজা সলোমন মন্দির-নির্ম্মাণকালে এই খনি হইতেই পাথর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কুঠার, শাবল ও ছেনির আঘাত এখনও দৃষ্টিগোচর হইবে—মনে হইবে, এই চিহ্নগুলি যেন সে-দিনের।

অলিভিস্ পাহাড়ের উপর নবনির্ম্মিত হিব্রু-বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ইহুদীদিগের একটি বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকাগারও আছে। সমগ্র প্যালেষ্টাইনে এই রব উঠিয়াছে যে, হিব্রু ভাষার পুনরুত্থান দ্রুতবেগে ঘটিতেছে।

প্যালেষ্টাইনের রাজধানী জেরুজালেম্। বৃটিশ-হাইকমিশনার

অথবা উচ্ছৃঙ্খল সকল অবস্থাতেই এই পবিত্র তীর্থস্থানের অর্থাগম দর্শকদিগের নিকট হইতেই হইয়া থাকে। এক জন ব্যবসায়ীর কথায় জানা যায় যে, এক ঋতুতে তিনি ৫০ হাজার বোতল জর্দ্দানের জল বিক্রয় করিয়াছিলেন। নবজাত শিশুকে দীক্ষিত করিবার জন্য এই পবিত্র বারি তাহারা

এইখানে থাকেন। যাবতীয় বৈদেশিক দূতনিবাসও এখানে অবস্থিত।

জেরুজালেম্ হইতে জেরিকো পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য-পথ অত্যন্ত জনবিরল। দস্যু-তস্করগণ এই পথের ধারে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। পথের ধারে সামারিটাস পান্থনিবাস

বিদ্যমান। কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, এইখানেই খৃষ্ট সাধু সামারিটানগণকে উপদেশাত্মক বাণী শুনাইয়াছিলেন।

নিউ জেরিকো তাহার শীতভবনসমন্বিত পল্লীসমূহসহ রাজপথের ধারে বিদ্যমান। পথটি বাইবেলযুগের সহরের ধ্বংসাবশেষের সন্নিহিত। এই সহরের প্রাচীরসমূহ জসুয়ার অনুচরবর্গের পরিক্রমা ফলে পড়িয়া গিয়াছিল। সাত বার প্রদক্ষিণের পর প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইলাইজা যেখানে অগ্নিময় রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের কাছাকাছি বিমানবন্দর।

মরুসমুদ্র হইতে পটাশ লবণসংগ্রহ

প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার সীমান্তে বৃটিশ-রচিত তারের বেড়া

জেরিকোর অদূরে জর্দান উপত্যকাভূমি। এই উপত্যকাভূমি বিদীর্ণ করিয়া জলস্রোত মরুসমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান সমুদ্রতট হইতে ১২ শত ৮৬ ফুট নিম্নে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে এমন নিম্নভূমি আর নাই।

মরুসমুদ্রের উত্তরপ্রান্তে একটি রাসায়নিক কারখানা বিরাজিত। উহার চারিধারে তারের বেড়া। সমুদ্রের ভারী জল হইতে কাষ্ঠভস্মের ক্ষার বাহির করা হইয়া থাকে।

আলেপো হইতে প্রস্তর-রচিত সিরীয় রাজপথ

আরবরা সিরিয়ায় সিমেন্টের বাঁধ দিতেছে

তীরে "কালিয়াবিচ হোটেল" অবস্থিত। জেরুজালেমের বালক-বালিকার দল চন্দ্রালোকিত রজনীতে এখানে নৃত্য ও সন্তরণের জন্য সমবেত হইয়া থাকে।

স্নানের ঘাটে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—হিব্রু, আরবী এবং ইংরেজী অক্ষরে—সন্তরণকারীরা যেন চোখে ও মুখে মরুসমুদ্রের কষা জল মোটে না লাগায়। ঐ জল লাগিলে অনিষ্ট হইবে। জর্দ্দান নদীর কোন মৎস্য যদি দৈবাৎ এই হ্রদে আসিয়া পড়ে, তখনই তাহার শ্বাসরোধ হয়।

মরুসমুদ্রের দক্ষিণাংশে লবণের কারখানা রহিয়াছে। উহার পার্শ্বে এক অদ্ভুত-দর্শন লবণস্তূপ বিদ্যমান। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই লবণস্তূপের একটি নাকি লটের পত্নীর। সোডম এবং গমোরা যখন ধ্বংস হয়, সেই সময় সেই স্ত্রীলোক পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া উহা দেখিয়াছিল,

এই প্রকাণ্ড হ্রদটির চারিদিকে নীল পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়ে গাছপালা কিছুই নাই। প্রথম দর্শনে হ্রদের জলরাশিকে সাধারণ জলের মত মনে হয়। হ্রদের

অমনই তাহার দেহ লবণ-স্তূপে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই দুইটি সহর অত্যন্ত দুর্নীতির আকর ছিল বলিয়া অগ্নি ও গন্ধক দ্রাবকে ধ্বংস হইয়া যায়। প্রাচীন আগ্নেয়-গিরির নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বহুদিন ধরিয়া উল্লিখিত দুইটি নগর আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন।
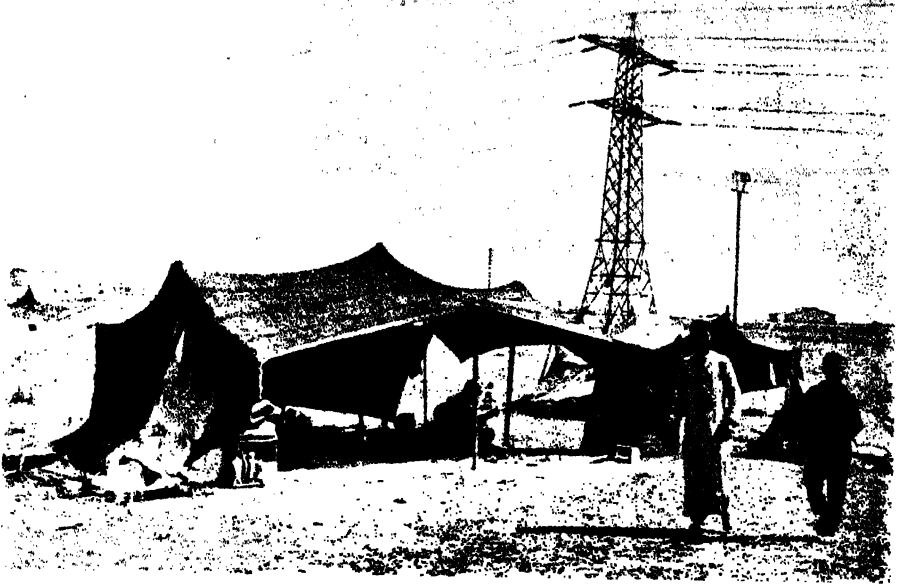
বেদুইন-শিবির

জর্দান-উপত্যকাভূমি অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে আসেনবি সেতুর উপর দিয়া নদী পার হওয়া যায়। জর্দানের অপর পার বৃটিশ-নিয়ন্ত্রণাধীন একজন আমীরের দ্বারা শাসিত। গ্রীক্‌যুগে ফিলাডেলফিয়ার ন্যায় প্রাচীন আম্মান নগরের প্রসিদ্ধি ছিল। আম্মান এখন মরুস্থানের রাজধানী।
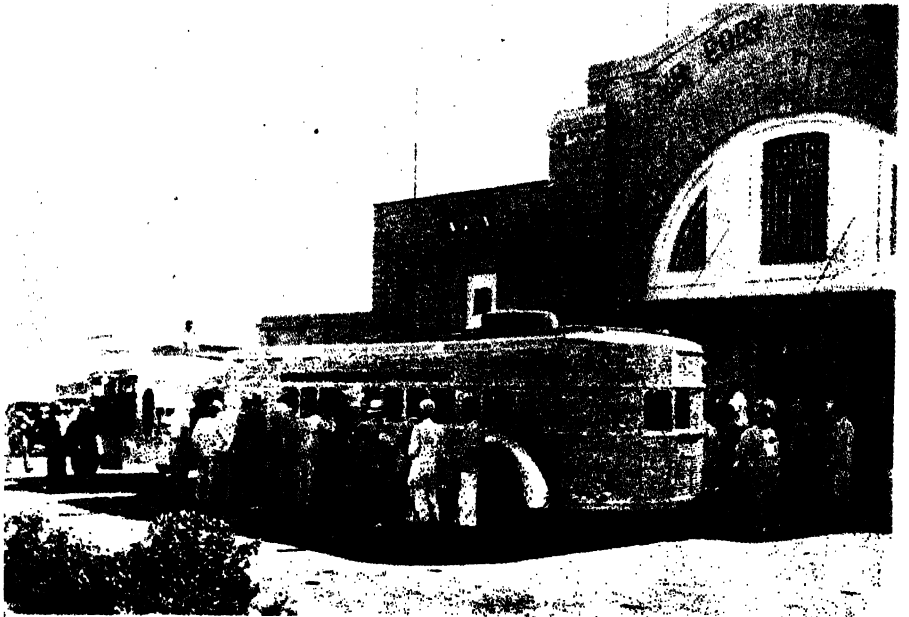
বাগদাদগামী দামাস্কাস বাস্‌ গাড়ী

এইখানে বৃহত্তম গ্রীক্‌রঙ্গালয়ের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এখান হইতে একটি রেলপথ শৈলমালার মধ্য দিয়া মক্কা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই শৈলমালার মধ্যে ম্যাচেরস্‌ অবস্থিত। এইখানে জন্‌ ব্যাপ্‌টিষ্টের মাথার জন্য সালোমে নৃত্য করিয়াছিল।

বাগদাদের বালকরা কোরাণ পাঠ করিতেছে
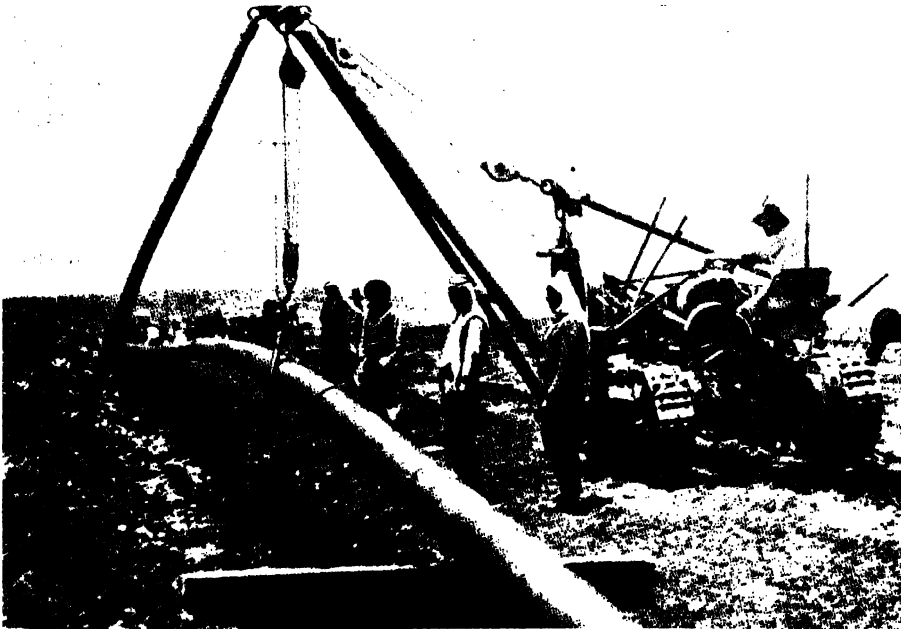
ইরাক হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এই তেলের নল প্রসারিত

চয়নে রত। পুরুষরা বন্দুক হস্তে পাহারা দিতেছে। পাছে আরবরা আসিয়া উৎপাত করে। গ্যালিলীর কাছেই আধুনিক টাইবেরিয়ান্ সহর। উহা প্রমোদ ক্ষেত্র বলিলেও চলে। গ্যালিলী হইতে খৃষ্ট সমুদ্র পার হইয়াছিলেন। এইখানে তিনি ধর্ম্ম প্রচার করেন, পীড়িতদিগকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্পর্শে মৃত ব্যক্তিও প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই খৃষ্ট শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন, কোথায় তাহারা জাল ফেলিবে। এই গ্যালিলীতেই খৃষ্ট ঝটিকাকে শান্ত করিয়াছিলেন। এখনও গ্যালিলীর সমুদ্রে সহসা ঝটিকা উত্থিত হইয়া জলযানসমূহকে বিপন্ন করিয়া তুলে, প্যালেষ্টাইন হইতে বর্ত্তমান যুগে যাত্রীরা মোটরবাস্ অথবা বিমানযোগে বাগদাদ গমন করিয়া থাকে। তেলের নল ইরাক হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত প্রস্তত। উহার সমান্তরালভাবে বাস চলিবার পথ এবং বিমানপথ

জর্দ্দান নদীতে যেখানে ইস্রেলাইটরা নদী পার হইয়াছিল, গাইডরা দর্শকদিগকে তাহা দেখাইয়া দেয়। এখন নদীর গোড়ার দিকে একটি জলোত্তলনকারী যন্ত্র বসিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্যালিলীয় কৃষিক্ষেত্রে ইহুদী নারীরা শস্য

চলিয়া গিয়াছে। এই তেলের নলের রাস্তা ৬ শত ১৮ মাইল ব্যাপী।

হাজার বৎসরের পুরাতন তীর্থস্থানে নির্ম্মিত তোরণ

আম্মান সহর হইতে মরু সমুদ্র পার হইয়া রুট্‌বা কূপের কাছে পৌছান যায়। এই প্রাচীন কূপ স্মরণাতীত যুগ হইতে সার্থবাহগণকে জল সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। এই কূপসমূহ উষ্ট্রপৃষ্ঠারোহী পুলিশ দ্বারা সুরক্ষিত। বিমান-বহর এইখানে আশ্রয় লইয়া থাকে। এখানে বেতার-ষ্টেশনও আছে, অতি শীতল জল এখানে পাওয়া যায়।

মোটরের রাস্তা আল্ ফলুজার কাছে ইস্পাতের সেতুর উপর দিয়া ইউফ্রেটিসের অপর পারে চলিয়া গিয়াছে। বৃটিশ-বিমান-বাহিনী শান্তিরক্ষার্থ এখানে ইরাকের রাজার সাহায্য করিয়া থাকে।

বাবিলনের দক্ষিণে বাতায়নবিহীন আন্‌নাজাফ্ দণ্ডায়মান। এইখানে ভূগর্ভস্থ কক্ষে দস্যুতস্করদল পূর্ব্বে অবস্থান করিত। যাত্রীদিগকে লুণ্ঠন করিবার জন্য তাহারা এই নিভৃত দুর্গ মনোনীত করিয়া লইয়াছিল। এখন বাবিলনের স্বর্গোদ্যানের কাছ দিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে।

বাগদাদেও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। টাইগ্রিসের উপর নৌকার সেতু এখনও বিদ্যমান। হারুণ অল্ রসিদের মহিষী জোবেদীর সমাধি-স্তম্ভও এখনও আছে। কিন্তু বহু পরিবর্ত্তন তথায় ঘটিয়াছে। যে সকল স্থানে সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, এখন তথায় বড় বড় রাজপথ বাহির হইয়াছে। এখন কাফিখানার রেডিওযন্ত্রের শব্দে এবং মোটর বাসের
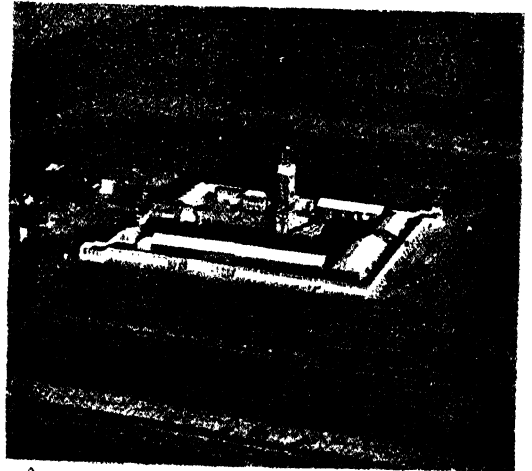
ইহুদীদিগের সুরক্ষিত কৃষিক্ষেত্র

শৃঙ্গধ্বনিতে মসজেদে নামাজের শব্দ চাপা পড়িয়া যায়। টাইগ্রিসের দক্ষিণে বসরা বন্দর। সিন্দাবাদ নাবিক এক

বাগদাদে আমেরিকার দূতাবাস

পুরাতন বাবিলন—ধ্বংসস্তূপে পরিণত

সময়ে এই বন্দরে আসিয়াছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর বসরা বন্দর দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছে। সকল জাতির ষ্টীমার এ যুগে এই বন্দরে আসিয়া থাকে।

বাগদাদের রেলপথ বসরায় আসিয়া শেষ হইয়াছে। বসরার খর্জ্জুরোদ্যান হইতে শতকরা ৮৫ ভাগ খর্জ্জুর সংগৃহীত হইয়া থাকে। নৌকাবোঝাই অশ্ব ভারতবর্ষে গমন করে। ইংলিশ, নেদারল্যাণ্ড এবং ফরাসীবিমান সমূহ বসরায় আগমন করে। এখানে বড় বড় হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে।

পারস্যের নূতন নাম ইরাণ। এখানে অশ্বারোহী, পোলো, কবিতা এবং সুগন্ধ দ্রব্যের প্রাচুর্য্য ইতিহাস-বিশ্রুত। অগ্নি-পূজকের স্থান বলিয়া পারস্য দেশের প্রসিদ্ধি আছে। তাহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক বিগ্রহেরও ইহা জন্মভূমি। এই দেশে উষ্ট্রপৃষ্ঠ ব্যতীত প্রবেশ করিবার উপায় পূর্ব্বে ছিল না। এখন চারিদিকে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। রেলপথ প্রস্তুত।

এখন আর এখানে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ নাই। বস্‌ভিয়ারী প্রভৃতি সম্প্রদায় অত্যন্ত কলহপ্রিয় ছিল। এখন তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে। তাহাদিগের নেতৃগণ নির্ব্বাসিত। বাকি সকলে এখন কায-কর্ম্ম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগে পারস্য ভাষায় চিঠিপত্র লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া বাধ্যতামূলক। বৈদেশিক অক্ষরে কিছুই লিখিবার উপায় নাই। দোকানের সাইনবোর্ড, হোটেল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নাম পারস্য ভাষায় লিখিতেই হইবে।

ইরাণের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ জাগ্রস্ পর্ব্বতমালার দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। সুস্-এর সন্নিহিত "মসজিদ-ই-সুলেমান" ক্ষেত্রসমূহ বিরাজিত। বাইবেলে বর্ণিত সুমাস এইখানেই অবস্থিত ছিল। সে-সময়ে এস্থার এখানকার অধিবাসী ছিলেন। এখন অ্যাংলো ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী এখানকার প্রাচীন জীবনধারার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে।

জলকূপ সমূহ হইতে রেলপথ করুণ নদী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে ষ্টীমার যোগে আহোয়াজ ও

আবাদানে যাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবাদান অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীগ্রাম ছিল। মৎস্য ও খর্জ্জুরসেবী অর্দ্ধবন্য আরবগণ তথায় বাস করিত। এখন এখানে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মদের ভাটী অবস্থিত। শত শত য়ুরোপীয় এখানে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বসবাস করেন। এখানে আমোদ-প্রমোদের সকল প্রকার আয়োজনই আছে।

সিরিয়ায় এখন ফরাসী-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। দামাস্কাস পথের সীমান্ত হইতে তারের বেড়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। জুপিটর, ভেনুস এবং ব্যাকসের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।

আধুনিক বালবেক সহরে স্থানীয় তরুণীরা তাহাদিগের কৃষ্ণতার নয়নের দৃষ্টি সুবেশ—সামরিক-পরিচ্ছদধারী ফরাসী তরুণ সৈনিকগণের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তরুণীদিগের পিতারা সিরীয় রাষ্ট্রনীতি লইয়া আলোচনা করিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সিরিয়ার উত্তরে নূতন তুর্ক সাধারণ-তন্ত্রশাসিত স্থান

গাজা যাইবার প্রাচীন পথে উষ্ট্রযূথ চলিয়াছে

দামাস্কাস্ অতি প্রাচীন সহর। এখানে যুগধর্ম্মের প্রভাব ব্যাপ্ত হইলেও দামাস্কাসবাসীরা প্রাচীনত্বের পক্ষপাতী।

লিটাসি উপত্যকাভূমিতে বালবেক বিদ্যমান। বালবেক কাহার রচিত তাহা কেহ জানে না। কবে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। আরবদিগের মধ্যে একটা কিংবদন্তী আছে যে, কেটন জেহোক দ্বারা অভিশপ্ত হইলে, তিনি উহা নির্ম্মাণ করেন।

গ্রীকরা পরবর্ত্তীকালে এখানে আসিয়া ইহাকে হেলিও-পলিস নামে অভিহিত করে। তার পর রোমানরা আসিয়া বিরাজিত। নূতন তুর্কী অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সিরিয়া ও তুর্কীর মধ্যে উৎকৃষ্ট রাজপথ সমূহ নির্ম্মিত হইয়া উভয়ের যোগসাধন করিয়াছে। আলেপ্পো বন্দর হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিলে লাটাকিয়া সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বে আনটিয়কের উহা বন্দর ছিল। ইহার ঠিক উত্তরে রাসসামারা। এইখানে প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ জগতের আদিমতম অক্ষরমালার উদ্ধারসাধন করিয়াছেন।

ভূমধ্যসাগরকে বেষ্টন করিয়া প্রাচীন বাণিজ্যপথ মিশর

পর্য্যন্ত গিয়াছে। অন্ততঃ ২ হাজার বৎসর ধরিয়া এই পথই বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই পথের ধারে ধর্ম্মযোদ্ধাদিগের নির্ম্মিত দুর্গ ও প্রাসাদসমূহ এখনও শৈলশিরে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ট্রিপলি এই পথেই পড়ে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ অশ্বারোহী সেনাদল ট্রিপলি অধিকার করে। তখন হইতেই ইহার জীবনস্পন্দন নূতন ভাবে চলিতেছে। পুরাতন ট্রিপলিতে আরবদিগের একটা বিখ্যাত পুস্তকাগার ছিল। সেণ্টগাইলসের, রেমণ্ড ধর্ম্মযুদ্ধের যুগে এই পুস্তকাগার পুড়াইয়া দেন।

পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক জীবন-যাত্রায় জয়লাভ করিতে হইলে শিক্ষা যে অত্যাবশ্যক, ইহা প্রাচ্যদেশবাসীরা বুঝিতে শিখিয়াছে। ভূস্বামিগণ ক্রমেই অবনতির পথে চলিয়াছে। দেশের লোক এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যাদি আরম্ভ করিয়াছে। অভিজাত-সম্প্রদায় এখনও তাহাতে অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই।

সাইডন বাইবেল যুগের একটি সহর। এখন সেই সহরে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

হাইফা প্যালেষ্টাইনের আধুনিক শ্রম-শিল্প-কেন্দ্র বলিলেই
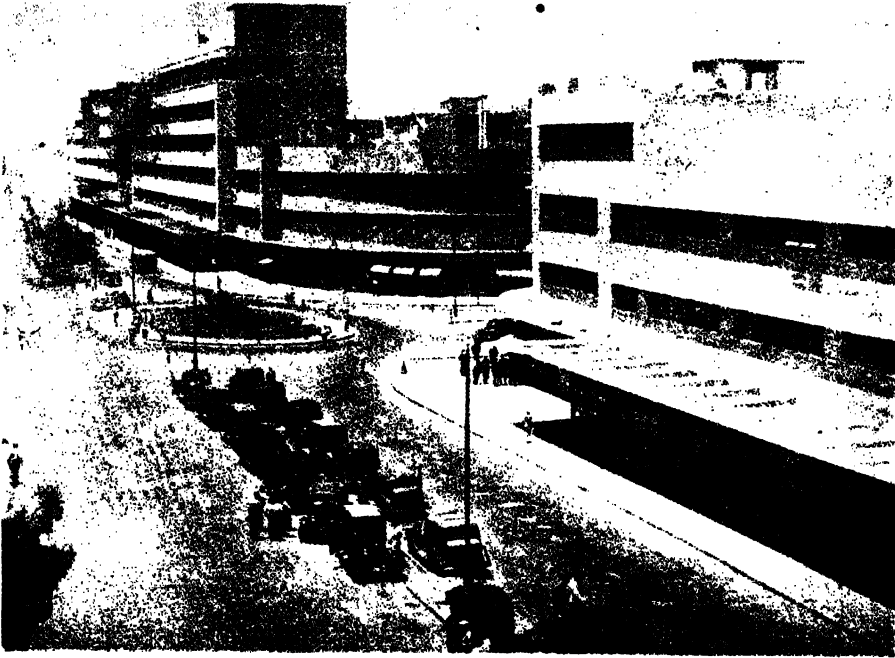
হাইফার বর্ত্তমান রাজপথ—৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই পথ ব্যবহৃত হইত

বেরুথ সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ও সম্পন্ন বন্দর। সেণ্টজর্জ্জ উপসাগরের উপর উহা অবস্থিত। কথিত আছে, সেণ্টজর্জ্জ ড্রাগনকে এইখানে বধ করেন। বেরুথ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। বেরুথে ৪৫টি বিভিন্ন দেশের ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতে আইসে।

প্রাচ্যদেশে এখন প্রতীচ্যের ভাবধারা এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, শিক্ষা, রাজনীতি সকল ব্যাপারেই অভূতপূর্ব্ব

চলে। এখানে বড় বড় ময়দার কল, চরুটিকার কারখানা, ধাতব দ্রব্যের বড় বড় দোকান দেখিতে পাওয়া যাইবে। অল্প দিনের মধ্যেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

বিশ্বযুদ্ধের পর যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ফলেই প্যালেষ্টাইনে বর্ত্তমান অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশের পররাষ্ট্রসচিব বালফুর ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনে জাতীয় বাসভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই আশ্বাসে নির্ভর করিয়া ইহুদীরা দলে দলে প্যালেষ্টাইনে বাস

রাজা সলোমনের সময়ের মেষপালক এ যুগেও বিদ্যমান

পুলিস-প্রহরীরা তৈল-খনির আস-পাশে চৌকী দিতেছে
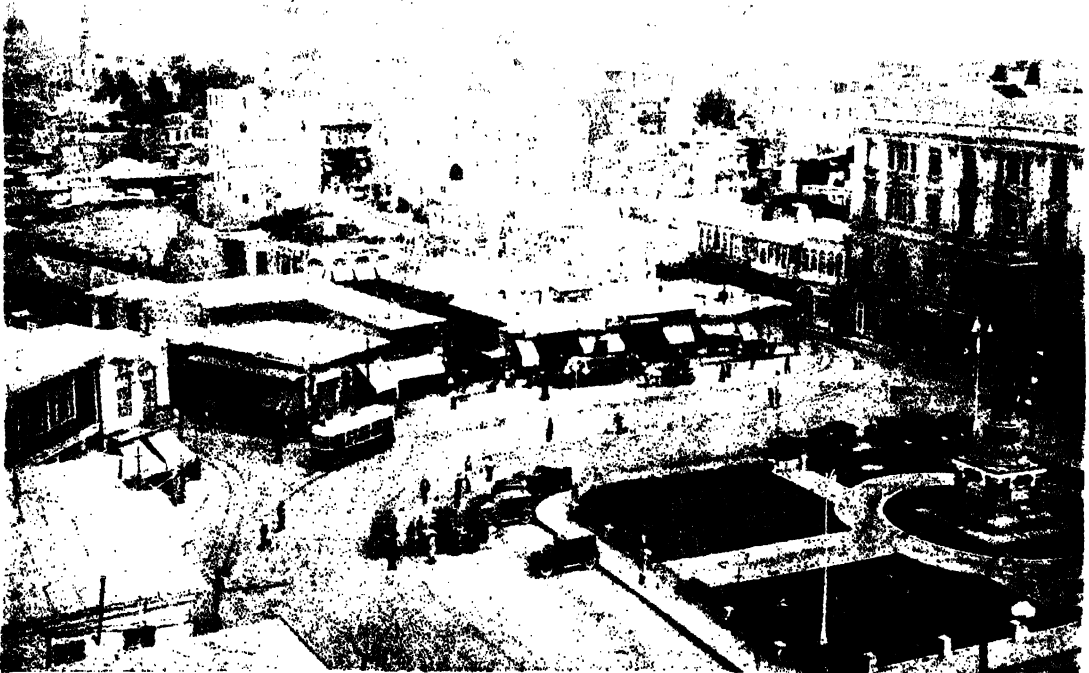
দামাস্কাস সহরের ব্যবসায়-কেন্দ্র

করিতে আগমন করে। জার্ম্মাণী হইতেই বেশীর ভাগ নর নারী এইখানে আশ্রয় লয়।

সমগ্র পৃথিবী হইতে ইহুদীরা যখন নূতন বাসভূমিতে দলে দলে আগমন করিতে থাকে, তখনই আরবগণ বিচলিত হইয়া প্রতিবাদে অগ্রসর হয়। প্রতিবাদ শেষে সংঘর্ষে পরিণত হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ-কমিশন প্যালেষ্টাইনে প্রেরিত হয়। কমিশন, সমগ্র স্থানটিকে আরব ও ইহুদী-দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। এই বিভাগের ফলে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী অধিকাংশ উর্ব্বরা ভূমি ইহুদীদিগের ভাগে পড়ে। ট্রান্স-জর্দ্দান ও বাকি অংশ আরবদিগের অংশে গিয়া পড়ে। মাঝখানে এক ফালি সরু ভূখণ্ড বৃটিশের অধিকারভুক্ত থাকে। সেই সরু ফালিটা জেরুজালেম হইতে জাফা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পবিত্র তীর্থস্থান ইংরেজের অধিকারেই থাকে। গ্যালিলী সমুদ্রের বন্দরও ইংরেজের অধিকারভুক্ত থাকে। আকোয়াবা উপসাগরের কর্ত্তৃত্বও ইংরেজ রাখেন।

টেল্-আভিবের পথে সাজোয়া গাড়ী চলিয়াছে

এই বিভাগে ইহুদী বা আরব কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। আরবরা প্রতিবাদ করে, এমন ভাবে দেশ বিভাগ করিলে তাহা তাহারা গ্রহণ করিবে না। ইহুদীরাও বলে যে, জেরুজালেমকে অধিকার করিবার কল্পনা তাহারা ২ হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। এখন যে ভাবে জমি ভাগ করা হইল, তাহাতে জেরুজালেমকে তাহারা জাতীয় রাজধানী করিতে পারিবে না। তৎপরিবর্ত্তে টেল্-আভিবকেই রাজধানী করিতে হইবে।

কার্ম্মেল পাহাড়ের উপর হাইফার কয়েক জন ধনী সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বহু দিন পূর্ব্বে তথায় কার্ম্মেলাইট ফাদাররা তাহাদিগের ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তাহারা আলোক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহাতে হাইফা বন্দরে আগমনকারী জলযানসমূহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই প্রাচীন পাহাড়ের উপর তাহা-দিগের ধর্ম্মপ্রচারক গুরু "বাব" সমাধি মন্দিরে নিদ্রাগত আছেন।

সেমারিয়া ধ্বংসস্তূপ অতিক্রম করিলে লিডিয়া বিমানবন্দরে আসা যায়। সেমারিয়ায় পলকে আগ্রিপার সম্মুখে বিচার করা হইয়াছিল। এই বিমানবন্দর হইতে বিমান-যোগে এথেন্স, রোম, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে গমন করা যায়।

অদূরে আজালন উপত্যকাভূমি। আরবরা তথায় গ্যাসোলিনচালিত ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি চাষ করিতেছে, দেখা যাইবে। এইখানে প্রাচীন কালে জসুয়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে নিশ্চল ভাবে থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রাচ্যদেশ ক্রমেই প্রতীচ্যভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, বাইবেল দেশ ভ্রমণ করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

হিটলার ও তাঁহার ভূতপূর্ব্ব উপরওয়ালা

একালের কূটরাজনীতি ক্ষেত্রে কাপ্তেন ফ্রিজ ওয়ায়েডম্যানের কাহিনী অতীব বিস্ময়োদ্দীপক, এবং ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় অদ্ভুত; কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য। ভাগ্যপরিবর্ত্তনের এই বিবরণ পাঠে সকলেই কৌতুক অনুভব করিবেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ফ্রিজ্ ওয়ায়েড্ম্যান উত্তর-ব্যাভেরিয়ার আগ্স্বার্গের সন্নিহিত কোন পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমরবিভাগে প্রবেশ করিয়া ১৬ নং ব্যাভেরীয় পদাতিক সৈন্যদলে স্থাপিত হইয়াছিলেন। এই সৈন্যদল ফ্ল্যাণ্ডার্সে 'ইটারনাল মড্' নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময় লেফ্টেনাণ্ট ফ্রিজ্ ওয়ায়েড্ম্যানের যে সকল আর্দ্দালী ছিল, ল্যান্স-কর্পোরাল (বর্শাধারী সৈনিক) এডল্ফ্ হিটলার তাহাদিগের অন্যতম।

এডল্ফ হিটলার ওয়ায়েডম্যানের সুদক্ষ আর্দ্দালী ছিল। সে তাঁহাকে সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার মস্ মস্ শব্দ করিতে করিতে তাঁহার জরুরি চিঠি-পত্র সহ সেলতোল্সের মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কার্য্যস্থলে গমন করিত, এবং যথাসময়ে তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া অভিবাদনান্তে চিঠি-পত্রের উত্তর প্রদান করিত; তাহার পর জুতার সেইরূপ শব্দ করিতে করিতে প্রস্থান করিত।

উচ্চপদস্থ লেফ্টেনাণ্ট এবং তাঁহার কারপরদাজ এই আর্দ্দালীর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল না। উভয়ের পদের যে ব্যবধান ছিল, তাহাতে বন্ধুত্বের কথা উঠিতেও পারিত না; কিন্তু সৈন্যদলকে যে সকল পরিখার (trenches) ভিতর কায করিতে হইত, সেখানে হিটলার তাহার এই উপরওয়ালাকে যে গভীর সম্মান প্রদর্শন করিত, তাহা তাহার মনের উপর প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সেই সম্মান মৌখিক নহে, আন্তরিক।

যুদ্ধ শেষ হইল। সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া গেল। কাপ্তেন এবং ল্যান্স-কর্পোরালকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কাপ্তেন ওয়ায়েডম্যান ব্যাভেরিয়াস্থ পৈতৃক ভিটায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার পারিবারিক ক্ষেত-খামারের কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অতঃপর বর্ষা নামিল; তাঁহার শস্যক্ষেত্রে ফসল পাকিল। সেই সময় তিনি তাঁহার তাঁবেদার ল্যান্স-কর্পোরাল এডল্ফ্ হিটলারের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব আর্দ্দালী মিউনিকে বাগ্মী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে! তাঁহার আর্দ্দালী অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তিতে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছে। কথাটা তিনি সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাহার পর তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সেই আর্দ্দালী বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব করিয়া ধরা পড়িয়াছে, এবং তাহার প্রতি কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। আর্দ্দালীর দুর্ম্মতির পরিচয় পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন।

তাঁহার ভূতপূর্ব্ব আর্দ্দালী বর্শাধারী সাধারণ সৈনিক যুবক বক্তৃতা-শক্তিতে দেশের লোক মাতাইয়া তুলিয়াছে, বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছে,—এ সকল ব্যাপার দুর্ব্বোধ্য রহস্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; এ সকল কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; অথচ ইহা সত্য, তিনি তাহারও প্রমাণ পাইলেন।

আরও কিছু কাল অতিবাহিত হইল; একদিন কাপ্তেন ফ্রিজ ওয়ায়েডম্যান শুনিতে পাইলেন, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব আর্দ্দালী এডল্ফ্ হিটলার জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার পদ লাভ করিয়াছে! তাঁহার মনে হইল, স্বপ্নও কি ইহা অপেক্ষা অসম্ভব হইতে পারে?

অবশেষে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রোয়েম ষড়যন্ত্রের পর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইলে এড্লফ হিটলার তাঁহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এরূপ একটি লোকও দেখিতে পাইলেন না, যাহাকে তিনি

হার হিটলার

অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু সেই সময় তাঁহার সেইরূপ এক জন বন্ধুর প্রয়োজন ছিল; এজন্য তিনি আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার বিশ্বাসের পাত্রের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কাপ্তেন ওয়ায়েড্ম্যান চ্যান্সেলারের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার ক্ষেত-খামার ভাড়া দিলেন, এবং জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া স্ত্রী-পুত্রাদি সহ বার্লিনে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বার্লিনে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্কটে পড়িতে হইল।

তাঁহাকে যে পদে নিযুক্ত করা হইল, তাহা সম্মানিত পদ নহে। তাঁহাকে এডজুট্যান্ট সেক্রেটারী-কম্প্যানিয়ন এডিকং নামক পার্শ্বচরের পদে নিযুক্ত করা হইল। পদটি সম্মানজনক না হইলেও দায়িত্বপূর্ণ।

ওয়ায়েডম্যান এবং হিটলারের পদমর্য্যাদা এখন পূর্ব্বের তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত। এক সময় যিনি উপরওয়ালা ছিলেন ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে তাঁহাকেই তাঁবেদার হইতে হইল। কাপ্তেনকেই এখন তাঁহার ভূতপূর্ব্ব আর্দ্দালীর আদেশে পরিচালিত হইতে হইল। ইহাতে তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে অদ্ভুত পরিণতি সঞ্চিত ছিল। ওয়ায়েডম্যান হিটলারের দূত বা দালালের পদে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার পদের কোন নাম ছিল না, এবং যে দায়িত্বভার তিনি প্রাপ্ত হইলেন, তাহার গুরুত্বেরও তুলনা ছিল না।

এই গুরুত্বের পরিমাণ বুঝিতে হইলে সেই সময় হিটলারের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার আলোচনার প্রয়োজন।

"বিভিন্ন দেশের অধিনায়কগণ আমার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহার সন্ধান লইয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত মনোভাব আমি জানিতে চাহি। ফ্রিজ তাহা স্বয়ং জানিয়া আসিয়া আমার গোচর করিতে পারেন, এজন্য আমি তাঁহাকে পাঠাইতে পারি না কি? ফ্রিজের সহিত পররাষ্ট্র বিভাগের, সমর বিভাগের অথবা অন্য কোন বিভাগের সম্বন্ধ নাই; তিনি ষোল আনাই আমার নিজের লোক। এ অবস্থায় আমি তাঁহাকে পাঠাইলে আমার উপদেশে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত করিতে পারিব।"

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া হার হিটলার ফ্রিজকে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে দেশান্তরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

ফ্রিজের আকৃতিতে লোকের চিত্তাকর্ষিণী শক্তি আছে; তাঁহার দেহ ছয় ফুট দীর্ঘ, মস্তকের কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে সীঁথি। তিনি বাক্‌চাতুর্য্যে ও সরস রসিকতায় অতি সহজে অপরিচিত ব্যক্তিকেও বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারেন। তাঁহার এই শক্তি বিধাতার দান।

রাজা জর্জ্জের অভিষেকোৎসব কালে হিটলার সুকৌশলে তাঁহার মারফৎ উৎসব-দরবারে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অভিষেকোৎসব কালে ফ্রিজ্‌ লণ্ডনে অবতরণ করিয়া উৎসব উপলক্ষে সমাগত জনতার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; কিন্তু কে কি কথা বলিতেছিল—সেই দিকে তাঁহার কাণ ছিল। উৎসবের পর তিনি বার্লিনে প্রত্যাগমন করিয়া, লণ্ডনে যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই হার হিটলারের গোচর করিয়াছিলেন। লণ্ডনস্থ জার্ম্মাণ-দূতের বিবৃতির উপর হিটলারের নির্ভর করিবার কথা; কিন্তু তাহা কত দূর নির্ভরযোগ্য, তাহা তিনি ফ্রিজের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছিলেন। লণ্ডনস্থ জার্ম্মাণ-দূত ফ্রিজকে জানিতেন না। ফ্রিজ নামক কোন ব্যক্তি হিটলারের প্রতিনিধি হইয়া অভিষেকোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, ইহাও তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই।

ফ্রিজ প্রদর্শনী সন্দর্শনের জন্য প্যারিসে উড়িয়া চলিলেন। তিনি স্মরণাগুলি দেখিয়া বেড়াইলেন, বিচিত্র পোষাকধারী ফরাসী তরুণের দলও তিনি দেখিলেন। তিনি সর্ব্বত্রই জীবন্ত ভাব লক্ষ্য করিলেন। তিনি সেখানে কি দেখিয়া আসিলেন, বার্লিনে ফিরিয়া তাহা তাঁহার মুরুব্বির গোচর করিলেন।

যখন এংগ্লো-আমেরিকান্‌ বাণিজ্যসম্বন্ধ-ঘটিত আলোচনা চলিতেছিল, ফ্রিজ তখনও আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার কর্ণ সজাগ ভাবে প্রত্যেক কথাটি আহরণ করিয়াছিল। সংবাদ রটিয়াছিল, তিনি রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সংবাদ সরকারী ভাবে সমর্থিত হয় নাই।

ফ্রিজের দৌত্যকার্য্যে হিটলার নিঃসন্দেহে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। কারণ, এই কার্য্যে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল।

ইডেনের পদত্যাগে বৃটিশ-মন্ত্রণাসভায় যখন মতদ্বৈধ লক্ষিত হইয়াছিল, সেই সময় কাপ্তেন ওয়ায়েডম্যান পুনর্ব্বার বৃটেনে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রণাসভার সকল রহস্য অবগত হইয়াছিলেন, এবং তাহা হিটলারের গোচর করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি যে কার্য্যের ভার লইয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব ভার বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ, এই সরলপ্রকৃতি ব্যাভেরীয় কৃষক বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফাক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কূটরাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার ভার পাইয়াছিলেন।

এই সাক্ষাতের ফল অতীব সন্তোষজনক হইয়াছিল। হিটলার বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে ভজাইবার জন্য দুই বার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম বার তিনি ভন রিবেনট্রপকে এই চেষ্টায় সাফল্য লাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভন রিবেনট্রপ দারুণ বৃটিশবিরোধী ছিলেন, এ জন্য তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। অবশেষে ওয়ায়েডম্যানের দৌত্য সফল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে অনভ্যস্ত হইলেও তাঁহার কার্য্যে নৈপুণ্যের অভাব লক্ষিত হয় নাই। তিনি একদিন প্রভাতে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বেল্‌গ্রেভিয়ার বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মতের মিল হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই কৃষিকর্ম্মানুরাগী বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহাদের মতের মিল হইয়াছিল; কোন কোন বৃটিশ-রাজনীতিক রহস্যচ্ছলে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কাপ্তেন ওয়ায়েডম্যান লর্ড হ্যালিফাক্সের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই হিটলারের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, কি, যে কথাগুলি হিটলারের প্রীতিকর হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কেবল তাহাই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া অন্যান্য কথা গোপন করিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার এই দৌত্যকার্য্যের কি ফল হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ইহার অব্যবহিত পরেই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন গগন-পথে বার্লিনে যাত্রা করিয়াছিলেন।

শ্যামের তরুণ রাজা আনন্দ

শ্যামের বালক রাজা আনন্দ মহীদল তিন বৎসর পূর্ব্বে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে অবস্থিতি কালে, শ্যামের রাজসিংহাসনের অধিকারী বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বহুদিন হইতে সুদূর

প্রবাসে বাস করায় শ্যাম দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর মনে তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল যে, তাহাদের বালক রাজা আনন্দ কি সুদূর প্রবাসে সত্যই জীবিত আছেন? যদি তিনি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে রাজ্যলাভ করিয়া এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে একবারও স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন না, ইহার কারণ কি?

ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক রাজা আনন্দ তাঁহার বিধবা জননীর সহিত কয়েক বৎসর যাবৎ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যে উদ্যান-ভবনে বাস করিতেছিলেন, সেই ভবনের নাম 'লাউসেন ভিলা'। চতুর্ব্বিংশ স্বর্ণছত্রের অধিকারী, জোয়ার-ভাটার সর্ব্বপ্রধান পরিচালক প্রভৃতি বহু খেতাবধারী রাজা আনন্দ 'লাউসেন ভিলা' হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া গত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে সশরীরে স্বদেশ-প্রত্যাগমনে তাঁহার ১ কোটি ৪৫ লক্ষ প্রজার নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তিনি সত্যই জীবিত আছেন। তাঁহার যে সকল প্রজা তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছিল, তাহাদের সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে।

রাজা আনন্দ মহীদল

রাজা আনন্দ তাঁহার মাতাকেও সঙ্গে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। তিনি যে সকল খেলানা লইয়া আসিয়াছেন, তাহার মধ্যে তোরঙ্গপূর্ণ খেলিবার রেল-ট্রেণ উল্লেখযোগ্য।
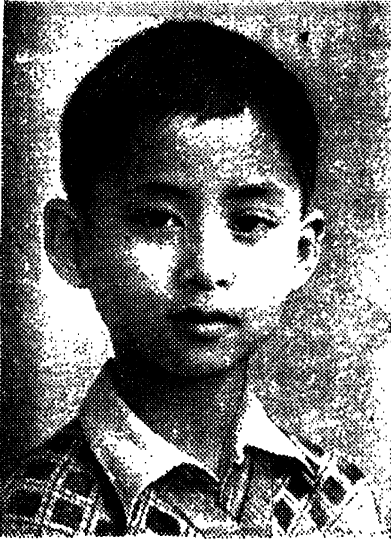
ভূতপূর্ব্ব শ্যামরাজ প্রজাধিপক গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আনন্দের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের প্রধান কারণ, রাজ্যের শাসন-ভার বহন করিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়াছিলেন। আনন্দ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, উপর্য্যুপরি দুই বার তাঁহাকে সুইট্‌জারল্যাণ্ড হইতে স্বদেশে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু প্রথমবার তাঁহার স্বদেশযাত্রার অল্পকাল পূর্ব্বে শ্যাম দেশের সমর বিভাগের মুষ্টিমেয় কর্ম্মচারী বিদ্রোহ ঘোষণা করায়, সেই সময় তাঁহার স্বদেশযাত্রা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। দ্বিতীয় বার আনন্দের স্বদেশযাত্রার আয়োজন শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার জননী তাঁহার স্বদেশযাত্রার প্রতিকূলে এই আপত্তি উত্থাপিত করেন যে, তাঁহার বালক পুত্রের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের পর তাঁহাকে রাজবিধি অনুসারে যে সকল আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে; এ অবস্থায় তাঁহার স্বদেশযাত্রার ব্যবস্থা বাতিল করা কর্ত্তব্য। রাজমাতার এই আপত্তি গ্রাহ্য করিতে হইয়াছিল। এই ভাবে দুই বারই তাঁহার স্বদেশযাত্রার আয়োজন রহিত হইয়াছিল।

শ্যাম রাজ্যের জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ এক বাক্যে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছিলেন যে, রাজা আনন্দের আরও কিছুকাল সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বাস করা উচিত; কিন্তু রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য গঠিত শাসনপরিষদ এই নির্দ্দেশ প্রদান করেন যে, বালক রাজার অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনে নানা প্রকার বিভ্রাট ঘটিতে পারে, অতএব রাজা আনন্দের স্বদেশে প্রত্যাগমন প্রার্থনীয়। আনন্দের পিতৃব্য ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক এখন 'সুখোদয়ের রাজকুমার' নামে পরিচিত; ইংলণ্ডের সরে জিলায় তিনি হ্যাংমুর নামক স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তিনি সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও শ্যামের রাজকার্য্যে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তিনিও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা আনন্দের স্বদেশযাত্রার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু শ্যাম রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কট দেখা দিল—যখন এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজ্যে এই মর্ম্মে এক প্রবল জনরব প্রচারিত হইল যে, শ্যামের বালক রাজা সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে খৃষ্টানভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছেন; এ অবস্থায় বুদ্ধের আত্মা তাঁহার দেহে প্রবেশের সুযোগে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু রাজার পক্ষে ইহা অমার্জ্জনীয় ত্রুটি এবং ইহা সর্ব্বথা পরিহারযোগ্য; কিন্তু রাজমাতা পুনর্ব্বার আনন্দের স্বদেশযাত্রার প্রস্তাবে বাধা দান করিলেন।

অবশেষে রাজ্যের শাসনপরিষদ রাজার স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য পীড়াপীড়ি করায় অগত্যা রাজমাতাকে সম্মতি প্রদান করিতে হইয়াছে। আনন্দ গত নভেম্বরের শেষভাগে শ্যামের রাজধানীতে উপনীত হওয়ায় রাজ্যে আনন্দোৎসব হইয়াছিল, এবং মহাসমারোহে অভিষেকসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইয়াছিল।

আনন্দের বয়স ২০ বৎসর না হইলে তিনি স্বাধীন ভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে পারিবেন না; সুতরাং রাজ্যের শাসন-পরিষদের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার ন্যস্ত করিয়া আনন্দ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে য়ুরোপে প্রত্যাগমন করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে। বুদ্ধের আত্মা তাঁহার দেহে প্রবেশ করিলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব তাঁহাকে আর বিচলিত করিতে পারিবে না; বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।

—

উইণ্ডসর-চেম্বারলেন বার্ত্তা

গত নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এক দিন রাত্রিকালে উইণ্ডসরের ডিউক এডওয়ার্ড (ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা) প্যারিসের রু-ড্য-রিভোলি নামক রাজপথে অবস্থিত মরিস-হোটেলের একটি সুসজ্জিত কক্ষে অধীর ভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন; চিন্তাভারে তাঁহার ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত। এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে তিনি কোন পদস্থ দর্শকের অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অথচ তখন পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তির দেখা নাই!

একে রাত্রিকাল, তাহার উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; তখন অশ্রান্ত বেগে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছিল। প্রমোদ-পুরী প্যারিস

অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ; সৌধশ্রেণী তাহাদের প্রশস্ত বাতায়নগুলি পুরু পর্দায় আবৃত করিয়া মৌন ভাবে সেই অশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় স্নাত হইতেছিল।

অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও ডিউক গল্‌ফ খেলিতে গিয়াছিলে', কিন্তু ক্রীড়া-শেষে তিনি কোন বিশিষ্ট পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের জন্য তাড়াতাড়ি হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সিংহাসন-ত্যাগের পর তিনি সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শুনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সহিত আর এক দিনও সাক্ষাতের

এডওয়ার্ড প্রধান মন্ত্রীকে মরিস-হোটেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নেভিল চেম্বারলেন এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, সেই দিন সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটের সময় মরিস-হোটেলে উপস্থিত হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট করেন।

প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মরিস-হোটেলে উপস্থিত হইবেন, এই আশায় উইণ্ডসরের ডিউক এডওয়ার্ড যখন সেণ্ট জার্ম্মেনের ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে তাড়াতাড়ি হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় চেম্বারলেন কোয়াই-ডি-অর্শে এডুওয়ার্ড
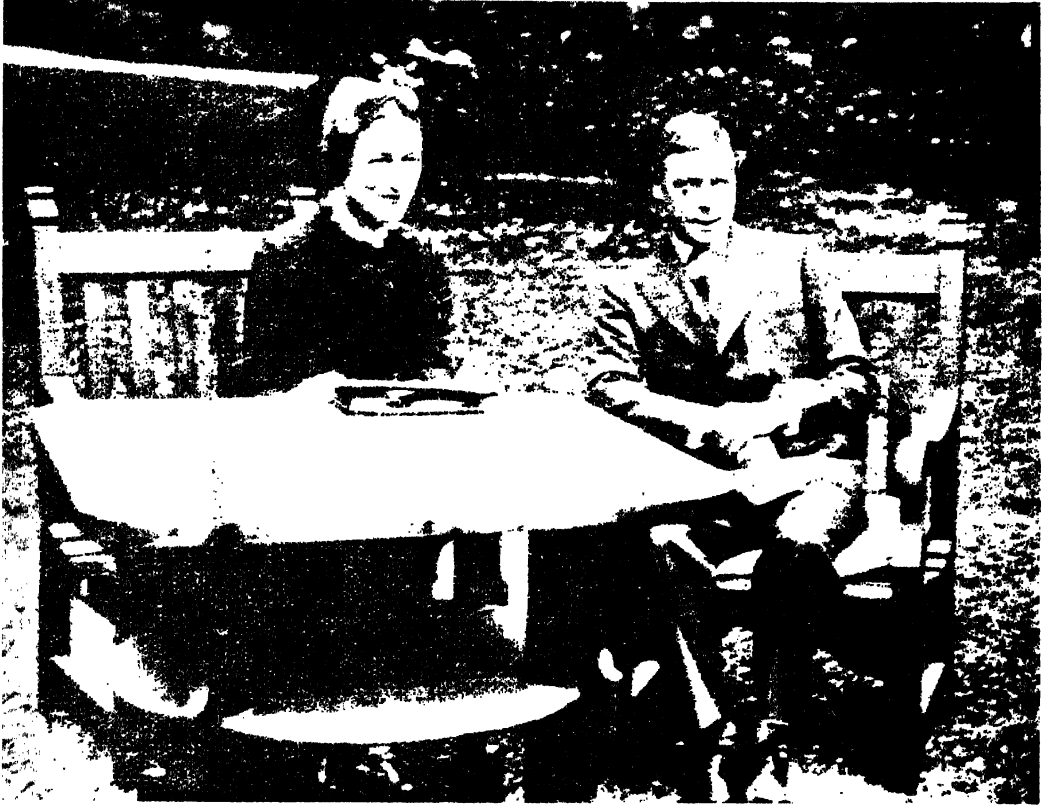
ডিউক ও ডাচেস অব উইণ্ডসর (ভূতপূর্ব্ব রাজা এডওয়ার্ড ও তাঁহার পত্নী)

সুযোগ লাভ করেন নাই। এই ব্যক্তি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী আর্থার নেভিল চেম্বারলেন।

এডওয়ার্ডের সিংহাসন-ত্যাগের পূর্ব্বে চেম্বারলেনের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল। আমরা যে দিনের কথার আলোচনা করিতেছি, সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা পরস্পরের নিকট কার্ড প্রেরণ করিয়া সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ চেম্বারলেন বৃটিশ-দূতাবাস হইতে পত্র-বাহক মারফৎ তাঁহার কার্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এডওয়ার্ড তাঁহার কোন অশ্বরক্ষক মারফৎ কার্ড পাঠাইয়াছিলেন।

এই ভাবে কার্ড-বিনিময়ের অল্প কাল পরে টেলিফোন-যোগে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই সাক্ষাতের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

ভিলাডিয়ার, জর্জ্জেস্ বনেট এবং ভাইকাউণ্ট হ্যালিফাক্সের সহিত পরামর্শে রত ছিলেন।

এই ঘটনার এক ঘণ্টা পরে প্রধান মন্ত্রীকে হোটেল-ডি-ভিলাতে তাঁহার অভ্যর্থনা-সভায় যোগদান করিতে হইয়াছিল। সেই সময় তিনি ডিউক এডওয়ার্ডের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে জানাইলেন, সম্ভবতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের আরও আধ ঘণ্টা পরে তিনি হোটেল মরিসে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

কিন্তু ৬-৩০ মিনিটের সময়েও নেভিল চেম্বারলেন হোটেল-ডি-ভিলায় উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইলেন ; কিন্তু তখনও তাঁহার আর একটি অভ্যর্থনা সভায় যোগদানের কথা ছিল। প্যারিসের সাংবাদিকগণ কোয়াই-ডি-অর্শে তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন

করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার গমনে বাধার কথা জানাইয়া তিনি পুনর্ব্বার ডিউকের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর এডওয়ার্ড যখন ডিনারের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন তখন রাত্রি ৭টা ২০ মিনিট; হঠাৎ টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ চেম্বারলেন টেলিফোনে সাড়া দিলেন; তিনি জানাইলেন—ভাইকাউণ্ট হ্যালিফ্যাক্স সহ তিনি হোটেল-মরিসে যাত্রা করিলেন।

অতঃপর এডওয়ার্ড উইণ্ডসর সে কালের মতই হাসিমুখে দর্শকদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নেভিল চেম্বারলেন অন্য সকলের ন্যায় বুঝিতে পারিলেন—ভূতপূর্ব্ব রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর হইয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববৎ বালকসুলভ প্রফুল্লতার যথেষ্ট অভাব হইয়াছে।

এডওয়ার্ড প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-সচিবকে তাঁহার পত্নীর সহিত পরিচিত করিলেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, "হার রয়াল হাইনেস্—দি ডচেস্ অফ উইণ্ডসর।"

নেভিল চেম্বারলেন নতমস্তকে অভিবাদন করিবার পূর্ব্বেই ডচেস্ অফ উইণ্ডসর অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে হাসিয়া, সরল আমেরিকান বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার করমর্দ্দনের জন্য শুভ্র হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন। অতঃপর নেভিল চেম্বারলেন নতমস্তকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু মস্তক অধিক নত করিলেন না।

ডিউক অফ উইণ্ডসরের স্ত্রীর সহিত তিনি এই সর্ব্বপ্রথম মামুলী প্রথায় পরিচিত হইলেন। এই মহিলা যে সময় লণ্ডনে 'মিসেস্ সিম্‌সন্' নামে অভিহিতা হইতেন, সেই সময় নেভিল চেম্বারলেনকে কোন দিন তাঁহার সহিত যথাবিহিত ভাবে পরিচিত করা হয় নাই।

হ্যালিফ্যাক্স

মিষ্টার চেম্বারলেন

অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রধান মন্ত্রী কি তাঁহাকে রাজকীয় ভাবে অভিনন্দিত করিবার জন্যই "গুড ইভ্‌নিং, মা'ম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন? রিপোর্টারগণ বলেন, তিনি ঐরূপই করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের কথোপকথন ২৫ মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ডচেসের সহিত ডিউকের ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন প্রসঙ্গে তাঁহাদের আলোচনা চলিয়াছিল!

'শান্তিস্রষ্টা' চেম্বারলেন ডিউককে না কি বলিয়াছিলেন, "আপনি শীঘ্র দেশে ফিরিলে কোন রাজনৈতিক বাধা উপস্থিত হইবে না।"

বস্তুতঃ, রাজা ও ডিউকের সম্বন্ধ এরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল যে, রাজা জর্জ্জ ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই একটি ঘোষণা-পত্র প্রচারে সম্মতি প্রকাশ করেন; তাহাতে বর্ণিত হইয়াছিল, "গত রাত্রে, রাজা বাকিংহাম প্রাসাদে প্রধান মন্ত্রীকে দর্শন দান করিলে, প্রধান মন্ত্রী তাঁহার প্যারিস-দর্শনের বিবরণ বর্ণনা করেন এবং ডিউক অফ উইণ্ডসরের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের কাহিনী বিবৃত করেন।"

এই রাজকীয় ঘোষণায় ডচেস্ অফ উইণ্ডসরের কোন [illegible] না থাকা লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে! কেহ কেহ এরূপও ব[illegible] ছিলেন যে, বড় দিনের সময় রাজ-পরিবারের পুনর্ম্মিলন উপ[illegible] ডিউক এডওয়ার্ড ও তাঁহার পত্নী সান্‌ড্রিংহামে উপস্থিত হই[illegible] পারেন; কিন্তু এ কথার উত্তরে রাজদরবার হইতে পূর্ণ অসম্ম[illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাকাপাকি ভাবে স্থির না হইলেও এরূপ একটি প্রস্তাব উ[illegible]পিত হইয়াছে যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ডিউক কয়েক জন পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে একাকী ইংলণ্ডে আসিতে পারেন। কিন্তু এডওয়ার্ডের মোসাহেবের দল সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ডচেস্‌কে যদি 'হার রয়াল হাইনেস্' খেতাব প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে ডিউক স্বদেশে আসিয়া বাস করিতে সম্মত হইবেন, তাহার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু ডিউক এডওয়ার্ড সস্ত্রীক স্বদেশে আসিয়া বাস করিবেন, এই আশায় তাঁহার পত্নীকে 'হার রয়াল হাইনেস্" খেতাব দানে সম্মানিত করা হইবে, আপাততঃ তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

সংপ্রতি ডিউক ও তাঁহার পত্নী প্রবাসে নিস্তব্ধ ভাবে কাল-যাপন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে রেস্তোরাঁ ও নৈশ-ক্লাব-সমূহে পূর্ব্বের ন্যায় ঘন ঘন উপস্থিত হইতে দেখা যাইতেছে না। এখন প্রায় প্রতি রাত্রিতেই তাঁহারা নিজের ঘরে নৈশভোজন শেষ করিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন, এবং রাত্রি গভীর হইবার পূর্ব্বেই শয্যা গ্রহণ করেন।

পরের সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের রাজদরবার হইতে ডচেস্‌কে 'হার গ্রেস্' অভিধায় সম্মানিত করা হইলেও 'হার রয়াল হাইনেস্' খেতাবে তাঁহাকে অভিহিত করা হইবে না এরূপ স্থির হওয়ায় ডিউক এডওয়ার্ড তাঁহাকে ইংলণ্ডে আনিবেন না, তিনি স্বয়ংও আসিবেন না। তাঁহার জননীর আগ্রহও তিনি পূর্ণ করিবেন না।

জার্ম্মাণীতে 'হাটুরে'র হাতে শাসন-ভার

জার্ম্মাণীতে যাহারা 'Street mobs' নামে অভিহিত, তাহাদিগকে 'হাটুরে' বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান ভাগ্য-বিধাতা এডল্‌ফ হিটলার এই সকল 'হাটুরে'র স্কন্ধে আরোহণ করিয়া জার্ম্মাণীর অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি সেই সকল 'হাটুরে'কে দলবদ্ধ করিয়া যে সৈন্যদল গঠন করেন, তাহারাই এখন তাঁহার 'তুফান-বাহিনী' (Storm-troop army) নামে পরিচিত। এই উচ্ছৃঙ্খল জনতা যোগ্য অধিনায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাঁহাকে সমুচ্চ বেদী হইতে অপসারিত করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, ইহা গত নবেম্বরের মধ্যভাগে তাহাদিগের অনুষ্ঠিত পৈশাচিক আচরণে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কারণ, এই সময় যুবক গুণ্ডার দল তুফান-বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া যে সকল অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই প্রকার অনাচার বর্ত্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর কোনও সভ্য দেশে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

তাহাদিগের এই প্রকার বর্ব্বর আচরণে সমগ্র সভ্য জগতে এরূপ ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল যে, জার্ম্মাণীর 'প্রোপাগাণ্ডা-সচিব' পল জোসেফ গোয়েবল্‌স গুণ্ডাদলের ভীষণ গুণ্ডামীতে বিচলিত হইয়া প্রত্যেক বৈদেশিক সংবাদদাতাকে বার্লিনে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং গুণ্ডাগুলার ব্যবহারে বিব্রত হইয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চেষ্টাকে তাঁহারই ন্যায় 'এক পেয়ে' অর্থাৎ খোঁড়া বলা যাইতে পারে। তিনি বিদেশী সাংবাদিকগণের নিকট প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণীর অধিনায়কগণ য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কড়া শাসনকর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইলেও তাঁহাদিগের স্বদেশীয় গুণ্ডাগুলাকে সংযত করা তাঁহাদের অসাধ্য হইয়াছিল।

পাঁচ লক্ষ ইহুদী এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল যে, হার্শেল গ্রিনজ্‌পান নামক ১৭ বৎসর বয়স্ক যে পোলিস ইহুদীর গুলী-বর্ষণে নাজী দূত সেক্রেটারী এডুয়ার্ড ভন রাথকে নিহত হইতে হইয়াছিল, তাহার যেন প্রাণদণ্ড না হয়। যে সময় হাসপাতালে ভন রাথের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়, সেই সময় হইতেই জার্ম্মাণীর ইতর গুণ্ডার দল প্রতিহিংসা-সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, "সর্দ্দার, সর্দ্দার, ইহুদীগুলার অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" নাজী গোঁয়ারগুলা ইহুদী পল্লী আক্রমণ করিল, ইহুদী-ভজনালয়গুলি (Synagogues) আগুন ধরাইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত করিল, ইহুদীদের দোকানগুলি লুঠ করিল; তাহার পর ইহুদী গৃহস্থগণের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহা চূর্ণ করিল। অধিকাংশ জার্ম্মাণ সেই পথ অতিক্রম করিবার সময় এই সকল বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াও দেখিল না। যাহারা 'আর্য্য' নামে পরিচিত, তাহাদের কেহ কেহ ক্ষুব্ধচিত্তে এই প্রকার পৈশাচিক আচরণের প্রতিবাদ করায় গুণ্ডার দল তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বার্লিন, ভিয়েনা, এবং অন্যান্য জার্ম্মাণ নগরস্থিত ইহুদী-ভজনালয়গুলি, এমন কি, মিউনিকের শেষ উপাসনালয়টিও ভস্মীভূত হইল। ইহুদী ভজনালয়গুলির সন্নিহিত যে সকল আর্য্যভবন সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল, তাহা অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 'ফায়ার-ব্রিগেডে'র দমকল হইতে জলপ্রবাহ নিঃসারিত হইল বটে, কিন্তু সেই জলে ইহুদী-ভজনালয়ের অগ্নিরাশি নির্ব্বাপণের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করা হইল না; 'ফায়ার-ব্রিগেডে'র দল অদূরে দাঁড়াইয়া হুতাশনের ধ্বংসলীলা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আততায়ীগণের অনুষ্ঠিত অপকর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য গোয়েবল্‌সের 'এংগ্রিফ' নামক পত্রিকায় কতকগুলি পথের নাম প্রকাশিত হইল; এই সকল পথের ধারে নগরের অধিকাংশ ইহুদী বাস করিত।

ভিয়েনা এবং অন্যান্য অষ্ট্রীয় নগরে ইহুদীদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দোকান বহুমূল্য পণ্য-সম্ভারে পূর্ণ ছিল। সেই সকল দোকান বিধ্বস্ত করিবার পূর্ব্বে 'তুফান-বাহিনী'র সৈন্যগণ প্রত্যেক দোকানের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। দোকানগুলি কেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে বাধা-দান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা লৌহদণ্ডের আঘাতে দোকানগুলির দ্বার জানালা চূর্ণ করিয়া রাজপথে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; তাহার পর প্রত্যেক দোকানের মূল্যবান পণ্যদ্রব্য—জহরতের অলঙ্কার, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই রাজপথে সমাগত গুণ্ডাগণকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইল। বড়দিনের উৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য নৈশ অন্ধকারে এই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্য নাজীগণের অন্তঃপুরে নীত হইল।

বার্লিনের পূর্ব্ব-পল্লীতে দুই জন ইহুদীকে উন্মত্তপ্রায় জনতা 'লিঞ্চ' করিয়া হত্যা করিল। ইহুদীগণের একটি ভজনালয়ের রক্ষী ভজনালয়ের অগ্নিতে জীবন্ত ভস্মীভূত হইল। ডর্টমণ্ডের একজন রুমানীয় ইহুদীকে আড়াই মাইল পথ বুকে হাঁটিতে বাধ্য করা হইল; তাহার গতি মন্থর হইবামাত্র তাহার পৃষ্ঠে সবেগে লাঠী পড়িতে লাগিল।

ভিয়েনা নগরে নাজীরা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সহ প্রত্যেক ইহুদীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ৬০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ ইহুদীগণকে গ্রেপ্তার করিতে লাগিল। এই ভাবে নাজীরা ১০ হাজার ইহুদীকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়; পরে এই দলের ৬ হাজার ইহুদীকে মুক্তি দান করা হয়। অবশিষ্ট ৪ হাজার ইহুদীকে 'কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে' প্রেরণের জন্য আটক করিয়া রাখা হয়। এই সকল 'কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প' এরূপ ভয়াবহ স্থান যে, গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে বুচেনওয়াল্‌ডির ক্যাম্পে ১৪৭ জন বন্দীকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। নাজীরা গৃহকর্ত্তাকে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে কি উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতেছিল, তাহা বুঝিতে না পারায় বালক-বালিকাগণের মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। প্রত্যেক ইহুদীগৃহের নিত্য ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্য ঘরের বাহিরে আনিয়া চূর্ণ করা হইয়াছিল। ২২ জন ইহুদী কন্‌সেন্‌ট্রেসন ক্যাম্পে নাজীদের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল।

মিউনিক নগরে চারি শত পুরুষ ও সাত জন ইহুদী নারীকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৪ ঘণ্টা মধ্যে তাহাদিগকে নগর ত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে এই মর্ম্মে একরারনামায় স্বাক্ষর করিতে হয় যে, তাহারা বিনা প্রতিবাদে জার্ম্মাণী ত্যাগ করিবে। সেই সময় তাহাদিগকে 'পাসপোর্টে' বঞ্চিত করা হয়। এই দলের দুই জন ধনাঢ্য ব্যাঙ্কার ক্রেমার ও তাঁহার স্ত্রী আত্মহত্যা

করিয়া এই লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। পরে দলস্থ অন্য সকলকে জ্ঞাপন করা হয়, তাঁহাদিগকে দেশত্যাগের জন্য যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে, সেই আদেশের উদ্দেশ্য ভয়প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু নগরের প্রত্যেক দোকানে এই আদেশ প্রচারিত হয় যে, তাহারা ইহুদীগণের নিকট কোন প্রকার খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। যে সকল বৈদেশিক সাংবাদিক বিধ্বস্ত ইহুদী ভবনসমূহের ধ্বংসস্তূপের চিত্রসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্যামেরাগুলি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রগণও এরূপ অশিষ্ট যে, নাজীরা প্রবীণ ইহুদীগণকে ভীষণ ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া তাহারা আনন্দে করতালি প্রদান করিতেছিল!

এই ভাবে ইহুদী-দলন করিয়াও নাজী সরকারের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই! একটি অর্দ্ধোন্মত্ত পোলিস ইহুদী যুবকের অপরাধের জন্য জার্ম্মাণীর ফীল্ড মার্শাল হার্ম্মান গোয়েরিং পাঁচ লক্ষ জার্ম্মাণ ইহুদীর প্রতি যে অর্থদণ্ডের বিধান করিলেন, তাহার পরিমাণ ৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড! গত বৎসর বসন্ত কালে, জার্ম্মাণীর ইহুদীগণের সমগ্র সম্পত্তির মোট মূল্যের পরিমাণ কত, তাহা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৬৬ কোটি পাউণ্ড বলিয়া প্রকাশ করেন; তদনুসারে সমগ্র সম্পত্তির মূল্যের অষ্টমাংশ অর্থদণ্ড করা হয়। কিন্তু ইহুদীরা সেই সময় তাঁহাদের সমগ্র সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক টাকার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মোট সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য জরিমানার টাকা অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অধিক ছিল না।

জার্ম্মাণীর ইহুদীগণের প্রতি এই সকল অত্যাচারের উপর তাঁহাদিগের সকল ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের সম্পত্তির যে ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা কোম্পানীতে তাঁহাদিগের দাবী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। নাজীরা ইহুদীদিগের দোকানসমূহ লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগের যে ক্ষতি করিয়াছে, জার্ম্মাণীর ইহুদীদিগকেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। ইহুদীদিগের কয়েকখানি প্রধান সংবাদপত্রের প্রচারও রহিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ইহুদীগণকে নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে বাস করিতে হইবে, অন্য সকল পল্লীতে তাহাদিগের বাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহাদিগের যে কয়েকখানি দোকান এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে ইহুদী ভিন্ন অন্য কেহ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে না। সাধারণ রাজকার্য্যে তাহাদের আর প্রবেশাধিকার রহিল না। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণীতে ইহুদী-নির্য্যাতন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে; সমগ্র পৃথিবীতে এই অত্যাচারের তুলনা নাই!

য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের 'তস্কর'-খ্যাতি

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের ওয়াসিংটন নগরে এই মর্ম্মে নব-শক্তি সন্ধি (the Nine Power Treaty) স্বাক্ষরিত হইয়াছিল যে, অতঃপর সকল জাতিই চীন দেশে বাণিজ্য (লুণ্ঠন?) করিবার সমান সুযোগ লাভ করিবে। কিন্তু এত দিন পরে দর্পোদ্ধত জাপান চীন দেশে যে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, তাহার বলে সে শ্বেতাঙ্গ জাতি সমূহের এই অধিকার বাতিল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাপানের নবনিযুক্ত পররাষ্ট্র-সচিব হাচিরো আরিতা মার্কিণ যুক্তরাজ্যের দূত যোসেফ গ্রিউকে, এবং বৃটিশ দূত সার রবার্ট ক্রেজিকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, জাপান-সরকার ১৯১২ খৃষ্টাব্দের 'নব-শক্তি সন্ধি' অচল বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে জাপানী সংবাদপত্রসমূহ বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাজ্যকে ক্রমাগত শুনাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে চীনের 'মুক্ত-দ্বার' রুদ্ধ (Door Slammed) হইয়া গিয়াছে; অতঃপর বাণিজ্য-ব্যপদেশে চীন দেশে দন্তস্ফুট করিবার সুযোগে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল। পররাষ্ট্র-সচিব আরিতা জাপানের সুমিষ্ট সিদ্ধান্ত এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, চীন দেশে অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের কর্ম্মপন্থা চীন দেশ-রক্ষার, এবং স্বায়ত্ত-শাসন ব্যাপারে আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে, অর্থাৎ অন্যান্য বৈদেশিক শক্তিকে চীন দেশে বাণিজ্য করিতে দেওয়া যাইবে কি না জাপানই তাহা স্থির করিবেন; জাপান এ বিষয়ে অন্য কোন শক্তির মোড়লী সহ্য করিবেন না।

জাপানী পররাষ্ট্র-সচিব আরিতার মন্তব্য শ্রবণ করিয়া মার্কিণ দূত মিঃ গ্রিউ ধীরভাবে তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন—আমেরিকা উক্ত সন্ধির পরিবর্ত্তনের বা তাহা রহিত করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বৃটিশ দূত সার রবার্ট ক্রেজি এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া জাপানী পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। জাপানী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আরিতা সার রবার্টের নিকট কতকগুলি রিপোর্ট পেশ করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—বৃটিশ সরকার জাপানের প্রতিকূলে চিয়াং কাইসেকের সরকারকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন; এ অবস্থায় বৃটিশ সরকার চীন দেশে কোন প্রকার সুবিধা পাইতে পারেন না, অর্থাৎ অতঃপর জাপান চীন দেশে বৃটিশ সরকারকে আমোল দিতে প্রস্তুত নহেন। বিজয়ীর অধিকারে তাঁহারা এই আদেশ জারী করিয়াছেন। এই জবাবের পর বৃটিশ দূত সার রবার্টকে নির্ব্বাক্ হইতে হইয়াছিল।

অতঃপর বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাজ্য একযোগে তাঁহাদিগের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবেন, ইহাই সাধারণের ধারণা। এই উভয় শক্তি জাপানকে এই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে জাপানের বাণিজ্যের অধিকার খর্ব্ব করিয়া এই জুলুমের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহাদের এই আস্ফালনের কোন মূল্য আছে কি না, তাহা পরে জানিতে পারা যাইবে; কিন্তু বৃটেন তাঁহাদের পৃথিবীব্যাপী রাজ্য ও বাণিজ্যগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার আশায় বৃটিশ-গৌরব ক্ষুন্ন করিতে কুণ্ঠিত নহেন; এ অবস্থায় বৃটেন জাপানকে জব্দ করিবার জন্য তাহার স্বার্থহানির চেষ্টা করা রাজনীতিসঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন কি?

কিন্তু বৃটিশ-রাজনীতিকগণ অন্যভাবে ইহার প্রতিকারপ্রার্থী। গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃটিশ পররাষ্ট্র অণ্ডার সেক্রেটারী লর্ড প্লিমাউথ পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, বৃটেন চীনকে টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য দানের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। চীন এই ভাবে বৃটেনের নিকট সাহায্য পাইলে

জাপানের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধে রত থাকিতে পারিবে। জাপানের পক্ষে ইহা অসুবিধাজনক এবং ক্ষতিকরও বটে।

জাপান চীন দেশে যে সকল অনাচার-অত্যাচার করিতেছে, তাহার সমর্থনের জন্য টোকিওর সংবাদপত্রসমূহ একযোগে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে প্রাচ্য ভূখণ্ডে চৌর্য্যবৃত্তির অভিযোগ করিয়াছে। তাহাদের যুক্তি এই যে, যেহেতু য়ুরোপের বিভিন্ন শক্তি সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডের বহু স্থান বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছে, অতএব প্রাচ্য ভূখণ্ডবাসী জাপান অস্ত্রবলে চীনের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিলে তাহা সমর্থনযোগ্য! রাম হরির মাথা ফাটাইয়াছে, অতএব যদু হরির প্রতিবেশী গোপালের গলায় ছুরী দিলে তাহা অন্যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অনুচিত! এই যুক্তি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য টোকিওর সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকাগুলি লিখিয়াছে, য়ুরোপীয়রা জাপানের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেছে, কিন্তু য়ুরোপীয় শক্তিসমূহের মধ্যে—

(১) বৃটেন ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে অহিফেন যুদ্ধের পর (after the Opium War) হংকং গ্রাস করিয়াছে।

(১) রুসিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে চীনের নিকট হইতে আমরস্ক কাড়িয়া লইয়াছে।

(২) ফ্রান্স ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডোচায়নার ৩টি প্রদেশ আত্মসাৎ করিয়াছে।

(৪) ফ্রান্স ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে টংকিং ও আনাম খাস-দখল করিয়াছে।

(৫) বৃটেন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ব্রহ্ম অধিকার করিয়াছে।

(৬) রুসিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের ভিতর দিয়া মাঞ্চুরিয়ান রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য চীনকে সম্মতি দানে বাধ্য করিয়াছিল।

(৭) রুসিয়ানরা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে রুসো-চাইনীজ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করেন।

(৮) জার্ম্মাণী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কিয়াওচাও (সিংটাও) আক্রমণ করিয়া অধিকার করে।

(৯) বৃটেন ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে ইয়াংসি প্রদেশে তাঁহাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।

(১০) ফ্রান্স ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে চীনের নিকট বলপূর্ব্বক কাওয়াংচাও উপসাগরের পত্তনী-স্বত্ব আদায় করে।

(১১) রুসো-চাইনীজ 'কনভেনসন্' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সঙ্গীণ উচাইয়া আর্থর বন্দর এবং ডালনী রুসিয়াকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার জন্য চীনকে বাধ্য করে।

(১২) ফ্রান্স ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ চীনে তাহার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

(১৩) বৃটেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সিংটাও প্রদেশে জার্ম্মানীর স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করে।

(১৪) বৃটেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উইহাইউইএর পত্তনী-স্বত্ব আদায় করে।

এতদ্ভিন্ন, মার্কিন যুক্তরাজ্যের ষ্টেট-সেক্রেটারী জন হে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে সকল বৈদেশিক শক্তির প্রবেশাধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার নীতির সমর্থন করেন। সংপ্রতি চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান ধীরে ধীরে সাংহাই, নানকিং, পিকিন, ক্যান্টন এবং হ্যাঙ্কাউ অধিকার করিয়া এইরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, সে অদূর ভবিষ্যতে বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জকে নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের এত কালের সকল অধিকার বাতিল করিবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ জাপানের এই স্পর্দ্ধার প্রতিবাদে উচ্চবাচ্য করেন নাই। যদি তাঁহারা জাপানের দর্প চূর্ণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবনত মস্তকে জাপানের আদেশ পালন করিতে হইবে। তাঁহারা চীনদেশে জাপানের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন, এবং জাপান প্রাচ্য মহাদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে। সুতরাং সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে অগ্নি প্রধূমিত হইতেছে, একদিন তাহা জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

ব্রহ্মের পথে যুদ্ধাস্ত্র

গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রেঙ্গুন-নদীর ডকে আচম্বিতে একখানি 'বৃটিশ ফ্ল্যাগ-সিপ্' জাতীয় জাহাজের আবির্ভাব হয়। এই জাহাজখানির নাম 'ষ্ট্যান্হল'। ইহা ৪ হাজার ৩ শত ৮১ টন মালবাহী ষ্টীমার। ইহা জে, এ, বিলিমেয়ার কোম্পানীর সম্পত্তি বলিয়া লণ্ডনে রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছিল।

মিঃ বিলিমেয়ারের সকল জাহাজের নামের প্রথমে 'ষ্ট্যান' শব্দটি সংযুক্ত আছে; কারণ, এই জাহাজী কোম্পানীর ধনাঢ্য তরুণ স্বত্বাধিকারী চর্ণসির ষ্ট্যান্হোপ রোডে বাস করিতেছেন। এই কোম্পানীর অধিকাংশ জাহাজ স্প্যানীস্ সরকারের জন্য অত্যন্ত উচ্চ ভাড়ায় মাল-বহনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বোমারু এরোপ্লেনগুলিকে এরূপ কৌশলে প্রতারিত করিতেছিল যে, সেই সঙ্কটজনক কার্য্যে তাহারা য়ুরোপব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

কিন্তু এবার ষ্ট্যান্হলের উপর ফ্র্যাঙ্কোর বোমারু এরোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণের কোন কারণই ঘটে নাই। চীন-সেনাপতি চিয়াং কাইসেকের সৈন্যদলকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত যুদ্ধোপকরণপূর্ণ এই জাহাজ হইতে যখন কুলীরা ৬১টি মেসিন-গনসহ সহস্র সহস্র মণ যুদ্ধোপকরণ রেঙ্গুনের বন্দরে নামাইতেছিল, সেই সময় একদল বৃটিশ-বর্ম্মিজ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তাহার পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

ব্রহ্মদেশ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম চীন পর্য্যন্ত মোটর-গাড়ী চালাইবার যে নূতন পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই পথে প্রেরণের জন্য এই সকল মহার্ঘ্য সমরোপকরণ ইরাবতী নদী পার করিয়া মান্দালয়ে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে নদীপথে পরিচালনযোগ্য নৌকা-সমূহে পুনর্ব্বার বোঝাই দিতে হইয়াছিল। ঐ সকল দ্রব্য চীনের য়ুনানে লইয়া যাইবার জন্য সেখানে চিয়াং কাইসেকের মোটর-লরী সমূহ অপেক্ষা করিতেছিল।

মান্দালয় হইতে য়ুনানে গমন করিবার দুইটি প্রশস্ত পথ আছে। একটি পথ লাসিও এবং মিউজের ভিতর দিয়া য়ুনান পর্য্যন্ত প্রসারিত; অন্য পথটি বাহমো এবং টেঞ্চিয়ুয়েন অতিক্রম করিয়া য়ুনানে প্রবেশ করিয়াছে। এই উভয় পথের কোন্ পথে চিয়াং কাইসেকের লরীগুলি ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যাইবে, এই সংবাদ গগনবিহারী সন্ধানী জাপ-এরোপ্লেনগুলির ভয়ে গোপন রাখা হইয়াছিল।

জাহাজের স্বত্বাধিকারী বিলিমেয়ারের জাহাজ সমূহের নির্ভীক

নাবিক ও খালাসীগণ য়ুরোপে সমরোপকরণ বহন করিতে নিত্য বহু বিপদ আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইলেও, চিয়াং কাইসেকের জন্য যুদ্ধোপকরণ বহনের ভার লইয়া বিলিমেয়ারকে ঐ প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সাংহাই-স্থিত বৃটিশ ও মার্কিণ বণিক্‌গণ সংবাদ পাইয়াছেন, চীন দেশের প্রান্তবর্ত্তী সাগরসমূহে নিরপেক্ষ দেশসমূহের জাহাজগুলির উপর বোমা-বর্ষণে বা টর্পেডো সাহায্যে সেগুলির ধ্বংসসাধন সম্পূর্ণ সম্ভবপর হইয়াছে; অর্থাৎ চীন-সমুদ্রে জাপানীরা আর নিরপেক্ষ দেশসমূহের জাহাজগুলিও ধ্বংস করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মের পথে চীন দেশে প্রেরিত যুদ্ধোপকরণ ধ্বংসে জাপানের আগ্রহ নাই কি?

জনরবে প্রকাশ, ডিক্টেটর চিয়াং জাপানের বিরুদ্ধে সরকারী ভাবে যুদ্ধ-ঘোষণার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু জাপ-আততায়ীরা যথারীতি যুদ্ধ-ঘোষণা গত ১৮ মাস হইতে নানা কৌশলে এড়াইয়া আসিতেছে। যদি এই ভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করা হইত, তাহা হইলে তাহার ফলে (১) জাপানীগণকে চীন দেশ অবরুদ্ধ করিতে দেওয়া হইবে। (২) উভয় পক্ষকে যে অধিকার দান করা হইবে, তাহার ফলে যে সকল বৈদেশিক জাহাজ সমরোপকরণ বহন করিবে, তাহাদিগকে সমুদ্রবক্ষে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু চীনের প্রকৃত নৌবাহিনী নাই, এজন্য ঐরূপ ব্যবস্থায় জাপানীরাই লাভবান হইবে। চীনারা যথাবিহিত ভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলে তাহার ফলে মার্কিণ যুক্তসাম্রাজ্যের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আমেরিকান নিরপেক্ষ-বিধানের (American Neutrality Act) সাহায্য গ্রহণ করিবেন। ইহাতে পরস্পর বিবদমান জাতিদিগের নিকট যে সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদাদি প্রেরিত হইতেছে, তাহাদের প্রেরণ রহিত হইয়া যাইবে।

এতদ্ভিন্ন, অন্য যে সকল জটিল আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে, যথা (১) জাপানীরা চীনের সমগ্র উপকূল অবরুদ্ধ করিয়া বিদেশী বাণিজ্য জাহাজগুলিকে চীন দেশের সমৃদ্ধ বাজারগুলি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে। (২) বৃটিশ, ফরাসী, ইটালিয়ান এবং আমেরিকান নৌ-বিভাগের জাহাজগুলির মাল এবং তাহাদের সশস্ত্র সৈন্যগুলিকে অপসারিত করিতে বাধ্য করিতে পারে। (৩) চীন দেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি বিদেশী জাপানী সৈনিকবর্গ কর্ত্তৃক যুদ্ধে প্রাপ্ত লুঠের মাল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

যদি তৃতীয় শক্তি জাপানে অস্ত্র-সরবরাহে বাধা দান করিয়া তাহার চালান রহিত করে, তাহা হইলে সেই জাতি নিরপেক্ষ পক্ষের জাহাজগুলিকেও আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিবে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

যতদিন ক্যান্টনের পতন না হইয়াছিল, ততদিন সেনাপতি চিয়াং কাইসেক অদূরবর্ত্তী হংকংএর ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন। এ বিষয়ে তিনি ক্যান্টন হাঙ্কাও রেলপথের সাহায্য লাভ করিতেন; এই পথ তাঁহার শত্রুগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বহুদূরবর্ত্তী খিড়কী দ্বার ব্রহ্মদেশ হইতে এবং সোভিয়েট মঙ্গোলিয়া হইতে তাঁহার যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হওয়ায়, ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি তিনি যুদ্ধ-ঘোষণা করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তাহাতে যেরূপ বিপন্ন হইতেন, তাঁহার শত্রুগণকে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সঙ্কটে নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। জাপান তাহার যুদ্ধোপকরণ আমদানীর জন্য প্রধানতঃ মার্কিণ যুক্তরাজ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

চিয়াং কাইসেকের জন্য কেবল যে ষ্ট্যানহল জাহাজেই যুদ্ধোপকরণ প্রেরিত হইয়াছে এরূপ নহে, ক্রমশঃ অন্যান্য জাহাজেও ব্রহ্মের পথে ঐ সকল দ্রব্য আমদানী হইবে; এবং সেগুলি জাহাজ হইতে নামাইয়া গুদামজাত করিবার জন্য জেটির অদূরে বিভিন্ন গুদাম ভাড়া করা হইয়াছে। এ অবস্থায় জাপানী বোমারু এরোপ্লেনগুলি নিষ্ক্রিয় থাকিবে এরূপ আশা করিতে পারা যায় কি? এই জন্যই ব্রহ্মবাসীরা ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। ব্রহ্ম সরকার ঘোষণা-প্রচারে তাহাদিগকে অভয় দান করিয়াছেন, এবং জাপানের সহিত তাঁহাদের মৈত্রী-বন্ধন অক্ষুন্ন আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের 'মা ভৈঃ' বাণীর মূল্য কতটুকু, ইহা স্থানীয় জনসাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে; কারণ, ব্রহ্মস্থিত জাপান-দূতের পক্ষ হইতে ঘোষিত হইয়াছে, ব্রহ্মের ভিতর দিয়া চীনের সমরোপকরণ যুনানে প্রেরণের সুযোগদান করিয়া বৃটিশ সরকার জাপানের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

প্রেমের সুর

তুমি যে গো করেছ মধুর,
আজি মোর সর্ব্ব চিত্তপুর;
শুনি মিলনের সুর দুয়ারে আমার,
ধ্বনি তার প্রতি অঙ্গে রস-বাণী করে যে সঞ্চার
তব প্রেম-পুষ্প-রেখা দিয়া
রঞ্জিত হইয়া আছে হিয়া,
লভিয়াছি প্রাণে ওগো অপূর্ব্ব বরণ;
জড় সে পেয়েছে ফিরে জ্যোতির্ম্ময় নবীন যৌবন

যে বারতা তোমাতে আমাতে
জেগে উঠে দিবসে ও রাতে,—
তাহা যেন শুধাইছে চরাচরময়
প্রেম মুগ্ধ প্রাণ কভু নাহি রাখে মরণের ভয়।
প্রেম করে প্রাণ নিয়ে খেলা,
নাহি তার ম্লান কভু বেলা,
সমুজ্জল ঊষা-আলো সম তার দিন।
রজনীর অন্ধকারে সে যে কভু হয় না বিলীন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল।

বারুণী

[গল্প

লেকের কাছে ছোট খাট রেস্তরাঁ। সাজ-সজ্জায় অপরূপ শ্রী। রেস্তরাঁর নাম বারুণী।

বৈকালের দিকে বারুণীর খুব পশার। রাত্রি দশটা-বারোটা পর্য্যন্ত উৎসবের জের চলে। রেডিও-শেটে সুরের হিল্লোল, সৌখীন তরুণ-তরুণীর হাসি-গল্পে ফেনিল প্রবাহ,—বারুণীর সামনে দিয়া যারা যায়, তারা বারুণীর পানে সন্ধানী-দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া যাইতে পারে না। দিকে দিকে আজ বারুণীর নাম।

কত রকমের কত লোক নিত্য আসে বারুণীতে। এখানকার আব-হাওয়ায় কাহারো মনে পল্লবে-লতায় আশার মুকুল রঙে রঙে রঙীন হইয়া ওঠে; কাহারো সময় কাটে অধীর প্রতীক্ষায়। কেহ ফেরে নৈরাশ্যের বেদনা বহিয়া; কেহ বা আবার স্বপ্নের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া যায়।

সন্ধ্যার পর বারুণীতে নিত্য আসে মীনা। তার সময় রুটিনে বাঁধা। হাসি-মুখ খুশী-মন। নিত্য দিন মীনা আসে প্রদীপের সঙ্গে, প্রদীপের মোটরে চড়িয়া। আসিয়া দুজনে বসে বারো নম্বর কামরায়। এ-কামরার দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়া লেকের খানিকটা দেখা যায়। কালো জলে আলোর রশ্মি পড়িয়া জল্-জল্ করে, যেন নেক্‌লেশের গায়ে হীরার কুচি!

মীনা আসে হাসি-মুখে, হাসি-মুখেই চলিয়া যায়। বারুণীর কিশোর বয় মধুর হাতে এ কামরার ভার। মধু তাদের পরিচর্য্যা করে। ফরমাশ-মতো চা-কফি, কেক্, চকোলেট আনিয়া জোগায়।

মধু দেখে মীনাকে। মীনার হাসি-মুখ দেখিয়া মধুর মন খুশীতে ভরিয়া ওঠে! সে কল্পনা-চক্ষে দেখে...

কত কি দেখো! বারুণীতে আসে আরো অনেক মেয়ে—কিন্তু মীনার মতো কেহ নয়! মীনার মুখে সরল হাসি, চোখে অনাবিল দৃষ্টি, কথায় স্বচ্ছ নির্ম্মল-প্রাণের আভাস! চমৎকার!

সারাদিন মধু আশায় আশায় থাকে—কখন সন্ধ্যা হইবে, কখন মীনা আসিবে, কখন মীনার টেবিলে চায়ের-কফির পেয়ালা বহিয়া আনিবে, কখন মীনা তাকে আদেশ করিবে,—আর একখানা কেক্...

মীনা আসে সাড়ে সাতটায়। যদি কোনোদিন ঘড়ির কাঁটা সাত আর ছ'য়ের ঘর ছাড়িয়া যায়, মীনার তখনো দেখা নাই এমন হয়, তাহা হইলে মধুর বুক ভাবনায় ভরিয়া ওঠে। অসুখ করিয়াছে, নিশ্চয়! চিরদিন মানুষ সুস্থ থাকিবে, এমন কখনো হয় না! কি অসুখ করিয়াছে? যদি অসুখ শক্ত হয়? যদি অসুখ না সারে...

দুশ্চিন্তার মেঘে মধুর মন ভরিয়া ওঠে। সারা আকাশ কালোয় কালো হইয়া যায়! তার পর মীনা আসে...তেমনি হাসি-মুখ...সে মুখে মৃদু বাণীর কাকলী-রব! মধু যেন প্রাণ পাইয়া বাঁচে...তার নিষ্ক্রিয়তা যায় উবিয়া। প্রচণ্ড উৎসাহে নিজেকে মীনার পরিচর্য্যায় ঢালিয়া দেয়!

প্রথম যেদিন মীনা আসে বারুণীতে প্রদীপের সঙ্গে—ছ'সাতমাস আগেকার কথা—বিল হইয়াছিল সাড়ে চার টাকা। মধুর হাতে প্রদীপ দিয়াছিল পাঁচ টাকার নোট; নোট ভাঙ্গাইয়া মধু একটা আধুলি আনিয়া প্লেটে রাখিয়া ধরিল প্রদীপের সামনে। প্রদীপ আধুলি লইল। মীনা

তার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া আধুলি কাড়িয়া লইল, বলিল,—ও আর ব্যাগে তোলে না, আমি নেবো···

হাসিয়া প্রদীপ কহিল,—কি করবে তুচ্ছ একটা আধুলি নিয়ে !

মধুর দু'চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। আধুলি লইয়া মীনা মধুর পানে চাহিল, কহিল,—নাও !

যন্ত্র-চালিতের মতো মধু হাত পাতিল। আধুলির লোভে নয়,···মীনা নিজের হাতে দিতেছে বলিয়া···

সে-আধুলিটি মধু খরচ করে নাই—রাখিয়া দিয়াছে··· দেবতার নির্ম্মাল্যের মতো। বিলের ফিরতি রেজকি থাকিলে মধুকে ডাকিয়া সে-রেজকি মীনা মধুকে দেয়। মধু লয়। পয়সার দামে সে রেজকির দাম কষে না। এ রেজকি···এ যেন কি...

সেগুলা সব জমাইয়া রাখিয়াছে। আরো পাঁচ জন দু' আনা চার আনা যা দিয়া যায়, সে পয়সা মধু খরচ করে; মীনার দেওয়া পয়সার সঙ্গে সে-পয়সার তুলনা হয় না। সে পয়সার সঙ্গে মীনার পয়সা সে কোনোদিন মিশায় নাই ! মিশাইবে না···

যতক্ষণ মীনা থাকে, মধু দাঁড়াইয়া থাকে ঘরের বাহিরে পর্দ্দার সামনে। তাদের দু' চারিটা কথাবার্ত্তা কানে আসিয়া লাগে। সে কথায় কতখানি আব্দার ভালোবাসা···মধু বোঝে। বুঝিয়া মনে মনে বলে, এ হাসি চিরদিন তোমার মুখে অটুট থাকুক...উজ্জ্বল থাকুক !

মনে কি যে হয় ! কেন হয়, মধু তাহা কোনো দিন বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। রাত্রির অন্ধকার সরাইয়া দিনের আলো ফুটিলে মন যেমন সহজ পুলকে ভরিয়া ওঠে,— কোনোদিন সে-আলোর পানে চাহিয়া মন প্রশ্ন তোলে না ···সে আলোয় কেন আনন্দ হয়, তার বিশ্লেষণ করে না··· সারা দিনের বাঁধা-ধরা বিরস কাজের পর সন্ধ্যায় মীনা আসিলে মন তেমনি সহজ পুলকে ভরিয়া ওঠে। কেন এ পুলক, মধুর মন সে সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন তোলে নাই ! তুলিবার কথা মনে হয় না !

সেদিন মধু দাঁড়াইয়াছিল ঘরে। প্রদীপের কথায় সিগারেটের টিন আনিয়াছিল···প্রদীপ একতাড়া কাগজ খুলিয়া মীনাকে অনেক কথা বলিতেছিল···

বলিতেছিল—রাজা এলেন। রাজার মনে ভয় আছে, সংশয় আছে। দেবদাসী নাট-মন্দিরে বসে পূজার ফুল সাজাচ্ছেন...তন্ময় চিত্ত। মন্দিরে লোকজন নেই ! দেবদাসী বসে মালা গাঁথছেন, রাজা এসেছেন, জানতে পারেন নি। রাজার বুক কাঁপছে। দেবদাসীকে খুব ভালোবেসেছেন··· অসহ্য সে ভালোবাসা ! রাজার বুকে সে ভালোবাসা আর বাঁধ মানছে না। রাজা এসেছেন দেবদাসীর কাছে সে-ভালোবাসা জানাতে। কিন্তু প্রথমে কি বলে কথা তুলবেন ? বুঝচো মীনা, বড় অধীর উৎকণ্ঠা···হয় আশার তৃপ্তি, নয় চির-নিরাশা···দেবদাসী ফুল সাজাতে সাজাতে আপন-মনে গুন্-গুন্ করে গান গাইছেন···বুঝচো মীনা, এখানে সেই গান···সেই

আমার সব বাসনার, সব-কামনার
সফলতা
ওগো দেবতা......

রাজা শুনলেন। রাজার মনে হলো, এ যেন তাঁর উদ্দেশে দেবদাসীর অন্তর-নিবেদন ! রাজা আর থাকতে পারলেন না···ডাকলেন,—দেবদাসী মঞ্জুলা···দেবদাসী চমকে উঠলেন···ফিরে চাইলেন। দেখেন, রাজা ! রাজার মুখের উপর পড়েছে নাটমন্দিরের মর্ম্মর-প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে এসে অস্তসূর্য্যের আলো ! দেবদাসীর মনে হলো, যেন শ্যামসুন্দর মন্দির ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন···

এখানে মীনা বাধা দিল। বলিল—বুঝেচি, এখানে খুব soft expression চাই···দেবদাসী এখানে উঠে দাঁড়াবে··· রাজার পানে চাইবে···দু'জনের চোখে-চোখে মিলন হবামাত্র ···কিন্তু যাকে রাজা সাজাচ্ছেন, তাঁর চোখের চাউনি ভারী কড়া। দেখলেন তো, অমন করে দেখিয়ে দিলেন আপনি, তবু কিছুতেই নরম-চাউনি চাইতে পারলে না ! তাই আমার ভয় হয়···

প্রদীপ বলিল—প্রোপ্রাইটারকে আমি বলেছি, মাইনে বেশী দিয়ে রেখেছেন বলে এই অতুল বাবুকে সব বইয়ে হিরো সাজাবেন, এতে ছবি মাটী হয়ে যাবে। রাজার পার্টে এর চেয়ে যদি ঐ সাত্যকি সেনকে পেতুম···ছোকরার চেহারায় লালিত্য আছে।

মীনা বলিল,—কিন্তু অত বড় পার্ট পারতো ? সাত্যকি বাবু তো ফিল্মে নামছে ছ'মাস !

প্রদীপ কহিল—আমি শিখিয়ে তৈরী করে নিতুম। সে বিদ্যা আমার আছে, অন্ততঃ তুমি তা স্বীকার করবে। নয়?

হাসিয়া মীনা বলিল—নিশ্চয়। সে কথা মানবো বৈ কি। আমাকে তো আপনিই তৈরী করেছেন। আমি নিজে জানতুমও না, আমার দ্বারা কি হতে পারে! আপনি ভার না নিলে আমার কিছুই হতো না, সত্যি! বলেছি তো, সেজন্য আপনার কাছে নিজেকে আমি একেবারে বিকিয়ে দিতে পারি। দিয়েওচি...

মীনার মুখের হাসি আরো মধুর হইল...দু'চোখে নিবিড় আবেশ...

প্রদীপ হাসিয়া সস্নেহে বাহুর ঘেরে মীনার কণ্ঠ...

মীনা চমকিয়া নিজেকে মুক্ত করিল। মৃদু স্বরে কহিল, —আঃ! বয় রয়েছে।

প্রদীপ চাহিয়া দেখে, তাই! মধু দাঁড়াইয়া আছে ঘরে...

রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল,—তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

মধু বলিল,—আপনার সিগারেটের টিন...

সঝঙ্কারে প্রদীপ কহিল,—এখানে রাখ্। রেখে চলে যা...

টিন রাখিয়া মধু চলিয়া যাইতেছিল, মীনার মন করুণায় ভরিয়া উঠিল। ছেলেটা ভালো...আহা! উহার কোনো অপরাধ নাই...কেন এমন রূঢ় ভাষায় তাড়াইয়া দাও?

মীনা ডাকিল,—মধু...

মধু ফিরিল।

মীনা বলিল,—শোনো, তোমার নাম কি?

মধু বলিল,—মধু।

—বাঙালী?

—হ্যাঁ।

প্রদীপ কহিল,—আবার ওকে নিয়ে কি হচ্ছে? এটুকু বুঝতে হবে না?

মীনা বলিল,—বুঝবো'খন!...ও মানুষ তো...মানুষের পরিচয় নিচ্ছি...

মধুর মনে হইল, দেবী...

প্রদীপ কহিল,—সাধে তোমাকে খুকী বলি...

মীনা কহিল,—বেশ, বলুন খুকী!

মীনা চাহিল মধুর পানে, কহিল,—পুরো-নাম বলো...

মধু বলিল,—মধুসূদন গাঙ্গুলি।

—বামুনের ছেলে! তুমি হোটেলে এই কাজ করো!

মধু বলিল,—আর কোনো কাজ কোথাও পাই নি কি না...

—বটে! বাড়ীতে তোমার কে আছে?

—বিধবা মা আর একটি বিধবা বোন...

মধু চুপ করিল।

মীনা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল,—তোমার বয়স কত?

মধু বলিল,—উনিশ বছর।

মীনা আশ্চর্য্য হইল, কহিল,—হুঁ! দেখলে তা মনে হয় না তো। মনে হয়, ষোলো সতেরো বৎসর।

মধু বলিল,—ছোটবেলায় আমার খুব অসুখ হয়েছিল কি না, তাই মাথায় বাড়তে পারিনি...

মধুর পানে মীনা চাহিয়া রহিল...অনেকক্ষণ। মধু দেখিল সে দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে...

মধু কোনোদিন স্নেহ-মায়া পায় নাই। মন তাই চিরদিন কাঙাল হইয়া আছে! তাই মধু বুঝিল, ও-দৃষ্টিতে কতখানি মায়া, কি করুণা...

প্রদীপ কহিল,—ওকে যেতে দাও। দিয়ে আমার কথাটা বোঝো, খুকুমণি...

মীনা আর-একটা নিশ্বাস ফেলিল, বলিল,—আচ্ছা মধু, এখন তুমি এসো। এর পরে তোমার সঙ্গে ভাব করবো'খন...

মধুর মন মীনার স্নেহকে অবলম্বন করিয়া আকাশে উঠিতেছিল। কালো মাটীর পৃথিবী ছাড়িয়া, বদ্ধ বাতাস ও অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর রাজ্যে, মুক্ত বাতাসের রাজ্যে... চকিতে সে-অবলম্বন প্রদীপ যেন কাড়িয়া লইয়াছে... মন আবার তাই সেই চির-পরিচিত কালো মাটীর বুকে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল!

দ্বারের বাহির হইতে মধু শুনিল, প্রদীপ বলিতেছে মীনাকে,—ভাব করবে বলে ও-বেচারাকে স্বর্গে তুলছো! বেচারী মারা যাবে...

মীনা বলিল,—ওসব তামাসা করবেন না...সত্যি, আমার ভারী বিশ্রী লাগে...

তার পর মধু জানিল সব পরিচয়...লোকের মুখে। জানিল, এই মীনা...ফিল্মে অভিনয় করে। আর-পাঁচ জনের

মতো সে নামহীন নয়, গোত্রহীন নয়···মা-বাপের আদরে মানুষ। বাপের পয়সা ছিল, সখ ছিল। মেয়েকে একালের ভাবেই মানুষ করিতেছিলেন। তার পর সহসা বাপ মারা গেলেন। তখন দেখা গেল, অনেক-টাকা ঋণ। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘর ভাঙ্গিয়া গেল। সে-ঋণ শুধিতে মা হইলেন নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়! মেয়েকে লইয়া বড়লোক আত্মীয়ের গৃহে গিয়া উঠিলেন। মেয়ে মীনা লেখা-পড়া জানে, গান গাহিতে জানে···দেখিতে ভালো···মন ভালো! কিন্তু শুধু আশ্রয়ের উপর ভর করিয়া মেয়েকে মানুষ করা চলে না! তার বিবাহ দিতে হইবে!

এই আত্মীয়ের গৃহে আত্মীয়ের পুত্র প্রদীপের দরদ সহানুভূতি প্রচুর। প্রদীপের বিনয়, সৌজন্য এবং ভদ্রতায় মা মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন,—মেয়ের বিয়ের কি যে হবে, বাবা! মেয়ে আমার লেখাপড়া জানে···যার-তার হাতে ওকে দিতে পারবো না তো!

প্রদীপ ফিল্ম-ডাইরেক্ট করে। প্রদীপ বলিল,—নিজের উপর ভর করে দাঁড়াবার শক্তি যখন মীনার রয়েছে, তখন কেন ভাবেন?

মা বলিলেন,—তার মানে? ওর আবার কিসের শক্তি!

প্রদীপ বলিল,—মীনাকে যদি ফিল্মে নামতে দেন, তা হলে বিয়ের জন্য ভাবতে হবে না। মীনা গান গাইতে জানে, দেখতে সুশ্রী···

মা বলিলেন,—কিন্তু ও-পথ তো বিয়ে দেবার পথ নয়। ও-পথে মেয়ে-জন্ম নিরাপদ হবে না, সার্থক হবে না, বাবা···

প্রদীপ বুঝাইল, নিজের শক্তিতে মীনা যদি খ্যাতি আর অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে বিবাহের জন্য ভাবিতে হইবে না। এখনকার ছেলেরা যেমন চায়···তাদের মন উদার···বিশেষ মীনার কণ্ঠ···এমন কণ্ঠ শুনা যায় না! এ যে প্রতিভা...genius···এ প্রতিভাকে ঘরের কোণে চাপিয়া রাখিলে পাপ হইবে! ভদ্রঘরের মেয়েরা এখন ফিল্মে নামিতেছেন। ভদ্রতা-সম্ভ্রমবোধ যার আছে, কোথাও তার ভয় নাই···দায়িত্ব প্রদীপের।

প্রদীপের কথায় মেয়েকে মা ছাড়িয়া দিয়াছেন প্রদীপের হাতে···বলিয়াছেন,—বেশ, তাই হোক, বাবা···

প্রদীপ তাকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছে। মীনা ফিল্মে নামিয়াছে···পয়সা পায় প্রচুর। মা ও মেয়ে এখন আলাদা বাড়ীতে থাকে। নিজের মোটরে মীনাকে তুলিয়া প্রদীপ ষ্টুডিয়োয় লইয়া যায়···আবার নিজের মোটরে করিয়া তাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দেয়···

মধু ভাবে, তার পর?

তার জন্য মীনার মনে মায়ার অন্ত নাই! মাঝে মাঝে মধুকে ডাকিয়া মীনা আলাপ করে। বলে,—এখানে কতই বা মাইনে পাও, মধু! এতে সংসারের কতটুকু সাশ্রয় হয়! ঘরের ভাড়া দিতে হয় পাঁচ টাকা···বাকী থাকে বারো। বারো টাকায় কি সংসার চলে?

মধু হাসে। মলিন হাসি।

মীনা বলে—কত দূর লেখাপড়া শিখেচো?

মধু বলিল—শিখতে পারলুম কৈ! ফার্ষ্ট বুকখানা শেষ করেছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। তার পরের বছর দিদি বিধবা হলো।

মীনা বলিল—আমি যদি টাকা দি, শিখবে লেখাপড়া?

আগে হইলে মধু বলিত, শিখিব। এখন···?

মধু ভাবে। ভাবিতে শিহরিয়া ওঠে! না, না···কি হইবে লেখাপড়া শিখিয়া! লেখাপড়া শিখিতে গেলে এখানে চাকরি করা হইবে না! এখানে চাকরি না থাকিলে মীনাকে দেখিতে পাইবে না···

মধু বলিল—এ-বয়সে লেখাপড়া শেখা হয় না···

মীনা বলিল—লেখাপড়া শেখবার বয়স-অবসর নেই, মধু···

মধু বলিল—না। শেখবার ইচ্ছে নেই···

মীনা বলিল,—এর পরে ধরো, যখন বিয়ে করবে···বৌ হবে, ছেলেমেয়ে হবে···তখন এ-টাকায় চলবে না তো!

মধু বলিল—বিয়ে এজন্মে করবো না···

মীনা বলিল—মায়ের তো সাধ হয়, যে ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনে ঘর-সংসার করবেন···

মধু বলিল—সে-সাধ মেটানো সম্ভব নয়।

—মা বলেন না বিয়ে করতে?

মধু বলিল—বলেন···

—তুমি কি জবাব দাও?

—আমি হাসি। হেসে বলি, ও-সাধ এ-জন্মে তুলে রাখো মা···আর জন্মে ও-সাধ মিটিয়ো···

কথাগুলার মধ্যে একটা সংসারের কতখানি বেদনা, একটা হৃদয়ের কতখানি নৈরাশ্য পুঞ্জিত···মীনার মন বাষ্পার্দ্র হইল। চোখের কোণে সে আর্দ্রতার আভাস জাগিল···

প্রদীপ একখানা খাতার পাতা উল্‌টাইয়া দেখিতেছিল ···বলিয়া উঠিল—ভারী মজা পেয়েছো তুমি···না? কেন, ও বেচারীকে ক্ষ্যাপাও বলো দিকিনি···

তার পর প্রদীপ চাহিল মধুর পানে, কহিল,—বল্ না, আপনি দিন দু'পাঁচ হাজার টাকা। দিয়ে বিয়ের সম্বন্ধ করুন···হুঁ···

তার পর খাতার পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মীনার কপোলে হাত দিয়া প্রদীপ কহিল—এইটে শোনো···এই-খানে রাণীর সঙ্গে হবে দেবদাসীর দেখা। রাণী এসেছেন মন্দিরে। রাজা দেবদাসীর কাছে আসেন—দুজনে উপবনে প্রেমালাপ হয়···রাণী সে খপর পেয়েছেন···পেয়ে এসেছেন দেবদাসীর কাছে···দেবদাসী তখন সন্ধ্যারতির জন্য বেশ-ভূষা করছেন,···তাঁকে নাচতে হবে দেবতার সামনে আরতির সময়···গুন্-গুন্ করে দেবদাসী গান গাইছেন। এবারে সেই গান

> বাহির হইতে কে যায় আমারে ডেকে !
> আমি ভুলে যাই, তাই তোমারে দেবতা,
> ভুলে যাই থেকে-থেকে ··

রাণী এসে বজ্র-স্বরে ডাকলেন—দেবদাসী···বলো তো মীনা, এখানেতোমার action কি হবে?

মীনা বলিল,—মনে আছে। আমার হাতে ফুলের মালা,—বেণীতে সে-মালা জড়াচ্ছি···রাণীর কথায় সে মালা হাতে রেখে দু'পাক ঘুরবো···এই ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমি যাবো রাণীর দিকে এগিয়ে, রাণী আসবে আমার দিকে এগিয়ে···দুজনের মধ্যে তফাৎ থাকবে প্রায় একহাত-টাক্···

আর একদিন। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে··· মীনার দেখা নাই। মধু যেন পাগল হইয়া যাইবে··· বারুণীর দ্বারে দাঁড়াইয়া সে ডাকিতেছে—হে মা-কালী, মা গো,···কেন উনি আস্‌ছেন না···

ভিতর হইতে ম্যানেজার ডাকিল—মধু···

সে-ডাক মধু কানে শুনিল না···

দু'বার তিনবার ডাক পড়িল। তবু মধু শুনিল না।

জগু বেয়ারা আসিয়া বলিল,—দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিস্! ম্যানেজার বাবুর গলা ফেটে গেল যে ডেকে ডেকে···

মধু শুনিল, বলিল,—ডাকুন গে···মানুষের শরীরের ভালো-মন্দ আছে তো! আমার খুব মাথা ধরেছে···আমি যেতে পারবো না ··

এমন কথা মধু কখনো বলে নাই। এমন কথা সে বলিতে পারে, সে ধারণা কাহারো ছিল না!

জগু গিয়া রিপোর্ট দিল। শুনিয়া ম্যানেজার বাবু চটিয়া লাল। স্থূল দেহটাকে কোনোমতে টানিয়া তিনি আসিলেন বাহিরে—মধু তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। সে দেখিতেছিল··· দূরে বড় ছুটো আলোর রশ্মি···মোটরের হেড্ লাইট···নিশ্চয় ঐ গাড়ী···হে ঠাকুর, তাই যেন হয়···

ম্যানেজার বাবু তার মাথার চুল ধরিয়া সবলে টানিলেন, বলিলেন—হতভাগা লক্ষীছাড়া! ডাকলে কথা কানে যায় না···

রাগের ঝোঁকে মাথার চুল ছাড়িয়া মধুর-গালে ঠাস-ঠাস করিয়া চড় মারিলেন, বলিলেন,—বারো নম্বর কামরায় দু-তিন জন ভদ্দর লোক এসে বসে আছেন! তা সাড়া নেই!···

মধু বলিল—আমি পারবো না···আমার অসুখ করেছে···

ভ্যাঙচাইয়া ম্যনেজার বাবু বলিলেন—অসুখ করেছে!··· অসুখ করেছে তো রূপ দেখাতে এখানে এসেছো কেন? ঘরে মায়ের আঁচলে শুয়ে থাকতে পারো নি···

মধু কটমট করিয়া চাহিল ম্যানেজার-বাবুর পানে · সে যেন বাঘের চোখের দৃষ্টি! ম্যানেজার বাবুর রাগ তখনো কমে নাই···আরো দু-চারিটা চড় ঘুষি লাথি মারিলেন। সে-মার খাইয়া মধু পথের উপরে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

ম্যানেজার রাগে গর-গর করিতে লাগিলেন—মধু যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল।

বেয়াদব চাকরকে শাস্তি দিয়া খুশী-মনে ম্যানেজার বাবু ঘরে ফিরিলেন, ডাকিলেন—জগু।···

জগু আসিল।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন,—মহেশকে বলো বারো-নম্বরের কাজ করতে···মোধোর অসুখ করেছে। বোধ হয়, সত্যি··· নাহলে ও কখনো গাফিলি করে না ··

তাই হইল···মহেশ গেল বারো-নম্বর কামরায় কাজ করিতে।

মধু পথের উপরে পড়িয়া রহিল। মারের যাতনা উপলব্ধি করিল না। মনে যে-যাতনা হইতেছিল···পথে অত মোটর চলিয়াছে···সেগুলার পানে চাহিয়া ঠাকুরকে সে ডাকিতেছে—হে ঠাকুর, এই গাড়ী···যেন এই গাড়ী···

গাড়ী আসিল···রাত তখন নটা বাজিয়া গিয়াছে।

গা ঝাড়িয়া মধু উঠিল, গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল,—এত দেরী হলো যে!

প্রদীপ কহিল—তোকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি! আচ্ছা তৈরী হয়েছে, দেখছি!

এ-কথায় মধুর মুখ শুকাইল।

মীনা দেখিল। কহিল—একটু কাজ ছিল, মধু, তাই দেরী হয়ে গেছে।···তবু এসেছি তো···

মধু কোনো কথা বলিল না···মনে হইল, বলে, কেন দেরী করিলেন···বড় ভাবনা হইয়াছিল···কিন্তু সে-কথা বলিতে পারিল না। মীনা একা থাকিলে হয়তো বলিত··· কিন্তু ও-লোকটার সাম্‌নে···

এক-মুখ হাসিয়া ম্যানেজার বাবু কহিলেন,—আসুন··· তাই ভাবছিলুম। আপনারা হলেন নিত্যদিনের পেট্রন··· এলেন না! অসুখ-বিসুখ হলো, না, কি···

প্রদীপ কহিল—একটু কাজ ছিল···

ম্যানেজার বাবু বলিলেন,—বারো-নম্বর খালি নেই··· ভাবলুম, হয়তো আসতে পারলেন না···আর তিন জন ভদ্দর লোক এলেন···হেঁ···হেঁ···অন্য ঘর খালি ছিল না···তা, ওরে জগু···

জগু আসিল।

ম্যানেজার বলিলেন,—এঁদের ঐ তিন-নম্বর ঘরে বসা ···বড় ঘর। ও-ঘরে আর কেউ যাবে না—রিজার্ভ রইলো! হেঁ হেঁ···একটা দিন···

দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া কাকুতি-মিনতিতে ম্যানেজার একেবারে লুটিয়া গলিয়া পড়িল।

তিন নম্বরের খাশ-বেয়ারা অধর। ম্যানেজার বাবু ডাকিল—অধর···দ্যাখোগে, কোনো অসুবিধা না হয়···

মধুর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ম্যানেজার বাবুর পায়ের উপর পড়িয়া সে কহিল,—আমার মাথা-ধরা সেরে গেছে···দয়া করে মাপ করুন। আমি রোজ ওঁদের সার্ভ করি···সার্ভ করছি আজ এক বচ্ছর···ওঁদের কি চাই না চাই, আমি জানি···

ম্যানেজার বাবু বলিল,—অধরকে বোল্‌গে যা···

মধু আসিয়া অধরকে বলিবামাত্র সে খুশী মনে সরিয়া পড়িল। মধু নামিল পরিচর্য্যায়···

মীনা বলিল—এ ঘরেও তুমি সার্ভ করো?

মধু বলিল—না···

মীনা বলিল—তবে?

মধু বলিল—আপনাদের আমি রোজ সার্ভ করি কি না ···ম্যানেজার বাবু তাই পাঠিয়ে দিলেন···

—ও · বেশ, বেশ···

মীনা বলিল প্রদীপকে—তুমি বলছিলে, আবার এতখানি পথ ঠেলে বারুণীতে যায় না, তার চেয়ে ক্যাশানোভায় ঢুকে পড়ি···আমার কিন্তু বারুণীর উপর খুব মায়া ···না এলে মনটা সুস্থির হতো না···

হাসিয়া প্রদীপ কহিল—জানি···এ ছোঁড়াটার উপর তোমার একটু টান আছে···

মধু কফি ঢালিতেছিল···এ-কথায় তার হাত কাঁপিল, পেয়ালায় কফি না পড়িয়া টেবিলে পড়িল এবং দু'চার ফোঁটা প্রদীপের কোটে···

চোখ রাঙাইয়া প্রদীপ কহিল—কি করলি, দেখেছিস্··· শূয়ার···

মধুর মুখ শুকাইল···

মীনা বলিল—দৈবাৎ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করে ও ফ্যালেনি।···কোটটা আমায় দেবেন। আমি পেট্রোল দিয়ে ওয়াশ্ করে দেবো'খন···

প্রদীপ কহিল,—না, না। তুমি এ ছোঁড়াকে বড় বেশী প্রশ্রয় দাও। উচিত নয়। কুকুরকে নাই দিলে সে মাথায় চড়ে বসে···তা জানো!

কঠিন স্বরে মীনা ডাকিল,—প্রদীপ বাবু···

প্রদীপ কহিল,—Yes, madam···

মীনা বলিল,—মানুষ গরীব হলেও তাকে মানুষ বলে জানবেন। মানুষকে কুকুর ভাববেন না···এমন কথা আমার সামনে আর কখনো বলবেন না। আমি সব সহ্য করতে পারি, শুধু মানুষকে এ-ভাবে অপমান করা আমার ভালো লাগে না···

মধু চলিয়া গেল।

মীনা ডাকিল,—মধু···

মধু ছিল পর্দ্দার বাহিরে···আবার ঘরে আসিল।

ছোট হাত-ব্যাগ খুলিয়া মীনা দুটি টাকা বাহির করিল, করিয়া বলিল,—নাও···

মধু কুণ্ঠিত হইল। তার হাত উঠিল না···

মীনা বলিল—আজ আমার জন্মদিন। উপহার দিচ্ছি, নাও। নিতে হয়···কোনো জিনিষ দেবো, ভেবেছিলুম···কিন্তু কি দেবো ঠিক করতে পারিনি, তাই ভাবলুম, এই উপহারই ভালো। তোমার ইচ্ছা-মতো কিছু কিনে নিয়ো···

মধু হাত পাতিল। হাত পাতিয়া মীনার টাকা হাতে লইল···

পরের দিন···

মীনা আসিল প্রদীপের সঙ্গে। বারো নম্বরের কামরা···

মুখে এক-মুখ হাসি মধু আসিল··তার হাতে ফুলের মস্ত তোড়া···পাৎলা কাগজে জড়ানো।

মধু বলিল,—কাল আপনার জন্মদিন গেছে, জানতুম না। একদিন দেরী হয়েছে···

হাসি-মুখে মীনা ফুল লইল।

মধু বলিল—মার্কেট থেকে সন্ধ্যার সময় কিনে এনেছি ···ভালো?

কাগজ ছিঁড়িয়া ফুলগুলা বুকে চাপিয়া মীনা কহিল—খুব ভালো···চমৎকার মধু। এ ফুল আমি ঘরের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখবো···কোনোদিন ফেলবো না। অনেকে অনেক উপহার আমাকে দেছেন, কিন্তু এমন উপহার কেউ আমায় দেয় নি···আমি খুব খুশী হয়েছি···সত্যি।

আবেগে মধু দু' চোখ মুদ্রিত করিল···তার পায়ের তলা হতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল···

প্রদীপ কহিল—চা আন্···

মধু বাহিরে গেল। শুনিল, ঘরে প্রদীপ বলিতেছে—He is in love with you, madam···

মীনা কহিল—চুপ···

আরো তিন মাস পরের কথা···

রাত্রি প্রায় আটটা। পর্দ্দার বাহিরে মধু দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের মধ্যে দুজনে কথা হইতেছিল···

মীনা বলিল—না, তুমি যে বলতে, এই মাসেই মাকে বলবে···আবার কিসের দেরী?

প্রদীপ বলিল—ছবিখানা শেষ হোক্···

মীনা বলিল—আর তো পাঁচ দিনের কাজ বাকী! তার পর ওদিকে পড়বে চোত মাস···ফাগুনের শেষে বিয়ে হয়ে যাবে। তার পর তুমি দু'মাসের ছুটী পাবে। সে সময় দুজনে কোথাও গিয়ে থাকবো'খন। আমার ইচ্ছে, কাশ্মীর যাই।

প্রদীপ কহিল—বিয়ের মন্তর পড়াটুকুই যা বাকী··· না হলে দুজনে কপোত-কপোতী হয়েই আছি তো!

মীনা বলিল—এ বড় অনিশ্চিত···এ নয়। আমি চাই, সংসার! সকলে জানবে, আমরা স্বামি স্ত্রী···

প্রদীপ বলিল—সকলেই জানে, তোমাকে আমি বিয়ে করবো···

মীনা বলিল—সেই-জানার জন্যই তো এমন করে তোমার সঙ্গে ফিরছি ছায়ার মতো···কিন্তু মন এতে ভরে না···

তার পর ক্ষণেক স্তব্ধতা···

পরে মীনা আবার কথা কহিল। আরো মৃদু কণ্ঠে বলিল —না···আগে বিয়ে হোক্···

প্রদীপ কহিল—একটি···

মীনা বলিল—না···কখ্খনো না··

প্রদীপ কহিল—তোমার জন্য আমি কি না করছি, মীনা!···আজ তোমার এই যে খ্যাতি, এই নাম···

মীনা বলিল—তুমি ভাবো, এ খ্যাতি, এ নামে আমার জীবনকে আমি সার্থক মনে করি?

প্রদীপ কহিল—কি বলচো তুমি, মীনা?

মীনা বলিল—তুমি ভালোবাসো, তাই···আমার এ-সব সার্থক হবে সেদিন, যেদিন সমাজের বুকে তোমার স্ত্রী বলে পরিচয় দেবো!···তুমি জানো, লোকে কত অপবাদ দেয়··· হাঁ, দেয়। আমি নিজের কাণে শুনেছি। সে-অপবাদ আমি

গ্রাহ্যও করি না। সে-অপবাদ শুনে মনে-মনে হাসি। ভাবি, দাও তোমরা অপবাদ…কিন্তু যেদিন দেখবে আমি তোমাদের প্রদীপ বাবুর স্ত্রী…

প্রদীপ কহিল—সত্যি তাই, মীনা…বাঃ, তোমার এ ভাবটুকু আমার কি চমৎকার যে লাগে…ছোট্ট মেয়ের মতো এই স্নিগ্ধ সরলতা…Divine ..

তার পর ছ'মাস…

বারুণীতে-দুজনের দেখা নাই…অসহ্য !

মধু গেল মীনার গৃহে। গৃহ শূন্য। খবর লইয়া জানিল, ছ'মাস তাঁরা এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন…মা ও মেয়ে। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না…

মধু বসিয়া ফিল্মের বিজ্ঞাপনগুলার উপর চোখ বুলায় …'দেবদাসী' ফিল্ম দেখানো হইতেছে। এ ফিল্ম দেখিতে সিনেমা-গৃহ লোকে লোকারণ্য। মধু গিয়া এ-ছবি দেখিয়া আসিয়াছে…একবার নয়,—ছ'বার, তিন বার…পাঁচ বার…

এক দিন নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না… সিনেমাওয়ালাদের প্রশ্ন করিল—মীনা দেবী এখন কোন্ ছবিতে নামছেন ?

তারা বলিল—ছবি তোলার কাজ তিনি ছেড়ে দেছেন।

বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল…মধু আবার জিজ্ঞাসা করিল, —প্রদীপ বাবু আর-কোনো ছবি তুলছে না ?

—তুলছেন বৈ কি ! এবারে তিনি তুলছেন 'মধু-চক্র'।

—সে ছবিতে মীনা দেবী সাজবেন না ?

—না।…

মধুর বিস্ময়ের সীমা নাই ! ভাবিল, হয়তো বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে প্রদীপ ছবিতে আর নামিতে দেয় নাই…

কিন্তু দেখিতে বড় ইচ্ছা করে ! কি করিয়া দেখা হয় ?

প্রদীপ বাবুর বাড়ীতে যদি যায় ?

ভয় করে ! প্রদীপ বাবু যে-লোক…নিজের কাণে শুনিয়াছে, মধুর নাম লইয়া তাঁর সঙ্গে বিশ্রী তামাসা করিয়াছে ! ইতর রসিকতা !

এমন কথা মানুষ মুখে উচ্চারণ করে…বিশেষ তাঁর সামনে !

মধুর জীবন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে ! 'কাজ করে… উপায় নাই ! কাজ না করিলে পয়সা পাইবে না। তার পয়সার উপর দু'টি প্রাণীর নির্ভর…বিধবা মা…বিধবা দিদি…

কলের মতো সে কাজ করিয়া যায়। অমানিশার পর জ্যোৎস্না জাগে…দিনের পর রাত্রি আসে…কিন্তু সে-সবে আর সে-মাধুরী নাই…প্রাণ নাই !

আরো ছ'মাস পরে !

সন্ধ্যার পর প্রদীপ আসিল বারুণীতে। ডাকিল,—মধু… সে ছোকরা কৈ ? সেই মধু ?…

মধু আসিল।

দেখিল, প্রদীপের সঙ্গে সুবেশে ভূষিতা এক তরুণী… মীনা নয় !

প্রদীপ কহিল,—ওরে ছোকরা, বারো নম্বর কামরা খালি ?

মধু বলিল,—খালি।

প্রদীপ কহিল,—বেশ। সার্ভ করো…

মধু সার্ভ করিল…যেন কলের পুতুল !

পর্দ্দার বাহিরে সে দাঁড়াইয়া আছে…কামরায় কথা চলিয়াছে…

তরুণী বলিল,—এই কামরা সেই বারুণী-তীর্থ ! এ হোটেলের উপর এত মায়া কিসের, বুঝি না !

প্রদীপ কহিল,—তুমি বললে, এ হোটেল দেখবে ! তার ভালো লাগতো। এ হোটেল ছাড়া আর কোনো হোটেলে সে যেতো না…

—চাষা !

প্রদীপ কহিল,—গরীবের ঘরে জন্ম ! হোটেলের মর্ম্ম কি করে জানবে !…তোমার মতো সোসাইটি-গার্ল নয় তো…

তরুণী কহিল,—আমার আজকের শীনটা কেমন হলো, সত্যি ?

প্রদীপ কহিল,—চমৎকার !

তরুণী কহিল,—তোমার সে মীনা দেবীর মতো ?

প্রদীপ কহিল,—তার চেয়ে ভালো ! মানে, মীনা এ-সব বনেদী সোসাইটি-গার্লের পার্টে খাপ খেতো না। তার প্লে ছিল ঘরোয়া…মানে, প্যাষ্টোরাল টাইপের। এ ছবিতে তাকে হিরোইন সাজাতে পারতুম না…

মণিহার

পৌষ, ১৩৪৫]

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
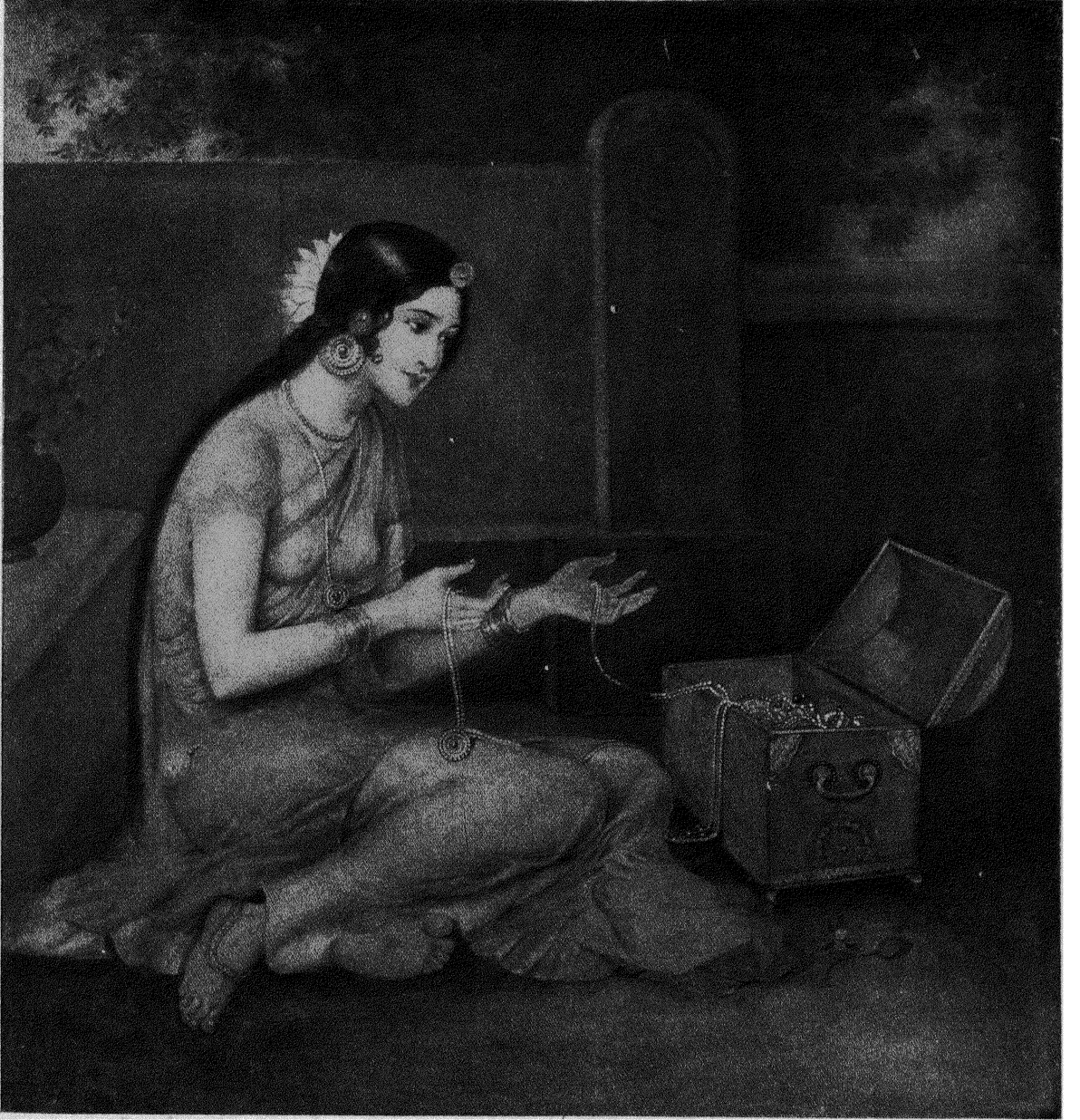
তরুণী কহিল,—আচ্ছা, সে সত্যি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?

—কি করে জানবো ?

—নিশ্চয় জানো। লুকিয়ে লুকিয়ে তার সঙ্গে প্রেমাভিনয় চলছে তোমার! নিশ্চয়!···First love···আমি শুনবো কেন তোমার স্তোকবাক্য!

প্রদীপ কহিল,—সত্যি, বিশ্বাস করো উজ্জ্বলা, সে ছিল এক আলাদা টাইপের মেয়ে···তার মন বিরূপ হলো, তার মানে, সে বায়না নিলে, তাকে বিয়ে করতে হবে। তা কি হয়! ঘ্যান্‌ঘেনে···নিজের চিন্তায় কাতর! প্রাণ খুলে মিশতে পারতো না···নিজেকে রাখতো ঘোমটার আড়ালে।···

তরুণী কহিল,—ও! তাই মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেল···মানে, যোগিনী!

তরুণী উচ্চ হাস্য করিল!

প্রদীপ কহিল,—আমাদের এ-যুগের ফিলজফি সে বোঝে না। দেবদাসী-ছবি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে ক্ষেপে উঠলো! বলে, বিয়ে করো—বিয়ে করো! শেষে বুঝিয়ে বললুম, তা হয় না মীনা, বিয়ে যাকে করবো, ফুটলাইটের আলো থেকে তাকে নিতে পারি না! স্ত্রী যদি মাটীর পুতুল হয়, তাতেও এসে যায় না, কিন্তু স্ত্রী with a stage fame!

তরুণী বলিল,—আমার সে নির্ব্বুদ্ধিতা কখনো হবে না। We are free···ever···to live, and to love.

প্রদীপ হাসিল, কহিল,—That's it.

তার পর ডাকিল,—বয়···

মধু আসিল।

মধুর মনের মধ্যে যেন ভিসুভিয়াস জাগিয়াছে··· ভাবিতেছিল, যদি এ ভিসুভিয়াসের আগুন সে ছড়াইয়া দিতে পারিত···তার গলিত লাভায় যদি ঐ পিশাচটাকে···

প্রদীপ কহিল,—এক প্লেট ফাউল-কারি···তোমার কি চাই, উজ্জ্বলা দেবী?

উজ্জ্বলা কহিল,—দু'খানা কাটলেট···

মধু চলিয়া আসিল। আসিয়া ম্যানেজার বাবুকে বলিল, —আমার মাথা ঘুরুছে বড্ড, দাঁড়াতে পারছি না বাবু। অধরকে বলুন, বারো নম্বরে দু'খানা কাটলেট আর এক প্লেট ফাউল কারি দিয়ে আসবে···

এ-কথা বলিয়া মধু বারুণী ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। আসিল একেবারে লেকের ধারে···ভাবিল, আজিকার এ রাত্রি যদি না আসিত···এ-সব কথা যদি না শুনিত·

নিশ্বাস ফেলিয়া সে চাহিল লেকের পানে। সামনে লেকের বুকে কালো জলের পাথার···জলের বুকে আলোর রশ্মি!

মনে পড়িল, মীনা বলিত,—দ্যাখো মধু, কালো জলের বুকে ভাগ্যে মাঝে মাঝে ঐ আলো পড়েছে, নাহলে অত কালোয় ভয় হতো! লেকের দিকে চাইতে পারতুম না!

মধুর চোখের সামনে আলো নিবিয়া সব যেন কালোয় কালো হইয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্মৃতির জয়

ভাবি শতবার ভুলিব তাহারে
ভাবিব না আর তাহার লাগি'।
নয়নে নয়নে স্মৃতিরেখা তার
সজীব হইয়া উঠিছে জাগি'॥
ভুলিতে যা' চাই পারি না ভুলিতে
স্মৃতি যে আমারে করে'ছে জয়।
তাহার সজীব প্রতিমা হেরি যে
অন্তরে আর বিশ্বময়॥
কোন্ শুভখনে তার সাথে দেখা
বাঁধিল সে কোন্ প্রণয়-ডোরে।
কত যুগ গেল তবু স্মৃতি তার
রহিয়াছে মোর হৃদয় ভ'রে॥
সুন্দর সে যে নয়ন-জুড়ান
যেথা কভু যাহা মধুর হেরি।
তাহার স্মৃতিটি ভেসে উঠে মনে,
যেন সে আমারে রহি'ছে ঘেরি'॥
কভু বা স্বপনে হেরি সে প্রতিমা
বাঁধি' মোরে তার বাহুর পাশে;—
বলে—তুমি মোরে ভুলিতে চাহ গো?
ভোল দেখি বলি'—মুচকি হাসে॥
ক্ষণ পরে যেই অভিমান ভরে
চলি' গেল দূরে ফেলিয়া মোরে;
অমনি বিরহ বেদনা জাগিল
আমি যেন কাঁদি ঘুমের ঘোরে॥
সেই হ'তে তারে রেখেছি হৃদয়ে
জীবনে কখনো যাব না ভুলি'।
মোর যাহা কিছু দিয়াছি তাহারে
মোর তরে কিছু রাখি নি তুলি'॥

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত।

নূতন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র

যুক্তরাষ্ট্রের সমরবিভাগের জন্য অধুনা যে স্বয়ংচালিত বন্দুক নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান কালের ব্যবহৃত বন্দুকের অপেক্ষা পাঁচ গুণ অধিক ক্ষিপ্রতার সহিত গুলী বর্ষিত হইবে। ত্রিশ 'ক্যালিবার

নূতন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র

(রন্ধ্রের ব্যাস) বন্দুকের মধ্যে আটটি কার্টিজ বা গুলী থাকে। সেনাদলের বন্দুকে পূর্ব্বে হাত দিয়া কার্টিজ সরাইবার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা পরিহার করা হইয়াছে। এখন ঘোড়া টিপিবামাত্র আপনা হইতে গুলী পর পর নির্গত হইয়া যায়। একটা কার্টিজ হইতে গুলী বাহির হইবামাত্র উহার গ্যাস তৎক্ষণাৎ ফাঁকা কার্টিজকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানে নূতন কার্টিজকে আনিয়া দেয়।

ব্যোমবিহারী বিচিত্র গণ্ডোলা

ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার বেলুনসংলগ্ন গোলাকার গণ্ডোলা আকাশযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডের আকাশযাত্রীরা বায়ুপূর্ণ ব্যাগের সহিত উহাকে সংলগ্ন করিতেছেন। এই গণ্ডোলার মধ্যে বিবিধ যন্ত্র

আকাশপথে উড্ডীয়মান গণ্ডোলা

লওয়া হইয়াছে। আকাশযাত্রীরা যন্ত্রগুলির সাহায্যে আকাশপথে নানা প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এই সঙ্গে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে, যাত্রার পূর্ব্বে গণ্ডোলাকে আকাশ-মার্গে তুলিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবস্থা করিতেছেন।

বিমানাকৃতি দ্রুতগামী নৌকা

এক জন ইংরেজ এঞ্জিনীয়ার বিমানপোতের ডানার আকারবিশিষ্ট একটি দ্রুতগামী নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উইনডারমিয়ার

হ্রদে উহার পরীক্ষা চলিয়াছে। এই যাননির্ম্মাণে ৪০ হাজার ডলার মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। পরলোকগত টি, ই, লরেন্স যে পরিকল্পনা অনুসারে দ্রুতগামী নৌকা প্রস্তুত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এই ইংরেজ-এঞ্জিনীয়ার তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। লরেন্স এমন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যে, জলযানের উপর এমন ভাবে

বিমানের ডানার আকারবিশিষ্ট দ্রুতগামী জলযান

ছোট ছোট টর্পেডো রাখিবেন যে, বিদ্যুৎচালিত হইয়া তাহা শক্রর রণতরীবহরের উপর পতিত হইলে এক সপ্তাহে সমগ্র রণতরীবহর ধ্বংস হইয়া যাইবে।

স্বেদনিবারক ললাট-বন্ধনী

সেলুলুসনির্ম্মিত এক প্রকার স্বেদনিবারক বন্ধনী বাজারে বাহির হইয়াছে। ইহা ললাটদেশে রবারের সাহায্যে ধারণ করিতে হয়। এই বন্ধনী ধারণ করিলে স্বেদধারা ঝরিয়া দৃষ্টিশক্তিকে আদৌ

স্বেদ নিবারক ললাট-বন্ধনী

আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বন্ধনী সমস্ত স্বেদ শুষিয়া লয়। নিজের ওজনের বিশ গুণ স্বেদধারা এই বন্ধনী শুষিয়া লইতে সমর্থ। অস্ত্র-চিকিৎসক হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিস-ক্রীড়কগণ সকলেরই পক্ষে-এই ললাটবন্ধনী বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা

গ্রীসের এথেন্স সহরে প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান প্রাচীন পুস্তক বিদ্যমান। পাছে কীট প্রভৃতির উৎপাতে

গ্রন্থরক্ষার ব্যবস্থা

বা অন্য প্রকার অবস্থা বিপর্য্যয়ে গ্রন্থগুলি নষ্ট হয়, এজন্য লাইব্রেরীর রক্ষক প্রত্যেক গ্রন্থের পাশে ফাঁক রাখিয়া তাহার মধ্যে কীট পতঙ্গ-নাশক রাসায়নিক জলকণা নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাতে গ্রন্থগুলি নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

অভিনব কঙ্কণ

বাজারে এক প্রকার ব্রেস্‌লেট বা কঙ্কণ বাহির হইয়াছে। এই ব্রেস্‌লেট নানাবিধ বর্ণের পাওয়া যায়। এই ব্রেস্‌লেটকে একটু

বিচিত্র ব্রেস্‌লেট

টিপিলে বা ঘুরাইলে উহার মধ্য হইতে নারীর প্রসাধন উপযোগী তিনটি দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। একটিতে পাউডার পফ,

দর্পণ এবং মুখে মাখিবার পাউডার। আর একবার ঘুরাইলে রুজ বা ওষ্ঠানুলেপন, পফ্ এবং দর্পণ মিলিবে। তৃতীয়বার ঘুরাইবামাত্র গণ্ডে অনুলেপন উপযোগী লাল রঙ্গ পাওয়া যাইবে। বিলাসিনী-দিগের পক্ষে এই প্রকার ব্রেসলেট বিশেষ প্রয়োজনীয়।

অতিকায় বিমান "ড্রেডনট"

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের জন্য অতিকায় বিমান "ড্রেডনট" নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতে ভীষণ শক্তিশালী বোমা ও টর্পেডো সমূহ বাহিত হয়। এই উড্ডীয়মান জাহাজনির্ম্মাণে ১০ লক্ষ ডলার মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। ৪৯ হাজার পাউণ্ড ওজনের বিস্ফোরক পদার্থ উহার বিরাট দেহাভ্যন্তরে আছে। প্রত্যেক ডানার নীচে ২ হাজার পাউণ্ড ওজনের এক একটি টর্পেডো সংলগ্ন থাকে। নিম্ন দিকে উড়িবার সময় এককালে যুগল টর্পেডোই শত্রুপোতের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে, এমন ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি মিনিটে এই উড্ডীয়মান জাহাজের গতি ৪ মাইল। ১ হাজার ৫০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ৪টি এঞ্জিন এই পোতে সংলগ্ন আছে। ইহার পাল্লা ৪ হাজার মাইল পর্য্যন্ত।
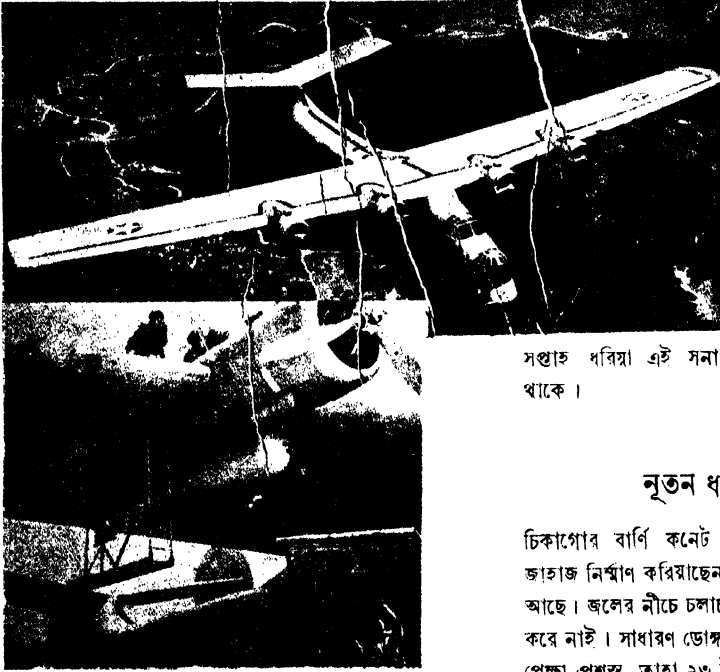
উপরের চিত্রে বিমান ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, নিম্নের চিত্রে ২ হাজার পাউণ্ড ওজনের টর্পেডো বিমানে সংলগ্ন করা হইয়াছে

সূর্য্যরশ্মি ল্যাম্প

নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন হাসপাতালে ধাত্রীরা আলট্রাভায়লেট সূর্য্যরশ্মির ল্যাম্প সাহায্যে নবজাত শিশুর দেহে সহজে চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকে। হাসপাতালে বহু শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পাছে শিশুদিগের সনাক্তকরণে ভুল হইয়া যায়, এই জন্য ধাত্রীরা শিশুদিগের গাত্রচর্ম্মে তাহার মাতার নামের আদ্য অক্ষর এবং প্রসূতির দেহেও তাহার নামের আদ্য অক্ষর সূর্য্যরশ্মি ল্যাম্পের সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া দেয়। ইহাতে সন্তানের অদল-বদল আর হইতে পারে না। দুই সপ্তাহ ধরিয়া এই সনাক্তকরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান থাকে।

সূর্য্যরশ্মি ল্যাম্পের সাহায্যে চিহ্ন অঙ্কিতকরণ

নূতন ধরণের ডুবো জাহাজ

চিকাগোর বার্ণি কনেট নামক এক ব্যক্তি মৎস্যাকৃতি একটি ডুবো জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহাতে এক জন লোকের থাকিবার স্থান আছে। জলের নীচে চলাচলের জন্য এত ছোট যান পূর্ব্বে কেহ নির্ম্মাণ করে নাই। সাধারণ ডোঙ্গা অপেক্ষাও ইহা ছোট। যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তাহা ২৩ ইঞ্চির অধিক নহে। উহার উচ্চতা মাত্র ৩৭ ইঞ্চি। ডুবো জাহাজে যে সব ব্যবস্থা থাকে, এই ক্ষুদ্র যানে তাহার সবই আছে। অক্সিজেন গ্যাস, বাতাস, পাম্প করিবার যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসদ্যোতক যন্ত্র সবই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দুই সেট বিদ্যুৎ-উৎপাদক ব্যাটারীও ইহাতে বিদ্যমান। এই বিচিত্র যানে চড়িয়া কনেট ৩ শত বার জলের মধ্য দিয়া এই পোতকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। ত্রিশ ফুট গভীর জলরাশির মধ্য দিয়া একাদিক্রমে এই ডুবো যানে চড়িয়া তিনি ১৪ মাইল গমন করিয়াছিলেন। এই যানসংলগ্ন ৪ ফুট পেরিস্কোপ যন্ত্র আছে। উহা জলের বাহিরে থাকে।
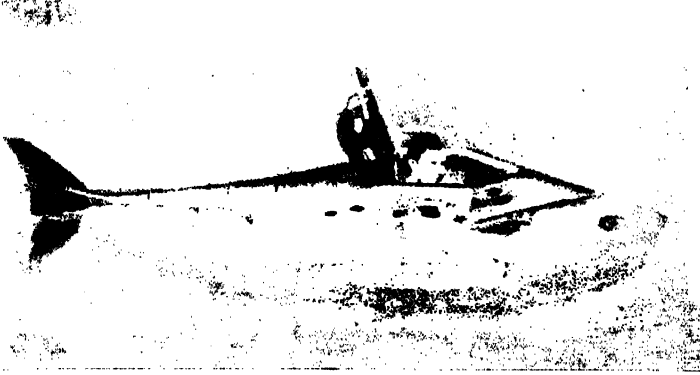
মৎস্যাকৃতি ডুবো জাহাজ

জেপলিনের নূতন রাণী

জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ জেপলিন "হিণ্ডেনবার্গ" ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আকাশ-যাত্রা কালে পুড়িয়া ধ্বংস হয়। সেজন্য এবার জার্ম্মাণী নূতন ধরণের

নূতন জেপলিন-রাণীর ব্যোমবিহার

জেপলিন নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই জেপলিনকে তাহারা 'জেপলিনের রাণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই জেপলিনের কক্ষগুলি হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ। আমেরিকা হইতে জার্ম্মাণী এবার অদাহ্য হিলিয়ম্ গ্যাস ক্রয় করিতে পারে নাই। হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষা হিলিয়ম্ ভারী হইলেও, উহা বিস্ফোরণ-প্রতিরোধক। যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মাণীকে ঐ গ্যাস বিক্রয় না করায় হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যেই এই অতিকায় বিমান আকাশপথে উড্ডীন হইবে। চিত্রে দেখা যাইতেছে—'জেপলিনের রাণী' ভূমি হইতে ব্যোমপথে উত্থিত হইতেছে।

অদ্ভুত শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র

সাধারণ ব্যাপার নহে। বর্ত্তমানে যে সকল অণুবীক্ষণযন্ত্র আছে, তাহার অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র দুই জন জার্ম্মাণ-বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ফলে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন বস্তুকে তাহার ৩০ হাজার গুণ অধিক বড় দেখাইবে।
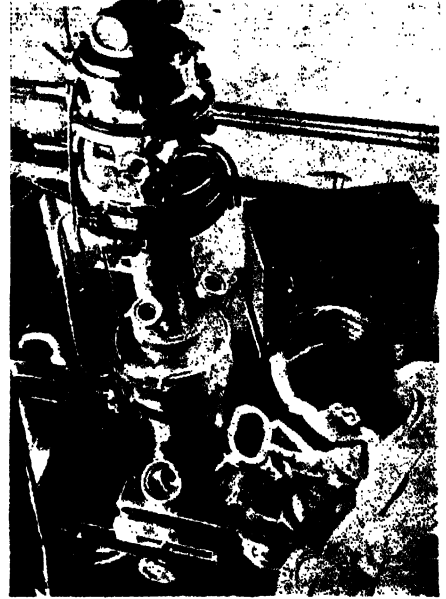
বিচিত্র অণুবীক্ষণযন্ত্র

কিরূপ শক্তিশালী কাচের দ্বারা ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকের সাধনা ক্রমশঃ অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিতেছে।

[উপন্যাস]

সপ্তত্রিংশ লহর

পুলিশ-কমিশনারের উৎকট সমস্যা

লণ্ডনের পুলিশ-কমিশনার লর্ড ব্রাডনীর সম্মুখে যে যুবকটি প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিল, লর্ড ব্রাডনী তাহার মুখের উপর এরূপ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহা দেখিলে মনে হইত, তিনি তাহার প্রতি দশ বার বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন।

লর্ড ব্রাডনী অতঃপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "তুমি কি এখনও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছ, যে দস্যু দীর্ঘকাল হইতে আপনাকে 'নিশাচর বাজ' বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছে—তুমিই সেই নিশাচর বাজ—যাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে, যাহার পৈশাচিক অত্যাচারে লণ্ডনের সম্ভ্রান্তসমাজ প্রপীড়িত, বিপন্ন ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে?"

এই যুবক বেসিল ফেটিস্‌বারি।

বেসিল ফেটিস্‌বারি পুলিশ-কমিশনারের সম্মুখে নীত হইয়া প্রথমে কিঞ্চিৎ দমিয়া গিয়াছিল; তাহার মুখে ভয়ের চিহ্ন প্রকাশিত না হইলেও সে মানসিক উৎকণ্ঠা দমন করিতে পারে নাই। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা তাহার নিজের জন্য নহে, শাস্তির ভয় মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে স্থান পায় নাই; কিন্তু দুশ্চিন্তা দমন করা তাহার পক্ষে সহজ হয় নাই। তথাপি সে অধীরতা প্রকাশ করিল না; সে যথাসাধ্য চেষ্টায় মন সংযত করিয়া, পুলিশ-কমিশনারের প্রশ্নে মুখে যে হাস্য সঞ্চয় করিল, তাহার সেই হাসি যেন নিদাঘাপরাহ্ণের নিবিড় মেঘস্তরের উপর প্রতিফলিত দিবাবসানের সুলোহিত তপন-কিরণ।

পুলিশ-কমিশনারের প্রশ্নে বেসিল ফেটিস্‌বারি মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, মহাশয়! আমি 'নিশাচর বাজ' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া এ কাল পর্য্যন্ত অবাধে এবং পুলিশের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া যে সকল দুঃসাহসের কাজ করিয়া আসিয়াছি, এবং যে সকল কার্য্যের জন্য প্রতিপদে পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহাদিগকে জনসমাজে ধিক্কারভাজন হইতে হইয়াছে, সেই সকল কার্য্যের জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহি; কিন্তু অবশেষে আমার অসতর্কতার জন্যই হউক, অথবা নিজের শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাসস্থাপনের ফলেই হউক, আমাকে ধরা দিতে হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আমার দণ্ডভোগের সময় উপস্থিত। আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, তাহা আমি অবিচলিত চিত্তে বহন করিতে প্রস্তুত। তবে আমাকে দণ্ড প্রদান আপনার এক্তারের বাহিরে। যে বিচারক আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার করিবেন, তাঁহাকে আমি যে গল্প শুনাইতে পারিব, কোন বিচারক সাধারণ দস্যু-তস্করের নিকট সেরূপ গল্প শুনিবার আশা করিতে পারেন না। আমি তাঁহার নিকট একটি হিসাব দাখিল করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমি এ দেশের তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কোষাগার হইতে যে অর্থরাশি লুণ্ঠন করিয়াছি—তাহার প্রত্যেক পেনি কি ভাবে ব্যয় করিয়াছি, তাহার হিসাব দাখিল করা আপনি অনাবশ্যক মনে করিতে পারেন; কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য আছে, তাহা প্রকাশের প্রয়োজন আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। আমার ইচ্ছা, আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতাখানি সংগ্রহ করিয়া আদালতে দাখিল করিব।"

লর্ড ব্রাডনী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার পুরোবর্ত্তী আসামীর

মুখের দিকে চাহিয়া, এবং মানসিক উত্তেজনা দমনে অসামর্থ্য-হেতু চেয়ারের উভয় হাতল দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া, চঞ্চল স্বরে বলিলেন, "তোমার অপকর্ম্মের সহযোগিগণের নাম আমার নিকট প্রকাশ করিতে, আশা করি, তোমার আপত্তি হইবে না। কারণ, তোমার কথা শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, তোমরা দলবদ্ধভাবে যে সকল কার্য্য করিয়াছ, তাহা বীরের কার্য্য বলিয়াই তুমি সিদ্ধান্ত করিয়াছ। এ অবস্থায় ঐ সকল বীরের নাম প্রকাশ করা, তুমি সম্ভবতঃ তাহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় বলিয়াই স্থির করিয়াছ। আমি জানি, রণজয়ী সেনাপতি তাঁহার সহযোগী বীরগণের নাম গোপন করিয়া রণ-জয়ের সকল গৌরব ও সাফল্য স্বয়ং উপভোগ করা ইতরের কার্য্য বলিয়াই মনে করেন।"

ফেটিস্‌বারি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আপনি আমাকে অতখানি নির্ব্বোধ মনে করিবেন না যে, আমি আপনার ন্যায় চতুর পুলিশ-কর্ম্মচারীর ধাপ্পায় ভুলিয়া আমার সহকর্ম্মী বন্ধুগণের জীবন বিপন্ন করিব। আমরা যে কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা সমর্থনের যোগ্য কি না, সে বিবেচনার ভার আমার উপর; কিন্তু আপনি আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য কি চক্ষুতে দেখিতেছেন—তাহাই বিবেচনা করিয়া আমি আমার বন্ধুগণের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করিব; এবং আমি কি করিব, তাহা আপনাকে বলিতেও আমার আপত্তি নাই। যে দল লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লীতে দীর্ঘকাল হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে—সেই দলের প্রকৃত অধিনায়ক সম্বন্ধে আপনি যদি কোন কোন কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে আপনার নিকট সে সকল কথা বলিতে আমি আপত্তি করিব না, বরং আগ্রহের সহিত সেই সকল সত্য কথা প্রকাশ করিব।"

লর্ড ব্রাডনী ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিলেন, "সে সকল কথা কি পেশাদারী অভিজ্ঞতার কাহিনী?"

পুলিশের সহিত ধস্তাধস্তিতে ফেটিস্‌বারির ললাটে আঘাত লাগায় তাহার ললাট কাটিয়া শোণিত নিঃসারিত হইয়াছিল; সে তাহার আহত ললাট করতল দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "আপনি যদি আশা করিয়া থাকেন, আমি যে কথা বলিব, তাহা পুলিশের গুপ্তচরের কার্য্যের ন্যায় আপনার কাযে লাগিবে, তাহা হইলে আমার দ্বারা আপনার সেই আশা পূর্ণ হইবে না—ইহা স্মরণ রাখিবেন। পুলিশের ইতর গুপ্তচরগুলার নিকট আপনি যেরূপ সাহায্য লাভ করেন, আমার নিকট আপনি সেইরূপ সাহায্য পাইবেন, এরূপ আশা আপনি করিতে পারেন, আপনার সম্বন্ধে এরূপ হীন ধারণা পোষণ করিয়া আমার নিকট আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করিব—আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা সেরূপ হীন নহে। আপনি পুলিশের কোন সাধারণ কর্ম্মচারী হইলে আপনার সম্বন্ধে সম্ভবতঃ আমার সেই প্রকার অবাঞ্ছনীয় ধারণা জন্মিতে পারিত। সত্য কথা বলিতে কি, সেই লোকটি জাতিতে আমেরিকান। সে আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। সে আমাদিগকে জব্দ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমরা তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করি নাই। সে 'ইল্লৎ' বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছিল।"

লর্ড ব্রাডনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল কোথায়?"

ফেটিস্‌বারি বলিল, "গত রাত্রে সে তাহার দলের কয়েক-জন লোকের সহিত হীথ্‌ল্যাণ্ডস্‌এ আসিয়াছিল; আমার সঙ্গীরা তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে তাড়াইবার জন্য এতই ব্যগ্র ছিল যে, আমারও অন্য দিকে দৃষ্টিপাতের অবসর ছিল না। এই জন্যই আমি তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পারি নাই; নতুবা কি পুলিশ আমাকে ধরিতে পারিত? আমি অনায়াসেই পলায়ন করিতে পারিতাম।"

লর্ড ব্রাডনী বলিলেন, "হাঁ, তা' পারিতে; তোমাদের সঙ্গিনীর ঘাড়ে অপরাধের সকল বোঝা চাপাইয়া পলায়ন করা সম্ভবতঃ তোমার পক্ষে কঠিন হইত না।"

লর্ড ব্রাডনীর এই তীব্র শ্লেষে বেসিল ফেটিস্‌বারির চোখ-মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু এত বড় অপমান সে নির্ব্বাক্ ভাবে সহ্য করিতে পারিল না। সে দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি ধরা পড়ায় আপনার সম্মুখে আনীত হইয়াছি। আমি আসামী, আপনি আমাকে অনায়াসে বিচারালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন; কিন্তু এভাবে আমার অপমান করিবার অধিকার আপনার নাই। আপনাদের দণ্ডবিধি আইনের ধারা আমার কিছু কিছু জানা আছে; পুলিশ কোন আসামীর প্রতি অপমান-জনক কথা বলিবে—আইন পুলিশকে এরূপ কোন অধিকার দিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হয় না।"

লর্ড ব্রাডনী বলিলেন, "আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে

তোমার সম্মান নষ্ট হইয়াছে, এরূপ আমি ধারণা করিতে পারি নাই; কিন্তু আমার কথা যে সত্য, ইহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই অপমানের জন্য তুমিই দায়ী নহ? কাযটা করিতে তোমার লজ্জা হইল না, আর আমি সেই কথার উল্লেখ করাতেই তোমার অপমান হইল!"

ফেটিস্‌বারি বলিল, "কিন্তু আপনার ঐ কথা সত্য নহে। আমি আপনার তাঁবেদার ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে যে কথা বলিয়াছিলাম, আপনাকেও তাহা বলিতে আমার আপত্তি নাই। হীথ্‌ল্যাণ্ডস্‌এ উপস্থিত হইয়া সেই যুবতীর নির্লজ্জার ন্যায় ঐভাবে নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দলের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এবং সে কোন দিন আমাদের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্যও আহূত হয় নাই। বস্তুতঃ, সে আমাদের দলের বাহিরের লোক —অর্থাৎ স্ত্রীলোক। সে পুলিশের কাছে স্বীকার করিয়াছে —আমাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। তাহার এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য কথা বলিতে কি, এরূপ বিরাট মিথ্যা আমি জীবনে অতি অল্পই শুনিয়াছি। সে যে দাবী করিয়াছে, তাহার সেই দাবী অসঙ্গত এবং মিথ্যা; আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।"

লর্ড ব্রাডনী বলিলেন, "সেই তরুণী তোমাদের দলভুক্তা, এ কথা অস্বীকার করিতেছ; কিন্তু ইহা কি সত্য?"

ফেটিস্‌বারি বলিল, "আপনি দয়া করিয়া স্মরণ রাখিবেন, আমরা মিথ্যা কথা বলি না।"

লর্ড ব্রাডনী বিদ্রূপভরে বলিলেন, "কিন্তু পরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন কর। কোন্‌টা অধিক অন্যায়? মিথ্যা কথা বলা, না, অপরকে সর্ব্বস্বান্ত করা?"

ফেটিস্‌বারি বলিল, "আমরা যে নীতি অনুসারে দস্যুবৃত্তি করি, তাহা সমর্থনযোগ্য; কিন্তু মিথ্যা কথা বলা ইতরের কার্য্য, আমরা তাহা ঘৃণা করি।"

লর্ড ব্রাডনী বলিলেন, "তবে কি আমাকে বিশ্বাস করিতে বল—সেই তরুণী তোমাদের অপরিচিতা?"

ফেটিস্‌বারি অনিচ্ছাভরে বলিল, "তাহার সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু সেই যুবতী সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা আমার জানা নাই। আমি শুনিয়াছি, তাহার নাম সিন্‌থিয়া হলগেট; কিছুদিন পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত তাহাকে সম্ভ্রান্তসমাজে মিশিতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পরে সে তাহার টাকাকড়ি সমস্তই হারাইয়া অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছিল।"

লর্ড ব্রাডনী—তাহার সম্বন্ধে আর কোনও কথা তোমার জানা নাই?

ফেটিস্‌বারি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আমি আর কোন কথা জানি না।"

লর্ড ব্রাডনী—তাহার সম্বন্ধে এই কয়টি মাত্র কথা আমার নিকট প্রকাশ করাই কি তোমার ইচ্ছা?

ফেটিস্‌বারি—সেই যুবতী সম্বন্ধে আমার যাহা জানা ছিল, তাহা আপনাকে বলিয়াছি; আপনি ঐ সকল কথা শুনিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই।

লর্ড ব্রাডনী কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উত্তম, এ সম্বন্ধে আমি তোমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না; কিন্তু তুমি বোধ হয় স্বীকার করিবে তোমার মত আসামী সম্বন্ধে আমারও কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য আছে।"

ফেটিস্‌বারি—হাঁ, আমি তাহা স্বীকার করি। আমি জানি, এই কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্যই সরকার আপনাকে চাকরীতে নিযুক্ত করিয়াছেন।

* * * * *

বেসিল ফেটিস্‌বারি পুলিশ-কমিশনার লর্ড ব্রাডনীর ইঙ্গিতে তাঁহার সম্মুখ হইতে অপসারিত হইলে লর্ড ব্রাডনী চিন্তাকুল চিত্তে দীর্ঘকাল তাঁহার চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পন্ন করা যে কত কঠিন, তাহা সেই দিন তিনি যেন মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। বেসিল ফেটিস্‌বারি সাধারণ দস্যু-তস্কর-শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইলে সমস্যা জটিল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইত না; কিন্তু বেসিল ফেটিস্‌বারি কে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তাহাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অনেক কথা চিন্তা করিবার ছিল।

সহসা তাঁহার আফিস-কক্ষের রুদ্ধ-দ্বারে কে করাঘাত করিল।

পুলিশ-কমিশনার রুদ্ধ-দ্বার অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কে তুমি? ভিতরে আসিতে পার।"

তাঁহার আদেশে ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট লর্ড ব্রাডনীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "একটি ভদ্রলোক এখানে দেখা করিতে আসিয়াছেন, মহাশয়! আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছি। তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

পুলিশ-কমিশনার দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর তিনি ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন, "উত্তম, তাহাকে আমার নিকট পাঠাইতে পার, আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব; কিন্তু সে একাকী আসিবে। আমি যে সময় তাহার সহিত আলাপ করিব, সে সময় অন্য কেহ এখানে না থাকে।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট বলিলেন, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।"

ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট পুলিশ-কমিশনারের আফিস-কক্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং দুই মিনিট পরে আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি মিঃ জেরাল্ড ফ্রষ্ট।"

পুলিশ-কমিশনারের ইঙ্গিতে ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট মিঃ ফ্রষ্টকে সেই কক্ষে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

তিনি পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিলে, মিঃ ফ্রষ্ট ঈষৎ হাসিয়া পুলিশ-কমিশনারকে বলিলেন, "মহাশয়, আমি 'ইভ্‌নিং সন্‌' নামক সংবাদপত্রের রিপোর্টার। আমি শুনিয়াছি, শীঘ্রই সংবাদপত্রসমূহে, জনসাধারণের অবগতির জন্য এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা প্রচারিত হইবে যে, যে বিখ্যাত দস্যু 'নিশাচর বাজ' নামে আত্মপরিচয় দিয়া থাকে, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এবং এই গ্রেপ্তারের ফলে জনসাধারণের ভয় ও উৎকণ্ঠা নিবারিত হইবে।—আমি এই যে সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কি সত্য?"

লর্ড ব্রাডনী মিঃ ফ্রষ্টের প্রশ্নের উত্তর দান না করিয়া দুই তিন মিনিট গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিলেন। সেই সময় তাঁহার পরিচিত কোন ব্যক্তি তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না! তাঁহার মুখ দেখিলে মনে হইত, তাঁহার বয়স হঠাৎ দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তিনি চিন্তা-সমুদ্রে পড়িয়া কোন দিকে যেন তাহার কুল-কিনারা দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি নত মস্তকে চিন্তা করিতেছিলেন; কিন্তু সহসা তাঁহার চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হইল। তিনি মুখ তুলিয়া মিঃ ফ্রষ্টের মুখের দিকে চাহিলেন; দুই একবার তাঁহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইল। তাহার পর তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য স্বয়ং আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি? আপনাদের অর্থাৎ আপনার ন্যায় সাংবাদিকগণের কার্য্যধারা আমার অজ্ঞাত। তবে আমার বিশ্বাস, আপনারা যে সকল সরকারী ঘোষণা শুনিয়া থাকেন—তাহা সত্য কি কি মিথ্যা, তাহা নিরূপণের জন্য সাধারণতঃ আপনারা পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সাক্ষাৎ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন না; আপনাদের যাহা বক্তব্য সংবাদপত্রেই তাহা প্রকাশ করিয়া সরকারের প্রচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মতামতের প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু তাহা না করিয়া আপনি স্বয়ং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

পুলিশ-কমিশনারের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া মিঃ ফ্রষ্ট বলিলেন, "আপনি সাংবাদিকগণের কার্য্যধারা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না আসিলেও পারিতাম, এবং সম্ভবতঃ সেইরূপ করাই সঙ্গত হইত; কিন্তু তথাপি আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে। ইহার কারণ, একটি যুবকের প্রতি যে অবিচার ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তাহা যদি আমি স্বয়ং চেষ্টা করিয়া নিবারণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য; এবং এই কথা চিন্তা করিয়াই আমি আপনার সহিত এ সম্বন্ধে সকল কথার আলোচনা করিতে আসিয়াছি। সাংবাদিকের কর্ত্তব্য হিসাবেও আমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি।"

পুলিশ কমিশনার স্তব্ধভাবে 'ইভ্‌নিং সন্‌'এর রিপোর্টার মিঃ ফ্রষ্টের এই সকল কথা শুনিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "আপনার সুদীর্ঘ ভূমিকা হইতে কাযের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! আপনার বক্তব্য কি, তাহা সংক্ষেপে বলুন। আমরা উভয়েই কাযের লোক, এবং আমাদের সময় কিরূপ মূল্যবান, তাহা যাঁহারা দৈনিক সংবাদপত্রে কায করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।"

মিঃ ফ্রষ্ট পুলিশ কমিশনারের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া

বলিলেন, "এবার সেই কথাই বলিতেছি। আমি সংবাদ পাইয়াছি, মিঃ বেসিল ফেটিসবারিকে অপরাধী মনে করিয়া পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে; এবং তিনি যে অবস্থায় ধরা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার এরূপ প্রতিকূল যে, তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে পুলিশকে দোষী করা যায় না। বেসিল ফেটিসবারি আত্মসমর্থন করেন নাই, আত্মসমর্থন করিয়া আপনাকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছাও তাঁহার নাই। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণের অধিকার তাঁহার নাই; অর্থাৎ তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া আপনাকে 'নিশাচর বাজ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য উৎসুক। কিন্তু তাঁহার এই পরিচয় সত্য নহে; সুতরাং তিনিই 'নিশাচর বাজ' এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পুলিশ যদি তাঁহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করে, এবং তিনি স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়া বিচারকের বিচারে কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করেন, তাহা হইলে সেই বিচার সুবিচার হইবে না। এই বিচার-বিভ্রাটে বাধাদান করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি যথা-সম্ভব সংক্ষেপেই সকল কথা আপনার গোচর করিলাম।"

লর্ড ব্রাডনী অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চাহেন: যে দস্যু 'নিশাচর বাজ' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া আপনার ব্যক্তিত্ব গোপন করিয়া আসিতেছে, বেসিল ফেটিস বারি সেই ব্যক্তি নহে, অন্য কোনও ব্যক্তি 'নিশাচর বাজ'? কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার জন্যই কি ফেটিসবারি তাহার অপকর্ম্মের দায়িত্বভার নিজের স্কন্ধে বহন করিতেছে?"

মিঃ ফ্রষ্ট বলিলেন, "হাঁ, আমি ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছি। আপনি আমার মনোগত অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন।"

লর্ড ব্রাডনী মিঃ ফ্রষ্টের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলিলেন না; তিনি তাঁহার সিগারেটের কৌটা হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া মুখে গুঁজিলেন, এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া স্তব্ধভাবে দুই এক মিনিট ধূমপান করিলেন। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল, এবং তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইল; যেন তিনি জটিল সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হইয়া অতঃপর তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন।

তিনি স্তব্ধভাবে সিগারেটটির কিয়দংশ দগ্ধ করিয়া, হঠাৎ মুখ তুলিয়া মিঃ ফ্রষ্টের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে প্রকৃত অপরাধী কে? আমি জানিতে চাই—যে ব্যক্তি 'নিশাচর বাজ' এই ছদ্মনামে আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছে, সে কে? তাহার প্রকৃত নাম কি?"

মিঃ ফ্রষ্ট বলিলেন, "আপনি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টকে এই রহস্যভেদের ভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনিও দীর্ঘকাল হইতে তদন্তে প্রবৃত্ত আছেন। তাঁহার ধারণা, নিশাচর বাজ কে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি এই ছদ্মনামে পরিচিত—তাহা তিনি জানেন, এবং আমার বিশ্বাস, তিনি যে সকল সংবাদ অবগত হইয়াছেন, তাহা আপনার গোচর করিয়াছেন। আপনি কি ইহা অস্বীকার করেন?"

মিঃ ফ্রষ্টের এই প্রশ্নে পুলিশ-কমিশনারের ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইল; তিনি তারস্বরে বলিলেন, "আপনি আমাকে জেরা করিবেন, আর আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর-দান করিব—এরূপ আপনি আশা করিবেন না। আমার সহিত আলাপে আপনি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিবেন না। আপনার ন্যায় দায়িত্বসম্পন্ন সাংবাদিককে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহা বিড়ম্বনাজনক বলিয়াই আমার ধারণা হইবে।"

মিঃ ফ্রষ্ট বলিলেন, "আমার কথা আপনার বিরক্তিকর হইয়াছে, এজন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু শিষ্টাচার সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ, আপনার এরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে সেই ধারণা যে সঙ্গত নহে, ইহা আপনাকে স্মরণ করাইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু বেসিল ফেটিস্‌বারি পুলিশের হাতে ধরা দিয়া যে আচরণ করিতেছেন, তাহা চালাইতে দেওয়া আমি অসঙ্গত মনে করি। কেবল অসঙ্গত নহে, তাহা আমার অসাধ্য। আমি তাঁহার অন্যায়াচরণে বাধাদান করিতে বাধ্য। যাহা সত্য, তাহাই আমি আপনার গোচর করিতে আসিয়াছি; ইহা ব্যতীত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য আমার নাই।"

লর্ড ব্রাডনী ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কাহার সম্বন্ধে আপনি সত্য কথা বলিতে আসিয়াছেন। নিশাচর বাজের সম্বন্ধে কি?"

মিঃ ক্রষ্ট নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপালোকের ন্যায় হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে—এ উভয়ই এক কথা।"

মিঃ ক্রষ্টের কথা শুনিয়া লর্ড ব্রাড্‌নীর চক্ষুযুগল সহসা সঙ্কুচিত হইল। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তাহা হইলে ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্টের সিদ্ধান্তই ঠিক?"

মিঃ ক্রষ্ট স্কন্ধ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "এই স্কচ্‌ম্যান তাঁহার কায ভালই বুঝিতে পারেন সন্দেহ নাই। আমি যে রাত্রিতে গণৎকার ক্রিজিনোভস্কির গৃহে হানা দিয়া সেখানে 'কফের' ভাঙ্গা বোতাম ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট সেই রাত্রির অব্যবহিত পরে উক্ত বোতাম আবিষ্কার করিয়া তাহা সনাক্ত করিয়াছিলেন। আমি আমার সহযোগিবর্গকে আদেশ প্রদানের জন্য যে সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া সাঙ্কেতিক ভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সেই ভাষার অর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং তাহার সাহায্যে প্রকৃত রহস্যের সন্ধান পাইয়া তিনি গতকল্য রাত্রিযোগে হীথ্‌ল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং গোপনে তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমার সাঙ্কেতিক ভাষায় নির্ভর করাতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছিল, একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আপনি ফরেষ্টকে রহস্যভেদের জন্য তদন্তে নিযুক্ত করিবার পর ঐ সকল লোকের সহিত অসঙ্কোচে যোগদান করা যে আমার পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক, ইহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এইজন্যই আমি সন্দেহভাজন হইয়াছিলাম, এবং এই সন্দেহ যে অসঙ্গত, একথা আমি বলিতে পারি না।"

পুলিশ কমিশনার মিঃ ক্রষ্টের কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "আপনি যে বিলক্ষণ চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি লণ্ডনের একখানি প্রধান সংবাদপত্রের রিপোর্টার হইলেও দস্যু-তস্কর দলের সহিত আপনার মিলিয়া-মিশিয়া কায করিবার শক্তি আছে, এই কথা আপনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।"

মিঃ ক্রষ্ট বলিলেন, "আপনি আমার ব্যবহারে চাতুর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন বলিলেন; কিন্তু আমি উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তবে আমি যাহা করিয়াছিলাম, তাহা এক সময় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। যাহা হউক, কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, আশা করি, আমি আপনার কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপন্ন করি নাই। আপনার সময় মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার যে সময় ব্যয় হইল, তাহাও নিরর্থক নহে; সুতরাং আপনার সময় নষ্ট হইল, এরূপ মনে করিবার কারণ দেখি না।"

লর্ড ব্রাড্‌নী বলিলেন, "আমাদের আলোচনাও মূল্যবান; আপনার কাহিনী আদ্যোপান্ত শ্রবণের জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। আপনি কি কারণে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে চাই।"

অতঃপর মিঃ ক্রষ্ট যে বিবরণ বিবৃত করিলেন, তাহা অদ্ভুত ও বিস্ময়োদ্দীপক।

[ক্রমশঃ]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ভুল-ভাঙ্গা

একা বসে রোগে ভুগি, সবারে বুঝাই—
পৃথিবীতে এ যাতনা কেহ সহে নাই।
হাসপাতালেতে গিয়ে ধরা পড়ে ভুল
ব্যথা-পারাবার সেথা হারায়েছে কূল।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

সূচীশিল্প

কথা ছিল এবারে বিভিন্ন রকমের সেলাই সম্বন্ধে কিছু বলবো। বলা মানে, সেলাইগুলির ছবি দেবো। ছবি ছাড়া বোঝা কঠিন।

যত দিন যাচ্ছে, নানা প্রয়োজনে সেলাইয়েও (Stitch) তত বৈচিত্র্য ঘট্‌ছে। যেমন leaf-stitch অর্থাৎ পাতার সেলাই। এ সেলাইটির সৃষ্টি হয়েছে সুতোয়-তৈরী গাছের পাতাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য। শিরা-শুদ্ধ গাছের পাতা এই ধরণেরই দেখায়। তার পর ঐ লেজি ডেজি-ষ্টীচ্ (lazy-daisy-stitch)। এর উল্লেখ গতবারে করেছি। এ ষ্টীচটির পরিকল্পনা হয়েছে সুতোয় বোনা ডেজি ফুলকে সত্যকারের ডেজি-ফুলের ঘুমন্ত অলস, অসংবদ্ধ রূপ দেবার জন্য। আসল কথা, শিল্পের উদ্দেশ্য, বাস্তবকে মোহন-রূপে প্রকাশ করা। যিনি সূচী-শিল্পী, এ-কথা তিনি জানেন এবং মানেন। তাই সব শিল্পীর মতো সূচীশিল্পীরও লক্ষ্য, শিল্পের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার দিকে। সুতোয়-বোনা ফুল-পাতা যেন রূপে-বেশে সত্যকার মতো দেখতে হয়।
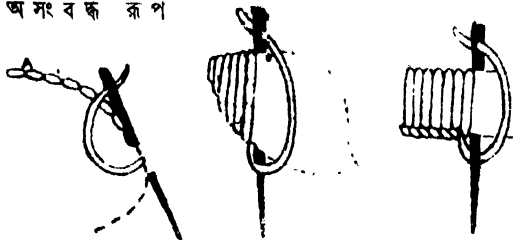
ষ্টেম্-ষ্টীচ্

ব্যাক্-ষ্টীচ্   স্যাটিন ষ্টীচ্   বট্‌ন্‌হোল-ষ্টীচ্

সেলাইয়ের যে-সব ছবি এবারে দেওয়া হলো, অনেকেই সে সব সেলাই হাতে-কলমে জানেন; কিন্তু সেলাইগুলোর নাম হয়তো জানেন না! তাই সূচী-শিল্পের বই, বিশেষ করে বিদেশী বই থেকে কোনো এমব্রয়ডারি তুলতে অসুবিধায় পড়েন। এ সব ফোঁড় কি করে তুলতে হয়, সে সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু লেখা বাহুল্য বলে মনে করি। কেন না, কি ভাবে ফোঁড় তুলতে হবে, প্রত্যেকটি ছবিতেই তা ছুঁচ-সুতো দিয়ে স্পষ্ট করে দেখানো আছে। ছবির ভাষার উপর আমাদের ভাষায় এ-সব সেলাইয়ের বর্ণনা সহজ হবে না।

লেজি-ডেজি-ষ্টীচ্

আমাদের ঘরের মেয়েদের মধ্যে শিল্প-কাজে যারা খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন, আগেই বলেছি, এ সব সেলাই তাঁরা জানেন। যাঁরা সেলাইয়ের কাজে সবে মাত্র হাতেখড়ি দিয়েছেন, গোড়ার দিকে শুধু প্রণালী লিখে দিলে অর্থাৎ হাতে-কলমে এ সব সেলাইয়ের কাজ সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে না দেখলে তাঁরা বুঝতে পারবেন না! সে জন্যও বটে, ভাষায় আমরা এ সব সেলাইয়ের বিশদ বিবরণ দেবার চেষ্টা করলুম না।
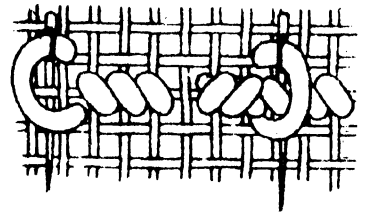
ক্রশ্-ষ্টীচ্

ছবি দেখে এ সব সেলাইয়ের ইংরেজী নামগুলি মনে রাখবেন। তাহলে এমব্রয়ডারি সম্বন্ধে সব কথা সুস্পষ্ট বোঝা যাবে।

উলের ব্লাউশ

গেল বারের উলের ব্লাউশটির বোনা বোধ হয় এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে এবং আশা করি, আমাদের নির্দ্দেশ বুঝতে কারো বিশেষ অসুবিধা হয় নি।

এবার আর ছুটি ব্লাউশের প্যাটার্ণ দেওয়া হলো। এ ছুটির ষ্টাইল খুব আধুনিক। প্রথমটির নাম "সিল্‌ভার এ্যারো" (Silver Arrow); দ্বিতীয়টির নাম "কর্ডুরয়" (Corduroy) জাম্পার-কোট।

"সিলভার এ্যারো" ব্লাউশটি তৈরী করতে লাগবে চার আউন্স সাদা রঙের উল এবং এক আউন্স গাঢ়-নীল-রঙের উল। আর চাই ন' নম্বরের এবং বারো নম্বরের ছ' জোড়া কাঠি এবং হাড়ের তৈরী একটি ক্রুশ। যদি বেল্ট-শুদ্ধ তৈরী করেন, তাহলে ছোট একটি বগলশ (buckles) চাই—বেল্টে আটকাবার জন্য।

ব্লাউশটির মাপ হবে—ঝুল ২১ ইঞ্চি। ছাতি—৩৫ ইঞ্চি। হিসেব-মত একে ছোট-বড় করতে পারেন।

সংক্ষেপোক্তি—সোঃ=সোজা; উঃ=উল্টো; সাঃ উঃ =সামনে উল দিয়ে তোলা (গতবারে এই ধরণের ঘর তোলার যে উপায় বলে দেওয়া হয়েছে—সেটি ঠিক উল্টো বলা হয়েছে। (এ ঘর তোলার নিয়ম—প্রথমে পিছনে উল দেবেন, অর্থাৎ উল্টো ঘর তোলার সময় যেমন দেন; তার পর কাঁটার মুখ সোজা করে একটি সোজা ঘর তুলবেন, তা হলেই একটি ঘরের জায়গায় ছুটি ঘর পাবেন)। নাঃ বুঃ তোঃ =না বুনে, ঘর এক-কাঠি থেকে আর এক-কাঠিতে তুলে নেওয়া। নাঃ বোঃ তোঃ=না-বোনা ঘরের মধ্য দিয়ে এই ঘরটীকে তুলে নেওয়া। এঃ=ছটী ঘর একসঙ্গে তোলা; ঘঃ কঃ=ঘর কমানো; ঘঃ বাঃ=ঘর বাড়ানো; রিঃ= রিপিট (পুনরাবৃত্তি)।

এইবার আসল কাজ আরম্ভ :—

পিঠের দিক

পিঠের দিকটা আগে করুন। ন' নম্বর কাঠিতে ১২১টি ঘর তুলুন। ৬ লাইন বুনুন—১টা সোঃ, ১টা উঃ এই প্যাটার্ণে। তারপর আসল প্যাটার্ণটি আরম্ভ করুন। বারো লাইনে প্যাটার্ণটি সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং ব্লাউশের সমস্তটাই তৈরী হবে এই ১ম লাইন ১২শ লাইনের প্যাটার্ণে। ১ম লাইন—৩টে সোঃ *, ২টো ঘর একসঙ্গে, ১টা সাঃ উঃ, ৬টা সোঃ। * এই চিহ্ন থেকে রিঃ করুন শেষ ঘর অবধি, গোড়ার ৩টে সোঃ বাদ দিয়ে কিন্তু শেষের ৬টা সোঃর জায়গায় ৪টা সোঃ করে। ২য় লাইনে—সব উল্টো। ৩য়—২টো সোঃ, * ছুটো ঘর এঃ, উঃ সাঃ, ১টা সোঃ, উঃ সাঃ, ১টা নাঃ বোঃ তোঃ (অর্থাৎ এই যে একটি সোজা ঘর এটি আগের ঐ নাঃ বুঃ তোঃ ঘরটির মধ্য দিয়ে তুলে নিতে হবে, নাঃ বুঃ তোঃ ঘরটিকে ফেলে দিয়ে)। ৩টে সোঃ। এইবার * এইখান থেকে এই প্যাটার্ণটি রিঃ করুন। কিন্তু শেষের ৩টো সোঃর জায়গায় ২টো সোঃ বুনবেন। ৪র্থ লাইন—সব উঃ। ৫ম—১টা সোঃ, * ২টো ঘর এঃ, উঃ সাঃ, ১টা সোঃ, উঃ সাঃ, নাঃ বুঃ তোঃ, ১টা সোঃ, নাঃ বোঃ তোঃ (আগের নির্দ্দেশমত), ১টা সোঃ। * থেকে এই প্যাটার্ণটি রিঃ করুন। ৬ষ্ঠ

প্লেন চেন-ষ্টীচ্

ফ্যাকড়া-চেন-ষ্টীচ্

রোমান্ চেন-ষ্টীচ্

রোমান-চেন-ষ্টীচ্ ফুটকিদার

লাইন—সব উঃ। ৭ম লাইন—৭টা সোঃ, * ২টো ঘর এঃ, সাঃ উঃ, ৬টা সোঃ। * থেকে রিঃ করুন লাইনের শেষে ৮টা সোঃ বুনে। ৮ম লাইন—সব উঃ। ৯ম—৬টা সোঃ, * ২টো ঘর এঃ, সাঃ উঃ, ১টা সোঃ, সাঃ উঃ, নাঃ বুঃ তোঃ, ১টা সোঃ, নাঃ বোঃ তোঃ, ৩টে সোঃ। * থেকে রিপিট করুন লাইনের শেষে ৬টা সোঃ বুনে। ১০ম লাইন—সব উঃ। ১১শ—৫টা সোঃ, * ২টো ঘর এঃ, সাঃ উঃ, ১টা সোঃ, নাঃ বোঃ তোঃ, ১টা সোঃ। * থেকে রিঃ করুন লাইনের শেষে ৫ম সোঃ বুনে।

১২শ লাইন—সব উঃ।

১২ লাইনে এই প্যাটার্ণটি শেষ হয়েছে,—আর একবার পুরো প্যাটার্ণটি রিঃ করুন, তার পর ১২ লাইনের প্রথম ৬ লাইন বুনুন। ৭ম লাইন—১২ নং কাঠিতে—* ৫টা সোঃ, ২টো ঘর এঃ, ৬টা সোঃ, ২টো ঘর এঃ। * থেকে রিঃ করুন লাইনের শেষে ১টা সোঃ বুনে (১০৫ ঘর হলো)। এইবার দেড় ইঞ্চি বুনুন—১টা সোঃ, ১টা উঃর প্যাটার্ণে।

"সিল্‌ভার এ্যারো"

৯ নম্বর কাঠিতে আগেকার ঐ "১২ লাইনের প্যাটার্ণ" করে যান। যখন দেখবেন বোনাটা সবশুদ্ধ ১৪ ইঞ্চি লম্বা হয়েছে, তখন হাতের মওড়া (sleeve shaping) আরম্ভ করুন। গোড়ার ছ' লাইন বোনবার পর :—

৭ম লাইন—লাইন আরম্ভ করার মুখে ৮টি ঘর তুলুন, তার পর যথানিয়মে বুনে যান।

৮ম লাইন—লাইন আরম্ভ করার মুখে ৮টি ঘর তুলুন ; তার পর যথানিয়মে বুনে যান। দুই লাইনের গোড়ায় এই ৮টি করে ঘর তোলা হলো ব্লাউশের ছোট হাতাটি তৈরী করার জন্য (১২১)।

যথানিয়মে বুনে যেতে হবে—যতক্ষণ না ঐ ৮ঘর তোলা হয়েছিল যে লাইনে, সে লাইন থেকে সমস্ত বোনাটি লম্বায় ৬॥ ইঞ্চি হয়।
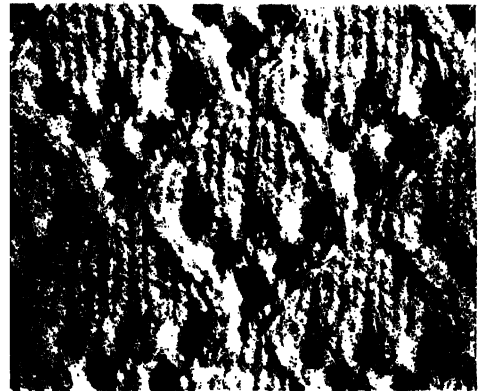
ব্লাউশের পিঠ

তার পর এর পরের ১০ লাইনে, প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় ৮টি করে ঘর ফেলতে হবে, তাহলে ১১শ লাইনের সময় কাঠিতে ঘর রইলো ৪১টি। এইবার ঐ ৪১টি ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

সামনের দিক

পিছনের দিক যে-নিয়মে করেছেন, ৩॥ ইঞ্চি অবধি সেই নিয়মে করুন। তার পর ব্লাউশের গলা আরম্ভ করুন। "১ম—১২শ" লাইনের প্যাটার্ণটির ৬ষ্ঠ লাইন অবধি করে ৭ম লাইন থেকে করুন নীচের প্যাটার্ণ অনুসারে :—

৭ম লাইনে গোড়া থেকে ৫৩ ঘর করুন "৭ম লাইনের" প্যাটার্ণ-অনুসারে ; তার পর বাকী ৫২টি ঘর অন্য একটি কাঠিতে তুলে রাখুন।

হেরিং চেন্ ষ্টীচ্ (মাছের কাঁটা)

হেরিং চেনের বাগিবের কাঁটা

এখন থেকে এই ৫৩টি ঘর নিয়ে "আসল প্যাটার্ণটি" বুনে যান। কিন্তু প্রতি ৬ষ্ঠ লাইন আরম্ভ করার আগে একটি করে ঘর কমাবেন।

এই ভাবে যখন মেপে দেখবেন গোড়া থেকে ১৪ ইঞ্চি বোনা হয়েছে, তখন প্যাটার্ণটির ৬ লাইন বুনে ৭ম লাইন আরম্ভ করার মুখে ৮টি ঘর তুলবেন, ব্লাউশের হাত করার জন্য। এখন প্যাটার্ণ-অনুসারে বুনে যান। তবে প্রতি ৬ লাইন অন্তর গলার দিকে একটি করে ঘর কমাতে ভুলবেন না। এইভাবে যখন হাতের অর্দ্ধাংশটুকু ৭॥ ইঞ্চি লম্বা হবে, এবং কাঠিতে মাত্র ৪০টি ঘর থাকবে, তখন কাঁধের কাছের অংশ বুনুন নীচের লেখা-অনুসারে :—

পরের লাইনে (হাতের দিকে) ৮টি ঘর ফেলুন এবং এক লাইন অন্তর এই একই দিকে ৮টি করে ঘর ফেলতে থাকুন। এইভাবে যখন সব ঘর বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সেই আলাদা কাঠিতে রাখা ৫২টি ঘর কাঠিতে তুলে নিন। সামনে উল দিয়ে একটি ঘর বাড়িয়ে ৫৩টি ঘর ক'রে এপাশটি যে নিয়মে বোনা হয়েছে, ঠিক সেই নিয়মে বুনে যান।

বেল্ট

শাড়ীর সঙ্গে পরলে ব্লাউশে এই বেল্টটি লাগানো বাহুল্য। তবে ফ্রকের সঙ্গে পরলে এটির দরকার হতে পারে।

১২নং কাঠিতে ১৬টি ঘর তুলুন নীল রঙের উল দিয়ে। ১টা সোঃ, ১টা উঃর প্যাটার্ণে বুনুন। ২৭ ইঞ্চি বোনার পর প্রতি লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর ফেলুন। এই ভাবে সব ঘরগুলি কমিয়ে ফেলুন।

পাতায় ক্রশ্ ষ্টীচ্

পাতায় প্লেট-ষ্টীচ্

গলার পটী

গলায় যে নতুন ধরণের পটী আছে, সেটা তৈরী করুন এই ভাবে :—

১২নং কাঠিতে নীল উল দিয়ে ৩টি ঘর তুলুন। ১টা সোঃ, ১টা উঃ—এই প্যাটার্ণে বুনুন। কিন্তু প্রতি এক লাইন অন্তর একটি করে ঘর বাড়ান। এই ভাবে সবশুদ্ধ ২৬টি ঘর হলে—২ লাইন বুনুন ঘর না বাড়িয়ে ; তারপর আবার প্রতি এক লাইন অন্তর লাইনের গোড়ায় একটি করে ঘর কমান। যখন কাঁটায় ৩টি মাত্র ঘর থাকবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

এই একই নিয়মে আর একটা টুকরো বুনুন।

এইবার আগের বারের মতো সব টুকরোগুলো ইস্ত্রী

করে জুড়ে ফেলুন, কাঁধ হাত ইত্যাদি। তারপর ছবিতে যেমন আড়াআড়িভাবে গলার পটীটি জোড়া আছে, সেই ভাবে পটী দুটি লাগান।

বেল্টের মুখে বগলশটি আটকে দিন। তারপর ক্রুশটি নিয়ে 'ভি' গলার ধারে এক-লাইন চেন বুনে দেবেন। বেল্ট গলাবার জন্য ব্লাউশের দু'পাশে দুটি পটী করে নেবেন।

জাম্পার-কোট

এটি তৈরী করতে লাগবে এগারো-আউন্স সাদা রঙের উল; আর চাই সাত নম্বরের এবং দশ নম্বরের দু'জোড়া কাঠি; সিকি গজ নীল লিনেন-কাপড়; আর বোতামের জন্য আধুলি-সাইজের ছ'টি পার্ল-বোতাম।

কোটটির ঝুল হবে ২২ ইঞ্চি; কোটের বোতাম বন্ধ করলে ছাতি হবে ৩৫॥ ইঞ্চি; কাফ-সমেত হাতের লম্বাই ১৯॥ ইঞ্চি। তার পর ছোট-বড় —সে-কাজ হিসাব-মাফিক করতে পারেন।

গোড়ায়-একটা কথা মনে রাখবেন —চওড়ার দিকে পাঁচটি-ঘর তুললে তবে হবে এক ইঞ্চি; আর লম্বায় ১৫ লাইনে এক ইঞ্চি হবে।

বোনবার সময় নীচের বা তলার দিক থেকে বোনা সুরু করবেন। তাতে ধারগুলো হবে বেশ মজবুত আর পাকা; বাঁধন কোথাও আল্‌গা হবে না।

পিঠ

নীচের দিক থেকে বোনা সুরু করতে হবে। সাত-নম্বর কাঠিতে ৮১টি ঘর তুলুন। এক ইঞ্চি বুনুন মস্ (moss) ষ্টীচে অর্থাৎ সাবুদানা-বুনন (৮১টি ঘর ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনবেন—কিন্তু বিষম ঘর হওয়ার জন্য শেষের ঘরটি শেষ হবে সোজায়; তার পরের লাইন আরম্ভ করবেন সোজায়। মানে, প্রত্যেক লাইন শেষ হবে সোজায় এবং আরম্ভ হবে সোজায়—আর ১টা সোঃ, ১টা উঃ প্যাটার্ণে বুনবেন)।

তার পরে এক ইঞ্চি এই প্যাটার্ণে বুনে আসল প্যাটার্ণটি আরম্ভ করুন:—১ম লাইন—সব সোঃ। ২য় লাইন—সব উঃ। ৩য় লাইন—সব উঃ। ৪র্থ লাইন—সব সোঃ।

এই চার লাইনের যে-প্যাটার্ণ, সেই প্যাটার্ণে সমস্ত ব্লাউশটি বুনতে হবে। আর একবার এই প্যাটার্ণটি রিঃ করুন। তার পরের লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর ফেলুন (৭৯)। তার পর প্রত্যেক ৪র্থ লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর ফেলবেন। এই ভাবে ঘর ফেলতে ফেলতে কাঠিতে যখন ৭১টি ঘর থাকবে, তখন ১০নং কাঠিতে ঘর বদলে নিয়ে ২ ইঞ্চি "আসল প্যাটার্ণে" বুনুন।

জ্যাম্পার-কোট

আবার ৭নং কাঠিতে ঘর বদলে নিন, নিয়ে পরের লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর বাড়ান। তার পর থেকে প্রত্যেক ৪র্থ লাইনের গোড়ায় এবং শেষে একটি

করে ঘর বাড়ান—এই ভাবে ঘর বাড়িয়ে যান, যতক্ষণ না কাঠিতে ৮১টি ঘর হয়। তার পর না বাড়িয়ে বুনে যান—যতক্ষণ না বোনাটি লম্বায় ১৫ ইঞ্চি হয়। তার পর হাতের ফাঁদ সুরু করুন।

এর পরের আট লাইনে, প্রতি লাইনের গোড়ায় ২টি করে ঘর ফেলুন (৬৫); তার পর প্রতি এক লাইন অন্তর লাইনের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর ফেলুন। এই ভাবে কাঠিতে যখন ৬১টি ঘর হবে, তখন আর ঘর না কমিয়ে বুনে যাবেন—হাতটি যতক্ষণ না—মানে, প্রথম ঘর বোনা হয়েছিল যে-লাইনে, সেই লাইন থেকে লম্বায় ৬॥ ইঞ্চি হয়।

তার পর প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় ৫টি করে ঘর

পাতায় ফ্ল্যাট প্লেট

পাতায় হেরিং বোন্ ষ্টীচ্

ফেলবেন—এইভাবে ঘর ফেলতে ফেলতে কাঠিতে যখন ২১টি ঘর থাকবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

সামনের বাঁ দিক

সাত নম্বর কাঠিতে ৪৫টি ঘর তুলে এক ইঞ্চি "মস ষ্টীচে" বুনুন (সাবুদানা)। তার পর আসল প্যাটার্ণ ধরে ৮ লাইন বুনে, ৯ম লাইনের গোড়ায় ১টি ঘর ফেলুন। তার পর প্রত্যেক তিন লাইন অন্তর চতুর্থ লাইনের গোড়ায় ১টি করে ঘর ফেলে যান। এই ভাবে ঘর ফেলতে ফেলতে কাঠিতে যখন ৪০টি ঘর থাকবে, তখন আর ঘর না ফেলে ৭নং কাঠিতে সেগুলি তুলে নিন এবং পরের লাইনের গোড়ায় ১টি ঘর বাড়ান। তার পর প্রতি ৪র্থ লাইনের গোড়ায় ১টি করে ঘর বাড়িয়ে যান—যতক্ষণ না কাঠিতে আবার ৪৫টি ঘর হয়। এবার আর না বাড়িয়ে বুনে যান—যতক্ষণ না বোনাটুকু লম্বায় ১৫ ইঞ্চি হয়।

এইবার হাতের ফাঁদ আরম্ভ করুন।

পরের লাইনের গোড়ায় ২টি ঘর ফেলুন। তারপর প্রতি এক লাইন অন্তর ২টি করে ঘর ফেলুন—কাঠিতে যখন ঘর কমে ৩৭টি হবে, তখন এক লাইন অন্তর ১টি করে ঘর হবে—তখন এক লাইন অন্তর একটি করে ঘর ফেলুন। যখন কাঠিতে ৩৫টি ঘর থাকবে, তখন আর না বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্যাটার্ণ-অনুযায়ী বুনে যান ১½ ইঞ্চি। দেড় ইঞ্চি বোনা হলে পরের লাইনের শেষে একটি ঘর ফেলুন (৩৪)। তারপর ঐ একই দিকের লাইন আরম্ভ করার গোড়ায়—প্রত্যেক এক লাইন অন্তর ১টি করে ঘর ফেলুন। এইভাবে যখন কাঠিতে ২০টি ঘর থাকবে,—তখন আর না কমিয়ে বুনে যান। হাতটি লম্বায় ৭২ ইঞ্চি হলে, কাঁধ আরম্ভ করুন:—

প্রথম লাইনের গোড়ায় ১টি ঘর ফেলুন—তারপর প্রতি এক লাইন অন্তর ৪টি করে ঘর ফেলুন। এবং এইভাবে ঘর ফেলতে ফেলতে সব ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

সামনের ডান দিক

ঠিক বাঁদিককার নিয়মে বুনে যাবেন। তবে সব কাজগুলি আরম্ভ হবে উল্টো দিক থেকে।

হাত

১০ নম্বর কাঠিতে ৩৯টি ঘর তুলে দেড় ইঞ্চি বুনুন মস্ ষ্টীচে। ৭ নং কাঠিতে ঘর বদলে নিন, নিয়ে আসলে প্যাটার্ণ অনুযায়ী বুনে যাবেন, তবে দেড় ইঞ্চি বোনার পরের গোড়ায় এবং শেষে ১টি করে ঘর বাড়াবেন। তারপর প্রতি ছ' লাইন অন্তর ১টি করে ঘর বাড়াবেন—লাইনের গোড়ায় এবং শেষে। এইভাবে যখন কাঠিতে ৬১টি ঘর হবে, তখন আর ঘর না বাড়িয়ে বুনে যান। হাতটি যখন লম্বায় ১৯ ইঞ্চি হবে, তখন প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় ২টি করে ঘর ফেলবেন। এইরকম ভাবে কাঠিতে যখন ৯টি ঘর থাকবে, তখন সব ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

বোতামের পটী

১০ নং কাঠিতে ৯টি ঘর তুলুন ; তুলে ৪ লাইন বুনুন মস ষ্টীচ-অনুযায়ী। ৫ম লাইন—৩টি ঘর—মস্ ষ্টীচ, ৩টি ঘঃ বঃ, ৩টি মঃ ষ্টীঃ। ৬ষ্ঠ লাইন—৩টি মঃ ষ্টীঃ, ৩টি ঘঃ তোঃ, ৩টি মঃ ষ্টীঃ। আবার মস ষ্টীচে বুনুন। তারপর থেকে প্রতি ৩ ইঞ্চি অন্তর এই ৫ম ও ৬ষ্ঠ লাইন অনুযায়ী
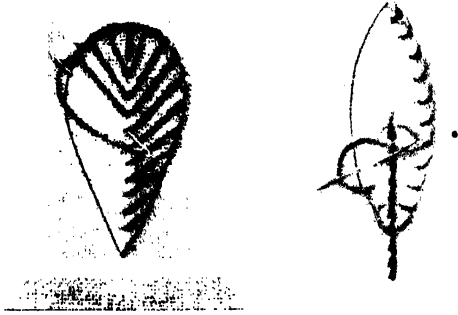
বটনহোল্স ষ্টীচদার পাতা ছোট বটনহোল্দার ছুঁচালো লীফ ষ্টীচ

বুনে যখন ৬টি বোতাম-ঘর হবে এবং পটীটি সামনের বোনা অর্দ্ধাংশের সঙ্গে সমান হবে, তখন ঘর বন্ধ করে ফেল্‌বেন।

আর একটি এইরকম পটী চাই বোতাম বসাবার জন্য। ১০ নং কাঠিতে ৯টি ঘর তুলে আগাগোড়া মস্ ষ্টীচে বুনে যান। বোতাম-ঘর আর তুলবেন না ; সামনের অংশের সঙ্গে এই দ্বিতীয় পটীটি সমান হলে ঘর বন্ধ করে ফেলুন।

কলার

১০ নং কাঠিতে ৩টি ঘর তুলে মস্ ষ্টীচে বুনে যান—বরাবর মস্ ষ্টীচে বুনবেন কিন্তু প্রতি এক লাইন অন্তর একই দিকে ১টি করে ঘর বাড়াবেন। এই উপায়ে কাঠিতে ১৯টি ঘর না হওয়া পর্য্যন্ত ঘর বাড়িয়ে যান। তারপর ঐ একই-দিকে প্রতি এক লাইন অন্তর ঘর কমিয়ে যান—কাঠিতে যে পর্য্যন্ত না ৩টি ঘর থাকে। এইবার ঘর বন্ধ করে ফেলুন। ঠিক এই রকম ভাবে আর একটি কলার তৈরী করুন।

এইবারে কাঁধ, পাশ এবং হাত জুড়ে ফেলুন। বোতাম পটী চুটি সেলাই করে, বোতাম-ঘরের সঙ্গে সমান করে বোতাম ছ'টি বসিয়ে নিন, তারপর কলার চুটি ছবির মত করে জুড়ে নিন।

দেহের শ্রী ও সৌষ্ঠব

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র বাড়ীর পোষা কুকুর-বিড়ালরা দেহ ছড়াইয়া (Stretch) স্বচ্ছন্দ হয়—এ-দৃশ্য কে না দেখিয়াছেন? অনেকে হয়তো ভাবেন, অবোলা পশু,—দেহকে এভাবে প্রসারিত করিয়া কি তার লাভ হয়!

সকালে এভাবে দেহ-ছড়ানোর অর্থ আছে। পশু-পক্ষী আজো নিসর্গ-বিধি মানিয়া চলে, তাই তারা সুস্থ থাকে। আমরা যত সভ্য হইতেছি, ততই নানা নকল নিয়ম-বিধি সৃষ্টি করিয়া দেহকে অকারণে অসুস্থ ও প্রপীড়িত করিতেছি! ঘুম ভাঙ্গিবার পরে কুকুর-বিড়াল সর্ব্বাঙ্গ অমন প্রসারিত করে কেন, জানেন?

ঘুমাইবার সময় তারা পাগুলাকে দেহ ঘিরিয়া কুণ্ডলী-ভাবে রাখিয়াছিল, সেজন্য পা হইয়াছে অসাড়-অবশ। জাগিবামাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আবার স্বচ্ছন্দ করা চাই, তাই নিসর্গ-বিধি-বশে কুকুর-বিড়াল,—শুধু কুকুর-বিড়াল কেন, সকল পশুই অমন করিয়া পা ছড়াইয়া দেহ প্রসারিত করিয়া দেহের কল-কজাগুলাকে স্বচ্ছন্দ সক্রিয় করিয়া তোলে।

এই ভাবে হাত-পা ও দেহ সম্প্রসারিত করায় ব্যায়াম-কাজ পর্য্যায়ক্রমে নির্ব্বাহিত হয়। আমরা যখন ঘুমাই, তখন আমাদের দেহ নানাভাবে অবস্থান করে। সে সময় দেহমধ্যে রক্তচলাচল-ক্রিয়া অব্যাহত থাকে না। জাগিবামাত্র সময়-সময় কাঁধে-ঘাড়ে-হাতে-কাঁখে-পায়ে যে-ব্যথা অনুভব করি, তার কারণ গা মুড়িয়া শুইবার দোষে! কাজেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে স্বচ্ছন্দ করিবার জন্য নিদ্রা-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ সম্প্রসারিত করা নিসর্গ-নির্দ্দিষ্ট বিধি। এ বিধি আমরা মানি না—জন্তু-জানোয়ার আজো মানিয়া চলে ; তাই তাদের দেহের গঠন সুঠাম থাকে চির-কাল।

এভাবে সর্ব্বাঙ্গ সম্প্রসারিত করার ফলে আর একটা মস্ত লাভ হয় এই, দেহের বাঁধন ভালো থাকে। কাজকর্ম্ম

না করিলে মানুষের দিন চলে না। কেহ হয় তো অফিসের চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া কাজ করিতেছেন ; কেহ বা রন্ধনশালায় পিঁড়িতে বা উবু হইয়া বসিয়া নিত্য রান্না-বান্না করিতেছেন,—সেজন্য কোমর মুড়িয়া থাকে, পিঠ ঝুঁকিয়া থাকে এবং তাহার ফলে দেহের গড়ন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বাঁকিয়া-ফুলিয়া বেয়াড়া হইয়া ওঠে! একভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিলে আমাদের হাত-পা টন্-টন্ করে, কোমর-পিঠ ঝন্-ঝন্ করে,—আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাতের পায়ের খিল ছাড়াইতে হয়—এ সব কারণে মাঝে মাঝে হাত-পা ছড়াইয়া দেহকে প্রসারিত করায় বহু অস্বস্তি-উপসর্গের দায় হইতে নিস্তার পাই।

যাঁরা বেশীমাত্রায় মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁদের পক্ষে (stretching) দেহ-সম্প্রসার অত্যাবশ্যক। ইহাতে দেহে-মনে স্বাচ্ছন্দ্য মিলে।

যাঁরা দেহ-চর্য্যা করেন, তাঁরা বলেন, মাঝে মাঝে আমরা যদি দেহ বাঁকাই (bend our bodies), তাহা হইলে সে ব্যায়াম-ক্রিয়ার ফলে হাত-পা মজবুত থাকে, দেহের শক্তি খর্ব্ব হয় না। ব্যায়াম করিবার অবসর যদি না পান, বেশ, এইভাবেই মাঝে মাঝে দেহ সম্প্রসারিত করুন, আড়ামোড়া ভাঙ্গুন—তাহাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে—বাত বা হাতে-পায়ে ঝন্ঝনানি যাতনা সহিতে হইবে না।

নিত্য এই সম্প্রসার-বিধি মানিয়া চলিলে আমাদের দেহ কোনোদিন তার স্বাভাবিক গড়ন-ছাঁদ হারাইবে না।

আমাদের দেহের সঙ্গে মোটর গাড়ীর তুলনা করা চলে। গাড়ীতে না চড়িয়া গেরাজে যদি ছ'মাস গাড়ী ফেলিয়া রাখেন, তাহা হইলে সে গাড়ীকে পরে সহজে সচল করা চলে না। গাড়ী নিত্য ব্যবহার করা চাই, নহিলে কলকব্জায় মরিচা ধরে—কলকব্জা বিগড়ায়। দেহও ঠিক তেমনি! এক সপ্তাহ চুপচাপ ঘরে বসিয়া থাকুন, নড়া-চড়া করিবেন না—দেখিবেন, হাঁটু এবং অপর গ্রন্থিগুলি কাঠের মতো শক্ত হইয়া গেছে—হাঁটু ও গ্রন্থি ব্যথায় টন্‌টন্ করিতেছে।

দেহের গঠন সুঠাম-সুশ্রী রাখিতে মেয়েদের পক্ষে দেহ-সম্প্রসার অত্যাবশ্যক। নিয়ম করিয়া নিত্য দেহ-সম্প্রসার-বিধি মানিয়া চলিলে দেহ বাঁটুল বা খাটো হইবে না ; দেহ দীর্ঘ হইবে। উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সেও যে-মেয়ের বাড় যথানুরূপ হয় নাই, দেহ-সম্প্রসার-বিধি মানিয়া চলিলে তাঁর দেহ যোগ্যানুরূপ দীর্ঘ হইয়াছে, দেখিবেন।

দেহপ্রসারে পরিশ্রম-জনিত ক্লান্তি ঘুচিয়া যায়। (Stretching and relaxing go together). পরিশ্রমের পর হাত-পা-দেহ ছড়াইয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গুন, সারা দেহে স্নিগ্ধ বিরাম-সুখ উপভোগ করিবেন ; ক্লান্তি অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে ঘুচিবে, এবং তার পর তখনি আবার দ্বিগুণ শক্তিতে কাজ করিতে পারিবেন। শীতকালে অনেকে জুজু-বুড়ী হইয়া থাকিতে চান—ব্যায়াম-বিধি পালন করিতে চান না—

১। খাড়া পায়ে সিধা

শীতের দিনে দেহ-সম্প্রসার-বিধি মানিতে তাঁদের কোনো হাঙ্গামা নাই। শীতের দিনে এ বিধির উপকারিতা খুব বেশী উপলব্ধি করিবেন। শীতের ভয় কমিবে।

এবারে দেহ সম্প্রসারণ-বিধির কথা বলি।

প্রথমে—খাড়া পায়ে সিধা সোজা হইয়া দাঁড়ান। বুক যেন পিছনে না ঝোঁকে—কোল-কুঁজোভাবে দাঁড়াইবেন না। বুক চিতাইয়া দাঁড়াইতে হইবে। (১নং ছবি) কনুইয়ের

কাছে দুমড়াইয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেহ ছড়ান্। এ সময় যদি দু'চারিটা হাই তুলিতে পারেন, আরো ভালো।

দুই—চেয়ারে বসিয়া চেয়ারের পিঠে বগল দিয়া দুই হাত পিছন দিকে ঝুলাইয়া দিন। (২নং ছবি) তার পর সামনের দিকে বুক ফুলাইয়া দুই পা একসঙ্গে জোড়-গাঁথিয়া ঊর্দ্ধে তুলুন। দু'-পায়ের চেটো সামনের দিকে যথাসম্ভব হেলাইয়া দিন। এবারে দু'হাত মিলাইয়া মুষ্টিবদ্ধ করুন। হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দু'পা একবার ঊর্দ্ধে তুলুন, পরক্ষণে নামান। প্রায় বিশবার এ ব্যায়াম-লীলা করিলে হাত-পা বুক-পিঠ ও কোমরের গড়ন কমনীয় থাকিবে।
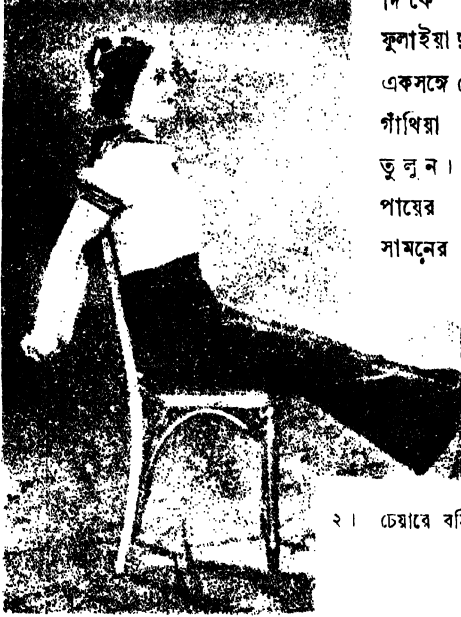
২। চেয়ারে বসিয়া

৩। কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত

তিন—এবার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেহের ঊর্দ্ধাংশ সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া চেয়ারে বসুন। দুই হাত দুই দিকে ঝুলানো থাকিবে। (৩নং ছবি দেখুন) এবার পিঠ ছড়ান—সঙ্গে সঙ্গে দুই কাঁধ বারংবার প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করুন।

চার—উঠিয়া দাঁড়ান। দু'পায়ের মধ্যে যেন বেশ খানিকটা ফাঁক থাকে (৪নং ছবি দেখুন)। এবার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া দিন—দুই হাত তুলুন ঊর্দ্ধে অর্দ্ধ-চক্রাকারে। পিঠ ও কাঁধ বেশ প্রসারিত থাকিবে। এবার দু'হাত পিঠের উপর দিয়া ডাহিনে-বামে ঘুরান্ (সামনের দিকে নয়)—যেন এ-হাত দিয়া ও-হাত ধরিতে চাহেন, এমনি ভাবে। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ দশ-পনেরো মিনিট ধরিয়া।

৪। সামনের দিকে ঝুঁকুন

পাঁচ,—আগের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকুন। এবারে দু'হাত বুকের দিকে রাখুন। দু'হাত ৫নং (৫নং ছবি দেখুন) ছবির ভঙ্গীতে ধরুন। দু'হাত দিয়া দু'হাতের কনুই ধরিতে হইবে। এই ভাবে সামনে-পিছনে ধীরে-ধীরে চলা-ফেরা করুন প্রায় বারো বার। এ ব্যায়ামে কোমর ও জঘনদেশ সুস্থ, সুঠাম থাকিবে।

ছয়,—সামনে একখানি চেয়ার রাখিয়া ধরিয়া দাঁড়ান। তার পর ডান পা তুলিয়া পায়ের গোড়ালি দিয়া চেয়ার

৫। দু'হাত বুকের দিকে

চাপিয়া থাকুন। এখন এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছেন—এই ভাবেই থাকিতে হইবে। এবার পিঠ বাঁকাইয়া ডান পায়ের হাঁটুর উপর মাথা রাখুন (৬নং ছবি দেখুন)। এই ভাবে পাঁচ মিনিট কাল থাকিবার পর ডান পা নামাইয়া বাঁ পা তুলুন এবং পূর্ব্বোক্ত ভাবে বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে মাথা রাখুন। এ ভাবে পাঁচ মিনিট কাল থাকিতে হইবে

৬। ডান পায়ের হাঁটুতে মাথা

নিত্য এ কয়টি ব্যায়াম-চর্চ্চা করিলে কোনদিন দেহ-গঠন সম্বন্ধে দুঃখ-অনুতাপ করিতে হইবে না। দেহ থাকিবে ছিপ্‌ছিপে এবং সে দেহে শ্রী ও সৌন্দর্য্যের বাস কায়েমিভাবে অবস্থান করিবে। চিরযৌবনা থাকিবেন।

আর একটি সহজ সম্প্রসার-বিধির কথা বলি। মাথায় যদি আর একটু বাড়িতে চান,—কাজে-কর্ম্মে হাঁফ ধরিলে সে অস্বস্তি হইতে যদি মুক্তি চান, তাহা হইলে দিনে দু' তিন বার করিয়া—যখনি সুবিধা পাইবেন,—চিৎ হইয়া শয়ন করিবেন; দু'হাত সামনে প্রসারিত করিয়া দিবেন। জোর পাইবার জন্য হাত দিয়া কঠিন ও নিশ্চল কোনো সামগ্রী ধরিয়া থাকিবেন (৭নং ছবি দেখুন)। পায়ের দিকেও কঠিন নিশ্চল কোনো সামগ্রী রাখিয়া, তাহাতে কিম্বা

৭। চিৎ হইয়া শয়ন

দেওয়াল থাকিলে সেই দেওয়ালে পা ঠেকাইয়া রাখিবেন (পায়ে জোর পাইবার জন্য) ; তার পর আড়ভাবে ও পরক্ষণে কাৎ-ভাবে সমস্ত দেহকে একবার সঙ্কুচিত ও পরক্ষণে প্রসারিত করিবেন। দেহের এই সঙ্কোচ ও প্রসারণ-ক্রিয়া চলিবে দশ মিনিট-কাল।

প্রসাধন

সেণ্ট বা গন্ধ-মাখা—

এ যুগে সেণ্ট-ব্যবহার শুধু ফ্যাশন নয়, প্রসাধনের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অলক্ত-রাগে চরণ রাঙানো বা কপালে টিপ পরা কিম্বা বেণী-রচনার সঙ্গে যদি গায়ে সেণ্ট বা গন্ধ না মাখেন, তাহা হইলে বেশভূষার অঙ্গহানি ঘটে! কিন্তু এই সেণ্ট বা গন্ধ কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, হয়তো সকলে তার মর্ম্ম ঠিক জানেন না! তার ফলে শিশি খালি করিয়া গন্ধ ঢালিয়াও মন তেমন খুশী হয় না! গন্ধ কি ভাবে মাখা উচিত, বলি।

প্রথমতঃ, কি সেণ্ট ব্যবহার করিবেন ? ইহা নির্ভর করে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রুচির উপর। গন্ধ কখনো জামা-কাপড়ে ঢালিতে নাই ; গন্ধ মাখিতে হয় গায়ে ঢালিয়া। আমাদের দেহে সর্ব্বদা যে তাপ-সঞ্চার হইতেছে, গায়ে ঢালিয়া গন্ধ মাখিলে, দেহের সে তাপ-সংযোগে গন্ধ মাখা সার্থক হয়। সে-সুরভিতে নিজে তৃপ্তি পাইবেন ; এবং বাতাসে সে সুরভি হিল্লোলিত হইয়া অপরকেও তৃপ্ত করিবে। জামা-কাপড়ে গন্ধ বা সেণ্ট ঢালিলে জামা-কাপড়ে বিশ্রী দাগ ধরে ; সে দাগ ওঠে না ; জামা-কাপড় নষ্ট হয়।

গন্ধ খুব বেশী মাখিবেন না। অল্প গন্ধে ফল পাওয়া যায় বেশী।

বাজে বা শস্তা দামের সেণ্ট কদাচ ব্যবহার করিবেন না। দামী সেণ্ট দু'চার ফোঁটা ঢালিলেই যথেষ্ট হইবে এবং সে গন্ধ বহুকাল থাকিবে।

গন্ধ মাখিয়া যদি কোনোখানে যাইতে চান্, তবে ঠিক বাহির হইবার পূর্ব্বক্ষণে গন্ধ মাখিবেন না—বাহির হইবার অন্ততঃ পনেরো মিনিট পূর্ব্বে গন্ধ-প্রসাধন করিবেন। কারণ, সেণ্টে যে স্পিরিট থাকে, সেটুকু উবিয়া গেলে তবেই পুষ্প-সুরভির বিকাশ ঘটে। এবং এ স্পিরিট উবিতে সময় লাগে সাত-আট-দশ মিনিট।

সেণ্ট মাখিবেন দু'হাতের কব্জীতে ; দুই কাণে ; ঘাড়ের পিছনে ; ও গলায়।

ভ্রূ—

ভ্রূ রমণীর মুখ-চোখের শোভা-মাধুরী বাড়াইয়া মুখকে কমনীয় করে। যাঁদের ভ্রূ পাতলা বা ছাড়া-ছাড়া, তাঁদের চোখে তেমন বাহার খোলে না! ভ্রূর পরমায়ু বড় জোর চার মাস। প্রতি চার-মাস-অন্তর ভ্রূর পুরানো পল্লব উঠিয়া তার জায়গায় নূতন পল্লব দেখা দেয়। এমন নিঃশব্দে ইহা ঘটে যে, আমরা জানিতেও পারি না।

যাঁদের ভ্রূ পাৎলা বা ছাড়া-ছাড়া, তাঁরা এক কাজ করিবেন—ভ্রূতে ভালো একটু ক্রীম মাখাইয়া নিত্য একবার করিয়া ছোট ব্রাশের সাহায্যে ভ্রূ ব্রাশ করিবেন, তাহা হইলে ভ্রূ হইবে চমৎকার, পূর্ণ-বিকশিত এবং কমনীয়।

কনুইয়ের সেবা

টেবিলে বা মেঝেয় দুই কনুই চাপিয়া বসিয়া-শুইয়া লেখাপড়া করা অনেকের স্বভাব। তার ফলে কনুইয়ে কালো দাগ ধরে, কড়া পড়ে ; সেজন্য কনুইয়ের যে শ্রী হয়, লোক-সমাজে হাত বাহির করিতে লজ্জা করে! কনুইয়ের এই বিশ্রী কদর্য্যতা যদি মোচন করিতে চান্, তাহা হইলে প্রত্যহ কনুইয়ে তৈল বা ক্রীম লেপিয়া 'মেশাজ' বা জোরে জোরে মর্দ্দন করিবেন। অথবা পাতি লেবু আধখানা করিয়া কাটিয়া সেই কাটা লেবু কনুইয়ের উপর চাপিয়া ধরিয়া কিছুদিন নিয়ম করিয়া ঘষিবেন। কনুইয়ের কড়া ও কালি মুছিয়া কনুইয়ের বিবর্ণতা ঘুচিবে!

টাকার মূল্য

বোম্বাইয়ের রপ্তানীকারক বণিক এবং কার্পাস কল-ওয়ালারা টাকার মূল্য কমাইয়া দিবার জন্য আজ প্রায় চার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এবার তাঁহাদের সে আন্দোলন ওয়ার্দ্ধার কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনের সমর্থন লাভ করিয়াছে। ইঁহারা টাকার মূল্য বিলাতী পাউণ্ডের মূল্যের সহিত গাঁথিয়া রাখিতে আপত্তি করেন না, কিন্তু টাকার মূল্য আঠার পেন্সের স্থলে ষোল পেন্স করিতে অর্থাৎ টাকার মূল্য গোপনে ১৬ আনার স্থানে ১৪ আনা করিতে চাহেন। বিলাতী পাউণ্ড ষ্টার্লিংই পৃথিবীর বাজারে মূল্যের একটা সর্ব্বজন-স্বীকৃত মানদণ্ড। তাহার মূল্য কমিবে বা বাড়িবে না,—কমিবে টাকার মূল্যের আট ভাগের এক ভাগ। কিন্তু ইহার প্রতিঘাত এ দেশের পণ্য-মূল্যের উপরও অল্পাধিক পড়িবে। সুতরাং তাহার পরিণাম ভাল হইবে না। বোম্বাই কলওয়ালারা মনে করিতেছেন যে, এই আন্দোলনের সাফল্যে বিনিময়ের হার বর্দ্ধিত হইবে। বিলাতী বস্ত্রের দাম বাড়িবে—প্রতিযোগিতায় তাঁহারা মিলের বস্ত্র বিক্রয় করিয়া অধিক লাভবান হইতে পারিবেন। ভারতের বাহিরে বিলাতী বস্ত্রের মূল্য ঠিক থাকিলেও ভারতীয় কলওয়ালারা কিছু কম মূল্যে তাঁহাদের মিলের বস্ত্র বেচিতে পারিবেন ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানী করিয়া অধিক লাভ করিতে পারিবেন। অথচ এই সকল রপ্তানী-পণ্য সংগ্রহের জন্য ভারতীয় কৃষকদিগকে তাঁহাদের অধিক মূল্য দিবার কোন কারণ থাকিবে না।

বোম্বাই ও সিন্ধুর বণিক্‌গণ অধিকাংশই রপ্তানী-ব্যবসায়ী। আমদানী-প্রধান বাঙ্গালার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ বিভিন্ন। টাকার বিনিময়মূল্য কমিলে বোম্বাইয়ের বণিক সম্প্রদায় রপ্তানী-পণ্যের মূল্য বাবদ বেশী টাকা পাইয়া অধিক লাভবান্ হইবেন। বিশেষতঃ বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় টাকার বিনিময়ের মূল্য হ্রাসের কল্পনা করিয়া বহু টাকা বিলাতে পাঠাইয়া আমানত রাখিয়াছেন। ইহা সম্ভব হইলেই তাঁহারা সে টাকা ভারতে আনিয়া শতকরা ১২॥০ টাকা হিঃ অনায়াসে লাভ করিতে পারিবেন। এই আশাতেই তাঁহারা টাকার মূল্য হ্রাস করিবার জন্য এত আগ্রহশীল। কিন্তু কংগ্রেস এই ব্যাপারে তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিলেন কেন? তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স করার ফলেই ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইতেছে,—আমদানী-বাণিজ্য অপেক্ষা রপ্তানী-বাণিজ্যের যে আধিক্য থাকা উচিত, তাহা থাকিতেছে না।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এইখানে একটা বিশেষ ভুল করিতেছেন। বিনিময়ের এইভাবে পরিবর্ত্তন করিলে বাণিজ্যের পাল্লার পরিবর্ত্তন করা যায় না। বিলাত স্বুবর্ণমান ত্যাগ করিয়া যে সুবিধা করিয়াছিলেন, তাহা স্থায়ী হয় নাই। আমাদিগকে আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের এটা দেনদার দেশ। আমাদিগকে প্রতি বৎসর বিলাতে বেফয়দা হোমচার্জ্জ বাবদ অন্ততঃ ৩ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পাঠাইতে হয়। এখনকার বিনিময় হিসাবে প্রতি বৎসর আমাদিগকে ঐ বাবদ ৪১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দিতে হইতেছে। টাকার মূল্য ১৬ পেন্স করিলে আমাদিগকে ঐ বাবদ আরও ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা যাচিয়া অধিক দিতে হইবে। ইহা ভিন্ন বিলাতে ভারতের ঋণের পরিমাণ বহু কোটি পাউণ্ড। টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দিলে সে বাবদ কত শত কোটি টাকা অধিক দিতে হইবে, তাহা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছেন কি? আমাদের দেশের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে এ ভাবে এত ঋণের বোঝা বাড়াইয়া তোলা কি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে না? কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা কেন বুঝিতেছেন না, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

পক্ষান্তরে গত বৎসর ভারতকে বিদেশ হইতে ১ শত ৭৩ কোটি টাকার পণ্য আমদানী করিতে হইয়াছে। যদি গত বৎসর টাকার মূল্য ১৬ পেন্স ধার্য্য থাকিত তাহা হইলে ঐ পরিমাণ পণ্য আমদানী বাবদ আরও সাড়ে ২১ কোটি টাকা অধিক লাগিত। দেশবাসীকে এরূপ অধিক টাকা

প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করা সঙ্গত কি? কখনই না। ইহাতে দেশের ও বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে। আমাদের দেশের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের টাকার মূল্য হ্রাস করিবার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সঙ্গত নহে।

কংগ্রেসের পক্ষে এই কথাগুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, টাকার মূল্য অস্বাভাবিক হওয়াতেই ভারতের পক্ষে বাণিজ্যের পাল্লা প্রতিকূল হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের ভুল ধারণা। বিনিময়ের কোন হারই স্বাভাবিক বা নৈসর্গিক হইতে পারে না। ফাউলার কমিটী সে কথা স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন। কংগ্রেসের কর্ত্তারা মনে করিতেছেন যে, টাকার মূল্য ১৮ পেন্স ধার্য্য করাতে বাণিজ্যের পাল্লা (balance of trade) বিপরীত পথে চলিয়াছে। ইহা সত্য নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সার জাহাঙ্গীর জি কয়াসজী এই উক্তির অসারতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। সম্প্রতি সরকারও বলিয়াছেন যে, গত জুন মাস হইতে বাণিজ্যের পাল্লা বিপরীতগামী হইয়াছে এ কথা যে সত্য নহে, তাহা তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে পারেন। বাণিজ্যের পাল্লা বিপরীতগামী হইবার বহু কারণ আছে। কেবলমাত্র মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাওয়াতেই বাণিজ্যের পাল্লা প্রতিকূল হয় না। অনেক সময় লোক উহা বাণিজ্য পাল্লার অসুবিধার কারণ মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক বিশেষজ্ঞও সে কথা বলিয়া থাকেন।

নব দিল্লী হইতে ভারতসরকার প্রচার করিয়াছেন, "১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে ভারতের বাণিজ্যের পাল্লা ক্রমশঃই ভারতের প্রতিকূল হইতেছে।" কিন্তু আসল কথা এই যে, প্রতিমাসেই সোনা-রূপা প্রভৃতি বাদ দিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে বাণিজ্যের পাল্লা ভারতের অধিকতর অনুকূল হইতেছে। গত বৎসরের এই সকল মাসের তুলনায়ও অধিক অনুকূল হইয়াছে।

বোম্বাইওয়ালারা বলিতেছেন, "মুদ্রার এই বর্দ্ধিত মূল্য স্থির রাখিতে যাইয়া নোটের মূল্য স্থির রাখিবার জন্য যে ধন-ভাণ্ডার রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার অনেকাংশ ক্ষয় পাইয়াছে।" সরকার তাহার জবাবে বলিয়াছেন যে, ঐ টাকা এখন রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের তহবিলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ঐ ব্যাঙ্কের সুবর্ণের এবং ষ্টার্লিঙের তহবিল বাড়িয়া গিয়াছে এবং আইন মতে যেখানে সমস্ত দায়িত্বের ৪০ ভাগ মাত্র সোণা প্রভৃতি মজুদ রাখিবার কথা, সেখানে সমস্ত নোটের অর্দ্ধেকের উপর ঐ তহবিলে মজুদ রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত ৬০ কোটি টাকার (পাউণ্ডের) বিদেশী দেনা শোধ করা হইয়াছে।

যাঁহারা মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিতেছেন যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি করাতে জিনিষের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। উত্তরে সরকার বলিয়াছেন, "সে কথা সত্য নহে। পৃথিবীব্যাপী মন্দার জন্য পণ্যের মূল্য কমিয়াছে সত্য, কিন্তু ইদানীং পণ্য মূল্য বাড়িয়া যাইতেছে।" ডক্টর গ্রেগরীর রিপোর্টে তাহাই প্রকাশ। টাকার মূল্য হ্রাস হইলে কৃষকগণ পণ্যের অধিক মূল্য পাইতে পারিবে না। অধিকন্তু তাহারা যে সকল বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করে, তাহার জন্য তাহাদের অধিক মূল্য দিতে হইবে। পণ্যের মূল্য নানা কারণেই হ্রাস পায়। মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে পণ্যের মূল্য হ্রাস পায়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ী হয় না। ভারত-সরকার বলিয়াছেন যে, টাকার মূল্য হ্রাস করিলে আন্তর্জ্জাতিক বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। একথা সম্পূর্ণ সত্য। বর্ত্তমান সময়ে বার্ত্তিক ব্যাপারে জাতীয়তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং পণ্যের অদল-বদলের (barter system) পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়াতে আর অবাধে সর্ব্বত্র পণ্যের খরিদ বিক্রয় হইতেছে না। এখন প্রত্যেক দেশের লোক নিজ নিজ দেশে তাহাদের আবশ্যক পণ্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। নিতান্তই যাহা স্বদেশে উৎপন্ন হয় না, তাহাই তাহারা বিদেশ হইতে কিনিতেছে। জার্ম্মাণী এই অদল-বদল বাণিজ্য-নীতির পথ দেখাইয়াছে। এই নীতির অর্থ, "তুমি আমাদের দেশের শিল্পজ পণ্য গ্রহণ কর, আমি তোমার দেশের কৃষিজ পণ্য গ্রহণ করিব।" পণ্যের সহিত পণ্যের বিনিময় হইবে, যাহার প্রাপ্য অধিক হইবে, সে অতিরিক্ত মূল্য পাইবে। জার্ম্মাণী বলিতেছে যে, ভারত যদি তাহাদের পণ্য ভূরি পরিমাণে গ্রহণ করে, তবেই তাহারা ভারত হইতে ২ কোটী টাকার কার্পাস-তুলা কিনিতে পারে। জার্ম্মাণী পূর্ব্বে ভারত হইতে যে তিসি কিনিত, তাহা এখন আর্জ্জেণ্টাইন হইতে গ্রহণ

করিতেছে। কারণ, ঐ দেশবাসীরা জার্ম্মাণীর কলে প্রস্তুত মাল অধিক লইয়া থাকে। ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতিরাও বলিতেছে যে, "ভারতবাসীরা আমাদের বস্ত্র অধিক লইলে আমরাও ভারতজাত কার্পাস-তুলা সমধিক পরিমাণে লইব।" মার্কিণের সহিত গ্রেটবৃটেনের যে বাণিজ্যচুক্তি হইয়া গেল, তাহাতেও পণ্য গ্রহণের ঐরূপ পাল্টা পাল্টি ব্যবস্থা আছে। তাহার উপর অন্যান্য দেশ কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া ফসলের ফলন অনেক বাড়াইয়াছে,—তাহারা যত শস্তাদরে পণ্য বেচিতে পারে, আমাদের দেশের কৃষকরা তাহা পারে না। কাযেই এখন পণ্য বেচিব বলিলেই যে কোন দেশ পণ্য অবাধে কিনিবে, তাহা মনে করাই ভুল।

পক্ষান্তরে আমদানী-পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে, ভারতের বিশেষতঃ আমদানী-প্রধান বাঙ্গালার সমধিক ক্ষতি হইবে। আশা করি, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ প্রদেশ বিশেষের ধন-কুবের সম্প্রদায়ের প্রভূত ধনাগমের পথ সুপ্রশস্ত করিবার অভিপ্রায়ে টাকার বিনিময়-মূল্য কমাইবার জন্য উদ্যম প্রকাশে অতঃপর বিরত হইবেন।

মুসলিম লীগের অধিবেশন

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে চারিদিন পাটনার বাঁকিপুর ময়দানে মুসলিম লীগের ২৬তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ আবদুল আজিজ এবং সভাপতি মিঃ জিন্না উভয়েরই বক্তৃতায় কংগ্রেস-বিদ্বেষ এবং মহাত্মা গান্ধীর নিন্দা সমধিক স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

রাজনীতিক বিষয়ের এবং অবস্থার বিশ্লেষণ কালে তিনি বিভিন্ন কংগ্রেসশাসিত প্রদেশের মুসলমানগণের অবস্থার উল্লেখ করিয়া কংগ্রেসী-মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করিয়াছেন। এই প্রকার অলীক অভিযোগ মুসলিম লীগ এবং লীগপন্থী অনেক নেতাই অনেক বার করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগের আহ্বান পাইয়াও এ পর্য্যন্ত কেহই সে বিষয়ে অগ্রসর হন নাই।

মিঃ জিন্না বলেন যে, মুসলিম-রাষ্ট্রগুলি জাগ্রত হইতেছে, কিন্তু ভারতের ৮ কোটি মুসলমানই কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? পশ্চাতে পড়িয়া থাকা ত আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু মিঃ জিন্না ভারতবর্ষের ৮ কোটি মুসলমানকে লইয়া কি স্বতন্ত্র মুসলিম-রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহেন? কিছুদিন হইতে কোন কোন লীগপন্থী মুসলমান এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মিঃ জিন্না আক্ষেপসহকারে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস মুসলীম লীগকে সমান আসন দিতে চাহেন না। এযাবৎ মিঃ জিন্না সেই দাবীই করিয়া আসিয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছেন যে, মুসলিম লীগই মুসলমানদিগের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস ইহা স্বীকার করিয়া লউন। কিন্তু কংগ্রেস জানেন যে, লীগ মুসলমানদিগের একমাত্র প্রতিষ্ঠান নহে। বহু সহস্র মুসলমান ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে যোগদান করিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং লীগকে মুসলমানগণের একমাত্র ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করার কোন অর্থই হয় না।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে মিঃ জিন্না অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। তাই তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষের অভিমত অনুসারে মুসলিম লীগ পদ-মর্য্যাদায় কংগ্রেসের সমতুল্য না হইতে পারে, কিন্তু ভারতের ৮ কোটি মুসলমানের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, মুসলিম লীগকে দানহিসাবে কিছু দিবার কোন অধিকার কংগ্রেসের নাই এবং লীগ কংগ্রেসের নিকট হইতে এইরূপ কোন দান গ্রহণ করিবে না।

মিঃ জিন্নার এই গর্জ্জন অহেতুক। কংগ্রেস মুসলিম লীগকে কিছু দিবার জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছেন বা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কংগ্রেসের কার্য্যে এমন কোন কিছুর আভাস নাই। কংগ্রেস সমগ্র ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের একমাত্র শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সমগ্র ভারতের সার্ব্বজনীন স্বাধীনতার জন্যই কংগ্রেস সংগ্রাম করিতেছেন। দানের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক নহে কি?

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জিন্না কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ অভিমত তিনি একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি যখন কংগ্রেসপন্থী ছিলেন, তখন তিনি এমন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেন নাই। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পরই তাঁহার কণ্ঠে

কংগ্রেসের সম্বন্ধে এই প্রকার অবাস্তব মতবাদ প্রকাশ পাইতেছে।

মিঃ জিন্না স্বীকার করিয়াছেন, কংগ্রেসে যে সকল মুসলমান সদস্য আছেন, তাঁহারা বিভ্রান্ত। সুতরাং কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা গান্ধী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানগণের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রথা চাপাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, উর্দ্দু ভাষার কণ্ঠরোধের জন্য ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা গান্ধীজী উদ্ভাবন করিয়াছেন।

অবশ্য দলের সভ্যগণকে মাতাইয়া তুলিবার জন্য এবং লীগে সদস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত এই প্রকার কল্পিত অভিযোগ-সৃষ্টি মিঃ জিন্নার পক্ষে প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি? মিঃ জিন্নার উক্তি যে অসার, তাহা দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বলিবেন। মুর্শিদাবাদের রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে মৌলবী আসরফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী মুসলিম্ লীগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, সুদীর্ঘ ৩২ বৎসরের মধ্যে মুসলমান-জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত লীগ, মুসলমান-জনগণের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাস্য। তাঁহারা কোটি কোটি মুসলমানের অর্থনৈতিক উন্নতি, স্বার্থরক্ষা প্রভৃতির জন্য কোন সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন কি? কোন প্রকার ত্যাগ ও নির্য্যাতন তাঁহারা ভোগ করিয়াছেন এমন, নিদর্শন নাই। "শুধু লীগপন্থীরা বড়দিনের বন্ধে বা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া, বড় বড় সহরে সভা করেন ও লোকদেখান কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। এ কথা সত্য।"

উল্লিখিত মন্তব্যের সার্থকতা কত অধিক, তাহা পাটনার অধিবেশনেও দেখা গেল। মিঃ জিন্না কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিবার অবকাশ কখনও ত্যাগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, হায়দ্রাবাদ-রাজ্যে কংগ্রেস জাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহার অর্থ হায়দ্রাবাদ মুসলমান-রাজ্য। কিন্তু কাশ্মীরে হিন্দু রাজ্য বলিয়া তথায় কংগ্রেস সে রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করেন নাই। মিঃ জিন্নার এই ভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের চেষ্টা যে দেশের কল্যাণের পরিপন্থী, তাহা কি তিনি নিজে এখনও অনুভব করিতে পারিতেছেন না?

মুসলিম্ লীগের অধিবেশনে একটা কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতে লীগপন্থীরা একশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন না। জাতি বলিতে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, পার্শী, বৌদ্ধ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককেই বুঝায়। কিন্তু লীগপন্থীরা স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে চাহেন। তাঁহাদিগের মতে মুসলমানের ধর্ম্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি সবই স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম অবশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম রাষ্ট্রনীতির বাহিরের বিষয়—উহা মানুষের অন্তরের জিনিষ। উহা জাতিগঠনের অন্তরায় হইতে পারে না। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে, চীনা মুসলমানরা বৌদ্ধ-চীনাদিগের সহিত একযোগে দেশের স্বাধীনতা, সম্ভ্রম, সমস্তই রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। ধর্ম্ম এখানে জাতিগঠনে অন্তরায় হয় নাই। য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশেরও ইতিহাস এই কথা প্রচার করিতেছে। কামাল আতাতুর্কের কথা মিঃ জিন্না ও তাঁহার সম্প্রদায় নিশ্চয় অবগত আছেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কামাল আতাতুর্ক নব্য তুরস্ককে গড়িয়া তুলেন নাই।

মুসলিম্লীগের অধিবেশনে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জাতিগঠনের অন্তরায়, তাহা স্বাধীনতা অর্জ্জনের বিরোধী। ভারতীয় খৃষ্টানদিগের অধিবেশনে সুযোগ্য সভাপতি মনীষী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দেশীয় খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের কংগ্রেসে যোগদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া হয় ত মুসলিম্লীগের সদস্যগণের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু জাতীয় সংগ্রামে ইহার প্রয়োজন অনিবার্য্য। মুসলিম লীগ যাহাই বলুন, কংগ্রেস যেন আর লীগপন্থীদিগের সহিত আলোচনায় সময় নষ্ট না করেন। একদিন আসিবে, যখন সকল মুসলমানই সাম্প্রদায়িক-প্রভাবমুক্ত হইয়া কংগ্রেসে যোগদান করিবেন। এই বৎসরেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বহু সহস্র মুসলমান কংগ্রেস-পতাকাতলে সমবেত হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক দিন লীগপন্থীদিগেরও হয় ত এ সুমতি হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

গত ২৭শে ডিসেম্বর গৌহাটীতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল। আসাম-প্রবাসী অশীতিপর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মূল সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সাহিত্যশাখায় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিজ্ঞানে ডাঃ নীলরতন ধর, সমাজবিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র রায়, বৃহত্তর বঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, ললিতকলায় শ্রীযুত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন। আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বর্দ্দলই সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন সুদীর্ঘকাল আসামে প্রবাস-জীবন যাপন করিয়া আসামের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালী আসামে নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করেন নাই। আসামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পশ্চাতে বাঙ্গালীর উদ্যম অল্প নহে। বাঙ্গালা-সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী সাহিত্যিক এবং পাঠকমাত্রেরই বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি আপনাকে প্রগতিবিহীন, প্রাচীনপন্থী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সত্য কথা গোপন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :—

"আপনারা দেখিবেন, যেন সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজমন ভোগোন্মুখ হইয়া না উঠে, আর্টের মুখোস পরিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা যেন সমাজে আদৃত না হয়; অনুকরণ ও অনুবাদ যেন মৌলিকতার দাবী না করে, লালসা যেন প্রেমের স্থলাভিষিক্ত না হয়; পাপীর চরিত্র-অঙ্কনে পাপ যেন লোভনীয় না হয়; পুণ্যবান্ লাঞ্ছিত হইলেও সেই লাঞ্ছনাই যেন সমাজের মুকুটরূপে শোভা পায়।"

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মূল সভানেত্রী হিসাবে আসাম ও বাঙ্গালার নিবিড় সংযোগ সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত অভিভাষণ সময়োপযোগী হইয়াছে। সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধেও তিনি নিজের অভিমত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন :—

"সাহিত্যিক যদি প্রকৃতই হিতকামী হন, তাহা হইলে, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভাষায় এবং ভাবে তাঁহার সংযত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নূতনত্বের নামে ঔদ্ধত্য, রুচিবিকৃতি এবং মুদ্রাদোষের প্রচলন করিয়া দিন কতক হাততালি পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। * * * সাহিত্যে যাহা মহত্তম, সৃষ্টিতে তাহা দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম্ম নিরপেক্ষ। সাহিত্য বস্তুতান্ত্রিক হউক, অথবা ভাবতান্ত্রিক হউক, যদি তাহা একাধারে হিতকর ও মনোহারী হয়, তবেই তাহা সার্থক। * * মনোহর সাহিত্য যদি মানবসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে তাহা অবাঞ্ছনীয়। * * মানুষের কল্যাণ এবং আনন্দ

বিধানের জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি—সাহিত্যের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয় নাই।"

উপসংহারে সভানেত্রী সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীমাত্রেরই ভাষা। প্রাচীন যুগ হইতেই ইহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীর দান আছে। কিন্তু বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তি পৃথক্ একটি সাহিত্যসম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কিন্তু সাহিত্যে যেখানে জাতিভেদ না থাকায় সকলের সমানাধিকার, সেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আসে কেন? * * * ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যে, দেশের এবং জাতির প্রাচীন সংস্কৃতি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এ কথা কোন দেশের কোন সভ্যসমাজই স্বীকার করেন না। * * * বিশ্ববরেণ্য ভাষাজননীকে যাঁহারা খণ্ডিত করিয়া তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে বাধা দেওয়া জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর অবশ্য-কর্ত্তব্য।"

সভানেত্রী খুব সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়া—বাঙ্গালা ভাষা লিখিয়াও ইরাণ-তুরাণের দিকে মুখ ফিরাইয়া আপনাদিগকে ইরাণী, তুরাণী মনে করেন, তাঁহারা সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন, ইহা আশা করা যায় না—অবশ্য ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী এমন অনেক বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন। এ কথা খুবই সত্য যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইলেও, একনিষ্ঠ সাধকগণের চেষ্টায় উত্তরকালে আবার তাহার সংস্কার সম্ভব হইবে।

সাহিত্যশাখায় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহাও উপভোগ্য। রসসৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত যুক্তিসমূহ প্রণিধানযোগ্য! "সংহতি রক্ষা করিয়া যে কাব্য সাহিত্য রচিত হয় তাহাই রসাস্বাদের পক্ষে উপনিষৎ হইয়া থাকে।" এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

শ্রীযুত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রীযুত নীলরতন ধর

ডাঃ শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগচী

রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন

"বাঙ্গালা সাহিত্যই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনের অসাধারণ উপাদান। ইহার বিশুদ্ধি রক্ষার উপর আমাদের জাতীয় জীবনের বিশুদ্ধি ঐকান্তিকভাবে নির্ভর করিয়া থাকে।"

গৌহাটীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রবাসী বাঙ্গালীরা সমবেত হইয়াছিলেন। আসামীদিগের সহিত বাঙ্গালীদিগের হৃদ্য মনোভাবের আদান-প্রদান হইয়াছিল। এইভাবে সমগ্র ভারতে বৃহত্তর বঙ্গের প্রসারে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবে।

ডাক বিভাগের লাভ

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকারী ডাকবিভাগে ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৩৮ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাকবিভাগে ৩০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৯৪ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং এবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ডাকবিভাগে সরকারের ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৪৪ টাকা অধিক উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ডাকবিভাগের কর্ম্মচারিগণের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা—পেন্সন বাবদ প্রায় ৭ লক্ষ টাকা এবং এ বৎসর গ্রামে কতকগুলি নূতন ডাকঘর প্রতিষ্ঠার জন্য মাত্র ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া মোট সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং আগামী বৎসরের বাজেটেও যে ডাকমাশুলের অসম্ভব হারের কিছু সুবিধা হইবে, এমন আশা করা যায় না। পোষ্টকার্ড, খাম, বুকপোষ্ট, ভিঃ পিঃ, পার্শ্বেল, রেজেষ্টারী, মণি অর্ডার ফিঃ অসম্ভব উচ্চ হারে নির্দ্ধারণের ফলে সরকারের ডাকবিভাগের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে;—সময় অনুসারে ক্রমবর্দ্ধমান বেতন-ব্যবস্থায় ডাকবিভাগের কর্ম্মচারিগণের বেতন প্রতি বর্ষেই বর্দ্ধিত হইতেছে; পেন্সনের পরিমাণ বৃদ্ধির ত কথাই নাই, অথচ অসম্ভব উচ্চহারে মাশুল নির্দ্ধারণের জন্য ডাকবিভাগের কার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে কমিতেছে। এজন্য জনসাধারণের অসুবিধার সীমা নাই। পত্রাদি লিখিতে ৩গুণ মাশুল দিতে হয়। ওজন অনুসারে মাশুলের হার অসম্ভব নির্দ্ধারণের উপর সামান্য মূল্যের ভিঃ পিঃ—এমন কি, একখানি সংবাদ পত্রের ভিঃ পিঃও রেজেষ্টারী করিতে বাধ্য করায় ও সেই সঙ্গে রেজেষ্টারীর হার দেড়গুণ করায়, ভিঃ পিঃর ব্যবসায় লোপ পাইতে বসিয়াছে—সুলভ সৎসাহিত্যের আধারে যে শিক্ষার স্রোত অনায়াসে দেশের সর্ব্বস্তরে প্রবাহিত হইতেছিল, ডাকমাশুলের হার অসম্ভব নির্দ্ধারিত করিয়া সরকার সে পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। ইহা কোন সুসভ্য দেশের সরকারের পক্ষেই গৌরবের বিষয় নহে। বিশেষতঃ যে দেশের সরকার আজও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ইহা গৌরবের পরিচায়ক হইতেই পারে না।

গত বৎসর সরকার ডাকবিভাগের প্রায় অর্দ্ধ কোটী টাকা লাভেও সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। এই বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে ডাক-বিভাগের কর্তৃপক্ষ সহসা সমস্ত মাসিকপত্রিকার উপর এক নোটীশ জারী করিয়া জানাইয়াছিলেন,—গল্প, উপন্যাস, কাহিনী এবং বিজ্ঞাপন কোন সংখ্যায়, কোন মতেই অর্দ্ধাংশের উপর হইতে পারিবে না;—হইলে সাময়িক পত্র পোষ্টের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া ঐ সংখ্যার মাসিকপত্র বেয়ারিং হইবে, অথবা বুকপোষ্টের মাশুল দিতে হইবে: অর্থাৎ চতুর্গুণ মাশুল লাগিবে। এই সুব্যবস্থার তৎপরতায় অনেক সংবাদপত্রের শারদীয়া সংখ্যার চতুর্গুণ মাশুল লাগিয়াছে;—অর্থাৎ শারদীয়া সংখ্যার মূল্য ও ডাকমাশুল সমান হইয়াছিল। পূজার আনন্দ অবসরে যে সকল সাহিত্যামোদী পাঠক শারদীয়া সংখ্যাপাঠে চিত্তবিনোদনের আশা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই ভাবে সরকারকে অগ্রিম ট্যাক্স্ দিতে হইয়াছে।

মাসিকপত্রের কোন সংখ্যায় কেবল বিজ্ঞাপনের পরিমাণ অর্দ্ধেকের উপর হইলে তাহা ট্যাক্স-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেও পারে; কিন্তু সকলেই জানেন, গল্প, উপন্যাস, কাহিনী, মাসিকপত্রের প্রাণ-স্বরূপ; সরকারী ডাক-বিভাগ ইহা কি কারণে যে, বিজ্ঞাপনের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ইহা কি আমোদকরেরই একটা রকমফের,—না, আয়-বৃদ্ধির অপূর্ব্ব উদ্ভাবনীশক্তি, ন', সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধ আনন্দে বঞ্চিত করিবার নূতন উপায়? প্রবন্ধ গবেষণাপূর্ণ মাসিকপত্রিকা বিলির ব্যয় অপেক্ষা গল্প-উপন্যাস-কাহিনী-বহুল মাসিক পত্রিকা বিলি করিতে সরকারী ডাকঘরের কি সমধিক ব্যয় পড়ে? পাতা গণিয়া বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া ডাক বিলির ব্যবস্থা কোন সুসভ্য দেশে প্রবর্ত্তিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

যে বৎসর সরকারী ডাকবিভাগে ৪৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৩৮ টাকা উদ্‌বৃত্ত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা অধিক উদ্‌বৃত্ত হইয়াছে, সেই বৎসর গ্রামে নূতন ডাকঘর প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার মাত্র ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছেন। অথচ এই ব্যয়ে ১২৪৩টি নূতন ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মনিঅর্ডার বিলির সুবিধার জন্য মনিঅর্ডার ফিঃ বাবদ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সরকারের ২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে। এই হিসাব হইতেই কি অনুমান করা যায় না যে, ডাক-মাশুলের সুবিধা হইলে এবং স্বল্প ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইলে সরকার আরও লাভবান হইতে পারিবেন? কিন্তু সরকারী-নৈবেদ্যের চূড়ার মণ্ডার জন্যই বাজেটের সকল ব্যয় নিঃশেষিত হইয়া যায়: অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহে সর্ব্বদাই অর্থাভাবে বাজেটে ব্যয়সঙ্কোচ ও ডাকমাশুলের ক্রমান্বয় বৃদ্ধির ব্যবস্থাই বাহাল থাকিয়া যায়।

—

প্রাদেশিক ঘটনা-বৈচিত্র্য

গত ১৯এ ডিসেম্বর অপরাহ্নে ঢাকার মেডিকেল স্কুলের নূতন ও পুরাতন ছাত্রগণের বার্ষিক সম্মিলনের কোন কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক প্রকাশের পর স্কুলের একটি 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের প্রথম দুই কলি অর্থাৎ 'বন্দে মাতরম্ সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্' এই অংশটুকুমাত্র সুর-সংযোগে গান করেন।

কিন্তু মাতৃভূমির বন্দনাসূচক এই দুই কলি গান শুনিয়াই সম্মিলিত মুসলমান-ছাত্রেরা উত্তেজিত হইয়া আজাহার উদ্দীন মিঞা, সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মেজর লিণ্টন ও ডাক্তার বরদাকান্ত সেন মেজরকে তীব্র ভাষায় বলে, তাঁহারা তাহাদিগকে এই ভাবে অপমানিত করিয়াছেন। এই 'ন্যক্কারজনক' গান গাহিবার অনুমতি দানের জন্য তাঁহাদের সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। তাহারা অবিলম্বে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট, এবং সরকারের নিকট এই ঘটনার বিষয় রিপোর্ট করিবে।

মেজর লিণ্টন তাহাদিগের এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ তিরস্কার বিনা প্রতিবাদে শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হয়; কারণ, মুসলমান-ছাত্রগণ এই সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গীত হইবে জানিয়া ইহাতে আপত্তি করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল।

তাহাদের এই প্রকার দম্ভ-প্রকাশ অহেতুক নহে, ইহা সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিবার পর স্কুলের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মেজর লিণ্টন যখন বুঝিতে পারিলেন—তাহারা তাঁহার অপমান করিয়াই নিরস্ত হইবে না, তাহারা তাঁহাকে যে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেও পারে, তখন তিনি তাহাদিগকে মধুর বাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টায় বিরত হইয়া, তাহাদের আবদার পূর্ণ করাই সঙ্গত মনে করিলেন; এবং যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শনও শিষ্টাচার-সঙ্গত বলিয়া মনে করে না, তাহাদিগের প্রতিকূলে তিনি এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, যদি এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তৃগণ "এই সঙ্গীত প্রত্যাহৃত হইল" বলিয়া ঘোষণা না করেন, এবং কেবল তাহাই নহে, হিন্দু ছাত্রেরা (উক্ত গানের প্রথম দুই কলি গাহিবার জন্য) মুসলমান-ছাত্রগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।—মেজর লিণ্টন হিন্দু-ছাত্রগণকে অপদস্থ করিবার জন্য যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া অবিসংবাদিত ভাবে গ্রহণ করা যায় কি? এই আদেশে তিনি বৃটিশ নিরপেক্ষ নীতির সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

কিন্তু এই বীররসাশ্রিত নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়ের তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল; কারণ, তখনও রঙ্গমঞ্চে অন্যতম প্রধান অভিনেতার আবির্ভাব হয় নাই। যাহা হউক, কয়েক মিনিট পরেই ঢাকা মেডিকেল স্কুলের স্বনামধন্য ডাক্তার খান সাহেব মৈজুদ্দীন খান সহসা সেই স্থলে দর্শনদান করিলে, তাঁহার ও মেজর লিণ্টনের প্ররোচনায় কমিটীর সম্পাদক "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত প্রত্যাহৃত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু-ছাত্রগণ তাঁহাদের শেষ আদেশ পালন করিলেন না। তাঁহারা একযোগে সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা মাতৃবন্দনা গানের অপমান করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে যে অন্যায় আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভূমি-

অপমানসূচক, মুসলমান-ছাত্রগণ ইহা বুঝিতে পারিবে, তাহাদের নিকট ইহা প্রত্যাশা করা যায় না; কারণ, মাতৃভূমির বন্দনাগান অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ই তাহাদের নিকট অধিক মূল্যবান্।

হিন্দুছাত্রগণ জানিতেন,—তাঁহারা দুর্ব্বল; স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন না। এ অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী সঙ্কীর্ণচেতা মুসলমান-ছাত্রগণের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তাঁহারা কি কারণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন? সম্ভবতঃ তরুণচিত্ত উদার মনোভাবের পরিচায়ক; এজন্যই তাঁহারা প্রথম হইতেই সরল ভাবে উদারতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন; সম্ভবতঃ ইহা তাঁহাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, উক্ত ঘটনার পূর্ব্বদিন মুসলমান-ছাত্রগণের অনুষ্ঠিত 'মিলাদ শরিফ' সম্মিলনে আমন্ত্রিত হইয়া হিন্দু-ছাত্রেরা তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন; স্কুলের 'কমন রুমে' উহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিব মিঃ ফজলুল হক, ও তস্য নব সংগৃহীত 'দোস্ত' মিঃ সামসুদ্দীনও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুসলমানগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য হিন্দু-ছাত্রেরা নগ্নপদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুসলমানগণের ধর্ম্ম ও আচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন: আর মুসলমান-ছাত্রগণ পরদিন প্রকাশ্য সভায় হিন্দু-ছাত্রগণের, এবং তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় সঙ্গীতের ঐ প্রকার অপমান করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মজ্ঞান, সংস্কৃতি, এবং কর্ত্তব্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করেন!

এই পরীক্ষার পর হিন্দু-ছাত্রগণ আত্মসম্মান রক্ষায় অবহিত হইবেন, এরূপ আমরা আশা করিতে পারি। মুসলমান-ছাত্রবর্গের প্রতি তাঁহারা যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা বলিয়া এ দেশের শিক্ষিতসমাজের ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

সামন্ত রাজ্যে অশান্তি

একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন কোন খড়ের গাদায় পড়িয়া খড়গুলি জ্বলিয়া উঠিবার পর, তাহা বায়ু-চালিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ গৃহগুলি ভস্মে পরিণত করে; এবং সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইলে তাহা সুরম্য অট্টালিকা এবং বিশাল প্রাসাদ পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করে। সেইরূপ ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তনরপতি-শাসিত রাজ্যে অল্প দিন পূর্ব্বে যে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই সকল রাজ-দরবারের ব্যবস্থার ত্রুটিতে ক্রমশঃ তাহা ব্যাপকতা লাভ করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান সামন্তনরপতি-শাসিত রাজ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই অনলে যে কেবল প্রজাপুঞ্জের সুখ-শান্তি দগ্ধ হইতেছে এরূপ নহে, রাজ্যের শাসকবর্গকেও সে জন্য অশান্তি ও উৎকণ্ঠা সহ্য করিতে হইতেছে। প্রথমে দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতের সামন্ত নরপতি-শাসিত কোন কোন রাজ্যে প্রজা-পুঞ্জের বিবিধ অভাব ও অভিযোগে শান্তি-ভঙ্গ হইয়াছিল। জয়পুরের মহারাজার আশ্রিত শিকর রাজ্যের রাও রাজা ও তাঁহার প্রজাবর্গকে জয়পুর রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটিতে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু দেশীয় রাজ্য-গুলির প্রজাপুঞ্জের মনে স্বদেশানুরাগ, এবং জাতীয় ভাবের স্পন্দন অনুভূত হওয়ায় এবং নানা প্রকার অনাচার ও উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভের জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়ায়, বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের শাসক-বর্গের সহিত তাহাদের বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১২ই ডিসেম্বর ঢেনকানাল রাজ্যের পুলিশ কাশীপুর গ্রামে লাঠি চালনা করায়, অনেকে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ঢেনকানাল রাজ্যের যে সকল প্রজা সত্যাগ্রহ করিয়াছিল, উক্ত রাজ্যের পুলিশ তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ও সম্বলপুর কংগ্রেসের নেতা পণ্ডিত মিশ্র এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মাতাব গত ১৯শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে ঢেনকানালে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যের অশান্তি দমনের এখনও কোন সুব্যবস্থা হয় নাই।

ঢেনকানাল রাজ্যের অদূরবর্ত্তী তালচের রাজ্যেও অশান্তির অনল সমভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাজসরকার প্রজাবর্গের অভিযোগে কর্ণপাত না করায়, পীড়ন অসহ্য হওয়ায়, এবং প্রায় ২৫ হাজার প্রজা গৃহত্যাগ করিয়া আঙ্গুলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা হইতেই গৃহহীন, অনশন-কাতর

প্রজাবর্গের প্রতি পীড়নের পরিমাণ কতকটা উপলব্ধি হইবে। উড়িষ্যার কংগ্রেস কমিটী তাহাদিগের অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু তাহাদিগের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার হইতেছে না। তালচের রাজ্যের প্রজামণ্ডলের কোন কোন নেতাকে দণ্ডবিধি আইনের ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গৃহত্যাগী প্রজারা এখনও জঙ্গলে পর্ণকুটীরে বাস করিতেছে। তাহাদের সঙ্কল্প, তালচের-দরবার যত দিন অভাব-অভিযোগের প্রতীকার না করেন, ততদিন তাহারা গৃহে ফিরিবে না; কিন্তু তালচের-দরবার শীঘ্র তাহাদের দুঃখ কষ্ট প্রশমনের ও অভিযোগ নিরাকরণের কোন ব্যবস্থা করিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। উড়িষ্যার কংগ্রেসী সরকার তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

যোধপুর রাজ্যেও প্রজাপুঞ্জের অবস্থা শোচনীয়। শ্রীযুত জয়নারায়ণ ব্যাস দুই বৎসর পূর্ব্বে যোধপুর রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এই বহিষ্কারের আদেশ এখনও বলবৎ আছে। রাজকোট রাজ্যেও প্রজাপুঞ্জকে নানা প্রকার অশান্তি-উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছে। অনাচারের প্রতিবাদস্বরূপ প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে রাজকোটে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, গত ২৬এ ডিসেম্বর সর্দ্দার পেটেল ও রাজকোট-নরপতি ঠাকুর সাহেবের মধ্যে আলোচনার পর তাহার অবসান হইয়াছে। রাজকোট রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর এই রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনে ও দমনমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করিয়া রাজনীতিক বন্দিগণকে মুক্তি প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের মধ্যেই রাজকোট রাজ্যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে। ভারতের অন্যান্য সামন্ত নরপতিশাসিত রাজ্যগুলি এই ব্যবস্থার অনুসরণ করিলে অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হইবার আশা করা যায়।

গত ১৪ই ডিসেম্বর, কোহলাপুর কংগ্রেস গঠন সম্পর্কে প্রচার-পত্র বিলি করিতেছিল। ৪ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২০শে ডিসেম্বর রাজ্যের বিশিষ্ট কর্ম্মীদিগের সভায় স্থির হয়, ২৫শে তারিখে ৫ হাজার প্রজা শোভাযাত্রা করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইবে। তদনুসারে তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া প্রধান মন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে উপনীত হয় এবং তাহাদের দাবীগুলির কথা তাঁহার গোচর করে। প্রধান মন্ত্রী তাহাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ শাখার সভাপতি শ্রীযুত এ কে পিল্লাই প্রকাশ করিয়াছেন—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজনীতিক অবস্থা অকস্মাৎ অধিকতর শোচনীয় হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। রাজার অর্ডিনান্স পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর। রাজদ্রোহের অভিযোগে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ও ষ্টেট-কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর আরও ৪ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মহারাজার নিকট প্রেরিত স্মারকলিপির স্বাক্ষরকারী আরও ৫ জন কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। কয়েক জন জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই রাজ্যের আইন অমান্য আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ অনুসারে গত ২৫শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত ছিল। গান্ধীজীর আশা, কর্ত্তৃপক্ষ প্রজাগণের আনীত অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করিয়া বন্দিগণকে মুক্তিদান করিবেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর ভোব রাজ্যের রাজাসাহেবের ৬০তম জন্মদিনের দরবারে প্রজাবর্গকে কয়েকটি সুবিধা দিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, প্রজাবর্গের ব্যক্তিস্বাধীনতা হ্রাস করা হইবে না, এবং জাতি-গঠন সম্পর্কিত বিভাগগুলির জন্য ব্যবস্থাপরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের ভিতর হইতে এক জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু এই মন্ত্রী প্রজাবর্গের কতটুকু হিতসাধনের ব্যবস্থা করিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহা এখনও অনুমান করা অসাধ্য।

ইন্দোর হইতেও অশান্তির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইন্দোর-সরকার মিউনিসিপ্যাল আইন এবং কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারসাধনে অসম্মত হওয়ায় মিউনিসিপ্যাল প্রজামণ্ডল দলের ১৪ জন সদস্যের সকলেই একযোগে মিউনিসিপ্যালিটীর সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু পরে হোলকার-সরকার জনসাধারণের দাবী অনুসারে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতঃপর রাজ্যের প্রজাবর্গ জনসভা করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু বাহিরের কেহ এই রাজ্যে আসিয়া সভাসমিতি করিতে চাহিলে তাঁহাদিগকে সে জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে রাজ্যের অশান্তি নিবারিত হইবে—তাহার সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না।

দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত রামদুর্গ রাজ্যের রাজা সাহেব গত ২৭শে ডিসেম্বর জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজদরবার দায়িত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নীতি গ্রহণ করিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্ররাজ্যের নরপতি প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য যে ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছেন, অন্যান্য রাজ্যের সামন্ত নরপতিগণের তাহা অনুসরণ-যোগ্য।

গোয়ালিয়র রাজ্যে কিছু কিছু সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক পন্থায় পানীয় জল সরবরাহ ও সহরের পয়ঃপ্রণালী সমূহের সংস্কারের জন্য মহারাজা সিন্ধিয়া ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আপাততঃ দুইটি নগরে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে, গোয়ালিয়র সরকার ক্রমশঃ প্রজাবৃন্দের অভাব অভিযোগ দূর করিয়া রাজ্যের বিবিধ দূষিত-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করিবেন।

রাজনন্দগাঁও মধ্যভারতে অবস্থিত সামন্ত নরপতি-শাসিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। কৃষকগণ গ্রামাঞ্চল হইতে দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের দাবী জানাইবার জন্য রাজভবনে অভিযানের সঙ্কল্প করিল। মহারাজার লালবান-প্রাসাদ বহু সশস্ত্র রক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। প্রজাবর্গ তাহাদের অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য রাজসকাশে গমনের সঙ্কল্প করিলে রাজা যদি তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন, আর শান্তিভঙ্গেরও আশঙ্কা হয়, তবে তাহা রাজা-প্রজা কাহারও কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে কয়েকদিন যাবৎ সত্যাগ্রহীরা নগরাভিমুখে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত ভ্রান্ত-নীতির ফলে তাহারা ধৃত ও প্রহৃত হইয়াছিল। দুর্গের কতিপয় মুসলমান প্রজা সত্যাগ্রহ করিলে প্রথমে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, রাত্রিকালে বাসগ্রামে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ধরা-ছাড়া বৃটিশভারতেরই অবলম্বিত নীতি। অতঃপর রাজনন্দগাঁওর দরবার ৭টি পরগণার জন্য স্বতন্ত্র প্রজাসভা গঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্তের অধিকার এই সকল সভায় থাকিবে না। সভাগুলি প্রজাদিগের সহিত রাজদরবারের সংযোগসাধন মাত্র করিবে। দরবারই এই সকল প্রজাসভার সভাপতি মনোনীত করিবেন। শ্রীযুত আর, এস্ রুইকার একটি জনসভায় বলিয়াছেন—প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অত্যন্ত নগণ্য, ইহাতে দায়িত্বপূর্ণ শাসনসংস্কারের এবং প্রজাবর্গ দ্বারা রাজস্ব ও অর্থ বিভাগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন কথার উল্লেখ নাই। ইহার ফলে প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি হইতে পারে। রাজদরবার কর্ত্তৃক সভাপতি মনোনীত করিবার ব্যবস্থা অত্যন্ত আপত্তিকর। এই পরিকল্পনায় প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অতঃপর ২৭এ ডিসেম্বর ৫ জন কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েক ঘণ্টা পরে মুক্তিদান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজদরবারের ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে, কিন্তু আমাদের আশা, রাজা ক্রমশঃ বাধ্য হইয়া রাজ্যের বিভিন্ন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

নিজামশাসিত হায়দরাবাদ রাজ্যেও অশান্তির অনল প্রধূমিত হইতেছে, হিন্দুসভার সভাপতি শ্রীযুত সাভারকর এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন,—হায়দরাবাদকে মুসলমান প্রদেশে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার ফলে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এবং রাজনীতিক অধিকারে বঞ্চিত হিন্দুরা ক্রমশঃ দাসের অবস্থায় উপনীত হইতেছে। শ্রীযুত সাভারকারের মতে নিজাম রাজ্যের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী সার আকবর হায়দারীই হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দুবিরোধী নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য দায়ী। হিন্দুদিগের এই দুর্দ্দশার প্রতীকার কল্পে আর্য্যসমাজীরা সর্ব্ব প্রথমে দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে এই বিষয়ে হিন্দু-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্ভব। এজন্য শত শত আর্য্যসমাজী কারারুদ্ধ ও নানাভাবে প্রপীড়িত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরেই মুসলমান-জনতার আক্রমণে দ্বাদশ জন আর্য্যসমাজী প্রাণ হারাইলেও অপরাধীরা ধরা পড়ে নাই, ইহা কি হায়দরাবাদের শাসন বিভাগের কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন নহে?

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নিজাম রাজ্যে হিন্দুর দুরবস্থা সম্বন্ধে হিন্দু-মহাসভার প্রতিনিধি যে রিপোর্ট দাবী করিয়াছিলেন, তা হাতে নানা প্রকার অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলেও তাহাতে কোন ফল হয় নাই। হিন্দু অধিবাসিবর্গের প্রতি নিজামদরবারের ব্যবহারের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদেও দীর্ঘকালেও সেই ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হয় নাই। অবশেষে গত বৎসর হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনে

সিদ্ধান্ত হয়, কয়েক জন হিন্দু জননায়ককে নিজাম দরবারে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য ডেপুটেশনে প্রেরণ করা হইবে ; কিন্তু নিজাম-সরকার হইতে ডেপুটেশন প্রেরণের অনুমতি পাওয়া যায় নাই।

সাভারকার মহাশয় হায়দরাবাদ ও ভূপাল রাজ্যে হিন্দু-প্রজাবর্গের দুর্দ্দশার প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি নাই বলিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত এক ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছিল, হায়দরাবাদের যে স্থানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক, সেই স্থানে হিন্দুর মঠ ও মন্দির বর্দ্ধিত বা মেরামত করা যাইবে না। হায়দরাবাদের সর্ব্বত্র মসজেদ বর্ত্তমান, কিন্তু কুত্রাপি হিন্দু-মন্দির নাই, আছে কেবল পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সহরের বাহিরে ভগ্ন মন্দিরে, অথবা গোদাবরী নদীতে হিন্দুগণকে ধর্ম্মাচরণ করিতে হয় ; অথচ এই রাজ্যের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী হিন্দু। সুতরাং এই সকল অনাচারের প্রতিবাদে হিন্দুরা আরও কিছু করিলে তাহা অনুচিত মনে করিবার কারণ নাই। হায়দরাবাদের হিন্দুরা তাঁহাদের দুর্দ্দশা মোচন করিয়া যদি তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের দুর্দ্দশার অবসান হইবে।

উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্যসমূহের (ইষ্টার্ণ ষ্টেট্‌স এজেন্সী) পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর আর, এল, বজলগেট পরিদর্শন উপলক্ষে নয়াগড় রাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ; রণপুরের সন্নিহিত কোন গ্রামে চুরি হওয়ায় প্রজামণ্ডলের কয়েক জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রজামণ্ডলকে বে-আইনী বলিয়া নির্দ্ধারিত করায় তাহারা সে সিদ্ধান্তের সমর্থন করে নাই, তাহার উপর প্রজামণ্ডলের ঐ সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করায় গোলযোগ বর্দ্ধিত হয়। ৫ই জানুয়ারী মেজর বজলগেট অবস্থা তদন্তের জন্য সুবেদারের সঙ্গে রণপুরে গিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে আদেশ করেন। জনতা তখন লাঠী লইয়া রাজ-প্রাসাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা মেজর বজলগেটের আদেশ পালন না করিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করায়, মেজর তাঁহার রিভলভার হইতে গুলী বর্ষণ করেন ; তাহাতে জনতার দুই জন লোক নিহত হয়। তখন উত্তেজিত জনতা মেজর বজলগেট ও সুবেদারকে আক্রমণ করে। আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল এবং সেই আঘাতেই মেজর বজলগেটের প্রাণবিয়োগ হয়। সুবেদারেরও অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। রণপুর রাজ্যের রাজার প্রাসাদের বাহিরেই এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। উত্তেজিত জনতা পলিটিক্যাল এজেণ্টকে হত্যা করিয়া যে অন্যায় করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের রাজারা যদি যথাসময়ে প্রজাবর্গের অভাব-অভিযোগে কর্ণপাত করিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে এভাবে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইত না। মেজর বজলগেটও যে তাঁহার পিস্তল ব্যবহারে সংযমের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই, ইহাও নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয়। নিরীহ প্রজাপুঞ্জ কতদূর উত্তেজিত হইলে অহিংসনীতি ত্যাগ করিয়া হিংসাশ্রয়ী হইতে পারে, এই ঘটনায় তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বরোদা রাজ্যে প্রজাবর্গের মধ্যে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশিত হইতেই বিচক্ষণ বরোদা-রাজ সতর্কতাবলম্বন করিয়াছেন। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এবং ব্যবসায় কার্য্য মন্দা হওয়ায় রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাবর্গের খাজনার চার টাকায় দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত হ্রাসের ঘোষণা করায় প্রজাবর্গের চাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়াছে।

কাশ্মীররাজ্যেও গণজাগরণের লক্ষণ পরিস্ফুট। কাশ্মীর-রাজের বহু মুসলমান প্রজা-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। তাহাদিগের সভা সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইলেও তাহারা সরকারের নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত করে নাই। এ জন্য দলে দলে প্রজা কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে, সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ; কিন্তু আন্দোলন বন্ধ হয় নাই। কাশ্মীরে যে সকল রাজনীতিক বন্দীরা আবদ্ধ আছে, সেখানে নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব লক্ষিত হইতেছে। এই সম্পর্কে কতকগুলি ওয়ার্ডারকে সাময়িক ভাবে পদচ্যুত করা হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত রোগের প্রতীকার ভিন্ন আন্দোলন বন্ধের সম্ভাবনা নাই। ক্ষুব্ধ প্রজাবর্গ কারাবরণে কুণ্ঠিত নহে।

উদারনৈতিক সম্মিলন

গত ৩০শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত উদারনৈতিক সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত পি, এস,

সপ্রু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সহিত সমগ্র সভ্য-বিশ্বের রাষ্ট্রনীতিক সম্বন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হিটলার ও মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট-নীতির প্রসারতার নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই ব্যাপার উপলক্ষে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড গণতান্ত্রিক নীতির সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্ম্মাণীর মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইনেও ইহুদী এবং আরবদিগের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সামঞ্জস্য নাই। সভাপতির মতে প্যালেষ্টাইনকে দেশ বলিয়া দাবী করিবার অধিকার আরবদিগের আছে। চীনে জাপানের জয় লাভের পরে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটেনের পক্ষে নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন।

শ্রীযুত সপ্রু বলিয়াছেন যে, মিঃ এন্টনী ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ প্রস্তাব করিতেছিলেন, ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগই ব্যবস্থাপরিষদের আয়ত্তাধীন হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার বক্তৃতায় দেখা যায়:—

"নূতন ভারতশাসন আইনের রচয়িতারা এই প্রস্তাবে (ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগ ব্যবস্থাপরিষদের আয়ত্তাধীন হইবে) সম্মত হন নাই। * * আমরা প্রথমাবধি জাতি-সঙ্ঘের সদস্য হইলেও ব্যবস্থাপরিষদে পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা করিবার অধিকার আমাদিগের নাই। * * যে সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে গুলির সম্বন্ধে যদি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মত প্রকাশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে ভারতের জাতি-সঙ্ঘে থাকিয়া লাভ কি?"

লাভ কিছুমাত্র নাই জানিয়াই কংগ্রেস এই স্বায়ত্ত-শাসনকে ভূয়া বলিয়াছেন। দেশবাসী সেই জন্যই যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবী করিতেছেন। উদারনীতিক দল যখন উহা অসার বলিয়া বুঝিয়াছেন, তখন কংগ্রেসের সহিত একযোগে কার্য্যপন্থা অবলম্বন করুন না। বক্তৃতার দিন আর নাই, এখন কাযের সময় সমাগত।

ঔপনিবেশিক অধিকার যে উদার-নীতিকদিগের লক্ষ্য, শ্রীযুত সপ্রু তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কোন জাতির পক্ষেই অন্যায় নহে। কিন্তু মনের মধ্যে শুধু আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিলেই তাহা লাভ করা যায় না। সেজন্য একনিষ্ঠভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন আছে। শ্রীযুত সপ্রু বৃটেনের শাসননীতির কর্ণধারগণকে যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতকে ঔপনিবেশিক অধিকার দিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কারণ, ভারতের জনমত ইদানীং যে পথে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ বৃটিশ-গণতন্ত্রসভায় যোগদান করিবার অনুকূল নহে। বৃটিশের পররাষ্ট্র নীতি ফ্যাসিজমের অনুকূল। ভারতবর্ষ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীযুত সপ্রু মিঃ চেম্বারলেনের পররাষ্ট্র নীতির সমর্থন করেন না, কিন্তু বৃটেনের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী নহে, উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। শ্রীযুত সপ্রু বৃটিশ-শাসন-বিধানের প্রকৃতির উপর আস্থা পোষণ করেন। সুতরাং বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক অধিকার-দান করিবেন, এই বিশ্বাস তাঁহার মনে বদ্ধমূল। কিন্তু দয়াদত্ত দানে কোন দিনই কোন জাতি স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিয়াছে, ইতিহাস এমন কথা বলে না। উহা অর্জ্জন করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত সপ্রু যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী নহেন। তবে "ভারত-শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্র-পরিকল্পনায় যে সকল আপত্তিকর বিষয় স্থান পাইয়াছে, সেগুলির জন্য আমরা উহা সমর্থন করিতে পারি না। উহাতে কেন্দ্রী-শাসনব্যবস্থা যে ভাবে করিতে হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তনসাধন প্রয়োজন" এ কথা শ্রীযুত সপ্রু বলিয়াছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর এই বিষয়ে যে সকল মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীযুক্ত সপ্রু সে সম্বন্ধে বক্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—

"শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বলিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইলে কংগ্রেস জনগত আইনঅমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবে। আমরাও সুভাষচন্দ্রের ন্যায় দেশকে ভালবাসি। সেই জন্য কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে বলিতে চাহি, বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্র যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয়, বিজ্ঞ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ নীরব রহিয়াছেন। আমার মতে এই ভাবে নূতন শাসনব্যবস্থা অচল করা সম্ভব হইবে না।"

কিন্তু শ্রীযুত সপ্রু, যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা ধ্বংস করিবার অন্যবিধ কোন রাষ্ট্রনীতিক কৌশলের কথা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করেন নাই। দেশীয় সামন্ত-নৃপতিবৃন্দের অনেকের রাজ্যে প্রজাগণের বিরুদ্ধে যে প্রকার অনাচার ও স্বৈরাচার

ষ্ঠত হইতেছে, তাহাতে কেন্দ্রী শাসনপরিষদে সেই সকল নৃপতির মনোনীত প্রতিনিধিবর্গ আসিলে স্বায়ত্তশাসন সার্থক হইতে পারিবে কি? অবশ্য শ্রীযুত সপ্রু সামন্ত রাজন্যবর্গের উদ্দেশে আবেদন জানাইয়া বলিয়াছেন যে, রাজ্যমধ্যে তাঁহারা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মর্য্যাদা যেন রক্ষা করেন। রাজকীয় ব্যয়ভার হ্রাসের ব্যবস্থা করাও তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য।

শ্রীযুত সপ্রু শৃঙ্খলাপূর্ণ অগ্রগতির পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন ;—

"যাঁহারা গণপরিষদ আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সে প্রস্তাবে আমাদিগের আস্থা নাই। * * বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হইবার পর প্রকৃত গণ-পরিষদ আহ্বান করা চলিতে পারে। কিন্তু আমরা বিপ্লবের পক্ষপাতী নহি। * * তাঁহারা যদি বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার শাসনব্যবস্থা যেরূপ সম্মিলনে রচিত হইয়াছিল, তাঁহারাও সেইরূপ সম্মিলন আহ্বান করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাতে আমরা আপত্তি করিব না। * * কিন্তু অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে না।"

শ্রীযুত সপ্রু বিপ্লববিরোধী। বিপ্লব দেশবাসীর কাম্য নহে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির গতিপ্রবাহ যে ভাবে চলিয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর গণবিপ্লব নির্ভর করে না।

বিশ্বে শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

গত ৭ই পৌষ শান্তি-নিকেতনের স্মৃতি-উৎসবে কবিবর ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম :—

"আমাদিগকে আজ সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে। মানবের বিবর্ত্তনের তিনটি সুস্পষ্ট দশা আছে। মনের স্বরূপ উপলব্ধির পর প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়, জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পথ অতি দুর্গম। আত্মোপলব্ধিই ইহার শেষ পরিণতি। সৃষ্ট জগতে কিরূপে সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তি বিরাজ করে এবং কেবলমাত্র আনন্দের ভিতর দিয়া কিরূপে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বর্ণনা করিতে যাইয়া ঋষিগণ উপনিষদে এই চরম সত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধনেও সমর্থ হইয়াছি ; কিন্তু ইহার ফলে সদ্ভাব ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে 'কেবল ভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লোকরা জ্ঞানের গণ্ডী কতদূর, তাহা বুঝিতেন এবং সেই জন্য আনন্দ ও প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। প্রত্যেক অসদুদ্দেশ্যের পশ্চাতে লোভ ও স্বার্থপরতা বিদ্যমান। এই প্রবৃত্তিই মানুষের মধ্যে দানবীয় সৃষ্টি করিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসৃষ্টি তাহারই কার্য্য। কোন দেশ আমাদের মত এত অধিক পরিমাণে ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মানবতার অপমান করিবার অপরাধে অপরাধী হয় নাই। যে দেশ নির্লজ্জ ভাবে তাহার গৌরবময় আধ্যাত্মিকতাকে বিস্মৃত হইয়াছে, হীন প্রবৃত্তিগুলি সেই দেশের অগৌরবজনক ধ্বংসের সূচনা করিতেছে। ধ্বংসাত্মক পরিণামের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, এবং বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রেম ও আনন্দের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটিলে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

এই মনোভাব হিন্দুসমাজ-সমর্থিত উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তাঁহার আক্ষেপ অকারণ নহে।

সমগ্র বিশ্বে যে অশান্তি ও বিপ্লব লক্ষিত হইতেছে, প্রজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞানের প্রসারই কি তাহার জন্য দায়ী নহে? বিজ্ঞান আজ বিশ্বের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অপকার সাধনেই সমধিক নিয়োজিত হইয়াছে। এ জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-সমাজই দায়ী। বিজ্ঞান যে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছে, তাহার ফলে সভ্যতা ও মানবজাতির ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। বিজ্ঞানের এই পরিণতি রুদ্ধ করিয়া তাহাকে মানবসমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার জন্য যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন, বিজ্ঞানবিৎ য়ুরোপীয় জাতি যে কবির আক্ষেপ শুনিয়া সেই পথ অবলম্বন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের দেশ তাহার গৌরবময় আধ্যাত্মিকতাকে বিস্মৃত হইয়াছে—এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা যে শিক্ষা য়ুরোপীয় সভ্যতার নিকট লাভ করিয়াছি, তাহার অনুসরণ করিতে হইলে আমরা যে মন্দ হইতে ভালটুকুই গ্রহণ করি, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? য়ুরোপ আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম উপলব্ধি না করিয়া আজ জড় শক্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ; কারণ,তাহারা শক্তির মোহ এবং ভোগের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে অসমর্থ। প্রাচীন আর্য্যগণ জড়-শক্তির উপাসনা না করিয়া পরাজ্ঞান আয়ত্ত করাই একান্ত কাম্য—প্রকৃত সুখের মূলীভূত কারণ বলিয়া তাঁহারা সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আমরা যখন সেই আদর্শ ত্যাগ করিয়া উচ্চাভিলাষ এবং জড়-শক্তির প্রসাদই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছি, তখন শিক্ষার আদর্শের পরিবর্ত্তন ভিন্ন আধ্যাত্মিকতার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিলে দুই নৌকায় পা রাখার চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল প্রয়াস হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান

অবস্থায় আমরা য়ুরোপীয় আদর্শে আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব হইয়াছি। এই আদর্শ ত্যাগ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, এ অবস্থায় আমরা প্রাচীন যুগের আনন্দ ও কল্যাণ ফিরিয়া পাইব, এ আশা কিরূপে করিতে পারি ?

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ২৬-তম অধিবেশনে ৪ঠা জানুয়ারী আরম্ভ হইয়া ৩ দিন বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। ভূগোল এবং ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানশাখার সভাপতি অধ্যাপক এম্, সুব্রহ্মণ্য 'ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে এবং অধ্যাপক এস, কে, রায় ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি রূপে ভারতীয় ভূতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও উন্নতি সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ আহারাদির পর স্পেশাল্ ট্রেণে তক্ষশিলা পরিদর্শনে গমন করিয়া দিবসের অবশিষ্ট সময় তত্ত্বানুসন্ধানে সেখানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

অতঃপর ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে অধ্যাপক জে, এন্, মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠের পর ভারতের দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন সদস্যগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। তিনি তাঁহার আলোচনার প্রারম্ভে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ সয়েল সায়েন্স' নামক সমিতির কার্য্যকলাপের বিবরণ প্রদান করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্র ও মৃত্তিকা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ভারতের নেতৃবৃন্দের এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কৃষিকার্য্যই ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর উপজীবিকা, এজন্য এদেশে 'ক্ষেত্রবৃদ্ধি' সৃষ্টির প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

শ্রীযুত এইচ, পি, মাইতি মনস্তত্ত্ব বিভাগের সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণে মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত নানা তথ্যের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় প্রধানতঃ তিনি মানবের মনোভাবেরই আলোচনা করিয়াছিলেন।

শারীরস্থান-বিদ্যাবিভাগের সভাপতি শ্রীযুত এন, এম, বসু তাঁহার অভিভাষণে ভারতে শারীরস্থান-বিদ্যা সম্বন্ধের গবেষণার ফলে যে সকল নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন।

ডক্টর কে, আর, রামনাথম্ গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিরূপে এই উভয় বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ২৬-তম অধিবেশন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লাহোরে ভারতের বহু বিজ্ঞানানুরাগী শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল, এবং যাঁহারা বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিরূপে জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী-বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা অধিক থাকায় বাঙ্গালাই যে সমগ্র ভারতের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বঙ্গজননীর গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন, ইহা আমরা আশা ও আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা-সম্মিলন

৭ই ও ৮ই পৌষ হরিশ মুখার্জ্জি রোডের ন্যাসনাল স্কুলে বঙ্গীয় কংগ্রেস-মহিলা-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ৩০ জন তরুণী স্বেচ্ছা-সেবিকা হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, আমাদের দেশের মহিলাগণকেও জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকিবার সময় আর নাই, এখন আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় আসিয়াছে। নারীর গৌরব ত্যাগে; ত্যাগ ও সাধনা ব্যতীত স্বামী-পুত্রের মঙ্গল হয় না। যে পথে স্বামী-পুত্রের মঙ্গল হয়, সেই পথে এখন কায করিতে হইবে। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা মহিলাগণের হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

এই সম্মিলনীর সাফল্য কামনা করিয়া যাঁহারা বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, অতঃপর সভায় তাহা পঠিত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ ও সভানেত্রী তাঁহাদিগের অভিভাষণ পাঠ করেন।

বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা ও কলিকাতা হইতে বহু মহিলা প্রতিনিধি-সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

সভানেত্রী তাঁহার অনতিদীর্ঘ অভিভাষণে বাঙ্গালার অগ্নিযুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নারীরা দেশের কার্য্যে কি ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি রাজনীতিক বন্দিগণের মুক্তি, সামন্ত রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন, এবং যুক্তরাষ্ট্রপ্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়া তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "আজ আপনাদের সকলের সমবেত শক্তি অবলম্বন করিয়া যে কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ গঠিত হইবে, তদ্দ্বারা আপনারা রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক সকল প্রকার উন্নতির অভিমুখে বাঙ্গালার মহিলাসমাজ তথা সমগ্র জনসাধারণকে অগ্রসর করিবার সুযোগ লাভ করুন, ইহাই অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।"

জাতীয় শক্তির উদ্বোধনে মাতৃজাতির এই সমবেত আকাঙ্ক্ষা—সম্মিলিত সাধনা জয়যুক্ত হউক।

হিন্দুমহাসভার অধিবেশন

২৮শে ডিসেম্বর হইতে তিন দিন নাগপুরে হিন্দু-সভার অধিবেশনে শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর পৌরোহিত্য করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, উপযুক্ত জাতীয়তাবাদীকেই যেন হিন্দুগণ ভোট দান করেন। কংগ্রেস হিন্দু-মহাসভাকে মুসলিম লীগের সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলিয়া উহার সহিত কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে কোন সংস্রব রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মহাসভার সদস্যগণকে অপাংক্তেয় করায় যে কংগ্রেসের শক্তি-হ্রাস সম্ভবপর, ইহা কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সাভারকর বলিয়াছেন,—

"কংগ্রেস আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা আমরা হিন্দুরাই করিয়াছি, কিন্তু আজ ভারতের সাতটি প্রদেশে আমরা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবার পর, সহসা কংগ্রেস আমাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। এখন ইঁহারা আর হিন্দুজাতির নামও উচ্চারণ করিতে চাহেন না।"

শ্রীযুত সাভারকরের এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু মহাসভা লীগের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে। হিন্দু মহাসভার বহু সদস্য সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য একনিষ্ঠ সাধনা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস তাঁহাদিগকে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানের সদস্য বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিলে শক্তিহীন হইবেন না কি?

শ্রীযুত সাভারকর বলিয়াছেন, "যে সকল মুসলমান বলেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে মুসলমান, সর্ব্বশেষে মুসলমান, ভারতকে তাঁহাদের জন্মভূমি বলিতে তাঁহারা গৌরব অনুভব করেন না।" হিন্দুরা সে গৌরবে গর্ব্ব অনুভব করেন। তিনি বলিয়াছেন—

"হিন্দুরা যত দিন লাখে লাখে জেলে গিয়া, হাজারে হাজারে আন্দামানে নির্ব্বাসিত হইয়া, ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিয়া, বৃটিশদিগের নিকট হইতে সমানভাবে সকল ভারতবাসীর জন্য রাজনীতিক অধিকার আদায় করিতে ব্যাপৃত ছিল, তত দিন মুসলমানরা দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিয়াছেন। কিন্তু বিপদে পড়িয়া বৃটিশ সরকার যখনই ভারতীয়দিগের হস্তে কিছু ক্ষমতা প্রদান করিলেন, অমনই মুসলমানরা এক লম্ফে ঘটনাস্থলে আসিয়া তাঁহাদিগের প্রাপ্য গণ্ডা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া পাইবার দাবী করিলেন।"

সাভারকর মহাশয়ের এই উক্তিতে সন্দেহের অবকাশ আছে কি? অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া হিন্দুর একনিষ্ঠ আন্দোলনে—আত্মত্যাগে—কারাবরণে, দুঃখকষ্টের কণ্টক-মুকুট শিরে ধারণে—নির্য্যাতন লাঞ্ছনার বিনিময়েই আজ সামান্য অধিকার ভারতবাসীর অধিগত হইয়াছে। সে জন্য হিন্দু কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, সকলের ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়গত সঙ্গত অধিকারে হিন্দু বাদী নহে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হিন্দুস্থানে হিন্দুরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়মাত্র, এইরূপ নির্দ্দেশ নিতান্ত ভ্রমাত্মক। "জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণরাই জাতি এবং ইহুদীরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়মাত্র। যদি তাহা হয়, তবে হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই জাতিরূপে পরিগণিত এবং মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়মাত্র।"

তাই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি ঘোষণা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ যাহা পাইবে, তাহারও উপরে বিশেষ সুবিধা ও রক্ষাকবচ প্রভৃতির যে অসম্ভব ও অশ্রুতপূর্ব্ব দাবী সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহ উত্থাপন করিতেছেন, হিন্দুরা কখনই তাহা সহ্য করিবেন না। সাধারণ ভারতীয় রাষ্ট্র-গঠনে জাতি, ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে। হিন্দু জাতি এই সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় নীতি হইতে এক চুলও অধিক অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু এক জন মুসলমানের ৩টি ভোট এবং ৩ জন হিন্দুর

১টি ভোট থাকিবে। যে রাজনীতিক দল ইহা চাহিবেন, হিন্দু জাতি কখনই তাহার * * * সমর্থন করিবেন না।"

প্রকৃত প্রস্তাবে রো'য়েদাদ সম্বন্ধে কংগ্রেসের না বর্জ্জন না গ্রহণ নীতি এবং একদল মুসলমানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা কংগ্রেসে লক্ষিত হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষতার দ্যোতক নহে। ইহা হিন্দুদিগের মনে যে বেদনার কারণ হয় নাই, তাহাও বলা যায় না। বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য হিন্দুর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাঁহারা কি কংগ্রেসে আকৃষ্ট হইয়াছেন, অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে? লীগপন্থীদিগের ব্যবহারেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সাভারকর বলিয়াছেন—

"তোমরা যদি আইস, তবে তোমাদিগের সঙ্গে এবং যদি না আইস, তবে তোমাদিগকে ছাড়িয়াই. যদি বিরোধিতা কর, তবে তৎসত্ত্বেও আমরা হিন্দুরা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইব এবং অদূর ভবিষ্যতেই স্বাধীন ও শক্তিসম্পন্ন হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় সম্ভব করিব।"

এই দৃঢ় উক্তি সর্ব্বথা স্মরণযোগ্য। কংগ্রেস এই ভাবের কোন সুস্পষ্ট উক্তি করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু হিন্দুরা এইরূপ দৃঢ়বাণী শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। দেশের কল্যাণের জন্য, স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য ভারতবাসীদিগের দাবী যে অত্যন্ত সঙ্গত, এ কথা জাতীয়তাবাদীমাত্রকেই মনে রাখিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তির অর্থ,—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মুক্তি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ,—প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা। ইহা হিন্দু যত অধিক পরিমাণে বুঝে, আর কেহ তাহা বুঝিলে কাম্যফললাভে এত বিলম্ব,—এত বাধা-বিঘ্নের উদ্ভব হইত না।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উপাধ্যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা পৌষ ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার কাশীপুরস্থ বাটী হইতে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া, আমরা বন্ধু-বিয়োগ-বেদনায় ব্যথিত হইয়াছি। এলাহাবাদে বাঙ্গালীর প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান "ইণ্ডিয়ান প্রেস" হইতে তাঁহার সম্পাদিত 'কাদম্বরী' এবং ছোট গল্প সঙ্কলন 'পুষ্পপাত্র', 'সওগাত' প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যরসিক-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। ১৩১৬ সাল হইতে তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকপত্রদ্বয়ের সহকারী সম্পাদকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের অবসরে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' সম্পাদন করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
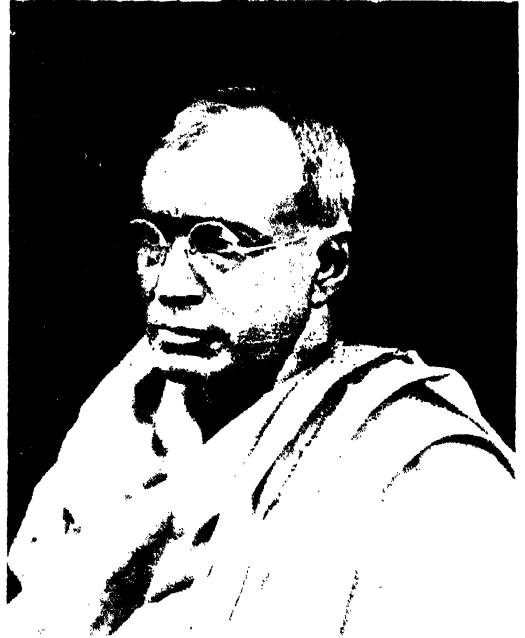
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্ত্তিত বাঙ্গালায় এম্, এ অধ্যাপনার ভার প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধক্রমে চারুচন্দ্র ঢাকায় গিয়া বাঙ্গালা অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন এবং পরীক্ষা না দিয়া এম্ এ উপাধি লাভে সম্মানিত হন। চারুচন্দ্রের মনীষার দান 'দোটানা', 'মুক্তিস্নান', 'বজ্রাহত বনস্পতি', 'সদানন্দের, বৈরাগ্য', 'বায়ু বহে পূরবৈঁয়া', 'পঙ্কতিলক', 'নষ্টচন্দ্র', 'হাইফেন', 'হেরফের', 'রূপের ফাঁদ', 'ধোঁকার টাটি' প্রভৃতি উপন্যাস পাঠে তরুণ সমাজ পুলকিত সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। চারুচন্দ্র সাহিত্যে নবতন্ত্রের উপাসক ছিলেন—তাঁহার ভাষার সাবলীল গতিভঙ্গিতে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে বেদনার অনুভূতি-সঞ্চারে করুণায় চিত্ত বিবশ করিত। "সাহিত্য"

"মাসিক বসুমতী" প্রভৃতি মাসিকপত্র তাঁহার রচনাসম্ভারে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি শূন্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনে—অনুবাদে—সমালোচনায়—শেষজীবনে 'বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থ প্রণয়নে যে শ্রম ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক চারুচন্দ্রের বিয়োগে যে অবিরাম নির্ঝর-গীতি বাঙ্গালার মরুবক্ষে স্তব্ধ হইল, সাহিত্যানুরাগী সম্প্রদায় সেজন্য চিরদিনই ব্যথা অনুভব করিবেন।

গিরিশচন্দ্র বসু

১৪ই পৌষ ৮৭ বৎসর বয়সে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য মনীষী শিক্ষাব্রতী গিরিশচন্দ্র বসুর কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত কায়স্থ-পরিবারে জন্মিয়া তিনি পঠদ্দশাতেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি রাভেন্স কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১৮৮২ খৃঃ সরকারের মনোনয়নে ও বৃত্তি পাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন (পরে লর্ড) সিংহ গিরিশচন্দ্রের বিলাতের সহপাঠী ও সুহৃদ-ছিলেন। পাঠ সমাপ্তির পর বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গবাসী স্কুল স্থাপিত করেন। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রবর্ত্তিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা তখন জনপ্রিয় ছিল। সেই নামেই তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বিলাতে অবস্থানকালেও তিনি ''বঙ্গবাসীতে' নিয়মিতভাবে লিখিতেন।

বিখ্যাত ফরাসী-লেখক ম্যাক্সওয়েলের 'জনবুল অ্যাণ্ড হিজ আইল্যাণ্ড' অবলম্বনে ইংরেজের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক তাঁহার লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সেই সময় 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সে গুলি সংগ্রহ করিয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পরেও তিনি বাঙ্গালায় কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক—সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নীরদমোহিনী টেনিসনের এনক আর্ডেনের কবিতা-অনুবাদ 'ছায়া' নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরী প্রত্যাখ্যান করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যে আত্ম-নিবেদন করিয়াছিলেন, 'বঙ্গবাসী' কলেজ তাঁহার সাধনা-সাফল্যের পূর্ণ পরিচয়। তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বি, এস্, সির ছাত্রগণকেও তিনি বাঙ্গালায় বিজ্ঞান পড়াইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের

গিরিশচন্দ্র বসু

নানা কার্য্যে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্রের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করিতেন। যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত—বেশে ও বাসে সম্পূর্ণ স্বদেশী, যিনি কবিবর হেমচন্দ্রের ভাষায় "শিক্ষাব্রতে ও সিদ্ধকামে" দরিদ্র ছাত্রগণের বন্ধু, সহায়, সেই গিরিশচন্দ্র বসুর বিয়োগে দুই যুগের মধ্যে সংযোগ-সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন্ধ্যা

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৭শ বর্ষ] মাঘ, ১৩৪৫ [৪র্থ সংখ্যা

গীতা-বিচার

১০

প্রতিবাদী বলিতেছেন,—"গীতার ব্রহ্মতত্ত্ব ও সপ্তশতীর মহামায়া যে এক ইহা আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই, যদি বুঝাইতে পারি,—তাহা হইলে, উনি প্রতিবাদ করিবেন, নতুবা প্রতিবাদ করিবেন না,—তিনি বলেন, এত বড় জটিল বিষয় দু'টা গীতার ও দু'টা সপ্তশতীর শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই বুঝান হয় না, তন্ন তন্ন করিয়া সকল লোকের হৃদয়ঙ্গম যাহাতে হয়, এমন ভাষায় তাহা প্রকাশ করা উচিত।"

আমার কথা।—

ধন্যবাদ, আমি যে শীঘ্র শেষ করিব বলিয়া একটু ত্বরা করিয়াছি, তাহা আপনি ধরিয়াছেন, আমাকে তাহা বলিয়া আমারই উপকার করিয়াছেন। অতএব—যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি,—

ব্রহ্ম প্রকৃতি-পুরুষস্বরূপ ইহাই গীতা ও সপ্তশতীর সিদ্ধান্ত। সপ্তশতী আমাদিগের দেশে এবং কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থেও 'চণ্ডী' নামে খ্যাত, ইহাও স্পষ্টতার অনুরোধে বলিয়া রাখিলাম।

প্রকৃতির স্বরূপ অচিৎ—অচেতন, পুরুষের স্বরূপ—চিৎ চেতন এবং চৈতন্য।

যিনি প্রকৃতি তাঁহা হইতেই বিশ্বসৃষ্টি,—ইহা সাংখ্যদর্শনের মত।

মায়াবাদী বৈদান্তিক সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি মানেন না। তাঁহারা প্রকৃতি স্থলে মায়াকে বসাইয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকৃতি ও মায়ার প্রভেদ বিস্তর, প্রকৃতি—মিথ্যা বা অনির্ব্বাচ্যা নহে, প্রকৃতির আদি নাই, অন্তও নাই।

মায়াবাদীর মায়া—মিথ্যা বা অনির্ব্বাচ্যা। "অনির্ব্বাচ্যা" শব্দের অর্থ,—সত্য কি মিথ্যা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় নাই,—তাহাতেই অনির্ব্বাচ্যা এই সংজ্ঞা। তাহার আদি নাই, অন্ত আছে। প্রকৃতি জগতের উপাদান—মূল উপাদান, মায়ার উপাদানত্ববিষয়ে মায়াবাদীর মধ্যেও মতভেদ আছে। মায়াবাদী যে মায়াকে প্রকৃতি স্থানে বসাইয়া থাকেন, তাহার মূলে,—উপনিষদের এই মন্ত্র প্রদর্শন করেন, যথা—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্‌-
মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। (শ্বেতা ৪।১০)

অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরই মায়ী। মহেশ্বরের যে মায়া তাহাই প্রকৃতি। মহেশ্বর শব্দের

অর্থ—পরমেশ্বর। এইরূপ অর্থ মায়াবাদীর সম্মত। সাংখ্যমতে এই মন্ত্রের অর্থ প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া জানিবে, এবং মহেশ্বরকেই মায়ী বলিয়া জানিবে। মায়া—অন্য কিছু নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতরের মন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশ—

"তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ"

মায়াবাদীকে এই অংশে একটু কষ্টকল্পনা করিতে হয়। কারণ—নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অবয়ব নাই,—মায়াযুক্ত বলিয়া—তাঁহার অবয়ব কল্পনা করিলেও তাহা ঐন্দ্রজালিকের সৃষ্ট মিথ্যাদৃষ্ট মাত্র,—তাহাকে পরমার্থ সত্য মহেশ্বরের অবয়ব বলিতে হইলে ভাষাগত অসঙ্গতি হয়। তাহা দূর করিবার জন্য যে প্রয়াস, তাহাকেই কষ্টকল্পনা বলিয়াছি। মিথ্যাকে সত্যের অবয়ব বলিলে, তাহা ভাষার অসঙ্গতি বা অর্থসামঞ্জস্যহীন শব্দ—ইহা অস্বীকার করা যায় না। যদি বলা যায়—প্রতিবিম্বের যে অবয়ব, তাহা মিথ্যা হইলেও যেমন সত্যের অবয়বরূপে ব্যবহার হয়, ভাষার অসঙ্গতি দোষ হয় না—সেইরূপ এস্থলেও হইবে। তাহাতে বক্তব্য এই যে,—সেখানে ভাষার অসঙ্গতি নহে,—ভাষাভাষীর দোষ। আমি যদি মিথ্যা করিয়া বলি,—'অমুক চুরি করিয়াছে'—তাহাতে ভাষার দোষ নাই,—আমার দোষ,—সে ব্যক্তি চুরি না করিলেও আমি তাহা মিথ্যা বলিয়াছি। প্রতিবিম্বের অবয়বকে মানুষের অবয়ব বলিলেও তাহাতে বক্তারই দোষ বুঝিতে হইবে। বক্তা প্রতিবিম্ব ও মানুষকে এক মনে করিয়া ভুল করিয়াছে। শ্রুতি—অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর কৃত,—উভয়মতেই ভাষা-ভাষীর দোষ মনে করা যায় না। অপৌরুষেয়ের বক্তা নাই এবং ঈশ্বরের মিথ্যা ভাষা অসম্ভব। এইরূপ শ্রুতিতে যদি মিথ্যাকেই সত্যরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়—তাহাকে ভাষার অসঙ্গতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ঐ ভাষা যে অর্থ প্রকাশ করিতেছে—সে অর্থ ঐ ভাষার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত,—চলিত ভাষায়—'চতুষ্কোণ গোলক' এই শব্দের যেমন কোন অর্থ হয় না,—সত্য-প্রকাশরত ভাষার পক্ষে,—অসত্য অর্থও সেইরূপ, অর্থ না হওয়ারই সমান। তাই বলিতেছি—'ভাষার অসঙ্গতি' হয়। এই অসঙ্গতি পরিহারের জন্য যে প্রয়াস তাহাই কষ্টকল্পনা।

প্রকৃতি সত্য এবং পুরুষও সত্য,—কিন্তু প্রকৃতির সত্যতা বা সত্তায় পরিণাম আছে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ নাশ না হইলেও বিকার হইয়া থাকে,—যেমন দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে ফুটিয়া উঠে;—এই ফুটিয়া উঠাই বিকার। দুগ্ধকটাহে অনেকক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগিলে দুগ্ধ ঘন হয়—শুষ্ক ক্ষীর হয়, শেষে দগ্ধ হয়,—এই প্রকারে দুগ্ধের স্বরূপ নাশ হয়, কিন্তু প্রকৃতি ফুটন্ত দুগ্ধের ন্যায় বরাবর থাকে—যত দিন জগৎ থাকিবে। জগতের প্রলয়—প্রকৃতির সমতা, দুগ্ধের শীতল অবস্থার ন্যায় সমভাবে অবস্থিতি। এই সমতারও বিভিন্ন ক্ষণসম্বন্ধপ্রযুক্ত অবস্থা ভেদ—অতীত অনাগত বর্ত্তমানাবস্থা হয়—এই দৃষ্টান্তেই সমপরিণাম বুঝিতে হইবে।

দুগ্ধের ফুটন্ত অবস্থার ন্যায় সৃষ্টিক্ষণে যে প্রকৃতির অভিব্যক্ত ক্রিয়াশীল অবস্থা তাহারই নাম বিষম-পরিণাম, আর প্রলয়কালে যে প্রকৃতির সমতা এবং তদ্ভাবেই বিভিন্ন ক্ষণসম্বন্ধের ন্যায় যে অবস্থাভেদ তাহার নাম সমপরিণাম। বিষমপরিণামে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি। সমপরিণামে,—কোন তত্ত্বের সৃষ্টি হয় না। বিষম পরিণামই হউক বা সম পরিণামই হউক, প্রকৃতির স্বরূপ নাশ কখনই হয় না। যে পুরুষ মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত প্রকৃতির আর সম্বন্ধ থাকে না বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির নাশ হয় না। মায়াবাদীর মতে মায়ার নাশেই মুক্তি। একৈক জীবের অজ্ঞান অবিদ্যা নামে পরিচিত হইলেও তাহা মায়ারই অংশ, মায়ার অঙ্গ হইতে এইরূপ অংশ স্খলিত হইলে তাহা যে পূর্ব্ব স্বরূপের অপচয় ইহা অস্বীকার করা যায় না; বিশেষতঃ এইরূপ ভাবে একে একে সকল জীবই যখন মুক্ত হইবে তখন মায়ানাশ মানিতেই হয়, যত কোটি বৎসরেরই হউক নাশ ত হইবেই, কিন্তু প্রকৃতির নাশ কখনই হয় না। অতএব সাংখ্যের প্রকৃতি ও মায়াবাদীর মায়া—এক হইতেই পারে না।

এক্ষণে দেখা যাক্,—গীতাতে প্রকৃতি শব্দ যে আছে,—তাহা সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়াবাদীর মায়া—কাহাকে বুঝাইতেছে?

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।"

এস্থলে প্রকৃতিকে অনাদিই বলা হইয়াছে। যখন অনন্ত বলা হয় নাই, তখন এ প্রকৃতি মায়া যে নহে—তাহা বলা যায় না,—মায়াও তো অনাদি।

হাঁ, এরূপ আশঙ্কা হইলেও—তর্কের যে সাধারণ পদ্ধতি আছে, তাহাতে, এ স্থলে অনাদি শব্দে—অনাদি অনন্ত দুই ধরিতে হয়। সাধারণ তর্কপদ্ধতি এই যে—যাহা 'ভাব'পদার্থ তাহা অনাদি হইলেই অনন্ত হইবে। ভাব শব্দের অর্থ—যাহা অভাবরূপে ব্যবহৃত নহে,—তাহাই ভাব। অমুক বস্তু নাই—অথবা ভবিষ্যতে হইবে,—ইত্যাদি রূপে—যাহার বর্ত্তমান অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়, তাহারই 'অভাব' বুঝিতে হয়। প্রকৃতি—এরূপ 'অভাব' নহে—'নাই' বা 'হইবে' এরূপ শব্দদ্বারা প্রকৃতিকে বুঝা যায় না, প্রকৃতির বাস্তব সত্তা এবং স্বরূপ গীতার সর্ব্বত্র স্বীকৃত, এ অবস্থায় তাহাকে যদি অনাদি বলা যায়,—তাহার উৎপত্তি নাই—ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার যে অন্ত আছে—ইহা মানিতে পারা যায় না—তাহা মানিলে, প্রকৃতির সহিত একত্র প্রযুক্ত পুরুষ—অনাদি হইলেও সান্ত হইতে পারেন এমন সংশয় হইতে পারে। সুস্পষ্ট উপদেশযুক্ত গীতামধ্যে অনাদি কিন্তু অন্তযুক্ত বস্তুর অস্তিত্ব কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। এস্থলে ঐরূপ মতবাদ গীতার মধ্যে স্থাপিত করা সাধারণ পদ্ধতিবিরুদ্ধ।

বিশেষতঃ গীতাতেই আর এক স্থানে আছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬।

আমি জন্মরহিত অব্যয়াত্মা এবং সর্ব্বজীবের ঈশ্বর হইলেও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজমায়ায় 'সম্ভবামি'—এস্থলে 'অব্যয়াত্মা' এবং 'সম্ভবামি' এ দু'টি পদের অনুবাদ করি নাই। 'অব্যয়াত্মা' লইয়া—অনেক কথা আছে বলিয়া এখানে অনুবাদ করিলাম না। 'সম্ভবামি'র অর্থ 'দেহবানিব ভবামি জাত ইব' (শঙ্করভাষ্য)। সম্ভবামি সম্যগ্-অপ্রচ্যুত-জ্ঞান বলবীর্য্য-শক্ত্যৈব ভবামি (শ্রীধর)। শঙ্কর-ভাষ্যমতে ভাবার্থ এই যে,—বাস্তব জন্ম আমার না থাকিলেও,—আমি দেহধারী না হইলেও,—দেহধারীর ন্যায় হইয়া থাকি ইহা আমার জন্মের অভিনয় মাত্র। এই যে দেহ-ধারণ বা জন্মাভিনয় ইহা আমার মায়া। শ্রীধর স্বামীর মতে ভাবার্থ এই যে, সং=সম্যক্=ভবামি=আবির্ভূত হই,—আবির্ভূত হইলেও আমার যে ঐশ্বরিক জ্ঞান বলবীর্য্য শক্তি তাহার কোন অংশের বিচ্যুতি হয় না। শেষটুকু সং বা সম্যক্ শব্দের ব্যাখ্যা। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে—মূল শ্লোকে প্রকৃতি ও মায়া দুইটি শব্দের উল্লেখ আছে। যদি প্রকৃতি ও মায়া একই হইবে, তাহা হইলে—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি' অথবা 'সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া' এইরূপই প্রয়োগ হইত,—বড় জোর—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি তয়া' হইত। ভাষার নিয়মানুসারে একই বাক্যমধ্যে একার্থ-বাচক শব্দের পুনঃপ্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে—তবে যদি বিশেষ কারণ থাকে তাহা হইলে, 'তৎ'শব্দ দ্বারা তাহা বুঝাইতে হয়। 'রাম বাবু—বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন,' অথবা 'রাম বাবু তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন'—এইরূপ বাক্য ব্যবহার হয়। রাম বাবু রাম বাবুর বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন—এইরূপ বাক্য ব্যবহার হয় না। যদি কেহ এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাতে শ্রোতার মনে হয়,—দ্বিতীয় রাম বাবু—আর এক ব্যক্তি। গীতার শ্লোকেও ঠিক তাহাই আছে। 'প্রকৃতিং স্বাং' প্রয়োগের পর 'আত্মমায়য়া' প্রয়োগ করাতে বুঝা যায়—এই স্বা প্রকৃতি ও আত্মমায়া এক নহে—'স্ব' এবং 'আত্ম' এক হইলেও—প্রকৃতি ও মায়া এক নহে—ইহা গীতার মত।

প্রকৃতি ও মায়া—দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া ধরিবার পক্ষে শ্রীধর স্বামীর মতও বুঝা যায়—

'স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামি।'

প্রকৃতি শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব এবং মায়া শব্দের অর্থ ইচ্ছা।

গীতার মূলমধ্যে প্রকৃতিশব্দের এরূপ অর্থ কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মায়া শব্দের ইচ্ছা অর্থও আভিধানিক বা গীতোক্ত নহে। গীতার প্রকৃতিশব্দের প্রয়োগ যে-অর্থে আছে তাহা কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রবন্ধে কিছু কিছু দেখাইয়াছি। অন্য প্রমাণ এ স্থলে দিতেছি,—

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।' ৩।২৭।

'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।' ১৩।২১।

'প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।' ৩।২৯।

'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।' ১৪।৫

'প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। ১৩।২৯।

ইত্যাদি গীতাশ্লোকে প্রকৃতি যে অর্থে ব্যবহৃত, তাহা সাংখ্যসম্মত, 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' এ স্থলে সেই সর্ব্বত্র স্বীকৃত অর্থ ত্যাগ করিতে যাওয়া কি উচিত ?

মায়া যে প্রকৃতি শব্দের অর্থ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সাংখ্য-দর্শনে এই প্রকৃতির নামান্তর অব্যক্ত, গীতা হইতেও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

> অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
> রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে ॥
> পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
> যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ৮।১৮-১৯।

এই দুই শ্লোকের ভাবার্থ,—কল্পারম্ভে অর্থাৎ ব্রহ্মার নিশাবসানে অব্যক্ত হইতে স্থূল প্রপঞ্চের উৎপত্তি এবং কল্পান্তে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাবসানে অব্যক্তেই তাহাদিগের লয়। কিন্তু এই অব্যক্ত পুরুষ নহেন,—পুরুষ অপর অব্যক্ত, কারণ তিনি সনাতন—সর্ব্বকালে একরূপ, এই কারণে তিনি অপরিণামী।

অন্যত্র দেখা যাইতেছে,—

> সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
> কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥
> প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য—৯।৭।৮।
> ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। ৯।১০।

অর্থাৎ কল্পান্তে (ব্রহ্মার দিবাবসানে) সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতিতে লীন হয়। এবং কল্পারম্ভে (ব্রহ্মার নিশাবসানে) স্বীয় প্রকৃতি আশ্রয়ে আমি সৃষ্টি করি। প্রকৃতিই এ সমস্ত প্রসব করেন, আমি অধ্যক্ষ (কর্ত্তা) থাকি ; (অধ্যক্ষ শব্দের শাঙ্করভাষ্যসম্মত অর্থ সাক্ষী=দর্শন দ্বারা উপকারক)।

অব্যক্ত ও প্রকৃতি এক বস্তু হইলে, গীতার উক্ত শ্লোকগুলির কোন বিরোধ থাকে না। অতএব এ অংশে গীতাদর্শন সাংখ্যদর্শনসহ একমতাবলম্বী আপাততঃ ইহা বলা যায়, মায়াবাদীর সহিত একমতাবলম্বী নহেন ইহা নিশ্চিত। তবে যে গীতাতে কতিপয় শ্লোকে মায়াশব্দের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ মোহিনীশক্তি, ইহা প্রকৃতিরই রাজস তামস বৃত্তি,—ইহার প্রচলিত অর্থ কুহক, ইহার দ্বারাই সাধারণ জীব মুগ্ধ হইয়া যায়। ত্রিগুণা প্রকৃতির বা বুদ্ধির অহঙ্কারসম্বন্ধ হেতুই চিন্মাত্র পুরুষের সহিত মায়ার সম্বন্ধ হয়। নতুবা সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত কেবল জ্ঞানস্বরূপ পুরুষে মায়াসম্বন্ধ থাকিতেই পারে না।

প্রতিবাদী মহাশয় এইবার আপত্তি করিতে উদ্যত হইয়াছেন, দেখিতেছি,—কিন্তু আপনার আপত্তি আমার অজ্ঞাত নহে, আমি স্বয়ং সেই আপত্তি উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিতেছি—যদি তাহার উপর কিছু বক্তব্য থাকে আপনি বলিবেন। আপত্তি :—

অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি এবং তাহাতেই লয়,—ইহা বলিলে গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ এবং তাহার মূলীভূত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়।—

> অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ১০।৮।
> বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
> সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥
> অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
> ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ॥ ১০।৪-৫।
> অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ। ১০।২০।
> যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
> মত্ত এব হি তান্ বিদ্ধি— ৭।১২।

পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুসারে বলিতে হয়, অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতেই সকলের উৎপত্তি—বিশেষতঃ সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ বা তদীয় কার্য্যসমূহ—প্রকৃতি হইতে যে উৎপন্ন—ইহা মানিতেই হয়, কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণা। কিন্তু এক্ষণে যে সমস্ত শ্লোক কথিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট ভাবে কথিত,—যিনি গীতা বক্তা তিনি 'অহং'—মায়াবাদীর কথিত এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী চিন্মাত্র ব্রহ্ম বা সাংখ্যসম্মত অনেক চিন্মাত্র পুরুষের অন্যতম হইলে—তাঁহা হইতেই সকলেরই উৎপত্তি এবং তিনিই স্থিতি ও লয়স্থান ইহা মানিতে হয়। এমন কি, সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভাবসমূহও তাঁহা হইতে উৎপন্ন ইহা মানিতে হয়, শ্রুতিও বলিয়াছেন—

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' (তৈত্তরীয়) যাঁহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, যাঁহার দ্বারা স্থিতি এবং যাঁহাতে লয় তিনিই ব্রহ্ম। অব্যক্ত বা প্রকৃতির সম্বন্ধ এস্থানে নাই। অতএব প্রকৃতি হইতে উৎপত্তিবাদ স্থাপন সহজ নহে। এই তো আপত্তি ?

ইহার উত্তর—আমার গত মাসের প্রবন্ধেই আছে।

'অহং' বলিতে বা ব্রহ্ম বলিতে সর্ব্বত্র চিন্মাত্র বুঝায় না। প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলন-স্বরূপ ই ব্রহ্ম। গীতা-বক্তা আপনার সেই স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া 'অহং' 'মাং' 'মত্তঃ' ইত্যাদি রূপে অস্মৎ-শব্দ প্রয়োগ বহু স্থানে করিয়াছেন।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। ৯।৪॥

এই শ্লোকার্দ্ধে তাহা স্পষ্টীকৃত। অব্যক্ত মূর্ত্তি—আমি এই জগৎকে উৎপন্ন করি। ('ততং বিস্তৃতম্ উৎপাদিতম্') বিস্তার শব্দের উৎপত্তি অর্থ শাঙ্কর-ভাষ্যেও অন্যত্র আছে—'অতএব চ বিস্তারম্'। ১৩।৩০। শ্লোকভাষ্যে আছে—'বিস্তারম্ উৎপত্তিম্'। তনধাতুর বিস্তার অর্থ ই পাণিনীয় সম্মত। অব্যক্ত ও পুরুষ এই উভয়ের মিলনে যে স্বরূপ তাহাই ব্রহ্ম—তাঁহার সাকার নিদর্শন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। এই মিলিতরূপের যে অচিদংশ তাহাই অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিভাগে তিনি মাতা—পুরুষভাগে তিনি পিতা—এই জন্য আর একটি শ্লোকে আছে—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। ৯।১৭।

প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পুরুষের নামান্তর আত্মা।

'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা' এই পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে যে 'অব্যয়াত্মা' শব্দের অনুবাদ করি নাই, এখন তাহার অনুবাদ ও ভাব প্রকাশ করিয়া সিদ্ধান্ত বিবৃত করিব।

প্রকৃতি পুরুষের যে মিলিত স্বরূপ, তাহার প্রকৃতি-ভাগ পরিণামী, অর্থাৎ স্বরূপ নাশ না হইলেও ফুটন্ত দুগ্ধের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; পরিবর্ত্তন থাকিলে তাহাকে অব্যয় বলা যায় না। অবস্থার পরি-বর্ত্তনই ব্যয়। কিন্তু পুরুষভাগ অব্যয়—অপরিণামী, তাই 'অহং' যিনি, তিনি 'অব্যয়াত্মা', আত্মাংশ তাঁহার অব্যয়। এ স্থলের ব্যাখ্যা এই প্রকার না হইলে 'অব্যয়াত্মা'শব্দের মধ্যে আত্মশব্দ প্রয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে; কেবল 'অব্যয়' বলিলেই চলিত। উভয়াংশ মধ্যে একাংশ পরিণামী এবং আত্মাংশ অর্থাৎ পুরুষভাগ অপরিণামী ইহা বুঝাইবার জন্যই আত্মশব্দ প্রয়োগ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে 'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম' এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও এস্থলে স্মরণীয়। অনাদি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'অনাদিমৎ' প্রয়োগ কেবল ছন্দের অনুরোধে নহে, 'অনাদি পরমং ব্রহ্ম' বলিলেই ছন্দো রক্ষা হইত। সমস্ত গীতা মধ্যে বা উপনিষদ মধ্যে অনাদি অর্থে—অনাদিমৎ শব্দের প্রয়োগ কোথাও নাই। অতএব 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি' এই যে দুইটি অনাদি বস্তু, তাহার সম্বন্ধ থাকাতেই, এই প্রকৃতি-পুরুষ-মিলিত স্বরূপকে 'অনাদিমৎ' বলা হইয়াছে। এই যে মিলিতস্বরূপ ইহার প্রকৃতিভাগ উপাদান কারণ, স্বর্ণালঙ্কারের স্বর্ণ যেমন উপাদান কারণ সেইরূপ। আর পুরুষভাগ অলঙ্কারের নির্ম্মাতার ন্যায় নিমিত্ত কারণ। এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) যেমন নিজের দেহ হইতে সূত্র উৎপাদন করে অর্থাৎ তাহার অচিৎ দেহ সূত্রের উপাদান কারণ, আর চিৎ—আত্মা সূত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা—ব্রহ্মও সেইরূপ।

'মম যোনি র্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।' ১৪।৩।

'অহং বীজপ্রদঃ পিতা' (১৪।৪) এই দুইটি শ্লোকাংশের ভাবও এইরূপ,—মহত্তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মে গর্ভধারণ করি এবং আমি অর্থাৎ আত্মা পুরুষ বীজদাতা। এখানে যে মহত্তত্ত্বস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব, তাহা জীবগণের উপাধি হইয়া, জন্মমৃত্যু ও মুক্তির ব্যবস্থার হেতু হইয়া থাকে। জীবগণের উৎপাদক বীজ আত্মার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতিবিম্বদাতা আত্মা এবং তদীয় অচিদংশ বা প্রকৃতিভাগের প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব সেই প্রতিবিম্ব গ্রহীতা। প্রতিবিম্বপাতই বীজদান, প্রতিবিম্বগ্রহণই গর্ভ-ধারণ। উভয় মেলনে একীভূত ব্রহ্মই একভাগে পরিণামা-বস্থায় গর্ভধারণ ও অপরিণামী অপর ভাগ দ্বারা গর্ভাধান করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্ম প্রকৃতিপুরুষাত্মক ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত।

প্রতিবাদী মহাশয়ের আর কোন আপত্তি আছে কি?

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ঋণ-পরিশোধ

[গল্প]

১
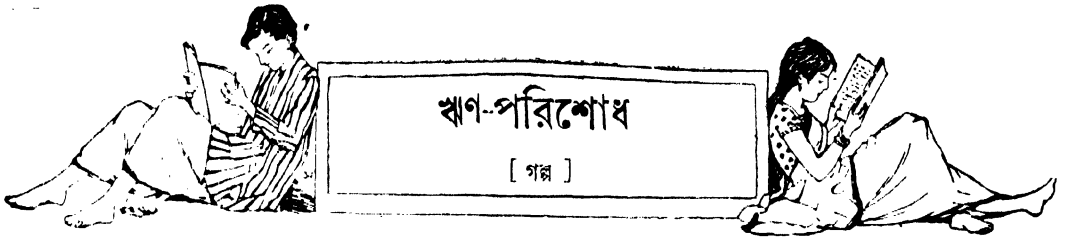
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, তুইটি ছেলে কলিকাতায় নিমতলা ষ্ট্রীটে একটি মেসে থাকিয়া ফ্রী-চার্চ্চ কলেজে পড়িত। এক জনের নাম রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—অন্যটির নাম হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রাজেন্দ্রের বাড়ী খুলনা জেলায় আর হরেন্দ্রের বাড়ী বর্দ্ধমানে। উভয়েই নিজ নিজ দেশ হইতে এন্‌ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে এফ্-এ পড়িতে আসিয়াছিল। সেকালে প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরেজী নাম "ম্যাট্রিকুলেশন" হয় নাই, "এন্‌ট্রান্স" নাম ছিল। তাহার পরবর্ত্তী পরীক্ষার নাম ছিল "ফার্ষ্ট আর্টস্" বা সংক্ষেপে "এফ্-এ"। এফ্-এর পর ছিল বি-এ এবং তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা ছিল এম-এ।

রাজেন্দ্র এবং হরেন্দ্র তুই জনেই একই দিনে ফ্রী চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হইল এবং দৈবাৎ একই মেসে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন উভয়ের মধ্যে জানা-শুনা ছিল না, একই বাসায় থাকিয়া, কলেজে একই ক্লাসে ভর্ত্তি হইলে আলাপ পরিচয়ে বিলম্ব হয় না, সুতরাং রাজেনের সঙ্গে হরেনের তুই চারিদিনের মধ্যে আলাপ পরিচয় এবং তুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রগাঢ় বন্ধুতা হইল। মেসে, প্রথমে তুই জনে পৃথক্ তুইটি ঘরে থাকিত, তাহার পর উভয়ে একত্র পড়াশুনা করিবার জন্য একই ঘরে আসিয়া জুটিল।

রাজেন প্রথম বিভাগে এবং হরেন দ্বিতীয় বিভাগে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়াছিল, এফ্-এ পরীক্ষায় তুই জনেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। ইহার পর উভয়ের ছাড়াছাড়ি হইল, হরেন্দ্র এফ-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে গেল—রাজেন্দ্র ফ্রী চার্চ্চেই বি-এ পড়িতে লাগিল। নিমতলা ষ্ট্রীট হইতে মেডিকেল কলেজ অনেক দূর, যাতায়াতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়, তাই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার তুই তিন মাস পরে হরেন্দ্র পুরাতন বাসা ছাড়িয়া বহুবাজারে একটা মেসে চলিয়া গেল। উভয়েই বন্ধুবিরহে প্রথমটা কাতর হইয়াছিল, সুযোগ পাইলেই উভয়ে হয় নিমতলা ষ্ট্রীটের নতুবা বহুবাজারের বাসাতে একত্র মিলিত হইত। এই ভাবে আরও তুই বৎসর কাটিয়া গেল। বি-এ পরীক্ষায় রাজেন্দ্র ফেল হইল, তাহার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার উপর প্রায় তিন চার মাসকাল নানাপ্রকার জটিল রোগে শয্যাগত হইয়াছিলেন, একমাত্র পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারায় তাঁহার মনে গুরুতর আঘাত লাগিল। তাঁহার বড় আশা ছিল, পুত্র বি-এল পাশ করিয়া উকিল হইবে, সে আশায় নিরাশ হওয়াতে এক দিন সহসা হার্ট-ফেল করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল।

রাজেন্দ্রের পিতা পূর্ব্বে খুলনায় মোক্তারি করিতেন,—ইদানীং প্রায় এক বৎসর কাল তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, আদালতে প্রায়ই যাইতে পারিতেন না। তাঁহার পৈতৃক বাস খুলনা জেলার এক সুদূর পল্লীগ্রামে, খুলনা সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। তিনি খুলনায় মোক্তারি করিতেন বলিয়া একটি ছোট বাটী ভাড়া লইয়া বারমাস খুলনাতেই বাস করিতেন, গ্রামে তাঁহার কুড়ি-পঁচিশ বিঘা ধান জমি ছিল, তাহা গ্রামস্থ এক ব্যক্তিকে জমা দিয়াছিলেন।

সতের বৎসর বয়সে, এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিবার এক মাস পরেই রাজেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল, বি-এ পরীক্ষা দিবার তুই মাস পূর্ব্বে তাহার একটি পুত্র হইয়াছিল। সে যখন এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে গেল, তখন তাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল, তাহার পিতা প্রতি মাসে অন্যূন তুই শত টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিতেন। তখন আদালতে এখনকার মত উকীল-মোক্তারের ভিড় ছিল না, সুতরাং উকীল বা মোক্তারদিগকে মক্কেলের আশায় আদালতের কাছে গাছতলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। সেই জন্য রাজেন্দ্রের পিতা পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া কলেজে পড়াইবার ব্যয়ভার বহন করিতে কাতর হন নাই। খুলনার এবং কলিকাতার ব্যয়ভার বহন করিয়াও তিনি কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের

শেষ বৎসরটা কষ্টেই কাটিয়াছিল, পীড়ার জন্য আদালতে যাওয়া বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জনও বন্ধ হইল, অথচ ব্যয় হ্রাস না পাইয়া, চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য বাড়িয়া গেল। তখন তাঁহার সঞ্চিত অর্থে হাত পড়িল। তৎপূর্ব্বেই পুত্র রাজেন্দ্র এফ-এ পাশ করিয়া আইন পড়িবার জন্য মেট্রপলিটান কলেজের আইন ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল। সে কালে বি-এ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বি-এল পড়া চলিত এবং অনেকেই বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরবৎসরেই বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইতেন। রাজেন্দ্র আইনক্লাসে ভর্ত্তি হওয়াতে তাহার ব্যয় বাড়িয়া গেল, তাহার উপর কতকগুলা আইনের বই কিনিতেও অনেকগুলা টাকা খরচ হইয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর প্রথম এক সপ্তাহ সুতীব্র শোকে সকলেই মুহ্যমান হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিলে তাহার জননী, বিধবা পিসীমা এবং দুইটি ভগিনীর শোকাবেগ সহজে প্রশমিত হইল না। এখন রাজেন্দ্রই সংসারের কর্ত্তা, তাহার উপরেই সংসারের ভার পড়িল, তাহার শোকে অভিভূত হইয়া থাকা চলে না। সে শোক ঝাড়িয়া ফেলিয়া সাংসারিক চিন্তায় নিমগ্ন হইল। প্রথম চিন্তা, পিতার শ্রাদ্ধ। রাজেন্দ্র ভাবিয়া দেখিল যে, খুলনাতে তাহার পিতার যেরূপ পশার-প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে খুলনাতে শ্রাদ্ধ করিলে ব্যয়বাহুল্য হইবে। যদি দেশে গিয়া পিতার পারলৌকিক কার্য্য করে, তাহা হইলে অনেক অল্প ব্যয়ে সে কার্য্য সমাধা হইতে পারে। পিসীমা ও পিতার দুই এক জন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া রাজেন্দ্র দেশে গিয়া শ্রাদ্ধ করাই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিল।

দেশে গিয়াও যে নির্ব্বিঘ্নে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনাও অল্প ছিল। দেশে আর একটা অসুবিধা ছিল, রাজেন্দ্রের জ্ঞাতিপিতৃব্য হারাধন ব্যতীত গ্রামস্থ আর কাহাকেও সে চিনিত না। হারাধন বাবু মামলা-মোকর্দ্দমা উপলক্ষে মাঝে মাঝে খুলনায় আসিতেন, তাই রাজেন্দ্র তাঁহাকে চিনিত। রাজেন্দ্র হারাধন বাবুকে পিতার মৃত্যু সংবাদ দিয়াছিল, এখন দেশে গিয়া শ্রাদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া আর একখানি পত্র দিল। এই পত্রের উত্তরে হারাধন বাবু তাহাকে দেশে গিয়া শ্রাদ্ধ করিতে উৎসাহ দিলেন।

রাজেন্দ্র খুলনার বাসাভাড়া মিটাইয়া দিয়া এবং পিতার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় আরোহণ করিল।

২

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার সময়, রাজেন্দ্রের পিতৃপিতামহের আবাস ধবলগঞ্জে নৌকা উপস্থিত হইল। নদীর ঘাট হইতে রাজেন্দ্রের বাটী খুব নিকট, বোধ হয় দুই তিন মিনিটের পথ। রাজেন্দ্র নৌকা হইতে নামিয়া অগ্রে তাহার হারাধন কাকার বাটীতে গমন করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আবার নদীর ঘাটে গমন করিল। হারাধন পূর্ব্বেই রাজেন্দ্রের বাড়ী কথঞ্চিৎ পরিষ্কার করাইয়া রাখিয়াছিলেন। হারাধন নদীর ঘাটে গমন করিলে, তাঁহার স্ত্রী রাজেন্দ্রের বাটীতে গিয়া তাহার জননী, পিসীমা ও বধূ, ভগিনী প্রভৃতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হারাধন বাবু ও রাজেন্দ্র নৌকার দাঁড়ী-মাঝিদিগের দ্বারা নৌকাস্থিত দ্রব্যসম্ভার একে একে বাড়ীতে আনাইয়া ফেলিলেন। সে দিন হারাধনের বাটীতেই রাজেন্দ্রের পিসীমা ও তাহার দুই ভগিনীর আহারাদির ব্যবস্থা হইল ; রাজেন্দ্র, তাহার জননী ও পত্নীর হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা রাজেন্দ্রের বাটীতেই হইল, হারাধন বাবুর স্ত্রী এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যথাসময়ে শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়া গেল, শ্রাদ্ধে প্রায় ষাট টাকা ব্যয় হইল। তাহার পর এক দিন রাজেন্দ্র হিসাব করিয়া দেখিল যে, খুলনা হইতে আসিবার এবং পিতার শ্রাদ্ধের পর তাহার হাতে মোট দুই শত বাহাত্তর টাকা মজুদ আছে। তাহার পিতা, পুত্র উকিল হইলে খুলনাতে বাড়ী কিনিবেন বলিয়া প্রায় তিন হাজার টাকা রাখিয়াছিলেন, সেই টাকা এখন পৌনে তিন শত টাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাজেন্দ্র আরও হিসাব করিয়া দেখিল যে, তাহার ভগিনীরা স্ব স্ব শ্বশুরালয়ে গমন করিলে, মাসিক পঁচিশ টাকাতে কোনরূপে তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ; সুতরাং আপাততঃ এক বৎসরের জন্য তাহাকে অন্নচিন্তা করিতে হইবে না, কিন্তু তাহার পর? প্রজার নিকট হইতে যে খাজনা পাওয়া যায়, তাহাতে বড় জোর দুই মাস কি আড়াই মাস চলিতে পারে। এ অবস্থায় যেমন করিয়াই হউক, মাসে অন্ততঃ ত্রিশ টাকা তাহাকে উপার্জ্জন করিতেই

হইবে এবং গ্রামে বসিয়া উপার্জ্জনের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাকে বিদেশে বাহির হইতেই হইবে।

হারাধন বাবু "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন, তিনি প্রতি সপ্তাহে "বঙ্গবাসী" পাইতেন।

এই "বঙ্গবাসীতে" এক দিন বিজ্ঞাপন স্তম্ভে সে দেখিতে পাইল, ফরিদপুর জেলায় ইদিলপাশা গ্রামে মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য এক জন প্রধান শিক্ষক আবশ্যক, বি-এ পাশ কিংবা ফেল হইলেও চলিবে। মাসিক বেতন পঁয়ত্রিশ টাকা। দুইটি ছেলেকে প্রাইভেট পড়াইলে বিনাব্যয়ে আহার ও থাকিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইয়া সে সেই দিনই এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। আট দিন পরে দরখাস্তের উত্তর আসিল, তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে, যত সত্বর সম্ভব কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে।

এত শীঘ্র যে তাহার একটা কায জুটিবে, রাজেন্দ্র তাহা স্বপ্নেও মনে করে নাই। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-ধারীর এত সংখ্যাবাহুল্য ছিল না, এম-এ পাশ করিয়া কুড়ি পঁচিশ টাকা বেতনের জন্য কাহাকেও লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না, সেই জন্যই রাজেন্দ্রকে চাকরির জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ইদিলপাশায় চাকরি গ্রহণ স্থির হইলে হারাধন বাবু পঞ্জিকা দেখিয়া একটা শুভ দিন দেখিয়া দিলেন। হারাধন বাবু তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখন একলাই কর্ম্মস্থলে যাও, সেখানে যখন রাঁধা ভাত আর বাসা পাইবে, তখন কোন ভাবনা নাই। এঁরা এইখানেই থাকুন, আমি দেখা-শুনা করব, তোমার কোন চিন্তা নাই। পরে যদি সুবিধা মনে কর, পূজার ছুটীতে এসে সকলকে নিয়ে যেও।"

এই পরামর্শই সঙ্গত বলিয়া মনে হইল। ইদিলপাশাতে হারাধন বাবুর মামাত ভগিনীপতির বাটী, তিনি ভগিনী-পতিকেও রাজেন্দ্রের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র দিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে, আহারাদির পর জননী, পিসীমা, হারাধন কাকা ও তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিয়া নৌকাযোগে অজ্ঞাত কর্ম্মস্থান উপলক্ষে যাত্রা করিল।

৩

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজেন্দ্র যখন কলি-কাতায় পড়িতে যায়, তখন তাহাদের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাছে এক-মাত্র পুত্রের কোন বিষয়ে অভাব বা অসুবিধা হয়, সেই আশঙ্কায় তাহার পিতা, প্রতি মাসে তাহাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ পাঠাইতেন। বাসাখরচ, দুধ, জলখাবার এবং কলেজের বেতন প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ করিয়াও তাহার প্রতি মাসে দশ বার টাকা উদ্বৃত্ত হইত। তাহার পিতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাজেন্দ্র একটি পয়সাও অপব্যয় করিবে না; রাজেন্দ্র ইহা জানিত এবং পিতার ঐ বিশ্বাস যাহাতে শিথিল না হয়, সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিত। বাসাতে থাকিবার তিন চারি মাস পরে, যখন হরেন্দ্রের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল, তখন রাজেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে, হরেন্দ্রের আর্থিক অবস্থা তাহার মত সচ্ছল নহে। বাসাতে সে জলখাবার প্রায়ই খাইত না, প্রত্যহ এক পোয়া করিয়া দুধ খাইত, অল্প খরচ হইবে বলিয়া হরেন্দ্র বাসার নিম্নতলে একটি কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল। রাজেন্দ্র দ্বিতলের একটা কক্ষে মাসিক চারি টাকা "সিট্রেণ্ট" বা ভাড়া দিয়া থাকিত এবং প্রত্যহ তিন পোয়া করিয়া দুধ লইত। রাজেন্দ্রের কক্ষে প্রথমে অন্য একটি ছাত্র থাকিত, সে ঐ বাসা ত্যাগ করিলে রাজেন্দ্র জোর করিয়া হরেন্দ্রকে উপরে আপনার কক্ষে লইয়া আসিল এবং মেসের ম্যানেজার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "হরেন কত করিয়া সিটরেণ্ট দেয়?"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "দুই টাকা।"

"এ মাস হইতে সে উপরে আমার ঘরে থাকিবে। হরেন দুই টাকা দেবে, আমি ছয় টাকা দিব।"

"তার মানে?"

"মানে কিছুই নয়, দু জনে এক ক্লাসে পড়ি, এক সঙ্গে থাকলে পড়ার সুবিধা হয় তাই।"

ম্যানেজার বাবু আর কিছু বলিলেন না। রাজেন্দ্র বাসার ঠাকুরকে বলিল, "কাল থেকে আমার জন্য পাঁচ পোয়া করে দুধ নিও, আমার দুধ আর হরেনের দুধ এক সঙ্গে জাল দিয়ে উপরে রেখে এস, আমি হরেনকে তাই থেকে দিব।" বাসার ঝিকে বলিল, "কাল থেকে আমার জন্য রোজ তিন আনার করে খাবার এন, ছ'পয়সায় কিছু হয় না।"

এই ব্যবস্থায় হরেন্দ্র দৃঢ়তার সহিত আপত্তি করিল,

কিন্তু রাজেন্দ্র সে আপত্তি গ্রাহ্য করিল না। হরেন্দ্র রাগ করিল, বন্ধুর সঙ্গে কলহ করিল, অন্য মেসে উঠিয়া যাইবে বলিল। তাহা শুনিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "সে মেসে কি আমি যেতে জানি না?"

পাঁচ সাত দিন এইরূপ তর্ক-বিতর্ক বকাবকির পর হরেন্দ্র অগত্যা ক্ষান্ত হইল। সে বলিল, "অনর্থক আমার ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপাচ্ছ, এ ঋণ আমি পরিশোধ করব।"

"নিশ্চয় করবে, আমি একটি পয়সাও ছাড়ব না, সুদ শুদ্ধ আদায় করব।"

ক্রমে ক্রমে হরেনের অভিমান দূর হইল, শেষে সে তাহার অভাবের কথা বন্ধুকে জানাইতে বা তাহার সাহায্য লইতে আর কুণ্ঠা বোধ করিত না। সে বুঝিল যে, রাজেন্দ্র তাহাকে সাহায্য করিবেই, কিছুতেই আপত্তি শুনিবে না। ভাল তাহাই হউক, সেও এই ঋণের একটা হিসাব রাখিবে। সে একখানি "ডায়েরি" কিনিয়া অত্যন্ত গোপনে তাহাতে দৈনন্দিন ঋণের হিসাব রাখিতে লাগিল। বাসা পরিবর্ত্তনের পরও হরেন্দ্র অকুণ্ঠিতচিত্তে বন্ধুকে আপনার অভাবের কথা জানাইয়া সাহায্য গ্রহণ করিত।

বি-এ পরীক্ষা দিয়া রাজেন্দ্র যখন খুলনায় চলিয়া গেল, তখন হরেন্দ্র একদিন হিসাব করিয়া দেখিল, তাহার ঋণের পরিমাণ চারি বৎসরে সাড়ে তিন শত টাকার উপর হইয়াছে। রাজেন্দ্র বন্ধুকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জানাইল এবং দেশে গিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, পত্রে সে কথাও লিখিল, কিন্তু ভুল করিয়াই হউক বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, সেই "দেশের" অর্থাৎ গ্রামের নাম উল্লেখ করিল না। হরেন্দ্র আশা করিয়াছিল যে, রাজেন্দ্র দেশে পিতার শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া আবার খুলনাতে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় এক মাস অপেক্ষা করিয়া রহিল, কিন্তু রাজেন্দ্রের নিকট হইতে কোন পত্রই পাইল না। তখন সে অধীর হইয়া খুলনাতে একখানা পত্র দিল, প্রায় পনর দিন পরে সেই পত্র অষ্টেপৃষ্ঠে মোহরাঙ্কিত হইয়া তাহারই কাছে ফিরিয়া আসিল। হরেন্দ্র বুঝিল যে, রাজেন্দ্র তখনও দেশ হইতে ফিরে নাই।

রাজেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই বন্ধুর কাছে তাহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা গোপন করিয়াছিল। সে ভাবিল, হরেন্দ্র তাহার আর্থিক দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে অত্যন্ত কাতর ও চিন্তিত হইবে এবং এই দুঃসময়ে বন্ধুকে সাহায্য করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইবে। রাজেন্দ্র ত বন্ধুকে ঋণ দেয় নাই, তাহার অভাব ঘুচাইতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিল মাত্র। হয় ত তাহার কষ্টের কথা শুনিয়া হরেন্দ্র অন্য লোকের কাছে ঋণ লইয়া রাজেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিবে। কায কি অত হাঙ্গামায়? হরেন্দ্রকে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিয়া সে হরেন্দ্রকে সকল কথা গোপন করিল।

ইদিলপাশাতে কার্য্যগ্রহণের পর রাজেন্দ্র একবার বন্ধুকে পত্র লিখিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল যে, ইদিলপাশা হইতে পত্র লিখিলে, ইদিলপাশা আগমনের কারণও বলিতে হইবে। তাহা হইলে হরেন্দ্র সহজেই বন্ধুর আর্থিক অবস্থার কথা অনুমান করিতে পারিবে। সুতরাং পত্র লিখিয়া কায নাই। এইরূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া সে হরেন্দ্রকে পত্র লেখা বন্ধ করিল। সময় সময় বন্ধুর জন্য মন চঞ্চল হইত, কিন্তু সে দৃঢ়তাসহকারে সে চাঞ্চল্য দমন করিত।

তিন বৎসর ইদিলপাশাতে চাকরি করিবার পর রাজেন্দ্র নদীয়া জেলায় রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে একটি শিক্ষকতা জোগাড় করিয়া জননী, পত্নী ও শিশুপুত্রকে লইয়া নূতন কর্ম্মস্থানে গমন করিল। তাহার পিসীমা ইতিপূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বৎসর দুই রামচন্দ্রপুরে সপরিবারে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মেদিনীপুরে একটা শিক্ষকতা লইয়া চলিয়া গেল। এইরূপে একবার এদেশ একবার ওদেশ করিয়া দশ বার বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময় এক দিন সে কলিকাতায় গিয়া হরেন্দ্রের সন্ধান করিল, কিন্তু তাহার কোন সংবাদই পাইল না।

৪

রাজেন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই ত্রিশ বৎসরে কলিকাতার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ীর পরিবর্ত্তে ইলেকট্রিক ট্রাম হইয়াছে, রিকশা পাল্কীকে দেশছাড়া করিয়াছে। মোটার বাস, মোটর গাড়ীর আমদানী হইয়াছে। সর্ব্বোপরি কলিকাতার বাহ্য আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে

ইম্প্রুভ্মেন্ট ট্রাষ্ট। ট্রাষ্ট কলিকাতাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছে।

এক দিন বেলা নয়টার সময় একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স্ক যুবা ট্রামে চড়িয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া শ্যাম-বাজারের দিকে যাইতেছিল। হাতিবাগানের মোড় পার হইয়া ট্রাম কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মুখার্জ্জি ফ্রেণ্ডস্-এর ডাক্তারখানার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, যুবকটি যেই তাড়াতাড়ি নামিতে যাইবে, অমনই পা পিছলাইয়া ট্রাম-লাইনের উপর পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। সৌভাগ্যের বিষয়, যুবক ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল, যদি প্রথম শ্রেণীতে থাকিত, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা পড়িত। যুবক পড়িয়া যাইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলে "মারা গেল" "মারা গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে শত শত লোক জমিয়া গেল। সন্নিহিত ডাক্তারখানা হইতেও লোকজন ছুটিয়া আসিল এবং তিন-চারি জন লোক মূর্চ্ছিত যুবককে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারখানার ভিতরে লইয়া গেল।

ডাক্তারখানার স্বত্বাধিকারী ডক্টর এচ্ মুখার্জ্জি এফ্, আর, সি, এস (লণ্ডন) এম, বি (ক্যাল) সে সময় ডাক্তার-খানাতে উপস্থিত ছিলেন। যুবককে ধরাধরি করিয়া ঔষধালয়ের মধ্যে শয়ান করাইয়া দিলে ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? এ কে?" এক জন উত্তর করিল, "ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে।" সেই কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব তাড়াতাড়ি রোগীর নিকটে গিয়া তাহার নাড়ী, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় শক্ লেগে মূর্চ্ছা হয়েছে, বেঁচে যাবে।" রোগীকে পরীক্ষা করিয়া তিনি অনেকক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সকলে বুঝিল, তিনি বোধ হয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রোগীর মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন, "একে উপরে নিয়ে যাও, জ্ঞান হলেও এখন উঠতে বা কথা কইতে দিও না। ব্রেণে কোনওরূপ আঘাত লেগেছে কি না দেখতে হবে।"

ডাক্তার সাহেবের আদেশে ডাক্তারখানার তিন-চারি জন লোক রোগীকে উপরে লইয়া গিয়া একটা বড় হলে, একটি সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। প্রায় দশ মিনিট পরে ডাক্তার সাহেব নিঃশব্দে তথায় উপস্থিত হইয়া এক জনকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

"বোধ হয় জ্ঞান ফিরে আসছে, চোখের পাতা কাঁপছে।"

ডাক্তার সাহেব শয্যার নিকট একখানা চেয়ারে বসিয়া পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমরা নীচে যাও। আমি দেখছি।"

সকলে প্রস্থান করিলে, ডাক্তার সাহেব যুবার মুখের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। প্রায় তিন মিনিট পরে যুবা একবার চক্ষু চাহিয়া আবার চক্ষু বুজিল এবং ক্ষণকাল পরে 'মা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ডাক্তার সাহেব তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কোথাও ব্যথা বোধ হচ্ছে?"

যুবক "না" বলিয়া ডাক্তার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। সে দেখিল, কোট-প্যাণ্ট পরিহিত, ক্ষৌরিত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন, ঘরটি বহুমূল্য আসবাবে সজ্জিত। যুবক ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কোথায়? আপনি কে?"

"আমি ডাক্তার। এটা ডাক্তারখানা।"

"হাসপাতাল?"

"না। আমার ডাক্তারখানা।"

"মনে পড়েছে। আমি ট্রাম থেকে নামতে পড়ে গিয়েছিলেম।"

"তোমার নাম কি?"

"ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।"

"বাড়ী কোথা?"

"খুলনা।"

"এখানে কোথা থাক?"

"বাদুড়বাগানে।"

"কোথা যাচ্ছিলে?"

"হাতিবাগানে ডাক্তার মুখুয্যে সাহেবের কাছে।"

ডাক্তার সাহেব আর একবার ভাল করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কোথাও বিশেষ আঘাত লাগে নি। বসতে পারবে?"

"পারব" বলিয়া যুবক ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। ডাক্তার

সাহেব তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, যুবকের পিতার নাম রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, তিনি পূর্ব্বে শিক্ষকতা করিতেন। প্রায় এক বৎসর হইল, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি আর শিক্ষকতা করেন না। চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। যুবকরা তিন ভাই, বড় জ্ঞানেন্দ্র—ক্যাম্বেল স্কুল হইতে পাশ করিয়া খুলনাতে ডাক্তারি করিতেছে। দ্বিতীয়—হরেন্দ্র কলিকাতায় একটা সওদাগরী অফিসে চল্লিশ টাকা বেতনে চাকরি করে। দুইটি ভগিনী আছে, তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহার পিতা হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় ভুগিতেছেন, বুক ধড়ফড় করে, মাঝে মাঝে বুকে বেদনা হয়। তাহাদের বাড়ীওয়ালা বলিয়াছিলেন যে, হাতিবাগানের ডাক্তার মুখুয্যে হৃদ্রোগে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, তাই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যুবক হাতীবাগানে আসিতেছিল, এমন সময় ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া পড়িয়া যায়।

সমস্ত শুনিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "আমিই ডক্টর মুখার্জ্জি। আমাকে এখন একবার পার্শিবাগান যেতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার বাবাকে দেখে ওষুধের ব্যবস্থা করব।"

যুবক সসঙ্কোচে বলিল, "আমরা আপনার ভিজিট—"

বাধা দিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "তোমার দাদা ডাক্তার। ডাক্তারের বাড়ীতে ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হয় না। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি।" এই বলিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

৫

বাদুড়বাগান লেনে একটা সরু গলির মোড়, ডাক্তারসাহেব যুবকের সহিত মোটার গাড়ী হইতে নামিয়া একটা একতলা বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের কক্ষে একখানা তক্তাপোশের উপর একজন বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, তাঁহার বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর হইবে, কিন্তু মাথার চুল, গোঁফ-দাড়ি সমস্ত পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে। তিনি একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় সেই যুবক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বাবা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ডাক্তার সাহেব কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া বৃদ্ধ রাজেন্দ্র বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, তাহা দেখিয়া ডাক্তার ইংরেজীতে বলিলেন, "উঠিবেন না, আপনি শয়ন করুন, আমি আপনার বুক পরীক্ষা করিব। আমার সময় বড় কম, অনেক জায়গায় যাইতে হইবে।"

অগত্যা রাজেন্দ্র বাবু শয়ন করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া যুবককে বলিলেন, "তোমার মাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিব, তাঁহাকে একবার এই দিকে আসিতে বল।" যুবক সেইখান হইতেই একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন, তুমি একবার এই দিকে এস, তিনি বাবার অসুখের কথা কি জিজ্ঞাসা করবেন।" মুহূর্ত্তকাল পরে রাজেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় পুত্র হরেন্দ্র আসিয়া ডাক্তারকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মা এসেছেন, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।"

ডাক্তার তখন পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া দ্বারের নিকট গিয়া বলিলেন, "স্বর্ণলতা, তুমি আমাকে কখনও দেখ নাই, তবে আমার স্ত্রী সুকুমারীর সঙ্গে তোমার এককালে পত্রে খুব আলাপ ছিল, প্রতি সপ্তাহেই চিঠি লেখালিখি হ'ত। পাছে তোমরা আমাকে চিনিতে না পার, তাই, সেই সেকালে তোমার লেখা একখানা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি, এই দেখ তোমার সেই চিঠি…"

তাঁহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রাজেন্দ্র বাবু ছুটিয়া আসিয়া বন্ধুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি? হরেন?"

ডাক্তার সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে তোমার হরেন? আমি ডক্টর এচ, মুখার্জ্জী এফ, আর, সি, এস (লণ্ডন) এম, বি (ক্যালকাটা)। থাক, এত দিন ছিলে কোথা বল দেখি? একেবারে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস!"

এমন সময় রাজেন্দ্র বাবুর স্ত্রী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া হরেন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে হরেন্দ্র ও ফণীন্দ্রও তাঁহাকে প্রণাম করিল। হরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও বাবা, আর এক দফা প্রণাম বাকী আছে। আমার স্ত্রীও আসছেন, আমাকে রেখে গাড়ী তাঁকে আনতে গেছে, তিনিও এলেন বলে।"

রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তুমি আমার সন্ধান পেলে কিরূপে?"

"তোমার ছেলের কাছে" এই বলিয়া প্রাতঃকালের ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তোমার ছেলের মুখ দেখেই তোমার সেই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার মুখ মনে পড়িল। তার জ্ঞান হ'তে তার বাবার নাম শুনে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে তোমাকে দেখতে এলাম। আসবার সময় আমার স্ত্রীর কাছ থেকে স্বর্ণলতার একখানা চিঠি চেয়ে নিয়ে এলাম, কি জানি, যদি আমার কথা ভুলে গিয়ে থাক।"

"পাছে তোমাকে ভুলে যাই তাই আমার মেজো ছেলের নাম রেখেছি হরেন। তোমার সন্তানাদি কি?"

"আমার কোন সন্তান এতদিন হয়নি, আজ জান্‌তে পেরেছি, আমার তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে —"

এমন সময় পথে মোটরের শব্দ শুনিয়া বলিলেন, "ঐ যে ব্রাহ্মণীও এসেছেন" বলিয়াই দ্বারের নিকট উঠিয়া গেলেন এবং লাল চওড়াপাড় শাড়ী পরিহিতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা এক প্রৌঢ়া মহিলাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিলেন, "সুকুমারি! ইনি তোমার সেই অচিনু, অদেখা বাল্যসখী স্বর্ণলতা আর ইনি আমার হারানো বন্ধু রাজেন্দ্র।"

সুকুমারীকে স্বর্ণলতা প্রণাম করিবার উপক্রম করিবা-মাত্র সুকুমারী বলিয়া উঠিলেন, "ওকি, ভাই? আমাদের মধ্যে আবার লৌকতা কেন?" এই বলিয়া সখীকে জড়াইয়া ধরিলেন। হরেন্দ্র ও মণীন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিল।

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "বাঁচা গেল—এত দিনে আমার একটা হিসেব নিকাশের ব্যবস্থা হল।"

রাজেন্দ্র বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "কিসের হিসেব।"

"আমার ঋণের। তোমার মনে আছে, কলেজে পড়বার সময় আমার আপত্তি অগ্রাহ্য করে তুমি আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করতে? আমি একদিন বলেছিলেম, 'তোমার এ ঋণ আমি পরিশোধ করব।' তাতে তুমি বলেছিলে, 'নিশ্চয়! আমি এক পয়সাও ছাড়ব না, মায় সুদ শুদ্ধ আদায় করব।' আজ আমার সেই ঋণ-পরিশোধের দিন। তোমার সাহায্যের পরিমাণ আমি রোজ ডায়রিতে লিখে রাখতেম। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর আমি হিসেব করে দেখলেম, আমার ঋণের পরিমাণ তিনশ ছাপ্পান্ন টাকা। শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ ধরে যখন তোমার ঐ টাকা পাঁচশ হল, তখন আমি পাঁচশ টাকা দিয়ে হাজার টাকা মূলধনে 'মুখার্জ্জি ফ্রেণ্ডস্' নামে ঔষধের দোকান খুললেম। দোকানটার দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। এখন যে বাড়ীতে ঐ দোকান, সেটা ভাড়া-বাড়ী নয়, মুখার্জ্জি ফ্রেণ্ডসেরই বাড়ী। নীচে ডাক্তারখানা, আফিস, গুদাম, দোতলায় বৈঠকখানা, তেতলায় অন্দর। বাড়ীটাতে প্রায় দেড়লাখ টাকা খরচ হয়েছে, সব হিসেব লেখা আছে। ডাক্তারখানার হিসেবে, ব্যাঙ্কে বোধ হয় চার পাঁচ লাখ টাকা জমা আছে, তার অর্দ্ধেক বখরাদার তুমি। আমি নিজে রোগী দেখে যা ভিজিট পাই, তাই আমার নিজস্ব আয়। দোকানের কায ব্যতীত অন্য কোন কাযে দোকানের এক পয়সাতেও আমি হাত দিই না। ভাল কথা, তোমার ছেলেদের ছেলেপুলে কি?"

রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন, "জ্ঞানেনের দুটি ছেলে। হরেনের এখনও বিবাহ হয়নি, বিবাহের চেষ্টা হচ্ছে। ফণী বি এ পড়ছে।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "বাবা হরেন, জ্ঞানেনকে আজই চিঠি দাও, যেন পত্রপাঠ বৌমাকে নিয়ে আসে। বাড়ীতে কচি ছেলের হাসি-কান্নার কলরব না থাকলে সে বাড়ী যেন শ্মশানের মত ভীষণ বলে মনে হয়। তোমাদের বোধ হয় রান্না-বান্না হয়ে গেছে? চট্‌পট্ খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নাও, আমি বারটার সময় গাড়ী পাঠিয়ে দেব। বাড়ীওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আজই তোমরা যাবে, আমি আর এক দিনও তোমার বাড়ী আগলে থাকতে পারব না। চল গো, আমরা আগে গিয়ে ওঁদের অভ্যর্থনার আয়োজন করিগে।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় জীবন

দ্বিতীয় প্রস্তাব

বন্দে মাতরম্ ও আনন্দমঠ

বঙ্কিমচন্দ্র "ভারত-কলঙ্ক" প্রবন্ধে হিন্দুর স্বভাবে যে সকল অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার অভাব, সমাজে ঐক্যের অভাব, সমাজমধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার (national feelingএর) অভাব,—এই সকল অভাবের মূল দেশভক্তির অভাব। দেশভক্তি অর্থ—কেবল দেশের মাটীর প্রতি ভক্তি নহে, দেশের সকল অধিবাসীর প্রতি অনুরাগ। এই ভক্তি থাকিলেই দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য আসে, জাতিপ্রতিষ্ঠা বা দেশগত জাতীয়তা উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেবল হিতবুদ্ধি এই ভক্তি উৎপাদন এবং পোষণ করিতে পারে না, বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের যোগ চাই; ঈশ্বরভক্তির মত এই ভক্তিরও সাধন চাই। সাধনের উপায় ধ্যান-ধারণা। জননী জন্মভূমিকে কি রূপে ধ্যান করিতে হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর জন্য বিধান করিয়া গিয়াছেন, জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে ধ্যান করিতে হইবে আরাধ্যা দেবীরূপে। এই বিধির প্রথম আভাস তিনি দিয়াছেন "কমলাকান্তের দপ্তরের" একাদশ সংখ্যায় (১২৮১ সনের= ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের "বঙ্গদর্শনে" প্রথম প্রকাশিত)। এই সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দুর্গোৎসব বর্ণনা করিয়াছেন। কমলাকান্তের দুর্গোৎসব মহিষমর্দ্দিনীর উপাসনা নহে,—স্বদেশপ্রেমের নেশায় মত্ত স্বদেশসেবকের বঙ্গমাতার উপাসনা। শারদীয় উৎসবের সপ্তমী পূজার দিন কমলাকান্ত আফিম একটু বেশী মাত্রায় খাইয়া প্রতিমা দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে প্রতিমা দেখা ঘটিল না। তিনি আফিমের নেশার ঘোরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, অনুভব করিলেন, তিনি যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাত্যাবিক্ষুব্ধ, দিগন্তব্যাপী, অনন্ত, অকূল প্রবল কালস্রোতে একাকী ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। এই কালসমুদ্রে কমলাকান্ত তাঁহার প্রসূতি জননী বঙ্গভূমির সন্ধানে ভাসিয়াছিলেন—ভাসিতেছিলেন। একা বলিয়া তাঁহার বড় ভয় করিতে লাগিল,—তিনি, কোথা মা, কই মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন প্রাতঃসূর্য্যের লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির দূরপ্রান্তে সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা আবির্ভূতা হইলেন। কমলাকান্ত মাকে চিনিতে পারিলেন।

এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা; এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত!……দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী 'বঙ্গপ্রতিমা।' কমলাকান্ত মায়ের পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। মায়ের স্তুতি পাঠ করিলেন। বলিলেন, "এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে প্রতিমা অনন্ত কাল-সমুদ্রে ডুবিল। কমলাকান্ত 'উঠ মা! উঠ মা!' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই প্রতিমা আর উঠিল না। তখন কমলাকান্ত স্বদেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এস আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কায কি?

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে, তাঁহার অভিভাষণের উপসংহারে, কমলাকান্তের স্বপ্নবিবরণের এই কয় পংক্তি আবৃত্তি করিতে শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। সম্মিলনের পরই অল-ইণ্ডিয়া-কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য দেশবন্ধুর আহম্মদাবাদে যাইবার

কথা ছিল এবং সেই কমিটীতে কয়েকটি প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার গুরুতর বিরোধের আশঙ্কা ছিল। * দেশবন্ধুর তখনকার মনের অবস্থার প্রভাবে তাঁহার মুখে বঙ্কিমের শব্দময়ী চিত্র শ্রোতার নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছিল।

কমলাকান্তের স্বপ্নদৃষ্ট মাতৃমূর্ত্তি ক্রমশঃ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। জননী জন্মভূমি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার মানসদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তি "বন্দে মাতরম্" গীতে চিত্রিত হইয়াছে।

১২৮৭ সনের চৈত্র (১৮৮১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল) মাসের বঙ্গদর্শনে "আনন্দ মঠ" উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে এই গীত প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। "বন্দে মাতরম্" গীতের সহিত আনন্দমঠের আখ্যান ভাগের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মহেন্দ্র এবং ভবানন্দ নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিয়াছিলেন। এমন সময় ভবানন্দ কথাবার্ত্তার জন্য বড় ব্যগ্র হইলেন। ভবানন্দ কথোপকথনের জন্য অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত আরম্ভ করিলেন—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং, মলয়জশীতলাং—" ইত্যাদি

যে প্রকারে গীতটি "আনন্দমঠে" উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয়, গীতটি স্বতন্ত্র রচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণতঃ গীতি-কবির মত স্বীয় অনুভূতি এবং ভাব-বিভূতি ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করিতেন না, তাঁহার ব্রত ছিল বাহিরের উপাদান সংগ্রহ করিয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি। "আনন্দমঠের" অনেক পূর্ব্বে প্রকাশিত "মৃণালিনী" উপন্যাসে দুইটি সঙ্গীত আছে বটে। "বন্দে মাতরমে"র সহিত সেই দুইটি গীতের তুলনা হয় না। এই সকল গীত সুকবির রচিত, "বন্দে মাতরম্" যেন স্বয়ম্ভূত; আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের বা বনের ফুলের মত আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"বন্দে মাতরম্" গীতে জন্মভূমির যে চিত্র আছে, তাহা দেবীর বা মানবীর আদর্শে অঙ্কিত হয় নাই, তাহা জন্মভূমির নৈসর্গিক আকৃতির আংশিক প্রতিবিম্ব। কবির কল্পনা-দর্পণে প্রতিফলিত এই প্রতিবিম্বে সুহাসিনী জন্মভূমির সুখদ-বরদ রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেবী এবং মানবীর তুলনায় জন্মভূমি সপ্তকোটি-আননা, দ্বিসপ্তকোটি-ভুজা। সন্তানের জননী জন্মভূমিই সর্ব্বস্ব। সুতরাং তাঁহার এই প্রতিমা গড়িয়া মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে হইবে। কিন্তু সপ্তকোটি-আননা দ্বিসপ্তকোটি-ভুজা সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা জননীর প্রতিমা গড়িয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং এই প্রতিমা পৌত্তলিকের প্রতিমা নহে, এবং এই মন্দির পৌত্তলিকের মন্দির নহে। তার পর জন্মভূমির মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য কবি গাইয়াছেন, দুর্গা-উপাসকের দুর্গা যেমন, লক্ষ্মী-সরস্বতীর উপাসকের লক্ষ্মী-সরস্বতী যেমন, জন্মভূমি আমার তেমনই উপাসনার বস্তু। এই উপাসনা অবশ্য পত্র-পুষ্প-ফল-জল দিয়া উপাসনা নহে।

"বন্দে মাতরম্" গীতে জননী-জন্মভূমির সার্ব্বজনীন প্রতিমা চিত্রিত এবং কীর্ত্তিত করিয়া নিপুণ চিত্রকর আনন্দমঠের আনন্দ-কাননের আনন্দ-মন্দিরে দেবীর আদর্শে জন্মভূমির বিভিন্ন অবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যে রাত্রে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে "বন্দে মাতরম্" গীত শুনাইয়াছিলেন এবং শিখাইয়াছিলেন, সেই রাত্রি প্রভাতে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে আনন্দমন্দিরে সত্যানন্দ ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। দেবালয়ে মহেন্দ্র প্রথম দেখিলেন, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। সম্মুখে মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি চিত্রিত রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে সরস্বতী। তার পর ১২৮৮ সালের বৈশাখের "বঙ্গদর্শনে" পাঠ আছে—

"সর্ব্বোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুলরত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী-সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিত। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে।"

* কমিটীর অধিবেশনে ভোটে মহাত্মার জয় এবং দেশবন্ধুর পরাজয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু শেষে মহাত্মাই হার মানিয়াছিলেন। ত্যাগমুগ্ধ হিন্দুর নিকট দেশবন্ধুর প্রভাব বড় কম ছিল না। কাউন্সিলে প্রবেশ বোধ হয় মহাত্মা-দেশবন্ধু বিরোধের একটি কারণ ছিল। বর্ত্তমানে মহাত্মার আশীর্ব্বাদ লইয়া কংগ্রেস-সদস্যগণ প্রাদেশিক এসেম্ব্লিতে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং হলফ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণরের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা বলেন, মন্ত্রিত্বগ্রহণ ব্রিটিশের অধীনতার পাশ হইতে মুক্তিলাভের সংগ্রামের অঙ্গ। লৌকিক ভাষায় ইহাকে বলে সাহচর্য্য। হা দেশবন্ধু! তুমি এখন কোথায়?

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে উনি?" সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, "মা।" "আনন্দমঠের" বর্ত্তমান সংস্করণে মাতৃমূর্ত্তি আর বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে নাই, "অঙ্কোপরি" নামিয়া আসিয়াছেন।

সত্যানন্দ কক্ষান্তরে মহেন্দ্রকে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "মা—যা ছিলেন।" "ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।"

সত্যানন্দ তার পরে মহেন্দ্রকে অন্ধকার সুরঙ্গ-পথে এক ভূগর্ভস্থ অন্ধকার-প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। মহেন্দ্র সেখানে এক কালী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী (সত্যানন্দ) বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিলেন, "কালী!"

ব্রহ্মচারী, "কালী অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী! হৃতসর্ব্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা।"

সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে দ্বিতীয় সুরঙ্গ-পথে লইয়া গেলেন। সহসা মহেন্দ্রের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিত দশভুজা প্রতিমা দেখিতে পাইলেন। সত্যানন্দ বলিলেন, "এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে শক্তি-শোভিত,—পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত।"

কমলাকান্তের স্বপ্নদৃষ্ট জন্মভূমির মূর্ত্তি।

জন্মভূমির মূর্ত্তি কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রান্তি নাই।

মহেন্দ্র 'আনন্দ মঠের' বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেবীরূপে জন্মভূমির ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া স্ত্রী কল্যাণীর সহিত মিলিত হইলেন। কল্যাণীর নিকট শুনিলেন, সেও পূর্ব্ব রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছিল। সে দেখিয়াছিল, সে এক অপূর্ব্ব স্থানে গিয়াছে। সেখানে যেন সকলের উপরে কে বসিয়া আছেন, "যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁহার যেন চারি হাত। তাঁহার দুইদিকে কি, আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ···যেন সেই চতুর্ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রী-মূর্ত্তি। সে-ও জ্যোতির্ম্ময়ী কিন্তু চারিদিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অতি শীর্ণা কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রী-মূর্ত্তি কাঁদিতেছে।" এই মেঘমণ্ডিতা স্ত্রী-মূর্ত্তি কল্যাণীকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—হারই জন্যে মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' চতুর্ভুজ কল্যাণীকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই আমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে।"

কল্যাণী চতুর্ভুজকেও চিনিলেন না, শীর্ণা স্ত্রীলোককেও চিনিলেন না। আমরা উভয় মূর্ত্তিই চিনিতে পারি। আমরা উভয় মূর্ত্তিই মহেন্দ্রের সঙ্গে আনন্দমঠের দেবালয়ে দেখিয়াছি।

'বঙ্গদর্শনে' যখন বন্দে মাতরম্ গীত প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন রাগিণী, তাল ইত্যাদি এইরূপে সূচিত হইয়াছিল—

১×১

মল্লার—কাওয়ালী, তাল যথা—বন্দে মাতরম্ ইত্যাদি।

এই গীত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে এত দূর প্রভাবিত করিয়াছে, এবং এমন সকল সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব হিসাব করিতে হইলে এই গীতের পরবর্ত্তী ইতিহাস স্মরণ করা আবশ্যক।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে (১২৮৭ সনের চৈত্র) বন্দে মাতরম্ গীত প্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে, কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাসনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরোজী, এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অক্ষয়চন্দ্র সরকার "কবি হেমচন্দ্র" পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—

"ইহার (১২৯১ সনের) এক বৎসর পরে, কলিকাতায় চতুর্থ (?) 'কংগ্রেস' উপলক্ষ করিয়া 'রাখী বন্ধন' প্রকাশিত হইল; তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গীতি, ভারতের ঐক্যতান-রূপে হেমচন্দ্র ঘোষিত করিলেন" (৪৮ পৃঃ)।

"রাখীবন্ধন" কবিতায় হেমচন্দ্র এই প্রকারে "বন্দে মাতরম্" গীতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"প্রণয়-বিহ্বল ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে
গাহিল 'বন্দে-মাতরম্'
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং।
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত—দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্'।
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত জগৎ মাতিল।"

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের আরম্ভে "বন্দে মাতরম্"

গীত গাওয়া হইয়াছিল, এবং তার পর বাঙ্গালার সভা-সমিতিতে এই সঙ্গীত গীত হইতে আরম্ভ হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি (slogan) এবং গীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সকলেই জানেন, সরকারের বঙ্গবিভাগ রদ করিবার জন্য এই আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধাচরণের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল "বন্দে মাতরম্"। বাঙ্গালা বাঁটোয়ারা সম্বন্ধীয় আন্দোলনে অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান সরকারী অভিমত সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং অনেক মুসলমান "বন্দে মাতরম"কে মুসলমানবিরোধী ধ্বনি মনে করিয়াছিলেন। "আনন্দমঠ" উপন্যাসের আখ্যান বস্তু এই প্রকার সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ যোগাইয়াছিল।

"আনন্দমঠে"র আখ্যান বস্তুর সহিত দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। একটি ছোট ঘটনা। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ। আর একটি খুব বড় ঘটনা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। "আনন্দমঠে"র পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের, অর্থাৎ ১১৭৬ সনের বাঙ্গালা-বিহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকৃত ইতিহাস এই প্রকারে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয় নাই।

"আনন্দমঠের" আখ্যান আরম্ভ হইয়াছে ১১৭৬ সালে (সনে) গ্রীষ্মকালে। ১১৭৬ বাঙ্গালা সন ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষার্দ্ধে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৭৭০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমার্দ্ধে শেষ হইয়াছিল। আনন্দমঠ ইতিহাস নহে, উপন্যাস। উপন্যাস লেখকের ইতিহাসকে বিকৃত করিবার অধিকার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" ইতিহাসকে যথেচ্ছ রূপান্তরিত করিয়াছেন। "আনন্দমঠে"র আখ্যানের সঙ্গে ঐ যুগের যথার্থ ইতিহাসও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উপন্যাসে এবং ইতিহাসে তফাৎ বুঝা যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই লিখিয়াছেন, মহম্মদ রেজা খাঁ তখন রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা ছিলেন। "১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই" এই কথার অর্থ, ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ তখনও শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। তখন নবাব মীরজাফর জীবিত ছিলেন না। তিনি দুর্ভিক্ষের সূচনার চার বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মীরজাফর যখন জীবিত ছিলেন, তখন ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন না, খাজনার টাকা আদায় করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। তখন বাঙ্গালা-বিহারের দেওয়ান ছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। আদৌ মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবার মত সুবা বাঙ্গালায়ও বাদশাহের দুই জন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি থাকিত; এক জন নবাব-নাজিম, যাঁহার কর্ত্তব্য ছিল শান্তিরক্ষা; এবং আর এক জন দেওয়ান, যাঁহার কর্ত্তব্য ছিল রাজস্ব আদায়। মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন নবাব নাজিমের পদপ্রার্থী নিজের বলে মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করিতেন, এবং নিজের অনুগত লোককে দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু নবাব-নাজিম এবং দেওয়ান উভয়কেই তখনও বাদশাহের নিকট হইতে স্বতন্ত্র ফারমান লইতে হইত। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নন্দকুমার দেওয়ানী সনদ এবং মহারাজ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিত শেষ-পত্রে, নবাব মীরজাফর গভর্ণরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাঁহার (মীরজাফরের) পুত্র এবং উত্তরাধিকারী নবাব নজমুদ্দৌলাকে এবং নন্দকুমারকে রক্ষা করেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ মীরজাফরের মৃত্যুর পর নন্দকুমারকে তাঁহার অপরাধের বিচারার্থ কলিকাতায় আনাইয়াছিলেন; মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং নবাব নজমুদ্দৌলাকে পেনসনভোগীতে পরিণত করিয়াছিলেন।* এই বৎসরই (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে) লর্ড ক্লাইব আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে দেওয়ানি ফারমান লইয়াছিলেন, কিন্তু রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন নাই। মুর্শিদাবাদের এবং পাটনার রেসিডেণ্ট বা কোম্পানীর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হইয়াছিল মহম্মদ রেজা খাঁর (নবাব মোজফ্‌ফর জঙ্গের) উপর, এবং বিহারের ভার দেওয়া হইয়াছিল রাজা সীতাব রায়ের উপর। এই ব্যবস্থার নাম দ্বৈত শাসন (dual government)।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সাক্ষাৎ কারণ অবশ্য অনাবৃষ্টি

---

* *Calendar of Persian Correspondence* (Imperial Records Department), Vol. 1, nos. 1964, 1971-1972.

কিন্তু এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঙ্গালা বিহারের অধিবাসিগণ যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষ যে লোকক্ষয় নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই—পক্ষান্তরে যে দুর্ভিক্ষ-বহ্নিতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক ভস্মীভূত হইয়াছিল, কোন কোন রাজপুরুষ যে তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন,—এইজন্য দায়ী কে? স্যার উইলিয়ম হান্টার তাঁহার Annals of Rural Bengal নামক পুস্তকে এই বিচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তকের সহিত পরিচিত ছিলেন। তবে কেন তিনি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোকক্ষয়ের জন্য পরলোকগত মীরজাফরকে এবং তাহার স্বধর্ম্মিগণকে দায়ী করিয়াছেন? ইহার উত্তর, বঙ্কিমচন্দ্র সুবা-বাঙ্গালার নাম করিয়া একটি কাল্পনিক সুবা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সুবার সুবাদার প্রভৃতি প্রায় সমস্তই কল্পিত। ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ঘটনার প্রকৃত বিবরণ লেখা নহে, রসের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যানভাগ অমন না করিয়া কেন এমন করিয়াছেন, এইরূপ অরসিকজনোচিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে কলা-কৌশল ভিন্ন অন্য বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। এদেশের লোকের যদি ইতিহাস পড়ার, ইতিহাস লেখার অভ্যাস থাকিত, তবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত ঘটনার ইতিহাসের বিশেষ চাহিদা হইত, এবং নানা আকারে এই ইতিহাস লিখিত হইত। প্রসিদ্ধ ইংরেজ-সেনানায়ক মার্লবরো (Duke of Marlborough) বলিয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ডের ইতিহাস শিখিয়াছেন সেক্সপিয়রের নাটক হইতে। আমাদেরও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ইতিহাসের জ্ঞানও তথৈব চ, 'আনন্দমঠ' উপন্যাস হইতে। তাই "বন্দে মাতরম্" গান লইয়া এত গণ্ডগোল।

মর্লি-মিন্টো রিফর্ম বা শাসনবিধি আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত যে অর্থে আমাদের দেশ ইংরেজের শাসনাধীনে ছিল, নবাবী আমলে সেই অর্থে এই দেশ মুসলমানগণের শাসনাধীনে ছিল না, হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকলেরই উচ্চ রাজপদ লাভ করিবার সমান অধিকার ছিল। মীরজাফরের দেওয়ান ছিলেন নন্দকুমার, সিরাজদ্দৌলার দেওয়ান ছিলেন মোহনলাল, আলিবর্দ্দী খাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন জানকীরাম, যিনি পাটনার নায়েব-নাজিমরূপে ভাবী নবাব সেরাজুদ্দৌলাকে বন্দী করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসনবিধি ছিল নবাব-নাজিমের ইচ্ছাতন্ত্র। নবাব নাজিম স্বয়ং মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই তাহাকে মুসলমান শাসন (Muhommadan rule) বলা যাইতে পারে না। নবাবী আমলের এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শাসন ছিল রাজতন্ত্র। তখন হিন্দু-মুসলমান সকলেই রাজার সমান অধীন ছিল।

নবাবী আমলে বাঙ্গালার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং কি কারণে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বে তাহারা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল, মন্বন্তরের প্রাক্কালে দুই জন কোম্পানীর উচ্চ কর্ম্মচারীর লিখিত দুইখানি চিঠিতে এই বিষয় বর্ণিত এবং আলোচিত হইয়াছে। এই দুই জন ইংরেজ কর্ম্মচারীর এক জন হেরি বেরেলষ্ট (Harry Verelst)। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে (২৬শে তারিখে) লর্ড ক্লাইভ পদত্যাগ করিলে বেরেলষ্ট সাহেব বাঙ্গালার গভর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিন বৎসর কাল এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর পদত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেও সতের বৎসরের অধিক কাল তিনি বাঙ্গালার নানা স্থানে কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং বেরেলষ্ট সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব-নাজিম, এবং বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যা এই তিন সুবার সুবাদার ছিলেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের সুবাদারের মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, এবং পরবৎসর হইতেই বর্গির হাঙ্গামা অর্থাৎ নাগপুরের ভোঁসলে রাজার অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তৃক বাঙ্গালা আক্রমণ এবং লুণ্ঠন আরম্ভ হইয়াছিল। কবি ভারতচন্দ্র বর্গির হাঙ্গামা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—

স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃত-আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

পশ্চিম-বঙ্গে এইরূপ দুর্গতি ক্রমান্বয়ে আট নয় বৎসর চলিয়াছিল। তথাপি তখন বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর লোকের অবস্থাই স্বচ্ছল ছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রাক্কালে, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল, বঙ্গবাসীর তৎকালীন দারিদ্র্যের কারণ আলোচনা করিয়া বেরেলষ্ট সাহেব কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পলাশির যুদ্ধের এবং নবাব মীরজাফরের মসনদ আরোহণের পূর্ব্বে, বাঙ্গালার জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"The farmar was easy, the artizan encouraged, the merchant enriched, and the prince satisfied."

অর্থাৎ কৃষকের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, শিল্পীর আদর ছিল, বণিক্ ধনশালী ছিল এবং রাজা সন্তুষ্ট ছিলেন। *

বেরেলষ্ট লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার দারিদ্র্যের প্রধান কারণ, বাঙ্গালা হইতে যে পরিমাণ সোনা-রূপা নগদ টাকা রপ্তানী হইত, সেই পরিমাণ সোনা-রূপা নগদ টাকা বাঙ্গালায় আমদানী হইত না। কাযে কাযেই দেশের ধনক্ষয়ই চলিয়াছিল। এই ব্যাপার বিশেষ ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল পলাশির যুদ্ধের পরে, মীরজাফরের সুবাদারীর সুরু হইতে। মীরজাফর মসনদের মূল্যস্বরূপ কোম্পানীকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন, কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে অনেক টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন; সুতরাং কেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নহে, অন্যান্য য়ুরোপীয় কোম্পানীও পরোক্ষভাবে এই টাকার অংশ পাইয়াছিলেন, এবং য়ুরোপ হইতে টাকা আমদানী না করিয়া এই টাকা দিয়াই কারবার চালাইয়াছিলেন। তখন কোম্পানীর এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের কারবার বিনা মাশুলে চলিতেছিল, কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের মাশুল দিতে হইত। ইহার ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া নবাব মীরকাশিমের সহিত কোম্পানীর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। নবাব মীরকাশিমের কোম্পানীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অনেক টাকার দরকার হইয়াছিল। সুতরাং তিনি দেশের ধনী, দরিদ্র সকলের নিকট হইতেই উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। মীরকাশিমের পতনের পর পুনরায় কিছুকাল মীরজাফরের সুবাদারী এবং তার পর কোম্পানীর দেওয়ানী। দেওয়ানী লাভের পর হইতে কোম্পানীর পক্ষে কারবারের জন্য নগদ টাকা আমদানী করিবার আবশ্যকতা আরও কমিয়া গিয়াছিল। বেরেলষ্ট সাহেব দেখাইয়াছেন, য়ুরোপীয় বণিক্রা যত টাকা আমদানী করিতেন, তাহার দেড়া টাকা রপ্তানী করিতেন। ইহাতেই বাঙ্গালা নিঃসম্বল হইয়াছিল। তাহার উপর দেশীয় ব্যবসায়িগণ য়ুরোপীয়গণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণ, মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেণ্ট বা কোম্পানীর প্রতিনিধি বেচার (Richard Becher) সাহেব কর্ত্তৃক কৌন্সিলের প্রেসিডেণ্টকে লিখিত ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে তারিখের চিঠি। বেচার সাহেব ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালায় পৌঁছিয়াছিলেন। সুতরাং নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর আমলে বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এই চিঠিখানিতে বেচার সাহেব লিখিয়াছেন:—

In Aliverdy Cawn's time the amount of the Revenues paid into the Treasury was much less than what comes in at present, but then the Zemindars, Shroffs, Merchants &c, were rich, and would at any time when an emergency required it, supply the Nabob with a large sum, which they frequently did, particularly when he was at war with the Marattoes. The custom then was to settle a malguzzary with the different Zemindars on moderate terms; the Nabob abided by his Agreement; the Zemindars had a natural interest in their Districts, and gave proper encouragement to their Ryotts, when necessary would wait for their rents, and borrow money to pay their own mulguzzary punctually. There were in all the Districts shroffs ready to lend money to the Zemindars when required, and even to the ryotts which enabled many to cultivate their grounds, which otherwise they could not have done. This mode of Collection and a free Trade

* **Harry Verelst**, *A view of the rise and progress and present state of the English Government in Bengal*, London. 1772, p 115.

which was carried on in such a manner that the Ballance proved yearly in it's favour, made the country flourish, even under an arbitrary Government and at a time when a large tract of it was for years together annually invaded by the Mharattoes, who burnt and destroy'd all they could come at, the poor inhabitants flying for shelter to the principal cities, European factorys, &c. The swelling of the rivers at the approach of the rains always obliged the Mharattoes to retire, and the inhabitants were again secure till January. They having encouragement set immediately to work, and endeavcured to get their crops in and sent to market before the time return'd for the apprehended invasion : insomuch that even under such circumstances the country was in a flourishing state, and the Zemindars &c. able to pay the Nabob his requisition (account his extraordinary expence in keeping so large an army to oppose the Mharattoes) the enormous sum of one Crore at one time, and fifty Laacks at another, besides paying the Malguzzary. I mention this only with a view of showing what this fine country is capable of under proper management. When the English first received the Dewannee their first consideration seems to have been the raising of as large sums from the country as could be collected, to answer the pressing demands from home and to defray the large expences here. The Zemindars not being willing or able to pay the sum required, aumils have been sent into most of the Districts. These aumils on their appointment agree with the Ministers to pay a fixed snm for the districts they are to go to and the man that has offered most has generally been preferr'd What a destructive system is this for the poor inhabitants ! The aumils have no connection or natural interest in the welfare of the country where they make the Collections, nor have they any certainty of holding their places beyond the year : the best recommendation they can have is to pay up their Kistbundees punctually, to which purpose they fail not to rack the country whenever they find they can't otherwise pay their Kists and secure a handsome sum for themselves Uncertain of their office, and without opportunity of acquiring money after their dismission can it be doubted that the future welfare of the country is not an object with them ? Nor is it to be expected in human nature These aumils also have had no check on them during the time of their employment ; they appoint those that act under them ; so that during the time of the year's Collection their power is absolute There is no fixed Hustabood by which they are to collect, nor any likelihood of complaints till the poor ryott is really drove to necessity by having more demanded of him than he can possibly pay. Much these poor wretches will bear rather than quit their habitations to come here to complain, especially when it is to be considered that it must always be attended with loss of time, risk of obtaining redress, and a certainty of being very ill used should the aumil's influence be sufficient to prevent the poor man's obtaining justice, or even access to those able to grant it to him. On this destructive plan, and with a continual demand for more revenue have the collections been made ever since the English have been in possession of the Dewannee. *

অর্থাৎ আলিবর্দ্দী খাঁর আমলের (১৭৪১-১৭৫৬) রাজস্বের হার দেওয়ানীর (১৭৬৫-১৭৬৯) আমলের হারের অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তখন জমীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই ধনী ছিল, এবং যখনই নবাবের মারাঠাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধের মত কোন ঠেকা কায উপস্থিত হইত, তখন তাঁহারা নবাবকে অনেক টাকা নজর দিতেন। তখনকার রীতি ছিল, অল্প মালগুজারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিভিন্ন জমীদারের সহিত জমীদারী বন্দোবস্ত দেওয়া হইত। নবাব এই বন্দোবস্তের সর্ত্ত প্রতিপালন করিতেন। নিজেদের জমীদারীর প্রতি জমীদারগণের অনুরাগ ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগকে উৎসাহদান করিতেন। খাজনা আদায়ের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেন না। প্রত্যেক জেলায় মহাজন ছিল, যাঁহারা জমীদারদিগকে এবং রায়তদিগকে টাকা ধার দিতেন। তখন যদিও শাসনবিধি স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল, যদিও অনেককাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই মারাঠারা বাঙ্গালার একটি বিস্তীর্ণ প্রদেশে আক্রমণ করিয়া সম্মুখে যাহা পাইয়াছিল তাহাই জ্বালাইয়া দিতেছিল বা ধ্বংস করিতেছিল, এবং সেখানকার অধিবাসিগণ ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া বড় বড় সহরে বা য়ুরোপীয়গণের কুঠী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় লইত; তথাপি তখন দেশ সমৃদ্ধ ছিল। বর্ষার আরম্ভে নদীগুলির জল যখন বাড়িয়া যাইত, তখন মারাঠারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত, এবং তখন হইতে, জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এই প্রদেশের লোকরা নিরাপদে কাল কাটাইত। উৎসাহ পাইত বলিয়া তখনই তাহারা চাষ-আবাদ আরম্ভ করিত, এবং মারাঠাগণের পুনরাক্রমণের পূর্ব্বেই ফসল কাটিয়া বাজারে পাঠাইতে চেষ্টা করিত। ইহার ফলে এইরূপ বিপদের সময়েও দেশের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। মারাঠাদিগের

---

* *The Letter Copy Books of the Resident at the Durbar at Murshidabad, 1969—1770.* (**Records of the Government of Bengal**), pp. xii—xiii.

আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য নবাবকে যে বৃহৎ সেনা পোষণ করিতে হইত, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে জমীদারগণ একবার এক কোটি টাকা, এবং আর একবার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজরা যখন দেওয়ানী লাভ করিলেন, তখন ইংলণ্ড হইতে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যে টাকা দাবী করিয়া পাঠাইতেন, তাহা পূরণ করা এবং এখানকার অত্যধিক ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল। সুতরাং এই দেশ হইতে যত টাকা আদায় করা সম্ভব হইত, তত টাকা তাঁহারা আদায় করিতে চেষ্টা করিতেন। জমীদারগণ এত টাকা দিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হওয়ায়, অধিকাংশ জেলায়ই আমিল পাঠান হইয়াছিল। যখন আমিলগণ নিযুক্ত হন, তখন তাঁহারা আপন আপন জেলার জন্য মন্ত্রীদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন, এবং যিনি বেশী টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত হন, তিনিই সাধারণতঃ নিযুক্ত হন। এই রীতি দেশের দরিদ্র অধিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যে জেলায় আমিলগণ রাজস্ব আদায় করেন, সে জেলার সহিত তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই এবং সেই জেলার হিতসাধনে তাঁহাদের স্বাভাবিক আগ্রহ নাই। তাঁহারা যে এক বৎসরের অধিক কাল আদায়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং কিস্তিমত নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক রাজস্ব দাখিল করিবার জন্য তাঁহারা যে উপায়ে পারেন খাজনা আদায় করেন, এবং নিজেদের লাভের অংশের জন্য যত পারেন আদায় করেন। এই আমিলগণ যত দিন আদায়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তত দিন কেহ তাঁহাদের কোনও কার্য্যে বাধা দেয় না। তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী তাঁহারা নিজেরাই নিযুক্ত করেন। খাজনার হার সম্বন্ধে কোনও কাগজপত্র নাই। আমিলগণ গরীব রায়তের নিকট যত পারেন ততই আদায় করেন। গরীব রায়তদিগের উপর যতই জুলুম হউক, তাহারা মুর্শিদাবাদে আসিয়া অভিযোগ করিতে সাহস পায় না। ইংরেজের দেওয়ানী লাভের পর হইতে যত দূর সম্ভব বেশী রাজস্ব আদায়ের জন্য, এই সর্ব্বনাশকর রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্টরূপে রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান বেচার সাহেবের একটি কর্ত্তব্য ছিল, সুতরাং রাজস্ব আদায়ের রীতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের তাঁহার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ২৪শে মে তারিখের পত্রে ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৮-১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালার রাজস্ব আদায়ের যে রীতির অনুসরণ করা হইয়াছিল, তিনি তাহার অপকারিতা দেখাইয়াছেন, এবং সেই অপকারের প্রতীকারের উপায় প্রস্তাব করিয়াছেন। তখনকার বাঙ্গালার জমীদার, রায়ত, মহাজন, খাতক, ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণীর লোকই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত বেরেলষ্ট সাহেবের ৫ই এপ্রিলের পত্রেও এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। বেরেলষ্ট সাহেব বাঙ্গালার এই সর্ব্বনাশের নানা কারণের মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছেন, কোম্পানীর বাণিজ্যনীতিকে এবং বাঙ্গালা হইতে অত্যধিক পরিমাণ নগদ টাকা রপ্তানীকে। বেচার সাহেবের অন্যান্য পত্রেও কোম্পানীর মূলধন ব্যবহারের রীতি (mode of providing the Company's investment), এবং নগদ টাকা বা সোনা-রূপা আমদানীর পরিবর্ত্তে রপ্তানী (the exportation of specie instead of importing large sums annually) দেশের সর্ব্বনাশের অন্যতম কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তিনি জমীদার এবং রায়তের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমিলগণের দ্বারা রায়তের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের কু-প্রথা, এবং এই কু-প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি স্বজাতি ইংরেজগণকেই দায়ী করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"These appear to be the principal causes why this fine country, which flourished under the most despotic and arbitrary Government, is verging towards its ruin while the English have really so great a share in the administration."

[ক্রমশঃ

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ (রায় বাহাদুর)

নূতন আয়কর-বিধান

২
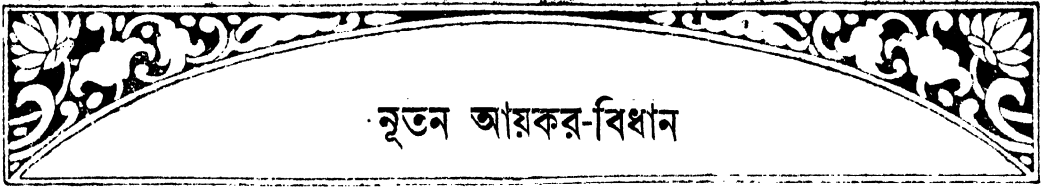
নূতন আয়কর-বিধানটি যে বিলাতের আয়কর আইনের অনুরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইযাছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। কিন্তু ইংলণ্ডের বা আমেরিকার আর্থিক অবস্থার সহিত ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার তুলনা হয না। ভারতের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য অন্য কোনও দেশে নাই। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল অর্থাভাব ও অন্নাভাব ক্রমেই বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় যে কোনও প্রকারের করভারই পরোক্ষভাবে দেশের একমাত্র আয়জনক কৃষির উপর পতিত হইয়া থাকে। ভারতের দরিদ্র ও ধনীর মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ যে, একক রাখিয়া অপরকে করভারে প্রপীড়িত করা চলে না। তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনের ফলে ব্যবস্থাপক সভার ব্যয়, আইন প্রণয়নের ও শাসনের ব্যয় ক্রমেই বিপুলভাবে বাড়িতেছে। অন্যদিকে পুলিসের ও সমরবিভাগের ব্যয় ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে ক্রমেই গুরু হইতেও গুরুতর হইতেছে। যাঁহারা বিত্তবান্, এই সঙ্কটে তাঁহারাই সরকারের বিপুল ব্যয়ভার নির্ব্বাহের অর্থ যোগাইতে সমর্থ। কিন্তু আয়কর আইনের দাপটে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যদি সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের যতটুকু করভার যোগাইবার ক্ষমতা, তাহার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন, তবে প্রাদেশিক সরকারের অর্থাভাব কোনও কালেই ঘুচিবার নহে। ইহার অনিবার্য্য ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রাদেশিক সরকার কৃষিকার্য্যের লাভের উপর আয়কর স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন এবং তাহার ফলে তখন দেশের একমাত্র আয়জনক পেশা, অন্নসংস্থানের উপায় কৃষি—যাহার উপর দেশের প্রায় শতকরা ৭৫ জনকে নির্ভর করিতে হইতেছে, তাহার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে যে এই পথে করধার্য্য করা সম্ভবপর, এরূপ ইঙ্গিতও দুই এক স্থলে প্রকাশ পাইতেছে।

এই জন্যই দরিদ্র ভারতের আর্থিক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে ভারতকে আর কোনও দেশের অনুকরণ করিতে গেলে চলিবে না। ভারতবর্ষকে এখন জগতের সহিত সমান তালে চলিয়া সমৃদ্ধিশালী হইতে হইলে ভারতকে শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপারে আরও বহুতর উন্নতি করিতে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের রক্ষকগণের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের বিরোধ থাকিবে, তত দিন এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন যে একরূপ অসম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয় নৌ বাণিজ্যের ব্যাপারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সকলেই এ কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। নূতন আয়করবিধান আইনে পরিণত হইলে, তাহার সম্পূর্ণ আয়—বর্ত্তমানে যেরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তগত হইতেছে—ভবিষ্যতেও তদ্রূপ হইবে। প্রাদেশিক সরকারের আয়ের পরিমাণ তাহার দ্বারা বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি পাইবে না—সুতরাং প্রাদেশিক সরকার অর্থাভাবে এখন যেমন জাতীয় গঠনমূলক কার্য্যে যথাযথ আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন না, তখনও সেই অবস্থা বিদ্যমান থাকিবে: সুতরাং তখন প্রাদেশিক সরকারকে বাধ্য হইয়াই নূতন নূতন কর স্থাপন করিতে হইবে। নূতন আয়কর বিধান আইনে পরিণত হইলে সেই পথই প্রশস্ত হইবে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে অবস্থায় নূতন আয়কর বিধান উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং তাহার যে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, গত অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতীতে' স্থূলভাবে তাহা আলোচিত হইলেও এবার রাষ্ট্রীয় পরিষদের আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ কিয়দংশ পুনরুল্লেখের প্রয়োজন।

যাঁহাদের আয় দুই হাজার টাকার অনধিক, বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের আয়-কর দিতে হইতেছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, তাহা নির্ণয়ের ভার ভারত সরকারের উপর। ভারত সরকার হইতে যখন ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট পেশ হইবে, তখনই এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত কি, তাহা জানা যাইবে। আয়কর-বিধানের আলোচনায় এ বিষয়ে সরকারের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে না। আয়কর বৃদ্ধির সহিত ভারত সরকারের

ব্যয়ও যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ,—আর সে ব্যয় যে বর্ত্তমান জাগতিক সঙ্কট-সময়ে বৃটেনের শক্তি-বৃদ্ধিকল্পে করা হইবে, তাহাও সুনিশ্চিত, জগদ্ব্যাপী মহাসমরের আশঙ্কা ক্রমশঃই প্রবল হইতেছে। এ অবস্থায় চ্যাটফিল্ড কমিটীর রিপোর্টের গতি অবশ্যই ভারত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিবৃদ্ধিকল্পে প্রযুক্ত হইবে। তখন আয়করের আয় কোন্ পথে ব্যয়িত হইবে, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তখন আবার এক হাজার টাকার উপরের আয়ের উপর কর ধার্য্য করিতে কতক্ষণ লাগিবে ?

বহু বৎসরের জীর্ণ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কি প্রকারে জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, এই আয়কর বিধান বিধিবদ্ধ করিবার কালেই তাহা দেখা গিয়াছে। ব্যবস্থা-পরিষদের তথাকথিত কংগ্রেসী দল জনসাধারণের হিতসাধনের অপেক্ষা যে কর্ত্তাভজায় অধিকতর দক্ষ, তাহার প্রমাণ তাঁহারা দিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্যবস্থা-পরিষদে যখন এইরূপ, তখন রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। হইয়াছেও তাহাই। কতকগুলি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিবার নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু সভায় গর্জ্জনও তেমন হয় নাই, কৃপাবর্ষণও হয় নাই।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যখন এই বিধান গৃহীত হয়, তখন কি পরিমাণ আয়ের উপর কি পরিমাণ কর ধার্য্য হইতে পারিবে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হয় নাই, নমুনাস্বরূপ আয়কর হারের তালিকার একাংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহাতে করধার্য্যযোগ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনে যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল, রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে এই বিল আলোচনার কালে তাহা অপসারণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই।

কংগ্রেসী দল এই বিলের ব্যাপারে সরকারের সহিত আপোষ করিয়া এই বিলটির সমর্থনে ভুল করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে মিঃ শান্তিদাস আস্কুরাম স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্যগণের ধারণা যে, তাঁহারা সরকারের সহিত মীমাংসা করিয়া এই বিলটির উন্নতিসাধন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। তাঁহারা বিলটিকে দোষমুক্ত করিতে পারেন নাই ; বরং রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে বিল যে প্রকারে শেষে বাহির হইতেছে, তাহাতে উহা দেশের শিল্পের উন্নতির পরিপন্থী হইবে। আমার মতে বিল ভবিষ্যতের ফেডারেশন সরকারের অর্থ-সচিবের জন্য রাখিলেই ভাল হইত ; কারণ, তিনি দেশের ও দশের অধিবাসিগণের প্রয়োজন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেন।" মিঃ শান্তিদাস সত্যই বলিয়াছেন যে, "শাসনপদ্ধতির বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই জাতীয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিক ক্ষমতা নাই—অথচ ঐরূপ বিল আইনে পরিণত হইলে এই পরিষদের সদস্যগণের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হইবে। বিলাতে এইরূপ কোনও বিধান সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের উচ্চতর ও নিম্নতর সভার সদস্যগণকে লইয়া একটি সম্মিলিত কমিটী গঠন করিয়া সেই কমিটীর উপরই বিলটির বিবেচনার ভার প্রদত্ত হইয়া থাকে, এখানেও ঐরূপ করা উচিত ছিল।"

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ বলেন—

"The taxpayers' interests had been more or less ignored. In view of the difficulties that lay in the way of the present policy in taxing the rich in the mannar proposed in the Bill, I would not subscribe to a measure which as a matter of fact, did not distinguish between the honest and dishonest assessee. I deprecate those provisions of the measure which even went farther than the Income-Tax Law in the United Kingdom."

অর্থাৎ—

"নবপ্রবর্ত্তিত আয়করবিধানে করদাতাদিগের স্বার্থের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই। এই বিধানে যে প্রকারে ধনীদিগের উপর কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, ঐ নীতি অবলম্বিত হইলে যে বিপদ ঘটিবে, তাহা মনে করিয়া আমি এই বিধানে সম্মতি প্রদানে অসমর্থ। প্রকৃত পক্ষে এই বিধানে অসাধু ও সাধু করদাতার মধ্যে কোনও প্রভেদ রক্ষিত হয় নাই। এই বিধান বিলাতের আয়কর আইনকে অতিক্রম করিয়াছে—সুতরাং আমি এই বিধানের সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিতেছি।"

ফলতঃ এই আইনের দ্বারা ভারত সরকারের অর্থাভাব পূরণ হইলেও ইহা ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায় হইবে, একথা আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিয়াছি।

যাহা হউক, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে এই বিলের আলোচনাকালে অনেকেই আশা করিয়াছেন যে, এই নূতন আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রচুর আয় হইবে, তাহা হইতে প্রাদেশিক সরকারকেও সাহায্য করা সম্ভব হইবে। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে কোনও প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় নাই—সুতরাং এই আশা পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। সার এ, পি, পাত্র ভারত সরকারের কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করা উচিত নহে বলিয়া কংগ্রেস-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কংগ্রেসী দলের সদস্য মিঃ রামদাস পান্টুলু ইহার যুক্তিপূর্ণ উত্তরও দিয়াছেন। কিন্তু কখন ভারত সরকার সাহায্য করিবেন কিম্বা আদৌ ভারত সরকার এই আয়কর হইতে প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করিবেন কি না, তাহা স্থির না হইতেই ইহা লইয়া কলহ দেখিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে এই বিলের আলোচনাকালে মিঃ হোসেন ইমাম বলেন যে, বিলের নানা দোষের মধ্যে লাভের যে টাকা করদাতার হস্তগত হইবে, তাহার উপর কর ধার্য্য না করিয়া আনুমানিক মোট লাভের হিসাবের উপর কর ধার্য্য করায় করদাতার বড়ই অসুবিধা হইবে। লাভের যত টাকা আদায় হইবে, এবং যত টাকা অনাদায়ী পাওনা হিসাবে একেবারে অনাদায়ী থাকিয়া যাইবে, তাহা প্রথমে কিছুতে বুঝা যাইবে না, অথচ হিসাব অনুসারে লাভের উপর আয়কর পূর্ব্ব হইতেই সরকার আদায় করিয়া লইবেন। মিঃ হোসেন ইমামের একথা যে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই, কিন্তু তথাপি প্রস্তাবিত আইনের এই ত্রুটি-সংশোধনের কোনও চেষ্টা করা হয় নাই।

বিলটির এইরূপ অনেক ত্রুটি থাকিলেও উহা আইনে পরিণত হইতে বাধা হইবে না; কারণ, ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বিলটি মানিয়া লইয়াছেন। এই আপোষ-মীমাংসার উদ্দেশ্য কি, তাহা গভীর রহস্যাবৃত বলিয়াই মনে হয়, তবে এই আপোষ-মীমাংসা না হইলে যে প্রস্তাবিত বিধানটি কিছুতেই আইনে পরিণত হইতে পারিত না, এ কথা সুনিশ্চিত।

প্রস্তাবিত আইনে ভারতের কোনও অধিবাসী ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোনও দেশে যদি কৃষিকার্য্যের দ্বারা অর্থ আয় করেন, তবে ঐ অর্থের উপর আয়কর ধার্য্য করা হইবে। ইহাতে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত থাকিবার কালে বহু ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ব্রহ্মদেশের কৃষিকার্য্যে অর্থনিয়োগ করিয়াছেন। এখন ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে পৃথক্ হওয়ায় ভারতের ঐ সকল ব্যক্তিকে ব্রহ্মদেশ হইতে লব্ধ কৃষির আয়ের উপর আয়কর প্রদান করিতে হইবে। ইহাতে একরূপ পরোক্ষভাবেই কৃষিজাত আয়ের উপরই আয়কর ধার্য্য করা হইল। এই ধারাটি আয়কর আইন হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ বি, দাস বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সার জেম্স্ গ্রীগ কংগ্রেসী নেতার সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া এই আপত্তিজনক ধারাটি প্রস্তাবিত আইনে কায়েমী করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে ভারতবর্ষে আয়কর আইনের প্রবর্ত্তন হইবার পর যে নীতিতে এই আইন চলিয়া আসিতেছিল—কৃষিলব্ধ আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য হইত না—তাহার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। অবশ্য আপোষ-মীমাংসার ফলে বৃটিশ-ভারতের বহির্ভূত স্থানে করদাতার যে আয় বর্ত্তাইবে, তাহা যদি সাড়ে চারি হাজার টাকার অধিক না হয়, তবে তাহার উপর কর ধার্য্য করা হইবে না। ইহাতে যাঁহাদের আয় অল্প হইবে, তাঁহারা প্রতিকার প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ভারতের বাহিরে কৃষিকার্য্য-লব্ধ হইলেও যাঁহাদের আয় অধিক হইবে, তাঁহারা মাত্র অধিক আয়ের হেতুবাদেই করধার্য্যের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন।

এতদিন আয়কর বিধানের পরিচালনায় যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইলে সংস্কৃত ফেডারেশন সরকারের অধীনেই তাহা করা উচিত ছিল। কিন্তু শাসনযন্ত্র-পরিচালনের বিশাল ব্যয়ের জন্য সরকারের টাকার যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই এইরূপ আইনের আবশ্যক, এই জন্যই যে প্রকারে হউক, এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সম্ভবতঃ এই বৎসর হইতেই ঐ আইন অনুসারে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। এই জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদে তিন দিনের মধ্যেই এই আইনের আলোচনা শেষ করা হইয়াছে। তথায় অবান্তর বিষয়ে যে সংশোধন প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে, তাহাও

কোনও সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত—আলোচিত হয় নাই। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এখন সেই সংশোধন প্রস্তাব সমেত বিলটি উপস্থিত করা হইয়াছে। এই অধিবেশনে উহা গৃহীত হইলেই পুনরায় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত করিয়া বিলটি আইনে পরিণত করা হইবে। বিলটি আইনে পরিণত হইলেই উহাতে বড়লাটের সম্মতি গ্রহণ করিতে বিলম্ব হইবে না; সুতরাং আগামী মার্চ্চ মাসের বাজেটেই ঐ আইনানুসারে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

অতঃপর আয়কর-বিধানের মূলনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। দেশের রক্ষার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন এবং তাহার জন্য বর্ত্তমান রণনীতি অনুসারে ব্যয়বৃদ্ধিও অপরিহার্য্য। এই সকল বিবেচনা করিয়াই এ দেশে আয়কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দরিদ্রের অপেক্ষা ধনীর উপরই সকল দেশে অধিক পরিমাণে আয়কর ধার্য্যের প্রথাও বর্ত্তমান। এই নীতি গ্রহণ করিয়াই ভারতে কৃষির আয়ের উপর এতাবৎকাল আয়কর ধার্য্য হয় নাই। যে সকল দেশের ধনী সম্প্রদায় শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সকল দেশে উচ্চহারে আয়কর ধার্য্য করা সঙ্গত বিবেচিত হইলেও ভারতের ন্যায় দরিদ্র প্রদেশে সেই হারে আয়কর ধার্য্য করিলে ভারতের পক্ষে তাহার ফল ভাল হইবে না। শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ধনীর ব্যক্তিগত স্বার্থ মূল লক্ষ্য হইলেও তাহাতে পরোক্ষভাবে দেশের শিল্পী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের উপকার সাধিত হইয়া থাকে। শিল্প ও ব্যবসায়ে যেমন লাভ হইয়া থাকে, তেমনই লোকসানের সম্ভাবনাও অল্প নহে। তবে যাঁহারা এই সন্দেহপূর্ণ পথে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের উন্নতি সাধনের সহায়ক হন, দেশের শাসকগণের নিকট হইতে তাঁহারা কিছু সদয় ব্যবহারের আশা অবশ্যই করেন। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। এদেশের শাসকগণ ভিন্নজাতীয় ও ভিন্নদেশীয়—এইজন্য স্বাভাবিক স্বজাতীয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহারা এদেশের শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ভারতীয়গণকে যথোপযুক্ত উৎসাহদান ত' দূরের কথা—তাঁহারা বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে বহু ভারতীয় ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে রক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই; তথাপি যে সকল প্রতিষ্ঠান ঐ সকল প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবিত আছে, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অত্যধিক হারে আয়কর আদায় করিতে ভারত সরকারের নৈতিক অধিকার আছে মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আবার এখন যে সকল শিশু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে—এই আইনের বিধান তাহাদের উন্নতির অন্তরায় হইবে। সুতরাং এই আইন কখনই তাহাদের পক্ষে মঙ্গল- জনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম এ বি-এল)।

শ্রী

"শ্রী"রে ত্যজিয়া শ্রীহীন হব কি আজি?
জলহারা নদী ফুলহীন লতাসম,
মরুর মতই তেয়াগি সুষমারাজি,
সুশ্রী বদন বিশ্রী করিব মম?

গুহকের সাথে শ্রীরামের কোলাকুলি,
শ্রীফল শিবের পায় না ত' অনাদর,
"শ্রীমতী," "শ্রীমানে" শ্রীহীন করিতে—তূলি
কেমনে ধরিব আমি যে চিত্রকর?

ইন্দ্রধনুর সপ্তরঙের—শ্রী
নাশ করিবারে ভ্রমেও নাহি যে চাই।
শ্রীচরণ ত্যজি হইব কি পাতকী?
জননী আমার মাথার মণি যে ভাই।

সাধু শ্রীমন্ত দেখালো কমলে নারী,
চিন্তামণিরে পেল শ্রীবৎসরাজ,
শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীচরণ লভি তাঁরি—
এল অহল্যা, ছিল সে পাষাণ মাঝ।

হউক ধরণী সুশ্রী ও সুন্দর,
সুশ্রী হউক আকাশের আঙিনাটি,
শ্রীমুখে ঝরুক অমৃতেরি নির্ঝর
জীবনে সবার যুক্ত হউক শ্রী!

শ্রীকাদের নওয়াজ
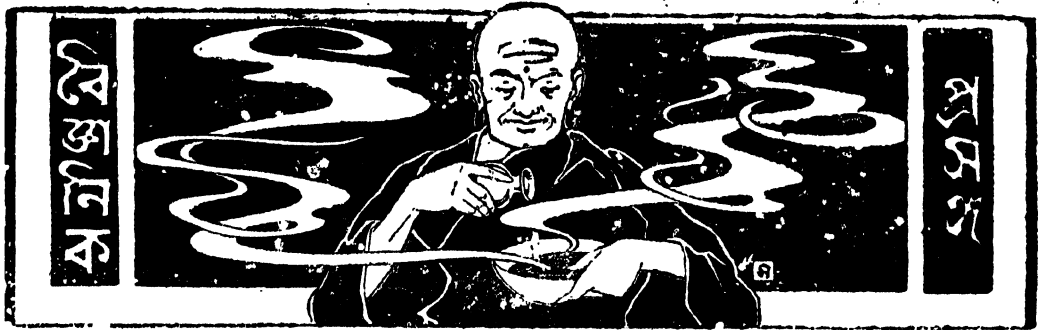
সজীব আলোক

কতিপয় আদিম জাতির বিশ্বাস যে, আলোক স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। খৃষ্ট-ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলও বলে যে, ঈশ্বর এক দিনেই আলোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, আলোকের সহিত জীবনের ও অন্ধকারের সহিত মরণের অস্পষ্ট সম্বন্ধের ধারণা অধিকাংশ মানবের মনে জাগরূক রহিয়াছে। বিজ্ঞানের মতে অবশ্য সূর্য্যই সমস্ত আলোক, তাপ ও তেজের আধার। অগ্নি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে মানুষ নানা প্রকার পদার্থ, খনিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল, প্রাণীজ চর্ব্বি, কাষ্ঠ ইত্যাদি দিয়া তমোনাশ করিয়া আসিতেছে। কয়লার ও অন্যান্য প্রকার গ্যাসের এবং বৈদ্যুতিক আলোকের এত দূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে যে, তাহাদের প্রভাবে উৎপাদিত কোন কোন প্রকার আলোক প্রায় দিবালোকের মত কার্য্য করে। আমরা এ স্থলে কিন্তু এরূপ কোন আলোকের কথা বলিতেছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয়, জীবদেহ-জাত আলোক। অপরাপর শ্রেণীর আলোকের সহিত ইহার অন্যতম প্রভেদ হইতেছে এই যে, ইহা কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা যায় না। উদ্ভিদ অথবা প্রাণী কেবলমাত্র স্বইচ্ছায় স্বীয় দেহস্থ যন্ত্রাদি দ্বারা ইহা উৎপাদন করিতে পারে। বিজ্ঞানে এইরূপ আলোক জৈব দীপ্তি (Bio-luminescence) নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং কয়েক জন প্রসিদ্ধনামা জীব ও রসায়নতত্ত্ববিৎ এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তথাপি জৈব-আলোকের উৎপত্তি, স্বরূপ, উপাদান ও আলোকবাহী প্রাণীর পক্ষে উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ের রহস্য সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত হইতে এখনও বিলম্ব রহিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে মাঠে, ঘাটে, বন-জঙ্গলে যাঁহাদিগকে কোন কারণে গতায়াত করিতে হয়, তাঁহারা সম্ভবতঃ কোন না কোন সময় গভীর তমসার ভিতর ক্ষুদ্র, অপূর্ব্ব ও স্থির দীপ্তি দেখিয়া চকিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। ইহা আলেয়ার আলোর ন্যায় ভ্রাম্যমান্ নহে; ইহার উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু তীব্রতা নাই। এরূপ আলোকের বর্ণ একেবারে শ্বেত নহে; সবুজ, লাল অথবা পীতের আভাযুক্ত। নিবিড় নিশীথে এইরূপ তাপহীন অস্বাভাবিক আলোক দেখিলে স্বতঃই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, এবং সেইজন্য অনাদিকাল হইতে সকল দেশের লোকই জৈব-আলোককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছে। যে সকল পার্ব্বত্য-পথে, অরণ্যে অথবা গ্রাম্য রাস্তায় কিম্বা ভগ্ন ও পুরাতন হর্ম্ম্যাদিতে এরূপ আলোক সময় সময় দৃষ্ট হয়, সে সমস্ত স্থল সাধারণতঃ লোকে দূরে পরিহার করে, এবং তৎসমুদায়ের সহিত কত ভূত, প্রেত, দেবতা ও লোমহর্ষণ ঘটনা প্রভৃতির সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইয়া আলোকোৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

ছত্রাকের দীপ্তি

জৈব-জগতের উভয় বিভাগেই—অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদে—দীপ্তি (Iuminosity) দৃষ্ট হয়। বড় বড় গাছের ক্ষত ও নির্য্যাস এবং কোন কোন উদ্ভিদের পুষ্পাংশ সময়ে সময়ে দীপ্যমান্ হইয়া উঠে। এরূপ আলোক কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বনিম্ন স্তরের উদ্ভিদ—ছত্রাক বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহারা কখন পরজীবী এবং কখন মৃতজীবী হইয়া, অর্থাৎ অন্য জীবিত অথবা মৃত ও গলিত উদ্ভিদের এবং প্রাণীর দেহ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, জীবনধারণ করে। ছত্রাকবর্গের মধ্যে বেঙের ছাতা অনেকেরই নিকট পরিচিত। গোয়ালের সন্নিহিত আবর্জ্জনাস্তূপে, পুরাতন খড়ের গাদিতে কিম্বা চালায় এই

শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মাইতে দেখা যায়। কয়েক প্রকার বেঙ্গের ছাতা পরিণত অবস্থায় আলোক বিকিরণ করিয়া থাকে। জমির উপর, দেওয়ালের গায়, অব্যবহৃত গৃহকোণে ও বাগানের জীর্ণ গাছে ছত্রাক জন্মিয়া ও অন্ধকারে তাহাদিগের হরিতাভ আলোক প্রদর্শন করিয়া অনেক সময় গ্রাম্য ব্যক্তি-বর্গকে ভয়ে অভিভূত করিয়াছে। বর্ষার শেষভাগে যখন তাপ ও শৈত্য উভয়েরই মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই সময় ছত্রাকের আবির্ভাব হয় অধিক। আর এক শ্রেণীর ছত্রাক জীবনের এক অবস্থায় (Rhizomorphs) আলোক উৎপাদন করিতে পারে। এই অবস্থায় ইহারা কাল সূতার আকার ধারণ করে, এবং দণ্ডায়মান বা পতিত, মৃত বৃক্ষকাণ্ডের চতুর্দ্দিকে অনিয়মিতভাবে নিজদিগকে বিস্তৃত করে। জঙ্গলের মধ্যে রোগাক্রান্ত বড় গাছে ও কর্ত্তিত কাষ্ঠের স্তূপে এবং বর্ষাকালে এইরূপ দীর্ঘ কাল সূতাবৎ ছত্রাক দেখা যায়। রাত্রির অন্ধকারে সূতাগুলি চক্ চক্ করিতে থাকে, এবং এক সঙ্গে বহুসংখ্যক সূতা সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে দূর হইতে বোধ হয় যেন বৃক্ষ কিম্বা কাষ্ঠস্তূপ জ্বলিতেছে। অবস্থা-বিশেষে এইরূপ দীপ্যমানতা পর পর ১০।১৫ রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতেও দেখা গিয়াছে। খনি অথবা গুহাগর্ভে দীপ্তিশীল ছত্রাক জন্মিয়াই স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে উক্ত স্থানে মণি-রত্নের সন্ধানে প্রবেশ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। যেখানে শৈত্যের মাত্রা অধিক এবং সূর্য্যালোকপ্রবেশের বিশেষ সুবিধা নাই, সেইরূপ স্থলেই দীপ্যমান ছত্রাক অধিক দৃষ্ট হয়। লতাগুল্মাদিবহুল জীর্ণ, পরিত্যক্ত অট্টালিকায়, সমাধিক্ষেত্রে, জলা-জঙ্গলের মধ্যেও সমপ্রকার আবেষ্টনের অন্তরালে এই প্রকার ভীতিপ্রদ উদ্ভিজ্জ-আলোক প্রায়ই নয়নগোচর হওয়া সম্ভব।

সমুদ্রজলে আলোকচ্ছটা

জলেই জীবনের প্রথম বিকাশ। সেইজন্য সমুদ্রগর্ভে যত প্রকার নিম্নতম শ্রেণীর জীবের একত্র সমাবেশ দেখা যায়, তেমন আর কুত্রাপি সুলভ নহে। এইরূপ কতিপয় ক্ষুদ্র, প্রায় আণুবীক্ষণিক প্রাণীর আলোক বিকিরণ করার ক্ষমতা আছে। গ্রীষ্মমণ্ডলের সাগরবক্ষে যাঁহারা বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময় কোন কোন স্থানে রাত্রিকালে তরঙ্গমালা কিরূপ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে; প্রচালনীর (Propellor) পক্ষ দ্বারা মথিত জলরাশি কিরূপ হরিৎ ও রক্তাভ আলোক দ্বারা জাহাজের গতিপথ উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। বস্তুতঃ ঋতুবিশেষে সমুদ্রজলে এই সমুদয় জীবসংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, জাহাজ যেন তরল অনলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বলা বাহুল্য যে, এ সকল জীব প্রাণী-জগতের অমেরুক (Invertebrata) সীমাভুক্ত।

জ্যোতিষ্মানতা প্রধানতঃ অমেরুক জীবগণের মধ্যেই আবদ্ধ। সমেরুক (Vortebrata) জীবসমূহের মধ্যে যে সমস্ত দীপ্ততার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সেগুলি প্রায়ই ভিত্তিহীন। দীপ্যমান্ মৎস্য অথবা সর্পের স্থান কেবলমাত্র কল্পনারাজ্যে। সমেরুক জীবের দীপ্যমানতার কাহিনী যেখানেই শুনা গিয়াছে, সেখানেই উহা রোগের অথবা পচনক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; অর্থাৎ পীড়িত কিম্বা মৃত জীবেই দেখা গিয়াছে। তপ্‌সে, ভেট্‌কি প্রভৃতি লবণাক্ত জলের মাছের মৃতদেহে যে সময় সময় দীপ্যমানতা দেখা যায়, তাহা পচনক্রিয়া-সহায়ক আনুবীক্ষণিক জীবাণুসঞ্জাত বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ জীবাণু-দেহে ফস্‌ফরাসের মাত্রা সমধিক। শল্কবিহীন, পিচ্ছিল সামুদ্রিক মৎস্য সম্বন্ধেও সমপ্রকার মন্তব্য প্রযোজ্য। এরূপ প্রাণীর জীবিতাবস্থায় জ্যোতিষ্মানতার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

খদ্যোতালোক

অমেরুক জীবসমূহের মধ্যে নানাপ্রকারের Bacteria, Jelly fish প্রভৃতির আলোক-বিকিরণের ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাধিক দীপ্তিবিকাশের ক্ষমতা জোনাকী জাতীয় কীটের মধ্যেই দেখা যায়। জোনাকী সর্ব্বদাই যে প্রদীপ্ত তাহা নহে। বৈদ্যুতিক আলোকযুক্ত গৃহ আলোকিত করা বা না করা যেমন গৃহস্বামীর ইচ্ছাধীন, নিজ শরীর আলোকিত করা তেমনই খদ্যোতের আপনার আয়ত্তের মধ্যে। অন্ধকার রাত্রিতে উদ্যানবাটীতে অথবা পল্লীগ্রামে ঝোপ-ঝাপে যাঁহারা জোনাকীর গতিবিধি মনযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়াছেন যে, অনেক সময়ে বহুসংখ্যক ভ্রাম্যমান্ জোনাকী অনিয়মিত ভাবে আলোক বিকিরণ করিলেও এক একটি নির্দ্দিষ্ট গাছের অথবা ঝোপের

মধ্যে অবস্থিত জোনাকীদলের কার্য্যের মধ্যে আশ্চর্য্য ঐক্য রহিয়াছে। তাহারা এক একবার সকলে একসঙ্গেই দীপ্যমান্ হইয়া উঠে, এবং তেমনই আবার একসঙ্গেই দীপ নির্ব্বাণ করে। ইহার কারণ কি, তাহা এখনও অজানিত এবং খদ্যোতের আংশিক পক্ষহীনতার সহিত আলোক উৎপাদনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই জোনাকী পোকার প্রাদুর্ভাব বেশী। নাতি-শীতোষ্ণ দেশেও অবশ্য ইহারা বাস করে। ইহারা কঠিন পক্ষসম্পন্ন কীট (Coleoptera)। ভারত, জাপান, আমেরিকার উষ্ণপ্রদেশ, কিউবা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদ্বীপপুঞ্জ ও অন্যত্র অদ্যাবধি প্রায় ১১৮ জাতীয় জোনাকী-কীট পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গ দেশের সাধারণ জোনাকী কীটের বৈজ্ঞানিক নাম Lucida ovata; অল্লাধিক আর্দ্রস্থানের ঝোপে ও জঙ্গলে থাকিতে ইহারা ভালবাসে। সর্ব্বত্রই এই জাতীয় কীট বালক-বালিকাগণের ক্রীড়ার দ্রব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেমুক ফুটির শাঁস বাহির করিয়া লইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে উহা বেশ স্বচ্ছ হয়। ইহার মধ্যে জোনাকী পোকাকে আবশ্যকমত পুরিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া এইরূপ প্রজ্বলিত গোলক লইয়া ছেলেরা অনেক সময় ক্রীড়া করিয়া থাকে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জেও এইরূপ ক্রীড়ার প্রচলন আছে, কিন্তু তথায় জোনাকি অপেক্ষা আরও অধিক দীপ্তিশালী একটি কীট আছে, উহার নাম Pyrophorus। উক্ত কীটের উভয় পার্শ্বেই কয়েকটি গোলাকার অংশ রহিয়াছে; তৎসমুদয় হইতে লণ্ঠনের ন্যায় আলোক নির্গত হয়। এই আলোক এত স্পষ্ট যে, উহাতে অপেক্ষাকৃত বড় লেখা পড়া যায়। পতঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত অমেরুক জীবে ভাস্বরতা দৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে সমুদ্র-গর্ভের ভীষণদর্শন অষ্টভুজ (Octopus) অন্যতম। ইহাদের কোন কোন জাতির বাহু-সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থলী হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। সমুদ্রগর্ভের এই প্রকার জীব সম্বন্ধে আমেরিকা ও জাপানে বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে।

জৈবালোকের উপাদান

[illegible]ngley, Ives, Molisch প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের [illegible]বাহিক গবেষণা দ্বারা জৈব আলোকের প্রকৃতি অনেকটা জানা গিয়াছে। ইহা কিন্তু জীবের কি উপকারে আইসে, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে সঠিক জানা যায় নাই। অবশ্য এ বিষয়ে আলোচনা খুব বেশী দিন আরম্ভ হয় নাই। আশা করিতে পারা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে মানব দীপ্তিমান্ প্রাণী ও উদ্ভিদের ভাস্বরতার প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া কৃত্রিম উপায়ে এইরূপ আলোক উৎপাদন করিতে পারিবে। বহুদিন পূর্ব্বে দৃষ্ট ভাস্বর বৃক্ষাদির অংশ সংগ্রহ করিয়া, এবং তাহা হইতে আলোকের হেতুভূত ছত্রাকের বীজ বাহির করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে জন্মাইয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত ছত্রাক উপযুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে আবার জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতে পারে। ছত্রাকতত্ত্ববিৎ ডাক্তার সহায়রাম বসু বঙ্গ, ব্রহ্ম, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশ হইতে সংগৃহীত পুরাতন ভাস্বর কাষ্ঠখণ্ডাদি হইতে Pleurotus, Armillaria এবং অন্যান্য জাতীয় ভাস্বর ছত্রাকের culture করিয়া তাহাদিগের দীপ্তিশীলতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

দীপ্যমান্ জীবসমূহ সম্বন্ধে আপাততঃ জানা গিয়াছে যে, উহাদের শরীরে আলোক উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ যন্ত্র আছে। এই সমুদয় যন্ত্রের সাহায্যে জীব ইচ্ছামত জ্যোতিঃ বিকাশ করিতে পারে, অথবা নিমেষমধ্যেই তাহা বন্ধ করিতে পারে। যে সমুদয় আবরণী-কোষ দ্বারা আলোক ঢাকিয়া দেওয়া হয়, সেগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে Chromatophores। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আলোক উৎপাদনের জন্য শৈত্য ও অক্সিজেন উভয়ই প্রয়োজনীয়। অধিক উত্তাপের মধ্যে আনিলে জীবের আলোক-বিকিরণ ক্ষমতা লোপ পায়। প্রাণিশরীরে যে দুইটি পদার্থের সহিত আলোক বিকিরণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সে দুইটির পণ্ডিতগণ নাম দিয়াছেন—luciferin ও luciferase অথবা photophlein ও photogenin। Luciferin জীবের সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। ইহা আলোক উৎপাদনের সাহায্য করে মাত্র। ইহার বিশিষ্ট গুণ এই যে, ইহা সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সিদ্ধ করিলেও অবিকৃত থাকে এবং অতি সামান্য মাত্রাতেও জ্যোতিঃবিকাশের সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে লুসিফেরিণই প্রকৃতপক্ষে আলোক উৎপাদক। ইহা জীবের কেবল দীপ্যমান্ অংশেই বিদ্যমান থাকে। উত্তাপাধিক্যে ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিম্বা একবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যখন শিরা অথবা পেশীর সঙ্কুচন দ্বারা দুই এক বিন্দু

লুসিফেরিণ আসিয়া লুসিফারেজযুক্ত কোষে প্রবেশ করে, তখনই আলোক দেখা যায়।

জোনাকীর আলো যেমন থাকিয়া থাকিয়া এক একবার জ্বলিয়া উঠে, ছত্রাকের আলোও সেইরূপ সবিরামগতি-সম্পন্ন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জৈব আলোক প্রধানতঃ সন্দীপনের উপর নির্ভর করে। কোনরূপ উত্তেজনা লাভ না করিলে প্রাণী কিম্বা উদ্ভিদ আলোকবিকাশ করে না। যখন তাড়নার অভাব, তখন আলোক উৎপাদনের দুইটি মূল উপাদানের সংযোগ সাধিত হয় না, এবং জ্যোতিঃও দেখা যায় না। কিরূপ অবস্থায় এইরূপ উত্তেজনার উদ্ভব হয়, এবং আলোকবাহী প্রাণী অথবা উদ্ভিদের কোন কোন বিশেষ অংশের যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফলে আলোক উৎপাদন সম্ভবপর হয়, তাহাই এখন নানা দেশের বিশেষজ্ঞগণের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির এই গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে শুধুই যে জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, ব্যবহারিক জগতেও যে এই জ্ঞানের প্রয়োগ করা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

রেডিও-তরঙ্গের বিচিত্র শক্তি

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, রেডিও এক রহস্যময় শক্তি। উহার সাহায্যে সঙ্গীত শুনা যায়, দূরের সংবাদ বিচিত্র উপায়ে পাওয়া যায় এবং দূরবর্ত্তী স্থান হইতে চিত্রও দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ নানা উদ্ভাবনাশক্তিবলে এই অপূর্ব্ব রেডিও হইতে নানা বিচিত্র গুণের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা গবেষণাফলে সংবাদ আদান-প্রদান ব্যাপারে রেডিওর বহু নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, উহার তরঙ্গ প্রভাবে পীড়িত গৃহপালিত পশুর রোগমুক্তি ঘটিয়া থাকে, নারীর মুখমণ্ডলের উপর রেডিওপ্রবাহ প্রযুক্ত হইলে মুখমণ্ডলের যে সকল দোষ-ত্রুটি থাকে, তাহা তিরোহিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ক্যালিফোর্ণিয়ার এক পশু-সংগ্রহাগারে মূল্যবান গৃহপালিত পশুর মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয়। নিউমোনিয়া রোগে দলে দলে তাহাদিগের মৃত্যু হইতে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, রেডিও-তরঙ্গ মনুষ্য-দেহে প্রযুক্ত হইলে পীড়ার উপশম ঘটিয়া থাকে। উপায়ান্তর না দেখিয়া গৃহপালিত পশুগুলির দেহে তাঁহারা রেডিওতরঙ্গপ্রবাহ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বিচিত্র মুখোস—রেডিও-শক্তি প্রয়োগে এই মুখোসের সাহায্যে চর্ম্মের নানাবিধ ত্রুটি সংশোধিত হইয়া থাকে

তাঁহারা অতি সত্বর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া পীড়িত গাভীগুলির শ্বাসযন্ত্রের উপর শক্তিশালী তরঙ্গপ্রবাহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গাভীগুলি এইভাবে চিকিৎসিত হওয়ায়, পঞ্চম দিবসে দেখা গেল যে, প্রত্যেক পীড়িত গাভী সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

রাসায়নিকগণও রেডিওতরঙ্গের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। ফরাসী-বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষার দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, তাম্রনির্ম্মিত তারের মধ্য দিয়া রেডিও তরঙ্গ-প্রবাহ পরিচালিত করিলে বহু রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পশুদেহে রেডিও শক্তির প্রয়োগ—পীড়িত কুকুরের দেহে রেডিও তরঙ্গপ্রবাহ প্রযুক্ত হইতেছে

কালিফের হলিউডে অবস্থিত সৌন্দর্য্যসংক্রান্ত প্রসাধন-বিপণীতে বহুবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার রেডিও সাহায্যে পরীক্ষিত হইয়াছে। রমণীদিগের মুখে ব্রণ, তিল অথবা অন্যবিধ চর্ম্মরোগের বিকাশ ঘটিলে রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে তাহা দূরীভূত হইতেছে। এজন্য একপ্রকার মুখোস নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহার মুখমণ্ডলে উল্লিখিত কোন প্রকার দোষ থাকে, তাহার আননে ঐ মুখোস পরাইয়া দেওয়া হয়। তার পর উষ্ণ রেডিওতরঙ্গ চর্ম্মের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার ফলে সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

বাল্‌টিমোর এবং ওহিও রেলপথ কীট-পতঙ্গাদির জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। সঞ্চিত শস্যের ভাণ্ডারে কীট-পতঙ্গের ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। এই ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া পড়েন। তখন এক জন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনীয়ার প্রস্তাব করেন যে, রেডিওতরঙ্গ প্রবাহে এই উৎপাত প্রশমিত হইতে পারে। তিনি হ্রস্ব তরঙ্গপ্রবাহ কীট-পতঙ্গাদির প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকেন। সঞ্চিত শস্যরাশির মধ্যে প্রবাহবেগ সঞ্চারিত হইবার পর দেখা গেল, কীট-পতঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

পশুচিকিৎসালয়ে পীড়িত কুকুর, মার্জ্জার প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর চিকিৎসায় হ্রস্ব রেডিওতরঙ্গ ইদানীং প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রক্রিয়ায় গলার ক্ষত বা শরীরাস্থিতে আঘাত জনিত ক্ষতাদি সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। প্রসিদ্ধ রেডিও-শক্তি উদ্ভাবনকারী লী দে ফরেষ্ট অশ্বদেহে এই রেডিওতরঙ্গ প্রয়োগ করিতেছেন। অশ্বের চরণে আঘাত লাগিলে, তরঙ্গ প্রয়োগে নিরাময় হইয়া থাকে।

ভবিষ্যতে রেডিও-শক্তির সাহায্যে আরও অনেক বিচিত্র ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস। দন্তচিকিৎসায় সুনিপুণ কোনও চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, অচিরকাল মধ্যে রেডিও-তরঙ্গপ্রবাহ দন্তপাতির উপর প্রযুক্ত হইলে দন্তের

লী দে ফরেষ্ট আহত অশ্বচরণে রেডিওপ্রবাহ প্রয়োগ করিয়া তাহার ব্যাধি নিরাময়ের পরীক্ষা করিতেছেন

হ্রস্বতরঙ্গগ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের প্রতিনিধি ও সংবাদ-সংগ্রাহকগণ বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন

নানা প্রকার ব্যাধির উপশম ঘটিবে। কুক্কুটাদি গৃহ-পালিত পক্ষী এবং গাভীকে রেডিও সঙ্গীতের দ্বারা অধিকতর সতেজ ও সবল করা যায়। আমেরিকার এক জন পশুপালক এই বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, গাভী ও মোরগীর প্রজনন-শক্তি ইহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। মোরগী ইহার ফলে বহু ডিম্ব প্রসব করিবে, এবং গাভীর দুগ্ধপ্রদান শক্তিও বর্দ্ধিত হইবে।

এইভাবে রেডিও সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে রেডিওপ্রবাহ আরও কত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বৈজ্ঞানিকদিগের অনুসন্ধিৎসা ফলে প্রকাশ পাইবে, তাহা এখন মানবকল্পনারও অতীত।

একা

পথে আজ কেহ নাই, সাথী-হারা একা একা চলি!
ব্যথা-ক্লিষ্ট মন মোর বড় শ্রান্ত বড় অসহায়!
সুখ-দিনে যারা ছিল, দুঃখ-দিনে গেছে পায়ে দ'লি,
এত বড় পৃথিবীতে আজ মোর কেহ নাহি হায়!

জীবনে উদ্দেশ্য ছিল, প্রাণ ছিল আশায় ভরিয়া,
চলার উদ্দাম ছন্দ গতি-পথে আনিত উল্লাস,
দুঃখ-ব্যথা-বেদনায় মন কভু পড়ে নি ভাঙ্গিয়া,
দুর্গম-যাত্রার মাঝে বুকে কভু জাগে নিক' ত্রাস!

আজ মোর সব ব্যর্থ, মিথ্যা মোর সকল সাধনা,
সত্য হলো এ নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় প্রাণের ক্রন্দন,
সত্য হলো দুঃখ-ব্যথা, সত্য হলো অশান্তি-বেদনা,
অন্ধকার ভবিষ্যতে একা কত বহিব জীবন?

এ পথে কি আছো কেহ? আছো কেহ জীবনের সাথী?
আমার প্রাণের কান্না বাজে না কি আজ কারো বুকে?
আছো কেহ—মোর সাথে জেগে রবে দুঃখময় রাতি?
সাথী হবে অন্তহীন নিরুদ্দেশ পথ-অভিমুখে?

কথা কও—কথা কও—সাড়া দাও—বুকে দাও বল,
এ ক্লান্ত জীবন মোর, জাগো তুমি, জাগো হে দিশারি!
পথের পাথেয় নাই, হারায়েছি সকল সম্বল,
একাকী এ অন্ধকারে আর আমি চলিতে না পারি!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

[উপন্যাস]

৯

স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রজমোহন-গৃহিণী সেই যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আর পাঁচটা দিনের মধ্যেও তাঁহার লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল না। অবশেষে চিকিৎসকদের বিঁধা-ফোঁড়া অত্যাচারের যত্নে তাঁহার চৈতন্য-হারা দেহের মাঝে যে ক্ষীণ প্রাণবায়ুটুকু জাগিয়া ছিল, সে আর থাকিতে পারিল না,—চিকিৎসকদের কড়া পাহারাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল। ছয় দিনের প্রভাতেই নিঃশঙ্ক হইয়া ডাক্তারের দল গৃহে ফিরিলেন।

পুত্রহীন ব্রজমোহনের শেষ ক্রিয়া কন্যার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। জননীর অন্তিম কায অনিলাকেই সম্পন্ন করিতে হইল।

কিন্তু সাত দিনের ব্যবধানে যে পিতামাতাকে হারাইল, তাহার মুখের পানে চাহিয়া শৈলর বুকের মাঝটা উপমাহীন কি এক রকম করিতে লাগিল!

অনিলা যদি কাঁদিত, ব্যাকুল হইয়া শোক প্রকাশ করিত, তাহা হইলে শৈল বোধ করি এতখানি অস্থির হইয়া পড়িত না! এমন করিয়া ভয়ও পাইত না! এমন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত না। কিন্তু এই যে অচল অটল মূর্ত্তিতে, মর্ম্মান্তিক শোক, দুঃখ সব আত্মসাৎ করিয়া, বুকখানার মাঝে চাপিয়া, অগ্নিগর্ভ ভূধরের মত অনিলা বাহিরে শান্ত, স্থির হইয়া রহিল, তাহাতে যেন শৈল স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাকে বিশ্বাস করিতে শৈলর প্রাণ যেন আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল। কেবলই মনে হইতেছিল, অন্তরে গুমরিয়া যে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল, অতর্কিত বিস্ফোরণের মত কি জানি কোন্ মুহূর্ত্তে সে শতধা হইয়া পড়িবে, বুঝি বা সেই উত্তাপে অনিলার বাঁচিবার আয়ুটা নিঃশেষে শুকাইয়া যাইবে। তথাপি ধৈর্য্যের ঐ প্রতিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া শৈলর সমগ্র অন্তর বার বার শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইতেছিল, সম্ভ্রমে মাথা যেন আপনি নত হইয়া আসিতেছিল।

তত্রাচ ইহার সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় তাহার মাত্র এই ক'টা দিনের। বিবাহের স্বল্প অবকাশে শৈল কাহারও সহিত বিশেষ পরিচিত হইতে পারে নাই। তাই চোখে তাহাকে দেখিয়া থাকিলেও চিত্ত তাহাকে স্মরণে রাখে নাই। দীর্ঘকাল প্রবাস-বাস শেষ করিয়া যখন সে গৃহে ফিরিল, তখন অনিলা তাহার নিকট অপরিচিতা; কিন্তু মুমূর্ষু শ্বশুরের পার্শ্বে উপবিষ্টা অনিলার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই শৈলর বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না, ব্রজমোহন কেন এমন করিয়া তাঁহার এই কন্যাটিকে শৈলর অগোচরে রাখিয়াছিলেন?

সন্তানকে অপরের দৃষ্টিপথে করুণার পাত্রী করিতে পিতৃস্নেহ আহত হয়।

তবু প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দুঃসহ আঘাতে মনোহর প্রাসাদের কিয়দংশ ভূমিসাৎ হইয়া গেলেও তাহার ভাঙ্গা-চোরা অবশিষ্ট হইতে ধরা পড়ে অতীতের গৌরব-শ্রী। তাহাতে দর্শকের বুকে জাগিয়া উঠে গভীর অনুকম্পা। কারণ, স্নেহ, মায়া, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি মানব-হৃদয়জাত মহৎ বৃত্তিগুলি আপনা হইতে নির্য্যাতিতের উপর আসিয়া পড়ে।

সেই জন্য পোকায়-কাটা ফুলের মত যে রূপলেখা শেষ হইয়াও নিঃশেষ হয় নাই, ত্রিপাদগ্রাসী চাঁদের ন্যায় ম্রিয়মাণ সেই মুখে চোখে অঙ্গসৌষ্ঠবের পানে চাহিয়া শৈলর বুকের মাঝে বেদনা সীমাহীন হইয়া উঠিল। তথাপি এই সুদুঃসহ সমবেদনাকে ভাষায় আকার দিয়া অনিলার কাছে

একটা বাণী উচ্চারণ করিতে পারিল না, এতটুকু সান্ত্বনা তাহাকে দিয়া নিজের হৃদয়ের গুরু ভারটাকে ঈষৎ লঘু করিয়া লওয়াও তাহার হইল না। কারণ, যে প্রচণ্ড সহিষ্ণুতা লইয়া অনিলা নিজের চারিপাশে একটা দুর্ভেদ্য গণ্ডী রচনা করিয়াছিল, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অনিলার নিকট এতটুকু অগ্রসর হওয়া শৈলর অসাধ্য।

জননীর মৃত্যুর পরদিন অনিলা শৈলকে বলিয়াছিল,—"আপনি বাবার ম্যানেজার অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।"

সত্য অনেক সময়ে কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। শৈল অবনীবাবুর সহিত দেখা করিয়া যাহা জানিল ও শুনিল, তাহা এমন অভূতপূর্ব্ব যে, শৈল জীবনে এত বড় বিস্ময়কর গল্প অবধি শুনে নাই। সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি ব্রজমোহন বসু! যাঁহার এই সুরম্য প্রাসাদ! বাড়ী-ভরা দাস দাসী! আত্মীয়-আশ্রিত! গ্যারেজে মোটর—আস্তাবলে গাড়ী! বড়মানুষীর কোন অনুষ্ঠানের যাহার কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না; তথাপি গরীব কেরাণী মরিয়া গেলে যে সঞ্চয়টুকু রাখিয়া যায়, তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিণীর জন্য সেটুকু অবধি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই—এমন কি, নিজের শ্রাদ্ধ খরচ অবধি নহে।

অবনীবাবুর মুখের পানে চাহিয়া বিবর্ণ, পাংশুমুখে শৈল চেয়ারের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এটর্ণি-বাড়ীতে কায করিয়া অবনীবাবুর মাথার চুলে যেমন পাক ধরিয়াছিল, মনটাও তেমনই পাথর হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি শৈলর এই একান্ত বিস্ময়মাখা ব্যথা-পাণ্ডুর মুখখানার পানে চাহিয়া কহিলেন, "শুনলে বিশ্বাস হয় না বটে! রোজগার সে ক'রত দু'হাতে—কিন্তু রেস-খেলাও যে বড় সর্ব্বনেশে! শেষে যখন চোখ খুলল, নেশা ছুটল, তখন দেনা আর কিছুতে সামলাতে পারলে না। খরচের হাত কিছুতে কমল না। ঢের বুঝিয়েছিলাম, কিছু হল না।"

শৈলর গলা অবধি যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এক গেলাস জল চাহিয়া এক নিশ্বাসে সেটা শেষ করিয়া কহিল, "বাড়ীখানা ত আমার শাশুড়ীর নামে কেনা ছিল?"

—"না বাবাজি! সেটা সে রেসে ওড়ায় নি। শুধু ঐ একটা কায সে ভাল করেছিল। বাড়ীটা বাঁধা দিয়েছিল, তোমার বিলেতের খরচ, তোমার মোটর, পাটনার বাড়ী—যা তোমাকে লিখে দিয়ে গেছে, এই সবের জন্যে। বলেছিলুম, অত খরচ করো না। সে কি উত্তর দিলে জান—" অবনী-বাবু থামিলেন। শৈল দুই চোখ তুলিয়া অবনীবাবুর মুখের পানে চাহিল। অবনী কহিলেন,—"আমায় বল্লে,—আমার ত ছেলে নাই! কিন্তু জান ত অবনী, সব জিনিষের আকাঙ্ক্ষা থাকে—শৈলকে আমি ছেলের মত নিয়েছি।"

"আমি বল্‌লুম, 'কিন্তু নিজে যে ভেসে যাচ্ছ, স্ত্রী-কন্যাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ!' আমার মুখের দিকে সে খানিক তাকিয়ে রইল! শৈল, আমি তার ক্লাসমেট ছিলুম! বড় হয়ে তার আপিসের আর বিষয়ের ম্যানেজার হয়েছিলুম। তার মনের অনেক অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার ছিল। কিন্তু এ রকম যন্ত্রণাপ্রদ দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখিনি! যে দিন সুনীলা গেল—সে দিনও না; যে দিন রায়েদের কাছে মাথার চুল অবধি বিকিয়ে গেল—সে দিনও না!"

অবনী চুপ করিয়া রহিলেন। যাহার সম্বন্ধে আলোচনা, সে আজ সুখ-দুঃখের অতীত হইয়াছে! তাহার কাযের ভাল-মন্দ আলোচনা করিতে গিয়া, সেই অমিতব্যয়ীর বুকের মাঝে যে পুত্রস্নেহ বুভুক্ষু অন্তর ছিল, তাহাকে মনে করিয়া অবনীর অন্তরে বোধ করি একটা বেদনার সাড়া দিল। কেন না, ক্ষণপরে তিনি যখন কথা কহিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি বা ক্ষোভ ফুটিয়া উঠিল না। আর্দ্রকণ্ঠে অবনী বলিলেন,—"তার চোখের পাতা ভিজে এলো, বাবাজি! ভারি-গলায় সে বল্লে, 'আমার সব দাবী চিরকাল শৈলর উপর বজায় থাকবে! অবনী, তুমি দেখো'।"

১০

এ কয়দিনের ঝড়-ঝাপটার মধ্যে পড়িয়া শৈল সুলেখাকে পত্র লিখিবার অবকাশ অবধি পায় নাই। আজ সুদীর্ঘ জবাব-দিহি করিয়া শৈল যখন সুলেখার উদ্দেশ্যে পত্রখানি শেষ করিল, তখন অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল, ইংলণ্ডে যে দিন তাহার পত্নীবিয়োগ সংবাদটা সে পাইয়াছিল, সে দিনের অবস্থাটা; এবং সেই স্মৃতিটাই আজ তাহাকে কেমন তীক্ষ্ণ খোঁচার মত বিঁধিয়া সারা চিত্তটাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল।

শৈল টেবিলের সম্মুখে চেয়ারটা ছাড়িয়া একটা আরাম-চেয়ারে আসিয়া শুইয়া পড়িল। একটা গভীর নিশ্বাস

ফেলিয়া সেই বিগত দিনের দুঃসহ স্মৃতিটাকে সে তাড়াইয়া দিতে চাহিল। কিন্তু স্মৃতির যে পীড়নটা মানুষ সহজে সহিতে চায় না, সময়ে সময়ে দেখা যায়, সেই পরিহার্য্য পীড়নই নাগপাশের মত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে সারা অন্তরটাকে চাপিয়া ধরিয়াছে!

মনের ভিত্তিগাত্রে যে ছবি আঁকিয়া শৈল আত্মীয়দের স্নেহচ্ছায়া ছাড়িয়া জন্মভূমির কোল ত্যাগ করিয়াছিল, যে স্বপ্ন সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সকল দুঃখ হরণ করিত, অকস্মাৎ তাহা যখন অদৃষ্টের কঠোর পরিহাস-সংঘাতে খান্ খান্ হইয়া গেল, প্রবাসের সেই দুঃখের দুর্দ্দিনে, দুর্ভাবনা যখন প্রতি মুহূর্ত্তে দেহের শোণিতবিন্দুকে শোষণ করিতেছিল, দাবী বা আশার যখন কোথাও কিছু ছিল না, মন্দ অদৃষ্টের সেই চরমতম মুহূর্ত্তে, আচম্বিতে কেমন করিয়া ঝটিকাভরা কাল মেঘখানি তাহার ভাগ্যাকাশ হইতে অপসৃত হইয়া সৌভাগ্যসূর্য্য দীপ্তিশালী হইল? যাঁহার আশ্বাসে, যত্নে ও অর্থে সে মানুষ হইতে পারিয়াছে, আজ সেই নমস্যকে মনে পড়ায় শৈলর চোখে জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে কক্ষান্তরে যে মাতৃপিতৃহারা সহায়সম্পত্তিহীনা তরুণীটি অবস্থান করিতেছিল, তাহার সঙ্কটময় অবস্থাটা, শৈলর সেই দিনকার বিপদের অপেক্ষা এক তিল কম নহে, বরং পাল্লার ঝুঁকিটা তাহারই দিকে বেশী, শৈলর বুকের মাঝে এ কথাটা অসংশয়ে মীমাংসিত হইয়া গেল।

শৈল মনে মনে সঙ্কল্প করিল, পাটনার বাড়ীটা সে অনিলাকে ফিরাইয়া দিবে এবং মৃত শ্বশুর শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ-খরচটা নিজের কাঁধে তুলিয়া লইবে। এমনই করিয়া অনিলার কি কি উপকারে শৈল তাহার বেদনার ভারটা লঘু করিবে, সেই চিন্তায় সে নিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। শৈল যে অকৃতজ্ঞ নহে, তাহাই সপ্রমাণ করিতে উপকারের তালিকাখানা দীর্ঘাকার করিতে অন্তর যখন ব্যস্ত,—মনের এমনিতর অবস্থায়, আকাশে বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত্তে অন্ধকারের পর্দ্দা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর বক্ষটাকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়, তেমনই ভাবে একটা তীব্রতম বিবেকের দ্যুতি এক নিমেষে এই গ্রহ-বিড়ম্বিতা মেয়েটির সীমাহীন দুর্ভাগ্যটাকে শৈলর চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে খাড় করাইল। এক দিন যাহার রূপ ছিল, অর্থ ছিল, অভিভাবক ছিল, আজ তাহার জীবনে সে সবই জন্মান্তরের কাহিনীর মত গল্পকথা হইয়া গিয়াছে! তাহার বেদনার ভারটা লাঘব করিবার পথ যে কত বড় দুর্গম ও পিচ্ছিল, তাহা মনে হইতেই শৈলর বোধ হইল, পৃথিবীর বাতাস যেন ফুরাইয়া তাহার নিশ্বাস গ্রহণের শক্তিটুকু অবধি কাড়িয়া লইতেছে!

এই স্বস্তিশান্তিহীন চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য শৈল কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের অপর বারাণ্ডাতেই অনিলার কক্ষ। বাহির হইতে তাহাকে দেখা যাইতেছে না। ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়া সে কি ভাবিতেছে, শৈল একবার তাহাই ভাবিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর সে অনিলার কক্ষে যাইবার জন্য বারাণ্ডার মোড় ঘুরিল।

খালি মেঝের উপর আনতমুখে অনিলা বসিয়া ছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বিষাদমাখা মুখখানির উপর রুক্ষ খোলা চুল এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছিল! অর্দ্ধমলিন লাল-পাড় শাড়ীখানি একটা কঠিন অশৌচকে অনুক্ষণ সকলের চোখে জাগরূক রাখিতে চেষ্টিত হইয়া আছে। শৈলর আগমন-শব্দে চকিত হইয়া একবার মুখ তুলিতেই শৈলর সজল চোখের সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইয়া অনিলার চোখে জল আসিল, এবং তাহাই সম্বরণ করিতে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া মিনিট দুই তিন নিঃশব্দে কাটাইয়া দিল।

শৈল একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। মিনিট কয়েক কাটিয়া গেল; তথাপি কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। অথচ এই দুঃসহ নীরবতা শৈলর চিত্তে একটা অস্বস্তি জাগাইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু কি যে সে বলিবে, কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবে, তাহার কিছুই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কারণ, মানুষ যখন সন্তপ্ত হৃদয় দিয়া অপরের সীমাহীন দুঃখটাকে নিজের বুকে অনুভব করে, তখন সান্ত্বনার স্তোকবাণী ওষ্ঠাধর দিয়া কিছুতেই সে বাহির করিতে পারে না। তাই আর্দ্র নেত্র-দুইটি শৈল যতবারই মুছিয়া ফেলিতেছিল, সে দুইটি নেত্রপল্লব অশ্রুতে ততবারই সিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে কহিল—"এদিকে আমি সব এক রকম ক'রে নিতে পারব। শুধু তোমার নিজের সম্বন্ধে ব্যবস্থা—" কথাটা শৈল শেষ করিতে পারিল না। একটা দুর্নিবার সঙ্কোচ শৈলর ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিল।

অনিলা মুখ তুলিয়া কহিল,—"আমার ব্যবস্থার কথা বল্‌ছেন? কিন্তু তার তো কিছুই আপনার হাতের মধ্যে নাই। শুধু বাবার শ্রাদ্ধ—"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "সে সব তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আর মাস ছয়েকের মধ্যে তোমার এ বাড়ী ছাড়বার কোন প্রয়োজন হবে না। কিন্তু আমি ত সব ঠিক জানি না। তোমার মামার বাড়ী—কি আর কোথাও? অবশ্য মাসে, মাসে, একশ করে, কি তারও কিছু বেশী টাকা তুমি পাবে। তোমার বাবা সেটুকু সম্পত্তি তোমার জন্যে রেখে গেছেন। পাটনার বাড়ীটাও তোমার আছে, তাতেও একটা মোটা আয় হবে।" শৈল থামিল।

অনিলা যে যথার্থ ই নিঃস্ব নহে, সঙ্গতি তাহার আছে এবং খুব সামান্য তাহা নহে, এইটুকু যে শৈল অনিলাকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছে, মনের এই বিশ্বাসে তাহার চিত্তের কি তৃপ্তি, মেঘমুক্ত আকাশের স্নিগ্ধতার মত সারা মুখখানিকে প্রসন্নতায় ভরাইয়া দিল। অনিলা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। উত্তরের প্রতীক্ষায় দুইটি ব্যগ্র আঁখির উৎসুক দৃষ্টি অপরের নেত্র হইতে তাহার উপর যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা এই মৌনতাকে বেশীক্ষণ স্থিতি লাভ করিতে দিল না। অনিলা কহিল, "বাবার অবস্থা আমার কাছে গোপন নেই। তিনি এমন কোন কিছুই রেখে যেতে পারেন নি, যাতে মাসে একশ কি তার কম অতি সামান্য কিছু পেতে পারি। সে শুধু আপনার দয়া! এর জন্যে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমায় মাপ করবেন, আমি তা নিতে অক্ষম। পাটনার বাড়ীর কথা বলছেন? বাবা আপনার নাম দিয়ে তা আপনার জন্যে কিনেছিলেন। দিয়েও গেছেন আপনাকে। আমার নেই বলে বাবার দান করা জিনিষ ফিরিয়ে নেবার প্রবৃত্তি যেন না জাগে। এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ দুর্ভাগ্য না আসে।"

শৈলর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। স্তব্ধ হইয়া সে নিজের আসনে বসিয়া রহিল। অনিলা যে শৈলর সহিত স্বেচ্ছায় একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহা শৈল বুঝিতে পারিতেছিল। কিন্তু কেন যে ইহা সে করিতেছে, তাহার অর্থ ই সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে প্রসন্নতার আলোটুকু শৈলর মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বিষণ্ণতার কাল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর ম্লান মূর্ত্তির মত শৈলর বিষাদমাখা গম্ভীর চেহারার পানে চাহিয়া অনিলার চিত্তটা বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ কল্যাণের পানে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের দুঃখটাকে মানুষ সহিবার শক্তি পায়। অনিলা কহিল,—"আমি কোন আত্মীয়ের আশ্রিত হ'তে পারব না। কারণ, যেখানেই থাকি, আমাদের সমাজে কুমারী থাকার রীতি নেই বলেই তাঁরা অশান্তিতে অস্থির হয়ে যে পথটা নির্দ্দেশ করবেন, সে পথে আমার পক্ষে যাওয়া দুঃসাধ্য। বিবাহ আমি কোন দিনই কাউকে করব না। কোন অনুরোধই আমাকে তা করাতে পারবে না। আপনি কোন মন্দির বা আশ্রমের যদি সংবাদ জানেন, যেখানে পবিত্র কুমারী-জীবন কেটে যাবার পথে কোন বিঘ্ন নেই, আমায় সেই সন্ধান দেবেন। আমি কৃতার্থ হবো।"

১১

একটা মাস শেষ করিতে এখনও কিছু দিন বাকি, শৈল পাটনা ত্যাগ করিয়াছে। কত বড় কাযের ঝুঁকির মাঝে গিয়া সে পড়িয়াছে, তাহার সেখানে উপস্থিত থাকার এখন কিরূপ বিশেষ প্রয়োজন, তাহার সব খবরই সুলেখা অবগত ছিল। অথচ সুলেখার সহিত মিলিত হইবার জন্য শৈলর অন্তরের নিদারুণ চাঞ্চল্যের কথাও বিদিত ছিল। নিজের বুক দিয়া তাহা এমন নিবিড় ভাবে সে অনুভব করিত যে, শৈলর ব্যাকুলতা যেন সুলেখার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফিরিত। তথাপি একটা অসম্ভাবিত অকল্যাণ, অপ্রত্যাশিত বিষণ্ণতার মেঘ পলকের নিমিত্ত কোথা হইতে ভাসিয়া ভাসিয়া মনের সব আশা-কল্পনার উপর নিরুৎসাহের ম্লানিমা ঢালিয়া দিত—কিন্তু তাহা পলকের জন্য।

শৈলর নির্দ্দোষ চরিত্র, গভীর দায়িত্ববোধ এবং উন্নত মনের উপর সুলেখার যথেষ্ট আস্থা ছিল। শৈল যে শুধু কাযের বেড়াজালে বন্দী! তা ভিন্ন আকর্ষণের কোন বস্তুই সেখানে নাই, তাহা সুলেখা নিশ্চিত জানে এবং শৈলর সঙ্কটময় অবস্থা যত বারই সে চিন্তা করিতে চাহে, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে শৈলর স্বভাবকোমল চিত্তে পরদুঃখকাতর বুকে, সেই অঙ্গহীনা দুর্ভাগা মেয়ে কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছে, সেই চিন্তাই সুলেখার বুকে

জাগিয়া উঠে। শৈলর সেই নিকটতমা আত্মীয়ার মর্ম্মান্তিক দুঃখে সান্ত্বনা দিতে স্নেহ-প্রবণ অন্তরে কতখানি উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠে, আগ্রহে বক্ষ স্পন্দিত হয়, তাহার একটা অদ্ভুত কল্পনা সুলেখার মনের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে।

এই চিন্তার ধারাটা যে শুধু নিজের মনে ব্যথার সৃষ্টি করে, তাহা নহে; শৈলর উপরও একটা অবিচার করে, তাহা সুলেখা বুঝিত। শৈলর সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা করা যে নিজের একটা প্রকাণ্ড পাগলামি, তাহা সে বুঝিত। তথাপি এই মোহাবিষ্ট চিন্তার হাত হইতে সুলেখা নিষ্কৃতি পাইত না। অনেক কায মানুষ মনে-প্রাণে অনুচিত বুঝিয়াও করিতে থাকে।

গোধূলির রাঙ্গা আলোর পানে চাহিয়া নিজের এমনি-তর চিন্তারাশির মধ্যে সুলেখা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; হাতের বইখানি খসিয়া কখন যে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই! বাগানের একখানি বেঞ্চির উপর শুধু ক্ষোদিত ভাস্কর-প্রতিমার মতই সে বসিয়াছিল, অকস্মাৎ পরিচিত পদশব্দের সহিত সুমিষ্ট কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনিতে সুলেখা ভয়ানক চমকিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে পশ্চাতের দিকে তাকাইল।

সহাস্যে শৈল কহিল—"কি লেখা, চিন্‌তে পার্‌ছ না?"

শৈলর কৌতুক প্রশ্নে একটা রহস্যময় উত্তর অবধি সুলেখার ওষ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। বিস্ময়-ঘোর কাটাইয়া তখনও সে চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে নাই। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "তুমি এমন হঠাৎ—?"

শৈল সুলেখার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—"এমন হঠাৎ আসাটা আমার উচিত হয় নি, না লেখা? কিন্তু আমার অদৃষ্টে দেখছি সবই হঠাৎ হয়। কোনটার চিন্তাই আমি আগে ক'রে উঠতে পারি না।"

সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানকার কায মিট্‌তে এখন তোমার কত দেরি?"

"খুব বেশী না হলেও এখনও কয়েকটা দিন আছে। ...নকার একটা হাঙ্গামা আমায় এখানে টেনে এনেছে," ...য়া শৈল তাহার আগমনের কারণটা যাহা জানাইল ...া এই:—একটা দরকারী কাগজ-পত্রের বাক্স পাওয়া ...চ্ছে না। অনিলা বলিয়াছে সেটা তাহার বাবার কাছে বরাবর থাকিত; কাশী হইতে তিনি পাটনায় যখন যান, তখনও সঙ্গে ছিল। খালি তিনি যখন ফিরিয়া যান, অনিলা তখন সেটা পায় নাই। তাহার অনুমান সেটা পাটনাতেই আছে এবং সেই সন্ধানেই শৈল এই সুদূর পথ ছুটিয়া আসিয়াছে। ঘটনাটা বলিয়া শৈল কহিল—"লেখা, তুমিও আমার সঙ্গে চল! আমি একা খুঁজতে পারি না।"

সুলেখা একটু ইতস্ততঃ করিতেই শৈল তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল, কহিল—"না মশাই, ওজর কিছু চলছে না! চলুন আমার সঙ্গে।"

গাড়ীতে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে সুলেখা কহিল,—"অনিলার কি ব্যবস্থা কচ্ছ?"

"অনিলার সম্বন্ধে আমি কিছু ক'রে উঠতে পাচ্ছি না।" শৈলর দৃষ্টিতে একটা চিন্তার ছায়াপাত হইল। কহিল—"তুমিই বল না লেখা—পরামর্শ দাও কি করি।"

"আমি পরামর্শ দেব?" সুলেখার প্রবাল রাঙ্গা ওষ্ঠাধরে হাসি ঝিরিয়া ধরিল। মাথায় একটা দুষ্টামির বুদ্ধি আসিল। কহিল, "তা দিচ্ছি—এক কায কর, তুমি তাকে বিয়ে ক'রে ফেল! তা হ'লে সব ভাবনা-চিন্তার হাত হ'তে মুক্তি পাবে।"

শৈলর বুকের মাঝটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে হাসিমুখে কহিল, "ধন্যবাদ! তুমি যে আমার অকৃত্রিম হিতৈষী, তা বধূনির্ব্বাচনে নিঃসন্দেহ হলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনিলার কঠোর প্রতিজ্ঞা, সে চিরকুমারী থাকবে।"

সুলেখার পরিহাস-দীপ্ত মুখখানি মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। অনিলার কথা বলিতে বলিতে শৈলর গলা অনেকবারই ভার হইয়া আসিয়াছিল, মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়াছিল। তাহা শৈল না জানিতে পারিলেও সুলেখার চোখে অজ্ঞাত ছিল না। নারীহৃদয়ের ঈর্ষ্যা অভিমান জাগিয়া আপনা হইতেই অনিলার উপর তাহার কেমন একটা বিতৃষ্ণা আনিতেছিল। সুলেখার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সে রাজি নয়? কিন্তু তোমার দিক্ হ'তে—তুমি তাকে"—সুলেখা কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া শৈল ক্ষণকাল সুলেখার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সহসা প্রসন্ন-স্নিগ্ধোজ্জ্বলহাস্যে

তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "আমি কি পারি, আর কি পারি না, তুমিই ব'লে দাও, সু?"

মানুষ যখন যথার্থই অকপট-চিত্তে অপরের কাছ হইতে নিজের কর্ত্তব্যটাকে নির্দ্ধারিত করিবার জন্য আবেদন করে, তখন হৃদয় বলিয়া যাহার বালাই আছে, সে কিছুতেই সেই আবেদনকারীকে পথিভ্রষ্ট হইতে দিতে চাহে না। বিশেষতঃ নারী! প্রিয়জনের ভালবাসার এতটুকু শিথিলতার ভয়ে সে যত বেশী চঞ্চল হয়, আবার তেমনই ধীর-শান্ত মূর্ত্তিতে সেই একান্ত আপনার জনকে পরের হাতে সঁপিয়া দিবার উদাহরণও সংসারে বিরল হইলেও দুর্ল্লভ নহে।

হঠাৎ যেন সুলেখার জ্ঞানলাভ হইল। ঈর্ষ্যা, অভিমান চোখের উপর যে সন্দেহের পর্দ্দাখানা দুলাইতেছিল, শৈলর চোখের প্রতি চাহিতেই নিমেষে তাহা অপসৃত হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল, শৈলর বুকের মাঝে মেয়েটির জন্য নির্ম্মল স্নেহের ধারা বহিতেছে, তাহার সমস্ত বেদনাটুকু সে নিজের বুক দিয়া উপলব্ধি করে বলিয়াই অনিলার কথায় শৈলর চোখে জল আসে। কিন্তু তাহার মাঝে পঙ্কিলতা নাই। নিষ্পাপ-হৃদয়ের স্বার্থলেশহীন যে সৌহার্দ্দ্য, তাহা দিয়াই সে নিকটতমা আত্মীয়াকে স্নেহ করে! তাই সুলেখার সম্মুখে অনিলার নামে শৈল এত নিঃসঙ্কোচ। গোপন করিবার তাহার কিছু নাই বলিয়াই রহস্যে শৈল লজ্জিত হয় না।

শৈল কহিল, "লেখা, কি ভাবছ?"

—"না—কিচ্ছু না। বাক্সটা খুঁজতে হ'লে যে ঘরে জ্যাঠামশাই শুতেন, সেই ঘরটা আগে দেখা উচিত।"

—"ঠিক বলেছ। আমার শোবার ঘরটাই তাঁর জন্য ব্যবস্থা করেছিলুম।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈল বেহারাকে ডাকিল, কহিল,—"হিঁয় একঠো লাল চাম্‌ড়েকা বাকস্ তোম্ দেখা হায়?"

"হাঁ জী! বোস্‌-সাবকো চলাযানেকা পিছে মেজ পর রহা। হাম্ উঠায়কে দেরাজকা অন্দরমে রাখা।"

শৈল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল,—"উল্লুক, কাহে নেহি হামকো কহা?"

বেহারা নত মস্তকে জানাইল, তাহার কসুর হইয়াছে। কিন্তু তাহার অপরাধ স্বীকার সত্ত্বেও দণ্ড হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সুলেখা শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "ও স্বমুখে দোষ স্বীকার কচ্ছে—ক্ষমা চাইছে।" আনন্দ আজ সুলেখার অন্তরের কাণায় কাণায় ভরিয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল। কাহারও কুণ্ঠিত মুখ, ম্লান দৃষ্টি, সে দেখিতে চাহে না।

শৈল সুলেখার প্রফুল্ল মুখখানার পানে চাহিয়া কহিল, "হাকিম যখন দয়া করছেন, আমি আর কি বলতে পারি।" সুলেখার হাসির ছোঁয়াচ শৈলর মুখে লাগিয়াছিল। কিন্তু সংসারে যত কিছু ক্ষণস্থায়ী বস্তু আছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষাও আনন্দ ক্ষণস্থায়ী! বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়া তাসের ঘরের মত, চোখের পলকে কোন্ মুহূর্ত্তে ইহা টুটিয়া যাইবে বলা যায় না।

মনিবের আদেশে বেহারা বাক্সটা হাজির করিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বস্তু সে প্রদান করিল—তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই অচিন্তনীয়। সেটা একখানা ছোট খাতা! মোরক্কো চামড়ায় বাঁধা পুস্তকেরই মত। বেহারা জানাইল, বাক্সর উপর এই কেতাবখানিও সে পাইয়াছিল।

শৈল সেখানা খুলিয়াই দেখিল, শ্বশুরের হস্তাক্ষর—দিনলিপি। কৌতূহলী চিত্তে সে পাতাগুলা একবার উল্টাইয়া দিয়া দেখিল, পাটনা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বরাত্রি অবধি তাহার উপর শ্বশুর আপনার মনের কথা অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহারই খাপছাড়া কয়েকটি ছত্রের উপর দৃষ্টিপাতের সঙ্গে অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঔৎসুক্যে দুই চোখের দৃষ্টি যেন তাহাতে আঁটিয়া গেল।

পাশে দাঁড়াইয়া সুলেখাও খাতাখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তরুণী-বুকের দুর্নিবার কৌতূহলকে কিছুতেই সে দমন করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কেহই কল্পনা করিতে পারিল না, মাত্র গোটাকতক লাইনের কতকগুলা সমষ্টি একজনকার অন্তরের অন্তস্তলের বাক্য হইয়া তাহাদের জীবনের নূতন অধ্যায় সূচিত করিবে!

শৈল ও সুলেখা তখন স্থির চোখে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়িতেছিল—

"অনেকখানি আশা লইয়া যাকে মানুষ করেছিলুম, যা[র] উপর প্রচণ্ড লোভ আমার প্রতি শিরায় শিরায় জড়ি[য়ে] আছে! সে আমার হবে না—সত্যর হবে। তার মে[য়ের] রূপ আছে, গুণ আছে, সত্যর নিজের হ'তে অর্থ আছে। শৈলকে পাঁচ জনের সামনে আজ উঁচু হয়ে দাঁড়াতে হ'[লে]

সত্যর সাহায্য চাই ; অনিলার আমার কি আছে ? ভগবান্ ! ভগবান্ ! তুমি তার অনিন্দিত রূপটুকু যেদিন কেড়ে নিলে, সে দিন সুনীলার মত তোমার চরণপ্রান্তে তাকে ডেকে নিলে না কেন ? বাপ-মার কাতর প্রার্থনায় কেন সে দিন রেখে গেলে নির্দ্দয়। উঃ! আর যে পারছি না।

"না! না! কালই চলে যাব। কি জানি শৈলকে যদি কিছু ব'লে ফেলি! আমার নিজের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছি। একি ! মাথাটায় যে ভারী যন্ত্রণা হচ্ছে—এতদিন মৃত্যুকে ডাকতুম ! মরণকালে শৈলর হাতে অনিলাকে সঁপে দেব বলে। আজ কিন্তু মৃত্যুকে আর চাই না। তার আগমনের নামে ভয় হচ্ছে! আমি চলে গেলে অনিলাকে কার কাছে দিয়ে যাব ? তার মা পাগল ! তার কি—"

লেখা শেষ হয় নাই ! শেষ হইতে পায় নাই। আকস্মিক উত্তেজনায় মানুষ ভাবাবেগে হৃদয়ের যে গভীর দুঃখ, ভীষণ নৈরাশ্য লেখনীর সাহায্যে কাগজের বুকে ঢালিয়া দেয়, এ যেন তাহারই একটা অংশ। এক জনের বুকের মণি-কোঠায় আশাভঙ্গের পুঞ্জিত আঘাত স্তূপাকারে জমিয়া উঠিয়াছিল, আজ অকস্মাৎ তাহাই দুই জন নর-নারীর মাঝখানে নিমেষে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইল। শৈল ও সুলেখা একই সঙ্গে মুখ তুলিল, চাহিল, কিন্তু মনে হইল, উভয়ের কাছ হইতে উভয়ে যেন বহুদূরে এক মুহূর্ত্তে সরিয়া গিয়াছে।

সুলেখা আস্তে আস্তে কহিল, "আপনি অনিলার কাছে কবে যাচ্ছেন ?"

"তুমির" আসন আজ "আপনি" দখল করিয়া বসিল। শৈলর কাণে কিন্তু তাহা বাজিল না। মুখ নীচু করিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল, মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, "কাল সকালে।"

—"তবে আমি চল্লুম," বলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া শৈলকে একটা ক্ষুদ্র নমস্কার দিয়া সুলেখা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। স্তব্ধ, অসাড়, শৈল কক্ষের মধ্যে ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জ্ঞানে, যাহার হাত ধরিয়া সাগ্রহে সে আপনার মোটরে তুলিয়া লইয়াছিল, সেই একান্ত বাঞ্ছিতার বিদায়-মুহূর্ত্তে শৈলর মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিবার কথাটা অবধি স্মরণে আসিল না। অপরিসীম ব্যথা-ভরা, একটা আকাশ-পাতালজোড়া চিন্তা, শৈলর সকল কর্ম্ম হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শৈলকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

১২

মামলায় সর্ব্বস্ব হারিলে, মানুষের যেমন শুধু চোখে-মুখে নহে, তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, এমন কি, কণ্ঠের স্বর অবধি অত্যাশ্চর্য্য বদল হইয়া যায়, সকালের মানুষকে বিকালে যেমন দশ বছর বয়স ডিঙ্গাইয়া দেয়, তেমনই ভাবে সর্ব্বস্বহারার কাল ছাপ, শুধু মুখে চোখে নহে, প্রতি গতি-ভঙ্গীতে অবধি আঁকিয়া শৈল শ্বশুরভবনে প্রবেশ করিল।

ব্রজমোহনের শোকাহত কন্যা ও আশ্রিত অনুগতদের সান্ত্বনা দিয়া সাহায্য করিয়া আসন্ন শ্রাদ্ধক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করাইতে যে আত্মীয়-বন্ধুরা ব্রজমোহনের সুবৃহৎ প্রাসাদ মুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রজমোহনের অবস্থার মন্দ দিক্‌টা জানিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দশা যে চরমে দাঁড়াইয়াছে, সেই সংবাদটা তাঁহারা জানিতেন না। তাহা জানিবার অবকাশ কেহ কোন দিন ব্রজমোহনের নিকট পান নাই। কারণ, তাঁর মাদকের নেশার মত, বড়মানুষী নেশাটা মানুষ সহজে ছাড়িতে পারে না। সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনে, যাঁতাকলের মত ইহার পেষণে মানুষ গুঁড়া হইয়া যায়, তথাপি মিথ্যা ঐশ্বর্য্যের মোহ মানুষ ছাড়িতে পারে না।

ব্রজমোহনের সুবৃহৎ বৈঠকখানা ভরিয়া আত্ম-পর অনেকে মিলিয়া তাঁহারই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিল। বাগ্-বিতণ্ডা উদ্দামবেগে বহিতেছিল এবং সে তর্ক-সংগ্রামে বাহুযুদ্ধের আশুসম্ভাবনা যখন রহিয়া রহিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে শৈল আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রচণ্ড কোলাহল মুহূর্ত্তে নীরব হইল। একটা ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলে, অপর একটা ইন্দ্রিয়ের প্রখরতার পরিচয় অনেক সময় পাওয়া যায়, এখানেও তাহার অভাব ঘটিল না। রুদ্ধবাক্ জনমণ্ডলীর দৃষ্টিশক্তি অকস্মাৎ প্রখর হইয়া শৈলর উপর পতিত হইল। একসঙ্গে এতগুলি লোকের দৃষ্টির আঘাতে শৈল কেমন বিব্রত হইয়া একবার নিজের পরিচ্ছদের পানে চাহিয়া দেখিল, সেখানে কোন গোলযোগ ঘটিয়াছে কি না।

ক্ষণিকের নীরবতা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। শৈলর

সম্পর্কীয় জ্যেষ্ঠশ্বশুর বিরজামোহন কহিলেন,—"বাবাজীর ট্রেণে বুঝি বড্ড কষ্ট হয়েছিল? মুখ চোখ কালিমাখা।"

শৈল চমকিয়া উঠিল। চিত্তের বেদনা কি মুখে ছায়া ফেলিয়াছে! একসঙ্গে সকলকে একটা অভিবাদন দিয়া শৈল ভিতরের অভিমুখে যাইতেছিল, বিরজামোহনের পুত্র, সন্তোষ হাঁকিয়া কহিল,—"ব্যারিষ্টার সাহেব, এদিক্‌টা শেষ ক'রে যাও।"

শৈল ফিরিয়া আসিল। এ সভায় বসিতে তাহার অন্তর অনিচ্ছুক হইলেও, এ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করিতে সে পারিল না।

সন্তোষ কহিল, "কাকামণির শ্রাদ্ধের ফর্দ্দখানার একটা মীমাংসা কর। দাঁড়িয়ে হবে না, ব'স।"

একটা চেয়ার টানিয়া শৈল বসিল।

ব্রজমোহনের এই বিপত্নীক জামাতার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবার গোপন ইচ্ছা, অনেকের মনেই ওতপ্রোত হইয়া জাগিত, মিলিত না শুধু সুযোগ। আজ হঠাৎ যখন সেই মুহূর্ত্তটা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত এই যশ-অর্থের খ্যাতিসম্পন্ন বিপত্নীকের মনস্তুষ্টির আশায় সপুত্র বিরজামোহন হইতে আরম্ভ করিয়া উপস্থিত সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সমবেত কণ্ঠে যে কথাটা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে আসল বক্তব্যটা ঢাকা পড়িয়া শুধু একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করিল। অবশেষে বিরজামোহন সকলকে থামাইয়া নিজেই মুখপাত্র হইলেন। বলিলেন যে, ব্রজর সহিত তাঁহার সম্বন্ধটা জ্ঞাতিসংক্রান্ত হইলেও ভালবাসাটা একেবারে সহোদরের মত।

বিরজামোহন কহিলেন, "ব্রজ তোমাকে ছেলের চোখেই দেখত, বাবা শৈল! এখন এই বৃহৎ কাযের ভারটা তোমার উপরেই পড়ছে, বাবা!"

শৈল একবার কক্ষস্থিত সকলের পানে চাহিয়া দেখিল। কহিল, "আমি ত উপস্থিত রয়েছি,—আশা করি, আপনারাও আমায় সাহায্য করিবেন।"

একবাক্যে সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়। নিশ্চয়। এজন্য চিন্তার আবশ্যক নাই। বিরজামোহন কহিলেন,—"সাহায্য করতে আমরা বাধ্য। তুমি কি আমাদের পর।"

সাহায্য করিতে সকলে বাধ্য হইলেও, সুবিধা তাহাতে কতটুকু হইবে ইহা বুঝিতেছিল, শৈলর অন্তর্য্যামী। তাই সে কাহারও 'পর নহে' এই সুসংবাদটা জানিয়া এবং এতগুলা মুখের আশ্বাসবাণী পাইয়াও তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল না।

ব্রজমোহনের অপর এক আত্মীয় কহিলেন, "অবনী বাবুকে ডাকা হয়েছিল। ব্রজদার সব টাকা-কড়ি তার হাতেই ত থাকত। আয়োজনটা কি রকম হবে সে না এলে কিছু হ'তে পারে না, এই আমার মত।"

তিনি তাঁহার মতটা উঁচু গলায় ঘোষণা করিলেও সমর্থনে সেটা স্থায়ী হইল না। প্রতিবাদের স্বরে বিরজামোহন কহিলেন,—"তুমি জিনিষের তলা দেখতে পাও না। শুধু বাজে বক। ইদানীং ব্রজর অবস্থাটা ভাল যাচ্ছিল না, তার খবর কিছু জান? শুধু ত প্রতি বছরের দুর্গাপূজায় এসে জড় হও। সপরিবারে এস, তিনদিন ধরে পেটপূরে চলে যাও। কিন্তু এই যে এতখানি হয় কোথা থেকে, সে ত আমি জানি।"

বিচালিস্তূপে অগ্নিনিক্ষেপের মত রমণীমোহনের ক্রোধটা দপ্‌ করিয়া পলকে জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি অনেকক্ষণ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছিলেন। আজিকার সভা আরম্ভ হইতে, বিরজামোহন যেমন সাড়ম্বরে নিজের প্রভুত্বটা ঘোষণা করিতেছিলেন, তেমনই প্রতি কথায় অপরকে তুচ্ছ করিতে ছাড়িতেছিলেন না। মানুষ মুখ বুজিয়া অপরের প্রভুত্বটা কোন মতে সহিলেও নিজের প্রতি তাচ্ছিল্যটা কিছুতেই সে সহিতে পারে না। অপমানিত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া পড়ে।

রমণীমোহন তিক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"তিন দিন আসি, আর তের দিন আসি, উপযাচক হয়ে কোন দিন আসিনি। ব্রজদা নেমন্তন্ন করতেন, না এলে বৌদিদি দুঃখ করতেন, বলতেন, তোমরা না হ'লে বাড়ী খাঁ খাঁ করে, তাই আসতুম। মাসের গোড়ায় দেখা দিয়ে হাত পাতবার তো দরকার হতো না?"

কি কথায় কি কথা সব আসিতেছে দেখিয়া, শৈল নিজেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিল, সীমাহীন অস্বস্তিতে চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যাহাদের কথা, তাহাদের মুখ লজ্জায় ঈষৎ কালও হইল না।

বিরজামোহন উগ্রকণ্ঠে কহিলেন,—"ভায়ের কাছে ভাই একবার ছেড়ে মাসে দশবার এলেও লজ্জা নেই। তবে সে

জোর থাকা চাই। আজ সে নেই, অনিলা মা একা, আমাকে গাড়ী পাল্কী পাঠাতে হলো না, কাকমুখে শুনে হাজির হলুম, একা নয়, পরিবার ছেলেমেয়ে সব নিয়ে। কিন্তু লোকে মেয়ের বিয়ের সুবিধার জন্য ধর্ণা দিতে পারে, শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পত্রের দিকে চেয়ে থাকে।"

স্বার্থের বিরোধ, লজ্জাহীন কলহের কদর্য্য মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া কক্ষস্থিত সকলের প্রতি শৈলর চিত্ত ভয়ানক বিমুখ হইয়া পড়িল।

ঘৃণা যখন অন্তরের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, তখন মুখে চোখেও তাহা গোপন থাকে না। শৈলর মুখের পানে চাহিয়াই সন্তোষ কহিল, "আপনারা তা হ'লে ধার-জিত করুন। শৈল বাবু চল্লেন।"

উপদ্রবরত অপদেবতাকে মন্ত্রের জোরে একান্ত বাধ্য করার মত, সন্তোষের মুখের বাণীটা দুইটি উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত বয়োবৃদ্ধকে মুহূর্ত্তে শান্ত করিল। এবং পলকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানটা সজাগ হইয়া উঠিল। বিরজামোহন আসল কথায় ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন,—"তা খরচটা আমাদের একটু চেপে করতে হবে। কি বল, রমণী! হাজার চার পাঁচ টাকার কমে কি—" বলিয়া তিনি শৈলর মুখের পানে চাহিলেন। বাবাজীর চোখের কোণে কিন্তু সমর্থনের কোন ইঙ্গিতই ফুটিল না।

মনের যত জ্বালা থাকুক, শৈলর সহিত আত্মীয়তা করিবার এই মাহেন্দ্রক্ষণ রমণীমোহন কিছুতেই ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বুঝিলেন না। মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—"আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। ব্রজদা আমাদের সহোদরের বাড়া, আমরা কি যা তা করতে পারি?"

বিরজামোহন কহিলেন,—"তাই এত মাথা কুটাকুটি, বলি, হাতীর শ্রাদ্ধ কি মশার কীর্ত্তনে হ'তে পারে? ব্রজ ছিল একটা দিক্‌পাল! কি বল, বাবাজী?"

বাবাজী কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইল।

শৈল আস্তে আস্তে কহিল,—"তাঁর কায, তাঁর উপযুক্তই হবে।"

রমণীমোহন কহিলেন, "আমরাও সে কথা মানি! তবে অবনী বাবু কেন গা-ঢাকা দিচ্ছেন? সে না হ'লে কিছু হ'তে পারে না!"

সন্তোষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, কহিল,—"আমাদের কাকা-মণির শ্রাদ্ধ-ব্যবস্থা করবেন অবনী বাবু এসে, আমরা থাকৃতে, এ হ'তেই পারে না। অনিলাকে জানিয়ে, তার মত নিয়ে ব্যাঙ্ক হ'তে টাকা তোলবার দরখাস্ত করা হোক্।"

একে একে সকলেই এই পরামর্শটাকে সমীচীন জ্ঞান করিলেন। প্রস্তাবটাকে সমর্থন করিয়া বিরজামোহন বলিলেন, "এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কিছু থাকতে পারে না। আর বাবাজী যখন উপস্থিত রয়েছেন, তখন টাকা তোলবার আপত্তি কি থাকতে পারে? অবশ্য শৈল জামাই, তাতে সাহেব, সে এ সব ঝক্কি পোয়াতে পারবে না। কাযটা আমাদেরই সব করতে হবে।"

এমনি অনেক মন্তব্যে কক্ষ মুখর হইয়া উঠিল। নীরব রহিল শুধু এক জন, এবং তাহার এই নীরবতার আড়ালে যে অর্থটা দাঁড়াইয়া রহিল, তাহা দেখিবার দৃষ্টি, বুদ্ধি বা চিত্তের অবস্থা, কক্ষস্থিত কোন ব্যক্তিরই ছিল না। সকলেই কর্ত্তা, উপদেষ্টা হইয়া একটা সমস্যাকে সমাধান করিতে—একটা মীমাংসা লইয়া নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত। গলার জোর, আত্মীয়তার দাবী, হার-জিতের একটা হট্টগোল বাধাইয়া নিজ নিজ বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইয়া, শৈলকে তাক্ লাগাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর।

শৈল হিন্দুর ঘরের সন্তান। তথাপি এরূপ কাণ্ড তাহার জীবনে অ-দৃষ্ট ছিল। শৈশবে পিতা, ও নাবালক অবস্থায় মাতার কাল হইয়াছিল বলিয়া পূজ্যতমদের পার-লৌকিক ক্রিয়াটা তাহাকে সংক্ষেপে চুকাইতে হইয়াছিল। তাই এই রাজসূয় অনুষ্ঠানের জন্য যে শ্রেষ্ঠ রথিবৃন্দ মাথা ঘামাইয়া কহিতেছিলেন—দান-সাগর, অধ্যাপক বিদায় ইত্যাদি কিরূপ হইবে, তাহারই বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুখের পানেই চাহিয়া বক্তব্যগুলি শুনিতেছিল। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরের ক্লান্তিটা ধীরে ধীরে তাহার বসিবার শক্তিটাকে কাড়িয়া লইতেছিল। প্রশস্ত ললাটের উপর স্থূল মুক্তাবলীর মত স্বেদবিন্দুগুলি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার বিশ্রামের প্রয়োজনটা অপরকে বুঝাইতেছিল। কিন্তু তাহা দেখিবার মত চোখ সেখানে একটি প্রাণীরও ছিল না।

সম্মুখের বারাণ্ডা দিয়া এক জন ভৃত্যকে যাইতে দেখিয়া, শৈল তাহাকে ডাকিয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আনিতে আদেশ করিল। ক্ষণপরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিল শুধু হাতে।

কহিল,—"দিদিমণি দাঁড়িয়ে আছেন, আপনাকে জল খেতে ভিতরে ডাকছেন।"

১৩

অনেকের বিস্ময়কে উপেক্ষা করিয়া, কৌতুক দৃষ্টিকে পশ্চাতে ফেলিয়া, শৈল অন্তঃপুরে আসিয়াছিল। কিন্তু অনিলার কক্ষে আসিয়া সে নিজেই একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

একটা জানালা ধরিয়া সম্মুখের বাগানটার দিকে মুখ করিয়া অনিলা দাঁড়াইয়া ছিল। বোধ করি, শৈলর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া শৈলকে দেখিয়া কহিল,—"আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন, আমি খবর পেয়েছি।" একটু থামিয়া কহিল, "আমি অপেক্ষা করছিলুম, আপনি ভেতরে এসে জল খাবেন বলে। বুঝলুম, সে সুবিধা আপনাকে কেউ দেবে না। তাই ডেকে পাঠাতে হ'ল।"

নিজ হাতে আসন পাতিয়া, ফলমিষ্টান্নের সুবৃহৎ রেকাবীখানি তাহার সম্মুখে দিয়া, অনিলা কহিল,—"আপনি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসুন; তার পর কাপড় বদলাতে যাবেন।"

শৈল অনিলার মুখের পানে চাহিতে পারিতেছিল না। তাহার এই অসঙ্কোচ আচরণের মাঝেও নিজেকে যেন কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছিল। ব্রজমোহনের সেই অসমাপ্ত লেখা বইখানি তখনও তাহার জামার বুক-পকেটের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। কত বড় দায়িত্ব মাথায় লইয়া আজ সে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মনে করিলে শৈলর ধমনীতে রক্তস্রোতঃ যেন বন্ধ হইয়া যায়। তথাপি অনিলার এই নিঃসঙ্কোচ আচরণ, গাম্ভীর্য্যের গভীরতা, তাহার মনের মূল অবধি নাড়িয়া অনিলার প্রতি চিত্তের একটা শ্রদ্ধাকে জাগাইতেছিল।

বিনা বাক্যে শিষ্ট ছাত্রের মত, হাত-মুখ ধুইয়া শৈল আসনে বসিয়া পড়িল এবং নিজের সঙ্কোচটাকে বোধ করি সরাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি আহারটা আরম্ভ করিয়া দিল।

গৃহের একটি পাশে শৈলর অনতিদূরে, যে রুক্ষকেশা, মলিনবেশা তরুণীটি বসিয়া নিঃশব্দে তাহার খাওয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, শৈল একবার চোখ তুলিলে দেখিতে পাইত, তাহার মৌন মুখখানির উপর বর্ষার কাল মেঘের মত পিতৃ-মাতৃহীনের গভীর শোক জমাট বাঁধিয়া থাকিলেও, অপরের বিষণ্ণ মূর্ত্তি ও শুষ্ক আননের পানে চাহিয়া তাহার অনুসন্ধিৎসু নারীচিত্ত ধীরে ধীরে যে কারণটা নিজের মনের মাঝে নির্ণয় করিতেছিল, তাহাতে শৈলর সহিত নিজের ব্যবধানটা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া লইতেছিল।

আহার শেষ হইয়া গেল—কিন্তু সম্পূর্ণ নীরবে। শৈল আসনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতে, অনিলা ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহার হাতে জল দিবার আদেশ করিল।

অনিলার জ্যেঠাইমা জয়ন্তী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বহির্বাটীতে বিরজামোহন যেমন কর্ত্তা হইয়াছিলেন, অন্দর-বাটীতে তেমনই পত্নী জয়ন্তীকে গৃহিণী করিয়াছিলেন। পদমর্য্যাদোচিত কণ্ঠস্বরে তিনি শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"খাওয়া হ'ল, বাবা?"

শৈল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহার ভুক্ত-অবশিষ্ট আহার্য্যগুলার পানে চাহিয়া, গালে হাত দিলেন। কহিলেন,—"ওমা! আমার কপাল!" অনুযোগ করিয়া শৈলকে কহিলেন, "কিছু খেলে না, বাবা; দাঁত দিয়ে কেটেই উঠে পড়লে?"

মৃদু হাস্যে শৈল কহিল,—"দাঁত দিয়ে কাটা আমার অভ্যাস নেই। সাধ্যমত যা খাবার তা খেয়েছি।"

—"তুমি জামাই মানুষ, ওকথা তুমি বলবেই। হ্যাঁরে অনিলা, তুই যে মা, এত বড় মেয়ে বসে থেকে খাওয়ালি? তা বলতে হয়। বাছা আমার কি কিছু খেলে না। একবার আমাকেও তো ডাকতে হয়?"

একটা অহেতুক আত্মীয়তা সৃষ্টি করিবার অছিলায়, পাছে জয়ন্তীর মুখে অনিলাকে দু'কথা শুনিতে হয়, সেই আশঙ্কায় শৈল ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কহিল,—"না, না, উনি কি করবেন? আমি আর খেতে পারতুম না। আপনি এসে অনুরোধ করলেও খেতুম না।"

শৈলর উত্তরের মধ্যে যে খোঁচাটুকু দেওয়া ছিল, শৈল মনে করিয়াছিল, তাহা এই ছদ্ম আত্মীয়তাকে আঘাত করিয়া অপরকে লজ্জা দিবে। কিন্তু, গণ্ডারের চামড়া যেমন সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলাকে উপহাস করে, তেমনই স্বার্থের চর্ম্মাবৃত মানুষের গায়ে, অপরের বিদ্রূপ-রহস্যগুলা প্রতিহত হয়।

জয়ন্তী কহিলেন,—"তুমি না হয় না খেতে, স্বীকার করছি, অনিলার ত কর্ত্তব্য আছে। আমি একবার মনে করলুম আসি—আবার ভাবলুম, ডাগর মেয়ে খাওয়াচ্ছে! আমি বরঞ্চ এ দিক্‌টা করি। জান ত বাবা, একা মানুষ, মাথার উপর সব।"

শৈলর সুগৌর মুখখানা পলকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। এত বড় অভদ্র ইঙ্গিত মানুষের এই অতীব দুঃখের সময়, ব্যথার মুহূর্ত্তে যে করিতে পারে, তাহার অন্তরের নীচতা শৈলর চোখে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল। অন্তরটা ঘৃণায় রি রি করিতে লাগিল। কিন্তু ইহারা যখন শ্বশুরের আত্মীয় বলিয়া অভিহিত ও অনিলার অভিভাবক হইয়া রহিয়াছে, তখন ইহাদের আর সে কি বলিতে পারে? আর বলিবার আছেই বা কি? তাহার নিজের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাটা যদি অপরের চিত্তকে চঞ্চল করে, মুখ দিয়া শ্লেষবাণী বাহির করে, তাহার জন্য শৈল নিজেও কতকটা দায়ী। কারণ, আঘাতের প্রতিঘাত আছে।

অনিলা চোখ তুলিতেই অবসন্ন দিনের বিদায়ী—বিষণ্ণ রাঙ্গা আলোর মত শৈলর রক্তিম মুখখানা তাহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িল এবং সেই নিমেষ-দৃষ্টিপাতেই মুহূর্ত্তে যেন শৈলর মনের কথাটা নিঃশব্দে পড়িয়া লইল। অনিলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আপনি ক্লান্ত, এইবার ও-ঘরে গিয়ে কাপড় বদলা-বেন।" তাহার স্বরে একটা কর্ত্তৃত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিল।

অনিলা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেই জয়ন্তী হাঁকিয়া কহিলেন,—"অনু, ভাঁড়ার ঘরে তোর ফলের রেকাবীটা রেখে এসেছি, মা। আর পাথরের গেলাসে সরবৎ আছে।" শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, বাবা শৈল, তুমি বুঝি এখনও পাণ পাওনি—দেখেছ কি ভুল হয়েছে আমার! আর বাবা, ছোটরা চলে গেল," বলিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি-বার জন্যই বোধ করি মুখটা অন্য দিকে ফিরাইলেন।

শৈল উত্তর করিল, "আমি পাণ খাই না।"

—"পাণ খাও না! সাহেব মানুষ বলে বুঝি! আর কেই বা জোর-জবরদস্তি ক'রে খাওয়াবে? সবই আমাদের বরাত, বাবা।"

জয়ন্তী আঁচলে একবার চোখ মুছিলেন। কিন্তু এই অযাচিত স্নেহধারা দিয়া যাহার অন্তরকে তিনি বিগলিত করিয়া বাধ্যবাধকতার বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা তাহার সম্বন্ধে সফল হইতেছিল কতটুকু, তাহা জানিতেছিলেন সেই সর্ব্বদ্রষ্টা।

শৈল হাসিল, কহিল, "অকারণ আপনি দুঃখ করছেন; আমি কোনদিন খাইনি। ছোটবেলা হতেই না।"

"তা জানি, ঠাকুরপো বলতেন, চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু শৈলচাঁদ আমার নিষ্কলঙ্ক। পাণ-সুপারিটি অবধি খায় না।"

বিমুখ দেবতাও স্তুতিগানে বিগলিত হইয়া বরহস্ত বাহির করেন। কিন্তু মানুষ সব সময় তাহাতে বশীভূত হয় না। জয়ন্তীর প্রশংসার অতিশয়োক্তিটা তাই তাহার মুখখানাকে আনন্দে উদ্ভাসিত করিল না। শুধু শ্মশ্রু-গুম্ফহীন ওষ্ঠাধরে যে হাসির রেখাটা ফুটিয়া উঠিল, তাহার অর্থটা যদি জয়ন্তী জানিতেন, তাহা হইলে পাণ খাইতে তিনি শৈলকে অনুরোধ করিতেন না।

জয়ন্তী আপনার কথা বজায় রাখিয়া কহিলেন,—"যতই তুমি সাহেব হও, পাণ না খাও বাবা, জানি ত—উপরোধে ঢেঁকিটাও মানুষ গেলে। শ্বশুরবাড়ী এসেছ, শালীদের মনস্তুষ্টির জন্য এ-ও তোমায় খেতে হবে।"

শৈল কোন কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ঢেঁকি গিলিবার কষ্টটাও মানুষ সহিতে পারে, কিন্তু দুইটা পাণ লইবার জন্য শৈল মুহূর্ত্ত অপেক্ষা অবধি করিল না।

ব্রজমোহনের গৃহে শৈলর জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষ ছিল। সেই কক্ষে আসিয়া কাপড় বদলাইয়া, বৈদ্যুতিক পাখার গতিটাকে সে দ্রুত করিয়া দিল। তার পর একখানি আরাম-চেয়ারের উপর ক্লান্ত দেহভারকে এলাইয়া দিয়া দুই চক্ষু মুদিল। নিদ্রা তাহার আসিল না। নিদ্রাহীনতার ক্লান্তি এবং অস্বোয়াস্তিও তাহাকে বিব্রত করিল না। চুপ করিয়া সে পড়িয়া রহিল। নিমীলিত চোখের পুরোভাগে অনিলার শোকাচ্ছন্ন ম্লান মূর্ত্তিখানি ভাসিতে লাগিল এবং তাহার স্বল্প ভাষণ, বাক্যালাপ, অবহিত অচঞ্চল আচরণের গভীরতা, এই আত্মীয়-স্বজনের পরিবেষ্টনের মাঝে থাকিয়াও তাহার অপরিসীম দূরত্বটুকু স্বতঃসিদ্ধের মত শৈল অনুভব করিতে লাগিল। ধূপের মৃদুগন্ধ চিত্তকে পুলকিত করিয়া তোলার মত অনিলার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায় শৈলর সারা চিত্ত যেন একটা আনন্দ বোধ করিতে লাগিল।

সেই সময়ে একটি পঞ্চদশী কিশোরী, রূপার ডিবায় মিঠা পাণের পরিপাটী খিলিগুলি লইয়া, কৌতুক-দৃষ্টিতে ব্রীড়া-সঙ্কুচিত পদে দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ—প্রচার ও সঙ্ঘ-গঠন

শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর ও তদীয় দেহাবশিষ্ট কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাধিস্থ করিয়া ত্যাগী ভক্তগণের অধিকাংশ নিজের নিজের বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। ভাড়ার চুক্তিমত বাগানের যে কয়েক দিন মেয়াদ ছিল, সেই কয়দিন ছোট গোপাল প্রভৃতি রহিয়া গেলেন। লাটু, তারক ও বুড়ো গোপালের ফিরিবার আর স্বতন্ত্র স্থান ছিল না। তাঁহারা কয়েকদিন কাশীপুর বাগানে থাকার পর একদিন সুরেশ মিত্র বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদের জন্য একটা বাসা করিয়া দিবেন ও তাঁহাদিগের জন্য যাহা প্রয়োজন হইবে, সমুদয় ব্যয় বহন করিবেন। সেই বাসায় তাঁহারা গিয়া থাকিবেন ও সংসারীরা মধ্যে মধ্যে সেইখানে আসিয়া জুড়াইবেন। ঠাকুরের সঙ্গ অদর্শনে ত্যাগী-সংসারী উভয় শ্রেণীর ভক্তগণের প্রাণে তখন বিরহ-অগ্নি জ্বলিতেছিল। সংসারীরা তখন জুড়াইবার স্থানের বিশেষ অভাব যে বোধ করিতেন, সন্দেহ নাই। সকলের মনেই তখন ত্যাগের ভাব। কুমার ভক্তগণকে ঠাকুর মনের দিক দিয়া ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বাহিরেও ত্যাগী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন।

ঠাকুরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির অধিকাংশ তাঁহার দেহত্যাগের পর বলরাম বাবুর বাড়ীতে উপরের ঘরে বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার কাপড়, গায়ের জামা, আলোয়ান, মূল্যবান বস্ত্র, হাতে-লেখা পুঁথি, হুঁকা, চটি জুতা প্রভৃতি সমস্ত জিনিষই তাহার মধ্যে ছিল। কিন্তু জিনিষগুলির কোন তত্ত্বাবধান কিছুদিন হয় নাই। সেই সুযোগে চোর বাক্স খুলিয়া অনেক জিনিষ লইয়া গিয়া বেচিয়া বা অন্যভাবে নষ্ট করিয়াও ফেলিয়াছিল। সুরেন্দ্রের বাসা করিয়া দিবার পর ঠাকুরের শয্যা ও আরও কিছু কিছু ঠাকুরের ব্যবহার করা জিনিষ ভক্তগণের নিকট আনিয়া রাখা হইল। বাকি জিনিষগুলির জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইতে লাগিল—আর না নষ্ট হয়। বরাহনগরে মুন্সীদের বাগানবাড়া ভাড়া লওয়া হইল। ভাড়া হইল মায় ট্যাক্স ১১৲ টাকা মাসিক। বাড়ীখানি স্থানে স্থানে ভাঙ্গা, তবে কয়েকটি ঘর ভাল ছিল। তাহারই একটি ঠাকুরঘর হইল ও অন্য ঘর গুলিতে ভক্তরা বিশ্রাম করিতেন। কাশীপুরের পাচক ব্রাহ্মণ শশী গাঙ্গুলীর বেতন ও ভক্তদিগের খোরাক খরচ যাহা লাগে, সমস্ত খরচের ভার প্রথমে লইলেন সুরেন্দ্র। এইরূপে ত্যাগী ভক্তগণের সাধনকেন্দ্রের জন্য মঠের এই সূত্রপাত হইল।

ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুর বাগান হইতে ঠাকুরের অবশিষ্ট গদি ও জিনিষপত্র লইয়া নূতন বাসায় আসিলেন। সেই রাত্রে শরৎ আসিয়া থাকিলেন। বুড়ো গোপালই প্রথম হইতে মঠে সর্ব্বসময়ে বাস করিতে লাগিলেন। তারক, যোগীন, রাখাল, লাটু ও কালী এই সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম বাড়ী হইতে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে বিষয়-বিভাগ সম্পর্কীয় মোকর্দ্দমা তখনও চলিতেছিল, তাহার তদ্বির তাঁহাকে করিতে হয়, সেইজন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ মঠে থাকিতে পারিতেছিলেন না। কখন বাটী হইতে যাতায়াত করিতেন, আবার মধ্যে মধ্যে মঠেও কয়েকদিন করিয়া থাকিতে লাগিলেন। এইরূপে শরৎ, শশী, রাখাল, নিরঞ্জন কিছুদিন বাড়ী হইতে যাতায়াত করিতে করিতে শেষে মঠেই আসিয়া রহিয়া গেলেন। রাখাল, লাটু, কালীও কিছুদিন পর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছিলেন, তাঁহারাও যোগদান করিলেন, এক বৎসর পরে যোগীনও আসিয়া জুটিলেন। যোগীন বৃন্দাবনে এই সময় শ্রীমার কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

শ্রীমা ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়দিন পরেই দক্ষিণেশ্বর নহবতে আবার ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে গোলাপ ব্রাহ্মণীও আসিয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে থাকিলেন। তাহার পর যোগীন, লাটু, কালী ও লক্ষ্মীমণিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমা কাশীতে আসেন—সেখান হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে আসিয়া বাস করেন। বৃন্দাবনে

শ্রীমার মনে ঠাকুরের অদর্শনজনিত বেদনা খুব প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে। প্রথম প্রথম ঠাকুরের জন্য প্রায় সর্ব্বদাই কাঁদিতেন। কিন্তু বৃন্দাবনে ঠাকুর শ্রীমাকে বার বার দেখা দিতে লাগিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার শোকের হ্রাস হইতে লাগিল। এই সময় একদিন ঠাকুর শ্রীমাকে যোগীনকে মন্ত্র দিতে বলিলেন এবং যে মন্ত্র দেওয়া হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম শ্রীমা এই সব দর্শন মনের ভুল মনে করিতেন, কিন্তু যোগীনের মন্ত্র দেওয়া উপলক্ষে শ্রীঠাকুর মাকে যখন তিন তিনবার দর্শন দিলেন, তখন শ্রীমা তাঁহার কথামত কার্য্য করিলেন এবং নিজের সঙ্গে যে ঠাকুরের অস্থির কৌটা ছিল—যাহা তিনি প্রত্যহ পূজা করিতেন—তাঁহার পূজা করিয়া ভাবাবিষ্টা হইয়া যোগীনকে মন্ত্রদান করিলেন। বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার ও তথা হইতে জয়পুরে গোবিনজীকে দর্শন করিয়া শ্রীমা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ও তথা হইতে কামারপুকুরে গমন করিলেন।

এইরূপে ঠাকুরের দেহত্যাগের এক বৎসর মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু আশ্রমে চিরস্থায়ী ভাবে বাস করিতে আসিলেন। ইহার পর আসিলেন সুবোধ ও সারদা। পরে গঙ্গাধর ও হরিনাথ আসিলেন। শেষে তুলসী আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই মঠই হইল ঠাকুরের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের মূর্ত্ত-প্রতীক। মঠের যুবকগণের নায়ক হইলেন নরেন্দ্র। ঠাকুর, দেহত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বেই, নরেন্দ্রের হাতে কৌমার-বৈরাগ্যবান্ ভক্তদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, ত্যাগ ও চরিত্রে মঠের ভক্তগণ তাঁহাকে তাঁহাদের স্বাভাবিক নেতা ও চালক বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং তিনি যখন একদিন বাধ্য হইয়া কলিকাতায় আসিতেন, তখন তাঁহার গুরুভ্রাতারা পথপানে চাহিয়া তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেন। মা যেমন অসহায় শিশুর প্রধান অবলম্বন-স্থল, সুরেন্দ্র এই সময় তেমনই মঠের ভাইদের অবলম্বন-স্থল ছিলেন। তিনি প্রথমে মঠে ৩০৲ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষে যতই মঠের ভক্তসংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল, অমনই সেই হারে তিনিও সাহায্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে দিতে শেষে মাসিক এক শত টাকা পর্য্যন্ত দিতেন। পরে অন্যান্য সংসারী-ভক্তগণ সুরেন্দ্রের সহিত নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য মিলাইয়া সমবেতভাবে মঠটিকে চালনা করিতে লাগিলেন। মঠে ভক্তগণ প্রথম প্রথম কেহ গেরুয়া পরেন নাই বা দত্ত, বসু, ঘোষ, মিত্র, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি ত্যাগও করেন নাই।

রাখালের পিতা রাখালকে বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। রাখাল স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। শশীর পিতাও শশীকে লইতে কয়েকবার আসিয়াছিলেন। শশী বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তিনি অন্য অন্য কুমার-ভক্তগণের মত বাড়ীতে অল্পদিনের জন্য ফিরিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নরেন্দ্র সেখানে মধ্যে মধ্যে গিয়া পড়িতেন এবং ঠাকুরের কথা বলিয়া ও তাঁহার অসীম ও অপার্থিব ভালবাসার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এবং মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ ইত্যাদি কথায় তাঁহাদিগের বৈরাগ্যভাব পুনরুদ্দীপনা করিয়া বাড়ী হইতে সকলকে মঠে লইয়া আসিতেন। এইরূপে শশী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতা আসিলে তিনি আর তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেন না,—একদিক্ দিয়া তিনি মঠে প্রবেশ করিতেন, অন্য দিক্ দিয়া শশী পলায়ন করিতেন। সারদারও অবস্থা সেইরূপ। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে বাহির হইতে দিবেন না এই মতলব। সারদা লুকাইয়া আসিতেন, এবং একদা তিনি মঠ হইতে দূরে যাইবেন, এই ইচ্ছায় পলায়ন করিয়াছিলেন। যদি পিতামাতা মঠে আসিয়া তাঁহাকে ফিরিবার পীড়াপীড়ি করেন এই ভয় তাঁহার ছিল। শশীর পিতা স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন, "নরেন্দ্রই যত অনিষ্টের মূল, ছেলে-গুলোর পরকাল খাইল আর কি। বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেও এই মন্দবুদ্ধি আবার তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিল! বাড়ীতে কি ধর্ম্ম হয় না?" রাখালের পিতাকে রাখাল বলিয়াছিলেন, কেন আর আপনি কষ্ট করে আসেন? আমাকে ভুলে যান,—এখানে আমি ভালই আছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি আপনাদের ভুলি, আপনারাও আমাকে ভুলে যান। সকলের মনে তখন তীব্র বৈরাগ্য। সেই বৈরাগ্যের প্রভাবে সংসারের মায়া দাড়াইতে পারিল না। "তোমাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব' না ক'

পথহারা”—সকলেরই মনে ঠাকুরের প্রতি এই সানুরাগ ভাব।

নরেন্দ্রের মনে এতদূর বিরহ জাগিল যে, তিনি ঈশ্বরদর্শন জন্য প্রায়োপবেশন করিতে মনস্থ করিতেছিলেন। গৃহি-ভক্তগণের মধ্যে দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের অদর্শনে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া হরি ও গঙ্গাধরকে লইয়া গিয়া নরেন্দ্র কোন প্রকারে তাঁহাকে নিবৃত্ত করাইয়া খাওয়াইয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে মঠের ভক্তগণ দৈহিক কষ্ট আদৌ গ্রাহ্য করিতেন না। কারণ, তখন তীব্র বৈরাগ্য তাঁহাদিগের মনের সমস্তটা অধিকার করিয়াছিল। বরাহনগরের মঠে আহারের আদৌ আড়ম্বর ছিল না। এমন কি, অনেক সময় নুণ-ভাত বা ভাত ও তেলাকুচার পাতার ছেঁচকি, এই দিয়া আহার করিয়াও তাঁহারা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। কখনও বা নরেন্দ্র তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাদি পড়িয়া শুনাইতেন, কখনও বা যাহাতে বৈরাগ্য বৃদ্ধি হয়, এমন শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহার গুরুভাইরাও এ সময় মনে এইরূপ ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, ঠাকুর নরেন্দ্রের ভিতর দিয়াই তাঁহাদিগকে ভগবান-প্রাপ্তির মার্গ দেখাইতেছেন ও তাঁহাদিগের নৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতেছেন।

এই বৈরাগ্যবান্ কুমার-ব্রহ্মচারিগণের তৎকালীন মঠ-জীবনের প্রধান আশ্রয়স্তম্ভ ছিলেন শশী। তিনি না থাকিলে মঠ চলিতে পারিত কি না সন্দেহ। যখন সন্ন্যাসিগণ ধ্যান, পাঠ বা জপে নিমগ্ন, নিজ নিজ শরীরের দিকে কোন দৃষ্টি রাখিতেন না, তখন শশী গুরুভাইদের আহারের জোগাড় করিয়া স্নেহময়ী মায়ের ন্যায় তাঁহাদের আহারের কালের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। এই সময় কালী তপস্যার সঙ্গে শাস্ত্রপাঠে কালাতিপাত করিতেন। তাহার একটি ঘর ছিল, উহার নাম মঠের ভক্তরা দিয়াছিলেন—‘কালীতপস্বীর ঘর’। কালী এই সময় বেদান্ত, উপনিষদ্ ও পাশ্চাত্য-দর্শন এই সকলের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন।

কিছু দিন এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর, কতকগুলি ভক্ত সন্ন্যাসীর বেশে পরিব্রাজক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশ-পর্য্যটন করিতে বাহির হইলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম সমস্তই ভ্রমণ করিলেন। কেবল মঠে রহিলেন শশী। তিনি শ্রীগুরু মহারাজের নিত্যসেবা ত্যাগ করিলেন না।

শ্রীঠাকুর নরেন্দ্রকে নিজ শক্তিতে কাশীপুর বাগানে শক্তিমান্ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্ব জীবের মধ্যে সেই ভগবান্ আছেন, এইটিই প্রত্যক্ষ করা সাধক-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল ও ধর্ম্মাচরণের চরিতার্থতা। এইবার সেই শক্তি জাগিয়া উঠিল। এই প্রেম যে জগজ্জনের জন্য নরেন্দ্রকে বিতরণ করিতে হইবে, তাহা তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু শক্তির কার্য্য শক্তিই করিতে আরম্ভ করিল। নররূপধারী ঋষিকে বাহন করিয়া সেই শক্তি এইবার পৃথিবীর কেন্দ্রে কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসের সুসমাচার বিতরণ করিবে, তাহার কাল আগতপ্রায় হইল,—সূচনাও দেখা যাইতে লাগিল।

বজ্রগর্ভ তাড়িতশক্তিপূর্ণ গ্রীষ্মের জলদ যেমন দেশান্তর-ভ্রমণ উদ্দেশে ও স্বান্তর্লীন বৃষ্টিকণা বর্ষণ করিবার জন্য সঞ্চরমান হইয়া বায়ুমণ্ডলে ঘুরিতে থাকে, তেমনই শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বিরহকাতর অথচ নিজ ত্যাগ-বৈরাগ্য-জ্ঞান-শক্তিতে আস্থাবান্ নরেন্দ্র পরিব্রাজক-বৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য মনে মনে অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন; কিন্তু মঠের প্রাথমিক অবস্থায় অপরিপক্ক গুরুভ্রাতাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এই ভাবে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত চলিল। তাহার পর তিনি একবার ডুব দিলেন। প্রায় দুই বৎসর কাল সন্ন্যাসীর বেশে পরিব্রাজক-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পরে আসিয়া কিছু দিন আবার মঠে থাকিলেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে একেবারে নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে পদার্পণ করিলেন। প্রথম পরিব্রাজক অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে কতক দূর করিয়া এক একজন সঙ্গী থাকিতেন। কখন শরৎ, কখন রাখাল, কখন বাবুরাম, কখন সারদা, কখনও বা গঙ্গাধর এই ভাবে প্রথম প্রথম ভ্রমণ শেষ করিলেন, এবং এই ভাবে বিভিন্ন যাত্রায় তিনি কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বৃন্দাবন, হাতরাস ও হিমালয়ের কিয়দংশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই ভ্রমণে হাতরাস-ষ্টেশনের মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত (পরে সদানন্দ) তাঁহার প্রথম শিষ্য হন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এই ভাবে তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে গাজীপুরে আসেন এবং সেখানে তাঁহার পূর্ব্বপরিচি

পাওহারী বাবা নামে এক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। ইনি কাশীর এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাস লইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে ও নানা ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। কাশীপুর বাগানে যখন ঠাকুর ছিলেন, তখন নরেন্দ্র একবার বাহির হইয়াছিলেন, একথা বলা হইয়াছে। তখন ইঁহার সহিত নরেন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। এইবারে তিনি ইঁহার কাছে কিছুদিন থাকিয়া যান। তাঁহার মনে ধারণা হয়—ঈশ্বরের জন্য হৃদয়ে যে বিরহাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে হয় ত নিভিয়া তাঁহার অশান্ত মনে শান্তি আসিতে পারে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দিবাভাগে পাওহারী বাবার সহিত আলাপ করিয়া মনে এক প্রকার ধারণা করিলেও প্রতি রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিতে লাগিলেন এবং নরেন্দ্রের দিকে ছলছল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন—নরেন্দ্রের এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। একাদিক্রমে একুশ দিন এই দর্শন চলিবার পর নরেন্দ্র গাজীপুর ত্যাগ করিলেন এবং পাওহারী বাবার সঙ্গও চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি আবার বাহির হইয়া পড়িলেন—ইচ্ছা, হিমালয়ের কোন নিভৃতস্থানে তপশ্চরণে কালক্ষেপ করিয়া আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন। গুরুভ্রাতৃগণের কেহ কেহ, তিনি কখন কোথায় থাকেন, সেই সন্ধান রাখিবার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতেন এবং তিনিও সাধ্যমত তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। এই যাত্রায় হৃষীকেশে তাঁহার দেহে ডিপথেরিয়া রোগের আক্রমণ ঘটে, তাহাতে তিনি প্রায় মৃত্যুমুখে পতিতই হইয়াছিলেন। গঙ্গাধর তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে হিমালয়ে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং পরে আলমোড়াতে শরৎ ও বৈকুণ্ঠ আসিয়া মিলিত হন। ক্রমে হরি আসিয়া জুটিয়াছিলেন। শরীরের অবস্থা একটু ভাল হইবার পর তিনি মীরাট হইয়া দিল্লীতে আসিয়া গুরুভ্রাতৃগণকে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত বিধানে তাঁহার কুমার-ভক্তগণকে সন্ন্যাস দেন নাই—এ কথা যথাস্থানে বলা হইয়াছে। তবে তিনি কি তাহাদের মন জানিতেন না, ও কে কে সন্ন্যাস-জীবনের যোগ্য তাহা বুঝেন নাই? তাই বাছিয়া বাছিয়া ভাবী সন্ন্যাসিগণকেই তিনি বুড়োগোপালের গেরুয়া বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। অবশ্য পরে ইঁহারা নরেন্দ্রের নেতৃত্বে বিরজা হোম করিয়া যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক একটি সন্ন্যাসাশ্রমভুক্ত নামও গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ সান্যাল যখন শরৎ (সারদানন্দ)এর সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গেরুয়া ছিল ও তিনিও কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। পরে কিন্তু তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী, নিরঞ্জন, যোগীন, গঙ্গাধর, হরি প্রভৃতি ইঁহারা সন্ন্যাসীর মনোবৃত্তি লইয়াই জন্মিয়াছিলেন এবং আমরণ সন্ন্যাসী রহিয়া গিয়াছিলেন। এই আশ্রমে রাখাল—ব্রহ্মানন্দ, বাবুরাম—প্রেমানন্দ, কালী—অভেদানন্দ, যোগীন—যোগানন্দ, নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ, শরৎ—সারদানন্দ, শশী—রামকৃষ্ণানন্দ, তারক—শিবানন্দ, বুড়োগোপাল—অদ্বৈতানন্দ, হরি—তুরীয়ানন্দ, সারদা—ত্রিগুণাতীত, গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ, লাটু—অদ্ভুতানন্দ, সুবোধ—সুবোধানন্দ, তুলসী—নির্ম্মলানন্দ, হরিপ্রসন্ন—বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেন। নরেন্দ্র পরিব্রাজক অবস্থায় প্রথমে বিবিদিশানন্দ পরে সচ্চিদানন্দ নাম গ্রহণ করেন। খেৎরীর রাজা তাঁহাকে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি পরে সেই নামই গ্রহণ করেন। তখন হইতে লোকসমাজে সেই নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক নরেন্দ্র রাজপুতানা, আলোয়ার, জয়পুর, খেৎরী, আমেদাবাদ, কাথিয়াবাড়, জুনাগড়, গুজরাট, সুদামাপুরী বা পোরবন্দর, দ্বারকা, পলিটানা, খাণ্ডোয়া, বোম্বে, পুণা, বেলগাঁও, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, মালাবার প্রদেশ, কন্যাকুমারী, রামেশ্বর, মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছিলেন—কোন কোন স্থানে কয়েক মাস করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। খেৎরীতে তিনি এক পণ্ডিতের নিকট পানিনী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। আমেদাবাদে ইসলাম ও জৈন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আহরণ করিলেন এবং পোরবন্দরে নয়

মাসকাল অবস্থান করিয়া রাজার এক জন সভাপণ্ডিতের নিকট দর্শন-সাহিত্য ও বৈদিকশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সাধুর ঝুলিতে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক, একখানি গীতা থাকিবেই।" সেই উপদেশ অনুসারে নরেন্দ্রের সঙ্গে একখানি গীতা ও একখানি The Imitation of Christ নামক ইংরেজী-পুস্তিকা থাকিতই। পরিব্রাজক অবস্থায় এইরূপ জ্ঞানার্জ্জন করিবার কালে নরেন্দ্র স্মরণ করিতেন, শ্রীঠাকুরের সেই বাণী—আত্মহত্যা একটা নরুণের দ্বারা করা যায়, কিন্তু অপরকে হত্যা করিতে গেলে নানা হাতিয়ার প্রয়োজন। তিনি যে জগদ্বিজয়ে অভিযান করিবেন, তাহার জন্য এইরূপে জ্ঞান ও বিদ্যার হাতিয়ার যাহা অর্জ্জন করিতে তাঁহার প্রয়োজন ছিল, তাহা শ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় হইয়া যাইতে লাগিল। এই পরিব্রাজক নরেন্দ্রের বিদ্যার ভাণ্ডার যেমন পূর্ণ হইতে লাগিল, ভাবধারার তেমনই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনও ঘটিতে লাগিল। পরিব্রাজক নরেন্দ্রের ব্রাহ্ম-স্বভাবসুলভ গোঁড়ামী লোপ পাইতেছিল, খেৎরীর রাজসভায় এক বাইজীর ভাবোদ্দীপক গানে তিনি অতিশয় বিচলিত হইয়া গেলেন। বেশ্যা, থিয়েটার প্রভৃতি কলিকাতার যে রাস্তায় থাকিত, গোঁড়া ব্রাহ্ম নরেন্দ্র সে পথ ত্যাগ করিতেন। আর এখন সেই নরেন্দ্র বেশ্যার সহিত এক সঙ্গে ধর্ম্মশালায় বাস করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন, এমন ভাবও রাখিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন, সবই ভগবানের মূর্ত্তি—'কাকো নিন্দে কাকো বন্দে দোনো পাল্লা ভারী।' পথ চলিতে চলিতে চোর ও সাধুসঙ্গ, ব্রাহ্মণ ও মেথরের সঙ্গ সমান ভাবেই তিনি গ্রহণ করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট ভারতের নিম্নস্তরের কৃষক ও শ্রমিকদিগের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভারতের মধ্যে ধর্ম্মের তত অভাব হয় নাই—যত অভাব হইয়াছে অন্নের। ঠাকুর বলিতেন, খালিপেটে ধর্ম্ম হয় না—'অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা'—সেই কথা, নিরন্নদের শীর্ণদেহ ও দুঃখ-মলিন চিত্ত তাঁহার মনকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর জীবনের কি মূল্য—যদি তাহা পরের উপকারে না লাগে। 'আত্মানং মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ'—সন্ন্যাসীর এই জীবনাদর্শের দ্বিতীয়াংশ যদি কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম হওয়া যায়, তবে আত্মার মোক্ষে তাঁহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভারত যে বিরাট দেশ। এ দেশের পুঞ্জীভূত দুঃখ-দারিদ্র্য অপনোদন করিতে বহু কোটি টাকার প্রয়োজন। কে এই বিপুল অর্থদান করিবে? তাঁহার শক্তি ও বিদ্যার প্রভাব যাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—তিনি যেন পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন। সেখানকার লোক অশেষ ধনী, তাঁহাদিগকে জয় করিবার মত শক্তিও তাঁহার আছে। টাকার ভাণ্ডার সেই পাশ্চাত্যে, তাঁহার মত লোক চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইলেও হইতে পারেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে খণ্ডোয়ায় পরিভ্রমণ কালে তিনি চিকাগো সহরে ধর্ম্মসভা বা Parliament of Religions সম্বন্ধে প্রথম সংবাদ পান। তবে কবে সভা হইবে এবং তাহাতে কেমন করিয়া প্রবেশ করা যায়, তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। এ দিকে ভারতের চার ধাম ভ্রমণও তাঁহার শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষাংশে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, তাহাই হইবে,—পশ্চিমে একবার গমন করিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের অগাধ ধনভাণ্ডার হইতে কিছু দুঃখী ভারতবাসী ভাইদের জন্য আনয়ন করিতে পারেন কি না।

এদিকে কলিকাতায় তাঁহার গুরুভ্রাতারা তাঁহার কোন সংবাদ পাইতেছিলেন না। তখনও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছিল, এবং সেখানে যথাপূর্ব্ব ঠাকুরের সেবা শশী প্রভৃতি চালাইতেছিলেন। তাঁহারা পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—কবে নরেন্দ্র ফিরিয়া আসিবেন, কবে আবার তাঁহাদিগকে নিজ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিবেন। নরেন্দ্র মঠে চিঠিপত্র দিতেন না, কাযেই তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেছিলেন না। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মান্দ্রাজে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) কয়েক জন স্থানীয় ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া এক বক্তৃতায় তিনি নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। মান্দ্রাজী-ভক্তগণ তাঁহার শক্তিতে সন্দিহান ছিলেন না; অতএব তাঁহার গমনোপযোগী পাথেয়াদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—স্বামি

বড়লোকের, রাজা, নবাবের দান গ্রহণ করিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। নতুবা অনেক রাজা মহারাজা তাঁহাকে এ বিষয়ে অর্থসাহায্য করিতে পাইলে কৃতার্থ মনে করিতেন। বিদেশযাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইবার পর হঠাৎ আবুপর্ব্বতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। এই দুই জন তখন এই স্থানে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগকে তিনি তাঁহার আমেরিকায় যাত্রার সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য জানাইলেন। বলিলেন—"হরি ভাই, হৃদয় আমার এখন অনেক বেড়ে গেছে—দেশের দুঃখ যে কি ও কত, তাহা আমি এখন বুঝেছি। ঠাকুরের নাম করে সাগরপাড়ি দিব, দেখি তিনি কিছু করেন কি না।" তাহার পর শ্রীমার আদেশ জন্য স্বামিজী পত্র লিখিলেন। শ্রীমা তখন বেলুড়ে ছিলেন; তিনিও ঠিক এই সময়ে এক স্বপ্নে দেখেন যে, ঠাকুর যেন গঙ্গায় নামিয়া ক্রমে জলে মিশিয়া গেলেন ও নরেন্দ্র "জয় রামকৃষ্ণ" রবে সেই পূতবারি চারিদিকে ছড়াইতে লাগিলেন। সুতরাং নরেন্দ্র যে আদেশ চাহিয়াছেন, তাহা সেই স্বপ্নমত শ্রীরামকৃষ্ণকে জগতে প্রচারেরই আদেশ মনে করিয়া শ্রীমা সে আদেশ ও তৎসহ আশীর্ব্বাদ পাঠাইলেন। জাহাজের টিকিটের মূল্য দিলেন খেৎরীর রাজা। তিনি তাঁহাকে রেশমী আলখেল্লা, জামা, পাগড়ী ইত্যাদি রেশমী ও পশমী পোষাক প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং স্বীয় দেওয়ানকে স্বামিজীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন—তাঁহাকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার জন্য। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম লইয়া বোম্বাই হইতে সমুদ্রে ভাসিলেন।

প্রথমে লঙ্কা, পরে পিনাং, সিঙ্গাপুর ও হংকং হইয়া জাহাজ চীনবন্দর কান্টনে এবং তথা হইতে জাপানে নাগাসাকিতে উপনীত হইল। এখান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে তিনি ওসাকা, কিওটো ও টোকিও সহর দর্শন করিয়া পুনরায় ইওকোহামাতে জাহাজ ধরিয়া ভ্যাঙ্কুভার সহরে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে জাহাজ ছাড়িয়া ট্রেণযোগে তিনি চিকাগো সহরে পৌঁছিলেন। তখন জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়—তিনি নূতন লোক, বিদেশে আসিয়াছেন, সে দেশের ধরণ-করণ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই জানা ছিল না। এই নূতন স্থান কি কর্ম্ম-কোলাহলের দেশ, কি অগাধ ধন-ঐশ্বর্য্যের ব্যঞ্জনা চারিদিকে! তিনি যেন এক প্রচণ্ড গতিশীল কলের চাকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চিকাগোতে মেলা বসিবে, তাহার জন্য কি বিরাট আয়োজনই চলিতেছিল! এই সব দেখিতে দেখিতে কয়েকদিন কাটিয়া যাইবার পর, তিনি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ও আর কোন নূতন ধর্ম্মপ্রতিনিধি লওয়া হইবে না। কারণ, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নূতন প্রতিনিধি হইতে হইলে কার্য্যকরী সভার আদেশ ভিন্ন হইবার উপায় নাই। আমেরিকা নূতন স্থান, তাঁহাকে কেহই চিনে না—কে-ই বা তাঁহার জন্য সুপারিশ করিবে, আর কেমন করিয়াই বা তিনি ধর্ম্মসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন! সময় চলিয়া যাইতেছিল! হাতের সামান্য পাথেয় প্রায় নিঃশেষিত! তবে কি এত আশা, ভরসা,—এত চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে! শ্রীগুরুদেব কি এমনই করিবেন! খরচের হার এই দেশে অতিমাত্রায় অধিক; এমন কি, একটা কুলি ১ শিলিং না পাইলে মোট ছুঁইবে না। কতকটা আশাভঙ্গ হওয়ায় তিনি মান্দ্রাজে অগত্যা টেলিগ্রাম করিলেন, যাহাতে আর কিছু সাহায্য লাভ করিতে পারেন। যাহা কিছু সামান্য তাঁহার হাতে তখন ছিল, তাহা লইয়া তিনি বোষ্টন নগরে যাত্রা করিলেন। যাহার সঙ্গে ভবসাগরকাণ্ডারী শ্রীগুরু কর্ম্মকর্ত্তারূপে রহিয়াছেন—যিনি লীলার জন্য নরেন্দ্রকে—বিবেকানন্দকে সাত সমুদ্র পারে বিশেষ উদ্দেশ্যে আনিয়াছেন—তিনি কি আর নিজের পুত্রকে অকূলে ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? রেলগাড়ীতে তাঁহার চিত্তাকর্ষক ও বীরত্বব্যঞ্জক রূপ ও উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় এক সহযাত্রিনীকে আকৃষ্ট করিল। তিনি যুবকের নাম ধাম উদ্দেশ্য প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইলেন এবং তাঁহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার (J. H. Wright) জে, এচ, রাইট্ নামক এক ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই রাইট্ সাহেব তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে যাহাতে তিনি ধর্ম্মসভায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন, সেই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং চিকাগো যাইবার একখানি টিকিট কিনিয়া এই হিন্দু যুবকের হাতে দিয়া, চিকাগোতে কোথায় থাকিলে তাঁহার অধিকতর সুবিধা হইবে তাহাও শিখাইয়া দিলেন।

চিকাগো এক বিরাট বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বিস্তৃত সহর। এই সহরে পথঘাট তাঁহার কিছুই জানা নাই। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পান না। কারণ, নাগরিকগণ তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ না দেখিয়া নিগ্রো মনে করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহা, বোধ হয়, অপমানসূচক বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। আহার্য্য ভিক্ষা করিলে কেহ দেয় না—কাহারও বাড়ীর সদরে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া যদি প্রবেশ করিতে উপক্রম করেন, অমনই বাড়ীর লোক দ্বার সজোরে বন্ধ করিয়া দেয়। ক্ষুধিত, শ্রান্ত, ক্লান্ত বিবেকানন্দ অবশেষে রাস্তাতেই বসিয়া পড়িলেন। যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত দিকের বাটী হইতে একটি মহিলা তাঁহার অবস্থা ও বিশেষ করিয়া তাঁহার চেহারা ও পরিচ্ছদের ভঙ্গী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ধর্ম্মসভার একজন সভ্য কি না। তাঁহার উত্তর শুনিয়া এই মহিলা নিজের গৃহদ্বার উন্মোচন করিলে ও তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। ইহাঁর নাম মিসেস্ হে (Mrs. G. W. Hale) এবং পরে ইনি স্বামিজীর একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বান্ধবীতে পরিণত হইয়াছিলেন আহার ও বিশ্রামান্তে গৃহকর্ত্রী তাঁহাকে লোক দিয়া ধর্ম্মসভার কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। এই সব সমবেত চেষ্টার ফলে ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষগণ সানন্দে বিবেকানন্দকে গ্রহণ করিলেন ও অন্যান্য প্রাচ্য-সভ্যগণের সহিত তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইবার তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এখানে তাঁহার চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা। দেখা যাউক সে দিকে ঠাকুর কতদূর কি করেন!

[ক্রমশঃ।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

যৌবন এলো বুঝি

রক্ত পতাকা আকাশে উড়ায়ে ভেরীর অট্টরবে
নবীন সূর্য্য হইয়াছে বার জগৎ জিনিতে হবে ;
বক্ষে বাঁধিয়া বাসনা ব্যাকুল
ছোটে গিরি-নদী ভাসায়ে দুকুল,
ফুল কিশলয় সবে—
হাসে জয় করি' জীর্ণ শাখার শতেক অগৌরবে।

দূর আকাশের তারারা নামে যে দীঘির অথৈ জলে
গভীর নিশীথে জলের বুকেতে লাখ মণিদীপ জ্বলে ;
যৌবন সুরা করিয়াছে পান
ঝঞ্ঝা যে তাই করে খান খান
নীল সাগরের তলে,
বনস্পতির শির ভেঙে চুরে বিজয় নেশায় চলে।

মেরুর চূড়ায়, সিন্ধুর তলে ছোটে ওই সন্ধানী
যৌবন তার কাণে কাণে বলে শত উৎসাহ বাণী ;
জোৎস্না-ধৌত রাঙা ফুলদলে
যৌবন শুধু মালা গাঁথি চলে ?
—তাহার সাধনাখানি
বরফের স্তূপে জড়ো করি' দেয় রাঙা স্বপনেরে আনি'।

বিস্মৃতিময় কবরের তলে অতীতের কথাগুলি
বিবশ তনুতে এলায়ে পড়ে যে স্মৃতির সরণী ভুলি ;
দুস্তর মরু প্রান্তর বন,
বাতাসের বেগে ছুটে চলে মন—
অসীমের পথে যেতে সুরু করে ফেলিয়া রঙের তুলি,
সেই যৌবন এলো বুঝি এলো পরাণ উঠিছে দুলি !

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ (বি-এ)।

পাশ্চাত্য সোসিয়ালিজম্

২

ইহার গোড়ার কথা এই যে, নরনারী নির্ব্বিশেষে মানুষ সব সমান, এবং সমান সুখেই সকলকে রাখিতে হইবে। আর্থিক অবস্থাই, এই সোসিয়ালিষ্টদের মতে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের একমাত্র হেতু। সুতরাং সমান সুখে সকলকে রাখিতে হইলে সমান একটা আর্থিক অবস্থায় সকলকে আনিতে হইবে।

সর্ব্বথা সমান বলিয়া নৈসর্গিক নিয়মে ন্যায়তঃ সত্যই যদি সকল মানুষ ঠিক সমান সুখের অধিকারী হয়, আর সেই সুখ যদি সত্যই একান্ত ভাবে আর্থিক অবস্থার উপরেই নির্ভর করে তবে আর্থিক সাম্যই মানবসমাজে একমাত্র কাম্যসুখের ও মঙ্গলের অবস্থা হইবে: শ্রেষ্ঠ মানবসমাজের লক্ষণই হইবে এই আর্থিক সাম্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই আর্থিক সাম্য স্থাপনার একমাত্র উপায় মানবসমাজকে কমিউনিজম্ বা সাম্যবাদী সঙ্ঘতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা।

তবে এই স্থলে আর একটি কথা বলাও দরকার। একেবারে নিক্তির ওজনে পুরোপুরি আর্থিক সাম্যই সকলে হয় ত মানবজীবনের সুখ ও কল্যাণের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। তবে অত্যধিক আর্থিক বৈষম্য দূর হয়, ইহা ইহারা সকলেই একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। ধনসম্পদে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামিত্ব অর্থাৎ ধনার্জ্জনে ও তাহার ব্যবহারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলে এরূপ ধনবৈষম্য দুষ্পরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, শক্তিমান্ ব্যক্তিদের হাতে এ অবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত অধিক ধন গিয়া জমিবেই, আর অল্পশক্তি যাহারা, তাহারা অনেকেই হয় ত প্রয়োজনানুরূপ ধনও পাইবে না। সকল রকম বৃত্তিতে অবাধ প্রতিযোগিতায় ধনার্জ্জনে সকলের সমান অধিকার থাকিলে এরূপ একটা অবস্থা দুষ্পরিহার্য্যও বটে। পূর্ব্বে শ্রেণীভেদে বৃত্তিগত একটা অধিকারভেদ য়ুরোপেও ছিল, এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সকলের অবাধ প্রতিযোগিতার রীতিও কোথাও ছিল না। ফরাসী-বিপ্লবের পরে সাম্যস্বাধীনতামূলক যে ব্যক্তিতন্ত্রতা য়ুরোপে দেখা দেয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ব্যক্তিতন্ত্রতার যুগেই সকল রকম বৃত্তিতে অবাধ প্রতিযোগিতায় ধনার্জ্জন এবং ইচ্ছামত সেই ধনের ব্যবহারে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হয় এবং দেশবিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যবিস্তারের সঙ্গে ব্যবসায়বাণিজ্যেরও দ্রুত প্রসার আরম্ভ হয়। বৈজ্ঞানিক নানারকম কলের আবিষ্কারও এই সময় হইতে থাকে এবং শিল্প ব্যবসায়গুলি তাহার ফলে বড় বড় ধনী, মহাজন মালিকদের বড় বড় কারখানার হাতে গিয়া পড়ে। কারণ, এইরূপ সব কারখানা ব্যতীত কলের কায গৃহস্থ শিল্পীদের ঘরে ঘরে চলে না। প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে না পারিয়া গৃহস্থদের ছোট ছোট শিল্পব্যবসায়গুলি লোপ পাইল এবং ব্যবসায়ী গৃহস্থরা সব কারখানায় গিয়া মজুরী করিতে বাধ্য হইল। মজুরীর বেতন ও কাযের সময়নিয়ম ইত্যাদিও স্থির হইত স্বাধীন চুক্তির আর অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি অনুসারে। আধুনিক যুগের ন্যায় শ্রমিকসমিতি কিছু তখনও দেখা দেয় নাই। সুতরাং কাযের চুক্তি হইত শ্রমিক কোনও দলের সঙ্গে নহে, ব্যক্তিগত ভাবে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ শ্রমিকদের সঙ্গে। অভাবগ্রস্ত শ্রমিকরা অধিকাংশ স্থলেই অল্প বেতনে অনেক বেশী কাযের চুক্তি করিয়া লইতে বাধ্য হইত। ইহার ফলে শ্রমিকদিগের অশেষ দুঃখে জীবনযাপন করিতে হইত, আর মালিক মহাজনদের হাতে লাভের ভাগ অনেক বেশী গিয়া জমিত। ইহারা সকলেই আবার সাক্ষাৎ ভাবে কারখানার কাযের মধ্যেও থাকিতেন না। কোনওরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম্ম না করিয়া কেবল মূলধন যোগাইয়াই তাহার সুদে বা লভ্যাংশে প্রচুর আয় ভোগ করিতেন। শ্রমিকদের তুলনায় সংখ্যায় সর্ব্বত্রই ইহারা অতি অল্প। কিন্তু বিভবের অন্ত ইহাদের ছিল না এবং অশেষ রকম বিলাসভোগের যথেচ্ছ আড়ম্বরে জীবন যাপনও ইহারা করিতেন। আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক—দেশের অতি বেশীর ভাগ লোক যাহারা—অতি অস্বাস্থ্যকর সঙ্কীর্ণ সব বাসগৃহে মানুষ

হইয়াও হীন পশুপালের ন্যায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইত। ধনী মালিক বা মহাজনের সখের একটি কুকুর বা অশ্ব যে সুখ-সচ্ছন্দতা পাইত, তাহার শতাংশও অনেক স্থলে ইহারা পাইত না। এই ধনবৈষম্য এবং তাহার দরুণ অসংখ্য শ্রমজীবী জনগণের এই দুঃখ-দুর্গতি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই—ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, অবাধ ব্যক্তিতন্ত্রতা-নীতি প্রবর্ত্তনের শতাব্দী বা অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যেই—অসহনীয় এক চরম মাত্রায় গিয়া উঠে। ইহার প্রতিকার কিসে হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধেও জোর একটা আন্দোলন য়ুরোপে তখন আরম্ভ হয়। সোসিয়ালিজম তাহারই একটা বিশিষ্ট ধারা। ধন-সম্পদে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত অধিকার (right of private property) এবং সেই অধিকারে পরিচালিত প্রচলিত ব্যবসায়পদ্ধতি বজায় রাখিয়াও শ্রমিকরা সুখসুবিধা কোন্‌দিকে কতটা ভোগ করিতে পারে, তাহাও ইহাদের হিতকামী অনেকে দেখাইতে থাকেন। চেষ্টাও নানারকম আরম্ভ হয়। কিন্তু অন্য কেহ কেহ বলিতে থাকেন, ধন যাহা কিছু শ্রম হইতেই আসে এবং শ্রমিকদেরই তাহা ন্যায্য পাওনা। পূর্ব্বকার সমাজের উচ্চপদস্থ শক্তিশালী ব্যক্তিরা অন্যায় বলে ইহার বেশীর ভাগ আত্মসাৎ করিয়াছে, এবং তাহাতে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামিত্ব স্থাপন করিয়া শ্রমিকদের খাটাইয়া তাহা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে যে ধনবৈষম্য লোকসমাজে দেখা দিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে ধনিকদের আয়ত্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়পদ্ধতি তাহাকে অতি অধিক মাত্রায় উন্নীত করিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের দুঃখদুর্গতিও অতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হইতে পারে, যদি এই ধনবৈষম্য দূর করিয়া শ্রমিকরা যাহাতে তাহাদের ন্যায্য পাওনা পায়, তাহার ব্যবস্থা করা যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ও ধনসম্পদে ধনিকদের ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করতঃ সব শ্রমিকের সমবেত অধিকার আনিতে পারিলেই ইহা সম্ভব হয়।

ব্যবসায়বাণিজ্য এবং ধনসম্পদ শ্রমিকদের সমবেত অধিকারে আসিলে, ধনিক বলিয়া পৃথক্ একটা সম্প্রদায় থাকে না এবং ধনসম্পদে ব্যক্তিগত অধিকারও কাহারও কিছু থাকে না। ইহাই কমিউনিজম্। কার্লমার্ক্স প্রমুখ যাঁহারা এই মত প্রচার করেন, তাঁহারাই সোসিয়ালিষ্ট নামে পরিচিত হন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, কেবল আর্থিক সাম্য-স্থাপনার লক্ষ্যই যে কার্লমার্ক্স এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী সোসিয়ালিষ্টদের গোড়াতে কমিউনিজমের দিকে প্রেরিত করিয়াছিল, তাহা নয়। আর্থিক বৈষম্যজনিত দুঃখ যাহাতে দূর হয় এবং ন্যায্য পাওনা পাইয়া সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে এই পৃথিবীতে থাকে, ইহাই ছিল তাঁহাদের মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য এই পন্থায় তাঁহারা সাধন করিতে চাহিয়াছেন। কমিউনিজম ব্যতীত আর কোনও উপায়ে ইহা হইতে পারে কি না, তাহা অবশ্য বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। কিন্তু যে কারণে যেরূপ মনোভাবের প্রেরণাতেই হউক, ইঁহাদের সিদ্ধান্ত এই হয় যে, কমিউনিজম ব্যতীত ইহা হইবার নহে। কমিউনিষ্ট আদর্শ ধরিয়াই তাই ইঁহারা ইঁহাদের সোসিয়ালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন এবং কমিউনিজম ও সোসিয়ালিজম্ একরূপ সমানার্থকসূচক বলিয়াও অনেকে মনে করেন।

কমিউনিজম্ বিশিষ্ট একরূপ সঙ্ঘজীবন-পদ্ধতি এবং পূর্ব্বে ইহার একটি ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞাও দেওয়া হইয়াছে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে ইহার প্রধান তিনটি নীতি বা কথা দাঁড়ায় এই :—

(১) এইরূপ সঙ্ঘের মধ্যে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত পৃথক্ পৃথক্ সম্পত্তির অধিকার (rights of private property) কাহারও কিছু থাকিবে না। ধনার্জ্জনে পরস্পর কোনও প্রতিযোগিতা এ অবস্থায় নিরর্থক। সুতরাং পরস্পরের সহযোগী ভাবে সমবেত কর্ম্মে ধন উৎপাদন সকলে করিবে। উৎপাদিত এই ধন সকলের সমান ও সমবেত অধিকারে থাকিবে। শক্তিসামর্থ্য বা রুচিপ্রবৃত্তির অনুসারে যে যত বা যেরূপ পারে কায করিবে। কিন্তু কাযের ফল বা উৎপাদিত ধন ও অন্যান্য সুখসুবিধাদি সকলে সমান ভাবে কি যাহার যাহার প্রয়োজন মত, অথবা মূল নীতির অবিরোধী অন্য কোনওরূপ ব্যবস্থা মত, ভোগ করিবে। বেশী করিলাম কি ভাল করিলাম, বলিয়া প্রয়োজনের উপরে, বা অন্য ভাবে বিহিত যাহা হয়, তাহার অতিরিক্ত কিছু কেহ পৃথক্‌ভাবে আমার বলিয়া দাবী করিবে না, গ্রহণও করিতে পারিবে না।

(২) পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্য-জীবন এ অবস্থায় চলিতে

পারে না এবং এই নীতির পরিপন্থীও বটে। সুতরাং সেই গার্হস্থ্য জীবনের বিলোপ বা যতদূর সম্ভব সঙ্কোচ এই সঙ্ঘমধ্যে করিতে হইবে। স্ত্রীপুরুষ কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে একনিষ্ঠ একটা দাম্পত্যের সম্বন্ধে মিলিত হইয়া নিজেদের সন্তানসন্ততিসহ সঙ্ঘের মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাদিগকে পৃথক্ এক একটি পরিবার বলিয়া সঙ্ঘ স্বীকার করিবে না, বিশিষ্ট কোনও অধিকার তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা কিছু করিবে না, বংশানুক্রমিক বিশিষ্ট কোনও জীবনধারাও ইহা হইতে গড়িয়া উঠিতে দিবে না, যাহা বিশিষ্ট এক একটি সামাজিক শ্রেণীর আকার ধারণ করিতে পারে।

(৩) কাযের সুব্যবস্থা না হইলে এবং সেই কাযে ও উৎপন্ন ধনাদির ভাগে ও ভোগে সঙ্ঘের সব নিয়ম সঙ্ঘভুক্ত সকলে মানিয়া না চলিলে সমবেত জীবন (collective life) সম্ভবই হয় না। ইহার জন্য সঙ্ঘের উপরে এক বা একাধিক ব্যক্তি লইয়া এমন একটি প্রভুশক্তি থাকিবে, যাহা কড়াভাবে নিয়মানুসারে কাযের ব্যবস্থা করিবে, ব্যবস্থা মত কায চালাইবে এবং সকলকে তাহাতে বাধ্য রাখিবে।

এই তিনটির মধ্যে প্রথমটিই হইল কমিউনিজম বা সাম্যবাদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে পরবর্ত্তী দুইটি নীতি অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। নহিলে সাম্যবাদী এইরূপ কোনও সঙ্ঘ রক্ষা করাই সম্ভব হয় না। তাই ঐ মূল লক্ষ্যসূচক নীতির সঙ্গে এই দুইটি নীতিও যোগ করা হইয়াছে।

এই দুইটির মধ্যে শেষের নীতিটি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ কোনও সঙ্ঘজীবন পরিচালনা করিতে হইলে উপরে এইরূপ একটি প্রভুত্বশক্তি যে একান্ত আবশ্যক, নহিলে এরূপ সঙ্ঘজীবন যে চলিতেই পারে না,—সকলেই সহজে এ কথাটা বুঝিবেন। আর সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরা যেরূপ চান, এক একটি দেশের সমগ্র জনমণ্ডলীকে যদি এইরূপ একটি সাম্যবাদী সমাজে পরিণত করিতে হয়, তবে এ প্রভুত্বের অধিকারী হইতে হইবে—সেই দেশের ষ্টেট্ বা রাষ্ট্রশক্তিকে।

তবে পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবন যে এইরূপ সঙ্ঘের সঙ্গে না বা চলিতে দেওয়া যায় না, এই কথাটা এত সহজে সকলে বুঝিবেন না, স্বীকার করিয়া লইতেও প্রস্তুত হইবেন না। সুতরাং ইহার কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে সংক্ষেপে যে কথাটার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার আর একটু বিস্তৃত বিবৃতি আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

গার্হস্থ্য বা পারিবারিক জীবনের মূল নীতিই হইল এই, পরিবারের কর্ত্তা গৃহস্থ পুরুষ যে, সে তাহার স্ত্রী, সন্তান সন্ততি এবং অন্যান্য পোষ্যবর্গ—যেমন বৃদ্ধ পিতামাতা, কর্ম্মাক্ষম কি অপোগণ্ড ভ্রাতাভগিনী প্রভৃতিকে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইচ্ছামত ধনার্জ্জনে এবং পরিবারভুক্ত পোষ্যবর্গের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে ইচ্ছামত তাহার ব্যবহারে যদি অধিকার না থাকে, তবে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব কেহ লইতে পারে না, জোর করিয়া সে দায়িত্ব কাহারও মাথায় চাপানও যায় না। সুতরাং ধনসম্পদের উপরে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিলে পারিবারিক বন্ধন আপনা হইতেই শিথিল হইয়া ক্রমে লোপ পাইবার কথা। এদিকে আবার গার্হস্থ্য-জীবন যদি কোনও মতে থাকেও, তবে সম্পত্তির উপরে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিয়া বেশীদিন রাখা যায় না। পারিবারিক আকর্ষণ বড় প্রবল আকর্ষণ। প্রত্যেক গৃহস্থই চেষ্টা করিবে, নিজের পারিবারকে বেশী সুখে রাখিতে কিসে পারে, কি প্রকারে তাহার জন্য অধিক ধন আহরণ ও সঞ্চয় করিতে পারে। স্বাভাবিক এই আকর্ষণ ও স্বার্থচেষ্টাকে আইনকানুনের শাসনে চিরকাল দমন করিয়া রাখা যায় না। শাসক প্রভুরা যত কড়া বাঁধনেই তাঁহাদের সব নিয়মে বাঁধিয়া রাখিতে চাহুন, বহু কৌশলে তাহার মধ্যেও ফাঁক খুঁজিয়া লইয়া নিজেদের স্বাভাবিক রুচিপ্রবৃত্তির অনুযায়ী সুখ সুবিধা লোকে করিয়া লইবে।

কার্ল মার্ক্স এবং তাঁহার সোসিয়ালিজম মতের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপে ও আমেরিকার নানাস্থানে এইরূপ সাম্যবাদী সঙ্ঘগঠনের চেষ্টা অনেক হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রায় দেখা গিয়াছে, সঙ্ঘভুক্ত ব্যক্তিরা যখন বিবাহ করে এবং স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া এক একটি পরিবার যখন তাহাদের হয়, আপন আপন পরিবারের স্বার্থ সকলের কাছে এত বড় হইয়া উঠে যে, ধন-সম্পদের সমান ও সমবেত অধিকারে কমিউনিষ্ট আদর্শ স্থির রাখা যায় না, সঙ্ঘই ভাঙ্গিয়া যায়। ধন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অধিকার লোপের (abolition of the rights of private property) সঙ্গে পারিবারিক জীবনের লোপও যে

কমিউনিষ্ট-পদ্ধতির অপরিহার্য্য নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বড় একটি কারণই হইতেছে এই সব পরীক্ষার ফল। বাস্তবিক কমিউনিষ্ট-পদ্ধতির মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবন চলে না এবং তাহা চলিতে দিলেও কমিউনিষ্ট-পদ্ধতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক মহামনীষী প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'রিপাব্লিক' নামক গ্রন্থে একটি আদর্শ সমাজের কল্পনা করেন। তিনি বলেন, স্বভাবতঃই মানবচরিত্রে তিনটি গুণের বা ভাবের প্রকাশ বা ক্রিয়া দেখা যায়, যাহাদের তিনি rational (সাত্ত্বিক) spirited (রাজস) এবং desiring (তামস *) এই তিনটি নাম দেন। সাত্ত্বিক রাজস অপেক্ষা এবং উভয়ই তামস অপেক্ষা উন্নত গুণ। সুতরাং তামস ভাবকে রাজস ভাবের এবং রাজস ভাবকে সাত্ত্বিক ভাবের আয়ত্ত রাখিতে পারিলেই মানবজীবন সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া কল্যাণের ভাগী হয়। যেমন ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেকটি মানবে, তেমন সমষ্টিভাবে মানবসমাজেও এই তিনটি গুণের প্রকাশ ও ক্রিয়া দেখা যায় এবং তাহার প্রভাবে তিনটি শ্রেণী বা সম্প্রদায় মানবসমাজে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। এই তিনটি শ্রেণীকেও প্লেটো সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস (rational, spirited ও desiring) এই তিনটি নাম দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্লেটোর বর্ণিত এই তিনটি শ্রেণী এ দেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-শূদ্রের অনুরূপ। এ দেশেও ঋষি ও আচার্য্যগণ ব্রাহ্মণকে সত্ত্বগুণপ্রধান, ক্ষত্রিয়কে রজোগুণ-প্রধান এবং শূদ্রকে তমোগুণপ্রধান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তবে গুণপ্রাধান্যভেদে বৈশ্যকে ও শূদ্রকে এ দেশে পৃথক্ দুইটি শ্রেণী বলিয়া ধরা হইয়াছে, আর প্লেটো উভয়কেই সমান এক desiring বা তামস নাম দিয়াছেন। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমন সামাজিক জীবনেও নিম্নতর গুণকে উচ্চতর গুণের বশবর্ত্তী থাকা আবশ্যক। তাই প্লেটো বলেন, সাত্ত্বিক অর্থাৎ জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত যে শ্রেণী, তাঁহারা ষ্টেট বা সমাজ কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহার সব বিধিব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিবেন। রাজস বা শৌর্য্যবীর্য্যে উন্নত যে শ্রেণী, তাঁহারা সেই সব বিধিব্যবস্থা অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে সমাজকে শাসন ও আপৎকালে রক্ষা করিবেন। আর বিষয়লুব্ধ যাহারা, তাহারা প্রথম দুই শ্রেণীর শাসন মানিয়া চলিবে। দ্বিতীয় এই শ্রেণী যত বেশী আপন আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া একান্ত ভাবে সমাজ-শাসন ও সমাজরক্ষার দিকে মনোযোগী হইবেন, সমাজ তত বেশী কল্যাণের ভাগী হইবে। তাই প্লেটো এই শ্রেণীকে একেবারে কমিউনিষ্টপদ্ধতির অনুবর্ত্তী করিয়া রাখিতে চাহেন। ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন, এই শ্রেণীভুক্ত কেহ বিবাহ করিবে না, স্বতন্ত্র পরিবারও কাহারও থাকিবে না। সমাজভুক্ত নারীরা সকল পুরুষেরই সমান ভোগ্যা থাকিবে; সন্তানসন্ততি যাহারা জন্মে, সকলেই এই সমাজের সমান সন্তান হইবে, এবং কড়া এমন নিয়ম করিতে হইবে, যাহাতে কে কাহার জনক, কোনও মতে কেহ তাহা না ধরিতে পারে। পরবর্ত্তী কমিউনিষ্ট সঙ্ঘপ্রবর্ত্তকরা অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে যে সিদ্ধান্তে শেষে উপনীত হন, প্লেটো সেই প্রাচীন যুগে তাঁহার দার্শনিক বুদ্ধিতে তাহাই উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ নীতি বা বিধির নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ পৃথক্ পৃথক্ পরিবারবিহীন এইরূপ সঙ্ঘে প্রসূত সন্তানসন্ততিবর্গ যে সঙ্ঘের সমান সন্তানসন্ততি বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সঙ্ঘই মাত্র তাহাদের লালন পালনে ও শিক্ষাদানে মানুষ করিয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে, ইহা কমিউনিষ্টদের একটি সাধারণ নীতি বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। কমিউনিষ্ট অর্থাৎ সঙ্ঘতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরাও বলিয়া থাকেন, দেশের সন্তানসন্ততি সব ষ্টেটের সন্তানসন্ততি (state children) হইবে, কারণ তাঁহাদের মতে সঙ্ঘের সমবেত শক্তির প্রতিভূই হইতেছে ষ্টেট।

য়ুরোপে সাধারণতঃ প্রত্যেকটি দম্পতি ও তাহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসন্ততিদের লইয়া পৃথক্ এক একটি পরিবার হয়। ভ্রাতাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, বিবাহিত পুত্রও পিতামাতার সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হইয়া কখনও থাকে না। এইরূপ পরিবারকে ব্যক্তিতান্ত্রিক (individualistic) পরিবার বলা যাইতে পারে। এ দেশে

* Desiring বলিতে বাসনানুবর্ত্তী বুঝায়। এই বাসনার অনুবর্ত্তিতা রজোগুণের একটা লক্ষণ বলিয়া এ দেশের পণ্ডিতরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তমোগুণের লক্ষণ জড়তা, উন্নত বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির অভাব। প্লেটোর এই desiring কথাটার অথবা এই কথাটা যে গ্রীক্ শব্দের ইংরেজি অনুবাদ, তাহার অর্থ বোধ হয় উন্নত কোনও সংস্কারবর্জ্জিত লোকের আপন আপন পার্থিব স্বার্থে একান্ত-ভাবে লোভের বশবর্ত্তিতা বা বিষয়লুব্ধতা হইবে। সেটা তামস ভাবের একটা লক্ষণই বটে। যাহা হউক, এই তুলনা প্রসঙ্গে অন্ততঃ 'তামস' এই নামে ইহাকে প্রকাশ করা যাইতে পারে।

…কবংশীয়, কখনও বা অতি নিকট আত্মীয় বিভিন্নবংশীয়ও, …ই তিন পুরুষের বহু দম্পতি সন্তানসন্ততিদের লইয়া এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে। এই সব পরিবারকে সাধারণতঃ যৌথ বা একান্নবর্ত্তী পরিবার বলা হয়। য়ুরোপের সব ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবারের সঙ্গে তুলনায় এ দেশের এইরূপ সব পরিবারকে যৌথ বা একান্নবর্ত্তী বলা হইয়াছে। নতুবা এ দেশের পরিবার-গঠনের রীতিই ইহা। পরিবার বলিতেই এইরূপ পরিবার বুঝায় এবং এরূপ কোনও বিশেষণ দিবার প্রয়োজন এ দেশের লোকে অনুভব করে নাই। একান্নবর্ত্তী কথাটা বিশিষ্ট এই-রূপ কোনও লক্ষণের পরিচায়ক নহে। কারণ, পরিবার যে ভাবে যাহাদের লইয়াই গঠিত হউক, পরিবারভুক্ত সকলেই সর্ব্বদা একান্নবর্ত্তী। 'যৌথ' কথাটা ইংরেজি 'joint' কথাটার অনুবাদ মাত্র। সুবিধার খাতিরে বিভিন্ন ব্যক্তিতন্ত্র পরি-বারের স্বেচ্ছায় স্থাপিত যেরূপ একটা যোগ ইহাতে বুঝায়, সেরূপ কোনও যোগ স্থাপনা করিয়া এইরূপ সব পরিবার গড়িয়া তোলা হয় নাই, আপনা হইতেই এইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সব ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবার হইতে এই সব পরিবারের পার্থক্যটা বুঝাইতে হইলে এগুলিকে সঙ্ঘতান্ত্রিক পরিবার বলা যাইতে পারে এবং কমিউনিষ্ট বা সঙ্ঘতান্ত্রিক আদর্শেই এ সব গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে। এই সব পরিবার অতি ক্ষুদ্র এক একটি গণ্ডীর মধ্যে, সম্পূর্ণ না হউক, বহু পরিমাণে কমিউনিষ্ট আদর্শেই গঠিত।

এক একটি পরিবারের স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি, যত দিন একত্র থাকে, সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। কেবল যখন পৃথক্ অন্নে ইঁহাদের কেহ কেহ ভাগ হন, তখন সম্পত্তির ভাগ উত্তরাধিকারের যে শাস্ত্রীয় বা আইনগত ব্যবস্থা আছে, তাহার অনুসারে হয়। যতদিন সকলে এক-পরিবারভুক্ত থাকে, যেই যাহা অর্জ্জন করুক, যাহারই চেষ্টায় বা অর্জ্জিত অর্থে পারিবারিক সম্পত্তি বৃদ্ধি পাউক, সবই পরিবারের সমান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। কোনও অংশ কেহ পৃথক্ ভাবে একেবারে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে না। স্বত্বের অধিকার অপেক্ষা ভোগের অধিকারটাই এই সব পারিবারিক জীবনের অনেক বড় কথা। শাস্ত্রীয় বিধিতে বা আইনে স্বত্বের অধিকার যাহার যেরূপই থাক্, ভাগের সময় সে কথা উঠে। একত্র যতদিন থাকে, ভোগের বেলা সে কথা কেহ ভাবে না। কমবেশী যেই যাহা উপার্জ্জন করুক, উপার্জ্জন আদবেই কেহ কিছু করিতে না পারুক, খাওয়া-পরায় সকলেরই সমান ব্যবস্থা থাকে। বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে যখন যাহার পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন, সেই-রূপ ব্যয় করা হয়। এইখানে আমাদের পারিবারিক জীবনের কমিউনিষ্ট আদর্শ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুরুষদের সম্বন্ধে স্বামিত্বে ও ভোগে সাধারণতঃ এই নিয়মই চলে। তবে নারীদের সম্বন্ধে ব্যতিক্রম কিছু দেখা যায়। শ্বশুরকুল হইতে বসনভূষণাদি যাহা কিছু দেওয়া হয়, সকলকেই সমান ভাবে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু পিতৃগৃহ হইতে প্রদত্ত বসনভূষণ বা কোনও সম্পত্তির উপরে প্রত্যেক নারীর পৃথক্ একটা স্বত্বের দাবী আছে, ভোগও সে ইচ্ছামত করিতে পারে, যদিও অনেক স্থলে ভাল দেখায় না বলিয়া অনেকে তাহা করে না।

কৃষি, শিল্প, কি বাণিজ্য—কোনও ব্যবসায় যদি এইরূপ কোনও পরিবারের বৃত্তি হয়, সকলে মিলিয়া যে যখন যতটা পারে কায করে, যে পারে না করে না। কিন্তু আয় হইতে স্ত্রীপুত্রাদিসহ সকলেরই সমান ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ কোনও ব্যবসায় যদি না থাকে, কর্ম্মক্ষম পুরুষরা যাহার যাহার শক্তির উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে যে যাহা পারে উপার্জ্জন করে। উপার্জ্জিত অর্থ সাধারণতঃ সমান এক তহবিলভুক্ত হয় এবং সমানভাবে সকলেরই ভোগ-দখলে তাহা থাকে। কেহ যদি উপার্জ্জন কিছু না-ও করে বা করিতে না পারে, সে-ও তাহার স্ত্রীপুত্রাদিসহ অপর সকলের সঙ্গে সমান গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী থাকে।

আত্মীয় সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ এবং বয়সে জ্যেষ্ঠ পুরুষ কেহ থাকেন পরিবারের কর্ত্তা, আর এইরূপ শ্রেষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা নারী কেহ থাকেন গৃহিণী। এই নারী কর্ত্তার স্ত্রী না হইয়া অপরা কেহও হইতে পারেন, যেমন অনেক এইরূপ পরিবারে সম্পর্কে ও বয়সে বড় কোনও বিধবাকেও সংসারের কর্ত্রী দেখা যায়। পরিবারভুক্ত অন্যান্য সকলে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে এই কর্ত্তার ও কর্ত্রীর অনুশাসন মানিয়া চলে। ইহাই এইরূপ পরিবারের আদর্শ এবং ইহা কমিউনিষ্ট আদর্শ-ই বটে। তবে এই আদর্শের মাত্রা সর্ব্বদা সকল পরিবারে সমান ভাবে রক্ষিত হয়, এমন কথা বলা যায় না। কারণ, আইনের বাধ্যতা কিছু এই সব পরিবারে নাই। নিয়ম-কানুন সব স্বেচ্ছায়

সকলে যতটা বা যতদিন মানিয়া চলে, ততদিনই ততটা রক্ষিত হয়। যখন না হয় এবং স্বার্থের ও খেয়ালের সংঘর্ষে অশান্তি দেখা দেয়, পরিবার ভাঙ্গিয়া ভাগ ভাগ হইয়া পড়ে। ইহাতেও বাধা কিছু নাই। তবে বাল্যাবধি সকলেই যাহাতে এইরূপ সব নিয়মে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, যেরূপ সংযমের প্রয়োজন তাহাতে হয়, তাহা যাহাতে সকলের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়ায়, সেদিকেও সতর্ক একটা দৃষ্টি প্রবীণদের থাকে। পুরুষপরম্পরাগত কতকগুলি প্রথা এবং শিক্ষা ও লোকমতের প্রভাবে তাহা মানিয়া চলিবার সাধারণ একটা রীতি এই সব পরিবারে তাই দেখা যায়।

স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধে এবং আপন সন্তানসন্ততিদের সম্বন্ধে একটা সঙ্কোচের রীতি যে এ দেশের এই সব পরিবারে আমরা দেখিতে পাই, তাহাই এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম বয়সে স্বামিস্ত্রী যথেচ্ছভাবে যখন তখন পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা দূরে থাক, আলাপও করিতে পারে না। অতি লজ্জার কথা বলিয়াই সকলে ইহা মনে করে। প্রাচীন বয়সেও অনেক নারী একটু ঘোমটা না টানিয়া স্বামীর সম্মুখে বাহির হন না, মুখামুখি আলাপ করেন না। গুরুজনের সমক্ষে নিজের সন্তানসন্ততিদের কোলে করা, আদর করা, নাম ধরিয়া ডাকা, এ সবও লজ্জার কথা। প্রথম বয়সের ত কথাই নাই, বড় হইলেও অনেকে ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এক পরিবারে পাঁচ ভাই আছে, সকলেরই ছেলে-মেয়ে হইয়াছে। ভাইপো-ভাইঝিদের ফেলিয়া কেবল নিজের ছেলেমেয়েদের লইয়া থাকা, তাহাদের লইয়া খাওয়া, সঙ্গে করিয়া বেড়ান, কোন দ্রব্য আদর করিয়া কেবল তাহাদের কিনিয়া দেওয়া অতি অসঙ্গত আচরণ বলিয়াই গণ্য হয়। পুরুষদের কাছে ঘরের সব ছেলেই সমান। বাপই বরং একটু তফাৎ তফাৎ থাকে, খুড়োজেঠাদের কাছেই ছেলেরা ঘেঁসে বেশী, আবদার করে বেশী। একত্র সকলে যখন আহারে বসেন, ছেলেমেয়েরা সঙ্গে বসিলে খুড়োজেঠাদের সঙ্গেই বসে, নিজ নিজ পিতার সঙ্গে নয়। মাতা গর্ভধারিণী ও স্তন্যদাত্রী; অতি শৈশবে কোলে করিয়া স্তন্যদান মাতাকে করিতে হয় বটে, কিন্তু শিশুপরিচর্য্যা অন্য নারীরাই বেশী করেন। একটু বড় হইয়া উঠিলে গৃহের সব ছেলে-মেয়েকে নাওয়ান খাওয়ান প্রভৃতি কাজ সমান ভাবেই নারীরা যিনি যখন পারেন করেন। কেবল যাহার যাহার মা তাহার তাহার নাওয়ান, খাওয়ান, পরান কাযগুলি করিলে, সেটাও খুব দোষের কথা, লজ্জার কথা, নিন্দার কথা হয়।

দাম্পত্য-আকর্ষণ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকর্ষণ, এবং আপন আপন সন্তান-সন্ততির প্রতি মমতার সঙ্গে অন্য কোনও প্রকার মমতার তুলনাই হয় না। দম্পতি পরস্পরের সঙ্গ যত চায়, এত আর কাহারও সঙ্গ চায় না। পিতামাতা আপন পুত্রকন্যাদের কোলে করিয়া আদরসোহাগ করিয়া যত আনন্দ পায়, এত আনন্দ আর কাহারও সন্তানদের হইতে পায় না।

আবার নিজের স্বামীর বা স্ত্রীর এবং পুত্রকন্যার সুখ-স্বার্থের দিকে প্রত্যেক নারীর বা পুরুষের যতটা টান গিয়া পড়ে, এত আর কাহারও সুখ-স্বার্থের দিকে গিয়া পড়ে না। অথচ স্বাভাবিক এই সব প্রবৃত্তি বা লিপ্সাকে সংযত রাখিতে না পারিলে ব্যবহারের যে সমতার উপরে বৃহৎ এই সব পরি-বারের অস্তিত্বই নির্ভর করে, তাহা থাকে না। প্রত্যেকটি দম্পতিকে আপন আপন সন্তানসন্ততিসহ পৃথক্ এক একটা স্বার্থের কেন্দ্রে এমন ভাবে টানিয়া লইবে এবং ব্যবহারের এমন পার্থক্য দেখা দিবে যে, নামে এক হইলেও, স্পষ্টতঃ অনেকগুলি ছোট ছোট পরিবার হইয়া ইহারা দাঁড়ায়। একই গৃহবাসী এবং নামেও 'যৌথ' বা 'একান্নবর্ত্তী' এরূপ পরিবার আজকাল অনেক দেখা যায়। অতি সাধারণ রকম কতকগুলি খরচ সকলের সমান এক তহবিল হইতে করা হয় বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন যাহার যাহা কিছু, নিজ নিজ পৃথক্ তহবিল হইতে ইচ্ছামতই সকলে চালাইয়া লয়েন। আপন আপন ভাইদের মধ্যেও আয়ের পার্থক্য অনুসারে খাওয়া-পরায় ভাল মন্দ মাঝারী নানারকম বন্দোবস্ত দেখা যায়।

এরূপ না ঘটিতে পারে, সঙ্ঘতান্ত্রিক অধিকারসাম্য বজায় থাকে, তাই স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধে এবং আপন আপন সন্তান-সন্ততিদের সম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কোচের রীতি এ দেশের পারি-বারিক জীবনে দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন কুসংস্কারমূলক অদ্ভুত অযৌক্তিক কতকগুলি কু-প্রথা বলিয়া অনেকেই অধুনা ইহা বর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু কেন এই সব প্রথা হইয়া-ছিল, ইহার কোনও সার্থকতা ছিল কিনা, আছে কিনা, এ কথা কেহ ভাবিয়াও কখনও দেখেন না। স্বভাবতঃই অতি প্রবল দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহ এইরূপ একটা সংযমের

বাধা না পাইলে, প্রত্যেকটি দম্পতিকে আপন আপন সন্ততি-সহ পৃথক্ এক একটি স্বার্থের কেন্দ্রে টানিয়া লইবেই এবং যদি তাহা লয়, তবে অধিকারসাম্যমূলক এরূপ সঙ্ঘতান্ত্রিক পরিবার চলিতে পারে না। ছোট কি বড়, সঙ্ঘ-জীবন যাহাদের লইয়া যে ভাবেই গঠিত হউক, অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিকেই তাহার ব্যক্তিত্বকে, ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র স্বার্থকে, স্বতন্ত্র কামনাকে, যতদূর সম্ভব সংযত রাখিয়া এই সঙ্ঘের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। এই আনুগত্য কঠোর বিধির শাসনেও আনা যাইতে পারে, আবার বাল্যাবধি অনুকূল শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ইহাই সঙ্ঘ-জীবনের ধর্ম্ম এইরূপ একটা অনুভূতি এবং ব্যবহারের অভ্যাস হইতেও আসিতে পারে। এ দেশের পারিবারিক জীবনে এই আনুগত্য যতটা দেখা যায়, এইভাবেই আসিয়াছে, কঠোর কোনও বিধির শাসন ইহার মধ্যে নাই।

যাহা হউক, এইরূপ সঙ্ঘের মধ্যে স্বতন্ত্র সব পারিবারিক জীবন যে চলিতে পারে না, এ দেশের পারিবারিক ব্যবহার হইতে সেই সত্যেরই বড় একটা সাক্ষ্য বা দৃষ্টান্ত আমরা পাই। তবে পাশ্চাত্য কমিউনিজম ও এ দেশের পারিবারিক কমিউনিজম উভয়ের মধ্যে বড় একটি পার্থক্য এই যে, যৌন-সম্বন্ধে দাম্পত্যের পবিত্রতাকে রক্ষা করিয়া বাহ্য ও অন্যান্য ব্যবহারে কতকগুলি সঙ্কোচ ও সংযমের নিয়ম এ দেশে হয়, আর পাশ্চাত্য কমিউনিজম বিবাহিত দাম্পত্য জীবনকেই লোপ করিয়া দিতে চায়, অথবা ইহাকে কোনও গুরুত্ব-বিহীন এমন একটা নগণ্য ব্যাপারে পরিণত করিতে চায়, যাহা থাকা না থাকা সমান। যৌন-সম্বন্ধে নরনারীর মিলন এ অবস্থায় কোনও নিয়মের শাসনে থাকে না, মিলন ও বিচ্ছেদ ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুসারেই ঘটে।

যাহা হউক, বহু অভিজ্ঞতা-প্রসূত পুরাতন এই যে কারণ রহিয়াছে, গার্হস্থ্যজীবন লোপের পক্ষে এইটাকেই যে সাম্য-বাদী সোসিয়ালিষ্টরা প্রধান কারণ বলিয়া মনে করেন, তাহা নয়। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত পৃথক্ পৃথক্ স্বত্বস্বামিত্ব লোপ ব্যতীত ধনসাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় না এবং পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্যজীবন থাকিতে দিলে সম্পত্তিতে পৃথক্ পৃথক্ অধিকার লোপ করাও অতি দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাই অগত্যা পূর্ব্বতন কমিউনিষ্টরা পারিবারিক জীবনের লোপ একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, এটা ব্যতীত ওটা যখন চলেই না, তখন এটাকে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর আর নাই, এইভাবেই এটাকে গ্রহণ করিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

কিন্তু কমিউনিষ্টপন্থী নব্য সোসিয়ালিষ্টরা তাঁহাদের কমিউনিষ্ট-পদ্ধতির পক্ষে ইহার একান্ত আবশ্যকতা যাহা আছে, অগত্যাপক্ষে কেবল তাহা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন না। আর্থিক বা বৃত্তিগত সব বিষয়ে কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার যে সব নিয়মের শাসন একান্ত আবশ্যক, তাহা ব্যতীত জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে সকল বন্ধনমুক্ত নরনারীর সমাজকে অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত স্তরের একটা সমাজ বলিয়াও ইহারা মনে করেন। তাই আপনা হইতেও এই বন্ধনমোচনটা বড় একটা কাম্য বস্তু তাঁহাদের হইয়াছে। সকল বিষয়েই ইহারা চরম সাম্যবাদী। স্ত্রীপুরুষে কোনও ভেদ কি বৈষম্য ইহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনে নরনারীর পক্ষে এই সাম্য সম্ভব হয় না,—কর্ম্মগত এবং পরস্পরের সম্বন্ধে অধিকারগত ও ব্যবহারগত একটা বৈষম্য অপরিহার্য্য। কারণ, গার্হস্থ্য-জীবনে স্বামিস্ত্রীর স্বাভাবিক সম্বন্ধই ভর্তৃভার্য্যার সম্বন্ধ। ইহাও বড় একটি কারণ—কেন সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরা গার্হস্থ্যজীবন লোপ করিতে চান। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেন গার্হস্থ্যজীবনে সমান দুইটি মানবের ন্যায় স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধও সাম্যনীতি অনুসারে চলিতে পারে না, এবং ভর্তৃভার্য্যারূপে কেন একটা অধিকার-বৈষম্য তাহাদের মধ্যে অপরিহার্য্য। পরে এক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম্ এ, অধ্যাপক)।

ক্যাপ্টেন্ বুথ্

৩
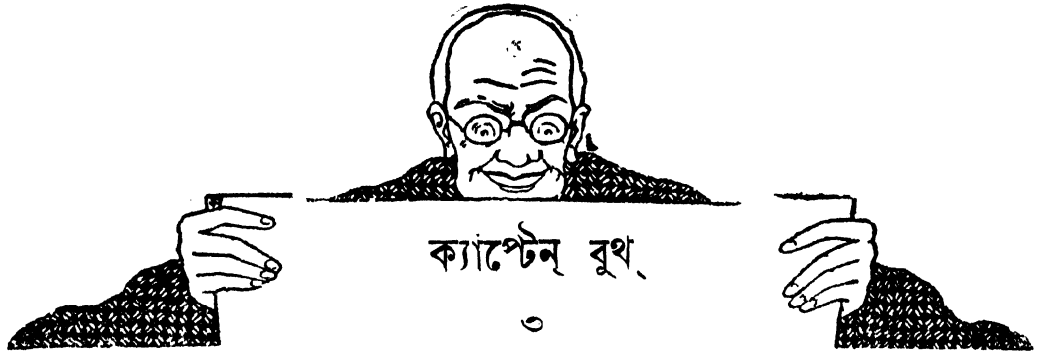
ভূতনাথের চেহারাই ছিল তার সবার বড় সার্টিফিকেট্, পণ্টনে সেই ছিল সবার ঊর্দ্ধে এক ফুট—সহস্রের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সবার দৃষ্টি তার ওপরেই পড়তো। আবার তার মুখের দিকে লোক যত চাইত, তারা তার রূপ যেন ততই উপভোগ করতো, তাতে এমন একটা কমনায় সহজ শৌর্য্য ও পৌরুষ-স্পর্শ ছিল। ফরাসী কমাণ্ডাররা তাই তাকে খুবই ভালোবেসে ফেলেন। ছয় মাসেই তাকে সোলজার থেকে একেবারে 'করপোরেল' ও পরে লেফটেনেণ্টের পদে উন্নীত করে' দেন।

প্রথম কয়েকদিন Trainingএ থাকতে হয়। ভূতনাথকে এক সপ্তাহে সে সব আয়ত্ত করতে দেখে অফিসার-কম্যাণ্ডিং তার পিট চাপড়ে, মুখ মুচকে হেসে রহস্যচ্ছলে বললেন, "একটু যদি বেঁটে হতে। যুদ্ধক্ষেত্রে নাববার সময় তোমার মাথাটি কিন্তু ক্যাম্পে রেখে যাওয়াই safe (নিরাপদ)। জার্ম্মাণীর গুলী আগেই তোমার খুলি উড়িয়ে দেবে ;—তারা ভারি শার্প-শূটার (লক্ষ্য-ভেদী) তুমি তাদের লক্ষ্য এড়াতে পারবে না।"

বুথ্ (Booth) বা ভূতনাথ বললে, "I dont care—আমি সে ভয় রাখি না।"

"But we care—আমরা কিন্তু রাখি। আমরা তোমাকে হারাতে চাই না। আমি তোমার দৈর্ঘ্যকে মন্দ বলছি না, মাথা বাঁচাতে পারলে ঐ দৈর্ঘ্যই একদিন তোমাকে বড় করবে। অফিসারদের দৈর্ঘ্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তোমাকে সতর্ক থাকতে বলাই আমার উদ্দেশ্য,—কারণ, আমরা তোমাকে চাই।"

"এখন আমাকে কি করতে বলেন ?"

অফিসার বললেন, "জার্ম্মাণরা অফিসার বেছেই মারে, তাই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখতে বলি।"

বুথ্ বললে, "তা থাকবে।"

অফিসার-কম্যাণ্ডিং খুব খুসী হ'য়ে—My brave boy বলে' পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলেন।

* * * *

ফরাসীরা গুণের আদর করতে জানে। বড় বড় দু'তিনটি অভিযানে তাকে মাথা নিয়ে ফিরতে দেখে,—অনেকেই আশ্চর্য্যও হ'য়েছেন।

বছর ফিরতেই ভূতনাথ বড় বড় অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং চীফ অফিস থেকে সনদ্ আসায় ক্যাপ্টেন বুথ্ (Captian Booth) বলে অভিহিত ও পরিচিত হ'য়ে পড়লো।

ননীগোপাল ছিল দলের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং ধীর ও মধুর প্রকৃতির। তাই Captain Booth তাকে কাছে-কাছেই রাখতেন ও 'মাষ্টার ন্যানী' বলে ডাকতেন। রাধারাণীর দাদা বলেই যে তার প্রতি বুথের এই ঔদার্য্য, সেটা ভাবলে আমাদের ক্যাপ্টেনের প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি ন্যায়ের পথ হতে সহজে বিচলিত হতেন না এবং শৌর্য্য-পাগল কর্ম্মবীর ছিলেন।

ন্যানী রাধারাণীকে প্রতি মেলে পত্র দিতো ও তার পত্র পেতো এবং সকল সংবাদই পাঠাতো। বুথ্ অত্যধিক লাজুক প্রকৃতির লোক, ইচ্ছা সত্বেও স্বতন্ত্র ভাবে রাধারাণীর কুশলটা জিজ্ঞাসা করতেও তার বাধতো কেনো যে, তার উত্তর তার নিজের কাছেও সুস্পষ্ট ছিল না। ন্যানীর বাড়ীর খবরটা তিনি সাপ্টা ভাবেই নিতেন।

ন্যানী সহজ, সরল ও সাধারণভাবে রাধাকে পত্র লেখে—সব কথা জানায়। তার মধ্যে রাধা কোনোদিন খুঁজে পায় না যে, বুথ্ তার খবর নিয়েছে বা তার সংবাদ জানতে চেয়েছে। তার অভিমান হয়,—ভাবে তিনি কি আমার কথাটা... কোনো কোনোদিন পত্র লেখবার প্রবল ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু প্রথম লিখবে কি বলে',—নারীমর্য্যাদা বা...

দেয়, মন বিদ্রোহ করে। লেখা হয় না। সত্যই ত' তাঁর কি উচিত অনুচিত জ্ঞান নেই!

* * * * *

যুদ্ধস্থান হ'তে দু'দিন দু'রাত পরে আজ সব মড়ার মত ফিরে, একটা পরিত্যক্ত পল্লীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সেটা কোনো গৃহস্থের বাড়ী ছিল,—তারা চেয়ার টেবিল কম্বল প্রভৃতি ফেলে পালিয়েছে। রান্নাঘরে চা চিনি ডিম প্রভৃতি দেখে সকলের শ্রান্ত শরীরেও উৎসাহ এলো—যেন পরম ঐশ্বর্য্য লাভ হয়েছে,—বিশেষ দু'তিন ক্যানেস্তারা জল পেয়ে! কয়েক জন চা তয়ের করতে লেগে গেল। ন্যানী একখানা খাটে অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়লো। তার প্রতি সকলেরি একটু স্নেহদৃষ্টি ছিল।

ক্যাপ্টেন বুথ্ পল্লীর অন্যান্য দিক্ ঘুরে, অবস্থা জেনে, সঙ্গীদের ঘরে এসে ঢুকলেন,—সঙ্গে ধূসর বর্ণের এক প্রকাণ্ড কুকুর! সকলে দাঁড়িয়ে উঠলো।

"বোসো। ফ্ল্যাণ্ডার্সে এসে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণদের এরূপ ভীষণ আক্রমণ ও অদম্য শক্তির আর আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে ব্যূহ-পারিপাট্যের পরিচয় পূর্ব্বে কোনোদিন পাইনি। ওই অবস্থায় নিয়ম রক্ষা করা ধারণার অতীত। আমি কেবল তাই লক্ষ্য করছিলুম।"

একটু হাসি টেনে বললেন—"মানুষ কতটুকু কি করতে পারে! আমরা যে ট্রেঞ্চে ঢুকেছিলুম, তার সামনে ঐ ছোট পাহাড়টিই আমাদের সাহায্য করেছে।"

সকলেই জানতো, যুদ্ধের কথাটা ক্যাপ্টেনের বিলাসের বস্তু—সারা রাত চলতে পারে।

নীরদ বললে—"এই কুকুরটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন?"

"ওঃ—বলছি—বড় করুণ কাহিনী।"

"আগে চা খান" বলে ননী সব এগিয়ে দিলে।"

"তোমরাও নাও। এ সব কোথায় পেলে?"

"এই বাড়ীর কিচেনেই ছিল। তারা অনেক জিনিষই নিয়ে যেতে পারেনি।"

"হ্যাঁ—কুকুরটার কথা,—আমি দূরবীণ ব্যবহার করছি—কোথা থেকে হঠাৎ এই কুকুরটা এসে, তার সামনের পা-দুটো দিয়ে আমার পা জড়িয়ে টানতে লাগলো। "কি রে—ব্যাপার কি?" কুকুরটা ছুটে কিছু তফাতে এক জন পড়েছিল, তার কাছে গিয়ে আমার দিকে ব্যাকুল ভাবে চাইলে। বুঝলুম—সেই তার মনিব। তাড়াতাড়ি যাবার সময় অসতর্ক ভাবে সোজা (erect) চলে গিয়েছি। লোকটি একটু জলের জন্য ছট্‌ফট্ করছিল। আমি দু'এক সেকেণ্ড মাত্র দাঁড়িয়ে দেখলুম—প্রাণ তার কণ্ঠাগত। কুকুর আমাকে আর দাঁড়াতে দিলে না—তার কাছে টেনে বসিয়ে দিলে বসতে না বসতে দুটি গুলী গায়ে হাওয়া দিয়ে আমার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ফ্ল্যাস্ক্ থেকে তার মুখে একটু জল দিলুম। জলটুকু কষ্টে গলা থেকে নামলো। সৈনিক আমার দিকে চাইলে।

—"তার ইঙ্গিত মত তার ভিতরকার পকেট হ'তে কাগজপত্র আর আঙুল হ'তে একটি আংটী বার করে নিলাম। অতি কষ্টে Good bye বলবার চেষ্টার সঙ্গে—সব শেষ।"

ক্যাপ্‌টেন বুথ নিজের সৈনিকদের সামনে কখনো দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেন না—সতর্ক থাকেন; অথচ সকলকে বন্ধুর মত ভালবাসেন। এক্ষেত্রে সহসা তাঁর অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়তেই, সামলে তাড়াতাড়ি সহজ ভাবেই বললেন,—"আচ্ছা, যাও—এখন খাওয়া সেরে সব শুয়ে পড় গিয়ে,—কখন কি 'বিগল্' পড়বে বলা যায় না।"

"আপনি কিছু খাবেন না?"

"না,—ফিল্ড-কমাণ্ডারের কাছে যেতে হয়েছিল, তিনি কিছু না খাইয়ে ছাড়লেন না। যাও, খেয়ে নাও গিয়ে। হ্যাঁ, আমি পাঁচ-সাত দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, বীরেন চার্জ্জে থাকবে,—বিশেষ জরুরি কায যদি কিছু এসে পড়ে, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানিও,—এই কার্ড রইলো, Miss Harlowর careএ দিলেই আমি পাব। যাও—"

সকলে ধীরে ধীরে চলে গেল। 'ফিল্ড-সার্ভিসে' অফিসারের আদেশ শোনা ও পালন করা ছাড়া, প্রশ্নের অবকাশ নাই।

* * * *

ক্যাপ্‌টেন বুথ একটু শুয়ে থাকবার পরই উঠে পড়লেন। দু' তিন ঘণ্টা শয়নই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তায় আজ আবার নানা চিন্তা তাঁর মনকে পীড়িত, অশান্ত ও বিচলিত করে' রেখেছে।

সৈনিকটির সুন্দর সুশ্রী চেহারা দেখেই বিশিষ্ট ভদ্রবংশের ছেলে বলেই তাঁর ধারণা হয়েছিল। তার কথাবার্ত্তাও সেই পরিচয়ই দিয়েছিল। তিনি বিলম্ব না করে' সরাসরি ফিল্ড-কম্যাণ্ডারের কাছে উপস্থিত হয়ে, সকল কথা বলেন ও তার কাগজপত্র ও আংটী, তাঁর হাতে দেন। কারণ—যাদের জীবন সর্ব্বক্ষণই অনিশ্চিত, তাদের সত্বর দায়িত্বভার মুক্ত হওয়াই সমীচীন।

ফিল্ড-কম্যাণ্ডিং কাগজপত্রগুলি এক নজরে দেখেই চমকে 'Oh' শব্দ উচ্চারণ করেই চুপ করেন। অন্যমনস্কে আপন মনেই বলতে থাকেন,—"এ ধ্বংসলীলায় অমন কত যুবাই প্রাণ দিতে এসেছে!"

সামলে, ক্যাপ্‌টেনকে বললেন—"এ সব যাঁর সম্পত্তি, তিনি ব্যারণের ছেলে। ফিরে গিয়ে Miss Harlow-র সঙ্গে বিবাহের কথা ছিল—তিনিও বড় ঘরের মেয়ে—মার্কুইস-কন্যা। তাঁর জীবনটাও নষ্ট হ'ল।—এই শিলকরা পত্রখানি West তাঁকে লিখেছিল, পোষ্ট করতে পারে নি। এ সব তুমি স্বহস্তে তাঁকে দেবে। কালই তোমার যাওয়া চাই,—এই হীরক অঙ্গুরীয়টি আমি অন্যের হাতে দিতে পারব না।—মৃত্যুর পূর্ব্বে West তোমাকে কিছু বলেছিল?"

"সময় তাঁর ছিল না, কেবল মাত্র—Ring not to be separated till life departs —"

"Oh!—আমি জানি, কত বড় নিদারুণ কর্ত্তব্য পালন করতে তুমি যাচ্ছ,—Can't help—Courage my boy."

কি ক'রে যে দুর্ম্মুখের কায করবেন, কি ক'রে যে এই দুঃসংবাদ—আসন্ন মিলনাকাঙ্ক্ষিণী একটি তরুণীকে, যে ভবিষ্যতের জন্য কত সুখস্বপ্নই না রচনা করছে,—তাকে দেবেন? এই চিন্তাই বুথকে অশান্ত ক'রে রেখেছিল।

সহসা রাধারাণীর দেওয়া রাখির স্পর্শ অনুভব ক'রে শিউরে উঠলেন। "এ কি! কেনো! কেনই বা দিলেন!"

* * * *

ন্যানী ঘুম ভেঙে দেখে—ক্যাপ্টেন্ বসে' আছেন,—চিন্তামগ্ন!

"একি! আপনি শোন্ নি?"

মুখে একটু ম্লান হাসি টেনে বুথ্ বললেন,—"শুয়েছিলুম, দুয়েকটা কথা মনটাকে চঞ্চল করায় উঠে পড়লুম। তারা মাথাটাকে পেয়ে বসেছে—ছাড়ছে না। এতে প্রত্যবায় আছে, এদের প্রশ্রয় দেওয়া জীবন-মরণ-ক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষের অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এদের মাথা থেকে দূর ক'রে খোলসা হতে চাই,—তাই তোমার অপেক্ষা করছিলাম।"

"ডাকেন নি কেনো?"

"ঘুমের তোমার দরকার। শোনো—কিছুদিন থেকে একটা কথা আমাকে অশান্ত ক'রে রেখেছে। যত দিন যাচ্ছে বা কাটছে, সেটা সর্ব্বক্ষণ আমাকে চঞ্চল করছে। তাতে কোনোদিন আমার অজ্ঞাতে আমার কর্ত্তব্যের ক্ষতি করে দিতে পারে—এই চিন্তাই আমাকে বেশী কষ্ট দিচ্ছে। নিশ্চিত মৃত্যুমুখে সর্ব্বক্ষণ থাকতে হয়—এখন সেই কথাটাই ইতস্ততঃ আনে, ভগবান রক্ষা ক'রে যাচ্ছেন। ভয় কোনোদিন আমার ছিল না, আমাকে স্পর্শই করেনি—তবু কেন ইতস্ততঃ আসে? তা হতে আমি মুক্ত হতে চাই। শেষ তোমরা কি বদনাম নিয়ে ফিরবে? না—তা হতে পারে না, ভগবানের কাছে পরিষ্কার থাকা চাই, সেখানে লুকোচুরি চলে না।"

ক্যাপ্টেন উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে লাগলেন।

ননী রুদ্ধশ্বাসে বিস্মিতের মত শুনছিল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি এমন কথা, ক্যাপ্টেন? আমাদের দ্বারা..."

বুথ্ বললেন—"তুমি বোধ হয় জান না—চন্দননগর হ'তে যুদ্ধযাত্রার অব্যবহিত ক্ষণে, বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তে রাধারাণী দেবী আমার ডান হাতে এই রাখিটি বেঁধে দিয়ে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় তাঁর বক্তব্য শেষ করেন, বলেন—'দেশে ফিরে আপনি স্বহস্তে আমার হাতে এটি ফিরিয়ে দেবেন, আমি এটি ফিরে চাই।' মৃত্যুপথযাত্রীর সকলের সব কথার অর্থবোধের সময় সেটা ছিল না। আমিও তা বুঝিনি। এখন যত দিন যাচ্ছে, যত ধূম আর প্রলয়-অগ্নির বিভীষিকা বাড়ছে, ততই ওই রাখি চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে তাঁর সেই সুস্পষ্ট আবেদন শোনাচ্ছে—'আমাকে স্বহস্তে ফিরিয়ে দিতে হবে—আমি এটি ফিরে চাই।'

—"স্ত্রীজাতির স্বভাবসুলভ মমতা-মাখা মন ওরূপ বিপদসঙ্কুল বিদায়ের সন্ধিক্ষণে, ব্যথা-বিচলিত হয়েই থাকে কিন্তু ওরূপ জনসঙ্ঘের মধ্যে যিনি নিজেকে সংযত করতে না পেরে এই কাযটি করেছিলেন, তার পশ্চাতে যে কতটা স্নেহ

ভালবাসা ও শুভকামনা থাকা সম্ভব, তা সহজেই অনুমান করা যায়; অথবা sentiment এর সাময়িক প্রেরণা তাঁকে এ কায করিয়েছিল, সেটা আমার কাছে অস্পষ্ট হলেও আমার প্রাণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে আছে। তাঁর এই রাখি আমি শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত ধারণ করে রয়েছি। তাঁর অনুরোধ মত এই রাখি স্বহস্তে তাঁর হাতে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আমার থাকবে, কিন্তু তা পারা না পারা তো আমার ইচ্ছাধীন নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সে আমার প্রতিভঙ্গ করে, কর্ত্তব্যে ইতস্ততঃ আনে। এ বাধা হতে আমি মুক্ত হতে চাই।"

ননী।—আমি কি কিছু…

বুথ।—হ্যাঁ, দেখ, এখানে সর্ব্বক্ষণই আমরা মৃত্যুমুখে। মৃত্যু এখানে বিস্ময়কর বস্তু নয়—সহজ। তার ভাবনা যে ভাবে, সে সৈনিক নয়। মৃত্যুকে বরণ করেই এখানে আসতে হয়—আসাটাই সত্য, ফেরাটাই অনিশ্চিত। কোন্ দিন কার কি ঘটবে, কেউ জানে না। তুমি জান, আমি শত্রুপক্ষেরও পরিচিত হয়ে পড়েছি। যদি কোনদিন…

ননী আর শুনতে না পেরে চঞ্চলভাবে বলে ফেললে—"এখন কি করতে বলেন?"

বুথ বুঝতে পেরে হাসিমুখে বললেন—"এ সব 'যদির' কথা, ন্যানী। তখন আমার হাত থেকে রাখিটি খুলে নিও—যত্ন করে রেখো,—যিনি দিয়েছিলেন, তাঁর হাতে দিও। আর যা বলবার হয় তাঁকে বোলো। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন…। কর্ত্তব্যে কখনো অবহেলা ক'র না—বাকিটা ভগবানের হাতে। আচ্ছা, এইবার আমি একটু বিশ্রাম করি।"

ননী যে অবস্থায় ছিল, বজ্রাহতের মত সেই ভাবেই নিস্পন্দ, নির্ব্বাক বসে রইল।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সর্ব্বশুভ্রা

নির্ম্মল নীল স্নিগ্ধ আকাশে দেখা যায় রথখানি!
বাতাস জানায় পরম পুলকে—আসে বসন্তরাণী।
কুসুম-বল্গা মরাল-যোজিত,
শ্বেত-শতদলে রথ সজ্জিত,
শুভ্র-তুষার-কিরীট-শোভিত—আসে ঐ বীণাপাণি!
দেখা যায় রথখানি।

আরতি-প্রদীপে সাজায়েছি থালি, মঙ্গল হেম-ঝারি;
পরাণ এনেছে নয়ন ভরিয়া পঙ্কতীর্থ বারি।
এস গো শুভ্রা, করুণারূপিণী,
এস চঞ্চলা, এস উদাসিনী,
জীবের জীবন-মানস-মোহিনী, তমসায় অপসারি,
লহ গো ভকতি-বারি!

মুনিজনগণ-বন্দিতা তুমি, যোগীর সাধন-ধন,
তুমি নিশীথের তমিস্র-প্লাবন, অলসের ভীরু মন!
এস গো সূর্য্যা, জ্ঞানের খনিকা,
ছড়ায়ে আঁধারে আলোর-কণিকা
মানস-ভুজগ মাথার মণিকা; এস মন-সুশোভন,—
যোগীর সাধন-ধন!

শুভ্র অলক, শুভ্র নয়ন,—শ্বেত-বাস-পরিহিতা,
উপনিষদের তুমি রহস্য—বেদ, ভাগবত, গীতা।
মহাভারতের পার্থ-সারথি—
একদিন মা গো হয়েছ, ভারতি,
গোকুলে কালিকা—পেয়েছ আরতি, অশোকবনেতে সীতা,
—সিতবসনান্বিতা!

শ্বেত-কুসুমের মালিকা কণ্ঠে, শুভ্র-কমল-আসনা,
জ্ঞান-প্রসবিনী, হৃদয়ে জননী দাঁড়ায়ে পূরাও বাসনা;
কি কথা জেগেছে অন্তরাকাশে—
জানাইতে চাহি তোমারে আভাসে,
শিখাও আমারে গোপন ভাষা সে, চির অনন্তশাসনা!
পূরাও প্রাণের বাসনা।

হৃদয় আমার টলমলটল ভাব-বন্যায় আজি,
শ্বেত-শতদল চরণ-পরশে ছড়ায় সুষমারাজি,
খেলিছে মরাল, উছল সরসী,
হাস মা বারেক অমৃত বরষি,
দেহ গো মরালে চরণ পরশি, উঠুক বীণাটি বাজি,—
ভকত-হৃদয়ে আজি!

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীরাধা

৩

জগন্নাথ-বল্লভ নাটক ঃ—

রায় রামানন্দ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাপ্রভুর এক জন প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটক বা 'রামানন্দ-গীতি' নাটক তাঁহারই রচনা। এই নাটকের শ্রীরাধা-চরিত্র আলোচনা আমাদের প্রবন্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকের প্রথম অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়—নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ। মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে যে অভিলাষ জন্মে,তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। এই পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভের অন্তর্ভুক্ত। এই নাটকে এইরূপভাবে নায়ক নায়িকার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে।

সখা রতিকন্দল সহ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। যমুনা-তীরবর্ত্তী কাননে প্রবেশ করিয়া বৃন্দাবনের বাসন্তী-শোভা শ্রীকৃষ্ণ একমনে উপভোগ করিতেছেন। কোকিলের স্বর, মলয়-পবন, পূর্ণচন্দ্র,—সকলই যেন আজ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রীতিকর অনুভূত হইতেছে। অশোকপল্লব ভগ্নদর্শনে তিনি ব্যথিত হইয়া মধুমঙ্গলকে হৃদয়-বেদনা জানাইতেছেন। এদিকে বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধা লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া মদনিকা ও বনদেবীর (সহচরীদ্বয়ের) নিকট উপস্থিত।

"কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং।
পঙ্কজমিবমৃদুমারুত চলিতম্ ॥
বিনিদধতী মৃদু-মন্থর পাদং।
রচয়তি কুঞ্জরগতিমনুবাদম্ ॥
কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ সমুদিত মনসিজ বাধা ॥
জনয়তু রুদ্রগজাধিপ মুদিতং।
রামানন্দ রায় কবিগদিতম্ ॥"

শ্রীরাধা সখীগণ সঙ্গে কুঞ্জে আসিয়াছেন। সখা রতিকন্দল মনে করিতেছেন, তাঁহারা তিনটি সোণার পুতুল। শ্রীকৃষ্ণ সখার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। শ্রীরাধা মদনমোহনকে অবলোকন করিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ইনি কে?' মদনিকা তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

"সোঽয়ং যুবা যুবতিচিত্তবিহঙ্গশাখী
মাক্ষাদিব স্ফুরতি পঞ্চশরো মুকুন্দঃ।
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি সুন্দরীণাং
নীবি স্বয়ং শিথিলতামুপযাতি সদ্যঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাকে ঈষৎ অবলোকন করিয়া তাঁহার বদনচন্দ্রিমার তুলনা কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তৎপর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে সকলেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে পূর্ব্বরাগের পরে শ্রীরাধিকার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সখীগণ বলিতেছেন, চন্দ্রের কিরণ এখন আর তেমন স্নিগ্ধ অনুভূত হয় না, কোকিলের কূজন এখন তাঁহার কর্ণে বিষ ছড়াইতেছে, তাঁহার হৃদয় এখন সম্পূর্ণ অস্থির। আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে এখন শ্রীরাধা লোচনদাস ঠাকুরের ভাষায় ঃ—

—"কি কহব রে সখি, মনসিজ বাধা।
নব নব ভাবভরে, তনু অনু পুলকিত,
শিব শিব জপতহি রাধা ॥
শীতল চন্দন, পরশে সমাকুল,
পিকরুতে শ্রবণ হি ঝাঁপ।
মলয়-সমীর, পরশে হই জর জর,
থর থর নিশি দিশি কাঁপ ॥
অলিকুল গান, শুনই বরনাগরী,
উথলত মদনবিকার।
গুরু-পরিবাদ, গোপত লাগি,
নাগরী রচয়তি বালকবিহার ॥
নয়নযুগল গল, বারি নিরন্তর,
ঝমরু বদন-সরোজে।
তিমির-তিরোহিত, নিভৃত নিকেতনে,
চিন্তই ব্রজকুলরাজে ॥
রাইক বদন, বেদন হেরি সুন্দরি,
ফাটত হৃদয় হামারি।
পামরি লোচনদাস, মরি যায়ব,
সোতুখ সহয়ি না পারি ॥"

শ্রীরাধা অশোকমঞ্জরীকে পদ্মদল আনিতে অনুজ্ঞা করিতেছেন। তাহার উপরে তিনি শয়ন করিবেন। অশোকমঞ্জরী স্বকার্য্যে গমন করিয়াছেন। শ্রীরাধা মদনিকা সহ শুক পাখীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ গ্রহণ করিয়া যেথায় শশিমুখী ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন হইতেছিল, তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের আলাপ শুনিবার জন্য গা'ঢাকা দিয়া রহিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ শশিমুখীর নিকট হইতে শ্রীরাধালিখিত প্রণয়-পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া বুঝিলেন, শ্রীরাধার অনুরাগ অসীম। কিন্তু সহজে ধরা দিবার পাত্র তিনি নন। পত্র পাঠ করিয়া তিনি যেন কিছুই জানেন না, কিছুই বোঝেন না, এইরূপ ভাব অবলম্বন করিলেন। কিন্তু মদনিকা শ্রীকৃষ্ণের হাবভাবে তাঁহার অন্তরের খবর পাইলেন। তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীরাধাকে তাঁহার ন্যায় এক গোপবালকের জন্য কুলমর্য্যাদা, লজ্জা পরিত্যাগ করিতে সখীর নিকটে নিষেধ করিতেছেন। বিদূষক মদন এই শ্রীরাধিকা তাঁহার অভিলষিত শ্রীরাধিকা একথা স্মরণ করাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তরের কথা বাহির হইয়া পড়িবে বলিয়া সখীর নিকটে শ্রীরাধিকাকে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। ইহার পরে প্রত্যেকে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরে তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়—'রাধা-বিরহ'। শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞায় শ্রীরাধিকা ব্যথিতা হইয়াছেন। শশিমুখী ও মদনিকা কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। শশিমুখী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ স্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অতএব শ্রীরাধাই বা কেন তাঁহার আশা হৃদয়ে পোষণ করিবেন? শ্রীরাধা তখন অতিকষ্টে ধৈর্য্যধারণ করিতেছেন, কিন্তু প্রাণের আশা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। মদনিকা শ্রীরাধার অনুরাগখনির সন্ধান পাইলেন। শ্রীরাধা যখন বিরহের দশমদশায় প্রায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন অর্থাৎ তিনি যখন মৃতকল্পা হইয়াছেন, মদনিকা তখন প্রকাশ করিলেন, শ্রীরাধার প্রণয়লিপিকা পাঠ করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে কিরূপ পুলকের ভাব তিনি দর্শন করিয়াছেন। এমনই সময়ে মাধবী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের [illegible]-পত্র প্রদান করিলেন। মাধবী ও মদনিকা পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া প্রফুল্লিতা হইলেও শ্রীরাধিকা এখনও শঠের বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। মদনিকার উপরে শ্রীরাধিকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলেন, মদনিকা শ্রীরাধিকাকে আশ্বস্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণসকাশে গমন করিলেন।

চতুর্থ অঙ্কে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গল সহ বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন, আর মনে করিতেছেন—'কেন আমি খঞ্জননয়নীকে পরিত্যাগ করিলাম।' শ্রীকৃষ্ণের এখন কলহান্তরিত অবস্থা।

"আপন শিরোহা আপন হাতে কাটিনু
কাঁহে করিনু হেন মান।"

অতঃপর মদনিকা আসিয়া শ্রীরাধাকে কেশরকুঞ্জে লইয়া আসিবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীরাধা এইবার তমোভিসারিকার বেশে কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্ম, দুর্ভেদ্য অন্ধকার অগ্রাহ্য করিয়া অভিসারে চলিয়াছেন। মদনিকার সঙ্কেতস্থলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া শ্রীরাধিকা বিপ্রলব্ধার ন্যায় মনে করিতেছেন—হয় তো সখী চতুরতা করিয়াছেন।

"তিমির-তিরোহিত সরণী।
গিরিষু দরীষু সমেব হি ধরণী॥
চিরয়তি কিং সখি দেবী।
বিধিরপি ময়ি কিমু ন হি হিতসেবী॥
অহিবাহিত ভীমং।
বিফলমিদং কিমুগহনমসীম্॥
সুখয়তু রুদ্রগজেশং।
রামানন্দরায়কৃতমণিশম্॥"

মদনিকা আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা বর্ণনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেশরকুঞ্জে আগমন করিয়া শ্রীরাধাবিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধা কেন আসিতেছেন না, হয়তো কোন বিপদ ঘটিয়াছে, কিংবা কুঞ্জ এত দূরে অবস্থিত বলিয়া শ্রীরাধিকার আসিতে বিলম্ব হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপ ভাবনায় আকুল, সখীসহ শ্রীরাধিকা তখন কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মদনিকা ও রতিকন্দল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে এক করিয়া দিয়া কুঞ্জান্তরে গমন করিলেন।

পঞ্চম অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়—শ্রীরাধাসঙ্গম। এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলন-মাধুর্য্য ভক্তগণের উপভোগের পরম ও চরম সম্পদ।

চারিদিকে মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোল, কেশরকুঞ্জ পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন প্রিয়-সঙ্গমের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। মিলনানন্তর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে ভীষণ এক কোলাহলে জনপদসমূহ চকিত হইয়া উঠিল। অরিষ্টাসুর আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার ভয়ে বৃন্দাবনবাসী সকলে বিব্রত হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে অরিষ্টাসুরের নিধন সাধন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে বিপন্মুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলে মদনিকা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন মানসে বকুলবৃক্ষতলে শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরাধিকাকে উপবিষ্ট করাইয়া বীজন করিতে লাগিলেন। মদনিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়! তুমি আর কি বাঞ্ছা কর?" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে।"

"পরিণত শারদ-শশধর-বদনা।
মিলিতা পাণিতলে গুরুনদনা॥
দেবি কিমিহ পরমস্তিমদিষ্টং।
বহুতর সুকৃত ফলতি মনুদিষ্টম্॥
পিকবিধুমধুপাবলি চরিতং।
রচয়তি মামধুনা সুখভরিতম্॥
প্রণয়তু রুদ্র নৃপে সুখমমৃতং।
রামানন্দভণিতহরিরমিতম্॥"

খৃঃ দ্বাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিশিষ্ট নাট্যকার ও পদকর্ত্তাদের রচনা অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধাচরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। আমরা সর্ব্বত্রই প্রায় দিব্যোন্মাদিনী শ্রীরাধাকেই দর্শন করিলাম। চণ্ডীদাসের "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥" সেই শ্রীরাধাকে আমরা প্রায় সকল বৈষ্ণবগ্রন্থেই তদবস্থ দেখিতে পাই।

বৈষ্ণব-কাব্য, নাটক ও পদাবলী রসের চিরন্তন নির্ঝর। রসবিকাশের এরূপ পরাকাষ্ঠা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণবগণ যে পাঁচটি রসের মধ্য দিয়া রসিক-শেখরকে অনুভব করেন, তন্মধ্যে 'মধুর' রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও রায় রামানন্দের সহিত তত্ত্ব আলোচনায় তাঁহার প্রত্যেক উত্তরেই 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর' উক্তি করিয়া পরিশেষে 'কান্তাপ্রেমকে'ই সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলারস এই কান্তাপ্রেমের মধ্য দিয়াই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য 'প্রেমের রাজ্য—নয়ন-জলের রাজ্য।'—প্রায় সকল বৈষ্ণব-গ্রন্থেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রজবিলাস সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে পাঠকদিগকে ভাবুক হইয়া পরে এই মধুর রস আস্বাদন করিতে হইবে। রক্ত-মাংসের চক্ষু লইয়া সর্ব্বপ্রথমেই রসাস্বাদন করিতে গেলে প্রেমরসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না, পাঠকগণ কলুষিত-দৃষ্টিতে এই প্রেম-রসকে দেখিবেন। সুতরাং অগ্রে ভাবুন, পরে রসাস্বাদন করুন।

মহাপ্রভু ভক্ত-শিষ্যগণসহ নিয়ত এই রস উপভোগ করিতেন এবং রসাবেশে বিভোর হইয়া পড়িতেন। ভক্ত ও শিষ্যগণের এই শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমনির্ঝরিণী পরম ও চরম সম্পদ। তাঁহারা আনন্দে বিভোর হইয়া এই রস নিয়ত উপভোগ করেন। "ব্রজের নিগূঢ়রসের এই আবেদন আধুনিক সুসভ্য যুগের মানুষকেও যে ভুলায়, তাহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ।" তিনি এই রসাস্বাদন করিয়াই লিখিয়াছিলেন :—

"আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হ'তে নববঙ্গে
নব যুগের চালক।
* * *
যদি পরজন্মে পাই রে হ'তে
ব্রজের রাখাল-বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক॥
* * * *
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে,
ওরে এ-পার ও-পার আঁধার হ'ল কালিন্দীরি কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া তরীর পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর কলাপখানি তুলে॥"

ব্রজের রাখাল-বালকরূপে পরজন্মে জন্ম লইতে তাঁহার আকুল আগ্রহ।

গুরু-গম্ভীর বরষায় কবির মনে পড়িয়া গেল—অভিসারিকা ও স্বপ্নাভিভূতা শ্রীরাধিকার কথা।

"অন্ধকার যমুনার তীর,—
নিশীথে নবীনা রাধা　নাহি মানে কোন বাধা,
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটীর;
অনুক্ষণ দর দর　বারি ঝরে ঝর ঝর
তাহে অতি দূরতর বন;—
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার,　সঙ্গে কেহ নাহি আর
শুধু এক কিশোর মদন।"
"স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে　ঝুপ ঝুপ্ বৃষ্টি পড়ে—
শুয়ে শুয়ে সুখ-অনিদ্রায়।
'রজনী সাঙন ঘন　ঘন দেয়া গরজন'
সেই গান মনে পড়ে' যায়।
'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে　বিগলিত চীর অঙ্গে'
মন-সুখে নিদ্রায় মগন,—
সেই ছবি জাগে মনে　পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জ্জন স্বপন।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস　অধরে লাগিছে হাস
কেঁপে উঠে মুদিত পলক,
বাহুতে মাথাটি থুয়ে,　একাকিনী আছে শুয়ে,
গৃহকোণে ম্লান দীপালোক;
গিরিশিরে মেঘ ডাকে,　বৃষ্টি ঝরে তরুশাখে,
দাত্তরী ডাকিছে সারারাতি,
হেন কালে কি না ঘটে,　এ সময়ে আসে বটে
একা ঘরে স্বপনের সাথী।
মরি মরি স্বপ্ন শেষে　পুলকিত রসাবেশে
যখন সে জাগিল একাকী,
দেখিল বিজন ঘরে　দীপ নিবু নিবু করে
প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি';—
বাড়িছে বৃষ্টির বেগ,　থেকে থেকে ডাকে মেঘ,
ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি　স্বপ্নে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া!"

'বৈষ্ণব-কবিতা' শীর্ষক কবিতায় কবি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সহিত পার্থিব প্রেমের সৌসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন
বৃন্দাবন গাথা—এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
মরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার?
এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নর-নারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা?
*　*　*　*
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।
বৈষ্ণব-কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভারে
বৈকুণ্ঠের পথে।
*　*　*　*
এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে' যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে।"

মাইকেলও তাঁহার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন—'কল্পনা' শীর্ষক কবিতাতে—

"চল যাই মহানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন গোপীচয়ে নাচায়ে; সঘনে
পূরি বেণু-রবে দেশ।"

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বি, এ)।

মানসী প্রিয়া

[গল্প

এক

দামিনীমোহন সেন ছিল তাহার পূরা নাম, কিন্তু আধুনিক রুচি অনুসারে নামটা সে একটু ছাঁটিয়া দেয়। অর্থাৎ মোহনের উপসর্গ কমাইয়া সে শুধু 'দামিনী সেন' লিখিত।

যুবকটি গুণবান্ এবং গুণের আদর জানে। কবিগুরুর 'অচলগড়' হইতে যখন তখন সে একটি ছত্র উদ্ধৃত করিত— 'মানীর মান করিব হানি মানীরে শোভে হেন কাজ ?'

দামিনী লেখক, এবং সত্য সত্যই ভাল লেখে। উদীয়মান লেখক হইলেও তাহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িতে-ছিল ধূপের সৌরভের মত। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। কারণ, ওদিকে তাহার লক্ষ্যটাই কম। যদি কোন বন্ধু বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, একটা অবজ্ঞার হাসির সহিত সে বলিত,—"এখনো আমার সেই মানসী প্রিয়া আসেনি, বন্ধু! মানে—যাকে আমি চাই, দিবারাত্র মন যাকে খুঁজে বেড়ায়।"

একদিন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সে উত্তর করিল,—"যাকে আমি—কি বলে—ধর ওয়ার্শিপ্ করি, তেমন প্রিয়া ত পাওয়া চাই!"

তাহার ভাসা-ভাসা চোখ দুইটা জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিল। সে বলিয়া চলিল,—"প্রেম কি ? কোথায় জন্ম তার জান ? মানুষ যেদিন ধরণীর এই বিচিত্র কর্ম্মশালায় প্রবেশ করে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত থেকে তার আত্মায়, স্বভাবে এবং দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে জড়িয়ে যায় প্রেম, এবং এই প্রেম যদি জীবনে কোনো দিন আত্ম-প্রকাশের উপা-দান না পায়, তা হ'লে থাক্‌বে সে তেমনি অঙ্গে-অঙ্গে—শিরায়-উপশিরায়—রন্ধ্রে-রন্ধ্রে—প্রত্যেক শিহরণে! বিবাহ কি ? কে না ক'র্‌তে চায় ? করে তো সবাই। কিন্তু তাকে কি তুমি বল্‌বে প্রেমের অন্তর্ভুক্ত কোন কায ? কখনই না।"

মাথার চুলগুলি দ্রুতহস্তে পশ্চাতের দিকে ঠেলিতে ঠেলিতে সে বলিতে লাগিল,—"না না, এ শুধু স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা যৌন-আকর্ষণ। এমনি একটা আকর্ষণ না থাক্‌লে জগতের কায চল্‌ত না, একটা জাতির স্থায়িত্ব রহিত হ'ত। তাই স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি, এমনি একটা আকর্ষণের সাহায্যে সৃষ্টিটা চালু ক'রে রেখেছে। ওটা এমন কিছু বড় জিনিষ নয়। সাধারণের জন্যেই ও-জিনিষটা,—বিশিষ্টদের জন্যে নয়।"

বন্ধু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "কি জানি, ভাই! তুমি হ'লে সাহিত্যিক মানুষ। তোমার মাথায় অনেক রকম অসাধারণ বস্তু ঘুরপাক্ খাচ্ছে। আমরা একান্ত গতানু-গতিকের পোষমানা জীব, আমাদের কথা ছেড়ে দাও।"

দামিনী গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, সেটা ঠিক! তোমাদের 'নেচারটা' অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু আমার এক-বারেই তা নয়।"

বন্ধু হাসিয়া হতাশের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

দুই

দিন এমনি ভাবেই চলিতেছিল। দামিনীর লেখার প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল কুসুম-সুবাসের মত।

সে উদাসীনভাবে এখানে-সেখানে বেড়ায়, সংগ্রহ করে মনের খাদ্য, খুঁজিয়া বেড়ায় মানসী প্রিয়া। তাহার আবেগ ছুটিয়া যায় দূর-দূরান্তের কোন্ এক অচেনা পুরীর বন্দিনী কুমারীর নিবিড় পক্ষ্মযুক্ত আয়ত লোচনযুগলের সন্ধানে। সে চক্ষুতে কি আছে ? দামিনী কল্পনাদৃষ্টিতে দেখে—সে চোখে

যেন মিনতি ঝরিয়া পড়িতেছে। সে দৃষ্টির ছলছলায়মান ঢেউগুলি আছড়াইয়া পড়ে দামিনীর বুকে।

পার্কে সে রোজই বেড়াইতে যায়। সবুজ ঘাসে ঢাকা ভূমির উপর বসিয়া চাহিয়া থাকে প্রজাপতির মত তরুণীগুলির প্রতি। নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, হয়তো ইহাদেরই মধ্যে আছে তাহার মানসী প্রিয়া, সেই বন্দিনী।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিয়াছে। বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিতেই চোখে পড়িল টেব্‌লের উপর কাগজ-চাপার নীচে একখানা খামে মোড়া চিঠি।

খামখানা তুলিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তাহার পর হাঁকিল, "বেয়ারা।"

বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইতেই দামিনী প্রশ্ন করিল, "এ চিঠি কখন্ এল?"

"আপনি বেরিয়ে যাবার পরই।"

কুঞ্চিত ভ্রূতেই চিঠির উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দামিনী আদেশ দিল, "আচ্ছা যাও।"

পরিষ্কার ইংরেজী হরপে তাহার নাম-ঠিকানা লেখা।

কে লিখিল? কাহার হাতের লেখা হইতে পারে? কোনও মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কি? নাঃ!

দামিনী মাথা নাড়িল। এত পরিষ্কার হস্তাক্ষর তবে কাহার? সহসা তাহার মনে একটা সম্ভাবনা খেলিয়া গেল। ভাবিল, হয় তো—

সে ললাট কুঞ্চিত করিয়া দেওয়ালের একখানা ছবির পানে তাকাইয়া অধর দংশন করিল। হয়তো দুইটি নিবিড় কালো চোখ—

তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ড্রয়ার হইতে কাঁচি বাহির করিয়া খামের একধার কাটিয়া পত্রখানা বাহির করিল। মুক্তার মত হস্তাক্ষর। দামিনী মুগ্ধ। লিপি-মাধুর্য্যের মোহটা একটু কাটিলে চিঠিখানা মনোযোগ দিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিল:—

"নমস্কার। আপনার সঙ্গে পরিচিত না হ'লেও, আপনার লেখার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। আপনার রচনায় আমি মুগ্ধ। মনে মনে ভাবি, যাঁর রচনা এত মধুর—না জানি তিনি নিজে আরও কত মধুর। এতদিন আপনার লেখার ভেতর দিয়ে আপনাকে দেখে এসেছি, কিন্তু এখন আর তা'তে আশ মেটে না। ইচ্ছে জাগে—সাক্ষাৎ আপনাকে দর্শন করি। আমাদের গ্রীষ্মাবকাশের আর মাসখানেক মাত্র দেরি আছে। হয়তো তখন মনের ইচ্ছেটা কার্য্যে পরিণত ক'র্‌বার সুযোগ আসবে। কলিকাতা গিয়ে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন ক'রে আমার সৌভাগ্যের মাত্রা বাড়িয়ে নিতে পারব তখন। শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ইতি—পুষ্প পাল।"

দামিনী লাফাইয়া উঠিল। পুষ্প পাল! তাহা হইলে মানসী প্রিয়া আজ উপযাচিকা হইয়া তাহার দুয়ারে আসিয়াছে!

সে একটা পা চেয়ারে তুলিয়া অপর পা-টা দ্রুত-তালে নাচাইতে নাচাইতে হর্ষোজ্জ্বল-মুখে রাজপথের পানে তাকাইয়া একটা সিগ্যরেট ধরাইয়া লইল। কি সুন্দর নামটি, আহা! পুষ্প!

বাঁ হাতের দুই আঙ্গুলে সিগারেটটা চাপিয়া গুন্‌গুন্ স্বরে সে গান ধরিল,—"কোন্ স্বরগের গরব নিয়ে মধু বুকে ঢল ঢল্।"

কিছুক্ষণ পরে পত্রখানা আবার চোখের সম্মুখে সে মেলিয়া ধরিল। এখন যেন পত্রের প্রতি-অক্ষর চুম্বকধর্ম্মী হইয়া দামিনীর মনকে আকর্ষণ করিতেছে—কি একটা মোহিনী শক্তিতে! কি আশ্চর্য্য! সাদা কাগজের উপর নীলাভ কালো রেখাপাতের সাহায্যে কতকগুলা বাক্যের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু সেই বাক্য-সমষ্টি একীভূত হইয়া যেন এক প্রাণময়ী তরুণীর বেশে দামিনীর মানস নয়নের সম্মুখে আবির্ভূতা। কি অপরূপ সে মুর্ত্তি! চূর্ণ অলক-গুচ্ছে ঈষদাবৃত ললাটের নিম্নে তুলিকায় অঙ্কিত যুগ্ম ভ্রূ-ধনু! তাহার নীচেই নিবিড় দীর্ঘ পক্ষ্মের ঝালর দেওয়া আয়ত কালো চোখ দুটি! সুঠাম নাসিকার দুই পাশে অরুণাভ গাল দুটি তো একটুখানি টোল খাওয়া—সেটা বেশ প্রীতি-ব্যঞ্জক। গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুখানি। সুগোল চিবুক। গাত্রবর্ণের তুলনা পাওয়া শক্ত। তবে যে চাঁপারঙ্গের সাড়ীটি সেই তন্বীর দেহখানি বেষ্টন করিয়াছে, যেন গায়ের রঙ্গের সহিত সে রঙ্গটা মিশিয়া গিয়াছে। অলঙ্কার? না, ভগবানের দেওয়া এ সৌষ্ঠবময় অঙ্গে অলঙ্কার মানায় না—লজ্জা পায়। তবে হাঁ, কাণে দুটি নীল পাথরের দুল, কণ্ঠে এক গাছা সরু হার, হাতে ঝিক্-ঝিকে দুই গাছা চুড়ি। বাস্—ইহাই যথেষ্ট। দামিনী ইহাকেই এতদিন হৃদয় ভরিয়া চাহিয়াছে, তাহার মানসী প্রিয়া এত দিনে ধরা দিয়াছে।

হঠাৎ একটা কি শব্দ কাণে আঘাত করিতেই দামিনীর সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেল। বিরক্তভাবে হাতের সিগারেটের পানে চাহিয়া দেখে উহা নিবিয়া গিয়াছে। ভস্মদানির উপর সেটা রাখিয়া দিয়া, পত্রখানি খামে পূরিয়া সে উঠিল। মাথা নাড়িয়া মনে মনে স্থির করিল, উত্তরটা সত্বঃই লিখিয়া রাখিবে।

তিন

গ্রীষ্মের ছুটির আর বিলম্ব নাই। দামিনীর হৃদয় এতদিন চাতকের মত পিপাসার্ত্ত হইয়া 'ফটিক জল, ফটিক জল' করিতেছিল। এইবার মেঘ দেখিয়া আনন্দিত। যখন জলধর দেখা দিয়াছে, তখন জল আসিতে বিলম্ব নাই। তাহার কাযের মধ্যে এখন শুধু চিঠি লেখা আর কবিতা রচা। গল্প লেখার উৎসাহটাও জ্যামিতিকক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ, তাহার পুষ্প—সেই মানসী প্রিয়া—আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আপনা হইতে তাহার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে আসিয়াছে শুধু ঐ গল্পের নিমিত্তই।

এখন আর বাহির ভালো লাগে না। বন্ধুদের বৃথা পরিহাসগুলি বিরক্তিকর। তবু তাহার মানসী প্রিয়ার বার্ত্তা সে কাহারও কাছে জ্ঞাপন করে নাই। হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে কৃপণের ধনের মত লুকাইয়া রাখিয়াছে; কিন্তু হতভাগা বন্ধুগুলা ভিতরের কথা বাহির করিবার চেষ্টায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করে। ইহাতে দামিনী মনে মনে অতিমাত্রায় বিরক্ত। মানুষের যেন অপরের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কি অনুসন্ধিৎসু এই মনুষ্যরূপী জীবগুলি!

সেদিন কোথাও কিছু নাই—পল্লব বলিয়া বসিল, "দাও তো হে দামিনী, তোমার মানস-প্রেম আমায় একটুখানি, তার বলে আমি একটা জীয়ন্ত মানসী-প্রিয়া খুঁজে বার করি।"

একদিন দুপুর বেলা সন্তোষের হঠাৎ আবির্ভাব হইল। দামিনী তখন কবিতার খাতায় ঝুঁকিয়া একটা নারী-বন্দনা লিখিতেছে। পশ্চাৎ হইতে খাতাখানা ফস্ করিয়া টানিয়া লইয়াই সন্তোষ পড়িতে সুরু করিয়া দিল। তাহার পর কি জেরা, কি উৎপাত! ইহারা যেন তাহাকে কিনিয়া রাখিয়াছে।

পুষ্পর আসার দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ততই দামিনীর ভয়—কি জানি, ঠিক সেই সময়েই যদি কোন হতভাগা উপস্থিত থাকে বা আসিয়া পড়ে এবং তাহাকে যদি অবিলম্বে তাড়ানো না যায়, তবে প্রথম দর্শনেই প্রিয়াকে কোনো অভিনন্দনই করা হইবে না। নাঃ, মাটী করিল এই ভূতের দল!

চার

বেয়ারা আসিয়া দামিনীর হাতে একখানা পত্র দিল রঙ্গীন-খামে মোড়া। কহিল, "যতীন বাবু বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌ছেন।"

পত্রখানা দামিনীর মুখে যতটা হর্ষ ফুটাইয়াছিল, এই সংবাদটা ঠিক ততটাই বিরক্তি ফুটাইল। সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বেয়ারাকে কহিল, "বল্ গে—এখন দেখা হবে না।"

বেয়ারা চলিয়া গেল, কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যে মূর্ত্তিমান্ যতীন সেখানে হাজির হইয়া উচ্চ হাস্যের ভঙ্গীতে কহিল, "কি ব্যাপার হে? রঙ্গীন খামে চিঠি আস্‌ছে আর পেঁচার মত দিনরাত ঘরে বোসে। আবার সন্তোষের মুখে শুন্‌লুম, কোন প্রিয়াকে উদ্দেশ কোরে কবিতা রচা হচ্ছে; এ সব কি বল ত?"

সে হাসি মুখেই চেয়ারে বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে দামিনী চেয়ার হইতে উঠিয়া উত্তেজনাপূর্ণ বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "কেন তোমরা আমার পেছনে লেগেছ বল ত? তোমাদের কাছে কি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বিক্রি কোরে ফেলেছি?"

তাহার পর সে শয়ন-ঘরের পানে যাইতে যাইতে কহিল, "না যতীন, এখন তুমি যাও, তোমায় যেতে বলার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু কি কর্‌ব, আমি এখন বড় শ্রান্ত—বাস্তবিক, অত্যন্ত ক্লান্ত।"

দামিনী ঘরে গিয়া খিল দিয়া খাম খুলিল। পুষ্পসারের গন্ধে ঘরের বায়ু ভরিয়া উঠিল। দামিনী একবার তাহার ঘ্রাণ লইয়া ধীরে ধীরে সন্তর্পণে একটিবার ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। আঃ, নারী এত মধুর! ঐ জন্যই কবি বলিয়াছেন—

"ভয়াবহ রাত্রি, মরুপথ যাত্রী,
সখি, তব আঁখি-দীপ জ্বালিও।
পিপাসিত হৃদে মম পান্থপাদপ-সম
সখি, তব প্রেমবারি ঢালিও।"

এই যে প্রিয়ার অমৃতবর্ষিণী লিপিকা-বাণী:—

"প্রিয়তম, তুমি যখন আমায় প্রিয়া বলেছ, আমি তোমায় প্রিয়তম বল্‌ব। তুমি লিখেছ, আমি দেখতে কেমন, তার বর্ণনা দিতে। কিন্তু প্রিয়, বাক্য যেখানে প্রেমের মদিরা পানে বিভোর, সেখানে নতুন ভাষা সৃষ্টির ক্ষমতা আমার নাই। তবে তোমার আছে। তাই মিনতি তোমায়, আমি যেমন তোমার রচনার মধ্য দিয়ে তোমায় দেখেছি, তোমার বুকে মাথা রেখে তোমার বাণী শুনেছি, তেমনি তুমিও, ওগো আমার হৃদয়-চকোর, তুমিও আমার লেখার মধ্য দিয়ে আমায় নিঃসংশয়ে গ্রহণ করো। কবে সেদিন আসবে—যেদিন তোমার দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখে দিবস-রজনীর বিদায়-আগমন বিস্মরণ হব! বিদায় প্রিয়তম!

তোমার প্রেমাভিষিক্ত—পুষ্প।"

দামিনীর মন হর্ষ-মদিরার নেশায় রঙ্গীন হইয়া টলমল করিতে লাগিল। সে জানালায় গিয়া শিস্ দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল, যতীনটাকে আজ বড় কড়া কথা শোনান হয়ে গেছে।

পাঁচ

দিন পাঁচেক হইল গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইয়াছে। দামিনীর হৃদয় বড় চঞ্চল। আজ তাহার প্রিয়ার আসিবার কথা। ব্যস্তভাবে তদারক করিয়া বেড়াইতেছে—বাড়ী-ঘর নিখুঁত-ভাবে পরিষ্কার হইল কি না। বাবুর্চী ঠিক রাঁধিতেছে কি না। দেখিতে দেখিতে নীচের ড্রইংরুম ও দামিনীর শয়ন-ঘর সুমার্জ্জিত হইয়া নব সজ্জায় ঝলমল করিতে লাগিল। কিন্তু দামিনীর পাশের ঘরটাই সব চেয়ে বেশী সজ্জিত হইয়াছে; কারণ, পুষ্প আসিয়া সেইখানেই শয়ন করিবে।

একটা বিষয়ে দামিনী বড় বিমনা হইয়া পড়িয়াছে—হাওড়া ষ্টেশনে তাহার যাওয়া হয় নাই। কয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম্মে পুষ্প অবতরণ করিবে, তাহার জানা নাই এবং জানিয়াও নাই। অবশ্য ষ্টেশনে যাইয়া খুঁজিয়া লইতে পারিত, কিন্তু যদি তৎপূর্ব্বে পুষ্প তাহাকে প্ল্যাটফর্ম্মে না দেখিতে পাইয়া তাহার অনুপস্থিতি কালেই বাটীতে আসিয়া পড়ে তাহাকে বাটীতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যায়? সব চেয়ে বাড়ীতেই অতিথির সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করা ভাল।

দামিনী আরও চিন্তা করিয়া দেখিল, পুষ্প কিছু নূতন কলিকাতায় আসিতেছে না। সে অশিক্ষিতা নয়, দস্তুর-মত কলেজে-পড়া শিক্ষিতা, আধুনিকা। সেকালের বামী-শ্যামী নয় যে, স্বামীর কোঁচা ধরিয়া অন্ধ সাজিবে আর রাস্তায় সাহেব দেখিলেই ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিবে। ষ্টেশন হইতে তাহাকে না আনিতে গেলেও, সে নিজেই অনায়াসে বাড়ী খুঁজিয়া আসিতে পারিবে।

ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। দামিনীর হৃদয়েও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া কে যেন হাতুড়ি পিটিল। উঃ, প্রথম সম্ভাষণটা কি ভাবে করা যাইবে? সে মনে মনে নানা কথাই ভাঁজিতে লাগিল।

সহসা দুয়ারে একখানা ট্যাক্সি থামিল। দামিনী ছুটিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই দেখিল, একটি চশমাধারী যুবক নামিতেছে। সে বিরক্তমুখে বৈঠকখানায় ফিরিয়া গিয়া একখানা চেয়ারে বসিতেই যুবকটিও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

দামিনী এক পলক তাহার পানে চাহিল। পাতলা ছিপছিপে লম্বা দেহ, মুখের গড়ন মানানসই, লম্বা চুলগুলা পিছনে ঠেলিয়া আঁচড়ানো, পাতলা সৌখীন পাঞ্জাবীর উপর জরীপাড় চাদর, পরিধানে ফরাশডাঙ্গার জরীপাড় ধুতি, পরিপাটী কোঁচাটি মাটীতে লুটাইতেছে, পায়ে দামী পেটেণ্ট লেদার পম্প-শু, চোখে সৌখীন চশমা।

দামিনী তাহার সজ্জা দেখিয়া মনে মনে বলিল, লোকটা যেন শ্বশুরবাড়ী এসেছে। কি সেণ্টের গন্ধ গায়ে! কে এ? যেই হোক্, শীঘ্র বিদায় করা দরকার। হয়তো এখনি সে এসে পড়বে। মনের বিরক্তি গোপন করিয়া কহিল, "আপনি কাকে চান?"

যুবক যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অগাধ জলে এতক্ষণ যেন পড়িয়া গিয়াছিল। দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক কহিল, "এটা দামিনী সেনের বাড়ী?"

"—হ্যাঁ।"

যুবক স্বচ্ছন্দভাবে একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। দামিনীর মুখ অন্ধকার। মনে মনে বলিল, "আ মোলো, এটা যে গেড়ে বস্‌ল। কে এটা এমন সময়ে জ্বালাতে এল?"

বিরক্তিভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

—"পাটনা থেকে। আজ আমার এখানে আসবার

কথা ছিল। আপনি অনুগ্রহ কোরে যদি একবার দামিনী সেনকে খবর দেন। বলুবেন, পুষ্প পাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

সহসা দামিনী টেবলের কোণটা চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিল। মনে হইল, সমস্ত পৃথিবীখানা দুলিতেছে, চেয়ার সমেত সে যেন পাতালে নামিয়া যাইতেছে।

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ সহ টেবলের উপর মাথাটা রাখিতেই পুষ্প পাল ব্যস্ত ভাবে কহিল, "কি হ'ল আপনার? কিছু অসুখ ক'রছে কি?"

অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া দামিনী কহিল, "কি নাম বল্লেন আপনার?"

পুষ্প পাল নামটার পুনরুক্তি করিতেই দামিনী কহিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি শুনেছি আপনার নাম তো। কিন্তু আপনার কি সব নামটাই ঐ, না আর কিছু ছিল?"

পুষ্প পাল কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "হ্যাঁ, আগে ছিল পুষ্প বিলাস পাল, কিন্তু অতবড় নামটা যেন বওয়া যায় না তাই—"

দামিনী তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল। তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। কিন্তু শেষে দামিনীই কথা কহিল। বলিল, "হ্যাঁ, দামিনী আমার বোন।"

পুষ্প উচ্ছ্বসিত ভাবে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দামিনী বাধা দিয়া কহিল, "থামুন, আমার কথা শেষ হয়নি। সেই দামিনী, আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, হ্যাঁ, সেই দামিনী সেন কাল রাত্তিরে মারা গেছে এশিয়াটিক কলেরায় ছ'ঘণ্টার মধ্যে।"

কথার শেষে দামিনীর দুই চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পুষ্প তখন চেয়ারের হাতল ধরিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে!

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।

কইয়ো খবর বন্ধুর আগে—

বন্ধুর আগে কইয়ো খবর—শুইন্যা তুমি যাও
(ভিন্ গাঁয়ের ও লোক)
আমার দ্যাশের চাঁদ সুরয্ দেখ্‌তে কি ভাই পাও,
(কইয়ো বন্ধুর আগে)
আমার গাঙের বালুর চরে
শালিক চড়াই নাচনা করে
আমার শাড়ীর আঞ্চলখানি দোলায় পূবেন বাও।

মোর যে বাড়ীর জামের গাছে কুটুম পক্ষী ডাকে
(শুইন্যা তুমি যাও)
আমার কুটুম আইসে না কো এই না গাঁয়ের বাঁকে।
(বন্ধুর আগে কইয়ো)
এই দ্যাশেতে সাঁঝ বিয়ানা
আইসে কারা যায় না জানা
তাদের মধ্যি আমার সে জন গোপন না কো থাকে।

আমায় ছাইড়া যে-জন গেছে পদ্মাপাড়ের গাঁয়;
(গাল দেবো না তায়।)
তার কথা আর কইমু কি গো কইমু তোমার ঠাঁয়।
(দুখ্যু অঢেল মোর)
রোজগারে যার বস্যাছে মন
আন্-ভাবনায় রয়না সে জন
আমি যে তার পইড়্যা আছি নাই মনে তা হায়।

তারে যে আজ কি কই আমি কইবার কি বা আছে
(ভিজি চোখ্যের জলে)
সুখ নিয়ে সে থাকুক বন্ধু শাপ লাগে তায় পাছে।
(গাল দেবো না তায়)
খুশি তাহার থাকুক যেথায়
আমিই বন্ধু রইমু হেথায়
কইয়ো বন্ধু দেখ্যা হলে চাই না তারে কাছে।

বন্দে আলী মিঞা।

ইতিহাসের অনুসরণ

আদিশূর

বাঙ্গালায় আদিযুগের নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন গহ্বরে কত নৃপতির নাম এবং কীর্ত্তি যে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তন্মধ্যে আদিশূরের নাম বিস্মৃতিতে বিলীন না হইলেও কতকগুলি খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিশারদ তাঁহাকে একেবারেই আমলে আনিতে চাহিতেছেন না। আদিশূরের কীর্ত্তির সমুজ্জ্বল দীপ্তিই তাঁহার স্মৃতিকে এ পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইতে দেয় নাই। বঙ্গীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যের ভাস্বর ভাস্কর স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রখর প্রতিভাশালী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ রায় শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এবং খ্যাতিমান্ ঐতিহাসিক পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আদিশূর বলিয়া পরিচিত ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বরকে আমল দিতে চাহেন নাই। কিন্তু শূর-বংশের সেই নৃপতির কীর্ত্তি কথা অতীত যুগের সাহিত্যের এত অধিক স্থান জুড়িয়া আছে যে, তাহা কঠিনতম শিলালিপির ন্যায় তাঁহার নামকে তিমিরতলে তলাইয়া যাইতে দিতেছে না। আদিশূরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ না করিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার সমকালীন কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন বা মুদ্রা আজিও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই কারণে এক জন কীর্ত্তিমান্ নরপতিকে বাস্তব ক্ষেত্র হইতে কল্পনার ক্ষেত্রে নির্ব্বাসিত করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। তাম্রফলক বা মুদ্রা না পাইবার অনেক কারণ ঘটিতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, ঐ সকল তাম্রফলক, গ্রাম্য চাষী এবং অশিক্ষিত লোকরাই পাইয়া থাকে। তাহারা উহার মর্য্যাদা বুঝে না। ধাতুমূল্য যাহা কিছু পায়, তাহার লোভে উহা গালাইয়া ফেলে। আমার জনৈক পরিচিত ব্যক্তি কোথা হইতে দুইটি প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিল। উহা সুবর্ণের। উহার আকার যেন কতকটা কাঁইবিচির (তেঁতুলের বিচির) মত। একদিকে একটি মূর্ত্তি অঙ্কিত, অন্যদিকে কি লেখা ছিল—আমি তাহা পড়িতে পারি নাই। আমি অনুমান করিয়াছিলাম, উহা একটি প্রাচীন মুদ্রা। ঐ কথা বলিলে লোকটি তাড়াতাড়ি ইহা আমার হাত হইতে লইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেইদিনই সেকরার দোকানে যাইয়া উহা গালাইয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপ কত মুদ্রা, কত তাম্রশাসন যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা বলা কঠিন। প্রায় ২৬ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের মহেশ্বরদি পরগণার বেলাব গ্রামের এক জন মুসলমান মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে একখানি তাম্র-শাসন পাইয়াছিল। সে উহা স্বর্ণপত্র মনে করিয়া উহার উপরিস্থিত রাজমুদ্রাটি চাঁচিয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হউক, দৈবযোগে সেটি নষ্ট হয় নাই। উহা একটি মূল্যবান তাম্রশাসন বলিয়া পরে প্রকাশ পায়। এইরূপ বিকৃতীকৃত তাম্রশাসনাদির পাঠোদ্ধার করাও সহজ নহে। এরূপ অবস্থায় সাহিত্যের বহু স্থানে যাঁহার নাম আছে, তাঁহার তাম্রশাসন বা মুদ্রা না পাইলেই তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা সঙ্গত হইতে পারে না।

আদিশূরের নামের কোন তাম্রশাসন বা মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কুলগ্রন্থে এবং কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির যাবতীয় কুলশাস্ত্রে যাঁহার বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, তাঁহার অস্তিত্ব কেবলমাত্র তাম্রশাসন বা মুদ্রা পাওয়া যায় নাই বলিয়া কি অস্বীকার করা সম্ভবে? কেবল কুলশাস্ত্রে নহে—প্রেম-বিলাস, লঘুভারত, ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত, দুর্গামঙ্গল, এমন কি, আইনী আকবরীতে পর্য্যন্ত যাঁহার অস্তিত্ব স্বীকৃত, তাঁহাকে অস্বীকার করিলে প্রকারান্তরে দেশ-প্রসিদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থের প্রমাণ অস্বীকার করা হয়।

আদিশূর এই অভিখ্যাটি নাম না উপাধি? রবিসেনের কুলপ্রদীপ এবং জয়সেনের বৈদ্যচন্দ্রিকা মতে আদি ঐ রাজার নাম নহে—উপাধি। আদিশূরের আসল নাম ছিল লক্ষ্মীনারায়ণ (১)। আবার মতান্তরে তাঁহার নাম ছিল

(১) যেনানীতা দ্বিজাঃ পূর্ব্বং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ।
জয়তি শ্রীমহারাজ আদিশূরাখ্যকীর্ত্তিতঃ॥
জয়সেন বিশ্বাসের বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা।

জয়ন্ত।(২) এক ব্যক্তির একাধিক নাম বিস্ময়ের বিষয় নহে। পণ্ডিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে আদিশূরের আদি নাম লক্ষীনারায়ণ। আদিশূর অন্য দেশ হইতে আসিয়া এই দেশ জয় করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ "শালবান" বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শালবানের বংশে তিন জন বড় বড় রাজা জন্মিয়াছিলেন। যথা—প্রতাপচন্দ্র, তেজঃশেখর এবং তৃতীয় আদিশূর।(৩) আদিশূরের দুই বিবাহ ছিল। আদিশূরের পিতার নাম ছিল মাধবশূর, পিতামহের নাম ছিল কবিশূর। আদিশূরের প্রথমা পত্নীর গর্ভে কোন সন্তানাদি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি পুনরায় চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখীর পিতার নাম ছিল চন্দ্রকেতু বা বীরসিংহ। ইঁহারা বৈদ্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রমুখীর মাতা ছিলেন ক্ষত্রিয়-কন্যা। নুলো পঞ্চানন সেই জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীকথায় বলিয়াছেন :—

আদিশূর বৈদ্য বটে ক্ষত্রকন্যা পত্নী।
শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজায়া না লাগে অরত্নি॥
কলির ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র সবই সমান।
বিশেষতঃ রাজা হলে নাহি থাকে জ্ঞান॥
রাজায় রাজায় বিভা সবাই ক্ষত্রিয়।
পিতৃমাতৃ এক পক্ষ রাজন্য গোত্রীয়॥
ভূপের ক্ষত্রত্ব হয় শৌর্য্যের প্রকাশ।
নৃপমাত্র ক্ষত্রাচার কলিতে সহাস॥

* * * *

হাত ঘুরায়ে নুলো কয় সবাই উচ্চ হ'তে চায়॥

—গোষ্ঠীকথা।

—(লালমোহন বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক সম্বন্ধনির্ণয়ে উদ্ধৃত)।

এখন জিজ্ঞাস্য—ইহা কি সমস্তই মিথ্যা? ইহাতে একটা ব্যাপার জানা যায় যে, সেকালে ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত অম্বষ্ঠ জাতির বিবাহ হইত। কেহ কেহ বলেন, অম্বষ্ঠ জাতিরাও ক্ষত্রিয় ছিলেন। এস্থলে আমি সেই অবান্তর কথা লইয়া আলোচনা করিব না। কুলশাস্ত্র কুলগ্রন্থ প্রভৃতি বর্জ্জন করিবার বিশেষ হেতু নাই। তাম্রশাসনের লেখা অপেক্ষা তালপাতায় বা তুলট কাগজে লেখা পুঁথি কেন অগ্রাহ্য হইয়া মনে হয়, তাহা আমরা বুঝি না।

বর্ত্তমান সময়ের বহু প্রত্নতত্ত্ববিশারদ কুলগ্রন্থ প্রভৃতির প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল গ্রন্থ অর্ব্বাচীন বা আধুনিক। উহা প্রায় সমস্তই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ আধুনিক হইলেই যে তাহা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ—জনশ্রুতিমাত্রই অমূলক হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত ভুল। রাজা বল্লালসেনের আমল হইতে এদেশে কুলগ্রন্থ সমস্ত লিখিত হইয়া আসিতেছে। বল্লালসেন উহা ভাল এবং নির্ভুল ভাবে লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। তদনুসারে তাঁহার আমল হইতে কুলগ্রন্থ সাবধানে লিখিত হইয়া আসিতেছে। সেকালে অধিকাংশ লোকই মাটীর ঘরে বাস করিত। লোকের মূল্যবান আলমারি ছিল না। মাটীর ঘরে চালির উপর রক্ষিত হস্তলিখিত তালপাতার পুঁথি উই, ঘুণ, ইন্দুর, অগ্নি প্রভৃতির জঠরে পরিপাক পাইয়াছে। বর্গি এবং মুসলমানদিগের অত্যাচারেও অনেক পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।(৪) জলপ্লাবনেও অনেক পুঁথি ভাসিয়া গিয়াছে। শীঘ্র এক পুঁথি হইতে অন্য পুঁথি নকল করিয়া লইতে অনেক

(২) ভূশূরেণ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী॥

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু সংগৃহীত বংশীবদন ঘটকের কুলগ্রন্থ হইতে।

(৩) আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।
বঙ্গরাজ্যাধিরাজঃ স স্বধর্ম্মপ্রতিপালকঃ॥

* * * *

তদ্বংশে জনিতশ্চৈকঃ প্রতাপচন্দ্রভূপতিঃ।
তৎকুলে জনিতশ্চান্যস্তেজঃশেখরসংজ্ঞকঃ॥

তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ।
গৌড়রাজ্যাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহামতিঃ॥

—বিপ্রকুলকল্পলতা।

অপিচ—শূন্যবহ্নি বিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজঃশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥

—লঘুভারত।

(৪) যবনৈশ্চ হৃতং সর্ব্বং পূর্ব্বং বৈ কুলপুস্তকম্।

—কুলতত্ত্বার্ণব।

অপিচ—বর্গিকেন হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ।
ততোঽপি বহুকালেন কৃতা বিপ্রপ্রমাদতঃ॥

—গোপালশর্ম্মা বচন।

ভুল হইত। কোথাও বা বিসর্গ বর্জ্জিত, কোথাও বা 'অঙ্ক' স্থানে 'অঙ্গ', কোথাও শাকের স্থানে শকে এবং শকের স্থানে শাকে হওয়াই সম্ভব। অধিকাংশ স্থলে যাহার হাতের লেখা ভাল, তাহার দ্বারাই পুঁথি নকল করাইয়া লওয়া হইত। কিন্তু সকল নকলকর্ত্তারই যে ভাষাজ্ঞান এবং শব্দজ্ঞান ভাল থাকিত, তাহাও না হইতে পারে। পরের পুঁথি চাহিয়া লইয়া, তাহা হইতে তাড়াতাড়ি নকল করিয়া লইতে শতাব্দের স্থানে শকাব্দে প্রভৃতি প্রমাদ ঘটিতই। ইহা ভিন্ন ঘটক মহাশয়রা পুঁথির অনেক স্থান মুখস্থ করিয়া রাখিতেন—এখনও অনেক ঘটক তাহা রাখেন। পুঁথি নষ্ট হইলে তাঁহারা স্মৃতির সাহায্যে উহা উদ্ধার করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলে সময় সম্বন্ধে অনৈক্য ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াওছে। বিশেষতঃ ঐ সময়ে সম্বৎ এবং শকাব্দ উভয় মতানুসারে বর্ষ-গণনা করা হইত। শাকে লেখা থাকিলে সম্বৎ এবং শকে লেখা থাকিলে শকাব্দা বুঝিতে হইবে। শতাব্দে এবং শকাব্দের লেখায় ঐরূপ গোল ঘটে। এই বিষয়ে সুধী ক্ষিতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার উপর আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অনেকে শাকে অর্থে শকাব্দে করিয়া লিপিকর-প্রমাদের গোলযোগের উপর আবার নূতন গোলযোগ ঘটাইয়া বসেন। সাধারণ অভিধানেও শাক শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে :—"কোন প্রসিদ্ধ রাজার অধিকার বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে বৎসর গণনা করা হয়, যেমন শকাব্দ, সংবৎ বা সন।" (শিবনারায়ণ শিরোমণি-কৃত শব্দার্থ-মঞ্জরী)। কুলপুস্তকে এইরূপ ভুল আছে। কিন্তু তাই বলিয়া আদিশূরের ন্যায় এক জন রাজার বৃত্তান্ত বা বংশ-পরিচয় প্রভৃতি সমস্তই যে সমস্ত কুলপুস্তকে একেবারে ভুল হইবে, ইহা মনে করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিবাহসভায় কুলশাস্ত্রের আলোচনা হইত। বরপক্ষের এবং কন্যাপক্ষের ঘটকদিগের মধ্যে বিচার ও বিতর্ক চলিত,—এরূপ অবস্থায় ঐরূপ মিথ্যা কখনই উহাতে প্রবিষ্ট করান সম্ভব হইত বলিয়া মনে হয় না।

আদিশূর যে এক জন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরমায় আছে যে, নানা দেশের রাজারা আসিয়া আদিশূরের চরণ-পূজা করিতেন। সর্ব্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণবেও ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে যে, আদিশূর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কর্ণাট, কেরল, কামরূপ, সৌরাষ্ট্র, মগধ, মালব এবং গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। (৫) তিনি যে এক জন বিশেষ প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি বৌদ্ধ ভাবে প্রভাবিত তদানীন্তন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সে কথা আমি পরে বলিতেছি। বিশেষ শক্তিশালী রাজা না হইলে বৌদ্ধভাবাপন্ন বাঙ্গালায় ও বেহারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এবং সমাজের প্রতিষ্ঠা করা কাহারও সাধ্য হইতে পারে না। ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করিয়াছেন যে, রাজা আদিশূর এক জন ছোট খাট রাজা বা বড় জমিদার ছিলেন। কিন্তু সেরূপ লোক দ্বারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম স্থাপন কখনই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

মহারাজ আদিশূর ঠিক কোন্ সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আদিশূর ৯১৮ সম্বতে জন্মগ্রহণ করিয়া ৯৩৪ সম্বতে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—তিনি ৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সিংহাসনলাভের কাল ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন। কিন্তু আমার এই মত ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে যে সকল আলঙ্কারিক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই 'বেণীসংহার' হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তন্মধ্যে বামন এবং আনন্দবর্দ্ধনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডক্টর ভাণ্ডারকরের মতে বামনই কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন সুতরাং তিনি অষ্টম শতাব্দীর লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই অতএব

---

(৫) অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধনৃপবরান্ স্বীয় দেশান্ বিদেশান্।
কর্ণাটং কেরলাখ্যং নরবরভটকৈরন্বিতং কামরূপম্॥
সৌরাষ্ট্রং মগধাস্তং নৃপমপি জিতবান্ মালবং গুর্জ্জরঞ্চ
হিত্বা কৈকাণ্যকুব্জাধিপতিমথ নৃপাস্তস্থবশ্যাস্তদাসন্।
—সর্ব্বানন্দ মিশ্র সংগৃহীত কুলতত্ত্বার্ণব।

বেণীসংহারকার ভট্টনারায়ণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। তিনিই আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় আদিশূরও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী রাজা হইতে পারেন না। ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুরের মতে আদিশূর ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কতকটা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। মগধে দুধপানি পাহাড়ে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে মনে হয়, আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ডক্টর কীলহর্ণ (Kielhorn) উহার পাঠোদ্ধার করেন। তিনি লিপির দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, উহা অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। উহা উদয়মান শিলালিপি বলিয়া আখ্যাত। অযোধ্যা হইতে উদয়মান্, শ্রীধৌতমান্ এবং অজিতমান্ নামক তিন ভ্রাতা অর্থার্জ্জনের আশায় তামলিপ্তি বন্দরে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। যখন মগধ রাজ্যের এক বন-পথে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহারা তথায় মগধরাজ আদি-সিংহের সাক্ষাৎ পান। মগধেশ্বর ঐ বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। উদয়মানের সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তথায় তিন ভাইকে তিনখানি গ্রাম দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। ইহাই ঐ শিলালিপির মর্ম্ম। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই মগধাধিপ আদিসিংহই গৌড়পতি আদিশূর। কালের নৈকট্য এবং নামের সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়েই এক ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। আদিশূর এবং আদি সিংহ উভয় শব্দই একার্থবোধক। বরং মগধের লোক শূর স্থানে সিংহ শব্দ ব্যবহার করিতেই পারে। উহা যদি উপাধি হয় ত সন্দেহ আরও গভীর হয়। কিন্তু এই শিলালিপিতে আদিসিংহকে মগধপতি বলা হইয়াছে। গৌড়পতি বলা হয় নাই। আদিশূর মগধ জয় করিয়াছিলেন,—তাহা কুলার্ণব হইতে জানা যায় (৫ম সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা আদিসিংহ এবং আদিশূর একই ব্যক্তি বলেন, তাঁহারা বলেন যে, ঐ গ্রাম দান মগধে হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহাকে এখানে মগধপতি বলা হইয়াছে। কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিয়া সন্দেহ জন্মে সত্য, কিন্তু নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আদিশূর সম্বন্ধে কোন তাম্রশাসন না পাওয়া গেলেও এবং বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তাঁহাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। শূর-বংশের লক্ষ্মীশূর, রণশূর প্রভৃতি কয়েক জন রাজার নামও পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা শূর-রাজগণের সহিত বৌদ্ধরাজগণের যে যুদ্ধ হইত, তাহারও আভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্টের এবং শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে শঙ্করাচার্য্য দেব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে শৈলবংশজাত প্রচণ্ডদেব রাজত্ব করিতেন। শুনা যায়, আচার্য্য দেবের উপদেশ শুনিয়া তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে ভক্তিমান্ হন এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নেপালে যান। গৌড়ে তখন শশাঙ্ক নরেন্দ্রদেব রাজা ছিলেন। শঙ্করের প্রভাবেই ইনি শৈব হইয়াছিলেন এবং হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের অল্প দিন পরেই সম্ভবতঃ আদিশূর সিংহাসনে আরোহণ এবং লোকমুখে শঙ্কর দেবের উপদেশাদি শুনিয়া ইনি বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালায় সারস্বত ব্রাহ্মণ (সপ্তশতী) ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ ছিল না। সেই জন্য পঞ্চ-গৌড়ের অধিপতি আদিশূর (মধ্যদেশ কান্যকুব্জ) হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। গৃধ্রপতনাদি ঘটনা কেবল উপলক্ষ মাত্র হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশীয় শ্যামল বর্ম্মাও বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করেন। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

আদিশূর এদেশে ব্রাহ্মণ আনিবার পূর্ব্বে যে এদেশে ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এ ধারণা ভুল। ঐ সময়ে এদেশে সারস্বত বা সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ ছিলেন। ইঁহারা যজ্ঞাদি করিতেন সত্য, কিন্তু বৈদিক-যজ্ঞ করিতে জানিতেন না। আদিশূর এই সারস্বত ব্রাহ্মণদিগকেই রাজপ্রাসাদে গৃধ্রপতনের প্রতিকারকল্পে যজ্ঞ করিতে বলেন। তাঁহারা ঐ কার্য্য করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ সময় এক জন ব্রাহ্মণ বলেন যে, কান্যকুব্জ-রাজার প্রাসাদোপরি এক গৃধ্র বসিয়াছিল। সেখানকার ব্রাহ্মণরা মন্ত্রশক্তির দ্বারা সেই গৃধ্র ধরিয়া তাহার মাংস দ্বারা যজ্ঞ করেন। মহারাজ আদিশূর

সেই কথা শুনিয়া কান্যকুব্জের রাজার নিকট হইতে পাঁচ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কান্যকুব্জ সম্ভবতঃ তখন আদিশূরের অধীন রাজ্য ছিল। দুর্গামঙ্গল গ্রন্থ হইতে ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুর প্রমাণ তুলিয়াছেন যে, মহারাজ আদিশূর বাজপেয় যজ্ঞ করিবার জন্য কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। ঐ সময় বাঙ্গালায় একবার অতিবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্গা-মঙ্গল পাঠে জানা যায় যে,—

প্রজার সতত পীড়া লোক বলে ক্ষীণ,
দুর্ভিক্ষ হইল দেশে ভূমি শস্যহীন।
বন্যায় বুড়িয়া যায় কত শত দেশ,
দ্রব্যের মহার্ঘ্য দেখি প্রজাদের ক্লেশ।

ইহা ভিন্ন আদিশূরের দ্বিতীয়া পত্নী চন্দ্রমুখার সন্তানাদি না হওয়াতে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞও করিয়াছিলেন। তিনি দুই দফায় কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন করিয়া দশ জন 'বেদ-গায়ক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে, তাহার পর ভট্টনারায়ণ প্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কনোজ হইতে বাঙ্গালায় লইয়া আসেন। শেষোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রথমোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই পুত্র। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সারস্বত ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, তাঁহারা অন্ধ্রবংশীয় শূদ্রক নামধেয় এক জন নরপতি কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিলেন। এই শূদ্রক কে? ইনি শশাঙ্ক নহেন ত?(৬) খুব সম্ভবতঃ তিনিই। তিনিই সারস্বত ব্রাহ্মণ (সপ্তশতী নামে পরিচিত)দিগকে বাঙ্গালায় স্থাপন করেন।

ইহা সত্য যে, শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত উপদেশ প্রভাবে শশাঙ্ক বৈদিক ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন। তখন বঙ্গদেশ বৌদ্ধবিপ্লবের প্রভাবে প্রায় ব্রাহ্মণশূন্য হইয়াছিল। শশাঙ্ক-আনীত এই সারস্বত ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালায় সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়েন। ইঁহারা সংখ্যায় নিশ্চিতই সাত শত ছিলেন না। শশাঙ্ক যে পালবংশীয় নৃপতি হইয়া শৈব হইয়াছিলেন, তাহার কারণ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব। বাঙ্গালায় আসিয়া সারস্বত ব্রাহ্মণগণ কিছু অবনত হইয়া পড়াতে আদিশূরকে আবার কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিতে হয়। বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই সম্ভবতঃ শশাঙ্ক বৌদ্ধ রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন।

আদিশূরের রাজধানী ছিল অনেক। তন্মধ্যে মেঘনার পূর্ব্বতীরে রামপাল নগরে তাঁহার অন্যতম রাজধানী ছিল। ইহা ভিন্ন গৌড়েও তাঁহার রাজধানী ছিল। নবদ্বীপ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরস্থ বর্ত্তমান শূটরো বা শূরো নামক পল্লীগ্রাম এখন যেখানে অবস্থিত, সেইখানেও সম্ভবতঃ আদিশূরের পিতৃপিতামহের রাজধানী ছিল। উহার নাম ছিল শূরনগর। এখন জিজ্ঞাস্য, আদিশূরের কোথাকার প্রাসাদে গৃধ্র বসিয়াছিল? সম্ভবতঃ রামপালে। কারণ, ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ যে পাঁচখানি শুষ্ক মালকাঠে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদী ফুল রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, তাহাই গজাইয়া উঠিয়া পাঁচটি গজারী গাছ হইয়াছিল। ঐ পাঁচটি গাছের চারিটি কিছুদিন পূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছিল একটি বোধ হয় এখনও আছে (৭)—উহা রামপালে রহিয়াছে। এরূপ বৃক্ষ ঐ দেশে আর কোথাও নাই।

আদিশূর বর্ত্তমান বঙ্গের উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতিরা তাঁহারই প্রবর্ত্তিত। তিনি বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজের সংগঠনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বহু দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আনীত উচ্চবর্ণের বাঙ্গালী জাতিও যাইতে বসিয়াছে। তাঁহার গজারী বৃক্ষপঞ্চকের শেষ গজারী বৃক্ষটিও শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে। বোধ হয়, বাঙ্গালা শীঘ্রই আবার কিরাতের দেশে পরিণত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

(৬) পুরান্ধ্রবংশজেনৈব শূদ্রকেণ মহাত্মনা।
অপুত্রকেণ ভূপেন পুত্রেষ্টি-যজ্ঞহেতবে॥
দেশাৎ সারস্বতাৎ রম্যাৎ সমানীয় প্রযত্নতঃ।
যজ্ঞান্তেঽস্মিন্ বঙ্গদেশে স্থাপিতা বিপ্রবর্জ্জিতে॥—কুলতত্ত্বার্ণব।

(৭) কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম যে, শেষ গজারী গাছটি শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হীরক

গল্প]

ঘড়িতে সন্ধ্যা ছয়টা বাজিয়া গেল।

স্বামী আসিয়া তাড়া দিলেন, "সাতটায় ট্রেন, ষ্টেশনে যাবে কখন? ঈস, আজ যে ভারী সাজের ঘটা দেখছি?"

স্বামীর প্রীতি-উপহার মুক্তার মালাগাছি গলায় পরিয়া কহিলাম, "সাজ ত তোমাদেরই জন্যে। তোমাদের ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন আমাদের বইতে হয়, নইলে সাজ আবার কিসের?"

তিনি কহিলেন, "আহা কি বিড়ম্বনা! তোমরা একেবারে নির্লিপ্ত উদাসী, কিচ্ছু চাও না; কিচ্ছু জানো না?"

"সত্যি জানি না। তোমরা সাজাতে ভালবাসো বলে সাজি, তোমরা দাও, আমরা নিই। তোমরা হাসালে হাসি, কাঁদালে কাঁদি। তোমাদের ছায়ার প্রতিচ্ছায়া আমরা; ধ্বনির প্রতিধ্বনি।" বলিয়া আমি পাউডারের কৌটা খুলিলাম।

স্বামী বলিলেন, "সব স্বীকার করে নিলাম। কথার বাক্সে এখনকার মত চাবি দিয়ে চল গাড়ীতে গিয়ে বসিগে। শেয়ালদ' এখান থেকে পুরো সাত মাইল, যেতে যেতে বাক্যবাণের আঘাতে আহত করতে যথেষ্ট সময় পাবে।"

বলিলাম, "সময় পেলে কি হ'বে? বেছে বেছে বাঙ্গালী ড্রাইভার রেখে সে রাস্তা বন্ধ ক'রে দিয়েছ? চল যাই, হয়ে গেছে। দেখো ত আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?"

স্বামী চোখ তুলিয়া হাসিলেন, "সাক্ষাৎ উর্ব্বশী, তিলোত্তমা। গালে এক পোঁছ রং মাখলে সোনায় সোহাগা হবে। সেটুকু বাকী রাখলে কেন? চট্‌পট্ সেরে নাও।"

মেয়েদের প্রসাধন নিজের জন্য নহে। পরের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, সেই পরের মুখের খোঁচা খাইয়া লজ্জায় আমার মাথা নত হইল।

আমি পাণের রসে ঠোঁট রাঙ্গা করিয়া চুপে চুপে কহিলাম, "কিবা বেশভূষা করেছি, যাতে এত শোনাচ্ছ? হীরক আমায় প্রথম দেখবে, সে সুন্দর, তাকে আনতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই যেতে হয়।"

"নিশ্চয়, ঘরেরটির জন্যে কিন্তু কখনো তোমায় এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে দেখি নি? বাইরের নামে ভাণ্ডার উজাড়; নতুনের নাম যেমন মিষ্টি, গায়ের বাতাসও তেমনি মধুর?"

কথার ঢংএ গা জ্বলিয়া যায়। আমি রাগিয়া উত্তর দিলাম, "সেটা আমাদের নয়; তোমাদেরই। পরিষ্কার-অপরিষ্কারের খবর জানবে কি করে? ঘরের বৌএর রূপগুণ তোমরা কোন জন্মে দেখে থাকো? যাদের নজর পরের দিকে, তারা আবার আসে আমাদের সমালোচনা করতে?"

"সমালোচনার স্পর্দ্ধা রাখি না; অত সাহস নেই। আত্মবেদনার আভাস দিতে গিয়েই এত লাঞ্ছনা। ঘরের চেয়ে পরের দিকে লক্ষ্য তোমার অনেক বেশী। তার প্রমাণ আয়নায় আর একবার নিজেকে দেখে নাও?" বলিতে বলিতে তিনি নীচে নামিয়া গাড়ীতে বসিলেন।

মনের আক্রোশ মনে চাপিয়া আমাকেও তাঁহার পাশে বসিতে হইল। স্বামীর পরিহাস আমি আজ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে জানিতে আমার বাকী নাই। সন্দেহ, সংশয়, ক্ষুদ্রতা তাঁহার মধ্যে স্থান পায়

না। রস-প্রবণ স্বভাবের নিমিত্ত তিনি অনেক সময় অনেক অবান্তর কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু আজিকার কথাগুলির ভিতর হইতে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার হুল ফুলে ঢাকা কাঁটার মত প্রকাশ পাইতেছিল। হীরক তাঁহারই প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর নহে কি? মাস-দুই পূর্ব্বে তিনি নিজে যাইয়া হীরককে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার আসার আশায় অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছিলেন। হীরক স্বামীর প্রিয়, প্রিয়তম জানিয়াই না আমি তাঁহার প্রিয় প্রসাধন করিয়াছি; ইহা বুঝিবার যাহাদের ক্ষমতা নাই, তাহারা আবার আসে আমাদের নিকটে বিদ্যাজাহির করিতে!

* * * *

আমরা ষ্টেশনে পৌঁছামাত্র ট্রেন আসিয়া থামিল। হীরককে খুঁজিয়া বাহিরে আনিতে স্বামীর বিলম্ব হইল না। তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্যে হীরকের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

হীরক আমার মুখের পানে তাহার উজ্জ্বল আঁখিপল্লব মেলিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসি যেন হাসি নয়, রাশি রাশি ফুটন্ত ফুল; ফুটিতেছে, ঝরিতেছে।

আমি মুগ্ধ-বিস্ময়ে হীরককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, স্বামীর উক্তি মিথ্যা নহে, অতিভাষণ নহে; সত্যই হীরক হীরার মত ভাস্বর, হীরার মত মনোহর। ছেলেটির নবীন সৌন্দর্য্যে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, হৃদয়ে রেখাপাত করে।

আমার কিশোরের আধজাগন্ত আধঘুমন্ত স্বপ্নালস নয়নের সম্মুখে কল্পনার রঙ্গীন তুলিকা একদিন যাহার দিব্যশ্রী, দিব্যমূর্ত্তি চকিতে আঁকিয়া চকিতে মুছিয়া লইয়াছিল; কে জানিত, এতকাল পরে সে রূপকথার রাজপুত্র আমার কুটীরে অতিথি হইয়া আসিবে! এ কি আগমন, না, আবির্ভাব?

আমি নিমেষহারা নেত্রে তাকাইয়া রহিলাম। আমার সম্মুখের যাহা কিছু ছিল, সবই বিলুপ্ত হইয়া গেল। ভোরের শুকতারার মত কেবল উজ্জ্বল, অম্লান হইয়া রহিল হীরক।

স্বামী বলিলেন, "তুমি একটুখানি স'রে বোসো, হীরক থাক মাঝখানে।"

হীরক হাসিতে হাসিতে আমাদের দুই জনের মাঝে বসিয়া আমার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিল। আমি হীরকের বন্ধু-পত্নী, আমার বাহুধারণের অধিকার তাহার অনধিকার-চর্চ্চা নহে। কিন্তু সে স্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোতঃ বহিতে লাগিল। স্পর্শের এমন মাদকতা আমি জানিতাম না। বসন্তের দক্ষিণা সমীরণের উতলা পরশ আজ যেন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ আমার হৃদয়-মালঞ্চের শুষ্ক মুকুল মুঞ্জরিত হইল।

তাহার হাতে হাত জড়াইয়া আমি নীরবে রহিলাম; স্বামীর দিকে চাহিতে পারিলাম না। আমার কোথায় কত বড় একটা অপরাধের সূচনা হইল কি? যিনি আমাকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিভৃতে হৃদয়লক্ষ্মী বলিয়া আদর করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইতে আমি মরমে মরিয়া গেলাম।

আমার লজ্জা, আমার সঙ্কোচ, নিতান্ত আমারই, কেহ তাহার ধার ধারিল না। দুই বন্ধু হাসি-গল্পে সারা পথ মুখরিত করিয়া চলিলেন।

পুরাতন চাকর সোফারের পার্শ্বে বসিল।

* * * * *

হীরকের আগমনে আমাদের নির্জ্জন গৃহে সমারোহ পড়িয়া গেল। স্বামীর মান্য অতিথির জন্য আমি অনেক যত্নে তাহার শয়ন-কক্ষটি সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। পঙ্খের কায করা দেওয়ালে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলাম। মধ্যস্থলে ঝুলান হইয়াছিল বেলোয়ারী ঝাড়, তাহার অভ্যন্তর হইতে লাল-নীল দীপের আভা ফুলপাতা-বিমণ্ডিত মেঝের গালিচার বুকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নূতন মেহগনি খাট, সাটীনের বিছানা, শিয়রে সাদা পাথরের টিপয়ের উপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যে ফুলের মত সুন্দর, ফুলের মত মনোমুগ্ধকর, তাহার বাসস্থানে ফুল না রাখিলে মানাইবে কেন?

গৃহে প্রবেশ করিয়া হীরক আনন্দে উৎফুল্ল হইল। প্রতি দ্রব্যে চক্ষু বুলাইয়া পরিতৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিল। হীরক বেশী কথা বলিতে পারে না, হাসির দ্বারা মৌন ভাষাকে মুখর করিয়া রাখে। হীরকের বন্ধু কিন্তু উল্টা, দিন-রাত বকর বকর। বাক্যের ডিপো, পেশা ওকালতি, কথা বেচিয়া খাইতে হয়। কাণ ঝালা-পালা ব্যাপার।

আমি ভালবাসি না। আমার ভাললাগে অল্প কথা, অনেক—অনেক হাসি।

হীরকের সঙ্গে আমার স্বল্প আলাপটাকে আরও একটুখানি বিস্তৃত করিবার আগ্রহে সবে কাছাকাছি হইয়াছি, এমন সময় স্বামী পঞ্চম স্বরে হাঁকিলেন, "ওগো, হীরককে খেতে দাও আগে, ওর ক্ষিধে পেয়েছে, খেয়ে নিয়ে হীরক এখন বিশ্রাম করুক, অনেক দূর থেকে এসেছে।"

আমি লজ্জিত হইলাম, যথার্থ হীরক বহু দূর হইতে আসিয়াছে। কত বন-বনান্তর নদী-নালা অতিক্রম করিয়া তাহাকে আমাদের কাছে আসিতে হইয়াছে। তাহার খাবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিশ্রামের কথা মনে ছিল না। উনি আবোল-তাবোল বকিলেও কাযের বিষয় টন্‌টনে। হইবে না কেন ? ব্যবসা যে কথা-বেচা।

আহারান্তে হীরক বন্ধুর আজ্ঞায় বিছানায় আশ্রয় লইল। শুধু আশ্রয় লওয়া নয়, অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঝাড়ের আলো নিবাইয়া, একটি মৃদু নীল আলো জ্বালিয়া আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যেমন করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রি সুপ্ত ধরণীর পানে চাহিয়া থাকে—যেমন করিয়া কুমুদ চাহিয়া থাকে সুদূরের চন্দ্রমণ্ডলের পানে, আমিও তেমনই নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম।

অনেক রাত্রে দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আজ কি খাবে না, ঠাকুর ভাত নিয়ে বোসে রয়েছে।"

সচমকে কহিলাম, "বাবুর ভাত দিতে বলগে, তাঁর খাওয়া না হলে কবে আমি আগে খেয়ে থাকি ?"

"বাবুর খাওয়া কোন্ কালে হয়ে গেছে, মা। তিনি শুয়ে পড়েছেন। রাত এগারটা বেজে গেছে।" বলিয়া ঝি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

দাস-দাসীর নিকটে মান বাঁচাইতে আমি খাবারের সম্মুখে বসিলাম বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলাম না। স্বামীর পাতের কাছে আমি না বসিলে তাঁহার যে খাওয়াই হয় না। আজ তাহার ব্যতিক্রমে আমার বুকের ভিতর খচ্-খচ্ করিতে লাগিল। মানুষের মন এমনই অপদার্থ। রূপের মোহ এতই উন্মাদকর, মুহূর্ত্তে বিশ্ব ভুলাইয়া দেয়; নিজেকে ভুলাইয়া দেয়। কোথায় ভাসিয়া যায় চরিত্রের একনিষ্ঠতা—হৃদয়ের একাগ্রতা।

পাশাপাশি দুইটি ঘর, সম্মুখে দালান। আমি স্বামীর ঘরে যাইতে মনস্থ করিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে হীরকের ঘরে ঢুকিলাম।

ধব্‌ধবে নেটের মশারির ভিতরে হীরক অঘোরে ঘুমাইতেছে। আলোর নীলরশ্মি তাহার সুন্দর, সুকুমার মুখে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ধূপের মৃদু গন্ধের সহিত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ সুবাস মিশিয়া কক্ষ সৌরভাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে কৃষ্ণা রাত্রি নিস্তব্ধতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া থম্‌থম্ করিতেছে। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বাতাস তরু-পত্র দোলাইয়া ফিস্‌ফাস্ শব্দে লুকোচুরি খেলিতেছে। তারায় তারায় চলিতেছে ইসারা—কাণাকাণি। দূর দূরান্তরের রাতজাগা পাখীটা পিক্ পিক্ র'বে কিসের যেন ইঙ্গিত করিয়া মরিতেছে। এ সঙ্কেত অভিসারের—এ রজনী অভিসারের। আমি অভিসারের যাত্রী, আমার বাধা নাই, বন্ধন নাই, সংসার নাই; সমাজ নাই। আমার দুর্ণিবার হৃদয়াবেগ স্রোতস্বিনী নদীর মত প্রিয়-অভিমুখে ধাবিত হইতেছে—ছুটিয়া যাইতেছে।

আমি সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া হীরকের শুভ্র, সৌম্য ললাটে একটি চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

হীরক নড়িয়া উঠিল, আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নিজের জায়গায় পলাইয়া আসিলাম।

আমাদের ঘর এক হইলেও বিছানা দুইটি। স্বামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমি শয্যাতলে অঙ্গ ঢালিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ আমার কি হইল ? প্রথম দর্শনে মুগ্ধ-বিহ্বলতা এত কাল গল্পে উপন্যাসেই পড়িয়া আসিয়াছি। কে জানিত, ফল্গুর প্রচ্ছন্ন ক্ষীণ ধারার মত উদ্দাম অপরিমেয় প্রেমধারা আমার অন্তরে লুকাইয়া ছিল, স্বপ্নেও আমি ইহার আস্বাদ পাই নাই। মা গো, এ লজ্জা, পরিতাপ আমি কেমন করিয়া রাখিব ? কিরূপে বলিব,—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

ভোর বেলা স্বামী আমার গা ঠেলিয়া বলিতেছিলেন, "ওগো, ওঠো, কত ঘুমাবে ? হীরক ত চা খায় না, তাকে এক কাপ গরম দুধের যোগাড় করে দাও। কাল এ

মাঘ, ১৩৪৫]

"চমকিত মন, চকিত শ্রবণ
তৃষিত ব্যাকুল আঁখি"—রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

বেচারা বন্দী হ'য়ে রয়েছে, দুধ খেয়ে মাঠ থেকে একটু বেড়িয়ে আসুক।"

আমি চোখ বুজিয়া উত্তর দিলাম, "এত সকালে আমি উঠতে পারবো না। এমন কচি খোকা কেউ আসেনি যে, এখুনি দুধ না হ'লে গলা শুকিয়ে যাবে। নতুন লোক মাঠে পাঠালেই চল্‌বে কি না, সঙ্গে লোক দিতে হবে না?"

স্বামী সহাস্যে কহিলেন, "সে লোক ত তুমিই আছ? সময়ের অপব্যয় হবে ভেবে কালকের সাজ-পোষাক এখনো ছাড়োনি দেখ্‌ছি?

আমি চমকিয়া চোখ খুলিলাম, পরণে আমার রেশমী শাড়ী, গায়ে মখমলের ব্লাউজ, গলায় মুক্তার মালা। মরণ! কি ভূতে আমাকে পাইয়াছে? এ আপদগুলি বদলাইবার কথাও ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া বসিলাম।

স্বামী বলিলেন, "ভালবাসায় পড়েছ, তাতে লজ্জা কি? ভালকে সকলেই ভালবাসে, আমিও হীরককে ভালবাসি, কিন্তু তোমার ভালবাসার গভীরতা বেশী, তাই সমস্ত ভুলে যাচ্ছ।"

অনুতাপে আমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। স্বামী সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন। আমার শোচনীয় অবনতি তাঁহার নিকটে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যিনি এত মহৎ উদার, আমি বিশ্ব ভুলিলেও তাঁহাকে ভুলিব না। উত্থান-পতনে সুখে-দুঃখে মনে রাখিব।

খোলা দরজার দিকে চাহিয়া দেখি, হীরক হাসিমুখে উঁকি-ঝুঁকি দিতেছে। বয়স কম নহে! তবু কাণ্ডজ্ঞানের লেশও নাই। ভদ্রমহিলার নিরালা শয়ন-গৃহের দিকে অমন লোলুপদৃষ্টিতে কোন ভদ্রলোক যে তাকাইতে পারে, এটা আমার ধারণা ছিল না। রূপ থাকিলেই হয় না, মার্জ্জিত সংযত শিষ্টাচার শিখিতে হয়।

না শিখিলে আমার কি? মান-সম্ভ্রমের বালাই কি-ই বা আমার অবশিষ্ট আছে? ওগো, আমি যে রসাতলে তলাইয়া গিয়াছি। ভদ্র, শিষ্ট, সংযত শব্দবিন্যাস আমার মুখে শোভা পায় না। আমি আমাকে হারাইয়াছি—বিকাইয়াছি।

দুঃখে ক্ষোভে শিথিল কেশ-বেশ লইয়া আমি আড়ালে সরিয়া আসিলাম।

সরিয়া থাকিলেই কি নিস্তার আছে? স্বামীর হাঁক-ডাকে অতিষ্ঠ হইয়া মুখ-হাত ধুইয়া, ধোয়া শাড়ী পরিয়া আবার ছুটিতে হইল দুই বন্ধুর সম্মিলিত সভায়।

বন্ধুদ্বয়ের চা-পান, দুগ্ধ-পান সমাধা হইয়াছে। এক জন খবরের কাগজ খুলিয়া বসিয়াছেন, আর এক জন ভ্রমণের উপযোগী পরিপাটী বেশভূষা করিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে।

আমি স্বামীর নিকটস্থ হইয়া ধীরে বলিলাম, "এখন বেড়ানো আমার সম্ভব নয়। সৃষ্টির কায পড়ে রয়েছে। দরোয়ানকে বলে দিই, হীরককে বেড়াতে নিয়ে যাক?"

স্বামী বলিলেন, "দরোয়ানের সঙ্গে তুমিও যাও, ঝি-চাকররা কাযকর্ম্ম সেরে নেবে। আমিও যেতে পারতাম, কিন্তু কোর্টে আজ আমার মোকর্দ্দমা আছে। কাগজপত্র ঠিক করে নিতে হবে। হীরক এখানে নতুন এলো, যা কিছু দেখাবার তুমিই দেখিয়ে শুনিয়ে দিও। ক'দিনই বা আমাদের কাছে থাকবে? শিগ্‌গীরই ত পাটনায় চলে যাবে।"

হীরকের বাবা পাটনা কলেজের অধ্যাপক, জানি হীরক বরাবর এখানে থাকিবে না। ফাল্গুনের দমকা হাওয়া কুঞ্জকাননে একটু হিল্লোল তুলিয়াই মিলাইয়া যাইবে। বর্ষার নবঘন মেঘ বর্ষণের পূর্ব্বেই অজানা অলকার উদ্দেশে উধাও হইবে। শরতের শেফালি ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িবে। হেমন্তের শিশির দূর্ব্বাদলে মুক্তা ছড়াইবে না।

হীরক একদিন চলিয়া যাইবে পূর্ব্ব হইতে জানিলেও, এখন স্বামীর কথায় আমার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রভাতের আলোকে আলোকময় ভুবন সহসা কালো হইয়া গেল।

আমি সজল-নয়নে মিনতি করিতে লাগিলাম, "তুমি কত লোকের কত কায জুটিয়ে দাও, হীরকের বাবার এখানে কি কোন একটা কাযের যোগাড় ক'রে দিতে পারো না? হীরকের বাবা এ দেশে কায পেলে ওকে আর পাটনায় যেতে হ'তো না?"

স্বামী কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইলেন, "তা জানি, চেষ্টা করলে একটা কেন, অনেক কায আমি হীরকের বাপকে দিতে পারি। তবে কেন তা ক'র্‌বো? কিসের জন্যে? চোরকে কেউ তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি ক'রতে ডাকে না।

চুরি যাবার ভয়ে তাড়িয়ে দেয়। আমিও চোর তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হবো।"

অপমানে, অভিমানে আমার অধরোষ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল, কথা কহিতে পারিলাম না। এই আমার স্বামী, যাঁহার প্রতি আমার অখণ্ড বিশ্বাস, অচলা ভক্তি, তিনি এত নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন!

স্বামীর নিকটে আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। হীরককে লইয়া বাহির হইলাম।

* * * * *

এ অঞ্চলের নূতন মাঠটি দিগন্তপ্রসারিত হইলেও প্রকৃতির স্বহস্তে নির্ম্মিত নহে। মানুষ মানুষের আরামের নিমিত্ত স্থানে স্থানে বৃক্ষের শীতল ছায়া রচনা করিয়া রাখিয়াছে। স্নিগ্ধ জলাশয় খনন করিয়াছে। আশে-পাশে সাজাইয়া দিয়াছে বনবিতান। দর্শনীয় কিছু না থাকিলেও এখানে উপভোগের বস্তুর অভাব নাই। মাঠে আসিয়া হীরকের উল্লাসের অন্ত রহিল না। কোন কিছু তাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারে না। টিয়া পাখীর কল গুঞ্জন ভ্রমরের গুন্ গুন্ শুনিয়া মহা উৎসাহে হীরক গান ধরিল। হাঁ, গলা বটে, যেন শত বেণু-বীণার ঝঙ্কার, হীরকের গানে-গল্পে আমি তন্ময়—অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বেলার দিকে লক্ষ্য ছিল না।

প্রভাতের রৌদ্র প্রখর হইয়া, পায়ের তলার ঘাস যখন উত্তপ্ত হইল, তখন আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

স্বামী কোর্টে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বেড়ানোর জন্য গাড়ী ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এ সদয় ব্যবহারে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল না—হৃদয়ের মেঘভার অপসারিত হইল না। তাঁহার তখনকার চড়া সুরের কড়া কথাগুলি আমার কাণে বারম্বার বাজিতেছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই হীরকের বাবাকে এখানে আনিতে পারেন; হীরককে রাখিতে পারেন স্ত্রীর জন্য এটুকু কে না করে? কে না সহে? আমাদের অন্যায় আবদার সহিবেন বলিয়াই না স্বামী। পতিতা পাতকিনীর আশ্রয়দাতার জন্যই আমরা পতি নামে ডাকিয়া থাকি। স্ত্রীর প্রতি দয়া যুগে যুগে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই আশাতেই উহাদের নামকরণ হইয়াছে দয়িত।

মনের খেদে তাঁহার উদ্দেশে যত ঝাল ঝাড়ি না কেন, তবু আমার হৃদয় সহসা ভারাক্রান্ত হইয়া চোখে জল আসিল। তিনি কি দিয়া খাইয়া গেলেন, কোন্ পোষাক পরিলেন; ঝির হাতের সাজা পাণ তাঁহার মুখে রোচে না। সঙ্গে টিফিন দেওয়া হয় নাই। নূতন বেহারাটা বড়ই অলস, হয় তো জুতা ব্রাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আজ মোজা ও কলার বদ্লানোর দিন। তিনি যে আপন-ভোলা ভোলানাথ, হাতে মুখে তুলিয়া না দিলে পরা হয় না, খাওয়া হয় না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, জিজ্ঞাসা করিলে ওরা ভাবিবে কি?

জিজ্ঞাসা করিবার আর সময় হইল না। হীরক সম্মুখে উপস্থিত; তাহার চোখে-মুখে হাসির ঝরণা, গলায় গানের সুর।

* * * * *

কয়েক দিন পর স্বামী কোর্ট হইতে ফিরিয়া আমাকে ডাকিলেন। আজ-কাল তাঁহার অবসর সময়টা হীরকের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনায় কাটিয়া যায়। আমার সহিত বাক্যালাপ নাই বলিলেই চলে। আমি ইচ্ছা করিয়া অন্তরালে সরিয়া থাকি। যিনি আমার ব্যথা বোঝেন না, তাঁহার কাছে যাচিয়া সোহাগ কাড়িতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। না হইলেও ডাকিলে যাইতে হয়।

স্বামী শোবার ঘরেই ছিলেন, তখনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। আবছা অন্ধকার কোণে কোণে কেবল নিবিড়তার জাল বোনা আরম্ভ করিয়াছে।

আমি স্বামীর গা ঘেঁষিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমায় ডেকেছ কেন?"

তিনি আস্তে আস্তে কহিলেন, "না ডাক্‌লে পাইনে, তাই ডেকেছি।"

"কি দরকার?"

"দরকার—হীরকের বাবার বন্ধু বিমল কাল পাটনায় যাচ্ছে, তার সঙ্গে হীরককে পাঠাতে হ'বে ঠিক করে এলাম। সকাল দশটায় পাটনার গাড়ী, এখুনি জিনিষপত্র গুছিয়ে গাছিয়ে রাখো। আমি কাযের ঝঞ্ঝাটে নড়তে পারছি না। অনিলের ছুটী নেই, এ সুযোগে না পাঠালে পরে সুবিধা হবে না।"

অকস্মাৎ আমার শরীর বেতস-পাতার মত কাঁপিতে লাগিল। বুকের ভিতর টন্-টন্ করিয়া উঠিল। আমি নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িলাম। আমার দুই চোখে অশ্রুর ধারা ছুটিল।

তিনি সাদরে সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "হীরককে ছেড়ে দিতে হবে শুনে এমন করছ কেন? তা, এক কায করলে বেশ হয়, তুমিও ওদের সঙ্গে যাও? পারবে না, বুঝেছি দু'নৌকায় পা দিয়েছ। হ্যাঁ, আমি পারি দুই দিক্ বজায় রাখতে, তুমি যদি আমায় পুরস্কার দাও?"

আমি দুই হাতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, "তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব, তিন সত্যি করছি। তুমি হীরককে যেতে দিয়ো না, ও গেলে আমি বাঁচবো না, মরে যাব।"

স্বামী হাসিলেন, "উঃ, এতখানি, আমি জানতাম না? আর কেঁদো না লক্ষ্মি, কাঁদতে হবে না, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ কর্‌ছি। আমি এখানেই অনিলের কায ঠিক করে তাকে চলে আস্‌তে আজ টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। এখন হলো ত? এইবার আমার পুরস্কার দাও?"

এক চোখে জল এক চোখে হাসি লইয়া আমি সতেজে উত্তর দিলাম, "বুড়ো বয়েসে রঙ্গ দেখে বাঁচি না! তোমার কি লজ্জা সরম নেই?"

"লজ্জা মেয়েদের ভূষণ, পুরুষের কাপুরুষতা। এক রত্তি একটা ছেলের সঙ্গে এত ঢলাঢলি করতে তোমার যদি লজ্জা না হয়; পুরস্কার চাইতে আমারি বা লজ্জা হবে কেন?" বলিয়া তিনি আমার মুখখানি কোলে টানিয়া লইলেন।

স্বামী আমাকে মাপ করিলেন; তোমরাও করিও। আমি ভাল না হইলেও একেবারে মন্দ নই। আসল কথাটা খুলিয়া বলা ভাল। অনিল আমাদের একমাত্র পুত্র, তস্য পুত্র হীরক। তাহার বয়সটা কাঁচা, রং ধরার বিলম্ব আছে। সবে পাঁচ বছরে পড়িয়াছে।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।

আমি

অনন্ত মোর জীবন—আমি অবিনশ্বর যে,
আমার মতন এত সুখী হায় এত দুঃখী আর কে?
এতই প্রবল, এত দুর্ব্বল,
এতই সফল, এত নিষ্ফল,
এত আসক্ত, এত বীতরাগ নিত্য ঐশ্বর্য্যে।

সুদূর জনমে হয় ত ছিলাম আমিই জগৎ শেঠ,
ধরণী তাহার মণিমাণিক্যে সাজায়ে আনিত ভেট,
কিম্বা ছিলাম পথের ভিখারী,
মিটিত না ক্ষুধা ফিরি বাড়ী বাড়ী,
হয় ত এ শির উন্নত ছিল নতুবা আছিল হেঁট।

সপ্ত সাগর ভরিয়া দিয়াছে আমার চোখের জল,
আমার হর্ষ-বিষাদে গঠিত বিশাল ভূমণ্ডল।
শ্যামল ধরণী আমি ভালবাসি,
বক্ষে ইহার ঘুরে ফিরে আসি,
আমারি আলোয় আলোকিত এর গগন-জল-স্থল।

কুরুক্ষেত্রে হয় ত ফিরেছি আমি অর্জ্জুন সাথ,
হয় ত আবার জীবন দিয়েছি রক্ষিতে সোমনাথ।
হয় ত আমার দুর্ব্বল হিয়া
অরাতি সৈন্য গিয়াছে দলিয়া,
হয় ত একাকী শত শত্রুর জীবন করেছি পাত।

বিধির হাতের দোলক দুল্‌ছি হাসি-অশ্রুর মাঝ,
যা কিছু করায় সব কায করি, নাই মোর কোনো কায
আমি অণুকণা, আমিই বিশ্ব,
আমিই নৃপতি, আমিই নিঃস্ব,
আমিই নিম্ন সাগরের তল, উচ্চ নগাধিরাজ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
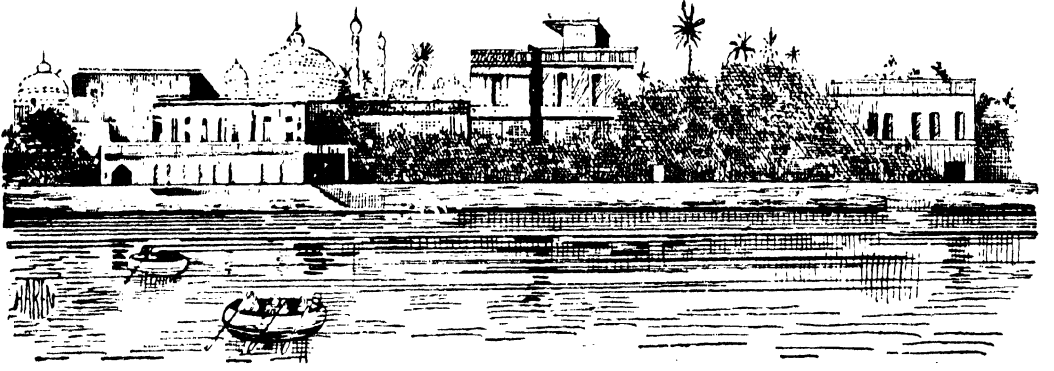
বর্ত্তমান রুমানিয়া

ডোরোথি হস্‌মার একজন মার্কিণ তরুণী। তিনি দ্বিচক্র-যানযোগে পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া রুমানিয়া পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। পূর্ব্বে কখনও তিনি এতদঞ্চলে আগমন করেন নাই। রুমানিয়ার ভাষাও তাঁহার জানা ছিল না। সীমান্ত প্রদেশ পার হইয়া একজন উক্রেনিয়ানের নির্দ্দেশমত তিনি দ্বিচক্রযান চালাইয়া শস্যক্ষেত্রের ভিতরের সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইলেন। একটি দেবস্থানের সন্নিহিত বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম সময়ে তিনি কিছু আহার্য্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

নতজানু মাতার ক্রোড়ে শিশু—পুরোহিত তাহাকে দীক্ষা দিতেছেন

যে অঞ্চল দিয়া তিনি চলিয়াছিলেন, তথায় উক্রেনীয়গণের বাস। ভোজনশেষে তিনি গাড়ী চালাইয়া এক নদীর ধারে উপনীত হন। তথায় আসিয়া তিনি নদীর জলে অবগাহন করিবার জন্য ঝম্প দিয়া নদীবক্ষে পড়িলেন।

সে দিন রবিবার। আরও অনেক তরুণী নদীজলে অবগাহন করিতেছিল। অবগাহন শেষে তাহারা অকুণ্ঠিতভাবে প্রায় নগ্নদেহে তীরে উঠিয়া বসন পরিধান করিতে লাগিল। ডোরোথি হস্‌মার তাহাদিগের সরলতায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন।

সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্রকায়, দারুনির্ম্মিত গির্জ্জা ছিল। উহা হইতে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তিনি তথায় গমন করিলেন।

তিনি দেখিলেন, একজন গোঁড়া পুরোহিত একটি শিশুকে ধর্ম্মে দীক্ষা দিতেছিলেন। শিশুর জনক-জননী পুরোহিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

শিশুটিকে একটি জলপাত্রে স্নান করাইয়া উহার জননীর হস্তে উহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল। তারপর পিতা-মাতা তিনবার পশ্চাদ্দিকে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। ইহার দ্বারা শিশুটিকে শয়তানের কবল হইতে যেন মুক্ত করা হইল।

ইহার পর সশব্দে ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণকালে তৃণশ্যামল ক্ষেত্র যেন বল-নৃত্যের কক্ষে

কুমারী অ্যাঞ্চন তরুণীর দল

পান্তরিত হইয়া গেল। গ্রামের যাবতীয় নর-নারী শ্বেত রিচ্ছদ ধারণ করিয়া তথায় সমাগত হইল। প্রথমে ক দল, পরে তরুণীরা পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া এক কাণ্ড বৃত্ত সৃষ্টি করিল। তারপর বেদিয়া বাদকদলকে রিবেষ্টন করিয়া তাহারা নাচিতে আরম্ভ করিল। ন অদূরে শ্বেত রোমাবৃত মেষপাল স্বচ্ছন্দে চরিয়া াইতেছিল।

তথা হইতে পরদিবস পরিব্রাজিকা সেরনাউটি অভিমুখে করিলেন। সেরনাউটির পূর্ব্বনাম ছিল জেরনোউইজ্। অঞ্চলটি এক সময়ে অষ্ট্রিয়ার একটি প্রদেশ ছিল। সেরনাউটি উহার রাজধানী ছিল। এতদঞ্চলে জার্ম্মাণ ভাষাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া এতদঞ্চলে গাড়ী চড়িয়া যাতায়াত অতি কষ্টকর। একজন পথিপ্রদর্শকের সাহায্যে অতিকষ্টে তিনি শৈল-সমাকীর্ণ অঞ্চল পার হইয়া সুসেভিটায় পৌঁছেন। পর্ব্বতশীর্ষ হইতে তিনি প্রাচীরবেষ্টিত একটি মঠ দেখিতে পাইলেন। আকারে-প্রকারে উহা মধ্যযুগের বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

এই মঠে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তিনি গমন করিলেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া তিনি মঠের প্রাচীরের বহির্দ্দেশে ও ভিতরে নানা প্রকার চিত্র দর্শন করিলেন। বাই-বেলের যুগের বহু ধর্ম্মাত্মার মূর্ত্তি এবং বিবিধ দৃশ্য বর্ণানু-পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বহু শতাব্দীর প্রাচীন চিত্রগুলির বর্ণানু-লেপন অতি বিচিত্র। তখন মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসি-নীরা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। সমাধিস্তম্ভে কেহ ফুলের গুচ্ছ অর্পণ করিতেছিলেন, কেহ বা সমাগত কৃষকদিগের সহিত চুপিচুপি কথা বলিতেছিলেন, কেহ বা বাতি জ্বালিবার কার্য্যে নিযুক্ত।

পরিব্রাজিকা বেদীর পশ্চাদ্ভাগে যাইবার চেষ্টা করিলে একজন পুরোহিত তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন যে, কোনও নারীর উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। উহার কারণ জানিতে চাহিলে, পুরোহিত তাঁহাকে জানাই-লেন, যে, উহা এত পবিত্র স্থান যে, পুরোহিত ব্যতীত আর কাহারও যাওয়া নিষিদ্ধ। পুরুষদিগের যাওয়া নিষিদ্ধ

মিস্ ডোরোথি হস্মার এবং রাসিনারি গ্রাম্য বালিকা

প্রার্থনাপুস্তক হস্তে সহরের নরনারীরা গির্জ্জায় চলিয়াছে

বুখারেষ্টের পসারিণীগণ

ভিক্ষার্থিনী বেদিয়া তরুণী ও শিশু

ঘিনডার গির্জ্জায় যোগদানকারী তরুণ-তরুণীরা

ট্রান্সিলভানিয়ার শস্যকর্ত্তনের দৃশ্য

নহে। কারণ, প্রত্যেক পুরুষই পুরোহিত বলিয়া পরিগণিত হইবার দাবী রাখে। কিন্তু নারীর পক্ষে নহে।

মিস্ ডোরোথি হস্‌মার ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু একজন সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, প্রধানা সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে ঐ মঠে রাত্রিবাস করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তথায় তিনি রাত্রিবাস করেন।

ষ্টিফেন-নির্ম্মিত পুটনা মঠ

পরিব্রাজিকা তথা হইতে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালার দিকে যাত্রা করেন। কোনও সহর সন্নিকটে নাই দেখিয়া তিনি একটি পাহাড় অতিক্রম করিবার অভিপ্রায় করেন। তখন সন্ধ্যা আসন্ন। জনৈক মেষপালককে তিনি ভাট্রাডরনিয়াই সহরের পথ জিজ্ঞাসা করেন। যে পথে তিনি চলিয়াছেন, সেই পথ দিয়া গমন করিলেই ঐ সহরে উপনীত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু লোকটা তাঁহাকে সে পথে যাইতে নিষেধ করিল। আরও কয়েক জন মেষপালক তথায় উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিনয়

মহিষ-বাহিত গাড়ী

...রে তাঁহাকে বলিল যে, ঐ পথে পাহাড় অতিক্রম ক... আদৌ সঙ্গত নহে—বিপদের আশঙ্কা আছে।

সিসনাডিয়োরা গির্জ্জায় সমবেত বিবাহার্থিনী কন্যা

টেলিকি দুর্গ-প্রাসাদ

অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি সন্নিহিত একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিনি জানিতে পারেন যে, উক্ত পাহাড়ে ডাকাতের আড্ডা আছে, তাহারা মোটর থামাইয়া আরোহীদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। এমন কি, উলঙ্গ অবস্থায় পথিকদিগকে ছাড়িয়া দেয়।

পরদিবস তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথে যাত্রা করেন। ট্রান্সিলভানিয়ায় পৌঁছিয়া তিনি স্যাক্সন সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পান। দ্বাদশ শতাব্দীতে উহারা এই স্থানে আহূত হইয়াছিল। এই জাতি যেমন পরিশ্রমী, তেমনই কর্ম্মকুশল। তাতার, মোঙ্গল এবং তুর্করা এখানে পর্য্যায়ক্রমে অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু এই স্যাক্সন জাতি নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের জাতীয় আচার, রীতি-নীতি এবং ভাষা অব্যাহত রাখিয়াছিল।

বুখারেষ্টের পেঁয়াজ-বিক্রেতা

বেদিয়া জননী—পৃষ্ঠে নিদ্রিত শিশু

রুমানীয় তরুণ-তরুণীদিগের "হোরা" নৃত্য

স্যাক্সন তরুণরা মনোরম পরিচ্ছদে সভায় চলিয়াছে

প্রিন্স মাইকেলের জন্মদিবসে পিতার চুম্বন

পাহাড়িয়া জাতির রোমশ মেষপাল

বিস্‌ট্রিটা সহরে পৌছিয়া তিনি দেখিতে পান যে, উহার অধিবাসীদিগের অর্দ্ধেক রুমানীয় এবং অর্দ্ধেক স্থাক্সন। বাড়ীগুলি প্রাচীন জার্ম্মাণ প্রথায় নির্ম্মিত। গৃহের প্রাচীরগুলি পুরু, গির্জ্জাগুলিতে গথিক্ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন। গুম্ফশ্মশ্রুহীন, সরলতাপ্রসন্ন আনন স্থাক্সনরা গাড়ী হাঁকাইয়া বাজারে চলিয়াছে। রাত্রিকালে খোলা উদ্যানে নক্ষত্রখচিত আকাশতলে নর-নারীর ওয়ালজ্ নৃত্য, রেস্তোরাঁয় বীয়ার-পানরত পুরুষদিগের হাস্য-পরিহাস দর্শকের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে।

স্থাক্সনদিগের ভাস্কর-শিল্প যেমন হৃদয়গ্রাহী, তাহাদিগের পরিচ্ছদও তেমনই মনোহর, বিচিত্র। পরিচ্ছদ পরিধানপদ্ধতিও সুন্দর। বিস্‌ট্রিটা, লেচিসটা, ঘিনুডা এবং অন্যান্য সহরের পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য চিত্তাকর্ষক।

পরিব্রাজিকা দ্বিচক্রযান আরোহণে সেণ্ট জেকবস উৎসবদিনে ঘিনুডায় গমন করিয়াছিলেন। তখন তত্রত্য নর-নারীর ব্যবহারে উৎসবের উত্তেজনা প্রবল। বয়স, পদমর্য্যাদা এবং নর-নারী হিসাবে পরিচ্ছদের তারতম্য সুস্পষ্ট।

সুসেভিটার প্রসিদ্ধ গির্জ্জায় প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত চিত্রাবলী

অপরাহ্নকালে বৃক্ষচ্ছায়ায় প্রাচীন স্থাক্সন পদ্ধতি অনুসারে ওয়ালজ্ নৃত্য চলিতেছিল। অকস্মাৎ ঝড় আরম্ভ হওয়ায় বেদিয়া বাদক এবং নর্ত্তকগণ সন্নিহিত ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মিস্ ডোরোথি হস্‌মার পরদিবস প্রাতঃকালে সন্নিহিত গ্রাম হইতে বিস্‌ট্রিটায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে গাড়ীতে তিনি আসিতেছিলেন, তাহাতে অনেকগুলি বালক-বালিকাও ছিল। তাহারা সুর করিয়া জার্ম্মাণ অভিযান সঙ্গীত গাহিতেছিল।

পরবর্ত্তী সহরে গমন করিয়া পর্য্যটনকারিণী তরুণী এক জন স্থাক্সন গ্রাম্য মোড়লের নিকট বাসোপযোগী স্থানের সন্ধান করেন। বৃদ্ধের পুত্র, পিতার নির্দ্দেশে তাঁহাকে একটি অনাথ আশ্রমে লইয়া যাইলেন। এই আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, স্থাক্সনরা কৃষক জাতি। অবশ্য অনেক পরিবারের পুত্রগণ জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ গমন করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু বহির্জ্জগতের সংস্রবে আসিয়াও তাহারা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসে। পিতৃপুরুষের ধারা তাহারা কোনমতেই বর্জ্জন করে না। সকলেই জমি
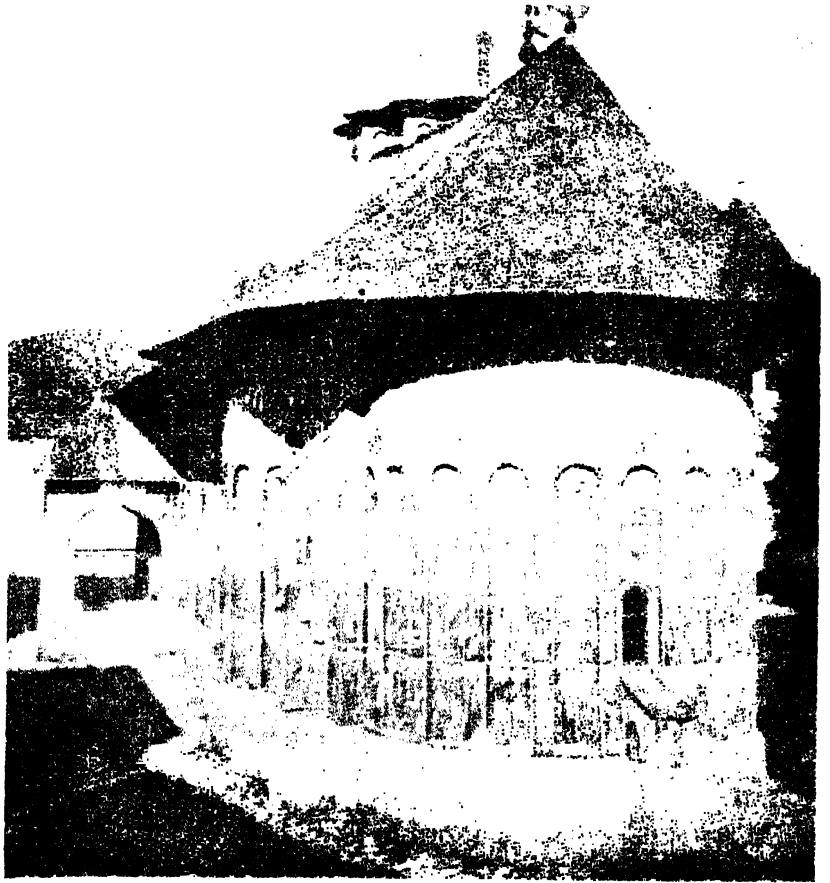
চাষে নিযুক্ত হয়। বির্স্ট্রটার দক্ষিণাঞ্চলে দ্বিচক্রযানে পরিভ্রমণকালে পর্য্যটনকারিণী ট্রান্সিলভানিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নর-নারীদিগের সংস্রবে আসেন। তিনি তাহাদিগকে পাশাপাশি বসবাস করিতে দেখিয়া ও পরস্পরের বিভিন্নতা দর্শনে বিস্ময়ান্বিতা হইয়াছিলেন।

কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় বিদ্যমান থাকায় এই অঞ্চলটি যেমন মনোরম, তেমনই সম্পৎশালী।

এই প্রাচীন সহরে ক্যাপ্টেন জন স্মিথ, তিন জন তুর্কের প্রাণবধ করেন

উপত্যকাভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর, অরণ্যানীতে প্রচুর সম্পদ্ এবং নদী জলে পরিপূর্ণ।

এতদঞ্চলে পাঁচটি জাতির বাস। রুমানীয়, হঙ্গেরীয়, স্যাক্সন, ইহুদী এবং বেদিয়া। এই পাঁচ প্রকার জাতির নর-নারীরা স্ব স্ব রীতি অনুসারে জীবন যাপন করিয়া থাকে।

প্রত্যেক জাতির জাতীয় প্রকৃতি তাহাদিগের বাস-ভবন, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটু মনোযোগ করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবে, কে কোন্ জাতীয় লোক।

প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মমন্দির স্বতন্ত্রভাবে নির্ম্মিত। হঙ্গেরীয় গির্জ্জাগুলির চূড়া দেখিবামাত্র তাহাদিগকে চিনিতে কষ্ট হইবে না। স্যাক্সনদিগের সাদাসিধা দুর্গাকার গির্জ্জা দর্শনমাত্রেই চিনিতে পারা যাইবে। রুমানীয় ধর্ম্মমন্দিরগুলির বাইজানটাইন রীতি তাহার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিবে।

মিস্ ডোরোথি হস্মার একজন হঙ্গেরীয় কাউণ্টের প্রাসাদে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কাউণ্ট ডোমোকস্ টেলেকি এখানে ২০ বৎসর বাস করিতেছেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ব লইয়া দিনযাপন করেন। বহু স্থান গমন করিয়া তিনি রোমক সাম্রাজ্যের যুগের বহু নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, ট্রান্সিলভানিয়া এক কালে ডাসিয়া নামক রোমক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। বর্ব্বর আততায়ীরা এই অঞ্চল আক্রমণ করিয়া রোমক সাম্রাজ্যের যাবতীয় নিদর্শন ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রুসিয়ার রাজার সহিত মতানৈক্য ঘটায় রাণী মেরিয়া থেরেসা হঙ্গেরীয়দিগের শরণাপন্ন হন। হঙ্গেরীয়গণ তরবারী কোষমুক্ত করিয়া তখন বলিয়াছিল যে, তাহারা রাণী মেরিয়া থেরেসার জন্য জীবনপাত করিবে।

ট্রান্সিলভানিয়ার অধিকাংশ দুর্গই রাণী মেরিয়া থেরেসার আমলে নির্ম্মিত হয়। জার্ণিয়েজেস দুর্গ তাহার অন্যতম। বহু দূর হইতে এই প্রাসাদের ঘণ্টাকৃতি ছাদ বৃক্ষরাজির

অন্তরাল ভেদ করিয়া দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে। টিলেকি বংশের প্রথম কাউণ্ট মিহালির আমলেএই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কাউণ্ট টিলেকি মিহালি তুর্কদিগের হস্তে নিহত হন। তাহার পর এই দুর্গপ্রাসাদ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের কৃষক বিপ্লবযুগে আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রাসাদের বহু মূল্যবান্ চিত্র, রেশমী আসবাবপত্র লুণ্ঠিত হয়। পুস্তকাগারে চামড়ায় বাঁধান বহু মূল্যবান্ গ্রন্থও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

কৃষক-রমণী তাঁতে কাপড় বুনিতেছে

কৃষক-রমণীরা পশমী বস্ত্র বয়ন করিতেছে

এই হঙ্গেরীয় কাউণ্টবংশের জমি এবং প্রাসাদদুর্গসমূহ সমগ্র ট্রান্সিলভানিয়ার নানা স্থানে অবস্থিত। এই সকল হঙ্গেরীয় পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ—একদমাজভুক্ত। এই বংশের ২৪টি কন্যা ট্রান্সিলভানিয়ান্‌দিগের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। মিস ডোরোথি হস্‌মার প্রত্যেক পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এ জন্য প্রত্যেক দুর্গপ্রাসাদ দর্শনের সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্কোভেলেষ্টি নামক প্রাসাদ দুর্গটি তাঁহার নিকট অত্যন্ত বিচিত্র বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। উহা চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। সাম্পাওলের কাউণ্ট হ্যালারের প্রাসাদদুর্গও অতি মনোরম। এখানে

শস্তকর্ত্তনে সমগ্র গ্রাম্য পরিবার

বেদিয়া-নারী জুতা খুলিয়া বাসন মাজিতেছে

মুরেসেনিতে কাউণ্টেস বিসিন্‌জেন অধিষ্ঠিতা। ট্রান্‌সিলভানিয়াতে তাঁহার অপেক্ষা পরিণতবয়স্কা কোন মহিলা কাউণ্টেস্‌ নাই। এক সময়ে তাঁহার মত ধনবতী কেহ ছিল না। তাঁহার কোন দুর্গ বা প্রাসাদ কিছুই অবশিষ্ট নাই। এখন ১২টি কক্ষ-বিশিষ্ট একটি চিত্র-শালার তিনি অধিকারিণী। তাঁহার পিতা একজন শিল্পী ছিলেন। ঐ কক্ষগুলি তিনি বহু যত্নে বহু বৎসর ধরিয়া শিল্পাকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্রতিভাশালী পরিবারের প্রতিভা-প্রভাবে এই পল্লী-ভবনটি নানাবিধ শিল্পকলার নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

মুরেসেনির চারিদিকে চমৎকার উপবন। এক সময়ে এখানে দূর্ব্বা-শ্যামল প্রাঙ্গণ বিদ্যমান ছিল। হ্রদও অনেকগুলি ছিল। কিন্তু এখন সেই বিস্তীর্ণ উপবন-ক্ষেত্রে বেদিয়ারা শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকে।

একবার ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু সে যুদ্ধে ই প্রাসাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। পঞ্চম শতাব্দীর ্গ চিত্র এখানে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

উপবনের বহু বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হইলেও, আপেল বৃক্ষের একটি বাগান এখনও আছে। আপেলগুলি পাকিবার আগেই চোরের কবলে গিয়া পড়ে। গাছ ও ফল চৌকী দিবার জন্য একজন রক্ষক একবার নিযুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে, চোরদিগের মধ্যে এক জন সৈনিক প্রহরী বিদ্যমান।

কাউণ্টেস্ বিসিনজেনের সম্পত্তির শত ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও গ্রীষ্মকালে বাসভবনে লোকাভাব হয় না। তাঁহার তিনটি কন্যা সে সময়ে মাতার কাছে আগমন করেন। বুডাপেস্ত হইতে দৌহিত্র-দৌহিত্রীরাও সমাগত হইয়া থাকে। তাহাদিগের সঙ্গে জার্ম্মাণ শিক্ষয়িত্রীরাও আগমন করিয়া থাকে।

টর্নিসারের তরুণী—রবিবাসরিক পরিচ্ছদে

কাউণ্টেস্ বিসিনজেন পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারেন না, কয়জনের জন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৫ জন হইতে ২৫ জনের জন্য টেবল সাজাইতে হয়। কারণ, টেলিফোনের কোন ব্যবস্থা নাই। অতিথিরা আহারকালে অপ্রত্যাশিতরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। কেহ হয় ত এক ঘণ্টার অতিথি, কেহ বা একদিন থাকিবে, আবার কেহ সপ্তাহকালও কাটাইয়া যায়।

বংশানুক্রমিক আতিথ্য-সৎকারের ব্যবস্থা এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমস্ত য়ুরোপ হইতে বিখ্যাত ব্যক্তিরা এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

ট্রান্‌সিলভানিয়ায় সামাজিক পদ-মর্য্যাদা মোটর গাড়ীতে নির্দ্ধারিত হয় না গাড়ী ও ঘোড়ার অনুপাতে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যাঁহার গাড়ী-ঘোড়া ভাল, তাঁহারই সামাজিক পদমর্য্যাদা অধিক।

ট্রান্‌সিলভানিয়ার স্যাক্সন গির্জ্জা

ট্রান্‌সিলভানিয়ায় শিকারের জন্য বিস্তৃত অরণ্যভূমি সংরক্ষিত আছে। য়ুরোপের মধ্যে এমন চমৎকার সংরক্ষিত শিকারের অরণ্য আর নাই। মিস্ ডোরোথি হস্মা[illegible] শিকারে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। ডম্‌ব্রাভায়োরা[illegible] প্রাসাদে এতদুপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রণ লাভ করেন। শিকারপ্রি[য়] ট্রান্‌সিলভানীয়গণ নানা স্থান হইতে শিকারের জন্য আগম[ন] করিয়াছিলেন। বুডাপেস্ত, জার্ম্মাণী এবং স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে শিকারপ্রিয় অতিথি সমাগম হইয়াছিল।

ছয়খানি গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সকলে অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। অরণ্যের মধ্যে পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিকারীদিগের জন্য স্থানও নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। এক একটি বৃক্ষে সেই নিদর্শন সংস্থাপিত হইয়াছিল। গ্রাম্য বালক ও বয়স্কগণের মধ্য হইতে ৪০,৫০ জন লোক বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। তাহারা বনের মধ্য হইতে শিকার তাড়াইয়া আনিবে।

ঝোপ-জঙ্গলে তাড়া দিয়া মাত্র অনেকগুলি হরিণ শিকারীদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। সেই সঙ্গে তিনটি

সে রাত্রিতে ৩৫ জন অতিথি ভোজনাগারে আহারে বসিয়াছিলেন। অতিথিদিগের পশ্চাতে ঢাল ও বল্লমধারী বর্ম্মাবৃত রক্ষকবর্গ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান ছিল। কক্ষ-প্রাচীরে ভীমদর্শন শৃঙ্গসমন্বিত মুণ্ডসমূহ সংলগ্ন ছিল। টেলেকি বংশের বিভিন্ন শাখার প্রসিদ্ধ শিকারীদিগের তৈলচিত্র-সমূহও প্রাচীরগাত্রে বিলম্বিত ছিল।

তিন দিন ধরিয়া শিকার-ক্রীড়া চলিল। দুঃসাহসিক শিকারীরা ভল্লুক শিকারের জন্য পর্ব্বতে পর্য্যন্ত গমন করিলেন। পার্ব্বত্য অরণ্যে ভল্লুক প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান

শীতকালে কুমারী তরুণীর দল পশমের সূতা তুলিতেছে

[illegible]বরাহও ছুটিয়া আসিল। তাহাদিগের প্রতি কোন [illegible]কারীই বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন [illegible]। ছোট ছোট জন্তু শিকারের জন্য দোনলা বন্দুক সকলের [illegible]তে ছিল। বড় জন্তু শিকারের উপযোগী বন্দুক কেহই [illegible]নেন নাই। বন্যশূকর আহত হইলে শিকারীদিগের [illegible]স্থা কাহিল হইত।

পাঁচবার তাড়া দিবার পর অতিথিদিগকে আহার্য্য ও [illegible]ীয় পরিবেষিত হইল। সকলেই কম্বল বা সতরঞ্চির [illegible]র আড় হইয়া পড়িলেন।

মিস্ ডোরোথি হস্‌মার এই শিকার উপলক্ষ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, হঙ্গেরীয় কৃষকগণ অভিজাত সম্প্রদায়ের কিরূপ অনুরাগী। তাহারা অভিজাতগণের উপরেই সকল সময় নির্ভর করিয়া থাকে।

রুমানীয় কৃষক সম্প্রদায় শতাব্দীব্যাপী হঙ্গেরীয় প্রভাবাধীন থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। তাহারা তাতার বা তুর্কদিগের মত সমরপ্রিয় নহে, কিন্তু তথাপি কি করিয়া জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং বংশবৃদ্ধি করিতে

হয়, তাহা তাহারা অবগত আছে। বেদিয়াদিগের প্রকৃতি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। একদিন এক জন বেদিয়া এক সজ্জী-বাগানে সজ্জী চুরি করিবার সময় ধরা পড়ে। লোকটা অসঙ্গতভাবে অন্যের বাগানে প্রবেশ করার জন্য তিরস্কৃত হয় এবং অপহৃত সজ্জী তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া উদ্যানস্বামী তাহাকে চোর বলিয়া তিরস্কার করেন। সে তাহাতে ক্রুদ্ধভাবে বলে যে, সে চোর নহে। ঐ উদ্যানজাত সজ্জী সে প্রায়ই জীবিকার জন্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

আর একদিন দুই জন বেদিয়া সংরক্ষিত অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার সময় রক্ষী তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। রক্ষী তাহাদিগের কুঠার কাড়িয়া লইয়া উক্ত কাষ্ঠের বোঝা গ্রামে তাহাদিগের সাহায্যে বহন করাইয়া লইয়া যায়।

স্ত্যাক্সন নারীদিগের ভোজনের দৃশ্য

মিস্ ডোরোথি হস্মার তখন কাউণ্টেসের প্রাসাদে চা-পান করিতেছিলেন, সেই সময় এক জন পরিচারক উত্তেজিতভাবে তথায় প্রবেশ করিয়া বলে যে, এক জন রাজা কাউণ্টেসের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কে সেই রাজা, জিজ্ঞাসা করায় ভৃত্য বলে যে, একজন রুমানীয় রাজা দেখা করিতে আসিয়াছেন। সত্যই এক জন সুবেশধারী সুন্দর ব্যক্তি কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী।

এই ব্যক্তি বেদিয়াদিগের রাজা। অরণ্যরক্ষকের হাতে তাঁহার দুই জন প্রজা নিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া তিনি প্রতিবাদ জানাইবার জন্য আসিয়াছেন!

রুমানিয়ায় কত বেদিয়া আছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। যাহারা লেখা-পড়ার চর্চ্চা করে, আদমসুমারিতে তাহাদিগের সংখ্যা ধরা পড়ে না। তবে মোটামুটি হিসাবে বলা যাইতে পারে, উহাদিগের সংখ্যা আড়াই লক্ষ হইবে। তাহারা রুমানীয় শাসন মানিয়া লইলেও, তাহাদিগের স্ব স্ব নেতার আনুগত্যই তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে। যাহারা উচ্চপদস্থ, তাহারা ধনী এবং সহরে বেশ আড়ম্বরের সহিত দিনযাপন করিয়া থাকে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক জন করিয়া সর্দ্দার আছে। নির্ব্বাচিত সর্দ্দার যে যুদ্ধপ্রিয় এবং চৌরকার্য্যে সুদক্ষ হইবে তাহাই নহে, তাহার পরিচ্ছদের সমারোহ এবং বৈচিত্র্যও গুণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। নির্ব্বাচিত সর্দ্দারের আদেশ তাহার দলের লোকরা সসম্মানে পালন করিয়া থাকে।

বেদিয়ারা নানাবিধ ব্যবসায়েও নিযুক্ত থাকে। ইহারা ইট তৈয়ারও করে। কালভারারি সম্প্রদায়ের বেদিয়ারা তাম্রনির্ম্মিত কেটলী নির্ম্মাণ করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফেরি করিয়া বিক্রয় করে। পাত্রাদি ভাঙ্গিয়া গেলে

ফুটা হইলে, তাহাও তাহারা মেরামত করিয়া থাকে। ফেরারাই সম্প্রদায়ের বেদিয়ারা ঘোড়ার নাল বাঁধায় এবং গো-শকটাদির চাকায় ধুর লাগাইয়া দেয়।

যাহারা লেখাপড়ার কাষ করে, তাহারা সাধারণতঃ অত্যন্ত ভদ্র ও সাধুপ্রকৃতির। তাহারা কোন কোন সময় সত্য রক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদিগের ব্যবহারও বিনয়-নম্র। যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে নেটোটীরা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ট্রান্‌সিলভানিয়ার তরুণ-তরুণীদিগের "হুইবল্" নৃত্য

[..]দিগের নারীরা নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল জানে এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চুরি করিয়া লইয়া যায়।

রিমেটিয়া গ্রাম হঙ্গেরীয় পরিচ্ছদের জন্য প্রসিদ্ধ। মিস ডোরোথি হস্‌মার এখানে এক ডাক্তারের অতিথি হন। [..]র গৃহে ছয়টি ভাষার নানাপ্রকার গ্রন্থ ছিল।

আল্‌বা আইয়ুলিয়ায় পরিব্রাজিকা ব্যারণ বানফির আতিথ্য গ্রহণ করেন। ক্যাথলিক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণও করেন। ছাত্রগণ প্রসিদ্ধ ব্যাথাসি পুস্তকাগারে তাঁহাকে লইয়া যায়। রুমানিয়ার মধ্যে এমন গ্রন্থাগার আর নাই। বহু হস্তলিখিত পুথি তথায় সংগৃহীত আছে। অষ্টম শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্ত তথায় সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

তথা হইতে যাত্রা করিয়া তিনি পথে স্যাক্সন ধর্ম্মমন্দির-গুলি দেখিতে পান। এখনও ২ শত ৬০টি স্যাক্সন গ্রামে ২ শতাধিক দুর্গাকার গির্জ্জা বিদ্যমান আছে। প্রাচীন কালে তুর্কীদিগের অভিযান বা আক্রমণ ঘটিলে এই সকল দুর্গগির্জ্জা হইতে পরস্পর পরস্পরের সহায়তার জন্য একযোগে কার্য্য করিত।

মিস্ ডোরোথি হস্‌মার স্যাক্সন-দিগের পুরাতন বিবরণলিপি-সমূহ গবেষণা করিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হয়েন। শিষ্টাচার সম্বন্ধে স্যাক্সন-দিগের এইরূপ নিয়ম তথায় ছিল যে, স্যাক্সনরা টেবলের উপর কনুই ভর দিয়া বসিবে না, সোজা-ভাবে বসিবে। যদি এই নিয়মের কেহ ব্যতিক্রম করে, তবে তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হইবে। শীতকালে কাটুনীদিগের সভা হয়। তথায় যুবকরা যুবতীদিগের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে পারিবে। ভদ্রভাবে কথা বলা বা অঙ্গভঙ্গী করা অত্যাবশ্যক। যদি কোন যুবক কোনও তরুণীর বডিস্ হইতে ব্রুচ খুলিবার চেষ্টা করে বা সেইরূপ কাষ করিতে যায়, তবে তাহাকে ৩০ মুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে হইবে।

কার্টা নামক স্থানে পর্য্যটিকা অতঃপর গমন করেন। তথায় সিষ্টারসিয়ান মঠের ধ্বংসাবশেষ আছে। তুর্করা তিনবার এই মঠ ধ্বংস করিয়াছিল। মোঙ্গলরা উহা

একবার ধ্বংস করে। সম্প্রতি ছাদবিহীন একটি স্থাক্সন গির্জ্জা তথায় বিদ্যমান আছে।

কার্টার অদূরে ফাগারাস্ পর্ব্বতমালা। উহার উচ্চতম শৃঙ্গ ৮ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। ফাগারাস ও সিবিউ পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী স্থানে বহু রুমানীয় গ্রাম বিদ্যমান।

রাসিনারি নামক এক গ্রাম পরিব্রাজিকা সাইকেলে করিয়া দেখিতে যান। তথায় একটি বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল। তিনি ইহাতে যোগদান করেন। যাযাবরদিগের গ্রাম হইতে বেদিয়া বাদ্যকরগণ সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল। বেহালা, সেলো, বাঁশী প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রে সঙ্গত আরম্ভ হইয়াছিল। নৃত্যকারীরা কৃষ্ণ ও শ্বেত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। রুমানীয় বাদকদলের পরিবর্ত্তে বেদিয়া বাদকদল কেন আসিয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে পরিব্রাজিকা তাহাদিগের মুখে বিস্ময়চিহ্ন দেখিতে পান। তাহাদিগের ধারণা, বাদক বলিতে বেদিয়াদিগকেই বুঝাইবে।

রুমানীয় গ্রামের কোন তরুণীর সম্বন্ধে গীত রচিত হইলে সেই কুমারী কন্যার বিবাহ হওয়া অতি কঠিন। প্রায়ই বিবাহ হয় না। যাহাদিগের সম্বন্ধে গান রচিত হয়, তাহাদিগের কার্য্য-কলাপ—ভালই হউক বা মন্দই হউক—শীঘ্রই জানাজানি হইয়া যায়। একবার এক বিবাহিত দম্পতিকে প্রকাশ্য প্রদর্শনীক্ষেত্রে আনয়ন করা হইয়াছিল। লজ্জায় তাহাদিগের আনন আরক্ত হইয়া গিয়াছিল। কাহারও নামে গীত রচিত হওয়ার অর্থ তাহাকে সামাজিক ভাবে দণ্ডিত করা।

পর্য্যটিকা লবণাক্ত হ্রদ লাকুল উরসুলুই দর্শনে গমন করেন। এই হ্রদটি সোভাটায় অবস্থিত। পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর জলধারা এই হ্রদে পতিত হইলেও উহার লবণাক্ত স্বাদ দূরীভূত হয় না। মেডিয়াস্ হইতে দ্বিচক্রযানে তিনি সিঘাই সোয়ারায় গমন করেন। এই সহরটি গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত। অতি মনোরম স্থান। তথা হইতে তিনি ব্রাসভ সহরে গমন করেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণগির্জ্জা এই স্থানে অবস্থিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উহা নির্ম্মিত হয়। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে উহা আগুনে

রুমানিয়ার হুয়েডিন গ্রামের বিবাহ-দৃশ্য

পুড়িয়া যায়। শুধু ভিত্তিভূমি ব্যতীত সবই অগ্নির করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ধূম্রজালে সব কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় উহার নাম কৃষ্ণগির্জ্জা হইয়াছে।

কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালার পাদমূলে আসিয়া মিস্ ডোরোথি হস্মার পার্ব্বত্য গ্রাম প্রেডিয়াল অতিক্রম করেন।

শস্যসংগ্রহে রুমানিয়ার কৃষক-পরিবার

সিনাইয়া হইতে তিনি রুমানিয়ার প্রাচীন রাজধানী রিগাটে পৌঁছেন। এইখানে আসিবার পর তিনি ইংরেজী কথা বলিবার সুযোগ লাভ করেন। তথা হইতে তিনি বুখারেষ্ট যাত্রা করেন। এখান হইতে কনষ্টান্টিনোপলে প্রত্যেক রাজপথ চলিয়া গিয়াছে। এই সহরে বাহ্যতঃ সবই পশ্চিমের অনুকারী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে চিরন্তন প্রাচীর স্থান ভিতরে ভিতরে বিদ্যমান। এখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরাধীন ছিল। প্রায় শত বৎসর হইল, অত্যাচারিত জনসাধারণ মুক্তিলাভ করিয়াছে।

অতঃপর তিনি সিনাইয়া সহরে গমন করেন। এইখানে রাজা ক্যারলের গ্রীষ্মাবাস আছে।

শ্রী...নাথ সেন।

পুষ্পলতা চাইল ধীরে

পুষ্পলতা
চাইল ধীরে
তেপান্তরে—
নবাগতা
অতিথটিরে
বরণ করে,
স্বচ্ছ দিনের
কিরণজালা
পূব্-গগনে
স্নিগ্ধরাতের
তারার মালা
সঙ্গোপনে ;

পথিক বধূর
লক্ষধারে
গোপন আশা
হৃদয় মধুর
সুপ্ততারে
নিল ভাষা।
ভাষায় ভাষায়
বারম্বারে
প্রাণের বাণী
অন্যমনায়
দিল তারে
কি কাহিনী !

পুষ্পাবলী
দেখ্‌লে ক্ষণেক
বিচার করে—
হ'লেম কলি
আমরা অনেক
জন্ম পরে—
কিন্তু তবু
ছিলেম যেন
আগে হ'তে
তাও কি কভু
হয় এঁ হেন
কোনমতে ?

এর পরে হায়
নাম্‌লো ছায়া
দিনের শেষে,
সন্ধ্যা ঘনায়
করুণ মায়া
প্রান্তে মেশে।
এলোমেলো
স্বপন-ঘেরা
যে কল্পনা,
রেখে গেল
মঞ্জুধারা
সেই বাসনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শূন্য সংসার

[গল্প]

পত্নী প্রিয়বালার নশ্বর দেহ চিতায় রাখিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া শ্রীবিলাস চক্রবর্ত্তী বুঝিলেন, তাঁর নিরীহ নির্ব্বিরোধ স্ত্রী গৃহখানিকে কি-ভাবেই না পূর্ণ রাখিয়াছিলেন! এখন সেই একজন-বিহনে গৃহ একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে! স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে কোনো দিন তাঁকে অপরিহার্য্য-অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয় নাই! এখন দেখিলেন, তিনি চলিয়া যাওয়ায় চারিদিক খালি হইয়া গিয়াছে।

দু'চার সপ্তাহ কাটিয়া গেল। গৃহের শূন্যতা না কমিয়া বাড়িল; বাড়িয়া ক্রমে অসহ্য হইল।

অফিসে শ্রীবিলাস মোটা টাকা বেতন পান; কাজ করিতে হয় অফুরন্ত। সে-কাজের জের আসে বাড়ী পর্য্যন্ত। স্ত্রী-বর্ত্তমানে কাজের ভিড়ে তাঁর পানে চাহিবার যেমন অবকাশ ঘটিত না, তেমনি ঘরের কোনো কাজে কোনো দিন তাঁকে মনোযোগ দিতে হয় নাই। বাড়ীতে দাসী আছে, চাকর আছে, বামুন আছে। আগেও ছিল। আগে দাসী চাকর-বামুনের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ ছিল না। কলে সংসার চলিত। এ-কল যিনি চালাইতেন, তিনি আজ নাই। কাজেই কল আর তেমন চলে না; দিকে দিকে বিশৃঙ্খলা জাগে! ঘড়ির টাইম দেখিয়া খাইতে আসিয়া দেখেন, আসন পাতা নাই—চাকর-বামুনে রান্নাঘরে বসিয়া গল্প করিতেছে। যদি বা আসন পাতা দেখেন, তরকারী হয় নাই! চাকর গিয়াছে বাজারে, এখনো ফিরিবার নাম নাই! ধোপা কাপড় দিয়া যায়—কোনোটা বাকী থাকে, কোনোটা ছিঁড়িয়া ফর্দ্দাফাঁই হইয়া আসে। রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না। মশারির দুর্গ ভেদ করিয়া মশার ফৌজ কখন ভিতরে ঢুকিয়াছে, কেহ দেখে না! ঘুমে চোখ মুদিবা-মাত্র মশার ফৌজ ব্যাণ্ড বাজাইয়া মহাসমারোহে যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়—গা হাত চাপড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে দ্বিপ্রহর রাত্রে মশারি তুলিয়া শ্রীবিলাস পাখা-হাতে মশা তাড়াইতে উদ্যত হন্!

এমনি দুর্গ্রহ ভোগ করিয়া তিনি বুঝিলেন, সংসারে বাস করিতে হইলে পত্নীর আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। একটি মাত্র পত্নী বহু বিঘ্ন, বহু অশান্তি-উৎপাত নিবারিত করিয়া জীবনকে সহজ, সচল ও নিরুপদ্রব রাখেন। প্রিয়বালা যত দিন পাশে ছিলেন, মশারি ফুঁড়িয়া কোনো রাত্রে দু'হাতে মশার সহিত তাঁকে সংগ্রাম করিতে হয় নাই। অফিসের পোষাক পরিতে গিয়া জামার বোতাম টাঁকিতে বসেন নাই! দাসী-চাকরের অত্যাচার তখন ছিল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত! অর্থাৎ কোনো দিক্ হইতে জীবনে উৎপাত-বাষ্প সমুত্থিত হয় নাই! মনে হইত, সংসার মধুর সুখময়!

এখন?

সংসারের অবস্থা স্মরণ করিয়া শ্রীবিলাস শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁর মন বাষ্পোচ্ছ্বাসে ভরিয়া আর্দ্র হইল।

তবে এ-কথাও ঠিক,—পত্নী প্রিয়বালা আজ নাই বলিয়া কোনো কাজে কোনো দিক্ হইতে নিষেধ ওঠে না! কোথাও বাধা নাই। এখন যা-খুশী করিতেছেন,—তাহাতে বাদ-প্রতিবাদের দাগ পড়ে না! আবার কাজ করিয়াও তৃপ্তি মেলে না। আগে পথে কোনো-কিছু ভালো জিনিষ দেখিয়া পছন্দ হইলে কিনিয়া গৃহে আনিতেন। পত্নী প্রিয়বালা সে-বস্তুর তারিফ করিলে আনন্দে-গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠিত! এখনো তেমন জিনিষ দেখিলে কিনিবার জন্য হাত নিশপিশ করিয়া ওঠে! কিন্তু কিনিয়া লাভ? স্ত্রী নাই! কাহাকে সে জিনিষ দেখাইবেন? কে সে জিনিষে

তারিফ করিবে? ক্ষোভে-নৈরাশ্যে বুকখানা হা-হা করিতে থাকে!

এক দিনের কথা বলি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অফিসের ফাইল-বগলে শ্রীবিলাস গৃহে ফিরিতেছিলেন। বহুবাজারের মোড়ে দেখেন, একটা দোকানে ঘণ্টা বাজাইয়া মাল-পত্র বিক্রয় হইতেছে—জলের দামে। ট্রাম হইতে ঝুপ্ করিয়া নামিয়া পড়িলেন। কৌতূহল-বশে উদ্‌গ্রীব মন লইয়া দোকানে ঢুকিলেন। দেখিলেন, রকমারী শাড়ী বিক্রয় হইতেছে,—টাকায় ছ' আনা দাম বাদ দিয়া। একখানা শিল্কের শাড়ী নজরে পড়িল। অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করিলেন,—এখানার দাম কত? দোকানদার বলিল আট টাকা বারো আনা। তা থেকে বাদ দিন টাকায় ছ' আনা···তাহলে গিয়ে বাদ যাবে আট টাকায় আট-ছ' আটচল্লিশ আনা, তার মানে, তিন টাকা; আর বারো-আনায় বাদ যাবে সাড়ে চার আনা। এগুলো বাদ দিয়ে দাম হলো পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা।

শ্রীবিলাস বলিলেন,—এখানা আমি নেবো।···বলিয়া পার্শ খুলিলেন: খুলিয়া একখানা পাঁচ টাকার নোট আর একটা টাকা বাহির করিলেন···

সহসা মনকে দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া একটা নিশ্বাস হা-হা করিয়া উঠিল, কার জন্য শাড়ী?

শাড়ী পরিবার মানুষ আজ গৃহে নাই···কার জন্য এ শাড়ী কিনিবেন?···

বলিলেন—না, আজ থাক্···বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে কাল আসবো'খন...

শ্রীবিলাস আর এক-মিনিট দোকানে দাঁড়াইলেন না··· পথে বাহির হইয়া আসিলেন।

মনে হইতে লাগিল, প্রিয়বালা যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, এ-সব সৌখীন শাড়ীর কথা কেন যে তখন মনে হয় নাই! এ শাড়ী পরাইলে তিনি কত খুশী হইতেন···তাঁকে কেমন মানাইত···দেখিয়া নিজে তৃপ্তি পাইতেন!

শাড়ীর শোকে পত্নীর শোক নূতন করিয়া প্রাণে বাজিল। বেশ তীব্র বেদনা!

আর এক দিন।

বন্ধুর পাল্লায় পড়িয়া সিনেমায় গিয়াছিলেন। বন্ধু বলিলেন,—সন্ন্যাসীর মতো পড়ে থাকে না। আমোদ-আহ্লাদ করো। বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী হয়ে দিন কাটালে ব্লাড-প্রেশার বাড়বে। জীবন তো মোটে এই একটি এবং সে-জীবন বড় ক্ষণিক!

শ্রীবিলাস কোনো জবাব দিতে পারিলেন না, সিনেমায় গেলেন।

সিনেমায় ছবি দেখিবেন কি, সামনে-পাশে-পিছনে যেদিক্‌কার আসনে দৃষ্টিপাত করেন, যেন রূপের হিল্লোল বহিয়া চলিয়াছে! একালের সব মেয়ে···তাদের হাস্যে-ভাষ্যে প্রতি-ক্ষণে বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িতেছে···কি জলুশ! এই ললিত-ললনাদের কথায় মন ভরিয়া রহিল। চোখের সামনে হাসি-অশ্রু-গীতি-কলরবের পিঠে চড়িয়া পর্দ্দায় কি কাহিনী বহিয়া চলিয়াছে, তার একটি কণা মনে রেখাপাত করিল না! কেবলি মনে হইতেছিল, এমন সুন্দর পৃথিবী··· এত রূপ···এমন মাধুরী···তাঁর জীবনে কি-বা মিলিয়াছে!···

গৃহে ফিরিলেন রাত্রে। পৃথিবীর বুকে আবার বসন্ত জাগিয়াছে। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরা···কাছেই কোন্ গৃহে এক পিঞ্জরের কোকিল বসন্ত-মাধুরীতে ভুলিয়া কণ্ঠে বনের কাকলী তুলিয়াছে···

শ্রীবিলাসের মনে হইতে লাগিল, তিনি একা···বড় একা! গৃহ তাঁর শূন্য···একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে!···

এ শূন্যতা ক্রমে বুকে চাপিয়া বসিল ভারী পাহাড়ের মতো।

গৃহ অসহ্য বোধ হইল। অফিস হইতে গৃহে ফিরিবার পথে শ্রীবিলাস হাঁটিয়া ফেরেন। দাঁড়াইয়া যত দোকানের সজ্জা-ভূষণ দেখেন। বেতারে গান ফোটে, শ্রীবিলাস ভিড়ে মিশিয়া পথে দাঁড়াইয়া সে-গান শোনেন···

রেডিয়োর ষ্টুডিয়ো-ঘরে বসিয়া গায়িকা গান গায়,—

> ধরণীর ঘরে-ঘরে হাসির মেলা, কত খেলা!
> তাতে ভুলে সুখে কাটে আমার বেলা···

শ্রীবিলাসের সারা দেহ কাঁপিয়া দুলিয়া ওঠে। মিথ্যা কথা···কোথায় ঘরে ঘরে হাসির মেলা? কোথায়

খেলা? তাঁর ঘর যেন পাথর-পুরী! সে পুরীতে না আছে হাসি, না আছে খেলা···আলো-বাতাসও আজ সে ঘরে প্রবেশ করে না!

মনে হয়, প্রিয়বালা যতদিন পাশে ছিলেন, কেন যে তাঁর পানে ফিরিয়া চাহেন নাই! প্রিয়বালার মনে কি মাধুরী ছিল··কিছুই জানিলেন না!

মাধুরী ছিল কি? বসন্ত-বাতাসে মন আজ যা চাহিয়া হা-হা করিয়া মরিতেছে, সে চাওয়ার সাধ প্রিয়বালা মিটাইতে পারিতেন?

এমন করিয়া নিঃশব্দ জীবনটাকে বহিয়া টানিয়া আর চালানো যায় না! শ্রীবিলাস স্থির করিলেন, বিবাহ করিবেন। এবং বিবাহ করিয়া এবার আর অফিসের কাগজপত্রের নীচে মনকে চাপিয়া পিষিয়া মারিবেন না। এবার···

কি করিয়া পত্নী সংগ্রহ করেন? যেভাবে প্রিয়বালাকে পাইয়াছিলেন···কোনো সাধনা করিতে হয় নাই···তাঁকে পাইয়াছিলেন না চাহিতে, অত্যন্ত সহজে···! সেভাবে নয়··· সে যেন অন্ধকারে ঢিল ছুড়িয়া ছিলেন! না-জানা না দেখা বধূ গৃহে আনিয়াছিলেন। বধূর দিবার মতো কি আছে, খপর লন নাই! এখন এ-বয়সে না-জানা একজনকে আনা···

সম্ভব নয়।

তখন দুনিয়ার কতটুকু জানিতেন! প্রাণ-মনের চাওয়ার খপর কতটুকু রাখিতেন! প্রাণ কি চায়, এখন বুঝিয়াছেন! এবং পথ চলিতে যে হাসির হিল্লোল প্রাণে-মনে চমক দিয়া যায়, ও-হিল্লোল যদি···

কিন্তু কি করিয়া তা হয়? একালের একটি মেয়ে···?

কাহারো সঙ্গে পরামর্শ করিবেন? যদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে?

অফিসের বন্ধুরা নিত্য বলেন—কতই বা তোমার বয়স হে! এখনো চল্লিশের চৌকাঠ মাড়াওনি।··· এ ভাবে একা-একা থাকবে কেন? বিয়ে করো। একালে ডাগর মেয়ে বহুৎ মিলবে!

শ্রীবিলাস ভাবেন, শুধু ডাগর নয়···ডাগর বয়সের সঙ্গে একালের এই হাব-ভাব···অর্থাৎ এবারের পত্নীর পক্ষে গৃহ-কোটরে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না! বাহিরে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিতে হইবে। বাড়ী-গাড়ী, সজ্জা-ভূষণ··· ঠিক একালে আর পাঁচজন যেমন··অর্থাৎ এবারের স্ত্রী শুধু গৃহিণী হইবেন না—তাঁর হওয়া চাই সাথী, সঙ্গিনী, সজ্জাভূষণা!

গল্প-উপন্যাসের কথা মনে পড়িল। ট্রামে বাসে মাঠে সিনেমায় তরুণীদের সঙ্গে নায়কদের দেখা হয়।···তিনিও একা, নিঃসঙ্গচারী···ইহা জানিয়া মায়া মমতা···প্রেম···?

বাস্তব জীবনে এমন ঘটে না? পথ চলিতে শ্রীবিলাস চাহিয়া দেখেন, একা ঐ চলিয়াছে তরুণী! আশায় মন দুলিয়া ওঠে···একটি নিমেষের দৃষ্টি···

কেহ ফিরিয়া তাকায় না! ভাবেন, আমার এমন বয়স হইয়াছে যে আমার পানে কেহ একবার চাহিয়া দেখিবে না?

বেশ-ভূষার পানে শ্রীবিলাস এতকাল দৃষ্টি দেন নাই; প্রিয়বালা অনুযোগ করিতেন। হাসিয়া শ্রীবিলাস বলিতেন—কি দরকার? আমি তো স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছি না! প্রিয়বালা বলিতেন—অযত্নে-অবহেলায় চেহারাটাকে দশ বছর বুড়িয়ে তুলেছো···

সে-কথা মনে পড়িল। আহা, সতী-লক্ষ্মী! মানস-নেত্রে আজিকার দুর্ভাগ্যের ছবি তিনি দেখিয়াছিলেন!

হেয়ার-কাটারের বাড়ী গিয়া শ্রীবিলাস চুল ছাঁটেন। প্রত্যহ দাড়ি কামান। সাবান-সেণ্ট নবীন উদ্যমে কিনিতে লাগিলেন। অফিসের পর বাড়ীতে আর ফাইল আনেন না, সিনেমায় যান প্রায় নিত্য। ধর্ম্মতলা হইতে একালের মাসিক-পত্র কিনিয়া আনেন। আনিয়া পড়েন গল্প, কবিতা, উপন্যাস।···

সেদিন একখানা খপরের কাগজে বিবাহের বিজ্ঞাপনগুলার উপরে সহসা নজর পড়িল। পাত্রী চাই···পাত্র চাই!··· একজন কুমারী মফঃস্বলের স্কুলে টীচারি করেন—বেতন পান পঞ্চাশ টাকা। তিনি চান্ উপার্জ্জনশীল পাত্র। তাঁর একটু বয়স হইয়াছে। তা হোক, চেহারা ভালো··ইত্যাদি!

শ্রীবিলাসের মন নাচিয়া উঠিল! Eureka! এই পথ···ঠিক!

তখনি বিজ্ঞাপন মুশাবিদা করিলেন। তার পর অনেক কাটকুট করিয়া ফেয়ার-কপি করিলেন,—

পাত্রী চাই

পাত্রের বয়স আটাত্রিশ বৎসর। সুস্থ সবল দেহ। অফিসে মোটা টাকা বেতন পান। সাহিত্যে-সঙ্গীতে রুচি আছে। সিগারেট ও সুরা বিষবৎ ত্যাগ করিয়া চলেন। গৃহে পুত্র-কন্যার কোনো উপদ্রব নাই। সুখের গৃহ—সুখের সংসার। একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী হইবেন। গৃহে দাসী-চাকর ও পাচক আছে। ধর্ম্ম এবং জাতি সম্বন্ধে কোনো বাচ্-বিচার নাই। পাত্রীর বয়স যেন বেশী না হয়। মনে আবেগ থাকা চাই। দেখিতে সুশ্রী হইবেন। একালের আচার-রীতি জানা ও মানা দরকার। ফটো পাঠাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সকল কথা গোপন থাকিবে।

—ক, খ, গ C/o কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এ বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপা হইল…

তার পর দিনগুলা কাটিতে লাগিল তীব্র সম্ভাবনার মধ্য দিয়া। সকালে ডাক-পিয়নের জন্য প্রত্যহ অধীর প্রতীক্ষা—অফিস হইতে ফিরিয়া প্রচণ্ড চিত্তাবেগে লেটার-বক্স হাৎড়ানো—মনে যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ চলিয়াছে সারাক্ষণ!

অবশেষে একদিন এ-যুদ্ধ থামিল। অফিস হইতে ফিরিয়া লেটার-বক্সে পাইলেন একটা বড় খামে মোড়া ফটো এবং চিঠি। নিবিষ্ট নয়নে ফটোখানি দেখিলেন…

মন্দ নয়! মাথার কেশগুলি বেশ পরিপাটী ছাঁদে রচিয়াছে তো! শাড়ীখানি পরিয়াছে বেশ চমৎকার ভঙ্গীতে! কপালে একটি টিপ…মুখে হাসি! বাঃ! বয়স…?

বুঝিতে পারিলেন না!

চিঠি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠিতে লেখা আছে,—

মান্যবরেষু

আপনার বিজ্ঞাপন পড়িলাম। আমার বয়স বেশী নয়। লোকে বলে, আমি সুশ্রী; চেহারা ভালো। কিছুদিন কর্পোরেশনের স্কুলে মাষ্টারি করিয়াছি—অস্থায়ী ভাবে। এখন চাকরি নাই; পাত্র খুঁজিতেছি। আমি হিন্দু। তবে প্রয়োজন হইলে খ্রীষ্টান বা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে রাজী আছি। স্বামীর ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম হইবে—তাহাতে কোনো আপত্তি নাই। এককালে আমি রেডিয়োয় গান গাহিতাম। কবিতা লিখি। তবে সে কবিতা কোনো কাগজে ছাপিতে দিই নাই। ঘর-কন্নার কাজ জানি। ফটো পাঠাইলাম। পত্রোত্তরে অন্য কথাবার্ত্তা হইবে। ইতি

শ্রীঅশ্রুকণা সান্যাল

৭নং মায়া-হরিণ এভেনিউ, বালিগঞ্জ।

শ্রীবিলাস কাঁপিলেন…চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়া যেন তার তীব্র ঝলকে ঝলশিয়া উবিয়া গেল।

কল্পনা-নেত্রে তিনি দেখিলেন, ফটোগ্রাফ ছাড়িয়া মায়াময়ী ঐন্দ্রজালিকার মূর্ত্তিতে এক রূপসী তরুণী আসিয়া বসিয়াছেন তাঁর ঐ পালঙ্কে…

পরের দিন তিনি চিঠি লিখিলেন,—

মাননীয়াসু

আপনার পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি যেমন লিখিয়াছেন, আমি ঠিক তেমনি জীবন-সঙ্গিনী চাহিতেছি। যদি দয়া করিয়া কাল সন্ধ্যা সাতটায় 'বেণু-কুঞ্জে' আসিতে পারেন—'বেণু-কুঞ্জ' ঠিক পার্ক-সার্কাশের ট্রাম-ডিপোর সামনে দক্ষিণে; বেণু-কুঞ্জ হোটেল—তাহা হইলে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে কথাবার্ত্তা কহিয়া ব্যাপার পাকা করিতে পারি। যত শীঘ্র বিবাহ সম্পাদিত হয়, ততই মঙ্গল। আশা করি, পত্রোত্তরে জানাইবেন, আপনার পক্ষে ও সময়ে ঐ দিন বেণু-কুঞ্জে আসা সম্ভব হইবে কি না!

আর একটি কথা, যদি কিছু মনে না করেন, অর্থাৎ আমাদের এ-মিলন সুনিশ্চিত বুঝিয়া লিখিতে সাহসী হইয়াছি—'বেণু-কুঞ্জে' যাতায়াতের দরুণ আপনার যে ট্যাক্সি-ভাড়া পড়িবে, সে ভাড়া আমি দিব। এ-পত্রে আপনাকে আমার নাম জানাইলাম। ইতি

স্নেহার্থী

শ্রীশ্রীবিলাস চক্রবর্ত্তী

এ-পত্রের উত্তর আসিল,—

মান্যবরেষু

আপনার সঙ্গে 'বেণু-কুঞ্জে' দেখা হইবে। বেশী খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন না। কারণ, আমি সদ্য জ্বর হইতে উঠিয়াছি। ইতি

শ্রীঅশ্রুকণা সান্যাল

হাতের অক্ষরগুলি চমৎকার! শ্রীবিলাস আবেগ-ভরে এ-চিঠি বুকে চাপিয়া চক্ষু মুদিলেন। মনে-মনে ডাকিলেন, অশ্রুকণা…অশ্রু…

অভিসার-সন্ধ্যা।

পথে বিভ্রাট ঘটিল। ট্যাক্সি বিগড়াইল। বনেট্ খুলিয়া ড্রাইভার এটা-ওটা টানাটানি করিল, বহু কশরৎ করিল। একঘণ্টা কাটিয়া গেল। গাড়ী চলিল না।

ড্রাইভার বলিল—দোশরা গাড়ী ফরমাইয়ে বাবু…ই নেহি চলে গা…

শ্রীবিলাস এতক্ষণ বিহ্বল চিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন…গাড়ীর বিকলতা-সম্বন্ধে চেতনা ছিল না। ড্রাইভারের কথায় চেতনা জাগিল। চেতনা জাগিতে ঘড়ির পানে চাহিলেন…চমকিয়া উঠিলেন! ইঃ, সাতটা বাজিতে তিন মিনিট বাকী! সর্ব্বনাশ!

তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পথে দাঁড়াইলেন।

ট্যাক্সিওলারা যেন আজ ষড়যন্ত্র করিয়াছে! এ পথে একখানা খালি-ট্যাক্সির দেখা নাই! উপায়?

একখানা রিক্‌শ। শ্রীবিলাস রিক্‌শয় চাপিয়া বসিলেন। ভাবিলেন, পথিমধ্যে যেমন দেখিবেন খালি ট্যাক্সি, অমনি···

সময় চলিয়াছে, না, নদীর স্রোত···

পনেরো মিনিট পরে ঐ যায় একখানা চলন্ত খালি ট্যাক্সি। শ্রীবিলাস প্রাণপণ-বলে হাঁকিলেন,—ট্যাক্সি···

লোকটা শুনিতে পাইল না···বাতাসের বেগে গাড়ী লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।···

রিক্‌শ চলিয়াছে ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্···এ কি গাড়ী! রাগে শ্রীবিলাসের আপাদ-মস্তক জলিয়া উঠিল।

আরো সাত মিনিট পরে আর-একখানা খালি ট্যাক্সি···

রিক্‌শর উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীবিলাস দুই হাত তুলিয়া উচ্চ-স্বরে হাঁকিলেন,—ট্যাক্সি ··

এ-লোকটা শুনিল। বোধ হয়, এ বেলায় তেমন রোজগার হয় নাই···তাই চারিদিকে অমন আকুল নেত্রের দৃষ্টি বুলাইয়া গাড়ী চালাইতেছিল···

ট্যাক্সি থামিল। রিক্‌শওয়ালাকে একটা আধুলি দিয়া শ্রীবিলাস ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিলেন। বলিলেন—পার্ক সার্কাশ···ট্রাম ডিপো···

বেণু-কুঞ্জ, না, আরাম-কুঞ্জ! প্রমোদ-বিলাসীর ভিড়ে কুঞ্জ গম্‌গম্ করিতেছে।

শ্রীবিলাস আসিয়া ম্যানেজারকে প্রশ্ন করিলেন—অশ্রুকণা সান্যাল বলে কেউ এসেছেন?

ম্যানেজার বলিল—জানি না। ভিতরে গিয়ে দেখুন···

ফটোখানা পকেটে ছিল। সে-ফটো বাহির করিয়া মুখখানা ভালো করিয়া দেখিয়া সে-মুখের ছবি মনে বেশ করিয়া আঁকিয়া লইয়া শ্রীবিলাস ঢুকিলেন বেণু-কুঞ্জের ভিতরকার হলে।···

কোথায় কুমারী অশ্রুকণা?

অসংখ্য টেবিল। কোনো টেবিল ঘিরিয়া দু'খানা চেয়ার, কোনোখানা ঘিরিয়া চার-পাঁচখানা। সব চেয়ার ভর্ত্তি। নানা-বয়সের নর-নারী···

ভালো শাড়ী এবং ভালো চেহারা দেখিয়া শ্রীবিলাস সন্ধান করিলেন···কোথায় নিঃসঙ্গ-নির্জ্জন-ধ্যান-নিমগ্না সেই একটিমাত্র তরুণী···একখানি চেয়ারে প্রতীক্ষা-রতা?

কোথাও নাই!

হতাশ চিত্তে কোণে একটা খালি চেয়ার দেখিয়া শ্রীবিলাস সেই চেয়ারে বসিলেন। ভাবিলেন, ভাগ্য! নহিলে গাড়ী বিকল হইবে কেন?···হয়তো প্রতীক্ষায় থাকিয়া-থাকিয়া বিরক্তি-ভরে অভিমান করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন!

বেয়ারা আসিয়া প্রশ্ন করিল—কি দেবো?

তাইতো!···শ্রীবিলাস তাড়াতাড়ি বলিলেন—এক পেয়ালা চা···

—টোষ্ট? ওম্‌লেট? পোচ্?

—না।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

কপালের ঘাম মুছিয়া শ্রীবিলাস চারিদিকে চাহিলেন কৈ···একাকিনী তরুণী? দূরে···ঐ না···ঐ আশমানী রঙের সিল্কের শাড়ী-পরা···ঐ যে কাহাকে খুঁজিতেছেন! দু'চোখে অধীর দৃষ্টি!···মুখখানা?···ঠিক এই ফটোর মুখের মতো···

শ্রীবিলাস উঠিলেন।

বেয়ারা চা আনিল, টেবিলে রাখিয়া কহিল—বাবু···

শ্রীবিলাস কহিলেন—রাখো চা···আমি আসছি।

দৃষ্টি ঐ তরুণীর পানে···শ্রীবিলাস চলিলেন। বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছে উত্তাল ছন্দে···

ঐ যে তরুণী···দু'চোখে অধীর দৃষ্টি! ও-অধীরতার অন্তরালে কি নিবিড় সুখ-সম্ভাবনার উল্লাস-উচ্ছ্বাস! শ্রীবিলাস বিমুগ্ধ হইলেন···

মুখখানি···

না, ফটোর মুখের চেয়ে আরো ভালো! ক্যামেরা যন্ত্র মাত্র! তার সাধ্য কি, ও-মুখের আদরা বুকে আঁকিবে! আর মুখের রঙ···যেন তাজা গোলাপ!

শ্রীবিলাসের মনে হইল, হৃৎপিণ্ডটা বুঝি বুক ভাঙ্গিয়া বুকের মধ্য হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে, এত জোরে দুলিতেছিল!

তরুণীর কাছে আসিয়া শ্রীবিলাস বলিলেন,—নমস্কার!

তরুণীর অধীর দু'চোখে ফুটিল বিস্ময়···আতঙ্ক!

শ্রীবিলাস সে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না, বলিলেন—আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। মানে, গাড়ী অচল হয়ে গিয়েছিল পথের মধ্যে! তা ইয়ে, আপনার ট্যাক্সি-ভাড়া কত পড়লো?…না, না, আমাকে এতখানি কৃতার্থ করতে এসেছেন…এ অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলবো না…

তরুণীর পানে শ্রীবিলাস চাহিলেন। তরুণীর দু'চোখে তখন আর বিস্ময় নাই, আতঙ্ক নাই! দু'চোখে অগ্নিশিখা জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে!

শ্রীবিলাস ভীত হইলেন…বিলম্ব হইয়াছে, তাই রাগ করিয়াছেন!

মৃদু-হাস্যে শ্রীবিলাস কহিলেন,—আমাকে ক্ষমা করবেন। অনেক কষ্ট দিয়েছি…নিরুপায়ে! তবু যখন দয়া করেছেন…করুণাময়ী দেবী…আমাকে আপনার দীন ভৃত্য বলে জানবেন।

মিনতির ভারে শ্রীবিলাস গলিয়া পড়িলেন।

সহসা তীব্র স্বর! তরুণী কহিলেন,—আপনি কেমন ভদ্রলোক!…এ সব কথার মানে?

শ্রীবিলাস চমকিত হইলেন। কথা নয়, যেন আগুনের গোলা!

শ্রীবিলাস সরিয়া আসিলেন…

একেবারে নিজের চেয়ারে। কোনোদিকে না চাহিয়া চায়ের পেয়ালা মুখে ধরিলেন…পৃথিবী ভয়ঙ্কর দুলিতেছিল!

পেয়ালায় দু'চুমুক মাত্র দিয়াছেন…

সহসা আর-একটা তীব্র স্বর—শুনছেন?

শ্রীবিলাস চোখ তুলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, রুদ্রভৈরব …তরুণ-বেশে একেবারে সামনে! তার দু'চোখে আগুনের হল্কা! আর রুদ্রভৈরবের পিছনে সেই আশমানী সিল্কের শাড়ী…

রুদ্রভৈরব কহিল—আপনার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার স্ত্রীর সঙ্গে তামাসা করেন ইতর-ছোটলোকের মতো! দীন ভৃত্য…করুণা!…মানে?…দেখবেন মজা?

স্ত্রী! তামাসা! মজা!

এঃ! তবে কি ভুল করিয়াছেন?…কিন্তু কি করিয়া জানিবেন?

শ্রীবিলাসের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি শুধু রুদ্রভৈরবের পানে চাহিয়া রহিলেন—মুখে কথা ফুটিল না।

রুদ্রভৈরব বজ্র-স্বরে বলিল—এর মানে? বয়সে তো এদিকে দেখছি, বুড়ো-শালিক! এ বয়সেও ইতরুমি ত্যাগ করতে পারেন নি!…পার্শী খুলে ভদ্রমহিলাকে হাত করতে এসেছেন! বটে! করুণাময়ী…দীন-ভৃত্য!…রাস্কেল কোথাকারের…

আশে-পাশে চার-পাঁচটা টেবিল হইতে একসঙ্গে কলরব উঠিল—কি হয়েছে মশায়?

রুদ্রভৈরব কহিল—দেখুন না মশায়, আমার স্ত্রী এসে আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছেন, টেনিশ খেলে আমি এসে ওঁর সঙ্গে এখানে জয়েন করবো…আর এই বুড়ো-শালিক ব্যাটা আমার স্ত্রীকে একলা দেখে ওঁর-সঙ্গে রসিকতা করতে গেছেন! ট্যাক্সি-ভাড়া করে ওঁকে নিয়ে joy-rideএ বেরুবেন!…বলেন, করুণাময়ী…উনি ওঁর দীন ভৃত্য!

—বটে!…

আশপাশের লোকেরা আস্তিন গুটাইয়া একেবারে রুখিয়া উঠিল,—বুড়ো-শয়তান…

শ্রীবিলাসের চোখের সামনে মা শ্মশান-কালী একেবারে তাথৈ তাথৈ করিয়া নাচিয়া উঠিলেন! তাঁর গলায় নৃমুণ্ডমালা…হাতে রক্ত-মাখা খড়্গ…রক্তে-লাল লোল রসনা!

দু'একটা চড়-ঘুষি মুখে পড়িল…গায়ে পড়িল…মাথায় পড়িল।

কোনোমতে শ্রীবিলাস কহিলেন—আমি মন্দ লোক নই মশায়, কুঅভিপ্রায়ে কোনো কথা বলিনি। মানে, ইয়ে, আমার সঙ্গে এখানে দেখা করবার কথা শ্রীমতী অশ্রুকণা সান্যালের…বিশেষ এক বৈষয়িক ব্যাপারে। তাঁকে আমি চিনি না। তাই ভুল করে…

সঙ্গে সঙ্গে প্রবল অট্টহাস্য! সে-অট্টহাস্যে হল বুঝি ফাটিয়া যাইবে…

সকাতরে শ্রীবিলাস বলিলেন—ম্যানেজারকে বরং জিজ্ঞাসা করুন, এসেই আমি সন্ধান নিয়েছি, অশ্রুকণা সান্যাল বলে কেউ এসেছেন কি না…

হট্টরোলে গড়াইতে গড়াইতে ব্যাপার এইখানে থামিল।

শ্রীবিলাস কিন্তু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না…চারিদিকে কৌতুকের দৃষ্টি…তাঁর পা দুটাও অসাড়, অবশ হইয়া গিয়াছে।

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া চুপচাপ তিনি বসিয়া রহিলেন ··মাথার মধ্যে সপ্ত-সমুদ্র ঢেউ তুলিয়া আতাল-পাতাল করিতেছে!

বেণু-কুঞ্জের রেডিওশেটে গান চলিয়াছে—

ভুল করে তুই সব খোয়ালি,
ওরে বেভুল বেচারী রে!
তোর ও-ভুল বুঝে তোর দুয়ারে
সে কি আবার আসবে ফিরে?

শ্রীবিলাস যেন পাগল হইবেন! বেতারেও এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উৎসারিত হইয়াছে তাঁকে লক্ষ্য করিয়া!···ওরা কি করিয়া জানিল?

মাথা ঘুরিতেছিল। শ্রীবিলাস চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বেতারের যন্ত্রে গানের কথায় বিদ্রূপের বাণ বহিয়া চলিয়াছে···

বেয়ারা আসিল,—ঔর কুছ্? চিকেন্-কারি? ডেভিল? গ্রেভি? কাট্‌লেট্? পুডিং?

চুপ করিয়া কাঁহাতক থাকা যায়!

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীবিলাস কহিলেন—পুডিং লা'ও···

দায়ে পড়িয়া পুডিং মুখে দিলেন···

সহসা চেয়ারের সাম্‌নে এক নারী-মূর্ত্তি ··

মূর্ত্তি কহিল—আপনার নাম শ্রীযুত শ্রীবিলাস চক্রবর্ত্তী?

শ্রীবিলাস মুখ তুলিয়া চাহিলেন···যে-মা-শ্মশান-কালী একটু আগে নৃমুণ্ডমালা গলায় দুলাইয়া নাচিয়া গিয়াছেন, এ যেন তাঁর কোনো অনুচরী! কঙ্কালখানার উপরে সিল্কের শাড়ী-ব্লাউশ্ চাপা দিয়া আধুনিক বেশে সাজিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! ··

শ্রীবিলাস কহিলেন—কেন বলুন দিকিনি···

অনুচরী হাসিল। হাসিয়া কহিল,—মানে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ট্রামে এলুম কি না···ভাবলুম, মিছিমিছি ট্যাক্সিতে এসে আপনার টাকা নষ্ট করি কেন?···যখন সব ঠিক, তখন আপনার পয়সার উপর দরদ করবো বৈ কি!

শ্রীবিলাসের বুঝিতে বাকী রহিল না, ইনি কে!···ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্ষুব্ধ মনে সহসা কে অজস্র শরক্ষেপ করিল। সে-শরে বুকে অজস্র প্রশ্ন রক্তবিন্দুর মতো ফুটিয়া উঠিল···

অনুচরী কহিল—বুঝেচেন তো, আমার নাম অশ্রুকণা সান্যাল ··

শ্রীবিলাস শিহরিয়া উঠিলেন···এবারে তিনি ভুল করেন নাই। ঠিক বুঝিয়াছেন।

অনুচরী চেয়ার টানিয়া শ্রীবিলাসের পাশে বসিল··· হাতের ছোট হাত-ব্যাগ খুলিল, খুলিয়া বলিল—এই আপনার চিঠি। আপনি লিখেচেন, যত শীগ্‌গির বিয়েটা হয়···

শ্রীবিলাসের বুক ভরিয়া নিশ্বাসের বাষ্প···সে বাষ্পবেগে বুক বুঝি ফাটিয়া যাইবে···

অনুচরী বলিল—তারিখ আমি এক রকম দেখে রেখেছি। সামনের হপ্তায় একটা শুভ দিন আছে। আপনি কি বলেন?

শ্রীবিলাস মরিয়া হইলেন। বলিলেন—কিন্তু আপনি ভুল করচেন! আমার নাম শ্রীবিলাস চক্রবর্ত্তী নয়···। শ্রীবিলাস চক্রবর্ত্তী বলে একটি ভদ্রলোককে একটু আগে এই হোটেলের সামনে দেখেছি। তিনি বাস-চাপা পড়েচেন ···তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাঁচলেন, কি, মারা গেলেন, জানি না। সে-খপর জানা যাবে কাল সকালে খপরের কাগজ বেরুলে।···মানে, জখম বেশ গুরুতর কি না···

এ কথা বলিয়া দ্রুত উঠিয়া তিনি পার্শ খুলিলেন, ডাকিলেন,—বয়···

বেয়ারা আসিল। তাড়াতাড়ি তার হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট দিয়া বলিলেন—বিল চুকিয়ে যা থাকবে, তুমি নিয়ো···তোমার বখশিস্···

কথাটা শেষ করিয়া শ্রীবিলাস চক্রবর্ত্তী চট্‌পট্ বেণু-কুঞ্জের বাহিরে আসিলেন। পথে একখানা ট্রাম চলিয়াছে··· ট্রামে চড়িয়া শ্রীবিলাস বেণু-কুঞ্জের পানে চাহিলেন···

না, সে অনুচরী তাড়া করে নাই! শ্রীবিলাস নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অরণ্যমধ্যে বিমানপোতধ্বংসী কামান

আমেরিকার ফোর্ট ব্রাগ্-এ কুচকাওয়াজ উপলক্ষে দেশরক্ষার সম্বন্ধে এক অভিনব প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। অরণ্যমধ্যে কাঠের কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বিমান-বিধ্বংসী কামান রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আকাশপথে শত্রুর বিমান আসিলে, এই স্থান হইতে
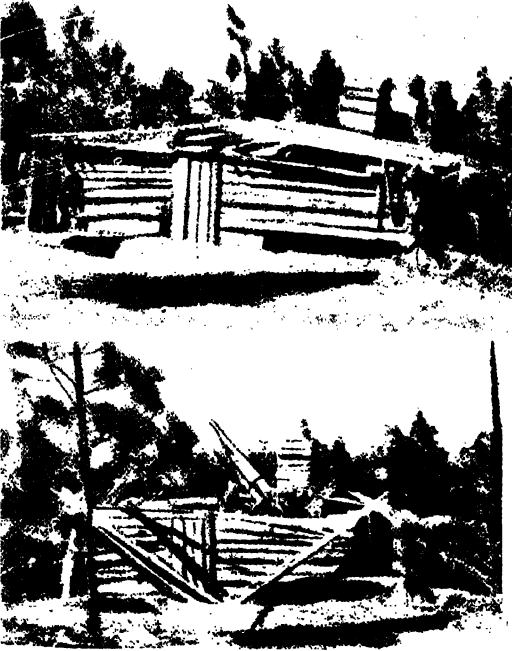
উপরের চিত্রে দারুকুটীর দেখা যাইতেছে। নিম্নের ছবিতে বিমান-বিধ্বংসী কামান অগ্নিবর্ষণে উদ্যত

র গতিবিধি লক্ষ্য করা অত্যন্ত সুবিধাজনক। উপর হইতে কামানের অবস্থান স্থান লক্ষ্য করা শত্রুবিমানের আরোহীদিগের অসম্ভব। তার পর যদি শত্রুবিমান কামানের পাল্লার মধ্যে য়া পড়ে, তখন মুহূর্ত্তমধ্যে দারুকুটীর সরাইয়া গুপ্ত বিমান-সী কামান হইতে অজস্র গোলা নির্গত হইতে থাকে। ছবি লেই ব্যাপারটা বেশ বুঝা যাইবে।

ভাসমান ডাকের বাক্স

ইদানীং যে সকল জাহাজ ডাকবহন করে, তাহাতে ভাসমান বাক্স থাকে। সেই বাক্সমধ্যে ডাকের চিঠিপত্রাদি রাখিয়া, চলিতে চলিতে জাহাজ হইতে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তরঙ্গ-বিতাড়িত হইয়া ভাসমান ডাক-বাক্স তীরে পৌছায়। ডাকবিভাগের লোকজন

ভাসমান ডাকের বাক্স

তীরসংলগ্ন বাক্স তুলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। শুধু ডাকের চিঠি বিলি করিবার জন্য জাহাজকে আর বন্দরে অকারণ বিলম্ব করিতে হইবে না বলিয়াই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

অতিকায় কামান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগে এক জাতীয় অতিকায় কামান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কামান হইতে ৯৫ পাউণ্ড ওজনের এক একটি গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই কামানের পাল্লা ১৫ মাইল পর্য্যন্ত। অর্থাৎ ১৫ মাইল দূর পর্য্যন্ত কামানের

গোলা চলিয়া যাইবে এবং সম্মুখে যাহা কিছু পড়িবে, সবই চূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কামানের গোলা ঊর্দ্ধদিকে ৩০ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইবে। এই কামান ১০টি রবারযুক্ত চাকার উপর অবস্থিত। সমগ্র কামানটির ওজন সাড়ে পনের টন অর্থাৎ প্রায় ৪ শত ২৬ মণ। হইতে ৪৫ মিনিটের মধ্যে এই কামানকে গোলাবর্ষণের

অতিকায় মার্কিণ কামান

উপযোগী করিয়া তুলিতে পারা যায়। এই কামান সম্পূর্ণ মার্কিণ পরিকল্পনা অনুসারে নির্ম্মিত।

দূরবীক্ষণযন্ত্রের সুবৃহৎ দর্পণ

টেক্সাসে ম্যাকডোনাল্ড অবজারভেটরী বা পর্য্যবেক্ষণাগারের জন্য একটি সুবৃহৎ দূরবীক্ষণযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার দর্পণখানি ৭ ফুট হইবে। এই ৮২ ইঞ্চি দর্পণখানি ঘষিয়া মাজিয়া পালিশ করিতে প্রায় ৪ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এই দর্পণখানির ওজন

দূরবীক্ষণযন্ত্রের সুবৃহৎ দর্পণ

৩ টন (এক টন ২৭।০ মণ)। উহা ১২ ইঞ্চি পুরু। দর্পণখানিকে এখন দূরবীক্ষণযন্ত্রে ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে।

অতিকায় যাত্রিবাহী বিমান

এই বিরাট যাত্রিবাহী বিমান ৪২ জন যাত্রী বহন করিতে সমর্থ। এই বিমানের ওজন ২১ টন। বিমানখানি ঘণ্টায় ২ শত মাইল বেগে
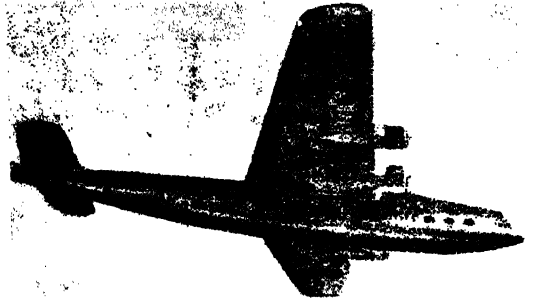
অতিকায় যাত্রিবাহী কামান

চলিতে পারে। ইহার ডানার বিস্তার ১ শত ২৩ ফুট। এই বিমান যাত্রিবহনের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহার গঠন-কার্য্যেও বৈচিত্র্য আছে।

দুগ্ধজাত পশমের পোষাক

বিস্ময়ের বিষয় বৈকি! দুগ্ধ হইতে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, মানুষ তাহা সাগ্রহে উপভোগ করে। কিন্তু বিজ্ঞানের কৌশলে দুগ্ধজাত পশমের পোষাক বিংশ শতাব্দীর অভিনব বস্তু।

দুগ্ধজাত পশমের পরিচ্ছদ

ইটালীর মিলান সহরে দুগ্ধজাত পশমের পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইতেছে। ৬৩ পাঁইট দুগ্ধ যন্ত্রের মধ্যে প্রদান করিবার পর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এমন পশম বাহির হইল যে, তাহাতে সমগ্র পোষাক প্রস্তুত হইয়াছে, দুগ্ধজাত পশম নিউইয়র্ক সহরে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহা হইতে পাঁশুটে বর্ণের নারীর ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়। মিলানের এই কারখানা ইদানীং বহু য়ুরোপীয় দেশে এই পরিচ্ছদ সরবরাহ করিতেছে। প্রদত্ত চিত্রে নারীর অঙ্গের পোষাক দুগ্ধজাত উল হইতে নির্ম্মিত।

বিমানবিধ্বংসী কামান

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিমানবিধ্বংসী নানাপ্রকার কামান তৈয়ার করিতেছেন। চিত্রে যে কামানের ছবি প্রদত্ত হইল, উহাও বিমানবিধ্বংসী আর এক শ্রেণীর কামান। এই কামান বিমান-

বিমানবিধ্বংসী কামান
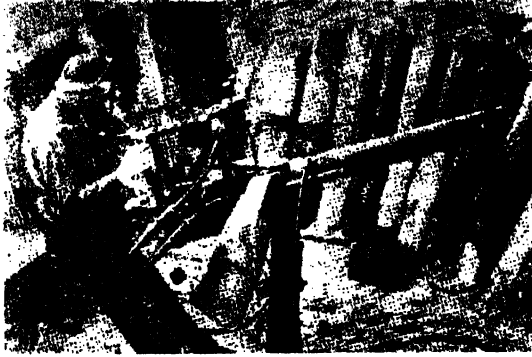
ধ্বংসকার্য্যে বিশেষ সুফল প্রদান করিবে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ আশা করেন। এই কামান হইতে অতি দ্রুত বোমা বর্ষিত হইয়া থাকে।

বিচিত্র ভস্মাধার

পাখীর আকারবিশিষ্ট ভস্মাধার বাজারে বাহির হইয়াছে। এই ভস্মাধারে জ্বলন্ত চুরুটিকা রাখিলে, খানিক পরে উহার উত্তাপে ভস্মাধারের পাখীর ব্যাদিত মুখ আপনা হইতে চুরুটিকাকে গ্রাস করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ভস্মাধারের অভ্যন্তরে এমনভাবে জড়ান তার সংলগ্ন আছে যে, চুরুটিকার উত্তাপে উহা এই ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড করিয়া থাকে। চুরুটিকা জ্বলন্ত অবস্থায় পুড়িতে থাকায় জড়ান তার খুলিয়া এই ব্যাপার ঘটাইয়া থাকে। পক্ষি-গর্ভে চুরুটিকা ভস্মে পরিণত হইবার পর, তলদেশ হইতে ভস্ম বাহির করিয়া ফেলা যায়।

বিচিত্র ভস্মাধার

যান্ত্রিক ফুসফুসের কাণ্ড

কৃত্রিম যান্ত্রিক ফুসফুসের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ মানুষের জীবন রক্ষা করিতে পারেন। মানুষের দেহ-যন্ত্রের স্বাভাবিক কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এই কৃত্রিম ফুসফুসের সাহায্যে রক্তপরিচালনার কার্য্য দ্বারা মানুষকে বাঁচাইতে পারা যায়। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক পশুদেহে এই উপায়ে নবজীবন সঞ্চার করিয়া সাফল্য
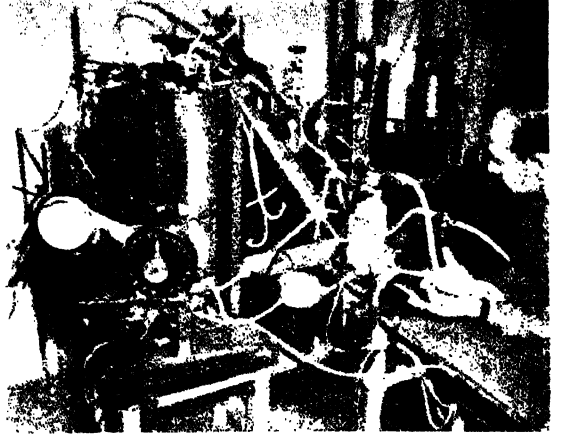
যান্ত্রিক ফুসফুসের কাণ্ড

লাভ করিয়াছেন। কৃত্রিম ফুসফুসের সাহায্যে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত করা যায়। নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের দ্বারা রক্ত বিশুদ্ধ করিয়া জীবদেহে সঞ্চালিত করিয়া চিকিৎসকগণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই মনুষ্যদেহেও এইরূপ প্রক্রিয়ায় সাফল্যলাভের চেষ্টা হইবে।

চক্ষুর ক্লান্তি দূর ও দেহের কান্তিবর্দ্ধনের উপায়

বাজারে দেহের কান্তিবর্দ্ধক ও চক্ষুর ক্লান্তিনাশক একপ্রকার পালকের ন্যায় লঘু "প্যাড" বাহির হইয়াছে। উহাতে একপ্রকার আরক

চক্ষুর ক্লান্তিনাশ ও বর্ণের কান্তিবর্দ্ধনের উপায়

ঢালিয়া দেওয়া হয়। সিক্ত প্যাডখানি চক্ষুযুগলের উপর ৫ মিনিট অন্তর মৃদুভাবে চাপিয়া ধরিলে, চক্ষুর ক্লান্তি দূরীভূত হইবে। উক্ত আরকের গুণে চক্ষুমণ্ডলের চারিদিকে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক ভাবে বহিতে থাকে। এই প্যাডের সাহায্যে দেহের কান্তিও বাড়াইতে পারা যায়।

বিচিত্র আকারের বন্দুক

বিচিত্র আকারের বন্দুক

জার্ম্মাণীর পদাতিক সৈনিকদিগের জন্য একপ্রকার নূতন বন্দুক সরবরাহ করা হইয়াছে। এই বন্দুক স্বয়ংচালিত হইয়া দ্রুত গুলী বর্ষণ করিয়া থাকে। এই বন্দুকের কক্ষগুলি গোলাকার। মুখগুলি বন্দুকের একদিকে অবস্থিত। ছবি দেখিলেই সব বুঝা যাইবে। ঘোড়া টিপিলেই গুলী আপনা হইতেই বন্দুকের যথাস্থানে নীত হয়। এই ভাবে এই বন্দুক ছোট কলের কামানের কাম করিয়া থাকে।

বিচিত্র দ্বিচক্রযান

চিত্রে প্রদত্ত দ্বিচক্রযানে দেখা যাইবে, একটি সমগ্র পরিবার আরোহণ করিয়াছে। পিতামাতা ও সাত জন পুত্র-কন্যা এই গাড়ীতে চড়িয়া প্রমোদভ্রমণে চলিয়াছে। দুইখানি দ্বিচক্রযান এমন ভাবে একই দ্বিচক্রযানে পরিণত হইয়াছে যে, তাহাতে ৯ জনের বসিবার আসন বিদ্যমান। পিতা ও মাতা সম্মুখের সারিতে বসিয়া গাড়ী চালনা
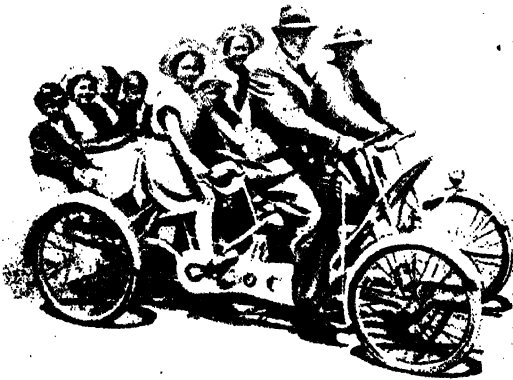
দ্বিচক্রযানে ৯ জন আরোহী

করেন, তাঁহাদের পশ্চাতের তিন জন সে বিষয়ে সাহায্য করে। বাকি সকলে নিরাপদে বসিয়া থাকে। এই অস্বাভাবিক গাড়ীখানি সুইজারল্যাণ্ডে নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত।

বিজ্ঞানের কৌশল

প্রসাধনাগারে ইদানীং সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক নানাপ্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে। যন্ত্রসহযোগে ইংরেজী 'Y' আকারের কাচের নলের মধ্য হইতে 'ভায়লেট' রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি গণ্ডদেশের রক্তপ্রবাহকে

গণ্ডদেশ আরক্ত করিবার বৈজ্ঞানিক কৌশল

এমনভাবে পরিচালিত করে যে, তাহাতে স্বাভাবিক লোহিত আভা গণ্ডদেশকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলে। সুন্দরীরা এইভাবে দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

বিচিত্র চুরুট

বীয়ার মদ্যে চুরুট ডুবাইলে উহাতে অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে সংলগ্ন হইয়া থাকে। তরলিত বাতাসে আর্দ্র চুরুট ধরাইবামাত্র উহার

বিচিত্র চুরুট

অগ্রভাগ বাতির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবে। পাঁচ ইঞ্চ দীর্ঘ অগ্নিশিখা উহা হইতে নির্গত হইতে থাকে। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ব্যুরোর ডাক্তার ফ্রান্সিস্ স্মিথ এই ব্যাপার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বন্ধুজনকে দেখাইয়াছেন।

উপন্যাস

অষ্টত্রিংশ লহর

পুলিস-কমিশনারের আত্মকথা

জেরাল্ড ক্রষ্ট বলিলেন, "আমার মনে হইত, বিচারপ্রণালী কোন কোন ক্ষেত্রে প্রহসন মাত্র; এবং আপনি যদি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি, পুলিস সম্বন্ধেও আমার ধারণা ঐরূপই ছিল। ইহার দৃষ্টান্তও দিতে পারি। একটি বুভুক্ষু বালিকা কোন রেস্তোঁরায় আহার করিয়া খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিতে না পারায় তাহার এই 'অপরাধে' তাহাকে ছয় মাসের জন্য কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সে জীবনে কোন দিন কোন অপরাধ না করিলেও তাহার এই শাস্তি! কিন্তু দেশের যত চোর ডাকাত, পকেট-মার, গুণ্ডা, কলঙ্ক-প্রচারের ভয় দেখাইয়া উৎকোচগ্রাহী প্রভৃতি বদমায়েসের দল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া বিনাদণ্ডে চরিয়া বেড়াইতেছে, আপনারা বহু চেষ্টাতেও তাহাদিগকে ধরিতে পারেন না; ইহা আমার বড়ই অন্যায় মনে হইত।"

পুলিস কমিশনার বলিলেন, "আমি স্বীকার করি—সর্ব্বদাই এরূপ হইয়া থাকে।" তাহার পর তিনি আরও দুই একটি কথা বলিলেন; ক্রষ্ট তাহা কাণে তুলিলেন না, বা সে কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কমিশনার তাহা অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন।

ক্রষ্ট অতঃপর বলিলেন, "আমাদের দলের লোকরা—আপনি আমার নিকট তাহাদের নাম শুনিবার আশা করিবেন না—এক রাত্রিতে নেলরের মামলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল; ওল্ড-বেলীর আদালতে তাহার মামলা চলিতেছিল। কিন্তু লজ্জার কথা এই যে, বিনাদণ্ডে সে মুক্তি লাভ করে! আমরা বুঝিলাম, বিচারকার্য্য অনেক স্থলে এই ভাবেই চলে; আইনকে সাক্ষীর খেয়ালে পরিচালিত হইতে হয়। আমরাও প্রথমে খেয়ালের বশীভূত হইয়া আমোদের জন্য এই কায আরম্ভ করি, তাহার পর ইহা জটিল সমস্যায় দাঁড়ায়; কিন্তু অবশেষে সঙ্কট ঘনীভূত হইল। আপনি ইচ্ছা হইলে ইহাকে 'এড্‌ভেঞ্চার' বলিতে পারেন।"

লর্ড ব্র্যাডনি বলিলেন, "গত রাত্রে তুমি কি হীথল্যাণ্ডস্‌এ ছিলে?"

ক্রষ্ট বলিলেন, "না, আমি মাউণ্ট ষ্ট্রীটে ছিলাম। আমার ধারণা ছিল, থর্সবি তাহার মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী সেখানেই রাখিয়াছিল; এবং পরে আমার এই ধারণাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।"

অনন্তর ক্রষ্ট তাঁহার হাতের ব্রীফ-কেস খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকখানি দলীল বাহির করিলেন, এবং কমিশনারকে বলিলেন, "এই সকল কাগজ-পত্র সংগ্রহের জন্যই আমি সেখানে গিয়াছিলাম। থর্সবি হর্ণিব্লো নামক ব্যাঙ্কারটার সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল; স্কুইনফোর্ড মিউনিসিপাল-ষ্টকের সার্টিফিকেট জাল করিয়া জনসাধারণের অর্থ অপহরণ করাই তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য।"—তিনি কমিশনারের ডেস্কের উপর একখানি কাগজ রাখিয়া বলিলেন, "আপনি এই কাগজখানিতেই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইবেন। ফেটিস্‌বারি আমার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ ছিলেন; আমার প্রধান সহকারী বলিয়াও ধরিয়া লইতে পারেন। আমি এখন আর একথা গোপন করিতে চাহি না; কারণ, তাহাতে কোন ফল হইবে না। আপনার নিকট এ কথা প্রকাশ করায় যতই ক্ষতি হউক, সেজন্য আমি চিন্তিত নহি; তবে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া আমি ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু ফেটিসবারিকে যে উপদেশ দান করা হইয়াছিল, গত

রাত্রিতে তিনি সেই উপদেশের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন ; তিনি আমাকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে আমার অপরাধ নিজের ঘাড়ে লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি আমার নিজের দায়িত্ব অন্য কাহারও ঘাড়ে না চাপাইয়া, স্বয়ং তাহার ভার বহনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। আর এক কথা, হর্ণিব্লো স্বয়ং বিস্তর দেনায় জড়িত হইয়া দেউলিয়া হইতে উদ্যত ; এইজন্য ঐ ভাবে ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে তাহার আগ্রহ হইয়াছিল।"

পুলিস-কমিশনার নিস্তব্ধ ভাবে ফ্রষ্টের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমাদের দলের কার্য্য নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন হইতেছিল।"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে যদি আপনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার উক্তির সমর্থন করি : কারণ, আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের কায মন্দ চলিতেছিল না। আমাদের কায একবার আরম্ভ হইলে আমরা যুদ্ধনিরত সৈন্যমণ্ডলীর ন্যায় অশ্রান্ত ভাবে তাহা সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতাম। আপনিও জানেন, পুলিস আমাদিগকে চূর্ণ করিবার জন্য কিরূপ কঠোর শ্রম করিয়াছিল।"

পুলিস-কমিশনার বলিলেন, "সে কথা সত্য ; তবে যদি তোমার শুনিতে আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমি পুলিসের বাহিরের লোক হিসাবে তোমার নিকট স্বীকার করিতে পারি যে, কিছু কালের জন্য আমি তোমাদের কল্যাণ কামনাই করিয়াছিলাম। আমি যে দায়িত্বসম্পন্ন পুলিস-কর্ম্মচারী, একথা ভুলিয়া গিয়াই তোমার নিকট আমার এই অভিমত প্রকাশ করিলাম—ইহা তুমি স্মরণ রাখিবে।"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "ধন্যবাদ মহাশয়। শুনিয়াছি, নিউটন স্মিথ গত রাত্রিতে নিহত হইয়াছে।"

পুলিস-কমিশনার বলিলেন, "হাঁ, ক্রিজিনোভস্কি কর্ত্তৃক সে নিহত হইয়াছে। আজ অতি প্রত্যূষে চাটসির একটা মাঠের ভিতর এই আর্ম্মাণীটাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। সে একখণ্ড কাচে ফাঁসের দৃশ্য দেখিয়াছিল বলিয়া অস্ফুট স্বরে প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল। যাহা হউক, তুমি পুলিসকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়াই বোধ হয় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলে ; কি বল ?"

ফ্রষ্ট মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না মহাশয়, আমি পুলিসকে অকর্ম্মণ্য মনে করি নাই। ইন্‌স্পেক্টর ফরেষ্ট পুলিসের কার্য্যদক্ষতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনি যে আইনের সহায়তা গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক। এতদ্ভিন্ন, উহাতে যে খেলা চলিয়াছিল, তাহা অতি চমৎকার।"

লর্ড ব্র্যাডনি বলিলেন, "বর্ত্তমানের এই বৈচিত্র্যের যুগে 'এডভেঞ্চারের' দিকেই লোকের ঝোঁক অত্যন্ত অধিক, এবং প্রায় সকলেই তাহার প্রয়োজন অনুভব করে। অবশ্য, বুড়াদের বাদ দিয়াই আমি এ কথা বলিতেছি।"

অতঃপর তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, "এতদ্ভিন্ন, আর একটি কারণের কথা তুমি বলিয়াছিলে বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"—তিনি পূর্ব্বে যে কথাটি অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন, এবার তাহা সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া ফ্রষ্টের মুখ বিবর্ণ হইল ; তিনি বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না।"

ফ্রষ্ট পুলিস-কমিশনারের ডেস্কে যে কাগজ রাখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইয়া ব্রীফ-কেসে পুনঃস্থাপিত করিতে উদ্যত হইলেন।

পুলিস-কমিশনার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও কি করিতেছ ? ও কাগজ আমি যে এখন পর্য্যন্ত পরীক্ষা করি নাই।"

ফ্রষ্ট বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি, মহাশয়! কিন্তু আমার একটু ভুল হইয়াছিল ; একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি দুইটি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল ; দ্বিতীয়তঃ, আপনার সঙ্গে একটা বুঝা-পড়া করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। আশা করি, এখন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রেরণ করা হয় নাই।"

পুলিস-কমিশনার বলিলেন, "না, তাহা হয় নাই আমি এইরূপ উপদেশই দান করিয়াছিলাম।"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "উত্তম ; এখন আমি যাহা প্রস্তাব করিব, সে সম্বন্ধে আশা করি আপনি সুবিবেচনা করিবেন আপনি এই কাগজগুলি আপনার নিকট রাখিতে পারেন।

কিন্তু সে জন্য আমার সর্ত্ত এই যে, আপনি বেসিল ফেটিসবারি এবং মিস সিন্থিয়া হলগেটকে মুক্তিদান করিবেন। আশা-করি, আপনি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই যে, 'নিশাচর বাজ' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া আমি যে সকল কার্য্যে বা কুকার্য্যে লিপ্ত ছিলাম, তাহার সহিত এই তরুণীর কোন সম্বন্ধ ছিল।"

পুলিস-কমিশনার বলিলেন, "কিন্তু এই যুবতীকে একটি রিভলভার হস্তে তোমাদেরই দলের ছদ্মবেশে হীথল্যাণ্ডসএ আসিয়া জুটিতে দেখা গিয়াছিল—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

ফ্রষ্ট পুলিস-কমিশনারের এ কথার উত্তরে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আপনি যাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিতেছেন, তাহ'তে কি প্রতিপন্ন হইয়াছে? আপনি তাহার প্রতিকূলে কিছুই প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, সে যে জবাব দিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত; অসম্ভব বলিলেও ভুল হয় না। সুতরাং তাহাতে কি যায় আসে?"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে ফ্রষ্ট পুলিস-কমিশনারের টেবলের কাগজ তাঁহার ব্রীফ্-কেসে পূরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর অধীর স্বরে বলিলেন, "আমি আপনার আদেশের অর্থাৎ আপনার অভিমতের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

পুলিস-কমিশনার তাঁহাকে চেয়ারে পুনর্ব্বার বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তোমার সকল প্রস্তাবই শৃঙ্খলাবর্জ্জিত, এবং বে-কায়দা।"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "আপনার বিবেচনায় যাহা সুশৃঙ্খল এবং কায়দা, তাহার সহিত এই ব্যাপারের কি সম্বন্ধ? আমি বলিতেছি, কয়েকজন সুদক্ষ তস্কর এখনও তাহাদের কার্য্যে রত আছে; ইহা কি আপনি অস্বীকার করিবেন?"

পুলিস-কমিশনার এই উক্তির সমর্থন করিলে ফ্রষ্ট বলিলেন, "উত্তম, তাহার পর কি?"

পুলিশ-কমিশনার প্রায় দুই মিনিট কি চিন্তা করিলেন; তাহার পর ফ্রষ্টের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উত্তম. আমি তোমার সর্ত্তেই সম্মত হইলাম, ফ্রষ্ট! আশা করি, তুমি এরূপ জেদী নহি, বা এরূপ অবিবেচক নহি যে, যাহা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করিব - তাহা নামঞ্জুর করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইবে, বা তাহা প্রত্যাখ্যান করিব। যাহা হউক, আমি তোমাকে একটি গল্প বলিতে চাহি, তাহাতে অধিক সময় নষ্ট হইবে না। আমারও সময় মূল্যবান্, তথাপি এই গল্পটি বলিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় নষ্ট করিতে হইবে। ইহা আমার ব্যক্তিগত কাহিনী।"

ফ্রষ্ট তাঁহার কথা শুনিয়া আপত্তি করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মুখে অধীরতা পরিস্ফুট হইল, যেন পুলিস-কমিশনারের গল্প শুনিবার জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

পুলিস-কমিশনার তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমার বয়স কত, ফ্রষ্ট!"

ফ্রষ্ট মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "আমার বয়স? আমার বয়স বত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে মহাশয়!"

পুলিস-কমিশনার বলিলেন, "আর আমার বয়স এখন পঞ্চান্ন বৎসর। বহুদিন পূর্ব্বে আমি যখন তরুণ যুবক সেই সময় একবার কার্য্যানুরোধে মেজরকায় প্রেরিত হইয়া-ছিলাম। সেখানে একটি পরমাসুন্দরী মার্কিণ-মহিলার সহিত আমার সাক্ষাৎ "

ফ্রষ্ট পুলিশ-কমিশনারকে তাঁহার মুখের কথা শেষ করিতে না দিয়া কিঞ্চিৎ অধীরভাবে বলিলেন, "সেখানে একটি পরমাসুন্দরী মার্কিণ যুবতীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার মধুর স্মৃতি সম্ভবতঃ আপনার হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত আছে, এবং এত দিন পরেও যৌবনের সেই স্মৃতি আপনি ভুলিতে পারেন নাই, ইহাও সম্ভবতঃ অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু সে সকল কথা কি আমার নিকট প্রকাশ না করিলে চলিতেছে না? উহা কি আমাকে শুনাইবার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক?"

পুলিস-কমিশনার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি যখন সেই কাহিনী তোমার নিকট বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহা যে তোমার শুনিবার অযোগ্য নহে, এবং তাহা তোমাকে শুনাইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে—ইহা তোমার বিশ্বাস করা উচিত ছিল। যাহা হউক, কথাটা আমাকে শেষ করিতে দাও। সেই মার্কিণ তরুণীর নাম এখনও তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই; তাহার নাম ছিল মার্গারেট ফ্রষ্ট। মার্গারেট ফ্রষ্টের সহিত প্রথম

পরিচয়ের পর তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বৰ্দ্ধিত হইল, এবং অবশেষে আমরা পরস্পরের প্রেমপাশে বন্দী হইলাম। আমাদের উভয়ের প্রেম এরূপ প্রগাঢ় হইল যে, ক্ষণেকের অদর্শনে আমরা উভয়েই জগৎ অন্ধকার দেখিতাম। প্রথম যৌবনের প্রেমে যে মাদকতা থাকে, তাহা জগতের সকল নেশা অপেক্ষা তীব্র, ইহা আশা করি, তোমাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমার মনে হইল, সেই তরুণীকে বিবাহ করিতে না পারিলে আমার জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ হইবে, জীবনধারণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে। কিন্তু যৌবনের মোহে, সাময়িক উত্তেজনাতেও তাহাকে সেই বিদেশে হঠাৎ বিবাহ করিতে পারিলাম না। কারণ, দেশে আমার পিতা ছিলেন; তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া আমার প্রেমের পাত্রীকে বিবাহ করা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না। পিতাকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করিতাম, এবং তাঁহার প্রতি আমার সাংসারিক কর্ত্তব্য ছিল। সেই কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া আমি পিতাকে পত্র লিখিলাম, এবং সেই পত্রে মার্গারেটকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমার পিতা গম্ভীরপ্রকৃতি এবং বংশমর্য্যাদার প্রতি অত্যন্ত আস্থাবান্ ছিলেন; এই জন্য আমার আশঙ্কা ছিল—সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা বিদেশিনীকে আমার বিবাহ করিবার প্রস্তাবে তিনি হয় ত আপত্তি করিবেন। যাহা হউক, যথাসময়ে তাঁহার পত্রের উত্তর পাইলাম। আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহা ফলিয়া গেল। আমার পিতা এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি লিখিলেন, আমি যেন রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীকে বিবাহ না করি।—তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছিলাম—মার্গারেট ক্রষ্ট অভিনেত্রী ছিল, রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া সে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। আমার পিতাকে সে কথাও জানাইয়াছিলাম; তাঁহার নিকট মার্গারেটের সম্বন্ধে কোন কথা গোপন করা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি নাই।

"একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম; আমি জানিতাম, যদি মার্গারেটকে বিবাহ করি, তাহা হইলে আমার জীবনের উন্নতির সকল আশা ব্যর্থ হইবে। আমি জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হইব; আমার সকল চেষ্টা-যত্ন বিফল হইবে। কিন্তু"—এই কথা বলিতে বলিতে পুলিস-কমিশনার লর্ড ব্র্যাডনির কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল; বহুকাল পূর্ব্বের—প্রথম যৌবনের কোমল স্মৃতিপূর্ণ কত কথা, কত বেদনা ও বিষাদপূর্ণ কাহিনী তাঁহার মনে পড়িতেই তাঁহার চক্ষুতে যেন অশ্রুর বাষ্প ঘনীভূত হইয়া আসিল; কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া, এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, মনকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "আমি পিতৃভক্ত সন্তান, পিতার অবাধ্য হওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে, ইহা আমি জানিতাম; কিন্তু প্রেমের মোহ আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। মার্গারেটের আশা ত্যাগ করা আমার অসাধ্য হইল; আমি মার্গারেট ক্রষ্টকে পিতার অসম্মতি-ক্রমেই বিবাহ করিলাম। তাহার পর তিন মাস অতিবাহিত হইল, সুখস্বপ্নের ন্যায় সেই তিন মাস কাটিয়া গেল। বিবাহের তিন মাস পরে আমাকে দেশে ফিরিতে হইল; কিন্তু আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। বিবাহের পর উক্ত তিন মাস রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় বন্ধ ছিল; আমি স্বদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে মার্গারেট রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য নিউ ইয়র্কে প্রত্যাগমন করিল। সে নিউ ইয়র্ক হইতেই অসুস্থ দেহে অস্ত্রোপচারের জন্য মেজরকায় আসিয়াছিল।

"আমরা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে এইরূপ সর্ত্ত হইয়াছিল যে, আমি শীঘ্র কাগজপত্রগুলি আমার কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়াই আমার স্ত্রীর সহিত যোগদান করিব।

"পিতার অসম্মতিতে মার্গারেটকে বিবাহ করায় তিনি ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ক্রোধে আমি সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিলাম। তিনি যখন জানিতে পারিলেন, আমি মার্গারেটকে বিবাহ করিয়াছি—তখন তাঁহাকে যেরূপ বিচলিত দেখিয়াছিলাম, জীবনে কখনও তাঁহাকে সেরূপ বিচলিত হইতে দেখি নাই; কিন্তু প্রেমের মোহ এরূপ প্রবল যে, স্নেহময় পিতার ক্রোধও আমি গ্রাহ্য করি নাই।

"যাহা হউক, লণ্ডন হইতে আমি নিউ ইয়র্কে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম; মার্গারেট তখন নিউ ইয়র্কের রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেছিল। তাহার বিরহযন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; পিতা অত্যন্ত বিরূপ ও ক্রুদ্ধ হইলেও আমি নিউ ইয়র্কে গমনের জন্য তাঁহার অনুমতি

প্রার্থনা করিলাম ; কিন্তু তাঁহার অনুমতি পাইলাম না। তিনি আমাকে বলিলেন—নিউ ইয়র্কে আমার যাওয়া হইবে না। তিনি আমাকে এ কথাও বলিলেন যে, নিউ ইয়র্কে গমন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত নির্বোধের কার্য্য হইবে।

"তাঁহার এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। যাহা হউক, তাঁহার এই আদেশ আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, আমার আর আমেরিকায় যাত্রা করা হইল না। অতঃপর আমি আর কখন আমেরিকায় গমন করি নাই। যদিও আমি মার্গারেটকে জীবন অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতাম, তথাপি আমি কিরূপ কাপুরুষ তাহা বুঝিতে পারিলাম। আমি পিতার বহু সাধ্য-সাধনা করিলাম, তথাপি তাঁহার অনুমতি মিলিল না ; অবশেষে তিনি বলিলেন, তাঁহার প্রতি যদি আমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, তাহা হইলে আমি যেন আরও এক বৎসরের মধ্যে আমেরিকায় যাইবার কথা মুখে না আনি। আমি আমার স্ত্রীর নিকট 'কেব্‌ল' করিলাম, কিন্তু তখন সে ব্রডওয়ের একটি বিখ্যাত রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেছিল, তাহার অভিনয়নৈপুণ্যে নিউ ইয়র্কের সৌখীন সমাজ ধন্য ধন্য করিতেছিল। সুতরাং আমি তখন তাহার নিকট যাই বা না যাই—সে বিষয়ে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাহার অভিনয়সাফল্যের নিকট প্রেম উপেক্ষিত হইল!

"এই ঘটনার কিছু দিন পরে আমেরিকা হইতে প্রেরিত 'কেব্‌লের' সংবাদে জানিতে পারিলাম, আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে! তাহার মৃত্যুসংবাদ ব্যতীত অন্য কোন সংবাদ পাইলাম না। আমি বহুদিন পরে সংবাদ পাইলাম, প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। আমি যখন তাহার নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করি, সেই সময় সে গর্ভবতী ছিল ; তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমার পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমার স্ত্রীর তাহার মৃত্যু হইল। পরে সংবাদ পাই, আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলেও পুত্রটি জীবিত ছিল। মাতৃহীন শিশুকে লোক প্রতিপালন করিতেছিল।"

ফ্রষ্ট এই কাহিনী শ্রবণের পর ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সে কত দিন পূর্ব্বের কথা?"

লর্ড ব্র্যাডনি বলিলেন, "বত্রিশ তেত্রিশ বৎসর হইবে।"

"অতি দীর্ঘকাল, মহাশয়!"

লর্ড ব্র্যাডনি বলিলেন, "হাঁ, অতি দীর্ঘকাল ; কিন্তু আমি এ কথা কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তুমি কি জানিতে না, জেরাল্ড, আমিই তোমার পিতা? আমি এই মাত্র তোমাকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলাম, তোমার নিশাচর বাজের ছদ্মবেশ ধারণের অন্য কারণ ছিল। আজ তোমার ও আমার মধ্যে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতি বিচিত্র!"

মিঃ ফ্রষ্ট কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অসাড়ভাবে বসিয়া রহিলেন।

লর্ড ব্র্যাডনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটজনক তাহা বুঝিয়া দেখ। আপনাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতে যাহার কুণ্ঠা নাই, সে স্বয়ং আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছে ; অথচ আমি পুলিস-কমিশনার হইয়া তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্যের ক্রটিনিবন্ধন জন্য তাহারই নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য আজ কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছি! যাঁহার হস্তে রাজধানীর শান্তি-রক্ষার ভার অর্পিত, এরূপ বিড়ম্বনা তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত।"

লর্ড ব্র্যাডনি পুত্রের নিকট আত্মপরিচয় দান করায় ফ্রষ্ট এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না ; তিনি নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন।

লর্ড ব্র্যাডনি বলিলেন, "আমি তোমার পিতা, এ সংবাদ তুমি কতদিন পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছ?"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে। সেই সময় আমি এই সংবাদ জানিতে পারিলেও আমাকে ইহা অত্যন্ত গোপনে বলা হইয়াছিল, এবং আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল—আমি যেন কোনও দিন যাচিয়া আপনার নিকট আমার পরিচয় দিতে না যাই ; যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপনার নিকট পুত্রস্নেহের দাবী না করি। কারণ, আমার ন্যায় নাম-যশোহীন দরিদ্রকে আপনি পুত্র বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহার সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের কোন্ স্তরে আপনার স্থান, আর আমার অবস্থা কি, তাহা কোন দিন আমি ভুলিতে পারি নাই ; বিশেষতঃ, সন্তান যদি পিতা

কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে সে অপমান পুত্রের অসহ্য। আমার মাতুলরা দরিদ্র ছিলেন না, এই মাতৃহীন ভাগিনেয়ের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল ; বিশেষতঃ, আমার মাতা নিউ ইয়র্কের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাসম্পন্না অভিনেত্রী ছিলেন, তিনিও প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য নিউ ইয়র্কে আমার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে আমাকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইটনে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ, আমার পিতা ইংরেজ এবং লণ্ডনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া আমার মায়ের আত্মীয়রা আমাকে লণ্ডনে প্রেরণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। আমি ইংলণ্ডে আসিয়া আমার পিতার নাম জানিতে পারি। কিন্তু তিনি আমার মায়ের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম বলিয়া তাঁহার নিকট পরিচিত হইবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। আমার পরিচয় কোনও দিন আপনার গোচর করি নাই।"

লর্ড ব্র্যাডনি বলিলেন, "তোমার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার এই জীবনাপরাহ্নে যদি আমি তোমার নিকট স্বীকার করি, আমি আমার পারিবারিক কর্ত্তব্য-পালনে যে ত্রুটি করিয়াছি, তোমার প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি, সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, তাহা হইলে—"

ক্রষ্ট বাধা দিয়া বলিলেন, "আমিই আপনার পুত্র, এ সংবাদ ত পূর্ব্বে আপনি জানিতেন না ; তবে আর সেজন্য কেন আপনি অনর্থক দুঃখ প্রকাশ করিবেন ? আমি কোন বৃটিশ লর্ডের পুত্র, বহুদিন পূর্ব্বে এ কথা জানিয়াও আমি উল্লসিত হইবার কোন কারণ পাই নাই, বরং দরিদ্রের ন্যায় কঠোর জীবন-সংগ্রামেই অভ্যস্ত হইয়াছি। এতকাল পরে আপনার সহিত পরিচয় উপলক্ষে আর উচ্ছ্বাসপ্রকাশ আমি নিতান্ত বাহুল্য বলিয়াই মনে করি। অতীতের সকল ত্রুটি বিস্মৃত হওয়াই বোধ হয় সঙ্গত হইবে।"

লর্ড ব্র্যাডনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "কিন্তু তুমি আমার পুত্র, তুমি এতকাল আমার স্নেহলাভ করিতে পার নাই, আমি তোমাকে পুত্রস্নেহে বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম, আমার ত্রুটি মার্জ্জনার অযোগ্য ; তাহা মার্জ্জনার জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করিতে পারি না।"

অতঃপর পিতা পুত্র উভয়ে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, দীর্ঘকাল কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না ; কিন্তু উভয়ের নেত্র হইতে যে মিলনাশ্রু প্রবাহিত হইল, তাহাতে তাঁহাদের মনের সকল ক্ষোভ ও সঙ্কোচ ধৌত হইল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

অতৃপ্তি

সাগর যে পেল গগনের ছোঁয়া
মিটিল কি তার আশা ?
বিরামবিহীন অশেষ চুমার
ক্ষুধা সে সর্ব্বনাশা—

তবু গর্জ্জন চলে অবিরাম
ধায় শত বাহু তুলে
সারা গগনেরে ডুবাইতে চাহে
নীল-সাগরের জলে।

শ্রীমতী নিভা দেবী।

হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ

ভারতীয় পরিষদে হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল আলোচনা হইতে চলিয়াছে এবং সারদা আইনের মত ইহাও হয় ত পাশ হইয়া আইনে পরিণত হইবে। এই সন্ধিক্ষণে হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ লইয়া আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়াই মনে হয়। বিদ্বান্, জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব অন্ততঃ আমাদের দেশে নাই, তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিলেই সুফল আশা করা যাইত। আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে এই অতি বিস্তৃত ও জটিল বিষয় লইয়া আলোচনা করা হয় ত হাস্যকর, কিন্তু আমার আলোচনা যদি দেশবাসীর চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

সভ্যতা অনুসারে বিবাহ ভিন্নরূপ, জগতের সমস্ত দেশের নীতি এক নয়, আমাদের দেশে যাহা দুর্নীতিমূলক, অন্য দেশে হয় ত তাহাই নিয়ম, আমাদের দেশের অবস্থা অন্য দেশের অনুরূপ নয়, কাযেই বিবাহ, সমাজ, আদর্শ ভিন্নরূপ এবং নীতি দুর্নীতি কথাটাও আপেক্ষিক (Relative) ; এ ক্ষেত্রে কোন দেশের সভ্যতা ও বিবাহের ক্রমপরিণতি বিচার না করিয়া কোন কথা বলা সঙ্গত নয়। সেই জন্যই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা, বিবাহ ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

সভ্যতা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ যে সম্পূর্ণ পৃথক্, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ এ বিষয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সভ্যতার ক্রমপরিণতির কোন্ স্থানে আসিয়া এই আদর্শ ভিন্নরূপ গ্রহণ করে, তাহা আলোচনার বিষয়। সভ্যতার বর্ত্তমান পরিণতির একটি তুলনামূলক ছক হইতে ইহা বোঝা যাইবে।

সমাজ	জীবিকা	বিবাহ	ধর্ম্ম
পশুমানব	পশুহনন	যৌন স্বেচ্ছাচার	নাই
যাযাবর উপজাতি	”	”	নৈসর্গিক ক্ষমতায় ভীতি
”	সর্দ্দার প্রথা এবং নদীমাতৃক সভ্যতা	বহু স্বামী বিবাহ বহু স্ত্রী বিবাহ	নৈসর্গিক ক্ষমতা বা উপদেবতার পূজা
[illegible]তি	রাজ-শাসন কৃষি	”	বহু দেবতার পূজা
”	কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প	অথবা এক বিবাহ	এক দেবতার পূজা
[illegible]তি (Nation)	উন্নত প্রণালীর	”	ব্রহ্মবাদ

এই পরিণতি যে সর্ব্বদা সত্য, তাহা নহে। দেশের সভ্যতার স্তর হিসাবে এখনও সব রকমের অবস্থাই জগতে রহিয়াছে, তবে সভ্যজগতের স্তর শেষোক্তরূপ। ইহার মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু আছে। এই রাষ্ট্র, সমাজ, বিবাহ, ধর্ম্ম আপনা আপনি স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ইহারা পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়াছে। যেমন, মানুষ যখন পশুহননকেই একমাত্র জীবিকার্জ্জনের উপায় বলিয়া জানিত, তখন এক স্থানে বাস করিবার প্রয়োজনীয়তাই ছিল না ; তখন পশুর মতই যৌন-স্বেচ্ছাচার চলিয়াছে। যখন সর্দ্দারশাসিত এক একটি ক্ষুদ্র জাতি এক স্থানে বসবাস করিত, তখন কৃষি বা কায়িক পরিশ্রমের জন্য বহু স্ত্রী বিবাহ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্ত্রী তখন গৃহপালিত পশুর মতই অর্থনৈতিক জীবনের মূলধন ছিল। (১)

হয় ত তখন ধর্ম্ম বা সমাজের অনুশাসন মানুষকে চালিত করিতে চাহে নাই। তাহার পর নীতি ও ধর্ম্ম দিয়া মানুষের মনে ভালবাসা ও নীতির সৃষ্টি করিয়াছে। আইন দ্বারা যেমন একদিকে বন্ধন করিয়াছে, তেমনই মনের পশু-প্রবৃত্তিকে মানব-প্রকৃতিতে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে, বিবাহ, রাষ্ট্র, সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল পরস্পর নির্ভর করিয়া, সেইজন্য বিবাহ কেবলমাত্র নর-নারীর যৌন-সম্পর্ক নহে, তাহা রাষ্ট্র বা সমাজের প্রয়োজন বা সভ্যতার ক্রমপরিণতির অঙ্গ।

এই সভ্যতার মূলে মানুষের সুখী হইবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে, এবং সেই সুখী হইবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এই বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি। এই সুখী হইবার ইচ্ছাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়,—দেহগত সুখ এবং মনোগত সুখ। দেহের সুখের জন্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, কৃষি, বাণিজ্য, রাষ্ট্র

(১) The monarchic and aristocratic organization of Society and the system of inheritance were based everywhere upon paternal power. In early days economic motives upheld, this system. One sees in Genisis how men desired a numerous progeny and how advantageous it was to them when they had it. Multiplication of sons was as advantageous as multiplication of flocks and herd.

B. Russel—Marriage & Morals, Page 29.

এবং জাগতিক সমস্ত বৈজ্ঞানিক দ্রব্য এবং মনের সুখের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি। যদি ডারউইনের ক্রমপরিণতির কথা মানিতে হয়, তবে Russel-এর কথা স্বীকার করিতে হয়—Thus man created God almighty and all-powerful…কারণ, মানুষের পক্ষে দুঃখে সান্ত্বনা পাইবার প্রয়োজন।

যে সময়ে নদীমাতৃক সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়েই হিন্দু মনীষিগণ দেখিলেন, খাদ্য ও দেহের ব্যসন-সামগ্রী মানুষকে সুখী করিতে পারে না। কারণ, মানুষের বাসনার অন্ত নাই। তখন তাঁহারা বাসনাকে ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে চাহিলেন, এবং পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা বাসনার স্বর্ণমৃগকেই অনুসরণ করিল। এই হইতেই হিন্দু-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে ত্যাগকে ভিত্তি করিয়া ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে ভোগকে কেন্দ্র করিয়া। অতএব হিন্দুগণ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-জীবনকে প্রাধান্য না দিয়া সে ক্ষেত্রে ছোট হইয়া রহিলেন এবং মনের রাজ্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চিন্তাতীত আদর্শকে জীবনে সফল করিয়া তুলিলেন, আর পাশ্চাত্ত্য তখন সাগর লঙ্ঘন করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া মানদণ্ড ও রাজদণ্ড হস্তে পৃথিবীকে ভোগ করিতে চাহিলেন, এবং আজও সেই আদর্শকেই তাঁহারা আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছেন।

এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভারত প্রাধান্য দিয়াছে অন্তরকে, আর পশ্চিম-জগৎ দিয়াছে দেহকে। অতএব ভিন্নমুখী এই দুই সভ্যতার আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং তাহার সমাজ, তাহার গঠন-প্রণালী, তাহার জীবনযাত্রা, তাহার দেখিবার ভঙ্গী (angle of vision) সম্পূর্ণ পৃথক্। সুতরাং পশ্চিমের পক্ষে যাহা সত্য, আমাদের পক্ষে তাহা সত্য নহে এবং তাহাদের সমাজে যাহা প্রয়োজন, আমাদের সমাজে তাহার প্রয়োজন হয় ত একেবারেই নাই। বর্ত্তমান সমাজ আমাদের অনুরূপ, অন্ততঃ অন্য দিকে চলিবার জন্য ব্যগ্র, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই সভ্যতাই মানুষকে সুখী করিতে চাহিয়াছে, তথাপি কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে নাই। কারণ, এই দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ককে একীভূত করা সম্ভব হয় নাই। তবে পাশ্চাত্ত্যজগতে আজ মন ও দেহ দুই-ই বিদ্রোহী, কেহই কাহারও উপর নির্ভরশীল নহে। ফলে তাহারা অসুখী, এবং আমরা উপবাস-কৃশ দেহ লইয়া মুখে হাসিবার প্রয়াস পাইতেছি। সুখের আভাস আমরা পাইয়াছি, কিন্তু তাহার সন্ধান পাই নাই। দেহ এবং মন এই দুইএর একটিকে বাদ দিয়া মানুষ সুখী হইতে পারে না। তবে সুখ জিনিষটার কোন মাপকাঠি নাই, তাহা পাওয়ার উপর নির্ভর করে না, চাওয়ার উপর নির্ভর করে এবং সেই জন্য আমরা দরিদ্র হইলেও সুখী। কারণ, যাহা চাহিয়াছি, তাহা হয় ত প্রায় পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ হারাইয়াছি।

বিবাহের ক্রম-পরিণতি

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিবাহসৃষ্টির মূলে কেবল যৌন-সম্পর্কই নাই বা ইহা কেবলমাত্র জান্তবস্বভাব-প্রবৃত্তি নহে। ইহা Biological প্রয়োজনই নয়, ইহা Economic ও Intellectual প্রয়োজনও বটে; কারণ, এই দুইএর প্রভাবেই ইহার পরিণতি। যদি কেবলমাত্র Biological প্রয়োজন হইত, তবে যৌন-স্বেচ্ছাচার হইতে এক-বিবাহের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক নয়। যৌন-স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্তি পুরুষের মধ্যে এখনও সম্পূর্ণ জীবিত এবং অর্থনৈতিক জগতে তাহারাই এখনও প্রধান। এ কথাও সত্য যে, বর্ত্তমান সভ্যজগতে মানুষের প্রবৃত্তির কোন্‌টি সহজ-প্রবৃত্তিগত এবং কোন্‌টি সংস্কৃতিগত, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এই হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টি প্রবৃত্তিকে একেবারেই পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, এ কথা বলা যায় না। অতএব আদিম জাতিসমূহ ও মানুষের নিকট-পূর্ব্বপুরুষ বানরের যৌন প্রবৃত্তি কিরূপ, তাহা জানা প্রয়োজন।

যৌন-স্বেচ্ছাচার

পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইএর মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, স্ত্রী সর্ব্বদাই বহু বিলাসের পক্ষপাতী নয়। প্যারট, বানর প্রভৃতি পশু-পক্ষীর মধ্যে বহুবিলাস খুব কম, এ কথা বড় বড় যৌন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণই স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে Ch. Letourneau এক জন বড় পণ্ডিত, তিনি বলেন যে, স্ত্রীগণ স্বভাবতঃই একবিলাসী, তবে সমস্তই একরূপ নহে। Havelock Ellisও এই মতাবলম্বী।(২)

(২) No sexual association comparable to polyandry is possible in this class (mammals). Since, even if she wished it, the female could not succeed in collecting seraglio of males.

Page 31. Evolution of Marriage

শুধু পক্ষিগণ নয়, তাহাদের মধ্যে অতি হিংস্রপ্রকৃতির পক্ষীও একবিলাসী এবং তাহারাও অর্থনৈতিক জীবন ব্যতিরেকেই এক এক জন ঘোর সংসারী। (৩)

ইহার পরে বানর। বানর নানা প্রকারের এবং তাহাদের স্বভাবও একরূপ নয়,—যেমন মানুষ নানাজাতীয় এবং বিভিন্ন প্রকৃতির। বানরগণ মানুষের নিকট-পূর্ব্ব-পুরুষ (ডারউইনের মতে), তাহাদের সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে আদিম মানব বা মানবের প্রবৃত্তির সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। বানরগণও সাধারণতঃ বহুবিলাসী বা এক-বিলাসী, কিন্তু স্ত্রীগণ বহুবিলাসী নহে। (৪)

এই সমস্ত কারণে মানুষের মধ্যে যৌন স্বেচ্ছাচার ছিল না বলিয়াই অনেকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আদিম মানব যাযাবরজীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত বলিয়া এবং পশু-হননই একমাত্র কার্য্য ছিল বলিয়া হয় ত ইহা প্রচলিত ছিল। তাহার প্রমাণ না পাওয়া যায় এমন নহে এবং বর্ত্তমান জগতে যে ইহা একেবারে নাই, তাহা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃত করা গেল। (৫) (৬) (৭) (৮)

কেবল আদিম প্রাতে নয়, বর্ত্তমান সভ্যজগতেও এরূপ স্বেচ্ছাচার বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারের মূলেও অনেকগুলি কারণ আছে। যে দেশে স্ত্রীসংখ্যা অত্যন্ত কম, সে দেশে এইরূপ হওয়া স্বাভাবিক; বিশেষতঃ যে দেশের বা জাতির গণ্ডী অতি অল্পপরিসর। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে—এই স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও একটা বিধিনিষেধ বা নীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম উদাহরণে যে পরিবার বুঝাইতেছে, তাহা যত স্বেচ্ছাচারীই হউক, অবৈধ সংসর্গের শাস্তি তখনও ছিল। এই সমাজ নীতির প্রথম বিকাশ (৯)। মানুষ তাহার পশুত্ব ছাড়িয়া প্রথম পরিবার গঠন করিয়াছে এবং পরে পরিবারকে বৃহৎ করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে। এই নীতিগঠনের মূলে রহিয়াছে প্রয়োজন, তাহা অর্থনৈতিকই হউক আর সামাজিকই হউক। ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার মধ্যে আমরা দেখিব, সমাজনিয়ম গঠনের মূলে রহিয়াছে এই প্রয়োজন।

---

(৩) Nearly all the rapacious animals, even the stupid vultures are monogamous. The conjugal union of the bald-headed eagle appears even to last till the death of one of the partners

Ibid Page 27,

(৪) There is the same diversity in the habits of monkeys. Some are polygamous and others monogamous. The Wanderoo of India has only one female and is faithful to her until death

Ibid Page 33

(৫) Concerning the conjugal customs of the peoples of Arabia Felix, Strabo speaks as follows:—

"Community of goods exists between all the members of the same family, but there is only one master, who is always the eldest of the family. They have only one wife between them all and he who can forestall the others enters her apartment the first and enjoys her......She never spends the night with any but the eldest, the chief. We must add that they have commerce with their own mothers On the other hand, adultery, which means to them commerce with a lover who is not of the family, is pitilessly punished with death. The daughter of one of the kings of the country, who was marvellously beautiful, had fifteen brothers, desperately in love with her, and who for this reason, took turns in enjoying her without intermission.

Ibid, Page 39 40.

(৬) Strabo too affirms of the Celtic population of Ierne (Ireland)

"The men have public commerce with all kinds of women, even their mothers and sisters."

Ibid 43.

(৭) Barbarous tribes belonging to white races are said also to have practised promiscuity in modern times. Among certain tribes of Zaporog, Cossacks the women are said to be common and are confined to separate camps. *Ibid.*

(৮) Should a man go on a long tour and his wife be unable to accompany him, he leaves her with a friend and borrows another woman for the trip. His duty is to return her safe and sound

'Where wives are borrowed and Heaven is hell' by Anton E Zischka A. B. Patrika Nov. 4. 1934

(৯) At this stage he (Primitive father) sees no bio-logical importance in safeguarding his wife's virtue, although no doubt he will feel instinctive jealousy if her infidelity thrust upon his notice At this stage, also, he has no sense of property in the child The child is the property of his wife and his wife's brothers, but his own relation with the child is merely one of affection.

B. Russel. Marriage & Morals. Page 136.

প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তি (Hetairism) ধর্ম্মমূলক গণিকাবৃত্তি (Religious Prostitution)

পণ্ডিতগণ স্বেচ্ছাচারের পরবর্ত্তী যুগেই উপরিউক্ত দুই প্রকার যৌনসম্পর্কের উল্লেখ করেন, এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতে ও য়ুরোপে দেবদাসীবৃত্তি ছিল, আরব প্রভৃতি দেশেও এই গণিকাবৃত্তি প্রকাশ্যে অন্যরূপে চলিত এবং পরে ধর্ম্মের নামে বা সম্পদ্ বা প্রভুত্বের নামে ৪ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই যৌন-স্বেচ্ছাচার চলিয়াছে। (১০)

কেবলমাত্র কাউণ্টই নয় বিশপরাও এই দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু ইহার মূল কারণ, পুরুষের বহু বিলাসেচ্ছা ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য। তখন পুরুষ কেবল পাশবপ্রবৃত্তির বলে ভোগই করিতে চাহিয়াছে, সেইজন্য যেটুকু নীতি প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা তাহারই স্বার্থকে ঘেরিয়া, নারীচরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিবার সময় তাহার হয় নাই।

বহুবিলাস (Polyandry এবং Polygamy)

বহুবিলাসের মূলকারণ সম্বন্ধে, Ch. Letourneau একটি সুন্দর কারণ দিয়াছেন। "The enormous consumption of men, necessitated by a savage or barbourous life has often given an impulse to polygamy." পক্ষান্তরে কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাস পাইলে স্ত্রীগণের পক্ষে বহুবিলাস প্রয়োজন হইয়া উঠে। বহুবিবাহ বা বহুবিলাস আজ-কালকার জগতেও বহু প্রচলিত। মুসলমানগণ বহুবিবাহ করিতেন, কুলীন হিন্দুগণও বহুবিবাহ করিয়াছেন। সিংহলে এবং তিব্বতে এখনও এক স্ত্রী বহু স্বামীকে বিবাহ করিয়া থাকেন এরূপ শোনা যায়। এবং এই গ্রন্থকারই বলিতেছেন,—The Miris and Dophars of Bengal are still polyandrous. Among the Todas of Nilgherry polyandry was fraternal. When a man married a girl, she became on that account the wife of all his brothers and inversely these became the husbands of all the sisters of the wife." Ibid P. 77.

এই বিচিত্র জগতে এইরূপ নানা যৌনসম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মূলে পারিপার্শ্বিক কারণও রহিয়াছে। কোন ক্ষেত্রে হয় ত পুরুষের প্রধান্য তাহাকে বহুবিলাসী করিয়াছে, কোন ক্ষেত্রে পুরুষের প্রয়োজনই স্ত্রীকে বহুবিলাসী করিয়াছে। Havelock Ellisও বলেন, পুরুষ স্বভাবতঃই বহুবিলাসী। (পরে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য) কাযেই পুরুষের বহুবিলাস স্বাভাবিক হইলেও, স্ত্রীর বহু-বিলাস স্বাভাবিক নয়, কিন্তু মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, যৌন অথবা মানসিক (কৃষ্টিগত) প্রয়োজনে সমাজে তাহাও চলিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, নীতির মাপকাঠি নাই, তাহা প্রয়োজনানুরূপ মাত্র,—কাল-স্থানভেদে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এই আলোচনার মধ্যে ইহা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য যে, প্রয়োজনই এই নীতিকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই প্রয়োজন (Biological নহে, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা অন্য কারণে) আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ভিন্নমুখী করিয়া দিয়াছে এবং ইহাও সত্য, এখনও প্রয়োজনই হয় ত স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করিয়া আমাদিগকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিতেছে। এই বহুবিলাস সম্বন্ধে বহু তথ্য ও প্রমাণ আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার অবশেষে বলিয়াছেন,—"In Conclusion, polyandry is an exceptional conjugal form, as rare as polygamy is common."

একবিবাহ

বহুবিলাসের স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য পরিণতি এক বিলাস। পূর্ব্বে পত্নী ও পুত্র ছিল গৃহ-পালিত পশুর মত জীবিকার মূলধন। কিন্তু মানুষের মন ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়া এই অবস্থায় তাহাকে সাথী হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইল। এই অবস্থায় ধর্ম্ম ও নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে, মানব-মন তাহার পাশব সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া নিজের লুব্ধতাকে উপেক্ষা করিয়া, নারীকে সমান

(১০) In a French title deed of 1507 we read that the Count d' Eue has the right of prelibation in the said place when anyone marries.

Evolution of Marriage, Page 48.

আসন দিয়াছে। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত শ' বলেন – (১১) আবার বলেন—(১২)

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য—যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে স্ত্রীর সংখ্যাধিক্য হইতে পারে, কিন্তু পুরুষের সংখ্যাধিক্য সাধারণতঃ হয় না।

কিন্তু মিঃ শ'র কথা যে সর্ব্বদাই সত্য, একথা মানিয়া লওয়া যায় না। পশ্চিমে—যেখানে নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিযোগিতা করিতেছে এবং করিয়াছে, সেই দেশসম্বন্ধে ইহা হয় ত খাটিতে পারে। কারণ, নারী সেখানে পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়, কিন্তু আমাদের দেশসম্বন্ধে অন্যরূপ,—নারী নদীমাতৃক সভ্যতার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত পুরুষের উপর নির্ভরশীল—এক্ষেত্রে একবিবাহের উৎপত্তি হওয়া স্বাভাবিক ছিল না—যদি পুরুষের নীতি ও সংস্কৃতির দ্বারা সে আপন মনকে সংস্কার করিয়া সমাজের উপযুক্ত করিয়া না লইত। এই স্থানে আমরা পাই আমাদের ত্যাগগত সভ্যতার মূল কারণ। বাহুবল, অর্থবল থাকিতেও সে নারীকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া তাহাকে নিজের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। মিঃ শ'এর প্রতিবাদস্বরূপ লোটার্ণোর একটি বাক্য উদ্ধৃত করা যায়—(১৩)

হিন্দু সভ্যতায় নারীকে এই উচ্চাসন বহু দিন হইতেই দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে পশুপ্রকৃতিকে সংস্কৃতি ও নীতির দ্বারা দমিত করিয়া তাহাকে বিবেকসম্পন্ন ও সমাজোপযোগী করিয়া তোলাই হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মনীতির মূল ভিত্তিভূমি। ইহার আরও একটি কারণ, আমরা, অর্থাৎ হিন্দু-সভ্যতা দেহকে উপেক্ষা করিয়া মনকেই প্রাধান্য দিয়াছি, কাযেই পুরুষের বহুবিলাসের ইচ্ছাকে তাঁহারা পশুপ্রকৃতির ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং যেহেতু সেই ইচ্ছা সমাজের অহিতকর, সেই হেতুই তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছেন। হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও একবিবাহের আদর্শ প্রাচীন।

গণিকাবৃত্তি

কিন্তু মানুষের সকলেই মানুষ নয়, কাহারও মধ্যে পাশবপ্রবৃত্তি বিবেককে হত্যা করিয়া আদিম মনুষ্যের মত তাহাকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলে। যতই সমাজের নীতির আদর্শের বন্ধন দেওয়া হউক না কেন, তাহারা সে নিয়মকে ভঙ্গ করিয়া নিজ লিপ্সাকে চরিতার্থ করিবেই। তাহারা সমাজে থাকিলে অবৈধ সংসর্গ (কুমারী ও পরস্ত্রী) করিয়া সমাজকে কলুষিত করিবে; সেই জন্য—সমাজের শুচিতাকে রক্ষা করিবার জন্য গণিকাবৃত্তির সৃষ্টি হইল। কারণ, যতদিন বহু বিলাস ও যৌন-স্বেচ্ছাচার চলিয়াছে, ততদিন গণিকার অন্ন জুটিবার কোন কারণ ছিল না এবং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে দেশে গণিকালয় আপন শোণিতে সমাজকে ধুইয়া মুছিয়া পূত করিয়া রাখে না, সে দেশে ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু সমাজে এই ক্ষত সমাজের দেহের বাহিরে, যাহারা এই ক্ষতকে আরোগ্য করিয়াছে, তাহাদের সমস্ত শরীরে এই ক্ষতের বিষক্রিয়া দেখা যাইবেই। বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল বলিয়াছেন—বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রবর্ত্তনের অর্থ, স্ত্রী-ব্যভিচারকে বিনষ্ট করা; কিন্তু স্ত্রী-ব্যভিচার নষ্ট হইলেই, কুমারী-ব্যভিচার আরম্ভ হইবে এবং সেই জন্যই য়ুরোপে কুমারী ব্যভিচার সমাজের অঙ্গে সগৌরবে বিরাজ করিতেছে—(১৪, ১৫)

(১১) The natural foundation of the institution of monogamy is not any inherent viciousness in polygamy or polyandry, but the hard fact that men and women are born in about equal numbers.

Preface to getting married. Page 137.

(১২) On the other hand, women object to polyandry because polyandry enables the best women to monopolise the men just as polygamy enables the best men to monopolise all women. That is why all our ordinary men and women are unánimous in defence of monogamy.

Ibid—Page 138.

(১৩) In attempting to estimate the moral worth of a people a race or civilazation, we are much more enlightened by the position given to women than by legal type of the conjugal union.

Evolution of Marriage, Page 180.

(১৪) Men and women born during the present century, although they are unconsciously apt to retain the old attitudes, do not for the most part, consciously believe that fornication as such is sin.

Marriage and Morals, Page. 238.

(১৫) In this morality female adultery is malversation by women and theft by men, while male adultery, with unmarried women is not an offence at all.

Shaw. Preface to Getting Married, Page 113.

ইহা ছাড়াও আমেরিকার জজ লিণ্ডসের পুস্তকে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, বিবাহ-বিচ্ছেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া অর্থে বোঝা যাইতেছে যে, কুমারী-ব্যভিচার বাড়িয়া যাইবে (অবশ্য বর্ত্তমান হিন্দু বিবাহপ্রথা থাকিতে পারে না এবং সাথী-বিবাহপ্রথা Companionate Marriage প্রচলিত হইবে)। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপে স্ত্রী-ব্যভিচারই যে বন্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার কারণ ও পরিমাণ আলোচনা করিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

হিন্দু সমাজ এই ব্যভিচারকে কিরূপে শাসিত করিতে চাহিয়াছে, তাহা জানা প্রয়োজন। হিন্দু সমাজে স্ত্রী ও কুমারী উভয়বিধ ব্যভিচারই দণ্ডার্হ—তাহারা সমাজের বাহিরে যাইতে বাধ্য হয়। গণিকাবৃত্তিকে জীবিত রাখিয়া তাঁহারা সমাজকে পবিত্র করিতে চাহেন, এবং যাঁহারা সমাজকে কলুষিত করে, তাহাদিগকে সমাজ পরিত্যাগ করে; এইরূপে সমাজের শুচিতা রক্ষা করা হয়। হিন্দু সমাজের মূল নীতিই ইহা, যাহারা পশুপ্রবৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া বিবেকসম্পন্ন হইতে চাহিবে না, বা সমাজের উপযোগী হইবে না, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমাজ স্বীয় আদর্শকে অনুসরণ করিবে। বহুর স্বার্থে সে অল্পকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

এখানে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দু সমাজের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক্। কেবল এক শুচিতারক্ষা-ব্যাপারেই নহে, সম্পূর্ণ সংস্কৃতিগতভাবে সে পৃথক্। যে পতিতাবৃত্তিকে পাশ্চাত্য-সভ্যতা দেশের নীতির মাপকাঠি বলিয়া মনে করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সেই পতিতাবৃত্তি দেশের দুর্নীতির মাপকাঠি নহে—তাহা সমাজের শুচিতার পরিচায়ক। গণিকাবৃত্তির জীবনের সঙ্গে ব্যভিচারের অটুট সম্পর্ক। এক্ষেত্রে আমি যদি বলি, পশ্চিম হইতে হিন্দুসমাজে অন্ততঃ ব্যভিচার কম, তাহা হইলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমাদের দেশবাসী বোধ হয় বিশ্বাস করিবেন। অবশ্য একথাও সত্য যে, আমাদের দেশের গৃহস্থ-বধূগণের সকলেই যে সতীসাধ্বী তাহা বলা যায় না, তবে কুমারীগণের পক্ষে (পাশ্চাত্যশিক্ষায় দীক্ষিত সমাজ বাদে) ব্যভিচারের সুযোগ কম, একথা সত্য। অবশ্য রাসেল বলেন,—(১৬)

য়ুরোপের পক্ষে একথা হয় ত সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের পক্ষে ইহা যে আদৌ সত্য নহে, তাহা দেশবাসী মাত্রেই জানেন, পুরুষের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহার মূলে কোন্ আদর্শ রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। হিন্দু বিবাহের আদর্শ আলোচনাকালে তাহা দেখা যাইবে।

নীতি ও প্রেমের উৎপত্তি

সভ্যতার ক্রমপরিণতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের পাশব প্রবৃত্তি ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনানুসারে কমিয়া আসিয়াছে এবং তাহার মানসিকবৃত্তি বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা দেহের সুখকেই একমাত্র সুখ বলিয়া গ্রহণ করে নাই—ক্রমে মনের সুখ ও শান্তিকে চাহিয়াছে—ক্রমে আমাদের দেশে দেহগত সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যৌন-স্বেচ্ছাচারের যুগেও একটি নীতি ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি; কিন্তু সেই নীতির মূলে ছিল আধিপত্য-জ্ঞান বা প্রবৃত্তিগত হিংসা, কিন্তু প্রেমগত কোন কারণ ছিল বলা যায় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যৌন-স্বেচ্ছাচারী পশুপক্ষীর মধ্যেও প্রেম বর্ত্তমান রহিয়াছে, কাযেই একবিবাহের সঙ্গে প্রেমের কোন নৈকট্য সম্বন্ধ না-ও থাকিতে পারে। Ellen Key বলেন,—(১৭)

একবিবাহের মূলে হয় ত সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই

(১৬) Protestant countries where marriages are easily dissolved, adultery is viewed with extreme disfavour, while in countries which do not recognise divorce, adultery, though regarded as sinful is winked at, at any rate where men are concerned.

Marriage & Morals, Page 178.

(১৭) It is very common but erroneous opinion that monogamy has given rise to love. Love appears already among animals and with them as in the world of men, has shown itself independent of monogamy. The origin of the latter in human society was the relation of proprietorship, religious ideas, considerations of collective utility, but not perception of the importance of love's selection.

Love & Marriage. P. 62.

ছিল এবং প্রেম হয় ত মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগতই হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ভালবাসার মূলে এই সহজ প্রবৃত্তিও যতখানি আছে, আমাদের সংস্কৃতিগত সাধনাও ততখানি আছে। তাহা হইলে এই প্রেমের উৎপত্তি হইতে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে দেখা যায়, ভালবাসা বা নারী পুরুষপ্রেমের মধ্যে অনেকটা আছে স্বভাবজ এবং অনেকটা আছে কৃষ্টিজ। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তার মূলে মানব-মনের আর একটি বিশেষ বস্তু আছে। সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখিল, কেবলমাত্র যৌন-সম্পর্কই মানুষকে সুখী করিতে পারে না, তাহারও উপরে তাহার প্রয়োজন, সে চাহে দরদ, সহানুভূতি, সান্ত্বনা। জীবনের মধ্যে আপনার করিয়া পুরুষ চাহে নারীর সাহচর্য্য—সান্নিধ্য। সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিল, কেবল দেহগত ভোগের মধ্যেই আনন্দ নাই, মনোগত ভোগের মধ্যেও প্রচুর আনন্দ রহিয়াছে। এই প্রেমের খনির সন্ধান যে দিন সে পাইল, সেদিন সে নারীকে খাদ্যে, অলঙ্কারে, সম্মানে, প্রেমে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল। সে দিন তাহার মধ্যে পাওয়ার প্রবৃত্তি অপেক্ষা দেওয়ার প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠিল এবং পক্ষান্তরে নারী তাহার স্নেহাঞ্চল দ্বারা চিরচঞ্চল এই আদমের শিশুকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এই তাহার প্রথম উন্মেষ—প্রেমের প্রথম বিকাশ। কিন্তু হিন্দু-প্রেমের আদর্শ একটু অন্যরূপ,—সে তাহার সভ্যতার দান। দেহগত এই ভোগকে যে প্রাধান্য দেয় নাই, মনকে সে প্রাধান্য দিয়াছে। কাযেই হিন্দু-প্রেমের আদর্শ যৌন-সম্পর্কের উপর স্থাপিত নহে, সে তাহার মানসিক সম্পর্কের উপর স্থাপিত। সেইজন্য হিন্দু-দম্পতির কে কতখানি পাইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া সে তাহার সুখ-শান্তিকে নির্ব্বাচন করে না, সে কতখানি দিয়াছে, একে অন্যকে কতখানি সুখী করিয়াছে, তাহা বিচার করিয়াই সে নিজের সুখকে যাচাই করে। আমাদের নারী-পুরুষের সুখ নির্ভর করে দেওয়ার মধ্যে, পাওয়ার মধ্যে নহে। সেইজন্য হিন্দুসমাজে দেখা যায়, পুরুষ লংক্লথের পাঞ্জাবী (১৲ মূল্য) পরিয়া স্ত্রীকে সুন্দর সিল্কের কাপড়ে সাজাইয়া রাখে, নারী নিজে না খাইয়া স্বামীকে খাওয়ায়, ত্যাগধর্ম্মের উপর স্থাপিত সভ্যতার মূল ধর্ম্মই এই, কিন্তু Ellen Key বলেন,—(১৮)

যাহাদের সভ্যতা ভোগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা পুরুষের স্বেচ্ছাচারী অন্তরের কথা মনে করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন সন্দেহ নাই এবং এই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহাদের সংস্কার সভ্যতা ত্যাগ-ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, তাঁহারা জানেন, ইহা কত বড় মিথ্যা। আমাদের দাম্পত্যজীবন দেওয়ার প্রতিযোগিতার নামান্তর মাত্র। স্বাভাবিক হউক আর নাই হউক, আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ইহাকে কি অনেকটা সফল করি নাই? এবং আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সেই সফল স্বপ্নকে আমরা ব্যর্থ করিতে চলিয়াছি!

নারী-পুরুষের ভালবাসা কি?

নারী-পুরুষের এই ভালবাসা গড়িবার মূলে যে দুইটি বস্তু আছে তাহা পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, একটি যৌন-আকর্ষণ বা দেহগত-কামনা এবং আর একটি কৃষ্টিগত বা মনোগত ভোগ-তৃষ্ণা। ইহার মধ্যে কোনটিই উপেক্ষার নয়। হিন্দু দার্শনিকগণ যদি বলেন, যৌন-আকর্ষণ পাপ এবং পরিত্যাজ্য, তবে সে কথা স্বীকার করা সম্ভব হয় না; কারণ, যৌন-আকর্ষণ না হইলে এই সংসার সমাজ বাঁচিয়া থাকিত না। এই দুইটি বস্তুর প্রত্যেকটিই প্রধান; কিন্তু যুগপৎ তাহাদের প্রাধান্য দেখা যায় না। কেবলমাত্র পুত্রার্থে যদি ভার্য্যা গ্রহণ করা যায়, তবে বিবাহে ভালবাসার অস্তিত্ব থাকে না, —পুরুষের পক্ষে পুত্রের প্রতি আকর্ষণ আপেক্ষিক, কিন্তু নারীর পক্ষে প্রবৃত্তিজ। এ কথা সকল মনীষীই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন,—প্রমাণযোগ্য বহু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু উদ্ধৃত অংশ দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

সুতরাং যৌন সম্পর্ক মানুষের প্রয়োজন এবং মানুষ (উচ্চস্তরের পশু) সে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চিরদিনই সমাজ ও নীতির আইন অমান্য করিয়াছে—আজও করিতেছে। এজন্য যে কামনা, তাহা কতদূর পর্য্যন্ত সমাজের উৎসাহ

(১৮) With arguments, for which Schopenhaur and Hartman once provided the philosophical formulæ, it has been shown that soulful love is an illusion of nature, and that the unity in love, which woman now claims of man, demands sacrifices which are opposed to his Physiological and Psychological nature.

Love and Marriage P. 70.

পাইতে পারে, তাহা পরে বিবেচ্য; কিন্তু মনোগত এই কামনাটিও সর্ব্বদা এক নয়।

আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসি না; আমরা ভালবাসি একটি আদর্শকে, সেই আদর্শের সঙ্গে যাহার যতটা সাদৃশ্য, তাহাকে আমরা তত আপনার করি। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে মিলাইতে পারা যায় এরূপ ব্যক্তি পাওয়া যায় না, অতএব যাহাকে পাই, যাহার সান্নিধ্য পাই, তাহার মধ্যে আপনার প্রিয় বস্তুটিকে খুঁজি। যাহার মধ্যে যতটা বস্তু পাই, সেই তত বন্ধু। যদি কেবল যৌনসম্পর্কই হইত, তবে জগতের সব নারীকেই সমান চোখে দেখিতাম; কিন্তু আমরা সুন্দর খুঁজিয়া মরি কেন? আবার সুন্দর খুঁজিয়া খুঁজিয়া কুৎসিতকে পাইয়াও আনন্দ করি কেন? ভালবাসা যৌন-সম্পর্কের উপর স্থাপিত বিলাস-কল্পনা, সেই কল্পনা আমরা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে পাইতে চাই। এ অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত।

মানুষের চিরন্তন নিয়ম এই, আজ সে যাহা চায় তাহা কাল চাহে না, যাহা পায় তাহা চায় না,—"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না" বাল্যকালে হয় ত খেলনার জন্য কাঁদিয়া মরি, যৌবনে নারীর জন্য উদাসী হই, প্রৌঢ়ে পুত্রের জন্য কন্যার জন্য, তাহাদের মৃত্যুর শোকে বুক চাপড়াইয়া কাঁদি, বার্দ্ধক্যে নাতিকে কাঁধে তুলিয়া নিজে ঘোড়া হইয়া ছুটি। মানুষের অন্তরের এই চাওয়ায় কোন ধারা বা নিয়ম নাই। যৌবনে যখন মন নারীর সঙ্গ চায়, তখন সে মানসিক জগতে তাহাকে ভোগ করে না, সমস্ত দেহ দিয়া নারীর দেহকে গণ্ডূষ করিতে চায়। তাহার ভোগবাসনা সহস্রমুখী হইয়া ঘিরিয়া ধরে। এই বয়সে দেহ মনের উপরে প্রভুত্ব করে, তাই নারীকে সে চায় অত্যন্ত নগ্নভাবে। স্বপ্ন দেখে যৌন-স্বেচ্ছাচারের, সমাজের বন্ধনকে মনে করে জেলখানার প্রাচীর। যৌবনের সুস্থ সবল অত্যন্ত উষ্ণ দেহ লইয়া নারীকে যেরূপ ভাবে চাই, পরে হয় ত তেমন করিয়া পাইতে চাহি না।*

যুবকগণ স্বীকার করিবেন না জানি, কিন্তু বিবাহিত বিগতযৌবন পুরুষগণ নারীকে এইরূপ ভাবে পাইতে চাহে না, তাহারা চাহে নারীকে সাথীরূপে, সুখে দুঃখে সে চায় নারীর অঞ্চলের নীচে আশ্রয় লইতে। যৌবনের উষ্ণতা কাটিয়া যাইয়া তখন মন বা এই মনোগত ভোগই বড় হইয়া উঠে। এই বয়সে আমরা দেখি Biological প্রয়োজন হইতে সংস্কৃতিগত প্রয়োজনই বড় হইয়া উঠে। তখন পুরুষ ঈর্ষা করে তাহার আপন পুত্রকে; কারণ, নারীর মন তখন পুত্রকেই বড় আপনার করিয়া লয়। নারীত্বের উপরে উঠে তখন তাহার মাতৃত্ব। নারীর রূপ তখন বদলাইয়া মাতৃ-রূপে দেখা দেয়। এখানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, নারীর পক্ষে যৌন-সম্পর্কের প্রয়োজন সন্তানের জন্য এবং এই মাতৃত্বের তৃষ্ণা কেবল মানুষ নয়, ইতর পশুপক্ষীর মধ্যেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই মাতৃত্বের তৃষ্ণাকে অতি সাংঘাতিক যৌনসম্পর্কের পক্ষপাতী পণ্ডিতগণও অস্বীকার করেন নাই। (১৯, ২০)

তাহার পর বার্দ্ধক্যে আমরা হই নারীর সাহায্যপ্রার্থী। তাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবনকে অতিক্রান্ত করিতে চাই। অতএব আমরা দেখিতেছি, ভালবাসা বা এই নারী-পুরুষের প্রেমের সঠিক কোন সংজ্ঞা নাই, ইহা বয়স ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর গ্রহণ করে। অতএব এই ভালবাসার পরিণতি কেবল নারী-পুরুষের উপর নির্ভর করে না, তাহা নির্ভর করে তাহার সংসারের উপর। সন্তান, পিতা মাতা, আত্মীয়স্বজনের উপর, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিবাহ-বিচারকালীন কেবল তাহার যৌন-সম্পর্ক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন; এই প্রেমের কোন অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। যেমন Shaw বলেন—

* Johan Bojer-এর Prisoner Who Sang দ্রষ্টব্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইহা বিশ্বাস করি।

(১৯) Though they have no desire for presence or care of children nevertheless they feel that motherhood is an experience necessary to their complete physical development and understanding of themselves and others and those who though unable to find or unwilling to entertain husband, would like to occupy themselves with rearing of children.

Shaw, Getting Married, Page 136.

(২০) But therefore also it is true of all who have quenched the warmth of fruitfulness in themselves, that they have committed the one unpardonable sin, that against the holy spirit of life,

Ellen Key,
Love and Mrriage—183.
Cf: "Ages made love a power,"
Ibid 63.

That assumption is that the specific relation which marraige authorises between the parties is the most intimate personal of human relation and embraces all the other high human relations. Now this is violently untrue. Every adult knows that the relation in question can and does exist between entire strangers, different in language, color, tastes, class,... in short except their bodily homology and reproductive appetite common to all living organism. page 147.

হিন্দুগণ কি ইহাকে ভালবাসা বলেন? এই reproductive appetiteকে তাঁহারা সমগ্র জীবনের নারী-পুরুষ সম্পর্ক বলিয়া স্বীকার করেন কি? যদিও এই প্রেম যৌন-সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল, তথাপি ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, সে কথা আমরা ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করিয়াছি। এই আদর্শকে হিন্দুগণ মানিয়াছেন বলিয়া রাষ্ট্র বা stateএর এককে ধরিয়াছেন একটি পরিবার। সেখানে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নাই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে সম্ভবতঃ democracyর প্রভাবে নারী-পুরুষ ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রের একক।

অতএব একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রতীচ্যে প্রেম বলিলে আমরা যাহা বুঝি, হিন্দু সমাজ তাহা বুঝে না।

লাভ ও ক্ষতি

পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও প্রাচ্য আদর্শ বিভিন্ন। এই দুই আদর্শের অনুসরণকারী সমাজে নারী-পুরুষ বা দম্পতি কোন্ দেশে কত সুখী? আমরা যদি কোন ব্যক্তিবিশেষকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি সুখী কি না? তাহার স্বাভাবিক উত্তর "আমি সুখী নই," এবং যে কোন দম্পতির ব্যক্তিবিশেষকে জিজ্ঞাসা করিলেই বোধ হয় এই একই উত্তর পাওয়া যাইবে। সমগ্র পৃথিবীর লোকই অসুখী এবং তাহা না হইলে সভ্যতার গতিই বন্ধ হইয়া যাইত, তবে কে কতখানি সুখী, তাহার বিচার করা যাইতে পারে। বলিতে পারেন—আমাদের দেশে নারীগণের বুঝিবার শক্তিই নাই যে তাহারা সুখী কি দুঃখী; যেহেতু তাহারা অশিক্ষিতা, কিন্তু সুখ-দুঃখ জানিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালী-ঘরের বধূগণ পাশ্চাত্য গৃহবধূগণ অপেক্ষা সুখী কি না,—তাহা বুঝা খুব কঠিন নয়। বিবাহ হইলে আমাদের দেশের নারীগণ সারা জীবনের মত নিশ্চিন্ত। কারণ, তাঁহারা জানেন, যদি নেহাৎ মৃত্যু তাঁহাদিগকে স্বামিহারা না করে, তবে তাঁহাদের জীবনের ভাবনা নাই, পুরুষরা সমগ্র সাধনা দিয়া তাঁহাদিগকে তাহাদের সবল বাহুবেষ্টনীর মধ্যে রাখিয়া দিবে। সুখে দুঃখে তাহারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। বিবাহজীবনে এই নিশ্চিন্ততা অন্ততঃ য়ুরোপীয় বধূগণের পাইবার উপায় নাই। পুত্রকন্যাসহ কবে কোন্ অশুভ দিনে রাস্তায় দাঁড়াইতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। বিধবা বাঙ্গালীবধূর পুত্র বড় থাকিলে ভাবনা নাই, না থাকিলেও ভাসুর দেবর থাকে। পুত্রকন্যার হাত ধরিয়া নূতন স্বামি-শিকারে বাহির হইতে হয় না। অবশ্য নর-পশুরও অভাব নাই—যাহারা লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় তাহাকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখে, কিন্তু সমাজে তাহার সংখ্যা কত? তাহাদের সংখ্যাধিক্য নাই, এবং সমাজের প্রভাবে তাহাদের সংখ্যাধিক্য হইবার উপায়ও নাই। পরস্পরের এই নির্ভরতার মধ্যেই তাহাদের স্বার্থ ও প্রেম নির্ভর করে, এবং বন্ধনের মধ্যেই তাহারা মুক্তির আনন্দ লাভ করে,—এই বন্ধনের প্রবল প্রাচীরই তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া তুলে। তাহার পর পুত্র-কন্যার মুখ চাহিয়া তাহারা জীবন কাটায়। ইহার মধ্যে কেহ কাহারও দাস নহে, কেহ কাহারও অধীন নহে, সকলেই তাহারা সমাজের জন্য—সেই সনাতন আদর্শের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু য়ুরোপের দম্পতির মধ্যে এই দাসত্ব রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একে অপরের দাস—তাই Shaw বলেন—বিবাহ sex slavery এবং সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না অর্জ্জন করিলে এই প্রথা দূরীভূত হইবে না, অবশ্য তখন বিবাহও থাকিবে না। ২১

অথচ মাতৃত্ব থাকিবে, যেহেতু—মাতৃত্ব সহজপ্রবৃত্তিজ। অর্থাৎ পাশ্চত্য সভ্যতার আর একটু উন্নত-স্তরে যৌন-স্বেচ্ছাচার চলিবে। সমাজ হইবে তখন Aldus Huxlyর new Brav worldএর মত।

(২১) But the achievement of economic independence by women which is already seen clearly ahead of us, would be (needed) to make marriage disappear altogether not by formal abolition but by simple disuse.

Shaw—Page 143.

আমাদের দেশের বিবাহ যৌন-দাসত্ব নয়, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভরণপোষণ পাইবার জন্যই স্ত্রী নয়, সে সমাজকে সেবার জন্য, মাতৃত্বের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টির জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ স্বামী; কারণ, বংশধর সৃষ্টির মূলে সে, সমাজের কল্যাণের জন্য—সভ্যতার প্রগতির জন্য সে। এই আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনে সত্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের নারীগণ কি বলিতে পারেন, তাঁহারা পরাধীন? স্বামী তাহার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করে, স্ত্রী সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। স্ত্রী স্বামীর অধীন নয়, স্বামীই পক্ষান্তরে স্ত্রীর অধীন। তাহা ছাড়াও আমরা দাম্পত্য জীবনে কতখানি পাইলাম তাহার দ্বারা নিজের সুখ বা কর্ত্তব্যকে যাচাই করি না। অন্যকে কতখানি সুখী করিতে পারিয়াছি, তাহা দিয়াই নিজের সুখ বা কর্ত্তব্যকে বিচার করি। পূজার বাজারে, ছেঁড়া ময়লা জামাটি গায়ে ৩০৲ টাকার কেরাণীকে যে লুব্ধনেত্রে সিল্কের সাড়ী বাছাই করিতে দেখিয়াছে, অথবা যে হিন্দু গৃহবধূকে সমস্ত দুধটুকু স্বামীকে দিয়া, হাসিমুখে বলিতে শুনিয়াছে,—"আমার? আমার আছে।" সেই কেবল এ কথা বিশ্বাস করিবে। শ' রাসেল নিজের চক্ষুতে এ দৃশ্য দেখিলে হয় ত বিশ্বাস করিতেন এবং বলিতেন,—না, বিবাহ যৌন-দাসত্ব নয়, ইহা তাহার উর্দ্ধে—বহু উর্দ্ধের সামগ্রী, এ সফল স্বপ্ন।

হিন্দু-গৃহের এই পরিতৃপ্তি, এই একান্তনির্ভরতা আত্মসমর্পণ যেখানে নাই, সে গৃহে শান্তির স্থান নাই। ভোগ যেখানে প্রবল, সেখানে পরিতৃপ্তি থাকিতে পারে না,—সেখানে পাওয়ার ইচ্ছাই না পাওয়ার দুঃখকে চিরন্তন করিয়া রাখে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাই সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিয়াছেন, "তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত, তুমি কবির সৃষ্ট নহ, ভগবানের দান।"

নিম্নে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল,—আমার মনে হয়, বাঙ্গালার অতি দীনতম গৃহেও এ দৃশ্য দেখা যাইবে না, এমন কি ভোগ যে এইরূপ বিভীষিকা লইয়া দেখা দিতে পারে, তাহা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ইহা সত্য এবং অতি অপ্রিয় সত্য। ২২

ভোগাদর্শ যখন বাড়িয়া চলে, তখন তাহা এইরূপই হইবে। এই কারণে জজ লিণ্ডসের বিবরণ সত্য হইতে পারে এবং বিবাহ Love Marriage, Free love বা Companionate Marrageএর নামে যৌন-স্বৈরাচার চলিতে পারে। ভোগই যেখানে আদর্শ সেখানে পরিতৃপ্তি কোথায়? তাহার বীভৎস চিত্র ইহাই। কুমারী-ব্যভিচারকে যেখানে উৎসাহই দান করা হয়। ২৩

হিন্দু বিবাহের আদর্শ

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, হিন্দু-বিবাহ কেবল মাত্র যৌন-দাসত্ব নহে বা ইহা যৌন-সম্পর্কও নহে; য়ুরোপীয় বিবাহ বলিতে যাহা বুঝা যায়, ইহা তাহাও নহে। য়ুরোপীয় বিবাহের মত ভোগও নহে, আবার কেবলমাত্র যৌন-সম্পর্ক বা প্রেমহীন নীরস ত্যাগও নহে। তবে ইহা কি? না ভোগ, না ত্যাগ, তবে ইহা কি? ইহা কর্ম্ম,—যে কর্ম্ম যৌন-সম্পর্ককে উপেক্ষা করে নাই, নারীকে উপেক্ষা করে নাই, পুরুষকে উপেক্ষা করে নাই, সবই আছে, ভোগও বটে, তবে তাহা ত্যাগগত ভোগ। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদের দাম্পত্যজীবন অন্যকে সুখী করিবার প্রতিযোগিতা মাত্র, এবং এই সুখী করিয়াই আমরা আনন্দ পাই,

---

(২২) They wash, dress, undress and answer natures calls in front of each other. The eldest girl sometime sleeps with the lodger. Why not? She has been wise to, if not exactly versed in, what the law describes as carnal knowledge since childhood and what she gets for the defilement of her young body helps to mend the boots.............. A slum woman one day told the Sister that she was worried "because she caught her eldest daughter aged eleven and her eldest boy thirteen, "at it" as she expressed it,................"Sexual intercourse, I sez, is the working man's one pleasure which he has not to pay for on the nail even if he pay a hundred afterwards for his bit of fun as you might say............"Countless of these girls and many of them in their early teens are syphilitic through soliciting men, and of all colour, in holes and corner of the streets, on stairways and from behind hoardings. *A. B. Patrika, 4. 11. 34.*

Harijans of British Slum.

(২৩) It seems absurd to enter upon a relation intended to be life long, without any previous knowledge as to their sexual compatibility.

Russel, Marriage & Morals 132.

পরিতৃপ্তি পাই। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার Ideal of Hindu Marriage প্রবন্ধে (The Visava Bharati Quartrly—July 1925) তিনটি নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী,
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্মপরিবর্জ্জিতঃ। (২৪)
তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে।
অস্মিন্নেব প্রযুঞ্জানো হ্যস্মিন্নেব তু লীয়তে॥
গৃহস্থ এব যজেত গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
চতুর্ণাম্ আশ্রমাণান্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে॥ (২৫)
—বশিষ্ঠ

এইখানে রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে ভারতীয় আদর্শের প্রকৃত সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনে স্বার্থ আছে, ভোগ আছে, কিন্তু তাহা ব্যক্তিবিশেষের ভোগ নহে, তাহা সমস্ত সমাজ বা দেশের জন্য—এই আদর্শই ত্যাগগত ভোগ।

দেহ ও মন কখনই এক সুরে চলিতে পারে না। দেহ চিরবিদ্রোহী, সে প্রতিক্ষণে মনকে উপেক্ষা করিয়া আপন পথে চলিতে চায়, অন্তর আমাদের বুদ্ধি-বিবেককে স্বীকার করিতে চাহে না এবং এই চিরন্তন বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি আজও ঘটে নাই, এবং এই মীমাংসা এই দুয়ের মধ্য হইতে পারে না। তাই এত দিন এই দুই মতবাদের সৃষ্টি—যাঁহারা দেহগত ভোগকে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাঁহারা মনের বন্ধনকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন, পক্ষান্তরে যাহারা বিবেককে মানিয়া চলেন, তাঁহারা দেহকে বা দেহগত ভোগকে পাশব প্রবৃত্তি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, অতএব এ মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু হিন্দু ঋষিগণ এই দুইকেই একটি তৃতীয় বস্তুতে আরোপ করিয়া এই চিরন্তন সমস্যার সমাধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। (২৬)

তাহা হইলে দেখা যায়, উপরিউক্ত দুইটি চিরবিরোধী মানববৃত্তির কোনটিকেই তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই, কোনটির প্রাধান্যই তাঁহারা ক্ষুণ্ণ করেন নাই, অথচ যাহা হউক একটি কল্যাণকর মীমাংসা করিয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, হিন্দু বিবাহে তাহা হইলে ভালবাসার স্থান নাই। কারণ, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রেম নারী-পুরুষের সম্পর্ককে মধুর করিয়া তুলে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবশ্যই এই মত পোষণ করিবেন। ভালবাসা বস্তুকে যদি আমরা য়ুরোপীয় ব্যাখ্যা না দিই, তবে এ কথা সত্য নয়। য়ুরোপে বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয় হয়, বিবাহের পরে সে প্রণয় কোন ক্ষেত্রে জীবিত থাকে, কোন ক্ষেত্রে জীবিত থাকে না। এখানে তাঁহারা যৌবনের অনভিজ্ঞ উন্মাদনার উপর—বা স্বভাবের উপর নির্ভর করেন ; কিন্তু যৌবনের এই বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করা উচিত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ, যৌবনে যে নারীকে ভাল মনে করিয়াছি, প্রৌঢ়ে হয়ত তাহাকেই অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করি। মানুষ নিজে কি চায় তাহাই যখন জানে না, তখন অপরিপক্ক মানববুদ্ধির উপর তাহার জীবন (যাহা কেবল তাহারই নহে) নির্ভর করিবে কেন ? আর হিন্দুবিবাহ যে প্রণয়হীন, এ কথা কে বলিবে ? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—(২৭)

(২৪) Karma here does not mean the looking after his family interest, but the performance of his specific duty—*The fulfilment of his obligation to Society.*

(২৫) That is to say, because the life of a householder is a life of self abnegation having its manifold obligation to Gods and men, therefore of all the four asrams, the asrams or estate of the house holder is specially distinguished.

In Societies where the household is but the means of ensuring the comfort and security of the individual, the nation of property also becomes intensely individualistic for the right of property is at the base of the householders' estate.

.........India, likewise, cultivated the viciousness out of property by converting the house-hold into a field for spiritual discipline.

(২৬) If the principle involed be once admitted, marriage needs must be reasoned from the control of the heart, and brought under the province of the intellect, otherwise insoluble problems will keep on arising ; for passion recks not consequences, nor brooks interference by outside judges, *Rabindranath, Ibid*—97 *Page*,

(২৭) Those who have no true aquaintance with our country and whole marriage system which is entirely different, take it for granted that Hindu Marriage is loveless. But do we not know of our own knowledge how false is such conclusion !

Ibid Page 100,

পার্থক্য এই যে, য়ুরোপে বিবাহের পূর্ব্বে য়ুরোপীয় প্রেম গড়িয়া উঠে এবং বিবাহ হয়, এবং আমরা কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিবাহ করি এবং পরে ধীরে ধীরে পরস্পরকে আপনার করিয়া লই। (হিন্দু বিবাহের মনস্তত্ত্বে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে)। আমাদের দাম্পত্য জীবনে আমরা, "replace the natural passion of sexual love by the cultivated of wedded love."

এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক ভালবাসা এবং কোন্‌টিতে ভুল করিবার সম্ভাবনা অধিক, তাহা ঠিক করা খুব কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। হিন্দু বিবাহ সমাজের অধীন মানবের কর্ত্তব্য বা তাহার নিজস্ব জীবন-প্রবাহের একটি ধারা মাত্র, তাহা পশ্চিমের বিবাহের মত একটি Contract বা চুক্তিমাত্র নহে। কাযেই রাষ্ট্রের পক্ষে এই বিবাহসম্বন্ধে আইন প্রণয়নের কোন অধিকার নাই,—আইন যদিও হয় তবে তাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় দীক্ষিত কয়েকজন লোকের পক্ষে প্রয়োজ্য হইবে, হিন্দু সমাজের কোন কাযেই লাগিবে না, dead letter হইয়াই তাহা থাকিবে—যেমন বিধবাবিবাহ কিছু চলিয়াছে কিন্তু সমাজ তাহাকে স্বীকার করে নাই, গ্রহণও করে নাই, যদিও বিধবা-বিবাহ বিবাহবিচ্ছেদ হইতে অধিক প্রয়োজনীয়, তথাপি হিন্দু সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিজের শুচিতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কারণ, হিন্দু সমাজ বহুর জন্য অল্পের স্বার্থকে চিরদিনই উপেক্ষা করিয়াছে,—গণিকাবৃত্তির মধ্যে আমরা তাহা দেখিয়াছি, এবং বিবাহবিচ্ছেদ আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা পুনরায় দেখা যাইবে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, হিন্দু স্বামী স্ত্রীকে তাহার সম্পত্তি বলিয়া মনে করে না, অর্থাৎ সেখানে Sense of property নাই। সে কথা কেবল চলিত যুক্তি নহে, তাহা শাস্ত্রীয়—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে,
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।—ভট্টভাষ্যে
লোকানন্ত্যং দিবং প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥—যাজ্ঞবল্ক্যঃ

ঘরকেই যে গৃহ বলে তাহা নহে "গৃহিণীকেও" 'গৃহ' বলা হয়। যেহেতু গৃহিণীর সহিত মিলিত হইয়াই পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চার প্রকার পুরুষার্থ প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—যেহেতু স্ত্রী হইতেই পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্র দ্বারা স্বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পুণ্যলোক সকলের প্রাপ্তি ঘটে, এই হেতু স্ত্রীদিগকে সম্মান করিবে এবং উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ করিবে।

অতএব শাস্ত্রীয় ভাব এই যে, স্ত্রী স্বামীর অধীন নহে, তাহার কর্ত্তব্যের সহযোগী, সৃষ্টি, (progeny) জীবন, সমস্ত কিছুরই সাথী। প্রকৃত companionate maraiage,—যাহা কেবলমাত্র যৌন-সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না।

মনুও সেই কথাই বলিয়াছেন—

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

স্ত্রীলোক অপত্যের উৎপাদন, জাত সন্তানের প্রতিপালন এবং প্রত্যহ লোকযাত্রা নির্ব্বাহের প্রত্যক্ষ কারণস্বরূপ জানিবে। অপত্য উৎপাদন, ধর্ম্মকর্ম্মসাধন, শুশ্রূষা, উত্তমরতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গ গমন কার্য স্ত্রীলোকের অধীন বলিয়া জানিবে।

ইহা ছাড়াও বিবাহের পরে কুশণ্ডিকার মন্ত্রে আমরা যাহা পাঠ করি, তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে স্ত্রীর পক্ষে দাসত্ব বা পরাধীনতা কোনটাই প্রমাণিত হয় না। আমরা সংকল্প করি—

ওঁ, মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্তং তেঽস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।

অথবা,

ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রাধান্য নাই,—'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।' এই আদর্শ শাস্ত্রে বা কাব্যে কেবল গড়িয়া উঠে নাই, হাজার হাজার বৎসরের tradition ইহার মূলে। সাহিত্য, কাব্য, শাস্ত্র, সমাজ যুগপৎ তাহার মনকে এমনই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে—এবং এই পাওয়া যে কত বড় সত্য, তাহা হিন্দু ছাড়া কেহ বুঝিতে পারিবে না। বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল বিবাহ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন,—২৮

(২৮) The essence of good marriage is respect for each other's personality, combined with that deep intimacy, physical, mental, and spiritual which makes a serious love between man and woman the most fructifying of all human experiences. Such love, like every thing that is great

ইহাই যদি ভাল বিবাহ হয়, তবে আমাদের হিন্দু বিবাহ ...য় ভাল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই,—ঘরে ঘরে আমরা এই ...ববাহের স্বরূপই দেখিতে পাই। যুগ-যুগান্তরের সাধনা ভারতীয় দাম্পত্যজীবনে এই Voluntary Sacrificeকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে, এই আদর্শের অনুপ্রেরণা আমাদিগকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে,—এই ত্যাগ আজ আমাদের নিকট অর্জ্জনের বস্তু নহে, ইহা প্রাপ্ত, স্বভাবসিদ্ধ ...ইয়া উঠিয়াছে। কেবল আদর্শ নহে, বাস্তবে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—যদি তাহাই হয়, তবে সেই বিবাহ-সংস্কারের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

রবীন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধের একটি বাক্য এই কথার সমর্থন করিবে, তিনি ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—(২৯)

[ক্রমশঃ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম এ)।

...and precious, demands its own morality, and ...requently entails a sacrifice of the less to the ...reater; but such sacrifice must be voluntary, ...r, where it is not, it will destroy the very basis ...f the love for the sake of which it is made.

Marriage and Morals, Page 249 & 250.

(২৯) ......For the wife, the husband is an idea. She has not surrendered herself to the brute force of another, but voluntarily consecrated herself to the service of her own ideal. And if the husband is a man of sensitive soul, the flame of this ideal love is transmitted to his own life also. Such mutual illumination it has often been our lot to witness.

Biswa Bharati Quarterly, July, 1925—Page 101.

পুরীতে

অসীম পারাবার আজিও হাহা-স্বরে
বুকের নিধিটিরে হতাশে খুঁজে মরে
তাই কি অনিবার ঢেউয়ের পরে ঢেউ
আছাড়ি' বেলাভূমে নিয়ত ভেঙ্গে পড়ে

নিয়ত ঝুরে আঁখি হৃদয় কাঁদে হায়
তাহারি স্মৃতি বহি' বাতাস ব'য়ে যায়
উদার নীল নভে উদাস নীলজলে
গোপনে তা'রি কথা পরাণে মুরছায়!

জড়ায়ে সব ঠাঁই তাহারি স্মৃতি ভাসে
তাহারি কথা সুধু কেবলি মনে আসে
যত না ব্যথা পাই, যতই মরি দুখে,
সুখের স্মৃতি তত ঘুরে যে চারি পাশে!

জীবনে যায় যাহা হারায় দিন যত
তা'রা না ফিরে আর বিলাপ করি শত।
কেঁদে যে চ'লে যায়, লুকায়ে পড়ে যেবা
তাহারা কাঁটা হয়ে বেঁধে যে অবিরত!

এবার আসা হেথা বৃথাই হ'ল বুঝি
বিমুখ বেলাভূমে বিফলে মরি খুঁজি
মুক্তা লুকায়েছে শুক্তি মেলা ভার
এবার এসে সুধু হতাশা সনে যুঝি!

গড়িতে গিয়া এই জীবনে ছায়াপথ
মরুতে ঘুরে মোর ব্যর্থ মনোরথ
সারথি হৃতবল তুরগ মৃতপ্রায়—
জীবন ছায়াহীন মরুতে কোথা পথ?

কি হবে কেঁদে আর, বিলাপে কিবা ফল,
কেহ ত নাহি মোর মুছাতে আঁখিজল
একেলা গৃহকোণে বিষাদভরা মনে
দীর্ঘ দিবারাতি কি ক'রে কাটে বল্?

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

বজরা

(রূপ-কথা)

তেপান্তর রাজ্য। রাজ্যের রাজা খুব খেয়ালী। রাজা একদিন সকালে সভায় এসে বসেছেন, বন্দীরা গান গেয়ে সবেমাত্র চুপ করেছে, রাজা ডাকলেন—মন্ত্রী···

কৃতাঞ্জলি-পুটে মন্ত্রী বললেন,—মহারাজ···

রাজা বললেন,—কাল রাত্রে চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখেছি।

—কি স্বপ্ন মহারাজ? তার বৃত্তান্ত শুনবো বলে আমরা উদ্গ্রীব।

রাজা বললেন,—স্বপ্ন দেখেছি···একখানি বজরা। সে-বজরায় চড়ে আমি পৃথিবী পর্য্যটন করছি।

মন্ত্রী বললেন,—মহারাজ যদি আদেশ করেন, তাহলে ব্যবস্থা করি।

রাজা বললেন,—চুপ করো। আমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত এখনো শেষ হয়নি।

মন্ত্রী বললেন,—ক্ষমা চাইছি, মহারাজ। বলুন সে বৃত্তান্ত···

রাজা বললেন,—সে-বজরা শুধু জলে চলে না, স্থলেও চলে।

মন্ত্রী পাত্র-মিত্র-সভাসদ সকলে অবাক! বললেন,—বলেন কি মহারাজ! জলের বজরা···সে বজরা স্থলে চলেছে! ভারী চমৎকার স্বপ্ন তো মহারাজ!

রাজা বললেন,—তাই।

মন্ত্রী বললেন,—তাহলে মহারাজ···

রাজা বললেন,—দেশ-বিদেশে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা জানাও—জলে চলে স্থলে চলে এমন বজরা যে আমাকে এনে দেবে, তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দেবো; আর আমি মরে গেলে সেই জামাই হবে এ-রাজ্যের রাজা।

মন্ত্রী বললেন,—যে আজ্ঞে, মহারাজ।

ঢ্যাঁড়াদার ঢ্যাঁড়া পিটে দেশ-বিদেশে তেপান্তর-রাজের ঘোষণা জানালো। যে শুনলো, সেই অবাক হলো। তারপর হেসে সকলে বললে,—বজরা চলবে স্থলে! হুঁঃ! এ কখনো হয়? রাজা-রাজড়ার খেয়াল!

খেয়াল বলে ঘোষণার কথা সবাই গেল ভুলে; ভুললো না শুধু একজন।

সে এক গরীব চাষা। চাষার বয়স হয়েছে। সারা জীবন বেচারা খেটে-খেটে সারা—কোনোদিন সুখ-ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখতে পেলে না!

চাষার দুই ছেলে। ছেলেরা ডাগর হয়েছে,—ক্ষেতে কাজ করে।

দুই ছেলেকে ডেকে চাষা বললে,—শোনো দুজনে কথা। ঐ যে গাঁয়ের শেষে অজগর বিজন-বন। ও বনে যত গাছ আছে, কেটে তক্তা বার করে সেই তক্তা দিয়ে তৈরী করা চাই বেশ বড় বজরা। এমন বজরা তৈরী করবে, যে-বজরা জলেও চলবে, স্থলেও চলবে। যদি তেমন বজরা তৈরী করতে পারো, তাহলে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হবে··· তেপান্তরের রাজা হবে! বুঝলে···

দুই ছেলে বললে,—বেশ।

তার পর দুই ভাইয়ে বাধলো ঝগড়া—কে বনে যাবে!

বাপ বললে,—ন্যাপাল যাবে। ন্যাপাল বড়। বড় যদি না পারে, তখন যাবে গোপাল।

তাই হলো।

পরের দিন ভোরের বেলায় কুড়ুল নিয়ে, করাত নিয়ে, যন্ত্রপাতি নিয়ে ন্যাপাল বনে চললো গাছ কাটতে। চাষার যে কটি বলদ ছিল, তাদের পিঠে ফল-ফুলুরির বস্তা চাপানো হলো। সেই সঙ্গে চাষা দিলে ডাব, ঝুনো নারকোল আর জল-ভরতি বড় দু'টো জলের জালা।

বড় ছেলে ন্যাপাল বনে গেল।

জোয়ান ছেলে…গতর খাটিয়ে খায়। হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে গাছ কাটতে লেগে গেল। এক দিন, দু'দিন, তিন দিন …ক্রমে এক-মাস কাটলো। বড় বড় কত গাছ যে ন্যাপালের হাতের কুড়ুলের ঘা খেয়ে কাটা পড়লো, সংখ্যা নেই! দু'মাস শেষ হয়-হয়, সেই সব গাছ চেলিয়ে ন্যাপাল তক্তা বার করছে, এমন সময় কোথা থেকে একটি বুড়ো মানুষ এসে পাশে দাঁড়ালো। বুড়ো ভয়ঙ্কর হাঁপাচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ বয়ে টশ্-টশ্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে…

বুড়ো বললে—এক আঁজলা জল দাও না, বাবা… পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

ন্যাপাল বললে,—যা বলেছো! এ বনে কত দিন আমাকে এখন থাকতে হবে, তার ঠিক নেই! পুঁজির মধ্যে ঐ দু'জালা জল। তা থেকে তোমায় দি খেতে—তার পর?

বুড়ো নিশ্বাস ফেললে. নিশ্বাস ফেলে বললে,—বিজন-বনে এত কি কাজ করছো গো?

ন্যাপাল বললে,—জানো না? গাছ কেটে সেই গাছ থেকে তক্তা বার করে রাজার জন্যে বজরা তৈরী করতে হবে—সে বজরা জলে চলবে, স্থলে চলবে…বুঝলে?

বুড়ো বললে—তবেই হয়েছে! যে তোমার মেজাজ! ও-মেজাজ নিয়ে বজরা তৈরী হয় না!…

এই কথা বলে' গায়ের ঘাম মুছে বনের পথ ধরে বুড়ো ছায়ায়-ছায়ায় চলে গেল। করাৎ-হাতে ন্যাপাল কাঠ চ্যালাতে লাগলো। দু'মাস গেল…তিন মাস গেল… তবু বজরা আর তৈরী হয় না! রেগে ধুত্তোর বলে' যন্ত্রপাতি নিয়ে ন্যাপাল একদিন শেষে ঘরে ফিরে এলো।

বাপ বললে,—কি হলো রে? পারলি নে?

ন্যাপাল বললে—ও-বজরা তৈরী অমনি চাট্টিখানি কথা কি না! দেখি, কে পারে!

বাপ ডাকলে,—গোপাল…

গোপাল এলো। বাপ বললে—তোর দাদা তো পারলে না। এবারে তুই যা…

গোপাল খুশী-মনে কুড়ুল-করাত নিয়ে বনে গেল।

কাঠ কেটে দু'মাস শেষ হয়-হয়, গোপাল কাঠ চ্যালাচ্ছে, এমন সময় সেই বুড়ো এসে হাজির। বুড়ো বললে—ওগো বাপু, দেবে আমায় এক আঁজলা জল? বড্ড তেষ্টা…

গোপাল বললে,—নিশ্চয় দেবো। এত জল রয়েছে আর তুমি বুড়ো মানুষ তেষ্টায় জল পাবে না, তাও কি হয়?

গোপাল জল দিলে…বুড়ো জল খেলে।

তার পর খুশী হয়ে বুড়ো বললে,—তেপান্তরের রাজার জন্যে বজরা তৈরী করছো বুঝি? সে-বজরা জলে চলবে, স্থলেও চলবে?

গোপাল বললে,—হ্যাঁ।

বুড়ো হাসলে, হেসে বললে,—কিন্তু এ যে পাগলের কথা, বাবা। মানুষে এমন বজরা তৈরী করতে পারে না। তুমিও পারবে না। কেন মিছে কষ্ট করছো! তার চেয়ে শোনো, আমার জানা একটি লোকের কাছে এমন বজরা আছে। তুমি বড় ভালো ছেলে…তেষ্টায় আমাকে জল দেছ। আমি তোমাকে সে বজরা এনে দেবো।…

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল…তার আর চিহ্ন নেই!

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে চোখ চেয়ে গোপাল দেখে, বনে এক মস্ত বজরা। বজরার উপর দাঁড়ী মাঝি। সব মজুত…শুধু বজরায় উঠে বসলেই হয়।

দাঁড়ী-মাঝিদের ডেকে গোপাল বললে,—কার জন্যে বজরা এলো হে?

তারা বললে,—গোপাল-মহারাজের জন্যে।

বটে! বাঃ! বুড়ো তো খাশা লোক! বজরা সত্যি!

গোপাল বজরায় চড়ে বসলো। বজরা চললো বন-বাদাড় ভেঙ্গে ডাঙ্গার উপর দিয়ে হু-হু বেগে…

বজরা দেখে বাপ বল্লে—বাহবা গোপাল! কিন্তু আর দেরী নয়। সোজা চলে যাও তেপান্তর। কি জানি, রাজার খেয়াল! যদি দু'দিন পরে সে খেয়ালের নিবৃত্তি হয়!

গোপাল চট্‌পট্ চান করে খেয়ে-দেয়ে বজরায় চেপে বসলো, দাঁড়ী-মাঝিদের ডেকে বল্লে—চলো তেপান্তর।

বজরা চল্‌লো ঘাট-বাট-পথের বুক বয়ে তেপান্তরের দিকে। পথে এক মস্ত মাঠ। গোপাল দেখে, সেই মাঠে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে—তার হাতে মস্ত গুল্‌তি-ধনুক। আকাশের দিকে চেয়ে সেই ধনুকে তীর জুড়ে সে টিক্‌ কর্‌ছে।

গোপাল বল্‌লে—কি কর্‌চো হে?

লোক বল্‌লে—আকাশের গায়ে খুব উঁচুতে দেখ্‌ছো ছোট্ট একটি কালো দাগ?

গোপাল দেখলে, দেখে বল্‌লে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,...যেন কালির ফোঁটা!

লোক বল্‌লে—কালির ফোঁটা নয়। ও হলো জটায়ু-পাখী। রামায়ণের সেই জটায়ু-পাখীর নাতি। তীর ছুড়ে আমি ওর চোখ বিঁধবো।

গোপাল অবাক্‌, বল্‌লে—তা কখনো হয়? ঐটুকু দেখা যাচ্ছে...ওর কোথায় ধড়, কোথায় মুখ, কোথায় চোখ—অসম্ভব!

লোক বল্‌লে—দাঁড়িয়ে ছাখো সম্ভব হয় কি না! অর্থাৎ কি জানো, এ হলো গবু-রাজার দেশ। এখানে শীকার করে জীবজন্তু মারলে সাজা হয়। জীবজন্তুর চোখ, কাণ, পা বিঁধলে সাজা হয় না। আমি ঐ জটায়ু-পাখীর চোখ বিঁধবো—পাখী মার্‌বো না। চোখ বিঁধলে পাখী মর্‌বে। তাতে পাখী-মারা অপরাধ হবে না। আইন বাঁচবে। জটায়ু-পাখীর মাংস খেতে চমৎকার। খেয়েছো কখনো?

গোপাল বল্‌লে,—না।

গোপাল দাঁড়ালো। লোকটি টিক্‌ করে' তীর ছুড়লো। চক্ষের নিমেষে প্রকাণ্ড জটায়ু মরে দড়াম্‌ করে এসে পড়লো একেবারে সে-লোকের পায়ের কাছে।

গোপাল অবাক্‌! বল্‌লে—যাবে ভাই আমার সঙ্গে তেপান্তর-রাজ্যে?

লোক বল্‌লে—চলো। চুপচাপ বসে আছি—কাজ-কর্ম্ম নেই। মন্দ কি, বেড়িয়ে আসা যাবে।

লোকটি চড়ে বসলো গোপালের বজরায়।

বজরা চলেছে...ডাঙ্গা ছেড়ে এবার জলে পাড়ি।

জল...জল...চারিদিকে জল। কোথাও ডাঙ্গার চিহ্ন দেখা যায় না। চলে চলে এক জায়গায় জলের কোলে ডাঙ্গা দেখা গেল। গোপাল দেখলে, ডাঙ্গায় একজন মানুষ—কাণে একটা প্রকাণ্ড লম্বা নল লাগিয়ে চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে আছে।

বজরা থামিয়ে গোপাল ডাঙ্গায় নেমে এলো। সেই মানুষের কাছে এসে বল্‌লে,—ও কি কর্‌ছো গা?

মানুষ বল্‌লে—এ নলের আশ্চর্য্য শক্তি। কাণে নল লাগিয়ে হাজার ক্রোশ দূরের শব্দ শুনে আমি বলে-দিতে পারি, সেখানে কি হচ্ছে।

গোপাল বল্‌লে—বটে! বটে! আচ্ছা, কাণে নল লাগিয়ে শোনো তো তেপান্তর রাজ্যে এখন কি হচ্ছে!

মানুষ কাণে নল লাগালো...তার পর বল্‌লে—সেখানে মহা-হুলস্থূল-কাণ্ড চলেছে। মানে, একদিকে রাজকন্যা, আর অন্যদিকে রাজা এবং রাজ্যের লোক। দু'দিকে মহা তর্ক চলেছে। রাজার দল বল্‌ছে, এমন বজরা চাই—সে বজরা জলে চল্‌বে, স্থলে চল্‌বে। রাজকন্যা খুব হাস্‌চেন আর বল্‌চেন,—অসম্ভব! এমন বজরা পৃথিবীতে কেউ তৈরী করতে পারে নি! পার্‌বে না!

গোপাল বল্‌লে—হুঁ! তা তুমি আস্‌বে আমাদের বজরায়? এসো না...তোমার নলের কেরামতি দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে'খন!

মানুষ বল্‌লে—চলো।

মানুষ উঠে বসলো বজরায়।

বজরা চল্‌লো।

আর এক জায়গায় গোপাল দেখলে, বনের মধ্য থেকে ধূলো উঠছে। এমন অজস্র ধূলো যে আকাশের রোদ সে-ধূলোয় ঢাকা পড়েছে...

গোপাল ভাবলে, এ তো মজা মন্দ নয়! আকাশে মেঘ নেই, অথচ দিনের বেলায় এমন অন্ধকার!

বজরা থামিয়ে বনে নেমে গোপাল দেখে, একটি ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে জুতোর ধুলো ঝাড়চে! কি প্রকাণ্ড জুতো...যেন এক-জোড়া পিপে!

গোপাল বললে—কি করছো গো?

ভদ্রলোক বললে—আমি বেরিয়েছি পৃথিবী-ভ্রমণে। আমার বাড়ী ল্যাপলাণ্ডে। হাঁটতে হাঁটতে দু'দিনে এসেছি

এইখানে। ধুলোয় ভরে জুতোর যা চেহারা হয়েছে···তাই রুমাল দিয়ে জুতোর ধুলো ঝাড়চি।

গোপাল বললে—তোমার পৃথিবী ঘোরা কত দিনে শেষ হবে?

ভদ্রলোক বললে—দু'দিনে বারো আনা ভাগ মেরে দিয়েছি। আর একটা বেলা পেলে ঘোরার কিছু বাকী থাকবে না।

গোপাল বললে—তেপান্তর এখনো ছাখো নি তো··· এসো আমার সঙ্গে। আমি যাচ্ছি তেপান্তর।

ভদ্রলোক বললে—চলো। হেঁটে জুতো-জোড়াকে আর ক্ষয়াই কেন?

সে ভদ্রলোকও বজরায় উঠলো।

তার পর বজরা এলো তেপান্তর। দেশে হুলস্থূল পড়ে গেল।

রাজার লোকজন এসে গোপালকে খাতির-অভ্যর্থনা করে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলো। রাজার কাছে এসে গোপাল বললে,—ঢ্যাঁড়া শুনে বজরা এনেছি, মহারাজ। এ বজরা জলে চলে, স্থলেও চলে। এখন বজরা দেখুন। দেখে রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত করুন।

রাজা এলেন পাত্র-মিত্র সঙ্গে নিয়ে বজরা দেখতে। বজরা দেখলেন। দেখে মহা-খুশী! তবে তো তিনি মিথ্যা স্বপ্ন দেখেন নি!

সকলকে নিয়ে সে-বজরায় রাজা চড়লেন···গোপাল সকলকে কত দেশ ঘুরিয়ে নিয়ে এলো।

তেপান্তরে ফিরে রাজা বললেন—রাজবাড়ীতে এসো বাপু। তোমার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবো।

রাজকন্যা এ কথা শুনলেন। গোপালের পরিচয় শুনে রাগে জলে উঠলেন, ডাকলেন—বাবা···

রাজা বললেন—কেন, রাজকন্যে?

রাজকন্যা বললেন—তুমি কি আমাকে রূপকথার রাজকন্যা পেয়েছো যে যাকে পাবে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে? না···তা হবে না। চাষার ছেলেকে আমি বিয়ে করবো—সসাগরা তেপান্তর-রাজ্যের একমাত্র রাজকন্যা আমি!···কক্‌খনো না!

রাজকন্যাকে রাজা বেশ ভালো রকম চেনেন। রাজকন্যার গোঁ চিরদিন দুর্জ্জয়! রাজা প্রমাদ গণলেন।

কিন্তু ওদিকে ঢ্যাঁড়া দিয়ে ঘোষণা জানিয়েচেন দেশে-বিদেশে—বিয়ে না দিলে দুর্নাম রটবে!···উপায়?

মন্ত্রী বললেন—আমি উপায় করচি, মহারাজ! হাজার হলেও চাষার ছেলে···ওকে কিছু টাকাকড়ি ধরে দিন্। পেয়ে খুশী হয়ে দেশে চলে যাবে'খন।

তাই হলো। রাজা বললেন—তোমাকে লক্ষ টাকা দিচ্ছি। পুঁটলি বেঁধে দেশে ফিরে যাও বাপু···

গোপাল বললে—তা হয় না, মহারাজ। আপনি যখন ঘোষণা জানিয়েছেন···

রাজা বললেন—কিন্তু বোঝো তো বাপু, তুমি হলে চাষার ছেলে, আর আমার মেয়ে হলো রাজকন্যা! রূপকথার আমোলে এমন বিয়ে চলতো···এ যুগে চলে না। লোকে নিন্দে করবে।

গোপালের ঘৃণা হলো। রাজা হয়ে কথা রাখে না··· এমন ইতর-মন!

গোপাল বললে—শুনুন মহারাজ, হয় কথা রেখে রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিন, না হয় বজরা ভরে' আমায় মোহর দিন। না হলে আমি যাবো না।

রাজ্যে দুশ্চিন্তার পাহাড় নামলো। এত বড় বজরা··· মোহর দিয়ে ও-বজরা ভরিয়ে তুলতে হলে তোষাখানা খালি হয়ে যাবে!

তখন সকলে মিলে সভায় বসলেন মন্ত্রণা করতে। দিন যায়, রাত যায়···এ-সমস্যা সমাধানের উপায় আর মেলে না!

দশ দিন, দশ রাত কেটে গেল। গোপাল এলো রাজসভায়; বললে—কি মহারাজ, কিছু স্থির করতে পারলেন?

রাজার মুখে কথা নেই! মন্ত্রী বললেন—রাজকন্যার বড় অসুখ চলেছে, বাবা! তাই আমাদের এখন মাথার ঠিক নেই! রাজবদ্যি বলচেন, যদি এক ঘটি জীবন-নদীর জল এনে রাজকন্যাকে খাওয়াতে পারা যায়, তবেই এ অসুখ সারবে। না হলে ওঁর প্রাণের আশা বুঝি ছেড়ে দিতে হয়! অসুখ সারলে ওঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, মহারাজ সাব্যস্ত করেচেন।

গোপাল বললে—জীবন-নদী কোথায় ?

মন্ত্রী বললেন—এখান থেকে সে এক-বছরের পথ !

গোপাল বললে—বটে ! তা ভয় নেই···আমি সে-জল আনিয়ে দিচ্ছি।

মন্ত্রী বললেন—কিন্তু সে জল চাই ছ'ঘণ্টার মধ্যে···না হলে রাজকন্যার প্রাণটুকুকে ধরে রাখা যাবে না !

গোপাল বললে—তাই হবে, মন্ত্রিবর।

বলে গোপাল এলো চলে।

মন্ত্রী বললে,—বুদ্ধি যা বার করেছি, মহারাজ, চমৎকার ! এক বছর এখন নিশ্চিন্তি ! এর মধ্যে ভালো রাজপুত্র দেখে রাজকন্যার বিয়ে দিন।

রাজা হাসলেন হো-হো করে। বললেন—এমন বুদ্ধি না থাকলে আর তোমায় করেছি এ-রাজ্যের মন্ত্রী !

এদিকে গোপাল এলো বজরায়। এসে ডাকলে,—জুতো-বন্ধু···

জুতো-ভদ্রলোক তখন বসে' নিবিষ্ট-মনে জুতো বুরুশ করছে, গোপালের কথায় সাড়া দিয়ে বললে—কেন, বন্ধু ?

গোপাল বললে—জীবন-নদীর জল চাই রাজকন্যার জন্যে। নাহলে রাজকন্যা বাঁচবেন না।

জুতো-ভদ্রলোক বললে—তার আর কি ! আমি এই জুতো পায়ে দিয়ে এখনি বেরুচ্ছি। এক ঘণ্টার মধ্যে জল এনে দেবো।

ঘটি নিয়ে জুতো-ভদ্রলোক তখনি বেরিয়ে পড়লো। গোপাল ঘড়ি ধরে বজরায় বসে রইলো।

এক ঘণ্টা যায়, দু'ঘণ্টা যায়, ক্রমে পাঁচ ঘণ্টা উত্তীর্ণ-প্রায়—জুতো-ভদ্রলোক আর ফেরে না !

গোপাল ডাকলে,—ও নল ভাই···

নলের মানুষ বললে—কেন ?

গোপাল বললে—জুতো-ভদ্রলোকের কি হলো ? সময় যে যায় !

নলের-মানুষ তখন কাণে নল গুঁজে আকাশ-পানে তাকালো। দু'মিনিট পরে বললে—জল নিয়ে ফেরবার সময় জুতো-ভদ্রলোক পথে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোপাল বললে—উপায় ?

গুলতি-ধনুকধারী লোক বললে—আমি উপায় করছি।

এই কথা বলে একরাশ কাঁই-বীচি নিয়ে সে গুলতি ছুড়লো। কাঁইবীচিগুলো পট্‌পট্ করে গিয়ে পড়লো পাঁচশো ক্রোশ দূরে জুতো-ভদ্রলোকের গায়ে। গায়ে পড়তেই তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। জুতো-ভদ্রলোক পায়ে জুতো এঁটে তখনি খাড়া হলো···

জীবন-নদীর জল এলো। সে-জল নিয়ে গোপাল চললো রাজ-বাড়ীতে।

জীবন-নদীর জল দেখে রাজা, মন্ত্রী—সকলের চক্ষু-স্থির !

রাজা বললেন—এখন কি উপায় হবে, মন্ত্রী ?

মন্ত্রী বললেন—ভাবতে দিন, মহারাজ···

রাজা বললেন—শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভাবো। দেরী করলে চলবে না।

মন্ত্রী ভাবতে লাগলেন।

গোপাল বললে—এখন আমার কি ব্যবস্থা করবেন, মহারাজ ?

রাজা বললেন—কাল খপর দেবো, বাপু। আজ আমাদের চিন্তা করতে দাও।

গোপাল বললে—বেশ, চিন্তা করুন। কাল আমি আবার আসবো।

মন্ত্রী তখন রাজ্যের খাতাঞ্জিকে ডাকলেন। খাতাঞ্জির সঙ্গে পরামর্শ চললো।

খাতাঞ্জি পাকা লোক।

মাথা চুলকে খাতাঞ্জি বললে—মোহর পাঠানো হোক। তারপর মোহর-ভরা সে বজরা আটক করুন। বিনা-হুকুমে তেপান্তর রাজ্যে বজরা এনেছে—এখানকার যা আইন, সে-আইনের জোরে ওর বজরা আটক করে বাজেয়াপ্ত করুন। মোহরকে-মোহর ঘরে ফিরে আসবে, তার সঙ্গে বজরাখানা হবে উপরি-লাভ।

খাতাঞ্জির পিঠ চাপড়ে মন্ত্রী বললেন—সাবাস বুদ্ধি ! বাঃ !

মন্ত্রী এসে রাজার কাছে বার্ত্তা জানালেন এবং মন্ত্রীর কথায় রাজা তোষাখানা খুলে রাজকন্যার মূল্য-স্বরূপ ভারে-ভারে টাকা আর মোহর পাঠালেন গোপালের বজরায় বজরা সে মোহরে-টাকায় ভরে উঠলো···

বিস্মিতা

[শিল্পী—শ্রীখগেন রায়

তার পর বন্ধুদের নিয়ে গোপাল বজরা ছাড়লো। দেশের দকে চললো।

ওদিকে সেনাপতিকে ডেকে মন্ত্রী বললেন—তোমার ফৌজ তৈরী করো। ও বজরা আটক করতে হবে। ধনরত্ন সব ফিরে পাবো—সেই সঙ্গে বজরা!

টাকা-কড়ি-মোহর-সোনাদানায় ভরতি বজরা চলেছে। হঠাৎ গোপালের কি খেয়াল হলো! নলের-মানুষকে ডেকে গোপাল বললে—ছাখো তো বন্ধু, রাজবাড়ীতে এখন কি ব্যাপার চলেছে?

নলের-মানুষ কাণে নল লাগিয়ে বললে,—সর্ব্বনাশ! ওরা ভারী ছোট লোক। টাকা-কড়ি দিয়ে এখন আবার বজরা পাকড়াবার ব্যবস্থা করেছে! ঘোড়ায় চড়ে হাজার হাজার ফৌজ আসচে বজরা ধরতে।

গোপাল বললে,—বটে! উপায়?

গুলতি-মানুষ বললে—আমি করছি উপায়!

সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তীরের বেগে রাজ-সেনাপতি আসছেন। গুলতি-ধনুকধারী লোক গুলতিতে রাশ রাশ নুড়ি ভরে' তাগ করে ছুড়লো। নুড়িগুলো এসে ঝর্ ঝর্ করে লাগলো ফৌজের যত ঘোড়ার পায়ে। ঘোড়ার দল অমনি সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

সকলে হতভম্ব!···মেঘ নেই, জল নেই···এমন শিলাবৃষ্টি হয় কোথা থেকে?

কিন্তু ভেবে কি হবে? ভাবলে ঘোড়া চলবে না!···ঘোড়াগুলোর পা ফুলে কলা গাছ! তারা দাঁড়াতে পারছে না, পিঠে ফৌজ বয়ে ছুটবে কি!

কাজেই সৈন্য-সামন্ত কিছু করতে পারলো না। গোপাল নিরাপদে ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরলো।

বজরা থেকে ধনরত্ন তুলে গোলাঘরে জড়ো করলো। বজরা খালি হলো। অমনি দেখতে দেখতে সে-বজরা কোথায় শূন্যে হয়ে গেল।

গোপাল সে ধনরত্ন তিন ভাগে ভাগ করলে। অজস্র ধন! এক ভাগ দিলে বুড়ো বাপকে; এক ভাগ দিলে বড় ভাইকে আর বাকী ভাগ নিজে নিয়ে দূরে গিয়ে বন কেটে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে।

বাপ এসে বললে—এবার বিয়ে কর্। ঘর-সংসার হলো, রাজ্য হলো, রাণী না হলে কাকে নিয়ে রাজ্য করবি? রাজ্য মানাবে কেন? ঘটক লাগিয়ে আমি রাজকন্যার সন্ধান করি।

গোপাল বললে,—না বাবা, না। রাজকন্যা নয়। রাজকন্যাদের বড্ড অহঙ্কার। আমি রাজকন্যা বিয়ে করবো না। গরীব গেরস্ত-ঘরের মেয়ে বিয়ে করবো। সে বৌ শান্ত হবে, ঘর-কর্ণার কাজ করবে, তোমাদের সেবা-শুশ্রূষা করবে। রাজকন্যা বিয়ে করলে সে ও-সব কিছু করবে না—শুধু সোনার পালঙ্কে বসে থাকবে! আমি রাজকন্যা বিয়ে করবো না।

বাপ বললে তাই হবে। আমি গেরস্ত-ঘরের মেয়ের সন্ধান করছি। এই মাসেই তোর বিয়ে দেবো। দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি হবো।

গোপালের বিয়ে হলো সেই মাসেই গরীব গেরস্তর মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি দেখতে দিব্যি···চাঁদের মতো ফুটফুটে! ভারী ভালো, ভারী ঠাণ্ডা মেজাজ।

বিয়ের পরে গোপাল হলো নতুন রাজ্যে রাজা আর গেরস্ত-ঘরের সেই মেয়ে-বৌ হলো সে-রাজ্যের রাণী।

তার পর মনের সুখে দু'জনে রাজ্য করতে লাগলো।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নকল শব্দ

ফিল্মে বা ছায়া-ছবিতে প্রচণ্ড ঝড় দেখি; দুরন্ত ব্যাঘ্র-সিংহ দেখি। ছবি দেখার সঙ্গে শুনি সে-ঝড়ের মত্ত হুঙ্কার; সে ঝড়ের বেগে সাগরের বিকট গর্জ্জন; দুরন্ত ব্যাঘ্র-সিংহের ভীম-ভয়ঙ্কর নাদ! সত্যকার এ ঝড়ের সামনে ক্যামেরা ধরিয়া ঝড়ের ছবি বা শব্দ-যন্ত্রে ঝড়ের ঐ বিকট হুঙ্কার-ধ্বনি তোলা অসম্ভব ব্যাপার! এ শব্দ আসল ঝড়, আসল সাগর-তরঙ্গ বা আসল ব্যাঘ্র-সিংহের গর্জ্জন নয়, এ শব্দ নকল।

যুদ্ধের ভীম-ভয়ঙ্কর ছবিতে দেখি কামানে গোলা ছুটিতেছে; শেল্ ফাটিতেছে; হাউইজার চলিয়াছে ঘর্ঘর-শব্দে—ভাবো, যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যকার কামান-দাগা বা শেল্-ফাটার শব্দ ছবিতে তোলা হইয়াছে? তোলা সম্ভব হইতে

কাউণ্ট কুটেলি ও সহকারিণী—বাক্স-সাহায্যে ট্রেণের রকমারি শব্দ-সৃষ্টি

পারে না! এই কামান-দাগা, শেল্-ফাটার যে-শব্দ আমরা ফিল্মে শুনি, তাহা নকল শব্দ; সত্যকার কামান দাগা, শেল্-ফাটা শব্দের অনুকরণে এ-শব্দ ষ্টুডিয়োয় ফরমাশ-মাফিক তৈরী হয়।

গ্রামোফোনে যেমন গান-বাজনা প্রভৃতির স্বর ও সুর রেকর্ড করিয়া রাখা হয়, চলন্ত-ট্রেণের শব্দ, জন্তু-জানোয়ারের ডাক, সাগরের গর্জ্জন—এ-সবও তেমনি আগে হইতে অনেক সময় রেকর্ড করিয়া রাখা হয়। ছবি তুলিবার সময় যখন যে-শব্দের প্রয়োজন, রেকর্ড বাজাইয়া শব্দ যন্ত্রে তাহারি প্রতি-শব্দ তুলিয়া ফিল্ম-নাট্যের অনুরূপ জায়গায় জুড়িয়া দেয়। আগে হইতে যে শব্দ-লহরী রেকর্ড করিয়া রাখা হয়, তার নাম stock-sound বা stock-noise.

কিন্তু আগে হইতে এভাবে ষ্টক্-শব্দ রেকর্ড করিয়া রাখায় পরিশ্রম এবং খরচের অন্ত থাকে না। এজন্য যখন যেমন শব্দ ছবিতে যেরূপ প্রয়োজন, বিবিধ যন্ত্র-সাহায্যে ষ্টুডিয়োর মধ্যে সেইরূপ শব্দ সৃষ্টি করিয়া এখন ফিল্মের কাজ সুনির্ব্বাহিত হইতেছে। এ নকল শব্দ এমন নিখুঁত যে, কোথাও নকল বলিয়া ধরা পড়িবার জো নাই।

এই নকল শব্দ সৃষ্টির ব্যাপারে কাউণ্ট মাজাগলিয়া কুটেলির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কাউণ্ট কুটেলি ইতালীয়ান। তিনি হলিউডের ষ্টুডিয়োয় শব্দ যন্ত্রীর কাজ করেন। একবার এক ফিল্মে বিরাট যুদ্ধ-দৃশ্য তুলিবার সময় যুদ্ধের বিরাট এবং বহু-বিচিত্র শব্দ-লহরী সৃষ্টি করিয়া তিনি সে-দৃশ্যে নিখুঁতভাবে যুদ্ধের বাস্তব-রূপ ফুটাইয়া তোলেন। তার পর হইতে চিন্তা-সাধনায় সত্যকার যে-কোনো শব্দকে নকল শব্দের দ্বারা তিনি এখন ফুটাইয়া তুলিতেছেন। তাঁর কুশলতায় মুগ্ধ হইয়া হলিউড তাঁর নাম দিয়াছে Big Noise বা 'প্রচণ্ড শব্দ'!

ছায়া-ছবিতে সত্যকার সকল ব্যাপার হুবহু নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করা চাই। কোথাও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঝিল্লীরব, কোথাও বা এক-হাজার কামানের প্রচণ্ড

রোলারে ম…
শীস বুল…
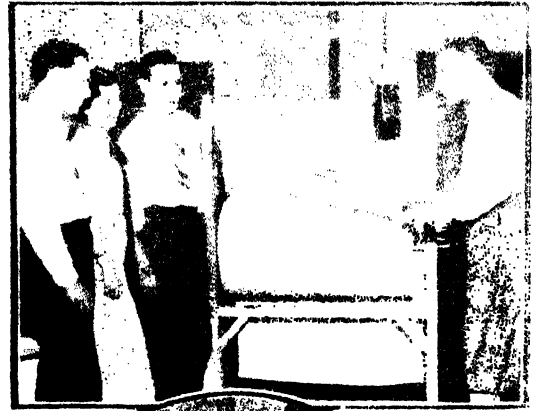
বোমা-ফাটার নকল শব্দ

তোপধ্বনি; কোথাও একটি সূচী-পতন হইল; কোথায় ডিনামাইটে প্রকাণ্ড পাহাড় সশব্দে ফাটিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। ছবিতে পাহাড় এবং সে-পাহাড়ের চাপড়া-ভাঙ্গা কুচি যেমন চোখে দেখানো চাই, তেমনি পাহাড়-ফাটার বিরাট শব্দও যেন সকলে কাণে শোনে! কাজেই এ শব্দ-সৃষ্টিতে ফাঁকি চলিবে না—চলিতে পারে না। ফাঁকি ধরা পড়িলে লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না; ছবি হইবে ব্যর্থ হাস্যকর!

এই সব নকল শব্দ-সৃষ্টিতে কাউণ্ট কুটেলি আজ পর্য্যন্ত ব্যর্থ-কাম হন নাই।

পৃথিবীতে শব্দের বিরাম নাই। কথায় বলে, শব্দময় জগৎ! সে শব্দ যেমন বিরাট, তেমনি বহু-বিচিত্র। এ

ফুটবলে কিক্-করার শব্দ নকল

বৈচিত্র্যের আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অথচ কাউণ্ট কুটেলি সকল শব্দই নকল করিতেছেন। যে কোনো শব্দের প্রয়োজন হয়, কাউণ্ট কুটেলি তখনি তার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঝিল্লী-রব তুলিবার জন্য বনে ঝিল্লী-সভায় যাবার প্রয়োজন নাই! ছোট এক-টুকরা টিনের চাকা যোগা করিয়া কৌশলে তাহা ঘুরাইয়া দেন, সে টিনের ঘূর্ণনে ঝিল্লীরব নিখুঁতভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া ওঠে। টিনের চাকা সুলভ। ইচ্ছা মাত্রে আমরা দশ-বিশটা সংগ্রহ করিতে পারি; কিন্তু সে চাকার সঙ্গে আর কি-বস্তু আঁটিয়া কিভাবে ঘুরাইলে ঝিল্লী-ধ্বনি জাগে, সে রহস্য জানেন শুধু কাউণ্ট কুটেলি! আমাদের দেশে মেলায় এবং হাটে যে টিনের বা কাঠের চর্কী বা বালামচি-বাঁধা ব্যাঙ বিক্রয় হয়—সেগুলাকেও কৌশলে বাজাইতে পারিলে ব্যাঙের ডাক এবং আরো বহু শব্দ সৃষ্টি করা চলে। একটা ঘোড়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; ছটা, দশটা, হাজারটা ঘোড়া ছুটিয়াছে—কখনো ঘাসের উপর দিয়া, কখনো পাহাড়ের পাথরের উপর দিয়া, কখনো বালির উপর দিয়া—যখন যেমন জমির উপর দিয়া যত ঘোড়া ছুটিতেছে, জমি এবং ঘোড়ার সংখ্যা ও গতির ক্রম-হিসাবে কদমের তালের সঙ্গে

নুড়িতে দু'-আঙুল দিয়া পায়ের নানা ধ্বনি তোলা

পার্থক্যটুকু কাউণ্ট কুটেলির নকল-শব্দে হুবহু বজায় থাকে।

পৃথিবী জুড়িয়া কত রকমের শব্দ নিত্য সৃষ্টি হইতেছে —সে সব শব্দ নকল উপায়ে গড়িয়া তুলিতে কাউণ্ট কুটেলি কটিই বা সরঞ্জাম লন! সরঞ্জাম বলিতে লন্ একটি প্লাঞ্জার (জল ঘাঁটিয়া জল নাড়িবার জন্য খোঁচ-দণ্ড); ছোট ট্যাম্‌টেমি-বাজনা (tom-tom); ক্যাম্বিশের একটি ব্যাগ; টিনের ছোট বাক্স; লাল-রঙের রবার-বেলুন; ব্যাঞ্জো; ছেলেদের খেলা-ঘরের এক-বাক্স রেল-গাড়ী; একটি বালিশ;

এক-টুকরা সিল্ক কাপড়; কয়েকটি cellophane এবং গরম জলের একটি বোতল। যাঁরা ম্যাজিক দেখান, তাঁরা যেমন বাটি-গেলাস, তাস বা রুমাল নিজস্ব ভঙ্গীতে আলাদা রকমে গড়িয়া লন, কাউণ্ট কুটেলিও তেমনি জিনিষগুলি একটু রকমারি-রীতিতে গড়িয়া লইয়াছেন এবং এই ক'টিমাত্র সরঞ্জামের সাহায্যে হাজার-রকমের শব্দ উচ্চ-নীচ নানাগ্রামে সৃষ্টি করিয়া অনুরূপ শব্দ সমাবেশে ছায়া-ছবিকে নিখুঁত সুন্দরভাবে সত্যের মতো প্রতিফলিত করিতেছেন। সত্যকার শব্দের সহিত তাঁর তৈরী এ সব নকল শব্দের কোথাও এতটুকু পার্থক্য দেখা যায় না।

কড়কড় শব্দে বাজ পড়িতেছে—বাজ পড়ার এ শব্দ ষ্টুডিয়োয় বসিয়া বিনা-মেঘে তিনি সৃষ্টি করিতেছেন পাৎলা কখানি তক্তার সাহায্যে। সাগরের ঢেউ কূলে আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে—পিছনে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের শব্দ—সে শব্দ তিনি সৃষ্টি করেন ছোট বাক্সে নানা সাইজের কতকগুলি নুড়ি ভরিয়া বিচিত্র তালে কায়দা করিয়া সেগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া। ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে—ঘোড়ার পায়ের শব্দ সৃষ্টি করেন নারিকেলের মালায় তালে তালে গ্রানাইটখণ্ড ঠুকিয়া।
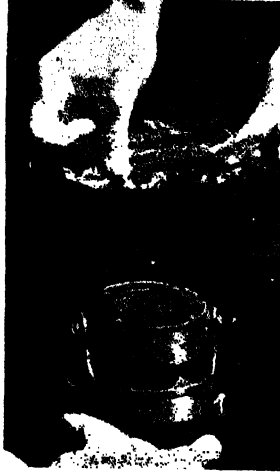
উপরে অয়েল-পেপার ;
নীচে শব্দ-যন্ত্র

একটি ঝড়ের যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন, সে যন্ত্র-সাহায্যে বাতাসের মৃদু মর্ম্মর-ধ্বনি হইতে সুরু করিয়া উত্তাল-ঝড়ের উতরোল হুহুঙ্কার-রব পর্য্যন্ত অবিকল সমুত্থিত হয়।

এই কয়টি সরঞ্জামের সাহায্যে সমুদ্র-বাহী সকল আকারের ও সকল প্রকারের জাহাজ এবং ষ্টীমারের বাঁশীর শব্দ; মানুষ ও জীব-জন্তুর নানা ভাবে চলা এবং দৌড়ানোর পায়ের ধ্বনি; গতিশীল ট্রেণের বিবিধ রব; আকাশে নানা জাতের পাখী ওড়ার রকমারি শব্দ, তাদের বিচিত্র বিভিন্ন কাকলী-রব; ঝিঁঝিঁ-পোকার ডাক; এরোপ্লেনের ভীম-ঘর্ঘর ধ্বনি; কামানের গোলা-ফাটার অট্টরব—সকল শব্দই অনায়াসে নিখুঁতভাবে উৎসারিত হইতেছে।

পূর্ব্বে এই সব নকল শব্দ সৃষ্টি করিতে ষ্টুডিয়োয় দু'চারিটা যন্ত্রের প্রচলন ছিল। সে যন্ত্রগুলি ছিল আকারে অতিকায় এবং তাহাদের সাহায্যে বিভিন্ন নকল শব্দ সৃষ্টি করিতে প্রচুর অর্থব্যয় হইত। কাউণ্ট কুটেলির কল্যাণে নকল শব্দ-গ্রহণে আজ ব্যয় হয় যৎসামান্য মাত্র। তাছাড়া সে কালের ঐ সব যন্ত্র রাখিতে ষ্টুডিয়োয় জায়গা লাগিত অনেকখানি। এখনকার এ সব সরঞ্জাম একটা মাত্র ছোট দেয়াল-আলমারিতে রাখা চলে।

জলে নৌকা চলিয়াছে—নৌকার দাঁড়-টানার নকল শব্দ সৃষ্টি করিতে তিন-চার জন লোককে পূর্ব্বে যন্ত্র লইয়া জলে নামিয়া হিম্‌শিম্ খাইতে হইত। কাউণ্ট কুটেলি আজ এমন যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন,—সে-যন্ত্র তৈয়ার করিতে খরচ ৭৫ সেণ্ট এবং যন্ত্রটি আকারে পাঁচ ইঞ্চি—অথচ এ যন্ত্রসাহায্যে জলের উপর সর্ব্বপ্রকার শব্দ অনায়াসে সৃষ্টি করা চলে। জলের বুকে একটি নুড়ি পড়িল—সে শব্দ হইতে জলে মাতন-তোলার ভীষণ শব্দ পর্য্যন্ত! যন্ত্রটিকে কৌশলে চালাইয়া যেমন খুশী শব্দ সৃষ্টি করেন, কোথাও খুঁত থাকে না বা এ শব্দ সৃষ্টি করিতে কাহাকেও জলে নামিতে হয় না!

এই নকল শব্দ সৃষ্টি করিতে কাউণ্ট কুটেলিকে সত্যকার কত বিচিত্র শব্দ সম্বন্ধে সুগভীর চিন্তা ও গবেষণা করিতে হইয়াছে, সে কথা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

কাউণ্ট কুটেলি বলেন,—ছায়া-ছবির কাজের জন্য কোথায় কি রকম শব্দের প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবামাত্র বুঝিয়া সেই শব্দ সৃষ্টি করা চাই। মেল-ট্রেণ প্রচণ্ড বেগে চলিয়াছে, তার শব্দ—এবং অর্ডিনারী প্যাসেঞ্জার ট্রেণ বা মাল-গাড়ী চলার শব্দ এক রকমের নয়—দুয়ের শব্দে তফাৎ আছে। এই তফাৎটুকুর সম্বন্ধে জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। সে জ্ঞান না থাকিলে কোনো যন্ত্রী নিখুঁতভাবে কোনো যন্ত্রে অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। জাহাজ, এরোপ্লেন, মোটর-গাড়ী—এ সবে কত শব্দ বৈচিত্র্য! চলার বেগের উপর যেমন শব্দের পার্থক্য নির্ভর করে, নানা-মেকারের তৈরী গাড়ীর শব্দেও তেমনি এক পার্থক্য! ফোর্ড-গাড়ী চলিলে যে রকম শব্দ শুনিব, হিলম্যান

নারিকেল-মালা ঠুকিয়া ঘোড়ার কদম-চাল

কিম্বা ডজ্ গাড়ী, কিম্বা প্যাকার্ড বা রোলশ্‌রয় গাড়ী চলিলে ঠিক তেমন শব্দ শুনিব না। এজন্য রকমারি শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই সর্ব্বাগ্রে—তবেই যন্ত্রীর হাতে এ-যন্ত্র সঠিক চলিবে।

বোমা-ফাটার প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করিতে কাউণ্ট কুটেলি একটা ফুলানো (inflated) বাস্কেট-বল ব্যবহার করেন। এই বাস্কেট-বলের মধ্যে কতকগুলি ছর্‌রা পুরিয়া তিনি এ শব্দ সৃষ্টি করেন। জলার গা বহিয়া বাতাস বহিতেছে,—বাতাস পত্র-পল্লবকে স্পর্শ করিলে যে-শব্দ ওঠে, সে-শব্দ তিনি সৃষ্টি করেন একটা রোলারের গায়ে এক আঁটি যবের শীষ বা ধানের শীষ বা ঝাউ-পাতার ঝালর ঝুলাইয়া। রোলারটি ঘুরানো হয়; রোলার ঘুরিবার সময় ঐ যবের বা ধানের শীষ তার গা ছুঁইয়া থাকে এবং সে-শব্দ শব্দ-যন্ত্রে ওঠে ঠিক জলার-গায়ে-বাতাস-বহা শব্দের মত। একটা বাক্সে একরাশ নুড়ি রাখিয়া সেই নুড়িগুলার মধ্যে দুটি বা তিনটি আঙুল চালাইয়া তিনি পাথরের উপর মানুষের চলা-পায়ের নকল-শব্দ সৃষ্টি করেন।

বৃষ্টি-পাতের শব্দ সৃষ্টি করা হয় টাইটভাবে বড় ক্যাম্বিশ খাটাইয়া তার উপর সীসার ছোট ছোট গুলি সবেগে বর্ষণ করিয়া। কাছে বৃষ্টি পড়িতেছে বা দূরে বৃষ্টি পড়িতেছে—এ শব্দ বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয় নকল শব্দের কাছে বা দূরে শব্দ যন্ত্র রাখিয়া সে-শব্দের প্রতিশব্দ গ্রহণ করিলে। একটা বড় ঢাক ঝুলাইয়া ঢাকের চামড়ার মাঝখানে শব্দ-যন্ত্র বসাইয়া নানা ভঙ্গীতে ঢাকে কাঠি পিটিয়া কাউণ্ট কুটেলি চলন্ত জেপলিনের ঘর্ঘর-শব্দ হুবহু উত্থাপিত করেন। ফুটবলে কিক্ মারিলে যে-শব্দ ওঠে, সে শব্দ তিনি সৃষ্টি করেন

ঝড়ের শব্দ সৃষ্টি যন্ত্র

যুদ্ধে গোলা ফাটার শব্দ-নকল

ক্যাম্বিশের বড় থলি বাতাসে ভরিয়া ফুলাইয়া সে-থলির তলা টিপিয়া থলিটিকে দুই দিক্ হইতে সবলে চাপিয়া। থলির তলায় চাপ দিবার সময় থলির মুখ একটু আলগা রাখিতে হয়; সেই আলগা রন্ধ্র-পথ দিয়া এক-ঝলক বাতাস সবেগে বাহির হইয়া যায়—তখন যে-শব্দ হয়, সে শব্দ ফুটবলে কিক্ মারা শব্দের ভুবহু অনুরূপ।

বনের বাঘ-সিংহের বিকট গর্জ্জন—যে-গর্জ্জন শুনিলে আমাদের হৃৎকম্প হয়, সে শব্দ নকল ভাবে সৃষ্টি করা হয় ঢাকের একদিক্কার চামড়া খুলিয়া যেদিকে চামড়া আছে, সেইদিক্কার চামড়ার উপরে সজোরে রজনলেপা তাঁত (বেহালার তাঁতের মতো) টানাটানি করিয়া। বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়াছে—দেওয়াল ফাটিতেছে, দ্বার-জানলা ফাটিতেছে, লোহার থাম ফাটিতেছে—এ সব ফাটার শব্দ সৃষ্টি করা হয় কায়দা-মাফিক অয়েল-পেপার টানিয়া। যে নল দিয়া বাগানের গাছপালায় জল দেওয়া হয়, সেই নল খাটো করিয়া কাটিয়া তার মধ্য দিয়া সবেগে বায়ু সঞ্চালিত করিলে যে-শব্দ ওঠে, সে শব্দে ফিল্মের কুমীরের নিশ্বাস-বায়ুর শব্দ নকল করা হয়।

এই সব নকল শব্দ সৃষ্টি করার ফলে বাদ্য-সমাবেশের দিকে একটি বিশেষ লাভ হইয়াছে। ফিল্মের ছবিতে আমরা যে অর্কেষ্ট্রা-বাজনা শুনি, মনে হয় অর্কেষ্ট্রায় যেন শ'খানেক রকমারি বাজনা বাজিতেছে! আসলে কিন্তু এ অর্কেষ্ট্রায় একশো রকমের বাজনা বাজে না। ক'টা বেহালা, বাঁশী-হার্ম্মোনিয়ম বাজে এবং সে-সবের সঙ্গে টিন, কাচ, কাঠ প্রভৃতি নানা ছাঁদে পিটিয়া এই বিরাট অর্কেষ্ট্রার সুর লহরী সৃষ্টি করা হয়।

নকল শব্দ সৃষ্টি করিতে ক'টাই বা সরঞ্জামের প্রয়োজন! অথচ এ সরঞ্জাম লইয়া আমরা এত বিচিত্র শব্দ নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করিতে পারিব না। শুধু সরঞ্জাম পাইলেই তো চলিবে না—সে সরঞ্জামের যথাযথ প্রয়োগ-কৌশল জানা চাই। একটা বাঁশের বাঁশীর কথা ধরি। যে বাজাইতে জানে, তুচ্ছ ঐ বাঁশের বাঁশী হইতে সে কত রকমারি সুর জাগাইতে পারে। যারা জানে না, তাদের হাতে বাঁশী দিলে বাঁশীতে হয়তো কোনো সুরই বাজিবে না! হার্ম্মোনিয়ম কি করিয়া বাজাইতে হয়, অনেকে জানেন; কিন্তু সে হার্ম্মোনিয়মে সুরের ইন্দ্রজাল রচিতে পারেন তিনি, যিনি কুশলী যন্ত্রী! কাজেই এ সব সরঞ্জামের প্রয়োগবিধি শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই সরঞ্জাম এবং কি কৌশলে তাহা হইতে এত বিচিত্র শব্দের সৃষ্টি করা যায়, কাউণ্ট কুটেলি বিশদভাবে সে সব বুঝাইয়া একখানি বড় বই লিখিয়া ছাপাইয়াছেন। সে বইয়ে হাজার-হাজার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বইয়ের মর্ম্ম বুঝিলে সে তালিকা দেখিয়া একজন বালকও এ-সব নকল শব্দ অনায়াসে সৃষ্টি করিতে পারিবে।
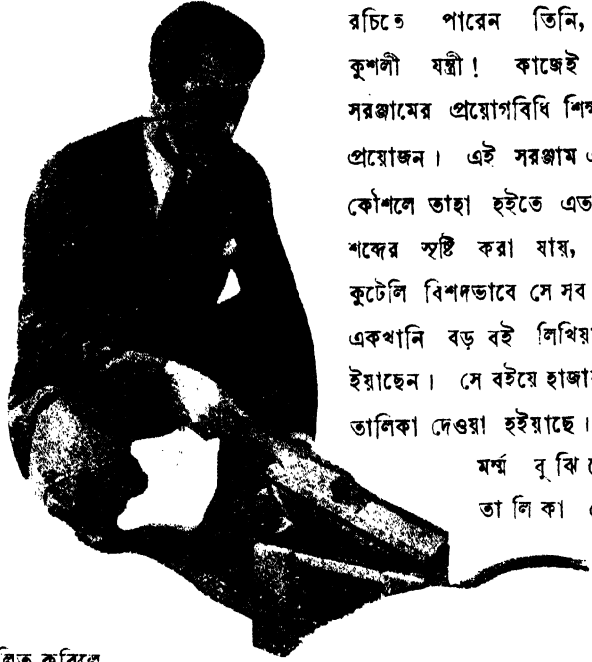
হোজ্-পাইপে বাতাস চালাইয়া অগ্নিলীলার শব্দ নকল

অসভ্য জাতির হাঙ্গর-পূজা

পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রকার জীব-জন্তুর পূজা প্রচলিত আছে। সাপ, বাঘ, বানর, কুম্ভীর প্রভৃতি প্রাণী বহু দেশে পূজিত হইয়া থাকে; তবে পূজার প্রণালী একরূপ নহে; কোন কোন জাতি তাহাদের পশু দেবতার সম্মুখে খাদ্যদ্রব্য নিক্ষেপ করিয়াই পূজা শেষ করে। কোন কোন দেশে কুম্ভীরের পূজা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু কোন জাতি হাঙ্গরের পূজা করে, এ সংবাদ এ দেশের অনেকেরই অজ্ঞাত।

সংপ্রতি কোন ইংরেজ লেখক লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও তাহাদের সন্নিহিত দ্বীপের আদিম অধিবাসিবর্গ কর্ত্তৃক হাঙ্গরপূজার যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ছোটদের প্রীতিকর হইবে—এই আশায় তাহাদের আগে উপস্থিত করিলাম।

এই ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন, "সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

অধিবাসিগণের প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে যে, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনগণের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তিগণের আত্মা বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া তাহাদের বাস-ভবনের নিকট বিচরণ করে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই পূর্ব্বপুরুষের পূজা করে। তাহাদের মৃত পূর্ব্ব-পুরুষ কোন না কোন প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—এই ধারণায় তাহারা কেবল পশু-পক্ষী নহে, কীট-পতঙ্গগুলিকে পর্য্যন্ত ভক্তি করে। মালাইটা দ্বীপের এক অংশের সমুদ্রোপকূলে হাঙ্গরের সংখ্যা এতই অধিক যে হাঙ্গরগুলা ঝাঁক বাঁধিয়া সেই অঞ্চলের সমুদ্রজলে ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহা দেখিয়া সেই স্থানের অধিবাসি-বর্গের ধারণা, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের আত্মা বাসস্থানের প্রতি মমতা বশতঃ ঐ সকল হাঙ্গরের দেহ আশ্রয় করিয়া বাসগ্রাম-সন্নিহিত সমুদ্রের জলে বিচরণ করিতেছে। এই বিশ্বাসে ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীরা হাঙ্গরগুলাকে ভক্তি করে। স্থানীয় অধিবাসীরা এ কথাও বলে যে, ঐ সকল হাঙ্গরের কোন্‌টি কাহার পিতা বা পিতামহ, তাহাও তাহারা চিনিয়া রাখিয়াছে, এবং কেহ দেখিতে চাহিলে তাহাকে সেই হাঙ্গরগুলি দেখাইয়া থাকে।

"এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যাহারা সমুদ্রোপকূলের এই অংশে বাস করে, তাহারা প্রতিবেশী হাঙ্গরগুলার সহিত এরূপ সুপরিচিত যে, এই সকল লোক সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া যে হাঙ্গরকে ডাকিবে, সেই হাঙ্গরই পোষা কুকুর-বিড়ালের মত আসিয়া জলের ধারে অপেক্ষা করিবে। এই সকল লোক বলে, তাহাদের মৃত পিতা পিতামহ প্রভৃতির আত্মা এই সকল হাঙ্গরের দেহে প্রবেশ করায় স্নেহের আকর্ষণে তাহারা তাহাদের পুত্র ও পৌত্রগণের নিকট উপস্থিত হয়; কিন্তু যাঁহারা এই গুলীখুরী গল্প বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা বলেন, ঐ সকল লোক এই হাঙ্গরগুলাকে পিতৃ-পুরুষ জ্ঞানে সর্ব্বদা খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে, এই জন্য ডাকিলেই উহারা নিকটে আসে। স্থানীয় লোকগুলি এই সকল হাঙ্গরকে 'ভুতুড়ে শয়তান' নামে অভিহিত করে।"

প্রবন্ধ-লেখক সর্টল্যাণ্ড দ্বীপে রবারের আবাদের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সর্টল্যাণ্ড দ্বীপ হইতে চারি শত মাইল দূরবর্ত্তী মালাইটা হইতে বুসিমাই নামক একটি কুলী উক্ত আবাদে চাকরী করিতে আসিয়াছিল। মালাইটার আদিম অধিবাসীরা প্রায় সকলেই হাঙ্গরের পূজা করিয়া থাকে।

সর্টল্যাণ্ড দ্বীপটি সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভূত। এই দ্বীপ-পুঞ্জের যে সকল অধিবাসী সর্টল্যাণ্ড দ্বীপের রবার-ক্ষেত্রে কুলীগিরি করিতে আসে, চাকরী গ্রহণের পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই মর্ম্মে চুক্তি-নামা স্বাক্ষরিত করিতে হয় যে, দুই বৎসরের পূর্ব্বে তাহারা চাকরী ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে পারিবে না। কুলীরা ঐ প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ না হইলে তাহারা ইচ্ছামত চাকরী ছাড়িয়া পলায়ন করে; তাহাতে আবাদের মালিকগণকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, এবং তাহাদের যাতায়াতের ব্যয়ভারও তাঁহাদিগকেই বহন করিতে হয়।

যদি কোন কুলী এই প্রকার চুক্তির পর নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে পলায়ন করে, তাহা হইলে সরকার তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এই চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি অনেক কুলী নানা কারণে দুই বৎসর কাল চাকরী করিতে অসম্মত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করে।

লেখক লিখিয়াছেন, "নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে দেশে ফিরিবার উপায় নাই, ইহা জানিয়াও এক রবিবারের প্রভাতে বুসিমাই সরকারী আফিসে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলে—তাহাকে তাহার দেশে ফিরিবার জন্য বিশেষ অনুমতি দান করিতে হইবে। দেশে তাহার আর না ফিরিলে চলিবে না।

"বলা বাহুল্য, চুক্তিনামা অনুসারে তাহার ছুটী মঞ্জুর করা সম্ভব হইবে না—একথা বুসিমাইকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু দেশে ফিরিবার জন্য সে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল যে, সে তাহার বাস-গ্রামে গমনের উদ্দেশ্যে বিশ্রামের দিন পনের মাইল দূর হইতে এক-খানি সালতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য তাহার এরূপ ব্যাকুলতার কারণ জানিতে আমার আগ্রহ হওয়ায় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের আবাদে কায করিতে তাহার কি অসুবিধা হইতেছিল, এবং তাহার উপরওয়ালা কি তাহার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিতেছিল? আমার এই প্রশ্নে বুসিমাই বলিল, আবাদের চাকরীতে তাহার কোন অসুবিধা নাই, বরং সে এখানে সুখেই আছে। তাহার উত্তর শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এখানে সে সুখে আছে, তথাপি তাহাকে দেশে ফিরিতে হইবে, ইহার কারণ জানিবার জন্য আমি তাহাকে পীড়াপীড়ি করিলে সে বলিল, মালাইটায় প্রত্যাগমনের জন্য সে স্বয়ং ব্যাকুল নহে, কিন্তু তাহার 'বন্ধু' সেখানে ফিরিবার জন্য তাহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিল।

"তাহার 'বন্ধু' ঐরূপ পীড়াপীড়ি করিতেছিল শুনিয়া আমি তাহার সেই বন্ধুটির নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। যদি কোন কুলী আবাদের অন্য কোন কুলীকে আবাদের কায ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার জন্য উৎসাহিত করে, তাহা হইলে তাহাকেও শাস্তি দেওয়া উচিত। আমার ইচ্ছা হইল—তাহার সেই বন্ধুকে ডাকাইয়া আনিয়া ভয়প্রদর্শন করিব, এবং ভবিষ্যতে সে অন্য কোন কুলীকে ঐরূপ কার্য্যে উৎসাহিত না করে, এজন্য তাহাকে সতর্ক করিব। কিন্তু বুসিমাই আমার নিকট তাহার সেই বন্ধুটির নাম প্রকাশ করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর আমি তাহাকে তাহার বন্ধুর নাম বলিবার জন্য অত্যন্ত জিদ করিলে বুসিমাই নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিল, তাহার সেই 'বন্ধু' আবাদের কোন কুলী বা অন্য লোক নহে, সে একটি 'হাঙ্গর!'

"বুসিমাইর কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম! আবাদের অদূরবর্ত্তী জেটির উপর দাঁড়াইয়া আমাদের এই প্রকার বাদানুবাদ চলিতেছিল। আমি বুসিমাইর কথা বিশ্বাস করিলাম না—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে বলিল, তাহার সেই বন্ধুটি আগ্রহ প্রকাশের জন্য তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি জেটির শেষ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া জলে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইব। আমি তাহার কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জেটির কিনারায় উপস্থিত হইলাম, এবং জলের দিকে চাহিতেই বুসিমাইর সালতির পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ডকায় হাঙ্গরকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম! সেই বন্দরের জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক সময় দুই একটা হাঙ্গর দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই হাঙ্গরটি কেবল যে অসাধারণ বৃহৎ ইহাই নহে, তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে সেখানে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবং যাহার প্রতীক্ষায় সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,—সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে বিলম্ব করায় হাঙ্গরটা যে অত্যন্ত অধীর হইয়াছিল, তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম।

"আমি বুসিমাইকে জানাইলাম, সে আমাকে যাহা দেখাইল, তাহার সহিত তাহার উক্তির সামঞ্জস্য থাকিতে পারে, কিন্তু দুই একটা হাঙ্গর কোন কুলীর ছুটীর জন্য সুপারিশ করিলে, বা তাহাকে দেশে পাঠাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, চুক্তিভঙ্গ করিয়া তাহাকে আমি দেশে পাঠাইতে সম্মত নহি। অতঃপর আমি বুসিমাইকে আবাদে ফিরিয়া যথানিয়মে কায-কর্ম্ম করিতে আদেশ প্রদান করিলাম, এবং তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলাম, সে যেন চুক্তিভঙ্গ করিয়া দেশে পলায়নের চেষ্টা না করে।

"আমার আদেশ শুনিয়া বুসিমাই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল—সে তাহার বন্ধুর অবাধ্য হইলে বন্ধুটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে। বুসিমাই আমাকে এ কথাও বলিল যে, তাহার হাঙ্গর 'বন্ধু' মালাইটা হইতে সলোমন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছে, এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া মালাইটায় ফিরিয়া যাইবে, সে জন্য সেখানে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

"বুসিমাইর কথা শুনিয়া আমি বিদ্রূপভরে বলিলাম—সে তাহার 'বন্ধু'কে যেন একাকী ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করে। আমার আদেশ শুনিয়া বুসিমাই আমাকে বলিল, তাহার 'হাঙ্গর বন্ধু' তাহার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে না। সে তাহাকে সঙ্গে লইয়াই দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। হাঙ্গরের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমি বলিলাম—তাহা হইলে তাহার হাঙ্গর বন্ধুকে আরও দুই বৎসর সেখানে অপেক্ষা করিতে হইবে; কারণ, দুই বৎসরের পূর্ব্বে তাহার চুক্তির মেয়াদ শেষ হইবে না।

"এই ঘটনার পর প্রায় দুই সপ্তাহ আমি কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় বুসিমাই সম্বন্ধে কোন কথা চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই, এবং তাহার কোন সন্ধানও লইতে পারি নাই। দুই সপ্তাহ পরে আবাদের ওভারসিয়ারের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম—তাহার অধীন একজন কুলীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কুলীটা পলায়ন করিয়াছিল—এ ধারণা ওভারসিয়ারের মনে স্থান পায় নাই; কারণ, কুলীরা যে সকল ডোঙ্গার সাহায্যে পলায়ন করে—সেই সকল ডোঙ্গার একখানিও স্থানান্তরিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন, কোন কুলী মনুষ্যের বসতিহীন অরণ্যের ভিতর দিয়া দ্বীপের অন্যপ্রান্তে পলায়ন করিবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না। পলাতক কুলীর অনুসন্ধানে একদল লোক প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা নিরুদ্দিষ্ট কুলীর সন্ধান পায় নাই। এই সকল কারণে ওভারসিয়ারের ধারণা হইয়াছিল, কুলীটার মৃত্যু হইয়াছিল। ওভারসিয়ার এই রহস্যের তদন্তের জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল।

"যে কুলী এই ভাবে অদৃশ্য হইয়াছিল, ওভারসিয়ার আমার নিকট তাহার নাম প্রকাশ করে নাই। কিন্তু তাহার নাম আমার অজ্ঞাত নহে, এই অনুমানে আমি অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলাম। অতঃপর আমি আবাদে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, আমার অনুমান মিথ্যা নহে; যে কুলীটা অদৃশ্য হইয়াছিল, সে বুসিমাই ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

"আমি যে দিন তদন্ত আরম্ভ করি, তাহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে যে বনজঙ্গল ছিল, সেই সকল জঙ্গলে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল, তাহার কোন সহকর্ম্মীর সহিত তাহার বিরোধ থাকায় সেই কুলী তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়া মৃতদেহটি কোন স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছিল।

"দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে বুসিমাইর সহিত আমার যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ হওয়ায়, বিশেষতঃ, সে তাহার হাঙ্গর বন্ধুর আদেশ পালনের জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহাও মনে পড়ায় আমার সন্দেহ হইল, হয়ত তাহার সেই হাঙ্গর 'বন্ধুই' তাহাকে তাহার স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় সে তাহারই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

"অতঃপর আমি কুলী সর্দ্দারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'বুসিমাই হাঙ্গর-পূজা করিত, ইহা কি তুমি জানিতে?'

"সর্দ্দার স্বীকার করিল—সে তাহা জানিত, এবং এই জন্যই সে সমুদ্রতীরে নিরুদ্দিষ্ট বুসিমাইর অনুসন্ধান করে নাই; কারণ, তাহার ধারণা ছিল, বুসিমাই হাঙ্গরের পূজা করে, সুতরাং হাঙ্গর তাহার কোন অনিষ্ট করিবে না।

বুসিমাই প্রবন্ধলেখককে তাহার হাঙ্গর বন্ধুটিকে দেখাইয়া দিতেছে

"সর্দ্দারকে জেরা করিয়া আমি আরও জানিতে পারিলাম, সমুদ্রতীরে একটি বড় গাছ ছিল, বুসিমাই সেই গাছের ডালে উঠিয়া তাহার হাঙ্গর-বন্ধুর সহিত আলাপ করিত। হাঙ্গরটা তীরের অদূরে

অল্প জলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু কুলীসর্দ্দার তাহাদের আলাপের মর্ম্ম আমাকে বলিতে পারিল না; কারণ, অন্যান্য কুলীরা হাঙ্গরের পূজা করিত না; হাঙ্গর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে—এই ভয়ে তাহারা সে দিকে ঘেঁসিত না। হাঙ্গরের সহিত বুসিমাইর আলাপ শুনিবার জন্যও তাহারা কোন দিন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই।

"যাহা হউক, সর্দ্দারের নিকট এই সংবাদ পাইয়া আমরা বুসিমাইএর অনুসন্ধানে সমুদ্রের এই অংশে উপস্থিত হইলাম। সেখানে—সেই বৃক্ষের অদূরে একটি বিজলী-বাতি পাইলাম; বুসিমাই উহা ব্যবহার করিত। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বুসিমাইর 'লাভা লাভা' (পরিধেয় বস্ত্র) এবং কোমরবন্দও পাওয়া গেল। কোমরবন্দটি হাঙ্গরটা দাঁত দিয়া কাটিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহাতে হাঙ্গরের দাঁতের চিহ্ন ছিল। কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বুসিমাইর দেহাবশিষ্ট আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ বুসিমাই তাহার 'বন্ধু'র উদরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।"

আদিম অধিবাসী হাঙ্গরকে নিকটে ডাকিয়া আনিতেছে

"অতঃপর আবাদের ওভারসিয়ার এক দিন কার্য্যোপলক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া কথায় কথায় বলিল, সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময় সে পূর্ব্বে অগভীর জলে একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গরকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিত; কিন্তু বুসিমাই ফেরার হইবার পর আর কোন দিন সেই হাঙ্গরটাকে সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।"

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং সটল্যাণ্ড দ্বীপের আদিম অধিবাসীরাই যে হাঙ্গরের পূজা করে এরূপ নহে, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের টেকশাস প্রদেশেও কুম্ভীর-পূজা প্রচলিত আছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে কুম্ভীর-পূজার একটি লোমহর্ষণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

টেকশাস প্রদেশে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, এই গ্রামের নাম হেমেনডর্ফ। সেখানে একটি সরাই আছে, তাহার মালিকের নাম জোসেফ বল, সে জাতিতে জার্ম্মাণ।

বল দুই বার বিবাহ করিয়াছিল, তৃতীয় বার বিবাহের জন্য সে পাত্রী খুঁজিতেছিল। তাহার সরাইএ প্রত্যহ রাত্রিকালে সুন্দরী নর্ত্তকীরা নৃত্য করিত; এই সকল নর্ত্তকীর কেহ কেহ হঠাৎ অদৃশ্য হইল, তাহাদের আর সন্ধান মিলিত না।

দেশ-বিদেশের অনেক সুন্দরী নিরুদ্দেশ হইত; তাহাদের কেহ কেহ নাচের মজলিসে নাচিতে আসিত. এজন্য পুলিস বলকে সন্দেহ করিয়া তাহার সরাই খানাতল্লাস করিতে আসে। পুলিসের তিন জন কর্ম্মচারী বলের সরাইএ আসিলে বল তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য পিস্তল তুলিল।

পুলিসের তিন জন কর্ম্মচারী সশস্ত্র ছিল, তাহারাও পিস্তল তুলিল। বল ধরা পড়িবার ভয়ে নিজের পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা করিল। নিজের বুকে সে গুলী মারিল, সেই এক গুলীতেই সাবাড়!

বল ধরা পড়িবার ভয়ে এই কার্য্য করিল, কিন্তু তাহার অপরাধ কি জান? তাহার সরাইএর পশ্চাতে সিমেণ্ট-করা একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ছিল, একটি ঝরণার জলে এই চৌবাচ্চা জলপূর্ণ হইত।

এই চৌবাচ্চায় পাঁচটি বড় বড় কুমীর ছিল। ভূত-ধর্ম্মাবলম্বী বল সেই পাঁচটা কুমীরের পূজা করিত। পূজার জন্য সে সেই চৌবাচ্চায় জীবিত মানুষ নিক্ষেপ করিত; যে সকল সুন্দরী তাহার সরাইএ নাচিতে আসিত, রাত্রিকালে সরাইএ যে সকল খরিদ্দার আসিত, বল তাহাদের ভিতর হইতে যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা, ধরিয়া সেই চৌবাচ্চায় নিক্ষেপ করিত; কুমীরগুলি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত। কেহই তাহাদের সন্ধান পাইত না। যে সকল নর-নারী কুমীরগুলির মুখে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহাদের মধ্যে চারি জন কুমীরগুলার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিলেও কুমীরের আক্রমণে তাহারা এরূপ আহত হইয়াছিল যে, চিকিৎসায় তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা হয় নাই।

জীবিত মানুষ ধরিয়া এ ভাবে কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করিবার কাহিনী আর কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বলের মৃত্যুর পর তাহার ঘর খানাতল্লাস করিয়া বলির লোকগুলির অনেক জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কোন কোন কাগজপত্র হইতে কুমীর-পূজার নিয়মাদিও জানিতে পারা গিয়াছিল।

বল সভ্য জার্ম্মাণ জাতির লোক, তথাপি সে মানুষ ধরিয়া তাহার দেবতা কুমীরগুলার মুখে নিক্ষেপ করিত—শুনিলে এ কথা কি তোমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়? কিন্তু ইহা সত্য কথা, এবং ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

যুগ্ম-মোড়লের গুপ্তমন্ত্রণা

'লি এপক্' ফরাসী পত্রিকা; হেনরী ডি কেরিলিস্ এই পত্রিকার সম্পাদক। গত ডিসেম্বর মাসে ইহাতে এডলফ হিটলারের সহিত বেনিটো মুসোলিনীর একটি কাল্পনিক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই আলোচনার মর্ম্ম এই যে, মুসোলিনী নেভিল চেম্বারলেনকে কি কৌশলে মুষ্টিগত করিয়া স্বার্থসিদ্ধ করিবেন, হিটলার তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

হিটলার—বুড়ো ছোকরাটির সহিত তোমার প্রথম বারের মুলাকাৎ জরুরী বটে! তোমাকে এখন চট্‌পট্ কি করিতে হইবে জান? তাহাকে পরিচালিত করিতে হইবে, তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে, আর তাহাকে খুব ভয় দেখাইতে হইবে।

মুসোলিনী

হিটলার

মুসোলিনী—আমি কি তাহাকে টিউনিস, কর্শিকা, এবং স্যাভয়ের দাবীর কথা জিজ্ঞাসা করিব?

হিটলার—বোকামী করিও না; তুমি যে কিরূপ শান্তিপ্রিয়, শান্তির জন্য তোমার প্রাণ কিরূপ ছটফট্ করিতেছে, তাহাই তাহাকে বুঝাইয়া দিবে; আর মিউনিকে যে কাণ্ডটা করা গিয়াছে—মুক্তকণ্ঠে তাহার মহিমা কীর্ত্তন করিবে। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে আনন্দে গদ্‌গদ হইবে, যেন হাতে 'ম্যাণ্ডলীন' পাইলে কীর্ত্তনটা জমাইয়া তুলিতে! কিন্তু আনন্দের বেগটা হঠাৎ সংবরণ করিয়া সহসা উৎকট মুখভঙ্গী করিবে, এবং হাত বজ্রমুষ্টি করিয়া ইটালীর শক্তির কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।

মুসোলিনী—ঐ সঙ্গে জার্ম্মাণীর শক্তির কথাটাও বলিব না?

হিটলার—না, না; কেবল ইটালীর শক্তির কথাই বলিবে। তাহাকে জানাইবে, তুমি মিশর ও সুদান চষিয়া ফেলিতে পার; বলিবে, তুমি সিসিলি ও প্যান্টেলেরিয়া হইতে মাল্টা ধ্বংস করিতে পার; এবং মৃত্যু পণ করিয়াও তোমার মৃত্যু-বাহিনীকে উড়ো বোমারু বহরের সহযোগে জিব্রল্টারের মানোয়ারী জাহাজগুলার ঊর্দ্ধে উড়িতে পাঠাইতে পার।

মুসোলিনী—যা বলিয়াছ, এডলফ! কিন্তু কথাগুলা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইবে না ত?

হিটলার—না হে ছোক্‌রা, সে ভয় করিও না। বার্টেস্‌গাডেনে আমি কি করিয়াছিলাম, তাহা দেখা তোমার উচিত ছিল। আমি তাহার কোটের 'ল্যাপেল্' চাপিয়া-ধরিয়া পেয়ারা গাছের মত তাহাকে ঝাঁকাইয়া দিয়াছিলাম, এবং বলিয়াছিলাম, তুমি ভাবিয়াছ কি? আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে লণ্ডন আর প্যারিস এই দুই সহরই ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

মুসোলিনী—হা হা হা (উচ্চ হাস্য)। সে যাহাই হউক, ঐ ভাবে ভয় দেখাইয়া আমি তাহাকে কি টিউনিস, স্যাভয় ও কর্শিকা সম্বন্ধে আমার দাবীর কথা বলিব?

হিটলার—না, ঐ কার্য্যটি তুমি করিও না। ঐ ভাবে ভয় দেখাইলে যখন দেখিবে তাহার প্রাণ প্রায় খাঁচা ছাড়িবার যোগাড় আর কি, সেই সময় তুমি তোমার দাবীর পরিমাণ যথাসম্ভব অল্প করিয়া তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। তুমি তাহা

নিকট জিবুটি, আর সুয়েজ খালে কয়েকটা সুবিধাজনক সর্ত্তের দাবী করিবে।

মুসোলিনী—কিন্তু এডলফ, এ যে ভারী 'রিডিকিলাস্!' আমি যে সত্যই উহা অপেক্ষা অনেক বেশী চাই।

হিটলার—তা চাও না; কিন্তু এক এক বার এক একটা দাবী কর। প্রথমে ঐ এক দফা মাত্র দাবী করিয়া তুমি উৎসাহের সঙ্গে তাহার হাতে ঝাঁকুনি দিয়া বলিবে, 'দেখ, তুমি বুড়া হইয়াছ, আর আমি 'ইয়ং ম্যান;' যখন উত্তর সহ আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, তখন আমি মধ্যপথে—মনে কর মিলানে—তোমার সঙ্গে দেখা করিব,—তাহার পর মিলানে যখন তুমি জিবুটি এবং আরও কোন কোন দাবীর জিনিষ পাইবে, তখন এক দম মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিবে। তখন আমার দাবীর পালা আসিবে। আসল কথা এই যে, বিভিন্ন সময়ে আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দাবী উত্থাপন করিতে হইবে।

মুসোলিনী—আমি তোমার যুক্তিটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

হিটলার—তবে শোন। এই যে 'ডিমক্রেসিগুলা'—ইহারা কিরূপ 'ইডিয়াট' তাহা ধারণা করা তোমার অসাধ্য। বিভিন্ন সময়ে আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দাবী করিতে দেখিলে প্রত্যেক বারই ইহাদের বিশ্বাস হইবে—আমরা উভয়ে একমত নহি। উহারা কল্পনা করিয়াছিল, জেকোশ্লোভাকিয়ার খানিকটা অংশ আমি গ্রাস করি, আমার এরূপ নীতির তুমি সমর্থন করিবে না। এখন তুমি ফ্রান্সের কোন কোন অংশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছ; উহারা ভাবিতেছে—আমি তোমার এই নীতির সমর্থন করিব না।

মুসোলিনী—তুমি কি বলিতে চাও, আমি জিবুতি ও সুয়েজ খাল দখল করিলেই তুমি ইউক্রেনের দাবী করিবে?

হিটলার—বাহবা! তুমি ঠিক বুঝিয়াছ।

মুসোলিনী—তাহার পর আমি টিউনিসের দাবী করিব?

হিটলার—হাঁ; তাহাই করিবে। এতক্ষণে আমার মতলব বুঝিতে পারিয়াছ!

মুসোলিনী—সাবাস! তাহার পর?

হিটলার—তাহার পর আমি রুমেনিয়া গ্রাস করিব; অনন্তর উপনিবেশগুলি, ইরাণ, এবং আলসেস্-লোরেণ জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে।—এই জন্যই বলিতেছি—ধীরে, মুসোলিনী, ধীরে!

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

যবনিকা।

য়ুরোপে রাজনীতিক পরিস্থিতি

য়ুরোপে রাজনীতিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক নহে। গত ২৩শে জানুয়ারী সোমবার লণ্ডনে এবং নিউইয়র্কে সরকারী কাগজের এবং শেয়ারের দর অনেক কমিয়া যায়। এই ব্যাপারে লোকের মনে আকস্মিতে শঙ্কার সঞ্চার হয় যে, বুঝি অচির ভবিষ্যতে একটা সামরিক যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। গত ১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) য়ুরোপের রাজনীতিক গগন যেরূপ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, এবার সেরূপ কিছুই হয় নাই সত্য, কিন্তু মোটের উপর অবস্থা বেশ সন্তোষজনক বলিয়াও মনে হয় না। যখন রাজনীতিক পরিস্থিতির বারংবার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, এবং যখন উপর্য্যুপরি শঙ্কাজনক অবস্থার উদ্ভব হয়, তখনই আচম্বিতে এমন একটা ঘটনা ঘটিয়া যায়, যাহার ফলে চারিদিক্ দিয়া সংগ্রামের কালানল জ্বলিয়া উঠে। সেই জন্য উপর্য্যুপরি এই শঙ্কাজনক অবস্থা ঘটিতেছে দেখিয়া অনেকের মনে শঙ্কার সঞ্চার হইতেছে। লোকের মনে বার বার এইরূপ শঙ্কার সঞ্চার হইতে থাকিলে, নানা অলীক সন্দেহই লোকের মনে জন্মিয়া যায়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সরাজেভো সহরে আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ডের যে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীয় সরকারের মনে সার্ভিয়ান সরকারের উপর যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহার হয় ত কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না; কিন্তু সেই সন্দেহই য়ুরোপে ভীষণ কালানল প্রজ্বলিত করিবার অতিপ্রবল কারণ হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে মধ্য-য়ুরোপের শক্তিবর্গের উপর পশ্চিম-য়ুরোপের শক্তিধরদিগের পরস্পর একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ও সন্দেহ কতকগুলি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবারও মধ্য-য়ুরোপে হার হিটলারের এবং মুসোলিনীর কার্য্যফলে, অকারণেই হউক আর সকারণেই হউক, কতকটা বিদ্বেষ এবং সন্দেহপূর্ণ ভাব সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় একটা অতি তুচ্ছ কারণে য়ুরোপে সংগ্রাম উপস্থিত যে হইতে পারে, তাহা সহজেই মনে হয়। সেই জন্য লোকের মন স্বতঃই চঞ্চল।

যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় যে, য়ুরোপে একটা ব্যাপক সংগ্রাম উপস্থিত হইবার কতকগুলি অনুকূল এবং আর কতকগুলি প্রতিকূল কারণ আছে। অনুকূল কারণগুলি এই:—

(১) জার্ম্মাণী যে ভাবে পূর্ব্ব-দক্ষিণ য়ুরোপে নিজ বাণিজ্য এবং রাজনীতিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে, তাহা লইয়া গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি জাতির মনেই যে কেবল শঙ্কার ও সন্দেহের সঞ্চার হইতেছে তাহা নহে, অধিকন্তু তাহাদের পকেটেও বিশেষ হাত পড়িতেছে। সন্দেহ বরং কিছুদিন সংযত করিয়া রাখা সম্ভবে, আর্থিক ক্ষতি অধিক দিন সহ্য করা যায় না।

(২) গত মন্দার পর যদিও বাণিজ্যের বাজারে একটু তেজীভাব দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু মার্কিণ মুলুকে সে তেজীভাব সরিয়া গিয়াছে, বৃটেনেও আবার যেন একটু সে তেজীভাবে ভাটা পড়িয়াছে। ফ্রান্স তাহার জাতীয় মুদ্রা ফ্রাঙ্কের মূল্যনির্দ্ধারণ ব্যাপারে অনেক কাণ্ডই করিয়াছে। ফ্রান্স হইতে লোক টাকা তুলিয়া অন্যত্র লইয়া যাইতেছে। ইহার জন্য অনেকে বাণিজ্যক্ষেত্রে বিনিময়-নীতি-(Barter system)কেই দায়ী করিয়া জার্ম্মাণীর উপর কুপিত হইতেছে।

(৩) জার্ম্মাণীর কর্ণধার হার হিটলার দুই দুইবার হুমকী দিয়া নিজ কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইলেন। সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ লোক সেজন্য বিস্মিত হইয়া গেল। এখন তিনি ডানজিগ এবং মেমেলের দিকে হাত বাড়াইতেছেন। ঐ দুইটি স্থান যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল সত্য, কিন্তু এখন উহা জাতিসঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে। সেজন্য লোক চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই দুইটি স্থানের জন্য একটা ব্যাপক ভাবে যুদ্ধ ঘটাইবার

প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে বার বার এইরূপে কেহ কেবল হুমকিতে পরাজিত হইতে চাহে না।

(৪) জার্ম্মাণী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া পাইবার দাবী করিতেছেন। ইংরেজ তাহা দিতে সম্মত নহেন। কাযেই জার্ম্মাণী এ বিষয়ে জিদ ধরিলে সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে।

(৫) জার্ম্মাণীতে এবং ইটালীতে জনসাধারণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য ইহারা একটা সংগ্রামে লিপ্ত হইতেও পারেন। কারণ, সংগ্রাম উপস্থিত হইলে দেশের লোক দেশের প্রতি মমতাবশতঃ অন্তর্ব্বিবাদের কথা ভুলিয়া যাইবে।

যুদ্ধ বাধিবার প্রতিকূল কারণ কি, তাহা এখন দেখা যাউক। উহাও এই ৫ দফায় বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) গ্রেটবৃটেন যুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতেছেন। ইহার ফলে মধ্য য়ুরোপের শক্তিবর্গ আকস্মিকে যুদ্ধ বাধাইতে ভয় পাইবে। গ্রেটবৃটেন ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ বাধাইবে না।

(২) ইটালী, জার্ম্মাণী এবং জাপান পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহারা যেন তিনটি চাকা একই অক্ষদণ্ডে সংযুক্ত থাকিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু ইহাদের কাহারও অর্থবল নাই,—আবিসিনিয়া জয় করিয়া এখন ঐ দেশ বশে আনিতে ইটালী বিব্রত। চীনযুদ্ধে জাপান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। সুতরাং এই শক্তিত্রয়ের বাস্ফোটই সার, ইহারা কেহই যুদ্ধ করিতে সম্মত হইবে না।

(৩) যুদ্ধ না করিয়া জার্ম্মাণী যে সুবিধা করিয়া লইয়াছে, যুদ্ধ করিলে সে সুবিধা ত হারাইবেই, অধিকন্তু আরও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জার্ম্মাণীর পক্ষে কোন বড় এবং বিশ্বাসযোগ্য শক্তিধর আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং জার্ম্মাণী গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ করিতে যাইবে না। ইহার উপর ইটালীর সহিত গ্রেট বৃটেনের চুক্তি, মার্কিণের সহিত গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্যচুক্তি এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের প্রীতি জার্ম্মাণীর যুদ্ধ করিবার পক্ষে নূতন অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৪) সম্প্রতি জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের বৃহত্তর প্রতিনিধি সভায় হার হিটলার যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কোন উষ্মা বা ভ্রুকুটিভঙ্গী নাই। জার্ম্মাণী যেন অনেকটা নরম সুরেই তাঁহাদের উপনিবেশগুলি চাহিয়াছেন। সুতরাং য়ুরোপের রাজনীতিক আকাশে যে মেঘ জমিতেছিল, তাহা আর অধিকতর শঙ্কাকুল হইয়া উঠে নাই।

(৫) ক্রমাগত অস্ত্র ও সমর-সরঞ্জাম বৃদ্ধির ফলে ঠিক কি হইবে, তাহা বলা যায় না। ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধির ফলে সকলে অধীর হইয়া পড়িতে থাকিলে, বিভিন্ন জাতি অধীর হইয়া একটা সংগ্রাম বাধাইতেও পারে, আবার পরস্পর পরস্পরের ভয়ে শান্ত শিষ্ট হইয়াও থাকিতে পারে। তবে মোটের উপর ক্রমাগত সামরিক বলবৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনাই অধিক হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অচির ভবিষ্যতে য়ুরোপে একটি মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইবে কি না? হার হিটলারের উক্তিতে ভাষার তীব্রতা নাই বটে,—কিন্তু তিনি এ কথা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, ইংরেজ যদি জার্ম্মাণীকে তাহার উপনিবেশগুলি ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল য়ুরোপে শান্তি বিরাজ করিবে। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহারা উপনিবেশগুলিতে সৈন্য রাখিবেন না,—তাঁহারা অন্নের জন্যই উপনিবেশ ফিরিয়া চাহিতেছেন। কিন্তু ইংরেজ যদি উহা ফিরাইয়া দিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে কি যুদ্ধ বাধিবে? সমস্যা এইখানে। তাহার উপর জার্ম্মাণীর বাণিজ্যনীতি যুদ্ধ বাধিবার একটা প্রবল কারণ। সুতরাং যুদ্ধ বাধিবার অনুকূল প্রথম দুইটি কারণ বড়ই প্রবল। ফলে হার হিটলারের কথাগুলি মোলায়েম হইলেও উহাতে য়ুরোপের রাজনীতিক আকাশ হইতে অশনিগর্ভ মেঘ অপসারিত হয় নাই। এখনও শ্বেতকায় জাতির মধ্যে দল পাকাপাকির চেষ্টা চলিতেছে। ইহা শুভলক্ষণ বলা যায় না। ফলে য়ুরোপের রাজনীতিক পরিস্থিতি শঙ্কাজনক হইয়াই রহিয়াছে। ইহার পরিণতি কি হইবে, তাহা বলা কঠিন।

নারী-গুপ্তচর জাপানী 'মাতহারির' ভাগ্যফল

বিখ্যাত নর্ত্তকী মাতহারি গুপ্তচররূপে বহুদিন পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও তাহার নাম এখনও শিক্ষিত সমাজের স্মরণ আছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে জাপানে এক মাতহারির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার নাম যোসিমকো কোয়াসিমা। জাপান তাহার জন্মভূমি হইলেও চীন সরকারের প্রাদেশিক রাজধানী চুন্‌কিং তাহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল। চীন দেশের 'সেনট্রাল নিউজ্ এজেন্সী' নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ, যোসিমকো কোয়াসিমা গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে চীন দেশের টিয়েনসিনের রাজপথে কোন অজ্ঞাত ঘাতক-হস্তে নিহত হইয়াছিল।

যোসিমকো কোয়াসিমা মাঞ্চু রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মাঞ্চু রাজবংশীয় প্রিন্স সু'র অনেকগুলি কন্যা ছিল, যোসিমকো তাঁহার দশম কন্যা। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রিন্স সু ডাইরেনে নির্ব্বাসিত হইলে যোসিমকো কোয়াসিমার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল; তাহাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া এক জন ধনাঢ্য জাপানী বণিক্ তাহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন। এই বণিক্ই তাহাকে সন্তাননির্ব্বিশেষে লালনপালন করিতেছিলেন। তৎকাল হইতে তাহার পিতৃবংশের শত্রুগণের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। এই সময়ে হংকংএর বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার করেন যে, যোসিমকো চীন দেশে জাপানের নারী-গোয়েন্দাসমূহের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুবতী চীনের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় এরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল যে, সে ছদ্মবেশে চীনা রমণী বা মাঞ্চুরিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, অথবা কোরিয়ান রমণী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছিল। সে যখন ছদ্মবেশ ধারণ করিত, তখন কেহই তাহাকে জাপানী নারী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না।

১৮ বৎসর বয়সে কুমারী কোয়াসিমা মধ্য-মঙ্গোলিয়ার প্রিন্স ফাঞ্চুলাবকে বিবাহ করিয়া টোকিও নগরে জাপান সম্রাটের চর বিভাগের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় কুয়াসিমা তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল।

মাঞ্চুরিয়ায় সে তাহার প্রতিভা-পরিচালনোপযোগী বিস্তীর্ণ

কার্য্যক্ষেত্র পাইয়াছিল। জেনারেল কেঞ্জি ডইহারা 'মাঞ্চুরিয়ার লরেন্স' নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি জাপানী গোয়েন্দা বিভাগের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন; কোয়াসিমা তাঁহার অধীনে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া চীনে জাপানী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কোয়াসিমা চীনের সামরিক কর্ম্মচারীর ছদ্মবেশে সাংহাই নগরে উপস্থিত হইয়া চীনের সমর বিভাগের বহু গুপ্ত সংবাদ নানা কৌশলে সংগ্রহ করিতেছিল, জাপানের সমর বিভাগ ইহাতে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল; কিন্তু এই সময় একবার তাহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহাকে বিপন্ন হইতে হয় নাই। অতঃপর সে টিয়েন-সিনে গমন করে। তাহার টিয়েন-সিনে উপস্থিতির কয়েক সপ্তাহ পরে নির্ব্বাসিত চীনা রাজপুত্র পিউ-ই ও তাঁহার শিক্ষক চেং-সিয়াও-সা একখানি জাপানী জাহাজে মাঞ্চুকুয়োর নিউচোরাং বন্দরে যাত্রা করেন। ইহার দুই বৎসর পরে পিউ-ই কে মাঞ্চুকুয়োর সাক্ষি-গোপাল সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়; এই ব্যাপারে কোয়াসিমা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। তাহার পর তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ সভ্য জগতে প্রচারিত হয় নাই। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কোয়াসিমা মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যে জাপানের 'লৌহ ও শোণিত' (iron and blood) নামক সৈন্য-দল সংগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। জাপান যে সময় উত্তর জেহল জয় করে, সেই সময় এই নারী-গোয়েন্দা আহত হইয়াছিল।

গত জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও জাপানী সংবাদপত্র-সমূহ এই জাপানী মাতহারির মৃত্যু-সংবাদ সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই; তবে তাহারা প্রচার করিয়াছিল, সে আহত হওয়ায় কিওরিৎস্যুর হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহার অবস্থা শোচনীয়। "কোন ব্যক্তিকে এই আহতা রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইতেছে না" এ কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘাতক-হস্তে তখন তাহার জীবনান্ত হইয়াছিল। জাপানে ও চীন দেশে এই শক্তিশালিনী নারীর খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত, এবং তাহার গোয়েন্দাগিরির কৌশল মাতহারির কার্য্যদক্ষতার সহিত তুলনীয়।

—

প্যালেষ্টাইনে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার চুরি

'অটোম্যান' ব্যাঙ্কের জেরুজালেম-শাখার ম্যানেজার লুই লি বোভিয়ার গত ডিসেম্বর মাসের শেষে একদিন রাত্রিকালে কালিয়া নামক স্থান হইতে মোটরযানে জেরুজালেম রোড দিয়া তাঁহার বাসভবনে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার মোটর-কার একটি বাঁকের মোড়ে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার গাড়ীর মাথার আলোকে এক জন আরবকে রাইফেল উদ্যত করিতে দেখিলেন। মসিয়ে বোভিয়ার তৎক্ষণাৎ এক হাতে মোটর-কারের ব্রেক কসিয়া, অন্য হাতে তাঁহার রিভলভার বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আরও ... জন আরব-দস্যু তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার রক্ষার আশা শূন্যে বিলীন হইল।

এই সকল দস্যু তাঁহার গাড়ী চালাইয়া দিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল, এবং পথহীন জুডীয় পাহাড়ের উপর দিয়া ... ১২ ঘণ্টা কাল তাঁহাকে টানিয়া লইয়া আড্ডায় চলিল। সেখানে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তাঁহাকে ছাগচর্ম্মে ঢাকিয়া রাখিল। পরদিন রাত্রিকালে দস্যুরা তাঁহাকে লইয়া একটি গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। আরব-দস্যুপতি সুলেমান সেই গুহায় তাঁহাকে তাহার খাদ্যদ্রব্যের অংশ—মোটা রুটি, তৈল, জলপাই, এবং পলাণ্ডু ভোজন করিতে দিল। মসিয়ে বোভিয়ার সদ্ব্যবহারে সুলেমানকে বশীভূত করিবার আশায় তাঁহার মূল্যবান্ ঘড়িটি তাহাকে উপহার প্রদান করিয়া ঘড়ি কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়—তাহাও তাহাকে শিখাইয়া দিলেন।

অতঃপর তাঁহাকে দুই জন প্রহরীর জিম্বায় রাখিয়া অন্যান্য দস্যু তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবে—তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। ম্যানেজার লি বোভিয়ার আরব ও তুর্কি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, দস্যুদলের বাদানুবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি দেখিলেন, সেই দলের এক জন দস্যু তাঁহার গাড়ী হইতে যে পরিচ্ছদ অপহরণ করিয়াছিল, তাহাই পরিধান করিয়া বসিয়াছিল, আর একজন তাঁহার স্নানের পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল। সুলেমানের সঙ্গী বলিল, 'আমরা উহাকে কোতল করিব।' কিন্তু দলপতি সুলেমান গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'চোপ্, রহ, আমরা ও কায করিব না।' (এস্কাউং! লাম নাউরিদ।)

সুলেমানের অভিসন্ধি অন্যরূপ ছিল। সে ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের মুক্তিপণ বাবদ এক হাজার পাউণ্ডের দাবী করিয়া এক জন রাখালকে জেরুজালেমের ব্যাঙ্কে প্রেরণ করিল; তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইল, দাবীর টাকা ২০ বস্তা চাউল এবং ১৫ বস্তা চিনির ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া সেই বস্তাগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া যাইতে হইবে।

দস্যুগণের দাবী পূরণ করা হইল। মুক্তিপণ পাইয়া তাহারা লি বোভিয়ারকে মুক্তিদান করিল। লি বোভিয়ার জেরুজালেমে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলে দস্যুরা তাঁহাকে একখানি ছাড়-পত্র লিখিয়া দিল; তাহার মর্ম্ম এই যে, পথিমধ্যে অন্য কোন দস্যুদল তাঁহাকে পুনর্ব্বার চুরি না করে।

অতঃপর লি বোভিয়ারকে গ্রীক খৃষ্টানদের একটি মঠে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইল। সেই মঠটি পূর্ব্বোক্ত গিরিগুহার দুই মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত হইলেও ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের পা ফুলিয়া যাওয়ায় তিনি চলিতে এরূপ কষ্ট বোধ করিতেছিলেন যে, সেই দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার তিন ঘণ্টা সময় লাগিল! তখন তাঁহার মস্তক অনাবৃত, এবং পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতে চলিতে পিপাসায় তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

আরব-দস্যুরা তাঁহার পরিহিত ট্রাউজার ব্যতীত সকল দ্রব্যই অপহরণ করিয়াছিল। লি বোভিয়ার উক্ত মঠে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একটা গাধায় চড়াইয়া জেরিকোর সেনানিবাসে প্রেরণ করা হইল।

এদিকে তিনি দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন শুনিয়া পুলিস তাঁহার সংবাদ জানিবার জন্য ৫ শত পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। পুলিস তাঁহার মোটর-কার খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, এবং তাঁহার সন্ধানের জন্য কয়েকখানি এরোপ্লেন নিযুক্ত করিয়াছিল। ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার ক্লান্তদেহে তাঁহার বাসভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে বিস্বাদ জল পান করিয়াছিলেন, তাহা যেন দীর্ঘকাল তাঁহার মুখে লাগিয়া ছিল, এবং মুখের পলাণ্ডুগন্ধ অপসারিত করিবার জন্য কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

এই সকল আরব-দস্যুর-অত্যাচারে জেরুজালেমের শ্বেতাঙ্গ সমাজকে আতঙ্কাভিভূত চিত্তে কালযাপন করিতে হইতেছে; কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে জানিবার উপায় নাই। বৃটিশ সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও শান্তিরক্ষায় কিরূপ অসমর্থ হইয়াছেন—এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তে পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

—

চীনের সহিত জাপানের সন্ধির চেষ্টা বিফল

জাপানের প্রধান মন্ত্রী কূটনীতিজ্ঞ প্রিন্স ফুমিমারো কনোয়ের মতানুবর্ত্তী হইলে চীনের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা সেনাপতি চিয়াং কাইসেক গত জানুয়ারী মাসের প্রথমেই জাপানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতেন। কিন্তু প্রস্তাবিত সন্ধির তিনটি সর্ত্ত চীনের প্রতিকূল ছিল; কারণ, এই সন্ধিতে সম্মত হইতে হইলে (১) চীনকে জাপান ও মাঞ্চুকুয়োর কম্যুনিষ্টবিরোধী দলে যোগদান করিতে হইত। (২) চীন দেশে সকল বৈদেশিককে যে সকল অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, একমাত্র জাপান ব্যতীত অন্য সকল বৈদেশিককে সেই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইত। (৩) চীন দেশে, বিশেষতঃ, উত্তর-চীনে এবং মধ্য-মঙ্গোলিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা মঞ্জুর করিতে হইত।

কিন্তু চিয়াং কাইসেক বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিকট নূতন সাহায্যলাভে উৎসাহিত হইয়া এই সকল সর্ত্তে সন্ধি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সুপ্রকাশিত হইয়াছিল।

সেনাপতি চিয়াং কাইসেক চুংকিংস্থিত প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইতে এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন যে, জাপানের প্রস্তাবিত সন্ধির এই সকল সর্ত্ত জাপানের নিকট চীনের অধীনতা স্বীকারের নামান্তর মাত্র; এ অবস্থায় চীনের পক্ষে এই সকল সর্ত্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ইতোমধ্যে চিয়াং কাইসেকের একজন রাজনীতিক সহযোগী দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে পরিশ্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া মন্ত্রণাসভার সভাপতি ওয়াং চিং উই-প্রদত্ত এরোপ্লেনের সাহায্যে উড়িয়া আসিয়া চিয়াং কাইসেকের সহিত জাপানের প্রস্তাবিত সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন বটে, কিন্তু সেই সুযোগে চীনের কেন্দ্রী মন্ত্রণাসভার সভাপতি জাপানের সহিত সন্ধিপ্রয়াসী মিঃ ওয়াং চিং উই এরোপ্লেনে চুংকিং হইতে দক্ষিণদিকে পলায়ন করেন। তিনি এই ভাবে পলায়নের পূর্ব্বে চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের 'কুয়োমিন্টাং' সভাকে জাপানের প্রস্তাবিত সর্ত্তে সন্ধির অনুকূলে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

ওয়াং চিং যে মুহূর্ত্তে ঐভাবে পলায়ন করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার গতিবিধি সংক্রান্ত রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন উপলক্ষে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, জাপানী রাজনীতিক সেনানায়ক মেজর কেন্জি ডইহারা (যিনি মাঞ্চুরিয়ায় এবং পিকিনে চীনের 'সাক্ষিগোপাল সরকার' প্রতিষ্ঠিত করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন) চীনের পক্ষে অপমানজনক এই সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি মিঃ ওয়াংকে এই লোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, মিঃ ওয়াং যদি এই সন্ধিসর্ত্তে রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাইসেককে সম্মত করাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পিকিনের প্রাদেশিক সরকারের একটি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। এতদ্ভিন্ন মিঃ ওয়াংকে হংকংএ উপস্থিত হইয়া সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনায় যোগদান করিতেও অনুরোধ করা হইয়াছিল।

চিয়াং কাইসেক
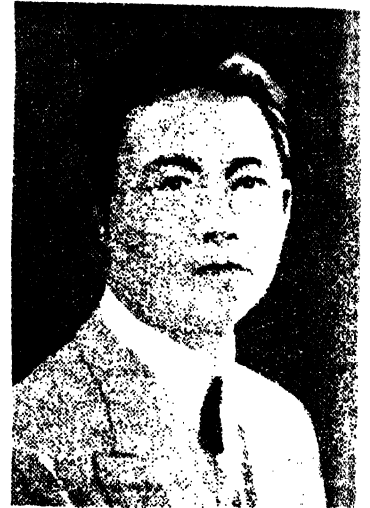
ওয়াং চিং উই

অতএব দেখা যাইতেছে, কেন্দ্রী মন্ত্রণা-সভার এই সভাপতিটি চীন-সরকারের মীরজাফর তুল্য বিশ্বাসঘাতক!

কিন্তু অনেকে বলিয়াছিলেন, মিঃ ওয়াং চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; পরে সেই ষড়যন্ত্র বিফল হওয়ায় তিনি চুংকিং হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ওয়াংএর পলায়নের পর তাঁহার সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা স্থায়ী হয় নাই; এই ঘটনার অল্পকাল পরে 'কুয়োমিন্টাং' নামক জাতীয় দলের কার্য্যকরী সমিতি এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন যে, মিঃ ওয়াংকে রাজ্যের সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। প্রস্তাবিত সন্ধি কেবল যে অগ্রাহ্য হইয়াছে এরূপ নহে, মিঃ ওয়াংকে চীনের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, সু-পেই নামক যে চীনা ভদ্রলোক মিঃ ওয়াংএর পলায়নের জন্য এরোপ্লেন সরবরাহ করিয়াছিল, মিঃ চিয়াং কাইসেক তাহাকে

গ্রেপ্তার করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে সকল স্বদেশ-দ্রোহী এই সকল সন্ধিসর্ত্ত অনুমোদনযোগ্য বলিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছিল—কেন্দ্রী সরকার তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়া চূড়ান্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ জারী করিয়াছেন।

জাপানের প্রস্তাবিত সন্ধি চীন সরকার কর্ত্তৃক এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব চীন এখনও পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইবে; এবং জাপানে যেভাবে নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া জাপানী প্রজাবর্গকে চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, জাপানও অনির্দ্দিষ্ট কাল এই যুদ্ধে রত থাকিবে।

—

ফরাসী উপনিবেশে প্রধান মন্ত্রী ডালাডিয়ার

টিউনিসিয়ার শাসনকর্ত্তা সিদি আমেদ বে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে প্যারিসে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় টিউনিসিয়ার প্রতি সিনর মুসোলিনীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পতিত হয় নাই; এজন্য সিদি বে প্যারিসে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্যারিসের যে হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই হোটেলে তাঁহার শয়ন-কক্ষে মেরি এন্টইনেতের অনাবৃত-বক্ষ একটি মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছিল; এজন্য বে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ফরাসী সরকারকে বলিতে সাহস করিয়াছিলেন—এই অপমান তিনি সহ্য করিবেন না, তিনি অবিলম্বে প্যারিস ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবেন, এবং তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত অতিথির প্রতি ফরাসী সরকারের এই অপমানজনক ব্যবহার দীর্ঘকাল তাঁহার স্মরণ থাকিবে। বলা বাহুল্য, তখন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ফরাসী সরকারকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

কিন্তু এবার? এবার সিদি আমেদ বে ইটালীর বুটের আঘাতের আশঙ্কায় কম্পিত-কলেবরে গত জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এডুয়ার্ড ডালাডিয়ারকে যেরূপ আগ্রহভরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যের চিহ্নমাত্র ছিল না।

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী যেরূপ ঘটা করিয়া এই ফরাসী উপনিবেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা মহাবীর নেপোলিয়নের-যোগ্য বটে! রেসিডেন্ট-জেনারেল এরিক লেবোর সহযোগে তিনি যখন নগরপথে শোভাযাত্রা করেন, তখন এক শত সাংবাদিক তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন, তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পথে এরূপ জনসমাবেশ হইয়াছিল যে, কাহারও পদমাত্র নড়িবার উপায় ছিল না।

যে সকল ইটালীয়ান এই নগরে বাস করে, তাহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিল, তাহার পর পথের দিকের জানালা খুলিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি শুনিল, "ডালাডিয়ার! ডালাডিয়ার!" "ফ্রান্স চিরজীবী হউক!" "মুসোলিনী নিপাত যাউক!"

ডালাডিয়ারের মস্তকোর্দ্ধে টাকের উপরে সামরিক বিমান সগর্জ্জন সশব্দে উড়িতেছিল। প্রধান মন্ত্রী প্রাকারবেষ্টিত বিজার্টা নগর হইতে উত্তর টিউনিসিয়ার অরণ্য ভেদ করিয়া যখন ২০ মাইল দূরবর্ত্তী টিউনিস নগরে গমন করেন, তখন তিনি যে সকল আরব-পল্লী অতিক্রম করেন, সেই সকল পল্লীর দরিদ্র অধিবাসীরা পথের উপর কতকগুলি তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিল।

টিউনিসের অদূরে আমেদ বের যে আড়ম্বরপূর্ণ প্রাচীন প্রাসাদ বর্ত্তমান, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাসাদে ইটালীর রাজা ভিক্টর এমানুয়েলের চিত্রের নিম্নভাগে ডালাডিয়ার আশ্রিত রাজা ৮০ বৎসর বয়স্ক আমেদ বের করমর্দ্দন করিয়াছিলেন। সেই সময় বের গাঢ় রক্তবর্ণ পরিচ্ছদের সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ দাড়ির লাল রং মিশিয়া গিয়াছিল। এই প্রাসাদে মহা আড়ম্বর সহকারে যে রাজভোজের আয়োজন হইয়াছিল, সেই ভোজসভায় বে প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "আপনি আমার এ কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন যে, প্রয়োজন হইলে টিউনিসিয়ার সকল লোক ফ্রান্সের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে।" প্রধান মন্ত্রী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমিও আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, ফ্রান্স টিউনিসকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় দান করিবে। ফ্রান্স চিরদিন সাম্য স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছে; পশুবল ও যথেচ্ছাচার দমন করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার কার্য্য।"

ডালাডিয়ার

অতঃপর প্রধান মন্ত্রী ইটালীর লিবিয়ার প্রান্তবর্ত্তী সীমা কি ভাবে সংরক্ষিত হইতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য উক্ত অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী সীমান্ত ভূমি পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী এই সময় মরুমধ্যবর্ত্তী আইন-টাউনাইন্ নামক মরূদ্যানে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যের কুচ-কাওয়াজ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের দুর্গ-প্রাকারগুলি কিরূপ সুদৃঢ়, মধ্যাহ্ন রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাও তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

উপনিবেশ পরিদর্শনকার্য্য এই ভাবে শেষ হইলে প্রধান মন্ত্রী ডালাডিয়ার বিজার্টায় প্রত্যাগমন করিয়া 'ফোচ' নামক জাহাজে আলজিরিয়া পরিদর্শনে যাত্রা করেন।

ডালাডিয়ারের টিউনিস পরিদর্শনকালে ইটালীর প্রচার-সচিব ডাইনো-আল্‌ফিয়ারী টিউনিসের ইটালীয় সংবাদপত্র 'ইউনিওয়ানে' এই মর্ম্মে আদেশ জারী করেন যে, তাহারা ডালাডিয়ারের টিউনিস পরিদর্শনের উল্লেখ মাত্র না করিয়া ইটালীয়গণের সহিত আরবগণের বন্ধুত্ব বন্ধন কিরূপ সুদৃঢ় তাহাই প্রচার করিতে থাকিবে। প্রচার সচিবের আদেশে আরবগণের সহিত ইটালীয়ানদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বিবরণ 'ইউনিওয়নে' যেদিন প্রকাশিত হইল, সেই দিনই আরবদিগের সংবাদপত্রসমূহে 'বিকৃত-মস্তিষ্ক ইটালীয়ানদের' দাবীর উল্লেখ করিয়া বহু অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রধান মন্ত্রী ডালাডিয়ার ফরাসী-অধিকৃত আলজিরিয়ার প্রধান নগর য়ুরোপীয়ভাবাপন্ন আলজিয়ার্সে উপস্থিত হইয়া আলজিরিয়ার গভর্ণর-জেনারেল লি বো, সেনাপতি নোগুয়েস, মরক্কোর রেসিডেন্ট

জেনারেল,বৈমানিক সেনাপতি টেট্, এবং ফরাসী নৌ-সেনাপতি এডমিরাল রিচার্ডের সহিত দুই ঘণ্টাকাল গোপনীয় পরামর্শে রত ছিলেন।

অতঃপর দেশরক্ষার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান মন্ত্রীর যে বক্তৃতা রেডিও-যোগে ফ্রান্সে এবং ফ্রান্সের প্রত্যেক উপনিবেশে বিঘোষিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে, "প্রত্যক্ষভাবেই হউক, আর পরোক্ষভাবেই হউক, আমাদের শত্রুপক্ষ যে ভাবেই আমাদিগকে আক্রমণ করুক, আমরা সেই আক্রমণে বাধা দান করিব, এবং বলে, শত্রুরা কৌশলে আমাদিগকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিলে আমরা যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিব, পৃথিবীতে কেহ তাহা বিচলিত করিতে পারিবে না, ইহাই আমার শেষ কথা।"

বস্তুতঃ, প্রধান মন্ত্রী ডালাডিয়ার আফ্রিকার উপনিবেশ পরিদর্শনে গমন করিয়া উপনিবেশগুলি শত্রুর আক্রমণে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। ইটালী যে কোন উপনিবেশ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিলেই সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, এবং উপনিবেশগুলি রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা হইবে ডালাডিয়ার তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সিনর মুসোলিনী তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করেন, সভ্যজগৎ সাগ্রহে তাহা লক্ষ্য করিবে।

—

সার চার্লস টেগার্টের কীর্ত্তিকাহিনী

সার চার্লস্ টেগার্ট শিক্ষিত বাঙ্গালীর অপরিচিত নহেন; কলিকাতার পুলিশ-কমিশনররূপে তিনি বাঙ্গালার সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এ দেশের লোকের তাহা অজ্ঞাত নহে। কোন সন্ত্রাসবাদী যুবক একদিন গোলদিঘীর অদূরে তাঁহার মোটর-কার লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে আহত হইতে হয় নাই। এই ব্যাপারে তাঁহার সাহসের প্রশংসা প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি স্বদেশে প্রস্থান করেন। জনরব শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল, বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাঁহার ভারতীয় কীর্ত্তিতে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু সেই উচ্চপদ তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে আরব সন্ত্রাসবাদী দমনের জন্য তাঁহাকে প্যালেষ্টাইনে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি আরব বিদ্রোহীগণের পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্য একটি সুদীর্ঘ তারের বেড়া নির্ম্মাণ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহা নির্ম্মাণে সরকারের বিস্তর টাকা ব্যয় হইলেও তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই, যেন-তেন-প্রকারেণ 'বুদ্ধিমানস্য' ধনক্ষয়ই সার হইয়াছে।

সার চার্লস টেগার্ট

এ হেন কীর্ত্তিমান্ টেগার্টের গুণগরিমার পরিচয় দানের জন্য বিলাতী জয়ঢাক তুমুল শব্দে বাজিয়া রাজ্যের কাণে তালা ধরাইয়া দিয়াছে।

তাঁহার কীর্ত্তির পরিচয় উপলক্ষে বলা হইয়াছে, "সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুলী চলিয়াছে; (Most shot-at man in the world) কিন্তু তাঁহার জীবন যেন মন্ত্রবলে সুরক্ষিত। দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ঠগী দস্যুরা (thugs) প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁহার 'কার' লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। একবার টেগার্ট রিভলভার উদ্যত করিয়া এক জন বোমানিক্ষেপকারীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং যতক্ষণ সে ধরা না পড়িয়াছিল, ততক্ষণ তাহার অনুসরণে বিরত হন নাই!

এখন তিনি প্যালেষ্টাইন সরকারের আতঙ্কবিরোধী উপদেষ্টা (anti-terror adviser) অল্পদিন পূর্ব্বে একদিন রাত্রিকালে সার চার্লস্ নাব্‌লাস-জেরুজালেম পথে 'ভ্যালি অফ্ রবার্স' অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করেন; একখানি সরকারী গাড়ীতে মেজর সি ব্রক্‌স্বিল, এবং প্যালেষ্টাইনের ভূতপূর্ব্ব পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সি, ডি, স্যাণ্ডারসন তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলেন।

সহসা মহাশব্দে সরকারী গাড়ীর 'টায়ার' ফাটিতেই সেই গাড়ী এবং তাহার রক্ষী দুইখানি সাঁজোয়া গাড়ীর গতিরোধ হইল। অগ্রগামী গাড়ীর সার্চ্চ-লাইটে পথিমধ্যে প্রস্তর-স্তূপের একটি বেড় লক্ষিত হইল।

প্রস্তরস্তূপ অপসারিত করিবার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্যাণ্ডারসন গাড়ী হইতে লাফাইয়া-পড়িয়া সেই কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। 'হোলি ল্যাণ্ডের' পথে এই প্রকার বাধা নিত্যই ঘটিয়া থাকে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্যাণ্ডারসন মোটর-কারের মাথার আলোকে দাঁড়াইয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন; সহসা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিপার্শ্ব হইতে রাইফেল গর্জ্জন করিয়া অগ্নি উদ্গিরণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে গুলীবৃষ্টি! এক ঝাঁক গুলীর আঘাতে স্যাণ্ডারসনের মৃতদেহ পথের উপর লুটাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই সাঁজোয়া গাড়ী হইতে বর্ষিত মেসিনগানের গুলীর ঝাঁক অন্ধকার বিদীর্ণ করিল। টেগার্ট পরিচালিত পুলিশ বিপ্লবিগণের সন্ধানে ধাবিত হইল; কিন্তু আততায়ীগণের অস্তিত্বের নিদর্শনস্বরূপ অর্দ্ধবিচ্ছিন্ন টেলিগ্রাফের তার মাত্র দেখিতে পাওয়া গেল। একদল আরব-বিদ্রোহীকে তখন টেলিগ্রাফের তার কাটিতে দেখা গিয়াছিল।

সার চার্লস টেগার্ট তাঁহার গাড়ীর বহির্ভাগ পরীক্ষা করিয়া যে সকল ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, তাহাদের মধ্যে তিনটি গুলী আবিষ্কৃত হইল। সার চার্লস্ গাড়ীর ভিতর যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহার এক ইঞ্চি মাত্র ব্যবধানে সেই সকল গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং বলিতে হয়, তাঁহার দেহ দৈব-সুরক্ষিত!

কিন্তু সার চার্লস্ আগষ্টস্ টেগার্ট যতদিন বাঙ্গালায় পুলিশের চাকরীতে বাহাল ছিলেন, ততদিন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁহার 'কার' লক্ষ্য করিয়া বোমা বর্ষিত হইয়াছিল, এবং প্রত্যেক বারই তিনি দৈবানুকম্পায় সেই সকল অব্যর্থ বোমা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ অদ্ভুত 'আষাড়ে' গল্প কাহার দ্বারা লণ্ডনে প্রচারিত হইয়াছিল? এই বিবরণ কি গোয়েন্দা দলপতি ভাগ্যবান সার চার্লসের আত্মপ্রসাদপুষ্ট কল্পনাপ্রসূত?

আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা—

গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের ষট্‌সপ্ততিতম অধিবেশনে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ফ্যাসিষ্ট-শক্তিগুলির প্রতি কটাক্ষ করিয়া আমেরিকাবাসীর উদ্দেশে সতর্কবাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভীষণ সমরাগ্নি সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা সাময়িক ভাবে প্রতিরুদ্ধ হইলেও এখনও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যে তিনটি বস্তুকে ভিত্তি করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, সেই ধর্ম্ম, গণতন্ত্র এবং আন্তর্জ্জাতিক সদ্ভাব আজ বিপন্ন হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে যে কেবল তাহার বাস্তু-ভিটা রক্ষা করিতে হইবে, তাহাই নহে; বস্তুতঃ যে নীতি ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া তাহার ধর্ম্মমন্দির, তাহার গভর্ণমেণ্ট ও তাহার সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার রক্ষার জন্যও মানুষকে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমেরিকার নিরপেক্ষতা আইনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই আইনের জন্য হয়ত এতদিন কেবল অত্যাচারীই উৎসাহ লাভ করিয়াছে—অত্যাচারিত প্রয়োজনীয় সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই বক্তৃতায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রগুলি বলে যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের রাজনীতিক নেতৃত্ব এক্ষণে দুর্ব্বল: এই জন্য তিনি এইরূপ "যুদ্ধং দেহি" বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই বক্তৃতা যে অসার বাক্যাড়ম্বর মাত্র নহে, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আমেরিকা কিছুদিন হইতে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছিল। নৌবহর বৃদ্ধির পরিকল্পনা বহু পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকা এক্ষণে দ্রুতগতিতে বিমান ও অন্যান্য সমরোপকরণ বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করিতেছে। তাহার অধিকারভুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপকে সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। নিরপেক্ষতা আইন সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উক্তির পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্পেন সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রথমেই মনে প্রশ্ন উদিত হয়, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে অকস্মাৎ এইরূপ কি নূতন ঘটনা ঘটিল যে, মনরো-নীতির অনুসরণকারী আমেরিকাকে চঞ্চল হইতে হইয়াছে? জাপানের মাঞ্চুকো গ্রাসে, ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণে, স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে ইটালীর প্রকাশ্য যোগদানে আমেরিকা ত চঞ্চল হয় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান যুগের কোন রাষ্ট্রই আপনার স্বার্থ বিপন্ন না হইলে চঞ্চল হয় না। আবিসিনিয়া, মাঞ্চুকো অথবা স্পেনের বিপদে আমেরিকার কোন স্বার্থহানির সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই সে তখন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ছিল। কিন্তু গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে জাপান কর্ত্তৃক চীন আক্রান্ত হইবার পর হইতে আমেরিকা নৌবহর বৃদ্ধি করিতেছে এবং অন্যান্য সামরিক বিভাগেও শক্তিসঞ্চয় করিতেছে। ইহার কারণ, সুদূর প্রাচীর এই অশান্তিতে আমেরিকা তাহার অধিকারভুক্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছে। তাহার পর, এক্ষণে জাপান তাহার অধিকৃত চীনা অঞ্চলে প্রতীচ্য শক্তিবর্গের বাণিজ্যাধিকার হরণ করিয়াছে। কাজেই আমেরিকা, বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সহিত জাপানের বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত আমেরিকার বিরোধের ক্ষেত্র দক্ষিণ-আমেরিকা। এতকাল আমেরিকা ও বৃটেন দক্ষিণ-আমেরিকায় একরূপ একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার উপভোগ করিয়াছে। এক্ষণে দক্ষিণ-আমেরিকার বাণিজ্যক্ষেত্রে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের সহিত এই দুইটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই বিরোধে ফ্যাসিষ্ট-শক্তিদ্বয়ই জয়ী হইতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে লীমা সম্মিলনীতে দক্ষিণ-আমেরিকাকে ফ্যাসিষ্ট শক্তির প্রভাবমুক্ত করিবার চেষ্টা সফল হয় নাই। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ্ প্রচুর; গত মহাযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলের পণ্যোপকরণ এবং খাদ্যসামগ্রী মিত্রশক্তিকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। এই দক্ষিণ-আমেরিকা ও চীনের বাণিজ্যাধিকার এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপের নিরাপত্তা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা আমেরিকাকে অত্যাচারী শক্তিত্রয়ের প্রতি বিরূপ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে এই স্বার্থ-সঙ্ঘাতের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

বৃটিশ-মন্ত্রিদ্বয়ের রোম-পরিভ্রমণ—

গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে মিঃ চেম্বারলেন এবং লর্ড হ্যালিফ্যাক্স সদলবলে রোমে গমন করেন এবং তথায় চারি দিন অবস্থানের পর ১৪ই জানুয়ারী তারিখে রোম ত্যাগ করেন। পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল যে, মিঃ চেম্বারলেন রোমে গমন করিয়া ফ্রাঙ্কো-ইটালীয় বিরোধ সম্পর্কে মধ্যস্থতা করিবেন। কিন্তু উহা তাঁহাকে আর করিতে হয় নাই। কারণ, মুসোলিনী তাঁহাকে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে, স্পেনে জেনারল ফ্রাঙ্কোর বিজয় তিনি চাহেন। সুতরাং স্পেন সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ফ্রান্সের সহিত এখন কোনরূপ আপোষ সম্ভব নহে। রোম-পরিভ্রমণের ফলাফল সম্পর্কে মিঃ চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। রোমে ইঙ্গ-ইটালীয় মিত্রতা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা হইয়াছে, এবং ইঙ্গ ইটালীয় চুক্তি অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রোম-পরিভ্রমণে মিঃ চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সন্তোষের কারণ—ইটালীর নিকট হইতে বৃটেনের আপাততঃ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, এই আশ্বাস তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। স্পেনে জেনারল ফ্রাঙ্কোর বিজয় সম্বন্ধে মুসোলিনির যে জিদ, তাহাতে বৃটিশ মন্ত্রিদ্বয় সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির একটি সর্ত্তে ছিল যে, স্পেন হইতে আনুপাতিক সংখ্যায় স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারিত হইবার পূর্ব্বে ঐ চুক্তির সর্ত্ত কার্য্যে পরিণত হইবে না। ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির এই সর্ত্তটি এখন চাপা পড়িল; স্পেনে ৩০,০০০ হাজার ইটালীয় সৈন্যের অবস্থিতি সত্ত্বেও ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি অনুসারে কার্য্য হইবে।

মিঃ চেম্বারলেন ও লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে সন্ত্রাসবাদ—

জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে আয়র্লণ্ড এবং ইংলণ্ডের কয়েকটি স্থানে বোমা বিস্ফোরণ হয়। ইহার ফলে দুই এক ব্যক্তির প্রাণহানিও ঘটিয়াছে; ট্রেলীতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের পুত্র মিঃ ফ্রান্সিস্ নেভিল্ চেম্বারলেনকে হত্যার চেষ্টাও হইয়াছিল এই বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যের জন্য আয়র্লণ্ডের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রিপাবলিক্যান্ আর্ম্মিই দায়ী। সমগ্র আয়র্লণ্ড হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে চরম দাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ জানেন, গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ড যখন স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত হয়, তখন উত্তর আয়র্লণ্ডের আলষ্টার প্রদেশটিকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছিল। গত বৎসর আইরিস ফ্রী ষ্টেটের "আয়ার" নামকরণ করিয়া তথায় যখন নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়, তখন মিঃ ডি ভেলেরা প্রভৃতি আইরিস্ নেতৃবর্গ আলষ্টারকে "আয়ার" রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া সমগ্র আয়র্লণ্ডকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বৃটেনের প্রতি অনুরক্ত প্রোটেষ্টাণ্ট-প্রধান আলষ্টারের বিরোধিতায় আইরিস্ নেতৃবর্গের চেষ্টা সফল হয় নাই। "আয়ার" রাজ্যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর তথা হইতে বৃটিশ-সৈন্য অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও উত্তর আয়র্লণ্ডের আলষ্টার রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য অবস্থান করিতেছে। স্বদেশভক্ত আইরিশগণ সমগ্র আয়র্লণ্ডকেই মাতৃভূমি বলিয়া জানেন; উত্তর আয়র্লণ্ডের বৃটিশ আনুরক্তি এবং এ অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতি তাহাদিগের নিকট অসহ্য। তাহার পর, আলষ্টার রাজ্যে বৃটিশভক্ত প্রোটেষ্টাণ্টগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও এ রাজ্যে ক্যাথলিকদিগের সংখ্যা উপেক্ষণীয় নহে। এক মাত্র ডার্ডন্ এবং য়্যানট্রিম্ জেলায় (county) ক্যাথলিক অধিবাসী অপেক্ষা প্রোটেষ্টাণ্ট অধিবাসীর সংখ্যা বহুগুণ অধিক; অন্য চারিটি জেলায় প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সমান। এই সকল ক্যাথলিক আলষ্টারের ক্রেগাভণ মন্ত্রিসভার নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পায় না। এই জন্য আলষ্টারের সংখ্যালঘিষ্ঠ ক্যাথলিক্ অধিবাসীদিগের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্যের প্রকৃত কারণ বুঝিতে হইলে উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ডি ভেলেরা

হার ভন রিবেনট্রপ

কমিণ্টার্ণবিরোধী দলে হাঙ্গেরি—

মিউনিক চুক্তির পর হাঙ্গেরির সহিত জার্ম্মাণীর যে সামান্য মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহা দুরীভূত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর আপন সমর্থনে চেক্ সৈন্য হাঙ্গেরির সীমান্তে যে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারও মীমাংসা হইয়াছে। হাঙ্গেরি এক্ষণে কমিণ্টার্ণ-বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছে। জার্ম্মাণীতে "ইউক্রেন আন্দোলন" আরম্ভ হওয়ায় পোলণ্ড ও হাঙ্গেরি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোলণ্ড ঐ সময় সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়, হাঙ্গেরিও জার্ম্মাণীর প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হাঙ্গেরির জার্ম্মাণভাবাপন্ন দলেরই জয় হইয়াছে। জার্ম্মাণীও হাঙ্গেরির সহিত বিবাদ করিয়া ইটালীকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহে নাই; কারণ, জার্ম্মাণী এক্ষণে ইটালীর সহিত একযোগে বৃটেন ও ফ্রান্সকে "চাপ" দিতে চাহে। ইটালী স্পেন সম্পর্কে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া ফ্রান্সকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়াছে; স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিজয়লাভের পর ইটালী তাহার অন্যান্য দাবীও উত্থাপন করিবে। ঠিক এই সময় রাইখস্-ট্যাগের বক্তৃতায় হার হিটলার দৃঢ়তার সহিত উপনিবেশের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। হাঙ্গেরি সম্পর্কে জার্ম্মাণী অনায়াসে তাহার অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু পোলণ্ড সম্পর্কে সে সফলকাম হয় নাই। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্রসচিব হার ভন রিবেনট্রপ ওয়ারসতে গমন করিয়া পোল-জার্ম্মাণ মিত্রতাস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। শুনা যায়, হার ভন রিবেনট্রপের এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই।

ডাঃ স্যাটের পদচ্যুতি—

গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে বার্লিনে ঘোষণা করা হয় যে, খ্যাতনামা অর্থনীতিজ্ঞ ডাঃ স্যাটকে রাইখস্ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল; তবে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য থাকিবেন। ডাঃ স্যাটের পদচ্যুতির সংবাদ পাইবা মাত্র জার্ম্মাণীর অর্থ-সচিব সোয়েরিণ ভন ক্রোশিক্ও পদত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ স্যাট্ বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিজ্ঞ; অথচ হিট্লারী রাজ্যে তাঁহার প্রতিভার মর্য্যাদা নাই। গত বৎসর মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে অর্থ-সচিবের পদ হইতে অপসারিত করিয়া রাইখস্-ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্টের পদ প্রদান করা হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ পদ হইতেও তাঁহাকে অপসারণ করা হইল। সমরোপকরণ বৃদ্ধি সম্পর্কে জার্ম্মাণীর উন্মত্ততা কোন অর্থনীতিজ্ঞের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কাযেই প্রবীণ অর্থনীতিজ্ঞ ডাঃ স্যাট্ হার হিট্লারের সহিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। এই ক্রমবর্দ্ধমান মতদ্বৈধতাই তাঁহার

পদচ্যুতির কারণ। শুনা যায়, ডাঃ স্যাটের পদচ্যুতির পর অর্থ-শাস্ত্রের মূলনীতির বিরোধী কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রা প্রকরণ বর্দ্ধিত

ডাঃ সাট

সিনর নেগ্রিন

করিবার (Currency inflution) নীতি জার্ম্মাণীতে অনুসৃত হইবে।

বার্সিলোনার পতন—

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্পেনের সরকার পক্ষের প্রধান কেন্দ্র বার্সিলোনা নগর জেনারল ফ্রাঙ্কো অধিকার করিয়াছেন। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে এই নগরের পতন একটি স্মরণীয় ঘটনা। বিদ্রোহী সৈন্য কর্ত্তৃক বার্সিলোনা অধিকৃত হইবার পর জেনারল ফ্রাঙ্কোর সমর্থকগণ এই বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন যে, স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অবসানপ্রায়; অতি সত্বর স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। বার্সিলোনা হস্তচ্যুত হওয়ায় স্পেনের সরকার পক্ষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার ফলে স্পেনে অচিরে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখনও ক্যাটালোনিয়া প্রদেশের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল এবং মধ্য স্পেনে টেরুয়েল্ হইতে করডোবা পর্য্যন্ত এবং মাদ্রিদ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল সরকার পক্ষের অধিকৃত আছে। ইটালী ও জার্ম্মাণীর সাহায্যপুষ্ট বিদ্রোহী পক্ষের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও সরকার-পক্ষের দৃঢ়তা যে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই, তাহা বার্সিলোনা পতনের অব্যবহিত পরে সিনর নেগ্রীনের বক্তৃতা হইতে বুঝা গিয়াছে। বিদ্রোহী সৈন্য যখন বার্সিলোনা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, ঠিক সেই সময় মধ্য-স্পেনে এষ্ট্রেমেডুরা রণক্ষেত্রে অন্য একটি বিদ্রোহী বাহিনী একাধিকবার সরকার পক্ষের নিকট পরাজিত হইয়াছে।

পীরেনিজের অপর পারে উত্তর-পূর্ব্ব ক্যাটালোনিয়ার যে অংশটি এখনও সরকার পক্ষের অধিকৃত আছে, উহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই অঞ্চলটি বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে সরকার পক্ষ আর অধিক দিন যুঝিতে পারিবে কি না, তাহা বলা যায় না। সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ জানেন যে, নিরপেক্ষতা চুক্তি নামক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের চক্রান্তে স্পেন-সরকার অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত; পক্ষান্তরে ইটালী ও জার্ম্মাণী প্রকাশ্যে সর্ব্বতোভাবে জেনারল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতেছে। প্রকাশ্যে সরকার পক্ষ কাহারও সাহায্য পায় না বটে; কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া, ফ্রান্স, মেক্সিকো প্রভৃতি রাষ্ট্র গোপনে স্পেনের সরকার পক্ষকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। গত কিছুকাল ধরিয়া সমুদ্র-পথে এই সাহায্য প্রাপ্তি অত্যন্ত দুষ্কর হইয়াছে; কারণ, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটী হইতে ইটালীয় বিমানগুলি বৈদেশিক জাহাজের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই জন্য সরকার-পক্ষকে এখন পীরেনিজের দিক্ হইতে স্থলপথে প্রাপ্ত গোপন সাহায্যের প্রতিই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইতেছে।

বোমার আঘাতে বার্সিলোনার অবস্থা

বিমান আক্রমণের ফলে বার্সিলোনা

বার্সিলোনা পতনের পর ফ্রান্সের নিকট হইতে গোপন সাহায্য প্রাপ্তির আশায় সিনর নেগ্রীন তাঁহার স্বদেশবাসীকে আশার বাণী শুনাইতে পারিয়াছিলেন। সিনর নেগ্রীন সম্প্রতি একাধিকবার পীরেনিজ অতিক্রম করিয়া ফ্রান্স আসা-যাওয়া করিয়াছেন। ক্যাটালোনিয়া প্রদেশটি যদি সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহীদিগের অধিকৃত হয়, তাহা হইলে সরকার পক্ষের স্থলপথে সাহায্যপ্রাপ্তির উপায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবে। কাযেই, তখন তাহাদিগের পক্ষে অধিক-কাল যুদ্ধ পরিচালন সম্ভব হইবে কি না, তাহা বলা যায় না।

বার্সিলোনা বিজয়ে জেনারল ফ্রাঙ্কোর কোনই কৃতিত্ব নাই—বলিতে গেলে বার্সিলোনা জয় করিয়াছেন মুসোলিনি ও তাঁহার ইটালীয় বাহিনী। লণ্ডনে কমন্স সভায় বক্তৃতাকালে মিঃ এটলী শেষ মুহূর্ত্তে স্পেনকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সোমালিল্যাণ্ড আক্রান্ত হইবে।

মুসোলিনি একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি স্পেনে অথবা স্পেনের অধিকারভুক্ত কোন অঞ্চলে ইটালীর অধিকার বিস্তার করিতে চাহেন না। এই আশ্বাস লাভ করিয়াও ফ্রান্স নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। স্পেনের কোন অংশ ইটালীর অধিকারভুক্ত না হইলেও, ফ্যাসিষ্ট-স্পেন যে সম্পূর্ণরূপে ইটালীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কাযেই, স্পেনে জেনারল ফ্রাঙ্কোর বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য ফ্রান্সকে বস্তুতঃ ইটালীর উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। তখন টিউনিস্, সুয়েজ, জিবুতি প্রভৃতি সম্পর্কে ইটালীর যে দাবী,

বিদ্রোহী পক্ষের গোলন্দাজবাহিনীর বার্সিলোনায় প্রথম প্রবেশের দৃশ্য

[illegible]ন—যে বিদ্রোহী বাহিনী বার্সিলোনা অধিকার করিয়াছে, তাহাতে [illegible]কেরও অধিক ইটালীয় সৈন্য ছিল। শুধু তাহাই নহে, [illegible]সিলোনা পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে জেনোয়া ও স্পেজিয়ায় [illegible]০০০ এবং রোমে ৩০,০০০ ইটালীয় সৈন্য প্রস্তুত রাখা হইয়া-[illegible]। বার্সিলোনা পতনের পূর্ব্ব দিন ইটালী হইতে সরকারীভাবে [illegible]ষণা করা হয় যে, জেনারল ফ্রাঙ্কোর নিশ্চিত বিজয়ের পূর্ব্বে ফ্রান্স [illegible] সোভিয়েট রুশিয়া যদি স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা [illegible]লে ইটালী যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এই ভীতি প্রদর্শন [illegible] ৬০,০০০ সৈন্য সমাবেশের অর্থ সুস্পষ্ট। ইহা ব্যতীত, ইটালী [illegible] পূর্ব্ব হইতে আফ্রিকার ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের সীমান্তে সৈন্য [illegible]বেশ করিয়াছিল। এই সৈন্যসমাবেশের অর্থ—ফ্রান্স যদি তাহার পূরণে অসম্মত হওয়া ফ্রান্সের পক্ষে আর সম্ভব হইবে না। এই জন্যই জেনারল ফ্রাঙ্কোর সম্পূর্ণ বিজয়ের সম্ভাবনায় ফ্রান্স শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে এবং এই জন্যই সে এখনও সরকারপক্ষের সৈন্যকে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিয়া তাহাদিগের প্রতিরোধ-শক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

ত্রিশক্তির প্রতিবাদলিপি—

গত অক্টোবর মাসে ক্যাণ্টন এবং হাঙ্কাও জাপানী-সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার পর হইতে গত তিন মাসের মধ্যে সুদূর প্রাচীর যুদ্ধে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। জাপান তাহার অধিকৃত চীনা অঞ্চল হইতে বৈদেশিক শক্তিবর্গের বাণিজ্যাধিকার ক্ষুন্ন

করিতেছে, ইহা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ডিসেম্বর মাসের শেষে আমেরিকা জাপানের নিকট এই সম্পর্কে এক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিয়াছিল। ইহার পর, জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বৃটেন ও ফ্রান্স জাপানের নিকট দুইখানি কঠোর প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিয়াছে। এই তিনখানি লিপির সারমর্ম্ম একই প্রকার; তিনটি রাষ্ট্রই নয়-শক্তির চুক্তি ও অবাধ বাণিজ্যাধিকারের কথা উল্লেখ করিয়া জাপানকে জানাইয়াছেন যে, চীন সম্পর্কে সে একাকী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে, তাহা মানিয়া লইতে তাহারা প্রস্তুত নহে। জাপান এখনও এই সকল লিপির কোন উত্তর প্রদান করে নাই।

বৃটেন্, ফ্রান্স ও আমেরিকার মুখে আজ দেড় বৎসর পরে নয়-শক্তির চুক্তির কথা কৌতূহলোদ্দীপক। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহারা কেহ চীনের রাজনীতিক স্বাধীনতা হরণ করিবেন না; সকলে চীনে অবাধ বাণিজ্যাধিকার সম্ভোগ করিবেন। নয়-শক্তির চুক্তি স্বাক্ষর করিবার পর মার্কিণ-প্রতিনিধি সিনেটার আণ্ডারউড্ জোর গলায় বলিয়াছিলেন, "আটটি শক্তি আজ চীনের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া তাহাকে ভবিষ্যৎ কালের জন্য 'ম্যাগ্না কার্টা' প্রদান করিতেছে; চীনের স্বাধীনতা কখনও নষ্ট হইবে না—তাহার রাজ্যের সমগ্রতা কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না।" গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন এই 'ম্যাগনা কার্টা'কে ছিন্নপত্র জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, তখন নয়-শক্তির চুক্তির স্বাক্ষরকারিগণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কারণ, মাঞ্চুরিয়ায় তাঁহাদিগের কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ ছিল না। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে

অধিকৃত বার্সিলোনা সহরের অধিবাসীরা বিজয়ী বিদ্রোহী পক্ষের সেনাদলকে অভিবাদন করিতেছে

জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুকো অধিকৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈদেশিক শক্তিবর্গ সমানভাবে চীনকে দোহন করিতেছিল। মাঞ্চুকো অধিকৃত হইবার পর হইতে চীন-লুণ্ঠনের বৃহত্তর অংশ জাপান লাভ করিতে আরম্ভ করে। সে যাহা হউক, চীন-লুণ্ঠন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চীন এতদিন কোন প্রকারে আপনার রাজনীতিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। শোষক শক্তিগুলির মধ্যে কেহ যাহাতে দুর্ব্বল চীনকে গ্রাস করিয়া অন্যান্য শোষক শক্তিকে "কদলী প্রদর্শন" করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ওয়াসিংটনে নয়-শক্তির এক বৈঠক আহূত হয়। এই বৈঠকে নয়টি শক্তি এই মর্ম্মে জাপান যখন চীন আক্রমণ করে, তখনও নয়-শক্তির চুক্তির স্বাক্ষর-কারিগণ "ম্যাগ্না কার্টার" মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কারণ, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, চীনে বাণিজ্যসম্পর্কে জাপানের সহিত আপোষ-মীমাংসা করা অসম্ভব হইবে না। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ব্রুসেল্স্ সম্মিলনীতে শক্তিবর্গের ক্লৈব্য সংবাদপত্রের পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। আজ যখন চীনে অবাধ বাণিজ্য তথা চীনকে অবাধে দোহন সম্পর্কিত বিষয়ে জাপান বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বৃটেন্, ফ্রান্স ও আমেরিকা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থপরতার এই নগ্ন রূপ উপভোগ্য।

শ্রীঅতুল দত্ত
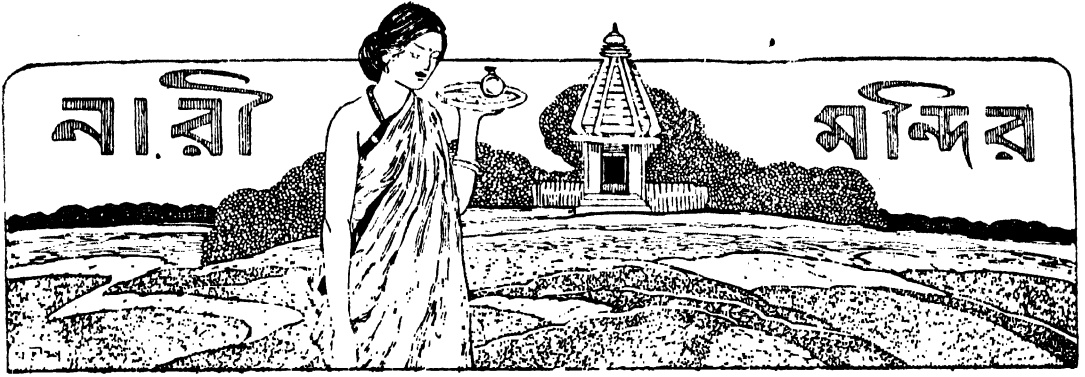
কুশন্

কুশনের চারখানি ছবি ছাপা হলো।

এ ধরণের সেলাই আজকাল অনেকেই করেন। এ-সজ্জা-সেলাইয়ে ঘরের শোভা বাড়ে। এ সেলাইয়ে পরিশ্রম বিশেষ নেই। কতকগুলো কাপড়ের টুকরো আর রঙ মিলিয়ে সুতো নিলেই কাজ চলবে। তবে এর প্রধান অসুবিধা এই যে, সকলে আমরা ছবি বা নক্সা আঁকতে জানি না। কাজেই প্রমাণ-সাইজের ছবি না পেলে ট্রেস (trace) করা শক্ত।

১নং ছবি দেখুন। এটি করতে হ'লে জমির কাপড়

১। পাহাড়-তলী

নেবেন ফিকে নীল রঙের; কিম্বা গোলাপী-আভাযুক্ত হলদে; কিম্বা ঐ ধরণেরি আকাশের কোনো-রঙের কাপড়।

তারপর সেই জমির উপর ছবিখানি ট্রেশ্ করে নেবেন। এবার গাছের পাতা-অংশের উপর সবুজ রঙের কাপড় ফেলে গাছের পাতার সাইজে কেটে নেবেন (ছবির আকারে)। এখন এই আঁকা কাপড়ের উপর গাছের-মাপে-কাটা সবুজ কাপড়ের টুকরোটুকু ফেলে পাতার সবুজ রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে সুতো দিয়ে বাট্‌ন্-হোল ষ্টীচ (Button-hole stich) করবেন।

তারপর গুঁড়ির ক্যাঁকড়া-বার-করা ডালপালার আকারে (shape) ব্রাউন রঙের দু'টুকরো কাপড় কেটে নিন। এইবার গাঢ় ব্রাউন রঙের সুতো দিয়ে ছবির উপরে কাটা টুকরো দুটিকে ফেলে বাট্‌ন্-হোল ষ্টীচ করুন।

গাছের তলার জমিটুকুও গাঢ় সবুজ রঙের এক-টুকরো কাপড়। মাঝের ঢালু—যার উপরে বাড়ীদুটি রয়েছে, ওর জন্য নেবেন অপেক্ষাকৃত ফিকে সবুজ রঙের কাপড়; তারপরের পাহাড়টি, ইচ্ছা করলে কালো কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে করতে পারেন; তবে গাঢ় সবুজ দিয়ে করলেই ভালো মানাবে। গাছদুটির পিছনে ঝোপের মতো যে গাছপালা আছে, ওটা ফিকে সবুজ কাপড়ের টুক্‌রোয় করা হয়েছে।

আকাশের মেঘ, ইচ্ছা করলে কাপড়ের টুকরো সেলাই করে

২। হাঁস ও মেয়ে

বসাতে পারেন। নয় তো আকাশের উপর ছবিতে যেমন আছে ব্যাক-ষ্টীচ (Back stitch) দিয়ে মেঘ সৃষ্টি করতে পারেন।

২নং ছবি—এ ছবিটিও একটি কুশনের। এ কুশনটি

করবার জন্যে ফিকে নীল রঙের কাপড় নেবেন। তার উপর ছবির আকারে সবুজ কাপড়ের টুকরো কেটে বটনহোল্ ষ্টীচ দিয়ে জুড়ে—নীচের ঘাসে-ঢাকা জমি করবেন। হাঁস দুটির গায়ের কাপড়ের টুকরো দুটি ধপ্‌ধপে সাদা; তার উপর সাদা সুতোর বটনহোল-ষ্টীচ। হাঁসের ঠোঁট দুটি কমলালেবু-রঙের (orange coloured) কাপড়ের টুকরো দিয়ে করা হয়েছে। পা-চারটিও তাই।

মেয়েটির সমস্ত দেহ এঁকে নেবেন একটা টুকরো কাপড়ের উপর; তারপর আলাদা রঙের সুতো দিয়ে টুপি-মুখ ইত্যাদির ধারি সেলাই করবেন। আগাগোড়া বাটন্‌হোল ষ্টীচে করবেন। জামার উপরকার ফুলগুলি ছুঁচ-সুতো দিয়ে তুলবেন; নয় তো ঐ রকম ফুলকাটা কাপড়ও ব্যবহার করতে পারেন। হাতের লাঠি আর কাপড় জুড়ে করবার দরকার নেই, ওটি সুতো দিয়েই করবেন। মেঘটুকু কাপড় জুড়ে করবার দরকার নেই—সাদা সুতো দিয়ে বাইরের লাইন (outline) এঁকে দেবেন।

৩নং ছবি—পেঙ্গুইনদের পেটের দিক্‌টা সাদা কাপড়ে, পিঠের দিক্‌টা কালো কাপড়ে এবং ঠোঁট ও পাগুলি কমলালেবু-রঙের কাপড়ে ঐ সব বিশিষ্ট রঙের সুতা দিয়ে করবেন। কুশনের জমির রঙ করবেন ধূসর (grey) বা সবুজ।
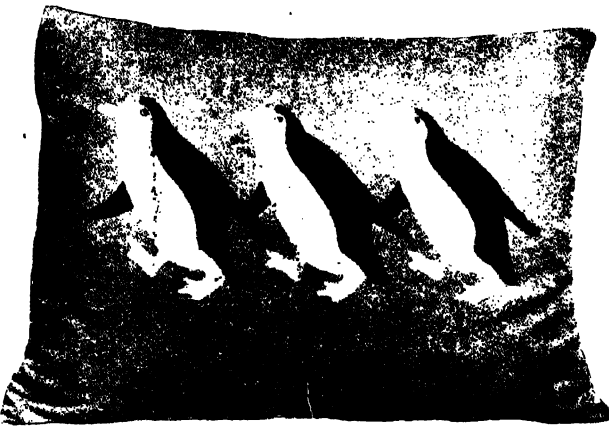
৩। পেঙ্গুইন্

৪। হরিণ

৪নং ছবি—কুশনের জমির জন্য নিতে হবে সবুজ-ঘাসের বা সবুজ পাতার রঙের কাপড়। জমির জন্য এ কাপড় হবে একটু মোটা ফিউজি-সিল্ক বা সুতির কাপড় বা ম্যাটি কিম্বা আলপাকা। অর্থাৎ কাপড়ের গা যেন মখমলের মতো মসৃণ বা ঝক্‌ঝকে না হয়—কাপড়ের গা হবে খশ্‌খশে।

হরিণের জন্য নিন্ বাদামী বা যে-রঙের হরিণ তৈরী করবেন, সেই রকম হরিণের গায়ের রঙের সিল্ক কাপড়। হরিণের চেহারা-অনুযায়ী এ কাপড় কেটে শিং, মুখ, গা পা-সমেত হরিণের ধারি (outline) কেটে নিন্! নিয়ে কুশনের জমিতে সেলাই করে নেবেন—সারা দেহের কিনারা ধারি যে ভাবে সেলাই করেন তেমনি ধরণে। সুতোর রঙ আর হরিণের গায়ের রঙ এক রকমের হওয়া চাই। চোখ তৈরী করবেন সাদা সুতো দিয়ে, চোখের তারা হবে কালো। নাকের বিঁধ এবং সে বিঁধের নীচে নাকের প্রান্তভাগ হবে কালো সুতোর। হরিণের গায়ের দাগ (spots) সাদা সুতোয় ছুঁচের সেলাই। হরিণের পায়ের নীচে জমির তৃণশস্যাদি তৈরী

করে নেবেন বাঁকা বা চক্ররেখায়—বটন্‌হোল ষ্টীচে। কাণের রেখা—কপাল থেকে স্বতন্ত্র রাখবার জন্য এবং গলা ও গায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রাখতে ধূসর রঙের সুতোয় ছবির ভঙ্গীতে বাঁকা রেখায় সেলাই তুলবেন।

সাধারণ ক্রশ-ষ্টীচ

৫নং ছবির কুশনটি বোধ হয় দেখতে ভালো লাগছে! সেলাই করা হয়েছে সাধারণ ক্রশ ষ্টীচ (cross-stitch) দিয়ে (কার্পেট বোনা হয় যে সেলাই দিয়ে)। ডিজাইন খুব নতুন নয়, কিন্তু রঙ মিলিয়ে করতে পারলে এতে বাহার খোলে চমৎকার।

কুশনটি করতে লেগেছে এক গজ ছ'গিরে সিল্ক সাটিন বা আল-পাকা-জাতীয় কাপড় (বহর ৩৬ ইঞ্চি)। সাধারণ কাশী-সিল্কের উপরও করতে পারেন।
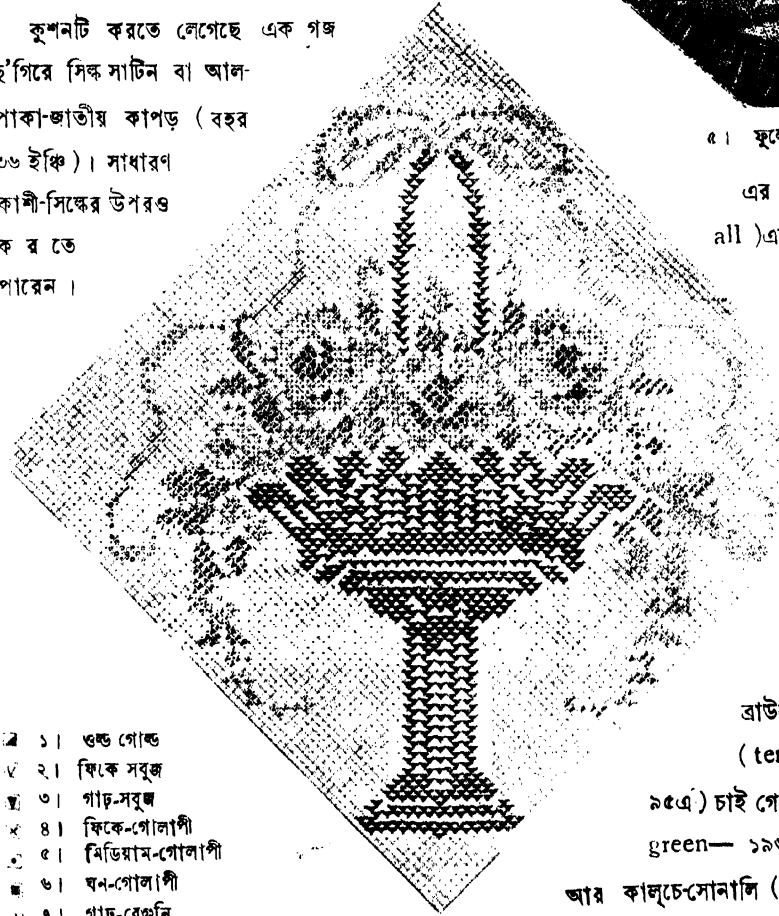
৫। ফুলের সাজি

১। ওল্ড গোল্ড
২। ফিকে সবুজ
৩। গাঢ়-সবুজ
৪। ফিকে-গোলাপী
৫। মিডিয়াম-গোলাপী
৬। ঘন-গোলাপী
৭। গাঢ়-বেগুনি
৮। ফিকে-বেগুনি

৭। সুতোর রঙ

৬। ফুলের সাজি

মোট কথা, সিল্কটুকু যেন বেশ খশ্‌খশে আর পুরু হয়। তা ছাড়া ম্যাটি কাপড়েও সেলাই করতে পারেন।

এর জন্য চাই পিয়ারসল্ (Pears-all)এর ম্যালার্ড ফ্লস (Mallard floss) সুতো ১ লচ্ছি করে—(D. m. c. সুতোতেও হতে পারে)। ফিকে বেগুনি সুতো (২৮১ শেড্); আর গাঢ়-বেগুনি-সুতো (২৮২এ) চাই সাজির রিবনের জন্যে। সোনালী-ব্রাউন (গোল্ড-ব্রাউন—শেড্ (১, ২৩); টেরা কোটা (terra cotta শেড্ নং ৯৩, ৯৪, ৯৫এ) চাই গোলাপ ফুলের জন্য। সবুজ (laurel-green— ১৯৬, ২০০ শেড্) পাতার জন্যে; আর কালচে-সোনালি (১০৪ বি শেড্) দরকার সাজির জন্য।

এ ছাড়া ১২ ইঞ্চি লম্বা ১২ ইঞ্চি চওড়া এক-টুকরো কার্পেট চাই; আর চাই কুশনে দেবার জন্য তুলো; যে রঙের-কুশনের জন্য কাপড় আনবেন, সেই রঙের কিম্বা তার

চাইতে গাঢ় রঙের কিছু কর্ড (cord) কুশনের ধারে দেবার জন্য।

এখন ঐ সিল্কের কাপড়টি দু-পাট করে সমান-মাপে

৮। ব্লাউশে হনিকম্ব (ল্যাটিশ্-প্যাটার্ণ)

দুটি চাকৃতি কেটে নিন। ঐ চাকৃতি দুটির একটির উপরের কার্পেটের টুকরোটি টেঁকে নিন। ৬ নং ছবি অনুযায়ী এইবার সুতো দিয়ে কাজ আরম্ভ করুন।

সাজিটি ঘর গুণে গুণে (কার্পেটের নিয়মে) তৈরী করবেন কাল্‌চে ব্রাউন সুতো দিয়ে। সাজির রিবন ও ফাঁশটি করুন ফিকে ভায়োলেট রঙের সুতো। পাতাগুলি—কিছু ফিকে-সবুজ, কিছু গাঢ়-সবুজ সুতো দিয়ে করুন। গোলাপ-ফুলগুলি গাঢ় লাল, ফিকে-গোলাপী কিম্বা গাঢ় গোলাপী রঙের করতে পারেন। তাতে শেড্ দেবেন সোণালী ব্রাউন সুতো দিয়ে, কিম্বা "টেরা-কোটা" (terra cotta) দিয়ে। তবে সব গোলাপগুলিই এক-সুতোয় করার চাইতে একটা ফিকে, দুটো গাঢ়, কিম্বা দুটো ফিকে একটা গাঢ় করলেই বোধ হয় ভালো হবে।

সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে কার্পেটটি যে সুতো দিয়ে আটকানো ছিল—ধারের সেই সুতোগুলি খুলে নেবেন। তারপর এমব্রয়ডারীর উপর আলুতোভাবে বুড়ো আঙুলের চাপ রেখে কার্পেটের সুতোগুলো এক এক করে টেনে বার করে নেবেন। উপর নীচে—দু'দিকের সুতোগুলো এই ভাবে খুলে নিয়ে সেলাইটির উল্টো দিকে গরম ইস্ত্রী চালিয়ে নেবেন।

এইবার সাড়ে তিন গজ লম্বা আর সওয়া দু' ইঞ্চি চওড়া একটি টুকরো কেটে নিন। এখন ঐ টুকরোটি এমব্রয়ডারী-করা টুকরোর সঙ্গে সমান করে কুঁচি দিয়ে নিন। এইবার ঐ কুঁচি-দেওয়া কাপড়ের টুকরোটি এমব্রয়ডারী-করা কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে দিন। জোড়ের মুখে গোল করে সরু দড়ি (cord) বসিয়ে নিন। উল্টো-দিক্‌টিও তৈরী করুন ঐভাবে। পরে, কাপড়ের টুক্‌রো দুটি মুখোমুখি করে জুড়ে নিন। জোড়বার সময় খানিকটা সেলাই করবেন না—ফাঁক রাখবেন। সে ফাঁক দিয়ে তুলো ভরতে হবে। সবটা জোড়া হলে,—যে-অংশটি ফাঁক রেখেছেন, সেইখান দিয়ে বেশ করে তুলো ভরে দিন কুশনটায়। এইবার কুশনের
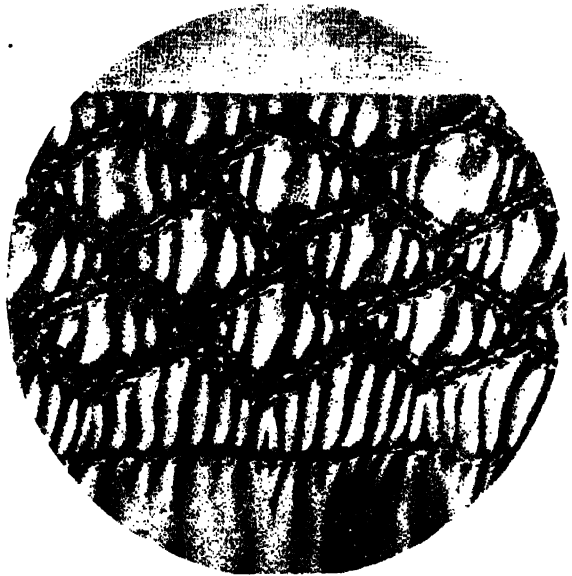
৯। ল্যাটিশ্-প্যাটার্ণ

বাকী অংশটুকু সেলাই করে নিন। এখন জোড়ের মুখে বাকী কর্ড-(দড়ি)টুকু বসিয়ে নিন।

এই সাজি সেলাইয়ে কোথায় কি রঙের সুতো ব্যবহার করবেন, ৭নং ছবিতে তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। তালিকা দেখে যথানুরূপ সুতো নেবেন।

হনিকম্ব (Hohey comb)

হনিকম্বের প্রচলন আজ-কাল খুব বেশী হয়েছে। সাধারণ ব্লাউশ বা ফ্রক—তাদের গলায় বা হাতে সামান্য একটুখানি হনিকম্ব করে দিলে সে ব্লাউশ ও ফ্রকে বাহার খুলে যায় শতগুণ। তার নিদর্শন এখনকার হাঙ্গেরিয়ান ব্লাউশ—যার চলন আজকালকার মহিলা-সমাজে খুব বেশী। অনেকে ভাবেন, হনিকম্বিং (Honey-combing) বা স্মকিং

১০। ব্লাউশ-সার্টে হনিকম্বের কাজ

১২। হনিকম্বের নানা ফোঁড়-তোলার নক্সা

(Smocking) করা বুঝি খুব শক্ত। কিন্তু সত্য বলতে ক, এত সহজে এ-কাজ করা যায় যে, হনিকম্বিং-এর মত হজ অথচ মনোরম সেলাই খুব কম আছে!

এই স্মকিং-এর সব-প্রথম প্রচলন হয়, ইউরোপের গ্রামে। মের পুরুষদের কাজ করবার সময় বার-বার হাতের াস্তিন ইত্যাদি নেমে পড়তো; কাজে অসুবিধা ঘটতো—ই মেয়েরা রকমারি সেলাই দিয়ে হাতের আস্তিন গুটিয়ে তেন। কালে এই স্মকিং কত সূক্ষ্ম সেলাইয়ে দিয়ে া যায়, তা নিয়ে প্রতিযোগিতা সুরু হলো। সেই

১১। হনিকম্ব-প্যাটার্ণ (ব্লাউশ-সার্ট)

প্রতিযোগিতার ফলে এই সূক্ষ্মতম হনিকম্ব-সেলাই নানা ছাঁদে প্রচার হতে লাগলো। এর দৌলতে মেয়েদের পোষাক আজ রকমারি শ্রীসৌন্দর্য্যে পরিপাটী হয়েছে।

হনিকম্ব কি উপায়ে করতে হয়, লিখে বোঝানো যাবে না। তাই ১২নং ছবিগুলির আশ্রয় নিতে হয়েছে।

সাধারণ স্বাস্থ্য

একালের মেয়েদের সম্বন্ধে অনুযোগ উঠিয়াছে এই যে, শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে বাঙ্গালার অন্তঃপুর শ্রীহীন হইতেছে। পর্দ্দার সে আবরণ আজ বহু ক্ষেত্রে উন্মোচিত; কিশোরী কুমারীরা হাঁটিয়া স্কুল-কলেজে চলিয়াছেন,—পড়াশুনায় তাঁদের অনুরাগ প্রবল—কিন্তু স্বাস্থ্য, শ্রী ও সৌন্দর্য্য যে আজ বাঙ্গালার নারী-সমাজকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমাদের হতাশ্বাসের সীমা নাই!

এই শ্রী ও সৌন্দর্য্য পরিম্লান হইবার কারণ, দেহ-চর্য্যা সম্বন্ধে মেয়েদের ঔদাস্য। আমাদের দেহে নিত্য-দিন বহু ক্লেদ, বহু বিষ পুঞ্জিত হয়। সে বিষ, সে ক্লেদ যদি নিত্য দিন যথারীতি নিষ্কাশিত না করি, তাহা হইলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে লাবণ্য, শ্রী ও সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক বড়

নিবিড়; কাজেই স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-লাবণ্যের অবসান ঘটে।

গায়ের উপরে যে ত্বক্ বা চামড়া আছে, তাহার স্বাস্থ্যের উপর বর্ণের দীপ্তি, কমনীয়তা ও মসৃণতা নির্ভর করে। এই গাত্র-ত্বক্কে নিত্যদিন ঘর্ষণে-মর্দ্দনে ক্লেদহীন রাখা প্রয়োজন। শুধু স্নানে এ কাজ হয় না। ঘষিয়া ঘষিয়া অঙ্গে তৈল মর্দ্দন বা হাত দিয়া নিত্যদিন যথারীতি একবার করিয়া অঙ্গ ঘর্ষণ-মর্দ্দন করা চাই। করিলে গাত্রাবরণ শুধু লাবণ্যদীপ্ত থাকিবে ভাবিবেন না, ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি-কাসি বা জ্বরের আশঙ্কাও দূর হইবে।

ঠাণ্ডা লাগিলে সর্দ্দি হয়। তার কারণ, গাত্রত্বক্ অস্বাস্থ্য ও ক্লেদযুক্ত থাকা হেতু সে ঠাণ্ডা রোধ বা প্রতিষেধ করিতে পারে না। সুপরিমিত ও সুনিয়মিত খাদ্য, আলো-বাতাস এবং সহজ ব্যায়াম—সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্য-নাশক।

ইতর পশুপক্ষী মুক্ত বাতাসে বাস করে। তারা প্রচুর আলো-বাতাস পায়। সেজন্য তাদের দেহ স্বাস্থ্য থাকে ভালো—দেহের ছাঁদ থাকে পুষ্ট নধর সুন্দর। কৃত্রিমতার চাপে নর-নারী স্বাস্থ্যহীন হইতেছে, এবং তাদের দেহের ছাঁদ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশ্রী কদাকার হইতেছে।

আলো-বাতাস, নিয়মিত ও সুপরিমিত খাদ্য-পানীয় দেহ-রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে চাই ব্যায়ামজনিত নিয়মিত অঙ্গ-চালনা। তাহা হইলে রূপলাবণ্য বা স্বাস্থ্য-শ্রী কোনোটাকেই হারাইতে হইবে না।

১। মেজেয় চিৎ ২। দু'পা ফাঁক

মেয়েদের সহজ ব্যায়াম-পদ্ধতির কথা বলিতেছি। এ ব্যায়ামে স্বাস্থ্য ও শ্রী রক্ষা পাইবে।

১। মেঝেয় চিৎ হইয়া শুইতে হইবে। দু' হাঁটু দুমড়াইয়া প্রথমে মাটীতে বা মেঝেয় পা রাখুন। তার পর দু'দিকে কোমরের নীচে দুই হাত দিয়া কোমর ধরিয়া কোমর হইতে পায়ের দিক্ ঊর্দ্ধে তুলুন। এক পা হাঁটুর দিকে দুমড়াইয়া মাটীতে রাখিবেন—অন্য পা ঊর্দ্ধে তুলিবেন। এ সময় দেহের ভর থাকিবে মাথা এবং দু'হাতের কনুইয়ের উপর (১নং ছবি দেখুন)। পরে যে-পা ঊর্দ্ধে তুলিয়াছেন, সেই হাঁটু দুমড়াইয়া সেই পায়ের উপর মাটীতে দেহের ভর রাখিবেন এবং অপর পা ঊর্দ্ধে তুলিবেন। এই ভাবে দুই পা লইয়া পর্য্যায়ক্রমে বারো বার তোলা-নামা করিতে হইবে। এ ব্যায়ামের ফলে ঘাড় ও পিঠ মজবুত থাকিবে—ঘাড় ও পিঠের গড়ন হইবে সুছাঁদের।

২। দু'পা ফাঁক' করিয়া দাঁড়ান। দুই হাত থাকিবে ঊর্দ্ধে প্রসারিত। এবার কোমরের কাছ হইতে দেহ বাঁকাইয়া একটি হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিত রাখুন—অপর হাত দিয়া—প্রথমে ডান হাত দিয়া—বাঁ পায়ের পাশে ভূমি স্পর্শ করুন। তার পর আবার দাঁড়ান; দাঁড়াইয়া এবার ডান হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিত রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া ডান পায়ের পাশে ভূমি স্পর্শ করুন। (২নং ছবি) এ ব্যায়ামে লিভার ও পাকস্থলী সুস্থ থাকিবে; অজীর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিবে না। পেটে চর্ব্বি জমিয়া থলথলে ভুঁড়ি হইবে না।

৩। একখানি চেয়ার রাখিয়া—চেয়ার হইতে এক ফুট দূরে দাঁড়ান। দুই হাত রাখুন পিছন দিকে কোমরের নীচে নিতম্বের উপর। তার পর পিছন দিকে অর্থাৎ পিঠের দিকে দেহ বাঁকান। এমন ভাবে বাঁকাইতে হইবে, পিঠের মেরুদণ্ড যেন চেয়ারের পিঠ স্পর্শ করে (৩ নং ছবি)। এ ব্যায়ামে মাজা মজবুত হইবে—তলপেটের গড়ন সুশ্রী সুছাঁদ থাকিবে।

৩। একখানি চেয়ার

৪। উপুড় হইয়া শুইতে হইবে—হাত দুটি থাকিবে

৪। উপুড় হইয়া

পিছনে জোড়-বাঁধা (৪ নং ছবি দেখুন)। এবার মাথা ও দুই পা যতখানি-সম্ভব ঊর্দ্ধে তুলুন—সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত জোড়-বাঁধা ভাবে তুলিবেন। যতখানি পারেন, তুলিতে হইবে। এভাবে দশ-বারো বার নৌকার মতো দুলিয়া তার পর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। এ ব্যায়ামে সারা দেহের গঠন হইবে মেদহীন, ঋজু ও সরল।

৫। দুই পা ছড়াইয়া মেঝেয়

৫। দুই পা ছড়াইয়া

বসুন। দু'হাত ঊর্দ্ধে তোলা থাকিবে। তার পর দেহের ঊর্দ্ধাংশ বাঁকাইয়া দুই হাত দিয়া দুই পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন (৫ নং ছবি)। এবার পা ছাড়িয়া দেহ সোজা করিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বসুন। আবার দেহ বাঁকাইয়া পূর্ব্বোক্তভাবে দুই হাত দিয়া দুই পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। এইভাবে দেহ বাঁকানো ও সিধা করা চলিবে বারো বার কিম্বা ষোল বার। এ ব্যায়ামে দেহ ছিপছিপে থাকিবে; কোথাও মাংসপিণ্ড জমিয়া দেহকে হতশ্রী করিবে না।

৬। চিৎ হইয়া শুইতে হইবে। দু পা প্রসারিত রাখুন। দুই হাত থাকিবে পাশে লম্বালম্বি শায়িত। তার পর বাঁ পা প্রসারিত করিয়া ডান পা দুমড়াইয়া

৬। চিৎ হইয়া শুইয়া
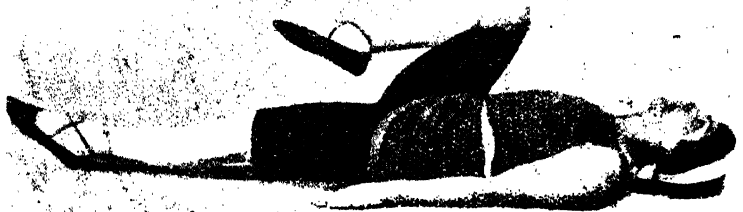
পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ঝাঁকানি দিয়া নড়ুন। (৬ নং ছবি)। এ ব্যায়ামে পায়ের গড়ন সুশ্রী হইবে—শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ভালো হইবে। এ ব্যায়াম বেশ দ্রুততালে করা চাই।

৭। দু'পা ফাঁক করিয়া বসুন। তার পর দু'হাত পিছন দিক্ হইতে আনিয়া মাথার পিছনে রাখিয়া (৭ নং ছবি দেখুন) মাথা নোয়াইতে হইবে। মাথা নোয়াইয়া এবার মাথা দিয়া বাঁ পায়ের হাটু স্পর্শ করুন। পরের বার ডান পায়ের হাঁটু স্পর্শ করুন। এ ব্যায়ামে অনাবশ্যক মেদ লোপ পায়—দেহাভ্যন্তরের সকল শিরা-উপশিরা ও যন্ত্রাদি সুস্থ সবল সক্রিয় থাকে।

৮। চিৎ হইয়া শুইয়া দুই হাত ছড়াইয়া দিন। তার পর ৮ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই পায়ের হাঁটু মুড়িয়া দেহ-ভাগ উর্দ্ধে তুলুন। মাথা ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকিবে। এ ব্যায়ামে দেহ মজবুত হইবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণে অনেকের হাঁফ ধরে—অথচ বুকে কোনো দোষ নাই! এ অস্বাচ্ছন্দ্য মোচন না করিলে যে-কোনো ব্যাধির আক্রমণে দেহ জর্জ্জরিত হইতে পারে। এ অস্বাচ্ছন্দ্য-মোচনের জন্য প্রয়োজন, জোরে নিশ্বাস-বায়ু-গ্রহণ। প্রত্যহ নিয়ম করিয়া ক্ষণকাল জোরে নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সর্ব্বদা নাক দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন। হাঁ করিয়া মুখ দিয়া নিশ্বাসবায়ু কদাচ গ্রহণ করিবেন না। মুখ দিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করিবেন—ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে হইবে। ফুশফুশে অক্সিজেন বাষ্প জোগানো চাই। জোরে নিশ্বাস-গ্রহণে সে কার্য্য সুসংসাধিত হয়। নিশ্বাস গ্রহণের জন্য দুটি ব্যায়াম-প্রণালীর কথা বলিতেছি—

৭। দু'হাত পিছন দিকে

৮। দুই পায়ের হাঁটু

৯। নাক দিয়া নিশ্বাস

১০। দু'হাত মাথার দিকে

(ক) ৯ নং ছবির ভঙ্গীতে চিৎ হইয়া শুইয়া নাক দিয়া নিশ্বাস টানিয়া অনেকখানি বায়ু গ্রহণ করুন এবং মুখ দিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগ করুন। দু'হাত উপরে তুলিয়া রাখা চাই।

(খ) ১০ নং ছবির ভঙ্গীতে দু'হাত মাথার দিকে প্রসারিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুন। এভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিলে সে

নিশ্বাস-বায়ু দেহাভ্যন্তরে সকল স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে।

৯। চিৎ হইয়া শুইয়া দু'পা জোড় গাঁথিয়া প্রসারিত রাখুন। তার পর মাথা ও কাঁধের ভার দেহের উপর রাখিয়া দু'পা ঊর্দ্ধে তুলুন। পা তুলিবার সময় দু'পা পরস্পরকে

১১। মাথা ও কাঁধের ভার

ছুঁইয়া থাকিবে (১১ নং ছবি)। প্রথমে যতটা পারেন পা তুলিবেন। অভ্যাসে এ ব্যায়াম ক্রমেই রপ্ত হইবে। এ ব্যায়ামে সমস্ত দেহের গড়ন সুছাঁদের হইবে।

এ কয়টি ব্যায়াম নিত্য দিনের জন্য। এ ব্যায়ামে হাঙ্গামা নাই। সকলের নয়নান্তরালে ঘরে দ্বার দিয়া এ ক'টি ব্যায়াম অনায়াসে করা চলে। করিলে দেহ যেমন সুঠাম হইবে, তেমনি তাহা লাবণ্যদীপ্ত থাকিবে এবং ব্যাধি দেহকে আশ্রয় করিবে না।

সজ্জা-বিলাস

ও-ডি-কলোঁ

গতবারে গন্ধ-সুরভি—সেণ্ট অর্থাৎ এসেন্স কি ভাবে ব্যবহার করা উচিত, সে কথা বলিয়াছি। এবারে সে সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলিতেছি।

সুগন্ধে দেহ মন ভালো থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। নিত্য-প্রসাধনের পক্ষে ও-ডি-কলোঁ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবে বাজে ও-ডি-কলোঁ কিনিবেন না; ভালো জিনিষ কিনিবেন।

প্রত্যহ কেশ-প্রসাধন মেয়েদের পক্ষে শুধু সুশ্রী দেখাইবার জন্য প্রয়োজন, এমন মনে করিবেন না। নিত্য সযত্নে কেশ প্রসাধন না করিলে কেশের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। কেশ নির্ম্মূল হয়; এবং কালো কেশে অকাল-শুভ্রতা দেখা দেয়। এজন্য মেয়েদের পক্ষে নিত্য-কেশ-প্রসাধন না করিলে নয়।

নিত্য কেশ-প্রসাধনের মতো অঙ্গ-প্রসাধনও নিত্য করা চাই। নহিলে গায়ের বর্ণ মলিন হইবে, কর্কশ হইবে। তাছাড়া চর্ম্মরোগে কষ্ট-যাতনার সীমা থাকিবে না। এই অঙ্গপ্রসাধন সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, বলিতেছি।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গা ধুইয়া দুই হাতে অল্প ও-ডি-কলোঁ ঢালিয়া দুই বগলে মাখিবেন। মাখিলে আরাম বোধ করিবেন,—বগলে দুর্গন্ধ হইবে না,—বগল ঘামিয়া জামায় দাগ ধরিবে না। হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত তেল-মাখার ভঙ্গীতে ও-ডি-কলোঁ মাখিবেন। তাহা করিলে পা বেশ নরম থাকিবে; পায়ের তলা ফাটিবে না।

আধ পাঁইট গোলাপ-জলে বড় চামচের এক চামচ ও ডি কলোঁ মিশাইয়া একটা স্বতন্ত্র শিশিতে রাখিবেন। এই গোলাপ-জলমিশ্রিত ও-ডি-কলোঁ নিত্য গায়ে-পিঠে ও মুখে ঘষিয়া মাখিবেন। মুখ ও গা কোমল থাকিবে; অঙ্গে লাবণ্য-দীপ্তি থাকিবে।

মাথার চুল যদি তৈলাক্ত থাকে, তাহা হইলে চুল বাঁধিবার সময় এক-টুকরা তুলায় অল্প ও-ডি-কলোঁ ঢালিয়া সেই তুলা দিয়া মাথার চুলের গোড়া ঘেঁষিয়া জোরে জোরে মাথা ঘষিবেন। ইহা করিলে মাথার চুলে তেলা-ভাব থাকিবে না, চুলের গোড়া মজবুত্ থাকিবে এবং মাথায় খুস্কি বা মরামাষ জন্মিবে না। মাথায় ও ঘাড়ে অল্প ও-ডি-কলোঁ ঘষিয়া মাখিতে ভুলিবেন না।

এ ভাবে নিত্যদিন অঙ্গ-সাধনা করিলে অঙ্গের মাধুরী ও লালিত্য কোনো কালে নষ্ট হইবে না। স্নিগ্ধ-সুরভিতে আরাম পাইবেন এবং দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে।

মাথা ধরিলে মাথায় অনেকে ও-ডি-কলোঁর পটী দেন,—তাহা না দিয়া ঘাড়ে ও-ডি কলোঁ ঘষিলে মাথাধরা শীঘ্র সারে।

তেলা গা

অকারণে অনেকের মুখ ঘামিয়া এমন তৈলাক্ত হয় যে, মুখে শ্রী থাকে না এবং সেজন্য অনেকখানি অস্বাচ্ছন্দ্য উপলব্ধি করেন। কেহ কেহ বলেন, কমলা লেবুর রস বা আঙুর খাইলে এ তৈলাক্ত-ভাব ঘোচে; সকলের পক্ষে কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। বার্লি-সেবনে এ অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকার হয়।

বড় চামচের চার-চামচ ভালো বার্লি নিন; জলে সে বার্লি ধুইয়া পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখিয়া ধোওয়া সাফ-করা বালি সেই পাত্রে ছাড়িয়া দিন। তার পর জ্বালে চড়াইয়া হাতা দিয়া নাড়িবেন। বার্লি ফুটিলে আর-একটি পাত্রে তাহা ঢালিয়া রাখুন। এই জ্বাল-দেওয়া সিদ্ধ বার্লির জলে চার পেয়ালা ফুটন্ত জল ঢালিয়া তাহাতে একটি পাতি লেবুর রস নিঙড়াইয়া মিশান। এবারে এই বার্লি জুড়াইতে দিন। জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইলে অল্প চিনি বা মিছরির গুঁড়া দিয়া বার্লি পান করুন।

এই ভাবে নিত্য তৈয়ারি করিয়া বার্লি পান করিলে মুখের ঘর্ম্মসিক্ত তৈলাক্তভাব নিঃশেষে ঘুচিবে।

সেকাল ও একাল

সেকালেও ক্ষুধা পেত সুধা ছিল অন্ন,—
মেয়েদের শুভ হাতে রান্না!
ভাঙ্গিয়া স্নেহের নীড় প্রগতির জন্য
কাঁদে নাই নারী মায়াকান্না!
একালে উড়িয্যাবাসী পাচকের ছদ্মে
হেঁসেলের ভার নিয়ে ধন্যি;
নাটক-সিনেমা-ঘোর দুটি আঁখি-পদ্মে—
তন্ময় একালের তন্বী!

তরুণেরা ভরা ছিল বলে আর বীর্য্যে,
লক্ষ্মী রহিত বাহুলগ্ন,
ক্ষেপণ করিত কাল জমাইয়া ভীড় যে—
বৃদ্ধেরা অবসর-মগ্ন।
একালে তরুণ ধরে বেকারের পন্থা,
হুজুগে নিয়ত নির্লিপ্ত,
বুড়োদের খেটে খেটে বেরিয়েছে কণ্ঠা,
সংসার-ঘানি টেনে ক্ষিপ্ত।

সেকালে বিদ্বৎজন শ্রেয়ঃ সব কার্য্যে—
ছিল সমাজের শিরোরত্ন,
রাজার আদর ছিল আপনার রাজ্যে
সব ঠাঁই বিদ্যার যত্ন।
পণ্ডিত পচে আজ পায় না সে মাইনে
গাঁয়ে-গাঁয়ে পাঠশালা চক্ষে;
একালে ধনীর ঠাঁই সকলের ডাইনে—
মানী তারা দুনিয়ার চক্ষে।

নামে সেকালের রাজা তরুণীর কর্ত্তা,
কাণ্ডারী ছিল তার মন্ত্রী;
বাজিয়ে বিহনে কোন নাচিয়ের সত্তা,—
কল্পনারও পরিপন্থী।
একালে যতই জ্ঞান থাক্ গবুচন্দ্রে
মন্ত্রী যে নৃপতিরই ভৃত্য,—
রাজা হবুচন্দ্রের সাথে মত-দ্বন্দ্বে
রাজকীয় গোঁ-টাই জিত্‌তো।

শ্রীঅদ্বৈতকুমার সরকার।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশীয় রাজন্য ও রাষ্ট্র সম্মেলন

সার সন্মুখম্ চেট্টি কোচিন রাজ্যের দেওয়ান। তিনি গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলে ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে দেশীয় রাজন্য ও রাষ্ট্র-সম্মেলন (Federation) সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি প্রথমতঃ কোচিন রাজ্যে যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। অনেকেই বলেন যে, দেশীয় রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলিতে স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠিত। সার সন্মুখম্ সে কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে আধুনিক পদ্ধতিসম্মত সুশৃঙ্খল শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, হাইদ্রাবাদ, বরোদা, কাশ্মীর এবং অন্যান্য রাজ্যের নাম করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা গত জানুয়ারী মাসের 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বর্ত্তমান সময়ে কোচিন রাজ্যে যেরূপ শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কথা তিনি বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন যে, কোচিন রাজ্যের প্রজাবর্গ জাতীয়ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র চাহিয়াছিলেন। কোচিনের মহারাজা সেই জন্য তাঁহাদিগকে জাতীয় শাসনতন্ত্র দিয়াছেন। কোচিন ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার বিস্তার দেড় হাজার বর্গ মাইল। জনসংখ্যা সাড়ে বার লক্ষের উপর। ইহার বাসযোগ্য ভূমিতে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১ হাজার [illegible]শত লোকের বাস। এই রাজ্যের রাজস্ব আদায় হয় ১ কোটি টাকা। এই রাজ্যে বেশ শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে। ইহার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে শতকরা ৮০ জন এবং নারীর মধ্যে শতকরা [illegible] জন লেখাপড়া জানে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্যে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই এই সভার হস্তে বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা পরিষদই সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া আসিতেছেন। তাহাতে মহারাজা হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহার পর গত বৎসর জানুয়ারী মাসে এদেশে শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ শাসনসংস্কার ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের কোচিন রাজ্যের শাসনসংস্কার আইন নামে অভিহিত।

কোচিনের বৃদ্ধ মহারাজ ৭৬ বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে প্রজাদিগকে এই শাসনাধিকার প্রদান করেন। গত বৎসর ১৭ই [illegible] (২রা আষাঢ়) এই শাসনসংস্কারের বার্ত্তা বিঘোষিত হয়। এই শাসনব্যবস্থাটি অত্যন্ত সরল। রাজ্যে ব্যবস্থাপক সভা একটি মাত্র। উহার সদস্যসংখ্যা ৫৮টি। তন্মধ্যে ৩৮টি সদস্য প্রজা সাধারণের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত। ৮ জন উনজন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মহারাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, আর ১২ জন সরকারী আমলা এবং বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তা। যে প্রজা সরকারে বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে কর দেয়, সেই ভোটদানের অধিকারী। যে ব্যক্তি School final পাশ করিয়াছে, তাহাকেও ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কেবল লাটিন খৃষ্টান এবং থিয়াস সম্প্রদায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী চাহিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী দেওয়া হইয়াছে। নারীদিগকেও পুরুষের ন্যায় ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগের সদস্য হইবার অধিকারও দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যদি সর্ব্বনিম্ন সংখ্যায়ও নির্ব্বাচিত না হইতে পারে, সেই জন্য তাহাদের জন্য দুইটি সদস্যের আসন স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে।

ব্যবস্থা পরিষদকে সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কেবল নিম্ন বিষয় কয়টির বিষয় আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। যথা :—

(১) মহারাজের সহিত বৃটিশ সরকারের এবং অন্য রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ।

(২) বৃটিশ সরকারের সহিত সন্ধি বা চুক্তি।

(৩) রাজ্যের সামরিক ব্যাপার।

(৪) হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের বিচারকার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আচরণ এবং

(৫) মহারাজের অধীনস্থ মন্দির সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রভৃতি।

উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় ভিন্ন ব্যবস্থাপক সভা শাসনসম্পর্কিত সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবার অধিকার পাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন রাজ্যের রাজস্ব-সম্পর্কিত বিষয়, রাজ্যস্থ কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সম্পর্কিত অধিকার সম্বন্ধে অথবা মহারাজের স্বীয় কোন বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে ঘোষণার বিষয় ঐ সভায় আলোচনা করিতে হইলে পূর্ব্বে মহারাজের মঞ্জুরী লইতে হয়। ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিবার অধিকার সদস্যদিগের আছে, তবে কেবলমাত্র উল্লিখিত ৫ দফা বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা তাহা পারিবেন না। ব্যবস্থাপক সভায় যে পাণ্ডুলিপি পাশ হইবে, মহারাজ তাহাতে সম্মতি দিলেই তাহা আইনে পরিণত হইতে পারিবে। মহারাজ কোন পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত করিবার অনুমতি না দিতেও পারেন। তবে তিনি অনুমতিদানে প্রায় অসম্মত হন না।

কাউন্সিলে রাজ্যের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিশদভাবে লিখিয়া পেশ করিতে হয়। কয়েকটি বিশেষ বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ই কাউন্সিল আলোচনা করিতে পারেন। যে কয়টি বিশেষ বিষয় আলোচনার বহির্ভূত তাহা এই,—(১) যে সকল বিষয়ে খরচ অবশ্য করিতেই হইবে, যথা কর্ম্মচারীদিগের পেন্সন, নিঃস্বার্থ দান ও পারিতোষিক দান, দেনার সুদ, সরকারী ঋণ পরিশোধের তহবিল প্রভৃতি। কতকগুলি বিশেষ রাজকর্ম্মচারীর বেতন এবং মহারাজের দান সম্পর্কিত ব্যাপারও কাউন্সিলের আলোচ্য নহে।

হস্তান্তরিত বিষয়গুলি মন্ত্রীদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হস্তান্তরিত করা হইয়াছে; যথা,—কৃষি, সমবায় সমিতি, কুটীর-শিল্পের বিকাশসাধন, স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা এবং পতিত জাতির উন্নতির ব্যবস্থা। মন্ত্রীদিগের বেতন কাউন্সিলের অধিকার-ভুক্ত। মন্ত্রীর সহিত দেওয়ানের মতভেদ হইলে মহারাজই সেই বিষয়ের চরম মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকেন।

দেখা যাইতেছে যে, কোচিন রাজ্যে স্বৈরশাসনই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সার সম্মুখম্ বলেন—

বৃটিশ-শাসিত রাজ্যের স্বৈরশাসনের দোষ ইহাতে নাই। কারণ, দেশীয় রাজ্যের আমলারা সকলেই রাজ্যের লোক। অন্য দেশ হইতে তাঁহারা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসেন নাই। আমলারা কার্য্য হইতে অবসর লইয়া দেশের মধ্যেই দশ জনের একজন হইয়া বাস করেন। সুতরাং দেশবাসীর স্বার্থ হইতে তাঁহাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে।

আমরা এ সম্বন্ধে দেওয়ানজীর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। স্বৈরশাসনের যে দোষ, তাহা কিছু পরিমাণে ইহাতে থাকিবেই। তবে এ প্রবন্ধে আমাদের সে কথা আলোচ্য নহে।

সার সম্মুখম্ চেট্টি স্বীকার করিয়াছেন যে, যাহাতে কোচিন রাজ্যের সামন্ত রাজা নিখিল ভারতীয় ফেডারেশনে অর্থাৎ রাষ্ট্র-সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কোচিনের দেওয়ানরূপে এই শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি কোচিনের মহারাজাকে ঐ ভাবে শাসনসংস্কার করিবার পরামর্শ দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে সংশয় হইয়াছিল যে, এইরূপ শাসন-সংস্কার করিলে ভারতের সার্ব্বভৌম মণ্ডলেশ পক্ষ (Paramount powere) কি মনে করেন। অনেকে সে সংশয়ের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী শক্তি তাহা কিছুই মনে করেন নাই। এখানে স্বতঃই মনে হয়, তাঁহাদের মনে ঐরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল কি অকারণ? আর এলবিয়ন ব্যানার্জ্জি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও সার সম্মুখমের পূর্ব্বে কোচিনের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই বলিয়াছিলেন যে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সার রবু বর্ম্মার ইচ্ছানুসারে কোচিনে এক মন্ত্রণা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়া মণ্ডলেশ্বর শক্তির নিকট তাহা পেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মণ্ডলেশ্বর শক্তিধর ঐ ব্যবস্থা অত্যন্ত উৎকট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সে জন্য উহা প্রবর্ত্তিত করা হয় নাই; সুতরাং সামন্ত রাষ্ট্রপতিকে যে চক্রবর্ত্তী শক্তিধরের ভয়ে সঙ্কুচিত থাকিতে হয়, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সামন্তেশ্বর যতই স্বাধীনচেতা হউন না কেন, মণ্ডলেশ্বরের মন রাখিয়া তাঁহাকে চলিতেই হইবে। ইহা স্বাভাবিক।

তাহার পর আসল কথা। সার সম্মুখম্ রাজন্যবর্গের ভারতীয় ফেডারেশন বা রাষ্ট্র-সম্মেলনে যোগ দিবার পক্ষে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অনেকে মনে করিতেছেন যে, রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিরা উন্নতিসাধক কার্য্যের একটা অতি প্রবল অন্তরায় হইবেন। ঐ সকল প্রতিনিধি ভারত সরকারের রাজনীতিক বিভাগের ইঙ্গিতে চলিবেন। সামন্তেশ্বরগণই ইঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন। সার সম্মুখম্ বলিয়াছেন যে, সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। কিন্তু তিনি তাহার যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। নিখিল ভারতের আর্থিক স্বার্থ একরূপ বলিয়াই যে তাঁহারা মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা দেখাইতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। সামন্তরাজ্যের প্রজারা অবাধে এবং স্বাধীনভাবে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং রাষ্ট্রীয় সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবেন এরূপ ব্যবস্থা যদি আইনে থাকিত, তাহা হইলেও বরং কতকটা আশা থাকিত। রাজন্যবর্গ যদি তাঁহাদের মনের মত লোকদিগকে ব্যবস্থা পরিষদে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে সে আশা থাকিবে না, ইহা কেবল কংগ্রেসের রাজনীতিকদিগের মত নহে—উদারনীতিকরাও ঐকান্তিক ভাবে ঐ মত পোষণ করিয়া থাকেন। ভারত সরকারের রাজনীতিক বিভাগ ঐ সকল সদস্যের উপর চাপ দিয়া কোন পক্ষে মতামত দিতে না বলিলেও তাঁহারা নিজ মেরুদণ্ডের দৃঢ়তার অভাবে অনেক সময় ঠিক নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে মত দিতে পারিবেন না—এরূপ শঙ্কা করিবার কারণ আছে। অনেক বিষয়ে মানুষের দুর্ব্বলতা থাকেই। সেই জন্য দেশের লোকের পক্ষ হইতে সদস্য-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। লর্ড স্যামুয়েল এবং লর্ড লোথিয়ানও বলিয়াছিলেন যে, ফেডারেশন প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে দেশের জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা যাহাতে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, এইরূপ একটা ব্যবস্থা করা নিতান্তই আবশ্যক। ইঁহারা উভয়েই এই ফেডারেশনের বিশেষ সমর্থক। আমরা ইঁহাদের অধিকাংশ কথারই সমর্থন করিতে পারি না।

লর্ড লোথিয়ান বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্রবাদী বৃটিশ শাসিত ভারতের সহিত স্বৈরশাসিত ভারতের গাঁইট-ছড়া বাঁধিলে তাহার ফলে বিশেষ মঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। দুই জন সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির লোককে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলে কোন ক্ষেত্রেই তাহার ফল ভাল হইতে পারে না।

এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা পরিষদে ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২৫ জনকে রাজন্যবর্গের মনোনীত সদস্য নির্ব্বাচিত করিলে তাহার ফল কোনরূপেই হিতসাধক হইতে পারিবে না। আবার রাষ্ট্রীয় পরিষদেও আড়াই শত সদস্যের মধ্যে ১০৪ জন সদস্য রাজন্যবর্গের মনোনীত হইবেন। অর্থাৎ উভয় পরিষদে সম্মিলিত সদস্যসংখ্যা হইবে ৬২৫, তাঁহাদের মধ্যে রাজন্যবর্গেরই মনোনীত সদস্য হইবেন ২২৯টি। উভয় পরিষদে প্রায় শতকরা ৩৬ জন সদস্য রাজন্যদিগের হাতের লোক হইবেন। উভয় পরিষদে রক্ষণশীল এবং প্রগতিবিরোধী সদস্য অনেক থাকিবেই। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় পরিষদ দুইটিতে জাতীয়তাবাদী দলের আর কিছুই করিবার উপায় থাকিবে না। শাসনসংস্কার আইনের পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন,—তাঁহারা এত অধিক সংখ্যক সদস্য রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত করিবার ব্যবস্থা কেন করিলেন, তাহা অতি স্থূলবুদ্ধি লোকেরও বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কোচিনের দেওয়ান বাহাদুর যতই শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, এই সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই ব্যবস্থায় রাজন্যদিগের সুবিধা হইবে না,—বৃটিশ-শাসিত ভারতবাসীদিগেরও সুবিধা হইবে না। প্রবল পক্ষের ভয়ে সশঙ্ক দুর্ব্বলকে প্রবলের ছন্দানুবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিতে হয় না,—দুর্ব্বল স্বীয় অস্তিত্বরক্ষার জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নিজ বুদ্ধি অনুসারেই স্থির করিয়া লয়। অনেক সময় সে ভুলও করে। দুর্ব্বলের মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হইয়াই থাকে। সুতরাং চক্রবর্ত্তী-শক্তি সামন্তরাজকে যতই স্বাধীনতা প্রদান করুন না কেন,—সামন্তরাজ যে সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনভাব প্রকটিত করিতে পারিবেন, তাহা আমরা আশা করি না। এ দুর্ব্বলতা তাঁহাদের মানসিক হইলেও উহা উপেক্ষা করা যায় না। সেই জন্য আমরা সামন্তরাজদিগের ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যবস্থার সমর্থন করিতে পারি না। মানবমাত্রেরই একটা মস্ত দোষ এই যে, তাহারা সদাই দাদার জয় গাহিয়া থাকে। আমরা কোন পক্ষকে দোষ দিতে চাহি না। স্বভাবের প্রভাব অনিবার। সেই জন্য আমরা রাজন্যগণের মনোনীত এত সদস্য গ্রহণের ঘোর বিরোধী। অতএব ঐ ফেডারেশন অগ্রাহ্য।

এই শাসনতন্ত্র পরিকল্পনায় অনেক দোষ হইয়াছে। ইহাতে শাসনপদ্ধতির স্বাভাবিক বিকাশের পথ রাখা হয় নাই। মিঃ সি, আর, এট্‌লি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ তারিখে বলিয়াছিলেন,—The Simon Commision among other things definitely laid it down that the Constitution should contain within itself the seeds of growth. In the whole of the proposal there is no suggestion of growth. There is no suggestion that at any time or on any occasion will the power of the Governor-General be relaxed. ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, "সাইমন কমিশন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, এই শাসনপদ্ধতিতে বিকাশের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত প্রস্তাবের মধ্যে বিকাশের কোন ব্যবস্থাই নাই। কোন সময়ে বা কোন উপলক্ষে বড় লাটের ক্ষমতা যে শিথিল করা হইবে, তাহাও বলা হয় নাই।" ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় এ দেশের কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই ইহা গ্রাহ্য করিয়া লইতে পারেন না। কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এত আঁটাসাঁটা যে, তাহাতে পাশ ফিরিবার উপায় রাখা হয় নাই। সুতরাং এই প্রকার অচল ও আড়ষ্ট ব্যবস্থা কোন দূরদর্শী ব্যক্তিই গ্রহণ বা সমর্থন করিতে পারেন না। সেই জন্য ইহাতে এদেশের কোন রাজনীতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই সম্মত হইতে পারেন নাই।

রাজন্যবর্গের এইরূপ অধিকার থাকা আইনসঙ্গত কি না, তাহা অবশ্য যাঁহারা শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আইনে (Constitutional law) বিশেষজ্ঞ, তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা সে সম্বন্ধে এ স্থলে অধিক কথা বলিলাম না। দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁহাদের রাজ্যমধ্যে গণতন্ত্রের দর্শনধারী কোন ব্যবস্থা করিলেই যে তাঁহাদিগকে নিখিল ভারতের সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্রে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই।

বিহারে বাঙ্গালী সমস্যা

গত জানুয়ারী মাসে বার্দ্দোলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিহারে বাঙ্গালী-সমস্যাসংক্রান্ত নির্দ্ধারণের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ওয়ার্কিং

কমিটীর সদস্যগণ বিহারে বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সদস্যবৃন্দের নির্দ্ধারণে প্রধানতঃ নয়টি সিদ্ধান্ত স্থান পাইয়াছে। প্রথম সিদ্ধান্তে কমিটী অখণ্ড ভারত গড়িবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তের শেষে আছে, "Nevertheless the Committee are of opinion that in regard to services and like matters the people of the provinces have certain claims which cannot be over-looked." অখণ্ড ভারত রচনা আদর্শ হইলেও, প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীদিগের চাকরী প্রভৃতি ব্যাপারে যে স্বাভাবিক নিশ্চিত দাবী আছে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। ইহাতে অখণ্ড ভারতবর্ষ রচনায় প্রাদেশিকতার বাধা কি প্রবল হইয়া উঠিবে না?

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে, "There should be no bar preventing employment of any Indian living in any part of the country from seeking employment in any other part."—যে কোন প্রদেশের ভারতীয় যে কোন প্রদেশের চাকরী পাইতে পারিবেন, তাহাতে কোন বাধা হইবে না। কিন্তু তাহার পরই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, "Preferential treatment to the people of the province"—প্রদেশের লোকের দাবীই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য হইবে। মোট কথা,এখানেও প্রাদেশিকতার প্রভাব সর্ব্বাগ্রে অনুসরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে যে, বিহারী ও বাঙ্গালাভাষাভাষী অধিবাসীদিগের মধ্যে বিহারে কোন পার্থক্য করা যাইবে না। চাকরী প্রভৃতি ব্যাপারে উভয় শ্রেণীর প্রতি সমান ব্যবহার করা হইবে। অন্যান্য প্রদেশের লোকদিগের দাবী বিবেচনা করিবার সময় উল্লিখিত দুই শ্রেণীর লোকের দাবী অগ্রে স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক।

চতুর্থ সিদ্ধান্তে দেখা যায় যে, ডমিসাইল সার্টিফিকেট প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে। আবেদনকারীরা তাহাদিগের আবেদনপত্রে শুধু জানাইবে, তাহারা ঐ প্রদেশের অধিবাসী, ঐ প্রদেশেই জন্ম অথবা তথায় ডমিসাইলরূপে বসবাস করিতেছিল।

পঞ্চম সিদ্ধান্তের নির্গলিতার্থ, আবেদনকারী প্রমাণ করিয়া দেখাইবেন যে, উক্ত প্রদেশকেই তিনি আপনার বাসস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে কতকাল বসবাস করিতেছেন, নিজের বাড়ী আছে কি না, তিনি অন্য কোন সম্পত্তির মালিক কি না, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে। যাহা হউক,ঐ প্রদেশে জন্ম এবং একাদিক্রমে ১০ বৎসর ঐ প্রদেশে বসবাস করিতেছেন, ইহাই পর্য্যাপ্ত প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবে।

উল্লিখিত তিনটি সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ডমিসাইল সার্টিফিকেট-প্রথা বিলুপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইলেও, প্রকারান্তরে ডমিসাইল সার্টিফিকেটে যে সব প্রমাণ প্রদান করিতে হয়, তাহার সবই বজায় রহিল। ইহাতে অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হইল কি?

এক্ষেত্রে প্রদেশে জন্মই তাহার অধিকার সাব্যস্তের জন্য ব্যবস্থিত হইলেই ঠিক হইত না কি? একাদিক্রমে ১০ বৎসর কোন প্রদেশে বাস না করিলে প্রাদেশিক অধিকার সাব্যস্ত হইবে না। এই প্রকার নির্দ্ধারণ অত্যন্ত কঠোর। বিহারে জন্মগ্রহণ করিবার পর, ঘটনাক্রমে কেহ যদি ৯ বৎসরের অধিককাল একাদিক্রমে কোন বারই বাস করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তিনি সেই অপরাধে প্রাপ্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। এরূপ নিয়ম সঙ্গত ও শোভন নহে। কমিটী এক্ষেত্রে ৫ বৎসর একাদিক্রমে বাস করা দরকার যদি বলিতেন, তাহা হইলে আদৌ অসঙ্গত হইত না।

ষষ্ঠ নির্দ্ধারণটি প্রশংসনীয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সরকারী কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পার্থক্যসূচক কোন ব্যবহার করা হইবে না। কার্য্যকালের অধিকার এবং যোগ্যতা বিচার করিয়া প্রমোশন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সপ্তম নির্দ্ধারণটি ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়া নির্দ্দেশিত। বিহার প্রদেশে যে কোন ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবেন। এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা বুঝা গেল না। কারণ, যে কোনও ভারতীয় ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে ব্যবসা করিতে পারেন। তাহাতে বাধা দিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার কোন সম্প্রদায়ের নাই। কমিটীর উচিত ছিল, এই প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীকে ভাষাগত শ্রেণীভেদের দিক্ দিয়া কোন প্রকার বাধা দিতে পারিবেন না—এইরূপ নির্দ্ধারণ প্রদান করা। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব কেন?

অষ্টম নির্দ্ধারণটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নার্থী-দিগের সম্বন্ধে। কমিটী বলিয়াছেন, "Places may be reserved for different Communities in the province but resevation should be in a fair proportion, preference in such educatiual institutions may be given to people of the province." বিষয়টিকে অত্যন্ত জটিল বলিয়াই মনে হইবে। কারণ, কোন সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ, সংখ্যাল্প-সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, যদি সংখ্যানুপাতে গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ছাত্রগণের তুলনায় অধিক সংখ্যায় বিদ্যার্জ্জনে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে এবং উচ্চতর অথবা উচ্চতম পরীক্ষার জন্য আগ্রহশীল হন, তখন কি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত সংখ্যানুপাতে তাহারা অধ্যয়নের অবকাশ পাইবে? এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যাপারে, কখনই সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই ব্যাপারে পরীক্ষায় পারদর্শিতা অনুসারে ব্যবস্থা হওয়াই নিরপেক্ষতার দ্যোতক।

নবম নির্দ্ধারণটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষার ভাষা-ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী স্থানে বাঙ্গালা ভাষাতেই শিক্ষা প্রদান করা হইবে। যেখানে হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলিত, তথায় হিন্দী ভাষা শিক্ষার বাহন হইবে। ইহা ঠিক যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ব্যবস্থিত হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাতেও এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইলে সুসঙ্গত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রাদেশিক ভাষা, এ ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু বিহারের অন্তর্গত মানভূম জেলা প্রভৃতি স্থানে, যেখানে, বাঙ্গালাভাষাভাষী সংখ্যারই অত্যধিক প্রাচুর্য্য, সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষায় হিন্দুস্থানী ভাষার সাহায্যেই শিক্ষালাভ করিতে হইলে, ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ব্যবস্থা।

মোটের উপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এই নির্দ্ধারণ মন্দের ভাল—তাঁহারা সকল বিষয়ে সুবিচার করিতে পারিয়াছেন, ইহা বলা চলে না।

বাঙ্গালায় হিন্দুর সংখ্যা নির্ণয়

আদমসুমারী আসন্ন। কংগ্রেস ইতঃপূর্ব্বে আদমসুমারী বর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিগত আদমসুমারীর যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল, তাহা যে নির্ভরযোগ্য নহে, এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ বিদ্যমান। আসন্ন আদমসুমারী যাহাতে নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, সে বিষয়ে দেশের নেতৃবৃন্দের চেষ্টা অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অসঙ্গতরূপে কোন সম্প্রদায় যাহাতে সংখ্যাবৃদ্ধির সুযোগ না পান, সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে হইবে।

রোয়েদাদ এবং বাঙ্গালার বিচ্ছিন্ন অংশের পুনরুদ্ধার-কল্পে সুসঙ্গতরূপে আদমসুমারীর কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব যেমন অধিক, দেশের নেতৃবৃন্দের সতর্ক দৃষ্টিরও প্রয়োজন তেমনই অনিবার্য্য। আশা করা যায়, দেশের কল্যাণকারী নেতৃবৃন্দ সময় থাকিতে বাঙ্গালায় হিন্দুর সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থায় অবহিত হইবেন।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

দুই বৎসরের মধ্যে ই, আই রেলে ৬ বার ভীষণ ট্রেণ-দুর্ঘটনায় বহু নরনারী হতাহত এবং বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এই ভাবে ট্রেণ-দুর্ঘটনার ফলে জনসাধারণের মনে একটা আতঙ্কসঞ্চার স্বাভাবিক।

গত ১১ই জানুয়ারী গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে হাজারীবাগ রোড ও চিচাকীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ডেরাডুন একস্‌প্রেস্ ট্রেণের ধ্বংস-সংবাদ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। হত, আহত এবং নিরুদ্দিষ্টের সংখ্যা যে কত, রেল-কর্ত্তৃপক্ষ এখনও তাহা নির্ভুলভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

এই ট্রেণ-ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, দুর্ব্বৃত্তরা রেল লাইন সরাইয়া লইবার ফলেই উক্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সে জন্য প্রথমতঃ, অপরাধীকে ধরিতে পারিলে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। পরে উহার পরিমাণ ২৫ হাজার হইয়াছে।

ট্রেণ-ধ্বংসের যে কারণ রেল-কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ ও প্রমাণাবলী যতক্ষণ না প্রকাশ পাইতেছে, ততক্ষণ উহা পর্য্যাপ্ত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন হয় না। এতদিনে অনুসন্ধানের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। সমগ্র ট্রেণে কত যাত্রী ছিল, তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

ডেরাডুন একস্‌প্রেসের ব্যাপারে দুইটি প্রধান জিনিষ লক্ষ্য করিবার। কতিপয় গাড়ী রেল-লাইন হইতে বিচ্যুত

হইয়া পড়িয়াছিল এবং পরে আগুন লাগিয়াছিল। গাড়ীতে ব্যাপকভাবে আগুন ধরিয়া যাওয়ায় অনেক আহত ব্যক্তিও আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বিবরণে জানা যায় যে, গাড়ী লাইনচ্যুত হইবার কয়েক মিনিট পরেই আগুন ধরিয়া যায়। প্রজ্বলিত ধ্বংসস্তুপের মধ্য হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, তাড়াতাড়ি অগ্নিনির্ব্বাণের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কাল ধূমায়িত অগ্নি বিদ্যমান ছিল।

কর্ত্তৃপক্ষের বিবরণে আগুন লাগিবার হেতু এবং অগ্নি নির্ব্বাণপ্রচেষ্টায় ঔদাসীন্যের কোন কারণ প্রদত্ত হয় নাই। সময়মত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে হয় ত যাত্রীদিগের দ্রব্যাদির কিয়দংশ এবং অনেক যাত্রীর প্রাণরক্ষা হইতে পারিত।

কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, রেল-লাইন উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল বলিয়াই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও জনসাধারণ নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না। দিল্লী মেল এই স্থান রাত্রি ১টা ৫০ মিনিটের সময় অতিক্রম করিয়াছিল। প্রায় ৩টা ১৫ মিনিটের সময় ডেরা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হইয়াছিল। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে এই দুর্ব্বৃত্ত দল অত্যন্ত কর্ম্মনিপুণ বলিতে হইবে এবং তাহাদিগের কাছে উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য যাহারা করিতে পারে, তাহারা সাধারণ লোকও নহে।

মোটের উপর, এই দুর্ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ-সম্বন্ধে যে সকল অনুমান প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আদৌ সন্তোষজনক নহে। প্রকাশ্য নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটী গঠিত করিয়া এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না হইলে, জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া শীঘ্র প্রকাশ্য তদন্ত কমিটীর ব্যবস্থা করুন। ই, আই, রেলের কর্ম্মচারীদিগের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কালবিলম্ব করা কখনই সঙ্গত হইবে না।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টপদে সুভাষচন্দ্র

এ বৎসর নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিপদে কে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহা লইয়া বহু আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া সভাপতি-পদ-প্রার্থী হইয়াছিলেন।

ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া প্রতিযোগিতায় অসম্মত হইয়া প্রথমে দাবী প্রত্যাহার করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়ার অনুকূলে আপনার নাম প্রত্যাহার করেন। ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াও সহসা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু

বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—দীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মূল্যবান্ উপদেশে উৎসাহিত হইয়া নির্ব্বাচনে অগ্রসর হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তিনি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবেন।

সঙ্গে সঙ্গে বার্দ্দোলী হইতে সপ্তরথি-স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল—শ্রীযুক্ত বসুর পুনর্নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নাই। ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়াই উপযুক্ত ব্যক্তি; তাঁহাকেই ভোট দিতে হইবে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, ভুলাভাই দেশাই, বাবু

রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি কংগ্রেসের সপ্তরথীর এই অভিযান দেখিয়া দেশবাসী বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্রের প্রচারিত বিবৃতির মর্ম্ম এইরূপ—

আমি ওয়ার্কিং কমিটীর ক্রীড়ণক নহি। দলবিশেষের মনোনয়ন—প্রতিনিধিগণের সভাপতি নির্ব্বাচন স্বাধীন মনোভাবের পরিচায়ক। প্রতিনিধিগণের ইচ্ছানুসারে ভোট দিবার স্বাধীনতা না থাকিলে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনা নিরর্থক। নরমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলের বিশ্বাসভাজন যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী সভাপতি নির্ব্বাচন প্রয়োজন।

গত ২৯শে জানুয়ারী সভাপতি নির্ব্বাচন উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। বাঙ্গালার প্রিয়তম সুসন্তান শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিযোগিতায় ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়াকে ১ শত ৯৯ ভোটে পরাজিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রকে ৪ শত ৪ ভোট প্রদান করিয়া বাঙ্গালীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

উড়িষ্যা, বিহার, অন্ধ্র ও গুজরাট ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকেই অধিক ভোট দিয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, আসাম, তামিলনাইডু (মাদ্রাজ), কেরল, কর্ণাটক, আজমীর, মাড়োয়ার প্রভৃতি সুভাষচন্দ্রকে সমধিক ভোট দিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, এই তুমুল নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতায় মহাত্মা গান্ধী প্রথমে কোনও "বাণী" প্রদান করেন নাই। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের অবসানে তিনি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই পরাজয় পট্টভীর নহে, তাঁহারই পরাজয়। কারণ, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহার এই বিরোধের কোন হেতু তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই। করিলে, দেশের লোক অবস্থাটা বুঝিয়া দেখিতে পারিত।

ভুয়া কংগ্রেস-সদস্যগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের ভোটে সুভাষচন্দ্র বিজয়ী হইয়াছেন বলিয়া অনুযোগ করিতেও মহাত্মাজী বিস্মৃত হন নাই। তবে মহাত্মাজী এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, সুভাষ বাবু দেশের শত্রু নহেন! দেশের জন্য তিনি ক্লেশ বরণ করিয়াছেন। সুভাষ বাবু তাঁহার নীতি ও কর্ম্মতালিকাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল মনে করেন। গান্ধীজী কামনা করিয়াছেন, সুভাষ বাবুর নীতি ও কর্ম্মতালিকা সফল হউক। লঘিষ্ঠদল যদি তাঁহার নীতি ও কর্ম্মতালিকার সহিত সমান তালে চলিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য মহাত্মাজী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যেন কোন বাধা সৃষ্টি না করেন।

গান্ধীজীর উক্তি হইতে মনে হইয়াছিল, বল্লভী দল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর পদ ত্যাগ করিবেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, খান আবদুল গফুর খান, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম, মিষ্টার কৃপালিনী, মিষ্টার শঙ্কররাও দেও, মিষ্টার ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাপ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই দ্বাদশ জন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি একাদিক্রমে ১৫।১৬ বৎসর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। নূতন দল তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিলে জাতীয় সাধনা কিরূপ সাফল্যলাভ করে, তাহা দেখিবার বিষয় নহে কি? কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের চারি আনার সদস্য নহেন, তখন সহসা সুভাষচন্দ্রের বিজয়ে বিচলিত হইলেন কেন?

কংগ্রেসের জাতীয় যজ্ঞের হোমানল যে বাঙ্গালী মনীষিগণ-প্রজ্বালিত, তাঁহাদের ত্যাগদীপ্ত দেশাত্মবোধের আহুতিপুষ্ট, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া কংগ্রেসের ইতিহাসে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্ব্বাচনে বাঙ্গালীমাত্রেই যে গৌরব অনুভব করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সামন্তরাজ্য

'মাসিক বসুমতীর' কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে বিভিন্ন সামন্ত-রাজ্যে স্বৈরাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রজাবৃন্দের জাগরণ, তাহার ফলে প্রজা-নিপীড়নের কথা আলোচিত হইতেছে।

সম্প্রতি রাজকোট, জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, দেশনেতৃগণ তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়াছেন। শেঠ যমুনালাল বাজাজ জয়পুরের লোক। জয়পুর রাজ্যে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা, রাজা পোলো খেলিতে বিলাতে গিয়াছেন জানিয়া শেঠ যমুনালাল প্রজামণ্ডলের সভাপতিত্ব করিবার জন্য গত ২৯শে ডিসেম্বর জয়পুরে যাইতেছিলেন। পথে মাধোপুর ষ্টেশনে তাঁহার উপর রাজ্যে

যমুনালাল বাজাজ

প্রবেশ নিষেধের আদেশ জারী হইয়াছিল। অহিংসমন্ত্রের উপাসক বাজাজ মহাশয় শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ লইতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জয়পুরে প্রবেশ না করা সম্ভব হইবে না, এই অন্যায় আদেশ অমান্যের জন্য জয়পুরের সরকারই দায়ী হইবেন।

১লা ফেব্রুয়ারী তিনি জয়পুরে গমন করিলে, জয়পুর ষ্টেট পুলিস সদলবলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মথুরা ষ্টেশনে নামাইয়া দেয়। তথা হইতে তিনি আগ্রায় গমন করেন। আগ্রা হইতে শিকর-যাত্রার পথে শেঠজী ৫ই ফেব্রুয়ারী ঠিকারী বাওয়ারী ষ্টেশনে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে তিনি বলিয়াছেন, জন্মভূমিতে প্রবেশে জন্মগত অধিকার কখনই আপত্তিকর হইতে পারে না। মহারাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনপ্রয়াসে অহিংস সংগ্রাম চালাইবার জন্য তিনি প্রজামণ্ডলে বাণী প্রদান করিয়াছেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী ভরতপুর রাজ্য-সীমানায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে যাত্রাপথে তাঁহাকে আজমীর রোড ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়া এক ডাক-বাঙ্গলায় আটক রাখা হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রেপ্তারের জন্য তাঁহার বাম গণ্ড আহত হইয়াছে। তাঁহার গ্রেপ্তারে জয়পুরে সত্যাগ্রহ—বিক্ষোভ প্রদর্শনের শোভাযাত্রা—বিভিন্ন স্থানে হরতাল হইয়াছে।

রাজকোটে সর্দ্দার বল্লভভাই সত্যাগ্রহ করিবার জন্য নেতৃত্ব করিতেছেন। মহাত্মাজীর পত্নী শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ এবং সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের কন্যা কুমারী মণিবেন প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে তাঁহারা রাজকোটে পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় পুলিস তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজকোট সীমান্তের প্রহরিবেষ্টিত এক বাঙ্গলায় আটক রাখিয়াছিল। ৭ই ফেব্রুয়ারী দেবীদাস গান্ধীর বিবৃতিতে প্রকাশ—তাঁহাদিগকে একটি নিকৃষ্ট নিভৃত পল্লীগ্রামে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। কস্তুরীবাই অসুস্থ, চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা নাই। ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ২৭তম ডিক্টেটর ও ২ শত ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। সত্যাগ্রহ, শোভাযাত্রা ও বক্তৃতাদি সমভাবেই চলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী ৯ই ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে বলিয়াছেন, জন্মভূমিপ্রবেশপ্রয়াসে প্রত্যেকবার শেঠ যমুনালালকে ফুটবলের মত জয়পুর রাজ্যের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া অতীব কুৎসিত আচরণ। এজন্য ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী সম্পূর্ণ দায়ী।

অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সামন্ত বা করদরাজ্যের শাসকগণ যে নবযুগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া চলিবার মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে পারিতেছেন না,

তাহা সুস্পষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যের অধিকারীর ইচ্ছা থাকিলেও, স্থানীয় রেসিডেন্টের নির্দ্দেশে দমন-নীতি অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। রাজকোটের ব্যাপারে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, "রাজকোটে বৃটিশ রেসিডেণ্ট 'রক্তনখ' প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজকোটের রাজাকে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করিয়া রাখিয়া, রাজকোটে রেসিডেণ্ট 'ত্রাস-শাসন' আরম্ভ করিয়াছেন। * * ২৬ জন স্বেচ্ছাসেবককে

বন্দী শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী

রাত্রিতে দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হইয়াছে। * * এজেন্সী পুলিস ষ্টেট এজেন্সী নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ও বিভিন্ন গৃহে খানাতল্লাসী হইয়াছে। রাজকোটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

মহাত্মাজী প্রজাবৃন্দকে ক্ষিপ্ত না হইয়া শান্ত—সংযতভাবে ঐ নির্ম্মম অত্যাচার বরণ করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলকেও গান্ধীজী দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাজকোটে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সার্ব্বভৌম শক্তির নিকট মন্ত্রিগণের আবেদন করিবার নিশ্চিত অধিকার আছে এবং ইহা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যও বটে। সার্ব্বভৌম শক্তির করদ-রাজ্যের প্রজাগণকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মহাত্মাজী তালচের সম্বন্ধেও উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রিগণকে অনুরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, তালচেরের ২৬ হাজার প্রজাকে যদি উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল নিরাপত্তা, বক্তৃতার অধিকার, সামাজিক ও রাজনীতিক কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা দানের আশ্বাস প্রদান করিয়া তালচেরে তাহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মন্ত্রীর আরাম আসনে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি?"

মহাত্মাজীর আবেদনে রাজপ্রতিনিধি কি উপায় অবলম্বন করেন, তাহা দ্রষ্টব্য। তবে এ কথা ঠিক, রাজন্য-শাসিত বহু স্থানে অনাচার ক্রমেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। ইহা আদৌ সুলক্ষণ নহে। শাসক ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীতে অচল, ইহা যদি রাজন্যগণ এখনও বুঝিতে না পারিয়া থাকেন, তবে এই ভ্রমের ফল, কাহারও পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন

জলপাইগুড়ীতে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের ৩৮তম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ সুদীর্ঘ, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনায় পূর্ণ।

শরৎ বাবু তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাকে সম্পূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমাদিগের উপর। কিন্তু ইহার জন্য বাঙ্গালীর যে নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।"

কথা খুবই সত্য। ঐক্য সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজনীয়, কিন্তু বাঙ্গালী সেই ঐক্যস্থাপনে সহায়তা করিতে গিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন করিতে পারে না। নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য

না হারাইয়াও একীভূত ভারত-রাষ্ট্রগঠনে বাঙ্গালী সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে পারে।

ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, নিখিল ভারতবর্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত করা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। কিন্তু ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতিকগণ ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, সে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নহে। শরৎ বাবু তাঁহার অভিভাষণে এই কথাটা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সামন্তরাজ্যসমূহ গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর তাঁহাদিগের

শ্রীযুভ শরৎচন্দ্র বসু

শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে অসম্মত। বৃটিশ-ভারতের প্রদেশসমূহ অংশতঃ গণতান্ত্রিক নীতির দ্বারা পরিচালিত; রাজন্ত-ভারত স্বৈরতান্ত্রিক। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য সমুদ্রপ্রমাণ। শরৎ বাবু বলিয়াছেন, "এই দুই শ্রেণীর বিপরীতধর্ম্মী উপরাষ্ট্র লইয়া কোন উপযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র বা 'ফেডারেশন' সৃষ্ট হইতে পারে না।"

বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিকগণ একথা বুঝেন না, এমন বলা চলে না। কিন্তু তাঁহারা তথাপি তথাকথিত সংহিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের জন্য ব্যগ্র। বর্ত্তমান অবস্থায় যে ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে শাসনব্যবস্থা চলিয়াছে, তাহা ভারতবাসীর অনভিপ্রেত। শরৎ বাবু বলিয়াছেন, "উহাতে কংগ্রেস কর্ত্তৃক বর্জ্জিত, পুরাতন দ্বৈতশাসন রূপান্তরিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।" প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হইলে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির উপর গণপ্রতিনিধিগণের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না। সামরিক বিভাগের উপরও জনপ্রতিনিধিগণের কোন ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগই ঘটিবে না। অথচ ভারতবাসী এই দুইটি বিষয়ের উপর স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে চাহে—ভারতবর্ষের ভাবী কল্যাণের জন্য তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শরৎ বাবু তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। সমগ্র বাঙ্গালাভাষাভাষী জনগণকে একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত রাখা অত্যাবশ্যক। এখনও বাঙ্গালার বহু বিচ্ছিন্ন অংশ অন্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। শরৎ বাবু বলিয়াছেন, "সেই সকল অঞ্চলকে বাঙ্গালায় ফিরাইয়া আনা কর্ত্তব্য।" 'মাসিক বসুমতী' এ বিষয়ে অনেক দিন হইতেই আলোচনা করিয়া আসিতেছে। শরৎ বাবু বলিয়াছেন, "বিচ্ছিন্ন অংশগুলি বাঙ্গালায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য নিখিল ভারতের কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। * * কোন বাঙ্গালীর পক্ষে এই সঙ্গত দাবী ত্যাগ করা সম্ভব নহে। যদি সকল বাঙ্গালী এক প্রদেশের মধ্যে একীভূত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রকৃত ফেডারেশন স্থাপিত হইতে পারে না।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক অধিকারের কোন সঙ্কোচসাধন করা হইবে না।"

রাজনীতিক কারণে যে সকল নর-নারী এখনও মুক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের মুক্তিকামনায় শরৎ বাবু আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে রাজনীতিক বন্দীদিগের মুক্তি-দাবীর প্রস্তাবও হইয়াছে। গান্ধীজী ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে সচিবমণ্ডলী সম্মত না হওয়ায়, নিন্দা করা হইয়াছে

শরৎ বাবু বাঙ্গালার সচিববৃন্দের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। "সরকার

কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যাপারে তাঁহাদিগের এই মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে" বলিয়া তিনি অভিযোগ করিয়াছেন।

কৃষকদিগের কল্যাণকল্পে এবং তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য যাঁহাদিগের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণের সঙ্গত ব্যবস্থা করিয়া চিরস্থায়ী ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ভবিষ্যতে তুলিয়া দিতে হইবে,—কিছুদিন হইতে এইরূপ আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং সরকার উপযুক্তরূপ গঠনকার্য্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না। বাঙ্গালার জমীদাররা শিল্প ও ব্যবসায়ে অর্থনিয়োগ করেন নাই, সেজন্য বাঙ্গালী চিরদিন ব্যবসা-শিল্প-বিমুখ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য সরকার প্রজার খাজনা হ্রাস করিয়া তাহার সাহায্যকল্পে অগ্রসর হইতে অসমর্থ। এই সকল যুক্তি ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলা চলে কি? সত্য বটে, বাঙ্গালার জমীদাররা ভূমিতেই অর্থ নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাভাবে তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যের জন্য অর্থ নিয়োগ করিতে পারেন না। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই যে বাঙ্গালী ব্যবসা ও শিল্পবিমুখ, ইহা স্বীকার করা যায় না। ইহার অন্যবিধ সঙ্গত কারণও আছে। শিল্প ও ব্যবসায়ের শিক্ষা, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে প্রেরণা আনিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশের মধ্যে এক নূতন চুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই উভয় দেশের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, তাহাও স্থির করিয়া দিতে হইবে। এই চুক্তি রচনায় এক পক্ষে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি, অপর পক্ষে কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন। চুক্তি কংগ্রেসের দ্বারা অনুমোদিত হইবে। ভারত যে দাবী উপস্থাপিত করিবে, ৬ মাসের মধ্যে ইংলণ্ড যাহাতে তাহা পূর্ণ করেন, সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব অনুসারে যে ইংলণ্ড সহসা ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সকল দিক্ বিচার করিয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিকগণ ভারতের সঙ্গত দাবীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিলে কল্যাণ হইবে। জাগ্রত জাতির সঙ্গত অধিকারের প্রতি উদাসীন থাকা সমীচীন নহে।

গায়কবাড়

প্রগতিশীল সামন্তরাজ্যের অধীশ্বর বরোদার গায়কবাড়—মহারাজা ৩য় সয়াজী রাও ৭৭ বৎসর বয়সে ৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই প্রাসাদ হইতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। সয়াজী রাও গায়কবাড়-বংশের দরিদ্র পরিবারের সন্তান। রেসিডেণ্টকে বিষপ্রয়োগে হত্যার অভিযোগে পূর্ব্বতন

৩য় সয়াজী রাও

গায়কবাড় মলহর রাও গদীচ্যুত হইবার পূর্ব্বে অত্যাচার আশঙ্কায় তাঁহার অগ্রজের বিধবা যমুনাবাঈ ইংরেজ সরকার দত্ত ৩০৲ টাকা বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া কন্যাসহ পুণায় বাস করিতেছিলেন। তিনিই বরোদায় আসিয়া সয়াজী রাওকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইন্দোরের প্রসিদ্ধ সচিব তাঞ্জোর মাধব রাও বরোদায় আসিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক গায়কবাড় সয়াজী রাওএর শিক্ষা প্রদান, রাজ্যপরিচালন ও উন্নতিবিধানে আত্মনিয়োগ করেন।

বরোদায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার

প্রবর্ত্তন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, প্রজার আর্থিক, নৈতিক, কৃষিশিল্প, স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান, স্বায়ত্তশাসন, অর্থকরী শিক্ষাদান, বিদ্যা অনুশীলন জন্য বহু পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, রাজ্যপরিচালন-নৈপুণ্যের জন্য গায়কবাড় সয়াজী রাও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বাঙ্গালীর প্রতিভার প্রতি তাঁহার সম্মান, সমাদর উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। গুণগ্রাহী গায়কবাড় বিলাতে অবস্থানকালে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরোদা রাজ্যে উচ্চশিক্ষা দিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গগৌরব রমেশচন্দ্র দত্তের বরোদার মন্ত্রিত্বে বিহারীলাল গুপ্ত রাজস্ব-সচিবের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। বিদ্যানুরাগী গায়কবাড় গিবনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গবিভাগে মাতৃমন্ত্রসাধনায় বাঙ্গালা সঞ্জীবিত—অনুপ্রাণিত হইলে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা জন্য শ্রীঅরবিন্দ বরোদা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই বৎসরের কলিকাতার শিল্প সম্মিলনে গায়কবাড় সভাপতির অভিভাষণে যে শিল্প-পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা জাতীয় কল্যাণকর। শেষজীবনে তিনি ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হিন্দুর পুণ্যতীর্থ দ্বারকা গায়কবাড়ের রাজ্য, রণছোড়লালজীর পূজা-সেবার সুব্যবস্থার জন্য তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সমাজের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দ্বারকার সন্নিকটবর্ত্তী ওখা বন্দরও বাণিজ্যের বিশেষতঃ লবণ-শিল্পের বিরাট কেন্দ্র। প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে গায়কবাড় ৩য় সয়াজী রাও সেনা-খাস্‌খেল সাম্‌শের বাহাদুরের ৬০ বৎসর রাজত্ব-কাল পূর্ণ হইলে জুবিলি উৎসবে প্রজাবৃন্দ জনহিতব্রত স্বাধীনচেতা নরপতি বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছিল।

ভূতনাথ কোলে

স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে ৫৮ বৎসর বয়সে গত ১০ই জানুয়ারী পরলোকে গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি প্রধানতঃ সেগুনকাঠ ব্যবসায়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ব্যবসার ব্যপদেশে তিনি কয়েকবার য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি গ্ল্যাডষ্টোন ওয়ালী কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ছিলেন। বহুবাজার ষ্ট্রীটে তাঁহার পিতৃনামে নবপ্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণে 'নফর বাবুর বাজার', কাঁকিনাড়ায় বাঙ্গালীর প্রবর্ত্তিত একমাত্র পাটকল, আসামে প্রতিষ্ঠিত কাঠচেরাই কল তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিরাট কীর্ত্তি। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনে

ভূতনাথ কোলে

আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের নৈষ্ঠিক কাউন্সিলার, দরিদ্র ছাত্রগণের সহায়রূপে সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। স্বগ্রামে ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা—নলকূপ স্থাপন—রাস্তা সংস্কার ও প্রসার—সেতু নির্ম্মাণ—বিষ্ণুপুরে ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়—দেওপাড়ায় অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন—দুর্ভিক্ষে বন্যায় বিপন্ন জনগণকে ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনকে গৌরব-সমুজ্জ্বল করিয়াছে। তিনি বিলাসবর্জ্জিত সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কিশোরী

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস
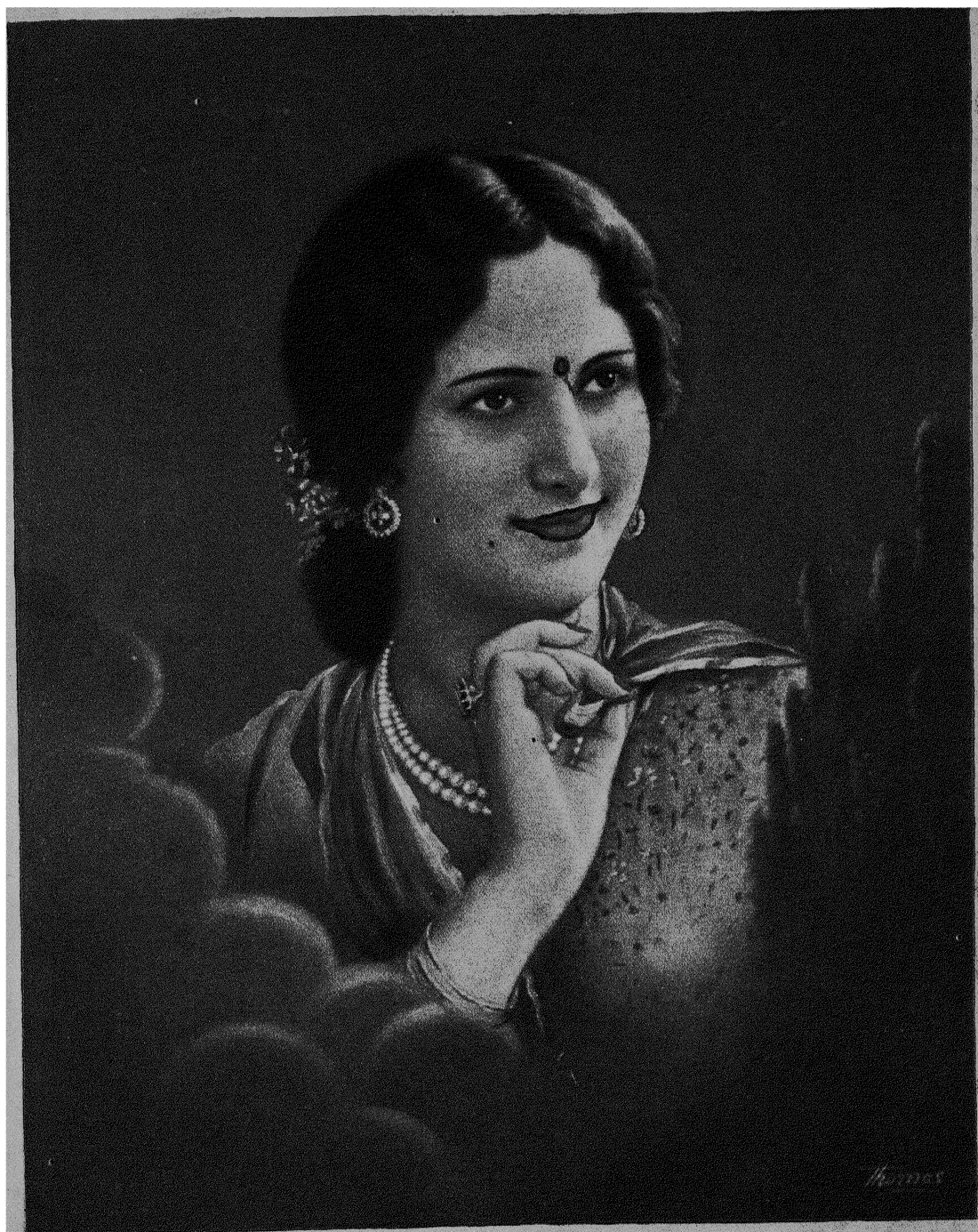
১৭শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩৪৫ [৫ম সংখ্যা

গীতা-বিচার

১২

গীতায় ব্রহ্মতত্ত্ব কি এই পঞ্চম অনুপ্রশ্নের বিচার শেষ হইয়াছে—আর করিতে হইবে না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিবাদী অনেকগুলি আপত্তি তুলিয়াছেন, অতএব এখনও শেষ হয় নাই।

প্রতিবাদীর আপত্তি—

(১) ত্রিগুণা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই অংশ, সম্মিলিত প্রকৃতি-পুরুষ ব্রহ্ম, ইহাই যদি গীতার মত হয়, তাহা হইলে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন (গীতা ২।৯) ইত্যাদি—নানা স্থানে ত্রিগুণ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপদেশ অসঙ্গত হয়।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন আছে—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে। ১৪।২১

অর্থাৎ ত্রিগুণ অতিক্রম যিনি করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষণ কি? কোন্ আচার আশ্রয় করিয়া এবং কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে অতিক্রান্ত হওয়া যায়?—এ প্রশ্নও অসঙ্গত হয়। কারণ—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি (৫।২৪)

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্। (৬।২৭)

ইত্যাদি বহু স্থলেই সাধকের ব্রহ্মভাবই যে পরমার্থ, তাহা উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম ত্রিগুণসম্বদ্ধ হইলে—গুণত্রয়াতীতের পক্ষে সেই ব্রহ্মভাব ঘটিতে পারে না, বরং ব্রহ্মভাব যে পরিত্যাজ্য, ইহাই মানিতে হয়।

(২) ত্রিগুণসম্বদ্ধ পুরুষ ব্রহ্ম হইলে এবং গীতোপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'অহং' 'মৎ' ইত্যাদি অস্মৎ শব্দ ব্রহ্মভাবাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইলে তিনিও ত্রিগুণসম্বদ্ধই হইয়া পড়েন, এরূপ স্থলে—

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ (৬।১৪)
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ (৯।৩৪)

যোগী, মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আমাতেই স্থাপন করিবে, এইভাবে মৎপরায়ণ হইয়া যোগসাধন করিবে। (ইহা ৬।১৪ অর্থ—শ্লোকের অর্থ)

হে অর্জ্জুন, তুমি আমাতেই মন সমর্পণ কর। আমার ভক্ত, আমারই পূজক এবং আমারই প্রণামরত হও—এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আত্মাকে যোগযুক্ত করিলে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। (ইহা ৯।৩৪ শ্লোকের অর্থ) এ সমস্ত উক্তি একেবারেই সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়ে। অতএব নির্ব্বিকার নিঃসঙ্গ নির্গুণ চিন্মাত্রই ব্রহ্ম, ইহাই গীতা-সিদ্ধান্ত।

(৩) জীব যে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব, এমন আভাস গীতায় কোথাও নাই, বরং স্পষ্টই কথিত হইয়াছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

'—প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্,—

জীবভূতাং মহাবাহো।'

অতএব অংশবাদই গীতার সিদ্ধান্ত, প্রতিবিম্ববাদ নহে।

পাঠকগণ জানিয়া রাখুন, এই প্রতিবাদী বাহিরের কোন ব্যক্তি নহেন, মনের দুইটি বৃত্তি—সঙ্কল্প ও বিকল্প, সঙ্কল্পকে আশ্রয় করিয়া আমি বিচার করিতেছি,—সঙ্কল্প বা আমি বিচারক, আর বিকল্পই প্রতিবাদী।

উত্তর।—(১) (২) আপত্তি একজাতীয়, সুতরাং এক উত্তর—উভয় আপত্তিখণ্ডনের জন্য প্রযুক্ত হইতেছে।

গীতার মতে, ত্রিগুণা প্রকৃতি ও ত্রৈগুণ্য এক নহে,—এই যে ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—ইহা প্রকৃতির কার্য্য,—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহারাই বন্ধনের হেতু,—যথা—

সত্ত্বংরজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ১৪।৫।

অর্থাৎ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ—(ত্রৈগুণ্য) প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহারাই অব্যয় আত্মাকে দেহে নিবদ্ধ করিয়া রাখে।

অতঃপর এই সকল গুণ কিরূপে আত্মাকে বদ্ধ করে, তাহার পরিচয় আছে। 'কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।' প্রতিবাদীর উল্লিখিত এই প্রমাণে স্পষ্টই আছে—'ত্রীন্ গুণান্ এতান্'—অর্থাৎ 'এই ত্রিগুণ—' ইতিপূর্ব্বে যাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত, সেই-ত্রিগুণাতীতের লক্ষণাদির প্রশ্ন করা হইয়াছে, প্রকৃতি হইতে অতীতত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্নও নাই। সাক্ষাৎ প্রকৃতি যে বন্ধনের হেতু, তাহা গীতায় কুত্রাপি কথিত হয় নাই। আরও প্রমাণ আছে—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ১৩।২২।

পুরুষ প্রকৃতিস্থ—প্রকৃতিতে অবস্থিত হইলে, প্রকৃতিজ—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে গুণ, তাহা ভোগ করেন। সেই যে গুণসঙ্গ, তাহাই সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। তবে প্রতিবাদী এখানে বলিতে পারেন, গুণভোগমাত্রই গুণসঙ্গ নহে,—প্রকৃতিস্থ হইয়া যে গুণভোগ—তাহাই গুণসঙ্গ,—কারণ, নির্গুণ ব্রহ্মকেও গুণভোক্তা বলা হইয়াছে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।

অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৩।১৫

যিনি জ্ঞেয়, সেই ব্রহ্ম,—সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণ দ্বারা প্রকাশিত—অর্থাৎ তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃই বাগাদি ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে, অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, তিনি অসক্ত (সঙ্গরহিত—নির্লেপ), তথাপি তিনি সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ এবং গুণভোক্তা। তিনি প্রকৃতিস্থ নহেন বলিয়াই নির্গুণ, এ কারণে গুণভোক্তা হইলেও নিঃসঙ্গ। গুণসঙ্গ তাঁহার নাই। অতএব প্রকৃতিস্থিতি যে ব্রহ্মস্বরূপ নহে, ইহা বেশ বুঝা যায়। সুতরাং সম্মিলিত প্রকৃতি-পুরুষ ব্রহ্ম হইতে পারেন না। এই যে প্রতিবাদীর উক্তি, ইহাও বিচারসহ নহে; কারণ, প্রকৃতিস্থিতি ও প্রকৃতি-পুরুষ সম্মেলন এক পদার্থ নহে। মনে কর, বিভিন্ন প্রকার সূত্রে নির্ম্মিত একখানি গালিচা,—ঐ গালিচায় যে সকল সূত্র আছে, তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইলেও সেই সূত্র অন্য সূত্রে অবস্থিত ইহা বলা যায় না, সংযোগ ও অবস্থান এক নহে,—দুই বন্ধু গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ,—পরস্পরে সংযুক্ত, কিন্তু কেহ কাহাতেও অবস্থিত নহে,—ইহা সহজনিদর্শন, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সদৃশ কোন সম্বন্ধ থাকিলেও পুরুষকে—চিন্মাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত বলা যায় না, সূত্রের পক্ষে অন্যত্র অবস্থিতি সম্ভব—প্রকৃতি-পুরুষের অন্যত্র অবস্থিতিও নাই; কারণ, উভয়েই ব্যাপক—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বব্যাপীর কি অধিষ্ঠানস্থান থাকে? অপরিমেয় পূর্ণের, আশ্রয়স্থান থাকিতে পারে না। যদি বল, দু'টি সর্ব্বব্যাপী অপরিমেয় পূর্ণ, ইহা যে একান্ত অসম্ভব। অসম্ভব কেন? স্থূলের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে, পরস্পরের পৃথক্ স্থান না হইলে বৃক্ষতরু গুল্ম পৃথিবী ও জল প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখা যায় না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু বায়ু ও আলোকের সঞ্চার একই স্থানে দেখা যায়, তাহাদিগের কোনরূপ ব্যাঘাত নাই। কারণ, উহাদিগের স্বরূপ বা অবয়ব অপরের স্বরূপ বা অবয়বের বাধক নহে। বায়ু পরিমেয় কি অপরিমেয়, আলোক পরিমেয় কি অপরিমেয়, এ প্রশ্ন এখানে মোটেই খাটে না, পরিমেয় হইলেও উভয়েরই সঞ্চার একই স্থানে হওয়ায় যদি কোন বাধা না থাকে, অপরিমেয় হইলেও তাহাতে বাধা থাকিতে পারে না। আরও দেখ, ঐ বায়ু ও আলোক এক সঙ্গে থাকিলেও কেহ কাহাতে অবস্থিত নহে, এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রকৃতি-পুরুষের পক্ষে অপ্রতু-

নহে। এইরূপে ন্যায় বৈশেষিকের মতে সর্ব্বব্যাপক অপরিমেয় অসংখ্য আত্মা আকাশ দিক্ ও কাল স্বীকৃত হইয়াছে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও অসংখ্য পুরুষ অপরিমেয় ও সর্ব্বব্যাপক। গীতা-দর্শনেও দেখি, "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'। প্রকৃতি ও পুরুষ দুই-ই যে অনাদি অনন্ত অর্থাৎ নিত্য, তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি। বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসূতি এক যে প্রকৃতি, তাহাকে একটি পরমাণুস্বরূপ বলা যায় না, অপরিমেয় বলিতেই হয়; যাহা পরিমেয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না, পরিমেয় হইলেই তাহার উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে। যাহার উৎপত্তি ও ধ্বংস থাকে, তাহা 'নিত্য' নহে, ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ দুইটি অপরিমেয় সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব গীতা-দর্শনেরও সম্মত, ইহা স্বীকার করিতে হয়। অতএব দুইটি সর্ব্বব্যাপকের অস্তিত্ব অসম্ভব, এই যে প্রতিবাদীর উক্তি, তাহা গীতা-দর্শনের বিরোধী।

এখন গোড়ার কথা ধরা যাক্—তবে যে, পুরুষের প্রকৃতিতে অবস্থান, তাহা নদীতে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের অবস্থানের ন্যায়,—ইহা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। গীতার এই শ্লোকই প্রতিবিম্ববাদের নিদর্শন; ইহা যে অংশবাদ নহে—তাহা প্রতিবাদীর (৩) সংখ্যক আপত্তির উত্তরে দেখাইব।

একাত্মবাদ গীতার সিদ্ধান্ত ইহাও পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, সম্মিলিত প্রকৃতি-পুরুষ ব্রহ্ম হইলেও এবং প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণের উৎপত্তি হইলেও তিনি নির্গুণ, সম্মিলিত উভয়ে কোন গুণ নাই,—তাই নির্গুণ, নিজ একাংশ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণস্বরূপের উপলব্ধি তাঁহার আছে বলিয়াই তিনি গুণভোক্তা। তিনি প্রতিবিম্ব নহেন—বিম্ব। প্রতিবিম্ব চন্দ্র যে নদীতরঙ্গে শত শত এবং নদীতরঙ্গের চঞ্চলতায় চঞ্চল, কিন্তু বিম্বস্বরূপ যে চন্দ্র আকাশে প্রকাশমান, তিনি এক এবং নদীতরঙ্গের চঞ্চলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। চন্দ্রকে যদি চেতন বলিয়া ধরা যায় (যদি বলিতেছি—জড়বাদীকে বুঝাইবার জন্য—প্রকৃত পক্ষে দৃশ্যমান চন্দ্রের অধিদেবতা যে চন্দ্র তিনি চেতন, ইহা শাস্ত্রবিশ্বাসীর অভ্রান্ত মত) ও তাঁহার নদীতরঙ্গের চঞ্চলতাদি দর্শনের ন্যায় এবং তাঁহারই প্রতিবিম্বসমূহের অবস্থা দর্শনের ন্যায় বিম্বস্থানীয় ব্রহ্মের—প্রকৃতিসঙ্গ গুণভোগ বুঝিতে হইবে। এই ভোগকে গুণসঙ্গ বলা যায় না। চন্দ্রপ্রতিবিম্বের তরঙ্গসঙ্গের ন্যায়, ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবেরই গুণসঙ্গ হইয়া থাকে, তাহাই সৎ ও অসৎ জন্মগ্রহণের হেতু। আমি সুখী আমি দুঃখী, এইরূপ সুখ দুঃখ প্রভৃতি গুণের অধিকারী আমি, এই ভাবই গুণসঙ্গ—তাহা জীবের (প্রতিবিম্বের) হয়, ব্রহ্মের (বিম্বের) হয় না। কারণ, প্রকৃতিপুরুষাত্মক ব্রহ্মের প্রাকৃতিক পরিণামের দ্বিতীয় স্তরে অহঙ্কারের উদ্ভব, মূলে তাহার অভিব্যক্তি না থাকায় 'অহং ভাব' উত্থিত হয় না;—অহঙ্কারপ্রযুক্ত সঙ্গ ব্রহ্মে অসম্ভব।

একই সত্তা প্রকৃতি ও পুরুষে বর্ত্তমান, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কার্য্যানুকূল সত্তাই সেই এক-সত্তা,—কেবল চিৎস্বরূপ নির্ব্যাপার নিষ্ক্রিয়—তাঁহার যে পারমার্থিক অপরিণামিনী সত্তা—তাহা কার্য্যানুকূল নহে,—শ্রুতি বলিয়াছেন,—'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।' (শ্বেতা) কেবল প্রকৃতির যে পরিণামিনী সত্তা, তাহাও অচেতনমাত্রের আশ্রিতা বলিয়া কার্য্যানুকূলা নহে। কেবল অচেতন হইতে কোন কার্য্যই হয় না। যেখানেই কার্য্য দেখিবে, সেখানেই তাহার পশ্চাতে চেতনের অস্তিত্ব আছে, ইহা বুঝিয়া লইবে। দৃশ্যমান কার্য্যসমূহ তাহার প্রমাণ। বায়ু আলোক প্রভৃতির কার্য্যেও চেতনের সাহায্য অনুমেয়। কার্য্যানুকূল বলিলে, যাহা থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইয়া থাকে—তাহাকে বুঝিবে,—দার্শনিক ভাষায় 'কার্য্যোপধায়িকা' বলিতে হয়। 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' ইত্যাদি গীতা-শ্লোকে সেই সত্তার পরিচয় আছে।

'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।' এই শ্লোকে 'ময়া' এই আমি চিৎ এবং 'অব্যক্তমূর্ত্তিনা'র অব্যক্ত অচিৎ উভয়েরই যে সর্ব্বজগতের উৎপাদকত্ব ঠিক একই ভাবে—তাহাই এক সত্তা। উভয়াশ্রিত এক সত্তার নিদর্শন—ক্ষুদ্র ধান্যবীজেও চলিয়া আসিতেছে। ধান্যবীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, বীজে পরিণামী ও অপরিণামী দুই অংশে এক অঙ্কুরোৎপাদকসত্তা বর্ত্তমান, তণ্ডুল তাহার পরিণামী অংশ, তুষ আপেক্ষিক অপরিণামী অংশ। কেবল তণ্ডুল হইতেও অঙ্কুর হয় না, কেবল তুষ হইতেও অঙ্কুর হয় না, তুষসংযুক্ত তণ্ডুল—ঐ ধান্যবীজ হইতেই অঙ্কুর হয়। জগতের অঙ্কুরও ঐরূপ চিৎসংযুক্ত অচিৎ হইতে হয়। সূক্ষ্ম সত্তা তিনটি এবং প্রত্যেকটিই নিত্য, স্থূল সত্তা অনন্ত এবং তৎসমস্তই

অনিত্য। সত্তার নামান্তর অস্তিত্ব। তিনটি সূক্ষ্ম সত্তার একটি অপরিণামিনী চিৎ সত্তা চিন্মাত্রস্বরূপ পুরুষে বর্ত্তমান, দ্বিতীয় পরিণামিনী অচিৎসত্তা কেবল প্রকৃতিতেই বর্ত্তমান, তৃতীয়—একৈককার্য্যানুকূলা চিদচিদুভয়বৃত্তি সত্তা—ইহাই ব্রহ্মসত্তা, এই সত্তা যাঁহার ধর্ম্ম্য—তিনি গীতোক্ত পুরুষোত্তম এবং তিনিই 'চণ্ডীর' মতে মায়া, উপনিষদের ব্রহ্ম। এই তৃতীয় সত্তা অন্যত্র নাই, কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় সত্তাও ব্রহ্মে অবচ্ছেদকভেদে বর্ত্তমান—চিদবচ্ছেদে প্রথম সত্তা এবং অচিদবচ্ছেদে দ্বিতীয় সত্তা; "অবচ্ছেদক" শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত, অংশ বা ভাগ শব্দ অবচ্ছেদক স্থলে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইতে পারে। অতএব সকল নিত্য সত্তার আশ্রয় এই ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ইনিই দেবাত্মস্বরূপা শক্তি নামে অভিহিত এবং স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া শক্তিই ইনি—'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্',—(শ্বেতা ০) 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ' (শ্বেতা ০) এই সত্তা একাংশে—চিদংশে নির্গুণা এবং অপর অংশে—অচিদংশে সগুণা। সুতরাং উভয়কে ধরিলে, তাহাকে নির্গুণ বলিতে হয়। দুই বন্ধু—একজন সুন্দর এবং অন্যজন কুরূপ, যেমন এরূপ স্থলে বলা যায়—দু'জন সুন্দর নহে, অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দুই জনে নাই, ভাবার্থ—ইহাদের এক জনেই সৌন্দর্য্য আছে—সেইরূপ চিদচিদাত্মক ব্রহ্মে অচিদংশে গুণ থাকিলেও চিদংশে তাহা না থাকায় উভয়াত্মক বস্তুকে নির্গুণ বলিতে হয়, উভয়ে ত গুণ নাই। সত্তা ও সত্তার আশ্রয়কে যে একপর্য্যায়ে গ্রহণ করিতেছি, তাহার কারণ—এই সত্তা তদীয় আশ্রয় হইতে একান্ত পৃথক্ নহে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদাভেদবাদ ইহার কারণ। ভেদাভেদ বিচার সময়ান্তরে করিব। গুণভোক্তৃত্ব কিন্তু উভয়ে বর্ত্তমান; গুণভোক্তৃত্ব শব্দের অর্থ—'গুণভোগোপধায়কত্ব' অর্থটাই অধিক কঠিন হইল, ভাবার্থ এই,—পাচক ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছে বলিলে, সে ব্রাহ্মণ তখন পাক করিতেছে না, কিন্তু পাক করা তাহার কার্য্য—এরূপ ব্রাহ্মণকে পাচক শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়, অতএব এ স্থলে উক্ত পাচকত্ব পাকোপধায়কত্ব নহে,—পাকযোগ্যত্ব মাত্র, পক্ষান্তরে, পাকে ব্যাপৃত ব্যক্তির পাচকত্বই পাকোপাধায়কত্ব, সেইরূপ—'গুণভোক্তা' শব্দে বুঝায়, যিনি তখন গুণ ভোগ করিতেছেন, তাঁহাকে; এই প্রকার গুণভোক্তা প্রকৃতি-পুরুষ উভয়াত্মক (চিদচিদুভয়াত্মক) ব্রহ্ম, কেবল পুরুষ ভোগস্বরূপ হইতে পারেন কিন্তু ভোক্তা নহেন, কারণ, ভোগ—জ্ঞান, পুরুষ সেই জ্ঞান-(চিৎ) স্বরূপ। যদি বলা যায়, সূর্য্য প্রকাশস্বরূপ হইলেও 'সূর্য্যঃ প্রকাশতে' এইরূপ প্রয়োগ সুপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ পুরুষ ভোগস্বরূপ হইলেও ভোক্তা বা ভুঙক্তে এইরূপ প্রয়োগ তাঁহাতে অসঙ্গত নহে, অতএব কেবল চিৎস্বরূপ পুরুষ (ব্রহ্ম) গুণভোক্তা হইতে পারেন। ইহা বলিলে, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, দৃষ্টান্ত সমান হয় নাই; প্রকাশ ও 'প্রকাশতে' এই দুইটি শব্দ বিষয়কে স্পর্শ করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, 'গুণভোক্তা' এই শব্দটি বিষয়কে স্পর্শ করিয়া প্রযুক্ত, গুণই এখানে বিষয়। 'সূর্য্যো লোকং প্রকাশয়তি' এস্থলে প্রকাশ অর্থে অভিব্যক্তি, তাহা সূর্য্যের নহে, লোকের; অতএব সূর্য্যের প্রকাশস্বরূপ লইয়া জ্ঞান-(চিৎ) স্বরূপ পুরুষের জ্ঞাতৃত্ব দৃষ্টান্ত খাটে না। উভয়স্বরূপ ব্রহ্মের পক্ষে গুণভোক্তৃত্ব সম্পূর্ণ সঙ্গত। যে হেতু, ভোগ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বিবিধ, অপরিণামী ও পরিণামী; অপরিণামী জ্ঞান—পুরুষ, তাঁহার সন্নিধান বশতঃ অচিৎ, প্রকৃতির যে স্বচ্ছ সত্ত্বাংশ, তাহা সূর্য্যপ্রকাশে দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল হয়, এই উজ্জ্বল সত্ত্বাই পরিণামী জ্ঞান। প্রকৃতির যে স্বচ্ছ সত্ত্বাংশ, তাহা কারণস্বরূপ, কার্য্যস্বরূপ নহে, অতএব সেই সত্ত্বা 'প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন' বা 'প্রকৃতিসম্ভবাঃ' যে ত্রিগুণ, তাহার অন্তর্গত নহে। প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্মে এই দ্বিবিধ জ্ঞানসম্বন্ধ বর্ত্তমান; পূর্ব্বোক্ত পরিণামী জ্ঞানকে ভোগস্বরূপে গ্রহণ করিলে তদুপধায়কত্ব—অর্থাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সত্তাসাপেক্ষ। প্রকৃতি না হইলে তাহার স্বচ্ছ সত্ত্বাংশ মিলে না, পুরুষ না হইলে—তাহা উজ্জ্বল হয় না। অপরিণামী জ্ঞান পুরুষকে ভোগস্বরূপে গ্রহণ করিলে তাহার উপধায়কত্ব অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধ সম্পাদন প্রকৃতিরই কার্য্য—প্রকৃতির যে বৃত্তি, তাহা হইতে বিষয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে, অতএব পুরুষ ব্যতীত সেই ভোগ থাকে না এবং প্রকৃতি ব্যতীত তাহার বিষয়সম্বন্ধ ঘটে না—এই কারণে উভয় সত্তাসাপেক্ষ গুণভোক্তৃত্ব উভয়াত্মক ব্রহ্মেই থাকে। অতএব যেরূপ ভোগই ধরা যাউক, গুণভোগোপধায়কত্ব—বা গুণভোক্তৃত্ব প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্মে তাহা

সঙ্গত হয়, কেবল পুরুষ বা কেবল প্রকৃতিতে সঙ্গত হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইল। সেই ব্রহ্ম যে নির্গুণ—তাহাও ইতি-পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যে সাধক এই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ—তিনি ত্রিগুণাতীত হইতে পারেন,—যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বন্ধনের হেতু—তাহা ব্রহ্মস্বরূপ নহে, বন্ধনহেতু—সত্ত্বাদি গুণত্রয়, প্রকৃতিসম্ভূত। কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে থাকিলেও—তাহা বন্ধহেতু হয় না, ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবের অহংবুদ্ধি—কেবল তাহাতেই নিবদ্ধ থাকে না, গীতোপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাহার অহং ব্যবহার সম্প্রসারিত—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিৎ অচিৎ—তাহার তখন 'অহং'। এই জন্যও তিনি তখন ত্রিগুণাতীত। অতএব ব্রহ্ম চিদচিদাত্মক হইলেও ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের ত্রিগুণাতীত হওয়ায় গীতা-বচনে কোন-রূপ অসামঞ্জস্য নাই। এই তত্ত্ব গীতা-দর্শনে নবম দশম ও একাদশ অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এব তু তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেস্বু তে ময়ি॥" (৭।১২)

ইত্যাদি শ্লোকেও এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক রাজস তামস ভাবও আমা হইতে উৎপন্ন এবং আমাতে বর্ত্তমান, ইহা শ্লোকার্দ্ধ হইতে বুঝা যায়। কার্য্য উপাদান কারণে থাকে—প্রকৃতি-পুরুষাত্মক আমি তাহাদিগের উপাদান কারণ, তাই তাহারা আমাতে বর্ত্তমান—আমি অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক যে ব্রহ্ম সেই আমি—তৎসমুদয়ে নাই, কেন না, তাহারা কেবল—অচিৎ—জড়বস্তু,—পুরুষাংশের সহিত তাহাদিগের মোটেই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রকৃতি-অংশও তাহাতে অধিষ্ঠিত নহে, তাহারাই প্রকৃতি অংশে অধিষ্ঠিত,—কার্য্যই কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কারণ কার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। বিশেষ কথা এই যে, তাহাদিগের যে আমাতে স্থিতি তাহা আংশিক—রাম বাবুর গ্রামে বা গৃহে অবস্থিতির ন্যায়। গ্রাম জুড়িয়া বা গৃহ ব্যাপিয়া রাম বাবু না থাকিলেও গ্রামের বা গৃহেরই একাংশে তিনি আছেন, সেইরূপ সাত্ত্বিকাদি ভাব আমার একাংশে আছে। না থাকিলে, কোথায় থাকিবে,আমি ব্যতীত আর যে স্থান নাই। অতএব গীতার ব্রহ্ম চিদচিদাত্মক।

নবম অধ্যায় দেখ,—

'অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
..................................সদসচ্চাহমর্জ্জুন।'

ইহার অপর পার্শ্বে স্থাপন কর, সপ্তশতী মন্ত্র।

'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা'
'শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গযজুষাং নিধান-
মুদ্গীথ রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।'
'সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে'
'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।'
'ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।'
'ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।'
'বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া'

'যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং'

গীতার দশম অধ্যায় দেখ,—

'কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।'

সপ্তশতী মন্ত্রে আছে—'শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা' 'মেধে সরস্বতি বরে' 'স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা' 'কান্তিরূপেণ সংস্থিতা' 'ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।'

গীতার দশমাধ্যায়ে আছে—

'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।'

সপ্তশতীতে আছে—

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।'

গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে—

'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ'

সপ্তশতীতে আছে—

'কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে।'
'সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে'

অর্থাৎ গীতার নবম দশম একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি ক্রতু (বৈদিক যজ্ঞ), আমি যজ্ঞ (স্মার্ত্ত মহাযজ্ঞ), আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি আজ্য,

আমি অগ্নি, আমি আহুতি, আমি ওঙ্কার, আমি ঋক্ যজু সাম—ইত্যাদি রূপে গীতা নবমাধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, সপ্তশতীতেও সংক্ষেপে তাহাই আছে, ভেদ কেবল 'আমি' এবং 'তুমি' অর্থাৎ বক্তা শ্রীকৃষ্ণ তাই 'আমি' আছে। সপ্তশতীতে স্তবকর্ত্তা ব্রহ্মা বা দেবগণ তাই 'তুমি' আছে।

প্রকৃতি-পুরুষস্বরূপ ব্রহ্ম নিজের প্রকৃতিস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া তদুৎপন্ন বিকারী বস্তু মাত্রেকেই তাঁহার সহিত অভিন্ন বুঝাইবার জন্য 'অহং ক্রতুঃ' ইত্যাদি বলিয়াছেন। মৃত্তিকা ও মৃন্ময়পাত্রের ন্যায়, সূত্র ও বস্ত্রের ন্যায় কার্য্য ও কারণে অভেদ গীতারও সিদ্ধান্ত, বিভূতি ও বিভূতিমানে যে ভেদ, তাহাও ইহাতে বর্ত্তমান, এইজন্যই ভেদাভেদবাদ গীতার সিদ্ধান্ত। সপ্তশতীরও ঐ সিদ্ধান্ত। 'একৈবাহং জগত্যত্র' ইহা অভেদবোধক, এবং 'পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।' 'মদ্বিভূতয়ঃ' 'আমার বিভূতি' এই অর্থে যে লুপ্তষষ্ঠী, তাহাই ভেদবোধক। পূর্ব্বে যে 'আমি' তুমি' ভেদ ছিল, এখানে তাহাও নাই, গীতার ন্যায় এখানেও আমি। উভয়াত্মক ব্রহ্মের পুরুষাংশ আশ্রয়ে গীতায় 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী' ইত্যাদি উপদেশ। তাঁহার পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সপ্তশতীতেও মাতৃত্বের কথা আছে। 'বিষ্টভ্যাহমিদং' এই শ্লোকের দ্বারা চিদচিদ্ ব্রহ্মবাদই যে সিদ্ধান্ত, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। কারণ, এই বিভূতিমধ্যে যাহা যাহা উল্লিখিত, তন্মধ্যে চিৎ অচিৎ দুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অহমাত্মা গুড়াকেশা' ইত্যাদিতে 'চিৎ'—পুরুষ। 'জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি' ইত্যাদি অচিৎ—এই সমস্ত কৃৎস্ন জগতেরই অন্তর্গত, সেই কৃৎস্ন জগৎকে একাংশ দ্বারা বিষ্টব্ধ অর্থাৎ নিরুদ্ধ করিয়া বা সংযোগবিশেষে ধরিয়া যিনি আছেন, তাঁহার সেই অংশ যে সত্য, তাহা মানিতেই হয়, মিথ্যা বা অনির্ব্বাচ্য হইলে, তদ্দ্বারা বিষ্টম্ভ নিরোধ বা সংযোগবিশেষ দ্বারা ধারণ করা যায় না। এ সমস্তই ব্যাবহারিক, ইহা বলিয়া আপত্তিগ্রন্থিমোচনের চেষ্টা করিলেও—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥১৩।৩।

অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ (অচিৎ ও চিৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ) এই উভয়বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই মদ্বিষয়ক জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান), উহাই শাস্ত্রসম্মত—এই স্থল অনুত্তরণীয়। 'মম' এই অস্মৎ শব্দে চিন্মাত্রস্বরূপ ধরিলে, ক্ষেত্রজ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই থাকে না। 'অচিৎ'কে 'মম' এই অস্মৎ শব্দ দ্বারা গ্রহণ করিলে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অস্মৎ শব্দের অর্থ প্রকৃতি-পুরুষ উভয়াত্মক হইলে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই যে প্রকৃতি-পুরুষ জ্ঞান, ইহা বলা বাহুল্য। প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় উৎপন্ন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি, মৃত্তিকা হইতে মৃন্ময় পাত্রের ন্যায়, সুবর্ণ হইতে কুণ্ডলাদির ন্যায় অভিন্ন বলিয়াই সেই সেই বিষয়জ্ঞানও প্রকৃতিজ্ঞানেরই অন্তর্গত, অতএব ক্ষেত্রজ্ঞানকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিজ্ঞানমধ্যে গ্রহণে কোনই বাধা হয় না।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা এরূপ নহে,—এই আপত্তি হইতে পারে, তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা—'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ী ক্রিয়েতে তজ্জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানমিতিমতমভিপ্রেতং মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ।' (শাঙ্করভাষ্য) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বৈলক্ষণ্যেন যজ্জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাজ্জ্ঞানং মম মতম্। (শ্রীধর) ইঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ উভয় বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহা আমার বিষয়েই জ্ঞান এ কথা বলেন নাই ; বলিয়াছেন,এই উভয় বিষয়ে যে জ্ঞান,তাহা সম্যক্ জ্ঞান, ইহা আমার মত। ইহা শাঙ্কর ভাষ্যের অর্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান মোক্ষের হেতু বলিয়া তাহাই জ্ঞান, আমার মত এই। শ্রীধর স্বামীর উদ্ধৃতাংশের ইহাই অনুবাদ।

অতএব প্রকৃতি-পুরুষ জ্ঞানই যে মদ্বিষয়ক জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) এইরূপ অর্থ ঐ শ্লোকের নহে। এ বিষয়ে আমার উত্তর—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯ শ্লোকে এই বিষয়ের উপসংহার।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯।

অর্থাৎ ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে এই আমি বলিলাম, আমার ভক্ত ইহা জ্ঞাত হইলে মদ্ভাব লাভে যোগ্য হয়।

দ্বিতীয় শ্লোক হইতে অষ্টাদশ শ্লোকের মধ্যে জ্ঞানের কথা দুইবার আছে, উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে—আর 'অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।৮॥ ইত্যাদি সপ্তম শ্লোক হইতে —তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥১১॥ এই পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে। উদ্ধৃত 'এতৎ ক্ষেত্রং' ইত্যাদি শ্লোকে (১৮) যে 'জ্ঞান' শব্দ আছে,

যাহা কোন্ জ্ঞানকে বুঝাইবে? দ্বিতীয় শ্লোকে যাহা আছে সেই জ্ঞানকে, না সপ্তম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত শ্লোকে যাহা আছে সেই জ্ঞানকে? এই সন্দেহের নিবৃত্তি সহজেই হয়,—কারণ—(১৮) শ্লোকে ক্ষেত্রের পর জ্ঞান, তৎপরে জ্ঞেয়—এইভাবে নির্দ্দেশ আছে, (৭—১১) শ্লোকে যে জ্ঞান—তাহাই ক্ষেত্রের পরে, প্রথমটি তৎপূর্ব্বে। তাহা হইলে দ্বিতীয়বারের জ্ঞান—জ্ঞানের উপায়, অর্থাৎ (৭—১১) পর্য্যন্ত শ্লোকের জ্ঞানশব্দের অর্থ—প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নহে—জ্ঞানের উপায়—অমানিত্ব (আত্মশ্লাঘার অভাব), অদম্ভিত্ব (স্বীয় ধর্ম্মাচরণ প্রকাশ না করা), অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরতা, শারীরিক সংযম ইত্যাদি যে জ্ঞান নহে—তাহা সুস্পষ্ট, অতএব এই জ্ঞানশব্দের অর্থ যে জ্ঞানের উপায়, তাহা নিঃসন্দেহ। দ্বাদশ শ্লোকে আছে—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে॥

আমি সেই জ্ঞেয় বলিব, যাহা জানিলে 'অমৃত' ব্যাপ্ত (মুক্তিপ্রাপ্ত) হওয়া যায়, সেই জ্ঞেয় অনাদিমৎ পরব্রহ্ম, যাহাকে সৎ বলা যায় না, অসৎ-ও বলা যায় না। এই অংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহার উল্লেখ এখানে আর করিব না। এই মাত্র বলিতেছি যে, জ্ঞানের উপায় বলা হইল,—জ্ঞেয় বলা হইল, কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপ এখানে বলা হইল না কেন? সাধনের সহিত সাধ্যেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, জ্ঞেয়ের সহিত নহে,—সাধ্য যে জ্ঞান তাহাকে বাদ দিয়া জ্ঞানের বিষয়কে গ্রহণ করায় জিজ্ঞাসিতের অনভিধান নামক দোষ ঘটে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্লোকের জ্ঞানবর্ণনা নিরর্থক ও নিঃসম্বন্ধ হইয়া উঠে। অতএব বলিতে হয়, দ্বিতীয় শ্লোকে যে জ্ঞান আছে—তাহারই ব্যাখ্যা—তৃতীয় হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত। জ্ঞান পূর্ব্বে কথিত হওয়াতে,—তাহার উপায় বা সাধনভাবে অমানিত্ব অদম্ভিত্ব প্রভৃতির নির্দ্দেশ আছে,—সাধ্য যে জ্ঞান তাহার নির্দ্দেশ প্রথমে থাকায়—জ্ঞান নির্দ্দেশের পর আর সাধ্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা হয় নাই, সেই জন্য জ্ঞানের বিষয়কে গ্রহণ করায়, 'জিজ্ঞাসিতের অনভিধান' দোষ হয় নাই, কারণ, দ্বিতীয় শ্লোকে জ্ঞান উপদিষ্ট হওয়াতে সাধ্যের জিজ্ঞাসাই হয় নাই। প্রাচীন ব্যাখ্যার অনুসরণ করিলেও—দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যর্থতা নিবারণ ও পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত রূপ ভাববর্ণনা আবশ্যক। তাহা হইলেই প্রাচীন ব্যাখ্যারও মর্ম্মার্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে যে জ্ঞান তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞেয় প্রসঙ্গে,—'অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম'—এই শ্লোকে ঐরূপ ব্রহ্মেরই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রবন্ধে 'অনাদিমৎ' শব্দের বিচার দ্রষ্টব্য। পারমার্থিক সৎ অব্যয় পুরুষমাত্রকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিলে,—'ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে' ইহা সঙ্গত হয় না। প্রকৃতি-পুরুষ উভয়াত্মক ব্রহ্ম ইহা স্বীকার করিলে—প্রকৃতি-অংশে সত্তা পরিণামিনী—ফুটন্ত দুগ্ধের ন্যায় অবস্থাপরিবর্ত্তন থাকায় অপরিণামিসত্তার অভাবে 'ন সৎ' বলা হয়, এবং—পুরুষাংশে অপরিণামিনী সত্তা থাকায় 'ন অসৎ' বলা হয়। এই যে জ্ঞেয়—ইহার সহিত স্পষ্টভাবে একবাক্যতা বা সমান অর্থ বুঝাইবার জন্যই—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ, তৎ মম জ্ঞানং মতম্—শাস্ত্রসম্মতম্—এই ব্যাখ্যা আমি করিয়া থাকি—তাহারই অনুবাদ দিয়াছি। সে ব্যাখ্যা অস্বীকার করিলেও—মূল গীতা যে ঐরূপ ভাবেরই উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি।

এ স্থানে স্মরণ করিয়া দিতেছি—প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্মে প্রকৃতিস্বরূপস্থ গুণ, বন্ধনের হেতু নহে—প্রকৃতিজাত গুণই বন্ধনের হেতু—ইহাই গীতা-সিদ্ধান্ত—সেই গুণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপদেশ—'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' শ্লোকে আছে। 'কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণান্' ইত্যাদি প্রশ্নেও—সেই সকল গুণ হইতে উত্তীর্ণ ব্যক্তির লক্ষণাদি জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্মবাদের সহিত ইহার কোনই বিরোধ নাই এবং গীতা-সিদ্ধান্ত এবং সপ্তশতী-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে অভিন্ন। ইহাই (১২) আপত্তির উত্তর।

প্রতিবাদীর (৩) আপত্তি প্রতিবিম্ববাদে; কিন্তু এ বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পূর্ব্বেও আছে—বর্ত্তমান প্রবন্ধেও 'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি'—এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে একটু বক্তব্য এই যে, প্রকৃতি স্থিতি অংশবাদেও সম্ভবে না। অংশকে যদি অংশীর সহিত অভিন্ন বলা হয়—তাহা হইলে, অংশকৃত গুণভোগ, 'অহং সুখী অহং দুঃখী' এইভাব অংশীতেও বিপর্য্যস্ত করে বলিতে হয়। আর যদি ভিন্ন হয়—তাহা হইলে নানাত্ববাদের সহিত ভেদ থাকে না।

প্রতিবাদী ছাড়িতেছেন না; বলিলেন, "প্রতিবিম্ববাদ

যখন ব্রহ্মসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিরও সম্মত, তখন ঐ বিষয়ে আর আমি কিছু বলিব না,—কিন্তু ইহা বলিব, যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথা হইতেছে—তাহাতেই চিদচিদ্ ব্রহ্মবাদ যে গীতার অসম্মত—প্রকৃতি হইতে আত্মমোচনই যে আকাঙ্ক্ষণীয়, তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, যথা—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫।

যাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের এইরূপ অন্তর—ভেদ—সম্বন্ধহীনতা এবং প্রকৃতি হইতে আত্মার মুক্তি দেখিতে পান, তাঁহারা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হ'ন।

অতএব প্রকৃতি-পুরুষোভয়াত্মক ব্রহ্ম গীতাসম্মত নহে।"

প্রতিবাদীর এ আপত্তির উত্তর—শ্লোকের অর্থ ঠিক ঐরূপ নহে, অন্তর শব্দের অর্থ—বৈলক্ষণ্য (শাঙ্করভাষ্যেও আছে—অন্তরম্ ইতরেতরবৈলক্ষণ্যবিশেষম্) সম্বন্ধহীনতা নহে,—বৈলক্ষণ্য অস্বীকার কি কোথাও আমি করিয়াছি? বলিয়াছি, চিৎ ও অচিৎ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের বৈলক্ষণ্য সর্ব্বত্রই প্রকাশ করিয়াছি, পরস্পর বৈলক্ষণ্যযুক্ত উক্ত উভয়ের সম্মিলিত সত্তাই ব্রহ্মসত্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম এই উভয়স্বরূপ, কেবল পুরুষ বা কেবল প্রকৃতি নহেন। ইহাও বলিয়াছি, এই প্রকৃতি মূল কারণস্বরূপ, মূল কারণস্বরূপ যে প্রকৃতি তাহা সাক্ষাৎ বন্ধন-হেতু নহে—প্রকৃতির কার্য্য ত্রিগুণই বন্ধনহেতু। বন্ধন শব্দের অর্থ সংসার। যদি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদজ্ঞান না হয়, তাহা হইলে, উভয়াত্মক ব্রহ্মজ্ঞানই হইতে পারে না; উভয়াত্মক ব্রহ্মজ্ঞানের উপযুক্ত দৃষ্টিই জ্ঞানচক্ষু—সেই চক্ষু প্রথমেই প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ দর্শন করিতে পায়,—তৎপরে সেই উভয়ের যুগপদ্ দর্শন হয়—যে কখন হীরা ও সুবর্ণের ভেদ অবগত নহে, তাহার দৃষ্টিতে হীরকখচিত সুবর্ণ অঙ্গুরীয় যথাযথ প্রতিভাত হয় না, এইজন্য হীরকখচিত সুবর্ণাঙ্গুরীয় চিনিতে হইলে সুবর্ণ ও হীরকের ভেদ জানিতে হয়। সেই ভেদজ্ঞান যাহার আছে, তাহার পক্ষে উভয়াত্মক বস্তু চিনিতে বাধা হয় না। অতএব শ্লোকের ঐ অংশ চিদ-চিদ্ ব্রহ্মবাদের (প্রকৃতি-পুরুষ উভয়াত্মক ব্রহ্ম এই মতের) প্রতিকূল নহে, প্রত্যুত অনুকূল। 'ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং' এই অংশের অনুবাদ 'প্রকৃতি হইতে আত্মমোচন' নহে। প্রকৃতি আর ভূতপ্রকৃতির যে বস্তুগত ভেদ—তাহাই আমার উক্তির অনুকূল প্রমাণ। ভূতপ্রকৃতি শব্দের অর্থ অহঙ্কার।

'মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।'

স্থূল পদার্থ হইতে ক্রমেই সূক্ষ্মতত্ত্বের উপদেশ গীতার এই শ্লোকে আছে। পঞ্চভূত স্থূল, তাহার উপাদান কারণ অহঙ্কার—তাহার উপাদান কারণ বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব, তাহার উপাদান অব্যক্ত বা প্রকৃতি—এই প্রকৃতিই মূলপ্রকৃতি। অহঙ্কারও যে প্রকৃতি—তাহা গীতাতে 'অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা'—এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকৃতি মূলপ্রকৃতি নহে,—স্পষ্টই কথিত হইয়াছে 'ভূত-প্রকৃতি'। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'মহাভূতান্যহঙ্কারঃ' ইত্যাদি শ্লোকের সহিত একবাক্যতা করিয়া ইহা যে অহঙ্কার তদ্বিষয়ে সংশয় থাকে না। বুদ্ধি-অহঙ্কার-মনঃ-সম্মিলিত এক এক অন্তঃকরণ—ব্যষ্টি-অন্তঃকরণ,—তাহাতে নিবদ্ধ পুরুষ প্রতিবিম্বই এক এক জীব। এই অন্তঃকরণ, বোধ বা জ্ঞান বৃত্তিযুক্ত বলিয়া বুদ্ধি নামে কথিত হইয়াছে। অহংবৃত্তিও বোধ বা জ্ঞানবিশেষ। জীবের ব্যষ্টিভাব বা পার্থক্য স্ফুরণ এই অহংবৃত্তি হইতেই হয়, ইহা সংসারের হেতু। অহংবৃত্তি-সম্পাদিত সেই ব্যষ্টিভাবের বিলয়ই ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ, নিজের অপরিচ্ছিন্ন চিদচিদাত্মক ব্রহ্মভাবে সেই ব্যষ্টিভাবের বিলয় হইয়া থাকে। অতএব সেই ব্রহ্মভাব জ্ঞান পরব্রহ্ম লাভের উপায়রূপে ঐ শ্লোকে উপদিষ্ট,—'প্রকৃতি হইতে আত্মমোচন' জানিবার উপদেশ—সাংখ্য বেদান্তের প্রচলিত সিদ্ধান্তেও নাই, গীতা সিদ্ধান্তেও নাই। যাহা উপনিষদে আছে—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। গীতার কথাও তাই। যাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; তাঁহার গীতোক্ত নাম পুরুষোত্তম,—সপ্তশতীর মতও তাই, কেবল মাত্র নামভেদ—সপ্তশতীতে তিনি মহামায়া। পূর্ব্বে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তিনি প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্ম। এক্ষণে নির্ণীত হইল, ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ—মূল-প্রকৃতির সহিত নিঃসম্বন্ধ হওয়া নহে। জীবের উপাধি বিলয়ে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্মভাবে পর্য্যবসানই মোক্ষ। চিদচিদাত্মক পরব্রহ্মই এই মোক্ষের স্বরূপ। এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব গীতাসম্মত, ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

[উপন্যাস]

১৪

"পাণ নিন্।"

সুমিষ্ট কণ্ঠের আহ্বান-ধ্বনিতে বিশ্রাম-মুদিত চক্ষু উন্মীলিত হইল। শৈল কহিল,—"আমি ত পাণ খাই না।"

অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিরক্তিটা শৈলর কণ্ঠস্বরে চাপা রহিল না; কিশোরীর কাণেও ধরা পড়িল। নিমেষে তাহার সুগৌর মুখখানি রক্ত-গোলাপের মত টক্‌টকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কোন উত্তর না দিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইয়াই—থামিল।

জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রস্থানোদ্যতা মেয়ের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"পাণ দিলি, খুকি?" শৈলর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"এই আমার মেয়ে শুভা। তোমার কাছে সবাই অচেনা।"

একটু-খানি হাসিয়া শৈল কহিল, "তা ঠিক। আমার শ্বশুর মশাই, আর মা ছাড়া এ বাড়ীর আর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব অবধি আমি জানতুম না।"

জয়ন্তী যে অনেকখানি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখের চেহারাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু সহজে তিনি হটিবার পাত্রী ছিলেন না; কহিলেন,—"পরিচয় হ'বার সময়ই বা কোথা ছিল? নগরে উঠ্‌তে বাজারে আগুন! তা তুমি না জান্‌লেও আমি ত জানি।"—জয়ন্তী একটু থামিলেন।

শৈল কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, আবার আরম্ভ করিলেন,—"সকল দিনের সব কথাই জানি, শৈল! ঠাকুরপো তোমায় খরচা দিয়ে বিলাত পাঠালেন। মানুষ করবার ভার নিয়েছিলেন। কিছু ত আমার অজানা নেই।"

জয়ন্তী শৈলর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন; কিন্তু বাক্যের বিচিত্র কৌশলের যে তীক্ষ্ণ খোঁচাটা শরের মত তিনি শৈলর উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা শ্বশুরের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতার বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গেল। আক্রমণটা ব্যর্থ হইল।

হাসিমুখে শৈল প্রত্যুত্তর করিল, "সে ত জানবার কথাই—স্বদেশে বিদেশে আমার আত্ম-বন্ধু সকলেই এটা জানে, আর আপনি—যখন শুন্‌ছি তাঁর নিকট-আত্মীয়া, আপনি ত জান্‌বেনই।"

"শুধু আত্মীয় কি বাবা, সুনীলা, অনিলা তো আমার কোলেই মানুষ হয়েছিল।"

শৈল চেয়ারের উপর উঠিয়া বসিল, কহিল, "আপনি বরাবর শ্বশুর মহাশয়ের কাছে থাক্‌তেন?"—কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলিল, এবং তাহার মাঝে যে খোঁচাটুকু ছিল, তাহা কণ্ঠস্বরেই বুঝা গেল।

মদের মত ক্রোধটাও অনেক সময় মানুষের মুখ দিয়া সত্য কথাটাকে বাহির করে। জয়ন্তী কহিলেন,—"না না, তা থাক্‌তে যাব কেন? পোড়া কপাল! ঐ যা পূজার ক'টা দিন থাকতুম। অভাগ্যির দশা না হ'লে কি মানুষ পরের ঘরে বাস করে? বালাই! বালাই! এই তোমার শ্বশুরের খুড়ো ছিলেন আমার শ্বশুর। আর ঠাকুরপোর অল্প বয়সে বাপ মারা গিছ্‌লেন। খুড়োই হয়েছিল অভিভাবক। বুঝেছ বাবা! তাই সে আমাদের বড্ড—"

"ওঃ—" বলিয়া চেয়ারের পিঠে হেলিয়া, শৈল চোখ মুদিল।

জয়ন্তী কথা চালাইয়া কহিলেন, "তুমি বিলেত হ'তে যে দিন এ বাড়ীতে এলে—ঐ গিয়ে বম্বে হ'তে, সে দিন

সকালে আমরা সবাই এখানে এসেছিলুম।” বলিয়া আবার কৈফিয়ৎ দিলেন ; কহিলেন, “শুভাকে কি না ঠাকুরপো বড্ড ভালবাসতো ! শুভা বল্‌তো, কাকামণি, আমি বিলেতের জামাই বাবুকে দেখ্‌বো।—তাই তিনি আমাদের সব আনালেন।”

শৈল আর সাড়া দিল না। এত বড় কাহিনীটার এতটুকু তাহার কাণে গিয়াছে কি না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না।

জয়ন্তী একটু নীরব হইয়া মনে মনে কি ভাবিয়া লইলেন ; কহিলেন, “আচ্ছা শৈল, তুমি না হয় আমাদেরই জান্‌তে না। অনিলা—তাকেও কি জান্‌তে না ?”

জয়ন্তী তীক্ষ্দৃষ্টিতে শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শৈল চোখ খুলিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে নিজের সমস্ত অন্তরটা দেখিয়া লইয়াছিল ; কহিল,—“জান্‌তুম বা জান্‌তুম না, কোনটাই ঠিক ক’রে ব’ল্‌তে পারছি না। আমার বিয়ের সময় একটি ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়েকে আমি দেখেছিলুম। তার পর অনেকগুলা বছর কেটে গিছ্‌লো। অনেক ভাঙ্গা-চোরা হয়ে গেল। সে কথা আমার মনেই ছিল না। আর কেউ আছে, এ খেয়ালও আমার ছিল না।”

শৈল চুপ করিল।

জয়ন্তী কহিলেন,—“বোধ করি ইচ্ছে ক’রেই করেছিলেন। তার দুটি মেয়ে রূপের ডালি ছিল। যে ভাগ্যিমানি, সে চ’লে গেল। সারা সংসারটা তার জন্যে হাহাকার করলে। ছোট বউ পাগল হ’ল। যার যেমন কর্ম্মফল !”

জয়ন্তীর উপর শৈলর মনটা প্রসন্ন ছিল না ; কিন্তু এখন যেন তাহা তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। তথাপি ইনি শ্বশুরের মাননীয়া আত্মীয়া বলিয়া মনের ঘৃণাটাকে সংযমের আবরণে ঢাকিয়া রাখিল। কিন্তু মনের বিরুদ্ধে মানুষ জোর করিয়া বেশীক্ষণ চলিতে পারে না ; তাই চোখের উপর হাতটা চাপা দিয়া সে নিঃশব্দে ঘুমাইবার ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করিল।

জয়ন্তী বুঝিলেন, এইবার তাঁহাকে উঠিতে হইবে। চোখের ইসারায় মেয়েকে তিনি কক্ষের একটি পাশে আড়ষ্টের মত আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া, এমন আশ্চর্য্য হইলেন, যেন আকাশ হইতে খসিয়া পড়িলেন ! কহিলেন,—“হ্যাঁ রে শুভা, মুখ্‌খানি অমন কাঁচু-মাচু ক’রে দাঁড়িয়ে কেন ? জামাই বাবু তোর পাণ খেলে ? সুপুরি কাট্‌তে ত আঙ্গুল কেটে রক্তারক্তি কর্‌লি !”

চাঁদের আলো যেমন রাজপ্রাসাদ, দীনের কুটীর মানে না, বিনা দ্বিধায় সে আপনার স্নিগ্ধ আলোটুকু সমভাবেই ছড়াইয়া যায় ; স্নেহ-কোমল চিত্ত তেমনই অপরের দুঃখ বা বেদনার আভাস পাইলেই ক্ষুব্ধ হয়। আত্মপর চিন্তা করে না। শৈল চমকিত হইল। তাহার জন্য একটি বালিকা এতখানি কষ্ট করিয়া যত্ন-উপহার লইয়া আসিয়াছিল। রূঢ় আচরণে সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে !

জয়ন্তী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; মেয়েকে বকিতে লাগিলেন, “সব কাযেই তোর তাড়া ; বল্লুম দুটো পাণ দে শৈলকে —আমি দেব মা, আমি দেব মা ! এখন আঙ্গুলে ব্যথা হ’ল। একজামিন দিবি কি ক’রে ?”

সলজ্জ মুখে মেয়ে কহিল,—“ও কিচ্ছু না। কালই সেরে যাবে। তুমি কেন বল্‌লে না, জামাই বাবু পাণ খান্‌ না ?”

যে কাযটা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তাহা করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। জয়ন্তী যেটাকে সহজে করিবার জন্য সচেষ্টভাবে বাক্যাড়ম্বর করিতেছিলেন, বেদনা ছড়াইতেছিলেন, সেটা কিন্তু ততই জটিল হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু বালিকার কণ্ঠে সরল অভিযোগে তাহা সোজা হইয়া গেল।

শুভার মুখের পানে চাহিয়া, সস্নেহ কণ্ঠে শৈল কহিল,— “পাণের ডিবেটা কই ?”

বর্ষার আকাশ শরতের প্রথম আলোকস্পর্শে অকস্মাৎ হাসিয়া উঠার মত, জয়ন্তীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখখানা নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন,— “ও মা ! তুমি বুঝি ভাবছিলে ডিবেতে আরসুল্লা ভরে দিয়েছে ? তাই পাণ নাওনি। আচ্ছা শুভা, জামাই বাবু তোরে যখন সন্দেহই করছে, তুই নিজে-হাতে ওকে পাণ দে।”

কম্পিত হাতে ডিবাটা খুলিতেই শৈল হাত বাড়াইয়া মিঠা পাণের খিলি তুলিয়া লইল। কহিল,—“পাণ আমি খেতুম না, শুধু তুমি ছেলে মানুষ আঙ্গুল কেটেছ ব’লে খেলুম।”

কথাগুলা সে শুভার মুখের পানে চাহিয়া কহিলে

...দের উপর মেঘাবরণের মত জয়ন্তীর উজ্জ্বল মুখের উপর একটা অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শৈল ইচ্ছা করিয়াই শুভার হাত হইতে পাণ লইবার দায়টা এড়াইয়া গেল।

১১

ব্রজমোহন বসুর পারলৌকিক ক্রিয়ার দিন আসন্ন। বৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আত্মীয়-কুটুম্বতে ভরিয়া উঠিতেছে। সংগোপনে শৈল অবনী বাবুর হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া কহিল,—"খরচটা আপনি একটু বুঝে করবেন—আমি কিছু বল্‌তে পারব না।"

মাথা নাড়িয়া অবনী কহিলেন, "সে তুমি না বল্‌লেও আমায় করতে হ'ত, বাবা! এটর্ণি-বাড়ীতে কায ক'রে চুল পাকালুম, কত রকম লোক দেখ্‌লুম—এক আঁচড়ে সব বুঝ্‌তে পারি।"

ব্যস্ত হইয়া শৈল কহিল,—"ও সব কথা যাক্, যা কিছু এই ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু একটা কথা, টাকাটা যে আমি দিচ্ছি, অনিলা যেন তা' না বুঝতে পারে। তা হ'লে সে হয় ত সব বন্ধ ক'রে দেবে।"

অবনী একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন,—"তার কাছে কোন কথা গোপন রাখা শক্ত। ভগবান্ এত অল্প বয়সে ওর সব কেড়ে নিয়েছেন বলেই বুদ্ধিটা ওকে একটু বেশী পরিমাণে দিয়েছেন। এই যে এত বড় সংসারটা, এর সব ভার ব্যবস্থাই ত ঐ অতটুকু মেয়ের কাঁধে চাপান ছিল। ওর মা ত অনেক দিনই সংসার ছেড়েছিলেন। বাপের অবস্থা এতটুকুও ওর কাছে গোপন নেই। তাই এক এক সময়ে অবাক্ হয়ে ভাবি, এতগুলা লোকের চোখের উপর নিজেদের মন্দ অবস্থাটাকে পরের চোখে কেমন ক'রে আড়াল করত, এই অর্থ-সঙ্কটের মাঝেও দশের সামনে কেমন ক'রে স্বচ্ছলতা শৃঙ্খলা বজায় রাখত, এ শুধু ওই পারতে পারে।"

অবনীকে টাকা দিয়া শৈল ফিরিয়া আসিল। বর্ষার অশ্রুসিক্ত আকাশের ম্লান মুখ, শরতের সোনালি আলো যেমন মুছিয়া দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তেমনই একটা মনোরম তৃপ্তি, গভীর স্বস্তি, আকস্মিক কোথা হইতে আসিয়া শৈলর মনের বিষণ্ণতাকে ধুইয়া মুছিয়া চিত্তটাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

বেলা অনেকটা বাড়িয়াছে। সকালে চা, বিস্কুট খাইয়া সেই যে সে বাহির হইয়াছে, তথাপি খাইবার কথাটা শৈলর আদৌ মনে পড়িল না। ভাবনা-হীন বিশ্রামের মধুর আস্বাদকে সে শুধু সকল দেহ মন দিয়া উপলব্ধি করিতেছিল।

এই অপ্রত্যাশিত উল্লাসটা আকস্মিক কোথা হইতে আসিয়া শৈলর চিত্তকে অধিকার করিল, তাহা বলা কঠিন। শ্বশুরের শ্রাদ্ধক্রিয়ার টাকাটা অবনীর হাতে সকলের অজ্ঞাতে দিতে পারিয়াছে বলিয়া, কিম্বা যাহাকে দয়ার পাত্রী বলিত, সেই সে তাহাদের অনেকের উপরে; তাহার হাত ধরিয়া চলিলে চোখ বুঝিয়া জীবনের বিঘ্নসঙ্কুল পথে কোথাও বাধে না, এই শুভ সংবাদটার জন্য কি না কে বলিতে পারে?

শুভা আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। আহার্য্য-ভরা রেকাবীখানা টেবলের উপর রাখিয়া কহিল,—"মা ব'লে দিলেন, আপনি এগুলা খেয়ে তবে স্নান করতে যাবেন।"

মানুষের মন যখন প্রফুল্ল থাকে, তখন বিরক্তিকর বস্তুটাকেও সে ভাল চোখে দেখে। অতি তুচ্ছ বস্তুর মাঝেও সে তখন আনন্দকে খুঁজিয়া পায়। স্মিতমুখে তথাস্তু বলিয়া সে শুভার দিকে হাতটা বাড়াইয়া দিল। অন্য সময় হইলে, টেবলের উপর যেমন রাখিয়াছিল তেমন রাখিতে আদেশ করিত। এমন করিয়া ব্যগ্রহস্ত সে বাড়াইত না।

শুভা টিপয়টা টানিয়া খাবারের থালাটাকে শৈলর সম্মুখে রাখিল। শৈলর যেন ত্বরা সহিতে ছিল না, এমনই করিয়া সে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শুভা হাসিয়া ফেলিল, কহিল,—"আজ খাবারগুলা কেমন হয়েছে, জামাইবাবু?"

কচুরীতে একটা কামড় দিয়া শৈল কহিল,—"আহা, যেন অমৃত।"

শুভার সাহস বাড়িয়া গেল। মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তথাপি তাহার কৌতুকপ্রিয় বালিকাচিত্ত পরিহাস করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। কহিল,—"আজ বুঝি খাণ্ডব-দাহন শেষ হ'ল?"

শৈল হাসিয়া ফেলিল, কহিল,—"হ্যাঁ, এমনি ক'রে বেলা বারটা অবধি পিত্তি চুঁইলে, শুধু খাণ্ডব-দাহন নয়, অনেক কিছু দাহন হয়ে যাবে, ভাই!"

শৈলর কথা শুভা মনে মনে বিশ্বাস করিল, তাহার

অপরিসীম ক্ষুধার কথা ভাবিয়া, ব্যথিত কণ্ঠে কহিল,—"আহা, আপনি যে সেই সকালে গাড়ী নিয়ে বেরুলেন, আমি মনে করলুম, পাটনাতে বুঝি পাড়ী দিলেন। অনিলাদি ত আপনার আশা-পথ চেয়ে খালি ঘড়ি দেখ্‌ছিলেন।"

শৈলর হাসিমুখ মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া আবার পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। সে কহিল,—"ঘড়ি তিনি দেখ্‌তে পারেন, তবে সেটা আমার জন্যে—তুমি বুঝ্‌লে কি ক'রে?"

প্রশ্নটা শৈল সহজ কণ্ঠে করিয়াছিল। তথাপি তাহার সেই মুহূর্ত্ত-গম্ভীর মুখখানা শুভার দৃষ্টি এড়ায় নাই। নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল। রহস্য-সম্পর্কীয়া বলিয়া শৈলর কাছে সে যত আবদার করিয়া উপস্থিত হউক, ঘনিষ্ঠতা তাহার সহিত যতই থাকুক, কিন্তু অনিলার নাম লইয়া এ দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিবার অধিকার তাহার আজও হয় নাই। এটুকু নিঃসংশয়ে বুঝিয়া অন্তর তাহার শুধু সঙ্কুচিত হইল না; সে একটু ভয়ও পাইল। ভয়টা শৈলকে লইয়া নহে, অনিলাকে লইয়া। অন্তরের সবখানি শ্রদ্ধা-ভক্তি দিয়া সে অনিলাকে ভালবাসিত। তথাপি এই ইঙ্গিতটা সে করিয়া ফেলিয়াছিল, মেয়েমানুষ বলিয়া। কিন্তু অনিলার প্রকৃতি সে অবগত ছিল। গায় পড়িয়া কোন আলোচনা সে সহিতে পারে না। তাহার আত্মাশ্রয়ী গূঢ় বেদনা পাছে অপরের অযাচিত সহানুভূতিতে সঙ্কুচিত হয়; তাই সতর্কতার সহিত আপনাকে সে সকলের কাছ হইতে সরাইয়া রাখিত। শুধু শুভাকে সে অকৃত্রিম স্নেহে ছোট বোনটির মত আপনার পাশে অনুক্ষণ রাখিত। কিন্তু এই কথাটা যদি কোন ক্রমে অনিলার কাণে উঠে, তাহার পর শুভার আসনখানি, পূর্ব্বের মত ঠিক থাকিবে কি না, এই চিন্তায় শুভা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শৈলর আহারটা শেষ হইল। শুভা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "বাবা আপনাকে ডেকেছেন। ব'লে দিয়েছেন, বিশেষ দরকার আছে।"

শৈল কহিল, "জ্যেঠা মশাই যদি বিশেষ দরকার ব'লে আমায় ডেকেছেন, ত তুমি এতক্ষণ আমায় তা বলনি কেন?"

"মা আপনার খাবার আগে বলতে মানা করেছিলেন।"

শৈল আর কোন কথা কহিল না। ইহাতে শুভার অন্যায় কিছু হয় নাই, অপ্রীতিকরও কিছু ঘটে নাই। তথাপি সে দিনটা শরতের পীতাভ দিনটির মত শৈলর চোখে বড় মিষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিল, অকস্মাৎ তাহাতে একটা ছায়াপাত হইল। মনটাও তিক্ত হইয়া উঠিল।

শৈলকে পাইয়া, বিরজামোহন কহিলেন, "অনিলা কি বলেছে, শুনেছ? সে বাপের কায আমাদের কথামত করবে না।" আগুনে-পোড়া লোহার মত তপ্তরক্ত চোখে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "আজ যদি ব্রজর একটা ছেলেও থাকত—"

জয়ন্তী স্বামীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন,—"এতেই লোকে বলে ছেলে আর মেয়ে। বাপ-মায়ের কায ছেলেতে ভিক্ষে ক'রে করতে লজ্জা পায় না। কথায় বলে, পিতৃ মাতৃ দায় মহাদায়। আর টাকা থাক্‌তে, শুধু মেয়ে বলেই ওর মুখ দিয়ে বার হ'ল, আমি অত খরচ করবো না। ঠাকুরপোর অনিলা-অন্ত প্রাণ ছিল কি না—"

বিরজামোহন কহিলেন,—"তুমি একবার বোঝাবার চেষ্টা কর, শৈল। আমাদের কথা কাণে নেবে, সে মেয়েই সে নয়।"

পথে আসিতে আসিতে শৈলর বুকের মাঝে এমনি একটা কথা শুনিবার আশঙ্কা জাগিতেছিল। ধীরকণ্ঠে সে কহিল,—"তিনি কি করবেন বলেছেন?"

—"বলেছেন মাথা আর মুণ্ডু!"

বিরজামোহন মনের সব রাগটুকু দু'খানি হাতের বিচিত্র ভঙ্গীর সাহায্যে প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"নিজেই ফর্দ্দ করেছেন। দানসাগর ত দূরের কথা, বৃষ উৎসর্গ অবধি করবে না। না অধ্যাপক বিদেয়, না কিছু। পাঁচটি বামুন আর গুটিদশেক কাঙালী খাওয়াবে। আর যারা ব্রজর সঙ্গে গেছল, বাড়ীতে এসেছিল, তাদের খাওয়াবে। ব্রজর খাতা ধরে নিমন্ত্রণ হ'ত, সেই ফর্দ্দ শুনাতে গিয়ে এই বিপত্তি। বোঝালুম, সে একটা মানী লোক ছিল। দিক্‌পালের সঙ্গে লোকে তার তুলনা দিতো, তার কায হবে, তিল কাঞ্চনে?"

শৈল কহিল, "তিল-কাঞ্চনের খরচ কত?"

মুখ বাঁকাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জয়ন্তী কহিলেন,—"শ' তিনেকের মধ্যে ত সব সারবার ব্যবস্থা হয়েছে, দেখলুম।"

বিরজামোহন কহিলেন,—"তাই বা দরকার কি ছিল? ব্রজর অদৃষ্ট মন্দ, ছেলে না হয় নেই, সুনিলাটাও যদি বেঁচে থাকত, আজ ভাবনা কি? আমি দিব্যি গেলে বল্‌তে পারি, সে কখনও এমন হ'তে দিত না। বাপের মত গে[illegible]

একটা কলিজাওলা মেয়ে ছিল। ভগবান্ ভালটাকেই কেড়ে নয়। ও ছোট বেলা হ'তে কঞ্জুস জানি।'

জয়ন্তী খপ্ করিয়া কহিলেন,—"ফলও পাচ্ছে। ও যেমন কাউকে দিতে রাজি নয়, ভগবান্‌ও তেমনি ওকে দিতে রাজি নয়। তা না হ'লে ওর মত রূপ কার ছিল ?"

শৈল কথাটাকে সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ না দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিরজামোহন পত্নীর মুখের পানে চাহিলেন, জয়ন্তী একটা অর্থসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া হাঁকিলেন, "শুভা!" কন্যা নিকটে আসিতে কহিলেন,—"শৈল অনিলার দিকে যায় কি না দেখিস্ ত।"

শুভা মাথা নাড়িয়া কহিল,—"না, না, জামাইবাবু একবারও ওদিকে যান্ না। অনিলাদি ত ডাকে না। সেই প্রথম দিন যা ডেকেছিল।"

জয়ন্তী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—"তুই ত সব জানিস, খালি সন্দারি!"

মায়ের বকুনীতে শুভা কিন্তু দমিল না। প্রবল বেগে আপত্তি করিয়া কহিল,—"আমি রাতদিন থাকি, দেখ্‌তে পেতুম না। জামাই বাবু হয় নিজের ঘরে, না হয় নীচে দাদা কি বাবা—ওদের কাছেই কথা কয়।"

১৩

আহার শেষ করিয়া একটু গড়াইবার জন্য অনিলা পাথরের মেঝেটা নিজের আঁচল দিয়া মুছিতেছিল; শৈল ঝড়ের মত আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, কহিল,—"তুমি কি গোল বাধিয়েছ ?"

অনিলা কোন কথা না কহিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মৌন মূর্ত্তির পানে চাহিয়া, শৈল নিজের উত্তেজনাটা বুঝিতে পারিল। অপ্রতিভ হইয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল,—"সব দিক্ চেয়ে কায করা ভাল। এমন ভাবে বাবার কায আমরা করলে, চারিদিক্ থেকে একটা ভয়ানক নিন্দা শুনতে হবে।"

অনিলা মৃদু কণ্ঠে কহিল,—"তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে।"

শৈল একটা চেয়ার টানিয়া বসিল। দুশ্চিন্তা ও তীব্র সংশয়ে তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা না হইলে সে এমন করিয়া ভুল করিত না। অনিলার উক্তিকে শ্লেষ কল্পনা করিয়া হঠাৎ সে উদীপ্ত হইয়া উঠিল। আর এক জনের ধীরতার তুলনায় তাহার কণ্ঠস্বর কিছু অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ শুনাইল। শৈল কহিল,—"আমায় তিনি ছেলের চোখেই দেখতেন, একথা যেমন আমি জানি, তেমনি আর পাঁচ জনেও জানেন।"

অনিলা তেমনই মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমিও তা জানি এবং এটা যে কতখানি সত্য, আমার চেয়েও তা কেউ বেশী জানতে পারে না। আর আপনিও ত সেই পুত্রের কাযই করছেন। এও ত সবাই দেখ্‌তে পাচ্ছে।"

"তবে এরকম ভাবে তাঁর কায ক'রে আমাকে তুমি ছোট ক'রে দিচ্ছ কেন? লোকসমাজে আমার মুখ দেখাবার পথ বন্ধ করছ। কিসের জন্যে তুমি এমন ক'রে ক্ষতি করছ ?"

শৈলর উত্তেজিত কণ্ঠের কথাগুলি যেন একটা অভিযোগের মত শুনাইল।

আশ্চর্য্য হইয়া অনিলা ক্ষণেক শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পরে কহিল, "আমি যদি আমার ইচ্ছামত বাবার কায করি, এতে আমায় ছেড়ে লোকে আপনার ওপরেই বা দোষারোপ করবে কেন? আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।"

শৈল হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "অনিলা, সকলে বলে তুমি খুব বুদ্ধিমতী। কিন্তু এটুকু যে কেন বুঝ্‌তে পারছ না! এ আমার দুর্ভাগ্য।"

অনিলা চুপ করিয়া রহিল। শৈলর অন্তরের এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে একটা সাড়া অবধি দিল না। মুখেরও কোন ভাবান্তর ঘটিল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া শৈল কহিল,—"অবনী বাবু কি তোমায় জানান্ নি যে, তাঁর কাছে টাকা আছে ?"

অনিলা কহিল,—"হ্যাঁ, তিনি জানিয়েছেন, পাঁচ হাজার টাকা তাঁর হাতে বর্ত্তমানে মজুত আছে।"

বর্ষার ঘন মেঘস্তরকে হঠাৎ দুই পাশে ঠেলিয়া দিয়া, মধ্যাহ্ন-রবি মুখ বাহির করিল। উজ্জ্বল মুখে শৈল কহিল,—"তবে তোমার আপত্তি কি ?"

অনিলা কোন উত্তর করিল না। বাদানুবাদ করা তাহার স্বভাব নহে। একটা স্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্য দ্বারা সকলের সহিত সে ব্যবধান রাখিয়া চলে, ইহা শৈল

বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই আজও সে রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা অসম্মতি বা প্রচ্ছন্ন বিরক্তির পরিচায়ক নহে। মনে মনে এই অনুমান করিয়া স্মিতমুখে শৈল কহিল,—"আমাদের মতের তবে মিল হল অনিলা?"

অনিলা মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, "আমি যা স্থির করি, কারুর কথায় তাকে অস্থির করি না।"

শৈল চমকিয়া উঠিল। নিজেকে অকস্মাৎ ভয়ানক অপমানিত জ্ঞান করিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে অন্তরটা তাহার দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুগৌর মুখখানা নিমেষে সিঁদুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। আপনাকে যথাসাধ্য চেষ্টায় সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে সে কহিল,—"মানুষ সব দিতে পারে, দিতে পারে না শুধু নিজের মর্য্যাদাকে। আর একেই বজায় করতে সেখানে যত কিছু ত্যাগ মহত্ত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামের বনবাসই বল, সীতার পাতাল-প্রবেশই বল—মনুষ্যত্বের প্রকাশ এইখানে। আজ আমি যে অনুরোধ নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলুম, তার মাঝেও সেই মর্য্যাদা দাঁড়িয়েছিল। যার জন্যে তোমার বাবা এমন ক'রে মৃত্যুর রাজ্যে চলে গেলেন।"

অনিলা নিঃসঙ্কোচে শৈলর দিকে চাহিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "আমার উত্তর আপনার মুখ দিয়ে বার হয়েছে। বাবার সব চেয়ে বড় যা, যার তলায় নিজেকে তিনি বলি দিয়েছেন, আমি তাকেই বজায় রাখতে ঘরে-বাইরে বিরোধ তুলতে ভয় পাচ্ছিলুম।"

—"তাকেই বজায় রাখতে?" একটা কঠিন বিদ্রূপের হাসিতে শৈলর মুখ ভরিয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল। অনিলা কিন্তু এ সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না; দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, আমি প্রাণপণে বাবার যে সম্ভ্রমটা বজায় রাখ্‌তে চাচ্ছি, এই এতগুলো লোক যা ভাঙ্গতে চাইছে। আপনি ছেলের দাবীতে তাদের সাথে যোগদান ক'রে বাবার সেই সম্ভ্রমটুকু নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন।"

এই অচিন্তনীয় অত্যদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত কথাটায় শৈলর মুখ পলকে বিবর্ণ হইয়া গেল। সম্মুখে প্রেতাত্মা দেখিলে মানুষ যেমন ভীতদৃষ্টিতে চায়, তেমনই করিয়া অনিলার পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "আমি তাঁর সম্ভ্রম নষ্ট করতে চাইছি?"

দৃঢ়কণ্ঠে অনিলা কহিল, "জ্ঞাতে হোক্, অজ্ঞাতে হোক্, আঘাত করলেই বেদনা লাগে। নিজের কর্ম্মের জন্য অথবা অদৃষ্টের জন্য বাবার অর্থের পরমায়ু নিঃশেষ হয়েছে বলেই কি তিনি জীবনে যা করেন নি, আমি তাঁর মেয়ে হয়ে সেই কাজ করব? আপনি এটা বিশ্বাস করেন?"

শৈল কহিল, "টাকাটা ত অবনী বাবুর কাছ হ'তে পাচ্ছ! আর তাই জানবেও সবাই।"

অনিলা একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আপনার মুখে এ রকম শোনবার আশা আমি করি নি।"

অনিলার হাসিটুকু শৈলকে বিঁধিল। অপ্রতিভ কণ্ঠে সে কহিল, "কিন্তু আমি যতদূর তাঁকে জানি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি দিলে তিনি আপত্তি করতেন না। অপ্রীত হতেন না।"

অনিলা কহিল, "হ'তে পারে তা। কিন্তু আপনি ত তাঁকে দিচ্ছেন না। আপনার কাছ হ'তে তিনি কিছু নিচ্ছেন না। দেব আমি তাঁকে—" অনিলা একটুখানি থামিল, কণ্ঠস্বর ভারী হইয়াছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়া কহিল, "বাবা মা আমার কাছেই হাত পাতবেন। আমার সামনেই তাঁরা দাঁড়াবেন—" অনিলা আবার থামিল। সূর্য্যদীপ্তিকে চলন্ত মেঘে আড়াল করার মত, একটা বেদনার ছায়া তাহার সঙ্কল্পকঠিন মুখখানিকে বার বার পাণ্ডুর করিয়া তুলিতেছিল। তাই কয়েক মুহূর্ত্ত থামিয়া মনের মাঝে একটা বল সঞ্চয় করিয়া কহিল, "আমার যা শক্তি, তাই দিয়েই আমি স্বর্গবাসী বাপ-মায়ের পূজা করতে চাইছি, এতে তাঁরাও তৃপ্ত হবেন, আমিও আশীর্ব্বাদ পাব।"

শৈল অনিলাকে চিনিয়াছিল। বুঝিল, এ মেয়েটি যে দুর্ভেদ্য প্রাকার নিজের চারিপাশে রচনা করে, তাহাকে ভেদ করিবার শক্তি কেহই পায় না। শৈলও না। অন্তর-দুয়ারের অর্গল চিররুদ্ধ করিয়া ইহার মন যেন নিজেকে একাকী রাখিবার বাসনায় বদ্ধপরিকর। কিন্তু এমন দীন-হীনভাবে, শ্বশুরের পারলৌকিক ক্রিয়াটা সম্পন্ন হইতে দিতে শৈলর অন্তরও কিছুতে সম্মত হইতেছিল না। শৈশবে পিতৃ-হারা সে, পিতার সব শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সে শ্বশুরকে অর্পণ করিয়াছিল।

ধীরে ধীরে শৈল কহিল, "অনিলা, ভয়ানক শোকে মনটা তোমার এখন আচ্ছন্ন, তাই আবেগের মাথায় তুমি ও রকম করতে চাইছ। কিন্তু আমি তোমার চেয়ে বয়সে

নেকখানি বড়; আঘাতও অনেক খেয়েছি। তার ভিজ্ঞতা হতেই বলছি—এটা তোমার সঙ্গত হবে না।"

স্থিরদৃষ্টিতে শৈলর পানে চাহিয়া, অচঞ্চলকণ্ঠে অনিলা কহিল, "কেন হবে না?"

—"কেন হবে না? তিনি যে আত্মসম্ভ্রমটা ভালবাসতেন। প্রাণের চেয়েও সেটাকে তিনি মূল্যবান্ মনে করতেন, সেই তাঁর—"

বাধা দিয়া অনিলা কহিল,—"আমি ত তাঁর কায দীনহীনের মত করতে চাই না, আপনি আমায় সেই পরামর্শ দিচ্ছেন?" অনিলার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিল।

"আমি—?" শৈলর মুখে অদৃশ্যহাতে কে যেন একমুঠা ছাই মাখাইয়া দিল। দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্ষণেক অনিলার পানে সে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনিলা এতটুকু বিচলিত হইল না; দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"হাঁ, আপনি। আমার যা সাধ্য, আমি তাই দিচ্ছি। এতে দীনতা প্রকাশ পায় না, একথা ত বলেছি। দীনতা প্রকাশ পায় শুধু পরের কাছে হাত পাতলে। আমি ভিক্ষা ক'রে বাপ-মা'র কায ক'রে তাঁদের ছোট ক'রে দেব, একথা আপনি ভাব্‌তে পারেন?"

যে মেঘখণ্ড সূর্য্যালোককে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল, অনিলার এই কথা কয়টায় তাহা যেন নিমেষে অপসৃত হইয়া গেল। মেঘনির্ম্মুক্ত রবিকরের কোথাও ঝাপসা রহিল না। শৈল দেখিতে পাইল, অনিলার আপত্তি কোথায়? কেন? অন্তরটা তাহার সম্মুখে উপবিষ্টা তরুণীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। কোমল কণ্ঠে সে কহিল, —"আমার কাছ থেকে নেওয়া তোমার ভিক্ষা নয়, অনিলা! নেবার অধিকার আছে—আর তা দিয়ে গেছেন, তোমার বাবা নিজে।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে অনিলার বুদ্ধিবৃত্তি কয়েক মুহূর্ত্ত যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। বিবর্ণমুখে অর্থহীন দৃষ্টিতে শৈলর মুখের পানে ক্ষণেক সে তাকাইয়া রহিল। তারপর কহিল, —"বাবা? অসম্ভব!"

অনিলার ম্লান মুখ, কুণ্ঠিতদৃষ্টি ও স্তম্ভিত ভঙ্গীর পানে চাহিয়া শৈলর অন্তরটা যেন জয়ের আনন্দে ভরিয়া উঠিল। দৃঢ়কণ্ঠে সে কহিল,—"হাঁ, তিনিই দিয়েছেন। প্রমাণ আমি দেখাতে পারি।"

তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটা উল্লাস উদ্বেলিত হইল। শেষ মুহূর্ত্তে বাজী যেন জিতিয়াছে। ঠিক সেই সময় জয়ন্তী পরদা ঠেলিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন।

১৭

মিত্রসাহেব কন্যার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—"তা হ'লে শৈলর ফিরতে একটু দেরী হ'বে। অনিলার একটা ব্যবস্থা না ক'রে সে আসবে কি ক'রে? আহা, বেচারা মেয়ে!"—বলিয়া অসহায়া বালিকার দুঃখের সমবেদনায় তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা শতগুণ গভীর বেদনার নিশ্বাস যে তাঁহার নিজের কন্যার হৃদয়ের মূল অবধি তরঙ্গাহত করিয়া তুলিল, তাহা মিত্র-সাহেব জানিতেও পারিলেন না।

সুলেখা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল, "অনিলার সম্বন্ধে অপরের ত কিছু করবার নেই। যা করবার তার বাবাই ত ক'রে রেখে গেছেন।"

কন্যার নির্বুদ্ধিতায় মিত্র-সাহেব ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু জীবনে যে দুঃখের মুখ দেখে নাই, মানুষের অবস্থা-সঙ্কট সংসার-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি সে পাইবে কোথা? ইহাই ভাবিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখশ্রীতে ছায়াপাত হইল না। সহজকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ব্রজ ব্যবস্থা ক'রে গেছে! কি বল্‌ছ, লেখা? ব্রজকে আমি খুব ভালবাসলেও, নিজের মেয়ের যে অবস্থা সে ক'রে গেছে, তার জন্যে আমি মুক্তকণ্ঠে তার নিন্দা করি। একটা গ্রাসাচ্ছাদনের টাকা অবধি রেখে যায়নি।"

নতনেত্রে সুলেখা কহিল, "আমি যত দূর জানি, তাতে মনে হয়, জ্যেঠামণি অনিলার জন্যে যদি কিছু টাকা-কড়ি রেখে যেতেন, তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ত না।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া মিত্র-সাহেব কহিলেন, "তবে কিসে সুবিধে হ'ত? ভগবান্ তার যা করেছেন, তাতে বিয়ের"—মিত্র-সাহেব থামিয়া কহিলেন, "সাংসারিক জীবের অর্থ না হ'লে এক পা চলার উপায় নেই। মানুষের যত কিছু শক্তির বিকাশ তার মূলে এই অর্থ। সেইজন্যেই এই বিশ্বজোড়া কাড়াকাড়ি মারামারি।"

সুলেখা কহিল, "বাবা, তোমার কথাটা আমি খুব মানি। অর্থই মানুষের শক্তি। আর এই অর্থের জোরেই তিনি অনিলার শক্তি, সামর্থ্যটুকু রেখে গেছেন।"

মেয়ের কথার হেঁয়ালি মিত্র-সাহেব কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এতগুলা কথার মাঝে সুলেখা যে কিসের ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা এই সুবিখ্যাত আইন-জীবীর কূটজ্ঞ বুদ্ধির অগম্য হইল। কারণ, মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা আছে। ইঁদুরের মত মাটী খুঁড়িয়া পরের সবটুকু তন্ন-তন্ন করিয়া সন্ধান করিলেও স্নেহের আচ্ছাদনে ঢাকা অনেক কিছু সে দেখিতে পায় না।

মিত্র-সাহেব কহিলেন—"লেখা, তোমার বক্তব্যটা একটু স্পষ্ট ক'রে বল।"

সুলেখার আনত দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের উপর আবদ্ধ হইয়া গেল; কিন্তু মৃদু কণ্ঠস্বর শব্দগুলিকে স্পষ্টরূপেই উচ্চারণ করিল। সুলেখা কহিল—"মিঃ রায়ের উপর অনিলার সব দাবীই জ্যেঠামণি রেখে গেছেন।"

মিত্র সাহেব হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন—"বাই জোভ! শৈলকে লক্ষ্য ক'রে তুমি এত তর্ক আমার সঙ্গে কচ্ছিলে! কিন্তু লেখা, কথাগুলা তোমার বড্ড ছেলে মানুষের মত হ'ল। স্বীকার কচ্ছি, শৈল তার আত্মীয়, তাকে দেখ্‌বে, অর্থসাহায্য করবে। কিন্তু অনিলার আত্মমর্য্যাদা কি স্মরণ করিয়ে দেবে না, শৈলর কাছে হাত পাত্‌তে হচ্ছে?" কথাটার শেষ দিকে মিত্র-সাহেবের কণ্ঠস্বর করুণায় বিগলিত হইয়া উঠিল। অনিলার বিলিব্যবস্থাটা মিত্র-সাহেবের কাছে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শৈল তাহার জন্য কতখানি কি করিতে পারে, এবং কি করিবে, তাহাও জানিবার একটা ভয়ানক আগ্রহ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উদার প্রাণ, নিঃসহায় বন্ধুকন্যার জন্য বাস্তবিকই পীড়া অনুভব করিতেছিল। কিন্তু অজ্ঞাতে যে নিজের ঘরের কোণে আর একটা বড় সমস্যার উদ্ভব হইয়া বিন্ধ্যাচলের মত মাথা তুলিয়া তাঁহার আনন্দের সূর্য্যালোককে বাধাগ্রস্ত করিতে চাহিয়াছিল, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। ভবিষ্যৎ কালো পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকে।

সুলেখার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মনের একটা দ্বিধাকে সজোরে সরাইয়া সে কহিল—"স্বামীর কাছে হাত পাততে ত লজ্জা নেই। তাতে আত্মসম্মানে ব্যাঘাত ঘটে না।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে একটা ধ্বনি করিয়া মিত্র সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন—"স্বামী—? হোয়াট্ ইস্ দিস্! আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! লেখা, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

অনেকখানি চিন্তা তর্ক-যুক্তি দিয়া দিনের পর দিন ধরিয়া সুলেখা নিজকে প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু বন্যার বিদ্রোহী ক্ষিপ্ত জলরাশি যেমন প্রচণ্ড আঘাতে নদীর শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দেয়, তেমনই জনকের বিস্ময়ের আঘাতে সুলেখার অন্তরের সব শক্তি যেন নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল। আত্মসংযমের কঠিন বাঁধনটা মুহূর্ত্তে শতখণ্ডে ছিঁড়িয়া পড়িল। পিতার মত সে-ও ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া বসিয়া রহিল। সম্বিৎ পাইল পিতার স্পর্শে ও কণ্ঠস্বরে।

মিত্র-সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া কন্যার কাছে আসিয়াছিলেন। সস্নেহে তিনি মেয়ের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে আশ্বাস ভরা কণ্ঠে কহিলেন,—"ও রকম ভয়ানক চিন্তাগুলা তোর করবার কোন কারণ নেই, মা! শৈলর উপর অবিচার করিসনি।"

বুকের মাঝে নিরুদ্ধ একটা আকুল ক্রন্দন এই স্নেহের স্পর্শটুকু পাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া সুলেখার কণ্ঠদ্বারে ঠেলিয়া আসিল। কিন্তু পিতার সম্মুখে ইহা প্রকাশ হইলে একটা অপরিসীম লজ্জা তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে, এই জ্ঞানটুকু তাহার অন্তরের সমস্ত বেদনার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

বয় আসিয়া জানাইয়া গেল, চা দেওয়া হইয়াছে। কন্যার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"চল, মা, চা খাইগে।"

চায়ের টেবলের চেয়ার অধিকার করিয়া মিত্র-সাহেব কন্যাকে কহিলেন,—"শৈলর মাথায় কত ঝঞ্ঝাট, তুই ত তা নিজেই গল্প করলি। ভেবে দেখ্ দিখি মা, এতে চট্ ক'রে সে কি আস্‌তে পারে? আর এই দেরীটার জন্য আমরা যদি বাজে চিন্তা করি, তার ঘাড়ে যদি দোষ চাপাই, তা আমাদের অন্যায় হ'বে।"

সুলেখা কথা কহিল না। মুখও তুলিল না। পিতাকে এক কাপ চা প্রস্তুত করিয়া দিয়া, নিজের এক কাপ ঢালিয়া লইল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মিত্র-সাহেব অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। এতগুলা আশ্বাসবাণীতে সুলেখার মুখ হইতে বিষাদের কালো মেঘখানা অপসৃত হইয়া আনন্দের দীপ্তি ফুটিল না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, এবং ইহার জন্য মনে মনে মানুষের তরুণ বয়সটাকেই দায়ী করিলেন। ঐ একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন অন্ধ আবেগে পরিচালিত অবস্থা মানুষের জীবনে একবার আসে, যখন মানুষ কাণে শোনে এক, অর্থ করে অপর। বিচার করে এক, ভাবে অন্য রকম। ঐ বিশ্রী বয়সটা অতিক্রম করিলে মানুষের যত রাগ আসিয়া পড়ে ওই অবস্থাটার উপর, এবং সাদা চুল ও কেশ-বিরল মাথায় তরুণবয়সের নর-নারীর আচরণগুলা এত দৃষ্টিকটু, অসংযত, অন্যায় ঠেকে যে, প্রতিমুহূর্ত্তে ধৈর্য্যের বাঁধন টুটিয়া শাসন নিজেকে প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "শৈলকে আমি ভাল ক'রেই চিনি। সুকুমারের উপর আমার যতখানি না আস্থা আছে, তার চেয়ে আমার অনেকখানি বেশী আস্থা শৈলর উপর আছে! তোমার মনে একথা জেগেছে ব'লে, লেখা, আমি দুঃখিত।"

ইঙ্গিতে এই অভিযোগটুকু করিয়া মিত্র-সাহেব কন্যার মুখের পানে চাহিলেন। আশা করিয়াছিলেন, এবার একটা উত্তর তিনি পাইবেন। কিন্তু আশা করিলেই যে তাহা পূর্ণ হইবে, ইহার ত কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। সুলেখা নীরবেই চা পান করিতে লাগিল।

চা-পান শেষ হইয়া গেল। বয় আসিয়া টেবল সাফ করিয়া দিল। তথাপি সুলেখা নির্ব্বাক্। মিত্র-সাহেব ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখা, তোমার কথার কি কোন কারণ আছে?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি কন্যার মুখের পানে চাহিলেন।

অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসটা সমুদ্রতরঙ্গের মত ফুলিয়া দুলিয়া তটের বুকে ভাঙ্গিয়া পড়িবার আগ্রহে কণ্ঠদ্বারে ঠেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে প্রাণপণে রোধ করিতেই ওষ্ঠের কাঁপুনি দাঁত দিয়া চাপিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া সুলেখা চেয়ার ছাড়িয়া ঈষৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

১৮

অনেকগুলি পুত্রকন্যার পিতা হইয়াও মিত্র-সাহেব দুইটি সন্তানকেই বুকে ধরিয়া বড় করিতে পারিয়াছিলেন। পুত্র সুকুমার, কন্যা সুলেখা। বাকি সকলেই কচি মুখের মিষ্ট হাসিতে স্বল্পদিন মিত্র-সাহেবের বুকে আনন্দ দিয়া, আবার সেইখানেই কঠিন আঘাত করিয়া বিদায় লইয়াছে। সে প্রিয় মুখগুলির জন্য মিত্র-সাহেবের চোখে মতির বিন্দু গড়াইয়া পড়ে।

সুকুমার ছিল মিত্র-সাহেবের দাম্পত্য-জীবনের প্রথম পুরস্কার! সুলেখা তেমনই ছিল পত্নী-স্মৃতির শেষ নিদর্শন। সুলেখাকে একটি বৎসর পালন করিয়া তাহার মা সুজাতা, স্বামীর কাছে কন্যাকে গছাইয়া বক্ষঃছাড়া স্নেহ নিধিগুলিকে খুঁজিতেই সাত দিনের জ্বরে অজানা রাজ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন।

জীবনের সুখ-দুঃখভাগিনী, আনন্দদায়িনী পত্নীকে হারাইয়া মিত্র-সাহেব তাঁহার শোকাহত জ্বালাভরা বুকে মা-হারা মেয়েকে টানিয়া লইয়াছিলেন। সে আজ অনেকগুলি বৎসর আগের কথা। তখন তাঁহার মাথাভরা কালো চুল, খোঁজা-খুঁজি করিলে দু-চারি গাছি সাদা মিলিত, এবং সন্নার দ্বারা মিত্র-সাহেব তাহা উৎখাতিত করিতেন। কিন্তু নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন বিধি-ব্যবস্থা চিরকাল টিকিয়া থাকে না। যুগ-হাওয়া তাহাকে বদল করিয়া দেয়। এখন মিত্র-সাহেবের কেশবিরল মাথায় অবশিষ্ট কয় গাছি সাদা চুলকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যত্নের ত্রুটি নাই। অতীতে ইহারাই অনাদৃত ছিল।

সেদিনে, এদিনে অনেক তফাৎ। সেদিন তিনি যে মা-হারাকে বুকে লইয়াছিলেন সান্ত্বনার জন্য, আজ শোকের আগুন নিবিয়াছে! জ্বালাও নাই, শুধু পোড়ার দাগটাই আছে। কিন্তু আজ এমন নিবিড় করিয়া সারা বুক জুড়িয়া সেই মেয়ে আছে, যাহাতে মনে হয়, রূপকথার নায়ক-নায়িকার পরমায়ু যেমন নির্ভর করিত ফুলের মাঝে, পাখীর মাঝে, তেমনই মিত্র-সাহেবের পরমায়ুটুকু নির্ভর করে কন্যা সুলেখার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দর উপর।

সুলেখা যখন দাঁত দিয়া ওষ্ঠাধর চাপিয়া বিবর্ণমুখখানাকে পিতৃদৃষ্টি হইতে মুহূর্ত্তে সরাইয়া লইতে ত্বরিতপদে কক্ষ ছাড়িয়া গেল, তখন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি মিত্র-সাহেব

নিজের চেয়ারখানাতে অচলয়াতনের মত আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। দুঃস্বপ্নের মত কি হইল, কিছুই তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অসংখ্য চিন্তা, সম্ভব, অসম্ভবের বেশ পরিয়া অকস্মাৎ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মিত্র-সাহেবের মগজটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, এবং এই ভিড়ের মধ্য হইতে এই অপরিচিত দলের কাহাকে তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, মিথ্যা বলিয়া কাহাকে বা বিদায় দিবেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিরুপায় হতাশদৃষ্টিতে ক্ষণেক তিনি চাহিয়া রহিলেন। ভিতরের ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়াছে, কতখানি মন্দের পথ ধরিয়াছে, প্রতিরোধ বা প্রতিকার কি, তাহাও মিত্র সাহেব খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার কূটবুদ্ধি মামলার কাগজ হইতে আইনের অনেক গলদ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, প্রত্যুৎপন্নমতি কথার জালে বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করিয়া নিজের জয়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। প্রতিভা-কৌশলে স্পষ্ট-লিখিত চুক্তিনামা হইতে স্বার্থকে বজায় করিতে স্বপক্ষে টানিয়া অর্থব্যাখ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু নর-নারীর ভালবাসা ব্যাপারে কোথা দিয়া যে কি ঘটিয়া যায়, জীবনের এই অপরাহ্নবেলায়, তাহার কোন হদিস তিনি পাইলেন না।

মেয়েকে মিত্র-সাহেব ভাল করিয়াই চেনেন। সে যে মনগড়া খেয়ালে এতখানি করিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই হইল না। তথাপি সুলেখার কথার মাঝে যে ইঙ্গিতটা ফুটিয়া উঠিতেছে, সেটাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অন্তর সম্মত হয় না। শৈলর প্রতি মিত্র-সাহেবের গভীর বিশ্বাস আছে। শৈলর চরিত্রের দৃঢ়তা, অন্তরের উচ্চতার অনেক পরিচয় মিত্র-সাহেব পাইয়াছেন। মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধাও করেন, এবং শৈলর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, কঠিন অধ্যবসায় এক দিন যে তাহাকে নিজ ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানে তুলিবে, ইহাতেও মিত্র-সাহেব নিশ্চিত ছিলেন। তাই শৈল যখন তাঁহার জামাতার পদ বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিল, সে দিন তিনি সাগ্রহে সম্মতি দিয়াছিলেন, এবং শৈলর হাতে যে তিনি মেয়েকে দিতে পারিবেন, ইহার গভীর আনন্দ, বর্ষার নদীর মত অন্তরের কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

মিত্র-সাহেব কথাটা বন্ধুকে জানাইতে দ্বিধা করেন নাই। অসঙ্কোচে এই শুভবার্তাটা ব্রজমোহনকে দিয়াছিলেন। শৈল সংসারে মাথা গলাইবে, ইহাতে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষিমাত্রেই আন্তরিক সুখী হইবে; ইহা ছিল মিত্র-সাহেবের অকপট বিশ্বাস, এবং তাঁহার সুস্পষ্ট মনে আছে, ব্রজ আপত্তির কথা কিছুই বলে নাই: বরং অস্ফুটকণ্ঠে একটা আশীষবাণীই উচ্চারণ করিয়াছিল। তবে সমস্ত ব্যাপার এমন বিকৃত হইয়া যাইতেছে কেন?

মিত্র-সাহেব অকস্মাৎ স্থির করিলেন,—একটা অহেতুক কল্পনাকে সুলেখা মনোরাজ্যে বিস্তার করিয়া যে অনর্থ করিতে উদ্যত, সেটার উৎপত্তি হইয়াছে শুধু শৈলর অনুপস্থিতির জন্য। সন্দেহের অঙ্কুর একবার হৃদয়ে রোপিত হইলে সে সবের মাঝ হইতে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দেখিতে দেখিতে শাখা-পল্লবিত হইয়া উঠে, বিশ্বাসের সূর্য্যালোক আড়াল করিয়া অন্ধকার চিত্তের ভাল-মন্দ বুঝিবার দৃষ্টিটা হারাইয়া ফেলে।

নিজের বিগত যৌবনের কথা মিত্র-সাহেবের মনে পড়িল। বড় বড় মামলা লইয়া যখন তিনি বিদেশে ছুটিতেন এবং তাহার জটিল জালে আবদ্ধ হইয়া পত্নীকে পত্র লিখিবার অবকাশ হারাইতেন, তখন সুজাতা কতখানি রাগ করিয়া সম্ভব অসম্ভব দোষে তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে দোষী করিতেন, এবং বাদলের ধারা কেমন করিয়া সেই কালো চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িত—আর মিথ্যা সৃষ্ট অপরাধ অন্যায়গুলাকে ক্ষালন ও বিতাড়ন করিতে কত শপথের দ্বারা কতখানি বেগ পাইতে হইত, তাহা মনে পড়িতে লাগিল।

অন্ধকার আকাশের বুক চিরিয়া, সুদীর্ঘ বিদ্যুৎরেখা যেমন ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্য্যের মনোরম দীপ্তি আঁকিতে থাকে, তেমনই মিত্র-সাহেবের মনের বিষণ্ণতার উপর লুপ্ত-যৌবনের বিস্মৃত অনেক কিছু স্মৃতি, কাহিনী বার বার খেলা করিয়া যাইতে লাগিল এবং তাহারই আলো থাকিয়া থাকিয়া মিত্র-সাহেবের আঁধার মুখখানাকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকের সন্দিগ্ধচিত্তের কথা মনে করিয়া মিত্র-সাহেবের হাসি পাইল। বিকলাঙ্গী রূপহীনা পিতৃ-মাতৃহারা মেয়েটির উপর কাহার না করুণার উদ্রেক হয়?

তাহার দুঃখের প্রতি মিত্র-সাহেবের অন্তরও সহানুভূতিতে ভরিয়া আছে। শৈল তাহার নিকট-আত্মীয়, তাহার জন্য শৈলর মন কাতর হওয়া স্বাভাবিক। স্নেহ ও সহানুভূতি

প্রকাশ করাও প্রধান কর্ত্তব্য। মিত্র-সাহেব নিজে ইহা স্বীকার করেন। শৈলর মত বিশ্বাসের অত বড় উচ্চ স্থান আর আছে বলিয়া তিনি জানেন না। সুলেখার অন্তর নীচ বা ক্ষুদ্র নহে। সে তাঁহারই কন্যা, তবে কেন সে এমন অবিচার করিল? মিত্র-সাহেব ক্ষুব্ধ হইলেন। নারীপ্রকৃতি বলিয়া চিত্তকে সান্ত্বনা দিলেন।

মানুষ নিজের চিন্তা অনুযায়ী অনেক সময়ে নিজের যুক্তিগুলিকে অজ্ঞাতে গুছাইয়া লয় এবং বিরোধী যুক্তিগুলাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আত্মপক্ষকে সমর্থন করে। তাই অনেক সময়ে সত্য হইতে মানুষ বঞ্চিত হয়। ইহা চিরন্তন রীতি। কারণ, যুক্তি-তর্কের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না বলিয়া যে, দুনিয়াতে অনেক কিছু মুছিয়া যাইবে, তাহা নহে।

মিত্র-সাহেব অনেক সমস্যার নিজেই মীমাংসা করিলেন। তিনি জানিতেও পারিলেন না, যে আকাশকে তিনি মেঘহীন পরিষ্কার বলিয়া বোধ করিতেছেন, তাহারই অদৃশ্য প্রান্তে একটা কালো মেঘ উদিত হইয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে সেটা সমস্ত আকাশেই পরিব্যাপ্ত হইবে। বুকে তাহার বজ্রও আছে।

১৯

পিতা-পুত্রীর সে দিনকার সেই আলোচনার পর পনেরটা দিন কাটিয়া গেল। কেহ আর শৈলর সম্বন্ধে কোন কথা তুলে নাই। মিত্র-সাহেবও না। কিন্তু মুখে অনেক কথা না আসিলেও মনের ভিতর যে তাহার আলোচনা চলিবে না, তাহাও নহে। তাই মিত্র-সাহেবের মনের ভিতর উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। কিছু নয় বলিয়া তিনি যাহা উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, সেই বিরক্তিকর চিন্তাই সময়ে অসময়ে কাযে অকাযে মনের ভিতর উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া যায়। ঘনপল্লব সূর্য্যালোককে বাধাগ্রস্ত করিলে তাহারই ফাটলে ফাটলে ঝিকিমিকি করিয়া আলোককণা নিজের স্থিতিটা জানাইয়া দেয়।

শৈলর নিকট হইতে মিত্র-সাহেব পত্র পাইলেন। তাহাতে জানিলেন, ব্রজমোহনের শ্রাদ্ধব্যাপার চুকিয়াছে, কিন্তু এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাহা সে চুকাইতে পারে নাই। তবে আশা করে, শীঘ্রই সকল কায সমাপ্ত করিয়া সে পাটনায় ফিরিবে।

শৈল সুলেখাকে পত্র লিখিয়াছিল। তাহাতে লিখিয়াছে, শ্বশুরের সেই অর্দ্ধসমাপ্ত দিনলিপিখানি এখন শৈলর কাছে আছে, এ কথা সে অনিলাকে বলিয়াছে। কিন্তু সেই প্রহেলিকাময়ী মেয়েটি কোন কথার মাঝেই নিজেকে ধরা দিতে চাহে না। শৈল লিখিয়াছে, সে একটা ভয়ানক আশ্চর্য্যের বস্তু। চোখে না দেখিলে, পাশে না থাকিলে অনুভব করা যায় না। নিজের চারিপাশে সে এমন একটা গণ্ডী সহজে রচনা করে, যাহাতে তাহার নিকট অগ্রসর হইবার মানুষের একটা সীমা সতত নির্দ্দিষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। নিকটতম শব্দের অর্থ বোধ করা অনিলার অভিধানে নাই। যদি থাকে, তাহার অর্থকেও সে স্বীকার করে না।

উত্তরে সুলেখা লিখিল, কঠিন-সাধ্যকে করায়ত্ত করায় আনন্দ আছে। যে ধরা দিতে চাহে না, ধরিবার আগ্রহ তাহার প্রতি বাড়িয়া থাকে। তাই মানুষ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য অনায়াসে নিজের সব ছাড়িতে পারে। রাজ-ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া কৌপীন পরিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, এবং ভগবান্‌কে যখন মানুষ পায় ইহা যেমন সত্য, তখন মানুষ যে মানুষকে পাইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তবে, পাইবার কামনা মন দিয়া না করিলে দুষ্প্রাপ্য কখন করায়ত্ত হয় না। আরও অনেক কথা দিয়া সুলেখা শৈলর পত্রখানা শেষ করিল। বুকের মাঝে ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আপনাকে সংযত করিল। নিজের হৃৎপিণ্ডকে দলিয়া এমন সর্ব্বনাশা কর্ত্তব্যের প্রেরণা শৈলকে দিবার তাহার প্রয়োজন কি? নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা উৎকট বোকামীর পরিচয় নহে কি?

হঠাৎ এক সময়ে সুলেখার লোভ হইল চিঠিখানা সে ছিঁড়িয়া ফেলে।

নিজের ব্যাকুলতাটুকুই সে শৈলকে জানাইবে। অপরের কথা জানিবার বাসনা অপূর্ণ থাকুক। কিন্তু—কিন্তু! শৈলর চোখে কি সুলেখা চিরদিনের মত নামিয়া যাইবে না? হয়ত তাহার আহ্বানে শৈল আসিবে। বন্ধন স্বীকার করিবে, বাগ্‌দত্ত নিরুপায় সে। কিন্তু সুলেখার অন্তর কি তাহাতে তৃপ্ত হইবে? সুলেখা চকিত হইল। ঝড়-বৃষ্টিভরা পৃথিবীর বুকের চেহারা আকাশের বিদ্যুৎ-অন্ধকারের পর্দ্দা তুলিয়া নিমেষের জন্য যেন দেখাইয়া দিল। নিজের মনের দুর্ব্বলতার পানে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কোন্ মোহাবিষ্ট

মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাছে এই সুদীর্ঘ পত্রখানা নষ্ট করিয়া ফেলে তাহারই ভয়ে ভৃত্যকে ডাকিয়া সুলেখা তখনই উহা ডাকে পাঠাইয়া দিল।

মনের ঝোঁকে অনেক কায করিলেও শরীরের ক্লান্তি নিস্তার দেয় না, নিজের নিয়মে আঁটিয়া বসে ; তেমনই বিবেকের তাড়নায় অনেক কিছু ত্যাগ করিলেও ত্যাগের সুখ অব্যাহতি দেয় না। বর্ষার বর্ষণধারার মাঝে সৃষ্টির কল্যাণ-বীজ নিহিত আছে জানা সত্ত্বেও সে যখন নৃত্যের ছন্দে কর্ম্মচক্রকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহে—অপ্রীতির দৃষ্টি তখন আপনা হইতে তাহার উপর পতিত হয়।

সুলেখা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে হেলিয়া পড়িল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিতের চোখে দিনের আলোর রঙ যেন বদলাইয়া গেল। গোটা কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে পৃথিবীকে এক চোখে দেখিয়াছিল ; জীবনের অভিজ্ঞতা এমন পুঞ্জীভূত ও পুষ্ট হইয়া অভ্রভেদী হইয়া দাঁড়ায় নাই। সুলেখা নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নিজের প্রকৃতির এই একটা দিক্ এত দিন তাহার আপনার কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পড়াশোনা, খেলা-গল্প, হাসি-ভালবাসার মাঝ দিয়া জীবনের কুড়িটা বৎসর তাহার অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শ্রান্তভাবে যেন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ যেখানে ঘুম ভাঙ্গিল, চক্ষু মেলিয়া বিস্ময়ে দেখিল, —উচ্চে-নীচে, দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে, অসংখ্য কর্ম্ম-প্রবাহ শুধু কাযের উদ্দামেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে ; বিশ্ব যেন সহস্র বাহু মেলিয়া কাযের ইঙ্গিতই মানুষকে করিতেছে। পরার্থপরতার যজ্ঞকুণ্ডে বাসনার পুষ্পগুলিকে নিক্ষেপ করিয়া চিত্তকে তাহারই মাঝে দিতে হইলে দুঃখের এমনিতর অগ্নি-পরীক্ষা মানুষকে দিতে হয়, এবং দিতে পারে বলিয়াই সে মানুষ। আঘাত না পাইলে ব্যক্তিকে চেনা যায় না ; দুঃসহ আঘাত দিয়া ভিতরের সুষুপ্ত মানুষটিকে জাগাইয়া তোলা বিশ্বস্রষ্টার একটা বিচিত্র খেয়াল।

মিত্র-সাহেব জানিয়াছিলেন, সুলেখা শৈলর নিকট হইতে পত্র পাইয়াছে এবং তাহার উত্তরও দিয়াছে। বর্ষার শেষে শরতের আলোর মত, বিষণ্ণ অন্তর অকস্মাৎ ভিতরে ভিতরে পুলকিত হইয়া উঠিল। মনের দশখানা বাতায়ন খুলিয়া স্বস্তির বাতাস চিত্তকে অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি দিতে চাহিল।

সুলেখার কক্ষে ঢুকিয়া হাসিমুখে মিত্র-সাহেব কহিলেন, “লেখা! শৈলর চিঠির তুমি জবাব দিয়েছ?”

লিখিবার টেবলটা গুছাইতে গুছাইতে সুলেখা জানাইল, জবাব সে দিয়াছে।

মিত্র-সাহেব কৌচটার উপর বসিয়া কহিলেন, “শৈল শীগ্‌গির আস্‌বে লিখেছে?”

তেমনইভাবে কায করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই সংক্ষিপ্তস্বরে সুলেখা কহিল,—“হুঁ।”

মিত্র-সাহেব কন্যার উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কহিলেন, “লেখা, এ কাযগুলো থাক না, তোমার আয়া করবে। এসো, একটু গল্প করা যাক্।”

সুলেখা অপ্রতিভ হইল। হাতের ঝাড়নটা ফেলিয়া আসিয়া বসিল ; কহিল, “বাবা, দাদা এইবার ফিরবেন আমায় লিখেছেন। তোমায় বোধ হয়, তা লিখেছেন!”

মিত্র-সাহেব কহিলেন, “ও আশ্বাসটুকু সুকু আমাকেও ত দিয়েছে। কিন্তু অনেকবার নিরাশ হ'য়ে আমি আর ওটা বিশ্বাস করি না।”

সুলেখা কহিল, “না, না, দাদা নিশ্চিতই আস্‌বেন, আমাকে তিনি শপথ ক'রে লিখেছিলেন—এবার তাঁর কথার নড়-চড় হবে না।”

মিত্র সাহেবের মুখের রেখার একটিরও পরিবর্ত্তন ঘটিল না ; কহিলেন, “আসে ভাল ; না এলেও ক্ষোভ করব না। শুধু অনুক্ষণ প্রার্থনা করব, তোমরা দুটি ভাই বোন আমার কাছে বা দূরে যেখানেই থাক, সুখী হও শান্তি পাও।”

মনের একটা গভীর বেদনা অজ্ঞাতে কণ্ঠস্বরে এমন নিবিড় হইয়া ধরা পড়িল যে, লেখা চকিত হইয়া জনকের মুখের পানে অপরাধীর মত একবার করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, “তোমাদের বিয়ের কথা আমি সুকুমারকে লিখেছিলুম। সে জানিয়েছে, তার পূর্ব্বাহ্নে সে এসে উপস্থিত হবে। তোমাকেও কি তাই লিখেছে?”

সুলেখার সুগৌর মুখখানা মুহূর্ত্তে একবার শোণিতলেশ-হীন হইল, আবার দেহের সমস্ত রক্ত যেন সেইখানেই নিমিষে আশ্রয় করিল। নিবিড় কালো চক্ষু দু'টি আষাঢ়ের নিকষকৃষ্ণ মেঘের মতই সজল বোধ হইল।

মেয়ের মুখের এই ভাবান্তরটুকু মিত্র-সাহেবের দৃষ্টি

গোপন রহিল না। তিনি চকিত হইয়া উঠিলেন। সংশয়ের বিদ্যুৎ এক লহমার জন্য দৃষ্টিকে বহু দূর বিস্তৃত করিয়া যাহা দেখাইয়া দিল, তাহাতে অন্তর তাঁহার যথার্থই ভীত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি নিঃশব্দে রহিলেন। জগতে সন্তান ছাড়া বড় দুঃখ আর কেহ দিতে পারে না। মানুষ ইহার কাছে এমন করিয়া পরাভূত হয় যে, এমন করিয়া আর কাহারও কাছে কোন দিন সে নিজের পরাজয় স্বীকার করিতে পারে না। তথাপি ইহাকে পাইবার জন্য কাঙ্গালবৃত্তির সীমা-পরিসীমা থাকে না। অপত্যহারা জীবন যেন মরুভূমির মত শুধু ধু ধু করিয়া একটা বিরাট শূন্যতার কথা বলিতে থাকে। ব্যর্থতার হাহাকার আর মেটে না।

মিত্র-সাহেব কহিলেন,—"লেখা, ছোট বেলায় তোমার মা তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন। আমিই তোমার বাপ-মা দুই হ'য়ে তোমায় বড় ক'রে তুলেছি। তোমার মা যে-কথা শুনতে পেতেন, আমি কি তা শোনবার দাবী ক'র্‌তে পারি না?"

সুলেখা কহিল,—"বাবা, তোমার কাছে তো আমার লুকাবার কিছু নেই। জ্যাঠামণি যে আশা বুকে নিয়ে—মিঃ রায়ের উচিত নয় কি তা পূর্ণ করা?"

মিত্র-সাহেব তিক্তকণ্ঠে কহিলেন,—"হ্যাঁ, তা পূর্ণ করা উচিত আমি স্বীকার কচ্ছি। কিন্তু আশা কিছু একটা করেছিলেন তার নিশ্চিত প্রমাণ কই? নিজেদের মন-গড়া একটা কিছু খাড়া কল্লে তো চল্‌বে না।"

সুলেখা মুখ নত করিয়া বসিয়াছিল। পিতার কণ্ঠস্বরে একবার তাঁহার মুখের পানে চাহিল। স্বরে তাহার কোন-রূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল,—"না বাবা, এমন প্রমাণ আছে যা হয়ে গেছে, যা না বলা কোন মতেই চলে না। পাথরে ক্ষোদার মত এমন অক্ষয় প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন।"

সুলেখার কথাগুলি অগ্নিরেখার মত মিত্র-সাহেবের মাথার মধ্যে সশব্দে খেলিয়া তাঁহাকে একবারে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। মিনিট-খানেক পরে মিত্র-সাহেব কথা কহিলেন—তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের অন্ত ছিল না,—কহিলেন, "তার—ব্রজর আশাটা কি ছিল?"

সঙ্কোচহীনকণ্ঠে উত্তর হইল, "মিঃ রায়কে তাঁর জামাই করা। অনিলার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া।"

দ্রাবক-পূর্ণ বোমা ফাটিয়া নিকটস্থ জনকে ভীত করিয়া তোলার মত মিত্র সাহেব ভীষণ চমকিয়া উঠিলেন ও কৌচটার উপর নড়িয়া বসিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "অসম্ভব মিথ্যা। কে এ আজগুবি রচনা করেছে? অবশ্য তুমি নও!"

পিতার অন্তস্তলস্পর্শী, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে নিজের মুখখানা সরাইয়া না লইয়া অবিচলিত কণ্ঠে সুলেখা কহিল, "কারু মাথা হ'তে বার হয় নি, বাবা! একটি মাত্র যাঁর মাথা হ'তে বার হবার অধিকার ছিল, সেই তিনিই বার ক'রে গেছেন।"

"এ কথা কে তোমাদের বল্লে? ব্রজর মুখ দিয়ে কখন এ রকম কথা বার হবে না, আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।"

প্রচণ্ড জ্বালায় মানুষ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। মিত্র-সাহেব কক্ষময় পাদ-চারণা আরম্ভ করিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

প্রভেদ

(অনুবাদ—তুলসীদাস হইতে)

তুলসী! যখন এলে তুমি এই ধরণীর মাঝে
　　কাঁদলে তুমি, উঠ্‌ল ধরা হাসি।
এমন কায কর, যাতে বিদায় নেবার বেলা
　　হাস্‌বে তুমি, কাঁদ্‌বে জগদ্‌বাসী॥

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যধারা

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার শিকাগোর অধিবেশন আরম্ভ হইল। পৃথিবীর নানা ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধিগণের মধ্যে ভারতের যে কয়জন প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহাদের নাম—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (ভারতীয় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পক্ষ হইতে), বোম্বের নাগরকার (ব্রাহ্ম ধর্ম্ম), ধর্ম্মপাল (বৌদ্ধগণের পক্ষ হইতে), গুজরাটী গান্ধী (জৈন ধর্ম্মের পক্ষ হইতে), মিঃ চক্রবর্ত্তী (থিওসফি বা আনী বেসান্তের তত্ত্ব-বিস্তার পক্ষ হইতে)। তাঁহাদের মধ্যে এই অজ্ঞাতনামা যুবক প্রতিনিধি আসিয়া জুটিলেন,—ইনি কোন বিশেষ ধর্ম্মের পক্ষ হইতে আসেন নাই,—ইনি ভারতীয়; ইঁহার ধর্ম্মও ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহার সেই সৌম্য অথচ তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি ও উজ্জ্বল মসৃণ রেশমী গেরুয়া, আলখেল্লা ও পাগড়ী-শোভিত দেহ সমবেত সহস্র সহস্র নর-নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিবেকানন্দও সেই বিরাট জনসভার মধ্যে সভাপতির পার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারেন নাই। এরূপ বিরাট জনতার সম্মুখে তিনি পূর্ব্বে আর কখন বক্তৃতাও করেন নাই। তদ্ভিন্ন, শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিদেশী, এবং তিনি যাহা বলিবেন, তাহা হয় ত পরমুহূর্ত্তেই সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইবে; অথচ বক্তৃতায় তিনি কি বলিবেন, তাহা তখন পর্য্যন্ত তিনি স্থির করিতে পারেন নাই! অন্য বক্তারা সকলেই স্ব স্ব বক্তব্য বিষয় লিখিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম কিছুই লিখিয়া আনেন নাই। তিনি তাঁহার বক্তৃতার ভাব ও ভাষার অভাব পরিপূরণের জন্য শ্রীঠাকুরের উপর আশ্বস্তচিত্তে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলেন। বিবেকানন্দ তখন যেন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট হইয়া সেই বিশাল সভাস্থলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উপবিষ্ট রহিলেন।
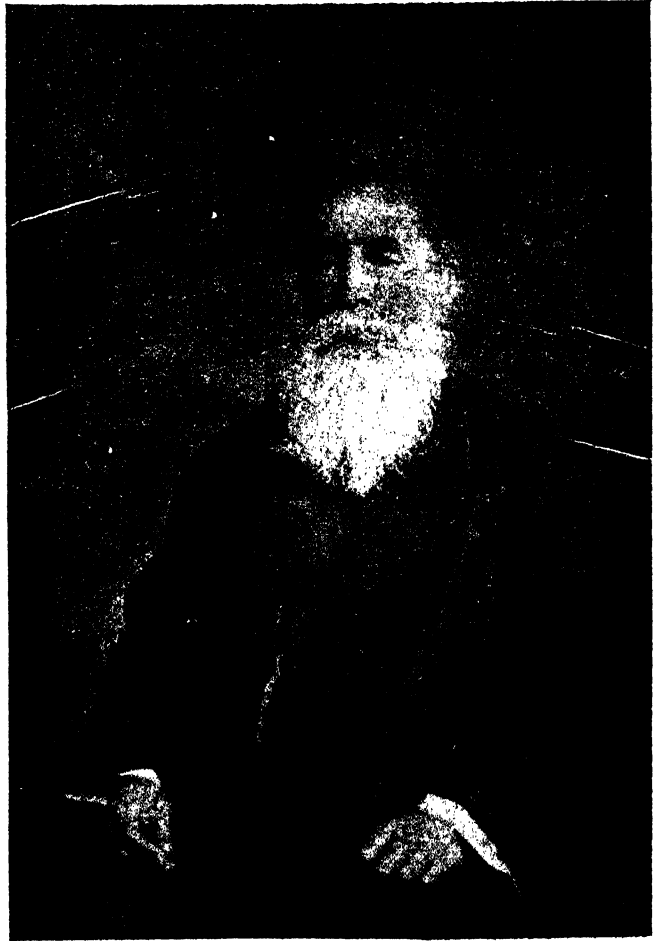
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

এক জনের পর এক জন করিয়া বিভিন্ন বক্তা

অভিভাষণের পর যখন ১৫ই সেপ্টেম্বর দিবাবসানে তাঁহার বক্তৃতার পালা আসিল, তখন তিনি উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "Sisters and Brothers of America"—"আমেরিকান্ ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ,"

স্বামী বিবেকানন্দ—শিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায়

...হার সেই কণ্ঠস্বরে কিরূপ দৈবশক্তি সঞ্জীবিত হইয়াছিল, ...তা মানবকল্পনার অগোচর ; কিন্তু তাঁহার সেই সম্বোধনে ...তৃমণ্ডলীর শত শত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া এই ভারতীয় ...সীকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই দুইটিমাত্র ...র সভায় সমুপস্থিত শ্রোতৃবর্গের বিশেষতঃ মহিলা- ...র মনে যেন উত্তেজনার প্রখর স্রোতঃ প্রবাহিত হইল, এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহারা বারংবার করতালি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, এই অদ্ভুত ভাবপ্রবণ অভিবাদন কি তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হইয়াছিল ? তাহার পর শ্রীগুরুর ইচ্ছায় আবেগময়ী ভাষায় তিনি যে অভিভাষণ প্রদান করিলেন, তাহা যেমন অভিনব, তেমনই সর্ব্বজন-চিত্তাকর্ষক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণ স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্যের স্পর্দ্ধা সম্বন্ধেই আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি বৈদিক ধর্ম্মের প্রতীক স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসিরূপে সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের মহিমাই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং হিন্দুর এই ধর্ম্ম যে সর্ব্বধর্ম্মের উৎস, তাহাই শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, "হে বিশ্ববাসী, পরস্পরকে তোমরা গ্রহণ কর। পরস্পরের সহিত পরিচিত হও—বিরোধ ত্যাগ কর। আমাদের বিশ্বেশ্বর বলিয়াছেন, যে যে পথে বা যে ভাবে আমার দিকে আসে, আমি তাহাকে সেই পথে সেই ভাবেই গ্রহণ করি। পৃথিবীর প্রত্যেক লোকই আমাকে লাভের জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে।" তাঁহার প্রথম দিনের বক্তৃতার অবসানে শিকাগোর ধর্ম্মসভাও সম্মিলিতভাবে সেই মহামানবকে অভিনন্দিত করিলেন। ভারতীয় এই অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী সেই দিন হইতে আমেরিকাবাসিগণের চক্ষুতে জগদ্বরেণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। যে বিশ্বগুরুর সর্ব্বসমন্বয়ধর্ম্মবীজ তিনি এক দিন সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি তাহা বিশ্বের লোকচক্ষুর সম্মুখে বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সেই দিন হইতে এই সমন্বয়-বীজ সমগ্র জগতের ধর্ম্মক্ষেত্রে উপ্ত হইতে লাগিল ; স্বামীজী-প্রবর্ত্তিত সেই কার্য্য আজও সমান উৎসাহেই চলিতেছে।

যে কয় দিন ধর্ম্মসভা বসিয়াছিল, প্রায় প্রত্যেক দিনই স্বামী বিবেকানন্দকে বক্তৃতা দিতে হইত, এবং পাছে দর্শক ও শ্রোতার উৎসাহ চলিয়া যায়, এই জন্য তাঁহার বক্তৃতার সময় নির্দ্দিষ্ট হইত শেষের দিকে। তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার তেজোগম্ভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য আমেরিকার শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ এতই বাড়িয়া গেল যে, সভায় অতিরিক্ত আসন স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইল, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী ঝিমাইয়া, ভিতর-বাহির করিয়া, অন্যমনস্কভাবে বা বিরক্তিসহকারে প্রায় সারাদিন অতিবাহিত করিত এই আশায় যে, কখন এই গৈরিক পরিচ্ছদধারী ধর্ম্মাচার্য্য বক্তৃতা করিবেন। স্বামী বিবেকানন্দও প্রথম দিনের ধর্ম্মসমন্বয়ার বার্ত্তা বিভিন্ন ভাবে ও তেজঃপূর্ণ ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দিনে বিবৃত করিতেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল, "Why we disagree"—আমাদের অমিল কেন? ২০শে তারিখের বিষয়, বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা নাই—বর্ত্তমানে অভাব—অন্নের :—"Religion not the crying need of India." ২২শের বক্তৃতা—ভারতের বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালীসমূহ—"The Modern Religions of India." ২৫শের বিষয়, হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ কি?—"The Essence of Hindu Religion." ২৬শের বিষয় "Buddhism the Fulfilment of Hinduism"—বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই সাফল্যময় পরিণতি। এই সমুদয় বক্তৃতার মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তৃতা তিনি ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদান করেন—বিষয় "Hinduism"—হিন্দুধর্ম্ম। ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্ম্মসভার শেষ দিন, তিনি তাঁহার শেষ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এইরূপে সর্ব্বসমেত ১২টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উপর দিয়া তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-বার্ত্তা অবিলম্বে জগতে প্রচারিত হইল। আমেরিকার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি এইরূপ নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিল—"বিবেকানন্দই সিকাগোর ধর্ম্মসভার অবিসংবাদিতভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও বক্তা। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি ভগবৎ-প্রেরণাপূর্ণ ও সহজাত। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, ভারতীয়গণের মত ধর্ম্মপণ্ডিত জাতির মধ্যে আমাদের খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাঠান কি মূঢ়তারই কার্য্য!" বলাই বাহুল্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ কৃতকার্য্যতার জন্য অন্য অন্য ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের মনে হিংসা ও দ্বেষের উদয় হইয়াছিল, এবং খৃষ্টধর্ম্মের গোঁড়া পাদ্রিগণ, ব্রাহ্মগণ ও থিওসফিষ্টগণ পরে কিছু দিন ধরিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তাঁহার যশঃ ও চরিত্রে মসীলেপনের বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন নরেন্দ্র প্রথমে শ্রীঠাকুরের কাছে আসিতে আরম্ভ করেন, তখন ঠাকুর এক দিন নরেন্দ্রকে বলেন, "দেখ্ নরেন্দ্র, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে; কিন্তু হাতী ফিরে চায় না। তোরে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে ক'রবি?" নরেন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি মনে ক'র্ব, কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রছে।" সেই মনোবৃত্তি আজ আমেরিকাতে কার্য্য করিল;—তিনি অনায়াসে এ সব উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং কোন কোন স্থলে এমন প্রত্যুত্তরও দিলেন যে, নিন্দাকারী স্বতঃই নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। তাহাদের হীনপ্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের শুভ্র যশঃ-কিরীট-প্রভা মলিন করিতে বা আংশিকভাবেও নিষ্প্রভ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় আমেরিকার ধর্ম্মজগতে স্বীয় ভাব প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং দিন দিন তাঁহার দলে লোকসমাগম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আমেরিকাতে অনেকেই স্বামীজীর শিষ্য, শিষ্যা হইতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যও অবিরত চলিতে লাগিল। আমেরিকায় তাঁহার প্রথম শিষ্য স্বামী কৃপানন্দ (পূর্ব্বাশ্রমের নাম Leon Lansberg) রুশ-দেশীয় য়িহুদী, এবং নিউইয়র্কের একখানি সংবাদপত্রের আংশিক স্বত্বাধিকারী ছিলেন। যখন স্বামীজী প্রথম আমেরিকায় আসিলেন, তখন তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে, ধর্ম্মদানের বিনিময়ে ঐ দেশ হইতে ধন লইয়া তিনি দীন, দরিদ্র ভারতবাসীর দুঃখমোচনের চেষ্টা করিবেন। একথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। এই কার্য্য সাধন করিতে তিনি প্রথমে একদল নিতান্ত হুজুগ-সন্ধানী লোকের সহিত আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এইভাবে তিনি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের পূর্ব্বভাগে, মধ্যভাগে সিকাগো, আইওয়াই, সেণ্ট লুইস্ মিনিয়পলিশ, ডেট্রইট্, বোষ্টন, ক্যামব্রিজ, বাল্টিমোর, ওয়াসিংটন্, নিউইয়র্ক

প্রভৃতি প্রদেশে ও সহরে বক্তৃতাদান করেন। কিন্তু ফন্দীবাজ ব্যবসায়িগণ তাঁহার সহায়তায় টিকিট বেচিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র তাঁহাকে পারিশ্রমিক প্রদান করিত। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলেন। তিনি অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মের হুজুগে আমেরিকাবাসিগণ যত শীঘ্র মাতিয়া উঠুক না কেন, টাকার থলির মুখ খুলিতে এই সর্ব্বশক্তিমান্ ডলারের দেশের লোক তেমন তৎপর নহে। প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে ভাবিয়া তিনি বক্তৃতার চুক্তি হইতে অবিলম্বে আপনাকে মুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং উপযুক্ত স্থান ও পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবেন স্থির করিলেন। ডেট্রইট্ সহরে তিনি নিজেকে চুক্তি-মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই সহরেই তিনি মিস গ্রীনস্টাইডেল্ (Miss Greenstidel) নাম্নী অতিমাত্র ভক্তিমতী মহিলাকে শিষ্যা করেন। তিনি ভক্তগণমধ্যে Sister Christine নামে অভিহিতা ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন, এবং এইস্থানে কয়েকটি বক্তৃতাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তিনি আমেরিকাতে শ্রীঠাকুরের কথা—যেখানে সেখানে বলিতে চাহিতেন না; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ধনগর্ব্বিত ও ভোগবিলাসী আমেরিকগণ এই সর্ব্বত্যাগী প্রেমময়ের কথা শুনিলেও তাহা আত্মস্থ করিতে পারিবে না। এই সময় তিনি আমেরিকাতে একটি ভক্ত-সঙ্ঘ সংগঠনের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সকল ভক্ত বেদান্তের বাণী অবহিতভাবে শুনিয়া তাহা ধারণা করিবার চেষ্টা করিবে, এবং পরে তাহা অন্যকে শুনাইবে, এইরূপই তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার 'রাজযোগ' রচনা শেষ হয়, এবং এই স্থানেই তিনি তাহা মিস্ ওয়াল্‌ড্রো (Miss S. E. Waldro) ওরফে 'হরিদাসী'কে দিয়া তাহা লিখাইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি সেন্ট লরেন্স নদীতীরস্থ থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড নামক দ্বীপ-ভবনে দ্বাদশটি নির্ব্বাচিত ভক্তের সহিত বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার যে কয়েকটি শিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। অভয়ানন্দ, (Marie Louise) মেরী লুইসী একটি ফরাসী মহিলা, ষ্টেলা (Stella) একটি অভিনেত্রী, ডাঃ রাইট্ (Dr. Wright), মিস্ রুথ এলিস্ (Miss Ruth Ellis) একটি ধর্ম্মপিপাসু তরুণী, মিসেস্ ওলী বুল্ (Mrs. Ole Bull) নরওয়ে-দেশীয়া এক জন শিল্পীর স্ত্রী, মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্ লিওড (Miss Josephine McLeod), সস্ত্রীক ফ্রান্সিস্ লেগেট্ (Mr. Francis Legget) নিউ ইয়র্কবাসী ধার্ম্মিক দম্পতী, হার্ভারের্ড অধ্যাপক রাইট (Prof. Wright)। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রচার-জীবনের প্রথমে ঈশ্বরপ্রেরিত সহায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এই দলের মধ্যে Sister Christineও ছিলেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দেই তিনি ইংলণ্ডে তাঁহার প্রিয় ভক্তশিষ্য গুডউইন (J. J. Goodwin) নামক ইংরেজ অনুচরটিকে প্রাপ্ত হন। এই শিষ্য অতঃপর ছায়ার ন্যায় স্বামীজীর অনুসরণ করিতেন। তিনি স্থায়িভাবে তাঁহার সেক্রেটারীর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি short hand বা সাংকেতিক লিখন-প্রণালীতে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া অতঃপর স্বামীজীর আমেরিকায় প্রদত্ত সমস্ত বক্তৃতা তাঁহার সহায়তায় জগদ্বাসীর সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর দিবারাত্রি-অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে করিতে নিউ ইয়র্ক নগরে অবস্থানকালেই স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইল। সেইজন্য তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতিকামনায় এবং বায়ুপরিবর্ত্তনের ফল-পরীক্ষার্থ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একটু দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে য়ুরোপে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি ফ্রান্সে অবতরণ করেন, এবং তাড়াতাড়ি প্যারিস সহর দর্শন করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন। এই যাত্রায় তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ছিলেন। অনন্তর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া, জুলাই মাসের শেষে ঐ দেশ ত্যাগ করেন। পুনর্ব্বার ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয়বার ইংলণ্ড দর্শন ঘটে। এবার অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন।

প্রথম বারেই ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রভূত আদর-যত্ন লাভ করিয়াছিলেন,—ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহে

ধর্ম্মস্থাপক বুদ্ধ ও খৃষ্টের সমপর্য্যায়ে তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মকার্য্যের তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হইতেছিল। সম্ভবতঃ, ইংরেজগণ তাঁহাকে আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া প্রীতিলাভ করেন। দ্বিতীয়বার তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া লণ্ডনের বিভিন্ন কেন্দ্রে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করেন যে, ধর্ম্মজগতে এ পর্য্যন্ত তিনি যাহা কিছু দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে; সমস্তই তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব-চিন্তা ও প্রেরণা। ইহাও তিনি ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণই তৎকালীন জগতের সমগ্র ধর্ম্ম-ভাবের ও চিন্তার একমাত্র কেন্দ্র। এই সম্পর্কে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জার্ম্মাণ মোক্ষমূলারের সাক্ষাৎ-পরিচয় হইলে মোক্ষমূলার তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতে অনুরোধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রায় অনুসারে স্বামী সারদানন্দ ভারতবর্ষ হইতে একটি বিবরণ পাঠাইলে মোক্ষমূলার তাহাই অবলম্বন করিয়া 'The Nineteenth Century' নামক বিখ্যাত মাসিক-পত্রিকায় "A Real Mahatman" নামে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মোক্ষমূলারের বিদ্যা, দার্শনিক দৃষ্টি ও ভারতীয় বেদাদি শাস্ত্রে অসামান্য অনুরাগ ও অধিকার দেখিয়া তাঁহাকে এক জন ঋষি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তিনি বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের নব-আবির্ভাব, এইরূপই তাঁহার মনে হইয়াছিল। ইংলণ্ডে আসিয়া স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতা (Miss Margaret Noble) ও সেভিয়ার-দম্পতীর ভক্তি ও সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা

মিস্ মার্গারেট্ নোবল্ (Miss M. Noble) ইংলণ্ডের কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বিবেকানন্দ একদিন সেই স্কুলে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিয়াছিলেন; সেই বক্তৃতা শ্রবণে ও তাঁহার তেজোদৃপ্ত আকৃতি দর্শনে মিস্ নোবল্ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্টা হইয়াছিলেন; তখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর

অদ্বৈত আশ্রম—মায়াবতী

প্রথম পরিচয়ে তিনি স্বামীজীর উক্তি বিনা তর্কে গ্রহণ করিতেন না; নিজের বুদ্ধি ও বিদ্যা দ্বারা তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শেষে তিনি সম্পূর্ণভাবে আপনাকে গুরুর চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর শিক্ষায়, শ্রীমা'র সঙ্গ-মাহাত্ম্যে ও স্বকীয় সাধনায় ব্রহ্মচারিণী ভগিনী নিবেদিতা সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং অনেকগুলি সুন্দর ও সারগর্ভ পুস্তক রচনা করিয়া ভারত সম্বন্ধে [illegible] অভিজ্ঞতা দূরদৃষ্টি সহকারে প্রচার করিয়াছিলেন। [illegible] খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতে আগমন [illegible]। ভারতের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজগতে ভগিনী নিবেদিতা [illegible] গুর অপূর্ব্ব দান।

স্বামী সারদানন্দ

সেভিয়ার-দম্পতি স্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণ-দর্শনে আমরণকাল তাঁহার অনুসরণের জন্য তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মিঃ সেভিয়ার (Mr. Sevier) অবসর-প্রাপ্ত কাপ্তেন ছিলেন। ইনি ইংলণ্ড হইতে নিজের যথাসর্ব্বস্ব সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীর সহিত স্বামীজীর সঙ্গ গ্রহণ করেন; হিমালয়ের আলমোড়ায় যে অদ্বৈত আশ্রম বর্ত্তমান, ভারতে আসিয়া তিনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্তর ঘটে। তাহার পর দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল ধরিয়া মিসেস্ সেভিয়ার বালক-বালিকাগণের শিক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

স্বামীজী আমেরিকার ন্যায় ইংলণ্ডে কোন মঠ বা মিশন স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে প্রথমে লণ্ডনে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দকে কলিকাতা হইতে ডাকিয়া পাঠান; কিন্তু পরে ইঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করেন। তাহার পর অক্টোবর মাসে স্বামী অভেদানন্দকে লণ্ডনে আনাইয়া এবং ইংলণ্ডের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সারদানন্দের স্থানে রাখিয়া, তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বামী অভেদানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, এবং এই জন্য তিনি লণ্ডনে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডে স্থায়িভাবে কোন প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বামী অভেদানন্দ অবশেষে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক নগরে গমন করিয়া সেই স্থানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতিশ্রমে স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় স্বামী বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যলাভের আশায়, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সেভিয়ার-দম্পতিসহ সুইট্জারল্যাণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে গ্রীষ্মকালের অধিকাংশ জেনিভা, চিলন, সেণ্ট বার্ণার্ড, লুজার্ণ প্রভৃতি স্থানে যাপন করিবার পর তিনি পল্ ডুঁসে (Paul Deussen) নামক জার্ম্মাণ দার্শনিক ও বৈদান্তিক কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে জার্ম্মাণীর কীল

(Kiel) সহরে যাত্রা করিলেন। হাইডেলবুর্গ, কোবলেঞ্জ, কলোন ও বার্লিন নগর তাঁহার গন্তব্য পথে পড়ায় স্বামীজী ঐ সকল স্থানের কিছু কিছু দর্শন করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীর ধন-সম্পদ্ ও শিক্ষা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পল ডুঁসে সোপেনহর সমিতির (Schopenhauer Society) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বামীজীর সহিত কথোপকথনে তিনি প্রীতিলাভ করেন; বেদান্তই যে মনুষ্যের সত্যানুসন্ধানপ্রচেষ্টার একটি অমূল্য দান, এবং সুখে-দুঃখে মনুষ্য-জীবনে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ, এই মত তিনি প্রকাশ করেন।

কীল সহর হইতে স্বামীজী দার্শনিক ডুঁসের সঙ্গে হামবার্গ, আমষ্টার্ডাম পরিভ্রমণান্তে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেন। তিনি আরও কিছুদিন লণ্ডনে থাকিয়া বক্তৃতা দান করেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে তিনি লণ্ডন ত্যাগ করিয়া আরও কিছুদিন য়ুরোপ-ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ইটালীর রোম, মিলান প্রভৃতি দর্শনের পর ষ্টীমারযোগে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেভিয়ার-দম্পতিও তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করেন। তিনি দরিদ্র স্বদেশবাসীর দুঃখ-কষ্ট প্রশমনের জন্য যে অর্থসংগ্রহের আশা করিয়াছিলেন, আপাততঃ তাহা সফল না হইলেও—পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসিগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমবীজ বপনের কার্য্য যে তাঁহার দ্বারা সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। এই কার্য্যের জন্য ঠাকুর তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য শেষ হইলে তাঁহার ছুটী হইবে, এজন্য বোধ হয় তাঁহার স্বাস্থ্যের এতদূর অবনতি ঘটিল যে, তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই; সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার প্রতীতি হইল যে, প্রভুর কর্ম্মও শেষ হইয়া আসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম ভারত ত্যাগ করেন, তখন তিনি ছিলেন কর্ম্মশক্তির অগ্নিময় মূর্ত্তপ্রতীক, যেন গলিত লাভাপ্রবাহ-অন্তর্লীন-বক্ষঃ রুদ্ধবীর্য্য আগ্নেয়গিরি—আর যখন তিনি সুদূর প্রবাস হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক-দেহেও যেন সায়াহ্নের ক্ষীণপ্রভ তপনের শেষ-রশ্মিজাল ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, যেন মৃত্যু কোন বিস্মৃতিসমাচ্ছন্ন তিমির-সাগর হইতে অন্ধকারের কৃষ্ণযবনিকা আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা সেই সাধকের—সেই কর্ম্মীর—বিগত যুগের ভারতের সেই শ্রেষ্ঠ মানবের ক্লান্তিক্ষীণ, অবসাদশিথিল, রোগজীর্ণ বরবপু সমাচ্ছাদিত করিবার জন্যই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দ

এদিকে কলিকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতৃগণ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আমেরিকায় তাঁহার বৈচিত্র্যময় কর্ম্মজীবনের ও তাহার অপূর্ব্ব সাফল্যের সংবাদ পাইলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ভারতবাসিগণকে বিদ্যাদান ও অন্য ভাবে তাহাদিগের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে খেৎরীতে গমন করিয়াছিলেন, এবং সেখানে কিছু দিন কর্ম্ম পরিচালিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউনহলে স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ও তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা আহূত হইলে বহু গণ্যমান্য নাগরিকের স্বাক্ষরসম্বলিত এক মানপত্র স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল। স্বামীজী তাঁহার মান্দ্রাজী ভক্তগণের সহিত নিয়মিতভাবেই পত্রবিনিময় করিতেন, এবং তাঁহারই প্রেরিত অর্থে মান্দ্রাজে 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে এক ইংরেজী মাসিক পত্রিকা কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

পল্লী-জ্যোৎস্না

নিথর নিটোল পুকুরের জল—
নাহি সাড়া, নাহি দোলা ;
নাহি ছলছল লীলা ও কাঁপন,
নাহিক ঢেউর ফোলা !—

প'ড়ে আছে যেন একটি আয়না
মসৃণ চক্‌চকে,
রূপা গলাইয়া চৌকা থালায়
ঢেলেছে কে—ঝক্‌ঝকে !
স্নিগ্ধ শীতল কোমল উজল
পুকুরের বারি শোভে,
চাঁদের কিরণ তারই 'পরে শোয়
যেন আরামের লোভে।
শুধু শুয়ে নয়, আরামে ঘুমায়
সেথায় চাঁদের আলো ;
আলোকে-সলিলে এত মাখামাখি
বড় লাগে মোর ভালো।

জলে ও আলোতে কোন ভেদ নাই,
মিলে মিশে একাকার ;
ধরণী ভেদিয়া উথলিছে যেন
গলা-রূপা-পারাবার।
তীরের উপরে গাছগুলি সব,
নীরব নিথর ভায় ;
মুখ দেখে যেন অবিরাম তারা
রূপার সে আয়নায়।
সহিতে না পারি' এত রূপ শোভা
এ আলোর মাতামাতি,
"চোখ গেল" ব'লে উঠিল ডাকিয়া
পাপিয়া কাঁপায়ে রাতি।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

মোহের স্বর্গ

(গল্প)

১

অনেক ভুগিয়া সূতিকাগৃহ হইতে উমা উঠিল বটে, কিন্তু শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না। প্রশান্ত অর্থবান্। জলের মত টাকা ঢালিতে লাগিল, যদি উমা সারে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা!

চিকিৎসায় উপকার হইল না দেখিয়া প্রশান্ত উমাকে লইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে রাঁচি গেল। এখানে আসিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাক, উমা একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া পড়িল। রুগ্না হইলেও তবু এত দিন সে এক বৎসরের ছেলেটিকে যতটুকু পারিত দেখাশুনা করিত, এখন একেবারে অপারগ হইয়া পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া প্রশান্ত প্রমাদ গণিল। প্রশান্তর এক বন্ধু বলিলেন, "ছেলেটির জন্যে এবং সংসার দেখাশুনা করবেন এমন একটি মেয়ে হ'লে তোমার ভাল হ'ত।"

প্রশান্ত বলিল, "তা ঠিক, কিন্তু তেমন লোক পাই কোথা? এর পূর্ব্বেও দু'একবার চেষ্টা করেছি, সুবিধা হয় নি।"

বন্ধু বলিলেন, "আচ্ছা, একবার মিস্ চ্যাটার্জ্জীকে ব'লে দেখব।"

পরদিন তিনি মিস্ চ্যাটার্জ্জীকে সঙ্গে করিয়াই আসিলেন।

প্রশান্ত বলিল, "আমার সংসারের অবস্থা হীরেনের মুখে শুনেছেন বোধ হয়। ঐটি আমার ছেলে,"—বলিয়া সে বারান্দার একপ্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। খোকা ভৃত্যের কোলে ছিল, তাহাকে দেখাইয়া বলিল, "ওর মা থাকতেও ও মাতৃহীন। ওকে একটু দেখাশুনা করবেন, আর এই ছোট সংসারটার তত্ত্বাবধান করবেন,—অবশ্য বামুন চাকর সবই আছে। এ ছাড়া আমার রুগ্না স্ত্রী, তাঁকে একটু কথাবার্ত্তায় প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করবেন!"

নমিতা বিনয়ের সহিত বলিল, "আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।" বলিয়া সে চাকরের নিকট হইতে মাতৃহস্ত-যত্ন-বঞ্চিত ক্ষীণ শিশুটিকে লইয়া বলিল, "চলুন, এর মা'র কাছে যাই।"

প্রশান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে ঈষৎ দ্বিধার সহিত বলিল, "আসুন।"

উভয়ে দ্বিতলে গেল। উমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে ঘুমাইতেছে। তাহার পানে চাহিয়া নমিতার চোখে জল আসিল। মহাপথযাত্রিণীর যাত্রার সকল আয়োজন প্রস্তুত হইয়া আছে, শুধু যেন একটি সঙ্কেতধ্বনি শুনিলেই হয়! তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহারা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে ঝি আসিয়া জানাইল, উমা জাগিয়াছে।

উমা দুয়ারের দিকেই চাহিয়া ছিল। নমিতাকে দেখিবা-মাত্র সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, এবং তাহার সমস্ত মুখে ঘোর অসন্তোষ ও বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। কঠোরদৃষ্টিতে সে নমিতার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বোসো।"

প্রশান্ত ঘরেই ছিল। সে পত্নীর ভাব ও অসম্মান-সূচক সম্বোধন শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। নমিতা একটা টুল টানিয়া সম্মুখে বসিয়া বলিল, "আজ কেমন আছেন আপনি?"

উমা রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "রোজ কেমন থাকি, তা কি তুমি জানো?"

নমিতা লজ্জা পাইয়া মাথা হেঁট করিল।

প্রশান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "উনি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, উমা—"

উমা তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, "থাম, তোমায় আর আমাকে শিক্ষে দিতে হবে না।"

প্রশান্ত দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘরের ভিতরটা যেন বিরক্তির হাওয়ায় ভারী হইয়া উঠিতেছে অনুভব করিয়া নমিতা অন্য কথার অবতারণা করিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "আপনার খোকাটি খুব লক্ষ্মী, চেনা অচেনা নেই।"

উমা ছেলের দিকে সরোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "হতভাগ্য ছেলে! আমার যম ওই ত।"

ইহার পর আর কেমন করিয়া আলাপ জমান যায়! নমিতা কি করিবে ভাবিতেছিল, উমা স্বয়ংই বলিল, "আমি তোমায় মিস্ চ্যাটার্জ্জী ব'লে ডাকতে পারব না, আমি তোমায় নার্স বল্‌ব।"

নমিতা ঘাড় কাত করিয়া বলিল, "বেশ।"—সে খোকাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

উমা বলিল, "যাও।"

নমিতা বাহিরে যাইবা মাত্র উমা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মরবই ত, কিন্তু দুটো দিন তর সইল না বুঝি? দেখে শুনে বেশ ছুকরীটি জুটিয়ে এনেছ ত!"

ইহার পর সে অশ্লীল দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিল।

প্রশান্ত বিব্রত হইয়া বলিল, "লক্ষ্মী উমা, চুপ করো, শুনতে পান্ যদি—"

উমা অধিক উচ্চকণ্ঠে বলিল, "পায় পাক্। আমি এ মুখ বুজে সহ্য করতে পারব না। একটা বুড়ো মানুষ আনতে পার না! যখনই আসে, যত সব ছুঁড়ী, না?"

প্রশান্ত বলিল, "বুড়ো মানুষ আচার-বিচার মেনে চলে। তোমার ঐ কচি ছেলের বোঝা বইতে কেউ আস্‌বে না।"

বৈকালের দিকে যখন প্রশান্ত ও নমিতার দেখা হইল, তখন নমিতা অবনত মুখে বলিল, "আমি আপনার কায করব বলেছিলুম বটে, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আপনার কায অত্যন্ত বেশী, আমি পেরে উঠ্‌ব না।"

প্রশান্ত সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। রেলিংয়ের উপর হাত রাখিয়া সে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে বলিল, "বুঝেছি, আপনি সকালের সব কথাই শুনেছেন। তার পক্ষে আপনাকে কিছুই আমার বল্‌বার নেই। আজ এক বছর হ'ল বিছানায় শুয়েছে, এর মধ্যে তিন চার বার চেষ্টা করলুম, প্রত্যেক বারই ও এই ভাবে তাঁদের অপমান ক'রে বিদায় করলে। উমার কেমন ধারণা যে, ওর স্বামী পৃথিবী শুদ্ধ লোকের লোভনীয়।"—বলিয়া সে ম্লানহাসি হাসিল।

তাহার মুখপানে চাহিয়া নমিতার মায়া হইতেছিল। সে বলিল, "রোগে পড়ে খিট্‌খিটে হয়েছেন।"

প্রশান্ত সক্ষোভ কণ্ঠে বলিল, "মনে করেছিলুম, ছেলেটা এবার দুর্গতি থেকে বাঁচ্‌ল, কিন্তু যার ভাগ্যে দুঃখ থাকে, কে তাকে সুখী করবে?" ক্রোড়স্থিত শিশুটির মুখপানে চাহিয়া নমিতার অন্তর দ্রুত দ্রবীভূত হইতেছিল। উমার আচরণ সে বিস্মৃত হইতে লাগিল।

প্রশান্ত যুক্তকরে বলিল, "বল্‌বার মুখ নেই, তবু বল্‌ছি—যদি পারেন ওকে ক্ষমা করবেন,—সে রুগ্ন—ক্ষমার্হ—"

নমিতা তাড়াতাড়ি ডান হাতটা কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "না না, আপনি আর আমায় লজ্জা দেবেন না। সত্যিই ত উনি রুগ্ন, ওঁর কথায় আমার ক্ষুব্ধ হওয়াই অন্যায় হয়েছে। আমি যাব না, আপনি খোকার জন্যে ভাব্‌বেন না।"

২

নমিতা রহিল বটে, কিন্তু দুই চারি দিনেই সে উমার কটু জিহ্বার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যাইবার কথা বলিতেও তাহার মমতা হইত। খোকার প্রতি তাহার অসম্ভব আকর্ষণ পড়িয়া গেল। আর মায়া হইত প্রশান্তর অসহায় অবস্থা ও সর্ব্বংসহা প্রকৃতি দেখিয়া। সে যে উমার কাছে প্রতিনিয়ত কি লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাহা দেখিয়া যেন নমিতার অসহ্য বোধ হইত।

সাত আট দিন পরে একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি নমিতা ছাদের এক পাশে কতকগুলা ফুলের টবে জলসেক করিতেছিল। সহসা প্রশান্তর কণ্ঠস্বর কাণে যাইতে ফিরিয়া চাহিল। প্রশান্ত বলিল, "আপনার ত উপস্থিত কোন কায নেই? গোপীনাথ, খোকা আর তিনকড়ির মাকে সঙ্গে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসুন না।"

নমিতা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তার চেয়ে আপনিই একটু বেড়িয়ে আসুন না। দিনরাত রোগীর ঘরে ব'সে ব'সে আপনারও ত শরীর খারাপ হওয়ার ভয় আছে।"

প্রশান্ত বলিল, "ও আমার স'য়ে গেছে।"

নমিতা বলিল, "তা হোক, আমি বরং বউরাণীর কাছে বস্‌ছি, আপনি যান।"

প্রশান্ত কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া বলিল, "না না, আপনার ওখানে যেতে হবে না। গেলেই ত যা তা বল্‌বে।"

নমিতা বলিল, "তা বল্‌লেনই বা। রোগা মানুষের কথায় রাগ-দুঃখ করতে নেই। যান, আর কথা বাড়াবেন না, ওতে কেবল সময়ের অপব্যয় হবে। আমি খোকাকে একটা গরম জামা পরিয়ে দিই।"—বলিয়া নমিতা চলিয়া গেল।

প্রশান্তরও যেন একবার রোগীর ঘর ছাড়িয়া মুক্ত বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাই নমিতার প্রস্তাবে সে সহজেই সম্মত হইল। কাপড় বদলাইতে গিয়া কি ভাবিয়া সে উমার ঘরে ঢুকিল।

উমা দ্বারের দিকেই চাহিয়া ছিল। প্রশান্তকে দেখিয়া বোমা-ফাটার মত গর্জ্জিয়া উঠিল, "আহ্লাদ যে আর ধরে না দেখ্‌ছি। তা, যাও না, যোড়েই যাও না। আর লোক দেখিয়ে ওঁকে আমার কাছে বস্‌তে হবে না। খাটেই পড়ে আছি—তা'বলে মরে ত নেই—সব বুঝ্‌তে পারি।"

প্রশান্ত স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল তাহার ঈর্ষ্যাবিকৃত মুখের পানে চাহিয়া-থাকিয়া নিঃশব্দে জামাটা খুলিয়া রাখিয়া একটা টুল টানিয়া বসিয়া রহিল। উমা তবুও তাহাকে মুক্তি দিল না, অবিশ্রান্তভাবে যতক্ষণ না নিজে ক্লান্ত হইল, এক তরফা বকিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে সে চুপ করিলে প্রশান্ত বলিল, "উমা, উনিও ভদ্রলোকের মেয়ে। অভাবে না পড়লে পরের দ্বারস্থ হন নি,—দিনরাত তাঁকে এমন ক'রে অপমান করতে তোমার একটু মমতা হয় না? অথচ তোমার ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দেখ্‌ছ ত, তোমার সংসার, তোমার ছেলে কি রকম আপনার ক'রে উনি টেনে কর্‌ছেন।"

উমা নূতন কলহের গন্ধ পাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "সেই জন্যেই মাসে মাসে টাকা গুণ্‌ব। রূপ দেখ্‌তে নয়। তুমি রূপ দেখে ভুল্‌তে পার, আমি শুধু কায নেব।"

প্রশান্ত চাপা ক্রোধের সহিত বলিল, "তুমি মনে প্রাণে জানো যে আমি অত নীচ নই; কিন্তু তবু যে তুমি কেন মনে এ ধারণা পুষেছ জানি না। ঝি-চাকরের কাছে আমায় কত খেলো ক'রে তুলেছ, ভাব দিকি! স্বামী চরিত্রহীন এ কথা সকলকে জানিয়ে তোমারও বোধ হয় মুখ খুব উজ্জ্বল হয়?"—বলিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৬

নমিতা আসার পর মাস দুই কাটিয়া গেল। উমার কোন পরিবর্ত্তন হইল না—একদিন সে জেদ ধরিল, সে বাটী ফিরিবে। প্রশান্ত বুঝাইতে লাগিল, এই দুর্ব্বল শরীরে অতখানি পথক্লেশ সহ্য করিয়া ঢাকায় যাওয়া তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। উমা শুনিল না। কাঁদিয়া-কাটিয়া রাগিয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল। কিন্তু তাহা তেমন ফলপ্রসূ হইল না দেখিয়া সে প্রায়োপবেশন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া সকাল হইতে জলস্পর্শ করিল না।

এ কয়দিন স্বামি-স্ত্রীতে অনবরত মনোমালিন্য যাইতেছিল। কলহ, কিচি-কিচির আর অন্ত ছিল না। নমিতা ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে সেদিকে ঘেঁসে নাই। কারণ, তাহাকে দেখিলে উমার রাগ আরও বাড়িয়া যায়।—কিন্তু আজ যখন প্রশান্ত দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, "নমিতা দেবী, উমা আজ প্রায়োপবেশন কর্‌ছে। আমি কিছুতেই খাওয়াতে পার্‌লুম না। আপনি যদি পারেন দয়া ক'রে একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন," তখন নমিতা মনের সকল দ্বিধা ত্যাগ করিয়া উমার কক্ষাভিমুখে চলিল।

সে প্রবেশ করিবামাত্র উমা তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তোমার কাছে সোহাগ কাড়িয়ে আমার নামে কি লাগিয়ে গেল?"

উমা যে কেমন করিয়া জানিতে পারিল, নমিতা বুঝিতে পারিল না, একটু থত-মত খাইয়া বলিল, "কৈ, কিছু বলেন নি ত!"

উমা শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা'হলে যে তুমি বড় দয়া ক'রে এ ঘরে এলে? রোগীর ঘরে ত কোনদিন ঢোক না—আজ হঠাৎ এত দয়া?"

নমিতা ইহার সদুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, "আপনার শরীর ভাল নয় বৌরাণী, বিরক্ত হ'লে আরও শরীর খারাপ হবে।"

উমা রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "থাক্‌, তোমায় আর আমাকে শেখাতে হবে না, এখন নিজের কাযে যাও।"

নমিতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনি আজ

কিছুই খান্‌নি বৌরাণী!" উমা এবার ঝাঁঝিয়া উঠিল; "তোমার অত মাথাব্যথা কিসের বল ত? যাও যাও, আর দরদে কায নেই! আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

অগত্যা নমিতা উঠিয়া আসিল। সে মনে করিয়াছিল, প্রশান্ত চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ ধারে আসিয়া দেখিল, পিছনে দুই হাত একত্র করিয়া চিন্তাচ্ছন্ন মাথায় সে দালানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নমিতাকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার মুখপানে চাহিয়া নমিতার মমতা বোধ হইতেছিল, প্রশান্তর চোখে সে চোখ মিলাইতে পারিল না। নত নেত্রে সে বলিল, "আমি কিছুই করতে পারলুম না।"

প্রশান্ত জানালার উপর বসিয়া পড়িল; হতাশভাবে বলিল, "নমিতা দেবী, কি করব আমি? উমা কি শেষটা অনাহারে প্রাণ দেবে?"

নমিতা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনি স্বীকার হন। রোগীর মনে শান্তি দিতে না পারলে স্বাস্থ্যকর জায়গায় রেখে কোন উপকার হবে না।"

প্রশান্ত আয়ত চক্ষু নমিতার মুখে নিবদ্ধ করিয়া রহিল, মনে হইল, সে যেন প্রস্তাবটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সেই উজ্জ্বল চক্ষুর বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে নমিতার অন্তর-দীপ জ্বলিয়া উঠিল কি? নমিতা কেমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে বলিল, "বৌরাণীকে দেশে নিয়ে চলুন।"

প্রশান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি ক'রে নিয়ে যাব, পথের টানাটানি কি ও সহ্য করতে পারবে? ওতেই হয় ত প্রাণ বেরিয়ে যাবে।"

নমিতা অঞ্চলটা বাঁ হাতে জড়াইতে জড়াইতে নিম্নকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু এভাবে যদি উপোস দেন, তা হ'লেও বাঁচান যাবে না।"

—"তাও সত্যি।"—বলিয়া প্রশান্ত যেন কি ভাবিতে লাগিল।

"নমিতা দেবী!"

নমিতা চমকিয়া চাহিল।

"আমার যে বড় ভাবনা হচ্ছে। আপনাকে বলতে ভরসা হয় না,—তবু ক্ষমা করেন যদি ত বলি,—খোকা, আপনার খোকা, ও একান্ত অসহায়,—ওর মুখ চেয়ে আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?" নমিতা যেন সঠিক বুঝিতে পারিল না, তাহার মাথার ভিতর যেন কি একটা ওলট-পালট চলিতেছিল।

প্রশান্ত বলিল, "ওর মা ওকে পৃথিবীতে এনেইছে, কিন্তু মনে করুন ও আপনারই ছেলে। ও আপনার কাছে মায়ের স্নেহ পায়, আপনাকেই মা ব'লে জানে। আপনার খোকাকে আপনিও কি ছেড়ে থাকতে পারবেন?" নমিতার খোকা সুশান্ত! নমিতার কণ্ঠ পর্য্যন্ত যেন কি এক অজানা আবেগে ভরিয়া উঠিল। তাহার খোকা? সুশান্ত তাহার!

বিহ্বল ভাবে সে বলিল, "আমি খোকাকে ছাড়তে পারব না, প্রশান্ত বাবু। আপনি না নিয়ে গেলেও আমি যাব।

প্রশান্ত বলিল, "আমি অকূলে পড়েছি, নমিতা দেবী! আপনি আমায় কূল দিলেন।"

৪

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতেছিল। নমিতা খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। খোকা? সত্যই কি তাহার মনের সমস্ত আকর্ষণ খোকাকে কেন্দ্র করিয়া রহিয়াছে? খোকার পিতার প্রতি কি তাহার মমতা জাগে নাই? ভাবিতে গিয়া তাহার সারা দেহ কাঁটা দিয়া উঠিল। আজ যে সত্যটি সে নিজের অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছে, তাহা নিজের মনে পর্য্যালোচন করিয়া দেখিবার সাহসও নমিতার নাই। নমিতা নিজের এ আশ্চর্য্য মোহের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠিতেছিল।

মোহ? হ্যাঁ, মোহ ছাড়া আর কি? প্রথম যৌবন সে সদর্পে কাটাইয়া দিয়াছে। কোনদিন কোন পুরুষ,—তা সে যতখানি রূপগুণসম্পন্ন হউক না কেন, তাহার মনে ছায়াপাত করিতে পারে নাই। নমিতা মনে করিত, তাহার ভয়ের দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ সাতাশ বছর বয়সে সে যে ধাক্কা খাইল, এ পতনের হাত হইতে রক্ষা করিবে কে? মনের উপর যে আস্থা ছিল, আজ তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নমিতা বুঝিয়াছে, হিংস্র পশুকে আফিং দিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেও নররক্তের আস্বাদ সে ভোলে না; সে তাহার জন্মগত স্বভাব!

ঘুমন্ত খোকা কাঁদিয়া উঠিল। নমিতা চমক ভাঙ্গিয়া

সজাগ হইয়া উঠিল। খোকার পাশে শুইয়া সে তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া চাপড়াইতে লাগিল।

সুশান্ত আধস্বরে ডাকিল, "মা!"

সুশান্ত তাহাকে মা বলিয়া ডাকে। প্রতিদিনই ডাকে, কিন্তু আজ যেন নমিতার সমস্ত অন্তর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে খোকাকে বুকে চাপিয়া মৃদু কণ্ঠে বারম্বার বলিতে লাগিল, "সুশান্ত, বাপ আমার, মাণিক আমার!" উচ্ছ্বাসে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল।

সুশান্ত ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুমাইয়া পড়িলে নমিতার চিন্তার ছিন্ন-সূত্র পুনরায় জোড়া লাগিয়া গেল। এই গৃহের কর্ত্রীত্ব, সুশান্ত-প্রশান্তের তত্ত্বাবধান, যাবতীয় গৃহিণীত্ব সে-ই করিতেছে। উমার স্বামী—তাহার সন্তান, কিন্তু সে তাহা ভোগ করিতে পারে না। সে যেন নমিতাকে সব ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে এক বিন্দুও ত তাহার নিজস্ব নহে। সে উমার হইয়া 'বদলী' খাটিতেছে। সুশান্তর এই মধুর সম্বোধন, এই প্রাণস্পর্শী স্পর্শ, প্রশান্তর এই একান্ত নির্ভরতা, এই নিবিড় বিশ্বস্ততা এসব কিছুই তাহার নিজের বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। সে শুধুই ভারবাহী বলদের মত উমার অচল সংসার কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া সচল রাখিতেছে। সে মানুষ নয়, তার অনুভূতি নাই, সে মূক, সে যন্ত্র!

দালানের ঘড়িতে একটা বাজিল, রাত্রি অনেক হইয়াছে!

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে। স্নানাগারে যাইতে হইলে উমার কক্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। নমিতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, এত রাত্রেও উমার ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। যখন সে ফিরিতেছিল, তখন ভিতর হইতে উমার ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল, "নার্স, নার্স, নমিতা—"

নমিতা বিস্মিত হইয়া কপাটটা একটু ঠেলিয়া ভিতরে মুখ ঢুকাইয়া বলিল, "আমাকে আপনি ডাকছেন, বৌরাণী?"

উমা হস্তেঙ্গিতে ডাকিল। উমার শয্যার একাংশে প্রশান্ত ঘাড় গুঁজিয়া গুটি-সুটি হইয়া ঘুমাইতেছিল। নমিতা উমার কাছে গেলে, সে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ভাই, ওঁর মাথাটা সোজা ক'রে একটা বালিশ দিয়ে যাবে?" নমিতার সহিত, এই চার পাঁচ মাসের মধ্যে, উমা কোনদিন এমন করিয়া কথা বলে নাই। নমিতা একটু বিস্মিতা হইল। প্রশান্তর প্রতি এই মমতা, ইহাও যেন উমার মুখে অভিনব কথা। তা ছাড়া উমা যে অনুরোধটা করিল, সেটা পালন করিতেও নমিতার সঙ্কোচ দেখা দিল।

উমা বলিল, "দেশে যাবার কথা বল্‌ছিল, কখন যে দু'জনেই ঘুমিয়ে প'ড়েছি জানি না। এখানেই শু'য়ে প'ড়েছে, গায়েও কিছু ঢাকা দেয় নি, শীত করছে, গুটি-সুটি হ'য়ে রয়েছে। দাও, ভাই, ওর মাথায় একটা বালিস"—

নমিতা কুণ্ঠার সহিত প্রশান্তর বিছানা হইতে একটা বালিস আনিয়া স্বয়ং ঋজু হইয়া বাঁ হাতে মাথা তুলিয়া ডান হাতে বালিসটা সরাইয়া দিল। নিদ্রিত প্রশান্তর মাথা প্রায় তাহার বক্ষঃসংলগ্নই হইয়াছিল আর কি,—তাহার গভীর উত্তপ্ত শ্বাসে নমিতার বক্ষঃশোণিত উত্তপ্ত—উদ্দাম হইয়া উঠিল। সে সযত্নে মাথাটি নামাইয়া বালিসে রাখিল। এক গোছা চুল মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেটিকে সরাইয়া দিবার জন্য নমিতার প্রবল বাসনা জাগিতেছিল—সেটি হাল্কা হাতে সরাইয়া দিল উমা। বলিল, "গায়ে কম্বলখানা ঢাকা দিয়ে দাও।"

নমিতা কম্বলখানি খুলিয়া প্রশান্তকে ঢাকা দিয়া বলিল, "আমি যাই এবার!" উমা বলিল, "হাঁ। সবুজ আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও।"

নমিতা বাহিরে গিয়াও কি জানি কেন এক মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। তাহার পর সম্পূর্ণ অনুচিত একটা কায করিয়া বসিল। সে কপাটটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, উমা তাহার শীর্ণবাহু দিয়া প্রশান্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার চিবুকের নীচে মুখ গুঁজিয়া আছে, এবং সদ্যঃ নিদ্রোত্থিত প্রশান্ত তাহার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিতেছে, "কি হ'ল উমা, কি হ'ল?"

বাহিরে কন্‌ক'নে বাতাস—তবু নমিতার মুখচোখ ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। বুকের ভিতর প্রবল আলোড়ন চলিতে লাগিল। সে দ্রুতপদে নিজের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশান্তর পাশে শুইয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "উমা স্বামী নিয়ে থাক,—আমি ত ছেলে পেয়েছি—এই ঢের, এই ঢের!"

৫

নমিতার পরামর্শই রহিল; অবশেষে দেশে ফেরা হইল। কিন্তু উমার কোন উপকার হইল না, বরং কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল, অল্পে অল্পে তাহার বামাঙ্গ ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতেছে।

দেশে আসিয়া ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে নমিতার প্রথম প্রথম বড়ই অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। সকলেরই যেন তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নাই! মধ্যে মধ্যে দুই এক জন তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া অনেক প্রশ্নও করেন। দুই চারিটা কথা প্রশান্তও শুনিতে পায়। একদিন নমিতাকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খুব অগ্নি-পরীক্ষা চল্‌ছে, না? মধ্যে মধ্যে ছিটে-ফোঁটা শুনতে পাই।" নমিতা হাসিয়া মুখাবনত করিল। প্রশান্ত বলিল, "ও গায়ে মাখবেন না। আপনি যেমন সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন তেমনই কর্‌বেন। আমার অচল সংসারের আপনিই কর্ণধার, আপনি হাল ছাড়বেন না।"

ইহারই দুই তিন দিন পরে একটা খাতা হাতে নমিতা প্রশান্তের বসিবার ঘরের দুয়ারে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভেতরে আস্‌তে পারি?"

প্রশান্ত একটা খেরো-বাঁধা খাতার উপর হইতে চোখ তুলিয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া বলিল, "অবশ্যই।"

নমিতা খাতা হাতে ঢুকিলে প্রশান্ত একটা সোফা নির্দেশ করিয়া বলিল, "বসুন।—ওঃ, আপনার হিসেব-পত্র হবে বুঝি?"

নমিতা মৃদু হাসিয়া সম্মতি দিল। বলিল, "গয়লার হিসেবটা কাল ক'রে রেখেছি, আজ তাকে টাকা দেব বলেছি। হিসেবটা দেখুন।" বলিয়া সে খাতাখানা প্রশান্তর টেবলে রাখিল। তাহার পর আর একটা ছোট কাগজ তাহার উপর মেলিয়া দিয়া বলিল, "ধোপার হিসেবটাও অমনি দেখে—"

প্রশান্ত হাত জোড় করিল। বলিল, "নমিতা দেবী, আমায় ক্ষমা করুন। আমি গৌরীশঙ্কর নই! অত হিসেব আমার ধাতে বর্‌দাস্ত হ'বে না।"

নমিতা ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু না ক'রে উপায় কি, প্রশান্ত বাবু? আপনাকে যে চোখ-কাণ বুজে এ অপ্রিয় কাজ কর্‌তেই হবে।"

প্রশান্ত বলিল, "দেখুন, ঐ সাড়ে ৫ টাকা শ' হিসেবে ১৭২ খানা কাপড়ের দাম কত, এ যদি আমায় হিসেব কর্‌তে হয়, তা হ'লে আমার একটা দিনই অপব্যয় হবে।"

নমিতা এবার হাসিল; বলিল, "আপনি একবার চেয়ে দেখুন না, সে কাযটা আমি সেরে রেখেছি। আপনি একবার শুধু চোখ বুলিয়ে নিন।"

প্রশান্ত একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, এক কায করুন না। সংসার-খরচের সমস্ত টাকা আপনার কাছেই থাক।"

নমিতা একবার প্রশান্তর মুখের পানে চাহিল। শিশুর মত সরল পবিত্র সে মুখ, নমিতা ঈষৎ মুখাবনত করিয়া বলিল, "তা কি হয়!"

প্রশান্ত বলিল, "না হবারও ত কিছু দেখছি না, নমিতা দেবী! আমি সত্যই অপটু, আমায় দয়া করুন—"

নমিতা বলিল, "আচ্ছা, সাপ্তাহিক খরচ আমায় দেবেন, আমি সপ্তাহে সপ্তাহে আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

প্রশান্ত সভয়ে বলিল, "আবার সেই বুঝিয়ে দেব! তবে আমি কি ছাই এতক্ষণ আপনাকে বোঝাচ্ছি? এ সংসারটা যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে চালাচ্ছেন, তেমনি এ বোঝাটাও আমার কাঁধ থেকে নাবিয়ে নিয়ে আমায় অব্যাহতি দিন।"

নমিতা বাঁ হাতে সীঁথা খুঁটিতে খুঁটিতে ঘাড় নাড়িল; বলিল, "তা হয় না। আমি আপনার মাইনে খাওয়া লোক, আত্মীয় নই। এত টাকা আমায় দিয়ে বিশ্বাস কি?"

"আপনাকে বিশ্বাস?"—প্রশান্ত জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, কি এক উচ্ছ্বাসে তাহার মুখমণ্ডলের প্রত্যেকটি শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

মিনিট পাঁচেক,—তাহার পর প্রশান্ত যখন কথা কহিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নাই। বলিল, "বিশ্বাসের কথা যদি তুললেন, তা হ'লে বলি, সুশান্তকে যদি আপনাকে দিয়ে বিশ্বাস করতে পেরে থাকি, তা হ'লে টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারব না? অবশ্য আপনি মেয়েছেলে, আপনাকে এটা বলা বোধ হয় অশোভন, তবুও বল্‌ছি; কারণ, আপনি অবিবাহিতা, আর আমি অপত্যবান্, সন্তান না হ'লে তার মমতা বোঝা যায় না।"

নমিতা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

প্রশান্ত গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উমা তার

গৃহিণীত্বের দাবী নিয়ে যে কোন দিন সেরে উঠবে, সে আশাও ত আর নেই। ওই ভাবে জীবন্মৃত হয়েই ওর বাকী দিনগুলো কাটবে। কাযেই তার সংসারে আপনার আবশ্যক কোন দিনই এক তিল কমবে না। এতখানি যার কাছে দাবী করব, তিনি আমার আত্মীয় কেন—সকলের বাড়া। এ সংসারকে নিজের না মনে করতে পারলে ত আমরা মারা যাই। নমিতা দেবী, আপনি চাকর-মনিব সম্বন্ধটা মনে রেখেছেন জেনে আমি বড় ব্যথিত হলুম! আপনি সুশান্তকে পালন করছেন—আপনি সুশান্তর মা, এইটাই এ সংসারে আপনার সব চেয়ে বড় দাবী।"

নমিতার চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল। হাত তুলিয়া মুছিলে পাছে প্রশান্ত টের পায়, সে জন্য সে মুছিল না, চোখও তুলিল না। ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া হিসাবের খাতা-পত্র তুলিয়া লইল। প্রশান্ত টেবলের উপর হইতে চাবীর গোছাটা তুলিয়া বলিল, "নিন, সবটাই আপনার হাতে তুলে দিলুম। এবার আমার ছুটী।"—গোছাটা সে নমিতার হাতে দিল। নমিতা চোখের জল আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, ঝর-ঝর করিয়া প্রশান্তর হাতে ঝরিয়া পড়িল।

৬

উমা যদিও শয্যাগত, কিন্তু সংসারের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংবাদ সে রাখে। নমিতার হাতে সংসার খরচের টাকা পড়িল, এবং প্রশান্তর চাবীর গোছা গেল, এ সংবাদ জানিয়া সে আগুন হইয়া উঠিল। ইহার পর প্রশান্তর সহিত যখন দেখা হইল, তখন দু' জনে তুমুল কলহ হইয়া গেল। চিরাচরিত রীতি অনুসারে আজ আর প্রশান্ত নীরবে রহিল না। সে-ও উত্তর দিল। কাযেই কলহের পরিসমাপ্তি সহজে হইল না।

প্রশান্ত বলিল, "বেশ করেছি—দিয়েছি। আমার যাকে খুসী দেব। তুমি যখন নিজে কোন ভার নিতে পারবে না, তখন তোমার এ নিয়ে চেঁচামেচি করবারও কোন অধিকার নেই। নুণ-তেলের হিসেব রাখা পুরুষ মানুষের কায নয়, আমি পারবও না।"

উমা দাঁতে দাঁত পিষিয়া বলিল, "তা পারবে কেন? অমন আপনার জন পেয়েছ যখন, তখন সর্ব্বস্ব তার হাতে তুলে না দিলে চলে?—মুখ নেড়ে আমার কাছে বলা হয়েছিল, 'তুমি জানো, আমি চরিত্রহীন নই!—' আজ বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারো, তুমি তাকে ভালোবাসো না?"

প্রশান্ত অতর্কিতে এক পা পিছাইয়া গেল। রুগ্না পত্নীর মনে আঘাত করিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না। কিন্তু তাহার পৌরুষের অবমাননায় সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে স্থিরদৃষ্টিতে উমার মুখপানে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "যা মনে বুঝেছ, তা মনে রাখলেই পারতে। আমার মুখ থেকে স্বীকার করিয়ে বেশী দুঃখ পেতে গেলে কেন? তোমার যখন যথার্থ ধারণা আমি তাকে ভালবাসি, তখন তা-ই জেনে রাখ। হ্যাঁ, আমি নমিতাকে ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি!"

আঘাতটা উমার কতখানি বাজিল, তাহা আর সে দাঁড়াইয়া দেখিল না, চট্ করিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

বৈকালের জলখাবার প্রশান্ত, উমার ঘরের সম্মুখের দালানে বসিয়া খায়, আজ আর তাহাকে অন্দর-মহলে দেখাই গেল না। নমিতা খানসামাকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, খাবার কোথায় দিবে।

একটু পরে খানসামা বৃন্দাবন আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, দাদাবাবু বল্‌লেন, খাবেন না।" একটু থামিয়া বলিল, "নিত্যি অশান্তি, নিত্যি ঝগড়া কি মানুষের ভালো লাগে? বউদিদি যেন বাবুর শনিগ্রহ, না মরে, না ছাড়ে!"

নমিতা মৃদু ভৎর্সনার সহিত বলিল, "ছিঃ বৃন্দাবন, ও কি বলছ! আচ্ছা, এক কায করো, বাবুকে বাইরেই খাবারটা দিয়ে এসো।"

বৃন্দাবন বলিল, "ও বাব্বা! কে এগোবে? আমি যাব না, দিদিমণি! বরঞ্চ এক কায করুন, আপনিই গিয়ে দিয়ে আসুন।"

নমিতা একটু চুপ করিয়া ভাবিল, এ ভাবে বাহ[illegible] প্রশান্তর প্রতি মমতা সে প্রকাশ করিতে চায় না, কি[illegible] আজ তাহার নিজেরও নিরালায় প্রশান্তর সহিত একটু ক[illegible] বলিবার আবশ্যক আছে।

বৃন্দাবন বলিল, "আপনি গিয়ে আসুন দিদিমণি, না হ[illegible] খাওয়াটা আর হবে না যে!"

নমিতা বলিল, "তাই যাচ্ছি। তুমি ছোট ট্রেটায় চা[illegible]

সরঞ্জামটা গুছিয়ে নাও।"—বলিয়া সে ঢাকা তুলিয়া পাথরের রেকাবীতে সাজান ফল ও মিষ্টি হাতে লইয়া বলিল, "এসো বৃন্দাবন।"

পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল, প্রশান্ত চেয়ারের হাতলে হাত গোল করিয়া রাখিয়া তাহার ভিতর মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। নমিতার আগমন সে জানিতে পারিল না।

বৃন্দাবন ফুলের তোড়া সরাইয়া ছোট টিপয়টা সম্মুখে আনিয়া রাখিবার শব্দে প্রশান্ত মুখ তুলিয়া চাহিল। বোধ হয় বৃন্দাবনকে ধমক দিতেই যাইতেছিল, কিন্তু নমিতাকে রেকাবী হাতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিল, "আবার কষ্ট ক'রে এখানে বয়ে নিয়ে এলেন!"

বৃন্দাবন তখন চলিয়া গিয়াছিল। নমিতা বলিল, "না আন্‌লে যে খাওয়া হয় না।"

প্রশান্ত হাসিল, ম্লান করুণ হাসি; বলিল, "ভগবান্ বোধ হয় একেবারে স্নেহবঞ্চিত হ'তে দেন না। উমা যে রকম আমার ওপর বিরূপ হয়েছে, বোধ হয় চারদিন আমি না খেলেও তার কিছু আসে যায় না। তাই আপনার কাছে বোধ হয় এই রকম অযাচিত যত্ন পাচ্ছি।"

নমিতা বলিল, "এ আর যত্ন কি? বাড়ীর যিনি প্রধান, তাঁর খাওয়া না হ'লে সকলেই অস্বস্তি বোধ করে।"

প্রশান্ত উঠিয়া আর একখানা চেয়ার পাশে টানিয়া আনিল, বলিল, "বসুন।"

নমিতা বসিল।

আহার সমাপ্ত করিয়া প্রশান্ত নমিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "আর একটা পেয়ালা থাক্‌লে আপনিও ত খেতে পার্‌তেন। বৃন্দাবনকে বলি—"

নমিতা সভয়ে বলিল, "না, না, থাক।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "আপনি কি এখন দু' একটা কথা বল্‌বার অবসর পাবেন?"

প্রশান্ত বলিল, "এখন আর আমার কি কায? শুধুই ত অবসর। বলুন, কি বল্‌বেন।"

নমিতা অঞ্চলের প্রান্ত হইতে প্রশান্তর চাবীর গোছাটা খুলিয়া টিপয়ের উপর রাখিল; বলিল, "চাবী আপনি ফিরিয়ে নিন, ও আমার কাছে না থাক্‌লেই ভাল।"

প্রশান্ত সোজা হইয়া বসিল, বলিল, "বুঝেছি, আমাকে একলাই হয় নি, উমা আপনাকেও বিষ বিঁধিয়েছে।"

নমিতা তাহার স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে বলিল, "উনি রোগা মানুষ, ওঁর মনের দিকে চেয়েই চল্‌তে হয়। যাতে উনি মনে শান্তি পান, মনে হয় তাই করা উচিত।"

প্রশান্ত নমিতার দিকে চাহিল, গভীর ক্ষুব্ধ দৃষ্টি; বলিল, "তা' হ'লে দেখ ছি ঈশ্বরের দেওয়া এই অটুট স্বাস্থ্যই আমার সকল দুঃখের কারণ! এর জন্যই বুঝি আমি সকলের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত।—উমা রোগা, তাই তার শত অত্যাচারও ক্ষমার্হ—তার স্বাস্থ্য নেই, মন আছে,—কিন্তু আমার কি মন ব'লে কিছু নেই, নমিতা দেবী? তাতে কি সুখ-দুঃখের ছায়া পড়ে না? যে ভাবে সে পারে, আমার অন্তরকে প্রতিনিয়ত ঘা দিচ্ছে, আমি ত নীরবেই সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি।—একদিন—এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি আমার প্রতিবাদ কর্‌বার অধিকার নেই?"

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া-ধরিয়া সে ক্ষণকাল নত নেত্রে রহিল, তাহার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার এই একত্রিশ বছর বয়স—আমি আমার জীবন্ত টাট্‌কা প্রাণটাকে উমার রোগশয্যার পায়ে বেঁধে তার সন্তোষ, তার তৃপ্তির জন্য চেষ্টা কর্‌ছি। তবু ত আমি তাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লাম না।"—দু'জনেই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিবার পর প্রশান্ত বলিল, "উমা আপনাকে সত্যই বড় অপমান করে। আপনার মনে বিতৃষ্ণা আসাই স্বাভাবিক, তবু—

নমিতা ঈষৎ সজল কণ্ঠে বলিল, "বৌরাণী এক তিলও বিশ্বাস যখন আমাকে করেন না, তখন—"

"উমা করে না, কিন্তু আমি যে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি!"

প্রবল আবেগের সহিত প্রশান্ত ইহা বলিয়া ফেলিল; কিন্তু এমন ভাবে সে কোন দিন নমিতার সহিত কথা বলিবার কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই সে নিজের কথায় নিজেই চমকিয়া উঠিল। দুই জনের বুকেই নিদারুণ সজ্ঘাত চলিতেছিল, তাই কাহারও কণ্ঠে ক্ষণকাল কোন শব্দ ফুটিল না।

প্রশান্তই প্রথম কথা বলিল। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা সে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিল। সে বলিল, "ওই অপয়া চাবীটার বিষয় কি স্থির কর্‌লেন?"

নমিতা মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়াইয়া গোছাটা লইয়া অঞ্চলে বাঁধিল। কথা বলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না।

৭

ইহার পর উমার অবস্থা সত্যই শোচনীয় হইয়া উঠিল। উমার মা পীড়িতা কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। নমিতাকে দেখিবামাত্র তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর কন্যার নিকট সমস্ত শুনিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে নমিতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। নমিতা তখন সুশান্তকে ঘুম পাড়াইতেছিল। উমার মাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আসুন।" তাহার পর সুশান্তকে কোলে লইয়া খাট হইতে নামিয়া বসিল।

সুশান্ত চাহে নমিতাকে জড়াইয়া শুইতে। সে তাহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল, "না আমি এখানে শোব না, মা! চল তুমি বিছানায় আমায় নিয়ে শোবে। চল না মা,—ওঠো—"

উমার মা বলিলেন, "তোমাকে মা বলে বুঝি?"

প্রশ্নের ভঙ্গী দেখিয়া নমিতা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল, ঘাড় হেলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

উমার মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এখন ত আমি এসেছি, আর তোমার দরকার হবে না। তুমি বরঞ্চ অন্যত্র কায দেখ।"

নমিতা চমকিয়া সুশান্তকে বুকে চাপিয়া ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে মহিলাটির মুখের পানে চাহিল। সুশান্ত—তাহার বুকের ধন, তাহার চোখের তারা, সুশান্তকে এক কথায় ছিনাইয়া ল'তে চায়, কে এ নিদয়া নারী!

উমার মা বলিলেন, "বুঝতেই ত পাচ্ছ বাছা, ঘি আর আগুন,—মেয়েটা আমার দেখে শুনে যেতে বসেছে—"

তিনি হয় ত আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু নমিতা অকস্মাৎ অত্যন্ত কঠোর স্বরে বলিল, "ছাড়িয়ে দিতে চান, দিন; আমি শুধু মাইনে খাওয়া চাকর বৈ ত নয়! কিন্তু অপবাদ দেবেন না। পাঁচটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে খেটেই ত আমাকে খেতে হয়। মেয়ে আপনার কি দেখেছেন, কি শুনেছেন?"

এমন সতেজ প্রত্যুত্তর শুনিয়া উমার মা একটু থত-মত খাইয়া গেলেন, বলিলেন, "তা তুমি সোমত্ত মেয়ে, দেখ্‌তেও ভাল, সেজে গুজেও থাক—পুরুষের মন ত?"

নমিতা পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরে বলিল, "ওসব কথা বল্‌ছেন কেন? স্পষ্ট ক'রে বলুন—রাখ্‌বেন না। ওভাবে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন কেন?"

উমার মা বলিলেন, "বল্‌লে আঘাত লাগে তা জান,—কিন্তু তুমিই ত দেখ্‌ছি পুরোপুরি গিন্নী। টাকা পয়সা, জামাইয়ের খুঁটি-নাটি সবই ত তোমার হাতে। কেন, জামাই কি মাটীর পুতুল, সে কি কিছুই করতে পারে না?"

নমিতা বুঝিল, ইহার সহিত ঝগড়া করা তাহার কর্ম্ম নয়; তাই বলিল, "কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি প্রশান্ত বাবুকে আজ তাঁর হিসেব-পত্র বুঝিয়ে দিয়ে কালই চ'লে যাব। আপনি এখন যান।"—বলিয়া সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে দুয়ার দেখাইয়া দিল।

৮

রাত্রি তখন অনেক, বারোটা বাজিয়া গিয়াছিল। নমিতা তাহার ঘরের জানালার কাছে বসিয়া গরাদেতে মাথা রাখিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল।

ইহারই নাম দাসত্ব! আজ দুই বৎসর সে এ সংসারে আছে, সংসারের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সহিত সে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে—পরিপূর্ণ কর্ত্রীত্ব করিয়াছে। অথচ আজ এক কথায় তাহার এখানকার সহিত সকল সম্পর্কের পরিসমাপ্তি হইয়া গেল! বৈকালে যখন সে প্রশান্তকে জানাইল, সে আর থাকিতে পারিবে না, তখন প্রশান্তর মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন অতল জলে পড়িয়া শ্বাস লইবার জন্য আঁকু পাঁকু করিতেছে। তাহার অসহায় মুখের পানে চাহিয়া নমিতার সমস্ত অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছিল,—কিন্তু সে নিরুপায়। অতৃপ্তি এবং ব্যর্থতার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া নমিতা যেন দিশেহারা হইয়া গেল। অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "উঃ, এ আমি কি ক'রে সহ্য করব?"

সহসা অত্যন্ত লঘু করস্পর্শের সহিত মৃদু আহ্বান আসিল, "নমিতা দেবী!"

নমিতা শিহরিয়া মুখ তুলিল, এবং প্রশান্তকে দেখিয়া পরক্ষণেই ছোট শিশুর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রশান্ত অদূরে বসিল। তার পর উদাসীনের ন্যায় নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ওদের মা-মেয়ের নির্য্যাতনের মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়ে আপনি পালিয়ে যেতে চাইছেন, নমিতা দেবী?"

মুহূর্ত্তের জন্য নমিতার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া চোখ মুছিয়া নীরবে

হইয়া রহিল। প্রশান্ত করুণ কণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে সত্যিই আপনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন ?"

নমিতার বক্ষঃ-শোণিত উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল ; তথাপি সে সংযত কণ্ঠে বলিল, "আমি বড় দুর্ব্বল, আমায় অমন ক'রে বল্‌বেন না, আমি সহ্য করতে পাচ্ছি নে।"

প্রশান্ত বলিল, "তবে থাকুন, যাবেন না। আপনার খোকাকে, এই হতভাগাকে ছেড়ে আপনি থাক্‌তে পারবেন? বুক ভেঙ্গে যাবে না ? আপনি কি বাঁচ্‌বেন ?"

নমিতা কাতর স্বরে বলিল, "না, না, আমার বড় শক্ত প্রাণ—আমি মরব না। আমি আপনাকে ছাড়ব—আমার খোকাকে ছাড়ব,—আপনি অকলঙ্ক থাকুন। এ আমার মোহের স্বর্গ,—আজ আমার বল্‌তে দ্বিধা নেই, আপনার সংসারে এসে আমি নারী-জন্মের সব কাম্যই পেয়েছি, এখানে নারীত্ব, মাতৃত্ব দুই আমি উপলব্ধি করেছি। কিন্তু এ যে মোহ, প্রশান্ত বাবু, এ ত সত্যি নয়, এ যে ভাঙ্গবেই।"

প্রশান্ত আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "না, নমিতা, এ সত্যি, এ মোহ নয়। আমি যে সত্যি তোমায়—"

নমিতা বাধা দিয়া মর্ম্মপীড়া-কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তা প্রকাশযোগ্য নয়। প্রকৃত ভালবাসা মানুষকে কলঙ্ক থেকে রক্ষা করে। ভালবাসা আত্মতৃপ্তি চায় না। প্রশান্ত বাবু! আমরা কেউ কারুর অপযশ সহ্য করতে পারব না। আমায় বাধা দেবেন না, প্রশান্ত বাবু! আমার মোহের স্বর্গ আমায় ছেড়ে যেতে দিন।"

প্রশান্ত সহসা তাহার হাতখানি মুঠার মধ্যে লইয়া মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ হইয়া রহিল ; কণ্ঠে তাহার শব্দ ফুটিল না। পরে সে নমিতার হাত ছাড়িয়া দিল।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

পথ

পথের দেবতা, হও প্রসন্ন ; করুণা-নয়নে চাও,
কেন রহস্য-ঘন যবনিকা আবার সমুখে ছাও ?
ও তব অসীম অশেষ সরণী
ছেয়ে আছে কি গো নিখিল ধরণী !
নাহি তা'র পার, নাহি তা'র শেষ, আদি সে নাহিক তা'ও
নাহি কাল দেশ পন্থ অশেষ ! ইঙ্গিতে কা'রে চাও ?

হে চলার পথ, ওগো বৈরাগী, ভুলায়েছ মোরে তুমি
ভুলায়েছে তব দিগন্তরেখা, শ্যামল কানন-ভূমি ;
তোমার পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে
কি যে ঘোর মায়া লুকাইয়া থাকে
সঙ্কেত করে কোন্ কুহকিনী অস্ত-অচল চুমি—
ভেসে আসে কোন্ সুদূরের সুর ! সে কথা জান কি তুমি ?

ওগো উদাসীন, ওগো নিষ্ঠুর, ওগো সনাতন পথ'!
কেন ডাক দাও, কর প্রলুব্ধ—পূরাবে কি মনোরথ ?
কত মাঠ বাট জনপদ হাট—
কত গিরিনদী কত খেয়া-ঘাট !
জানার গণ্ডী পারায়ে চলেছ কোন্ অজানার কূলে !
চির-নিশিদিন হে চির-যাত্রি ! ছুটে চল কুতূহলে।

দিবস-রজনী জনম-মরণ কত যুগ হ'য়ে পার
পান্থবীণার তারে তারে তুলি কি মধুর ঝঙ্কার !
যুগে যুগে তুমি নব নব লোকে
দেখায়ে সরণী দ্যুলোকে ভূলোকে
অপরূপ এই বিচিত্র-পথে বাহির করিলে মোরে—
সে পথ-নাট্য পথের পাঁচালী শিখাও জীবন-ভোরে।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য।

ইতিহাসের অনুসরণ

বক্তিয়ার খিলজি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়

বাঙ্গালার ছোট ছোট ছেলেরাও তাহাদের পাঠ্য-ইতিহাসে পড়ে যে, মহম্মদ-ই বক্তিয়ার নামধেয় খিলজি বংশের এক জন ভাগ্যান্বেষী তুর্কী সপ্তদশটি মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বাঙ্গালার রাজধানী নদীয়া জয় করিয়াছিলেন। যে সময় এই সপ্ত দশটি অশ্বারোহী নদীয়ার রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিল, সে সময় বঙ্গাধিপ লক্ষ্মণসেন সবেমাত্র ভোজনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাসাদ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে শুনিবামাত্র বৃদ্ধ রাজা উচ্ছিষ্টমুখেই খিড়কির দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রাণী বা দাস-দাসী কাহাকেও সঙ্গে লইবার সময় পান নাই। এত বড় একটা নির্জ্জলা মিথ্যা গল্প যে মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে, ইহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই গল্পটি ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছিল দেখিয়া অব্যাজে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ উহার আষাঢ়ে ভাব গোপন করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন যে, রাজবাটীর নিকটস্থ একটি আমবাগানে বক্তিয়ার খিলজি কয়েক শত তুর্কী অশ্বারোহী লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এ পলস্তারাটা আরও হাস্যজনক। কারণ, বঙ্গাধিপতি কি সাঁওতাল বা গারো জাতির সর্দ্দার ছিলেন যে, তাঁহার প্রাসাদের পার্শ্বেই বিটপিবহুল এমন ভীষণ জঙ্গল ছিল যে, তাহার মধ্যে চারি পাঁচশত সশস্ত্র তুর্কী সৈন্য লুকাইয়া থাকিতে পারিত? আর এই রাজ্যের রাজার রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা কি এতই হাস্যজনক ছিল যে, মগধ হইতে এতগুলি সশস্ত্র তুর্কী তাঁহার রাজধানীর দিকে ধাবিত হইল, তিনি তাহার কোন খবরই রাখিলেন না? এ যে অসম্ভব! এই কাহিনীর রচয়িতা মিন্‌হাজ তাঁহার রচিত ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে, খিলজি সর্দ্দারসনাথ মাত্র আঠারো জন তুর্কী রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। সে সময়ে কান্যকুব্জ, উদ্দণ্ডপুর, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিজয়কাহিনী নিশ্চিতই বাঙ্গালায় পৌঁছিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় আচম্বিতে সশস্ত্র তুর্কী দেখিয়া কি দেশের লোকের মনে কোন সংশয় জন্মে নাই? কেহ কি রাজ্যেশ্বরকে সে সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাপন করেন নাই? [illegible]জানা যায়, আগন্তুক অশ্বারোহীরা লোককে বলিয়াছিল যে, ইহারা রাজধানীতে ঘোড়া বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে ত ঐ ১৮টি ভিন্ন ঘোড়া ছিল না। কিন্তু উহারা যখন রাজ্য জয় করিতে আসিয়াছিল, তখন তাহারা কি তীর, ধনুক, বর্শা, তরবারি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া আসে নাই? বিনাযুদ্ধে রাজ্যেশ্বর খিড়কীদ্বার দিয়া চম্পট দিবেন, ইহা কি তাহারা বুঝিয়াছিল? অসম্ভব! এ কাহিনী নিতান্তই অলীক।

এই অলীক এবং আজগুবি কাহিনীটি প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। সাহিত্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় ইহা প্রথমে অবিশ্বাস করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তখন প্রকাশ পায় নাই বলিয়া তিনি এ সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে পারেন নাই। এই কাহিনীর প্রচারক মীনহাজ-উস-সিরাজ তাঁহার 'তবকৎ-ই-নসিরী' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, নদীয়ার যে রাজা পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম লচ্‌মোনিয়া। মিন্‌হাজ এই গল্পটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন? ৬৪১ হিজিরায় অর্থাৎ ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে নিজামউদ্দীন এবং সমসামউদ্দীন দুই ভাইয়ের মুখে তিনি উহা শুনিয়াছিলেন। ইহারা তখন লক্ষ্মণাবতী নগরে ছিলেন এবং বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের হয় ত স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল; হয় ত সকল কথা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য নানা কারণে ইহাদের কথা বিশ্বাসের অযোগ্য। অবিশ্বাসের প্রথম কারণ, যে সময়ে বক্তিয়ার খিলজি মগধের উদ্দণ্ডপুর এবং নালন্দা জয় করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাহার বহুপূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনদেব মরিয়া গিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনদেবের মৃত্যু হইয়াছিল।"* বক্তিয়ার কোন্ সময়ে নবদ্বীপ-লুণ্ঠনে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। তবে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সে

---

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠা। Journal & Proceedings of Asiatic Society of Bengal, New serie's Vol X. P. 290.

তিনি বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, একথা কেহই বলেন নাই। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি উদ্দণ্ডপুর ধ্বংস করেন। তাহার পর-বৎসরই যদি তিনি গৌড়মণ্ডল আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১২০০ খৃষ্টাব্দে ইনি নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তাহার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেই লক্ষ্মণসেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের তিন পুত্র ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে মাধবসেন, বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই মাধবসেনের মৃত্যু হয়। ঠিক্ কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। সেইজন্য অনুমান হয়, তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপসেনের কিম্বা কেশবসেনের আমলে বক্তিয়ার নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন; সুতরাং লচ্‌মোনিয়া নামে কোন বৃদ্ধ রাজার অস্তিত্বই তখন ছিল না। কেহ কেহ এই ব্যাপার সম্বন্ধে আরও একটি উপাখ্যান বলেন। তাঁহারা বলেন, কেশবসেন ১১১৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। ইঁহারই গর্ভস্থ শিশু উত্তরকালে লাক্ষ্মণেয় নাম ধারণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে বক্তিয়ার নদীয়া লুণ্ঠন করেন। প্রথমতঃ ১১১৮ খৃষ্টাব্দে কেশবসেন মরা দূরে থাকুক, জন্মিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহার পর ইঁহার পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তাহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঐ গল্পের মর্ম্ম এইরূপ:—"কেশবসেনের গর্ভবতী বিধবা মহিষীর যখন প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন রাজসভায় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া বলেন যে, যদি রাজ্ঞীর সন্তান সত্বর প্রসূত হন, তাহা হইলে সেই সন্তান অল্পায়ুঃ এবং দুর্ভাগ্য হইবে। কিন্তু সকলেই ঐ গর্ভস্থ শিশুকে গৌড়ের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তবে আর চারি পাঁচ দণ্ডকাল অতিক্রান্ত করিয়া যদি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তিনি সুখী ও দীর্ঘজীবী হইবেন। রাজবাটীর সকলেই দৈবজ্ঞের কথা বিধিবাক্য বলিয়া মানিতেন। কিন্তু সন্তান তখন প্রসূত হইতে আসিতেছে; বৈদ্যগণ ঔষধ দ্বারা তাহার গতি নিরোধ করা অসম্ভব বলিলেন। তখন রাণী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজ চরণদ্বয় রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধপদে এবং মস্তক নিম্নে রাখিয়া অবস্থান করিতে থাকিলেন। চারি পাঁচ দণ্ড অর্থে প্রায় পোণে দুই ঘণ্টা। অত্যাসন্নপ্রসবা নারীকে এইরূপ অবস্থায় রাখিলে সে নারী ত মরেই, গর্ভস্থ সন্তানই কি বাঁচে? সে সন্তানও হাঁপাইয়া মরে। অন্ততঃ ঐরূপ ভাবে থাকিলে সন্তানের মরিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহারাজ কেশবসেনের রাজসভাসদ্‌গণ কি এতই আনাড়ী ছিলেন যে, তাঁহারা এই বিষম বিপদের সম্ভাবনা কল্পনাও করেন নাই? উক্ত গল্পে বলা হইয়াছে যে, এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্ঞী মরিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তান বাঁচিয়া ছিল। সেই সন্তানই লাক্ষ্মণেয় সেন। এই গল্পটি আমরা একবারেই অসম্ভব মনে করি। কারণ, রাজমন্ত্রী এবং রাজ-জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগেরও এইরূপ ব্যাপারে একটা দায়িত্ববোধ ছিল। এ গল্প একান্তই অবিশ্বাস্য।

উল্লিখিত উপাখ্যান সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বুঝা যায় যে, কেশবসেনের মৃত্যুর সময় তাঁহার অন্তর্ব্বত্নী পত্নীর গর্ভে ভিন্ন লক্ষ্মণসেনের আর কোন বংশধর ছিল না। কিন্তু তাহা নহে। লক্ষ্মণসেনের চারি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মাধবসেন, বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন এই তিন পুত্রের নামই শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, লক্ষ্মণনারায়ণসেন নামক লক্ষ্মণসেনের আর এক পুত্র ছিল। এ বিষয়ে বিশিষ্ট প্রমাণের একান্ত অভাব। লাক্ষ্মণেয়সেন সম্বন্ধে সমস্ত কাহিনী অবিশ্বাস্য।

তাহার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন,—মিন্‌হাজ-কথিত এই 'নোদীয়া' কোথায় ছিল? ইহা কি নবদ্বীপ? তাহাই সম্ভব। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "নবদ্বীপ কখনই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল না।" নবদ্বীপ কোন সময়েই বাঙ্গালার রাজধানী ছিল না সত্য, কিন্তু এই স্থানের নিকট তদানীন্তন গঙ্গা এবং জলাঙ্গীর সঙ্গমস্থলের উপরেই সেনবংশীয় রাজা সামন্তসেন গঙ্গাবাসের জন্য একটি প্রাসাদ রচনা করিয়া তথায় তাঁহার জীবনের শেষ দশায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা প্রবাদ আছে। সে সময় ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিতা ছিল। এখন উহা নবদ্বীপের পূর্ব্ব দিক্ দিয়াই প্রবাহিত। বল্লালসেনও সময় সময় এইখানে আসিতেন। এ স্থানে বল্লালদীঘি নামক এক দীর্ঘিকাও রহিয়াছে, তবে রাজধানী বলিলে ঠিক যাহা বুঝায়, তাহা এখানে ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ এখানে গৌড়েশ্বরের পরিবারমধ্যে

যাঁহারা বৃদ্ধ হইতেন, তাঁহারাই শেষকালে গঙ্গাবাসের জন্যই থাকিতেন, এবং স্থানীয় পণ্ডিতদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপাদি করিতেন। হয় ত বল্লালসেন শেষ বয়সে এখানে কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে এ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে বল্লাল-পোতা খনন করিয়া মোল্লা সাহেব নামক এক ব্যক্তি কয়েকখানি কাষ্ঠের বারকোস এবং একটি কীটদষ্ট কাষ্ঠের সিন্দুক পাইয়াছিলেন। * কাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে কয়েকখানি জীর্ণ শাল, পশমী কাপড়, এবং কয়েকটি ছোট ছোট রৌপ্য-মুদ্রা ছিল। ইহা দেখিয়া বোধ হয়, ধর্ম্মকার্য্যের জন্যই সম্ভবতঃ সেন-রাজগণ অথবা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন সময়ে সময়ে এস্থানে আসিতেন। কিন্তু সেন-বংশের রাজধানী ছিল গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী, এবং সুবর্ণগ্রাম। সুবর্ণগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গে।

৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"নদীয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেনরাজ্যের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন।" আমার ধারণা, নবদ্বীপের রাজবাড়ীতে কেহ বড় একটা থাকিত না। দুই চারিজন কর্ম্মচারী ও জনকয়েক রক্ষী সেনা মাত্র তথায় থাকিত। এরূপ অবস্থায় সম্ভবতঃ বক্তিয়ার খিলজি অতর্কিতভাবে এই স্থান আক্রমণ করিয়া ইহা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। রাজার প্রাসাদস্থ কোন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ব্যাপার দেখিয়াই অন্তঃপুরের পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বক্তিয়ারও এই প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া বিশেষ ধনরত্ন পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই।' আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বক্তিয়ার নবদ্বীপের অরক্ষিত রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া আর এখানে অবস্থিতি করেন নাই—বা এখানে রাজধানী স্থাপনও করেন নাই। তিনি সে সময় বাঙ্গালা-বিজয়ও করিতে পারেন নাই। বক্তিয়ার নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়াই ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) জয় করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মগধ হইতে আসিবার পথে তিনি গৌড়-বিজয় করেন নাই। নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার পর তিনি গৌড় জয় করিয়াছিলেন।

* Vide Hunter's Statistical Account of Bengal. vol II

কিন্তু কি ভাবে সেই বিজয়কার্য্য সমাধা হইয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস বা কিম্বদন্তীও নাই। কোন মুসলমান ঐতিহাসিকও সে কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বক্তিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে উদন্তপুর অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১২০০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ লুণ্ঠন করেন।

বক্তিয়ার খিলজি কোন্ পথ দিয়া নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ কেহ প্রদান করেন নাই। তিনি কোন্ পথ দিয়া গৌড়দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। অধিকাংশ পথই তখন মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয় নাই; সুতরাং বক্তিয়ারের পক্ষে সে সকল পথ ধরিয়া আসা অসম্ভব ছিল। একমাত্র সাহেবগঞ্জের ভিতর দিয়া তেলিয়াগড়ির পার্ব্বত্য পথ দিয়া তাঁহার পক্ষে গৌড়ে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু গৌড়েশ্বর যদি ঐ পথ সুরক্ষিত রাখিতেন, তাহা হইলে তুর্কীদের পক্ষে বাঙ্গালায় প্রবেশ করা একরূপ অসম্ভব হইত; অথচ তিনি তাহা করেন নাই। কেন করেন নাই, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সম্ভবতঃ মগদস্যুদিগের আক্রমণে পর্য্যুদস্ত পূর্ব্ববঙ্গকে রক্ষা করিতে যাইয়াই তিনি এদিক্ হইতে কোন বিপদের শঙ্কা করেন নাই। মগধের পাল-বংশীয় রাজগণের সহিত গৌড়ের সেন-বংশীয় রাজগণের অবিরাম যুদ্ধে উভয় দেশের শাসকগণ হীনবল হইয়া পড়েন। সম্ভবতঃ, তন্মধ্যে পাল-বংশীয় রাজগণের শক্তি অতিমাত্র ক্ষুণ্ণ হওয়াতেই গৌড়পতি ঐদিক্ হইতে আর আক্রমণের শঙ্কা করেন নাই। সেই জন্য তিনি গৌড়মণ্ডল অনেকটা অরক্ষিত রাখিয়াই বঙ্গমণ্ডল রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, অথবা যাঁহার উপর গৌড়মণ্ডল রক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেই কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং সামরিকবুদ্ধির একান্ত অভাব ছিল।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে—"এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই বখ্তিয়ারের নদীয়াবিজয়কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 'নোদিয়া' পুনর্ব্বার হিন্দু রাজা কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কারণ, মহম্মদ ই বখ্তিয়ারের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীস উদ্দীন য়ুজবক 'নোদিয়া' বিজয় করিয়া বিজয়কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন।" আমার কি

ক্তিয়ার কর্তৃক নবদ্বীপলুণ্ঠনের কাহিনী একেবারেই অলীক লিয়া মনে হয় না। রাজবাড়ীর লোক বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের জন্য বিজয়সেন-নির্ম্মিত গঙ্গাবাসের বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেন। বক্তিয়ার ইহা কোনরূপে জানিতে পারিয়া নলোভে এই স্থান অধিকৃত করিতে আসিয়াছিলেন। তখন নবদ্বীপ বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে নাই। কথিত আছে যে, বল্লালসেনের পিতামহ সামন্তসেন এই স্থানে গঙ্গাবাসের জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার কিছু দিন পরে এক জন যোগী আসিয়া নবদ্বীপে গঙ্গার চরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়াইতেন। বিখ্যাত শঙ্কর তর্কবাগীশ এবং বাপ্তি-শিরোমণি ছিলেন—ঐ যোগীর ছাত্রগণের মধ্যে প্রধান। তখন এই স্থানে ব্রাহ্মণপ্রধান একটি ছোট গ্রাম ছিল। ক্রমে ঐ স্থান রাজগণের গঙ্গাবাস-ভবনের সান্নিধ্য হেতু ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিপথে আরূঢ় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের গৌরব-ভাস্কর মাধ্যন্দিন গগনে সমুদিত হইয়াছিল। বক্তিয়ার ১২০০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ-লুণ্ঠনে আসিয়াছিলেন, এই মতই বিচারসহ। সুতরাং সে সময়ে নবদ্বীপ প্রকাণ্ড বিদ্যাস্থান না হইলেও ঐ স্থানের কিছু বিদ্যার গৌরব প্রকাশ হইতেছিল। বক্তিয়ার উদ্দণ্ডপুরের গিরিশিখরস্থ সঙ্ঘারাম যে ভাবে ধ্বংস করিয়া মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, নবদ্বীপে তাহা কিছুই করেন নাই। ইহাতে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, বক্তিয়ার নবদ্বীপে অধিক দিন থাকেন নাই। রাজার রাজধানী জয় করিয়া অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য তথায় রাজধানী অধিকার করিয়া থাকাই বিজেতাদিগের নিয়ম। বক্তিয়ার যদি ঐ স্থানের লোকদিগকে হত্যা করিতেন,—তাহা হইলে কোথাও না কোথাও তাহার উল্লেখ থাকিত। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমার সন্দেহ হয়, সম্ভবতঃ বক্তিয়ার নবদ্বীপ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের সান্নিধ্যে কোন স্থানই তিনি স্থায়ী ভাবে অধিকার করিতে পারেন নাই।

নদীয়া লুণ্ঠন করিবার পরে বক্তিয়ার গৌড়নগর অধিকার করিয়া ঐ স্থানে তাঁহার প্রধান আড্ডা স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কখনই সমস্ত বঙ্গভূমি অধিকার করিতে পারেন নাই। বরেন্দ্রভূমির অতি সামান্য অংশ মাত্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখনও পূর্ব্ববঙ্গে সেন বংশের রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বক্তিয়ার কর্তৃক গৌড়বিজয়কে মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা-বিজয় কোন মতেই মনে করা যাইতে পারে না। ফেরেস্তা তাঁহার 'তারিখ-ই ফেরেস্তা' নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বক্তিয়ার গৌড় এবং 'নোদিয়া' ধ্বংস করিবার পর গৌড় এবং নবদ্বীপের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা দেশেই রঙ্গপুর নাম দিয়া একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তবকাতি আকরবী নিজামুদ্দীন আহম্মদ লিখিয়াছেন যে, বক্তিয়ার নদীয়া বিধ্বস্ত করিবার পর আর তথায় রাজধানী স্থাপন না করিয়া গৌড়ের নিকটই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং নবদ্বীপ অতর্কিত আক্রমণে লুণ্ঠিত হইলেও উহা অধিকৃত হয় নাই। বক্তিয়ার কর্তৃক নবদ্বীপ লুণ্ঠিত হইবার ৫৫ বৎসর পরে বাঙ্গালার তদানীন্তন সুলতান মগীস উদ্দীন য়ুজবক তৎকর্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের স্মরণচিহ্ন-স্বরূপ নূতন মুদ্রা প্রচলিত করাইয়াছিলেন।* ইহাতে স্বতঃই মনে হয় যে, বক্তিয়ার নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উহা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। আর দ্বিতীয় বার নবদ্বীপ বিজয় একটা বড় গৌরবের ব্যাপার বলিয়াই সুলতান মগীস উদ্দীন ঐ তথ্য প্রচারার্থ নূতন মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, নবদ্বীপ-লুণ্ঠনের পর বক্তিয়ার ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়াই গৌড় অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তথায় বাস করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন নদীয়া-লুণ্ঠনের পরও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এক দিকে মগ দস্যুদিগের সহিত অন্য দিকে মুসলমানদিগের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হইত। এই দুইজন নৃপতির তাম্রশাসন হইতেই জানা যায়, যে তাঁহারা যুদ্ধে কয়েকবার গর্গ যবনদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।† সম্ভবতঃ ইঁহারাই বক্তিয়ারকে নদীয়া অঞ্চল হইতে তাড়াইয়াছিলেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

* Catalogue of Coins in Indian Museum Calcutta, vol. 11 to 1461 বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ ২৭ পৃষ্ঠা।

† এই তাম্রশাসনের কথা J. A. S. B. New Series vol X P. 99 to 104 দ্রষ্টব্য। উহাতে আছে—

শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্ম্মাগ্রণীঃ
সগর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ।
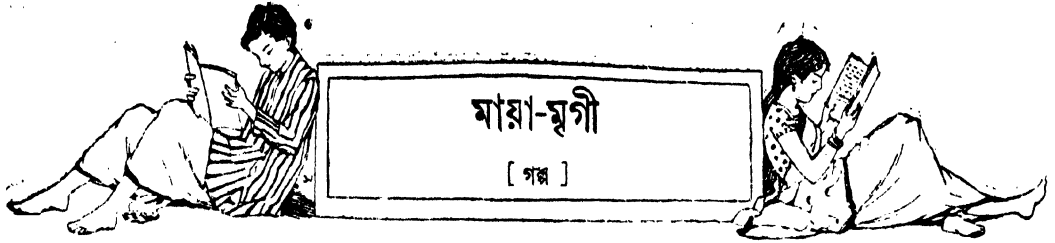
মায়া-মৃগী

[গল্প]

কয়দিন হইতেই শুনিতেছি—আমার বাড়ীর কাছে একখানি ভাড়াটে বাড়ীতে একঘর নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছেন।

সেদিন প্রভাতে বাড়ীর সম্মুখের বাগানটিতে একটু প্রভাত বায়ু সেবনের সহিত গাছগুলির তদারক করিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় তাঁহারা আমাদের সহিত পরিচয় করিতে আসিলেন।

পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহারা স্বামী এবং স্ত্রী। ভদ্রলোকের নাম মনতোষ দত্ত, সংক্ষেপে মিঃ ডট্—স্ত্রীর নামও শুনা গেল সুহাস, আপাততঃ মিসেস্ ডট্। ভাবভঙ্গী এবং কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, তাঁহারা উদারপন্থী।

একজন মহিলা আসিয়াছেন, সুতরাং আমার স্ত্রীকে ডাকাইয়া আনিলাম এবং মহিলাটির পরিচয়ও দিলাম।

নমস্কার এবং প্রতিনমস্কার প্রভৃতি যথাবিধি হইয়া গেল,—আমার গৃহিণী অনুরোধ করিলেন—একটু চা খান। সঙ্গে সঙ্গে দেখি—পাচকঠাকুর ও চাকর চায়ের সরঞ্জাম-সহ দুইখানি ট্রে ভরিয়া কিস্‌মিস্-বসান কেক, বিস্কুট, পুডিং ইত্যাদি লইয়া আসিল।

বিস্ময়ের সুরে দত্ত-দম্পতি প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ করেছেন কি—শুধু চা দিলেই হ'ত।" কিন্তু বস্তুগুলির প্রতি তাঁহারা আগে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন না। তার পর তাঁহাদের সবিনয় বিদায়প্রার্থনার সহিত আমাদের স্বামি-স্ত্রীকে তাঁহাদের গরীব-খানায় যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ, এবং সহাস্যে বিদায় গ্রহণ।

প্রায় দেড় মিনিটের মধ্যেই দেখি, জগুয়া নামধারী হিন্দুস্থানী ছোকরা-চাকরটি আহুত হইল,—এবং টেবু অর্থাৎ আমার গৃহিণী তাহাকে হুকুম করিল, "এই, গোবরজল দিয়ে টেবলটা মুছে দে—আর এঁটো বাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে যা—"

জগুয়ার কোলে ছোট খুকি ছিল, টেবু তাহাকে কোলে লইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আমি বোধ করি কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। হঠাৎ কাণে গেল, "মাগো, সামনের দাঁত দুটো কি উঁচু!"

প্রশ্ন করিলাম—"কার?"

"আহা হা, ন্যাকাপণা হচ্ছে। দেখনি যেন!"

অবাক্ হইয়া বলিলাম, "কার কথা বল্‌ছো গো?"

"ঐ মিসেস্ দত্তর গো! সামনের দাঁত দুটো কি রকম গজদন্ত দেখ্‌লে না?"

না, তাহা দেখি নাই বটে; স্ত্রীলোকের চেহারা বিশ্লেষণ করার মত বুদ্ধি-শুদ্ধি ভগবান্ আমাকে দেন নাই। কেবল টেবুরাণীর চেহারার সমালোচনা মাঝে মাঝে করি; কিন্তু আমার বোধ হয় তাহা পক্ষপাতশূন্য না হইয়া প্রায়শঃ পক্ষপাতপূর্ণই হইয়া পড়ে।

যাহাই হউক, একটু দুষ্টুমি করিয়া বলিলাম, "কই, দাঁত উঁচু তো দেখ্‌লাম না। বেশ তো দেখ্‌তে।"

মুখখানা ঘুরাইয়া টেবু চলিয়া গেল।

আলাপ ক্রমশঃ জমিয়া আসিতেছিল, মিষ্টার দত্ত আলাপী লোক। সন্ধ্যাগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। সমস্ত দিন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা কাযের পর একটু ক্লান্তিনাশের আশায় ক্লাবে আসিতে হয়; কিন্তু মিষ্টার দত্তকে পাওয়ার পর কিছু দিন যাবৎ আমার বৈঠকখানাটিতে আড্ডা বসিতে লাগিল।

বাহিরের ঘরে আমরা বাজি ধরিয়া ব্রীজ খেলি; দাবা ইত্যাদিও মাঝে মাঝে চলে। মিসেস্ দত্ত কিন্তু আমাদেরই অর্দ্ধরক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের মত অন্তঃপুরে গিয়া গল্প করেন।

সে দিন সন্ধ্যায় মিষ্টার দত্তর অনুপস্থিতির জন্য আমাদের আসরটা ভাল জমিল না। সন্ধ্যা হইতেই ঝির্‌ঝির্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খেলা না জমায় এক এক করিয়া সকলেই খসিয়া পড়িলেন। হাতে একটা ফৌজদারি 'কেস' আসিয়াছিল। দু'চারখানি আইন-পুস্তক বাহির করিয়া অপরাধতত্ত্বমূলক ধারাগুলি মিলাইতে বসিলাম।

কেহ না থাকায় টেবু একবার উঁকি মারিয়া ঘরে ঢুকিল। আপনার মনেই বলিল, "তোমাদের খেলা আজ যে সকাল সকালই ভেঙ্গে গেল গো! যাকৃগে, একটু সকাল সকাল খেয়ে নিও। বাবাঃ, একে মাঘ মাস—তার ওপর আবার বৃষ্টি, হাত-পা যেন কালিয়ে দিচ্ছে।"

আমার গায়ে ওভার-কোটের উপর শালখানা চাপাইয়া সে চলিয়া গেল।

কতটুকু তা বলিতে পারি না, কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মৃদু হাস্য-ধ্বনি কাণে যাওয়ায় মুখ তুলিয়া দেখি, সেই দুর্দ্দান্ত শীতে ফুরফুরে পাতলা দামী সিল্কের বস্ত্রাদিতে পরিশোভিত হইয়া একটি লেডিস্ ছাতা মাথায় দিয়া মিসেস্ দত্ত আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত! যেন বিশেষ কি একটা মজা হইয়াছে এইরূপ ভাবে হাসিতেছেন! হঠাৎ টেবুর কথাটা মনে পড়িয়া গেল, "মাগো, দাঁত দুটো কি উঁচু!"

আমার একটা অপবাদ আছে বন্ধুমহলে—আমি নাকি মহিলাদের সঙ্গে সপ্রতিভভাবে কথা বলিতে পারি না। কথাটা ত হয় সত্য; কারণ, এত রাত্রিতে মিসেস্ দত্ত একা উপস্থিত হওয়ায়, আমি নিজেই যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিলাম।

তাহা সত্ত্বেও খুব সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, "এই যে আসুন! কই, আজ মিষ্টার দত্ত এলেন না যে?"

তেমনই হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "তিনি তো আজ বাড়ী নেই। ওঁর সম্পর্কে এক বোনের জন্মোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হ'য়েছে—সেখানে গেছেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি গেলেন না?"

অবহেলার ভঙ্গীতে ওষ্ঠ উল্‌টাইয়া তিনি বলিলেন, "নাঃ, আমি গেলাম না। যেখানে ভাল লাগে না, সেখানে আমি যাই নে।"

দুই চারি সেকেণ্ড পরে, দ্রুত বলিতে লাগিলেন, "আপনাদের বাড়ী আস্‌তে আমার খুব ভাল লাগে। জানেন না, এই রাত্রেও থাক্‌তে পারলাম না—চলে এলাম।"

আর একটু কায করিবার ইচ্ছা ছিল। পেটের দায় বড় দায়!

মিসেস্ দত্তকে বলিলাম, "বেশ করেছেন—এসেছেন, ভেতর ভেতর যান না। গল্প করবার লোক পেলে সবাই খুসী হবেন—" কিন্তু তাঁহার নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। একখানি ডেক-চেয়ারে সুস্থভাবে হাত-পা মেলিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—"এ ছবিটা কে ক'রেছে, আপনার স্ত্রী বুঝি? বাঃ, এ টেবিল-ক্লথটা তো বেশ! ফুলদানী জোড়া দেখ্‌ছি মোরাদাবাদী। কোথা থেকে কিন্‌লেন এটা?"

কেন কি জানি—তাঁহার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিষ্টার দত্ত কখন ফিরবেন?"

তিনি এবারেও সেইরূপ অবজ্ঞার সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কি জানি—কখন।"

পুনরায় তাঁহাকে বলিলাম, "চলুন, ভেতরে চলুন।" কিন্তু তিনি যেন সেকথা শুনিতেই পান নাই এইরূপ ভাবে আমাকে নানাবিধ বাক্যজালে জড়িত করিতে লাগিলেন। কি করি, অগত্যা নিজেই উঠিয়া-পড়িয়া বলিলাম, "আসুন, ভেতরে যাই।"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিতই যেন তিনি বলিলেন, "রাত হয়েছে, আচ্ছা চলুন, টেবুদির সঙ্গে দেখা ক'রেই যাই।"

ভিতর-বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, নীচের তলায় কেহই নাই, কেবল চাকর-দাইগুলা মৃত্তিকার কড়ায় করিয়া আগুন অর্থাৎ বেহারী ভাষায় 'বরুশি' সেঁকিতেছে। আর কড়া তামাকুর দুর্গন্ধ ছড়াইয়া কলরব করিয়া গল্প করিতেছে।

আমাদের দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল, "মাইজী উপরমে গেলেন।"

টুলু, বুকু, তুলতুল—সব কটাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। টেবল লাইটের নীচে একখানি পুস্তক খোলা আছে—সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া বাড়ীর গৃহিণীটি অনন্যমনে সেই দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়াও দেখিলেন না—এমনই অখণ্ড মনোযোগ!

আজকাল এইরূপই হইয়াছে। দুই তিনটি সন্তান-জন্মের সঙ্গে আমি তাহাদের মায়ের কাছে আবশ্যকীয় তৈজস-পত্রের সামিল হইয়া পড়িয়াছি।

তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "ওগো, ইনি এসেছেন।" তবুও টেবুর নিম্নাবনত ক্ষুদ্র মস্তকখানি উর্দ্ধোত্থিত হইল না;

তেমনই অবস্থাতেই বলিল, "এই রাত্রে আবার কিনি এলেন গো!"

আমি যেন লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম। ছি ছি, ভদ্রমহিলা কি মনে করিলেন! এ কি টেবুর দুষ্টুমি নাকি? বড় রাগ হইল। আজ যেন সব রকমে আমায় দুর্গ্রহে ঘেরিয়াছে।

গম্ভীরভাবে বলিলাম, "বই থেকে মুখ তুলে দেখ না কিনি এসেছেন!"

মিসেস্ দত্ত এতক্ষণ সাড়া-শব্দ না দিয়া মিট্-মিট্ করিয়া হাসিতেছিলেন। হঠাৎ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। এতক্ষণে বাটীর গৃহিণীর চমক লাগিল। বিস্মিতকণ্ঠে খাতির করিয়া বলিলেন, "ওমা! মিসেস্ দত্ত যে! কখন এলেন? আসুন, আসুন—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন না। তার পর এত রাত্রে হঠাৎ আমাদের উপর দয়া হ'ল যে! মিষ্টার দত্ত আসেন নি?"

দত্ত মহাশয়া প্রথমে ভিতরে আসিতে চান নাই। এখন দেখি, দিব্য জাঁকিয়া বসিলেন। দুই চারিটি বাক্যালাপের পর সহসাই যেন বিস্মৃত কথা মনে পড়িল, বলিলেন, "টেবুদি, একখান গান করুন, শোনা যাক্?"

মন্দ নয়। টেবুর গান যে শুনিবার মত করিয়া কতদিন শুনি নাই। কিছুদিন তাহাতে আমাতে সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াছিলাম বটে। বড় অর্গানটি সেই সময়ই কেনা হয়। মনে পড়ে, কোর্ট হইতে ফিরিয়া টেবুর দুই একখানি গান না শুনিতে পাইলে, জলখাবার খাইতে ভীষণ আপত্তি করিতাম।

আমি একটু অন্যমনা হইয়া পড়িলাম। একখানি কুঞ্চিত কেশপূর্ণ অমল সুন্দর তরুণ মুখশ্রী মনে জাগিয়া উঠিতেছিল; সে আজ দশ বৎসর আগেকার ছবি!

এখনকার টেবু আর তখনকার টেবুতে পার্থক্য ঠিক যেন ধরি ধরি ধরিতে পারি না গোছ।

পূর্ণযুবতীর স্বামিপ্রেম, এবং মাতৃত্বগর্ব্বপূর্ণ দৃপ্ত দেহভঙ্গীর সহিত কিশোরী বধূটির সরমভরা গুণ্ঠিত কুণ্ঠায় পার্থক্য তো আছে বটেই। মানুষের অতীত জীবনের সুখময় স্মৃতি বড় মধুর বলিয়া মনে হয়!

বর্ত্তমান! তাও মিষ্ট বৈ কি! অকস্মাৎ অর্গানের টিউন-ঝঙ্কারের সহিত সঙ্গীতের স্বরলহরী বাজিয়া উঠিল। দত্ত মহাশয়া গান করিতেছেন—

"আমি বাঁচিয়া বাঁচিয়া মরি নিতি
দাও হে আমারে বাঁচায়ে,
ব্যথার আগুনে জ্বালায়ে জ্বালায়ে
লও হে আমারে যাচায়ে।"

কণ্ঠস্বর যে অত্যন্ত মিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ করা উচিত নয়। পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িয়া নামিয়া গান থামিয়া গেল।

একটু প্রগল্‌ভতা হইয়া গেল বোধ হয়। গৃহিণীকে বলিয়া ফেলিলাম, "তুমি একখানা গাও না!"

সঙ্গীতঝঙ্কারের পরিবর্ত্তে বাক্যঝঙ্কার শুনিলাম, "আহা হা, আর আমার গান শোনে না! মিসেস্ দত্ত, আপনিই ভাই, আর একখানি গান শুনিয়ে দিন, উনি খুসী হবেন—"

মিহিস্বরে হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "রাত হ'য়ে যাচ্ছে যে, ভাই! আপনাদের খাওয়া-দাওয়া আছে। মিছামিছি 'ডিস্টারব্' করা—আচ্ছা, বল্‌ছেন যখন, আর একখানা গাই।"

কিছুক্ষণ ধরিয়া আর একখানি গান হইল।

এবার সত্যই রাত বেশী হইয়া পড়িয়াছিল—প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। দত্ত মহাশয়াকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসা উচিত। সন্ধ্যাবেলায় একা আসিয়াছিলেন, কিন্তু এই রাতে! সেটা আমার কেমন কেমন লাগে। এই জন্যই অনেকে আমায় বলেন কূপমণ্ডুক; তা বলুন!

আমার গাড়ীখানি কয়দিন হইতে বিগ্‌ড়াইয়া বসিয়াছিল। পাচক মিশিরজী এবং জগুয়াকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত পাঠাইলাম।

হঠাৎ টেবু বলিল, "তুমি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেই পারতে।"

কণ্ঠস্বরে যেন ব্যঙ্গের আভাস পাওয়া গেল। বুঝিতে পারিয়াও আমি ভাল মানুষের মত বলিলাম, "তার তো দরকার ছিল না, মিশিরজী জগুয়া দু'জনে তো সঙ্গে গেল।"

৬

প্রায় দুই তিন মাসের পর একটা শনিবারে কোর্ট হইতে ফিরিয়া দেখি, টেবুর খুব জ্বর হইয়াছে। সে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।

অন্য দিন আমি ফিরিলে—নিজে আমার জুতা প্রভৃতি দেয়। সেদিন আর উঠিতে পারিল না। ব্যস্ত

হইয়া বলিল, "ওরে টুলু, দে না ওঁর জামা-জুতো খুলে। নয় তো জগুয়াকে ডাক্ না।"

ডাকিতে কাহাকেও হইল না। টুলুরাণীর সাহায্যে জামা-জুতা খুলিয়া ফেলিলাম—পারুক বা না পারুক, আমার নয় বৎসরের প্রথমা কন্যাটি আমাকে ধরিয়া খানিকটা টানা-হিঁচ্‌ড়া করিল। তাহাকে আদর করিয়া বলিলাম, "বাঃ, টুলু বেশ কায শিখেছিস্ তো।"

সে ভারী খুসী হইয়া নীচে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে তাহার সু-উচ্চ কণ্ঠস্বরের সপ্তগ্রাম শোনা গেল, "ওরে জগুয়া, তুই একটা কিচ্ছু না। আমি তো একলাই বাবার টাই, কোট, জুতো, মোজা স-ব খুলে দিয়ে এলাম। মা'র জ্বর হয়েছে যে। যা তুই ওপরে গিয়ে হাত-পা ধোবার জল তোয়ালে ঠিক ক'রে দিয়ে আয়। ও মিশিরজী, বাবাকে খাবার দিয়ে এস না বাপু! কখন খেয়ে গেছেন—ক্ষিদে পায় না?"

মনে একটা আনন্দ হইতেছিল। নারীজাতি জন্মগৃহিণী, বিশেষ বাঙ্গালী-মেয়ের অবিমিশ্র প্রাণবস্তুটুকু আমাদের দেবপূজার দেশী ফুলগুলির মত সৌরভময় ও কোমল। তবে যদি সংসারের গর-হিসাবে তাহাদের গৃহিণীত্ব ব্যর্থ হইয়া যায় —সে অন্য কথা।

গায়ের উত্তাপ এবং অস্থিরতা দেখিয়া মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। ডাক্তার আনিবার প্রস্তাব করায় গৃহিণী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, "হ্যাঁ, ডাক্তার ডাক্‌তে হবে এখুনি! কেন, তোমার কি তর সইছে না; আমি গেলে আবার—"

আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম। গৃহকর্ত্রীর হুকুমে সম্মুখে বসিয়া জলযোগ সারিতে হইল। শুনিলাম,—"মিসেস্ দত্তর কাল জন্মতিথি গো! আজ দুপুরে এসে বলে গেলেন —কাল যেতে হবে। আমার জ্বর দেখে খুব দুঃখ করতে লাগলেন,—বল্লেন, 'জ্বর কমিয়ে ফেলুন বল্‌ছি'।"

"ঠিকই বলেছেন; তোমার জ্বরটা না কম্‌লে মহা মুস্কিল—"

"কি মুস্কিল? মিসেস্ দত্তর নিমন্ত্রণে যাওয়ার?"

"নিমন্ত্রণ যাওয়ার জন্য আমি খুব একটা কৌতূহল অনুভব করিনে। কিন্তু তোমার অসুখ থাকলে—আমি যেন কেমন হয়ে যাই। সেবার তোমার সেই কলিকের বেদনা দেখে কোর্টে গেছ্‌লাম। অভয় বাবু বল্লেন, 'কি ভাই মুখ শুক্‌নো কেন?' উত্তর দিয়েছিলাম, কলিকের বেদনা। তিনি চম্‌কে উঠে বল্লেন—'তাই নাকি? তবে কোর্টে এলেন কেন?' যেই বল্লাম,—আমার নয়, আমার নয়, বাড়ীতে। এই পর্য্যন্ত যেই বলা হ'য়েছে, বারলাইব্রেরী সুদ্ধ হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো। ঠাট্টা ক'রে আমাকে নাস্তানাবুদ বানিয়ে—বাড়ী পাঠিয়ে—তবে তারা নিশ্চিন্ত হ'ল। তোমার জ্বর দেখে আবার কোন কাযে গেলেই—আবার সেই দুর্দ্দশা হবে।"

আমার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া টেবুর জ্বরাক্রান্ত গণ্ডদেশে যে সুখের—গর্ব্বের লজ্জাজড়িত আরক্ত আভা ফুটিয়া উঠিল,—তাহা আমাকে কিছুকালের জন্য বিমুগ্ধ করিয়া দিল।

তার পরদিনও টেবুর জ্বর ছাড়ে নাই। একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া ঔষধ দিয়া গিয়াছিলেন। রবিবার কোর্টের হাঙ্গামা ছিল না। গৃহিণী অসুস্থ অবস্থাতেই যতটা সম্ভব আমার খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করিয়া বিশ্রামার্থে শয়ন করিবার হুকুম দিয়া—ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

একখানি সোফার উপর শয়ন করিয়া সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে বোধ করি আমারও নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। কারণ, কখন খবরের কাগজখানি মেঝেয় পড়িয়া গিয়াছিল জানিতে পারি নাই। উপরন্তু স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, জব্বর আলি নামক আমার একজন মুসলমান মক্কেল আবক্ষ-প্রলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রুরাজি নাড়িয়া নাড়িয়া ক্রমাগত খোদা-তালার দোহাই দিতেছে, আমিও উত্তেজিতভাবে তাহার সহিত বাদানুবাদ করিতেছি। হঠাৎ 'ওগো শুন্‌ছো' স্বরটা বড় মিষ্ট মনে হইল। একথাও মনে হইল, বুড়া জব্বর আলি কি করিয়া এমন সুকোমল রমণীকণ্ঠ পাইল! আবার, "ওগো শুন্‌ছো, উঠে পড় না!"

এবার তন্দ্রাটুকু সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল। এখন উপলব্ধি করিলাম, টেবু ডাকিয়া দিতেছে, বেলা চারিটায় মিষ্টার দত্তর গৃহে উৎসবে যোগ দিতে হইবে।

কিছু ফুল একটি ভেলভেটের কেসে, রূপা-বাঁধান চিরুণী, ব্রুস আর্শী, সিন্দুরকৌটা প্রভৃতি লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলাম।

আয়োজন ভালই। খুব বড় একখানি ঘরকে ফুল-পাতা দিয়া সাজান হইয়াছে। সমাগত সমবেত নর-নারীর

চিত্র-বিচিত্র পরিচ্ছদাদি, উপহারের দ্রব্যাদি দেখিয়া বড়দিনের কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কথা মনে পড়ে।

আমি কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই উসখুস্ সুরু করিয়া দিলাম। গৃহে গৃহিণী অসুস্থ, এসব গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ কিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

পরিচিতদের সহিত একটু আলাপন এবং অপরিচিতদের সহিত আপ্যায়ন শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

সিঁড়ি হইতে নীচে নামিতেছি, পাশের দিক্ হইতে ছোট একটি দরজা খুলিয়া গেল। দেখি, মিসেস্ দত্ত ডাকিতেছেন, "একবার এ ঘরে আস্‌বেন, মাত্র দু' মিনিট!"

"নিশ্চয়ই, কি বল্‌ছেন?"

ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া, সিল্কের কাপড়-মোড়া কি একটি জিনিষ লইয়া তিনি 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা'র মত আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আপনি ভালবেসে আমায় উপহার দিলেন?"—অত্যন্ত কম্পিত কণ্ঠস্বর!

বলিলাম, "কি আর সামান্য জিনিস—"

"আমার জন্মতিথির দিনে আমিও আপনাকে সামান্য একটি উপহার দিতে চাই, নেবেন?"

মনে হইল, কি উপহার রে বাবা! উপক্রমণিকাটুকু তো মন্দ নয়। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলাম। তবু সাহস দেখাইয়া বলিলাম, "উপহার জিনিসটা সর্ব্বদাই গ্রহণীয়,—যদি উপযুক্ত হয়।"

"তা হ'লে এইটা নিন্।"

আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখি, দত্ত মহাশয়ারই একখানি ফটো-চিত্র! মধ্যস্থলে ছবিটিকে রাখিয়া খুব চওড়া ভেলভেটের বর্ডারে অতি সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকার্য্য করিয়া বাঁধান হইয়াছে।

ছবিখানি লইতে হইল। না লইলে বড় বিশ্রী দেখায়। গৃহে আসিয়া ছবিখানি, গৃহস্বামিনীর দরবারে দাখিল করিলাম।

জ্বরটা ছাড়িয়া গিয়াছিল। টেবু হাসিয়া বলিল, "শুধু ছবি এনে আর কি হ'ল! মূর্ত্তিমতী যে নিজেকেও তোমার করে সমর্পণ করতে এসেছিলেন! নিলে না কেন?"

সকোপে বলিলাম, "ছি! ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে ও কি কথা? এই রকম বুদ্ধি হচ্ছে বুঝি?"

"আচ্ছা, ছবিটা ভাল ক'রে দেখ তো।"

দেখিলাম, ফুল লতা-পাতার ভিতর অতি পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট অক্ষরে লেখা আছে—"রিমেম্বার মি"; "ফরগেট্ মি নট; য়ো-রিভোয়া; সুহাস!" চারিটি কোণে—চারটি লিখন!

টেবু বলিতে লাগিল, "বিশেষ লোকটিকে বিশেষ ছবিখানি, বিশেষ ক'রে মনে রাখবার জন্য, বিশেষ ক'রে ফিরে যাওয়ার জন্য, বিশেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে। মনে রেখ; ভুল না—ফিরে দেখা করো; আর দেখ যেন মিসেস্ দত্ত বলো না—কেবল মাত্র সুহাস!"

"কি বক্‌ছো টেবু, পাগলের মত! মাথা খারাপ হ'ল না কি?"

বঙ্কিম হাসিয়া টেবু বলিল, "না, আমার মাথা তো ঠিকই আছে। দেখো, তোমার যেন মাথা খারাপ না হয়।"

টেবু হাসিতেছিল বটে, কিন্তু অমলিন আকাশে মেঘ সঞ্চার হইয়াছে। সে ঐ ছবি দেওয়ার ব্যাপারটি পছন্দ করে নাই। আমিও বুঝিয়াছিলাম—ছবিখানি দেওয়ার পশ্চাতে একটু ছলনা লুকান ছিল!

তা থাকুক্—আমার টেবু আছে, আমার টুলু, বুকু, তুলু—আমি কি খোকা!

কিছু দিন হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর শরীর ভয়ানক অসুস্থ; কন্যাকে দেখিবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এখানে কন্যাও মাতার পীড়ার সংবাদে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। ফলতঃ আমার নিজের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া টেবুকে কিছু দিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইবে!

টেবুর অবস্থা ঠিক সাপে ছুঁচোধরার মত! পাঁচ ছয় দিন আগে হইতে, উনকোটি চৌষট্টি গুছাইতেছে।

"ওগো, এই জারগুলোতে আচার রইলো, সব রকম। যেটা খাবে ঠাকুরের কাছে চেয়ে নিও। ঠাকুর! বাবুকে খাওয়ার পাতে আচার দিতে ভুল-না যেন!"

"ওগো—মাংস-টাংস যেদিন যা খাবার ইচ্ছে হ'বে ঠাকুরকে ব'লে করিয়ে নিও, বাপু! ঠাকুর,—বাবুকে রোজ জিজ্ঞেস ক'রে নিও বাবা!"

"ওগো—কোর্ট থেকে ফিরে জল খেও কিন্তু রোজ;

কাযের ঠেলায় যেন ভুলে যেও না, বুঝ্‌লে ? তোমার আবার যে ভুলো মন !"

"ওগো—দাই যেন বিছানা-টিছানাগুলো রোদে দেয় ; ঝেড়ে-ঝুড়ে দেয়—দেখো।"

"লছমনিয়া—বিছানা-টিছানাগুলো দেখা-শোনা করিস্ বাছা ! বাবুর খাওয়া-দাওয়ার তুইও একটু দেখা শোনা করিস্ ; আর বলাই বেশী, তুই তো আজকের দাই ন'স্।"

এমনই কত অসংখ্য উপদেশ দিয়া ম্লানমুখে সে গাড়ীতে উঠিল। আমার শ্যালক তাহার রকম দেখিয়া বলিল, "তোর মনটা দেখ্‌ছি এখানেই পড়ে থাক্‌বে, টেবু !"

কর্ম্মাবসানে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াই। টেবু নাই, ছেলেরা নাই ! নাঃ, পারা যায় না। কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, ছাড়িয়া থাকা দায় !

পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটা তিথি হইবে—ছাদে আসিয়া বসিয়াছিলাম। কবিত্বশক্তি থাকিলে সেদিন নিশ্চয়ই আমি একটা ভাল কবিতা লিখিয়া ফেলিতাম।

ছাদের একাংশ জুড়িয়া নানা প্রকার টবে—নানা জাতীয় ফুলগাছ লাগান ছিল। দুই চারিটি ফুল ফুটিয়াছিল। বেশ একটা মিষ্ট গন্ধ আসিতেছিল ; গাছগুলি—টেবুর একান্ত নিজস্ব। তাহারই তদ্বিরে এগুলি বাঁচিয়া আছে।

অতীতের অনেক কথাই মনে আসিতেছিল। এমনই জ্যোৎস্না রাতে টেবু ছাদ হইতে নড়িতে চাহিত না।

উন্মনা হইয়া ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, জগুয়া আসিয়া একখানা চিরকুট হাতে দিল। মিসেস্ দত্ত লিখিয়াছেন, "এখুনি আমার দয়া করিয়া তাঁর এখানে আসুন—মিষ্টার দত্ত ভয়ানক অসুস্থ !"

পাচক মিশিরজী পাকা লোক, তাহাকে লইয়া চলিলাম, যদি কোন আবশ্যক হয়।

কিন্তু মিষ্টার দত্তর অবস্থা দেখিয়া, ভয়ে বিস্ময়ে যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল ! চোখ দুইটি ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছে ! মুখ দিয়া অজস্র ফেন নির্গত হইতেছে ! এ কি ব্যাপার ?

কোন প্রশ্ন না করিয়া তাড়াতাড়ি মিশিরজীকে পাঠাইয়া দিলাম ডাক্তার আনিবার জন্য !

তার পর মিষ্টার দত্তর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ডাকিলাম, "মনতোষ বাবু, মিষ্টার দত্ত !"—কোন উত্তর পাওয়া গেল না !

মিসেস্ দত্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখন থেকে এ রকম অবস্থা হয়েছে ?"

অশ্রুধারায় ভাসিতে ভাসিতে তিনি উত্তর দিলেন, "প্রায় আধ ঘণ্টা তিন কোয়াটার হবে উনি বাড়ী এসে শুয়ে পড়েন, তার পর ঘরে ঢুকে আমি ওঁকে এই অবস্থায় দেখ্‌তে পাই। অনেক ক'রে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কিছু জবাব না দিয়ে একবার কেবল আপনাকে ডাকৃতে পাঠাতে ব'লেছিলেন।"

হঠাৎ দত্ত মহাশয় চতুর্দ্দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন ; পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কষ্ট হচ্ছে বলুন তো ?"

অতি কষ্টে, ভয়ানক কষ্টে, জড়িত স্বরে বলিলেন, "আপনি এসেছেন—মিঃ মুখার্জ্জী,—আমি—আমি বিষ খেয়েছি।"

এই সন্দেহই হইতেছিল আমার। তবুও, "বিষ খেয়েছি" কথাটা কাণে যাওয়া মাত্র মাথাটা যেন হঠাৎ ঘুরিয়া উঠিল। কে যেন অতি উচ্চস্থান হইতে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে ! নিজেকে সামলাইবার পর বলিলাম, "বিষ খেলেন কেন, মিষ্টার দত্ত ?" তখনও জ্ঞান ছিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় অত্যন্ত কষ্টকর মর্ম্মান্তিকভাবে বলিলেন, "দেনা ! দেনা ! দেনার জ্বালায় খেলাম, মিষ্টার মুখার্জ্জী···নিজে ইচ্ছা ক'রে খেয়েছি, কারুর কোন দোষ নেই,—সুহাস রইলো, ওকে—ওকে—আপনারা দেখ্‌বেন—"

দুই জন ডাক্তার আসিয়া পড়িলেন। নানারূপ পরীক্ষার পর তাঁহারা উভয়েই বলিলেন, "এখন আর বৃথা চেষ্টা—অনর্থক ওঁকে কষ্ট দেওয়া।"

আর বিশেষ কিছু করা হইল না। ভয়ানক কষ্টভোগ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনের অবসান হইল।

দত্ত মহাশয় তো গেলেনই, কিন্তু আমার যে কি হইল—তা নিজেই বুঝিতে পারি না। একটা ভারাক্রান্ত নিশ্বাস যেন সর্ব্বদা বুকের ভিতর আবদ্ধ হইয়া আছে।

কাছে স্ত্রী নাই, কন্যা-পুত্র নাই, কি করি আমি !

শোকার্ত্তা মিসেস্ দত্ত সর্ব্বদাই আসেন, তাঁহাকে কিছু বলিতে পারি না।

পশ্চিমাঞ্চল হইলেও এখানে বাঙ্গালীটোলা আছে, এবং বাঙ্গালীও বহুৎ আছেন। অতএব জাত-ভায়ের চর্চ্চা—যাহাকে আপনারা পরচর্চ্চা বলেন, সেই অমৃত-আস্বাদনের ইচ্ছা বঙ্গদেশের কোন পল্লীগ্রামবাসিগণের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম বলিয়া মনে হয় না!

দত্ত মহাশয়ার যখন-তখন আমার এখানে আসা লইয়া ইতিমধ্যেই শ্রুতিসুখকর মৃদুগুঞ্জন আরম্ভ হইয়াছে; তাহা অতি সাবধানে উচ্চারিত হইয়া আমারও কর্ণকুহরে একটু আধটু প্রবেশ করিতেছে।

অতএব কিংকর্ত্তব্যম্? তাড়াতাড়ি টেবুকে সব খুলিয়া পত্রে লিখিয়া দিলাম, "শীঘ্র এস গো, বিপদ হইতে উদ্ধার কর—আমাকে বাঁচাও!"

শুনিতেছি, কে এক আত্মীয় যুবক আসিয়াছে। দত্ত মহাশয়া এখান হইতে শীঘ্র পাততাড়ি গুটাইবেন এইরূপ আশা হয়!

কয়দিন হইতে মকর্দ্দমার কোন বালাই নাই। কায-কর্ম্ম নাই বলিলেই হয়। সন্ধ্যা হইতে বসিয়া নিজের করুণ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছি—এহেন সময় যাঁহাকে আমি ডরাই, সহসা সেই দেবীটির আবির্ভাব ঘটিল—আমারই সম্মুখে!

অতি ধীরভাবে তিনি একখানি চেয়ার দখল করিলেন, এবং অত্যন্ত দরদভরা স্বরে 'আমি কেমন আছি' প্রশ্ন করিলেন। আমাকেও উত্তর দিতে হইল বৈ কি! দুই চারিটি কথার আদান-প্রদান ঘটিয়াছে মাত্র, এমন সময় কি যে হইল—!

মিসেস্ দত্ত করুণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জল—জল—জল দিন, মিষ্টার মুখার্জ্জি, বুক গেল!"

হায় হায়, একি বিপদ! চোখ বুজিয়া একেবারে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িলেন যে!

ঘরেই জলের কুঁজা ও গ্লাস; খুব ক্ষিপ্রভাবে চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিলাম!

অল্পমাত্র পরে চোখ খুলিয়া "আঃ" বলিয়া গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু সুস্থ বোধ করছেন কি, মিসেস্ দত্ত?"

সে কথার উত্তর না দিয়া তিনি আমার ডান হাতখানি টানিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন! সহজাত-সংস্কারবশে হাত টানিয়া লইয়া বলিলাম, "এমন কেন করছেন?"

আবার সেইরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ছাড়বেন না, মিষ্টার মুখার্জ্জী, আমাকে ছাড়বেন না। আপনাকে ছেড়ে যেতে পারবো না আমি—তা হ'লে বাঁচ্‌বো না—"

প্রেতাবিষ্টের মত আচ্ছন্ন হইয়া শুনিয়া যাইতেছিলাম।

অকস্মাৎ অতিপ্রিয় অতি মিষ্টকণ্ঠে বলিতে শুনিলাম, "না, না, ছাড়বেন কেন? টাই বাঁধবার বদলে আপনাকেই গলায় বেঁধে কাল থেকে ওঁকে কোর্টে পাঠাব'খন! আজ আর কেন? ওঁকে মুক্তি দিয়ে আপাততঃ বাড়ী যান!"

টেবু আসিয়াছে! টেবু! সেই তো আমার সম্মুখে আসিল। হাত ধরিয়া মিষ্ট হাসিয়া বলিল, "আমি গো আমি,—পেতনী নই, শাঁকচুন্নী নই, তোমার টেবু; তোমাকে অবাক্ ক'রে দেব ব'লে চুপি চুপি এসে নিজেই অবাক্ হচ্ছিলাম।"

শ্রীমতী লীলাদেবী গঙ্গোপাধ্যায়।

সমালোচনা

বাবুইয়ের নীড় হেরি কহিলেন কাক—
হেন কীর্ত্তি আছে কিবা এরি এত জাঁক!
ছোট পাখী, লোকে তাই যশ গায় পিছে,
আশ্-পাশ্ ঢাকা সব, দ্বার কেন নীচে?
আলো যেতো ভালো, হ'লে উপরেতে ওটা;
বলে কবি, আরও যেতো বরষার ফোঁটা।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়

বার্ণিসের দেশীয় উপাদান

সভ্যতা-বিস্তারের সহিত এমন কতকগুলি দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছে যে, তাহাদের সহিত গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বন্ধ না থাকিলেও সেগুলি উন্নত মানবসমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রং, বার্ণিস, পালিশ ইত্যাদি এইরূপ দ্রব্যের পর্য্যায়ভুক্ত। গৃহ, গৃহসজ্জা, যানবাহন ও নানাবিধ নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুতে বার্ণিশ আবশ্যক হয়। এক রেল গাড়ীর কামরা তৈয়ারী করিতে কি বিপুল পরিমাণ বার্ণিস দরকার! তদ্ভিন্ন মোটর, জাহাজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রকার যান এবং ইমারৎ, পূর্ত্তকার্য্য, আসবাব ইত্যাদির ত কথাই নাই। বার্ণিস ও রং যে এই সমস্ত দ্রব্যের সৌন্দর্য্যমাত্র সম্পাদন করে তাহা নহে, জল-হাওয়ার ক্রিয়া প্রতিরোধ করার শক্তি থাকায় ইহাদের দ্বারা দ্রব্যাদির স্থায়িত্বগুণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলতঃ শিল্প, বাণিজ্য ও জীবনযাপনধারার উন্নতির সহিত বার্ণিসের চাহিদা জগৎময় শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং ভারতেও যে ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় বার্ণিসের কাটতি হইতেছে, বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমবর্দ্ধমান বার্ণিসের কারখানাসমূহ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বার্ণিস প্রস্তুতরূপ একটি অপেক্ষাকৃত নূতন শিল্প যে দেশমধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা সুখের বিষয়; কিন্তু ইহা আরও সুখের বিষয় হইত যদি ইহার উপাদানসমূহ দেশীয় স্বভাবজ পদার্থভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত হইত। ভারতের কানন-কান্তারে বার্ণিস প্রস্তুতোপযোগী দ্রব্যের অভাব নাই; কিন্তু তন্মধ্যে অনেকগুলিই অনাদরে নষ্ট হইতেছে, এবং সেই স্থলে বিদেশ হইতে আমদানী করা মাল-মশলা ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যখন এতদ্দেশে সর্ব্ববিষয়ে জাগরণ আরম্ভ হইয়াছে, তখন বার্ণিস প্রস্তুতের ন্যায় একটি বড় শিল্পে যথাসম্ভব দেশীয় উপাদান ব্যবহার অবশ্য করণীয়।

ভারতে তার্পিণ উৎপাদন

অধিকাংশ বার্ণিসের উপাদানকে দ্রব অবস্থায় পরিণত করে বলিয়া তার্পিণ বার্ণিস-শিল্পে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও আমাদিগের দেশে ব্যবহৃত সমস্ত তার্পিণই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। পাইন্ অথবা সরল তরুর নির্য্যাস হইতে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হয়। পাইন হিমালয়ের নানা অঞ্চলে সুলভ; ইহার চিড় নামক একটি জাতি উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের খুব সাধারণ বৃক্ষ। চিড় গাছের গায়ে দাগ দিয়া বহিষ্কৃত নির্য্যাস বহু কাল হইতে বাজারে গন্ধবিরোজা নামে পরিচিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে তার্পিণ ও রজন উৎপাদনের সম্ভাব্যতার উপর পূর্ব্বে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গন্ধবিরোজা হইতে তার্পিণ তৈয়ারীর প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়, এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহা ফলবতী হওয়ায় দেশমধ্যে তার্পিণ-শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এই সফলতার মূলে ছিল প্রধানতঃ তদানীন্তন ভারতীয় বন-বিভাগের রসায়নতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় সর্দ্দার পুরণ সিংহের ফলিত রসায়ন-বিষয়ক অসামান্য জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতা। তিনিই ভাওয়ালীর আদি কারখানায় প্রদর্শন করেন যে, ব্যবসায়িক হিসাবে ভারতে তার্পিণ উৎপাদন সম্ভবপর। সে যাহাই হউক, পঞ্চনদে জাল্লো এবং যুক্তপ্রদেশে বেরিলী কারখানায় এখন যথেষ্ট পরিমাণে তার্পিণ ও রজন প্রস্তুত হইতেছে, এবং দেশের অভাব পূরণ করিয়াও কতক পরিমাণে বিদেশে চালান যাইতেছে। কাশ্মীররাজ্যমধ্যে অবস্থিত জম্মুর দুইটি কারখানাও তার্পিণ উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছে। তথাপি ইহা বলিতে পারা যায় না যে,

ভারতের তার্পিণ উৎপাদনোপযোগী কাঁচা মালের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইতেছে। যে সকল সরল তরু হইতে এখন নির্য্যাস সংগৃহীত হইতেছে না, তাহাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক চিড় গাছই বৃটিশ-শাসিত ভারতে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে ৮ লক্ষ একর পরিমিত ভূমি অধিকার করে। সমস্ত ভারতে অন্যূন ১৫ লক্ষ গ্যালন তার্পিণ এবং ৪ লক্ষ হন্দর রজন উৎপাদিত হইতে পারে। সেই স্থলে এখন মাত্র ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৪ শত ৭২ গ্যালন তার্পিণ ও ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭ শত ৩৩ হন্দর রজন উৎপাদিত হইতেছে; তন্মধ্যে যথাক্রমে ১২ হাজার ৮ শত ১২ ও ১৩ হাজার ১ শত ২ হন্দর রজন ও তার্পিণ বিদেশে চালান যায়। ইহা ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দৃষ্ট হয়; তৎপরবর্ত্তী সময়ে ইহার সামান্যই ইতর-বিশেষ হইয়াছে। বস্তুতঃ, দেশীয় তার্পিণ-শিল্প প্রসারের যে প্রচুর অবসর রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আঠা ও অন্যবিধ নির্য্যাস

অনেক বৃক্ষ হইতে স্বভাবতঃ কিম্বা কোন প্রকারে ক্ষত উৎপাদিত হইলে সেই ক্ষত দিয়া রস নির্গত হয় এবং পরে জমিয়া গিয়া আঠাবৎ কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ইহা কেবল মাত্র আঠা (Gum); আবার অন্য স্থলে ইহার সহিত তৈল ও অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে (Gumresin)। শেষোক্ত প্রকার নির্য্যাসই তার্পিণ প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী। ভারতের বিশাল অরণ্যসমূহে এরূপ বহু তরুগুল্মাদি রহিয়াছে, যাহাদিগের নির্য্যাস বার্ণিসের কার্য্যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বন-বিভাগ কর্ত্তৃক এই প্রকার দ্রব্য বনের গৌণ ফসল-(Minor forest products) রূপে পরিগণিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এগুলি অত্যন্ত উপেক্ষিত হইত। এখন বন-বিভাগসমূহে কাষ্ঠ ব্যতীত অপরাপর বন-ফসল সদ্ব্যবহারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী (utilisation officer) নিযুক্ত হওয়ায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং নির্য্যাস বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। তবুও ভারতীয় বৃক্ষাদির নির্য্যাস সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে অনুসন্ধান হয় নাই, এবং বিভিন্ন শিল্পে তৎসমুদয় প্রয়োগের উপযোগিতাও সাধারণের গোচরীভূত করা হয় নাই। স্থানীয় ব্যবহার অথবা উদ্যমশীল ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক ব্যবসায়ে অল্প মাত্রায় প্রবর্ত্তন হইতে জানিতে পারা যায় যে, কতিপয় বৃক্ষনির্য্যাস বার্ণিসের উপাদানরূপে আদৃত হইতে পারে। নিম্নে সেইরূপ কয়েকটি নির্য্যাসের আলোচনা করা যাইতেছে।

স্বাভাবিক বার্ণিস

কোন কোন গাছের কাণ্ডে দাগ দিলে তাল বা খেজুরের রসের ন্যায় রস নির্গত হয় এবং উহা কোন দ্রব্যের উপর মাখাইয়া দিলে এমন একটি পর্দ্দা পড়িয়া যায়—যাহা জল ও বায়ুর প্রতিক্রিয়া সহ্য করিতে সমর্থ। নিম্নে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:—

লাক্কার (Rhus succedena): হিমালয়ের পাদদেশস্থ অরণ্যসমূহে, পঞ্চনদ হইতে আসামের খাসিয়া পাহাড় পর্য্যন্ত অনেক স্থানে ইহার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ কাঁকড়াশৃঙ্গী এই গাছ হইতেও সংগৃহীত হয়, যদিও প্রকৃত কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহার সমবর্গীয় অন্য তরুজাত। দাগ দিলে ইহার কাণ্ড হইতে যে রস নির্গত হয়, তাহা কাল বার্ণিসের কায করে। জাপানের প্রসিদ্ধ বার্ণিস-বৃক্ষ ইহারই সমগণীয় এবং ইহাকেও বন্য বার্ণিস-তরু (Wild varnish tree) বলা হয়। আপাততঃ ইহার রস কচিৎ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

জিউলী (Odina wodier): এই মধ্যমাকার তরুও ভারতের নানা স্থানে সুলভ। ইহার আঠা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন; বাবলার গঁদের সহিত ইহা অনেক সময় ভেজাল থাকে। চূণকাম স্থায়ী করিবার জন্য এবং কাপড় ও কাগজে মাড় দিতে ইহার কতক পরিমাণ ব্যবহার আছে। বার্ণিস-উপাদানের মধ্যে ইহা এখন তেমন স্থান পায় নাই, যদিও মোটা ও সস্তা বার্ণিসের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

পিয়াল (Buchanania latifolia): যুক্তপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও সাধারণতঃ শুষ্কতর ও উষ্ণতর অঞ্চলে পিয়াল গাছ সমধিক সংখ্যায় জন্মিয়া থাকে। বাদামের ন্যায় স্বাদযুক্ত, চিরঞ্জি নামে পরিচিত ইহার ফল-শাঁস আরণ্য জাতিগণ খাদ্যের জন্য আহরণ করে। পিয়াল-কাণ্ড ও ফলের রস স্বাভাবিক বার্ণিস। কোন কোন স্থানে সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও পিয়াল-রস ব্যবসায়িক মাত্রায় সংগ্রহ ও বার্ণিশে প্রয়োগের চেষ্টা কুত্রাপি দেখা যায় না।

ভেলা (Semecarpus anacardium): কাপড়ে ছাপ দেওয়ার কালি ইহা হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইংরাজিতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Marking Nut। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে ইহার দুইটি জাতি রহিয়াছে। উভয় জাতিরই কাণ্ডে দাগ দিলে প্রচুর রস পাওয়া যায়; উহার দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ বার্ণিস প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহাকে নাড়াচাড়া করিতে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক; কারণ, এই রস এত দাহক যে, চর্ম্মোপরি ফোস্কা উৎপাদন করে

এ স্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, উপরি-উক্ত কয়েকটি বৃক্ষই আম্র-বর্গের (Anacardiaceae) অন্তর্গত। উক্ত বর্গের অনেক গাছ হইতেই গঁদ ও রঞ্জন-মিশ্রিত আঠা পাওয়া যায় এবং কোন কোন স্থলে দাগ দিলেও অস্বচ্ছ, চট্‌চটে রস নির্গত হয়। আম্রবর্গীয় বৃক্ষরসের বার্ণিসও সমপ্রকার শিল্পে প্রয়োগ যে সম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষা আবশ্যক।

তৈলপ্রধান নির্য্যাস

সাধারণতঃ এই প্রকার নির্য্যাসকে তৈল বলা হইয়া থাকে, কিন্তু এগুলি প্রকৃতপক্ষে রঞ্জন-মিশ্রিত তৈল (oleo-resin)। এই শ্রেণীর বার্ণিস-উপাদানের মধ্যেও আবার একটি আম্রবর্গীয় নির্য্যাসই প্রধান, উহার নাম খেউ বা খির্টাস এবং উহা Melanorrhoea usitata নামক বৃক্ষ হইতে পাওয়া যায়। এই তরুজাতি আসামের মণিপুর অঞ্চল হইতে ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া শ্যাম পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ Lacquer-এর কাযে অনেক দিন হইতে ইহার চলন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আসামে ইহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। গাছের গায়ে ইংরেজি V সদৃশ দাগ দিয়া বর্ষাকালে রস সংগৃহীত হয়; এবং নিয়মিতভাবে কার্য্য করিলে এক ব্যক্তি এক মরসুমে প্রায় ২ মণ রস সংগ্রহ করিতে পারে। কেবল বিশুদ্ধ রসই সাক্ষাৎভাবে দ্রব্যাদির উপর লাগাইতে পারা যায়; আবশ্যক হইলে উহার সহিত রং-ও মিশ্রিত করিয়া লওয়া চলে।

সমবর্গীয় না হইলেও গর্জ্জন খেউর মত সমপ্রকারের নির্য্যাস প্রদান করে। গর্জ্জনের ন্যায় উচ্চ মহীরুহ ভারতের বনসমূহে বিরল। ২ শত ফুট উচ্চ ও ১৫ ফুট বেড়যুক্ত গর্জ্জন গাছ অসাধারণ নহে। শীতের শেষভাগ হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত গাছে দাগ দিয়া বৃক্ষ-প্রতি অন্যূন ৩ মণ রস পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও আসামে কাছাড় প্রভৃতি স্থানে এই নির্য্যাস সংগৃহীত হইয়া থাকে, এবং ব্রহ্মদেশ হইতেও কলিকাতায় সমধিক পরিমাণে আমদানী হয়। বাজারে তিন প্রকার গর্জ্জন-তৈল দেখা যায়, যথা—মলিন-পীত, রক্তবর্ণ, ও রক্তাভ ধূসরবর্ণ। কিছুদিন রাখিয়া দিলে তৈলে দুইটি স্তর দেখা দেয়; ঊর্দ্ধ স্তর গাঢ়-ধূসর এবং নিম্ন স্তর অপরিষ্কার শ্বেতাভ। নীচের স্তর অনেকে অব্যব-হার্য্য মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, উভয় স্তরই সমগুণ-সম্পন্ন। গৃহ ও জলযানাদি রং ও বার্ণিস করিতে গর্জ্জনের ব্যবহার আছে, কিন্তু বার্ণিস-শিল্পে ইহার আরও অধিক প্রসার বাঞ্ছনীয়। গর্জ্জনতৈল লিথোগ্রাফির কালি তৈয়ারীর পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। গর্জ্জনতৈল সামান্য পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। উপযুক্তরূপে প্রচার করিতে পারিলে বিলাতী বাজারে ইহার আরও অধিক কাটতি হওয়া সম্ভবপর।

কঠিন নির্য্যাস

উৎকৃষ্ট বার্ণিসে ব্যবহৃত কতকগুলি নির্য্যাস সচরাচর কঠিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি আছে—সেগুলি পুরাকালের বৃক্ষপ্রসূত; মৃত্তিকাগর্ভ হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়—যথা, অম্বর (Amber) ও কৌড়ী (Kauri) গঁদ। এই সমুদয় কঠিন নির্য্যাসের সাধারণ নাম কোপাল (copal)। অনেক নির্য্যাসই তার্পিণ অথবা সুরাসার, মেথিলেটেড্ স্পিরিটে দ্রবণীয়। কিন্তু কয়েক প্রকার কোপালকে প্রথমতঃ সমধিক উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া না লইলে তাহারা প্রয়োজনানুরূপ তরল হয় না। বার্ণিস প্রস্তুতকারকগণ কার্য্যের সুবিধার জন্য নির্য্যাসসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা,—তৈলে দ্রবণীয়, সুরাসারে (স্পিরিটে) দ্রবণীয় ও বিশেষ প্রকার দ্রাবণে (solvent) দ্রবণীয়।

যে সকল কোপালশ্রেণীর নির্য্যাস প্রায়শঃ বার্ণিসে ব্যবহৃত হয়, সে সমুদয় পৃথিবীর নানা স্থান হইতে আসে; তন্মধ্যে ব্যবসায়ে নিম্নলিখিতগুলির প্রাধান্য অধিক :— আফ্রিকার Animi এবং আরও ২।৩ প্রকার কোপাল;

আমেরিকার ব্রেজিল ও অষ্ট্রেলিয়ার কৌড়ী ; ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ম্যানিলা ; এবং য়ুরোপীয় ও মার্কিণী অম্বর। এই সমুদয় বিদেশীয় নির্য্যাসের স্থানে দেশীয় কোপাল-শ্রেণীর নির্য্যাস দরজা, জানালা প্রভৃতি রং করিবার জন্য ব্যবহার করিলে মসৃণতা অল্প হয় না— কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেগুলিকে বাজারে বিস্তৃতভাবে চালাইবার জন্য তেমন চেষ্টা দেখা যায় না। ইহা সত্য যে, রীতিমত চাহিদার অভাবেই এগুলি সব সময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই জন্যই কাহারও কাহারও দেশীয় কোপালের অপকর্ষতা বিষয়ক ধারণা জন্মিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহা কোপালের দোষ নয়, সংগ্রহকারক ও প্রস্তুতকারকের দোষ। ভারতের অনেক কাঁচা মালের ন্যায় নির্য্যাসেও অনেক অবান্তর পদার্থ দৃষ্ট হয় ; কতকগুলি যে ইচ্ছা করিয়া মিশান না হয়, তাহা নহে। খাঁটি নির্য্যাসের চাহিদা বাড়িলে এবং তাহার উপযুক্ত মূল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইলে সংগ্রহকারিগণ সতর্কতা অবলম্বন করিবে ও সুপরিষ্কৃত নির্য্যাসও যে বাজারে আসিতে আরম্ভ করিবে, তাহা আশা করিতে পারা যায়। তাহা হইলে ভারতীয় কোপাল-শ্রেণীর নির্য্যাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাও পরিত্যক্ত হইবে।

এ স্থলে আমরা বিশেষ ভাবে তিন প্রকার ভারতীয় কোপালের উল্লেখ করিতেছি; ইহাদিগকে দামারও (Dammar) বলা হয়। এগুলি যে বাজারে একবারে অপরিচিত, তাহা নহে; কিন্তু ইহাদের ব্যবহার প্রায়ই স্থানীয়। সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এগুলি এখনও জগতের বাজারে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু উপযুক্ত রূপ প্রচার হইলে এগুলি যে অনেক প্রতিপত্তি-সম্পন্ন বিদেশীয় কোপালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

কারুবা (Vateria indica): ইহার অন্য নাম White Dammar বা Piney resin। কারুবা গাছ ভারতের দক্ষিণাংশে কানাড়া, মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে সুলভ। তথায় লোকে এই নির্য্যাস হইতে ধূপ প্রস্তুত করে ও জলযানাদির পালিশে প্রয়োগ করে। নারিকেল-তৈল সহযোগে ইহা হইতে যে বাতি প্রস্তুত হয়, তাহার আলোক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। কাণ্ডনিঃসৃত টাটকা রসের বার্ণিসরূপে স্থানীয় ব্যবহার বহু কাল হইতে চলিয়া আসি-তেছে। কঠিনীভূত নির্য্যাসের বর্ণ বয়স অনুসারে হরিতাভ হইতে গাঢ় অম্বরবর্ণ হইয়া থাকে। উত্তপ্ত সুরাসার ও কর্পূরের সহিত মিশ্রিত হইলে ইহা হইতে যে বার্ণিস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বচ্ছ ; মানচিত্র বা সমপ্রকারের দ্রব্যে লাগাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। এরূপ বার্ণিস আরও সস্তা দরে প্রস্তুত করিতে হইলে উপাদান পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ৫ সের তার্পিণ, সওয়া সের রুমি মস্তকী ও অর্দ্ধসের কারুবা, এইরূপ মাত্রায় মিশ্রিত করিলে চলে। মসিনার তৈলের সহিত কারুবা ফুটাইয়া আসবাবাদির জন্য উৎকৃষ্ট বার্ণিস তৈয়ারী করা যায়। বস্তুতঃ, কারুবা-নির্য্যাস বার্ণিস প্রস্তুতের একটি মূল্যবান্ উপাদান। এখন বাজারে ইহার যৎসামান্য চলন আছে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহার কাট্তি অনেক পরিমাণে বাড়িতে পারে।

ঠিঙ্গন—(Hopea odorata): ইহাকে Yellow Dammar বা Rock Dammarও বলা হয়। ভারতের ভিতরে না হইলেও আন্দামান দ্বীপের বিশাল অরণ্যে ঠিঙ্গন গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ঠিঙ্গন বৃহদা-কার তরু, তাহার কাণ্ডে আঁচড় দিলে ইহার নির্য্যাস প্রচুর মাত্রায় সংগৃহীত হইতে পারে। আপাততঃ নিম্নব্রহ্মে ইহা কতক পরিমাণে সংগৃহীত হয় ; কিন্তু তাহার অধিকাংশই স্থানীয় ব্যবহারে লাগে, সামান্যই বাহিরে চালান যায়। উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা হইতে বার্ণিস প্রস্তুত করিলে উহা যে বিদেশীয় কোপালজাত বার্ণিসের সমকক্ষ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কালাদামার—(Canarium Spp): অন্য নাম Black Dammar. Canarium গণভুক্ত নয়টি জাতি ভারতের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রায় সকলগুলি হইতেই নির্য্যাস পাওয়া যায়; কিন্তু বার্ণিসের নির্য্যাস হিসাবে ভারতের পশ্চিমাংশে, কঙ্কণের দক্ষিণাংশের অরণ্যসমূহে প্রাপ্ত, মান্দা ধূপ নামে পরিচিত C, Strictum নির্য্যাসই বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এই গাছের গোড়ায় আগুন জ্বালাইয়া ও কাণ্ডে আঁচড় দিয়া নির্য্যাস সংগৃহীত হয়। নির্য্যাসখণ্ডসমূহ গাঢ় ধূসর বর্ণ বা কৃষ্ণাভ। কোন কোন প্রকার আফ্রিকাজাত কোপালের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে, এবং গুণ-

সমপ্রকার। জলযান পালিশে ও সুগন্ধরূপে ইহার কতক পরিমাণে স্থানীয় ব্যবহার আছে। বার্ণিসের উপাদানস্বরূপ কালাদামারের সমধিক প্রচার হওয়া আবশ্যক। মসিনার তৈল ও তার্পিণ সহযোগে ইহা হইতে নানা প্রকারের সুলভ বার্ণিস প্রস্তুত হইতে পারে। উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামে C. bengaleuse ও C. resinifera নামক দুইটি বৃক্ষও সুগন্ধ নির্য্যাস প্রদান করে। দার্জ্জিলিংএ সময় সময় ইহা গোকুল ধূপ নামে বিক্রয় হয়। এগুলিরও বার্ণিস প্রস্তুত দ্বারা সদ্ব্যবহার করিতে পারা যায়।

গালা ও ধুনা উভয়ই বার্ণিসের উপাদান এবং উভয়ই ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়; সিঙ্গাপুর হইতেও কতক পরিমাণে ধুনা আমদানী হয়। বার্ণিস প্রস্তুতে ইহাদের ব্যবহার সুপরিচিত।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

বসন্ত

বহু দিনের আকুল চাওয়া
দখিণ-হাওয়া আস্‌ল এবার,
এল বসন্ত বনে বনে—কই
মনে বসন্ত এল না ত আর?
বনের কোকিল ডাকিতেছে কুহু,—
মনের কোকিল বলে শুধু উহু,
মুহুমুহু হেরি শকুন্তলা—সে
দুর্ব্বাসা শাপ শিরেতে ধরে;
বাংলার বুকে কোথা বসন্ত?
চির-হিম ঋতু বিরাজ করে।

দুঃখ দৈন্য ঘরে ঘরে আজি
অনলের সম উঠিছে জ্বলি,
মঞ্জরী ফোটে শাখায় শাখায়
হিয়ায় শুকায় আশার কলি;
সোনার পল্লী আর না বিরাজে
ধেনু-চরা মাঠে বেণু নাহি বাজে,
বটের ছায়ায় আর না পথিক
আঁচল বিছায়ে ঘুমায় সুখে,
কৃষকের গান শুনিলে সাঁঝেতে
মশকেরা গাহে বনের বুকে।

ফাল্গুন এল, এল বসন্ত—
হাসি নাই তবু কারো যে ঠোঁটে
বাঙালী কাটায় কভু অনশনে
কভু এক মুঠা অন্ন জোটে;
ভগ্ন ভিটায় চাম্‌চিকা বসে,—
শূন্য ক্ষেতেতে মনের হরষে,
খ্যাক্‌শিয়ালীরা বিচরিছে,—আর
খেয়াল ভাঁজিছে শেয়াল সাঁঝে,
শূন্যে বালুচরে ফিঙে ওড়ে শুধু
খরগোস ডাকে বনের মাঝে।

বাংলার হৃদি-কালিন্দী আজ
কালিয়নাগের বিষেতে ভরা,
নির্ম্মল-নীর পেতে হ'লে এবে
কালিয়-দমনে চাই যে ত্বরা;
কোকিলেরে আজ নাহি প্রয়োজন
গরুড় পাখীরে দিই আবাহন,
হাতের কুঠার টুটিবে না কভু,
প্রভাস-তীর্থে সিনান বিনা,
আজি বসন্ত চাহিনে আমরা,
বাজে না যখন মনের বীণা।

কাদের নওয়াজ
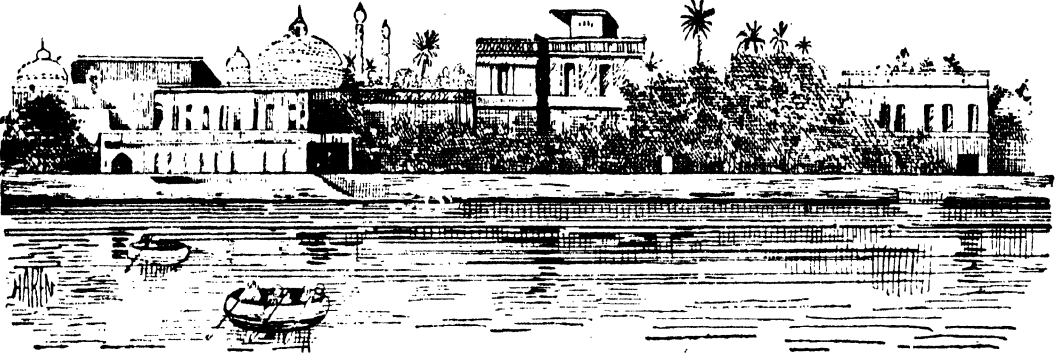
তুরস্কের রূপান্তর

সম্প্রতি মিঃ ডগ্‌লাস্‌ চ্যাণ্ডলার নামক এক জন মার্কিণ পর্য্যটক তুরস্ক পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ইস্তাম্বুল সহরে প্রবেশ করিয়া জনৈক তুর্ক-বন্ধুকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই বন্ধুটি তাঁহাকে বলেন, "আধুনিক প্রথায় এদেশে সহর গঠনে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা এখনই আপনি দেখিতে পাইবেন না। আর কিছুকাল পরে আসিলে আপনি বিস্মিত হইতেন। আর পাঁচ বৎসরে এই সহরকে নূতনরূপে গঠিত করা হইবে। তবে আপাততঃ ইস্তাম্বুল সহর দেখিলে আপনি এটুকু বুঝিবেন যে, ইস্‌লামিক্‌ রীতি হইতে ইস্তাম্বুল সম্পূর্ণ নূতনরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে তুরস্কের প্রথম পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন হয়। তদবধি প্রতি বৎসরে ঐ তারিখে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঐ সময় সপ্তাহ ধরিয়া প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেক প্রদেশে স্থানীয় শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কেহ গভর্ণর, কেহ মেয়র, কেহ অল্ডারম্যান, কেহ পুলিসের কর্ত্তার পদ গ্রহণ করে। ছোট মেয়েরা কৃষ্ণবর্ণ কাপড় পরিধান করিয়া, সাদা ব্লাউস্‌ গায়ে আঁটিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের কিছু দূরে ঐ সকল পদের স্থায়ী বয়স্ক অধিকারীরা দাঁড়াইয়া তাহাদিগের কার্য্য-পদ্ধতি লক্ষ্য করিতে থাকেন,—পাছে তাহারা কোনপ্রকার মারাত্মক ভ্রম করিয়া না বসে। এই ভাবে হাতে-কলমে বাল্যকাল হইতে তুরস্কের নর-নারীরা দেশের যাবতীয় শাসন-কার্য্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
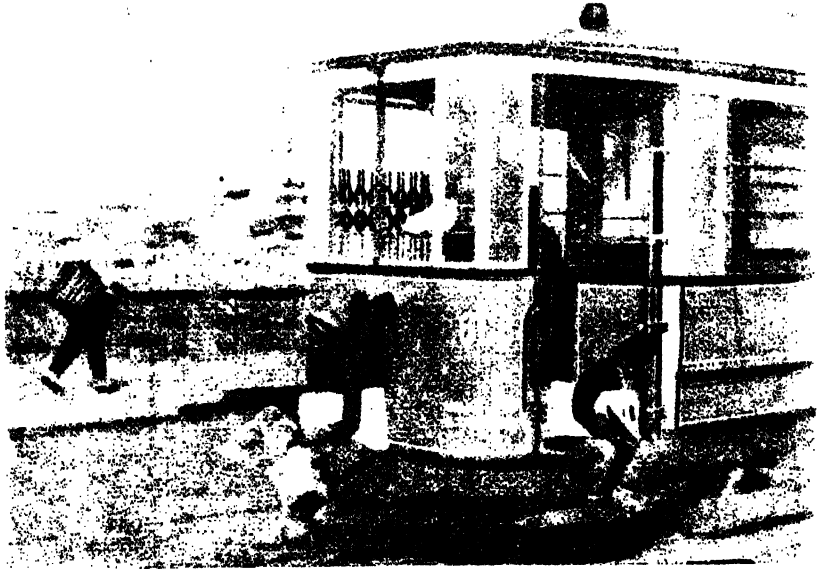
তুরস্কের ট্রাম-গাড়ী

অপরাহ্নকালে বালক-বালিকাদিগকে প্রমোদিত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট চলচ্চিত্র দেখান হয়। তুরস্কে তরুণমতি বালক-বালিকাদিগকে যা' তা' ছবি দেখিতে দেওয়া হয় না।

"পেরা এভিনিউর" দৃশ্য অতি মনোরম। এই পথের দু' পার্শ্বে চলচ্চিত্র-ভবনসমূহ বিরাজিত। হোটেল, বড় ব

গুদাম, এই পথের ধারেই অবস্থিত। লাটিন অক্ষরে প্রত্যেকের পরিচয় সুস্পষ্ট। শুধু মস্‌জেদ-প্রাচীর, এক লীরা দামের ব্যাঙ্কনোট, এলুমিনয়ম ও তাম্র-নির্ম্মিত কোন কোন মুদ্রার গাত্রে আরবী অক্ষর দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সৌন্দর্য্য-প্রসাধনের দোকানগুলি এমনই চিত্তাকর্ষক যে, উহাদের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে নারী-মাত্রই তাহাদিগের কুন্তল বৈদ্যুতিক-যন্ত্রের সাহায্যে তরঙ্গায়িত করিবার একবার দোকানে প্রবেশ করিয়া থাকে।

তুরস্ক রাজধানীতে কামাল আতাতুর্কের প্রস্তরমূর্ত্তি

তুরস্কের দৈনিক সংবাদপত্র "টান্‌" অত্যন্ত জনপ্রিয়। লাটিন ও আরবী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে। সাধারণ-শাসিত তুরস্ক মুসলমান মৌলবী মোল্লার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্ম সংক্রান্ত পাঠ নিষিদ্ধ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে ইচ্ছামত উপাসনা করিতে পারে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পুরুষ বা নারী ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মযাজিকা পথে বাহির হইবার সময় পুরোহিতের পরিচ্ছদে অঙ্গ ভূষিত করিতে পারে না।

তুরস্কের যাদুঘর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বিবিধ প্রকার মনোহারী দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া এইস্থানে সুরক্ষিত। নানাপ্রকার মণি-মাণিক্য সংগ্রহশালায় বিদ্যমান। এক একটি রত্নের মূল্যও বিস্ময়কর।

প্রত্যেক সাধারণসেব্য-গৃহে কামাল আতাতুর্কের আবক্ষ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। তুরস্কে পূর্ব্বে কোন মানুষের প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিবার আদেশ ছিল না। কামাল আতাতুর্ক এই আদেশ রহিত করিয়া দেন। তদবধি মর্ম্মরপ্রস্তরে বিবিধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়া দেশের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

তুরস্কে প্রসিদ্ধ ঘটনা অনুসারে অনেকে ইদানীং নিজের নামকরণ করিয়া থাকেন। তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী, বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্‌মেট ইন্নেনু, স্বাধীনতার যুদ্ধে ইন্নেনু-রণক্ষেত্রে জয়লাভ করায় ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

ইস্তাম্বুল নর্ম্মাল স্কুলের ডাইরেক্টর বেয়ান্‌ নেবাহাৎ কারাওরমান্‌। 'বেয়ান্‌' অর্থে মিস্‌ অথবা মিসেস্‌। 'বে' অর্থে মিষ্টার। এই বেয়ান্‌ নেবাহাৎ কারাওরমান্‌ অর্থে শ্রীমতী বেয়ান্‌ কৃষ্ণ-অরণ্য। 'কারা' অর্থে কৃষ্ণ এবং 'ওরমান্‌' অর্থে অরণ্য।

শ্রীমতী কারাওরমান্‌ স্বয়ং বিদুষী নারী। তিনি বক্তৃতা উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট কামাল আতাতুর্কের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করেন। উহা এইরূপ :—"নারীর প্রধান কর্ত্তব্য মাতৃত্বে অবহিত হওয়া। জননীরা সুশিক্ষিতা

তুরস্কের কেটলীড্রম—পূর্ব্বে এই কটাহে সৈনিকদিগের খাদ্য প্রস্তুত হইত

তুরস্কের আধুনিক নারীবৃন্দ

মসজেদে প্রবেশের পূর্ব্বে ভক্ত মুসলমান পা ধুইতেছে

আধুনিকা তুরস্ক মহিলা মেষজাত পশম সংগ্রহ করিতেছেন
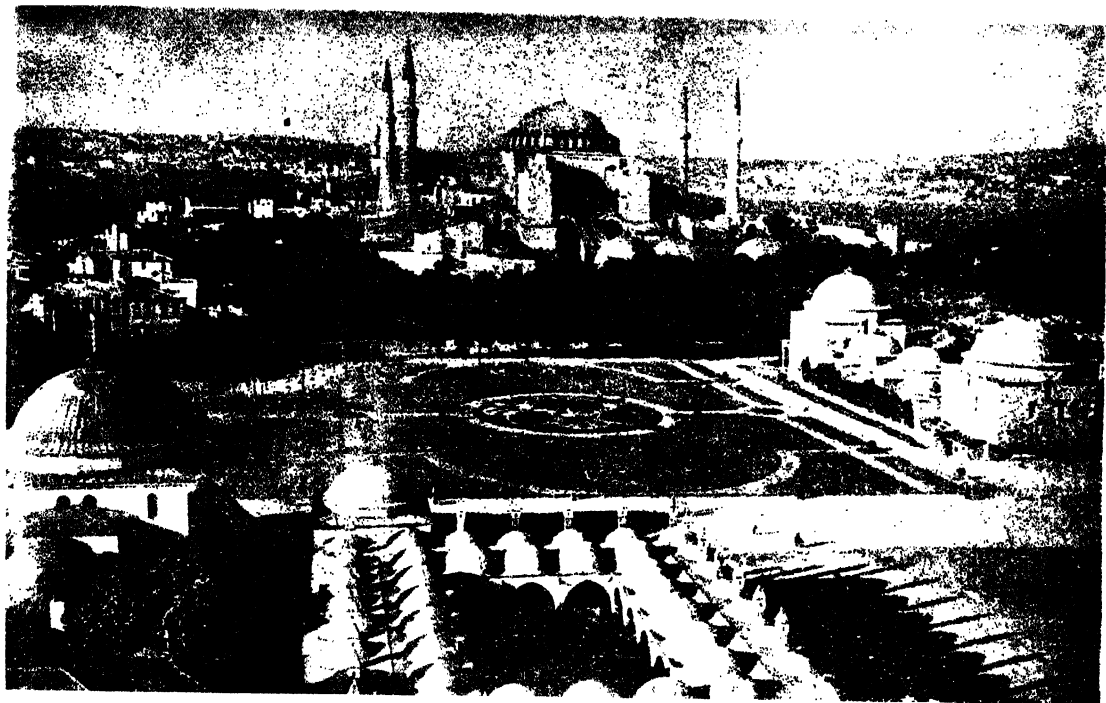
ইস্তাম্বুলের সেণ্ট সোফিয়া গির্জ্জা—বহু শতাব্দী ধরিয়া এই গির্জ্জা মসজেদহিসাবে ব্যবহৃত
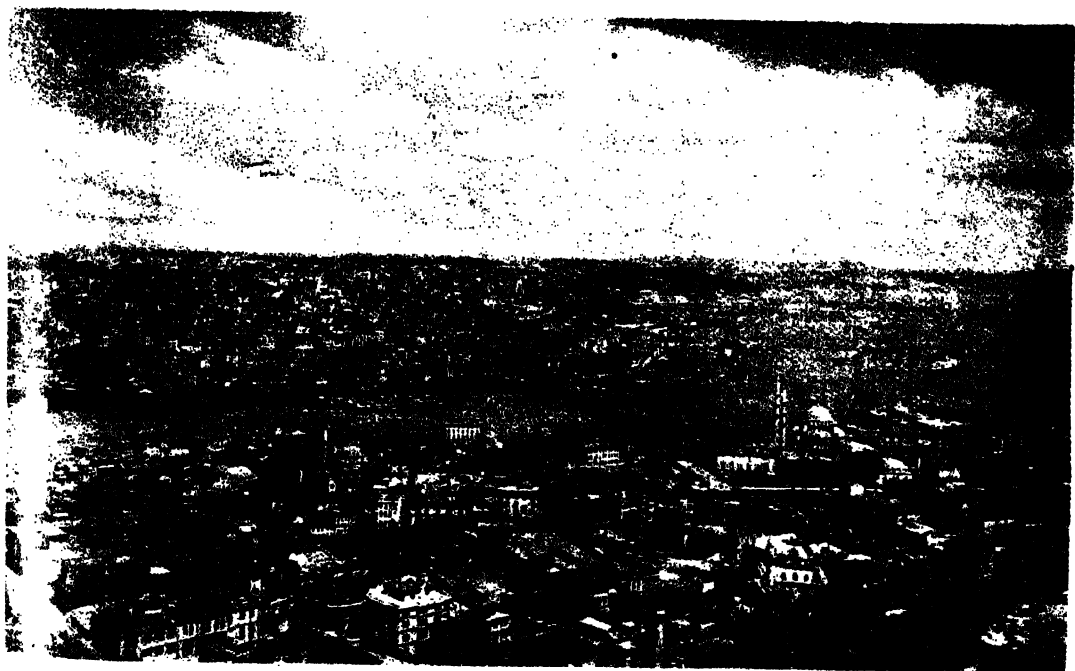
প্রাচীন ও নবীন ইস্তাম্বুল সহর; মাঝে গালাটা সেতু; তাহার পরই ডলমা বাকে প্রাসাদ—এইখানে কামাল আতাতুর্ক গত ১০ই নবেম্বর প্রাণত্যাগ করেন

ইস্তাম্বুলের সন্নিহিত ফ্লোরিয়ায় কামাল আতাতুর্কের গ্রীষ্মভবন
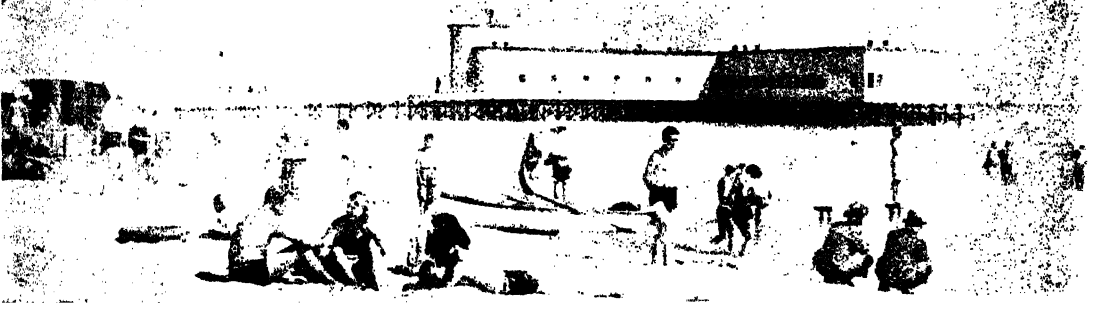
হইলেই দেশের সন্তান উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষায় বরেণ্য হইতে পারিবে। আমাদের জাতি শক্তিশালী হইবার জন্য দৃঢ়পণ করিয়াছে। সে জন্য আমাদিগের নারী জাতির পক্ষে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন অনিবার্য্য। নারী জাতিকে বিজ্ঞানের সকল শিক্ষা পাইতে হইবে, এবং পুরুষের ন্যায় উপাধিলাভেও তাঁহারা নিশ্চিতই বঞ্চিত হইবেন না। জীবনযাত্রার যাবতীয় পথে পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে কায করিবেন—পরস্পরকে সহায়তা দান করিবেন।”

তুরস্কে শিক্ষার যাবতীয় পর্য্যায় অবলম্বিত হইয়াছে। নারীদিগকে রন্ধন, পরিবেষণ, পুষ্পসজ্জায় গৃহশোভা সম্পাদন, সঙ্গীত এবং আরও বিবিধ প্রকার গৃহস্থালীর কার্য্য নারীর অবশ্য শিক্ষণীয়, বড় বড় সহরে বালক-বালিকাদিগের জন্য ক্রীড়া-প্রাঙ্গণসমূহও বিদ্যমান।

ইস্তাম্বুলে গর্দ্দভ নাই। ভারবহন কার্য্য গর্দ্দভের দ্বারা সম্পাদিত হইত, কিন্তু রাসভকুল তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। গর্দ্দভ না কি অতীতের অগৌরবের দ্যোতক—তাই এই ব্যবস্থা।

আধুনিকা তুরস্ক নারীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদ

তবে ফিজিল আডালার বা প্রিন্সেস্ দ্বীপপুঞ্জের বুইউক্ আডালায় এখনও গর্দ্দভের প্রচলন আছে। এখানে মোটর গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ। অশ্ব ও রাসভ এখানে রাজত্ব করিয়া থাকে। এই শস্যশ্যামলা দ্বীপে ইস্তাম্বুলের সৌখীন সম্প্রদায় মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবসরবিনোদন করিয়া থাকেন।
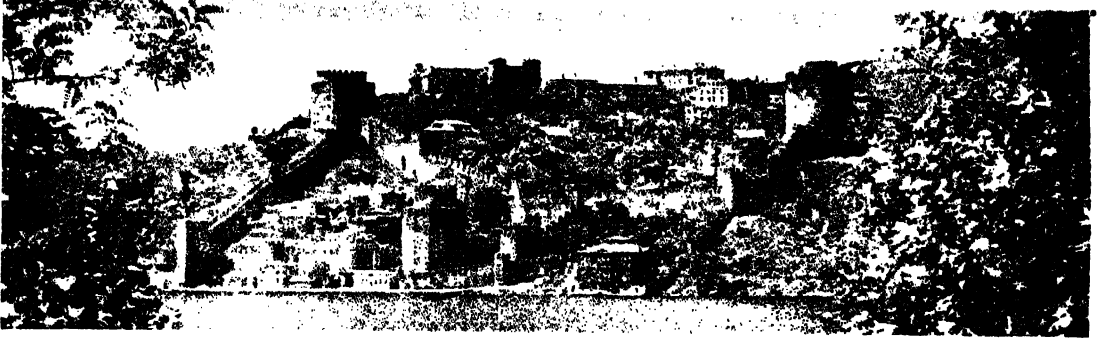
বর্ত্তমান মার্কিণ রবার্ট কলেজ—পূর্ব্বে এইখান হইতে পারস্য-সম্রাট্ দারিয়স্ তাঁহার য়ুরোপ-বিজয়ী সেনাবাহিনীর যাত্রা লক্ষ্য করিতেন

তুরস্কের কলেজের ছাত্রী হাতে কার্পেট বুনিতেছে

তুরস্কে মোরগের লড়াই, কুকুরের যুদ্ধ, উষ্ট্রযূথের লড়াই প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে ষাঁড়ের লড়াই তুরস্কে নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু আইনে এই ব্যবস্থা আছে যে, ষাঁড়ের লড়াই হইলেও, কোন ষণ্ড যাহাতে মারা না পড়ে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আঙ্কারা সহরে রাজপথগুলি সুপ্রশস্ত এবং মনোরম। সহরের মাঝখানে অশ্বারোহী কামাল আতাতুর্কের প্রস্তর-মূর্ত্তি বিদ্যমান। আঙ্কারার মসৃণ পথগুলিতে দ্বিচক্রযানসমূহ অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ-তরুণীরা দ্বিচক্রযানে যাইতেছে, এ দৃশ্য সকল সময়েই দর্শকের দৃষ্টিপথে পড়ে।

সহরের মধ্যে একাদশটি পুরাতন মস্জেদের গুম্বজ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সমগ্র সহরে একটিও গির্জ্জা নাই। ফরাসী এবং ইটালীয় দূতাবাসের সংলগ্ন গির্জ্জা আছে। তথায় ইচ্ছা করিলেই যে কেহ উপাসনায় যোগ দিতে পারে।

আঙ্কারায় এ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অপেরাও দেখা দেয় নাই। শুধু চলচ্চিত্রালয় আছে। তথায় পুরাতন ছবি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সঙ্গীতপ্রিয়দিগের জন্য সপ্তাহে দুইবার সঙ্গীতশ্রবণের ব্যবস্থা আছে। এইখানে যে সকল বাদ্যযন্ত্র আছে, তাহা

আনাটোলিয়ার বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়া কৃষকগণ আগুন জ্বালিবার জন্য গাছের ডাল-পালা কাটিয়া লইয়া চলিয়াছে

হিউয়ুকে ৩ হাজার ৫ শত বৎসরের পুরাতন ঈগলমূর্ত্তি
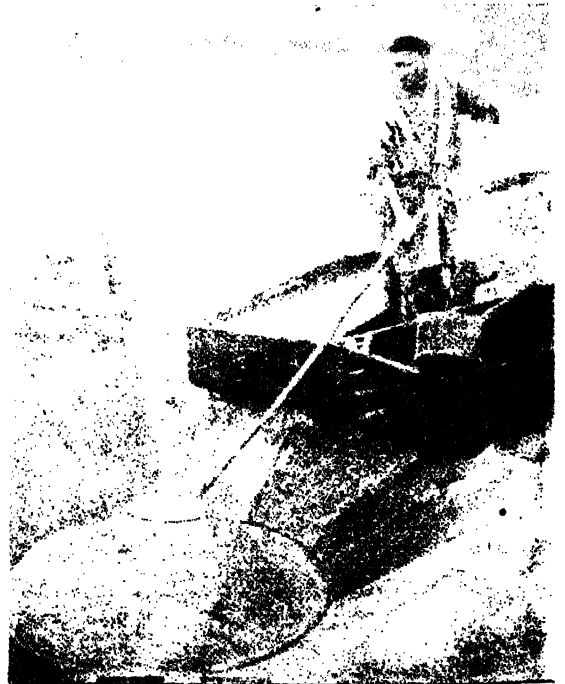
আঙ্গুরের রস হইতে সিরাপ প্রস্তুত
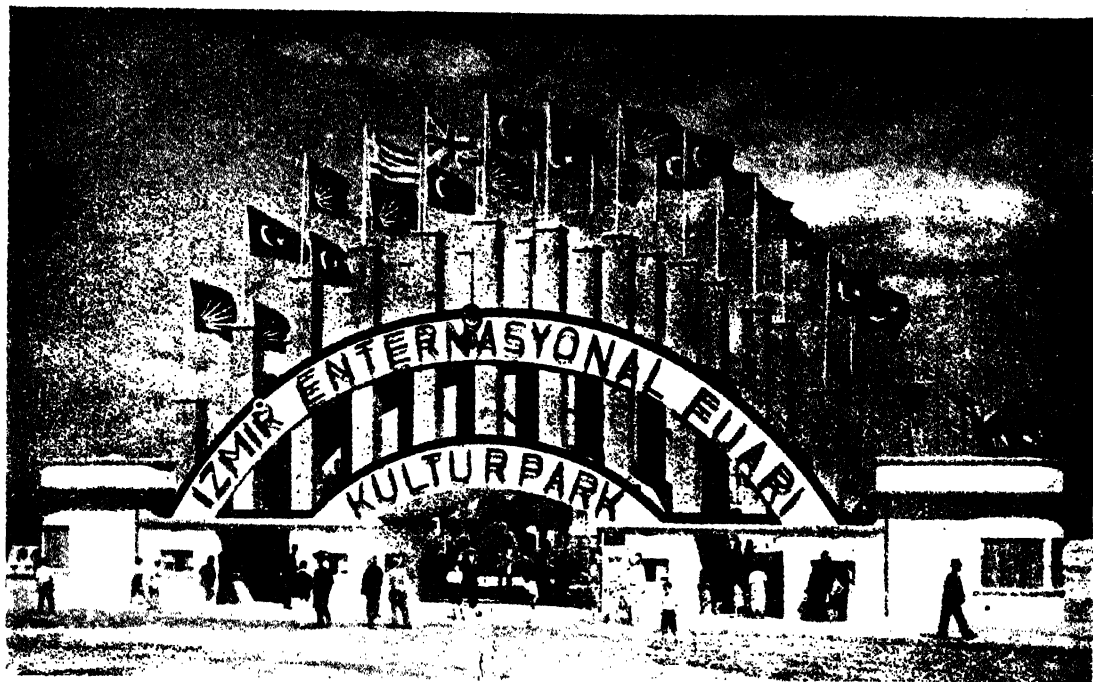
ইজমিরে আন্তর্জ্জাতিক মেলা—বিভিন্ন জাতীয় পতাকা উড়িতেছে

প্রাচীন যুগের ধূমপানরত তুর্ক

নূতন শিরোভূষণ-পরিহিত শিক্ষক ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন

সম্পূর্ণ তুরস্কজাত। গলফ ক্রীড়ার প্রচলন এখনও এখানে হয় নাই। কিন্তু টেনিসক্রীড়ার প্রতি সাধারণের অনুরাগ সমধিক। শীতকালে স্কীক্রীড়া আরম্ভ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট অশ্ব আরোহণ করিতে পারা যায়। উন্মুক্ত প্রান্তরে অশ্বধাবনে আনন্দও প্রচুর।

আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ম্মাণকার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে কোন কোন অংশে শিক্ষাদানকার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বালকবালিকাগণ আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতেছে।

মোটরের পরিবর্ত্তে অশ্বসাহায্যে গাড়ী চড়াই অতিক্রম করিতেছে
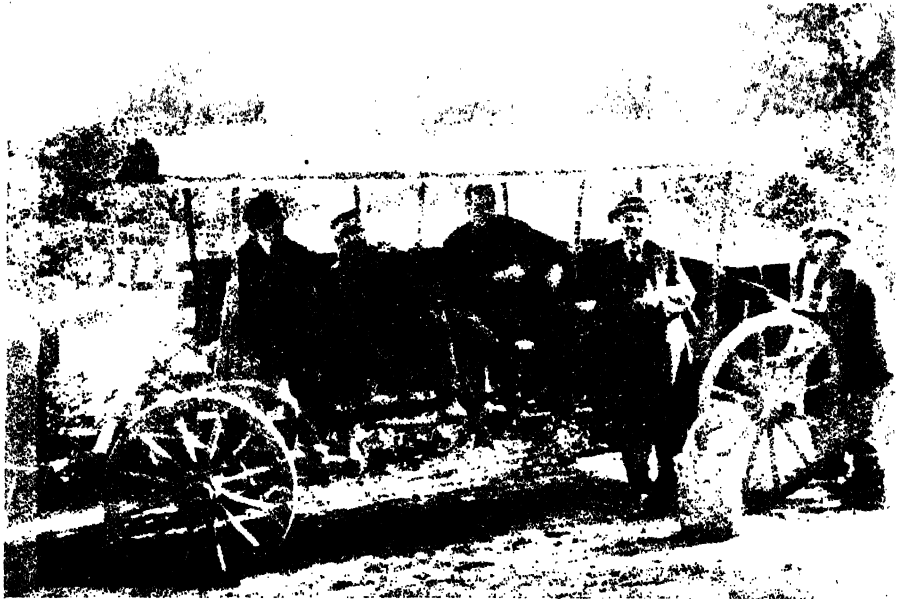
তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচনদিবসে গাড়ী করিয়া ভোটসংগ্রহ

তুরস্কে ৭০ প্রকার আপেল উৎপাদিত হয়। নাসপাতি ও ৫২ প্রকারের। আঙ্গুর ৭৫০ প্রকারের তথায় পাওয়া গিয়া থাকে। কৃষি বিভাগ বিভিন্ন প্রকার সব্জী ও ফল উৎপাদনে বিশেষভাবে অবহিত।

রঙ্গালয় নির্ম্মিত না হইলেও আঙ্কারায় নাট্য বিভাগ বিদ্যমান। তুর্কীরা চমৎকার অভিনয় করিতে পারে। এ বিষয়ে ইহাদের স্বাভাবিক দক্ষতা প্রশংসনীয়।

নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের নাম গাজী ইন্‌ষ্টিটিউট। গত বৎসর এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২ শত ৪৪ এবং ছাত্রীর সংখ্যা

তুরস্কের আধুনিকা বিদুষী মহিলা

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিচ্ছদ-ভূষিত আধুনিক তুর্ক পূর্ব্বপুরুষের সংগৃহীত ইতিহাস পাঠ করিতেছে

করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষয়িত্রীরা বিবাহ করিতে পারিবেন। তবে ৮ বৎসর কাল তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হইবে, ইহাই নিয়ম।

গঠন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদিগের বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য নিজেরাই করিয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যাপার তাহারা হাতে-হাতিয়ারে শিক্ষা করিয়া থাকে।

এশিয়া মাইনরে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সমধিক। এজন্য তুরস্কে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধকের ব্যবস্থা চমৎকার। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার ফলে ম্যালেরিয়ার সাংঘাতিক প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস

..ন হইয়াছিল। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীকে বিনা অর্থে ..হার্য্যাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রই সে ভার বহন করে। পাঠ্যপুস্তক, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যতীতও প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে খরচের জন্য কিছু মুদ্রা দিবার ব্যবস্থাও সরকার

পাইয়াছে। সরকার হইতে এখনও কুইনিন বিতরিত হইয়া থাকে।

তুরস্কে বিমান বিদ্যালয় আছে। এখানে পুরুষ ও নারী সমানভাবে বিমান-পরিচালন শিক্ষা করিয়া থাকে। গত

বৎসর ৫ শত ৫০ জন ছাত্র এবং ৫ শত ৫০ জন ছাত্রী তিন মাস ধরিয়া এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। প্যারাসুট হইতে ঝম্পপ্রদানও এই শিক্ষার অন্তর্গত। এই শিক্ষায় যাহারা বেশ দক্ষতা দেখাইতে পারে, তাহারাই বিমান বিভাগে শিক্ষা-লাভের জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে।

তুরস্কে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত আলোচনা হইতেছে। ইহার ফলে ইতিহাস-সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। নানাস্থানে ইতোমধ্যে খননকার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই খননকার্য্যে মার্কিণ, ফরাসী, সুইডিস্, ইংরেজ, জার্ম্মাণ এবং তুর্করাও আছেন।

সহরে কার্পিক্ রেস্তোরাঁ নামক একটি ভোজনালয় আছে। উচ্চপদস্থ বহু সরকারী কর্ম্মচারী এখানে পান-ভোজন প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

মোজাকি এক সময়ে ক্যাপাডো-সিয়ান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এখানে কোনও নূতন লোক আসিলেই স্থানীয় পুলিস তাহার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। অর্থাৎ নবাগতকে বিশেষ ব্যক্তির পরিচয়-পত্রাদি দেখাইতে হয়।

তুরস্কের একান্তবর্ত্তী এই সহরে কৃষকদিগের শিক্ষার্থ কলেজ আছে। মার্কিণ অধ্যাপক এখানে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তুরস্ক সরকার এখানকার ছাত্রদিগকে একপ্রস্ত পোষাক ও কলেজের বেতন দান করেন। এই মার্কিণ কলেজের বেতন বাৎসরিক ৪০ ডলার। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য আহারাদি বাবদ ১ শত ৬৫ ডলার বৎসরে লাগে।

এখানে রুশীয়দিগের নির্ম্মিত একটি তুলার কল আছে। ১ হাজার ২৪টি
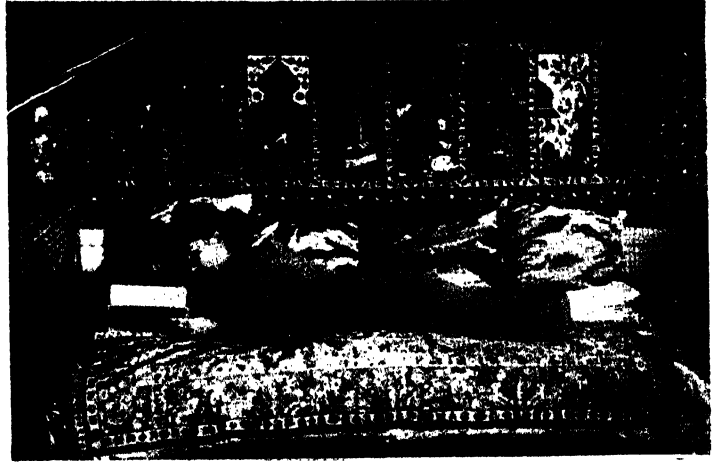
আধুনিকা তুরস্ক-তরুণী আরাম শয়নে অধ্যয়নরতা
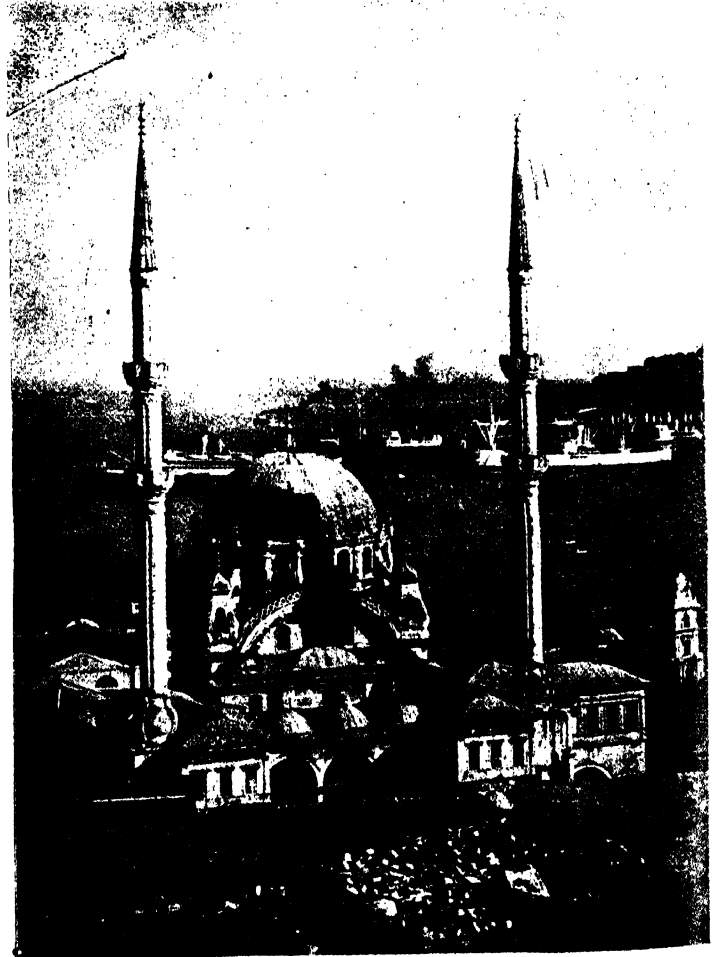
ইস্তাম্বুলের প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের একাংশ

বুলগেরিয়া হইতে প্রত্যাগতা তুরস্ক তরুণী উনান জ্বালিতেছে
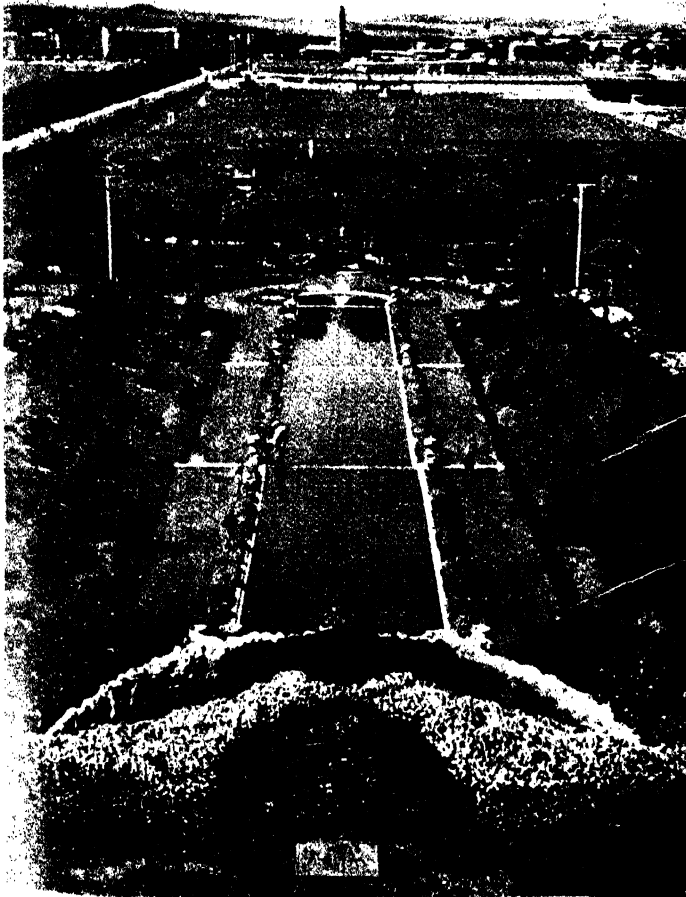
আঙ্কারার প্রমোদোদ্যান

তাঁত এই কলে চলে। তাহাতে বৎসরে ৩ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র বাহির হয়। ৪ হাজার শ্রমিক এই কলে কায করিয়া থাকে।

যে সকল মুসলমান শ্রমিক অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তাহারা কলের ভীষণ শব্দ অগ্রাহ্য করিয়া, নিকটেই কাপড় বিছাইয়া, তাহার উপর নমাজ পড়ে। তাহাতে তাহাদের নমাজের কোন বিঘ্ন হয় না। এই মিলের নাম 'কায়সেরী'।

এই কলে পূর্ব্বে প্রত্যহ ১০ ঘণ্টা করিয়া শ্রমিকদিগকে কায করিতে হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে দৈনিক ৮ ঘণ্টা করিয়া কায হয়। ইহাতে উৎপন্ন মালের পরিমাণ হ্রাস না পাইয়া শতকরা ২৫ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কলের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদিগের সুখ-সুবিধার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

এই অঞ্চলের স্কুলে ১৩ শত ছাত্র এবং ১ শত ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তাহারা জীব-বিজ্ঞান, ইতিহাস, পৌর-বিজ্ঞান, ড্রয়িং, হস্তশিল্প, সঙ্গীত, ব্যায়াম এবং গৃহস্থালীর পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সকলেরই পরিচ্ছদ আধুনিক ধরণের। কাহারও মাথায় ফেজটুপী নাই। অবগুণ্ঠন ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে। পথে এখন নারীর নগ্ন মুখ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

আদানা সহর তুরস্কের চারিটি বৃহৎ সহরের অন্যতম। এখানেও প্রাচ্যপ্রভাব নাই বলিলেই চলে। রাজপথে একটিও উষ্ট্র দৃষ্টিগোচর হইবে না। তবে ইস্তাম্বুলের মত এখান হইতে গর্দ্দভ নির্ব্বাসিত হয় নাই।

এই সহরে তুলা-প্রতিষ্ঠান দর্শনীয়।

উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা প্রস্তুত করিবার জন্য তুরস্ক সরকার বিগত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একজন অভিজ্ঞ পরিচালকের নিয়োগ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার বীজ বপনের জন্য বহু সহস্র বিঘা জমি চাষ হইতেছে।

পূর্ব্বে বনভোজনপ্রথা তুরস্কে অপরিজ্ঞাত ছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তে প্রায়ই সমগ্র পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বনভোজনে বাহির হইয়া থাকেন।

আদানা হইতে একটি শাখা রেলপথ আদানা সমতল ভূমির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পথ ৫০ মাইল মাত্র। সেণ্ট পল টারসনের মধ্য দিয়া মালিন বন্দর পর্য্যন্ত গিয়া উহা থামিয়াছে।

সেণ্ট পলের সময়ে সিডনস্ নদীর জলরাশি (বর্ত্তমানে ইহার নাম টার্সস্) ভূমধ্যসাগর হইতে প্রবাহিত একটি জলবিস্তারের উপর গিয়া পড়িত। এইখানে মার্ক এণ্টনীর সহিত দেখা করিবার জন্য রাণী ক্লিওপেট্রা আসিয়াছিলেন।

বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত টারসস্ দিয়া যাত্রীরা যাতায়াত করিত। এখন উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। গতায়ুঃ সভ্যতার চিহ্ন এখন এখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া

ইস্তাম্বুলের চিত্র-বিদ্যালয়ে পুরুষ ও নারী চিত্রকরগণ নগ্নচিত্র অঙ্কিত করিতেছে

আধুনিক তুরস্কের ব্যায়াম-রত বালক-বালিকার দল

আফিয়নে প্রকাণ্ড অহফেন-দুর্গ

তুরস্কের নারী শ্রমিকরা জলযোগের পূর্ব্বে হাতমুখ ধুইতেছে

যাইবে। এখন নূতন ধরণের অট্টালিকা-সমূহ তথায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

সমগ্র জেলার মধ্যে টারসস্ পার্ক দেখিবার মত স্থান। এই প্রমোদোদ্যানে কমলা নেবু ও দ্রাক্ষালতার কুঞ্জবন দেখিতে পাওয়া যাইবে। আরণ্য ঘুঘু পাখী দলে দলে এখানে বিচরণ করিয়া থাকে।

এই উদ্যানজাত আঙ্গুর কামাল আতাতুর্ককে উপহারস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল। সমগ্র দেশ হইতে দর্শকদল এই উদ্যান দেখিবার জন্য আগমন করিয়া থাকে।

তুরস্কে আদাম সুমার দিবসে সকল লোক কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে আদাম সুমারের কর্ম্মে নিযুক্ত লোক জন ব্যতীত, আর সকলেই এই দিন গৃহে বিশ্রাম করিয়া থাকে। তুরস্কে ইহা আইন বলিয়া পরিগণিত।

স্বাস্থ্যবিধির নিয়মানুসারে মাংসের দোকানগুলি পর্দ্দার দ্বারা আবৃত রাখিতে হয়। ইহা না করিলে দোকান-দারকে আইন অনুসারে দণ্ডদান করিতে হইয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক কশাইখানার সদর দরজায় পর্দ্দা ঝুলান থাকে। তবে দোকানের পশ্চাৎদ্বার ও বাতায়নগুলি উন্মুক্ত থাকে।

টারসস্ হইতে ফনিয়া, আফিয়ন্, ফারাহিসার এবং ইজমির যাইতে হইলে পর্য্যটককে টারস্ পর্ব্বতমালা আরোহণ করিতে হইবে। ফনিয়ার সমতল-ক্ষেত্রে প্রচুর গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরিমাণ এত অধিক যে, সমগ্র দেশের অভাব ইহার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। এখনও এতদঞ্চলে প্রচুর গৃহ-পালিত পশু পাওয়া যায়। রাখালগণ

বুলগেরীয় ভাষা-ভাষিণী তুরস্ক মহিলা

তুরস্কের ভবিষ্যদ্বক্তা পারাবত

ইজমিরের ফলের বাজার—প্রধানতঃ ফুলে পরিপূর্ণ

মসজেদের মধ্যে প্রবেশ করিবার স্বতন্ত্র পাদুকা
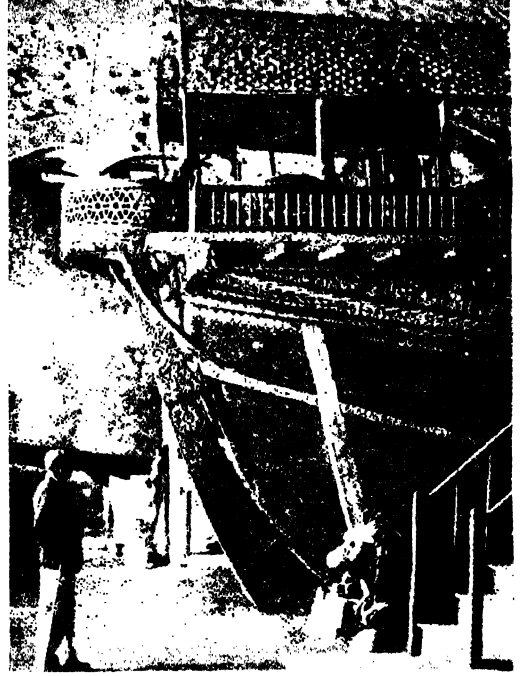
সুলতান ৪র্থ মহম্মদের ব্যবহৃত হস্তিদন্ত ও শুক্তিরচিত বজরা
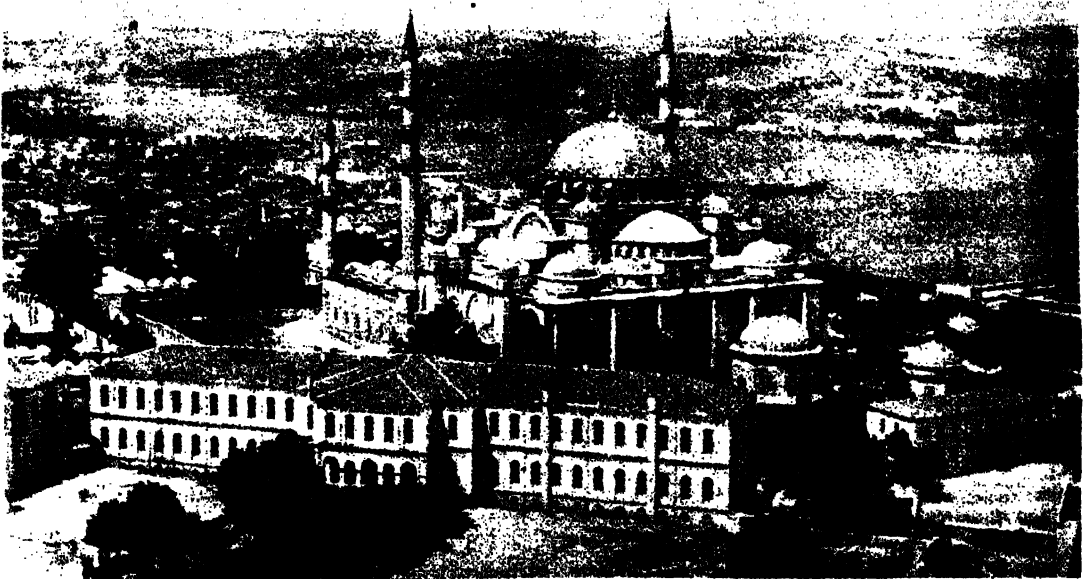
সুলতান সলিমান-নির্ম্মিত প্রাচীন মসজেদ

মেষ-চর্ম্ম-নির্ম্মিত টুপী মাথায় দিয়া মেষপাল চরাইতেছে, এ দৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মেষপালকদিগের সঙ্গে যে সারমেয় দল থাকে, তাহারা ট্রেণ দেখিলেই উহার সহিত পাল্লা দিয়া ডাকিতে ডাকিতে দৌড়াইতে থাকে। কিন্তু ট্রেণ যখন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, তখন লাঙ্গুল আন্দোলিত করিতে করিতে নিজের কার্য্যে ফিরিয়া আইসে।

তুরস্কের রেলপথের ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। লসেনের সন্ধিপত্রের পূর্ব্বে তুরস্কের নিজস্ব কোন রেলপথ ছিল না। সর্ব্বসমেত তখন ২ হাজার মাইল রেলপথ ছিল। কতকটা ফ্রান্সের, কতক ইংলণ্ডের, কতক জার্ম্মাণীর। এই সকল রেলপথের উপর দিয়া তুরস্কের রেলগাড়ী চলিত। অনেকগুলি রেলপথ অল্পদূরপ্রসারী ছিল। কতক-গুলি রেলপথ সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রসমূহের সহিত, কতকগুলি বন্দর পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এক শাখা হইতে অন্য শাখায় গাড়ী যাইবারও সে সময় কোন ব্যবস্থা ছিল না।

তুরস্কে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, তুরস্ক-সরকার সমস্ত রেলপথ তাহাদিগের মালিকগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লন। বর্ত্তমানে কোন রেলপথই আর বিদেশীয় সম্পত্তি নহে। ইহার পর তুরস্কের এঞ্জিনীয়ার ও তুরস্কজাত পদার্থের দ্বারা ২ হাজার ৫ শত মাইলব্যাপী রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনও রেলপথের বিস্তারসাধন চলিয়াছে। আরও ২ হাজার মাইল রেলপথ নির্ম্মিত হইলে সমগ্র দেশের চারিদিকেই রেলের বিস্তারসাধন ঘটিবে।

রেলপথের সন্নিহিত পল্লীগ্রাম ও সহরগুলির ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। কৃষক নারীরা, পুরুষের পাশে সমানভাবে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত। যেখানে ঝোপ-ঝাড় আছে, তথায় কৃষক-দম্পতির শিশুরা খেলা করিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মহিষ দ্বারা কৃষিক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া থাকে।

রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় যাত্রীর ভিড় বেশ হয়। কোন ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে যাত্রীরা গাড়ী হইতে নামিয়া সন্নিহিত উৎসের জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকে। তুরস্কে আর দরবেশের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিপত্তি নাই। তাহাদের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কামাল আতাতুর্ক চারি-দিকেই সংস্কারের প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। দরবেশের দল এখন কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অর্থোর্জ্জন করিতেছে। কেহ কেহ নিরীহ পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।
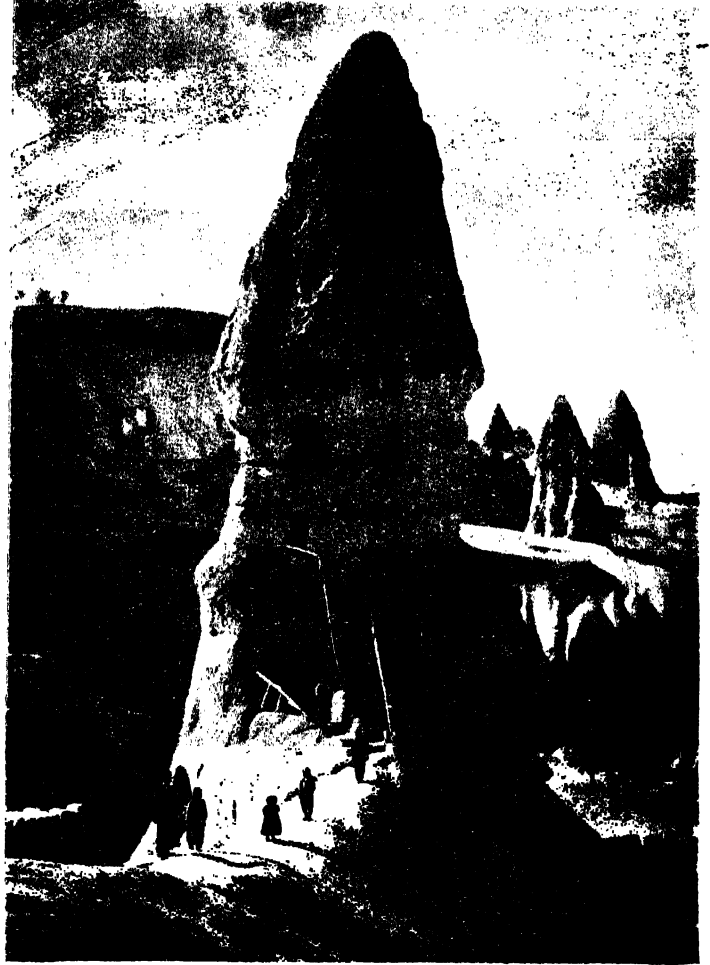
উরগপের সন্নিহিত মাটসানের প্রাচীনতম পাহাড়—ইহাতে বহু গুহা বিদ্যমান

কনিয়া এবং আঙ্কারার মধ্যবর্ত্তী স্থানে, কচিসারের

সন্নিহিত প্রকাণ্ড লবণহ্রদ টুজ্ বিদ্যমান। ইহার জল-বিস্তারের পরিমাণ এক হাজার বর্গ-মাইল। কিন্তু শীতকালে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর স্থানে ৬০ ইঞ্চির বেশী জল থাকে না। নীচে কয়েক ইঞ্চি পুরু লবণ বিরাজিত। অতি পুরাতন পদ্ধতিতে লবণ উত্তোলিত হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহারা একই প্রণালীতে জলের মধ্য হইতে লবণ উত্তোলন করিয়া থাকে। এক স্থানে জমা করিয়া উহা [illegible] হইলে, উষ্ট্রপৃষ্ঠে বাজারে নীত হয়। বর্ত্তমানে ৩ কোটি পাউণ্ড ওজনের লবণ বৎসরে সংগৃহীত হইয়া থাকে। আধুনিক প্রণালীতে শীঘ্রই লবণ নিষ্কাশন-কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

ইস্তাম্বুলে মিহরিমা মসজেদ—অভ্যন্তরভাগ

এনাটোলিয়ায় এখনও উষ্ট্র বর্জ্জিত হয় নাই। রেলপথের প্রাদুর্ভাবে উহার মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

নসরুদ্দীন হোজা আনাটোলিয়ার একজন পরিহাস-রসিক লোক ছিলেন। পঞ্চ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। এইখানে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান। তিনি অতি খেয়ালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে বহু বিচিত্র কাহিনী প্রচলিত আছে। আকলেহিরে তাঁহার সমাধি আছে। সমাধির সম্মুখে একটি তোরণ দেখা যাইবে। সমাধির চারিদিকে কোন বেড়া বা প্রাচীর নাই।

আফিয়ন্ কারাহিসার অহিফেনের জন্য প্রসিদ্ধ। তুরস্কের অহিফেন এই-খানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সহরে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। উহার চূড়া কৃষ্ণবর্ণের।

আফিয়নের জল নানা ব্যাধিপ্রশমনের জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার জল বোতলে পূর্ণ করিয়া সমগ্র তুরস্কে বিক্রীত হইয়া থাকে। আফিয়নের স্বাস্থ্যনিবাসে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা স্বাস্থ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া থাকে।

তুরস্কে পূর্ব্বে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সুরা প্রস্তুত হইত না। সরকারী তত্ত্বাবধানে যে সুরা ইদানীং প্রস্তুত হইতেছে, তাহা উৎকৃষ্ট জাতীয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট সুরার সংখ্যা অধিক নহে। অধুনা মানিসা ও ইজমিরএ অধিক পরিমাণে সুরা উৎপাদনের কল বসিয়াছে।

ইজমিরএর সমুদ্রতটবর্ত্তী স্থানের ভবনাদি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের অগ্নিতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অধুনা এই সহরটিকে নূতন করিয়া গঠিত করা হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক মেলা এইখানে বসিয়া থাকে। আঙ্কারার ন্যায় এখানেও প্যারাসুট হইতে ঝম্পপ্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

নদীবক্ষে মাছধরা

তরঙ্গে যন্ত্রযুগের প্রাদুর্ভাবে ইদানীং তথায় হাতের কারুকার্য্য বিলয়-প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। গাছ-গাছড়া হইতে যে রং বাহির হইত এবং তাহাতে কাপড় রঞ্জিত করিয়া কুলা নামক স্থানে যে শ্রমশিল্প মানুষের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাজারে আর পাওয়া যায় না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এখন যে রং বাজারে পাওয়া যায়, তাহাতে অনুরঞ্জিত যে সকল দ্রব্য এখন বাজারে বিক্রয়ার্থে আইসে, তাহা দেখিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের কেহ জীবিত থাকিলে অশ্রুপাত করিতেন। এখন কে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া রং প্রস্তুত করিবার উপযোগী গাছ-গাছড়ার সন্ধান করিবে? সে প্রবৃত্তি আর মানুষের মনে নাই। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের শাহ আদেশ

কিউবকে নির্ম্মিত বিশাল জলের ভাণ্ডার
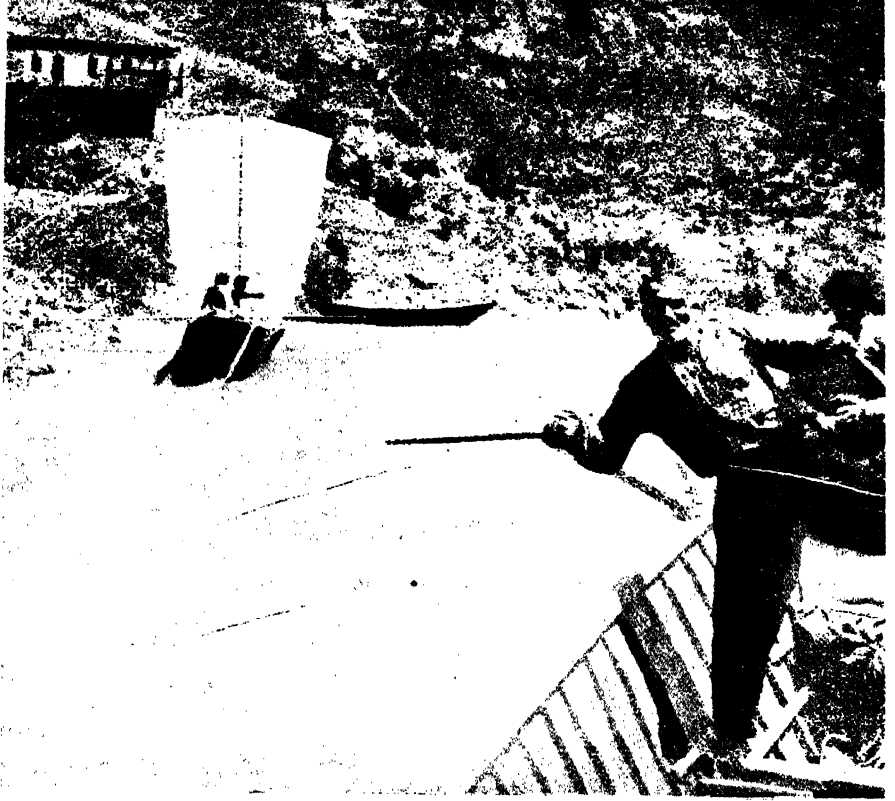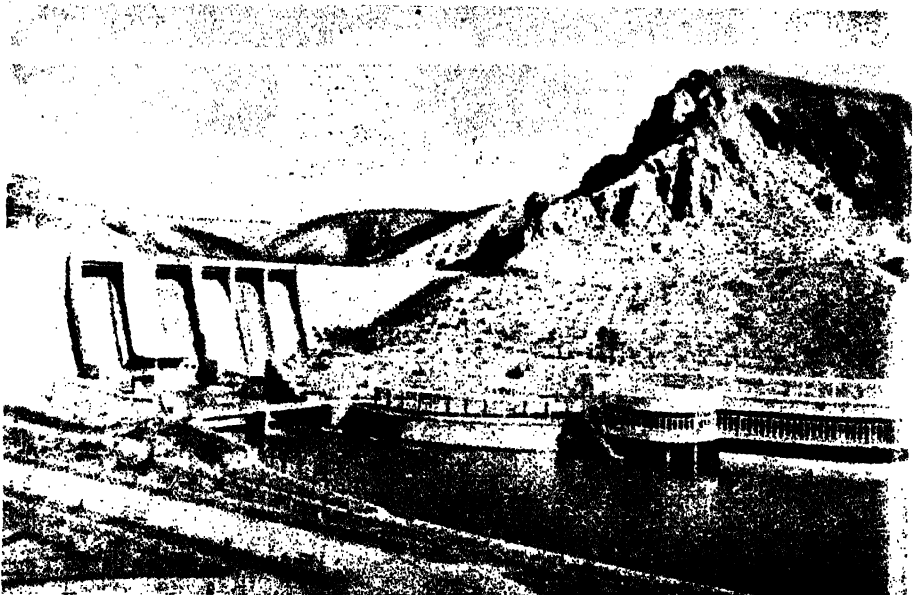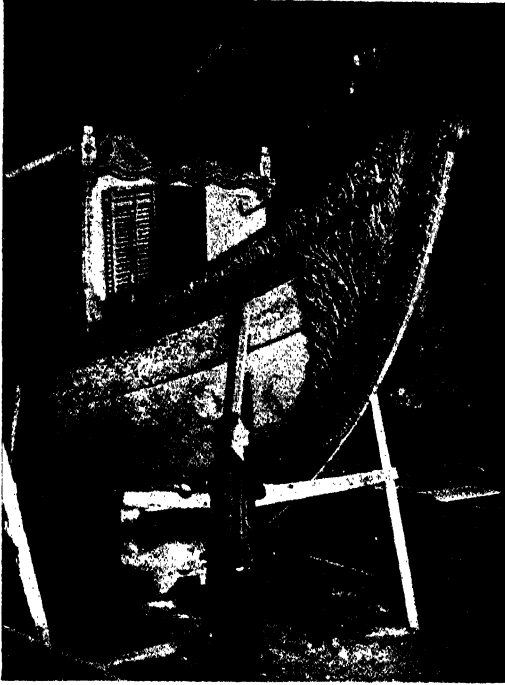
সুলতান আবদুল আজিজের ব্যবহৃত মূল্যবান্ বজরা

তামাকের কারখানায় শ্রমরতা তুরস্ক তরুণী কফি পান করিতেছে

বুরসার সমাধিক্ষেত্র—তুরস্কের প্রথম ছয় জন সুলতান এখানে সমাহিত আছেন

দিয়াছিলেন, যে কেহ গাছ-গাছড়াজাত রং ব্যবহার না করিবে, তাহাকে কঠোর শাস্তিভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সে আদেশ এ যুগে অচল।

যাহারা পূর্ব্বে গাছ-গাছড়াজাত রং লইয়া বস্ত্র অনুরঞ্জিত করিত, তাহাদিগের অনেকে এখন বন্য-বরাহ শিকার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। বুর্মা এবং দার্দ্দেনালিস্ অঞ্চলের বিস্তৃত অরণ্যে উহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বুরসার মসজেদ—উৎস হইতে জল পড়িতেছে—মুসলমানগণ প্রার্থনা করিতেছে

মুসলমানগণ বন্য-বরাহ-মাংস ভক্ষণ করে না বলিয়া ইস্তাম্বুলের খৃষ্টানগণ শূকরমাংস সস্তায় পাইয়া থাকে। ইজমির নর্ম্মাল স্কুলে কৃষ্ণনয়না কুমারীরা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। কোন তরুণীই শীঘ্র বিবাহ করিতে চাহে না। তুরস্কে এখন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। তরুণী তুর্কী-কন্যারা বিবাহ না করিয়া অশিক্ষিত, দরিদ্রদিগের মধ্যে জ্ঞানবিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের তরুণী ছাত্রীরা প্রাচীন লোক-সঙ্গীত এবং আধুনিক তুরস্কের জাতীয় সঙ্গীত প্রত্যহ গান করিয়া থাকে।

তুরস্কে নর-নারীনির্ব্বিশেষে ব্যায়াম-চর্চ্চা করিয়া থাকে। কামাল আতাতুর্কের ব্যবস্থাতেই অন্তঃপুরচারিকারা এখন নানাবিধ শারীরিক ব্যায়ামে পারদর্শিনী হইয়াছেন।

সামসন ও ইজমির নামক দুইটি অঞ্চলে প্রচুর তাম্রকূট উৎপাদিত হইয়া থাকে। তামাকের কারখানায় যন্ত্র-সাহায্যে চুরুটিকা ভূরি-পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গম্বুজের উপর বেতার যন্ত্র

স্মির্ণায় তরুণীরা সিগারেট তৈয়ার করিতেছে

য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ-ভূষিত আধুনিক তুর্ক

কামাল আতাতুর্কের কর্তৃত্বে তুরস্কে পরিচ্ছদের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর।

মধ্য আনাটোলিয়ায় কি ভাবে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করায় একজন স্থানীয় অধিবাসী বলেন, "রাত্রিকালে আমাদের মস্তক হইতে ফেজ কাড়িয়া লওয়া হয়। তাহার পর ক্রমশঃ অবগুণ্ঠন অপসারিত হয়। প্রথমে রাজকর্ম্মচারিগণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকপত্নীরা ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, অবশেষে একটি সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয়—সেই সময়ের পর কাহারও অবগুণ্ঠন ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যাহারা সহজে অবগুণ্ঠন ত্যাগে সমর্থ হয় নাই, তাহারা গোপনে তিন সপ্তাহ কাল অবগুণ্ঠন ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়া অবশেষে বিনা অবগুণ্ঠনে পথে বাহির হইতে সাহস করিয়াছিল।

কামাল আতাতুর্কের আমলে তুরস্কের এই নবরূপ উত্তরকালে সম্ভবতঃ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা

ভারতীয় নাট্য যে বেদমূলক, তাহা অগ্রহায়ণের 'মাসিক বসুমতীতে' সংক্ষেপে প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অতঃপর, প্রাচীন ভারতের আর্ষ রচনাবলী ও লৌকিক সাহিত্যমধ্যে ভারতীয় নাট্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় কি না—ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য হইবে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অধ্যাপক কীথপ্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করিতে চাহেন না যে, বৈদিক সাহিত্যে ভারতীয় নাট্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ ইঙ্গিত আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি-সংহিতায় (৩০।৬) 'গীত', 'নৃত্ত' ও 'শৈলূষ' শব্দ, ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (৩।৪।২) 'নৃত্ত' ও 'শৈলূষ' শব্দ পাওয়া যায়। সায়ণ, মহীধর প্রভৃতি বেদ-ভাষ্য-টীকাকারগণ ঐ সকল স্থলে 'শৈলূষ' শব্দের প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'নট'। তথাপি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, ঐ শব্দগুলির সহিত প্রকৃত নাট্যের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। অধ্যাপক কীথ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বৈদিক সাহিত্যে 'নৃতু' বা 'নৃত্ত' শব্দের প্রয়োগ আছে সত্য; কিন্তু উক্ত শব্দগুলি যে-সংস্কৃত 'নৃৎ' ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন, সেই ধাতুর প্রাকৃত রূপ হইতে জাত 'নট' বা 'নাট্য' শব্দের প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যের কোনও স্থানে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বৈদিক যুগে প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গভূত নৃত্যাদি পরবর্ত্তী লৌকিক যুগে প্রবর্ত্তিত নাট্যের জনক; অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক যুগে কেবল ধর্ম্মনৃত্যই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তৎকালে প্রকৃত নাট্যের ছিল একান্ত অভাব; পরবর্ত্তী লৌকিক যুগে এই নাট্য তাহার প্রকৃত পূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছিল। এই সকল পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ বৈদিক সাহিত্যে প্রযুক্ত 'শৈলূষ' শব্দের অর্থ করিয়া থাকেন—'মূকাভিনেতা' (pantomime)—প্রকৃত নট নহে।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের এই মতবাদ কতদূর যুক্তিসহ, সুধী পাঠকবর্গের উপর তাহার বিচার-ভার রহিল। বর্ত্তমানে আমরা নাট্য সম্বন্ধে আর্ষ-গ্রন্থ ও প্রাচীন লৌকিক সাহিত্যের অভিমত লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আর্ষ-গ্রন্থ বলিতে মূলতঃ বুঝায়—শ্রৌতগৃহ্যাদি সূত্রাবলী, মন্বাদি ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিসংহিতা, রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি। এ সকলের মধ্যে শ্রৌতগৃহ্যাদি সূত্রসমূহ সাধারণতঃ বৈদিক সাহিত্যেরই পরিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ একখানি সূত্রগ্রন্থে ["নৃত্য-গীত-বাদিত্রাণি ন কুর্য্যান্ন চ গচ্ছেৎ" পারস্কর-গৃহ্যসূত্র—২।৭।৩] তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য-গীত-বাদিত্র) ত্রৈবর্ণিকের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ বলেন যে, ঐ সকল সূত্রগ্রন্থে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির উল্লেখ থাকিলেও 'নট' বা 'নাট্য' শব্দের প্রয়োগ না থাকায় নাট্যের প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে উপলভ্যমান ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিসংহিতাগুলির মধ্যে 'মনুসংহিতা' প্রাচীনতম ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। এই মনুসংহিতায় 'নর্ত্তন', 'গীতবাদন' (২।১৭৮), 'শৈলূষ' 'রঙ্গাবতারক' (৪।২১৪ ২১৫), 'তৌর্য্যত্রিক' (৭।৪৭), "চারণ" (৮।৩৬২), 'নট' (১০।২২), 'কৌশীলব্যক্রিয়া' (১১।৬৬) প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুইটি কারণে মনুসংহিতার বচন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতসমাজে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না—(১) প্রথমতঃ মনুসংহিতার বর্ত্তমান 'ভৃগুপ্রোক্ত' সংস্করণ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে না, বরং উহা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনাও হইতে পারে; (২) দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধৃত শব্দগুলি প্রকৃত নাট্য-সম্পর্কিত না হইয়া মূকনাট্য-সম্বন্ধী (pantomime) হওয়াই অধিক সম্ভব বলিয়া পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণের ধারণা (১)।

(১) 'শৈলূষ' শব্দের অর্থ মেধাতিথি প্রভৃতি মনু-টীকাকারগণ করিয়াছেন—'জায়াজীব নট'। ভানুজি-দীক্ষিত অমরকোষের টীকা 'ব্যাখ্যাসুধা'য় বলিয়াছেন—শৈলূষগণ শিলূষ ঋষির বংশজাত। 'রঙ্গাবতারক' বলিতে তাঁহারা অর্থ করিয়াছেন—নট গায়ন ব্যতিরিক্ত অন্যপ্রকার রঙ্গাবতারক—যথা, মল্ল প্রভৃতি। 'চারণ' শব্দটির প্রয়োগে

মনুসংহিতার প্রামাণ্য স্বীকৃত না হইলে অন্যান্য স্মৃতি-সংহিতার প্রমাণ প্রদর্শন করাই বৃথা। কারণ, মনুসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতর বা অধিক প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। অতএব, অন্য শ্রেণীর আর্ষ-গ্রন্থমধ্যে অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

রামায়ণের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সংস্করণে 'ব্যামিশ্রক' (২।১।২৭), 'শৈলূষ' (২।৩০।৮) 'নট নর্ত্তক' (২।৬৭।১৫), 'নাটক' (২।৬৯।৪) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে (২)। এমন কি, স্বয়ং সীতাদেবী শৈলূষদিগের জঘন্য চরিত্রের (জায়াজীবত্বের) স্পষ্ট ইঙ্গিতও করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রকরণেও পাশ্চাত্ত্য গবেষকগণ নাট্যসম্বন্ধীয় কোন প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই সকল উল্লেখের মধ্যে হয় প্রক্ষিপ্তবাদ, নয় ত মূকাভিনয়েরই ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন।

মহাভারতেও সভাপর্ব্বের (২।১১।৩৬) 'নাটক'-শব্দটি ইহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। শান্তিপর্ব্বের "নট" শব্দ (১২।১৪০।২১), অথবা অনুশাসনপর্ব্বের 'নটনর্ত্তক' শব্দ (১৩।৩৩।১২) এ সকলই অধ্যাপক কীথের মতে মূকাভিনেতার বাচক মাত্র (৩)। একমাত্র হিল্লেব্রাণ্ড সাহেব এই পদগুলি হইতে পুরাদস্তুর অভিনয়ের সূচনা পাইয়াছেন, ও সে কারণে কীথ সাহেব তাঁহাকে উপহাস করিতেও ছাড়েন নাই। তবে শান্তিপর্ব্বে (১২।২৯৪।৫) যে 'রঙ্গাবতরণ' ও 'রূপোপজীবন' বলিয়া যে দুইটি শব্দ আছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কীথ সাহেব আর সত্য গোপন করিতে পারেন নাই। 'রঙ্গাবতরণ' শব্দটি অভিনয়ের পর্য্যায় ('appearing on the stage') বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার কারণ, নীলকণ্ঠ 'রঙ্গাবতরণ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন —রঙ্গে স্ত্রী প্রভৃতির বেশ ধারণপূর্ব্বক অবতরণ— অর্থাৎ অভিনয়, আর 'রূপোপজীবন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবধান রাখিয়া চর্ম্মময় আকৃতি দ্বারা ক্রীড়া প্রদর্শন—দাক্ষিণাত্যে 'জলমণ্ডপিকা' নামে প্রসিদ্ধ—অর্থাৎ 'ছায়ানাট্য'। কীথ সাহেব নীলকণ্ঠের এ অর্থটি অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলকণ্ঠের সময়ে (খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দী) হয় ত ঐ প্রকার ক্রীড়ার প্রচলন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া উক্ত প্রথা যে প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? পক্ষান্তরে 'রূপোপজীবন' শব্দটি যে-'রঙ্গাবতরণ' শব্দের সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই 'রঙ্গাবতরণ' শব্দটি অভিনয়েরই বাচক; তাহা ছাড়া 'রূপোপজীবন' শব্দটি 'রূপোপজীবিনী' বা 'রূপাজীবা' শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ও ইহা হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের ঘৃণিত জীবনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়; অর্থাৎ 'রূপোপজীবন' শব্দটি জায়াজীব নটের দুশ্চরিত্রতারই সূচনা করিয়া থাকে মাত্র (৪)। কীথ সাহেবের পূর্ব্বাপর-ব্যাখ্যা সর্ব্বজনসমর্থিত না হইলেও তিনি যে মহাভারতের অন্ততঃ একটি স্থলেও প্রকৃত 'নট' ও 'নাট্যে'র উল্লেখ পাইয়াছেন—ইহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

মহাভারতের 'খিল' অংশ হরিবংশেও নাট্যাভিনয়ের অতি বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট বিবরণ আছে (৫)। বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞে 'ভদ্র' নামে এক জন কামরূপী নট অতি

ব্যবহিত পরেই মূলগ্রন্থে চারণগণের দুশ্চরিত্রতার (জায়াজীবত্বের) সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে—"সজ্জয়ন্তি হি তে নারীর্নিগূঢ়াশ্চারয়ন্তি চ।" টীকাকারগণও বলিয়াছেন যে, চারণ শব্দের অর্থ নট-গায়নাদি। বস্তুতঃ নটগণ যে নিজ নিজ ভার্য্যার দেহ পণ্যরূপে ব্যবহার করিতে দিত—ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে নট ও নাট্য বিষয়ক এ সকল স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যদি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে অগত্যা তর্ক হইতে নিরস্ত হওয়াই ভাল। বিশেষতঃ 'কৌশীলব্যক্রিয়া' (কুশীলবগণের অর্থাৎ নটগণের কার্য্য) প্রভৃতি শব্দও প্রকৃত নাট্য না বুঝাইয়া মূকাভিনয় মাত্র বুঝাইতেছে, —এরূপ পাশ্চাত্ত্য মতের অন্ধ অনুসরণ যদি করিতে হয়—তাহা হইলে আর কোন্ শব্দ যে প্রকৃত নাট্যের বাচক হইবে, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির অতীত।

(২) তিলকটীকাকার অর্থ করিয়াছেন—ব্যামিশ্রক প্রাকৃতাদি-ভাষামিশ্রিত নাটক; শৈলূষ—জায়াজীব। বঙ্গবাসী সংস্করণ সটীক রামায়ণ দ্রষ্টব্য।

(৩) মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ 'নটনর্ত্তক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ভরতাদি অর্থাৎ অভিনেতা প্রভৃতি। বঙ্গবাসী সংস্করণের সটীক মহাভারত দ্রষ্টব্য।

কিন্তু তিলকটীকাকার বা নীলকণ্ঠ বিশেষ প্রাচীন না হওয়ায় কীথপ্রমুখ গবেষকবৃন্দ তাঁহাদিগের বাক্য প্রমাণস্বরূপে গণনা করেন না।

(৪) কীথ সাহেব এই প্রসঙ্গে বরাহমিহির (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) রচিত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে প্রযুক্ত 'রূপোপজীবিন্' (বৃঃ সং ৫।৭৪) শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন—Sanskrit Drama pp. 54-55

(৫) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯১-৯৩ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

সুন্দরভাবে নাট্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই ভদ্রের ছদ্মবেশে নাট্যাভিনয়ের ছলে বজ্রপুরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরাধিপতি অসুররাজ বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন বলিয়া হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে দুইটি নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। প্রথম অভিনয়টি হয় বজ্রপুরের শাখানগর 'সুপুরে' (বা 'স্বপুরে')। উহাতে রামায়ণের একাংশ (রামজন্ম) নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। এ অভিনয়ে প্রদ্যুম্ন নায়কের ভূমিকা, শাম্ব বিদূষকের ও গদ পারিপার্শ্বের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর স্ত্রীভূমিকায় বারনারীগণ নটীরূপে অবতীর্ণা হইয়া ছিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় অভিনয় হয় মূল বজ্রপুরে। তথায় অভিনীত নাটকের নাম ছিল 'রম্ভাভিসার'। এখানে স্বকার্য্যসাধনোদ্দেশে নটবেশধারী প্রদ্যুম্ন, গদ ও শাম্ব নান্দীপ্রয়োগ করিলে পর প্রদ্যুম্ন স্বয়ং গঙ্গাবতরণাশ্রিত মঙ্গল-শ্লোক পাঠ করেন। পরে প্রকৃত নাটকাভিনয় আরম্ভ হয়। উহাতে রাবণের ভূমিকায় শূর, নলকূবরের অংশে প্রদ্যুম্ন, বিদূষকরূপে শাম্ব, ও রম্ভার বেশে 'মনোবতী' নাম্নী এক বারাঙ্গনা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ অভিনয়ে দৃশ্যপটাদিরও অভাব ছিল না। যদুনন্দনগণ মায়াবলে কৈলাস পর্ব্বতের দৃশ্য পর্য্যন্ত হুবহু নকল করিয়াছিলেন। ইহাকে 'রঙ্গমায়া' (stage-illusion) বা 'পুস্ত'-কৌশল ব্যতীত আর কি বলা সম্ভব? কীথ সাহেব হরিবংশের এই উপাখ্যানোক্ত নাট্য-বিবরণ আর মূকাভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তবে তিনি বলেন যে, হরিবংশ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর রচনা। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে বা তাহারও পূর্ব্বে রচিত সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ত অস্তিত্ব এখনও রহিয়াছে। অতএব, হরিবংশের বচন-প্রামাণ্যে ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীনতা প্রতিপাদনের প্রচেষ্টায় তিনি বিশেষ কোন কৃতিত্ব খুঁজিয়া পান না।

এইরূপে পৌরাণিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার প্রায় সকল প্রযত্নই পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের দ্বারা অগ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। এই সকল পৌরাণিক প্রমাণের কোন কোনটি তাঁহা-দিগের মতে প্রক্ষিপ্ত; আর অবশিষ্টগুলি—হয় মূকাভিনয়, নয় চারণগীতি, অথবা কথকতা, কিংবা পুতুলনাচ বা ঐরূপ এমন কোন একটা ব্যাপারের সূচক—যাহাতে নাট্যের অতি ক্ষীণ পূর্ব্বাভাস থাকিলেও যাহা কোন-রূপেই পুরাদস্তর নাট্যাভিনয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে 'নট'শব্দের পর্য্যায়ভূত দুইটি শব্দের আলোচনা একরূপ অপরিহার্য্য। তন্মধ্যে প্রথম শব্দটি হইতেছে 'ভারত'। মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রচারক বলিয়া ভরত-পুত্রগণ ও ভরতপুত্রগণের বংশজাত নটগণ 'ভারত' নামে খ্যাত হন। তাই প্রাচীনশাস্ত্রসম্মত পরিভাষায় 'ভরত' ও 'ভারত' শব্দের অর্থে 'নট'। কিন্তু পাশ্চাত্য গবেষকগণ বলিয়া থাকেন—না, ইহা ঠিক নহে।—ভারতগণ 'ভারত'-শাখার চারণ কবি (rhapsode) মাত্র; এই সূত-চারণগণই প্রথমে গীতাকারে মহাভারতের বীজাংশ গ্রথিত করিয়াছিলেন। পরে ইঁহাদিগেরই দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ও কালে রচিত বিচ্ছিন্ন গীতাংশ একত্র সংবদ্ধ ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া প্রথমে 'ভারত' ও পরে 'মহাভারত' রূপ ধারণ করিয়াছে। মোটের উপর এই চারণগণ শ্রব্য-কাব্যের উদ্ভবকারণ হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু দৃশ্য-কাব্যের সহিত ইঁহাদিগের কোনই সম্পর্ক নাই। এমন কি, এই সকল পণ্ডিত স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, 'ভাট' শব্দটিও 'ভারত' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। পক্ষান্তরে আমাদিগের ধারণা, 'ভাট' শব্দের সহিত প্রাকৃত 'ভট্ট' শব্দ ও সংস্কৃত 'ভর্তৃ' শব্দের সম্বন্ধই নিকটতর। ভট্ট ও চারণগণের জীবিকা প্রায় একই রূপ ছিল—প্রাচীন রাজগণের বা প্রখ্যাত পুরুষদিগের উন্নত কীর্ত্তি-কলাপ ও বংশপরিচয় কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা জীবিকার্জ্জন করিতেন। ভট্টগণ নটগণের ন্যায় কদাচারী (জায়াজীব) ছিলেন না।

আলোচ্য দ্বিতীয় শব্দটি হইতেছে "কুশীলব"। ইহা অবশ্য সকলেরই জানা আছে যে, মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ মহাকাব্যের গান বা আবৃত্তির প্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর যমজ তনয়—কুশ ও লব। তাঁহাদিগের রামায়ণ গানের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্যই 'কুশীলব' শব্দটি 'নট' শব্দের পর্য্যায়রূপে এযাবৎকাল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হয় কি? অবশ্য তাই বলিয়া আমরা এরূপ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে চাহি না যে,

রামতনয়দ্বয়ই নটসম্প্রদায়ের আদিপুরুষ ছিলেন; অথবা মাত্র এইটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই কুশ ও লবের রামায়ণ-গানকে পুরাদস্তুর অভিনয়ের শ্রেণীভুক্ত করাকেও আমরা সঙ্গত মনে করি না,—বিশেষতঃ, যখন বহু গবেষক 'কুশীলব' শব্দটির মধ্যে নটের জাতিগত দুশ্চরিত্রতার আভাস পাইয়া থাকেন, (কুশীলব=কু-শীল+ব)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই শব্দটি ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতার পরিপোষক একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে বলিয়াই আমাদিগের দৃঢ় ধারণা। কারণ, খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও পাণিনি-ব্যাকরণ-সম্প্রদায়ভুক্ত মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি কুশীলবগণের (বিশেষতঃ নটস্ত্রীগণের) চরিত্রদোষের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

তর্কের অনুরোধে না হয় স্বীকার করা গেল যে, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণাদির বিবরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্ভরযোগ্য নহে (৬); অথবা উহাতে মূকাভিনয়-জাতীয় অভিনয়ের আভাস ব্যতীত প্রকৃত নাট্যের কোন প্রসঙ্গই পাওয়া যায় না। কিন্তু মহর্ষি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণসূত্রে যে 'নট' শব্দ, ও 'শিলালিন্' ও 'কৃশাশ্ব' নামক দুইজন নটসূত্রকারের নাম রহিয়াছে, সেগুলিকে ত আর মূকাভিনয়-সম্পর্কিত উল্লেখ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না (৭)। অথচ অধ্যাপক কীথ এস্থলেও তাহাই করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত দুইটি সূত্রেও 'নট' বলিতে 'মূকাভিনেতা' (pantomime) বুঝাইতেছে; অন্ততঃ, 'নট' বলিতে যে এস্থলে পুরাদস্তুর 'অভিনেতা' বুঝাইতে পারে, এরূপ কোন প্রমাণ কেহ দিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার ধারণা। তাহা ছাড়া কীথ সাহেবের মতে পাণিনির আবির্ভাবকাল আন্দাজ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী। অতএব, পাণিনির গ্রন্থে 'নট' বা 'নাটের' উল্লেখ থাকিলেও ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা সিদ্ধ হয় না। অপরন্তু পাণিনির সূত্রে এক 'নটসূত্র' শব্দ ব্যতীত দৃশ্যকাব্য বা অভিনয়ের বাচক অন্য কোন শব্দেরই সন্ধান মিলে না; এ কারণে পাণিনি যে দৃশ্যকাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে।

এই সকল অযৌক্তিক উক্তির বিরুদ্ধে বহু বক্তব্য আছে। মহর্ষি পাণিনি দুইটি আর্ষ 'নটসূত্রের' উল্লেখ করিয়াছেন—সে নটসূত্রদ্বয় অধ্যয়ন করিতেন, এরূপ দুইটি প্রাচীন নট-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের ইঙ্গিতও তাঁহার গ্রন্থে আছে। যে শাস্ত্র পাণিনির আবির্ভাবেরও পূর্ব্বে নিজস্ব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল, তাহা যে তখনও কেবলমাত্র কয়েক-প্রকার মূক অঙ্গবিক্ষেপ প্রদর্শনেই পর্য্যবসিত ছিল, সে শাস্ত্র-সম্প্রদায় যে দীর্ঘকাল ব্যবধানেও নির্ব্বাক্ অভিনয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই—ইহা ঘোরতর অবিশ্বাস্য কথা নহে কি? ভারতের সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রসম্প্রদায়েই দেখা গিয়াছে, শব্দের প্রকাশ অগ্রে, ক্রিয়ার বিকাশ তাহার পরে। অপৌরুষেয় শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া লৌকিক যে কোন শাস্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে শ্রবণ, মধ্যে মনন ও অবশেষে কর্ম্মানুষ্ঠান। শব্দোচ্চারণ ব্যতীত যে দেশের বৈদিক-লৌকিক কোন প্রকার ক্রিয়াই সিদ্ধ হইত না, সেই ভারতে একমাত্র নাট্যসম্প্রদায়ে যুগের পর যুগ—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মূকাভিনয় বিনা বাধায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল—ইহা অতিশয় অশ্রদ্ধেয় সিদ্ধান্ত।

তাহার পর পাণিনির আবির্ভাব-সময়ের কথা। মনস্বী গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী। অধ্যাপক কীথ-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এত দীর্ঘ-কাল পূর্ব্বে পাণিনিকে স্থাপন করিতে নিতান্তই নারাজ; কোনরূপ যুক্তির অবতারণা না করিয়াই তাঁহারা পাণিনির সময় নির্দ্দেশ করেন—খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী (৮)। অধ্যাপক শ্রীপাদকৃষ্ণ বেল্‌ভাল্‌কর

(৬) অগ্নিপুরাণে নৃত্য ও অভিনয় সম্বন্ধে নাতিবিস্তৃত বিবরণ আছে (অগ্নিপুরাণ, বঙ্গবাসীসংস্করণ, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে অগ্নিপুরাণের এ অংশ-গুলি বহু পরবর্ত্তী যুগে প্রক্ষিপ্ত—ভরত-নাট্যশাস্ত্রাদিরও পরবর্ত্তী।

(৭) "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ (পাঃ ৪।৩।১১০); 'শিলালিন্' কর্ত্তৃক প্রোক্ত নটসূত্র যাহারা অধ্যয়ন করেন, সেই সকল নটগণের নাম 'শৈলালিনঃ'। "কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ" (পাঃ ৪।৩।১১১) কৃশাশ্ব-প্রোক্ত নটসূত্রের অধ্যেতা নটগণের নাম—'কৃশাশ্বিনঃ'।

(৮) সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' ও ক্ষেমেন্দ্রের "বৃহৎকথা-মঞ্জরীতে" বর্ষ, উপবর্ষ, পাণিনি, ব্যাড়ি, ইন্দ্রদত্ত, গুণাঢ্য, শর্ব্ব-বর্ম্মা, বররুচি (কাত্যায়ন), নন্দ, শকটাল, যোগানন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য প্রভৃতি সকলেই সমকালীন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হয়ত গুণাঢ্যের অধুনালুপ্ত বৃহৎকথাতেও এইরূপ উপাখ্যানই বর্ণিত ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে দৃঢ়তর প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই সকল কাহিনীর প্রামাণিকতা ও ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা যায় না।

তাঁহার "সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্প্রদায়" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, পাণিনিকে কোন ক্রমেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর নিম্নে স্থাপন করা যাইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, পাণিনির গ্রন্থে দৃশ্যকাব্যসম্পর্কিত কোন শব্দের অভাব হেতু পাণিনির নাট্যবিদ্যার সহিত পরিচয়ের অভাব অনুমান করিতে যাওয়াও নিতান্ত যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। যে সকল শব্দ সাধারণ নিয়মে ব্যুৎপন্ন হয় না, মাত্র সেই সকল অসাধারণ শব্দই তাঁহার বিশিষ্ট সূত্রগুলিতে স্থান পাইয়াছে। সাধারণ নিয়মে ব্যুৎপন্ন কোন শব্দই ত তাঁহার কোন সূত্রে দৃষ্ট হয় না। উদাহরণ-স্বরূপে আমরা 'গজ' শব্দের উল্লেখ করিতে পারি। পক্ষান্তরে তাঁহার সূত্রমধ্যে 'অজ' শব্দের সন্ধান মিলে। অতএব, অধ্যাপক কীথের অনুসরণে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, মহর্ষি 'গজ' নামক প্রাণীর সহিত পরিচিত ছিলেন না—বরং তাঁহার পরিচয় ছিল 'অজ' নামক প্রাণিবিশেষের সহিত! মহর্ষি নটসূত্রদ্বয়ের উল্লেখ করিলেন, তথাপি নাট্যবিদ্যার সহিত তাঁহার পরিচয়ের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেল না, ইহা যাঁহারা বিনা দ্বিধায় বলিতে পারেন, তাঁহাদিগের এতাদৃশ গবেষণার মূলে কোন গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে—সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক।

উক্ত অন্যতম নটসূত্রকার কৃশাশ্ব একজন দিব্যাস্ত্রবেত্তা ঋষি ছিলেন, ইহার প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। মহাকবি ভবভূতি তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রবিদ্যার গুরু বলিয়া 'মহাবীরচরিত' (প্রথমাঙ্ক) ও 'উত্তররামচরিত' (প্রথমাঙ্ক) নাটকদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। কীথপ্রমুখ পণ্ডিতগণ কৃশাশ্বকে প্রসিদ্ধ ইন্দো-ইরাণীয় বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন (৯)। আবার, 'শিলালিন্' নামটিও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে—'শতপথব্রাহ্মণে' আচার্য্য 'শৈলালি'র নাম পাওয়া যায়। এক কালে ঐ নামে একটি বৈদিক শাখাও প্রচলিত ছিল—ঐ শাখার 'শৈলালিব্রাহ্মণ' বর্ত্তমানে আমাদিগের নিকট অপরিচিত নহে (আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্র ৬।৪।৭) পক্ষান্তরে, স্বর্গত অধ্যাপক সিল্ভ্যাঁ লেভি এই দুইটি নামের মধ্যে কিছু শ্লেষের সন্ধান পাইয়াছেন। কৃশাশ্ব একজন মহাবীর, অথচ তাঁহার নাম কৃশাশ্ব (কৃশ অশ্ব যাহার)। 'শিলালিন্' শব্দেও ঐরূপ শ্লেষ (শিলালিন্—শিলাশয্যাশায়ী)।

'কৃশাশ্ব' ও 'শিলালিন্' শব্দে শ্লেষ থাকুক বা না থাকুক, ইঁহাদিগের রচিত 'নটসূত্র' যে অতি প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না (১০)। যদি কীথ সাহেবের মতই স্বীকার করা যায় যে, পাণিনির আবির্ভাব-কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী, তাহা হইলেও উক্ত নটসূত্রদ্বয়কে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীর রচনা বলিতে হয়। অন্যথা পাণিনির বয়স্ খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী ধরিলে নটসূত্রদ্বয়ের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর পরে ফেলিতে পারা যায় না। আর তাহা হইলেই প্রাচীন ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির উপর গ্রীকপ্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে গ্রীসে পুরাদস্তর নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল—একথা এখনও পর্য্যন্ত কোন পাশ্চাত্য গবেষক বলিতে সাহস পান নাই।

অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের পরেই উঠে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র কথা। অর্থশাস্ত্রে 'কুশীলবকর্ম্ম' (১৷৩), 'নটনর্ত্তক-গায়কবাদকবাগ্জীবনকুশীলবপ্লবকসৌভিকচারণ', 'রঙ্গোপজীবিনী', 'রঙ্গোপজীবী' (২।২৭) প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। কথাসরিৎসাগরের প্রমাণে কৌটিল্য পাণিনির সমকালবর্ত্তী। আর বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণে কৌটিল্য, চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দরাজগণ সমকালবর্ত্তী (খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী)। ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও এই মতই পোষণ করেন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তা-

(৯) কৃশাশ্ব-কেরেশস্প (অবেস্তা)। (ক) দক্ষকন্যা অর্চি ও ধীষণার গর্ভে কৃশাশ্বের ঔরসে দিব্যাস্ত্রসমূহের জন্ম হয় (হরিবংশ ৩।১২)। (খ) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাশ্বের পুত্র কৃশাশ্ব; তাঁহার ভার্য্যাদ্বয় অর্চি ও ধিষণা (ধীষণা) (ভাগ ৬।৬)। (গ) ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সংযমের পুত্র (ভাগ ৯।২)। দেবর্ষি কৃশাশ্বের এক পুত্রের নাম প্রহরণ; অপ্সরাঃ ঘৃতাচীর গর্ভে তাঁহার 'নৈধ্রুব' নামে আর এক পুত্র জন্মে (কূর্ম্ম ১৮,১৯)। (ঙ) ইক্ষ্বাকুবংশীয় সংহতাশ্বের দুই পুত্র—কৃশাশ্ব ও অক্ষণাশ্ব (কূর্ম্ম ২০)। (চ) মনুবংশীয় বহুলাশ্বের পুত্র (ভাগ ৯।৬)। (ছ) মনুবংশীয় সহদেবের পুত্র (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১)।

(১০) অধ্যাপক বেল্ভাল্কর বলেন—যদিও মহর্ষি ভরত আদি নাট্যশাস্ত্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তথাপি অধুনা উপলভ্য-মান 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া বোধ হয়। অতএব উক্ত নটসূত্রদ্বয় বর্ত্তমানে প্রচলিত নাট্যশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর।

নাই। কৌটিল্যকে হয়ত খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ফেলিতে কাহারও আপত্তি না হইতে পারে ; কিন্তু অধ্যাপক জলি, অটো ষ্টীন, উইণ্টার নিজ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের মতে বর্ত্তমানে উপলভ্যমান অর্থশাস্ত্রখানি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত—কৌটিল্যের নামে প্রচলিত (১১)। অতএব, উক্ত গ্রন্থের প্রামাণ্যেও ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে চাহেন না।

'কামসূত্রে' 'নাটকাখ্যায়িকাদর্শন' (১।৩।১৪), 'নটী' (৭।১।১৪), 'কুশীলবভার্য্যা' (৫।১।১৭), 'প্রেক্ষণক' (৪।১।১৫) 'প্রেক্ষা' (১।৪।৯) প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দর্শনে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, কামসূত্র-রচনাকালেও ভারতে নাট্যবিদ্যার প্রচার বিশেষ ভাবেই ছিল। কিন্তু কামসূত্র যে বিশেষ প্রাচীনকালের রচনা—তাহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না।

আর অর্থশাস্ত্র যে ক্ষেত্রে অপ্রমাণ, তথায় কামশাস্ত্রের প্রামাণ্য যে সহজে স্বীকৃত হইবে, তাহাও বোধ হয় না। কামসূত্রের রচয়িতা মহর্ষি বাৎস্যায়ন। প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্রের মতে কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন অভিন্ন ব্যক্তি।

(১১) মমঃ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, মমঃ গোপীনাথ কবিরাজ Cambridge History of India (Vol. 1)এর সম্পাদক প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মত—কৌটিল্য বা কৌটিল্যই স্বয়ং মৌর্য্যযুগে 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বহু মতভেদ বর্ত্তমান।

আবার অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ বলেন যে, হয় ত কৌটিল্যের নামান্তর বাৎস্যায়ন ছিল, কিন্তু অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বাৎস্যায়ন কামসূত্র-রচয়িতা বাৎস্যায়ন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত জলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে কামসূত্রের রচনা-কাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী। পক্ষান্তরে, প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ-পণ্ডিত স্মিড্ বাৎস্যায়নকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থাপন করিতে চাহেন। এই সকল পরস্পরবিরোধী মতবাদ হইতে এইটুকু মাত্র অনুমান করা সম্ভব যে; পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ অর্থশাস্ত্রের ন্যায় কামসূত্রকেও খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে স্থাপন করিতে নারাজ। অতএব, তাঁহাদিগের মতে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা প্রতিপাদনে কামসূত্রের বচনেরও বিশেষ কোন মূল্য থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমানে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে অর্থশাস্ত্র বা কামসূত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে না পারিলেও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রোক্ত প্রমাণ যে কোন ক্রমেই উপেক্ষার যোগ্য নহে—তাহা অধিকাংশ সুধী ব্যক্তিই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার ফলে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে। অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতেও যে ভারতে নাট্যচর্চ্চা ও নটসূত্র-রচনা হইত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহর্ষি পাণিনির গ্রন্থ হইতে অসংশয়ে পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

নববধূ

কি কর! হাত ছাড়ো দেখে কেউ ফেল্‌বে!
ঠাট্টায় তামাসায় বিঁধে মোরে ফেল্‌বে!
তুমি ভালোবাসো, বাকী নাই জান্‌তে!
মুখে বলে কিবা লাভ দেখে চাই মান্‌তে!
আমি ভালোবাসি কি না! কেন চাও শুন্‌তে?
হ্যাঁগা, তুমি পার নাকি ভালো হাত গুণ্‌তে?
দেখি আজ আমি কি কি কায কর্‌বো?
লেখা নেই? তবে বলো, আমি কবে মর্‌বো?
আমি মরে গেলে পার্‌বে না সইতে?
"পরী-বৌ" ঘরে এনে প্রেম-বাণী কইতে?
বুঝি সুন্দর! করো শুধু অভিনয়!
মরি যদি, বিয়ে তুমি কর্‌বেই নিশ্চয়!
কাছে বল্‌বেই ছিনু কত কুৎসিত!
তুমি কেন দোষী হবে? পুরুষের এই রীত!

হাতে মোর লেখা আছে অকাল-বৈধব্য?
বিদ্যে শিখেছো খুব, হও নাই সভ্য!
হাত ছাড়!...ও কি করো...কথা কও আস্তে,
ছেলে মানুষের মত এত পারো হাস্‌তে।
করো কি...আঃ, ছাড়ো চুল, বড্ড যে লাগ্‌ছে...
...ও ঘরেতে ব'সে ওরা নিশ্চয় রাগ্‌ছে!
তোমার কাছেতে আসা, করা শুধু অন্যায়
সব কায পড়ে থাকে মিথ্যা সময় যায়।
খুলে দিলে চুলগুলো! ভালো চাও...বেঁধে দাও
আমি কি তা জানি তুমি পার কি না পার তাও!
এ মালা কোথায় পেলে? সুন্দর ফুল তো!
এনেছ আমার তরে? করো নাই ভুল্‌তো?
কেন এত ভালোবাসো, সত্যি গো...বল না...
• কি আমার দাম, ভাবি—নহে তো এ ছলনা?

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেনগুপ্ত (এম-এ)।
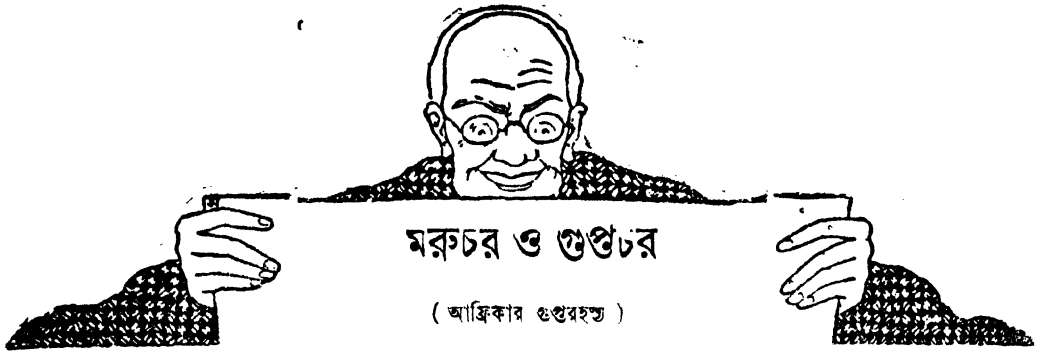
মরুচর ও গুপ্তচর

(আফ্রিকার গুপ্তরহস্য)

আফ্রিকার আলেকজান্দ্রিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-জগতের মিলন-ক্ষেত্র, এবং বহু বিচিত্র রহস্যের আকর। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি বিরাজিত, নীল নদের ‘ব’দ্বীপের একটি দীর্ঘ বাহু পূর্ব্বে প্রসারিত। নীল নদের সলিল-স্পর্শ-শীতল সমীরণপ্রবাহ আলেকজান্দ্রিয়ার উপকণ্ঠস্থ মরুভূমির সুতীব্র উত্তাপ অপসারিত করিয়া ইহাকে স্নিগ্ধ করিতেছে। ইহার সুদৃশ্য পণ্যবীথী প্রাচ্য মহাদেশ-সুলভ বহু বিচিত্র পণ্যসম্ভারে পূর্ণ; কারুখচিত নানা জাতীয় কার্পেট তাহাদের মধ্যে প্রধান। প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে যে নবীন আলেকজান্দ্রিয়া গঠিত হইয়াছে, তাহা সুদূর অতীতের ও বর্ত্তমানের সংযোগস্থল। প্রাচীন নগরীর অবসাদশিথিল স্বপ্নবিজড়িত ভাবের, এবং নবীন নগরীর জাগ্রত উদ্দীপনা ও অশ্রান্ত চাঞ্চল্যের সম্মিলনে যেন কোন কুহকীর ঐন্দ্রজালিক দণ্ডের আন্দোলন অনুভূত হইয়া থাকে।

কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার এক দিক্ যেমন উজ্জ্বল, অন্য দিকে অন্ধকারও সেইরূপ গভীর। বহু অবৈধ কার্য্যের অন্যতম নিষিদ্ধ পণ্য দ্রব্যের চালান, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের রপ্তানী-সূত্রে উভয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার সহিত সংযুক্ত। এই অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া বহু ব্যক্তি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। যুরোপের নানা দেশে যে কোকেন ও হিরোইন প্রস্তুত হয়, তাহা আলেকজান্দ্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। যাহারা এই কার্য্যে রত থাকে, তাহারা অসাধারণ চতুর, এবং যে সকল কৌশলে তাহারা তাহা রপ্তানী করে, সেই কৌশল এইরূপ বিচিত্র যে, জনসাধারণের তাহা ধারণার অতীত।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এক দিন আলেকজান্দ্রিয়া নগরের শুল্ক আফিসের প্রধান দরজায় একখানি মোটর-কার দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চালকের আসনে একটি সুবেশধারী মিশরীয় যুবক উপবিষ্ট ছিল; তাহাকে দেখিলে মনে হইত, কয়েক মিনিটের মধ্যে যে ভিক্টোরিয়া জাহাজ জেটিতে ভিড়িবে, তাহাতে তাহার কোন বন্ধুর আগমনের কথা; তাহারই সে যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল। অল্পকাল পরে জাহাজ বংশীধ্বনি করিয়া জেটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু যুবকটি তখনও তাহার মোটর-কার হইতে নামিল না। অবশেষে জাহাজের আরোহীরা তীরে অবতরণ করিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইলেও তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ অচঞ্চল। তাহার ভাবভঙ্গীতে অধীরতার চিহ্নমাত্র ছিল না।

এই যুবকের নাম এলবার্ট মালেম। সে তাহার গাড়ীতে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিল। কয়েক মিনিট পরে দুইটি চট্‌পটে তরুণী এক একটি পোঁটরী বহন করিয়া ডকের দেউড়ি পার হইয়া বাহিরে আসিল। তাহাদিগকে দেখিয়া এলবার্ট ব্যগ্র ভাবে তাহার ‘কার’ হইতে নামিয়া মহাসমাদরে তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যে অধিক সুন্দরী, তাহার নাম ফ্যানি এপোষ্টোলেটস; সে যুবকটির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গভীর আগ্রহে উভয় হস্তে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিল। যুবক তাহার মুখচুম্বন করিল; তাহার পর তিন জনেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ আরম্ভ করিল।

অতঃপর এলবার্ট মোটর-গাড়ীর ‘সেল্‌ফ ষ্টার্টারে’ খোঁচা দিয়া তাহা চালাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু গাড়ী চলিল না। তখন সে গাড়ী হইতে নামিয়া পশ্চাতের ধুরা (Back asle) পরীক্ষা করিল, এবং পাঁচ মিনিট তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তাহার আসনে ফিরিয়া আসিল। ধুরাসংলগ্ন বাক্সে ও সেল্‌ফ ষ্টার্টারে কি গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল, তাহা সে জানিত; সুতরাং ত্রুটি সংশোধিত হওয়ায় গাড়ী চলিতে লাগিল।

নগরের দূরে-পথে মোটর-কার পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। নগরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি উদ্যান-ভবন ছিল, এলবার্ট তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিল; কিন্তু গাড়ী চালাইবার সময় সে পুনঃ পুনঃ পশ্চাতে চাহিতে লাগিল। সেই সময় পথে বিস্তর মোটর-কার যাতায়াত করিতেছিল; এই জন্য কোন মোটর-কার তখন তাহার অনুসরণ করিতেছিল কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার সঙ্গিনী ফ্যানিও উৎকণ্ঠিত চিত্তে পুনঃ পুনঃ পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গিনী জীন চ্যালিন স্তব্ধভাবে তাহার পার্শ্বে বসিয়া ছিল।

এলবার্ট প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ফ্যানির মুখের দিকে চাহিলে ফ্যানি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, “আমাদের সন্দেহটা ঠিক; তবে আমাদের অনুসরণ-কারী পুলিস, কি গোয়েন্দেভিস্‌-দল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; সম্ভবতঃ শীঘ্রই আমাদিগকে থামিতে হইবে। যাহা হউক, উড়িয়া চল এলবার্ট, ইহাই আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।”

এলবার্ট অধিকতর বেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। তখন তাহারা নগরের জনতা ছাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত ফাঁকা পথে আসিয়া পড়িয়াছিল। গাড়ী বায়ুবেগে ধাবিত হইল।

প্রথমে ঘণ্টায় ৬০, তাহার পর ৭০, এবং অবশেষে ৭৫ মাইল বেগে গাড়ী যেন উড়িয়া চলিল; পথ সোজা, কিন্তু যেন অসীম; তাহার উভয় পার্শ্বে তালীকুঞ্জ, দূরে রৌদ্রপ্রতপ্ত মরুভূমি, মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ তরুশ্রেণীপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর; প্রান্তর-প্রান্ত মরুবক্ষে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু এলবার্ট বায়ুবেগে মোটর চালাইয়াও পশ্চাতের গাড়ীর দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিতে পারিল না; তাহার অনুসরণকারী

মোটর-কার ক্রমশঃ মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান হ্রাস করিয়া তাহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

ফ্যানি তাহার সঙ্গীকে চঞ্চল স্বরে বলিল, "আসিয়া পড়িল যে ! ও নিশ্চিতই পুলিসের 'কার'। গৌরেভেডিস্-দল এত সহজে আমাদিগকে ধরিতে পারিত না।"

তাহাদের অনুসরণকারী সত্যই 'পুলিস-কার'। পুলিসের 'কেন্দ্রী নার্কোটিক্স বুরো' যতই সতর্ক হউক, যে সময় তাহারা সংবাদ পাইয়াছিল, তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এলবার্ট মালেমের যাত্রারম্ভের পূর্ব্বে তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিতে পারে নাই। তাহার পর পুলিস-কার দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে শুভ্র য়ুনিফর্ম্ম-ধারী পুলিস-কর্পোরাল পুলিশ-কার হইতে রুমাল উড়াইয়া অগ্রগামী এলবার্টকে গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিল। পুলিস-কার তখন এলবার্টের গাড়ীর কয়েক গজ মাত্র পশ্চাতে ছিল।

এলবার্ট হাসিয়া বলিল, "পুলিস আমাকে গাড়ী থামাইতে বলিতেছে; কিন্তু তাহাতে ফল কি? উহারা আমাদের গাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কিছুই পাইবে না।"

মাদক 'ব্যারণ' ডেভিড গৌরেভেডিস্
(নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের কারখানাওয়ালা)

সে গাড়ী থামাইলে পুলিস-কার তাহার গাড়ীর পাশে আসিয়া পড়িল। পুলিশ-কর্ম্মচারী, কর্পোরাল এবং একটি 'প্রাইভেট' তৎক্ষণাৎ সেই গাড়ী হইতে পথে লাফাইয়া পড়িল।

পুলিস-কর্ম্মচারী বলিল, "তোমাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম, সকলে আমাদের গাড়ীতে উঠিয়া এস।"—তাহার পর পুলিস-কর্ম্মচারী কর্পোরালকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাসান, তুমি ঐ গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া চল।"

এলবার্ট বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধাভরে বলিল, "কি অভিযোগে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল? আমরা মোটরে চড়িয়া একটু ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছিলাম।"—এ কথা বলিলেও সে পুলিসের অবাধ্য হইল না, তাহার সঙ্গিনীদ্বয় সহ পুলিস-কারে উঠিয়া বসিল। জীন চ্যালিন নাম্নী যুবতী এ দলে নূতন আসিয়াছিল, এই ব্যাপারে সে আতঙ্কাভিভূত হইল।

অতঃপর পুলিস-কার সশব্দে আলেকজান্দ্রিয়া নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। বন্দীরা ও পুলিস উভয় পক্ষই নির্ব্বাক্। পুলিস-কার কিছুকাল পরে পুলিসের সদর আফিসে উপস্থিত হইলে এলবার্ট ও তাহার সঙ্গিনীদ্বয়কে পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী জয়েস্ বের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল।

জয়েস্ এলবার্ট মালেম ও ফ্যানিকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন; তাহারা যে সন্দেহভাজন, ইহা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জানা ছিল, তথাপি যথানিয়মে কায করিবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের নাম?"

এলবার্ট অসঙ্কোচে বলিল, "আমার নাম এলবার্ট মালেম, আর আমার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয়ের এক জনের নাম ফ্যানী এপস্টোলেটস্ এবং দ্বিতীয়, জীন চ্যালিন। আমরা কোন বে-আইনী কায করি নাই; সুতরাং আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গোয়েন্দা লেলাইয়া দিয়া এ ভাবে—"

পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী তাহার কথায় বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "থামো; ও সকল কথা আমার জানা আছে। নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের চালানী কারবার-সম্পর্কে তোমাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।—কর্পোরাল, উহাদের পরিচ্ছদাদি খানাতল্লাস করা হইয়াছে?"

কর্পোরাল বলিল, "হাঁ হুজুর; কিন্তু উহাদের পরিচ্ছদাদি খানাতল্লাস করিয়া কোন নিষিদ্ধ মাল পাওয়া যায় নাই বটে, তবে এই দুইটি স্ত্রীলোক যে বৃহদাকার 'গার্টার' পরিধান করিয়াছে, তাহার পকেট আছে।"

এলবার্ট বলিল, "বৃহৎ গার্টারে পকেট থাকা দণ্ডবিধি আইনে কত দিন হইতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, হুজুর তাহা বলিবেন কি?"

প্রধান কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, "উহাদের গাড়ী খানাতল্লাস করা হইয়াছে?"

কর্পোরাল বলিল, "হাঁ হুজুর, গাড়ীও খানাতল্লাস করা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের পরিশ্রম বিফল হইয়াছে, গাড়ীতেও কিছুই পাওয়া যায় নাই।"

কর্পোরালের উত্তর শুনিয়া পুলিসের অধ্যক্ষ জয়েস্ বে ধাঁধায় পড়িলেন; কিন্তু মনের ভাব তিনি গোপন করিলেন। তিনি যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না।

অতঃপর তিনি আসামীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তদন্তসাপেক্ষে তোমরা হাজতে আবদ্ধ থাকিবে।"

তাঁহার কথা শুনিয়া এলবার্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিল, আলেকজান্দ্রিয়ায় তাহার একটি বন্ধু আছেন, তিনি ডেপুটি; এই প্রকার ব্যবহারের জন্য পুলিসকে জবাবদিহি করিতে হইবে। সে ফুর্ত্তি করিবার জন্য মহিলাদের লইয়া গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতেছিল, পুলিস অবৈধভাবে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মহিলাদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত অশিষ্ট ব্যবহার করা হইয়াছে। পুলিস যখন তাহাকে হাজতে লইয়া চলিল, তখন সে পুলিসকে গালি দিতে লাগিল।

তাহাদিগকে হাজতে পাঠাইয়া জয়েস্ বে বলিলেন, "উহাদের মোটর-কার খানাতল্লাস করা হইয়াছে বলিলে; কিন্তু তোমাদের তল্লাসী আমার মনঃপূত হয় নাই। আমি স্বয়ং সেই গাড়ী পরীক্ষা করিব, গাড়ীর নিকট আমাকে লইয়া চল।"

জয়েস বে এবার স্বয়ং খানাতল্লাসী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এলবার্টের মোটর-কারের প্রত্যেক গদী, মেঝের পাটাতন যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে পরীক্ষা করা হইল; পুরু গদীগুলি তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের সাহায্যে খুঁচাইয়া দেখা হইল। ইঞ্জিনের কোন অংশে কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় কি না, তাহারও পরীক্ষার ত্রুটি হইল না; কিন্তু কোনও স্থানে সন্দেহজনক কোন দ্রব্যের সন্ধান হইল না।

বে মোটর-কারের প্রত্যেক অংশ সতর্কভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন; তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এই মোটর-কারের ধূয়ার বাক্সটার গঠন-প্রণালী একটু অদ্ভুত নহে কি?"

এক জন মিস্ত্রী তাহাতে ঘা মারিল, তাহার পর যন্ত্রের সাহায্যে তাহা খুলিয়া ফেলিল; ধূয়ার বাক্সের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়াই সে আনন্দে ও উৎসাহে হুঙ্কার দিল। তাহার পর ছালটি-কাপড় দ্বারা আবৃত একটি পুলিন্দা টানিয়া বাহির করিল। বে তাহার আবরণ অপসারিত করিয়া পুলিন্দার দ্রব্যটি পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হিরোইন! আমি এইরূপই অনুমান করিয়াছিলাম।"

বে তাঁহার সহযোগী বরক্রককে সঙ্গে লইয়া আফিসে প্রত্যাগমন করিলেন। বরক্রক পরীক্ষা-ফলে খুসী হইয়াছিলেন; তাঁহাদের শ্রম সফল হইয়াছিল।

বরক্রক বলিলেন, "আবিষ্কারটা উল্লেখযোগ্য বটে। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, অভিযোগটা হয় ত ফাঁসিয়া যাইবে।"

অধ্যক্ষ জয়েস বে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, যৎসামান্য কিছু পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বরক্রক, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না—এই সামান্য দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া বিশেষ কোন্ ফল হইল না? যে দলের বিরুদ্ধে আমাদিগকে শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, সেই দলটি তুচ্ছ নহে; তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য অনেক চতুর ব্যক্তি মাথা খাটাইতেছে। মালেম ছোকরাকে আমরা বিলক্ষণ শিক্ষা দিতে পারি; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিব না। সে জানে, কোন কথা যদি সে প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার মুরুব্বিরা তাহাকে গুলী করিয়া মারিবে। তাহার পশ্চাতে থাকিয়া কেহ তাহাকে পরিচালিত করিতেছে, এবং তাহারও পশ্চাতে অন্য এক জন পরিচালক আছে। এই দলের শক্তির কেন্দ্র কোথায়, তাহাই আমাদিগকে আবিষ্কার করিতে হইবে। গোরেভেডিস-দল য়ুরোপে যে নিষিদ্ধ মাল চালাইতেছে, যদি আমরা তাহা বন্ধ করিতে পারি, তাহা হইলেই একটা কাযের মত কায হইবে।"

অতঃপর জয়েস বে বরক্রকের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলে বরক্রক পত্রখানির ভাঁজ খুলিয়া নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠ করিলেন,—

"ইটালীর কন্‌সল-জেনারেল আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, সীলমোহর করা যে পাঁচটি ট্রাঙ্ক প্রেরিত হইয়াছে, তাহা যেন আমরা খুলিয়া পরীক্ষা না করিয়াই ছাড়িয়া দিই।"

বরক্রক পত্রখানি পাঠ করিয়া জয়েস বের মুখের দিকে চাহিলে জয়েস বে হাসিয়া বলিলেন, "পত্রখানি যে জাল চিঠি, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ আছে কি? আজ প্রভাতে পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। এই পত্র পাইয়াই আমি কন্‌সল-জেনারেলের আফিসে সন্ধান লইয়াছিলাম। তাঁহারা এই পত্র সম্বন্ধে কোন কথা জানেন না বলিয়াছিলেন। পত্রে যে পাঁচটি ট্রাঙ্কের উল্লেখ আছে, সেগুলি এখনও খুলিয়া দেখা হয় নাই; কিন্তু তাহাতে হয় হিরোইন, না হয় কোকেন প্রেরিত হইয়াছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু কে ঐগুলি প্রেরণ করিয়াছে? মালেম ও তাহার সহকর্ম্মীরা কাহার আদেশে পরিচালিত হইতেছে? মালেম যে মোটর-কার চালাইতেছিল, তাহার ধূয়ার ঐ প্রকার বিশেষ আকারের বাক্সই বা কে নির্ম্মাণ করিয়াছে? নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের চালানী কারবারের সহিত এই সকল লোকের সংস্রব আছে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

অতঃপর এলবার্ট মালেমকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করা সম্ভব হইবে না, জয়েস বে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। এলবার্ট পুলিসের নিকট অনেক কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভিতর একটিও কাযের কথা ছিল না। ফ্যানি এপস্টোলেটস্ নাম্নী যুবতীও এলবার্টের পন্থার অনুসরণ করিয়াছিল। সে আবোল-তাবোল অনেক কথা বলিলেও কাযের কথা একটিও বলে নাই। দ্বিতীয়া যুবতী কিছুই জানিত না। বরক্রক তাহার চোখ-মুখের ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, দলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, সম্ভবতঃ শিক্ষানবিশরূপে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে তাহাকে দলে গ্রহণ করা হইয়াছিল; দলের গুপ্ত কথা সে কিছুই জানিত না। এ অবস্থায় তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার মুখ হইতে কোন কোন গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বরক্রক তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে মুক্তিদান করা হইল, তুমি যাইতে পার। কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি ইহাদের সংস্রব হইতে দূরে থাকিবে। আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উহাদের সহিত পুনর্ব্বার ঘনিষ্ঠতা করিলে তোমাকে দারুণ বিপদে পড়িতে হইবে, এ কথা স্মরণ রাখিও। আর যদি তোমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাদের সদর আফিসে যাইবে।"

মালেমের সহকর্ম্মিগণের সন্ধান মিলিল না। ভিক্টোরিয়া জাহাজের অন্যান্য আরোহিগণের সন্ধান লওয়া হইল। তাহাদিগের পরিচয়াদি গ্রহণের পর দুই একজনকে সেই দলের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া সন্দেহ করা হইল বটে, কিন্তু তাহাতে রহস্যভেদের কোন সুবিধা হইল না। নিবিড় রহস্যান্ধকারে বিন্দুমাত্র আলোকস্ফুরণ লক্ষিত হইল না। যাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা দুর্লঙ্ঘ্য পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে সম্পূর্ণ নিরাপদে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর জয়েস বে বরক্রকের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বে চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, "এখন আমরা কোন্ পথে অগ্রসর হইব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না; তবে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় বা তাহার সন্নিহিত কোন স্থানে উহাদের কর্ম্মকেন্দ্র অবস্থিত। কন্‌সল-জেনারেলের আফিসের যে চিঠির কাগজখানি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আসল কাগজ, কৃত্রিম নহে। কেবল উহাতে যে স্বাক্ষরটি আছে, তাহাই জাল। চিঠির কাগজখানি তাহারা অতি সহজেই সংগ্রহ করিতে

পারিয়াছিল বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই দলের কোন লোক উক্ত আফিসেই আছে, এ কথাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কাগজ-খানি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।"

বরক্রক ইঙ্গিতে অধ্যক্ষের এই মন্তব্যের সমর্থন করিলেন। তাঁহাদের এলাকায় দীর্ঘকাল হইতে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের অবৈধ আমদানী রপ্তানী চলিতেছিল, অথচ তাঁহারা ইহাতে বাধা দান করিতে অসমর্থ, এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন।

এই সময় একটি নূতন ঘটনা সংঘটিত হইল। নিষিদ্ধ মাদক-দ্রব্য বিক্রয় করে—এই সন্দেহে একটি লোককে গ্রেপ্তার করা হইল; কিন্তু তাহার নিকট কোন মাদক দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। তবে তাহার পকেটে ধূলিবৎ যে গুঁড়া সংগৃহীত হইল, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসাধ্য হওয়ায় পরীক্ষার জন্য তাহা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হইল।

রসায়নবেত্তা সেই চূর্ণ পরীক্ষা করিয়া পুলিস আফিসে যে রিপোর্ট পাঠাইলেন, জয়েস বে তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন, "এ এবং বি চিহ্নিত মোড়কে যে নমুনা প্রেরিত হইল, তাহাতে মরফাইন ও হিরোইনের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব বর্ত্তমান।"

উক্ত চূর্ণ ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তির পকেটে এক টুকরা কাগজ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও উপেক্ষাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। উহাতে লিখিত ছিল,—"বিটার লেক্‌স ৩১এ আগষ্টের কাছাকাছি।"

বে তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ ইহা তেমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নহে; তবে ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে কি না, তাহা তাহাকে খুঁচাইয়া বাহির করিতে হইবে। মরুভূমির প্রান্তদেশে সিনাইএর যে সীমান্তভূমি অবস্থিত, সেই স্থান হইতে নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য কিছু কিছু আসিতেছে, এরূপ মনে করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না।"

অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সে তাহা বাজে কথা বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল; অধিকন্তু সে আত্মসমর্থনের জন্য বলিল, সে সম্রান্ত এজেণ্ট, মাদকদ্রব্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ঐ জিনিসটি স্যাকারিন, এবং স্যাকারিন বলিয়াই তাহা বিক্রয় করা হইয়াছিল। এ কথা সত্য যে, একদল সার্থবাহ রেশম ও নানা-প্রকার মশলা সহ মিশরে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার একটি বন্ধু তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিল যে, ঐ সকল বণিক্ নগরে উপস্থিত হইবামাত্র সে যেন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করে। কারণ, সে তাহাদের নিকট হইতে কিছু মশলা লইয়া বিক্রয় করিলে কমিশন পাইতে পারে। এই প্রকার কার্য্যই তাহার উপযোগী; কারণ, সে সম্রান্ত এজেণ্ট ইত্যাদি।

জয়েস বে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন; এই শ্রেণীর গল্প তিনি পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বরক্রককে বলিলেন, "মসলার পরিবর্ত্তে 'হসিস্' শব্দ ব্যবহার করিতে পার। সিনাই-সীমান্তে যত ঘাটি আছে, সর্ব্বত্র টেলিগ্রাম কর।"

'হসিস্' এক প্রকার উগ্র, চেতনানাশক মাদকদ্রব্য; নর-হত্যার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া এই শব্দ হইতে 'এসাসিন্' কথাটির উৎপত্তি।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বরের কথা। মধ্যাহ্নের সূর্য্য আফ্রিকার সাহারিয়া মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর অগ্নি-বর্ষণ করিতেছিল। সেই সময় সীমান্ত-পুলিসের এক জন কর্পোরাল এবং তাহার তিন জন অনুচর মরু-বক্ষে উপবেশন করিয়া দূরবীণের সাহায্যে সতর্কতা সহকারে সার্থবাহগণের প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়াও, জনমানবের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া তাহারা অবসন্ন ও হতাশ হইয়া পড়িল। সিনাই-সীমান্ত হইতে যে সকল বণিক্ উষ্ট্রারোহণে মরুভূমিতে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদের প্রত্যেক দলেরই গতিবিধি পুলিস এই ভাবে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহারা তখন পর্য্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে না পারিলেও, তাহারা জানিত কোন কোন ধূর্ত্ত ও ভীষণ-প্রকৃতি লোক সম্রান্ত আরব বণিকের ছদ্মবেশে মিশরের সীমান্ত-ভূমি অতিক্রম করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে।

যাহা হউক, কর্পোরাল অবশেষে তিন জন সার্থবাহকে দেখিতে পাওয়ায় তাহাদের পণ্যদ্রব্যাদি পরীক্ষা করিল; কিন্তু তাহাদের কাহারও নিকট আপত্তিজনক কোন দ্রব্য দেখিতে পাইল না। তাহারা কোন প্রকার নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য রপ্তানী করিতেছিল, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা দূর হইল না; সে তাহাদিগকে বিদায় দান করিয়া অতঃপর কি করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সেই সময় অদূরে চীৎকারধ্বনি শুনিয়া কর্পোরালের চিন্তাস্রোতঃ অবরুদ্ধ হইল। সে তাহার অনুচরবর্গের দিকে ফিরিয়া চাহিতেই তাহার এক জন অনুচর সেই মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। তদনুসারে সে তাহার হাতের দূরবীণে চক্ষু স্থাপন করিয়া দূরে—বহু দূরে দিক্‌চক্রবাল-সীমায় কয়েক জন উষ্ট্রারোহীকে দেখিতে পাইল। কর্পোরালের ধারণা হইল, তাহারা যেন কয়েকটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকা, স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া-ছিল। কয়েক মিনিট পরে সে উষ্ট্রারোহিগণকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল। ছয় জন সার্থবাহ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

ছয় জন উষ্ট্রারোহীকে মন্থরগতিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কর্পোরাল তাহার সঙ্গিগণকে যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিল।

উষ্ট্রারোহীরা এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিস-প্রহরিগণের অদূরে উপস্থিত হইল। ছয়টি উষ্ট্রে যে সকল পণ্যদ্রব্য ছিল, তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এক এক জন বেদুইন প্রত্যেক উষ্ট্র পরিচালিত করিতেছিল। এই সকল বেদুইনের মস্তক ও মুখ-মণ্ডল আংশিক ভাবে অবগুণ্ঠনাবৃত। এক একটি সুদীর্ঘ রাইফেল প্রত্যেক উষ্ট্রচালকের পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। কর্পোরাল উষ্ট্রারোহিগণকে থামিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে তাহাদের দলপতি ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল বটে, কিন্তু তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না, শ্রেণীবদ্ধ ছয়টি উষ্ট্রই সম্মুখে আর অগ্রসর না হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

কর্পোরাল সার্থবাহ দলের সর্দ্দারকে বলিল, "প্রত্যেক বণিকের পণ্যদ্রব্যগুলি খানাতল্লাসীর জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের আদেশ পাইয়াছি; সুতরাং তোমরা যে সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছ, তাহা আমরা পরীক্ষা করিব। তবে যত শীঘ্র এই কার্য্য শেষ

হয়, আমরা তাহার ব্যবস্থা করিব। আমাদের কার্য্য শেষ করিতে অনাবশ্যক বিলম্ব হইবে না।"

অতঃপর বণিক্‌গণ উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলে খানা-তল্লাসী আরম্ভ হইল। সার্থবাহগণের দলপতি উৎসাহভরে পুলিসকে তাহাদিগের আরব্ধ কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিল। এই ভাবে সাহায্য করিতে করিতে পুলিসকে সে বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। সে বলিল, পুলিস তাহাদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত বণিক্‌গণকেও নিষিদ্ধ পণ্যের বাহক সন্দেহে তাহাদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করে; ইহা পুলিসের ভদ্রতাজ্ঞানের পরিচায়ক বটে! ভদ্রলোককে অবিশ্বাস করাই উহাদের পেশা—ইত্যাদি।

যাহা হউক, অতঃপর উটগুলির পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রত্যেক গদী নামাইয়া লওয়া হইল। গদীগুলির জোড়ের মুখ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গেল—তাহা ফাঁপা, এবং তাহা 'হসিসের' বিভিন্ন বাণ্ডিল দ্বারা পূর্ণ!

বণিকের দল এই ভাবে ধরা পড়ায় তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া শৃঙ্খলিত করা হইল। কর্পোরাল সেই দলের সর্ব্বশেষ ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য, তুমি যে আমার দোস্ত আবু! তুমি এই দলে ভিড়িয়াছ? আমি তোমাকে সাচ্চা আদমী বলিয়াই জানিতাম আবু!"

উটের গদীর প্রতিকৃতি
(স্বাভাবিক অবস্থা)

আবু বলিল, "আমি আল্লার নামে দিব্য করিয়া বলিতেছি, এখনও আমি তেমনই সাচ্চা আদমীই আছি। আমি এই সকল ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না; কিন্তু পরে আমার মনে কিছু কিছু সন্দেহ হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি খুসী হইয়াছি; আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব।"

কর্পোরাল পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে বলিল, "পরে আমরা ও-সকল কথার আলোচনা করিব।"—

(নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য আবিষ্কারের পর)

কর্পোরাল তাহার অনুচরবর্গের কার্য্য-পদ্ধতি লক্ষ্য করিতে করিতে দেখিতে পাইল, তাহাদের দলের সর্ব্বাপেক্ষা চতুর এবং তল্লাসীকার্য্যে সুনিপুণ লোকটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিল। যেন সে সন্দেহজনক কোন দ্রব্য লক্ষ্য করিয়াছিল। সেই সময় তল্লাসীকার্য্য শেষ হওয়ায় পণ্যদ্রব্যপূর্ণ আধারগুলি যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, এবং বেদুইন উষ্ট্রচালকগণ হাস্যপ্রফুল্ল মুখে তাহাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতেছিল।

কর্পোরাল তাহার অনুচরের ইঙ্গিতে তাহার সম্মুখীন হইলে অনুচরটি নিম্নস্বরে বলিল, "এই সকল উটের পিঠের গদীগুলি অত্যন্ত স্থূল ও বৃহৎ, কর্পোরাল। এগুলি একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে।"

তাহার কথা শুনিয়া কর্পোরাল একটি উটের পার্শ্বে উপস্থিত হইল, এবং তাহার পিঠের গদীটিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে গদী হইতে ঢপ ঢপ শব্দ উত্থিত হইল; গদীটি যে নিরেট নহে, ইহা সে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিল। কর্পোরাল গদীগুলি পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতেছে দেখিয়া বেদুইন সর্দ্দারের মুখভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল; তাহার মুখমণ্ডল ক্রোধ ও উৎকণ্ঠায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। চক্ষুর নিমেষে সে তাহার পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ রাইফেলটি স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সম্মুখে পুলিসের অটোমেটিক পিস্তল যে ভাবে উদ্যত হইল, তাহার অর্থ বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সঙ্গে সঙ্গে বেদুইন সর্দ্দারের সঙ্গীরা পুলিসের রাইফেলসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইল।

অতঃপর সে উষ্ট্রারোহিগণকে লক্ষ্য করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তোমরা নিজ নিজ উটের সওয়ার হও; খবরদার, কোন রকম চালাকী করিলে তোমাদের উপর গুলী চলিবে।"

আসামীগণকে এভাবে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছিল যে, উটের পিঠে সওয়ার হইয়া উট পরিচালিত করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইল না। সার্থবাহগণ অদূরবর্ত্তী থানার অভিমুখে পরিচালিত হইল। পুলিস-প্রহরীরা রাইফেল উদ্যত করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল।

তাহারা থানায় নীত হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাহাদের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ লিখিয়া লইয়া সশস্ত্র প্রহরিবর্গের জিম্মায় তাহাদিগকে সদর আফিসে প্রেরণ করিবে—সেই সময় কর্পোরাল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে আবু নামক উষ্ট্রারোহী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিল। তাহা শুনিয়া দারোগা আবুকে অন্যান্য আসামীর সহিত সদরে না পাঠাইয়া থানায় রাখিয়া দিল।

অন্য সকলে প্রস্থান করিলে দারোগা আবুকে বলিল, "শুনিলাম, তুমি বলিয়াছিলে তোমার সঙ্গীরা যে হসিস্ লইয়া যাইতেছিল, তাহার সম্বন্ধে তুমি কিছুই না কি জানিতে না?"

আবু বলিল, "আল্লার দিব্য, পয়গম্বরের দিব্য, আমি সত্যই কিছু জানিতাম না।"

দারোগা—এই সওদাগরগুলার দলে কিরূপে ভিড়িয়াছিলে ?

আবু বলিল, "দেখুন দারোগা সাহেব, আমার আর্থিক অবস্থা কি রকম স্বচ্ছল ছিল, তাহা আপনার ঐ কর্পোরালের সুবিদিত ; কিন্তু নসিবের ফেরে আমার ধনদৌলৎ সকলই নষ্ট হইল, শেষে কিউবেড্ডিতে আমি অনাহারে মর-মর হইলাম। সেই সময় একদিন সওদাগর দলের ঐ সর্দ্দারের সঙ্গে আমার দেখা। সে বলিল, —উট চালাইবার জন্ত তাহার একজন লোকের দরকার। তাহারা মালপত্র ফেরি করিবার জন্ত আলেকজান্দ্রিয়ায় যাইতেছিল ; উহারা আমাকে কথা দিল, আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছিয়া আমাকে কায দিবে, সেই সময় আমার তলবও মিলিবে।"

দারোগা—আর কোন কথা তোমার বলিবার আছে ?

আবু—হাঁ দারোগা সাহেব, একদিন রাত্রিকালে ঐ সর্দ্দার তাহার একজন তাঁবেদারের সঙ্গে যে পরামর্শ করিতেছিল, তাহা আমি লুকাইয়া শুনিয়াছিলাম। তাহারা হসিসের কথার আলোচনা করিতেছিল। উহা আলেকজান্দ্রিয়ায় লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া কত টাকা লাভ করিবে—তাহাও বলিতেছিল। বলিভার্ড রসেটিতে কে নাকি একজন লোক আছে, তাহারই হাত দিয়া মালগুলি বিক্রয় করা হইবে, এ কথাও শুনিতে পাইয়াছিলাম।"

দারোগা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার নাম কি ? তাহার নাম শুনিতে পাও নাই কি ?'

আবু—না, তাহারা কাহারও নাম বলে নাই, কেবল 'সর্দ্দার' বলিয়া তাহার পরিচয় দিয়াছিল।

কয়েক মিনিট পরে খটাখট্ শব্দে চারি দিকে টেলিগ্রাম চলিতে আরম্ভ হইল।

আবু যে সর্দ্দারের কথা বলিয়াছিল, গোয়েন্দা-পুলিস সন্ধান লইয়া তাহার আস্তানা খুঁজিয়া বাহির করিল।

সহসা এক দিন এক ব্যক্তি সেই গৃহের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমার নাম হামিদ ইস্‌মাইল, ডাক্তার ফালিনার সঙ্গে আমি দেখা করিতে আসিয়াছি।"—ডাক্তার ফালিনাই সেই গৃহের মালিক।

একটি বৃদ্ধা আরব-নারীর হস্তে এই গৃহরক্ষার ভার ছিল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল। তাহার মনিব স্থানান্তরে গমনের সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল—হামিদ ইস্‌মাইল নামক একটি ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। কিন্তু তিনি এত শীঘ্র আসিবেন, বৃদ্ধা এরূপ আশা করে নাই। তাহার মনিবের ঘরে ফিরিতে বিলম্ব হইবে ; এ অবস্থায় বৃদ্ধা আগন্তুককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে কি না, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট চিন্তার পর বৃদ্ধা আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষটি দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল, তাহা কোন সম্ভ্রান্ত সদাগরের আফিস।

বৃদ্ধা আগন্তুককে সেই কক্ষে রাখিয়া প্রস্থান করিলে, আগন্তুক আরব সেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েক মিনিট কাণ পাতিয়া চারি দিকের শব্দ লক্ষ্য করিল ; তাহার পর সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারের চাবি বন্ধ করিল, এবং নিঃশব্দে আফিসের ডেস্কের নিকট গমন করিয়া নকল চাবির সাহায্যে ডেস্কটা খুলিয়া ফেলিল।

ডেস্কের বিভিন্ন খোপে যে সকল কাগজ-পত্র ও ফটো ছিল, তাহা বাহির করিয়া সে তাড়াতাড়ি সেগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। ডেস্কের উপর একটি পুস্তকাধারে কতকগুলি পুস্তক ছিল। আগন্তুক প্রত্যেক পুস্তক বাহির করিয়া তাহার মলাটের মুড়া ধরিয়া সবেগে ঝাঁকাইতে লাগিল। একখানি পুস্তক হইতে একখানি আলগা সাদা কাগজ সেই ঝাঁকুনীতে ঘরের মেঝের উপর খসিয়া পড়িল। আগন্তুক তাহা কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিল। উহা চিঠি লিখিবার কাগজ, কেবল মাথার দিকে আলেকজান্দ্রিয়া নগরস্থিত ইটালীর কন্‌সল-জেনারেলের আফিসের নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত ছিল।

আগন্তুক সেই কাগজখানি পকেটে ফেলিল, তাহার পর পুস্তকগুলি যথাস্থানে রাখিয়া ডেস্কটি চাবি দিয়া বন্ধ করিল, এবং সেই কক্ষের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের সদাগর হাসান বকর

এই পল্লীর নাম বলিভার্ড রসেটি। কয়েক শত গজ দূরে পথের ধারে একখানা মোটর-কার দাঁড়াইয়া ছিল। উক্ত আরব যুবক সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সোফারকে বলিল, "হেড কোয়ার্টার্সে চল।"

বরক্রকই হামিদ ইস্‌মাইলের ছদ্মবেশে এই কার্য্য শেষ করিয়াছিল। তাহার মন আনন্দে, উৎসাহে পূর্ণ হইল। এত সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, ইহা সে আশা করিতে পারে নাই। সিনাই-সীমান্তে সার্থবাহ-দলের যে সর্দ্দারটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহারই নাম হামিদ ইস্‌মাইল। বরক্রক তাহারই ছদ্মবেশে তাহার আফিস এই ভাবে খানাতল্লাস করিয়াছিল। সে সেখানে ইটালীর কন্‌সল জেনারেলের আফিসে ব্যবহৃত চিঠি লিখিবার কাগজ ব্যতীত আরও কোন কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিল,—কয়েকখানি সাঙ্কেতিক পত্র এবং উক্ত ডাক্তার ফালিনার একখানি ফটোগ্রাফ।

বরক্রক তৎক্ষণাৎ জয়েস্ বের সহিত পরামর্শ করিতে চলিল। সে তাহার সংগৃহীত কাগজপত্র ও ফটো জয়েস বের সম্মুখে রাখিল ; কিন্তু একটিও কথা বলিল না। জয়েস বে নির্ব্বাক্‌ভাবে কাগজগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে জয়েস বে মুখ তুলিয়া বরক্রককে বলিলেন, "তুমি অতি প্রশংসনীয় কায করিয়াছ বরক্রক ! তোমার চেষ্টায়

আজ একটা ধাড়ী বদমায়েসের সন্ধান হইল। আবাদ বকরই ডাক্তার ফার্লিনা নামে পরিচিত। এই ফটো দেখিয়াই আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি; উহার পরিচয় সংগ্রহের জন্ত দলীল-পত্র দেখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বকর মিঞা যে এই ব্যাপারে লিপ্ত আছে, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়! উহার ভাই হাসান অতি ভয়ঙ্কর লোক; কিন্তু সে মাদক দ্রব্যের অবৈধ চালানী কার্য্যে যোগদান করিয়াছে, ইহা আমার অজ্ঞাত ছিল।

"আবার মিঞা আলেকজান্দ্রিয়ায় এই অবৈধ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত করিতেছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইলাম। হাসান এই নগরের পূর্ব্বাংশে তাহার ভূসম্পত্তি পরিচালিত করে। শুনিয়াছি, সে তাহার জমিজমার উন্নতি করিতেছে। এখন বুঝিতেছি, সেই স্থানে সে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য সঞ্চয় করে। এখন আমাদিগকে সেই স্থানে খানাতল্লাস করিতে হইবে। আমরা যত শীঘ্র এই আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিতে পারি—ততই মঙ্গলের বিষয় হইবে।"

নগরের পূর্ব্বাংশে বকরের কয়েকখানি কুটীর ছিল। সেই স্থানে সে কতকগুলি পরিখা খনন করাইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে যে জমি ছিল, তাহা কাঁটা-তারের বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বকর মিঞা বলিত, আরব দস্যুগণের চুরি নিবারণের জন্ত তাহাকে সেই স্থানটিতে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হইয়াছিল।

সকলেই তাহার এ কথা বিশ্বাস করিত, এবং পুলিস কোন দিন সন্দেহ না হওয়ায় সেই স্থানটি পরীক্ষা করে নাই।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে-দশটার সময় সেখানে যে ঘটনা ঘটিল, সেই কথা বলিতেছি। তখনও কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র উদিত হয় নাই। বকরের অধিকৃত স্থানটি তখন নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সশস্ত্র পুলিস নিঃশব্দে আসিয়া সেই স্থানে হানা দিল, এবং তিন জন পুলিস-কর্ম্মচারী খানাতল্লাসীর জন্ত আড্ডার দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা অন্ধকারে দুইজন লোককে কাঁটা-তারের বেড়ার ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিল।

পুলিসের প্রধান দল অগ্রসর হইবার আদেশ পাইল। এক জন দারোগা কর্তৃক তাহারা পরিচালিত হইল। দারোগা আড্ডার এক জন প্রহরীকে রাইফেল হস্তে কিছু দূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল, "পুলিস আসিয়াছে, তোমরা শীঘ্র আত্মসমর্পণ কর।"

উত্তর আসিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরে নহে; রাইফেলের একটা গুলী দারোগার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল! তখন অগত্যা পুলিসকে গুলীবর্ষণ করিতে হইল। আড্ডার তিন জন লোক পুলিসের গুলীতে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। অবশেষে পুলিসের সহিত তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হাসান বকর তাহার অনুচরবর্গকে পরিচালিত করিতে লাগিল। পুলিসকে সম্মুখীন দেখিয়া তাহারা ছোরা চালাইতে লাগিল। কিন্তু এই যুদ্ধ অর্দ্ধঘণ্টার অধিক স্থায়ী হইল না। পুলিস সংখ্যাধিক্য বশতঃ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিল। বকরের অনুচরবর্গের অনেকে অন্ধকারে পলায়ন করিলেও বকর এবং তাহার দশ জন অনুচর পুলিসের হস্তে আত্মসর্পণ করায় তাহাদিগকে অবিলম্বে শৃঙ্খলিত করা হইল।
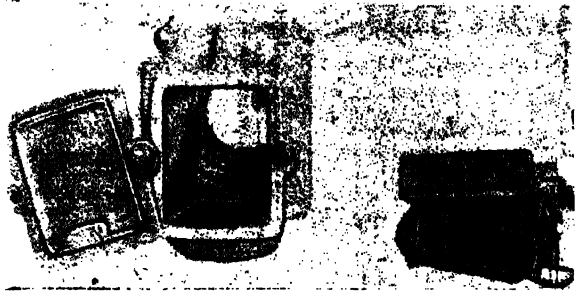
মোটর-কারের ধুরার গুপ্ত বাক্স (নিষিদ্ধ পণ্য হিরোইন-পূর্ণ)

উজ্জ্বল বিজলী-বাতির আলোকে কুটীরগুলি এবং পরিখা খানাতল্লাস করা হইল। কুটীরগুলির মেঝেতে কতকগুলি গভীর গর্ত্ত আবিষ্কৃত হইল; সেখানে প্রচুর পরিমাণে মন্ত, গাঁজা, আফিং, ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য সঞ্চিত ছিল। পুলিস একটি বৃহৎ অট্টালিকার দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই হসিসের ধূমে তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহারা সেই কক্ষের মেঝেতে একদল চণ্ডুখোরকে পড়িয়া থাকিতে দেখিল; উগ্র নেশায় তাহারা তখন উত্থান-শক্তিরহিত। চণ্ডুর নেশায় তাহারা অভিভূত হইয়া অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

তাহাদিগের পাহারার ব্যবস্থা করিয়া জয়েস বে বরক্রককে বলিলেন, 'উহাদের প্রধান আড্ডা ধরা পড়িয়াছে। হাসান ও তাহার ভাই আবাদ বকরকে এবার আমরা অন্যূন দশ বৎসরের জন্ত নির্ব্বাসিত করিতে পারিব।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নিয়তি

যে জন সহিছে সদা রোগের যাতনা,
মৃত্যু যার অহর্নিশি একান্ত কামনা,
মৃত্যু তারে স্পর্শ নাহি করে
বাঁচিতে অধিক দিন সাধ যার মনে,
অটুট দেহের স্বাস্থ্য সুখী ধন-জনে,
অকস্মাৎ সেই জন মরে

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়।

হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ

২

বিবাহ-বিচ্ছেদ ও তাহার উৎপত্তি

এক হিন্দু ব্যতীত জগতের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদপ্রথা বর্ত্তমান ছিল, এবং এখনও আছে। একমাত্র হিন্দু সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত হয় নাই, যেহেতু বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু সমাজের প্রয়োজন নহে। হিন্দু সমাজের গঠন-প্রণালী স্বতন্ত্র; এই জন্যই জগতের অন্য কোন দেশের সভ্যতার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই। এখন দেখা প্রয়োজন, সভ্যতার কোন্ স্তরে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজন হইয়াছিল।

যে সময়ে নারী গার্হস্থ্য-জীবনের মূলধন বলিয়া বিবেচিত হইত, (যেহেতু সে কার্য্যক্ষম পুত্রোৎপাদনে সমর্থা) সে যুগে নারীর কোন সত্ত্বাই ছিল না; সে দাসীরূপে গৃহপালিত পশুবৎ মানবের সহায়তা করিয়াছে—তখন বহু বিবাহের যুগ। কিন্তু নারী যখন তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব লইয়া অর্থ-নৈতিক জগতে আসিয়া পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল, সেই সময়ে পুরুষের এরূপ সাধ্য ছিল না যে, নারীর প্রতি গৃহপালিত পশুবৎ ব্যবহার করে—সেই সময়েই বিবাহ-বিচ্ছেদের উৎপত্তি। যেখানে নারীর বিবাহ যৌন-দাসত্ব মাত্র, সেইখানেই এই বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী স্বাভাবিক। এই কারণেই সমস্ত পাশ্চাত্য মনীষীই মেয়েদের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার দাবী করেন। নারীগণ যদি সত্য সত্যই স্বাধীনা হন, তবে অবশ্য বিবাহে আবদ্ধ থাকিবেন না, ইহাই শ'এর মত। অবশ্য মাতৃত্ব প্রকৃতিগত সম্পদ্ বলিয়া নারী সন্তান প্রসব করিবে, পিতার প্রয়োজন হইবে, কিন্তু নাম-গোত্রের প্রয়োজন হইবে না। পাশ্চাত্য জগৎ আজ সেই পথেই চলিয়াছে। (৩০)।

বিবাহকে যৌন-দাসত্ব মনে করেন বলিয়াই, 'শ'এর নিকট বিবাহ গণিকাবৃত্তিরই নামান্তর মাত্র। (৩১) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-বিবাহ যৌন দাসত্ব নহে, এবং হিন্দু নারীকে সেই কারণেই অর্থনৈতিক জগতে ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য বাহির হইতে হয় নাই। কয়েকজন মাত্র চাকুরী করিতেছেন, তাহার কারণ স্বাধীনতাপ্রবৃত্তির প্রভাব নহে, বাঙ্গালায় বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব। এখন দেখা যাইতেছে, অন্যান্য সমস্ত সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ অতি আবশ্যকীয়; কিন্তু হিন্দু সমাজে তাহার কোন প্রশ্নই উঠে না; কারণ, দম্পতির কেহই পরের দাস নয়, তাহারা সমাজের, সংসারের, সৃষ্টির। ইহা আদর্শের কথা, সমস্ত হিন্দু-দম্পতিই যে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন, এমন নহে, সমাজের সকল লোক দেবতা হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইত। কিন্তু হিন্দু সমাজ ইহাদের সম্বন্ধে কি প্রতিকার করিয়াছেন তাহা দেখা প্রয়োজন।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নারী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে? পরাশর বলেন—

> নষ্টে, মৃতে, প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পরাশরের এই মতও হিন্দু সমাজ গ্রহণ করে নাই। Shaw, Russel প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার সঙ্গে আরও কয়েকটি অবস্থা যোগ করিয়াছেন। যৌন এবং মানসিক অসামঞ্জস্যও তাহার মধ্যে বিশেষ কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন হত্যাপরাধে স্বামী ২০ বৎসরের জন্য

---

(৩০) It is in the general movement for the prevention of destitution that the means for making women independent of compulsory sale of their persons in marriage or otherwise, will be found.

Shaw, Page 151.

(৩১) At present it reduces the difference between marriage and prostitution to the difference between Trade Unionism and unorganised casual labour.

Ibid, 151.

জেলে গেলে নারী কি করিবে ? অথবা স্বামী পাগল হইয়াছে, কোন দুষ্টরোগে ভুগিতেছে, তখন স্ত্রী কি পতিব্রতাই রহিবে ? আপাততঃ দেখিলে মনে হয়, বাস্তবিকই ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা, সমাজের অতি বড় অনিয়ম। কিন্তু হিন্দু সমাজের গঠনপ্রণালী ভিন্ন। জগতে উপরি-উক্ত লোকের সংখ্যা কত ? হাজারে হয় ত একজন—কি তাহাও নয়। [বিধবার সংখ্যা বাদ দিয়া, বিধবা-বিবাহ এই প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে]। এই অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তির জন্য, বা তাহাদের সুখ-দুঃখের বিচার করিতে যাইয়া সমস্ত সমাজকে বিশৃঙ্খল করিয়া দেওয়া, বা মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করা তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন নাই। ৯৯৯ জন ব্যক্তির সুখের জন্য ১ জনকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং এই পাপ উপেক্ষা করিয়া সমাজ-বন্ধন না করিলে আজ আমাদের দরিদ্রকুটীরে ছিন্ন কন্থায় নিদ্রা এত তৃপ্তিদায়ক হইতে পারিত না। এই বন্ধনের মধ্যে হিন্দু-সংস্কৃতি মুক্তি পাইয়াছে; সেই জন্যই জগতের সভ্যতার প্রবল স্রোতও তাহাকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই।

Shaw বলেন,—"Marriage is as a fact not in the least like marriage as an ideal"—কথাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ নাই। fact কোন দিনই ideal নয়, এবং তাহা হইলে idealই fact হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু মানব-সভ্যতা চিরদিন এই idealকে factএ পরিণত করিয়াছে; তাহা না হইলে এই অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যাইত। তাহা হইলে একথা বলা যায়, যুগে যুগে ideal পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, মানুষ এক idealকে লাভ করিয়া, আরও বড় idealএর অনুসরণ করিয়াছে। Idealকে পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতা কাহার অনুসরণ করিবে ? তখন তাহার পক্ষে বর্ব্বরযুগে ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না। আর হিন্দু-গার্হস্থ্যজীবনে ইহা কি আমরা পাই নাই ?

পাশ্চাত্য-জগতে বিবাহ-বিচ্ছেদ চলিতেছে, এবং এখন তাহা যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে সকলেই দেখিতেছেন,—উভয়ের ইচ্ছাতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া উচিত, তাহাতে কারণ প্রদর্শনের কোন অর্থ হয় না। রাসেল, শ', এলেন কে, সকলেই একবাক্যে এ কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা তাহার যথেষ্ট কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একথা এখন প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। (৩২, ৩৩, ৩৪)

অবশ্য Ellen Key পরে আবার বলিয়াছেন যে, ভালবাসাও প্রয়োজন এবং ত্যাগও প্রয়োজন, তবেই প্রকৃত বিবাহ হইতে পারে। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ একবিলাসী এবং ভাবপ্রবণ (Havelock Ellisএর উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য), তাহাদের পক্ষে এই যৌন-স্বেচ্ছাচারের মধ্যেও হয় ত মাতৃত্বের প্রভাবে এই ভালবাসা গড়িয়া উঠা সম্ভব; কিন্তু পুরুষ চিরস্বেচ্ছাচারী, বহুবিলাসী, তাহার পক্ষে এই ভালবাসা গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক নয়।

যাহা হউক, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রবর্ত্তনের অর্থ এই যে, ইহার পরিণতি যৌন-স্বেচ্ছাচারে। বিধিবন্ধন প্রথমে থাকিতে পারে, তবে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বাতিল করিয়া দিতেই হইবে। আমেরিকায় যেরূপ বিবাহের সাড়ে ছয় মিনিট পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, অবস্থাটা সেইরূপই হইবে, এবং যৌন-স্বেচ্ছাচারের ফলে, দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস পাইবে। ৩৫

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে এই অনিবার্য্য ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

নর ও নারীর যৌন ও মনস্তত্ত্ব

নর ও নারীর কামতৃষ্ণা বা মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নারীর মন দুর্ব্বল এবং ব্যক্তিত্বহীন। একটা সাধারণ উদাহরণ হইতে তাহা বুঝা যাইতে পারে; কোন এম এ,-পাশ মেয়েকে যদি ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেকে বিবাহ করিতে বলা হয়, সে

(৩২) The sensible thing to do then is to grant divorce whenever it is desired, without asking why ?

Shvw—Page 189.
Preface to getting Married

(৩৩) For this reason, much the best ground of divorce in all such cases is mutual consent.

Russel, Marriage & Morals, Page 184.

(৩৪) But the true line of development will quite certainly be this, that divorce will be free......

Love & Marriage, Ellen Key. Page 28e.

(৩৫) A woman with several husbands bears fewer children than a woman with one......

Shaw. Page 137.

অবশ্যই তাহাতে রাজী হইবে না, এবং ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেও এম, এ,-পাশ মেয়েকে বিবাহ করিতে সাহসী হইবে না। ইহার অর্থ এই যে, নারী দুর্ব্বলচিত্ত, সে এমন একটি লোককে চায়, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, পক্ষান্তরে পুরুষ চায় এমন নারীকে, যে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে সাহস করিবে না। পুরুষ ব্যক্তিত্ববান্, বহুবিলাসী ও স্বাধীনতাপ্রয়াসী ; নারী দুর্ব্বলচেতা, পরাধীনতাপ্রয়াসী ও ব্যক্তিত্বহীন। নারী সনাতনপন্থী, পুরুষ প্রগতি-পন্থী। ৩৬, ৩৭

যৌন-জগতে নারী নিষ্ক্রিয় অথচ বেশী শক্তিশালী, পুরুষ সক্রিয়, কিন্তু চঞ্চল। নারী একবিলাসী, পুরুষ বহুবিলাসী ; কারণ, পুরুষ স্বেচ্ছাচারী ও তাহার মন পরিবর্ত্তনশীল। ৩৮

পুরুষ সাহিত্য ও কলাক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী, অধিক creative, এবং নারীর মন প্রাচীনপন্থী বলিয়া এ ক্ষেত্রেও নারী নিষ্ক্রিয়। পুরুষ কল্পনাপ্রবণ, নারী বাস্তববাদী, অথচ বেশী ভাবপ্রবণ, সেই কারণেই তাহারা প্রাচীনপন্থী।

Havelock Ellis বলেন,—We have but discovered in a more difinite and fundamental manner that women are more emotional. 398 Page কারণ, vaso-moter system—the neuro muscular ruler of spontaneous organic life responds more readly to stemulus in women... ....401 Page. [Man and Woman.]

এবং এই কারণেই নারীর পক্ষে কোন আদর্শবাদকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা সম্ভব, কিন্তু পুরুষের পক্ষে নয়। নারী তাহার এই ভাবপ্রবণতা দিয়া জীবনকে ঘেরিয়া রাখে, এবং ত্যাগে, সহিষ্ণুতায়, আত্মসমর্পণে, সে শ্রেষ্ঠতর জীব। এই কারণেই আমরা সীতার আলেখ্য পল্লীর গৃহে গৃহে দেখিতে পাই, কিন্তু রাম লক্ষণের আলেখ্য দেখিতে পাই না।

Havelock Ellis যৌন-তত্ত্বের এক জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁহার মত অবশ্যই অনেকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাঁহার এই সমস্ত মতের উপর নির্ভর করিয়া একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, নারীর দেহ ও মন এক বিলাসের অনুকূল, এবং পুরুষের দেহ ও মন বহুবিলাসের অনুকূল।

অতএব বর্ত্তমান য়ুরোপ ও আমেরিকার যৌন-স্বেচ্ছাচার স্বভাবজ নয়, তাহা হয় তাহাদের ভোগাদর্শের কৃষ্টিগত, না হয় সে দেশের নারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের হস্তের ক্রীড়ণক মাত্র,—স্বামীর সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা তাহাদের নারীত্ব ভুলিয়া গিয়াছে,—স্বভাবও ভুলিয়াছে, তাই অশান্ত হৃদয়ে ক্রমাগত স্বামী বদল করিতেছে। তাহার মূলে হয় ত প্রলোভনই বর্ত্তমান।

Havelock Ellis নারী-পুরুষের প্রেমকে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই অংশটি উদ্ধৃত করিলে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। ৩৯

এখন এই যৌনবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব আলোচনার পর

(৩৬) From an organic stand-point therefore, woman represents, the more stable and conservative element in evolution. It is a metaphorical as well as liberal truth that the centre of gravity is lower in woman and less easily disturbed. In various parts of the world anthropologists have found reason to suppose that primitive racial elements in a population are more distinctly preserved by the women than the men,

Man & Woman—4910
Havelock Ellis.

(৩৭) We have, therefore, to recognise that in men, as in males generally, there is an organic variational tendency to diverge from average, in woman, as in females generally an organic tendency, notwithstanding all their facility for minor oscillations, to stability and conservatism, involving a diminished individualism and variability.

Ibid

(৩৮) The sexual sphere in woman is more massive and extended than in men, but it is less energetic in its manifestation. In men the sexual instinct is a restless source of energy which over flows into all sorts of channels.

Ibid—441 Page,

(৩৯) The progressive and divergent energies of men call out and satisfy the twin instincts of women to accept and follow a leader, and to expend tenderness on a reckess an l erring child, instincts often intermingled in delicious confusion. And in women men find beings who have not wandered so far as they have from the typical life of earth's creatures; women are for men are the human embodiments of the restful responsiveness of Nature. To every man, as Michelet has put in the woman

একথা বলা যাইতে পারে, পুরুষের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া, তাহাকে স্নেহাঞ্চলে ঘিরিয়া রাখাই তাহার ধর্ম্ম ; প্রকৃতির চিরচঞ্চল এই পুরুষ—সন্তানকে স্নেহ দিয়া, মমতা দিয়া, কামনা দিয়া ঘিরিয়া রাখাতেই তাহার আনন্দ,—এই দুরন্ত শিশুকে আপনার সহিষ্ণুতা ও আত্মসমর্পণ দ্বারা বশীভূত করাতেই তাহার নারীত্ব, এবং নারীর সৃষ্টি-প্রেরণার সহায়ক হওয়াই পুরুষের পৌরুষ।

উপরি-উক্ত আলোচনার পর একথা যদি কেহ বলে যে, প্রকৃতিগত ভাবে বিচার করিলে, নারীর পক্ষে, তাহার দেহ ও মন কোনটির পক্ষেই বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজন নাই,—প্রয়োজন পুরুষের ; তাহার দুর্দ্দমনীয় কামনা চরিতার্থ করিবার জন্যই নারীকে বঞ্চিত করা বা প্রতারিত করা তাহার স্বভাব, তাহা বলিলে কি অন্যায় বলা হয় ? এবং আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, য়ুরোপীয় বা আমেরিকার নারীগণ স্বভাবপ্রদত্ত এই বশীকরণ মন্ত্র হারাইয়া আজ স্বতঃই পুরুষের খেয়ালের স্রোতে ভাসিয়াছে, এবং মাতৃত্বের প্রলোভনে নিজের দেহকে পণ্য করিয়া বিবাহ বা স্বামি-শিকারের উপলক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন-স্বেচ্ছাচারে বাধ্য হইয়াছে। হিন্দু বধূগণ এই সহিষ্ণুতা, আত্মসমর্পণ, স্নেহ, প্রেম (Havelock Ellis কথিত emotion) দ্বারা অসংযত পুরুষকে গৃহের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ইহা যৌন-দাসত্ব নহে,—যৌন-প্রভুত্ব, মানসিক প্রভুত্ব, আদর্শের পরিপোষক। কবিগুরু বাল্মীকির সীতাচরিত্র হিন্দু নারীর এই স্বভাব-প্রবৃত্তিকে কালজয়ী করিয়া রাখিয়াছে,—তাই হিন্দু গৃহ-বধূ স্বাভাবিক নারীর স্বরূপ। এই বশীকরণ মন্ত্রে যাহাদের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহারা পত্যন্তর গ্রহণ করিবে কেন, তাহারা পতিকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া লইবে।

হিন্দু বিবাহ এবং তাহার যৌনসম্পর্ক ও মনস্তত্ত্ব

এখন আমাদের দেখা প্রয়োজন, হিন্দু বিবাহ যেভাবে হয় এবং হিন্দু দাম্পত্য-জীবন যেমন ভাবে চলে, তাহাতে উপরে উল্লিখিত ভালবাসা ও যৌনসম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার কতখানি সহায়তা করে এবং আদর্শ অনুসারে আমাদের জীবন কত দূর নিয়ন্ত্রিত হয়। মনে প্রাণে দেহে সুখী হইবার অনুকূল এবং প্রতিকূল কোন্ কোন্ অবস্থা আছে, এবং তাহার মীমাংসাকল্পে সমাজ কি করিয়া থাকেন ?

পাত্র বা পাত্রীনির্ব্বাচন করেন পিতা বা তৎস্থানীয় অভিভাবক। সাধারণতঃ বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র-পাত্রীর সাক্ষাৎ হয় না, অকস্মাৎ একদিন দেবতা সাক্ষী করিয়া, চারিপাশের আনন্দ-কলরোলের মধ্যে তাহারা প্রতিজ্ঞা করে, আমাদের জীবন মন এক হইল ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বলিয়াই তাহা সম্ভব না হইতে পারে, হয় ত সকল দম্পতির জীবন মন এক হয় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালবাসারও কোন সঠিক সংজ্ঞা নাই, আমরা যদি পরস্পর ভালবাসিয়াই বিবাহ করিতাম, তবে সে ভালবাসা অটুট থাকিবে, এ কথা কেহ বলিতে পারে না ; কারণ, যৌবনে যাহা ভালবাসিয়াছি, পরে তাহা না-ও ভালবাসিতে পারি, এবং ঠিক ভালবাসিবার মত ব্যক্তিও বাস্তব জগতে মিলে না। এখানে যৌবনের অতি চঞ্চল ও অনভিজ্ঞ মন লইয়া আমরা যাহা পছন্দ করি, তাহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনাই অধিক, কিন্তু প্রবীণের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে যে পছন্দ, তাহাতে ভুল না হইবার সম্ভাবনা অধিক—কারণ, তাঁহারা দেখিবেন, পাত্র বা পাত্রী সংসার ও সমাজের উপযোগী কি না। যদি যৌবনের প্রেমই ঠিক হইত, তবে য়ুরোপে অসংখ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ হইবে কেন ? পুরুষকে বা নারীকে জয় করিবার জন্য আমরা সে অভিনয়ই করিব না, তাহারই বা স্থিরতা কি ? ফলে নারী হয়ত যাহাকে মহৎ বিশ্বাসে বিবাহ করে, সে চরম জঘন্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। আমাদের সমাজ নারীকে বা পুরুষকে যাচাই করে—তাহার বংশ, শিক্ষা এবং উপযোগিতা হিসাবে।

যে বয়সে মানুষের লালসা দুর্নিবার হয়, ঠিক সেই সময়ে বা তাহার পূর্ব্বেই হিন্দু বিবাহ হয়, এবং এই বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংযম পালন করিয়া অকস্মাৎ সংসর্গলাভে তাহাদের আকর্ষণ অতি প্রবল হইয়া উঠে। ৪০, ৪১

---

whom he loves as the earth was to her legendary son, he has but to fall and kiss her breast and he is strong again ·········· and she brings man into harmony with Nature. This organically primitive nature of women, in form and function and instinct, is always restful women, tortured by their vagrant energy. *Ibid.*

(৪০) The 'desire' however, against which India's solution of the marriage problem declared war, is one of the Nature's most powerful fighters ;

এখানে কথা উঠিতে পারে, এরূপ মিলনে, যৌন-অসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা। (পাশ্চাত্ত্য বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি বিশেষ কারণ) তাহার জন্যই পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচারপ্রথা, তাহার মধ্যে. কোষ্ঠীবিচারে যোনিবিচারও একটি প্রধান বিষয়। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্র হয়ত নির্ভুল বা নির্ভরযোগ্য না-ও হইতে পারে; হিন্দু সমাজ কুমারীর কৌমার্য্যকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন, এবং কুমারী-ব্যভিচার যে দেশে নাই, সে দেশে যৌন-অসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনাও অল্প।

হিন্দু দম্পতির এই প্রথম মিলনের পরে ধীরে ধীরে কামনা কমিতে থাকে, (অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহা কমে) এবং তখন মনে মনে সে চায় অন্য কিছু—ভালবাসা, প্রেম। তৃপ্তকামনার ভিত্তিভূমিতে মনের জাগরণ আসে; তখন স্ত্রী চাহে তাহার স্নেহ প্রেম যত্ন সেবা দ্বারা স্বামীকে খুসী করিতে, স্বামী চাহে তাহার ধন শক্তি সাধনা দ্বারা স্ত্রীকে তাহার মানসী করিয়া তুলিতে—সন্তানজন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলে সেই প্রতিযোগিতা।

অবশ্য যদি এমন হয় যে, স্বামি স্ত্রীর মধ্যে যথেষ্ট অনৈক্য আছে, তখন কি হইবে? বাস্তবজগতে পূর্ব্বরাগে আমরা যে ভালবাসি, তাহা ঠিক মনের মত ব্যক্তিকে যে ভালবাসি তাহা নহে; পরিচয়ে, নৈকট্যে যাহার মধ্যে কিছু মনের মত পাই, তাহাকেই আপনার করি, তাহার ত্রুটিকে ক্ষমা করি, গুণকে বড় করিয়া লইয়া ভালবাসিয়া ফেলি, তাহা না হইলে কুৎসিত মেয়েকে কেহই ভালবাসিত না। হিন্দু দাম্পত্য-জীবনে যদি এই মানসিক অসামঞ্জস্য ঘটে, তবে তখনও আমরা ইহাই করি; যেহেতু এ সম্পর্ক ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই হেতুই পুরুষ স্ত্রীর মনোমত হইতে চেষ্টা করে, এবং স্ত্রী স্বামীর মনোমত হইতে চেষ্টা করে। গুণকে বড় করিয়া দেখিয়া, দোষকে ক্ষমা করিয়া আমরা মিলিত হই, অথবা দোষকে বিসর্জ্জন দিয়া গুণলাভ করিয়া মিলিত হই। এখন অনেকে বলিবেন, এ ত প্রকৃত বা স্বভাবজ প্রেম নহে, "ধ'রে বেঁধে পীরিত"; কিন্তু সবক্ষেত্রেই আমরা এই ধ'রে বেঁধে পীরিতই করি। পার্থক্য এই—এক ক্ষেত্রে ধরার কার্য্যটা করে সমাজ, অন্য ক্ষেত্রে করে আমাদের লালসা বা আমাদের চিরকল্পনাপ্রবণ মন। কেহ কি বলিতে পারেন, ঠিক যেমন ব্যক্তিটিকে জীবনের সহচর বা সহচরীরূপে কল্পনা করেন, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তিটিকেই ভালবাসেন? যদি বাস্তবজগতে তাহাই মিলিত, তবে কাব্য শুকাইয়া যাইত, সভ্যতার শেষ হইত, পৃথিবী স্বর্গ হইত। মানুষের মনের এই অতৃপ্তিই এই বিরাট সভ্যতার মূল উৎস; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সুখী ব্যক্তি বা দম্পতির অস্তিত্ব অসম্ভব।

এই বন্ধনের সৃষ্টি পুরুষের স্বার্থের জন্য নয়, নারীর স্বার্থরক্ষার জন্য। নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব আলোচনা কালে দেখা গিয়াছে, পুরুষ চঞ্চল ও তাহার মন পরিবর্ত্তনশীল এবং দেহ বহুবিলাস-অভিলাষী। হ্যাভেলক এলিসের কথা স্বীকার করিলে, এবং স্বাধীনতা থাকিলে পুরুষ প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া এক একটি বিবাহ করিত। নারীর যৌবন পুরুষের চেয়ে ক্ষণস্থায়ী এবং মাতৃত্ব তাহাদের অমোঘ আকর্ষণ, এবং তাহারা প্রাচীনপন্থী, এই কারণে স্বামীকে ত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে পুরুষের পক্ষে স্ত্রী ত্যাগ অপেক্ষা কঠিনতর। এই বন্ধনের সৃষ্টি স্ত্রীর স্বার্থরক্ষার্থ।

মানব মন পরিবর্ত্তনশীল। ভালবাসা, আমাদের চাওয়াও পরিবর্ত্তনশীল, এই পরিবর্ত্তনশীল মানব-মন হিন্দু দাম্পত্য-জীবনে পরিতৃপ্তি পায়, অবশ্য বিভিন্ন নারী বা পুরুষের মধ্যে নয়, একই ব্যক্তির মধ্যে, এবং হিন্দু নারীর আত্ম-সমর্পণ ও একান্ত নির্ভরতাই পুরুষের এই খেয়ালকে চরিতার্থ করে; এই সহিষ্ণুতা ও আত্মসমর্পণই পুরুষকে বশীভূত করিয়া তাহার ইচ্ছাধীন করিয়া নয়,—তাহার সন্তান-পালনে, তাহার ভরণ-পোষণে পুরুষ তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।

consequently, the question of how to overcome it was not an easy one. There is a particular age, said India at which this attraction between the sexes reaches its height, so if marriage is to be regulated according to the social will, it must be finished with before such age. Hence the Indian custom of early marriage. R. Tagore.

The ideal of Hindu Marriage B. Biswa Bharati Quarterly. *July 1925, Page 109*

(৪১) It is evident to every thoughtful person that a real sexual morality is almost impossible without early marriage—

Love & Marriage, Ellen Key.
Page—311

সন্তান জন্মিবার পরে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই এই সন্তানকে ধরিয়া দিনাতিপাত করিতে থাকে, এবং সন্তানের স্নেহে উভয়ের ভালবাসা গাঢ়তর হইয়া উঠে। পারিবারিক বন্ধন আমাদের অতি নিবিড় এবং বিস্তৃত, সেই জন্যই তখন পুরুষের পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন কথাই আর উঠে না। পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের নিকট-সম্বন্ধ—নরওয়েতে পারিবারিক বন্ধন নিবিড় বলিয়া সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ অতি অল্প।

য়ুরোপীয় বিবাহের সঙ্গে, এবং তাহার প্রণালীর সঙ্গে আমাদের আদর্শগত ও ব্যাবহারিক জীবনগত পার্থক্য কি, তাহা একরূপ আলোচিত হইল। য়ুরোপের প্রত্যেকেই অসুখী বা জীবনে দুই চারিবার বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়াছেন এরূপ নয়, সেখানেও স্বামিস্ত্রীর নিবিড় ভালবাসা আছে, চিরকালই থাকিবে। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দু বিবাহে অসুখী হইবার সম্ভাবনা অতি কম,—সেখানে মানুষের পশুপ্রবৃত্তি অন্ধকে প্রবঞ্চিত করিবার সুযোগ পায় না, পাশ্চাত্য দেশে তাহা পায়। পাশ্চাত্ত্যে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া কুমারী-ব্যভিচারে পুরুষ তাহার বহু-বিলাসী প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করিবার সুযোগ পায়, কিন্তু হিন্দু সমাজে পুরুষ নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের মত নারীর পদতলে আশ্রয় লয়। পাশ্চাত্ত্যে নারী ব্যভিচারী পুরুষের হাতের পুতুল, হিন্দু সমাজে নারী পুরুষের শক্তি, তাহার অঞ্চল পুরুষের স্নেহচ্ছায়া।

পক্ষান্তরে আমি একথাও বলি না যে, হিন্দুসমাজ ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন, তাহার মধ্যেও অনেক গলদ আছে, যাহা দূরীভূত করা বিশেষ প্রয়োজন, এবং যুগ-পরিবর্ত্তনেই তাহা হইতেছে। আমাদের সমাজের আদর্শ যে অন্যের তুলনায় কোন অংশে খারাপ নয়, ইহাই বক্তব্য। আত্মসুখসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগ-বিলাসের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া কেবল তাহার সদ্গুণের আদর্শ গ্রহণ করিবে, সেইদিন ভারত হইবে পূর্ণ, তৃপ্তিময়, স্বাধীন।

পাশ্চাত্ত্য বিবাহ-বিচ্ছেদ

আমেরিকা ও য়ুরোপে যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে, তাহার সংস্কার প্রয়োজন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। শ, রাসেল প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ সকলেই Free Divorce অনুমোদন করেন, এবং তাহার ফলে মানুষের পক্ষে সভ্যতার গোড়ার যুগে সেই যৌন-স্বেচ্ছাচারে ফিরিয়া যাওয়াই সম্ভব, কারণ, অর্থনৈতিক জগতে কেহ কাহারও অধীন থাকিবে না। কিন্তু এই Free Divorce ও Free Loveকে যে তাঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা মানুষের সহজ প্রবৃত্তির পরিপোষক বলিয়া, কৃষ্টি বা সংস্কৃতির পরিপোষকতার দিকে তাঁহারা বিচার করেন নাই; সেই জন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদ হিন্দু আদর্শের, হিন্দু সভ্যতার মূল-নীতির বিরোধী, এবং হিন্দু সমাজে অচল। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অর্থ-নৈতিক জগতে স্ত্রী-পুরুষে যখন বিরোধিতা আরম্ভ হইবে, তখন বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর নারীগণের মত তাহাকে পুনরায় গৃহকোণে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং চরম ভোগ-বিলাসের পরে যেমন বৈরাগ্য আসা স্বাভাবিক, তেমনই করিয়া মুক্তি-স্বাধীনতা, যৌন-স্বেচ্ছাচার ও ভোগসমাপ্তির পরে পাশ্চাত্ত্য জগৎ নূতন করিয়া ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রাচ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের আনুমানিক ফলাফল

বর্ত্তমান শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কি, তাহা বলা কঠিন। প্রাচ্য সংস্কার ও সংস্কৃতি লইয়া তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই শিক্ষাকে নিজেদের মত করিয়া গ্রহণ করিবেন—না নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিয়া পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন, এবং তাহা কালের গর্ভে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব না হইলেও, বর্ত্তমান ভারত তথা বাঙ্গালা যে একটা Transition periodএর মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রতীচীর এই স্রোতঃ আমাদের ভিত্তিভূমিকে নিশ্চিহ্ন করিবে কি রূপান্তরিত করিবে, তাহা কে জানে? স্রোতের মত বিদেশী প্রভাব আসিতেছে, স্রোতের মত গৃহের খাদ্য বিদেশে যাইতেছে, এই সন্ধিক্ষণে প্রীতি-ভক্তির বহু বন্ধনের উপরে স্থাপিত হিন্দু সমাজ স্ব স্বরূপে অবস্থান করিবে কি না, বলা কঠিন।

পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, বিবাহ-বিচ্ছেদ আমাদের আদর্শের প্রতিকূল, এবং সমাজগঠনপ্রণালীর প্রতিকূল;

পাশ্চাত্ত্য মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বলিবেন, ও আদর্শ মিথ্যা, সংস্কারমাত্র, মানুষ মানুষ—আদর্শ বা সমাজের দাস নয়। তাহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে এবং সে ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করিতেই হইবে—তাহারা individualism বা freedomএর পক্ষপাতী। ব্যক্তি যে stateএর, সমাজের, একথা হয়ত তাঁহারা স্বীকার করিবেন না—না করুন, আদর্শ মিথ্যা, সব মিথ্যা হউক, ব্যাবহারিক জীবনের লাভ-ক্ষতি নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। সেখানে কি ফলাফল হইতে পারে, তাহার বিচার নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পূর্ব্বে একবিবাহ-উৎপত্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, নারী যেদিন অর্থ-নৈতিক জগতে পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, সেইদিনই একবিবাহের সৃষ্টি (একথা আমাদের সমাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে)। যখন নারী নির্ভরশীল রহিল না, তখনই স্বাধীনতা দাবী করিল। কিন্তু আমাদের দেশে নারী আজও নির্ভরশীল, তবুও একবিবাহ চলিয়াছে। কিন্তু পুরুষ বিশেষতঃ বহু হিন্দু পুরুষই আজ সঙ্গতিহীন এবং সেই জন্য তাহারা বিবাহে অনিচ্ছুক। নারীগণ যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ চানই, তবে অর্থ-নৈতিক জগতে তাঁহাকে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, তাহা না হইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন চিরমৃত হইয়াই রহিবে। ধরা গেল যে, নারীগণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্য নারীর মত স্বামি-শিকারে বাহির হইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে কুমারী-ব্যভিচার বাড়িয়া যাইবে। দেশ স্বাধীন নয়, কাযেই পুরুষ অর্থ-নৈতিক জগতে নারীর চাপে আরও দীন হইয়া পড়িবে, এবং কুমারী-ব্যভিচারের সুযোগ লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে, বিবাহ করিতে চাহিবে না। বিবাহের বয়স ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে এবং হিন্দু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের লোকসংখ্যা ক্রমেই কমিতে থাকিবে। পরাধীনদেশে অর্থাভাব ঘুচিবে না এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃপায় সন্তানসংখ্যা আরও কমিবে।

পুরুষ তাহার স্বেচ্ছাচারী বহুবিলাসী ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে এই আইনের সুযোগ লইয়া নিরপরাধা স্ত্রীকে পথে বসাইতে কুণ্ঠিত হইবে না (অবশ্য কেবল নারীই বিবাহ-বিচ্ছেদে সমর্থ হইবে, পুরুষ বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারিবে না, এরূপ আইন না হইলে) এবং অতিক্রান্ত-যৌবনা গৃহবধূকে সসন্তান পথে দাঁড়াইতে হইবে। পরাধীন দেশে তাহার অন্ন জুটিবে না, সন্তানগণকে Orphanageএ সহসা ভর্ত্তি করা সম্ভব হইবে না। কেবল অর্থনৈতিক জগতেই নহে, মানসিক জগতেও তাহাকে সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

মাতৃত্বের প্রেরণা নারীর সহজ প্রবৃত্তিগত, এবং গর্ভধারণ করিতে হইলেই তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এবং পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পুরুষের সন্তানের প্রতি মমতা নারী অপেক্ষা কম, এবং অতি অনৈসর্গিক কারণ বশতঃও যখন তাহার পক্ষে গর্ভধারণ করিবার উপায় নাই, তখন সন্তানপ্রতিপালনের গুরু দায়িত্ব হইতে তাহারা নিষ্কৃতি চাহিবে এবং তাহা এড়াইতে চেষ্টা করিবে। অন্য দেশে তাহা না করিলেও আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় করিবার সম্ভাবনা বেশী। বর্ত্তমানে আমাদের পরিবার পিতৃবংশানুক্রম, কিন্তু ঘরে ঘরে তাহা মাতৃবংশানুক্রম পরিবারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। হিন্দু দায়ভাগ সংস্কার না হইলে মাতার পক্ষে সন্তান পালন অতি কঠিন হইয়া পড়িবে।

অর্থনৈতিক জগতে না আসিলে নারীগণ বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ লইতে পারিবেন না (এটা সুযোগ বা স্ত্রীদের পক্ষে প্রয়োজন, কি পুরুষের প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)। অর্থনৈতিক জগতে তাহারা হানা দিলে দেশের বেকার সমস্যা বাড়িবে, এবং সরকার বর্ত্তমানের মত উদাসীন থাকিবেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়—অন্ততঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য কোন চেষ্টাই করিবেন না। পাশ্চাত্ত্যের ভোগাদর্শের প্রভাবে ও বেকার-সমস্যায় পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে, এই শিথিলতার ফলে নারীই বেশী দুর্ব্বিপাকে পড়িবেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমাদের দেশে মুসলমান সমাজে এরূপ সমস্যা আসে নাই কেন? তাহার কারণ, তাঁহাদের ধনাধিকারবিধান অন্যরূপ। এখনও মুসলমান নারী পুরুষের অর্থনৈতিক জগতে বিরোধিতা করেন নাই, তাঁহারা শিক্ষিতা হইয়া স্বাধীনতা চাহিলে একই সমস্যার উদ্ভব হইবে।

বিবাহ-বিচ্ছেদপ্রথা কোন কালেই আমাদের দেশে প্রয়োজন হইবে না, এমন নহে। আমাদের সমাজ যদি পাশ্চাত্ত্য মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রয়োজনীয়

হইয়া উঠিবে, কিন্তু বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা, আদর্শ ও ব্যাবহারিক জীবনে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন প্রয়োজনই নাই।

অর্থনৈতিক জগৎ ও বিবাহের আপেক্ষিক সম্পর্ক বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইলে অনেক মনীষিবাক্য উদ্ধৃত করিতে হয়। দেশের অর্থনীতিবিশারদগণ এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা করিবেন। আমাদের সমাজে এ বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্ত্য বিবাহও যখন নর-নারীকে সুখী করিতে পারে নাই, তখন সে আদর্শের অনুসরণ করা ভুল হইবে সন্দেহ নাই, এবং আমাদের দাম্পত্য-জীবন যখন অধিকতর সুখী বলিয়া মনে হয়, তখন আমাদের আদর্শের অনুসরণ করিয়া সমাজে তাহা প্রতিভাত করিয়া তোলা বা বাস্তবে পরিণত করিয়া তোলাই উচিত বলিয়া মনে হয়।

Bishop Cameron T. Darvis (New York Episcopal Diocose) বিবাহের সম্পদ্ ও বিপদের কারণ কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন—

Dangers :—

1 The search of Pleasure
2. The question of money
3. Selfishness
4. Brutishness
5. Unnecessary refusal to have children

Aids.

1. Sexual Knowledge and Consideration
2. Children
3. Intellectual Companionship
4. Common outside interest

ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের তালিকা :—

Evolution…ক্রম-পরিণতি
Promiscuity…যৌন-স্বেচ্ছাচার
Polyandry Polygamy Polygyny } বহুবিবাহ, বহুবিলাস
Polygamous or Polyandrous…বহুবিলাসী
Monogamy…এক-বিবাহ
Monogamous…একবিলাসী
Nomadic life…যাযাবর জীবন
Adultery…স্ত্রী-ব্যভিচার
Fornication…কুমারী-ব্যভিচার
Sex slavery…যৌন-দাসত্ব
Passive…নিষ্ক্রিয়
Active…সক্রিয়
Sexual incompatibility…যৌন-অসামঞ্জস্য
Mental " …মানসিক "
Economic sphere…অর্থনৈতিক জগৎ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম, এ)।

তব নূপুরধ্বনি

(গান)

তব নূপুরধ্বনি
শুনি শ্যামল বনে
মম অধীর হিয়া
নাচে সমীর সনে।

শুনি তোমারি বাঁশি
ঝরে জোছনা রাশি
আঁকে স্বপন-রেখা
মম নয়ন-কোণে।

তব পরশ মাখি
ফোটে চামেলী বেলা,
ভাসে গগন-গাঙে
কত মেঘেরি ভেলা!

তব রূপেরি মায়া
আনে অসীম-ছায়া,
কহে গোপন কথা
মম পরাণ-মনে।

শ্রীমতী নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়।

[উপন্যাস]

ঊনচত্বারিংশ লহর

আপোষে শেষ

পুলিস-কমিশনার লর্ড ব্রাডনী কয়েক মিনিট নতমস্তকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া-থাকিয়া যখন মুখ তুলিয়া জেরাল্ড ফ্রষ্টের মুখের দিকে চাহিলেন, তখন তাঁহার সেই দৃষ্টিতে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কঠোরপ্রকৃতি পুলিস-কমিশনারের পদোচিত দম্ভ অথবা আত্মমর্য্যাদাসূচক তেজোগর্ব্ব লক্ষিত হইল না। মনুষ্য-প্রকৃতি যতই উদ্ধত বা তাহার স্বমহিমা সজাগ হউক, তাঁহার জীবনে এরূপ দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে কখন না কখন প্রভাব বিস্তার করে যে, তাহার চোখ-মুখের বেদনাতুর ভাব দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়—

'মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!'

লর্ড ব্রাডনীর মুখের ভাব তখন সেইরূপ।

তিনি পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কিন্তু একটা বিষয় আমি বুঝিতে পারিতেছি না; এ কায করিতে কি কারণে তোমার প্রবৃত্তি হইয়াছিল? যে দুর্ব্বহ—আমি তাহা নীতিবিগর্হিত ও উচ্ছৃঙ্খলও বলিতে পারি, দায়িত্ব-ভার তুমি গ্রহণ করিয়াছিলে—তাহার মূলে কোন্ প্রলোভন ছিল, তাহা আমাকে বলিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে কি? সাহসের কথা আমি বলিলাম না; কারণ, আমি জানি, তোমার সাহসের অভাব নাই।"

লর্ড ব্রাডনীর উক্তি শুনিয়া জেরাল্ড ফ্রষ্টের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইল। লর্ড ব্রাডনী তাহার ক্রোধের পরিচয় পাইয়া মনে মনে তাহার প্রশংসাই করিলেন। উত্তর না পাইয়া তিনি উঠিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

* * * * *

সিন্থিয়া সেই সময় কারাকক্ষ হইতে জেরাল্ড ফ্রষ্টের সম্মুখে নীত হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার স্নান শেষ হইয়াছিল। স্নানান্তে তাহার দৈহিক গ্লানি ও মানসিক অবসাদের অবসানে তাহাকে সদ্যোবিকশিত শিশির-স্নাত কুসুমের ন্যায় প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। মেঘান্তরিত প্রভাতারুণের সুস্নিগ্ধ কিরণ-লেখার ন্যায় তাহার সুকোমল অধর-প্রান্তে মৃদুহাস্যের শেষ-রেখাটি তখনও অদৃশ্য হয় নাই।

সিন্থিয়া জেরাল্ড ফ্রষ্টকে লক্ষ্য করিয়া কোমলস্বরে বলিল, "তোমার অধীরতা প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। আমি গত কল্য রাত্রিকালে হীথল্যাণ্ডস্‌এ গমন করিয়াছিলাম, ইহা যেমন সত্য, এই কার্য্যে যে আমার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, তাহাও সেইরূপ সত্য।"

জেরাল্ড ফ্রষ্ট বলিলেন, "আমি সেখানে যাইব মনে করিয়াছিলাম, ইহা তুমি কিরূপে জানিলে?"

সিন্থিয়া হলগেট বলিল, "উহা অনুমান করা কি আমার পক্ষে খুব কঠিন হইয়াছিল? তুমি বারমিংহামে ছিলে ভাবিয়া আমি টেলিফোনে তোমাকে ডাকিয়াছিলাম; কিন্তু জানিতে পারিলাম, তুমি কোথাও উধাও হইয়াছ। যে গরু গৃহস্থের ক্ষেতের ফসল খাইয়া বেড়ায়, গরুর মালিক তাহাকে বাঁধিয়া-রাখিবার পর যদি সেই গরু কোন উপায়ে গলার দড়ি খুলিতে পারে—তাহা হইলে কোথায় যাওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক? আমিও বুঝিলাম—তোমার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিক যখন চরিবার একটু সুযোগ পাইয়াছ—তখন কি আর ঘরে বাঁধা থাকিতে পার? তাহার পর কাগজে পড়িলাম—থর্সবি তাহার পল্লীভবনে দেশের যত উপোষী ছারপোকা জুটাইয়া এক 'পার্টি' দিতেছে! তখন এই উভয় ঘটনা হইতে যাহা সিদ্ধান্ত করা যায়—তাহাই করিলাম।"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "রিভলভারটা কোথা হইতে জুটাইয়াছিলে?"

সিন্‌থিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ—সেই হাতিয়ারের কথা ভুলিতে পার নাই ? সেটি সত্যই ছেলেখেলার পিস্তল নয়, জিনিসটা আসলই বটে ; আমার বাবা উহা ব্যবহার করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি আমারই হাতে আসিয়াছিল ; নগদ টাকা হইলে আমার ভোগে লাগিত না। কিন্তু হাতিয়ারটা মারাত্মক হইলেও ওটা খালি ছিল, কেবল দর্শনশোভা !"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "আমাকে খুব ফাঁকি দিয়াছিলে !"

সিন্‌থিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, "কিন্তু ও-কথা সকলে বলিতে পারিবে না। সেই যে পুলিসম্যানটা—ফরেষ্ট, যে কারণে অকারণে সর্ব্ব-ঘটে বিরাজিত থাকিয়া, নিজের বুদ্ধির প্রাচুর্য্য আর গোয়েন্দাগিরিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়া উপর-ওয়ালাদের খুসী করিবার চেষ্টা করে, সেই বেচারার গোবর-ভরা মাথায় সেই পিস্তলের প্রচণ্ড এক ঘা মারিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়াছিলাম,—এ জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ—আমি তোমার উদ্ধারের চেষ্টাতেই এই অপকর্ম্মটা হঠাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আর একটা অসাধ্যসাধন করিতে হইয়াছিল,—সেই সাংঘাতিক মুখোসটা মুখে আঁটিয়া কয়েক ঘণ্টা যাপন ! আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল ; কিন্তু তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমার এই প্রাণান্তকর চেষ্টা ! দম বন্ধ করিয়া সমুদ্রে ডুবিয়া-মরা বোধ হয় উহা অপেক্ষা অনেক সহজ হইত।"

ফ্রষ্ট মুখে বিশাল গাম্ভীর্য্যের ঝুলি নামাইয়া বলিলেন, "মিস্ হল্‌গেট, তুমি আর যাহাই কর, নিশাচর বাজের বিরাট মহিমা-সমুজ্জ্বল য়ুনিফর্ম্মের ঐ প্রকার নিন্দা করিয়া মনুষ্যের পরোপকারবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করিও না।"

সিন্‌থিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি নিন্দা করি নাই ; আমার ঐ মন্তব্য নিরপেক্ষ সমালোচনা।"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "জানি ; একালে সকল নিন্দা-গ্লানিই সমালোচনার নামে তরিয়া যায় ! যাহারা উঠিতে বসিতে দিনে দশবার ভদ্রলোকের কুলের কথার আলোচনা করিয়াও ক্লান্ত হয় না, প্রত্যহ সেই একই কথা বলিয়া মনে করে চূড়ান্ত রসিকতা করিলাম ! তাহা ভদ্রলোকের অসহ্য হইলেও নিরপেক্ষ সমালোচনা বলিয়াই চালাইবার চেষ্টা হয়।"

সিন্‌থিয়া দুঃখের চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া বলিল, "আমার মন্তব্যের জন্য আমি দুঃখিত হইলাম, মিঃ ফ্রষ্ট ! এই উক্তি আমি প্রত্যাহার করিতেছি। নিশাচর বাজের বিরাট মহিমা সমুজ্জ্বল য়ুনিকর্ম্মের প্রধান গুণ, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের বিষয় এই যে, ঐ মুখোস মুখে ব্যবহার করিলে পরম সুন্দর, রূপবান্ পুরুষকেও চমৎকার কদাকার দেখায়, এবং মনে মনে সেই মহিমা-সমুজ্জ্বল য়ুনিকর্ম্মের অজস্র প্রশংসা করিতে হয়। আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি, ইহা নিশাচর বাজের অপূর্ব্ব প্রতিভার দান।"

জেরাল্ড ফ্রষ্ট বলিলেন, "দুঃখিত হইলাম বলিলেই যথেষ্ট হইল না। এ জন্য তোমাকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।" —ফ্রষ্ট হঠাৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া সিন্‌থিয়ার ওষ্ঠ চুম্বন করিলেন। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমার প্রথম চুম্বন তোমার স্মরণ আছে কি না, তাহা তুমিই বলিতে পার।"

সিন্‌থিয়া বলিল, "আজ সেই স্মরণীয় রাত্রির কথা আমার মনে পড়িতেছে—যে রাত্রিতে তুমি আমাকে বিপন্ন দেখিয়া ক্রিজিনোভস্কি নামক ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত লোকটার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে। তবে এ কথাও সত্য যে, আমি তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, তুমিই নিশাচর বাজ। আমি জানি, অন্যান্য যুবককেও নিশাচর বাজ বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল ; কিন্তু সেই সন্দেহ অমূলক।"

ফ্রষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বহু দিন হইতে তুমি জানিতে—আমিই নিশাচর বাজ ? না, ইহা তোমার চালাকী ! আমিই নিশাচর বাজ—ইহা তুমি কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে ?"

সিন্‌থিয়া সহজ স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি জানিতে পারিয়াছিলাম ; ইহার অধিক আমার আর কিছুই বলিবার নাই। আমি স্বীকার করিতেছি, নিশাচর বাজের যে কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, জেরাল্ড ফ্রষ্টের কণ্ঠস্বরের সহিত তাহার পার্থক্য আছে ; যদি সে পার্থক্য না থাকিত, তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই তুমি ধরা পড়িতে। কিন্তু তুমি জান, কেহ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা কহিলেই তাহা বিভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হইবে—এ যুক্তি অসার। কেবল তাহাই নহে, তুমি খোঁড়াইতে ; কিন্তু উহা যে তোমার অভিনয়, ইহাও আমি ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। তুমি অন্য

সকলকে প্রতারিত করিতে পারিলেও আমার চক্ষু এই প্রকার অভিনয়ে প্রতারিত হয় নাই।"

ফ্রষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিস্ হলগেট, তোমার এই কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না; আমি অধিকতর সন্তোষজনক কৈফিয়তের দাবী করিতেছি।"

সিন্থিয়া হলগেট নতমস্তকে জেরাল্ড ফ্রষ্টের সকল কথা শুনিতেছিল; সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া বক্রদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখমণ্ডল কাণের ডগা পর্য্যন্ত অরুণাভ হইল; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "তুমি কি জান না, প্রণয়িনীর চক্ষু হইতে তাহার প্রণয়াস্পদের কিছুই এড়াইয়া যায় না? সকলই ধরা পড়ে?"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "হয় ত তোমার এই অনুমান সত্য; কিন্তু ইহা হইতে আমি কিরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি?"

সিন্থিয়া মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "তুমি হয় মূর্খ, না হয় অরসিক, এই জন্য তুমি—তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, আমি তোমাকে ভালবাসিতাম, এবং এখনও ভালবাসি। তাহার প্রেমাস্পদকে এ কথা যে নারীকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হয়, এবং না বলিলে তাহার প্রণয়ী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারে না, তাহার চক্ষুর নীরব ভাষা পাঠ করিতে পারে না, সেই নারী যে দুর্ভাগিনী—ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় আছে কি?"

জেরাল্ড ফ্রষ্ট এ কথা শুনিয়া গভীর বিস্ময়ের ভাণে দুই চক্ষু কপালে তুলিলেন; তাহার পর সিন্থিয়ার কথা যেন বিশ্বাস করিতে পারেন নাই—এই ভাবে বলিলেন, "কি বলিলে? তুমি আমাকে ভালবাসিতে, এবং এখনও ভালবাস? কি সর্ব্বনাশের কথা! সংবাদপত্রের আফিসে যাহাদিগকে সংবাদ-সরবরাহের কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদিগের কি ভালবাসিবার অবসর আছে?"

সিন্থিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "যে নারী কোন পুরুষকে ভালবাসে, সেই পুরুষসম্বন্ধে তাহার অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তুমি দিবাভাগে সংবাদপত্রের সেবা কর, রাত্রিকালে সহযোগিগণের সহিত মিশিয়া অনাচারী, নিষ্ঠুর, কৃপণ ধনিগণের অর্থ লুণ্ঠন কর; তোমার এই উভয় কার্য্যের উদ্দেশ্যই জনসমাজের সেবা, কিন্তু আমি তোমার সেবিকা। আমি জানি, আমার হৃদয়ভরা প্রেম তুমি অগ্রাহ্য করিবে না।"

সিন্থিয়াকে আর কোন কথা বলিতে হইল না; জেরাল্ড ফ্রষ্ট উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া সিন্থিয়াকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। পুলিস-কমিশনারের খাস-কামরায় প্রেমিক-যুগলের এরূপ অভিনয় বোধ হয় এই প্রথম!

* * * *

জেরাল্ড ফ্রষ্ট পর দিন সিন্থিয়া হলগেটের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "দুই চারি দিনের মধ্যে ওয়াটের সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল কি?"

সিন্থিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "হাঁ, দেখা হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে সে নরফোক্ ষ্ট্রীটের কোন বড় কোম্পানীর 'ফারমে' একটি চাকরী পাইয়াছে।"

ফ্রষ্ট বলিলেন, "তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন; কিন্তু আমি জানিতে চাই—সে কি তোমাকে থর্সবি-সংক্রান্ত কোন কাগজ দিয়াছিল?"

সিন্থিয়া বলিল, "হাঁ, দিয়াছিল।"

অতঃপর সে অদূরবর্ত্তী ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া একখানি কাগজ বাহির করিয়া আনিল, এবং তাহা জেরাল্ড ফ্রষ্টকে দেখিতে দিল।

সেই কাগজে লিখিত ছিল,—

"আমি তোমাকে যাহা বলিব, তুমি তাহা করিবে। তুমি আমার আদেশ পালন না করিলে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিব। ই, টি।"

ই, টি, অর্থাৎ এডমণ্ড থর্সবি।

জেরাল্ড ফ্রষ্ট সেই কাগজখানি মনে মনে পাঠ করিলে সিন্থিয়া হলগেট তাঁহাকে বলিল, "থর্সবি মিঃ অটারওয়েকে যে এই পত্র লিখিয়াছিল, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। এই আগ্রহের জন্যই, আমার হস্তে যে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল, তাহা সম্পাদনের জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমি সেই কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম। ইহা আমার কার্য্যোদ্ধারের জন্য অত্যন্ত নোংরা কৌশল হইলেও—"

জেরাল্ড ফ্রষ্ট সিন্থিয়ার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "হউক অত্যন্ত নোংরা কৌশল; কিন্তু আমি ইহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য ও অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিলে, তোমার সেই অপরাধ ক্ষমা করা হইল।"

সিন্‌থিয়া হলগেট কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু—কিন্তু—"

জেরাল্ড ফ্রষ্ট তাহার কুণ্ঠার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "আর 'কিন্তু'র কোন প্রয়োজন নাই। আর এক সপ্তাহ মধ্যে ক্যাক্সটন হল রেজিষ্টারের আফিসে আমাদের বিবাহ হইবে, ইহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছি। আশা করি, এই এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি বিবাহের সকল আয়োজন শেষ করিতে পারিবে। আর একটি কথা তোমাকে বলা হয় নাই। আমি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি চাকরী পাইয়াছি; এতদিন যে ভাবে সংবাদপত্রের সেবা করিয়া আসিয়াছি—তাহার সহিত এই চাকরীর বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই। লণ্ডনের পুলিস-কমিশনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে আমি অসাধারণ দক্ষ; আমার এই দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ তিনি আমাকে তাঁহার সেরেস্তায় একটি ভাল চাকরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই চাকরীর বেতন ও সম্মান উভয়ই অধিক, এবং সংবাদপত্রের সেবার ন্যায় ইহাও জনসেবা।"

'মর্ণিংমুন' সম্পাদক গলটি, জেরাল্ড ফ্রষ্টের পত্র পাইয়া, পরদিন 'মর্ণিংমুন'এ তাহার ফটো প্রকাশ করিলেন; ঐ প্রকার মূল্যবান্ সংবাদপূর্ণ জরুরী পত্র বহু কালের মধ্যে লণ্ডনের কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। 'মর্ণিংমুনের' যে সংখ্যায় উক্ত পত্র প্রকাশিত হইল, সেই সংখ্যা লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল।

পত্রখানি এইরূপ,—

"ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমাকে আমার অবলম্বিত কার্য্যভার ত্যাগ করিতে হইল। সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি এই সংবাদ তাঁহার পত্রিকায় বিঘোষিত করিতেছি যে, আমি আমার পেশা ত্যাগ করিলাম। অতঃপর আমাকে যে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, আমার পক্ষে তাহা আনন্দদায়ক, এবং আমি পরমাগ্রহে তাহাতে যোগদান করিতেছি। ইহার অতিরিক্ত আমার আর কোন কৈফিয়ৎ নাই। ভবিষ্যতে কেহই 'নিশাচর বাজে'র কার্য্যধারার আর কোন পরিচয় পাইবে না।

নিশাচর বাজ।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সমাপ্ত

অসমাপ্ত

কোকিল বলিছে, সময় যে মোর নাই,
নাহিক সময় মোর,
বাবুইএর মত বাসা যদি আমি চাই
দুখের থাকে না ওর।
গাহিতে কেবল গান
বসন্ত অবসান—
না ফুরাতে কায ফুরায় জীবন
ঝরে নয়নের লোর।

ফুল বলে, আমি কহিতে পাইনে কথা
সময় আমার নাহি,
চলে যায় মোর না চিনিতে তরুলতা
জীবন ক্ষণস্থায়ী।
রুদ্ধ বুকের ধন
না করিতে বিতরণ
বিদায়ের ক্ষণ আসিয়া দাঁড়ায়—
আমি ম্লানমুখে চাহি।

পাহাড় বলিছে, কত যুগ আর বাঁচি,
করিতে কিছু না পারি,
বিরাট বিশ্ব! অবাক্ হইয়া আছি
দিতে তাঁর বলিহারি।
বিচিত্র তাঁর লীলা
ভাবি হয়ে গেছি শিলা
জড়-ভরতের মতন রয়েছি—
আর সব কায ছাড়ি।

শক্তি ক্ষুদ্র, বিপুল বাঞ্ছা প্রাণে
দিয়াছ হে ভগবান্—
ক্ষণিকের মাঝে অঙ্কুরন্তের লীলা
এ কি মহা অবদান।
যাহা ঝরে যায় চুপে
দেখা দেয় নব রূপে
নূতন আসরে পুনঃ এসে ধরে
আধা-গাওয়া তার গান।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

দ্বারসংলগ্ন গুপ্ত কাচদর্পণ

সদর দরজায় কেহ ডাকাডাকি করিলে, লোকটি কে, তাহা ভিতরের লোক দ্বার খুলিবার আগে যাহাতে সুস্পষ্ট দেখিতে পায়, এজন্য দ্বারে কাচ-চক্ষু বসাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কাচ-চক্ষু দুই ইঞ্চি পরিমাণ ঘষা কাচ। দ্বারের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র বাহিরের লোক দেখিতে পায় না। কিন্তু ভিতর হইতে

দ্বার-সংলগ্ন দর্পণ

যে দ্বার খুলিতে যায়, দর্পণ-প্রতিবিম্বিত বাহিরের আহ্বানকারী লোকের সুস্পষ্ট মূর্ত্তি সে দেখিতে পায়। সুতরাং তদনুসারে সে দ্বার খুলিয়া দেয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও যাহাতে ঐ কাচের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, এমন ভাবে উক্ত দর্পণ দ্বারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। সে ব্যবস্থাও আছে।

দ্বিচক্রযানের মৎস্যাকৃতি আবরণ

আমেরিকার ইষ্টন ও কব্ নামক দুইজন মার্কিণ স্বয়ংচালিত যানে আরোহণ করিয়া প্রতি মিনিটে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করেন। এই মোটর-চালিত দ্বিচক্রযানের উপরে একটি আবরণ ছিল। আরোহীরা উহার অভ্যন্তরে গাড়ীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদিগকে বাহির হইতে দেখিবার উপায় ছিল না। আবরণের পশ্চাদ্দিক্ হইতে আরোহীরা গাড়ীতে উপবেশন করিতে পারেন। অতি লঘু ও দীর্ঘকালস্থায়ী কাঠের দ্বারা এই আবরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। আবরণের নাসিকার কাছে যে ফাঁক আছে, তদ্দ্বারা
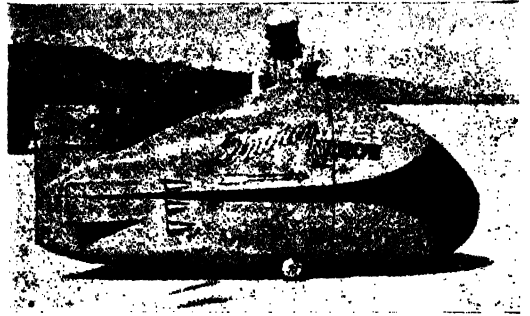
দ্বিচক্রযানের মৎস্যাকৃতি আবরণ

বাতাস প্রবেশ করিয়া এঞ্জিনকে শীতল করিয়া দেয়। পশ্চাতের পুচ্ছের কাছে যে সকল ছিদ্র আছে, তদ্দ্বারা বাতাস বাহির হইয়া যায়। কাচের বাতায়ন-পথে বাহিরের সকল অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। গাড়ী থামাইবারও সুবন্দোবস্ত আছে। এই গাড়ী কালিফের আলজিনায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ছবি দেখিলেই আবরণসহ দ্বিচক্রযানটি কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

অনুসরণকারী বিমান

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ শত্রু-বিমান অনুসরণ করিবার জন্য এক শ্রেণীর বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার প্রপেলারের মধ্য দিয়া যাহাতে বোমা নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, এই ভাবে এই বিমানে দুইটি কামান রক্ষিত হইয়াছে। অক্সিজেন বাষ্পের যন্ত্রাদি বিমানে এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে যে, তাহার সাহায্যে অত্যন্ত ঊর্দ্ধে বিমান উত্থিত হইতে পারে। এই পোতে রেডিও যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। সেই সঙ্গে বিমান-গতিপ্রতিরোধক জালও বিদ্যমান। ইহার ফলে ভূমি হইতে শত্রুপক্ষীয় বোমারুবিমানের
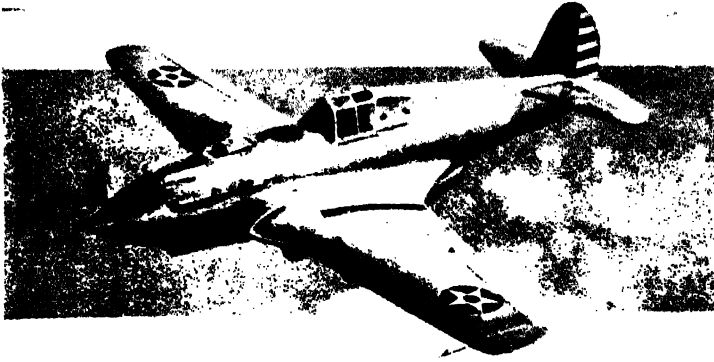
অনুসরণকারী বিমান

আগমনে বাধা দিতে পারা যায়। অবশ্য কি উপায়ে তাহা সম্ভবপর, তাহা সামরিক বিভাগের গুপ্ত কথা।

দ্রুতগামী বিমাননাশক ট্যাঙ্ক

আমেরিকা দ্রুত সমরসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। এজন্য নানাপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ও শত্রু-বিমানধ্বংসের উপযোগী ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে। একপ্রকার ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে বিমানবিধ্বংসী কামান সংস্থাপিত। এই ট্যাঙ্ক ঘণ্টায় ১ শত ১৮ মাইল বেগে পথের উপর দিয়া বিমানের অনুসরণ করিতে পারে।
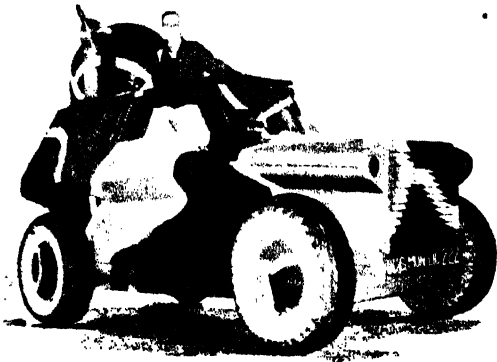
দ্রুতগামী বিমানবিধ্বংসী ট্যাঙ্ক

অতি বন্ধুর পথেও এই ট্যাঙ্ক ঘণ্টায় ৭৮ মাইল ধাবিত হয়। এই ট্যাঙ্কের উপরে স্বয়ংচালিত যে কামান সংস্থাপিত আছে, তাহা হইতে প্রতি মিনিটে ১ শত ২০টি গোলা বিমানের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে। এই ট্যাঙ্কের সম্মুখে ও পশ্চাতে আরও তিনটি কামান অবস্থিত। ট্যাঙ্কে এক জন চালক ও দুই জন গোলন্দাজ থাকে। তাহারা যাহাতে আহত না হয়, এজন্য তিন ইঞ্চি পুরু গুলী-নিবারক কাচ তাহাদিগের চারিদিকে আছে। এই ট্যাঙ্কের ওজন ১০ হাজার পাউণ্ড। ইহা অন্যান্য ট্যাঙ্কের তুলনায় এক টন লঘুভার।

বিজ্ঞানের কৌশল

আমেরিকার বৈজ্ঞানিক শিল্পী এক জাতীয় ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঘড়ীর সঙ্গে কুকুরের আহার্য্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ঘড়ীতে এমন ভাবে দম দিবার বন্দোবস্ত আছে যে, ঠিক নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা বাজিবামাত্র ঘড়ীর আধারসংলগ্ন পাত্রের ঢাকনি আপনা হইতে মুক্ত হয়। তাহার মধ্যে কুকুরের আহার্য্য থাকে। মনিব বাড়ী না থাকিলে কুকুরের আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবরণ মুক্ত হইবামাত্র কুকুর যথাসময়ে আহার্য্য পাইয়া থাকে। কুকুর এই ব্যাপারে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, ঠিক নির্দ্দিষ্ট আহারের সময় চুপ করিয়া ঘড়ীর কাছে আসিয়া বসিয়া থাকে।

উপরের চিত্রে কুকুর আহারের প্রতীক্ষা করিতেছে; নিম্নের চিত্রে আবরণমুক্ত আধার হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতেছে

তার পর ঘড়ীর কাঁটা নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার সঙ্কেত করিবামাত্র কুকুর ভোজনপর্ব্ব সমাধা করে।

অভিনব যাত্রিবিমান

ইংলণ্ডে যাত্রিবহনের জন্য একপ্রকার নূতন বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমানের ওজন ১৩ টন। য়ুরোপে যাত্রিবহনের জন্য এই বিমান নিযুক্ত হইবে। এই বিমানের দৈর্ঘ্য সাড়ে ৭১ ফুট। উভয় ডানার
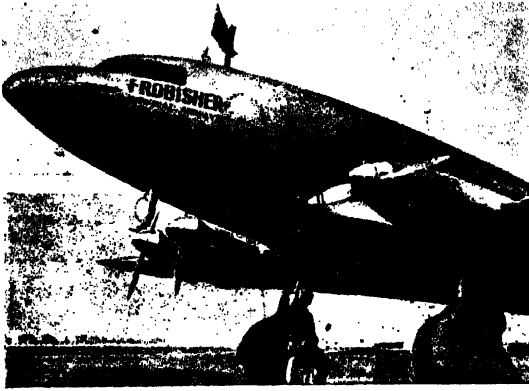
নূতন ধরণের যাত্রিবিমান

বিস্তার ১ শত ৫ ফুট। ৭২ জন আরোহী এই পোতে স্বচ্ছন্দে স্থানলাভ করিতে পারিবেন।

কলের হাতী

কলের দ্বারা চালিত একটি হস্তী নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার নামকরণ হইয়াছে জুম্বো। মোটর-চালিত এই হস্তীটি ধীরে ধীরে চলিতে পারে, দৌড়িতে পারে এবং নৃত্য করিতেও সমর্থ। জীবিত হস্তী স্বাভাবিকভাবে যেমন করিয়া হস্ত-পদাদি চালনা করিয়া থাকে,
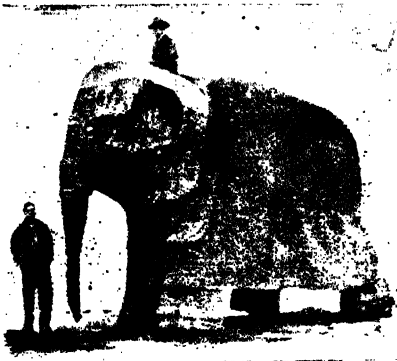
মাহুত এই কলের হাতীকে ইচ্ছামত দৌড় ঝাঁপ নৃত্য করাইতে পারে

এই যন্ত্র-চালিত হস্তীটিও ঠিক সেইভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন করিয়া থাকে। এক গ্যালন তৈলে জুম্বোর দৌড় ঝাঁপ, নৃত্যাদি ২০ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। মাহুত-চালিত জুম্বো এইভাবে ১৫ হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। অবশ্য বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্যেই কলের হাতীর এই পরিভ্রমণ। এই প্রকার অনেকগুলি কলের হস্তী নির্ম্মিত হইতেছে। তাহারা যাত্রিবহন ও নিউ ইয়র্কের বিশ্বমেলায় বিজ্ঞাপনের কার্য্য করিবে। হাতীর কাঠামো দারু ও সূক্ষ্ম তারনির্ম্মিত।

তাপ-প্রতিরোধক কাচের কেৎলী

নূতন ধরণের কাচের কেৎলী নির্ম্মিত হইয়াছে। রেফরিজিরেটারে জল ভরিয়া রাখা এবং টেবলে চায়ের জন্য ব্যবহারের উপযোগী হইবে বলিয়া এই কেৎলীর চাহিদা বাড়িয়াছে। এই স্বচ্ছ কেৎলী কাচনির্ম্মিত এবং উত্তাপ-প্রতিরোধক শক্তি-বিশিষ্ট। যখন কেৎলীর জল ফুটিতে থাকে, তখন দেখা যায়, কতখানি জল উহাতে আছে। কেৎলীর ঢাকনি বন্ধ করিবার সুবন্দোবস্ত আছে।

তাপ-প্রতিরোধক কাচের কেৎলী

বিমানাকৃতি দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী

ছোট-খাট বিমানের আকারবিশিষ্ট দ্রুতগামী মোটর-গাড়ী নির্ম্মিত
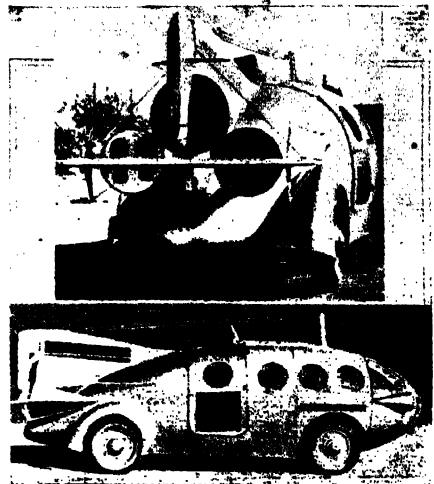
বিমানাকৃতি দ্রুতগামী মোটর; উপরের ছবিতে মোটর গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ এবং নিম্নের ছবিতে মোটর গাড়ীর সমগ্র অংশ দেখা যাইতেছে

হইয়াছে। বিমানের ডানা শুধু ইহাতে নাই। এই মোটর-গাড়ী ঘণ্টায় ১ শত ১৫ মাইল বেগে ধাবিত হইতে পারে। এই গাড়ীতে ৮ সিলিণ্ডারযুক্ত মোটর আছে। হাউই শক্তির দ্বারা ইহাকে পরিচালিত করিবার কল্পনা, গাড়ীর নির্ম্মাতা করিয়াছিলেন। তাই গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে সেইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। গাড়ীখানি এল্যুমিনয়মে নির্ম্মিত। ১৬ হাজার ডলার মুদ্রা ব্যয়ে এই অভিনব মোটর-গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

ট্রাঙ্ক ও বিমানধ্বংসের অস্ত্র

মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগে দুই প্রকার ভীষণ অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি অস্ত্রের দ্বারা বিমানপোতের সহিত সংগ্রাম চলিবে, অপরটির দ্বারা ট্যাঙ্কের সহিত যুদ্ধ চলিবে। বিমানধ্বংসী কামান স্বয়ংচালিত। একটি চারি চাকার ট্রেলারের উপর উহা স্থাপিত। একটি লঘুভার ট্রাক্ উহার সহিত সংলগ্ন। ট্রাকৃটি অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে ধাবিত হয়। সমগ্র যন্ত্রটির ওজন ৫ হাজার পাউণ্ড। এই ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান একটি গাড়ীর উপর সংস্থাপিত। গোলন্দাজ বর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া থাকে। গোলা নিক্ষেপের সময় একজন গোলন্দাজ কামানে গোলা ভরিয়া দেয়, অপর ব্যক্তি লক্ষ্য ঠিক করিয়া গোলা নিক্ষেপ করে।

উপরে স্বয়ংচালিত বিমানধ্বংসী কামান ; নীচে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী আগ্নেয়াস্ত্র

জলের উপর দিয়া সমগ্র অট্টালিকা অপসারণ

পিয়োরিয়ার এক ব্যক্তি নূতন বাড়ী ক্রয় করিয়া ট্রাকের সাহায্যে তাহা স্থানান্তরিত না করিয়া ইলিনয় নদীর উপর দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া নূতন স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। ইস্পাত-নির্ম্মিত এই অট্টালিকার ওজন ৪১ টন। এই বাড়ীটিতে ৮টি ঘর আছে। একখানি মোটরচালিত লঞ্চ বাড়ীটিকে টানিয়া অপর পারে লইয়া গিয়াছিল। ৮ ইঞ্চি পরিমাণ জল ভেদ করিয়া বাড়ীটি পরপারে গিয়া উঠিয়াছিল।
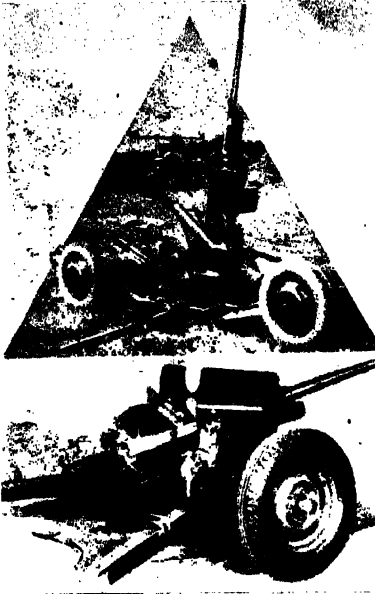
জলের উপর দিয়া অট্টালিকা অপসারণ

নূতন ধরণের মোটর-গাড়ী

বোতাম টিপিবামাত্র মোটর-গাড়ীর ছাদ আপনা-হইতে খুলিয়া যাইবে, এই ভাবের নূতন মোটর-গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার ইচ্ছা করিলেই অন্য বোতাম টিপিবামাত্র ছাদ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে। এজন্য পরিশ্রম করিবার আদৌ প্রয়োজন হইবে না।

বৈজ্ঞানিক কৌশলে মোটর-গাড়ীর ছাদ তোলা ও নামান

এত দ্রুত এই কার্য্য সম্পন্ন হয় যে, মনে হইবে, ইন্দ্রজাল-প্রভাবে উহা সম্ভবপর হইয়াছে। পূর্ব্বে ছাদ তুলিয়া দেওয়া ও নামাইয়া ফেলিবার জন্য চালক ও আরোহীর সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হইত। এখন আর তাহার কোন প্রয়োজনই নাই।

বাহাদুর ছেলে

(রূপ-কথা)

এক

পনেরো বছর বয়সেই সুরদাস লেখাপড়ায় সকলকেই অবাক্ করিয়া দিল। পাড়ার সবাই সুরদাসের পড়াশুনা দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, 'এ ছেলে নিশ্চয়ই ক্ষণজন্মা, তাঁতীর ছেলে হ'লে কি হবে।'

পাড়ার সকলের মুখেই সুরদাসের ত এই রকম সুখ্যাতি, আবার বাড়ীতে তার দুর্গতির কথা যদি শোনো, তোমরাও সকলে একেবারে অবাক্ হইয়া ভাবিবে,—'এত কষ্টের ভেতর দিয়ে কেমন ক'রে সে এই বয়সে অত লেখা-পড়া শিখে সবার সুখ্যাতি পেয়েছে!'

সুরদাসের বাবা রামদাস তাঁত বুনিত। সুরদাসের মা চরকায় সুতা কাটিয়া ও ছোট ছোট নলিগুলিতে সেই সুতা ভরিয়া দিয়া স্বামীর কাযে সাহায্য করিত। সারা দিন ধরিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যে কাপড় তৈয়ারী হইত, রামদাস তাহা হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। তাহাতেই এই ছোট পরিবারটির দিন এক রকম করিয়া চলিয়া যাইত। রামদাসের একটা মস্ত গুণ ছিল, সে ছেলেবেলা হইতে একটি দিনের জন্যও মিথ্যা কথা বলে নাই। কাপড় বেচিতে গিয়াও কখনো সে ভুলিয়াও মিথ্যা কথা বলিত না। হিসাব করিয়া তাহার কাপড়ের যে দাম সে বলিত, তাহার নড়-চড় সে কখনই করিত না, তা সে কাপড় বিক্রয় হউক আর নাই হউক। রামদাসের এই সত্যনিষ্ঠার কথা এই অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে প্রচার হইয়া গিয়াছিল। এ জন্য হাটে-বাজারে রামদাস কাপড় লইয়া যাইবামাত্রই বিক্রয় হইয়া যাইত। বাপের এই গুণটি পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিল সুরদাস।

সুরদাসের হাতে-খড়ির দিন রামদাসের কি আহ্লাদ! এই কয় বছরেই তাহার ছেলে মুখে মুখে কত কথাই শিখিয়াছে। লেখা-পড়ার পাঠ তো তাহাদের বংশে কখনো নাই। তাহার ছেলের মুখ দিয়া কিছুতেই মিথ্যা কথা বাহির হয় না, দেখিয়া ভারী খুশী। সুরদাস কোনদিন কোন দোষ করিলে তাহা যত বড় দোষ হউক, কিছুতেই চাপিয়া যাইত না; জিজ্ঞাসা করিলেই মুখখানা উঁচু করিয়া কহিত,—'আমি করেছি!' অথচ, তাহার বয়স তখন তিন বৎসরও পূর্ণ হয় নাই।

হাতে-খড়ির দিন রামদাস ছেলেকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া কহিল,—বল বাবা, তুমি খুব ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখ্‌বে?

ছেলে বাবার গলাটি দুই হাতে জড়াইয়া কহিল,—'হাঁ বাবা, আমি শিখ্‌বো।'—কে যেন অতটুকু ছেলের মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি অমন করিয়া প্রকাশ করাইয়া দিল।

কিন্তু ইহার পর ছেলে কি ভাবে তাহার পড়াশুনা চালাইল, দুর্ভাগ্য রামদাস তাহার কোনো খবরই রাখিতে পারিল না। কেন, সে কথাই এবার বলিতেছি।

দুই

সুরদাসের হাতে-খড়ির পরদিন সেই যে রামদাস কাপড় লইয়া হাটে গেল, আর বাড়ী ফিরিল না। তাহার পর আরও কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সুরদাস চৌদ্দ বছরে পড়িয়াছে, কিন্তু আজও রামদাসের আর কোনও খবর আসে নাই; পাড়া-শুদ্ধ সবাই ঠিক দিয়া রাখিয়াছে—রামদাসের আর আশা নাই, হয় সে মরিয়াছে; নয় তো বোম্বেটেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। সে আর আসিবে না।

রামদাসের স্ত্রী কমলার তখন কি কষ্ট! স্বামী কাপড় লইয়া বাজারে গেলেন, আর ফিরিলেন না। সুরদাসকে লইয়া তখন তাহার আরও দুইটি ছেলে। এমন কিছু সঞ্চয় নাই যে, ছেলে তিনটিকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিবে।

রামদাসের বাড়ীখানি ছোটখাটোর উপর মন্দ ছিল না। বাড়ীর লাগোয়া একখানা ছোট বাগান ছিল, একটা পুকুর এবং কিছু ধানজমিও তাহার ছিল।

রামদাসের এক জ্ঞাতি খুড়োর এই জমিগুলির উপর অনেক দিন হইতে লোভ ছিল। সুযোগ বুঝিয়া এই সময় তিনি হিতৈষীর মত আসিয়া কহিলেন,—'আমি যতক্ষণ আছি, তোমাদের ভাবনা কি! আমিই সব দেখা-শোনা করব, যাতে তোমাদের দিন চলে যায়, তারও উপায় ক'রে দেব।'

কমলা যেন অকূলে কূল পাইল। সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—'কাকা, আমি তো আপনাদের কুলের বউ, এখন আপনিই আমাদের ভরসা। আপনি যা বলবেন, তাই আমরা করব। শুধু একটা কথা, তাঁর বড় সাধ ছিল যে, সুরো পাঠশালায় পড়ে। সেইটুকু আপনি বজায় রাখ্‌বেন।'

সেই দিন হইতেই খুড়ো ইহাদের মাথার উপর চাপিয়া বসিলেন। খুড়োর নাম শ্রীনিবাস। কিন্তু পাড়ার লোক আড়ালে তাহাকে নরপিশাচ বলিয়া ডাকিত। শ্রীনিবাস রামদাসের তাঁত-খানা চালাইবার ব্যবস্থা করিল। পুকুর বাগান দখল করিয়া লইল। ধানজমিগুলিরও তদারক আরম্ভ করিয়া দিল। কমলা দিবা-রাত্রি খাটিত, তাহার ছেলেগুলিকেও গাধার খাটুনি খাটিতে হইত, কিন্তু তবুও দুই বেলা তাহারা কেহই পেট পুরিয়া খাইতে পাইত না।

মুখ বুজিয়া কমলা সবই সহিত, কোনো বিষয়েই কোনো দিন খুড়োর কথার প্রতিবাদ করিত না। কিন্তু যখনই খুড়ো সুরদাসকে পড়াশুনা ছাড়াইয়া তাঁতের কাযে ও চাষের জমিতে লাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তখনই কমলা হাত দু'খানি যোড় করিয়া বলিত,—আমি তো গোড়াতেই বলেছিলুম কাকা, সুরো লেখাপড়া শেখে, এইটিই ছিল তাঁর বড় সাধ, দোহাই আপনার, ওকে পাঠশালা ছাড়াবেন না।

খুড়ো গজ-গজ করিতে করিতে বলিত, লেখাপড়া শিখে ছাই হবে; তাঁতীর ছেলের তাঁতই ভালো।

সুরদাস সবই শুনিত, নিজেদের অবস্থাও বুঝিত। তাহার বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। মনে মনে সেই বয়সেই সে স্থির করিয়াছিল, লেখাপড়া শিখিয়া মায়ের এই দুঃখ আমাকে ঘুচাতেই হইবে।

বুদ্ধি খাটাইয়া সে খুড়োরও মন যোগাইয়া চলিত। পাঠশালার পড়ার সঙ্গে সে খুড়োর ফাই-ফাইফরমাসও অনেক শুনিত। তাঁতের কাযেও ছেলেটির মেধা দেখিয়া খুড়ো অবাক্ হইয়া গেল। এক দিন বলিল,—তুই এতেই ভালো ক'রে লেগে পড়, সুরো, কালে মানুষ হবি।

সুরদাস খুড়োর কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর দিল—আমি সে রকম মানুষ হ'তে চাই না দাদু, আমি চাই মানুষের মত মানুষ হয়ে মানুষের কষ্ট ঘোচাব, একশো মানুষকে দু'বেলা পেটপুরে খেতে দেব।

বালকের মুখে এইরূপ দম্ভের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ শ্রীনিবাস কহিল—তোর বাবার মাথায় ছিট ছিল, তোর মাথাতেও সেটা এসে ঢুকেছে, এ ভালো কথা নয়।

যে সকল বালকের মনে বড় হইবার জন্য জিদ থাকে, মায়ের কষ্ট যাহাদের গায়ে কাঁটার মত বিঁধিয়া ব্যথা জাগায় ও সেই কাঁটা তুলিবার জন্য যাহারা পাগল হইয়া উঠে, কিছুতেই তাহারা মন-মরা হয় না। তাই, দুইবেলা ভালো করিয়া পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া এবং ছুটীর সময় মজুরের মত খাটিয়াও সুরদাস একমনে বিদ্যার সাধনা এমন নিবিষ্টভাবেই করিতেছিল যে, চৌদ্দ বছর বয়সে সে তখনকার গ্রাম্য বিদ্যালয়ের সমস্ত পাঠই শেষ করিয়া ফেলিল।

বাহিরের লোকের মুখে সুরদাসের যখন খুবই সুখ্যাতি, বাড়ীতে শ্রীনিবাস তখন মুখখানা বিকৃত করিয়া কমলাকে কহিল,—আর কি, ছেলে তোমার লেখাপড়ায় লায়েক হয়ে চতুর্ভুজ হয়েছে তো এবার মায়ে-পোয়ে পেটের চেষ্টা দেখ, আমি কিন্তু খাওয়া-পরা তোমাদের যোগাতে পারব না, তা ব'লে রাখ্‌ছি।

এতদিনে ইহাদের পুকুর বাগান ও ধানের ক্ষেত সমস্তই খুড়োর মুঠার ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। খুড়ো হিসাব করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন,—এতগুলি বছর বসিয়ে বসিয়ে এতগুলো পেটের আহার যোগাতে যে টাকা খরচ হয়েছে, ঐ ক'বিঘে জমি থেকে তার এক আনাও উসুল হবে না।

সুরদাস কহিল,—দাদু, এতদিন আপনি খাইয়েছেন, আমাদের দেখেছেন শুনেছেন, আর একটি বছর আপনি আমার মা আর ভাইটিকে দেখুন।

শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিল,—তাতে কি 'চতুঃভুজ' হবে?

সুরদাস কহিল,—আমি উপায়ের চেষ্টায় বেরুব দাদু, এক বছরের ভেতরেই মানুষ হয়ে ফিরব।

শ্রীনিবাস গম্ভীর হইয়া কহিল,—বুঝিছি, বাপের রাস্তা ধরবার মতলব করেছিস্!

সুরদাস কহিল,—হাতে-খড়ির দিন বাবাকে দেখেছি, বাবার কথাগুলো এখনো মনে আছে, বাবার সেই মুখখানা আর চোখের চাহনি এখনো ভুলিনি দাদু! বাবা বেরুলেন হাটে, আর ফিরলেন না, কি হ'ল তাঁর, কোথায় তিনি,—সে সন্ধানও কি আমার নেওয়া উচিত নয়, দাদু?

দাদু তখন মনে মনে ঠিক দিতেছিলেন, এই তুখোড় ছেলেটা সরে গেলে তাঁরই রাস্তা আরও খোলসা হয়, বাস্তু ভিটেটাও তাঁর নিজের বাস্তুর সামিল হইয়া যায়।

মুখখানা গম্ভীর করিয়াই তিনি কহিলেন, এত বড় বোঝা এতগুলো বছর ধরে যখন মাথায় তুলে বয়েছি, তার তুলনায় এ তো শাকের আঁটি। আচ্ছা—তোমার কথাই সই।

ইহার পর সুরদাস মায়ের পায়ের তলায় মাথাটি রাখিয়া কহিল,—তোমার দুঃখ দূর করতে আমি পশ্চিমে বেরুব মা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর—যেন মনোবাঞ্ছা আমার পূর্ণ হয়, দশ জনের এক জন হয়ে যেন এই ভিটেয় ফিরে আবার এমনি ক'রে তোমার পায়ের ধূলো নিতে পারি।

কমলা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল,—সে কি রে, কোথায় যাবি বাবা, কেমন ক'রে যাবি,—তুই যে এখন দুধের ছেলে!

সুরদাস মুখখানা তুলিয়া জোর গলায় কহিল,—আমি তাঁতীর ছেলে; পাঁচ বছর বয়স থেকে কলম ধরেছি, মাকু চালিয়েছি, হাড় আমার এমনি শক্ত হয়ে গেছে যে, কিছুতেই ভাঙ্গবে না। মানুষ আমাকে হতেই হবে, মা। তোমার কষ্ট ঘুচাব। মুখ দিয়ে কখনো মিছে বলিনি, আমার কথা মিছে হবে না, মা।

মা ছেলের মাথায় হাতখানি রাখিয়া, ধরা-গলায় কহিলেন,—আশীর্ব্বাদ করি বাবা, মনোবাঞ্ছা তোমার পূর্ণ হোক।

তিন

চৌদ্দ বছর বয়সের বালক সুরদাস থান-দুই কাপড়, একখানা চাদর আর একখানি গামছা মাত্র সম্বল করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল, মায়ের কষ্ট মোচন করিতে এবং নিজে রোজগার করিয়া মানুষ হইতে। মনের মধ্যে আরও একটি আশা তাহার চাপা ছিল, সেটি হইতেছে—তাহার বাবাকেও এই সঙ্গে খুঁজিয়া বাহির করা।

যে বয়সে ছেলেরা একলা গ্রামের বাহিরে যাইতে ভয় পায়, সঙ্গে কেহ না থাকিলে রাতে-ভিতে ঘরের বাহিরে যাইতেও সাহসে কুলায় না, সেই বয়সে সুরদাস একরকম নিঃসম্বল অবস্থায় শুধু মনের জোরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় মনে মনে সে ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া শুধু বলিয়াছিল,—এই দেশেরই ছেলে শ্রীমন্ত তার বাবার সন্ধানে কালাপানি পার হয়ে সিংহলে গিয়েছিল। শ্রীমন্তের ছিল সাত ডিঙ্গা, অনেক লোক-জন, বিস্তর ধন-দৌলত। আমি চলেছি একা, সম্বল আমার কিছুই নাই। কিন্তু মাথার ওপর আছ তুমি। পথ দেখিয়ে ঠিক জায়গাটিতে তুমিই আমাকে নিয়ে চল ঠাকুর!

হুগলী জিলার সপ্তগ্রাম অঞ্চলে সুরদাসদের বাড়ী। তখন সপ্তগ্রামের খুব নাম-ডাক। এ অঞ্চলের সেরা সহর। এখন কলিকাতা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় জায়গা, সেকালে বাঙ্গালা দেশের সপ্তগ্রামও ছিল এমনি জম-জমাট সহর। সপ্তগ্রামের বন্দর হইতে তখন দেশ-বিদেশে জাহাজ-বোঝাই হইয়া নানা রকমের তৈরী কাপড়, রেশম, সূতা, তুলা প্রভৃতি রপ্তানী হইত। এই সপ্তগ্রাম হইতে আরও দশ ক্রোশ তফাতে ছিল সুরদাসদের গ্রাম। সেই গ্রামের নাম সাতনা।

সাতনা গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ তফাতে আর একখানা খুব সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। গ্রামখানি নদীর কিনারায় বলিয়া এখানে একটা খুব বড় গঞ্জ বা বাজার বসিয়াছিল। অনেক দোকান-পাট, ঘর-বাড়ী, লোকের সমাগম, গাড়ী পাল্কী প্রভৃতি দেখিলে মনে হইত, ইহাও একটা বড় সহর। সপ্তাহে একদিন এখানে হাট বসিত। আশে-পাশের গ্রাম হইতে তাঁতীরা এই হাটে কাপড় বেচিতে আসিত! এখানে সস্তায় কাপড় বিকাইত বলিয়া সপ্তগ্রাম হইতে অনেক মহাজন এখানে কাপড় কিনিতে আসিতেন ও প্রচুর কাপড় কিনিয়া নৌকায় সপ্তগ্রামে যাইতেন। এখান হইতে সপ্তগ্রামে নৌকা যাতায়াত করিত। অনেকে হাঁটা-পথেও যাইতেন। তখনকার লোক পাঁচ সাত ক্রোশ পথকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না, অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতেন। এই গ্রাম্য সহরে একটা বড় বিদ্যালয়ও ছিল। সেখানে মোটামুটি রকমের সংস্কৃত ও ফার্সী পড়ান হইত। দেশের রাজা তখন মুসলমান, কাযেই একালের ইংরেজীর মত, তখন ফার্সী ভাষা সকলকেই শিখিতে হইত।

সুরদাস তাহার গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ তফাতে এই সহরে পাঠ অভ্যাস করিতে আসিত। যাতায়াতে তাহাকে নিত্য ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত, কিন্তু তাহাতে সে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিত না। বরং এখানে আসিলেই তাহার বুকখানি যেন দুলিয়া উঠিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিত একখানি স্নেহময় মুখ,—সে মুখ তাহার বাবার! সুরদাসের হাতে-খড়ি হইবার পরদিন এই হাটেই সে কাপড় বেচিতে আসিয়াছিল, আর বাড়ী ফিরে নাই! তিনটি বৎসর কঠোর পরিশ্রমে সুরদাস এই বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু সেই তিনটি বৎসরের মধ্যে এমন একটি দিন যায় নাই—যে দিন সুরদাস তাহার বাবার কথা না ভাবিয়াছে! সেই বাবার সন্ধানেই আজ সে বুক বাঁধিয়া বাহির হইয়াছে।

সঙ্গে ছিল চিড়া ও কয়েক ডেলা গুড়। গামছায় বাঁধিয়া সেই চিড়া সে নদীর জলে ভিজাইয়া লইল। তাহার পর তীরেই একটু স্থান ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া সে গামছায় ভিজানো চিড়া তথায় রাখিল। কলাপাতায় জড়ানো শুষ্ক গুড়ের যে দুটি ডেলা গামছার আর একটি খুঁটে বাধা ছিল, তাহা খুলিয়া ভিজা চিড়ার সহিত মিশাইল। পিতলের একটি হাল্কা ঘটীও তাহার পুঁটলীর ভিতর ছিল। সেটি লইয়া সে জল আনিতে নদীতে নামিল। হাত মুখ ধুইয়া ঘটীটি জলে ভরিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে একটা চীল আসিয়া তাহার গামছায় বিছানো আহার্য্যটুকু সমস্তই এক ঝাপ্টায় তুলিয়া লইয়া গেল। সুরদাস দুই চক্ষু মেলিয়া চীলটার এই কাণ্ড দেখিল, কিন্তু সে তখন নাগালের বাহিরে গিয়াছে। জলপূর্ণ লোটাটি লইয়া সে যথাস্থানে ফিরিয়া নিজের মনেই হাসিল। নল রাজার গল্প তাহার মনে পড়িয়া গেল; বরাত মন্দ হইলে পোড়া শোলমাছও জ্যান্ত হইয়া জলে পলায়।

হাসিমুখেই সুরদাস নদীর জল মুখে ঢালিবার জন্য ঘটীটি নত করিয়াছে, এমন সময় নদীর তীরে বাঁধা একখানা নৌকার ভিতর হইতে একজন বিদেশী ভদ্রলোক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পরিষ্কার হিন্দীতে কহিল,—শুধু জল খেয়ো না বাচ্চা, আমার কাছে এসো—থোড়া মিঠাই লিয়ে যাও।

নদীর তীরে অনেকগুলি নৌকাই বাঁধা ছিল। সপ্তগ্রামের যে সকল মহাজন এই সহরের হাট হইতে কাপড় কিনিতে আসিতেন, এই সকল নৌকা তাঁহাদেরই। এই মহাজনটি নৌকার ভিতরে বসিয়া সুরদাসের ভোজনের আয়োজন আগাগোড়াই দেখিতেছিলেন।

সুরদাস হাতের ঘটীটি নামাইয়া নৌকার দিকে চাহিল। দেখিল, মাথায় সাদা টুপি, পরনে পিরাণ পায়জামা, কাঁচা পাকা পরিপুষ্ট গোঁফওয়ালা এক প্রৌঢ়বয়স্ক হিন্দুস্থানী নৌকায় দাঁড়াইয়া তাহাকে মিঠাই লইবার জন্য ডাকিতেছেন। সুরদাসের মনের ভিতর একটা চাপা অভিমান অমনি গুমরিয়া উঠিল, সেও হিন্দীতে উত্তর দিল,—আপনার মঙ্গল হোক, কিন্তু শেঠজী, আমি ভিখিরী নই, আপনার মিঠাই আমি নিতে পারব না; আমাকে মাপ করবেন।

ছেলেটির চেহারা দেখিয়াই শেঠজীর মনটি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই তাহার দুর্ভোগ দেখিয়া তাঁহার মনটিও গলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অল্পবয়স্ক ছেলেটি যেরূপ শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার অযাচিত অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিল, এবং যে বিশুদ্ধ ভাষায় কথাগুলি সে কহিল, তাহাতে তিনি আরও মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

তিনি আরও স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—তুমি আমার ছেলের মত; আমার চোখের ওপর চীলটা তোমার খাবার তুলে নিয়ে গেল, খালি জল তুমি মুখে ঢাল্‌ছো; তোমার বাবা কাছে থাক্‌লে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারতো? আর তিনি তোমাকে মিঠাই দিতে গেলে তুমি নিতে না?

সুরদাস স্তব্ধ হইয়া এই নূতন মানুষটির কথাগুলি শুনিল। এমন করিয়া স্নেহের সুরে কেহ ত তাহাকে ডাকে নাই; মা ভিন্ন এখন আদর আর ত সে কাহারো নিকট পায় নাই! কে এ মহাজন! কিন্তু মনের অভিমানটুকু তথাপি নিশ্চিহ্ন হইল না। সুরদাস উত্তর দিল,—আমার বাবা যদি আজ থাক্‌তেন, শেঠজী, তা হ'লে এ রকম ক'রে আমাকেও এখানে আস্‌তে হ'ত না, চীলও আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পালাত না। তা ছাড়া, বাবার দেওয়া খাবার হাত পেতে নিতে ছেলের মনে দ্বিধা আসে না। কিন্তু—

শেঠজী হাসিয়া কহিলেন,—বুঝিছি, আমি পর ব'লে আমার দেওয়া খাবার হাত পেতে নিতে তোমার কুণ্ঠা হচ্ছে। কিন্তু কি হ'লে এ কুণ্ঠা দূর হ'তে পারে, আমাকে বল্‌বে?

সুরদাস কহিল, আদান-প্রদান। ধরুন, আপনি যদি আমার কাছ থেকে কিছু পান, তার বদলে আপনার কাছে থেকেও আমি আপনার দেওয়া জিনিস নিতে পারি। কিন্তু আমার তো দেবার মত কিছু নেই, শেঠজী!

শেঠজীর মুখখানি অমনি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঠোঁটের কোণে

হাসি দেখা দিল। গলার স্বরটুকু আরও কোমল করিয়া তিনি কহিলেন,—তুমি কি লিখ্তে পড়তে জানো খোকা?

সুরদাস উত্তর দিল,—কিছু কিছু জানি।

শেঠজী প্রফুল্লমুখে কহিল,—তুমি যখন বাঙ্গালী, বাঙ্গালা তো জান্বেই; হিন্দী ফার্সী থোড়া বহুত জান কি?

সুরদাস কহিল,—জানি।

উল্লাসের সুরে শেঠজী কহিলেন,—জানো? আচ্ছা, ফার্সী চিঠি পড়তে পার তুমি?

সুরদাস উত্তরে কহিল,—পারি। চিঠি পড়তেও পারি, লিখ্তেও পারি।

শেঠজী কহিলেন,—আমি ফার্সী বল্তে পারি, কিন্তু লিখ্তে-পড়তে জানি না। দিল্লীর মোকাম থেকে একখানা ফার্সী চিঠি আমার নামে এসেছে। সে চিঠি আমার কাছেই আছে। কিন্তু এখনো পড়ানো হয় নি। পড়ে দেবে তুমি?

সুরদাস হাসিমুখে কহিল,—এ আর এমন কি বেশী কথা। বেশ ত।

শেঠজী কহিলেন,—যদি চিঠিখানা তুমি ঠিক পড়ে দিতে পার খোকা, ওর জবাবটাও তোমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেব। আর তার জন্য শুধু মিঠাই কেন, তোমার মেহন্নতানাও ঠিক মত দেব। তা হ'লে তুমি নৌকায় এসো।

লোটা, লাঠি ও অবশিষ্ট কাপড় চাদর দু'খানি লইয়া সুরদাস নৌকায় উঠিল। নৌকাখানি দিব্য সাজানো; যেন একখানি ছোটো-খাটো বৈঠকখানা। শেঠজী তাহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। তাহার পর বেতের একটি চুপড়ীর ভিতর হইতে এক-খানি চিঠি বাহির করিয়া সুরদাসের হাতে দিলেন।

সুরদাস চিঠিখানা খুলিয়াই তৎক্ষণাৎ পড়িয়া শেঠজীকে শুনাইল। শেঠজী বিস্ময়ের সুরে কহিলেন,—বড় বড় মুন্সীরাও এত তাড়াতাড়ি ও এমন পরিষ্কার করিয়া চিঠি পড়্তে পারে না। যাক্, এর জবাব ধীরে সুস্থে একটু পরে তোমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেব। এখন তো তুমি কিছু খাও।

সুরদাস এবার আর 'না' বলিতে পারিল না। হাসিমুখে কহিল,—আপনার জিদ আমার চেয়েও বেশী শেঠজী!

শেঠজী কহিলেন,—সেই জন্মেই এমন ভাবে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে।

নৌকার ভিতরেই নানাবিধ ফল ও প্রচুর মিষ্টান্ন ছিল। চাকরকে ডাকিয়া শেঠজী সে সকল আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। এমন ফল ও এত মিষ্টান্ন সুরদাস কখনো চোখেও দেখে নাই। দুইখানি রূপার থালায় ভরা প্রচুর ফল ও মিষ্টান্ন কিন্তু তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারিল না; বিপুল অশ্রু যেন বাষ্পের মত তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; আর সেই বাষ্পের ভিতর দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল—তাহার মায়ের মলিন মুখ, তাহার দুইটি ভাইয়ের ক্ষুধাকাতর শীর্ণ দেহ! তাহার সম্মুখে এই রাজভোগ, আর তাহারা—

একটা নিশ্বাস জোরে ফেলিয়া সুরদাস আর্ত্তস্বরে কহিল,—না, শেঠজী, এ সব সরিয়ে নিয়ে যেতে বলুন; আমি খেতে পারবো না, আমাকে ছুটি চিঁড়ে কিম্বা মুড়ি এনে দিতে বলুন।

শেঠজীও স্তব্ধ! হইল কি? খাইতে বসিয়া কেন এই ছোকরা এমন কথা বলিল। কিন্তু জেরা করিতেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল; মনের বন্ধ দুয়ারটি খুলিয়া দিয়া সুরদাস তাহাদের সংসারের অবস্থা ও তাহার নিরুদ্দেশ যাত্রার সকল কথাই খুলিয়া বলিল। তাহার পর নিজেই প্রশ্ন করিল,—আপনিই বলুন শেঠজী, যার মা একটি বেলাও পেটপূরে খেতে পায় না, ভাই দুটি মুটে-মজুরের মত খাটে অথচ পেটে দুটি-বেলা ভাত পড়ে না, এই রাজভোগ তার মুখে কেমন ক'রে রুচ্বে?

শেঠজীও এই করুণ কাহিনী শুনিয়া একেবারে অভিভূত; তাঁর দুই চক্ষুর কোণ দিয়া টস্-টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। রুমালে চক্ষু মুছিয়া তিনি কহিলেন,—এদিন তোমার থাক্বে না খোকা, তোমার এই ত্যাগ দেখেই বুঝ্তে পারছি, ভগবানের দয়া তুমি পাবেই। বেশ, সাদা-সিধে খাবারই তোমার জন্য আনাচ্ছি, তুমি তাই খাও।

শেঠজী তখন চাকরকে দিয়া বাজার হইতে মুড়ি-মুড়কি আনাইয়া সুরদাসকে খাইতে দিলেন, সেই সঙ্গে কিছু মিষ্টান্ন ও দুই-চারিটুক্রো ফল অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে সুরদাস কহিল,—কি চিঠি আমাকে লিখ্তে হবে এবার বলুন।

শেঠজী কহিলেন,—আগে তুমি বল, কোন্ মুল্লুকে যাবে ব'লে তুমি বেরিয়েছ?

সুরদাস কহিল,—আমি যদি সে কথা বলি, আপনি হাস্বেন; আমাকে উপহাস করবেন।

শেঠজী কহিলেন,—না। আমি মানুষ চিনি। তুমি বল।

সুরদাস কহিল,—আমি মনে মনে ঠিক করেছি, বরাবর দিল্লী যাব।

শেঠজী প্রশ্ন করিলেন,—তার পর?

সুরদাস কহিল,—দিল্লীতে দেশের বাদশা থাকেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

শেঠজী কহিলেন,—বল কি? বাদশার সঙ্গে দেখা করবে ব'লে বেরিয়েছ তুমি! ভাল, তোমার মতলবটা কি শুনি?

সুরদাস কহিল,—তাঁর কাছে আমার নালিশ আছে।

দুইটি চক্ষু কপালে তুলিয়া শেঠজী সুরদাসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মুখ দিয়া তাঁহার আর কথা বাহির হইল না। এ ছোকরা বলে কি? নালিশ করিবার জন্য নিসংম্বল অবস্থায় বাদশার কাছে চলিয়াছে সুদুর দিল্লীতে!

শেঠজী কহিল,—খোকা, তুমি বাদশাকে জান না; বড় বড় রাজা নবাব আমীর ওমরাহ তাঁর সামনে মুখ তু'লে কথা কইতে ভয় পান। তুমি তো ছেলেমানুষ।

সুরদাস কহিল,—তাঁদের কথা আলাদা। আমি তো বাদশার তাঁবেদার নই, আমি তাঁর মুলুকের প্রজা—ছেলেরই সামিল। আমি ভয় পাব কেন? আমার ভয়-ডর নেই।

শেঠজী কহিলেন,—তোমার কায সিদ্ধ হবেই। বেশ, তোমাকে দিল্লীতে নিয়ে যাবার ভার আমিই নিচ্ছি। দিল্লীতেই আমার কারবার। সপ্তগ্রামেও আমার মোকাম আছে। আমি এই সহরে মাল খরিদ করতে এসেছিলাম। এখান থেকে ফিরে সপ্তগ্রামে যাব। সেখানে দিন দুই থেকে বরাবর দিল্লীতেই রওনা হব। তুমি আমার সঙ্গেই থাক্বে, মুন্সীর কায করবে। তোমার

খাওয়ার পরবার কোন ভাবনা তো থাক্‌বেই না, হাত-খরচাও মাস মাস কিছু কিছু পাবে। কেমন, রাজী?

সুরদাস কহিল,—আপনি আমাকে দেখেই যখন ছেলের মত ভালবাসছেন, তখন আমিও আপনাকে বাপের মতই শ্রদ্ধা করব। আমা হ'তে আপনার কাযের কোনো ক্ষতি হবে না, আপনার এই দয়া আমি মাথা পেতেই নিচ্ছি, শেঠজী।

শেঠজীর নাম মাণিকচাঁদ। খুব ছোট থেকেই তিনি এত বড় হইয়াছেন। কিন্তু ছেলেবেলায় যে সব কষ্ট ও অভাবের ভিতর দিয়া তিনি মানুষ হন, বড় হইয়াও তাহা ভুলেন নাই।

দশ বছর বয়সে তিনি মাথায় ভারি বোঝা লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরি করিয়া তরি-তরকারী বেচিতেন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে এখন তিনি দেশের এক জন ধনবান্ মহাজন। দিল্লী সহরে তাঁহার মস্ত কারবার, ভারতের বড় বড় নগরে তাহার শাখা। এখন আর তাঁহাকে লোকের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া তরি-তরকারি বেচিতে হয় না; সহরের বড় বড় আমীর-ওমরাহরা এখন তাঁহার কর্ম্মশালায় দামী দামী জিনিষ-পত্র কিনিবার জন্য আনাগোনা করেন। বাদশার সেরেস্তাতেও এখন মাণিকচাঁদের নাম পত্তন হইয়াছে; হীরা জহরত হইতে আরম্ভ করিয়া সোনা রূপা সাজ পোষাক নানা দেশের কাপড়-চোপড় তিনি এখন যোগান দেন। রাজধানীর যে কয়জন ভাগ্যবান্ মহাজন বাদশাহী পল্টনের রসদ সরবরাহ করিবার ভার পাইয়াছেন, শেঠ মাণিকচাঁদ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

সামান্য একটি ঘটনাচক্রে বালক সুরদাস মাণিকচাঁদের মত এমন বড় মহাজনের স্নেহ ও আদর পাইয়া তাঁহার সঙ্গে দিল্লী চলিল।

চার

জাহাঙ্গীর শাহ তখন ভারতবর্ষের বাদশাহ। ইঁহার পিতা আকবর শা প্রজাদের এতই প্রিয় হইয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁহার উদ্দেশে বলিতেন—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা! জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়া যদিও বাপের গুণগুলি হুবহু গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু দোষও তাঁহার ছিল, কিন্তু সুশাসন ও সুবিচার সম্বন্ধে মাথা খেলাইয়া এমন কতকগুলি নিয়ম তিনি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাপের আমলের 'রাম-রাজত্বে'ও তেমনটি ছিল না। সেই নিয়মগুলির একটির কথাই আজ তোমাদিগকে বলিব। আর, সেই নিয়মটির অনুসরণ করিয়া আমাদের সুরদাস কেমন করিয়া তাহার নালিশটি আর-কাহারও সাহায্য না লইয়া নিজেই বাদশাহকে জানাইতে পারিয়াছিল, তাহা শুনিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, সেকালে চন্দ্র-সূর্য্যও সহজে যে মোগল-বাদশাকে দেখিতে পাইত না, কোন জরুরী বিষয়ে বিচারপ্রার্থী একজন দীন দরিদ্র প্রজার পক্ষেও সেই বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার নালিশটি জানানো কত সহজ ছিল।

রাজধানীর জাঁক-জমক, বাদশাহের ঠাট-ঠমক, আমীর-ওমরাহদের দপদপা, দোকানপাটের চোখ ঝলসানো বাহার, এসব দেখিয়া সুরদাসের মন মুগ্ধ হইতে চাহিল না। তাহার এক চিন্তা, কেমন করিয়া বাদশাহের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার বাবার কথা জানাইবে, বিচার চাহিবে।

মাণিকচাঁদ তাহার মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া একদিন বলিলেন, খোকা, তোমার বাবার কথা ভুলে যাও। বারো বছর হ'তে চল্‌লো তোমার বাবা হয়েছেন নিখোঁজ, এখন বাদশার কাছে এই নিয়ে নালিশ তুললে তিনি হেসে উড়িয়ে দেবেন, শুধু তাই নয়—তোমাকে পাগল ভেবে আটক রাখ্‌বারও হুকুম দেবেন।

কথাগুলি সুরদাসের বুকে বাজিল! সে মুখখানি মলিন করিয়া কহিল,—কিন্তু এই আশা নিয়েই যে আমি আপনাকে ধরেছি, আপনার সাথে এখানে এসেছি।

মাণিকচাঁদ বলিলেন,—শুধু ত তোমার এই আশাই নয়,—সত্যিকার মানুষ হয়ে তুমি দেশে ফিরবে, এই সঙ্কল্প নিয়েই ত তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে? আমি বল্‌ছি, শেষের আশাটি তোমার এখানে কিছুকাল থাক্‌লেই পূর্ণ হবে।

সুরদাস বলিল,—কিন্তু আমার মন যে বল্‌ছে শেঠজী, বাবাকে যদি আমি পাই—তা হ'লে সব আশাই আমার পূর্ণ হবে। আমি বল্‌ছি, আমার বাবা বেঁচে আছেন, আমি তাঁকে পাবই। আপনি শুধু আমাকে বাদশার কাছে নিয়ে চলুন।

মাণিকচাঁদ বলিলেন,—সবুর কর খোকা, ঠিক সময় হ'লেই আমি তোমাকে বাদশার কাছে নিয়ে যাব।

সে দিন সকালে উঠিয়াই সুরদাস এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিল। মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে বরাবর বাদশাহের প্রাসাদের দিকে ছুটিল। প্রাসাদের যে দিকে বাদশাহ থাকেন, সেই দিকে বাদশাহের উপরের ঘর হইতে একটি শিকল বারান্দা ও বাহিরের প্রাচীরের উপর দিয়া বরাবর বাহিরে ঝুলিতেছিল। সুরদাস সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আশেপাশে সশস্ত্র প্রহরীরা পাথরের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের চোখগুলি রহিয়াছে সুরদাসের দিকে, আর সেগুলি যেন দপ-দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আর এই বলিয়া শাসাইতেছে—খবরদার!

শিকলটি যেখানে ঝুলিতেছিল, সে স্থানটি পাথর দিয়া বাঁধান। পাথরের যে প্রাচীরটি বাহিয়া শিকলটি নীচে আসিয়াছে, সে পাথরের উপর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নাম স্বাক্ষর করা একটি হুকুমনামা বেশ স্পষ্ট ক্ষুদিয়া দেওয়া হইয়াছে। চোক দুইটি কপালে তুলিয়া সুরদাস তাহা পড়িতে লাগিল। পড়িয়া সে বুঝি অকূলে কূল পাইল। ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া, পুতুলের মত খাড়া ভীষণমূর্ত্তি রক্ষীদের দিকে না চাহিয়া, মরিয়া-হইয়া সেই শিকলটি ধরিয়া সে দিল এক টান! অমনই ঢং ঢং ঢং শব্দ করিয়া প্রাসাদের ভিতরে বাদশাহের শয়ন-মন্দিরে সোনার ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদল ছুটিয়া আসিয়া সুরদাসকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই প্রাসাদের দিকে সুদৃশ্য বারান্দার কিংখাপের ঝালর দেওয়া পরদার ভিতর দিয়া একখানি মুখ বাহির হইল। রক্ষীরা সকলে একসঙ্গেই মাথা নীচু করিয়া কুর্নিশ করিতে লাগিল। সুরদাস বুঝিল, মুখখানি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের। সে-ও তখনই প্রহরীদের মত বাদশাহকে তাহার অভিবাদন জানাইল।

বাদশাহ সেইখান হইতেই শুধু এক নজরে সুরদাসকে দেখিয়া লইলেন, তাহার পর হাত তুলিয়া প্রহরীদিগের সর্দ্দারটিকে কি একটা ইঙ্গিতে করিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

এইবার সর্দ্দার-প্রহরী সুরদাসের ঠিক সামনে আসিয়া দুই চোখ পাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বাদশার হুকুমনামা পড়েছ তুমি?

সুরদাস আস্তে আস্তে বলিল,—প ড়েছি।

সর্দ্দার প্রহরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—পড়ে বুঝ্‌তে পেরেছ যে, বাদসাহকে জানাবার মত খুব জরুরী নালিশ ছাড়া ঐ শেকল টান্‌লে তার কি শাস্তি ?

সুরদাস জানাইল,—আমার নালিশটিও খুব জরুরী।

সর্দ্দার প্রহরী বলিল,—বেশ, দরবারেই শাহানশার সামনে তার বোঝা-পড়া হবে। আর একটু পরেই দরবার বস্‌বে। আমার সঙ্গেই তোমাকে দরবারে যেতে হবে।

সুরদাসের সহিত সর্দ্দার-প্রহরীর এই সব কথা হইতেছে, এমন সময় দেখা গেল যে, আর একটি অদ্ভুত চেহারার মানুষ রাস্তা হইতে এই দিকেই হন্ত-দন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। লোকটির মাথার চুলে জটা ধরিয়াছে, আর সেগুলি পিঠখানি ছাপাইয়া কোমর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে; গোঁফ-দাড়িও ঠিক এই ভাবে বাড়িয়া তাহার চেহারাটিকে জংলা রকমের করিয়া তুলিয়াছে। চুল দাড়ির যাহার এত বাড়-বৃদ্ধি, পরণে তাহার কিন্তু শতছিন্ন টেনা, কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। উদম গা, খালি পা, চোখ দুটি পাকা করমচার মত রাঙ্গা।

সর্দ্দার প্রহরী তাহাকে দেখিয়াই বুঝিল, সে-ও শিকল টানিতে আসিয়াছে এবং তখনও পর্য্যন্ত শিকল টানিবার সময় আছে। এদিকে আবার বাদশার কড়া হুকুম, সকাল বেলা নির্দ্দিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে যে কেউ শিকল টানিতে আসুক না কেন, সর্দ্দার-প্রহরী শুধু তাহার উপর নজর রাখিবে ও শিকলটানার পর বাদশাহ তাহাকে দেখা দিলেই, সেই লোককে দরবারে বাদশার সম্মুখে হাজির করিয়া দিবে। কেহই তাহাকে রুখিতে পারিবে না। তবে কোন গুরুতর ও রীতিমত জরুরী ব্যাপার ছাড়া শিকল টানিয়া বাদশাহকে বিরক্ত করিলে যে তাহার জন্য বিশেষ শাস্তি আছে, যাহারা পাথরে বাদশাহের হুকুমনামায় লেখা এই সব কথা পড়িতে না পারে, সর্দ্দার-প্রহরী তাহাকে ইহা সমঝাইয়া দিবে।

সুরদাস এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রথমেই বাদশাহের এই হুকুমনামা পড়িয়াছিল, সেই জন্যই সর্দ্দার-প্রহরী তাহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেয় নাই। কিন্তু এই অদ্ভুত চেহারার লোকটি পাথরের উপর ক্ষোদাই করা হুকুমনামাটির দিকে না চাহিয়া একেবারে শিকলটি টানিবার জন্য হাত বাড়াইতেই সর্দ্দার-প্রহরী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—আগে শাহানসার ঐ হুকুমনামাটি পড়।

সেই লোকটি দাড়ি-গোঁফে আবৃত মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—আমার পড়া আছে।

সর্দ্দার-প্রহরী পুনরায় বলিল,—জান, খুব জরুরী নালিশ ছাড়া ওতে হাত দিলে তার কি শাস্তি?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হাঁ, হাঁ, জানা আছে। আমার যা নালিশ, বাদশার দরবারে, সে রকম নালিশ এ পর্য্যন্ত ওঠে নি।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা শিকলের হাতল ধরিয়া যেমন টান দিল, তখনই আগেকার মত ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টাগুলি বাজিয়া উঠিল; সকলেই যেন একেবারে থ! একটু পরে পরদার ভিতর দিয়া আবার সেইভাবে বাদশাহের সুন্দর মুখখানি বাহির হইল। সবাই কুর্ণিশ করিল; যে লোক শিকল টানিয়াছিল, বাদশাহ তাহাকে দেখিলেন, তাহার পর সর্দ্দার-প্রহরীকে সেইভাবে ইঙ্গিত করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

এইভাবে শিকলটানার ব্যাপার, কালে-ভদ্রে কখনও ঘটিয়া থাকে। কেন না, বাদশাহের কাছে তুলিবার মত সঙ্গীন বিষয় ছাড়া, যেমন-তেমন ব্যাপারে শিকল টানিয়া বাদশাহকে বিরক্ত করিলে তার শাস্তিও ছিল খুব কঠিন।

এই সময় বাদশাহের মহলে নহবত বাজিয়া উঠিল; বুঝা গেল, বাদশাহ এবার দরবারে চলিয়াছেন। প্রহরীরা তাড়াতাড়ি শিকল-ঘর বন্ধ করিয়া ফেলিল; তাহার পর সুরদাস ও সেই চুলদাড়িওয়ালা অদ্ভুত মানুষটিকে ঘিরিয়া দরবারে লইয়া চলিল।

পাঁচ

এই শিকলটানার খবরটি দেখিতে দেখিতে সারা সহরে ছড়াইয়া পড়িল। এই ব্যাপারে কি নালিশ উঠে, তাহা শুনিবার জন্য দলে দলে কত লোকই আম-দরবারের প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কথাটা মাণিকচাঁদের কাণেও গিয়াছিল, শিকলটানার ব্যাপারে একটি ছেলের কথা শুনিয়া তাঁহার বুকের ভিতরটি ঢিপ্-ঢিপ্ করিয়া উঠিল! কি সর্ব্বনাশ! সুরদাস তাঁহাকে না বলিয়া এ কায করে নাই ত? তখনই তিনি সুরদাসের খোঁজ করিলেন! কিন্তু তাহাকে না পাইয়া তিনিও তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চাপিয়া দরবারে ছুটিলেন।

দরবার তখন বসিয়া গিয়াছে। ছোট বড় কত রাজা-রাজড়া, কত আমীর-ওমরাহ, কত সব হোমরা-চোমরা লোক অত বড় দরবারটি যুড়িয়া বসিয়াছেন! সভা যেন এই সব লোকের জমকালো পোষাকের জলুষে ঝক্-মক্ করিতেছে। উঁচু সিংহাসনে বাদশাহ বসিয়া আর্জ্জী শুনিতেছেন, তাঁহার প্রায় সামনেই সুরদাসকে হাজির করা হইয়াছে।

মাণিকচাঁদ হাঁফাইতে হাঁফাইতে এই সময় দরবারে ঢ কিলেন। দরবারের প্রহরীরা তাঁহাকে চিনিত, তিনি আসিতেই তাহারা দরজা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

বাদশাহের সিংহাসনের কাছেই সুরদাসকে দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। যে ভয় তিনি করিয়াছিলেন, যাহা অনুমান করিয়া দরবারে ছুটিয়া আসিয়াছেন, তাহাই সত্য হইয়াছে। হায়, হায়! ছেলেটিকে বাঁচাইবার কোন উপায় ত আর নাই! তাহার নালিশ শুনিয়া বাদশাহ তাহাকে কিছুতেই রেহাই দিবেন না! তিনি হতবুদ্ধির মত সুরদাসের দিকে চাহিয়া তাহার আর্জ্জী শুনিতে লাগিলেন।

সুরদাস হাজির হইতেই বাদশাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—কার নামে তোমার নালিস? কি তোমার আর্জ্জী?

সুরদাসের আর্জ্জী শুনিবার জন্য দরবারশুদ্ধ সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, সকলেরই মনে কৌতুহল জাগিতেছিল—ছেলেটি কি বলে, কাহার নামে নালিশ করে!

কিন্তু সুরদাস উত্তরে যে নামটি করিল, এক নিমিষে সমস্ত দরবারটি তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেল! মাণিকচাঁদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সুরদাস কি বলিল শুনিবে? সে নির্ভয়ে বাদশাহের প্রশ্নের

উত্তরে বলিল,—আমার নালিশ জাঁহাপনার নামে; আমার আর্জ্জী এই—জাঁহাপনার মুলুক থেকে আমার বাবা গায়েব হয়েছে, বারো বছর হ'ল তিনি নিখোঁজ, এর খেসারৎ শুদ্ধ আমি আমার বাবাকে ফিরিয়ে পেতে চাই।

বাদশাহ প্রথম হইতেই এই ছেলেটিকে কৌতূহলের সহিত দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া এইরূপ নালিশ বাহির হইতেই তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। বড় বড় রাজা, বড় বড় যোদ্ধা, নাম-করা ওস্তাদরা যাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুখ ফুটিয়া কথা কহিতেই ভয়ে এতটুকু হইয়া যান, এই ছেলেটি কি না তাঁহার মুখের উপর জোর গলায় অকুতোভয়ে বলিয়া বসিল, নালিশ তাহার তাঁহারই নামে, অপরাধী তিনিই!

বাদশাহের আশে-পাশে থাকিয়া যে সকল পদস্থ প্রহরী বাদশাহের শরীর ও দরবারের শান্তি রক্ষা করে, তাহারা সুরদাসের এই স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া একেবারে আগুন আর কি! তাহারা কি ইহা বরদাস্ত করিতে পারে? রাগে গর-গর করিতে করিতে তাহাদের ভিতর হইতে দুই জন সুরদাসের গলা টিপিয়া ধরিবার জন্য আগাইয়া আসিল। কিন্তু বাদশাহ তখনই হাতের একটি আঙুল তুলিয়া ও ভ্রূকুটি করিয়া ইঙ্গিত করিলেন,—সবুর!

এই সামান্য ইঙ্গিতেই অতবড় দরবার যেন কাঁপিয়া উঠিল। প্রহরীরা থ হইয়া যে যাহার জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল।

বাদশাহ এবার বেশ সহজ ও কোমল কণ্ঠে সুরদাসকে বলিলেন, আগে তোমার কথাটা আমাকে সব শুনিয়ে দাও; গোড়ার কথাটা আমি সব জান্‌তে চাই।

সুরদাস তখন বেশ কায়দার সঙ্গে আর একবার বাদশাহকে কুর্নিশ করিল; তাহার পর তাহার বাবার নিখোঁজ হইতে মানিকচাঁদের সহিত দিল্লীতে আসিয়া শিকল-টানা পর্য্যন্ত সকল কথাই খুলিয়া বলিল।

বাদশাহ ধীরভাবে সুরদাসের কথাগুলি শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এর জন্য বাদশার নামে নালিশ করবার কারণ?—বাদশার এতে কি কসুর, বাচ্চা?

সুরদাস পুনরায় কুর্নিশ করিয়া বাদশাহের কথার যে উত্তর দিল, তাহা আরও চমৎকার! সে বলিল,—জাঁহাপনা মুলুকের মালিক, তাই লোকের কসুর হ'লে তার যখন শাস্তি দিতে পারেন, জাঁহাপনার তরফ থেকে কোন কসুর হ'লে লোকে কার কাছে তার জন্য নালিশ করবে? জাঁহাপনার দপ্‌দপার ভেতর থেকে মুলুকের একটা মানুষ যদি গায়েব হয়ে যায়, তার জন্ম দায়ী কে?

বাদশাহ মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—সাবাস! ঠিক কথাই তুমি বলেছ। তোমার নালিশ মঞ্জুর; তুমি ব'স; আমি দেখ্‌ছি এর কি ব্যবস্থা হ'তে পারে।

তখনই এক জন দরবারী সুরদাসের কাছে আসিয়া তাহাকে একখানি আসনে বসাইয়া দিল। সুরদাসের ফাঁড়া আশ্চর্য্য রকমে কাটিয়া গেল দেখিয়া মানিকচাঁদের তখন কি আনন্দ!

এইবার বাদশাহের ইঙ্গিতে রক্ষীরা চুলদাড়িওয়ালা জংলো চেহারার সেই মানুষটিকে বাদশাহের সামনে আনিয়া হাজির করিল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কি নালিশ?

লোকটি বাদশাহকে রীতিমত কুর্নিশ করিয়া বলিল,—জাঁহাপনা! আমার নালিশ এই, বারোটি বছর ধরে এই সহরের বুকের ওপর আমাকে গুম ক'রে রাখা হয়েছিল। বারো বছর ধরে, সূর্য্যের আলো আমার চোখে পড়েনি, আকাশের পানে তাকাতে পাইনি, একখানা বন্ধ ঘর বই দুনিয়ার আর কিছুই আমি দেখিনি।

বাদশাহ এইখানে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বারো বছর ধরে যা দেখনি, আজ কেমন ক'রে তা দেখ্‌তে পেলে? কথাটা খুলে বল।

লোকটি বলিল,—বারো বছর পূর্ণ হতেই আমি সেখান থেকে কৌশল ক'রে পালিয়ে এসেছি, জাঁহাপনা!

বাদশাহ আবার প্রশ্ন করিলেন,—কারা তোমাকে গুম ক'রে রেখেছিল?

লোকটি এবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কান্নার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল,—আমার ভাইপোরা,—আমার ভাই মারা গেলে যারা রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, মাথা রাখবার জায়গা ছিল না, কি খাবে তার কোন সংস্থানও ছিল না, আমি তাদের আশ্রয় দিয়েছিলুম; বুকে ক'রে মানুষ করেছিলুম।

বাদশাহ প্রশ্ন করিলেন,—তারা বড় হয়ে অমানুষ হ'ল কেন? তোমাকে গুম ক'রে রাখ্‌বারই বা কারণ কি?

লোকটি উত্তর দিল,—পয়সা, জাঁহাপনা পয়সা। অনেক পয়সাই আমি উপায় করেছিলুম। পয়সার ওপরেই আমি বসে থাকতুম। আমার নিজের ছেলেপুলে স্ত্রী কিছুই ছিল না দুনিয়ায়, ওরাই ছিল আমার সব। আমার মনে মনে সাধ ছিল জাঁহাপনা! পুঁজির অর্দ্ধেক খয়রাত করব, বাকি অর্দ্ধেক ওরা করবে ভোগ। কিন্তু তাতেই ওদের মনে জ্বালা ধরেছিল। ওরা সেই নিয়েই দিবারাত্রি আমাকে ত্যক্ত করতে লাগলো—যাতে আমার যথাসর্ব্বস্ব শুধু ওদেরই হাতে তুলে দিই—খয়রাৎ ক'রে নষ্ট না করি। সেই থেকে আমি কথা বলা বন্ধ ক'রে দিই, জাঁহাপনা! হঠাৎ মাথায় খেয়াল হ'ল, সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে, বন্ধ ঘরে ব'সে আমি ভগবানের নাম জপ করব আর দু'বেলা দু'মুঠো খাবো, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না; বারোটি বছর ধরে আমার এই মৌনব্রত সাধনা চলবে।

বাদশাহ বলিলেন,—বটে! তারপর তোমার ভাইপোরা কি করলে?

লোকটি বলিল,—ওরা এরই সুবিধাটুকু নিয়ে আমাকে হারিয়ে দিলে, জাঁহাপনা! মাস-কতক যেতে না যেতেই সবাই জান্‌লে আমি কথা বলা বন্ধ করেছি, বন্ধ ঘরে ব'সে ভগবানের নাম জপ্‌ছি। তখন ওরা আমাকে এমন একটা গুমটিঘরে কয়েদ ক'রে রাখ্‌লে, ওরা বই আর কেউ যে ঘরটির খবর রাখ্‌ত না। দুনিয়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না; একটি বার কেউ এসে শুধু সামান্য কিছু খাবার আর জল দিয়ে যেতো। এই একই ভাবে সেই ঘরে বারোটি বছর কাটিয়েছি, জাঁহাপনা! কাল রাত্তিরে একটা সুযোগ পেয়ে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাড়ী গিয়েছিলে, না বরাবরই এখানে এসেছ?

লোকটি বলিল,—সেখান থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি বাড়ীতেই আগে যাই, জাঁহাপনা, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, আমিই যেন আমার সেই ঘরটিতে বসে আছি। যারা যারা আমাকে জান্‌তো, তারা এখনো সবাই জানে—শঙ্করদাস সাধু হয়ে গেছে, কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে, দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়ে বন্ধ ঘরে ব'সে মালা

জপছে। আমি তাকে দেখে এসেছি জাঁহাপনা, এখনো সে সেখানে আছে।

বাদশাহ বলিলেন,—চমৎকার! বুঝতে পেরেছি আমি, তোমার নাম শঙ্করদাস, এতকাল তুমি গায়েব হয়েছিলে, এখন ফিরে এসেছো, যে তোমারই ঘরে ব'সে আছে, তোমারই মতন আর এক শঙ্করদাস!—বেশ, এখনই এর বিহিত আমি করছি।

তখনই কোতোয়াল সাহেবকে তলব হইল। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ হুকুম জারী করিলেন,—এই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যে বাড়ী আর যে যে লোককে এ দেখিয়ে দেবে, যে অবস্থায় তারা থাকুক—দরবারে হাজির করবে।

দরবারের সকলেই স্তব্ধ হইয়া বাদশাহের হুকুম শুনিল। অবাক্ হইয়া দেখিল, সেই বিদ্ঘুটে চেহারার মানুষটিকে লইয়া কোতোয়াল সাহেব তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, এক দল অস্ত্রধারী প্রহরী তাহাদের পিছু পিছু ছুটিল।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই এই দলটি ফিরিয়া আসিল। দলে এবার পাঁচটি নূতন লোক। তাহাদের মধ্যে চারটি যুবা, আর একটি বয়স্ক লোক। বয়সটি তাহার ঠিক ধরিবার যো নাই, এক মুখ দাড়ী, এক মাথা চুল, তাহাতেও জটা বাঁধিয়াছে, পরনে গেরুয়া কাপড়, গায়ে ঐ রঙ্গেরই একটি ফতুয়া। দরবারে ঢুকিয়াই সকলে মাথা নীচু করিয়া বাদশাহকে কুর্নিশ করিল; গেরুয়া-পরা মানুষটি যেন হতভম্ব, সে ঠিক মত বাদশাহকে কুর্নিশ করিতেও পারে নাই। কিন্তু যুবক কয়টি এ সব বিষয়ে ওস্তাদ হইলেও তাহাদের মুখ যেন ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে।

বাদশাহ ইহাদিগকে নিজের মুখেই শঙ্করদাসের নালিশের কথা শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি তোমরা বলতে চাও? এর নালিশ সত্য?

চারিটি যুবার মধ্যে যেটি সবার বড়, সে উত্তর দিল,—মিছে কথা, ও লোক নিশ্চয়ই পাগল; ইনিই শঙ্করদাস—আমাদের কাকা।—বাদশাহ তখন গেরুয়াধারীর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি বলতে চাও?

গেরুয়াধারী বাদশাহের এই কথার উত্তরে শুধু তাহার কপালে হাতখানি ঠেকাইল।

প্রথম যুবাটি অমনি বলিয়া উঠিল,—কথা বলার অভ্যাস বন্ধ করায় ইনি বোধ হয় বোবা হয়ে গেছেন, জাঁহাপনা, বারো বছর ধরে একটি কথাও বলেন নি।

আগেকার চুলদাড়িওয়ালা টেনাপরা মানুষটি বলিল,—বারো বছর ধরে আমিও মুখ বুজিয়ে ছিলুম, জাঁহাপনা; কিন্তু তাতে আমি বোবা হয়ে যাই নি। জাঁহাপনার হুকুম হ'লে, এই লোককে আমি জেরা ক'রে সবার সামনে প্রমাণ ক'রে দেব যে, এ ভণ্ড, তা ছাড়া, যারা আমাকে ভাল করেই জানে, আমি তাদেরও সাক্ষী মানবো।

বাদশাহ পুনরায় গেরুয়াধারীকে প্রশ্ন করিলেন,—সত্যই কি তুমি বোবা?

লোকটি পূর্ব্বের মতই নিরুত্তর, অসহায়ের মত কপালে হাতখানি ঠেকাইল।

বাদশাহ তখন হুকুম দিলেন,—একে বাইরে নিয়ে গিয়ে পঁচিশ ঘা কোড়া লাগাও।

হুকুম শুনিয়াই দুই জন রক্ষী গেরুয়াধারীকে ধরিবার জন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সুরদাস চীৎকার করিয়া বলিল, জাঁহাপনা, বান্দার কসুর মাপ করা হোক,—ইনিই আমার বাবা!

সুরদাসের এই কথায় বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রহরীটি পর্য্যন্ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! এ ছোকরা বাল কি!

বাদশাহ দুই চোখের ভ্রূ কুঁচকাইয়া সুরদাসের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, তুমি নালিশ করেছ, তোমার বয়স যখন তিন চার বছর, সেই থেকে তোমার বাবা গায়েব হয়েছে; এই লোকটাকে এক নজরে দেখেই কি ক'রে চিনলে?

সুরদাসের মুখ-চোখ তখন বুঝি একটা অপরিসীম আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। সে আবেগের সহিত বলিল,—সেই বয়স থেকেই যে আমার বাবার মুখখানি মনের ওপর এঁকে রেখেছি জাঁহাপনা! এছাড়া, আমার আর্জ্জীতে আগেই ত জানিয়েছি, এখানে এসে অবধি প্রতি রাত্তিরেই আমি স্বপ্নে বাব'কে দেখেছি, আমার বাবার এই মূর্ত্তিই দেখিছি জাঁহাপনা! এই মুখ, এই চোখ, এই সব চুলদাড়ি, এই গেরুয়া কাপড়,—ইনিই আমার বাবা! আমি আমার বাবাকে পেয়েছি, আমার নালিশ তুলে নিচ্ছি, জাঁহাপনা—

সুরদাস আনন্দের আবেগে সেই গেরুয়াধারীর দিকেই ছুটিতে-ছিল, কিন্তু বাদশাহের বজ্রকণ্ঠের স্বর তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল। বাদশাহ বলিলেন,—সবুর! তুমি নালিশ তুলে নিলেও এই-খানেই মামলাটির শেষ নয়; তোমার বাবা হলেও এ লোক ভণ্ড, জাল, এর ওপর অন্যের নালিশ আছে।

সুরদাস তখন আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল,—বাবা!

এতক্ষণ পরে এই ডাকে সেই গেরুয়াধারী বোবাটিরও মুখ ফুটিল; সেও ভাঙ্গাগলায়, গলার কথাগুলি ভাবের আবেগে জড়াইয়া ফেলিয়া আধ-আধ স্বরে জবাব দিল,—সু-র-দা-স—

এইবার একসঙ্গে সেই চারিটি যুবার মুখগুলি শবের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর বাদশাহের প্রশ্নে গেরুয়াধারী মানুষটি চোখের জলে তাহার বুকখানি ভিজাইয়া যে করুণ কাহিনী শুনাইয়া দিল, তাহার মোটামুটি মর্ম্ম এইরূপ:—

জীবনে কখনও সে মিথ্যা বলে নাই এবং মিথ্যা বলিবে না কোনদিন—ইহাই ছিল তাহার পণ। আর জীবনের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল—ছেলে সুরদাস লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয়, দশ জনের প্রশংসা পায়। এই সূত্রেই সে এক সাধুর পাল্লায় পড়িয়া জানিতে পারে, তাহার ছেলের মস্ত ফাঁড়া আছে। ইহা শুনিয়া ছেলের ফাঁড়া কাটাইবার জন্ত সে সাধুর কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়। সাধু তখন তাহার ছেলেকে বাঁচাইবার অছিলায় জানায় যে, ছেলের সংস্পর্শ ছাড়িয়া বারো বছর তফাতে যদি থাকিতে পারে, তবেই তাহার ছেলে বাঁচিয়া যাইবে ও পরে বড়লোক হইবে। এই সম্পর্কে সেই সাধু তাহাকে এই বলিয়া সত্যবদ্ধ করিয়া লয় যে, এই বারো বছর সে সাধুর কথা-মত চলিবে ও মুখ বুজিয়া বোবা হইয়া থাকিবে। সত্যের খাতিরে রামদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া সাধুর সঙ্গে দিল্লীসহরে আসে এবং অন্যায় জানিয়াও বোবা হইয়া তাহার কথা মত কায করিতে রাজী হয়। তাহাকে বলা হইয়াছিল, কেহ কোন

প্রশ্ন করিলে, শুধু কপালে হাতখানি ঠেকাইবে। সত্যের খাতিরে সে তাহার কথাই রাখিয়াছে আর এই বারোটি বছর কায়-মনঃপ্রাণে সে শুধু ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানাইয়াছে—তিনি সত্যময়, তিনিই করুন সত্যের প্রকাশ। বারো বৎসর পরে সে প্রার্থনা আজ সার্থক হয়েছে।

ইহার পর সেই চারি জন যুবাও তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তাহারা জানাইল, তাহাদের খুড়াকে গুম করিয়া খুড়ার চেহারার সঙ্গে মিলে, এমন একজন লোককে আনিয়া তাহার জায়গায় বসাইবার ষড়যন্ত্র তাহারা করিয়াছিল। তাহাদেরই এক পেটোয়া লোক অনেক সন্ধান করিয়া বাঙ্গালা মুলুক হইতে এই লোকটিকে ভুলাইয়া আনিয়াছিল। সেই লোকই সাধু সাজিয়া রামদাসকে বোকা বানাইয়াছিল। এই কাযের জন্য তাহাকে বিস্তর টাকা দিতে হইয়াছিল, টাকা লইয়া সে সরিয়া পড়িয়াছে।

বাদশাহ তৎক্ষণাৎ সেই ফন্দীবাজ লোকটিকে ধরিবার জন্য হুলিয়া বাহির করিতে কোতোয়ালকে হুকুম দিলেন। শঙ্করদাস তাহার বাড়ী ও সম্পত্তি ফেরত পাইল, তাহার চারিটি ভাইপোকে হাজতে পাঠানো হইল।

অবশেষে বাদশাহ সুরদাসের আর্জ্জীর উত্তরে এইরূপ আদেশ দিলেন,—এমন অদ্ভুত নালিশ, আর সঙ্গে সঙ্গে তার এমন নিষ্পত্তি, এ পর্য্যন্ত এ দরবারে কখনো হয়নি। সত্যের উপর এমন নিষ্ঠা ও বাপের উদ্দেশে ছেলের এমন শ্রদ্ধার পরিচয় এই নালিশ সম্পর্কেই পাওয়া গেল। যদিও সত্যময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় সত্যের প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু সব দিক্ দিয়ে বিচার ক'রে বাদশাহ এই সত্যনিষ্ঠ পিতা-পুত্রকে রীতিমত পুরস্কৃত করাও কর্ত্তব্য ব'লে মনে করছেন। সুতরাং আমীরের মত স্বচ্ছন্দভাবে এদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হ'তে পারে, এরূপ একটি জায়গীর ও তার সঙ্গে নগদ বিশ হাজার আসরফি বাদশাহ সরকার হ'তে সুরদাসকে খেলাত দেওয়ার হুকুম হইল।

বাদশাহের এই হুকুম শুনিয়া দরবারশুদ্ধ সকলের মুখেই আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। দরবার ভাঙ্গিতেই মাণিকচাঁদ সুরদাসকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—তুমি বাহাদুর ছেলে!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতিকায় প্রাণী

রামায়ণ-মহাভারতে আমরা যে-সব অতিকায়-প্রাণী বা যক্ষ-রক্ষ, গয়-গবাক্ষ, জটায়ু-পক্ষী প্রভৃতির কাহিনী পড়ি, প্রাচীন যুগে সে-সব অতিকায় প্রাণী সত্যই ছিল বলিয়া আজিকার বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ পাইতেছেন! তাঁরা বলেন, পৃথিবীর অতি-প্রাচীন বা আদি-যুগে মানুষের বাস এখানে মোটেই নিরাপদ ছিল না! এ যুগে নানা রোগে মানুষের জীবন খুবই শঙ্কাচ্ছন্ন, সন্দেহ নাই; তার উপর ভূমিকম্প, বিষ-বাষ্প, সাপখোপ—এ-সবের নির্য্যাতনও নিত্য ঘটে; কিন্তু এ-সবে একটা সান্ত্বনা আছে। এই যে—ভূমিকম্প ঘটে কালে-ভদ্রে; এবং রোগ বা ভূমিকম্প ঘটিবার পূর্ব্বে বিভীষিকায় নাড়ী ছাড়ে না! আদি-যুগে পৃথিবীতে যে-সব অতিকায় প্রাণীর বাস ছিল, তারা প্রায় রামায়ণ-মহাভারতের সূর্পণখা, কুম্ভকর্ণ, ঘটোৎকচ প্রভৃতির মতো। বিকট চেহারা লইয়া কখন্ আসিয়া সাম্নে দাঁড়াইবে, তার কোনো ঠিক্-ঠিকানা ছিল না। এবং ঠিক্-ঠিকানা ছিল না বলিয়া তখন-কার দিনে পথ-ঘাট দারুণ বিপদে পূর্ণ থাকিত!

জন্তু-জানোয়ারকে আমরা ভালো বাসি। বাঘ-সিংহকে ভয় করিলেও তাদের উপর মমতা আছে, নহিলে ছুটীর দিনে চিড়িয়াখানায় ছুটিব কেন? বাঘ-ভাল্লুক-সিংহের খাঁচার সাম্নে যতখানি সময় আমরা ব্যয় করি, এতটা সময় চিড়িয়াখানার আর কোনো প্রাণীকে দেখিতে ব্যয় হয় না। সার্কাসে শত-রকমের খেলার মধ্যে সব চেয়ে আমাদের দেখিতে ভালো লাগে, জীবন্ত বাঘ-সিংহের সঙ্গে বীর-বৃকোদরদের সংগ্রাম!

পৃথিবীর মাটী পাহাড়, গাছ-পালা, নদীর পলি প্রভৃতি দেখিয়া হিসাব কষিয়া প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা আদি-যুগের প্রাণীদের যে-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সব প্রাণীর বিরাট বপু এবং বাসনা-কামনার কথা শুনিলে প্রাণে যেমন আতঙ্ক জাগে, তেমনি ইহা ভাবিয়াও আনন্দ হয়, ভাগ্যে সেই আদিম যুগে আমাদের জন্ম হয় নাই! সে যুগে জন্ম লইলে আতঙ্কেই বোধ হয় আধ-মরা হইয়া থাকিতাম!

গরিলা এখন আফ্রিকার জঙ্গলে কোণঠেশা হইয়া বাস করিতেছে। তার কারণ, পৃথিবীতে মানুষের বাস ক্রমে বাড়িয়াছে,—মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রসার বাড়িয়াছে; মানুষ অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ার করিয়া বন-জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম-নগরের পত্তন করিয়াছে, অস্ত্র-সাহায্যে বহু হিংস্র-জন্তু বধ করিয়াছে, এবং অবশিষ্ট জন্তু-জানোয়ার মানুষের ভয়ে সুদূর নিরালা-নিবিড় বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে। এ সুবুদ্ধির ফলে তারা যেমন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে, আমরাও তেমনি আরাম পাইয়াছি—এ-কথা মানিতেই হইবে।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন,—আদি-যুগে পশু-পক্ষী, এমন কি, মানুষও আকারে খুব বড় ছিল। কালক্রমে সকলের আকার খর্ব্ব হইতেছে; এবং এই খর্ব্ব হওয়ার 'রেট' মাপিয়া

হিসাবে আদি-যুগের পশু-পক্ষীর যে-আকৃতি অকাট্য অভ্রান্ত বলিয়া বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, মানুষ যদি বুদ্ধি ও বিদ্যার জোরে এ-সব জীব-জন্তুকে শায়েস্তা করিতে না পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে নরলোক এবং নর-নারীর আজ চিহ্ন থাকিত না!

বহু গবেষণা এবং অনুশীলনের ফলে জানা গিয়াছে—পশুদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিধাতা চমৎকার সামঞ্জস্য ও বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া তাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে-সব পশুর পায়ে তিনি খুর দিয়াছেন, তাদের মাথায় দিয়াছেন শিং। শিংয়ের সঙ্গে আবার দাঁতের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। ঘোড়া, গরু, হরিণ—ইহাদের পায়ে খুর আছে; ইহাদের দাঁতের উপর দিক্ চ্যাপ্‌টা থ্যাবড়ানো (flat)। উদ্ভিদ্-খাদ্য দাঁতে পিষিয়া খাইতে পারিবে,তাহারি জন্য দাঁতের এমন গড়ন! বিড়াল, কুকুর, সিংহ, বাঘ—ইহাদের মাথায় শিং নাই, পায়ে খুর নাই; ইহাদের দাঁত ধারালো! প্রাণি-খাদ্য দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া তাদের মাংস ছিঁড়িয়া হাড় চিবাইয়া খাইবে 'বলিয়া কুকুর-বিড়ালকে বিধাতা এমন ধারালো দাঁত দিয়াছেন! দাঁত দেখিয়া বলা যায়, কোন্ জীব মাংসাশী; কোন্ জীব নিরামিষাশী!

ষ্টেগোসরাশ ও প্লেশিয়োসরাশ

বৈজ্ঞানিকরা আর একটি পরম সত্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন,—সৃষ্টির ইতিহাসে মৎস্য কূর্ম্মই প্রথম জীব। বহু কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী জলে জলময় ছিল। সেই প্রলয়-পয়োধিজলে মৎস্য ভিন্ন অন্য কোনো জীবের পক্ষে বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল! জল শুকাইয়া পলি পড়িতে পড়িতে যেমন স্থলের বিকাশ ঘটিতে লাগিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জীব-সৃষ্টিতেও বৈচিত্র্য ঘটিয়া জলচরের সঙ্গে স্থলচর জীবের জন্ম হইতে লাগিল। এবং অবশেষে…

কিন্তু আধুনিক জীব-তত্ত্বের এত কথা আজ তোমাদের বলিতে বসি নাই। আজ শুধু আদি-যুগের অতিকায় জীব-জন্তুর কথা বলিতেছি।

স্থল দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তৃণশস্য পত্র-পল্লবের জন্ম হইল। জল-স্থলের দোটানায় পড়িয়া পৃথিবীর বক্ষে ঘটিতে লাগিল বিপুল আন্দোলন। সৃষ্টির প্রথম যুগে দিকে দিকে সংঘর্ষ এবং আস্ফালনের কোনো সীমা ছিল না! কোথাও জলের বুকে বিপুল বন্যাবেগ বহিয়া চলিয়াছে; পৃথিবীর মাটীর মধ্যে দারুণ কম্পন-আলোড়ন চলিয়াছে; আগ্নেয়গিরি ফাটিয়া বিরাট অগ্ন্যুচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প—ভাঙ্গা-গড়ার সে এক বিরাট সমারোহ!
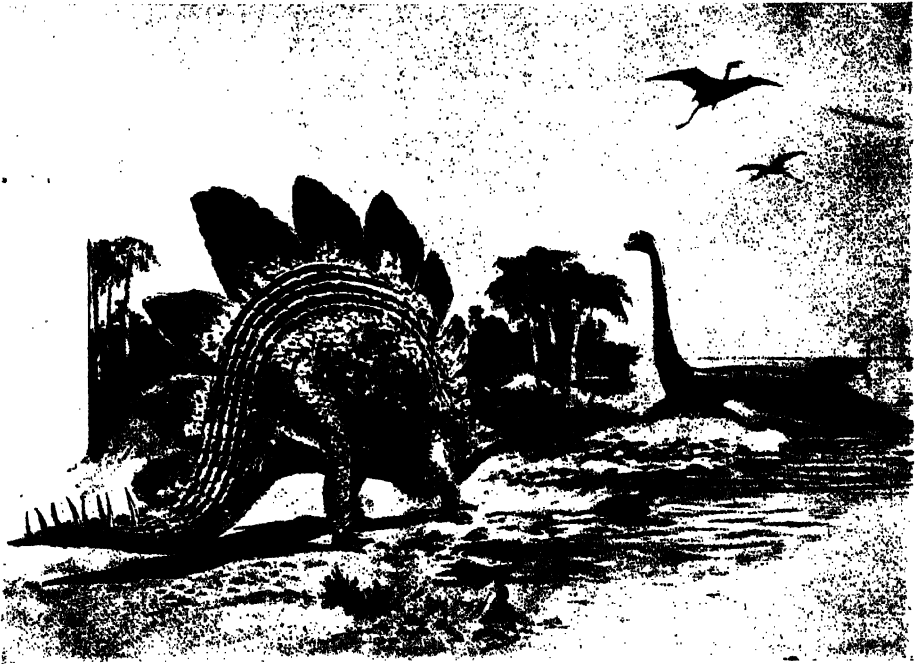
এ বিরাট কম্পন-আন্দোলন কবে শান্ত হইল, তাহার সাল-তারিখের হিসাব এখনো নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু এই কম্পন-আন্দোলনের সময় বিরাট-দেহধারী নানা

জীব-জন্তু পৃথিবীর জলে-স্থলে তাণ্ডবলীলা জুড়িয়া বাস করিতেছিল। আজ সে সব অতিকায় জীব-জন্তুর কতক বিলুপ্ত হইয়াছে; কতকগুলির বংশধর আকৃতিতে খর্ব্ব ও কৃশ, প্রকৃতিতে শান্ত, নম্র, নিরীহ হইয়া পৃথিবীর বুকে নানা নামে বাস করিতেছে। ইহাদের বংশ-কাহিনী তোমাদের স্কুলপাঠ্য বাঙলার ইতিহাস, গ্রীক-রোমের ইতিহাস ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের চেয়ে কম মনোজ্ঞ বা কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়!

জীবন-যুদ্ধ বলিয়া একটা কথা আছে। তার অর্থ, বাঁচিতে গেলে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমাদের বাঁচিতে হয়। এ সংগ্রামে যারা প্রবল, তারা বাঁচে; যারা দুর্ব্বল, প্রবলের সহিত সংঘর্ষে তারা প্রাণ দেয়। মানুষ প্রবল। মানুষের কাছে তাই শত শত পশু-পক্ষী মৃগয়া-ব্যসনাদিতে প্রাণ দিতেছে।

ব্রোন্টোসরাশ ও সেরাটোসরাশ

এই সব অতিকায় জীবের মধ্যেও চিরন্তন বিধি-বশে সংগ্রাম চলিয়াছিল। সে সংগ্রামে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জীবের কতক সবলতরের হাতে প্রাণ দিয়াছে; কতক কোনো মতে বাঁচিয়া আছে।

অতিকায় এ সব জীবের মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন জীব ছিল প্লেশিয়োসরাশ। এটি ছিল জলের জীব। প্রকাণ্ড দেহ। টিক্‌টিকির মাথা ও মুখ; সে-মুখে কুমীরের দাঁত; গলা সাপের মতো এবং গা তিমির মতো। এ জীবটির দেহ ছিল বাইশ ফুট লম্বা। জলে বাস করিলেও দারুণ মাংসাশী—প্রকৃতি বেজায় হিংস্র ছিল। ভাবো, আজ আমরা হাঙর-কুমীরের জন্য জলে নামিতে ভয় পাই! আর এ জীব যদি আজ জল-তরঙ্গে লীলাখেলা করিয়া বেড়াইত? নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইতেছি—শুশুকের মতো প্লেশি-য়োসরাশ অমনি হুশ্ করিয়া সহসা একবার মাথা তুলিয়া আকাশ দেখিতে উঠিল! তাহা হইলে নদীর ওপারের আশা ছাড়িয়া একেবারে ভব-সাগরের ওপারে গিয়া আমাদের নামিতে হইত!

প্লেশিয়োসরাশের এক জ্ঞাতি-ভাই ছিল ষ্টেগোসরাশ! ইনি আরো ভয়ঙ্কর। এঁর ঘাড় হইতে সুরু করিয়া সারা পিঠে কাঁটার খড়্গা,—পুচ্ছে কাঁটার চাবুক।

প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ ব্যারণ কুভিয়ার বলেন, আদি যুগে পৃথিবীর স্থলপ্রদেশ ছিল চতুষ্পদ জীবের লীলাভূমি। ইহাদের বপু ছিল যেমন বিরাট, মেজাজ তেমনি ভয়ঙ্কর,—অর্থাৎ এরা ছিল আকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ। সে-সব চতুষ্পদের বংশ আজ একেবারে লোপ পায় নাই! তবে বংশধরেরা আজ এমন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে যে, দেখিলে দুঃখ হয়! বিরাট্ অতিকায় বহু চতুষ্পদ প্রাণীর বংশধরদিগের মধ্যে কেহ হয়তো আজ নেংটি-ইঁদুররূপে গৃহস্থের লেপ-কাঁথা কাটিয়া দিন-গুজরাণ করে; কেহ বা ছুঁচো মূর্ত্তিতে নর্দ্দামায় গোপন-বসতি স্থাপন করিয়াছে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রোফেশর মার্শ বলেন, আদিম যুগে

ব্রোণ্টোসরাশ বা "বজ্র-গিরগিটি" নামে এক জাতের সরীসৃপ বাস করিত। তার দেহ ছিল ষাট ফুট লম্বা; এবং সে দেহের ওজন ৫৪০ মণ! তার একখানি চরণ-পাতে এক গজ জায়গা লাগিত! এত-বড় আকার লইয়া ভাগ্যে এ জীবটি নিরামিষাশী ছিল, নহিলে পৃথিবীতে মানুষকে আর তার অনুগ্রহে বাঁচিতে হইত না!

এ জীবটির পরম-শত্রু ছিল সেরাটোসরাশ। সেরাটোসরাশ ছিল দারুণ মাংসাশী। ব্রোণ্টোসরাশের গন্ধ পাইলে দুনিয়া ভুলিয়া সেরাটোসরাশ তাকে তাড়া করিত। ব্রোণ্টোসরাশের গলায় দাঁত বসাইয়া আগে এই অহিংস-নিরামিষাশীর রক্তপান করিত—তার পর তৃণ-শস্যে পুষ্ট নধর দেহে তার পারণ চলিত দু' তিনদিন ধরিয়া! আত্মরক্ষার জন্য বেচারী ব্রোণ্টোসরাশের পায়ে বিধাতা ধারালো নখ দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুধাতুরের ধারালো দাঁতের সঙ্গে নিরামিষাশীর পায়ের নখ পাল্লা দিতে পারিবে কেন? এমনিভাবে সেরাটোসরাশের হিংসার চাপে অত বড় নিরামিষাশী ব্রোণ্টোসরাশ জীবের বংশ বিলুপ্ত হইয়া গেছে!

ব্রোণ্টোসরাশের স্বজাতি আট্‌লাণ্টোসরাশের একখানা উরুর হাড় কোন্ পাহাড়ের তলায় পাওয়া গিয়াছে। এই টুকরা হাড়টুকু লম্বায় ছ'ফুট দু' ইঞ্চি। এ হাড় এখন আছে লণ্ডনের ন্যাচার্যাল-হিষ্ট্রী-মিউজিয়মে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, যে-জীবের উরুর হাড় এমন মোটা, সে জীবটির দেহ দৈর্ঘ্যে আশি ফুট না হইয়া যায় না!

সে যুগে আর এক জাতের সরীসৃপ বাস করিত—তার নাম মেগালোসরাশ। এ জীবটি ছিল দারুণ মাংসাশী এবং হিংস্র। যেমন তীরের বেগে ছুটিত, লাফ দিতেও তেমনি ওস্তাদ ছিল। দেহে প্রচণ্ড শক্তি,—ধারালো দাঁত; বড় বড় ধারালো নখ; ঘাড়ে এবং পুচ্ছে কুমীরের গায়ের মতো কাঁটার কেয়ারি—শুনিলে আতঙ্ক জাগে! একবার ভাবো দিকি, মোটরে চড়িয়া ক্লাশ-শুদ্ধ ছেলেমেয়ে গ্রামের কোনো মাঠে গিয়াছ পিকনিক করিতে! টিফিন-বাক্স খুলিয়া লুচি তরকারী সন্দেশ-কেক্ বাহির করিয়াছ, এমন সময়ে ঝোপের পাশে ঐ দেখা যায় মেগালোসরাশ!

তার পর কি, সে-কথা কল্পনা না করাই ভালো!

ত্রিশিরাতপ নামে এক জাতের জীব বাস করিত পাহাড়ে-পর্ব্বতে। গণ্ডারের পিঠে কুমীরের গায়ের কাঁটা, মায় ঝাপ্‌টা-মারা ল্যাজ আঁটিয়া ছাড়িয়া দাও—গতি-শক্তি দাও কুকুরের মতো দ্রুত, তীব্র,—এবং রাজ্যের কাস্তে-শাবল, লাঙ্গলের ফাল, করাত্, বাঁটালী জুড়িয়া মুখোস রচিয়া

মেগালোসরাশ

মাথায় চাপাও—দ্যাখো তো, ছবিতে-ছাপা ত্রিশিরাতপের চেহারার সঙ্গে মেলে কি না! ভাবো, দার্জ্জিলিং কি সিমলা পাহাড়ে বেড়াইতে বাহির হইয়াছ; কিম্বা বাড়ীর আরো কাছে ঐ হাজারিবাগে, কিম্বা রাঁচিতে—এবং পাহাড় চড়িতে গিয়া দেখিলে, ঐ নামিয়া আসে ত্রিশিরাতপ-দানব!

তবে ভয় নাই! এ সব জীব এযুগের পৃথিবীতে বাস করে না। মা-বসুমতী আমাদের নিরাপদ রাখিবার জন্য

ত্রিশিরাস্তপ

ইহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিয়া-ছেন। নহিলে এ সব জীবের প্রতিবেশী হইয়া বাস করা—তার চেয়ে আকাশ-ঝরা 'পয়জন-গ্যাস্' তো সঞ্জীবনী-সুধা!

কিন্তু ও সব কথা যাক। এই ত্রিশিরাস্তপের বাস ছিল দক্ষিণ-আমেরিকায়। ইহার দেহ ছিল পঁচিশ ফুট লম্বা; মাথার খুলিটাই সাত ফুট!

বিলাতী গল্পে ড্রাগন নামক একটি জীবের উল্লেখ দেখি। এক জাতের প্রাচীন ড্রাগনের অস্থি-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এর নাম টারোডাক্‌টিল্। এরা ছিল নিশাচর এবং দারুণ মাংসাশী। পণ্ডিতরা বলেন, এই টারোডাক্‌টিলের বংশধররা আজ নির্জীব বাঁটুল বাদুড়-চামচিকার মূর্ত্তি ধরিয়া ধরণীতে বাস করিতেছে!

লণ্ডনের মিউজিয়মে এক-জাতের পশুর কঙ্কাল সংরক্ষিত আছে। ইহার দেহ (দাঁড়ানো-অবস্থায়) আঠারো ফুট দীর্ঘ,—পায়ের উরুর স্থূলত্ব হাতীর পায়ের তিন গুণ! হাড়গুলা দারুণ মজবুত; সে হাতের পাশে ইস্পাতকে পাঁকাঠি বা জালানি তক্তা বলিয়া মনে হয়। এ জীবের নাম ছিল মেগাথে-রিয়াস। দক্ষিণ আমেরিকার বনে-জঙ্গলে এ যুগেও 'শ্লথ' নামে

টারোডাক্‌টিল্

-এক-জাতের বানর দেখা যায়। মেগা-থেরিয়াস্ এই শ্লথের আদি-পুরুষ। মেগাথেরিয়াসের গায়ে এত জোর ছিল যে, দু' হাতের একটি হ্যাঁচকা-টানে বড় বড় তালনারিকেল-খেজুরের গাছ নিমেষে সে ধরাশায়ী করিয়া দিত! এ জীবের আদি-বাস ছিল পাটাগোনিয়া অঞ্চলে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ জীব এখনো আছে। পাটা-গোনিয়ায় এ জীব ধরিবার জন্য লোক গিয়াছে।

মেগাথেরিয়াস্

এই সব অতিকায় জীব-জন্তুর কথা শুনিয়া মনে যেমন ভয় হয়, তেমনি বিস্ময় জাগে! চিরদিনের পৃথিবী জীব-মাতা বসুমতী যুগে-যুগে আপন-বক্ষে কত শত জীবকে লালন করিয়াছেন! সে সব জীবের মধ্যে বিবর্ত্তন-ধারা-মতে এই যে নানা বৈচিত্র্য, আকৃতি-প্রকৃতিতে এমন বৈষম্য—কেন এরূপ ঘটে?

চিড়িয়াখানায় আমরা জীব-জন্তু দেখিতে যাই, দেখিয়া ক্ষণিক আমোদ উপভোগ করি। মিউজিয়মে যাই—অতীত যুগের কঙ্কাল-স্মৃতি মনে ক্ষণেকের জন্য দোলা দেয়। কিন্তু এ আমোদ, এ দোলার নিবৃত্তি না করিয়া মনের এ বিস্ময়-কৌতূহলকে জাগ্রত রাখিয়া যদি আমরা রহস্য-সন্ধানে অগ্রসর হই, তাহা হইলে পুরাতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানিতে পারিব, তাহাতে বিস্ময়-আনন্দের সীমা থাকিবে না!

সাম্যবাদী সমাজ

গার্হস্থ্য-জীবনে স্বামি-স্ত্রীর 'স্বাভাবিক সম্বন্ধই ভর্তৃ-ভার্য্যার সম্বন্ধ এবং ভার্য্যারূপে স্ত্রীকে সতীত্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী হইয়াও চলিতে হইবে। ভর্তৃরূপে প্রত্যেকটি স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিদের ভরণ-পোষণের জন্য দায়ী। এ দায় স্বেচ্ছায় কেহ গ্রহণ না করিলে আইন তাহাকে বাধ্য করিতে পারে। এই সব সন্তান-সন্ততি যে তাহারই ঔরসজাত, এ বিষয়ে নিশ্চয়তা না থাকিলে কোনও স্বামী এ দায় গ্রহণ করিতে পারে না, এবং আইনও ন্যায়তঃ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না। কিন্তু স্ত্রী সতীত্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ যৌন-সম্বন্ধে স্বামীতেই একনিষ্ঠা না হইলে এ নিশ্চয়তা সম্ভব হয় না। তাই সতীত্ব ভার্য্যাত্বের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিগণিত হইয়াছে। কোনও কোনও সমাজে বিধবা-বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ বা 'ডিভোর্সে'র পর পুরুষান্তরের সঙ্গে বিবাহ অনুমোদিত এবং বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু যতদিন কোনও নারী কোনও পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে মিলিতা না হয়, ততদিন সেই স্বামী ব্যতীত পুরুষান্তরের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ তাহার পক্ষে কেবল নিন্দনীয় নহে, সর্ব্বত্র নিষিদ্ধও বটে।

যাহা হউক, গার্হস্থ্য-জীবনে নারীকে যে সতীত্বধর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী বা যৌনসম্বন্ধে একনিষ্ঠা হইয়া ভর্তৃরূপে কোনও না কোনও একজন মাত্র পুরুষের গৃহে থাকিয়া তাহারই ঔরসজাত সন্তানদের লালন-পালন ও তাহার সঙ্গে অন্যান্য যাবতীয় গৃহধর্ম্ম করিতে হয়, এবং তাহা হইতে অধিকারগত ও ব্যবহারগত যে একটা বৈষম্যও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহা চরম সাম্যবাদী মার্ক্সপন্থী সোসিয়ালিষ্টরা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন না। গার্হস্থ্য-জীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে কার্য্যের এই ভাগ এবং তাহা হইতে এই বৈষম্য যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা তাঁহারা বুঝেন। তবে স্ত্রী-পুরুষের নৈসর্গিক বিষমতাই যে এই ভাগের মূলে রহিয়াছে, এবং জনক-জননী উভয়ের স্নেহে ও দায়িত্বে উভয় হইতে প্রসূত সন্তান-সন্ততি প্রতিপালিত যাহাতে হইতে পারে, তাহারই প্রয়োজনে এই গার্হস্থ্য-জীবন যে নৈসর্গিক ধর্ম্মেই তাহার সব অধিকারগত ও ব্যবহারগত বৈষম্য লইয়া লোক-সমাজে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এইটি তাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। যেমন সাধারণভাবে মানুষে মানুষে, তেমন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও স্বাভাবিক কোনও বৈষম্য আছে, ইহাই তাঁহারা স্বীকার করেন না। গুণানুযায়ী কর্ম্মবিভাগে মানুষে মানুষে অধিকারভেদে যেমন কোনও শ্রেণীভেদ তাঁহারা চাহেন না, তাহা লোপ করিয়া সকলকেই সমান কর্ম্মে সর্ব্বথা সমান অধিকারভোগী একস্তরে আনিতে চাহেন,—স্ত্রী-পুরুষকেও তেমনই সমান কর্ম্মে সমান অধিকারভোগী একস্তরে আনিতে চাহেন। সাম্যই ইঁহাদের মতে মানবজীবনের স্বাভাবিক নীতি, বৈষম্যমাত্রই অস্বাভাবিক ও ন্যায়বিরোধী। কেবল পুরুষে পুরুষে নয়, নারীতে নারীতে নয়, নারী-পুরুষেও এই সাম্য তাঁহারা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই শ্রেষ্ঠ কাম্য অবস্থা বলিয়া মনে করেন। উচ্চনীচভেদে বিভিন্ন কুলে বিভিন্ন অবস্থায় যে লোক জন্মায়, তাহাও যেমন একটা accident অর্থাৎ নৈসর্গিক কোনও কারণবিহীন ও লক্ষ্যবিহীন একটা ঘটনা মাত্র বলিয়া মনে করেন, নারী যে নারী আর পুরুষ যে পুরুষ হইয়া জন্মে, তাহাও তেমনই একটা accident বা নৈসর্গিক কোনও কারণবিহীন ও লক্ষ্যবিহীন একটা ঘটনা মাত্র বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। 'Accident of birth and sex'—এই একটি কথাও এই মতাবলম্বী লোকদের মুখে সর্ব্বদা শোনা যায়। ইঁহারা বলেন, জন্মহেতু (বা জন্মসহজ গুণহেতু) কর্ম্মবিভাগ ও অধিকার-বৈষম্যে বিভিন্ন পর্য্যায়ে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ যেমন মানবজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে গড়িয়া উঠে নাই, উচ্চতর সম্প্রদায়ের অবিচার অত্যাচারের ফলে ঘটিয়াছে,—তেমনই নর-নারীভেদে মানবজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে তাহার এই বৈষম্যমূলক নীতিপদ্ধতি ধরিয়া গার্হস্থ্যজীবন লোকসমাজে গড়িয়া উঠে নাই, উঠিয়াছে পুরুষের বা পুরুষশাসিত সমাজের অবিচার অত্যাচারের ফলে নারীজাতির বিশেষ কতকগুলি অসহায় অবস্থা হইতে। সুতরাং ইহা তাহার পক্ষে কাম্য একটা সুখকর কি কল্যাণকর ব্যবস্থা হইতে পারে না। যাহা হইয়াছে—হীন একটা দাসত্বের ব্যবস্থা মাত্র।

নারী যে পুরুষের অধীন হইয়া এই অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হয়, তাহার কারণ, ইঁহারা বলেন, নারীর আর্থিক স্বাধীনতা নাই। নারী-পুরুষ সর্ব্বথা যখন সমান; সমান সুযোগ পাইয়া সকল ক্ষেত্রে সমান সমান কাযে নারীও যদি পুরুষের সঙ্গে সমান উপার্জ্জনে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত, এ অধীনতা, এ আনুগত্য তাহাকে স্বীকার করিতে হইত না। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় এ সুযোগ নারীকে দেওয়া হয় নাই, গার্হস্থ্যজীবনে পুরুষের আশ্রয়ে তাই তাহাকে বাস করিতে হইতেছে। সুযোগ পাইয়া আর্থিক স্বাধীনতা সে লাভ করুক, এ আশ্রয় তাহার পক্ষে আর আবশ্যক হইবে না। এ আশ্রয়ের বিশিষ্ট যে সব নীতির বন্ধনে তাহাকে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাহা হইতেও সে মুক্তিলাভ করিবে।

সামাজিক কি পারিবারিক যে সব নীতির বন্ধন মানবজীবনে এখন রহিয়াছে, সাধারণভাবেও তাহা হইতে মুক্তি অতি কাম্য বস্তু বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। একদিকে যেমন ইঁহারা সাম্যবাদী, অপরদিকে আবার তেমন স্বাধীনতাবাদীও বটেন। মূল লক্ষ্য আর্থিক সাম্য-স্থাপনার প্রয়োজনে ধনার্জ্জনে ও ধনাধিকারে মানুষের স্বাধীনতাকে যত বড়ই সব কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক হউক, অন্যান্য সকল বিষয়ে সকল রকম কাযকর্ম্মে ও পার্থিব সুখসম্ভোগে, নব্য এই পাশ্চাত্য সোসিয়ালিজম্ আবার নর-নারীনির্ব্বিশেষে সকলের পূর্ণ স্বাধীনতার বা বন্ধনমুক্ত ভাবে চলিবার পক্ষপাতী। যৌন-সম্বন্ধেও সোসিয়ালিষ্টরা চাহেন, নর-নারী সকলেই অবাধে নিজেদের রুচি মত চলিবে।

ইঁহারা বলেন, কেবল ইঁহারা কেন, সাধারণ ভাবে য়ুরোপ আমেরিকায় এইরূপ একটা মতই প্রবল ভাবে অধুনা দেখা দিয়াছে যে, যৌনব্যবহারে এই স্বাধীনতা ব্যতীত পার্থিব জীবনে নর নারী প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে না। প্রাচীন যে সব নীতি বা রীতি এই স্বাধীনতার পথে বাধা হইয়া রহিয়াছে, তাহা দূর করিয়া দিয়া মানব-জীবনের সুখের পথকে সরল, অনর্গল ও সুপ্রশস্ত করিয়া লইতে হইবে, ইহাই এই মতের বড় দাবী। গার্হস্থ্যজীবনে নারীর ত কথাই নাই, পুরুষও এ সব নীতি বা রীতি একেবারে লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পারে না। যখন পারে না, বাধা কিছু না কিছু আসিবেই, গার্হস্থ্যজীবন নারী কি পুরুষ কাহারও পক্ষেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

গার্হস্থ্য-জীবন যে সাম্যবাদী পাশ্চাত্য সোসিয়ালিষ্টরা লোপ করিতে চান, তাহার কারণগুলি হইল মোটের উপর এই :—

(১) ধনসম্পদে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার লোপ করিয়া সাম্যবাদী কমিউনিষ্ট আদর্শানুযায়ী সোসিয়ালিজম্ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পৃথক্ পৃথক্ গার্হস্থ্যজীবন তাহার মধ্যে চলে না, চলিতে দিলে কমিউনিষ্ট জীবনপদ্ধতি রক্ষা করাও দুঃসাধ্য হয়।

(২) যেমন পুরুষ তেমন স্ত্রী, উভয়েই সমান মানব। সুতরাং যেমন ধনসম্পদে, তেমন অন্যান্য সকল পার্থিব বিষয়েও সমান অবস্থায় থাকিয়া সমান অধিকার উভয়ে ভোগ করিবে, ইহাও চরম সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরা চাহেন। গার্হস্থ্যজীবনে যৌনসম্বন্ধে কোনও না কোনও পুরুষের একনিষ্ঠা ভার্য্যা হইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণাধীনতায় তাহারই গৃহে থাকিয়া নারীকে যে প্রধানতঃ সন্তান পালন ও গৃহকর্ম্মাদি করিতে হয় এবং ইহার প্রয়োজনে যৌনব্যবহারে নারীপুরুষে যে বিভিন্ন রকম নৈতিক আদর্শ (moral standard) দেখা যায়, ইহাতে সাম্যবাদের নীতি লঙ্ঘিত হয়।

(৩) সামাজিক ধনসাম্যস্থাপনার প্রয়োজনে ধনার্জ্জনে ও ধনাধিকারে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে যতই সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা হউক, অন্যান্য সকল বিষয়ে সোসিয়ালিষ্টরা আবার নর-নারীনির্ব্বিশেষে সকল মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতার পক্ষপাতী। যৌনসম্বন্ধে এবং আরও অনেক বিষয়ে যে সব নীতির বন্ধন নারী পুরুষ উভয়কেই গার্হস্থ্যজীবনে বেশী কম কিছু না কিছু মানিয়া চলিতে হয়, তাহাতে যথেচ্ছ সুখভোগে এই স্বাধীনতার বা স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তিতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়।

ধনসম্পদে ব্যক্তিগত স্বত্ব-স্বামিত্বের সঙ্গে যেমন কর্ম্মগত, ধনগত ও কুলগত একটা শ্রেণীভেদ, তেমনই গার্হস্থ্যজীবন ও তাহার বিশিষ্ট নীতি-পদ্ধতি, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত মানবসমাজে প্রচলিত আছে। এই সমাজই ভাঙ্গিয়া নূতন এমন এক সমাজ সাম্যবাদী নব্য সোসিয়ালিষ্টরা বা সমাজতন্ত্রবাদীরা গড়িয়া লইতে চান, যেখানে এই শ্রেণীভেদ ত থাকিবেই না, গার্হস্থ্যজীবনের লোপে নর-নারীর সম্বন্ধও এমন এক নূতন নীতিতে চলিবে, যাহাতে সমান শিক্ষালাভ করিয়া সমান সমান কাযকর্ম্মে সমান অবস্থায় থাকিয়া সমান স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে পার্থিব সকল সুখ সমানভাবে সকলে ভোগ করিতে পারিবে। এখন গার্হস্থ্য বর্জ্জিত এবং সর্ব্বদা সমান কর্ম্মে সমান অধিকারভোগী সমান স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তী নর-নারীর জীবন এই সমাজে কিরূপ হইবে, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি হইবে, সন্তানপালনাদি নারীজাতির বিশিষ্ট কাযগুলি কিভাবে চলিবার ব্যবস্থা হইতে পারে অথবা কি ব্যবস্থা সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরা করিতে চাহেন, চেষ্টাও কিছু কিছু করিয়াছেন, তাহার যথাসম্ভব একটা বিবৃতি বা চিত্র দিবার চেষ্টা করিব।

প্রাচীনপন্থী বর্ত্তমান সমাজ ও তাহার নীতিপদ্ধতির সঙ্গে তাহারই অনুপ্রেরণাপ্রসূত, তাহারই অনুরূপ ও অনুকূল একটা সাহিত্য ও শিক্ষাপদ্ধতিও গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন দেশের এই যে সমাজ ও তাহার নীতিপদ্ধতি—বিশিষ্ট এক একটি ধর্ম্ম বা (religion) তাহার মূলে রহিয়াছে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের নির্দ্দেশসমূহই প্রথম রূপ তাহাকে দিয়াছে, প্রাণসঞ্চার তাহাতে করিয়াছে। ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধীয় মতবাদ ও বিশ্বাস এবং ভগবদারাধনার নিয়মপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে যতই পার্থক্য দেখা যাক্, গার্হস্থ্যজীবননীতি, নারী-পুরুষের সম্বন্ধ, সন্তানপালনে পিতামাতার কর্ত্তব্য, পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য, ঐহিক অপেক্ষা পারত্রিক কল্যাণের গুরুত্ব, ভোগমার্গ অপেক্ষা ত্যাগমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়েই বিভিন্ন এই সব ধর্ম্মে আশ্চর্য্য একটা ঐক্যও রহিয়াছে, —সামাজিক নীতিপদ্ধতিও এসব বিষয়ে মোটের উপরে একই আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছে, একই ধারায় মানবসমাজকে পরিচালিত করিতে চাহিয়াছে। প্রত্যেক সমাজের সাহিত্যে ও শিক্ষাপদ্ধতিতেও ধর্ম্মীয় প্রেরণা ও ধর্ম্মনীতির অতি বড় একটা প্রভাবও দেখা যায়। কিন্তু মার্ক্সপন্থী সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরা একান্তভাবে নিরীশ্বর ও ইহসর্ব্বস্ব জড়বাদী। ধর্ম্মকে তাঁহারা লোকসমাজের অতি বড় একটা অকল্যাণের হেতু এবং দীনজনগণের পক্ষে ধনিজনবর্গের কূটকৌশলপ্রসূত হীন একটা দাসত্বের শৃঙ্খল মাত্র বলিয়া মনে করেন। ইহার বিলোপও তাঁহাদের সাম্যতন্ত্রের একটি নীতিসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের বাঞ্ছিত নূতন সমাজে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মানুবর্ত্তী নীতিপদ্ধতির কোনও স্থান থাকিতে পারে না, তাহার প্রভাবান্বিত সাহিত্য ও শিক্ষাপদ্ধতিও চলিতে পারে না। তাই প্রাচীন সমাজকে ভাঙ্গিয়া নূতন একটা সমাজ যেমন তাঁহারা গড়িতে চান, সঙ্গে সঙ্গে তেমনই প্রাচীন ধারার সাহিত্য ও শিক্ষাপদ্ধতিকেও লোপ করিয়া নিজেদের মতানুযায়ী নূতন একটা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া নূতন এমন একটা শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে চান, যাহাতে বাল্যাবধিই সাম্যবাদের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া একান্তভাবে তাহারই নীতির প্রভাবে মানুষের জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং তাহারই কর্ম্মপদ্ধতির অনুবর্ত্তন সকলের পক্ষে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

ধনোৎপাদনাদির ব্যবস্থা যাহাই হউক, কর্ম্মের অধিকারে কি শ্রমের আয়ে নারীপুরুষে যে কোনও ভেদই এ সমাজে থাকিবে না, একথা বলাই বাহুল্য। নিজেদের নূতন সমাজনীতির অনুযায়ী যেরূপ সাহিত্যই তাঁহারা সৃষ্টি করুন এবং যেরূপ শিক্ষালয়ই প্রতিষ্ঠা করুন, বাল্যাবধি এক সঙ্গেই সেই শিক্ষায় যথাসম্ভব সমান মতিগতি, সমান চরিত্ররীতি ও সমান যোগ্যতা লাভ করিয়া সমান সহযোগীর ন্যায় নারীপুরুষ উভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, সমান সমান সহযোগীর ন্যায় বরাবর কায করিয়া যাইবে। নারীস্বভাবের ও পুরুষস্বভাবের পার্থক্যহেতু পরস্পরের সম্বন্ধে ব্যবহারের যেরূপ সব পার্থক্য বর্ত্তমান সমাজে দেখা যায়, তাহাও দূর করিয়া ফেলিতে হইবে, এ অবস্থায় আপনা হইতেও দূর হইবে বটে। কমনীয়তা ও কোমলতা নারীস্বভাবের প্রধান ধর্ম্ম এবং ইহার প্রভাবে

নারী সাধারণতঃই কিছু দুর্ব্বলা ও লজ্জানম্রা। নারীর একটি নামই তাই এদেশে হইয়াছে যেমন অবলা, য়ুরোপেও তেমন হইয়াছে fair sex বা weaker sex. পুরুষরা সর্ব্বত্রই প্রায় নারীকে যত্নে রক্ষণীয়া বলিয়া মনে করেন এবং বিশিষ্ট একটা আদর ও মর্য্যাদাও দিয়া থাকেন। সাধারণ যানাদিতে নারীকে আসন ছাড়িয়া দিবার রীতি ইহারই একটি দৃষ্টান্ত বটে। পুরুষের সঙ্গে ব্যবহারে যে শীলতা পুরুষ মানিয়া চলে, নারীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শীলতা মানিয়া তাহাকে চলিতে হয়, এবং তাহার রীতিও অনেকটা ভিন্ন রকমের। সামাজিক শিষ্টাচারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই পার্থক্যের ভিন্ন ভিন্ন রীতি দেখা যায় বটে, কিন্তু পার্থক্য একটা আছেই। নব্য য়ুরোপে বহু নারী বাহিরের সব পুরুষোচিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবাধে এখন প্রবেশ করিতেছেন এবং পুরুষের ন্যায় পুরুষের প্রতিযোগী বা সহযোগী হইয়া দাঁড়াইতেছেন, সাম্যের দাবীও বেশ জোরেই সর্ব্বত্র এখন হইতেছে। পূর্ব্বতন শিষ্টাচারসম্মত ব্যাবহারিক পার্থক্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, বিশেষ নাগরিক সমাজে। তবু এখনও অনেক বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টরা এই সব ভেদ একেবারেই লোপ করিয়া ফেলিতে চান। ইহারা চাহেন, পুরুষরা যেমন সমান সমান 'কমরেড' (comrade) বা সমধর্ম্মী, সমকর্ম্মী, বন্ধু বা সঙ্গীর ন্যায় একত্র কাযকর্ম্ম করে, মেলে মেশে, আমোদ-প্রমোদ করে,—নারী-পুরুষও তেমনই সমান সমান কমরেডের ন্যায় কাযকর্ম্ম করিবে, মিলিবে মিশিবে, আমোদ-প্রমোদ করিবে। পরস্পর কমরেড পুরুষের মধ্যেও যেমন কিছুতে কোনও সঙ্কোচের বাধা নাই, পরস্পর কমরেড নারীপুরুষের মধ্যেও তাহা কিছু থাকিবে না।

সকলেই জানেন, বর্ত্তমান যুগে নব্য এই সাম্যবাদী সোসিয়া-লিজম্ প্রতিষ্ঠার প্রবল একটা চেষ্টা রুশ দেশে হইতেছে, হইয়া গিয়াছে বলিয়াও অনেকে মনে করেন। অন্যান্য বিষয়ে এই চেষ্টার সফলতা যতদূর হউক না হউক, নারীপুরুষের জীবন এবং পরস্পর সম্বন্ধ যে বহু পরিমাণে এই সাম্যনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আপাততঃ উঠিয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে। সমতাসূচক নূতন 'কমরেড' নামটাও সেখানে সকলে ব্যবহার করে, অর্থাৎ যে নামটা ব্যবহার করে, তার ইংরেজী হইতেছে—'কমরেড'। খাঁটি বাঙ্গালায় কথাটি হয় 'সাঙাৎ'। সকলেরই নামের আগে 'কমরেড' কথাটা দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও রুশ-আদর্শের সোসিয়ালিষ্ট দল একটা গড়িয়া উঠিতেছে বা উঠিয়াছে। ইঁহারাও নামের আগে 'কমরেড' কথাটা ব্যবহার করিয়া থাকেন, যেমন 'কমরেড বিনোদ' 'কমরেড বিনোদিনী' ইত্যাদি। কলেজের ছাত্র প্রভৃতি তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকেও এই নামটার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের সভাসমিতির আফিসসংক্রান্ত চিঠিপত্রে 'Dear Comrade' এই পাঠটা সাধারণতঃ এখন ব্যবহৃত হয়।* তবে ইঁহারা সত্যসত্যই সকলে 'সোসিয়ালিষ্ট' কি না অথবা ইহার তত্ত্বতাৎপর্য্যফলাফলাদি সব বুঝিয়া এই মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কি না, জানি না।

যথাবিহিত কর্ম্মক্ষেত্রে সমান সমান কাযকর্ম্ম করিয়া নারীপুরুষ প্রত্যেকেই সমান সমান জীবিকার অধিকারী হইবে, কাযের সময় কাযে আর অবসর সময় আমোদ-প্রমোদে সমান সমান কমরেডের ন্যায় মেলামেশা করিবে, নারী-পুরুষ বলিয়া ব্যাবহারিক কোনও পার্থক্য থাকিবে না, পার্থিব বিষয়সম্ভোগে অবাধে যার যার অভিরুচিমত সকলে চলিবে,—ইহাই হইল নূতন এই আদর্শ সমাজে ব্যক্তিগতভাবে নর-নারীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের রীতি।

গার্হস্থ্যজীবন থাকিবে না, কোনও ধর্ম্মও ইঁহারা মানেন না। সুতরাং বিবাহরূপ কোনও অনুষ্ঠান অথবা নর-নারীর মধ্যে এ জাতীয় কোনও সম্বন্ধের স্থায়িত্ব এ অবস্থায় হইতে পারে না, তাহার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়াও ইঁহারা মনে করেন না। যৌনসম্বন্ধে ইচ্ছা-মত মিলন হইবে, ইচ্ছামত ছাড়াছাড়ি হইবে, ইহাই সুবিধার কথা বা কাম্য রীতি বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। তবে ইচ্ছা যদি কাহারও হয়, বিবাহরূপ কোনও অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারে, করিয়া একনিষ্ঠ দাম্পত্যের সম্বন্ধেও বাস করিতে পারে, বাধা তাহাতে কিছু নাই। কিন্তু এ অবস্থায় দাম্পত্য ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া বেশী লোক যে চলিবে না, চলিতে পারে না, এ কথা না বলিলেও চলে।

পৃথক্ পৃথক্ গৃহস্থালী নাই, গৃহকর্ম্মের ভার লইবার মত গৃহে গৃহে গৃহিণীও কেহ নাই। নারী-পুরুষ সকলকেই সমান ভাবে বাহিরে কায কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। গৃহে গৃহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আহারাদির ব্যবস্থা এ অবস্থায় চলিতে পারে না। সুতরাং সাধারণ সব ভোজনাগার থাকিবে, নির্দ্দিষ্ট সময় মত সেখানে গিয়া সকলে আহার করিয়া আসিবে। বাসস্থান সম্বন্ধেও এইরূপ সাধারণ একটা ব্যবস্থা থাকিবে। বড় বড় হোটেলের ন্যায় আস্তানায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এক বাড়ীতেও লোক করিয়া লইতে পারে। স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় কতকটা স্থায়ী ভাবের সম্বন্ধে মিলিত নর-নারীর এক গৃহে একত্র থাকিবারই কথা, এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা পৃথক্ ভাবেও তাহারা করিয়া লইতে পারে। কিন্তু অনর্থক এ হাঙ্গামার মধ্যে কেন লোক যাইবে বা যাইতে চাহিবে? দুই জনেরই সমান কায-কর্ম্ম বাহিরে, এত অবসরই বা কাহার হইবে?

রোগপীড়া লোকের আছে। আহারাদির ন্যায় সাধারণ প্রতি-ষ্ঠানেই রোগপরিচর্য্যার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাসপাতাল, নার্সিং-হোম প্রভৃতি য়ুরোপের সব নগরে নগরে অনেক এখন হইয়াছে। একটু কঠিন কোনও রোগ হইলেই গৃহে আর কেহই বড় থাকে না, হাসপাতালে বা নার্সিং হোমেই যায়। সোসিয়ালিষ্ট সমাজে সর্ব্বত্রই এরূপ সব হাসপাতাল বা সরকারী নার্সিং হোমের প্রতিষ্ঠা হইবে, সহজ কি কঠিন রোগপীড়া কাহারও কিছু হইলেই এই সব স্থানে তাহাকে আশ্রয় লইতে হইবে। সরকারী রোগসেবক বা রোগসেবিকাদের হাতেই বালবৃদ্ধ রোগী মাত্রকে গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। নিজ গৃহের ন্যায় নিজস্ব এরূপ আশ্রয় কোথাও কাহারও নাই, পিতা

* কিছুকাল পূর্ব্বে যে 'উদার' (liberal) মত দেশে দেখা দিয়াছিল, সেই মতে পুরুষরা ছিল সব ভাই ভাই, নারীপুরুষ ছিল সব ভাইবোন। চিঠিপত্রেও 'Dear Brother Dear Sister', ('প্রিয় ভ্রাতা', 'প্রিয় ভগিনী') এই পাঠ তখন তরুণসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন কেহ আর 'ভাই ভাই' 'ভাই বোন' নহেন, সকলেই সমান 'কমরেড' বা সাঙাৎ। সকলের সমান পিতা এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়াই 'ভাই ভাই' 'ভাই বোন' সম্বন্ধ ধরা হইত। কিন্তু নারী-পুরুষে সকল প্রকার ভেদ কেবল নহে, স্বয়ং ঈশ্বরকেই নব্য এই সাম্যবাদ লোপ করিয়া ফেলিতে চায়। সুতরাং 'ভাই ভাই' 'ভাই বোন' এই সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়া সকলেই হইয়াছেন সমান 'কমরেড' বা 'সাঙাৎ-সাঙাৎনী'। সুতরাং নামের বিশেষণে সম্বোধনসূচক শব্দও তদনুরূপ করা হইতেছে।

মাতা ভাই-বোন, স্বামি-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি দরদের জনও এমন কোথাও কাহারও নাই, কেহ থাকিতে পারে না, যে দরদে রোগীর শান্তি কি রোগজ্বালার উপশম কেহ কিছু লাভ করিবে। অথবা সে দরদ কেহ চাহিবে না বা পাইবে না।

তার পর আমোদপ্রমোদ। য়ুরোপের বড় বড় সব নগরে নৈশ ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা, মিউজিকহল (সঙ্গীতশালা), ড্যান্সিংহল (নৃত্যশালা) প্রভৃতি সাধারণ প্রমোদালয় এখনই অনেক হইয়াছে। হোটেল রেস্তরাঁরও অভাব নাই। গৃহ বা গৃহ বলিতে যাহা আছে, পৃথক্ আহারাদির ব্যবস্থা অতি কম লোকেরই সেখানে হয় বা সহজে কেহ করিয়া লইতে পারে। অধিকাংশ নারী-পুরুষকেই বাহিরে কাযকর্ম্ম করিতে হয়। এই সব হোটেল রেস্তরাঁয় খাইয়া তাহারা কাযকর্ম্মে যায়, কাযকর্ম্মের অবসরে হোটেল রেস্তরাঁয় গিয়া কিছু ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আইসে, দৈনিক কার্য্যাবসানে এই সব হোটেল রেস্তরাঁয় গিয়া ভুরিভোজন করে এবং তার পর এই সব সাধারণ প্রমোদালয়ে গিয়া আমোদ-প্রমোদ করে। গৃহের অভাবে এইরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই সোসিয়ালিষ্ট সমাজে করিতে হইবে, যথাভিরুচি প্রমোদে এই সব স্থানেই সকলে গিয়া চিত্ত-বিনোদন করিবে। গৃহে আর কতটুকু প্রমোদের আয়োজন লোকের থাকিতে পারে? অনেক বেশী এই সব স্থানে লোক পায়। প্রিয়জনের সহিত নিভৃত বিশ্রম্ভালাভ কেহ চাহিলে, তাহারও স্থান কি অবসরের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র থাকিবে।

নারী-পুরুষের মিলন যে ভাবেই হউক আর এক একটি এরূপ মিলন যতদিনই থাকুক, সন্তানসন্ততি অবশ্য জন্মিবে। এক একটি জাতি বা সমাজকে বজায় রাখিতে হইলে ইহাদের জন্ম অত্যাবশ্যকও বটে। ইহাদের গর্ভে ধারণ, গর্ভে পোষণ এবং সময়মত প্রসব নারীকেই করিতে হইবে। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ঘরগৃহস্থালী নাই, গৃহকর্ত্তা স্বামী কাহারও নাই, গৃহবাসী অন্য পরিজনও কেহ কাহারও নাই। সুতরাং গর্ভিণীর পরিরক্ষণ ও প্রসূতির পরিচর্য্যা সরকারী ব্যবস্থাতেই চালাইতে হইবে। বর্ত্তমান এই সমাজেই নগরে নগরে এখন বহু হাসপাতাল, সরকারী বা সাধারণ সূতিকাগার এবং সেবাশ্রম (nursing home) প্রভৃতি হইয়াছে ও হইতেছে। বহু নারীই প্রসবের সময় এই সব স্থানে এখন আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্যয়, সব না হউক, অনেকটা স্বামীরাই বহন করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পরিচর্য্যার জন্য অতি দীর্ঘকাল এই সব আশ্রমে থাকা প্রায়ই কাহারও পক্ষে বড় সম্ভব হয় না, গৃহে ফিরাইয়া লইয়া স্বামীদেরই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। নূতন এই সমাজে এই সব আশ্রয়ের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই এমন ভাবে করিতে হইবে যে, প্রত্যেকটি গর্ভিণী নারী এই সব স্থানে গিয়া প্রসব করিতে পারে এবং প্রসবের পরেও সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হওয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া যথা-প্রয়োজন পরিচর্য্যাদি লাভ করিতে পারে। ব্যবস্থা সব সরকারী, ব্যয়ভারও সরকারী অবশ্য হইবে। পূর্ণগর্ভার ত কথাই নাই, গর্ভের সূচনা হইতেই অনেক নারী এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, বাহিরে গিয়া বাঁধা নিয়মে আফিস আদালতে, ক্ষেতখামারে, কারখানা কারবারে, পুলিসপাহারায় কি রণশিবিরে দূরে থাক, গৃহে থাকিয়া সাধারণ গৃহস্থালীর কাযও তেমন কিছু করিতে পারেন না। এই সময়ে তাঁহাদের প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্য্যাদি সব সরকারী আশ্রয়ে সরকারী ব্যয়েই সর্ব্বত্র করিতে হইবে।

গর্ভে ধারণ-পোষণ করিয়া সন্তান প্রসব মাত্র নারীরা করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিতে এ অবস্থায় পারে না। কারণ, তাহা করিতে হইলে পুরুষের সঙ্গে সমান সমান কাযকর্ম্মে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ তাহার পক্ষে ঘটে না। তার পর পিতৃত্বনিরূপণ সর্ব্বদা সম্ভব হয় না বলিয়া দায়ও প্রায় সব গিয়া পড়িবে মাতার উপরে। সুতরাং নবপ্রসূত সব শিশু পালনের এবং এই শিশুরা একটু বড় হইয়া উঠিলে তাহাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদির ব্যবস্থাও সব সরকারী করিয়া লইতে হইবে, সরকারী ব্যয়েই সব চালাইতে হইবে। ছেলেপিলেরা আর পিতা-মাতার পৃথক্ পৃথক্ ছেলেপিলে থাকিবে না, সব সরকারী ছেলেপিলে (state children) হইবে, সরকারের হাতেই থাকিবে। সন্তানের জনয়িত্রী স্ত্রী হিসাবেও নারীদের এ অবস্থায় একরূপ সরকারী স্ত্রী বলা যাইতে পারে।* নগরে ও গ্রামে সর্ব্বত্রই স্থানে

* যেমন ব্যক্তিগত কোনও সম্পত্তিকে সরকারী বা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে চাহেন, তেমন ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত বা কর্ত্তৃত্বাধীন সব কর্ম্মকেও সরকারী বা জাতীয় অধিকারভুক্ত করিতে বা কর্ত্তৃত্বাধীনতায় আনিতে সোসিয়ালিষ্টরা চাহেন। ইহাকে এই সব সম্পত্তির বা কর্ম্মের nationalisation বা socialisation বলা হয়। পুরুষ যেমন বীজ, স্ত্রীও একহিসাবে তেমনই সন্তানজননের ক্ষেত্র। স্ত্রীকে এই হিসাবে 'ক্ষেত্র' বলিয়া এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও অনেক স্থলে উল্লেখ আছে। যাহা হউক, এখন স্ত্রীরূপ এই সব ক্ষেত্র প্রত্যেকটি স্বামীর পৃথক্ পৃথক্ অধিকারভুক্ত আছে। দেশের সকল পুরুষের সমান অধিকারভুক্ত বা সরকারী ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির পরিণতিকে nationalisation বা socialisation of women বলা যাইতে পারে। স্ত্রীজাতির এইরূপ nationalisation বা socialisation আবশ্যক, এইরূপ একটি মতও সোভিয়েট রুশিয়ায় উঠিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। তবে যে কোনও পুরুষের সঙ্গে যথেচ্ছ ভাবে যৌনসম্বন্ধ স্থাপন এ সমাজে ঘটিবে এবং সন্তানের জননপালনাদি কর্ম্মও যে ভাবে চলিতে পারে, নামে না হউক, কার্য্যতঃ তাহাকে nationalisation of women বলা যাইতে পারে বটে। Natinoalisation of women ঠিক না হউক, nationalisation or socialisation of the function or work of women সাম্যস্থাপনার পক্ষে আবশ্যক, বোলশেভিক রুশিয়ার প্রথম ডিক্টেটর বা সর্ব্বময় কর্ত্তা লেলিনের এইরূপ একটি উক্তি আছে। সন্তানপালন গৃহে থাকিয়া নারীকে করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহবাসী পরিজনবর্গের আহারাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি গৃহকর্ম্মও করিতে হয়। ইহারই প্রয়োজনে গৃহকর্ত্তা স্বামীর উপরে নির্ভর করিয়া গৃহেই তাহাকে থাকিতে হয়। এই কাযগুলিই বর্ত্তমান সমাজে নারীদের প্রধান কায বা special function বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ইহার দায়েই বাহিরে সমান ভাবে পুরুষের সঙ্গে আসিয়া বৈষয়িক কাযকর্ম্মে অর্থোপার্জ্জন তাহারা করিতে পারে না। কিন্তু নারীর এই কাযগুলিকে যদি সোসিয়ালাইজ (socialise) অর্থাৎ সাধারণের বা ষ্টেটের অধিকারভুক্ত বা কর্ত্তৃত্বাধীন করা যায়, তবেই পুরুষের সঙ্গে তাহাদের সাম্য স্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং socialisation of the function of women একান্ত আবশ্যক বলিয়া, লেলিন উল্লেখ করিয়াছেন। সন্তানপালনাদি গৃহকর্ম্ম এভাবে 'সোসিয়লাইজ' করা হয় ত সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সন্তানকে গর্ভে ধারণপোষণ ও প্রসব 'সোসিয়ালাইজ' করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকটি নারীকে স্বতন্ত্র ভাবেই ইহা করিতে হইবে।

স্থানে সাধারণ নার্সারী (public nursery) বা শিশুপালনাগার থাকিবে। প্রসবের পর শিশুরা সব এই সব স্থানে প্রেরিত হইবে এবং মাতারা সব সুস্থ হইয়া যার যার কাযে চলিয়া যাইবে। যত প্রয়োজন বোর্ডিং স্কুলের মত সাধারণ বিদ্যালয় (public residential schools and colleges) প্রতিষ্ঠা করা হইবে। Public বা সরকারী সব শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ইহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন এবং অভিভাবকের ন্যায় প্রতিপালনও করিবেন।

শিক্ষার ব্যবস্থাও আবার এমন হইবে যে, এক পদার্থবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান এবং সোসিয়ালিষ্ট নীতিমূলক সাহিত্য ব্যতীত আর কেহই কিছু না শিখিতে পারে। প্রাচীন তত্ত্ববিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীনভাব ও চিন্তার ধারা, প্রাচীন ধর্ম্মানুগত চরিত্রের আদর্শ, ইহার কোনও প্রভাব পাছে ছেলেমেয়েদের মনে আসিয়া পড়ে, তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন বিদ্যা ও সাহিত্যকে একেবারে লোপ করিয়া ফেলিতেই সোসিয়ালিষ্টরা চান, এবং তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী নূতন এক সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে চান। বিদ্যালয়ে কেবল নয়, দেশেও সাধারণ ভাবে নূতন এই সাহিত্য চলিবে। রঙ্গমঞ্চেও সর্ব্বত্র নূতন এই নীতিমূলক নাটকের অভিনয় হইবে। সাহিত্য ও সুকুমার কলা প্রভৃতি সব কিছুকেই এমন এক নূতন রূপ, নূতন ভাব ধরাইতে হইবে, যাহাতে নূতন এই পদ্ধতিকেই মনে প্রাণে সকলে আঁকড়িয়া ধরে, চরিত্র বাল্যাবধি এই ভাবের প্রেরণায় ও চিন্তার প্রভাবে নূতন এই আদর্শে গড়িয়া উঠে। শিক্ষার সকল প্রচেষ্টাও তাই ইহারই অনুকূল পথে পরিচালিত হইবে। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর এই সব বিদ্যালয়ে এই ভাবে সকলের কাটিবে। তার পরে যৌবনে উচ্চতর সব বিদ্যালয়ে ব্যাবহারিক বিজ্ঞানাদি শিখিয়া কাযকর্ম্মের যোগ্য যখন হইবে, ছেলেমেয়েরা যথাব্যবস্থিত সরকারী সব ব্যবসায় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদিতে * গিয়া কাযকর্ম্ম করিবে। ব্যবস্থামত প্রাপ্য যাহা হয় প্রয়োজনীয় খরচের জন্য তাহা লইবে, অবসর সময় যার যেমন ভাল লাগে স্বচ্ছন্দে সেই ভাবে চলিবে।

এইরূপ একটা অবস্থা সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেটে বা সমাজে অবশ্যম্ভাবী ত বটেই, তা ছাড়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা সোসিয়ালিষ্টরা বাঞ্ছনীয় বলিয়াও মনে করেন। শৈশবাবধি বালক-বালিকারা যদি এই ভাবে প্রতিপালিত হয় এবং এইরূপ শিক্ষালাভ করে, পারিবারিক সম্বন্ধের কোনও আকর্ষণ, কোনও মমতা, তাহাদের চিত্তে কখনও আসিতে পারিবে না। একেবারে সোসিয়ালিষ্ট ধাতুর মানুষই সকলে হইয়া উঠিবে।

পিতামাতার গৃহ বলিয়া কোনও স্থান নাই, পিতামাতার সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও সন্তান কাহারও বড় থাকিবে না, কুলবংশের কোনও পরিচয় কি তাহার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা দূরে থাক, পৃথক্ পৃথক্ কোনও নাম পর্য্যন্ত কাহারও এ অবস্থায় সম্ভব হয় না। পৃথক্ পৃথক্ পারিবারিক জীবনের সঙ্গে কৌলিক কি সামাজিক শ্রেণীভেদ যে সোসিয়ালিষ্টরা লোপ করিতে চান, তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছু হইতে পারে না। কেবল আইনের জোরে যাহা পাঁচ পুরুষেও হইয়া উঠিতে পারে কি না সন্দেহ, এ অবস্থায় এক পুরুষেই হয় ত বা তাহা হইতে পারে। তবে এ কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের চিন্তা ও ভাব বাঁধা একটা পথে জোর করিয়াই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইবে, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তির অবসর তাহার কিছু থাকিবে না। একই আদর্শে একই ছাঁচে ঢালা সব মানুষ দেশে হইবে। যেমন ভাবে ও চিন্তায়, তেমন চরিত্রেও বৈচিত্র্য কি কাহারও কোনও বৈশিষ্ট্য কোথাও কিছু এ সমাজে থাকিতে পারে না। মানুষের জ্ঞানপিপাসা বহুদিকেই অতৃপ্ত, ভাববিকাশ বহুদিকেই রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। মানুষের জীবন্ত সমাজই অনেকটা পুতুলনাচের মেলার মত হইবে। ধনসাম্য, নারী-পুরুষের কর্ম্মসাম্য এবং যৌনসম্ভোগে উভয়ের সমান স্বাধীনতা স্থাপনা-রূপ ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে লক্ষ্য সোসিয়ালিষ্টদের এই দিকে চেষ্টাও এই ইষ্টলাভেরই তাঁহারা করিতে চান, এবং কোথাও কোথাও করিতেছেনও বটে। কিন্তু মানুষের স্বভাবের বিচিত্র গতি ও স্ফূর্ত্তিকে সত্যই এ ভাবে চাপিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া এক ছাঁচে সকলকে গড়িয়া তোলা বাস্তব জীবনে সম্ভব হইতে পারে কি না, হইবে কি না, কেহই তাহা আজ বলিতে পারেন না।

এখন বৃদ্ধ এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে কর্ম্মাক্ষম ব্যক্তিদের কথা। পারিবারিক জীবন যদি উঠিয়া যায়, পিতামাতার সঙ্গে স্বাভাবিক স্নেহমমতার সম্বন্ধ যদি না থাকে, সন্তানপালন যদি সেই স্নেহমমতায় পিতামাতা না করেন, তবে বার্দ্ধক্যে কি ব্যাধিতে কোনও পিতামাতারই বা কি দাবী-দাওয়া সন্তানের উপরে থাকিতে পারে? কে কাহার জনক-জননী (বা ভাই-ভগিনী) তাহার পরিচয় একটা থাকাই এ অবস্থায় সর্ব্বদা সম্ভব হয় না। সুতরাং যতদিন সুস্থ ও সমর্থ থাকিবে, সকলেই কাযকর্ম্ম করিবে। তার পর বার্দ্ধক্যে কি ব্যাধিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে, ষ্টেটই তাহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবে। ইহার জন্যও সরকারী সব গৃহ বা আশ্রম থাকিবে, সেখানে সরকারী সব কর্ম্মচারীদের বা সেবকসেবিকাদের তত্ত্বাবধানে সরকারী ব্যবস্থা মতই খাইয়া পরিয়া বাকী জীবন তাহারা কাটাইবে।

কিন্তু এত বড় গুরুদায়িত্ব লইয়া এইভাবে সব কাযের ব্যবস্থা করিয়া এই ষ্টেট কাহারা চালাইবে? কেবল ধনোৎপাদক ব্যবসায়াদি চালান আর ধন ভাগ করিয়া দেওয়া নয়, দেশের যত সব গর্ভিণী ও নব-প্রসূতির পরিচর্য্যা, ছেলেমেয়েদের মানুষ করিয়া তোলা, অক্ষম-রুগ্ন ও বৃদ্ধদের প্রতিপালন করা—এ সবও আছে। যথাযোগ্য লোক বাছিয়া লইয়াও আবার কাযের ভার দিতে হইবে, কায ভাল চলে কি না দেখিতে হইবে। ভোটে যাহারাই সব সরকারী লোক হউক, সাধারণ মানুষ ত তাহারা সব। তাহাদের হাতেই এই দায়িত্বের ভার থাকিবে। লোক বাছিতে ভুল করিবে না ত? যদি করে তখন কি হইবে? ষ্টেটের হাতে অধুনা যে সব কর্ম্মের ভার রহিয়াছে, তাহাই আশানুরূপ ভাবে চলে না। সোসিয়ালিষ্ট রাষ্ট্রের এত রকমের এত কায চলিবে কি? এখন যে সব ঘরের কায, তাও সরকারী হইবে। পিতার কায, মাতার কায, গৃহিণীর কায—সব সরকারী, সব socialised! ব্যাপার বড় সহজ নয়, ভাবিবার কথাই বটে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ (এম-এ)।

* শাসন ত আছেই, ব্যবসায়াদি ধনোৎপাদন ও ধনবিভাগমূলক কাযকর্ম্মও সব socialised হইয়া ষ্টেটের হাতেই থাকিবে। লোকহিতকর অন্যান্য যত কিছু কাযকর্ম্ম হইতে পারে এবং তাহার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যাহা কিছু তাহাও সব socialised এই সমাজে হইবে, ব্যক্তিগত অথবা ষ্টেটের বহির্ভূত কোনও সঙ্ঘের বা সম্প্রদায়ের হস্তে থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান সব সমাজেই ক্রমে এই সব কায ষ্টেটের হাতে যাইতেছে। সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেট পুরাপুরিই সব নিজের হাতে গ্রহণ করিবে এবং তাহাই সোসিয়ালিষ্ট ষ্টেটের আদর্শ।

ফিরে এসো

(গল্প)

[শ্রীমতী পার্ল এস বাক্-রচিত গল্প হইতে]

ট্রেণ চলিয়াছে। চলন্ত ট্রেণের কামরায় বসিয়া জন বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। চোখের সামনে পল্লীর বিচিত্র দৃশ্য বায়োস্কোপের ছবির মতো ছুটিয়া ছুটিয়া সরিয়া চলিয়াছে—সে-সবে জনের দৃষ্টি নাই! তার মনে ঝড় বহিতেছে। সে ঝড়ে দুনিয়া সবেগে দুলিয়া ঝাপসা অস্পষ্ট!

জন আজ বেকার। চাকরি ছিল; গিয়াছে।

জন ভাবিতেছিল, কাজ জানে না বলিয়া যদি আজ চাকরি হইতে বরখাস্ত হইত, তাহা হইলে দুঃখ ছিল না। কাজে কোনো দিন ফাঁকি দেয় নাই। মনিবের নিমকের মর্য্যাদা রাখিয়া চলিয়াছে পরম নিষ্ঠা-ভরে। সেদিক্ দিয়া পরাজয় নয়। যাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী যদি কেহ থাকে, সে তার ভাগ্য!

কিন্তু এই ভাগ্যকে সে কোনো দিন মানে নাই। চিরদিন শক্তিকে মানিয়াছে; শক্তির সাধনা করিয়াছে। তাই আজ সান্ত্বনার কোনো অবলম্বন না পাইয়া অচেনা অজানা অনিশ্চিত ভাগ্যকে টানিয়া আনিয়া এ ভাবে তাকে অভিশাপে জর্জ্জরিত করিতে গিয়া মন অকূলে থই পাইতেছে না!

দেড় বছর চাকরি করিয়াছে। তরুণ বয়স, কাজে নিষ্ঠা আছে,—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় বিভূষিত—গলদ তার কোথাও নাই! অথচ অফিস চলিতেছে না বলিয়া নূতন লোকদের এ ভাবে বিদায় দেওয়া—যোগ্যতার তারিফ না করিয়া—এমন অবিচার সে কখনো কল্পনা করিতে পারিত না! এ চাকরি হারাইয়া অনেকের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে—নিজের শিক্ষা-সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে। সকলে বলিয়াছে—একাধারে এমন যোগ্যতা দেখা যায় না, সত্য! কিন্তু কি করিব? বড় দুঃখিত, চাকরি খালি নাই!

চেষ্টা করিয়া যদি এমন নৈরাশ্য ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনের মূল্য কি!

সহর ছাড়িয়া তাই আজ জন চলিয়াছে তার পল্লীর ঘরে। সেখানে মা আছেন, বাবা আছেন…চিরদিনের আরাম-নীড়!

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। জনের চমক ভাঙ্গিল। পরের ষ্টেশনে তাকে নামিতে হইবে। সেই চিরদিনের পরিচিত ছোট্ট ষ্টেশন…তারের বেড়ায় ঘেরা। সে বেড়ার গায়ে লতানে ফুলের গাছ। সেই ষ্টেশন-মাষ্টার…সেই টিকিট-ঘর। ষ্টেশনের ফটকের বাহিরে সেই মেটে পথ… গাছপালা ঝোপ্-ঝাপের মধ্য দিয়া গিয়া তার গৃহের দ্বার স্পর্শ করিয়াছে! বাবা নিশ্চয় ষ্টেশনে আসিবেন—তাঁর সেই বহু কালের পুরানো ফোর্ড গাড়ীখানিতে চড়িয়া এবং সেই গাড়ীতে বাপের পাশে বসিয়া ছ'মাইল পথ ভাঙ্গিয়া বাড়ী।

বাবা জমি চষেন। লোকজন আছে—তবু তাদের সঙ্গে নিজের হাতে বাপ করেন ক্ষেতের কাজ। মনে পড়িল, আট বৎসর আগেকার কথা। পল্লীর স্কুল ছাড়িয়া সহরে যেদিন প্রথম পড়িতে আসে। পণ করিয়াছিল, গ্রামে থাকিয়া চাষার কাজ জন কখনো করিবে না! লেখাপড়া শিখিয়া সহরে বড় চাকরি-বাকরি করিয়া মানুষের মতো মানুষ হইবে। চিরদিনের কামনা তাই! বাঁচার মতো মানুষ বাঁচে শুধু সহরে। পল্লীতে কি সুখে মানুষ বাঁচিবে!

বাল্যসখী স্যালির সঙ্গে যত কথা হইত। স্যালিও সহরে আসিয়াছিল কাজ করিতে। দু'জনে নিত্য দেখা হইত। এক সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া—নাচের আসরে যাওয়া—আনন্দের সীমা ছিল না! স্যালিকে জন বলিত,—এসো, আমরা বিয়ে করি। বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতি! এ কথায় স্যালি হাসিত, হাসিয়া বলিত—সবুর করো জন! এ কালের চাকরি ক'দিন টেঁকে, আগে ভাখো! যখন তোমার চাকরি পাকা হবে, তখন বিয়ে···বুঝ্‌লে! যেখানেই তখন থাকি, ডেকো, আসবো। বিয়ে হবে।

চার মাস আগে স্যালির চাকরি গিয়াছে! কারণ ঐ এক—অফিস চলে না! এত লোক তারা রাখিবে না!

স্যালি সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। বলিয়া গেছে—মনে রেখো—যেখানেই থাকো, তোমার চাকরি পাকা হলে তোমার কাছে আস্‌বো। তখন বিয়ে হবে—কেমন?

সব কথা জনের মনে পড়িতেছিল।

ভাগ্যে তখন বিবাহ করে নাই! করিলে আজ দুশ্চিন্তা বাড়িত। স্যালি ঠিক কথা বলিয়াছিল। জগতের রীতি স্যালি কি করিয়া জানিল?

জন তেমন পয়সা বাঁচাইতে পারে নাই! কেন বাঁচাইবে? এ দুর্দ্দিনের কল্পনা তার মনে জাগে নাই। জানিত, চাকরি মিলিয়াছে—নিষ্ঠা-ভরে কাজ করিতেছি—মাহিনা বাড়িবে—প্রোমোশন হইবে। যোগ্যতার জয় পৃথিবীতে চিরদিন!

কিন্তু···

সহসা একটা ধাক্কা দিয়া ট্রেণ থামিল। সে ধাক্কায় জনের চিন্তার সূত্র গেল ছিঁড়িয়া। চাহিয়া জন দেখে, তার গ্রামের ছোট্ট ষ্টেশনটিতে ট্রেণ থামিয়াছে।

আবার সেই গ্রাম। পরাজয়ের কালি মাখিয়া ক্ষতবিক্ষত মনে সকলের সামনে দাঁড়ানো! চকিতের জন্য মনে হইল, না, নামিব না। ট্রেণে বসিয়া থাকি···যত দূর ট্রেণ যায়, যাই!

কিন্তু নামিতে হইল। প্ল্যাটফর্ম্মে বাবা, মা···তার কামরার দিকে আসিতেছেন। তাঁদের মুখে হাসির রেখা!

জন ট্রেণ হইতে নামিল। দেখিল, মায়ের মাথার চুল সব পাকিয়া গিয়াছে। দেড় বছর সে বাড়ী আসে নাই; দেড় বছরে এমন পরিবর্ত্তন! বাবার মুখে অসংখ্য রেখা পড়িয়াছে···চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে! বাবা রীতিমত বুড়া হইয়া গিয়াছেন।

মা আসিয়া জনকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বাবা জনের হাত ধরিলেন, হাসিয়া বলিলেন—রোগা হয়ে গেছ!

মা বলিলেন—কেন রে? অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

জন বলিল—না!···

জন নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—চাকরি গেছে। অন্য জায়গায় ঢের ঘুরে চেষ্টা করলুম···কোথাও আর চাকরি মিললো না!

মা বলিলেন—না মিলুক! ঘরে বসে থাকলেও তোর অন্ন খায় কে, বাবা?

বাবা বলিলেন—ভেবেছিলুম, ছেলে আসছে—কত টাকা রোজগার করে আনছে; সেই টাকায় ওদিক্‌কার ঘরখানা পাকা করে ফেলবো!

মা বলিলেন—চাষে লক্ষ্মী!···ভয় কি! মান-ইজ্জৎ রেখে ক'পুরুষ চলে আসছে! ধার নেই, দেনা নেই···কোনো দুশ্চিন্তা নেই। তুই শুক্‌নো মুখে থাকিস্‌নে!

বাবা বলিলেন—তখন বলেছিলুম, লেখা-পড়া শিখেছো, চাষের কাজে সে বিদ্যা-বুদ্ধি খাটাও—অনেক উন্নতি হবে। শুনলে না···সহরে গেলে চাকরি করতে!···এখানে বাপ-বেটায় মিলে যদি ক্ষেতের কাজে লাগি, তাহলে ক্ষেতে ফশল ফলবে কি, সোনা ফলবে!···

মা বলিলেন—চাকরির সখ ছিল—মিটেছে তো! আর ওখানে নয়। ভগবান্ যা দেছেন, তাই নিয়ে থাকো।

সেই পাখী-ডাকা পল্লীর পথ। মোটর আসিয়া বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল!

পুরানো বাড়ী-ঘর। স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। ছুটো পাখী ডাকিতেছে···বন-ফুলের গন্ধ···রাজ্যের আরাম যেন এইখানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে!

লোক-জন আসিয়া গাড়ী হইতে মোট নামাইল।

পরিচিত ঘর। মায়ের হাতে সেলাই-করা টেবিলের ঢাকা। খাটে বিছানা পাতা। ওয়াড়গুলি মায়ের নিজের হাতে তৈরী···বিছানার চাদরের এক জায়গায় তালি···এ তালির কাজে কি সূক্ষ্মতা! আসবাব-পত্র সেই

চিরদিনের পুরানো। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার টাঙ্গাইতে গিয়া পেরেক বসে নাই ; সে পেরেক একটু নীচে ঠুকিয়া আঁটিয়া দিয়াছিল···ক্যালেণ্ডারের মাথায়-দেওয়ালের গায়ে বালি খসা সেই খোঁদলানো দাগ···টেবিলের উপরে ব্লটারে কালি-পড়ার সেই কালো ছোপ্! যেখানে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল, সেখানে আজো তাহা ঠিক তেমনি আছে···কোথাও এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই!

মনটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এ সব কি করিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জন দেখিল···চারিধারে চাহিল।

মা বলিলেন—বোস্···আমি খাবার আনি।

জন বলিল—বড্ড ক্লান্তি বোধ করছি মা। আমার ঘুম পাচ্ছে।

মা বলিলেন—একটু কিছু মুখে দিয়ে তাহলে ঘুমো!··· তার পরে কথাবার্ত্তা হবে'খন!

তাহাই হইল। সামান্য কিছু খাবার মুখে দিয়া জন বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া দিল।···

মাটীর গুণ···বাতাসের গুণ···জলের গুণ!···তার উপর স্নেহ! এ-সবের সংস্পর্শে মনের গ্লানি মুছিয়া গেল।

বাপের সঙ্গে ক্ষেতে বাহির হয়। মাটী চষে; আগাছা ছাঁটিয়া সাফ করে; ফশল কাটিয়া ঘরে তোলে।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মন কেবল বলে, এ কাজ যদি করিবি, তাহা হইলে এত বিদ্যা শিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজে বুদ্ধির কি কৌশল দেখাইবি? মনে মনে কল্পনার কানন রচিতেছিলি,—সে কানন যে শ্মশান হইয়া গেল! এ-কাজ পশুতেও করে! মানুষ হইয়া···

বেদনায় মন অমনি টনটন্ করিয়া ওঠে! জন ভাবে, মনের উপর নিত্য মাটীর তাল চাপাইয়া এভাবে মনকে হত্যা করিব? এখান হইতে সরিয়া পড়ি···মানুষের সভায় যাই! মানুষের সভায় গিয়া মানুষের মতো বাস করি!

এখানে মাঠে যায় গোরু—গোরু কাজ করে। সে-ও ঐ গোরুর সঙ্গে মিশিয়া গোরুর কাজ করিয়া গোরুর স্বজন হইয়া উঠিতেছে! মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে শুধু কি উদরটাকে পূর্ণ করিবার জন্য?

কিন্তু মানুষের সভায় গিয়া মানুষের সঙ্গেও তো মিশিয়াছিল! সেখানেও উদর-পূরণের জন্য যুদ্ধ চলিয়াছে! মানুষ বলিয়া কে কবে তাকে মানিয়াছে? সে সভায় কেহ তার পানে মানুষ বলিয়া ফিরিয়া চাহে নাই! সেখানে কি ভিড়! সে ভিড়ে হাজার-হাজার মানুষের মধ্যে সে-ও ছিল তাদের মতো একজন মানুষ! তবু সেখানে তার স্থান রহিল না! সে ভিড় তাকে বিদায় করিয়া দিল—প্রয়োজন নাই বলিয়া!

এখানে কেহ বিদায় দেয় না···দিবে না। এখানে সকলে বলে, তারো প্রয়োজন আছে! এই যে তার প্রয়োজনীয়তা···ইহাতে কি শান্তি···কি আরাম! সহরে উপেক্ষা-অবহেলা সহিবার পর এখানকার এ সমাদর···

তাছাড়া এখানকার কাজে দেহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সঁপিয়া দিলেও···এত কাজের মধ্যেও মন কত কি চিন্তা করে!

সেদিন নিজের হাতে বেড়া বাঁধিতে বাঁধিতে মনে হইল, সহরে মানুষের ভিড়ে বাস করিয়াও মনকে লইয়া কোনো-দিন ভুবন ভ্রমণ করিতে পারি নাই! সকালে নিত্য বসিয়া খপরের কাগজ খুলিয়া পড়িত,—পলিটিক্সের ধাপ্পা-বাজি, শত ফন্দী শত অভিসন্ধির রহস্য ছিল নখদর্পণে—সিনেমা-থিয়েটারের প্রলোভন-চাতুরীর মর্ম্ম মজ্জাগত ছিল! এত ছিল, তবু কল্পনার পাখায় ভর করিয়া মলিন মর্ত্ত্য ছাড়িয়া আকাশে উঠিবার সামর্থ্য মনের ছিল না!

এখানে সবুজ শ্যামল তৃণমঞ্জরী···নীল নির্ম্মল আকাশ···পাখীর কল-কাকলী···রৌদ্রে-মেঘে রামধনুর ছন্দ লীলা···

মলিন-মর্ত্ত্যে স্বপ্ন-মাধুরীর স্বর্গ-ছবি মানুষ যদি কোথাও দেখিতে পায় তো সে এইখানে! মনের উপর এখানে কোলাহল-কলরবের দামামা বাজে না···লক্ষ রকমের অকাজ মনকে এখানে পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দিতে পারে না!

সহরে অফিসের কাজ সারিয়া সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া মন মূর্চ্ছাতুর থাকিত। মনের সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে প্রয়োজন হইত তীব্র উত্তেজনা! তাই সিনেমায় ছুটিত···নাচের আসরে ছুটিত···অত্যুগ্র নেশায় মনকে সচেতন করিতে!

পল্লীর এই মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া আজ মনে হয়,

সিনেমার সে গৃহ, নাচের সে আসর লোকের নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঝাঁজিয়া থাকিত···দূষিত বাষ্প-গন্ধে মাথা ঝন্ঝন্ করিত! সেখানকার সেই হাসি-গল্প আলাপ-সখ্য নিতান্তই মুখের ব্যাপার···মনের সহিত সে-সবের কোথাও এতটুকু সংযোগ ছিল না!'

এখানে হাসি-গল্প প্রাণের মূল হইতে উৎসারিত হয়! বাতাস এখানে মধুময়! রৌদ্র মধুময়! নকল সাজ-পোষাকের জৌলুশে চোখে এখানে ধাঁধা লাগে না! জীবনের এমন সজীব রূপ সহরে দেখে নাই!

কিন্তু স্মালি? স্মালিকে খপর দিবে? কোথায় আছে স্মালি? লিখিবে—এসো আমার কাছে?

সন্ধ্যার সময় বাবা মা জন তিনজনে খাইতে বসিয়াছিল। খাইতে খাইতে কত কথা কত গল্প··· যে সব লোকজন ক্ষেতে কাজ করে, তাদের সুখ-দুঃখের সব কথা বাবা জানেন, মা জানেন। তারাও জানে, বাবা কি চান, মা কি চান···প্রাণে-মনে কোথাও গোপনতার নাম-গন্ধ এখানে নাই।

রাত্রি প্রায় নটা। বাবা বলিলেন—একবার স্মিথকে দেখে আসি। আজ কাজে আসেনি। শুনলুম, অসুখ করেছে।

বাবা চলিয়া গেলেন। ঘরে মা আর জন।

জন বলিল—তোমার একদণ্ড বিরাম মেলে না, মা। সারাক্ষণ সংসার আর ক্ষেত, ক্ষেত আর সংসার! কষ্ট হয় খুব?

মা বলিলেন—কিসের কষ্ট? না।

জন বলিল—জগতে কত কি ঘটছে। জানো, ছবির মানুষ কথা কয়···হাজার মাইল দূরে কে গান গাইছে গল্প বলছে, এখানে বসে যন্তর দিয়ে মানুষ শোনে তার গান, আর গল্প···জঙ্গল কেটে কত কত সহর তৈরী হয়েছে··· আকাশে এরোপ্লেন চলেছে···টেলিফোনে কোথাকার মানুষ কোথাকার মানুষের সঙ্গে কথা কইছে···সাহারার বুকে সহর বসেছে···এ-সবের কিছু ছাখোনি, কিছু শোনোনি! ইচ্ছা হয় না জানতে? দেখতে?···থিয়েটার? সিনেমা? সহর? দোকান? এরোপ্লেন?

মা বলিলেন—না। জানিস জন, লোকে বলে, জীবন নয়, যেন যুদ্ধ চলেছে! আমার কিন্তু কখনো তা মনে হয়নি। বিয়ে হয়ে এ সংসারে আসি, তখন আমার বয়স উনিশ বছর। ওঁর বয়স চব্বিশ। তার পর শুধু কাজ আর কাজ···কাজ নিয়ে দু'জনের দিন কাটছে। কোনোদিন মনে সেজন্য দুঃখ-কষ্ট হয় নি!

—কিন্তু জীবনের কিছুই তুমি ছাখোনি মা···

—কিছু মানে কি?

জন বলিল,—সহরে দেখেছি, মেয়েরা দলে দলে সিনেমায় চলেছে, নাচে চলেছে। নিত্য নতুন সখ···পার্টি, বল, ভোজ, ···একটা না একটা কিছু! রোজ চাই। না হলে মনে শান্তি মেলে না। তার উপর ভালো কাপড়, ভালো জামা, ভালো গয়না···

মা বলিলেন,—বুঝেছি! এখানে একবার এসেছিল রে তোদের ঐ কথা-কওয়া ছবি। ষ্টেশনের মাঠে তাঁবু ফেলে টিকিট বেচতো। পাঁচজনের কথায় এক দিন গিয়ে-ছিলুম দেখতে। ভালো লাগলো না, বাবা! জ্যান্ত মানুষের কথা শুনছি···ছবির মানুষের কথা আবার কি এমন শোনবার মতো! আমাদের ছোটবেলায় অমন কত তামাসা দেখেছি···দুটো ঘুঁটি বাটি-চাপা দিলে, তার পর বাটি তুলতে দুটো ডিম বেরুলো! এমনি ভেল্কি-বাজী, সাপখেলা, ভাল্লুক-নাচ। এ'ও তেমনি তামাসা···তেমনি ফক্কিকারী! ও দেখলে কি চতুর্ভুজ হবো, তা যেমন বুঝি না; তেমনি না দেখলে বাঁচা যাবে না কেন, তাও বুঝি না!···কাজ নিয়ে আমরা বেশ আছি। কারো কাছে ধার-দেনা নেই। স্বচ্ছন্দ মন, সুস্থ দেহ··· ছেলে মানুষ করেছি। এর বেশী কামনা মানুষের আর কি থাকতে পারে!···আমোদ-আহ্লাদ? ও সখ যত বাড়াবে, তত বাড়বে! সাধ করে কেন অশান্তি ডেকে আনি!··· আমি বুঝি, যখন বাঁচতে হবে, তখন স্বচ্ছন্দভাবে যাতে বাঁচতে পারি, তার উপায় করবো! যা সত্যি, তাই নিয়ে থাকবো! যা ছবি, ছায়া, মিথ্যা,—তার মায়ায় ভুললে চলবে কেন? আমি বুঝি, মা-বসুমতী সত্যি··· তাঁর বুক থেকে স্নেহের যে দান পাচ্ছি, তাতে মানুষের সব অভাব ঘোচে। লোভ করে পৃথিবী ছেড়ে আকাশের পানে তাকালে চাঁদ-সূয্যি-তারা কোনোদিনই পাবো না—শুধু হা-হুতাশ সার হবে! যে শান্তি হাতের

নাগালে, তা ছেড়ে নাগালের বাইরে মনকে কোনোদিন যেতে দিই নি।

জন একাগ্র মনে মায়ের কথা শুনিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া বলিল,—ধরো, তোমার যদি একটি মেয়ে থাকতো, সে-ও যদি এমনি তোমার মতো এই গ্রামে পড়ে থাকতো চির-জীবন···তাতে তোমার মন ব্যথায় আকুল হতো না ?

মা বলিলেন,—কেন হবে ? আমার জীবনে কোনো দিন ব্যথা পাই নি তো! বিয়ের পরেই তোকে পেলুম। কাজ বাড়লো। তোকে নাওয়ানো-খাওয়ানো,—তোর জামা-কাপড় তৈরী করা···তার পর স্কুলে গেলি। তুই স্কুলে যেতিস, আমি সংসার নিয়ে থাকতুম। গোরু বাছুর হাঁস মুর্গী দেখাশুনা—একটার পর একটা কাজ লেগে থাকতো। তার মধ্যে পরের ভালো দেখে নিজের মন্দ নিয়ে হা-হুতাশ করবো, সে সময় ছিল না! স্বামি-পুত্রের পরিচর্য্যা—তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখা—এর চেয়ে বড় কামনা আমার মনে কোনোদিন ঠাঁই পায় নি! আমার মন তাতে ভরে আছে। এর বেশী কিছু চাই নি। তোমাদের রেখে যেতে পারলেই এখন আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হবে, খুশী-মনে আমি যেতে পারবো।···যদি আবার জন্ম নি, ভগবানের কাছে কামনা জানাবো, যেন এই ঘর···এ-ঘরে এই স্বামী, এই সন্তান আবার পাই। চাই না আমি সহরে জন্মাতে, চাই না আমি সহরের মেয়েদের মতো সখ-সভ্যতা!···

মা চুপ করিলেন।

আকাশে মেঘ ডাকিল। মা বলিলেন,—বৃষ্টি আসবে, বুঝি। যাই, কাঠগুলো বাইরে পড়ে আছে—ঘরে তুলে রেখে আসি।

জন বলিল,—লোকজনদের বলো না···

মা বলিলেন,—সারাদিন খেটে তারা শুয়েছে বোধ হয়। নিজের যখন সামর্থ্য আছে, কেন তাদের কষ্ট দি!

মা চলিয়া গেলেন।

জন বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে মা কি করিয়া এমন পূর্ণ-সুখ, পূর্ণ আরাম পাইলেন? স্যালির কথা মনে পড়িল। স্যালিকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে স্যালি কি মায়ের মতো একদিন তার ষাট বৎসর বয়সে এমনি হাসি-মুখে বলিতে পারিবে, এখানকার এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে তার জীবন পরিপূর্ণ সার্থক হইয়াছে!

তা যদি পারে···

জন নিজে বুঝিয়াছে—ছুটাছুটিতে আরাম নাই, শুধু দুঃখ! মস্ত আশায়, মস্ত কল্পনায় পদে পদে আঘাত বাজে! তার চেয়ে হাতে যা পাওয়া যায়, তাহার সদ্ব্যবহার —তাহাতে অশান্তি-বিরোধের ভয় নাই!

ভাবিল, স্যালিকে চিঠি লিখি—স্যালি, আমার মাঁকে ও বাবাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি, সুখ-শান্তি বা আরাম পাইতে গেলে অনেক বেশী আয়োজনের প্রয়োজন নাই। যা আমাদের আছে, তাহা লইয়াই···

সে চিঠি লিখিতে বসিল। আকাশে-বাতাসে ঘরে-বাহিরে এই যে আরাম, শান্তি···তাহারি বর্ণনায় চার পাতা ভরাইয়া দিল।

বাবা আসিলেন, বলিলেন—স্মিথ ভালো আছে গো··· একটু জ্বর হয়েছিল। তা সামান্যই। বিকেল থেকে জ্বর আর নেই···

মা আসিলেন।

বাবা বলিলেন—কোথায় গেছলে?

মা বলিলেন,—কাঠগুলো তুলে রেখে এলুম।

বাবা বলিলেন,—বেশ করেছো। বৃষ্টি হবে, মনে হচ্ছে···

তারপর বাবা ডাকিলেন,—জন···

জন চাহিল। বাবা বলিলেন,—রাত হয়েছে। লেখা-পড়া রেখে শুয়ে পড়ো। কাজের পর বিশ্রাম চাই। নাহলে দেহ-মন ভালো থাকবে কেন?

শ্রীপৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়।
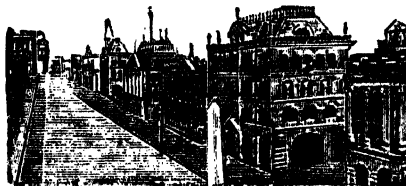
বৈষ্ণবমত-বিবেক

শ্রীবৃন্দাবনে রূপসনাতন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপ ইঁহারা দুই জনেই শিশুকাল হইতে শাস্ত্র-চর্চ্চায় ও শাস্ত্রাধ্যয়নে বিশেষ আগ্রহবান্ ছিলেন এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর ঐ দুই ব্যাপারে উৎসাহদান করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বৃত্তিদান করিতেন। শৈশব হইতেই সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি স্বপ্নে শ্রীভাগবত গ্রন্থ এক ব্রাহ্মণ তাঁহ'কে দান করিতেছেন, ইহা দেখিতে পান। প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়াই তিনি স্বপ্নদৃষ্ট ঐ ব্রাহ্মণের হস্তে শ্রীভাগবত প্রাপ্ত হইয়া উহা শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন মনে করিয়া প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অনুশিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার 'লঘুতোষণী' টীকার শেষভাগে পিতৃব্যগণের ও পিতার বংশাবলীর পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর কথা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতন-নামিনাম্॥
তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদন্যবিবক্ষয়া।
অথো তদজ্ঘ্রিজীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকর উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

"শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁর অতিশয় প্রীত॥
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।
শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর॥
স্বপ্ন-ভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।
প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা॥
পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত মহাহর্ষচিতে।
মগ্ন হৈলা প্রভু-প্রেমামৃত-সমুদ্রেতে॥
শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আস্বাদিল।
তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল॥"

—১ম তরঙ্গ।

আজন্ম ভাগবতসেবী শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মূল ভিত্তি এই শ্রীমদ্ভাগবতের হৃদয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলাময় শ্রীমদ্ দশম স্কন্ধের যে সুবৃহৎ টীকা বা টিপ্পনী রচনা করেন, তাহাই বৈষ্ণবতোষণী বা বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী নামে বিখ্যাত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর আদেশে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব ইহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিবার জন্য যে টীকা রচনা করেন, তাহা লঘুতোষণী নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীজীব নিজেও সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ নামে অনুপম সিদ্ধান্তপূর্ণ একটি টীকা রচনা করেন। এই টীকার প্রারম্ভে তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী টীকার* নাম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত তালিকায় শ্রীধর স্বামীর "ভাবার্থদীপিকা" ভিন্ন আরও ৭টি ভাষ্য ও টীকার নাম পাওয়া যায় যথা—১। শ্রীহনুমদ্ভাষ্য ২। বাসনাভাষ্য ৩। সম্বন্ধোক্তি ৪। বিদ্বৎকামধেনু ৫। তত্ত্বদীপিকা ৬। পরমহংসপ্রিয়া ও ৭। শুকহৃদয়। এতদ্ব্যতীত তিনি ১। মুক্তাফল ২। হরিলীলা ৩। ভক্তিরত্নাবলী এই তিনখানি নিবন্ধের নামও করিয়াছেন। নিবন্ধ তিনখানি বর্ত্তমানেও পাওয়া যায়—কিন্তু শ্রীধর স্বামীর "ভাবার্থদীপিকা" ব্যতীত অন্য যে ৭টি টীকার নাম শ্রীজীব করিয়াছেন, তাহা আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীজীব লঘুতোষণীর কোথাও কোথাও বাসনাভাষ্য হইতে প্রমাণের উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু

* যস্য সাক্ষাৎ শ্রীহনুমদ্ভাষ্য-বাসনাভাষ্য-সম্বন্ধোক্তি-বিদ্বৎকামধেনু-তত্ত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকা-পরমহংসপ্রিয়া-শুকহৃদয়াদয়ো ব্যাখ্যাগ্রন্থাস্তথামুক্তাফল-হরিলীলাভক্তিরত্নাবল্যাদয়ো নিবন্ধাশ্চ বিবিধা এব তত্তন্মতপ্রসিদ্ধমহানুভবকৃতা বিরাজন্তে।—শ্রীজীব গোস্বামীর টীকা।

অন্য টীকাগুলির কোনও অংশ শ্রীজীবের কোনও লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত অন্য চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্রামানুজ সম্প্রদায়ের শ্রীল সুদর্শন সুরিকৃত ১। শুকপক্ষীয়ং ও ঐ সম্প্রদায়ের বীর রাঘবাচার্য্যকৃত ২। ভাগবতচন্দ্রিকা, শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থকৃত ৩। পদরত্নাবলী, শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীল শুকদেবকৃত ৪। সিদ্ধান্তপ্রদীপ ও শ্রীমদ্বল্লভ সম্প্রদায়ের শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যকৃত ৫। সুবোধিনী এই টীকা কয়েকখানি স্ব স্ব সম্প্রদায়ে সমাদৃত। এতদ্ব্যতীত দশমস্কন্ধের রাসপঞ্চাধ্যায়ের বহু টীকা বিদ্যমান। তন্মধ্যে রামনারায়ণকৃত ও কিশোরদাসকৃত দুইটি টীকা ব্যতীত অদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীও দশমস্কন্ধের টীকা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতেরই টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের একটি টীকা পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, মধুসূদন মাত্র রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শ্রীমচ্চৈতন্যদেবের অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঁচটি টীকা প্রণীত হয়। উহার মধ্যে শ্রীপাদ সনাতনের বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকাই সর্ব্বপ্রধান। তৎপরে শ্রীনাথ পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্যমত-মঞ্জুষা। অতঃপর ৩। শ্রীজীব গোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ৪। সারার্থদর্শিনী এবং শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের ৫। বৈষ্ণবানন্দিনী। এস্থলে আমরা শ্রীজীবের লঘুতোষণীর আর স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিলাম না; কারণ, উহা বৃহত্তোষণীর মর্ম্মার্থ লইয়া শ্রীপাদ সনাতনের আদেশে বিলিখিত বলিয়া উহাকে বৃহত্তোষণীরই অন্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এই টীকাগুলির মধ্যে শ্রীমচ্চৈতন্যদেবের সাক্ষাদাদেশবলেই শ্রীল সনাতনের "তোষণী" টীকা রচিত হয়। এই টীকাখানি একদিনে রচিত হয় নাই। ১৪৭৬ শকে এই টীকাখানি সমাপ্ত হইয়াছিল। বোধ হয়, ইহার পর সনাতন গোস্বামী আর কোনও গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু এই টীকাখানি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমগ্র জীবনের সাধনার ফল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে—সম্ভবতঃ কৈশোর কাল হইতেই ঐকান্তিক ভাবে যে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে তিনি তাঁহারই উপদিষ্ট সিদ্ধান্তনিচয়ে এই টীকাখানি সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীল সনাতন ইহার লেখক, তথাপি শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়াই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই টীকাখানি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই টীকারচনায় তাঁহার কোনও স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া তিনি কোথাও স্বীকার করেন নাই। বরং তিনি টীকার প্রারম্ভে স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ বলেই এই টীকা প্রণয়ন করিতেছেন।* শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপাদ সনাতনকে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচারের সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখা যায়। যথা—

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবত-সিদ্ধান্ত গূঢ় সকল কহিল॥
হরিবংশে করিয়াছে গোলোকের স্থিতি।
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥
মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার আর যত বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥
মহিষী হরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন কৈল দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইল এই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন তুচ্ছ, এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥

* শ্রীমচ্চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ গুণবতোঽখিলম্।
ভূয়াদিদং যদাদেশবলেনৈব বিলিখ্যতে॥
অর্থাৎ—নিখিল সদ্গুণের আধার শ্রীমচ্চৈতন্যরূপী শ্রীভগবানের আদেশেই এই টীকা লিখিত হইল; অতএব ইহা দ্বারা তিনি প্রীত হউন।

"মুক্তি যে শিক্ষালুঁ তোরে স্ফুরুক্ সকল।"
এই তোমার বর হইতে হবে মোর বল ॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল—"এই সব স্ফুরুক্ তোমারে ॥"

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ২৩

মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই সকল সিদ্ধান্ত সনাতন গোস্বামী তাঁহার দশমের টীকা বৈষ্ণবতোষণীতে সুবিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব, অলৌকিকত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের এই সর্ব্বোৎকর্ষত্ব ইহার পূর্ব্বে আর কোন টীকায় প্রমাণ হয় নাই। এই স্থলে আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীরূপ গোস্বামীর বিবৃত শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সঙ্গত মনে করি। সাধারণ স্মার্ত্তমতে শ্রীকৃষ্ণ মৎস্য-কূর্ম্মাদির ন্যায় নারায়ণের অংশাবতার কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অন্যান্য অবতারের কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

অর্থাৎ মৎস্য-কূর্ম্ম বরাহ-নৃসিংহ-রামাদি অবতার সেই পরম-পুরুষের অংশ ও কলা—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিতেছেন—"ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্তু ভগবান্ এষ এব পুরুষস্যাবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণে ধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিধ্যতি ন তু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বম্। এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্ ন তু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া ন তু ভগবত্তা-ধ্যাসেনেত্যর্থঃ।" শ্রীভাগবতে ১।৩।২৮ শ্লোকটীকায়াং। অর্থাৎ—শ্রীভাগবতের এই অধ্যায়ে অবতারসংখ্যা-কথনে বিংশতিতম অবতাররূপে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ অর্থাৎ ইনিই পুরুষ যাঁহার অবতার—সেই অবতার ভগবান্।" 'অনুবাদ' না বলিয়া—'বিধেয়ের' উল্লেখ করিবে না"—এই ন্যায় অনুসারে শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্ত্বলক্ষণরূপ ধর্ম্ম সাধিত হয় কিন্তু ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ-ধর্ম্ম সাধিত হয় না। অজ্ঞাত বস্তুকে 'বিধেয়' এবং জ্ঞাত বস্তুকে অনুবাদ কহে।* অতএব শ্রীকৃষ্ণ শব্দ অনুবাদ এবং ভগবত্ত্ব তাঁহার বিধেয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্বলক্ষণ-রূপের ধর্ম্মিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তিনিই যে মূল ইহা সিদ্ধ হইল, মূল হইতে যে তাঁহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা কোনও প্রকারে সিদ্ধ হইল না। "স্বয়ং" এই কথার দ্বারা তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব ভগবানের প্রাদুর্ভাব বশতঃ অথবা ভগবত্তার অধ্যাসের দ্বারা তাঁহার ভগবত্ব নহে, তিনি স্বয়ংই ভগবান্।"

শ্রীকৃষ্ণের এই মহিমা শ্রীভাগবতের মর্ম্ম। শ্রীল ভাগবত-মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাসম্মত এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। শ্রীল সনাতন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে এই তত্ত্ব খ্যাপন করেন এবং স্বয়ং ভগবানের লীলাকথার আকর শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের অতি বিস্তৃত এবং অপূর্ব্ব টীকা প্রণয়ন করেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া শ্রীরূপ শ্রীললিতমাধব ও শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকদ্বয়ে এবং শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও তাঁহার অলৌকিক লীলার বর্ণনা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া যান। অনুপম-প্রতিভাশালী শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এই তত্ত্ব আরও দার্শনিকভাবে আলোচনা করিয়া সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সুগম করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া নিখিল শক্তির আশ্রয় সর্ব্বাবতারের অবতারী সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীল সনাতন গোস্বামীই দশমের টীকা

*এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীজীব গোস্বামীর অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন, "অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥ 'বিধেয়' কহিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে—যেই হয় জ্ঞাত ॥ যৈছে কহি—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥ বিপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥ তৈছে ইহাঁ অবতার সব হৈল জ্ঞাত। কার অবতার? এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥ 'এতে' শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ। 'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয় সংবাদ। তৈছে কৃষ্ণ অবতার—ভিতরে হৈল জ্ঞাত। তাহার বিশেষ জ্ঞান—সেই অবিজ্ঞাত ॥ অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দে আগে অনুবাদ। 'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয়-সংবাদ ॥ কৃষ্ণের 'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য। স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥ কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ। তবে বিপরীত হৈত সূত্রের বচন ॥"

—শ্রীচৈঃ চঃ আদি। ২য় পঃ।

"বৈষ্ণবতোষণী"তে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকনৈপুণ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন।

এই টীকায় শ্রীপাদ সনাতনের বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান না করিলে শ্রীল সনাতনের জীবনকথার অঙ্গহানি ঘটে বলিয়াই মনে হইতেছে, এই জন্য অতি সংক্ষেপে শ্রীপাদ সনাতনের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে মাধুর্য্যকেই ভগবত্তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সর্ব্বশক্তিময় শ্রীভগবান্ ভক্তির বশ। এই ভক্তিরই চরমোৎকর্ষ প্রেম। প্রাকৃত জগতের জনগণের বোধসৌকর্য্যার্থ এই প্রেমের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গগণের যে সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা প্রধানতঃ চারিভাবে বিভক্ত। এই চারিটি ভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাব। শ্রীভগবানে নিরুপাধিভক্তিসম্পন্ন সেবকগণের তদ্দাস্যই সাধারণ অবলম্বন। শাস্ত্রাদিতে এই জন্যই জীবকে শ্রীভগবানের দাস বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানে এতদপেক্ষা অধিক প্রীতিময় সম্বন্ধ—সখ্য, ব্রজলীলায় শ্রীদাম সুদাম সুবলাদি রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণের সখারূপে তাঁহার সহিত সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সঙ্কোচহান বিশ্রম্ভময় এই সম্বন্ধবন্ধনে শ্রীভগবানেরও অতিশয় সন্তুষ্টি জন্মিয়া থাকে। এতদপেক্ষা গভীর প্রেমময় বাৎসল্যভাব ও চমৎকারিত্বের আতিশয্যময়। শ্রীবৃন্দাবনে যশোদার বাৎসল্যভাব আদর্শে অদ্বিতীয়। প্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব মধুর বা কান্তাভাবে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। এই কান্তাভাব আবার দ্বিবিধ—স্বকীয়া ও পরকীয়া। এই পরকীয়াভাবের লীলা শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আনন্দময়ী স্বকীয়া শক্তিগণের সহিত একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন-লীলায়ই হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশুদ্ধা-প্রীতিময়ী লীলাস্থলী হিসাবে ব্রজভূমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গশক্তি যোগমায়াদেবী এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলাব্যাপারের কর্ত্রী। অঘটনঘটনপটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবেই কান্তা-ভাবময়ী পরমান্তরঙ্গশক্তিগণ পরমস্বকীয়া হইলেও রসোৎকর্ষের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের পরকীয়া অভিমান ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই অলৌকিক ভাব একমাত্র ব্রজভূমিতেই সম্ভব। যথা—শ্রীচরিতামৃতে—

"পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা তাহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের যে অনাবৃত লীলা-মাধুর্য্য তাহার সন্ধান সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীভাগবতে পরমহংস-চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সনাতন এই শ্রীভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় লীলা শ্রীভাগবতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রসাদে অবগত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করেন। পুরাণাদির বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীবসুদেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীদেবকীদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইয়া নন্দভবনে অচেতনা যশোদা দেবীর ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাটিকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান মনে করিয়া এই কন্যাটির বিনাশবাসনায় তাঁহাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করেন। এই কন্যাটি যশোদা-গর্ভসম্ভবা এবং শ্রীকৃষ্ণ দেবকীগর্ভসম্ভূত। কিন্তু শ্রীভাগবতের বহু স্থানেই ইঙ্গিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন এবং যশোদা-গর্ভজাত। শ্রীপাদ সনাতনই অন্যান্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণজন্ম সম্বন্ধে শ্রীভাগবতের এই গূঢ়োক্তির রহস্য প্রকাশ করেন।

শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই আছে—

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ॥ ১।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা॥"

অর্থাৎ—শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন—হে রাজন্! আত্মজ উৎপন্ন হইলে উদারচিত্ত শ্রীনন্দ মহাশয় পরমানন্দিত হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া স্নানানন্তর শুচি ও অলঙ্কৃত হইলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন পাঠ করাইয়া বিধিপূর্ব্বক আত্মজের জাতকর্ম্ম, পিতৃলোকের ও দেবলোকের অর্চ্চনা করাইলেন॥ ১-২।

এই দুইটি শ্লোকে "আত্মজ" শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি অপরের পুত্র হন, তবে এই 'আত্মজ' শব্দের প্রয়োগ যথার্থ হয় না। শ্রীসনাতন বলিতেছেন—

"শ্রীবসুদেবগৃহে শ্রীভগবানেক এব জাতঃ, শ্রীনন্দগৃহে তু মায়য়া সহেতি। পরমরহস্যত্বাত্তৎপ্রসঙ্গঃ পূর্ব্বং নোদিষ্টঃ। তত্র তু শ্রীবসুদেবেন মায়াপরিবর্ত্তেন বিন্যস্তঃ পুত্রঃ শ্রীনন্দাত্মজেনৈবৈক্যং প্রাপ্ত ইতি মুখ্যয়ৈব বৃত্ত্যা তদাত্মজত্বং ঘটত ইতি। অতএব ব্রহ্মণাপি বক্ষ্যতে পশুপাঙ্গজায়েতি। অতএব রুদ্রযামলে—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

অর্থাৎ—শ্রীল বসুদেবের গৃহে শ্রীভগবান্ একাকীই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনন্দগৃহে তিনি অনুজা মায়াদেবীর সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয় হওয়ায় ইহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। নন্দালয়ে শ্রীবসুদেব যে পুত্রটি রাখিয়া আসেন, তিনিই শ্রীনন্দাত্মজের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে আত্মজ শব্দের মুখ্যা বৃত্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নন্দাত্মজত্ব ঘটিতেছে। এই জন্যই এই স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিবার জন্য "পশুপাঙ্গজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই জন্যই 'রুদ্রযামলে' দেখিতে পাওয়া যায়—

"যদুবংশে জাত কৃষ্ণ অন্য; যিনি গোপরাজ নন্দের নন্দন তিনি শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও গমন করেন না।"

এই রহস্য শ্রীপাদ সনাতন প্রকাশ করিবার পর শ্রীরূপাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষণ করিয়াছেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—মথুরার এবং দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ তাঁহা হইতে অভিন্ন হইয়াও তাঁহার অংশ। কারণ, তাঁহাতেই সর্ব্বপ্রকার লীলামাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীব্রজভূমিতে যে সকল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাও মাধুর্য্যের অনুগতরূপে প্রকাশিত এবং কোথাও কোথাও মাধুর্য্যের পরিপুষ্টির জন্য সান্দ্রানন্দময়ী লীলাশক্তিরূপিণী শ্রীযোগমায়া কর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আর একটি সিদ্ধান্তবৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীশ্রীভগবান্ পরতত্ত্বের একটি পরম বিশেষ প্রকাশ। তাঁহার অন্তর্য্যামিত্ব এবং ব্রহ্মভাব এই তত্ত্বের অন্তর্গত। শ্রীল সনাতনের "বৈষ্ণবতোষিণী"তেই সর্ব্বপ্রথমে এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মস্তুতির ব্যাখ্যায় এই তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মার ব্রহ্মতত্ত্বের এবং অন্তর্য্যামিতত্ত্বের প্রাপ্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মহিমার পরমোৎকর্ষ দেখিয়া তিনি ভগবানের অন্যান্য অবতারের—এমন কি পুরদ্বয়ে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অপেক্ষা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ভক্তিরও বিজয়ভেরী নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীরাসলীলা শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিতে বর্ণিত থাকিলেও বর্ণনার গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে এবং তত্ত্বের বিন্যাসে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিতব্য বিষয়গুলির মধ্যে এই শ্রীরাসলীলাকেই মুখ্যতম বলিয়া ভক্তগণ মনে করিয়া থাকেন। এই রাসলীলা সর্ব্বসাধারণের আলোচ্য নহে; এই জন্যই শ্রীসনাতন শ্রীরাসলীলার ব্যাখ্যার উপক্রমেই বলিতেছেন, "শ্রীযুক্ত বাদারায়ণিরুবাচেতি,—বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাদ্ভগবান্ শ্রীব্যাসো বাদরায়ণঃ তস্য তপঃফলরূপঃ পুত্র ইতি সর্ব্বজ্ঞত্ব-শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদিকং ধ্বনিতং, তেনোক্তস্যাদস্যাখ্যানস্য সর্ব্বথা যথা সাধনসাধ্যত্বং প্রৌঢ়ানুরাগমত্ত্বং চাভিপ্রেতং ততো ভক্ত্যৈতচ্ছ্রোতব্যমিতিভাবঃ।"

শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায় হইতে ৫টি অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথমেই —"শ্রীবাদরায়ণি বলিলেন"—এই বলিয়া কথা আরম্ভ করা হইয়াছে। পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব শ্রীভাগবতের বক্তা। ইনি শ্রীভগবানের আবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের পুত্র, ভগবান্ ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে মহাতপস্যার আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বাদরায়ণ, তাঁহার সেই তপস্যার ফলস্বরূপ এই পুত্র লাভ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম বাদরায়ণি। তাঁহার তপস্যার ফলস্বরূপ এই পুত্রে সর্ব্বজ্ঞত্ব, শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্ব ইত্যাদির অবস্থান এই বাদরায়ণ শব্দের দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার কথিত আখ্যানে সর্ব্বতোভাবে সাধনের দ্বারা সাধ্য এবং বিষয়ে অতিবর্দ্ধিত অনুরাগই অভিপ্রেত। অতএব ভক্তিসহকারে তাহা শ্রোতব্য, ইহাই "বাদরায়ণি কহিলেন" এই বাক্যটির মূলগত ভাব।"

ইহা দ্বারা বুঝা গেল, শ্রীভগবানে বিশেষ ভক্তিলাভ না করিলে এবং বিশেষতঃ শাস্ত্রে ও শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট শ্রীভগবানে বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকিলে প্রাকৃত বিচারশীল ব্যক্তির রাসলীলা

শ্রবণ করা উচিত নহে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাঁহাকে সর্ব্বাবতারের মূল অবতারী স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন—যিনি অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির অধিকারী, তাঁহার পরমান্তরঙ্গ শক্তিগণের সহিত তাঁহার অতিলৌকিক লীলার কথাকে যাঁহারা প্রকৃতভাবে আলোচনা করিতে চান, তাঁহারা নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশেরই কারণ হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ সনাতন ভক্ত ভিন্ন অপরকে রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

পরমভক্ত বিজ্ঞতম পণ্ডিত সনাতন রাসলীলায় যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের, রসচাতুর্য্যের ও সম্যগ্‌দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণের ও বিচারের চেষ্টাও দুঃসাধ্য। অতএব আমরা সে চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিলাম, তবে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্, যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী, যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণভজনে আগ্রহবান্, তাঁহারা শ্রীপাদ সনাতনের সমগ্র দশমস্কন্ধের টীকাটি যদি ক্রমানুসারে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তবে তাঁহারা ভাগবতার্থজ্ঞানে কৃতার্থ হইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বিশেষতঃ শ্রীপাদ সনাতন সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়া রাসপঞ্চাধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকের প্রত্যেক শব্দটির—এমন কি—'চ' 'বৈ' 'তু' 'হি' প্রমুখ অব্যয়ের প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন এমন সুবিচারপূর্ণ ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে মস্তক নত হইয়া পড়ে এবং মনে হয় যে, ইঁহারা যে বাঙ্গালী জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখনও কি বাঙ্গালা দেশে সেই বাঙ্গালীর বংশধরগণই বিরাজ করিতেছে?

শ্রীপাদ সনাতন রাসলীলা শেষ করিয়া বলিতেছেন—

ক্রীড়তা বহিরন্তশ্চ জনোঽয়ং যেন নর্ত্ত্যতে।
তস্য চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতোঽস্ত্বিদম্॥

অর্থাৎ "যিনি মানবগণের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া তাঁহাদিগকে নাচাইতেছেন, এই ব্যাখ্যা দ্বারা সেই চৈতন্যরূপী হরির প্রীতি সাধিত হউক।"

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

ধনী

ট্রামে যেতে পথে দেখি দেওয়ালের গায়ে
বিজ্ঞাপন এঁটে দেছে। বৃহৎ অক্ষরে
লেখা তাতে এক প্রশ্ন,—"ধনী বলো যারে,
কোন্ ধনে ধনী সে গো?"
হাসি রঙ্গ-ভরে!
সিনেমা-কোম্পানি কোনো হেঁয়ালির ভাষে
দর্শকে বাঁধিতে চায় কৌতূহল পাশে!

ট্রাম চলে। ঐ প্রশ্ন ঘূর্ণীচক্রছলে
সারা মন ছেয়ে বাড়ে বিরাট-প্রসারে;
কোন্ ধনে ধনী, সত্য, মানুষ হেথায়?
ব্যাঙ্কে মোটা-তহবিলে? বড় কারবারে?
সোনা-মণি-জহরতে? চেকের বহরে?
দাস-দাসী? সোফা-কোচ? বাগানে-মোটরে?

টাকার সামর্থ্য খুব—শক্তিধর টাকা!
হাঁদা-গাধা তার জোরে চড়ে' বসে শিরে;
তালুক-মুলুক হেথা যার যত বেশী—
দুনিয়ার স্তব-স্তুতি ঝরে তারে ঘিরে!
মূর্খ হোক্, দুষ্ট হোক্, দুর্ব্বৃত্ত সে হোক্—
তারি পায়ে নতি দেয় দুনিয়ার লোক!

টাকা আর জমি-জমা—এ শুধু সম্পদ্?
বন্ধু-প্রতিবেশী? মান, ইজ্জৎ, সম্ভ্রম?
মনের আনন্দ-প্রীতি? স্নেহ মায়া-দয়া?
গান, সুর, চিত্র, গল্প, কল্পনা-বিভ্রম—
এ-সবের দাম নাই? সম্পদ্ এ নয়?
বিশ্বে দেখি এ-সবের অনন্ত-বিজয়!

টাকা-কড়ি, কারবার জলবিম্ব সম—
আজ আছে, কাল নাই—চকিতে মিলায়!
সুরে-গানে স্নেহে যার মন রসে না কো,
বিশ্বের মাধুরী যে-বা বুঝিল না, হায়,
টাকাকড়ি-কারবার গেলে, তার মতো
এ বিশ্বে দেখি না কারে নিঃস্ব, ভাগ্যহত!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া

ফ্রাঙ্কো সরকারের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার—

বৃটেন্ ও ফ্রান্স স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের সহিত কূটনীতিক সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া জেনারল ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্টের

জেনারল ফ্রাঙ্কো

সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৃটেন্ ও ফ্রান্সের যুক্তি এই যে, বার্সিলোনা নগর ও ক্যাটালোনিয়া প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের অধিকারভুক্ত হইবার পর বস্তুত: তাহারাই স্পেনের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছে; গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট এখন যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত; দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই এখন জেনারল ফ্রাঙ্কোর সমর্থক; গণতান্ত্রিক দলের নেতৃবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধতা সমুপস্থিত; বিশেষতঃ তেরটি রাষ্ট্র ইতোমধ্যে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পক্ষে জেনারল ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্টকে অস্বীকার করিয়া চলা শুধু নিরর্থক নহে, ইহার ফলে স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টকে অহেতুক ধনপ্রাণনাশে উৎসাহিত করা হইবে।

বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে প্রদর্শিত এই সকল যুক্তি পূর্ণসত্য নহে। বার্সিলোনা এবং ক্যাটালোনিয়া প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় সরকার পক্ষ সমরোপকরণ উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু ইহার ফলে, তাঁহারা জেনারল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করিবার সকল শক্তিই হারাইয়াছেন, এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। সরকার পক্ষে এখনও সুসজ্জিত পাঁচ লক্ষ সৈন্য আছে। জেনারল ফ্রাঙ্কো যদি জার্ম্মাণী ও ইটালীর সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এখনও সরকার-পক্ষকে পরাভূত করা সম্ভব হইবে কি না, সন্দেহ। স্পেনের তিন-চতুর্থাংশ স্থান বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইলেও স্পেনের অধিকাংশ অধিবাসীই যে জেনারল ফ্রাঙ্কোর সমর্থক, ইহা বিশ্বাস করা দুষ্কর। আজ আড়াই বৎসর কাল ধরিয়া যাহারা অগণিত নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও পঙ্গুকে নির্ম্মম-হস্তে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে, অসংখ্য সুরম্য জনপদ যাহারা শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, যাহাদের বর্ব্বরতায় সহস্র সহস্র নরনারী গৃহহারা, স্বজনহারা, পথের ভিখারী হইয়াছে,—আজ স্পেনের অধিকাংশ অধিবাসী তাহাদের সমর্থক, এই কথা বিশ্বাস করা সহজ নহে। পশুশক্তির দ্বারা মানুষের দেহকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু তাহার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করা কখনও সম্ভব নহে। জেনারল ফ্রাঙ্কোর সৈন্য বার্সিলোনায় প্রবেশের পর তাহাদিগকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে • বলিয়া য়ুরোপের কতকগুলি সংবাদপত্র যে

মিঃ চেম্বারলেনের ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন

প্রেসিডেণ্ট আজানা

প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে, তাহার সত্যতায় সন্দেহ হয়। দুই দিন পূর্ব্বে জেনারল ফ্রাঙ্কোর যে দানবীয় সেনা-বাহিনী বার্সিলোনাবাসীর আতঙ্কস্বরূপ ছিল, দুই দিন পরে তাহারা বার্সিলোনাবাসীর ত্রাণকর্ত্তা বিবেচিত হইল, ইহা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য। বৃটিশ-প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় জেনারল ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করিয়া না লইলে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টকে অহেতুক ধন-প্রাণনাশে উৎসাহ দেওয়া হইবে। এই উক্তি মিঃ চেম্বারলেনের ন্যায় ভোঁতা রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভব। স্পেনের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে বে সামরিক অধিবাসীর ধন-প্রাণনাশের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী কে? এই আড়াই বৎসর কাল ধরিয়া স্পেনের প্রায় প্রত্যেকটি নগরের বে-সামরিক অধিবাসীর উপর নির্ম্মম ভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছে ফ্রাঙ্কোর পক্ষের ইটালীয় বিমান; পলাতক নগরবাসীর উপর মেসিনগান চালাইয়াছে ফ্রাঙ্কোর সৈন্য; বে-সামরিক অধিবাসীর উপর হিংস্র মূর সৈ...দিগকে লেলাইয়া দিয়াছে জেনারল ফ্রাঙ্কো। পক্ষান্তরে সরকার পক্ষ কখনও ফ্রাঙ্কোর অধিকৃত অঞ্চলের বে-সামরিক অধিবাসীর উপর কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। এক সময়ে তাহারা প্রতিশোধমূলকভাবে এক স্থানে বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই তাহারা আপনাদিগের

মঃ ব্লুম

মঃ দালাদিয়ার

ভ্রান্তি উপলব্ধি করে, এবং প্রতিশোধমূলক কার্য্য হইতে বিরত হয়। যদি মিঃ চেম্বারলেনের কথাই সত্য হয়, তাহা হইলেও প্রশ্ন কর
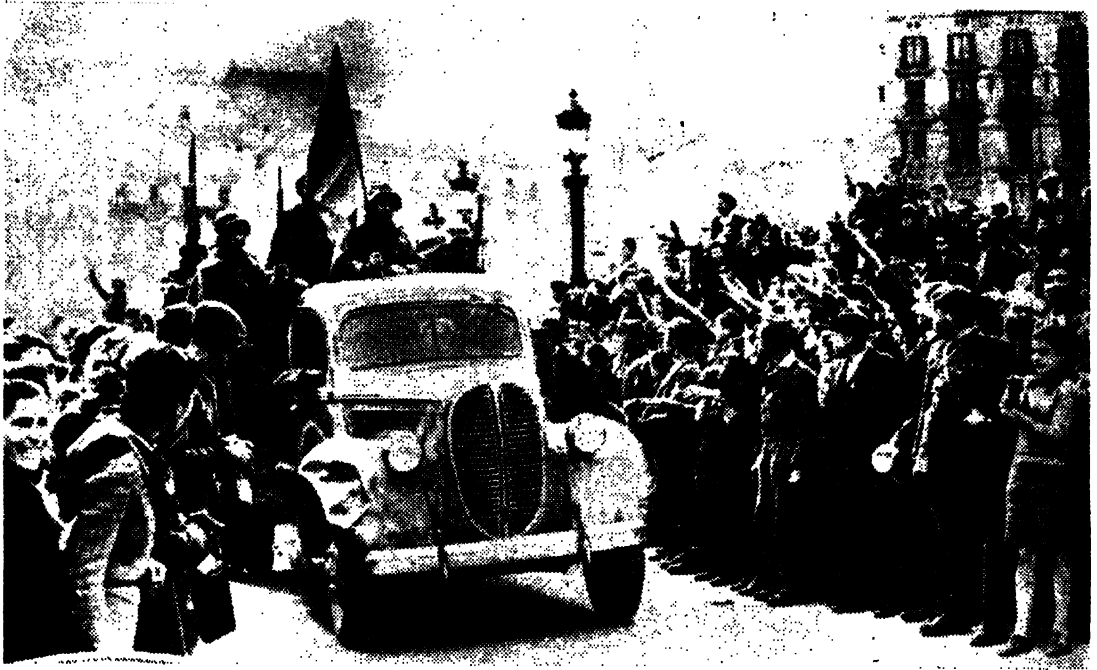
বার্সিলোনা-বিজয়ী দলকে বার্সিলোনায় ফ্রাঙ্কোর পক্ষপাতী অধিবাসিগণের অভিবাদন

বার্সিলোনায় ফ্রাঙ্কোর চিত্রসহ বিজয়ী সৈন্যগণের শোভাযাত্রা

যাইতে পারে যে, জেনারল ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করিয়াই কি তিনি ও তাঁহার সহযোগী মঃ দালাদিয়ার স্পেনের রক্তপাত নিবারণ করিতে চাহিয়াছেন? সরকার-পক্ষ ত তখনও প্রাণপণ শক্তিতে বিদ্রোহীদিগকে প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর। অবশ্য দালাদিয়ার মন্ত্রিসভার বিশ্বাসঘাতকার ফলে স্পেনের জাতীয় ধনভাণ্ডার জেনারল ফ্রাঙ্কোর হস্তগত হওয়ায় সরকার পক্ষের দুষ্পূরণীয় অর্থনীতিক ক্ষতি হইয়াছে। বার্সিলোনা-পতনের সময় এই ধনভাণ্ডার ফ্রান্সে স্থানান্তরিত করিয়া গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট কি ভুলই না করিয়াছেন? গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে মতবিরোধের কথাও অতিরঞ্জিত। প্রেসিডেণ্ট আজানার পদত্যাগের পর গণতান্ত্রিক দলে মতদ্বৈধতার সম্পূর্ণ অবসান হইয়াছে। পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় "ফাঁসী দিবার পূর্ব্বে অপবাদ" দেওয়াই কি সাম্রাজ্যবাদীদিগের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য?

স্পেনের অন্তর্বিপ্লব এবং তাহার সংশ্লিষ্ট আড়াই বৎসর-ব্যাপী ঘটনাবলীর সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইবেন না।

তাঁহারা জানেন যে, "নিরপেক্ষতা" নামক সাম্রাজ্যবাদীদিগের চক্রান্তের ফলে স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয়ের বৈধ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন; পক্ষান্তরে তথাকথিত নিরপেক্ষতা চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জার্ম্মাণী ও ইটালী নিয়মিতভাবে জেনারল ফ্রাঙ্কোকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করিয়া আসিয়াছে। বৈধ গভর্ণমেণ্টের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াও স্পেনের সরকার পক্ষ আজ আড়াই বৎসর কাল অসমসাহসিকতার সহিত বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন; আজও স্পেনের এক-চতুর্থাংশ তাঁহাদিগের অধিকার-ভুক্ত। সাম্রাজ্যবাদীদিগের হীন ষড়যন্ত্রের ফলে স্পেনের সরকার-পক্ষ যদি তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত না হইতেন এবং ইটালী ও জার্ম্মাণী যদি প্রকাশ্যে জেনারল ফ্রাঙ্কোর পক্ষাবলম্বনে সাহসী না হইত, তাহা হইলে স্পেনের বিদ্রোহ তিন মাসের মধ্যেই দমিত হইত, য়ুরোপের অদূর অতীতের ইতিহাসও আজ অন্যভাবে লিখিত হইত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মঃ দালাদিয়ার ও মিঃ চেম্বারলেন তাহা চাহেন নাই। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের চেষ্টাতেই আজ স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের ধ্বংস হইতেছে।

বার্সিলোনার পতনের সংবাদে উৎফুল্ল মুসোলিনির পিয়াজা ভিনিসিয়ার অলিন্দে দাঁড়াইয়া বক্তৃতাদান

বৃটেনের অভিসন্ধি সিদ্ধ—

গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্পেনে এবং জুন মাসে ফ্রান্সে "পপুলার ফ্রণ্ট" (সম্মিলিত বামপন্থী দলের) গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন তাহারই প্রতিবেশী ফ্রান্সে এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বাররক্ষী স্পেনে সাম্রাজ্যবাদী-বিরোধীদিগের এই প্রভাব সুনজরে দেখে না। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্পেনে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে বৃটিশ-সরকারের চাপে ফ্রান্সের ব্লুম-মন্ত্রিসভা "নিরপেক্ষতা" এবং স্পেন-সরকারের নিকট অস্ত্রবিক্রয় বন্ধের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বাধ্য হন। এই সময় প্যারীস্থিত বৃটিশ প্রতিনিধি সার জর্জ্জ ক্লার্ক ফ্রান্সের "পপুলার ফ্রণ্ট" গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে ভীতিপ্রদর্শন করেন যে, ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত না হইলে স্পেন সম্পর্কে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর বিরোধে বৃটেন্ কখনও ফ্রান্সকে সমর্থন করিবে না। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ ব্লুম বৃটেনের এই হুমকিতে ভীত হন নাই। তিনি জানিতেন যে, তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত সামর্থ্য জার্ম্মাণীর ছিল না। আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছিল—তাঁহার "স্বগৃহে"; মঃ দেলবো, মঃ যতে এবং মঃ দালাদিয়ার—রেডিক্যাল দলের এই তিন জন মন্ত্রী জানাইলেন যে, স্পেন সম্পর্কে বৃটেনের ইচ্ছা অনুসারে না চলিলে তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন। এইভাবে "পপুলার ফ্রণ্ট" গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে মঃ ব্লুম বৃটেনের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে স্পেনের সরকার পক্ষ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত। এই তথাকথিত নিরপেক্ষতার জন্যই স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের ধ্বংস সাধিত হইতেছে। ফ্রান্স-সম্পর্কে বৃটেনের মনোবাঞ্ছা পূ[র্ণ] হইয়াছে গত সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিকে। আজ স্পেন সম্পর্কে তাঁহার অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। মিউনিক চুক্তিতে বৃটেনের ক্রীড়নক দালাদিয়ার মন্ত্রিসভা জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্প[ণ]

বার্সিলোনার পথে একদল বিজয়ী সৈন্য

করিয়াছে। মিউনিক বৈঠকের পর বলপূর্ব্বক সাধারণ ধর্ম্মঘট দমন করিয়া দালাদিয়ার মন্ত্রি-সভা ফ্রান্সকে বামপন্থীদিগের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়াছে। ফ্রান্সের রেডিক্যাল্ দল—মঃ দালাদিয়ার এই দলের নেতা এবং বৃটেনের চেম্বারলেন মন্ত্রি-সভা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই পশ্চিম য়ুরোপ হইতে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধীদিগের প্রভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেছিল। জেনারল ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্টের বৈধতা স্বীকারে এই আড়াই বৎসরব্যাপী চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হইল।

গ্রাণাডেলা অধিকারের পর বিদ্রোহী সৈন্যদলের বিশ্রাম

স্পেন হইতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদিগের প্রভাব দূরীভূত হইলেই ফ্রান্স ও বৃটেন নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; কারণ, সাম্রাজ্য-বাদিগণ আপনারা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ। ইটালী ফ্রান্সের নিকট টিউনিস্-কর্সিকা-জিবুতি-সুয়েজ সংক্রান্ত দাবী উত্থাপন করিয়াছে; জার্ম্মাণীও বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে তাহার উপ-নিবেশ সংক্রান্ত দাবী শুনাই-তেছে। বৃটেন্ ও ফ্রান্স জানে, জেনারল ফ্রাঙ্কো যদি ইটালী ও জার্ম্মাণীর দ্বারা প্রভাবান্বিত থাকেন এবং সশস্ত্র বিরোধের সময় তাহারা যদি স্পেনকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে মহা অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। বৃটেন তখন ভূমধ্য-সাগরপথে তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সহিত সংযোগ রাখিতে পারিবে না; এলজিরিয়া ও মরক্কোর সহিত ফ্রান্সের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। এই সম্ভাবিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বৃটেন্ ও ফ্রান্স জেনারল ফ্রাঙ্কোকে ইটালী ও জার্ম্মাণীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই জন্যই তাহারা জার্ম্মাণীর অজ্ঞাতে মিনরকা দ্বীপ অধিকারে জেনারল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিয়াছে, এই জন্যই ফ্রাঙ্কো-গভর্ণমেণ্টের বৈধতা স্বীকারে তাহারা লজ্জাকর ব্যস্ততা প্রদর্শন করিয়াছে, এই জন্যই তাহারা ফ্রাঙ্কোকে ঋণদানের প্রলোভন দেখাইতেছে।

স্প্যানিস যুবতীগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহী সৈন্যদলের সম্বর্দ্ধনা

স্পেনের সরকারপক্ষ এখনও যুদ্ধপরিচালনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রধান সেনাপতি জেনারল মিয়াজা ঘোষণা করিয়াছেন—So long as there is a single man standing under the banner of the Republic we resist. এই দৃঢ়তা বীরোচিত, আদর্শের প্রতি অতুলনীয় নিষ্ঠার পরিচায়ক। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার যদি কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে কেবল এই দৃঢ়তার দ্বারা জেনারল ফ্রাঙ্কোকে পরাভূত করা আর

সম্ভব হইবে না। সরকার পক্ষের একমাত্র আশা—ফ্রাঙ্কো-ইটালীয় বিরোধ; ফ্রান্স ও ইটালীর মনোমালিন্য যদি সশস্ত্র বিরোধে পরিণত হয় এবং জেনারল ফ্রাঙ্কোর অধিকৃত অঞ্চল যদি ইটালীর ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে তখন, কেবল ফ্রান্স নহে, বৃটেনও স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বনে বাধ্য হইবে। এই ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধিয়া নেগ্রীণ-দেল্ভায়ো মিয়াজা আজ মৃত্যুপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমেরিকার মনোভাব—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। তবে, সে না কি এই সম্পর্কে লজ্জাকর ব্যস্ততা প্রদর্শন করিবে না। এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, জেনারল ফ্রাঙ্কোর সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকা সম্পর্কে আশ্বস্ত হইতে চাহে। জেনারল ফ্রাঙ্কো যদি দক্ষিণ আমেরিকায় ফ্যাসিষ্ট প্রচারকার্য্য হইতে বিরত থাকিবার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে আমেরিকা তাহার গভর্ণমেণ্টের বৈধতা স্বীকার করিতে পারে। গত মাঘ মাসের "মাসিক বসুমতী"তে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা-সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি যে, গত কিছুকাল ধরিয়া দক্ষিণ আমেরিকার ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘাত-সংঘাত আরম্ভ হইয়াছে। এই জন্যই সে আজ এত চঞ্চল। গণতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি 'দরদ' দেখাইয়া এবং ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির প্রতি কটাক্ষ করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ কর্ডেল হাল্ যে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন, তাহার মূলে এই স্বার্থ-সংঘাতের কথা রহিয়াছে। স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের সমাধিরচনায় গণতন্ত্রের 'দরদী' মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোন আপত্তি নাই, অবশ্য ইহার ফলে দক্ষিণ আমেরিকায় তাহার এক জন শত্রু যদি বৃদ্ধি না পায়।

প্যালেষ্টাইন-সমস্যা—

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে লণ্ডনে প্যালেষ্টাইন-সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্যালেষ্টাইন এবং সুদূর প্রাচীর অন্যান্য কয়েকটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রতিনিধি এবং ইহুদী প্রতিনিধিগণ এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছেন। এই সম্মিলনীতে আরবগণ দাবী উত্থাপন করিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিতে হইবে; ম্যাণ্ডেটের পরিবর্ত্তে সন্ধি-স্থাপন করিতে হইবে; ব্যাল্ফুর-ঘোষণা বাতিল করিতে হইবে; ইহুদীদিগের প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ এবং তাহাদিগের নিকট জমি বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ইহুদীদিগের পক্ষ হইতে ডাঃ ওয়েজম্যান্ সম্মিলনীতে দাবী জানাইয়াছেন যে, ব্যাল্ফুর-ঘোষণাকে পরিপূর্ণভাবে মানিয়া চলিতে হইবে; ঐ ঘোষণা অনুসারে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগের "নিজ জন্মভূমি" (National Home) স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহুদীদিগের নিকট ভূমি বিক্রয়ের ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ডাঃ ওয়েজম্যান্ আরও জানাইয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের ম্যাণ্ডেট মানিয়া চলাই ইহুদীদিগের দাবীর মূল কথা। দুই পক্ষের দাবী এইরূপ পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় প্যালেষ্টাইন-সমস্যার সমাধান হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ সরকার এক্ষণে প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধানের জন্য অস্থায়ী ভাবে একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যবস্থায় আরব, ইহুদী ও বৃটিশ সদস্য লইয়া একটি আইন-পরিষদ গঠিত হইবে, সংখ্যালঘিষ্ঠ ইহুদীদিগের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে, এবং বৃটেনের সহিত দেশরক্ষা সম্পর্কে সন্ধি হইবে।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্রটি তুরস্কের অধীন ছিল। মহাযুদ্ধের পর প্যালেষ্টাইনের আরবদিগকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইংরেজ তাহাদিগকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিয়াছিল। যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি আবিষ্কার করেন যে, নিজ দেশ শাসন করিবার ক্ষমতা আরবদিগের নাই; এই জন্য রাষ্ট্র-সঙ্ঘ প্যালেষ্টাইন শাসনের ম্যাণ্ডেট (অক্ষম রাজ্যের প্রতি অভিভাবকত্ব) দিলেন ইংরেজকে। যুদ্ধের সময় আর্থিক প্রয়োজনে ইহুদীদিগকে "হাত" করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের পক্ষ হইতে ব্যালফুর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইহুদীদিগকে একটি নিজ-দেশ (National Home) প্রদান করা হইবে; ইহাই বিখ্যাত ব্যাল্ফুর-ঘোষণা। যুদ্ধের পর প্যালেষ্টাইন ইহুদীদিগের নিজ-দেশ নির্দ্ধারিত হয়, এবং তদনুসারে তথায় ইহুদীগণ আসিতে আরম্ভ করে।

গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ হাইকমিশনার একটি শাসন-পরিষদসহ প্যালেষ্টাইনের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের কর্ম্মশক্তি প্রদর্শনের একটি নূতন ক্ষেত্র পায়। ক্রমে প্যালেষ্টাইনে সৈন্য-শিবির স্থাপিত হয় এবং সেখানকার অস্ত্র আমদানীর উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ বৃটিশের অধীন অন্যান্য দেশের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহার সমস্তই ক্রমে প্যালেষ্টাইনে প্রকট হইয়া উঠে। সেখানকার আরবগণ তুরস্কের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া বস্তুতঃ ইংরেজের অধীন হয়।

এইরূপ অবস্থায় আরবগণ সন্তুষ্ট হইবে না, ইহা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই; দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ হইতে আগত ইহুদীগণ তাহাদিগের বাসভূমি জুড়িয়া বসিতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহুদীদিগের সংখ্যা প্যালেষ্টাইনের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক হইয়া উঠিল। আরব ভূম্যধিকারীদিগের নিকট হইতে যে সকল জমি লইয়া দরিদ্র আরবগণ পুরুষানুক্রমে চাষ করিয়া আসিতেছিল, ধনকুবের ইহুদীগণ উহা ক্রয় করিতে লাগিল। জমি হইতে বঞ্চিত হইয়া দরিদ্র আরবদিগের দুর্দ্দশা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ফলে আরবদিগের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল; খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণ বহুবার বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে একটি ক্ষমতাহীন আইন-পরিষদ গঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আরবগণ এই চাতুরীতে ভুলে নাই। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ও ইহুদীদিগের উচ্ছেদ, এই দুইটি দাবী লইয়া তাহারা প্রবল আন্দোলন চালাইতে লাগিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে আরবদিগের বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ সরকার প্যালেষ্টাইন-সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য প্রথমবার পীলের সভাপতিত্বে এবং দ্বিতীয়বার উডহেডের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। পীল্-কমিশন্ প্রস্তাব করেন যে, প্যালেষ্টাইনকে তিন-ভাগে বিভক্ত করা হউক; সমুদ্রোপকূলের অংশে ইহুদী রাষ্ট্র এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ অংশকে ট্রানসজর্ডানের সহিত যুক্ত করিয়া

লণ্ডনে সেণ্টজেমস্‌ প্রাসাদে প্যালেষ্টাইন সম্মিলনের উদ্বোধনে বৃটিশ ও আরব প্রতিনিধিগণ
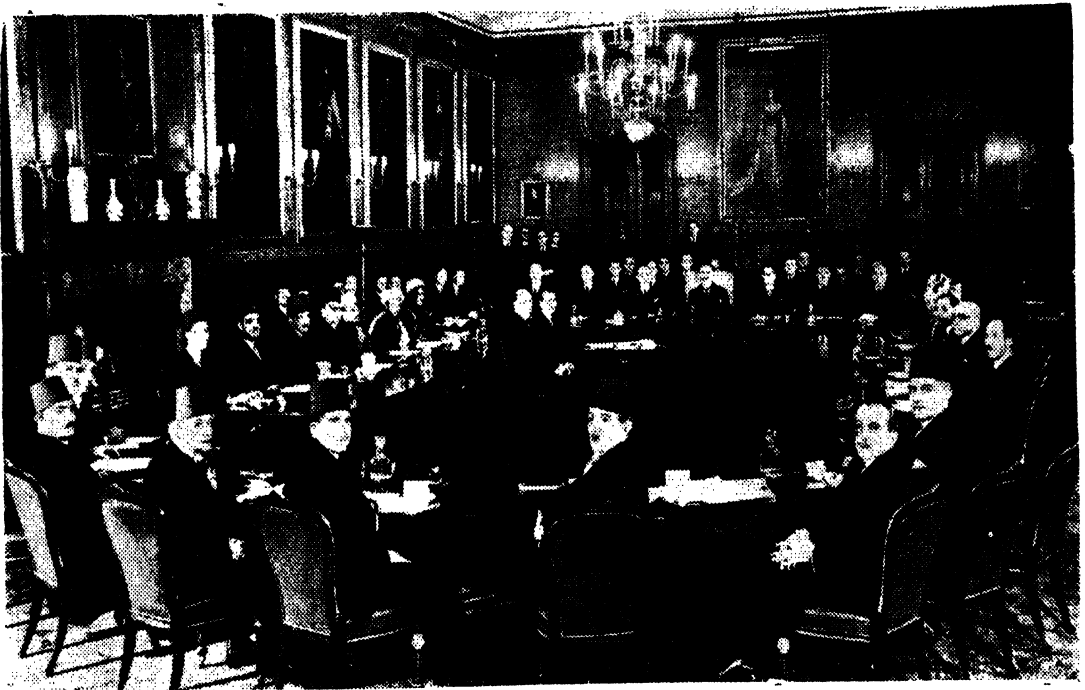
প্যালেষ্টাইন সম্মিলনের দ্বিতীয় উদ্বোধনে বৃটিশ ও ইহুদী প্রতিনিধিগণ

তথায় আরব-রাষ্ট্র গঠিত হউক; জেরুজালেম্ ও বেথ্‌লেহেমের তীর্থযাত্রীদিগের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ অংশ বৃটিশের হাতে থাকুক; এতদ্ব্যতীত, নাজারেথ, টিবেরিয়াস্ হ্রদ ও উহার উপকূল এবং আরব ও ইহুদীদিগের ধর্ম্ম-মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি বৃটিশের অধিকারভুক্ত হউক। হাইফা টিবেরিয়াস্ সাদাদ ও একার এবং আপাততঃ জাফা বন্দরটি ও দক্ষিণে আকাবা উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ ভূখণ্ড শাসন করুক বৃটেন্। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ায় আরবগণের বিদ্রোহ আরও ভীষণাকার ধারণ করে। পরে, উডহেড কমিশন প্যালেষ্টাইনকে ত্রিধাবিভক্ত করিবার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ইহাতে আরবগণ আরও বিক্ষুব্ধ হয়। সীরিয়া, ইয়েমেন, সৌদী আরব, মিশর প্রভৃতি মুসলমান রাষ্ট্র হইতে বৃটেনের প্যালেষ্টাইন-নীতির প্রতিবাদ শ্রুত হইতে থাকে; তখন, প্যালেষ্টাইন-সমস্যার সমাধানের জন্য একটি সম্মিলনী আহ্বানের ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমান সময় লণ্ডনে এই সম্মিলনীর অধিবেশন চলিতেছে।

প্যালেষ্টাইনে বৃটেনের স্বার্থ—

প্যালেষ্টাইনে বৃটেন্ স্বার্থ-সম্পর্কশূন্য নহে। ভারতবর্ষের সহিত অপ্রতিহত যোগাযোগ রাখিবার জন্য সুয়েজের পার্শ্ববর্ত্তী প্যালেষ্টাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সুদূর প্রাচ্য-বিমানপথের একটি প্রধান ষ্টেশন এই প্যালেষ্টাইনে। ইরাক হইতে পাইপ্‌যোগে পেট্রোল আসে হাইফা বন্দরে। তাহার পর, দিন দিন য়ুরোপের রাজনীতিক অবস্থা যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ-কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুয়েজের পূর্ব্ব উপকূল নিরাপদ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। বৃটেন্ ইহুদীদিগের জন্য বিগলিত-হৃদয় নহে; সে ইহুদীদিগকে শিখণ্ডীরূপে সম্মুখে রাখিয়া প্যালেষ্টাইনে আপনার কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। যতই কমিটী-কমিশন নিযুক্ত হউক, যতই সম্মিলনী ও পরামর্শ-সভা আহূত হউক, প্যালেষ্টাইনের উপর বৃটেনের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইতে পারে—এইরূপ কোন ব্যবস্থায় প্যালেষ্টাইন-সমস্যার সমাধান কখনও হইবে না, ইহা নিশ্চিত। বৃটেন্‌ই প্যালেষ্টাইন-সমস্যাকে জটিল করিয়াছে, এবং সেই সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে।

চীন-জাপানসংঘর্ষ—

জাপানের হাইনান্ দ্বীপ অধিকার এবং সাংহাইএর উপর শাসনাধিকার বিস্তারের চেষ্টা—ফেব্রুয়ারী মাসে এই দুইটিই সুদূর প্রাচীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাপান অকস্মাৎ হাইনান দ্বীপ অধিকার করে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপটির গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। চীনাদিগের অধিকৃত দ্বীপগুলির মধ্যে হাইনান্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দক্ষিণ চীনের কোয়াংটাং প্রদেশ এবং এই দ্বীপটির মধ্যে মাত্র একটি ক্ষুদ্র প্রণালীর ব্যবধান। ইহা ফরাসী অধিকৃত কোয়াঙ্গচাও হইতে মাত্র ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী এবং সিঙ্গাপুর-হংকং জলপথের উপর অবস্থিত। জাপানী অধিকৃত ফরমোসা এবং ক্যারোলাইন্‌সের সহিত হাইনান্‌কে সংযুক্ত করিলে এই দ্বীপশ্রেণী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টন করে। জাপানের হাইনান্ দ্বীপ অধিকারে ফ্রান্স অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে; সে তাহার উৎকণ্ঠার কথা জাপানকে জানাইয়াছিল। জাপান বলিয়াছে যে, হাইনান্ দ্বীপের নৌঘাঁটী অধিকার না করিলে সমুদ্রপথে চীনে সমরোপকরণ প্রবেশ বন্ধ করা সম্ভব নহে; এই দ্বীপে জাপান অধিকার বিস্তার করিতে চাহে না—সামরিক প্রয়োজন শেষ হইলেই সে ঐ স্থান ত্যাগ করিবে; ফরাসী ইন্দো-চীন সম্পর্কে জাপানের কোন দুরভিসন্ধি নাই।

বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে এই হাইনান্ দ্বীপ অধিকারের ভীতি-প্রদর্শন করিয়া জাপান ব্রুসেলস্-সম্মিলনী বিফল করিয়াছিল। গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে নবশক্তির চুক্তির স্বাক্ষরকারিগণ ব্রুসেল্‌সে

লতা পাতায় আবৃত হইয়া চীনা-সৈন্যের আত্মগোপন

সমবেত হন। এই সময় ফরাসী সেনেটের বৈদেশিক বিভাগের চেয়ারম্যান্ সেনেটার হেনরী বেরেংগার ঘোষণা করেন যে, ইন্দো-চীনের পথে চীনে সমরোপকরণ ও সৈন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল; কারণ, জাপান ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছে যে, এই সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তিত না হইলে সে হাইনান্ দ্বীপ, এমন কি, ইন্দো-চীনের কয়েকটি বন্দরও অধিকার করিবে। সেই সময় হইতে ফ্রান্স এই ঘোষণা অনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছে; ইন্দো-চীনের পথে আর চীনে সমরোপকরণ প্রবেশ করে নাই। সুতরাং চীনে অস্ত্র-শস্ত্র প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য ঐ দ্বীপ অধিকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই সম্পর্কে যুক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক।

জাপানের অধিকারবিস্তার-প্রচেষ্টা—

সম্প্রতি বৃটেন্, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে বাণিজ্যাধিকার হারাইয়াছে; ইহার ফলে জাপানের সহিত তাহাদিগের মনোমালিন্য আরম্ভ হইয়াছে। এই তিনটি শক্তি এখন মার্শাল চিয়াং-কাইসেককে নানা রকমে সাহায্য করিতেছে। এই জন্য জাপান হাইনান্ দ্বীপ অধিকার করিয়া এক সঙ্গে ফ্রান্স,
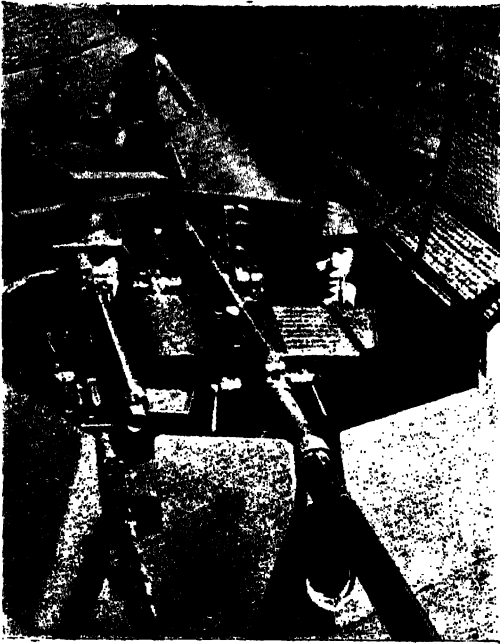
রণক্ষেত্র অভিমুখে চীনের বর্ম্মাবৃত মোটর-গাড়ী

বৃটেন ও আমেরিকাকে সন্ত্রস্ত রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এই দ্বীপটি এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত যে, জাপান কর্ত্তৃক উহার অধিকারে হংকং-সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর অষ্ট্রেলিয়ার জলপথের সংযোগ বিপন্ন হইয়াছে, ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দো-চীনের নিরাপত্তাও নষ্ট হইয়াছে। জাপান যদি এই দ্বীপে বিমান ও সাবমেরিণের ঘাঁটী নির্ম্মাণ করে, তাহা হইলে সে প্রশান্ত মহাসাগরে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে; প্রয়োজনবোধে সে এই অঞ্চলে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা—তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইবে।

জাপানের হাইনান্ দ্বীপ অধিকারের আর একটি উদ্দেশ্য—সাংহাইএর উপর শাসনাধিকার বিস্তার। ইটালী যেমন তাহার আফ্রিকার সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার জিবুতিকে আপনার অধিকারভুক্ত করিতে চাহে; তেমনই জাপানের নব-প্রতিষ্ঠিত চীনা সাম্রাজ্যের প্রবেশদ্বার সাংহাইএর উপরও জাপান শাসনাধিকার বিস্তার করিতে চাহিতেছে। সাংহাইএর আন্তর্জ্জাতিক অঞ্চলটি এখন বৃটিশ, ফরাসী, জাপানী, মার্কিণী ও চীনা প্রতিনিধিদিগের দ্বারা গঠিত মিউনিসিপ্যাল গভর্ণমেণ্ট দ্বারা শাসিত। ইহা ব্যতীত, একমাত্র ফ্রান্সের দ্বারা শাসিত একটি অঞ্চলও সাংহাইতে আছে। এনহুই প্রদেশে জাপানের অধিকার বিস্তৃত হইবার পর হইতে সাংহাইতে সন্ত্রাসবাদমূলক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সন্ত্রাসবাদ নিবারণের অছিলায় জাপান সমগ্র সাংহাইতে আপনার অধিকার বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাংহাইএর সহিত প্রতীচীর তিনটি শক্তির স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত; এই জন্য জাপান ঐ তিনটি শক্তি-সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নেই হাইনান্ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে।

সম্প্রতি মার্শাল্ চিয়াং-কাইসেকের কিঞ্চিৎ মতিপরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। তিনি কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি চীনে যে নূতন সমর-পরিষদ গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কম্যুনিষ্টগণ একটি পদও প্রাপ্ত হয় নাই। কম্যুনিষ্টগণ কুয়োমিণ্টাংদের দলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রবেশের অধিকারও লাভ করে নাই। যতদূর মনে হয়, এই বিষয়ে চীনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের "গোপন হস্ত" কার্য্য করিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বৃটিশ সরকার যেমন ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত জাপানের অধিকার বিস্তৃত হইতে দিতে চাহেন না, সেইরূপ চিয়াং-কাইসেক গভর্ণমেণ্টের উপর কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব বিস্তৃত হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ। এই জন্য সম্ভবতঃ বৃটেন্ চিয়াং-কাইসেককে সাহায্যদানের পূর্ব্বে কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব-দমন সম্পর্কে তাঁহাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বৃটেন্ তখন সোভিয়েট রুশিয়া ও জাপানের প্রভাব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পশ্চিম চীনে চিয়াং-কাইসেকের অধিকৃত অঞ্চলটিকে রক্ষাব্যূহরূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ব্যূহ অতিক্রম করিয়া জাপানী সৈন্য যদি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে না পারে এবং কম্যুনিষ্ট তথা সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব যদি ব্রহ্মদেশের সীমান্তের দিকে বিস্তৃত না হয়, তাহা হইলেই বৃটেনের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে।

শ্রীঅতুল দত্ত।
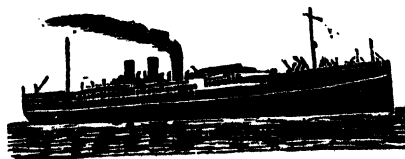
সানকীতে বজ্রাঘাত

গত নভেম্বর মাসে একটি চপলচিত্ত ইহুদী-বালকের গুলীতে প্যারিসে ভন্ রাথ নিহত হওয়ায়, জার্ম্মাণ-রাষ্ট্রনায়ক এডলফ হিটলার জার্ম্মাণীর ইহুদীগণকে শোষণের একটা উপলক্ষ পাইয়াছিলেন। ইহুদীগণের নিকট হইতে তিনি ৮ কোটি পাউণ্ড দাবী করিয়াছিলেন; তাহাদিগকে নানা ভাবে নির্য্যাতন করিয়া তিনি ৪ কোটি পাউণ্ড জরিমানা আদায় করিয়া জার্ম্মাণীর ধনভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই ভাবে হল্যাণ্ডে আরও দুইটি দাঁও মারিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ হয় নাই। এই উভয় ঘটনাই অতি তুচ্ছ; তথাপি উল্লেখের অযোগ্য নহে।

গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে হল্যাণ্ডের হেগ ও আমষ্টারডাম্ নগরস্থিত জার্ম্মাণ-দূতভবনে দুই দিন নাকি গুলী বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন জার্ম্মাণ রাজনীতিকের মৃত্যু হয় নাই, কাহাকেও আহত হইতেও হয় নাই; এ অবস্থায় হার হিটলার কি করিয়া ওলন্দাজ সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পারেন? তাঁহার এই দুরাশা পূর্ণ হয় নাই।

হল্যাণ্ডের হেগ নগরের যে অট্টালিকায় জার্ম্মাণ কাউন্সিলার ব্যারণ ভন্ পুট্‌লিজ্ বাস করেন, এক দিন অকস্মাৎ বন্দুকের একটা গুলী সেই অট্টালিকার একটি বাতায়ন ভেদ করে। এই ঘটনার দুই দিন পরে আমষ্টার্ডাম নগরস্থ জার্ম্মাণ-কন্সলের বাসভবনেও না কি ঐ ভাবে গুলী বর্ষিত হইয়াছিল। পরদিন প্রভাতে জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলি এই ঘটনার তদন্তের প্রতীক্ষা না করিয়াই এই মন্তব্য প্রকাশ করে যে, স্থানীয় ইহুদীরাই এই ভাবে জার্ম্মাণ-দূতাবাস আক্রমণ করিয়াছিল; এই কার্য্যে যে হল্যাণ্ডের নিরপেক্ষ-নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে, জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলি ওলন্দাজ সরকারকে এ কথাও স্মরণ করিতে বলিয়াছিল।

অতঃপর হল্যাণ্ডের উক্ত উভয় নগরস্থ জার্ম্মাণ-দূতাবাস ও কন্সলের বাসভবন পুলিস-প্রহরিবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টনের পর অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে জানিতে পারা যায়—কোন বালক গুল্‌তি (Catapult) হইতে যে বাঁটুল নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহারই একটা ঘটনাক্রমে জার্ম্মাণ-দূতাবাসের একটি গৃহ-কক্ষের বাতায়ন ভেদ করিয়াছিল। ঘটনাটি এইরূপ তুচ্ছ হইলেও জার্ম্মাণ-সৈন্যদল সুসজ্জিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল! জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব জোয়াকিম্ ভন রিবেনট্রপের আদেশে তিন দল জার্ম্মাণ সৈন্যও হল্যাণ্ড-সীমান্তে উপস্থিত হইয়া সদর্পে কুচ-কাওয়াজ আরম্ভ করে! এতদ্ভিন্ন, হেগ নগরস্থ জার্ম্মাণ সচিব কাউণ্ট জুলিয়াস জেক-বরকার্শ-রোডা ওলন্দাজ পররাষ্ট্র-সচিবের নিকট উক্ত 'দুর্ঘটনা'র জন্য প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন।

ওলন্দাজ সরকার প্রবলের সহিত বিরোধ করিয়া লাভ নাই বুঝিয়া তাঁহাদের পররাষ্ট্র-সচিব পাটিজন-মারফৎ জার্ম্মাণ-সচিবের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

কিন্তু যে সকল পুলিস এই ব্যাপারের তদন্তের ভার পাইয়াছিল, তাহারা বহু চেষ্টাতেও রহস্য ভেদ করিতে পারিল না। সাক্ষী সংগ্রহেরও চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু একজন লোকও বলিতে পারিল না যে, সে কাহাকেও নির্দ্দিষ্ট ভবন লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতে দেখিয়াছিল বা বন্দুকের শব্দ শুনিয়াছিল। যে বাতায়ন গুলীবর্ষণে বিদীর্ণ হইয়াছিল, তাহার অদূরে কোন ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেও দেখা যায় নাই। আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যে গুলী হেগের জার্ম্মাণ দূতাবাসের বাতায়ন বিদীর্ণ করিয়াছিল—তাহা সেই বাতায়নের ঊর্দ্ধস্থ শার্শি ভেদ করিয়া ছাদের কড়ি-বরগার পাশেই বিদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং সেই সময় সেই কক্ষে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সেই গুলী বর্ষিত হয় নাই। কে কি উদ্দেশ্যে সেই গুলী নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং কোন্ স্থান হইতেই বা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, পুলিস যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই; তথাপি দুর্ব্বল ওলন্দাজ সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত ও অপদস্থ হইতে হইয়াছিল।

বলদর্পিত জার্ম্মাণী সামান্য কারণে বা অকারণে দুর্ব্বল প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে এইভাবে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। হিটলারের ইঙ্গিতে কখন্ কাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়, কেহই তাহা বুঝিতে পারিতেছে না; এ জন্য সকলকেই সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতে হইতেছে। অথচ হিটলারের আশ্বাসবাক্যে নির্ভর করিয়া বৃটিশ-প্রধানমন্ত্রী আর যুদ্ধের আশঙ্কা নাই, য়ুরোপে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন। কিন্তু হিটলারের উপনিবেশের দাবী এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, এবং বেনিটো মুসোলিনী ফরাসী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ গ্রাসের জন্য মুখব্যাদান করিয়া লালা নিঃসারিত করিতেছেন!—ইহার পরিণাম সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

চীনের রাষ্ট্রনায়কের দাম্পত্য-কলহ

রাজপুরুষগণের অযোগ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা চীনের চিয়াং কাইসেকের সরকারের অভিশাপস্বরূপ হইয়াছে। ইহার উপর গত জানুয়ারীর মধ্যভাগ হইতে চিয়াং-কাইসেকের স্ত্রী মাই-লিং চিয়াং-কাইসেক স্বামীর সহিত বিরোধ করায় চিয়াং-কাইসেককে অত্যন্ত অসুবিধা ও মনঃকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে।

চীনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ওয়াং-চিং-উই কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আকাশ-পথে ফরাসী ইণ্ডো-চায়নায় পলায়নের পর চিয়াংকে 'কেব্‌ল'-যোগে এই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন যে, জাপান যে সকল সর্ত্তে সন্ধি করিতে প্রস্তুত, সেই প্রস্তাব তাঁহার গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু জাপান-প্রদত্ত সন্ধি-সর্ত্ত গ্রহণ করিলে চীন জাপানের হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত হইবে বুঝিয়া চিয়াং

কাইসেক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এ সংবাদ পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

ওয়াং জাপানের অনুগৃহীত এবং স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ায় চিয়াং-কাইসেকের সামরিক সহযোগিগণ সুদূর চাংকিং রাজধানীতে একটি জরুরী সমিতির অধিবেশনে ওয়াংকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন; কিন্তু ওয়াং-চিং-উই এখন পলাতক।

ওয়াং-সংক্রান্ত আন্দোলন চাপা পড়িবার পূর্ব্বেই টোকিওতে প্রচার করা হইয়াছে যে, চীনের রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং-কাইসেকের গুণবতী পত্নী মাই-লিং স্বামীর সহিত বিরোধ করিয়া হংকং-এ গমন করিয়াছেন; তিনি হংকং হইতে তাঁহার স্বামীকে জানাইয়াছেন, তিনি অবিলম্বে তালাক-নামা গ্রহণ করিবেন। (obtain an immediate divorce)

চীনের সরকারী-মহল এই জনরবের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা জাপানীদের মিথ্যা-প্রচার; কিন্তু চীনের জনসাধারণ শুনিয়াছে, চিয়াং-কাইসেক জাপানী বিমানবাহিনীর সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার স্ত্রী মাই-লিংকে ইহার পরিচালন-ভার অর্পণ না করায় চিয়াং-পত্নী সত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তবে তিনি অভিমানভরে পতিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় নাই।

এ কথা সত্য যে, মাদাম চিয়াং-কাইসেকই চীন দেশের সামরিক বিমানবাহিনীর সংগঠনকর্ত্রী; কিন্তু গত মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে এই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিয়া মাদাম চিয়াং-কাইসেকের ভ্রাতা টি ভি সুংকে চীন দেশের জাতীয় বিমান-বাহিনীর নেতৃত্ব-ভার প্রদান করা হয়। সেই সময় হইতে চিয়াং-কাইসেকের উক্ত শ্যালকই চীনের বিমান বিভাগের পরিচালক।

এই পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে 'ডেস্প্যাচে' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল যে, চীন দেশের বিমান-বাহিনীর ৪০ জন সোভিয়েট ভলন্টিয়ার নারীর অধীনে কার্য্য করিতে, এবং বিমান-পরিচালনে নারীর আদেশ পালন করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। মাদাম কাইসেকের আদেশ-পালনে তাহারা অসম্মত হওয়ায় চীনের সামরিক বিমান-বাহিনীর অবস্থা অল্প দিনের মধ্যেই অবনত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ, চিয়াং-কাইসেকের সহিত তাঁহার স্ত্রীর বিরোধ চলিলে চীনের পক্ষে তাহা অকল্যাণজনক; এই বিরোধের ফলে চীন দেশে সুং-বংশের প্রভাব বিলুপ্ত হইতেও পারে। গত ১০ম শতাব্দী হইতে সুং-বংশ চীন দেশে প্রভূত প্রভাববিস্তার করিয়া আসিতেছে, এবং এই বংশ চীন দেশের বহু কল্যাণসাধন করিয়াছে।

চীন জাতির রক্ষাকর্ত্তা সান-ইয়াৎ-সেন যে সময় মাঞ্চু-রাজবংশকে মহাচীনের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া চীন সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময় চার্লস সুং তাঁহার পরম বন্ধু এবং উপদেষ্টা ছিলেন। চার্লস সুং মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; এই জন্য তিনি তাঁহার তিন কন্যাকে উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নিউইয়র্কে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ওয়াং-চিং-উই

মাই-লিং (চিয়াং-কাইসেকের পত্নী)

চার্লস্ সুংএর তিন কন্যার মধ্যে প্রথমা আই-লিং (প্রেমভাবিনী) দীর্ঘকাল সান-ইয়াৎ-সেনের খাস-মুন্সী ছিলেন। তিনি 'ইয়ং-মেনস্ ক্রিশ্চয়ান এসোসিয়েসনে'র সেক্রেটারী এইচ, এইচ, কংকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কং এখন চীনের রাজস্বসচিব। তিনি চীনের সর্ব্বপ্রধান অভিজাত-বংশীয়; তিনি চীনের রাজর্ষি কন্‌ফ্যুসির ৭৫তম অধস্তন পুরুষ।

চার্লস্ সুংএর দ্বিতীয়া কন্যা চিং-লিং (সুখভাবিনী) সান-ইয়াৎ-সেনের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। ইনি স্বামীর সহিত নির্ব্বাসন-দণ্ড বরণ করিয়াছিলেন। চিং-লিং চীন দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চীনের জাতীয় সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অন্য একটি শক্তিসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে চিয়াং-কাইসেকের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়।
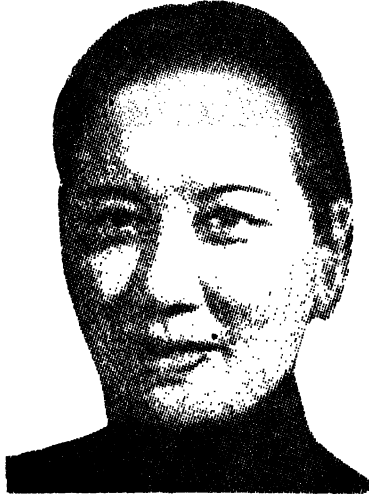
চার্লস সুংএর কনিষ্ঠা কন্যা মাই-লিং (রূপভাবিনী) চিয়াং-কাইসেকের পত্নী। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সাংহাই নগরে তিনি ৪১ বৎসর বয়স্ক চিয়াং-কাইসেককে বিবাহ করেন; কিন্তু তাঁহার বয়স স্বামীর বয়সের তুলনায় অনেক অল্প। চিয়াং কাইসেকের দুইটি বৌদ্ধ-পত্নী ছিলেন; তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার তিনটি পুত্র ছিল। বৌদ্ধ পত্নীদ্বয়ের বিয়োগের পর চিয়াং মাই-লিংকে বিবাহ করেন; সুতরাং বলা বাহুল্য, মাই-লিং চিয়াং-কাইসেকের তৃতীয়া পত্নী।

চিয়াং-কাইসেক বৌদ্ধ মহিলাদ্বয়কে বিবাহ করিবার সময়

'বৌদ্ধ ছিলেন; মাই-লিংএর সহিত তাঁহার বিবাহের পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মাই-লিংই তাঁহাকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সুং-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় চিয়াং-কাইসেক চীন দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অবশেষে সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের পরিচালন-ভার লাভ করেন। তিনি সুং-পরিবারের সহায়তা লাভ করিতে না পারিলে, চীন দেশের 'ডিক্টেটারী'তে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন কি না, সন্দেহের বিষয়।

মাদাম চিয়াং অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও নিষ্ঠাবতী রমণী তিনি আজীবন দুর্নীতি, লোভ এবং নীচতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চীন দেশের নারীসমাজে উচ্চ আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সংযত ভাবে জীবন পরিচালিত করেন। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁহার অসাধারণ। চীন দেশে তিনি বহুবিধ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। চিয়াং-কাইসেকের প্রতিদ্বন্দ্বী চ্যাং-হুয়ে-লিয়াং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চিয়াংকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মাদাম চিয়াং-কাইসেক বিমান-যোগে ৭ শত মাইল দূরবর্ত্তী সিয়ান-ফু নগরে গমন করেন, এবং অদ্ভুত কৌশলে তাঁহার স্বামীকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন।

মাদাম চিয়াং-কাইসেক চীন দেশের সামরিক বিমান-বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করিতে না পারিলে স্বামীর সহিত শীঘ্র পুনর্ম্মিলিত হইবেন কি না, তাহা অনুমান করা অসাধ্য।

প্যালেষ্টাইনে গোরা-পুলিসের শাস্তি

এ দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস, পুলিসের সাত খুন মাফ! কোন কোন পুলিস-কর্ম্মচারী গুরু অপরাধে আদালতে দণ্ড পাইলেও সেই দণ্ড অধিকাংশ স্থলে 'ধোপে টিকিতে' দেখা যায় না; ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। প্রতি বৎসর প্রাদেশিক লাট একদিন বৈঠক করিয়া যেভাবে পুলিসের পিঠ চাপড়াইয়া থাকেন, তাহাতে পুলিস আপনাদিগকে জনসাধারণের সেবক মনে না করিয়া মুরুব্বি মনে করিলে তাহাতেও বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু প্যালেষ্টাইনের পুলিসের খুন-মাফের কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। জেরুজালেমের চীফ জষ্টিস্ সার হ্যারী হারবার্ট গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে পুলিসের বিরুদ্ধে আরোপিত একটি অভিযোগের বিচারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বৃটিশ সরকার প্যালেষ্টাইন-পুলিসের অবৈধ ব্যবহারে প্রশ্রয় দান করিতে প্রস্তুত নহেন।

মহম্মদ হাদাদকে বিপ্লবী আরব বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল। এ দেশ হউক—আর ও দেশ হউক, বিপ্লবী সন্দেহে যে হতভাগ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়, হাতকড়ি ও জেল তাহার অঙ্গের ভূষণ! মহম্মদ হাদাদকে অবৈধ ভাবে হত্যা করা হইয়াছে (charged with the unlawful killing) এই অভিযোগে প্যালেষ্টাইনের কয়েকটা গোরা-পুলিস বিচারপতি সার হ্যারী হারবার্টের আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। আসামীরা সংখ্যায় ৪ জন।

বিচারালয়ে আত্মসমর্থন উপলক্ষে উক্ত চারি জন আসামীই বলে, তাহারা পুলিসের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রহরী, তাহারা বিপ্লবী হাদাদকে একখানি গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যখন জাফার জেলখানায় রাখিতে যাইতেছিল, হাদাদ সেই সময় গাড়ী হইতে লাফাইয়া-পড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করায়, তাহার গতিরোধের জন্য তাহারা তাহাকে গুলী করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হাদাদ এই ভাবে গুলী খাইয়া অক্কালাভ করিয়াছে। তাহারা কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল; এ অবস্থায় তাহাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ টিকিতে পারে না।

কিন্তু বিচারপতি সার হ্যারী হারবার্ট আসামীচতুষ্টয়ের এই জবাবে নির্ভর না করিয়া, তাঁহার সহযোগী বিচারক এ্যটন এটালা ও স'র সহিত একমত হইয়া আসামী গোরা-চতুষ্টয়ের প্রতিকূলে এই আদেশ প্রদান করেন যে, ২২ বৎসর বয়স্ক কনষ্টেবল উইলিয়ম উড নরহত্যার চেষ্টার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় (guilty of attempted manslaughter) তাহার প্রতি ৩ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইল। ৩২ বৎসর বয়স্ক কনষ্টেবল জন ম্যান্‌সেল উক্ত কয়েদীর দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেহের ঘোর অনিষ্ট-সাধন করায়, তাহার প্রতি ১ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হইল। এতদ্ভিন্ন, ২৪ বৎসর বয়স্ক কনষ্টেবল ফিলিপ ক্রস্‌লি ও ২২ বৎসর বয়স্ক আর্চ্চি ক্রস্‌লি উক্ত কয়েদীর দেহের ঘোর অনিষ্ট করায় তাহাদের প্রত্যেককে এক বৎসরের জন্য জামিনে আবদ্ধ করা হইল।

বিভিন্ন সাক্ষীর জবানবন্দী পর্য্যালোচনা করিয়া প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আসামীরা হাদাদকে হত্যা করিবার জন্য পূর্ব্বে কোন প্রকার কার্য্য-ধারা স্থির করে নাই; হতভাগ্য আরবটা গাড়ী হইতে নামিয়াছিল বটে, কিন্তু দৌড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করে নাই। সে যখন গাড়ী হইতে নামিয়া প্রায় ২০ গজ দূরে গমন করিয়াছিল, সেই সময় তাহাকে গুলী মারিয়া ধরাশায়ী করা হয়।

বিচারপতিরা ইহাও সিদ্ধান্ত করেন যে, সেই সময় কয়েদী হাদাদের উভয় প্রকোষ্ঠ হাতকড়ি দ্বারা শৃঙ্খলিত ছিল; এ অবস্থায় তাহার পলায়ন নিবারণের জন্য পুলিস তাহাকে গুলী মারিয়া ধরাশায়ী করিল, তাহাদের এই কার্য্য সমর্থনযোগ্য নহে।

ডাক্তারী পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে—হাদাদের দেহের ৪টি আঘাতের মধ্যে ২টি আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল। আসামী-চতুষ্টয়ের যে কোন ব্যক্তির গুলীতে ঐ প্রকার সাংঘাতিক আঘাত হইয়াছিল। এই জন্য উহাদের চারি জনকেই হাদাদের দেহের ক্ষতি করিবার জন্য অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, আসামী উড ভূতলশায়ী হাদাদের নিকট গমন করিয়া সেই অবস্থাতেও তাহাকে গুলী করিয়াছিল, এইজন্য বিচারপতিগণ তাহাকে নরহত্যায় সচেষ্ট বলিয়া গণ্য করিলেন।

ফিলিপ ও আর্চ্চি ক্রস্‌লি তরুণবয়স্ক এবং প্যালেষ্টাইনের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, এই হেতু তাহাদের প্রত্যেককে ২৫০ প্যালেষ্টাইন পাউণ্ডের জামিনে আবদ্ধ করা হইল।

এই বিচারের পরদিন উক্ত উভয় ক্রস্‌লিকে পুনর্ব্বার হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়া মাউণ্ট-স্কোপসৃস্থিত পুলিসের সদর আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রাচ্যদেশে গোরার হাতে বন্দুক থাকিলে দেশীয় লোককে গুলী করিবার জন্য তাহাদের হাত নিস্‌পিস্ করে, এবং তাহারা যে পাশবিক মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে—বহুবার তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তুরস্কে কি ধর্ম্মানুরাগ ফিরিবে?

কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের স্থান ছিল না।

তাঁহার কর্তৃত্বলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুরস্ক মুসলমান-ধর্ম্মজগতের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে সেই অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের জাতীয় মহাসভায় তিনি এক আইন পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন; সেই আইনের বলেই তুরস্ক ইস্লাম ধর্ম্মের সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়াছিল।

গত জানুয়ারী মাসের শেষভাগে তুরস্ক-রাজধানী আঙ্কারায় এইরূপ এক জনরব শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, ইস্লাম ধর্ম্মে পরম আস্থাবান্ বর্ত্তমান দেশনায়ক ইস্মেৎ ইনোয়েন্নুর সঙ্কল্প হইয়াছে, তিনি কামাল আতাতুর্কের প্রবর্তিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বর্জ্জন করিবেন। অভিজ্ঞগণ জানেন, কামাল আতাতুর্কের পরলোক-গমনের দেড় বৎসর পূর্ব্বে তুরস্কের প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদই তাঁহাদের সেই বিরোধের একমাত্র কারণ। কামাল আতাতুর্ক জীবিত থাকিতে এই মতভেদের অবসান হয় নাই।
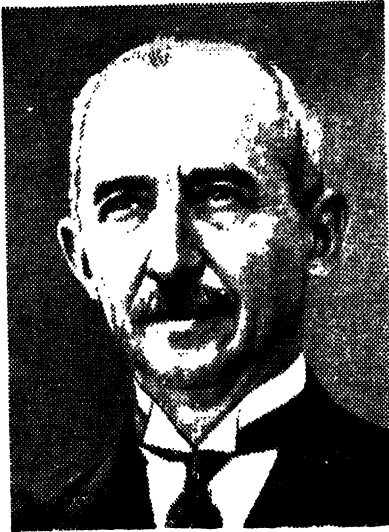
ইসমেৎ ইনোয়েন্নু

মিশরের নবীন নৃপতি ফারুক

সেই সময় কামাল আতাতুর্ক তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া এই মর্ম্মে তাঁহাকে শপথ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর যদি প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার পদে নির্ব্বাচিত হইতে হয়, তাহা হইলে তিনি যেন ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত নীতির কোন পরিবর্ত্তন না করেন; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ইসমেৎ তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা হয়। গত নভেম্বর মাসে মৃত্যু-শয্যাশায়ী কামাল আতাতুর্ক জানিতে পারেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ইসমেৎকেই তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হইবে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি তুরস্কে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোক-গমনের পর সেই নীতি পরিত্যক্ত হইবে; তাঁহার দীর্ঘকালের সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। এই চিন্তায় মৃত্যুকালে তিনি শান্তি-লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রেসিডেণ্ট ইনোয়েন্নু যে সময় তুরস্কের সুলতানের সৈন্যদলে কর্ণেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় কামাল পাশা সেই সৈন্যদলে সামান্য সব-অণ্টার্ণের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের অবসানে কর্ণেল ইনোয়েন্নু সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গ্রীসোতুর্কি যুদ্ধের পর কামাল আতাতুর্ক সেনাপতি ইনোয়েন্নুর অপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কামাল পাশা কোন দিন মুসলমান ধর্ম্মের আচারানুষ্ঠানের অনুসরণ না করিয়া সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ ও নৃত্যগীতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে নিষিদ্ধ সুরাপান করিতেন, এবং মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া-থাকিয়া আমোদপ্রিয় ইয়ার-বন্ধুবর্গ লইয়া স্ফূর্ত্তি করিতেন; কিন্তু ইনোয়েন্নু মুসলমান ধর্ম্মের কোন অনুশাসন অগ্রাহ্য করিতেন না। ধার্ম্মিক মুসলমানগণের অনুষ্ঠিত সকল আচার-ব্যবহারই তিনি মানিয়া চলিতেন, সুরা স্পর্শ করিতেন না, এবং রাত্রি জাগিয়া বন্ধুগণের সহিত স্ফূর্ত্তিও করিতেন না। তিনি প্রত্যহ সকালে সাড়ে সাতটার সময় যথানিয়মে শয্যা ত্যাগ করিতেন। কামাল আতাতুর্ক কোন দিন মসজেদে প্রবেশ করিতেন না; কিন্তু ইনোয়েন্নু প্রত্যহ নিয়মিতভাবে উপাসনায় যোগদান করিতেন; ধার্ম্মিক মুসলমানের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল। এজন্য তিনি ধর্ম্মানুরাগী নিষ্ঠাবান্ মুসলমান নেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর জনরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তুরস্কের নেতৃত্বে প্রাচ্যভূখণ্ডে আরবগণের চেষ্টায় ধর্ম্মসংক্রান্ত একটি নূতন প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইবে, এবং তুরস্কই পুনর্ব্বার মুসলমান ধর্ম্ম-জগতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে।

গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে মিশর-রাজধানী কায়রো নগরে আরব নেতৃবৃন্দের একটি বৈঠক বসিয়াছিল; প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা নিরূপণের জন্য লণ্ডন নগরে যে সভার অধিবেশন হইতেছে, সেই সভায় কিরূপ আলোচনা করা হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্যই এই বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নুরী পাশা এই বৈঠকের প্রস্তাবে আশা করিয়াছিলেন, "এই সভায় আরবগণের একটি আন্তর্জ্জাতিক সমিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রত্যেক দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করিবার ভার গ্রহণ করিবে।"

সকলেই জানেন, কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক হইতে সুলতানকে বিতাড়িত করিবার পর তুরস্কে কাহাকেও খলিফের পদ প্রদান করা হয় নাই।

গত জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে মিশরের নবীন নরপতি ফারুক

কায়রোর প্রধান উপাসনাগার কুয়োৎসুম মসজেদে ভক্তবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া ইমামের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় এই মসজেদে মিশরপতির যে সকল আরব অতিথি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত সাউদী আরব ও ইমেনের বিভিন্ন রাজা ও সর্দার-পুত্রগণও যোগদান করিয়াছিলেন। রাজা ফারুক যথানিয়মে নামাজ শেষ করিয়া ইসলামের গৌরব বিঘোষিত করিলে তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ সমস্বরে বলিয়াছিলেন, "খালিফ দীর্ঘজীবী হউন।"

বিভিন্ন দেশের যে সকল রাজপুত্র এই মসজেদে উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের রাজগণ খালিফত্ব লাভের জন্য এরূপ ব্যাকুল যে, রাজা ফারুককে তাঁহার সমর্থকগণ খালিফ বলিয়া অভিহিত করায় ঐ সকল দেশের রাজপুত্ররা রাজা ফারুকের এই দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই, তুরস্কেই তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ।

আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্

প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি উইলিয়াম বট্‌লার ইয়েট্‌স্ গত জানুয়ারী মাসের শেষে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডের কবি-সমাজে যে আসন শূন্য হইয়াছে, তাহা শীঘ্র পারপূরণের সম্ভাবনা নাই।

উইলিয়াম ইয়েট্‌স্ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুন আয়ার্ল্যাণ্ডের স্যাণ্ডিমাউণ্ট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা খ্যাতনামা চিত্রকর ছিলেন। ইয়েট্‌স্ শৈশবে ও প্রথম যৌবনে আয়ার্ল্যাণ্ডের হ্যামারস্মিথ ও ডবলিন নগরে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘকাল নিয়মিতভাবে শিক্ষালাভ করেন নাই, এবং তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উচ্চ-শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; তথাপি তিনি অসামান্য কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্লিগো অঞ্চলের মাতুলালয়ে বাস করিতেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে কবিত্বের বীজ-বপনে সাহায্য করিয়াছিল।

ইয়েট্‌স্ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে লণ্ডনে গমন করেন, এবং বিখ্যাত ইংরেজ লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সম্পাদিত 'The Yellow Book' নামক গ্রন্থকে রচনা-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'The Wonderings of Disin' প্রকাশ করেন।

এই সময় লণ্ডনের সাহিত্য-সমাজে ইয়েট্‌সের প্রতিভার সমাদর আরম্ভ হইলে তিনি লণ্ডনের কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের সহযোগে একটি সাহিত্য-চক্র সংগঠন করেন। ইয়েট্‌স অতঃপর দীর্ঘকাল একান্ত মনে কাব্যকলার সেবায় রত থাকায় তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করেন; ইংরেজী সাহিত্য-সমাজে তাঁহার কবিতার খ্যাতি ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে। কিন্তু তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করিলেও তাঁহার কবিতা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ্‌-রূপে আইরিশ কবিতার বিশেষত্বেও বঞ্চিত হয় নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে ইয়েট্‌স প্রথম শ্রেণীর কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া যুগের কবিগণের তিরোধানের পর ইংরেজী কবিতাক্ষেত্রে কোন উচ্চশ্রেণীর কবির আবির্ভাব হয় নাই, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রণ, অথবা শেলীর অভাব পূরণ করিতে পারেন এরূপ কোন প্রতিভাবান্ ইংরেজ কবি এই যুগের পর ইংলণ্ডে আবির্ভূত হইয়া ইংরেজী-সাহিত্য কবিত্বসম্পদে সমৃদ্ধ করিতে পারেন নাই। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের এই পতনের যুগে আইরিশ কবি ইয়েট্‌সই ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের দৈন্য দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তিনিই অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কাব্যসাহিত্যের শৃঙ্খল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; এ জন্য ইংরেজী কাব্য-জগতে তাঁহার গৌরব স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এ বিষয়ে ইংরেজী সাহিত্যের সেবকগণের মতভেদ নাই, এবং এই কারণেই পরিণত বয়সেও তাঁহার মৃত্যু ইংরেজী কবিত্বের দিক্ দিয়া ক্ষোভের কারণ হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতেই ইয়েট্‌সের রচিত গ্রন্থাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হইতে থাকে। তাঁহার রচনাশক্তি কেবল

আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্

কবিত্বেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নাট্যকার, প্রবন্ধ-লেখক, সমালোচক, এবং অনুবাদকরূপেও তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আত্ম-জীবনী' ইংরেজী সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব দান। যাঁহারা তাঁহার আত্মজীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতিতে' ইহার প্রভাব পরিস্ফুট দেখিয়া সম্ভবতঃ বিস্মিত হইয়াছেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাব্‌লিন নগরে 'আইরিস্ লিটেরারি থিয়েটারের' উদ্বোধন হইলে—ইয়েট্‌স্ তাঁহার রচিত অনেকগুলি নাটক এই রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি 'অ্যাবি' রঙ্গালয়ের পরিচালকগণের অন্যতম ছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি রঙ্গালয়ে অভিনয়োপযোগী করিয়া কতকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার নাট্য-প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নাটকগুলি গল্পের মাধুর্য্য ও ভাষার সরসতায় জন্য

রঙ্গালয়ের দর্শকগণের প্রীতিকর হইয়াছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের অতীত যুগের কথা ও কাহিনী, কিংবদন্তী ও প্রবচন প্রভৃতি অবলম্বনে ইয়েট্‌সের নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল।

ইয়েট্‌স যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সমালোচকগণ সাধারণতঃ তাহা তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল কবিতায় তাঁহার জীবনের পরিণতির প্রভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতাগুলিতে ভাবের প্রগাঢ়তা অপেক্ষা ভাষার আবেগ ও উচ্ছ্বাস অধিক। তাঁহার দ্বিতীয় স্তরের কবিতায় ভাষার ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা ভাবের অধিকতর গভীরতা পরিস্ফুট। তাঁহার তৃতীয় স্তরের কবিতাগুলি পাঠক সাধারণের দুর্বোধ্য রহস্যের কুহেলিকা-জালে সমাচ্ছন্ন! রবীন্দ্রনাথের বার্দ্ধক্যের কবিতা সম্বন্ধেও অনেকেই এইরূপ অভিমত পোষণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইয়েট্‌সের কবিতা-গ্রন্থে যে কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ আরম্ভ হইয়াছিল, ৪০ বৎসর পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শেষ কবিতাগুচ্ছ তাহার পরিণতি বলিয়া খ্যাত।

বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদেও ইয়েট্‌স যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার বহু অনুবাদে ইংরেজী-সাহিত্য সমৃদ্ধ। তিনি এসিয়ার বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতীয়, চীন ও জাপানী সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন; এবং ভারতের উপনিষদের রস গ্রহণ করিয়া তাহাদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনূদিত শফোক্লিশের দুইখানি সরস নাটকও রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল।

আইরিশ সরকার ইয়েট্‌সের গুণের পুরস্কার প্রদানে কার্পণ্য করেন নাই। আয়র্লণ্ডে জাতীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে আইরিশ সরকার তাঁহাদের জাতীয় কবিকে সিনেটার মনোনীত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইয়েট্‌স ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যে রসরচনার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। এই অর্থ তিনি স্বদেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে দান করেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি তাঁহার চেষ্টায় প্রসিদ্ধি লাভ করায় নোবেল পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। এই আইরিশ কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সমালোচনা-শক্তির সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই ভূমিকা তাঁহার গদ্যরচনার আদর্শরূপে ইংরেজী সাহিত্য-সমাজে সমাদৃত। ইয়েট্‌সের মৃত্যুতে কেবল ইংরেজী ও আইরিস্ সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল এরূপ নহে, আমাদের দেশের সাহিত্যেরও একজন গুণগ্রাহী সুহৃদের অভাব হইল, এ জন্য শিক্ষিত ভারতবাসীও তাঁহার মৃত্যুতে বন্ধুর বিয়োগদুঃখ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যে তিনি অমর হইবেন।

জার্ম্মাণীর নির্ব্বাসিত কাইজারের জন্মতিথি উৎসব

জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব কাইজার ২য় উইলহেম হোহেনজোলার্ণ ২০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে এডল্ফ হিটলার অপেক্ষাও মহা-পরাক্রান্ত ছিলেন, এবং সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির ভাগ্যবিধাতা হইলেও, তিনি দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া য়ুরোপব্যাপী যে সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অবশেষে তাঁহাকেই দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। তিনি সমগ্র য়ুরোপের সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিয়াছিল; এতকাল পরেও নির্ব্বাসনে তাঁহাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। নিত্য তিনি অতীত স্মৃতির সুতীব্র দংশন-জ্বালা সহ্য করিতেছেন। গত জানুয়ারী মাসের শেষে হার হিটলারকে তাঁহার এই পতনের কথা স্মরণ করিতে বলা হইয়াছিল; কারণ, হিটলারও তাঁহার ন্যায় দুরাকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হিটলার কি এই উপদেশে কর্ণপাত করিয়াছেন? ভূতপূর্ব্ব কাইজার ২য় উইলহেম ও হিটলারের অবস্থা একরূপ নহে। জার্ম্মাণীর মহা-সম্ভ্রান্ত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাইজার ২য় উইলহেম পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন; অবশেষে কর্ম্ম-ফলে তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া বার্দ্ধক্যে দেশান্তরে সুদীর্ঘ নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতে হইতেছে। কিন্তু এডল্ফ হিটলার অজ্ঞাত-কুলশীল সাধারণ গৃহস্থের পুত্র, দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সৌভাগ্যক্রমে আজ

ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাটের জন্মতিথি-উৎসবে

তিনি শক্তিশালী জার্ম্মাণ জাতির অধিনায়ক; তাঁহার কর্ম্মফলে আবার এক দিন হয় ত তাঁহাকে চরম দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। সেই দুর্দ্দিনের কথা চিন্তা করিয়া তিনি হয় ত বলিবেন, 'ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়!' কিন্তু যে পথে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার প্রতিনিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

২য় উইলহেম হোহেনজোলার্ণ ভাগ্যদোষে হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত হইলেন, এবং সর্ব্বত্যাগী হইয়াও হার হিটলারের অনুগ্রহে বার্ষিক ৮ হাজার ৪ শত পাউণ্ড বৃত্তিতে নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেও, তিনি হল্যাণ্ডের ডুর্ণ-হাউস নামক বাসভবনে তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনের একবিংশ বর্ষে তাঁহার ৮০তম জন্মতিথির উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ডুর্ণ-হাউসে তিনি তাঁহার জন্মতিথির উৎসব সম্পন্ন করিলেও জার্ম্মাণীতে তাঁহার পক্ষপাতী যে সকল কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাদিগকে তাঁহার অনুকূলে 'টোষ্ট' পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং আদেশ করিয়াছিলেন,

তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে জার্ম্মাণীতে যেন উৎসবের কোন আয়োজন করা না হয়।

শুভ্র দাঁড়ি-গোঁফ এবং পক্বকেশধারী উইলহেম এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহার পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও তাঁহার যে সকল বিশিষ্ট বন্ধুবর্গকে তাঁহার বাসভবনে সমবেত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে; বস্তুত: দেখিলে মনে হইত—যেন 'চাঁদের হাট' বসিয়াছিল। সকলেই পরমানন্দে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ উইলহেম তাঁহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত শুভ্র গোঁফ-জোড়াকে পরিপাটীরূপে বুরুষ করিয়া সেকালের জার্ম্মাণ 'লাইফ গার্ডে'র শুভ্র ও চাকচিক্য-সম্পন্ন য়ুনিফর্ম্মে সজ্জিত হইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছদে তিনি যে ভোজসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, সেই সভায় সমাগত আত্মীয় বন্ধুগণের বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গের পরিহিত হীরক-জহরতাদিখচিত মহামূল্য বিচিত্র অলঙ্কারসমূহ উজ্জ্বল বিজলী-প্রভায় ঝকমক করিতেছিল, এবং সেই আলোক তীক্ষ্ণধার তরবারি-ফলকে প্রতিফলিত হওয়ায় নির্ব্বাসিত কাইজারের অতীত জীবনের গৌরব-স্মৃতিই সভাসীন পুরুষ ও মহিলাগণের মনে উদিত হইয়াছিল। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ উইলহেম নির্ব্বাসিত অবস্থায় নিয়ত কিরূপ অর্থকষ্ট সহ্য করিতেছিলেন, তাঁহার জন্মতিথি উৎসবের সেই আড়ম্বরের মধ্যে তাহা বোধ হয় কাহারও চিন্তা করিবার অবসর হয় নাই। জার্ম্মাণীতে উইলহেমের যে সকল ভূসম্পত্তি তাঁহার খাস-দখলে ছিল, তাহার রাজস্ব হিসাবে প্রতিবৎসর ৩৫ হাজার পাউণ্ড তাঁহাকে প্রদান করা হইত; কিন্তু হাতী পাঁকে পড়িলে ভেকও তাহাকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এই প্রবচনের প্রমাণস্বরূপ হিটলার তাঁহার প্রাপ্য এই মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৮ হাজার ৪ শত পাউণ্ড বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব কাইজারের বার্ষিক আয় ছিল ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাসনের পর তাহা পৌনে দুই লক্ষ (১ লক্ষ ৭৫ হাজার) পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছিল! এই আয় হইতে তাঁহাকে রাজ-বংশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ১৭টি বিভিন্ন পরিবারকে সাহায্য করিতে হইত; এই সকল পরিবারে যে সকল লোক ছিল, তাহাদের সংখ্যা ৪৯ জন। এই সকল সাহায্য দান করিয়া তিনি জার্ম্মাণী হইতে বার্ষিক ৮ হাজার ৪ শত পাউণ্ড মাত্র বৃত্তি পাইতেছেন। বিশাল জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বরের ইহাই এখন বার্ষিক আয়! প্রকাশ, হার হিটলার ইহারও কিয়দংশ কর্ত্তন করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া নির্ব্বাসিত কাইজার হার হিটলারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে হিটলার লিখিয়াছেন, ঐ প্রকার প্রস্তাব তাঁহার অজ্ঞাত। (professed no knowledge of any cut in the allowance of the Ex K iser)

যাহা হউক, ভূতপূর্ব্ব কাইজারের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৃটেন হইতে রাজা জর্জ্জ, রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং রাজমাতা রাণী মেরী তাঁহার নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়া তাঁহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্রিন্স লুই ফার্দ্দিনাণ্ড এবং তাঁহার রূপবতী পত্নী এই ভোজসভার শোভা-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। লুই ফার্দ্দিন্যাণ্ড ভূতপূর্ব্ব কাইজারের পরম প্রীতিভাজন পৌত্র, এবং সুপ্রসিদ্ধ হোহেন-জোলার্ণ রাজবংশের একমাত্র আশাস্থল। তাঁহার পত্নী গ্র্যাণ্ড ডচেস কায়রা রুশিয়ার জারের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। ভূতপূর্ব্ব কাইজার ইঁহাদের উভয়কেই যৎপরোনাস্তি স্নেহ করেন। ভবিষ্যতে যদি কখন রুশিয়ায় বা জার্ম্মাণীতে রাজবংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর শাসনভার ইঁহারাই লাভ করিবেন, ভূতপূর্ব্ব কাইজারের ইহাই বার্দ্ধক্যের একমাত্র সুখস্বপ্ন।

ভালবাসি কেন বেদনার গান

ভালবাসি কেন বেদনার গান কেন তাহা গেয়ে থাকি—
গভীর নিশীথে নিরালায় কেন বেদনার ছবি আঁকি?
বাল্মীকি তার ক্রৌঞ্চ-মিথুন তরে
বেদনার জলে পরাণের বাণী ঝরে,
সেই বাণী হলো আদি যে কবিতা বুঝিলে কিছু কি সাকী?
বেদনা যে তাই আঁকি।

বিস্মৃতি আর অভিশাপ যদি নাহি নিত কালিদাস
ভয় করুণায় বাদ দিত যদি অশ্রু দীরঘ-শ্বাস,—
তাহ'লে ফুটিত শকুন্তলার রূপ?
উঠিত নভে কি মনের গন্ধ ধূপ?
মহাকাব্যের রামায়ণ সে'ও সীতার বেদন-রাশ,—
—ভাল তাই ব্যথা-ভাষ।

বার্ণাড-শ'র বুকে বেজেছিল বিশ্ব-নরের ব্যথা—
অতি বড় কবি ছিল তাই সে যে ভোলেনি কেহ সে-কথা;
পরের বেদনে শেলীর নয়ন জল
কবিতা হ'য়েই ছেয়েছে ধরণীতল:
ওয়ার্ডওয়ার্থের জীবনে এসেছে শত দুঃখ অসারতা
না জানে আজিও কে তা?

শা-জিহারেরই কাহিনী শুনেছ সুন্দর কত বল—
সুন্দর করি রাখিছে ধরায় বেদনার আঁখিজল;
কলুষিত যাহা দুঃখের অনলমাঝে
খাঁটী সোনা হ'য়ে বিশ্ব-সভায় রাজে,
দুখের গানেতে স্বর্গ আসিয়া ভরে যে ধরণীতল
ভালো তাই আঁখিজল।

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ (বি-এ)।

[উপন্যাস]

৩৩
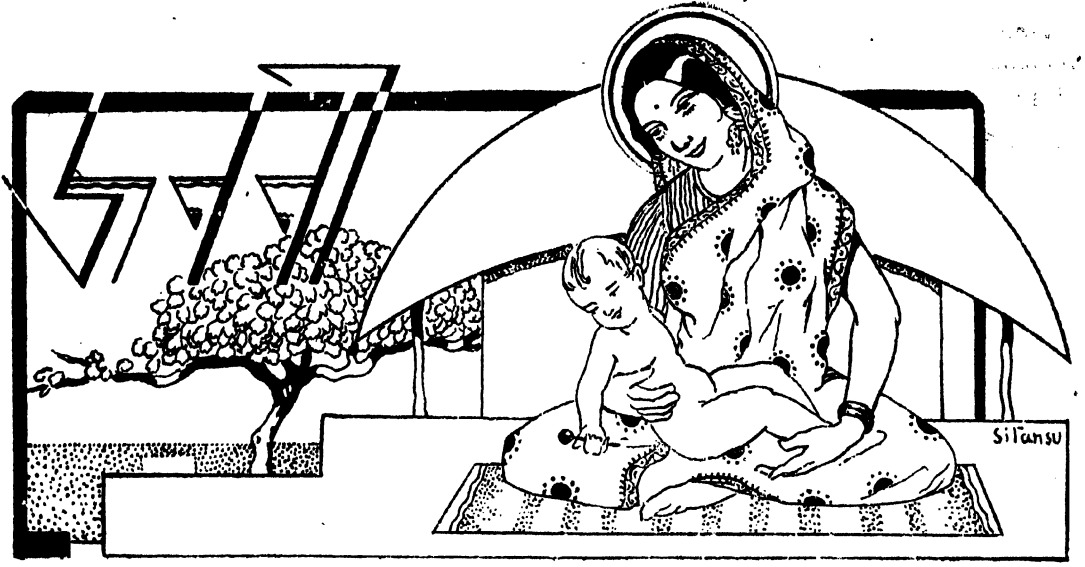
বহু অনুসন্ধানে কণার জন্য যে পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, তাহার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ সকলেরই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হইল। এই "সকলের" বলিতে দুই জনকেই বুঝায়—পূর্ণিমা ও রেণু। কারণ, নীরেন্দ্র এ বিষয়ে—অন্যান্য বিষয়েরই মত—সম্পূর্ণভাবে এই দুই জনের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ তাহার এই স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য রেণুর সহিত এক দিন ব্যবহারে তাহার ভুলের পর হইতে যেন আতঙ্কে পরিণত হইয়াছে—পাছে, সে আবার ঐরূপ কোন ভুল করে। তাহা না হইলে সে কখনই দেবদত্তকে রেণুর মাসীমা'কে দিতে দিত না। কারণ, সে স্বভাবতঃ স্নেহশীল এবং তাহার এই পুত্রের প্রতি তাহার স্নেহ প্রকাশপথ না পাইয়া তাহাকেই সর্ব্বদা পীড়িত করিত।

কালিদাসের ব্যাখ্যাকার বিবাহে বর-সম্বন্ধে কে কি আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা লিখিয়াছেন :—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

অর্থাৎ কন্যার ইচ্ছা বর রূপবান হউন, মাতা ধনবান্ জামাতা চাহেন, পিতা বরের বিদ্যাবত্তা ইচ্ছা করেন; বান্ধবগণের কামনা—বর সৎকুলজ হউক, আর অন্য লোক মিষ্টান্নের আশাই করে। বর্ত্তমানকালে এই উক্তির কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। এখন বান্ধবদিগের কথায় কেহ বড় গুরুত্বারোপ করে না; কেন না, সমাজের পূর্ব্ব-বন্ধন শিথিল হইয়াছে; "অপর সকলের" কথা বিবেচ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুতরাং অবশিষ্ট—মাতা, পিতা ও কন্যা স্বয়ং। এই ক্ষেত্রে কন্যা স্বয়ং কোনরূপ মত প্রকাশ না করিলেও যে পাত্রের সন্ধান মিলিল, তাহার রূপের অভাব নাই। সে বিত্তবান্ এবং বিদ্বান্। রেণু কন্যার মাতা না হইলেও মা'র অধিক এবং তাহার মতই সকলের মত অপেক্ষা অধিক আদৃত। তাহার কারণ, পূর্ণিমা মুখে বলিতেন—"দেখ, মা, আমি সেকালের লোক; এখন সব ধরণ বদ্‌লে গেছে; তুমি যা' ভাল বুঝবে, তা'ই কর।"—মনে মনে তিনি জানিতেন—রেণু সর্ব্বতোভাবে কণার কল্যাণকামনাই করে এবং তাঁহার দিন যখন ফুরাইয়া আসিয়াছে, তখন যাহা করিবার রেণুকেই করিতে হইবে।

বাস্তবিক রেণু মুখে যাহাই বলুক, সে তাহার অন্তর পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছে, তাহার স্নেহে সে কণাকে বঞ্চিত করিতে পারে নাই; পারিবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, কণাকে স্নেহে বঞ্চিত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে—চুম্বক যেমন স্বভাবজ গুণে লৌহকে আকৃষ্ট করে, কণা তেমনই সকলের স্নেহ আকৃষ্ট করে। তাহার পর কণা তাহাকে পাইয়া আপনাকে আর মাতৃহীনা বলিয়া মনে করিতেই চাহে নাই। কণা যে ভাবে স্নেহে লালিতা-পালিতা, তাহাতে সে যে বিদ্বান্ পাত্রে—ধনীর ঘরে বিবাহিতা হইলেও কখন

"বৌ-গাদার" বধূ হইলে স্বস্তি পাইবে না, তাহা রেণু বুঝিত এবং বুঝিত বলিয়াই অন্য দিকে আদরণীয় বহু সম্বন্ধ-প্রস্তাব সে-ই বর্জ্জন করিয়াছিল। এক জন ঘটকী বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিয়াছিল, "মা গো মা, তোমরা যে দেখছি, কম্বলের লোম বাছা ক'রে সম্বন্ধ বাছছ। তোমাদের মনের মত সম্বন্ধ আনা আমার সাধ্য নয়।" এমন কি, পূর্ণিমারও এক একবার মনে হইয়াছে—কন্যার অদৃষ্ট সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইলেও হয়ত চলে না। কিন্তু তিনি রেণুর মতেই মত দিয়া গিয়াছেন। তাহার কারণ, সব দায়িত্ব রেণুকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাকে সে-ই দায়িত্ব গ্রহণ করাইতে পারিলে তাঁহার আর কোন চিন্তা বা ক্ষোভ থাকিবে না। তাই ঘটকীদিগকে তিনি বলিতেন, "বাছা, আমরা বুড়া মানুষ—মেয়ের মা'কে সব বল।" মেয়ের মা! যে সব ঘটকী জানিত—রেণু মেয়ের বিমাতা, তাহারা হয়ত একটু হাসিত, কিন্তু রেণুর দৃষ্টির সম্মুখে সে হাসি আর ফুটিতে পাইত না।

এই সম্বন্ধটি যখন রেণুর মনোমত হইল, তখন পূর্ণিমা বলিলেন, "দেখ মা, আমাদের পরামর্শ করবার লোকও অধিক নাই; আছেন কেবল বেহান। তাঁ'র বুদ্ধিও এত বিমল যে, তাঁ'র পরামর্শ আমি সকলের পরামর্শের উপর মনে করি। এক বার তাঁ'র মত জান্‌তে হ'বে; তুমি এক বার তোমার মাসীমা'র সঙ্গে পরামর্শ কর।" এই বিষয়ে রেণু পূর্ণিমার সহিত একমত। সে বলিল, "মাসী-মা'কে তবে একবার আস্‌তে বলি?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "সে কি হয়? তুমি তাঁ'র কাছে যাও।"

"আপনি যা'বেন না?"

"তাঁ'র কাছে যেতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করে—তাঁ'র কথা শুনলে মন জুড়ায়, তাঁ'কে দেখলে পুণ্য হয়। কিন্তু আমি যে সদাই ভয়ে ভয়ে থাকি, যদি সেখানে গিয়ে অসুখ বোধ হয়, তবে তাঁ'কে বিব্রত করা হ'বে।"

"আপনি অত ভয় পাবেন না।"

"তুমি ভরসা দিলেই আর ভয় করি না—ভার ত তোমার, দায়ও তোমার। আমি ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই—তোমাকে না পেলে আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত।" তাঁহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

রেণু বলিল, "কি যে আপনি বলেন!"

"না, মা; আমি মনের কথাই বলি।"

"আমি যদি ছেলেমানুষ হতাম, তবে আপনি আমাকে আদর দিয়ে মাটী করতেন।"

"মা, তোমার মত বৌ না পেলে কণা আর অশোককে নিয়ে আমি কি করতাম?"

রেণু একটা কাযের ছল করিয়া উঠিয়া গেল। তাহার যাইবার উদ্দেশ্য—আপনার উদ্বেল মনোভাব সংযত করা—তাহার বিকাশ গোপন করা। সে নানা কথা ভাবিতে-ছিল—বাস্তবিক পূর্ণিমার স্নেহ অপরিসীম; আর কণা ও অশোক সত্য সত্যই তাহাকে মা মনে করে। কিন্তু অদৃষ্টের কি কঠোর বিধান—সে কিছুতেই সুখী হইতে পারিল না!

সেই দিন অপরাহ্নে পূর্ণিমা রেণুকে লইয়া মৃণালিনীর গৃহে উপনীতা হইলেন। মৃণালিনী তখন ঠাকুর-ঘর হইতে আসিয়া কি পড়িতেছিলেন। রেণু জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি পড়ছেন, মাসীমা?"

মৃণালিনী বলিলেন, "ও কিছু নয়।"

"কিছু নয় কি?" বলিয়া রেণু পুস্তকখানা তুলিয়া লইয়া দেখিল এবং বিস্মিতভাবে মাসীমা'র দিকে চাহিল। এ কি! মাসীমা একখানি ইংরেজী বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে একখানি অভিধান ছিল।

রেণু বলিল, "মাসীমা কি এখন গীতা ছেড়ে—এই পড়ছেন?"

"না, মা, গীতা ত ছাড়তে পারি না—সে পরকালের সম্বল—তা' না হ'লে চলে না। কিন্তু যে ইহকাল মুছে আস্‌ছিল, তুই যে আবার তা'কে ফুটিয়ে তুললি।"

"আমি কি করলাম, মাসীমা?"

"তুই যে দেবদত্তের ভার আমার উপর দিয়ে গেলি।"

"তাই তুমি এই কায করছ?"

"দেখ, তোর মেস মশায় বল্‌তেন, যা' করবার মনে হয়, তা' ভাল ক'রে করতে হয়। যখন কর্ত্তব্য মনে ক'রে কায নিয়েছি, তখন সে কর্ত্তব্য পালন করতে হ'বে।"

পূর্ণিমা শ্রদ্ধায় যেন নির্ব্বাক্‌ হইয়াছিলেন, এই বার বলিলেন, "আপনি কি দেবুকে পড়ান?"

"না, বেহান—সে বিদ্যা কি আমার আছে? কিন্তু ও যা' পড়ছে, তা'র উপর লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করি।

ইংরেজী তাঁকেও পড়তে শুনেছি—দিন কয়েক দেবুর মাষ্টারের উচ্চারণ শুনে মনে কেমন সন্দেহ হ'তে লাগল। তাই চেষ্টা ক'রে দেখছি, যদি ওর কোন কাযে লাগি।"

পূর্ণিমা বলিলেন, "পা'র ধুলা দিন, বেহান। আপনি ধন্য।"

তিনি হাত বাড়াইলে মৃণালিনী ব্যস্তভাবে হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "করেন কি ?"

পূর্ণিমা বলিলেন, "সত্য কথা বল্‌তে কি, আমার সময় সময় বৌমা'র উপর অভিমান হয়েছে—ছেলেকে কেন নিজের কাছে থাক্‌তে দিলেন না! আজ আমার সে অভিমান দূর হয়ে গেল। নীরেনের বহু পুরুষের ভাগ্য যে, তা'র ছেলে আপনার কাছে মানুষ হচ্ছে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "ও কথা বল্‌বেন না, বেহান।"

রেণু ভাবিল, সে অভিমানভরে যে কায করিয়াছিল, তাহাতে সে মা'র কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছে। তাহার মনে হইল, তাহার মনের ভার একটু লঘু হইল।

তাহার পর তিন জন কণার বিবাহের প্রস্তাবের আলোচনা করিলেন। সব শুনিয়া মৃণালিনী বলিলেন, "ভালই ত মনে হচ্ছে—কেবল কথা, আমরা যেমন বেহান পেয়েছি, রেণু তেমনই বেহান পা'বে ত ?"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু সে সংশয় মিটাই কেমন ক'রে ?"

"কিন্তু মিটাবার চেষ্টা করতে হ'বে। শাশুড়ী যদি দজ্জাল হয়, আর স্বামী যদি শক্ত না হয়, তবেই বিপদ।"

সে সংশয় মিটাইবার ভার মৃণালিনীকে দিয়া পূর্ণিমা রেণুকে লইয়া বিদায় লইলেন। ততক্ষণে দেবদত্ত স্কুল হইতে ফিরিয়াছে। পূর্ণিমা তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

গৃহে ফিরিবার সময় পূর্ণিমা রেণুকে বলিলেন, "তোমাকে অনেকগুলি অনুরোধ ক'রে, অনেক ভার দিয়ে যাচ্ছি—আর একটি অনুরোধ করব—যদি সময় পাও তবে মর্‌বার সময় কণা আর অশোকের সঙ্গে যেন দেবুকেও দেখতে দিও।"

মৃণালিনী যে কাযের ভার লইতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। তিনি যে পাত্রের সকল সংবাদ লইবার ভার পূর্ণিমার নিকট লইয়াছিলেন, সে কাযেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পাত্রপক্ষের পরিচয় লইয়া তাহাদিগের আত্মীয়-কুটুম্বের সন্ধান করিলেন এবং যশ ও অপযশ দাস-দাসীর মুখে ব্যক্ত হয় বুঝিয়া সেই দিক্ হইতে সংবাদসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন। পাত্রের মাতার পিত্রালয় হইতে যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাই নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক মনে করিয়া তিনি পূর্ণিমাকে বিবাহের প্রস্তাবে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিলেন।

তখন কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইল।

ক্রমে কার্য্যের অধিকাংশ ভারই মৃণালিনীর উপর পড়িল এবং তিনি সে বিষয়ে পূর্ণিমাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহে মৃণালিনীকে কার্য্যভার প্রদান—পূর্ণিমার নিকট বিশেষ স্বস্তির বিষয় হইয়াছিল। তিনি যেমন সকল কাযে রেণুকে সঙ্গে লইতেছিলেন, রেণুও তেমনই মাসীমা'র সঙ্গে কায করিতেছিল। শারীরিক অবস্থার সুযোগ লইয়া পূর্ণিমা যতটুকু পারিলেন সরিয়া থাকিলেন।

বিবাহের পর প্রথম বার শ্বশুরালয় হইতে ফিরিয়া জামাতা সুনীল কণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি শুনেছি, মা তোমার বিমাতা। তা'ই কি ?"

কথাটা সত্য—কিন্তু সত্য হইলেও তাহা কণার প্রীতিপ্রদ হইল না; সে বলিল, "আমিও তা'ই শুনেছি, কিন্তু কোন দিন তা' বুঝতে পারি নি।"

সুনীল বলিল, "মা'র ব্যবহারে স্বভাবতঃই তাঁ'র প্রতি ভক্তি হয়; তোমার কথায় আমার সে ভক্তি আরও বেড়ে গেল।"

কণা বলিল, "কিন্তু মা'কে যে ভক্তি করতে হয়, তা' মা কোন দিন আমাকে শিক্ষা দেন নাই।"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "সে কি শিক্ষা দিতে হয় ?"

"কেন ?"

"তোমাকে যে ভালবাসতে হয়, তা' কি তুমি আমাকে শিখিয়ে দিবে ?"

কণার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে লজ্জার সঙ্গে কি আনন্দ ও পরিতৃপ্তিও ছিল না ?

কণা বলিল, "শিক্ষা যে কেবল কথা ব'লে দিতে হয়, তা' নয়—ব্যবহারেও তা দেওয়া যায়। মা'কে আমি কোন দিন ভক্তি করিনি—কেবলই ভালবেসেছি।"

সুনীল শুনিতে লাগিল—"আমি যখন কোন মা'কে তাঁ'র ছেলেমেয়েকে তিরস্কার করতেও দেখি, তখন আমি বিস্মিত হই—মা কি ছেলেকে বকতে পারেন? কই,—আমাদের মা ত কোন দিন এতটুকু বিরক্তি প্রকাশও করেন নি!"

সুনীল হাসিয়া বলিল, "সে উভয় পক্ষেরই প্রশংসার কথা।"

"কেন?"

"ছেলেমেয়ে দুরন্ত হ'লে মা বিরক্ত না হ'য়ে পারেন না। কিন্তু তা'তে স্নেহের অভাব বুঝায় না।"

"দুরন্ত! তুমি অশোককে যদি ছেলেবেলায় দেখতে, তা' হ'লে আর ও কথা বল্‌তে না। ও যখন কোন আবদার ধরত, তখন ঠাকমা আর বাবা প্রমাদ মনে করতেন; কিন্তু মা'র কাছে গেলেই যেন আগুনে জল পড়ত।"

তাহার পর সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "আর যাঁ'কে তোমরা দিদিমা বল?"

"উনি দিদিমা। যে মা'র কথা শুনেছি, তাঁ'র মা নাই; যে মা'র কাছে মানুষ হয়েছি, তাঁ'র মা-ও তিনি আমাদের মা হ'বার আগেই দেহরক্ষা করেছিলেন; আমরা ঐ এক দিদিমাকেই জানি। উনি মা'র মাসীমা।"

"ঠাকমা ওঁর কথা মা'কে বলেছেন; শুনে আশ্চর্য্য মনে হয়।"

"তা'ই বটে।"

কণার বিবাহ উপযুক্ত পাত্রে হওয়ায় রেণুর আনন্দ লক্ষ্য করিয়া পূর্ণিমা ও মৃণালিনী উভয়েই বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন বটে, কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না। সে তাহার জীবনকে বিবাহাবধি যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তাহাতে সে অনেক সময়েই তাহার পিতৃবন্ধু প্রকাশচন্দ্রের তাহার সম্বন্ধে উক্তি স্মরণ করিত। সে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তাহার কর্ত্তব্য কি শেষ হইবে না? তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—কণা আর অশোক যদি তাহার সন্তান হইত, তাহা হইলে সে হয়ত তাহাদিগকে কাহারও কাছে রাখিতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহার সন্তানের অধিক, তাই "কণার বিয়ে দিয়ে তা'কে যখন 'পরঘরী' ক'রে দেবে—তা'র নিজের সংসার নিয়ে সে ব্যস্ত হ'বে—অশোকেরও সংসার ক'রে দেবে—তখন তোমার কর্ত্তব্য শেষ হ'বে। তখন কর্ত্তব্য থাক্‌বে কেবল স্বামীর সম্বন্ধে।"

তাহার তিনটি বন্ধনের একটি হইতে সে মুক্তিলাভ করিল; উপযুক্ত পাত্রে কণার বিবাহ হইয়াছে; সে শীঘ্রই তাহার সংসার লইয়া ব্যস্ত হইবে। তাহার পর—কিন্তু তাহারও যে অনেক বিলম্ব! অশোককে সংসারী করিতে হইবে। তাহার পর? রেণু স্থির করিয়াছিল—বধূকে সে তাহার শ্বশুরের ভার দিবে; তখন তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইবে।

সে যখন এই কথা মনে করিত, তখনও কিন্তু সে শান্তি পাইত না; কারণ, দেবদত্তের কথা যে তাহার মনে উদিত হইত না, তাহা নহে। সে তাহার ভার মৃণালিনীকে দিয়াছে—তাহার সে ভার-দান কত সার্থক হইয়াছে, তাহা সে বিশেষভাবেই বুঝিয়াছে। কিন্তু সে যেমন মন হইতে পুত্রকে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই; তেমনই মৃণালিনীও তাহাকে বলিয়াছেন, "তুমি যে ভার দিয়েছ, তা' আমি দেবতার দান ব'লেই নিয়েছি বটে, কিন্তু এ কথা যেন কখন ভুল না—মা'র কর্ত্তব্য হ'তে তুমি মুক্তি পা'বে না; আমার পরও তোমাকে সে কর্ত্তব্য কর্‌তে হ'বে। সেজন্য প্রস্তুত থেক।"

তিনি যখন সে কথা বলিয়াছিলেন তখন সে তাহার গুরুত্ব অনুভব করে নাই। কিন্তু তাহার পর বৎসরের পর বৎসর গিয়াছে, এই সময়ের মধ্যে সে দেখিয়াছে—মৃত্যুর মত কঠোর সত্য আর নাই। তাহার আগমন কখন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত, কখন মন্থর ও বিলম্বিত; কিন্তু সে আগমন অনিবার্য্য। এই সময়ের মধ্যে সে তাহার অতর্কিত আগমন দেখিয়াছে—তাহার পিতার সম্বন্ধে; আর এই সময়ের মধ্যে পিসীমা গিয়াছেন, প্রকাশচন্দ্র গিয়াছেন। আজ পূর্ণিমা যে স্থানে রহিয়াছেন, তাহা পদ্মার কূলের মত, যে কোন মুহূর্ত্তে নদীগর্ভে পতিত হইতে পারে। মাসীমা'রও বয়স হইতেছে। তিনি প্রস্তুত, কিন্তু সে কি তাঁহার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে? যদি সে মৃত্যু এখনই হয়, তবে সে দেবদত্তকে কাহার নিকট রাখিতে পারিবে? তাহা হইলে—সমুদ্রের বেলাবালুতে বালকের গঠিত খেলাঘর যেমন এক তরঙ্গে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহার এত দিনের সব ব্যবস্থা কি তেমনই হইয়া

ছন্দা

যাইবে না? যদি তাহা বিলম্বিত হয়, তবেই তাহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। সে কথা সে যখন ভাবিত, তখন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিত না। তাহার অদৃষ্ট-দেবতা কি তাহার সঙ্কল্পে অলক্ষ্যে হাসিতেছিলেন?

এদিকে সত্য সত্যই কণার বিবাহ দিয়া সে যেন এক-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় আর এক বন্ধনে বদ্ধ হইল। কণা তাহার কন্যাই রহিল এবং তাহার আকর্ষণে সুনীলও তাহার পুত্রের মত হইল।

পূর্ণিমা তাহা লক্ষ্য করিতেন। এক দিন তিনি মৃণালিনীর সহিত সেই কথার আলোচনা করিয়া বলিলেন, "বেহান, কেবল ভাবি, আর কেন? এই পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে মরিতেই চাই, কিন্তু সে সৌভাগ্য কি হ'বে।"

মৃণালিনী বলিলেন, "যদিও বঙ্কিম বাবু লিখেছেন, সময়ে কেহ মরে না; তবুও আপনার মরণ অসময়ে হ'বে না।"

৩৪

রেণু পূর্ণিমার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিত; ডাক্তাররা বলিয়াছিলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে একবার রোগের আক্রমণে প্রাণান্ত হইতে পারে। কণা যে দিন স্বামীর গৃহে গেল, সে দিন—কয় দিনের উত্তেজনায় ও তাহার গমনে অবসাদের ফলে তিনি বক্ষে যাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে রেণু তাঁহার প্রতি আরও অধিক মনোযোগ দিতে থাকে। সেই দিন সে ব্যবস্থা করিল, অশোক নীরেন্দ্রের নিকট রাত্রিতে শয়ন করিবে—সে পূর্ণিমার কাছে থাকিবে। পূর্ণিমা বলিলেন, "মা, এক মেয়ে তা'র ঘরে গেল ব'লে কি আর এক মেয়েকে কোলে টেনে নিচ্ছ?"

রেণু উত্তর দিল, "তা' নিব না?"

"কিন্তু আর ক'দিন? অনেক ভাগ্যে তোমার মত বৌ—মা পেয়েছি; কিন্তু তোমাকে দিয়ে সেবা করিয়েই গেলাম।"

"যে স্নেহ দিয়েছেন, তা' যে অসাধারণ, মা!"

কয় মাস কাটিল; মধ্যে মধ্যে বক্ষে বেদনা অনুভূত হইত—সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিবর্ণ ও নাড়ীর গতি অনিয়মিত হইত। তখনই ঔষধ দিয়া শুশ্রূষা করিয়া কোনরূপে সে আঘাত সহ্য করা সম্ভব হইত। কিন্তু রেণু লক্ষ্য করিয়াছিল—যত দিন যাইতে লাগিল, ততই আক্রমণের ব্যবধান হ্রাস পাইতে লাগিল, আর প্রতি আক্রমণের পর দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যে কণাকে ও সুনীলকে, আর দেবদত্তকে শেষ সময় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে কথা রেণু কণাকে ও সুনীলকে যেমন মৃণালিনীকেও তেমনই জানাইয়া রাখিয়াছিল।

এই ভাবে কয় মাস কাটিবার পর এক দিন অপরাহ্নে সহসা আক্রমণ আসিল। আক্রমণের বেগ দেখিয়া রেণু ভীত হইল। ব্যবস্থানুসারে তখনই কণাকে ও মৃণালিনীকে টেলিফোন করা হইল। সুনীল তখন গৃহে ছিল না; কিন্তু কণা সংবাদ পাইয়াই ব্যস্ত হইয়া আসিল। এদিকে মৃণালিনীও দেবদত্তকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ডাক্তার "ইন্‌জেকশন" দিয়া রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন—যেন ঔষধের কোন ক্রিয়া হয় নাই।

পূর্ণিমা এক বার মুদ্রিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন। রেণু বলিল, "মা, তোমার কণা এসেছে—মাসীমা দেবদত্তকে নিয়ে এসেছেন।"

পূর্ণিমা শুনিতে এবং শুনিলেও বুঝিতে পারিলেন কি না, বুঝা গেল না। তবে তাঁহার মুখে যাতনার যে চিহ্নটুকু ছিল; তাহা যেন প্রক্ষালিত হইয়া গেল-সে মুখে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল—মনে হইল, রাত্রির অন্ধকারাপগমে ফুল ফুটিয়া উঠিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন—বলিলেন, "সব শেষ।"

কণা কাঁদিয়া উঠিল। আর নীরেন্দ্র মাতৃহারা বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

অশোক যেন প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করিতে পারিল না। জ্ঞান হইবার পর মৃত্যুর সহিত তাহার এই প্রথম পরিচয়।

রেণু স্থির—কিন্তু যেন কতকটা স্তম্ভিত।

মৃণালিনীই কণাকে সান্ত্বনা দিলেন—পূর্ণিমার শেষ ইচ্ছা ছিল, তাহাকে সুপাত্রে অর্পিতা দেখিয়া যাইবেন। তিনি পুণ্যবতী, তাঁহার সে ইচ্ছাও পূর্ণ হইয়াছে। মানুষকে যাইতেই হইবে। তিনি যে পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে গিয়াছেন, ইহাই ভাগ্য বলিয়া মনে করা সঙ্গত।

তিনি নীরেন্দ্রকে বকিলেন, তাহাকেই স্থির হইয়া সকলকে শান্ত করিতে হইবে ; মা'র শেষ কায করিতে হইবে। তাহার অধীর হইলে চলিবে না।

হিন্দুর শাস্ত্র মৃতের সম্বন্ধে যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহাই এইরূপ শোকে মানুষকে স্থির হইবার উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

নীরেন্দ্র তাহার কর্ত্তব্য বুঝিল, বুঝিয়া তাহা পালন করিবার আয়োজন করিল।

ততক্ষণে সুনীল ও তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুনীলের পিতা যাহাকে "পাকা লোক" বলে তাহাই। তিনি অগ্রণী হইয়া সব ব্যবস্থা করিলেন।

তাহার পর শ্রাদ্ধের আয়োজন।

পূর্ণিমার মৃত্যুর পর রেণু বিশেষভাবে অনুভব করিল —তিনি সংসারে কি ছিলেন এবং সে তাঁহার জন্য কত অভাব অনুভব করিতে পারে নাই, কত দায়িত্ব বুঝিতে পারে নাই। তিনি যত দিন জীবিতা ছিলেন, তত দিন সব কাযের দায়িত্ব তিনি রেণুকে দিলেও তাহা তাঁহার ছিল। এখন তিনি নাই—সংসারে সব দায়িত্ব তাহার। এই সংসার সে কিছুতেই তাহার বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে নাই এবং সেই জন্যই সে দায়িত্ব স্বাভাবিক নিয়মে তাহার উপর ন্যস্ত হইলেও সে তাহাতে আগ্রহানুভব না করিয়া বরং তাহা ভার বলিয়াই মনে করিতে লাগিল। কণার শ্বশুর ও শাশুড়ী আসিয়া শ্রাদ্ধের বিষয়ে তাহার সহিতই পরামর্শ করেন, অথচ সে কোন বিষয়ে আপনার মত প্রকাশ করিতে শঙ্কানুভব করে। কোন বিষয়ে প্রয়োজন হইলে সে কেবল মাসীমা'র সহিত পরামর্শ করে। কণার শাশুড়ী এক দিন বলিলেন, "বেহান, আপনার বেহাই বলছিলেন, বেহান কি এখনও আপনাকে ক'নে বৌটি মনে করেন? শাশুড়ী ছিলেন—পর্ব্বতের আড়ালে ছিলেন ; এখন শক্ত হ'য়ে সব কায করতে হ'বে ; পরের গণ্ডা যেমন পরকে বুঝিয়ে দিতে হ'বে, আপনার যা' পাওনা, তা' তেমনই কড়া হ'য়ে কড়ায় কড়ায় বুঝে নিতে হ'বে ; চতুর না হ'লেই ফতুর হ'বেন।"

কথার যাথার্থ্য রেণু অনুভব করিল বটে, কিন্তু তাহার অবস্থা কে বুঝিবে?

কণা তাহাকে কেবলই বলিত, "মা, তুমি যদি এখনও সব কাযেই সঙ্কোচ বোধ কর, তবে আমি এসে দাঁড়াব কা'র কাছে?"

রেণু তাহাকে বলিয়াছিল, "কেন কণা, উনি আছেন— যাঁ'র বাড়া নাই, তিনি রয়েছেন—তুমি ও-কথা বলছ কেন?"

উত্তরে কণা বলিয়াছিল, "কিন্তু তুমি মা—তুমি কি নাই? বাবা স্নেহ করেন—কিন্তু মা'র যত্ন বাবা দিতে পারেন না। তুমি যা-ই কেন মনে কর না, আমি জানি— আমি তোমার মেয়ে, একমাত্র মেয়ে, আর তুমিই আমার মা। আমায় আদর তোমাকেই করতে হ'বে—আমার সব আবদার অত্যাচার তুমি যেমন সহ্য করেছ, তেমনই তোমাকেই সহ্য করতে হ'বে।"

বলিতে বলিতে কণা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। রেণু তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিয়াছিল, "মা-লক্ষ্মী, তুমি কি কোন দিন অত্যাচার করেছ?"

কণা তাহার কোন উত্তর দেয় নাই ; মা'র বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়াছে।

সে ক্রন্দনের বেদনা যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত রেণুর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তথায় বেদনার উদ্ভব করিয়াছিল। বাস্তবিক কণা ও অশোক তাহাকে কিছুতেই মনে করিতে দেয় নাই যে, সে তাহাদিগের মাতা নহে।

কণা বলিয়াছে, "মা, তুমি আমাকে দূর ক'রে দিতে চাইলেও আমি দূর হ'ব না ; তুমি যদি বিরক্ত হও, তবুও সে বিরক্তি আমি মা'র আশীর্ব্বাদ মনে ক'র্‌ব।"

যে এমন মনে করে, তাহাকে কি দূরে রাখা যায়? প্রকাশচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন, কণার বিবাহ দিলে তাহার একটি বন্ধন দূর হইবে—তাহাও কি হইবে না? তবে সে জানিত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইবে—কণা তাহার সংসারে সংসারী হইয়া পড়িবে।

তাহার লক্ষণ পূর্ণিমার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবার দুই মাসের কিঞ্চিৎ অধিক কাল পরে আত্মপ্রকাশ করিল। কণার শাশুড়ী লক্ষ্য করিলেন, কণার শরীর ভাল নাই—বিবমিষা দেখা দিয়াছে। তিনি কণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল বৌমা—এখানে থাক্‌বে, না বাপের বাড়ীতে যা'বে?"

কণা উত্তর দিল, "যদি পাঠান, মা'র কাছে যা'ব।"

শাশুড়ী বধূকে লইয়া আসিয়া হাসিয়া রেণুকে বলিলেন,

"এই নিন্ বেহান, আপনার আদরের মেয়ে, আপনি যা' হয় করবেন।"

রেণুর নূতন কায হইল। সে কাযের গুরুত্ব যেমন অধিক, তাহার দায়িত্বও তেমনই। তাহাকে যে কাযের ভার গ্রহণ করিতে হইল, তাহার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। সে কেবল মনকে সাহস দিত—চেষ্টায় যদি আন্তরিকতা থাকে, তবে তাহা ব্যর্থ হয় না; আন্তরিকতা ছিল বলিয়াই মাসীমা তাহার সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে কায করিয়াছিলেন, তাহা আর তাহার অজ্ঞাত নাই।

সে এই কার্য্যে সর্ব্বদা মাসীমা'র পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং সে ভয় পাইলে তিনিই তাহাকে সাহস দিতেন—মানুষের ক্ষমতা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; সুতরাং তাহাকে কেবল আপনার ক্ষমতায় নির্ভর না করিয়া আন্তরিক ভাবে কায করিতে হয়—সে কাযের ফল যাহা তাহা তাহার ক্ষমতার অতীত। তিনি প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেন—বহু দিন পাঠের ফলে তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু দিনের সাধনায় তিনি সেই উপদেশানুসারেই আপনার কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন। তিনি বহু বার রেণুকে উহা হইতে আপনার কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশে রেণু গীতা-পাঠও করিয়াছিল ও করিত। মাসীমা তাহাকে বলিতেন, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতেই হইবে—তাহাই ধর্ম্ম; সুতরাং ভয় পাইলে চলিবে না। তিনি বুঝাইতেন—"ভগবান্ মানুষকে উপদেশ—নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কর্ম্মেই যেন তা'র অধিকার হয়, কর্ম্মফলে নয়; আর কর্ম্মপরিত্যাগে যেমন তা'র কামনা না হয়, তেমনই যেন কর্ম্মফল তা'র কাযের হেতু না হয়। সে ত তুমি জান। বিশেষ যে কারণেই কেন হ'ক না, তুমি ত আপনার জীবনে ঐ উপদেশই সার্থক করেছ। তবে তোমার ভয় কি?"

তাঁহার উপদেশে রেণু হৃদয়ে বল পাইত। আর কণার শাশুড়ীর সাহায্য তাহার পক্ষে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। তিনি বৃহৎ একান্নবর্ত্তিপরিবারের সন্তান—সেই জন্য তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে রেণুর কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইত। সর্ব্বোপরি রেণুর কার্য্যে আন্তরিকতা ছিল।

অশোক মধ্যে মধ্যে দিদিকে বলিত, "দিদি, এই বার মা'কে জব্দ করতে হ'বে; মা'কে তোমার ছেলেকে দিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ী যা'বে ত?"

কণা বলিত, "আপাততঃ আমি মা'কে যে জব্দ করছি, তা' থেকে মা অব্যাহতি পেলে নিশ্চয়ই দিদিমা'র বাড়ীতে গিয়ে ঠাকুরের পূজা দিবেন।"

রেণু বলিত, "সে কথা সত্য, কণা। তবে জব্দ তুমি করছ না। মাসীমা'ই ঠাকুরকে পূজা দিবেন—তোমার ছেলে হ'লে তাঁর এ ত্রুটি হবে না।"

"সত্যই, মা, সময় সময় মনে হয়—তোমাকে কি কষ্টই দিচ্ছি! কিন্তু তা'তে আমার লজ্জা হয় না; আমি ভাবি—মা'কে যদি কষ্ট দি—সে ত মা'র পাওনা।"

এইরূপ কথা বলিয়া কণা যখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিত বা তাহার কোলে মাথা রাখিয়া ছোট ছেলের মত শুইয়া পড়িত, তখন রেণুর অন্তরে সত্য সত্যই মাতৃস্নেহের উৎস উৎসারিত হইত। সে যে কত চেষ্টায় সেই উৎসমুখ রুদ্ধ করিয়া রাখিত, তাহা সেই জানে। তাহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিত।

এক দিন অশোক দিদিকে তাহার সেই কথা বলিলে—রেণু অসতর্ক মুহূর্ত্তে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "কণা, এ কায ক'র না।"

শুনিয়া অশোক হাসিয়া উঠিয়াছিল—"দিদি, কেমন বলেছি, মা'কে জব্দ করার ঐ উপায়। দেখছ ত, মা ভয় পেয়েছে!"

কিন্তু কণা তাহা মনে করিতে পারে নাই! সে ভাবিয়াছিল, রেণু যে ভাবে কথাটা বলিল, তাহাতে ভয় প্রকাশ পায় নাই—বেদনাই সপ্রকাশ ছিল। অথচ সে ইচ্ছা করিয়াই তাহার পুত্রকে মাসীমা'কে দিয়া তাহাদিগকেই বুকে লইয়া রহিয়াছেন! তাহার এক বার মনে হইল, সে রেণুকে বলে, "মা, আমি সর্ব্বদা কাছে থাকি না—দেবুকে নিয়ে এস।" কিন্তু দুইটি বিষয় বিবেচনা করিয়া সে তাহা বলে নাই—প্রথম, দিদিমা দেবদত্তকেই তাঁহার জীবনের অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই অবলম্বনচ্যুত করা নিষ্ঠুরতাই হইবে। দ্বিতীয়,—ঐ বিষয়ের আলোচনায় রেণু সর্ব্বদা এমন বিরত থাকিয়াছে যে, পাছে সে বিরক্ত হয় সেই ভয়েও কণা তাহা বলিতে পারিল না।

রেণুর আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হইল না—যথাকালে কণার একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। প্রসব-বেদনা অনুভূত হওয়া হইতে প্রসব পর্য্যন্ত কণা তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহে নাই—রেণুকে তাহার কাছেই থাকিতে হইয়াছিল। দেখিয়া কণার শাশুড়ী মৃণালিনীকে বলিয়াছিলেন, "সার্থক মেয়ে তৈরী করেছিলেন বটে; ক'জন মা মেয়ের জন্য এমন করতে পারে?"

শুনিয়া মৃণালিনীর মন আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

নীরেন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া সূতিকাগারের সম্মুখে বারান্দায় ছিল; ধাত্রী যাইয়া তাহাকে সংবাদ দিল—কন্যা হইয়াছে। অশোক স্কুলে যায় নাই; পিতার কাছেই ছিল। সে বলিল, "বাবা, আমি কখন্ খুকী দেখব?" নীরেন্দ্র যখন বলিল, "বোধ হয়, বেশী দেরী হ'বে না।"—তখন সে সেই কথায় নির্ভর করিয়া স্থির হইতে পারিল না—দ্বারের নিকটে যাইয়া ডাকিল, "মা!" রেণু উত্তর দিল, "কি, বাবা?"

"বেশ লোক ত, আমি কখন্ খুকী দেখব?"

রেণু ধাত্রীকে বলিল, "একটু সব চাপাচুপী দেও—ও কিছুতেই শুনবে না।"

অল্পক্ষণ পরেই রেণু ডাকিল, "অশোক, এস।"

অশোক ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কখন্ দেখবেন?"

রেণু সে প্রশ্নের উত্তর দিল না; ধাত্রী বলিল, "তুমি মামাবাবু—তুমি কি দিয়ে ভাগনীর মুখ দেখবে?"

অশোক এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বলিল, "মা, আমি কি করব?"

রেণু তাহার গলার হার খুলিয়া অশোককে দিয়া বলিল, "এই দিয়ে দেখ।"

অশোক যেন বিজয়গর্ব্বে ধাত্রীর হাতে সেই হার দিয়া ভাগিনেয়ীর মুখ দেখিল।

তখন রেণু বলিল, "এইবার তুমি বাইরে যাও—তা'র পরে আবার দেখতে পা'বে।

বাহিরে আসিয়া অশোক পিতাকে বলিল—"বাবা, ছোট্ট মেয়ে।"

নীরেন্দ্র হাসিল।

রেণু আপনার পুত্রকে প্রসবান্তে দেখিতে পায় নাই, বলা যায়। এবার সে সদ্য-প্রসূত শিশুকে দেখিল। শিশুর সম্বন্ধে সব কর্ত্তব্য তাহাকেই করিতে হইল। কণাকে সে বিষয়ে কেহ কোন কথা বলিলে সে বলিত, "যা' বলতে হয়, মা'কে বল। আমি ও-সব জানি না।" তাহার শাশুড়ী হাসিয়া রেণুকে বলিতেন, "বেহান, এই হচ্ছে কর্ম্মফল। কিন্তু মেয়েটিকে এমন ক'রে তৈরী করলেন কেমন ক'রে? যখন শ্বশুরবাড়ীতে থাকে, একেবারে ভালমানুষ—গলার আওয়াজ কেউ শুনতে পায় না, শ্বশুর-শাশুড়ীর কি যত্ন করে! আর আপনার কাছে এলে একেবারে মা'র আদুরে মেয়ে—সব কাযই মা করবেন!"

রেণু কেবল হাসিত।

বাস্তবিক রেণুকে কণা যেন জড়াইয়া ছিল।

কণার কন্যা রেণুর ক্রোড়েই "মানুষ" হইতে লাগিল। দুই মাস পরে কণাকে তাহার শাশুড়ী এক এক দিন লইয়া যাইতেন বটে, কিন্তু, হয়ত মেয়ের অযত্ন হইবে মনে করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরাইয়া দিতেন।

এইরূপে যখন ছয় মাস অতীত হইল, তখন কণার শাশুড়ী তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তখন তাহাতে আপত্তি করিবার আর কোন কারণই ছিল না।

রেণু তাহার যাইবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু কণা গাড়ীতে উঠিবার সময় যখন চক্ষু মুছিল, তখন তাহারও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কণার কন্যাকে আদর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার সময় সে-ও চক্ষু মুছিল।

পরদিন কণার শাশুড়ী আসিয়া বলিলেন, "বেহান, কি যে 'যাদু' করেছেন—মেয়ে আমাদের কা'কেও চায় না—কেবল আপনাকে খুঁজে।"

রেণু হাসিল এবং সেই হাসির আবরণে তাহার মনের মধ্যে অনুভূত বেদনা লুকাইতে চেষ্টা করিল।

রাত্রিতে শুইয়া সে যে অভাব অনুভব করিত—আর কখন তাহা করে নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভারত সরকারের বজেট

১৬ই ফাল্গুন ভারত সরকারের রাজস্ব-সচিব সার জেমস্ গ্রাগ কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় বজেটের হিসাব পেশ করিয়াছেন। এই বজেট নানা দিক্ দিয়া ঘোর অসন্তোষজনক হইয়াছে। সার জেমস্ গ্রীগ গত বৎসর যখন ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের বজেট প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তখন তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, এবার ভারত সরকার ৮৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাইবেন। তাহা হইতে ৮৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন; সুতরাং হাতে থাকিবে ৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু তাহার পর আট নয় মাস পরে সংশোধিত হিসাবে দেখা গেল, সরকার এই বৎসর কেবল ৮৩ কোটি টাকা রাজস্ব পাইবেন; কিন্তু ব্যয় দাঁড়াইবে ৮৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। অতএব এবার ভারত সরকারের তহবিলে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকা ত দূরের কথা, একেবারে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। তাহার পর সার জেমস্ গ্রীগ ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের জন্য যে বজেট প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে আয় ধরা হইয়াছে ৮২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা; ব্যয় ৮২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং অর্থসচিব ৫০ লক্ষ টাকার ঘাটতির আশঙ্কা করিয়া বিদেশী কার্পাসের শুল্ক দ্বিগুণ করিয়াছেন। কার্পাসের প্রতি-পাউণ্ডে দুই পয়সার স্থলে এক আনা হিসাবে শুল্ক নির্দ্ধারণের ফলে তিনি আশা করিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে আমদানী ৭ লক্ষ গাঁট কার্পাসের উপর ৫৫ লক্ষ টাকা শুল্ক আদায় হইবে, ইহাতে ৫০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণ হইয়া সরকারী তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের লম্বা আঁশের তুলার চাষবৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিলাভের অজুহাত দেখাইতেও বিস্মৃত হন নাই। যে সরকার শাসনতন্ত্রের বিরাট ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য বহুদিন পূর্ব্বেই কাগজের প্রতি-পাউণ্ডে এক আনা হিসাবে শুল্ক নির্দ্ধারণ—দিয়াশলাই কর—আমোদ-কর স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব ও অসঙ্গত নহে।

সার জেমস্ এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন। প্রথম, লম্বা আঁশের তুলার উপর আমদানী-শুল্ক দ্বিগুণ করিয়া দিয়া আগামী বৎসরের বজেটে ঘাটতি বাঁচাইলেন। তাহার পর তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার স্বদেশবাসী ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগের একটা বড় উপকার করিতে বিস্মৃত হইলেন না। ইহার ফলে ভারতজাত কলের সূক্ষ্ম বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিনিধিগণও বিলাতের প্রধান মন্ত্রীকে ভারতে অধিক বিলাতি বস্ত্র বিক্রয়ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। এই শুল্কবৃদ্ধি সেই অনুরোধের ফল কি? সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারের বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ অলিভার ষ্ট্যান্‌লি বলিয়াছেন, ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাসজাত পণ্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া না হইলে বৃটিশ সরকার ভারতের সহিত কোন নূতন বাণিজ্যচুক্তি করিবেন না। এই ব্যবস্থার ফলে আমদানী লম্বা আঁশযুক্ত কার্পাসের উপর কার্য্যতঃ দশ টাকা স্থলে শতকরা ২০ টাকা হারে আমদানী-শুল্ক ধার্য্য হইল। সুতরাং ভারতীয় মিলের যে কাপড় এখন পাঁচসিকা মূল্যে বিকাইতেছে, তাহা ১ টাকা ।৵০ আনা মূল্যে বিকাইবে। টাকায় প্রায় সাড়ে ৬ পয়সা বা সাত পয়সা মিহি কাপড়ের দর চড়িবে। বাঙ্গালার কার্পাস-কলগুলি বিদেশ হইতে আমদানী কার্পাসের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। একে এদেশে রেলের ভাড়া অত্যন্ত অধিক, তাহার উপর এই শুল্কবৃদ্ধিতে বাঙ্গালার কার্পাস-কলের উপর ইহার প্রভাব সমধিক হইবে। ভারতবাসী মাত্রেরই এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ২৪শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম বলিয়াছেন, ল্যাঙ্কাশায়ারকে সাহায্য করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। কৃষকগণকে সাহায্য ছলনা মাত্র। কয় বৎসর পূর্ব্বে পল্লী-উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল, কিন্তু নির্ব্বাচনের পর আর সে কথা শুনা যায় নাই। ২৫শে ফাল্গুন শ্রীযুক্ত সপ্রু বলিয়াছেন, তুলা জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার উপর দ্বিগুণ কর ধার্য্য করা অন্যায়—সমর্থন-যোগ্য নহে।

ভারতীয় বজেটে সামরিক বিপুল ব্যয়ের প্রতিবাদ

ভারতবাসী ক্রমাগতই করিয়া আসিতেছে, আর সরকার ক্রমাগতই সেই ব্যয় বৃদ্ধি করিতেছেন। এ ব্যয় কোনক্রমেই কমাইবার চেষ্টা হইতেছে না। ২ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গ মাইল বিস্তীর্ণ, প্রায় দেড় কোটি লোকের বাসভূমি ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, উহা রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সামরিক ব্যবস্থা হইল, তথাপি ভারতের মোট সামরিক ব্যয় হ্রাস পাইল না; অধিকন্তু বিলাতী সরকার ভারত সরকারকে সামরিক ব্যয়ের জন্য প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। তথাপি ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় ৪৫ কোটি টাকার কম হইল না, ইহা হিমাচলের ন্যায় অচল অটল হইয়া ভারতের বক্ষে চাপিয়া বসিয়া রহিল। ইহাতে ভারতে ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধার সম্ভাবনা কোথায়?

সার জেমস্ গ্রীগ বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সকল সভ্য দেশেরই সামরিক খরচা বাড়িয়া যাইতেছে। তাহা সত্য। কিন্তু অন্য দেশের সামরিক খরচা সমস্ত রাজস্বের তুলনায় যত কম, ভারতে তত কম নহে। গ্রেট বৃটেনের সামরিক ব্যয় সমগ্র রাজস্বের শতকরা ১৪ অংশ। সম্প্রতি হয় ত উহার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। ফ্রান্সে শতকরা ১০ অংশ, ইটালী এবং জাপানেরও ঐরূপ। জার্ম্মাণীর শতকরা ৫ অংশ। আর ভারতের ৮২ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে সাড়ে ৪৮ কোটি (৪৫+৩॥=৪৮॥) টাকা সামরিক ব্যয়। যাহা কিছু উপার্জ্জন, তাহার অধিকাংশই যদি দেশরক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ বাঁচে কিসে? দেশের কল্যাণ সংসাধিত হয় কিসে? তাহার পর অন্য দেশে সামরিক কার্য্যে সেই দেশের লোকই নিয়োজিত থাকে। তাঁহাদের বেতন, পেন্সন, ভাতা প্রভৃতি বিদেশে যায় না। আমাদের দেশ একে ত দরিদ্র; তাহার উপর সরকার বিদেশ হইতে অত্যন্ত মোটা বেতন দিয়া সমর বিভাগে বহু লোক আমদানী করেন। ইহাতে আমাদের দেশকে আরও দরিদ্র হইয়া পড়িতে হইতেছে। সেইজন্যই আমাদের উহাতে বিশেষ আপত্তি। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ২৫শে ফাল্গুন ওয়াজিরিস্থান সম্পর্কে দুই কোটি টাকা ব্যয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, উহাতে কি ভারতের পক্ষে লাভজনক হইবার কোন সম্ভাবনা আছে?

অত্যধিক হারে শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াও এবার শুল্ক বিভাগে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা কম আদায় হইয়াছে। আর ভারত সরকারের স্বদেশী শুল্ক (excise duty) খাতে ৪৯ লক্ষ টাকা কম আদায় হইয়াছে। কেবল কয়েকটি বাবদ আমদানী শুল্কের আদায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ, যন্ত্রপাতি আমদানী বাবদ বজেটের অনুমান অপেক্ষা ২১ লক্ষ টাকা অধিক পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, তুলা আমদানী শুল্ক বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া সার জেমস্ অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু গতিক দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, এই বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে। অন্যান্য বাবদ আমদানী-শুল্ক অনেক কমিয়াছে। তন্মধ্যে কৃত্রিম রেশম এবং বৃটিশ কার্পাস-পণ্য হইতে শুল্ক আদায় কম হইয়াছে। রপ্তানী-শুল্ক বাবদ কত টাকা কম আদায় হইয়াছে, তাহা সার জেমস্ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। তবে পাট এবং পাটের পণ্য রপ্তানী খাতে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অধিক আদায় হইবে। স্বদেশজাত পণ্যের উপর ধার্য্য করের মধ্যে চিনির উপর ধার্য্য কর কিছু অধিক আদায় হইয়াছে। দেশের লোকের অবস্থা মন্দ হইলেই বহির্ব্বাণিজ্য কমিয়া যায়। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেনের প্রবীণ বাণিজ্য-কমিশনার টমাস আইনস্কফ (Sir Thomas Ainscough) বলিয়াছিলেন যে, ভারত সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ আমদানী-রপ্তানী শুল্ক। উহা যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তাহা হইলে শাসন-পরিচালনা কঠিন হইবে। সেই জন্য শাসকদিগের মধ্যে অনেকে ভারতে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার বিরোধী। এবার আবার সেই ধুয়া ধরিয়া কতকগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী "হুক্কা হুয়া" রবে গগন-পবন মুখরিত করিবেন কি না, কে জানে? সরকারের নীতির দোষেও এই রপ্তানী-শুল্কের হানি হইয়াছে, সরকার যদি রপ্তানী সুবর্ণের উপর একটু চড়া হারে রপ্তানী-শুল্ক ধরিতেন, তাহা হইলে এই ব্যাপার ঘটিত না। ভারতবাসী অনেকেই সে কথা বলিয়াছিলেন। কর্ত্তারা সে কথা কাণে তুলেন নাই। তবে এবারকার এই আমদানী-শুল্ক হ্রাসের প্রধান কারণ, এবার দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ—বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয়।

সার জেমস্ আয়কর আইনের পরিবর্ত্তন হেতু আয়কর

বৃদ্ধি পাইবে আশা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, চলতি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রদেশগুলি ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার স্থলে আয়কর আদায়ের তহবিল হইতে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা পাইতে পারিবে। কিন্তু এই মন্দার বাজারে —এই ক্রমবর্দ্ধমান আয়করবিধান ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্তগণের কিরূপ পীড়াদায়ক—ব্যবসায়ের অন্তরায় হইবে, তাহা 'মাসিক বসুমতীর' অগ্রহায়ণ ও মাঘ সংখ্যার প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবসায়ের আয়বৃদ্ধি হেতু সমধিক আয়কর আদায় হইবে, এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

টাকার সুদ কম দিতে হইবে বলিয়া সরকারী তহবিলে কিছু টাকার ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। সে জন্য রাজস্ব-সচিব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজস্ব-সচিবদিগের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যফলে দেনা কমিয়া গিয়াছে, না সুদের হার নামিয়া গিয়াছে বলিয়া সুদ বাবদ দেয় কমিয়া গিয়াছে, —তাহাই বিবেচ্য। সেভিংস ব্যাঙ্ক, নূতন কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির সুদের হার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই জন্য সুদ বাবদ দেয় কমিয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ইহাতে লোকের অসুবিধা হইলেও কৃষি-ঋণ রেহাই-বোর্ডের কার্য্যফলে লোক আর মহাজনী করিতে চাহিতেছে না। সেই জন্য বাঙ্গালার মহাজনরা হাত গুটাইয়াছেন। তাঁহারা সুদ কম পাইলেও সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতেছেন।

বজেটে লবণের উপর ধার্য্য-শুল্ক হ্রাস করা হয় নাই। মণ করা পাঁচসিকা হারই বাহাল আছে। পোষ্টকার্ড, বুক-পোষ্ট বা অন্য কোন ডাক-মাশুলও হ্রাস করা হয় নাই। গত বৎসর বজেটের অনুমান অনুসারে ডাক ও তার-বিভাগের মোট আয়—১১ কোটি ৭০ লক্ষের স্থলে পরবর্ত্তী হিসাবে ১১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছিল। এই ১৮ লক্ষ টাকা আয় হ্রাসের অনুপাতে ব্যয়সঙ্কোচ ও নূতন পরিকল্পনা-বর্জ্জনের ফলে সরকারী ডাক ও তার দুই বিভাগে একত্র লক্ষাধিক টাকা লাভ হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু সে জন্য ডাকমাশুলের যে কোনরূপ সুবিধা হইবে না, সে আশঙ্কা আমরা 'মাসিক বসুমতীর' পৌষ সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়াছিলাম। তার-বিভাগে সরকারী বজেটে চিরদিনই ক্ষতি দেখা যায়, কিন্তু ডাক-বিভাগে পৃথক্‌ভাবে এবার কত টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, কেন্দ্রীপরিষদে ডাক-মাশুল হ্রাসের প্রস্তাবের সম্ভাবনা বুঝিয়াই বোধ হয় অর্থনীতিবিশারদ রাজস্ব-সচিব তাহা প্রকাশ করেন নাই। অসম্ভব ডাক মাশুল নির্দ্ধারণের ফলে দেশের সর্ব্বস্তরে অনায়াসে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সুলভ সৎসাহিত্যের প্রচার অসম্ভব হইয়াছে—ভিঃ পিঃর ব্যবসা লোপ পাইতে বসিয়াছে, —জনসাধারণকেও পত্রব্যবহার কমাইতে হইয়াছে; কিন্তু তিন গুণ মাশুল নির্দ্ধারণের ফলে সরকারী ডাক-বিভাগের আয়-বৃদ্ধির কোনরূপ অসুবিধা ঘটে নাই—কার্য্যের পরিমাণ কমিলেও কর্ম্মচারিগণের উচ্চ বেতন সময় অনুসারে বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে সরকার এই দরিদ্র দেশে নূতন কর ধার্য্য না করিয়া সার্ব্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার পরিকল্পনা আজও করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষেই উচ্চহারে ডাক মাশুল নির্দ্ধারণে শিক্ষাবিস্তারের উপর পরোক্ষভাবে করস্থাপন করা সম্ভব। ইহাতে জ্ঞান-প্রসারে শিক্ষাবিস্তারের পথরোধ হইয়াছে। ডাক-মাশুল হ্রাস করিলে সরকারের আয় যে সমধিক বর্দ্ধিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

যতদিন ভারতের সামরিক ব্যয়ের হ্রাস না হইবে, ততদিন এই বজেট ঠিক সন্তোষজনক ভাবে প্রস্তুত করা যাইবে না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বৃটিশের খাস উপনিবেশে পরিণত করা হইয়াছে। সে সময় সব্রহ্ম ভারতের সামরিক ব্যয় ছিল সাড়ে ৪৪ কোটি টাকার কম। আর এখন ব্রহ্মদেশের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সামরিক ব্যয় করা হইতেছে, তাহা হইলেও ব্রহ্মবিযুক্ত ভারতের সামরিক ব্যয় দাঁড়াইয়াছে ৪৫ কোটি টাকার উপর। ইহা ভিন্ন বৃটিশ সরকার যে সাড়ে ৩ কোটি টাকা দিয়াছেন,—তাহাও এই সামরিক-দামোদরের চোরা বালির ভিতর তলাইয়া গেল। সত্য বটে, পৃথিবীর সামরিক পরিস্থিতি উদ্বেগশূন্য নহে; কিন্তু সরকার যদি এ দেশের লোককে বিশ্বাস করিয়া সামরিক শিক্ষা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই সঙ্গীন অবস্থার উদ্ভব হইত না।

বিহারের বজেট

৮ই ফাল্গুন বিহারী সরকারের রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ বিহার ব্যবস্থাপক সভায় যে বজেটের হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক। এই বজেটে

বিহারপ্রদেশবাসীর হিতসাধনকল্পে বিশেষ প্রচেষ্টা হইয়াছে। উহাতে সাম্প্রদায়িক প্রভাব নাই। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের পক্ষে সুবিধা করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিহার প্রদেশটি বাঙ্গালা অপেক্ষা ছোট, ইহার লোকসংখ্যাও বাঙ্গালা অপেক্ষা কিছু কম। এই প্রদেশটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু দেশের লোক অত্যন্ত দরিদ্র। এই প্রদেশে রাজস্ব অধিক আদায় হয় না; যাহা আদায় হয়, তাহা হইতে সরকারী বাঁধা খরচ বাদ দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে এই অভাবগ্রস্ত প্রদেশের সকল অভাব পূর্ণ করা সম্ভব হইতে পারে না। তাহা হইলেও বিহারের বর্ত্তমান রাজস্ব-মন্ত্রী সকল জাতিগঠন কার্য্যের জন্য সম্ভবমত অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন। তথাপি এবার ঐ বজেটে টাকার ঘাটতি হয় নাই। রাজস্ব-মন্ত্রী মহাশয় গত বৎসর বজেট প্রস্তুত করিবার সময় অনুমান করিযাছিলেন, বিহারে জমিদারদিগের দেয় নবপ্রবর্ত্তিত আয়কর হইতে এবার ৪০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে—কিন্তু প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন হইলে প্রজার খাজনা শতকরা ২০ হইতে ২৫ টাকা হারে কম হইয়াছে; সেই জন্য জমিদারদিগের আয় কমিয়া গিয়াছে, কাযেই তাহারা আয়কর কম দিয়াছে। ফলে প্রকৃতপক্ষে ঐ বাবদ ৩০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার অধিক আদায় হয় না। ইহা ভিন্ন মদ্যপান প্রভৃতি নিবারণের জন্য কতকগুলি জিলাতে চেষ্টা হইবে, সে জন্য রাজস্বের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে। তাহাতেও সরকারী তহবিলে টাকার ঘাটতি হইবে না, বরং ৭৫ হাজার টাকা উদ্বৃত্তই হইবে। নূতন কর কিছু ধার্য্য করা হয় নাই। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কিছু নূতন কর ধার্য্য, অথবা প্রবর্ত্তিত কোন কর বৃদ্ধি করা হইতে পারে। স্বাস্থ্যের এবং শিক্ষার জন্য বিহার সরকার যথাসাধ্য অর্থ বরাদ্দ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। বিহারে বাঙ্গালার ন্যায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া না থাকিলেও ঐ প্রদেশের সরকার ম্যালেরিয়া নিবারণ, —ক্ষয়রোগ, কালাজ্বর দমনের জন্য অর্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। বন্যা-প্রতিরোধকল্পে তাঁহারা স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিহারী সরকার ভোট সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে ঋণদান করেন নাই, পরন্তু তাহাদিগের স্থায়ী মঙ্গলের জন্যই অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন। অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির প্রতিকার জন্য ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া নলকূপ প্রতিষ্ঠায় সেচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২৷৷৹ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ-বিহারে বিদ্যুদুৎপাদনযন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে। স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের নির্দ্দেশ দানের জন্য উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষিসম্পর্কিত ব্যাবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রত্যেক পঞ্চগ্রামে পুস্তকাগার স্থাপনের কল্পনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আবশ্যক অর্থের বরাদ্দ, এবং হরিজনদিগের বাসগৃহের জন্যও ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার বজেট

৩রা ফাল্গুন বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের বজেট পেশ করিয়াছেন। বজেটে ব্যয়ের ব্যবস্থাতে সচিবমণ্ডলীর —বিশেষতঃ রাজস্ব-সচিবের কৃতিত্ব কতখানি, তাহা বুঝা যায়। প্রজার প্রদত্ত করের টাকা প্রজার হিতার্থ ব্যয় করাই সুশাসনের নিদর্শন। বিশেষতঃ, গণশাসনের উদ্দেশ্যই হইতেছে প্রজাসাধারণের উন্নতিসাধন। তাই বিশিষ্ট বার্ত্তাবিশারদগণ বলেন, কোন দেশের শাসনব্যবস্থা প্রজার পক্ষে হিতকর কি না, তাহা তাহাদের বজেটের ধরণ দেখিলেই বুঝা যায়। প্রজাসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে হইলে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার এবং তাহাদের বিদ্যার—প্রতিভার বিকাশসাধন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে সে বজেট দেশের জনসাধারণের মনঃপূত হইতেই পারে না।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং গত ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের বজেটের বরাদ্দ বর্ত্তমান রাজস্ব-সচিব করেন নাই। ঐ বৎসর বাঙ্গালার সরকারের তহবিলে খরচ-খরচা বাদ ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। তাহার পর এই সচিবসঙ্ঘ সদম্ভে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের বজেট এই

রাজস্ব সচিবের রচিত। এই বৎসর মোটের উপর সরকারের আয়-ব্যয় হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গালার সরকারী তহবিলে ৮৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ঘাট্‌তি হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের বজেটে বাঙ্গালা সরকারের মোট আয় ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, মোট ব্যয় ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং অনুমান ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে। অর্থ-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার এবার বাঙ্গালা সরকারের ১ কোটি টাকা ঋণ-গ্রহণের এবং দুইটি নূতন কর-স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি—ধনবৃদ্ধির জন্য কোন পরিকল্পনা করেন নাই। অন্ততঃ বজেটে সে হিসাবে কোন অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা হয় নাই। ঋণগ্রহণ সকল সময় দূষণীয় নহে। ঋণে গৃহীত টাকা যদি ধনবর্দ্ধক কার্য্যে এমনভাবে বিনিয়োগ করা যায় যে, তাহার লাভে অল্পদিনেই ঋণের টাকাটা সুদে আসলে পরিশোধ হয়, অথচ উহার দ্বারা দেশের স্থায়িভাবে ধন-বৃদ্ধির উপায় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঋণ করা সঙ্গত; বরং সময়ে সময়ে সেরূপ ঋণ করিবার প্রয়োজনও ঘটে। কিন্তু যদি এক কোটি টাকা ঋণ করিয়া সরকারী রিজার্ভ তহবিলে যথেষ্ট টাকা মজুদ থাকা সত্বেও বজেটের ৮৭ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পূরণ করা হয়, এবং তাহা হইতে বহু লক্ষ টাকা কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে দেখান হয়, তাহাতে কৃষকদিগের অবস্থাও উন্নত হইবে না, এবং ঐ টাকা অনায়াসে ওয়াশীল করিবারও কোন উপায় হইবে না বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘকালের জন্য বাঙ্গালার কৃষকদিগের স্কন্ধে বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ঋণভার চাপিয়া থাকিবে। সুতরাং টাকা লইয়া এরূপভাবে ছিনিমিনি খেলা সমর্থন-যোগ্য নহে।

বাঙ্গালী রাজস্ব-সচিব অবশ্যই জানেন যে, বাঙ্গালার কৃষীবলের এই ঋণের এবং দারিদ্র্যের কারণ কি। ইহার কারণ, এ দেশের কৃষকদিগের যোতে জমির স্বল্পতা, প্রতি-পাল্য পরিজনের আধিক্য, এবং জনপদবিধ্বংসী ভীষণ ম্যালেরিয়া। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটী স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালী কৃষকদিগের ঋণের পরিমাণ ১ শত কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুসন্ধানে ইহার পরি-মাণ আরও অধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব কৃষকদিগকে এ পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া কি সুবিধা করিয়াছেন? উহাতে যে সুদের কড়িও কুলাইবে না; তবে ঋণদাতার পক্ষে ভোটপ্রাপ্তির সুবিধা হইতেও পারে। কৃষকদিগের দুরবস্থার প্রতিকার করিবার দুইটি উপায়—শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা, ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ। শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিলে জমির উপর চাপ কম পড়িবে; আর ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ করিলে কৃষীবলের এবং শ্রমিকের কর্ম্মশক্তি বাড়িবে, কায কামাই করিতে হইবে না। নতুবা তাহাদের ঋণের পরিমাণের টাকায় এক পাই হিসাবে সাহায্য করিলে কিছুই হইবে না। বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব ধাপ্পা দিয়াছেন, কৃষকদিগের নিকট সুদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু দুঃস্থ কৃষকদিগকে টাকা দাদন করিয়া আসল এবং সুদ কিভাবে আদায় হয়, তাহা সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থা দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে। কৃষি-প্রধান বাঙ্গালার কৃষির উন্নতিবিধানের জন্য এবার মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁনের প্রস্তাব অনুসারে ২৩শে ফাল্গুন বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় বহু বাদানুবাদের পর মাত্র ১৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। কৃষিপ্রাণ বাঙ্গালার কৃষির উন্নতি প্রয়োজন-তুলনায় ইহা বিন্দুমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারত সরকারের নিকট গৃহীত ঋণ মকুব করা হইয়াছে, পাট-রপ্তানী-শুল্ক বাবদ অধিক টাকা পাওয়া যাইতেছে, আয়কর তহবিল হইতেও মোটা টাকা মিলিতেছে, রাজবন্দী-দিগকে ছাড়িয়া দেওয়াতে অনেক টাকা খরচ বাঁচিয়াছে—তাহা সত্বেও বাঙ্গালা সরকারের বজেটে ঘাট্‌তি হইল, ইহাতেই শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের কৃতিত্বের পূর্ণ-পরিচয় প্রকাশ-মান! তিনি জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য কি করিয়াছেন? এই ৭৭ হাজার বর্গ-মাইল বিস্তৃত বৃটিশ-শাসিত বঙ্গে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বাবদ এক নিঃশ্বাসে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া শিক্ষানুরাগের অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন! কয়েকটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধানের জন্য তিনি ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে ইহা নিতান্তই তুচ্ছ। আর সাম্প্রদায়িক প্রভাব বা সচিব-বিশেষের অনুগ্রহভাজন বলিয়া কোন কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ব্যবস্থার জন্য এই দান প্রদত্ত হইয়াছে কি না, তাহাও বিবেচ্য। অর্থ-সচিব 'আজাদ'

'নামক দৈনিক পত্রকে ৩০ হাজার টাকা সাহায্য দানে সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচারেরই সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

বজেটের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অর্থ-সচিব কুকুর-দৌড়ের উপর, এবং আয়করযোগ্য প্রত্যেক ব্যবসায়ী, চাকুরিয়া, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতির উপর ৩০ টাকা হিসাবে 'মুণ্ডকর' স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ১২ লক্ষ টাকা আদায়ের আশা করিয়াছেন। সাধারণ জুয়াখেলা—সর্ব্বপ্রকার লটারী আইনে নিষিদ্ধ; কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মত কুকুর-দৌড় জুয়ার রকমফের হইলেও সচিবসঙ্ঘের কৃপায় অনুমোদিত হইয়াছে। বজেটের ঘাট্‌তি পূরণের অজুহাতে অর্থ-সচিব সেই জুয়াখেলার বখরাতেও সরকারী তহবিল পুষ্ট করিতেছেন।

সম্রাট্ আওরঙ্গজেব উপায়ক্ষম হিন্দু প্রজার মাথা-প্রতি জিজিয়া কর পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করিয়া ইতিহাসে "খ্যাতি" অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে আয়কর, অত্যধিক মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, লাইসেন্স প্রভৃতি বিবিধ কর প্রচলিত ছিল কি না জানা যায় না; সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রজাকে বৎসরে ৪০৲, মধ্যবিত্তকে ২০৲, সাধারণকে ১০৲ টাকা হিসাবে জিজিয়া কর দিতে হইত। কিন্তু বাঙ্গালার অর্থ-সচিব ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর, ভাড়া আদায়ের তুলনায় সমধিক মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের উপর বার্ষিক ৩০৲ টাকা হিসাবে 'মুণ্ডকর' প্রবর্ত্তনের সুব্যবস্থা দিয়াছেন। তথাপি কি তাঁহার গৌরব-গর্ব্বে জাতীয় ইতিহাস সমুজ্জ্বল হইবে না? কিন্তু বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের ২৩শে ফাল্গুনের অধিবেশনে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এই 'মুণ্ডকর' আয়করের নামান্তর কি না, এবং এরূপ আয়করস্থাপনের অধিকার বাঙ্গালার অর্থ-সচিবের আছে কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন।

গত নভেম্বর মাসে ফরাসী সরকার পণ্ডিচেরী, চন্দননগর প্রভৃতি ফরাসী-অধিকৃত নগরের অধিবাসী বৃটিশ প্রজার উপর ১৯৩৯ জানুয়ারী মাস হইতে ২০ টাকা হিসাবে 'মুণ্ডকর' প্রবর্ত্তনের বিধান দিয়াছিলেন। ফরাসী-অধিকৃত প্রদেশে অবশ্য আয়কর, অত্যধিক শুল্ক নাই; মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সও যৎসামান্য। কিন্তু বিক্ষোভের আশঙ্কায় ফরাসী সরকার বৃটিশ প্রজার উপর এই 'মুণ্ডকর' শেষে আর প্রবর্ত্তন করেন নাই। অবশ্য, সাম্যস্বাধীনতার লীলাভূমি ফরাসী রাজ্যের কথা স্বতন্ত্র। সরকারী শাসনযন্ত্রের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আরও কর স্থাপিত হইবে বলিয়া বাঙ্গালার অর্থ-সচিব করদাতৃগণকে আশ্বাস দিয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারিগণের বেতন হ্রাস, পেন্সন পরিবর্ত্তনের উপায় নির্ণয়ের কথা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সচিবসঙ্ঘে তাঁহারা যে দ্বাদশগোপাল দেশবাসীর করভারে পুষ্ট হইতেছেন, বজেটে সে বিপুল ব্যয়-লাঘবের উল্লেখ করিতে অবশ্যই তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন।

রেলওয়ে বজেট

ভারতীয় রেলপথগুলি রেলওয়ে-বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ৪৩ হাজার ১ শত ৩০ মাইল রেলপথ বিস্তৃত। রেলওয়ে বিভাগ হইতে সরকারের মোটা টাকা আয় হইয়া থাকে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রেলওয়ে বিভাগের সালতামামি এবং বজেটের হিসাব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইতেছে। কিন্তু এই আলোচনা অনেকটা অর্থশূন্য। কারণ, রেল-বিভাগের পরিচালন-নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের বিশেষ অধিকার নাই। তবে এই আলোচনা উপলক্ষে রেলওয়ের পরিচালননীতি এবং কার্য্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনোভাব প্রকাশ করা যায়, ইহাই যাহা কিছু লাভ। তদনুসারে নীতি এবং ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা না করা রেলওয়ে-বোর্ডের সম্পূর্ণ বিবেচনাধীন।

প্রতি বৎসরের মত এবারও গত ১লা ফাল্গুন ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার টমাস ষ্টুয়ার্ট রেলওয়ে বিভাগের সালতামামি এবং বজেটের হিসাব পেশ করিয়াছিলেন। ঐ হিসাবে প্রকাশ, ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে রেল-বিভাগে মোট ৯৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা আয়, ক্ষয়পূরণ সুদসহ মোট ৯২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়, এবং ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে মোট ৯৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা আয়, ক্ষয়পূরণ সুদসহ মোট ৯২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়, এবং ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে মোট আয় ৯৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, ক্ষয়পূরণ সুদসহ মোট ব্যয় ৯২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা এবং ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। এই উদ্বৃত্ত টাকাটা ভারত সরকার রেলওয়ে বিভাগের রাজস্ব বাবদ লইয়াছেন।

রেলওয়ে বিভাগের সদস্য সার টমাস ষ্টুয়ার্ট খুব সংযত-ভাবে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আগামী বৎসরে রেল-বিভাগে মোট আয় হইবে ৯৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এবারকার সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ১০ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে, এবং কার্য্যঃপরিচালনার জন্য ব্যয় হইবে ৫১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। ইহা ভিন্ন নানা বাবদে ৩৬ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে, এবং সুদ বাবদ ৩২ লক্ষ টাকা কম দিতে হইবে। ইহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, রেলওয়ে বিভাগে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে। ঐ টাকা ভারত সরকার পাইবেন।

রেলওয়েগুলিতে যাত্রিসংখ্যা কমিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে যাত্রীদিগের ভাড়া বাবদ অর্দ্ধ কোটি টাকা আয় কম হইয়াছে, এবং আগামী বৎসরে আরও ১৫ লক্ষ টাকা এই বাবদ আয় কম হইবে ধরা হইয়াছে; তবে এবার মালের ভাড়া বাবদ ৮ লক্ষ টাকা অধিক আসিয়াছে, এবং ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে আরও ৩৫ লক্ষ টাকা এই বাবদ আয় বাড়িবে আশা করা হইয়াছে। এই বৎসরে চারিটি ছোট ছোট রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ৮৬ লক্ষ টাকা, এবং দক্ষিণ-বিহার রেলওয়ে খরিদ করিবার জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহা ভিন্ন রেলপথের পাটি প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের জন্য এবং অন্যান্য আবশ্যক কাযের জন্য কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। রেলওয়ে বজেটে লোকমতের বিশেষ কোন প্রভাব না থাকিলেও এ সম্বন্ধে দেশের লোকের পক্ষ হইতে কতকগুলি কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যাহাতে দেশীয় যাত্রীদিগের সহিত,—বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত। যাত্রিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের সুব্যবস্থা হইলে সরকারী রেলওয়ে বিভাগে আরও অর্থাগম সুনিশ্চিত। একমাত্র মালের ভাড়া ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী-দিগের প্রদত্ত ভাড়াই রেলপথের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়। ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের নিকট হইতে রেলওয়েগুলি ২৭ কোটিরও অধিক টাকা পাইয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন উচ্চতর শ্রেণীর যাত্রীদিগের নিকট তাঁহারা সওয়া ৩ কোটির কিছু অধিক টাকা ভাড়া পাইয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণই সরকারী রেল-বিভাগের প্রধান রসদদার; কিন্তু তাহারাই রেল-কর্ম্মচারিগণের দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে বাধ্য হয়—ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের এবং পরিতাপের বিষয়।

রেলওয়েকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা আবশ্যক। যাহাতে জাতীয় শিল্পের এবং ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এরূপ ভাবে রেল কর্তৃপক্ষের যাত্রীর ও মালের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। অত্যধিক মাশুল, মাল পাঠাইবার অসুবিধা এবং বিলম্বের জন্যই বাস ও লরীর প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে বহুস্থানে পরাভূত হইতেছে। দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিই রেলেওয়ের আয়বৃদ্ধির সহায়তা করে। ইহা ভিন্ন রেলওয়ের ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যবস্থাও অবিলম্বে করা আবশ্যক। নেমিয়ার এবং ওয়েজউড কমিটীও সে কথা বলিয়াছেন। দেশের লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ঘটিলেই রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পায়। সে জন্যও দেশের বাণিজ্য-শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে রেলের ভাড়া যথাযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—

ভারতে সরকারী বেতন

আমাদের এই দরিদ্র দেশে সরকারী আমলাদিগের বেতন যে অত্যন্ত অধিক, সে কথা এ দেশের লোক বহু দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছেন। এই অত্যধিক বেতন প্রদানের ফলে সরকারী বজেটে প্রতিনিয়ত ঘাটতি পড়িতেছে। সেই জন্য জাতিগঠনকার্য্যে আবশ্যক অর্থ ব্যয়িত হইতেছে না,—ইহাই এ দেশের জনসাধারণের স্থায়ী অভিযোগ। অন্যান্য ধনাঢ্য দেশের সরকারী আমলাদের বেতনের তুলনায় এ দেশের সরকারী আমলাদের বেতন যে অত্যন্ত অধিক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইদানীং কংগ্রেসের মন্ত্রীরা এ দেশের লোকের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া অল্প বেতন লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেতন অপেক্ষা তাঁহাদের অধস্তন সরকারী আমলাদিগের বেতন অনেক অধিক। ইহাতে কংগ্রেস-মন্ত্রিগণের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে ভিন্ন কমে নাই। সম্প্রতি লিওনার্ড এম স্কিফ 'ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সরকারী আমলাদিগের বেতনের সহিত অন্য বহু ধনাঢ্য দেশের সরকারী আমলাদিগের বেতনের তুলনা করিয়াছেন। যদিও কোন কোন প্রদেশে

সরকারী আমলাদিগের বেতন কমাইবার চেষ্টা হইতেছে,—কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা প্রদেশে সে চেষ্টার একান্তই অভাব লক্ষিত হয়। কংগ্রেসের মন্ত্রীরা মনে করেন যে, দেশের লোকের সেবার জন্য তাঁহারা নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন; সেই জন্য তাঁহাদের পদের মর্য্যাদা। কিন্তু বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ লজ্জা জয় করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহারা নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া সানন্দে উচ্চ বেতন লইতেছেন।

মিষ্টার লিওনার্ড স্কিফ জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতনের সহিত বাঙ্গালার প্রধান সচিবের বেতনের তুলনা করিয়াছেন। জাপান এসিয়াস্থিত দেশ। জাপান সাম্রাজ্যে যত লোকের বাস, বাঙ্গালায় তাহার অর্দ্ধেক লোকেরও বাস নহে। জাপানীরা বাঙ্গালী অপেক্ষা ধনাঢ্য। তথাপি জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক ৬ শত ২২ টাকা, আর বাঙ্গালার প্রধান সচিবের বেতন মাসিক ৩ হাজার টাকা। অন্যান্য জাপানী মন্ত্রীরা মাসিক ৪ শত ৪০ টাকা বেতন পান, আর বাঙ্গালার সচিবরা দেশপ্রীতিবশে সগর্ব্বে ২৫০০৲ টাকা বেতন গ্রহণ করেন। জাপানী সেক্রেটারীরা মাসিক ৩৭৫ টাকা করিয়া বেতন পান। ভারতে শিশু প্রদেশ উড়িষ্যার প্রধান সেক্রেটারীর বেতন মাসিক ২ হাজার ১ শত ৫০ টাকা; আর বাঙ্গালার প্রধান সেক্রেটারীর মাসিক বেতন ৫ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা!

কোরিয়ার যিনি প্রধান শাসক, তিনি মাসিক ৪ শত ৪০ টাকা বেতন পান। আর পঞ্জাবের গভর্ণর বেতন পান ৮ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা। জাপানের এক জন রাজপুরুষ ৩ শত ৩৪ টাকা বেতন লইতে পারেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ১ হাজার ১ শত ৫০ টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, জাপানের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, অন্য দেশ অপেক্ষা জাপানে হীনতা এবং উৎকোচ গ্রহণের মাত্রা অধিক, এ অভিযোগ তিনি শোনেন নাই।

ইহার পর উক্ত গ্রন্থকার য়ুরোপীয় দেশের সহিত ভারতের আমলাদিগের বেতনের তারতম্য কত, তাহা দেখাইয়াছেন। পোল্যাণ্ড বিহার অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সমৃদ্ধ দেশ। তথাকার লোকসংখ্যা বিহারের তুলনায় অনেক কম। তাহা সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট পান মাসিক ১ হাজার ৫ শত ৬০ টাকা, আর বিহারের গভর্ণর ৮ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা। ভারতের জিলার এক জন ম্যাজিষ্ট্রেট পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট অপেক্ষা অধিক বেতন পাইতে পারেন। পোল্যাণ্ডে ১৩ জনের অধিক আমলা হাজার টাকার অধিক বেতন পাইতে পারেন না, বিহারে কিন্তু হাজার টাকার অধিক বেতনওয়ালা আমলার সংখ্যা মাত্র ১ শত ৫৬ জন!

ইহার পর মিষ্টার লিওনার্ড স্কিফ মার্কিণের সরকারী আমলাদিগের বেতনের সহিত ভারতীয় সরকারী আমলাদিগের বেতনের তুলনা করিয়াছেন। মার্কিণ দেশ ভারত হইতে বহুগুণে ধনশালী। তথাকার অধিবাসীদিগের গড় আয় ভারতীয় অধিবাসীদিগের গড় আয়ের ২২ গুণ। যদি সরকারী আমলাদিগের বেতন, দেশের জনসাধারণের আয়ের আনুপাতিক হিসাবে ধার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতের সরকারী আমলাদিগের বেতন মার্কিণী সরকারী আমলাদিগের বেতনের ২২ ভাগের এক ভাগ হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি? মার্কিণের এক জন দক্ষ কারিকর মাসে ৩০০ টাকা হইতে ৪৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের দাবী করিতে পারে। অধিকন্তু ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা মার্কিণের অধিবাসি-সংখ্যা অনেক অল্প। পক্ষান্তরে মার্কিণ সরকারের রাজস্ব ভারত সরকারের রাজস্বের ১০ গুণ। এরূপ অবস্থায় ভারতের বড়লাটের বেতনের সহিত মার্কিণের প্রেসিডেণ্টের বেতনের তুলনা অসঙ্গত হইবে না। মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট মাসে ১৭ হাজার ৬২ টাকা মাত্র বেতন পান। ভারতের বড়লাট পান ২১ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা। মার্কিণের মন্ত্রিসভার সদস্যরা এক এক জন ৩ হাজার ৪ শত ১২ টাকা হিসাবে বেতন পান। পক্ষান্তরে বড়লাটের মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রত্যেকে ৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা করিয়া মাসিক বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। মার্কিণের নিউইয়র্ক ষ্টেটের শাসনকর্ত্তা মাসিক ৫ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা পান, আর ভারতের যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার বেতন ৬ হাজার টাকা। দক্ষিণ ডাকোটার (মার্কিণের) শাসনকর্ত্তা মাসিক ৬ শত ৬২ টাকা এবং দিল্লীর কমিশনার মাসিক ৩ হাজার টাকা পাইয়া থাকেন। মার্কিণের প্রধান বিচারপতির দক্ষিণা মাসিক ৪ হাজার ৫ শত ৫০ টাকা, আর বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতির পারিশ্রমিক মাসিক ৬ হাজার টাকা।

অতঃপর ঐ গ্রন্থকার বিলাতী আমলাদিগের বেতনের সহিত ভারতীয় আমলাদিগের বেতনের তুলনা করিয়াছেন। ভারতের লোকসংখ্যা যত, বিলাতের লোকসংখ্যা তাহার শতকরা ১২ জন। ভারতের রাজস্ব অপেক্ষা বিলাতী সরকারের রাজস্ব শতকরা ৩ শত ১৭ গুণ অধিক। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী কিন্তু ভারতের বড়লাটের বেতনের অর্দ্ধেক বেতন পাইয়া থাকেন। ভারতীয় রাজস্বের হাজার-করা এক ভাগ বড়লাট লইয়া থাকেন, বিলাতী রাজস্বের লক্ষ করা এক ভাগ প্রধান মন্ত্রী গ্রহণ করেন। বিলাতের সিভিলিয়ান-দিগের উচ্চতম বেতন ৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা। অত বেতন অতি অল্প সিভিলিয়ানই পাইয়া থাকেন। বিলাতের অধিকাংশ সিভিলিয়ানই ৭৭৭ টাকা হইতে ১,০০০ টাকা বেতন পাইলেই সন্তুষ্ট। বিলাতের মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্য ৫,৫৫৫ টাকা পান। ভারতীয় রাজপুরুষগণের উচ্চ বেতনের সহিত ইহার তুলনা করুন।

লর্ড ব্রাবোর্ণ

১১ই ফাল্গুন বেলা ১০টা ৪৮ মিনিটে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ আন্ত্রিক অস্ত্রোপচারের পর ৪৩ বৎসর বয়সে লাট-প্রাসাদে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে লর্ড ব্রাবোর্ণের জন্ম—তাঁহার পূর্ণ নাম মাইকেল হারবার্ট রড্‌লফ ন্যাচবুল। তিনি ওয়েলিংটন কলেজে, পরে উল্‌উইচের রাজকীয়-সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে রয়াল আর্টিলারি সৈন্যদলে নিয়োজিত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপের মহাসমরে যোগদান করিয়া তিনি 'মিলিটারী ক্রস' পদকে সম্মানিত হইয়াছিলেন। তিনি রয়াল আর্টিলারী, রয়াল ফ্লায়িং কোর, আর, এ, এফ প্রভৃতি বিভিন্ন সৈন্যদলে কার্য্যকালে কৃতিত্ব ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই জন্য সামরিক ডেস্‌প্যাচে তিনি তিনবার প্রশংসিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীর মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ২৯ ডিভিসন সৈন্যদলের সহিত তিনি জীবনপণে গ্যালিপলি উপদ্বীপে অবতরণ করিয়া সাহস ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের অবসান-কাল পর্য্যন্ত তিনি ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে সামরিক কার্য্যে আত্মনিবেদন করিয়া যশ ও যোগ্য পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রূপবতী গুণবতী লেডি ডোরিন জেরাল্ডাইন ব্রাউনকে বিবাহ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সামরিক পদ ত্যাগ করিয়া নিউ কন্‌সলিডেটেড্‌ গোল্ডফিল্ডসের ডিরেক্টর হন। তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কন্‌জার-ভেটিভ দলের সদস্যরূপে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি তদানীন্তন ষ্টেট-সেক্রেটারী সার স্যামুয়েল হোরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হন। এই

লর্ড ব্রাবোর্ণ

পদত্যাগ করিয়া ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড ব্রাবোর্ণ ৩৮ বৎসর বয়সে বোম্বাইএর গভর্ণর নিযুক্ত হন। তাঁহাদের বংশের তিনি পঞ্চম ব্যারণ;—তিনি সেণ্ট জন অফ্‌ জেরু-জালেম—জি, সি, আই, ই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বোম্বায়ে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার সময় ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালার গভর্ণর হন। বৃটিশ সরকার তাঁহার যোগ্যতায় আস্থাবান্‌ ছিলেন বলিয়া লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো তিন মাসের জন্য স্বদেশে গমন করিলে তিনি অস্থায়িভাবে বড়লাটের কার্য্য করিয়া-ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালে বাঙ্গালার বহু রাজনীতিক বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি প্রশংসনীয়।

বাঙ্গালার ছোটলাট সার জন উড্‌বর্ণের পর লর্ড ব্রাবোর্ণের শৌর্য্যদীপ্ত কর্ম্মনিরত জীবন বাঙ্গালা মায়ের স্নেহ-কোমল বক্ষে সমাহিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার অকালবিয়োগে আমরা লেডি ব্রাবোর্ণ ও তাঁহার দুই পুত্রকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিবাহ-বিচ্ছেদবিধি

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য আইনের এক পাণ্ডুলিপি পেশ করা হইয়াছে। এইরূপ একটা আইন করিবার এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হিন্দু সমাজের সাধারণ লোক বিবাহকে একটা ধর্ম্ম-সংস্কার বলিয়া মানেন, আর যাঁহারা পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত নহেন,—তাঁহারা গতানুগতিকভাবে অথবা শাস্ত্রবাক্য বলিয়া উহা মানেন; এবং যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের মধ্যে একাংশ উহা কতকটা ভাল ভাবিয়া, আর কতকটা গতানুগতিক ন্যায় উহা মানেন। বর্ত্তমান শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে উহা ধর্ম্ম-সংস্কার বলিয়া মানিতে অসম্মত। কিন্তু এই শিক্ষিতের সংখ্যা কত? যে সম্প্রদায়ে পুরুষের মধ্যে শতকরা ১২ জন বা বড় জোর ১৫ জন কেবলমাত্র লিখিতে এবং পড়িতে জানে, সে সম্প্রদায়ে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যে অত্যন্ত অল্প, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহার কেবলমাত্র অক্ষরপরিচয় বা অল্প বিদ্যা লাভ হইয়াছে, তাহাকে কোনমতেই শিক্ষিত বলিতে পারা যায় না। কারণ, ঐরূপ অল্প শিক্ষায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি জন্মে না। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষিতের এবং ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিবার মত লোকের সংখ্যা খুবই কম। সেই কমের মধ্যে আবার অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বিবাহ-বিচ্ছেদ চাহেন কি না, তাহাও স্থির হয় নাই। আমাদের ধারণা, অধিকাংশ লোকই বিবাহবিচ্ছেদ চাহেন না। ইহার কারণ, পুরুষের পক্ষে ডিভোর্সের প্রয়োজন নাই; যেহেতু, হিন্দু সমাজে পুরুষ এককালে একাধিক বিবাহ করিতে পারেন; নারী তাহা পারেন না। পুরুষ এক নারীকে ত্যাগের পর অন্য নারীকে বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার চালাইতে পারেন,—সুতরাং পুরুষের বিশেষ অসুবিধা নাই। অসুবিধা হইতেছে নারীর। নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ সমাজ কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। কাযেই স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে চাহিলেও স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িতে চাহেন না। এই জন্য স্বামী কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর অত্যাচার বা পীড়ন করেন, ইহা ভিন্ন কোন কোন ক্ষেত্রে বাতিকগ্রস্ত লোক বা উন্মাদ-রোগগ্রস্ত লোকও স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

এখন জিজ্ঞাস্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তিত হইলে ঐ সকল উৎপীড়িতা নারীর সুবিধা হইবে কি না? আমাদের বিশ্বাস, তাহা হইবে না। এ দেশের লোকের যেরূপ মনোবৃত্তি, এবং কুমারী যেরূপ সুলভ, তাহাতে বিবাহ-বিচ্ছেদকারিণী নারীকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিবেন না। তবে যে সকল নারীর অনেক পয়সা আছে, তাহাদিগকে হয় ত কেহ কেহ বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু সেরূপ সুবিধা অল্পই ঘটিবে। সাধারণতঃ ধনবতী নারীরা স্বামীর নিকট অসদ্ব্যবহার পান না। কিন্তু দরিদ্রা নারী বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রা হইলে হিন্দু সমাজে সম্মান পাইবেন না। এই দারুণ জীবন-সংগ্রামের দিনে ভ্রাতৃগৃহেও তিনি সমাদর পাইবেন না। হয় ত তাঁহাকে অশেষ গঞ্জনা সহিয়া দিনপাত করিতে হইবে। হিন্দু সমাজের নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এই আইনটি সমাজসংস্কারকগণ অহৈতুকী প্রীতির বশে রচনা করিয়া অবিবেচনা প্রকট করিয়াছেন। পাণ্ডুলিপির প্রথম ব্যবস্থা—পুরুষত্ব নষ্ট হইলে বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে। পুরুষত্ব লোপ একটা চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি। এ রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে, কি রোগের সূচনাতেই আদালতে ছুটিতে হইবে? ডাক্তার দেশমুখ তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে সে কথা কিছুই বলেন নাই। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে কি ধর্ম্ম-শাসনানুমোদিত হিন্দু বিবাহের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা হইবে না?

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—স্বামী যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, এদেশে স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে স্ত্রীও প্রায়ই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। স্ত্রী যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে কি হইবে, তাহাই বিচার্য্য। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর ত বিবাহ-বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন হইবে না। তিনি স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বীয় ধর্ম্ম পালন করিবেন, তবে আবার বিবাহ করিতে পারিবেন না।

পাণ্ডুলিপিতে তৃতীয় ব্যবস্থা—কোন পুরুষ এক স্ত্রী

জীবিত থাকিতে দারান্তর পরিগ্রহ করিলে তাহার ভার্য্যার পক্ষে তাহা বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার কারণ হইবে। হিন্দু-শাস্ত্রে কতকগুলি অবস্থায় একাধিক স্ত্রীকে বিবাহ করিবার বিধান আছে। হিন্দু শাস্ত্রসম্মত প্রয়োজনকালে পুরুষের বহু বিবাহের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার কথা না তুলিয়াও বলা যায় যে, যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীতে প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে পুরুষের বহুপত্নীত্ব অনুমোদিত হইয়াছিল।

পাণ্ডুলিপির ৪র্থ ব্যবস্থা—স্বামী যদি ৩ বৎসরকাল ক্রমাগত অনুপস্থিত থাকেন, স্ত্রীর পক্ষে তাহা বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হইবে; অর্থাৎ কোন যুবক যদি বিবাহ করিয়া বিলাতে অধ্যয়ন করিতে যায় এবং ফিরিতে তিন বৎসরের অধিক কাল বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে স্ত্রী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা জুড়িয়া দিবেন। অথবা যদি কেহ রাজনৈতিক কারণে তিন বৎসরের অধিককাল কারাবরণ করেন, তাহাও কি বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ হইবে? ইহাই ডাক্তার দেশমুখের বিবাহ-বিচ্ছেদ পাণ্ডুলিপির স্থূলমর্ম্ম। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কি এই পাণ্ডুলিপির সমর্থন করিবেন? এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হইলে তাহা হিন্দুর উপরই বর্ত্তিবে, মুসলমানের উপর বর্ত্তিবে না। এখন আইনেও সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা হইতে চলিল। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কাহারা? ব্যবস্থা পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ নহেন কি?

ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণের শাস্ত্রসিদ্ধান্তে—সমাজ-কল্যাণৈকপ্রাণ প্রাচীন স্মার্ত্তগণের সুব্যবস্থানৈপুণ্যে হিন্দু সমাজ চিরস্বাধীন—সুনিয়ন্ত্রিত। আমরা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানের উপর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নূতন বিধি প্রণয়নের চিরবিরোধী। একেই আমরা আইনের নাগপাশে আবদ্ধ, তাহার উপর যে সকল সংস্কারক নিত্যনূতন আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া হিন্দু সমাজের শান্তি ও স্বাধীনতা নাশ করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনই সমাজের কল্যাণকামী নহেন। নিখিল ভারতপ্রেমে আত্মহারা না হইলে সকলে অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ডাঃ দেশমুখের এই 'বর্গী'-বিধান কখনই বাঙ্গালার সমাজে—বাঙ্গালীর গৃহে শান্তি ও মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। সেকালের সেই 'বর্গী এল দেশে' ছড়াটা এখনও অনেকের স্মরণ আছে।

বরোদার নবীন গায়কবাড় মহারাজা প্রতাপসিং রাও

বরোদার ভূতপূর্ব্ব গায়কবাড় মহারাজা সার সয়াজি রাওর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, গত ফেব্রুয়ারীর প্রথমে তাঁহারই ব্যবস্থানুসারে তাঁহার পৌত্র প্রতাপসিং রাও বরোদা-রাজগদীর উত্তরাধিকারী বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছেন। সার সয়াজি রাওর জীবিতাবশিষ্ট পুত্রগণের কেহই বরোদা-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই; ইহার কারণ বিবৃত করিতে হইলে দুই একটি পূর্ব্ব-কথার আলোচনা প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

বরোদা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পিলাজি রাও গায়কবাড়ের কয়েকটি পুত্রের মধ্যে তাঁহার তৃতীয় পুত্র প্রতাপ রাওর বংশধরগণ বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জিলায় কাবলানা নামক গ্রামে বাস করিতেন। উক্ত প্রতাপ রাওর প্রপৌত্রের পৌত্র খাসে রাওর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; তিনটি বালক পুত্র লইয়া তিনি কষ্টে সংসার পালন করিতেছিলেন। তাঁহার এই পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে গণপৎ রাও, গোপাল রাও, এবং সম্পৎ রাও।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরোদার মহারাজা মলহর রাও ভারত-সরকার কর্ত্তৃক গদীচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব গায়কবাড় মহারাজা খাণ্ডে রাওর বিধবা মহারাণী যমুনা বাঈ সাহেবাকে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক বরোদার রাজগদীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দত্তক গ্রহণের অনুমতি দান করায়, মহারাণী যমুনা বাঈ কাবলানা গ্রাম হইতে কৃষিজীবী খাসে রাওর উক্ত তিন পুত্রকেই বরোদায় লইয়া যান। মহারাণী এই বালকত্রয়কে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া ত্রয়োদশবর্ষীয় গোপাল রাওকেই দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই অতঃপর মহারাজা তৃতীয় সয়াজি রাও গায়কবাড় নামে অভিহিত হইয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বরোদা-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মহারাজা সয়াজি রাও গায়কবাড় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তাঞ্জোরের শেষ মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী বাঈকে বিবাহ করেন। মহারাণী লক্ষ্মী বাঈ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, মহারাজা সয়াজি রাও মধ্য-ভারতের দেওয়াস্ রাজ্যের সর্দ্দার বাজী রাওর কন্যা শ্রীমতী

চিম্না বাঈকে বিবাহ করেন। মহারাণী চিম্না বাঈর গর্ভে মহারাজার কয়েকটি পুত্র ও একটিমাত্র কন্যা (কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাণী) জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু মহারাজা সয়াজি রাও এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্রকে তাঁহার গদীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন নাই।

স্বর্গীয়া মহারাণী লক্ষ্মী বাঈর গর্ভে মহারাজা সয়াজি রাওর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র যুবরাজ ফতে সিং রাও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২২।২৩ বৎসর মাত্র বয়সে এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার এই পুত্রই যুবরাজ প্রতাপসিং রাও—তাঁহার পিতামহের নির্দ্দেশ-ক্রমে বরোদা-সিংহাসনে বর্ত্তমান গায়কবাড়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মহারাণী চিম্না বাঈর গর্ভজাত পুত্ররা রাজভ্রাতার প্রাপ্য বৃত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

বরোদার ভূতপূর্ব্ব মহারাজা

বরোদার নবীন মহারাজা

মহারাজা প্রতাপ সিং রাও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ শিকারী। তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা না করিলেও দূরদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ পিতামহের তত্ত্বাবধানে নবীন যৌবনে রাজ্য-পরিচালনোপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; সুতরাং রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্যে তাঁহাকে অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে, বা শাসন-বিভাগের দায়িত্ব-সম্পন্ন কর্ম্মচারিগণের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে হইবে না। রাজ্য-পরিচালনসম্পর্কে তাঁহার কর্ত্তব্যানুরাগের বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তার অভাব নাই। তাঁহার রুচি, প্রবৃত্তি ও মনোভাব হইতে অভিজ্ঞগণের ধারণা—তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতামহের ন্যায় প্রজারঞ্জক ও বিচক্ষণ নরপতি হইবেন। তাঁহার পিতামহের যে আদর্শ তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান, তিনি সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া রাজ্যের শাসন-কার্য্য পরিচালন করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপই সকলে আশা করেন। তিনি প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী, অনেকেই এরূপ ধারণা পোষণ করিতেছেন। কারণ, সেই ভাবেই তিনি শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সঙ্কটকালে এই শিক্ষা যে তাঁহার প্রজাপুঞ্জের কল্যাণপ্রদ হইবে, ইহা কাহারও দুরাশা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

খুলনায় হিন্দুমহাসভা

৫ই ফাল্গুন খুলনায় এবার হিন্দু-মহাসভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সভারকর মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের মিলন সংঘটনের জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় কঠোরভাবে তাহার ত্রুটি প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন। সভারকর মহাশয়ের বক্তৃতা

যে কংগ্রেসের নীতির তীব্র সমালোচনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের নীতি-পরিচালকগণ জানেন যে, দেশকে যদি কার্য্যতঃ স্বাধীন করিতে হয়, ভারতবাসীর যদি প্রকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিতে হয়—আর অহিংসার পথে যদি সেই চেষ্টা পরিচালিত করিতে হয়,—তাহা হইলে সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভারতবাসীর একমত হইয়া সেই দাবী উপস্থিত করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সেই জন্য তাঁহারা হিন্দুর পক্ষ হইতে অতিরিক্ত ত্যাগস্বীকার করিয়া এ পর্য্যন্ত মিলনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। দান-ধর্ম্ম খুব বড় ধর্ম্ম ; কিন্তু বলি রাজা সেই দান-ধর্ম্মের বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন বলিয়া শেষে তাঁহাকে রসাতলে বাস করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। পাণ্ডবরা সর্ব্ব দাবী ছাড়িয়া আপনাদের ভরণ পোষণের জন্য কেবলমাত্র পাঁচখানি গ্রাম লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহাদিগকে অত্যন্ত নমনীয় দেখিয়া দম্ভের অবতার দুর্য্যোধন সেই অতি সামান্যমাত্র করুণাও তাঁহাদিগের প্রতি প্রদর্শন করিতে সম্মত হন নাই। ইহা মানুষের স্বভাব। অপরিণামদর্শীদিগের ইহাই শেষ। তাহারা যতক্ষণ নত পক্ষকে দোহন করিতে পারে, ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়ে না। কংগ্রেসের পরিচালকবর্গ এই সহজ সত্যটি ভুলিয়া যাইতেছেন বলিয়া বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুত বিনায়ক সভারকর সেই জন্যই এমন নির্ম্মমভাবে কংগ্রেসী নীতির দোষ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি যে সকল ত্রুটি দেখাইয়াছেন,—তাহার একটিও মিথ্যা নহে। তিনি বলিয়াছেন যে, "দুই জনের এক জন অথবা দুই পক্ষের এক পক্ষ যদি বন্ধুত্ব না চাহে, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তির বা পক্ষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও উভয়ের মিলন সম্ভব হয় না।" কংগ্রেস যে নীতিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্পাদন করিতে চাহিতেছেন, তাহা শেষকালে সফল হইতেও পারে। তবে সে সাফল্য হইবে—বাঘে গরুতে একত্র জলপানের মত। বাঘ এবং গরুর একসঙ্গে জলপান করা তখনই সম্ভব, গরু যখন বাঘের পেটে যায়—তাহার পূর্ব্বে তাহা সম্ভব নহে। বাঙ্গালার হিন্দু এবং মুসলমানে কোন কালেই বিরোধ ছিল না ; অন্ততঃ মুসলমান-শাসনের শেষ আমলে যে তাহা ছিল না, ইহা ইংরেজ-শাসনের প্রথমকালীন বহু মুসলমান এবং ইংরেজ লেখকের রচনা পাঠে জানা যায়। আলীবর্দ্দী, সিরাজউদ্দৌলা এবং মির-কাশিমের আমলে দুই এক জন মৌলানা হয় ত উর্দ্দূ বা আরবী জানিতেন, কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণ বাঙ্গালা ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা মনে করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রবি-শশী অনেক বার উদিত এবং অস্তমিত হইয়াছে,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন অনুভূত হইল না,—আর কংগ্রেস যেমন মিলনের জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইতেছেন, তেমনই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ-রেখাটা পাকাপোক্ত করিবার জন্য বাঙ্গালী-মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া উর্দ্দূ ভাষায় কথা বলাইবার চেষ্টার বিরাম নাই। ইহা দেখিয়া যাঁহাদের চৈতন্য হইতেছে না, তাঁহাদের কস্মিন্ কালেও চৈতন্য হইবে না।

বিনায়ক দামোদর সভারকর

দৈনিক সংবাদপত্রে যাঁহারা সভারকরের বক্তৃতা পড়িয়াছেন,—তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, সে নীতি পরাজিতের নীতি। সকলেই আলেকজাণ্ডারের ন্যায় উদার ব্যবহার করিতে পারেন না। অনেকে পরাজিত ধূল্যবলুণ্ঠিত বিগত-প্রাণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। বাহ্য ব্যবহারটা অনেক সময় ভিতরকার প্রকৃতিরই পরিচয় দেয়। কংগ্রেস-মন্ত্রীরা মুসলমানদিগের কতকগুলি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা নিন্দার্হ

হইতে পারেন না। কিন্তু ঠিক ন্যায়ের নিক্তি ধরিয়া চুলচেরা বিচার করিয়া উনজন হিসাবে কতকটা অনুকূল ব্যবস্থাই করা উচিত। যেখানে স্বার্থ লইয়া কাড়াকাড়ি, সেখানে ন্যায্য সীমার সান্নিধ্যে কিছু ত্যাগস্বীকারের স্থান রাখা চাই; কিন্তু সেই স্থান অতিক্রান্ত হইতে দেওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। শ্রীযুত সভারকর যেন উদারতার জন্য সে স্থানটুকু রাখিতে সম্মত নহেন। অবশ্য তিনি অপর পক্ষের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়াই এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু হইলেও হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য পরিহার করা সমীচীন নহে।

শ্রীযুত সভারকর কংগ্রেস-নীতির প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছেন, একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তিনি সরলভাবে কথা বলিয়াছেন, এজন্য তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি যেমন তাঁহার সমালোচনায় কংগ্রেস-নীতির দোষ-ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তেমনই কি উপায় অবলম্বনে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই। সেইটিই হইতেছে আসল কথা। তিনি হিন্দুদিগকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট করিবার পর হইতেই কংগ্রেসকে ক্রমাগত হিন্দুর স্বার্থ বলি দিয়া মুসলমানের স্বার্থ পুষ্ট করিতে হইতেছে। সেই জন্য লক্ষ্ণৌ সহরেই সার আলী ইমাম্ ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে বলিয়াছিলেন, হিন্দুরা বড় ভুল করিয়া বসিল। এখন সাইমন কমিশন পর্য্যন্ত সেই প্যাক্টের দোহাই দিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সভারকর খাঁটি হিন্দুদিগকে ভোট দান করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমরাও তাঁহার সে কথার অনুমোদন করি। কিন্তু আজ-কাল শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই agnostic বা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন। কংগ্রেসের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোক অধিক। প্রকৃত আনুষ্ঠানিক হিন্দুরা রাজনীতিক পঙ্কিলতায় নামিতে চাহেন না। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান করা কঠিন।

শ্রীযুক্ত সভারকরও এই সমস্যার সমাধানের কোন উপায় বলিয়া দেন নাই। তাঁহার সমালোচনা অনেকটা destructive হইয়াছিল, constructive একেবারেই হয় নাই। আমরা একথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে, নিজের অধিকার ছাড়িয়া অন্যকে অধিকতর অধিকার ঘুষ দিয়া কখনই স্থায়ী মিলন হইতে পারে না। এই কথা যে সত্য, তাহা কংগ্রেস কর্ত্তৃক হিন্দু-মুসলমানে মিলন-চেষ্টার ব্যর্থতাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কংগ্রেস এই সময়ে হিন্দুসভাকে বর্জ্জন করিয়া আবার একটা বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছেন। কোন মুসলমান যদি তাঁহাদের কোন সাম্প্রদায়িক সভার সদস্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও মুস্লিম লীগ ত্যাগ করিতে হয় না। কংগ্রেসের পরিচালকবর্গ আশা করিতেছেন যে, তাঁহারা মুসলমানদিগকে অধিকতর অধিকার দিয়া স্বদলে আনিবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালকবর্গ এখনও তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারেন নাই; আশা করি, তাঁহারা পরে তাহা পারিবেন।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত সভারকর বাঙ্গালায় একটি শক্তিশালী হিন্দুদল গঠন করিবার প্রস্তাবে বলিয়াছেন, যত দিন কংগ্রেস তাঁহাদের বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তন না করিবেন, তত দিনই কংগ্রেসের সহিত ঐ দলের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। হিন্দুদিগের একটা শক্তিশালী দল গঠন করিবার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু সনাতনীরা ঐ দলে যোগ দিবেন কি? বিষয়টা বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। এ সময়ে হিন্দুসম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না।

রাজকোটে মহাত্মাজীর অনশন

রাজকোট কাথিয়াবাড়ের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—বিস্তার ২৮৩ বর্গ-মাইল, জনসংখ্যা মাত্র ৫২ হাজার। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি মহাত্মাজীর অনশনে সম্প্রতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রাজ্যের অধিপতি ঠাকুর সাহেব সামন্তরাজ। সামন্ত রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আন্দোলনের তরঙ্গসংঘাতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রজাগণও চঞ্চল হইয়াছিল। ঠাকুর সাহেব বল্লভভাই পেটেলের সহিত আলোচনার পর শাসনসংস্কার কমিটী গঠন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মতে ঠাকুর সাহেব ৭ই মাঘের প্রচারপত্রে সেই প্রতিশ্রুতি বাতিল করায় আবার সত্যাগ্রহ চলিয়াছিল। গত ২০শে মাঘ শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ ও কুমারী মণিবেন

সত্যাগ্রহ পরিচালন করিতে গিয়া দরবার কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ইহার পর মহাত্মাজী ১৫ই ফাল্গুন রাজকোট রাজ্যে গিয়া আপোষের প্রস্তাব করেন; কিন্তু ঠাকুর সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। মহাত্মাজী তখন ঠাকুর সাহেবকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি পালন ও বন্দিগণকে মুক্তি দিবার দাবী জানাইয়া ১৮ই ফাল্গুন চরম পত্র দেন। ঠাকুর সাহেব জানান যে, এ পত্রে গান্ধীজী কমিটীতে যে সকল ব্যক্তিকে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ১০ই পৌষের প্রতিশ্রুতি পত্রানুযায়ী নহে—এজন্য তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণে বাধ্য নহেন। তাঁহার রাজ্যে বিভিন্ন প্রতিনিধি লইয়া শাসন পরিষদ গঠন করিবার অধিকার তাঁহার আছে। এই পত্র পাইয়া মহাত্মাজী ১৯শে ফাল্গুন মধ্যাহ্নে অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের উপবাসে দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রাজকোট দরবার শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ ও কুমারী মণিবেনকে ২২শে ফাল্গুন মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। রাজকোট দরবার বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন যে, "মহাত্মাজীর চরম পত্রের দাবী মানিতে হইলে ঠাকুর সাহেবকে সকল ক্ষমতা ত্যাগ করিতে হয়—তিনি ইহাতে অসম্মত। মহাত্মাজী রাজকোটে সরজমিনে তদন্ত করিয়া রাজনীতিক আন্দোলনকারী ও বন্দিগণের উপর অত্যাচার হয় নাই জানিয়াছেন। কিন্তু তিনি কতকগুলি অসম্ভব সর্ত্ত দিয়া অনশন করিবার ভয় দেখাইতেছেন। এ অবস্থার জন্য মহাত্মাজী নিজেই দায়ী। ঠাকুর সাহেব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই। রাজকোট রাজ্যের প্রজারা ঠাকুর সাহেবের মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শাসন পরিষদের প্রতি আস্থাবান্। কিন্তু সর্দ্দার পেটেল ও কতকগুলি বাহিরের লোক দরবারে মিথ্যা অভিযোগে সম্ভ্রমহানি করিতেছেন।"

ইহার পর গান্ধীজী তাঁহার এবং ঠাকুর সাহেবের পত্রের নকল বড়লাটের নিকট পাঠাইবার জন্য রেসিডেন্ট্ মিষ্টার গিবসনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ব্যাপারটা তাঁহার স্বয়ংই বড়লাটকে জানাইবার ইচ্ছা ছিল। এ দিকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কংগ্রেস মন্ত্রিদল বড়লাটকে তার করিলেন, ইহার প্রতিকার না হইলে সকল প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিবেন। লর্ড লিন্‌লিথগো প্রথমে মহাত্মাজীকে অনশন ভঙ্গ করিবার অনুরোধ করিয়া তার পাঠাইলেন। মহাত্মাজী সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলেন। বড়লাট রাজপুতানা হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং মহাত্মাজীকে জানাইলেন যে, তিনি ঠাকুর সাহেবের নোটিশ এবং পত্রে বর্ণিত সর্ত্ত অনুসারে কিরূপ কমিটী গঠন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রথমে ভারতীয় ফেডারল আদালতের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গাওয়ারের (Sir Marrice Gwyer) মত লওয়া হইবে। তাঁহারই সিদ্ধান্ত অনুসারে ঠাকুর সাহেবকে কমিটী গঠিত করিতে হইবে। নোটিশের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কমিটীর সদস্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে সার মরিস গাওয়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ঠাকুর সাহেব তাঁহার নোটিশে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সম্মত হইয়াছেন। ফেডারল কোর্টের প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর ঠাকুর সাহেব যাহাতে তাঁহার প্রতিশ্রুতিপালনে বাধ্য হন, বড়লাট তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

বড়লাটের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া মহাত্মাজী চারি দিনের পর ২৩শে ফাল্গুন এক গেলাস সুমিষ্ট নেবুর রস পান করিয়া পারণা করিয়াছেন। এই চারি দিনের উপবাসে তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের জীবনসঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাঁহার তারের সানুনয় আহ্বান পাইয়াও যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর সকল কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, রাজকোট ব্যাপারে মহাত্মাজী জয়লাভ করিতে পারেন নাই। এখন সকল ব্যাপার সার মরিস গাওয়ারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহারই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, রাজকোটের নৃপতির সকল রাজন্যবর্গকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এই সময়ে—এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অতি সামান্য সংখ্যক অধিবাসীর জন্য কংগ্রেসের এই সন্ধিক্ষণে তিনি জীবন বিপন্ন করিলেন কেন? আশা করি, কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির পর তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না।

ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশন

দ্বাদশ সদস্যের পদত্যাগ—

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ব্যতীত দ্বাদশ জন সদস্য—আবুল কালাম আজাদ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই, ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া, শ্রীযুত শঙ্কররাও দেও, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাব, আচার্য্য কৃপালনী, আবদুল গফুর খাঁ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম গত ২৬শে মাঘ একযোগে পদত্যাগ-পত্র

ত্রিপুরী কংগ্রেস-মণ্ডপের প্রধান তোরণ

পেশ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একখানি স্বতন্ত্র পত্রে লিখিয়াছিলেন—বর্ত্তমান সময়ে একমতে কায করিবার জন্য তিনি সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্ব্বাচনের বিরোধী। নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে সহকর্ম্মিগণ সম্বন্ধে সুভাষ বাবুর উক্তিতে তিনি ব্যথিত—তাহা প্রত্যাহার করা সঙ্গত। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এমন কি উক্তি করিয়াছিলেন, যে জন্য মহাত্মাজী পরাজিতের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সদস্যগণ পদত্যাগ করিয়াছিলেন? কংগ্রেসে যে মতভেদ প্রকট হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন পরিহার করিবার পর তাঁহার অনুগামিগণ ব্যবস্থা পরিষদে থাকিয়া আইনানুবর্ত্তী ভাবে কার্য্য করিতে চাহেন। সংস্কারপন্থিগণের ইহা অনভিপ্রেত। তাঁহারা নূতন কল্পনায় বিভোর হইয়া সমাজতন্ত্রিদল সংগঠন করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র যে শাসন-সংস্কার আইনে নির্দ্দিষ্ট সম্মিলিত রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরোধী, সে অভিমত হরিপুরা কংগ্রেসের অভিভাষণেই প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এই দ্বাদশ জন সদস্য এক বৎসর সুভাষ বাবুর সহিত একমত হইয়া কায করিয়া এ বার কংগ্রেস-অধিবেশনের পূর্ব্বে সহসা একযোগে পদত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দলের অনেকে যে সামান্য রদ-বদল করিয়া যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র গ্রহণে সম্মত আছেন, ইহা মিঃ ভুলাভাই দেশাই বিলাতে যাইবার পর জনরবে প্রচারিত হইয়াছিল। সহকারী ভারত-সচিব মিঃ মুরহেডের সহিত মহাত্মা গান্ধীর নিভৃত আলোচনা প্রকাশ পায় নাই; তাহা রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে—সংহতি রাষ্ট্রতন্ত্রগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী 'হরিজন' পত্রে লর্ড লোথিয়ানের পত্রের উত্তর পড়িয়া মনে হয়, সংহতি রাষ্ট্রতন্ত্রে তাঁহার আপত্তির কারণ গুরুত্বপূর্ণ নহে। শাসন-তন্ত্র আইনের ব্যবস্থা—স্বৈরশাসকগণের প্রতিনিধিদিগকে এবং গণতান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে একই যোয়ালে যোতা হইবে। এই ত্রুটি সংশোধিত হইলেই কি সংহতি রাষ্ট্রতন্ত্র গ্রহণীয় হইবে? ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্রে মিঃ রাসব্রুক উইলিয়ামের পত্রের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে—ইতঃপূর্ব্বে প্রাদেশিক সরকার সম্বন্ধে যেরূপ বুঝাপড়া হইয়াছিল, কেন্দ্রী সরকার সম্বন্ধেও গান্ধীজীর সেইরূপ প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা। মহাত্মাজী ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় যদি সুভাষচন্দ্র বলিয়া থাকেন—কংগ্রেসের কেহ কেহ মিলিত রাষ্ট্রতন্ত্রের সমর্থন করেন, তাহা কি এতই অন্যায় যে, সদস্যগণ আর তাঁহার সহিত একযোগে কায করিতে
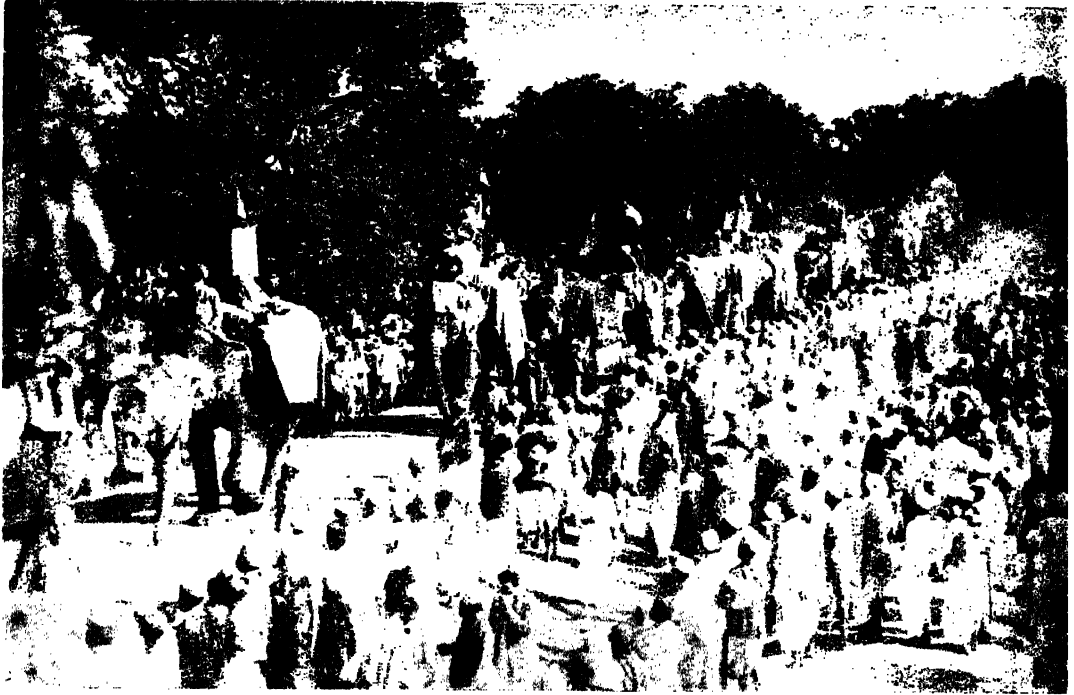
ত্রিপুরীতে মহাত্মা ও ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণের চিত্রপৃষ্ঠে হস্তিযূথ-সমন্বিত শোভাযাত্রা
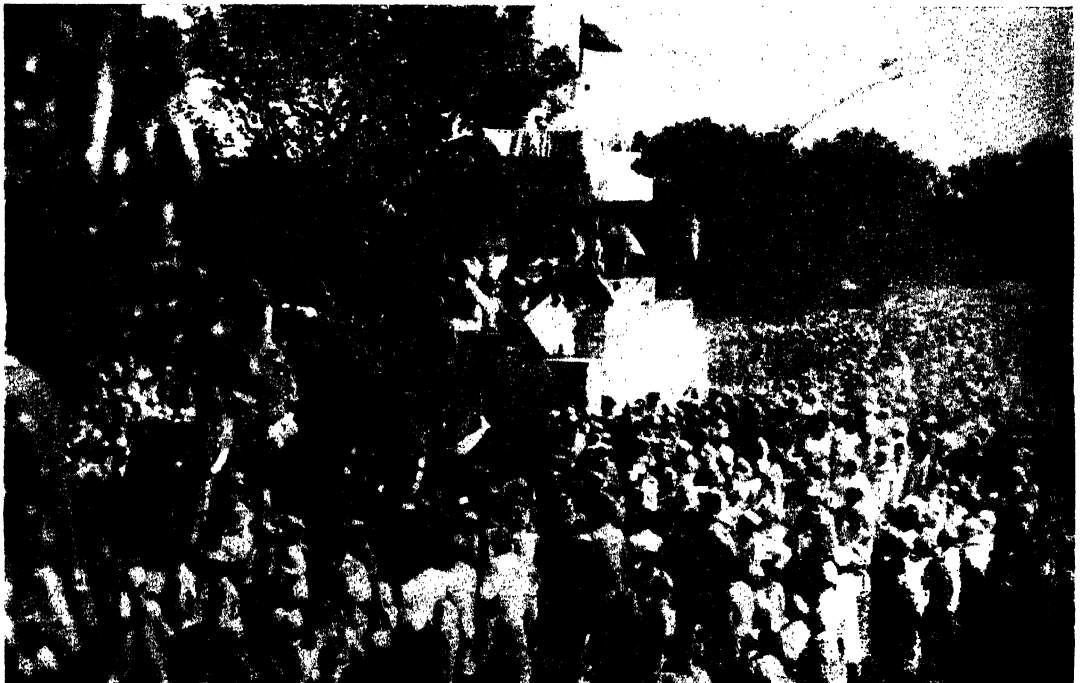
হস্তিযূথবাহিত রথে রাষ্ট্রপতির সুসজ্জিত চিত্র

পারিলেন না? মহাত্মাজী যখন স্বয়ংই বলিয়াছেন—কেবল রাজন্যগণ যদি কেন্দ্রী পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া না পাঠান, সদস্যগণ যদি প্রজাদিগের নিকট হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসেন, তাহা হইলে তাঁহার ফেডারেশন মানিয়া লইতে আপত্তি নাই। কিন্তু ইহাতেই কি আপত্তির নিরসন হইবে? সাইমন কমিশন রিপোর্টে বলিয়াছেন—সংস্কৃত শাসনযন্ত্রে যেন শাসন-পদ্ধতির বিকাশ-পথ অবাধ থাকে। সরকারের পরিকল্পিত ফেডারেশন আইনে সে পথ উন্মুক্ত আছে কি না, মহাত্মাজীর তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিব স্যামুয়েল হোর বলিয়াছিলেন, এই শাসনতন্ত্র অত্যন্ত কঠোর—অনমনীয়—তবে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা উহা সংশোধন করা যাইবে। অধিকাংশ কংগ্রেস-সদস্য যে ফেডারেশন চাহেন না, তাহা সুভাষচন্দ্রের নির্ব্বাচন সাফল্যেই প্রমাণিত হয় নাই কি?

নির্ব্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি ৩রা ফাল্গুন সেগাঁওয়ে গিয়া মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও আলোচনা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পরেই তিনি প্রবল ম্যালেরিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৪ই ফাল্গুন সুভাষচন্দ্র দ্বাদশ জন সদস্যের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণের সম্মতিপত্র পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মীমাংসার আশায় তিনি কার্য্যকরী সমিতির নূতন সদস্য মনোনয়ন না করিয়া বিষম ভুল করিয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল পদত্যাগ করেন নাই।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—

জাতীয়-যজ্ঞের হোমানল প্রজ্বালিত করিবার জন্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্র জীবন বিপন্ন করিয়া রোগাক্রান্ত শরীরে মাতা, ভ্রাতা, পরিজনসহ ২২শে ফাল্গুন জব্বলপুরে পৌঁছিয়া এম্বুল্যান্সে ত্রিপুরীতে গিয়াছিলেন। ৫২ হস্তি-বাহিত রথে চড়াইয়া বিরাট শোভাযাত্রাসহ তাঁহাকে লইয়া যাইবার যে সমারোহের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা তিনি সসম্মানে প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজীর, রাষ্ট্রপতির, ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণের চিত্রপৃষ্ঠে হস্তিযূথসহ শোভাযাত্রার আড়ম্বর হইয়াছিল।

রাষ্ট্রপতি মহাত্মাজীকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য অনুরোধ করিয়া 'তার' করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি তারে জানাইয়াছেন—চিকিৎসকগণ আমাকে ১৩ই মার্চ্চের পূর্ব্বে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তুমি চিকিৎসকদিগের নির্দ্দেশ অবহেলা করিয়াছ, আমার সে সাহস নাই। বলা বাহুল্য, ১২ই মার্চ্চ কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে এবং ১৩ই মহাত্মাজী বড়লাট-সন্দর্শনে দিল্লী যাইতেছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ২২শে ফাল্গুন ত্রিপুরীর খাদি ও কুটীর-শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে মহাত্মার বৈবাহিক শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—আপনারা কাহাকে বিশ্বাস করিবেন, ৩৫ বৎসর যে কর্ণধার দক্ষতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন তাঁহাকে, না নবীন কর্ণধারকে? কিন্তু মহাত্মা
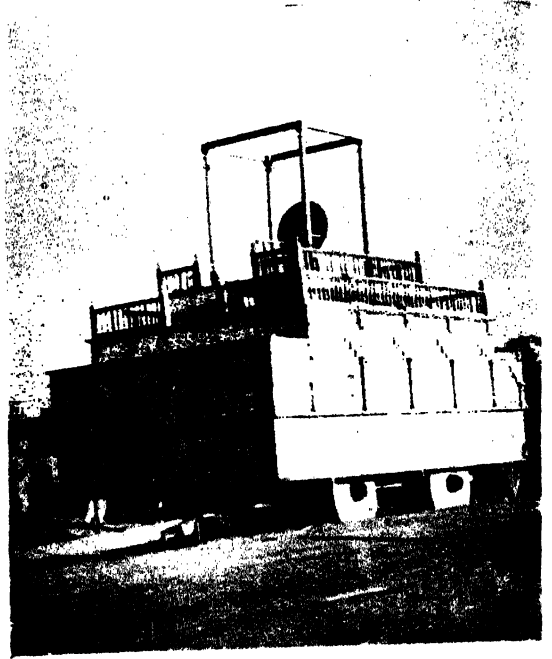
ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতির শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত রথ

গান্ধী ত' ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্যারিষ্টার ছিলেন, তিনি ত' ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন, স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলের নির্দ্দেশে তিনি এক বৎসর ভারতভ্রমণে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন; সুতরাং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার পদন্যাস এখনও ২৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। ২৩শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে মাত্র ২০ মিনিট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর ১ম দিনের বিষয়-নির্ব্বাচনী অধিবেশন হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতির অসুস্থতার জন্য মৌলানা আবুল

খাদি ও গ্রাম্য-শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনে পণ্ডিত জওহরলাল
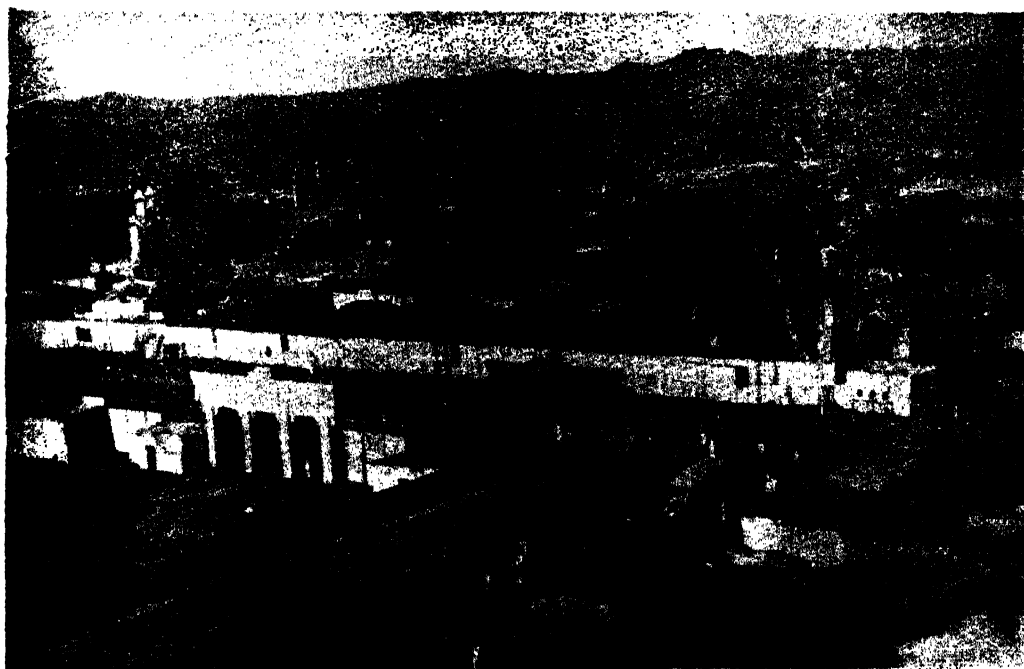
ত্রিপুরী কংগ্রেসের গ্রাম্য-শিল্প প্রদর্শনী

কালাম আজাদ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত জওহরলাল রাজকোটে মহাত্মার অনশন ভঙ্গের সংবাদ ঘোষণা করিলে উল্লাস-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

আচার্য্য কৃপালনীর রিপোর্ট ও ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক হিসাব ঐ দিনের সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

রোগক্লিষ্ট সুভাষচন্দ্রের সানুনয় আহ্বানে মহাত্মাজী সঙ্কট সময়ে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র রাজকোট রাজ্যের প্রজা-আন্দোলন সফল করিবার জন্য অথবা তাঁহার বশম্বদ বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট প্রতিশ্রুতি বজায় রাখিবার জন্যই তিনি এই সময় উপবাস আরম্ভ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। এজন্য বিলম্ব করা যেন আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

২৪শে ফাল্গুন বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে কুটীর হইতে এম্বুল্যান্স গাড়ীতে সভামণ্ডপে আনিয়া ষ্ট্রেচারে করিয়া মঞ্চোপরি রোগীর শয্যায় শায়িত করান হয়। পদত্যাগকারী সদস্যগণকে মঞ্চোপরি না দেখিয়া তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত ঘনশ্যাম সিং গুপ্তের মারফতে তাঁহাদের অনুরোধ জানাইলে তাঁহারা মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বেই তাঁহাদের সহিত আপোষের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

শ্রীযুত সিদ্ধের সদস্যগণের পদত্যাগের বৈধতা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রপতি বলেন—কার্য্যকরী সমিতির শূন্য আসন পূর্ণ করিবার অধিকার যখন সভাপতির আছে, তখন তিনি সদস্যদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতেও পারেন।

এম্বুলান্সে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে সুভাষচন্দ্র

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব—

মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠনের জন্য যুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবে বলেন, ইহাতে মতবিরোধের অবসান হইবে—মহাত্মাজীর নেতৃত্বে গত কয় বৎসর যে মূল নীতি ও কার্য্যতালিকা অনুসারে কংগ্রেসের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কমিটী আস্থাবান্—সেই নীতি অনুসরণযোগ্য। আগামী

বর্ষের সঙ্কট অবস্থায় কেবল মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশকে জয়ী করিতে পারেন, এজন্য কেবল মহাত্মাজীর আস্থাভাজন সদস্যগণই নির্ব্বাচনযোগ্য। কিন্তু এই গান্ধী-আনুরক্তি কি গণতন্ত্রের বিরোধী নহে? বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে দুই দিন তুমুল বিতর্কের পর এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুত অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন, শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ, মিঃ নুরুদ্দীন বিহারী, শ্রীযুত ভরদ্বাজ প্রভৃতি ১১ জন নেতার সংশোধন-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

২৬শে ফাল্গুন বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির তৃতীয় দিনের অধিবেশনে মহাত্মাজীর টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের প্রভাবে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির জ্বর বৃদ্ধির জন্যই বোধ হয় অধিবেশন কালে পদত্যাগ সম্ভব হয় নাই। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইলে দেশের অনিষ্ট অনিবার্য্য। কিন্তু সে দায়িত্ব মহাত্মাজীর। কেন না, এই প্রস্তাবের মর্ম্ম—মহাত্মাজীই কংগ্রেস, কংগ্রেসের স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশন—

২৬শে ফাল্গুন ত্রিপুরীর বিষ্ণুদত্ত নগরে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশন অপরাহ্ন ৩॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে রোগশয্যাশায়িত সভাপতি সুভাষচন্দ্র

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে সমর্থিত হইয়াছে। পদত্যাগকারী সদস্যগণ কোন প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেন নাই। মহাত্মাজী কংগ্রেসে যোগদান না করিলেও কংগ্রেস যে তাঁহার নির্দ্দেশে পরিচালিত হইতেছে ও হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পন্থজীর প্রস্তাব অনুসারে মহাত্মাজীর নির্ভরযোগ্য দ্বাদশ জন সদস্য পুনরায় নির্ব্বাচিত হইলে, কংগ্রেসের নীতি যথাযথ ভাবে পরিচালন সম্ভব নহে বলিয়া

দুই লক্ষাধিক দর্শকসমাবেশে—বিভিন্ন প্রদেশ-সমাগত প্রতিনিধিগণের যথাযোগ্য আসন গ্রহণে—বাসন্তী ও শ্যামল বসন-বিভূষিতা দেশসেবিকাগণের সুনিয়ন্ত্রণে—সুসজ্জিত বিজলীদীপ্ত বিরাট মণ্ডপ সৌম্যশ্রী, অনুপম—শোভাময় হইয়াছিল। জ্বর ও দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রপতি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে না পারায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন। খণ্ডিত বন্দে মাতরম্ গানের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ

গোবিন্দদাস অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু রাষ্ট্রপতির ইংরেজী-ভাষায় লিখিত সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ পাঠ করিলে আচার্য্য নরেন্দ্র দেব হিন্দিতে তাহার ব্যাখ্যা করেন।

চীন, জাপান, জাঞ্জীবার, কলম্বো হইতে তারে প্রেরিত শুভেচ্ছাপূর্ণ বাণী পাঠের পর পণ্ডিত জওহরলাল মিশরীয় প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উত্তরে তাঁহাদের নেতা মামুদ বে সাফল্য কামনা, ধন্যবাদ

বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বক্তৃতা

প্রদান—কংগ্রেস প্রতিনিধিদলকে মিশরে আমন্ত্রণ করিবার পর ঐ দিনের কার্য্য শেষ হয়।

অভ্যর্থনা সভাপতির অভিভাষণ—

অভিভাষণ-সূচনায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস বলিয়াছেন, কংগ্রেস নগরের নাম মহাকোশলের পরলোকগত কর্ম্মী স্বর্গীয় বিষ্ণুদত্ত শুক্লের নাম অনুসারেই বিষ্ণুদত্তনগর হইয়াছে। মহাকোশল বরাবরই কংগ্রেসের একনিষ্ঠ অনুবর্ত্তক। হিন্দুসেভা, আম্বেদকরের দল ও অন্যান্য সহযোগকামী দল কেহই মহাকোশলে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কেবল গত বৎসর এখানে মুস্লেম লীগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, পৃথিবী এখন এক সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতেছে। যে কোন সময়ে পৃথিবীব্যাপী এক সংগ্রাম উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহার মতে "যদি একটা ব্যাপক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইংরেজ ভারত রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং ভারতবাসীকেই ভারত রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু ভারতবাসীরা যদি সমরবিভাগের উপর এবং বৈদেশিক নীতির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারিবে, না।" সে কথা যথার্থ। কিন্তু ঐ দুই বিভাগে কর্ত্তৃত্ব পাওয়াই অত্যন্ত কঠিন, দেশের মধ্যে স্বার্থ লইয়া কলহ করিলে তাহা কখনই সম্ভব হইবে না। তাহার পর তিনি কেনিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকার ফিজিতে, সিংহলে, মালয় প্রভৃতি রাজ্যে ভারতবাসীর লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গান্ধীজী বুঝিয়াছেন যে, এই সমস্যার সমাধান ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভের উপর নির্ভর করে। ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু সে স্বাধীনতা লাভ করা ত সহজ হইবে না। ইংরেজ কি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও ভারতবর্ষ রক্ষার চেষ্টা করিবে না? এই উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে সমস্ত ভারতবাসীকে অহিংসা ধর্ম্মে অবিচলিত থাকিয়া একযোগে এবং একপ্রাণে কার্য্য করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে তাহা কতদূর সম্ভব হইবে, তাহাই হইতেছে বিবেচ্য। কেবলমাত্র ভাবের আবেগে চালিত হইয়া কার্য্য করিলে চলিবে না,—দেশের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া কর্ম্মশক্তি পরিচালিত করিতে হইবে।

শেঠজী কংগ্রেসের মধ্যে ভেদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। রাজেন্দ্র-প্যাটেল দলের প্রভাবে কংগ্রেসে এইবার এই ভেদরেখার বিস্তার বাড়িয়াছে। এই ভেদ নূতন দেখা দেয় নাই। যে বিহার প্রদেশ বাঙ্গালীদিগের প্রভাবে শিক্ষিত হইয়াছে, যে বিহারের উন্নতির পথিপ্রদর্শকই বাঙ্গালী, যে বিহারকে রাজনীতিক আন্দোলন করিতে শিখাইয়াছে বাঙ্গালী, যে বিহারে বহু বাঙ্গালী প্রবাস করিয়াছেন,—আজ সেই বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় একজনও বাঙ্গালী নাই। যথার্থ একতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, হৃদয় হইতে ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতাজনক বৃত্তিগুলি জ্ঞানের হোমকুণ্ডে দগ্ধ করিতে হইবে। আজ ভারতভূমি কেবল হিন্দু-মুসলমানের ভেদে দীর্ণ নহে, আজ ভারতে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা

ষোলকলায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে,—কেবল একতা মাত্র সম্বল করিয়া দেশ উদ্ধার করা,—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করা—কত কঠিন, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

শেঠ গোবিন্দদাস অভিভাষণে বলিয়াছেন—কংগ্রেস এখন ইটালীর ফ্যাসিষ্ট, জার্ম্মাণীর নাজী এবং রুশিয়ার কমিউনিষ্ট দলের সহিত তুলনীয়। পার্থক্যের মধ্যে তাহারা হিংসাপন্থী, আমরা অহিংসনীতি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি। ফ্যাসিষ্টদিগের মধ্যে মুসোলিনীর যে স্থান, নাজীদিগের মধ্যে হিটলারের যে স্থান, কমিউনিষ্টদিগের মধ্যে ষ্টালিনের যে স্থান—কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মাজীর স্থান সেইরূপ। কাযেই তিনি মহাত্মাজীর ডিক্টেটরী ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। বল্লভভাই প্যাটেল ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি কংগ্রেসে এই প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। ফ্যাসিষ্ট বা নাজী আদর্শ কেন যে এদেশে নিন্দিত, তাহা অবশ্যই শেঠজী জানেন। তথাপি তিনি কংগ্রেস হইতে গণতান্ত্রিক আদর্শের উচ্ছেদ করিতে চাহেন।

শেঠজী বলিয়াছেন—কংগ্রেস গান্ধীজীর সৃষ্ট, কিন্তু গান্ধীজীই কি কংগ্রেসের শক্তিতে প্রভাবশালী নহেন? শেঠজীর অভিভাষণে কোন নূতন কর্ম্মনির্দ্দেশের আভাস নাই, তাহা কেবল গান্ধীভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস।

ত্রিপুরীতে সদস্যগণসহ সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

সভাপতির অভিভাষণ—

সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রয়োজনীয় কথায় পূর্ণ। তিনি ঐক্যের সূর্য্যবিকাশে ভারতে রাজনীতিক আকাশে মেঘাড়ম্বরের অবসানে সত্যনির্ণয়ের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার আশা করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা, ধন্যবাদ প্রদান, রাজকোটে মহাত্মাজীর সাফল্যের জন্য উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। সভাপতি-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে যে দ্বাদশ জন সদস্য পদত্যাগ—জহরলাল নেহেরুর এই সম্পর্কিত পৃথক্ বিবৃতি—মহাত্মাজীর অনশনে চাঞ্চল্য—নিজের অসুস্থতায় যে সঙ্কট অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সে জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি মিশরের ওয়াফদ দলের প্রতিনিধিগণকে স্বাগত সম্ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। য়ুরোপ ও এশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক ঘটনায়—ফরাসী ও বৃটিশের মর্য্যাদা-হানির প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

"হরিপুরা কংগ্রেসের পর পাশ্চাত্ত্য জগতে বহু উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক সংঘর্ষের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে যে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রধান। উহাতে ফ্রান্স বৃটেন প্রভৃতি য়ুরোপের রাষ্ট্রপতিসমূহের নাজী জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার ফলে য়ুরোপে ফ্রান্সের প্রভাব ধ্বংস হইয়াছে। বিনা রক্তপাতে য়ুরোপীয় প্রভাবের একচেটিয়া অধিকার জার্ম্মাণীই লাভ করিয়াছে। তাহার পর গণতান্ত্রিক স্পেনের ক্রমাবনতির ফলে ফ্যাসিষ্ট ইটালী ও নাজী জার্ম্মাণীর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন প্রমুখ তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় রাজনীতি হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে বিতাড়িত করিবার জন্য জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছে।

"কিন্তু কতকাল উহা সম্ভব হইবে? রুশিয়াকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া ফ্রান্স এবং গ্রেট বৃটেনের কি লাভ হইয়াছে?"

অতঃপর ভারতের রাজনীতিক আলোচনায় রাষ্ট্রপতি

স্বরাজলাভের জন্য বৃটিশ সরকারকে নির্ভীক সুস্পষ্টভাবে চরম-পত্র দিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"স্বরাজের প্রশ্ন উপস্থিত, এবং আমাদিগের জাতীয় দাবী বৃটিশ সরকারের নিকট চরম পত্রের আকারে পেশ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

"নিষ্ক্রিয় মনোভাব অবলম্বন এবং যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিবার সময় বহুপূর্ব্বে অতীত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা কখন আমাদিগের উপর চাপান হইবে, উহা আর এখন প্রশ্ন নহে। সমস্যা এই,—য়ুরোপে শান্তিপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত যদি কয়েক বৎসর যুক্তরাষ্ট্রসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করা না হয়, তবে আমাদিগের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য।

"ইহাতে সন্দেহ নাই যে, চারি শক্তির মধ্যে আপোষ অথবা অপর কোন উপায়ে য়ুরোপে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেট বৃটেন কঠোর সাম্রাজ্যনীতি অবলম্বন করিবে। বৃটেন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে দুর্ব্বল মনে করিয়াছে বলিয়া আজ ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে আরবদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কতকটা চেষ্টা করিতেছে। আমার মতে, চরম পত্রের আকারে আমাদিগের জাতীয় দাবী বৃটিশ সরকারের নিকট পেশ করা এবং উত্তরের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় দেওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন উত্তর পাওয়া না যায়, অথবা যদি অসন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদিগের জাতীয় দাবীর জন্য যথাশক্তি শাসন অবলম্বন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

"ব্যাপকভাবে আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ ব্যতীত অপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না এবং বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটিশ সরকার সর্ব্ব ভারতীয় সত্যাগ্রহের মত ব্যাপক একটি সংগ্রামে দীর্ঘকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না।"

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু জলপাইগুড়ীর রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে গৃহীত এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই কংগ্রেসকে জানাইয়াছিলেন। এই প্রস্তাব কংগ্রেসে বহুমতে সমর্থিত হইলে বাঙ্গালার নির্দ্দেশই স্বীকৃত হইত। মত-বিরোধের অবসানে একযোগে জাতীয় সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সাফল্যলাভের আশা করিয়া সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"কংগ্রেসে একদল ব্যক্তি মনে করেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম ঘোষণা করার সময় এখনও আসে নাই— তাঁহাদের মনোভাবে আমি বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু বস্তুতন্ত্রবাদীর দৃষ্টি লইয়া সমগ্র অবস্থা বিশ্লেষণ করার পরে আমি নৈরাশ্যের কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না। ৮টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের মর্য্যাদা ও প্রভাব বিশেষভাবে বাড়িয়াছে বৃটিশ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গণ-আন্দোলনের বিশেষ বিস্তার ঘটিয়াছে, সর্ব্বোপরি, করদ-রাজ-শাসিত ভারতেও অভূতপূর্ব্ব জাগরণের সূচনা দেখা গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির অবস্থাও আমাদের অনুকূল—স্বাধীনতা-সংগ্রামে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়ার মত এতাদৃশ সুযোগ আমাদের জাতীয় জীবনে আর কখন পাইব? বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান অবস্থা ভবিষ্যৎ সাফল্যের সহায়ক। দলাদলি লোপ করিয়া, সকল শক্তি একত্র করিয়া কায়মনোবাক্যে জাতীয় সংগ্রামে অবতরণ করিলে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বিপন্ন করিতে পারি। বর্ত্তমান অনুকূল অবস্থার যথাসম্ভব সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমরা কি দূরদৃষ্টির পরিচয় দিব অথবা জাতীয় জীবনের এরূপ সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় নষ্ট করিব?"

হরিপুরা অধিবেশনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া সামন্ত রাজ্যের কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন পরিচালনপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"হরিপুরা অধিবেশনের পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ আমরা দেখিতেছি যে, অধিকাংশ স্থানেই সার্ব্বভৌম শক্তি করদ রাজগণের সহিত যোগ দিয়াছেন। এমত অবস্থায়, কংগ্রেসকর্ম্মী আমরা কি দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাদিগের সহিত অধিকতর সহযোগিতা করিব না? আজ আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, সে সম্বন্ধে আমার মনে আদৌ সন্দেহ নাই।

খাদি-প্রদর্শনীতে বিদ্যামন্দির পরিদর্শনে পণ্ডিত জওহরলাল ও কুমারী ইন্দিরা

"উপরি-উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পরে, করদ রাজ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দায়িত্বপূর্ণ শাসনসংস্কার সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করাও ওয়ার্কিং কমিটীর কর্ত্তব্য। এতদিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে কাজ হইয়াছে। চিন্তা বা সুনির্দ্দিষ্ট

পরিকল্পনার অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্তু, আজ যে সময় আসিয়াছে, তাহাতে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হইলে তদুদ্দেশ্যে একটি সাব কমিটী নিয়োগ করা ওয়ার্কিং কমিটীর কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে মহাত্মা গান্ধীর এবং নিখিল ভারত করদ রাজ্যবাসী প্রজা সম্মিলনের সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করা উচিত।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত মত তাঁহাকে কংগ্রেসে এক দলের অপ্রীতিভাজন করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধীজী এখনও অভিমত

লোকমতের প্রভাবে যাহাতে সামন্ত রাজ্যগুলি শাসনশীল হইয়া প্রজার অধিকার বিস্তার করে, তাহার জাতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানকে চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সব রাজ্যের শাসন—কু-শাসন, সে সব রাজ্য কেবল সন্ধির বা সনন্দের সর্ত্তে নির্ভর করিয়া বৃটিশ বেয়নেটের সহায়তায় আপনাদিগের কু-শাসন রক্ষা করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু সন্ধি বা সনন্দ যে পরিবর্ত্তিত অবস্থায়ও পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, তাহা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারেও বুঝা

কংগ্রেসে বাঙ্গালার সদস্যগণের বিক্ষোভ প্রকাশ

প্রকাশ করেন নাই। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—

"যদি আমাদিগের মতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হয়, তবে আমরা কি করিব, আজ তাহাই আমাদিগের বিবেচ্য নহে; পরন্তু যদি ইংরেজ ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না করেন, তবে কি করিতে হইবে, তাহাই বিবেচনার বিষয়।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব ভারত সরকার যদি এখন স্থগিত রাখেন, তাহা হইলেই সামন্ত রাজ্যসমূহের সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। কারণ, ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশে স্বৈরশাসন স্থায়ী করা কোন ভারতবাসীর অভিপ্রেত নহে। সেরূপ ব্যবস্থায় যাইতেছে। সুতরাং যদি প্রয়োজন হয়, তবে সে সকলের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সুখের বিষয়, ভারত-সচিব তাহার আভাষ দিয়াছেন।

আশাবাদী সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে সাগ্রহে সাদরে আহ্বান করিয়া অভিভাষণ-উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"স্বরাজ্য-সংগ্রামের শেষ স্তরে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। সেজন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রথমতঃ ক্ষমতা-লাভের ফলে কংগ্রেসকর্ম্মী মহলে যে অনাচার ও দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, কঠোর ভাবে তাহা দমন করিতে হইবে।

"তাহার পর দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকল প্রতিষ্ঠানের—

বিশেষভাবে কিষাণ ও শ্রমিক আন্দোলনের সহিত আমাদিগকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিতে হইবে। প্রগতিকামী সকল দলকেই একত্রে কায ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিতে হইবে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকল শক্তির সমন্বয় কারতে হইবে।

"কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কুজ্ঝটিকাপূর্ণ—মতভেদ সুপরিস্ফুট। আমাদের বহু বন্ধু সর্ব্বদাই নৈরাশ্য বোধ করিতেছেন—কিন্তু আমি সর্ব্বদাই আশাবাদী। আজ যে মেঘ দেখিয়া আপনারা হতাশ হইতেছেন, তাহা বিচরণশীল—দূরগামী। দেশবাসীর স্বাদেশিকতায় আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, অল্প দিনের মধ্যেই আমরা এই সকল অসুবিধা অতিক্রম করিতে ও ঐক্যস্থাপন করিতে পারিব। বন্দে মাতরম্।"

মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে দলবিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা ঘটে নাই। একমন্ত্রসাধনায় সমগ্র দেশবাসীর আত্মনিবেদনের সম্ভাবনা অন্তর্হিত হইয়াছে। আর সুভাষচন্দ্রের আইন অমান্যের পরিকল্পনা গ্রহণ জন্য দেশ প্রস্তুত কি না, তাহাও সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন, আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা এখন অনুকূল; কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে প্রতিকূল, তাহা কংগ্রেসের অধিবেশনেই পরিস্ফুট হইয়াছে। সেইজন্য এই আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আরোগ্যলাভের পর সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

কংগ্রেসের ২য় দিনের অধিবেশন—

২৭শে ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৬॥টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের ২য় দিনের অধিবেশন চলিয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণে রাষ্ট্রপতির ১০৫ জ্বর ও ব্রঙ্ক-নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশের জন্য তাঁহার অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়াছিল। ডাক্তার ও পরিজনগণের উপদেশ—অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, চিকিৎসার জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জব্বলপুর হাসপাতালে না যাইয়া তিনি ত্রিপুরীতেই মৃত্যুকে বরণ করিবেন।

খণ্ডিত বন্দে মাতরম্ গানের পর পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাবানুসারে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অধিবেশনপ্রারম্ভে রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্যের সঙ্কটজনক অবস্থা বিঘোষিত হইলে প্রতিনিধিগণ—বিশাল দর্শকসঙ্ঘ উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হন। সুভাষচন্দ্রের শঙ্কাকুল অবস্থার জন্য বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে গৃহীত পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর পরবর্ত্তী অধিবেশনে প্রদানের জন্য শ্রীযুত এনি প্রস্তাব করেন। বহু প্রতিনিধির প্রতিবাদধ্বনি থামিবার পর পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে অধিকাংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহাতে সুভাষচন্দ্রের সমর্থক দল আসন ত্যাগ করিয়া ভোট গণনার জন্য বিক্ষোভপ্রকাশ 'সুভাষ জিন্দাবাদ' প্রভৃতি তুমুল ধ্বনি
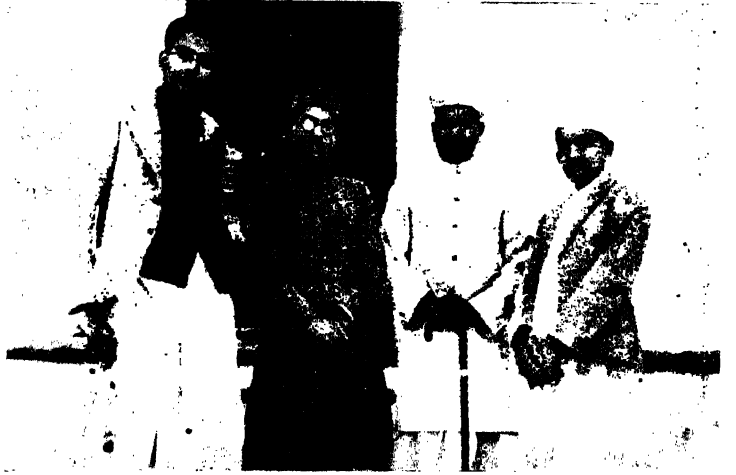
ত্রিপুরী কংগ্রেসের অফিসারবৃন্দ

করিতে থাকিলে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য-পরিচালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সভাপতি ও পণ্ডিত জওহরলাল বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় আগামী কল্য ভোট গণনা হইবে জানাইলেও বিক্ষুব্ধ জনতা শান্ত হন না। পণ্ডিত নেহেরু সুভাষপন্থী জনতাকে সরোষে বলেন, ২৫ বৎসর কংগ্রেসে এরূপ দেখেন নাই। এই দুর্নীতির কথাই মহাত্মা 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন,—লক্ষাধিক নর-নারী শান্তভাবে বসিয়া আছেন, কয়েক শত লোক সভা পণ্ড করিতেছেন। গণতান্ত্রিকতায় শৃঙ্খলাবোধ, ধৈর্য্য ও উদ্যম অপরিহার্য্য। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মিঃ এনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন বলায়, জনতা শান্ত হইয়া আসন গ্রহণ করেন। পরে মিঃ এনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

স্বর্গীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন—মিশরীয় প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা—চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ প্রভৃতি সভাপতির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঐ দিন প্রাতে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে গৃহীত পণ্ডিত নেহেরুর জাতীয় দাবী—কংগ্রেসের দুর্নীতি নিবারণ—সামন্ত রাজ্য—চীন-জাপান—কংগ্রেসের নীতি ও কার্য্য-তালিকা সম্বন্ধীয় পঞ্চ প্রস্তাব * পণ্ডিত জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এবং দেশের আদর্শ স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রস্তাবিত উপায়ের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন—

"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের উপর যুক্তরাষ্ট্র চাপাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প। এখন ইহার বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম করিবার সময় আসিয়াছে। কিষাণ, শ্রমিক ও দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগের মধ্যে বিশেষ জাগরণ দেখা দিয়াছে এবং গান্ধীজী স্বয়ং যখন দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগের স্বার্থসংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভারতের সংগ্রামের সাফল্য সুনিশ্চিত। তিনি আবেগপূর্ণভাবে দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ধর্ম্ম হইতে ইহার উৎপত্তি নহে। তিনি এই সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই দৌর্ব্বল্য অপসারিত করিতে হইবে।"

আচার্য্য নরেন্দ্র দেব প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংগঠন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে বলেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন, প্রস্তাবটিতে কেবল ভাল ভাল কথা গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাতে কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার ইঙ্গিত নাই।

বৃটিশ সরকারকে চরম পত্র প্রদান করিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলগুলিতে অচল অবস্থার উদ্ভব করিয়া যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন আছে।

মিষ্টার এ এম জামান প্রস্তাবটির সমর্থন করিয়া বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংগ্রাম করিতে কংগ্রেস যদি এখন তাঁহার সংকল্প ঘোষণা না করেন, তাহা হইলে কবে সে সংকল্প হইবে?

শ্রীযুত ভরদ্বাজের বক্তৃতার পর পণ্ডিত জওহরলাল আপত্তিগুলির প্রতিবাদে বলেন, মাত্র চরম পত্রের ভয় দেখাইলেই বৃটিশ সরকার তাঁহাদিগের দাবীগুলি পূর্ণ করিবেন না। জনসাধারণকে পূর্ব্বে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ও সংগঠিত করিতে হইবে।

শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ বিতর্কের উত্তর প্রদান করিবার পর জাতীয় দাবীর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুত প্রকাশের কংগ্রেসে দুর্নীতি অপসরণ প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হইবার পর ঐ দিনের মত সভা ভঙ্গ হয়।

২৭শে ফাল্গুন রাত্রে, ২য় দিনের অধিবেশনের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু টেলিফোনযোগে মহাত্মা গান্ধীকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্কট-অবস্থা—তাঁহার পদত্যাগের জনরব—পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণের প্রতিক্রিয়া—কংগ্রেসে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতি জানাইয়াছিলেন। সুভাষ বাবুর জ্বরবৃদ্ধি ও পদত্যাগ-সম্ভাবনায় গান্ধীজী দুঃখিত হইয়া টেলিফোনে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য ধন্যবাদ—ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত করিয়া কার্য্যকরী সমিতির পুরাতন সদস্যদের গ্রহণ করিলে তাঁহারা মনে-প্রাণে সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা করিবেন।

কংগ্রেসের ৩য় দিনের অধিবেশন—

২৮শে ফাল্গুন প্রাতে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির মণ্ডপে কংগ্রেসের অধিবেশনে পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাঁহার প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন করিলে উহা সংশোধন জন্য তুমুল বাদানুবাদ চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নরীম্যান, সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং, শ্রীযুক্ত ভরদ্বাজ, মিঃ এনি, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত সিদ্ধ, মিঃ নুরুদ্দিন বিহারী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র প্রভৃতি সুভাষচন্দ্রের প্রতি অনাস্থা—দোষারোপ ও বক্রোক্তি প্রত্যাহার—পরিবর্জ্জন—সংশোধন জন্য বক্তৃতায় বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ বক্তৃতায় বলেন—এই ভাবে কংগ্রেসের সময় অপব্যবহার না করিয়া এই সংঘর্ষের নিবৃত্তি হউক। বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে বিতর্কমূলক আলোচনার পর ইহা বন্ধ করা আবশ্যক। গান্ধীজীর সহিত আমাদের মতভেদ আছে, কিন্তু তাঁহার মর্য্যাদা ও কংগ্রেসে একতা প্রতিষ্ঠার সার্থকতা আমরা স্বীকার করি। মহাত্মাজীর অভিপ্রায়মত কার্য্যকরী সমিতি গঠিত না হইলে বিভেদ অনিবার্য্য। পন্থজীর

প্রস্তাবের অন্যান্য অংশেও আমাদের আপত্তি আছে, এজন্য সমাজতন্ত্রী দল নিরপেক্ষ থাকিবে।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ বিতর্কের উত্তরে বলেন,—মহাত্মাজী বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন—সুভাষবাবুর জয়ে তাঁহার নীতির পরাজয় হইয়াছে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সমর্থকগণ মহাত্মার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন নাই, সুভাষচন্দ্র মহাত্মার অধীনে কায করুন, তাঁহারা ইহাই চাহিয়াছেন। সুতরাং মহাত্মাজীর নেতৃত্বে আস্থা-জ্ঞাপনের জন্য কংগ্রেসের এই প্রস্তাব গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন। সকলে মহাত্মাজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিলেও কেহ কেহ তাহা তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্যকরী সমিতি গঠনের সমর্থন করেন নাই—এই মত কি তাঁহাদের নিজের কথারই প্রতিবাদ নহে? আমরা সকলেই চাই যে, সুভাষ বাবুই সভাপতি থাকুন—এই প্রস্তাব তাঁহার প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপক নহে। ইহার পর সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পন্থের প্রস্তাব সম্বন্ধে ঐ দিন মধ্যাহ্নে রাষ্ট্রপতি অভিমত দিয়াছিলেন যে, ইহা অনাস্থা প্রস্তাব নহে—তাঁহার নীতি ও কর্ম্মতালিকা কার্য্যে পরিণত হইতে অসুবিধা হইলেই পদত্যাগের প্রশ্ন উঠিতে পারে।

২৮শে ফাল্গুন অপরাহ্ণ ৬৷৹টায় কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হইয়া রাত্রি ১০৷৷৹টায় পরিসমাপ্তি হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সকল উত্তেজনার অবসান হয়। দর্শকসমাবেশের অল্পতার জন্য জনসাধারণ বিনা টিকিটে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি ব্রঙ্ক-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত—জ্বর ১০৩,—তাঁহার অনুপস্থিতিতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রপতির আরোগ্য কামনা করেন। শেষ দিনের কার্য্যতালিকায় ৫টি প্রস্তাব সন্নিবেশিত ছিল। প্রথমে পণ্ডিত জওহরলালের প্যালেষ্টাইন ও বেলুচিস্থান সম্পর্কিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

অতঃপর মিউনিকচুক্তি, ইঙ্গ-ইতালীয়চুক্তি এবং স্পেনের ফ্রাঙ্কো-গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার জন্য পণ্ডিত নেহেরু বক্তৃতায় বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির তীব্র নিন্দা করেন, এই প্রস্তাবে তিনি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণের অধিকারের কথারও উল্লেখ করেন। পণ্ডিতজী বলেন—কোন দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ—নির্য্যাতিতকে সাহায্যের অধিকার ভারতের নাই। তিনি চীনে মেডিকেল মিশন ও স্পেনে খাদ্যসম্ভার পাঠাইবার দাবী জানান। তিনি আশা করেন—ভারতের স্বাধীনতা লাভ আসন্ন। বিদেশের নিকট ভারতের শক্তি সম্পদ্ সাহায্যের মূল্য সমধিক। জগতের প্রত্যেক রাষ্ট্র ভারত তাঁহাদের সহিত কিরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহা জানিতে উৎসুক। শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন—পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভারতের নাই। ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি বটে, কিন্তু বৃটেনই রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ সামন্তরাজ্যের শাসনসংস্কার প্রস্তাব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—সামন্তরাজ্যে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনই কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজন্যগণের দমননীতি দেখিয়া মনে হয়, তাঁহাদের পক্ষে প্রজাদিগকে অধিকার দিয়াও প্রত্যাহার করা সম্ভব। এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া খাঁ আবদুল গফুর খাঁ কাশ্মীররাজ্যের অনাচারের উল্লেখের পর বলেন—প্রজাগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রকৃত সত্যাগ্রহীর ন্যায় আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রস্তুত হউক, ইহাই কংগ্রেসের অভিপ্রায়। শ্রীযুক্তা কমলা দেবী এই প্রস্তাবের সংশোধনে বলেন—সামন্তরাজ্যে আন্দোলনের নির্দ্দেশ ও সাহায্যের জন্য কংগ্রেসের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রয়োজন, যথাযথ নির্দ্দেশের অভাব—নেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতার জন্যই বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন সফল হয় নাই। এই সংশোধন প্রস্তাব সমর্থনে শ্রীযুক্ত অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন বলিয়াছেন, হরিপুরা প্রস্তাবের ফলেই যে সামন্ত রাজ্যে গণজাগরণ সূচিত হইয়াছে, ইহা বিচারসহ নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের সামন্ত রাজ্যসম্বন্ধে নূতন নীতির আবশ্যক। পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা বলেন, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে দমননীতির আশু প্রতিকার প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত আর কে সিদ্ধ প্রস্তাবের সমর্থন করেন, শ্রীযুক্ত শঙ্কর, শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত কে, সি রেড্ডি বলেন—মহীশূর সরকার, সর্দ্দার প্যাটেল ও আচার্য্য কৃপালনীর সহিত যে চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন, এজন্য উক্ত রাজ্যে আন্দোলন প্রয়োজন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিতর্কের উত্তর দিবার পর সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য ও সামন্তরাজ্যের শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারত স্বাধীন হইলে কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি অবিচারের প্রতিকার করিতে পারিবে। তিনি ব্রহ্মবাসীদিগকে ভারতের সহিত তাঁহাদের কৃষ্টিগত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না করিতে অনুরোধ করেন। ব্রহ্ম কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুর এই প্রস্তাবে ব্রহ্মের

খাদি ও গ্রাম্য-শিল্প প্রদর্শনীক্ষেত্রের অপরাংশ—ত্রিপুরী

ভারতবাসীর ধনপ্রাণ বিপন্ন অংশটি বাদ দিতে বলেন, কিন্তু তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ডাঃ চৈৎরাম গিদোয়ানীর সমর্থনে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধক্রমে পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাবে আগামী বড়দিনের সময় বিহারে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে। অতঃপর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু—রাষ্ট্রপতি—সভাপতি—প্রতিনিধি-বর্গ—অভ্যর্থনা সমিতি ও কর্ম্মিগণকে ধন্যবাদ প্রদান—বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য উল্লাস প্রকাশের পর—৫২তম অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

প্রত্যাবর্ত্তন—

এবার কংগ্রেসের অধিবেশন সময়ে ত্রিপুরীতে পুলিসের বিশেষ সমারোহের ব্যবস্থা-বৈচিত্র্য ছিল। সুভাষচন্দ্র রোগশয্যায় সংবাদ পাইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকে অনুরোধ জানাইলে পুলিস-বাহিনী অপসারিত হয়।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের সংশয়াপন্ন অবস্থায় বাঙ্গালার বাহিরের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার অনুরোধে সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্য কংগ্রেসের অধিবেশন মুলতুবী রাখিতে সম্মত হইলেও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিশেষ প্রতিবাদে তাহা সম্ভবপর হয় নাই।

৩০শে ফাল্গুন মাতা, ভ্রাতা ও পরিজনসহ রোগক্লিষ্ট সুভাষচন্দ্রকে কলিকাতায় আনিবার পথে নিভৃত শুশ্রূষায় সত্বর রোগ উপশমের আশায় ধানবাদে তাঁহার ভ্রাতৃগৃহে লইয়া যাওয়া

হইয়াছে। তাঁহার শঙ্কাজনক অবস্থার জন্য বাঙ্গালীমাত্রই উৎকণ্ঠিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তিনি বাঙ্গালা মায়ের স্নেহকোমল শ্যামল অঙ্কে ফিরিয়া সত্বর আরোগ্য লাভ করুন। সুস্থ হইয়া তিনি কংগ্রেসের নূতন কর্ম্মতালিকা ও নূতন ওয়ার্কিং কমিটী-সংগঠনের পরামর্শ গ্রহণ জন্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের আদেশ মান্য করিয়া, কার্য্যপরিচালন সমিতিতে মহাত্মার নির্দ্দেশ অনুযায়ী নূতন সদস্যগণকে লইয়া কার্য্য-পরিচালন সমিতি সংগঠন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মতালিকা—যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাধা প্রদান করা হইলে এবং আপোষ সম্ভব না হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন।

মহাত্মাজী বড়লাট-সন্দর্শনে দিল্লীতে গিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, আচার্য্য কৃপালনী এবং খান আবদুল গফুর খান প্রভৃতি কংগ্রেস-বিজয়ী বীরগণ গান্ধীজীকে বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল করিবার জন্য অধিবেশন শেষে ২৯শে ফাল্গুন দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

গান্ধীজীর প্রিয়তম শিষ্য মিঃ ভুলাভাই দেশাই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে নব-প্রবর্ত্তিত ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর-বিধান সমর্থনে যেরূপ প্রবল আগ্রহের পরিচয় দিয়াছিলেন—সরকারের পরিষদে কংগ্রেসীদলের সেই সহায়তা—সেই আপোষের ফলে বাণিজ্য শিল্পোন্নতির যে প্রবল অন্তরায় চিরদিনের জন্য সংসাধিত হইয়াছে, 'দেশাই-দলের সে কীর্ত্তি কি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চিরস্মরণীয় নহে?—তাহা কি উপেক্ষার যোগ্য?

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভের প্রস্তাব গান্ধীজীর নির্দ্দেশে তাঁহার অনুচরবর্গের ষড়যন্ত্রে—প্রচেষ্টায় অধিবেশনে সমর্থিত হইলেও,—সভাপতির জীবন-সঙ্কটকালে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে গৃহীত হইলেও, কংগ্রেস মহাত্মাজীর কঠোর কবলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে। গান্ধীজী কংগ্রেসের চার আনা সদস্য না হইলেও তাঁহারই সূত্রাকর্ষণে যে কংগ্রেস পরিচালিত—নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ও হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? রোগ-যন্ত্রণাতুর সুভাষচন্দ্রের কাতর অনুনয়ও উপেক্ষা করিয়া তিনি কংগ্রেসের অধিবেশন সময়ে ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন-সংস্কার-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লাট-দরবারের আনন্দ-সম্মিলনে যাইতে পারিয়াছেন। দিল্লীতে তাঁহাকে হরিজনগণের কুটীরে অবস্থান করিতে হইবে না, এবার তিনি ধনকুবের বাবু ঘনশ্যামদাস বিরলার প্রাসাদে অতিথি!

তাঁহারই নেতৃত্ব অবিচারিত চিত্তে শিরোধার্য্য করিবার জন্য সমগ্র বাঙ্গালীজাতি প্রস্তুত হউন! আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে দেশবাসী যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইলে সহস্র সহস্র নর-নারী লাঞ্ছনানির্য্যাতন—সাদরে কারাবরণ করিবার পর যিনি সহসা অনায়াসে বলিয়াছিলেন—দেশবাসী ভ্রান্তপথে চলিয়াছে—তাঁহার আদর্শানুযায়ী অহিংস অসহযোগ সার্থক হয় নাই বলিয়াই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে—স্বরাজ-শিখরে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই—তিনিই একমাত্র এই অহিংস সংগ্রাম চালাইবার যোগ্য মহামানব! সকলে নিবৃত্ত হউন—একক সৈনিক তিনিই এ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করিবেন! তাঁহারই মোহনীয় প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া আবার কি বাঙ্গালী তাঁহার আদেশে—নির্দ্দেশে নতশিরে গণতান্ত্রিক জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর হইবে? কিন্তু যাঁহার রচিত পুনা প্যাক্ট বাঙ্গালায় সংস্কৃতির বিরোধী মনীষার অনুসরণ-যোগ্য হিন্দু সম্প্রদায়কে দ্বিধা বিভক্ত ও বিব্রত করিয়াছে, বাঙ্গালী কি তাহা কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে?

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনুসরণে

শিল্পী মিষ্টার টমাস

১৭শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩৪৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

গীতা-বিচার

১২ *

বন্দে মাতরম্

পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যার প্রবন্ধে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচার করিয়াছি, তাহারই কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট এই 'বন্দে মাতরম্'। আমার সাহিত্যাধ্যাপক পরম পূজনীয় ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয় বঙ্কিম বাবুরও অধ্যাপক ছিলেন † ন্যায়ভূষণ মহাশয় ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠবংশসম্ভূত। বঙ্কিম বাবু যখন নিকটবর্ত্তী কর্ম্মস্থান হইতে রবিবারে রবিবারে কাঁঠালপাড়ার বাটীতে আসিতেন, তখনই তিনি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। বঙ্কিম বাবু পড়িবার সময় ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের মুখে শুনিলেন "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।"—এই গীতা শ্লোকের ব্যাখ্যা। পূজ্যপাদ ন্যায়ভূষণ মহাশয় 'নিবাসঃ'—এই পদের অর্থ করিতেন জন্মভূমি। ইহার সহিতই আবৃত্তি করিতেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' সেই ব্যাখ্যা শ্রবণই 'বন্দে মাতরম্' গীতের মূল। 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি' 'ধাত্র্যৈ নমো নমঃ' 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ'—এই সপ্তশতী মন্ত্র এবং উপরিলিখিত গীতামন্ত্রের সমন্বয়ে 'বন্দে মাতরম্' গীতি। এই গীতি মন্ত্রপ্রসূত বলিয়া মন্ত্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ জন্মভূমির যে উপাসনা, তাহা গীতোক্ত ব্রহ্মোপাসনার অন্যতম স্বরূপ। ভগবান্ গীতায় স্বমুখে বলিয়াছেন—

> মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
> ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ৯।১৩॥

দেব-প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মারা আমাকে অব্যয় (সনাতন) ভূতাদি (জীবগণের আদি) জানিয়া অনন্যচিত্তে আমাকে ভজনা করেন। ইহার পরেই আছে,—

> সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
> নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥

সর্ব্বদা আমার কীর্ত্তন, দৃঢ়ব্রত হইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি বিষয়ে

* গতবারে ভ্রমক্রমে (১২) সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে,—(১১) সংখ্যা হইবে। এবারে ভ্রমসংশোধনার্থে (১২) সংখ্যাই প্রদত্ত হইল।

† তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয় অপর প্রবন্ধে প্রদান করিলাম।

প্রযত্ন এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণতি দ্বারা নিত্যযুক্ত হইয়া আমাকে উপাসনা করিয়া থাকেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্য মহাত্মারা 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্' এই প্রকার জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমাকে পূজা করত উপাসনা করেন, তন্মধ্যে সেই বাসুদেবের সহিত নিজের অভেদজ্ঞানে কোন কোন সাধক উপাসনা করেন, আমি তাঁহার দাস এই বুদ্ধিতে কেহ কেহ তাঁহার উপাসনা করেন, কেহ কেহ ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি বহু প্রকারেও বিশ্বতোমুখ (সর্ব্বাত্মক) আমার উপাসনা করেন। (এই অর্থ শ্রীধর-টীকাসম্মত)

অতঃপর তিনি যে সর্ব্বস্বরূপ, তাহা দেখাইয়াছেন,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
ইত্যাদি।

আমি ক্রতু (অগ্নিষ্টোমাদি বৈদিক যজ্ঞ), আমি যজ্ঞ (স্মৃত্যুক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ), আমি স্বধা (পিতৃ উদ্দেশে বিহিত শ্রাদ্ধাদি), আমি ঔষধ (সর্ব্বপ্রাণিভোগ্য অন্ন বা সর্ব্বহিতকারী ঔষধ), আমি মন্ত্র, আমিই আজ্য (হোমীয় দ্রব্য), আমি অগ্নি (যজ্ঞাগ্নি), আমি হোম (১৬)। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা), পিতামহ, বেদ্য (জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্র (শুদ্ধিদাতা অথবা শুদ্ধিহেতু প্রায়শ্চিত্ত), প্রণব, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, (১৭) গতি (ফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাস (ভোগস্থান), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ (হিতকারী), প্রভব (সৃষ্টিকর্ত্তা), প্রলয় (সংহারকর্ত্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান) এবং বীজ (কারণস্বরূপ), তথাপি ব্রীহি যব প্রভৃতির ন্যায় নহি—যেহেতু আমি অব্যয় (অবিনাশী), (১৮) ইত্যাদি। ইহা শ্রীধর-টীকাসম্মত অর্থ। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির মতে পদের অর্থবিষয়ে কিছু ভেদ আছে, তাহা পরে দেখাইব। শ্রীধরমতে 'নিবাস' শব্দের অর্থ 'যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি', স্থানং শব্দের অর্থ তিষ্ঠত্যস্মিন্, নিধান শব্দের অর্থ 'নিক্ষেপ' (কালান্তরোপভোগ্যং) গচ্ছিত বা স্থাপ্য ধন ইত্যাদি। উভয়ের মূলতঃ তাৎপর্য্য এক।

এই ব্যাখ্যায় স্পষ্ট জন্মভূমির নাম না থাকিলেও— 'নিবাসঃ' 'স্থানং' এই দুইটি পদ থাকায় একটি যে জন্মভূমির জ্ঞাপক, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

পূর্ব্ব শ্লোকে আছে,—'পিতাহমস্য জগতো মাতা' যিনি মাতা তিনিই জন্মভূমি, তাঁহার উপাসনা পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে আছে।

গীতায় যিনি পুরুষোত্তম,—'ধাত্রী' জগতের আধারভূতা মহীরূপে এবং মাতৃরূপে সপ্তশতীতে (চণ্ডীতে) তাঁহারই স্তুতি আছে, তথায় তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী মহামায়া। উভয় শব্দেরই যে একই অর্থ, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি।

এতৎ সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা আছে, সেইজন্য উপরে গীতার ছয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই ছয়টি শ্লোকের প্রথমটিতে ভজনার কথা আছে, কিন্তু কিরূপে যে ভজনা, তাহা কথিত হয় নাই, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্লোকেই তাহা কথিত, 'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং' এই শ্লোকে বাচিক, মানসিক ও কায়িক এই ত্রিবিধ কর্ম্মযোগের কথা আছে এবং 'জ্ঞানযজ্ঞেন' ইত্যাদি— শ্লোকে জ্ঞানযোগের কথা আছে।—(ইহা শ্রীধর-সম্মত ভাবার্থ)।—শঙ্করমতে (১৪), পূর্ব্ব শ্লোকে, অধীতবেদান্ত শমদমাদিসম্পন্ন মুমুক্ষু অধিকারীর নির্দ্দেশ,জ্ঞানযজ্ঞেন ইত্যাদি (১৫) শ্লোকে উপাসনাস্বরূপ নির্দ্দেশ আছে। এই জ্ঞানযোগ অদ্বৈত জ্ঞান বা পরমার্থদর্শন হইলে,—'একত্বেন' জ্ঞানই প্রাপ্ত হওয়া যায়, 'পৃথক্ত্বেন' এবং 'বহুধা' হয় কিরূপে ?— এই প্রশ্ন সমাধানার্থ,—টীকাকারগণ অধিকারভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অধিকারভেদে জ্ঞানভেদ আনিয়াছেন,— শঙ্করমতে,—প্রথমোক্ত একত্বজ্ঞানই অদ্বৈতদর্শন, তাহাকে রূপকস্বরূপে যজ্ঞ বলা হইয়াছে, যজ্ঞ হইলেই তাহাতে যজন আবশ্যক—এ স্থানে যজন কি না অভিন্নভাবে উপাসনা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনজনিত ব্রহ্মাকারা অখণ্ডচিত্তবৃত্তিই সেই উপাসনা। প্রথমোক্ত উপাসনা উত্তম অধিকারীর পক্ষে; মধ্যম অধিকারী দ্বিবিধ,—তাহাদিগের কেহ কেহ "আদিত্য এবং চন্দ্রাদি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিষ্ণুই অবস্থিত" এই জ্ঞানে

যে কোন এক আলম্বন আশ্রয়ে আমার উপাসনা করেন, আমি ঐ সব রূপ গ্রহণ করিয়া অবস্থিত বিশ্বরূপ আমারই উপাসনা অপরে করেন। অতএব অন্যে জ্ঞানযজ্ঞেন (মাং) যজন্তঃ 'কেচিৎ' একত্বেন উপাসতে, (কেচিৎ) পৃথক্ত্বেন (উপাসতে) (কেচিচ্চ) বহুধা (অবস্থিতং) বিশ্বতোমুখং (বিশ্বরূপং) (বহুধা) (উপাসতে) এই প্রকার অন্বয় করিতে হয়।

শাঙ্কর-ভাষ্য যথা—

"তে কেন কেন প্রকারেণোপাসত ইত্যুচ্যতে জ্ঞানেতি। জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞস্তেন যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরঞ্চান্যে-ঽন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্য উপাসতে তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন, একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে, কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেন আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন স এব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত ইত্যুপাসতে কেচিৎ বহুধাবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্ব্বতোমুখো. বিশ্বরূপ ইতি বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণো-পাসতে।…"ভাষ্যের এই পাঠানুসারে বলিতে হয়,—শাঙ্করভাষ্যমতে 'বহুধা বিশ্বতোমুখম্' মূলের পাঠ নহে, 'বহুধা সর্ব্বতোমুখম্' এইরূপ পাঠ। ভাষ্যে মূলস্থ 'বহুধা' শব্দ দুইবার গৃহীত হইয়াছে। আনন্দ গিরি শাঙ্করভাষ্যের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে বুঝা যায়,—তাঁহার মতে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা উপাসনা দ্বিবিধ—এক অদ্বৈতদর্শন, অন্য বিশ্বরূপোপাসনা অর্থাৎ বৈশ্বানরবিদ্যা। আদিত্যাদি আলম্বনে উপাসনা তাঁহার সম্মত নহে,—শাঙ্করভাষ্যে 'কেচিদ্ বহুধাবস্থিতঃ'—ইত্যাদি পাঠ তাহাতে গৃহীত হয় নাই। ঐ পাঠ থাকিলে—'কেচিচ্চ' ইত্যাদি পাঠেরই তাহা বিবৃত ইহা বলিতে হয়। কিন্তু ইহা সঙ্গত হয় না, বিবৃতি অংশ ব্যর্থই হইয়া পড়ে। যে পাঠ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহার মর্ম্মার্থ—উপরের অনুবাদেই আছে।

শাঙ্করভাষ্যে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা মূলের অধিক অনুগত। সেই ব্যাখ্যার অনুগত অনুবাদ—পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর আমার কথা।

'জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে' ইত্যাদি শ্লোকের অন্যবিধ অর্থ এই যে,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

....

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। ৭।১৬-১৭ অর্দ্ধ।
"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" ৭।১৯ অর্দ্ধ ॥

এই প্রমাণ অনুসারে—'জ্ঞানযজ্ঞেন—ইহার অর্থ শ্রীধর স্বামী যাহা করিয়াছেন, প্রথমার্দ্ধে তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়। অর্থাৎ 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্' এই প্রকার জ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমার যজন করত অপর সাধকেরা উপাসনা করে। অপর দ্বিবিধ সাধক আছে—তাহাদিগের কেহ কেহ আমার অনন্ত রূপের মধ্যে কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া তিনিই এবং ব্রহ্ম এই ভাবে উপাসনা করেন এবং কেহ কেহ আমার বিভিন্ন রূপকেই বহু প্রকারে উপাসনা করেন। আমি যজ্ঞ ক্রতু ইত্যাদি নানারূপ হইলেও—যিনি যজ্ঞভক্ত তিনি আমাকে এক যজ্ঞভাবেই উপাসনা করেন—যজ্ঞের উপকরণ সেই যজ্ঞ হইতেই অভিন্ন এই বোধ তাঁহাদিগের থাকে।

যাঁহারা তাঁহাকে মাতা বলিয়া উপাসনা করেন,—তাঁহারা তাঁহাকেই, যজ্ঞ ক্রতু পিতা ইত্যাদি রূপ মনে করিয়া উপাসনা করেন,—যিনি তাঁহাকে নিবাস অর্থাৎ জন্মভূমি-রূপে উপাসনা করেন, তিনি সেই জন্মভূমিকেই যজ্ঞ ক্রতু মাতা ইত্যাদি মনে করিবেন, ইহাই একত্বেন উপাসনার অর্থ,—আর ব্রহ্মই যে ব্রহ্মা শিব ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, সেই তাঁহার প্রত্যেক ভাবকে যে পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক উপাসনা তাহাই 'পৃথক্ত্বেন বহুধা' উপাসনা। এই ব্যাখ্যায় জন্মভূমিকে মাতৃভাবে উপাসনাই 'বন্দে মাতরম্' স্তুতি দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, "জন্মভূমি অর্থে নিবাস শব্দের প্রয়োগ কষ্ট-কল্পিত, নিবাস শব্দের সহজ অর্থ বাসভূমি হইতে পারে বটে, কিন্তু বাসভূমি ও জন্মভূমি ত এক নহে। পল্লীগ্রাম যাঁহার জন্মভূমি এমন বহু ব্যক্তির বাসভূমি কলিকাতা, ইহা প্রত্যক্ষ"—ইহার উত্তর এই যে,—ভর্ত্তা প্রভু এবং শরণ (রক্ষক) একার্থ শব্দ হইলেও প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ ঐ সকল শব্দকে কোনরূপে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন,—সেইরূপ এখানেও নিবাস, শরণ (গৃহ), স্থান, নিধান, এই সকল শব্দই বাসভূমির বোধক হইতে পারে,—শরণ শব্দের রক্ষক অর্থ থাকিলেও গৃহ অর্থও আছে,—ভর্ত্তা এবং রক্ষক একার্থ হইলে

—শরণ শব্দের অর্থ গৃহ হওয়াই সঙ্গত,—বিশেষতঃ নিবাস শব্দের সন্নিহিত থাকায়—গৃহ অর্থে শরণ শব্দের প্রয়োগই অধিকতর সম্ভবপর, অথচ এই শব্দদ্বয়ের পরস্পর ভেদ-প্রবণস্থলে উল্লিখিত দৃষ্টান্তেই প্রাপ্ত হওয়া যায়,—নিবাস শব্দে আদি নিবাস এবং গৃহ শব্দে বর্ত্তমান নিবাস,—পল্লীগ্রামে যাহাদিগের জন্ম এবং বর্ত্তমানে কলিকাতাবাসী,—তাঁহাদিগের আদি নিবাস জন্মভূমি, বর্ত্তমানে গৃহ কলিকাতা, —শরণ শব্দের অর্থ—রক্ষক হইলেও—পরে যে 'স্থান' শব্দ আছে—তাহা হইতেও বর্ত্তমান বাসস্থান বুঝা যায়,—সুতরাং নিবাস শব্দের অর্থ আদি নিবাস হওয়া অসঙ্গত নহে। নিধান শব্দের অর্থ—শ্রীধর-মতে লয়স্থান, শঙ্করমতে স্থাপ্য ধন। কিন্তু গীতামধ্যে 'নিধান শব্দের আর যে দুই স্থানে প্রয়োগ আছে,

১। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ১০।১৮

২। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ১০।৩৮

সেই উভয় স্থানেই শাঙ্করভাষ্যসম্মত অর্থ 'আশ্রয়।' এই দুই স্থানেই পরং প্রকৃষ্টং নিধীয়তেঽস্মিন্ জগৎ সর্ব্বং প্রলয়াদাবিত্যর্থঃ (শাঙ্কর ভাষ্য); অতএব উক্ত দুই শ্লোকেই শঙ্করমতে নিধান শব্দের অর্থ আশ্রয়। গতির্ভর্ত্তা ইত্যাদি শ্লোকে 'স্থানং' শব্দ আশ্রয় অর্থে গ্রহণ করাতে শাঙ্করভাষ্যে ও শ্রীধর টীকায় 'নিধানং' শব্দের অর্থান্তর কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু (১) নিবাস (২) স্থান ও (৩) নিধান শব্দে (১) জন্মভূমি (২) ভোগভূমি এবং (৩) কর্ম্মভূমি এই তিন প্রকারে অথবা (১) জন্মভূমি, (২) ভোগভূমি এবং (৩) সমগ্র ভূমণ্ডল এই তিন প্রকারে অর্থভেদ গ্রহণ করিলেও পুনরুক্তি পরিহার হইতে পারে। ভর্ত্তা এবং শরণ শব্দের প্রাচীনসম্মত অর্থই স্বীকৃত হইল। অতএব নিবাস শব্দের আদিবাসভূমি বা জন্মভূমি অর্থে প্রয়োগ পুনরুক্তি পরিহারের জন্য উক্তস্থলে আবশ্যক, অতএব কষ্টকল্পিত নহে।

প্রশ্নের উত্তরে যাহা উপরে বলিলাম, তাহা পুরাতন ব্যাখ্যার অনুসরণে। 'একত্বেন পৃথক্ত্বেন' এই উত্তরার্দ্ধের যে অন্যবিধ ব্যাখ্যা সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিয়াছি—জন্মভূমি অবলম্বনে তাহারই সবিস্তার, বিবরণ অতঃপর প্রদান করিতেছি,—

গীতার নবম অধ্যায় ভগবদ্ভজনীয় উপদেশে পূর্ণ, এক ভাবে এবং নানাভাবে তাঁহার ভজনা হইয়া থাকে, কোন ভজনা দ্বারা সংসার হইতে পরিত্রাণ, কোন ভজনায় অভীষ্ট সুখ স্বর্গাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে,—স্বর্গাদি সুখার্থীর ভজনার ফলে স্বর্গাদি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই সুখভোগ অনন্ত কালের জন্য নহে, ভজনজনিত পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গাদি সুখভোগের অবসান ঘটে,—তখন আবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥

(শঙ্কর-মতে)—পূর্ব্ব অধ্যায়ে যোগসাধনার উপদেশ থাকায়—একমাত্র তাহাই অবলম্বনীয়—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা অর্জ্জুনের যেন না হয়, এই কারণে—এই অধ্যায়ের উপদেশ। প্রারম্ভশ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, হে অর্জ্জুন, তুমি অনসূয়ু—অসূয়ারহিত অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের উপযুক্ত পাত্র, এই কারণে তোমাকে এই অতি গোপনীয় বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান উপদেশ করিব যাহা জ্ঞাত হইয়া তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। 'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্' অর্থাৎ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'আত্মৈবেদং সর্ব্বম্'—ইত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ সম্যক্ জ্ঞান—অদ্বৈত জ্ঞান, জ্ঞান শব্দের অর্থ; 'তাহার অনুভব'—শাস্ত্রোপদিষ্ট অদ্বৈত জ্ঞানের যে নিজ হৃদয়ে উপলব্ধি—তাহাই বিজ্ঞান শব্দের অর্থ। সংসারবন্ধনই অশুভ শব্দের অর্থ।

ইদমেব তু সম্যগ্‌জ্ঞানং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যাত্মৈবেদং সর্ব্বম্ একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ 'কিং বিশিষ্টং? বিজ্ঞানসহিতম্ বিজ্ঞানম্ অনুভবঃ'—(শাঙ্কর ভাষ্য) এস্থলে অনুভব শব্দের আনন্দগিরি-কৃত ব্যাখ্যা—'অনুভবঃ'—সাক্ষাৎকারঃ।

(শ্রীধর-মতে)—স্বীয় পরমেশ্বরতত্ত্ব ভক্তিমার্গেই সুলভ—অন্য মার্গে নহে। ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়াছেন, এক্ষণে স্বীয় অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্য এবং ভক্তির প্রভাব বর্ণনার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন, হে অর্জ্জুন, আমি জানি তুমি অনসূয়ু—আমি যে বারংবার নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করিতেছি, তাহা আমার করুণা—তোমার এই বিশ্বাস দৃঢ়, ইহার জন্য আমাকে আত্মশ্লাঘারত মনে করা তোমার দ্বারা কদাচ হয় না। সেইজন্য গোপনীয়তম ঈশ্বরবিষয়ক (মদ্বিষয়ক) জ্ঞান ও উপাসনার উপদেশ

করিব, যাহা জ্ঞাত হইয়া সত্বই তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ধর্ম্মজ্ঞানমাত্রই গোপনীয়, আত্মা যে দেহাদি হইতে অতিরিক্ত এই জ্ঞান তদপেক্ষা গোপনীয়—(গোপনীয়তর) পরমাত্মজ্ঞান আরও গোপনীয় অতএব গোপনীয়তম। বিশেষ পাত্র ব্যতীত ইহার উপদেশ করিতে নাই,—করিলে বিপরীত ফল হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই বিপরীত ফলের উদাহরণ প্রদানের লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। নিম্নস্থ দুইটি অনুচ্ছেদ পাঠ করা না করা পাঠকের ইচ্ছাধীন।

৪৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা। শ্রীনাথ বেদান্তবাগীশ পটলডাঙ্গায় থাকিতেন—তিনি বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন। কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তিনি বেদান্ত পড়াইতেন, কথায় কথায় তিনি আমার নিকট এই কথা বলেন। আমার মতে সেই ধনাঢ্য বেদান্তপাঠে অনধিকারী। আমি বেদান্তবাগীশকে বলিলাম, এইরূপ বেদান্ত অধ্যাপনা অনুচিত। তিনি তাহার প্রতিবাদ করিলেন না বটে, কিন্তু অধ্যাপনা হইতে নিবৃত্তও হন নাই, তাহা পরে তাঁহারই কথায় জানিতে পারিলাম। সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতেন এবং সেই দিনে অধ্যাপক-বিদায় করিতেন। দুই বৎসর পরে বেদান্তবাগীশ একদিন বলিলেন, তর্করত্ন, যাহা বলিয়াছিলে, তাহা খুবই ঠিক,—অনধিকারীকে বেদান্ত অধ্যাপনার ফল ফলিয়াছে—এখন বাবু বলেন, "শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, অতএব পরিত্যাজ্য—বিশেষতঃ বেদান্তসূত্রে এ বিষয়ে কোন উপদেশ নাই, অতএব আমি ইহা আর করিব না।" তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ ত্যাগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বহু ব্যক্তিই বৈদান্তিক, যথেচ্ছ আচরণ বৈদান্তিকতার বা পরমাত্মজ্ঞানের লক্ষণ। শুনিয়াছি পরমাত্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা পঞ্জাবে না কি খুব প্রবল, ইন্দ্রিয়দোষ যে অনুচিত কার্য্য নহে, তাহার সমর্থনকল্পে তথায় চলিত প্রবচন—'কর্ম্মণি লগ্নং ব্রহ্মণি তৎকিম্'—সীমান্ত প্রদেশের 'ওম্ মণ্ডলী' তাহারই একটা ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি, ইহাও রটিয়াছে।

অতএব পরমাত্মজ্ঞান যে 'গোপনীয়তম', ইহা সুপ্রমাণিত।

শাঙ্কর ভাষ্যমতে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহা উপাসনারই নামান্তর—ইহা তাঁহার মত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা নবম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যের সহিত পরবর্ত্তী উপাসনাবাক্যের মিল থাকে না। যে চিদচিদুভয়াত্মক ব্রহ্মতত্ত্ব গীতাসম্মত বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি—সেই সিদ্ধান্তে উপাসনার অর্থ এই নবমাধ্যায়েই উপসংহার বচনে স্পষ্টীভূত।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।"

আমাতেই চিত্ত স্থির রাখিবে, আমারই যজন (কর্ম্মযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্চনা) নিরন্তর করিবে, (কর্ম্মযজ্ঞের নিদর্শন যথা) আমাকে নমস্কার করিবে, এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া মনকে আমাতেই সমাহিত করত আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

আমি অর্থে চিদচিদাত্মক ব্রহ্ম, তিনিই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আশ্রয়ে অভিব্যক্ত, ইহা নিম্নলিখিত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥

আমি মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়াছি—কিন্তু আমার যে ভূতমহেশ্বরস্বরূপ পরম তত্ত্ব তাহা না জানিয়া মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে।

কেবল নিষ্ক্রিয় চিৎ ও জড়স্বরূপ কেবল অচিতের যে ঈশ্বরত্ব হয় না—এবং মায়াকৃত ঈশ্বরত্ব বলিলে তাহা যে 'পরং ভাবম্' পরম তত্ত্ব হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্ব-প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের সহিত মিলাইয়া বুঝিতে হইবে—এই চিদচিদাত্মক ব্রহ্ম মহত্তত্ত্বাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত।

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানযজ্ঞে যে উপাসনা—তাহা চিদচিদাত্মক ব্রহ্মই—(বাসুদেবই) সব এই অদ্বৈতজ্ঞানে পর্য্যবসিত এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে, একমাত্র যজ্ঞরূপে, একমাত্র জগজ্জনকরূপে, একমাত্র জগজ্জননীরূপে এবং একমাত্র জন্মভূমি ইত্যাদি রূপে 'একত্বেন বহুধা' উপাসনা জ্ঞানমার্গেও হইতে পারে। অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত ইহার ভেদ এই যে, ইহাতে দাস্য প্রভৃতি ভাবে সাধক আপনার উপাস্যকে পৃথক্‌ভাবে বুঝে—কিন্তু যিনি উপাস্য, তাঁহার সেই রূপ এবং তত্ত্ব সর্ব্বত্র বিরাজিত ইহা অনুভব করে। আর তাঁহারই উপাসনা পৃথক্‌রূপেও আছে—নিষ্কাম পুরুষের নিত্যাগ্নিহোত্রে এবং দর্শপূর্ণমাস যাগে ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা-চিদচিদাত্মক ব্রহ্মেরই এক এক রূপে স্ফুরণবোধে যে উপাসনা তাহাই—'পৃথক্ত্বেন বহুধা' উপাসনা। ব্রহ্মভাবের

জ্ঞান না হইয়া ফলদাতা এক এক দেবতা এই ভাবে যে সকল উপাসনা, তাহা জ্ঞানযজ্ঞে উপাসনা নহে। তাহা কর্ম্মমার্গে সকাম উপাসনা। এই নবম অধ্যায়েই 'ত্রৈবিদ্যা মাং' (২০।২১) শ্লোকে এই উপাসনা ও তাহার দোষ কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের একনিষ্ঠভাবে উপাসনা মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ! জগজ্জনক শিবরূপে বা জগজ্জননী দুর্গারূপে উপাসনার স্বরূপ শৈব শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ে প্রচলিত; অতএব সেই সেই উপাসনার কথা এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। জন্মভূমির একনিষ্ঠভাবে যে উপাসনা তাহাই গীতার পূর্ব্বোক্ত ৯ অধ্যায় ১৬—১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝাইতেছি।

জন্মভূমি শব্দের—ব্যাপক অর্থ ভারতবর্ষ,—ইহাই কর্ম্মভূমি, 'ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে'। (বিষ্ণুপুরাণ) বৈদিক ক্রতুর, স্মৃত্যুক্ত যজ্ঞের ও শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যের নিষ্পাদক বলিয়া এই জন্মভূমিকে ক্রতু, যজ্ঞ এবং স্বধা বলা হইয়াছে। 'আয়ুর্ঘৃতং' আয়ুষ্কর বলিয়া বেদে ঘৃতকে যেমন আয়ু বলা হয়,—সেইরূপ জন্মভূমি ভারতও ক্রতু যজ্ঞ ও স্বধা,—এই জন্মভূমি ইহাকে অথবা ক্রতু বা যজ্ঞাদিকে অচেতনবোধে তুচ্ছ করিতে নাই, ইনিই 'অহং' চিদচিদাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ ক্রতু, যজ্ঞাদিরূপেও চিদচিদাত্মক ব্রহ্মময়ী। ইনিই ঔষধ—সর্ব্বরোগহর বা অন্নস্থান, যত রোগ আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বরোগের ঔষধ এই ভারতভূমি, নিজ সন্তানগণের ওষধিজাত অন্ন ইনিই প্রদান করেন। পঠ্যমান বেদমন্ত্র, হবনীয় আজ্য—আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি এবং হোমকর্ম্ম আর কুত্রাপি নাই, তাই এই ভারতভূমিই ঐ সকল বস্তুর অনন্যসাধারণ আশ্রয়—ভারতসত্তার অধীন ইহাদিগের সত্তা। যেমন—সুবর্ণসত্তার অধীন হার ও বলয় প্রভৃতি সুবর্ণভূষণের সত্তা বলিয়া ঐ হার ও বলয় প্রভৃতিকে সুবর্ণ বলা হয়, সেইরূপ এখানেও বেদমন্ত্র প্রভৃতিকে ভারতভূমিরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। (অহং—নিবাসস্বরূপোঽহং যজ্ঞঃ ইত্যাদিরূপ সংস্কৃত টীকা হইবে।) ১৬।

অন্নদাতা বলিয়া ভারতই পিতা, অনভিব্যক্ত জীবের মাতৃগর্ভের ন্যায় অভিব্যক্ত ভারতীয় জীবের প্রথম স্থান জন্মভূমি ভারত, তাই তিনি মাতা,—তাঁহার ধারণ দ্বারাই ভারতের সন্তানগণ স্থিতিযুক্ত তাই তিনি ধাতা,—অন্যতন জীবের পিতৃপুরুষগণেরও অন্নদানাদি দ্বারা পিতৃত্ব ইহাতেই বর্ত্তমান—তাই ইনি পিতামহ,—ইনিই বেদ্যবস্তু—ইহার স্বরূপ বিদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন; এই ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রভূমি, প্রণবধ্বনি এই ভারতেরই বিশিষ্ট লক্ষণ, তাই তিনি ওঙ্কার, ঋক্, যজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব (আনন্দ গিরি বলেন, 'এব' চ' এই চকারের অর্থ অথর্ব্ববেদ), কুরুগণের নিবাসস্থান বলিয়া দেশের নাম যেমন কুরু, সেইরূপ বেদের নিবাসস্থান বলিয়া ভারতও বেদ সংজ্ঞায় অভিহিত, দেশান্তরে বেদের প্রবাস—নিবাস নহে। এই জন্মভূমি ভারতবর্ষই 'গতি' (গম্যতে যস্মাৎ অপাদানে ক্তি)। বিষ্ণুপুরাণে ইহার ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিরস্মাৎ প্রযান্তি বৈ।
তির্য্যক্‌ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে।
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ গম্যতে।

(বিঃ পুঃ ২ অংশ ৩ অঃ)

ইনি ভোগ-মোক্ষের প্রদাত্রী, এই স্থান হইতেই সর্ব্বত্র গতি হইয়া থাকে, অতএব ইনি গতি,—ভর্ত্তা—গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি অসংখ্য নদীজলে—সুখাদ্য শস্য ও ফলে ইনিই ভরণ করিতেছেন, তাই ভর্ত্তা, বেদবাণী, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও সমাজশাসন দ্বারা প্রভুত্ব করিতেছেন বলিয়া ইনিই প্রভু,—ভারতীয়গণের দোষগুণের 'সাক্ষী' যে ইনি, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। যখন তাঁহার সন্তানগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্য, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি গুণে সমৃদ্ধ ছিল, তখন ইনি নিজ প্রভাবে চমৎকৃত ভূতলে—সেই সব গুণের সাক্ষী হইয়াছিলেন, আর আজ পরপদদলিত হইয়া স্বীয় সন্তানগণের অযোগ্যতার সাক্ষী হইয়াছেন। ইনিই 'শরণ'—যত মন্দ অবস্থা হউক, সন্তানগণের রক্ষা ইনিই করিতেছেন, অমৃতপুত্রগণ আজ অন্য বিষয়ে ইহুদীদিগের সমাবস্থ হইলেও ইহারই জন্য স্থানভ্রষ্ট হয় নাই,—ইনিই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, 'সুহৃৎ' হিতসাধনে সতত তৎপর, ঋষিদিগের সদুপদেশ—জলবায়ুর স্বাভাবিক উৎকর্ষ—স্বল্প ব্যয়ে জীবিকানির্ব্বাহ—ইত্যাদি দ্বারা ইনি হিতসাধন করিতেছেন। জন্মভূমি বলিয়াই 'প্রভব' উৎপত্তিহেতু, সপ্তমোক্ষদায়িনী পুরী,

হিমাচল হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রবাহিত মোক্ষদায়িনী সুরধুনী, দেহচিত্তশুদ্ধিবিধায়িনী যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্য নদী ও শত শত তীর্থ যাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে বিরাজমান—তাঁহার ন্যায় মৃত্যুস্থান নিঃশঙ্ক শান্তিময় মরণ-স্থান পৃথিবীতে কি দ্বিতীয় আছে, তাই তিনি 'প্রলয়'—লয়ের প্রকৃষ্ট স্থান ইনি। আর ইনিই 'স্থান' স্থিতিদান ইনিই করিয়া থাকেন,—দু' চারি শত বৎসরের কথা নহে—কতকাল হইতে স্থিতিভ্রষ্টের স্থিতিদান করিয়া আসিতেছেন। পুরাতনের নাম লোপ হইলেও স্বরূপের লোপ হয় নাই, অসংখ্য জাতির মধ্যে তাহাদিগকে নিজ বক্ষে স্থান দিয়াছেন, 'পার্শি' 'শাকলদ্বীপী' প্রভৃতির অস্তিত্ব আজিও প্রত্যক্ষ। ইনিই 'নিধান' (নিধীয়তে নিগূহ্য আধীয়তেঽস্মিন্ নিধানম্) বসুমতীর নিধি—গুপ্তধন ইঁহার গর্ভে নিহিত—স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, হীরকাদি মণি ও ধনপ্রদ বিবিধ বস্তুর খনি ইঁহার গর্ভে বর্ত্তমান—সেই জন্যই ইনি নিধান,—ইনিই বীজ—ভারতী সন্ততির (বিষ্ণুপুরাণে এই নামই ব্যবহৃত) 'উড়ে আসিয়া জুড়ে বসা নহে'—এই স্থানই তাহার বীজ—অঙ্কুরেরও পূর্ব্বাবস্থা। এই বীজ হইতেই ভারতীয় সন্ততির অঙ্কুরোদ্গম,—সেই কারণে ইনি বীজ,—সাধারণ গ্রাম নগরের বা অপর দেশের ন্যায় ইঁহার অপচয় হয় না—হিমালয়কিরীটিনী মলয়-সংবাহিতচরণা অচলা বলিয়া ইনি অব্যয়—ইঁহার ব্যয়—অপচয় হয় না—অন্ততঃ উপাসক ইঁহাকে অব্যয় অক্ষয় বলিয়াই বুঝিয়া রাখিবে। ইহাই চিদচিদাত্মক পরব্রহ্মের জন্মভূমিরূপে জ্ঞানযজ্ঞে একনিষ্ঠ উপাসনা।

এই যে ভারতভূমির একনিষ্ঠ উপাসনা—তাহার পথ বঙ্গভূমির ভক্ত সন্তান বঙ্গভূমিকে আশ্রয় করিয়াই দেখাইয়াছেন।

'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং' এই পূর্ব্বোক্ত (১৪) শ্লোকে যে কর্ম্মযোগে উপাসনা তাহা জন্মভূমি সম্বন্ধে প্রথম কর্ত্তব্য, তাই প্রথমেই তাহার উল্লেখ। সেই কর্ম্মযোগ—(১) জন্মভূমিকে কীর্ত্তিমতী করা—(কীর্ত্তয়ন্তঃ কীর্ত্তিমতীং কুর্ব্বন্তঃ)। (২)

দৃঢ়ব্রত হইয়া উদ্যমশীল হওয়া এবং (৩) ইঁহার নিকটে নতভাবে অবস্থান করা—এই তিনটি কর্ম্মযোগ।

বাহিরের ভাবে ভাবুক হইয়া ভারতের চিরন্তন ভাবধারা বিসর্জ্জন—অবজ্ঞারই প্রকটমূর্ত্তি,—তাহার সহিত, নত হওয়ার প্রতিকূল সম্বন্ধ। অতএব সেই সব সন্তান জন্মভূমিকে 'কীর্ত্তিমতী' করিতে পারে না, প্রকারান্তরে দেশান্তরকেই কীর্ত্তিমান করে। জননীর হৃদয়শোণিত সম সযত্নরক্ষিত চিরন্তন ভাবকে পরিহার করিয়া প্রতীচীর হীন অনুকরণ জননী জন্মভূমির যে কত বড় অবমাননা, তাহা শুদ্ধ জন্মভূমি উপাসনার কর্ম্মযোগীই বুঝিতে পারে।

শুদ্ধচরিত্রা ব্রহ্মচারিণী বিধবা জননীর দুঃখ দূর করিবার নাম করিয়া উপযুক্ত পুত্র যদি বলপূর্ব্বক তাঁহার আচার ও বেশভূষার পরিবর্ত্তনসাধন করে—তাহাকে নত তো দূরের কথা—জননীর উপকারীও বলা যায় না—প্রত্যুত আঘাতকারী কুপুত্র বলিতে হয়,—জন্মভূমির ভাবধারাপরিপন্থী ভারতসন্তানকে ঠিক সেই আসনেই বসাইতে হয়।

সপ্তশতী বলিয়াছেন, 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।' সেই যে একা জগজ্জননী—তিনিই মহীমণ্ডল—অতএব ভারত তাঁহারই মূর্ত্তি—জ্ঞানযোগ বড় শক্ত, সর্ব্বসমর্পণে একনিষ্ঠতা জ্ঞানযোগের লক্ষণ—তাহাতে অশক্ত হইলেও শুদ্ধ কর্ম্মযোগ 'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা—।' উপাসনা করিতে পারিবে কি? পার ত গীতা ও সপ্তশতীর অনুশাসন ভক্তের শুদ্ধগীতি উদাত্তকণ্ঠে গান কর—"বন্দে মাতরম্।"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

---

(১) পরাধীন জন্মভূমির সন্তান—সেই পরের নকলনবিশী করিয়া পরের নিকট যে 'বাহবা' অর্জ্জন করে, তাহা তাহার 'কীর্ত্তি' হইতে পারে, কিন্তু জন্মভূমি তাহার 'কীর্ত্তিমতী' হয়েন না, তাঁহার পূর্ব্বতন সন্তানগণের সর্ব্বোপরি বরেণ্যতা স্মরণ করিয়া বুঝি তাঁহার অশ্রুপাত হয় এবং তাঁহার হেয় অবস্থায় সন্তানরত্নের উজ্জ্বল আলোকে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে।

(২) যতদিন জন্মভূমিকে কীর্ত্তিমতী করিতে সামর্থ্য না হইবে, ততদিন তৎসাধন, তাতে একনিষ্ঠতা ও তদর্থ উদ্যম—অর্থার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্মের অবসরে মৌখিক উদ্যম নহে,—সম্মানলাভের জন্য 'কাগুজে' সুখ্যাতির জন্য উদ্যমের অভিনয় নহে—প্রাণপণ অনাবিল উৎকট যত্নপরায়ণতাই এই উদ্যমশীলতা।

(৩) পরদেশের সম্পদ্ দর্শনে বিহ্বল হইয়া দৈববিড়ম্বনায় দৈবপীড়িত ভারতবর্ষকে কেবল অবজ্ঞা না করা নহে,—তাঁহার আজ্ঞাধীনই নত হওয়ার মর্ম্ম।

স্বরূপ

[গল্প]
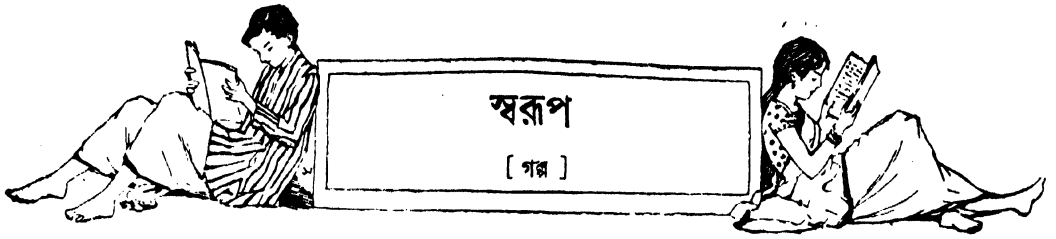
এক

স্বামী এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া অপ্রতিভ-সুরে একটু যেন লজ্জিতের মত স্ত্রীকে কহিলেন, আচ্ছা, এই মুর্গীর ডিমগুলো হেঁসেলে রাঁধানো, বা টেবিল-চেয়ারে খাওয়ার ব্যবস্থা এগুলো দিনকতক যদি বন্ধই রাখ, ক্ষতি কি তাতে? মা এসেছেন, ওঁরা সেকেলে মানুষ। এ সব দেখে বড় দুঃখ পান। অর্দ্ধেক দিন হয়তো খাওয়াই হয় না।

স্ত্রী বিস্মিত এবং উত্তপ্ত সুরে বলিলেন, বল কি! তোমার মা যদি এখন ছ'মাস এখানে থাকেন, ছ'মাস আমি আমার ছেলেমেয়েদের পিঁড়ি পেতে কলাপাতায় হবিষ্যান্ন খাওয়াব না কি? অত আব্দার আমার সয় না। তাছাড়া কিসের জন্যে শুনি? নিজের বিবেক ব'লে, মনুষ্যত্ব বলেও কিছু আছে তো? যা আমি নিজে মানি না, যে সব কুসংস্কার অত্যন্ত ঘৃণা করি, কারও খাতিরে বা কাউকে খুশী করবার লোভে তা মেনে চল্‌বার ভাণ আমার দ্বারা হবে না। ছেলেমেয়েদের সামনে 'হিপক্রেসি'র এ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি ধরতে পারব না।

স্বামী আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া সরিয়া পড়িলেন। স্ত্রী খানসামাকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, মোটরটা বার করতে বল। আমি মিসেস্ মিত্তিরের ওখানে একবার যাব।

শীতের হাওয়া পড়িয়াছে; কার্ত্তিকের শেষ। সকাল-বেলায় গৃহস্বামীর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। নীচের 'কন্‌সাল্‌টিং রুমে' রোগীর ভীড় জমিতে সুরু করিয়াছে। ডাক্তার কে, কে, বসুর পসার অসম্ভব। তাঁহার নাম জানে না এ অঞ্চলে এমন কেহই নেই। মডার্ণ-গৃহস্থালীর আধুনিক গৃহস্বামী। কর্ত্তব্যে বা চাল-চলনে তাঁহার স্ত্রীও এতদিন তাঁহাকে কখনও এতটুকু দোষ দিতে পারেন নাই। হঠাৎ আজই কেন জানি না, এমন ভয়ানক অন্যায় অনুরোধ তিনি তাঁহার স্ত্রীকে করিয়া বসিলেন! এ অন্যায়ের মূলে 'সেন্টিমেন্ট' বলিয়া একটা পদার্থ বড় অধিক মাত্রায় আছে। তাঁহার স্ত্রী তরলা মোটরে মিসেস্ মিত্রের গৃহে 'রিটার্ণ-ভিজিট' দিতে বাহির হইয়া পথে সেই সেন্টিমেন্টের বিশ্লেষণ করিতে করিতে চলিলেন। মা আসিয়াছেন, বড় সুখের কথা। বেশ তো, এক সপ্তাহ থাকুন, দু' পাঁচখান ধর্ম্মমূলক নাটক দেখুন, গঙ্গাস্নান করুন;—না হয় তাঁহাকে মোটরে করিয়া বালীর ব্রীজ্ কি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখাইয়া আনা হউক্। প্রায় গোটা একদিন মোটরটা আর অন্য কোন কাযে পাওয়া যাইবে না; তা না যাক, তরলার তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু এ কি! প্রায় মাস দেড়েক হইতে চলিল, তাঁর কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার নামটি নাই! সেদিন তাঁহার খাস-ঝি সৌদির কাছে তরলা শুনিতেছিল, মা নাকি এবার বরাবর এখানেই থাকিবেন। এতদিন তরলার শ্বশুর বাঁচিয়াছিলেন, শেষ বয়স পর্য্যন্ত সরকারী কাযে মোটা পেন্সন পাইয়াছেন, তা ছাড়া নেটিভ ষ্টেটে দেওয়ানের কায করিতেন—কুমিল্লার ওদিকে। শাশুড়ী সেখানেই থাকিতেন। মাস ছয়েক হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সেই প্রকাণ্ড বাড়ীতে রাজোচিত সমারোহে তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকিতেন। এখন দীপ নিবিয়াছে, নাট্যশালার দীপ্তি চিরনির্ব্বাপিত। শূন্য-গৃহে একা তিনি টিকিতে পারেন নাই, তাই একমাত্র ছেলের কাছে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। আর একটি মেয়ে আছে, তাহারও এই কলিকাতাতেই বিবাহ হইয়াছে। ভয় তরলার তাই এইখানেই। শেষ অবধি বুড়ী যদি কলিকাতাতেই থাকা মনঃস্থ করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! ঘরকরণার মাঝখানে এই একটা বিরোধী বিসদৃশ বস্তু লইয়া তরলা দিন কাটাইবে কেমন করিয়া! প্রতিদিন—প্রতিরাত্রি তাহার দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে না?

মিসেস্ মিত্রের গৃহদ্বারে গাড়ী দাঁড়াইল। মিসেস্ তটিনী মিত্র তখন কোথাও যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়া বাহিরের কক্ষে বসিয়া ছিলেন। তরলাকে দেখিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে কহিলেন, তরলা, আজ যে আমাদের মিটিংয়ে যাবার কথা, এত দেরী কেন? সমস্তই ভুলে বসেছিলে বুঝি? তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে

আমি শেষে একাই যাচ্ছিলুম। দায়িত্বজ্ঞান তোমাদের বড় কম।

তরলা নির্জ্জীবের মত একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, মনে সবই ছিল তটিনীদি, কিন্তু বাড়ীতে এখন যা অশান্তি চলছে, তাতে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে রাখাই দায়। 'মোষ্ট্ ডিস্‌গাস্‌টিং এ্যাফেয়ার!' তোমাকে আর বলব কি, অশান্তিতে জীবন জর্জ্জরিত!

সকাল বেলাকার ঘটনাটা ডালপালা লাগাইয়া তরলা বলিতে সুরু করিল। তটিনী উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, মিষ্টার বসুকে তুমি ঠিক জবাবই দিয়েছ। আর যাই কর, ভিতরে একরকম বাইরে একরকম ব্যবহার ক'রে ছেলেদের সামনে হিপক্রেসির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুমি ধরতে পারবে না। 'অন্ নো একাউণ্ট!'

চাকর আসিয়া খবর দিল, মা, গাড়ী নিয়ে বাবু বেরিয়েছেন, তবে এখনই আসবেন। বেশি দেরী হবে না মিনিট দশ।

তরলা কহিল, তটিনীদি তা'হলে আমাদের গাড়ীটা ফেরত দি। ছেলেদের আবার স্কুল আছে। ওঁর গাড়ীটা উনি তো সর্ব্বদাই নিয়ে রোগীর বাড়ী ঘুরচেন, অন্য কাযে বড় একটা পাওয়া যায় না। নির্ম্মলের আবার দশটার মধ্যে কলেজও আছে।

তটিনী বলিলেন, ফেরত দাও। আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব'খন। কিন্তু ঐ যা বললে ভাই, পারিবারিক অশান্তি থেকে কারও রেহাই নেই। আমিও এদিকে আবার এক অশান্তিতে পড়েছি। চল, রাস্তায় যেতে যেতে তোমাকে না হয় বলব ব্যাপারটা। কিন্তু মিসেস্ হালদারের কথাগুলো গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়, শুনেছ তিনি কি লিখেছেন? তিনি লিখেছেন, ওসব অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের মিটিংয়ে তিনি সায় দিতে পারেন না। জগতে যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য আছে—দিন রাত আছে, ততদিন ধনি-দরিদ্রের তফাৎও থাকবে, এ্যারিষ্টক্রেসীও থাকবে। ও নিয়ে মিটিং করা বা গণআন্দোলন করা একেবারে ব্যর্থ। দেখ দিকি কথাগুলোর ছিরি-ছাঁদ। 'জাষ্ট্ লাইক্ হার।' পড়ে অবধি রাগে আমার গা জ্বলছে।

তরলা কিন্তু গণ-আন্দোলনের কথা শুনিবার জন্য আদৌ অধীর হয় নাই। তটিনীদি পারিবারিক অশান্তি সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন। সেটা শেষ অবধি না শুনিতে পাইলে তো তাহার রাত্রিতে ঘুম হইবে না। আরও একটু সরিয়া আসিয়া সে কহিল, তোমার তো সুখের সংসার ভাই তটিনীদি। দুই ছেলের এক জন ব্যারিষ্টার, এক জন এগ্রিকালচার-স্পেশালিষ্ট্। স্বামী তো হাতের মুঠোয় ধরা। তোমার কথায় ওঠেন বসেন। তোমার আবার পারিবারিক অশান্তি কোন্‌খানে?

সহানুভূতির এই অজস্র প্লাবনে তটিনী ভাসিয়া যাইবার যো হইলেন। করুণ সুরে কহিলেন, তোমরা যতটা মনে কর, অতটা নয়। বাইরে থেকে লোকে বড় বাড়িয়ে দেখে। এই তো আজ সকালেই মিষ্টার মিত্রের সঙ্গে আমার একচোট্ হয়ে গেল। তিনি কোথা থেকে একটা হাড়হাবাতে ছোঁড়াকে আবিষ্কার ক'রে এনেছেন। আবার বলেন কি না, সে আমাদের এখানে থেকে কলেজে পড়বে। ছেলেটা অতি গরীব, তিনকুলে কেউ নেই। আমি বললুম, আমাদের বনেদী ঘরে ও সব চালচুলোহীন পথের লোককে আমি জায়গা দিতে পারব না। তার চেয়ে সাহায্য যদি চায়, কিছু টাকা ধরে দাও, ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।

তরলা কহিল, ঠিকই বলেছ। দেখ্‌ছি তোমার আমার একই জ্বালা। পুরুষগুলো অতিরিক্ত 'আইডিয়ালিষ্ট।' আইডিয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তারা সংসারের বাস্তব দিক্‌টা ভুলে যায়। তখন ভুগ্‌তে যা হয়, তা শুধু আমাদেরই ভাগে পড়ে। কারণ, চব্বিশ ঘণ্টা অষ্টপ্রহর ওরা তো কিছু আর সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে থাকে না।

মিষ্টার মিত্র এতক্ষণ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া একটা চৌকির উপর হাত রাখিয়া যে দাঁড়াইয়াছিলেন, দু'জনের মধ্যে তাহা আদৌ কেহ লক্ষ্য করে নাই। তিনি বলিলেন, গাড়ী তৈরী। কিন্তু যদি আমাকে ক্ষমা কর তটিনী, তা হ'লে একটা কথা বলি। পুরুষদের ঘাড়ে স্বচ্ছন্দে দোষ চাপালে, কিন্তু তোমাদেরও কাযে ও কথায় মিল কোথায়? চলেছ অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের মিটিংয়ে। সোসালিষ্টিক মতবাদ নিয়ে লোকের সঙ্গে তর্ক কর। ধনি-দরিদ্রের সমান অধিকার এই কথা জোর-গলায় বলে আজ সভানেত্রীর অভিভাষণ পাঠ করবে। আর পারো না দিতে জায়গা তোমার বাড়ীতে এক অসহায় দরিদ্র ছাত্রকে?

বন্ধুর সামনে স্বামীর এই স্পর্দ্ধিত এবং স্পষ্ট উক্তিতে

ভটিনী এত রাগিয়া গেলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জলন্ত দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন নিঃশব্দে।

২

মিষ্টার কে, কে, বসুর বাড়ীতে যে অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা মিটিয়াছে, কিন্তু অভিনব উপায়ে। তরলা সেদিন একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার দোসাদ্ চাকরটা তরলার শাশুড়ীর খাবার জলের কলসী হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া লইয়া বাবুকে দিতে গেল। অন্য কোন দিন সে এরূপ আচরণ করে নাই। আজ কেন করিল, তাহাও জানা যায় নাই। হয়তো তরলা তাহাকে এইরূপ আদেশই ইচ্ছা করিয়া দিয়াছিল। গৃহিণী অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তরলাকে ডাকাইয়া কহিলেন, বৌমা, এমন হ'লে তো বাছা, আমি টিক্‌তে পারি না। তোমার চাকর-বাকরদের এ কেমন ব্যবহার! ও গেঁদি, যা এখন আবার নূতন কলসী কিনে দু'মাইল হেঁটে গঙ্গাজল নিয়ে আয়।

গৃহিণীর খাস-ঝি গেঁদি, মুখ ভীমরুলের চাকের মত করিয়া কহিল, রোজ রোজ এত আমি পারিনে বাপু। তার চেয়ে চল আমরা দিদিমণির বাড়ী গিয়ে থাকি গে। তিনি তো থাক্‌বার জন্যে দু'বেলা খোসামুদি করছেন, মোটর পাঠাচ্ছেন। তোমারই গা হয় না।

তরলার শাশুড়ী বামাসুন্দরী গম্ভীর মুখে কহিলেন, তাই থাক্‌তে হবে দেখ্‌ছি শেষ পর্য্যন্ত।

তরলা তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিল, তা যেখানে খুসী গিয়ে থাকতে পারেন। তাই ব'লে ওঁর জন্যে আমি দিবা-রাত্র ছুঁই-ছুঁই ক'রে থাকতে পারব না।

বামাসুন্দরী নিতান্ত অপমানিত বোধে গেঁদিকে মোট-ঘাট বাঁধিতে আদেশ দিয়া, লেক্ রোডে মেয়েকে পত্র লিখিতে বসিলেন। এতদিন তিনি যে মেয়ের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, ভগবান্ বিধিমত তাহার সাজা দিতেছেন। এখন অবিলম্বে সে যেন মোটর লইয়া আসে। এই কথাটাই বিনাইয়া বিনাইয়া লিখিলেন। চিঠি লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় জরুরী একটা কেস্ দেখিয়া ডাক্তার কে, কে, বসু বাড়ী ফিরিলেন এবং স্ত্রীর মুখে ব্যাপার শুনিয়া অর্দ্ধভুক্ত কেক এবং পাউরুটি ফেলিয়া, রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে মায়ের ঘরের দিকে ছুটিবার উপক্রম করিলেন। হাত ধুইবার ত্বরা সহিল না।

তরলা দুয়ার রুদ্ধ করিয়া ক্রোধ-রক্তিম মুখ ফিরাইয়া কহিল, কিছুতেই যেতে পাবে না। যেতে চাচ্ছেন, যান। দেখ্‌ব মেয়ে-জামাই কত দিন ওঁকে সমাদর ক'রে রাখে। ঠাকুরঝিকে আমি চিনি। বাবুর্চ্চির রান্না ছাড়া একটি দিন ঠাকুর-জামাইয়ের মুখে রোচে না। বাড়ীতেও স্লিপার পায়ে সর্ব্বদা না থাক্‌লে ঠাকুরঝির পা ফেটে যায়। এ হেন আচারবাগীশ মা নিয়ে ওঁরা কত দিন টিক্‌তে পারেন, তা-ই আমি দেখি। চিঠিতে কাঁদুনী গেয়ে সোহাগ জানানো আলাদা, আর বারোমাস ঝক্কি সয়ে ঘর-কন্না করা আলাদা; —দু'টোতে দস্তুরমত তফাৎ আছে।

করুণাকান্তি বাবু বাধা পাইয়া হতাশ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তফাৎ যে আছে, তা আমিও জানি। কিন্তু তোমার ঠাকুরঝি কমলা বুদ্ধিমতী। সে জানে, একটু রয়ে-সয়ে নিলে যদি লাখ-দেড়েক টাকা এখনই অনায়াসে পাওয়া যায়, তা হ'লে সেটা ছেড়ে দিতে নেই।

তরলা অবাক্ হইয়া কহিল, দেড়-লাখ টাকা হঠাৎ কোথা থেকে পাবে? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

করুণা বাবু কহিলেন, মাথা খারাপ কেন হবে? কেন, তুমি কি বাবার উইলের কথা শোননি? তিনি উইলে লিখেছেন, আমার স্ত্রী স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠাবতী শুচিপরায়ণা, নিরীহ প্রকৃতির। তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং কন্যা সেরূপ নয়, তাহাদের গৃহস্থালীতে তাঁহার শান্তিতে বসবাস করিবার সম্ভাবনা নাই, সেজন্য আমি আমার ছেলেকে পঞ্চাশ হাজার ও মেয়েকে দশ হাজার মাত্র দিয়া, আমার অবশিষ্ট সঞ্চিত দেড় লক্ষ টাকা আমার স্ত্রীকে দিয়া গেলাম। ঐ টাকায় তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার। তিনি ইচ্ছামত দান, হস্তান্তর বা মৃত্যুর পর যাহাকে খুসী দিয়া যাইতে পারেন।

তরলা চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, বল কি! একথা তো আমি জানতুম না। তুমি প্রথম দিনে—যেদিন খুব সেন্টিমেন্ট দেখিয়ে বকাবকি করলে, সেদিন যদি ঘুণা-ক্ষরেও এ কথা বল্‌তে! কিন্তু তোমার বাবা তো দেখ্‌ছি অনেক টাকা জমিয়ে গেছেন।

মিঃ বসু কহিলেন, হ্যাঁ, অনেক টাকা। আমিও প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেছলুম। তোমরা সেকেলে আচার-ব্যবহারের

যতই নিন্দে কর, ঐ চালে চলে বাবা অত টাকা তো জমিয়ে গেলেন। আর আমিও কম রোজগার করিনে, কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি উড়ে যায়! আজ অবধি তো একটা পয়সা জমাতে পারিনি। দর্জ্জির দেনা, বাবুর্চ্চি আর ধোবার বিল শুধ্‌তে শুধ্‌তে কর্পুরের মত সমস্ত উবে যায়. তবে বাবা একটা ভুল করেছেন, মেয়েমানুষে অবলম্বন ছাড়া থাকতে পারে না। মা বিধর্ম্মী ছেলে বা ম্লেচ্ছ-আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত মেয়ের বাড়ীতে বরঞ্চ পরাধীন হয়ে বাস করবেন, তবু আলাদা থাকতে পারবেন না,—যত টাকাই তাঁহার হাতে থাকুক।

তরলা মাথায় একটু ঘোমটার মত দিয়া চুলটা একটু ঠিক করিয়া লইয়া কহিল, যাই, মাকে আটকাইগে। সত্যিই তো, উপযুক্ত ছেলে থাক্‌তে মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ী বাস করতে যাবেন তিনি কোন্ দুঃখে। এসব কিছুই হ'তে পারত না, তুমি যদি আগাগোড়া সব কথা প্রথম থেকেই আমায় খুলে বলতে। ভগবান্ তোমাকে কবে যে বুদ্ধি দেবেন, জানি না। আমি ব'লে তাই কোন রকম ক'রে চালিয়ে নিচ্ছি। নইলে কি—যে হোত, ভাব্‌তেও আমার ভয় করে।

শ্রীমতী আশালতা সিংহ।

বর্ষ-বিদায়

হায়!
আজিকে বিদায়,　　রবির আতপ-তাপে ভরা,
হে বর্ষ! বুকেতে লয়ে নিদাঘের কিরণ-পশরা,
বাজায়ে শ্যামের বাঁশী শ্যামল সে নীপ-কুঞ্জবনে;
শুনায়ে রাধার নাম, সাধা সুরে কেতকীর আকুল শ্রবণে,
ভরিয়া হাতের সাজি, 'যূথী' 'জাতী' কদম্বের সুরভিত ফুলে
ঝমর ঝমাৎ ঝম্ বাজাইয়া পায়ে মল,
এলাইয়া আলু-থালু কালো মেঘ চুলে—
শ্যামাঙ্গী বরষা সুন্দরী, এল যবে হেথা, তুমি হে বরষ!
হাসিলে কাঁদিলে তারি সনে, করিলে সরস্
মোদের বিরস-চিত্ত করি সুধাদানে,
তাই আজি প্রাণে
ব্যথা লাগে হায়!
বলিতে বিদায়!

তারপর,
ল'য়ে মনোহর,　　শরতের শ্যাম শোভারাজি,
চন্দ্রমল্লিকায় ভরি প্রভাতের সাজি,
শিউলি খোপায় পরি, ভুঁই-চাঁপা দুল করি কাণে,
শরতের রাণী এল, স্বরগের সুধা ল'য়ে
ঢালিবারে আমাদের প্রাণে,
তার পর মধুরাণী বসন্তের ফুটাইয়া মাধবী-মঞ্জরী বনে বনে,
ঘন লাল রং লয়ে পিচকারী দিল হাসি পলাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে,
সেই সব স্মৃতি সনে আজ, মনে পড়ে হে বর্ষ তোমায়,
চৈতী-রাতের চাঁদ ঐ বুঝি নভে ডুবে যায়,
শুকতারা হায়! সজল নয়নে,
চেয়ে চেয়ে পাণ্ডুর গগনে
মেঘেতে মিলায়,
হে বর্ষ! বিদায়।

কাদের নওয়াজ।

মহাভাষ্যের দার্শনিক মত

প্রমাণ

ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি প্রসঙ্গক্রমে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। দার্শনিক বিষয় তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়। যিনি ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহার শব্দ-সাধনের প্রতি অধিক লক্ষ্য থাকাই উচিত। প্রতিপাদ্য বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ দিলে প্রতিপাদ্য বিষয়ে অবিচার হওয়া স্বাভাবিক। সুখের বিষয়, পতঞ্জলি তাহা করেন নাই এবং এই জন্যই তিনি বৈয়াকরণগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে কোন বস্তুরই প্রতিপাদন করা হউক না কেন, তাহার জন্য প্রমাণের অপেক্ষা থাকিবেই; বিনা প্রমাণে কোন বস্তুর প্রতিপাদন করা অসম্ভব। এই কারণে পতঞ্জলিকে প্রসঙ্গক্রমে প্রমাণের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। আমরা তাঁহার এই প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতেই তাঁহার অভিমত প্রমাণের সন্ধান পাইতেছি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল প্রমাণের শ্রেষ্ঠ। চার্ব্বাকের ন্যায় অত্যন্ত উগ্র দার্শনিকও প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপলাপ করিতে পারেন নাই। মহাভাষ্যকারও প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের বলবত্তার কথাও বলিয়াছেন (১)। বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও কতকগুলি কারণে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না—ইহা আমাদের অনুভব-সিদ্ধ। মহাভাষ্যকার ইহার উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই—

ষড্‌ভিঃ প্রকারৈঃ সতাং ভাবানামনুপলব্ধির্ভবত্যতিসন্নিকর্ষাদতিবিপ্রকর্ষান্মূর্ত্ত্যন্তরব্যবধানাত্তমসাবৃতত্বাদিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাদতিপ্রমাদাদিতি। (মহাভাষ্য ৪।১।৩)

ছয়টি কারণে বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না,—(১) অতি সান্নিধ্যবশতঃ চক্ষুঃস্থিত কজ্জলের প্রত্যক্ষ হয় না;—(২) অতিদূরত্ববশতঃ সুদূর আকাশে উড্ডীন বিহঙ্গের প্রত্যক্ষ হয় না;—(৩) কোন মূর্ত্ত বস্তুর ব্যবধান থাকিলে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না—যেমন প্রাচীরের ব্যবধানবশতঃ গৃহমধ্যস্থিত স্বর্ণরত্নাদির প্রত্যক্ষ হয় না। (৪) অন্ধকারের আবরণ হেতু অন্ধকারে অবস্থিত গর্ত্তাদির প্রত্যক্ষ হয় না;—(৫) চক্ষুঃ প্রভৃতি যে কোন ইন্দ্রিয় কোন রোগের দ্বারা শক্তিহীন হইলে তাহার দ্বারা বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না;—(৬) বিষয়ান্তরে চিত্ত অতি নিমগ্ন থাকিলে সম্মুখের বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত ভাষ্যকার স্বয়ং লিপি বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—বৈয়াকরণ শাকটায়ন রথের পথে আসীন থাকিয়াও সেই পথে গমনশীল শকটসমূহকে প্রত্যক্ষ করেন নাই (২)। মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ, ইহা ন্যায়ভাষ্যকার বাৎসায়ন (৩) ও মীমাংসাবার্ত্তিককার ভট্ট কুমারিল (৪) প্রভৃতি দার্শনিকগণের অভিমত। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইঁহাদের অনেক পূর্ব্বে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন (৫)। ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ, এই জন্য ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—ইহা ৪।১।৩ সূত্রের মহাভাষ্য পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায়।

যোগী পুরুষগণের অতীত, অনাগত, এবং বর্ত্তমান সকল বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে; সেই জ্ঞানের জন্য বস্তুর সান্নিধ্যের কোন অপেক্ষা নাই; দূরস্থিত, ব্যবহিত এবং সূক্ষ্ম,—সকল প্রকার বস্তুই যোগীর জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। ইহা কুমারিল ভট্ট ব্যতীত সকল বৈদিকমতাবলম্বী দার্শনিকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই জ্ঞান ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান নহে, যোগবলেই এই জ্ঞান হয়। আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈত বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধিতে যোগীর অতীত এবং অনাগত বিষয়ে যে জ্ঞান হয়,—তাহাকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাহাকে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হইতে বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কেবল দূরস্থিত, কোন কিছুর ব্যবধানে

১। প্রত্যক্ষেণ বিরুদ্ধ্যতে।—প্রত্যক্ষেণ খল্বপি স বিরুধ্যতে। য আহ খট্বাবৃক্ষয়োঃসল্লিঙ্গং নোপলভ্যত ইতি। তত্র স্বেন্দ্রিয়বিরোধঃ কৃতো ভবতি। ন চ নাম স্বেন্দ্রিয়বিরোধিনা ভবিতব্যম্।—মহাভাষ্য ৪।১।৩

(২) বৈয়াকরণানাং শাকটায়নো রথমার্গ আসীনঃ শকটসার্থং যান্তং নোপলেভে।—মহাভাষ্য ৩।২।১১৫

দ্রষ্টব্য—সাংখ্যকারিকা—

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥ ৭

(৩) দ্রষ্টব্য—ন্যায়ভাষ্য ১।৪

(৪) দ্রষ্টব্য—শ্লোকবার্ত্তিক ১।১।৪।৬০

(৫) দ্রষ্টব্য—মনসা সংযুক্তানীন্দ্রিয়াণ্যুপলব্ধৌ কারণানি ভবন্তি। মহাভাষ্য ৩।২।১১৫

বর্ত্তমান এবং সূক্ষ্ম প্রভৃতি বিষয় বর্ত্তমান থাকাকালে সেই সকল বিষয় যোগীর যে জ্ঞান, তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; যোগীর এইরূপ জ্ঞানকে যোগজ বা আর্ষ জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বস্তুর যোগ-প্রভাবে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে যোগজ বা আর্ষ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলা হইয়াছে (৬)।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সূক্ষ্ম বিষয়েও যোগী পুরুষগণের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহার সমর্থনের উদ্দেশে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থকারের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, যোগী পুরুষগণের এই যে ত্রিকালজ্ঞতা, ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে অর্থাৎ যোগী পুরুষগণের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বস্তুবিষয়ক যে জ্ঞান—তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান,—পরোক্ষ জ্ঞান নহে (৭)।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরই অনুমান প্রমাণ। শব্দ প্রভৃতি অন্য প্রমাণগুলি সকল দার্শনিক স্বীকার করেন নাই; কিন্তু এক চার্ব্বাক ব্যতীত অন্য সকলেই অনুমান প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন (৮)। এইরূপে বহুবাদীর সম্মত হওয়ায় প্রত্যক্ষের পরই অনুমানের স্থান। সূক্ষ্মবস্তু যে অনুমান-গম্য, তাহা আমরা পতঞ্জলির উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের

"সূক্ষ্মো হি ভাবোঽনুমিতেন গম্যঃ। (৩।২।১২৩)

এই অংশে লক্ষ্য করিতে পারি।

পতঞ্জলি ৩।২।১২৪ সূত্রের মহাভাষ্যেও প্রসঙ্গক্রমে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন; বহ্নি প্রভৃতি অনুমেয় বস্তুর সহিত তাহার অনুমাপক ধূমাদির যে নিয়ত সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের জ্ঞান পূর্ব্বে থাকিলেই অনুমান হয়,—ইহাও সে স্থলে বলিয়াছেন (৯)। ইহার দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান যে অনুমিতির হেতু, তাহা বলা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ অনুমান অপেক্ষা প্রবল; কিন্তু যে স্থলে প্রত্যক্ষ দোষদুষ্ট হয়, সে স্থলে অনুমানের প্রাবল্য হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকার দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সমর্থন করিয়াছেন। একটি দণ্ডের দুই প্রান্তে অগ্নি সংবদ্ধ করিয়া সেই দণ্ডকে বেগে ঘুরাইলে চক্রের ন্যায় প্রতীতি হয়; ইহাকে অলাতচক্র বলে। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন, অলাতচক্র প্রত্যক্ষ হয়; কিন্তু অনুমানের দ্বারা জানিতে পারা যায়, ইহা চক্র নহে। ইহা চক্রভ্রান্তি মাত্র (১০)।

মীমাংসক-বরেণ্য ভট্ট কুমারিল ব্যাপ্তিজ্ঞানকে

---

(৬) আর্ষজ্ঞানস্যাপরোক্ষত্বানভ্যুপগমাৎ।—অদ্বৈতসিদ্ধি—১ম পরিচ্ছেদ—জড়ত্বহেতূপপত্তি।

আচার্য্য মধুসূদনের এই উক্তির তাৎপর্য্য গৌড়ব্রহ্মানন্দপ্রণীত লঘুচন্দ্রিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—আর্ষজ্ঞানস্যেতি। যোগজধর্ম্মজন্যজ্ঞানস্যেত্যর্থঃ। অনভ্যুপগমাদিতি। অনাবৃতসাক্ষিতাদাত্ম্যবিশিষ্টবিষয়কত্বং জ্ঞানস্যাপরোক্ষত্বম্; আর্ষজ্ঞানস্যানাবৃতত্বসম্পাদকত্বেঽপি তদ্বিষয়েঽতীতানাগতে তৎকালে সাক্ষিতাদাত্ম্যাভাবাত্তদংশে তস্য নাপরোক্ষতা, বিদ্যমানবিষয়াংশে ত্বপরোক্ষং তজ্‌জ্ঞানম্‌···ইতি ভাবঃ।

(৭) দ্রষ্টব্য—মহাভাষ্য ৩।২।১২৩—

অপিচাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি—

বিষস্য বালা ইব দহ্যমানা ন লক্ষ্যতে বিকৃতিঃ সন্নিপাতে।

অস্তীতি তাং বেদয়ন্তে ত্রিভাবাঃ সূক্ষ্মো হি ভাবোঽনুমিতেন গম্যঃ॥

ত্রিষু কালেষু ভাবো ভাবনা যেষাং তে ত্রিভাবা যোগিনো যে ভাবনাবশেন ত্রীনপি কালান্ যোগিপ্রত্যক্ষেণ বিদন্তি।—কৈয়ট প্রণীত মহাভাষ্যপ্রদীপ।

(৮) কোন্ দার্শনিকের মতে কতগুলি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা তার্কিকরক্ষার প্রমাণপ্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে—

প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
প্রত্যক্ষমনুমানং চ সাংখ্যাঃ শব্দশ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা॥
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ।

ইহা ব্যতীত চেষ্টাকেও এক সম্প্রদায় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন, ইহা তর্কসংগ্রহের পদকৃত্য টীকা এবং যুক্তিদীপিকা-প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশেষিকমতে যে দুইটি প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্যের মতের অনুসরণে বলা হইয়াছে। ব্যোমশিবাচার্য্য-প্রণীত "ব্যোমবতী"তে বৈশেষিকমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রতিভাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন এরূপ এক সম্প্রদায় ছিলেন,—ইহা ন্যায়কন্দলী এবং যুক্তিদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৯) অথবা আদেশে সামানাধিকরণ্যং দৃষ্ট্বাঽনুমানাদ্ গন্তব্যং প্রকৃতেরপি সমানাধিকরণ্যং ভবতীতি। তদ্যথা ধূমং দৃষ্ট্বাগ্নিরত্রেতি গম্যতে। ত্রিবিষ্টব্ধকং দৃষ্ট্বা পরিব্রাজক ইতি।······প্রত্যক্ষস্তেনাগ্নিধূময়োরভিসম্বন্ধঃ কৃতো ভবতি। ত্রিবিষ্টব্ধকপরিব্রাজকয়োশ্চ। স তদ্বিদেশস্থমপি দৃষ্ট্বাঽধ্যবস্যতি অগ্নিরত্র পরিব্রাজকোঽত্রেতি।

(১০) দ্রষ্টব্য—মহাভাষ্য ৩।২।১২৪

ভবতি বৈ প্রত্যক্ষাদনুমানবলীয়স্ত্বম্। তদ্যথা আলাতচক্রং প্রত্যক্ষং দৃশ্যতেঽনুমানাচ্চ গম্যতে নৈতদস্তীতি।

কৈয়ট—আশুসঞ্চারাচ্চক্রভ্রান্তিরুৎপদ্যতে।

'ভূয়োদর্শন সাধ্য বলিয়াছেন (১১)। মীমাংসক প্রভাকর ও নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ভূয়োদর্শন ব্যতিরেকেও ব্যভিচারজ্ঞান না থাকিলে একবার মাত্র দর্শনে হইতে পারে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতের সহিত ভট্ট কুমারিলের মতের সামঞ্জস্য নাই; স্থলবিশেষে একবার মাত্র দর্শনেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে, ইহা মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন (১২)।

পতঞ্জলি শব্দ প্রমাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমরা শব্দ প্রমাণকে স্বীকার করি; শব্দ যাহা বলে, তাহাই আমাদের প্রমাণ (১৩)। মহাভাষ্যের প্রাচীন টীকাকার আচার্য্য ভর্তৃহরি অনুমান অপেক্ষা শব্দ প্রমাণের প্রতি অধিক আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ বাক্যপদীয়ে বলিয়াছেন, শাস্ত্র ঋষিগণের যোগপ্রভাবে লব্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানমূলক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি যেরূপ কোন অবিশ্বাসের আশঙ্কা আসিতে পারে না, সেইরূপ শাস্ত্রের প্রতিও কোনরূপ অবিশ্বাসের সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। অনুমানের প্রতি কোনরূপ আস্থাই আসিতে পারে না। এক জন নিপুণ তার্কিক যত্ন সহকারে কোন বিষয়ের অনুমান করিলেও, তাঁহার অপেক্ষা আর এক জন অধিক নিপুণ তার্কিক সেই অনুমানের দোষ উদ্ভাবন করিয়া সেই বিষয়েই অন্য প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন। যে স্থলে অন্ধ ব্যক্তি পথের কিয়দংশ হস্তস্পর্শের দ্বারা প্রথমে সমতল অনুভব করিয়া, তাহার পর, অবশিষ্ট পথকেও অনুমানের দ্বারা সমতল বলিয়া স্থির করে এবং সেই অনুমানের বিশ্বাসে সেই পথে 'ধাবিত হয়,—সেই স্থলে সেই অন্ধের গর্ত্ত প্রভৃতি নিম্নভূমিতে পতন যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিষয়ে শাস্ত্রকে অবহেলা করিয়া, কেবল অনুমানের দ্বারা কর্ত্তব্য-নিশ্চয় করিয়া চলে, তাহারও শ্রেয়ের পথ হইতে পতন সুনিশ্চিত (১৪)।

এখানে ইহা বলা অনাবশ্যক যে, আচার্য্য ভর্তৃহরি মহাভাষ্যকারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সিদ্ধান্তকেই বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

পতঞ্জলি ৬।১।৮৪ সূত্রের ভাষ্যে শ্রুতি ও স্মৃতি এই উভয়কেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং মহাভাষ্যের আরও অনেক স্থলে স্মৃতি ও শ্রুতির বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৫)।

প্রাচীন ভারতীয় বৈদিকমতাবলম্বী আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও সেই প্রামাণ্যের সমর্থনের সময় পরস্পর ঐকমত্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসকগণ অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। উত্তর-মীমাংসক বেদান্তী এবং নৈয়ায়িকগণ পরমেশ্বরের উক্তি বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। নব্য মীমাংসক খণ্ডদেব তাঁহার ভাট্টরহস্য নামক গ্রন্থে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার উক্তিরূপে বেদের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একথা এখানে অবশ্য বক্তব্য যে, প্রাচীন মীমাংসক ভট্ট কুমারিল প্রভৃতি পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া অপৌরুষেয় বাক্যরূপেই বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন (১৬)। প্রাচীন বৈশেষিকগণ ঋষিগণের প্রাতিভ জ্ঞানকেই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণরূপে স্বীকার

---

(১১) ভূয়োদর্শনগম্যা চ ব্যাপ্তিঃ সামান্যধর্ম্ময়োঃ।
জ্ঞায়তে ভেদহানেন কচিচ্চাপি বিশেষয়োঃ।
শ্লোকবার্ত্তিক—অনুমানপরিচ্ছেদ—১২

(১২) কস্যচিৎ খল্বপি সকৃৎকৃতোভিসম্বন্ধোঽত্যন্তায় কৃতো ভবতি। তদ্‌যথা বৃক্ষপর্ণয়োরয়ং বৃক্ষ ইদং পর্ণমিতি। স তদ্‌-বিদেশস্থমপি দৃষ্ট্বা জানাতি বৃক্ষস্যেদং পর্ণমিতি।—মহাভাষ্য৩।২।১২৪
কস্যচিদিতি। ন ভূয়োদর্শনেন সম্বন্ধগ্রহণমপি তু সকৃদ্দর্শনে-নাপীত্যর্থঃ।—কৈয়ট।

(১৩) শব্দপ্রমাণকা বয়ম্। যচ্ছব্দ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্।
—মহাভাষ্য—পস্পশাহ্নিক।

(১৪) দ্রষ্টব্য—বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ড—
আবির্ভূতপ্রকাশানামনুপপ্লুতচেতসাম্।
অতীতানাগতজ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে॥ ৩৭
অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ পশ্যন্ত্যার্ষেণ চক্ষুষা।
যে ভাবান্ বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে॥ ৩৮
যো যস্য স্বমিব জ্ঞানং দর্শনং নাভিশঙ্কতে।
স্থিতং প্রত্যক্ষপক্ষে তং কথমন্যো নিবর্ত্তয়েৎ॥ ৩৯
যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥ ৩৪
হস্তস্পর্শাদিবান্ধেন বিষমে পথি ধাবতা।
অনুমানপ্রধানেন বিনিপাতো ন দুর্লভঃ॥ ৪২

(১৫) দ্রষ্টব্য—মহাভাষ্য—২।২।৬; ৩।১।৭; ৪।১।৪৮; ৫।১।১১৫; ইত্যাদি।

(১৬) দ্রষ্টব্য—শ্লোকবার্ত্তিক—সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার।

করায় তাঁহাদের মতেও বেদ ঈশ্বরের বাক্যরূপে প্রমাণ নহে; ঋষিগণের প্রাতিভ জ্ঞানই বেদের মূল; অতএব বেদ ঋষিপ্রণীত, ইহাই এই মতে স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালের বৈশেষিকগণ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মতে পরমেশ্বরের উক্তিরূপেই বেদের প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনে পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় পরমেশ্বরের উক্তিরূপেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে,—ইহা বুঝিতে হইবে। নিরীশ্বর-মতাবলম্বী কপিলের অনুবর্ত্তী সাংখ্যাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তে পরমেশ্বরের কোন স্থান নাই। তাঁহারা কপিলের ন্যায় সিদ্ধপুরুষকে বেদের আদি উপদেষ্টা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রলয়ের পরবর্ত্তী প্রতিসৃষ্টির আদিতে এই-রূপ সিদ্ধপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের জ্ঞানপ্রভাবে পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রচলিত বেদরাশিকে স্মরণ করিয়া, এই সৃষ্টির উপকারার্থ প্রবর্ত্তিত করেন—ইহাই ইহাদের সিদ্ধান্ত। বেদের প্রামাণ্য-সমর্থনে বিভিন্ন মতাবলম্বী বৈদিক আচার্য্য-গণের উদ্ভাবিত যুক্তি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও বেদের প্রতি ইহাদের সকলের দৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

মহাভাষ্যকার বেদের প্রামাণ্য-সমর্থনে অন্য প্রকার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব-মীমাংসার আচার্য্যগণ বেদের আনুপূর্ব্বীকে (শব্দরাশিকে) অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মহাভাষ্যকার বেদের প্রতিপাদ্য বস্তুকে (অর্থকে) নিত্য বলিয়াছেন; বেদের শব্দবিন্যাসকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্তে বেদের অন্তর্গত বাক্যগুলি ঋষিগণের রচিত (১৭)।

মহাভাষ্যকার বেদের অর্থকে (প্রতিপাদ্য বস্তুকে) নিত্য বলিলেও, সেই বেদপ্রতিপাদ্য নিত্যবস্তু কি, এই বিষয়ে পরবর্ত্তী কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচার বিতর্কের অব-তারণা দেখিতে পাওয়া যায়। নাগেশ ভট্ট এই বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, বেদ-প্রতিপাদ্য এক-মাত্র নিত্যবস্তু পরমেশ্বর; যে হেতু ভগবদ্‌গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ নিজকে সকল বেদের প্রতিপাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৮)।

নাগেশ ভট্টের এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, বেদে যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের চরম উদ্দেশ্য—অন্তিমলক্ষ্য পরমেশ্বর। এই চরম উদ্দেশ্যের প্রতি সকল বেদের পরম তাৎপর্য্য আছে বলিয়া সকল বেদেরই প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর। ভগবদ্‌গীতাতে এই অভিপ্রায়েই পরমেশ্বরকে সকল বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু বলা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ, এই তিনটি প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণের উল্লেখ মহাভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জলদর্শন, নিরীশ্বর সাংখ্য কাপিলদর্শন এবং ভগবান্ মনুর ন্যায় মহাভাষ্যকারও তিনটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন (১৯)। শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

(১৭) নহি ছন্দাংসি ক্রিয়ন্তে, নিত্যানি ছন্দাংসি।...যদ্যপ্যর্থো নিত্যঃ। যা ত্বসৌ বর্ণানুপূর্ব্বী সাঽনিত্যা।

—মহাভাষ্য ৪।৩।১০১

নিত্যানীতি। কর্ত্তুরস্মরণাত্তেষামিতি ভাবঃ। যা ত্বসাবিতি। মহাপ্রলয়াদিষু বর্ণানুপূর্ব্বীবিনাশে পুনরুৎপাদ্য ঋষয়ঃ সংস্কারাতিশয়াদ্বেদার্থং স্মৃত্বা শব্দরচনাং বিদধতীত্যর্থঃ। ততশ্চ কঠাদয়ো বেদানুপূর্ব্ব্যাঃ কর্ত্তার এব নতু স্থিতায়া এব সুশর্ম্মাদিবৎ প্রবক্তারঃ। —কৈয়টপ্রণীত মহাভাষ্য-প্রদীপ।

(১৮) পরে তু...এবং চার্থশব্দেনাত্রেশ্বরঃ। মুখ্যতয়া তস্য সর্ব্ববেদতা পর্যবিষয়ত্বাং। বৈদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইতি গীতোক্তেরিত্যাহুঃ।—নাগেশভট্টকৃত মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত ৪।৩।১০১

সমগ্র বেদের পরমেশ্বরেই তাৎপর্য্য—ইহা ন্যায়াচার্য্য উদয়নও বলিয়াছেন;—

কৃৎস্ন এব হি বেদোঽয়ং পরমেশ্বরগোচরঃ।
স্বার্থদ্বারৈব তাৎপর্য্যং তস্য স্বর্গাদিবদ্‌বিভৌ॥—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ৫।১৬

আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র নিখিল বেদের ব্রহ্মজ্ঞানেই তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন—দ্রষ্টব্য—ভামতী ৩।২।৪০

(১৯) প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
—মনুসংহিতা ১২।১০৫

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।—পাতঞ্জলদর্শন ১।৭
ত্রিবিধং প্রমাণম্।—সংখ্যসূত্র ১।৮৮
প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি।—অনিরুদ্ধবৃত্তি।
দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টম্—।—সাংখ্যকারিকা ৪

ভাসর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত "ন্যায়সার"নামক ন্যায়দর্শনের প্রাচীন গ্রন্থের "ভূষণ" নামক টীকায় এই তিনটি প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। বৈশেষিকমতের প্রাচীন আচার্য্য ব্যোমশিবও যে এই তিনটি প্রমাণই স্বীকার করিয়াছেন,—ইহা (৮) সংখ্যক পাদটীকায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

সে-কালের পল্লীর বাসন্তী-মেলা

[পল্লী-চিত্র]

আমি যে 'সে-কালের' কথা বলিতেছি—তাহা দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বের কথা নহে, আমাদের বাল্যকালের, অর্থাৎ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু তাহাই কি অল্প দিন? এই ৬০ বৎসরে আমাদের পল্লী-অঞ্চলের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর! কেবল শিক্ষা বা সভ্যতা-বিস্তারে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এরূপ নহে; রীতি-নীতি, রুচি-প্রবৃত্তি, সামাজিক ব্যবহার, জীবন-যাপনের প্রণালী —সকল বিষয়েই সমাজের বিভিন্ন স্তরের নর-নারীর মধ্যে এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে একালেও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পল্লীগ্রামে মেলা বসিয়া থাকে, কিন্তু সে-কালে সেই ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাস-গ্রাম নদীয়া জিলার মেহেরপুরে এক মাসস্থায়ী যে 'বাসন্তী-মেলা' দেখিয়াছিলাম, সেরূপ মেলা একালে আর দেখিতে পাই না। মনে হয়, একালে আমোদ-প্রমোদের আদর্শ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী গ্রামবাসীর ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত ভেদজ্ঞান ভুলিয়া গ্রামের সাধারণ উৎসবানন্দে যোগদান সেকালের একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য বলিয়াই মনে হইত। আমাদের সে-কালের পল্লীর বাসন্তী-মেলার বর্ণনা সম্ভবতঃ একালের পাঠক-পাঠিকা-গণের অপ্রীতিকর হইবে না। ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই দীর্ঘকালে বার্দ্ধক্যবশতঃ স্মৃতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে। সে-কালে যাঁহারা এই মেলা দেখিয়াছিলেন, ইহার সাফল্য-সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং ইহার নিখুঁত বিবরণ শুনাইয়া শ্রোতৃবর্গকে আমোদিত করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। সে-কালের এই সুখের, গ্রামের সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বিবিধ আনন্দ উপভোগের মধুর কাহিনী আজ এই অবসাদশিথিল বার্দ্ধক্যে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে! আর কিছু দিন পরে অতীত যুগের এই কাহিনী বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন গর্ভে বিলীন হইবে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মেহেরপুর মহকুমায় যিনি সব্‌ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল জে, ডি, এণ্ডারসন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং বঙ্গভাষার অধ্যাপকরূপে স্বদেশেও তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত মিশিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এবং গ্রামের অধিকাংশ শিক্ষিত পরিবারকে তিনি চিনিতেন। বাঙ্গালায় তখন আমলাতন্ত্রের রাজত্ব; কিন্তু মিঃ এণ্ডারসনের ন্যায় সদাশয়, প্রজারঞ্জক ও ন্যায়-পরায়ণ সিভিলিয়ান অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীয়ার মেহেরপুর ইংরেজ নীলকরদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। কাথুলী, কাজলা, শিকারপুর, সিভিলগঞ্জ, আমঝুপি, কাপাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের নীলকুঠীতে তাহাদের নীল প্রস্তুত হইত। মেদিনীপুর জমিদারী-কোম্পানীর তখনও সৃষ্টি হয় নাই। নিশ্চিন্তপুর কানসার্ণের ইংরেজ কুঠীয়াল কোম্পানী তখন মেহেরপুরের জমিদার; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ইজারাদার ছিলেন। জমিদারীর আসল মালিক ছিলেন—কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী। বস্তুতঃ, মেহেরপুরের ফৌজদারী আদালতে ইংরেজ কুঠীয়ালগণের মামলা মকর্দ্দমা প্রায়ই লাগিয়া থাকিত বলিয়া সে-কালে এক এক জন অজাতশ্মশ্রু ইংরেজ সিভিলিয়ানকে মেহেরপুরের সব্‌ডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত করা হইত। কোন বাঙ্গালী ডেপুটীকে সে-কালে এই পদে নিযুক্ত করা হইত না, এবং সে সময় বাঙ্গালী সিভিলিয়ানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প থাকায় কোন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান মেহেরপুর মহকুমার শাসন-ভার পাইতেন না। বাঙ্গালী সিভিলিয়ানদের মধ্যে কেবল স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অল্প দিনের জন্য মেহেরপুরের মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তিনি মেহেরপুরে থাকিতেই তাঁহার 'মাধবীকঙ্কণ' নামক উপন্যাসখানির রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার পর দীর্ঘকাল

পর্য্যন্ত আন্‌কোরা ইংরেজ সিভিলিয়ানগণই সেখানে মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে এক জন বাঙ্গালী ডেপুটী কয়েক মাসের জন্য মেহেরপুর-মহকুমা শাসনের ভার পাইয়াছিলেন; তাঁহার নাম মিঃ দুর্গাদাস চৌধুরী। তিনি কলিকাতা-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার আশুতোষ চৌধুরীর পিতা। এই সময় কৃষ্ণনগরবাসী স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল রায় মেহেরপুরের ছোট-আদালতের হেড্‌ক্লার্ক; তিনি স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পাঠ্যাবস্থায় দুই একবার মেহেরপুরে তাঁহার বড় দাদার বাসায় গমন করিয়াছিলেন। আমরা তখন বালক। রাজেন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় সুখেন্দ্রলাল আমাদের বাল্যসুহৃদ্ ছিলেন। বরিশালের সুবিখ্যাত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত তখন নদীয়ার ছোট-আদালতের জজ।

মেহেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, ডি, এণ্ডারসনের উৎসাহে ও আগ্রহে বোধ হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মেহেরপুরে বাসন্তী-মেলার প্রতিষ্ঠা হয়। ফাল্গুন মাসের শেষে অথবা চৈত্র মাসের প্রথমে এই মেলা আরম্ভ হওয়ায় ইহাকে 'বাসন্তী-মেলা' বলা হইত। ইহার পূর্ব্বে বা পরে এরূপ সমারোহপূর্ণ বৃহৎ মেলা নদীয়া জিলার অন্য কোথাও বসিয়াছিল কি না জানি না। মল্লিক ও মুখোপাধ্যায় এই দুই জমিদার-পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ একযোগে এই মেলা সুসম্পন্ন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেহেরপুরের শিক্ষিতসমাজ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ব্রজকুমার মল্লিক, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ইন্দুভূষণ মল্লিকের পিতা) শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক, জমিদার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পিতা স্বর্গীয় নরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি এই মেলার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায়-পরিবারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে তাঁহাদিগের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই মেলা উপলক্ষে মহিষমর্দ্দিনী-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা হইয়াছিল; সুতরাং বলা বাহুল্য, এই মেলায় পৌত্তলিকতার সংস্রব ছিল; কিন্তু মেহেরপুরের মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এজন্য মেলা বর্জ্জন করেন নাই। তখন আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব হয় নাই, এবং আমলাতন্ত্র 'devide and rule' এই শাসননীতি প্রবর্ত্তন করেন নাই; এজন্য পল্লীগ্রামবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্প্রীতিতে বাস করিতেন, এবং উৎসবাদির অনুষ্ঠানে হিন্দু-প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও মুসলমানগণ মোগলাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়া হিন্দুর সংস্রব বর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন না। মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি করা আপত্তিজনক, এরূপ অভিযোগও মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে কোন দিন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের লোক পরস্পরের ধর্ম্মভাবে বাধা প্রদান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ দূরের কথা, ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারেও পরস্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সুখে, দুঃখে, বিপদ, সম্পদে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহাতে মুসলমানগণের সংস্কৃতি লুপ্ত হইবে এরূপ আতঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের নারীগণকে অপহরণ করিয়া তাহাদের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের কথাও শুনিতে পাওয়া যাইত না। হিন্দুর প্রতিবেশী মুসলমানগণ হিন্দু-পরিবারবর্গকে স্বজন বলিয়াই মনে করিতেন। হিন্দুরাও সকল কার্য্যে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন, এবং তাঁহাদের সহযোগিতায় গ্রামের সাধারণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতেন। এই বাসন্তী-মেলায় স্থানীয় মুসলমানগণ সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ৬০ বৎসর পরে আজ সাম্প্রদায়িকতার সৌরভামোদিত পল্লীসমাজে এইরূপ মেলা উপলক্ষে প্রণয়বন্ধন কিরূপ নিবিড় হইত, তাহা অনুমান করা দুরূহ নহে।

আমাদের বাস-ভবনের পূর্ব্বসীমায় গ্রামের যে প্রধান পথ থানা হইতে গ্রামপ্রান্তস্থ আদালত পর্য্যন্ত প্রসারিত, সেই পথের পূর্ব্বে একটি প্রশস্ত ময়দান অবস্থিত; বহুকাল হইতে তাহা 'গড়ের মাঠ' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, নবাবী আমলে 'গোয়ালা চৌধুরী' নামক ভূস্বামিগণের এখানে গড় ছিল, এবং তাহার নীচে ভূগর্ভে যে পাতাল-ঘর ছিল, সেই পাতাল-ঘরে এই রাজ-পরিবারের ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত থাকিত। রাজবাটী কিছু দূরে ছিল। একবার মারাঠা ফৌজ রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিলে রাজপরিজনবর্গ সেই পাতাল-ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্গীরা পাতাল-ঘরের সন্ধান না পাইলেও যে রক্ষীর নিকট পাতাল-ঘরের বহির্দ্বারের চাবি ছিল, সেই রক্ষীকে হত্যা করে।

এজন্ত রাজপরিবারস্থ কোন লোক পাতাল-ঘরের বাহিরে আসিতে পারেন নাই; দীর্ঘকাল রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারা প্রাণত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে প্রবাদ, এই মাঠে কেহ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলে তাহাকে নির্ব্বংশ হইতে হইবে। এই জন্য এই মাঠে কেহ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করে না। এই মাঠেই মেলার স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

মেলা বসাইবার পূর্ব্বে এই মাঠটির বিভিন্ন অংশে বহু-সংখ্যক অস্থায়ী কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুই পাশে সারি সারি কুটীর, মধ্যে প্রশস্ত পথ। সম্মুখে সমুচ্চ বংশতোরণ; তোরণের অদূরে অত্যুচ্চ মঞ্চ নহবৎখানায় পরিণত। মেলার সময় প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে গভীর রাত্রিতে এই মঞ্চে সুস্বরে নহবৎ বাজিত। কুটীরগুলির কোন অংশে জুতার দোকান; তাহার পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ মনোহারী দ্রব্যের দোকান। অন্য দিকে মিষ্টান্নের দোকান; কৃষ্ণ-নগরের সরভাজা, সরপুরিয়া; বহরমপুরের ছানাবড়া, খাগড়াই মুড়কী; বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা; বিভিন্ন জিলার বিখ্যাত খাদ্যদ্রব্যের দোকান। তাহার পর বাসনের দোকান; কোন স্থানে কাষ্ঠনির্ম্মিত আসবাব-পত্রের দোকান। গরুর গাড়ীর চাকা হইতে চেয়ার, বেঞ্চি, খাট, পালঙ্ক সকলই সেখানে বিক্রয় হইতেছিল। কাপড়ের দোকানে নানাপ্রকার বিলাতী কাপড় হইতে শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, পাবনা প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রয় হইতেছিল। কোথাও চুড়ির দোকান; সেখানে রাশি রাশি কাচের চুড়ি হইতে গালার চুড়ি পর্য্যন্ত আমদানী হইয়াছিল। অধিকাংশই জার্ম্মাণ পণ্য; বহির্ব্বাণিজ্যে জাপানের বোধ হয় তখনও হাতে-খড়ি হয় নাই।

কামার-দোকানে ছুরী, কাঁচি, বঁটি, দা, কোদালী, খেঁকো, কাস্তে, কুড়ুল, খুরপো, এমন কি, শড়কী, বর্শা, ট্যাটা পর্য্যন্ত আমদানী হইয়াছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারের দোকানও কিছু কিছু আসিয়াছিল। তাহার অদূরে গিল্‌টির গহনার দোকানে গিল্‌টির বাহার; তাহার ঔজ্জ্বল্যে আসল স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারগুলিকে ম্লান দেখাইতেছিল। সে-কালেও একালের মত 'মেকি' সাচ্চাকে কোণঠেসা করিয়া রাখিত। কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজ, সকল ক্ষেত্রেই মেকি চিরদিন খাঁটির মুখোস পরিয়া আপনার গৌরব ঘোষণা করিতেছে এবং লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়া খাঁটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে—'ওটা মেকি, তাই এ বাজারে বিকাইল না!' মেকিকে যাহারা মেকি বলিয়া চিনিতে পারে—তাহারাও তাহাকে কাঁধে তুলিয়া নাচে, কারণ, মেকি বড় 'পপুলার!' এইজন্য গিল্‌টির দোকানে ক্রেতার বিষম ভীড়।

একপাশে গ্রাম্য মুচি ও ডোমের দল বেতের ও বাঁশের চটার ধামা, কাঠা, ডালি, কুলো, ঝাঁপি প্রভৃতি আধার নির্ম্মাণ করিতেছিল। বিভিন্ন জিলা হইতে কত প্রকার পণ্যদ্রব্যের দোকান আসিয়াছিল, এই সুদীর্ঘ ষাট বৎসর পরে তাহা ঠিক স্মরণ নাই। নানাপ্রকার চিত্র-পট, এবং কুমারের দোকানের নানাপ্রকার পুত্তলিকা সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সুশিক্ষিত চিত্রকর-গণের নিপুণ তুলিকায় নানাবর্ণাঙ্কিত একালের চিত্রপটের সহিত সে-কালের 'নৃত্যলাল কর্ম্মকারের' অঙ্কিত পটগুলির তুলনা হয় না। এখন কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাদের সহিত সে-কালের নাড়ুগোপাল, মা যশোদা, গণেশ, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান্ বা মুকুটধারী রাজা ও মহাদেবমূর্ত্তিরও তুলনা হয় না; কিন্তু উচ্চ আদর্শের অভাবে তাহাই আমাদের শিশুহৃদয় জয় করিয়াছিল। আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

মেলার মাঠের এক পার্শ্বে দুই তিনটি নাগরদোলা। বালক-বালিকা হইতে পল্লীগ্রামের প্রৌঢ়, এমন কি, বৃদ্ধরাও তাহাতে উঠিয়া 'এক পয়সায় কুড়ি পাক' খাইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না, আরও এক পয়সার চাই। অদূরে দুই তিন দল ঘোড়াবাজি। ঘোড়াবাজির মালিক উদ্ঘাটিত ছত্রবৎ সুগোল আধারটির কেন্দ্রস্থিত দণ্ডটি ঘুরাইতেছিল। শ্রেণীবদ্ধ অশ্বগুলির প্রত্যেকটির উপর এক একটি ছেলে, ঘোড়ার জিনের সম্মুখস্থ গোঁজটা দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া কৌতূহল-স্পন্দিত বক্ষে বসিয়াছিল, আর ঘোড়াগুলা বন্-বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল।

কিন্তু অন্য দিকের দৃশ্য স্বতন্ত্র। মাঠের উত্তর-প্রান্তে দরমানির্ম্মিত প্রকাণ্ড 'টাপোর'; তাহার নীচে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা পাঞ্চালরাজনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভার অনু-করণে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সমুচ্চ 'গ্যালারীর' এক দিকে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদমণ্ডিত, জমকাল উষ্ণীষ

ও স্বর্ণাভ শিরস্ত্রাণধারী নানা দেশের রাজগণ; অন্য দিকে নানা দিগ্দেশের কৃশ, স্থূল, লম্বা বেঁটে ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট; গ্যালারীর নিম্নে নীলবর্ণ দীর্ঘদেহ অর্জ্জুন; অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৎস্যচক্র ভেদ করিতেছেন; তাঁহার অবনত নেত্রের দৃষ্টি পদপ্রান্তস্থ জলাধারে সন্নিবিষ্ট। আমরা তখন বালক হইলেও কাশীদাসের মহাভারত পড়িতে শিখিয়াছি। এজন্য অর্জ্জুনের মূর্ত্তি দেখিয়াই কাশীদাসের সেই বর্ণনা মনে পড়িল,—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি,
পদ্মপত্র যুগ্ম-নেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা!"

মনে হইল, শিল্পীরা কাশীদাসের বর্ণনা স্মরণ করিয়াই এই স্বয়ম্বর-সভা রচনা করিয়াছিল। সভার অন্য পার্শ্বে দ্রৌপদী, 'হাতেতে দধির পাত্র, লয়ে পুষ্পমালা' অর্জ্জুনকে বরমাল্য দান করিতে আসিতেছেন; তাঁহার উভয় নেত্রে লজ্জা ও আনন্দ তরঙ্গায়িত।

ময়দানের পূর্ব্বপ্রান্তে পুষ্করিণীর পাড়ে নির্ম্মিত একখানি ঘরে ছায়া-বাজির পুতুল-নাচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার কিছু দক্ষিণে কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর এক একটি দৃশ্য। যে সময় এই মেলার আয়োজন হয়, তাহার অল্প দিন পূর্ব্বে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধবগিরি ও এলোকেশী-সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা শেষ হইয়াছিল; কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জিলায় তখনও সেই কলঙ্কজনক ব্যাপারের আন্দোলন চলিতেছিল। তখনও পল্লী-অঞ্চলের ভিখারীরা মোহান্তের কুকীর্ত্তি সম্বন্ধে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছিল; বাজারে নবীন-এলোকেশীর পট বিক্রয় হইতেছিল। আমরা দেখিলাম, একটি কক্ষে মাটীর একখানি ঘানী প্রস্তুত করিয়া তাহার পার্শ্বে মোহান্তের মৃন্ময়মূর্ত্তি; মোহান্ত সেই ঘানী টানিয়া তৈল বাহির করিতেছিল। অদূরে এলোকেশী উপবিষ্টা, তাহার উভয় হস্ত বাধা-দানের ভঙ্গীতে উত্তোলিত; তাহার স্বামী নবীনের হাতে একখানি বঁটি। নবীন সেই বঁটি দ্বারা অবিশ্বাসিনী পত্নীকে হত্যা করিতে উদ্যত। বহুদূরবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল ও মোহান্তের 'মিঠে' সম্বন্ধে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল।

যে কুটীরে এই সকল মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বস্থ কুটীরে একটি যুদ্ধের দৃশ্য। এক পার্শ্বে জগৎসিংহ ওস্মানের সহিত অসিযুদ্ধ করিতেছিলেন। জগৎসিংহের তরবারির আঘাতে দুই জন পাঠান-বীর ভূতলশায়ী; অস্ত্রাঘাতে তাহাদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। ওস্মান জগৎসিংহের আক্রমণে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। অদূরে অন্য একটি দৃশ্য; বিমলা কতলু খাঁর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতেছিল। শয্যাশায়ী কতলু খাঁর চক্ষু আতঙ্কবিস্ফারিত। বিমলার চক্ষুতে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা পরিস্ফুট। পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা রুদ্ধনিশ্বাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের ঘটনাগুলির বিবরণ শুনিতেছিল; কারণ, এ সম্বন্ধে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না।

মেলায় দুর্গেশনন্দিনীর এই দৃশ্য প্রদর্শনের কারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী কিছু দিন পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু পল্লীবাসিগণ এ সম্বন্ধে কোন কথা জানিত না। মেলার কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা মেলার রঙ্গমঞ্চে 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকাকারে অভিনয় করাইবেন; কিন্তু পল্লীর জনসাধারণ দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যান-বস্তুর বিবরণ জানিতে না পারিলে এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন নাটকাভিনয় দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে, প্রচুর টিকিট বিক্রয় হইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। এই মেলার কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যান-বস্তু জনসাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া তাহাদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা বিজ্ঞাপনের প্রকার-ভেদ।

মেলার কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গেশনন্দিনী অভিনয় করাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, কারণ, কলিকাতার বেঙ্গল থিয়েটারে সেই সময় এই নূতন নাটক অভিনীত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। বিশেষতঃ পূর্ব্বে কোন দিন কলিকাতা হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা মেহেরপুরে আসিয়া কোন নাটকের অভিনয় করেন নাই। এইজন্য মেলার কর্ত্তৃপক্ষ নূতনত্বের মোহে বহু অর্থব্যয়ে মেহেরপুরে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের একটু সুবিধাও হইয়াছিল।

অভিজ্ঞগণ জানেন, সে-কালে প্রসিদ্ধ অভিনেতা শরৎ

ঘোষ জগৎসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় করিতেন, এবং একটি বৃহৎ অশ্বের আরোহী হইয়া 'ষ্টেজে' প্রবেশ করিতেন; দর্শকগণ এই দৃশ্যে তুমুল করতালিধ্বনি করিত। শরৎ ঘোষকে দেখিয়াছি; তিনি কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনী ছাতু বাবুর বংশধর ছিলেন। ছাতু বাবুর পরিবারবর্গের সহিত মেহেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল।

রামচন্দ্র বাবু মেহেরপুরে ইংরেজ নীলকর কুঠীয়ালগণের অভ্যুদয়কালে অত্যন্ত জেদী ও ক্ষমতাশালী জমিদার বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা বাল্যকালে জনরব শুনিয়াছিলাম, একবার কোন কারণে মেহেরপুর অঞ্চলের প্রধান নীলকর ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল; এজন্য ওয়াটসন কোম্পানীর দাম্ভিক ম্যানেজার রামচন্দ্র বাবুকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিছু দিন পরে একটা সুযোগ জুটিয়াছিল। রামচন্দ্র বাবু কার্য্যোপলক্ষে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছিলেন; কার্য্যশেষে তিনি কৃষ্ণনগর হইতে পাল্কী আরোহণে মেহেরপুরে ফিরিতেছিলেন।

কৃষ্ণনগর হইতে মেহেরপুরে আসিতে বাঙ্গালচির মাঠ অতিক্রম করিতে হয়। এই মাঠে পূর্ব্বে ঠ্যাঙ্গাড়ের ভয় ছিল; ঠ্যাঙ্গাড়েরা বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য থাকিয়া পথিকগণের পদদ্বয় লক্ষ্য করিয়া 'ঠেঙ্গা' অর্থাৎ ছোট ছোট বাঁশের লাঠী ছুড়িত। সেই আঘাতে পথিক ধরাশায়ী হইলে দস্যুরা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অদৃশ্য হইত। এজন্য পথিকরা দলবদ্ধ না হইয়া এই পথে চলিত না।

রামচন্দ্র বাবু ষোল বেহারা-বাহিত পাল্কীতে বাঙ্গালচির মাঠে প্রবেশ করিতেই নীলকর 'সাহেব'দের এক দল বরকন্দাজ, পাইক তাঁহার পালকী আটক করিল, এবং পালকীসহ রামচন্দ্র বাবুকে অদূরবর্ত্তী নীলকুঠীতে লইয়া গেল। সেখানে কুঠীয়াল ইংরেজ ম্যানেজারের আদেশে রামচন্দ্র বাবুকে কি ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ নাই; কিন্তু রামচন্দ্র বাবু মেহেরপুরে প্রত্যাগমন করিলে গ্রামের লোক শুনিতে পাইল—নীলকর-হস্তে রামচন্দ্র বাবুর অপমানের চূড়ান্ত হইয়াছিল; তাঁহার সুগৌর দেহে না কি প্রহার-চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

রামচন্দ্র বাবুর আদেশে অতঃপর এক রাত্রিতে মেহেরপুরের এলাকাস্থিত সমস্ত নীলকুঠী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এক রাত্রিতে বিভিন্ন স্থানের ত্রিশ চল্লিশটি কুঠী অনুচরবর্গ দ্বারা লুণ্ঠন ও আংশিক ভাবে বিধ্বস্ত করা কিরূপ যোগাড়-যন্ত্র এবং লোকবল ও অর্থবল-সাপেক্ষ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মুখুয্যে বাবুদের বাসভবনের সম্মুখ দিয়া যে পথ প্রসারিত আছে, সেই পথ দিয়া শ্বেতাঙ্গ নীলকরগণ এক কুঠী হইতে অশ্বারোহণে অন্য কুঠীতে যাইতেন; কিন্তু প্রবাদ, জমিদার-বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদিগকে ঘোড়া ছাড়িয়া কিছুদূর পদব্রজে যাইতে হইত। একালে এ সকল গল্প 'গুলীর আড্ডা'র কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

রামচন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর জমিদার-পরিবার নানা শরিকে বিভক্ত ও দুর্ব্বল হইলেও সে-কালে তাঁহাদের [illegible] অভাব হয় নাই। রামচন্দ্র বাবুর পুত্র স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বাবুর অনুরোধে শরৎ ঘোষ মেহেরপুরের বাসন্তী-মেলায় দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ের জন্য সদলে সেখানে আসিয়া মুখুয্যে বাবুদেরই আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিনোদিনী প্রভৃতি কলিকাতার বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীগণও শরৎ বাবুর সঙ্গে গমন করেন। বিনোদিনীর বয়স তখন অল্প; তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় পরিণত বয়সে 'অমৃত-মদিরা' নামক যে কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার
বিনীর বাড়ীতে যাই খাইতে 'বিয়ার'।"

এই 'বিনী' কি 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনেত্রী সেই বিনোদিনী? অমৃত বাবু জীবন-সন্ধ্যায় প্রায় প্রত্যহ 'বসুমতী' আফিসে আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া নানা গল্পে আমাদিগকে আনন্দদান করিতেন। 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত সতীশ বাবুকে তিনি কি প্রীতির চক্ষুতেই দেখিতেন! 'মাসিক বসুমতী' বিশেষতঃ, 'শারদীয়া বসুমতী'র জন্য কত সরস কবিতা তিনি মুখে মুখে রচনা করিয়া দিতেন। সেই আনন্দের স্মৃতি জীবনে ভুলিবার নহে। সেই সময় সে-কালের দুর্গেশনন্দিনীর এই বিনোদিনীর কথা কোন দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই;

কথাটা স্মরণ হয় নাই। আমার দুর্ভাগ্য! জিজ্ঞাসা করিলে সে-কালের অনেক পুরাতন কথা তাঁহার নিকট শুনিতে পাইতাম।

যাহা হউক, শরৎ বাবুর নির্দ্দেশে মেহেরপুরে মুখুয্যে-বাড়ীর বৈঠকখানায় দুর্গেশনন্দিনীর নানা প্রকার দৃশ্যপট অঙ্কিত হইতে লাগিল। মন্দির, উদ্যান, কারাগার, কত কি। আমরা স্কুলের ছুটীর পর দল বাঁধিয়া সেই সকল চিত্রপট দেখিতে যাইতাম।

কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী তখন নূতন প্রকাশিত হইয়াছে, পৌরাণিক নাটক নহে, পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা দুর্গেশ-নন্দিনীর পরিচয় জানিত না; অথচ রঙ্গালয়ে অভিনয়-দর্শনের জন্ত যদি দর্শকের ভীড় না হয়, সহস্রাধিক টিকিট বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে থিয়েটারের দল আনিবার বিপুল ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে? এজন্ত মেলার কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গেশনন্দিনীর কয়েকটি দৃশ্যের নরনারী-মূর্ত্তি কৃষ্ণনগরের শিল্পী দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ওস্‌মানের সহিত জগৎসিংহের অসিযুদ্ধ, কতলু খাঁর হত্যা প্রভৃতি দৃশ্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পল্লীগ্রামের অগণ্য অধিবাসী এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া দুর্গেশনন্দিনীর উপাখ্যানের মর্ম্ম অবগত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের এই চেষ্টা বিফল হয় নাই। পল্লীগ্রামের 'ষ্টেজে' দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় দেখিবার জন্ত সহস্র সহস্র দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। অসংখ্য টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। আমরা স্কুলের ছাত্ররাও টিকিট কিনিয়া কাকার সঙ্গে অভিনয় দেখিয়াছিলাম, কাকা স্কুলের সেকেণ্ড-মাষ্টার ছিলেন। আমাদিগকে অর্দ্ধমূল্যে টিকিট দেওয়া হইয়াছিল; উহাতে হেড-মাষ্টারের স্বাক্ষর ছিল। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের অভিনয় দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, আহা, ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা! কিন্তু তিনি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি কি না স্মরণ নাই।

রঙ্গমঞ্চের কিছু দূরে একখানি খড়ের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে "ছায়াবাজীর পুতুল-নাচ" প্রদর্শিত হইয়াছিল। সে-কালে 'বায়স্কোপ' 'সিনেমা' 'টকী' প্রভৃতির অস্তিত্ব এ দেশের লোকের কল্পনাতেও স্থান পাইত না; কিন্তু তাহারা সে-কালের থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতি দেখিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিত, একালে 'সিনেমা' 'সবাক্-চিত্র' প্রভৃতি দেখিয়া দর্শকগণ কি তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ করিতেছে? কিন্তু সে-কালের তুলনায় একালে আমোদের ব্যয় কিরূপ বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-কর আক্কেল-সেলামী দিতে হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে দেশের আর্থিক উন্নতির পরিচয় পাই না! সে-কালে ছয় পয়সা মূল্যের তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া গ্রামের জনসাধারণ যে আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিত, একালে নয় সিকা মূল্যের নকল-সিল্কের কাপড়ের ছাতা কি আধুনিক গ্রামবাসিগণকে তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দদান করিতে পারিতেছে? অর্থই কি আনন্দের মানদণ্ড?

কিন্তু একালের মেলার মত সে-কালের মেলার কর্ত্তৃপক্ষ অর্থসংগ্রহের আশায় দুইটি অপকার্য্যে প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন; একটি জুয়াখেলা, দ্বিতীয় রূপজীবিনীদিগকে মেলায় রূপের দোকান খুলিতে দেওয়া।—নানাপ্রকার জুয়া-খেলা চলিতেছিল। একটির নাম 'কুপন-খেলা।' এক পয়সার বাজি, যে ঘরে গুটি পড়িবে, পয়সাটি সেই ঘরে ধরিলে ঐ সঙ্গে আর চারি পয়সা লাভ; নতুবা পয়সাটি গেল। তাসেরই কত রকম খেলা; বালক আমরা সকল বুঝিতে পারিতাম না; দেখিতাম, অনেক লোক মেলা দেখিতে আসিয়া ট্যাঁকের সর্ব্বস্ব হারিয়া গামছায় চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিতেছিল। কেহ বা প্রথমে দুই টাকা জিতিয়া শেষে হাতের সম্বল পাঁচ টাকাই হারিয়াছে, এবং তাহা উদ্ধারের আশায় পুনর্ব্বার টাকা আনিতে বাড়ীতে ছুটিয়াছে! লাল-পাগড়ী চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে-ছিল, কিন্তু জুয়ারীরা অনেক টাকা খাজনা দিয়াছিল; বিশেষতঃ, পুলিসের দারোগা মুস্তফি মহাশয় তাহাদের মুরুব্বি। এই বিভাগ পরিদর্শনের ভার পাইয়াছিল চন্দোর ঘোষ। চন্দোর ঘোষ গ্রামের গুলীখোরদের দলের সর্দ্দার ছিল। তবে জুয়ার সহিত গুলীর কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

রূপজীবিনীদের ঘর ঠিক করিয়া দেওয়া, তাহাদের খাজনা আদায় প্রভৃতির ভার ছিল মথুর চাটুয্যের উপর। মথুর চাটুয্যে জমিদার বাবুদের মোসাহেবী করিত। যাহা-দের হাতে টাকা-কড়ি ছিল, অথচ মাথার উপর কোন অভিভাবক ছিল না, তাহাদের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া মামলা-মকর্দমা সৃষ্টি করাই তাহার পেশা ছিল। সে অদ্ভুত

কৌশলে উভয় পক্ষকেই দোহন করিত। কিছু দিনের মধ্যেই সেই ধনাঢ্য পরিবার তাহার কৃপা-কটাক্ষে 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' হইয়া পথে দাঁড়াইত; চাটুয্যে তখন 'বাবুদের' মজলিশে তাহাদের বুদ্ধির নিন্দায় হাস্যরসের সৃষ্টি করিত। বাল্যকালে একটা ছড়া শুনিতাম, "মেহেরপুরের ইল্লৎ যায়, মথুর চাটুয্যে ম'লে।"

মেলার ময়দানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে জঙ্গলপূর্ণ কয়েকটি বৃহৎ গর্ত্ত ছিল; সেই গর্ত্তের ধারে রূপজীবিনীগণের শ্রেণী-বদ্ধ কুটীর। দক্ষিণে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর; পশ্চিমে বহরমপুর; উত্তরে রাজসাহী ও পূর্ব্বে চুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে ইহারা ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিল। অধিকাংশই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ফরসা দেখাইবার জন্য তাহাদের মুখে চা-খড়ি-চূর্ণের সাদা প্রলেপ। দেখিয়া মনে হইত—তৈলপক্ক কৃষ্ণবর্ণ ডাবা হুঁকার শোভা-বর্দ্ধনের জন্য চূণকাম করা হইয়াছে; অনেকেরই বয়স ত্রিশ চল্লিশ বৎসর; কিন্তু পরিধানে নীলাম্বরী বা ডুরে সাড়ী। সে অতি বীভৎস দৃশ্য! নাকে সোনার নোলক, তাহার উপর কাণে দুল, বা এয়ারিং, হাতে গিল্টির চুড়ী ও তাগা, গলায় পাঁচনলা কণ্ঠমালা, এবং কটিতটে রূপার সুপ্রশস্ত চন্দ্রহার, পায়ে চারিগাছা 'ডায়মন্‌কাটা' মল। কেহ মেলার ভিতর ঘুরিয়া মলের ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বংশীরবমুগ্ধ হরিণের মত শিকার সংগ্রহ করিতেছিল; কেহ বা তাহার রূপের দোকানে বসিয়া রসজ্ঞ শ্রোতাকে মুগ্ধ করিবার জন্য গান ধরিয়াছিল,—

'ঐ যায় বুঝি যৈবনের তোরী অকুল তুফোনে,
মদনের ঢেউ লেগেচে আর 'আকৃতে' পারি নে।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই রসিক প্রেমিক ভাবাবেশে মদারুণ নেত্র অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া, মাথার তরঙ্গায়িত 'বাবরী'কাটা কেশগুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া, মহা উৎসাহে ডুগী-তবলায় সঙ্গত করিতেছিল। কুটীরদ্বারে শ্রোতার ভীড়।—এই অঞ্চলেই মেলার সমারোহ অধিক।

দোকানে দোকানে খরিদদারের অসম্ভব ভীড়। তাহারই মধ্যে ভিখারিণী 'বোষ্টুমী'—নাকে রসকলি, কাণে পাশা, ভ্রূ-যুগলের মধ্যে বা অধরের নিম্নে উল্কী, প্রকোষ্ঠে রৌপ্যবলয়, সে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া মিহিসুরে গান ধরিয়াছিল—

"ব্রজের শ্যাম, ব্রজে চল দিনেক দু'দিন তরে—"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গী 'বোরেগী' মোটা গলায় গাহিতেছিল,—

"বারেক দেখা দিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে, এসো তুমি ফিরে"—

তাহার পর মাথা নাড়িয়া, উভয়ে সমস্বরে 'ডুয়েট'—

"ধরে রাখ্‌বো না হে!"

'বাবাজী'র হাতে ময়লা ও জীর্ণ একরঙ্গা-বেষ্টিত গাব্‌গুবাগুব অর্থাৎ গোপীযন্ত্র। সে মাথা নাড়িয়া, সুদীর্ঘ দাড়ীর নানা রকম ভঙ্গী করিয়া, একটা ছোট কাঠি দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্র-হস্তে তাহার বাদ্যযন্ত্রের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিয়া ঝঙ্কার দিতেছিল—

"বারেক দেখা দিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে, এসো তুমি ফিরে,
ধরে রাখ্‌বো না হে!"

বাসন্তী পূজার সঙ্গে কয়েকদিন নানাপ্রকার উৎসব চলিল। অবশেষে গ্রামের লোক শুনিতে পাইল—নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরের পথে ৬০খানি গরুর গাড়ীতে মতি রায়ের যাত্রার দল আসিয়াছে!

মেলার আসরে কয়েকদিন খেমটা, বাই হইতে টপ, কবি, কীর্ত্তন কিছুই বাদ যায় নাই; কিন্তু যাত্রা আরম্ভ হয় নাই। মতি রায়ের যাত্রার দল আসিয়াছে শুনিয়া চতুর্দ্দিকের পঁচিশখানি গ্রামের লোক যাত্রা শুনিতে মেহেরপুরে ছুটিল।

মতি রায় স্বয়ং আসিয়াছিলেন; তিনি উভয় জমিদার-পরিবার মল্লিক ও মুখুয্যে বাবুদের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রিশেষে আসরে গান আরম্ভ করিলেন।—বিষয় "ভীষ্মের শরশয্যা।"

চ্যাটাইয়ের প্রকাণ্ড টাপোরের নীচে যাত্রার আসর হইয়াছিল। টাপোর শুভ্র চন্দ্রাতপ দ্বারা আবৃত; তাহার চতুর্দ্দিকে লাল ঝালর। চাঁদোয়ার নীচে শ্রেণীবদ্ধ লাল, নীল, সবুজ কাচের বেল-লণ্ঠন, প্রত্যেকটির ভিতর এক একটি মোমবাতি। মধ্যে মধ্যে দশ পনেরটি ডাল-বিশিষ্ট বেলোয়াড়ী ঝাড়। আসরের বাঁশের খুঁটিগুলি মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত—এক-একটি থামের মত দেখাইতেছিল; সেগুলি লোহিত বস্ত্র ও সোনালী জগজগা-মণ্ডিত। প্রত্যেক স্তম্ভে এক একটি দেওয়ালগিরি সংরক্ষিত। প্রত্যেক দেওয়ালগিরির

নীচে সে-কালের আর্ট ষ্টুডিয়ো, বা রবি বর্ম্মার অঙ্কিত চিত্রপট। প্রকাণ্ড আসরে ফরাস; বংশদণ্ডের রেলিংএর সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ বেঞ্চ। রেলিংএর পশ্চাতে সারি সারি চ্যাটাই প্রসারিত;—তাহা ভিন্ন-গ্রামের 'চাষাভুষো' দর্শকগণেরই অধিকারভুক্ত।

'ভীষ্মের শরশয্যা' পালা 'গাহনা' হইবে শুনিয়া বহু পল্লীগ্রামের পঞ্চসহস্রাধিক দর্শক রেলিংএর বাহিরে চতুর্দ্দিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মহকুমার কনষ্টেবল চৌকিদারদল আসরের শান্তিরক্ষা করিতেছিল। প্রভাত হইতে দর্শকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সেই অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে যে-ভাবে যাত্রা হইত, একালে তাহার সকল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দাড়ি-গোঁফ-কামান পুরুষ স্ত্রীলোক সাজিয়া বা জমকাল সাজ-পোষাকে সজ্জিত হইয়া রাজা-রাণী, বা মুনি-ঋষির শুভ্রাকার গোঁফ দাড়ি ও জটাজূটসমাচ্ছন্ন হইয়া আসরে অভিনয় করিল। তাহাদের বক্তৃতা শেষ হইলে ছয় জন 'জুড়ি' চোগা-চাপকানে মণ্ডিত হইয়া আসরে বিভিন্ন দিকে দাঁড়াইয়া, সমস্বরে চীৎকার করিয়া সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিল। আর একদল লোক আসরে বসিয়া কর্ণমূলে করতল স্থাপন করিয়া সমুচ্চ স্বরে তাহাদের গানের অনুবৃত্তি করিল।

জুড়ির গানের পর আবার বক্তৃতা, তাহার পর একই প্রকার সাজে সজ্জিত ১৫।১৬টি ছোকরা দিকে দিকে বিভক্ত হইয়া গান করিতে লাগিল। তাহাদের মাথায় জরীর তাজ, পরিধানে লাল-নীল গর্নেটের কোট ও হাফ্‌প্যান্ট; পায়ে রঙ্গিন মোজা, জানুর নীচে তাহা গার্টারে আঁটা; কটিদেশে বগলস্‌-আঁটা কোমরবন্ধ।

মতি-রায়ের দল গ্রামে এই প্রথম আসিয়াছে। সকলেই মুগ্ধহৃদয়ে বক্তৃতা ও সঙ্গীত উপভোগ করিতে লাগিল। অবশেষে একটি বালকের করুণ সঙ্গীত যাত্রার উপসংহার-কালে দর্শকগণের নয়নে অশ্রু-তরঙ্গ প্রবাহিত করিল।

কুরুক্ষেত্রে প্রথম যুদ্ধের অবসানে দশম দিন কুরু-পিতামহ ভীষ্ম অর্জ্জুনের শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া শরশয্যায় নিপতিত।—কুরুকুল ও পাণ্ডবগণ শত্রুতা ভুলিয়া দুই পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াই। ক্ষুব্ধহৃদয়ে বিহ্বল-নেত্রে পিতামহ ভীষ্মের এই হৃদয়ভেদী পরিণাম নিরীক্ষণ করিতেছেন। আকর্ণবিস্তীর্ণ-গুম্ফধারী যুধিষ্ঠির রাঙ্গতার রাজমুকুট পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া, মলিন রুমালে চক্ষু ঢাকিয়া রোদন করিতেছেন; তাঁহার ললাটের সিন্দূ-রাঙ্কিত রেখাত্রয় ললাট-প্রবাহিত ঘর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া গোঁফের পাশ দিয়া ঝরিয়া পড়িয়েছে; মধ্যম পাণ্ডবের লৌহগদারূপী কাঠের 'দামাট'বিশিষ্ট তুলাভরা মুদ্গরটি ধরাতলে নিক্ষিপ্ত; অর্জ্জুনের রূপালী রাঙ্গতামণ্ডিত বাখারীর গাণ্ডীব হস্ত হইতে স্খলিত-প্রায়; তিনি তাঁহার উভয় হস্তের ভর দিয়া গলা ফুলাইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, তাঁহার সবুজ গর্নেটের সেনাপতির পরিচ্ছদের ভিতর ময়লা সার্টের ঘর্ম্মসিক্ত কলারের কিয়দংশ শোভা-বিকাশ করিতেছে। রাজা দুর্য্যোধন পিতলের একটা গাড়ু লইয়া শরশয্যাশায়ী শুষ্ককণ্ঠ পিতামহের পিপাসা নিবারণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সেই সময় লোহিত পট্টবস্ত্রমণ্ডিত একটি গৌরকান্তি বালক ভীষ্মজননী গঙ্গার বেশে আসরে প্রবেশ করিল, এবং শরাঘাত-জর্জ্জরিত, জীবনের প্রান্তোপনীত, শরশয্যা-শায়ী, শুভ্রকেশ বীরের রণশ্রান্ত বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া করুণ-কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

"মরি রে মরি প্রাণ-কুমার আমার,
এ দশা তোর কে করিল?
এই বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড
আমার ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচা'ল?
* * * * * *
দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি
কোন্ দস্যুতে হ'রে নিল?"

এই গানে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় করুণার প্লাবনে প্লাবিত হইল। সহস্র সহস্র শ্রোতা অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। মেহেরপুর মহকুমায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক, তাহাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সৈয়দ, হাজী প্রভৃতি অতি অল্পই দেখা যায়; কিন্তু কোন শ্রেণীর মুসলমানের সহিত কোন শ্রেণীর হিন্দুর মনোভাবের কোন পার্থক্য ছিল না, তাই দেখিলাম, হিন্দু নর-নারীর পার্শ্বে বসিয়া মুসলমান নর-নারীরা এই সঙ্গীতে সমভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল; কারণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণার ন্যায় স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি মনোবৃত্তি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমান, এবং এই জন্যই সে-কালে

হিন্দু-মুসলমান স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেও পরস্পরের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিত। আজ ৬০ বৎসর পরে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের সেই সদ্ভাব কোথায়, ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি।

বেলা একটার পর যাত্রা ভাঙ্গিলে 'ভোঁ ভোঁ দুম্‌ দুম্‌' শব্দে মধ্যাহ্নের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। দর্শকগণ যাত্রার সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। সে-দিন হাট-বাজার বন্ধ। মেছুনী, তরি-তরকারী-বিক্রেতা সকলেই যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিল। তাহারা আর কোন দিন ত মতি রায়ের যাত্রা শুনিতে পাইবে না; হাট-বাজার ত প্রত্যহই বসিবে।

অপরাহ্ন হইতে মেলাস্থলে আবার নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ হইল। এই ভাবে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত মেলা চলিল। এরূপ মেলা আমাদের গ্রামে গত ৬০ বৎসরের মধ্যে হয় নাই, ভবিষ্যতে কখন হইবে তাহারও সম্ভাবনা নাই; কারণ, সে যুগ আর নাই। এ যেন আর এক জাতি, এখন আমোদ-প্রমোদের ধারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তাই সর্ব্বহারা বেদনাতুর একক জীবনের স্তিমিত সন্ধ্যায় একালের পাঠককে সে যুগের বিস্মৃতপ্রায় এই অতীত কাহিনী শুনাইয়া রাখিলাম,—যদি কিছু দিন ইহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

উদাসী

সৃষ্টি-ছাড়া দৃষ্টি-মাখা ছন্নছাড়া মতি
একলা চলে পাগলা ভোলা বিরামহারা গতি;
ঝাঁপ দিয়েছে অসীম পথে নাইকো কিছু জানা,
মর্ম্মমাঝে হার মেনেছে কর্ম্মরোলের হানা।

ভরা হাটের হাজার ধ্বনি আস্‌ছে ভেসে কাণে
হর্ষ-দুঃখের ঢেউ ছুটেছে আকুল কলতানে;
ডাক্‌ছে তারে পিছন হ'তে যাত্রা কত দূর—
দেয় না সাড়া আলয়-ছাড়া পাগল ভবঘুর।

সঙ্গী জনের গণ্ডী ঘেরে নাইকো রে তার ঠাঁই,
বক্ষে লাগে ঝঞ্ঝা শত, লক্ষ্য কিছু নাই;
কারুণ্যেরি কাজল আঁকা উদাস চাহনিতে,
একলা পথিক পথের মাঝে চলে বেভুল চিতে।

রঙীন আশার হাতছানি সার, প্রেমের প্রলাপন,
অন্ধ, বধির, আগল-খোলা পাগল ভোলা মন—
তরল বুকে ফুটিয়ে মুখে সরল মৃদু হাস
জানিয়ে চলে উদাস পথিক যাত্রা-অভিলাষ।

দীর্ঘদিনের কূজন-গীতি কোথায় গেলো মিশে
সাঁঝের ছায়ে ভিড়লো তীরে পারের তরণী সে,
নাম্‌লো কালো বনের শিরে যায় না কিছু দেখা
আপন মনে আপন-ভোলা চল্‌ছে একা একা।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

এমব্রয়ডারী

এমব্রয়ডারী মানে যে খুব জটিল রকমের সূচী-শিল্প, সব সময়েই তা মনে করবেন না। অতি অল্প-আয়াসেও মনোরম এমব্রয়ডারীর কাজ করা যায়। তারই কয়েকটি নমুনা এবারে দেওয়া হলো। এগুলি করতে সময় বেশী লাগবে না, মাথাও বেশী ঘামাতে হবে না। নিত্য-ব্যবহার্য্য টেব্‌ল্‌ক্লথ ইত্যাদিতে এ ধরণের সেলাই খুবই নয়ন-রঞ্জক হবে।

কেট্‌লি-ঢাকা ও টেবল্‌-ক্লথ,

১নং ছবিটি টি-কোজীর (কেটলী ঢাকার) উপর করা হয়েছে। ছবির গাছটি বেশ একটু নতুন ধরণের। এর নাম "জাপোনিক।" যে-সব সুতোয় বা উপাদানে এ কেটলী-ঢাকা তৈরী হয়েছে, তাতে খরচ পড়ে খুবই সামান্য; এবং ধোলাই-কাচাইয়ে এ-সব ফুল বা পাতার রঙ উবে বা জ্বলে যাবে না।

এ গাছটি তৈরী করতে সুতো লাগবে পাঁচ রঙের।
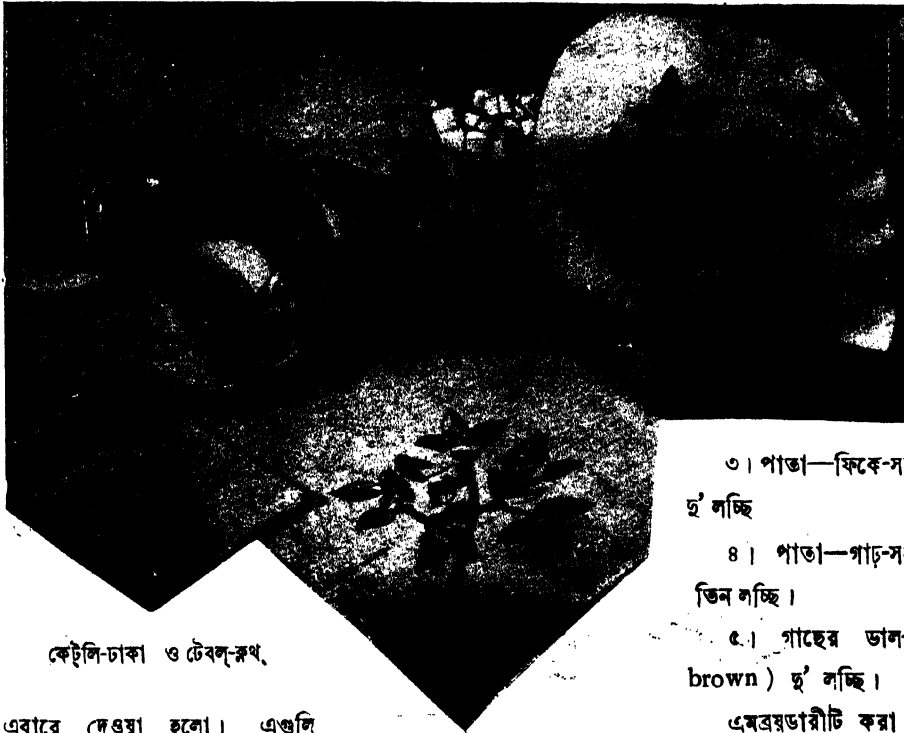
১। ফুলের পাপড়ি—টুক্‌টুকে লাল (cherry-red) চার লচ্ছি।

২। ফুলের মধ্যকার পরাগ-পুট—সোনালি (golden-yellow) দু' লচ্ছি।

৩। পাতা—ফিকে-সবুজ (light-green) দু' লচ্ছি

৪। পাতা—গাঢ়-সবুজ (dark-green) তিন লচ্ছি।

৫। গাছের ডাল—বাদামী (dark-brown) দু' লচ্ছি।

এমব্রয়ডারীটি করা হয়েছে আগাগোড়া সাটিন ষ্টিচে (Satin stitch) এবং ব্ল্যাঙ্কেট-ষ্টিচে (Blanket stitch)। পৌষমাসের বসুমতীতে সাটিন-ষ্টিচের পরিচয় পাবেন।

বড় ছবি দেখে গাছটি এঁকে বা ট্রেশ্‌ করে নিন। যে কাপড়ে সেলাই করবেন, তার রঙ যদি

মাখনের মত হয়, ভালো ; তা'হলে সুতোর রঙও বেশ খুলবে।

এখন এই কাপড়ের উপর ছুঁচের ফোঁড় তুলুন।

টুকটুকে লাল সুতো দিয়ে সাটিন-ষ্টিচে ফুলের পাপড়িগুলি তৈরী করুন। তারপর সোনালি সুতো দিয়ে ফুলের মাঝখানটা তৈরী করুন। এ সেলাইও হবে সাটিন-ষ্টিচে। তার পর ডালপালা ; ব্রাউন সুতো দিয়ে এগুলো করবেন সাটিন-ষ্টিচে।

এইবার পাতা তৈরী করবার পালা। পাতাগুলি তৈরী করবেন ব্ল্যাঙ্কেট-ষ্টিচ দিয়ে। এ ষ্টিচ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি, কিন্তু ছবি দেখলে বোধ হয় ফোঁড়-তোলার প্রণালী আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। পাতাগুলির কতক করবেন গাঢ়-সবুজ, কতক ফিকে-সবুজ সুতোয়। তারপরে জমির লাইনটি করুন গাঢ় সবুজ সুতোয় ব্ল্যাঙ্কেট-ষ্টিচে।

এমব্রয়ডারী করবার প্রণালী বলা হলো। এখন নিজের ইচ্ছামত যে-কোনো কাপড়ে এই গাছটি গড়ে তুলতে পারেন।

জাপোনিকা

দ্বিতীয় ছবির সেলাই আরো সহজ এবং অল্প-আয়াস-সাধ্য ; তা বলে কোনো দিক দিয়ে নিতান্ত সাধারণ সেলাই নয়।

এ সেলাইয়ের কাজ তোলার জন্য চাই খদ্দর-জাতীয় কাপড়। মানে, বেশ মোটা এবং ফাঁক-ফাঁক বুননের কাপড় নেবেন। ছবিতে দেখছেন সেলাইটি করা হয়েছে কুশন্ এবং সোফা-ঢাকার উপরে। কিন্তু ঠিক ঐ প্রয়োজনেই যে এদের লাগাতে হবে, এমন বাধ্য-বাধকতা নেই! যে কোনো কাজে এ সেলাই লাগাতে পারা যায়।

ফুলের সার

এতেও পাঁচ রঙের সুতো লেগেছে।

১। মাঝখানকার ফুলটির জন্যে বেগুনি রঙের সুতো (mauve)।
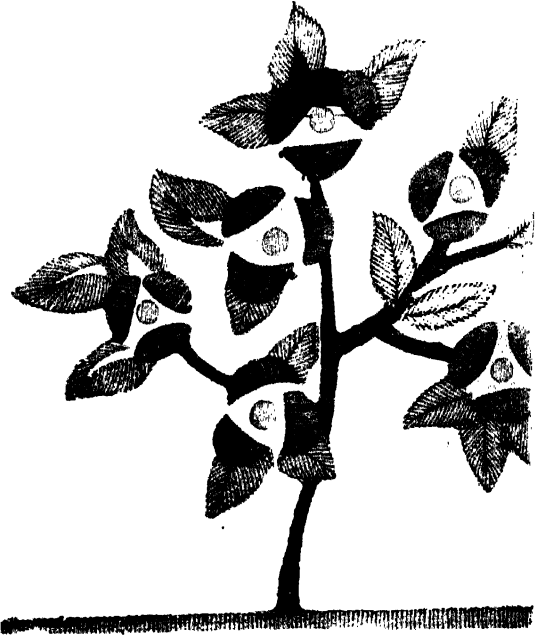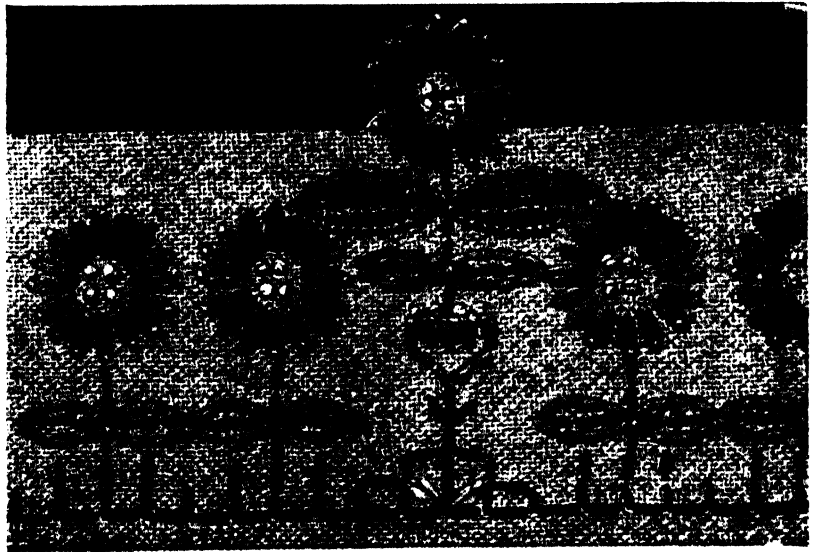
২। বাকী ফুলগুলির জন্যে—গোলাপী (pink) সুতো।

৩। ফুলের রেণু—হলদে (yellow)।

৪। পাতা—ফিকে সবুজ (light-green)।

৫। পাতা গাঢ় সবুজ (dark-green)।

কুশনের উপরকার তিনটি ফুলের মধ্যে মাঝখানকার

ফুলটি বেগুনি রঙের এবং দু'পাশের দুটি ফুলই গোলাপী রঙের সুতোয় করা। নীচেকার ফুলের সারে প্রথম ফুলটি গোলাপী; দ্বিতীয়টি বেগুনি; কুঁড়িটি গোলাপী। এই-ভাবে একটা গোলাপী, একটা বেগুনি রঙের সুতোয় ফুলের সার তৈরী করবেন—কুঁড়ি-শুদ্ধ ধরে।

ফুলগুলি করা হয়েছে আগ গোড়া লেজি-ডেজি ষ্টিচে

কুশন

ওয়াড়

(lazy-daisy-stitch)। পৌষের মাসিক বসুমতী দেখুন।

ফুলের রেণুগুলি হলদে রঙের ফ্রেঞ্চ-নট (French knot); কুঁড়ির গোড়ার পাতাদুটি গাঢ় সবুজ রঙের লেজি-ডেজি ষ্টিচ। পাতাগুলি সাধারণ ষ্টিচ—ফিকে সবুজ রঙের সুতো দিয়ে তৈরী। পাতার শিরগুলি গাঢ় সবুজ; বড় পাতাগুলি ফিকে সবুজ রঙে বাট্‌নহোল ষ্টিচ দিয়ে করা হয়েছে; কিন্তু পাতার শির গাঢ় সবুজ রঙের। ফুলের বোঁটা এবং জমির লাইন গাঢ় সবুজ রঙের সুতোয় ষ্ট্রোক্‌-ষ্টিচ (stroke-stitch)।

একটা কথা মনে রাখবেন, এই এমব্রয়ডারীটি করবেন খুব মোটা সুতো দিয়ে; না হয় সাধারণ সুতো দু'পাট্টা করে নিতে পারেন।

মতির গাছে মুক্তার ফল

ছেলেবেলায় রূপকথার গল্প শুনেছিলুম, রাজার খেয়ালে গাছ তৈরী হলো! মতির গাছ—তাতে মতির ডালপালা; গাছের পাতা সোনা-রূপোর; আর সে গাছে ফলে মুক্তোর ফল! একালে মতির গাছ এবং সে গাছে মুক্তোর ফল—ঘর সাজাবার জন্য মেয়েরা খুব সহজেই তৈরী করতে পারেন। এ গাছ তৈরী করতে খরচ পড়ে দু'তিন টাকা মাত্র।

কি করে এই গাছ হয়, আর এ গাছে মুক্তার ফল ফলানো যায়, বলি।

গাছের জন্য দরকার তামার তার পঁচিশ ফুট। ১৮ নম্বরের তার কিনবেন। এ তার মজবুত হবে এবং এ তারে গাছ তৈরী করলে তারের গাছ যেমন খাড়া থাকবে, তেমনি তারকে ইচ্ছা-মতো বাঁকিয়ে ডালপালা তৈরী করা যাবে—ডালপালার ভারে গাছ বেঁকে নুয়ে পড়বে না। তা ছাড়া আরো-কিছু চাই—অর্থাৎ

তার হেলানো

ক'হালি বিলিতি মুক্তো; যদি বড় গাছ তৈরী করেন, তা'হলে চার-পাঁচ হালি বিলিতি মুক্তো কিন্‌বেন। এ মুক্তো

ছোট-বড় নানা আকারের পাওয়া যায়। গাছ যেমন ছোট-বড় হবে, গাছের ফলও তেমনি গাছের সঙ্গে মানায়, এমনি সাইজের হওয়া চাই—এটুকু বুঝে দরকারী সাইজের বিলিতি মুক্তো নেবেন। গাছ রাখবার জন্ম চাই ছোট কাঁচের বাটি কিম্বা মাটীর টব্। 'ক্রুশ-বোনা সুতো নেবেন এক বাণ্ডিল; খানিকটা গালা-কাঠি চাই। ইংরেজীতে যাকে shellac বলে, সেই গালার কাঠি নেবেন। আর চাই নানা রঙের কিছু পুঁতি; সেলুলয়েড-

ডালে সুতা জড়ানো

সীমেণ্ট এক টিউব; ১৮ নম্বরের খানিকটা তামার তার এবং কিছু চুমকি বা রাংতা-জরির কুচি।

১৮ নম্বরের যে-তার নিয়েছেন, সেই তার দু'ফুট ক'রে কাটুন। এগারো-বারো পীশ্ হয়, এমন ভাবে কাটবেন। খুব মিহি তার দিয়ে এই এগারো-বারোটি তার এবার একসঙ্গে জুড়ে জড়িয়ে বাঁধুন। এক দিকে তিন ফুট ছেড়ে বাঁধবেন। যে দিকটা ছাড়বেন, সে-দিকটা হবে গাছের গোড়া। বাঁধা হলে এই তারের গুছি ছোট ফুলদানীতে রাখুন। রেখে ডালপালাগুলিকে বেঁকিয়ে হেলিয়ে দিন। যে-গাছ তৈরী করবেন, সত্যকার সে-গাছের ডালপালা যেমন হেলে থাকে, তেমনি ভাবে এই তারগুলি নানাভাবে হেলিয়ে দেওয়া চাই। ১নং ছবি দেখলে তার-হেলানোর ভঙ্গীটুকু বুঝতে পারবেন। হেলানো তার যাতে ঠিক থাকে —ঝুলে না পড়ে, এজন্য তারের ঠেঁকো দিয়ে সেই ঠেকো তারটুকু বেঁধে নেওয়া চাই। ডালপালা বেঁধে গাছ খাড়া হলে গোড়ার দিকটা ফিতে জড়িয়ে কিম্বা সিল্ক বা কালো ন্যাক্‌ড়া জড়িয়ে ফুলদানী ভরাট ক'রে সে গাছকে টাইট ভাবে ফুলদানীতে বসানো চাই। তা' হলে গাছ নড়বে না, পড়বে না।

এবার গাছ এবং ডালপালার তারের

ডালে রঙ-রাঙ্তা

গায়ে মিহি সুতো জড়িয়ে দিন। বেশ টাইটভাবে সুতো জড়ানো চাই। এ সুতো দিয়ে ডালপালাগুলি গাছের সঙ্গে টাইটভাবে আঁটা থাক্‌বে। গাছের গোড়া থেকে সুতো জড়াবেন, না হ'লে সুতো আল্‌গা হতে পারে। কি করে সুতো জড়াবেন, ২নং ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন।

এবার বিলিতি মুক্তোগুলি একটির পর আর একটি তারে গেঁথে নিন্। মুক্তোর গাঁথুনি যেন ঠাশ্ হয়—আল্‌গা হলে গাছের শ্রী থাক্‌বে না! ৩নং ছবিতে মুক্তো গাঁথার প্রণালী দেখানো হয়েছে।

ডালপালা বাদ দিয়ে গাছের অপর অংশে একটু রঙ মাখিয়ে নেবেন—সেই রঙের উপর ঐ শেলাক্-গালা তাতিয়ে গাছের গায়ে সে-গালা লেপে দিন। এ গালা গরম
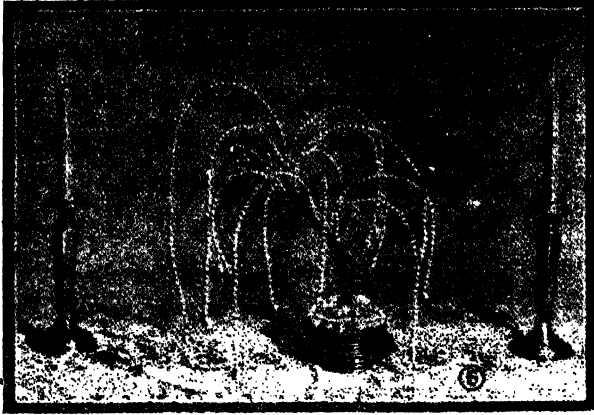
মণির গাছ

থাক্‌তে থাক্‌তে তাতে চুম্‌কি ও জরির কুঁচি এঁটে নেবেন তা'হলে গাছ বেশ ঝিক্‌-ঝিক্ করবে! রঙ মানিয়ে জরির কুচি লাগাতে পারলে গাছের বাহার যা খুল্‌বে, চমৎকার!

ডালের তারে মুক্তো বসানোর আগে যদি ইচ্ছা করেন, ডালের সঙ্গে ছোট ছোট তার জুড়ে নিতে পারেন—এ তারে নানা রঙের পুঁতি গেঁথে নিতে পারেন। না করলে ক্ষতি নেই; করলে গাছের বাহার বাড়বে। প্রত্যেকটি ডালের শেষে মুক্তো গাঁথা হয়ে গেলে শেষভাগটুকুতে সেলুলয়েড সিমেন্ট টিপে এঁটে নেবেন—এ সিমেন্টের গড়ন হবে নোলোকের মতো। এই সিমেন্ট শুকিয়ে জমাট-টাইট হলে ডালের মুক্তো খশে ঝরে পড়বার ভয় থাক্‌বে না; এবং তার ভারে ডাল হেলে নুয়ে থাক্‌বে। এইবার ফলসমেত গাছটি তৈরী হলো।

ডালপালার আকার ছোট-বড় করা, ডালে পাতা আঁটা এগুলো সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। রান্নায় মানিয়ে বনিয়ে যত মসলা দেবেন, ততই তার স্বাদ বাড়ে—এ কথা কে না জানে! তেমনি রঙবাহার রাংতা দিয়ে নানা রঙের তবলকী গেঁথে গাছের বাহার যাঁর যেমন খুশী বাড়িয়ে তুল্‌তে পারেন। গাছের ডালপালা কোন্‌টা কতখানি হেলবে, কোনোটা অন্যটাকে না ঢেকে রাখে—এ সব দিকে নজর রাখাতেই শিল্পীর গুণপনা প্রকাশ পায়। সে সম্বন্ধে বিধি-নিয়ম নির্দেশ করে কোনো লাভ নেই। একই মাটী নিয়ে অনেকে শিবের মূর্ত্তি গড়েন; কারো হাতে শিবের মূর্ত্তি চমৎকার ছাঁদে গড়ে ওঠে, কারো হাতে মাটীর সে শিবকে চেনা শক্ত হয়। অতএব যার হাতের যা-গুণ, প্রত্যেক শিল্প-কাজে তা' প্রকাশ পাবেই!

এই গাছ তৈরী হলে ঘরের টেবিলে সাজিয়ে রেখে যদি সে গাছের দু'দিকে বাতিদানে রাত্রে বাতি জালিয়ে দ্যান, তা' হলে ঘরে বসে রূপকথার রাজ্য দেখা হয়ত অসম্ভব হবে না!
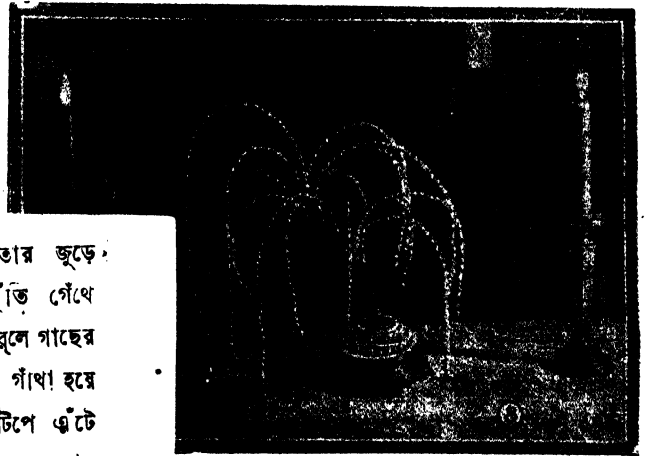
বাতির আলোয়

মুখচন্দ্রমা

গায়ের-মুখের রঙ যত ফর্শাই হোক, মুখের গড়ন যদি ভালো না হয়, তাহা হইলে সে-মেয়েকে কেহ 'সুন্দরী' বলিবে না; 'সুন্দরে কুৎসিত' বলিয়া তাঁর নামে কলঙ্ক-রেখা লাগিয়া থাকিবে চিরদিন।

অনেকে বলেন, মেয়েদের মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকিবে, মুখশ্রী না-ই বা রহিল, রঙটা ফর্শা হইলেই পরমার্থ! এ কথা এ কালের নিরবগুণ্ঠন-সমাজে চলে না! শুধু তাই নয়, মুখের নিখুঁত ছাঁদেই মেয়ে-জাতের আসল সৌন্দর্য্যমাধুরী!

রুজ পাউডারে মুখে বাহার খোলে, এ কথা যিনি ভাবেন, তিনি ভুল করেন। যাঁর মুখের গড়ন ভালো নয়,

অর্থাৎ মুখের গড়নে খুঁৎ আছে—যেমন গড়ের মাঠের মতো বিশাল বা ঢিপির মতো উঁচু কপাল ; 'টেবো' গাল ; বড়ি বা বালুবের মতো নাক ; কোল-বসা চোখ ; চিবুকের নীচে মাংসের থলি ঝুলিয়া চিবুককে দোতলা-তিনতলা করিয়াছে, তাঁদের মুখ পাউডারে-রঙে বিভীষিকা জাগায়—কথাটা রূঢ় হইলেও সত্য !

রূপসজ্জায় রুজ, ব্লুম, পাউডার, ক্রীমের পিছনে অজস্র পয়সা যাঁরা ব্যয় করিতে কাতর নন, মুখের গড়ন ভালো করিতে তাঁদের লক্ষ্য নাই, দেখি ! তার একটি কারণ, কোনো যন্ত্রপাতি, দড়ি বা ফিতার সাহায্য না লইয়া—নিত্য দিন কিছুক্ষণ ধরিয়া সহজ ব্যায়ামে মুখের ঢিপি-ঢাপা টোল-খোঁদল সারিয়া মুখকে যে কমনীয় রমণীয় করা যায়, এ কথা অনেকে জানেন না ! তাই আমরা সেই কথার আলোচনা করিতেছি।

রূপসী হোন, কুরূপা হোন—সকল মেয়েই চান্ তাঁকে যেন বেশ 'স্মার্ট' দেখায় ! নকল সাজে এ 'স্মার্ট' ভাবের পাত্তা মেলে না। মুখের গড়নের দোষ ঢাকিতে অনেকে এ যুগে পর্দ্দা, নেটের বাঁধন, সেলুলয়েড বা রবারের খোল-নলিচা—নানা বস্তুর শরণ লন ; তাহাতে সুফললাভ সম্ভব নয়। মুখের গড়ন সুছাঁদের করিয়া তুলিতে সাধনা চাই—ব্যায়াম-সাধনা।

অনেকের চিবুকের নীচে এক থোলো মাংস থলির মতো বাড়িয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকে। এ চিবুককে ইংরেজীতে বলে double chin. এ ধরণের চিবুকে সুশ্রী মুখ ভারী জগদ্দল দেখায় এবং মুখের শ্রী তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় ! এ খুঁত দূর করিতে অনেকে চিন্-ষ্ট্রাপ কিনিয়া তাহা দিয়া চিবুক বাঁধিয়া রাখেন। এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে চিবুকের কাছে রক্ত-চলাচল-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে এবং চিবুকের পেশী দুর্ব্বল হয় ; বাঁধন-মুক্ত হইলে চিবুকের মাংস থলথলে ভাবে ঝুলিয়া পড়ে ! এ রীতি মানিলে চিবুকের খুঁত ঘুচিবে না—ঘুচিতে পারে না ! মাচার আশ্রয় টুটিলে কুষ্মাণ্ড যেমন মাটীতে ঝুলিয়া পড়ে, চিন্-ষ্ট্রাপের বাঁধন খুলিবামাত্র দোহারা বা তুপুরু চিবুকও তেমনি লোল ভাবে ঝুলিয়া পড়িবে !

সব খুঁৎ ধীরে ধীরে জমিয়া মুখের এ কমনীয় শ্রী নষ্ট করে। সূচনায় এ খুঁৎ ধরা যায় না। এদিকে যখন নজর পড়ে, তখন শ্রী-হীনতায় ক্ষোভে-দুঃখে মন হাহাকার করিয়া ওঠে।

গায়ের বর্ণ নির্ভর করে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য-পানীয়ের উপর। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা বলেন—Proper diet will clear up your complexion and give it radiance and luster. সযত্নে নিত্য গাত্রাদি পরিমার্জ্জনা করা চাই। মুখে বা অঙ্গের কোনোখানে যেন ধূলা-ময়লা ক্লেদ না জমিয়া থাকে। তারপর চাই যথারীতি ব্যায়াম। এ বিধি মানিয়া চলিলে গায়ের বর্ণ প্রদীপ্ত উজ্জ্বল থাকিবে ; ত্বক মসৃণ এবং মুখ ও অঙ্গের গঠনে সামঞ্জস্য ও সৌকুমার্য্য বজায় থাকিবে।

এ যুগের বিশেষজ্ঞেরা বলেন—মুখের গড়নে যদি খুঁত থাকে, বিধিবদ্ধ ব্যায়াম-পালনে সে খুঁৎ ঘুচিয়া মুখ নিখুঁত সুন্দর হইবেই।

সুশ্রী মুখ হইবে মসৃণ, কোমল ; মুখের সকল রেখা হইবে সুস্পষ্ট—lines well defined.

মুখের হাড়ের গড়নে যদি দোষ থাকে, তবে সে দোষ অস্ত্রোপচার (plastic operation) ভিন্ন ঘুচিবার নয়। চিবুকের নীচে যদি আর-এক প্রস্থ মাংস গজাইয়া 'গল-কম্বলের' মতো গলার পাশে দুলিতে থাকে, তবে সে বোঝা অনায়াসে ফেলিয়া দেওয়া যায়। সেজন্য চাই শুধু দু'হাতে নিয়ম মানিয়া চিবুক-মর্দ্দন !

এ ব্যায়াম সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা-চাই। যখনি হাঁটিবেন চলিবেন বা বসিবেন, মাথা যেন সিধা খাড়া থাকে ; পিঠ যেন বাঁকিয়া ঝুঁকিয়া না থাকে। এ কথা মনে রাখিয়া চলিলে মুখের কোথাও কোঁচ পড়িয়া মুখের শ্রী নষ্ট হইবে না।

মুখের শ্রী-সম্পাদনে যে কয়টি ব্যায়াম প্রয়োজন, এবারে বলি।

চিবুকে বা মাড়িতে দোষ থাকিলে অর্থাৎ মুখের নীচের দিক ট্যারচা বা বেমানান হইলে কাণের নীচে মাড়ির উপরে গালের মাংস-চর্ব্বি ও পেশী দু'হাতের বৃদ্ধ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দিয়া তুলিয়া ধরিবেন। মাড়ির হাড়ের উর্দ্ধে তুলিতে হইবে। তার পর এই মাংস চর্ব্বি ও পেশী ধীরে ধীরে টিপিবেন ; টিপিয়া উপর হইতে নীচের দিকে এবং পরক্ষণে নীচে হইতে উপর দিকে দুমড়াইতে হইবে। এমনি ভাবে দু'হাত সংলগ্ন রাখিয়া বাঁ কাণের নীচে হইতে ডান কাণের নীচে পর্য্যন্ত ডলাই-মলাই চলিবে—বাঁ দিক হইতে

ডাহিনে এবং ডান দিক হইতে বাঁ দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে এ ব্যায়াম করিতে হইবে দশ মিনিট। গালে বা চিবুকে চিম্‌টি কাটিবেন না বা বেশী জোরে মর্দ্দন করিবেন না; তাহাতে চামড়া ছড়িয়া বা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। এ ব্যায়ামের সময় বৃদ্ধ অঙ্গুলি যেন নীচের দিকে থাকে।

ডবল-চিন বা দুপুরু চিবুক। দু'হাতের চেটোয়

১। গালের মাংস

প্রথমে একটু ক্রীম্ বা পমেড-ভ্যাশেলিন বা নারিকেল তৈল ঢালিয়া হাতের চেটো দুটিকে তৈলাক্ত করিয়া নিন। তার পর ডান হাতের আঙ্গুলগুলি জোরে চাপিয়া চিবুকের ডগা হইতে সুরু করিয়া ঘাড়ের পিছন দিক পর্য্যন্ত রগড়াইয়া ঘষুন। (২নং ছবি) তার পর বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়া ঘাড়ের পিছন হইতে সুরু করিয়া চিবুকের ডগা পর্য্যন্ত জোরে ঘষুন—কয়েক মিনিট এমনি অবিরাম ঘর্ষণ করিয়া রীতি বদল করিতে হইবে। অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুল দিয়া চিবুকের ডগা হইতে ঘাড়ের পিছন দিক পর্য্যন্ত এবং বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়া ঘাড়ের পিছন দিক হইতে চিবুকের ডগা পর্য্যন্ত ঘর্ষণ-মর্দ্দন করিবেন। প্রত্যহ রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে এ ব্যায়াম করিবেন পনেরো

২। ডবল-চিন্

মিনিটকাল। তাহাতে এ-জায়গায় রক্তচলাচলক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া অনাবশ্যক মেদভার বা চর্ব্বি লোপ পাইবে—ডবল চিনের চিহ্ন থাকিবে না।

ঝুঁকিয়া চলা বা
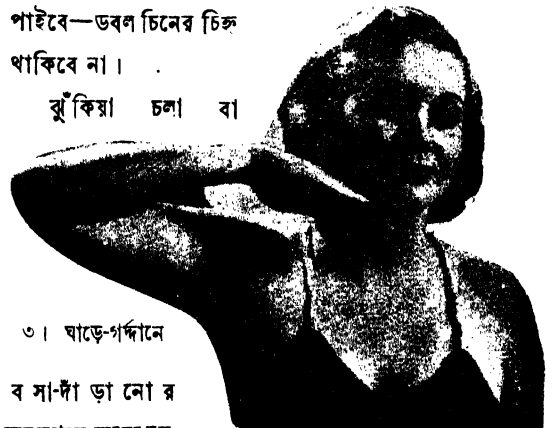
৩। ঘাড়ে-গর্দ্দানে

ব সা-দাঁ ড়া নো র কদভ্যাসে অনেকের মাথা ঝুঁকিয়া ঘাড়ে-গর্দ্দানে হইয়া পড়ে। এ খুঁত মোচন করিতে হইলে সিধা খাড়া ভাবে মাথা রাখিয়া চিবুকের নীচের দিক দিয়া ডান হাত উপুড় করিয়া গলা ও চিবুকের তলদেশ (৩নং ছবি) পর্য্যন্ত আগাগোড়া অল্প-জোরে ঘর্ষণ-মর্দ্দন করিবেন। প্রথমে ডান দিক হইতে বাঁ দিকে ঘর্ষণ

করিবেন—তার পর বাঁ হাত উপুড় করিয়া বাঁ দিক হইতে ডান দিকে এইভাবে ঘর্ষণ-মর্দ্দন করিবেন।

মুখের সৌষ্ঠব বা সৌকুমার্য্য সাধনের জন্য। একটা উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসুন। দু'হাত দু'দিকে চেয়ারের উপর রাখুন। চেয়ারে পিঠ ঠাশিয়া পিঠ সিধা রাখুন। এবার মাথা পিছন দিকে ঝুলাইয়া দিন। চিবুক থাকিবে উর্দ্ধমুখী। (৪নং ছবি)। এইভাবে অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে একবার হাঁ করুন—পরক্ষণে মুখ বুজুন। মাথা যতখানি সাধ্য পিছন দিকে হেলাইয়া রাখিবেন। প্রতিবার মুখ বুজিবার সময় আপনার মুখের পেশীসমূহে যেন বেশ টান বা চাড় পড়ে। চিবুক রাখা চাই। মুখ বুজিবার সময় পেশীতে টান পড়া চাই। যদি টান না পড়ে, তবে ব্যায়াম পণ্ডশ্রম বলিয়া জানিবেন।

গঠন-ছাঁদ পরিপাটী করা। নাকের গড়নে দোষ থাকিলে অস্ত্রোপচার ভিন্ন সে দোষ কাটে না—এ ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল। কিন্তু তাহা ভুল। নাকের বহু দোষ হরে ব্যায়াম! নাকের উপর-দিক যদি মুখে মিশিয়া থাকে এবং ডগা যদি বড়ির মতো হয়, তাহা হইলে বুড়া ও তর্জ্জনী—এ দুই আঙুলে নাসাগ্র-ভাগ চাপিয়া ধরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া দু আঙুল গালের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া আনিবেন।

৪। চিবুক উর্দ্ধমুখী

৫। নাকের দু'দিক

দশবার এইভাবে মুখ খুলিতে ও মুখ বুজিতে হইবে। তার পর সামনের দিকে মাথা হেলাইয়া স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা করুন। এ সময় দু'চোখ থাকিবে সমরেখায় (on a level line)। এইবার ডান দিকে যথাসম্ভব মাথা হেলান—চিবুক যেন ডান কাঁধের উপর থাকে। চিবুক স্পর্শ করিবার জন্য কদাচ কাঁধ তুলিবেন না। চিবুক যেন সামনের দিকে না হেলে—কাঁধের উপরে নাসাগ্রভাগে ধীরে ধীরে দু আঙুলে মোচড় দিবেন। এ ব্যায়াম করিবেন দশ মিনিটকাল।

তার পর দু'হাতের মধ্যম অঙ্গুলি দিয়া নাকের দুদিকে চাপিয়া (৫ নং ছবি) উপর হইতে নীচে এবং নীচে হইতে উপর দিকে একটু জোরে জোরে ঘর্ষণ করিবেন। এ ব্যায়াম নিত্য দশ মিনিট ধরিয়া করা চাই।

এ ব্যায়ামের সঙ্গে যে-খাদ্য সহজে জীর্ণ হয়—যে-খাদ্যে

পুষ্টি, এমন খাদ্য পরিমিত ভাবে গ্রহণ করিবেন। ছ'মাস নিয়ম করিয়া এ ব্যায়াম মানিয়া চলিলে মুখের শ্রী সুকুমার হইবে।

সজ্জা-বিলাস

ফুলদানীতে ফুল সাজানো

রাশীকৃত ফুল লইয়া তার সঙ্গে পত্রপল্লব মিশাইয়া ফুলদানীতে গুঁজিয়া দিলে সে ফুল-সাজানোর বাহার খোলে না। ফুলদানীতে কি করিয়া ফুল সাজাইতে হয়, সে সম্বন্ধে বিধি-নিয়ম আছে।

সব ফুলদানীতে সব ফুল যেমন মানায় না, তেমনি নানা রকমের ফুল লইয়া ফুলদানী সাজাইতে চাহিলে ফুলের গোত্র ও প্রকৃতি বিচার করা প্রয়োজন। মানব-সমাজে যেমন জ্ঞাতি-শত্রু আছে, ফুলের সমাজেও তেমনি ফুলে-ফুলে মৈত্রী-বিদ্বেষ আছে। দেওয়ালের গায়ে লতায় পাতায় যে সব ফুল ফোটে, সে সব ফুল অন্য ফুলের ঘেঁষ সহিতে পারে না। এ ফুলের সঙ্গে গোলাপ, চাঁপা ও মর্শুমী ফুল একত্র গুচ্ছাকারে ফুলদানীতে রাখিলে গোলাপ-চাঁপা ও মর্শুমী ফুলের অকাল-মৃত্যু সুনিশ্চিত।

তার পর ফুলদানীর কথা। গোলাপ রাখিবেন চীনা মাটীর ফুলদানীতে; পিতল বা ব্রঞ্জের বা কাচের ফুলদানীতে গোলাপ রাখিলে সে গোলাপ যতদিন সুস্থ থাকে, তার চেয়ে সে বেশীদিন সুস্থ তাজা থাকিবে চীনা মাটীর ফুলদানীতে। ক্রীশানথিমাম, পপি প্রভৃতি যে-সব ফুলের পরমায়ু একটু দীর্ঘ, সে সব ফুল পিতল বা তামার ফুলদানীতে ভালো থাকে, সুস্থ থাকে।

ফুল রাখিবার পূর্ব্বে ফুলদানীতে যদি একটা তামার পয়সা ফেলিয়া দেন বা জলে একটু এ্যাসপিরিন ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে সে ফুলদানীতে ফুল অনেকদিন তাজা থাকিবে।

ফুল কিনিবার সময় বোঁটা বা ডালপালার প্রান্তভাগ সাফ্ আছে দেখিয়া তবে ফুল কিনিবেন। ফুলদানীতে ফুল রাখিবার সময় বোঁটার বা শাখা-প্রশাখার প্রান্তভাগ কলম-কাটার ভঙ্গীতে টেরচাভাবে কাটিয়া লইবেন— তাহাতে ফুল ভালো থাকিবে এবং দীর্ঘকাল বাঁচিবে।

রাত্রে ফুলদানী হইতে তুলিয়া ভায়োলেট ফুলকে জলে ভিজাইয়া রাখিবেন। গোলাপ ফুল রাত্রে একটু গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবেন; সকালে আবার সহজ ব্যবস্থা।

ফুলদানীর জল নিত্য প্রাতে বদলাইয়া দিবেন।

ক্রীশানথিমাম, ডালিয়া, জিনিয়া, জেরানিয়াম প্রভৃতি মর্শুমী ফুল সব চেয়ে দীর্ঘজীবী। তবে তাদের পরিচর্য্যায় যেন ঔদাসীন্য না ঘটে, সাবধান! *

* গত পৌষ-সংখ্যায় "সিল্ভার এ্যারো" জাম্পারটির প্যাটার্ণ তোলার ছাপায় একটু ভুল রয়ে গেছে। সেজন্য অনেকের অসুবিধা ঘটেছে, জানিয়েছেন।

পিঠের দিক্

৩য় লাইন,—২টো সোঃ * ২টো ঘর এঃ, উঃ সাঃ, ১টা সোঃ উঃ সাঃ, ১টা নাঃ বু তোঃ, ১টা সোঃ, ১টা নাঃ বোঃ তোঃ, ৩টে সোঃ।

এ ছাড়া কয়েক জায়গায় "উঃ সাঃ" অর্থাৎ "উল্ সাম্নে" কথাটিকে "সাঃ উঃ" অর্থাৎ "সাম্নে উল" বলে' ছাপা হয়েছিল। এজন্য বুনতে যাঁদের ভুল হয়েছে, তাঁদের কাছে ত্রুটি স্বীকার কর্ছি। এ ভুলটুকু দয়া ক'রে তাঁরা শুধরে নেবেন।

ইতি—স্বঃ শিঃ লেঃ।

[উপন্যাস]

২০

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিজকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিল। যাহা স্পষ্ট ছিল, তা অস্পষ্ট হইয়া অবশেষে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

বেহারা আসিয়া বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিয়া কক্ষটাকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া গেল।

মিত্র-সাহেব চকিত হইলেন। মেয়ের পানে চাহিলেন। সুলেখা যেন হঠাৎ ধ্যানে বসিয়াছে। ক্ষোদিত মূর্ত্তির মত নিস্তব্ধ থাকিয়া সম্মুখের টেবলটার পানে চাহিয়া আছে। কিন্তু মুখ দেখিলেই বোঝা যায়—অকস্মাৎ টেবলটি এমন কিছু পরম বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠে নাই যে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে সুলেখা এমন নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বোধ করি, সে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে দৃষ্টির বাহিরে যাহা আছে, তাহাই দেখিতেছিল।

মিত্র-সাহেব কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "শৈলকে কি তুমি এই রকম নীচ মনে কর?"

সুলেখার মুখ পাংশু হইয়া গেল। দৃষ্টিতে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। কহিল,—"নীচ—না বাবা, আমি তো তা কোন দিন মনে করিনি!"

তীব্রকণ্ঠে পিতা কহিলেন,—"তবে এমন কথা তুমি কেন বললে, যাতে তাকে একটা ভয়ানক স্বার্থপর, কাপুরুষ বুঝায়? তার মুখ দেখতেও যেন ঘৃণা হয়?"

একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ভয়ের অন্ধকার—সুলেখার সুগৌর মুখখানিকে কালো করিয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত যেন সে রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধবাক্, পাথর হইয়া রহিল। তার পর কহিল,—কণ্ঠস্বর বাতাসে কাঁপা শতদলের মত, একটা দুর্নিবার আতঙ্কে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে—সুলেখা কহিল,—"না বাবা, তাঁকে একবারও ত আমি নীচ বা স্বার্থপর বলিনি।"

একটা প্রবল ক্রন্দনবেগ তাহার কণ্ঠস্বরকে রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

সুলেখার এই বেদনা-বিদ্ধ মুখখানার পানে চাহিয়া মিত্র-সাহেবের অন্তর উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিল, বুকের মাঝে কেবলই একটা দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ সমুদ্র-তরঙ্গের মত দুলিয়া, ফুলিয়া যেন সংযমের সীমা ছাড়াইতে চাহে।

অন্তরের ছায়া চোখেই বেশী প্রতিফলিত হয়। মিত্র-সাহেবের দৃষ্টি হইতে যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ও, তুমি তা বল না। তুমি এখন ছেলেমানুষ কি না। কিন্তু আমি বলব, সে তাই। তার এই জুয়াচুরী আমি ভাঙ্গব।"

একটা প্রবল ধাক্কা যেন সুলেখার আচ্ছন্ন অন্তরকে ভয়ানক জোরে নাড়িয়া দিল। সর্ব্বনাশ যে কত বড় হাঁ মেলিয়া তাহাকে গিলিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্ধকারে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত আলোকে তাহার ছবিটা সে দেখিতে পাইল। সে শিহরিয়া উঠিল। ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "না, বাবা, না। সে জোচ্চোর নয়। মিথ্যাবাদীও নয়।"

ইহার বেশী কথা তাহার মুখে বাহির হইল না—বাহির হইল নেত্রে অশ্রু। ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীর মত হঠাৎ শাসনের বিধি-নিষেধকে চূর্ণ করিয়া উন্মত্ত আবেগে উহা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য যখন মানুষের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, স্নেহাস্পদের ব্যাকুলতা বা অশ্রুরেখার অন্তর

তখন বিচলিত হয় না। অন্তর ব্যথিত হইলেও কর্ত্তব্যে বিমুখ হয় না।

আদেশপূর্ণ কণ্ঠে মিত্র-সাহেব কহিলেন, "লেখা, তুমি তার ব্রীফ নিও না। আমি মানা কচ্ছি। ব্রজ যদি এ রকম প্রতিশ্রুতি তার কাছ থেকে নিয়েছিল, তবে কেন সেই মিথ্যাবাদী আমার কাছে তোমায় চাইলে? তাকে আমি সহজে নিষ্কৃতি দেব না।"

আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎগমের পূর্ব্বে সহসা যেমন বিবর্ণ হইয়া উঠে, ভয়ানক ক্রোধে মিত্র-সাহেব সেইরূপ পাণ্ডুর মুখে কার্পেটমোড়া মেজের উপর পা ঠুকিলেন।

শৈলর সহিত জনকের হয় ত একটা প্রচণ্ড বিরোধ বাধিবে। তাহার লজ্জা, গ্লানি ও বেদনার বিষাক্ত বাষ্প নির্ম্মল বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করিয়া তুলিবে, তাহার ফলে তিল তিল করিয়া সুলেখাকে কি মৃত্যুর দ্বারে ঠেলিয়া দিবে না? মানস-দৃষ্টিতে এই দৃশ্যের কল্পনা করিয়া, তাহার দেহ বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল—পৌষের শীতাড়ষ্ট বাতাস যেন তাহার দেহের সমস্ত রক্তকে হিম-শীতল করিয়া দিল।

কম্পিত হাতখানা বাড়াইয়া সে পিতার হাতটা চাপিয়া ধরিল। যন্ত্রণামথিত কণ্ঠে সে কহিল, "না, বাবা, না। তুমি তা করো না। তুমি ঠাণ্ডা হও। গোড়া থেকে তার উপর অবিচার হচ্ছে। আমার মিনতি, তুমি তা করো না।"

মেয়ের চোখের অশ্রুবন্যা মিত্র-সাহেবকে এতক্ষণে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সুলেখার পাশে বসিয়া-পড়িয়া তিনি কহিলেন, "না, তোমরা বল এক রকম, কর অন্য রকম। কিন্তু শৈল এমন লুকোচুরি খেল্লে কেন? সে তো জানৃত যে—" কথা শেষ না করিয়া অর্দ্ধপথে মিত্র-সাহেব থামিলেন। বোধ করি, চরম দুঃখের কথাটা সহজে মুখ দিয়া উচ্চারিত হয় না।

যে কথাটা উচ্চারিত হইল না, তাহার মাঝে যে কঠোরতম অভিযোগ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে চিনিতে সুলেখার এতটুকুও বিলম্ব হইল না। পিতার মত শান্ত কণ্ঠে সে-ও ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "না বাবা, সে কিছু জানৃত না! আমি তাকে চিনি, সে প্রবঞ্চক নয়। যদি জ্যাঠামণির জীবিত অবস্থায় সামান্য ইঙ্গিতও তাঁর কাছ হ'তে সে পেত, তা হ'লে এমন প্রস্তাব সে কিছুতেই তুল্‌তে পারত না। বাবা, তুমি বিশ্বাস কর, আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, অনিলার অস্তিত্বও সে জানৃত না।"

মিত্র-সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। অবুঝ এই মেয়েটা! যুক্তি তর্কের কোন অনুশাসনই এখানে চলে না এবং শৈলর প্রতি সুলেখার ভালবাসাটা সমুদ্রের মত কত গভীর ও সীমাহীন, তাহার পরিচয় মিত্র-সাহেবের অগোচর রহিল না। জীবনে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে আর তাহার অন্তরে স্থান পাইবে না, নিঃসংশয়ে সেটুকু বুঝিয়া অন্তরটা তাঁহার ব্যথিত, পীড়িত হইতে লাগিল। ভূমিকম্পে ফাটিয়া যাইবার মত যে বুকখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা জোড়া লাগিবে কেমন করিয়া? ভাঙ্গা জোড়া লাগিলেও নূতনের মত সে হয় না। জোড়ের একটুখানি দাগ চিরদিনের জন্য আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

আশাকে মানুষ ছাড়িতে পারে না, বাঁচিবার বীজ-মন্ত্র যে তাহারই মধ্যে নিহিত আছে। শৈলকে জামাতা করিবার কল্পনা মিত্র-সাহেবের সমগ্র অন্তর প্রভাবিত করিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ চোখের সম্মুখে কল্পনা যেন ইন্দ্র-ধনুর মত মিলাইয়া গেল, তাহার স্থানে একটা দুঃখের পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মিত্র-সাহেবের চিত্তটা এই নিষ্ঠুর সত্যকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেছিল না। আসন্ন মৃত্যুর পাশে দাঁড়াইয়াও মানুষ পথ খুঁজিতে থাকে, মনে করে, দৈব ইহাকে হয় ত রক্ষা করিবে।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "ব্রজকে আমি তোমাদের বিবাহের কথা জানিয়েছিলুম; কই, সে আমায় তো এ বিষয়ে কিছু বলেনি?"

সুলেখা কহিল, "তিনি তো এ কথা কারও কাছেই বলেন নি। পাটনায় এসেছিলেন, বল্‌তে পারেন নি, সেইটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।"

মিত্র-সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বভাব কোমল, পরদুঃখকাতর অন্তঃকরণে কথাটা আঘাত করিল। কিন্তু তা বলিয়া প্রসঙ্গটার এইখানেই সমাপ্তি ঘটিল না। কহিলেন, "তুমি পাগল! অনিলার কথা শুনে যত উদ্ভট চিন্তা, তোমার মাথায় শুধু জাগ্‌ছে। শৈল নিশ্চয়ই এ বিষয়ে তোমায় কিছু বলেনি?"

কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া সুলেখা কহিল, "কিন্তু আমারি কি আর তাকে বিবাহ করা উচিত?"

কন্যার মুখপানে ক্ষণকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অবশেষে মিত্র-সাহেব কহিলেন, "কেন, উচিত নয়? তুমি ত নিজেই শৈলকে ছোট মনে কর না, অপরকেও কর্ত্তে দাও না। সে তোমাকে চেয়েছে। তুমিও তাতে অসন্তুষ্ট নও। তখন এ রকম পাগলামির খেয়াল মনে এনো না, লেখা! লোকে নিন্দা করবে।"

জনকের এই প্রকার বিরক্তিমাখা মূর্ত্তি সুলেখার অপরিজ্ঞাত। ঝড়ের আকাশের ন্যায় তাঁহার অন্ধকার মুখ সুলেখার দেহে একটা ভয়ের জাল বিস্তার করিলেও, মুখে একটা বেদনার চিহ্ন আঁকিলেও, যে নির্ভীক নারীত্ব তাহার বুকের ভিতর অটল ছিল, তাহাকে যেন কিছুই স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। মূলহীন শৈবালদলের মত সবটাই যেন উপরে ভাসিতেছিল। মিত্র-সাহেবের যুক্তি, ক্রোধ, অনুনয়—তাঁহার তূণের বাছা বাছা বাণগুলি সবই ব্যর্থ হইতেছিল।

সুলেখা শান্ত কণ্ঠে কহিল, "লোকে নিন্দা করবে সেই দিক্‌টাই দেখ্‌ব? আর সমস্ত অন্তর যেটাকে অন্যায় বল্‌বে, সেইটা নিয়ে পীড়ন করব?"

বর্শার ফলার মত মিত্র-সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিল।

তিক্ত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "পীড়ন! কথাগুলা তোমার ভয়ানক হেঁয়ালী-ভরা। শৈল কি তোমাকে বিবাহ কর্ত্তে সম্মত নয়?"

সুলেখা মাথা নত করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমরা দু'জনেই বুঝেছি এটা অনুচিত।"

বিদ্রূপের সুরে মিত্র-সাহেব কহিলেন, "উচিত কোন্‌টা?"

সুলেখা কহিল, "জ্যাঠামণির ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করা। তিনি নিশ্চিত করেছিলেন অনিলার সঙ্গেই তাঁর জামাইয়ের বিয়ে হবে।"

মিত্র-সাহেব ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ রহিলেন। বোধ করি, একটা উচ্ছ্বসিত ক্রোধকে ভিতরে দমন করিতেই তাঁহার এই নীরবতা। কিন্তু ক্রোধটা মেয়ের উপর হইল না। হইল সেই দুর্গ্রহের উপর, যে এই শান্তিস্বভাবা, অনুগতা বুদ্ধিমতী মেয়েটাকে হঠাৎ এমন অবুঝ, অবাধ্য, বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্ট, অদৃষ্ট বলিয়াই তাহার উপরে আক্রোশের ঝাঁঝটা কণ্ঠ দিয়া সুলেখার উপর স্নেহের সুরে বাহির হইল।

মিত্র-সাহেব কহিলেন, "তুমি বল্‌ছ, জীবনে এ কথা ব্রজ মুখ দিয়া বার করেন নি; তুমি বল্‌ছ, শৈল এ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত পায় নি। অথচ ব্রজর এইটাই ইচ্ছা ছিল। মনের একান্ত কামনা ছিল। সুলেখা, তুমি নিজের কথায় নিজেই জড়িয়ে পড়ছ।"

মিত্র-সাহেব হাসিলেন।

এতটুকু বিচলিত না হইয়া সুলেখা কহিল, "তিনি যে নিজের জামাইকে নিজের ক'রেই রাখ্‌তে চেয়েছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ আছে। আর আমি তা দেখেছি।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মিত্র-সাহেব কহিলেন, "কই, কি অকাট্য প্রমাণ দেখাও আমাকে? তবে আমি তা বিশ্বাস করব।"

সুলেখা কহিল, "তাঁর নিজের হাতের লেখা আছে।"

মিত্র-সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন, কহিলেন, "দেখি সে চিঠি।"

২১

প্রচণ্ড বিস্ময় ও তীব্রতম অভিমান ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইয়া, শৈলর অন্তরটা অনিলার প্রতি তিক্ত করিয়া তুলিতেছিল। অনিলা তাহার অর্থের সাহায্য লইল না। তথাপি তাহারই পশ্চাতে অনুক্ষণ সাহায্যের বাহু বাড়াইয়া পদে পদে উপেক্ষিত হইতে হইবে? অকস্মাৎ সে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বসিল। আহত অন্তর ক্ষিপ্ত বিদ্রোহীর মত অনিলার প্রতি বিমুখতা করিতে ভিতরে ভিতরে তাহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইত। কিন্তু চেষ্টাই পাইত! তাহার উপর একচুল সে উঠিতে পারিত না। বন্দী যেমন পরের ইচ্ছার উপর আপনাকে সমর্পিত করিয়া দুর্ভোগগুলা বহিতে থাকে, প্রতিকারের সমস্ত পন্থা রুদ্ধ, স্বাধীনতা-সূর্য্যের ক্ষীণ আলোকরশ্মি প্রবেশের কোনও উপায় পর্য্যন্ত নাই, শৈলরও ঠিক যেন তেমনই অবস্থা। একটা অজানিত মোহ অনির্দ্দিষ্ট পথে অসতর্কভাবে আসিয়া পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও গ্লানিকে পঙ্গু করিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণে অনিলার দিকে শৈলকে নিয়ত টানিতেছিল।

জয়ন্তী কহিলেন, "বাবা, ও মেয়ের কথা ভগবান্ বুঝ্‌তে পারেন কি না জানি না। তুমি আমি তো মানুষ। তুমি যদি ওকে চাও, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে? সাধে কি দুঃখ—"

শৈল কথাটাকে সমাপ্ত হইতে দিয়া কহিল, "আচ্ছা থাক্, আমি এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা কহিব।"

জয়ন্তী সায় দিয়া কহিলেন, "তা তো ঠিক কথা শৈল। তুমি তো ছোট নও, সে-ও ছোট নও। তোমরা পরস্পরকে বুঝ্‌বে ভাল। তবে কি জান, গেরস্থ ঘর, পাঁচ পরিবারের পরিবার, কথা না কয়ে তো থাক্‌তে পারি না।"—জয়ন্তী মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

শৈলর কপোল হইতে কর্ণমূল অবধি একবার আরক্ত হইল, কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। জয়ন্তীর মনটা সঙ্কীর্ণ, ছোট, তাহার অনেক পরিচয় শৈল পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তরের নীচতা যে এতখানি, কোন বিষয়ে কটু ইঙ্গিত করিতে যে তাঁহার ওষ্ঠে বাধে না, তাহা শৈল পূর্ব্বে ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। বৃশ্চিক-দংশনের মত একটা প্রচণ্ড জ্বালায় শৈলর মনের ভিতরটা জ্বলিতে লাগিল।

স্বার্থের কুজ্ঝটিকা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। জয়ন্তীর মন যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির তীব্রতম ইচ্ছায় নিরতিশয় বিকল না হইয়া স্বাভাবিক থাকিত, তাহা হইলে শৈলর এই নীরবতা তাঁহাকে একটা কশাঘাত করিত, মুখের দীপ্তি নিভাইয়া অন্ধকার লেপিয়া দিত।

শৈলর মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া জয়ন্তীর চিত্ত বিকৃত ব্যথায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মেয়েকে ডাকিয়া কহিলেন, "জামাই বাবুকে খাওয়া; আমি দুধটা দেখে আসি।"—বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শৈল হাত গুটাইয়া উঠিতে উদ্যত হইতেই শুভা কহিল, "আপনি উঠ্‌ছেন কেন? মা যে আমাকে বক্‌বে!"

নীরস কণ্ঠে শৈল উত্তর করিল, "খাওয়া যে আমার হ'য়ে গেছে। তাই উঠ্‌ছি।"

"না! না! তা' উঠ্‌তে পাবেন না! মা চলে গেছেন বলেই আপনি উঠ্‌ছেন। আমি বুঝেছি।"

শুভা খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভোরের আলোর মত সে হাসি নিজের ও পরের মনে আনন্দ সঞ্চার করিলেও, বিষাদের মেঘ সেই হাসির অন্তরালে যেন একটু কালো হইয়া ভাসিতে লাগিল।

শুভার মুখের পানে চাহিয়া শৈল কহিল, "হাস্‌ছ!"

মানুষের মন যখন তিক্ত থাকে, সবই তখন তাহার কাছে অকারণে বিকৃত বলিয়া বোধ হয়।

শুভা কহিল, "আপনার রাগ দেখে না হেসে কি থাকা যায়! ঠিক্ যেন ছোট ছেলে, রাগ-গোসা হ'ল, আর গট্‌-গট্‌ ক'রে উঠে গেল।"

সকালের আলো মুক্তধারায় যেমন অন্ধকারকে ধুইয়া দেয়, তেমনই অকপট চিত্তের সরলতা, বিষণ্ণতাটাকে স্বচ্ছ করিয়া তোলে। শৈল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "রাগ হয়েছে—কে প্রচার কল্লে?"

শুভা হাসিয়া কহিল, "প্রচারকের বুঝি অভাব হয়! আপনি নিজেই তো প্রচার কচ্ছেন।"

"আমি! হাঁ, এই মাত্র তোমার কাছে কর্‌লুম বুঝি?"

"কল্লেনই তো! মিথ্যা না কি?"

বিদ্রূপভরে শৈল কহিল, "না, ভয়ানক সত্যি। আর এই রকম সত্যি আর একটু অগ্রসর হ'লে, এ বাড়ী থেকে আমাকে অনেকটা সরে যেতে হবে।"

শুভা হাসিয়া কহিল, "এটা আদালত-ঘর নয় যে আপনি আইনের ফাঁকে সব এড়াবেন। এটা চোখের উপর—"

বাধা দিয়া শৈল কহিল, "নিশ্চয় মানি। মিথ্যাটা শুধু তোমাদের চোখের খাতিরেই সত্যি হবার চেষ্টা করে।"

রহস্যের ছলে শৈল যে খোঁটা দিল, তাহা শুভাকে বিঁধিল। তাহার মুখের সরসশ্রী মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। আয়ত চোখে শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "মিথ্যা!—আচ্ছা, আপনি ঠিক ক'রে বলুন, আমি ঘরে ঢুক্‌তে আপনি খাওয়াটা চট্ ক'রে বন্ধ কল্লেন কি না?"

শুভার চোখ দুটা চক্‌-চক্ করিয়া উঠিল।

নিজের আচরণ ঠিক সঙ্গত হয় নাই। মনের উষ্মাটা এই কিশোরীর চোখে গোপন রহে নাই, এবং নিজকে ইহার হেতু ভাবিয়া একটি কোমল চিত্ত যে ব্যথা পাইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া শৈলর পরদুঃখপীড়িত অন্তর অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাদের উপর বিমুখতায় তাহার চিত্ত কঠিন

হইয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু কথাটা মনে হইতেই স্নেহে ও করুণায় তাহার অন্তর বিগলিত হইয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্বভাব-বহির্ভূত একটুখানি হাসিয়া শৈল কহিল, "ইস, বয়ে গেছে! ওর ভয়ে আমি খাওয়া বন্ধ কত্তে গেলুম!"

জয়ন্তী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "শালি-ভগ্নীপতিতে তো খুব হাসি-খুসী গল্প জুড়ে দিয়েছ। ভাঁড়ার হ'তে শুনতে পাচ্ছিলুম। তাই অনিলাকে বল্লুম—শুভাটার আদর-পাওয়া কপাল। ঠাকুরপো ভালবাসতেন, শৈলও ভালবাসে।"

অতর্কিত চপেটাঘাত প্রাপ্তের মত এক নিমেষে শৈলর সুগৌর মুখখানা কাল হইয়া উঠিল। কোন কথা না কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শুভা চেঁচাইয়া কহিল, "জামাই বাবু, আজ দুপুরবেলা আপনাকে তাস খেলতে হবে।"

শৈল কোন সাড়া না দিয়া সম্মুখের বারান্দাটা পার হইয়া যাইতেছিল, পার্শ্বের কক্ষের খোলা দরজা দিয়া তাহার অভ্যন্তরটা চোখে পড়িল; দেখিল, অনিলা নতমুখে পাণ সাজিতেছে।

জয়ন্তী আর অনিলা সেদিন পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছিলেন। জয়ন্তী একবার কক্ষের চারি পাশে চাহিয়া কহিলেন, "অনু, একটা কথা বলি মা, এখানে এখন কেউ নাই। এইবার কথাটা সেরেনি। শুভাটা আছে শৈলর কাছে। তা' না হ'লে সে আবার এসে পড়বে।"

অনিলা মুখ তুলিল না। নিঃশব্দে যেমন খাইতেছিল, তেমনই খাইতে লাগিল। কিন্তু খাবার রুচিটা যে তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, তাহা থালার ও হাতের পানে চাহিলেই বুঝা যায়।

জয়ন্তী কহিলেন, "শৈলর মনটা বড্ড নরম। চেপে-চুপে ধরলে না বলে পারবে না। আমি ওকে তোর কথাই বল্‌ছিলুম, বললুম, বাবা—!" জয়ন্তী থামিলেন। মনে করিলেন, অনিলা এইবার তাহার ব্যগ্র-ব্যাকুল মুখ তুলিয়া চাহিবে, এবং সেই অবসরের ফাঁকে তিনি অনিলার মনের সব কথাটুকু আঁচিয়া লইবেন। নিজের কথার ধারাটাকে সেই অনুযায়ী গুছাইয়া লইবেন।

মানুষ আশা করে অনেকখানি, কিন্তু সফল হয় কতটুকু?

বর্ষার নিঃশব্দ মেঘ সঞ্চারের বুকে শক্তি থাকে অনন্ত। নির্ব্বাক্ সহিষ্ণুতা লইয়া প্রতিপক্ষকে অবহেলা দেখানটা পরাভবের লক্ষণ নহে। জয়েরই পূর্ব্বাভাস।

জয়ন্তী কহিলেন, "অনু, মাছগুলা তো চটকাচ্ছিস্, খেলি কই? অমন খাওয়া হ'লে শরীর থাকবে ক'দিন?"

একটুখানি হাসিয়া অনিলা কহিল, "আপনি তো আমার খাওয়া জানেন না। আমি বরাবরই এমনি খাই।"

জয়ন্তী মনে মনে অবাক্ হইলেন। যে তুচ্ছ কথাটার উত্তর না দিলে কোন পক্ষেরই লাভ-ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই, অনিলা হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে সে কথাটার জবাব দিল। আর যে কথাটা জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়, যে সমস্যাটা উঁচু পাহাড়ের মত, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার জন্য এই স্বল্পভাষিণী মেয়েটির নীরব নিথর বুকের মাঝে এতটুকু স্পন্দন যে জাগিয়াছে, তাহা সেই শান্ত রেখাপাতশূন্য মুখখানি দেখিয়া বুঝা গেল না।

কিন্তু এক পক্ষের নীরবতা যতই সুস্পষ্ট হউক, অন্য পক্ষের বলিবার স্পৃহাটা তাহাতে বিন্দুমাত্র কমিল না। জয়ন্তীর প্রকৃতিটা ছিল বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ, কঠিন; লক্ষ্যকে পূর্ণমাত্রায় বিদ্ধ না করিয়া সে প্রতিনিবৃত্ত হয় না।

জয়ন্তী কহিলেন, "শৈলকে বল্লুম, বাবা, তুমি ছাড়া ওর আর কে আছে? তুমি যদি ওকে দয়া কর, তবেই তো দাঁড়াতে পারবে। ওকে বিয়ে করাই তোমার ধর্ম্ম। অনিকে ভগবান্ যথার্থই করুণার পাত্রী করেছেন। ঠাকুরপোর উচিত ছিল, হাতে-পায়ে ধ'রে এ কায শেষ করা। তা আমরাই না হয় কচ্ছি।"

অনিলা মুখ তুলিয়া কহিল, "জ্যাঠাইমা, আপনার খাওয়ার দেরী আছে?"

জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না, মা এই হ'ল বলে। একটু বোস না" বলিয়া দু-এক গ্রাস শেষ করিয়া কহিলেন, "জানিস অনু, শৈল একটা কথা কইতে পাল্লে না। কথায় বলে, স্নায়ের দড়িতে হাতী বাঁধা পড়ে। তা তোকে একটু বলি মা, তুই তো ডাগর হয়েছিস। মা, জ্যাঠাই, আমরা শেখাব কি? তবে বলাও ভাল, সে সোমত্ত ও স্বাধীন ছেলে। বাধা দিবার কেউ নেই। তুই যদি একটু চেপে

ধরিস—এই একটু মমতা, যাকে আমরা চল্‌তি কথায় টান বলি, তাই একটু—"

কথাটা সমাপ্ত হইতে পাইল না। কাল মেঘ-ভরা বৈশাখের স্তব্ধ আকাশের মত সমস্ত মুখখানা জমাট গাম্ভীর্য্যে কঠিন হইয়া উঠিল। আসনের উপর দাঁড়াইয়া অনিলা কহিল, "আপনার খাওয়া শেষ হ'তে অনেক দেরী। অনুমতি নিয়ে উঠ্‌তে দোষ নেই, আমার কায আছে; আমি চল্লুম।"

অনিলার মুখের পানে চাহিয়া জয়ন্তী আর একটুও শব্দ অবধি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ-ভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন।

২২

শৈল শুভাকে দিয়া অনিলাকে বলিয়া পাঠাইল, সে দেখা করিবে।

হাতের সেলাইটা বাক্সের মধ্যে রাখিতে রাখিতে অনিলা কহিল, "আস্‌তে বল।"

শৈল কক্ষে প্রবেশ করিল, কহিল, "আমার একটু বিশেষ কথা আছে।" শুভার পানে চাহিয়া কহিল, "শুভা, এই আমার চাবিটা নাও। আমায় পাটনায় যেতে হবে। স্যুটকেসটা গুছিয়ে দাওগে।"

অনিচ্ছুক হাতে চাবিটা লইয়া শুভা একবার অনিলার পানে চাহিল। তার পর আস্তে আস্তে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

জয়ন্তীর ঘৃণাকর ইঙ্গিতগুলা দপ্ করিয়া অনিলার মনে পড়িয়া গেল। মনের ভিতর অনেক বিষ, অনেক জ্বালা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তে অন্তরটা কঠিন হইয়া উঠিল। ডাকিয়া কহিল, "শুভা, শুনে যা"—শৈলর পানে চাহিয়া কহিল, "স্যুটকেসটা গুছানর কি এক্ষুণি দরকার?"

শৈল এক মুহূর্ত্ত অনিলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর হাত বাড়াইয়া শুভাকে কহিল, "চাবিটা দাও, চাবিটা দাও। ওটা এখন গুছাতে হবে না। শুভা, তুমি একটু তোমার মা'র কাছে থাকগে। অনিলার সঙ্গে আমার একা কোন কথা আছে।"

শৈলর কথা বলিবার ভঙ্গী, কণ্ঠের স্বর অনিলাকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল। আত্মবিস্মৃত ।। ক্ষণকাল সে শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দরজার পর্দ্দাটা টানিয়া দিয়া শুভা কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল।

শৈল চেয়ারটার উপর নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। শুভার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে অনিলার পানে চাহিয়া সে একটু-খানি হাসিল, কহিল, "আমার এই রকম আচরণের জন্য এক্ষুণি একটা তুমুল আলোচনার ঝড় উঠ্‌বে জানি। কিন্তু আমি তাদের বোঝাতে চাই, আমারই শুধু এ রকম করবার অধিকার আছে।"

অনিলার সমস্ত মুখখানা পলকে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। উত্তর দিবার চেষ্টায় ওষ্ঠপ্রান্ত একটু কাঁপিল। কিন্তু কথা একটাও বাহির হইল না। অত্যন্ত অপরিচিত একটা লজ্জা অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে যেন আড়ষ্ট করিয়া তুলিল।

শৈল আস্তে আস্তে কহিল, "বাবার শ্রাদ্ধে তুমি আমার সাহায্য নিলে না, তখন তা নিয়ে জোর করিতে পারিনি। কেন না, জোর করবার অধিকার তখন তো পাইনি।"

বিদ্যুৎচমকের মত অনিলার মাথার ভিতর জয়ন্তীর সেই কথাগুলা খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত অন্তরটা দৃঢ় ও সতেজ হইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া অকুণ্ঠিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল, "এখন কি সে অধিকার পেয়েছেন?"

অনিলার এই সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাটা শৈলর নিকট হঠাৎ ভয়ানক বিদ্রূপের মত বোধ হইল। গ্রীষ্মের তপ্ত বায়ু যেন মনের ভিতর একটা ঝট্‌কা বহাইয়া গেল। ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে সে কহিল, "অধিকারের কথা জিজ্ঞেস কচ্ছ? তবে শোন, যে-দিন সুনীলা মারা গেল, তোমাদের সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ ছিঁড়ে গেল; তার পর যে মুহূর্ত্তে তোমার বাবার টাকা আমার হাতে এল, এটা নিশ্চিত হয়ে গেল, তোমার আর আমার অদৃষ্ট এক সুতায় বাঁধ্‌তে হবে।"

অনিলা মুখ তুলিল। একটু সামান্য উদ্বেগের ছায়া বা বিস্ময়ের চিহ্ন তাহার নির্ব্বিকার মুখে বা শান্ত কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া উঠিল না; কহিল, "বাবা টাকা দিয়ে আপনাকে বেঁধেছেন, তাই আপনার আর নিষ্কৃতি নাই? যত দুঃসাধ্যই হউক, আপনাকে তা পালন কত্তে হবে?"

একটা খুব বড় রকম আত্মত্যাগ করিতেছে—তাহারই

আনন্দের নেশায় শৈলর ভিতরটা মশগুল হইয়া উঠিয়াছিল। কল্পনার চোখে সকলের বিস্ময় ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সমক্ষে অনিলার সৌভাগ্য-দীপ্ত রাঙ্গা মুখখানিও একবার দেখিয়া লইয়াছিল। কিন্তু অনিলার শান্ত কণ্ঠের এই উত্তরটা আঘাত দিয়া যেন শৈলর তন্দ্রাটাকে ভাঙ্গিয়া দিল। ভয়ানক বিস্ময়ে সে অনিলার মুখের পানে চাহিল, এ রকম জবাব যে অনিলার মুখ দিয়া বাহির হইবে, তাহা সে আশা করে নাই এবং বহুবারের মত আর একবার স্মরণ হইল, এই মেয়েটি দুর্বোধ্য রহস্যের মত জটিল।

অনিলা কহিল, "কিন্তু তার কোন আবশ্যক নেই। আপনার মনের কাছে উঁচু থাক্‌তে পারেন, এইটুকু তাকে শুধু বোঝালেই হবে।" অনিলা একটু থামিল। পরমুহূর্ত্তে কহিল, "বাবা, দিদির সঙ্গে আপনার বিয়ে দিয়েছিলেন- সে দিন সমস্ত অন্তর থেকেই আপনাকে বড় ক'রে তোল্‌বার ভার নিয়েছিলেন। এমন তো ভাবেন নি, মেয়ে যদি না থাকে তবে কোরব না, সে কথা তো বলেন নি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনাকে মানুষ করবার, এবং নিজের প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া আলাদা কিছু নেই। তবে এই দ্বিতীয় দধীচি হবার আবশ্যক আপনার কি?"

অনিলার কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ বা শ্লেষ কিছুই ছিল না। তথাপি সেটা গিয়া শৈলর বুকে বাজিল। যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়া এই যে প্রচ্ছন্ন প্রত্যাখ্যান, ও তাহার মাঝে আরও প্রচ্ছন্ন যে তিরস্কারটুকু ছিল, সেটা যেন লজ্জার আকারে শৈলর মাথাটাকে হেঁট করিয়া দিতে চাহিল।

শুষ্ককণ্ঠে শৈল কহিল, "তিনি আমার উপকারক, তাঁর ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না।"

অনিলার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা মৃদুহাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাদের চল্‌বার পথে অনেক উপকারককেই তো আমরা দেখ্‌তে পাই, কিন্তু তাদের সকলের প্রত্যুপকার করবার চেষ্টায় অধীর হলে, দয়া ক'রে অনেকে আমাদের পাগলা গারদেরই ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

শৈলর অন্তরের বিরক্তির পাত্রটা যেন উপছাইয়া পড়িল; অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, "তুমি বল্‌তে চাও, কৃতজ্ঞতা বিস্মরণ হওয়া মনুষ্যত্ব?"

অন্ধকার আকাশের গায়ে বিদ্যুৎবিকাশের মত বিদ্রূপের কঠিন হাসিতে তাহার মুখ একবার ভরিয়া কহিল, "দুঃখের বিষয়, সে নীতি-শিক্ষা কারুর থাক্‌লেও আমার নেই। উপকারীর প্রত্যুপকার না করলেও জীবনটা—থাক সে কথা। তোমার মনের যেমন গঠন, কথাগুলা অসার উচ্ছ্বাসের মতই তোমার কাণে বাজ্‌বে। মনের খবর তুমি পাও না।"

অনিলা কহিল,—"আপনি দেনা শোধ করেন। যার কাছে এক তিল উপকার পান, ঠিক্ তিল মেপে যতক্ষণ তা শোধ কত্তে না পারেন, ততক্ষণ আপনার মনের শান্তি, তৃপ্তি কিছুই নেই, এই তো?"

অনিলা শৈলর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শৈল কহিল, "ঠিক তাই।"

শৈল যে উত্তরটা অতি সংক্ষেপে দিল, সেটা যে তীক্ষ্ণ তীরের মত গিয়া অপরের বুকে বিঁধিল, তাহা শৈলর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গেল। যে মেয়েটির পানে চাহিলে শৈলর বুকের ভিতরটা বেদনায় টন্‌-টন্ করিতে থাকে, স্নেহে করুণায় আর্দ্র অন্তর সব সুখ, সব স্বার্থ ত্যাগ করিতে এতটুকু পশ্চাৎপদ হয় না, শৈলর সেই একান্ত সহানুভূতির পাত্রীর অন্তর যে তাহার মুখের ভাষায় আহত হইবে—তাহার বহু দিনের বহু রুদ্ধ বেদনাকে একেবারে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে পারে, ইহার কোন সংবাদই শৈলর জানা ছিল না।

অনিলার মনের ভিতরটা পাথরের মত কঠিন হইয়া উঠিল। সহজ কণ্ঠে সে কহিল, "সত্যিকারের সাহায্য পাবার দাবী আপনার যেখানে ছিল, সেখানে সেটা দয়া বলে, প্রতিদান দেবার কথাটা জানিয়ে আপনি কৃতজ্ঞ অন্তরের মহত্ত্ব দেখিয়ে লোকের চমক লাগাতে চাইছেন। আর যেখানে পাবার দাবী আপনার এতটুকু ছিল না, তবু যে উপকৃত হয়েছেন, সে উপকারের দেনা আপনি কি দিয়ে শুধ্‌বেন? অথচ প্রত্যুপকার না কত্তে পেলে আপনার শান্তি নেই, তৃপ্তিও নেই।"

শৈল স্তব্ধ হইয়া গেল। অনিলা যে তাহাকে এমন করিয়া আঘাত করিবে, তাহা শৈলর স্বপ্নের অতীত ছিল।

আজ সকালে জয়ন্তী যে ভাবে কথা কহিয়াছিলেন, যে ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহারই অপমানে, এবং শুভার সহিত অহেতুক হাস্যালাপের লজ্জায় সে নিজের অধিকারের দাবীটা অনিলার উপর সুস্পষ্ট

করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে শুভাকে এমন অসঙ্কোচে কক্ষ হইতে সরাইয়া দিয়াছিল। শৈলর মনের মাঝে আপনা হইতে কেমন একটা সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাহাকে চাহি না বলিয়া ফিরাইয়া দিবার সাধ্য অনিলার নাই। বরঞ্চ তাহার দুঃখের কপাল, রাতারাতির মধ্যে ভোজবাজির গল্পের মত সৌভাগ্য-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার গভীর আনন্দে নিঃশব্দে শ্রদ্ধার অঞ্জলি সে শৈলর প্রতি ঢালিয়া দিবে।

মানুষ যখন নিজের মন দিয়া অপরের বিচার করিতে থাকে, তখন তাহাকে এই ভাবেই ঠকিতে হয়। শৈলর মনে কর্ত্তব্যের প্রেরণা ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ অভিনয়ের মাঝখানে যবনিকা পড়িয়া গেল। সবই যেন ভয়ানক খাপছাড়া বোধ হইল। দেওয়ালি নিশার আলোক-মালা ঝড়ের ঝাপটায় এক সঙ্গে নিবিয়া গিয়া স্থানটাকে যেন নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

শৈলর ম্রিয়মাণ মূর্ত্তি, বিষণ্ণ দৃষ্টির পানে চাহিয়া—অনিলা কহিল, "আত্মীয়তার সামান্য বন্ধন না থাকলেও মিত্র-সাহেব যে আপনার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের ন্যায় আচরণ করেছিলেন, এর মধ্যে কি একটা মস্ত বড় কামনা ছিল না? তাঁরই চেষ্টায়, যত্নে, আপনি পাটনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একটা প্রতিদান পাবার আশা কি তিনি রাখেন নাই? আর আপনি অনায়াসে সেটা দিতে পারেন। বাবার মুখে শুনেছিলুম, দেবার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছিলেন।"

অনিলার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও শৈলর গা জ্বলিয়া উঠিল; উত্তেজনার সহিত সে বলিল, "তখন তো জানতুম না, তুমি—"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অনিলা কহিল, "আমি আছি? কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমি আছি বলেই কি আপনি আপনার উপকারকের প্রতি বিমুখ হবেন?—অসম্ভব! আপনি ঠিকই করেছিলেন। এতে আপনার কুণ্ঠার কিছু নাই, লজ্জারও কিছু নাই। বরং এমনই তো হচ্ছে।"

সবিস্ময়ে শৈল কহিল, "এমন তো হচ্ছে!"

"নিশ্চয় হচ্ছে। সকলেই আপনাদের বাক্‌দানের কথা জেনেছে। মিত্র-সাহেব সানন্দে আপনাকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মেয়ে, তিনিও তো মনে মনে আপনাকে স্বামী বলে বরণ করেছেন। কিন্তু হঠাৎ যখন সে সব মিথ্যা হয়ে যাবে, তখন বাইরে আপনার নিন্দাটা কি ভয়ানক হয়ে উঠবে, একবার চিন্তা করুন। আর সুলেখার কথা ভাবুন, যে কোন অংশে আপনার অযোগ্য নয়—আপনার প্রার্থিত—তার উপর কি ভয়ানক অন্যায় করা হবে বলুন। এই আশাভঙ্গের বেদনা সে যদি না সইতে পারে! বাপের চোখের মণি সে হয়ে আছে। জানেন তো, সংসারে বড্ড প্রয়োজন যাকে—থাকা তারই দুঃসাধ্য। তা' হ'লে আপনার সেই একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর আপনি কি করলেন?"

শৈল আর একটি কথাও কহিতে পারিল না। দুই চোখের দৃষ্টিতে শুধু একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। অনিলার কথাগুলা অসঙ্গত নহে, অন্যায় নহে। অজানার আড়ালে সংগুপ্ত ভবিষ্যতের চেহারা কেই বা দেখিতে পায়? তাহার মন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ভরিয়া গেল। শ্বশুরের মৃত্যুর পরই একটা দুঃসহ চিন্তা কুয়াসা-ঢাকা প্রভাতের মত তাহার সমস্ত মনটাকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছিল; মধ্যে শুধু একটা ভয়ানক ত্যাগ করিতেছে। আনন্দে তাহারই আলোর আভাস সে দেখিতে পাইতেছিল। আবার সবই যেন মিলাইয়া গেল। চোখে পড়িল মেঘান্ধকারসমাচ্ছন্ন সন্ধ্যার আকাশ।

২৩

শৈল যেদিন পাটনা হইতে ব্রজমোহনের সেই হারান বাক্সটা লইয়া ফিরিয়া আসিল, তাহার একান্ত বিরস মুখ, বিষণ্ণ দৃষ্টি ও ম্রিয়মাণ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছিল, এবং দ্বিধাহীন ভাবে অনুমান করিয়া লইয়াছিল, এটা দীর্ঘ পথশ্রমজনিত ক্লান্তি।

নিজের ঘরে অনিলাও সেদিন শৈলকে জল খাওয়াইতে বসাইয়া সকলের মতই চমকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পাঁচ জনের মত মুখে সেটা প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই শৈলকে সে কোন প্রশ্নই করে নাই, এবং পাঁচ জনে যে কারণটা অবিলম্বে ধারণা করিয়া সন্তুষ্ট হইল, সেটার সহিত তাহার মতের সামঞ্জস্য রহিল না। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি শুধু তাহার প্রখর হইয়া উঠিল। শ্রমের ক্লান্তি এমন করিয়া মানুষের মুখে কাল দাগ টানিতে পারে না, তাহা

বুঝিয়া অনিলা নিজের মনেই ইহার কারণ খুঁজিতে লাগিল। অর্থব্যয়ের দুর্ভাবনা কি শৈলর মনে এমন করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে, যাহার ভারে সে ক্লান্ত, অবসন্ন? অনিলা সঙ্কল্প করিল, সেই দুর্ভাবনা হইতে শৈলকে সে মুক্তি দিবে। কিন্তু সেই তর্কে যে দিন শৈল নিজের বুক-পকেট হইতে ব্রজমোহনের সেই অসমাপ্ত খাতাখানা অনিলার সম্মুখে বাহির করিয়া জানাইয়া দিল শৈলর অনিলার উপর দাবী কতখানি, এবং কৃতজ্ঞতার নাগপাশে শ্বশুর তাহাকে যে বন্ধন দিয়া গিয়াছেন, তাহা খুলিবার সাধ্য তাহার নাই—অনিলারও নাই।

শোণিতলেশহীন শবের মুখ লইয়া অনিলা শৈলর মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়াছিল, এবং শৈলর মহত্ত্বটা যতই বুকের মাঝে অনুভব করিতেছিল, ততই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে তাহার সারা অন্তর আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল; সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্য ক্ষোভে লজ্জায় ভিতরটা তাহার সমধিক ব্যাকুল হইতেছিল। স্বর্গবাসী পিতার অমোঘ ইচ্ছা কি ভয়ানকভাবে সুলেখার কাছ হইতে শৈলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার দিকে টানিয়া আনিতেছে, তাহা মনে হইতেই অন্তরটা তাহার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু—না, অনিলা এত বড় নিষ্ঠুরা নয়। এমন করিয়া নিজের সুখ-কামনা সে করে না। তাহার পিতার অনেক অর্থ অনেক দিকেই ব্যয়িত হইয়াছে, শৈলর জন্যও না হয় কিছু হইয়াছে। কিন্তু গ্রহণেরও ত অধিকারভেদ আছে, সে তাহার দিদির স্বামী।

নিরালা কক্ষে একলা বসিয়া শৈলর সহিত বাদানুবাদগুলা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে আকস্মিক একটা গভীরতর লজ্জায় অনিলা দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

শৈলকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া অনিলার অন্তরে একটা অনুতাপ জাগিতেছিল। তাহাকে যে শৈল বুদ্ধিহীনা গর্ব্বিতা বলিয়াই মনে মনে অভিহিত করিবে, ইহা ভাবিতে তরুণীর চিত্ত ব্যথিত হইতেছিল। মানুষের চোখে ছোট হইয়া যাওয়ার অপেক্ষা বড় লজ্জা আর নাই। কিন্তু রূপহীনা অঙ্গহীনা যে, তাহাকে পত্নী করিয়া কেহ কি তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? পুরুষের যৌবন-স্ফীত চিত্তের তলে তলে অনেক দুর্ব্বলতা, অনেক মোহ যে জড়ান থাকে। অতৃপ্তির বোঝা মানুষ কত দিন বহিতে পারে? সমুদ্রমন্থনে অনন্ত নাগের ক্লান্তির নিশ্বাসের মত, অতৃপ্ত দাম্পত্য-জীবনের ক্লান্তি মুহুর্মুহুঃ যে বিষ উদ্গিরণ করে, তাহাতে সংসারটা দু'দিনেই তিক্ত, বিস্বাদ হয়। নর-নারীর আয়ু তিলে তিলে হরণ করিয়া মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেয়।

অনিলার অন্তর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল, শৈলকে সে মুক্তি দিবে। কিন্তু কেন সে শৈলকে মুক্তি দিতেছে, তাহার অতি অস্পষ্ট ইঙ্গিতও কোন দিন সে শৈলকে জানিতে দিবে না। শৈলর যতটুকু পরিচয় অনিলা পাইয়াছিল, সুখে, দুঃখে অনিলার নিঃসংশয় সঙ্কোচহীন নির্ভর-স্থল হইয়া দাঁড়াইতে সে যখন বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তখন 'যাও' বলিলেই সে চলিয়া যাইবে না,—যাওয়ার অকাট্য যুক্তিটা যতক্ষণ না তাহার বিবেকের সহিত খাপ খাইবে।

অনিলা ভাবিতেছিল, নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেই কি তাহা গ্রহণ করা যায়? গ্রহণেরও ত একটা যোগ্যতা, একটা সীমা আছে। আধারের তুলনায় আধেয়টা বেশী হইলেই তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। মনের এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে, সংযত কর্ত্তব্যময়ী নারীমূর্ত্তির অনুশাসনের তলায়, যে তরুণী কুমারীর প্রাণটি নিঃশব্দে বসিয়াছিল, বেদনার আঘাতে সে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহারই অশ্রুরুদ্ধ চোখের জলে অনিলার দুই গণ্ড প্লাবিত হইয়া গেল।

অজ্ঞাতে যে সে শৈলকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই গোপন সংবাদ বুকের ভিতর হইতে অকস্মাৎ কে যেন অনিলার কাণে কাণে বলিয়া দিল। অনতিক্রমণীয় বাধার রুদ্ধ কপাটখানার উপর প্রণয়ের নিষ্ফল মর্ম্মবেদনা প্রতিহত হইতে লাগিল। তাহারই বেদনায় অধীর হইয়া সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। ভগবান্! ভগবান্! একদিন তো তুমি সবই দিয়াছিলে দেবতা! তবে কেন যৌবনের প্রবেশ-পথে তাহাকে এমন করিয়া ভিখারী করিয়া দিলে? জন্মান্তরের কোন্ কঠিন অপরাধের দণ্ড নির্ম্মম হাতে অনিলার মাথায় হানিয়া বসিলে? চোখের জলে ভাসিয়া অনিলা প্রার্থনা করিল, যে ক্ষমাহীন শাস্তি আমার মাথার উপর দিয়াছ দেবতা, সে বোঝাটা বহিবার শক্তি দাও তুমি, শক্তিময়! ভালবাসার অমূর্ত্ত বিন্দুপানের জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় চাঁদের পাশে ঘুরিবার মত আকাঙ্ক্ষা কোন দিন যেন তাহার প্রাণে না জাগে।

এমন করিয়া অনিলার তরুণী-বুকের ভালবাসার সহিত বিবেকের একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল। ভোগের সহিত ত্যাগের

কুরুক্ষেত্র-সমর যখন চলিতেছিল, সেই সময়ে জয়ন্তী ধীরে ধীরে অনিলার কাণে ঢালিয়া দিলেন, শুভার প্রতি শৈলর স্নেহ কতখানি প্রবল হইয়াছে। মন্তব্যে প্রকাশ পাইল, ইহা স্বাভাবিক। ইঙ্গিতে তিনি জানাইলেন, অনিলার উচিত, শৈলকে আকর্ষণ করা।

রৌদ্রের উত্তাপের তুলনায় রৌদ্রতপ্ত বালির বেশী জ্বালা; দুঃখের অপেক্ষা দুঃখের কৃত্রিম সহানুভূতিটা বেশী অসহনীয়। অনিলার বুকের ভিতরটা দগ্ধ অঙ্গারের পোড়ার মত রি-রি করিতে লাগিল। অদৃষ্টের দোষ দিয়া জয়ন্তী জানাইয়া দিলেন, কর্ত্তব্যের প্রেরণায় শৈল অনিলাকে গ্রহণ করিলেও পুরুষের রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্যভরা তনু-মন আপনার অজ্ঞাতে অপরকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। অনিলা জয়ন্তীর এই সকল ইঙ্গিত ও মন্তব্য শ্রবণ করিল বটে, কিন্তু সে কোন সাড়া দিল না। শুধু তাহার দুঃখসমুদ্র মথিত করিয়া এই চিন্তাটাই বার বার জাগিতে লাগিল, অনিলা যদি শৈলর সহধর্ম্মিণী হয়, তাহা হইলে শৈলর উপর একটা কঠিন অবিচার করা হইবে। শৈলর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার ক্ষুব্ধ পীড়িত অন্তরের ব্যথা অভিযোগের মত অন্তর্য্যামীর পাদমূলে নিপতিত হইয়া, হয়ত তাহার স্বর্গবাসী পিতার অনাবিল শান্তির হানি ঘটাইবে। ভালবাসার ধনকে যুপকাষ্ঠে নীত জীবের মত কেহ কি বলি দিতে পারে?

নিজের অন্তরকে দৃঢ় করিতে অনিলা বদ্ধপরিকর হইল। হঠাৎ অনিলার মনে হইল, তাহার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবে বলিয়া শৈল সুলেখাকে ছাড়িয়া আসিয়া আবার অজ্ঞাতে হয়ত শুভার প্রতি সে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। না, না, সুলেখার কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শৈলকে শুভার হইতে অনিলা কোন মতে দিতে পারিবে না।

২৪

পত্নীর পানে চাহিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "অনিলার দুর্ব্বুদ্ধি শুনেছ? বিয়ে সে করবে না।"

একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "শৈলকেও নয়?"

বিরজামোহন কহিলেন, "তবে ছাই বল্‌ছি কি? তাকে বিয়ে করবার জন্য শৈল ভিন্ন এ পৃথিবীতে ব্যস্ত হওয়া তো দূরের কথা, সম্মতিই বা দেবে কে?"

জয়ন্তী পাণের সহিত খানিকটা দোক্তা মুখে পুরিয়া দিয়া মুখখানা ফুটবলের মত স্ফীত করিয়া কহিলেন, "কেন কচ্ছে না? শৈলকে কি পছন্দ হলো না?"

তপ্ত কড়ায় খই ফুটিয়া-উঠার মত বিরজামোহন হঠাৎ রাগিয়া-উঠিলেন। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "পছন্দ? ওর জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার জোর! শৈল যে ওকে বিয়ে কত্তে চেয়েছিল, সে শুধু ব্রজর খাতিরে। হ্যাঁ, মানুষ তো এই শৈলকেই বলি।"

প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সহিত জয়ন্তী কহিলেন, "তবে ভাইঝি বা তা চিনলেন না কেন?"

উষ্মার সহিত বিরজামোহন কহিলেন, "বরাতের লেখা।"

ভিতরের ক্রোধটা জয়ন্তী আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। উত্তাপের সহিত কহিলেন, "নিজের বরাতের লেখা কিছু পড়েছো! পরের বরাতের কথা ভেবে তো খুব আকুল হচ্ছ!"

বিনা কলহে অকস্মাৎ একটা চড় খাইয়া মানুষ যেমন থতমত খাইয়া যায়, তেমনই সবিস্ময়ে পত্নীর পানে চাহিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "তোমার কথার হেঁয়ালী বোঝা দায়! যা কপালে আছে হবে, তার জন্য চিন্তা করব কি?"

জয়ন্তীর ভিতরে যেন অগ্নিকাণ্ড বাধিয়া গেল, দীপ্তকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখ, বরাত মানুষকে গড়ে নিতে হবে। সত্যি সত্যি গোঁপের তলায় খেজুর আসে না। হাতের কাছে সে থাকে, হাত দিয়েই তাকে গোঁপের তলায় দিতে হয়।"

বিরজামোহন কহিলেন, "কিন্তু বর্ত্তমানে খেজুর পাই-বা কোথা? হাতই বা দিই কোথা?"

—"চোখ আর ইচ্ছা থাক্‌লেই হয়। এই যে আমি কচ্ছি কি ক'রে? এই যে অনিলার হেথা পড়ে আছি, মায়ের মত তাকে শেখাচ্ছি পড়াচ্ছি, এ কেন? ভেবে দেখেছ কি?"

একটুও দ্বিধা না করিয়া বিরজামোহন কহিলেন,—"নিশ্চয় দেখেছি। ওর মা-বাপ নেই, তাই।"

"নেই তো আমার কি?" বলিয়া স্বামীর প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জয়ন্তী মুখখানা ফিরাইয়া লইলেন।

বিরজামোহন মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। পত্নী একদিন বলিয়াছিলেন, "এখন আমরা ছাড়া অনিলার আর

কে আছে? তার কাছে আমাদের থাকা উচিত।" বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়াছিলেন। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে পুত্র-কন্যা লইয়া বিরজামোহন অনিলার বাড়ীর ছাতের তলায় আশ্রয় লইয়া শিকড় গাড়িতেছিলেন। কিন্তু আজ অকস্মাৎ পত্নীর এই বিপরীত সুরটা তাঁহাকে বুদ্ধিভ্রান্ত করিয়া দিল। এলো সূতার রাশি বাতাসে জড়ো হইয়া জট-পাকানোর মত সব কিছুই গুলাইয়া গেল। পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "তবে কি এখানে থাকবার প্রয়োজন আমাদের নাই?"

বুদ্ধিমান্ শত্রুর সহিত বিবাদ করিয়াও সুখ আছে; নির্ব্বুদ্ধি মিত্রের সহিত বন্ধুত্বেও তৃপ্তি নাই। জয়ন্তী ঝাঁকিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তোমার মত জেগে ঘুমোলে থাকবার দরকার নেই। অনিলা বিয়েতে মত দিচ্ছে না ব'লে কেঁদে হাট বসাচ্ছ, কিন্তু কেন দিচ্ছে না, খোঁজ করেছ?"

মহাবিস্ময়ে বিরজামোহন কহিলেন, "কেন দিচ্ছে না?"

বিজয়-হাস্যে জয়ন্তীর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। উল্লসিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "যতই তারা সেয়ানা হোক, আমার কাছে উড়তে দেরী আছে। আমি শৈলকে বল্‌ছি, বিয়ে করা তার উচিত। অনিলাকে জানাচ্ছি, বিয়েটা যদি হয় তার সৌভাগ্য। কিন্তু তার মাঝে কল-কাঠীটি এমনি ভাবে টিপ্‌ছি যে, নিজেরাই দুদিকে দু'জনে সরে যাচ্ছে।"

এই একান্ত নীচ স্বার্থপরতার চিত্র দুঃস্বপ্নের মত বিরজামোহনকে কয়েক মুহূর্ত্ত ভীত করিয়া রাখিল। পত্নীর পানে একটা ঘৃণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "ছিঃ, তুমি না মা? তোমার না মেয়ে আছে?"

স্বামীর মুখের এই এত বড় তিরস্কারে জয়ন্তীর মুখের এতটুকু রং বদলাইল না। ভিতরে যে তিনি লজ্জা পাইয়াছেন, তাহারও চিহ্ন দেখা দিল না। সঙ্কোচহীন কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "তোমার মত নিরেট দায়িত্বজ্ঞানহীন হ'লেই মুখ দিয়ে এমন কথা বার হয়।"

বিস্ময়ে বিরক্তিতে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বিরজামোহন কহিলেন, "স্বার্থ মানুষের ভাল-মন্দ দৃষ্টিটাকে নষ্ট ক'রে দেয়। তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইছ; আমি বল্‌ছি, নিজের সংসারের যদি কল্যাণ পেতে চাও, পরের মাথা খেতে যেও না।"

জয়ন্তী জ্বলিয়া উঠিলেন, তেমনই উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কারু মাথা খেতে চাই না। আমি আমার ছেলে-মেয়ের কল্যাণ খুঁজ্‌ছি—যা প্রত্যেক বাপ-মায়ের কর্ত্তব্য। আমি তার চেয়ে এক চুল বেশী কিছু খুঁজি না।"

বিরজামোহন অবাক্ হইয়া গেলেন। পত্নীর মুখ লজ্জায় ম্লান না হইয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল—দায়িত্বের গরিমা-বোধে।

জয়ন্তী কহিলেন, "অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, মা-বাপ যদি সন্তানের শুভ চেষ্টা না করে তো তাকে নরকে পচ্‌তে হয়। তুমি আমাকে স্বার্থপর ব'লে গাল দিচ্ছ, তোমার ভাই কি স্বার্থপর ছিল না? তবে কেন তার সুখ্যাতিতে গলা ফাটাচ্ছ?"

বিরজামোহন রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমার ভাই স্বার্থপর ছিল? কি বলছ তুমি?"

তৎক্ষণাৎ হাত-মুখ নাড়িয়া জয়ন্তী উত্তর দিলেন, "না, পরার্থপরতায় দধীচি! নিজের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে সে কি করেনি? জালের পর জাল বিছিয়ে শৈলকে এমন ক'রে সে বেঁধে গেছে, যা থেকে মুক্তি পাওয়া শৈলর অসাধ্য। যে মেয়েকে চোখে দেখ্‌লে কেউ বউ করে না, তাকেই বিয়ে করবার জন্য শৈল ব্যস্ত! তোমার ভাই জান্‌ত, এ কাযটা করা অন্যায়। তাই মুখ ফুটে কোন দিন বল্‌তে পারেনি,—'শৈল, তুমি আমার মেয়েকে নাও।' কিন্তু এক টুকরা কাগজে এমন দলিল ক'রে গেল, যা ফেল্‌তে শৈল কিছুতেই পাচ্ছে না।"

বিরজামোহন নির্ব্বাক্ রহিলেন। তাঁহার অপলক দৃষ্টি পত্নীর মুখের প্রতি স্থির হইয়া রহিল।

জয়ন্তী কহিলেন, "তুমিই বল, শৈলর কি নেই? রূপ বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র ঐশ্বর্য্য আন্‌বার শক্তি—সবই তার আছে। ভাগ্যমানী মেয়েরাই শৈলকে পেলে ধন্য হয়। তোমার ভাইয়ের শুধু নিজের টাকা ছিল ব'লে কাণা কুচ্ছিত মেয়েটার জন্য তাকে বেঁধে রেখে গেছে, এতে পাপ হয় না? এ রকম বিয়ে শৈলর জীবনে শুভ হবে কি? একটা মানুষের সারা জীবনের তৃপ্তি হরণ করার চেয়ে পাপ আর কি আছে? তবু এ কাযে তার পাপ হয়নি, কেন জান?"

জয়ন্তী উজ্জ্বল নেত্রতারকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিলেন।

সাপের দৃষ্টিতে মোহাকৃষ্ট পতঙ্গের মত পত্নীর উজ্জ্বল চোখের পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বিরজামোহন কহিলেন, "কেন?"

আনমনে

শিল্পী—শ্রীবিশ্বনাথ সোম

জয়ের আনন্দের চেয়ে বড় আনন্দ মানুষের আর কিছু নাই। অন্তরের গভীর উল্লাস জয়ন্তীর মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সোৎসাহে তিনি কহিলেন, "এই এতখানি করার পিছনে, ইচ্ছাটা ছিল তার মেয়ের মঙ্গল করা। ভগবান্ তার ইচ্ছাটা দেখেছেন, তিনি নিজে যাকে দুঃখী করেছেন, বাপের প্রাণ তাকে সুখী করতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করে নি। তাই ঠাকুরপোর স্বর্গবাসের বাধা জন্মাবে না। আমিও তেমনি কোন পাপ কচ্ছি না।"

যুক্তি-তর্ক বাদ-বিতণ্ডায় জয়ী হইতে না পারিলেও সেই মতটা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে বিরজামোহনের চিত্ত কিছুতেই সম্মত হইতেছিল না। কুণ্ঠিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ব্রজর এত আশার জিনিস এমন হ'লে পাপ শব্দটার কোন অর্থই থাকে না।"

জয়ন্তী হাসিলেন, কহিলেন, "ভ্রান্ত সংস্কারকে আঁকড়ে তুমি থাক, পাপ-পুণ্যির একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। মানুষকে হত্যা করলে ভয়ানক পাপ বল? কিন্তু যুদ্ধে যখন বিপক্ষকে মারা হয়, তখন হয় অক্ষয় পুণ্য। কেন, সে মৃত্যুটা কি মৃত্যু নয়? তাতে কি ব্যথা বাজে না? কিন্তু ক্ষেত্রহিসাবে বিচার হচ্ছে বলেই পাপ পুণ্যে পরিণত হলো। তেমনি বুদ্ধি দিয়ে পারি, অর্থ দিয়ে পারি, আর সামর্থ্য দিয়ে পারি, সন্তানকে যদি বড় করবার চেষ্টা না করি তো সেই আমাদের মহাপাপ।"

বিরজামোহন কহিলেন, "কিন্তু এর মাঝে পরস্বহরণ ছাড়া বড় হবার আর কি পাচ্ছ বল?"

"পাচ্ছি না? আমাদের এমন টাকা নেই—যাতে শৈলর মত জামাই আমরা কখন পাব; শুধু একটু বুদ্ধি খরচ করলেই যদি তাকে পাই, তবে কেন করব না? ভাল জিনিসটাকে প্রত্যেকেই চায়। যার শক্তি আছে, সে কেড়ে নেয়। এ শুধু শক্তির পরিচয় প্রদান। আমার মেয়ের ভাল আমি সকলের চেয়ে বেশী ক'রে চাইব। তার জন্যে যা দরকার সবই আমি করব। তাতে পাপ নেই। আমি মা, আমার তা করবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

বিরজামোহন দুর্ব্বলপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। পত্নীর সহিত বাদ-বিতণ্ডায় পারিয়া উঠিতেন না। কিন্তু বাহিরের শাসনে অন্তর বশীভূত হয় না। নিরন্তর সে প্রতিবাদ করিতে লাগিল; মানুষ ইচ্ছা করিলে মানুষের ভাল করিতে পারে না, ভগবান্ যদি সহায়তা না করেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

আমার মরণে

আমার মরণকালে এঁকে দিও মোর ভালে
চুম্বনের টীকা;
আমার রচনা করা নব অনুরাগ-ভরা
প্রেমের গীতিকা
গেও তুমি মধুস্বরে —সুন্দর মঙ্গল করে
বিদায়-লগনে,
আঁখিজল ফেল নাক' দীর্ঘশ্বাস ঢেল নাক'
উন্মুক্ত গগনে।
আমার মর্ম্মের কথা লিখে যাব যথা তথা
পাতায় পাতায়
থাকিবে করুণ গাথা বসন্তের বুকে গাঁথা
বহু মমতায়;

এ দু'টি নয়নে মোর ঘনাইয়া ঘুমঘোর
আসিবে যখন—
চোখের পল্লবে মম আঁকিও গভীরতম
আনন্দ-বেদন।
মম শেষ-শয্যাখানি বিছাইয়া দিও আনি
শেফালিকা-তলে;
সংসারের শত কাযে সতর্ক চক্ষুর মাঝে
কোন কিছু ছলে
আমারে দেখিও গিয়ে যেথা তব তরে প্রিয়ে
রহিব জাগিয়া,
ও দু'টি কাজল-আঁকা শ্রাবণের-মেঘ-ঢাকা
নয়ন লাগিয়া।

শ্রীবিমলকান্তি সমাদ্দার।

ইতিহাসের অনুসরণ

রাজা গণেশনারায়ণ ভাদুড়ী

বাঙ্গালার ইতিহাসে মুসলমান অধিকারের পর দুই জন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক জনের নাম রাজা গণেশ, অন্য জনের নাম রাজা দনুজমর্দ্দন। উঁহাদের ইতিহাস অনেকটা বিস্মৃতির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছে। কিন্তু এই দুই জন রাজা যে বাঙ্গালা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, একাধিক মুসলমান ঐতিহাসিক ইঁহাদের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন প্রণীত রিয়াজ-উস্ সালাতীন নামক গ্রন্থে রাজা গণেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন তারিখ-ই-ফেরেস্তা এবং তবকাৎ-ই-আকবরীতেও রাজা গণেশের কথা আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকখানি কুলগ্রন্থ ভিন্ন আর কুত্রাপি হিন্দুদিগের লিখিত রাজা গণেশের চরিত বা বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। কুলগ্রন্থগুলির প্রদত্ত বিবরণের পরস্পর মিল নাই। গোলাম হোসেন তাঁহার রিয়াজ-উস্-সালাতীনে গণেশের চরিত্রকে অত্যন্ত কালিমালিপ্ত করিয়াছেন। মুসলমান-লিখিত অন্য দুইখানি গ্রন্থে গণেশকে অতটা কালিমাময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হয় নাই; বরং অনেক স্থানে রাজা গণেশের প্রশংসাই আছে। রাজা গণেশের আসল নামটা কি ছিল, তাহা লইয়া ইংরেজ এবং বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে অত্যন্ত অধিক মতভেদ দেখা যায়। ফারসী ভাষায় লিখিত মুসলমান ইতিহাসে তাঁহার নাম লিখিত হইয়াছে কান্স বা কানিস্। এখন কান্স বা কানিস্ ত বাঙ্গালীর নাম হয় না। বিভারিজ সাহেব বলেন, কান্স বা কানিস্ গণেশ হওয়াই সম্ভব; কেন না, পারসিক হাতের লেখা গ্রন্থে অনেক স্থানে গাফির স্থানে কফি ব্যবহৃত হয়। ব্লকম্যানের মতে কান্স্ গণেশ হইতে পারে না। কারণ, মূলে কফি অক্ষরটি স্পষ্ট আছে। অতএব আসল নামটা কংসই হইবে। ওয়েষ্ট-মেকট বলেন, কান্স্ গণেশ নামই ব্যক্ত করে। ডক্টর বুকানন হামিল্টন (Buchanun Hamilton) এই রাজার নাম গণেশই লিখিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন কানিস্। কুলশাস্ত্রেও গণেশ নাম পাওয়া যায়। তবে কেহ কেহ বলেন, এই রাজার নাম ছিল কংসনারায়ণ। আবার কেহ বলেন, তাঁহার নাম ছিল গণেশনারায়ণ। তিনি কে ছিলেন, তাহা লইয়াও গোল আছে। রিয়াজ-উস্-সালাতীন গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেন বলেন যে, তিনি ভাতুড়িয়া পরগণার বড় জমিদার ছিলেন। এই ভাতুড়িয়া পরগণাটি কোথায়? রেণেলের (Rennel) মানচিত্রে বাঙ্গালার এক বিস্তীর্ণ ভূভাগকে ভাতুড়িয়া পরগণা বলিয়া চিহ্নিত আছে। তাহার পশ্চিমে মহানন্দা এবং পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণে গঙ্গা, এবং পূর্ব্বে করতোয়া নদী ছিল। গ্র্যাণ্টের (Grant) মতে ভাতুড়িয়া একটি বিস্তীর্ণ প্রাচীন পরগণা। কেহ কেহ বলেন, এককালে নাটোর এই ভাতুড়িয়া পরগণার সামিল ছিল। বুকানন হামিল্টন বলেন, রাজা গণেশ ছিলেন দিনাজপুরের হাকিম। রাজা গণেশ সম্বন্ধে এইরূপ নানা-মতের সামঞ্জস্য করাই অত্যন্ত কঠিন। তাহার পর তাঁহার জাতি লইয়াও মতভেদ বিদ্যমান। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র অনুসারে রাজা গণেশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীযুত দুর্গাচরণ সান্ন্যাল মহাশয় তাহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রাজা গণেশের পূর্ণ নাম গণেশ-নারায়ণ খাঁ। তাঁহার পুত্রের নাম যদুনারায়ণ খাঁ, এবং পৌত্রের নাম অনুপনারায়ণ খাঁ। যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তস্য পুত্র অনুপনারায়ণ একটাকিয়া রাজ্যের রাজা বা জমিদার হইয়াছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় এই তথ্য বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলশাস্ত্র ও স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের রাজন্য কাণ্ডে বলিয়াছেন যে, দিনাজপুর জিলার রাইগঞ্জ থানার এলাকায় গণেশপুর নামক যে স্থান আছে, সেইস্থানেই রাজা গণেশের একটি রাজধানী ছিল। রাজা গণেশ এই গণেশপুর হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত এক রাজপথ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন রাস্তা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে রাজা গণেশ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ

ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল দত্তখাস্ বা দত্তখান। আবার কাহারও কাহারও মতে দত্তখাস রাজা গণেশের নাম নহে। দত্তখাস ছিলেন রাজা গণেশের মন্ত্রী। এই সকল কথার নিশ্চিত মীমাংসা করা সম্ভব নহে। আমার মতে রাজা গণেশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। একটাকিয়ার জমিদারগণ ভাদুড়ী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। গণেশের পৌত্র অনুপনারায়ণ একটাকিয়া গ্রামের জমিদার হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধারাই বরাবর চলিয়াছিল। সুতরাং তিনি যে ভাতুড়িয়ার ভাদুড়ী ছিলেন,—ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার খান্ উপাধি ছিল। ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও খান্ বা খাঁ উপাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বলিহারের জমিদারদিগের আত্মীয়-কুটুম্বগণের মধ্যে অনেকের খাঁ উপাধি আছে। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও খাঁ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে, রাজা গণেশ আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। তখন জিনিষপত্র শস্তা ছিল। সুতরাং এখনকার তুলনায় তখনকার আট লক্ষ টাকা প্রায় ২২ বা ২৩ লক্ষ টাকার সমান * বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকে বলেন, তিনিই প্রথমে বঙ্গে দুর্গোৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ স্থলে এ বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। রাজা গণেশ যে এক জন বিশেষ কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি কেবল কীর্ত্তিমান্ ছিলেন না, এক জন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তিও ছিলেন। রাজা গণেশের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে শুনা যায় যে, তিনি প্রথমে গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহের আমলে রাজস্ব এবং শাসন-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস্-সালাতীন গ্রন্থে গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজা গণেশের চক্রান্তের ফলে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিহত হইয়াছিলেন।

* ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন যে, আকবরের আমলে এক টাকার বিনিময়-মূল্য ছিল ২ শিলিং ২ পেন্স। সুতরাং তখনকার টাকার মূল্য বিলাতী টাকার বিনিময়-মূল্য হিসাবে এখনকার টাকার মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ ছিল, ইহা বলা যাইতে পারে। এখনকার টাকার মূল্য ১৮ পেন্স।

কিন্তু এই উক্তির সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই ঘটনার প্রায় তের বৎসর পরে আজম শাহের পৌত্র সুলতান সমস্উদ্দীনও রাজা গণেশ কর্ত্তৃক নিহত হন। সমস্-উদ্দীন সংগ্রামে নিহত হইবার পর রাজা গণেশ গৌড়বঙ্গের রাজা হইয়াছিলেন,—কেহ কেহ এ কথাও বলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্লকম্যান্ বলেন যে, রাজা গণেশ কখনই গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর বলিয়া আত্মপরিচয় দেন নাই। তিনি সাহাবউদ্দীন বয়াজিদ নামক এক জন মুসলমানকে গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। গোলাম হোসেন বলেন, সাহাবউদ্দীন বয়াজিদ এবং সমস্উদ্দীন অভিন্ন ব্যক্তি। এই প্রশ্নের মীমাংসা করা অত্যন্ত কঠিন। ঐতিহাসিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, "সৈকউদ্দীন হাম্জা শাহের পুত্র সুলতান সমস্উদ্দীনের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা অথবা তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণীত হওয়া কঠিন। সাহাবউদ্দীন বয়াজিদ্ শাহ ৮১২ হইতে ৮১৭ হিজরা পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, কারণ, ৮১২, ৮১৬ ও ৮১৭ হিজরায় তাঁহার নামে মুদ্রিত রজত-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।" ৮১৮ হিজরায় অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশনারায়ণের পুত্র যদু সুলতান জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নাম ধারণ পূর্ব্বক গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। লোক অনেক সময় মিথ্যা ঘটনার উদ্ভাবনা করিয়া ইতিহাসকে তমসাচ্ছন্ন করে, ইহা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। গোলাম হোসেন তাঁহার প্রণীত রিয়াজ-উস্-সালাতীন গ্রন্থে কেবলই রাজা গণেশের নিন্দা করিয়াছেন। সে জন্য অনেকেরই বিশ্বাস, তিনি কেবল গণেশের শত্রুপক্ষের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্লকম্যানও ঐ কথা বলেন। আমাদের মনে হয়, রাজা গণেশ অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত লোক ছিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। রিয়াজ-উস্-সালাতীনে লিখিত আছে যে, রাজা গণেশ অনেক শিক্ষিত মুসলমানের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। সেখ মঈনউদ্দীন আব্বাসের পুত্র সেখ বদর-উল্-ইস্লাম রাজা গণেশকে তাঁহার পদমর্য্যাদানুরূপ সম্মান দান না করিয়া বরং উপেক্ষাই করিয়াছিলেন; সেই অপরাধে রাজা গণেশ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস্-সালাতীনে আরও লিখিত আছে যে, রাজা গণেশ কতকগুলি শিক্ষিত মুসলমানকে নৌকা করিয়া

নদীর মধ্যস্থলে লইয়া যাইয়া ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। এ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই প্রসঙ্গে গোলাম হোসেন আরও লিখিয়াছেন যে, মুসলমান-দিগের উপর এই প্রকার নৃশংস অত্যাচারে বিচলিত হইয়া শেখ নুরকুতুব-উল-আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শার্কীকে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম শাহ গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ফিরোজপুরে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন; রাজা গণেশ সেই সংবাদ পাইয়া ভীত হইয়া পড়েন, এবং প্রাণ ও রাজ্যরক্ষার জন্য নুরকুতুব-উল-আলমের শরণাপন্ন হন। তিনি শেখের চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহার প্রীতি অর্জ্জন করেন। শেখ নুরকুতুব আলম তখন রাজা গণেশকে এই সর্ত্ত দেন যে, রাজা যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ইব্রাহিম শাহকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিবেন। রাজা গণেশ সেই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে মুসলমান হইতে নিষেধ করায় তাঁহার মুসলমান হওয়া হয় নাই। নুরকুতুব আলম তাঁহার পরিবর্ত্তে গণেশের পুত্র যদুকেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা, এবং জালালউদ্দীন নাম দিয়া গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন শেখ নুরকুতুব আলম ইব্রাহিম শাহকে গৌড় আক্রমণ করিতে নিষেধ করেন। ইহার অতি অল্প দিন পরেই ইব্রাহিম শাহের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাই রিয়াজ-উস্‌-সালাতীনের প্রদত্ত বিবরণের মর্ম্ম।

এই উক্তি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, যে রাজা গণেশ শেখ নূরের দুই পুত্রকে পরে কারারুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যে প্রাণভয়ে শেখের চরণে মস্তক রাখিয়া রাজ্য ও প্রাণ ভিক্ষা করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ যে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, অন্য কোন ঐতিহাসিকই সে কথা বলেন নাই। মুসলমানদিগের উপর রাজা গণেশের অত্যাচারের কথা অন্য কোন মুসলমান ঐতিহাসিকই লিখিয়া যান নাই, বরং কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক রাজা গণেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর সমদর্শিতা ছিল বলিয়া তাঁহার প্রশংসাই করিয়াছেন। অধিকন্তু রাজা গণেশ প্রথমে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং পরে সেই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন, এই উক্তি সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে হয়। যে ব্যক্তি প্রাণভয়ে এবং রাজ্যচ্যুত হইবার ভয়ে ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সম্মত হয়, পত্নীর অনুরোধে তাহার সেই প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিবার সাহস কখনই হয় না। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার মহিষীই কি এইরূপ ভীত ব্যক্তিকে ঐরূপ অনুরোধ করিতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার মহিষী যে তাঁহার একমাত্র পুত্র যদুনারায়ণকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা-দানে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহাও অনেকটা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। পুত্র বিধর্ম্মী হইয়া যাইবে, পৌত্র পিতার আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহার রাজ্য ভিন্ন বংশে চলিয়া যাইবে, গণেশের রাণী কি সে কথা মনে করেন নাই? বাঙ্গালী জননী এমন কায করিতে পারেন না। আর এক কথা, গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, ফিরোজপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই ইব্রাহিম শাহের মৃত্যু হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর রাজা গণেশ অনেক দিন বাঁচিয়াছিলেন। ইতিহাস বলিতেছে যে, রাজা গণেশের মৃত্যুর পর অন্ততঃ ২৫ কিম্বা ২৬ বৎসর পরে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শার্কী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং এ দিক্ দিয়াও গোলাম হোসেনের উক্তি নির্ভরের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়াই মনে হয়।

আরও কতকগুলি কারণে গোলাম হোসেনের বিবৃত কাহিনী মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, ইব্রাহিম শাহের মৃত্যুর পর রাজা গণেশ তাঁহার ধর্ম্মত্যাগী পুত্র জালালউদ্দীনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আবার স্বয়ং স্বহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ কথা একেবারেই মিথ্যা। কারণ, ইব্রাহিম শাহের মৃত্যুর প্রায় পাদ-শতাব্দ পূর্ব্বে রাজা গণেশের মৃত্যু হইয়াছিল। রাজা গণেশ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন, এবং ঐ সময়েই তাঁহার পুত্র যদুনারায়ণ জালালউদ্দীন নাম ধারণ করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কারণ, জালালউদ্দীনের ঐ সময়ে সিংহাসন আরোহণের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তখন জৌনপুরে ইব্রাহিম শাহ সশরীরে বিরাজ করিতেছিলেন। গোলাম হোসেন বলিয়াছেন,—যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা গণেশ

এক সুবর্ণ-ধেনু নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মুখের ভিতর যদুকে প্রবেশ করাইয়া পশ্চাদ্দেশ হইতে নির্গমন করাইয়াছিলেন। ইহাতেই না কি যদুর প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। ইহার নাম সুবর্ণ-ধেনু-ব্রত-প্রায়শ্চিত্ত। এরূপ কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে কি না, তাহা আমি জানি না। যদি না থাকে, তাহা হইলে ইহা গোলাম হোসেনের কল্পিত বিবরণ। যাহা হউক, তারিখ-ই-ফেরেস্তায় কিন্তু রাজা গণেশের ভূয়সী প্রশংসা আছে। তাঁহাকে অনেক মুসলমান মুসলমানদিগের প্রকৃত হিতৈষী বলিয়া মনে করিতেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, রাজা গণেশের মৃত্যুর পর কতকগুলি গৌড়ীয় মুসলমান প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় তাঁহার শব সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকল মুসলমান ঐতিহাসিকের মতে রাজা গণেশ সাত বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যদি মুসলমানদিগের উপর অযথা অত্যাচার করিতেন, তাহা হইলে মুসলমানগণ কখনই তাঁহাকে প্রকৃত মুসলমান মনে করিয়া মুসলমানের ন্যায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার কথা বলিতেন না।

রাজা গণেশ অবশ্য কতকগুলি মুসলমানকে কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন। হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন, যিনি বিশেষ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন, রাজা গণেশ তাঁহাকেই কঠোর শাস্তি দিতেন। প্রকৃত দোষীকে তিনি কখনই ক্ষমা করিতেন না। সেইজন্য অনেক মুসলমান তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। তাঁহার অভ্যুদয়কালে গৌড়বঙ্গে আবার সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাঢ়ী শ্রেণীর মহিন্তাপাঁই বৃহস্পতি নামক এক জন বড় পণ্ডিত রাজা গণেশ এবং তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারীর নিকট "রায়-মুকুট" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি একখানি স্মৃতিগ্রন্থ, অনেকগুলি কাব্যের টীকা এবং অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়া যান। তাঁহার অমরকোষের টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। রাজা গণেশের আমলে বাঙ্গালা সাহিত্যেরও কতকটা উন্নতি হইয়াছিল, এবং নবদ্বীপের গৌরব-ভাস্কর মাধ্যন্দিন আকাশে বিরাজ করিতেছিল। ইনি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেক অনাচার নিবারিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজা গণেশ যে এক জন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, জালালউদ্দীন রাজা গণেশের মুসলমান উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র। ষ্টুয়ার্টের এই অনুমান মিথ্যা। জালালউদ্দীনের প্রকৃত নাম ছিল যদুনারায়ণ, জিতমল্ল বা জয়মল্ল। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেন যে, "রাজা গণেশের হিন্দু-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানরা সাহায্যের অভাবে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই।" এই উক্তির কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। যদুই সম্ভবতঃ রাজা গণেশের একমাত্র পুত্র-সন্তান ছিলেন। সেই জন্য তাঁহারই পুত্র অনুপনারায়ণ একটাকিয়া জমিদারীর অধিকারী হইয়াছিলেন। যদু রাজা গণেশের জীবদ্দশায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ তিনি রাজা গণেশের মৃত্যুর পরেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদুর মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে নানা মত আছে। তবকাৎ-ই-আকবরী মতে যদু রাজ্যলোভেই মুসলমান হইয়াছিলেন। এ অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যদুর পিতা রাজা গণেশ যতদিন জীবিত ছিলেন, সেই কালমধ্যে তিনি কখনই মুসলমানদিগকে ভয় করিয়া কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি শেখ নুর কুতুব-উল্ আলমের পুত্র শেখ আনোয়ারকে এবং শেখ জাহিরকে কোন বিশেষ অপরাধে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে শেখ নুর কুতুব-উল্-আলমের অনুচরদিগের সম্পত্তি লুণ্ঠিত করা হইয়াছিল। অবশ্য উক্ত সেখ সাহেব একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তদানীন্তন গৌড়ীয় মুসলমান সমাজে শেখ নুর আলমের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল। তিনি যে ঐরূপ কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার সামরিক বল এবং প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল। নতুবা তিনি ঐরূপ কার্য্য করিতে কখনই সাহস পাইতেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুর পরই যে যদুর এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিলে আর সিংহাসন লাভ করিতে পারিতেন না, তাহা মনে হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, যদু আজাম শাহের রূপবতী কন্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্যই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজম শাহের কন্যার

নাম ছিল আসমান-তারা। কেহ কেহ বলেন, যত্নুর মুসলমান পত্নীর নাম ছিল ফুলজানি বেগম। যত্নুর সহিত বিবাহের পর আসমান-তারার নাম ফুলজানি বেগম হওয়া বিচিত্র নহে। হয়ত প্রণয়ের পাথারে পড়িয়া তরুণ যুবক যদুনারায়ণ ভাদুড়ী মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যত্নুর কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। যত্নুর মৃত্যুর পর যত্নুর পুত্র সমসুদ্দীন আহম্মদ-শাহ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

রাজা গণেশ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। মুসলমান ঐতিহাসিক ভিন্ন কোন হিন্দু তাঁহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন; কেবল গোলাম হোসেনই তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের শত্রুও অনেক হয়। ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসে রাজা গণেশ-নারায়ণ এক জন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত তাঁহার নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা, তাঁহার রাজত্বকালের কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে সাহাবুদ্দীন বয়াজিদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। গণেশ যে রাজা হইয়াছিলেন, তাহা অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই পাওয়া যায়। এই অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ, রাজা গণেশের মৃত্যুর দেড় শত বৎসর মাত্র পরে লিখিত হয়। উহাতে নরসিংহ নড়িয়ালের গুণ-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে :—

সেই নরসিংহ যশঃ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা-বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয় বাদশাহে মারি গৌড়ে হইল রাজা॥

তবে কি রাজা গণেশই সাহাবুদ্দীন বয়াজিদ শাহ নাম ধরিয়া শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন? সমস্যাটি সঙ্গীন। অনেক বাদশাহের আমলের মুদ্রাও ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সময়ে রাজা গণেশ বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়কার যত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সাহাবউদ্দীন বয়াজিদের নাম অঙ্কিত আছে। ইহাতে সন্দেহ হয়, ইনিই বুঝি ঐ ছদ্মনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। ব্যাপারটা রহস্যপূর্ণ। এই সময়ে কংসরাম নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সান্ন্যালবংশীয়। কিন্তু তিনি বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোন কিছুই করেন নাই। ইহার সহিত গণেশকে জুড়িয়া অনেকে গোল বাধাইয়াছেন। আকবরের রাজত্বকালে 'কংসনারায়ণ' নামক এক জন রাজা তাহিরপুর রাজবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিও স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সুতরাং ইঁহাদের কথা এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। পূর্ব্বে নারায়ণ এই নাম ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রায় দেখা যাইত না।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

মিথিলার প্রাচীন ইতিহাস

মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান উত্তর-বিহারে রাজর্ষি জনকের মিথিলা নামে রাজ্য ছিল। তৎকালে এই রাজ্য সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল। অধুনা সেই মহাকাব্যের যুগ আর নাই এবং তাহার নিদর্শনও আর নাই। তথাপি এই মিথিলা-বক্ষে বিশেষতঃ দ্বারবঙ্গ জেলায় কপিলেশ্বরাদি বহু সুপ্রাচীন তীর্থগুলির কিম্বদন্তী হইতে বেশ অনুমিত হয় যে, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের কীর্ত্তিকলাপের প্রভাবে দ্বারবঙ্গ আর্য্য জাতির নিকট চিরপবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন, দ্বারবঙ্গের বিভিন্ন পল্লীর অরণ্যে ও জলাশয়ে কতই যে অগণিত প্রাচীন মহামূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

আজ চারি বৎসর দ্বারবঙ্গের পল্লীসমূহ ভ্রমণ করিয়া প্রত্নতত্ত্বের যে সকল দুর্লভ নিদর্শন পর্য্যবেক্ষণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাহা ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পরবর্ত্তীকালে বলি নামে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান 'রাজনগর' ষ্টেশন হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে 'বলিরাজপুর' নামক স্থানে তাঁহার বিশাল দুর্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুর্গের চতুর্দ্দিক্-পরিবেষ্টিত প্রাচীর অদ্যাপিও সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ ও ১৫ ফুট প্রস্থ এবং

রাজা বলি-কা-গড়—খৃঃ-পূঃ ২০০ অব্দের পুরাতন দুর্গ

ইহার অভ্যন্তরে বহু গৃহ স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে একটি গৃহ খনন করিলে প্রাচীর-গাত্র সজ্জিত করিবার জন্য যে সকল চিত্রাঙ্কিত ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কতিপয় নিদর্শন বহিষ্কৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে লতাপুষ্প-সুশোভিত একটি ইষ্টক (Tarracotta) তৎকালীন মৃত্তাস্কর্য্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দুর্গের গঠনপ্রণালী ও কারুকার্য্যাদি পরীক্ষা করিয়া সরকারী ভারতীয় প্রত্নতত্ব বিভাগ ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজগৃহ ও নন্দনগড়ের সমতুল্য এবং খৃঃ-পূঃ ২০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

রাজা বলির পর অন্ধ্রগণ রাজত্ব করিতেন। 'ঝনঝারপুর' ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে অন্ধ্রথার নামক স্থানে যে ধ্বংসস্তূপ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অন্ধ্রগণের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া ঘোষিত।

অন্ধ্রগণের পর কুশানবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। 'মধুবাণী' মহকুমার অন্তর্গত বনাটপুর নামক স্থানে শেষ অন্ধ্ররাজ বনাট রাজত্ব করিতেন। অনুমান ৯০ খৃষ্টাব্দে কুশানবংশীয় বীর হবিষ্ক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। 'কমলা' ও 'জীবচ'
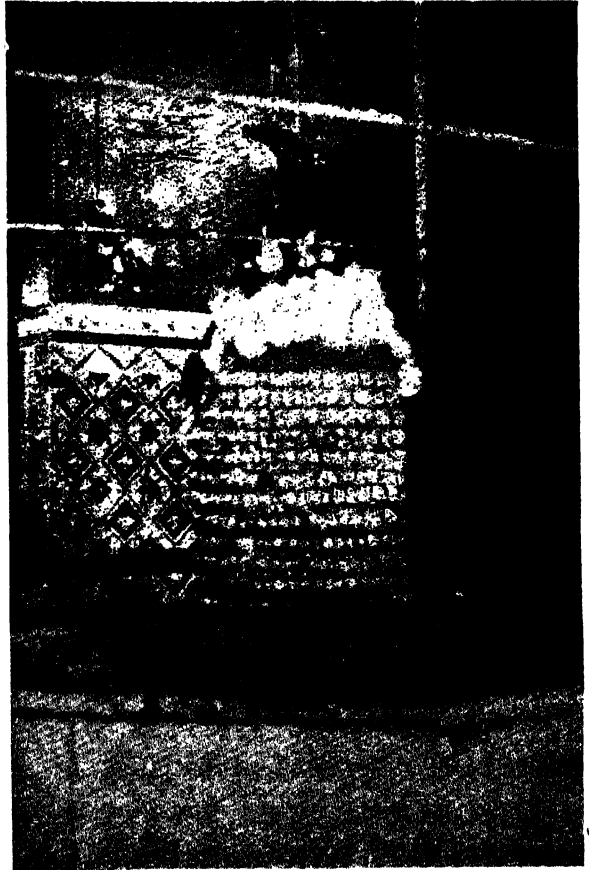
শিবের সহস্রাক্ষ-মূর্ত্তি—পাল-রাজত্বের একটি নিদর্শন

নদীর মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হবিষ্ক যুদ্ধে বিজয়ী হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র বহুদিন যাবৎ শকগণের (কুশান-বংশ শক-বংশের একটি শাখা) নামানুসারে শকারি নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমানে স্থানটি 'শকরি' নামে পরিচিত। এই স্থানের অনতিদূরে ঘোড়দৌড় নামে একটি বিশাল দীঘি আছে। কথিত আছে, তথায় স্থানীয় নৃপতিদিগের অশ্বারোহী সৈন্যগণ শিক্ষালাভ করিত।

কুশান-বংশের রাজত্বের পর পালবংশীয় নৃপতিগণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই যুগের নিদর্শন দ্বারবঙ্গের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়।

গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দ্বারবঙ্গ সহরের প্রান্তভাগে বাগমতী নদীর তীরবর্ত্তী কালীস্থানের সন্নিকটস্থ একটি প্রাচীন প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া বিষ্ণু, গণেশ, ভৈরব প্রভৃতি দেবদেবী মূর্ত্তি, গুমতি-চক্র প্রস্তরীভূত চাউল, অভ্র ও মৃন্ময় মূর্ত্তি ও মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শিব, হরগৌরী, বিষ্ণু, মহাবীর, দুর্গা প্রভৃতি বহু প্রস্তরমূর্ত্তি তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তৎসমুদয় সহরের বক্ষে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

দ্বারবঙ্গের প্রাচীন ধ্বংস-স্তুপাদি পরীক্ষা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১১৯৭ অব্দে সাহাবুদ্দিন মোহম্মদ ঘোরীর দ্বিতীয় সেনাপতি বক্তিয়ার খিলজী বিহার অধিকারকালে দ্বারবঙ্গের হিন্দুরাজগণের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিগুলিও ধ্বংস করেন।

বহুদিন যাবৎ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির উদ্ধারের চেষ্টা না থাকায় এতদঞ্চলের প্রাচীন গৌরব লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। পরিশেষে স্বর্গীয় মিথিলেশ্বর স্যার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর এবং বর্ত্তমান মিথিলেশ্বর স্যার কামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের প্রচেষ্টায় বহু প্রাচীন মূর্ত্তি সংরক্ষিত হইয়াছে।

মূর্ত্তিশিল্প ব্যতীত মিথিলার প্রাচীন পুঁথিও ঐতিহাসিক বস্তু। মহাকবি কালিদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতগণের লিপি এবং দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার বহু পণ্ডিতগণের তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্রে লিখিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, উপনিষদ ও চণ্ডী প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এতদঞ্চলের প্রাচীন পুঁথি উদ্ধারকল্পে স্বর্গীয় মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দ্বারবঙ্গ সহরে নব-প্রতিষ্ঠিত শ্রী ভারতীয় শিক্ষাসম্মেলন কর্ত্তৃক মিথিলাক্ষরে লিখিত বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইতেছে।

হরগৌরী-মূর্ত্তি—দশম শতাব্দীর পাল-রাজগণের একটি স্মৃতি-চিহ্ন
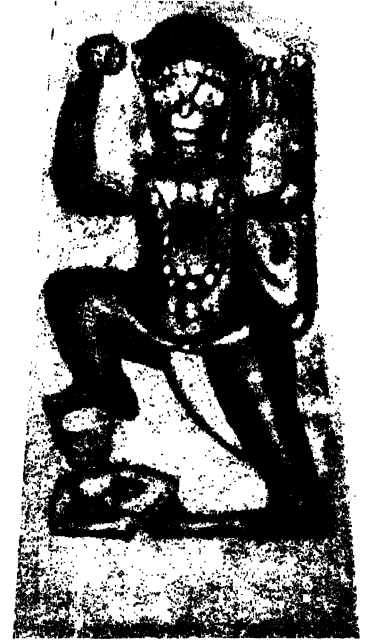
মহাবীর-মূর্ত্তি—অহিরাবণ-বধের একটি খৃঃ পূঃ ২০০ বর্ষের পুরাতন

সম্প্রতি সরকারী ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বহু কাহিনী-বিজড়িত মিথিলার ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তুপাদি উদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হইয়াছেন। 'বলিরাজ গড়' 'প্রাচীন কীর্ত্তিসংরক্ষণ আইন' দ্বারা রক্ষিত-অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত হইবে স্থির হইয়াছে, ঐতিহাসিক বস্তু উদ্ধারকল্পে সর্ব্বসাধারণেরও চেষ্টা থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল।

গৃহলক্ষ্মী

(গল্প)

হাওড়া জেলার মিত্রডাঙ্গার জমিদার বাবু রমারঞ্জন মিত্ররায় প্রাচীন জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, আকবর বাদশাহের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ যখন পাঠানদিগকে বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যা অভিমুখে বিতাড়িত করেন, তখন এই জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামকমল মিত্র মহাশয় মানসিংহকে নানাভাবে সাহায্য করায়, মহারাজ মানসিংহ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহের নিকটে তাঁহার প্রচুর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিবার জন্য বাদশাহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী বাদশাহ রামকমল মিত্রকে বিস্তৃত জমিদারী এবং "রায়" উপাধি প্রদান করিয়া সেনাপতির সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি রামকমলের বংশধরগণ "মিত্ররায়" উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। মিত্ররায় মহাশয়দিগের সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী, লোকমুখে বংশাবলীক্রমে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে।

কোন কবির কবিত্বে অমরত্বলাভ করিতে না পারিলেও মিত্ররায়-বংশ দয়া, দাক্ষিণ্য, বদান্যতা ও দেব-দ্বিজে ভক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মিত্রডাঙ্গা ও তৎসন্নিহিত কয়েকখানা গ্রামের লোক মিত্ররায়দিগকে "রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত, এবং তাঁহাদিগের বাড়ীকে "রাজবাড়ী" বলিত। মিত্রডাঙ্গার রাজবাড়ীতে মহাসমারোহে "বারমাসে তের পার্ব্বণ" সম্পন্ন হইত, এবং সে-কালের প্রাচীন হিন্দু জমিদারবংশসমূহের সকল প্রথাই এই বংশে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হইত। বাঙ্গালায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনেকেই যেমন আচারে-ব্যবহারে পাশ্চাত্য আদব-কায়দার অনুকরণ করিয়া সাহেবীয়ানার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, সে-কালের ভূস্বামীরাও সেইরূপ সকল বিষয়েই মুসলমান রাজগণের অনুকরণ করিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন। বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রাচীন জমিদার-পরিবারে যে কঠোর অবরোধ-প্রথা দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহাও এ দেশের মুসলমান-সমাজপ্রচলিত প্রথার নিদর্শন। মিত্রডাঙ্গার জমিদার বাবুরাও এই আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অবরোধের কড়াকড়ি সম্বন্ধে তাঁহারা মুসলমান সমাজেরও এই গৌরব ম্লান করিয়াছিলেন।

মিত্রডাঙ্গার জমিদার বাবুদিগের অন্তঃপুর বহির্ব্বাটী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। অন্তঃপুর ও তৎসংলগ্ন উদ্যান ও পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে প্রায় পনের হাত উচ্চ প্রাচীর ছিল; এই প্রাচীর-বেষ্টিত অংশে পরিবারস্থ পুরুষগণ ব্যতীত অপর কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন পুরুষ-ভৃত্য অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে পাইত না; এমন কি, নারীরাই উদ্যান রক্ষা করিত। অন্তঃপুরের কোন অংশের জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন হইলে, রাজমিস্ত্রীরা সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সেই অংশের অন্তঃপুরিকাগণকে অন্দরের অন্য অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত।

বর্ত্তমান জমিদার রমারঞ্জন বাবুর পিতামহ কালীরঞ্জন বাবুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের অবরোধপ্রথার ব্যবস্থা এইরূপই ছিল। তিনিই প্রথমে ফারসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী শিক্ষা আয়ত্ত করেন। এই পরিবারে রমারঞ্জনই একজন ইংরেজ গৃহশিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিখিয়া মিত্ররায়-বংশে সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে পুরমহিলাগণের শিক্ষাদানের জন্য একজন বাঙ্গালী ও একজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করেন।

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে টালিগঞ্জ পল্লীতে তাঁহাদের একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল; তিনি মধ্যে মধ্যে সপরিবারে সেখানে বাস করিতেন। রমারঞ্জন বাবু পত্নীকে লইয়া কলিকাতার যাদুঘর, পশুশালা, শিবপুরের বাগান, এমন কি, সার্কাস থিয়েটারে পর্য্যন্ত যাইতেন। কিন্তু সে বহু পূর্ব্বের কথা; ভারত-রাজধানী কলিকাতার তখন উন্নতির দ্বিতীয় যুগ। এই যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধারণা হইয়াছিল, মদ না খাইলে ও 'সাহেব' না সাজিলে বাঙ্গালী সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। রমারঞ্জন একমাত্র পুত্র রাধারঞ্জনকে সকল বিষয়েই 'পুরা সাহেব' করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিশুপুত্রের সহিত তিনি বাড়ীতে সর্ব্বদা ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতেন; সে ইংরেজ বালকগণের সঙ্গে থাকিয়া ইংরেজী আদব-কায়দায় সম্যক্ অভ্যস্ত হইতে পারিবে—এই আশায় তিনি রাধারঞ্জনকে কলিকাতার ডভটন্ কলেজের স্কুলবিভাগে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পুত্র বি এ পাশ করিলে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে য়ুরোপে প্রেরণ করিবেন। য়ুরোপ হইতে সে 'সাহেব' হইয়া ফিরিয়া আসে—ইহাই ছিল তাঁহার উচ্চ অভিলাষ।

রমারঞ্জন বাবু পুত্রকে পুরাদস্তর 'সাহেব' করিয়া তুলিলেও এক বিষয়ে তিনি অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন। পুত্র বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান অথবা ব্যারিষ্টার হইয়া আসুক এ ইচ্ছা তাঁহার থাকিলেও, পুত্র যে বিলাত হইতে একটি 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীকে' পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিবে, এ চিন্তা তিনি দুঃসহ মনে করিতেন। এ জন্য তিনি স্থির করিয়াছিলেন, পুত্রকে অবিবাহিত অবস্থায় য়ুরোপে পাঠাইবেন না। তিনি ইহাও শুনিয়াছিলেন যে, বিলাতে কুমারী মেরি, লুসি, হিল্ডা, সুসানগণ ভারতীয় রাজপুত্রগণকে রূপের ফাঁদে ফেলিয়া বিবাহ করিবার জন্য সর্ব্বদা হাব ভাব-চাতুরিজাল বিস্তার করিয়া থাকে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, একটি সদ্বংশজাতা রূপবতী কায়স্থ-কুমারীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে উচ্চশিক্ষার জন্য য়ুরোপে প্রেরণ করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনও নবশিক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রমারঞ্জন বাবু পুত্রের জন্য পাত্রী অন্বেষণে মনোনিবেশ করিলেন। পাত্রীর অভাব ছিল না। বাৎসরিক প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর মালিক রমারঞ্জন বাবু,—তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহের জন্য কখনও পাত্রীর অভাব হয় না। তিনি অনেক বনিয়াদী কায়স্থ-জমিদারের কন্যার সংবাদ পাইলেন, কিন্তু কোন পাত্রীই তাঁহার মনোনীত হইল না; কারণ, সেই সকল কন্যা এবং তাহাদের অভিভাবকগণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী, সেই সকল পাত্রী কি তাঁহার পুত্রের উপযুক্ত? এরূপ দুই চারিটি কুমারীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহারা সে-কালেও চলনসই রকম ইংরেজী বুঝিতে বা বলিতে পারিত, একটু আধটু সঙ্গীতচর্চ্চাও করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা কি তাঁহার শিক্ষিত পুত্রের সহিত সমান তালে পা-ফেলিয়া চলিতে পারিবে? তাই কোন পাত্রীই তাঁহার পছন্দ হইল না।

এই ভাবে দুই চারি মাস অনুসন্ধানের পর তিনি একটি পাত্রীর সন্ধান পাইলেন। হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ জে, কে, ডাটের কন্যা মিস্ ইভা। মিঃ ডাট সে-কালের ডব্লু, সি, বোনার্জি; টি, পালিত প্রভৃতি ব্যারিষ্টারগণের সহযোগী ছিলেন। ইভা লোরেটো হাউসের স্কুলবিভাগে পড়িত; দেখিতে ঠিক আরমানি বিবি। স্কুলে যখন সে সহপাঠিনীদের মধ্যে থাকিত, তখন তাহাকে দেখিলে কেহ বলিতে পারিত না যে, সে বাঙ্গালীর মেয়ে। তাহার হাব-ভাব, চাল-চলন, দাঁড়াইবার, বসিবার, কথা কহিবার ভঙ্গী ঠিক ইংরেজ-কুমারীর মত। রমারঞ্জন বাবু পুত্রের জন্য ঠিক এইরূপ একটি পাত্রীই খুঁজিতেছিলেন। সুতরং মিস্ ইভা ডাটের সন্ধান পাইয়া তাহাকেই ভাবী পুত্রবধূরূপে নির্ব্বাচন করিলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ জে, কে, ডাট ওরফে যুগলকিশোর দত্ত বনিয়াদী বংশের লোক না হইলেও তখন কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি; ব্যারিষ্টারীতে বার্ষিক তাঁহার লক্ষাধিক টাকা আয়; শ্বেতাঙ্গ সমাজেও তাঁহার প্রচুর পশার-প্রতিপত্তি। মিষ্টার ডাটের পুত্র ছিল না, দুইটি কন্যা; বড় আইভির সহিত তরুণ সিভিলিয়ান মিঃ মিটারের বিবাহ হইয়াছিল। ছোট ইভার জন্য তিনি একটি উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ইভারও একজন বিলাত-ফেরতের সহিত বিবাহ হয়। রাধারঞ্জন বিলাত-ফেরত না হইলেও আদব-কায়দায় পুরাদস্তর 'সাহেব', তাহার উপর ধনী জমিদারের একমাত্র সন্তান; সুতরাং মিঃ ডাট যখন রাধারঞ্জনের সংবাদ পাইলেন,

তখন মনে করিলেন যে, বিলাত-ফেরত না হইলেই বা ক্ষতি কি? তবে কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া দুই তিন বৎসর পরে বিবাহ দিলেই ভাল হয়, কারণ, ইভার বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর।

বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল, কিন্তু রমারঞ্জন বাবু অত দিন বিলম্ব করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, চার পাঁচ মাসের মধ্যেই তিনি পুত্রকে বিলাতে পাঠাইবেন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন; অবিবাহিত পুত্রকে তিনি য়ুরোপে পাঠাইতে সম্মত নহেন। অগত্যা ডাট সাহেবকে রমারঞ্জন বাবুর প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। প্রথম কথাবার্ত্তার তিন মাস পরেই রাধারঞ্জনের সহিত ইভার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহটা বিনা-পণেই হইয়াছিল; কারণ, রমারঞ্জন বাবু যৌতুক সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করিলেও মিঃ ডাট কন্যার বিবাহে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

২

রমারঞ্জন বাবু পুত্রের বিবাহের পরই পুত্রকে বিলাতে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। বিলাতে পাঠাইবার সকল ব্যবস্থা শেষ, রাধারঞ্জন কোন্ তারিখে, কোন্ ষ্টীমারে যাত্রা করিবেন তাহাও স্থির, এমন সময় একদিন রমারঞ্জন বাবু সহসা পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হইলেন; সুতরাং রাধারঞ্জনের য়ুরোপ-যাত্রা বন্ধ করিতে হইল। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না; কিন্তু এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, হাইড্রোপ্যাথ, কবিরাজ, কোন চিকিৎসকই কিছু করিতে পারিলেন না। পক্ষাঘাত রোগে সাধারণতঃ রোগীর দক্ষিণ অথবা বাম অঙ্গ অসাড়—অবশ হইয়া যায়, রমারঞ্জন বাবুর সেরূপ হইল না; তাঁহার নাভীর নিম্নদেশ অসাড় হইয়া গেল, ঊর্দ্ধ অঙ্গে পীড়ার আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তাঁহার মানসিক শক্তিও বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইল না, পূর্ব্বের মত জমিদারীর সকল কার্য্যই তিনি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; লেখা-পড়ার কার্য্যে কোন ব্যাঘাত হইল না, কিন্তু তাঁহার চলৎশক্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গেল। পিতাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া রাধারঞ্জন য়ুরোপে যাইতে পারিলেন না, কলিকাতায় থাকিয়াই পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। ইভাও স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। রাধারঞ্জন যথাসময়ে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি এ পাশ করিলেন। সুবিখ্যাত ফাদার লাফোঁ তখন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ।

প্রায় তিন বৎসর শয্যাগত থাকিবার পর রমারঞ্জন বাবুর মৃত্যু হইল। তিনি পীড়িত হইবার পর হইতেই পুত্রকে জমিদারী কায-কর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর যখন রাধারঞ্জন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, তখন বিষয়কার্য্য পূর্ব্বের মতই সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, রাধারঞ্জনকে কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হইল না। ছাত্রাবস্থায় তিনি কলিকাতাতেই থাকিতেন, এক্ষণে জমিদারীর মালিক হইয়া তাঁহাকে কখন কখন দেশে যাইতে হইত। মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রমারঞ্জন বাবু তাঁহার বাল্যবন্ধু হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক ভদ্রলোককে তাঁহার জমিদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হরেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে সাব-জজ ছিলেন, তিনি অবসর গ্রহণ করিলে রমারঞ্জন অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়া তাঁহাকে ম্যানেজারী কার্য্যগ্রহণে সম্মত করাইয়াছিলেন। হরেন্দ্র বাবু সপরিবারে মিত্র-ডাঙ্গায় বাস করিতেন। তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান ছিল না, দুইটি কন্যা ছিল। কন্যা দুইটি নিজ নিজ পুত্র-কন্যা লইয়া স্বামিগৃহে বাস করিতেন। রাধারঞ্জন হরেন্দ্র বাবুকে "কাকা বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

রমারঞ্জনের মৃত্যুর পর যথাসময়ে যথোচিত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইল। হরেন্দ্র বাবুর যত্নে ও পরিশ্রমে কোনও বিষয়ে ত্রুটি হইল না। রাধারঞ্জন পুরাদস্তুর 'সাহেব' হইলেও হরেন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, তাঁহাকে তাঁহার জমিদারীর কর্ম্মচারী না ভাবিয়া পিতৃবন্ধু বলিয়াই মনে করিতেন। রমারঞ্জন বাবু বৈষয়িক ও পারিবারিক সকল বিষয়েই হরেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে জমিদারীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, ইহা রাধারঞ্জনের অজ্ঞাত ছিল না।

পূর্ব্ব হইতেই রাধারঞ্জনের য়ুরোপে গমনের ইচ্ছা ছিল, এবং রমারঞ্জনেরও তাহাতে সম্মতি ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতার মৃত্যুর প্রায় ছয় মাস পরে রাধারঞ্জনের

আবার য়ুরোপে যাইবার ঝোঁক হইল,—কিন্তু একাকী নহে—সস্ত্রীক। তিনি জানিতেন যে, ইভার বিলাতগমনে মিঃ ডাট বা তাঁহার পত্নীর কোন আপত্তি ছিল না, কারণ, মিসেস্ ডাটও একবার স্বামীর সহিত য়ুরোপে গিয়াছিলেন। ইভার অগ্রজা আইভিকে লইয়া তাঁহার সিভিলিয়ান স্বামীও সেই সময় দীর্ঘ অবকাশে য়ুরোপে ভ্রমণ করিতেছিলেন; সুতরাং রাধারঞ্জনেরও যে সস্ত্রীক য়ুরোপ-ভ্রমণের ইচ্ছা হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। রাধারঞ্জন একদিন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার 'কাকাবাবুর' কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তুমি একবার দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া এস, আমিও ইহা ইচ্ছা করি। যাহার অর্থ ও সামর্থ্য আছে, তাহার দেশভ্রমণ দ্বারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত। আমি সরকারী কার্য্যে সারা বাঙ্গালার অর্থাৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সকল জিলাতেই গিয়াছি (তখন বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা, বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন ছিল), ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার আচার ব্যবহার দেখিয়াছি। তাহার পর পেন্সন লইয়াও বাড়ীতে বসিয়া থাকি নাই; তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ করিয়া তোমার কাকীমাকে লইয়া ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ—এমন কি, ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছি। এই ভ্রমণের ফলে আমাদের যে কোন উপকার হয় নাই তাহা নহে, মনের ও মতের সঙ্কীর্ণতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। দেশভ্রমণে আর কিছু না হউক, কূপমণ্ডুকতা দূর হয়। তবে আমার মনে হয় যে, ভারতের বাহিরে কোথাও যাইবার পূর্ব্বে, আমাদের এই দেশটা একবার ঘুরিয়া দেখা উচিত। নতুবা কলিকাতা হইতে বা বোম্বাই হইতে ষ্টীমারে চড়িয়া একেবারে ব্রিণ্ডিসি বা লণ্ডনে গিয়া নামিলে, সে দেশে যাহা দেখিবে তাহাই অপূর্ব্ব, অদ্ভুত মনে করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইবে। ইহার ফলে মনে হইবে, উঁহারা আমাদের তুলনায় কত বড়, উঁহাদের কাছে আমরা কত ছোট! য়ুরোপে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিলে অবাক্ হইবে, কিন্তু বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ ঘুরিয়া যদি বিলাতে যাও, তাহা হইলে পাশ্চাত্য স্ত্রী স্বাধীনতা আর তোমার দৃষ্টিতে নূতন বলিয়া বোধ হইবে না। বৌমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাও আমি বারণ করিব না, কিন্তু আমার মনে হয় যে, স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটু বেশী বয়সে অর্থাৎ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের পর বিলাতে যাইলে অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্টের সম্ভাবনা অধিক। শৈশব কাল হইতে যাঁহারা বিলাতে মানুষ হইয়াছেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র—তাঁহারা পাশ্চাত্য মহিলা সমাজের গুণ ও দোষ সমান ভাবেই পাইয়া থাকেন। বৌমা যদিও কলিকাতায় ইংরেজের স্কুলে ইংরেজ মহিলাদের নিকট শিক্ষা পাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার ধাতের বাঙ্গালীত্ব ত তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। তোমার নিজের কথাই ভাব। তুমিও ছেলেবেলা হইতেই সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে সাহেবী স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করিয়াছ, আদব-কায়দা, দাঁড়া-দস্তরে পুরা 'সাহেব' বলিয়াই আপনাকে মনে কর, কিন্তু উহা বাহ্য আবরণ, তোমার মন কি ইংরেজের বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে? ইংরেজের স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিবাৎসল্য তুমি লাভ করিয়াছ কি? বৌমাও পুরা 'মেম সাহেব', কিন্তু ইংরেজ মহিলার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, সৎসাহস, তাহাদের ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ তিনি কি আয়ত্ত করিয়াছেন? দেখ বাবা, যে সব গরু মাঠে-ঘাটে চরিয়া বেড়ায়, তারা যেমন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে, বাঁধা গরু একবার দড়ি ছিঁড়িয়া পথে বাহির হইলে সেরূপ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করিতে পারে না; লম্ফ ঝম্প করিয়া সে জানাইতে চায় যে, সে বাঁধন ছিঁড়িয়াছে। আমাদের দেশের যে সকল শিক্ষিতা মহিলা য়ুরোপে ঘুরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের চালচলন দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা সভ্যতার তাল সাম্‌লাইতে পারিতেছেন না। বৌমা য়ুরোপে গিয়া সেখানকার স্বাধীন মহিলা সমাজ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, সে দেশের নারীরা কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছে। বিলাতে যাইলে তিনি দেখিতে পাইবেন, সে দেশের ভদ্রমহিলারা আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় কিরূপ আগ্রহশীলা। আর এক কথা. সে দেশের লোকমাত্রেই যে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে। ইংলণ্ডের এক জন ব্যারণ, কাউণ্ট, বা মার্কুইস অপেক্ষা তুমি হীন নও, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। বৌমাকে লইয়া য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিতে চাও, যাও; কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া ইংরেজের বাহ্যানুকরণ করিতে গিয়া শেষে ঠকিতে না হয়, ইহা স্মরণ রাখিও।"

রাধারঞ্জন নীরবে হরেন্দ্র বাবুর কথাগুলি শুনিয়া বলিল, "আপনার উপদেশ আমার স্মরণ থাকিবে।"

হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সেখানে কৃপণতা করিও না, অপব্যয় করিও না। মনে রাখিও, এই জমিদারী তোমার

নহে, তোমার প্রজাদের। তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ তোমার নিকট গচ্ছিত আছে, সেই অর্থ তাহাদের মঙ্গলের জন্যই ব্যয় করা উচিত। য়ুরোপের বড় বড় ভূস্বামীদের প্রজার অবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের দেশের কৃষক বা শ্রমিক অপেক্ষা সে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা কত উন্নত। প্রজার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি জমিদারের উপর নির্ভর করে। য়ুরোপে গিয়া কেবল বড় বড় কয়েকটা সহর দেখিয়াই মনে করিও না যে, সব দেখা হইল, সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়া কৃষকদের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিও; তাহাতে তোমার উপকার হইবে। ইংরেজ মোট বয়, ইংরেজ জুতা মেরামত করে, তাহারা পথে ঝাঁটা দেয়, ইহাই য়ুরোপের বৈশিষ্ট্য নহে। সে দেশের মুটে-মজুর, ঝাড়ুদার, চামার, এ দেশের ঐ শ্রেণীর লোক অপেক্ষা কিরূপ উন্নত প্রণালীতে জীবন যাপন করে, তাহা লক্ষ্য করিও। তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর বেশী কথা কি বলিব?"

ইহার দুই মাস পরে, রাধারঞ্জন সস্ত্রীক বোম্বাই হইতে য়ুরোপে যাত্রা করিলেন।

৩

প্রায় তিন বৎসরকাল য়ুরোপে বাস করিয়া রাধারঞ্জন ইভাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইভা লরেটো হাউসে পড়িবার সময় ফরাসী ভাষা শিখিয়াছিলেন, চলনসই-গোছের ফরাসী বলিতেও পারিতেন। রাধারঞ্জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় 'সেকেণ্ড ল্যাঙ্গোয়েজ' হিসাবে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে লাটিন লইয়াছিলেন। তাঁহার লাটিনভাষার অভিজ্ঞতা য়ুরোপে অবস্থানকালে তাঁহার কোন উপকারে আসে নাই, ইভার ফরাসী ভাষার জ্ঞান অনেক সময় তাঁহাদের কাযে লাগিয়াছিল। রাধারঞ্জনের ধারণা ছিল যে, ইংরেজী জানা থাকিলে য়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই কায চালাইতে পারা যায়; কিন্তু ব্রিণ্ডিসি হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত রেলপথে ভ্রমণ করিবার সময় তাঁহার এই ভ্রম দূর হইল। ইটালী বা ফ্রান্সের কোন রেল-ষ্টেশনেই তাঁহারা ইংরেজী-জানা রেল-কর্ম্মচারী দেখিতে পাইলেন না, ইটালীতে সকলেই ইটালীয় ভাষায় এবং ফ্রান্সে ফরা[illegible] ভাষায় কথা বলে। ইটালীর রেলপথে দুই এক কর্ম্মচারী সামান্যরূপ ফরাসী বলিতে বা বুঝিতে পারে, কিন্তু ইংরেজী ভাষার বিন্দুবিসর্গও বোঝে না। ইটালীর সীমা পার হইয়া ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বিড়ম্বনা ভোগ অনেকটা হ্রাস পাইল, ফরাসী ভাষায় ইভার যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল, তাহা তাঁহাদের অনেক কাযে লাগিল।

তাঁহারা প্রধানতঃ ইংলণ্ডেই বাস করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে দুই এক সপ্তাহের জন্য স্পেন, পর্টুগাল, হল্যাণ্ড, বেল-জিয়ম, ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী ও সুইডেনে বেড়াইয়া আসিতেন; ফ্রান্সে প্রায় তিন মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। হরেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে পল্লীগ্রামে কৃষকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, রাধারঞ্জনের সে কথা স্মরণ ছিল; লণ্ডনে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে পল্লী-গ্রামাঞ্চলে তিনি দুই এক সপ্তাহ কাটাইয়া আসিয়াছিলেন, তবে কোন কৃষক পরিবারের সঙ্গে মিলামিশা করেন নাই; যে কোন একটা গ্রাম্য হোটেলে আশ্রয় লইতেন, এবং পল্লীগ্রামের দৃশ্য উপভোগ করিয়াই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিতেন। এইরূপে প্রায় তিন বৎসরে সত্তর পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় বা অপব্যয়ের বিনিময়ে য়ুরোপীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাঁহারা দেশে ফিরিলেন। এই তিন বৎসরে ইভা কয়েকটা ইংরেজী, ফরাসী ও ইটালীয়ান সঙ্গীতে, এবং স্বামি স্ত্রী উভয়েই বল-নাচে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বোম্বাইএ প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে রাধারঞ্জন তারযোগে হরেন্দ্র বাবুকে আপনাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, হরেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। রাধারঞ্জন দীর্ঘকালের পর "কাকা বাবুকে" দেখিয়া স[illegible] মস্তক ঈষৎ নত করিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলে[illegible] আমি ভাবেই হরেন্দ্র বাবুর করমর্দ্দন করিলেন[illegible]। আজ থেকে [illegible] এ-বংশের গৃহলক্ষ্মী।" হরেন্দ্র বাবু প্রথমে বুঝিতে পা[illegible] ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চিত্র পাঠক-ডাঙ্গার প্রাচীন জমিদার[illegible] [illegible]রিলাম; কিন্তু আজ বাঙ্গালী মাতৃ-রঞ্জনের বিবাহের [illegible]াছে, আত্মসম্মানজ্ঞান লাভ করিয়াছে, আজ বিবাহের [illegible]ত্র বাঙ্গালা হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

লীলাস্তব ও গীতাবলী

সনাতনের এই দশম স্কন্ধের টীকা ১৪৭৬ শকে সমাপ্ত হয়। ইহাই তাঁহার চিরজীবনব্যাপী সাধনার শেষ ফল। ইহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেন। "বৈষ্ণবতোষণীর" বহু স্থলেই তিনি শ্রীভাগবতামৃতে কোন কোনও বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার টীকা দিগ্‌দর্শিনীর কথাও আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এইক্ষণে লীলাস্তব বা শ্রীদশমচরিত এবং গীতাবলীর বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। লীলাস্তব হইতেছে দশম স্কন্ধের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলার বিশেষ বিশেষ ঘটনার বর্ণনা। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান চলিতেছিল—কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থ স্তবমালা গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিন্তু স্তবমালার অন্তর্গত 'গীতাবলী' ও দশমচরিতকে শ্রীরূপের রচিত বলিয়া উহার টীকা প্রণয়ন কালে বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু গীতাবলী সম্বন্ধে বলদেবের সাক্ষ্য প্রমাণসহ নহে। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার "পদামৃতসমুদ্রে" সনাতনের ভণিতাযুক্ত পদাবলীকে শ্রীল সনাতনরচিত বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য বৈষ্ণবদাস 'পদকল্পতরু'তে সনাতনের ভণিতাযুক্ত বহু পদ উদ্ধার ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাঁহার 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে' বহু পদ সনাতনের ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। পদগুলিতে যখন সনাতনের ভণিতা রহিয়াছে এবং তদনুকূলে পদামৃতসমুদ্রকার সুপণ্ডিত শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের সাক্ষ্য রহিয়াছে, তখন সেগুলিকে কিছুতেই শ্রীরূপের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরূপই সনাতনের নামের ভণিতা দিয়া ঐ পদগুলি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যখন পরম প্রামাণিক বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর সে কথা বলেন নাই, তখন আমরা সেই অনুমান গ্রাহ্য করিতে পারি না।

ফলতঃ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীরূপ গোস্বামীর খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত রচনাবলী শ্রীজীব গোস্বামী সংগ্রহ করিয়া, স্তবমালার অন্তর্ভুক্ত করেন। ঐ সময়ে শ্রীল সনাতনের গীতাবলী ও তাঁহার দশমচরিত উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহা শ্রীরূপের রচনা বলিয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ কাহারও কাহারও ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্দিষ্ট দশমচরিতের তাহা হইলে আর সন্ধান মিলে না। এইজন্য গীতাবলী যেমন শ্রীপাদ সনাতনের রচিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই, দশমচরিত সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার তেমনই কোনও কারণ নাই।

আমাদের অনুমান হয়, শ্রীপাদ সনাতন শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বহু পদ পালাবদ্ধ ভাবে রচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে, এখন প্রায় ৫০টি পদ পাওয়া যায়। পদগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও অতি সরল সংস্কৃতে রচিত। ভাষার লালিত্য ও ভাবের মাধুর্য্যে পদগুলি অতি সুন্দর। আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য উহার দুই চারিটি পদ মাত্র এইস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। সুরট।

রাধে! নিগদ নিজং গদমূলম্—
উদয়তি তনুমনু কিমিতি তাপ-কুলমমুকৃতবিকটকুকুলম্। ধ্রু।
প্রচুরপুরন্দরগোপবিনিন্দক, কান্তিপটেলমমুকূলম্।
ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি, সংভৃতমুরসি দুকূলম্?।
অভিনন্দসি নহি, চন্দ্র রজোভরবাসিতমপি তাম্বূলং,
ইদমপি বিকিরসি বরচম্পককৃতমনুপমদামসচূলম্।
ভজদনবস্থিতিমখিলপদে সখি! সপদি বিড়ম্বিততূলম্।
কলিতসনাতন-কৌতুকমপি তব হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলম্।

২। সৌরাষ্ট্রী।

ভামিনি! পৃচ্ছ ন বারংবারং—
হন্ত বিমুহ্যতি বীক্ষ্য মনোমম বল্লবরাজকুমারম্। ধ্রু।

কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজমুপরি চুচুম্বলরঙ্গী,
তেন হঠাদহমভবং বেপথুমণ্ডলসঙ্কুলদঙ্গী ॥
দাড়িমলতিকামনুনিস্তলফলনমিতং সদধে হস্তম্।
তদনুভবাম্যম ধর্ম্মোজ্জলমপি, ধৈর্য্যধনং গতমস্তম্ ॥
অদশদশোকলতাপল্লবময়মতুনুসনাতন শর্ম্মা।
তদহমবেক্ষ্য—বভুব চিরং বত বিস্মৃতকায়িককর্ম্মা ॥

৩। ললিত।

নাকর্ণয়মতিসুহৃদুপদেশম্।
মাধব চাটুপটলমপিলেশম্ ॥
সীদতি সখি! মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্ ॥
নালোকয়মর্পিতমুরুহারম্।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্ ॥
হন্ত সনাতন গুণমভিযান্তম্।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্ ॥

৪। গৌরী।

কুর্ব্বতি কিল	কোকিলকুল	উজ্জল কলনাদম্।
জৈমিনিরিতি	জৈমিনিরিতি	জল্পতি সবিবাদম্ ॥
মাধব! ঘোরে	বিয়োগতমসি	নিপপাত রাধা।
বিধুর মলিন	মূর্ত্তিরধিক	মধিরূঢ় বাধা ॥ ধ্রু।
নীল নলিন	মাল্যমহহ	বীক্ষ্য পুলকবীতা।
গরুড় গরুড়	গরুড়েত্যভি	রৌতি পরমভীতা ॥
লম্বিত মৃগনাভি	মগুরুকর্দ্দম	মনুদীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠ	মপি সনাতন	মনুলীনা ॥

গীতাবলীতে শ্রীপাদ সনাতন যে প্রকার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে গীত মুখ্যতঃ রচনা করিয়াছেন, দশমচরিতেও শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সেই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে তাহা হইতে কোনও লীলা-বর্ণনা আর উদ্ধার করিলাম না।

শ্রীপাদ সনাতনের গ্রন্থাবলীর একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা দ্বারা সেই মহাপণ্ডিত কর্ম্মবীরকে বুঝিবার কিছু মাত্র সাহায্য হইতে পারে। একাধারে এরূপ পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, ভক্তচূড়ামণির আবির্ভাব দেশের অতিশয় সৌভাগ্যবশেই ঘটিয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিশেষ ভাবে পরিচয় প্রদান করা এরূপ অসম্ভব। তথাপি তাহাই যখন তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম, তখন সে বিষয়েও আলোচনার প্রয়োজন।

শ্রীমদনমোহনের আগমন

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীল বজ্রনাভ শ্রীবৃন্দাবনে যে আটটি বিগ্রহ স্থাপন করেন, তাঁহার মধ্যে দুইটি গোপাল-বিগ্রহ ছিলেন—সাক্ষিগোপাল ও মদনগোপাল। সাক্ষিগোপাল বহু দিন হইল ভক্তের প্রতিজ্ঞারক্ষার ছলে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় চলিয়া গিয়াছেন।* সাক্ষিগোপাল শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দিরের সম্মুখে বিরাজ করিতেন।† ব্রজমণ্ডলে মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে সকল বিগ্রহসেবাই লোপ পাইয়াছিল; কোন কোন বিগ্রহ অতি গোপনে কোনও ভক্তগৃহে বিনাড়ম্বরে সেবিত হইতেন। বিগ্রহের জন্য কোনও উৎসব বা আড়ম্বর হইলে মুসলমান শাসকগণ জানিতে পারিয়া সেবককে নানারূপে নির্য্যাতিত, এমন কি কোথাও কোথাও যে প্রাণদণ্ডে পর্য্যন্ত দণ্ডিত করিতেন, আমরা তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

মথুরায় এক চৌবে ব্রাহ্মণের গৃহে মদনগোপাল এইরূপে অতি গোপনে সেবিত হইতেন। চৌবে-গৃহিণী অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি নিজের গর্ভজ পুত্রের ন্যায় অতি যত্নে মদনমোহনের সেবা করিতেন। সনাতন গোস্বামী ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া ঐ চৌবে-পত্নীর গৃহে মদনগোপালকে দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। তিনি ঐ চৌবের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া মদনগোপালের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইলেন এবং মদনগোপালের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মদনগোপাল সনাতনের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া পারিলেন না। পরম বাৎসল্যময়ী চৌবে-পত্নীকে মদনগোপাল অচিরে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "সনাতন নামে যে সাধু আসিয়া থাকেন, আমি তাঁহার নিকটই থাকিব,—আগামী কল্য তিনি আমাকে লইতে আসিলে তুমি আমাকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিও।" চৌবে পত্নী এই আদেশ পাইয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইলেও পরদিন সনাতন গোস্বামী মদনগোপালকে লইতে আসিলে, তিনি ঐ শ্রীবিগ্রহকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন। সনাতন মদনগোপালকে লইয়া যাইয়া ১৪৫৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে

* ইহার বিবরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

† "বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহা দেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়॥"
—চরিতামৃত, মধ্য ৫ম

আদিত্যটীলায় একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মদনগোপালের সেবা আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব হইয়াছিল, কিন্তু তিরোভাবের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার পরমপ্রিয় জগদানন্দ পণ্ডিতকে দিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমি শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছি, সনাতন যেন আমার জন্যে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন।"* সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্য অতি যত্নে যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানই মদনগোপালের সেবায় নিবেদন করিলেন। সনাতন হয় ত' এই মদনগোপালের মধ্যেই তাঁহার চিরাভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। মহাসিদ্ধ ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামী অলৌকিক প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীমন্মদনগোপালের সেবা করিতে লাগিলেন। মদনগোপালও তাঁহার মাধুর্য্যভাবময় সেবায় "মদনমোহনে" পরিণত হইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন ও নানাবিধ লীলায় সনাতনকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যিনি বৈরাগ্যের প্রাবল্যে রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বিরক্ত বৈষ্ণববেশে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তিনি কি করিয়া সেবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিবেন? তিনি দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যে আটা সংগ্রহ করিতেন, তাহাই জলে মাখিয়া হস্তের দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিতেন এবং তাহাই আগুনে সেঁকিয়া, তাহার সহিত ব্রজভূমিতে উৎপন্ন বন্য শাকের অলবণ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ "আঙাকড়ি" ভোগ। এখনও অন্যান্য উপাদেয় ভোগের পূর্ব্বে মদনমোহনকে এই "আঙাকড়ি" ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। সনাতন মদনমোহনকে আনিয়া পরমপ্রেমভরে এই "আঙাকড়ি" ভোগ নিবেদন করিয়া দিয়া তাঁহার প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইতেন।

যাঁহাকে প্রবল মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে—তাঁহাকে এই প্রকার প্রসাদে তৃপ্ত রাখা বুঝি মদনমোহন সঙ্গত মনে করিলেন না। তাই তিনি স্বপ্নে আবদার করিয়া সনাতনকে বলিলেন—"আমার এই অলবণ ভোগে তৃপ্তি হইতেছে না। আমার জন্য একটু ভাল করিয়া ভোগের বন্দোবস্ত কর।" সনাতনও মদনমোহনকে নিতান্ত নিজ জন বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং তিনি নিতান্ত প্রণয়বিশ্রব্ধ বন্ধুর ন্যায় বলিলেন—"আমি এখন সব ছাড়িয়া আসিয়া তোমার জন্য কোন্ মুখে লোকের কাছে উপাদেয় অন্ন, ব্যঞ্জন বা পরমান্ন ভিক্ষা করিব? যদি তোমার ভাল খাইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি নিজেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লও।" তথাস্তু। মদনমোহন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন।

পঞ্জাব দেশস্থ মুলতান নগরে কৃষ্ণদাস কর্পূর নামে এক জন ধনী বণিক্ বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়-কায়স্থ। তিনি বহু পণ্যদ্রব্যপূর্ণ তরণী লইয়া ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ বন্দরে বাণিজ্য করিতেন। তিনি ঐরূপ কয়েকখানি তরণী লইয়া যমুনাপথে আসিতেছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের সন্নিকটস্থ আদিত্যটীলার ঘাটে আসিয়া তাঁহার পণ্যপূর্ণ তরণীগুলি চড়ায় ঠেকিয়া গেল। অনেক চেষ্টায়ও আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া কৃষ্ণদাস তথায় অবতরণ করিলেন এবং ঐ স্থানের কোনও লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—দূর হইতে মদনগোপালের অবস্থান-কুটীরে দীপশিখা দেখিতে পাইয়া তিনি তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময়ে সনাতন সন্ধ্যারতিতে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কান্তি—অলৌকিক প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিয়া বণিক্ তাঁহার পদে প্রণত হইলেন এবং স্বীয় বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। সনাতন তাঁহাকে আশ্বাসদান করিয়া তাঁহাকে মদনমোহনের নিকটে লইয়া গেলেন; বণিক্ সেই অনুপম মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সনাতন বলিলেন—"ইনি সর্ব্বশক্তিময়, ইঁহার ইচ্ছা হইলে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" কৃষ্ণদাস তখন মদনমোহনের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—"ঠাকুর! আমার নৌকাগুলি ছাড়াইয়া দেও। তোমার কৃপায় এবার পণ্যবিক্রয়ে আমার যাহা লাভ হইবে, তাহার দ্বারা আমি তোমার মন্দির-নির্ম্মাণ ও সেবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিব।" এই প্রার্থনার পর কৃষ্ণদাস যমুনার ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অকস্মাৎ যমুনায় প্রবল স্রোতঃ আসিয়া নৌকাগুলিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

সে বার পণ্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণদাসের চতুর্গুণ

* "আমিহ আসিতেছি, কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে॥"
—চৈঃ চঃ, অন্ত্য ১৩।

লাভ হইল। কৃষ্ণদাস বুঝিলেন, মদনমোহনের কৃপায়ই তাঁহার এইরূপ আশার অতিরিক্ত লাভ হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীপাদ সনাতনকে সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং তাঁহারই উপদেশ লইয়া আদিত্যটীলায় শ্রীমদনমোহনের জন্য সুন্দর মন্দির, ভোগমন্দির, জগমোহন ও নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সনাতনের মদনমোহন এই নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কৃষ্ণদাসও মদনমোহনের কৃপাদেশে সনাতনের নিকট দীক্ষিত হইয়া মলতানে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও আর একটি মদনগোপালের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমভরে সপরিবারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীসনাতনের প্রকটকালে এই শ্রীমন্দিরেই মদনমোহনের সেবা হইত এবং এই মন্দিরই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রথম মন্দির। যদিও শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হন, তথাপি শ্রীমদনমোহনই শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপ্রথম বিগ্রহ। আমরা শ্রীরূপের জীবন-কথা আলোচনা করিবার সময়ে শ্রীগোবিন্দদেবের আবিষ্কারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব। যাহা হউক, শ্রীমদনমোহনের এই প্রথম মন্দির আজ ভগ্ন ও বিস্মৃত প্রায়। মদনমোহনের পুরাতন সু-উচ্চ মন্দিরের পার্শ্বস্থ এই মন্দিরটি এখন রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং অতিজীর্ণাংশে কেহ আর সর্পভয়ে সহজে পদার্পণ করিতে চাহে না। এই মন্দিরটি আদিত্যটীলায় প্রাচীরবেষ্টিত চত্বরমধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের নাট-মন্দির দৈর্ঘে ৫৭ ফুট ও প্রস্থে ২০ ফুট, তাহার পশ্চিমে জগমোহন দৈর্ঘে ২০ ফুট ও প্রস্থে ২০ ফুট; ইহার পশ্চিম গাত্রে সংলগ্ন মূল মন্দির। নাটমন্দিরের ছাদ ভাঙ্গিয়া লুপ্ত হইয়াছে, জগমোহনের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মূল মন্দিরের গাত্রে পরগাছা জন্মিয়া মূল মন্দিরও ধ্বংসপ্রায়।*

শ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির—বৃন্দাবন

শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকাশের পূর্ব্বেই শ্রীল গোপাল ভট্ট ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট দুই জনেই ভক্তিশাস্ত্রে প্রবীণ তরুণ যুবক। ইহার মধ্যে গোপাল ভট্ট শ্রীসম্প্রদায়ের বেঙ্কট ভট্টের পুত্র; শ্রীরঙ্গমে শিশুকাল হইতেই তিনি শ্রীসম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার, উৎসব, ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেই শ্রীল সনাতন

* ইহার পরে যশোহরের বসন্ত রায়ের পিতা গুণানন্দ গুহ যখন সুবৃহৎ কারুকার্য্যসমন্বিত মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন শ্রীরূপ-সনাতনের অভাবে শ্রীজীবই ব্রজমণ্ডলের কর্তা—অতএব আমরা শ্রীজীব গোস্বামীর জীবনী প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিব। এই মন্দির আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক অপবিত্র হয় এবং শ্রীল মদনমোহন প্রথমে জয়পুর ও পরে তথা হইতে করৌলীতে নীত হন।

গোস্বামী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন—এদিকে শ্রীল রঘুনাথ ভট্টও শ্রীরূপের স্নেহাশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহাদের দুই জনকে পাইয়া শ্রীল সনাতনের কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। সনাতন পূর্ব্বেই শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃত গ্রন্থ শেষ করিয়াছিলেন, এখন গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সাহচর্য্যে ঐ গ্রন্থের পরিশোধন টীকা প্রণয়নকার্য্য প্রায় শেষ হইল। তৎপরে—সনাতন মহাপ্রভুর আদেশানুসারে যে শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ করচাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উভয়ে মিলিয়া তাহার আলোচনার ফলে সম্পূর্ণাঙ্গ শ্রীহরিভক্তিবিলাস লিখিত হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীভাগবতের দশমের রচনা প্রায় শেষ হয়। সনাতনের তিরোভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই "তোষণী" টীকা রচনা সম্পূর্ণ হয়।

শ্রীমদনমোহন, সনাতনের শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ। ইহা ব্যতীত তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলে আরও অনেক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে শ্রীচরণ পাহাড়ীর নিকটস্থ "শেষশায়ী" নামক গ্রামে যে সুপ্রসিদ্ধ "শেষশায়ী" মূর্ত্তি ছিলেন, তাঁহার যথোচিত সেবার বন্দোবস্ত করেন। এই শেষশায়ী মূর্ত্তির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ শেষশায়ী মূর্ত্তি নারায়ণেরই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন বিশ্ব প্রলয়জলে লয়
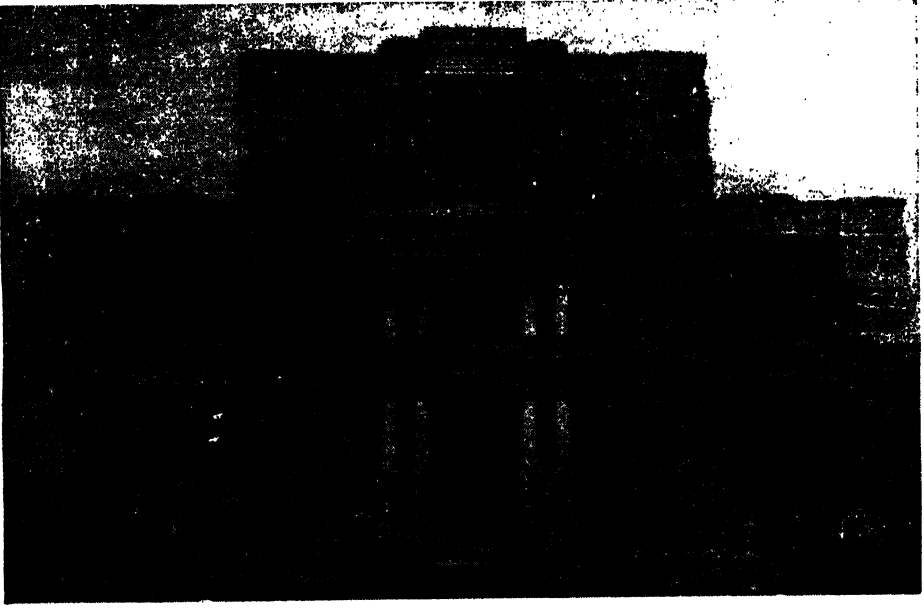
শ্রীগোবিন্দজীউর পুরাতন মন্দির—বৃন্দাবন

টীকা বৃহত্তোষণীরও লেখা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রীমদনগোপাল দেবের শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের পর গ্রন্থ-রচনা কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। শ্রীজীব বৃন্দাবনে আসিলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকা দিগ্‌দর্শিনী ও তোষণী

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আদেশে জয়পুররাজ সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিংহ মদনমোহনের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রতিনিধি বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দির জীর্ণ হইলে ২৪ পরগণা জেলার বহড়ুর নন্দকুমার বসু মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দিরেই এখন প্রতিনিধি বিগ্রহ বিরাজমান।

হইয়াছে, তখন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীনারায়ণ কারণার্ণবে সহস্রশীর্ষাঃ অনন্ত নাগের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিত হন এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকেন। ঐ সময়ে শ্রীনারায়ণের নাভিদেশ হইতে একটি পদ্ম উদ্গত হয় এবং ঐ পদ্মে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই শেষশায়ী সেই শেষশায়ী নহেন।

একদা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা সখীগণসহ এ স্থানে শেষশায়ী লীলার অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণ শেষশায়িরূপে শয়ন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধিকা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহার পাদসম্বাহনে নিরত

হন। এই মূর্ত্তিই "শেষশায়ী" নামে স্থাপিত হইয়া ঐস্থানে বজ্রনাভ কর্ত্তৃক সেবিত হইতে থাকেন। কালক্রমে মুসলমানের অত্যাচারে ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য সেবার লোপের সহিত এই সেবাটিরও লোপ হয়। যখন শ্রীল মহাপ্রভু শ্রীব্রজমণ্ডলে আগমন করেন, তখন তিনি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন—কিন্তু তখন সেবার বন্দোবস্ত ছিল না। শ্রীল সনাতন স্থানীয় ব্রজবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সকলের সাহায্যে এই স্থানে 'শেষশায়ীর' সেবা ও পূজার বন্দোবস্ত করেন। এই স্থানে তদবধি শেষশায়ীর সেবা চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নন্দগ্রামে একটি গোফার মধ্যে শ্রীমন্নন্দ, যশোদা ও শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তখন এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের সেবা লুপ্ত হইয়াছে। পরে শ্রীসনাতন ১৫৬১ শকাব্দে এই সেবার প্রবর্ত্তন করেন।

এইরূপে সনাতন বহু সেবার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; অথচ অতি দীন বৈষ্ণবোচিত স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে ভূষিত গোস্বামিত্রয় নিজনাম প্রখ্যাপনের চেষ্টা না করায় সেই সকল সেবার প্রবর্ত্তন যে তিনি করিয়া গিয়াছেন, ইহা এখন আর জানিবার উপায় নাই। তবে ব্রজমণ্ডলে এখন যতগুলি সেবা প্রচলিত আছে, ইহার অধিকাংশই যে শ্রীসনাতনের দ্বারা পুনঃপ্রবর্ত্তিত—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীসনাতনের মদনমোহন প্রতিষ্ঠার কিছু পরেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ প্রমুখ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন।* শ্রীরূপ গোস্বামীর জীবনকথাপ্রসঙ্গে আমরা শ্রীগোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমে করিতে হইল। যখন শ্রীমদনমোহন প্রতিষ্ঠিত হন, তখন শ্রীরাধিকামূর্ত্তি তৎসহ বিদ্যমান ছিলেন না। শ্রীমদনমোহন ও শ্রীগোবিন্দদেব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ যখন শ্রীপুরীধামে পৌঁছিল, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। উড়িষ্যার অধিপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকুমার শ্রীপুরুষোত্তমদেবও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মদনমোহনের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়াই দুইটি শ্রীরাধিকামূর্ত্তি পাঠাইয়া দেন—কিন্তু ঐ দুই মূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবনের সন্নিহিত হইবার পূর্ব্বেই পূজারি স্বপ্নে দেখিলেন যে, দুইটি মূর্ত্তি আসিতেছেন—তন্মধ্যে একটি শ্রীললিতা দেবীর মূর্ত্তি; উঁহাকে শ্রীল মদনমোহনের দক্ষিণে বসাইতে হইবে আর অন্যটি শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি উঁহাকে বামে বসাইতে হইবে। শ্রীবৃন্দাবনে বিগ্রহদ্বয় আসিলে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হইল। *

শ্রীব্রজমণ্ডলে যতগুলি তীর্থ এখন বিদ্যমান, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপই তাহাদের অধিকাংশের আবিষ্কর্ত্তা। তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শন হইত। অলৌকিক রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাও নানা ভাবে ও নানা রূপে শ্রীল সনাতনের সহিত নানারূপ রহস্যলীলা করিতেন। ভক্তিরত্নাকর ও অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে কয়েকটি লীলার কথা শুনা যায়—আমরা তাহার ২।১টি বর্ণনা করিতেছি।

১। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া আসেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প ছিল। কিন্তু শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দিলেন না, তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রবল বৈরাগ্যের কারণে তিনি অবস্থান করিবার জন্য কুটীরাদি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক মনে করিলেন না। একদিন শ্রীল সনাতন,

---

* শ্রীগোবিন্দদেব পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইলেও শ্রীল সনাতনের শ্রীমদনমোহনের প্রতিষ্ঠার পর—গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে "সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভ" নামক পুঁথির প্রমাণ কি কারণে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা আমরা শ্রীরূপ সনাতনের আবির্ভাব কালের আলোচনায় জানাইয়াছি।

* যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—(৬১ তরঙ্গে)—

মহারাজ শ্রীপ্রতাপ রুদ্রের কুমার। পুরুষোত্তম জানা নামে সর্ব্বাংশে সুন্দর॥ তেঁহ দুই প্রভুর এ সম্বন্ধ শুনিয়া। যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া॥ বৃন্দাবন নিকটে আইলা কথো দিনে। শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে॥ সেবা অধিকারী প্রতি মদনমোহন। স্বপ্নচ্ছলে ভঙ্গিতে কয়য়ে হর্ষমন॥ পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভানে। রাধিকা ললিতা দুই ইহা নাহি জানে॥ আগুসারি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ। ছোট শ্রীরাধিকা মোর বামেতে রাখহ॥ বড় ললিতায় রাখ আমার দক্ষিণে। ইহা শুনি অধিকারী চলে সেই ক্ষণে॥

দাসগোস্বামীকে দেখিতে আসিয়াছেন। দাসগোস্বামী কদম্বখণ্ডীর নিকটে বসিয়া শ্রীরাধিকার লীলা স্মরণ করিতেছেন এবং তাঁহার নয়ন বাহিয়া দরদরধারে অশ্রু নির্গত হইতেছে। তিনি একরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন। শ্রীসনাতন দেখিতে পাইলেন, ঐ সময়ে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র কদম্বখণ্ডীর জলাশয়ে জলপান করিতে আসিয়াছে—পাছে ব্যাঘ্রটি দাসগোস্বামীর দিকে যায় এবং তাঁহার কোনও অনিষ্ট করে, এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকের বেশে একগাছি যষ্টি লইয়া ঐ ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া দিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। রাখালবালকটি ঐ সময়ে সনাতনের দিকে চাহিয়া তাঁহার এই নূতন চাকুরীর কথা বুঝাইবার জন্য দুষ্ট হাসি হাসিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই দুঃখ দেখিয়া শ্রীসনাতন দুঃখিত হইলেন। তিনি দাসগোস্বামীর নিকট এই সমস্ত বিবৃত করিয়া তাঁহাকে কুটীরবাসে সম্মত করাইলেন; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রক্ষার জন্য এইরূপ দুঃখ পাইবেন, ইহা কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? সনাতন গোস্বামী তখন রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী গ্রামের ব্রজবাসিগণকে ডাকিয়া দাসগোস্বামীর জন্য কুটীর নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলেন।

২। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দদেবের বামে শ্রীরাধিকা প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলি নামে শ্রীরাধিকার একটি সুন্দর স্তব রচনা করেন। উহার প্রথম শ্লোকটি এই—

নবগোরোচনা গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতি বেণী ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্॥

অর্থাৎ "শ্রীরাধিকা নবগোরোচনার ন্যায় গৌরবর্ণা, তাঁহার পরিধানের বস্ত্র উৎকৃষ্ট নীলোৎপলের ন্যায়, মণিস্তবক দিয়া সমুজ্জ্বল করিয়া তাঁহার যে বেণী রচিত হইয়াছে, তাহা সর্পের ফণার ন্যায়।" শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীরাধিকার বেণীর এই বর্ণনা শুনিয়া একটু দুঃখিত হইলেন। পরমানন্দময়ী শ্রীরাধিকার বেণীর সহিত সর্পের তুলনা শ্রীসনাতনের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তিনি শ্রীরূপকে জানিতেন—শ্রীমহাপ্রভু যে তাঁহাতে অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতেন। এই জন্য তিনি শ্রীরূপকে ঐ কথা না বলিয়া সন্দেহাকুলচিত্তে শ্রীরাধাকুণ্ডের গোবিন্দঘাটে স্নান করিতে গেলেন। কুণ্ডের জলে নামিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কুণ্ডের উপরিভাগে বৃক্ষতলে বালিকাগণ খেলা করিতেছে। উহার মধ্যে একটি বালিকার পৃষ্ঠলম্বিত বেণী দেখিয়া সনাতনের বোধ হইল, যেন ঐ বালিকাটির পৃষ্ঠে সর্প বাহিয়া উঠিতেছে। ইহা দেখিয়া সনাতন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বালিকাটিকে ডাকিয়া সাবধান হইতে বলিলেন এবং নিজে দৌড়াইয়া সাপটিকে তাড়াইতে গেলেন। সনাতন দেখিতে পাইলেন যে, বালিকাগণ তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া তখনই অন্তর্হিত হইল। তখন সনাতন গোস্বামী বুঝিতে পারিলেন যে, রূপ গোস্বামী শ্রীরাধিকার বেণীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হওয়ায় শ্রীরাধিকা নিজে সখীগণ-সহ দর্শন দান করিয়া সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গেলেন। ঐ সময়ে শ্রীরূপ রাধাকুণ্ডে দাসগোস্বামীর নিকট আগমন করায় সনাতন তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন।

শ্রীল সনাতনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার এই প্রকার লীলার কথা আমরা পূর্ব্বেও ২।১টি বর্ণনা করিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ পরেও দুই একটি বর্ণনার আবশ্যক হইবে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অদ্বৈতবাদী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।"

অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব অচিন্ত্য, তর্কযোগে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে না। ভক্তের সহিত ভগবানের এই সকল লীলা অলৌকিক এবং কোনও যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝা যায় না। যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহারাই ইহা শুনিয়া লাভবান্ হইবেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল্)।

ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণী

(অলৌকিক তত্ত্ব)
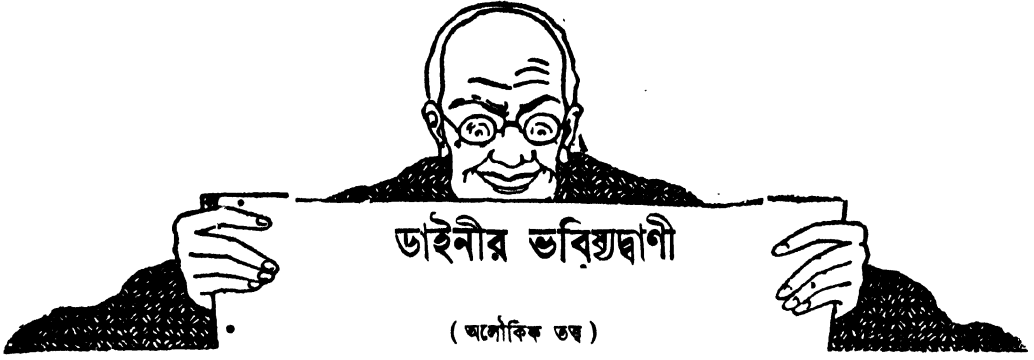
মিঃ জন হার্ভি ইংরেজ। তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশে সরকারের কোন উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মধ্য-ভারতের আদিম অধিবাসিনী ডাইনী অপবাদগ্রস্তা একটি প্রৌঢ়া রমণীর অদ্ভুত শক্তির আলোচনা উপলক্ষে গত মার্চ্চ মাসে লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ মাসিকে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন এবং কৌতুকাবহ বলিয়া 'মাসিক বসুমতীর' পাঠকগণকে তাহার রসাস্বাদন করাইতেছি।

মিঃ হার্ভি লিখিয়াছেন, "তখন গ্রীষ্মকাল; অপগত-মধ্যাহ্নের রৌদ্রও অত্যন্ত প্রখর। সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে যে স্ত্রীলোকটি অনাবৃত মস্তকে ও অবসাদ-শিথিল পদে অতি কষ্টে ধূলিপূর্ণ গ্রাম্য পথে চলিতেছিল, তাহার উভয় হস্ত দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ। ছিন্ন বস্ত্রের অঞ্চল তাহার স্কন্ধ হইতে পুনঃ পুনঃ খসিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু তাহার হস্তদ্বয় রজ্জুবদ্ধ থাকায় সে অতি কষ্টে তাহার স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে সমর্থ হইতেছিল। তাহার চক্ষু দুইটি সর্ব্বাগ্রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। রমণী প্রৌঢ়া; তাহার বয়স অন্যূন ৪৫ বৎসর বলিয়াই আমার অনুমান হইল। ভারতের অধিবাসীরা এই বয়সেই তাহাদের দেশের নারীগণকে বৃদ্ধা মনে করে। এই বয়সেই তাহার মুখমণ্ডলের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইলেও তাহার চক্ষু দুইটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল নেত্রে যন্ত্রণা-চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সেই নারী বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ জনতার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল।

সে ১৯—খৃষ্টাব্দের কথা। আমি এক সপ্তাহের ছুটীতে আমার সহকর্ম্মী বোম্বাই প্রদেশস্থ সি—র সহিত খান্দেশে শিকার করিতে যাইতেছিলাম। সিনাবার নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আমাদিগের গন্তব্যস্থল। এই গ্রামখানি বোম্বাই হইতে দুই দিনের পথ। পুণার পথে অবস্থিত একটি ডাক-বাঙ্গলোতে আমাদিগকে রাত্রিযাপন করিতে হইল। পরদিন অপরাহ্ণে আমরা সিনাবার গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, সেই সময় পথের একটি বেঁক ঘুরিতেই একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। প্রায় পঞ্চাশ জন স্থানীয় লোককে দলবদ্ধ ভাবে চলিতে দেখিলাম। দরবেশের ন্যায় পরিচ্ছদধারী একজন লোক লম্ফনের ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে সেই জনতাকে পরিচালিত করিতেছিল।

সি—আমাদের মোটর-গাড়ী চালাইতেছিলেন; তিনি সেই জনতাকে পথরোধ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গাড়ীখানি পথের এক প্রান্তে সরাইয়া লইলেন; আমাদের 'কার' অচল হইল। আমরা গাড়ীতে বসিয়া সেই শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, দুই তিন জন লোক প্রায় উলঙ্গ; কৌপীন ব্যতীত তাহাদের অঙ্গে অন্য কোন আবরণ ছিল না। তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অবিশ্রান্ত ভাবে ঢোলক বাজাইতেছিল, এবং এই দলের দলপতি নাচিয়া কুঁদিয়া মুখব্যাদান করিয়া প্রাণপণে যে চিৎকার করিতেছিল, তাহাই না কি সঙ্গীত নামে অভিহিত! সেই একঘেয়ে চিৎকার বৈচিত্র্যহীন, এবং কর্ণের পীড়াদায়ক।

সেই সময় উক্ত স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইলাম। তাহার ছিন্ন পরিধেয়-বস্ত্র ধূলিধূসরিত। তাহার রজ্জুবদ্ধ হাত দুইখানির ভার যেন সে আর বহন করিতে পারিতেছিল না। তাহার চক্ষুতে যে হতাশ ভাব লক্ষ্য করিলাম, তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। রমণীর রজ্জুবদ্ধ হাত দুইখানির দিকে চাহিয়া, এবং সেই দুর্ভাগিনী নারী কিরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল তাহা অনুভব করিয়া, আমার সঙ্গী সি—র মুখ-কান্তি অত্যন্ত গম্ভীর হইল। সহসা তিনি আস্তিন গুটাইলেন।

তিনি রমণীকে মুক্তিদান করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, 'আমাদের কিছুই করিবার নাই। যদি আমরা উহাদের কার্য্যে বাধা দানের চেষ্টা করি, তাহা হইলে এই জনতা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া একটা হাঙ্গামা বাধাইবে।'

আমার কথা শুনিয়া বন্ধু বলিলেন, 'তোমার কথা সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহা জিলা-পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের তদন্তের বিষয়।'—অনন্তর তিনি আমাদের গাড়ীর পশ্চাতে উপবিষ্ট আর্দ্দালীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কিরূপ তামাসা আর্দ্দালী!'

আর্দ্দালী ফুজলদার খাঁ এই শোভাযাত্রার কারণ বিবৃত করিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। সে মহা উৎসাহে হিন্দুস্থানী ভাষায় যে সকল কথা বলিল, তাহা হইতে আমরা এইমাত্র বুঝিতে পারিলাম যে, উক্ত জনতা কর্ত্তৃক পরিচালিতা রজ্জুবদ্ধা নারী ডাইনী—এ বিষয়ে উহারা নিঃসন্দেহ হওয়ায়, উহার দেহ হইতে ভূত ভাগাইবার জন্য উহাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করিয়াছে; এবং ডাইনীটা ভবিষ্যতে গ্রামবাসিগণের কোন অনিষ্ট করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে সমারোহে উহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করা হইতেছে। পূর্ব্বেও এই অঞ্চলে ডাইনীগণকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল; সেই সকল ডাইনীর শাস্তির তুলনায় ইহার দণ্ড লঘু হইয়াছে বলিয়াই

মনে হয়। সর্দ্দারের কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল না, কারণ, এই ঘটনার কিছু দিন পরে বোম্বাইএর 'টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে এই জিলারই একটি ডাইনীর শাস্তির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল; গ্রামবাসীরা ডাইনী-অপবাদগ্রস্তা একটি নারীকে আগুনে পুড়াইয়া মারিয়াছিল! তাহার সেই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অতীব লোমহর্ষণ।

জনতা ধীরে ধীরে সেই পথ অতিক্রম করিলে বন্ধু গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের ন্যায় এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, 'এই সকল লোক যে স্বরাজের দাবী করে, ইহাই আশ্চর্য্য!' তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া মনে হইল, যে সকল দেশের নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক কুসংস্কারান্ধ, তাহাদের যেন স্বাধীনতা লাভের কোন অধিকার নাই! কিন্তু কোন্ স্বাধীন দেশের নিম্নস্তরের অশিক্ষিত লোক কুসংস্কারবর্জ্জিত? আমাদের স্বদেশের?

যাহা হউক, কিছুকাল পরে আমরা গ্রাম অতিক্রম করিয়া গরুর গাড়ীর পথ ত্যাগ করিলাম, এবং আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিবির অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

পথিমধ্যে দুই এক স্থানে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। আমাদের মোটর-কারের চাকা একটি নালার বালুকাস্তরের ভিতর বসিয়া গিয়াছিল, এবং এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের পর আমাদের মোটর-কারের দুইটি 'টায়ার' ফুটা হইয়াছিল। এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আমরা একটি আম্রকাননের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই স্থানে আমাদের তাম্বু স্থাপিত হইয়াছিল।

আমরা সন্নিহিত গ্রাম হইতে স্থানীয় এক জন শিকারীকে সংগ্রহ করিলাম। আমরা আমাদের আর্দ্দালী ফজলদার খাঁকে আহার্য্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিয়া, আবলুস-বর্ণধারী এক জন দেশীয় 'গাইড' সঙ্গে লইয়া রাইফেল্স সহ শিকারে বাহির হইলাম।

শিকার-শেষে যখন তাম্বুতে ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমরা একটি কৃষ্ণসার শিকার করিয়া ফিরিলাম; বৃহৎ হরিণ, তাহার মস্তকটি ২২ ইঞ্চি। 'সাহেব লোকে'র নিকট কিঞ্চিৎ টাটকা মাংস লাভের আশায় বিস্তর স্থানীয় লোক তাম্বুর সম্মুখে জটলা আরম্ভ করিল। আমরা তাহাদিগকে জানাইলাম, তাহারা হরিণটির চর্ম্ম উন্মোচন করিয়া, তাহার মাংস টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া দিলে খানিক মাংস বকশিস্ পাইবে।

কোরাণের ব্যবস্থানুসারেই শিকারটিকে 'হালাল' করা হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ফজলদার খাঁ হরিণটার কাঁধের মাংস কাটিয়া নিজের জন্য রাখিয়া দিল, এবং আমাদের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহাও কাটিয়া রাখিল। অবশিষ্ট মাংস সে সমাগত গ্রামবাসিগণকে বিতরণ করিল। সেই মাংস তাহাদের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাহাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল।

মাংস লইয়া, গ্রামবাসীরা দীপ জ্বালিয়া সেই আলোকের সাহায্যে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ফজলদার খাঁ আমাদের জন্য যে মাংস রন্ধন করিয়াছিল, তাহা উপাদেয় হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন শেষ করিলাম। অনন্তর আমরা শয়নের পূর্ব্বে তাম্বুর দ্বারে বসিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলাম।

সহসা তাম্বু হইতে প্রায় ২০ ফুট দূরে অন্ধকারে কি একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম! সেই শব্দ সি—ও শুনিতে পাইয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, 'হরিণটাকে যে স্থানে কাটা হইয়াছিল, সেই স্থানে বোধ হয় শিয়াল আসিয়াছে।'

আমাদের মোটর-কারের মাথার আলোকের সাহায্যে তাম্বু আলোকিত করিয়াছিলাম। যে স্থান হইতে ঐ প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম, ল্যাম্পের আলোক সেই দিকে নিক্ষেপ করিলাম। সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম, যাহাকে শিয়াল মনে করিয়াছিলাম, সে

সঙ্গীতরত গ্রাম্যদলপতি

শিয়াল নহে, সে একটি স্ত্রীলোক! সেই স্থানে হরিণের যে কয়েকখানি হাড় পড়িয়া ছিল, সে সেই হাড়গুলি সাগ্রহে সংগ্রহ করিতেছিল!

স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া সি—মহা বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, 'কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আজ অপরাহ্নে যে স্ত্রীলোকটিকে জনতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতে দেখিয়াছিলাম—এ যে সেই স্ত্রীলোক! এখানে আসিয়া সে হরিণের হাড় সংগ্রহ করিতেছে!'

বন্ধুর কথা সত্য; এ সেই ডাইনীই বটে! কিন্তু সে কিরূপে এখানে আসিয়া জুটিল? মোটর-কারের সেই তীব্র আলোকসম্পাতে সে যেন অভিভূত হইয়াছিল। সে পলায়নের চেষ্টা না করিয়া নিস্পন্দ ভাবে সেই স্থানেই বসিয়া রহিল। সি—তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় কোমল স্বরে বলিলেন, 'উঠিয়া আমার সঙ্গে এস বাঈ! আমরা তোমার কোন

ক্ষতি করিব না ; তুমি মাংস খাইতে চাও, তাম্বুতে বহুং মাংস আছে, ; তুমি যত চাও তাহাই পাইবে।'

সে হরিণের হাড়গুলি দুই হাতে বুকের কাছে চাপিয়া-ধরিয়া তাম্বুর সম্মুখে আসিল, এবং সেখানে বসিয়া-পড়িয়া আতঙ্কবিহ্বল নেত্রে আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

ফজলদার খাঁ স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল। 'সাহেব লোক' এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। কিন্তু আমরা

রজ্জুবদ্ধ ডাইনী গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইতেছে

তাহার বিরক্তি গ্রাহ্য না করিয়া খানিক চা আনিয়া স্ত্রীলোকটিকে প্রদান করিতে বলিলাম। স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত চা পান করিল।

অনন্তর আমি তাহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, তাহার নাম ক্ষমা। ফজলদার খাঁ তাহার দুর্গতির কারণ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহাও জানিতে পারিলাম। তাহাকে ডাইনী অপবাদ দিয়া পীড়ন করা হইয়াছিল; পরে সে ঐ ভাবে গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

এই সকল কথা বলিয়া স্ত্রীলোকটি অবশেষে কাতর ভাবে বলিল, 'আমাকে উহারা এতই মারিয়াছে যে, আমার শরীরের হাড় বেদনায় টন্-টন্ করিতেছে। আজ সারাদিন আমি কিছুই খাইতে পাই নাই।'

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষুর সেই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম। কোন তরুণীর চক্ষুতে যে প্রভা ও মাধুর্য্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় প্রৌঢ়ার চক্ষুতে তাহার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না ; ইহা প্রকৃতই বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া আমার মনে হইল। সে ডাইনী কি না, তাহা আমি তখন আলোচনা-যোগ্য বলিয়া মনে করি নাই ; কিন্তু তাহার চক্ষু হইতে যে জ্যোতিঃ নিঃসারিত হইতেছিল, তাহা আমার মজ্জা পর্য্যন্ত যেন কাঁপাইয়া তুলিল !

সি—তাহাকে বলিলেন, স্থানীয় জনসাধারণ ত তাহাকে সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়াছে,—অতঃপর সে কোথায় যাইবার, কি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে ? তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রীলোকটি বলিল, তাহার প্রহার-ক্লিষ্ট দেহে শক্তি সঞ্চার হইলে সে উদয়পুরে যাইবার চেষ্টা করিবে ; শৈশবকালে সে উদয়পুর হইতেই এই দূর-দেশে আসিয়াছিল।

আমরা তাহাকে খানিক মাংস ও কয়েকখানি চাপাটি প্রদান করিয়া পরদিন পুনরায় আমাদের তাম্বুতে আসিতে আদেশ করিলাম। বিদায় গ্রহণের সময় সে যখন আমাদিগকে সেলাম করিল, তখন তাহার মুখ হাস্যে উজ্জ্বল হইল।

স্ত্রীলোকটি প্রস্থান করিল। সি—তাঁহার পাইপে অগ্নি সংযোগ করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, 'স্ত্রীলোকটির যে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।'

পরদিন প্রত্যূষে আমরা তাম্বু ত্যাগ করি ; ফিরিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। আমাদের সঙ্গী শিকারী আমাদিগকে লইয়া একটা সম্বরের সন্ধানে চলিল ; কিন্তু আমাদের সকল শ্রমই বিফল হইল। আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া এতই ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, টিফিনের পর আর আমাদের নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। সুতরাং অপরাহ্নটা আমরা গল্প গুজবেই কাটাইয়া দিলাম। ক্ষমার কথা সে দিন আমরা দুই জনেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমি আমার ক্যাম্পখাটে পড়িয়া একটু নিদ্রার আয়োজন করিতেছিলাম ; সহসা আমার পাশে আসিয়া কে মৃদু স্বরে বলিল, 'সেলাম সাহেব !'

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম, ক্ষমা আসিয়াছে। আমার অনুমান হইল, সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্যের প্রার্থনায় আসিয়াছে। তাহাকে খাদ্য-দ্রব্য প্রদানের অভিপ্রায়ে আমার আর্দালীকে ডাকিতে উদ্যত হইয়াছি—ক্ষমা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাত তুলিয়া নিষেধ-সূচক ইঙ্গিত করিল। তাহার পর বলিল, 'আপনার চাকরকে ডাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি এই অঞ্চল ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। এই স্থান ত্যাগের পূর্ব্বে আমি সাহেবদের নিকট বিদায় লইব। আপনাদের দয়ার কথা আমি ভুলিতে পারিব না।'

তাহার হাতে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলী দেখিয়া আমার কৌতূহল হইল ; সে কি উপায়ে উদয়পুরে যাইবে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আমার প্রশ্নে সে যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছিল, এই ভাবে বলিল, 'কেন ? হাঁটিয়া যাইব।'

হাঁটিয়া যাইবে ! এই ক্ষীণকায় প্রাণী জীর্ণদেহে প্রায় এক সহস্র মাইল হাঁটিয়া যাইবে ? বিশেষতঃ, সেই দীর্ঘ পথ মরুভূমির ভিতর দিয়া প্রসারিত !

সি—র মনেও ঠিক এই ভাবেরই উদয় হইয়াছিল। কারণ,

তিনি ক্ষমার কথা শুনিয়া পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া, পাথেয় বাবদ তাহাকে দশটি টাকা প্রদান করিলেন।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে ক্ষমা একটা অদ্ভুত কায করিল! সে আমাদের খুব কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের চক্ষুর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'সাহেব দু'জন ক্ষমার প্রতি বড় সদয় ব্যবহার করিয়াছেন; এই জন্য তাঁহাদের একটু উপকার করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছে।'—অনন্তর সে সি—র মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এই সাহেব অতি অল্প দিনের মধ্যে বিলাত যাইবেন, তাঁহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। কিন্তু এই সাহেব (সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার চক্ষুর দিকে চাহিয়া বলিল) এক বার জলপথে বিপদে পড়িবেন; আর একবার মানুষের হাতে তাঁহার বিপদ ঘটিবে। কিন্তু এই দুই বারই নাগ (সর্প) দ্বারা তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে। স্মরণ রাখিবেন সাহেব,—দুই বারই নাগ আপনার জীবন রক্ষা করিবে।'

এই কথা বলিয়াই ক্ষমা চলিয়া গেল।

সি—আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন; তাহার পর বলিলেন, 'স্ত্রীলোকটা কি ভাবিয়া ও কথা বলিল, তাহা ঠাহর করিতে পারিয়াছ কি?'

আমি বলিলাম, 'নাগ শব্দের অর্থ আমরা যাহাকে 'কোব্‌রা' বলি তাহাই, সাধারণতঃ গোখ্‌রো সাপ। কিন্তু গোখ্‌রো সাপ কিরূপে আমার প্রাণ রক্ষা করিবে, আমার জলে ডুবিয়া-মরা বন্ধ করিবে, এবং পরে মানুষের আক্রমণ হইতে সাপই আমার প্রাণরক্ষা করিবে, এ রহস্য বুঝিয়া-উঠা আমার অসাধ্য।'

এই ঘটনার পর আর কোন দিন ক্ষমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

ঠিক এক মাস পরে সি—কে 'ভাইসরয় অফ্ ইণ্ডিয়া' জাহাজে হঠাৎ স্বদেশযাত্রা করিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি ছয় মাসের ছুটীতে স্বদেশ-যাত্রা করিলেন; কিন্তু এই ছুটী তাঁহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব!

জাহাজের জেটিতে তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণের সময় বলিলেন, 'সেই ডাইনীটার কথা তোমার স্মরণ আছে কি? সে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল—আমি শীঘ্রই স্বদেশ-যাত্রা করিব। যোগাযোগটা অদ্ভুত বটে! তোমার 'গোখ্‌রো'র খবর কি?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'এতদিনের মধ্যে একটা হেলে সাপেরও লেজ দেখিতে পাইলাম না, তা গোখ্‌রো!'

এই ঘটনার কিছু দিন পরে ভ্রমণোপলক্ষে আমাকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইতে হয়। কয়েকটি সামন্ত রাজ্য পরিদর্শনের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আমাকে মধ্য-ভারতের ইন্দোর নগরে কিছু দিন বাস করিতে হইয়াছিল। সেই সময় আমি আমার বন্ধু বি—র সহিত উক্ত অঞ্চলের কয়েকটি দর্শনযোগ্য স্থান পরিদর্শন করি। আমার এই বন্ধুটি ইন্দোরের মহারাজার খাস-মহলে চাকরী করিতেন।

একদিন আমি আমার এই বন্ধুর সহিত ইন্দোর হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরবর্ত্তী মহেশ্বর সন্দর্শনে যাত্রা করি। মহেশ্বর নর্ম্মদা নদীর তীরে অবস্থিত; ইহার মন্দিরসমূহ, এবং প্রাসাদগুলির খ্যাতি লোক-মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

একদিন অপরাহ্ণে বি—বলিলেন, স্থানীয় বোটে আমরা সহস্রধারা নামক জলপ্রপাত দেখিতে যাইব। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য না কি অতুলনীয়। কিন্তু এসম্বন্ধে আমার বন্ধুরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। এই স্থানে নর্ম্মদা নদীর বিস্তার প্রায় অর্দ্ধ মাইল, এবং নদীর স্রোতঃ যেরূপ প্রখর, সেইরূপ বিঘ্নসঙ্কুল।

যাহা হউক, নদী সম্বন্ধে স্থানীয় জেলেদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, তাহাদের নৌকাগুলি দেখিতে অত্যন্ত কদাকার হইলেও বিলক্ষণ মজবুৎ এবং নির্ভরযোগ্য। এই সকল নৌকার প্রত্যেকখানি পনের হইতে কুড়ি ফুট দীর্ঘ, এবং পাঁচ ফুট প্রশস্ত। এই সকল নৌকার মাস্তল ও পাল আছে, কিন্তু ভাটিতে যাইবার সময়েই তাহা ব্যবহৃত হয়; উজানে যাইবার সময় দাঁড় ও গুন ব্যবহার করা হয়।

এইরূপ দুইখানি নৌকা আমাদের জন্য মন্দিরের পাষাণ-সোপানে আনীত হইল। জুতা সহ মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া আমি মোজা পরিয়া সোপান-শ্রেণীর নিম্নে অবতরণ করিলাম।

বি—বলিয়াছিলেন, আমরা বৃহত্তর নৌকাখানিতে আরোহণ করিব। তদনুসারে আমি সেই নৌকায় উঠিতে উদ্যত হইলাম। আমি নৌকার কিনারায় এক পা তুলিয়া দিয়াছি, সেই সময় নৌকার খোলের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়াই আতঙ্কে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল! নৌকার খোলের ভিতর কুণ্ডলীকৃত এক প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ!—সাপটা সক্রোধে ফণা তুলিয়া আমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল!

আমি তৎক্ষণাৎ এক লাফে তিন ধাপ উপরে উঠিলাম। তাহা দেখিয়া বি—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?'—তিনি পূর্ব্বেই সেই নৌকায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন।

আমি রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিলাম, 'সর্ব্বনাশ, শীঘ্র নাম। নৌকার খোলের ভিতর প্রকাণ্ড গোখ্‌রো! কুলার মত ফণা, আমাকে ছোবল মারিয়াছিল আর কি!'

আমার কথা শুনিয়া তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ক্ষেপিয়াছ না কি!'—তাহার পর তিনি হিন্দুস্থানী ভাষায় নৌকার মাঝিকে কি বলিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া নৌকার দাঁড়ি-মাঝি সকলেই বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল। তাহার পর মাঝি মাথা নাড়িয়া বলিল, 'নাহিন্ সাহিব! নাগ নাহিন্ হ্যায়।'

আমার পীড়াপীড়িতে বি—দাঁড়ি-মাঝিদিগকে নৌকার আগাগোড়া সর্ব্বস্থান পরীক্ষা করাইতে বাধ্য করিলেন। তাহারা কোনও স্থানে সাপ দেখিতে পাইল না; কিন্তু আমি নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি ধাঁধায় পড়িলাম বটে, কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম না; আমি আর সেই নৌকার ছায়াও মাড়াইলাম না। অতঃপর আমি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিলাম। দাঁড়ি-মাঝিরা আর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, আমি একটি পাগল! বি—ভাবিল, অতঃপর আমি 'ঝোপে ঝোপে ভূত' দেখিব!

আমাদের উভয় নৌকা নিরাপদে জলপ্রপাতের নিকট উপস্থিত হইল। সেই দৃশ্য প্রকৃতই অনির্ব্বচনীয়, সুন্দর। বিশেষতঃ, সন্ধ্যার আলো অন্ধকারের মিলনক্ষণে তাহার সৌন্দর্য্য বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

জলপ্রপাত দেখিয়া যখন আমরা প্রত্যাগমন করিলাম, তখন

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। উভয় নৌকার মাঝি নৌকার মাস্তুলে পাল তুলিয়া দিল। আমাদের বোট স্রোতের অনুকূলে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিল। বৃহত্তর বোটখানি প্রায় চল্লিশ গজ আগে চলিল। ছোট নৌকায় আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম। তাহার পর হঠাৎ সম্মুখে খন্-খন্ ঝন্-ঝন্ শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহত্তর বোটের আরোহিগণের কি হৃদয়ভেদী করুণ আর্ত্তনাদ!

আমাদের নৌকার মাঝি তৎক্ষণাৎ তাহার হা'ল টানিয়া নৌকার গতিরোধ করায় অগ্রগামী নৌকার সহিত তাহার নৌকার ধাক্কা লাগিল না। সেই বৃহৎ নৌকাখানি তখন নদী-স্রোতে উপুড় হইয়া ভাসিতেছিল। তাহার তলায় একটি প্রকাণ্ড ফুকর দেখিতে পাইলাম; বুঝিলাম, মগ্ন-শৈলের সংঘর্ষণেই তাহার এইরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। সেই নৌকার ছয় জন দাঁড়ি-মাঝির মধ্যে দুই জন মাত্র ভাঙ্গা নৌকার কিনারা ধরিয়া নদীর জলে ভাসিতেছিল; অবশিষ্ট চারি জন প্রবল স্রোতে বোধ হয় ভাসিয়া গিয়াছিল।

সেই বিপন্ন লোক দুইটিকে অবিলম্বে আমাদের নৌকায় তুলিয়া লইলাম; কিন্তু অন্ত যে সকল লোক অদৃশ্য হইয়াছিল, সান্ধ্য অন্ধকারে তাহারা যদি দূরে ভাসিয়া গিয়া বা ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে কুম্ভীরের উদরে প্রবেশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই; এই নদীতে অসংখ্য কুম্ভীর আহারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমরা হতাশ হৃদয়ে মহেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলাম।

সেই দিন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া বহু দিন পরে ক্ষমার কথা আমার স্মরণ হইল। তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দু'টি আমার মানসনেত্রে প্রতিফলিত হইল। ক্ষমা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, আমার জলে ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা আছে, কিন্তু নাগ আমাকে রক্ষা করিবে। তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। প্রকৃত ঘটনা আমি লিপিবদ্ধ করিলাম; ক্ষমার এই শক্তির উৎস কি, পাঠক তাহা নির্ণয় করুন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সাপটা ফণা তুলিয়া আমাকে ছোবল মারিতে উদ্যত না হইলে আমি সেই নৌকায় উঠিতে আপত্তি করিতাম না; এবং তাহার কি ফল হইত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আর কেহ সেই নৌকায় সাপ দেখিতে পাইল না, ইহারই বা কারণ কি? ইহা কি আমার মানসিক বিভ্রম? আমি কোন দিন এই রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই। আমার বন্ধু সি—এক মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন, তাহাই বা ক্ষমা কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল? শীঘ্র স্বদেশ-যাত্রার সম্ভাবনা তাঁহার কল্পনারও অগোচর ছিল।

লেখক নৌকায় পা তুলিতেই নৌকার খোলে ক্রুদ্ধ গোখ্‌রো

আমার সম্বন্ধে ক্ষমার দ্বিতীয় দৈববাণী এখনও সফল হয় নাই। সে বলিয়াছিল, মনুষ্য-হস্তে আমার বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু নাগ আমাকে সেই বিপদে রক্ষা করিবে। আমার এরূপ শত্রু কেহই নাই, যে আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে; আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা, ত দূরের কথা! কিন্তু যদি তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়, পাঠকগণ তাহা পরে জানিতে পারিবেন। সেই ভবিষ্যৎ এখন আমার ধারণাতীত।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রহস্যময়ী

তোমারে বুঝিতে আমি পারিনি কো আজো,
নিত্য কি-কি কায লয়ে থাকো—
আমি জানি না কো!
চিনিতে পারি না তব নিত্য নব বেশে,
কখন্ কি ভাবে তুমি সাজো!

এই তব গান গাওয়া—
এই হাসি, এই চাওয়া;
ক্ষণ'পরে সব ভুলে যাও।
কি গান গেয়েছো প্রাতে, আর মনে নাই রাতে,
আন্-মনে অন্য গান গাও!

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মানবের মিত্র কীট

সচরাচর কীট অতি সামান্য প্রাণী বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। লোক কীট-পতঙ্গাদিকে উপেক্ষাই করে, কিন্তু মানব-জীবনের উপর তাহাদিগের প্রভাব যে কত অধিক, তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না। দু'একটি কীট দেখিয়া সেগুলিকে আমরা তুচ্ছ মনে করিতে পারি, কিন্তু প্রাণিজগতে কীটসমষ্টি আদৌ নগণ্য নহে। তাহার সমর্থনে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সমস্ত উচ্চতর প্রাণীর অর্থাৎ মেরুদণ্ডীর—মৎস্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গ, চতুষ্পদ ইত্যাদি —জাতিসংখ্যা (species) প্রায় ২০ হাজার ; এবং অজ্ঞাত মেরুদণ্ডী জগতে প্রায় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু জীব-জগতের নিম্নতর অর্থাৎ অমেরুক শাখাভুক্ত হইলেও কীটবর্গ অন্যূন ৫ লক্ষ জাতি লইয়া গঠিত। তদ্ভিন্ন, কীটশাস্ত্রের অগ্রগতির সহিত প্রতি বৎসরই নূতন নূতন জাতি আবিষ্কৃত হইতেছে। দ্রুত বংশবৃদ্ধি-ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় এবং অনেক জাতীয় কীটের মধ্যে সমাজ ও শ্রমবিভাগ গড়িয়া উঠায় কীটবর্গ যে কোন প্রাণিবর্গের সমকক্ষ হইতে পারে। বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বে উৎপত্তি লাভ করিয়া এবং পরবর্ত্তী অসংখ্য বৃহদাকার পরাক্রান্ত প্রাণিজাতির সহিত জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া কীটপতঙ্গসমূহ এখনও পর্য্যন্ত যে ধরা-বক্ষে বিরাজমান রহিয়াছে, ইহাই তাহার প্রধান সাক্ষ্য। স্বাভাবিক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হইলে এবং বিশেষতঃ মনুষ্য দ্বারা নিরন্তর বিতাড়িত ও বিধ্বস্ত না হইলে কীটবংশ সমগ্র পৃথিবীই অধিকার করিয়া ফেলিত।

আমাদিগের গৃহ, গৃহসজ্জা, আহার্য্য, পরিধেয়, শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং এমন কি, আমাদিগের জীবন—কোনটিই কীট হইতে নিরাপদ নহে। কীটকুল জগৎময় মনুষ্য সমাজের যে ক্ষতি করে, তাহার আর্থিক মূল্য হিসাব করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক ভারতবর্ষেই কীটজনিত ক্ষেত্রজ ও আরণ্য ফসলের ক্ষতি এবং মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর রোগ ও মৃত্যুর নিম্নতম মূল্য ধরিয়া লইলেও দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর এইভাবে দুই শত কোটি টাকার অপচয় হয়। এই সমস্ত কারণে কীট সাধারণতঃ মানবের প্রবল শত্রু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু কীটমাত্রেরই মনুষ্যের অনিষ্ট-সাধন ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম নাই, এরূপ ধারণা যদি করা যায়, তবে তাহা ভ্রান্ত বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। প্রকৃত পক্ষে অদ্যাবধি জ্ঞাত পাঁচ লক্ষ কীটজাতির মধ্যে মাত্র প্রায় তিন শত জাতিকে সাক্ষাৎ কিম্বা পরোক্ষভাবে মানবের অপকার করিতে দেখা গিয়াছে। অন্য দিকে এমন কতক-গুলি কীট আছে, যাহারা সকল সভ্য মানবের পক্ষে প্রায় অপরিহার্য্য। বহুযুগ পূর্ব্ব হইতে মানব তাহাদিগের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে পালন করিয়া আসিতেছে। আমরা এস্থলে মানবের মিত্রস্থানীয় সেইরূপ কয়েকটি কীটের আলোচনা করিতেছি।

কীটজাত খাদ্যাদি

কীট কয়েক প্রকারে মানবের খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। দু'এক স্থলে ইহা নিজেই মনুষ্যের আহার্য্য। আফ্রিকার পঙ্গপাল ইহার একটি উদাহরণ। উক্ত দেশে অনেক অর্দ্ধসভ্য ও অসভ্য জাতি তৃপ্তির সহিত পঙ্গপাল খাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, শস্যের ক্ষতি নিবারণের জন্য যে অগণ্য পঙ্গপাল বিনষ্ট করা হয়, সেগুলিও ফেলা যায় না। বড় বড় কারখানায় স্তূপীকৃত পঙ্গপাল চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে যে পশুখাদ্য ও সার প্রস্তুত হয়, আফ্রিকার নানা অঞ্চলে তৎসমুদয়ের কাটতি যথেষ্ট। পঙ্গপাল ক্ষেত্র ও উদ্যানজাত ফসলের সমূহ ক্ষতিসাধন করে বটে, কিন্তু অরণ্যাকীর্ণ স্থানকে মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়া দেওয়ার পক্ষে ইহারা কম সাহায্য করে না। এরূপ স্থলের অবাঞ্ছনীয় লতা-গুল্মাদি উদরসাৎ করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা

যেরূপে গৃহ প্রস্তুতের ও চাষের জমি তৈয়ারী করিয়া দেয়, তাহাতে মানুষের অনেক সময়, শ্রম ও অর্থব্যয় বাঁচিয়া যায়।

বর্ষাকালে প্রজননের সময় উইপোকাকে ডানা বাঁধিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতে অনেকেই দেখিয়াছেন। এইরূপ ঝাঁক দেখা দিলেই ইহাদিগকে ধরিয়া খাইবার জন্য মাঠে-ঘাটে অনেক প্রকার পশুপক্ষীর সমাবেশ হয়। কোন কোন স্থলে এগুলি মনুষ্যেরও খাদ্য। দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে কতিপয় আরণ্য জাতি এইরূপ কীট সংগ্রহ করে এবং সদ্য সদ্য ভাজিয়া বা পোড়াইয়া খাওয়া ব্যতীত শুঁটকি চিংড়ির মত ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্যও রাখিয়া দেয়।

অনেক কীট কীড়া (Larva) অবস্থায় বেশ মাংসল হয়, যেমন লেবু গাছের পোকা, গুবরে পোকা ইত্যাদি। খাদ্য-রূপে এরূপ কীড়ার পক্ষপাতী কয়েকটি যাযাবর জাতি ভারতে ও চীনে রহিয়াছে। কীট-খাদ্য অবশ্য আদিমজাতি-সমূহের মধ্যেই অধিক প্রচলিত এবং এই অভ্যাস বংশানু-বর্ত্তিতার ফল। বানরও যে কোন কোন প্রকার কীট ভক্ষণ করে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন।

কীট পতঙ্গ যে সকল উপায়ে মানবের খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে, তন্মধ্যে ইহাদের দ্বারা উদ্ভিদের নিষেকক্রিয়া সম্পাদন (fertilisation) সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। একলিঙ্গ পুষ্পের এবং কোন কোন অবস্থায় উভলিঙ্গ ফুলেরও ফল উৎপাদনের জন্য গর্ভতন্তুতে পরাগ-সংযোগ করিয়া দেওয়ার কাযে বায়ু কিম্বা পতঙ্গের মধ্যস্থতা আবশ্যক হয়। আমা-দিগের খাদ্য ও অন্যান্য প্রকারে ব্যবহার্য্য ফসলের মধ্যে কীট-নিষিক্ত উদ্ভিদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

ফসলের যেমন অনিষ্টকারী কীট রহিয়াছে, তেমনি অন্য এমন কতকগুলি কীট আছে, যাহারা অনিষ্টকারী কীটের ধ্বংসসাধন করিয়া পরোক্ষভাবে ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার কীটকে খাইয়া ফেলে, কিম্বা উহাদের দেহে পরজীবিরূপে প্রবেশ করিয়া অবশেষে উহার প্রাণনাশ করে। কীটজগতেও সিংহ-ব্যাঘ্রের ন্যায় মাংসভোজী (carnivorous) প্রকৃতির জীব আছে। ডাইন ফড়িং (praying mantis), ধামসা পোকা, পদ্মকীট (lady bird) প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্থল। কৃষির ক্ষতিকর কীটদেহে উপযুক্ত জাতীয় পরজীবী প্রবর্ত্তন করিয়া উহার ধ্বংস-সাধন আধুনিক ব্যাবহারিক কীট-শাস্ত্রসম্মত কীটনাশের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

কীটোৎপন্ন যে উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে মানুষ আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া আসি-তেছে, তাহা হইল মধু। বন্য মৌচাক সংগ্রহ ব্যতীত জগতের অনেক দেশেই মৌমাছি পালন প্রচলিত রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে মধু দেশবাসিগণের আয়ের অন্যতম আকর। আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া ও কিউবা এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপ তাহার দৃষ্টান্ত। ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, কাশ্মীর, কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে বহুকাল হইতে মৌমাছি-চাষ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী-

ম্যান্টিস বা ডাইন ফড়িং ;—অন্য পোকা ধরিয়া খাইতেছে
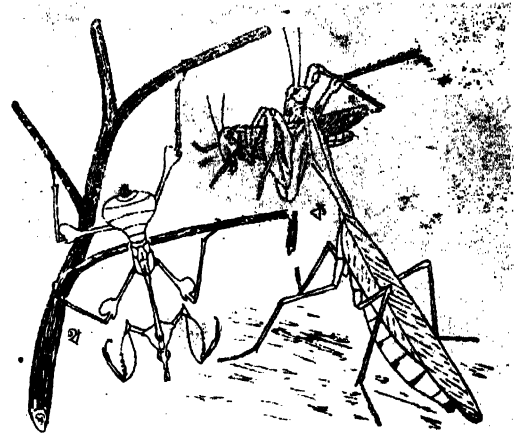
সম্মত মৌমাছিপালন অতি অল্প দিন হইল এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। Apis dorsata, A. florea ও A. indica—এই তিন জাতিই ভারতের প্রধান মৌমাছি; স্থানভেদে এক বা অন্যের প্রাধান্য দেখা যায়। এগুলি সমস্তই বন্য জাতি—যদিও স্থানে স্থানে লোক ইহাদিগকে পালন করে। প্রকৃত গৃহপালিত জাতির উদ্ভব এখনও এ দেশে হয় নাই।

ভারতে মধু ও মধুথ উৎপাদনের কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় না। বন্য জাতিবর্গ ও গ্রামবাসিগণ অনেক পরিমাণ মধু স্বকীয় ব্যবহারে ব্যয় করিয়া থাকে; উদ্বৃত্ত অংশই বাজারে আইসে। বঙ্গদেশে সুন্দরবন ও

মুর্শিদাবাদ জেলায় কতক পরিমাণ মধু সংগৃহীত হয়। বন-বিভাগ মধু ও মোমকে গৌণ আরণ্য ফসলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন ও ঐ সমুদয় সংগ্রহের জন্য ঠিকা বিলি হইয়া থাকে। মধু ও মোম উৎপাদন দ্বারা ভারতবাসীর যেরূপ লাভ হইতে পারে, এখন তাহার অতি সামান্য অংশই হয়। অন্যান্য সুসভ্য দেশের ন্যায় ভারতের গ্রামে গ্রামে মৌমাছি পালন প্রসার লাভ করিলে আমরা নিজ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট রাখিয়াও বিদেশে অনেক মধু চালান দিতে পারি। বিলাতী বাজারে মধুর চাহিদা কম নয়। এক লণ্ডন সহরে বৎসরে নানা দেশ হইতে মোট প্রায় পাঁচ লক্ষ হন্দর মধু আসে।

এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের পদ্মমধু এবং শ্রীহট্ট ও খাসিয়া পর্ব্বতের কমলা-মধু উল্লেখযোগ্য। খাদ্যার্থে ও কোন কোন প্রকার রোগচিকিৎসায় ইহাদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। কিন্তু এরূপ বিশেষ স্বাদ ও গন্ধযুক্ত মধুরও দূর বাজারে সমধিক কাটতির জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করা হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, এগুলি উৎকৃষ্ট ক্যালিফর্ণিয়া দেশীয় মধুর সমতুল্য।

স্বাস্থ্যসংরক্ষণে সহায়তা

কীটজনিত রোগ দ্বারা মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু-পক্ষীর যে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথাপি কতিপয় কীট জাতি যে রোগ-চিকিৎসায় ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণে সহায়তা করে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এরূপ কীটের দুই একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে তেলিনী মক্ষি ও কাচ-পোকা নামে ২।৩ জাতীয় কঠিনপক্ষ পতঙ্গ দেখা দেয়; ইহারা Cantharis ও Mylabris গণভূক্ত এবং গায়ে বসিলে চর্ম্মোপরি ফোস্কা হইয়া যায়। এই সমুদয় কীট ও ইহাদের বীর্য্য Cantharidin ঔষধে ব্যবহৃত হয়। কেশ-বর্দ্ধক বলিয়া প্রসাধন দ্রব্যাদি প্রস্তুতে ইহা সময় সময় স্থান পায়। ব্যবসায় উদ্দেশ্যে এ সকল পতঙ্গ এখনও তেমন সংগৃহীত হয় না, কিন্তু তাহা করিলে দেশীয় ও বিদেশীয় বাজারে কাটতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় কীট সমজাতীয় স্পেনীয়, রুশীয় ও চৈনিক কীটের সহিত সমগুণ-সম্পন্ন।

আর্শুলার উপদ্রবে গৃহস্থমাত্রেই উত্ত্যক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সীমাবদ্ধ হইলেও আর্শুলার সুগুণ আছে। চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে আর্শুলা শুধু সুখাদ্য নয়, ইহার পুনর্যৌবন দান করিবারও খ্যাতি আছে। আর্শুলা হইতে প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক্ Blatta americana হাঁপানির উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায়ও শুষ্ক আর্শুলা-চূর্ণ কোন কোন রোগে মূত্রকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। মাকড়সার জাল রক্তস্রাব রোধ করে; আধুনিক ভেষজবিজ্ঞানেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

কয়েক জাতীয় পিপীলিকার দংশনজনিত তীব্র জ্বালা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন; পিঁপড়ার বিষে Formic Acidএর বিদ্যমানতা ইহার হেতু। Formates ঔষধে ব্যবহৃত হয়, যদিও Formic acid এখন আর পিঁপড়া হইতে নিষ্কাষিত হয় না। এই প্রসঙ্গে মৌমাছিরও উল্লেখ করা যায়। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৌমাছির হুলে যে বিষ আছে, তাহা বাত-রোগ প্রশমনে বিশেষ ফলপ্রদ। শ্রমিক মৌমাছি দ্বারা দংশন করাইয়া কিম্বা উক্ত বিষযুক্ত মলমাদির বাহ্য প্রয়োগ করিয়া (apinisation) আজকাল বাতের চিকিৎসা হইতেছে।

পচা ক্ষতে সময়ে সময়ে কয়েক প্রকার কীট কীড়া (maggot) দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে, ইহারা মাংস পচিয়া জন্মিয়াছে এবং ইহাদের উপস্থিতি বিপজ্জনক। কিন্তু বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় কতিপয় অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইহারা গলিত মাংস ভক্ষণ করিয়া এবং ক্ষতস্থান হইতে আবর্জ্জনাদি অপসারণ করিয়া নূতন মাংসপেশী গজাইবার সুবিধা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত, চিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত বহু সৈনিক এই সকল কীড়ার কৃপায়ই জীবনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মৌচাকে এক জাতীয় পতঙ্গ (Bee-moth) প্রবেশ লাভ করিয়া মৌমাছির সর্ব্বনাশ-সাধন করে। সম্প্রতি মার্কিণ দেশে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, এই পতঙ্গের যক্ষ্মা-রোগবীজ ধ্বংস করার অনন্যসাধারণ গুণ রহিয়াছে। ইহাকে যক্ষ্মা-চিকিৎসায় প্রয়োগের চেষ্টা চলিতেছে।

কীট-পতঙ্গাদি প্রকৃতির নিজস্ব আবর্জ্জনা অপসারক (scavenger)। মানব-বসতির মধ্যে অথবা সন্নিকটে

প্রতিনিয়ত যে সকল আবর্জ্জনা জমিয়া উঠে, তৎসমুদয় কীটকুল ভক্ষণ অথবা অপসারণ না করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস অসম্ভব হইয়া পড়িত। মৃত কিম্বা গলিত উদ্ভিদ্ বা প্রাণিদেহ কিরূপে অবিলম্বে কীটবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে

তুঁত পলু বা রেশম-কীট ;—ডিম, কীড়া, গুটি, পুত্তলি ও পতঙ্গাবস্থা দেখান হইয়াছে

এণ্ডিকীট ;—ডিম, কীড়া, গুটি, পুত্তলি ও পতঙ্গ

হয়। স্বল্প-সময়ের মধ্যেই উক্তরূপ দেহাবশেষের আর কোন চিহ্নই থাকে না। মনুষ্যালয় অপেক্ষা অরণ্যে কীটের এই আবর্জ্জনা পরিষ্কাররূপ স্বাভাবিক কার্য্য স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হয়। গুবরে পোকা, উই, পিঁপড়া, কয়েক জাতীয় মক্ষিকা-কীড়া ইত্যাদি এই শ্রেণীর কীটের মধ্যে অগ্রগণ্য।

শিল্প-বাণিজ্যে প্রভাব

পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীন শিল্প কীটজাত পদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত ব্যাবহারিক কীট মানুষকে প্রচুর সম্পদ্ অর্জ্জন করিতে সহায়তা করিয়াছে, তন্মধ্যে রেশম-

মুগাকীট ;—ডিম, কীড়া, গুটি, পুত্তলি ও পতঙ্গ

তসরকীট ;—ডিম, কীড়া, গুটি, পুত্তলি ও পতঙ্গ

কীট অন্যতম। একাধিক জাতীয় কীট হইতে রেশম সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া পৃথিবীময় শিল্প-বাণিজ্য চলিতেছে। অবশ্য রেশমের মধ্যে তুঁত পোকার রেশমই প্রধান। ভারতে উক্তরূপ রেশম ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় কীট হইতে এণ্ডি, মুগা ও তসর উৎপাদিত হইয়া থাকে। পুরাকাল

হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও ভারতীয় রেশমজাত দ্রব্যের জগতের বাজারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। এখন আর সেদিন নাই, তথাপি এখনও বৎসরে মোট প্রায় ২৬ লক্ষ ২০ হাজার ৪ শত পাউণ্ড রেশম এতদ্দেশে উৎপাদিত হয়। রেশম-শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যাও ১০ লক্ষের কম হইবে না। ভারত ভিন্ন আরও অনেক দেশে রেশম-শিল্পের প্রসার যথেষ্ট। সুতরাং রেশম-কীটসমূহ জগতের কি বিপুল সংখ্যক অধিবাসীর অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

রেশম অপেক্ষা লাক্ষা-কীটের ব্যবহার সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন। পূর্ব্বে লাক্ষা রঙ্গের জন্যই ব্যবহৃত
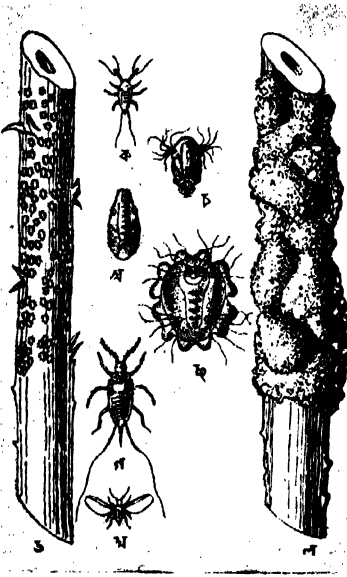
লাক্ষাকীট :—জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও লাক্ষামণ্ডিত প্রশাখা

হইত; উহার রঞ্জন পরে ব্যবহারে আসিয়াছে। লাক্ষা-কীটের বাস ভারতেই আবদ্ধ বলিলে চলে; কারণ, ভারত ব্যতীত কেবলমাত্র শ্যাম ও ইন্দো-চীনেই লাক্ষা পাওয়া যায়। এতদ্দেশ হইতে বৎসরে ২ কোটি টাকা মূল্যের উপরেও লাক্ষা রপ্তানি হয়। লাক্ষা রঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত ব্যবহার হিন্দু-রমণীগণের চিরাদৃত আলতায়। এ ক্ষেত্রেও কৃত্রিম রঙ্গ প্রবেশ করিয়াছে। তবুও দেশমধ্যে এখনও লাক্ষা রঙ্গ প্রস্তুত হয়, যদিও ইহার রপ্তানি বিগত শতাব্দীর তৃতীয়-পাদ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। দেশমধ্যেও নানাবিধ শিল্পে লাক্ষার অনেক কাটতি আছে। লাক্ষা-কীট বন্য বা অর্দ্ধবন্য অবস্থায় উৎপাদিত হয় এবং সেই জন্য অরণ্য ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানবাসী লোক লাক্ষা-সংগ্রহাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

রঙ্গের জন্য আরও একটি কীট বিশ্ববিখ্যাত—উহা কোচিনীল (Cochineal); প্রসিদ্ধ কারমাইন নামক রঙ্গ এই জাতীয় স্ত্রী কীটের মৃতদেহ হইতে নিষ্কাশিত হয়। কোচিনীল কীট মধ্য-আমেরিকার আদিম অধিবাসী। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক ইহা সভ্য-জগতের অন্যত্র প্রচারিত হয়। ইদানীন্তন কৃত্রিম রঙ্গের প্রতি-যোগিতায় কোচিনীলের প্রসার অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে বটে, তবু এখনও উহার চাহিদা কম নয়। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এতদ্দেশে বাৎসরিক প্রায় ২ লক্ষ টাকার কোচিনীল আমদানি হইত। কোচিনীল কীট ফণিমনসা গাছে পালন করা যায়। এক সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ইহা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী রিষড়া প্রভৃতি স্থানে সামান্য চাষও হইত। দুঃখের বিষয় যে, উপযুক্ত উৎসাহ ও চেষ্টার অভাবে কোচিনীল উৎপাদন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

নবীন পল্লবাভ্যন্তরে কোন কোন জাতীয় কীট ডিম পাড়ে; তাহার ফলে উক্ত স্থানে গুটিকা কিম্বা অন্য আকারের স্ফীতাংশ বা Gall দৃষ্ট হয়। কাঁকড়া-শৃঙ্গী ও মাজুফল এইরূপ গলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রঙ্গ ও কষ প্রস্তুতে এবং ঔষধে এই প্রকার গলের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এক সময় মাজুফল কালিপ্রস্তুতের অন্যতম উপাদান ছিল।

মধুর বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মৌচাক হইতে মধুর ন্যায় মোমও পাওয়া যায়, এবং মধু সংগ্রহের সকল বড় বড় কেন্দ্রেই মোম তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মোমবাতি প্রস্তুতে মোম প্রধানতঃ ব্যবহার করা হইত; এখন মোমবাতি কীটজ মোম হইতে প্রস্তুত হয় না। তথাপি অন্যান্য শিল্পে, ধাতব তৈজস-পত্র ও অলঙ্কার, মুদ্রিত বস্ত্র ও ভেষজ-শিল্প ইত্যাদিতে মোমের যথেষ্ট ব্যবহার রহিয়াছে। ভারত হইতে বৎসরে প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকার মোম রপ্তানি হয়। ভারতে মধুর মত মোম উৎপাদনবৃদ্ধিরও যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে।

রমণীগণ সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনার্থ কীটের সাহায্য গ্রহণ

করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। নানা প্রকার বিচিত্র বর্ণের কীট সভ্য-জগতেও সুন্দরীগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইতে দেখা যায়। এতদ্দেশে আরণ্য জাতিরা সুদৃশ্য কীট সংগ্রহ করে; তন্মধ্যে সোনালি আভাযুক্ত গাঢ় নীলবর্ণের সোনা-পোকা নামক কীটের পক্ষই কপালে টিপের জন্য সমধিক ব্যবহৃত হয়! সভ্য মহিলাসমাজে টিপ-পরাপ্রথা বিরল হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু দূর-পল্লীগ্রামে এখনও লোপ পায় নাই। হায়দ্রাবাদ ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে এক প্রকার মূল্যবান্ বস্ত্রে সোনালি-রূপালি কাযের ন্যায় উজ্জ্বল শোভনীয় বর্ণের কীটপক্ষেরও কায করা হইয়া থাকে। তফাৎ হইতে দেখিলে এগুলি রত্নখচিত বস্ত্র বলিয়া মনে হয়। স্বাভাবিক কীট বা কীটাংশেরও নকল দ্রব্য আজ কাল বাজারে প্রচলিত হইয়াছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

পথচারী

কাটোয়ার ঠিক অজয়-নদীর তীরে
ছিল আমাদের বাসা,
ভরা যৌবন, ভরা নদী আর ছিল—
বুক-ভরা ভালবাসা।
অশথের সারি তখনো হয় নি বুড়া,
দেখা যেত দূরে ঝাউয়ের ঝালর চূড়া,
শিশু বকুলের বুকে পিক্ বুলবুলি
শুনাতো বনের ভাষা।

তাহার পরেই বহু দূর চট্টলে—
পরীর পাহাড় পর,
উড়ন্ত পাখী প্রিয়ার সহিত পুনঃ
পাতিল আবার ঘর।
সাগরের নীল দিগন্ত নীলে মিশি
চক্ষে মোদের জাগিত যে দিবানিশি,
নিম্নে নিবিড় সবুজ শোভার ভিড়,
—উপরে নীলাম্বর।

বারাসত হতে গিয়াছিনু বীরভূমে
কান্দী হতে গেছি কাঁথি,
কভু চলিয়াছি ঢাকা হতে লালবাগ
প্রিয়া ছিল মোর সাথী।
ভ্রমণ করেছি নদীয়াচাঁদের দেশে
তখনো কালের তুষার জমেনি কেশে,
ছোট ছোট সুখ হাসি ও অশ্রু দিয়ে
জীবনের মালা গাঁথি'।

কভু মাপায়েছি মেঘনা নদীর চর,
বিপদের মাঝখানে,
ময়মনসিংএ দাঙ্গা করেছি রোধ
হিন্দু মুসলমানে।

কোথাও বাজার, কোথাও বিদ্যালয়
স্থাপন করেছি দেয় ক্ষীণ পরিচয়,
দেশনেতা নই তবুও দেশের হিত
সাধিয়াছি মনে-প্রাণে।

ভূধর সাগর নগর পল্লী মাঠে
ঘুরিয়াছি কত বেশে,
কতই নিন্দা, ততোধিক সুখ্যাতি—
সহিয়াছি ভালবেসে।
আপন হয়েছে কত যে অচেনা পর,
লভিয়াছি প্রীতি মমতার নির্ঝর,
দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ পথের স্মৃতি—
চক্ষে আসিছে ভেসে।

কভু মনে পড়ে চণ্ডীদাসের ভিটা
সে গড়-মন্দারণ,
কখনো সুদূর কামাখ্যা-মন্দির
চঞ্চল করে মন,
ইছাই ঘোষের দেউলের কথা ভাবি,
অতীত পথের নূতন নূতন দাবী,
হর্ষ এবং বিষাদের আলো-ছায়া
আসে যায় ক্ষণে ক্ষণ।

জীবনের এই সায়াহ্নে বসি আছি
নাতি-নাতিনীর মাঝ
উঁকি মেরে যায় কত আধ-ভোলা গীতি
কত আধ-গড়া কায।
নূতন দেশেতে এখন নূতন শ্রোতা
যাহা বলি তারা সবাই ভাবে উপকথা,
পিঁজরাপোলেতে করিছে রোমন্থন
উচ্চৈঃশ্রবা আজ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[রহস্যোপন্যাস]

প্রথম প্রবাহ

রঙ্গালয়ে নরহত্যা

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় 'অর্কিয়ম' তখন দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ। সুবেশধারী যুবক এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা তরুণীরা এক এক স্থানে দল বাঁধিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে, এবং তুচ্ছ কথায় উচ্চহাস্যে বান্ধবীদলে রসিকতা প্রকাশ করিতেছে। কেহ বা কোন পরিচিত ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া গ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে শুভ্র দন্তশ্রেণী উদ্‌ঘাটিত করিতেছে, অথবা সঙ্ক্ষিপ্ত কথায় সম্ভাষণ চলিতেছে।

রঙ্গালয়ের বাহিরে নানা আকারের কার, ট্যাক্সি-ক্যাব বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত বিভিন্ন বয়সের নর-নারী-গণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামাইয়া দিয়া সেই জনারণ্য হইতে বহির্গমনের পথ খুঁজিতেছে। সেই অল্পপরিসর স্থানে কত গাড়ী যে সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারায় নিরুপায় ভাবে হা-হুতাশ করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। আরোহিপূর্ণ নূতন নূতন গাড়ী সেই শকট-ব্যূহ ভেদ করিয়া সম্মুখে 'অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে।

নূতন নূতন উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়ের জন্য 'অর্কিয়ম' রঙ্গালয় লণ্ডনের রঙ্গালয়সমূহের মধ্যে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জ্জন করিলেও অন্য একটি কারণে নাট্যরসলিপ্সু নর নারীগণ ইহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অভিনেত্রী সমাজের অলঙ্কার, বিখ্যাত অভিনেত্রী বেটি সেমুর নূতন নূতন নাটকের নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 'অর্কিয়ম' রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতেন। যেদিন এই রঙ্গালয়ের হ্যাণ্ডবিলে বা প্রাচীর-পত্রের বিজ্ঞাপনে অভিনেত্রীগণের নামের শীর্ষ-স্থানে বেটি সেমুরের নাম বিঘোষিত হইত, সেদিন অর্কিয়মে তাঁহার অভিনয় দেখিতে গিয়া স্থানাভাবে অনেক দর্শককেই ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে ফিরিতে হইত। আমরা যে রাত্রির কথা বলিতেছি, সেই রাত্রিতে বেটি সেমুর একখানি নূতন নাটকের নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতে নামিয়াছিলেন; এই জন্যই সেই রাত্রিতে দর্শকের ভীড় এত অধিক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও তাঁহার মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রোতৃবর্গের শ্রবণবিবরে সুধাসিঞ্চন করিত; বিশেষতঃ হাস্যরসপূর্ণ নাটকের অভিনয়ে তাঁহার সমকক্ষ অভিনেত্রী ইংলণ্ডে দ্বিতীয় ছিল না। এই জন্যই তিনি সে দিন অভিনয় করিবেন শুনিয়া লণ্ডনের অভিনয়দর্শন-লোলুপ সকল স্তরের নর-নারী অর্কিয়মের প্রেক্ষাগৃহের দ্বারদেশে বিপুল জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের ঘটনার কথা লিখিতেছি, তাহার ছয় মাস পূর্ব্বেও বেটি সেমুরের নাম লণ্ডনের নাট্যরসিক-গণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। যে সকল অজ্ঞাতনামা নাচ-ঘরের মালিক নর্ত্তকীর দল লইয়া মফস্বলের গ্রামে গ্রামে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় দেখাইত, বেটি সেমুর প্রথমে সেই সকল দলে অভিনয় করিয়া যৎসামান্য অর্থোপার্জ্জন করিতেন; কিন্তু এই সকল ভ্রাম্যমান রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। যে সকল রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীগণের প্রায় সকলেই অভিনয়কার্য্যে অপটু, সেই সকল রঙ্গালয়ে যোগদান করিলে প্রতিভা সাধারণতঃ উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বেটি সেমুরের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন অতীব-বিস্ময়-কর! আমাদের দেশের অনেকে বোধ হয় মিঃ ডিলম্যানের নাম শুনিয়াছেন; তিনি ভ্যারাইটি এজেন্টের কায করিতেন। কোন গুণবতী অভিনেত্রীর সন্ধান পাইলে চা-বাগানের আড়কাটীর মত তাহাকে তিনি মুঠায় পুরিতেন; এক দিন তিনি কোন পল্লীগ্রাম হইতে লণ্ডনে যাইতেছিলেন, কয়েক

মিনিটের জন্য তিনি ট্রেণ ধরিতে পারিলেন না। সে দিন সেই গ্রামে একটি ভ্রাম্যমান রঙ্গালয়ে একখানি গীতিনাট্যের অভিনয় হইতেছিল শুনিয়া সময় কাটাইবার জন্য তিনি অপেরা দেখিতে চলিলেন। তিনি সেই নাট্যমঞ্চে বেটির অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। তিনি এই শ্রেণীর একটি অভিনেত্রীরই সন্ধান করিতেছিলেন। তিনি সেই দিনই বেটির সহিত চুক্তি করিয়া নিজের দলে তাঁহাকে টানিয়া লইলেন।

তাহার পর অতি অল্প দিনেই বেটির খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে বৃটেনের নাট্য-সমাজ মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইল, বেটি অভিনেতৃ-সমাজে 'অপূর্ব্ব আবিষ্কার'।

বেটি যে দিন সর্ব্বপ্রথম লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে একখানি নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করিলেন, সেই দিনই লণ্ডনের প্রধান প্রধান রঙ্গালয়ের পরিচালক তাঁহাকে দলে গ্রহণের জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু চতুর ডেলম্যান পূর্ব্বেই তাঁহাকে তিন বৎসরের চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এজন্য সকলেরই সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

যাহা হউক, 'অর্কিয়মে' অভিনয় আরম্ভ হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ধূসরবর্ণ একখানি ক্ষুদ্র 'কার' হইতে একটি যুবক নামিয়া আসিয়া রঙ্গালয়ের সম্মুখীন হইলেন। এই যুবককে দেখিলে মনে হইত, তাঁহার বয়স পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। তাঁহার চোখ-মুখ দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারিত না যে, তাঁহার বয়স ঐরূপ অধিক হইয়াছিল।

এই যুবক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট, তাঁহার নাম রিচার্ড ষ্ট্রীট; কিন্তু সাধারণতঃ তিনি 'ডিক' নামে পরিচিত ছিলেন। আমাদের দেশে নীলমণির ডাক-নাম যেমন নীলু, ভজহরি যেমন ভজা, ও-দেশে সেইরূপ রিচার্ড 'ডিক', উইলিয়ম 'বিল', এলবার্ট 'বার্টি' প্রভৃতি। রিচার্ড অত্যন্ত জেদী কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া পুলিস কমিশনার হইতে ইয়ার্ডের সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার নাম দিয়াছিল—'একগুঁয়ে ডিক'।

এই সময়ের প্রায় আট মাস পূর্ব্ব হইতে এক দল দস্যু গভীর রাত্রিতে লণ্ডনের নানা স্থানে ডাকাতি করিত বলিয়া এই দস্যুদল লণ্ডনের সর্ব্বত্র এবং সমাজের সকল স্তরে 'মিডনাইট গ্যাং' নামে পরিচিত হইয়াছিল। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-পুলিস বহু চেষ্টাতেও এই দস্যুদলকে দমন করা দূরের কথা—তাহাদের সন্ধান পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট রিচার্ডের হস্তে এই দস্যুদলের দমনের ভার অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এই দলের দলপতির টিকি স্পর্শ করিতে পারেন নাই।

ডিক ষ্ট্রীট এই দস্যুদলের সন্ধানে নানা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সে দিন তিনি 'অর্কিয়ম্' থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, উক্ত দস্যুদলের সন্ধান লওয়াই তাঁহার পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিনি উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন; বিশেষতঃ, বেটি সেমুরের অভিনয় সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি উচ্চ ছিল; উক্ত রঙ্গালয়ে তাঁহার আগমনের ইহাই প্রত্যক্ষ কারণ। তবে তিনি যে বেটির অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা তিনি অন্যের নিকট স্বীকার করিতেন না।

ডিক ষ্ট্রীট যে সময় রঙ্গালয়ের বহির্দ্বারে পদার্পণ করিলেন, তখন অভিনয়ারম্ভের অধিক বিলম্ব ছিল না। অতঃপর তিনি কি করিবেন তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় 'বক্স' আফিসের অদূরে দণ্ডায়মান দুই জন ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে যাহার বয়স অধিক, তিনি দীর্ঘকায়, মুখ লোহিতাভ। তাঁহার মাথার দুই চারিটি কেশ পাকিয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, এবং তাহাতে রসিকতার আভাস সুস্পষ্ট; তিনি ডিকের সম্মুখে হাতখানি প্রসারিত করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "এত বিলম্ব করিয়া ফেলিলে! আমরা ত তোমার আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম।"

ডিক বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বিলম্বের কারণটা একদম গদ্যভাবাপন্ন, অর্থাৎ আমার কলারের বোতামটা ফেরারী আসামীর মত নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়া বহু চেষ্টায় তাহাকে হাতে পাইয়াছি—এই জন্যই এত বিলম্ব।"

অপরাধের রিপোর্টার (crime-reporter) ফ্রাঙ্ক ট্রেসি মেগাফোনের নিকট দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে হাসিলেও তাঁহার প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইল।

ডিক ষ্ট্রীট পূর্ব্বে টিকিট সংগ্রহ করিয়া না রাখিলেও সৌভাগ্যক্রমে একটি 'বক্সে' স্থান পাইলেন। তিনি একাকী থিয়েটার দেখিতে আসিবেন এরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, এজন্য তিনি ফ্রাঙ্ক ট্রেসি ও হাওয়ার্ড কারফাক্সকে তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বন্ধুদ্বয়ের হাতে তেমন কোন জরুরী কায না থাকায় তাঁহারা তাঁহার সহিত অভিনয় দর্শনে সম্মত হইয়াছিলেন।

আসনে উপবেশন করিবার পর কারফাক্স ডিককে বলিলেন, "তুমি কায ফেলিয়া থিয়েটারে আসিয়াছ দেখিয়া চক্ষুকে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে একটু কঠিন হইয়াছে। আমি যখনই তোমাকে বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তখনই তুমি আমাকে ঠেলিয়া-ফেলিয়া বলিয়াছ, কায ফেলিয়া তোমার উঠিবার ফুরসৎ নাই। কিন্তু আজ?"

ডিক বলিলেন, "ফুরসৎ কি আজই ছিল? তবে কথা কি জান? কুঁজোর চিং হইয়া শুইবার সখের মত ডিটেক্‌টিভ বেচারাদেরও একটু-আধটু স্ফূর্ত্তি করিতে ইচ্ছা হয়।"

কারফাক্স বলিলেন, "অর্থাৎ পেয়াদারও শ্বশুরবাড়ী যাইবার সখ হয়! কিন্তু কেবল কি অভিনয় উপভোগ করিয়া স্ফূর্ত্তি করিবার আশাতেই এখানে আসিয়াছ? 'মিড্‌নাইট' দলের সন্ধান লইবার জন্যও কি তোমার আগ্রহ নাই?"

ডিক বলিলেন, "আগ্রহ ত যথেষ্টই আছে, কিন্তু সে আগ্রহ পূর্ণ হইবার উপায় কি?"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "সে দলের কি আর কোন সংবাদই পাও নাই?"

ডিক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আর কোন সংবাদ নাই।"

কারফাক্স বলিলেন, "তাহারা একদম ডুব মারিয়াছে; ইহার কারণ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

ডিক অবজ্ঞাভরে মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, ডুব মারিয়াছে; কিন্তু তাহাতে মৌলিকতার অভাব নাই। তুমি বোধ হয় জান না, দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহারা রিজেন্ট ষ্ট্রীটের ফিনিগানের ধনভাণ্ডার লুঠ করিয়া এক লক্ষ পাউণ্ডের হীরা-জহরৎ সহ প্রস্থান করিয়াছে।"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "পুলিস তোমরা, নরমের যম; কিন্তু শক্তের কাছে ঘেঁসিতে সাহস কর না। তাহাদের সন্ধানই পাও না, তা ঘেঁসিবে কি? ঐ সকল হীরা-জহরৎ উদ্ধার করিবে—সে আশা নাই।"—অতঃপর তিনি চেয়ারখানা একটু ঘুরাইয়া লইয়া তাহাতে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "তাহারা খুব চতুর আদমী; চতুর না হইলে কি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ বাহিনীর চক্ষুতে ধূলা দিয়া এত দিন লুকাইয়া থাকিতে পারিত?"

ষ্ট্রীট বলিলেন, "তাহারা যে চতুর, ইহা আমি স্বীকার করি না, চতুর তাহাদের দলপতিটা। দলপতির কি নাম, তাহা আমরা বহু চেষ্টাতেও জানিতে পারি নাই; তবে শুনিয়াছি, সে তাহার অনুচরগণের নিকট মিঃ 'মিড্‌নাইট' নামে পরিচিত। সাধারণতঃ মধ্যরাত্রিতেই সে বিষয়কর্ম্মে বাহির হয় বলিয়া তাহার এই ছদ্মনাম কি না, কে জানে? আমি তাহাকেই ধরিবার চেষ্টায় আছি। তাহার অনুচরগুলা কি মানুষ? পালের গোদাটা ধরা পড়িলে, তাহারা ত ফাঁসের দিকে অমনই গলা বাড়াইয়া দিবে।"

কারফাক্স এ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "লোকটা কে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পার নাই?"

ডিক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আট মাস পূর্ব্বে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার অধিক কিছুই জানিতে পারি নাই। আমরা এই মাত্র জানিয়াছি—তাহার নাম এবং মস্তিষ্ক উভয়ই বর্ত্তমান। তাহার দলের দুই জন দস্যু ধরা পড়িলে তাহাদিগকে জেরা করিয়া কিছুই জানিতে পারি নাই। তাহারা বলিয়াছিল, তাহাদের দলপতির সহিত কোন দিন তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু তাহাদের এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? তুমিই ত সেই দুই জন আসামীর পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছ, তাহাদের কথা কি সত্য?"

হাওয়ার্ড কারফাক্স তখন লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার; ফৌজদারী মামলা-পরিচালনে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি।

তিনি ডিকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "হাঁ; আসামীদ্বয়ের অনুকূলে মামলা চালাইবার ভার আমিই পাইয়াছি।"

ডিক বলিলেন, "উহাদের পক্ষে তোমাকে নিযুক্ত করিল কে? কথাটা কয়দিন হইতেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম।"

কারফাক্স বলিলেন, "বক্‌ম্যান এণ্ড কীল নামক এটর্ণী কোম্পানীর মিঃ বক্‌ম্যান। লণ্ডনের ইহারা খ্যাতনামা এটর্ণী, বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত।"

ডিক বলিলেন, "কিন্তু কাহার আদেশে তাঁহারা তোমাকে নিযুক্ত করিলেন ? ও আদেশ নিশ্চিতই কেহ দিয়াছে।"

ব্যারিষ্টার একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "অবশ্যই দিয়াছে। যে দিন আসামী গণ্টার ও লার্চকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করা হয়, তাহার পরদিন সকালে উঁহারা আমাকে কৌন্সিলী নিযুক্ত করিবার উপদেশ-সহ যে পত্র পাইয়াছিলেন, সেই পত্রের সঙ্গে আমার 'ফি' বাবদ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল ; সেই পত্রখানি টাইপ-করা, কিন্তু পত্রে প্রেরকের নাম-ঠিকানা কিছুই ছিল না।"

ফ্রাঙ্ক ট্রাসি এ কথা শুনিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "পত্রে নাম-ঠিকানা না থাকিলেও সেই পত্র যে মিঃ মিড্‌-নাইটের নিকট হইতেই আসিয়াছিল, ইহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।"

ডিক বলিলেন, "আমারও সেইরূপ বিশ্বাস।"

ফ্রাঙ্ক বলিলেন, "মিঃ মিড-নাইটএর সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে পার, তাহা হইলে আমাকে তাহা জানাইতে ভুলিও না। 'ম্যাগাফোনে' আমি তাহা লিখিবার ভার পাইয়াছি। ম্যাগাফোন-সম্পাদক এই ভার সম্পূর্ণরূপে আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।"

ডিক বলিলেন, "আমরা তাহা জানিতে পারিলে নিশ্চিতই তোমাকে জানাইব।"

অতঃপর অরচেষ্ট্রা থামিলে রঙ্গালয়ের যবনিকা উত্তোলিত হইল। ষ্ট্রীট বন্ধুবর্গ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ষ্ট্রীট অভিনয় দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তখন তিনি ঘোর অন্যমনস্ক। অবশেষে বেটি সেমুর অভিনয় করিতে আসিলে ষ্ট্রীট তাঁহার অভিনয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া ষ্টেজের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। চুরি-ডাকাতির কথা তিনি বিস্মৃত হইলেন ; স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কথাও আর তাঁহার স্মরণ রহিল না। তিনি সেই রূপসী তরুণীর সুগঠিত দীর্ঘ দেহ আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বেটি সেমুর পুরুষের পরিচ্ছদে অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন। সুদৃশ্য সান্ধ্য পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে চমৎকার মানাইয়াছিল। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ডিকের শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যেন মোহ উপস্থিত করিল।

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে বেটি সেমুরের সহিত ডিক ষ্ট্রীটের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

তাহার পর বহুবার নানা উপলক্ষে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। দুই দিন তিনি বেটিকে সঙ্গে লইয়া 'ডিনার' করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ডিকের ধারণা হইয়াছিল, বেটি কেবল অপরূপ রূপবতী নহেন, তিনি সুরসিকা, এবং তাঁহার সাহচর্য্য কাম্য।

বেটি সম্বন্ধে ষ্ট্রীটের প্রকৃত মনোভাব কি, তাহা বিশ্লেষণ করিবার জন্য কোন দিন তিনি মনস্তত্বের আলোচনা করেন নাই। কিন্তু একথা সত্য যে, তিনি উপর্য্যুপরি কয়েক সপ্তাহ তাঁহাকে না দেখিলে কি যেন অব্যক্ত অভাব অনুভব করিতেন, এবং তাঁহার সহিত দেখা করিবার উপলক্ষ খুঁজিতেন, আর উহা তাঁহার আন্তরিক দৌর্ব্বল্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন।

বেটি সেমুরের অভিনয় শেষ হইলে নাটকের প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়িল ; দর্শকগণের করতালিধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ যেন কাঁপিতে লাগিল। কারফাক্স উঠিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন, "চল, বাহিরে গিয়া শুক্‌নো গলা ভিজাইয়া লই।"

বন্ধুগণ 'বক্স' ত্যাগ করিয়া পান-ভোজনের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই সময় ডিক অদূরবর্ত্তী জনতার ভিতর একটি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলেন। ডিক তাঁহার সঙ্গিগণের নিকট কয়েক মিনিটের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া, জনতা ঠেলিয়া সেই পরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে চলিলেন।

লোকটি দীর্ঘকায়, দেহ স্থূল ; ভদ্রলোকের মতই চেহারা। আগন্তুক সুরুচিসঙ্গত সান্ধ্যপরিচ্ছদে সজ্জিত ছিল।

ডিক তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। লোকটি চমকিয়া উঠিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল ; ডিকের মুখের দিকে চাহিয়াই মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আত্ম-সংবরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল। সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ডিক বলিলেন, "গুড্‌-ইভ্‌নিং কর্ণেল! অভিনয় উপভোগ্য বলিয়া মনে হইল কি ?"

'কর্ণেল' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডিকের মুখের দিকে চাহিয়া যেন তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমার সন্দেহ হইতেছে, আপনি মানুষ ভুল করিয়াছেন, মহাশয়! আমি ত আপনাকে—"

ডিক কর্ণেলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে চেনেন না—এই কথা বলিতেছেন? কিন্তু আপনার এই চালাকী নিষ্ফল।"

কর্ণেল কিঞ্চিৎ বিরক্তিভরে বলিল, "চালাকী?"

ডিক বলিলেন, "চালাকী শব্দটিতে আপনার আপত্তি থাকিলে, আমি বলিব 'ভান'। আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই, এইরূপ ভান করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া-পড়িতে পারিবেন, এইরূপ আশা করিয়াছেন কি?"

কর্ণেল কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "দেখুন মিঃ ষ্ট্রীট, আমি এখানে কিঞ্চিৎ আমোদ উপভোগ করিতে আসিয়াছি; এ সময় আপনার ন্যায় সতর্ক গোয়েন্দা কোন গুপ্ত অভিসন্ধিতে আমার অনুসরণ করিয়া আমাকে পাঁচ রকম জেরায় বিব্রত করিবেন—ইহা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি নাই।"

ডিক হাসিয়া বলিলেন, "এই জন্যই আপনি প্রথমে আমাকে আমোল দিতে চাহেন নাই? তা আপনি আমোদ উপভোগ করুন, আমার তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না; কিন্তু আপনার ন্যায় চতুর তস্কর বিনা-অভিসন্ধিতে কেবল চক্ষুকর্ণের তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যেই রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা হঠাৎ কি করিয়া বিশ্বাস করি?"

এই কথা বলিয়া ডিক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একদল মহিলাকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহাদের দেহে বহুমূল্য হীরা-জহরতের অলঙ্কার শোভা পাইতেছিল। ডিকের সন্দেহ হইল, সেই সকল মহিলার অলঙ্কারগুলির উপরেই কর্ণেলের নজর ছিল, তাহার 'অভিনয় উপভোগ' উপলক্ষ মাত্র।

ডিককে সেই সকল মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া কর্ণেলও সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল, এবং ডিকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা সত্য নহে, মিঃ ষ্ট্রীট! আমি এখন সাধু হইয়াছি; সত্যই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছি। আমার এ কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন।"

ডিক অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ও কথা আপনি অন্যকে বলিবেন; আমি আপনাকে চিনি কি না।"

কর্ণেল বলিল, "কিন্তু আমি সত্য কথাই আপনাকে বলিয়াছি। আজ এই রাত্রিকালে আমি বিষয়কর্ম্মের সন্ধানে এখানে আসি নাই।"

ডিক বলিলেন, "তবে আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন? আপনি যে হঠাৎ রঙ্গালয়ের অভিনয়ের পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহাই আমাকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আপনার ও-কথা বিশ্বাস করা যে আমার অসাধ্য, কর্ণেল!"

কর্ণেল বলিল, "তবে আপনি বিশ্বাস করুন, কৌতূহল বশতঃই আজ রাত্রিকালে আমাকে এই রঙ্গালয়ে আসিতে হইয়াছে।"

ডিক প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে কর্ণেলের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া বলিলেন, "কৌতূহল? কিরূপ কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আপনাকে এখানে আসিতে হইয়াছে, তাহা কি শুনিতে পাইব না?"

কর্ণেল অস্ফুট স্বরে বলিল, "আজ অভিনয়ের সময় এখানে কি কাণ্ড ঘটে, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি। কোন-একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিবে, ইহা আমার জানা আছে; কিন্তু সেই কাণ্ডটা কি, তাহাই জানিতে চাই।"

ডিক তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন, এখানে কোন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিবে; কিন্তু সেই কাণ্ডটি কি, তাহা আপনি জানেন না বলিলেন। আপনার এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। কথাটা আপনি পরিষ্কার করিয়া বলিবেন কি?"

কর্ণেল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আমি এখনও তাহা জানিতে পারি নাই, তবে আমি তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছি বটে;—কারণ, নানা প্রকার জনরব আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহা হইতে আমি কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিতে চাহি না। জনরবের কথা আপনার না শুনাই ভাল।"

ডিক বলিলেন, "কিরূপ জনরব, তাহা বলিতে আপনার আপত্তি কি?"

কর্ণেল কথাটা উড়াইয়া-দেওয়ার চেষ্টায় তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "জনরবের কি কোনও মূল্য আছে? তবে হাঁ, আমি জানিতে পারিয়াছি, আজ রাত্রিকালে এই রঙ্গালয়ে কোন সঙ্গীন ব্যাপার ঘটিবে। কিন্তু সেই ব্যাপারটা কি, তাহা সত্যই আমি জানি না, মিঃ ষ্ট্রীট! তাই তাহা দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছি। যখন তাহা ঘটিবে, তখনই বুঝিতে পারিব—সে কি ব্যাপার!"

ডিক তাহার মুখ হইতে কথাটা বাহির করিয়া লইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কর্ণেল তাহা জানিত না বলিয়াই হউক, বা তাহা প্রকাশ করিতে তাহার আপত্তি থাকাতেই হউক, তিনি তাহার নিকট আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। অগত্যা তিনি তাঁহার বন্ধুগণের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হওয়ায় বসিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মন অশান্তিতে পূর্ণ হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন। কর্ণেলের কথাগুলি দুর্ব্বোধ্য রহস্যপূর্ণ বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল। তিনি মনে মনে সেই সকল কথারই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ডিক যাহার সহিত আলাপ করিলেন, সে তাহার পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট 'কর্ণেল' নামে অভিহিত হইলেও তাহার প্রকৃত নাম 'অল মার্কন্।' তাহার চেহারা ও ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে তাহাকে 'মিলিটারী' বলিয়া ধারণা হইত, সকলে তাহাকে সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করিত; এই জন্য সে 'কর্ণেল' খেতাব লাভ করিয়াছিল। লোকের হীরক-রত্নালঙ্কার অপহরণ করাই তাহার পেশা ছিল; এবং সে সময় লণ্ডনে তাহার ন্যায় চতুর 'জহরৎ চোর' দ্বিতীয় ছিল না। কিন্তু চোর বলিয়া কোন দিন তাহাকে ধরা পড়িতে হয় নাই।

ডিক অবশেষে এই সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া অভিনয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কে বেট সেমুরের কোন ভূমিকা ছিল না। রঙ্গমঞ্চে অন্য যাহারা অভিনয় করিতেছিল, তাহাদের অভিনয় ডিকের প্রীতিকর হইল না, তাহা নিতান্ত একঘেয়ে বলিয়া তাঁহার বিরক্তিজনক হইল। অবশেষে যখন দ্বিতীয় অঙ্কের পর যবনিকা পড়িল, তখন তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তৃতীয় অঙ্কে কে কি অভিনয় করিবে, তাহা জানিবার জন্য তিনি 'প্রোগ্রাম' দেখিতে লাগিলেন।

তিনি জানিতে পারিলেন, অতঃপর দুই জন নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন করিবে। তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইলে রঙ্গমঞ্চের দীপালোক নিষ্প্রভ করা হইল; ব্যাণ্ডের বাদ্যধ্বনিও কোমল হইল।

অতঃপর সহসা এরূপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল যে, সমগ্র লণ্ডনের অধিবাসিবর্গ—সকল সমাজের পুরুষ ও রমণী তাহার আলোচনায় যোগদান করিয়াছিল; দুই দিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের নর-নারীবর্গের মুখে অন্য কথা ছিল না।—সহসা ভীষণ শব্দে একটা পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ রঙ্গালয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। কে যেন দর্শকগণের বক্ষে সবেগে হাতুড়ী ঠুকিল।

পিস্তলের গর্জ্জনধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডের বাদ্য নীরব হইল। সহস্রাধিক দর্শকের কণ্ঠ হইতে যুগপৎ আতঙ্ক-ধ্বনি নিঃসারিত হইল—যেন গ্রীষ্মের নিস্তব্ধ প্রদোষে সহসা উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে শত শত বৃক্ষের শুষ্ক পত্ররাশি এক-সঙ্গে ঝরিয়া পড়িল।

ডিকের অদূরবর্ত্তী 'বক্স' হইতে ফ্রাঙ্ক উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি ব্যাপার?" কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই রঙ্গালয়ের আলোকরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ব্বাপিত হওয়ায় রঙ্গালয় গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে দর্শকগণের আসন হইতে মিশ্র কণ্ঠের বিচিত্র কলরোল উত্থিত হইল এবং অন্ধকারের মধ্যেই সান্ধ্য-পরিচ্ছদে সজ্জিত এক জন লোক দ্রুতবেগে অর্কেষ্ট্রা রেলের অভিমুখে ধাবিত হইল।

সে দর্শকগণের কলরোল ডুবাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "যিনি যেখানে বসিয়া আছেন, অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া থাকুন; কেহই আসন ছাড়িয়া উঠিবেন না, কেহই বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিবেন না। যদি দর্শকগণের মধ্যে ডাক্তার কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি দয়া করিয়া উঠিয়া আসুন। তিনি আমার নিকট আসিলে উপকৃত হইব। যে ভদ্রলোকটি 'এ' বক্সে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলী বর্ষিত হইয়াছে।"

ডিক ষ্ট্রীট তৎক্ষণাৎ তাঁহার 'বক্স' হইতে সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নিদাঘ-সন্ধ্যার মেঘকান্তির ন্যায় গম্ভীর হইল। তিনি অস্ফুট স্বরে কি বলিলেন, তাহা অন্যের কর্ণগোচর হইল না।

কর্ণেল যে ঘটনার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা এই ভাবে সংঘটিত হইল! ইহা যে ঘটিবে, তাহা কি সে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিল? এই দুর্ঘটনার সহিত তাহার কি কোন সংস্রব ছিল?

কে ডিকের এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠা—স্বামীজীর তিরোভাব

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ভারত-প্রত্যাবৃত্ত স্বামী বিবেকানন্দ সিংহলের কলম্বো সহরে অবতরণ করিয়া যে অভিনন্দন লাভ করিলেন, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব—তেমনই হৃদয়স্পর্শী। কলিকাতা হইতে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী-শিষ্য সদানন্দ এবং ব্রহ্মচারী কানাই (নির্ভয়ানন্দ) তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, মাদ্রাজ হইতে তাঁহার ভক্তগণও সকলে সেখানে গমন করেন। তিনি যে পথে আসিবেন, সেই পথে বহু তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গমনকালে তাঁহার মস্তকে পুষ্প ও গঙ্গাজলমিশ্রিত গোলাপ-জল বর্ষিত হইতেছিল। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলে সমবেতভাবেই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তিনি এইভাবে কলম্বো, কাণ্ডী, অনুরাধাপুরম্ অতিক্রম করিয়া ভারতের পম্বোমে অবতরণ করেন। তথা হইতে রামনাদ, মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী ও কুম্ভকোণম্ পার হইয়া তিনি মাদ্রাজ সহরে উপনীত হইলেন। সমস্ত পথে তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে হইল। রামনাদের রাজা তাঁহার 'জীবকে শিববোধে সেবার' উপদেশ শুনিয়া পরদিন তাঁহার আগমন উপলক্ষে সহস্র সহস্র দরিদ্রকে ভূরিভোজন করাইয়াছিলেন।

স্বামীজী মাদ্রাজ সহরে পদার্পণ করিলেন, মাদ্রাজের নাগরিকবর্গ তাঁহাকে বহুমান প্রদান করেন। এখানে তাঁহাকে দেশীয় ও বিদেশীয় ভক্তগণের পক্ষ হইতে বহু অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়। ইহার মধ্যে খেৎরীর রাজার অভিনন্দনপত্র ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়ম জেমসের (William James) অভিনন্দন-পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজে তিনি নয়দিন যাপন করেন, এবং সেই সময় বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের প্রথম বক্তৃতা—"My Plan of Campaign,—আমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী।" মাদ্রাজে ভবিষ্যৎ ভারতের জাগরণের প্রথম স্পন্দন লক্ষিত হয় এবং সেই জনগণ-জাগরণ অদ্যাবধি পুনরায় নিদ্রালস হয় নাই। নিত্য নব নব দেশহিতকর কর্ম্মে তাহা আত্ম-নিয়োগ করিতেছে। এই হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতে নব জাতীয়তার (Nationalism) প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মাদ্রাজ হইতে জাহাজে স্বামীজী কলিকাতায় আগমন করেন, এবং এখানেও তিনি বহু সম্মান সহকারে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাজা রাধাকান্তের ভবনে তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে অভিনন্দন-পত্র প্রদানের জন্য বহু সহস্র নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতৃগণ প্রথম প্রথম তাঁহার প্রচারিত জীবসেবা আর্ত্ত-সেবা প্রভৃতি বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এতদিন নির্জ্জনে গোপনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও উপদেশ চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ কর্ম্ম-কোলাহলে লাফাইয়া পড়িতে তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরুষ-প্রবর স্বামী বিবেকানন্দের বিরাট ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে তাঁহা-দিগকে তাঁহার মতাবলম্বী হইতে হইল। তাঁহারা অবিলম্বে ধারণা করিলেন, শ্রীঠাকুর স্বামীজীর ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছেন, তিনিই তাঁহাকে কার্য্যপ্রেরণা প্রদান করিতেছেন। এ সকল কর্ম্মে এ-দেশীয় ও বিদেশীয় সকল ভক্ত বেশ মিশিয়া গেলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া বেদান্ত-ধর্ম্মপ্রচারের এক কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার পর স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত আর্ত্তগণের সেবার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। জনহিতকর ও সেবামূলক কার্য্য এইভাবে এ দেশেও আরম্ভ হইল।

স্বামীজীর শরীর এ দিকে দিনে দিনে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। তিনি একটি কর্ম্মিসঙ্ঘ সংগঠনের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট না হইলে এলোমেলো ভাবে কোন কার্য্যই অধিক দিন চলিতে পারে না। সেই জন্য ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে শ্রীঠাকুরের গৃহী ও ত্যাগী সমস্ত ভক্তকে ভক্ত বলরামের
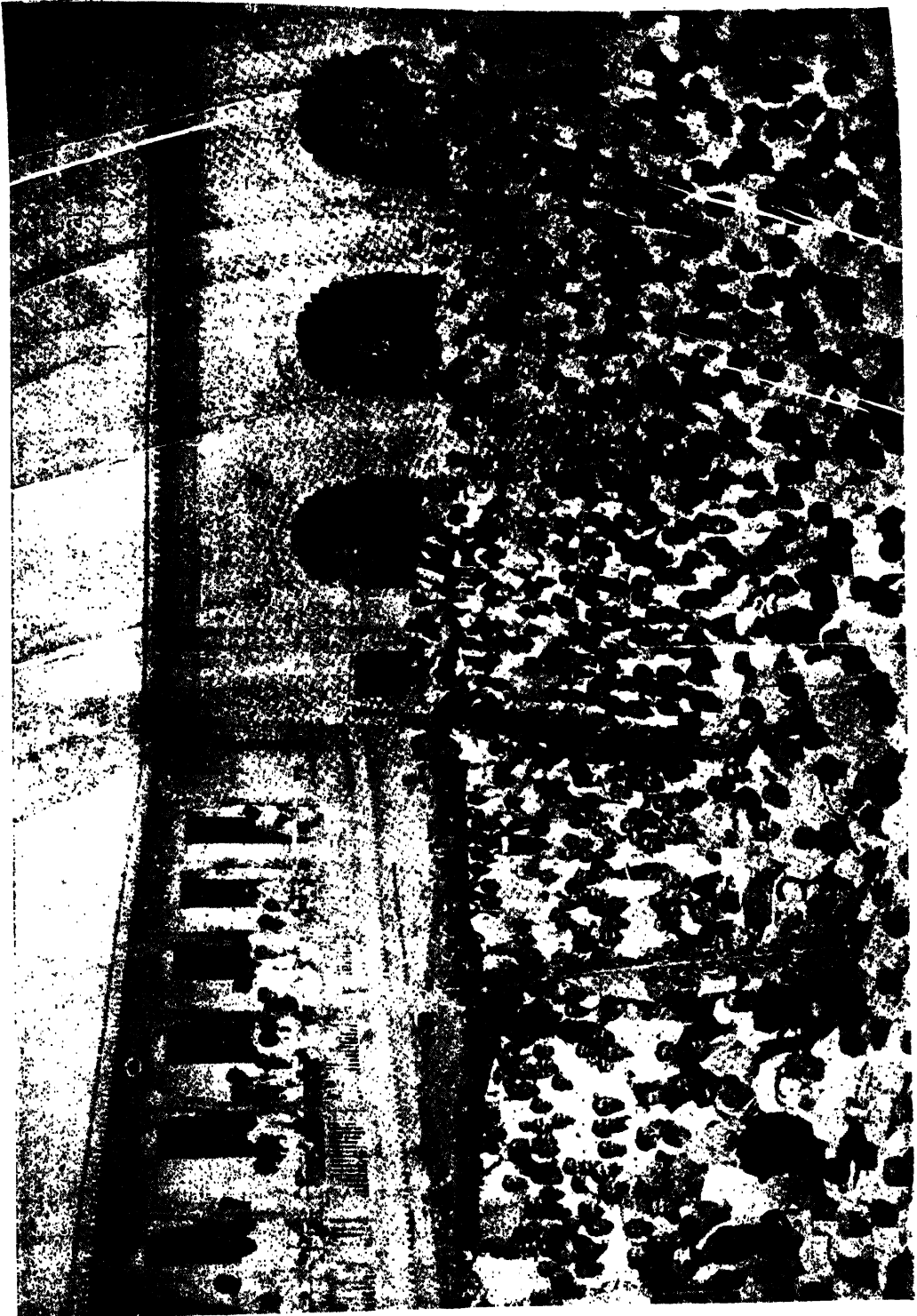
রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের গৃহপ্রাঙ্গণে স্বামীজীর অভিনন্দন-সভা

গৃহে আহ্বান করা হইল, এবং সামান্য বাদানুবাদের পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হইল সর্ব্বধর্ম্মভাবলম্বীদিগের মধ্যে একতা-সংস্থাপন; বেদান্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ—মাদ্রাজ

প্রচারের জন্য ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদিগকে ত্যাগ, তপস্যা ও যথাযোগ্য শিক্ষা দ্বারা প্রস্তুতকরণ। সঙ্ঘকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল, এবং তাহাদের নাম হইল শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাস—মাদ্রাজ
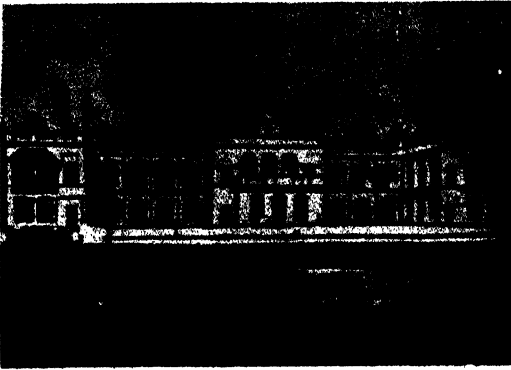
ও শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন। প্রথমাংশের উদ্দেশ্য হইল, ভারতের বিভিন্ন নগরে মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা—যে স্থান হইতে সন্ন্যাসী কর্ম্মী পাওয়া যাইবে; এবং দ্বিতীয়াংশের উদ্দেশ্য—ভারতের ভিতরে ও বাহিরে প্রচারক প্রেরণ করা,—যাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মাদর্শ ও কর্ম্মজীবন দ্বারা ভারত ও বিদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ধর্ম্মভাবের মিলন-সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন। সর্ব্বোপরি স্থির হইল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত রাজনীতির কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবে না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মঠ ও কলিকাতা-কেন্দ্রের মিশনের 'প্রেসিডেন্ট' বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। প্রথম প্রথম প্রতি রবিবার বলরামের বাড়ীতেই সঙ্ঘের অধিবেশন হইতে লাগিল। সমস্ত সন্ন্যাসী, গুরুভ্রাতৃগণ ও কতিপয় গৃহী ভক্ত মিশনের প্রাথমিক সদস্য নিযুক্ত হইলেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ মঠের তথা মিশনের সদস্য হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য আম
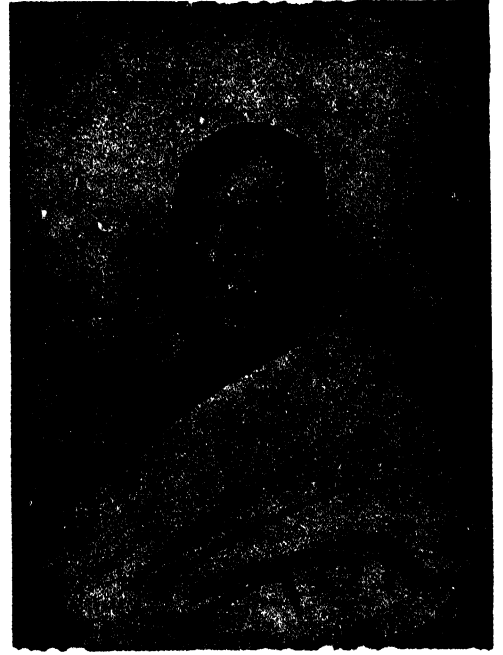
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

খাওয়া—বাগানের আমগাছের ডালপাতার হিসাব করা নয়। ভগবানকে ভালবাসাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়। ঠাকুরের মর্ম্মী ভক্ত ও শিষ্যগণ তাহাই শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, নির্জ্জনে গোপনে ভগবানের ধ্যানে আপনাদের জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিবেন, এই ছিল তাঁহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা। এমন সময়—স্বামীজী প্রতীচীর কর্ম্মপ্রবণতা লইয়া আসিয়া রামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপন করায় অন্যান্য গুরু-ভাই প্রথম প্রথম মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "গেঁড়ে ডোবাতেই

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী যোগানন্দ

দল বাঁধে"—যে মন সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিতে চাহে বা পারে, সেখানে দল নাই—সবই আপন। স্বামীজীও প্রথম প্রথম ধ্যান-সমাধিই সন্ন্যাসি-জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য মনে করিয়া-

বলরাম বসুর বাড়ী

ছিলেন; কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে কাশীপুরে বিশেষ করিয়া এ ভাব ত্যাগ করিতে বলিয়া যাহাতে সর্ব্বজীবে নারায়ণ বোধ হয়, সেই ধারণাই শ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া নির্দ্দেশ দান করায় নরেন্দ্রও তখন বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেই নরেন্দ্রই এখন জনসেবা, শিববোধে সর্ব্বভাবে জীব-সেবাই—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিতে গুরু-ভ্রাতৃগণকে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, কেবল নিজের নিজের মুক্তির চেষ্টা—স্বার্থপরতা। তাহার পরিবর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যপূর্ব্ব ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাণী জগতের লোকসমাজে উপস্থাপিত করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। নিজ জীবনের কামনাহীন কর্ম্ম আচরণের সাহায্যে জীবের সেবা করিতে পারিলে সেব্য ও সেবক উভয়েই ধন্য হইবেন—এইরূপে সমগ্র বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম, ভাব ও প্রেম প্রচারিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইহাই করিতে চাহে—ইহাই Practical religion বা সজীব ধর্ম্ম। যে ঠাকুর নিজের সমাধি অবস্থা হইবার সময় মনকে নিম্নস্তরে রাখিবার জন্য মা'র নিকট সমাধি যেন না দেন এইরূপ প্রার্থনা করিতেন এবং 'আমি জল খাবো' 'আমি তামাক খাবো' 'আমি বাহ্যে যাবো' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিতেন—যাহাতে মন

উচ্চস্তরে উঠিয়া না যায় ; কারণ, মন যদি নিম্নস্তরে থাকে, তবেই ভক্ত সঙ্গে আলাপ উপদেশ দান চলিতে পারিবে —যিনি অপরের জীবনের নৈতিক কল্যাণ কামনা করিয়া ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও এইভাবে মধ্যে মধ্যে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার যাঁহারা অন্তরঙ্গ ও শিষ্য—যাঁহাদিগকে তিনি আপনার জন বলিতেন—তাঁহারা কি না নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে ধ্যান, জপ লইয়া আবদ্ধ থাকিলেন আর সমগ্র জগৎ দুঃখ-দারিদ্র্যের তামসিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিল, তাহা

স্বামী অখণ্ডানন্দ

দেখিয়াও তাঁহারা অঙ্গুলী হেলন করিবেন না! ইহাই কি প্রভুর আবির্ভাবের অর্থ ও উদ্দেশ্য? স্বামীজীর এই ভাবের কথা ও বক্তৃতা শুনিয়া গুরুভাইগণ আর বিশেষ ভাবে তাঁহাকে বাধা দিতে পারিলেন না। তিনি ত তাঁহাদের সহজ দলপতিই ছিলেন, তাঁহার কথায় ও কার্য্যে নিজেদের মত দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুপ্রেরণা নিজেরা অনুধাবন করিতেও বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাবের বৈষম্যের বিবাদ মিটিয়া গেল। সকলেই স্বামীজীর আজ্ঞা দ্বিধাশূন্যচিত্তে পালন করিতে লাগিলেন।

সেবা-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমশঃ তাহা ব্যাপক হইতে আরম্ভ করিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অনাথ বালক সংগ্রহ করিয়া ঐ জেলার সারগাছিতে এক অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মঠ হইতে দুই জন সন্ন্যাসী তাঁহার সাহায্যার্থ আসিলেন। ক্রমে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল অনাথ, লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে তাঁতির, ছুতারের, দর্জ্জীর কার্য্য ও রেশম-কীট পালনের জ্ঞান ও প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীত দিনাজপুরে এক দুর্ভিক্ষের সাহায্য-কেন্দ্র খুলিলেন, এবং তাহার কার্য্য ক্রমশঃ বহু গ্রামে প্রসারিত হইল। এইরূপে দেওঘরেও সাহায্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বেলুড়ে ভবিষ্যৎ স্থায়ী মঠের জন্য ১৫ একর (৪৫ বিঘা) জমী ক্রয় করা হইল, এবং বৈশাখ হইতেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে তাহার গঠন-কার্য্য আরম্ভ হইল। যাহা কিছু সম্বল তাঁহাদের হাতে ছিল, তাহা এইরূপে নিঃশেষিত হইয়া গেল, অথচ এই সময় কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হওয়ায় মঠের সন্ন্যাসিগণ এই সকল রোগীর সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময় স্বামীজী দার্জ্জিলিং হইতে সত্বর কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, এবং কোন প্রকারে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী সিষ্টার নিবেদিতা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকেও এই সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। প্লেগের উপশম না হইয়া ক্রমশঃ তাহা প্রবলতর হইল এবং বর্ষাধিক কাল তাহা প্রবল থাকায় কার্য্যও বর্ষাধিককাল চলিল। নিবেদিতা, স্বামী শিবানন্দ, সদানন্দ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সেই কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন নিবেদিতাই এই কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব-ভার পাইলেন। মাদ্রাজে শশী মহারাজের কার্য্য ব্যাপকভাবে চলিতেছিল। স্বামী শিবানন্দ এই সময়ে সিংহলে গমন করিয়া বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেবা ও ধর্ম্মপ্রচার উভয় কার্য্যই যুগপৎ এইভাবে চলিতে লাগিল।

এই সকল সেবা-কার্য্যের মধ্যে স্বামীজীও স্থির ছিলেন না, ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তাঁহার প্রচারকার্য্যের বিরাম ছিল না।

স্বামী ত্রিগুণাতীত

মিসেস ওলী বুল

তিনি কিছু দিন দার্জ্জিলিং ও কিছু দিন আলমোড়ায় বিশ্রাম করিবার পর আবার উত্তর-ভারত ভ্রমণে বাহির হইলেন। স্বামীজী পঞ্জাব ও কাশ্মীর ভ্রমণ করিলেন, এবং সেখানে ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে বহু বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

এ দিকে মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে শেষ হইল। শ্রীঠাকুরের নামে উৎসর্গীকৃত এই মঠে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী ঠাকুরের মূর্ত্তি (ফটো) প্রতিষ্ঠিত হইল। মঠটি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দেই আইনসঙ্গত-ভাবে
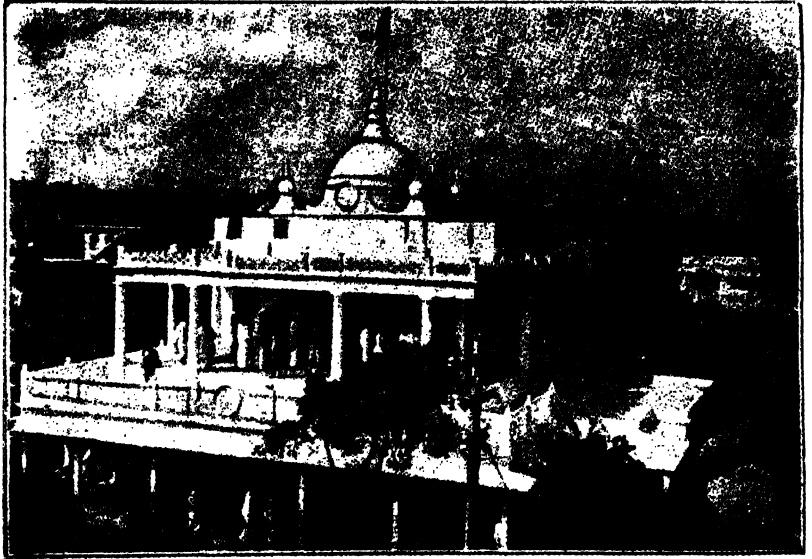
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—বোম্বাই

রেজিষ্ট্রী করা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইল মুখ্যতঃ সন্ন্যাসি-গণের ধর্ম্ম-শিক্ষা ও সাধনকেন্দ্র। ইহার কার্য্য হইল শ্রীঠাকুরের সমন্বয়-ধর্ম্ম প্রচার করা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন লোক হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইল। মঠের কতকগুলি ট্রাষ্টী এবং মঠ-মিশনের যুক্ত কর্ম্মকর্ত্তা দ্বারা মিশন পরিচালিত হইতে লাগিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনও আইন-সঙ্গত-ভাবে রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের সময় হইতে মঠের কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপ ও অব্যাহতভাবে চলিতে পারে, এই

ভগিনী নিবেদিতা

উদ্দেশ্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী মঠ ও মিশনের কতকগুলি বিশিষ্ট বিধিনিষেধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন—যেগুলি বর্ত্তমানেও প্রবর্ত্তিত আছে। প্রচার বিভাগের জন্য "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক মাসিক পত্রিকা মাদ্রাজ হইতে মায়াবতী আশ্রমে আনীত হইল; মিষ্টার সেভিয়ার তাহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতের পরিচালনায় "উদ্বোধন" নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। স্থির হইল, উভয় পত্রিকার কোনখানিতেই রাজনীতি-সংক্রান্ত কোন প্রবন্ধ থাকিবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ—দেওঘর

Miss Margaret Noble ও Miss Muller ভারতীয় নারীগণের শিক্ষার জন্য একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ পাইলেন। মিসেস্ ওলী বুল (Mrs. Ole Bull)
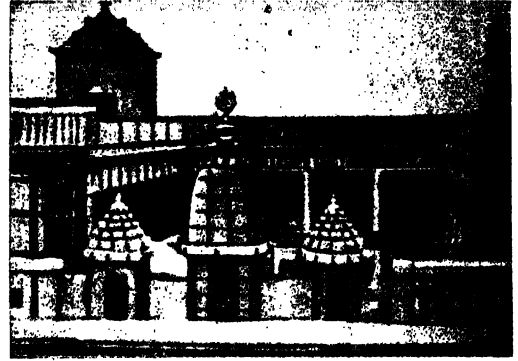
ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়—কলিকাতা

মাতৃ-সদন ও শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা
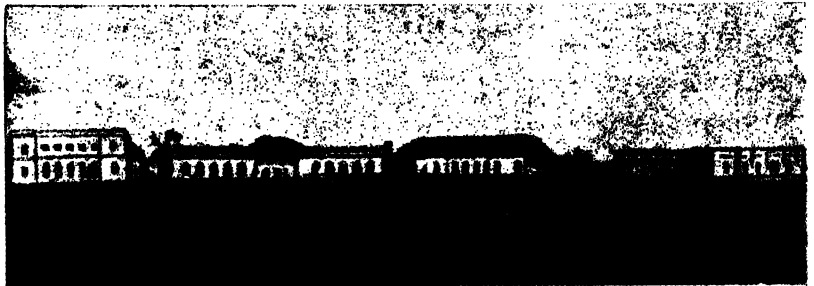
ও মিস্ জে ম্যাক্লাউড ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে কলিকাতায় আসেন। মিস্ ম্যাক্লাউড কিন্তু নিবেদিতার মত স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, অদ্বৈত আশ্রম—কাশী

শান্তি-আশ্রম—স্যানফ্রান্সিস্কো

তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিতা, সহানুভূতিসম্পন্না—বন্ধুরূপে তাঁহার সহায়তা করিতেন। স্বামীজী কর্ত্তৃক ইনি নিজ ভাব বা ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিতে আদিষ্টা হন নাই। মিস্ নোবল কলিকাতায় আসিয়া অল্পদিন মধ্যেই ব্রহ্মচারিণীর ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্বামীজীই তাঁহার "নিবেদিতা" নাম প্রদান করেন। নিবেদিতা যাহাতে ভারতের রীতি-নীতি, ভাবধারা ও জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এদেশের লোকদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্বামীজী ভারত-ভ্রমণে কিছুদিন তাঁহাকে সঙ্গিনী করেন। এই সময়ে তিনি নিবেদিতাকে বিশেষ শাসনাধীনে রাখিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার কঠোরতায় নিবেদিতাকে কখন কখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইত। এই ভাবে গঠিতা হইয়া ভগিনী নিবেদিতা নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ ভারতবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর শ্রীমার জন্মদিনে কলিকাতা বোসপাড়ায় যে বালিকা বিদ্যালয় তাঁহার নামে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আজিও কলিকাতায় 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন (১৮৯৮)। তাঁহার 'Master as I saw him' গ্রন্থে তিনি তাঁহার গুরুকে কি ভালবাসার—শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষুতে দেখিতেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের দুঃখে ও নৈতিক দীনতায় কৃপাপরায়ণ হইয়া, সুগভীর প্রেমের উৎস হৃদয়ে লইয়া ধরায় আসিয়াছিলেন। তিনি পাপী তাপীর সব ভার নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাদের পাপ ও মলিনতার

জন্য রোগ ভোগ করিয়া দেহ দান করিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহার প্রেমধনে ধনী নরেন্দ্র তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ধর্ম্মের অভয়বাণী পৃথিবীর দিকে দিকে বিঘোষিত করিয়া Brides disease রোগে ক্লিষ্ট হইয়া, হাঁপানীর মধ্যেও লোকহিতকর কার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি তখন মহাকালীর ভীষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম—রেঙ্গুন

বিবেকানন্দ-ভবন—হলিউড

করালবদনের ছায়া মৃত্যুরূপে তাঁহার সম্মুখে সন্দর্শন করিলেও যুদ্ধে বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। পাশ্চাত্যদেশে যে ধর্ম্মের—নিষ্কাম কর্ম্মের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা পল্লবিত হইতেছে, কিম্বা অঙ্কুরে শুকাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিবার ব্যগ্রতায় আবার প্রতীচ্য ভূখণ্ডে গমনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। বেলুড় মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, ভগিনী নিবেদিতাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন পুনর্ব্বার বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, তথা হইতে কলম্বো, তাহার পর নেপল্‌স হইয়া জার্ম্মাণীতে উপনীত হইলেন। তৎপরে ৩১শে জুলাই লণ্ডনে আসিয়া, আগষ্ট মাসে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া নিউইয়র্কে পদার্পণ করিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তসমিতি—নিউইয়র্ক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমন্দির—পোর্টল্যাণ্ড

২০শে জুলাই পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া ক্যালিফোর্ণিয়াতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে এক আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। স্বামী অভেদানন্দ তখন পূর্ণোদ্যমে নিউইয়র্কে বেদান্ত-প্রচারকার্য্যে রত ছিলেন, ইহা দেখিয়া তিনি সন্তোষলাভ করেন। তাহার পর আমেরিকা হইতে তিনি প্যারী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে তিনি Congress on the History of Religions নামক

ধর্ম্মসভায় যোগদান করিতে আহূত হইয়াছিলেন। এখানে বক্তৃতা করিবার পর তিনি কিছুদিন ফ্রান্সে বাস করিয়া ফরাসীদিগের কৃষ্টি ও ধর্ম্মজীবনের তথ্যানুসন্ধানে রত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন নিবেদিতা ও Mrs. Ole Bull। এই সময়ে নিবেদিতা কিছুদিন ভারতীয় নারীর জীবনকথা শুনাইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডযাত্রাকালে স্বামীজী তাঁহাকে এই বলিয়া বিদায় দান করেন—"নিবেদিতা, তুমি যদি আমার স্বহস্তগঠিত

স্বামী প্রেমানন্দ

যন্ত্র হও, তবে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; আর যদি মায়ের হাতের পুতুল হও, তবে চিরজয়ী হইবে।"—এই সময়ে বিবেকানন্দ ফ্রান্সে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে দর্শন করেন, এবং হীরাম মাক্সিম সহ তাঁহার সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মালোচনা হয়। অক্টোবর মাসে তিনি ভিয়েনা ও কনষ্টান্টিনোপল দর্শনাভিলাষে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করেন। পথে বল্কান রাজ্য, গ্রীস ও মিশর দর্শন করেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বেলুড় মঠে পৌঁছিয়াই তিনি শুনিলেন যে, মিষ্টার সেভিয়ার অক্টোবর মাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন; তৎক্ষণাৎ তিনি মায়াবতী অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পক্ষাধিককাল থাকিয়া সেভিয়ার-পত্নীকে সান্ত্বনা দান করিয়া, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষভাগে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাহার পর তাঁহার জননীকে সঙ্গে লইয়া তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে কিছু দিন ভ্রমণ ও ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই উপলক্ষে ঢাকার দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়কে সস্ত্রীক তাঁহার গৃহে দর্শন করিয়াছিলেন। এই বৎসর স্বামীজী মঠে দুর্গাপ্রতিমা আনিয়া বিশেষ সমারোহে শারদীয়া দুর্গাপূজা সমাধা করেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মহা সমারোহে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে মঠে বহু লোকসমাবেশ হওয়ায় তিনি বিপুল আনন্দলাভ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি অল্প কিছু দিন কাশীবাস করেন। এই সময় জাপান হইতে মিঃ ওকাকুরা তাঁহাকে জাপানের ধর্ম্মসভায় নিমন্ত্রণ করিতে আসেন; কিন্তু স্বামীজীর স্বাস্থ্য তখন ভগ্নাবস্থার চরমসীমায় উপনীত, তিনি জাপান যাইতে সমর্থ হইলেন না; তবে ওকাকুরাকে সঙ্গে লইয়া তিনি বুদ্ধগয়া দর্শন করাইয়া কাশীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কাশী হইতে ফিরিয়া তিনি শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন,—বুঝিলেন, জীবনসন্ধ্যা আগতপ্রায়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, প্রভাতে তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তিন ঘণ্টাকাল ধ্যান করেন। তাহার পর যথারীতি আহারান্তে অল্পকাল বিশ্রাম করেন। অপরাহ্নে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে কিছু দুর ভ্রমণ করিয়া আসেন, এবং সন্ধ্যার আরতির সময় ধ্যান করিতে বসেন। ধ্যানান্তে শয়ন করেন এবং এক ঘণ্টার পর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৩৯ বৎসর। মহাবীর, মহাভক্ত, মহাত্যাগী, মহাকর্ম্মী সপ্তর্ষির এক ঋষি এই ভাবে মানব-দেহ ত্যাগ করিয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে কর্ম্মপ্রবাহ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা দিনে দিনে বল ও বেগ সঞ্চয় করিয়া চলিতেছে এবং তাহার প্রসার এখন জগদ্ব্যাপী হইয়াছে। শ্রীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্যগণও এইরূপে নিজ নিজ সন্ন্যাস-জীবনের পূর্ণতা লাভ করিয়া পরমধামে গত হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই মণিগণের এক একটি মণি একই সূত্রে গাঁথা—প্রত্যেকেই ঠাকুরের এক এক ভাবের এক একটি মূর্ত্ত-প্রতিমা। যাঁহারা

ঠাকুরকে দর্শনের সৌভাগ্য লইয়া জন্মেন নাই, তাঁহারা ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবন ও চরিত্র দেখিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বগুণময় ও সর্ব্বভাবময় ঠাকুরের কথঞ্চিৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের প্রায়ই সবগুলি মণি আজ কালগর্ভে বিলীন ও অন্তর্হিত হইয়াছেন। মাত্র একটি অভেদানন্দ এখনও জীবিত আছেন, তিনিও প্রাপ্তবয়স্ক, বার্দ্ধক্যে উপনীত; হয় ত শীঘ্রই ধরাধাম ত্যাগ করিবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়-ধর্ম্ম সজীব ও সচল। যতই দিন যাইতেছে, ততই দেশ-বিদেশে তাঁহার ভক্তসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাঁহারা তাঁহার আচরিত এবং বিবেকানন্দ ও তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের আদর্শ ও তাঁহার জীবন-মহিমা-জ্যোতিঃ প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের পর শতাধিক বর্ষ অতীত হইয়াছে—সম্প্রতি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্য একটি প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরনির্ম্মাণের ব্যয় বহন করিয়াছেন দুই জন আমেরিকান স্ত্রী-ভক্ত, মিস্ হেলেন রুবেল ও মিসেস্ অ্যানে উরসষ্টার। এরূপ বিরাট মন্দির বঙ্গদেশে এই প্রথম নির্ম্মিত হইল। সমগ্র মন্দিরের দৈর্ঘ্য ২৩৩ ফুট, বিস্তার ১০৯ ফুট, ও উচ্চতা ১১২ ফুট। মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দিরের দৈর্ঘ্য ১৫২ ফুট। মন্দির-মধ্যে ঠাকুরের শ্বেত-প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪ই জানুয়ারী ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে।

স্বামী বিবেকানন্দ
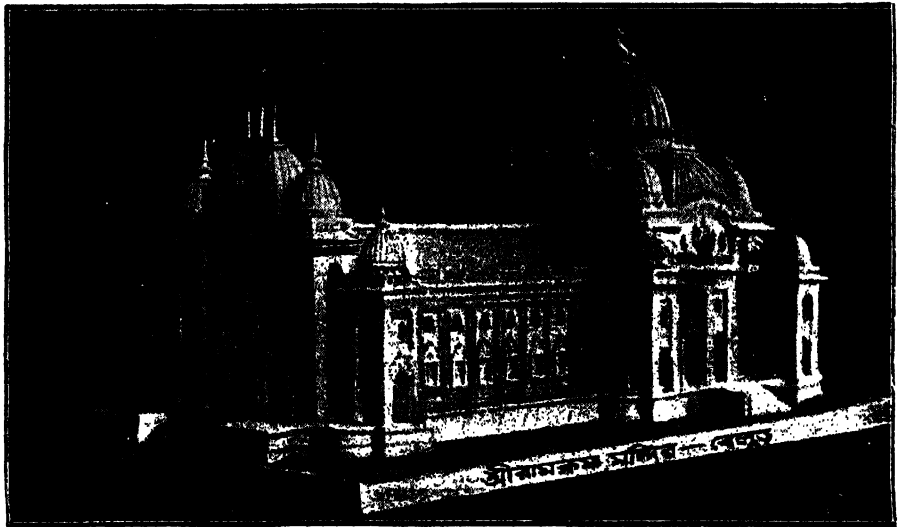
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নূতন মন্দির—বেলুড় মঠ

প্রার্থনা করি, এমনই করিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার ভাবধারা প্রবাহিত থাকিয়া তাহা যেন কলুষিত ও ভোগবিলাস-সঙ্কুচিত-চিত্ত মনুষ্যগণকে সত্যের, আলোকের, আনন্দের ও অমৃতের পথে পরিচালিত করিতে থাকে; তাঁহার নরজন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য সফল হয়। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র।

অনুশাসন

[গল্প]

আমার বাল্যকাল হইতেই দেশ-ভ্রমণের বাতিক প্রবল ; কিন্তু উপার্জ্জনটা নিজের ভরণ-পোষণের পক্ষেই অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং বহুকাল পূর্ব্বেই ঐ বাতিকটার কণ্ঠরোধ হইয়াছে। অগত্যা ভ্রমণ-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তিলাভ করিতেছিল। অকস্মাৎ স্কুলে আসিলেন এক পারিব্রাজক, নানা দেশ সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর বক্তৃতার পর তিনি পাথেয়স্বরূপ ছেলেদের নিকট কিছু অর্থ প্রার্থনা করিলেন, এবং তাহা সংগ্রহের প্রতীক্ষায় আমারই ঘরে তাঁহার রাত্রি যাপন।

হোষ্টেলে মাষ্টার মশায়রা তখন খাইতে বসিয়াছিলেন। কাগজের তখনকার বড় খবর—অষ্টম এডওয়ার্ড রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন, এবং ষষ্ঠ জর্জ্জ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে তাহা লইয়াই তর্ক চলিতেছিল। পরিব্রাজক সুবোধ বাবু নির্ব্বাক্ শ্রোতা।

একদল বলিতেছিলেন,—রাজা হইবেন আদর্শপুরুষ, তাঁহার মোহ, লিপ্সা থাকিবে না, বিধাতার তিনি বামহস্ত-স্বরূপ। রামচন্দ্র বিদীর্ণ হৃদয়ে জানকীকে বনবাসে পাঠাইয়াছিলেন—প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য। তাহাই আমাদের সনাতন আদর্শ—ত্যাগের আদর্শ ; রাজার পক্ষে —যাঁহাকে দেশের লোক শ্রদ্ধা করিবে—তাঁহার পক্ষে সাধারণ মানুষের মত বিকার থাকা উচিত নয়।

অন্যদল বলিতেছিলেন,—যে লোক প্রেমের জন্য রাজ্য, সম্মান, প্রভুত্ব হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহার প্রেমকে কোনমতেই তুচ্ছ করা চলে না। মানুষ হিসাবে, একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ হিসাবে সে ব্যক্তি মহান্—শ্রদ্ধেয়।

তর্ক জমিয়া উঠিল। কেহ উত্তেজিত হইয়া কটূক্তি করিলেন, কেহ ব্যঙ্গোক্তি করিলেন, সাধারণ তর্ক যেমন হাতাহাতিতে পরিণত হয়, ইহারও পরিণতি সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া বলিলাম,—সুবোধ বাবু, সরে পড়া যাক্, এখানে থাক্‌লে আহত, এমন কি, নিহত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

সুবোধ বাবু আমার সঙ্গে ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে আদরে গৃহে স্থান দেওয়ায় একটু স্বার্থও ছিল। তাঁহার নিকট গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প শুনিবার ইচ্ছা ছিল। আমাদের পিছনে ক্ষীণকায়, কৃশ উমেশ বাবুও সন্ত্রস্ত ভাবে উপস্থিত হইলেন।

একটা চুরুট ধরাইয়া বলিলাম,—সুবোধ বাবু, গাছের ডালে যখন রাতের পর রাত কাটিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই রাত জাগ্‌তে কষ্ট হবে না, আপনাকে কিন্তু গল্প বল্‌তে হবে।

সুবোধ বাবু হাসিয়া বলিলেন, ভ্রমণ করাতেও আমার ক্লান্তি নাই আর গল্প বলাতেও আমার শ্রান্তি নাই। আপনাদের এই তর্ক শুনে ···

—আজ্ঞে 'আপনাদের' নয়,—ওদের বলুন।

—হ্যাঁ, ওদের তর্ক শু'নে আমার পুরাতন একটা কথা মনে পড়ে গেল। প্রায় ওইরূপ একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছিল ; আজ বারবার সেই কথাটাই মনে পড়্‌ছে। এই প্রসঙ্গে সে গল্পটা বোধ হয় খুব সুশ্রাব্য হবে।

বেশ হবে, রোমাঞ্চের সঙ্গে রোমান্স জম্‌বে ভাল। বর্ম্মাটা ধরিয়ে নিয়ে আরম্ভ করুন।

সুবোধ বাবু একরাশ ধোঁয়া উদ্গিরণ করিয়া আরম্ভ করিলেন—

আপনাদের হয়ত ধারণা থাকতে পারে ভারতবর্ষের সবখানিই লোকে জানে, তার সমস্ত তথ্যই সরকারী আফিসে পাওয়া যায়, তা নয়। আসামের ডাক্‌লা ষ্ট্রীট সম্বন্ধে আমি বলেছি, সভ্যতার বিন্দুমাত্র আলো আজও সেখানে প্রবেশ করেনি। অমনি অজ্ঞাত প্রদেশ ভারতবর্ষে একাধিক আছে, যেখানে দেশলাই জ্বালতে দেখলে লোকে ভৌতিক কাণ্ড মনে করে! ভারতের এই বিশাল হিন্দু-সভ্যতার পাশেই তিমিরাচ্ছন্ন দেশ আবহমান কাল হ'তে বিরাজ করছে······

তখন আমি ঘুরছিলাম রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি-পূত আরাবল্লী পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে। ভীল-পল্লীতে মাঝে মাঝে আশ্রয় পেতাম। অতিথিকে তারা সমারোহের সঙ্গে আহার্য্য পানীয় দিত। রাত্রে পাহাড়ের পাদদেশে তাদের পুত্র-কন্যার সঙ্গে পর্ণকুটীরের প্রাঙ্গণে খেতুম, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা ক'রতুম। মাঝে মাঝে বড় ভাল লাগ্‌ত, তাই দুই একদিন হয়ত কোন ভীল-পল্লীতে বিশ্রাম করতুম। ভীলেরা যেমন সবচেয়ে বড় বন্ধু হ'তে পারে, তেমনি সবচেয়ে হিংস্র শত্রুও হ'তে পারে। তাদের এই নির্ভীক আচরণ আমার কাছে অতি সুন্দর বলে মনে হ'ত।—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যান্য ভাষা সহজে আয়ত্ত করলেও ওদের ভাষাটা পারিনি—কোনমতে নিজের কথা বুঝিয়েছি মাত্র······

আরাবল্লী পর্ব্বতের উত্তর পাদদেশ বেয়ে চলেছি। বামে, দূরে রাজপুতনার ধূসর মরু মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্‌ করে, পাহাড়ের কোলে কোলে বাবলা গাছগুলা বিচ্ছিন্ন ভাবে দণ্ডায়মান। যত দিন যায় লোকের বসতি ততই কম হ'য়ে আস্‌ছে। ম্যাপ ও কম্পাস দেখে নিজের অবস্থানটি অনুমান করতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু ঠিক করতে পারলুম না,—এক দুর্গম প্রদেশে যেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি······

অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দ্রুতপায়ে এগিয়েও কোন আশ্রয় খুঁজে পেলুম না। কোথায় থাকি চিন্তা করতে করতে একটা বড় পাথরের উপর ক্লান্ত দেহের ভার রেখে বসে পড়লুম; ক্লান্তি দূর হবার পূর্ব্বেই সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবে গেল। দিনে তখন বেশ গরম পড়ে, রাত্রে একটু শীত। আশে-পাশে জঙ্গলও গভীর নয়, দু'একটা নেকড়ে থাকতে পারে মাত্র। সঙ্গে রুটি ছিল, একটু জলের দরকার। ফ্লাস্কটা ভেঙ্গে গেছল, আশে-পাশে চেয়ে দেখ্‌লাম, কোন গিরিনির্ঝর আছে কি না! কিন্তু উঠে অনুসন্ধান করবার শক্তি নেই,······ধীরে ধীরে আকাশের গায়ে এক ফালি চাঁদ উঠ্‌লো, জ্যোৎস্নায় দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করলুম······

অনেক খুঁজে একটা গর্ত্তে খানিকটা জল পেলুম, রুটি খেয়ে রাত্রের মত এসে শুলাম। খুব ঘুম পাবার কথা, কিন্তু ঘুম এল না। জ্যোছনা-ভরা আকাশের নীচে শুয়ে বারবার বাঙ্গালার গ্রামের কোলে সেই জীর্ণ কুটীরের কথা মনে হ'ল—যদিও কোন আকর্ষণ, কোন আত্মীয়ই আমার নেই, তবুও জন্মপল্লীর জন্যই মনটা বারবার ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো। মনে হ'ল,—এই পরিশ্রম শুধু পণ্ডশ্রম, বিড়ম্বনা মাত্র······

একটু ঘুম এসেছে,—ঘুম ঠিক নয়—তন্দ্রা। হাত-পা, চোখ সব বিবশ হ'য়ে গেছে, কিন্তু কাণটা তখনও সজাগ রয়েছে, একটা অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুর কাণে এসে বাজ্‌লো। রমণীকণ্ঠের গান। অনেক গান শুনেছি, কিন্তু গান যে এত সুমিষ্ট হ'তে পারে, তা কখনও ভাবিনি। পাহাড়ের উপর থেকে সেই সুরতরঙ্গ ভেসে এসে সেই মরুর নিথর নিস্তব্ধ বায়ুমণ্ডলকে যেন মধুময়, মোহময় ক'রে তুলেছিল। বার বার মনে হ'ল, সে সলিটারী রিপারের কথা,—কে যেন বুকে প'ড়ে গমের গাছ কাট্‌তে কাট্‌তে প্রাণের দুঃখকে সুরের রূপ দিয়েছে······

কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ফরসা হ'তেই ঘুম ভেঙ্গে গেল; শুকতারা ধব্‌ধব্ ক'রে জ্বল্‌ছিল,—শরীরে ক্লান্তিও আর নেই। জিনিষপত্র গুছিয়ে রওনা হব স্থির করেছি, হঠাৎ যন্ত্র-সঙ্গীতের একটু ঝঙ্কার কাণে এসে পৌঁছল, বসলুম। প্রভাতে সেই সুরের ঝঙ্কার আমাকে যেন বিবশ ক'রে সেখানেই বসিয়ে রাখ্‌ল। বার বার মনে হ'ল, এ সুর লক্ষ্য ক'রে খুঁজে বের করি সেই রমণীরত্নকে, যে আমার মত সঙ্গীতজ্ঞানহীন অরসিক লোককেও এমন মোহিত ক'রে তুলেছে; কিন্তু ঐ অজ্ঞাত প্রদেশে পা বাড়াতে সাহস হ'ল না। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত বন্ধ হ'ল, আমিও রওনা হলুম······

সঙ্গে সে দিন আহার্য্য নেই, ক্রমাগত চলেছি; কিন্তু লোকালয়ের কোন চিহ্নও দেখতে পেলুম না, ভয় হ'ল। খাদ্য পানীয় অভাবে শেষে·········গা শিউরে উঠ্‌ল। এমন ভাবে এই অজ্ঞাত প্রদেশে আমি মরতে পারবো না। বেলা ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ল, একটি, দুইটি······

পথশ্রমে পিপাসায় তখন শরীর আর চল্‌ছে না, কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত মনে হচ্ছে তাই, প্রাণপণে ছুটেছি লোকালয়ের সন্ধানে। সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে তখন তৃষ্ণা, কণ্ঠ যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; ঢোক গিলেও কণ্ঠকে সিক্ত করা যায় না। দারা মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণায় কেমন ছট্‌ ফট্‌ করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন, তা তখন অনুভব করেছি। তৃষ্ণা যে মানুষের কত প্রবল হ'তে পারে, তা আপনারা হয়ত বুঝ্‌বেন না—তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন হয়ে এল! নিরাশায়, ক্লান্তিতে ব'সে পড়লুম, ক্ষণেকের জন্যে হয়ত চেতনা বিলুপ্ত হয়ে ছিল······

আবার উঠে তাকালুম,—দূরে বাবলা বনের মাঝে যেন অস্পষ্ট একটি কুটীর দেখা গেল; ছুট্‌তে ছুট্‌তে গেলুম। সত্যই লোকালয়, একটি যুবক কুঠার নিয়ে জ্বালানি কাঠ ফাড়ছে, একটি যুবতী বৃক্ষের ছায়ায় ব'সে শিশুকে স্তন্য দান করছে। আমি জল চাইলাম। তারা বোধ হয় কিছুই বুঝ্‌লো না। আমি ইসারা ক'রে দেখালুম······

যুবতীটি কুটীর প্রাঙ্গণের কূপে একটা হাঁড়ি নামিয়ে দিল, আর দুই মিনিট পরেই তৃষিত কণ্ঠকে আমি সিক্ত করতে পারবো,—অদূরে খাটিয়ার উপর বসে পড়লুম······

যুবকটি উত্তেজিত হ'য়ে কি যেন বল্‌লো। কি অপরাধ করেছি বুঝ্‌লাম না, যুবতীটি জলের পাত্র নামিয়ে আরও বেশী উত্তেজিত হ'য়ে সম্ভবতঃ গালাগালি করলে। আমি চুপ ক'রে বসেই রইলাম। অকস্মাৎ যুবকটি উদ্যত কুঠার নিয়ে ছুটে এল······

ভাবলুম, যদি পালাই জল বিনা মৃত্যু, যদি থাকি কুঠারের আঘাতে অপমৃত্যু!

দেহে শক্তি কিছু কম নেই, আমি যুবকের কুঠার কেড়ে নিয়ে এক ঘুসিতে তাকে ধরাশায়ী করলাম। রমণীটি চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, জলের পাত্র কেড়ে নিয়ে সবে চুমুক দিতে যাব, চেয়ে দেখি আর একটি সবলকায় বৃদ্ধ উদ্যত বল্লম হস্তে ছুটে আসছে—অতি অল্প দূরে······

ভয়ে কি স্বভাবগত অভ্যাসের জন্যে জানি না—দৌড় দিলাম। কোন্‌ দিক্‌ জানি না, কোথায় জানি না, সাম্‌নে যে রাস্তা পেলাম তাই ধ'রে দৌড়তে লাগ্‌লাম, হিংস্র বৃদ্ধ বল্লম হস্তে দ্রুত এই তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের অনুসরণ করতে লাগ্‌লো। কতক্ষণ দৌড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি বৃদ্ধ নেই, হয় ত' ফিরে গেছে। ভাল ক'রে পিছন পানে চেয়ে সাম্‌নে তাকালুম, অদূরে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে সেই দিকেই চল্‌লুম—তখনও প্রায় একঘণ্টা বেলা ছিল······

পাহাড়ের উপরে একটা মন্দির। আশে-পাশে বাবলা বন, বহুদূরে বনের অন্তরালে লোকের আবাস। মন্দিরের চারি পাশ ধরে কোথায়ও জন-প্রাণীর সন্ধান পেলাম না, জল পাব কোথা? মন্দিরের চত্বরে একটা মহিষী তার বৎসকে স্তন্য দান করছিল, পিপাসা আর সহ্য হয় না। বৎসকে তাড়িয়ে দিয়ে মহিষীর বাঁটে মুখ দিয়ে পেট ভরে দুধ পান করলুম। মহিষী কিছু বল্‌ল না। অনেকটা পরিতৃপ্ত হয়ে মন্দিরের সিঁড়ির কোলে গাছের নীচে বিছানা বিছিয়ে নিলাম। ক্লান্তিতে ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল,—ইন্দ্রিয় সব বিবশ হ'য়ে এল······

ঝুম্‌-ঝুম ক'রে মল বাজিয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে কে যেন মন্দিরে উঠ্‌ছে। কৌতূহল হ'লেও চোখ মেলে দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'ল না। ঝঙ্কৃত মল্‌ ক'গাছি যেন থমকে আমার শিয়রের কাছেই দাঁড়াল। কোন অজ্ঞাত ভাষায় কি যেন প্রশ্ন করলে······

পুনরায় সংস্কৃতে প্রশ্ন করলে—কস্ত্বং?

উত্তর না পেয়ে ভীলেদের ভাষায় প্রশ্ন করলো—কে তুমি?

চোখ মেলে অবাক্‌ বিস্ময়ে চেয়ে রইলুম, একটি অষ্টাদশী নারী, সম্ভবতঃ কুমারী, অনিন্দ্যসুন্দর তনু, এত সুন্দরী নারী বোধ হয় জীবনে দেখি নি। এই কালো অসুন্দর ভীলপল্লীর মাঝে এই নারী সত্যই বিস্ময়কর। এই বর্ণ, এই সুঠাম সুন্দর তন্বী তনু বোধ হয় সভ্য-জগতেও বিস্ময়কর। আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে ভুলে গেলাম······

সে পুনরায় প্রশ্ন করলে বললুম, পরিব্রাজক। ইঙ্গিতে জল চাইলাম। সে দ্বিরুক্তি না ক'রে কিছু খাদ্য ও জল নিয়ে এল। পান ক'রে যেন হৃত জীবনীশক্তিকে ফিরে পেলাম।

সূর্য্য ডুবে গেল। আকাশের বুকে গত দিনের মত আবার উজ্জ্বল সুন্দর এক ফালি চাঁদ উঠ্‌ল। গাছের ফাঁকে একটু জ্যোৎস্না মুখের উপর এসে পড়লো।

ঝুম্ ঝুম্ ক'রে মল বাজিয়ে মেয়েটি আবার এসে শিয়রে দাঁড়াল। উঠে ব'সে চাইলাম—জ্যোৎস্নাধারা তার সর্ব্বাঙ্গে পড়ে শুভ্র তুষারের মত চিক্-চিক্ করছে, তার সৌন্দর্য্যকে যেন মোহমদির ক'রে দিয়েছে। আমি অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌ছিলাম—সেটা ঠিক কামজ নয়, যাকে বলে শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে সৌন্দর্য্যকে ভোগ করা—

সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে,—রাত্রে খাবার ও থাক্‌বার কি হবে ?

—এখানে আর কে থাকে ? পুরুষ মানুষ ?

—কেউ নয়, আমি একাই এই মন্দিরে থাকি।

মনে মনে ভীত হলাম, একটু আশ্চর্য্য বলেও বিস্ময় প্রকাশ করলুম। বল্লুম, খাবার যদি কিছু থাকে দিন, এখানেই শুয়ে থাক্‌বো······

—আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

তার অনুসরণ ক'রে মন্দিরের বারান্দায় উঠ্‌লাম। মন্দিরের পাশে একটা ঘরের দ্বার খুলে সে গরম দুধ, রুটি ও কিছু মিষ্টি এনে দিল। ইঁদারা থেকে জল তুলে দিল। আমি খেতে বস্‌লুম······

প্রশ্ন হ'ল—দেশে দেশে ঘুর্‌ছ কেন ?

—দেশ দেখ্‌ছি, ভাল লাগে তাই।

—আর কিছুই না ?

—না।

—বাড়ী কোথায় ?

—বাঙ্গালা দেশে।

—কি পড়েছ ?

—দুটো পাশ করেছি—আই-এ পাশ।

—কত দিন ঘুর্‌ছো ?

—তিন বৎসর।

প্রশ্ন করলুম—এখানে একা থাকেন ?

—হ্যাঁ।

—ভয় করে না ?

—না।

—চিরদিনই আছেন ?

—না, বাবা, এই মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, দু'বৎসর হ'ল মারা গেছেন। তাঁর স্থলে আমিই কায করছি।

—চিরদিন কর্‌তে হবে ?

সে একটু হেসে বল্লে,—হ্যাঁ—সম্ভবতঃ তাই।

খাওয়া শেষ হ'লে সে বল্লে,—এই বারান্দায় শুয়ে থাকুন, আমি ঘরে থাক্‌বো, ভয় নেই। চলুন, আপনার বিছানা নিয়ে আসি।

ভয় আমার নেই, তবে এই নির্জ্জন বিরাট মন্দিরের মধ্যে এই মেয়েটির এত সন্নিকটে রাত্রিযাপন করাটাকে মনে মনে ঠিক গ্রহণ করতে পার্‌লুম না। বল্লুম—ঐ বাইরে থাক্‌বো'খন।

সে দৃঢ়স্বরে বল্লে—না, অতিথিকে আমরা বাইরে শুতে দেই না।

অগত্যা মন্দিরের বারান্দায় বিছানা পেতে নিলাম। সে শয্যা-রচনায় সাহায্য করলে, শিয়রে ঘটীতে জল দিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বল্লে,—তবে যাই।

—হ্যাঁ।

মন্দিরের সুবৃহৎ এবং গুরুভার দরজা সে সশব্দে বন্ধ ক'রে দিল। আকাশের জ্যোৎস্না পানে আর একবার চেয়ে ভাবলুম—এই এক স্বপ্ন-মন্দির, এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই মানুষের জীবনে স্বপ্ন সত্য হ'য়ে ওঠে······

প্রভাতে পূবের আকাশ ফর্‌সা হ'য়ে এলে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মন্দিরের উপরের কোনও অলিন্দ থেকে ঠিক তেমনি সুন্দর, মধুর যন্ত্র-সঙ্গীতের রেশ ভেসে আস্‌ছিল। চোখ উন্মীলিত ক'রে, মুগ্ধের মত সেই গভীর নির্জ্জনস্থলে এই সঙ্গীত শুন্‌ছিলাম। বুঝ্‌লাম, কালও এরই যন্ত্র-সঙ্গীত শুনেছিলুম। কাল যে টিলা পাহাড়টির উত্তর-পারে ছিলাম, সারাদিনের পরিশ্রমের পর তার দক্ষিণ দিকে এসে পৌঁছেছি।······

হয় ত আবার একটু ঘুমিয়েছিলুম ; যখন জাগলুম তখন পূবের আকাশ লাল হ'য়ে উঠেছে। মন্দিরের ভিতর থেকে সুললিত কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্রপাঠের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর মন্দিরটাকে যেন পূত—পবিত্র ক'রে তুলছিল······

ধীরে ধীরে উঠে বস্‌লুম। মন্দিরটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম, পিছনের চত্বরে প্রায় শতাধিক গাভী ও মহিষী ছিল।

পিছনে বহু পুরাতন একটি ইন্দারা, মন্দিরের কার্নিসে কত কবুতর প্রভাতী সঙ্গীতে চারিদিক্ মুখর ক'রে রেখেছিল। অদূরে পত্র-বিরল বাবলা গাছগুলির মাথা দেখা যাচ্ছিল—দূরে ধূসর বালু ও পাথরময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর। দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, অকস্মাৎ মেয়েটি এসে বল্‌ল,—এস আমার সঙ্গে। তার হাতে বাল্‌তি, কয়েকটি গাভী দোহন ক'রে এক বাল্‌তি দুধ নিয়ে সে গাভীগুলির উদ্দেশ্যে কি যেন বল্‌লো। গাভীগুলি উন্মুক্ত মন্দিরদ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো।

আমরা ফিরে এলাম, সে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত কর্‌তে গেল। ছোলা ভিজা, গুড় ও কয়েকটা অপরিচিত ফল দিয়ে বল্‌লো,—খেয়ে নিন্, খেতে ত দেরী হবে······

বল্‌লুম,—আপনি খাবেন না।

সে জিভ কেটে বল্‌লে—ছিঃ, ঠাকুরের পূজো রয়েছে যে।

অপ্রস্তুত হ'য়ে আমি বল্‌লুম, তবে আমিও পূজো দেখেই খাবো।

—আপনি পরিশ্রান্ত, কাল থেকে পূজো দেখে খাবেন।

—কাল ত আমাকে চলেই যেতে হবে······

সে তার আনত চোখদুটির অতি স্বচ্ছ ও সরল দৃষ্টি আমার চোখের উপর রেখে বল্‌লে,—কালই যাবেন! কেন?

আমি নির্ব্বাক্, আমার যাওয়া না যাওয়ায় এর কি আসে যায়? নেহাত আতিথ্যধর্ম্ম বোধ হয়। বল্‌লুম—খাওয়া আর চলাই ত আমার কায······

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সে কি যেন বল্‌লে, তার অর্থ সেদিনও বুঝিনি, আজও জানি না; সম্ভবতঃ বলেছিল, দু'দিন জিরিয়ে নিলে ক্ষতি কি?

আমি খেয়ে নিয়ে কি কর্‌বো ভাব্‌ছি, অকস্মাৎ সে আবার এল। তার নামটা কি জান্‌বার জন্য কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—নাম কি?

সে ঈষৎ হেসে বল্‌লে, নাম আমার মনুয়া, তবে অন্যের সাম্‌নে ডাক্‌বেন আচার্য্যা বলে। নইলে তারা হয়ত······ মনুয়া হেসে উঠল।

'তারা' বল্‌তে 'কারা' কিছুই অনুমান কর্‌তে পার্‌লুম না, আশে-পাশে কেউ আছে বলেও মনে হ'ল না। জিজ্ঞাসা কর্‌বার পূর্ব্বেই সে বল্‌লে, এখন কি কর্‌বেন?

—সেইটাই সমস্যা!

মনুয়া বললে—চল, কাঠ কেটে আনি, রান্নার কাঠ নেই······

এমন নিঃসংশয়ে এবং নিঃসন্দেহে সে আমাকে ডাক্‌লে যে, তার আত্মনির্ভরশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও সরলতাকে আমি প্রশংসা না ক'রে পারলুম না। ভাবলুম, যে তরুণী এই মন্দিরে একা এমনি করে বাস করতে পারে, তার পক্ষে এই রকম বলাই সম্ভব। কুঠার নিয়ে তার সঙ্গে চল্‌লুম······

পাহাড়ের উপরে উঠে শুক্‌নো ডাল আমি কাট্‌তে লাগ্‌লুম, যেহেতু আমি পুরুষ, এবং আমার পৌরুষকে অনাহত রাখ্‌তে হ'লে সেটা অপরিহার্য্য। অভ্যাস নেই তাই একটু পরেই হাত জ্বালা করতে লাগ্‌লো। সে আমাকে জিরোতে দেখে বল্‌লে,—বলেছিলুম, তুমি পারবে না······

আমি হেসে বল্‌লুম,—অভ্যাস নেই তাই—নইলে······

সে হেসে কুঠার নিয়ে কাঠ কাট্‌তে সুরু করলো, আমি একটা পাথরের উপর ব'সে দেখ্‌তে লাগলুম। অদূরে একটা গুল্মের মাথায় লাল টুক্‌টুকে এক থোকা ফুল ফুটেছিল। সেগুলিকে নিয়ে এসে আপন মনে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করছিলুম, মনুয়া এসে বল্‌লে,—চল যাই, আট দিনের মত কাঠ সংগ্রহ হ'য়ে গেছে······

বললুম,—চল।

ওর আলুলায়িত এলো খোঁপার মাঝে এই ফুলের গোছাটা গুঁজে দেবার ইচ্ছে কচ্ছিল, কিন্তু সাহস হয়নি, তাই ফুলটা তার হাতে দিয়ে কাঠের বোঝা মাথায় তুল্‌তে গেলাম। সে বললে—না, না, ও-সব আমি নেব।

তার কথায় কর্ণপাত না ক'রে কাষ্ঠভার স্কন্ধে নিলুম ও তাকে আগে আগে চল্‌তে বল্‌লুম। সে লালফুলের মঞ্জরীটাকে খোঁপায় গুঁজে আগে আগে চলল। মনে মনে খুসী হয়েছিলুম। তার সমস্ত কিছু জান্‌বার জন্যে বল্‌লুম,—আশে-পাশে কি কোন গ্রাম নেই?

সে ফিরে তাকিয়ে বল্‌ল,—শুন্‌বে সব, বল্‌ছি।

একটু থেমে সে বল্‌ল, আমাদের জাতের ধর্ম্মগুরু ছিলেন আমার বাবা। এই চারিপাশে প্রায় দু'শ গ্রামে তাদের বসতি। এই মন্দিরই তাদের আদালত, শাসন-বিভাগ, সমাজ-পরিচালক—এক কথায় সবই। বাবার মৃত্যুর পরে সেই ধর্ম্মগুরুর পদে আমি অভিষিক্ত

হয়েছি। আমাদের নিয়ম, আঠার বৎসরের পূর্ব্বে কোন মেয়ে-ধর্ম্মগুরু বিবাহ করতে পারবে না। তার পর সে তার খুশীমত বিয়ে করতে পারে; তবে তার শিষ্যদের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। বিবাহের পর সেই হবে সকলের গুরু, তার ভবিষ্যৎ-সন্তান হবে ভবিষ্যৎ ধর্ম্মগুরু। এমনি ক'রে প্রাচীনকাল থেকে এই মন্দিরের কাষ চলে এসেছে।

—তোমার বয়স?

—উনিশ।

—বিয়ে করনি কেন?

সে হেসে ফিরে দাঁড়াল, তার স্বেদাক্ত মুখের উপর রৌদ্র চিক্-চিক্ ক'রে উঠ্‌ল। আমি কবি নই বা মনস্তত্ত্ববিদ্ নই, তা হ'লে হয়ত সে হাসির অর্থ বুঝ্‌তে পারতুম।

স্নানান্তে সে পূজার জন্যে মন্দিরে প্রবেশ করলো, আমি বসে বসে তার পূজা করা দেখ্‌লুম। এই তাপসী তরুণীর মন্ত্রোচ্চারণ শুনে, তার ভক্তিনম্র চোখদু'টির পানে চেয়ে মনে হ'ল, সে শ্রদ্ধেয়; পাপপঙ্কিল, বাসনাব্যগ্র জগতের অনেক ঊর্দ্ধে তার স্থান। তাই বোধ হয়, তুলসীতলায় নতশির বঙ্গরমণীর আলেখ্য এত সুন্দর······

অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে একটি তেলের প্রদীপ জ্বল্‌ছিল, তার আলোক ওই গৌরীর শুভ্র আননে স্বর্ণচ্ছটা ছিটিয়ে দিয়েছিল। আরক্ত কপোলের প্রান্ত বেয়ে দু'ফোঁটা ভক্তি-অশ্রু ধীরে নিঃশব্দে নেমে এল। অশ্রুবিসর্জ্জনের মধ্যেও যে আনন্দ আছে, তা সেইদিন প্রথম বুঝ্‌লুম।

দুপুরে রাঁধা-খাওয়ার পর যখন বিশ্রাম করছি, তখন প্রায় তিরিশ জন স্ত্রীপুরুষ এসে উপস্থিত হ'ল। তারা প্রণাম ক'রে তার সঙ্গে কি কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। মনুয়া আমাকে দেখাইয়া বোধ হয় পরিচয় দিল, তারা আমাকেও প্রণাম করলে।

বোধ হয়, কোন সামাজিক বিচার হ'ল। মনুয়া উদ্যত তর্জ্জনী দ্বারা কি যেন একটা আদেশ জ্ঞাপন করলে, তারা প্রস্থান করলে। মনুয়ার এই গম্ভীর এবং অপ্রাকৃত অভিব্যক্তি দেখে মনে মনে হাস্‌ছিলুম; এবার প্রকাশ্যেই হাস্‌লুম। মনুয়া বল্‌লে,—হাস্‌লে যে?

—তোমার গাম্ভীর্য্য দেখে।

সে খিল-খিল ক'রে হেসে বল্‌লে,—ওঃ, এই, তা না হ'লে কি চলে!

সন্ধ্যার সময় কয়েকজন লোক হাট থেকে এল। মন্দিরের জন্যে প্রত্যেক দোকানীর নিকটে কিছু প্রাপ্য আছে, কয়েকজন মোড়ল তা সংগ্রহ ক'রে প্রত্যেক হাটবারে দিয়ে যায়। মন্দিরে, তাদের আচার্য্যাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও প্রণাম ক'রে তারা প্রস্থান করলে।

সন্ধ্যার পরে আকাশে চাঁদ উঠেছিল······

আহারাদির পরে দু'জন এসে মন্দিরের সোপানের উপর বসলুম। অদূরে পাহাড়ের চূড়াটা চন্দ্রালোকে কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হ'ল। বালুকারাশির স্বচ্ছতর কণাগুলি ঝিক্-মিক্ করছিল। এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিস্তব্ধ নির্জ্জন রাত্রে আমি আর আমার পার্শ্বোপবিষ্টা মনুয়া। পিঠের উপর তার আলুলায়িত কুন্তলদাম প্রসারিত। আমি বললুম,—তুমি রাত্রে মাঝে মাঝে গান কর মনুয়া?

—হ্যাঁ।

—বড় একা বোধ হয়, তাই কি?

—হ্যাঁ।

—আজকে একটা গান করবে?

মনুয়া আমার মুখের পানে ক্ষণেক চেয়ে কি যেন ভাব্‌ল, তারপর বল্‌ল, আচ্ছা শোনো—সে তার পায়ের মলে তাল দিয়ে গান সুরু করল। হয়ত কোনো ভজন, দেবদেবীর স্তুতি মাত্র, কিন্তু তার সুরটি যেন আজও কাণে ঝঙ্কৃত হ'চ্ছে। মোহাবিষ্টের মত তন্ময় হয়ে শুন্‌ছিলাম; সে গেয়ে যাচ্ছিল, দুটি অতি বিস্মিত, সৌন্দর্য্য-পিপাসু চোখ যে তার পানে অনিমিষে চেয়ে ছিল, তা দেখ্‌বার মত ক্ষমতা, বাহ্যজ্ঞান তার ছিল না। তার অন্তর সুরের অনুসরণে মরজগতের বহু ঊর্দ্ধে তখন বিচরণ করছিল।

নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী বলে মনে হ'ল। লুব্ধনেত্রে এমন ক'রে তাকিয়ে থাকা হয়ত এই দেবী-প্রতিম তরুণীর অপমান করা; তার ভক্তি-আপ্লুত অন্তরকে কলুষিত করা নহে কি?

গান শেষ হ'লে তার হাতখানা নিজের হাতের মাঝে

নিয়ে বললুম,—তোমায় কষ্ট দিলুম মনুয়া, চল এখন শোবে……

সে আমার পিছনে পিছনে ফিরে এল। গৃহদ্বার থেকে 'আসি' বলে রাত্রির মত বিদায় নিল।

এমনি ক'রে প্রায় পাঁচ ছ'দিন কেটে গেল……

যেতে ইচ্ছে হয় না।, মনে হয়—ভ্রমণ ত অনেক করেছি, আর কায কি!—"ওরে কবি এইখানে তোর কুটীরখানি তোল্।" এরা ত জগতের অনেক কিছুই দেখেনি, জীবন তবুও চল্‌ছে, এমনি ক'রেই সারাজীবন কাটিয়ে দেব। আবার মনে হয়, এই শান্ত জীবনের মোহ হয়ত দু'দিনের জন্য, তারপর যেতেই হবে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা মনুয়ার সঙ্গে কায করি—তার পূজা অর্চনা গৃহকর্ম্মে সাহচর্য্য করি। সন্ধ্যায় কণ্ঠসঙ্গীত, এবং প্রত্যূষে যন্ত্রসঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ—শুনি। মনটা মনুয়ার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে……

সেদিন সন্ধ্যায় স্থির করলাম,—কাল সকালেই এই অতিপ্রিয় স্থান ত্যাগ করবো। এখানে আর কয়েক দিন থাক্‌লে মনুয়াকে ছেড়ে যাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না।

পরদিন সকালে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি, মনুয়া জ্বরে অজ্ঞান। ডাকাডাকির পর বহু কষ্টে দরজা খুলে জানাল যে, সে অসুস্থ। তার ঘরে ঢুকে তার শয্যাপার্শ্বে বসে শুশ্রূষা করতে সাহস হচ্ছিল না। ভাবলুম,—এমনি অসহায় অবস্থায় এই আশ্রয়দাত্রীকে ফেলে যাওয়া মানুষের পক্ষে কি কখন সম্ভব হ'তে পারে?

সুতরাং তার গায়ের উত্তাপ অনুভব করলুম। জ্বর খুব বেশী, সম্ভবতঃ বেশী রোদ লেগে জ্বর হয়েছে; সমস্ত মুখখানা রক্ত-রাঙা। সঙ্গে কিছু ঔষধ ছিল, তাই দিতে লাগলুম, আর মনুয়ার গৃহকর্ম্ম নিজের হাতেই শেষ করতে আরম্ভ করলুম। মনুয়া জিজ্ঞাসা করলে—পূজার কি হ'ল?

—কি আর হবে? আমি ত পূজা করতে জানি না।

—গান করলে ঠাকুর খুশী হবেন, তাই কর।

—তাও ত জানি না।

মনুয়া রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে ম্লান হেসে পাশ ফিরে শুয়ে বলল, আচ্ছা, আমি তোমায় শেখাব।

মনুয়া তিন চার দিনেই সেরে উঠ্‌ল।

একদিন কয়েকজন মাতব্বর এসে কি আলাপ ক'রে গেল জানি না; তবে এইটুকু বুঝ্‌লাম, প্রসঙ্গটি আমাকে নিয়েই। এই ধর্ম্মাধিকরণকে আমি হয়ত অপবিত্র করেছি। তাদের প্রস্থানের পরে আমি বললুম,—মনু, তুমি ত সেরে উঠেছ, আমি কাল সকালেই যেতে চাই।

মনুয়া কোন জবাব দিল না! একটু চুপ ক'রে থেকে বললে,—আমার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে কি না, ওরা তাই শুন্‌তে এসেছিল।

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললুম,—কার? কার সঙ্গে মনু! যদি দু'চার দিনের মধ্যে হয়ত বিয়েটা দেখেই যাব।

মনুয়া ম্লান হেসে আমার মুখের পানে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। আমি পুনরায় বললুম, কার সঙ্গে—কোন্ সে…

মনুয়া অতি শান্ত বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বললে, ওরা মনে করেছে, তুমি ভগবৎপ্রেরিত; তোমার সঙ্গে আমার—ওরা ঠিক করেছে তোমার সঙ্গেই আমার……

আমি হেসে বললুম,—কেবল ওরাই?

মনুয়া আর একবার আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইল। মানুষের চাহনির একটা ভাষা আছে; আমি মূর্খ, সে কথা সেদিন জানতুম না। আজ সেই চাহনির অর্থ আমার কাছে সুস্পষ্ট……

মনু দ্বার বন্ধ ক'রে হয়ত ঘুমিয়েছে……

আমি মুক্ত উদার আকাশের পানে চেয়ে ভাবছিলুম—মনুয়াকে গ্রহণ ক'রে জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলা—সে আমার ভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই তাপসীর স্বামী হওয়ার যোগ্যতা কি আমার আছে? না হয় তার সাধনাতেই আমি তার উপযুক্ত হ'তে চেষ্টা করবো; কিন্তু একটা জাতির ধর্ম্মগুরু হবার যোগ্যতা ত আমার সত্যই নেই, সে সাহসও আমার নেই। ভগবানের পায়ে মনুয়ার মত ভক্তি-অশ্রু নিবেদন করার মত সাধনাও আমার নেই। পরিব্রাজক—কাবুল কান্দাহার পার হয়ে, ককেসাস্ পর্ব্বত লঙ্ঘন ক'রে য়ুরোপেও হয়ত যেতে পারি। স্থির করলুম, আর নয়, বলে যাওয়ার সাহস হয়ত হবে না, না বলেই প্রত্যূষে চলে যাবো।

পশ্চিম আকাশের কোণে পাণ্ডুর চাঁদ তখন নিষ্প্রভ,

ডুবু-ডুবু। নিজের পুটুলী পিঠে রেখে, মন্দিরদ্বার থেকে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে, মনুয়ার কুশল প্রার্থনা ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। দ্রুতপদে পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে চলেছি। মন্দিরের গাভীগুলা এখানেই চরে সন্ধ্যায় ফিরে যায়, আজও তারা আসবে। দূরে পিছনে মন্দিরের সমুচ্চ চূড়া বেশ দেখা যায়। মনুয়া হয়ত এখন স্তোত্রপাঠে মগ্ন।

ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হ'ল। পিছনে ফিরে দেখলুম, অতি পরিচিত এই পার্ব্বত্য মন্দিরটির গম্বুজে সোনালী রোদ প্রতিফলিত। গাভীদোহনের সময় হয়েছে—মনু হয়ত আমাকে খুঁজছে।

হঠাৎ ভাবলুম, এমনি ক'রে পালিয়ে আসাটা কি অগৌরবের নয়! নিতান্ত চোরের মত নিজেকে চুরি ক'রে এ ভাবে আত্মরক্ষা করা, এ ত পৌরুষ—আত্মনির্ভরতা নয়।

থমকে দাঁড়ালুম। আবার ভাবলুম, বলে আসার শক্তি যার নেই, তার আত্মসমর্পণ করাই ত শ্রেয়ঃ। তস্করের মত অন্ধকারের আবরণে আত্মরক্ষার সার্থকতা কি?

ফিরে এলাম। পথে গাভীগুলিকে দেখতে পেলাম না। তারা হয়ত আজ মনুয়ার আদেশ পায় নি! মন্দিরদ্বারে এসে দাঁড়ালুম, তখন অনেকখানি বেলা।

দুধের বালতি পাশে ক'রে মনুয়া মন্দিরের সোপানে বসে দূরের পানে চেয়েছিল। বিগত বন্ধুর পিছনে হয়ত তার মন তখন ব্যাকুল-আগ্রহে ছুটেছিল! কাছে গিয়ে দেখি, বালতি এখনো খালী, দুগ্ধদোহন হয়নি।

হঠাৎ আমাকে দেখে জলে-ভেজা চোখ দুটো মেলে হেসে বললে, কোথায় গেছিলে?

যে আমাকে এমন ভাবে বিশ্বাস করেছে, যে আমার উপর এমন নিঃসংশয়ে নির্ভর করেছে, তাকে প্রতারণা করা কত বড় নিষ্ঠুরতা! সে আমার বেশ দেখেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি; এই সরল অন্তরকে বিদ্ধ করা!

রাত্রে মনুয়ার গান শেষ হ'লে তার হাতখানা টেনে নিয়ে বললুম,—মনুয়া, আমি কাল যাবো?

মনুয়া বিস্মিত হ'য়ে বললে,—কেন?

—দেখ তোমাকে পাওয়া আমার ভাগ্য, কিন্তু এই মন্দির আর এতগুলি লোকের ভার নেওয়ার যোগ্যতা ত সত্যিই আমার নেই। তাই আমাকে যেতেই হবে।

মনুয়া চুপ ক'রে রইল, তার হাতখানা আমার হাতের মাঝে একান্ত বিবশ, নিস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে ছিল। আমি বললুম,—তুমি অনুমতি দাও, যাই······

মনু মৃদু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললে,—যেও।

প্রত্যূষে মন্দিরের সিংহদ্বারের কবাট ধরে মনু এসে দাঁড়াল। আমি তার হাত ধরে বললুম,—দুঃখ ক'রো না, আমি যাই।

বহু চেষ্টার পর কম্পিত কণ্ঠে সে বলল,—আচ্ছা, এসো।

সেই রঞ্জনকূলের মত লাল ফুলের গুচ্ছটিকে আমার হাতে ফেরৎ দিয়ে, মুখের পানে আর একবার চাইলে। চোখ দুটি তার জলে টল-টল্ করছিল; কথা বলার শক্তিও আর তার ছিল না।

চললুম···পিছনে মন্দিরদ্বারে পাষাণমূর্ত্তি মনুয়া তখনও জলভারাক্রান্ত নেত্রে দাঁড়িয়ে। সেই চক্ষুর ব্যাকুল দৃষ্টি যেন আমারই পিঠে আছড়ে পড়ছিল—আজও সেই সজল চক্ষুদুটি হয়ত তেমনি ভাবে চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে!

* * * *

বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সুবোধ বাবু চুপ করিলেন।

আমরাও নির্ব্বাক্। জলভরা চোখদুইটির করুণ মিনতি আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল; সুবোধ বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, ন্যায় কি অন্যায় করেছি জানি না। কে জানে, মনুয়ার অন্তর বড়, না, মন্দিরের শুচিতাই বড়। জানি না, কেন মনুয়াকে উপেক্ষা করেছিলুম, কিন্তু তার সাধনা, তার শুচিতাকে আমি রক্ষা করেছি, এই আমার সান্ত্বনা।

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ)।

পূজ্যপাদ ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণ

গীতাবিচারে পরম পূজ্যপাদ ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সহিত 'বন্দে মাতরম্' গীতির সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাঁহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। ব্যাকরণ পাঠে যখন আমি আমার পরমারাধ্য ৺পিতৃদেবের এবং পরম পূজ্যপাদ ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম, বালস্বভাবসুলভ চাপল্যে ৺ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে প্রতিদ্বন্দ্বী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বলিয়া তখন মনে করিতাম। আমাদিগের বাস-ভবন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও ন্যায়ভূষণ মহাশয়দিগের বাস-ভবন সংলগ্ন বলিলেই চলে। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের তাৎকালিক চতুষ্পাঠীও দুই শত হস্তের মধ্যে ছিল। আমার যখন নবম বৎসর বয়ঃক্রম, তখন সুপদ্ম ব্যাকরণের 'উণাদি' সমাপ্ত করিয়াছিলাম,—ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে গিয়া ছাত্রদিগের সহিত ব্যাকরণের পূর্ব্বপক্ষ করিতাম, ছাত্রেরা বলিতে না পারিলে, ন্যায়ভূষণ মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করিতাম,—কোন কোন দিন ভাবিতাম, তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছি, সেই মহাপুরুষের গাম্ভীর্য্য ও শক্তি, বালক আমি বুঝিতাম না। যাহা হউক, আমার 'কারক' পাঠের সময়ে পরমারাধ্য ৺পিতৃদেবের ৺গঙ্গালাভের পর একমাত্র যাঁহাকে গুরু মানিয়া ব্যাকরণের অবশিষ্ট পাঠ সমাপনে মনোযোগী হইলাম, সেই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও আমাকে তদ্ধিতের কিয়দংশ পর্য্যন্ত পাঠ দিয়া ৺গঙ্গালাভ করিলেন। তখন আমার বয়ঃক্রম দশ বৎসর। তদ্ধিতের অবশিষ্ট অংশ ও কাব্য অধ্যয়নের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরই ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইল। প্রথম প্রথম খুবই লজ্জা ও দুঃখ হইয়াছিল, কিয়দ্দিন পরেই অধ্যাপক মহাশয়ের স্নেহ ও আদরে সে লজ্জা ও দুঃখ অপনীত হইল। তাঁহারই কথা আজ বলিতেছি।

তাঁহার পুত্রধারা না থাকিলেও বাঙ্গালায় যতদিন সুপদ্ম ব্যাকরণপাঠী একজনও জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার বিদ্যাবংশধারা বিলুপ্ত হইবে না। ১২৪০ সালের পরবর্ত্তী সময়ে সকল দেশের সুপদ্ম ব্যাকরণ অধ্যাপকগণই তাঁহার শাখা। পূর্ব্বতন সময়ে সুপদ্ম ব্যাকরণ পাঠের প্রধান স্থান খাঁটুরের ভট্টাচার্য্য-বংশধরেরাও তাঁহার ছাত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়াছিলেন। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপনের পর তাঁহার পুণ্যনামে 'জয়রাম ন্যায়ভূষণ লেন' হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার রচিত তত্ত্বসার গ্রন্থে গুরুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটি ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার নাম স্থায়ীই হইয়া আছে।

> কাব্যব্যাকরণাব্ধিপারতরণে যঃ কর্ণধারায়তে,
> তস্মাৎ শ্রীজয়রামপাদকমলাৎ ক্ষোদাম্বুলাভে কৃতে।
> লব্ধোঽভূদ্ যদুরামপাদগমনির্য্যঃ সর্ব্ববিদ্যাখনিঃ
> ক্ষোদোঽশিক্ষ্যত ভাস্বরাদ্ হলধরাদ্ যস্তর্কচূড়ামণিঃ॥

সুতরাং তাঁহার নাম লুপ্ত হইবার নহে।

ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের অন্তরঙ্গ ছাত্রমধ্যে একমাত্র আমিই এক্ষণে জীবিত, আমারও শেষ নিশ্বাসের আর অধিক বিলম্ব নাই, তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য নহে, তাঁহার পুণ্যনামকীর্ত্তনে ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার বৃত্তান্ত লিখিতেছি—

১২১১ শকাব্দে ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জন্ম। পিতা ৺রাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কারের (বেচু ঠাকুরের) নিকট এবং অগ্রজ সহোদর ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ, অভিধান এবং কিঞ্চিৎ কাব্য অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভের পর ভট্টপল্লী সমাজের তাৎকালিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ৺ব্রজনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

তখন ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্তি করিতে অন্যূন ১২ বৎসর লাগিত। ৫।৬ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের পরে, তিনি তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতসমাজমূর্দ্ধন্য ৺হলধর তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া ব্যাকরণ ও কাব্যের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ইঁহার পূর্ব্বে বৈয়াকরণ পণ্ডিতদিগের ভট্টপল্লী সমাজে অধ্যাপকশ্রেণীর মধ্যে স্থান

ছিল না,—অর্থাৎ স্বগ্রাম বা বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে অধ্যাপক-বিদায়ের নিমন্ত্রণ-পত্র ইঁহাদিগের হইত না। এই জন্য ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী ছিল না,—ব্যাকরণ অধ্যাপনে সমর্থ পণ্ডিত প্রায় প্রতি গৃহে থাকিলেও রীতিমত অধ্যাপনার ব্যবস্থা না থাকায়, ভট্টপল্লীর অনেকেই ২৪ পরগণা, গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত খাঁটরো গ্রামে ব্যাকরণ অধ্যয়নের জন্য গমন করিতেন। ভট্টপল্লী সমাজে সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রচলিত, সুপদ্ম ব্যাকরণের বিখ্যাত চতুষ্পাঠী তখন নিকটবর্ত্তী স্থানে খাঁটারোতেই ছিল। ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পর আলোচনার জন্যই বহু ছাত্রযুক্ত চতুষ্পাঠী ব্যাকরণ পাঠের উপযুক্ত স্থান।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন, "নিজ ভট্টপল্লীতেই ব্যাকরণপাঠার্থী ছাত্র প্রায় এক শত, প্রত্যেকের বিদেশে গিয়া অধ্যয়ন সহজ নহে,—বিশেষতঃ বিদেশে পাঠাইবার জন্যই ব্যাকরণ পাঠেও বয়ঃক্রম কিছু অধিক হইয়া যায়, ৭।৮ বৎসর বয়স্ক বালককে তো বিদেশে পাঠান যায় না, অতএব ভট্টপল্লীতেই ব্যাকরণাধ্যয়নের জন্য চতুষ্পাঠী স্থাপন আবশ্যক, এবং এই চতুষ্পাঠীর যোগ্য অধ্যাপক জয়রাম ভায়া।" এই চিন্তার পরে ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে তিনি বলিলেন, "ভায়া, তুমি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া সমাজের হিতার্থে ব্যাকরণ ও কাব্যের চতুষ্পাঠী স্থাপন কর, তোমার অধ্যাপক-সমাজে বিশিষ্ট স্থান এখন হইতেই হইবে, দুই জন নৈয়ায়িক এবং এক জন স্মার্ত্তের পরেই তোমার অধ্যাপক-মর্য্যাদা হইবে,—ভট্টপল্লী সমাজে ৪খানা নিমন্ত্রণ-পত্র হইলেই একখানা তোমার হইবে। তুমি আরও ৬।৭ বৎসর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নৈয়ায়িক অধ্যাপক হইলেও সমাজের চতুর্থ অধ্যাপক হইতে তোমার অনেক বিলম্ব হইবে—কারণ, তোমা অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী নৈয়ায়িক এখন ৫।৬ জন বর্ত্তমান,—তোমার সমবয়স্কও ২।৩ জন আছেন,—স্মার্ত্তও ২।৩ জন; অতএব তুমি সমাজহিতার্থে এই কার্য্যে ব্রতী হও। আমরা সমবেতভাবে তোমাকে 'ন্যায়ভূষণ' উপাধি প্রদান করিতেছি, আর তুমি চতুর্থ অধ্যাপক হইলে।"

তাহাই হইল—তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুরোধে, ১২৪০ সালে, ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইল।

যে সকল গ্রামস্থ ছাত্র খাঁটরোতে অধ্যয়নার্থ গিয়া অনেকদূর পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর খাঁটরোয় গমন করিলেন না, ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকটেই পাঠ স্বীকার করিলেন; যাঁহারা নিজ গৃহে পিতা পিতৃব্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারাও এই নূতন চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট হইলেন; কেবল ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পিতৃব্যপুত্র রাজেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয় যে কয়জনকে গৃহে বসিয়া পাঠ দিতেন, তাঁহারা ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে আসিলেন না। তাঁহাদিগের সংখ্যা ৪।৫ জনের অধিক নহে। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের প্রথমাবস্থার ছাত্র ভট্টপল্লীর অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ৺সীতারাম তর্কপঞ্চানন; তাঁহার পরে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ৺দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, স্মার্ত্ত ৺অভয়াচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমুখ, ভট্টপল্লীর অধ্যাপকবৃন্দ তাঁহারই ছাত্র। গণদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা রাসতারণ শিরোমণি প্রমুখ বিভিন্ন সমাজস্থ অধ্যাপকগণও তাঁহার ছাত্র। ভট্টপল্লী সমাজে এমন এক জন সংস্কৃতজ্ঞও নাই, যিনি তাঁহার ছাত্র বা ছাত্র সম্প্রদায়ের ছাত্র নহেন। পণ্ডিত সমাজ ব্যতীত ইংরাজি শিক্ষিত সমাজেও তাঁহার ছাত্র অল্প নহে। কাঁঠালপাড়ার ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ খ্যাতনামা মনীষিগণ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের ছাত্র।

ন্যায়ভূষণ মহাশয় ১২৯৫ সালে সজ্ঞানে ৺গঙ্গার তীরনীরে দেহরক্ষা করেন।

যশোর (এখনকার যশোর এবং খুলনা), বাঁকুড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা এবং নদীয়ার দ্বিসহস্রাধিক ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্র। বর্ত্তমান সময়ে সুপদ্ম ব্যাকরণ পাঠ যিনিই করিয়াছেন বা করিতেছেন, তিনিই ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের শাখা।

৭।৮ দিন মাত্র তাঁহাকে মৃত্যুরোগ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই ৭।৮ দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করিয়াছেন। যখন মল্লিনাথের কাব্যগ্রন্থের টীকা মুদ্রিত হয় নাই, তখনও হস্তলিখিত মূল পুস্তক মাত্র অবলম্বনে ন্যায়ভূষণ মহাশয় কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পাঠ দিতেন; তবে তখন এ সব কাব্যপাঠার্থী প্রায়ই ছিলেন না। তখন ভট্টি, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, নৈষধ এই সব গ্রন্থ কিছু কিছু পাঠ হইত, আমাদিগের অর্থাৎ গৌতমদিগের গৃহে একখানি

অভিজ্ঞান শকুন্তল ছিল—তাহাই সমগ্র ভট্টপল্লী সমাজের প্রথম পাঠ্য হয়। অধ্যাপক ন্যায়ভূষণ মহাশয় স্বয়ং এ সব কাব্য পাঠ করেন নাই। মহাকাব্যের মধ্যে ভট্টির নবম সর্গ পর্য্যন্ত, রঘুবংশের নবম সর্গ পর্য্যন্ত, কুমারসম্ভব, নৈষধের ৭ম পর্য্যন্ত তাঁহার অধীত। (তখন নৈষধচরিত পাঠ হইত, অধীতী নৈয়ায়িকের নিকট, গুরুমুখী বিদ্যাযুক্ত নৈষধের অধ্যাপক ভট্টপল্লীর শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ন্যায়ভূষণ মহাশয়ও নৈষধ অধ্যয়ন করেন।) পদাঙ্কদূত ও উদ্ধবদূত এই দুইখানি দূতকাব্য তাঁহার পঠিত। আর সেকালে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে পঠিত হইত গীতা ও চণ্ডী। বলা বাহুল্য, ন্যায়ভূষণ মহাশয়ও তাহা পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষা প্রবর্ত্তনের পরে, তাঁহার ছাত্রদিগকে সমুদয় কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার অধ্যাপনা করিতেন। তিনি দেবনাগর অক্ষর জানিতেন না, তিনি বলিতেন,—"দেবনাগর অক্ষরপরিচয় করিতে কয়দিন লাগে, আমি অনায়াসেই করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করিব না, করিলে আমার কাব্য অধ্যাপনার যশ নষ্ট হইবে, লোকে বলিবে, আমি মল্লিনাথের টীকা দেখিয়া মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, নৈষধ অধ্যাপনা করি, অপর টীকা দেখিয়া অন্য গ্রন্থ অধ্যাপনা করি।"

তিনি নল-চরিত নামে একখানি কাব্য লিখিতেছিলেন,—কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই। কিরাতার্জ্জুনীয়ের ১ম হইতে নবম সর্গ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব টীকা রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপা ও বিশ্বাসপাত্র তাঁহার এই অধম ছাত্রকে (আমি তখন অধ্যাপনা করি) তাহা দেখিতে দিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার দেহান্ত হয় এবং আমিও দীর্ঘকাল পীড়িত থাকি, সেই অবস্থায় ভগ্নগৃহের বৃষ্টিজলে—বাক্সমধ্যস্থিত সেই পুস্তক নষ্ট হইয়া যায়,—এ অপরাধ আমার অমার্জ্জনীয়, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতে সে অপরাধ আমার হয় নাই,—সে টীকা তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই,—মল্লিনাথের টীকা থাকিতে নূতন অসম্পূর্ণ টীকার আদর হইবে না—এই ভাবিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি, কিন্তু অপরাধ-স্মৃতির কণ্টক হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে পারি না।

(১) ছাত্রবাৎসল্য, (২) সরল সত্যনিষ্ঠা, (৩) সংস্কৃত ভাষায় অসীম ব্যুৎপত্তি, (৪) ঋষিজনোচিত পবিত্রতা, (৫) সন্তোষশীলতা, (৬) অক্রোধ এবং (৭) অধ্যাপনে অনুরাগ এই কয়টি তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

(১) ছাত্রবাৎসল্য—সকল ছাত্রকেই তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন,—আমি স্বয়ং সে স্নেহের যে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি,—তাহা এ স্থলে বলিতেছি,—

আমি যখন কাব্য পাঠ আরম্ভ করি, তখন আমার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর। আমার যাঁহারা সহপাঠী ছিলেন, তাঁহাদিগের বয়স কাহারও ২০ বৎসর, কাহারও বা ১৮ বৎসর এইরূপ। আমার অধ্যয়নবিষয়ে বড়ই জিগীষা ছিল—আমার সহপাঠীদিগকে পাঠে অতিক্রম করিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। আমি অধ্যাপক মহাশয়কে বলিলাম, "সহপাঠীদিগের সহিত যে পাঠ হয় তাহা অল্প, আমি আরও একখানি কাব্য পড়িতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সহপাঠীদিগের অসাক্ষাতে পড়িতে চাহি, নতুবা তাহারা বাধা দিবে।" তিনি একটু চিন্তা করিয়াই বলিলেন, "আমার নিত্যকৃত্য ও আহার ব্যতীত সমস্ত দিনই চতুষ্পাঠীতেই থাকি, রাত্রিতে বাড়ীতে থাকি বটে, কিন্তু তুমি বালক, রাত্রিতে তোমার কষ্ট হইবে,—তুমি আমার আহারের সময় আসিও।"—আমি তাহাই করিলাম, তিনি মুখে অন্নগ্রাস দিতেছেন আর আমাকে পড়াইতেছেন। সেই অবস্থা এখন মনে হইলে তখনই আত্মধিক্কার উপস্থিত হয়, প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধকে এত কষ্ট দিয়াছি, গলদেশে অন্নরোধে জীবনান্ত হওয়াও অসম্ভব ছিল না, ইহা তখন না বুঝিলেও, যদি ঘটিত, সে পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় হইত না, অথচ আমি তাঁহার কি করিয়াছি, কোন্ সেবায় বিশেষ ভাবে লাগিয়াছি? যখন সেই সব কথা ভাবি, তখন অশ্রুসংবরণ দুষ্কর হয়।

(২) সরল সত্যনিষ্ঠা—ন্যায়ভূষণ মহাশয়েরা সাত সহোদর। তাঁহাদিগের যে সব পৈতৃক ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল—তাহার কর আদায় প্রভৃতি কার্য্যের ভার ছিল এক ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর। তিনি কর আদায় করিয়া—পিতৃব্য প্রভৃতিকে অংশ বণ্টন করিয়া দিতেন। জমীদার ইচ্ছামত খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, তখন প্রজাদিগের জোতস্বত্ব হইত না,—এক জন প্রজার বার্ষিক কর ছিল ৩।০ টাকা, ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ৪।০ টাকা খাজনা ধার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃব্যদিগকে ৩।০ টাকা খাজনার অংশই দিতেন, এক টাকা তাঁহার থাকিত। একবার প্রজা খাজনা দিতে আসিয়াছে, ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র

বাড়ীতে না থাকায় স্থায়ভূষণ মহাশয়কে ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা দিল,—স্থায়ভূষণ মহাশয় বলিলেন,—মদন, এক টাকা অধিক দিয়াছ, তোমার যে ৩॥০ খাজনা। প্রজার নাম মদন। মদন বলিল,—ষষ্ঠম ঠাকুর, (স্থায়ভূষণ মহাশয় সাত সহোদরের ষষ্ঠ বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে ষষ্ঠম মশায় বা ষষ্ঠম ঠাকুর বলিত) পূর্ব্বে আমার ৩॥০ টাকা খাজনাই ছিল বটে—আপনার 'ভাই-পো' এক টাকা বাড়াইয়াছেন। স্থায়ভূষণ মহাশয় বলিলেন,—আমি যাহা জানি তাহাই লইতে পারি। ভাইপো বাড়াইয়া থাকে, তাহাকে দিও, আমি গোলমালে যাইতে চাহি না।

(৩) যত কঠিন সংস্কৃত শ্লোক বা গদ্য হউক না, টীকার সাহায্য ব্যতীত তাহার ব্যাখ্যা করিতে স্থায়ভূষণ মহাশয় পারিতেন। এইরূপ পাণ্ডিত্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধীনে যখন উপাধিপরীক্ষার সৃষ্টি হইল, প্রথম বৎসরেই স্থায়ভূষণ মহাশয় কাব্যের বাচনিক পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হ'ন।

(৪) আবাল্য বিশুদ্ধচরিত্র, আকারে আচারে ব্যবহারে তাঁহার পবিত্রতা সুব্যক্ত ছিল, তাঁহাকে দেখিলেই শ্রদ্ধায় মস্তক নত হইত। দেহ দীর্ঘ ছিল না, স্থূল মোটেই নয়, বর্ণ গৌর, সহাস্য বদন, চন্দনতিলকাঙ্কিত প্রশস্ত ললাট, বার্দ্ধক্যে বলিযুক্ত, কণ্ঠে তুলসীমালা, দীর্ঘ নাসিকা—হৃদয়ে সেই মূর্ত্তি উদিত হইলে, এখনও মানসচিত্তে ঋষিদর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকি।

(৫) আয় অতি অল্প,—কিন্তু মুখে প্রসন্নতার অভাব একদিনও দেখি নাই, সদা সন্তুষ্ট। মূলাযোড় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সময় ভট্টপল্লীর ৩ জন অধ্যাপক প্রথমেই কর্ত্তৃপক্ষের আকাঙ্ক্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসিত হ'ন, তাঁহারা এই অধ্যাপকপদ গ্রহণে সম্মত কি না? নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস স্থায়রত্ন মহাশয়, স্মার্ত্ত পূজনীয় মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণি মহাশয় এবং কাব্য ও ব্যাকরণে পূজ্যপাদ ৺জয়রাম স্থায়ভূষণ মহাশয়—এই তিন জন অধ্যাপকই উক্ত পদগ্রহণে সম্মত হ'ন নাই। নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত মহাশয়দ্বয়ের অবস্থা স্থায়ভূষণ মহাশয়ের অবস্থা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট ছিল—স্থায়ভূষণ মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা সাধারণের দৃষ্টিতে শোচনীয় হইলেও, তিনি তাহাতে দুঃখবোধ করিতেন না, সুতরাং অনায়াসেই তিনি সেই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার সন্তোষশীলতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

(৬) যতই ক্রোধের হেতু উপস্থিত হউক না, তাঁহাকে কখনই ক্রুদ্ধ হইতে দেখি নাই, কোন ছাত্রকে কখন প্রহার করেন নাই, দুর্ব্বাক্য বলেন নাই, ছাত্রের দুষ্টতা নিবারণার্থ অভিভাবকগণের অনুরোধ হইলে, ছাত্রকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, আমার পাদস্পর্শ করিয়া স্বীকার কর ঐরূপ অনুচিত কার্য্য আর করিবে না। ইহাই তাঁহার শাসন। স্থায়ভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বোল্লিখিত দুই জন ছাত্র ৺সীতারাম তর্কপঞ্চানন মহাশয় এবং ৺দিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ছাত্রশাসনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, শাসনপক্ষপাতী অভিভাবকগণ এই দুই চতুষ্পাঠীতে তাঁহাদিগের বালকদিগকে প্রেরণ করিতেন।

(৭) শাস্ত্রোক্ত অনধ্যায় প্রতিপদ অষ্টমী প্রভৃতিতে অধ্যাপনা হইত না। কিন্তু স্থায়ভূষণ মহাশয় চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত থাকিতেন, ছাত্রদিগকে বলিতেন, জিজ্ঞাসাবাদ কর, শাস্ত্রীয় কথায় সময়ক্ষেপ না করিলে, আমার 'শ্লেষ্মা' হইয়া থাকে।

স্থায়ভূষণ মহাশয়ের দুই বিবাহ, তিনটি কন্যা হইবার পর প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হইলে, পুত্রার্থ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন। ইঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মে। বিসূচিকা রোগে এই একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয়া পত্নীরও কিছুদিন পরে মৃত্যু হয়। এই সব শোক তিনি অনায়াসে সহ্য করিয়াছেন, শোকের সময়েও তাঁহার অধ্যাপনার বিরতি হয় নাই। প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠা কন্যা, জামাতা এবং দৌহিত্র লইয়াই তাঁহার সংসার। স্থায়ভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুকালে কোন কন্যাই জীবিত ছিলেন না। গৃহজামাতারও মৃত্যু হইয়াছিল। যাহা হউক, স্থায়ভূষণ মহাশয় একই ভাবে প্রাতঃকালে শৌচাদিকৃত্য, স্বহস্তে পুষ্পচয়ন, সন্ধ্যাপূজাদি নিত্যধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের পর মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে, একবার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান করা এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পরই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা—এই তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ম্ম, দিবানিদ্রা ছিল না। আমার সময়ে দেখিয়াছি, সায়ংসন্ধ্যার পরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া রচনাদি করিতেন, চতুষ্পাঠীতে আসিতেন না। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে রাত্রিতেও চতুষ্পাঠীতে আসিতেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কখন কখন, কোন কোন পদস্থ ইংরেজকে চতুষ্পাঠী পরিদর্শনার্থ আনিতেন, একবার প্রেসিডেন্সী বিভাগের তাৎকালিক কমিশনার 'এডগার' সাহেবকে আনিয়াছিলেন, সাহেবের গমনের পর ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে আত্মশুদ্ধি ও চতুষ্পাঠীর পবিত্রতা বিধানার্থ যে যত্ন করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা এ সময় উল্লেখ না করাই ভাল।

ভট্টপল্লীতে তৎকালে ঋষিমণ্ডলী দর্শন হইত। ন্যায়ভূষণ মহাশয় তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহার তিরোধানের পরেও কতিপয় মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে মনে হয়, সত্যযুগ তখনও অতীত হয় নাই, তৎপরে ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে একবারে দ্রুতপতন—সহসা ঘোর কলির আবির্ভাব, এই দুঃসময়ে চিত্তশুদ্ধির জন্য ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের শ্রীচরণারবিন্দ স্মরণ করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ভগ্ন-দেউল

আপনা হারায়ে রহেছি গো প'ড়ে হায়,—
ভগ্ন-দেউল আমি,
নিভৃতে একেলা ধরার আঁচল-ছায়
কাঁদে হৃদি দিনযামী!
যাহা ছিল মোর হারায়ে ফেলেছি সব,
নাহি আর সেই হাসিরাশি, কলরব,
স্বপনের মত ভুলিয়াছি সবাকায়,
বিষাদ এসেছে নামি',
আপনা হারায়ে রহেছি গো প'ড়ে আজ,
ভগ্ন-দেউল আমি!

মনে পড়ে আজো অতীতের সুখ স্মৃতি,
কাজল-সন্ধ্যাক্ষণে,
হ'ত আরাধনা গাহি সুমধুর গীতি,
বিবিধ বাদ্য সনে!
সকলি পাশরি ভাবি আজো বারে-বারে,
শঙ্খের রব সান্ধ্য অন্ধকারে—
মুখরিয়া আর উঠে নাকো নিতি-নিতি
আমার এ-অঙ্গনে!
মনে পড়ে আজো অতীতের সুখ-স্মৃতি,
কাজল-সন্ধ্যাক্ষণে!

আরতির বাঁশী নীরব হয়েছে আজি,
রুদ্ধ হয়েছে দ্বার,
মরম-বীণার তারে তারে উঠে বাজি',
বেদনার হাহাকার!
বল্লী-বিতানে কুসুম শুকায়ে যায়,—
উৎসব-নিশি বৃথা কেঁদে ফিরে হায়,
বন্দনা লাগি' যতনে ভরিয়া সাজি,
আসে নাক' কেহ আর;
আরতির বাঁশী নীরব হয়েছে আজি,
রুদ্ধ হয়েছে দ্বার!

বিহানের রোদ সুগভীর বেদনাতে,
সহানুভূতির মত,
স্নেহের পরশ দানিয়া আপন হাতে,
কেঁদে যায় অবিরত!
নাহি দেবপূজা, শুচি আর আরাধনা,
চন্দন-ঘষা, অঙ্কন আলিপনা,…
আশা আলো গান নিভে গেছে একসাথে,
ছিল জীবনের যত;
বিহানের রোদ সুগভীর বেদনাতে,
কেঁদে যায় অবিরত!

বুকের পাঁজর উপাড়ি' যেদিন হায়,
ধূলায় এলেম নামি',
কহিনু নীরবে—'এত দয়া অভাগায়,
হে মোর দয়াল স্বামী?'
ভাবি—এ জীর্ণ পাদ-পীঠ কত দিন—
এম্নি পড়িয়া রবে হায় জনহীন!
ভুলিয়াছি সব, হারায়েছি সবাকায়,
সকলি গিয়াছে থামি',
নিভৃতে একেলা রহেছি গো প'ড়ে আজ,
ভগ্ন-দেউল আমি!

শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী।

পাতালপুরী

(রূপকথা)

ছোটু ছেলেমানুষ। কিন্তু তার খুব সাহস; ভয়-ডর সে জানে না।

রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। ছোটু এলো রাজার কাছে; এসে বললে,—আমাকে চাকরি দিন, মহারাজ। আমি বীর—যুদ্ধ করবো।

রাজা বললেন—আমার কেউ কোথাও শত্রু নেই, বাপু। কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অন্য চাকরি চাও, দিতে পারি।

ছোটু বললে,—না মহারাজ। আমি বীর, যুদ্ধ করতে চাই। কেরাণীগিরি কি মোসাহেবী-চাকরি আমি করবো না!

ছোটুর মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই; কেউ নেই। রাজার দরবারে চাকরি মিললো না,—কোমরের খাপে তলোয়ার আঁটা—ছোটু চললো দুনিয়ার পথে।

চলে চলে এলো কত সহর, কত গ্রাম পার হয়ে এক অজগর বনের সামনে। সন্ধ্যা হয়েছে। চারিদিকে মিষ-কালো অন্ধকার। পকেট থেকে দেশলাই বার করে দেখে, দেশলাইয়ে একটিও কাঠি নেই। সর্ব্বনাশ! উপায়? বনে দোকান নেই যে দেশলাই কিনবে!

দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় দেখলে, দূরে গাছপালার ঝোপের মধ্যে আলো ঝিক্‌ঝিক্ করছে! সেই আলো দেখে হেঁটে ছোটু এলো এক পাথর-পুরীর সামনে। পুরীর পাঁচিলের পাথর মাঝে মাঝে খশে গেছে,—সেই ফাঁক দিয়ে ভিতরে আলো জ্বলছে, দেখতে পেলে।

ছোটু ঢুকলো পুরীর মধ্যে। একটা ঘর। সে ঘরে ঢুকে দেখে, মস্ত স্তম্ভে অনেক বাতি জ্বলছে; আর সেই স্তম্ভ জড়িয়ে এক অজগর-সাপের দেহ। এত বড় সাপ! ছোটু খাপ থেকে তলোয়ার বার করে যেমন সাপের গায়ে কোপ বসাবে, মেয়েলি-গলায় কে বলে উঠলো—মেরো না গো, মেরো না। আমায় উদ্ধার করো।

চমকে চেয়ে ছোটু দেখে, দেহ অজগরের হলে কি হবে, সে দেহে এক অপরূপ রূপসী কন্যার মুখ।

ছোটু বললে—কে তুমি?

সাপ-মেয়ে বললে—আমি পাতালপুরীর রাজকন্যা। আমায় তুমি উদ্ধার করো গো, আমি তোমায় বিয়ে করবো।

মেয়ের মুখওয়ালা সাপকে বিয়ে করার কথায় অন্য লোকে হয়তো শিউরে সরে পড়তো, কিন্তু ছোটু শিউরে সরে গেল না! সে বুঝে নিলে, নিশ্চয় কোনো মায়াবীর মায়ায় রাজকন্যার দেহখানা সাপের দেহ হয়ে আছে! তুক্-তাকে এ দেহ খশে আবার মানুষের দেহ হবে। ছোটু বললে—বেশ। কিন্তু কি করলে তুমি মানুষের দেহ পাবে, বলো?

সাপ-মেয়ে বললে,—পাশের ঘরে যাও। দেখবে, একখানা লাল বেনারসী শাড়ী আছে, আর ছোট একটি মোটুক আছে। সেগুলি এনে শাড়ীখানা দাও আমার গায়ে জড়িয়ে, আর আমার মাথায় দাও সেই মোটুক পরিয়ে। তা হলেই আমার সাপের দেহ খশে মানুষের দেহ হবে।

ছোটু তাই করলে। দেখতে দেখতে সাপের দেহ উবে গেল। ছোটু দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে গোলাপ-বরণ রাজকন্যা!

ছোটু বললে—এসো রাজকন্যা, পাথরপুরী ছেড়ে তোমার বাবার পাতালপুরীতে যাই।

রাজকন্যা বললে,—এখনো সময় হয় নি। রাত্রে বেরুতে গেলে আবার ধরা পড়ে বন্দী হবো। তুমি এক কাজ

করো। আমি মোহর দিচ্ছি। বনের শেষে সরাইখানা আছে। রাত্তিরটুকু সেইখানে ঘুমিয়ে কাটাও। বেলা আটটার সময় রথে চড়ে সরাইয়ের দোরে গিয়ে আমি তোমায় ডাকবো। তখনি তোমাকে বেরিয়ে এসে আমার রথে চড়তে হবে। তার পর সেই রথে চড়ে পাতালপুরীতে দুজনে যাবো—পাতালপুরীতে হবে বিয়ে।

ছোটু বললে,—বেশ কথা!

রাজকন্যা বললে,—যাবার আগে সরবৎ খেয়ে যাও। তোমাকে ক্লান্ত দেখছি। বোধ হয়, অনেক পথ হেঁটেছো?

ছোটু বললে,—হঁ্যা।

রাজকন্যা নিজের হাতে সরবৎ তৈরী করে ছোটুর হাতে পাত্র দিলে। সরবৎ খেয়ে ছোটু আরাম পেলে।

রাজকন্যা বললে,—আর এক মিনিট দেরী করো না—এখনি বেরিয়ে পড়ো। না হলে সরাইয়ের দোর খোলা পাবে না। মনে রেখো, কাল সকালে বেলা আটটা...

ছোটু বললে,—নিশ্চয় মনে রাখবো।

পরের দিন। সরাইয়ে ছোটুর ঘুম ভাঙ্গলো, বেলা তখন দুপুর।

ছোটু উঠে সরাই-ওয়ালাকে বললে—বড্ড ঘুম ঘুমিয়েছি তো!...আমাকে কেউ ডাকতে এসেছিল?

সরাইওয়ালা বললে,—এসেছিল বৈ কি। দিব্যি এক গোলাপ-বরণ কন্যা। সোনার রথে চড়ে এসেছিল। সরাইয়ের দোরে রথ থামিয়ে তিনবার ডাকলো। তারপর এই ফুলটি দিয়ে বলে গেল, কাল সকালে আবার সে আসবে বেলা আটটায়।

ছোটু হায়-হায় করতে লাগলো। ফুলটি নিলে। চমৎকার গন্ধ! মন মুগ্ধ হলো। ছোটু ভাবলে, কন্যা তা'হলে উপকার ভোলে নি! ভালো!

রাত্রে সেদিন সকাল সকাল শুয়ে পড়লো...ভাবলে, কাল আর বেলায় ঘুম ভাঙ্গলে চলবে না।

কিন্তু ঘুম আর হয় না! তন্দ্রা আসে—তখনি সে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। ছোটু স্বপ্ন দেখে, দোরে রথ এসে দাঁড়িয়েছে! ধড়মড়িয়ে উঠে এসে ছোটু দেখে, কোথায় কি! নিঝুম রাত...সকাল হতে এখনো ঢের দেরী!

এমনি ধড়ফড়ানির মধ্য দিয়ে রাতের অর্দ্ধেক গেল কেটে। শেষ রাত্রে ছোটুর গাঢ় ঘুম এলো এবং সে ঘুম ভাঙ্গলো ঠিক আগের দিনের মতো বেলা দুপুরে!

ঘুম ভেঙ্গে উঠে ছোটু বললে—কেউ এসেছিল আমাকে ডাকতে?

সরাইওয়ালা বললে,—হঁ্যা। সেই রথে চড়ে সেই কন্যা...ঠিক সেই বেলা আটটায়। এই রুমাল দিয়ে গেছে, আর বলে গেছে, কাল সকালে আবার আসবে ঠিক বেলা আটটায়...

ছোটু বললে,—কাল যদি ঘুমোই, আমায় ঠেলে তুলে জাগিয়ে দিয়ো ভাই! আমি বকশিস্ দেবো, বুঝলে।

সরাইওয়ালা বললে—ডেকে দেবো।

সে-রাত্রেও ঠিক তেমনি ঘুম! চোখ খুলে রাখা গেল না! ছোটু ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল আটটায় সরাইয়ের দোরে রাজকন্যার রথ এসে দাঁড়ালো। সরাইওয়ালা ছোটুকে জোরসে ঠ্যালা দিলে—ছোটুর ঘুম ভাঙ্গলো না! কাণের কাছে চীৎকার তুললো,—ওঠো গো, রথ এসেছে! তবু ছোটুর সাড়া নেই! রথ ওদিকে চলে যায়—বকশিস্ ফসকায়! সরাইওয়ালা তখন মোটা লাঠি নিয়ে এসে ছোটুর পিঠে বসিয়ে দিলে এক ঘা! চাকররা কাঁশর-ঘণ্টা বাজাতে লাগলো...অবশেষে ছোটুর ঘুম ভাঙ্গলো। ছোটু বললে—রথ এসেছে?

সরাইওয়ালা বললে,—এসেছে কি! এসে ঐ চলে যাচ্ছে...

চলে যাচ্ছে! তলোয়ারের খাপ কোমরে জড়াতে জড়াতে ছোটু পথে বেরিয়ে পড়লো...ঐ যায় সোনার রথ.... সামনে ছিল সরাইওলার ঘোড়া। সহিস তাকে দানা খাওয়াচ্ছিল। তড়াক্ করে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছোটু তাকে রথের পিছনে ছুটিয়ে দিলে...

বাতাসের বেগে রথ চলেছে,—ঘোড়াও তার পিছনে ছুটেছে তেমনি বেগে...তবু রথের নাগাল মেলে না!

চলে চলে রথ এলো সমুদ্রের তীরে। চকিতে সমুদ্রের বুকে জলের ঢেউয়ের উপরে এসে রথ মিলিয়ে গেল!

এতখানি পথ ছুটে ঘোড়ার দম ছিল না,—সে লুটিয়ে পড়লো সমুদ্রের তীরে। ছোটু চুপ করে রইলো না—নৌকোর সন্ধানে সমুদ্র-তীরে ছুটোছুটি করে ফিরতে লাগলো।

একখানি নৌকা মিললো না। হতাশ হয়ে সমুদ্রতীরে বসে ছোটু চেয়ে রইলো অজগর-প্রমাণ ঢেউয়ের পানে···

বেলা পড়ে এলো···ক্ষুধায় পিপাসায় ছোটুর প্রাণ যায়-যায় হয়েছে···সমুদ্রের লোণা-জলে পিপাসা মিটবে না!

তখন ছোটু উঠলো। কাছে কোথাও যদি জল আর খাবার পাওয়া যায়···

হেঁটে হেঁটে সারা রাত কাটলো,—ভোরের দিকে ছোটু এক কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে পৌছুলো। ঘরের সামনে চাঁপাফুলের গাছ,—আর সেই গাছের তলায় বসে এক রূপসী-কন্যা এক-মনে মাছ-ধরার জাল বুনছে। সামনে সাগরের জলে প্রমত্ত ঢেউ···সে-ঢেউ কূলে এসে আছড়ে লুটিয়ে পড়ছে।

ছোটু বললে,—আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো? আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

কন্যা বললে—বসো। আমি খাবার এনে দিচ্ছি।

চক্ষের নিমেষে খাবার এলো। ভাত, ডাল, মাছ ভাজা, মাছের তরকারী, মাছের ঝোল আর মাছের অম্বল। রকমারি মাছ!

খেয়ে আরাম পেয়ে ছোটু বললে,—জানো, এখানে কোন্‌খান দিয়ে পাতালপুরীতে যাওয়া যায়?

কন্যা বললে,—তুমি বুঝি পাতালপুরীতে যাবে?

—হ্যাঁ।

—কেন গো? পৃথিবী বুঝি ভালো লাগছে না?

ছোটু বললে,—তা নয়। এ যাওয়ার মধ্যে একটা কাহিনী আছে!

—কি কাহিনী,—বলো না, শুনি!

ছোটু তখন সব কথা খুলে বললে। শুনে কন্যা বললে,—পাতালে যাবার পথ-ঘাট বলতে পারবো না,—তবে সেদিন মাছ ধরতে গিয়ে জালটা কেমন ভারী ঠেকলো। ভাবলুম, জালে বুঝি তিমি-মাছ পড়েছে! শেষে জাল তুলে দেখি, তিমি নয়; সীসেয় মুখ-আঁটা তামার একটা ঘটী! আগুনের আঁচে ধরতে সীসে গেল গলে,—তখন সে ঘটীর মধ্যে দেখলুম একটা রেশমী চাদর আর একটা পুঁথির বগলি। বগলির মধ্যে পঞ্চাশটা সোনার মোহর। সেই বগলি আর চাদর তোমাকে দিচ্ছি। চাদরখানি গায়ে দিয়ে পাতালপুরীর কামনা নিয়ে জলে ঝাঁপ দাও,—কামনা পূর্ণ হবে।

ছোটু বললে,—সত্যি? বটে!

কন্যা বললে,—মিথ্যা কথা বলে আমার লাভ? চাদর গায়ে দিয়ে পরখ করে ছাখো! হ্যাঁ, একটা কথা, পাতাল-পুরীর রাজকন্যাকে বিয়ে করে আমার চাদর আর বগলি ফেরৎ দিয়ে যেয়ো। কেমন?

ছোটু বললে,—নিশ্চয়।

রেশমী চাদর গায়ে জড়িয়ে ছোটু বললে,—পাতালপুরী যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেল,—আকাশ নেমে পড়লো পায়ের কাছে, পৃথিবী উঠে গেল আকাশে,সাগরের জল কুণ্ডলী রচে ঘুরপাক খেতে-লাগলো···

কোথায় আছে, ছোটু তা বুঝতে পারলো না···

এ গোলযোগ থামলো বহুক্ষণ পরে···গোলযোগ থামতে ছোটু দেখে, সামনে মস্ত প্রাসাদ! দ্বারে দ্বারী দাঁড়িয়ে। ছোটু বললে,—আমি কোথায়?

দ্বারী তাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলো,—কাণা না কি! রাজবাড়ীর দেউড়ী বুঝি নজরে পড়ছে না?

—কোথাকার রাজবাড়ী?

—পাগল! চেনো না? পাতালপুরীর রাজবাড়ী।

পাতালপুরীর রাজবাড়ী! বাঃ! ছোটু মহাখুশী!

কিন্তু এলুম কি করে!···যেমন এই রেশমী চাদরখানি গায়ে দিয়ে মনে ভাবা···ঠিক! সেই সাগর-কন্যা বলেছিল, এ চাদর গায়ে দিয়ে পাতাল-রাজপুরীর কামনা করে জলে দাও ঝাঁপ···

চাদরের খুব গুণ আছে তো!

রাজবাড়ীতে নবৎ-শানাই বাজছে,—দাস-দাসীরা রঙীন-কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ছোটু আবার জিজ্ঞাসা করলে,—হ্যাঁ ভাই দ্বারী, রাজবাড়ীতে আজ কিসের এত বাজনা-বাদ্যি? আমি ভাই বিদেশী লোক, জানি না বলে জিজ্ঞাসা করছি!

দ্বারী বললে,—এ দেশের রাজকন্যা নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। তাঁকে আবার পাওয়া গেছে কি না—তাই আজ সকালে সকলে মন্দিরে যাচ্ছেন পূজো দিতে।

ছোটু ভাবলে, বেশ হয়েছে। ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যাক! গোলাপ-বরণ রাজকন্যা তাকে দেখে চিনতে পারবে নিশ্চয়।

শঙ্খ-ঘন্টার রোলে, শানাইওলাদের শানাইয়ের রবে সকলে পথে এলেন—রাজা, রাণী, রাজকন্যা, রাজ-পুরোহিত, রাজপুরীর যত সখী-সহচরী। ছোটু দেখলে রাজকন্যাকে; রাজকন্যাও তাকে দেখলে; কিন্তু তাকে দেখবামাত্র রাজকন্যার চোখ উদাস হলো—যেন রাজকন্যা তাকে চেনে না! রাজকন্যা অন্য দিকে তাকালো।

সকলে মন্দিরের পথে চললেন।

ছোটুর মন দুঃখে ভরে গেল! ভাবলে, রাজকন্যা নিশ্চয় রাগ করেছে! তিন দিন তার ঘুম ভাঙ্গেনি! কথা সে রাখেনি! উপায়? ছোটু চললো সবার পিছনে···

দ্বার-রক্ষীরা বললে—কোথা যাও?

ছোটু বললে—মন্দিরে।

তারা বললে—খবর্দার! ভিখিরী ছোটলোকদের সেখানে যাবার জো নেই!

ভিখিরী ছোটলোক! ছোটু বললে—আমি ভিখিরী নই, ছোটলোক নই। আমি জোয়ান ফৌজ।

তারা হেসে বললে—থাম্ রে পাগলা! ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে বলে কি না, আমি জোয়ান ফৌজ! যা, যা, গোল করিস নে।

ছোটুকে ঠেলা দিয়ে তারা একপাশে হটিয়ে দিলে। ছোটু ভাবলে, পুঁতির বগলিতে আছে পঞ্চাশ মোহর—সাগর-কন্যা দেছে!

সে চললো পাতালপুরীর সেরা দর্জীর কাছে। বললে, —আমাকে বেশ জমকালো ভালো পোষাক দাও তো বাপু! পঞ্চাশ মোহর দাম দেবো।

সকালে এমন খদ্দের মিলেছে! দর্জী ভালো পোষাক এনে দিলে,—ছোটু বগলি খুলে তার দাম ফেলে দিলে নগদ পঞ্চাশ মোহর!

পোষাক পরে ছোটু ভাবলো, সব মোহর খুইয়ে বসলুম! এখন খাবো কি দিয়ে?···বগলি নাড়াচাড়া করতে ভিতরে মোহর বাজলো ঝম্‌ঝম! ছোটু অবাক্! পঞ্চাশ মোহর দাম দেছে গুণে—আবার মোহর এলো কোথা থেকে? বগলি উপুড় করে গুণে দেখে, বাঃ, পঞ্চাশ মোহর!···

বুঝতে পারলো, এ নিশ্চয় মায়া-বগলি—সেই রূপকথার গল্পে যেমন শোনা যায়! যত খরচ করো, বগলিতে পঞ্চাশ মোহর জমা থাকবে সর্ব্বক্ষণ!

ভারী আনন্দ হলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে বুকে বল নিয়ে সে এলো রাজপুরীর ফটকে!

পূজো দিয়ে মন্দির থেকে সকলে ফিরে এসেছেন! রাজপুরীতে উৎসব চলেছে। ছোটু রাজপুরীর ফটকে ঢুকতে গেল। দ্বারী দিলে বাধা, বললে—হুকুম নেই!

ছোটু বললে,—বটে! হুকুম নেই? ছাখ্, কি করে ঢুকি!

রেশমী চাদর গায়ে দিয়ে ছোটু বল্‌লে—আমি চাই রাজার সামনে যেতে!

চোখের পলক-পাতে ছোটু এসে দাঁড়ালো রাজার খাশ্-কামরায়! রাজা, রাণী, রাজকন্যা বসে ছক্ পেতে পাশা খেলছিলেন। ছোটু বললে—আমি পাশা খেলবো।

রাজা বললেন,—পঞ্চাশ মোহর বাজি রেখে খেলতে বসতে হবে।

ছোটু বললে—বেশ।

বগলি থেকে পঞ্চাশ মোহর বার করে ছোটু রাখলো পাথরের চৌকিতে। রাজা বললেন—বসো।

দান পড়ে না···ছোটু হেরে গেল। হেরে সে বললে—আবার খেলবো।

রাজা বললেন—আবার পঞ্চাশ মোহর বার করো।

—নিশ্চয়!

বলে ছোটু বগলি থেকে তখনি পঞ্চাশ মোহর বার করে দিলে।

দেখে রাজা বললেন,—বাঃ!

রাণী বললেন—চমৎকার!

রাজকন্যা বললেন—আশ্চর্য্য ব্যাপার!

ছোটু বললে—সাপের গা খশিয়ে রাজকন্যার অঙ্গ ফিরে পাওয়ার চেয়েও আশ্চর্য্য না কি রাজকন্যা?

রাজা বললেন,—চুপ! ও-কথা নয়।

ছোটু বললে—জেনে চুপ করে থাকবো কেন, মহারাজ? রাজকন্যার সাপের অঙ্গ কে ঝরিয়ে দেছে, জানেন? আমি!

রাজা চাইলেন রাজকন্যার দিকে, বললেন—এ কথা সত্য, রাজকন্যা?

রাজকন্যা বললেন,—সত্য। আমি একে বলেছিলুম, সকালে আমার রথ এসে দাঁড়াবে তোমার দোরে—তোমাকে ডাকবো; তুমি এসে আমার রথে উঠে বসবে; আমার সঙ্গে এখানে আসবে; এলে তোমার সঙ্গে হবে আমার বিয়ে। তিন-তিন দিন আমি রথ নিয়ে গেছি মহারাজ…ওর ঘুম ভাঙেনি…কোনো দিন ও আসেনি। আমার কি দোষ?

রাজা বললেন,—ঠিক! তা ছাড়া তোমার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে কি বলে দি, বলো? তুমি সামান্য লোক—তবে তোমার বগলিটি দেখছি অসামান্য! যদি ঐ পুঁতির বগলি আমায় দাও, তা হলে রাজকন্যার সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দিতে পারি।

ছোটু বললে—কিন্তু এ আমার জিনিষ নয়, মহারাজ! এটি এক সাগর-কন্যা আমায় দেছে। বলে দেছে, রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেলে এ বগলি তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কাজেই কি করে এ বগলি দি, বলুন?

রাজকন্যা বললে,—বেশ, একেবারে না দাও, যদ্দিন না বিয়ে হয়, ততদিন এ বগলি আমায় ব্যবহার করতে দাও।

ছোটু বললে—তা দিতে পারি, কিন্তু আগে বিয়ের দিন ঠিক হোক্।

রাজা বললেন—এক মাস বাদে দোল-পূর্ণিমা—সেই দোল-পূর্ণিমার রাত্রে বিয়ে হবে।

খুশী মনে ছোটু তার পুঁতির বগলি দিলে রাজকন্যার হাতে।

রাজা বললেন—পাতালপুরীতে তোমার থাকবার জায়গা নেই নিশ্চয়! তা রাজার জামাই হবে…যেখানে-সেখানে থাকা ভালো দেখাবে না। ও-পাড়ায় রাজবাড়ীর অতিথশালা আছে। সেইখানে তুমি থাকবে, যতদিন না বিয়ে হয়।

ছোটু বললে—তাই হবে মহারাজ!

ছোটু গেল অতিথশালায়।…

পরের দিন রাজবাড়ীতে এলো। দ্বারী বললে,—রাজামশাই মহালে গেছেন। রাজবাড়ীতে কারো প্রবেশের অনুমতি নেই…

ছোটু ফিরে গেল…

পরের দিন আবার এলো। সেদিনও দ্বারীর মুখে ঐ জবাব! পর পর চার-পাঁচ দিন এলো, দ্বারীর সেই এক জবাব,—মহারাজ এখনো ফেরেন নি!

ছোটু বললে—নাই ফিরুন, আমি মহারাণীর সঙ্গে দেখা করবো।

দ্বারী বললে—মহারাণীর ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে। মাথার যাতনায় তিনি আকুল—তাঁর সঙ্গে কি করে দেখা হবে?

ছোটু ভাবলে, এ শুধু রাজা-রাণীর ছল! সন্দেহ হলো, রাজা-রাণী তা হলে কথা রাখবে না! হয়তো বিয়ে দেবে না! ঠকিয়ে বগলি নেছে!

ছোটু বললে—বেশ, রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করবো। জানো তো, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?

দ্বারী বললে—রাজকন্যা এখন গান-বাজনা শিখচেন… তাঁর সঙ্গেও দেখা হবে না।

ছোটুর রাগ হলো। তামাসা পেয়েছে, বটে! সে যেন দয়ার প্রার্থী ভিখিরী! ভাবলে, দুত্তোর! রেশমী-চাদর থাকতে দ্বারীর কাছে এত কৈফিয়ৎ কেন দি? রেশমী চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে ছোটু বললে,—যাবোই আমি রাজকন্যার কাছে—নিশ্চয়!

বলতে না বলতে ছোটু এলো রাজবাড়ীর বাগানে! গোলাপজলের ঝর্ণার পাশে শ্বেত পাথরের বেদীতে বসে রাজকন্যা সেই পুঁতির বগলি নেড়ে মোহর বার করছে আর সেই মোহর গুণছে—ন'শো পঞ্চাশ…হাজার…এক হাজার পঞ্চাশ…এগারোশো…এগারোশো পঞ্চাশ…

আহ্লাদে তাঁর মন একেবারে মত্ত-মশগুল! এমন সময় পাশে এসে ছোটু ডাকলে,—রাজকন্যা…

রাজকন্যা চমকে উঠলো। চেয়ে দেখে, ছোটু! বললে,—তুমি! অন্দরের বাগানে এসেছো কি সাহসে? যাও, এখনি চলে যাও! না হলে আমি প্রহরীদের ডাকবো।

ছোটু বললে—চটছো কেন রাজকন্যা? আমি এসেছি দোল-পূর্ণিমায় আমাদের বিয়ে হবে, সেই কথা মনে করিয়ে দিতে!

রাজকন্যা হেসে গড়িয়ে পড়লো, বললে,—বিয়ে! তোমার সঙ্গে! তোমার আস্পর্দ্ধা কম নয় তো! আমি

হলুম পাতালপুরীর রাজকন্যা—আর তুমি কোথাকার ছোট-লোক···চাল নেই, চুলো নেই···হুঁঃ!

ছোটু বললে—বটে! তা বেশ, বিয়েয় কাজ নেই। আমার পুঁতির বগলি দাও ফিরিয়ে।

—দিচ্ছি বৈ কি!—বলে রাজকন্যা পুঁতির বগলি বুকে চেপে ধরলো!

ছোটু বললে—দেবে না বগলি? তা হলে আমার দোষ নেই!

এই কথা বলে রেশমী চাদর গায়ে জড়িয়ে রাজকন্যার হাত ধরে ছোটু বললে,—চলো তবে আমার সঙ্গে পৃথিবীর শেষ সীমানায় ··

যেমন বলা, কোথা থেকে এলো দমকা ঘূর্ণী-বাতাস! সে বাতাস দু'জনকে উড়িয়ে এনে একেবারে নামিয়ে দিলে এক ধূধূ মাঠের প্রান্তে!

ছোটু বললে,—কি দেখচো রাজকন্যা?

ভয়ে রাজকন্যার প্রাণ উড়ে গেছে! কোনোমতে সে ভাব গোপন করে হেসে রাজকন্যা বললে,—তোমার সঙ্গে আমি তামাসা করছিলুম। ভাবলুম, রাগিয়ে দিয়ে দেখি, তুমি কি করো!

একটা কথা বলে রাখি। পাতালপুরীর রাজা-মানুষটি বড় সহজ-মনের মানুষ নন্! মেয়েটিও ঠিক বাপের মতো! ছোটুকে সেই যে সরবৎ খাওয়ানো—সেই ফুল আর রুমাল দিয়ে যাওয়া—সেগুলো ছিল মন্ত্র-পড়া; মন্ত্রের জোরে ছোটুকে কাল-ঘুমে পেয়েছিল—তাই ঘুম ভেঙ্গে সে উঠতে পারেনি। সাপের গা খশে মানুষ হওয়ায় সর্ত্ত ছিল—যে-মানুষের জন্য সে রাজকন্যার দেহ ফিরে পাবে, তাকে বিয়ে করা চাই! তিন দিন তার দোরে এসে ডাক দিয়ে তাকে নিয়ে পাতালপুরীতে যাওয়া চাই! এ সর্ত্ত না রাখলে আবার সেই সাপের দেহ ধারণ করতে হবে! তাই সে সর্ত্ত-পালনের জন্য রাজকন্যা ফন্দী এঁটেছিল!

এখন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে এসে রাজকন্যা ভাবলে, কি করে রাজ্যে ফিরি! লোকটার কবলে এসে পড়েছি··· পরিত্রাণের উপায় কি?

রাজকন্যা বললে—কি জানো, তোমাকে পরখ করছিলুম! ভাবলুম, পথে পথে ঘুরে বেড়াও—তোমার এমন কি শক্তি-সামর্থ্য আছে যে, আমায় বিয়ে করে এর পরে যখন পাতালপুরীর সিংহাসনে বসবে, তখন যদি শত্রু এসে পাতালরাজ্য আক্রমণ করে, কি উপায়ে সে আক্রমণ রোধ করবে? তা এখন দেখছি, তোমার একার যা শক্তি আছে, লক্ষ লক্ষ ফৌজের সে শক্তি নেই।···আর আমার ভয় নেই· আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

ছোটু বললে—ঠিক বলছো?

রাজকন্যা বললেন—ঠিক বলছি।···এখন বলো না গো, তুমি এক নিমেষে কি করে আমায় এখানে নিয়ে এলে? বড্ড আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে! বাবার কাছে মার কাছে তোমার এ শক্তির পরিচয় দিতে পারলে আমার কত গর্ব্ব, কত আনন্দ হবে, তা আর কি বলবো!

মিষ্টি কথায় ছোটুর মন গেল ভুলে'···রেশমী চাদরের গুণের কথা রাজকন্যার কাছে সবিস্তারে সে খুলে বললো।···

তার পর ছোটুর ঘুম পেলে। রাজকন্যার কোলে মাথা রেখে ছোটু ঘুমিয়ে পড়লো।

রাজকন্যা তখন করলে কি, ছোটুর মাথা কোল থেকে নামিয়ে মাটীর উপর রাখলো—তার পর রেশমী চাদরখানি গায়ে জড়িয়ে বললে,—ইচ্ছা করছে, পাতাল-পুরীর রাজবাড়ীতে আমার সেই ঘরটিতে ফিরে যাই!

যেমন বলা, অমনি হুশ্ করে সেই দমকা ঘূর্ণী হাওয়া উঠলো···আর পর-মুহূর্ত্তে রাজকন্যা দেখে, সে বসে আছে পাতালপুরীর রাজবাড়ীতে নিজের ঘরে!

ওদিকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ছোটু দেখে, রেশমী চাদর নেই! রাজকন্যাও নিরুদ্দেশ!

ব্যাপার বুঝতে বাকী রইলো না। রাগে-দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ে, গালে-মুখে চড় মেরে ছোটু কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে তুললো!···

তার পর মাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অস্থির মন!···কি করে? এখন কি করে?

ক্ষুধায় আকুল···সামনে দেখে, একটা কুল-গাছ! কুল ফলেছে থলো-থলো! কুলের রঙ সাদা···রূপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে···হাতের নাগালে ছিল একরাশ রূপোলি কুল। পেড়ে খেতে লাগলো।

কুল খেয়ে নদীতে নামলো অঞ্জলি ভরে জল খেতে। ফটিকের মতো জল! অঞ্জলি ভরে জল খেতে গিয়ে

দেখে, জলে তার মুখের যে-ছায়া পড়েছে···এ কি···মাথায় দুটো শিং গজিয়েছে যে! মাথায় হাত দিয়ে দেখে, সত্যই তাই! ছাগলের শিঙের মতো দু'রগে দুই প্রকাণ্ড শিং!

মনে মনে সে বললে, ঠিক হয়েছে! ঐ পাজী রাজকন্যার কথায় যেমন বিশ্বাস করেছিলুম···ছাগলের মতো বুদ্ধি··· তার যোগ্য সাজা এই ছাগলের শিং!

তবে এ শিং নিয়ে লোকালয়ে যাওয়া চলে না! মনের দুঃখে ছোটু সেই মাঠে পড়ে রইলো।

বিকেলে আবার ক্ষুধার উৎপাত। এবারে চোখে পড়লো, গাছে সোনালি রঙের কুল। পেড়ে খেলে। খেয়ে নদীর জলে ছায়ার দিকে চেয়ে দেখে, মাথার শিং খসে উবে গেছে! বাঃ! রোগ আর রোগের ওষুধ পাশাপাশি ফলেছে!···

মাথায় ফন্দী জাগলো! লতা দিয়ে গাছের ডালপালা জড়িয়ে বেঁধে ছোটু একটি ঝুড়ি তৈরী করলে; তার পর দু'জাতের কুল পেড়ে ঝুড়ি-ভরতি করে সে-ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ছোটু লোকালয়ে এসে একখানা নৌকো জোগাড় করে এলো পাতালপুরীর ঘাটে।

পরের দিন সকালে নকল কতকগুলো দাড়ি-গোঁফ মুখে এঁটে ঝুড়ি মাথায় ছোটু এলো রাজবাড়ীর সামনে— জোর-গলায় হাঁকতে লাগলো,—কুল চাই! মজার কুল! রূপোর কুল!

স্নান সেরে দোতলার ঘরে রাজকন্যা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। পথে রূপোর কুল ডাক শুনে বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পথের পানে তাকালো। তাকিয়ে দেখে, বুড়োর ঝুড়িতে সত্যি সত্যি নতুন জাতের কুল···রূপোর মতো ঝক্‌ঝকে!

এমন কুল কখনো চোখে দেখে নি!

দাসীদের দিয়ে তখনি কুলওলাকে ডাকিয়ে আনা হলো। কুলওলা ছোটু এলো। রাজকন্যা সে দাড়ি-গোঁফের ভারে তাকে চিনতে পারলে না, বললে,—তোমার কুলের কি দাম?

ছোটু-কুলওলা বললে,—একটির দাম দশ মোহর।

রাজকন্যা বললে,—বলো কি? একটি কুল—দশ মোহর দাম! কি এর এমন গুণ?

ছোটু বললে,—খেলেই বুঝতে পারবেন! মুখের বাহার যা হবে, স্বপ্নেও তা ভাবেন নি রাজকন্যা!

—বটে! আচ্ছা, দাও আমাকে এক কুড়ি।

ছোটু বললে,—দাম পড়বে দু'শো মোহর।

—বেশ গো বেশ,—সেই দামই পাবে!···

পুঁতির বগলি হাতে নিয়ে রাজকন্যা দু'শো মোহর গুণে দিলে! ছোটুর মনে হতে লাগলো, নি কেড়ে ঐ বগলি! কিন্তু না, বিপদ ঘটবে! কোন মতে সে লোভ সংবরণ করে গুণে কুড়িটি রূপোলি কুল ছোটু দিলে রাজকন্যার হাতে।

কুল নিয়ে রাজকন্যা ডাকলো সখীদের, বললে,—আয় সকলে আমার ঘরে,—সকলে মিলে সজ্জা-করা কুল খাবো।

রাজকন্যা কুল নিয়ে ঘরে গেল। ঝুড়ি নিয়ে ছোটু পথে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এক নিরালা জায়গায় এসে দাড়ি-গোঁফ ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ পরলো।

ওদিকে হুলুস্থুল ব্যাপার! কুল খেয়ে মুখ-সজ্জা দেখতে রাজকন্যা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দেখে,—সর্ব্বনাশ! মাথার দুদিকে ছাগলের শিঙের মতো শিঙ গজিয়েছে!

শিং দেখে কেঁদে চীৎকার করে রাজকন্যা পুরী মাথায় করলো।

রাজা-রাণী ছুটে এলেন···কন্যার মাথার দিকে চেয়ে রাজা-রাণী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। রসাতলের রাজ-কুমারের সঙ্গে কন্যার বিবাহের কথা পাকা,—দুদিন বাদে বিয়ে,—এখন কন্যার মাথায় শিঙ গজালো! শিঙওলা কন্যাকে রাজার কুমার বিয়ে করবে কেন?

সব কথা শুনে রাজা ঢ্যাঁড়া দিয়ে ঘোষণা জানালেন, সেই দেড়ে কুলওলাকে যে ধরে এনে দেবে, সে পাবে পঞ্চাশ হাজার মোহর পুরস্কার। আর রাজকন্যার মাথার শিঙ যে খসাবে, সে যা চাইবে, রাজা তাকে তাই দেবেন!

দেড়ে-কুলওলার সন্ধান মিললো না। ঢ্যাঁড়া শুনে সন্ন্যাসীর বেশে ছোটু এলো রাজপুরীতে। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি দেখে ভক্তি হয়, বটে! রাজা বললেন,—শিঙ খসবে তো ঠাকুর?

সন্ন্যাসী বললে,—একজন সখীকে দিয়ে আগে পরখ করুন, মহারাজ!

চক্ষু মুদে ছোটু ধ্যানে বসলো,—অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলো; তারপর বড় সখীর হাতে দিলে সোনালি ফুল।··· বড় সখী সোনালি ফুল মুখে দিলে,—দেখতে দেখতে তার মাথার শিং কোথায় মিলিয়ে গেল! বড় সখীর যেমন মুখ ছিল, তেমনি মুখ হলো!

দেখে রাজা ভারী খুশী! বললেন,—এবারে রাজকন্যার শিং খুলে দাও ঠাকুর।

ঠাকুর চক্ষু মুদে ধ্যানে বসলেন! বললেন,—না, হবে না!

রাজা অবাক্! রাজকন্যা শিউরে উঠলো! রাণী কেঁদে ফেললেন,—কেন হবে না?

ঠাকুর বললেন,—রাজকন্যা ভয়ঙ্কর পাপ করেছেন,—যার নাম চুরি। সে চোরাই-মাল এখনি এখানে এনে দিন!

সভার মধ্যে চুরির কলঙ্ক! কিন্তু উপায় কি? কবুল করে সে মাল ফেরৎ না দিলে মাথার শিং কোনোদিন খশবে না! রাজকন্যা ঢোক গিলে বললেন,—পুঁতির একটা ছোট বগলি···এখনি আমি সন্ন্যাসী-ঠাকুরের হাতে সে বগলি এনে দিচ্ছি···

ছোটু-সন্ন্যাসী বললে,—হ্যাঁ, দাও সে বগলি।

রাজকন্যা পুঁতির বগ্‌লি দিলে,—সন্ন্যাসী বগলি রাখলো তার ঝুলির মধ্যে! তার পর আবার ধ্যানস্থ হলো! একটু পরে সন্ন্যাসী বললে,—উহুঁ। আর একটা চুরি-পাপ দেখছি! নাঃ, রাজকন্যার শিং আর খশ্‌লো না, মহারাজ!

রাণী বললেন,—ও মা, আবার কি চুরি করেছিস্, এ্যাঁ? রাজার কন্যা তুই!

রাজকন্যার বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগলো। রাজকন্যা বললে,—একখানা রেশমী চাদর! ভারী তো জিনিষ। দিচ্ছি ফেলে!

রাজকন্যা রেশমী চাদর দিয়ে দিলে,—সন্ন্যাসী সে-চাদর গায়ে জড়িয়ে হো-হো করে হেসে উঠলো। হেসে বললে,—যেমন রাজা, তার তেমনি রাজকন্যা। দুজনেই ঠক, পাজী, বদমায়েস! পাপের সাজা থাকুক্ কপালে আঁটা।

এ কথা শুনে সকলে অবাক্!

ছোটু-সন্ন্যাসী মাথার জটা ফেলে, লম্বা দাড়ি ফেলে বললে—আমি সন্ন্যাসী নই। আমি সেই ছোটু!···আমি চললুম পৃথিবীতে। তোমাদের শিং তোমাদের থাকুক! হাঃ হাঃ হাঃ···

কথার সঙ্গে সঙ্গে ছোটু যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!···

সমুদ্রের তীরে সেই কুঁড়ে-ঘর। কুঁড়ে-ঘরের সামনে চাঁপার গাছে অজস্র চাঁপা ফুল ফুটেছে···রূপসী সাগর-কন্যা বসে নিবিষ্ট-মনে জাল বুনছে। ছোটু এসে পাশে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে ডাকলো—ওগো কন্যা, শুনচো?

সাগর-কন্যা চোখ তুলে চেয়ে দেখে, ছোটু! বললে—কি গো বাবু, পাতালপুরীর রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হলো?

ছোটু বললে—না। সে কন্যাকে আমি বিয়ে করবো না। বিয়ে করা চলে না। ওরা ভারী ছোটলোক।

—তার মানে?

ছোটু সব কথা খুলে বললে।

শুনে সাগর-কন্যা বললে—এখন কি করবে?

ছোটু বললে—তোমাকে বিয়ে করবো। তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে!

সাগর-কন্যা শুনলো, শুনে বললে—কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে।

—বলো।

—আগে ঐ মোহরের থলি আর কামনা-চাদর সাগরের জলে ফেলে দিতে হবে! মোহর-মোহর করে চব্বিশ ঘণ্টা যদি কামনা নিয়ে মানুষ ছুটোছুটি করে, তাহলে জীবনে না মিলবে সুখ, না মিলবে শান্তি! পারবে ও দুটি জিনিষ ফেলে দিতে?

ছোটু বললে—নিশ্চয়।···ফেলে দিলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

—করবো।

বগলি আর চাদর ছোটু দিলে কন্যার হাতে। সাগর-কন্যা সাগরের জলে ফেলে দিলে সেই পুঁতির বগলি আর কামনা-চাদর!

তার পর?

তার পর ছোটুর বিয়ে হলো সাগর-কন্যার সঙ্গে। মোহর নেই, কামনা-চাদর নেই, কাজেই দুজনে মনের সুখে বাস করতে লাগলো।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

চোখের ভুল

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আমাদের চোখ দুটি এমন কৌশলে রচিত এবং এ-চোখের এমন শক্তি যে, চোখ দুটিকে সুস্থ ও সবল রাখতে পারলে ত্রিশ-হাজার রকমের রং আমরা সঠিক দেখতে পাবো! কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা আশি জন লোক দু'রকম লাল রঙের সূক্ষ্ম-তফাত বুঝতে পারি না।

ক'বছর আগে আমেরিকার এক প্রকাণ্ড ছাপাখানায় সেখানকার এক বড় কোম্পানি ক'রকম রঙের ক্যাটালগ ছাপতে দিয়েছিল। ছাপাখানার যে-পদস্থ কর্ম্মচারী কালির রঙ পরীক্ষা করতেন, তাঁর চোখের দোষে কোম্পানির ক্যাটালগে ছাপার কালির রঙে গরমিল হয়। তার ফলে ক্যাটালগগুলো বাতিল এবং ছাপাখানার ক'হাজার টাকা লোকসান হয়!
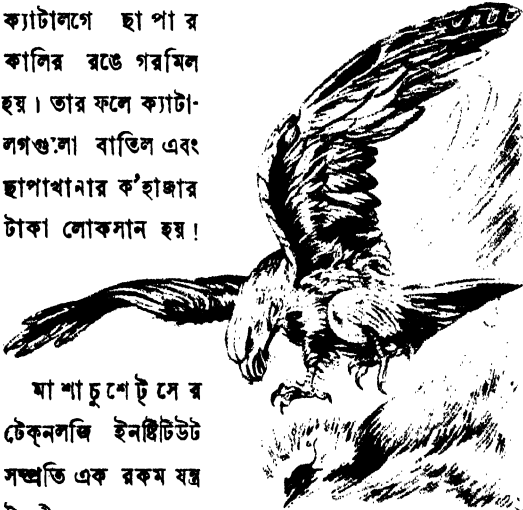
ঈগলের ছোঁ

মাশাচুশেট্‌সের টেক্‌নলজি ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি এক রকম যন্ত্র তৈরী করেছেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁত-ভাবে নানা রকম রঙের সূক্ষ্মতম শেড্ (shade) অনায়াসে লক্ষ্য এবং বিচার করা চলে। এ যন্ত্রটি ক'বছর আগে তৈরী হলে মার্কিনের ছাপাখানাওয়ালার অনেক টাকা বেঁচে যেতো!

খালি চোখে আমরা নানা রঙের সূক্ষ্ম শেডের (shade) পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারি না; তার ফলে কোন্ শেডের পর কোন্ শেড মানায় বা খাপ খায়, তা নির্দ্ধারণ করাও কঠিন হয়। রঙের শেড নিয়ে সূক্ষ্ম হিসাবের কি প্রয়োজন, আমরা আজো তা বুঝি নি; কিন্তু আমেরিকায়-য়ুরোপে এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ক্যালেণ্ডার ছাপা হচ্ছে, ব্যবসা-শিল্পের ট্রেড-মার্ক ছাপা হচ্ছে, তাতে রঙের সূক্ষ্ম শেডটুকু একেবারে নিক্তির মাপে কষে নেওয়া হয়। সুতরাং রঙের বাছ-বিচার সম্বন্ধে ও-সব দেশে সতর্কতার অন্ত নেই। শুধু-চোখে ঠিক-রঙ দেখা সম্বন্ধে আমাদের ভুল ঘটে নিত্য।

কাপড়ের রঙ নিয়ে আলোচনা করা যাক। শিল্কের কাপড় কিনতে বাজারে বেরিয়েছি। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোয় যে-রঙকে দেখবো টকটকে লাল, ঘরের মধ্যে স্তিমিত রৌদ্রালোকে সেই রঙকেই অন্য রকম দেখবো; আবার রাত্রে বিজলী-বাতির আলোয় ঐ কাপড়েই দেখবো দিনের আলোয়-দেখা রঙের সঙ্গে অনেকখানি তফাৎ ঘটেছে।

ধরো, বাড়ীতে ফিকে আশমানি রঙের কাপড় দরকার—

কাপড়ের রঙ-দেখা

দোকানের ঘরে বিজলী-বাতির তীব্র আলোয় যে-কাপড়কে ফিকে আশমানি দেখে কিনে আনলে, বাড়ীতে দিনের আলোয় সে-রঙ দেখে চমকে উঠবে—ফিকে আসমানি রঙ তো নয়, এ-সম্পূর্ণ আলাদা রঙ! জামা-কাপড় কিনতে গিয়ে এ রকম বিভ্রাট নিত্য ঘটে। এ জন্য রঙীন কাপড় কিনতে হলে বিশেষ হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ ঠকতে হবে।

এ-রকম যে হয়, তার কারণ কি? কারণ, আমাদের চোখে-দেখার ভুল এবং তীব্র আলোর ধাঁধা! বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ ভুলে লজ্জার কারণ নেই। আলোর তারতম্য ঘটলে সে আলোয় রঙেও আমরা তফাৎ দেখি। রঙ একই কিন্তু ভোরের আলোয় সে রঙ যেমন দেখাবে, দুপুরের ঝাঁজালো-তীব্র আলোয় তেমন দেখাবে না; আবার গোধূলির

ম্লান আলোয় সে-রঙ একেবারে বদলে যাবে ; রাত্রে তীব্র আলোর দীপ্তিতে সে-রঙ হবে আবার আর এক রকম।

Colours appear different in various kinds of light. হলদে রঙ অনেক সময় চোখে ধরা পড়ে না। রৌদ্রে আছে সাত রকম রঙ। এ সাত রঙে আছে হলদে রঙের আভা—হলদে রঙের আলোতেই কোনো বস্তুর হলদে রঙ চোখে ধরা পড়ে ; তীব্র লাল আলোয় হলদে রঙ বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়—হলদেকে সাদা দেখায়।

শিকাগোয় একটি নূতন থিয়েটার-বাড়ী খোলা হয়েছে—আধুনিক বিজ্ঞান-অনুমোদিত কলা-কৌশলে। এ থিয়েটারে

অনুভব করেননি এবং চিকিৎসকেরাও কোনোদিন তাঁর চোখের অসুস্থতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেননি !

বন্ধুদের কথায় লক্ষ্য করে তিনি দেখেন, তাঁরা মিথ্যা বলেননি। স্যুটটি পার্পল রঙের শার্জ্জের বটে! দর্জীকে তাড়া দিলেন, বললেন,—এ কাপড় আমার নয়। আমি এনেছিলুম ব্লু শার্জ্জ ; এর রঙ রক্তের মতো লাল। কাপড়ের নমুনা ছিল দর্জীর কাছে। সে বললে, এ ব্লু শার্জ্জ নয় কস্মিন্-কালে—এই তো আপনার দেওয়া কাপড়ের টুকরো···

তখন কাপড়ের দোকানে গিয়ে ভদ্রলোক কাপড় দেখালেন,—এ রঙ দিয়েছো কেন? তারা বললে,—এই
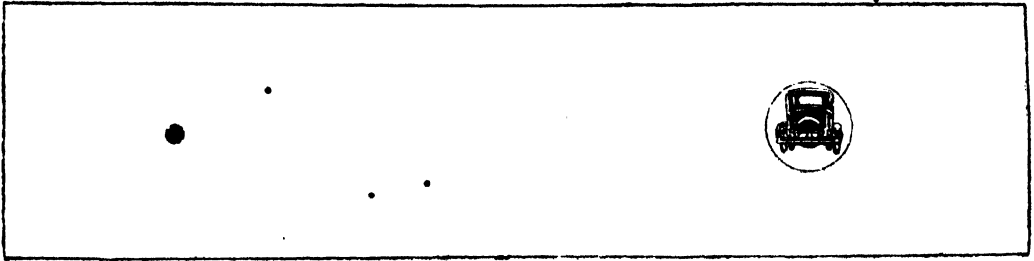
কালো ফুটকি　　　　মোটর গাড়ী

আলোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নূতন এবং অপরূপ। রাত্রে থিয়েটারের ভিতরকার সব আলোগুলি জ্বেলে দিলে ষ্টেজের শীন টক্‌টকে লাল দেখায়। আবার কতকগুলি আলো জ্বাললে লাল রঙ অদৃশ্য হয়ে শীনে সোনালি-হলদে আলোর প্লাবন বয়ে যায়।

আমেরিকার একজন ভদ্রলোকের কথা বলি। রঙ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ সেকেলে। ব্লু রঙের শার্জ্জ-স্যুট ছাড়া অন্য রঙের শার্জ্জ তিনি ব্যবহার করতেন না। দোকান থেকে নিজে দেখে একবার ব্লু শার্জ্জ কিনে এনে তিনি স্যুট তৈরী করান এবং সে স্যুট গায়ে দিয়ে পথে-ঘাটে বেরুবামাত্র তাঁর বন্ধুরা অবাক্! সকলে বলেন,—ব্লু শার্জ্জের দাস্য ছেড়ে দেছো! ভদ্রলোক বললেন, তার অর্থ? বন্ধুরা বললেন,—এ যে রক্ত-রাঙা (Purple) শার্জ্জের স্যুট পরেছো! তিনি জবাব দিলেন,—Purple রঙ কি! এ তো ব্লু শার্জ্জ !

ভদ্রলোকের চোখে কোন দোষ ছিল না—খোলা চোখে লেখা-পড়ার কাজ করতেন, চশমার প্রয়োজন

তো কাপড়! আপনি এই কাপড় নিয়ে গিয়েছিলেন। নম্বর দেখুন, নাম দেখুন!

কাপড় দেখে ভদ্রলোক অবাক্! দোকানে এ-কাপড়ের রঙ দেখাচ্ছিল ব্লু অথচ স্যুট করবা মাত্র কাপড়ের রঙ দেখালো রক্তের মতো কাল্‌চে-লাল!

দোকানের মধ্যে বসে বিজলী-বাতির আলোয় কোনো কাপড়ের রঙকে সঠিকভাবে আমরা দেখি না। সে রঙে তফাৎ ঘটে! দিনের মুক্ত আলোয় কাপড়ের রঙ মিলিয়ে দেখতে হয় ; তবেই ঠিক রঙ দেখা হয়! এ কথার যাথার্থ্য যে কোনো দোকানে গিয়ে রঙীন কাপড় দেখলেই বোঝা যাবে। আমাদের এ চোখে রঙ-দেখায় যে ভুল ঘটে, তার পরীক্ষা সহজে নেওয়া চলে। সবুজ রঙের কোনো জিনিযে বহুক্ষণ ধরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবার পর-মুহূর্ত্তে যদি আমরা লাল রঙের কোনো বস্তুর উপরে দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে যে রঙ দেখবো, তা তার স্বাভাবিক বর্ণের চেয়ে অনেক বেশী গাঢ় অর্থাৎ red দেখবো redder !

নানা রঙের কাপড়-চোপড় বাছাই করতে হলে বা

নানা রঙের বস্তু দেখতে হলে একটা রঙের কাপড় বা বস্তু দেখার পরে একখণ্ড ব্লটিং-কাগজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার পর অন্য রঙের কাপড় দেখা; তবেই দ্বিতীয় কাপড়ের রঙ দেখায় ভুল হবে না। নচেৎ ভুল হবেই—অর্থাৎ সঠিক রঙ চোখে দেখবো না।

আমাদের যে-চোখ অন্য কিছু দেখতে কোনো ভুল করে না—অর্থাৎ মানুষকে মানুষ দেখে, আলু পটল উচ্ছে-বেগুন দেখায় ভুল করে না, রোগাকে রোগা দেখে, মোটাকে মোটা দেখে, রঙের বেলায় সে-চোখের এ ভুল কেন ঘটে—সে কথা জানতে খুবই কৌতূহল হয়!

রঙের বেলায় এ ভুল-দেখার কারণ, আমাদের চোখের তারার ঠিক মাঝখান দিয়ে আমরা রঙ দেখি। Only the central part of the eye, directly back to the pupil is sensitive to colour. চোখের একেবারে কোণ দিয়ে অর্থাৎ অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখলে আমরা কোনো জিনিষের রঙ সম্বন্ধে সঠিক আভাস পাই না। তবে দৃষ্ট বস্তুর গতি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। ঊর্দ্ধ-আকাশ থেকে চিল যে বহু-নিম্নে মাটীর বুকে নেংটি ইঁদুর দেখে ঝুপ্ করে নেমে ছোঁ মারে, তার কারণ, চিল ঐ চলন্ত ইঁদুরকে দেখে,—ইঁদুরের গতি দেখে সে ছোঁ মারে; ইঁদুরকে সে দেখে না।

বিভিন্ন রঙের শক্তি বিভিন্ন। এবং এ শক্তির কাহিনী বেশ কৌতুককর। কোনো জিনিষ যদি লাল রঙের ন্যাকড়ায় বাঁধো বা লাল রঙের কাগজে প্যাক্ করো, তাহলে সে-প্যাকেট আকারে একটু বড় দেখাবে—প্যাকেটের অনুরূপ আকার দেখায় ভুল হবে। সকালে এবং বৈকালে উদয়-সূর্য্য এবং অস্ত-সূর্য্যকে আকারে আমরা বড় দেখি ঠিক এই কারণে; এ দুটি সময়ে সূর্য্যের বর্ণ থাকে দুপুরের সূর্য্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত লাল।

এ জন্য লাল রঙকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, 'অগ্র-বর্ণ' (advancing colour)। লাল রঙের সব বস্তুকে তাদের প্রকৃত অবস্থানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত বলে মনে হয়। নীলকে দেখায় যেন দূরে আছে। নীল রঙকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, 'দূর-বর্ণ' (retiring colour.)

ছোট ঘরের দেওয়ালে লাল বা সবুজ রঙ দিতে নেই—তাতে ঘরকে ছোট মনে হবে। দেওয়ালের রঙ নীল হলে ঘরকে বড় দেখাবে। লাল এবং সবুজ রঙে আর-একটু পার্থক্য আছে। লাল রঙকে 'তপ্ত' মনে হয়; সবুজ বা নীল রঙে ঠাণ্ডার আভাস পাই। রঙের জন্য থার্ম্মোমীটারে তাপের কোনো বৈষম্য ঘটে না সত্য,—তা না ঘটলেও চোখে ধাঁধা ঘটে অনেকখানি।
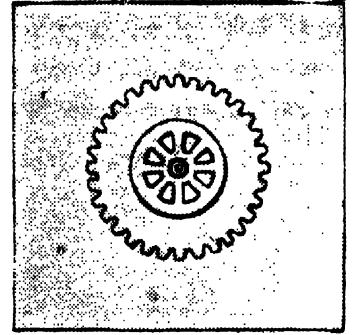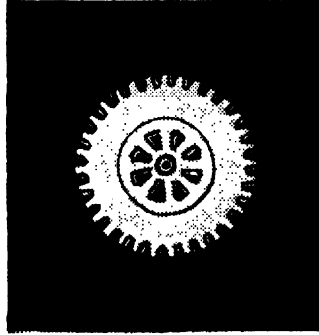
চক্র-কৌতুক
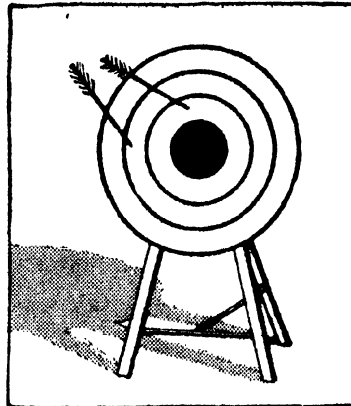
শীতের দিনে লাল রঙের পর্দ্দা, লাল রঙের র‍্যাগ আরাম-প্রদ; গ্রীষ্মে কষ্টকর মনে হয়। বসবার ও শোবার ঘরে আলোর জন্য নীল বা সবুজ বাল্‌ব্ ব্যবহার করলে আরাম পাওয়া যাবে।

তীর দাগা

বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—গোলাপী বর্ণে স্বাস্থ্য, প্রীতি ও সৌন্দর্য্যের আভাস; পীতবর্ণে আনন্দ, পুলক ও সুখের আভাস; রক্তের মতো কাল্‌চে-লালে বিলাস, মর্য্যাদা এবং রহস্যের আভাস পাই

সাদা-কালো রঙেও চোখের এ ভুল ঘটে। আগের

পৃষ্ঠায় ছবি ছাখো। বাঁ দিকে কালো একটি ফুটকি; ডান দিকে গোলকের মধ্যে একখানি মোটর-গাড়ী। বইখানি তুলে চোখের কাছে আনো; এনে বাঁ চোখ বুজে ডান চোখের দৃষ্টি ঐ কালো ফুটকিটির উপরে নিবদ্ধ রাখো পাঁচ মিনিট। এবার বইখানি চোখের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নাও। মুখের কাছ থেকে বইখানি তিন ফুট সরবামাত্র ডান দিকের ঐ গাড়ীর ছবিখানি আর চোখে দেখতে পাবে না—গাড়ীর ছবি অদৃশ্য হয়ে যাবে!

এবার 'চক্র-কৌতুক' ছবি ছাখো। দুটি চতুষ্কোণ, এবং দুটি গোল চাকা দেখচো! দুটিই সমান মাপের। চাকা দুটির ভিতর বাহিরের শেডে কোনো তফাৎ
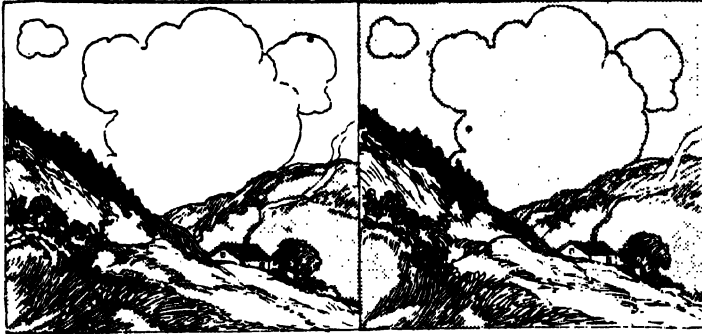
আকাশ

নেই। তবু বাঁ-দিক্‌কার চাকাখানি কালোর গায়ে আঁকা থাকার জন্য বাঁ-দিক্‌কার চাকার রেখাগুলি দেখাচ্ছে মোটা শেডের, ডান-দিক্‌কার চাকার রেখা দেখাচ্ছে হাল্কা শেডের। আসলে কিন্তু তা নয়—দুয়ের শেডে কোনো তফাৎ নেই।

তীর-দাগা ছবি কেটে নিয়ে বা এমনি ছবি এঁকে বড় একখানি সাদা কাগজে আঁটো,—এবার একদৃষ্টে এটির পানে চেয়ে মনে মনে এক থেকে পঁচিশ পর্য্যন্ত গোণো। গণা-শেষে সাদা কাগজের খালি জায়গার পানে তাকাও—দেখবে কাগজের সাদা জায়গাতেও কালো চক্র-রেখা পরিস্ফুট।

এবার উপরের ছবি দু'খানি ছাখো—ছাপার কালির পার্থক্যহেতু চোখে দেখচো, বাঁ-দিক্‌কার ছবির আকাশ ডান-দিক্‌কার ছবির আকাশের চেয়ে বড় এবং ঘন। আসলে কিন্তু দুয়ে কোনো তফাৎ নেই।

সাদা চোখে এমন অনেক ভুল আমরা দেখি। এ ভুলের জন্য রজ্জুতে সর্পভ্রম বা ভূত দেখা আশ্চর্য্য নয়!

—

ইতর-প্রাণীর ভাষা

জন্তু-জানোয়ার কি পরস্পরে 'বাক্যের' দ্বারা মনোভাব বিনিময় করে? সুখ-দুঃখ ভয় ক্ষুধা-পিপাসার বাসনা পশুপক্ষী ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করে? তাদের কণ্ঠস্বরে যে বৈচিত্র্য শুনি, সে বৈচিত্র্যের কোনো অর্থ আছে? এ সব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে! দেখেছি তো, পুকুরের বুকে একরাশ হাঁস,—হঠাৎ একটা হাঁস কোনো কারণে ভয় পেয়ে 'প্যাক-প্যাক' করে ডেকে উঠলো, অমনি দলের বাকি হাঁসগুলো মুখ তুলে প্যাক প্যাক রব তুললো,—তুলে নিমেষে সকলে সেখান থেকে সরে পড়লো! প্রথম হাঁসের ঐ যে সঙ্কেত, সে সঙ্কেতের অর্থ গভীর! না হলে হাঁসের দলে এমন চকিত-চমক লাগতো না!

বাড়ীর পোষা কুকুরকে দেখেছি, প্রহার খেয়ে আর্ত্ত রবে চীৎকার তোলে; সেই কুকুরকে দেখেছি, চুপ-চাপ বসে আছে, হঠাৎ বাড়ীতে ঢুকলো অজানা লোক, অমনি কুকুর তাকে উদ্দেশ করে চীৎকার তুললো আবার পথের কুকুর দেখলে আর এক রকমের রব তুলে বাড়ীর পোষা কুকুর ছুটলো পথে তার পিছনে! এই যে তিন রকম ব্যাপারে তিন রকম চীৎকার,—এ তিনের অর্থ তিন রকম! এ স্বর-বৈচিত্র্যে তিন রকমের মনোভাব ব্যক্ত হয়। তা যখন হয়, তখন এ স্বরের অর্থ আছে এবং নর-সমাজে বিবিধ বিভিন্ন বাক্যে যেমন আমরা বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করি, কুকুর-বিড়ালও তেমনি স্বরবৈচিত্র্যে ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ করে।

কিন্তু পশু-পক্ষীর সমাজে এই স্বর-সঙ্কেতেই তাদের সমগ্র মনোভাব পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায় না। নেকড়ের সমাজে নিঃশব্দে ভীতি-সঙ্কেত প্রচারিত হয়। ভোজের সমারোহ ঘটলে কাক-সমাজ সরবে সে বার্ত্তা প্রচার করে না, —নিঃশব্দে সে সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হয় এবং চকিতে

সে সমারোহ-ভোজে কাকের ভিড় জমে। চড়াইপাখীর দলে বিভীষিকার আভাস জাগবামাত্র নীরবে নিঃশব্দে সে সংবাদ প্রচারিত হয় এবং দলশুদ্ধ চড়াই নিমেষে পক্ষ-সঞ্চালনে পলায়ন করে।

মার্কিন সুধী টম্পশন শেটন প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘকাল বহু আলোচনা এবং অনুশীলন করেছেন। তিনি বলেন, অবোলা পশুপক্ষী ছ' সাত রকমে বাক্‌-চাতুর্য্য প্রকাশ করতে পারে। গভীর জঙ্গলে কণ্ঠ-রবে সংবাদ প্রদান করায় বিপদ আছে,—শত্রুপক্ষ সে কণ্ঠ-স্বর শুনে আক্রমণ তোলে; শাবকদের ডাকবার প্রয়োজন হলে মৃদু শব্দ করে। বহু-দূরে সংবাদ-জ্ঞাপনের প্রয়োজন হলে সে এক মজার ব্যাপার ঘটে। এই হরিণের পুচ্ছভাগে এক গোছা সাদা লোম আছে; এরা ভয় পেলে সে লোম খাড়া হয়ে ওঠে এবং সূর্য্যালোকে ঝকঝক করে। সে তীব্র-শ্বেত বর্ণ বহু দূর থেকে দেখা যায়। তা দেখে এ জাতের হরিণ সতর্ক হয়।

ভয় পেলে বহু জানোয়ারের দেহ থেকে এক বিচিত্র গন্ধ বেরোয়। অবস্থা-ভেদে এ গন্ধে তারতম্য ঘটে! এ গন্ধে জন্তু-জানোয়ারেরা ভয়ের ব্যাপার ঘটেছে বুঝে সতর্ক হয়।

প্রোফেশর শেটন পশু-পক্ষীর স্বর অনুশীলন করছেন

করতে পারে,—কাজেই বনে-জঙ্গলে পশুপক্ষী সমাজে নীরবে নিঃশব্দে সংবাদ-প্রচারের কাজ চলে। কোনো কোনো পশুপক্ষী গায়ের গন্ধে সংবাদ-প্রচারের কাজ সারে,—কোনো পশুপক্ষী এ কাজ সারে তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি-ভঙ্গিমায়। খরগোস খুব নিরীহ প্রাণী,—ভয় পেলে পিছনের পায়ে মাটী ঠুকে দলের সকলকে বিভীষিকার সংবাদ জ্ঞাপন করে।

অধ্যাপক শেটন বলেন, আমেরিকায় এক-জাতের হরিণ আছে। তাদের সমাজে সংবাদ-প্রচারের ভঙ্গী বিচিত্র রকম। ভয় পেলে এরা শীষ দেয়; কৌতূহলী হলে উচ্চ রব

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলেন,—আদিম যুগে গায়ের গন্ধ ছিল পশু-সমাজে বিচিত্র ভাবের আদান-প্রদানের একমাত্র উপায়। পশু-ভেদে এ গন্ধে তারতম্য ঘটে।

মানুষের মুখ দেখে আমরা যেমন বুঝতে পারি, সে ভয় পেয়েছে, না রাগ করেছে, খুশী হয়েছে, না রোগ-যাতনা ভোগ করছে, পশু সমাজও তেমনি গন্ধের তারতম্যে পশুর ভাব-ভঙ্গী সঠিক বুঝে নেয়। এই গন্ধের সাহায্যে স্বাস্থ্য পশু-পক্ষীরা পরস্পরকে চেনে,—তারা পুরুষ কি স্ত্রী; তাদের দেহের স্বাস্থ্য কেমন; তাদের বয়স কত; তাদের

স্বর-লহরী

ক্ষুধা পেয়েছে না, উদর-পূর্ত্তি হয়েছে ; তারা কি চায় ; তারা ভীত না তৃপ্ত,—এ সমস্ত তারা সঠিক বুঝতে পারে। পশুর গায়ের গন্ধে আমরা এ-সব কিন্তু উপলব্ধি করতে পারি না।

কীট-পতঙ্গের সমাজেও এই গায়ের গন্ধ সংবাদ-জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট উপায়। বহু কীট-পতঙ্গ একেবারেই বাক্‌হীন। তাদের কণ্ঠ থেকে কোনোরকম শব্দ উৎসারিত হয় না।

কয়েকটি পতঙ্গের কাণ আছে। কারো 'কাণ' পায়ে ; কারো 'কাণ' তলপেটে ; কারো বা পশ্চাদ্দেশে! যে সব কীট-পতঙ্গের কণ্ঠে ধ্বনি জাগে, তাদের সে কণ্ঠধ্বনি এত ক্ষীণ যে, আমাদের শ্রুতিগোচর হবার উপায় নেই।

পিপীলিকা-সমাজে বাক্ বা ভাষা-রীতির প্রচলন আছে বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু অধ্যাপক শেটন বলেন, এ ধারণা ঠিক নয়। তারা গায়ের গন্ধে সংবাদ জ্ঞাপন করে। দুটি পিপীলিকায় সাক্ষাৎ হলে একটি পিপীলিকা যদি অপরটির মাথার উপর মাথা ঠেকায় তা হলে তার অর্থ,

বাঘ

—'আমার সঙ্গে এসো ;' দেহে মাথা ঠেকালে তার অর্থ হয়—'এই বোঝা বইতে আমায় সাহায্য করো।'

পশু-সমাজে বানরের মত 'আওয়াজী' জীব আর নেই! লম্ফদানে অসাধারণ পটুতা আছে বলে বনে-জঙ্গলে তাদের

ভয়ের পরিমাণ খুব অল্প! ক'জাতের বানরের স্বর-যন্ত্র মানুষের স্বর-যন্ত্রের অনুরূপ। তাই তারা নানা জটিল রব সৃষ্টি করতে পারে।

আদিম যুগের মানুষ শৈশবে যে ভাবে যে ভঙ্গীতে মনোভাব প্রকাশ করতো, সে ভঙ্গীর সঙ্গে বানরের ভাব-প্রকাশের ভঙ্গীর অনেকখানি সামঞ্জস্য ও সমতা আছে। শিশুর মুখের ভাব, চীৎকারের ভঙ্গী দেখে শিশু কি চায়, আমরা তা অনেকখানি বুঝতে পারি। শিশুর বিরক্তি, তৃপ্তি, যাতনা—এগুলো আমরা বুঝি তার চীৎকারের বিচিত্র ভঙ্গিমায়! শিম্পাঞ্জীও মানব-শিশুর মতো বিচিত্র চীৎকারে মনোভাব প্রকাশ করে। আনন্দ হলে হাসে; রাগ হলে কর্কশ চীৎকার তোলে; বিরক্ত হলে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে।

পশু-সমাজে শিম্পাঞ্জি এবং বনমানুষের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী; বিচিত্র স্বর-সৃষ্টিতেও তাদের পটুতা অসাধারণ। শিক্ষা দিলে এরা নরলোকের দু'চারটে ভাষা বলতে পারে—এবং নাম ধরে ডাকলে বা কোনো কথা বললে তার অর্থ বেশ উপলব্ধি করে। যে সব বিশেষজ্ঞ শিম্পাঞ্জির ভাষা অনুশীলন করেছেন, তাঁরা বলেন, ক্ষুধা পেলে শিম্পাঞ্জি

আমেরিকান্ হরিণ

'গাক্-গাক্' শব্দ করে। অভিনন্দন জানাতে হলে রব তোলে, 'ঘো-ঘো-ঘো;' ভয় পেলে বলে, 'হু-উ হু-উ'; খুশী হলে বলে, 'ও-আ ও-আ;' সন্দিগ্ধচিত্ততায় বলে, 'আ ও আ, আ ও আ;' ব্যথা-যাতনা পেলে বলে, 'আই আই'; মিনতি বা প্রার্থনা জানাতে হলে বলে, 'উ উ-উ'; দুঃখিত হলে বলে, 'কা-কা-কা।'

হাওয়ার্ড হিল ও তাঁর পশুশালা

বাক্য-যোজনার ব্যাপারে নর-সমাজের সঙ্গে পশু-সমাজের প্রভেদ আছে। ভাষা শিখে তবেই আমরা অনুরূপ

বাক্য-ব্যবহারে যথাযথ মনোভাব প্রকাশ করতে সমর্থ হই ; পশুসমাজে এ শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কাকলী-বৈচিত্র্যে পক্ষি-শিশু পক্ষিমাতার মনোভাব উপলব্ধি করে—মায়ের ভয়, আদর, বিরক্তি—এ সব বুঝতে তার ভুল হয় না।

লশ এঞ্জেলেশ মিউজিয়মের প্রাণিতত্ত্ববিৎ সুধী শ্রীযুত হাওয়ার্ড হিল বলেন,—চারটি মৌলিক শব্দে পক্ষিসমাজের ভাষা-বিন্যাস গঠিত। এক রকম শব্দে তারা জানায় বিপদ বা ভয় আসন্ন ; দ্বিতীয় রকম শব্দে জানায় মিলন-বাসনা ; তৃতীয় রকম শব্দে জানায়, ক্ষুধা পাইয়াছে ; চতুর্থ রকম শব্দে জানায়, এসো, আমরা দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা করি। যে সব পাখী ঋতু-ক্রম-রীতিতে এদেশে-ওদেশে আস্তানা পাতে, তাদের অভিযান-বার্ত্তা-জ্ঞাপনে স্বর-বৈচিত্র্য আছে!

আওয়াজী বানর

এক-জাতের পশু-পক্ষী অপর জাতের পশু-পক্ষীর স্বর-ভঙ্গিমার অর্থ বোঝে। রবিন পাখীর স্বর-সঙ্কেত অন্য পাখী বোঝে। ছোট রবিনের ডাকে বনের বড় বড় পশুরাও সাড়া তোলে।

পতঙ্গ

আমেরিকায় এক-জাতের পাখী আছে, তার নাম নীল জে। এ পাখী আর আমাদের দেশের নীলকণ্ঠ—এক জাতের। এরা হরবোলা ; অন্য পাখীর স্বর হুবহু নকল করতে পারে ; এবং অন্য পাখীর স্বর নকল করে সে দলে ত্রাস, কৌতূহল জাগিয়ে যেন মজা পায়। ফশলের ক্ষেতে অন্য পাখীরা সদলে এসে ভোজ-সমারোহ লাগিয়েছে, এমন সময় এই নীলকণ্ঠ পাখী ঝোপের আড়ালে বসে তাদের দলের ভীতি-সঙ্কেত-রব তুললো, অমনি ক্ষেতের যত পাখী প্রাণভয়ে উড়ে পালালো! তখন নীলকণ্ঠ নিশ্চিন্ত মনে ক্ষেতে এসে নির্ব্বিবাদে ফশল ভোগ করতে বসলো—এ ঘটনা সেখানে প্রায় নিত্যকার ব্যাপার।

পশু পক্ষীর বিচিত্র স্বর নকল করে বহু শীকারী শীকারকে অনায়াস-লভ্য করে তোলেন। বনে শীকার করতে এসে যূথ-হারা মৃগশিশুর ভীত আর্ত্ত স্বর নকল করলেন, সে স্বর শুনে বনের হরিণ-দল এলো ছুটে, শীকারী অমনি খুশী-মনে রাইফেল তুললেন এবং তাঁর শীকার-অভিযান সার্থক হলো—এ ঘটনা বিরল নয়।

এক

কলেজে পড়াশুনা করিতে করিতে রাধানাথের মানস ক্ষেত্রে প্রচুর বিলাসের বীজ অঙ্কুরিত না হইয়া, কে জানে কোথা হইতে যত বৈরাগ্যের আগাছা দেখা গেল। জিনিষটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিকতার মধ্যে অস্বাভাবিকতার স্থান থাকা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন নহে।

ক্রমে তরুণ রাধানাথের মাথার চুল হইতে পায়ের জুতা অবধি বৈরাগ্যের লক্ষণ জাহির করিতে সুরু করিল। তাহার আহার-বিহারে কার্য্য-কলাপে কথাবার্ত্তায় বৈরাগ্যের ছোপ।

কলেজের পাঠ্য ছাড়া সে আরও অনেক গ্রন্থ পড়িত। কিন্তু সেগুলি নাটক-নভেল জাতীয় বা কাব্যরসাত্মক নহে —দস্তুর মত ধর্ম্মগ্রন্থ—গীতা, পুরাণ, বেদ, দর্শন ইত্যাদি। আধুনিক সভ্যতার কল-কোলাহল এবং আবহাওয়া যাহাতে তাহার মনের তপোবনে কোন প্রকার উৎপাত করিতে না পারে, এ জন্য সে ধর্ম্ম-নীতির প্রাচীর দিয়া মনটাকে ঘিরিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বায়ুর উচ্চতমস্তরে বিচরণশীল পক্ষীর মত তাহার চিন্তা উড়িয়া চলিত উর্দ্ধলোকে কোন্ অলক্ষ্যের অচিন্তনীয়ের সন্ধানে!

প্রকৃতি যখন চন্দ্রালোকে হাস্যময়ী, রাধানাথ জানালায় বসিয়া বিস্ময়াপ্লুতভাবে বাহিরের পানে চাহিয়া থাকে। তাহার মনে হয়, এই ঘন বায়ুস্তর ভেদ করিয়া প্রকৃতির বুকে প্রতিবিম্বিত যাঁহার রূপ এত মধুর, এত স্নিগ্ধ, না জানি সাক্ষাৎ সে রূপ কত লক্ষগুণ আরও মধুর, আরও মনোহর! সে রূপের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে মানুষের না কি সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়—তাহাকে আর সংসারের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার দ্বন্দ্ব ভোগ করিতে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

অন্ধকারও রাধানাথের চিত্তকে দমাইতে পারে না। আঁধার রাতে জানালায় অথবা ছাদে বসিয়া যখন তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতি এবং নক্ষত্রখচিত, কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, তখন সকল রূপের একমাত্র আকর যিনি, তাঁহারই নিবিড় কেশদামের শোভা কল্পনা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে।

তাহার গুরুদেব তুরীয়ানন্দ স্বামীজি এই শিষ্যটির একাগ্রতা এবং গুরুভক্তিতে বড়ই প্রসন্ন। তিনি মাঝে মাঝে উৎসাহ দেন—আরে বেটা ডরো মাৎ, আপ্‌না সড়ক্ পর্ সিধা চল্ না। কিন্তু রাধানাথকে তবু মাঝে মাঝে পথ হারাইতে হয় এবং ভয় ডরেরও সম্মুখীন হইতে হয়। তাহার কারণ, সে মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান, এবং তাঁহারা তরুণ পুত্রের নির্ব্বাচিত এই বৈরাগ্যের পথটাকে বিপথ বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদিগের আশা—ছেলে সংসারী হইয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা তাঁহাদের সুখী করিবে। কিন্তু তাহা না হইয়া এ কি? যেন শিব গড়িতে বানর! ছেলের শুষ্ক মুখ, রুক্ষ চুল, সাত্ত্বিক আহার জননী মহালক্ষ্মীর অন্তরে আর্ত্তনাদ তুলে।

তরুণরা সাধারণতঃ যে পথে চলিতে আকৃষ্ট হয়, তাহা নরকের। কিন্তু মহালক্ষ্মীর মনে হয়, সে পথের অপেক্ষা এ পথটা যেন আরও ভীষণ। সংসারে থাকিয়া ভোগ-বিলাসে উদাস, অর্থসঙ্গতি সত্বেও দীন ভিক্ষুক, যৌবনেই বানপ্রস্থ, এ সব অন্যে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তিনি মা, তিনি পারেন না; তাঁহার যে ঐ একটিই সন্তান।

রাধানাথের পিতা শিবদাস গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। অতিশয় ধনী এবং অবিচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী না হইলেও তাঁহার মন বেশ উদার, উন্নত। কলিকাতায় একখানি বাড়ী, ব্যাঙ্কে কিছু নগদ টাকা এবং উপযুক্ত বেতনের চাকরি—ইহা লইয়াই নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যান। মিথ্যা অভিমান বা কোনও একটা দুরাকাঙ্ক্ষা

তরঙ্গ-শীর্ষে

শিল্পী—শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত
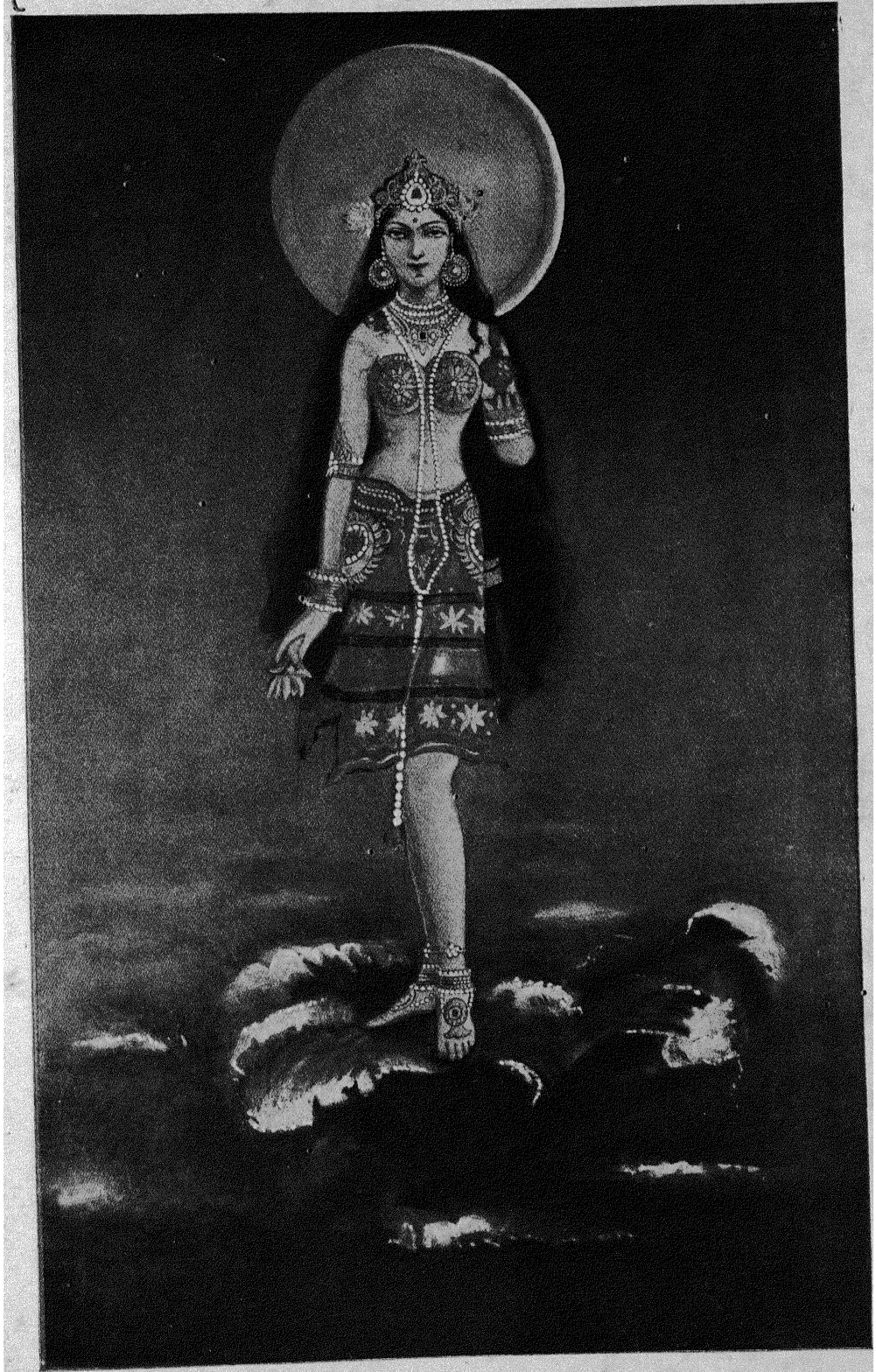
পোষণ করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। অসামাজিক না হইলেও তিনি বড় যে মিশুক তাহাও নহেন। সাদাসিধা পরিচ্ছদ, সরল হাসি এবং সদ্‌বুদ্ধিব্যঞ্জক উজ্জ্বল চক্ষু তাঁহার বিশিষ্টতার পরিচায়ক।

রাধানাথকে তিনি সযত্নে মানুষ করিয়া আসিতেছেন। মানুষ হইলে সে দশ জনের এক জন হইবে, এই আশাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান উৎসাহ। কিন্তু রাধানাথ যে পথে চলিতে সুরু করিয়াছে, তাহা একটুও তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

রাধানাথের মনের একটা দিক্ প্রবল ভাবে টানিয়া লইতেছেন স্বামীজি। বিপরীত দিকে বাপ-মায়ের সংযুক্ত আকর্ষণও যেন স্বামীজির আকর্ষণকে জয় করিতে অসমর্থ। মহালক্ষ্মী ভাবেন, তাঁহাদের দিকে আরও এক জনের সাহায্য আবশ্যক—একটি সুরূপা নববধূর। কিন্তু শিবদাস ভাবেন, সে সাহায্যও যদি বিফল হয়, তখন পরের মেয়ে ঘরে আনার পরিণাম?

ইহা লইয়া স্বামি-স্ত্রীতে বিতর্ক হয়। শিবদাস বলেন, "ছেলে যখন বৈরাগ্যের দিকে এতটা ঝুঁকেছে, তখন ওর বিয়ে না দেওয়াই ভালো। যে দুঃখ আমরা পাচ্ছি, হয়তো তার চেয়ে ঢের বেশী পাবে এক জন নিরপরাধা। তার সারা জীবনের চোখের জলের জন্যে পাপের ভাগী হব আমরা।"

মহালক্ষ্মী ফুঁপাইয়া বলিয়া উঠেন, "আমার ঐ একটাই ছেলে। তুমি বাপ হয়ে কেমন ক'রে চাইছ—ছেলেটা ছন্নছাড়া সন্ন্যাসী হয়েই জীবনটা কাটাবে?"

শিবদাসের বুকের বেদনা মুখে পরিস্ফুট হয়। স্ত্রীকে বাধা দিবার ভঙ্গীতে একটা হাত তুলিয়া কহেন, "ওগো, না না; তোমার ভুল। সেটা কখনো আমার কামনা হ'তে পারে না; তবে কি জান, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া যায় না। বিয়ে দিলে ছেলের মনের গতি ফিরেও যেতে পারে। কিন্তু যদি না গেল? একবার ভাব দেখি, একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে ঘরে এনে কি সর্ব্বনাশটা তার করা হবে! এমন তো অনেক ঘটেছে, অগাধ সম্পত্তি, সুন্দরী স্ত্রী, এ সব তুচ্ছ ক'রে বাপের এক ছেলে সন্ন্যাসী হয়েছে।"

তাঁহার কথা শেষ না হইতে মহালক্ষ্মী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"তুমি থামো, ও সব অলুক্ষণে কথা মুখে এনো না। আমি যেমন ক'রে পারি ছেলের বিয়ে দেবই।"

শিবদাস ভ্রূকুটী করিয়া বাহিরের পানে তাকাইলেন। মুখখানায় উদ্বেগ ও চিন্তা ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

দুই

মহালক্ষ্মীর দুর্নিবার ক্রন্দনে এবং জেদের আতিশয্যে উৎপীড়িত হইয়া শেষে পুত্রের বিবাহের জন্য শিবদাস চেষ্টিত হইতে বাধ্য হইলেন। বহু স্থানে বহু কন্যা দেখিয়া অবশেষে উত্তম বংশের একটি সুরূপা সুলক্ষণা কন্যার সহিত বিবাহ স্থির করিলেন।

রাধানাথ প্রমাদ গণিল। পিতা বিবাহের ঠিক করিলেও সে মনে মনে ইহার একান্ত বিরোধী। কারণ, গুরুজি বলেন, নারী ব্যাঘ্রী, সাধকের মন গিলিয়া খায়। যে নারীর খপ্পরে একবার পড়িয়া যায়, তাহার আর উদ্ধার নাই। 'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী' এই নারী। ইত্যাদি কত কি উপদেশ গুরুজির প্রমুখাৎ রাধানাথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। তাই সে দৃঢ়সঙ্কল্প, কিছুতেই ব্যাঘ্রীর হাতে আত্মসমর্পণ করিবে না। তাহার কল্পিত তপোবনে গুরুজির কৃপায় সিংহী-ব্যাঘ্রী নাই! সেখানে আছে এক সাধনারূপ বৃক্ষ; যাহার অদৃশ্য শীর্ষভাগে নিঃসংশয়ে ঝুলিতেছে মোক্ষফলটি—তাহাই যে রাধানাথের একমাত্র কাম্য, লভ্য এবং সেব্য। যেমন করিয়া হউক, তাহার পক্ষে চিরকুমার থাকাই দরকার, এবং সে তাহাই থাকিবে।

কিন্তু পিতার এ কি কায! গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি! বিপদটা এমন ঝড়ের বেগে উপস্থিত হইল যে, রাধানাথ কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইবার সময় পাইল না। বাপ-মা, আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব সকলে এক দিন একজোটে তাহাকে এক প্রকার চ্যাংদোলা করিয়াই উদ্বাহরূপ সেতুটা পার করিয়া দিল। তাহার অনিচ্ছুকতা বাক্যে এবং মুখভঙ্গীতে যথেষ্ট আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও শুভকার্য্যে সে বাধা দিতে পারিল না।

এতগুলি অত্যাচারীর হাতে দেহটা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেও রাধানাথ মনটাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। ছাদনাতলায় দাঁড়াইয়া সে গুরুজিকে বার বার স্মরণ করিয়াছে, এবং শুভদৃষ্টির সময়েও বেশ ফাঁকি দিয়া চারি চক্ষুর মিলন হইতে দেয় নাই। মনে মনে শতবার গাহিয়াছে—জয় গুরুজিকি জয়! শুভদৃষ্টির সময় তরুণী মায়া স্বামীর

অকলঙ্ক মুখের পানে অল্পক্ষণের জন্য সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামীর সহিত দৃষ্টিবিনিময় না হওয়াতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহার কারণ, সে মনে করিয়াছিল, তাহার স্বামীটি হয় তো বেশ লাজুকপ্রকৃতির।

বিবাহের পর নববধূসহ ঘরে ফিরিয়াই রাধানাথ অদৃশ্য! শীঘ্রই চারিদিকে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শিবদাস স্বামীজির নিকট ছুটিলেন, কিন্তু সেখানেও তাহার পাত্তা নাই। শুধু এইটুকু জানা গেল, সম্ভবতঃ সে এখন তীর্থভ্রমণে ব্রতী। যে সকল শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণের উপযোগী, স্বামীজি তাহাদিগকে সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে গৃহত্যাগী হইয়া কিছুকাল তীর্থে তীর্থে সাধুসঙ্গ করিতে উপদেশ দেন। কঠোর মোক্ষসাধনার এই অঙ্গটা রাধানাথের এইবার সমাপ্ত হওয়া চাই। তবে সে গুরুজির কৃপায় অতি গৌরবের সন্ন্যাস আশ্রম লাভ করিতে পারিবে।

তিন

শিবদাস যাহা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। যাহা হউক,—'তাবদ্ ভয়স্ত ভেতব্যম্ যাবদ্ভয়মনাগতম্, আগতন্ত' ইত্যাদি নীতির অনুসরণে তিনি এখন যথোচিত প্রতীকারের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত। সম্ভব অসম্ভব সকল স্থানেই যত আত্মীয় বা পরিচিত অনাত্মীয় আছে, তাঁহাদিগকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিলেন রাধানাথের অনুসন্ধান করিতে। ইংরেজী, বাঙ্গালা, হিন্দী সংবাদপত্রসমূহে নিরুদ্দিষ্টের আলেখ্যযুক্ত দীর্ঘ বিজ্ঞাপন, পুরস্কার ঘোষণা প্রভৃতিরও ত্রুটি নাই। থানায় থানায়ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হইল।

এই সংকল্পে প্রত্যাশিত ফল উপেক্ষা করিয়া এক দিন রাধানাথের নিকট হইতে একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র আসিল। তাহাকে অন্বেষণের চেষ্টা বৃথা। সে গৃহে ফিরিবে না, তীর্থভ্রমণের পর সন্ন্যাস লইয়া জীবন ধন্য করিতে কৃতসঙ্কল্প। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই, গুরুজির কৃপা তাহার উপর নিত্য বর্ষিত হইতেছে।

পত্র পাঠ করিয়া মহালক্ষ্মী আছড়াইয়া পড়িলেন। শিবদাসের মনের আবেগ আর কোনমতেই রুদ্ধ রহিল না। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার প্রচেষ্টায় নিজেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নববধূ মায়া নিকটে নতশিরে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিবদাস সর্ব্বহারার চোখে বধূর পানে চাহিলেন। তাঁহার মন হাহাকারে পূর্ণ। পুত্র চিরদিনই সংসারবিরাগী, সাধুসঙ্গ ভালবাসে, সাধুর সন্ধানে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। এমন সুরূপা গুণবতী পত্নী লাভ করিবার পর তাহার চিত্ত সংসারাভিমুখী হইবে, এরূপ আশা পোষণ করা শিবদাসের পক্ষে অন্যায় হইয়াছিল বলা যায় না। কিন্তু হায়, এ কি হইল! এক নিরপরাধা ভদ্রকন্যার এ কি সর্ব্বনাশ করিলেন! এই গুরু অপরাধের জন্য যে দণ্ড তাঁহাকে নিশ্চয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার ভীষণতা যে কল্পনারও অতীত!

শিবদাস আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—মা! মায়া শ্বশুরের নিকট অগ্রসর হইতেই, তিনি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন—"বল্ দেখি মা, কেমন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত হয় এ অপরাধের?"

"কোন্ অপরাধের, বাবা?"

"যে শাস্তিটা ভোগ করতে হবে তোকে সারাজীবন ধ'রে শুধু আমার জন্যে, সেই অপরাধের।"

অতি সহজ সরল কণ্ঠে মায়া বলিল, "আমার জন্যে কোন চিন্তা নেই, বাবা। আমার জন্যে আপনার আবার অপরাধ কি? আমি তো আপনাদেরই।"

বধূর কথা শুনিয়া এবং আচরণ দেখিয়া শিবদাস অবাক্। মায়া আবার কহিল, "কিসের ভাবনা, বাবা? হিন্দুর ঘরে জন্ম, ধর্ম্মই আমাদের বল, জীবনের সহায়। আমাদের এই ধর্ম্মেই তো প্রায়ই হয়ে থাকে মহামানবদের জন্ম। বুদ্ধ, নিমাই, শঙ্করাচার্য্য, পরমহংসদেব, কত অতিমানবের! বৈরাগ্যই তাঁদের ছিল যেন বিলাস। আপনি কাতর হচ্ছেন কেন? আমার ভাগ্যে যেটুকু মাপা আছে, আশীর্ব্বাদ করুন, সেইটুকুর ভোগেই যেন জীবনে তৃপ্তি পাই।"

শিবদাসের মুখে প্রতিফলিত হইল একটা স্বর্গীয় ভাবাবেশ। বধূর হাত ধরিয়া আকুলস্বরে কহিলেন, "তোর এই ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে কখনো যেন ছেড়ে যাস্‌নে, মা। স্নেহের আবরণে ঢেকে রাখিস্।"

মায়ার মুখখানা স্নেহ-করুণ, তাহার চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু।

চার

রাধানাথ গৃহত্যাগী শুনিয়া মায়ার পিতা আসিলেন তাহাকে লইয়া যাইতে। প্রথম চোটে বৈবাহিককে কিছু শক্ত কথা শুনাইতে কসুর করেন নাই। প্রত্যুত্তরে কিছুই না বলিয়া শিবদাস অপরাধ স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু মায়া পিতার সহিত ফিরিয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। শোকার্ত্ত শ্বশুর-শাশুড়ীকে ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই রাজি নয়। জীবনে আর তাহার মুখদর্শন করিবেন না, এই কথা ক্রোধ ভরে বলিয়া তিনি ফিরিয়া যান।

তিনি চলিয়া যাইতে শিবদাস বলিয়াছিলেন, "কেন গেলি না, মা? এ অভাগার কাছে থেকে শুধু দুঃখ পাওয়া বৈ তো নয়।"

উত্তরে মায়া বলিয়াছে, "সে আমার অদৃষ্টে যতটুকু আছে তা তো পাবই, বাবা! তার জন্যে একটুও ভাবি না। আমা হ'তে যদি আপনারা মনে একটুও শান্তি পান, সেইটেই এখন আমার সব চেয়ে সুখের।"

এত দুঃখেও শিবদাসের চোখে আনন্দাশ্রু। কহিলেন, "পাগলী মা আমাদের! শুধু তোর জন্যেই বেঁচে থাকা। সংসারের বন্ধন এখন তুই-ই।"

মায়া আন্তরিক আগ্রহে শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে। তাঁহাদিগকে অবসরকালে বই পড়িয়া শুনায়। কন্যার মতই তাহার আবদার। হাস্য-পরিহাসে তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখে।

নৈরাশ্যে মহালক্ষ্মীর মানসিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার ঐ একমাত্র পুত্র রাধানাথ। মায়াই তাহাকে গৃহবাসী করিবে, এই আশাতেই মনকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। কিন্তু সে যখন এত দিনেও ফিরিল না, তখন ক্রমশঃ মনে মনে মায়ার প্রতিই অপ্রসন্ন হইতে লাগিলেন। সে-ই অপয়া, তাই তাঁহার সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইতেছে।

তিনি মুখে স্পষ্ট কিছু না জানাইলেও বুদ্ধিমতী মায়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারে। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আকাশের পানে সময়ে সময়ে চাহিয়া থাকে। মনের আবেগে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। জীবন-নদীর পারে দাঁড়াইয়া মরণকে হাতছানি দেয়

মায়া ঘরের মধ্যে কায করিতেছে, এমন সময়ে মহালক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর কাণে আসিল, "বৌমা!"

ত্রস্তপদে শাশুড়ীর ঘরে আসিয়া কহিল, "আমায় ডাকছেন, মা?"

"হ্যাঁ।"

মায়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আয়ত কালো চোখ দুইটায় একটা যেন কিসের আশঙ্কা। একবার অবজ্ঞাভরে তাহার পানে তাকাইয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মহালক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি ঠিক হয়ে থেকো, কাল ভোরেই যেতে হবে। দিদি খবর পাঠিয়েছে, সেখানে বেলায় ভিড় হয়, ভোরে না গেলে সুবিধে হবে না।"

মায়া জিজ্ঞাসিল, "কোথায়, মা?"

"তাও ব'লে দিতে হবে? ন্যাকা! সেই সাধুজির কাছে; যেখানে সে-দিন গেছলুম আমরা। দিদির বাড়ীর কাছে তিনি এখনো রয়েছেন।"

মায়ার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে-দিন সাধুর দৃষ্টি আকার ইঙ্গিত তাহার একটুও ভাল লাগে নাই। তিনি না কি এক জন তান্ত্রিক। দেখিলে মনে হয়, দেবতাকে যতটা পাইয়াছেন তাহার তুলনায় বেশী পাইয়াছেন শয়তানী। তরুণীদের প্রতি চটুল চাহনি, তাহাদের উপকারে আসিবার অত্যধিক আগ্রহ, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া সঙ্গতিপন্ন শিষ্য করিবার প্রচেষ্টা, কাহারও স্বার্থসিদ্ধির জন্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অছিলায় অর্থগ্রহণ—এগুলি আর কিছু না হউক, অতিব্যবসায়ীর লক্ষণ বলিয়াই মায়ার মনে হইয়াছে। সেখানে দেবতার সংস্রব নাই, দেবতার দোহাই দিয়া একটা কপট ব্যবসা মাত্র।

মায়া লক্ষ্য করিয়াছে, সাধুজির দৃষ্টিতে একটুও ত্যাগের আলোক নাই, আছে ভোগের পাবক। তাই শঙ্কিত মনে তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আর কখনও তাঁহার কাছে আসিবে না। কোন প্রকার ঋণে তাঁহার কাছে নিজেকে আবদ্ধ হইতে দিবে না।

মহালক্ষ্মীর আহ্বানে মায়া চকিতভাবে চাহিয়া দেখিল, হাতে একখান কাগজ লইয়া তিনি কহিতেছেন, "কবচ ধারণ করতে যা যা লাগবে, এইতে সব ফর্দ্দ করা আছে।"

মায়া বিস্মিতভাবে কহিল, "কবচ?"

"হ্যাঁ গো, তবে শুনছ কি? সাধু একটা কবচ দেবেন তোমায় ধারণ করতে। সে কবচ যে ধারণ করে, তিন

সপ্তাহের মধ্যে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ফর্দ্দটায় কি কি লেখা আছে দেখ তো।"

মায়া ফর্দ্দখানা গ্রহণ না করিয়া কহিল, "আমায় ক্ষমা করুন মা, ও কবচ আমি ধারণ করতে একটুও রাজী নই। আমি সেখানে আর যাব না।"

তাহার অপ্রত্যাশিত উত্তরে বিস্মিত হইয়া মহালক্ষ্মী কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। তাহার পর তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "তোমায় যেতেই হবে।"

মায়া দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

"তবে তুমি এই মুহূর্ত্তে বাপের বাড়ী চলে যাও। যে স্বামীর কল্যাণে বাধো দেয়, আমি তেমন বৌয়ের মুখদর্শন করতে চাই নে।"

মহালক্ষ্মী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ বাধা পড়িল। অতিশয় গম্ভীরমুখে প্রবেশ করিলেন শিবদাস। বধূকে নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "যাও মা, একটু খোলা হাওয়ায় গিয়ে বস গে। এই ঘর ছাড়া তোমার যে সব দরজাই বন্ধ। শোকার্ত্ত শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখ চেয়ে তুমি তো নিজেই এই কারাবাস স্বীকার ক'রে নিয়েছ, তা না হ'লে এই মুহূর্ত্তেই তোমায় বাপ-মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসতুম পবিত্র কুমারীর মত।"

মায়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল! একবারও মুখ তুলিয়া চাহিল না, একটা নিঃশ্বাস ফেলিল না, তাহার চক্ষুও সজল হইল না।

পাঁচ

রাত তখন একটা কি দুইটা। শিবদাস বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্দ্ধ-শয়ানভাবে আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া। হাত দুইখানা মাথার তলায় গুঁজিয়া চিন্তানিমগ্ন। আজ-কাল তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন সর্ব্বদাই চিন্তিত। তাঁহার দর্পণের মত ললাটে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখাপাত হইয়াছে। যে বার্দ্ধক্যকে এত কাল ধরিয়া শান্তি ও সন্তোষের আনুকূল্যে নিরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এইবার তাহা জরার পতাকা লইয়া তাঁহার দেহ-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি মানুষটা চাপা, মনের ভাব বড় একটা সহজে প্রকাশ করিতেন না। তবু মায়াকে দেখিলে মাঝে মাঝে তাঁহার দুই চোখের দৃষ্টি বেদনাতুর হইত, মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত—বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছি মা, ভারি অপরাধ! মায়া অনুযোগপূর্ণদৃষ্টিতে শ্বশুরের পানে তাকায়, তাহার নয়নপল্লবের কাণায় কাণায় অশ্রু উপচাইয়া উঠে। শিবদাস তখন জোর করিয়া হাসিয়া তাহার কান্না ভুলাইবার জন্য কহেন, "পাকা চুল তুলে দিবি না, মা?"

চিন্তামগ্ন শিবদাস হঠাৎ নিকটে যেন কাহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে?"

"আমি, বাবা।"

"বৌমা? এখনো ঘুমোওনি যে?"

মায়া হাসিয়া কহিল, "আপনিও তো ঘুমোন নি।"

"না, আমারও ঘুম আসে নি। তুমি ঐ টুলটায় বোসো, মা।"

মায়া বসিল। নৈশ অন্ধকারের পানে চাহিয়া উভয়েই নিস্তব্ধ। আকাশে এক ফালি ক্ষীণ চন্দ্র পাণ্ডুর ম্লান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সে অন্ধকারটাকে যেন আরও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। সেই আলো-আঁধারের পানে চাহিয়া থাকিলে কি যেন একটা অব্যক্ত বেদনা স্মৃতি-বিজড়িত হইয়া হৃদয় শঙ্কান্বিত করিয়া তুলে।

অনেকক্ষণ পরে শিবদাস ডাকিলেন, "বৌমা!"

সুপ্তোত্থিতার মত মায়া জিজ্ঞাসিল, "আমায় ডাকলেন, বাবা?"

"হ্যাঁ, মা। আজ অফিসে এক বন্ধুর কাছে শুনে এলুম, তাঁরা হরিদ্বার যাচ্ছেন কুম্ভমেলায়। আমাকেও ঘুরে আসতে পরামর্শ দিলেন; কি জানি, যদি ছেলেটাকে কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর আশ্রমে খুঁজে পাওয়া যায়।"

আগ্রহাতিশয্যে মায়া বলিয়া উঠিল, "সত্যি? তা হ'লে আর দেরি কোরে কায কি, বাবা?"

কথাটা বলিয়াই মায়া লজ্জায় মাথা নত করিয়া রহিল।

শিবদাসের মুখে একটু দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল। হায় রে মৃগতৃষ্ণিকা! অভাগা মরুপথচারীর শুষ্ক প্রাণ তোমারই কল্যাণে উৎসাহপূর্ণ হইয়া কোনরূপে টিকিয়া থাকে। তোমার অমূল অস্তিত্বের মূল্য বড় কম নয়!

শিবদাস কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, "না মা, একটুও দেরি করা হবে না। আমি শীগ্‌গিরই তোমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ব ঠিক করেছি।"

"আমাদের নিয়ে?"

মায়ার কণ্ঠের হর্ষোচ্ছ্বাস অনুভব করা শিবদাসের পক্ষে একটুও কঠিন হয় নাই।

"হ্যাঁ মা, তোমাদেরও নিয়ে। শুধু হরিদ্বার কেন, আরও নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে খুঁজে আসা যাবে।"

"আচ্ছা বাবা, যদি না পাওয়া যায়, মাকে কি ব'লে সান্ত্বনা দেবেন? তা হ'লে হয়তো তাঁকে আর আনাই যাবে না। একবারে পাগল্ হয়ে যাবেন না তো?"

শিবদাসের কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হইয়া আসিল। বুঝিলেন, সান্ত্বনা হারাইবার ভয়টা মায়ার নিজেরই। তাহার অন্তরের আকুল কামনা করুণ মর্ম্মস্পর্শী বাষ্পাকারে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বাহির হইয়া গৃহের বাতাস পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা যেন মানস-নয়নে তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহার চক্ষু দুইটির দৃষ্টি দিবারাত্র কাহাকে অনুসন্ধান করে, তিনি অনুভব করিতে পারেন। সে হয়তো তাহাকে চেনে না হয় চেনে না; কিন্তু চিনুক বা না-ই চিনুক, সেই মায়ার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু—ধ্রুবতারা। হায় অজ্ঞ রাধানাথ! পৃথিবীতে চলিবার এমন সহজ সরল পথ হেলায় ত্যাগ করিয়া ধরিয়াছ একটা কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ! জান না, পাগল! জীবনের মধু সে পথে চলিতে চলিতে শুকাইয়া যায়, তবু চলা শেষ হয় না।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবেগভরা কণ্ঠে শিবদাস কহিলেন, "তোমার মত কল্যাণময়ীর অন্তরের আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারবে না, ঠিক আসবে। ভগবানেরও যে উপেক্ষা করার সাধ্য নেই, মা!"

ছয়

হরিদ্বার হইতে বিফলমনোরথ হইয়া শিবদাস ফিরিবার মুখে সপরিবারে কাশীতে নামিয়াছেন। ইচ্ছা, এখানেও কিছুদিন থাকিয়া অনুসন্ধান করিবেন।

মায়াকে পশ্চাতে লইয়া শিবদাস চলিয়াছেন বিশ্বনাথ দর্শনে, সেদিন মহালক্ষ্মী আসেন নাই। কেহ তাঁহাকে বলিয়াছে, গঙ্গাকে একশ আট অঞ্জলি দান করিলে তিন দিনেই বাসনা পূর্ণ হয়। তাই ঐ কার্য্যে অতি প্রত্যূষেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

শিবদাস আপন মনেই চলিয়াছেন। তাঁহার পশ্চাতে চলিতে চলিতে মায়ার লক্ষ্য দোকান-বাড়ী এবং পথচারীদিগের প্রতি। একটা বাড়ীর পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে হঠাৎ অস্ফুটধ্বনি করিয়া থামিয়া পড়িল। শিবদাস ফিরিয়া দেখেন, ডান দিকের একটি বাড়ীর পানে মায়া বিহ্বলভাবে তাকাইয়া। তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিতেই যাহা দেখিলেন, তাহাতে আকস্মিক উত্তেজনায় তাঁহার পা টলিতে লাগিল। বধূর হাত ধরিয়া ত্বরিত-পদে তিনি একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কম্পিত কণ্ঠে মায়া ডাকিল, "বাবা!"

বাধা দিয়া শিবদাস কহিলেন, "ঠিক ধরেছিস, মা! আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি!"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মায়া জিজ্ঞাসিল, "তবে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেন কেন?"

"বোকা মেয়ে, আমাদের এখন লুকিয়ে থাকতে হবে। গোপনে খোঁজখবর নিয়ে ধরতে হবে। ও যদি জানতে পারে আমরা এখানে এসেছি, হয়তো তা হ'লে এখান থেকে পালাবে।"

মায়া অনিশ্চিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্কটার চরণে তাহার অন্তরাত্মা আছাড় খাইয়া একটি প্রার্থনাই নিবেদন করিল—"মা, ফিরিয়ে দাও!"

সাত

রাত দশটা। নিস্তব্ধ আশ্রমে জ্যোতির্ম্ময়-মূর্ত্তি স্বামীজি উপবিষ্ট। সম্মুখে শিবদাস, মহালক্ষ্মী ও মায়া।

স্বামীজি বলিতেছেন, "দীক্ষা নিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে সন্ন্যাস এখনও দিই নাই। গৃহ-ত্যাগ ক'রে এলেও তার মন এখনো সম্পূর্ণ গৃহবিমুখ হ'তে পেরেছে ব'লে মনে হয় না। সন্ন্যাসের আগ্রহ সে রোজই জানায়, কিন্তু তাকে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকতে উপদেশ দিয়েছি।"

মায়ার পানে তাকাইতে তাঁহার দৃষ্টি করুণাপূর্ণ হইল। কহিলেন, "আহা, এমন স্ত্রী ফেলে এসেছে!" তিনি উদার মনে কিছুক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন। মহালক্ষ্মী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই স্নিগ্ধস্বরে ব্যস্তভাবে বুঝাইলেন, "চুপ কর মা; ওকে এখন জানতে দেওয়া উচিত নয় যে, তোমরা আমার কাছে এসেছ।"

মহালক্ষ্মী চোখ মুছিয়া নিবেদন করিলেন, "আমার যে ঐ একটিই সন্তান, ওকে ফিরিয়ে দাও, বাবা।"

স্বামীজি হাসিয়া কহিলেন, "পাগল মেয়ে, ফিরিয়ে দেবার মালিক তো আমি নই। যিনি মালিক, তাঁরই কাছে নিবেদন কর, মা, তোমার মনের কামনা।"

আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শিবদাসের পানে চাহিয়া স্বামীজি কহিলেন, "দেশে ফিরে যান সবাই, আমি কয়েক দিন পরে ওকে পাঠাচ্ছি। একটা উপদেশ স্মরণ রাখবেন, ওর বিরুদ্ধে আপনারা কেউ যাবেন না। যা বলবে যা করবে, সবেতেই যেন দেখতে পায় আপনারা বেশ প্রসন্ন। মন শক্ত কোরে রাখবেন।"

শিবদাস স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। মায়া গলায় অঞ্চল দিয়া তাঁহার চরণে মাথা ঠেকাইতে স্বামীজি তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "ভয় নেই বেটি, আশা পূর্ণ হবে, ঘরে ফিরে যা।"

পরদিন প্রাতে স্বামীজি রাধানাথকে ডাকাইয়া একান্তে কহিলেন, "রাধানাথ, তুমি সন্ন্যাসের উপযুক্ত।"

রাধানাথের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল, "প্রভু, আপনারই কৃপা!"

"কিন্তু সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে একটা পরীক্ষা দিতে হয়।"

"আদেশ করুন, প্রভু।"

"আমি জেনেছি তোমার সাধ্বী স্ত্রী আছে।"

রাধানাথের মুখ শুকাইল। তাহা দেখিয়া স্মিতহাস্যে স্বামীজি কহিলেন, "তোমায় একবার ঘরে ফিরে যেতে হবে।"

রাধানাথ প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়াই উঠিল, "প্রভু, ফেলে আসা বন্ধনটাকে আবার ফিরে গিয়ে গলায় পরব? এ অভাগার প্রতি কৃপা করুন।"

"দাঁড়াও, সব কথা এখনো আমার বলা হয় নি। তুমি সন্ন্যাসের অধিকারী হ'তে পারবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে। তোমায় চিরদিনের জন্যে গৃহী হ'তে পাঠাচ্ছি না। মাসত্রয় গৃহবাসী হয়ে থাকবে। সেই সময়ে স্ত্রীকে একান্ত সহধর্ম্মিণী জ্ঞান ক'রে তার হাতের সেবা নেবে, দিনে অবসরকালে তার সাহচর্য্য এবং রাত্রে তাকে শয্যাসঙ্গিনী করবে। তিন মাস কাল গৃহবাসের ফলে মনে যদি একটুও দাগ না পড়ে, গৃহের প্রতি যদি একটুও আকর্ষণ বোধ না হয়, তবেই তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের সময় এসেছে জানবে। নচেৎ আরও দীর্ঘকাল গৃহবাস করবে। এতে দুঃখ নাই। যে মন্ত্র পেয়েছ, নিত্য জপ করবে, সাধন স্বাধ্যায় যথানিয়মে বজায় রেখে চলবে। 'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥' যে সন্ন্যাস নিতে ইচ্ছুক, তার এ কথা স্মরণ রাখা দরকার। কারণ, সন্ন্যাসীর পক্ষে মিথ্যাচারী হওয়া মহাপাপ। সন্ন্যাসের পথ বড়ই কঠোর। সাধু গৃহস্থের পক্ষে স্বধর্ম্মনিরত হয়ে চলা তেমন কঠিন নয়। ভগবানের কৃপায় নির্লিপ্ততা লাভ ক'রে সে ও মুক্তি পায়।"

"কিন্তু প্রভু, পরীক্ষা দিয়ে ফিরে এলে আপনার কৃপালাভ হবে তো?"

"নিশ্চয়। পরমহংসদেবকেও এই পরীক্ষা দিতে হয়েছে। তিনি এই পরীক্ষায় সগৌরবেই উত্তীর্ণ হন।"

ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া রাধানাথ কহিল, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমারও জয়লাভ হয়।"

"তথাস্তু।"

আট

তখন সবে সন্ধ্যা। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালা সুরু হইয়াছে। সন্ধ্যাদীপ দেখাইয়া মায়া দেব-দেবীর ছবির তলায় প্রণাম করিতে করিতে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইতেছে, হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বর কাণে আসিতেই চমকিয়া ছুটিল দেখিয়া আসিতে।

নীচে নামিতে নামিতেই শুনিল মহালক্ষ্মীর কান্না—"রাধু এতদিন পরে ফিরে এলি, বাবা?" তাহার আর নামা হইল না, বিপুল পুলকে স্পন্দিত বক্ষে সে উপরে ফিরিয়া গিয়া লুকাইয়া পড়িল।

শিবদাস রাধানাথকে দেখিবামাত্র আনন্দে রুদ্ধবাক্! কিছুক্ষণ পরে স্বামীজির কথা স্মরণ হইবামাত্র মহালক্ষ্মীকে রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ, ছেলে ঘরে এল তেতেপুড়ে, কোথায় আগে তাকে ঠাণ্ডা করবে, তা না, এখন কাঁদতে বসলে?"

বলিতে বলিতে তিনি মহালক্ষ্মীর পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মহালক্ষ্মী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, "যাক্, এখন হাত-মুখ ধুয়ে স্থির হয়ে বোস্, বাবা, আমি জলখাবার আনি।"

"জলখাবার এখন নয়, মা। আগে আমার জপ সেরে নিতে হবে, তার পর—"

উচ্চকণ্ঠে মহালক্ষ্মী ডাকিলেন, "বৌমা, পুজোর ঘরে রাধুর সন্ধ্যা করবার ঠাঁই কোরে দাও।"

রাত্রিকালে আহারাদির পর তরুণ ব্রহ্মচারীকে নিজের ঘরে খাটে শয়ন করিতে দেখিয়া আর তিনটি প্রাণীর আনন্দ এবং কৌতুকের সীমা নাই।

প্রায় দশমাস পরে গৃহে ফিরিয়া মাতা-পিতার স্নেহ রাধানাথের বড় মধুর বোধ হইতেছিল। তাহার উপর আবার একটি রূপসী তরুণীর আন্তরিক যত্ন এবং প্রীতি। এ জিনিষের সহিত তাহার কোন দিন পরিচয় ছিল না, আজই জীবনে ইহার নূতন আস্বাদন। তবু এখনও মায়ার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় তাহার ঘটে নাই।

গৃহে প্রত্যাগমনের মুহূর্ত্ত হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে সময়টা অতিবাহিত হইল, রাধানাথ মনে মনে তাহারই প্রীতিপূর্ণ আন্দোলন করিয়া দেখিতেছে, হঠাৎ কাহার পদশব্দে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মায়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই নিঃশব্দে কপাট রুদ্ধ করিয়া রাধানাথের নিকটে উপবেশন করিল।

এতক্ষণ রাধানাথ লাবণ্যময়ী মায়ার মুখপদ্ম ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় নাই। কতকটা তাহার লজ্জা এবং কতকটা মায়ার অবগুণ্ঠন ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু এইবার মায়ার শুভ্র যুথিকার মত দেহকান্তি এবং মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে রাধানাথ মনে মনে কহিল, হাঁ, রূপবতী বটে! বিবাহের এতকাল পরে এইবার উভয়ের শুভদৃষ্টি ঘটিল।

মায়ার রূপের জোয়ারে রাধানাথের মুগ্ধচিত্ত তাহার অজ্ঞাতসারে ভাসিয়া চলিয়াছে, হঠাৎ পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিল। পত্নী সুন্দরী কি কুৎসিতা, তাহাতে রাধানাথের কি আসে যায়? সে আসিয়াছে পরীক্ষা দিতে, মেয়াদ ফুরাইলেই জীবনের মত চলিয়া যাইবে।

সহসা কাণে আসিল মৃদু কণ্ঠস্বর—"অত কি ভাবছ?"

অপ্রতিভ রাধানাথ কহিল, "না, এমন কিছু নয়। আচ্ছা, তোমার নামটি কি?"

"আমার নাম বুঝি কখনো শোন নি? বিয়েটাও হয়েছিল যেমন হঠাৎ, তোমার অন্তর্ধানটা আবার তার চেয়েও হঠাৎ। আমার নাম মায়া।"

মায়া! রাধানাথের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গরের আঘাতে মনে একটা স্ফুলিঙ্গ উঠিল—'মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা। ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥' সাক্ষাৎ মায়াই তো বটে! গুরুদেব, রক্ষা কর! পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হই!

রাধানাথকে হঠাৎ বিমনা দেখিয়া মায়া কি-জানি-কেন একটু হাসিল। সেই হাস্যময়ী রূপসীর পানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে রাধানাথ বেশ অনুভব করিতে পারিল, বিরাট মোহমুদ্গরটি একটু একটু করিয়া সেই 'ঈষৎ হাসির তরল হিল্লোলে' তলাইয়া যাইতেছে।

মায়া এইবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেই রাধানাথ দস্তুর মত ঘামিয়া উঠিল।

"পা টিপে দেব?"

"না না, পা টিপে দেবে কেন? স্ত্রীলোক পুরুষের—"

কথা শেষ না হইতেই রাধানাথের একটা পা খপ্ করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া টিপিতে টিপিতে মায়া কহিল, "হলেই বা স্ত্রীলোক। তোমায় কত তীর্থ, কত মঠ, কত সাধুর আশ্রম ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছে তোমার এই পা। আমার কাছে এর চেয়ে বড় তীর্থ—এর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই।"

রাধানাথ অবাক্।

নয়

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। পরীক্ষার মেয়াদ ফুরাইতে আর মাস খানেক বাকি। সেদিন রাত্রিতে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া যাইতেই রাধানাথের দৃষ্টি পড়িল, পার্শ্বে নিদ্রিতা পত্নীর প্রতি। শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ মায়ার মুখে ও বুকে রজতধারা ছড়াইয়া দিয়াছে।

মনে পড়িল অনিরুদ্ধ-উষার কাহিনী। এমনই জ্যোৎস্না-লুণ্ঠিতা নিদ্রিতা উষাকে হরণ করিয়াছিল অনিরুদ্ধ। এই নারী যুগে যুগে, কল্পে কল্পে পুরুষের মন হরণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেন? কি আছে ইহার মধ্যে, যে জন্য পুরুষ জ্ঞান হারাইয়া পতঙ্গের মত ইহার রূপাগ্নিতে ঝাঁপ দেয়?

রাধানাথ নিজের পানে তাকাইল। সে'ও তো এই মোহ হইতে নিস্তার পায় নাই। না, সত্যই না। মাঝে

মাঝে তাহার মন বিভ্রান্ত হইয়া উঠে বৈ কি। এই সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা নারী সর্ব্বদাই তাহার চিত্ত টানে। এই রূপ জিনিষটা কি, তাহা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিবার জন্যই বুঝি রাধানাথ পত্নীর মুখখানা নিরীক্ষণ করিতে করিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল।

আরও কিছু দিন পরে দুপুর বেলা ঘরে কি একটা কায করিতে করিতে মায়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল, এমন সময়ে রাধানাথ আসিয়া কহিল, "আজ যে এত ফূর্ত্তি ?"

"দুঃখটাকে ভুলতে একটু ফূর্ত্তির অভিনয়।"

"তোমার আবার দুঃখ কিসের ?"

মায়া একটু হাসিল, কিছু বলিল না। রাধানাথ ব্যথিত হৃদয়ে নিকটে গিয়া আবিষ্কার করিল, সেই হাসির দুই পাশ দিয়া প্রচুর অশ্রুধারা !

"আচ্ছা মায়া, তুমি কি সত্যিই আমায় বড্ড ভালবাস ? আমি কাছে না থাকলে তোমার জীবন সত্যিই বিষময় হয়ে পড়বে ?"

রাধানাথ মায়ার হাত ধরিল। কিন্তু মায়া রোদনোচ্ছ্বাসে ফুলিতে ফুলিতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কক্ষ হইতে পলায়ন করিল।

দশ

শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। রাধানাথ ঠিক করিয়াছে—বিজয়ার রাত্রিতে গৃহত্যাগ করিবে। মায়া সে কথা জানে। জানিলেও মহালক্ষ্মীর কাছে ইহা গোপন রাখিয়াছে। শিবদাসকে এ কথা জানাইতে, তিনি বলিয়াছেন, "সে ভার তোর ওপর, মা! যেমন ক'রে পারিস্ ওকে ঘরে রাখতে চেষ্টা করিস্।"

মায়া মুস্কিলে পড়িয়াছে। যে থাকিবে না, তাহাকে কেমন করিয়া রাখিবে ?

বৈকালে শিবদাস একখানা ট্যাক্সিতে সকলকে লইয়া নানা স্থানে প্রতিমা দর্শন করিয়া আসিবেন। কিন্তু রাধানাথ যাইতে অনিচ্ছুক। কাযেই শিবদাস শুধু মহালক্ষ্মীকে লইয়া বাহির হইলেন। মায়া ও রাধানাথ বাটীতেই রহিল।

মায়ার যাইতে ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, আর তিন দিন পরেই রাধানাথ চলিয়া যাইবে জীবনের মত। তাহার মন ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যার সময় আপন ঘরে বসিয়া বিষণ্ণ মনে দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে হাস্য-মুখে প্রবেশ করিল রাধানাথ।

"কেমন ফন্দি ক'রে তুমি আর আমি বাড়ীতে রয়ে গেলুম।"

চমকিয়া মায়া দেখিল, রাধানাথ তাহার অতি নিকটে আসিয়া বসিয়াছে। জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি ইচ্ছে ক'রেই গেলে না ?"

"নিশ্চয়।"

"কেন ?"

"শুধু তোমায় একান্তে পাব ব'লে।"

"যাকে দু'দিন পরে জন্মের মত চলে যেতে হবে, তার এটুকু পাওয়ায় লাভ ?"

মায়াকে বাহুবেষ্টিতা করিয়া রাধানাথ কহিল, "লাভ এইটুকু—সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ত্যাগ।"

"কি বল্লে ?"—মায়া একটা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

"হ্যাঁ মায়া, সত্যিই। ভেবে দেখ্‌লুম, যদি ফিরে যাই, মিথ্যাচারী সন্ন্যাসী হব। সে মহাপাপ। আমার এখন ফেরা চল্‌বে না।"

মৃদু-হাস্যে মায়া কহিল, "কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের মোহটা এমন এক কথায় কাটিয়ে ফেলা কি ভাল ?"

স্মিত মুখে মায়ার কাণের কাছে মুখ আনিয়া রাধানাথ কহিল,—

"আমি গৃহী, নহি সন্ন্যাসী
যোগীর সাধনা নাহি,
অঞ্জলি ভরি প্রীতির প্রসাদ
শুধু নিশিদিন চাহি।"

আবেশে মায়ার ঘুম আসিতে লাগিল। তখন দূর হইতে আরতির মধুর বাঁশীর সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

শ্রীমতী ইলারাণী মুখোপাধ্যায়।
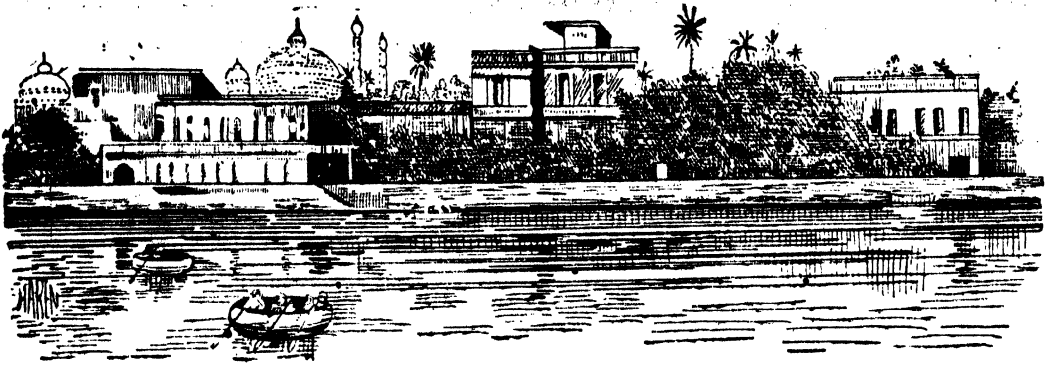
বালী দ্বীপের স্বরূপ

ভারত মহাসাগরে সুমাত্রা, জাভা, সেলিবিস্, মলক্কাশ, বালী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপসমন্বিত যে দ্বীপপুঞ্জ বর্ত্তমান, তন্মধ্যে বালী দ্বীপকে অনেকে ভূস্বর্গ নামে অভিহিত করে। বালী দ্বীপের অধিবাসিগণের ধারণা, মৃত্যুর পর এই দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তাহারা অমরত্ব লাভ করিবে।

বালীবাসীরা মনে করে, দেবতারা বন্ধুর ন্যায় তাহাদিগের হিতৈষী, এবং অনুক্ষণ তাহাদিগের সান্নিধ্যে বাস করিতেছেন। ভূত-প্রেতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করে, তাহা বিলক্ষণ উত্তেজনাপূর্ণ। পৌরাণিক কাহিনীর অভিনয়ই সাধারণতঃ ইহাদের আমোদ প্রমোদের প্রধান বিষয়। দেশের সর্ব্ব-সাধারণ এই সকল আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়া থাকে, এবং সমাজের কোন স্তরের নর-নারী তাহাতে বঞ্চিত হয় না। অধিক কি, দুগ্ধপোষ্য বালক-বালিকাগণ পর্য্যন্ত তাহাদের মাতার স্তনদুগ্ধের সহিত হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীগুলির রসমাধুর্য্য উপভোগ করে।

বালী দ্বীপের নারীদিগের স্নানপ্রথা

বালী দ্বীপের কোন অংশে উৎকৃষ্ট বন্দর না থাকায় এই দ্বীপে বৈদেশিক প্রভাব-বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিবাসিগণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া জীবনযাপনের প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের সকল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরির প্রভাবে বালী দ্বীপের জমি অত্যন্ত উর্ব্বর, জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর; বিশেষতঃ, অধিবাসিগণ প্রয়োজন হইলেই জল পায়, এ জন্য তাহাদিগকে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয় না, এবং সেখানে কখন দুর্ভিক্ষ দেখা যায় না। বালীবাসীরা পরম সুখে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে।

প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র্য

মিঃ মেনার্ড আওরেন উইলিয়াম্‌স নামক মার্কিণ পর্য্যটক বালী দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া এই দ্বীপ ও দ্বীপের অধিবাসী সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার সেই মনোজ্ঞ বর্ণনা 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকবর্গের তৃপ্তিবিধান করিবে।

বালীদ্বীপের নারীরা মোট বহিতেছে

মিঃ উইলিয়াম্‌স লিখিয়াছেন,"বালী দ্বীপের সৌন্দর্য্য অতীব চিত্তাকর্ষক হইলেও তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া উপভোগ করা যায় না। বালী দ্বীপের মন্দিরসমূহ, অদ্ভুতাকার দেবমূর্ত্তিগুলি, অধিবাসিগণের দেহের বাদামী রঙ্গ, ধান্যক্ষেত্রসমূহের উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুঞ্জনকারী পক্ষিকুল (humming bird), বীজনরত নারীগণ কর্ত্তৃক পাখা আন্দোলনের সময় তাহাদের অঙ্গুলিগুলির বিচিত্র ভঙ্গী,

বালীর পুরুষ শবদেহের শোভাযাত্রা

বেতের ঝুড়ির ভিতর সংরক্ষিত যুদ্ধনিপুণ মোরগ দল, এ সকলই অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু তাহাদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিলে চলিবে না; সে সৌন্দর্য্য একযোগে উপভোগ্য। বালী দ্বীপের সংস্কৃতি বহুকালের পুরাতন। বালী অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষ নহে। এখানে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বর্ত্তমান; কিন্তু হিন্দুস্থানে জাতিগত পার্থক্য যেরূপ প্রবল, এখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এই দ্বীপবাসিগণের জাতিগত

উপবেশনের ভঙ্গীতে নৃত্যগীত

বালীর বালিকা-নৃত্য

উৎসারিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মৃত্যুস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহাতে বহু জনপদ বিধ্বস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি বালীবাসীরা আশ্বস্ত চিত্তে গিরিসমূহের দিকে চাহিয়া থাকে! কারণ, তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল পর্ব্বতে দেবগণ বাস করেন।

এই সকল পর্ব্বত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা আকর্ষণ করে; এই বর্ষণই আগ্নেয়গিরি সমূহ দ্বারা প্রভাবান্বিত ভূভাগকে উর্ব্বরতা দান করে, এবং ২ হাজার ২ শত ৪০ বর্গমাইল স্থানের দশ লক্ষাধিক অধিবাসীর জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। বালী দ্বীপের পশ্চিমাংশ অন্যান্য অংশের ন্যায় উর্ব্বর নহে। ইহার পশ্চিমাংশ এখনও অরণ্যসঙ্কুল। এই সকল অরণ্যে ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ ও নানা জাতীয় হরিণ বাস করে। বালী দ্বীপের যে সকল অধিবাসী কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পর্ব্বতগুলি চিরদিনই তাহাদের কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে।

ব্যবস্থা হিন্দুস্থানের অধিবাসিবর্গের সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায় জটিলও নহে।

এই দ্বীপ বহু আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ; সেই সকল আগ্নেয় গিরির একটি হইতে কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও তরল অগ্নিরাশি

গিরিশ্রেণী ও সঙ্গীত

বালী দ্বীপে কোন পার্ব্বণ উপলক্ষে নৃত্যের মজলিশ বসিলে তরুণ নর্ত্তক বালীর গিরিচুড়া গোয়েনোয়েং অগোয়েং-এর উদ্দেশ্যে প্রথমে অভিবাদন করে, এবং কৃষকগণ বক্র বংশদণ্ডে তালপত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ ঝুলাইয়া দিয়া থাকে। ইহা সুপবিত্র গিরিশৃঙ্গের প্রতি অভিবাদনের ইঙ্গিতরূপে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় অর্কেষ্ট্রা গেমল্যান নামে অভিহিত।

ভারত মহাসাগর হইতে জাভা সাগর পর্য্যন্ত যে সকল দ্বীপ আছে, তাহাদের অধিবাসিবর্গ শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও তাহারা সকলেই প্রফুল্ল চিত্তে পিত্তলনির্ম্মিত করতাল ও মন্দিরা বাজাইয়া গান করে। তাহাদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম রেয়ং, ট্রম্পং, গাংসা, ঘণ্টা এবং কেন্ডাং; কেন্ডাং দামামাবৎ বাদ্যযন্ত্র, অঙ্গুলী দ্বারা তাহা বাজাইবার নিয়ম। এই বাদ্যধ্বনির তালে তালে তাহাদের নৃত্য চলিতে থাকে। লেখক বলিতেছেন, এক দিন তিনি বালী হোটেলের সম্মুখে স্থানীয় নর্ত্তকগণের নৃত্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সেখানে অনেকগুলি বৈদেশিক দর্শক উপস্থিত ছিল; কিন্তু সহস্র সহস্র স্থানীয় অধিবাসী একাগ্র চিত্তে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছিল।

নৃত্যকলায় মাংসপেশী-সঞ্চালন

লেখক বলিতেছেন, "ডেনপাসার নামক স্থানে এক শুক্রবারের রাত্রিতে আমি একটি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালককে যেরূপ দক্ষতার সহিত নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা যে কোন নৃত্যকুশল নর্ত্তকের নৃত্যের সহিত তুলনায় যোগ্য। সে শ্রেণীবদ্ধ পিত্তলনির্ম্মিত বৃহৎ ঘণ্টাসমূহের পশ্চাতে জানু নত করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মস্তকের চুলে একটি পুষ্প আবদ্ধ ছিল, এবং তাহার হাতে একখানি পাখা আন্দোলিত হইতেছিল। এই ভাবে সে এরূপ কৌশলে নৃত্য করিতেছিল যে, তাহা প্রত্যেক দর্শককে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিল।

"এই নর্ত্তক প্রথমে পিত্তলনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রশ্রেণী লক্ষ্য করিল না, সে তাহার জানুতে ভর দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার সেই নৃত্যকৌশল দেখিয়া মনে হইল, সে যেন একটি নাচের পুতুল, কাহারও অদৃশ্যহস্ত-পরিচালিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল। সেই সময় তাহার উভয় বাহু ও অঙ্গুলিগুলি যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত আন্দোলিত হইতেছিল, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ; না দেখিলে কেহ তাহার সেইরূপ অদ্ভুত দক্ষতার কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক জন

নারীদিগের ঐক্যতানবাদন

চিকিৎসক তাহার সেই নৃত্যকৌশল সন্দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, 'যেখানে উহার পেশী নাই, সেই স্থানেই পেশী আন্দোলিত করিতেছে—ইহাই অতি আশ্চর্য্য'!

'হামিং বার্ড' নামক অতি ক্ষুদ্র গুঞ্জনকারী পক্ষী যে ভাবে কোন পুষ্পের সম্মুখে আসিয়া তাহার পক্ষগুলি আন্দোলিত করে, এই তরুণ নর্ত্তক সেই ভাবে তাহার হাতের পাখাখানি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা সহকারে আন্দোলিত করিতে লাগিল। সেই সময় তাহার মস্তকটি মুহুর্মুহু এক পাশ হইতে অন্য পাশে আন্দোলিত, এবং তাহার চক্ষু দু'টি যেন অক্ষিকোটর হইতে বাহির হইয়া বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইতেছিল। তাহার সেই দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল—তাহা দুষ্টুমী-ভরা (mischievous glances)। নর্ত্তকী বাজনার তালে তালে নানা ভাবে নাচিতে লাগিল। বাদ্যধ্বনি সুমিষ্ট।

বালী দ্বীপের চতুর্দ্দশী সুন্দরী নর্ত্তকী

দেবমন্দিরে নারীবক্ষঃ আবৃত করিতে হয়

পথিমধ্যে দশ বার জন 'জাঙ্গার' নর্ত্তকীকে পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে দেখা গেল। যখন তাহারা ধূলিসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে খড়ের কুটীরে অথবা প্রাচীরবেষ্টিত গৃহপ্রাঙ্গণে গৃহকার্য্যে রত থাকে, তখন এই সকল তরুণীর কটি-দেশের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অনাবৃত থাকে; কিন্তু যখন তাহারা দেবমন্দিরে প্রবেশ করে, তখন তাহাদিগকে বক্ষঃস্থল আবৃত করিতে হয়। গৃহপ্রাঙ্গণে নৃত্য করিবার সময় বিদেশাগত দর্শকের সম্মুখেও বক্ষঃস্থল অনাবৃত রাখিতে তাহারা লজ্জা বোধ করে না। ইহাদের পরিচ্ছদ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহারা গলায় যে 'কলার' ব্যবহার করে, তাহা সচ্ছিদ্র মহিষচর্ম্ম-নির্ম্মিত। মস্তকের শিরস্ত্রাণ উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট, এবং তাহাদের আকার বহু প্রকার।

এ দেশে বালিকারা তিন চারি বৎসর বয়সেই নৃত্য শিক্ষা আরম্ভ করে, এবং যৌবনাগমেই তাহাদের নৃত্য শেষ হয়; কিন্তু তাহারা পরবর্ত্তী কালেও নৃত্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে।

ইহারা হিন্দুর পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অভিনয় করিতে ভাল-বাসে। অনেক তরুণী নানা প্রকার সাজ-সজ্জা করিয়া মজলিসে অভিনয় করিতে আসে। তাহাদিগকে দেখিয়া বালক-বালিকারাও বলিতে পারে তাহারা অর্জ্জুন সাজিয়াছে।

উত্তর-বালীতে জেঙ্গার নৃত্যের একদল নর্ত্তকী খোলা পায়ে নৃত্য করায় স্থানীয় অধিবাসীরা মর্ম্মাহত হইয়াছিল; কারণ, বালী দ্বীপে নর্ত্তকী নৃত্যকালে বক্ষঃস্থল অনাবৃত রাখিলেও তাহাদের পদদ্বয় পরিচ্ছদে আবৃত করিতে হয়; সেরূপ না

বালী দ্বীপের জননী ও সন্তান

শুষ্ক নারিকেল-শস্য বিক্রয়ার্থ ওজন করা হইতেছে

বালী দ্বীপের উচ্চচড পর্ব্বত—অন্তরে পথ

লড়ায়ে মোরগ-হস্তে পিতামহ ও পৌত্রী

পুষ্পসম্ভারসহ তরুণীরা মন্দিরে চলিয়াছে
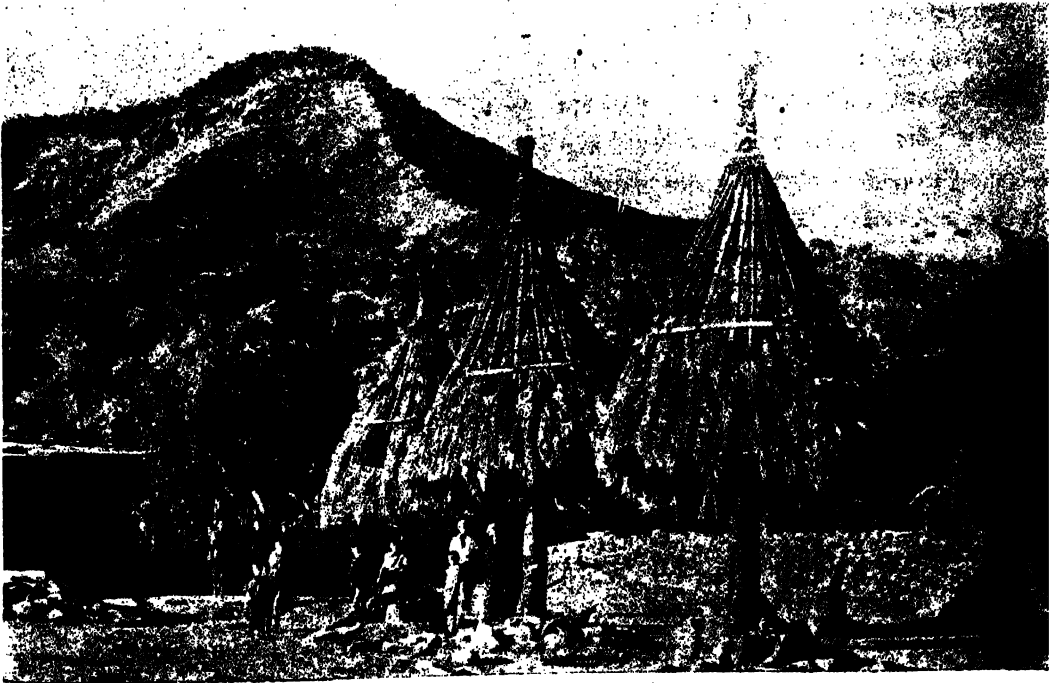
নাদা সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতিস্তম্ভ

করা অত্যন্ত অভদ্রতার চিহ্ন।

বেদোয়েলো নামক স্থানে এক দিন মর্কট-নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই নৃত্যের সময় শত শত নর্ত্তক মশালের আলোক অথবা চন্দ্রের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া নৃত্য করে। ইহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নৃত্য করিবার সময় বানরের মত লম্ফ-ঝম্প করে বলিয়াই সম্ভবতঃ এই নৃত্যের নাম মর্কট-নৃত্য (Monkey Dance); তাহাদের ভাবভঙ্গীও তখন বানরে ভাবভঙ্গীর অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহারা সামরিক নৃত্যের অনুকরণে যে প্রকার নৃত্য করে, তাহা 'বারিজ নৃত্য' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নৃত্যশেষে তাহারা কিরীচ লইয়া যুদ্ধ করে; কিন্তু সেই যুদ্ধও নৃত্যের অঙ্গ।

বেশাকিতে যে দেবমন্দির আছে, তাহার খড়ের চাল প্যাগোডার ন্যায় উচ্চ। তাহার চতুর্দ্দিকে সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র প্রসারিত; মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বেশাকির মন্দিরে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন গ্রামের দলপতি তাহার গ্রামের অধিবাসিগণের কল্যাণকামনায় পূজা দিয়া থাকে। বালিকাগণ উজ্জ্বল-বর্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া নৃত্য করিবার সময় এরূপ বিভোর হইয়া থাকে যে, তখন তাহারা বাহ্যজ্ঞানে বঞ্চিত হয়। সাধারণের ধারণা, সেই সময় তাহাদের দেহে ভূতের ভর হয়। নাচিতে নাচিতে তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে স্ত্রীলোকরা সেই অবস্থায় তাহাদের দেহ সোনালী ও রূপালী বস্ত্রে মণ্ডিত করে। অতঃপর বালিকারা উঠিয়া পুনর্ব্বার নাচিতে থাকে। এই সকল বালিকার সম্মোহিত ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; দর্শকগণ সহিষ্ণুচিত্তে তাহাদের চেতনা-সঞ্চারের প্রতীক্ষা করে।
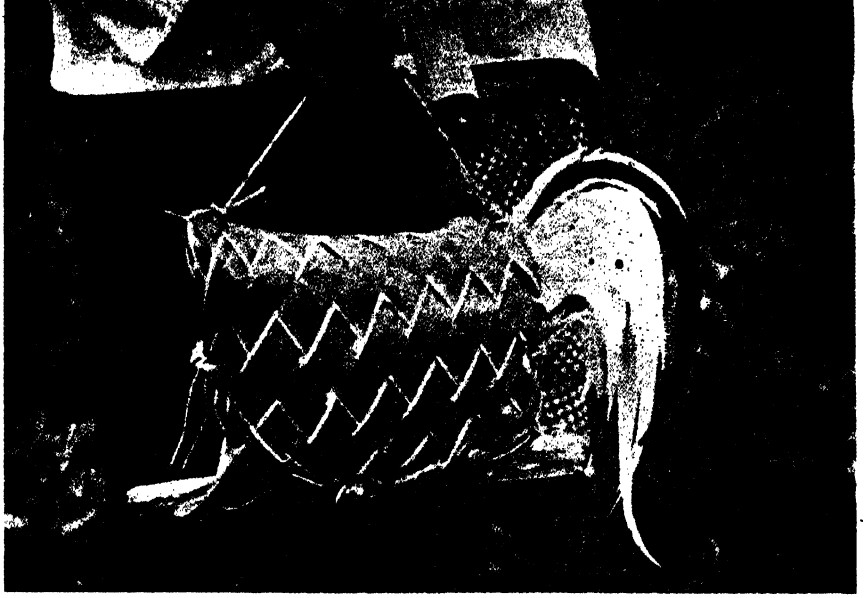
অবরুদ্ধ লড়ায়ে মোরগ

মিথ্যা-সাক্ষ্যদানের শাস্তি

বালীতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অতি গুরু অপরাধ। এই অপরাধের দণ্ডের ব্যবস্থাও লোমহর্ষণ। যাহারা মিথ্যা

প্রাচীরগাত্রে দ্বিচক্রযানারোহীর ক্ষোদিত মূর্ত্তি

সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহাদিগকে অরণ্যবাস করিতে হয়। অরণ্যে প্রবেশ করিলে তাহারা পথ-ভ্রান্ত হয়, তাহার পর যখন তাহারা পথের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে চারিদিকে ঘুরিতে

একই আধারে গৃহপালিত মোরগ ও শূকর আহারনিরত

সর্পকবল হইতে রক্ষা পায়, বন্য মহিষ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া শৃঙ্গাঘাতে তাহাদিগের দেহ বিদীর্ণ করে, এবং তাহারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

কখন কখন তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তরখণ্ড তাহাদের বক্ষঃস্থলে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় বক্ষ বিদীর্ণ হয়। তাহাদের অনেকে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং ক্ষুধার্ত্ত কুম্ভীর তাহাদিগকে গ্রাস করে। এই ভাবে তাহাদের সকলকেই অস্বাভাবিক

থাকে, সেই সময় তাহাদের সর্ব্বশরীর সুদৃঢ় আরণ্য লতায় পরিবেষ্টিত ও আবদ্ধ হয়। তাহারা সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে; কিন্তু তাহারা

মনুষ্যস্কন্ধে বাহিত শূকর

মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সেই সময় বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া হুড়-মুড় করিয়া তাহাদের মাথায় পড়ে। সেই আঘাতে যাহাদের মৃত্যু না হয়, তাহাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হয়; অথবা বিষধর সর্প তাহাদিগকে দংশন করে। যাহারা

মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয়। পানাহারের সময়, অথবা নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহারা মৃত্যুকবলে নিপতিত হইতে পারে। কেহ দাঁড়াইয়া মরে, কেহ কেহ বসিয়া বা শয়ন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে; বস্তুতঃ, মৃত্যু তাহাদের নিকট কখন্ কি ভাবে আসিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাহারা, তাহাদের পুত্রকন্যাগণ, তাহাদের পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী প্রভৃতি পুনর্ব্বার পৃথিবীতে নরজন্ম লাভ করিতে পারে না। তাহারা জন্মান্তরে কীট, পতঙ্গ, সর্প বা অন্যান্য সরীসৃপদেহ ধারণ করে। তাহারা জীবনে কখন সুখের মুখ দেখিতে পায় না। ইহাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের শাস্তি।

আমি বালী হইতে বিদায় গ্রহণের দিন জনতার অনুসরণ করিয়া একটি প্রান্তরে প্রবেশ করি। সেই প্রান্তরে মোরগের লড়াইএর জন্য একখানি কুটীর ছিল। সেই কুটীরের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি দোকানদারকে দেখিতে পাইলাম; তাহারা বস্ত্র এবং লেমনেড প্রভৃতি পানীয় দ্রব্য বিক্রয় করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া আমার প্রতি তাহারা সদয় ব্যবহার করিল। আমি দুই সেণ্ট মূল্যে একখানি প্রবেশ-পত্রিকা ক্রয়ের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার নিকট হইতে টিকিটের মূল্য গ্রহণ করা হইল না। সেই জনতার ভিতর যাহারা কাণে ফুল গুঁজিয়া কর্ত্তৃত্ব

নারিকেল-মালা হইতে রচিত হার—তরুণী বিক্রেত্রী
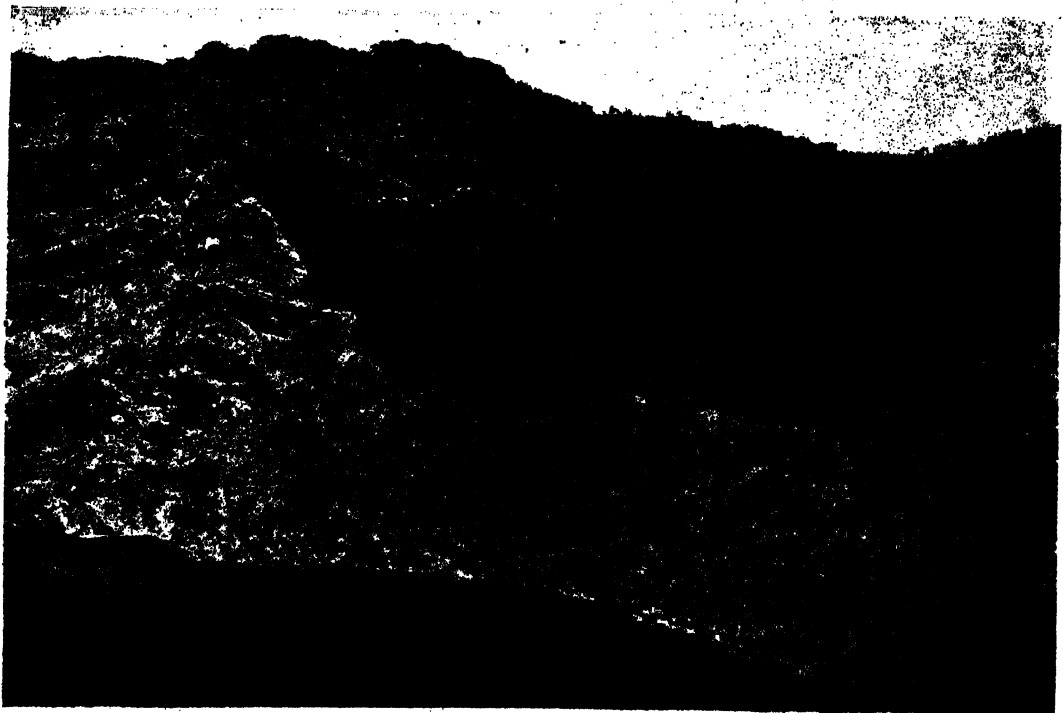
পুষ্প-রচিত শিরোভূষা সহ নর্ত্তকী

পাহাড়-পরিবেষ্টিত-হ্রদ

বালী দ্বীপের ক্ষোদিত হাস্যকর মূর্ত্তি

ক্রন্দনরত শিশুক্রোড়ে হাস্যাননা বালী তরুণী

নাদা সম্প্রদায়ের অস্ত্রধারী বীরগণ

গাঢ় হওয়ায় আমি আমার ক্যামেরার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না; অগত্যা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রতীরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

সমুদ্রবিহার সেদিন আমার অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল। সমুদ্রের পূর্ব্বাংশ গভীর, কিন্তু সঙ্কীর্ণ উপসাগর লম্বক পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহার পর যে দ্বীপটি অবস্থিত, তাহার নাম 'লেসার-মুণ্ডা চেন।' এই স্থান হইতে বালীর গিরিশৃঙ্গ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর ১২ হাজার ২ শত

করিতেছিল, আমাকে দেখিয়া তাহারা বলিল, 'এই ভদ্রলোককে পথ ছাড়িয়া দাও।'—কিন্তু অন্ধকার তখন

২৩ ফুট উচ্চ লম্বকের আগ্নেয়গিরি রিঙজানি নয়ন-গোচর হইল।

লম্বক প্রায় এক শতাব্দী কাল বালীর অধিবাসিবর্গ দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। এখনও তাঁহাদের গৌরবস্মৃতি-মণ্ডিত প্রাসাদসমূহের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। সদাপ্রফুল্ল বালীবাসিগণের অভ্যুদয়ের পর লম্বকের শসক নামক অধিবাসীরা ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। তাহাদের প্রকৃতি বিষণ্ণ। ইহাদের জাতিগত বা ধর্ম্মগত পার্থক্যের একমাত্র নিদর্শন নারীজাতির পরিচ্ছদেই বর্ত্তমান; এই পার্থক্যের অন্য কোন নিদর্শন সুস্পষ্ট নহে।

তরুণী গায়িকার বেশ-সজ্জা

তরুণী অভিনেত্রীর মুকুটবন্ধনে রত বৃদ্ধ

বালীর রমণীগণ পর্দ্দা ও অবগুণ্ঠনের প্রভাব হইতে মুক্ত বলিয়া তাহাদের তরুণীগণের অকুণ্ঠিত সৌন্দর্য্য সহজেই দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু লম্বকের মুসলমান রমণীগণ অবরোধের পক্ষপাতিনী। তাহাদের মুখকান্তি দর্শকগণের নয়নগোচর হয় না। নার্ম্মাদা, যাক্রানেগারা এবং অন্যান্য স্থানে বালীর সেকালের রাজগণের সখের উদ্যান ও প্রাসাদসমূহ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মসলেম, মোগল এবং বালীরাজগণ স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ জল এবং ঝরণার জলধারা সখের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। নার্ম্মাদার যে সকল জলাশয়ে রাজগণের মোসাহেবরা মহানন্দে সাঁতার কাটিত, একালে নার্ম্মাদার বিশ্রামাগারে অবস্থিত অতিথিগণ কৌতুহল সহকারে

সেই সকল জলাশয় ও তৎসন্নিহিত প্রাসাদগুলি সন্দর্শন করেন।

সহস্র সহস্র লোক বহু বৎসরের পরিশ্রমে এই সকল রমণীয় উদ্যান এবং গিরিপার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ ও বহু জলপূর্ণ জলাশয়সমূহ খনন করিয়াছিল। অতীতের এই

দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য-সহ নারীর দল

সকল মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া আমরা রাত্রিকালে আমাদের জাহাজে প্রত্যাগমন করিলাম।

ফ্লোরেসে পাঁচ দিন

আমাদের জাহাজের খোলে যে সকল পণ্যদ্রব্য ছিল, তন্মধ্যে জমান দুগ্ধ, টর্চ্চের ব্যাটারী, বাইসাইকেলের চাকা, আমেরিকান সাবান ও দাঁতের মাজন উল্লেখযোগ্য। সেগুলি 'জীবন-তরী'তে চালান দেওয়ার জন্য সজ্জিত ছিল। তীরের দিকে চাহিয়া নারিকেলের শুষ্ক শাঁস পাহাড় প্রমাণ স্তূপীকৃত দেখিলাম। এগুলি তৃতীয় শ্রেণীর শাঁস। সরকার স্থানীয় অধিবাসিগণকে নারিকেলের শাঁসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ, তাহা হইলে সেগুলি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিত; কিন্তু সরকারের সেই চেষ্টা সফল হয় নাই।

এমেরীতে চারি সপ্তাহ অন্তর জাহাজ আসিয়া থাকে। সেই সময় কয়েক ঘণ্টার জন্য সমুদ্রকূলে নানা জাতীয় লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বালীর অধিবাসিগণের সহিত কোন বিষয়ে তাহাদের সাদৃশ্য নাই। সেই সময় দুইখানি মোটর-কারে রোয়েটেং এবং রাজওয়া হইতে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ এখানে আসিয়া থাকেন; উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বোতলপূর্ণ সুশীতল বীয়ার মদ্য, এবং বন্ধুগণের সহিত আলাপের লোভেই তাঁহারা এই স্থানে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

আইয়েয়ারে মোটর-কারের অভাবে আমাকে জাহাজেই থাকিতে হইল। ফ্লোরেসের প্রধান নগর এণ্ডিতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত জাহাজ হইতে আমার নামিবার সুযোগ হইল না। এণ্ডি নগর দেখিয়া সহর বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বাজারের সময় ব্যতীত অন্য সময় এই নগরের জনসংখ্যা কয়েক শতের অধিক নহে। এণ্ডিতে আমি স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টারের স্ত্রীর আতিথ্য স্বীকার করিয়া সরকারী বিশ্রামাগারেই (রেষ্ট হাউস) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু পোষ্ট-মাষ্টারের স্ত্রী আমার যেরূপ আদর-যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছিল, আমি তাঁহার কোন ধনাঢ্য আত্মীয়।

যে সকল খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের

বালীর তরুণী নর্ত্তকীর ভঙ্গিপূর্ণ নৃত্য

নগ্নপ্রায় দেহে বালী দ্বীপের তরুণীরা মন্দিরের বাহিরে আসিতেছে

কোনটি স্থানীয় উৎপন্ন-দ্রব্য নহে। চাইনীজ ষ্টোর হইতে মাংসপূর্ণ যে ক্ষুদ্র টিনটি পাওয়া গেল, তাহা সিকাগো বা আর্জেন্টিনা হইতে আমদানী হইয়াছিল। জমান দুগ্ধের টিন য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্ বা সুইট্জারল্যাণ্ড হইতে আসিয়াছিল। পীচ, পিয়ারা ও চেরী ফলপূর্ণ-টিন কালিফর্ণিয়ার আমদানী। আনারস হাউয়াই দ্বীপের, এবং কমলা নেবু চীনের ক্যান্টনজাত। এই সকল দ্রব্য না পাইলে এ স্থানে অনাহারে কাল-যাপন করিতে হইত।

সোমবাওয়া দ্বীপের জাহাজ

এই স্থান হইতে কুড়ি মাইল দূরে এবং সমুদ্রতল হইতে এক মাইল উচ্চে তিনটি হ্রদ আছে, স্থানীয় মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য বশতঃ ইহাদের একটির জল নীলবর্ণ, দ্বিতীয়টির সবুজবর্ণ, এবং তৃতীয় হ্রদের জল লোহিতবর্ণ। এক স্থানে দাঁড়াইয়া এই তিনটি হ্রদই দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ, দুইটি হ্রদের ব্যবধান অতি অল্প। পাহাড়ের একটি সঙ্কীর্ণ দেওয়াল তাহাদের ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। এমন কি, যে হ্রদের জল নীলবর্ণ, তাহার নিকট হইতে একটি লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে অতি সহজেই তাহা লাল হ্রদের জলে পতিত হয়।

বাঙ্গওয়া স্থানটি শীতল; তাহার অদূরে বংশ-তরু সমাচ্ছাদিত গদাকাম্পং বর্ত্তমান রাজার বাসস্থান। রাজার প্রাসাদটি প্রশস্ত, এবং একখানি মোটর-কার তাঁহার গৌরবের সামগ্রী। অন্যান্য অধিবাসীরা খড়ের কুটীরে বাস করে। সেই সকল কুটীরের বারান্দা বাঁশের জাফ্রি দ্বারা পরিবেষ্টিত। রমণীগণ সেখানে বসিয়া তাঁতে বস্ত্র বয়ন করে।

হ্রদগুলি প্রেতাত্মার বাসস্থান

পূর্ব্বে যে তিনটি হ্রদের কথা বলিয়াছি, স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস—সেখানে প্রেতাত্মা বাস করে। যে হ্রদের জল নীল, সেই হ্রদে বৃদ্ধগণের প্রেতাত্মার বাস। যে হ্রদের জল সবুজ, সূর্য্যকিরণে তাহার জলের সেই বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহারা অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের আত্মা এই হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে হ্রদের জল লাল, সেই হ্রদে যাদুকর, 'তন্ত্রমন্ত্রবিৎ 'গুণী' লোক, ডাইনী প্রভৃতি মৃত্যুর পর বাস করিয়া থাকে।

মাওয়েমেরার নামক স্থানে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব লক্ষিত হওয়ায় অধিকাংশ বালক-বালিকার উদর প্লীহার আবির্ভাবে ঢকাকার হয়। এই জন্য এই স্থানটি শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইবে। পাহাড়াঞ্চলে একটি নূতন নগর নির্ম্মিত হইতেছে।

বালীতে বালক-বালিকাদিগের ক্রন্দনধ্বনি প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় না। শিশুগণ যতদিন চলিতে না পারে,

ততদিন তাহাদিগকে ক্রোড়ে বহন করা হয়। তাহাদিগকে কখন প্রহার করা হয় না; কিন্তু তাহারা গুরুজনের অবাধ্য না হয়—সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। শিশুগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দানের জন্য য়ুরোপীয় আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বালকগণ একটু বয়স হইলে গরু চরায়, এবং মহিষগুলিকে জল পান করায়। বালিকাগণ মায়ের নিকট তাঁত বুনিতে ও রাঁধিতে শেখে।

সুমাত্রা দ্বীপ হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ৩ হাজার মাইলের মধ্যে তিন শতাধিক আগ্নেয়গিরি আছে; ইহাদের ভিতর ৬০টি হইতে এখনও লাভা ও গলিত ধাতু প্রভৃতি উদ্গত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোন অংশে এত অধিক সংখ্যক আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব নাই। এই সকল আগ্নেয়গিরির শীর্ষদেশে প্রচুর মেঘ সঞ্চিত হয়, এবং বৃষ্টিধারাপাতে নিম্নস্থ ভূখণ্ড অত্যন্ত উর্ব্বরতা লাভ করে।

ফ্লোরেসে নানাবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে ধান্য, নারিকেল, কফি, চন্দনকাষ্ঠ, দারুচিনি, তামাক, এবং মুক্তাপূর্ণ শুক্তি প্রধান। এখানে পুরুষ বিবাহ করিতে চাহিলে ক'নের পিতৃগৃহে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কাল গোলামী করিতে হয়।

ফ্লোরেসের নর্ত্তকগণ নৃত্যের পূর্ব্বে তরবারি লইয়া 'প্যারেড' করে। তাহারা ঝিনুকনির্ম্মিত কণ্ঠমালা, এবং গজদন্তনির্ম্মিত বলয় পরিধান করে। তাহারা ঝালরবিশিষ্ট ব্যাগ ক্রোড়ে ঝুলাইয়া নৃত্য করিতে যায়।

উপাসনার স্থানে সকল স্ত্রীলোকই বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে। তরুণীরা অত্যন্ত লাজুক, এবং গৃহকোণানুরাগিণী। বিবাহের পর তাহারা অনেক অধিকার লাভ করে। তাহারাই গৃহস্থালীর কাম-কর্ম্ম করে; সংসার-খরচের টাকাও তাহারাই ব্যয় করে। অনেক রমণী বাহির হইতেও অর্থোপার্জ্জন করে, এজন্য তাহাদের নিজেরও আয় আছে। অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, রন্ধনের তৈজসপত্র, শূকর ছানা প্রভৃতি গৃহপালিত পশু-পক্ষী তাহাদের স্ত্রীধন। কিন্তু বাসগৃহ, ধানের জমি, গো-মেষাদি পশু-পাল এবং কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রপাতি, দা, কুড়াল, কাস্তে, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রাদি পুরুষের সম্পত্তি।

বালীর অনেক তরুণী নারিকেল-মালার কণ্ঠমালা ধারণ করে। বালীতে মোরগের লড়াই জনসাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক ক্রীড়া। লড়াইয়া মোরগের অধিকারী শুষ্ক নারিকেল-পত্র-নির্ম্মিত পিঞ্জরে তাহার মোরগটিকে ক্রীড়াক্ষেত্রে লইয়া আসে; চতুষ্কোণ পিঞ্জরের পার্শ্ব দিয়া তাহার বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছটি বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ তাহার মুখ দেখিতে পায় না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তাহাকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া

বিচিত্র পূজা-সম্ভারবাহিকা তরুণীর দল

হাস্য-স্ফুরিতাধরা বালীর তরুণীগণ

জনসাধারণের সম্মুখে ছাড়িয়া দর্শকগণের সহিত পরিচয় করা হয়।

চীনারা বালীর দুগ্ধপোষ্য শূকরছানার 'রোষ্টের' অনুরাগী; এরূপ মুখরোচক খাদ্য তাহাদের না কি জীবজগতে আর দ্বিতীয় নাই। বালীর অধিবাসীরা এজন্য পাল পাল শূকর পুষিয়া থাকে, এবং প্রতি বৎসর তাহা যবদ্বীপে ও মালয় দ্বীপ-পুঞ্জে চালান দিয়া থাকে। ঐ সকল দ্বীপের চীনাম্যানরাই তাহা ক্রয় করে।

বালীর নারীরা মস্তকে ভার বহন করে এবং মস্তকে গুরুভার বহন করিয়া তাহারা ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিতে পারে। এই শিক্ষা তাহারা শৈশবকাল হইতে লাভ করে।

বালীতে কাহারও মৃত্যু হইলে মৃত-দেহ যে আধারে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সেই আধারটি একটি বৃক্ষ কুঁদিয়া নির্ম্মিত হয়। পুরুষের মৃত্যু হইলে সেই আধারটিকে বৃষের মূর্ত্তি প্রদান করা হয়, নারীর মৃতদেহ বহন করিতে তাহা গাভীর ন্যায় নির্ম্মিত হয়। মৃতদেহ ফেল্ট ও মখমল দ্বারা আবৃত করা হয়, এবং তাহা নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়। বালীর প্রত্যেক অধিবাসীর উচ্চাভিলাষ, তাহার মৃতদেহ যেন মহাসমারোহে সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হয়, এবং বিস্তর আড়ম্বর সহকারে তাহা সমাহিত করা হয়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাজার কুমারী

রূপের মঞ্জরী অঙ্গে উঠিছে মুকুলি'
অপরূপ লাবণ্যের দ্যুতি বিকাশিয়া;
রাজার কুমারী তুমি বয়সে কিশোরী,
অতুল মাধুর্য্য অঙ্গে সদা কল্লোলিয়া।
শিশুকাল হতে তোমা বাসিয়াছি ভাল,
দিয়াছি প্রাণের অর্ঘ্য চরণে তোমার;
তব প্রেম-সুধারাশি চাহিয়া চাহিয়া,
রাত্রি-দিন জাগিয়াছি খুলি হৃদিদ্বার।

শয়নে স্বপনে তব মূরতি-মুকুর,
ধরিয়াছি মুগ্ধ চিত্তে নয়ন সম্মুখে;
হেরিয়াছি আমি যেন তোমার ভিতরে
বন্দী হয়ে রহিয়াছি মহানন্দে সুখে।
শরতের চাঁদ সম তব প্রেম-শিখা;
স্পর্শে তার ফুটিয়াছে মোর চিত্তদল।
তব স্নেহ-সুধাধারা সোণার বিভায়
জ্বলে দিবানিশি মোর অন্তরের তল।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল।

বহু বার ব্যবহারযোগ্য স্বচ্ছ নমনীয় বাড়

কাহারও হাত-পা ভাঙ্গিয়া অস্থি স্থানচ্যুত হইলে ডাক্তার সেই স্থানে কাঠের বাড় বা 'পাটা' রাখিয়া সেই ভগ্নস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া থাকেন; ইহাতে উক্ত অংশের চিকিৎসায় নানা প্রকার অসুবিধা

বহু বার ব্যবহারযোগ্য স্বচ্ছ নমনীয় বাড়

ঘটিয়া থাকে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত সংপ্রতি এক প্রকার স্বচ্ছ ও নমনীয় দ্রব্য-নির্ম্মিত বাড় ব্যবহৃত হইতেছে; তাহা গরম জলে কিছুকাল ফেলিয়া রাখিলেই তাহার আকার অতি সহজে ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এবং তাহা ভাঙ্গা হাড়ে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। উত্তাপের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার করা যায় এবং এই উপায়ে ইহার আকারও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই বাড় কাঠের বাড় অপেক্ষা লঘুভার, এবং ইহার ব্যবহারও আরামপ্রদ। ইহা স্বচ্ছ বলিয়া রঞ্জনরশ্মি সাহায্যে চিত্রগ্রহণের কোন অসুবিধা হয় না; ইহা না খুলিয়াই আহত স্থান পরীক্ষা করিতে পারা যায়।

—

শয্যাযুক্ত বাইসাইকেলে দেশভ্রমণ

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া দেশের এক জন বাইসাইকেল-আরোহী দেশভ্রমণে বাহির হইয়া রাত্রিকালে যেখানে বিশ্রাম করেন, সেই স্থানেই শয্যা প্রসারিত করিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিতে পারেন; তাঁহার সাইকেলে এই শয্যা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সাইকেলের পশ্চাতে যে 'ট্রেলার'টি জুড়িয়া
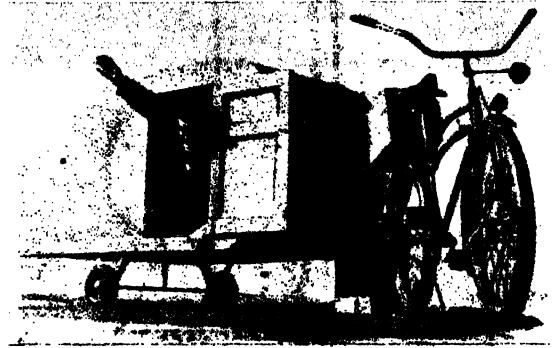
শয্যাযুক্ত বাইসাইকেলে দেশভ্রমণ

সাইকেল চালনা করেন, সেই ট্রেলার আট ফুট দীর্ঘ, তাহাতে যে শয্যা প্রসারিত থাকে, তাহাতে বিলক্ষণ আরামে হাত-পা ছড়াইয়া শয়ন করিতে পারা যায়। ইহা ৩৮ ইঞ্চি উচ্চ, এবং ৩৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। যিনি এই নূতন ধরণের বাইসাইকেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম বব ম্যাক্‌কলে। তিনি এই সাইকেলে কালিফোর্ণিয়া হইতে ফ্লরিডা পর্য্যন্ত পর্য্যটনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। চিত্রে তাঁহার সাইকেলের পশ্চাদ্বর্ত্তী ৮ ফুট দীর্ঘ 'ট্রেলার' দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহার ওজন ১ শত ৩৫ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় পৌণে দুই মণ।

—

দাঁড়াইয়া চালাইবার ত্রিচক্র যান

ষ্টেট্‌সভিল নামক এক জন যন্ত্রবিদ্ শিল্পী সংপ্রতি একখানি নূতন ধরণের ট্রাইসাইকেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে বসিবার আসন নাই; তাহা দাঁড়াইয়া চালাইতে হয়। ইহা চালাইবার জন্য আরোহীকে হাত বা পা অথবা যদিচ্ছাক্রমে উভয়ই ব্যবহার করিতে হয়। আরোহী এক দিকের প্যাডেল হইতে অন্য দিকের প্যাডেলে দেহের ভার স্থাপন করিতে পারেন। এই ত্রিচক্রযানের সম্মুখে যে একখানি মাত্র বৃহত্তর চাকা আছে, তাহার সহিত পশ্চাদ্-গতি

দাঁড়াইয়া চালাইবার ত্রিচক্রযান

নিবারক একটি যন্ত্র সংযোজিত আছে, তাহার সাহায্যে এই ত্রিচক্রযানের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই সময় অন্য প্যাডেল ঊর্দ্ধে তুলিবার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ভিন্ন, একটি স্প্রিং আছে, তাহার সাহায্যে বিপরীত দিকের 'ব্র্যাকেট'কে পশ্চাতের 'হুইলে' ঘুরাইতে পারা যায়। সম্মুখের চাকায় যে শৃঙ্খল সংযুক্ত আছে, তাহার সাহায্যে এই ত্রিচক্রযানের শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এতৎসহ প্রকাশিত চিত্রে এই ত্রিচক্রযানের পরিচালন-কৌশল বুঝিতে পারা যাইবে।

রেডিওচালিত বিচিত্র মূর্ত্তি

জড়বিজ্ঞান ক্রমশঃ অসাধ্য-সাধন করিতেছে। দশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনার ফলে এক জন সুইস্ বৈজ্ঞানিক রেডিও-চালিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মূর্ত্তি ৭ ফুট দীর্ঘ, এবং ওজনে প্রায় ৫ মণ (৪ শত পাউণ্ড); শিল্পী এই মূর্ত্তির নাম রাখিয়াছেন, 'সাবর।' 'সাবর' পুত্তলিকা হইলেও তাহার জিহ্বা আছে, কথা বলে; পা আছে, চলিয়া বেড়ায়; হাত আছে, তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি বহন করিতে পারে। তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে, তাহার মুখ হইতে উত্তর পাওয়া যায়। চিত্রে দেখুন, সে তাহার মনিবের আদেশে তাঁহার সিগারেট ধরাইয়া দিতেছে। আহার করে না, বেতন গ্রহণ করে না, আদেশ পালন
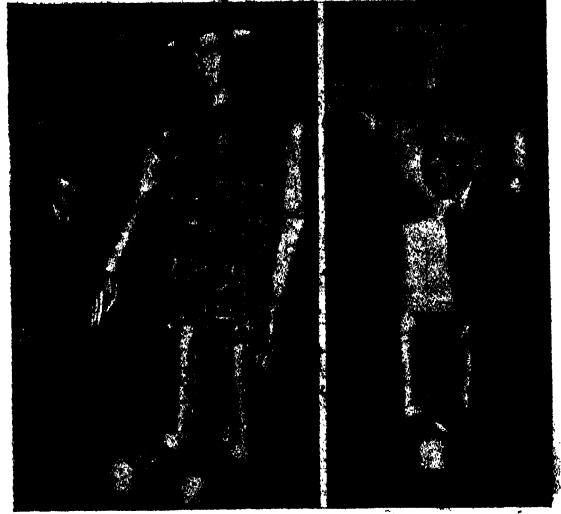
রেডিওচালিত বিচিত্র মূর্ত্তি

করে, চোর-ডাকাত তাড়ায়; এরূপ ভৃত্য অনেকেই গ্রহণ করিতে উৎসুক; কিন্তু এরূপ একটি ভৃত্য নির্ম্মাণে কত টাকা ব্যয়, তাহা প্রকাশ নাই। ঊর্দ্ধে 'সাবরের' একটি অনাবৃত ও একটি পরিচ্ছদাবৃত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। বৈজ্ঞানিক-প্রবর দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মা।

বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত করাত

সম্প্রতি বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত যে নূতন-ধরণের করাত নির্ম্মিত হইয়াছে, চিত্রে পাঠক তাহার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইতে-

বৈদ্যুতিক শক্তি-পরিচালিত করাত
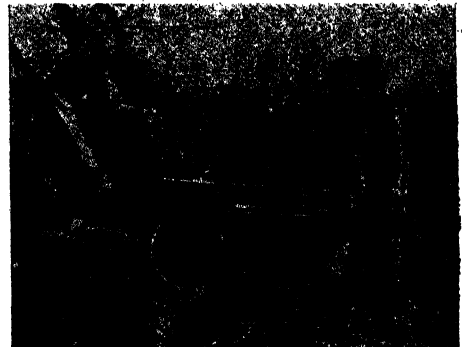
ছেন। একটি অনতিবৃহৎ 'এয়ার কম্প্রেসার' হইতে শক্তি-চালনা-কৌশলে এই করাত যে কোন বৃক্ষ ছেদন করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড

করিতে, এবং তাহা হইতে চেলা বাহির করিতে পারে। এই করাতের ফলা একটি দণ্ড দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, এবং ইহা ছাব্বিশ ইঞ্চি ব্যাসের কাঠের গুঁড়ি তিন মিনিটের মধ্যে চিরিয়া ফেলিতে পারে। করাত চালাইবার সময় কাঠের গুঁড়ির ভিতর চাপিয়া বসিলে, যদি তাহার ফলা টানিয়া বাহির করা অসাধ্য হয়, তাহা হইলে ফলাটি ফ্রেম হইতে সহজে খুলিয়া লইতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় কাঠের গুঁড়ির চিরের ভিতর হইতে তাহা অতি অনায়াসে বাহির করিয়া লওয়া যায়। দুই জন করাতী করাতের ফ্রেম ধরিয়া, তাহাদের মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ কাঠের গুঁড়ি চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করিতেছে; চিত্রে তাহাদিগের কার্য্যপ্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

রাক্ষুসে চাকার প্রকাণ্ড বোঝা বহন

এ কালে চক্রচালিত শকটে নানা প্রকার বোঝা বহন করা হয়; কিন্তু সংপ্রতি একটি বিশালাকার চক্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ·গাইট
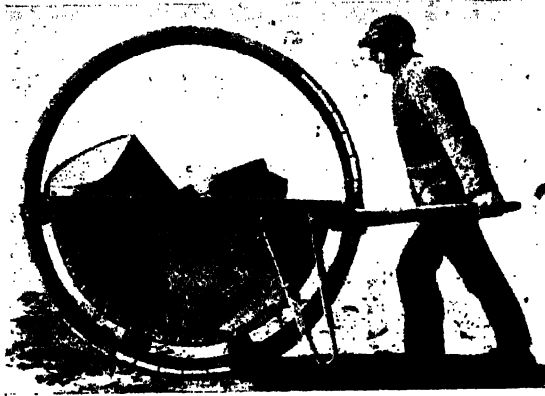
রাক্ষুসে চাকার প্রকাণ্ড বোঝা বহন

বহনোপযোগী হাত-গাড়ীর অভাব পূরণ করিতেছে। এই চাকার ভিতর বোঝা চাপাইয়া দীর্ঘ দণ্ডের সাহায্যে চাকাখানি ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই ভাবে এক জন লোক কিরূপ বিশাল বোঝা একাকী ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

রণতরীর গোলায় আহত সমুদ্রে পতিত বিমানের উদ্ধারের ব্যবস্থা

'বৃটিশ রয়াল এয়ার ফোর্স' অর্থাৎ রাজকীয় উড়ো বহর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সি-প্লেনকে 'কুইন-বীজ' নামে অভিহিত করে, সে-গুলি বৃটিশ নৌ-বিভাগের খ-পোতবিধ্বংসী গোলন্দাজবর্গ কর্ত্তৃক তাহাদের কামানের গোলার লক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এগুলি কোন আড়কাঠী বহন করে না; ইহারা ইহাদের আশ্রয় জাহাজ হইতে ক্ষেপণীর সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, এবং যে সময় আকাশে অবস্থান করে, সেই সময় বেতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আকাশ-পথে আক্রমণের প্রকৃত অবস্থার অনুসরণে তাহাদের গতি ঐ সকল গোলন্দাজকে লক্ষ্য স্থির করিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করে। যে প্লেন লক্ষ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহাতে মূল্যবান্ বেতারের সরঞ্জাম, এবং মোটরসমূহ সংরক্ষিত হয় বলিয়া যাহাতে তাহা সমুদ্রে ডুবিয়া না যায়, এই উদ্দেশ্যে তাহা সমুদ্র হইতে তুলিয়া

রণতরীর গোলায় আহত সমুদ্রে পতিত বিমান উদ্ধার

লইবার জন্ত একখানি জাহাজকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখা হয়। চিত্রে দেখুন, ঐরূপ প্লেনকে জল-সমাধি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এক-খানি জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধাবিত হইয়াছে।

বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীবদ্ধ চাবির স্তায় চাবির সাহায্যে বৈদ্যুতিক কণ্ঠস্বরে বাক্যালাপ

এই সঙ্গে যে যন্ত্রটির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, পৃথিবীতে উহাই বাক্যসৃষ্টির প্রথম কল। শ্রেণীবদ্ধ চাবি টিপিয়া যে ভাবে সুর বাহির হয়, নবাবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক কলটিতে সেইরূপ চাবি টিপিয়া মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ স্বর বাহির হয়। কোন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক

কর্ম্মী শ্রেণীবদ্ধ চাবিগুলির একটি বা একাধিক এক সঙ্গে টিপিয়া উক্ত কল হইতে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা, ঘটনার বিবরণ, বা প্রশ্নাদি মনুষ্যকণ্ঠস্বরে বাহির করিতে পারেন। এই যন্ত্রের ভিতর কৌশলে দুই শ্রেণীর বাক্‌শব্দ (two kinds of speech sound) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কারক 'বেল টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ার'গণ ইহাকে 'ভোডার' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই যন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার একটি বোতাম ঘুরাইলেই স্ত্রীলোক বা পুরুষের কণ্ঠস্বর নির্গত হয়। কেবল তাহা নহে; 'ভোডার' মেষের ও গো-ছাগের কণ্ঠস্বর, শৃকরছানার কণ্ঠনিঃসৃত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ, এবং কাঠ-ঠোকরার ঠক্‌-ঠক্‌-ধ্বনি উৎপাদন করায় ইহাকে অনায়াসে 'হরবোলা' বলা যাইতে পারে।

বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণীবদ্ধ চাবির ন্যায় চাবির সাহায্যে বৈদ্যুতিক কণ্ঠস্বরে বাক্যালাপ

বস্তুতঃ, বিদ্যুতের সাহায্যে বাক্যোচ্চারণের এরূপ যন্ত্র পূর্ব্বে কখন আবিষ্কৃত হয় নাই।
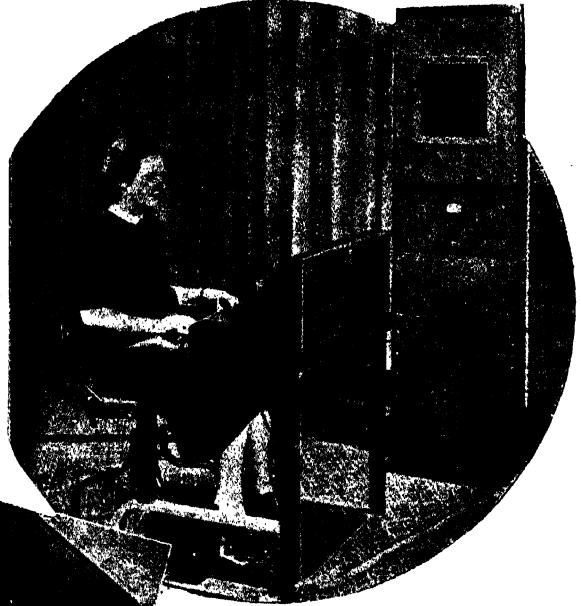
চক্ষুর ঢাল

যাহাদিগকে যন্ত্রাদির সাহায্যে শিল্পাগারে কায কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাদের চক্ষুকে কয়লার কুচি, লোহা বা অন্যান্য ধাতুর অগ্নিময় ফুলকি প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য চক্ষুর এক প্রকার স্বচ্ছ ঢাল নির্ম্মিত হইয়াছে।

চক্ষুর ঢাল

ইহা নাক-মুখের আবরণরূপেও ব্যবহৃত হইতেছে। এই ঢাল দ্বারা দৃষ্টি অবরুদ্ধ না হয়, এজন্য ইহা অগ্নিরোধক, স্থিতিস্থাপক, স্বচ্ছ উপাদানে নির্ম্মিত। উত্তপ্ত ধাতুর প্রখর উত্তাপ হইতেও

ছড়া আলু

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য 'মাসিক বসুমতী'র পাঠকগণকে প্রকৃতি দেবীর বিচিত্র খেয়ালের নিদর্শন দেখাইবার জন্য এই বিচিত্র অদ্ভুত

ছড়া আলু

আলুটি পাঠাইয়াছেন। কলার ছড়ার মত একই ছড়ায় এই আলু তিনটি সন্নিবেশিত, অথচ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র।

ইহা চক্ষুকে রক্ষা করিয়া থাকে। এই ঢালের সহিত সংযুক্ত আধারে একটি ঘর্ম্মনিবারণী দ্রব্য আবদ্ধ আছে; উহা ইচ্ছানুযায়ী অপসারিত হইতে পারে। তাহার সাহায্যে ললাটনিঃসৃত ঘর্ম্মধারা চক্ষুর দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন, যাঁহারা চশমা ব্যবহার করেন, তাঁহারা যদি এই ঢালের নীচে চশমা ধারণ করেন, তাহাতে দৃষ্টি-সঞ্চালনের বিঘ্ন হয় না, এক জন শিল্পীর চিত্র প্রদর্শিত হইল, শিল্পী এই ঢালের সাহায্যে চক্ষু ও নাক-মুখ আবৃত করিয়া কার্য্যে রত আছেন।

সূর্য্যালোক বা মৃত্তিকার সংস্পর্শ ব্যতীত বৃক্ষোৎপাদন

সূর্য্যালোক বা মৃত্তিকার সংস্পর্শ ব্যতীত উৎপাদিত বীজ হইতে কেবল কৃত্রিম উত্তাপে উৎপন্ন বিলাতি বেগুন (টোমাটো) গাছের বৃদ্ধির উপর আলোকের ক্রিয়ার ফল-সংক্রান্ত বিবিধ রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্মিথ্‌সোনিয়ান্ ইনষ্টিটিউসন' নামক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে একাধিকবার পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, রাসায়নিক উপায়ে উৎপন্ন দ্রব পদার্থ, এবং কৃত্রিম আলোক দ্বারা মৃত্তিকা ও সূর্য্যালোকের অভাব পূরণ করা হইতেছে। এই প্রকার আলোকের সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই সকল তরু বিভিন্ন উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে; কোনটি লাল, কোনটি নীল, কোনটির বর্ণ অন্য প্রকার। এতৎসম্পর্কীয় চিত্রদ্বয়ের প্রথম চিত্রে রসায়নতত্ত্ববিৎ বিশেষজ্ঞ একটি যন্ত্রে ৫ শত বাতির আলোক উৎপাদন করিতেছেন; ইহা হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন শক্তির আলোকে বৃক্ষ উৎপাদিত হইবে। দ্বিতীয় চিত্রে, কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত বিলাতি বেগুনের কয়েকটি চারা পরীক্ষা করা হইতেছে।

সূর্য্যালোক বা মৃত্তিকার সংস্পর্শ ব্যতীত বৃক্ষোৎপাদন

সাইকেলের বায়ুপ্রবাহ-নিবারক আচ্ছাদন

ফরাসী দেশে হস্ত-পদ দ্বারা পরিচালিত সাইকেলে বায়ুপ্রবাহ-নিবারক ক্যাম্বিসের আচ্ছাদন নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহার উপযোগিতা প্রদর্শিত হইতেছে। বাইসাইকেল চালাইবার সময়

সাইকেলের বায়ুপ্রবাহ-নিবারক আচ্ছাদন

হস্ত দ্বারা এই আচ্ছাদন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। এই আচ্ছাদনের ফ্রেমটি লঘুভার ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত; তাহা সাইকেলের আরোহীর কাঁধের উপর সাইকেলের সহিত সংযোজিত থাকে। সাইকেল যখন দ্রুতবেগে পরিচালিত হয়, সেই সময় বিপরীতমুখী বায়ুর বেগ ইহার গতিতে বাধা দান করিতে পারে না। সাইকেল সেই বাধা অতিক্রম করিয়া চলে। সাইকেলের আসন মাটী হইতে প্রায় আঠার ইঞ্চি উর্দ্ধে থাকে। বস্তুতঃ, চক্রের উর্দ্ধভাগ ইহার সহিত সমতলে অবস্থিত। সম্মুখস্থ চাকার উর্দ্ধভাগের সহিত গাড়ীর 'প্যাডেল' সংযোজিত থাকায়, আরোহী ইচ্ছানুযায়ী সম্মুখে গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আরোহীর মস্তক উদ্ঘাটিত আচ্ছাদনের বাহিরে থাকায় তিনি ইচ্ছানুযায়ী সকল দিকে দৃষ্টি পরিচালিত করিতে পারেন। এতৎসহ প্রকাশিত চিত্র লক্ষ্য করিলেই পাঠকগণ সাইকেল-আরোহীর অবস্থা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবেন। সাইকেল-আরোহী সাইকেল পরিচালিত করিবার পূর্ব্বে এবং পরে কি অবস্থায় আছেন, উভয় চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উচ্চ পক্ষধারী বাতায়নযুক্ত এরোপ্লেন

এই নবনির্ম্মিত এরোপ্লেনের উচ্চ পাখার নীচে যে বাতায়নশ্রেণী আছে, তাহাদের সাহায্যে আরোহীরা ভূতলস্থিত সকল দৃশ্য সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। ইহার সঙ্গে যে ট্রাইসিকল 'গিয়ার' সংযুক্ত আছে, তাহার সাহায্যে ইহা সহজে ভূতলে অবতরণ করিতে পারে। ইহাতে ১৬ জন আরোহীর স্থান আছে, ইহার আয়তন ৬০ ফুট দীর্ঘ; কিন্তু পক্ষবিস্তার করিলে পক্ষসহ ইহার দৈর্ঘ্য ৭৮ ফুট। ৮৫০ অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট দুইটি ইঞ্জিনে ইহা পরিচালিত হয়, এবং ইহা ঘণ্টায় ১ শত ৬৯ মাইল পথ সহজে অতিক্রম করিতে পারে।
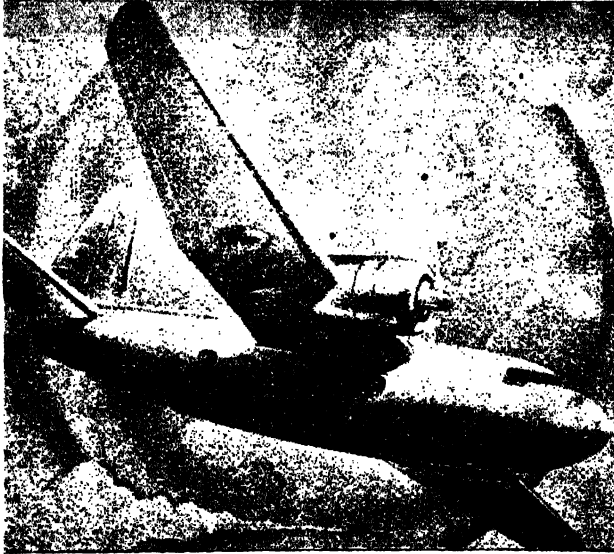
উচ্চ-পক্ষধারী বাতায়নযুক্ত এরোপ্লেন

সকল জলাধারের নল-মুখে ব্যবহারোপযোগী নূতন ধরণের ফিল্‌টার

য়ুরোপের বাজারে ইস্পাতনির্ম্মিত এক প্রকার ফিল্‌টারের আমদানী হইয়াছে; এই ইস্পাতে মরিচা ধরে না, এবং ফিল্‌টারের জল আপনা-হইতেই পরিষ্কৃত হয়। ইহা যে কোন জলাধারের নল-মুখে ব্যবহৃত হইতে পারে। গরম বা ঠাণ্ডা জল ব্যবহারে কোন অসুবিধা হয় না। জলাধারের জলে যে সকল ময়লা থাকে, তাহা ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলে বিনা চেষ্টায় অপসারিত হয়। এই নূতন ফিল্‌টারের আদর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। চিত্রে পাঠক ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলের বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবেন। বৈজ্ঞানিক যুগে বিভিন্ন প্রকার উন্নতি বিস্ময়কর।
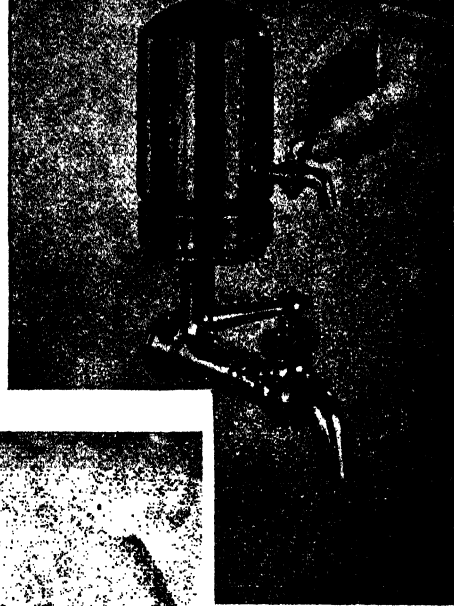
সকল জলাধারের নল-মুখে ব্যবহারোপযোগী নূতন ধরণের ফিল্‌টার

আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া

অষ্ট্রীয়া-গ্রাসের বার্ষিক উৎসব—

গত মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হার হিট্‌লার এক অভিনব উপায়ে অষ্ট্রীয়া-গ্রাসের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে জেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; ভূতপূর্ব্ব জেকো-শ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও শ্লোভাকিয়া প্রদেশ জার্ম্মাণ "রাইথে"র সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, রুমেনিয়া তথা কার্পেথো-ইউক্রেণ প্রদেশটি হাঙ্গেরির অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, রুমানিয়াকে জার্ম্মাণীর সহিত ব্যাপক বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করা হই-য়াছে; লুথেনিয়ান্ গভর্ণ-মেণ্টের নিকট হইতে জার্ম্মাণী মেমেল্ অঞ্চলটি ছিনাইয়া লইয়াছে। এখন জার্ম্মাণী ড্যান্‌জিগ্ ও "পোলিস্ করিডরে"র (ড্যান্‌জিগ্ ও পোমারনিয়ার মধ্যবর্ত্তী পোল্ অঞ্চল) উপর অধিকার স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

শ্লোভাকিয়ার ঝটিকা সেনাবাহিনী ব্র্যাটিসলাভার পথে টহল দিতেছে

ব্র্যাটিসলাভায় পলায়নপর শ্লোভাক ন্যাশনালিষ্টগণ

মিউনিক চুক্তির ভয়াবহ ফল—

গত সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক্ বৈঠকেই জেকো-শ্লোভাকিয়ার সমাধি রচিত হইয়াছিল, পাঁচ মাস পরে আজ সে য়ুরোপের মানচিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন হইল। মিউনিক চুক্তিতে জার্ম্মাণী কেবল জেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটেন্ অঞ্চলেরই অধিকারী হয় নাই, বস্তুতঃ সে জেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশকে তাহার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। মিউনিকে হতভাগ্য জেক্ গভর্ণমেণ্ট আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধুশূন্য হয় এবং স্বদেশে সুরক্ষিত সীমান্ত হইতে বঞ্চিত হয়। বৃটেন্ জার্ম্মাণীকে উপনিবেশ প্রত্যর্পণের দাবী উত্থাপনে বিরত করিতে চাহিয়াছিল; জার্ম্মাণীকে সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে রক্ষা-ব্যূহরূপে ব্যবহার করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ফ্রান্স সম্পর্কে বৃটেন চাহিয়াছিল ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়া ফ্রান্সকে তাহার অনুগত দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করিতে।

সশস্ত্র শ্লোভাক লিঙ্কা পুলিসকে অগ্রাহ্য করিতেছে

শ্লোভাকিয়ার জার্ম্মাণ নেতা হার কারমারসিন্

যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল জার্ম্মাণ প্রাণ দিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি বীরদিনে স্মৃতিতর্পণ
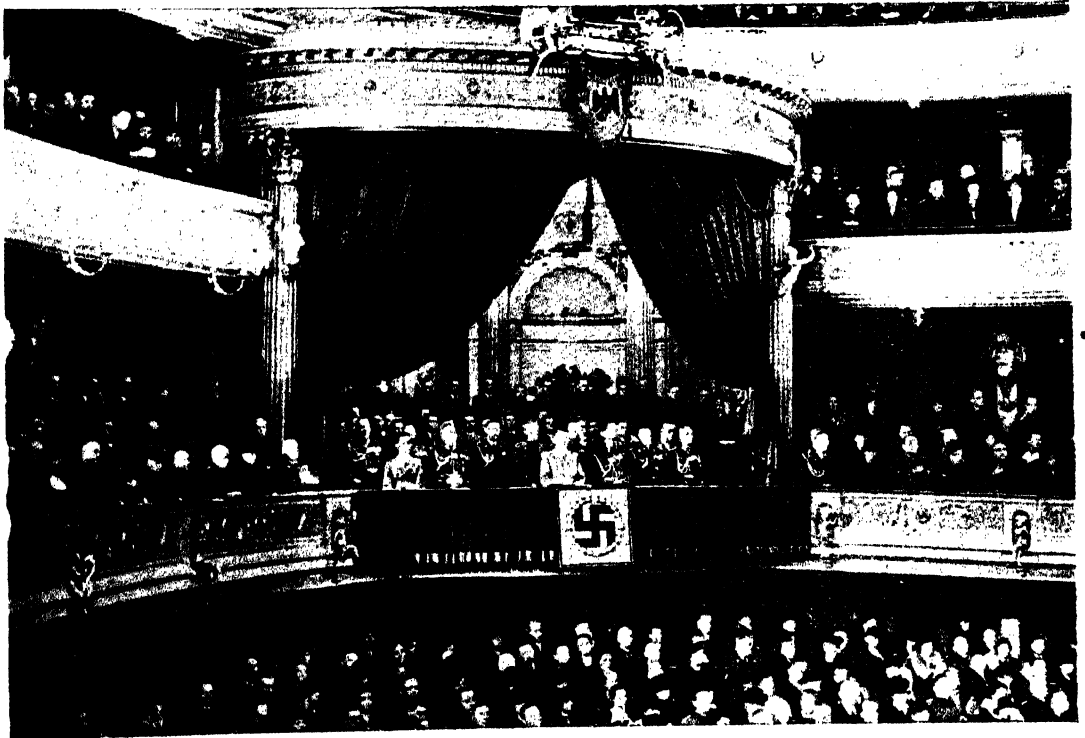
এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বৃটেন্ জার্ম্মাণীর ঔদ্ধত্যে প্রশ্রয় দিয়াছে। জার্ম্মাণী যখন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যের বিধান প্রবর্ত্তন করেন, তখন কোন প্রকার প্রতিবাদ জ্ঞাপন ত দূরের কথা, ইহার তিন মাস পরে জুন মাসে জার্ম্মাণীর সহিত বৃটেন্ নৌচুক্তি করিয়াছিল। ইহার পর, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে জার্ম্মাণী যখন নিরস্ত্রীকৃত রাইণলণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করিল, তখন বৃটেন্ই ফ্রান্সকে পাণ্টা সৈন্য সমাবেশ করিতে দেয় নাই। ঐ বৎসর জুলাই মাসে যখন স্পেনে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়, তখন জার্ম্মাণীর সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে বৃটেন্ই ফ্রান্সের ব্লুম্ গভর্ণমেণ্টকে স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। বৃটেনের নিকট হইতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াই জার্ম্মাণী ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রীয়া গ্রাস করিয়াছিল। জেকো-শ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া চুক্তিবদ্ধ ছিল। কাযেই, কেবল বৃটেনের ইঙ্গিতেই জেকোশ্লোভাকিয়ার সুডেটেন্ অঞ্চল তথা তাহার সুরক্ষিত সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করা জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। গত সেপ্টেম্বর মাসে জেকো-শ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের সমগ্রতা যখন বিপন্ন হয়, তখন সোভিয়েট রুশিয়া ঘোষণা করে যে, ফ্রান্স যদি তাহার চুক্তি পালন করে, তাহা হইলে সে-ও তাহার চুক্তি পালন করিবে। তখন বৃটেন্ ফ্রান্সকে "চাপ" দিয়া তাহাকে জেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কিত ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাহার পর, বৃটেন্ মিউনিকে বসিয়া আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ জেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করে। মিউনিক বৈঠকের পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিলেন। এই উল্লাস য়ুরোপে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নহে; মিউনিকে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট সামরিক চুক্তি বস্তুতঃ বাতিল হইয়াছিল, অষ্ট্রীয়া ও সুডেটেন্ অঞ্চল গ্রাসে জার্ম্মাণীর উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা কতক পরিমাণে মিটিয়াছিল, মধ্য-য়ুরোপে জার্ম্মাণ "রাইখের" প্রসারতায় জার্ম্মাণী সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে রক্ষা-ব্যূহরূপে কার্য্য করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিল—ইহাই মিঃ চেম্বারলেনের উল্লাসের কারণ।

স্বাধীন শ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ টিসো ও হিটলারের আলোচনা

ব্র্যাটিসলাভার জেক-বিরোধী মনোভাব

স্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়ায় নাজী-আন্দোলন—

মিউনিক চুক্তির পর হিট্‌লার জেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। নাজী দলের প্রেরোচনায় ক্রমে স্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া (কার্পেথো ইউক্রেণ) প্রদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইল। ঐ দুইটি প্রদেশের স্বায়ত্ত-শাসিত গভর্ণমেণ্টের উপর নাজী-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নাজী আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়াই স্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া প্রদেশ কেন্দ্রী গভর্ণমেণ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিট্‌লার প্রথমে বোহেমিয়া ও মোরোভিয়া প্রদেশ এবং পরে স্লোভাকিয়ার উপর জার্ম্মাণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

স্লোভাক নেতা ডাঃ সাইডর্

পদচ্যুত স্লোভাক নেতা ডাঃ টিসো

হাঙ্গেরীর রুথেনিয়া গ্রাস—

রুথেনিয়া প্রদেশটি পূর্ব্বে হাঙ্গেরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাঙ্গেরী বহু দিন হইতে এই প্রদেশটিকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। মিউনিক চুক্তির পর সে রুথেনিয়া গ্রাস করিয়া পোলণ্ডের সন্নিহিত দেশে পরিণত হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু হিটলার তখন হাঙ্গেরীর এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার মনে এই আশঙ্কা ছিল যে, ইটালীর অনুগত হাঙ্গেরী ও পোলণ্ড যদি সন্নিহিত দেশে পরিণত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ সৈন্যের পূর্ব্ব য়ুরোপে অগ্রগতির পথ চিরতরে অবরুদ্ধ হইবে। কিন্তু তখন হাঙ্গেরী জার্ম্মাণীর আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিগণিত হইয়াছে—সে তখন জার্ম্মাণীর সহিত "কমিণ্টার্ণ"-বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ। কাযেই, হাঙ্গেরীর রুথেনিয়া অধিকারে হিট্‌লারের আর আপত্তি নাই। বস্তুতঃ হিটলারের নিকট হইতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়াই হাঙ্গেরী রুথেনিয়া অধিকার করিয়াছে।

মেমেল্—

বাল্টিক সাগরের পূর্ব্ব-উপকূলবর্ত্তী মেমেল্ বস্তুতঃ জার্ম্মাণ অঞ্চল; ভার্সাই সন্ধির বিধানে জার্ম্মাণী এই

হার হিট্‌লার ও সস্ত্রীক গোয়েরিং

অঞ্চলটি হারাইয়াছিল। মেমেলের আয়তন ৯৪৫ বর্গ মাইল; অধিবাসীর সংখ্যা দেড় লক্ষ, ইহার অধিকাংশই জার্ম্মাণ। গত ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচনে মেমেলের স্থানীয় "ডায়েটের" ২৯টি আসনের মধ্যে ২৬টি আসন যখন নাজীগণ অধিকার করিয়াছিল, তখনই সেখানকার নাজী নেতা নিউম্যান্ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে জার্ম্মাণ "রাইখের" অন্তর্ভুক্ত হইতে চেষ্টা করিবেন। মেমেল্ জার্ম্মাণ "রাইখের" অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক; ভার্সাই সন্ধি বহু পূর্ব্বেই ছিন্নপত্রে পরিণত হইয়াছে, মেমেল্‌কে সামরিক শক্তির দ্বারা আপনার অধিকারভুক্ত রাখা লিথুনিয়ান্ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত। মেমেল্ জার্ম্মাণ "রাইখের" অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিটলারের পক্ষে পোলণ্ডকে "চাপ" দেওয়া সহজ হইয়াছে; কারণ, মেমেল্ এতদিন লিথুনিয়ার অধীন থাকিলেও পোলণ্ড ঐ বন্দরটিকে অবাধে ব্যবহার করিয়াছে।

রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী এম্ কালিনেস্কু

রুমানিয়া ও জার্ম্মানীর বাণিজ্য চুক্তি—

রুমানিয়ার তৈল ও শস্যের উপর বহু দিন হইতেই জার্ম্মানীর লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। জেকোশ্লোভাকিয়া আত্মসাৎ করিয়া জার্ম্মাণী বহুসংখ্যক শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিকারী হইয়াছে। জেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রগুরু ডাঃ ম্যাসারিকের চেষ্টায় ভূতপূর্ব্ব হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের শতকরা ৮০টি শিল্পকেন্দ্র এই নবগঠিত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই সকল শিল্পকেন্দ্র আজ জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হইল। অষ্ট্রীয়া ও জেকোশ্লোভাকিয়াকে উত্তমরূপে পরিপাক করিয়া উহা হইতে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে পণ্যোপকরণের অবাধ সরবরাহ প্রয়োজন। এই জন্য রুমানিয়ার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নষ্ট করিবার ভীতিপ্রদর্শন করিয়া জার্ম্মাণী তাহাকে অর্থনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিয়াছে। রুমানিয়া এই প্রস্তাব প্রথমে দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য বৃহৎ শক্তির নিকট হইতে তাহার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় সে পরে জার্ম্মাণীর সহিত ব্যাপক অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই চুক্তিতে জার্ম্মাণী রুমানিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে নাই বটে; কিন্তু সে যে অধিকার পাইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ব্যাপক। হয়ত এই অধিকারের বলেই জার্ম্মাণী অদূর ভবিষ্যতে রুমানিয়াকে সম্পূর্ণভাবে তাহার পদাশ্রিত করিবে।

"পোলিস-করিডর" ও ড্যানজিগ—

জার্ম্মাণীর পোমারানিয়া প্রদেশ এবং ড্যান্‌জিগের মধ্যবর্ত্তী যে অঞ্চলটি "পোলিস্-করিডর" নামে খ্যাত, ইহা পোলণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল; এই অঞ্চলটির তখন নাম ছিল পোমার্জ্জ প্রদেশ। গত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রুসিয়ার অধিকারভুক্ত হয়। গত মহাযুদ্ধের পর, পোলণ্ড যখন

রুমানীয় "ফিনায়সাজ ফ্রণ্টার" বাহিনী

হার হিটলারের (মোটরে দণ্ডায়মান) মোরাভিয়ার রাজধানী ব্রোণ সহরে প্রবেশ
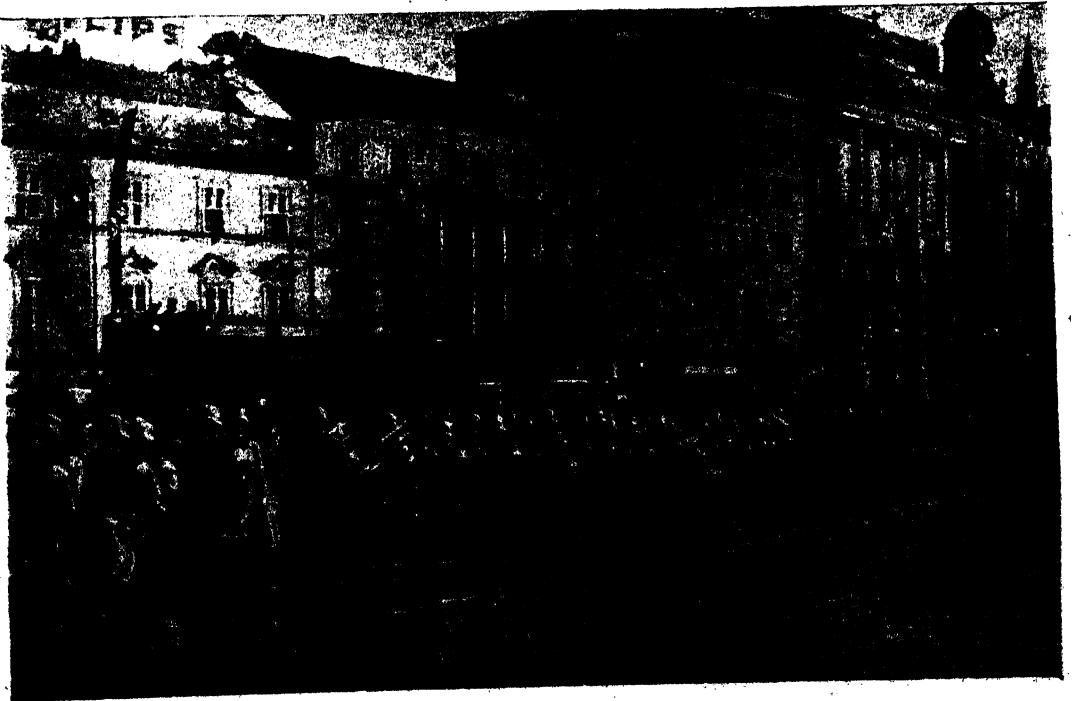
মোরাভিয়ার রাজধানী ব্রোণ সহরে জার্মাণ সৈন্যদলের প্রবেশ

মোরাভিয়ার রাজধানী ব্রোণ সহরে হার হিটলার সম্বর্দ্ধিত

প্রেগের ঐতিহাসিক "হ্রাডসিন" প্রাসাদ জার্ম্মাণ-সেনার অধিকারে
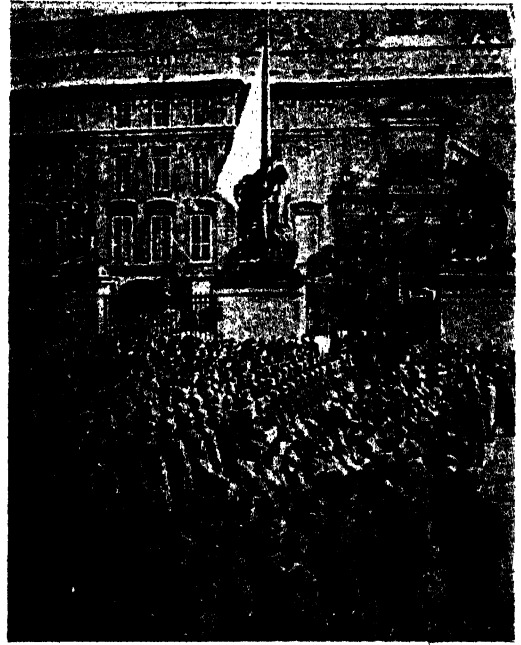
শতাধিক বৎসরের পরে পুনরায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তখন তাহাকে সমুদ্রে প্রবেশের পথ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলটি তাহাকে দেওয়া হয়। "পোলিস্ করিডর" নামক এই অঞ্চলটিকে রাষ্ট্রনীতিকগণ বাল্‌টিক সাগরের "বারুদের গুদাম" বলিয়া থাকেন। এই অঞ্চলটি এবং ইহারই পূর্ব্বে ড্যান্‌জিগ্‌ যদি জার্ম্মাণীর

প্রেগে ডাক্তার হাচা ও হার হিটলার

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ডাক্তার হাচার বার্লিন ত্যাগ

অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে বাল্‌টিক সাগরের সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে জার্ম্মাণীর একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে পারে; পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর স্থলপথের সংযোগও স্থাপিত হয়। ড্যান্‌জিগ বস্তুতঃ জার্ম্মাণ সহর; ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই জার্ম্মাণ। এতদিন ইহা বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীনে ছিল এবং প্রত্যেক শক্তি ইহাকে বাণিজ্যের জন্য অবাধে ব্যবহার করিতে পারিত। এক্ষণে ড্যান্‌জিগে নাজী-দিগের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কাযেই, জার্ম্মাণী ইহাকে যে কোন মুহূর্ত্তে "রাইখের" অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে। ড্যান্‌জিগ এবং ইহারই পার্শ্বে নব-প্রতিষ্ঠিত ডীনিয়া বন্দরের পথে পোলণ্ডের শতকরা ৬৭ ভাগ বহির্বাণিজ্য চলে।

বিপন্ন পোলণ্ড—

জেকোশ্লোভাকিয়া জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং রুথেনিয়া প্রদেশটি জার্ম্মাণীর আশ্রিত রাজ্য হাঙ্গেরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়াছে পোলণ্ড। তাহার তিন দিক্ এখন জার্ম্মাণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাযেই জার্ম্মাণী এখন ড্যান্‌জিগ ও "পোলিস্-করিডর" অধিকার করিবার জন্য পোলণ্ডকে চাপ দিবে, ইহা স্বাভাবিক। পোল্ গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা ড্যান্‌জিগ সংক্রান্ত পূর্ব্ব-ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিতে এবং পোল্ রাজ্যের সমগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রেগে জার্ম্মাণ সৈন্যদলের প্রতি জেকদিগের বিদ্বেষপ্রকাশ

বোহেমিয়ার রাজধানীতে জার্ম্মাণ সেনার আগমন

চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার মতি-পরিবর্ত্তন

জার্ম্মাণীর জেকোশ্লোভাকিয়া-গ্রাসে বৃটেনের চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা জার্ম্মাণী সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিউনিকে হিটলার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, য়ুরোপে তাঁহার আর রাজ্যগত আকাঙ্ক্ষা নাই। সেই আশ্বাস তিনি ভঙ্গ করিয়াছেন, জেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে মিউনিক চুক্তির স্বাক্ষরকারীদিগের সহিত পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নাই। ইহার পর জার্ম্মাণীর সন্তুষ্টি-বিধানের (Appeasement) কথা উচ্চারণ করা আর চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মিঃ চেম্বারলেন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ জার্ম্মাণীর সন্তুষ্টিবিধানের নীতি অনুসরণ করিবেন আর জার্ম্মাণী ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব-য়ুরোপের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বৃটিশ ব্যবসায়িগণকে নির্ব্বাসিত করিবে, ইহা বৃটিশ জনসাধারণ আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। এই জন্য চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব নীতি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে জার্ম্মাণীর অত্যাচারমূলক কার্য্যপ্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে তাঁহাদিগের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পোলণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার মনোভাবের সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারা এই প্রতিশ্রুতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। বৃটেনের জনমত বিক্ষুব্ধ হওয়ায় চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা তাঁহাদিগের "সুর" পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৃটেনের জনমত শান্ত হইলে হয়ত তাঁহারা অকস্মাৎ আবিষ্কার করিবেন যে,

"পোলিস্-করিডর" ও ড্যান্‌জিগ জার্ম্মাণীকে প্রদান করিয়াও পোলণ্ডের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাইতে পারে। এই সঙ্কটকালেও বৃটেনের দৌর্ব্বল্য দেখা গিয়াছে। জেকো-শ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব-বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়া প্রস্তাব করিয়াছিল যে, অবিলম্বে বৃটেন, ফ্রান্স, রুশিয়া, পোলণ্ড, রুমানিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি শক্তিকে লইয়া সম্মিলনী আহূত হউক এবং জার্ম্মাণীর অত্যাচারমূলক প্রচেষ্টা নিবারণের উদ্দেশ্যে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হউক। বৃটেন এই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই এবং সেই জন্যই রুমানিয়া জার্ম্মাণীর সহিত অর্থনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউক্রেণ—

রুশিয়ার স্বল্পভাষী রাষ্ট্রনায়ক মিঃ ষ্ট্যালিন কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে নাজী-ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর দান করিয়াছেন। জার্ম্মাণী যে সোভিয়েট ইউক্রেণ অধিকার করিতে চাহে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেই চাহেন নাই; তাঁহার যুক্তি—সোভিয়েট রুশিয়ার সামরিক শক্তি হিটলারের অবিদিত নাই। মিঃ ষ্ট্যালিন্ বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পরিধানের উপযোগী প্রচুর পরিচ্ছদ সোভিয়েট রুশিয়ার আছে। জার্ম্মাণীর প্রকৃত অবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, হিটলার প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহেন না। সোভিয়েট ইউক্রেণের প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি আছে সত্য; কিন্তু তিনি যুদ্ধ করিয়া ঐ অঞ্চল অধিকার করিতে চাহেন না। পোলণ্ড, রুমানিয়া, রুথেনিয়া ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে যে ইউক্রেণ অঞ্চল বিস্তৃত রহিয়াছে, সেখানে গোপনে প্রচারকার্য্য করিয়া তিনি ইউক্রেণিয়ানদিগের স্বাধীনতা আন্দোলন সৃষ্টি করিতে চাহেন। পরে ঐ অঞ্চলটিকে জার্ম্মাণীর প্রভাবাধীনে একটি তথাকথিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সোভিয়েট ইউক্রেণের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী ইউক্রেণিয়ান্। কিন্তু তাহারা জারের আমলে ইহুদী ও রুশদিগের দ্বারা অত্যন্ত নির্য্যাতিত হইয়াছে। এই জন্য ইউক্রেণিয়ান্‌গণ স্বভাবতঃ ইহুদীবিরোধী। হিট্‌লার আশা করেন, নাজীবাদের ইহুদী-নির্য্যাতনের ধ্বনি এবং গোপন কার্য্যের দ্বারা সোভিয়েট ইউক্রেণের অধিবাসীদিগকে সোভিয়েট ইউনিয়ন্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা সহজসাধ্য হইবে।

স্পেন যুদ্ধের সমাপ্তি ও ইটালীর দাবী—

স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে যবনিকা পাত হইয়াছে। মাদ্রিদ ও ভ্যালেন্‌সিয়া জেনারল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, বস্তুতঃ স্পেনে এখন জেনারল ফ্রাঙ্কোর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেষ মুহূর্ত্তে গণতান্ত্রিক দলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। কর্ণেল কাসাডো নামক জনৈক

স্পেনের নির্ব্বাসিত কর্ণেল লিষ্টার

সামরিক কর্ম্মচারী এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিয়াছিল। তাহারাই মাদ্রিদ ও ভ্যালেন্‌সিয়াকে জেনারল ফ্রাঙ্কোর হস্তে অর্পণ করিয়াছে। জেনারল ফ্রাঙ্কো কোন সর্ত্তে রাজী হন নাই; অবশেষে বিনা সর্ত্তেই কর্ণেল কাসাডো ও তাহার সঙ্গিগণ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের অধিকৃত অঞ্চল জেনারল ফ্রাঙ্কোর হস্তে অর্পণ করিয়াছে।

বৃটেন্ এবং তাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত ফ্রান্স স্পেনের বিদ্রোহীদিগকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। বৃটেন্ মনে করিয়াছিল যে, ইটালী যদি স্পেনে প্রভাব বিস্তার করে এবং জার্ম্মাণী যদি মধ্য-য়ুরোপে প্রসারতা লাভ করে, তবে তাহারা উভয়ে সন্তুষ্ট হইবে। জার্ম্মাণী সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইটালীও সন্তুষ্ট হয় নাই; স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন অবসানপ্রায়,
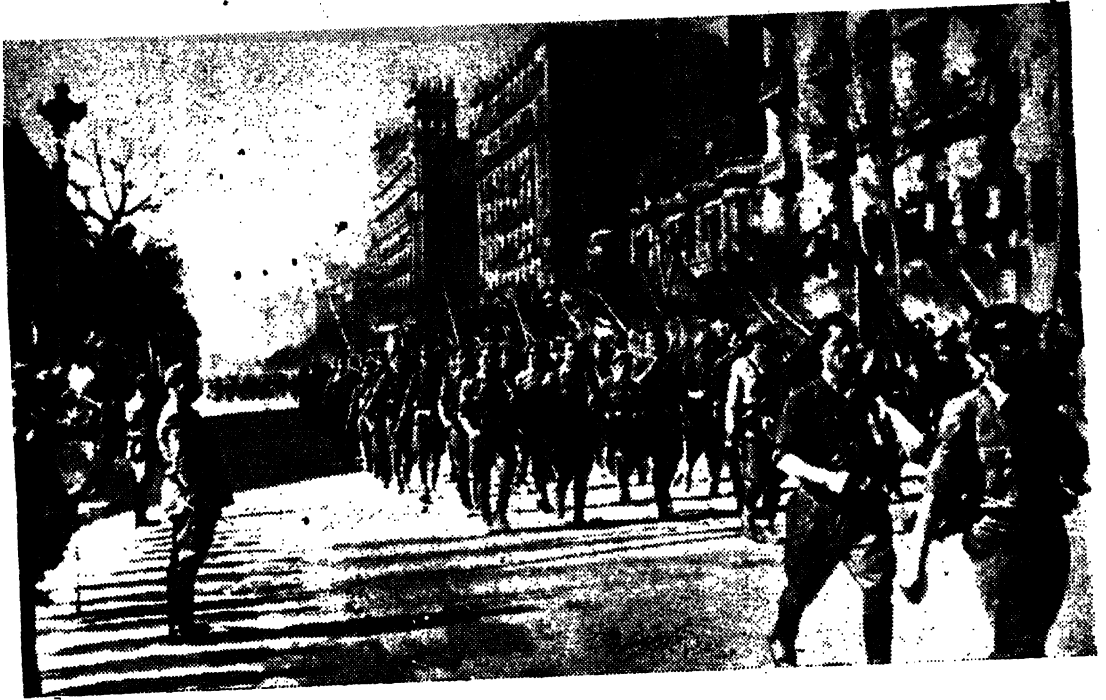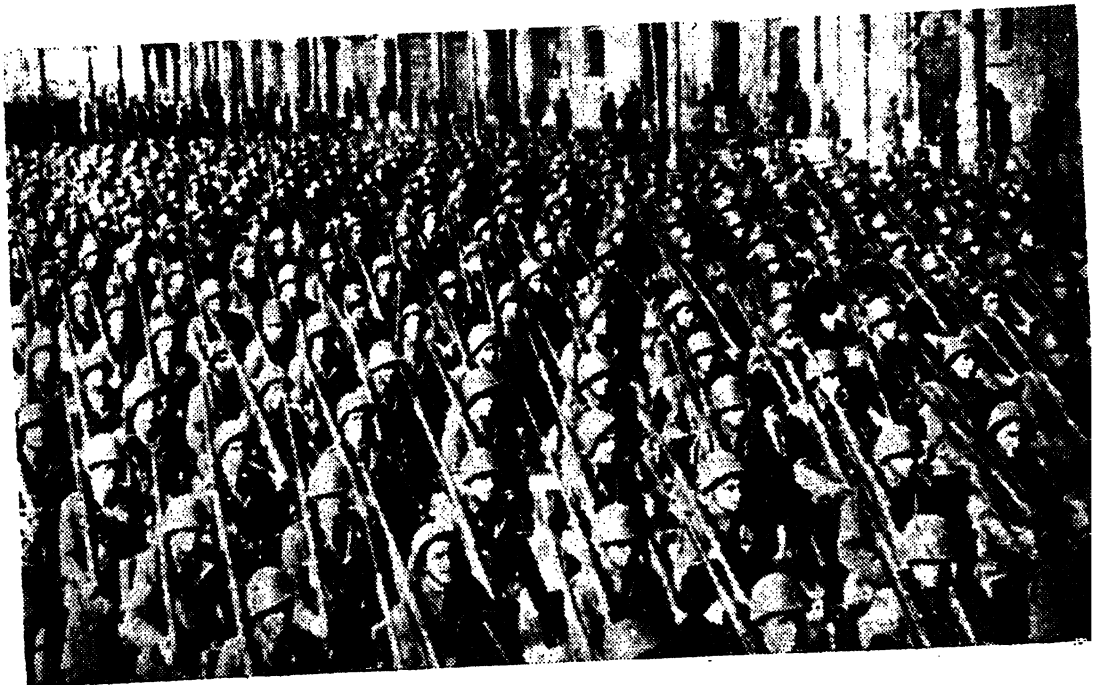
জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও স্পেনের বিজয়ী বাহিনী

বার্সিলোনায় স্পেনের বিজয়ী বিদ্রোহী সেনাদলের কুচ-কাওয়াজ

প্রধান নৌ-সেনাধ্যক্ষ বেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কো

বাইজারটায় ফরাসী কর্তৃপক্ষ স্পেন সাধারণ-তন্ত্রের একদল লোককে অভিনন্দিত করিতেছেন

তখন হইতেই ইটালী টিউনিস্-কর্সিকা-জিবুতি সংক্রান্ত দাবী উত্থাপন করিয়াছে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের পর মুসোলিনি কেবল সেই দাবী সম্বন্ধে পুনরুক্তিই করেন নাই, ফ্রান্সকে ভীতি-প্রদর্শনও করিয়াছেন। ফ্রান্স তখন অত্যন্ত বিপন্ন; তাহার পূর্ব্ব-সীমান্তে জার্ম্মাণী আল্‌সেস্-লোরেণের পুনরধিকারের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। এদিকে ইটালী উচ্চস্বরে "টিউনিস্-কর্সিকা-জিবুতি" ধ্বনি করিতেছে। ফ্রান্স মনে করিয়াছিল যে, জার্ম্মাণীর জেকোস্লোভাকিয়া গ্রাসে ইটালী অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এখনও সে মনে করিতেছে যে, জার্ম্মাণী যদি পোলণ্ডের অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা হইলে "রোম-বার্লিন্ মেরুদণ্ড" দুর্ব্বল হইবে। জার্ম্মাণীর জেকোস্লোভাকিয়া গ্রাসে ইটালী যে অসন্তুষ্ট হয় নাই, তাহা জানা গিয়াছে। পোলণ্ড সম্পর্কেও সে

উদাসীনতা প্রদর্শন করিবে, ইহা নিশ্চিত। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর সাফল্য দেখিয়া মুসোলিনী আরও অধৈর্য্য হইতেছেন।

পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া মনে হয়, বৃটেন ও ফ্রান্স যদি সত্যই সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে মনোভাব পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে হয়ত ইটালী অবিলম্বে তাহার দাবীপূরণে সচেষ্ট হইতে সাহস করিবে না। বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া যদি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই সম্মিলিত শক্তিকে প্ররোচিত করিবার সাহস রোম-বার্লিন মেরুদণ্ডের নাই। বৃটেন ও ফ্রান্স এখনও যদি ইতস্ততঃ করে, তাহা হইলে ফ্রান্সের পক্ষে ইটালীর দাবীপূরণে বাধা দেওয়া কখনও সম্ভব হইবে না।

আলবেনিয়ার মানচিত্র

ইটালীর আলবেনিয়া অধিকার—

গত ৭ই এপ্রিল ইটালী আলবেনিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। রোমের সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ইটালীর রণতরীসমূহ ও সেনাদল, সান্টিগুয়া, রানান, ভ্যালেনা-ডুরাজ্জো এবং জিওভারি দামেডুয়া সহরগুলি সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছে।

দুর্ব্বল আলবেনিয়া প্রবল শক্তিমান ইটালীর সহিত একা যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে সে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ইটালীর সহিত মিত্রতা সন্ধি বিদ্যমান বলিয়া যুগোশ্লাভিয়া বিপন্ন আলবেনিয়াকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছে।

আলবেনিয়াবাসীরা এবং সেনাবাহিনী ইটালীর এই আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত। তাহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, ইটালীয়ান সেনাবাহিনী তাহাদিগের মৃতদেহের উপর দিয়াই তাহাদিগের দেশ অধিকার করিতে পারিবে।

আলবেনিয়ার মুসলমান রাজা জগ একদল প্রতিনিধিকে ইটালীর সেনাপতি গুজেনির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাহাদিগের মারফৎ রাজা জগ কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, ইটালী সে প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে আপোষে আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু ৮ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীয় বাহিনী আলবেনিয়ার রাজধানী টিরানায় প্রবেশ করিয়াছে। রাজা জগ এবং সরকারী সদস্যরা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আলবেনিয়া রাজ্য পুরাতন তুর্কীর স্কুটারী, জানিনা কোশোভা ও মোনাষ্টি এই চারিটি প্রদেশ লইয়া গঠিত

হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা তুর্কীর অধিকারগত ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। ঐ বৎসর রাষ্ট্রদূত-সম্মিলনে আলবেনিয়ার স্বায়ত্ত-শাসননীতি স্বীকৃত হয়। আলবেনীয় প্রতিনিধিরা ঐরেদের প্রিন্স উইলিয়মকে মুকুট প্রদান করেন।

উইলিয়মের শাসন কিন্তু ব্যর্থ হইয়া যায়। ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার ফলে আলবেনিয়ায় বিপ্লব ঘটে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে উইলিয়ম ও আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের সকল সদস্য আলবেনিয়া ত্যাগ করেন। তথায় অরাজক অবস্থার উদ্ভব হয়।

জার্ম্মাণ যুদ্ধ শেষ হইবার পর, আলবেনিয়ান্‌দিগের সহিত ইটালীয়ান ও যুগোস্লাভদিগের যুদ্ধ হয়। পরিশেষে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আলবেনিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্য হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উহা গণতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হইয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে।

এই সময় এক সমিতি গঠিত করিয়া আলবেনিয়াকে রাজতন্ত্রশাসিত দেশরূপে পরিগণিত করিবার প্রয়োজন ঘটে। রাষ্ট্রপতিরূপে জগ দেশ-শাসন করিতেছিলেন। তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বহু য়ুরোপীয় দেশ এই ব্যবস্থা মানিয়া লয়েন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ইটালীর সহিত আলবেনিয়ার ২০ বৎসরের জন্য সন্ধি হয়। সেই সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ইটালী বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ দেশকে গ্রাস করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

আলবেনিয়া ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার পরিমাপ ১০ হাজার ৬ শত ২৯ বর্গমাইল। ইহার মোট জনসংখ্যা ১০ লক্ষের কিছু অধিক। এই দেশের স্থায়ী সেনাবল ১২ হাজার। কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ১ লক্ষ সেনাবল রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারে। অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, আলবেনিয়া ইটালীর করায়ত্ত হইল। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রভাব বিস্তারের জন্য আলবেনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিতে মুসোলিনী বিরত হইবেন এমন মনে করা যায় না। বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ চেম্বারলেন যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, ইটালীর আলবেনিয়া গ্রাসে তাহার আর এক দৃশ্য অভিনীত হইতে চলিয়াছে। মিঃ চেম্বারলেন এখন স্কটল্যাণ্ডে মৎস্যশিকারের আনন্দ উপভোগ করিতে গিয়াছেন। তাঁহার এ আনন্দ অব্যাহত থাকিবে ত? জার্ম্মাণী ও ইটালী মধ্য-য়ুরোপে ক্রমশঃ সর্ব্বশক্তিমান হইবার যে পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহাতে বাধা দিবার শক্তি কাহারও আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

শ্রীঅতুল দত্ত।

চৈত্র

চৈত্র এল অনল-হাওয়া সাথে
ঝরিয়ে দিয়ে আমের কোমল কলি,
চম্‌কে ভাঙ্গে জীর্ণ পাতার খেলা
পড়ুতে ত্বরা মরণ-কোলে ঢলি;

শাখার শিরে নবীন পাতার রাশি
হাওয়ার তালে নৃত্যে মাতোয়ারা,
সবুজ পরশ সারা দেহে মাখি
অলস হোল কিংশু দিশাহারা।

বাজলো মনে হারিয়ে যাওয়ার বাঁশী
মিলনমাঝে মিলিয়ে ছিল যাহা,
মুখর পাখীর মন না মানে মানা
ডুক্‌রে কাঁদে পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা।

শ্রীমতী নিভা দেবী।

পার্লামেণ্টের সদস্যগণের ভাতা বৃদ্ধি

বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রত্যেক সদস্য পূর্ব্বে বার্ষিক চারি শত পাউণ্ড ভাতা পাইতেন, সংপ্রতি তাঁহাদের ভাতার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া বার্ষিক ছয় শত পাউণ্ড হইয়াছে, এই ভাতার উপর ট্যাক্স নাই। তাঁহাদের ভাতাবৃদ্ধির ফলে তাঁহারা ওয়েষ্ট মিনষ্টার প্যালেস্ বারে ও ভোজনাগারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

পার্লামেণ্টের ভোজন বিভাগের 'কিচেন কমিটী' পূর্ব্বে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়া আসিতেছিল, এখন আর তাহাদের ক্ষতি হইবে না, এইরূপ আশা হইয়াছে। এই ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাদ্য-দ্রব্যাদির কিছু কিছু মূল্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কারণ, এখন প্রত্যেক সদস্য পূর্ব্বাপেক্ষা বার্ষিক দুই শত পাউণ্ড অধিক পাইতেছেন। পূর্ব্বে প্রত্যেক পেয়ালা চায়ের মূল্য দুই পেন্স অর্থাৎ প্রায় দুই আনা ধার্য্য ছিল, এখন তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া আড়াই পেন্স করা হইয়াছে।

এই সকল ভোজনাগারের ভৃত্যরা বলিতেছে, পার্লামেণ্টের সদস্যগণের বার্ষিক ভাতা দুই শত পাউণ্ড বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাদের পুরস্কারের পরিমাণও শতকরা ত্রিশ পাউণ্ড হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে ইহারা যাহার নিকট এক শিলিং বকশিস্ পাইত, এখন তাঁহার নিকট প্রায় পনের পেন্স বকশিস্ মিলিতেছে। আয় বৃদ্ধি হইলে প্রায় সকলেরই ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

—

রুসিয়া সম্বন্ধে জাপানের কর্ত্তব্য

সোভিয়েট রুসিয়ার এলাকাস্থিত কোন কোন জলাশয়ে জাপানী জেলেরা বহুদিন হইতে মাছ ধরিয়া আসিতেছে, সোভিয়েট সরকার পূর্ব্বে তাহাতে আপত্তি করিত না; কিন্তু সোভিয়েট সরকারের সহিত জাপানের বিরোধ প্রবল হওয়ায়, সোভিয়েট সরকার কিছু দিন পূর্ব্বে জাপানী মৎস্যজীবিগণকে মাছ ধরিতে না দিয়া তাহাদিগকে এলাকা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। ইহাতে জাপান সরকারের ধারণা হয়, তাহাদের মামুলী অধিকারে সোভিয়েট সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এজন্য জাপান ক্রুদ্ধ হইয়া বার্লিনে এক বৈঠক বসাইয়া তাহার প্রতিনিধিকে জার্ম্মাণ ও ইটালীর সরকারের সহিত পরামর্শ করিতে পাঠায়। সেই বৈঠকে জার্ম্মাণী ও ইটালীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠকে জাপানের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয়, সোভিয়েট সরকার জাপানী জেলেদের যে অপমান করিয়াছে, ইহা অসহ্য; অতএব জাপান সোভিয়েট সরকারকে বলিবে, 'যুদ্ধং দেহি।'

জাপানের এই প্রস্তাব শুনিয়া ইটালী ও জার্ম্মাণী কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত বৈঠকে নাজী ও ফ্যাসিষ্ট প্রতিনিধিগণ জাপানকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিয়াছে, এখন তোমরা তাড়াতাড়ি সোভিয়েট সরকারকে খোঁচাইতে যাইও না, তাহার ফল ভাল হইবে না। কারণ, (১) জাপান রুসিয়ার বিরুদ্ধে এখন অস্ত্রধারণ করিলে জার্ম্মাণী বা ইটালী কেহই সেই যুদ্ধে জাপানকে সাহায্য করিতে পারিবে না। (২) বিশেষতঃ, জার্ম্মাণীর ও ইটালীর উপনিবেশের সমস্যা সমাধানের জন্য, প্রয়োজন হইলে, জাপানকে তাহাদের অনুকূলে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে।

য়ুরোপের শান্তি যে পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, তাহা এইরূপ সামান্য সামান্য ব্যাপারে জার্ম্মাণী ও ইটালীর মনোভাব হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে।

—

জার্ম্মাণীর সামরিক বিমানের ক্ষতি

জার্ম্মাণীর বিমান-বাহিনীর পরিচালকের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে! বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ কাল হইতে নাজী বিমান-বহরের গড়ে চারি-খানি সামরিক বিমান প্রতি সপ্তাহেই দৈবদুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হইয়াছে।

এই দুঃসংবাদ যাহাতে জার্ম্মাণ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত না হয়, জার্ম্মাণ সরকার তাহার ব্যবস্থা করিলেও জার্ম্মাণীর বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসিবর্গ এবং কৃষকগণ ঐ প্রকার বিমানধ্বংস নিয়তই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং সংবাদপত্রে এ সংবাদ প্রকাশিত না হইলেও জার্ম্মাণীর জনসাধারণ লোকের মুখে মুখে ইহা জানিতে পারিয়াছে, এবং জনরবে প্রকৃত ঘটনা নানাভাবে পল্লবিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার এই ফল হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর নারী-সমাজ তাঁহাদের পুত্রগণকে বিমান-পরিচালনকার্য্যে নিযুক্ত করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য গোয়েরিং গত মার্চ্চ মাসের প্রথমে এক প্রার্থনা-পত্র প্রকাশ করিয়া জার্ম্মাণীর নারী-সমাজকে জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের সন্তানদের সামরিক বিমান পরিচালিত করিবার জন্য উৎসাহিত করেন, এবং এই চাকরী গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে অনুমতি দান করেন।

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ সরকার কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহায়তায় এরূপ উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন, যাহার ফলে সামরিক বিমানগুলি দৈবদুর্ঘটনায় গগনপথে বিধ্বস্ত হইলেও সেগুলি নিরাপদে ভূতলে অবতরণ করিতে পারে!

জার্ম্মাণীর সামরিক বিমানগুলি গগন-পথে দৈবদুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত না হয়, সেজন্য গোয়েরিংএর সহযোগিগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু জার্ম্মাণীর নারী-সমাজ গোয়েরিংএর আশ্বাসবাক্যে নির্ভর করিয়া তাঁহাদের পুত্রগণকে সামরিক বিমানসমূহ পরিচালন-ভার গ্রহণ করিতে পাঠাইবেন কি না, এখনও তাহার নিশ্চয়তা

নাই; এজন্য জার্ম্মাণীর বিমানবহর পরিচালন অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণ সরকার এ বিষয়ে বৃটিশ ও ফরাসী সরকারের নিকট উৎসাহ লাভ করিতে পারেন নাই।

হিটলারের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা

একটি চাঞ্চল্যজনক পূর্ত্তকার্য্য য়ুরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। জার্ম্মাণরা শীঘ্রই রাইন মেন-ডানিয়ুব খালের খননকার্য্য শেষ করিবে। এই খাল কৃষ্ণসাগরকে উত্তর-সাগরের সহিত সংযোজিত করিবে। নানা বিভিন্ন দেশ এই উভয় সাগরের ব্যবধানে অবস্থিত। নাৎসীরা আশা করিতেছে, এই খালের

কর্ণেল বেক

সাহায্যে মধ্য ও পূর্ব্ব-য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য জার্ম্মাণগণের মুষ্টিগত হইবে।

কিন্তু পোলরা যদি লণ্ডন, প্যারিস ও নিউইয়র্ক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে—তাহা হইলে এই খালের প্রতিযোগিতায় আর একটি খাল খননের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তাহারা যে খাল খননের জন্য উৎসুক হইয়াছে, তাহা বালটিক সাগরের ডাইনিয়া বন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া পোলিশ নদীসমূহের ভিতর দিয়া রুশো-রুমানিয়ান সীমান্তস্থিত নীপার নদী অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে। তবে এই খালের একটি অসুবিধা হইবে, ইহা কৃষ্ণসাগরতীরবর্ত্তী কনষ্টান্জা বন্দর স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু কনষ্টান্জা রুমানিয়ার প্রধান বন্দর। যাহা হউক, এই খালটি জার্ম্মাণ খাল অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হইবে।

পোল্যাণ্ডের কর্ণেল জোসেফ্ বেক সংপ্রতি লণ্ডনে আসিয়াছেন, তিনি লণ্ডনে এই খালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, এজন্য টাকা ধার পাওয়া যাইবে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি এ কথাও বলিবেন যে, যদি পোলদিগের সঙ্কল্পিত এই খাল খনন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে পোল্যাণ্ড জার্ম্মাণ-ইটালিয়ান অর্থনীতিক একচেটে অধিকার হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের নারী-সদস্য

বৃটিশ পার্লামেণ্টে এখন নারী-সদস্যের সংখ্যা অল্প নহে; বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইলে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শিষ্টাচারের অভাব ছিল না, কিন্তু এখন তাঁহারা সামান্য সামান্য কারণে পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছেন।

গত মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁহাদের এক জন অন্যকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় বাধা দান করিতে থাকেন, এবং বলেন, তিনি বক্তৃতায় মার্জ্জারীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের নিম্নলিখিত মহিলা-সদস্যগণ ঝগড়াটে বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যথা—লেডি এষ্টর, ডক্টর এডিথ সমারকিল, এলেন উইলকিন্সন, মিসেস্ ম্যাভিস্ টেট এবং এলিনর রাথবোন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতি, তাঁহাদের নাম ভাইকাউন্টেস ডেভিডসন, থেল্মা কাজালেট, ইরেনি ওয়ার্ড, ফ্লরেন্স হর্সব্রুগ, মিসেস জর্জ্জ হার্ডি এবং মিসেস্ এডাম্সন।

নারীজাতির কল্যাণপ্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সকল নারী-সদস্য তাঁহাদের দলগত পার্থক্য ত্যাগ করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকেন। মাতৃত্ব এবং শিশুকল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে তাঁহারা একযোগে তাহার সমর্থন করেন; কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে নারী-সদস্যরা নিজের ব্যক্তিগত অভিমত ত্যাগ করেন না, এবং তাহার সমর্থনে পরস্পরকে আক্রমণ করেন। তাঁহাদের চরিত্রগত এই বিশেষত্ব দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর অবসর-বিনোদন

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী আর্থার নেভিল চেম্বারলেন গত ১৮ই মার্চ্চ তাঁহার সপ্ততিতম জন্মদিবসে তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমে প্রভাতে ৭টার পর এক পেয়ালা চা এবং সংবাদপত্র পাঠ। অতঃপর ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নান এবং আটটার সময় প্রাতর্ভোজন। এই সময় মিসেস্ এনি চেম্বারলেনের চুম্বন ও পারিবারিক উপহার গ্রহণ। তাঁহার নাতি-নাতিনীগণ (মিসেস্ ষ্টিফেন লয়েডের পুত্র-কন্যা) এই সময় তাঁহার আদর লাভ করিতে আসে। প্রধান মন্ত্রী তাহাদের সহিত বালকের ন্যায় খেলা করেন, এবং তাহাদিগকে আমোদিত করিবার জন্য চীৎকার করিয়া থাকেন।

প্রাতর্ভোজনের টেবলে তিনি নানাপ্রকার গল্প করেন; দিবসের মধ্যে এই সময়েই তিনি সকল গল্প শেষ করেন। ইহার পর আর তাঁহার গল্প করিবার অবসর হয় না। গল্পে তিনি রসিকতা প্রকাশের চেষ্টা করেন।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীরা—লয়েড জর্জ্জ, বলডুইন, এবং ম্যাক-ডোনাল্ড রাজনীতিক সুহৃদ্গণকে প্রাতর্ভোজনের টেবলে আহ্বান করিতেন, কিন্তু নেভিল চেম্বারলেনের সে অভ্যাস নাই।

প্রধান মন্ত্রী সপরিবারে ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে বাস করিতে আরম্ভ করায় যে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, সে জন্য প্রায় ১৩ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। আর্ল বলডুইন যে কক্ষে শয়ন করিতেন, চেম্বারলেন সেই কক্ষের নীচের তলায় একটি কক্ষে শয়ন করেন।

প্রাতর্ভোজনের পর প্রধান মন্ত্রী তাঁহার স্ত্রীর সহিত সেণ্ট জেম্‌স পার্কে কিছুকাল ভ্রমণ করেন। এই সময় সরকারী কোন কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপণ করেন না, পারিবারিক কোন চিন্তাও তাঁহার মনে স্থান পায় না। তিনি দুষ্প্রাপ্য পক্ষীগুলি সন্দর্শন করেন, তাঁহার স্ত্রী নূতন নূতন চারাগাছ পরীক্ষা করেন। চেম্বারলেন তাঁহার পারিবারিক দর্জ্জি-নির্ম্মিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা সেকেলে এবং আড়ম্বরবর্জ্জিত।

তাঁহার স্ত্রী ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে একটি ছত্র উপহার-দান করেন, তাহা তিনি সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; বহুবার তাহার আবরণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ছাতা লইয়া তিনি মিউনিকে দরবার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রোমে মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় তাঁহার সঙ্গে অন্য ছাতা ছিল। ছাতা তাঁহার নিত্য সঙ্গী। তিনি শুভ্রবর্ণ ওয়েষ্টকোটে সোনার এলবার্ট চেন ব্যবহার করেন, কিন্তু শিং বাঁধানো চশমা অপেক্ষা পাঁস নে (pince-nez) ব্যবহারেরই অধিক পক্ষপাতী। সরকারী কাগজপত্র পাঠের সময় তাঁহাকে প্রথমোক্ত প্রকার চশমা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। যখন তাঁহার বাতব্যাধি পীড়াদায়ক হয়—তখন তিনি গো-মাংস স্পর্শ করেন না, তখন তিনি সাধারণ মাংস আহার ও জলমাত্র পান করেন। অন্য সময় তিনি উদরপূর্ণ করিয়া আহার করেন, এবং হুইস্কি, সোডা ও অন্যান্য মদ্য আকণ্ঠ পান করেন এই ৭০ বৎসর বয়সেও।

মিষ্টার নেভিল চেম্বারলেন

তিনি চুরুট-ধূমপান করেন, রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে পাইপ টানেন। তাঁহার লাইব্রেরীর টেবলে নানা আকারের পুরাতন পাইপ সজ্জিত থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সন্তরণ করিতেন, এখন পদব্রজে ভ্রমণ করেন। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমে শিকার করিতে গিয়া তিনি পদচালনায় অন্য সকল শিকারীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক স্থানে বসিয়া মাছ ধরিতে ক্লান্তিবোধ করেন না।

উইলিয়াম গ্ল্যাডষ্টোন এবং বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি ব্যতীত আর কাহাকেও ৭০ বৎসর বয়সে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হয় নাই। চেম্বারলেনের সহিষ্ণুতা অসাধারণ, তাঁহার বিপক্ষ দল যখন তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া 'তুড়িতে' থাকেন, তখন তিনি মিটি মিটি করিয়া হাসেন এবং এই ভাবে তাঁহাদের দুর্ব্বাক্য উড়াইয়া দিয়া স্বস্তি অনুভব করেন।

সোভিয়েট সরকার সম্বন্ধে বৃটিশ মনোভাব

সোভিয়েট সরকার সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের মনোভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় রাজনীতিকগণকে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সেক্রেটারী লর্ড হালিফাক্সের ব্যবহারেই এই পরিবর্ত্তনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত আইভ্যান মাইস্কিকে লণ্ডনস্থ রুশীয় রাজদূত-ভবনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে ভোজের আয়োজন হয়, লর্ড হালিফ্যাক্স সেই ভোজ-সভায় যোগদান করিয়া আইভ্যান মাইস্কির সহিত ভোজন করেন, এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হঠাৎ আইভ্যান মাইস্কির অভ্যর্থনা-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিঃ চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রুশিয়ার প্রতি তাঁহার পক্ষপাতের নিদর্শন এই প্রথম।

আইভ্যান মাইস্কি

লর্ড হালিফ্যাক্স সেই ভোজসভায় রুশ রাষ্ট্রদূত আইভ্যান মাইস্কিকে খোলাখুলি ভাবেই বলেন—রুশিয়ার সহিত বৃটেনের সম্বন্ধ যাহাতে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিত ভিন্ন লর্ড হালিফ্যাক্স স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রুশ রাষ্ট্রদূতের নিকট এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না।

বৃটিশ পররাষ্ট্র-সেক্রেটারী আইভ্যান মাইস্কির নিকট এরূপ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, বাণিজ্যগত সহযোগিতার অতিরিক্ত আরও কিছু করা প্রয়োজন, অর্থাৎ য়ুরোপীয় এবং প্রাচ্য দেশীয়

বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে যাহাতে বৃটেনের সহিত রুশিয়ার অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ব্যাপারের পর কোন কোন রাজনীতিকের ধারণা হইয়াছে, জার্ম্মাণী ও ইটালী জাপানকে জানাইয়া রাখিয়াছে—জার্ম্মাণীর ও ইটালীর উপনিবেশের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইলে জাপানকে তাহাদের অনুকূলে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে; যদি জাপান ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত যোগদান করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে রুশিয়ার সহায়তার প্রয়োজন হইতেও পারে ভাবিয়াই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিতে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সেক্রেটারী রুশ রাষ্ট্রদূতের সহিত সহসা ঘনিষ্ঠতা করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন। এই ধারণা যে অমূলক, ইহা কে বলিতে পারে?

—

তুরস্ক-সরকারের মতি-পরিবর্ত্তন

নব তুরস্কের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তুরস্কের মতি-পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন য়ুরোপীয় রাজনীতিকগণ বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছেন। বহু বৎসর হইতে তুর্কি সরকার আরবগণকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন। ইহা প্রধান কারণ, বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে আরবরা তুরস্কের সহিত শত্রুবৎ আচরণ করিয়াছিল, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এক্ষণে জর্ডন নদীর বাম তীরে যে ক্ষুদ্র আরব রাজ্যটির অস্তিত্ব বর্ত্তমান, তাহার নাম ট্রান্স-জর্ডনিয়া। আমীর আবদুল্লা এখন এই রাজ্যের রাজা হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমীর আবদুল্লার বৃটিশ মন্ত্রণাদাতারাই পরোক্ষভাবে এই রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু সংপ্রতি তুরস্কের বর্ত্তমান দেশনায়ক ইস্‌মেৎ ইনোয়েনু আমীর আবদুল্লাকে নানাভাবে তৈলাক্ত করিতেছেন। তিনি আমীর আবদুল্লাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তুরস্ক রাজধানী আঙ্কারায় লইয়া গিয়াছেন। সেখানে আমীর আবদুল্লার প্রতি তাঁহার আশাতীত সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে; তাহার উপর আমীরের পুত্রকে তুরস্কের প্রেসিডেণ্টের দেহরক্ষী সৈন্যদলের কাপ্তেনের পদ প্রদান করা হইয়াছে।

ইস্‌মেৎ ইনোয়েনু

যোসেফ গোয়েবলস

বৃটিশ-রাজনীতিকগণের ধারণা, আরব জাতির উপর তুরস্ক প্রভাব বিস্তারের জন্য উৎসুক; সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ইহা তুর্কি প্রেসিডেণ্টের একটি চাল মাত্র; কিন্তু তাঁহার এই চালের ফলে বৃটেন কি প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের কোন উপায় স্থির করিতে পারিবেন? তাঁহার এই মতি-পরিবর্ত্তন বৃটেনের অনুকূল বলিয়াই অনেকের ধারণা।

জার্ম্মাণীতে ফ্যাসিজমবিরোধী মত প্রচার

জার্ম্মাণীতে হিটলারের প্রধান সমর্থক যোসেফ গোয়েবল্‌স যাহাকে 'গোপনীয় চিঠিপত্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা রীচবারের (Reichwehr) সৈনিক-শ্রেণীতে প্রচারিত হইতেছিল। উহাদের মধ্যে যে পত্রখানি নিম্নশ্রেণীর সামরিক কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, তাহা যে সকল প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত, সিনর মুসোলিনী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'পপোলো ডি ইতালিয়া' (Popolo d' Italia) নামক পত্রিকায় সেই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীর সহিত এই সকল সংগ্রহের অধিকাংশেরই সম্বন্ধ ছিল। একটি সন্দর্ভ এইরূপ,—"জার্ম্মাণ পাশবিকতার আতিশয্য হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত অসংখ্য নিহত বীরের নাম স্মরণ করিয়া আমরা কামানপূর্ণ নগর এসেন নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত করিব। পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল জার্ম্মাণ নরঘাতক ও লুণ্ঠনকারী দস্যু মানবসমাজে যোগদানের অধিকার লাভ করিবে সন্দেহ নাই।"

"জার্ম্মাণীকে সাংঘাতিক আঘাত প্রদান ও প্রুসিয়ার উৎকট সমরপ্রবণতার আতঙ্ক হইতে য়ুরোপকে রক্ষা করা ইটালীর এখন একমাত্র কর্ত্তব্য।" ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ও ২৯শে এপ্রিল প্রকাশিত মুসোলিনীর প্রবন্ধ হইতে এই দুইটি অংশ সংগৃহীত। যে সকল আন্দোলনকারী এই সকল সন্দর্ভ প্রচারের জন্য দায়ী, তাঁহারা নাজী সৈন্যমণ্ডলীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিতে চাহেন যে, মুসোলিনী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণীর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন।
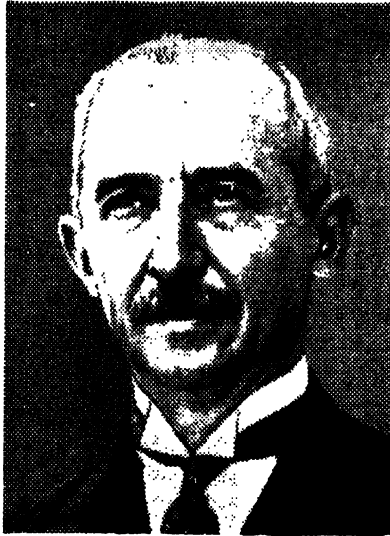
বস্তুতঃ মুসোলিনী যে হার হিটলারের সহিত মিত্রবৎ আচরণ করিতেছেন, তাহার মূলে তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই, তাঁহার অনুষ্ঠিত বহু কার্য্যেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। হার হিটলারও এরূপ নির্ব্বোধ নহেন যে, তিনি 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' মুসোলিনীকে চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু একালের কূটনীতিজ্ঞগণ এক হস্তে ধৃত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা

পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিয়া, অন্য হস্তে পরম প্রীতিভরে 'বন্ধু'র কণ্ঠালিঙ্গন করেন, এবং অন্য দেশের ভণ্ডের দল এই প্রকার বন্ধুত্বের আন্তরিকতায় নির্ভর করিতে বলিয়া স্বদেশবাসীকে প্রতারিত করেন ও এইরূপ কার্য্যে প্রভূত আত্মপ্রসাদও লাভ করেন।

রুশিয়ার সমরায়োজন

রুশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ষ্ট্যালিন কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন যে, জার্ম্মাণ, ইটালী, জাপানী এই তিন শক্তির সহিত তাঁহাকে একদিন যুদ্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু সমগ্র দেশবাসী রুশিয়ার নেতৃবর্গকে সাহায্য না করিলে এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার জয়লাভের সম্ভাবনা নাই।

কিছুদিন হইতে রুশিয়ায় ভয়ঙ্কর ধর-পাকড় চলিতেছিল, বহু ব্যক্তিকেই স্বদেশদ্রোহিতার অপবাদ দিয়া কঠোরতম দণ্ডে

ষ্ট্যালিন

দণ্ডিত করা হইতেছিল, অনেকে অস্বাস্থ্যকর স্থানে নির্ব্বাসিত হইতেছিল, সোভিয়েট সরকার সন্দেহভাজনগণকে সেকালের জারের নিহিলিষ্ট-শাসনের ন্যায় কঠোর শাসনে শৃঙ্খলিত করিতে-ছিলেন। কিন্তু অল্পদিন হইতে সোভিয়েট সরকারের এই কঠোরতা অপসারিত হইয়াছে।

রুশিয়ার দূরদর্শী অধিবাসিগণের ধারণা, দেশবাসিগণ শত্রুর আক্রমণে সোভিয়েট নেতৃবর্গকে সাহায্য করিবে, এবং দেশরক্ষার জন্য তাঁহাদের উন্নত পতাকামূলে সমবেত হইবে। এই আশায় ষ্ট্যালিন ঐ শ্রেণীর অত্যাচার রহিত করিয়া দেশের লোকের বিশ্বাস-ভাজন হইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই অনুমান যে মিথ্যা নহে, তাহা গত মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন কোন ঘটনায় প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পুলিস বিভাগের ডেপুটী চীফ পুলিস অফিসার ক্লিপ্যাণ্ড এবং তাঁহার অধীন তিন জন পুলিস-কর্ম্মচারী পশ্চিম সাইবেরিয়ার কয়লার খনি অঞ্চলের প্রধান নগর লেনিনস্ক কুজনেটস্কির ১৬০টি ছাত্রকে ভীষণ পীড়ন করায় তাহাদিগকে পাঁচ হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

যে সকল পুলিস কর্ম্মচারী ঐ সকল বালককে উৎপীড়ন করিয়াছিল, সাইবেরিয়ার সংবাদপত্রসমূহ তাহাদিগকে 'নররাক্ষস' নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের অত্যাচারকাহিনী প্রকাশ করিয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে, তাহারা বালক-গুলিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের বিচারের জন্য স্থাপিত একটি সামরিক বিচারালয়ে লইয়া গিয়াছিল। এই সকল বালকের বয়স দশ হইতে বার বৎসর। কিন্তু তাহাদের বিচারে বিলম্ব হওয়ায় তাহাদের অনেককে আট মাস পর্য্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। কারাগারে তাহাদিগকে খালি মেঝের উপর শয়ন করিতে দেওয়া হইত এবং পুলিস এই মর্ম্মে তাহাদের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়াছিল যে, তাহারা 'ফ্যাসিষ্ট বিপ্লবী দল' গঠন করিয়া-ছিল।

ভোলোডিয়া দশ বৎসর বয়স্ক একটি শিশু, তাহাকে দেখিলে একটি সজীব পুত্তলিকা বলিয়াই মনে হইত। তাহাকে তিন দিন পর্য্যন্ত সাধারণ কারাগারে ভীষণস্বভাব দস্যু ও নরহন্তা-গণের মধ্যে আটক রাখা হয়, চতুর্থ দিন রাত্রিকালে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া একটি গুপ্ত কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে ঐ সকল 'নর-রাক্ষস' পুলিস কর্ম্মচারী তাহাকে নানা প্রকার জেরা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা পেন্সিল ও কাগজ হাতে লইয়া 'বিপ্লব' 'বিভীষিকাবাদ' 'ফ্যাসিষ্ট দলের জন্য ছাত্র সংগ্রহ' প্রভৃতি যে সকল কথা বলে, 'দুধের ছেলে' ভোলোডিয়া সে সকল কথার অর্থ জানিত না, সে কি উত্তর দিবে? প্রথম রাত্রিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে 'মা মা' শব্দে রোদন করিতে থাকে। সে পুলিসকে সেই রাত্রে কোন কথা বলিতে পারে নাই।

পরবর্ত্তী কয়েক রাত্রিতে উপর্য্যুপরি চেষ্টার পর পুলিস বালক-টিকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া বিচারালয়ে কি ভাবে অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া লইল। অবশেষে বালক আদালতে নীত হইলে সে শিখান বুলি আওড়াইতে লাগিল, স্বীকার করিল, সে বিপ্লববাদিগণের দলপতি এবং পাঁচ বৎসর বয়স হইতে তাহার দলের জন্য বালক সংগ্রহ করিতেছিল। এই প্রসঙ্গে একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক পরিহাসচ্ছলে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভোলোডিয়া সরকারের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহা সে জন্মের পূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছিল, (anti state crime must have been pre-natal.)

এই সকল বালককে নানা ভাবে উৎপীড়িত করায় ঐ সকল পুলিস কর্ম্মচারীকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার পর রাজনীতিক কারণে দণ্ডিত বন্দিগণকে সাইবেরিয়ার কারাগার হইতে ক্রমাগত মুক্তিদান করা হইতেছে। দেশবাসিগণের বিশ্বাসভাজন হইবার জন্যই সোভিয়েট সরকারের এই সকল ব্যবস্থা।

রুশিয়ার বর্ত্তমান ডিক্টেটর ষ্ট্যালিন আশা করিতেছেন, তিনি এই ভাবে দেশের লোকের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে তাহাদের সহায়তায় তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে না। লাল সৈন্যদল সংগঠনের পর সংপ্রতি তাহার যে একবিংশতি

বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, সেই উৎসব উপলক্ষে সৈন্যগণকে যে শপথ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেই শপথের ভাবারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই মর্ম্মে শপথ গ্রহণ করিতে হইত যে, তাহারা পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিবে, কিন্তু এখন তাহাদিগকে শপথ করিয়া বলিতে হইতেছে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাহারা জীবনোৎসর্গ করিবে।

এতদ্ভিন্ন সোভিয়েট সরকারের নৌ-বিভাগের ভাইস কমিশার (Naval Vice commissar) এডমিরাল আইভ্যান ষ্টিপানোভিচ ইসাকফ্, আমেরিকার জাহাজনির্ম্মাণের বন্দরে রুশিয়ার জন্য রণতরী ও যুদ্ধজাহাজসমূহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছেন।

রুশিয়ার সমর বিভাগের কমিশনার ক্লেমেণ্ট এফ্রিমোভিচ্ ভোরোসিলফ্, ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন, সেই যুদ্ধে প্রথমে গ্যাস ব্যবহার করা হইবে, গ্যাসের যুদ্ধ শেষ হইলে বিজ্ঞান-সম্মত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ চলিবে। এই জন্য তাঁহাকে ইহাও ঘোষণা করিতে হইয়াছে যে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশে যে 'Military Academy for Chemical Warfare' প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়াছে, এখন তাহার আকার তিন গুণ বর্দ্ধিত করা হইবে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রুশিয়ার সকল প্রদেশের রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিকগণকে অবিলম্বে যোগদান করিতে হইবে।

এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রুশিয়ার সামরিক কর্ম্মচারিগণকে কেবল গ্যাসের ব্যবহার সম্বন্ধেই সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। শিক্ষালাভের পর তাঁহারা সীমান্তে আসিয়া এক দল রসায়ন-বিদ্যাবিৎ কর্ম্মচারীর সহায়তায় যুদ্ধের যোগাড়যন্ত্র করিবেন। ভূগর্ভে তাঁহাদের যে আড্ডা স্থাপিত হইবে, তাহা সাধারণতঃ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের আদর্শে নির্ম্মিত হইবে। তাঁহারা গ্যাসের মেঘ সৃষ্টি করিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে সীমান্ত-ভূমি রক্ষা করিবেন।

রুশিয়ার সামরিক কর্ম্মচারিগণ রাসায়নিক গ্যাসের সাহায্যে যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধের মহলা দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, সোভিয়েট গ্যাসনিবারক মুখোস পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং গ্যাসের যুদ্ধে তাঁহারা সকল পরাক্রান্ত শত্রুবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

সোভিয়েট সরকারের যুদ্ধের এই আয়োজন একালে সম্পূর্ণ নূতন এবং অব্যর্থ, ইহাই তাঁহাদিগের ধারণা। তাঁহাদের তিন শত্রু—জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান একযোগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিলে তাঁহাদের উদ্ভাবিত নূতন রণ-কৌশলের পরীক্ষা হইবে না।

মান্‌চুকুয়োর সম্রাটের ভবিষ্যৎ

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান বহু দিনের চেষ্টায় চীন সাম্রাজ্যের একটি প্রধান অংশ আত্মসাৎ করিয়া তাহার মান্‌চুকুয়ো নাম প্রদানের পর এই নব-গঠিত রাজ্যের শাসনভার প্রদানের জন্য এক জন সাক্ষি-গোপাল সম্রাটের অনুসন্ধান করিতেছিল; বিস্তর অনুসন্ধানের পর একটি চশমাধারী কৃশ যুবককে জাপান সম্রাট্ হিরোহিটোর অধীনে মান্‌চুকুয়োর সম্রাটের পদে নিযুক্ত করিয়াছিল।

এই যুবকের নাম পিউ-আই। (Pu-Yi) ইনি চীন সাম্রাজ্যের মাঞ্চু-রাজবংশের শেষ বংশধর। পিউ-আই তাঁহার উত্তরাধিকারের দাবীতে চীন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলে চীনের নব-গঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকার দুইবার তাঁহাকে চীন সাম্রাজ্যের সিংহাসন হইতে পদাঘাতে বিতাড়িত করেন। এই ভাবে বিতাড়িত হইয়া তিনি জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া কোন অজ্ঞাত পল্লীভবনে নির্লিপ্তভাবে কালযাপন করিতেছিলেন। সেই অবস্থায় জাপান সরকার তাঁহাকে সেই পল্লীভবন হইতে আবিষ্কার করিয়া মাঞ্চুকুয়োর সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। জাপান ঘোষণা করিল, চীনের রাজবংশ হইতেই মাঞ্চুকুয়োর সম্রাট্ নির্ব্বাচন করা হইল, জাপানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠা ও নির্লোভিতার পরিচয় আর কি থাকিতে পারে? পিউ-আই মাঞ্চুকুয়োর সম্রাটের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার নাম হইল সম্রাট্ ক্যাং-তে। (Kang-Teh)

মাঞ্চুকুয়ো-সম্রাট্

পিউ-আই মাঞ্চুকুয়োর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার রাজ্যকালের পঞ্চ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জাপান গত মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থির করিয়াছিল—জাপান সমগ্র চীন জয় করিয়া যে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তাহা মাঞ্চুকুয়ো সাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইবে, এবং মাঞ্চুকুয়ো সম্রাট্ ক্যাং-তে এই সম্মিলিত সাম্রাজ্যের সম্রাট্ বলিয়া বিঘোষিত হইবেন। এই ব্যবস্থায় জাপান পিকিন, নানকিং এবং সাংঘাই সরকারকে অভিন্ন শাসনশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলে চীন সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইবে।

পিউ-আইএর বয়স এখন ৩৩ বৎসর। তিনি তিন বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃব্য চীন-সম্রাট্ কুয়াং লুই-পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বালক সম্রাট্ মিঃ পিউ-আই নামেই পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সুশিক্ষার ভার সার রেজিনাল্ড জনষ্টন নামক ইংরেজ শিক্ষকের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির পর তিনি তাঁহার ইংরেজ শিক্ষকের নিকট একটি ইংরেজী নামের জন্য সুপারিশ করিলে সার রেজিনাল্ড তাঁহাকে হেনরী নাম প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বয়স যখন ১৭ বৎসর, সেই সময় চীনের সেনাপতি চাং সুন চীনের সম্রাট

বলিয়া আপনাকে বিজ্ঞাপিত করায় পিউ-আইকে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দুই সপ্তাহ মধ্যে এই ভূঁইফোড় সম্রাটের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অতঃপর পিউ-আই তাঁহার পাঠাগারে প্রত্যাগমন করেন।

জাপানীরা যখন মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করিয়া হেনরী পিউ-আইকে সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন হইতেই তাহারা অবশিষ্ট চীনের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, এবং সঙ্কল্প করিয়াছিল, চীন জয় করিয়া তাহারা পিউ-আইকে সমগ্র চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিবে, এবং ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

জাপানী-রাজদূত জেনারেল হিসিকারী প্রতি মাসে তিনবার সম্রাট ক্যাংতের সিংকিং প্রাসাদে গমন করিয়া সম্রাটের সহিত পররাষ্ট্র-নীতির আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটকে মাঞ্চুকুয়োর শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতে হয় না। তিনি প্রত্যহ দীর্ঘকাল পুরাতন ইংরেজী সংবাদপত্র পাঠ করেন, অবসরকালে টেনিস্ ও বিলিয়ার্ড ক্রীড়ায় আনন্দ উপভোগ করেন, এবং প্রতি রবিবার প্রভাতে দরবার উপলক্ষে রাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনায় রত থাকেন, এবং সায়ংকালে গুলীর আঘাতে অটুট 'কারে' থিয়েটারে গমন করেন। তিনি পিঞ্জরের বিহঙ্গের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও সুখী।

সম্রাট হেনরী পিউ-আই জীবনে দুইবার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; একবার তিনি কুসংস্কারের নিদর্শন দীর্ঘ শিখা নির্ম্মূল করিয়া য়ুরোপীয় নাপিতের সাহায্যে কেশের পরিপাট্যবিধান করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়বার জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও চশমা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসী অমাত্যগণ বলিয়াছিল, চশমা ধারণে সম্রাটের সম্মান নষ্ট হয়; কিন্তু চশমা ভিন্ন তিনি এক ইঞ্চি দূরের বস্তুও দেখিতে পান না।

সনেট

এত দিন ছিলে তুমি মোর কল্পনাতে
গোপন মানস-লোকে! কনক-প্রভাতে
প্রথম বসন্তবায়ু এল কক্ষদ্বারে,
হৃদয়-নিকুঞ্জে মোর আনন্দ-সম্ভারে
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিল প্রসূন। অন্ধকার
উৎস 'পরে সুকোমল প্রশান্ত উদার
ফুটিয়া উঠিলে তুমি জ্যোতিঃ পদ্মসম
আদিম উষায় যেন।
স্নিগ্ধ নিরুপম
বিদায়বিষণ্ণ এই গোধূলি আলোতে
আজ তুমি এলে নামি' কল্পলোক হ'তে!
সুদূর রহস্য তবু রয়েছে ঘেরিয়া
প্রতি অঙ্গ তব। ভরিয়া উঠিছে হিয়া
চাহি' তোমা পানে। তোমার মাঝারে বুঝি
মৃত্তিকা আকাশ আজি পাইয়াছে খুঁজি'!

গোধূলির আলো কাল পড়েছিল মুখে,
এস আজ রূঢ় দিবালোকে! সুখে দুখে
তোমারে চিনিয়া লব সংসারের মাঝে
আশায় নৈরাশ্যে গাঁথা যেথা নিত্য রাজে
ক্ষুধিত হৃদয় শত। মায়ার কাজল
মুছে ফেল আঁখি হ'তে তব সুনির্ম্মল
তোমার আনন হ'তে খুলে দাও আজি
লজ্জা আবরণ। কল্পনা-কুসুমরাজি
চয়ন করিয়া আমি সৃজিনু যাহারে
সে আজি ভাসিয়া যাক বিস্মৃতির পারে।
তুমি যাহা শুধু তাই লব আজ হেরি',
দুরন্ত বাস্তব শুধু রবে তোমা ঘেরি'
সুনীল মরণ সম। মোহমুক্ত প্রাণ
মাটীর মাঝারে মাটী করুক সন্ধান!

হায় রে দুরাশা, মাটী—তার অন্তস্তলে
স্নিগ্ধ-মন্দাকিনীধারা বহে! ফুলে ফলে
ভরে বক্ষ তার। নিছক বাস্তব সেও
কল্পনার লীলা। মূঢ় মন, কি যে শ্রেয়
কে পারে বুঝিতে? কে পারে চিনিতে কহ
স্বরূপ তোমার? শুধু জাগে অহরহ
চিনিবার সুতীব্র বাসনা। দিবালোকে
স্বপ্নের মাধুরী তব লেগে থাকে চোখে,
বাস্তবের মরুভূমে জাগে শ্যামলতা,
বহে ফল্গু—বালুকার ব্যগ্র ব্যাকুলতা!

চিরন্তন এ মিলন কল্পনা-বাস্তবে,
আলো ও ছায়ার খেলা এ নিখিল ভবে
চলিতেছে যুগে যুগে। ছায়া পরিহরি'
কেমনে তোমার আলো পশিবে সুন্দরী?

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ইণ্ডো-বৃটিশ বাণিজ্যচুক্তি

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট প্রসিদ্ধ অটোয়া চুক্তি হইয়াছিল। এই চুক্তি ভারতবাসীর মনঃপূত হয় নাই। এই চুক্তিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের সহিতও পরস্পর বাণিজ্যের সর্ত্ত করা হইয়াছিল। কেবল ভারত নহে,—অধিকাংশ বৃটিশ উপনিবেশও ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিল। ভারতবাসীরা পক্ষপাতমূলক শুল্কপ্রবর্ত্তন-ব্যবস্থার চিরকালই বিরোধী। ফিস্‌ক্যাল কমিশনও (Kiscal Commission) এই চুক্তির সমর্থন করেন নাই। লর্ড কর্জ্জনের আমলের ভারত সরকারও ইহা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। এই অটোয়া চুক্তি বিধিবদ্ধ করিবার সময় ভারতের পক্ষ হইতে যাঁহারা ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ভারতের জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন নাই বা জনমতের সহিত পরিচিত ছিলেন না। যাহা হউক, এই চুক্তির মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকার বলিয়াছিলেন যে, যতদিন অটোয়া চুক্তির অনুরূপ একটা চুক্তি ভারতবর্ষের সহিত বৃটেনের না হয়, ততদিন ভারতের সহিত অটোয়ার চুক্তি মত কায হইতে থাকিবে। এ বিষয়ে দেশের লোকের কোন মতই লওয়া হয় নাই। বলা বাহুল্য, তাহার পর আজ প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া বৃটিশ বণিক্‌দিগের সহিত ভারতবাসীদিগের একটা চুক্তি করিবার জন্য চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননবর সার জাফরউল্লা খাঁ ও তাঁহার ভারতীয় পরামর্শদাতারা কতবার বিলাত আর ঘর করিলেন,—লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগের প্রতিনিধিরাও কিছুদিন শীতল সমীর-সেবিত শিমলা-শিখরে আসিয়া কাটাইয়া গেলেন,—কিন্তু উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ইণ্ডো-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তির কোন সর্ত্তই সাব্যস্ত হয় নাই। ম্যাঞ্চেষ্টার ভারতে অধিক পরিমাণে কাপড় বেচিতে চাহে। ভারতবাসীরা তত বিলাতী কাপড়ের বোঝা বহিতে চাহেন না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ঠেলাঠেলি চলিয়া আসিতেছিল। ইহার পর প্রকাশ পাইল যে, ভারত সরকারের সহিত বৃটিশ সরকারের ইণ্ডো-বৃটিশ বাণিজ্যচুক্তি হইয়া গিয়াছে। ৭ই চৈত্র উহার কতকগুলি সর্ত্ত ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই চুক্তির ১৬ দফা সর্ত্তের সারমর্ম্ম দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। চুক্তির সমস্ত সর্ত্ত কিছু পূর্ব্বে প্রকাশ করিলে এ বিষয়ে জনসাধারণের ভাবিয়া দেখিবার সুবিধা হইত। যাহা হউক, কার্পাস-বস্ত্র-সম্পর্কিত সর্ত্তগুলিই উহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সেই সর্ত্তগুলি এইরূপ। ভারতবর্ষকে চলতি বৎসরে (আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত) বিলাত হইতে আমদানী ৩৫ কোটি গজ কাপড় কিনিতেই হইবে। কিন্তু মোটের উপর ভারতবাসীকে বৎসরে অন্ততঃ সাড়ে ৪২ কোটি গজ বিলাতী কাপড় ক্রয় করিতেই হইবে। তবে আপাততঃ গ্রেটবৃটেন হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর যে মূল্য-শতকরা ২০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য আছে বা ছিল, তাহা কোরা কাপড়ের উপর মূল্য-শতকরা ৫ টাকা হারে এবং ছাপা কাপড়ের উপর মূল্য-শতকরা আড়াই টাকা হারে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ এখন হইতে বিলাতী কোরা কাপড় প্রভৃতি মূল্য-শতকরা ১৫ টাকা হারে আমদানী-শুল্ক দিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবে। কেবল ছাপা কাপড়ের মূল্যের উপর শতকরা সাড়ে ১৭ টাকা হারে শুল্ক দিতে হইবে। আমদানী বিলাতী কাপড়ের পরিমাণ ৩৫ কোটি গজ পর্য্যন্ত না হইলে ঐ আমদানী-শুল্কের পরিমাণ আরও শতকরা আড়াই টাকা হারে কমাইয়া দেওয়া হইবে। তবে যদি কোন বৎসরে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী ৫০ কোটি গজের উপর উঠে, তাহা হইলে বিলাতী কার্পাসপণ্যের উপর লঘূকৃত আমদানী-শুল্ক আবার বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আবার যদি উহা সাড়ে ৪২ কোটি গজের নীচে নামিয়া আসে, তাহা হইলে আবার ঐ আমদানী-শুল্ক কমান হইবে।

পক্ষান্তরে গ্রেটবৃটেনকে চলতি ইংরেজী বৎসরে ৫ লক্ষ গাঁইট ভারতীয় কার্পাসতুলা লইতে হইবে। উহার পর-বৎসর সাড়ে ৫ লক্ষ গাঁইট, তাহার পর প্রতি বৎসর ৬ লক্ষ গাঁইট করিয়া কার্পাসতুলা ভারত হইতে লইতে হইবে।

যদি চলতি বৎসরে লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিরা ৪ লক্ষ গাঁইটের কম ভারতীয় কার্পাসতুলা কেনে এবং ইহার পরবর্ত্তী বৎসর সাড়ে ৪ লক্ষ গাঁইটের কম তুলা ভারত হইতে খরিদ করে, তাহা হইলে এই শুল্ক আবার বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। কিন্তু লাঙ্কাশায়ারের কলওয়ালারা যে ভারত হইতে ভবিষ্যতে অধিক কার্পাসতুলা লইবে, এমন কোন ব্যবস্থাই এই চুক্তিতে নাই। সুতরাং উহার জন্য ভারতবাসীদিগের যে কোন লাভ হইল, তাহা মনে করা যাইতে পারে না।

ভারতবাসীরা গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে ৩৫ কোটি গজ, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৮ কোটি ৯০ লক্ষ গজ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৩ কোটি গজ বিলাতী বস্ত্র আমদানী করিয়াছিল। তাহার পর এই চুক্তি অনুসারে সাব্যস্ত করা হইল যে, ভারতবাসীকে অতঃপর প্রায় সাড়ে ৪২ কোটি গজ বিলাতী কাপড় আমদানী করিতে হইবে। অর্থাৎ বিলাতী বস্ত্রের আমদানী প্রায় দ্বিগুণ করিতে হইবে। স্বদেশী শিল্পকে এরূপভাবে পঙ্গু করা যে ঘোর অবিচারের কার্য্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে বিলাতী তাঁতিরা ভারতের নিকট হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার গাঁইট, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫ লক্ষ ৩২ হাজার গাঁইট এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার গাঁইট তুলা কিনিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে ভারতের নিকট হইতে ৪ লক্ষ অথবা সাড়ে ৪ লক্ষ গাঁইট কার্পাস কিনিতে বাধ্য থাকিবেন, এরূপ চুক্তির ফলে বিলাতী তাঁতিরা ভারতকে বিন্দুমাত্রও অনুগ্রহ বা আনুকূল্য করিলেন না। বরং এই চুক্তি লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। বিলাতী তাঁতিরা যে স্থলে সাড়ে ৫ লক্ষ অথবা ৬ লক্ষ গাঁইট কার্পাসতুলা কিনিয়া আসিতেছিল, সে স্থলে ৪ লক্ষ সাড়ে ৪ লক্ষ গাঁইট কিনিতে পারিবে এই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াতে ভারতবাসীদিগের স্বার্থ রক্ষা করিবার মনোভাব কতদূর প্রকাশ পাইল, তাহা সকলে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

কেবল তাহাই নহে, ভারতে বিলাত হইতে আমদানী বস্ত্রের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য ছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উহা শতকরা ৫ টাকা হারে কমাইয়া দেওয়া হয়, আবার এখন শুল্ক অকারণে শতকরা ৫ টাকা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল! কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নহে। যদি ভারত সাড়ে ২৬ কোটি গজের স্থানে ৩৫ কোটি গজ বিলাতী কাপড় আমদানী করিতে না পারে, তাহা হইলে ইহা হইতে আরও আড়াই টাকা হারে বিলাতী বস্ত্রের উপর আমদানী-শুল্ক কমাইয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই বৎসরের মধ্যেই প্রায় ২০ কোটি গজ কাপড় বিলাত হইতে অধিক আমদানী করিতেই হইবে। তাহা অসম্ভব। কারণ, ভারতের বস্ত্রব্যবসায়িগণের গুদামে এখন অনেক বিলাতী বস্ত্র মজুদ রহিয়াছে। সুতরাং এই কৌশলে বিলাতী বস্ত্রের উপর ধার্য্য আমদানী শুল্ক আরও শতকরা আড়াই টাকা হারে কমাইয়া দিবার নিশ্চিত ব্যবস্থাই করা রহিল। অর্থাৎ বিলাতী বস্ত্রের উপর যে রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা এইবার উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে শতকরা সাড়ে ১২ টাকা হারে রাজস্ব-শুল্ক মাত্র ধার্য্যের ব্যবস্থাই করা হইল। অটোয়া কমিটীর রিপোর্টে সার আবদুর রহিম, মিষ্টার সীতারাম রাজু এবং দেওয়ান বাহাদুর রায় হরবিলাস সর্দ্দা যে সংখ্যাল্প সদস্যের স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন,—তাহাতেও তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, পক্ষপাতমূলক শুল্কের (Preferential Tariff) ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। লর্ড কর্জ্জনের আমলে ভারত সরকার এবং পরে ফিস্‌ক্যাল কমিশন উহা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগের স্বার্থরক্ষার্থ ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের সহিত এইরূপ পক্ষপাতমূলক শুল্ক ধার্য্য করিলেন। আর্থিক ব্যাপারে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভের উহা অপূর্ব্ব নমুনা!

১৩ই চৈত্র ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব সার মহম্মদ জাফরুল্লা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই অসঙ্গত চুক্তির প্রস্তাবটি গ্রাহ্য করাইয়া লইবার জন্য উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সুষ্ঠু বলিয়া কেহ মনে করেন নাই। যাহা ন্যায়তঃ সমর্থন করা অসম্ভব, তাহা সমর্থন করিতে হইলে বক্তৃতা যেরূপ হয়, তাঁহার বক্তৃতা সেইরূপই হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর হইতে ভারতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী কমিয়া আসিতেছে আর ভারতীয় তুলার বিলাতে রপ্তানী বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব লাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদিগের প্রস্তুত বস্ত্র ভারতে আমদানী করিবার জন্য সাহায্য করা আবশ্যক। আমরা এ কথার সার্থকতা

স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে যে ভীষণ বেকার-সমস্যা ও অন্ন-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অগ্রে দূর না করিয়া আমরা বৃটেনের বেকার-সমস্যার কথা ভাবিতে পারি না। অতএব বৃটিশ বেকার-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আমাদের চিন্তা করিবার অবসর এখন নাই। বিলাতী তাঁতিরা ইচ্ছা করিয়া ভারতীয় তুলা কেনে না, ভারতে তুলা শস্তা বলিয়াই কিনে।

বাণিজ্য-সচিবের এই প্রস্তাবের তিনটি সংশোধন প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল—

(১) শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব করেন,—ব্যবস্থা পরিষদের আগামী শিমলা অধিবেশন পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রাখা হউক। ইতোমধ্যে ঐ চুক্তির প্রস্তাব-ফলে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের উপর ইহার ফল কিরূপ হইবে, তাহার বিষয় একটি কমিটীর দ্বারাই অনুসন্ধান করা উচিত।

(২) মিষ্টার এইকম্যানের প্রস্তাব অখিল বাবুর প্রস্তাবের অনুরূপ। কেবল কমিটীর গঠন সম্বন্ধে একটু পার্থক্য ছিল।

(৩) সর্দ্দার শান্ত সিংহ প্রস্তাব করেন যে,—বিলাতী তাঁতিরা চলতি বৎসরে সাড়ে ৬ লক্ষ গাঁইট এবং তাহার পর তিন বৎসরের মধ্যে ১০ লক্ষ গাঁইট কার্পাসতুলা ভারত হইতে লইবেন এবং তন্মধ্যে লম্বা এবং ছোট আঁশওয়ালা তুলার পরিমাণ যথাক্রমে ৩০ এবং ৭০ অংশ হওয়া চাই।" মূল প্রস্তাবে এই ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ব্যবস্থা পরিষদে এই প্রস্তাব লইয়া তুমুল বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। শেষে উক্ত পরিষদ ৫৭—ভোটে বাণিজ্য-সচিবের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মোস্লেম লীগের দল কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। য়ুরোপীয় এবং সরকারের মনোনীত সদস্যরা সরকারের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ৪৭টি; সুতরাং ২৮শে মার্চ্চ ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভোটে ইঙ্গো-বৃটিশ বাণিজ্য-চুক্তি অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অধিকাংশ লোকই এই চুক্তি চাহেন নাই। স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, দেশের জনমত যাঁহারা প্রতিবিম্বিত করেন, তাঁহারা কেহই এই চুক্তিতে সম্মতি দেন নাই। কেন্দ্রী পরিষদে এই চুক্তি অগ্রাহ্য হইবার পর বড় লাট স্বৈর ক্ষমতা প্রয়োগ না করিলেও ৩০শে মার্চ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদে অধিকাংশ ভোটে উহা গৃহীত হইয়াছে। ৩১শে মার্চ্চ অটোয়া চুক্তির অবসানে ১লা এপ্রিল হইতে এই চুক্তি অনুসারে কায হইবার কথা। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, "এখন ভারতে আমদানী বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য্যের যে ব্যবস্থা হইল, তাহা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পরক্ষার্থ পরিকল্পিত নহে, তাহা ভারতে বিলাতী বস্ত্র-বাণিজ্যের রক্ষা-শুল্ক বলিয়াই যেন পরিকল্পিত।

রাজস্ব বিল

ভারত সরকারের রাজস্ব বিল বড় লাটের সার্টিফিকেট দ্বারা গৃহীত হইল। এই বিলখানির আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সদস্যই অনেক আবশ্যক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। লবণের কর মণকরা ১।০ স্থলে ১ টাকা করিবার জন্য শ্রীযুত অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি রাজস্ব বিলের প্রতিবাদকল্পে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই। লবণের ব্যাপারে সারচার্জ্জ আইন বহাল রাখিবার প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। সারচার্জ্জ জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে প্রবর্ত্তিত করা হয়। জরুরী অবস্থা এখন আর নাই, তথাপি দরিদ্র কৃষিজীবীদিগের প্রতিবাদ এবং আপত্তি উপেক্ষা করিয়াই রাজস্ব সচিব নিমকের উপর সারচার্জ্জ বহাল রাখিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত লালচাঁদ নবলরাই সংশোধন প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন যে, ভারত-সচিব পাঁচ বৎসরকাল ভারতের নিমক খাইয়াও তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন না। শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ বলেন যে, লবণের ব্যাপারটা একটা স্থায়ী ক্ষতে পরিণত হইয়াছে। সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার হাসিয়া বলেন, ক্ষতের উপর আর লবণ নিক্ষেপ করিবেন না। শ্রীপ্রকাশ আরও বলেন যে, সরকার লবণাম্বুবেষ্টিত ভারতের দীন অধিবাসী-দিগকে নিত্য প্রয়োজনীয় লবণের ব্যবহার বিষয়ে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। এই দিন লবণের কর মণকরা ৪ আনা হ্রাস করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হয়।

এই সময় মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি বড়লাট কর্তৃক সার্টিফিকেট করিয়া রাজস্ব বিল পাশ করিবার নীতির তীব্র প্রতিবাদ

করিয়াছিলেন। সার জেমসের এই সংশোধক প্রস্তাবটি ৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মুসলেম লীগের সদস্যগণ এবং অন্য ৪ জন সদস্য এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন পক্ষেই ভোট দেন নাই। পোষ্টকার্ডের মূল্য তিন পয়সার স্থানে দুই পয়সা করিবার প্রস্তাবও ব্যবস্থা পরিষদে গ্রাহ্য হইয়াছিল। কার্পাস-শুল্ক দ্বিগুণ করিবার প্রস্তাবটি বর্জ্জন করিবার জন্য সার হোমি মোদী এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, কাঁচামালের উপর এই ভাবে কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব যুক্তিবিরুদ্ধ। ইনি আরও বলেন যে, ফিস্‌ক্যাল কমিশন কাঁচা মালের উপর শুল্ক ধার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও তিনি কাঁচা মাল তুলার উপর ধার্য্য-শুল্ক দ্বিগুণ করিলেন কেন? ইহাতে তাঁহার অর্থ-কমিশনের সুপারিশের উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। বক্তা আরও বলেন যে, রাজস্ব বিলের ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, উহার জন্য সূতা এবং কাপড়ের উপর যে রক্ষা-ব্যবস্থা আছে, তাহা বৃথা হইয়া যাইবে। রীতিমত তদন্ত করিয়াই এই রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, সুতরাং রাজস্ব সচিব উহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। মিষ্টার এফ, ই, জেম্‌স্ বলেন যে, তিনি শুল্ক নির্দ্ধারণ সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ সদস্যদিগের মতের সমর্থন করেন না। তিনি আমদানী কার্পাসতুলার উপর ধার্য্য শুল্ক দ্বিগুণিত করিবার প্রস্তাবটি বর্জ্জন করিবার মতেরই সমর্থন করেন। কৃষকদিগের দিক্ দিয়াই বিচার করা হউক, অথবা বস্ত্রশিল্পের দিক্ দিয়াই বিচার করিয়া দেখা হউক, কিম্বা এ দেশে ঐ কাঁচা মালের আংশিক অভাবের দিক্ দিয়াই ভাবিয়া দেখা হউক, কোন দিক্ দিয়াই কাঁচা মালের উপর শুল্ক ধার্য্য করা সমর্থনীয় হইতে পারে না। মিষ্টার চ্যাপমান মর্টিমার শ্বেতাঙ্গ সদস্যদিগের মামুলী অসার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াই সার হোমীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। মিষ্টার মনু সুবেদার সার হোমী মোদির উক্তিই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। সার হোমী মোদির প্রস্তাবও ব্যবস্থা পরিষদে গ্রাহ্য হয়।

১১ই চৈত্র, অর্থ-সচিব সার জেম্‌স গ্রীগের ব্যবহারে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি রেল বজেটের শেষ দফার দাবী সম্পর্কে ভোট গণনার সময় শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির সম্বন্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করিয়াছিলেন। মিষ্টার এনে এই অশিষ্ট উক্তির প্রতিবাদ জন্য প্রেসিডেন্টের নির্দ্দেশ চাহিলে তিনি বলেন যে, তিনি যখন ঐ উক্তিটি স্বয়ং শুনেন নাই, তখন তিনি ঐ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না। তবে কাহারও পক্ষে কোন গ্লানিকর বা অভদ্র উক্তি করা উচিত নহে। বিরোধী দলের কেহ কেহ রাজস্ব সচিবকে এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আসনে অটলভাবে বসিয়া থাকেন। ইহাতে সদস্যদিগের মধ্যে ঘোর উত্তেজনা সঞ্চার হয়। পরিষদে রাজস্ব-সচিবের প্রস্তাব একে একে অগ্রাহ্য হইতে থাকে। শেষটা রাজস্ব-সচিব মিষ্টার সত্যমূর্ত্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বৈঠক-শেষে মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি সহাস্যবদনে রাজস্ব-সচিবের সহিত করমর্দ্দন করিলে পরিষদ-গৃহ উল্লাসমুখরিত হইয়াছিল। অতঃপর রাজস্ব বিল ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়, সে জন্য উহা বড়লাটের নিকট ফেরত পাঠান হয়। বড়লাট ঐ বিলখানি যে আকারে উপস্থিত করা হইয়াছিল, সেই আকারেই উহা গ্রাহ্য করিয়া লইবার জন্য সুপারিশ করিয়া পাঠান। ফলে লবণ-কর হার প্রতি মণ এক টাকা ৪ আনা বহাল রাখিবার জন্য রাজস্ব-সচিব এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ঐ সম্বন্ধে পরিষদের ভোট সমস্ত বিল সম্বন্ধে ভোট বলিয়া গণ্য হইবে ধার্য্য হয়। এই প্রস্তাবটির পক্ষে ৪২টি এবং বিপক্ষে ৫০টি ভোট হওয়াতে বিলখানি আবার পরিত্যক্ত হইয়াছিল। রেলওয়ে বজেটের সম্বন্ধে একটি অতিরিক্ত দাবীও ৬২টি ভোটে অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৪ই চৈত্র কাউন্সিল অব্ ষ্টেট ২৭টি ভোটে বড়লাট কর্ত্তৃক সার্টিফিকেট করিয়া প্রেরিত এই বিলখানি গ্রাহ্য করিয়া লয়েন। প্রতিপক্ষদলের নেতা রামদাস পাণ্টালু এই প্রকার সুপারিশ করিয়া রাজস্ব বিল পাশ করাইয়া লইবার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আজ পাঁচ বৎসর কাল উপর্য্যুপরি সার্টিফাই করিয়া রাজস্ব বিল গ্রহণ করার দ্বারাই কর্ত্তৃপক্ষ এ দেশের জনমত কতটা গ্রাহ্য করেন এবং গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে এদেশ কতটা শাসিত হইতেছে, তাহা বেশ সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে।

কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের সরকারী নিমন্ত্রণ রক্ষা

কংগ্রেস এখনও কাগজে-কলমে অসহযোগ নীতি পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসকর্ম্মীরা অসহযোগ নীতির অন্তর্জ্জলি করিতেছেন। কংগ্রেসের একমাত্র মুখপাত্র মহাত্মাজী ত বিনা নিমন্ত্রণেও লাট-ভবনে যাতায়াত করিতেছেন। গান্ধীজীর অনুগত ভক্তবৃন্দও লাট-বেলাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণে কুণ্ঠাশূন্য। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বলিতেছেন, ঐ প্রকার সরকারী খানা-পিনায় যোগদান সম্বন্ধে কংগ্রেসকর্ম্মীদিগের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হয় নাই। কিন্তু গত ৩০শে মার্চ্চের বড়লাটের দরবারের সার্কুলারে প্রকাশ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু অন্যান্য নিমন্ত্রিতের সহিত বড়লাটের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপরিষদের অন্যতম কংগ্রেস-নায়ক শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেলে মিষ্টার এফ ই জেমসের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসকর্ম্মীরা আর এখন ঐ নিষেধাজ্ঞা মানিতেছেন না। যিনি কংগ্রেসের একমাত্র কর্ণধার বলিয়া বিঘোষিত, সেই মহাত্মাজীই যখন হামেশা লাট-বেলাটের বাড়ী ছুটিতেছেন, তাঁহাদের সহযোগিতা ও সহকারিত্ব সাদরে গ্রহণ করিতেছেন, তখন কি বুঝিতে হইবে না যে, ঐ অসহযোগ নীতি ব্যর্থ বলিয়াই কার্য্যতঃ উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে,—কিন্তু বোধ হয়, সে কথা চক্ষুলজ্জার অনুরোধে কাগজে-কলমে স্বীকৃত হইতেছে না।

হিন্দুর কর্ত্তব্য

শ্রীযুত বিনায়ক সাভারকর এখন নিখিল ভারতীয় হিন্দু-সভার সভাপতি। ১১ই চৈত্র হইতে ৩ দিন তিনি মুঙ্গেরে বিহার প্রাদেশিক হিন্দুসভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "হিন্দুদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা করিবার চেষ্টা যে জাতীয়তার বিরোধী এবং লজ্জাজনক, এরূপ চিন্তা যেন হিন্দুরা মনেও স্থান না দেন। তাঁহার বিশ্বাস এই যে, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ই হউন, আর সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ই হউন, সকল সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ যুক্তিসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষা করিয়া চলা উচিত। এই ভাবের জাতীয়তার সহিত হিন্দুদিগের সংস্কৃতিগত, রাজনীতিগত এবং সমাজগত স্বার্থরক্ষা ব্যবস্থায় কোন বিরোধ নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "যদি কেহ এমন কথা বলে যে, ভারতে জাতীয়তা শব্দের অর্থই এই যে, হিন্দুদিগের ক্রমাগতই অবনয়ন, মুসলমানগণের চীৎকারে হিন্দুর অবিরত অধিকার ত্যাগ, তাহা হইলে হিন্দুদিগের সে প্রকার জাতীয়তাকে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ইহা কেবল হিন্দুবিরোধী নহে, উহা আসল জাতীয়তারও বিরোধী" ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত সাভারকর যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

শ্রীযুত বিনায়ক সাভারকর

তিনি আরও বলিয়াছেন, হিন্দুরা উনজন সম্প্রদায়ের সহিত ঠিক তুল্যমূল্যভাবে ব্যবহার করিতে সম্মত; কিন্তু তাঁহারা সংখ্যাধিক বলিয়া অন্যকে ক্রমাগত অধিকার ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহেন। মুঙ্গেরে হিন্দুসভার অধিবেশনে বহু জন-সমাগম ও বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্রযূথসহ বিপুল শোভাযাত্রার আড়ম্বরে হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বনি, গোলাপজল ও পুষ্পবর্ষণের মধ্যে বীর সাভারকর ও ডাঃ মুঞ্জেকে রৌপ্যনির্ম্মিত তাঞ্জামে বসাইয়া সভায় লইয়া যাওয়া

হয়। সাভারকর বলিয়াছেন, অনেকে মনে করেন হিন্দু মহাসভা প্রাচীন হিন্দুদিগের কুসংস্কার পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে ; সে ধারণা ভুল। হিন্দু মহাসভা হিন্দুত্ব রক্ষা অর্থাৎ হিন্দুর সংস্কৃতি, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর ভাষা প্রভৃতি রক্ষা করিতে চাহেন। ইহা ধর্ম্মমতবাদ অপেক্ষাও ব্যাপক। কংগ্রেস মুসলমানদিগের পক্ষপাতী বলিয়াই কংগ্রেসের উপর হিন্দু মহাসভা আস্থাহীন। কংগ্রেস সরকারের নিকট হইতে মুসলমানরাই অধিক অধিকার পাইতেছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সমস্ত হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কায করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কতকগুলি বিষয়ে এত বড় একটা বিশাল দেশে মতভেদ ঘটিবেই। কিন্তু সেই বিষয়গুলি আপাততঃ বিবেচনাধীন রাখিয়া অন্য বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। নতুবা মতবিরোধ জন্য একতা স্থাপনে অসুবিধা ঘটিবেই। যে সকল বিষয়ে মতভেদ আছে, সে সকল বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বিগণকে স্বাধীন মত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াই সঙ্গত।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠনের বিলম্ব জন্য নানারূপ অনুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সে জন্য জামাডোবা হইতে ১১ই চৈত্রের বিবৃতিতে এই বিলম্বের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তিনি কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গঠন না করিয়া কংগ্রেসের অচল অবস্থা ঘটাইয়াছেন। কিন্তু যখন কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করিয়া একপক্ষকালের জন্য কংগ্রেসের সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ কোন আন্দোলন করা হয় নাই। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে মহাত্মা গান্ধীর মতানুসারেই কার্য্যকরী সমিতি গঠিত করিতে হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা কংগ্রেসের অধিকার এবং নিয়মের বহির্ভূত বলিয়াই রাষ্ট্রপতির ধারণা। আমরাও ঠিক তাহাই মনে করি। কংগ্রেসের সভাপতি এক জন সভা-শোভন ব্যক্তি নহেন যে, তাঁহার মতের কোন মূল্য নাই —অন্যের অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে তিনি পরিচালিত হইতে বাধ্য। ত্রিপুরী কংগ্রেসে ঐ প্রস্তাব গ্রহণের সময় কংগ্রেসের সদস্যবর্গ সকলেই জানিতেন যে, সুভাষ বাবু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। মহাত্মাজীও ত্রিপুরী কংগ্রেসে উপস্থিত হন নাই। পীড়িত সুভাষ বাবুর পক্ষেও তাঁহার সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করা সম্ভব ছিল না। মহাত্মাজী রাজকোট হইতে দিল্লী, এমন কি এলাহাবাদে আবুল কালাম আজাদকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে দেখিতে বা পরামর্শ করিতে জামাডোবায় আসিতে পারেন নাই। এই জন্যই কার্য্যকরী সমিতি গঠন এত দিন সম্ভবপর হয় নাই। রাষ্ট্রপতি স্পষ্টভাষাতেই বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস যদি তাঁহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত এবং বে-আইনী এই প্রস্তাবটি গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেসের নিয়ম অনুসারে ১৩ই মার্চ্চ তারিখেই কার্য্যকরী সমিতি গঠন করিতে পারিতেন।

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের পর হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উপস্থিত অবস্থায় কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ব্বক কার্য্য করা সম্ভব হইবে কি না? কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি সম্বন্ধে মহাত্মাজীর ধারণা কি, তাহা সুস্পষ্টভাবে মহাত্মাজীর নিকট হইতে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। উহাতে কেবল একমতাবলম্বী লোক থাকিবে, না, কংগ্রেসে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক আছেন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন মতের লোক উহাতে থাকিবে? যদি মহাত্মাজীর মত ইহাই হয় যে, উহাতে একমতাবলম্বী লোকই থাকিবে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির মতানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদিগের সহযোগিতা করিয়া কায করা সম্ভব হইবে কি? রাষ্ট্রপতি আরও বলিয়াছেন যে, মিষ্টার পন্থের প্রস্তাব সম্বন্ধে মহাত্মাজীর ধারণা কি, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। মহাত্মাজী যদি মনে করেন যে, উহা সুভাষ বাবুর উপর অনাস্থাসূচক, তাহা হইলে তিনি কি সে জন্য সুভাষ বাবুর পদত্যাগ ইচ্ছা করেন? কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, পন্থের প্রস্তাব কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের সহিত মহাত্মা গান্ধীর পুনর্ম্মিলনসাধক। সুভাষ বাবু প্রসঙ্গতঃ একথাও বলিয়াছেন যে, "তাঁহার পক্ষ হইতে মহাত্মাজীর

সহিত কোন বিচ্ছেদ বা কলহ ঘটে নাই।" এই সকল কারণেই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী গঠনে বিলম্ব ঘটিয়াছে। কিন্তু গয়া কংগ্রেসের পর যেমন দুই দল দুইটি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবারও সেইরূপ হইবে কি না, তাহাই সঙ্গীন সমস্যা। ২৫শে চৈত্র রাষ্ট্রপতি প্রচার করিয়াছেন যে, আগামী ১৩ই বৈশাখ নূতন কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির এবং ১৪ই বৈশাখ ত্র্যহস্পর্শের দিন হইতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হইবে। মহাত্মাজীর মনোনীত কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের নাম ৭ই বৈশাখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

এতদিন কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক না বসাতে কংগ্রেসের কার্য্যের যে অসুবিধা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সে জন্য যাঁহারা আচম্বিতে ঐ কমিটীর পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দায়িত্ব কি অধিক নহে? গত বৎসর হরিপুরা কংগ্রেসের ছয় সপ্তাহ পরে ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক বসিয়াছিল। তাহাতে তো কোন কথা হয় নাই। এবারই উহা লইয়া এত হৈ চৈ হইল কেন? মহাত্মাজী যদি ত্রিপুরী কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে পারিতেন, অথবা লাট-প্রাসাদের জরুরী কার্য্য এক দিনের জন্যও স্থগিত রাখিয়া সুভাষ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও এই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিতে অথবা কমিটীর বৈঠক বসাইতে এত বিলম্ব ঘটিত না। মহাত্মাজীর স্বাস্থ্য ভাল নহে। কিন্তু তিনি রাজকোট হইতে দিল্লী আর দিল্লী হইতে রাজকোট যাইতে পারিলেন, আর সুভাষ বাবুর সহিত দেখা করিবার জন্য দিল্লী হইতে ঝরিয়ায় আসিতে পারিলেন না! এজন্য মহাত্মাজী বোধ হয় পূর্ব্বে কোন অনুপ্রেরণা পান নাই। যাহা হউক, এখন মহাত্মাজী কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিরূপ মত এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন—তাহা জানিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন।

সামন্তরাজ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠনফলে ভারতে যে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। যাহাতে ইহার প্রসার বৃদ্ধি হয়, ইহা কোন ভারতবাসী, বা ভারতীয়দের শুভকামী ব্যক্তিই ইচ্ছা করিতে পারেন না। মিশর হইতে যাহারা ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও ইহার নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গের পর রাজকোটস্থিত মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী, মায় কতকগুলি আসন, মুসলমানদিগের জন্য সংরক্ষিত করিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সংবাদটি গত ১১ই মার্চ্চ তারিখের 'ইণ্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্ম্মার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মাজী আরও বলিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানদিগের মনে শান্তি দিবার জন্য তাঁহার ঐ কথা বলা আবশ্যক হইয়াছিল। গান্ধীজী যদি সত্য সত্যই রাজকোট রাজ্যের মুসলমানদিগকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি একটা সাংঘাতিক ভুল করেন নাই? নৈতিক ভাবে বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার বা এইরূপ ব্যবহার করিবার কোন অধিকারই নাই। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী যে ভারতবর্ষের পক্ষে অশেষ অনিষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এতদিন শুনা গিয়াছিল, কংগ্রেস ঐ সম্বন্ধে "না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতি" অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই সংবাদ যদি সত্য হয়—এবং এতদিন যখন উহার কোন প্রতিবাদ স্বয়ং গান্ধীজী বা তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য কেহ করেন নাই, তখন উহা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে—তাহা হইলে কংগ্রেসের একমাত্র মুখপাত্র গান্ধীজী তাঁহার কার্য্য দ্বারা যে ইহা মানিয়া লইলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। লণ্ডন সমিতিতে রাজন্যবর্গ কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রচলনে ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। ম্যাক্‌ডোনাল্ডী রোয়েদাদেও (যদিও উহাকে কোনমতে রোয়েদাদ বা Award বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না) উহা কেবল মাত্র বৃটিশ-শাসিত ভারতেই প্রবর্ত্তিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—নিখিল ভারতের জন্য উহা করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজী কোন্ নীতি অনুসারে অথবা যুক্তিবলে এই ঘোর অনিষ্টকর ব্যবস্থা দেশীয় রাজন্যবর্গের স্কন্ধে চাপাইতে উদ্যত হইয়াছেন? কিন্তু সামন্ত রাজাদিগকে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত করিবার অধিকার তাঁহার আছে কি? মণ্ডলেশর শক্তি যদি এই সুযোগে

রাজন্যশাসিত ভারতে উহা চালাইবার জন্য চাপ দেন তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে সম্মত না হইয়া পারিবেন না। কিন্তু যে প্রথা ঘোর অনিষ্টকর এবং অন্তর্বিবাদের কারণ বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত, সে প্রথা এক-তৃতীয়াংশ ভারতে চালাইবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ কেন হইল, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এ যেন একটা অতি দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকা। তিনি মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য এই কায করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যাঁহারা কিছুতেই তুষ্ট হইবেন না বলিয়া বদ্ধপরিকর, তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে যাওয়া কি সুধীজনসম্মত কার্য্য? তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি কেহই সমর্থন করিতে পারেন না।

সরকারী কার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা

গুণের বিচার না করিয়া কেবল সম্প্রদায় হিসাবে, সরকারী কার্য্যে লোক নিয়োগ করা যে বিশেষ দোষাবহ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে যাহাদের গুণ উপেক্ষিত হয়, কেবল সেই সম্প্রদায়েরই ক্ষতি হয় না, সরকারেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—বর্ত্তমান সময়ে, হিন্দুস্থানে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায় সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক হিসাবে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। বাঙ্গালার ব্যবস্থা-পরিষদে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদিগের জন্য ৬০টি পদ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য ২০টি এবং অবশিষ্ট ২০টি পদ উচ্চবর্ণের হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের জন্য রাখিতে হইবে। অতএব শতকরা ৫-৬টি পদ উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা পাইতে পারেন। ইহাই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালার সচিব-সঙ্ঘের অভিমত। কারণ, শতকরা ২০টি মাত্র পদ যখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বর্ণহিন্দুদিগের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে,—তখন এই বর্ণ-হিন্দুরা বর্ত্তমান শাসন-তরণীর কাণ্ডারীদিগের কিরূপ প্রেমাস্পদ, তাহা সকলেই ভাবিয়া দেখুন। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী লোকদিগকে যেরূপ ভাবে বাদ দিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশটি গঠিত হইয়াছে, তাহাতেও ত শতকরা ৬০ জন মুসলমান নাই। শিক্ষায়, কৃতিত্বে, প্রতিভায়, ব্যবসায়ে, কার্য্যসম্পাদনে, সাহিত্যে, শিল্পে কোন্ বিষয়ে মুসলমানগণ হিন্দু অপেক্ষা অধিক অগ্রসর? কিন্তু সে যুক্তি হক-মন্ত্রিমণ্ডলের বিবেচ্য নহে। যুক্তিহীন সিদ্ধান্তকারীদিগের ভোটের জোরে ঐ প্রস্তাব বাঙ্গালার ব্যবস্থাপরিষদে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রধান মন্ত্রীর একটি উক্তি তুলিয়া এই প্রস্তাবের যুক্তিহীনতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন—হক-মন্ত্রিমণ্ডলী উহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িক হিসাবে সরকারী চাকুরীদানের আমরা ঘোর বিরোধী। উহাতে নানা অনর্থ ঘটে। সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী দেওয়াই কর্ত্তব্য। মুসলমান নবাবরাও তাহাই করিতেন,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও কতকটা তাহাই করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি, গণতন্ত্রবেশধারী সাম্প্রদায়িক শাসনের আমলে অনেক অদ্ভুত কাণ্ডই সম্ভব হইতেছে!

মহাত্মাজীর উপবাসের সাফল্য

রাজকোটের মামলা মিটিলেও পালা শেষ হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর পরম ভক্ত সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই মামলায় জয়ী হইয়াছেন। ভারতীয় ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গাওয়ার ২০শে চৈত্র যে রায় দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, উভয় পক্ষের দলিলপত্র দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল যাঁহাদিগকে কমিটীর সদস্য করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন, ঠাকুর সাহেবকে তাঁহাদের মধ্য হইতেই কমিটীর সদস্য-নির্ব্বাচন করিতেই হইবে। কারণ, ইহা ঠাকুর সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ কমিটীর সদস্যদিগের নাম মনোনীত করিবেন সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং সদস্য নিয়োগ করিবেন ঠাকুর সাহেব। সর্দ্দার বল্লভভাই যাহাদিগকে সুপারিশ করিয়া ঠাকুর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, ঠাকুর সাহেব তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে পারিবেন, সর্দ্দার প্যাটেলকে তাহাদিগের বিষয় পুনর্ব্বিচার করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন, কিন্তু সর্দ্দার প্যাটেলের মনোনীত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও তিনি কমিটীর সদস্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি ইহা দেখান সম্ভব না হয় যে, সর্দ্দার প্যাটেল যাঁহাদিগকে সুপারিশ করিয়াছেন,

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজকোট রাজ্যের প্রজা অথবা কর্ম্মচারী নহেন, তাহা হইলে সর্দ্দার প্যাটেলের সুপারিশই বলবৎ হইবে। কমিটীর দশ জন সদস্যের মধ্যে এক জনকেই সভাপতি করিতে হইবে। ইহাই হইল ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের মর্ম্ম। তবে প্রসঙ্গতঃ বিচারপতি সার মরিস এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বিনা প্রমাণে যেমন গান্ধী-পক্ষ ঠাকুর সাহেবের পক্ষের উপর উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়াছেন, ঠাকুর সাহেবের পক্ষও তেমনই বিনা প্রমাণে গান্ধী-পক্ষের উপর উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়াছেন। কারণ, অসাধু উদ্দেশ্য না থাকিলেও সকল পক্ষই নিজ নিজ মত পোষণ করিতে পারেন।" অকারণে প্রতিপক্ষের উপর উদ্দেশ্যের আরোপ করা কোন পক্ষেরই সম্মানসূচক নহে। এই মন্তব্যে গান্ধী-পক্ষের এবং ঠাকুর-পক্ষের উভয় পক্ষেরই যে সম্ভ্রমহানি হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি মহাত্মা বলিয়া সম্মানিত এবং নিখিল ভারতের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা বলিয়া দাবীদার, তাঁহার পক্ষে প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্য বিশেষ ক্ষতিকর কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই মামলায় কোন্ পক্ষের জয় হইল? কাদা ত উভয় পক্ষই মাখিলেন, কিন্তু জয়মাল্য কে পাইলেন? সপ্তবিংশতি নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় যে মহাত্মা গান্ধী সদাই বহু চিকিৎসক-পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভারতের রাজনীতিক গগনে তাঁহার অমল-ধবল মাহাত্ম্য-কৌমুদী বিকীর্ণ করিতেছেন, তিনি এই সংবাদে অবিলম্বে এতই স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র তাঁহার স্বাস্থ্যের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। এই স্বাস্থ্যলাভের লক্ষণ স্পষ্টই প্রতীয়মান। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছেন যে, এই মামলায় তিনিই জয়মাল্য পাইয়াছেন। তিনি রায়প্রকাশের পরই মিষ্টার ধাবরকে রাজকোটে তারে বিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমতী সুরোজিনী নাইডু এই সংবাদে "গান্ধীজী কি জয়" রবে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুতরাং গান্ধী-পক্ষ যে মনে করিতেছেন,—তাঁহারা যোল আনা জয়লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু সত্যই কি তাহাই?

এ ক্ষেত্রে একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, এই অতি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য-সম্পর্কিত মামলার মীমাংসা ব্যাপারে অসহযোগ মন্ত্রের প্রচারক মহাত্মা গান্ধী সম্রাটের প্রতিনিধি এবং ভারতীয় শাসন-যন্ত্র পরিচালকবৃন্দের অগ্রণী লর্ড লিনলিথগোর সহযোগিতা যে সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ কোথায়? রাজকোট ব্যাপারে ঠাকুর সাহেবের অন্তরশুদ্ধির জন্য মহাত্মাজী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আত্মিক বলের তরঙ্গাভিঘাতে ঠাকুর সাহেবের অন্তরশুদ্ধি সম্ভব না হইলেও বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বিচলিত হইয়াছিলেন। বড়লাট প্রথমে মহাত্মাজীকে এই প্রাণান্তিক সঙ্কল্প পরিহারের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তিনি এই বিবাদের বিষয়টি ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গাওয়ারের হস্তে প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী আহ্লাদসহকারে সেই প্রস্তাব

৩রা মার্চ্চ প্রায়োপবেশন ব্রতের সঙ্কল্পে মহাত্মাজীর সংযম

গ্রহণ করিয়া উপবাস ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে ফেডারাল আদালতকে মান্য করিয়া লইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে একসঙ্গে দুইটি ফললাভ হইয়াছে। একটি ফল এই যে, অসহযোগ আন্দোলন যে নিজ শক্তিবলে,—অন্যের সাহায্য না লইয়া যে কোন কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারে না, তাহা তিনি জগৎসমক্ষে যেন স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। কারণ, উহা যে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্যসাধনে সমর্থ, এ দৃঢ়বিশ্বাস যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে তিনি লর্ড লিন্‌লিথগোর সাহায্য লইতেন না। দ্বিতীয়তঃ, ফেডারাল শাসনের একটা অচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য্য অঙ্গই হইতেছে ফেডারাল আদালত। কংগ্রেসের একমাত্র নায়ক মহাত্মাজী কংগ্রেসের সহিত অন্য পক্ষের বিবাদের বিষয়টিকে বিনা আপত্তিতে আগ্রহসহকারে ফেডারাল আদালতের হাতে সঁপিয়া দিতে সম্মত হইয়া উহাকে বে-ওজর মানিয়া লইয়াছেন। এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কংগ্রেস ইহার পূর্ব্বেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন স্বীকার করিয়া লইয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের অর্দ্ধাংশ মানিয়া লইয়াছিলেন। এইবার তাঁহারা এই শাসন আইনের উপর অর্দ্ধ অংশ ফেডারেশনের বিশিষ্ট-অঙ্গ স্বীকার করিয়া লইলেন। ফলে কার্য্যতঃ কংগ্রেসের আত্মাস্বরূপ মহাত্মাজী শাসন-সংস্কার আইনের ব্যবস্থিত বিধির বার আনাই এখন মানিয়া লইলেন। এখন অবশিষ্ট সিকি অংশ মানিতে কি চক্ষুলজ্জা বাধা দিবে?

এখন জিজ্ঞাস্য—এই মামলায় জয় হইল কাহার? মহাত্মাজীর ইহাতে জয় হইয়াছে বলা যায় না। কারণ, তাঁহার মূল আন্দোলন অসহযোগ যে নিজ চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তাহা তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। কিন্তু জয় হইল লর্ড লিন্‌লিথগোর এবং ভারতীয় ব্যুরোক্রেসীর। কারণ, তাঁহারা কার্য্যতঃ কংগ্রেসকে শাসন সংস্কারের সমস্ত না হউক, বার আনা মানাইতে সমর্থ হইয়াছেন। আর গান্ধীজী লর্ড লিন্‌লিথগোকে সামন্ত রাজ্যগুলির আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন।

তবে রাজকোটের এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য সামন্ত রাজ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত করিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, রাজকোটের ঠাকুর সাহেব সর্দার প্যাটেলের সহিত যেরূপ সর্ত্ত করিয়াছিলেন, অন্য কোন সামন্ত রাজা অতঃপর আর ঐরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের ক্ষমতা অন্যের হাতে দিতে সম্মত হইবেন না।

মহাত্মা গান্ধী রাজকোট গমনের পর গত ২৮শে চৈত্র নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। মহাত্মাজী ঠাকুর সাহেবকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে কমিটীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৫ জন করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু ঠাকুর সাহেব তদুত্তরে ১০ জনের অধিক সদস্য গ্রহণের প্রস্তাবে সম্মত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, মহাত্মাজী তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া বেসরকারী মুসলমান, ভায়াৎ ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মোট ৪ জন সদস্যকে কমিটীতে স্থান দিবেন। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য, কমিটীতে বল্লভভাই প্যাটেলের দলের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। এই নূতন সমস্যার মীমাংসার জন্য মহাত্মাজীর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কলিকাতার অধিবেশনে যোগদান করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

এবার ইষ্টারের ছুটীতে গত ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র কুমিল্লায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মূল সম্মিলনের পৌরোহিত্যের ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল। সাহিত্য-শাখার ভার পাইয়াছিলেন, কাজী আবদুল ওদুদ। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, দর্শন-শাখার ভার পাইয়াছিলেন, মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, ইতিহাস শাখার নেতৃত্বের ভার পড়িয়াছিল, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেনের উপর। সঙ্গীত-শাখায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রী হইয়াছিলেন।

কুমিল্লার সাহিত্য-সম্মিলনের বৈশিষ্ট্য—অধিকাংশ অধ্যাপকই মূল এবং বিভিন্ন শাখায় নির্ব্বাচিত সভাপতি হইয়াছেন। যাঁহারা অধ্যাপক শ্রেণীর নহেন, অথচ বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলিয়া সুপরিচিত, তাঁহাদিগের কেহই এই সম্মিলনে পৌরোহিত্য করিতে আহূত হন নাই। অবশ্য যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের যোগ্যতার বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু তথাপি যাঁহারা অধ্যাপক নহেন, তাঁহাদিগের কাহাকেও নির্ব্বাচিত করা অশোভন হইত না।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের অভিভাষণে ত্রিপুরার মহারাজাদিগের বঙ্গভাষার প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ অভিভাষণটির মধ্যে চিন্তা করিবার বহু বিষয় আছে।

সুনীতি বাবু বাঙ্গালা ভাষার গৌরবময় অবস্থার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালা ভাষা পাঁচ কোটির অধিক লোকের মাতৃভাষা। * * সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ জনগণের ভাষার মধ্যে, বাঙ্গালা ভাষার স্থান সপ্তম; ভাবের স্ফুরণে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাঙ্গালা ভাষা। বাঙ্গালা ভাষার গৌরব সম্বন্ধে আমরা এতটা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি যে, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার জন্য বাঙ্গালার দাবী যে আর সব ভাষার আগে, এ কথাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি।"

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে কি না, তাহার সম্বন্ধে তিনি উহা "অপ্রাসঙ্গিক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী ভাষা কবে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়া বাঙ্গালা ভাষার হানি করিবে, এইরূপ দুশ্চিন্তা কাহারও কাহারও মনে দেখা দিয়াছে বলিয়া, তিনি তাহা অমূলক ভীতিপ্রসূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজী ভাষারই পক্ষপাতী। কারণ, তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরেজীকে বাদ দিয়া অন্য কোনও ভাষাকে তাহার স্থানে বসাইতে গেলে আমাদিগের মানসিক ক্ষতি হইবে।"

রাষ্ট্রভাষা হিন্দী বা উর্দ্দু—কি হইবে, এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সুনীতি বাবু বলিয়াছেন যে, উহা বাঙ্গালীর কাছে "কতকটা দূরের বস্তু"। ভারতের সকল প্রদেশে হিন্দুস্থানী ভাষা শিখাইবার প্রচেষ্টা এখন চলিয়াছে। সুনীতিকুমার এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যাহারা স্বেচ্ছায় উহা শিখিতে চাহে তাহারা শিখুক, কিন্তু "মাদ্রাজে এই জবরদস্তী নীতি ইতিমধ্যে অনুসৃত হইতেছে।" তিনি লিখিয়াছেন, "এইরূপ জোর করিয়া অনিচ্ছুক প্রজার ঘাড়ে আর একটি ভাষা চাপানো ঘোর অত্যাচার—ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেরই বিদ্রোহ করা উচিত।"

সুনীতি বাবু আর একটা কথা বলিয়াছেন—বাঙ্গালা ভাষাকে নূতন ভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এতকাল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকগণ মিলিতভাবে মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিয়াছেন। প্রয়োজনানুসারে সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ চয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। "মুসলমান লেখকগণ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বিদেশী শব্দের আমদানী করিতেন না। বাঙ্গালা ভাষার কাঠামো বদলাইতে কেহ কখনও চেষ্টা করেন নাই। উপরের সাজস্বরূপ শব্দাবলীরও ব্যাপকভাবে পরিবর্ত্তনের চেষ্টা এতাবৎ হয় নাই।"

কিন্তু বর্ত্তমানে কতকগুলি মুসলমান লেখক এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামীয় করিতে চাহিতেছেন। সুনীতি বাবু বলিয়াছেন—

"'গুরু' বা 'শিক্ষক' স্থানে 'ওস্তাদ' 'মারা গেলেন' বা 'দেহত্যাগ করিলেন' স্থলে 'এন্তেকাল ফরমাইলেন', 'বিচার' স্থলে 'এন্সাফ', 'সেবক' স্থলে 'খাদেম', 'মানুষ' স্থলে 'এনছাম' অর্থাৎ 'ইনসান', 'মাতাপিতা' স্থলে 'ওয়ালিদায়েন', 'গুরুজন' স্থলে 'বুজুর্গান', 'ঈশ্বরদত্ত' বা 'ভগবানের দেওয়া' স্থলে 'খোদাদাদ্', 'কবিত্ব' স্থলে 'শাইরী'—এইরূপ বিদেশী শব্দ প্রয়োগে ভাষা অর্দ্ধেকের উপর বাঙ্গালীর কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাষাকে আরবী ফারসী শব্দে ভরপূর করিয়া না দিলে, সেই ভাষা যাহারা বলে তাহাদের ইসলামী পাকাপোক্ত হয় না, এইরূপ এক অনৈতিহাসিক এবং হানিকর ধারণার বশবর্ত্তী ইঁহারা হইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ সংস্কৃত শব্দ বুঝে, অনেক স্থলে আরবী ফারসী শব্দের অর্থ তাহাকে বাঙ্গালী হিন্দুর মত জানিয়া লইয়া তবে বুঝিতে হয়। * * * ভারতের বাহিরে তুর্কীস্থানে ও পারস্য দেশে মুসলমান সাহিত্যিক মহলে চেষ্টা চলিতেছে, তুর্কী ও ফারসী ভাষাদ্বয়কে খাঁটী তুর্কী ও ফারসী ভাষা করিয়া তুলা—তুর্কী হইতে আরবী ফারসীর এবং ফারসী হইতে আরবী শব্দ বহিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে। * * * যুগোপযোগী প্রচেষ্টা বাঙ্গালার বাহিরে আরম্ভ হইয়াছে; পশ্চিমের মুসলমান লেখকগণের মধ্যে ভাষাবিষয়ে নির্ব্বিচারে আরবী ফারসী শব্দগ্রহণের বর্জ্জন করিবার কথাও উঠিয়াছে; কেবল বাঙ্গালা ভাষাতেই কি সেই রীতি গৃহীত হইয়া বাঙ্গালী জন-সাধারণকে ধাঁধায় ফেলা হইবে এবং পাঁচ কোটির উপর লোকের দুর্লভ ভাষাগত ঐক্যকে স্বেচ্ছায় বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে?"

সুনীতি বাবুর উল্লিখিত যুক্তি অত্যন্ত সারগর্ভ এবং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ বিষয়ে তিনি আরও বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে গেলে, এই ভাষার উপরে ভীষণ এক জুলুম হইবে—এবং এই পরিবর্ত্তন দুই এক পুরুষে সম্ভব হইবে না। পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নূতন এক ধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেরূপ নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার মত কল্পনা ও শক্তি, এবং মানসিক প্রবণতা, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামীয় করিয়া ফেলিতে হইবে' এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের আছে কি না জানি না; কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, যেখানে Laissez faire অর্থাৎ 'যা-খুশী-তাই করো' নীতি অবাধে চলিতেছে, সেখানে এই প্রকার মানসিক শক্তি এবং কল্পনার পরিচয় বাঙ্গালা ভাষায় কেহ এখনও দেখান নাই। আরবী-ফারসী-বহুল বাঙ্গালায় যেখানেই শক্তিশালী মুসলমান লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেই তাঁহার সমাদর

হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর নিকটেই হইয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুর কাছেও তাঁহার জনপ্রিয় হইতে বাধা ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত কাজী ইমদাদুল-হক্-সাহেবের 'আবদুল্লাহ'এর মত উপাদেয় সামাজিক উপন্যাসে স্থানে স্থানে যে আরবী-ফারসী-মিশ্র বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোনও হানি হয় নাই, বরঞ্চ তাহার দ্বারা বাস্তবের যথার্থ অনুকরণ হইয়া রস-সৃষ্টিতে সহায়তা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও আরবী-ফারসী-মিশ্র বাঙ্গালা, কবি প্রসঙ্গ-ক্রমে ব্যবহার করিয়াছেন।"

"বিগত শতকের মধ্যে কলিকাতায় মুদ্রিত মুসলমানী কেচ্ছা-সাহিত্যে যে একটা খিচুড়ী বাঙ্গালা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন মুসলমান লেখকগণের ধারাকে অনুসরণ করে না, বাঙ্গালা দেশের কোনও অঞ্চলের মুসলমানদের বা হিন্দুদের মধ্যে প্রচারিত মৌলিক ভাষার সঙ্গে যাহার কোনও সংযোগ নাই, যাহার মধ্যে বিশেষ কৃত্রিমতার সঙ্গে অনাবশ্যক ভাবে উর্দুর শব্দ ও বাক্য রীতির প্রয়োজন করা হয়।"

সুনীতি বাবুর এই যুক্তি সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য। যে সকল মুসলমান লেখক ভাষার জগাখিচুড়ী সৃষ্টি করিতে কৃতসংকল্প, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার হিতকামী বলা চলে না। এ বিষয়ে সুনীতি বাবুর নির্দ্ধারণ উদ্ধৃত হইল—

"বাঙ্গালা ভাষায় যে সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকের পাঠের উদ্দেশ্যে লিখিত হইবে, বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ছাত্রগণের পাঠ্য হইবে, তাহাতে বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় যে রীতি অধুনা প্রচলিত আছে, সেই রীতিই আপাততঃ বহাল থাকুক্। মুসলমান ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় বিশেষ শব্দ আবশ্যক হইলে আরবী ফারসী হইতে বাঙ্গালায় লইতে হইবে—এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু যদি বাঙ্গালা শব্দ (ইহার মধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দও ধরিতে হইবে) অনুরূপ অর্থে ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিলে ভাল হয়। * * * * * বাঙ্গালা-ভাষী হিন্দু-মুসলমানের ভাষাগত ঐক্যের হানি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য দেশের যথার্থ হিতকামী বঙ্গ-সন্তান চেষ্টিত হইবেন; অন্যথায় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মহান্ অনর্থ হইবে।"

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি এবং প্রসারের জন্য যাঁহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, সুনীতি বাবু তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রয়াস যে নানাদিক্ দিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারিগণ সংস্কৃতের ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালা অক্ষরে এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত সুলভ মূল্যে প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে তাহার জাতির প্রাচীন আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদের সহিত পরিচিত হইতে আহ্বান করিয়াছেন; বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া হিন্দু বাঙ্গালী, এই জন্য 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারিগণের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কতকগুলি প্রধান পুস্তকও ইঁহারা প্রকাশিত করিয়াছেন। তদ্রূপ 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা ও অধুনাতন স্বত্বাধিকারী বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য সৃষ্টি, সুলভ গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশিত করিয়া, দেশের মধ্যে সেগুলিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন—অন্যথা বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার নিজের সাহিত্যের সহিত এত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিত কি না সন্দেহ। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের কল্যাণে বাঙ্গালী পাঠক নূতন করিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীর মূলের সৌন্দর্য্য মাতৃভাষার মাধ্যমে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় লাভ করিতে পারিতেছে; এই প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত শেক্স্পিয়রের গ্রন্থাবলীর যে সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে একটি সুসংবাদ, বঙ্গভাষী জাতিকে তজ্জন্য অভিনন্দিত করা হইতে পারে। 'হিতবাদী' যন্ত্র হইতে পূর্ব্বে যে সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্য গ্রন্থ ও অনুবাদ-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, সেগুলির দ্বারাও বঙ্গবাণীর মহিমা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছে।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি

এবং আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহার সম্যক্ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিছু কাল হইতে সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টতর ধারণার অভাব দেখা যাইতেছে। সাহিত্য ইদানীং অনেক ক্ষেত্রে কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুনীতি বাবু বলিয়াছেন—

'প্রগতি-সাহিত্য'—এই নামটি, কয়েক মাস যাবৎ হঠাৎ কতকগুলি 'তরুণ' সাহিত্যিকের প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ নামের সার্থকতা বুঝি না। আমরা এই নাম এবং ইহার মধ্যে নিহিত মনোভাবের গতি অনুসরণ করিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। আদর্শ-বাদ ও বস্তুবানুসারিতা; উদ্দেশ্যশীলতা ও উদ্দেশ্য-হীনতা; শিবের অর্থাৎ কল্যাণের প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য, অথবা অনৈতিক হউক বা প্রতিনৈতিক হউক, কেবল সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্যই সাহিত্য; সমাজ ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিব, কি ব্যক্তিত্বের বাধা-হীন প্রকাশের আবাহন করিব—এই দুই ধরণের মতবাদকে আশ্রয় করিয়া, এই দুই বিভিন্ন শ্রেণী সম্মুখীন হইয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার সংরক্ষণ ও বিধ্বংসনের প্রশ্নও উঠিয়াছে। Art for Art's sake—এই মত লইয়া পুরাতন কলহও উঠিয়াছে। সাহিত্যে পরকীয়াবাদের প্রাবল্য, দুর্নীতির প্রসার প্রভৃতি অনাচার অনেককে বিচলিত করিতেছে।

"বিশ্ব-সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সহিত অল্লাধিক পরিচয়ের ফলে আমার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, যাহা সত্যকার রস-রচনা, তাহা প্রাণধর্ম্মী—প্রাণের স্ফূর্ত্তি যেমন স্বতঃ হইয়া থাকে, এই রূপ রস-রচনার স্ফূর্ত্তিও স্বতঃ হইয়া থাকে; দেশ, কাল, পাত্র—এগুলির প্রভাব বা আবেষ্টনীকে এই রূপ প্রাণধর্ম্মী রচনা বর্জ্জন করিতে পারে না,—এই জন্য ইহা বাস্তবানুসারী হইতে বাধ্য; আবার সেই সঙ্গে, লোকাতিগ দৃষ্টি বা অনুভূতির পরিচয়ও ইহাতে পাই,—অন্যথা বিশ্ব-মানবের আস্বাদনের উপযোগী রসের সৃষ্টি ইহাতে হইতে পারিবে না। সাহিত্য-রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মহাকালের মান-দণ্ডের আবশ্যকতা আছে; যাহা সত্য, যাহা মহৎ, যাহা সার্থক, তাহাই নিরবধি কালের স্রোতের মধ্যে টিকিয়া যায়; যাহা অসত্য, যাহা ক্ষুদ্র, যাহা নিরর্থক, তাহা ক্ষণিকের খ্যাতি পাইয়া বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

"এক প্রকার সাহিত্য আছে, যাহার প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, সেই প্রকার সাহিত্যের উৎস রিরংসা এবং তাহার কাম্য ঐ মনোবৃত্তির উত্তেজন; সেই প্রকার সাহিত্য, সাহিত্য হয় তো আধুনিকতার, বাস্তবের ও শিল্পের দাবী করিয়া সাহিত্য নীতিনিষ্ঠ হইবে না. এই মত-বাদের ধ্বজা উড়াইয়া লোকের কাছে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করে। সেরূপ সাহিত্য জগতে নূতন নহে, তাহা কখনও টিকে নাই, টিকিবেও না; এবং এ যুগে সেইরূপ সাহিত্যের জন্য ধর্ম্মাধিকরণের ব্যবস্থা সব দেশেই অল্প-বিস্তর আছে। যথার্থ বাস্তববাদী সাহিত্য যদি সত্য দৃষ্টির সঙ্গে দর্শনের লক্ষ্য বা আদর্শ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা আমাদের আদরের সহিত গ্রহণীয়।

"সাহিত্যে নীতিনিষ্ঠতা থাকিবে কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে. 'নীতি' বলিলে আমরা কি বুঝিব তাহা জানা দরকার। 'নীতি' শব্দে সাধারণতঃ আমরা বুঝি morality; এই শব্দের যে অর্থ স্বামী বিবেকানন্দ একবার ব্যবহার করিয়াছেন, সেই অর্থ বিশেষ ভাবে আমার মনে লাগে—Morality is that which strenghthens, immorality is that which weakens: যে নীতি মানুষকে জীবনের সব দিকে শক্তি দিতে পারে না, তাহার আবশ্যকতা নাই; এই দৃষ্টিতে বিষয়টা দেখিলে, বোধ হয় সাহিত্যে সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্নের সমাধান অনেকটা সহজ হইয়া উঠে।

"আধুনিক বাস্তব-বাদী সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য, দরদ দিয়া নির্ভীক ভাবে সত্য দৃষ্টির সহিত আমাদের সমাজের পরিস্থিতি দেখানো—আমাদের জীবন-মরণ সমস্যাগুলি পরিস্ফুট করিয়া তোলা।"

বর্ত্তমানে সাধু ও চলিত দুই প্রকার ভাষা লইয়া বাঙ্গালা রচনারীতি চলিতেছে। এই দুই প্রকার ভাষা যে বাঙ্গালা ভাষার ঐক্যের পক্ষে কোন কোন বিষয়ে হানিকর, সুনীতি বাবু তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনার পর তিনি লিখিয়াছেন—

"অনেকে সাধু-ভাষাকে পুরাপুরি অপ্রচল করিয়া দিয়া, একমাত্র চলিত ভাষা, সারা বাঙ্গালা জুড়িয়া সমগ্র বঙ্গভাষীর মধ্যে সাহিত্যের ভাষা হইয়া যায়, ইহা কামনা করেন, অবশেষে এইরূপই হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। আমিও এক সময়ে এইরূপ কামনা করিতাম—মনে করিতাম, বুঝি প্রাচীনপন্থী ভাষা বলিয়া সাধু ভাষার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু আধুনিকতার লেবেল গায়ে লাগাইয়া কতকগুলি তরুণ সাহিত্যিক যে ভাবে এক উৎকট চলিত-ভাষার প্রয়োগ করিতেছেন তাহা দেখিয়া, এবং কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার প্রধান পরীক্ষকের কার্য্য করিবার সময়ে, উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার ছাত্রদের বাঙ্গালা রচনা দেখিয়া, আমার মনে দৃঢ় ধারণা দাঁড়াইয়াছে যে, সাধু-ভাষার উপযোগিতা এখনও যায় নাই,—আরও কিছুকাল ধরিয়া সাধু-ভাষা বাঙ্গালী জাতির সাহিত্য ও মানসিক সংস্কৃতির বাহন থাকিতে পারে; এবং থাকা আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়।

"উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাধু-ভাষায় শিক্ষানবিশী করা, ইহার চর্চ্চা করা এবং বিশুদ্ধ ভাবে অর্থাৎ চলিত-ভাষার সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়া সাধু-ভাষায় লেখা, বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের পক্ষে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্য্য ব্রত বা সাধনা।"

সুনীতি বাবু এক সময়ে চলিত ভাষায় পক্ষপাতী ছিলেন এবং স্বয়ং সেই ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝিয়াছেন যে, সাধু ভাষার উপযোগিতা আছে এবং সাধু ভাষার প্রয়োজন আছে। অভিজ্ঞতাফলে দেখা যায়, চলিত ভাষায় সুন্দর সাহিত্য

অতি অল্পই বাঙ্গালা ভাষায় আছে। কিন্তু সাধু ভাষায় লিখিত সুললিত হৃদয়গ্রাহী সাহিত্যের সংখ্যা এখনও অনেক অধিক। সুনীতি বাবু সাধু ভাষা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেমন বিচারসহ, তেমনই বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয়।

উপসংহারে বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা লইয়া অল্প দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষভাবে বিতর্ক চলিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চলিত ভাষার বানান নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া সাধু ভাষার রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব না করিয়া একক অবস্থান সম্বন্ধে যে অনুমোদন করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিকের বিশেষ আপত্তি আছে। অবশ্য সুনীতি বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বানানের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে হয় ত এমন কথা উঠিতে পারে যে, চলিত ভাষা সম্বন্ধে সুনীতি বাবু যেমন অভিজ্ঞতার ফলে অভিমতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, হয় ত ভবিষ্যতে অভিজ্ঞতার ফলে বানান সম্বন্ধেও মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

সুনীতি বাবুর অভিভাষণ মোটের উপর সুন্দরই হইয়াছে। মতদ্বৈধের অবকাশ থাকিলেও তাঁহার অভিভাষণ যে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণের গবেষণার বিষয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সাহিত্য-শাখার সভাপতি কাজী আবদুল ওদুদ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। "এই ক্ষণ সাহিত্যিকদিগের পক্ষেও পীড়াদায়ক। কারণ, তাঁরা আনন্দজীবী। আনন্দিত পরিবেষ্টন ভিন্ন তাঁরা যেন নিশ্বাসগ্রহণ করতে পারেন না।" তাঁহার আর একটি বক্তব্য, "যুগধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ব'লেই একালের যা যুগধর্ম্ম তা যে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করবে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। * * * তাই একালের বড় সাহিত্যিকদের রচনার উপরে বিজ্ঞানের প্রভাব যেমন প'ড়েছে, তেমনিভাবে পড়েছে গণতন্ত্রের ও ধনসাম্যতন্ত্রের প্রভাব।"

কাজী আবদুল ওদুদ আরও একটু স্পষ্টভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিলে বুঝিবার সুবিধা হইত। ছায়াচ্ছন্ন, কুহেলিকা আবৃত ভঙ্গীতে তিনি বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা করায় অনেকের পক্ষে তাঁহার অভিভাষণের সমস্ত রস অনুভবগম্য হয় নাই।

ইতিহাস-শাখায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের অভিভাষণটি উপভোগ্য হইয়াছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "যে কারণেই হউক, প্রাচীন ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক সাহিত্যের প্রাচুর্য্য ছিল না। * * * মুসলমান আমলের গোড়া হইতেই পণ্ডিতদিগের মধ্যে ইতিহাস সঙ্কলনের আগ্রহ দৃষ্ট হয়। * * * কিন্তু সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ তখনকার ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সচরাচর আকর্ষণ করিতে পারে নাই।"

সুরেন্দ্র বাবু ইতিহাস সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য। "ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।
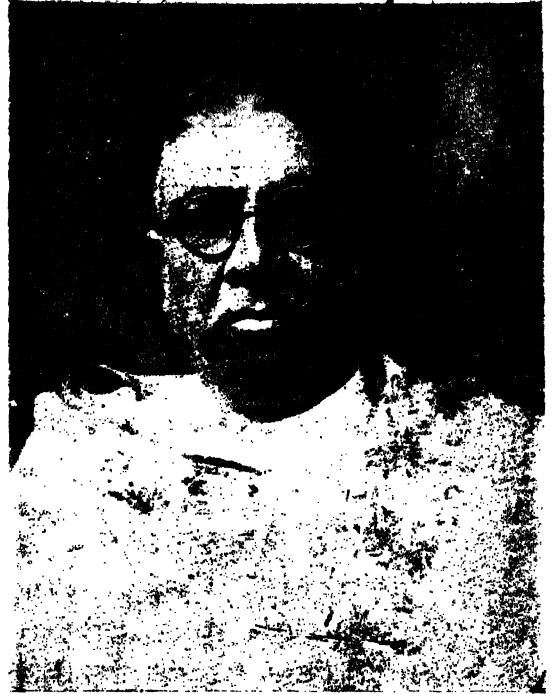
ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী

ঐতিহাসিকরা তথাপি বহুর ভিতর ঐক্যের সন্ধান করিতেছেন।" তিনি বলিয়াছেন, "সরকারী মহাফেজখানার কাগজ-পত্রের উপরই একালের পণ্ডিতরা নির্ভর করেন বেশী। উপাদান সংগ্রহের পূর্ব্বে ইতিহাসরচনার চেষ্টা করা বৃথা।" উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "একাধারে সাহিত্যরথী ও বৈজ্ঞানিক রসস্রষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা, এরূপ ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎ আজ পর্য্যন্ত পাইলাম না।" তবে

তিনি আশা করেন, ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইলে, এক দিন এদেশেও যথার্থ ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হইবে।

ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগীর বিজ্ঞান-শাখার অভিভাষণটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার বক্তব্যের মূল বিষয়—আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক অনেক আছেন, কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের চর্চ্চা খুবই কম। সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-তত্ব শিখাইবার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়াছে। এজন্য তিনি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তন করা আবশ্যক। যন্ত্রশিল্পের পক্ষে দেশের মনোভাবের পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক বলিয়া তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহকে পরিচালিত করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, "কৃষিও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চালিত হইলে, হস্তশিল্পও ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিবে, এবং বড় বড় কল-কারখানায় যন্ত্রশিল্পজাত সকল প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে। তবেই ত দেশ বড় হইবে। আকাশ হইতে দেশে ধনসম্পদ বর্ষিত হয় না।"

শ্রীযুত মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রীর দার্শনিক সভার অভিভাষণটি দীর্ঘ হইলেও শুধু দার্শনিক নহে সহজবোধ্য হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বেশ সরলভাবে দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা করিয়া ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

বণিক্ সমিতি সম্মেলন

২৫শে চৈত্র দিল্লী সহরে বণিক্ সমিতির মহাসম্মেলন বসিয়াছিল। সেই সম্মেলনের সভাপতি মিষ্টার জমায়ত এন্ আর মেটা যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা নানা দিক্ দিয়াই প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান সময়ে আর্থিক সমস্যা সকল সমস্যাকেই অতিক্রম করিয়াছে। সেই জন্য বণিক্ সম্প্রদায়ের কথা আমাদের দেশে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সকল দেশেই এই আর্থিক সমস্যার কথা রাজনীতিক সমস্যার উপরে স্থান লাভ করিতেছে। সেই জন্য আমাদের দেশেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সম্মুখে যে সকল সমস্যা উপস্থিত, তাহার দিকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়িয়াছে।

ভারত সরকারের দুইখানি আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিশেষভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম,—মোটরযান সম্পর্কিত বিল; দ্বিতীয়,—আয়কর বিল। সভাপতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মোটরের সহিত প্রতিযোগিতায় রেলওয়েগুলির আয় কমিয়া যাইতেছে, উহা নিবারণ করিবার জন্যই সরকার এই মোটরযানের অবাধগতি ও কার্য্যসঙ্কোচসাধনে আইনের পাণ্ডুলিপি রচিয়াছেন। এই বিলখানি মোটরযান ব্যবসায়ের সঙ্কোচসাধক বলিয়া অনেকেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সিলেক্ট কমিটী এই বিলখানির কয়েকটি ধারায় কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া উহার কতকটা সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা হইলেও বিলখানি যে আকারে ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেক অসুবিধা ঘটিবে। তবে সভাপতির মতে এই মোটরযান-পরিচালনার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় রেলপথের কর্তৃপক্ষ ইহার উপর অসঙ্গত ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা এই ব্যাপারটা এত সহজ ভাবে লইতে পারিলাম না। প্রথমতঃ যে কয়টি প্রদেশে কংগ্রেস-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সে কয়টি প্রদেশ আপাততঃ কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে সত্য, কিন্তু যেখানে কংগ্রেসের প্রাধান্য নাই, সেখানেই ত বিষম মুস্কিল। ফলে এই আইন জনকল্যাণকর হয় নাই।

নবপ্রবর্ত্তিত আয়কর বিল সম্পর্কে সভাপতি বলিয়াছেন যে, উহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী আইনটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। মূলে উহা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছিল। কিন্তু বণিক্ সমিতির প্রচেষ্টায় বিলখানির কয়েকটি বিশেষ আপত্তিকর ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই আইনে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এবং সম্ভ্রান্তগণের হানিজনক অনেক ধারা আছে। 'মাসিক বসুমতী'তে পূর্ব্বেই আয়কর বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের কথাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন, ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছে। এই বহির্ব্বাণিজ্যে রপ্তানীর আধিক্য হইতেই আমরা বৈদেশিক ঋণ এবং দেয় টাকা দিয়া থাকি। ইহা হ্রাস পাইলে ভারতবাসীর যে বিশেষ ক্ষতি এবং ঘোর অসুবিধা ঘটিবে,

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বে যে উপায়ে বৈদেশিক দেনা পরিশোধ করা হইত, এখন আর সে উপায় নাই। কেবলমাত্র মার্কিণ, গ্রেট-বৃটেন এবং বৃটিশ-উপনিবেশগুলিতে বাণিজ্য বিস্তার করিয়া ভারতকে সেই দেনার টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতের বৈদেশিক দেনা সম্পূর্ণ ইংলণ্ডের নিকট। অতএব ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিয়া ভারতবাসীকে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে হয় ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইবে, অন্যথা বিলাতী পণ্যের আমদানী কমাইয়া দিতে হইবে। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে আমাদের ঐ দেশে যত টাকা দিতে হইবে, সেই পরিমাণ টাকা লাভ থাকা চাই। কিন্তু ইংরেজ ব্যবসাদার জাতি। তাঁহারা এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইতে চাহিবেন না। ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তির ভঙ্গী দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

তিনি বলিয়াছেন যে, ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তির দ্বারা ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। স্বার্থ ত রক্ষিত হইবেই না, বরং স্বার্থহানি ঘটিবে।

তাহার পর ভারতীয় শিল্প-সংরক্ষণ সম্বন্ধেও সভাপতি অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যে ভাবে ভারতীয় টেরিফ বোর্ডের নির্দ্ধারণ অগ্রাহ্য করিতেছেন, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। চিনি, ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং কাগজ সম্বন্ধে টেরিফ বোর্ড যে ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা ভারত সরকার হয় একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন অথবা তাহার কিছু অংশমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার টেরিফ বোর্ডের সুপারিশের কথা চিন্তা করিতে প্রায় এক বৎসর হইতে দেড় বৎসর সময় কাটাইয়া দিয়াছিলেন। এই বিলম্বের জন্য সরকারই প্রধানতঃ দায়ী। তাঁহারা এই অজুহত দিতেছেন যে, ঐ সুপারিশ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে তাঁহাদের অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে, সেই জন্য ঐ সকল শিল্পের অবস্থা বদলাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ সুপারিশগুলি প্রযোজ্য নহে।

সভাপতি বিদেশে যাহাতে ভারতীয় পণ্য অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইতে পারে, তাহার উপায় করিতে বলিয়াছেন। ভারতীয় কারখানায় প্রস্তুত লৌহ, ইস্পাত, বস্ত্র, চিনি, সিমেণ্ট প্রভৃতি যাহাতে আফগান রাজ্যে, ইরাণে, ব্রহ্মদেশে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় এবং মলয় রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিকায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইরাণে এবং আফগান রাজ্যে অন্য দেশজাত পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্যকে পরাজিত হইতে হইতেছে। ভারত সরকারের ইহার উপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সংরক্ষণ-শিল্পের সুযোগ পাইতেছে বলিয়া ভারতে বিদেশী মূলধনে কতকগুলি কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ইনি ভারত সরকারকে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় অবহিত হইবার জন্য সুপরামর্শ দিয়াছেন।

সন্তোষের মহারাজা

মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মাত্র তিনদিন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত থাকিয়া—৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা আলিপুরের 'সন্তোষ-হাউসে' ৭ই চৈত্র রাত্রি ২টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার সন্তোষ গ্রামের জমিদার-বংশে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজা সার মন্মথনাথের জন্ম। সেকালে পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারগণের মধ্যে জাহ্নবী চৌধুরাণীর নাম বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জাহ্নবী চৌধুরাণীর অন্য সরিক বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণীই মন্মথনাথের জননী। পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর মন্মথনাথ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শৈশবেই কলিকাতায় আনীত হইয়াছিলেন। প্রথমে হেয়ার স্কুলে, তাহার পর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তরুণ যৌবন হইতেই মহারাজা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং অষ্টাদশ বৎসর বয়সে লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন।

ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত মন্মথনাথ যে সকল ইংরেজী রচনায় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের অনুবাদ প্রধান। দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠসহোদর সুকবি প্রমথনাথের ন্যায় বঙ্গ-সাহিত্যের সেবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু আমাদের দেশে কোন প্রতিভাবান্ লেখক বিদেশী সাহিত্যের সেবা করিয়া সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারেন নাই। মন্মথনাথ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন।

টাঙ্গাইলে পি, এম, কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি, অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রমথনাথেরও যথেষ্ট উৎসাহ ও আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। টাঙ্গাইলে তাঁহারা জননীর নামে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ তাঁহার অর্থসাহায্যে উপকৃত হইয়াছিল। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণে ৫০ হাজার টাকা দান তাঁহার রাজভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহা তাঁহার ভবিষ্যৎ যশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল।

মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী

মহারাজা ঢাকা জমিদার-কেন্দ্র হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া সেই বৎসরই বাঙ্গালার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, আবগারী ও পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রিত্বলাভ করেন, এ সময় মন্ত্রীর বেতন এই দরিদ্র দেশে বার্ষিক ৬৪ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়া সভাপতি হয়েন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া তিনি যথেষ্ট প্রশংসা ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার তৈলচিত্র কাউন্সিল চেম্বারে এবং আর একখানি টাউন হলে স্থাপিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী-জীবনের সার্থকতা তিনি পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও সমিতির সভাপতি বা সদস্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের প্রথম বাঙ্গালী সভাপতি এবং অলিম্পিক এসোসিয়েসনেরও সভাপতি ছিলেন। ব্যায়ামচর্চ্চায় তিনি উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক তাঁহাকে 'নাইট' এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহাকে 'মহারাজা' খেতাব দান করা হয়।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। কলিকাতায় একটি শিশু-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার চেষ্টাও প্রশংসনীয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রীতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী স্পেনের ভাইস-কন্সল।

মহারাজার কর্ম্মময় জীবনের অবসানে তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনগণকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র

ঠনঠনিয়ার মিত্র-পরিবারের রায় সাহেব জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ৭৬ বৎসর বয়সে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ মিত্র-ভবনে ১৩ই চৈত্র রাত্রে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরখানার সামান্য কেরাণী হইতে প্রতিভা, অধ্যবসায় প্রভাবে অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ রেজিষ্ট্রারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ধর্ম্মানুশীলনে,স্বদেশী শিল্পের উৎসাহদানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত কানাইলাল মিত্র কলিকাতা হাই কোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর সম্মানার্থে ১৪ই চৈত্র বাঙ্গালা সরকারের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগ বন্ধ ছিল।

রায় জলধর সেন বাহাদুর

'ভারতবর্ষের' সুপ্রবীণ সম্পাদক, সর্ব্বজনপরিচিত রায় জলধর সেন বাহাদুর ৮০ বৎসর বয়সে ২৬শে চৈত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।